শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

নতুন সিলেবাস
৩৫তম বিসিএস লিখিত পরীক্ষা
২০০ নম্বরের জন্য

প্রফেসর'স

# বিসিএস বাংলা

প্রথম পত্র ও দ্বিতীয় পত্র

**১০ম-৩৪তম বিসিএস-এর প্রশ্ন সমাধান**

নতুন সিলেবাসে মডেল প্রশ্ন ও উত্তর সংযোজিত

প্রফেসর'স প্রকাশন

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

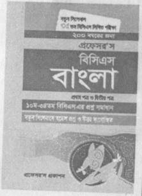

প্রফেসর'স বিসিএস বাংলা

প্রকাশক : জসিম উদ্দিন
প্রফেসর'স প্রকাশন
৩৭/১ দ্বিতীয় তলা, বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

মুদ্রক : সুবর্ণ প্রিন্টার্স, ৩/ক-খ পাটুয়াটুলী লেন, ঢাকা ১১০০
ফোন : ৭১২৪৬৫৩

প্রচ্ছদ : রফিক উল্যাহ, দি ডিজাইনার

পরিবেশক : বর্ণালী বইঘর, ৫৩ নীলক্ষেত, ঢাকা ১২০৫
ফোন : ০১৭১২ ২২৩৮৮৩

মূল্য : ৯০০ টাকা

প্রকাশকাল
প্রথম প্রকাশ : জুন ১৯৯৭
পঞ্চদশ সংস্করণ
মার্চ ২০১৫

Professor's BCS Bangla
Published by Jashim Uddin
Professor's Prokashon, 37/1 (1st Floor)
Banglabazar, Dhaka 1100
Phone : Office 9584436
Sales Center 7125054, 9533029
Email : pp@professorsbd.com
Price : 900.00 Taka

# Syllabus

## বাংলা; পূর্ণমান-২০০

### প্রথম পত্র; পূর্ণমান ১০০

(সাধারণ এবং টেকনিক্যাল/পেশাগত-উভয় ক্যাডারের জন্য)

পূর্ণমান-১০০

| | |
|---|---|
| ১। ব্যাকরণ | ৫ × ৬ = ৩০ |
| ক) শব্দগঠন | |
| খ) বানান/বানানের নিয়ম | |
| গ) বাক্যশুদ্ধি/প্রয়োগ-অপপ্রয়োগ | |
| ঘ) প্রবাদ-প্রবচনের নিহিতার্থ প্রকাশ | |
| ঙ) বাক্যগঠন | |
| ২। ভাব-সম্প্রসারণ | ২০ |
| ৩। সারমর্ম | ২০ |
| ৪। বাংলা ভাষা ও সাহিত্য-বিষয়ক প্রশ্নের উত্তর | ৩০ |

### দ্বিতীয় পত্র; পূর্ণমান ১০০

(শুধুমাত্র সাধারণ ক্যাডারের জন্য)

পূর্ণমান-১০০

| | |
|---|---|
| ১। অনুবাদ (ইংরেজি থেকে বাংলা) | ১৫ |
| ২। কাল্পনিক সংলাপ | ১৫ |
| ৩। পত্রলিখন | ১৫ |
| ৪। গ্রন্থ-সমালোচনা | ১৫ |
| ৫। রচনা | ৪০ |

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

## বইটি কেন আপনার জন্য জরুরি

৩৫তম বিসিএস থেকে নতুন পরীক্ষা পদ্ধতি অনুযায়ী বাংলা প্রথম ও দ্বিতীয় পত্র পরীক্ষা দুই দিনে ৩ ঘণ্টা করে মোট ৬ ঘণ্টার পরিবর্তে এক দিনে ৪ ঘণ্টায় অনুষ্ঠিত হবে। জেনারেল ক্যাডারের পরীক্ষার্থীদের ২০০ নম্বরের পরীক্ষা ৪ ঘণ্টা এবং টেকনিক্যাল/প্রফেশনাল ক্যাডারের পরীক্ষার্থীদের ১০০ নম্বরের পরীক্ষা দিতে হবে ২ ঘণ্টায়। নতুন পরীক্ষা পদ্ধতিতে সময় কমানো হলেও কাল্পনিক সংলাপ, গ্রন্থ-সমালোচনা, অনুবাদের মতো বিষয়গুলো সিলেবাসে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। অন্যদিকে লিখিত পরীক্ষায় গড় ন্যূনতম পাস নম্বর ৫০% এবং কোনো বিষয়ে ৩০% নম্বরের কম পেলে উক্ত বিষয়ে কোনো নম্বর পাননি বলে গণ্য হবে। কিন্তু বাংলা আমাদের মাতৃভাষা বলে আমরা এ বিষয়টিকে কম গুরুত্ব দিয়ে থাকি এবং বিষয়টিতে আশানুরূপ নম্বর পাই না। অথচ অন্য সকল বিষয়ের মতো বাংলাতেও কিছুটা মনোযোগ দিলে এ বিষয়ে ভালো নম্বর পাওয়া যায়, যা মোট নম্বরের সাথে যুক্ত হয়ে কাঙ্ক্ষিত সাফল্য অর্জনে সহায়তা করে। তাই নতুন সিলেবাস ও পরীক্ষা পদ্ধতির দিকে গুরুত্ব দিয়ে পরীক্ষার্থীদের সার্বিক চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে বিশেষভাবে প্রকাশ করা হয়েছে **'প্রফেসর'স বিসিএস বাংলা'** বইটি।

**যেভাবে বিন্যাস করা হয়েছে বইটি**

- ১০ম থেকে ৩৪তম বিসিএস পর্যন্ত সকল প্রশ্নের সমাধান।
- নতুন সিলেবাসের আলোকে ১০ সেট মডেল প্রশ্ন ও উত্তর।
- ব্যাকরণের জটিল বিষয়গুলো সহজবোধ্য ও আধুনিক কৌশল, নিয়ম-কানুন ও পর্যাপ্ত উদাহরণের মাধ্যমে উপস্থাপন।
- গুরুত্বপূর্ণ ও দুর্লভ ভাব-সম্প্রসারণ, সারমর্ম, প্রবাদ-প্রবচনের নিহিতার্থ প্রকাশ, অনুবাদ, কাল্পনিক সংলাপ, গ্রন্থ-সমালোচনাসহ বহু প্রয়োজনীয় বিষয় অন্তর্ভুক্তি।
- বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের বিষয়গুলো আলোচনার পাশাপাশি প্রশ্নোত্তরে উপস্থাপন।
- প্রাতিষ্ঠানিক, ব্যবসায় সংক্রান্ত পত্র ও স্মারকলিপি লেখার কৌশল ও পর্যাপ্ত নমুনা।
- নানা বিষয়ের আপডেট তথ্যসমৃদ্ধ গুরুত্বপূর্ণ ৬০টি প্রাসঙ্গিক প্রবন্ধ বা রচনা।

প্রফেসর'স প্রকাশন সব সময়ই পাঠকের স্বার্থ এবং বিভিন্ন শিক্ষার্থী ও পেশাজীবীদের সাফল্যের প্রতি অধিক গুরুত্ব দিয়েছে। তাই বিগত প্রায় দুই দশক ধরে বিসিএস পরীক্ষার্থীদের কাছে প্রফেসর'স প্রকাশন-এর বইগুলো সাফল্যের স্বর্ণসূত্র হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। আমাদের বিশ্বাস, আমাদের প্রকাশিত অন্যান্য বইয়ের মতো এ বইটিও আপনাদের সাফল্যের ক্ষেত্রে আরো কার্যকরভাবে সহায়তা করবে।

# সূচি

## BCS প্রশ্ন ও সমাধান : ১০ম - ৩৪তম


| | |
|---|---|
| ৩৪তম বিসিএস ২০১৪ | ০৩ |
| ৩৩তম বিসিএস ২০১২ | ১১ |
| ৩২তম বিসিএস ২০১২ (বিশেষ) | ২৩ |
| ৩১তম বিসিএস ২০১১ | ৩০ |
| ৩০তম বিসিএস ২০১১ | ৪২ |
| ২৯তম বিসিএস ২০১০ | ৫২ |
| ২৮তম বিসিএস ২০০৯ | ৬৩ |
| ২৭তম বিসিএস ২০০৬ | ৭৩ |
| ২৫তম বিসিএস ২০০৫ | ৮০ |
| ২৪তম বিসিএস ২০০৩ | ৮৪ |
| ২৩তম বিসিএস ২০০১ (বিশেষ) | ৮৭ |
| ২২তম বিসিএস ২০০১ | ৯০ |
| ২১তম বিসিএস ১৯৯৯ | ৯৩ |
| ২০তম বিসিএস ১৯৯৯ | ৯৬ |
| ১৮তম বিসিএস ১৯৯৮ | ৯৯ |
| ১৭তম বিসিএস ১৯৯৬ | ১০২ |
| ১৫তম বিসিএস ১৯৯৪ | ১০৫ |
| ১৩তম বিসিএস ১৯৯২ | ১০৯ |
| ১১তম বিসিএস ১৯৯১ | ১১৩ |
| ১০ম বিসিএস ১৯৯০ | ১১৭ |


## বাংলা ▸▸ প্রথম পত্র; পূর্ণমান ১০০

(সাধারণ এবং টেকনিক্যাল/পেশাগত-উভয় ক্যাডারের জন্য)

### ০১ । বাংলা ব্যাকরণ । মান ৩০


| | |
|---|---|
| ক. শব্দগঠন | ০৩ |
| ১. সন্ধির সাহায্যে শব্দগঠন | ০৪ |
| ২. উপসর্গযোগে শব্দগঠন | ০৭ |

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

## সূচি


৩. প্রত্যয়যোগে শব্দগঠন ... ১১
৪. সমাসের সাহায্যে শব্দগঠন ... ১৪
৫. পদ পরিবর্তনের মাধ্যমে শব্দগঠন ... ১৬
৬. দ্বিরুক্তির সাহায্যে শব্দগঠন ... ১৭

খ. বানান/বানানের নিয়ম ... ১৯
বাংলা একাডেমির প্রমিত বাংলা বানানের নিয়ম ... ১৯
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের বানানরীতি ... ১৯
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়-প্রবর্তিত বাঙ্গালা বানানের নিয়ম, ১৯৩৬ ... ২৬
বাংলা বানানের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ নিয়ম ... ৩০
কিছু জটিল শব্দের বানান ... ৩১
আরও যেসব শব্দের বানান জানা জরুরি ... ৩২
বানান ও ভাষারীতি বিষয়ক শুদ্ধিকরণ ... ৩৭

গ. বাক্যশুদ্ধি/প্রয়োগ-অপপ্রয়োগ ... ৩৯
i. বাক্যশুদ্ধি
ণ-ত্ব ও ষ-ত্ব বিধানঘটিত অশুদ্ধি/ ভুল ... ৪০
সন্ধিঘটিত ভুল ... ৪১
বচনঘটিত ভুল ... ৪৩
পুরুষ ও স্ত্রীবাচক শব্দঘটিত অশুদ্ধি ... ৪৪
প্রত্যয়ঘটিত কিছু অশুদ্ধ বাক্যের শুদ্ধিকরণ ... ৪৬
বিভক্তিজনিত অশুদ্ধি ... ৪৬
সমাসঘটিত অশুদ্ধি ... ৪৭
শব্দ প্রয়োগজনিত শুদ্ধিকরণ ... ৪৭
বাক্যের পদক্রমজনিত অশুদ্ধি ... ৫০
প্রবাদ-প্রবচনজনিত অশুদ্ধি ... ৫২
বাংলা একাডেমির প্রমিত বাংলা বানানের নিয়ম ... ৫২
সাধু ও চলিত ভাষারীতির মিশ্রণজনিত ভুল ... ৫৫
ii. প্রয়োগ-অপপ্রয়োগ
বহুবচনের অপপ্রয়োগজনিত ভুল ... ৫৭
শব্দের অপপ্রয়োগজনিত ভুল ... ৫৭
শব্দের বানানগত অশুদ্ধি/অপপ্রয়োগ ... ৬০
শব্দের গঠনগত অপপ্রয়োগ ... ৬০
প্রায় সমোচ্চারিত শব্দের বানান ... ৬১
বাক্যে শব্দের অশুদ্ধ ও শুদ্ধ প্রয়োগ ... ৬২
প্রচার-মাধ্যমে ভাষার অপপ্রয়োগ ... ৬২
সম্ভাব্য বাক্য শুদ্ধিকরণ ও প্রয়োগ-অপপ্রয়োগ ... ৬৪
বিগত বিসিএস পরীক্ষার প্রশ্ন সমাধান ... ৭৫


## সূচি


ঘ. প্রবাদ-প্রবচনের নিহিতার্থ প্রকাশ ... ৮৬
বাংলা সাহিত্যের প্রবাদ-প্রবচনের জনপ্রিয়তার কারণ ... ৮৬
বাক্য দিয়ে প্রবাদ-প্রবচনের নিহিতার্থ প্রকাশ ... ৮৭
প্রবাদ-প্রবচনের কতিপয় নমুনা ... ৯৭
বিগত বিসিএস পরীক্ষার প্রশ্ন সমাধান : প্রবাদ-প্রবচন ... ১০৫

ঙ. বাক্যগঠন ... ১০৭
সার্থক বাক্যের লক্ষণসমূহ ... ১১০
বাক্যের গঠনগত দিক ... ১১১
বাক্য পরিবর্তন ... ১১২
অর্থানুসারে বাক্যের শ্রেণিবিন্যাস ... ১১৫


### ০২ । ভাব-সম্প্রসারণ । মান ২০


সাধারণ আলোচনা ... ১১৭
ভাব-সম্প্রসারণ কথাটির তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ ... ১১৭
ভাব-সম্প্রসারণের প্রয়োজনীয়তা ... ১১৭
ভাব-সম্প্রসারণের প্রক্রিয়া ... ১১৭

গুরুত্বপূর্ণ ভাব-সম্প্রসারণ
১. অধর্মের ফল হইতে নিষ্কৃতি নাই ... ১১৯
২. অর্থই অনর্থের মূল ... ১১৯
৩. অনুকরণের দ্বারা পরের ভাব আপন হয় না ... ১২০
অর্জন না করলে কোন বস্তুই নিজের হয় না
৪. অসি অপেক্ষা মসী অধিকতর শক্তিমান ... ১২০
৫. অর্থসম্পত্তির বিনাশ আছে কিন্তু জ্ঞানসম্পদ কখনো বিনষ্ট হয় না ... ১২১
৬. অধিকার পাওয়া এবং অধিকারী হওয়া এক বস্তু নয় ... ১২১
৭. অন্যের পাপ গণনার আগে নিজের পাপ গোণ ... ১২২
৮. অনেক কিছু ভাবার চেয়ে অল্প কিছু করাই শ্রেয় ... ১২২
৯. আপনি আচরি ধর্ম পরের বোঝাও ... ১২২
১০. আলস্য এক ভয়াবহ ব্যাধি ... ১২৩
১১. ইচ্ছা থাকলে উপায় হয় ... ১২৩
১২. উত্তম নিশ্চিন্তে চলে অধমের সাথে/তিনি মধ্যম যিনি চলেন তফাতে ... ১২৪
১৩. এমন অনেক দুঃখ আছে যাকে ভোলার মতো দুঃখ আর নেই ... ১২৪
১৪. কাক কোকিলের একই বর্ণ/স্বরে কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন ... ১২৫
১৫. কঠোরতার সঙ্গে কোমলতার সমাবেশ ব্যতীত মনুষ্যচরিত্র সম্পূর্ণতা পায় না ... ১২৬
১৬. কীর্তিমানের মৃত্যু নাই ... ১২৬
১৭. কার্পণ্য ও মিতব্যয়িতা এক কথা নয়। এই দুইকে এক মনে করা নিতান্তই ভ্রম ... ১২৭
১৮. গতিই জীবন, স্থিতিতে মৃত্যু ... ১২৭
১৯. ঘুমিয়ে আছে শিশুর পিতা সব শিশুদের অন্তরে ... ১২৮

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

## সূচি


২০. চরিত্র জীবনের অলংকার ও অমূল্য সম্পত্তি ........ ১২৮
২১. চকচক করলেই সোনা হয় না ........ ১২৮
২২. জ্ঞানই শক্তি ........ ১২৯
২৩. জ্ঞান মানুষের মধ্যে সকলের চেয়ে বড় ঐক্য ........ ১২৯
২৪. জীবনের জন্য মৃত্যু, মৃত্যুর জন্য জীবন নয় ........ ১৩০
২৫. জীবনের কাছ থেকে পালানো সহজ, তার সঙ্গে লড়ে জয়ী হওয়াই কঠিন ........ ১৩০
২৬. জন্ম হক যথা তথা কর্ম হোক ভালো ........ ১৩১
২৭. তুমি অধম, তাই বলিয়া আমি উত্তম হইব না কেন? ........ ১৩১
২৮. তরুলতা সহজেই তরুলতা, পশুপাখি সহজেই পশুপাখি, কিন্তু মানুষ প্রাণপণ চেষ্টায় তবে মানুষ ........ ১৩২
২৯. দাও ফিরে সে অরণ্যে, লও এ নগর ........ ১৩২
৩০. দুর্নীতি জাতীয় জীবনে অভিশাপ স্বরূপ ........ ১৩৩
৩১. দুর্জন বিদ্বান হইলেও পরিত্যাজ্য ........ ১৩৩
৩২. দুঃখের মতো এত বড় পরশপাথর আর নেই ........ ১৩৪
৩৩. ধর্মের ঢাক আপনি বাজে ........ ১৩৪
৩৪. নীচ যদি উচ্চভাসে, সুবুদ্ধি উড়ায়ে হেসে ........ ১৩৫
৩৫. নতুনই পুরাতনকে রক্ষা করে থাকে। পুরাতনের মাঝেই নতুনের বাস ........ ১৩৫
৩৬. নদী কভু পান নাহি করে নিজ জল,/তরুগণ নাহি খায় নিজ নিজ ফল। ........ ১৩৬
৩৭. নাম মানুষকে বড় করে না, মানুষই নামকে বড় করে তোলে ........ ১৩৬
৩৮. নিরক্ষরতা দুর্ভাগ্যের প্রসূতি ........ ১৩৭
৩৯. প্রীতিহীন হৃদয় আর প্রত্যয়হীন কর্ম দুই-ই অসার্থক ........ ১৩৭
৪০. পথ পথিকের সৃষ্টি করে না, পথিকই পথ সৃষ্টি করে ........ ১৩৮
৪১. পরিশ্রমই সৌভাগ্যের প্রসূতি ........ ১৩৮
৪২. প্রয়োজনীয়তাই উদ্ভাবনের জনক ........ ১৩৯
৪৩. পাপীকে নয়, পাপকে ঘৃণা কর ........ ১৩৯
৪৪. বিদ্যার সঙ্গে সম্পর্কহীন জীবন অন্ধ এবং জীবনের সঙ্গে সম্পর্কহীন বিদ্যা পঙ্গু ........ ১৪০
৪৫. বিদ্যার সাধনা শিষ্যকে নিজে অর্জন করতে হয়, গুরু উত্তরসাধক মাত্র ........ ১৪১
৪৬. বুদ্ধি যার বল তার ........ ১৪১
৪৭. বিত্ত হতে চিত্ত বড় ........ ১৪১
৪৮. বন্দি যেমন বদ্ধ বিচারকও তেমনি বদ্ধ ........ ১৪২
৪৯. বন থেকে জানোয়ার তুলে আনা যায়, কিন্তু জানোয়ারের মন থেকে বন তুলে ফেলা যায় না ........ ১৪২
৫০. বন্যেরা বনে সুন্দর; শিশুরা মাতৃক্রোড়ে ........ ১৪৩
৫১. বিশ্রাম কাজের অঙ্গ এক সঙ্গে গাঁথা
নয়নের অংশ যেমন নয়নের পাতা ........ ১৪৩
৫২. ভোগে সুখ নাই, কর্ম সম্পাদনেই প্রকৃত সুখ ........ ১৪৪
৫৩. মঙ্গল করিবার শক্তিই ধন, বিলাস ধন নহে ........ ১৪৪
৫৪. মুকুট পরা শক্ত, কিন্তু মুকুট ত্যাগ আরো কঠিন ........ ১৪৫
৫৫. মিথ্যা শুনিনি ভাই
এই হৃদয়ের চেয়ে বড় কোন মন্দির কাবা নাই ........ ১৪৫


## সূচি


৫৬. মানুষ আপনার ঘর আপনি রচনা করে ........ ১৪৬
৫৭. যে সমাজ গতিবিশিষ্ট, সেই সমাজ উন্নতিশীল ........ ১৪৬
৫৮. যে জাতি জীবন হারা অচল অসাড়
পদে পদে বাঁধে তার জীর্ণ লোকাচার ........ ১৪৭
৫৯. যে নৌকা হালের শাসন মানে না, তাকে বেসামাল হতেই হয় ........ ১৪৭
৬০. যারে তুমি নিচে ফেল, সে তোমারে বাঁধিছে যে নিচে,
পশ্চাতে রেখেছ যারে, সে তোমারে পশ্চাতে টানিছে ........ ১৪৮
৬১. যৌবনে অর্জিত সুখ অল্প, কিন্তু সুখের আশা অপরিমিত ........ ১৪৮
৬২. যে সহে সে রহে ........ ১৪৮
৬৩. শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড ........ ১৪৯
৬৪. শিক্ষাই শক্তি শিক্ষাই মুক্তি ........ ১৫০
৬৫. সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই ........ ১৫০
৬৬. সবলের পরিচয় আত্মপ্রসারে আর দুর্বলের পরিচয় আত্মগোপনে ........ ১৫১
৬৭. সাহিত্য জাতির দর্পণ স্বরূপ ........ ১৫২
৬৮. সততাই সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা বা নীতি ........ ১৫২
৬৯. সুশিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রই স্বশিক্ষিত ........ ১৫৩
৭০. সঞ্চয়ই উন্নয়নের মূল চাবিকাঠি ........ ১৫৪
৭১. সাধনা নাই, যাতনা নাই ........ ১৫৪
৭২. স্পষ্টভাষী শত্রু নির্বাক মিত্র অপেক্ষা ভালো ........ ১৫৪
৭৩. সৌজন্যই সংস্কৃতির পরিচয় ........ ১৫৫
৭৪. হাতে কাজ করায় অগৌরব নাই,/অগৌরব হয় মিথ্যায়, মূর্খতায় ........ ১৫৫
৭৫. ক্ষুদ্রত্বের মধ্যেও মহত্ব আছে ........ ১৫৬
বিগত বিসিএস পরীক্ষার প্রশ্ন সমাধান : ভাবসম্প্রসারণ ........ ১৫৭


### ০৩ । সারমর্ম । মান ২০


গুরুত্বপূর্ণ সারমর্ম ........ ১৭৯
বিগত বিসিএস পরীক্ষার প্রশ্ন সমাধান : সারাংশ/সারমর্ম ........ ২৬০


### ০৪ । বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক প্রশ্নের উত্তর । মান ৩০

#### ক. বাংলা সাহিত্যের যুগবিভাগ


ক. প্রাচীন যুগ বা আদি যুগ ........ ২৭৬
খ. মধ্যযুগ ........ ২৭৬
গ. আধুনিক যুগ ........ ২৭৭


#### খ. প্রাচীন যুগ ও চর্যাপদ


⊙ প্রাচীন যুগ ও চর্যাপদ ........ ২৭৯
⊙ চর্যাপদের কবি ........ ২৭৯
⊙ মডেল প্রশ্ন ........ ২৮১

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

## সূচি

### গ. মধ্যযুগ


- ⊙ অন্ধকার যুগ ........ ২৮৩
- ⊙ শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ........ ২৮৪
- ⊙ বৈষ্ণব পদাবলী ........ ২৮৫
- ⊙ জীবনী সাহিত্য ........ ২৮৮
- ⊙ মর্সিয়া সাহিত্য ........ ২৮৯
- ⊙ নাথ সাহিত্য ........ ২৯০
- ⊙ মঙ্গলকাব্য ........ ২৯১
- ⊙ অনুবাদ সাহিত্য ও মহাকাব্য ........ ২৯৫
- ⊙ রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান ........ ২৯৯
- ⊙ আরাকান রাজসভায় বাংলাসাহিত্য ........ ৩০২
- ⊙ পৃষ্ঠপোষক ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য ........ ৩০৩
- ⊙ লোকসাহিত্য ........ ৩০৫
- ⊙ শায়ের ও কবিওয়ালা ........ ৩০৭


### ঘ. আধুনিক যুগ


- ⊙ বাংলা গদ্যের উন্মেষপর্ব ........ ৩০৯
- ⊙ ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ ও বাংলা গদ্য ........ ৩১১
- ⊙ পত্রিকা ও সাময়িকপত্র ........ ৩১৪
- ⊙ গুরুত্বপূর্ণ পত্রিকার নাম ও সম্পাদক ........ ৩১৪
- ⊙ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-১৮৯১) ........ ৩২০
- ⊙ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৮৯৪) ........ ৩২৩
- ⊙ মাইকেল মধুসূদন দত্ত (১৮২৪-১৮৭৩) ........ ৩২৬
- ⊙ মীর মশাররফ হোসেন (১৮৪৭-১৯১২) ........ ৩৩১
- ⊙ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১) ........ ৩৩৪
- ⊙ দীনবন্ধু মিত্র (১৮৩০-১৮৭৩) ........ ৩৪৬
- ⊙ কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬) ........ ৩৪৭
- ⊙ জসীমউদ্‌দীন (১৯০৩-১৯৭৬) ........ ৩৫২
- ⊙ বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন (১৮৮০-১৯৩২) ........ ৩৫৪
- ⊙ ফররুখ আহমদ (১৯১৮-১৯৭৪) ........ ৩৫৭
- ⊙ কায়কোবাদ (১৮৫৭-১৯৫১) ........ ৩৫৮


### আধুনিক ও সমসাময়িক কবি, লেখক ও নাট্যকার


- ⊙ আখতারুজ্জামান ইলিয়াস (১৯৪৩-১৯৯৭) ........ ৩৫৯
- ⊙ আবু ইসহাক (১৯২৬-২০০২) ........ ৩৬০
- ⊙ আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ (১৯৩৪-২০০১) ........ ৩৬১
- ⊙ আবুল ফজল (১৯০৩-১৯৮৩) ........ ৩৬১
- ⊙ আল মাহমুদ (১৯৩৬-) ........ ৩৬৩
- ⊙ আলাউদ্দিন আল আজাদ (১৯৩২-২০০৯) ........ ৩৬৪


## সূচি


- ⊙ আশরাফ সিদ্দিকী (১৯২৭-) ........ ৩৬৫
- ⊙ আহমদ শরীফ (১৯২১-১৯৯৯) ........ ৩৬৬
- ⊙ আহসান হাবীব (১৯১৭-১৯৮৫) ........ ৩৬৬
- ⊙ কাজী মোতাহার হোসেন (১৮৯৭-১৯৮১) ........ ৩৬৭
- ⊙ খান মুহাম্মদ মঈনুদ্দীন (১৯০১-১৯৮১) ........ ৩৬৮
- ⊙ গোলাম মোস্তফা (১৮৯৭-১৯৬৪) ........ ৩৬৯
- ⊙ জহির রায়হান (১৯৩৫-১৯৭২) ........ ৩৬৯
- ⊙ জাহানারা ইমাম (১৯২৯-১৯৯৪) ........ ৩৭০
- ⊙ বন্দে আলী মিয়া (১৯০৬-১৯৭৯) ........ ৩৭১
- ⊙ বুদ্ধদেব বসু (১৯০৮-১৯৭৪) ........ ৩৭২
- ⊙ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯০৮-১৯৫৬) ........ ৩৭৩
- ⊙ মুনীর চৌধুরী (১৯২৫-১৯৭১) ........ ৩৭৪
- ⊙ মুহম্মদ এনামুল হক (১৯০৬-১৯৮২) ........ ৩৭৫
- ⊙ মুহম্মদ আবদুল হাই (১৯১৯-১৯৬৯) ........ ৩৭৬
- ⊙ ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ (১৮৮৫-১৯৬৯) ........ ৩৭৭
- ⊙ শওকত ওসমান (১৯১৭-১৯৯৮) ........ ৩৭৮
- ⊙ শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৭৬-১৯৩৮) ........ ৩৭৯
- ⊙ শহীদুল্লাহ কায়সার (১৯২৭-১৯৭১) ........ ৩৮১
- ⊙ শামসুর রাহমান (১৯২৯-২০০৬) ........ ৩৮২
- ⊙ সিকান্দার আবু জাফর (১৯১৯-১৯৭৫) ........ ৩৮৪
- ⊙ সুফিয়া কামাল (১৯১১-১৯৯৯) ........ ৩৮৫
- ⊙ সৈয়দ আলী আহসান (১৯২০-২০০২) ........ ৩৮৬
- ⊙ সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ (১৯২২-১৯৭১) ........ ৩৮৬
- ⊙ সৈয়দ শামসুল হক (১৯৩৫-) ........ ৩৮৭
- ⊙ হাসান হাফিজুর রহমান (১৯৩২-১৯৮৩) ........ ৩৮৮
- ⊙ হুমায়ূন আহমেদ (১৯৪৮-২০১২) ........ ৩৮৯
- ⊙ প্রকৃত নাম, ছদ্মনাম ও উপাধি ........ ৩৯২


## বাংলা ▸▸ দ্বিতীয় পত্র; পূর্ণমান ১০০

(শুধুমাত্র সাধারণ ক্যাডারের জন্য)

### ০১ । অনুবাদ (ইংরেজি থেকে বাংলা) । মান ১৫


০১. ইংরেজি থেকে বাংলা অনুবাদের কৌশল ........ ৩৯৭
০২. অনুশীলনীর জন্য গুরুত্বপূর্ণ অনুবাদ ........ ৪০০
০৩. বিভিন্ন নিয়োগ পরীক্ষায় আসা অনুবাদ ........ ৪০৮
বিসিএস পরীক্ষায় আসা অনুবাদ (ইংরেজি পরীক্ষা) ........ ৪০৮
পিএসসির বিভিন্ন নিয়োগ পরীক্ষায় আসা অনুবাদ ........ ৪১২
ব্যাংক নিয়োগ পরীক্ষায় আসা অনুবাদ ........ ৪২৭

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

# সূচি

## ০২। কাল্পনিক সংলাপ । মান ১৫


⊙ সংলাপ রচনার কৌশল ........ ৪৩৭
⊙ নমুনা সংলাপ ........ ৪৩৮
০১. বিজ্ঞান ও বিজ্ঞান-মনস্কতা বিষয়ে শিক্ষক ও ছাত্রের মধ্যে সংলাপ ........ ৪৩৮
০২. দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি নিয়ে দুই বান্ধবীর সংলাপ ........ ৪৩৯
০৩. ভবিষ্যৎ জীবন নিয়ে দুই পরীক্ষার্থী বন্ধুর সংলাপ ........ ৪৪০
০৪. চিকিৎসক ও রোগীর সংলাপ ........ ৪৪১
০৫. গ্রীষ্মের ছুটিতে কোথায় বেড়াতে যাওয়া হবে তার পরিকল্পনা নিয়ে দু বান্ধবীর সংলাপ ........ ৪৪৩
০৬. বইমেলা নিয়ে দুই বন্ধুর মধ্যে সংলাপ ........ ৪৪৩
০৭. সংস্কৃতি ও অপসংস্কৃতি নিয়ে দুই বন্ধুর সংলাপ ........ ৪৪৪
০৮. ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থী ও ভর্তি কর্মকর্তা : প্রসঙ্গ কলেজ ভর্তির প্রক্রিয়া ........ ৪৪৫
০৯. দুই বন্ধু নিশি ও নিপা। বিয়ে বাড়িতে অনুষ্ঠানের প্রসঙ্গ নিয়ে তাদের মধ্যে সংলাপ ........ ৪৪৬
১০. বাবা এবং ছেলের মধ্যে পড়াশুনো নিয়ে সংলাপ ........ ৪৪৭
১১. বদমেজাজি মালিক জালাল তালুকদার ও ধুরন্ধর ড্রাইভার শাকিল। গাড়ির ক্রমবর্ধমান জ্বালানি খরচ নিয়ে তাদের মধ্যে সংলাপ ........ ৪৪৭
১২. নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের উচ্চাভিলাষী কন্যা লাবলী ও নিরীহ মা : প্রসঙ্গ হিন্দি ছবির নায়িকা হওয়ার প্রবল আত্মবিশ্বাস ........ ৪৪৮
১৩. পার্সেল প্রেরক শিপলু ও পোস্টমাস্টার : প্রসঙ্গ বিদেশে পার্সেল পাঠানো ........ ৪৪৯
১৪. ব্যায়াম করার উপকারিতা নিয়ে দুই বন্ধুর মধ্যে সংলাপ ........ ৪৫০
১৫. একজন শিক্ষক এবং একজন ডাক্তারের কাজের সাদৃশ্য নিয়ে দুই ছাত্রের মধ্যে সংলাপ ........ ৪৫০
১৬. মা ও মেয়ের মধ্যে সংলাপ যেখানে মেয়ে তার হোস্টেল জীবন সম্পর্কে মাকে বলছে ........ ৪৫১
১৭. বিনা বেতনে অধ্যয়নের সুযোগ প্রার্থনা করে একজন ছাত্রের কলেজ অধ্যক্ষের সাথে সংলাপ ........ ৪৫২
১৮. নিয়োগদাতার সাথে চাকরিপ্রার্থীর ভাইভার সংলাপ ........ ৪৫২
১৯. অনেকদিন পরে দেখা হয়েছে এমন দুই বন্ধুর মধ্যে সংলাপ ........ ৪৫৩
২০. স্কুলের বার্ষিক ক্রীড়া বিষয়ে দুই বন্ধুর সংলাপ ........ ৪৫৪


## ০৩। পত্রলিখন । মান ১৫


⊙ অফিস সংক্রান্ত ও আধা-প্রাতিষ্ঠানিক পত্র ........ ৪৫৬
⊙ ব্যক্তিগতপত্র ........ ৪৭৪
⊙ স্মারকলিপি ........ ৪৮১
⊙ ব্যবসা সংক্রান্ত পত্র ........ ৪৯৩
⊙ সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্য পত্র ........ ৫০৩


## ০৪। গ্রন্থ-সমালোচনা । মান ১৫

### প্রাচীন ও মধ্যযুগ


০১. চর্যাপদ ........ ৫২৩
০২. শূন্যপুরাণ ........ ৫২৪
০৩. শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ........ ৫২৫
০৪. মঙ্গলকাব্য ........ ৫২৬
০৫. পদ্মাবতী ........ ৫২৮


# সূচি


০৬. ইউসুফ জোলেখা ........ ৫২৯
০৭. লাইলী মজনু ........ ৫২৯
০৮. মৈমনসিংহ-গীতিকা ........ ৫৩০


### আধুনিক যুগ

উপন্যাস


০১. আলালের ঘরের দুলাল ........ ৫৩১
০২. দুর্গেশনন্দিনী ........ ৫৩১
০৩. কপালকুণ্ডলা ........ ৫৩২
০৪. কৃষ্ণকান্তের উইল ........ ৫৩৩
০৫. হুতোম প্যাঁচার নকশা ........ ৫৩৩
০৬. বৌঠাকুরাণীর হাট ........ ৫৩৪
০৭. গোরা ........ ৫৩৪
০৮. যোগাযোগ ........ ৫৩৫
০৯. শেষের কবিতা ........ ৫৩৫
১০. চার-অধ্যায় ........ ৫৩৬
১১. বিষাদ-সিন্ধু ........ ৫৩৬
১২. আনোয়ারা ........ ৫৩৮
১৩. গৃহদাহ ........ ৫৩৮
১৪. শ্রীকান্ত ........ ৫৩৯
১৫. দেবদাস ........ ৫৪০
১৬. পদ্মরাগ ........ ৫৪১
১৭. আবদুল্লাহ ........ ৫৪১
১৮. পথের পাঁচালী ........ ৫৪২
১৯. হাঁসুলীবাঁকের উপকথা ........ ৫৪২
২০. কবি ........ ৫৪৩
২১. বাঁধন-হারা ........ ৫৪৪
২২. মৃত্যু-ক্ষুধা ........ ৫৪৪
২৩. পাপের সন্তান ........ ৫৪৫
২৪. পদ্মানদীর মাঝি ........ ৫৪৫
২৫. পুতুলনাচের ইতিকথা ........ ৫৪৬
২৬. জননী ........ ৫৪৭
২৭. তিতাস একটি নদীর নাম ........ ৫৪৮
২৮. ক্রীতদাসের হাসি ........ ৫৪৯
২৯. আদিগন্ত ........ ৫৫০
৩০. লালসালু ........ ৫৫০
৩১. চাঁদের অমাবস্যা ........ ৫৫১
৩২. কাঁদো নদী কাঁদো ........ ৫৫২
৩৩. জগদ্দল ........ ৫৫২
৩৪. উত্তম পুরুষ ........ ৫৫৩
৩৫. সূর্য-দীঘল বাড়ী ........ ৫৫৩
৩৬. কাশবনের কন্যা ........ ৫৫৩
৩৭. সারেং বৌ ........ ৫৫৪
৩৮. সংশপ্তক ........ ৫৫৪
৩৯. রাইফেল রোটি আওরাত ........ ৫৫৫
৪০. কর্ণফুলী ........ ৫৫৫
৪১. একটি ফুলের জন্য ........ ৫৫৬
৪২. হাজার বছর ধরে ........ ৫৫৬
৪৩. আরেক ফাল্গুন ........ ৫৫৭
৪৪. প্রদোষে প্রাকৃতজন ........ ৫৫৮
৪৫. পিঙ্গল আকাশ ........ ৫৫৮
৪৬. যাত্রা ........ ৫৫৯
৪৭. বটতলার উপন্যাস ........ ৫৬০
৪৮. ঘর মন জানালা ........ ৫৬০
৪৯. জীবন আমার বোন ........ ৫৬১
৫০. খাঁচায় ........ ৫৬১
৫১. ওঙ্কার ........ ৫৬২
৫২. চিলেকোঠার সেপাই ........ ৫৬২
৫৩. খোয়াবনামা ........ ৫৬৩
৫৪. হাঙ্গর নদী গ্রেনেড ........ ৫৬৫
৫৫. পোকামাকড়ের ঘরবসতি ........ ৫৬৫
৫৬. ছাপ্পান্ন হাজার বর্গমাইল ........ ৫৬৬
৫৭. নির্বাসন ........ ৫৬৬
৫৮. জোছনা ও জননীর গল্প ........ ৫৬৭
৫৯. পুবের সূর্য ........ ৫৬৭
৬০. নূরজাহান ........ ৫৬৮
৬১. সোনালী মুখোশ ........ ৫৬৮


নাটক


০১. কৃষ্ণকুমারী ........ ৫৬৯
০৩. বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ ........ ৫৭০
০৪. একেই কি বলে সভ্যতা ........ ৫৭১
০৫. টিনের তলোয়ার ........ ৫৭১
০৬. নীল-দর্পণ ........ ৫৭২
০৭. সধবার একাদশী ........ ৫৭৩
০৮. বিসর্জন ........ ৫৭৩
০৯. চিত্রাঙ্গদা ........ ৫৭৪

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

# সূচি

১০. ডাকঘর ... ৫৭৪
১১. রক্তকরবী ... ৫৭৫
১২. জমীদার দর্পণ ... ৫৭৫
১৩. সাজাহান ... ৫৭৬
১৪. নবান্ন ... ৫৭৭
১৫. নেমেসিস ... ৫৭৮
১৬. সিরাজ-উ-দ্দৌলা ... ৫৭৮
১৭. উজানে মৃত্যু ... ৫৭৯
১৭. বহিপীর ... ৫৮০
১৮. রক্তাক্ত প্রান্তর ... ৫৮০
১৯. কবর ... ৫৮২
২০. নূরলদীনের সারা জীবন ... ৫৮২
২১. পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায় ... ৫৮৩
২২. সুবচন নির্বাসনে ... ৫৮৩
২৩. কিত্তনখোলা ... ৫৮৪

কাব্যগ্রন্থ

০১. মেঘনাদবধ কাব্য ... ৫৮৫
০২. বঙ্গসুন্দরী ... ৫৮৬
০৩. গীতাঞ্জলি ... ৫৮৬
০৪. মানসী ... ৫৮৭
০৫. বনফুল ... ৫৮৮
০৬. সোনার তরী ... ৫৮৮
০৭. ক্ষণিকা ... ৫৮৯
০৮. মহাশ্মশান ... ৫৯০
০৯. অনল প্রবাহ ... ৫৯১
১০. অগ্নিবীণা ... ৫৯১
১১. দোলন-চাঁপা ... ৫৯২
১২. বিষের বাঁশী ... ৫৯২
১৩. সাম্যবাদী ... ৫৯৩
১৪. বনলতা সেন ... ৫৯৩
১৫. রূপসী বাংলা ... ৫৯৪
১৬. নকশী কাঁথার মাঠ ... ৫৯৪
১৭. সাঁঝের মায়া ... ৫৯৫
১৮. রাত্রিশেষ ... ৫৯৬
১৯. সাত সাগরের মাঝি ... ৫৯৬
২০. ছাড়পত্র ... ৫৯৭
২১. বন্দী শিবির থেকে ... ৫৯৭
২২. একুশে ফেব্রুয়ারি ... ৫৯৮
২৩. সোনালী কাবিন ... ৫৯৮

প্রবন্ধ/গল্পগ্রন্থ

০১. শকুন্তলা ... ৫৯৯
০২. কমলাকান্তের দপ্তর ... ৬০০
০৩. অবরোধবাসিনী ... ৬০০
০৪. আয়না ... ৬০১
০৪. দেশে বিদেশে ... ৬০২
০৫. আত্মজা ও একটি করবী গাছ ... ৬০৩

## ০৫ । রচনা । মান ৪০

### সরকার-প্রশাসন ও রাজনীতি

০১. হরতাল : প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ ... ৬০৬
০২. যুদ্ধাপরাধীদের বিচার ও বাংলাদেশ ... ৬১৩
০৩. রাজনৈতিক সংস্কৃতি : প্রেক্ষিত বাংলাদেশ ... ৬১৯
০৪. বাংলাদেশে গণতন্ত্র চর্চা : সমস্যা ও সম্ভাবনা ... ৬২৩
০৫. আইনের শাসন ও বাংলাদেশ *[২৭তম; ২৫তম; ২২তম বিসিএস]* ... ৬২৭
০৬. বাংলাদেশের জাতীয় সংহতির সমস্যা ও সম্ভাবনা *[১৮তম বিসিএস]* ... ৬৩১
০৭. পার্বত্য শান্তিচুক্তি : প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া *[২৮তম বিসিএস]* ... ৬৩৬

### শিল্প-বাণিজ্য-অর্থনীতি

০৮. বাংলাদেশের পাটশিল্পের ভবিষ্যৎ *[৩৩তম; ৩০তম বিসিএস]* ... ৬৪২
অথবা, বাংলাদেশে পাটশিল্প : সমস্যা ও সম্ভাবনা
০৯. বাংলাদেশের দারিদ্র্য ও দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি *[১৫তম বিসিএস]* ... ৬৪৭

# সূচি

১০. সাম্প্রতিক পণ্যমূল্য বৃদ্ধি ও গণ-জীবন/দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি *[১১তম বিসিএস]* ... ৬৫২
১১. বাংলাদেশের মৎস্য সম্পদ *[৩১তম বিসিএস]* ... ৬৫৬
১২. বাংলাদেশের তৈরি পোশাক শিল্প : সমস্যা ও সমাধান *[৩৪তম বিসিএস]* ... ৬৬১
১৩. বাংলাদেশের পর্যটনশিল্প : সমস্যা ও সম্ভাবনা *[২৯তম; ১৫তম বিসিএস]* ... ৬৬৫
১৪. জ্বালানি সংকট নিরসনে বিকল্প শক্তি ... ৬৭০
১৫. বাংলাদেশের শ্রমবাজার সংকট ও সম্ভাবনা/বাংলাদেশের জনশক্তি রপ্তানি *[৩০তম বিসিএস]* ... ৬৭৪

### সামাজিক সমস্যা ও বিষয়াবলী

১৬. দুর্নীতি : প্রেক্ষিত বাংলাদেশ ... ৬৭৬
*অথবা,* বাংলাদেশের দুর্নীতি ও সন্ত্রাস : সমাধানের উপায় *[২৭তম বিসিএস]*
*অথবা,* দুর্নীতিমুক্ত সমাজ গঠনে সমাজশক্তির ভূমিকা *[৩৩তম বিসিএস]*
১৭. সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয় *[২৪তম; ১৭তম বিসিএস]* ... ৬৮২
১৮. ভেজালবিরোধী অভিযান *[২৯তম বিসিএস]* ... ৬৮৬
১৯. মাদকাসক্তি ও বিপন্ন ভবিষ্যৎ প্রজন্ম ... ৬৯০
২০. সড়ক দুর্ঘটনা : নিরাপদ সড়ক চাই *[১৫তম বিসিএস]* ... ৬৯৫

### বিজ্ঞান-প্রযুক্তি, তথ্য ও যোগাযোগ

২১. তথ্যপ্রযুক্তি ও বাংলাদেশ *[৩৪তম; ৩১তম; ২৫তম বিসিএস]* ... ৭০১
২২. তথ্যবিপ্লবে ইন্টারনেট/ইন্টারনেট ও তথ্যপ্রযুক্তি *[২৯তম বিসিএস]* ... ৭০৬
২৩. সংবাদপত্রের স্বাধীনতা *[২৮তম বিসিএস]* ... ৭১০
২৪. বেসরকারি টিভি চ্যানেল ও বাংলাদেশের গণমাধ্যম/আজকের দিনের প্রচার মাধ্যম *[২৭তম বিসিএস]* ... ৭১৫
২৫. ডিশ এন্টেনার সুফল ও কুফল/ডিশ সংস্কৃতির ভালোমন্দ *[২২তম; ১৭তম বিসিএস]* ... ৭২০

### বাংলাদেশ ও বহির্বিশ্ব

২৬. ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ক : একটি মূল্যায়ন *[১৮তম বিসিএস]* ... ৭২৩
২৭. মানব সম্পর্ক উন্নয়নে বিশ্বায়ন *[৩১তম বিসিএস]* ... ৭২৮
অথবা, বিশ্বায়ন বা গ্লোবালাইজেশন *[২৯তম বিসিএস]*

### ভাষা-সাহিত্য ও সংস্কৃতি

২৮. বিশ্বায়ন ও আমাদের সংস্কৃতি/সাংস্কৃতিক আগ্রাসন *[৩০তম; ২৭তম; ২১তম; ১৩তম বিসিএস]* ... ৭৩৫
২৯. বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য/বাংলাদেশের সংস্কৃতি ও তার রূপান্তর *[১১তম বিসিএস]* ... ৭৪০
৩০. বাংলাদেশের লোকশিল্প *[১০ম বিসিএস]* ... ৭৪৪
৩১. বাংলাদেশের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি *[৩৪তম বিসিএস]* ... ৭৪৯
৩২. বাংলার লোকসাহিত্য/সমাজ ও লোকসংস্কৃতি/পল্লীসাহিত্য *[৩৩তম; ১৩তম বিসিএস]* ... ৭৫২
৩৩. সর্বস্তরে বাংলা ভাষার ব্যবহার *[২০তম বিসিএস]* ... ৭৫৮
৩৪. বাংলা সাহিত্যের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ *[২০তম বিসিএস]* ... ৭৬০
৩৫. বাংলা সাহিত্যে দেশপ্রেম/বাংলা সাহিত্যে স্বদেশপ্রীতি ... ৭৬৬
৩৬. বাংলা নাটক ও নাট্যচর্চা/বাংলা নাট্যসাহিত্য/বাংলাদেশের নাটক বা নাট্য আন্দোলন *[১১তম; ১০ম বিসিএস]* ... ৭৬৯
৩৭. বাংলাদেশের শিশুসাহিত্য *[৩১তম বিসিএস]* ... ৭৭২
৩৮. সাহিত্য ও জাতীয় চেতনা ... ৭৭৭

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

# সূচি

## ভাষা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধ


৩৯. ভাষা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধ ........ ৭৮১
৪০. ভাষা আন্দোলন এবং বাংলা ভাষার বিশ্বায়ন/আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস *[২১তম বিসিএস]*.... ৭৮৪
৪১. ভাষা আন্দোলনভিত্তিক বাংলা সাহিত্য *[২৯তম বিসিএস]*........ ৭৮৮
৪২. মুক্তিযুদ্ধ ও বাংলা সাহিত্য ........ ৭৯৩
৪৩. মুক্তিযুদ্ধ ও বাংলাদেশের উপন্যাস *[৩০তম; ২২তম বিসিএস]*........ ৭৯৭
৪৪. মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও আমাদের সংস্কৃতি........ ৮০৩
৪৫. বাংলাদেশের সমাজ কাঠামো পরিবর্তনে মুক্তিযুদ্ধ........ ৮০৬
অথবা, মুক্তিযুদ্ধের চেতনার প্রেক্ষিতে গণতান্ত্রিক সমাজ *[৩৩তম বিসিএস]*


## শিক্ষা ও স্বাস্থ্য


৪৬. বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থা : সমস্যা ও সমাধান ........ ৮১০
৪৭. সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা : পরিকল্পনা ও সাফল্য/সবার জন্য শিক্ষা *[২৭তম; ২৪তম; ২৩তম বিসিএস]*... ৮১৪
৪৮. গণশিক্ষা *[১৩তম বিসিএস]* ........ ৮১৯
৪৯. মানবসম্পদ উন্নয়নে শিক্ষা/দক্ষ জনশক্তি উন্নয়নে বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থা ........ ৮২১
৫০. এইডস : তৃতীয় বিশ্বের জনস্বাস্থ্যের এক মারাত্মক হুমকি *[১৫তম বিসিএস]* ........ ৮২৭


## নারী ও শিশু


৫১. নারী উন্নয়ন ও ক্ষমতায়ন *[৩৩তম; ২৯তম বিসিএস]*........ ৮৩১
৫২. নারী শিক্ষা উন্নয়ন *[২৯তম বিসিএস]*........ ৮৩৮
৫৩. শিশুশ্রম ও বাংলাদেশের শিশু শ্রমিক *[১৭তম বিসিএস]*........ ৮৪৩


## পরিবেশ ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ


৫৪. বাংলাদেশের পরিবেশ সমস্যা এবং এর সমাধান *[২৪তম; ২১তম; ১৩তম; ১১তম বিসিএস]*..... ৮৪৯
৫৫. বাংলাদেশের প্রাকৃতিক দুর্যোগ *[১৩তম বিসিএস]* ........ ৮৫২
৫৬. বাংলাদেশের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ........ ৮৫৭
৫৭. বাংলাদেশের বন্যা সমস্যা ও প্রতিকার *[১১তম বিসিএস]*........ ৮৬১
৫৮. বাংলাদেশের ভূমিকম্প : বিপর্যয় ব্যবস্থাপনা *[৩০তম বিসিএস]*........ ৮৬৫
৫৯. বিশ্ব জলবায়ু পরিবর্তন ও বাংলাদেশ *[৩০তম; ২৯তম বিসিএস]* ........ ৮৭১
৬০. আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্প ও বাংলাদেশ *[২৯তম বিসিএস]* ........ ৮৭৬


## মডেল প্রশ্ন ও উত্তর

### বাংলা প্রথম পত্র


⊙ মডেল টেস্ট-০১........ ৮৮৩
⊙ মডেল টেস্ট-০২ ........ ৮৮৯
⊙ মডেল টেস্ট-০৩ ........ ৮৯৫
⊙ মডেল টেস্ট-০৪ ........ ৯০২
⊙ মডেল টেস্ট-০৫ ........ ৯০৮


### বাংলা দ্বিতীয় পত্র


⊙ মডেল টেস্ট-০১........ ৯১৪
⊙ মডেল টেস্ট-০২ ........ ৯১৫
⊙ মডেল টেস্ট-০৩ ........ ৯১৭
⊙ মডেল টেস্ট-০৪ ........ ৯১৮
⊙ মডেল টেস্ট-০৫ ........ ৯১৯




# ৩৫তম বিসিএস

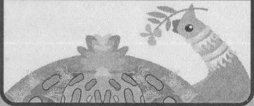

# BCS প্রশ্ন ও উত্তর

৩৪তম বিসিএস ২০১৪
৩৩তম বিসিএস ২০১২
৩২তম বিসিএস ২০১২
৩১তম বিসিএস ২০১১
৩০তম বিসিএস ২০১১
২৯তম বিসিএস ২০১০
২৮তম বিসিএস ২০০৯
২৭তম বিসিএস ২০০৬
২৫তম বিসিএস ২০০৫
২৪তম বিসিএস ২০০৩
২৩তম বিসিএস ২০০১
২২তম বিসিএস ২০০১
২১তম বিসিএস ১৯৯৯
২০তম বিসিএস ১৯৯৯
১৮তম বিসিএস ১৯৯৮
১৭তম বিসিএস ১৯৯৬
১৫তম বিসিএস ১৯৯৪
১৩তম বিসিএস ১৯৯২
১১তম বিসিএস ১৯৯১
১০ম বিসিএস ১৯৯০

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

# BCS প্রশ্ন ও উত্তর

## ৩৪তম বিসিএস ২০১৪, বাংলা : প্রথম পত্র

নির্ধারিত সময় : ৩ ঘণ্টা; পূর্ণমান : ১০০

নম্বর

[দ্রষ্টব্য : *প্রত্যেক প্রশ্নের মান প্রশ্নের শেষ প্রান্তে দেখানো হয়েছে।*]

১. ক. বাক্যগুলো শুদ্ধ করুন : $\frac{১}{২}\times১২=৬$

১. তিনি স্বচ্ছল পরিবারের সন্তান।
উত্তর : তিনি সচ্ছল পরিবারের সন্তান।

২. এ খবরটি অত্যান্ত বেদনাদায়ক।
উত্তর : খবরটি অত্যন্ত বেদনাদায়ক।

৩. মুখস্তবিদ্যা পরিহার করা দরকার।
উত্তর : মুখস্থবিদ্যা পরিহার করা দরকার।

৪. তিনি পৈত্রিক ভিটায় বসবাস করেন।
উত্তর : তিনি পৈতৃক ভিটায় বসবাস করেন।

৫. সুশিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রই সশিক্ষিত।
উত্তর : সুশিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রই স্বশিক্ষিত।

৬. এটি একটি অনুবাদিত গ্রন্থ।
উত্তর : এটি একটি অনূদিত গ্রন্থ।

৭. আমি অপমান হয়েছি।
উত্তর : আমি অপমানিত হয়েছি।

৮. এ ব্যক্তি সকলের মাঝে বয়স্ক।
উত্তর : এ ব্যক্তি সকলের মাঝে বয়োজ্যেষ্ঠ।

৯. এ তো তার দূর্লভ সৌভাগ্য।
উত্তর : এ তো তার দুর্লভ সৌভাগ্য।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



১০. তোমার সঙ্গে আমার একটা গোপন পরামর্শ আছে।
উত্তর : তোমার সঙ্গে আমার একটা গোপনীয় পরামর্শ আছে।

১১. বালকটি আরোগ্য হয়েছে।
উত্তর : বালকটি আরোগ্য লাভ করেছে।

১২. সাভার ট্র্যাজেডির শোকসভায় বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবি, বিজ্ঞানী, দার্শনিক প্রমুখগণ শ্রদ্ধাঞ্জলী নিবেদন করেন।
উত্তর : সাভার ট্র্যাজেডির শোকসভায় বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী, বিজ্ঞানী, দার্শনিক প্রমুখ শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেন।

খ. যথার্থ শব্দ বা শব্দগুচ্ছ দ্বারা শূন্যস্থান পূরণ করুন : ১×৬=৬

১. সুখের দিনে অমন ——— মাছি কত দেখা যায়।
২. পরীক্ষায় পাস করার জন্য সে ——— পণ করেছে।
৩. তার সঙ্গে ——— দেখা হয়।
৪. তাঁর অকাল মৃত্যু এ সংসারে ——— হয়ে দেখা দিল।
৫. ছলের টাকা ——— যায়।
৬. আমার কাঁধে ভারী জোয়াল, তুমি তো ভাই ———।

উত্তর : ১. দুধের; ২. মরণ; ৩. কালেভদ্রে; ৪. বিনা মেঘে বজ্রাঘাত; ৫. জলে; ৬. মুশকিল আসান।

গ. ছয়টি বাক্যে প্রবাদটির নিহিতার্থ ব্যাখ্যা করুন : ১×৬=৬

আগে-পিছে লণ্ঠন, কাজের বেলা ঠনঠন্!

উত্তর : প্রবাদটির অর্থ : গুণহীনের বৃথা আস্ফালন। অনেক আয়োজন থাকলেও সঠিকভাবে দায়িত্ব পালনে অনীহা পোষণকারী মানুষের দ্বারা বড় কোনো কাজ করা অসম্ভব। কর্ম পরিকল্পনার সাথে কাজের কোনো সমন্বয় সাধন না করলে শুধুমাত্র আয়োজনেই কর্মযজ্ঞের সমাপ্তি ঘটে। আমাদের সমাজে আগে-পিছে লণ্ঠন নিয়ে অনেক লোকই ঘুরে বেড়ায় কিন্তু প্রকৃত কাজের লোকেরা নিরলসভাবে কাজ করে থাকেন। তাদের অযাচিত আয়োজনের প্রয়োজন পড়ে না, তারা কর্মে নিবিড়ভাবে নিয়োজিত থাকেন। মানুষের উচিত আগে-পিছে লণ্ঠন নিয়ে না ঘুরে সঠিকভাবে নিজ দায়িত্ব পালন করা। প্রকৃতপক্ষে পরিশ্রমীরাই সফলতা অর্জন করে থাকে।

ঘ. বাগধারা ব্যবহার করে বাক্য রচনা করুন : ১×৬=৬

টনক নড়া; ডামাডোল; কাষ্ঠহাসি; গোড়ায় গলদ; লেফাফা দুরস্ত; লেজে গোবরে।

উত্তর :

টনক নড়া (সচেতন হওয়া)– প্রধানমন্ত্রীর আগমন উপলক্ষে এলাকাবাসীর টনক নড়েছে।
ডামাডোল (গোলযোগ)– ছাত্তার সাহেবের বাড়িতে কিছুদিন যাবৎ বিয়ের ডামাডোল চলছে।
কাষ্ঠহাসি (শুকনো হাসি)– জামান সাহেবের কাষ্ঠহাসিতে বোঝা যায় তিনি এখনও সুস্থ নন।
গোড়ায় গলদ (শুরুতে ভুল)– অঙ্ক মিলবে কেমন করে? গোড়াতেই তো গলদ।
লেফাফা দুরস্ত (বাইরের ঠাট বজায় রেখে চলেন যিনি)– এই লেফাফা দুরস্ত লোকটিকে দেখে কি মনে হয় যে, ইনি কপর্দক শূন্য।
লেজে গোবরে (বিশৃঙ্খলা করা)– যোগ্যতা না থাকলে কাজে তো লেজে গোবরে করবেই



ঙ. বাংলা পরিভাষা লিখুন : ১×৬=৬

Abrogate; Booking; Bibliography; Execute; Agenda; Deed.

উত্তর :

| প্রদত্ত শব্দ | পরিভাষা |
|---|---|
| Abrogate | রদ করা, লোপ করা |
| Booking | টিকিট ক্রয়, সংরক্ষণ |
| Bibliography | গ্রন্থপঞ্জি |
| Execute | নির্বাহ করা |
| Agenda | আলোচ্যসূচি |
| Deed | দলিল |

২. ভাবসম্প্রসারণ করুন : ২০

মানুষের মৃত্যু হলে তবুও মানব থেকে যায়।

ভাবসম্প্রসারণ : সময় অনন্ত, জীবন সংক্ষিপ্ত। সংক্ষিপ্ত এ জীবনে মানুষ তার মহৎ কর্মের মধ্য দিয়ে এ পৃথিবীতে স্মরণীয়-বরণীয় হয়ে থাকে। আবার নিন্দনীয় কর্মের মাধ্যমে এই জগতে অনেকে বেঁচেও মরে থাকে। কেননা ব্যক্তি, পরিবার তাকে ভালোবাসে না; সমাজ, দেশ ও জাতি তাকে শ্রদ্ধা করে না, স্মরণ করে না; তার মৃত্যুতে কারো যায়-আসে না।

মানুষ মাত্রই জন্ম-মৃত্যুর অধীন। পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করলে একদিন তাকে মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে– এটা চিরন্তন সত্য। আর মৃত্যুর মধ্য দিয়েই সে পৃথিবী থেকে চির বিদায় নেয়। কিন্তু পেছনে পড়ে থাকে তার মহৎ কর্মের ফসল। যে কর্মের জন্য সে মরে যাওয়ার পরও পৃথিবীতে যুগ যুগ বেঁচে থাকে।

মানুষের জীবনকে দীর্ঘ বয়সের সীমারেখা দিয়ে পরিমাপ করা যায় না। জীবনে কেউ যদি কোনো ভালো কাজ না করে থাকে তবে সে জীবন অর্থহীন, নিষ্ফল। সেই নিষ্ফল জীবনের অধিকারী মানুষটিকে কেউ মনে রাখে না। নীরব জীবন নীরবেই ঝরে যায়। পক্ষান্তরে, যে মানুষ জীবনকে কর্মমুখর করে রাখে এবং যার কাজের মাধ্যমে জগৎ ও জীবনের উপকার সাধিত হয় তাকে বিশ্বের মানুষ শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করে। সেই সার্থক মানুষের কাজের অবদান বিশ্বের বুকে কীর্তিত হয়ে কৃতী লোকের গৌরব প্রচারিত হতে থাকে। কীর্তিমান ব্যক্তির যেমন মৃত্যু নেই, তেমনি শেষও নেই। কারণ এ পৃথিবীতে সে নিজস্ব কীর্তির মহিমায় লাভ করে অমরত্ব। কীর্তিমানের মৃত্যু হলে তাঁর দেহের ধ্বংস সাধন হয় বটে, কিন্তু তার সৎ কাজ এবং অম্লান-কীর্তি পৃথিবীর মানুষের কাছে তাকে বাঁচিয়ে রাখে। তার মৃত্যুর শত শত বছর পরেও মানুষ তাকে স্মরণ করে। তাই সন্দেহাতীতভাবে বলা যায়, মানবজীবনের প্রকৃত সার্থকতা তার কর্ম-সাফল্যের ওপর নির্ভরশীল। একটা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য মানুষ পৃথিবীতে আসে এবং সে সময়সীমা পার হওয়ার সাথে সাথে সে বিদায় নেয় পৃথিবী থেকে। এ নির্দিষ্ট সময়সীমায় সে যদি গৌরবজনক কীর্তির স্বাক্ষরে জীবনকে মহিমান্বিত করে তুলতে সক্ষম হয়, মানবকল্যাণে নিজের জীবন উৎসর্গ করে, তবে তার নশ্বর দেহের মৃত্যু হলেও তার স্বকীয় সত্তা থাকে মৃত্যুহীন। গৌরবোজ্জ্বল কৃতকর্মই তাকে বাঁচিয়ে রাখে যুগ থেকে যুগান্তরে।

মানুষের দেহ নশ্বর কিন্তু কীর্তি অবিনশ্বর। কেউ যদি মানুষের কল্যাণে নিজেকে নিবেদিত করে, তবে মৃত্যুর পরেও তার এ কীর্তির মধ্য দিয়ে সে মানুষের হৃদয়ের মণিকোঠায় চিরকাল বেঁচে থাকে।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



৩. সারমর্ম লিখুন : ১০ × ২ = ২০

ক. হে চিরদীপ্ত, সুপ্তি ভাসাও
জাগার গানে;
তোমার শিখাটি উঠুক জ্বলিয়া
সবার প্রাণে।
ছায়া ফেলিয়াছে প্রলয়ের নিশা,
আঁধারে ধরণী হারায়েছে দিশা।
তুমি দাও বুকে অমৃতের তৃষা
আলোর ধ্যানে!
ধ্বংস তিলক আঁকে চক্রীরা
বিশ্ব-ভালে।
হৃদয় ধর্ম বাঁধা পরিয়াছে
স্বার্থ-জালে।

**সারমর্ম :** বিশৃঙ্খলায় পরিপূর্ণ বর্তমান সমাজ এমন সেবক চায়, যারা সকলের হৃদয়ে আলো জ্বেলে অন্ধকার দূর করবে। চারদিকে আজ প্রলয়ের সুর, ধরণী অন্ধকারে নিমজ্জিত, স্বার্থলোলুপ মানুষেরা চক্রান্তের থাবা বিস্তার করে আছে সর্বত্র। তাই এ সময় সত্য সেবকদের আলোর মশাল নিয়ে বিদ্যুৎ গতিতে এগিয়ে যেতে হবে। তবেই সাধারণ মানুষ পাবে আলোর দিশা।

খ. নিন্দুকেরে বাসি আমি সবার চেয়ে ভালো
যুগ জনমের বন্ধু আমার আঁধার ঘরের আলো।
সবাই মোরে ছাড়তে পারে বন্ধু যারা আছে
নিন্দুক সে তো ছায়ার মত থাকবে পাছে পাছে।
বিশ্বজনে নিঃস্ব করে পবিত্রতা আনে
সাধকজনে বিস্তারিতে তার মত কে জানে?

**সারমর্ম :** নিন্দা ও সমালোচনা জ্ঞান ও কর্মের শুদ্ধতা আনয়ন করে মানুষকে পরিপূর্ণতা দান করে। নিন্দুক মানুষকে সঠিক পথে, সৎ কাজে ও মনুষ্যত্ব বিকাশে সহায়তা করে। তাই জাগতিক সাফল্যে সমালোচনার অবদান অনস্বীকার্য।

৪. অতি সংক্ষেপে উত্তর লিখুন : ২ × ১৫ = ৩০

ক. **'চর্যাপদ' কত সালে এবং কোন স্থান থেকে উদ্ধার করা হয়?**
উত্তর : চর্যাপদ উদ্ধার করা হয় ১৯০৭ সালে, নেপালের রয়েল লাইব্রেরি (রাজগ্রন্থাগার) থেকে এটি আবিষ্কৃত হয়।

খ. **বাংলা লিপির উৎস কী?**
উত্তর : বাংলা লিপির উৎস ব্রাহ্মী লিপি।

গ. **'মোসলেম ভারত' পত্রিকার সম্পাদক কে ছিলেন?**
উত্তর : 'মোসলেম ভারত' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন মোজাম্মেল হক।



ঘ. **'চণ্ডীদাস সমস্যা' কী?**
উত্তর : মধ্যযুগে বাংলা কাব্যে অন্তত চারজন চণ্ডীদাসের কবিতা পাওয়া যায়। এরা হলেন : বড়ু চণ্ডীদাস, দ্বিজ চণ্ডীদাস, দীন চণ্ডীদাস, চণ্ডীদাস। এই চারটি নামের মধ্যে শেষ তিনটি নাম একজনের নাকি তাঁরা পৃথক কবি তা নিশ্চিত করে আজও বলা যাচ্ছে না। এই সমস্যাকেই 'চণ্ডীদাস সমস্যা' বলে।

ঙ. **আরাকান রাজসভায় বাংলা সাহিত্য চর্চা করেছেন এমন দুই জন লেখকের নাম লিখুন।**
উত্তর : আরাকান রাজসভার পৃষ্ঠপোষকতায় মধ্যযুগে বাংলা সাহিত্যের যে বিকাশ সাধিত হয়েছিল তা বাংলা সাহিত্যে ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য। আরাকান রাজসভার দুইজন লেখক হলেন : দৌলত কাজী, আলাওল। কবি দৌলত কাজী রচিত গ্রন্থ 'সতীময়না ও লোরচন্দ্রানী' এবং কবি আলাওল রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হলো : 'পদ্মাবতী', ও 'সপ্তপয়কর'।

চ. **বাংলা সাহিত্যে 'ভোরের পাখি' কে? কেন তাকে ভোরের পাখি বলা হয়েছে?**
উত্তর : বাংলা সাহিত্যে 'ভোরের পাখি' বিহারীলাল চক্রবর্তী। তিনিই প্রথম বাংলায় ব্যক্তির আত্মলীনতা, ব্যক্তিগত অনুভূতি ও গীতোচ্ছ্বাস সহযোগে কবিতা রচনা করে বাংলা কবিতাকে ভিন্নমাত্রা দান করেন। এজন্য তাকে বাংলা সাহিত্যের 'ভোরের পাখি' বলা হয়।

ছ. **ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের প্রকৃত নাম কী? কোন প্রতিষ্ঠান থেকে তিনি 'বিদ্যাসাগর' উপাধি লাভ করেন?**
উত্তর : ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের প্রকৃত নাম ঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি স্বাক্ষর করতেন ঈশ্বরচন্দ্র শর্মা নামে। তিনি সংস্কৃত কলেজ থেকে (১৮৩৯ সালে) 'বিদ্যাসাগর' উপাধি লাভ করেন। তার অনুবাদ গ্রন্থ : 'বেতালপঞ্চবিংশতি', 'শকুন্তলা', 'ভ্রান্তিবিলাস'। তার বিখ্যাত শিশুতোষ গ্রন্থ 'বর্ণপরিচয়'।

জ. **বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে প্রতিনিধিত্বশীল চারটি ভাষাগোষ্ঠীর নাম লিখুন।**
উত্তর : বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে প্রতিনিধিত্বশীল চারটি ভাষাগোষ্ঠী হলো : মান্দারিন, স্প্যানিশ, ইংরেজি ও আরবি।

ঝ. **রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের চারটি নাটকের নাম লিখুন।**
উত্তর : বাংলা সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিভা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তিনি উপন্যাস, কাব্য, প্রবন্ধ, ছোটগল্প রচনার মতো নাটক রচনায়ও সফলতা অর্জন করেন। তার রচিত চারটি নাটক হলো : 'বিসর্জন', 'রাজা', 'ডাকঘর' ও 'রক্তকরবী।'

ঞ. **বঙ্কিমচন্দ্রের ত্রয়ী উপন্যাসের নাম লিপিবদ্ধ করুন।**
উত্তর : বাংলা উপন্যাসের জনক হিসেবে অভিহিত করা হয় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে। তার রচিত ত্রয়ী উপন্যাস হলো : 'আনন্দমঠ' (১৮৮২), 'দেবী চৌধুরাণী' (১৮৮৪) ও 'সীতারাম' (১৮৮৭)।

ট. **বাংলাদেশে প্রথম কোথায় ও কবে ছাপাখানা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল?**
উত্তর : বাংলাদেশে প্রথম ছাপাখানা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল রংপুরে, ১৮৪৭ সালে। এটি 'বার্তাবহ' নামে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। ঢাকায় 'বাংলা প্রেস' নামে প্রথম ছাপাখানা প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৬০ সালে।

ঠ. **'মজলুম আদিব' কে? এ নামে তিনি কোন গ্রন্থ রচনা করেন?**
উত্তর : 'মজলুম আদিব' কবি শামসুর রাহমান। তিনি এ নামে 'বন্দী শিবির থেকে' কাব্যগ্রন্থটি রচনা করেন। তার উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ হলো : 'উদ্ভট উটের পিঠে চলেছে স্বদেশ', 'বাংলাদেশ স্বপ্ন দ্যাখে', 'এক ফোঁটা কেমন অনল।'

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



ঙ. রশীদ করীমের চারটি উপন্যাসের নাম লিখুন।

উত্তর : রশীদ করীম কথাসাহিত্যিক হিসেবে উপন্যাস রচনায় সর্বাধিক কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। তার রচিত চারটি উপন্যাস হলো : 'উত্তম পুরুষ', 'প্রসন্ন পাষাণ', 'আমার যত গ্লানি' ও 'প্রেম একটি লাল গোলাপ।'

চ. 'পৃথক পলঙ্ক'র লেখক কে? তিনি কোন সনে মৃত্যুবরণ করেন?

উত্তর : 'পৃথক পলঙ্ক'-এর লেখক নন্দিত কথাসাহিত্যিক হুমায়ূন আহমেদ। তিনি ২০১২ সালে মৃত্যুবরণ করেন।

ণ. 'বুদ্ধিবৃত্তির নতুন বিন্যাস' কী? এর লেখক কে?

উত্তর : 'বুদ্ধিবৃত্তির নতুন বিন্যাস' প্রবন্ধগ্রন্থ। এ প্রবন্ধগ্রন্থের লেখক আহমদ ছফা। তার উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধগ্রন্থ হলো : 'বাঙালি মুসলমানের মন', 'যদ্যপি আমার গুরু', 'বাঙালি জাতি' ও 'বাংলাদেশ রাষ্ট্র।'

## ৩৪তম বিসিএস ২০১৪, বাংলা : দ্বিতীয় পত্র

নির্ধারিত সময় : ৩ ঘণ্টা; পূর্ণমান : ১০০

[দ্রষ্টব্য : *প্রত্যেক প্রশ্নের মান প্রশ্নের শেষ প্রান্তে দেখানো হয়েছে।*] নম্বর

১. যে কোনো একটি বিষয়ে রচনা লিখুন : ৪০

ক. বাংলাদেশ রাষ্ট্রের উত্থানে নারীর অবদান;

খ. তথ্য-প্রযুক্তি ও নতুন গণমাধ্যম;

উত্তর : পৃষ্ঠা ৭০১ ও ৭১৫।

গ. বাংলাদেশের পোশাক-শিল্পে বৈদেশিক বিনিয়োগ : সংকট ও সম্ভাবনা;

উত্তর : পৃষ্ঠা ৬৬১।

ঘ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : কবি ও কর্মী;

ঙ. বিকেন্দ্রীকরণ ও পল্লী-উন্নয়ন।

২. বন্ধনীর মধ্যে বর্ণিত সঙ্কেতের ইঙ্গিতে একটি প্রবন্ধ লিখুন : ৪০

ক. জনসংখ্যা সমস্যা জন-সম্পদে রূপান্তরে কর্মমুখী শিক্ষা :

(কর্মমুখী শিক্ষা কী? বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থা; কর্মমুখী শিক্ষার গুরুত্ব; বাংলাদেশে কর্মমুখী শিক্ষার বর্তমান পরিস্থিতি; যুগোপযোগী নতুন নতুন ক্ষেত্রে কর্মমুখী শিক্ষার প্রসার; প্রশিক্ষিত জন-সম্পদের কর্মসংস্থানের উদ্যোগ; শ্রম বাজারে প্রশিক্ষিত জন-সম্পদের ভূমিকা।)

খ. সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও বাংলাদেশ :

(সাম্প্রদায়িকতা; অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ রাষ্ট্রের জন্ম; ধর্ম নিরপেক্ষতা ও বাংলাদেশের সংবিধান; ধর্ম ও রাষ্ট্রের সম্পর্ক; বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি; সম্প্রীতির লক্ষ্যে করণীয়।)

উত্তর : পৃষ্ঠা ৭৪৯।

গ. লৈঙ্গিক সমতাবোধ :

(লৈঙ্গিক সমতার ধারণা; কেন বিভাজন?; অসমতা কি প্রাকৃতিক?; অসমতার উৎসে সমাজের ভূমিকা; সমতা ও সামাজিক প্রগতি; নারী-পুরুষ-যৌথতা ও ভবিষ্যতের বাংলাদেশ।)



৩. যে কোনো একটি বিষয়ে পত্র লিখুন : ২০

ক. আপনার এলাকার অনুন্নত শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রভূত উন্নয়নকারী একজন বিদ্যোৎসাহী প্রবীণ শিক্ষকের সংবর্ধনা উপলক্ষে একটি মানপত্র রচনা করুন।

উত্তর :

আলমডাঙ্গা বহুমুখী পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক শ্রদ্ধেয় আলী আকবর স্যারের অবসর গ্রহণ উপলক্ষে শ্রদ্ধাঞ্জলি।

হে মহান শিক্ষাব্রতী,

আমাদের সশ্রদ্ধ চিত্তের অভিনন্দন গ্রহণ করুন। আজ আমাদের হৃদয় ব্যথিত। এক আলোকময় দিনে অফুরন্ত কর্মোদ্দীপনা নিয়ে এতিহ্যবাহী এই শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকতার মহান ব্রত নিয়ে এসেছিলেন। সুদীর্ঘ ২২ বছর এর কর্ণধার হিসেবে সগৌরবে দায়িত্ব পালনের পর আজ বেজে উঠেছে বেদনার করুণ সুর। বেদনাময় এই লগ্নে ব্যথাহত হৃদয়ের গভীর শ্রদ্ধাঞ্জলি অন্তরে কেবলই জেগে ওঠে বিষাদের বাণী—

হে মহান কর্মবীর,

আমাদের পরম সৌভাগ্য যে, আমরা আপনার মত একজন কর্মঠ, উদারচিত্ত, সুদক্ষ ও প্রজ্ঞাবান শিক্ষকের পদপ্রান্তে বসে শিক্ষা লাভের সুযোগ পেয়েছি। তাছাড়া এ অঞ্চলের বহু অনুন্নত শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের প্রভূত উন্নয়নকারী একজন বিদ্যোৎসাহী প্রবীণ শিক্ষক হিসেবে আমরা আপনাকে চিনি। আজ আমাদের হৃদয়পটে বারবার আপনার স্মৃতি বিজড়িত হিরন্ময় মুহূর্তগুলো ভেসে উঠছে। সুদীর্ঘকাল আপনি কর্মনিষ্ঠা, আন্তরিকতা ও প্রীতিস্নিগ্ধ ভালোবাসা দিয়ে আমাদের অন্তর জয় করেছিলেন। অজস্র ছাত্র পরশ পাথরের মতো আপনার হাতের ছোঁয়ায় পেয়েছে আলোকিত জীবন। আমাদের স্মৃতির রাজ্যে আপনি অমর, অক্ষয় ও চিরঞ্জীব। তাই আপনার বিচ্ছেদবেদনা আমাদের কোমল হৃদয়কে গভীরভাবে শূন্যময় করছে। সতিই মনে হচ্ছে—

*তোমার কীর্তির চেয়ে তুমি মহৎ*
*তুমি প্রকৃত ক্ষণজন্মা পুরুষ।*

হে জ্ঞানতাপস, সাধক

সুদীর্ঘ কর্মজীবনে আপনি ছিলেন সত্য ও ন্যায়ের এক আদর্শ প্রতীক। আপনার অন্তঃকরণ ছিল পবিত্র ও মহৎ। আপনার মধুর ব্যবহার, আচার-আচরণ ও চারিত্রিক মাহাত্ম্য উভয়ের মাঝে যে আত্মার বন্ধন সৃষ্টি করেছে তা কখনো টুটে যাবে না। আমরা কি দেব আপনায়— আছে শুধু অশ্রু। হারানোর বেদনায় বুঝতে পারছি আপনি কত বড় সম্পদ ছিলেন। আপনি নিরলস সাধনায় শিক্ষার্থীদের জীবনকে সুন্দরভাবে গড়ে তুলেছেন। অনেকেই জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে আপনার সুচিন্তিত দিক নির্দেশনা পেয়ে। পরম যত্নে, নিষ্ঠায় ও অক্লান্ত পরিশ্রম সহকারে শিক্ষাদানে নিজেকে তিল তিল করে নিঃশেষে উজাড় করে যে মহৎ দৃষ্টান্ত রেখে গেলেন সে ব্রত, সে ত্যাগ, কর্মকুশলতার গৌরব ও খ্যাতির উপমা খুঁজতে হলে আমাদের যেতে হবে অন্তহীন বারিধির কাছে, নয়তো বিপুলাকার হিমালয়ের কাছে। আমাদের কণ্ঠে আজ উচ্চারিত হচ্ছে—

*অপমান তব করিব না আজ*
*করিয়া নান্দী পাঠ।*

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



হে প্রগতিশীল সংগ্রামী কণ্ঠ,
আপনার প্রগতিশীল চিন্তাধারা আমাদের ঐক্যবদ্ধ করবে, সত্যানুসন্ধানের পথ দেখাবে। তাই শ্রদ্ধা জানাই আপনার এ সত্য সুন্দর ও সংগ্রামী সাধনাকে। আপনার প্রচেষ্টার কথা ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। আপনি আমাদের শিক্ষাগুরু, আমরা আপনার শিষ্য—

*কত রাজ্য, কত রাজা গড়িছ নীরবে*
*হে পূজ্য, হে প্রিয়!*
*একত্বে বরেণ্য তুমি, শরণ্য এককে*

হে বিদায়ী শিক্ষাগুরু,
নীতি ও আদর্শের প্রশ্নে আপনি ছিলেন অনড় অবিচল। আপনার গুণের প্রকৃত মূল্যায়ন আমরা করতে পারিনি। বয়সের দোষে কখনো-বা ঔদ্ধত্য রিপুর তাড়নে আপনার প্রতি আমরা বহু অপরাধ করেছি, অশোভন হয়েছি। আজ বিদায়লগ্নে আপনার কাছে আমাদের প্রার্থনা স্বীয় বদান্যতা ও ঔদার্যগুণে আপনি যেন আমাদের শত ভুলত্রুটি মার্জনা করে বিদায়ী আশীর্বাদে আমাদের ভবিষ্যৎ জীবনকে সুখী ও সমৃদ্ধ হওয়ার পাথেয় দান করুন। আপনার জ্ঞানদীপ্ত শিক্ষার আলোকে আমাদের ভবিষ্যৎ যেন উজ্জ্বল প্রভাকরের ন্যায় উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে এটিই আমাদের কামনা। এই বিদ্যালয় থেকে বিদায় নিলেও আমাদের অন্তরের মণিকোঠায় থাকবেন চিরদিন অম্লান। আপনার প্রচেষ্টায় এলাকার আরো অনুন্নত ও নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান উপকৃত হোক। প্রার্থনা করি আপনি দীর্ঘায়ু হোন। আপনার দিনগুলো সুস্থ, সুন্দরভাবে কাটুক—এ আমাদের আন্তরিক কামনা।

তারিখ : ২২.০৩.২০১৪ — আপনার স্নেহধন্য
আলমডাঙ্গা, চুয়াডাঙ্গা — ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ
আলমডাঙ্গা বহুমুখী পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়, চুয়াডাঙ্গা।

**খ. আপনার শহরের ঐতিহ্যবাহী বৈশাখী মেলার মাঠ সরকারি স্থাপনার কাজে ব্যবহার করার সিদ্ধান্ত হওয়ায় নাগরিক জীবনে সমন্বয়ধর্মী দেশজ সংস্কৃতির চর্চায় নেতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে—এ আশঙ্কা জানিয়ে এবং মাঠটির সাংস্কৃতিক গুরুত্ব ব্যাখ্যা করে একে রক্ষার জন্য সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের সচিবের নিকট আবেদনপত্র লিখুন।**

উত্তর :

০৭ জানুয়ারি ২০১৪

বরাবর
সচিব মহোদয়
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ঢাকা।

বিষয় : বৈশাখী মেলার মাঠ স্থাপনামুক্ত রাখার জন্য আবেদন।



জনাব,
যথাবিহিত সম্মানপূর্বক নিবেদন এই যে, কুষ্টিয়া জেলার মিরপুর একটি সমৃদ্ধ এলাকা। অত্র এলাকার জনগণ আবহমানকাল থেকেই সংস্কৃতি সাধনা করে আসছে। সেজন্য জেলার মধ্যে এলাকাটির যথেষ্ট সুনাম ও সুখ্যাতি রয়েছে। এলাকায় রয়েছে বেশ কিছু সংস্কৃতিচর্চা কেন্দ্র। এ এলাকার আধিবাসীরা শিক্ষা-দীক্ষা এবং রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে অত্যন্ত সচেতন। দীর্ঘদিন ধরে সংস্কৃতিচর্চা কেন্দ্রগুলো অত্যন্ত কৃতিত্বের সাথে তরুণ-তরুণীদের মধ্যে সংস্কৃতি বিস্তার করে যাচ্ছে। ধর্মীয়, সামাজিক, রাজনৈতিক সকল অনুষ্ঠান এখানে সম্প্রীতির বন্ধনে সম্পন্ন হয়। মিরপুর শহরে রয়েছে একটি ঐতিহ্যবাহী বৈশাখী মেলার মাঠ। প্রতি বছর বাঙালির জাতীয় উৎসব সেখানে অনুষ্ঠিত হয়। এটি বাঙালির একটি সর্বজনীন লোকউৎসব। এদিন আনন্দঘন পরিবেশে নতুন বছরকে বরণ করে নেয়া হয়। অতীতের ভুলত্রুটি ও ব্যর্থতার গ্লানি ভুলে নতুন করে সুখ-শান্তি ও সমৃদ্ধি কামনায় উদ্‌যাপিত হয় নববর্ষ। আমাদের বৈশাখী মেলার মাঠটি বহুদিন ধরে মেলার ঐতিহ্য বহন করে আসছে। অথচ সংবাদপত্রের মাধ্যমে আমরা জানতে পেরেছি আমাদের ঐহিত্যবাহী এ মাঠে সরকারি স্থাপনা তৈরি হবে। সরকারি স্থাপনা তৈরির বিষয়ে আমাদের কোনো মতবিরোধ নেই। তবে সেটা যেন মাঠের পাশে কিছু পতিত জমি রয়েছে সেখানে তৈরি করা হয়—এটাই এলাকাবাসীর প্রাণের দাবি। কেননা এ মাঠে সরকারি স্থাপনা তৈরি হলে ঐতিহ্যবাহী এ বৈশাখী মেলা বন্ধ হয়ে যাবে।

অতএব, আপনার নিকট আমাদের বিনীত আরজি, আপনি বৈশাখী মেলার মাঠটি স্থাপনামুক্ত রাখার জন্য সংশ্লিষ্ট সকল প্রকার সহযোগিতা দান করে বাধিত ও অনুগৃহীত করবেন।

নিবেদক
এলাকাবাসীর পক্ষে
মোঃ হেলাল উদ্দিন

**গ. রাজধানীর কোনো বিশিষ্ট পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতার নিকট বিভাগভিত্তিক অনুমোদিত এজেন্সি চেয়ে আবেদনপত্র লিখুন।**

## ৩৩তম বিসিএস ২০১২, বাংলা : প্রথম পত্র

নির্ধারিত সময় : ৩ ঘণ্টা; পূর্ণমান : ১০০

[দ্রষ্টব্য : *প্রত্যেক প্রশ্নের মান প্রশ্নের শেষ প্রান্তে দেখানো হয়েছে।*] — নম্বর

১. ক. বানান, শব্দ প্রয়োগ ও বিন্যাস, ভাষারীতি ইত্যাদি শুদ্ধ করে নিচের বাক্যগুলো পুনরায় লিখুন : $\frac{১}{২}\times ১২ = ৬$

১. এসব লোকগুলোকে আমি চিনি।
উত্তর : এসব লোককে আমি চিনি।/এ লোকগুলোকে আমি চিনি।

২. তুমি আমার কাছে আরও প্রিয়তর।
উত্তর : তুমি আমার কাছে আরও প্রিয়।

৩. শুধুমাত্র গায়ের জোরে কাজ হয় না।
উত্তর : শুধু গায়ের জোরে কাজ হয় না।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



৪. তিনি নিরহঙ্কারী ও নিরপরাধী মানুষ।
উত্তর : তিনি নিরহঙ্কার ও নিরপরাধ মানুষ।

৫. সে গাছ হইতে অবতরণ করিল।
উত্তর : সে গাছ থেকে নামলো।

৬. অচিরেই বাংলাদেশ একটি সমৃদ্ধশালী দেশে পরিণত হবে।
উত্তর : অচিরেই বাংলাদেশ একটি সমৃদ্ধ দেশে পরিণত হবে।

৭. আসছে আগামীকাল কলেজ বন্ধ থাকবে।
উত্তর : আগামীকাল কলেজ বন্ধ থাকবে।

৮. তার দারিদ্র্যতায় কষ্ট পেয়েছি আর সৌজন্যতায় মুগ্ধ হয়েছি।
উত্তর : তার দারিদ্র্যে কষ্ট পেয়েছি আর সৌজন্যে মুগ্ধ হয়েছি।

৯. আমি অপমান হয়েছি।
উত্তর : আমি অপমানিত হয়েছি।

১০. ইতোমধ্যে গ্রামের সমস্ত লোকেরা সম্বর্ধনা সভায় যোগ দিল।
উত্তর : ইতোমধ্যে গ্রামের সব লোক সংবর্ধনা সভায় যোগ দিয়েছে।

১১. নিরপরাধী লোক কাকেও ভয় করে না।
উত্তর : নিরপরাধ লোক কাউকেই ভয় করে না।

১২. অপরাহ্ন লিখতে অনেকেই ভুল করে।
উত্তর : অপরাহ্ণ লিখতে অনেকেই ভুল করে।

খ. শূন্যস্থান পূরণ করুন : ৬

বিদ্যা মানুষের মূল্যবান —, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু — তদপেক্ষাও মূল্যবান। অতএব, কেবল বিদ্বান বলিয়াই কোন লোক — লাভের যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না। চরিত্রহীন লোক যদি নানা — আপনার — পূর্ণ করিয়াও থাকে, তথাপি তাহার— পরিত্যাগ করাই শ্রেয়।

উত্তর : বিদ্যা মানুষের মূল্যবান সম্পদ, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু চরিত্র তদপেক্ষাও মূল্যবান। অতএব, কেবল বিদ্বান বলিয়াই কোন লোক সম্মান লাভের যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না। চরিত্রহীন লোক যদি নানা বিদ্যায় আপনার জ্ঞানভাণ্ডার পূর্ণ করিয়াও থাকে, তথাপি তাহার সঙ্গ পরিত্যাগ করাই শ্রেয়।

গ. ছয়টি পূর্ণ বাক্যে নিচের প্রবাদটির নিহিতার্থ প্রকাশ করুন : ৬

পুষ্প আপনার জন্য ফোটে না।

উত্তর : সমাজের বৃহত্তর কল্যাণে নিজেকে নিবেদন করাতেই মানুষের জীবনের সার্থকতা। এ জগতে বহু মহৎ লোক আছেন যারা পরের মঙ্গলের জন্য নিজেদের বিলিয়ে দেন। তাদের একমাত্র চিন্তা, কি করলে অপরের দুঃখ দূর হয়ে তার মুখে হাসি ফুটবে, কিসে সমাজ-সংসারের কল্যাণ হবে। তারা নিজেদের সুখ-শান্তির বিষয়ে কখনো চিন্তা করে না এবং নিজেদের সর্বস্ব বিসর্জন দিয়ে পরের মঙ্গল সাধন করেই সুখানুভব করে থাকেন। তাই তারা এ নশ্বর জগতে চিরস্মরণীয় ও বরণীয় এবং তাদেরকে 'মনের মন্দিরে নিত্য সেবে সর্বজন'। সকলের উচিত স্বার্থপরতা ত্যাগ করে এ রকম অপরের কল্যাণে নিজেকে উৎসর্গ করা।



ঘ. নিচের শব্দগুলো দিয়ে পূর্ণবাক্য রচনা করুন : ৬

সান্ত্বনা, ঊর্ধ্ব, ধিকৃত, আশিস, অচিন্ত্য, কটূক্তি।

সান্ত্বনা : বিধবার একমাত্র সন্তান মারা যাবার পর তাকে সান্ত্বনা দেয়ার ভাষা খুঁজে পাচ্ছিলাম না।

ঊর্ধ্ব : শেয়ার বাজারের সূচক ঊর্ধ্বমুখী করতে সরকার বহু পদক্ষেপ হাতে নিয়েছেন।

ধিকৃত : রাজাকাররা এ সমাজে সব সময়ই ধিকৃত লোক হিসেবে গণ্য হবে।

আশিস : মৃত্যুপথযাত্রী মা তার একমাত্র পুত্রকে আশিস করলেন।

অচিন্ত্য : আমার আপন ছোট ভাই আমার এত বড় ক্ষতি করতে পারে এটা আমার কাছে অচিন্তনীয় বিষয়।

কটূক্তি : মন্ত্রীর কটূক্তি শুনে সচিব মর্মাহত হয়েছেন।

ঙ. নির্দেশানুযায়ী বাক্যগুলো রূপান্তর করুন : ৬

১. শিক্ষক আমাকে উপদেশ দিলেন এবং বিদায় করলেন। (সরল বাক্য)
উত্তর : শিক্ষক আমাকে উপদেশ দিয়ে বিদায় করলেন।

২. যখন বিপদ আসে, তখন দুঃখও আসে। (যৌগিক বাক্য)
উত্তর : বিপদ এবং দুঃখ একসাথে আসে।

৩. বিদ্বান লোক সর্বত্র আদরণীয়। (জটিল বাক্য)
উত্তর : যার বিদ্যা আছে, তিনি সর্বত্র আদরণীয়।

৪. সে যেমন কৃপণ তেমন চালাক। (যৌগিক বাক্য)
উত্তর : সে খুব কৃপণ এবং চালাক।

৫. সে এমএ পাস করেছে বটে কিন্তু জ্ঞানলাভ করতে পারেনি। (জটিল বাক্য)
উত্তর : যদিও সে এমএ পাস করেছে, তথাপি সে জ্ঞানলাভ করতে পারেনি।

৬. যখন বৃষ্টি থামলো, তখন আমরা স্কুলে রওনা হলাম। (যৌগিক বাক্য)
উত্তর : বৃষ্টি থামলো এবং আমরা স্কুলে রওনা হলাম।

২. যে কোনো একটির ভাবসম্প্রসারণ লিখুন (অনধিক ২০টি বাক্য) : ২০

ক. শৃঙ্খলিত সিংহের চেয়ে স্বাধীন গাধা উত্তম।

ভাবসম্প্রসারণ : স্বাধীনভাবে কোনোমতে জীবনযাপন করাটাও পরাধীন হয়ে বাহ্যিক আরাম-আয়েশের মধ্যে জীবনযাপনের চেয়ে ভালো।

একজন পরাধীন ব্যক্তির কাছে যদি কোনো কিছুর অভাব না-ও থাকে তথাপি সে মানসিকভাবে সুখী থাকতে পারে না। কারণ, যে কোনো ব্যক্তির কাছে স্বাধীনতার সুখের বিকল্প আর কিছুই হতে পারে না। মানুষ সব সময় তার নিজ ইচ্ছায় চলতে চায়, কারও অধীনে থেকে তার নির্দেশনা মোতাবেক তাকে চলতে হবে, এটা কোনোমতেই সে মেনে নিতে চায় না। স্বাধীনভাবে সে বহু কষ্ট স্বীকার করে বেঁচে থাকতে রাজি আছে, কিন্তু পরাধীন হয়ে অঢেল ধন-সম্পদের অধিকারী হয়েও বেঁচে থাকতে রাজি নয় সে। পরের তৈরি সুরম্য অট্টালিকায় বসবাস করার চেয়ে নিজের খড়কুটো দিয়ে তৈরি ভাঙা ঘরে থাকা অনেক সুখের মনে হয় প্রত্যেকের কাছেই।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



স্বাধীনতা সকলের কাছেই এক অমীয় সুধা। এ সুধা পান করার জন্য মানুষ রক্তের সাগর পাড়ি দেয়। এ স্বাধীনতা রক্ষায় তাকে হতে হয় আরও সতর্ক। এত কষ্ট করে স্বাধীনভাবে বেঁচে থাকা অন্যের অধীনে এসব কষ্ট ত্যাগ ব্যতীত বেঁচে থাকার চেয়ে শত-সহস্র গুণ শ্রেয়। স্বাধীনভাবে একদিন বেঁচে থাকা পরাধীন হয়ে সহস্র দিন বেঁচে থাকার চেয়ে মঙ্গলজনক।

স্বাধীনতার এ অমূল্য সুখ পেতে হলে আমাদেরকে স্বাধীনতা রক্ষায় সর্বদা সজাগ এবং সতর্ক থাকতে হবে।

**খ. ক্ষুধার রাজ্যে পৃথিবী গদ্যময়।**

**ভাবসম্প্রসারণ :** সুন্দরের সাধক হলেও মানুষের কাজ শুধু কল্পনার জগৎ নির্মাণ করা নয়, কঠিন ও কঠোর বাস্তবের মুখে তাকে রূঢ় সত্যকে স্বীকার করে চলতে হয়। আমরা জানি, জীবনধারণের দাবি যেখানে উপেক্ষিত সেখানে কল্পনা-বিলাসিতা নিরর্থক। রূঢ় বাস্তবতার মোকাবিলাই তখন মূল লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায়।

মানুষের জীবন বেশ কয়েকটি অধ্যায়ের সমষ্টি। এ মহাজীবনে এক অধ্যায়ে যেমন পদ্যের ঝঙ্কার বা কবিতার স্নিগ্ধতা রয়েছে তেমনি অন্য অধ্যায়ে রয়েছে গদ্যের কড়া হাতুড়ি বা বাস্তবতা। মানুষের জীবন কেবল কবিতার মতো কল্পনার বা উচ্ছাশার দ্বারাই গঠিত এমন নয়, সুখের পিঠে যেমন দুঃখ থাকে, আলোর পরে আঁধার, তেমনি এই কল্পনার জগৎ ছাড়াও এখানে রয়েছে কঠোর-কঠিন বাস্তবতা। এ বাস্তবতা মেনে নিয়েই তাকে চলতে হবে। এটি তার অস্তিত্বের সাথে সম্পর্কিত। তাকে পৃথিবীর বুকে টিকে থাকতে হলে প্রথমেই জীবন ধারণের মৌলিক দাবিসমূহের বাস্তবতা স্বীকার করে তা অর্জনের প্রচেষ্টা চালাতে হবে। এসব মৌলিক প্রয়োজনের ব্যবস্থা হয়ে যাবার পর সে কল্পনা-বিলাসিতার কথা চিন্তা করতে পারে। কবিতা মানুষকে আনন্দ দেয় কিন্তু একজন ক্ষুধার্ত ব্যক্তির কাছে কবিতা পাঠ করে আনন্দ দেয়ার চেষ্টা করাটা তার কষ্টই কেবল বাড়াবে। পূর্ণিমার চাঁদ মানুষের কাছে খুবই প্রিয়। কিন্তু একজন ক্ষুধার্ত মানুষ ঐ চাঁদকে দেখে ঝলসানো রুটির কথাই চিন্তা করবে। চাঁদের চেয়ে রুটি তখন তাকে বেশি আনন্দ দিবে।

বাস্তবতা নির্মম ও কঠিন হলেও তাকে মেনে নিয়েই আমাদের চলতে হবে।

**৩. সারমর্ম লিখুন :** ১০ × ২ = ২০

ক. একদা ছিল না জুতা চরণযুগলে
দহিল হৃদয় মম সেই ক্ষোভানলে।
ধীরে ধীরে চুপি চুপি দুঃখাকুল মনে
গেলাম ভজনালয়ে ভজন কারণে।
দেখি সেথা একজন পদ নাহি তার
অমনি জুতার খেদ ঘুচিল আমার।
পরের দুঃখের কথা করিলে চিন্তন
আপনার মনে দুঃখ থাকে কতক্ষণ।

**সারমর্ম :** মানুষের প্রত্যাশার কোনো শেষ নেই। এই অসীম প্রত্যাশা পূরণ করতে না পারার ব্যর্থতা সব সময়ই তাকে কষ্ট দেয়। কিন্তু কেউ যদি অপরের এরকম অপ্রাপ্তির বেদনার কথা গভীরভাবে চিন্তা করে তাহলে তার নিজের মনে না পাওয়ার আর কোনো দুঃখ থাকে না।



খ. মহাসমুদ্রের শত বৎসরের কল্লোল কেহ যদি এমন করিয়া বাঁধিয়া রাখিতে পারিত যে, সে ঘুমাইয়া পড়া শিশুটির মতো চুপ করিয়া থাকিত, তবে সেই নীরব মহাশব্দের সহিত এই লাইব্রেরির তুলনা হইত। এখানে ভাষা চুপ করিয়া আছে, প্রবাহ স্থির হইয়া আছে, মানবাত্মার অমর আলোক কালো অক্ষরের শৃঙ্খলে কাগজের কারাগারে বাঁধা পড়িয়া আছে। ইহারা সহসা যদি বিদ্রোহী হইয়া উঠে, নিস্তব্ধতা ভাঙ্গিয়া ফেলে অক্ষরের বেড়া দগ্ধ করিয়া একেবারে বাহির হইয়া আসে। হিমালয়ের মাথার উপরে কঠিন বরফের মধ্যে যেমন কত কত বন্যা বাঁধা আছে, তেমনি এই লাইব্রেরির মধ্যে মানব হৃদয়ের বন্যা কে বাঁধিয়া রাখিয়াছে।

**সারাংশ :** ইতিহাস, ঐতিহ্য, সভ্যতা, অনুভূতির অনুরণন, নান্দনিক সৌন্দর্য প্রকাশ তথা শাশ্বত কল্যাণ প্রতিষ্ঠার ভূয়োদর্শন কালো কালির অক্ষরে পুস্তকে লিপিবদ্ধ থাকে। আর গ্রন্থাগারে যুগ-যুগান্তরের সে সম্পদ সঞ্চিত থাকে বলে গ্রন্থাগারই একটি জাতির মননের প্রতীক।

**৪. অতি সংক্ষেপে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর লিখুন :** ১৫ × ২ = ৩০

**ক. চর্যাপদ কে আবিষ্কার করেন?**

**উত্তর :** ১৮৮২ সালে প্রকাশিত Sanskrit Buddhist Literature in Nepal গ্রন্থে রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র সর্বপ্রথম নেপালের বৌদ্ধতান্ত্রিক সাহিত্যের কথা প্রকাশ করেন। তাতে উদ্দীপ্ত হয়ে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী নেপালের রয়েল লাইব্রেরি থেকে ১৯০৭ সালে 'চর্যাচর্যবিনিশ্চয়' নামক ঐ সাহিত্যের কতগুলো পুঁথি (পদ) আবিষ্কার করেন। উদ্ধারকারীর সম্পাদনায় 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ' থেকে পুঁথিগুলো ১৯১৬ সালে (১৩২৩ বঙ্গাব্দে) 'হাজার বছরের পুরান বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধগান ও দোহা' নামে প্রকাশিত হয়। এ গ্রন্থটিই পরে চর্যাপদ নামে পরিচিতি পায়।

**খ. বাংলা গদ্যের জনক কে?**

**উত্তর :** বাংলা গদ্যের জনক ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। বাংলা গদ্যের অবয়ব নির্মাণে তিনি বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করেন। তারই বলিষ্ঠ প্রতিভার যাদুস্পর্শে বাংলা গদ্য কৈশোরকালের অনিশ্চয়তাকে পশ্চাতে পরিত্যাগ করে পূর্ণ সাহিত্যিকরূপের নিশ্চয়তার মধ্যে স্থান পায়। বিদ্যাসাগরের পূর্ববর্তী গদ্যের বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করলে তৎকালীন লেখকদের মধ্যে যে সুষম বাক্য গঠনরীতির নিদর্শন লক্ষণীয় হয়ে ওঠে না তা নয়, কিন্তু এ ব্যাপারে বিদ্যাসাগর যেমন সচেষ্ট ছিলেন তেমন আর কারো মধ্যে দেখা যায় না। সেজন্য বাংলা গদ্যশৈলীর উদ্ভবের পঁয়তাল্লিশ বছর পরে লেখনী ধারণ করা সত্ত্বেও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে বাংলা গদ্যের জনক বলা হয়ে থাকে।

**গ. প্রাবন্ধিক হিসেবে হুমায়ুন আজাদের কৃতিত্ব আলোচনা করুন।**

**উত্তর :** হুমায়ুন আজাদ ছিলেন একজন মুক্তচিন্তার অধিকারী, ধর্মীয় গোঁড়ামীর চরম বিরোধী, দেশপ্রেমিক ও সাহিত্যিক। তার প্রবন্ধসমূহে এসব মুক্তচিন্তার পরিচয় মেলে। তার বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কিত রচনা 'লাল নীল দীপাবলি বা বাঙলা সাহিত্যের জীবনী' এবং 'কত নদী সরোবর বা বাঙলা ভাষার জীবনী' বাংলার অমূল্য সাহিত্য সম্পদ। একজন লেখকের লেখা কখনও যুগ-সময়ের দ্বারা প্রভাবিত হয়, কখনও তার লেখা যুগ-সময়কে প্রভাবিত করে। হুমায়ুন আজাদের প্রবন্ধ আমাদের যুগ-সময়কে প্রভাবিত করেছে।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



ঘ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত তিনটি ছোটগল্পের নাম লিখুন।

উত্তর : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত তিনটি বিখ্যাত ছোটগল্পের নাম হচ্ছে– ১. পোস্টমাস্টার; ২. কাবুলিওয়ালা এবং ৩. সুভা। এ তিনটি ছোটগল্পের প্রধান চরিত্র হচ্ছে যথাক্রমে রতন, মিনি এবং সুভাষিণী। ছোটগল্পের মাধ্যমে তিনি সমাজের কুসংস্কার, নারী অধিকার এবং নারী বিদ্রোহসহ নানাবিধ দিক উপস্থাপন করেছেন। প্রেম ও প্রকৃতি তার গল্পের অন্যতম উপাদান। তিনি গল্প সরাসরি আরম্ভ করেন এবং মুহূর্তের মধ্যে পাঠকের মনকে ঘটনাস্রোতে মগ্ন করেন। ঠিক মুখে বলা গল্পের মতো সহজ স্বচ্ছন্দ স্রোতে বয়ে চলে তার কাহিনি।

ঙ. বড়ু চণ্ডীদাস রচিত কাব্যটির নাম লিখুন।

উত্তর : বড়ু চণ্ডীদাস রচিত 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' মধ্যযুগের প্রথম কাব্য। তিনি ভাগবতের কৃষ্ণলীলা সম্পর্কিত কাহিনী অবলম্বনে, জয়দেবের গীতগোবিন্দ কাব্যের প্রভাব স্বীকার করে, লোকসমাজে প্রচলিত রাধাকৃষ্ণ প্রেম সম্পর্কিত গ্রাম্য গল্প অবলম্বনে পঞ্চদশ শতাব্দীতে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্য রচনা করেন। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যের প্রধান চরিত্র তিনটি; কৃষ্ণ, রাধা ও বড়াই। এ কাব্যের মোট ১৩টি খণ্ড আছে। এগুলো হলো : জন্মখণ্ড, তাম্বুলখণ্ড, দানখণ্ড, নৌকাখণ্ড, ভারখণ্ড, ছত্রখণ্ড, বৃন্দাবনখণ্ড, কালিয়দমনখণ্ড, যমুনাখণ্ড, হারখণ্ড, বাণখণ্ড, বংশীখণ্ড ও রাধাবিরহখণ্ড।

চ. তিনটি মঙ্গল কাব্যের নাম লিখুন।

উত্তর : তিনটি মঙ্গলকাব্য হলো মনসামঙ্গল, ধর্মমঙ্গল ও অন্নদামঙ্গল।

**মনসামঙ্গল :** মঙ্গলকাব্যগুলোর মধ্যে মনসামঙ্গল প্রাচীনতম। সাপের দেবী মনসার পূজা প্রচারের কাহিনীই এ কাব্যের বিষয়বস্তু। এ কাব্যের মূল চরিত্রগুলো হলো চাঁদ সওদাগর, বেহুলা, লখিন্দর ও মনসা দেবী।

**ধর্মমঙ্গল :** ধর্মমঙ্গল হলো পঞ্চদশ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গের বীরভূম, বর্ধমান, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর ইত্যাদি অঞ্চলে ধর্মঠাকুর বা ধর্ম নামের যে দেবতাকে নিম্নশ্রেণী এবং কোথাও কোথাও উচ্চশ্রেণীর হিন্দুরা পূজা করত, সেই কাহিনী অবলম্বনে রচিত কাব্য। এ কাব্যের মূল চরিত্রগুলো হলো–হরিশ্চন্দ্র, মদনা, লুইচন্দ্র, কর্ণসেন, গৌড়েশ্বর ও লাউসেন।

**অন্নদামঙ্গল :** অন্নদামঙ্গল হলো দেবী অন্নদার মাহাত্ম্য প্রচারে ভবানন্দ মজুমদারের জীবন নিয়ে রচিত কাব্য। কবি ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর রচিত এ কাব্যের মূল চরিত্রগুলো হলো ভবানন্দ, হরিহোড়, বিদ্যাসুন্দর, মানসিংহ, ঈশ্বরী পাটনী।

ছ. 'অবসরের গান' কবিতাটি কার রচনা?

উত্তর : 'অবসরের গান' কবিতাটির রচয়িতা রূপসী বাংলার কবি জীবনানন্দ দাশ। প্রকৃতি মগ্নতা এ কবির বৈশিষ্ট্য। বাংলাদেশের প্রকৃতি তার কবিতায় অত্যন্ত আকর্ষণীয় রূপে বিধৃত হয়েছে। ঝরাপালক, বনলতা সেন, মহাপৃথিবী, সাতটি তারার তিমির, বেলা অবেলা কালবেলা, রূপসী বাংলা তার বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ।

জ. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের তিনটি উপন্যাসের নাম লিখুন।

উত্তর : মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত তিনটি বিখ্যাত উপন্যাস হলো– ১. জননী; ২. পদ্মানদীর মাঝি এবং ৩. পুতুল নাচের ইতিকথা। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত প্রথম উপন্যাসের নাম 'জননী' (১৯৩৫)। তার 'পদ্মানদীর মাঝি' (১৯৩৬) উপন্যাসটি 'পূর্বাশা' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। এ আঞ্চলিক উপন্যাসে জেলে জীবনের সুখ-দুঃখ বর্ণনা করা হয়েছে। এ উপন্যাসের উল্লেখযোগ্য চরিত্র হচ্ছে– কুবের, কপিলা, মালা, ধনঞ্জয়, গণেশ, শীতলবাবু, হোসেন মিঞা প্রমুখ। 'পুতুল নাচের ইতিকথা' (১৯৩৬) উপন্যাসের প্রধান দুটি চরিত্র হচ্ছে– শশী ও কুসুম।



ঝ. ভাষা আন্দোলনভিত্তিক দুটি কবিতার নাম লিখুন।

উত্তর : ভাষা আন্দোলন তথা একুশের প্রথম কবিতা মাহবুব-উল-আলম চৌধুরীর 'কাঁদতে আসিনি, ফাঁসির দাবি নিয়ে এসেছি' ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারির রক্তাক্ত ঘটনার পরপরই রচিত হয়েছিল। ভাষা আন্দোলনভিত্তিক আরেকটি বিখ্যাত কবিতা মোহাম্মদ মনিরুজ্জামানের 'শহীদ স্মরণে'। [এছাড়া কবি গোলাম মোস্তফার 'একুশে ফেব্রুয়ারি' কবিতায় ভাষা আন্দোলনের চেতনার প্রতিফলন ঘটেছে। 'সংগ্রাম চলবেই' কবিতায় সিকান্দার আবু জাফর লিখেছেন–

"জনতার সংগ্রামই চলবেই
আমাদের সংগ্রাম চলবেই।"]

ঞ. মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক তিনটি উপন্যাসের নাম লিখুন।

উত্তর : মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক তিনটি উপন্যাস হলো– ১. রাইফেল রোটি আওরাত, ২. দুই সৈনিক ও ৩. নির্বাসন।

১. **রাইফেল রোটি আওরাত :** শহীদ বুদ্ধিজীবী অধ্যাপক আনোয়ার পাশার 'রাইফেল রোটি আওরাত' মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক উপন্যাসসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সংযোজন। প্রত্যক্ষ আর সাক্ষাৎ ঘটনাবলীকে তিনি উপন্যাসে রূপ দিয়েছেন জীবনের শেষ এ গ্রন্থে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ এ অঞ্চলে পাক হানাদারের আক্রমণ নিখুঁতভাবে তুলে ধরা হয়েছে উপন্যাসটিতে।

২. **দুই সৈনিক :** স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় কিভাবে আমাদেরই আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে কেউ কেউ পাকিস্তানি মিলিটারিদের সহায়তা করতে এগিয়ে গিয়েছিল এবং অবশেষে নিজেদের এবং প্রিয়জনদের জীবনে দুর্ভোগ ও করুণ পরিণতি নেমে এসেছিল তার একটি চিত্র অঙ্কিত হয়েছে শওকত ওসমানের এ উপন্যাসে।

৩. **নির্বাসন :** হুমায়ূন আহমেদের এ উপন্যাসটি একজন পঙ্গু মুক্তিযোদ্ধাকে নিয়ে লিখিত। স্বাধীনতা যুদ্ধে আনিসের নিম্নাঙ্গ স্থায়ীভাবে অবশ হয়ে গেলে তার প্রেমিকা জরীর বিয়ে হয়ে যায় অন্য ছেলের সাথে। বরযাত্রীরা তৈরি হয়েছে বিদায় নিতে। সবাই জরীকে ধরাধরি করে উঠানে নিয়ে এলো। আনিস জানালা দিয়ে নিচে তাকিয়ে আছে। তার মনে গভীর বিষাদের ছায়া নেমে এলো।

ট. বঙ্গবন্ধুর অসমাপ্ত আত্মজীবনী সম্পর্কে তিনটি বাক্য রচনা করুন।

উত্তর : জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান রচিত 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' গ্রন্থটি এপ্রিল ২০১২ ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড (ইউপিএল) থেকে প্রকাশিত হয়। ২০০৪ সালে নজরে আসা এ ডায়েরিটি তিনি ১৯৬৭ থেকে ১৯৬৯ সাল পর্যন্ত পাকিস্তানের কারাগারে অন্তরীণ থাকাকালীন সময়ে লিখেছিলেন। এখানে তিনি তার নিজের জীবনের বিভিন্ন রাজনৈতিক পর্যায় যেমন ভাষা আন্দোলন, স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলন ইত্যাদি তুলে ধরেছেন।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



**ঠ. বাংলাদেশের তিনজন বিশিষ্ট নাট্যকারের নাম লিখুন।**

**উত্তর :** বাংলাদেশের তিনজন বিশিষ্ট নাট্যকার হলেন–১. মুনীর চৌধুরী, ২. সেলিম আল দীন, ৩. হুমায়ূন আহমেদ।

১. **মুনীর চৌধুরী :** তিনি রক্তাক্ত প্রান্তর, চিঠি, কবর, দণ্ডকারণ্য প্রভৃতি নাটক রচনা করেছেন।

২. **সেলিম আল দীন :** সেলিম আল দীনের উল্লেখযোগ্য নাটক– সর্প বিষয়ক গল্প ও অন্যান্য (১৯৭৩), কেরামতমঙ্গল (১৯৮৩), কীত্তন খোলা (১৯৮৩), মুনতাসীর ফ্যান্টাসি (১৯৮৫), চাকা (১৯৯০), যৈবতী কন্যার মন (১৯৯২), বনপাংশুল (১৯৯১), হরগজ (১৯৯২), হাতহদাই (১৯৯৭)।

৩. **হুমায়ূন আহমেদ :** তার রচিত উল্লেখযোগ্য নাটক– এইসব দিনরাত্রি, কোথাও কেউ নেই, নক্ষত্রের রাত, মন্ত্রী মহোদয়ের আগমন শুভেচ্ছা স্বাগতম, চন্দ্র কারিগর, চন্দ্রগ্রহণ, অপরাহ্ণ, রূপালি নক্ষত্র, সবুজ ছায়া, উড়ে যায় বকপক্ষী।

**ড. বাংলা সাহিত্যের তিনজন শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিকের নাম লিখুন।**

**উত্তর :** বাংলা সাহিত্যের তিনজন শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক হলেন–১. শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ২. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ৩. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়।

১. **শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় :** বাংলা সাহিত্যের সর্বাধিক জনপ্রিয় ঔপন্যাসিক হলেন শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। তিনি বাঙালির আবেগশ্রোতকে খুলে দিয়েছিলেন এবং সে আবেগে ভেসে গিয়েছিল পাঠকেরা। তিনি সামাজিকভাবে নিষিদ্ধ কিছু ব্যাপারকে সামনে নিয়ে এসেছিলেন এবং সেগুলোকে মহিমা দান করেছিলেন।

২. **বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় :** তাকে বাংলা উপন্যাসের স্থপতি বলা হয়। তার প্রথম সার্থক উপন্যাস 'দুর্গেশনন্দিনী'। বিষয়বস্তুর অসাধারণত্বের ওপর প্রাধান্য আরোপের প্রবণতা, উপন্যাসের কাঠামো নির্মাণে নৈয়ায়িক বা তার্কিক শৃঙ্খলা রক্ষার চেষ্টা এবং মননশীলতাজনিত সুষমতার প্রয়োগের জন্য তিনি বিখ্যাত।

৩. **মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় :** তিরিশের দশকে বাংলা কথাসাহিত্যের যে পালাবদল বাংলা গল্প এবং উপন্যাসের নতুন একটি বিশ্ব নির্মাণকে সম্ভবপর করে তুলেছিল, তিনি ছিলেন এর প্রধান স্থপতি। 'পদ্মানদীর মাঝি' তার বিখ্যাত উপন্যাস।

**ঢ. বৈষ্ণব পদাবলীর তিনজন শ্রেষ্ঠ পদকর্তার নাম লিখুন।**

**উত্তর :** বৈষ্ণব পদাবলীর তিনজন শ্রেষ্ঠ পদকর্তা হলেন– ১. বিদ্যাপতি, ২. চণ্ডীদাস ও ৩. জ্ঞানদাস।

১. **বিদ্যাপতি :** বিদ্যাপতি ছিলেন মিথিলার রাজসভার কবি। রাজা শিবসিংহ তাকে কবিকণ্ঠহার উপাধিতে ভূষিত করেন। তার রচিত কয়েকটি বইয়ের নাম– পুরুষপরীক্ষা, কীর্তিলতা, গঙ্গাবাক্যাবলী, ভাগবত ইত্যাদি।

২. **চণ্ডীদাস :** বাংলা ভাষায় বৈষ্ণব পদাবলীর আদি রচয়িতা কবি চণ্ডীদাস। শিক্ষিত বাঙালি বৈষ্ণব সাহিত্যের রস ও আনন্দের সংবাদ পেয়েছে চণ্ডীদাসের পদাবলী থেকে। চৈতন্যদেব যার পদাবলী শুনে মোহিত হতেন তিনি এই চণ্ডীদাস। 'সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই' তার বিখ্যাত উক্তি।

৩. **জ্ঞানদাস :** সম্ভবত ষোড়শ শতাব্দীতে বর্ধমান জেলায় কবি জ্ঞানদাসের জন্ম। তিনি চণ্ডীদাসের কাব্যাদর্শ অনুসরণ করেন এবং তার সঙ্গে নিজের প্রতিভার সমন্বয় করেন। তার বিখ্যাত চরণ-'রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর।'



**ণ. কোন তিন কবির নাম যথাক্রমে কবিকণ্ঠহার, কবিকঙ্কণ ও রায়গুণাকর।**

**উত্তর : কবিকণ্ঠহার :** 'কবিকণ্ঠহার' উপাধিটি কবি বিদ্যাপতির। রাজা শিবসিংহ তাকে এ উপাধিতে ভূষিত করেন। তার কয়েকটি বইয়ের নাম– পুরুষপরীক্ষা, কীর্তিলতা, গঙ্গাবাক্যাবলী, ভাগবত ইত্যাদি।

**কবিকঙ্কণ :** 'কবিকঙ্কণ' হচ্ছে মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর উপাধি। মেদিনীপুর জেলার বাকুড়া রায়ের পুত্র রঘুনাথ তাকে এ উপাধি প্রদান করেন।

**রায়গুণাকর :** 'রায়গুণাকর' ভারতচন্দ্রের উপাধি। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র তাকে এ উপাধি প্রদান করেন। তার বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ হচ্ছে– 'অন্নদামঙ্গল'।

## ৩৩তম বিসিএস ২০১২, বাংলা : দ্বিতীয় পত্র

নির্ধারিত সময় : ৩ ঘণ্টা; পূর্ণমান : ১০০

[দ্রষ্টব্য : *প্রত্যেক প্রশ্নের মান প্রশ্নের শেষ প্রান্তে দেখানো হয়েছে।*] নম্বর

১. যে কোনো একটি বিষয়ে রচনা লিখুন : ৪০

ক. মুক্তিযুদ্ধের চেতনার পটভূমিতে গণতান্ত্রিক সমাজ;

**উত্তর :** পৃষ্ঠা ৮০৬।

খ. দুর্নীতিমুক্ত সমাজ গঠনে সমাজশক্তির ভূমিকা;

**উত্তর :** পৃষ্ঠা ৬৭৬।

গ. বাংলাদেশে পাট শিল্পের ভবিষ্যৎ;

**উত্তর :** পৃষ্ঠা ৬৪২।

ঘ. বাঙালির বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলন ও বাংলা সাহিত্য;

**উত্তর :** পৃষ্ঠা ৭৬০ ও ৭৬৬।

ঙ. বাংলাদেশে ফোকলোর চর্চা

**উত্তর :** পৃষ্ঠা ৭৫২।

**২. বন্ধনীর মধ্যে উল্লিখিত সঙ্কেতের ইঙ্গিতে একটি প্রবন্ধ লিখুন :** ৪০

**ক. পরিবেশ আন্দোলন :**

(পরিবেশের সংজ্ঞা; পরিবেশ আন্দোলনের সূচনা; পরিবেশ আন্দোলনের কারণসমূহ; বিশ্ব পরিবেশ সচেতনতা; পরিবেশ আন্দোলনে বাংলাদেশের ভূমিকা; পরিবেশ আন্দোলনে বিশ্ব সমাজের করণীয়; পরিবেশ আন্দোলনে সরকারি ও বেসরকারি সহযোগিতা; উপসংহার।)

**উত্তর :** পৃষ্ঠা ৮৪৯।

**খ. নারীর ক্ষমতায়ন :**

(সূচনা; বিশ্ব প্রেক্ষাপট; বাংলাদেশ প্রেক্ষাপট; প্রশাসনিক পর্যায়ে নারীর অবস্থান; নারীর ক্ষমতায়ন প্রক্রিয়া ও বাস্তব প্রেক্ষাপট; নারীর ক্ষমতায়নে প্রতিবন্ধকতা; নারীর ক্ষমতায়নে সরকারের গৃহীত পদক্ষেপ; উপসংহার।)

**উত্তর :** পৃষ্ঠা ৮৩১।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



**গ. নিয়মানুবর্তিতা বা শৃঙ্খলাবোধ :**
(ভূমিকা; নিয়মানুবর্তিতার প্রয়োজনীয়তা; সমাজ ও জাতীয় জীবনে নিয়মানুবর্তিতা; নিয়মানুশীলনের প্রস্তুতিকাল; নিয়মানুবর্তিতা ব্যক্তি স্বাধীনতার অন্তরায় নয়; নিয়মানুবর্তিতা ভঙ্গের পরিণতি; নিয়মানুবর্তিতার ফলাফল; উপসংহার।)

**৩. যে কোনো একটি বিষয়ে পত্র লিখুন : ২০**

**ক. বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তকে ইতিহাস বিকৃতিগত ত্রুটি সংশোধন ও সঠিক ইতিহাস সংরক্ষণে কতিপয় কার্যকর প্রস্তাব জানিয়ে শিক্ষামন্ত্রী বরাবর একটি স্মারকলিপি রচনা করুন।**

**বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তকে ইতিহাস বিকৃতিগত ত্রুটি সংশোধন ও সঠিক ইতিহাস সংরক্ষণে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী সমীপে**

**স্মারকলিপি**

**হে শিক্ষানুরাগী,**
স্বাধীন সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী হিসেবে আপনি দেশের আপামর মানুষের নিকট শিক্ষার আলো পৌঁছে দেবার মহান দায়িত্ব গ্রহণ করায় আপনাকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। শিক্ষাক্রম উন্নয়ন, শিক্ষাক্ষেত্রে দুর্নীতির মূলোৎপাটন, শ্রেণীকক্ষে পাঠদানের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান ইত্যাদি ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণে আপনি যে দৃঢ় ভূমিকা নিয়েছেন তা ইতোমধ্যেই শিক্ষা উন্নয়নে কার্যকর পদক্ষেপ হিসেবে সর্বমহলে প্রশংসিত হয়েছে। এজন্য আপনাকে সাধুবাদ জানাই। বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের চেতনায় উজ্জীবিত হয়ে নিরন্তর দেশের জন্য আপনার অধিকতর ভালো কিছু করার প্রচেষ্টা ও অব্যাহত ত্যাগ জনগণ শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করে। আপনি একটি দলের নির্বাচিত সংসদ সদস্য ও গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রী হয়েও নিজের স্বচ্ছ জ্ঞান ও বিবেক বিচ্যুত হয়ে এখন পর্যন্ত কোনো কাজ করেননি। আপনি কোনো দলের না হয়ে, বরং সকলের বন্ধু হয়ে সমাজ উন্নয়নে প্রাণান্ত চেষ্টা অব্যাহত রেখেছেন। এটি অবশ্যই আনন্দের, গৌরবের আর অহংকারের বিষয়। আপনার মতো একজন শিক্ষামন্ত্রী আমরা পেয়েছি এটি সত্যিই পরম সৌভাগ্যের।

**হে দেশপ্রেমিক,**
সুখানুভূতির এ মহতী পর্বে অত্যন্ত দুঃখের সাথে স্মরণ করতে হয় যে, ৩০ লক্ষ শহীদের রক্তের বিনিময়ে অর্জিত আমাদের সোনার বাংলাদেশ। মা-বোনের ইজ্জত এবং অনেক ত্যাগ-তিতিক্ষা ও দীর্ঘ নয় মাস রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে অর্জন করা স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশে অধিকার রয়েছে আমাদের সকলের। এটি কারও ব্যক্তিগত সম্পদ বা সম্পত্তি নয়, নয় কোনো বিশেষ দলের বা গোষ্ঠীর। তবু স্বাধীনতা পরবর্তী সরকারগুলো তাদের ভিতকে মজবুত ও নিজেদের রাজনৈতিক দুর্বলতা ঢেকে রাখার অপচেষ্টা হিসেবে স্কুল কলেজের পাঠ্যপুস্তকে ইতিহাস বিকৃত করার মত জঘন্য ঘটনার অবতারণা করে চলছে। এ সকল বিকৃত ইতিহাস যেমন বিকৃত মন-মানসিকতার বহিঃপ্রকাশ, তেমনি একটি দুর্বল ও বিকৃত জাতি হিসেবে দেশকে ধ্বংস করে দেবার পাঁয়তারাও বটে।

**হে শিক্ষামোদী,**
সঠিক ইতিহাস জাতির জন্য শুধু গর্বেরই বিষয় নয়, এটি একটি উন্নত জাতি গঠনের শর্তস্বরূপ। আমরা জানি জাতির উৎপত্তি, ইতিহাস, প্রত্নতাত্ত্বিকতা প্রভৃতি বিকৃত ও নষ্ট হয়ে গেলে জাতীয় পরিচয় দেবার জন্য সে জাতির আর অবশিষ্ট কিছু থাকে না। কিন্তু আমাদের দেশের রাজনীতিবিদরা



স্বাধীনতার ঘোষক, স্বাধীনতায় নেতৃত্ব, মহান নেতা জাতির পিতা প্রভৃতি অহেতুক প্রশ্নে সব সময়ই দ্বিধা বিভক্ত থেকে নিজেদের মতো ইতিহাস রচনা করে জাতির সাথে প্রতারণা করে চলেছে। আর এ সকল ইতিহাসের আশ্রয়স্থল হিসেবে স্কুল-কলেজের পাঠ্যপুস্তককেই গিনিপিগ বানানো হচ্ছে।

**হে শিক্ষাচার্য,**
অত্যন্ত লজ্জা ও ঘৃণার বিষয় হলো এ দেশে এখনো বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের প্রতি শ্রদ্ধা সর্বজনীন ও প্রশ্নমুক্ত হয়নি। যে জাতির রয়েছে সংগ্রাম ও যুদ্ধের সুদীর্ঘ ইতিহাস, যে জাতি মাথা নত করেনি ইংরেজ ও পাকিস্তানিদের কাছে, সে জাতির প্রতিনিধি হয়ে ঘৃণ্য ও হীনমনোবৃত্তির পরিচয় দিয়ে চলেছে এ দেশের কিছু স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী। কোমলমতি শিশু-কিশোরদের ভুল তথ্য দিয়ে এক ধরনের তথ্য-দ্বিধা তৈরি করছে এরা। ফলে দেশের অদূর ভবিষ্যৎ আলোহীন অন্ধকার পথের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। এমতাবস্থায় ইতিহাস বিকৃতিগত ত্রুটি সংশোধন ও সঠিক ইতিহাস সংরক্ষণের জন্য কতিপয় কার্যকর প্রস্তাব পেশ করা হলো :

- দলমত নির্বিশেষে দেশের একই ইতিহাস সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা।
- দেশের সকল শিক্ষাবোর্ডের অধীনে সকল শ্রেণীর বইয়ে একই ইতিহাস তুলে ধরা।
- ইতিহাসের বিকৃতি ও দলীয়করণকৃত বই ও দলিল দস্তাবেজ সরকারিভাবে নষ্ট করে ফেলা।
- স্কুল-কলেজে ইতিহাসের তথ্যসমূহ নির্ভুল ও অবিকৃতি নিশ্চিত করে নতুন পাঠ্যবই ও রেফারেন্স বই সরবরাহ করা।
- সর্বোপরি শিক্ষিত, মেধাবী ও উন্নত জাতি গঠনে একই ইতিহাসের সান্নিধ্যে নতুন প্রজন্মকে গড়ে তোলার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা।

পাঠ্যপুস্তক থেকে বিকৃত ইতিহাস মুছে ফেলে সঠিক ইতিহাস সংরক্ষণ করা এখন সময়ের দাবি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত। তাই নতুন প্রজন্মকে সঠিক ইতিহাস জানাতে এবং ঐক্যবদ্ধ বাংলাদেশী হিসেবে নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠা করতে আপনার যথাযথ পদক্ষেপ প্রত্যাশা করছি। আপনার জীবন কর্মসফল হোক। আপনি দীর্ঘায়ু হোন।

তারিখ : ২৪.১২.২০১৪
ঢাকা

বিনীত
সচেতন দেশবাসীর পক্ষে
..............................
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা-১০০০।

**খ. আপনার অঞ্চলের কৃষকদের কৃষিপণ্যের ন্যায়সঙ্গত মূল্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে একটি 'কমিউনিটি খাদ্য গুদাম নির্মাণ প্রয়োজন' মর্মে জাতীয় দৈনিকে প্রকাশের জন্য একটি পত্র লিখুন।**

তারিখ : ২২.০৫.২০১৪

সম্পাদক
প্রথম আলো
১০০ কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ
কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



জনাব,
আপনার বহুল প্রচারিত 'প্রথম আলো' পত্রিকার চিঠিপত্র কলামে নিম্নলিখিত জনগুরুত্বপূর্ণ সংবাদটি প্রকাশ করে বাধিত করবেন।

বিনীত
আরিফুল ইসলাম
কুনিয়া, মাদারীপুর

মাদারীপুরের কুনিয়ায় কমিউনিটি খাদ্য গুদাম নির্মাণ প্রয়োজন

আমরা মাদারীপুর জেলার অন্তর্গত সদর উপজেলার কুনিয়া ইউনিয়নের বাসিন্দা। এ এলাকায় প্রায় এক লক্ষ লোক বসবাস করে। এ জনগোষ্ঠীর অধিকাংশই কৃষিকাজ করে জীবিকা নির্বাহ করে। এসব কৃষক এতই দরিদ্র যে, ফসল তোলার মৌসুমেই তারা সব ফসল বিক্রি করে দিতে বাধ্য হয়। এর ফলে তারা ফসলের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত হন। কারণ ফসল তোলার মৌসুমে ঐ সব খাদ্যশস্যের দাম খুবই কম থাকে। আর এ সুযোগটি কাজে লাগায় স্থানীয় মধ্যস্বত্বভোগী মজুদদাররা। তারা এ মৌসুমে অল্প দামে কৃষকের কাছে থেকে ফসল কিনে নিয়ে মজুদ করে রাখে এবং সুবিধামতো সময়ে চড়াদামে তা বিক্রি করে। কৃষক যেখানে তার উৎপাদিত ফসলের উৎপাদন খরচ পাচ্ছেন না সেখানে মজুদদাররা বিরাট অঙ্কের টাকা লাভ করছে। ফলে এ অঞ্চলের কৃষকদের অস্তিত্বের সংকট দেখা দিয়েছে এবং কৃষিকাজ মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে। এমতাবস্থায় এই এলাকার কৃষি ও কৃষকদেরকে রক্ষা এবং মধ্যস্বত্বভোগী মুনাফালোভী ব্যবসায়ীদের দৌরাত্ম্য কমাতে সরকারের আশু হস্তক্ষেপ প্রয়োজন। এলাকার লোকজন এক্ষেত্রে মনে করেন যে, সরকারের খাদ্য মন্ত্রণালয়ের অধীন জেলা খাদ্য কর্মকর্তার তত্ত্বাবধানে এখানে একটি কমিউনিটি খাদ্য গুদাম নির্মাণ করে এ সমস্যার কিছুটা হলেও সমাধান করা সম্ভব হবে। এর ফলে কৃষকগণ ঐ গুদামে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত দামে তাদের পণ্য বিক্রি করতে পারবেন। এতে কৃষক যেমন ন্যায্য দাম পাবেন তেমনি বাজারেও কৃষিপণ্যের মূল্য স্থিতিশীল থাকবে। তবে দুঃখজনক হলেও সত্য যে, এ খাদ্য গুদাম নির্মাণের ব্যাপারে পূর্বে সংশ্লিষ্ট দপ্তরে যোগাযোগ করা হলেও এক্ষেত্রে কোনো অগ্রগতি সাধিত হয়নি। কিন্তু এ এলাকার উন্নয়নের জন্য এ পরিস্থিতির অবসান ঘটানো একান্ত প্রয়োজন। তাই অনতিবিলম্বে কমিউনিটি খাদ্য গুদাম নির্মাণ করে জনদুর্ভোগ লাঘবে যথাযথ কর্তৃপক্ষের সদয় দৃষ্টি আবারও আকর্ষণ করছি।

এলাকাবাসীর পক্ষে
**আরিফুল ইসলাম**
কুনিয়া, মাদারীপুর।

গ. মহল্লার পাশে শিশুদের খেলার মাঠে ইদানিং মাদকাসক্তদের আনাগোনা বেড়ে যাওয়ায় উদ্বেগ প্রকাশ করে পৌর মেয়রকে পত্র লিখুন।

তারিখ : ২২.০৫.২০১৪

মেয়র
রাজৈর পৌরসভা
রাজৈর, মাদারীপুর



বিষয় : খেলার মাঠে মাদকাসক্তদের উপদ্রব নিরসনে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের আবেদন।

জনাব,
সবিনয় নিবেদন এই যে, আমরা রাজৈর পৌরসভার নতুন শহর এলাকার বাসিন্দা। আমাদের এলাকাটি অত্যন্ত ঘনবসতিপূর্ণ। এ এলাকায় ভদ্র-শালীন, মার্জিত রুচির লোকের যেমন অভাব নেই তেমনি অভাব নেই দুশ্চরিত্র, চোর-বাটপার এবং নেশাখোরদেরও। এসব মাদকসেবী তাদের আড্ডার এবং যাবতীয় অপকর্মের স্থান হিসেবে বেছে নিয়েছে এ মহল্লার শিশুদের খেলার জন্য পৌরসভা কর্তৃক নির্ধারিত মাঠটি। দিনের বেলায় এ মাদকাসক্তদের আনাগোনা কম হলেও রাত হবার সাথে সাথেই তারা তাদের কার্যক্রম শুরু করে দেয়। গভীর রাতে তারা নির্জন পথিকের সর্বস্ব কেড়ে নেয়। এসব মাদকসেবীর ভয়ে কোমলমতি শিশুরা এখন আর এ মাঠে খেলতে আসে না। তাই এটি বর্তমানে একটি পরিত্যক্ত এবং নোংরা মাঠে পরিণত হয়েছে। মাঠের জন্য পর্যাপ্ত নিরাপত্তা এবং আলোর ব্যবস্থাও নেই। এমতাবস্থায় আর কিছুদিন গেলে এটিকে আর মাঠ বলা যাবে না। এছাড়া এ মাদকাসক্তদেরও স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনার প্রয়োজন রয়েছে।

অতএব, জনাবের সমীপে আবেদন, উক্ত মাঠ রক্ষায় এবং মাদকসেবীদের কালো থাবার হাত থেকে অত্র এলাকা রক্ষায় কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করে বাধিত করবেন।

নিবেদক
নতুন শহর এলাকাবাসীর পক্ষে
মেহনাজ মাহজেবীন আদৃতা

## ৩২তম বিসিএস ২০১২, বাংলা : প্রথম পত্র

নম্বর

[দ্রষ্টব্য : *প্রত্যেক প্রশ্নের মান প্রশ্নের শেষ প্রান্তে দেখানো হয়েছে।*]

১. ক. বানান, শব্দ-প্রয়োগ ও বিন্যাস, ভাষারীতি ইত্যাদি শুদ্ধ করে নিচের বাক্যগুলো পুনরায় লিখুন : $\frac{১}{২}$×১২ = ৬

১. দৈন্যতা প্রশংসনীয় নয়।
উত্তর : দৈন্য/দীনতা প্রশংসনীয় নয়।

২. ছাত্রীগণের মধ্যে অনুপস্থিতের সংখ্যা কম।
উত্তর : ছাত্রীদের মধ্যে অনুপস্থিতির সংখ্যা কম।

৩. এমন অসহ্যনীয় ব্যাথা আমি আর কখনও অনুভব করি নাই।
উত্তর : এমন অসহ্য ব্যথা আমি কখনো অনুভব করিনি।

৪. আকণ্ঠ পর্যন্ত ভোজনে স্বাস্থ্যহানি ঘটে।
উত্তর : আকণ্ঠ ভোজনে স্বাস্থ্যহানি ঘটে।

৫. আবশ্যকীয় ব্যায়ে কার্পণ্যতা অনুচিত।
উত্তর : আবশ্যক ব্যয়ে কার্পণ্য অনুচিত।

৬. তাহার বৈমাত্রেয় সহোদর অসুস্থ।
উত্তর : তার বৈমাত্রেয় ভাই অসুস্থ।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



৭. সমুদয় সভ্যগণ আসিয়াছেন।
উত্তর : সভ্যগণ এসেছেন।

৮. পাতায় পাতায় পরে শিশির শিশির।
উত্তর : পাতায় পাতায় পড়ে নিশির শিশির।

৯. ঝনুঝা শেষ হইতে না হতে কুঝ্ঝটি অনচলটি ছাইয়া ফেললো।
উত্তর : ঝঞ্ঝা শেষ হতে না হতে কুজ্ঝটিকা অঞ্চলটি ছেয়ে ফেললো।

১০. পৈত্রিক সম্পত্ত্বির মাদ্যমে ভদ্রস্থতা রক্ষা হয়, মহদুপকারও হয়।
উত্তর : পৈতৃক সম্পত্তির মাধ্যমে ভদ্রতা রক্ষা হয়, মহোপকারও হয়।

১১. সকলে একত্রিত হয়ে ধুমপান পরিত্যয্য ঘোষণা করিলেন।
উত্তর : সকলে একত্র হয়ে ধূমপান পরিত্যাজ্য ঘোষণা করলেন।

১২. অনুবাদিত কবিতাটি পড়ে সে উচ্ছাসে উচ্ছল হয়ে উঠল।
উত্তর : অনূদিত কবিতাটি আবৃত্তি করে সে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল।

খ. শূন্যস্থান পূরণ করুন : ৬

আজকের দুনিয়াটা আশ্চর্যভাবে অর্থের — উপর নির্ভরশীল। লাভ ও লোভের দুর্নিবার গতি কেবল — যাবার নেশায় লক্ষ্যহীন প্রচণ্ড — শুধুই আত্মবিনাশের পথে এগিয়ে চলেছে; মানুষ যদি এই মূঢ়তাকে — না করতে পারে, তবে — কথাটাই হয়তো লোপ পেয়ে যাবে। মানুষের জীবন আজ এমন এক — এসে পৌছেছে, যেখান থেকে আর হয়তো — উপায় নেই; এবার উঠবার সিঁড়িটা না খুঁজলেই নয়।

উত্তর : আজকের দুনিয়াটা আশ্চর্যভাবে অর্থের **নাড়িকাঠির** উপর নির্ভরশীল। লাভ ও লোভের দুর্নিবার গতি কেবল **আগে** যাবার নেশায় লক্ষ্যহীন প্রচণ্ড **বেগে** শুধুই আত্মবিনাশের পথে এগিয়ে চলেছে; মানুষ যদি এই মূঢ়তাকে **জয়** না করতে পারে, তবে **মনুষ্যত্ব** কথাটাই হয়তো লোপ পেয়ে যাবে। মানুষের জীবন আজ এমন এক **প্রান্তে** এসে পৌছেছে, যেখান থেকে আর হয়তো **নামবার** উপায় নেই; এবার উঠবার সিঁড়িটা না খুঁজলেই নয়।

গ. ছয়টি পূর্ণবাক্যে নিচের প্রবাদটির নিহিতার্থ প্রকাশ করুন : ৬

সে কহে বিস্তর মিছা, যে কহে বিস্তর।

উত্তর : মিথ্যাবাদীরা সাধারণত বেশি কথা বলেন। তারা যে কোনো ঘটনা বা বিষয় বর্ণনার ক্ষেত্রে যেমন প্রচুর মিথ্যার অবতারণা ঘটান তেমনি এসব মিথ্যাকে স্বাভাবিক সত্য হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে প্রাসঙ্গিক-অপ্রাসঙ্গিক প্রচুর যুক্তি তুলে ধরেন। পক্ষান্তরে, একজন সত্যবাদী লোক স্বল্পভাষী হন। সত্যবাদী লোক যে কোনো ঘটনা বা বিষয়কে যথাযথভাবে বর্ণনা করে সমাজের ইতিবাচক ধারাকে বজায় রাখতে সহায়তা করেন। মিথ্যাবাদী তার বর্ণনায় সত্য-মিথ্যার মিশ্রণ ঘটিয়ে বিষয়টিকে অতিরঞ্জিত করে তোলেন। তার প্রচুর কথাবার্তা তাকে আরো পাপী করে তোলে এবং সমাজে দ্বন্দ্ব-কলহ সৃষ্টি করে।

ঘ. নিচের শব্দগুলো দিয়ে পূর্ণবাক্য রচনা করুন : ৬

অন্বয়, কমা, অনুনাসিক, ছাঁচ, টোকা, সারসংক্ষেপ।

উত্তর : অন্বয় : ক্রিয়ার সঙ্গে সম্বন্ধ পদের অন্বয় বা সম্বন্ধ নেই বলে সম্বন্ধ পদকে কারক বলা হয় না।
কমা : বাক্যে সম্বোধন পদের পর কমা বসে।



অনুনাসিক : চন্দ্রবিন্দু প্রতীকটি পরবর্তী স্বরধ্বনির অনুনাসিকতার দ্যোতনা করে বলে একে অনুনাসিক ধ্বনি বলে।
ছাঁচ : শামীমার চরিত্রটি একজন আদর্শ রমণীর ছাঁচে গঠিত হয়ে উঠেছিল।
টোকা : চাষীরা টোকা মাথায় দিয়ে বের হয়েছে।
সারসংক্ষেপ : ২০১৪-১৫ অর্থবছরের জাতীয় বাজেটের সারসংক্ষেপ বর্ণনা কর।

ঙ. নির্দেশানুযায়ী বাক্যগুলো রূপান্তর করুন : ৬

১. ধনীরা প্রায়ই কৃপণ হয়। (জটিল বাক্য)
উত্তর : যারা ধনী, তারা প্রায়ই কৃপণ হয়।

২. মিথ্যা বলার জন্য তোমার পাপ হবে। (যৌগিক বাক্য)
উত্তর : তুমি মিথ্যা বলেছো, তাই তোমার পাপ হবে।

৩. যিনি পরের উপকার করেন, তাঁকে সবাই শ্রদ্ধা করে। (সরল বাক্য)
উত্তর : পরোপকারীকে সবাই শ্রদ্ধা করে।

৪. সবাই অধীনতার বন্ধন ছিন্ন করতে চায়। (প্রশ্নাত্মক বাক্য)
উত্তর : কে না অধীনতার বন্ধন ছিন্ন করতে চায়?

৫. আরও কথা আছে। (নেতিবাচক বাক্য)
উত্তর : এটিই শেষ কথা নয়।

৬. তার আদর্শ বিস্মরণযোগ্য নয়। (অস্তিবাচক বাক্য)
উত্তর : তার আদর্শ অবিস্মরণীয়।

২. যে কোনো একটি প্রবাদের ভাব-সম্প্রসারণ করুন (অনধিক ২০টি বাক্যে) : ২০

ক. জন্ম হোক যথা তথা কর্ম হোক ভাল।

ভাব-সম্প্রসারণ : আপন জন্মের ব্যাপারে মানুষের নিজের কোনো ভূমিকা থাকে না। উঁচু বা নিচু, ধনী বা দরিদ্র পরিবারে তার জন্ম হওয়াটা তার ইচ্ছা বা কর্মের ওপর নির্ভর করে না। কিন্তু কর্মজীবনে তার ভূমিকা ও অবদানের দায় তার নিজের ওপর বর্তায়। তাই পৃথিবীতে মানুষের প্রকৃত বিচারে তার জন্ম-পরিচয় তেমন গুরুত্ব বহন করে না। বরং কর্ম-অবদানের মাধ্যমেই মানুষ পায় মর্যাদার আসন, হয় বরণীয়-স্মরণীয়।
সমাজে একদল লোক আছেন যারা বংশ আভিজাত্যে নিজেদের সম্ভ্রান্ত মনে করেন। তারা বংশ মর্যাদার অজুহাতে সমাজে বিশেষ মর্যাদা দাবি করেন। কিন্তু তাদের এই প্রয়াস বাস্তবতা বিবর্জিত ও হাস্যকর। সমাজের নিচুতলায় জন্ম নিয়েও মানুষ কর্ম ও অবদানে বড় হতে পারে। মানবসমাজের ইতিহাসে এ রকম উদাহরণ অজস্র। পদ্মফুলের সৌন্দর্যই বড়। পঙ্কে জন্মেছে বলে তাকে হেয় গণ্য করা হয় না। তেমনি মানুষের কর্মে সাফল্যই বড়, জন্ম-পরিচয়ে মানুষের বিচার হীনমন্যতারই পরিচায়ক। বস্তুত প্রকৃতির রাজ্যে মানুষে মানুষে কোনো ভেদাভেদ নেই। একদল মানুষ মানুষের ওপর আধিপত্য কায়েমের জন্য সমাজে বড়-ছোট, ধনী-দরিদ্র ইত্যাদি ব্যবধান সৃষ্টি করেছে। ধর্মীয় ব্যবধান রচনা করেছে মানুষই। ফলে সমাজে মানুষে মানুষে আপাতদৃষ্টে ভেদাভেদ সৃষ্টি হয়েছে। তাই যে কোনো পেশা, যে কোনো কাজ মানুষ করুক না কেন, তা সমাজে গুরুত্বহীন নয়। মানুষ যেখানেই জন্মাক, যে কাজই করুক, সে সততা ও নিষ্ঠার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করছে কিনা সেটাই বিবেচ্য। মানুষের কল্যাণে, সমাজের অগ্রগতিতে সে যতটা অবদান রাখে তার ভিত্তিতেই তাকে মূল্যায়ন করা হয়। সেই অনুযায়ীই তাকে সমাজে স্বীকৃতি দিতে হয়। বংশ-পরিচয়ের অজুহাতে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সম্পদ, ক্ষমতা ও দম্ভের শক্তিতে মানুষের ওপর জবরদস্তি করে সমাজে মর্যাদার আসন লাভ করা যায় না। তাই জন্ম-পরিচয়ে, উর্ধ্বে আপন কর্ম-পরিচয় তুলে ধরাই হওয়া উচিত মানুষের জীবনব্রত। তাহলেই সুকর্মের মাধ্যমে মানুষ গৌরব ও মর্যাদার আসনে আসীন হতে পারে।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



খ. জ্ঞানহীন মানুষ পশুর সমান।

ভাব-সম্প্রসারণ : জ্ঞানে মানুষ যথার্থ মনুষ্যত্বের অধিকারী হয়ে ওঠে। মানুষের প্রকৃত বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায় জ্ঞানের অধিকারী হলে। অন্যদিকে, জ্ঞানহীন মানুষ পশুত্বের পর্যায় থেকে উন্নীত হতে পারে না। তাই মানুষের সবসময় জ্ঞান সাধনায় নিয়োজিত থাকা অত্যাবশ্যক।

মানুষ হিসেবে জন্ম নিলেই মানুষের জীবন মানবিক গুণসম্পন্ন হয় না। মানুষকে মনুষ্যত্ব অর্জন করতে হয়। শিক্ষা-দীক্ষা ও অভিজ্ঞতার প্রভাবে মানুষের জীবন ক্রমেই জ্ঞান দ্বারা সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। জ্ঞান মানুষকে যোগ্যতা দান করে। নানা বিদ্যায় সে পারদর্শী হতে থাকে। জ্ঞানের আলোকেই মানুষের জীবন বিকশিত হয়। জ্ঞান মানুষকে বিশ্বজগতের সাথে পরিচিত করে। মানুষ হিসেবে শ্রেষ্ঠত্ব লাভের জন্য জ্ঞানের সহায়তা অপরিহার্য। অন্য প্রাণীর সাথে মানুষের পার্থক্য এখানেই। বিশ্বের তাবৎ প্রাণীর ওপর মানুষ প্রভুত্ব করছে জ্ঞানের শক্তিতে। বিশ্ব সভ্যতার বিকাশ ঘটেছে জ্ঞানের অবদানের ফলে। বিশ্বজগতের বর্তমান উন্নতির পেছনে দাঁড়িয়ে আছে মানুষের জ্ঞানের সাধনা। অপরদিকে, শিক্ষা-দীক্ষার অভাবে জ্ঞানের সাথে যেসব মানুষ পরিচিত হতে পারেনি তারা যথার্থ মনুষ্যত্বের মর্যাদা পায়নি। তারা অজ্ঞতার আঁধারে চিরদিন আবদ্ধ হয়ে আছে। তারা যোগ্যতাহীন। কিছু অবদান রাখার মতো সামর্থ্য তাদের নেই। তারা উন্নত জীবনের সন্ধান পায়নি। জ্ঞানের অভাবে তারা আধুনিক জীবনের সম্পদও ভোগ করতে পারে না। তাদের জীবনের সাথে পশুর জীবনের কোনো পার্থক্য নেই। মানুষ ও পশুর মধ্যে জ্ঞানই ভেদরেখা টেনে রাখে। তাই জ্ঞান অর্জিত না হলে মানুষ আর পশুর মধ্যে কোনো ব্যবধান থাকে না।

৩. সারমর্ম লিখুন : ১০ × ২ = ২০

ক. সবারে বাসিব ভাল, করিব না আত্মপর ভেদ
সংসারে গড়িব এক নতুন সমাজ।
মানুষের সাথে কভু মানুষের রবে না বিচ্ছেদ–
সর্বত্র মৈত্রীর ভাব করিবে বিরাজ।
দেশে দেশে যুগে যুগে কত যুদ্ধ কত না সংঘাত।
মানুষে মানুষে হল কত হানাহানি।
এবার মোদের পুণ্যে সমুদিবে প্রেমের প্রভাত
সোল্লাসে গাহিবে সবে সৌহার্দ্যের বাণী।

সারমর্ম : আপন-পর আত্মীয়-অনাত্মীয় সকলকে একই সম্পর্কের বন্ধনে গেঁথে আমরা একটি বৈষম্যহীন সমাজ গড়ে তুলব। যুদ্ধ বা দ্বন্দ্ব-সংঘাত নয়, পারস্পরিক ভালোবাসা ও সহমর্মিতার মাধ্যমেই বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব। আমাদের প্রত্যাশা হচ্ছে প্রেম-পুণ্যে ভরা একটি সাম্য ও সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশ।

খ. বিশ্বের যা কিছু মহান সৃষ্টি চির-কল্যাণকর।
অর্ধেক তার করিয়াছে নারী, অর্ধেক তার নর।
বিশ্বের যা কিছু এল পাপ-তাপ বেদনা অশ্রুবারি
অর্ধেক তার আনিয়াছে নর, অর্ধেক তার নারী।
নরককুণ্ড বলিয়া কে তোমা করে নারী হেয়-জ্ঞান?
তারে বল, আদি-পাপ নারী নহে, সে যে নর-শয়তান।
অথবা পাপ যে... শয়তান যে... নর নহে নারী নহে,
ক্লীব সে, তাই সে নর ও নারীতে সমান মিশিয়া রহে।
এ বিশ্বে যত ফুটিয়াছে ফুল, ফলিয়াছে যত ফল,
নারী দিল তাহে রূপ, রস-মধু-গন্ধ সুনির্মল।



সারমর্ম : জগৎ-সভ্যতা বিনির্মাণে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলের রয়েছে সমান অবদান। নারী-পুরুষ উভয়ের পরিশ্রমেই গড়ে উঠেছে আজকের বিশ্বসভ্যতা। তাই মানুষ হিসেবে কেউ ছোট নয়, সকলেই সমান পূজনীয়।

৪. অতি সংক্ষেপে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর লিখুন : ২ × ১৫ = ৩০

ক. 'সান্ধ্য ভাষা' কি? এ ভাষায় কোন সাহিত্য রচিত হয়েছে, সংক্ষেপে লিখুন।

উত্তর : যে ভাষা সুনির্দিষ্ট রূপ পায়নি, যে ভাষার অর্থও একাধিক অর্থাৎ আলো-আঁধারের মতো, সে ভাষাকে পণ্ডিতগণ সন্ধ্যা বা সান্ধ্য ভাষা বলেছেন। এ ভাষায় বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন যুগের একমাত্র নিদর্শন 'চর্যাপদ' রচিত হয়েছে। এটি মূলত বৌদ্ধ সহজিয়াগণ কর্তৃক রচিত ৫০টি বা ৫১টি গানের সংকলন। চর্যাপদের আবিষ্কারক হরপ্রসাদ শাস্ত্রী চর্যাপদের ভাষা সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন, 'আলো আঁধারি ভাষা, কতক আলো, কতক অন্ধকার, খানিক বুঝা যায়, খানিক বুঝা যায় না।' এ কারণেই চর্যার ভাষাকে সান্ধ্যভাষা বলা হয়।

খ. বিখ্যাত চারজন বৈষ্ণব পদকর্তার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিন।

উত্তর : বৈষ্ণব পদাবলীর চারজন মহাকবি হলেন-বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস ও গোবিন্দদাস।

১. বিদ্যাপতি : বিদ্যাপতি ছিলেন মিথিলার রাজসভার কবি। রাজা শিবসিংহ তাকে কবিকণ্ঠহার উপাধিতে ভূষিত করেন। তার রচিত কয়েকটি বইয়ের নাম-পুরুষপরীক্ষা, কীর্তিলতা, গঙ্গাবাক্যাবলী, ভাগবত ইত্যাদি।

২. চণ্ডীদাস : বাংলা ভাষায় বৈষ্ণব পদাবলীর আদি রচয়িতা কবি চণ্ডীদাস। শিক্ষিত বাঙালি বৈষ্ণব সাহিত্যের রস ও আনন্দের সংবাদ পেয়েছে চণ্ডীদাসের পদাবলী থেকে। চৈতন্যদেব যার পদাবলী শুনে মোহিত হতেন তিনি এই চণ্ডীদাস। 'সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই' তার বিখ্যাত উক্তি।

৩. জ্ঞানদাস : সম্ভবত ষোড়শ শতাব্দীতে বর্ধমান জেলায় কবি জ্ঞানদাসের জন্ম। তিনি চণ্ডীদাসের কাব্যাদর্শ অনুসরণ করেন এবং তার সঙ্গে নিজের প্রতিভার সমন্বয় করেন। তার বিখ্যাত চরণ-'রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর।'

৪. গোবিন্দদাস : গোবিন্দদাস বিদ্যাপতির ভাবাদর্শে বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। বিদ্যাপতির অলঙ্কার ও চিত্রকল্প তাকে মুগ্ধ করেছিল। তিনি কল্পনাকে চমৎকার অলংকার পরিয়ে দেন। তার বিখ্যাত পঙ্‌ক্তি-'যাহাঁ যাহাঁ নিকসয়ে তনু তনু জ্যোতি।'

গ. আলাওলকে 'পণ্ডিত কবি' বলা হয় কেন?

উত্তর : আলাওল ছিলেন আরাকানের রাজসভার আশীর্বাদপ্রাপ্ত কবিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। শুধু তাই নয়, তিনি মধ্যযুগের মুসলমান কবিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। আলাওলের শ্রেষ্ঠ কাব্যের নাম 'পদ্মাবতী' (১৬৪৮)। আলাওলের অন্যান্য বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ হচ্ছে-'সয়ফুলমুলুক বদিউজ্জামাল, 'সেকান্দার নামা'। আলাওল কবি, কিন্তু পণ্ডিত কবি। তার কাব্যে পাণ্ডিত্য ও কবিত্বের সংমিশ্রণ ঘটেছে। রত্নসেন, ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ আলাওলের পাণ্ডিত্যের স্বীকৃতি দিয়ে উদ্ধৃতি দিয়েছেন। কাব্য, প্রেম ইত্যাদি সম্পর্কে আলাওলের মন্তব্য বিবেচনা করলেই তার পাণ্ডিত্যের গভীরতা উপলব্ধি করা যায়।

ঘ. 'লায়লী মজনু' কাব্যের প্রেমের স্বরূপ আলোচনা করুন।

উত্তর : আমির-পুত্র কয়েস বাল্যকালে বণিক-কন্যা লায়লীর প্রেমে পড়ে মজনু বা পাগল নামে খ্যাত হয়। লায়লীও মজনুর প্রতি গভীর আকর্ষণ অনুভব করে। কিন্তু উভয়ের মিলনের মধ্যে আসে প্রবল বাধা; ফলে মজনু পাগলরূপে বনে-জঙ্গলে ঘুরে বেড়াতে থাকে। অন্যদিকে লায়লীর অন্যত্র বিয়ে হলেও তার মন থেকে মজনু সরে যায়নি। তাদের দীর্ঘ বিরহজীবনের অবসান ঘটে করুণ মৃত্যুর মাধ্যমে। এই মর্মস্পর্শী বেদনাময় কাহিনী অবলম্বনেই লায়লী-মজনু কাব্য রচিত।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



ঙ. 'মেঘনাদ বধ' কাব্যের সর্গ সংখ্যা কত এবং কি কি?
উত্তর : 'মেঘনাদবধ কাব্য'-এর মোট নয়টি সর্গ রয়েছে। এগুলো হচ্ছে-প্রথম সর্গ-অভিষেক, দ্বিতীয় সর্গ-অস্ত্রলাভ, তৃতীয় সর্গ-সমাগম, চতুর্থ সর্গ-অশোক বন, পঞ্চম সর্গ-উদ্যোগ, ষষ্ঠ সর্গ-বধ, সপ্তম সর্গ-শক্তিনির্ভেদ, অষ্টম সর্গ-প্রেতপুরী এবং নবম সর্গ-সংস্ক্রিয়া।

চ. সংক্ষেপে কপালকুণ্ডলা চরিত্রের স্বরূপ নির্ণয় করুন।
উত্তর : 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসে 'কপালকুণ্ডলা' হচ্ছে অরণ্যে এক কাপালিক পালিতা নারী, যাকে কেন্দ্র করে এ উপন্যাসের কাহিনী গড়ে উঠেছে। কপালকুণ্ডলা এক রহস্যময়ী নারী আর উপন্যাসের মূল কাহিনী সেই রহস্যকে ঘিরেই আবর্তিত হয়েছে। প্রকৃতির সৌন্দর্য ও রহস্যময়তার সাথে কপালকুণ্ডলা চরিত্রটি একাকার হয়ে গেছে। এ চরিত্রের মাধ্যমে বাস্তবজীবনকে ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করে বিস্ময়কর ও অলৌকিকের প্রতি প্রবণতা প্রকাশ পেয়েছে। এটি একটি রোমান্টিক চরিত্র। ইতিহাস ও দৈবশক্তির সংমিশ্রণে কপালকুণ্ডলা চরিত্রটি দৃঢ় ব্যক্তিত্বসম্পন্না নারী চরিত্র হিসেবে পাঠক মনে স্থান করে নিয়েছে।

ছ. 'গৃহদাহ' উপন্যাসে সুরেশ চরিত্রটি সংক্ষেপে আলোচনা করুন।
উত্তর : 'গৃহদাহ' উপন্যাসে সুরেশ হচ্ছে মহিমের বন্ধু, যে মহিমের স্ত্রী অচলার প্রণয়ী। এ উপন্যাসে সুরেশের প্রতি অচলার আকর্ষণ-ই হচ্ছে কাহিনীর কেন্দ্রীয় উপকরণ। সুরেশের মাধ্যমে শরৎচন্দ্র এ উপন্যাসে প্রথা বহির্ভূত প্রেম ও নারী-পুরুষ সম্পর্কের এক ব্যতিক্রম বর্ণনা তুলে ধরেছেন। অচলা স্বামী মহিমকে ভালোবেসেই বিয়ে করেছিল, কিন্তু সুরেশকেও দূরে ঠেলে দেয়া তার পক্ষে সম্ভব হয়নি। স্বামীগৃহ ত্যাগ করে সুরেশের সঙ্গে চলে গিয়ে সে গতানুগতিক সামাজিক আদর্শে চরম আঘাত হানে।

জ. 'সধবার একাদশী' কি সার্থক প্রহসন? আলোচনা করুন।
উত্তর : 'সধবার একাদশী' (১৮৬৬) একটি সার্থক প্রহসন। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে সুরাপান ও বেশ্যাসক্তি একশ্রেণীর যুবকের জীবনে বিপর্যয় সৃষ্টি করেছিল, যা এ প্রহসনের মূল কাহিনী। নায়ক নিমচাঁদের জীবনে প্রতিভা থাকা সত্ত্বেও ব্যর্থতা, অধঃপতন বোধ ও আত্মগ্লানি নাটকটিতে এক নতুন মাত্রা যোগ করেছে। চরিত্রসৃষ্টি, সংলাপ, ঘটনাপ্রবাহ, কৌতুক সবকিছু মিলিয়ে 'সধবার একাদশী' বাংলা সাহিত্যের একটি সার্থক প্রহসন। এখানে 'নিমচাঁদ' চরিত্রটি অবিস্মরণীয় এবং 'কেনারাম' চরিত্রটি তৎকালীন শিক্ষিত শ্রেণীর নৈতিক অবস্থান ও হাস্যকর বিচার ব্যবস্থার নির্দেশক।

ঝ. লোকসাহিত্য বলতে কি বুঝেন? এর প্রধান শাখা কি কি?
উত্তর : সাহিত্য হলো একের সাথে অন্যের মিলনের মাধ্যম। লোকসাহিত্য হলো জনসাধারণের মুখে মুখে প্রচলিত গাঁথা, কাহিনী, গান, ছড়া, প্রবাদ ইত্যাদি। লোকসাহিত্যের উপাদান হলো জনশ্রুতিমূলক বিষয়। বহুদিন পূর্বের কোনো ঘটনা বা কাহিনী লোক পরম্পরায় কল্পনারূপক হয়ে লোকসাহিত্যে স্থান পায়। লোকসাহিত্যের প্রধান শাখা হচ্ছে লোকগান, গীতিকা, কাহিনী ও কবিগান। 'হারামণি' প্রাচীন লোকগীতি সংকলন। এর সম্পাদক মনসুর উদ্দীন। নাথ গীতিকা, পূর্ববঙ্গ গীতিকা ও মৈমনসিংহ গীতিকা হচ্ছে লোকগীতিগুলোর তিনটি ভাগ। 'ঠাকুরমার ঝুলি', 'ঠাকুরদাদার ঝুলি', 'টুনটুনির বই' প্রভৃতি বিখ্যাত লোককাহিনী। গোঁজলা গুই কবিগানের আদি গুরু।

ঞ. 'পাখির কাছে ফুলের কাছে' কার রচনা? তার রচিত তিনটি কাব্যের নাম লিখুন।
উত্তর : 'পাখির কাছে ফুলের কাছে' রচনাটি আল মাহমুদ রচিত একটি শিশুসাহিত্য। 'লোক লোকান্তর', 'কালের কলস', 'সোনালী কাবিন' তার রচিত তিনটি কাব্যের নাম।



ট. কবি কায়কোবাদের প্রকৃত নাম কি? তার লেখা 'অশ্রুমালা' কাব্যের কাহিনী সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করুন।
উত্তর : কায়কোবাদের প্রকৃত নাম মুহম্মদ কাজেম আল কোরেশী। কায়কোবাদের একটি বিখ্যাত গীতিকাব্য 'অশ্রুমালা'। এ গ্রন্থের মূল সুর প্রেম। তবে প্রকৃতির প্রতি আকর্ষণবোধও এ কাব্যে লক্ষ্য করা যায়। এ গ্রন্থে 'প্রিয়তমার প্রতি', 'সেই মুখখানি', 'নীরব রোদন', 'উদাসীন প্রেমিক' ইত্যাদি কবিতায় প্রণয়ক্ষেত্রের বঞ্চনা ও প্রণয়রঞ্জিত জীবনের প্রগাঢ় বেদনার পরিচয় আছে। এ কাব্যের অনেকগুলো কবিতায় আমরা মুসলমানদের প্রাচীন সমৃদ্ধি ও সৌভাগ্যের কথা স্মরণ করে কবিকে দুঃখ প্রকাশ করতে দেখেছি। মুসলমানদের বর্তমান দুরবস্থা কবিকে বেদনার্ত করেছে। তাই তিনি অতীতের সমৃদ্ধ যুগকে অবলম্বন করতে চেয়েছেন। 'শ্মশান সঙ্গীত', 'সিরাজ সমাধি', 'মোসলেম শ্মশান' ইত্যাদি কবিতায় এরূপ ইতিহাস রয়েছে।

ঠ. গ্রিক ট্র্যাজেডি 'ইডিপাস' বাংলায় অনুবাদ করেন কে? তার রচিত তিনটি কাব্যের নাম লিখুন।
উত্তর : 'ইডিপাস' গ্রন্থটি বাংলায় অনুবাদ করেন সৈয়দ আলী আহসান। তার বিখ্যাত তিনটি কাব্যগ্রন্থ হচ্ছে- 'একক সন্ধ্যায় বসন্ত', 'অনেক আকাশ' ও 'সহসা সচকিত'।

ড. সৈয়দ মুজতবা আলীর চারটি গ্রন্থের নাম লিখুন।
উত্তর : সৈয়দ মুজতবা আলীর বিখ্যাত চারটি গ্রন্থ হচ্ছে-'চাচা-কাহিনী', 'দেশে বিদেশে', 'পঞ্চতন্ত্র' ও 'শবনম'। এর মধ্যে 'চাচা-কাহিনী' ছোটগল্প গ্রন্থ, 'দেশে-বিদেশে' ভ্রমণকাহিনী, 'পঞ্চতন্ত্র' ব্যক্তিগত প্রবন্ধ সংকলন এবং 'শবনম' উপন্যাস।

ঢ. 'নারী জাগরণের অগ্রদূত' বেগম রোকেয়ার 'সুলতানার স্বপ্ন' রচনাটির কাহিনী সংক্ষেপে বিবৃত করুন।
উত্তর : বাংলা সাহিত্যে নারী জাগরণের অগ্রদূত বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন রচিত 'সুলতানার স্বপ্ন' গ্রন্থটি ইংরেজিতে Sultana's Dream শিরোনামে রচিত। এ গ্রন্থের বর্ণনায় Sultana একজন অবরুদ্ধ নারী। গৃহের চতুষ্কোণ হচ্ছে তার বিচরণ ও কর্মক্ষেত্র, বাইরের হাজারো সুবিধা ভোগ করার অধিকার তার ছিল না। তিনি স্বপ্ন দেখেন : তিনি তার বোন সারার মতো এক অপরিচিতা নারীর সঙ্গে অন্তঃপুর ত্যাগ করে উন্মুক্ত প্রকৃতির মধ্যে ফুল-বাগান দেখতে বের হয়েছেন, যাকে স্বপ্নরাজ্য (Lady land) বলা হয়েছে। অর্থাৎ এ গ্রন্থে বেগম রোকেয়া একটি নারীবাদী স্বপ্নরাজ্য বা ইউটোপিয়ার বর্ণনা দিয়েছেন, যেখানে সমাজে নারী-পুরুষের প্রচলিত ভূমিকা উল্টে গেছে। সেখানে নারীরা সমাজের যাবতীয় অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের প্রধান চালিকাশক্তি আর পুরুষরা প্রায় গৃহবন্দি। এ সমাজে কোনো অপরাধ নেই, এখানে প্রচলিত ধর্ম 'ভালোবাসা ও সত্যের'।

ণ. মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক একটি উপন্যাস সম্বন্ধে সংক্ষেপে বর্ণনা করুন।
উত্তর : শওকত ওসমানের মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক উপন্যাস 'নেকড়ে অরণ্য' নির্বাসিত রমণীদের বোবা কান্নায় মুখর। একটা গুদাম ঘর শৃঙ্খলিত বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করছে। গুদাম ঘরের মধ্যে যেসব নারী আছে তারা অপমানিতা, নির্যাতিতা, ধর্ষিতা এবং সেই সূত্রে হিন্দু-মুসলমান শিক্ষিত-অশিক্ষিত গ্রামীণ ও নাগরিক রমণীদের মধ্যে একটা ঐক্য ও সাম্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। রুচি, সংস্কৃতি ও ভাষার ব্যবধান দূর হয়ে একটি গভীর মমত্ববোধ পরা সবাই পরস্পরের কাছাকাছি এসেছিল। সকলের কাছে একটা দুঃখই পাহাড়। তারই ভারত সকলে বহনরতা। তাই একে অপরের কাছাকাছি হওয়ার ব্যগ্রতা অপরিসীম।

## ৩২তম বিসিএস ২০১২, বাংলা : দ্বিতীয় পত্র

৩২তম বিসিএস পরীক্ষা মুক্তিযোদ্ধা, মহিলা ও উপজাতীয় (শুধু কারিগরি ও পেশাগত ক্যাডার) প্রার্থীদের জন্য স্পেশাল হওয়ায় 'বাংলা দ্বিতীয় পত্র' বিষয়ে লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়নি।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



# ৩১তম বিসিএস ২০১১, বাংলা : প্রথম পত্র

*[দ্রষ্টব্য : প্রার্থীদিগকে সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। বাংলা ভাষায় প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। প্রত্যেক প্রশ্নের মান প্রশ্নের শেষ প্রান্তে দেখানো হয়েছে।]* নম্বর

১. ক. বানান, শব্দ প্রয়োগ ও বিন্যাস, ভাষারীতি ইত্যাদি শুদ্ধ করে নিচের বাক্যগুলো পুনরায় লিখুন : $\frac{১}{২}\times১২=৬$

১. সমস্ত প্রাণীকূলই পরিবেশের জন্য নিতান্ত প্রয়োজন।
শুদ্ধ : সব প্রাণীই পরিবেশের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

২. মুমুর্ষ লোকটির সাহায্য করা উচিৎ।
শুদ্ধ : মুমূর্ষু লোকটিকে সাহায্য করা উচিত।

৩. তোমার কটুক্তি শুনিয়া তিনি মর্মাহত হয়েছেন।
শুদ্ধ : তোমার কটূক্তি শুনে তিনি মর্মাহত হয়েছেন।

৪. রুগ্ন ব্যক্তিটির জন্য আরও অধিকতর সাহায্য প্রয়োজন।
শুদ্ধ : রুগ্ণ ব্যক্তিটির জন্য আরও অধিক সাহায্য প্রয়োজন।

৫. কারোর জন্যই দৈন্যতা কাংখিত হতে পারে না।
শুদ্ধ : কারো জন্যই দৈন্য/দীনতা কাম্য হতে পারে না।

৬. আমি বিভূতিভূষন বন্ধোপাধ্যায়ের কোনো উপন্যাস পড়ি নি।
শুদ্ধ : আমি বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কোনো উপন্যাস পড়িনি।

৭. পুকুর পরিষ্কারের জন্য কতৃপক্ষ পুরষ্কার ঘোষনা করেছে।
শুদ্ধ : পুকুর পরিষ্কারের জন্য কর্তৃপক্ষ পুরস্কার ঘোষণা করেছেন।

৮. অদ্যক্ষ মহদয় ঘটনার বিশদ বিবরন জানতে চাইল।
শুদ্ধ : অধ্যক্ষ মহোদয় ঘটনাটির বিশদ বিবরণ জানতে চাইলেন।

৯. বিষয়টি মস্তিষ্ক গ্রহন করার নয়, অন্তরে উপলব্ধির যোগ্য।
শুদ্ধ : বিষয়টি মস্তিষ্কগ্রাহ্য নয়, অন্তরে উপলব্ধিযোগ্য।

১০. অনুস্ঠানে স্ববান্দবে আপনি আমন্ত্রিত।
শুদ্ধ : অনুষ্ঠানে আপনি সবান্ধব আমন্ত্রিত।

১১. সেই ভীবৎসো ঘটনা এখনও বিস্মিত হতে পারি নি।
শুদ্ধ : সেই বীভৎস ঘটনা এখনও বিস্মৃত হতে পারিনি।

১২. লক্ষী মেয়ে যারা ছিল, এখন তারা চরছে ঘোটক।
শুদ্ধ : যারা লক্ষ্মী মেয়ে ছিল, তারা এখন ঘোড়ায় চড়ছে।

খ. শূন্যস্থান পূরণ করুন : ৬

—— স্বাধীনতাযুগে সমাজপতিরা সমাজ-উন্নয়নে —— ধরতেন। ফলে, জন-অধিকার আদায়ের স্বপ্ন —— ছিল না। বর্তমানে —— ধনীরা সে পদ অধিকার করেছেন। তাই, জনগণের —— উন্নত জীবনের স্বপ্ন হয়ে উঠেছে যেন ——।

উত্তর : প্রাক, ম্যাও, ছেলের হাতের মোয়া, অর্থগৃধ্নু, সার্বিক, সোনার হরিণ।



গ. ছয়টি পূর্ণবাক্যে নিচের প্রবাদটির নিহিতার্থ প্রকাশ করুন : ৬

যে সহে, সে রহে

উত্তর : সহনশীলতা একটি মহৎ গুণ এবং মানবজীবনে সুপ্রতিষ্ঠার জন্য এ গুণের বিশেষ গুরুত্ব বিদ্যমান। মানুষের মতো বাঁচতে হলে এবং জীবনে সাফল্য অর্জন করতে হলে সর্বাগ্রে প্রয়োজন সহনশীলতা। রোগ-শোক, দুঃখ-দারিদ্র্য, অন্যায়-অবিচার এসবের চাপে মানুষ পর্যুদস্ত হয়ে চোখে বিভীষিকা দেখে। কিন্তু এসব প্রতিরোধে চাই শক্তি, অধ্যবসায় ও সহিষ্ণুতা। যুদ্ধে জয়-পরাজয় আছেই কিন্তু যে মানুষ পরাজয়কে অম্লান বদনে মাথা পেতে নিয়ে পরবর্তী বিজয়ের জন্য ব্রতী হয়, সেই বিজয় অর্জন করতে পারে, সে-ই যথার্থ বীর। সহিষ্ণুতার গুণেই রবার্ট ব্রুস সপ্তমবারের যুদ্ধে শত্রুর কবল থেকে দেশকে উদ্ধার করেন।

ঘ. নিচের শব্দগুলো দিয়ে পূর্ণবাক্য রচনা করুন : ৬

অভিহিত মূল্য; নির্ঘণ্ট; পরিবীক্ষণ; রূপরেখা; মোক্তারনামা; প্রাধিকার।

উত্তর : অভিহিত মূল্য : অভিহিত মূল্যের উপর ভিত্তি করে শেয়ারের লভ্যাংশ ঘোষিত হয়।

নির্ঘণ্ট : যে কোনো বইয়ের নির্ঘণ্ট একটি অতি প্রয়োজনীয় অংশ।

পরিবীক্ষণ : প্রতিষ্ঠানের হিসাব পরিবীক্ষণের জন্য চুক্তিভিত্তিক একজন পরিবীক্ষক নিয়োগ দেয়া হয়েছে।

রূপরেখা : সম্প্রতি ভারত-বাংলাদেশ অবকাঠামোগত উন্নয়নের রূপরেখা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে।

মোক্তারনামা : মোক্তারনামা হাতে পাওয়ার পর উভয় পক্ষই নতুন উদ্যমে মামলা পরিচালনায় উঠে-পড়ে লাগল।

প্রাধিকার : মুক্তিযোদ্ধার সন্তান, নারী এবং উপজাতিদের প্রাধিকার কোটায় নিয়োগের লক্ষ্যে ৩২তম বিসিএস পরীক্ষার বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে।

ঙ. নির্দেশানুযায়ী বাক্যগুলো রূপান্তর করুন : ৬

১. আগে পরীক্ষা দাও, পরে চিন্তা করো। (সরল বাক্য)
উত্তর : পরীক্ষা দিয়ে চিন্তা কর।

২. এখনই না গেলে তার দেখা পাবে না। (যৌগিক বাক্য)
উত্তর : এখনই যাও, নতুবা তার দেখা পাবে না।

৩. পিতা তো আছেন, তবু পুত্রকে খোঁজ কেন? (জটিল বাক্য)
উত্তর : পিতা যখন আছেন তখন পুত্রকে খোঁজ কেন?

৪. যদি পানিতে না নাম, তবে সাঁতার শিখতে পারবে না। (যৌগিক বাক্য)
উত্তর : পানিতে নাম, নচেৎ সাঁতার শিখতে পারবে না।

৫. যদি কথা রাখেন, তাহলে আপনাকে বলতে পারি। (সরল বাক্য)
উত্তর : কথা রাখলে আপনাকে বলতে পারি।

৬. সে তার পিতার ঋণ পরিশোধ করেছে। (জটিল বাক্য)
উত্তর : তার পিতা যে ঋণ করেছিল, সে তা পরিশোধ করেছে।

২. যে কোনো একটি প্রবাদের ভাব-সম্প্রসারণ করুন (অনধিক ২০টি বাক্যে) : ২০

ক. চাঁদেরও কলঙ্ক আছে

ভাব-সম্প্রসারণ : প্রতিটি মানুষেরই যেমন কিছু ভালো দিক বা গুণ রয়েছে তেমনি কিছু খারাপ দিকও রয়েছে। এমনকি মহৎ ব্যক্তিবর্গও একেবারে পুরোপুরি ত্রুটিমুক্ত নন।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



ভুল করা মানুষের স্বভাব। এই ভুলের কারণে সৃষ্ট কলঙ্ক মানুষকে সমাজে হেয় করে দেয়। সাধারণ মানুষ অহরহ এই ভুল করে থাকে, তাদের জীবনে এ রকম ছোটখাট ভুল তারা নির্দ্বিধায় করে থাকে। কিন্তু মনীষীগণ কিংবা মহামানবেরা কি এ রকম ভুল বা অপরাধ করেছেন? আমরা তাদের জীবনী ভালোভাবে পর্যালোচনা করলে দেখতে পাব যে, তারাও জীবনে অল্প হলেও অপরাধ করেছেন। যদিও তারা যে পরিবেশ ও পরিস্থিতিতে অন্যায়-অপরাধ করেছেন তা সাধারণ মানুষের ভুল বা অন্যায় করার পরিস্থিতি থেকে ভিন্ন, তবুও তারা অপরাধ তো অন্তত করেছেন। তাই পৃথিবীর যত বড় মনীষী বা মহামানবের জীবনীর দিকে আমরা তাকাই না কেন কিছু অপরাধ আমরা দেখতে পাব, যা তাদের কাছ থেকে আশা করা যায় না।

চাঁদ দেখতে অনেক সুন্দর। অনেক কবি-সাহিত্যিক তাদের কাব্য রচনার অনুপ্রেরণা পান চাঁদ দেখে। কিন্তু চাঁদ সুন্দরের যথার্থ উপমা হলেও এই চাঁদের নিজের গায়েই রয়েছে অসংখ্য কলঙ্কচিহ্নস্বরূপ দাগ। তেমনি মহামানবগণ পৃথিবীতে প্রেরিত হয়েছিলেন মানবজাতিকে সুপথ দেখানোর জন্য, অথচ তাদের দ্বারাও কোনো কোনো সময় এমন অপরাধ বা ত্রুটি সংঘটিত হয়েছে যা তাদের প্রেরণের উদ্দেশ্যের সম্পূর্ণ বিপরীত। তবে আমাদেরকে এ সকল মহামানবের জীবনের ত্রুটিগুলো দেখে সেখান থেকে ভালো শিক্ষা নিতে হবে এবং চেষ্টা করতে হবে। তাদের জীবনের ত্রুটি ধরে বসে থাকলে চলবে না।

**খ. গঙ্গাজলে গঙ্গপুজো**

**ভাব-সম্প্রসারণ :** পুজো দেয়া হিন্দুধর্মাবলম্বীদের কাছে একটি অতি পুণ্যের কাজ। গঙ্গপুজোর ক্ষেত্রে যেমন দেখা যায় যে, গঙ্গামাতার জল দিয়ে পুজো দিয়ে গঙ্গাকে সন্তুষ্ট করতে চেষ্টা করা হয় তেমনি সমাজে অনেক লোক দেখা যায়, যারা কৌশলে অপরের অবদান দিয়েই অপরকে সহায়তা করে নিজের স্বার্থ আদায় করে নেন।

পৃথিবীর ইতিহাস ঘাটলে আমরা এ রকম অসংখ্য দৃষ্টান্ত দেখতে পাব যেখানে অন্যের সম্পদ দিয়েই অন্যকে পরিতুষ্ট করা হয়েছে, অথচ এ রকম কর্ম সাধনকারী ব্যক্তিকে জগতে সবাই আজও শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করে। স্বাধীনতা যুদ্ধের পর বিভিন্ন দেশ থেকে যে বিভিন্ন ধরনের সাহায্য পাওয়া গেছে তার অধিকাংশই ছিল শর্তযুক্ত, সে শর্ত পূরণ করতে গিয়ে দেখা গেছে যে, বিদেশ থেকে আগত সাহায্যের শতকরা ৮০ ভাগই আবার ঐ দেশে ফিরে গেছে। অথচ বিশ্ব জেনেছে তাদের উদারতার কথা, বর্তমান কালেও যেসব শর্তযুক্ত ঋণ সহায়তা এবং অনুন্নত দেশগুলোকে এমনভাবে কারিগরি ও প্রযুক্তিগত সহায়তা দেয়া হয়, যার ফলে ঐ সহায়তার উপকার পাওয়া অনুন্নত দেশগুলোর পক্ষে আর সম্ভব হয়ে ওঠে না। যেমন কারিগরি সহায়তার ক্ষেত্রে কারিগরি সহায়তা প্রদানকারী দেশগুলোর কাছ থেকেই বিশেষজ্ঞ বা এক্সপার্ট নিয়োগ করার শর্ত দেয়া থাকে, যাদেরকে অনেক বেশি বেতন-ভাতাসহ অন্যান্য অনেক সুবিধা প্রদান করতে হয়। এর ফলে বরং উন্নত দেশগুলোই তাদের উদ্বৃত্ত ঋণ এবং বেকার সমস্যার সমাধান করে।

এভাবে উপসাগরীয় যুদ্ধের সময় ইরানের কাছে অস্ত্র বিক্রি করে সেই অর্থ আমেরিকা তুলে দিয়েছিল নিকারাগুয়ার কন্ট্রা বিদ্রোহীদের হাতে। এভাবেই স্বার্থান্বেষী মহল কৌশলে তাদের স্বার্থ উদ্ধারে সব সময় সচেষ্ট রয়েছে। তাই আমাদেরকে এ সকল সুযোগ সন্ধানী কুচক্রীদের ব্যাপারে সতর্ক হতে হবে।





**৩. সারমর্ম লিখুন :** ১০ × ২ = ২০

ক. রূপনারাণের কূলে
জেগে উঠিলাম,
জানিলাম এ জগৎ স্বপ্ন নয়।
রক্তের অক্ষরে দেখিলাম
আপনার রূপ,
চিনিলাম আপনারে
আঘাতে আঘাতে
বেদনায় বেদনায়;
সত্য যে কঠিন,
কঠিনেরে ভালোবাসিলাম,
সে কখনো করে না বঞ্চনা।
আমৃত্যু দুঃখের তপস্যা এ জীবন,
সত্যের দারুণ মূল্যে লাভ করিবারে,
মৃত্যুতে সকল দেনা শোধ করে দিতে।

**সারমর্ম :** মানবজীবন কেবল স্বপ্নের মতো সুন্দর নয়, বরং মানবজীবনের প্রকৃতরূপ চিনতে পারা যায় কঠোর ও কঠিন বাস্তবের মুখে রূঢ় সত্যকে গ্রহণের মাধ্যমে। তবে সত্য রূঢ় হলেও সত্যবাদী পরিণামে কাঙ্ক্ষিত সুফল লাভ করে। তবে সত্যনিষ্ঠ ব্যক্তি কেবল পরকালেই তার কৃতকর্মের চূড়ান্ত ও যথার্থ পুরস্কার পাবেন।

খ. যতটুকু আবশ্যক কেবল তাহারই মধ্যে কারারুদ্ধ হইয়া থাকা মানবজীবনের ধর্ম নহে। আমরা কিয়ৎ পরিমাণে আবশ্যক শৃঙ্খলে বদ্ধ হইয়া থাকি এবং কিয়ৎ পরিমাণে স্বাধীন। আমাদের দেহ সাড়ে তিন হাতের মধ্যে বদ্ধ, কিন্তু তাই বলিয়া ঠিক সেই সাড়ে তিন হাত পরিমাণ গৃহ নির্মাণ করিলে চলে না। স্বাধীন চলাফেরার জন্য অনেকখানি স্থান থাকা আবশ্যক, নতুবা আমাদের স্বাস্থ্য ও আনন্দের ব্যাঘাত ঘটে। শিক্ষা সম্বন্ধেও এই কথা খাটে। অর্থাৎ, যতটুকু মাত্র শিক্ষা আবশ্যক– তাহারই মধ্যে ছাত্রদিগকে একান্ত নিবদ্ধ রাখিলে কখনই তাহাদের মন যথেষ্ট পরিমাণে বাড়িতে পারে না। অত্যাবশ্যক শিক্ষার সহিত স্বাধীন পাঠ না মিশাইলে ছেলেরা ভাল করিয়া মানুষ হইতে পারে না। বয়ঃপ্রাপ্ত হইলেও বুদ্ধিবৃত্তি সম্বন্ধে সে অনেকটা পরিমাণে বালকই থাকিয়া যায়।

**সারাংশ :** প্রয়োজন না থাকলেও একটা সীমাবদ্ধ গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ থাকা উচিত নয়। নিতান্ত প্রয়োজন ছাড়াও আমাদেরকে আরো অনেক কিছু করতে ও শিখতে হবে যা আমাদের জীবনকে পরিপূর্ণতা দান করবে।

**৪. অতি সংক্ষেপে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর লিখুন :** ২ × ১৫ = ৩০

**ক. চর্যাপদে চিত্রিত দরিদ্র জনগোষ্ঠীর পরিচয় দিন।**

**উত্তর :** চর্যাপদ বাঙালি সমাজের বিশ্বস্ত দলিল। এতে একদিকে যেমন তৎকালীন সমাজের উঁচু শ্রেণীর [যেমন– ব্রাহ্মণ (বামহন), মন্ত্রী (মতিএ) ইত্যাদি] জনগোষ্ঠীর বিবরণ রয়েছে তেমনি বিভিন্ন পেশার দরিদ্র জনগোষ্ঠীর বিবরণও রয়েছে এতে। এসব দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে– মাঝি (কামলি), বেশ্যা (দারী), শিকারী (অহেরী), নেয়ে (নোবাহী) ইত্যাদি। তাছাড়া চর্যাপদে ডোমিনীর নগরে তাঁত ও চেঙারি বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহের কথা উল্লেখ রয়েছে। এছাড়াও চর্যাপদে কাপালিক (কাপালি), যোগী (জোই), পণ্ডিত আচার্য (পণ্ডিতচার্য), শিষ্য (সীস) ইত্যাদি জনগোষ্ঠীর জীবনযাপন চিত্রিত হয়েছে।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



**খ. 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যের রচয়িতা সম্পর্কে ধারণা দিন।**

**উত্তর :** 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যের রচয়িতা বড়ু চণ্ডীদাস। তিনি বাঁকুড়া জেলার ছাতনায় মতান্তরে বীরভূমের নানুর গ্রামে আনুমানিক ১৩৭০ খ্রিষ্টাব্দের কোনো এক সময়ে জন্মগ্রহণ করেন। বড়ু চণ্ডীদাসের নাম কয়েকভাবে পাওয়া যায়, যেমন– অনন্ত চণ্ডীদাস, বড়ু চণ্ডীদাস, চণ্ডীদাস ইত্যাদি। এর মধ্যে বড়ু তার কৌলিন্য উপাধি, চণ্ডীদাস গুরুদত্ত নাম, অনন্ত প্রকৃত নাম। ধারণা করা হয়, তিনি চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে রাধা-কৃষ্ণের প্রেমের কাহিনী অবলম্বনে মোট ১৩ খণ্ডে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যটি রচনা করেন। তিনি আনুমানিক ১৪৩৩ খ্রিষ্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন।

**গ. 'মনসামঙ্গল' কাব্যের যে কোনো একজন কবির পরিচয় লিখুন।**

**উত্তর :** বিজয়গুপ্ত মনসামঙ্গল কাব্যের অন্যতম কবি। বাংলা সাহিত্যে সুস্পষ্ট সন-তারিখযুক্ত মনসামঙ্গল কাব্যের প্রথম রচয়িতা বিজয়গুপ্ত। তার জন্ম বাংলাদেশের বরিশাল জেলার গৈলা গ্রামে। বরিশাল অঞ্চলের প্রাচীন নাম ছিল বাকেরগঞ্জ (নদীর বাঁকে ছিল বলে এ স্থানকে বাকেরগঞ্জ বলা হতো) এবং গৈলা গ্রামের প্রাচীন নাম ছিল ফুল্লশ্রী। পিতা সনাতন গুপ্ত। মাতা রুক্মিনী দেবী। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ পাদে তিনি জীবিত ছিলেন। কবির কাব্যে উল্লিখিত একটি শ্লোক থেকে অনুমিত হয় তিনি গৌড়ের সুলতান হুসেন শাহের আমলে ১৪৯৪ খ্রিষ্টাব্দে কাব্য রচনায় প্রবৃত্ত হন। বিজয়গুপ্তের মনসামঙ্গল অত্যন্ত জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। ফলে এ ধারায় তার পূর্ববর্তী কবিগণের যশ ম্লান হয়ে যায়। কিন্তু কাব্যধর্মের বিচারে বিজয়গুপ্তের কবিপ্রতিভা খুব উচ্চস্তরের ছিল না। ভাবপ্রবণতা অপেক্ষা বস্তু-বিশ্লেষণ প্রবণতা তার মধ্যে বেশি ছিল। উপমা প্রয়োগেও তার অভিনবত্ব ছিল।

**ঘ. যুগসন্ধিক্ষণের কবি কে? কেন বলা হয়?**

**উত্তর :** ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তকে যুগসন্ধিক্ষণের কবি বলা হয়। তিনি ১৮১২ খ্রিষ্টাব্দে পশ্চিমবঙ্গের কাঁচড়া পাড়ার শিয়ালডাঙ্গায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। তিনি ঈশ্বরগুপ্ত নামে পরিচিত ছিলেন।

**যুগসন্ধিক্ষণের কবি বলার কারণ :** ১৮০১ খ্রিষ্টাব্দ থেকে বাংলা সাহিত্যের আধুনিক যুগ সূচিত হলেও বাংলা কাব্য সাহিত্যে ১৮৬১ খ্রিষ্টাব্দে 'মেঘনাদবধ কাব্য' রচিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত প্রকৃত অর্থে আধুনিকতা আরম্ভ হয়নি। এই ষাট বছর (১৮০১-১৮৬১) কাব্যে আধুনিকতায় পৌছার চেষ্টা চলেছে মাত্র। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের জীবনকাল ১৮১২ থেকে ১৮৫৯ খ্রিষ্টাব্দ। তিনি বড় হয়েছেন কলকাতার নাগরিক পরিবেশে। সাংবাদিকতার পাশাপাশি কবিতা চর্চায় তিনি এ সময় মধ্যযুগের দেবদেবীর কথা বা কাহিনী নির্ভর কাব্য রচনা বর্জন করে ব্যক্তি অভিজ্ঞতায় ছোট ছোট কবিতা লেখা শুরু করেন। তপসে মাছের মতো সামান্য প্রাণীও তার কাব্যের বিষয়বস্তু হয়। তার কবিতায় সমাজসচেতনতা বিশেষ করে মাতৃভূমির প্রতি দরদ অর্থাৎ দেশাত্মবোধ স্পষ্ট দেখা যায়। আবার কবিয়ালদের কাব্য ঢঙ, পয়ার ও ত্রিপদীর ব্যবহারও তার কবিতায় ব্যাপকভাবে লক্ষ্যযোগ্য। আসলে মধ্যযুগের শেষ প্রতিনিধি ভারতচন্দ্র এবং আধুনিক যুগের প্রথম পুরুষ মাইকেল মধুসূদন এই দুই মনীষীর মধ্যবর্তীকালে ঈশ্বরগুপ্তের আবির্ভাব। তার মধ্যে মধ্যযুগের কাব্য-বৈশিষ্ট্য ও আধুনিক যুগের সূচনা-বৈশিষ্ট্য সমানভাবে লক্ষ্য করা যায় বলে তাকে যুগসন্ধিক্ষণের কবি বলা হয়।



**ঙ. বালিকা বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে বিদ্যাসাগরের অবদান নির্দেশ করুন।**

**উত্তর :** নারী শিক্ষা সহায়তার অগ্রদূত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ৩৫টি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। জনশিক্ষা বিশেষ করে নারী শিক্ষা বিস্তারে তার উৎসাহ লক্ষ্য করে ছোট লাট ফেডারিক হ্যালিডে কর্তৃক অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসেবে দক্ষিণাঞ্চলের স্কুলসমূহের বিশেষ পরিদর্শক নিযুক্ত হয়েছিলেন। এ দায়িত্ব লাভের পর ছুটির সময়ে গ্রাম-গ্রামান্তর পরিভ্রমণ করে তিনি ২০টি মডেল স্কুলও প্রতিষ্ঠা করেন। কর্তৃপক্ষের সঙ্গে মতবিরোধ দেখা দিলে ১৮৫৮ খ্রিষ্টাব্দের ৩ নভেম্বর পাঁচশত টাকা মাসিক বেতনের সংস্কৃতি কলেজের অধ্যক্ষ ও অন্যান্য সরকারি পদ থেকে স্বেচ্ছায় অবসর গ্রহণ করেন। এছাড়াও তিনি বেথুন কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন।

**চ. বীরাঙ্গনা কাব্যের যে কোনো একটি নারী চরিত্রের বৈশিষ্ট্য লিখুন।**

**উত্তর :** প্রসিদ্ধ রোমান কবি পাবলিয়াস ও ভিডিয়াস ন্যাসো বা সংক্ষেপে ও ভিডের Heroides (Heroic Epistle) শীর্ষক পত্রকাব্যের আদর্শে মধুসূদন ভারতীয় নারীর চরিত্রাঙ্কনের পরিকল্পনা করেছিলেন, কিন্তু পারিবারিক, শারীরিক প্রভৃতি কারণে মাত্র এগারোখানি পত্র রচনা করে তিনি 'বীরাঙ্গনা কাব্য' প্রকাশ করেন।

এ কাব্যের 'দ্বারকানাথের প্রতি রুক্মিনী' পত্রে রুক্মিনীর গৃহচারিণী কল্যাণী পতিব্রতা মূর্তিকেই অপূর্ব শ্রদ্ধার সঙ্গে ফুটিয়ে তুলেছেন। এ পত্রের আদর্শ ভারতীয় নারীর একনিষ্ঠ ছায়ামূর্তিই ফুটে উঠেছে। বিদর্ভাধিপতি ভীষ্মক রাজপুত্রী রুক্মিনী দেবীকে পৌরাণিক ইতিবৃত্তে স্বয়ং লক্ষ্মী-অবতার বলে ব্যাখ্যা করে থাকেন। সুতরাং তিনি আজন্ম বিষ্ণুপরায়ণ ছিলেন। যৌবনাবস্থায় তার ভাই যুবরাজ রুক্মচেদীশ্বর শিশুপালের সাথে তার পরিণয়ার্থে উদ্যোগী হলে রুক্মিনী দেবী দ্বারকানাথের প্রতি এই পত্রটি প্রেরণ করেন। রুক্মিনী এ কাব্যে নিজেকে লজ্জাবতী, অসহায়, প্রিয়ভক্ত এবং অপরাধী হিসেবে উপস্থাপন করেছেন।

**ছ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত তিনটি কাব্যনাট্যের নাম উল্লেখ করুন।**

**উত্তর :** যে নাটকে কাব্যধর্ম অর্থাৎ লীরিক, আবেগ ও কল্পনার প্রাধান্য থাকে তাকে কাব্যনাট্য বলে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের তিনটি উল্লেখযোগ্য কাব্যনাট্যের নাম হচ্ছে– ১. প্রকৃতির প্রতিশোধ (১৮৮৪), ২. বিসর্জন (১৮৯০) ও ৩. মালিনী (১৮৯৬)।

**জ. 'উদাসীন পথিকের মনের কথা' কার রচনা? এটি কোন ধরনের সৃষ্টিকর্ম?**

**উত্তর :** 'উদাসীন পথিকের মনের কথা' উপন্যাসের রচয়িতা মীর মশাররফ হোসেন। উপন্যাসটির প্রকৃতি হচ্ছে ইতিহাস-আশ্রিত উপাখ্যানধর্মী। এটি প্রকাশিত হয় ২৯ আগস্ট ১৮৯০। 'উদাসীন পথিক' এই ছদ্মনামে মশাররফ হোসেন ব্যক্তিগত জীবনের পটভূমিতে স্বীয় পারিবারিক ইতিহাস ও সমসাময়িক বাস্তব ঘটনার চিত্র তুলে ধরেছেন এ গ্রন্থে। প্রকৃতপক্ষে এটিকে উপন্যাস কিংবা আত্মজীবনীমূলক রচনা এর কোনোটাই বলা যায় না বরং বলতে হয় গ্রন্থটি লেখকের আত্মজীবনী-নির্ভর কতিপয় বাস্তব ও কাল্পনিক ঘটনার মিশেলে উপন্যাসসুলভ সাহিত্যিক উপস্থাপনা।

**ঝ. রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন প্রতিষ্ঠিত একটি মহিলা সমিতির পরিচয় দিন।**

**উত্তর :** বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন মুসলমান মহিলাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ১৯০৬ সালে 'আঞ্জুমান খাওয়াতীন' নামে একটি মহিলা সমিতি প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯১৬ সালে এ সমিতির নামকরণ করা হয় আঞ্জুমানে খাওয়াতীনে ইসলাম (মুসলিম মহিলা সমিতি)। এ সমিতির কার্যালয় ছিল কলকাতায় এবং সদস্য সংখ্যা ছিল ১২ জন।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



**ঞ. 'কল্লোল যুগ' সম্পর্কে ধারণা দিন।**

**উত্তর :** 'কল্লোল' পত্রিকাকে ঘিরে যে সময়টিতে সাহিত্যের আধুনিকতাবাদী আন্দোলনের প্রকাশ ও বিকাশ তাই 'কল্লোল যুগ' নামে পরিচিত। 'কল্লোল' পত্রিকায় যারা লিখতেন তাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, বুদ্ধদেব বসু, প্রেমেন্দ্র মিত্র, নজরুল ইসলাম, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখ।

**ট. জীবনানন্দ দাশের কবিতায় চিত্ররূপময়তার উপস্থিতি তুলে ধরুন।**

**উত্তর :** রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জীবনানন্দ দাশের কবিতা সম্বন্ধে বলেছিলেন, চিত্ররূপময়। জীবনানন্দের কবিতা পড়তে-পড়তে ইমপ্রেশনিস্টদের ছবির কথাই মনে হয়। এ ছবিগুলোর খণ্ডাংশের কোনো অর্থ হয় না, সব মিলিয়ে একটা সামগ্রিক আবেদন (Total Effect) সৃষ্টি করাই এর লক্ষ্য। ইমপ্রেশনিস্টদের মতো কখনো তার চোখে ভোরের আলো সবুজ হয়ে দেখা দিয়েছে, কখনো বা নীল। বনলতা সেন কাব্যগ্রন্থের ঘাস, শিকার বা ধূসর পাণ্ডুলিপির অবসরের গান কবিতা পড়লেই তা বোঝা যায়। জীবনানন্দ দাশ প্রেম, হতাশা, স্মৃতি, প্রেরণা, জীবন, মৃত্যু প্রভৃতি ভাবনা ও অনুভূতিকে আলোর মাধ্যমে দেখেছেন 'সুরঞ্জনা' ও 'সুদর্শনা' কবিতায়। এছাড়া তার ইতিহাস চেতনা এবং সমাজচেতনাও অনেক ক্ষেত্রে আলোর প্রতীকে প্রকাশ পেয়েছে। 'হাজার বছর শুধু খেলা করে' বা 'সবিতা' কবিতায় এসব চিত্ররূপময়তা সুস্পষ্ট। বুদ্ধদেব বসু এ জন্যই বলেছিলেন, 'তার কাব্য বর্ণনাবহুল, তার বর্ণনা চিত্রবহুল এবং তার চিত্র বর্ণবহুল।'

**ঠ. আখতারুজ্জামান ইলিয়াস অথবা হাসান আজিজুল হকের ঔপন্যাসিক পরিচয় দিন।**

**উত্তর : আখতারুজ্জামান ইলিয়াস :** আখতারুজ্জামান ইলিয়াস (১৯৪৩-১৯৯৭) তার উপন্যাসে অনাহার, অভাব দারিদ্র্য ও শোষণের শিকার হয়ে যারা মানবেতর জীবনযাপন করছে সেসব অবহেলিত মানুষের জীবনাচরণ উজ্জ্বলভাবে এঁকেছেন। তার একটি বিখ্যাত উপন্যাস হচ্ছে– 'চিলেকোঠার সেপাই' (১৯৮৭) যা উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের প্রেক্ষাপটে রচিত হয়েছে। আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের অপর উপন্যাস 'খোয়াবনামা'য় (১৯৯৬) গ্রামবাংলার নিম্নবর্ণিত শ্রমজীবী মানুষের জীবনালেখ্যসহ ফকির-সন্ন্যাসী বিদ্রোহ, আসামের ভূমিকম্প, তেভাগা আন্দোলন, ১৯৪৩-এর মন্বন্তর, পাকিস্তান আন্দোলন, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ইত্যাদি ঐতিহাসিক উপাদান নিপুণভাবে উপস্থাপিত হয়েছে।

**হাসান আজিজুল হক :** হাসান আজিজুল হক (১৯৩৯-) মূলত কথাসাহিত্যিক হিসেবে পরিচিত। তার উল্লেখযোগ্য উপন্যাস– বৃত্তায়ন (১৯৯১); শিউলি (২০০৬); আগুনপাখি (২০০৬)। 'আগুনপাখি' হাসান আজিজুল হকের পৈতৃক নিবাস বর্ধমানের একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা ওই এলাকার মানুষের সংগ্রামী জীবন এবং বিভেদকারী রাজনীতি ও সম্প্রদায়িকতার যথাযথ রূপায়ণ। এর মধ্য দিয়েই লেখক জীবনের নেতিবাচকতা পরিহার করে ইতিবাচকতার সন্ধান করেছেন। উপন্যাসটিতে প্রথাগত চরিত্র-নাম নেই। তবে সব চরিত্রই বোঝা যায়। এগুলো ত্রিমাত্রিক ও দ্বন্দ্বসংকুল। মেঝ বউ চরিত্রটি উপন্যাসের মূল এবং সমস্ত প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে সুসংবদ্ধতার প্রতীকের উজ্জ্বল উদাহরণ।

**ড. ভাষা-আন্দোলনের প্রভাবে রচিত যে কোনো একটি ছোটগল্পের পরিচয় বিধৃত করুন।**

**উত্তর :** ভাষা আন্দোলনের প্রভাবে রচিত একটি বিখ্যাত ছোটগল্প হচ্ছে 'একুশের গল্প'। এর রচয়িতা জহির রায়হান (১৯৩৫-১৯৭২)। তপু গল্পের প্রধান চরিত্র। সে ছিল মেডিকেল কলেজের ছাত্র। ১৯৫২



সালের একুশে ফেব্রুয়ারি মাতৃভাষা বাংলার রাষ্ট্রীয় মর্যাদা আদায়ের মিছিলে যোগ দেয় এবং মিলিটারির গুলি তপুর কপালে আঘাত করলে সে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। শাসকশ্রেণী তার লাশ পর্যন্ত গায়েব করে। জন্মগতভাবেই একটি পা ছোট ছিল তপুর। চার বছর পর তপুর সহপাঠীদের রুমমেট এক ছাত্র একটা কঙ্কাল নিয়ে গবেষণা করার সময় দেখতে পায়– কঙ্কালের একটা পা ছোট এবং কপালে ছিদ্র। ছাত্রটি তৎক্ষণাৎ তপুর বন্ধুদের কঙ্কালটি দেখায়। তপুর সহপাঠীরা কঙ্কালটি পরীক্ষা করে দেখতে পায় যে, সেটি তপুর দেহের কঙ্কাল। এভাবে তপু কঙ্কাল হয়ে আবার বন্ধুদের কাছে ফিরে আসে।

**ঢ. মুক্তিযুদ্ধের পটভূমিতে রচিত সৈয়দ শামসুল হকের নাটক সম্পর্কে ধারণা দিন।**

**উত্তর :** মুক্তিযুদ্ধের পটভূমিতে রচিত সৈয়দ শামসুল হকের বিখ্যাত কাব্যনাট্য হচ্ছে 'পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়' (১৯৭৬)। এ নাটকে দেখা যায়, মুক্তিযুদ্ধের শেষ পর্যায়ে পাকসেনারা একটি গ্রামে প্রবেশ করে। গ্রামের মাতবর তার মেয়েকে পাকিস্তানি সৈন্যদের হাতে তুলে দিতে বাধ্য হয়। ঐ মাতবরের সামনেই মেয়ে আত্মহত্যা করে। এরপর মাতবর অনুতপ্ত হয়ে বুকফাটা আর্তনাদে আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে তোলে।

**ণ. প্রাবন্ধিক হিসেবে আবদুল ওদুদ অথবা আহমদ শরীফের বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করুন।**

**উত্তর : কাজী আবদুল ওদুদ :** বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলনের পথিকৃৎ কাজী আবদুল ওদুদ (১৮৯৪-১৯৭০) ছিলেন ঢাকাস্থ 'মুসলিম সমাজ' নামক সংগঠনের অন্যতম নেতা। তার উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধগ্রন্থ হলো : 'রবীন্দ্রকাব্য পাঠ', 'হিন্দু-মুসলমান বিরোধ', 'কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ', 'নজরুল প্রতিভা', 'বাংলার জাগরণ', 'শরৎচন্দ্র ও তারপর', 'হযরত মুহাম্মদ ও ইসলাম' ইত্যাদি। তিনি ন্যায়নিষ্ঠা, উদারতা ও অসাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গির জন্য খ্যাত ছিলেন। বিশ দশকে ঢাকায় বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলন থেকে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি একজন সজাগ বুদ্ধিজীবী, চিন্তাবিদ ও লেখক হিসেবে সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ে নিজের প্রজ্ঞা ও সংবেদনশীলতাকে সক্রিয় রেখেছিলেন। তিনি ছিলেন অন্তরে ধার্মিক অথচ শাস্ত্রাচারের গোঁড়ামিমুক্ত এক উদার মানবিকতা-সম্পৃক্ত, বিচারপরায়ণ ও নির্ভীক কলমসৈনিক। অন্নদাশঙ্কর রায় মন্তব্য করেছেন, 'কাজী আবদুল ওদুদ ছিলেন জাতিতে ভারতীয়, ভাষায় বাঙালি, ধর্মে মুসলমান, জীবনদর্শনে মানবিকতাবাদী, মতবাদে রামমোহনপন্থী, সাহিত্যে গ্যেটে ও রবীন্দ্রপন্থী, রাজনীতিতে গান্ধী ও নেহেরুপন্থী, অর্থনৈতিক শ্রেণীবিচারে মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক, সামাজিক ধ্যান-ধারণায় ভিক্টোরিয়ান লিবারল।'

**আহমদ শরীফ :** আহমদ শরীফ (১৯২১-১৯৯৯) মূলত শিক্ষাবিদ ও গবেষক হিসেবে পরিচিত। তার উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধগ্রন্থ হচ্ছে– বিচিত চিন্তা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি চিন্তা, পুঁথির ফসল, স্বদেশ অন্বেষা, কালিক ভাবনা, প্রত্যয় ও প্রত্যাশা, ইদানীং আমরা, কালের দর্পণে স্বদেশ। ড. শরীফ মধ্যযুগের পুঁথি সম্পাদনা করে এক বিরাট সাহিত্য দ্বার উন্মোচনের কাজ করেছেন। 'বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য' তার একটি গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক গবেষণাকর্ম।

## ৩১তম বিসিএস ২০১১, বাংলা : দ্বিতীয় পত্র

[দ্রষ্টব্য : *প্রত্যেক প্রশ্নের মান প্রশ্নের শেষ প্রান্তে দেখানো হয়েছে।*] নম্বর

১. যে কোনো একটি বিষয়ে রচনা লিখুন : ৪০

ক. সাহিত্যে আদর্শবাদ ও বাস্তববাদ;

খ. মানব-সম্পর্ক উন্নয়নে বিশ্বায়ন;

**উত্তর :** পৃষ্ঠা ৭২৮।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



গ. বাংলাদেশের অর্থনৈতিক বিকাশে তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার;
উত্তর : পৃষ্ঠা ৭০১।
ঘ. আগামী পৃথিবী;
ঙ. গ্রাম ছাড়া ঐ রাঙ্গামাটির পথ।

২. বন্ধনীর মধ্যে উল্লেখিত সঙ্কেতের ইঙ্গিতে একটি প্রবন্ধ লিখুন : ৪০

ক শিশু সাহিত্য :
(সংজ্ঞা, প্রকৃতি ও পরিসর; শিশুর পাঠস্পৃহা গঠনে আকর্ষণ সৃষ্টি; শিশু সাহিত্যের প্রকারভেদ; প্রধান প্রধান শিশু সাহিত্যিক ও তাদের সাহিত্যকর্ম; শিশু সাহিত্যের ইতিহাস-ঐতিহ্য; শিশু সাহিত্যের ভাষা; প্রকরণশৈলী ও দুর্বোধ্যতা পরিহার; শিশুর চরিত্র গঠনে নৈতিক জিজ্ঞাসা ও কৌতূহল সৃষ্টি; উপসংহার।)
উত্তর : পৃষ্ঠা ৭৭২।

খ. বাংলাদেশের মৎস্য সম্পদ :
(মৎস্য সম্পদের গুরুত্ব; বাংলাদেশের মৎস্য পরিস্থিতি; বাংলাদেশে মাছের উৎস; মিঠা পানির মাছ; লোনা পানির মাছ; উৎস হিসেবে খামার; মৎস্য সম্পদ উন্নয়নের উপায়; রপ্তানির ব্যবস্থা।)
উত্তর : পৃষ্ঠা ৬৫৬।

গ. দেশপ্রেম :
(সূচনা; স্বদেশ চেতনা; স্বদেশ প্রেমের স্বরূপ; দেশপ্রেমের প্রায়োগিক ক্ষেত্রসমূহ; দেশপ্রেম উদ্বুদ্ধকরণে আমাদের করণীয় নির্দেশ; দেশপ্রেম ও রাজনীতি-সমাজনীতি; দেশপ্রেম ও সুষম অর্থনীতি; দেশপ্রেম উজ্জীবনে সাহিত্য-সংস্কৃতি; দেশপ্রেম ও নৈতিক আদর্শ; দেশপ্রেম ও বিশ্বপ্রেম সম্পর্ক; উপসংহার।)

৩. যে কোনো একটি বিষয়ে পত্র লিখুন : ২০

ক. জাতীয় জীবনে মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে সমৃদ্ধ করার লক্ষ্যে ছোট ভাইকে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস সমৃদ্ধ একটি পত্র লিখুন।
উত্তর :

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
২৯ জুন ২০১৪

স্নেহের মিহির
শুভাশিস ও আদর নিও। একাদশ শ্রেণীতে বার্ষিক পরীক্ষায় প্রথম হয়েছ শুনে খুব খুশি হয়েছি। তোমাকে অভিনন্দন। তোমাকে উপহার দেব বলে শিশু একাডেমী ৫ খণ্ডের বিশ্বকোষ কিনে রেখেছি। হাতে পেলে খুব ভালো লাগবে।

পর বিশেষ সমাচার তোমাকে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও ইতিহাস সমৃদ্ধ কিছু বিশেষ তথ্য জানানোর জন্য আমার এ পত্র লেখা। স্বাধীনতার ৪১ বছর পূর্ণ হলো অথচ দুঃখের বিষয় হলো অধিকাংশ জনতা মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস এখনো ভালো করে জানে না। নতুন প্রজন্মের কাছে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা আজ অবহেলিত। অথচ বাংলাদেশের একজন সুনাগরিক হিসেবে এসব বিষয়ে জানা যে কত জরুরি তা তুমি বুঝবে আমার চিঠির মাধ্যমে। প্রত্যেক নাগরিকের অবশ্যই মুক্তিযুদ্ধের চেতনা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থাকা উচিত। আর একজন ছাত্র হিসেবে তো আরো গুরুত্বপূর্ণ বলে আমি মনে করি। কারণ ছাত্ররাই এনেছিল '৫২-এর ভাষা আন্দোলন, '৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান, পরিশেষে মহান মুক্তিযুদ্ধ। আশা করি আমার কথাগুলো মন দিয়ে গ্রহণ করবে ও ধারণ করবে। শুধু তাই নয় দেশ ও জাতিকে তা উপলব্ধি করার মহান দায়িত্ব গ্রহণ করবে।



পটভূমির কথা যদি ধরি তাহলে বলতে হয় সেই ১৯৪৭ সালের ভারত বিভাগের গোড়ার কথা যেখানে মুক্তিযুদ্ধের বীজ বপন করা হয়েছিল ইংরেজদের ঔপনিবেশিক শাসনের মাধ্যমে। এরই ধারাবাহিকতায় পাকিস্তানি দোসরদের হাত হতে মুক্তি পায় বাংলা ভাষা; '৫৪-এর যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন, '৫৮-এর আইয়ুবী শাসন, '৬৬-এর ৬ দফা যা বাঙালি মুক্তির সনদ হিসেবে গণ্য, '৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান, '৭০-এর নির্বাচন। ঘটনা প্রবাহে মিছিল মিটিং আন্দোলন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণ এবং পরবর্তীতে আসে ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ অন্ধকার রাত্রিতে পাক হানাদার বাহিনীকর্তৃক নিরস্ত্র বাঙালির ওপর সশস্ত্র পাকিস্তানির বর্বরতা হত্যাযজ্ঞ। চলে নয় মাসব্যাপী রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ। ৩০ লাখ শহীদের রক্ত এবং অসংখ্য মা বোনের ইজ্জতের বিনিময়ে অবশেষে ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ বাঙালি জাতি বিজয় লাভ করে।

১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের পর থেকে আমাদের যে সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল গড়ে ওঠেছে তার মূলে কাজ করেছে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বিকশিত হয়েছে আমাদের সমাজ জীবনে। ব্যক্তি স্বাধীনতা, নারী মুক্তি আন্দোলন, নারী শিক্ষা, গণশিক্ষা, সংবাদপত্রের ব্যাপক বিকাশ সর্বোপরি গণতান্ত্রিক অধিকার চেতনা ব্যাপকভাবে বিস্তৃতি লাভ করেছে সমাজে। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ১৯৯০-এর গণঅভ্যুত্থানের জন্ম দিয়ে প্রতিষ্ঠিত করেছে দেশে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা এবং অবাধ স্বাধীন গণতন্ত্র চর্চার পরিবেশে পর্যায়ক্রমে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সংসদীয় গণতান্ত্রিক পদ্ধতি। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা আমাদের সাহিত্যে এক নবতর সাহিত্য ধারার জন্ম দিয়েছে। বাংলাদেশের সাহিত্য চর্চা আজকে যতটা ব্যাপ্তি পেয়েছে তার পেছনে বড় প্রেরণা ছিল মুক্তিযুদ্ধের চেতনা। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা আমাদের সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে রচিত হয়েছে স্বাধীনতার পর। গান, নাটক, চলচ্চিত্রেও গৌরবগাথা প্রকাশ পেয়েছে। মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে কঠিন আত্মত্যাগের মাধ্যমে ১৯৭১ সালে আমরা যে স্বাধীনতা অর্জন করেছি তা হচ্ছে রাজনৈতিক ও সামাজিক স্বাধীনতা। তাই মুক্তিযুদ্ধের চেতনা সবার অন্তরে ধারণ করে সেই চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে দেশ ও জাতির কল্যাণে সর্বদা নিয়োজিত থাকা উচিত। আমিও বিশ্বাস রাখি তুমি আমার কথার মর্মার্থ বুঝবে এবং আমার আশাকে আরও দৃঢ় করবে।

আর বিশেষ কিছু লিখছি না। মন দিয়ে লেখাপড়া করবে, শরীরের প্রতি যত্ন নিও। ভালো থেকো এই কামনায়।

তোমার বড় ভাই
শুভজিৎ

| ডাক টিকেট | |
|---|---|
| প্রেরক<br>শুভজিৎ কুমার সরকার<br>জগন্নাথ হল<br>ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়<br>ঢাকা-১০০০ | প্রাপক<br>মিহির কান্তি সরকার<br>কলারোয়া<br>সাতক্ষীরা |

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



খ. পল্লী অঞ্চলের গণমানুষের চিকিৎসা সেবার অন্তরায়সমূহ চিহ্নিত করে সে সম্পর্কে কার্যকরী প্রস্তাব পাঠিয়ে মাননীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা মন্ত্রী মহোদয়ের নিকট একটি স্মারকলিপি রচনা করুন।

উত্তর :

পল্লী অঞ্চলের গণমানুষের চিকিৎসা সেবার অন্তরায়সমূহ চিহ্নিত এবং তা দূরীকরণের কার্যকর প্রস্তাব উল্লেখপূর্বক মাননীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা মন্ত্রী মহোদয়ের নিকট–

## স্মারকলিপি

**হে স্বাস্থ্য অনুরাগী,**

দেশের প্রতি অগাধ ভালোবাসা, সমাজ গড়ার অবিরাম চেষ্টা এবং দেশব্যাপী চিকিৎসাক্ষেত্রে আপনার আমূল পরিবর্তনের প্রচেষ্টা সম্পর্কে আমরা সবাই অবগত। আপনার প্রান্তিক পর্যায় থেকে উচ্চ পর্যায় পর্যন্ত চিকিৎসা ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানোর পরিকল্পনা আমাদেরকে বিস্মিত করেছে। এতে আমরা যেমন আনন্দিত হয়েছি, তেমনি দেশে মাঠ পর্যায়ের চিকিৎসা ব্যবস্থার উন্নয়নে আপনার প্রচেষ্টা দেখে হয়েছি আশান্বিত। আপনি নিশ্চয় অবগত আছেন যে, আমাদের দেশের প্রায় ৮০ শতাংশ মানুষ পল্লী অঞ্চলে বসবাস করে। তাই দেশের সার্বিক জনস্বাস্থ্যের উন্নয়নকল্পে পল্লী অঞ্চলের গণমানুষের চিকিৎসা সেবার ব্যাপক উন্নয়ন প্রয়োজন। আপনার প্রচেষ্টা সত্ত্বেও পল্লী চিকিৎসা সেবায় রয়েছে নানাবিধ অন্তরায়। নিচে এসব অন্তরায়সমূহ এবং তা দূরীকরণের কার্যকর প্রস্তাব উল্লেখপূর্বক আপনার সুদৃষ্টি ও যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণের কামনা করছি।

**অন্তরায়সমূহ :**

১. **পর্যাপ্ত অবকাঠামোর অভাব :** পল্লী মানুষের চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করতে হলে প্রয়োজন পর্যাপ্ত অবকাঠামো সুবিধা। যেমন : ডাক্তারদের বসার সুবিধা, থাকার এবং অন্যান্য অবকাঠামো, যা আমাদের গ্রামাঞ্চলে নেই বললেই চলে।

২. **ডাক্তারের অভাব :** পল্লীর মানুষ সংখ্যায় দেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় ৮০ শতাংশ। কিন্তু সে অনুপাতে এখানে চিকিৎসকের সংখ্যা একেবারেই নগণ্য। তথাপি যতজন চিকিৎসক নিয়োজিত আছেন তারাও বিভিন্ন অজুহাতে চিকিৎসা সেবা দেন না। আবার অনেক সময় অনেক দিন ধরে অনুপস্থিত থাকেন। এতে করে চিকিৎসা সেবা থেকে বঞ্চিত হয় পল্লী অঞ্চলের মানুষ।

৩. **রোগ পরীক্ষা-নিরীক্ষার সমস্যা :** গ্রামের মানুষের কি রকম রোগ হয়েছে তা জানার কোনো উপায় থাকে না, কারণ রোগ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার কোনো ব্যবস্থা নেই। যেহেতু আমাদের পল্লী সমাজে অধিকাংশ মানুষ দরিদ্র, তারা শহরে গিয়ে এগুলোর পরীক্ষা করাতে পারে না। এর ফলে তারা চিকিৎসা সেবা থেকে বঞ্চিত থাকে।

৪. **সচেতনতার অভাব :** পল্লীর মানুষ অধিকাংশ ক্ষেত্রে কুসংস্কারে বিশ্বাসী। তারা আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থার উপর বিশ্বাস করে না। শিক্ষার অভাব, যথাযথ প্রচার-প্রচারণার অভাব ইত্যাদি কারণে মানুষের মধ্যে আধুনিক সেবার বিষয়ে ব্যাপক অসচেতনতা রয়েছে। ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে পল্লী চিকিৎসার পুরো পরিকল্পনা।



৫. **ডাক্তারদের অবহেলা :** অধিকাংশ চিকিৎসক রোগীর রোগ ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ এবং পরীক্ষণ না করেই ব্যবস্থাপত্র প্রদান করেন। এতে পল্লীর জনগণ প্রকৃত চিকিৎসা সেবা থেকে বঞ্চিত হয়।

৬. **নিম্নমানের ও অপর্যাপ্ত ওষুধ :** যেসব ওষুধ পল্লী অঞ্চলে সরবরাহ করা হয় তা প্রয়োজনের তুলনায় অপর্যাপ্ত। তার উপরে আবার এগুলোর গুণগত মান একবারেই নিম্ন। এছাড়াও এসব ওষুধ আবার অবৈধভাবে বাইরে বিক্রি হয় কিছু অসাধু লোকের সহযোগিতায়।

৭. **অসাধু লোকের তৎপরতা :** অজ্ঞতা, অসচেতনতাকে কাজে লাগিয়ে কিছু অসাধু লোক পল্লীর মানুষদের নিয়ে বিভিন্ন রকমের অপকর্ম করে তাদেরকে প্রকৃত চিকিৎসা থেকে বঞ্চিত করে।

**প্রতিকারসমূহ :**

১. পর্যাপ্ত অবকাঠামো সুবিধা ও বিশেষ প্রণোদনার মাধ্যমে চিকিৎসকদের গ্রামমুখী করা।

২. পর্যাপ্ত সংখ্যক চিকিৎসক নিয়োগের মাধ্যমে চিকিৎসকের অভাব পূরণ করে চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করা।

৩. রোগ পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো তৈরি করা এবং স্বল্প মূল্যে এ সেবাসমূহ প্রদানের ব্যবস্থা করা।

৪. সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে সমন্বয় করে প্রচার-প্রচারণা বৃদ্ধি করা এবং শিক্ষার উন্নয়ন ঘটানো যাতে করে গ্রামাঞ্চলের জনগণ আধুনিক চিকিৎসা সেবার প্রতি আগ্রহী হয় এবং অসাধু লোকদের হাত থেকে মুক্তি পায়।

৫. চিকিৎসকদের প্রয়োজনীয় নির্দেশিকা বই প্রদান করা, যা রোগীদের রোগ পরীক্ষা ও ব্যবস্থাপত্র প্রদানে সহায়ক হয়।

৬. পর্যাপ্ত ও সঠিক মানের ওষুধের ব্যবস্থা করা ইত্যাদি।

**হে দেশহিতব্রতী,**

আপনি সমাজ ও দেশের কল্যাণকামী, দেশহিতব্রতী মানবের উত্তম সুহৃদয়। আপনি দেশের পল্লী গণমানুষের চিকিৎসা ব্যবস্থায় ব্যাপক পরিবর্তনের মাধ্যমে ৮০ শতাংশ মানুষের জীবনমানকে উন্নত করে আপনার দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে বিরল দৃষ্টান্তের অধিকারী হবেন এই আমাদের প্রত্যাশা।

**হে কল্যাণকারী,**

আপনার কাছে আমাদের বিনীত অনুরোধ পল্লী অঞ্চলের গণমানুষের চিকিৎসাসেবা নিশ্চিতকল্পে উল্লিখিত অন্তরায় ও প্রতিকারের উপায়সমূহ বিবেচনা করে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করে আমাদেরকে কৃতজ্ঞ করবেন।

পরিশেষে আপনার সুস্থ শরীর, পেশাগত সুনাম ও দীর্ঘায়ু কামনা করছি।

তারিখ : ১৩.০৬.২০১৪ নিবেদক
ঢাকা সচেতন নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিবৃন্দ
ঢাকা

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



গ. আপনার উপজেলায় জনগণের জ্ঞানোন্নয়নে একটি বহুমুখী পাঠাগার স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা প্রতিপন্ন করে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে একটি আবেদনপত্র রচনা করুন।

উত্তর :

তারিখ : ১৫.০৬.২০১৪

জেলা প্রশাসক
ঝালকাঠি জেলা
ঝালকাঠি।

বিষয় : বহুমুখী পাঠাগার স্থাপনের জন্য আবেদন।

জনাব,
সবিনয় নিবেদন এই যে, ঝালকাঠি জেলার রতনপুর উপজেলাটি শিক্ষা-দীক্ষায় যেমন উন্নতি করেছে, তেমনি বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের ফলশ্রুতিতে উপজেলাটিতে এসেছে অর্থনৈতিক সচ্ছলতা। উপজেলার এ সমৃদ্ধি ধরে রাখা এবং আরও উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি করার জন্য বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষা লাভ ও জনগণের জ্ঞানোন্নয়নে সর্বাধুনিক তথ্য সরবরাহের ব্যবস্থা থাকার প্রয়োজন বলে মনে করি। এই প্রয়োজন মেটানোর জন্য অত্র উপজেলায় একটি বহুমুখী পাঠাগার স্থাপন অতি জরুরি হয়ে পড়েছে। এখানে বিভিন্ন বিষয়ে বিশেষত জনজীবনের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সম্পৃক্ত বইপত্র এবং বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা, সরকারি ইশতেহার ইত্যাদি সংগৃহীত থাকবে। এলাকার নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সবাই পাঠাগার ব্যবহার করতে পারবে। এলাকার একজন ধনাঢ্য ও দানশীল ব্যক্তি পাঠাগারের জন্য প্রয়োজনীয় জমি দান করতে সম্মত হয়েছেন। ভবন নির্মাণ, আসবাবপত্র, বই-পুস্তক, কর্মচারী ইত্যাদির জন্য আপাতত ১০ লক্ষ টাকার প্রয়োজন।

অতএব, মহোদয়ের নিকট বিনীত প্রার্থনা এই যে, রতনপুর উপজেলায় একটি বহুমুখী পাঠাগার স্থাপনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে বাধিত করবেন।

নিবেদক
আসকারী জামান
রতনপুর এলাকাবাসীর পক্ষে

## ৩০তম বিসিএস ২০১১, বাংলা : প্রথম পত্র

[দ্রষ্টব্য : *প্রত্যেক প্রশ্নের মান প্রশ্নের শেষ প্রান্তে দেখানো হয়েছে।*] নম্বর

১. ক. বানান, শব্দ প্রয়োগ, বিন্যাস, ভাষারীতি ইত্যাদি শুদ্ধ করে নিম্নের বাক্যগুলো পুনরায় লিখুন। $\frac{1}{2}\times১২=৬$

১. অস্তমান সূর্য দেখতে পর্যটকেরা সমুদ্রের সৈকতে ভীড় করেছে।
উত্তর : অস্তমান সূর্য দেখতে পর্যটকরা সমুদ্র সৈকতে ভিড় জমিয়েছে।

২. তিনি স্বস্ত্রীক বাহিরে গেছেন।
উত্তর : তিনি সস্ত্রীক বাইরে গেছেন।

৩. সকল ছাত্রদের অবগতির জন্য বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়েছে।
উত্তর : সকল ছাত্রের অবগতির জন্য বিজ্ঞপ্তি দেয়া হয়েছে।

৪. অন্তরের অন্তস্থল থেকে আমি শ্রদ্ধা নিবেদন করছি।
উত্তর : অন্তরের অন্তস্তল থেকে আমি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি।



৫. মরুভুমিতে বিচরণ করলে অনেক সময় মরুদ্যানের সন্ধান পাওয়া যায়।
উত্তর : মরুভূমিতে বিচরণ করলে অনেক সময় মরূদ্যানের সন্ধান মেলে।

৬. আমি এ ঘটনা চাক্ষুস প্রত্যক্ষ করেছি।
উত্তর : আমি এ ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছি।

৭. আবশ্যকীয় ব্যয়ে কার্পণ্যতা করা অনুচিত।
উত্তর : আবশ্যকীয় ব্যয়ে কার্পণ্য অনুচিত।

৮. নতুন নতুন ছেলেগুলি বড়ই উতপাত করছে।
উত্তর : নতুন ছেলেগুলো বড়ই উৎপাত করছে।

৯. তার মতো কৃতি ছাত্র খুব কম দেখা যায়।
উত্তর : তার মতো কৃতী ছাত্র খুব কম দেখা যায়।

১০. রবিন্দ্র প্রতীভা বিশ্বের বিস্ময়।
উত্তর : রবীন্দ্র প্রতিভা বিশ্বের বিস্ময়।

১১. বিমানের সিলেটগামী আভ্যন্তরীন ফ্লাইটটি দেরীতে ছাড়বে।
উত্তর : সিলেটগামী বিমানের অভ্যন্তরীণ ফ্লাইটটি বিলম্বে ছাড়বে।

১২. ছাত্রদের কঠোর অধ্যাবসায় প্রশংসনীয়।
উত্তর : ছাত্রদের কঠোর অধ্যবসায় প্রশংসনীয়।

খ. শূন্যস্থান পূর্ণ করুন : ৬

কালোবাজারিতে টাকা করে রফিক সাহেব এখন সমাজে — হয়ে উঠেছেন। তাদের মত মানুষের জীবনযাপনে — প্রকাশ পায়। কিন্তু চিন্তা ভাবনার ক্ষেত্রে তারা — কে অতিক্রম করতে পারে না। তাই সমাজ ও সংসার সম্পর্কে তাদের কোনো — জন্মে না। ফলে, সকল ক্ষেত্রে তারা — ভাসিয়ে দেয়।

উত্তর : কালোবাজারিতে টাকা করে রফিক সাহেব এখন সমাজে **কেষ্টবিষ্টু** হয়ে উঠেছেন। তাদের মত মানুষের জীবনযাপনে **সরফরাজি চাল** প্রকাশ পায়। কিন্তু চিন্তা ভাবনার ক্ষেত্রে তারা তামার বিষকে অতিক্রম করতে পারে না। তাই সমাজ ও সংসার সম্পর্কে তাদের কোনো **কাণ্ডজ্ঞান** জন্মে না। ফলে, সকল ক্ষেত্রে তারা **গড্ডলিকা প্রবাহে** গা ভাসিয়ে দেয়।

গ. ছয়টি পূর্ণ বাক্যে নিচের প্রবাদটির নিহিতার্থ প্রকাশ করুন : ৬

অতি দর্পে হত লঙ্কা।

উত্তর : 'অতি দর্পে হত লঙ্কা'—প্রবাদটির অর্থ বেশি অহংকারে পতন। সমাজে অনেক সময় দেখা যায়, মানুষ বিপুল ধন-সম্পদ ও ক্ষমতার অধিকারী হয়ে ধরাকে সরা জ্ঞান করে। তার আচরণ হয় উদ্ধত, চলাফেরা হয় বেপরোয়া। কাউকে সে তোয়াক্কা করতে চায় না। প্রকৃতপক্ষে অহংকার মদমত্ত এই মানুষ কিন্তু তার সর্বনাশ তথা পতনের দিকে এগিয়ে যায়। পরিণামে তার ধ্বংস বা পতন অনিবার্য হয়ে ওঠে।

ঘ. নিম্নলিখিত শব্দগুলো দিয়ে পূর্ণবাক্য লিখুন : ৬

অধ্যাদেশ, প্রজ্ঞাপন, প্রাক্কলন, প্রেষণ, অবকাশ বিভাগ, সর্বশেষ বেতনপত্র।

উত্তর : অধ্যাদেশ : সন্ত্রাস দমনে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক অধ্যাদেশ জারি করা হয়েছে।
প্রজ্ঞাপন : ৩২তম বিসিএসে মুক্তিযোদ্ধার সন্তানদের বিভিন্ন ক্যাডারে নিয়োগের জন্য সরকারি প্রজ্ঞাপন জারি হয়েছে।
প্রাক্কলন : ২০১৪-১৫ অর্থবছরে বাংলাদেশের মাথাপিছু জাতীয় আয় ১৩০০ মার্কিন ডলারে পৌছবে বলে অর্থ মন্ত্রণালয় থেকে প্রাক্কলন করা হয়েছে।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



প্রেষণ : ড. ফজলুর রহমান প্রেষণে ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করছেন।

অবকাশ বিভাগ : সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অবকাশ সংক্রান্ত কার্যাবলী অবকাশ বিভাগ সম্পন্ন করে থাকে।

সর্বশেষ বেতনপত্র : বাংলাদেশ সরকার সর্বশেষ অষ্টম বেতনপত্র ঘোষণা করেছে, যা ২০১৫ সালের মাঝামাঝি সময় থেকে কার্যকর হওয়ার কথা রয়েছে।

ঙ. সূত্রানুসারে বাক্যে রূপান্তর করুন : ৬

১. না গেলে দেখতে পাবেনা। (যৌগিক বাক্য)
উত্তর : যাও, নতুবা দেখতে পাবে না।

২. আপনি যদি চান তবে আমি আগামীকাল আসতে পারি। (সরল বাক্য)
উত্তর : আপনি চাইলে আমি আগামীকাল আসতে পারি।

৩. সৎপথে চল, দেখবে জীবনে উন্নতি হবে। (সরল বাক্য)
উত্তর : সৎপথে চললে জীবনে উন্নতি হবে।

৪. তিনি আর এ পথ মাড়ান না। (জটিল বাক্য)
উত্তর : তিনি যখন কোথাও যান তখন এ পথ তিনি মাড়ান না।

৫. যদি বারণ কর তবে গান গাবনা। (সরল বাক্য)
উত্তর : বারণ করলে গান গাব না।

৬. সূর্য পশ্চিম দিকে অস্ত যায়। (না বাচক বাক্য)
উত্তর : সূর্য পশ্চিম দিকে উদিত হয় না।

২. যে কোনো একটি প্রবাদের ভাব-সম্প্রসারণ করুন (অনধিক ২০টি বাক্য) : ২০

ক. নাচতে না জানলে উঠান বাঁকা।

ভাব-সম্প্রসারণ : কাজে কুশলতা দেখাতে না পারলে মানুষ অপরের ওপর দোষ চাপাতে চেষ্টা করে। নিজের অক্ষমতা ঢেকে রাখার জন্য মানুষের এ ধরনের প্রবণতা লক্ষ করা যায়। নিজের কোনো দোষ-ত্রুটি কেউ স্বীকার করতে চায় না বলে অপরের ওপর দোষ চাপানোর বৈশিষ্ট্য মানুষ দেখিয়ে থাকে। নাচতে জানলেই তবে নৃত্যশিল্পী হয়ে ওঠা সম্ভব। দক্ষতার জন্য বাহাদুরি তারই প্রাপ্য। কিন্তু নাচে দক্ষতা অর্জন করা সম্ভব না হলে তখন দোষ চাপানো হয় উঠানের ওপর। উঠান বাঁকা সেজন্য নাচা গেল না। এমন কৈফিয়ৎ অক্ষম নৃত্যশিল্পীরাই দিয়ে থাকে। এ ধরনের প্রবণতা মানুষ তার বিভিন্ন কাজে ফুটিয়ে তোলে। নিজের ব্যর্থতা বা অক্ষমতার কথা মানুষ সহজে স্বীকার করতে চায় না। অন্যের ওপর দোষারোপ করে নিজের গ্লানি থেকে রেহাই পেতে চায়। সেজন্য মানুষ যুক্তির আড়ালে ত্রুটি গোপন করে। নিজেকে নির্মল করে রাখার চেষ্টা মানুষের থাকে। কিন্তু জীবনে ব্যর্থতা থাকবে না এমন হতে পারে না। দুর্বল মনের মানুষ সে ব্যর্থতাকে স্বীকার করে না। যার সাহস নেই, উদারতা নেই সে-ই এমন পরের ওপর দোষ চাপায়। মানুষকে বড় মনের অধিকারী হতে হবে এবং সত্যকে যথাযথভাবে স্বীকার করে নিতে হবে। নিজের দোষ স্বীকার করা বড় গুণ। মানুষকে এ গুণের অধিকারী হওয়া উচিত।

খ. অল্প জলের তিত পুঁটি, তার এত ছটফটি।

ভাব-সম্প্রসারণ : তিত পুঁটি এক ধরনের ছোট মাছ, যেগুলো অল্প ও অগভীর জলে বসবাস করে। সমুদ্রের বিশাল জলের সাথে এদের পরিচয় নেই, নেই অভিজ্ঞতা ও বিচরণ জীবনের অন্য বিষয়ের সাথে। আমাদের সমাজেও তিত পুঁটি সদৃশ এমন কিছু ব্যক্তি রয়েছেন যাদের জ্ঞান কিংবা গুণ খুবই সামান্য কিন্তু উচ্চ বাক্য, মুখের বুলি আর ভাবখানা এমন যে, সে যেন অবিরতই বিশ্ব জয় করে চলছে।



মানুষ সৃষ্টির সেরা জীব। আল্লাহ সকল মানুষকে অতি সুন্দরভাবে সৃষ্টি করেছেন। তবে এই মানুষের মাঝে কিছু পার্থক্য আছে। তাই সমাজে এমন অনেক লোক দেখা যায় যারা নিজের ক্ষমতা বা অবস্থার কথা চিন্তা না করে কেবলমাত্র মুখের জোরে দিনকে রাত করার চেষ্টা করেন। যার নেই ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবোধ, নেই নিজস্ব গুণাবলী কিংবা যিনি খোঁজ রাখেন না নিজের সীমাবদ্ধতার— দেখা যায় তিনি শুধু অহংকার, আত্মগৌরব ও ফাঁকাবুলি দিয়ে ধরাকে সড়া জ্ঞান করে চলার চেষ্টা করেন। এ ধরনের মানুষ সমাজের সর্বস্তরেই রয়েছে আর সমাজের ভেতর থেকে সমাজকে ও নিজেকে কলুষিত করে চলছে। প্রকৃতপক্ষে এমন মনোবৃত্তি ধারণ ও লালন করা সত্যিই লজ্জাকর এবং হীনমনোবৃত্তির পরিচয়। আর এ জন্যই ইংরেজিতে বলা হয় An empty vessel sound much অর্থাৎ খালি কলস বাজে বেশি। পক্ষান্তরে যাদের অভিজ্ঞতা বেশি, জ্ঞানের প্রাচুর্যে যারা বলিষ্ঠ, স্বভাবগতভাবেই তারা নমনীয় ও মহৎ প্রকৃতির হন। এরা নিজের বড়াই নিজে করেন না, মিথ্যা অহমিকা দেখান না, আত্মগৌরব ফুটিয়ে তুলতে নিজেকে হাস্যকর ব্যক্তি বা বস্তুতে পরিণত করেন না। বেশি আড়ম্বর না করে আমাদের অবস্থান নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হবে। যার নিজের শক্তি, সামর্থ্য কিংবা যোগ্যতা নেই, অথচ সে যদি ভাগ্য বা কপালের ওপর দোষ চাপিয়ে বড় হতে চায় তাহলে তার স্বপ্ন পূরণ হবার নয় এবং যদি মিথ্যা বাড়াবাড়ি করে নিজেকে বড় বলে প্রতিষ্ঠিত করতে চায় সেটা কখনোই সম্ভব নয়। অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানের গভীরতার কারণেই মূলত মানুষের চিন্তা ও কর্মের বহিঃপ্রকাশ। যে যত জানে সে তত মানে, যার যত আছে তার প্রকাশ তত কম। মানব সমাজ এমনই বৈচিত্র্যময় কাঠামোতে প্রতিষ্ঠিত।

৩. সারমর্ম লিখুন : ১০ × ২ = ২০

ক.
হে মহাজীবন, আর এ কাব্য নয়
এবার কঠিন, কঠোর গদ্যে আনো,
পদ-লালিত্য ঝঙ্কার মুছে যাক,
গদ্যের কড়া হাতুড়িকে আজ হানো!
প্রয়োজন নেই, কবিতার স্নিগ্ধতা—
কবিতা, তোমায় দিলাম আজকে ছুটি,
ক্ষুধার রাজ্যে পৃথিবী গদ্যময়;
পূর্ণিমা-চাঁদ যেন ঝলসানো রুটি—

সারমর্ম : সুন্দরের সাধক হলেও কবির কাজ শুধু কল্পনার জগৎ নির্মাণ করা নয়, কঠিন ও কঠোর বাস্তবের মুখে তাকে রূঢ় সত্যকেও বাণীরূপ দিতে হয়। দায়বদ্ধ কবি জানেন, জীবনধারণের দাবি যেখানে উপেক্ষিত সেখানে কল্পনা-বিলাসিতা নিরর্থক। রূঢ় বাস্তবতার রূপায়ণই তখন তার কবিতার লক্ষ হয়ে দাঁড়ায়।

খ. হিন্দুত্ব মুসলমানত্ব দুই সওয়া যায়, কিন্তু তাদের টিকিত্ব দাড়িত্ব অসহ্য, কেননা ঐ দুটোই মারামারি বাধায়। টিকিত্ব হিন্দুত্ব নয়, ওটা হয়ত পাণ্ডিত্য। তেমনি দাড়িও ইসলামত্ব নয়, ওটা মোল্লাত্ব। এই দুই ত্ব মার্কা চুলের গোছা নিয়েই আজ এত চুলোচুলি। আজ যে মারামারিটা বেধেছে, সেটাও এই পণ্ডিত-মোল্লার মারামারি, হিন্দু-মুসলমানদের মারামারি নয়। নারায়ণের গদা আর আল্লার তলোয়ার কোনোদিনই ঠোকাঠুকি বাঁধবে না, কারণ তারা দুইজনই এক, তার এক হাতের অস্ত্র তারই আর এক হাতের ওপর পড়বে না।

সারাংশ : মুসলিম ও হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে গোঁড়া শ্রেণী আল্লাহ কিংবা নারায়ণের নামে কোন্দলে জড়িয়ে পড়লেও প্রকৃতপক্ষে মহাবিশ্বের স্রষ্টা একজনই, দু'জন নন। তাই ধর্মান্ধতা ত্যাগ করে সম্প্রীতির সাথে সকলকে জীবনযাপন করা উচিত।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



৪. অতি সংক্ষেপে নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলোর উত্তর লিখুন : ২×১৫ =৩০

**ক. চর্যাপদের পদকর্তাদের সম্পর্কে ধারণা দিন।**

**উত্তর :** বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন যুগের একমাত্র নিদর্শন চর্যাপদের কবির সংখ্যা নিয়ে মতান্তর রয়েছে। সুকুমার সেন তার 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' (১ম খণ্ড) গ্রন্থে ২৪ জন পদকর্তার কথা বলেছেন। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ সম্পাদিত 'Buddhist Mystic Songs' গ্রন্থে ২৩ জন পদকর্তার নাম পাওয়া যায়। তবে ২৪ জনের পক্ষেই অধিকাংশ পণ্ডিত মত দিয়েছেন।

**চর্যাপদের পদকর্তাগণ হলেন :** ১. আর্যদেব, ২. কঙ্কণপা, ৩. কম্বলাম্বর, ৪. কাহ্নপা, ৫. কুক্কুরীপা, ৬. গুন্ডরীপা, ৭. চাটিলপা, ৮. জয়নন্দী, ৯. ডোম্বীপা, ১০. ঢেণ্ঢণপা, ১১. তন্ত্রী, ১২. তাড়ক, ১৩. দারিক, ১৪. ধামপা, ১৫. বিরুবাপা, ১৬. বীণাপা, ১৭. ভদ্রপা, ১৮. ভুসুকুপা, ১৯. মহীধরপা, ২০. লুইপা, ২১. লাড়ীডোম্বী, ২২. শবরপা, ২৩. শান্তিপা ও ২৪. সরহপা।

**খ. নাথ সাহিত্য কাকে বলে? এ সাহিত্যের প্রধান কবি কে?**

**উত্তর :** বৌদ্ধ ধর্মমতের সঙ্গে শৈবধর্ম মিশে 'নাথ ধর্ম'-এর উদ্ভব। বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগে নাথ ধর্মের কাহিনী অবলম্বনে শিব উপাসক নাথযোগী ও সিদ্ধার্থের রচিত সাহিত্যই 'নাথ সাহিত্য' নামে পরিচিত। নাথ সাহিত্যের প্রধান কবি শেখ ফয়জুল্লাহ। তার কাব্য 'গোরক্ষ বিজয়'। এটি সম্পাদনা করেন আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ। এছাড়াও শুকুর মুহাম্মদ রচিত 'গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাস', যা সংগ্রহ করেন চন্দ্রকুমার দে এবং ভীমসেন রায় নাথ রচিত 'মীনচেতন' উল্লেখযোগ্য নাথ সাহিত্য।

**গ. দুজন বৈষ্ণব পদকর্তার পরিচয় দিন।**

**উত্তর :** মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের মূল্যবান নিদর্শন 'বৈষ্ণব পদাবলী'। 'বৈষ্ণব পদাবলী'তে রাধা-কৃষ্ণ তাদের প্রেমলীলায় জীবাত্মা ও পরমাত্মার রূপকে উপস্থিত। বৈষ্ণব কবিতার চার মহাকবি হচ্ছেন বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস। নিচে দুজন বৈষ্ণব পদকর্তার পরিচয় দেয়া হলো :

**বিদ্যাপতি :** বিদ্যাপতি ছিলেন মিথিলার রাজসভার কবি। রাজা শিবসিংহ তাকে কবিকণ্ঠহার উপাধিতে ভূষিত করেন। তার রচিত কয়েকটি গ্রন্থের নাম– পুরুষপরীক্ষা, কীর্তিলতা, গঙ্গাবাক্যাবলী, ভাগবত। বাঙালি না হয়েও অথবা বাংলায় কবিতা রচনা না করেও তিনি বাঙালির শ্রদ্ধেয় কবি। তিনি ব্রজবুলি ভাষায় তার পদাবলী রচনা করেছেন। বিদ্যাপতিকে 'অভিনব জয়দেব' ও 'মিথিলার কোকিল' বলেও আখ্যা দেয়া হয়। তার পদাবলীর কয়েকটি লাইন–

*এ সখি হামারি দুখের নাহি ওর।*
*এ ভরা বাদর মাহ ভাদর*
*শূন্য মন্দির মোর।।*

**চণ্ডীদাস :** বাংলা ভাষায় বৈষ্ণব পদাবলীর আদি রচয়িতা কবি চণ্ডীদাস। শিক্ষিত বাঙালি বৈষ্ণব সাহিত্যের রস ও আনন্দের সংবাদ পেয়েছে চণ্ডীদাসের পদাবলী থেকে। চৈতন্যদেব যার পদাবলী শুনে মোহিত হতেন তিনি এই চণ্ডীদাস। তার পদের বিখ্যাত লাইন—

*সবার উপরে মানুষ সত্য,*
*তাহার উপরে নাই।*

**ঘ. মঙ্গল কাব্যের বৈশিষ্ট্যগুলো লিখুন।**

**উত্তর :** মঙ্গল কাব্য হচ্ছে মধ্যযুগের উপাখ্যান। এ কাব্যগুলোতে কবিরা অনেক বড় বড় কাহিনী বলেছেন। দেবতাদের কাছে মঙ্গল কামনা করে এ কাব্যগুলো রচিত হয়েছে বলে এগুলোর নাম মঙ্গল কাব্য।



**মঙ্গল কাব্যের বৈশিষ্ট্য :** ১. প্রায় সব কবি স্বপ্নে দেবতার নির্দেশ পেয়ে কাব্য রচনা করেছেন। ২. প্রথমেই থাকে সর্বসিদ্ধিদাতা গণেশের বন্দনা। ৩. কাব্যের অধিকাংশ ঘটনা সাধারণ নয়, অসাধারণ। ৪. মঙ্গল কাব্যের নায়ক-নায়িকারা সবাই শাপভ্রষ্ট দেবতা। শাপান্তে স্বর্গে ফিরে যান। ৫. মর্ত্যে পূজা প্রচারের সময় দেবতাদের আচরণ মানুষের মতো।

**ঙ. জীবনী সাহিত্য বলতে কি বুঝেন?**

**উত্তর :** বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগের গতানুগতিক ধারায় জীবনী সাহিত্য এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। শ্রীচৈতন্যদেব ও তার কতিপয় শিষ্যের জীবনকাহিনী অবলম্বনে এই জীবনী সাহিত্যের সৃষ্টি। চৈতন্য জীবনের কাহিনীতে কবিরা অলৌকিকতা আরোপ করেছেন। তবু চৈতন্য ও তার শিষ্যরা বাস্তব মানুষ ছিলেন এবং এ ধরনের বাস্তব কাহিনী নিয়ে সাহিত্যসৃষ্টি বাংলা সাহিত্যে এই প্রথম। বাংলা ভাষায় শ্রীচৈতন্যের প্রথম জীবনীকাব্য বৃন্দাবনদাসের 'শ্রীচৈতন্যভাগবত'। চৈতন্যদেবের জীবনী গ্রন্থকে 'কড়চা' নামে অভিহিত করা হয়। চৈতন্যদেবের জীবনী হিসেবে যে বইটি সবচেয়ে বিখ্যাত, তার নাম 'চৈতন্যচরিতামৃত'। এর লেখক কৃষ্ণদাস কবিরাজ।

**চ. রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান কাব্যধারার তিনটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করুন।**

**উত্তর :** মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের মুসলমান কবিদের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অবদান রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান। চতুর্দশ শতকের শেষ দিকে বা পঞ্চদশ শতকের প্রথম পাদে বাংলা সাহিত্যে মুসলমান কবিদের প্রথম আবির্ভাব ঘটে। এ কাব্যধারার তিনটি বৈশিষ্ট্য হলো :

১. প্রাচীন ও মধ্যযুগের ধর্মকেন্দ্রিক ও দেবতাকেন্দ্রিক সাহিত্য ছেড়ে এ কাব্যগুলোতে প্রথমবারের মতো মানবীয় বৈশিষ্ট্য প্রতিফলিত হয়।
২. এ কাব্যের কাহিনী বাঙালির ঘরের নয়, বাইরে থেকে সংগ্রহ করে বাংলা কাব্যে রূপদান করা হয়েছে।
৩. বাংলাদেশের সাহিত্যের গতানুগতিক ঐতিহ্যের বাইরে নতুন ভাবনা-চিন্তা ও রসমাধুর্যের পরিচয় এ কাব্যধারায় ছিল স্পষ্ট।

**ছ. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে বাংলা উপন্যাসের জনক বলা হয় কেন?**

**উত্তর :** বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক উপন্যাস 'দুর্গেশনন্দিনী' রচনার কৃতিত্ব সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের। ১৮৬৫ খ্রিস্টাব্দে তিনি উপন্যাসটি রচনা করেন। 'দুর্গেশনন্দিনী' রচনার মাধ্যমে বঙ্কিমচন্দ্র একদিকে যেমন তার মৌলিক প্রতিভা বিকাশের পথের সন্ধান লাভ করেন, অন্যদিকে তেমনি বাঙালির মন এক অভিনব সাহিত্যশিল্পের রসাস্বাদন করতে সক্ষম হয়। বঙ্কিমচন্দ্র মোট তার সাহিত্যিক জীবনের ২২ বছরে ১৪টি উপন্যাস রচনা করেন। এর মধ্যে রয়েছে বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক উপন্যাস 'দুর্গেশনন্দিনী', বাংলা সাহিত্যের প্রথম রোমান্টিক উপন্যাস 'কপালকুণ্ডলা', বাংলা ভাষায় প্রথম মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণমূলক উপন্যাস 'রজনী'। উপন্যাস সাহিত্যে তার এসব অবদানের জন্য বঙ্কিমচন্দ্রকে বাংলা উপন্যাসের জনক বলা হয়।

**জ. বাংলা সাহিত্যে অন্ধকার যুগ বলতে কি বুঝায়?**

**উত্তর :** বাংলা সাহিত্যের শুরুতেই অর্থাৎ ১২০১ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৩৫০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত সময়কালকে অন্ধকার যুগ হিসেবে অভিহিত করা হয়। এই সময়ে বাংলা সাহিত্যের লিখিত উল্লেখযোগ্য কোনো নিদর্শন পাওয়া যায় না। ধারণা করা হয় তুর্কি বিজয়ের ফলে মুসলিম শাসনামলের সূচনার পটভূমিতে নানা অস্থিরতার কারণে এ সময়ে তেমন কোনো উল্লেখযোগ্য সাহিত্য সৃষ্টি হয়নি। তবে

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



কোনো কোনো সাহিত্যিকের মতে, এ সময়ে উল্লেখযোগ্য কোনো সাহিত্য পাওয়া না গেলেও 'শূন্যপুরাণ', 'নিরঞ্জনের রুষ্মা', 'সেক শুভোদয়া'র মতো কিছু অপ্রধান সাহিত্য সে সময় রচিত হয়েছিল। তাই তারা এ সময়কে অন্ধকার যুগ হিসেবে মেনে নিতে চান না।

**ঝ. বাংলা সাহিত্যে মাইকেল মধুসূদন দত্তের তিনটি অবদানের বর্ণনা দিন।**

**উত্তর :** মাইকেল মধুসূদন দত্ত (১৮২৪-৭৩) বাংলা কাব্যসাহিত্যে আধুনিক যুগের প্রবর্তক। মধ্যযুগের কাব্যে দেবদেবীর মাহাত্ম্যসূচক কাহিনীর বৈশিষ্ট্য অতিক্রম করে বাংলা কাব্যধারায় মানবতাবোধ সৃষ্টিপূর্বক আধুনিকতার লক্ষণ ফুটানোতেই মাইকেল মধুসূদন দত্তের অতুলনীয় কীর্তি প্রকাশিত।

**তিনটি অবদান :** ১. তার প্রথম নাটক 'শর্মিষ্ঠা'র (১৮৫৯) মাধ্যমে পাশ্চাত্য রোমান্টিক নাট্যকলার আদর্শ প্রদর্শিত হওয়ায় তা বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে প্রথম সার্থক নাটক হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে। ২. তিনি বাংলা সাহিত্যের প্রথম ও শ্রেষ্ঠ মহাকাব্য 'মেঘনাদবধ কাব্য' (১৮৬১) রচনা করে বাংলা মহাকাব্যের ধারার প্রবর্তন করেন। ৩. তার 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী' (১৮৬৫) বাংলা কাব্যধারায় সনেট জাতীয় কবিতা রচনার পথিকৃৎ হিসেবে অপরিসীম গুরুত্বের অধিকারী।

**ঞ. 'বিষাদ সিন্ধু' গ্রন্থের জনপ্রিয়তার কারণ কি?**

**উত্তর :** বাংলা সাহিত্যের প্রথম মুসলিম ঔপন্যাসিক মীর মশাররফ হোসেনের খ্যাতি মূলত 'বিষাদ সিন্ধু' গ্রন্থটির জন্যই। 'বিষাদ-সিন্ধু' (১৮৮৫-৯১) একটি ইতিহাস আশ্রিত উপন্যাস। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স)-এর দৌহিত্র ইমাম হোসেনের সঙ্গে দামেস্ক অধিপতি মাবিয়ার একমাত্র পুত্র এজিদের কারবালা প্রান্তরের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ এবং ইমাম হাসান-হোসেনের করুণ মৃত্যুকাহিনী 'বিষাদ-সিন্ধু' গ্রন্থে বর্ণিত মূল বিষয়। প্রথমত ইসলাম ধর্ম সম্পর্কিত স্পর্শকাতর কাহিনী সাধারণ মুসলিম পাঠকের কাছে এর জনপ্রিয়তার প্রধান কারণ। দ্বিতীয়ত 'বিষাদ-সিন্ধু'র জাদুকরী রচনাগুণের জন্যে সাহিত্যরসিকজনের কাছেও গ্রন্থটি আদরণীয়। জয়নাবের রূপে বিমোহিত এজিদ এবং এই রূপতৃষ্ণার পরিণামে বহু মানুষের বিপর্যয় ও ধ্বংসের যে কথকতা বর্ণিত হয়েছে তা গ্রন্থটিকে জনপ্রিয় করে তুলেছে।

**ট. বাংলা সাহিত্যে 'সবুজপত্র' পত্রিকার অবদান সম্পর্কে লিখুন।**

**উত্তর :** প্রমথ চৌধুরী সম্পাদিত 'সবুজপত্র' বাংলা সাময়িক পত্রের ইতিহাসে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ১৯১৪ খ্রিষ্টাব্দে সবুজপত্রের প্রথম প্রকাশ ঘটে। রবীন্দ্রনাথ সবুজপত্রের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন। প্রমথ চৌধুরী বীরবলী রীতি নামে যে মৌখিক ভাষারীতি সাহিত্যে প্রচলন করে যুগান্তর এনেছিলেন তার প্রচারের মাধ্যম ছিল এই সবুজপত্র। পত্রিকাটি বুদ্ধিজীবী সাহিত্যিকদের কেন্দ্রস্বরূপ বিবেচিত হয়। সবুজপত্রকে কেন্দ্র করে একটি সাহিত্যিক গোষ্ঠীও তখন গড়ে উঠেছিল। ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী, অতুলচন্দ্র গুপ্ত, ধূর্জটি প্রসাদ মুখোপাধ্যায়, সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, সতীশচন্দ্র ঘটক, বিশ্বপতি চৌধুরী প্রমুখ কবি-সাহিত্যিক সবুজপত্রে লিখতেন। সবুজপত্রের সান্নিধ্যে থেকে তারা কথ্যভাষার বাচনভঙ্গি স্বীকার করে নেন। প্রমথ চৌধুরী নিঃসন্দেহে বাংলা সাহিত্যের একজন শক্তিশালী গদ্য লেখক ও নতুন একটি রীতির স্রষ্টা। সবুজপত্র ছিল এই নতুন গদ্যরীতির বাহন।

**ঠ. 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' কাব্য কে রচনা করেন? তার কবি মানসের পরিচয় দিন।**

**উত্তর :** ধূসর পাণ্ডুলিপি কাব্যের রচয়িতা রূপসী বাংলার কবি জীবনানন্দ দাশ। এছাড়াও 'ঝরাপালক', 'বনলতা সেন', 'মহাপৃথিবী', 'সাতটি তারার তিমির', 'বেলা অবেলা কালবেলা' ও 'রূপসী বাংলা' তার কাব্যগ্রন্থ।





জীবনানন্দ দাশ রবীন্দ্রপ্রভাব থেকে নিজেকে দূরে রেখেছিলেন। এই দূরত্ব স্বভাবসিদ্ধ ও স্বতঃস্ফূর্ত। বাংলা কবিতায় পুরনো অতিক্রম করে নতুনের যে অগ্রযাত্রা শুরু হয়েছিল তার পদশব্দ সেখানেই অনুরণিত হয়ে উঠেছে। প্রকৃতি মগ্নতা তার বৈশিষ্ট্য। বাংলাদেশের প্রকৃতি তার কবিতায় অত্যন্ত আকর্ষণীয় রূপে বিধৃত হয়েছে। এখানকার প্রকৃতির অপরূপ সৌন্দর্য তাকে বিমুগ্ধ করেছিল বলেই তিনি লিখেছিলেন : 'বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি, তাই আমি পৃথিবীর রূপ খুঁজিতে যাই না আর।'

**ড. বিয়োগান্ত নাটক কাকে বলে? বিয়োগান্ত নাটকের বৈশিষ্ট্য কি?**

**উত্তর :** সাহিত্যকর্মে, বিশেষভাবে নাটকে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাসমূহ যখন তার পরিণতিতে প্রধান চরিত্রের জন্য চরম বিপর্যয় ডেকে আনে তখন তাকে সাধারণভাবে বিয়োগান্ত নাটক বলা হয়। নাটক শেষে দর্শক-শ্রোতার হৃদয় বেদনাপ্লুত হয়ে ওঠে; এমন অভিনয়ই বিয়োগান্ত নাটক বা ট্রাজেডি। শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের 'সিরাজদ্দৌলা', মুনীর চৌধুরীর 'রক্তাক্ত প্রান্তর' প্রভৃতি সার্থক বিয়োগান্ত নাটক।

**ঢ. পথনাটক কাকে বলে? নাট্যকারের নামসহ দু'টি পথনাটকের নাম লিখুন।**

**উত্তর :** পথনাটকের ধারণা একেবারেই সাম্প্রতিক। গণনাট্যের পথ ধরেই পথনাটকের সৃষ্টি। নাটককে দর্শক সাধারণের আরও কাছে নিয়ে যাবার উদ্দেশ্যেই পথনাটকের উদ্ভব। নির্ধারিত মঞ্চ ছাড়াই যে নাটক সামান্য পরিসরে স্বল্প আয়োজনে যে কোনো স্থানে, এমনকি পথের পাশেও অভিনীত হতে পারে তাকেই পথনাটক বলা হয়। এই শ্রেণীর নাটকের চরিত্র নির্বাচন, দৃশ্য পরিকল্পনা প্রভৃতি সবই হবে বিশেষ সহজসাধ্য।

**দুটি পথনাটক :** এস এম সোলায়মানের 'ক্ষ্যাপা পাগলার প্যাচাল' (১৯৭৬) ও শঙ্কর শাওজালের 'মহারাজের অনুপ্রবেশ' (১৯৯০)।

**ণ. মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক পাঁচটি উপন্যাসের নাম লিখুন।**

**উত্তর :** মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক পাঁচটি উপন্যাস হলো : ১. রাইফেল রোটি আওরাত, ২. নীলদংশন, ৩. নিষিদ্ধ লোবান, ৪. জলাংগী ও ৫. জাহান্নাম হইতে বিদায়।

## ৩০তম বিসিএস ২০১১, বাংলা : দ্বিতীয় পত্র

*[দ্রষ্টব্য : প্রত্যেক প্রশ্নের মান প্রশ্নের শেষ প্রান্তে দেখানো হয়েছে।]* নম্বর

১. যে কোনো একটি বিষয়ে রচনা লিখুন : ৪০

ক. মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক বাংলা উপন্যাস;
উত্তর : পৃষ্ঠা ৭৯৭।

খ. নদী ভাঙন ও তার সম্ভাব্য প্রতিকার;

গ. বিশ্ব জলবায়ু পরিবর্তন;
উত্তর : পৃষ্ঠা ৮৭১।

ঘ. বাংলাদেশের জনশক্তি রপ্তানি;
উত্তর : পৃষ্ঠা ৬৭৪।

ঙ. বাংলাদেশে পাটশিল্পের ভবিষ্যৎ।
উত্তর : পৃষ্ঠা ৬৪২।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



২. বন্ধনীর মধ্যে উল্লিখিত সংকেতের ইঙ্গিতে একটি প্রবন্ধ লিখুন : ৪০

ক. পরিবেশ আন্দোলন : (পরিবেশ আন্দোলনের সূচনা; এই আন্দোলনের কারণসমূহ; বিশ্ব পরিবেশ সচেতনতা; পরিবেশ আন্দোলনে বাংলাদেশের অবস্থান; এই আন্দোলনে বিশ্ব সমাজের করণীয়; আন্দোলনের ভবিষ্যৎ; এই আন্দোলনে সরকারি-বেসরকারি সহযোগিতা।)
উত্তর : পৃষ্ঠা ৮৪৯।

খ. ভূমিকম্প : (ভূমিকম্প কী এবং কেন হয়? ভূমিকম্পের পরিমাপ ও মাত্রা; বাংলাদেশে ভূমিকম্পের সম্ভাবনা; এর মাত্রা বিষয়ে বাংলাদেশের বিশেষজ্ঞ অভিমত; ভূমিকম্প চলাকালে কী করণীয়; শেষ হলে কী কী করা কর্তব্য; ভূমিকম্প মোকাবিলায় সরকারের পূর্ব প্রস্তুতি; উপসংহার।)
উত্তর : পৃষ্ঠা ৮৬৫।

গ. সাংস্কৃতিক আগ্রাসন : (দেশজ সংস্কৃতি; সংস্কৃতির বিশ্বায়নের সূচনা; বহি-সংস্কৃতির আগ্রাসন ও প্রসারণ; সাংস্কৃতিক আগ্রাসনে স্থানীয় সংস্কৃতির অবস্থা; বিশ্ব ও স্থানীয় সংস্কৃতির মেলবন্ধনের ইতিবাচক দিক; স্থানীয় সংস্কৃতি সংরক্ষণে বিভিন্ন উদ্যোগ; সরকারের করণীয়।)
উত্তর : পৃষ্ঠা ৭৩৫।

৩. যে কোনো একটি বিষয়ে পত্র লিখুন : ২০

ক. স্কুল-কলেজের পাঠ্যপুস্তকে ইতিহাস বিকৃতিগত ত্রুটি সংশোধন ও সঠিক ইতিহাস সংরক্ষণে কতিপয় কার্যকর প্রস্তাব জানিয়ে শিক্ষামন্ত্রী বরাবর একটি স্মারকলিপি লিখুন।
উত্তর : *৩৩তম বিসিএসের ৩ নং প্রশ্নের ক-এর উত্তর দেখুন।*

খ. আপনার এলাকার একজন মুক্তিযোদ্ধার সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে পাঠের জন্য একটি মানপত্র রচনা করুন।

**দেশ বরেণ্য বীর মুক্তিযোদ্ধা ...... শুভাগমন উপলক্ষে আমাদের প্রাণঢালা সংবর্ধনা**

**হে মহান অতিথি,**
বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের বীর সৈনিক! আজ তোমার আগমনে অত্র এলাকার প্রতিটি মানুষের প্রাণ পর্যন্ত উল্লসিত হয়ে উঠেছে। তোমার শুভাগমনে আমাদের এলাকায় আজ প্রাণের সাড়া জেগেছে। আবালবৃদ্ধবণিতা সকলেই আজ আনন্দে বিভোর। দেশমাতৃকার স্বাধীনতাসূর্য ছিনিয়ে আনার সূর্যসন্তান হিসেবে আমরা তোমাকে আমাদের হৃদয়-নিংড়ানো শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করছি। তুমি তা গ্রহণ করে আমাদের ধন্য কর।

**হে দেশের সূর্যসন্তান,**
মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে তোমার অসাধারণ অবদানের জন্য বাংলাদেশ সরকার তোমাকে বীর-উত্তম খেতাব প্রদান করেছে। এ মহাগৌরব শুধু তোমার একার নয়, তুমি এতদঞ্চলের সন্তান হওয়ায় এ গৌরব আমাদেরও। তোমার এ স্বীকৃতি আমাদের মুখ উজ্জ্বল করেছে, সম্মান বাড়িয়েছে। সেজন্য তোমাকে জানাই আমাদের অন্তরের গভীর কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধার্ঘ্য।

**হে মৃত্যুঞ্জয়ী সৈনিক,**
বাঙালির অস্তিত্বের যুদ্ধে বীরদর্পে অংশগ্রহণ করে তুমি মৃত্যুকে জয় করেছ। যুদ্ধক্ষেত্রে তোমার অসম বীরত্ব ইতিহাসের পাতায় কিংবদন্তি হয়ে আছে। মৃত্যুভয়ে তুমি পেছনে তাকাওনি। দেশের প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসায় তুমি হয়ে উঠেছিলে মৃত্যুঞ্জয়ী। তোমার বীরত্বের কাছে মৃত্যুদূত হার মেনেছে। আমরা জানি, তোমার সমস্ত শরীরে আজও বুলেটের ক্ষতচিহ্ন বিদ্যমান। তোমার ক্ষতদানগুলো বিজয় গৌরবেরই পুষ্পিত আলেখ্য আমাদের কাছে।



**হে মহান দেশপ্রেমিক,**
বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের তুমি একজন অকুতোভয় বীর সেনানী। তোমার যুদ্ধকৌশল এবং আঘাত হানার পারদর্শিতায় বর্বর বাহিনীর অত্যাচার থেকে মুক্তি পেয়েছে এ দেশের লাখো নারী পুরুষ ও নিষ্পাপ শিশুরা। তুমি মানুষকে যেমন ভালোবেসেছ তেমনি অকৃত্রিমভাবে ভালোবেসেছ দেশকে। তোমার দেশপ্রেমের জন্যই আমাদের মুখে মুক্তির হাসি ফুটেছে। তুমি আমাদের হৃদয় উৎসারিত সংগ্রামী অভিনন্দন গ্রহণ কর।

**হে আপসহীন সংগ্রামী,**
আজ এ গৌরবের দিনে তোমাকে সম্মান জানানোর ভাষা আমাদের জানা নেই। কোনো বস্তুগত উপঢৌকন দিয়ে পুরস্কৃত করলে তোমার গৌরব কালিমায় ঢাকা পড়বে। তাই তোমাকে আমাদের অন্তর পেতে বরণ করে নিচ্ছি। সেই সাথে এলাকাবাসীর পক্ষ থেকে তোমাকে উপহার দিচ্ছি হাজার বুকের সশ্রদ্ধ ভালোবাসা। তুমি দীর্ঘজীবী হও, মানুষের মাঝে চিরদিন বেঁচে থাক– এ কামনা আমাদের।

তারিখ : ১৫.০৬.২০১৪ বিনয়াবনত
কুমিল্লা ........................ এলাকাবাসীর পক্ষে
..........................................

গ. বৃক্ষ ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের যৌক্তিকতা দেখিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া ছোট ভাইকে অনুপ্রাণিত করে একটি পত্র লিখুন।

১০.০৬.২০১৪
সোনারগাঁও, নারায়ণগঞ্জ

স্নেহের 'খ'
আমার ভালোবাসা নিস। আশা করি পরম করুণাময়ের অপার মহিমায় কুশলেই আছিস। জেনে খুশি হলাম, বিশ্ববিদ্যালয়ের চতুর্থ সেমিস্টার ফাইনাল পরীক্ষায়ও তুই এ+ ধরে রাখতে পেরেছিস এবং পরবর্তী পরীক্ষার প্রস্তুতিও বেশ ভালো।

তোকে বলার অপেক্ষা নেই যে, বৃক্ষ ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আমাদের দেশের ও বিশ্বের জন্য বিশেষ করে মানব অস্তিত্বের জন্য কতখানি জরুরি ও প্রয়োজন। দিন-দিন বিশ্বের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে গ্রিন হাউজ প্রতিক্রিয়াও অব্যাহতভাবে শুরু হয়ে গেছে। আর বৈশ্বিক উষ্ণতার এরূপ বৃদ্ধির কারণে পৃথিবী নানাবিধ সংকটের সম্মুখীন হয়ে পড়ছে। এসব সংকট ও সমস্যা মোকাবেলার একমাত্র উপায় হলো বেশি-বেশি বৃক্ষ রোপণ ও বৃক্ষ সংরক্ষণ করা। কোনো একটি দেশের জন্য মোট ভূভাগের শতকরা ২৫ ভাগ জমিতে বৃক্ষায়ণ দরকার। কিন্তু আমাদের দেশে এ সংখ্যার পরিমাণ খুবই কম। কিন্তু সমুদ্র উপকূলীয় দেশ হিসেবে মূলত আমাদের দেশেই অধিক বৃক্ষরোপণ দরকার ছিল। গ্রিন হাউজ প্রতিক্রিয়ার কারণে যে কয়টি দেশের বিশেষ ঝুঁকির মধ্যে পড়ার খুব সম্ভাবনা রয়েছে তার মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম। পাশাপাশি বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ করা না হলে দেশের বন্যপ্রাণী যেমন বিলুপ্তির সম্ভাবনা রয়েছে, তেমনি দেশের মূল্যবান সম্পদ হারানোর সম্ভাবনাও উপেক্ষা করার মতো নয়।

পত্রিকা মারফত জানতে পারলাম, বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু ছাত্র-ছাত্রী বিশ্ববিদ্যালয়ের গাছপালার সংরক্ষণ না করে বরং তারা বৃক্ষ কর্তন এবং ফল ও ফুলের গাছ নষ্ট করে পরিবেশের ক্ষতি করে চলেছে। সত্যিই এটি দুঃখজনক, যারা জাতির ভবিষ্যৎ কর্ণধার, দেশ ও জাতিকে এগিয়ে

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



নেবার কাজে ব্যস্ত থাকার কথা তারা পরিবেশের অসীম ক্ষতি করে চলেছে। আমি আশা করবো, বৃক্ষ ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণে সামান্য হলেও তোর অংশগ্রহণ থাকবে। কেননা দেশ-মাতৃকার জন্য প্রকৃতপক্ষে এখনই কিছু করার সময়।

ভালো থাকিস। শরীরের প্রতি যত্ন নিস। আজ রাখি।

ইতি
তোর বড় ভাইয়া
ক

## ২৯তম বিসিএস ২০১০, বাংলা : প্রথম পত্র

*[দ্রষ্টব্য : প্রত্যেক প্রশ্নের মান প্রশ্নের শেষ প্রান্তে দেখানো হয়েছে।]* নম্বর

১. ক. বানান, শব্দ প্রয়োগ, বিন্যাস, চলিত রীতি ইত্যাদি শুদ্ধ করে নিচের বাক্যগুলো পুনরায় লিখুন : $^1/_2 \times ১২ = ৬$

১. **বঙ্কিমচন্দ্রের রচনারীতির উৎকর্ষতা অনস্বীকার্য।**
উত্তর : বঙ্কিমচন্দ্রের রচনারীতির উৎকর্ষ অনস্বীকার্য।

২. **সুশিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রই সশিক্ষিত।**
উত্তর : সুশিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রই স্বশিক্ষিত।

৩. **সকলের সহযোগীতায় আমি স্বার্থকতা লাভ করতে চাই।**
উত্তর : সকলের সহযোগিতায় আমি সার্থকতা লাভ করতে চাই।

৪. **ঝুড়িতে রাখা সমস্ত মাছগুলোর আকার একই রকমের।**
উত্তর : ঝুড়িতে রাখা সব মাছের আকার একই রকম।

৫. **তাহার শুশ্রূষা ও সান্তনায় আমি শক্তি ও উৎসাহ পাইলাম।**
উত্তর : তার শুশ্রূষা ও সান্ত্বনায় আমি শক্তি ও উৎসাহ পেলাম।

৬. **এমন অসহ্যনীয় ব্যাথা কখনো অনুভব করিনি।**
উত্তর : এমন অসহ্য ব্যথা কখনো অনুভব করিনি।

৭. **স্ব স্ব ভূমির পুষ্করিনী পরিষ্কার করার নিমিত্ত কর্তৃপক্ষ পুরস্কার ঘোষণা করিয়াছে।**
উত্তর : নিজ নিজ পুকুর পরিষ্কার করার জন্য কর্তৃপক্ষ পুরস্কার ঘোষণা করেছে।

৮. **কবির শোকসভায় বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবিরা শ্রদ্ধাঞ্জলী জ্ঞাপন করেছে।**
উত্তর : কবির শোকসভায় বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবীগণ শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করেছেন।

৯. **তিনি সানন্দিতচিত্তে সম্মতি দিলেন।**
উত্তর : তিনি সানন্দে সম্মতি দিলেন।

১০. **সে যে ব্যাকারণের বিভিষীকায় ভিত নয়, আশা করি তুমি তা জান।**
উত্তর : সে যে ব্যাকরণের ভয়ে ভীত নয়, আশা করি তুমি তা জান।

১১. **নদীর তীরের সব জমিগুলো আমার আয়ত্ত্বাধীনে আছে।**
উত্তর : নদীর তীরের সব জমি আমার আয়ত্তে আছে।

১২. **ভূমিকম্পে উর্ধমুখী দালানটি ধ্বসে পড়লো।**
উত্তর : ভূমিকম্পে দালানটি ধসে পড়লো।



খ. **শূন্যস্থান পূর্ণ করুন :** ৬

কালোবাজারিতে টাকা করে রফিক সাহেব এখন সমাজে — হয়ে উঠেছেন। তাদের মতো মানুষের জীবনযাপনে — প্রকাশ পায়। কিন্তু চিন্তাভাবনার ক্ষেত্রে তারা — কে অতিক্রম করতে চেষ্টা করে না। তাই সমাজ ও সংসার সম্পর্কে তাদের কোনো কাণ্ডজ্ঞান জন্মে না। ফলে, সকল ক্ষেত্রে তারা — গা ভাসিয়ে চলে। দেশের উন্নতির জন্য — তাদের পক্ষে সম্ভব নয়।

উত্তর : কালোবাজারিতে টাকা করে রফিক সাহেব এখন সমাজে কেষ্টবিষ্টু হয়ে উঠেছেন। তাদের মতো মানুষের জীবনযাপনে সরফরাজি চাল প্রকাশ পায়। কিন্তু চিন্তাভাবনার ক্ষেত্রে তারা তামার বিষকে অতিক্রম করতে চেষ্টা করে না। তাই সমাজ ও সংসার সম্পর্কে তাদের কোনো কাণ্ডজ্ঞান জন্মে না। ফলে, সকল ক্ষেত্রে তারা গড্ডলিকা প্রবাহে গা ভাসিয়ে চলে। দেশের উন্নতির জন্য মেও ধরা তাদের পক্ষে সম্ভব নয়।

গ. **ছয়টি পূর্ণ বাক্যে নিচের প্রবাদটির নিহিতার্থ প্রকাশ করুন :** ৬

**মাছের মা'র পুত্রশোক।**

উত্তর : মাছের মা'র পুত্রশোক কথাটির অর্থ কপট বেদনাবোধ। যাকে আরও সহজে বলা যায় আন্তরিকতাহীন লোক দেখানো কৃত্রিম শোক। অন্তর্দলীয় সংঘর্ষে প্রতিদ্বন্দ্বীর মৃত্যু বা নিহত হওয়ার পর লোক দেখানোর জন্য কোনো কোনো রাজনীতিবিদ চোখের পানি ফেলে, এ যেন মাছের মা'র পুত্র শোক। তেমনি সংসারেও দেখা যায় এর নানা উদাহরণ। জীবিত থাকা অবস্থায় দুই সতীনের মধ্যে কখনও সদ্ভাব ছিল না। অথচ এক সতীনের মৃত্যুতে আরেক সতীন কাঁদছে, দেখে মনে হয় মাছের মা'র পুত্রশোক।

ঘ. **নিম্নলিখিত শব্দগুলো দিয়ে পূর্ণ বাক্য লিখুন :** ৬

পরিপত্র, মুচলেকা, সমঝোতা-স্মারক, সংশ্লেষণ, কুজ্ঝটিকাবৃত্তি, প্রত্ন-উৎস।

উত্তর : পরিপত্র : সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে নির্বাচন কমিশন নতুন পরিপত্র জারি করলেন।
মুচলেকা : অফিসের অধস্তন কর্মচারী ভবিষ্যতে আর অন্যায় করবে না বলে ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তার নিকট মুচলেকা দিলেন।
সমঝোতা-স্মারক : প্রবল প্রতিপক্ষের মধ্যে সমঝোতা-স্মারক স্বাক্ষরিত হলো।
সংশ্লেষণ : গ্রিন হাউস প্রতিক্রিয়ার জন্য দায়ী বায়ুমণ্ডলে বিভিন্ন গ্যাসের সংশ্লেষণ।
কুজ্ঝটিকাবৃত্তি : আজকাল কিছু কিছু লেখককে কুজ্ঝটিকাবৃত্তি করতে দেখা যায়।
প্রত্ন-উৎস : মহাস্থানগড়ে পাল আমলের নতুন কিছু প্রত্ন-উৎসের সন্ধান পাওয়া গেছে।

ঙ. **সূত্রানুসারে বাক্যে রূপান্তর করুন :** ৬

১. **যদি সে নিরপরাধ হয়, তাহলে সে মুক্তি পাবে। (যৌগিক বাক্য)**
উত্তর : সে নিরপরাধ এবং মুক্তি পাবে।

২. **পৃথিবীতে অনেক কিছু আছে, কিন্তু অসম্ভব কিছু নেই। (সরল বাক্য)**
উত্তর : পৃথিবীতে অসম্ভব বলে কিছু নেই।

৩. **তারা একটি জীর্ণ কুটিরে বাস করে। (জটিল বাক্য)**
উত্তর : তারা যে কুটিরে বাস করে, সেটি জীর্ণ।

৪. **জ্ঞানীদের পথ অনুসরণ কর, দেশের কল্যাণ হবে। (সরল বাক্য)**
উত্তর : জ্ঞানীদের পথ অনুসরণে দেশের কল্যাণ হবে।

৫. **তুমি অধম বলে আমি উত্তম হব না কেন? (যৌগিক বাক্য)**
উত্তর : তুমি অধম তাই বলে আমি উত্তম হব না কেন?

৬. **তোমাকে দেয়ার মতো আমার কিছুই নেই। (জটিল বাক্য)**
উত্তর : আমার এরূপ কিছু নেই যে, তোমাকে দেব।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



২. যে কোনো একটি প্রবাদের ভাব-সম্প্রসারণ করুন (অনধিক ২০টি বাক্য) : ২০

ক. যে সহে, সে রহে।

ভাব-সম্প্রসারণ : সহনশীলতা একটি মহৎ গুণ এবং মানবজীবনে সুপ্রতিষ্ঠার জন্য এই গুণের বিশেষ গুরুত্ব বিদ্যমান। মানুষের মতো বাঁচতে হলে এবং জীবনে সাফল্য অর্জন করতে হলে সর্বাগ্রে প্রয়োজন সহনশীলতা।

সহনশীলতা মানবজীবনের অন্যতম সাম্যনীতি। পৃথিবীতে অবিমিশ্র সুখ-দুঃখ বলে কিছু নেই। সুখ-দুঃখ আসলে মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ। বিপদাপদের মধ্য দিয়েই মানুষের যাত্রা শুরু হয়। তাকে সংগ্রাম করতে হয় নানা প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে। রোগ-শোক, দুঃখ-দারিদ্র্য, অন্যায়-অবিচার এসবের চাপে মানব পর্যুদস্ত হয়। চোখে বিভীষিকা দেখে। কিন্তু এসব প্রতিরোধ করার জন্য চাই শক্তি, অধ্যবসায় ও সহিষ্ণুতা। যুদ্ধে জয়-পরাজয় আছেই কিন্তু যে মানুষ পরাজয়কে অম্লান বদনে মাথা পেতে নিয়ে পরবর্তী বিজয়ের জন্য ব্রতী হয়— সে-ই বিজয় অর্জন করতে পারে, সে-ই যথার্থ বীর। বিখ্যাত মনীষীদের জীবন পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, সফলতা অনায়াসে তাদের কাছে ধরা দেয়নি। এ সফলতার জন্য তাদের সহ্য করতে হয়েছে নানা লাঞ্ছনা-গঞ্জনা। কিন্তু মহৎ লোকেরা এতে পিছপা হননি বরং ধৈর্যসহকারে এগিয়ে বিজয়ের মালা ছিনিয়ে এনেছেন। তারা যদি ধৈর্য হারিয়ে ফেলতেন তবে তাদের সাফল্য আসত না। কাজেই সহ্য ক্ষমতা যার আছে বেঁচে থাকার অধিকার কেবল তারই।

ইতিহাসের পাতায় এরূপ বহু দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া যায়। মহানবীর জীবনালেখ্য সহনশীলতার এক অসামান্য দলিল। তাই তো তিনি মক্কা বিজয়ের পরও বন্দিদেরকে দিলেন নিঃশর্ত মুক্তি। ঘোষণা করেন, 'তোমরা সবাই মুক্ত, স্বাধীন।' এ সহনশীলতায় মুগ্ধ হয়েই আশ্চর্য কণ্ঠে বলে ওঠেন উইলিয়াম ম্যুর, ধৈর্যহীন হলে কোনো কিছুই নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভবপর হয় না। ধৈর্য না থাকলে যে কোনো সমস্যা মোকাবিলা করা কঠিন হয়ে পড়ে। এ অবস্থা জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভের অন্তরায়। সহনশীল বা ধৈর্যশীল হলে মানুষ ধীরস্থিরভাবে কর্মপন্থা নির্ধারণ করতে পারে এবং প্রতিপক্ষকে মোকাবিলা করার উত্তম কৌশল অর্জন করতে সক্ষম হয়। তাই জীবনে সফলতার জন্য সকলকে ধৈর্যশীল বা সহনশীল হতে হবে। 'The magnanimity with which Mohammed treated a people who had so long hated and rejected him is worthy of admiration.' স্কটল্যান্ডের রাজা রবার্ট ব্রুস ইংল্যান্ডের রাজা এডওয়ার্ডের সাথে ছয়বার যুদ্ধে পরাস্ত হয়েও ধৈর্য ধারণ করেছিলেন এবং সহিষ্ণুতার গুণে পুনরায় যুদ্ধ করে সপ্তমবারের প্রচেষ্টায় শত্রুর কবল থেকে স্বদেশ উদ্ধার করেন।

খ. অভাগার গরু মরে, ভাগ্যবানের বউ মরে।

ভাব-সম্প্রসারণ : পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক নারী। এ প্রবাদে সমাজ ও সংসারের অর্ধাঙ্গী নারীর মৃত্যুকে হেয় করা হয়েছে, যা লিঙ্গবৈষম্যের চূড়ান্তরূপ। গরু গার্হস্থ্য জীবনের অর্থকরী সম্পদ। গরু সম্পদ ব্যবহার করে দরিদ্র কৃষকের অর্থনৈতিক কল্যাণ সাধিত হয়। দরিদ্র কৃষকের গরু মরলে অনেক সময় তার কৃষিকাজ বাধাগ্রস্ত হয়। আরেকটি গরু কিনতে তাকে প্রায় সর্বস্বান্ত হতে হয়। এটি জীবনযাপনের একটি দিক। অন্যদিকে পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় নারীকে পদে পদে শাসন-শোষণ, বঞ্চনা, নির্যাতনের শিকার হতে হয়। পুরুষ নারীকে তাদের প্রয়োজনে ভোগ্যপণ্যে রূপান্তরিত করেছে। নারীকে ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছে। নারী হয়ে পড়েছে শিক্ষায় অনগ্রসর। ফলে তারা হয়েছে অবহেলিত ও পশ্চাৎপদ। লেখাপড়া কম জানা বা না জানার



কারণে দেশের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডেও নারীর অবদান কম এবং গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হয় না। সামাজিক দিক দিয়ে নারীরা বিপর্যস্ত। নারীকে ধর্মীয় কুসংস্কার, গোঁড়ামির বেড়াজালে আবদ্ধ রেখে ঘরের চার দেয়ালের মধ্যে তাদের বন্দি করা হয়েছে। পুরুষতান্ত্রিক সমাজ কাঠামোয় জন্ম থেকেই শুরু হয় নারীর প্রতি বৈষম্য, অনাচার, বঞ্চনা, সহিংসতা। অভাবের সংসারে ছেলের পাতে এক মুঠো ভাত জুটলেও মেয়েটিকে থাকতে হয় উপোস বা অর্ধাহারে। স্বাস্থ্যগত দিক দিয়ে নারী ভোগে অপুষ্টিতে। বিয়ের সময় ছেলেকে দিতে হয় যৌতুক, অন্যথায় হতে হয় নির্যাতনের শিকার। এমনকি স্বামী কর্তৃক পরিত্যক্ত পর্যন্ত হতে হয়। স্বামীগৃহে গৃহবধূকে নানা অত্যাচারের শিকার হতে হয়। শুনতে হয় কটূক্তি। অর্থনৈতিকভাবে নারীকে দুর্বল রেখে পুরুষ নারীকে করে তোলে পরনির্ভরশীল। সমাজ ও সংসারে নারী বঞ্চিত হয় ন্যায্য অধিকার থেকে। উপেক্ষিত হয় জীবনের সর্বক্ষেত্রে। নারী পরিণত হয় পুরুষের ক্রীড়নকে। শিক্ষা, অভিজ্ঞতা, মননের উৎকর্ষে নারীকে পিছিয়ে রাখা হয়। যে নারী সন্তান জন্ম দিল, তাকে লালন-পালন করে বড় করল, অথচ সেই নারীকে তার সন্তানের ভবিষ্যৎ নিয়ে কোনো সিদ্ধান্ত নিতে দেয়া হয় না, বা দিলেও তা গৃহীত হয় না। এভাবে পুরুষতান্ত্রিক সমাজকাঠামোয় সামাজিক কুসংস্কার, নিপীড়ন ও বৈষম্যের বেড়াজালে নারীকে সর্বদা অবদমিত করে রাখা হয়েছে। আলোচ্য প্রবাদটিতে গরুর মৃত্যুতে দুঃখ প্রকাশ ও গৃহবধূর মৃত্যুতে সুখ প্রকাশ পুরুষের মানসিক বিকৃতির পরিচায়ক। ভোগী পুরুষ স্ত্রীর মৃত্যু হলে অনায়াসে আরেকটি বিয়ে করে নতুন নারী উপভোগ ও যৌতুক লাভ করতে পারবে বলে গৃহবধূর মৃত্যুকে সে সৌভাগ্যের লক্ষণ বলে মনে করে। এ দ্বারা নারীকে পশুর চেয়েও নিচে নামানো হয়েছে। বহু আগে প্রচলিত এ প্রবাদের অকার্যকারিতার লক্ষ্যে বহুবিধ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। পাশাপাশি নারী উন্নয়নে আন্তর্জাতিকভাবেও নানা উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। আশা করা যায়, অদূর ভবিষ্যতে পুরুষের এরূপ নীচ, হেয় মানসিকতার পরিবর্তন ঘটবে। নারী-পুরুষের সমতা অর্জিত হবে।

৩. সারমর্ম লিখুন : ১০ × ২ = ২০

ক. নমি আমি প্রতি জনে, আদ্বিজ চণ্ডাল,
প্রভু ক্রীতদাস!
সিন্ধুমূলে জলবিন্দু, বিশ্বমূলে অণু;
সমগ্রে প্রকাশ!
নমি কৃষি-তন্তুজীবী, স্থপতি, তক্ষক,
কর্ম, চর্মকার!
অদ্রিতলে শিলাখণ্ড– দৃষ্টি অগোচরে,
বহ অদ্রিভার!
কত রাজ্য, কত রাজা গড়িছ নীরবে
হে পূজ্য, হে প্রিয়!
একত্বে বরেণ্য তুমি, শরণ্য এককে,–
আত্মার আত্মীয়।

সারমর্ম : জগৎ-সভ্যতা বিনির্মাণে সকল শ্রেণীর মানুষের রয়েছে সমান অবদান। রাজা-প্রজা, শ্রমিক-মালিক সকলের পরিশ্রমেই গড়ে উঠেছে আজকের বিশ্বসভ্যতা। তাই মানুষ হিসেবে কেউ ছোট নয়, সকলেই সমান পূজনীয়।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



খ. স্বাধীন হবার জন্য যেমন সাধনার প্রয়োজন, তেমনি স্বাধীনতা রক্ষার জন্য প্রয়োজন সত্যনিষ্ঠা ও ন্যায়-পরায়ণতার। সত্যের প্রতি শ্রদ্ধাবোধহীন জাতি যতই চেষ্টা করুক, তাদের আবেদনে নিবেদনে ফল হয় না। যে জাতির অধিকাংশ ব্যক্তি মিথ্যাচারী, সেখানে দু'চারজন সত্যনিষ্ঠকে বহু বিড়ম্বনা সহ্য করতে হয়; দুর্ভোগ পোহাতে হয়। কিন্তু মানুষ ও জাতি হিসেবে মাথা তুলে দাঁড়াতে হলে সে কষ্ট সহ্য না করে উপায় নেই।

**সারাংশ :** স্বাধীনতা ও ন্যায়পরায়ণতা অধিক সংখ্যক মিথ্যাচারী ও অন্যায়কারী কর্তৃক সৃষ্ট দুর্ভোগ মুষ্টিমেয় সত্যনিষ্ঠ ব্যক্তিকেই ভোগ করতে হয়। আত্মমর্যাদাশীল জাতি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হতে হলে এ দুর্ভোগটুকু স্বীকার করে নেয়া ছাড়া উপায় নেই।

**৪. অতি সংক্ষেপে নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলোর উত্তর লিখুন :** ২ × ১৫ = ৩০

**ক. চর্যাপদের ধর্মমত সম্পর্কে ধারণা দিন।**

**উত্তর :** চর্যাপদে বৌদ্ধধর্মের তত্ত্বকথা বিধৃত হয়েছে। বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যগণ তাদের ধর্মীয় রীতিনীতির নিগূঢ় রহস্য চর্যাপদে রূপায়ণ করেছেন। চর্যাপদের মাধ্যমে বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যরা গোপন তত্ত্বদর্শন ও ধর্মচর্চাকে বাহ্যিক প্রতীকের সাহায্যে ব্যক্ত করেছেন। বৌদ্ধ ধর্মের মহাযান শাখা কালক্রমে যেসব উপশাখায় বিভক্ত হয়েছিল তারই বজ্রযানের সাধনপ্রণালী ও তত্ত্ব চর্যাপদে বিধৃত। মহাসুখরূপ নির্বাণ লাভ– এই হলো চর্যার প্রধান তত্ত্ব। চর্যার ধর্মমত বিশেষ দীক্ষিত জনের প্রতি উদ্দিষ্ট বলে তাকে বিশুদ্ধ লোকধর্মের বৈশিষ্ট্যের অধিকারী মনে করা হয় না।

**খ. ডাক ও খনার বচনের বৈশিষ্ট্য আলোচনা করুন।**

**উত্তর :** ডাক ও খনার বচন বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন যুগের সৃষ্টি এবং লোকসাহিত্যের আদি নিদর্শন। ডাক নামক জনৈক জ্ঞানী ব্যক্তি যাঁর বচনসমূহ ডাকের বচন নামে সুপ্রসিদ্ধ ও বহুপ্রচলিত। খনা ছিলেন বিখ্যাত বাঙালি মহিলা জ্যোতিষী। জ্যোতিষ শাস্ত্র অনুযায়ী চাষাবাদ, বৃক্ষরোপণ, গৃহনির্মাণ প্রভৃতি শুভাশুভ বিষয়ক সুপ্রচলিত প্রবচন যা খনার রচিত বলে প্রসিদ্ধ। ডাক ও খনার বচনের মধ্যে বিষয়গত ঐক্য বিদ্যমান। উভয়েই মানবজীবনে প্রভাব বিস্তার করেছে। এতে নীতিবাক্য, বহুদর্শী উপদেশ, আবহাওয়া ও কৃষি সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা ইত্যাদি বিষয়ে বলা হয়েছে।

**গ. বড়ু চণ্ডীদাসের পরিচয় দিন।**

**উত্তর :** বড়ু চণ্ডীদাস মধ্যযুগের আদি কবি ছিলেন। তার জন্ম তারিখ নিয়ে মতভেদ রয়েছে। তবে তিনি চণ্ডীমূর্তি বাসলীর ভক্ত ছিলেন। বড়ু চণ্ডীদাসের অমর সৃষ্টি বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগের প্রথম কাব্য 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'।

**ঘ. বৈষ্ণব পদাবলি কী? এগুলো কোন শতাব্দীর রচনা?**

**উত্তর :** মধ্যযুগে বাংলা সাহিত্যের প্রধানতম বা শ্রেষ্ঠ গৌরবময় ফসল বৈষ্ণব পদাবলি সাহিত্য। রাধা-কৃষ্ণের প্রেমলীলা অবলম্বনে এ অমর কবিতাবলির সৃষ্টি এবং বাংলাদেশে শ্রীচৈতন্যদেব প্রচারিত বৈষ্ণব মতবাদের সম্প্রসারণে এর ব্যাপক বিকাশ। জয়দেব-বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাস থেকে সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত বৈষ্ণব গীতিকবিতার ধারা প্রবাহিত হলেও প্রকৃতপক্ষে ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দীতে এ সৃষ্টিসম্ভার প্রাচুর্য ও উৎকর্ষপূর্ণ ছিল।

**ঙ. বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে চৈতন্যদেব কেন স্মরণীয়?**

**উত্তর :** নবদ্বীপে জন্মগ্রহণকারী শ্রীচৈতন্যদেব ভগবত প্রেমে উন্মত্ত হয়ে ওঠেন। মুসলমান শাসন ও ইসলাম ধর্মের সম্প্রসারণে হিন্দু সমাজের যে বিপর্যয় সৃষ্টি হয়েছিল তাকে প্রতিরোধ করার মন্ত্র প্রচার করেন চৈতন্যদেব তার বৈষ্ণব মতবাদের মাধ্যমে। তিনি প্রচার করলেন, 'জীবে দয়া ঈশ্বরে ভক্তি, বিশেষ করে নাম-ধর্ম, নাম-সংকীর্তন'। চৈতন্যদেবের আবির্ভাবে যে



প্রভাব লক্ষ করা যায় তা হচ্ছে, ঐতিহাসিক ও সামাজিক দিক থেকে দেশ জাতীয় মুক্তির পথের সন্ধান পায়। মানব প্রেমাদর্শে সমৃদ্ধ বৈষ্ণব দর্শন ও ধর্ম সম্প্রদায় গড়ে ওঠে এবং অধ্যাত্মভাব, চিত্র সৌন্দর্য ও মধুর প্রেমরসে সমৃদ্ধ বৈষ্ণব সাহিত্য সৃষ্টি হয়।

**চ. মধ্যযুগের সাহিত্যের সাথে আধুনিক যুগের সাহিত্যের মৌলিক পার্থক্য কী?**

**উত্তর :** মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে ধর্মীয় বিষয় ছিল একমাত্র উপজীব্য। আধুনিক যুগে বাংলা সাহিত্যের সবচেয়ে বড় লক্ষণ বলে বিবেচিত হতো মানবিকতা। মধ্যযুগের সাহিত্যে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ না থাকলেও আধুনিক বাংলা সাহিত্যে তা পরিলক্ষিত হয়। মধ্যযুগের বাংলা কাব্য ছিল অনুবাদ ও অনুকরণমূলক। মৌলিকতা আধুনিক সাহিত্যের অন্য একটি লক্ষণ। মধ্যযুগে রাজানুগত্য, জাতীয় চেতনাবোধ ও দেশীয় ঐতিহ্য চর্চার বিকাশ ঘটে। দেশপ্রেম বা জাতীয়তাবোধ আধুনিকতার লক্ষণ বলে বিবেচ্য।

**ছ. রোসাঙ্গ রাজসভার পৃষ্ঠপোষকতায় কী ধরনের সাহিত্য রচিত হয়? সে সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিন।**

**উত্তর :** রোসাঙ্গ রাজসভার পৃষ্ঠপোষকতায় বাঙালি মুসলমান কবিরা ধর্ম সংস্কারমুক্ত মানবীয় প্রণয়কাহিনী অবলম্বনে কাব্যধারার প্রথম প্রবর্তন করেন। এ সময় 'লস্কর উজির' বা সমর সচিব আশরাফ খানের আদেশে কবি দৌলত কাজী 'সতীময়না ও লোরচন্দ্রানী' কাব্য রচনা করেন। রোসাঙ্গ-রাজের প্রধানমন্ত্রী মাগন ঠাকুরের পৃষ্ঠপোষকতায় আলাওল 'পদ্মাবতী' কাব্য রচনা করেন। আলাওল সমরসচিব সৈয়দ মুহম্মদ খানের আদেশে 'হপ্তপয়কর', রাজমন্ত্রী নবরাজ মজলিসের আদেশে 'সেকান্দরনামা', রোসাঙ্গ-রাজ অমাত্য সৈয়দ মুসার আদেশে 'সয়ফুলমুলুক বদিউজ্জামাল' কাব্য রচনা করেন।

**জ. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে কেন বাংলা গদ্যের জনক বলা হয়?**

**উত্তর :** বাংলা গদ্যের অবয়ব নির্মাণে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করেন। গদ্যের অনুশীলন পর্যায়ে বিদ্যাসাগর সুশৃঙ্খলা, পরিমিতিবোধ ও ধ্বনি প্রবাহে অবিচ্ছিন্নতা সঞ্চার করে বাংলা গদ্যরীতিকে উৎকর্ষের এক উচ্চতর পরিসীমায় উন্নীত করেন। তারই বলিষ্ঠ প্রতিভার যাদুস্পর্শে বাংলা গদ্য কৈশোরকালের অনিশ্চয়তাকে পশ্চাতে পরিত্যাগ করে পূর্ণ সাহিত্যিকরূপের নিশ্চয়তার মধ্যে স্থান পায়। গদ্য তার অস্থির গতির কাল অতিবাহিত করে স্থিরতার পর্যায়ে উপস্থিত হয়। বিদ্যাসাগরের পূর্ববর্তী গদ্যের বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করলে তৎকালীন লেখকদের মধ্যে যে সুষম বাক্য গঠনরীতির নিদর্শন লক্ষণীয় হয়ে ওঠে না তা নয়, কিন্তু এ ব্যাপারে বিদ্যাসাগর যেমন সচেষ্ট ছিলেন তেমন আর কারো মধ্যে দেখা যায় না। সেজন্য বাংলা গদ্যশৈলীর উদ্ভবের পঁয়তাল্লিশ বছর পরে লেখনী ধারণ করা সত্ত্বেও তাকে বাংলা গদ্যের জনক বলা হয়ে থাকে।

**ঝ. 'রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পে নারী-ব্যক্তিত্ব' শিরোনামে একটি অনুচ্ছেদ লিখুন।**

**উত্তর :** বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক ছোটগল্পকার বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর-এর ছোটগল্পে পুরুষ চরিত্রের চেয়ে নারী চরিত্র অধিকতর উজ্জ্বল। 'ঘাটের কথা' গল্পে কুসুম, 'দেনাপাওনা' গল্পে নিরুপমা, 'পোস্টমাস্টার' গল্পে রতন, 'দালিয়া' গল্পে আমিনা, 'একরাত্রি' গল্পে সুরবালা, 'জীবিত ও মৃত' গল্পে কাদম্বিনী, 'জয়-পরাজয়' গল্পে অপরাজিতা, 'কাবুলিওয়ালা' গল্পে মিনি, 'সুভা' গল্পে সুভাষিনী, 'মহামায়া' গল্পে মহামায়া, 'সম্পাদক' গল্পে প্রভা, 'সমাপ্তি' গল্পে মৃন্ময়ী, 'প্রায়শ্চিত্ত' গল্পে বিন্ধ্যবাসিনী, 'দিদি' গল্পে শশি, 'অতিথি' গল্পে অন্নপূর্ণা প্রভৃতি চরিত্রগুলো মুখ্য হয়ে উঠেছে। এতে সমাজের কুসংস্কার, নারী অধিকার, নারী বিদ্রোহসহ নানাবিধ দিক উপস্থাপন করা হয়েছে।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



**ঞ. 'বীরবলী গদ্যে'র স্রষ্টা কে? এ গদ্যের বৈশিষ্ট্য সংক্ষেপে উল্লেখ করুন।**

উত্তর : বীরবলী গদ্যের স্রষ্টা প্রমথ চৌধুরী। এ গদ্যের বৈশিষ্ট্য হলো এটি চলিত ভাষায় লেখা গদ্যের সুমার্জিত রূপ। এ গদ্যে অন্তর্নিহিত প্রাণশক্তি, দৃঢ় প্রকৃতিস্থ ও বহিরাবয়ব আঙ্গিক বিন্যাসে সমৃদ্ধ। এ গদ্যে রসিকতাচ্ছলে সত্যকে উপস্থাপন করা হয়েছে।

**ট. নজরুলের কথাসাহিত্যে নিম্নবর্গের জীবন সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোকপাত করুন।**

উত্তর : বাংলা সাহিত্যে বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম-এর আবির্ভাব ঘটে রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা, বিশৃঙ্খল অবস্থার মধ্যে। যেখানে প্রতিটি স্তরে নিপীড়িত জনগণের দীর্ঘশ্বাস দেশের বাতাস বিষাক্ত করছে; জাতীয় জীবনে তখন ঘনান্ধকারের সমাবেশ। কাজী নজরুল ইসলাম তার লেখনী ধারণ করলেন এসব উৎপীড়িত জনগণের প্রতি সহানুভূতির মাধ্যমে। লিখলেন কাব্যগ্রন্থ, নাটক, উপন্যাস, সঙ্গীত, প্রবন্ধ প্রভৃতি। যেমন 'বাঁধন-হারা' উপন্যাসে কবি নূরু ও মাহবুবার প্রণয় এবং শেষ পর্যন্ত নূরুর পালিয়ে গিয়ে সৈনিক জীবনে প্রবেশ কিংবা 'মৃত্যুক্ষুধা' উপন্যাসে দারিদ্র্য, ক্ষুধা, দুর্ভিক্ষের পরিপ্রেক্ষিতে সপরিবারে মেজ বৌয়ের মুসলিম থেকে খ্রিষ্ট ধর্মে ধর্মান্তর।

**ঠ. 'কল্লোল-যুগ' বলতে কী বোঝেন? এ যুগের সাহিত্যকে কেন 'ত্রিশোত্তর সাহিত্য' বলা হয়?**

উত্তর : 'কল্লোল' পত্রিকা থেকে কল্লোল-যুগ কথাটির উৎপত্তি। বিংশ শতাব্দীর তিনের দশকে কল্লোল পত্রিকা বের হয়। সাত বছর চলে এ পত্রিকাটি। এ পত্রিকাকে ঘিরে যে সময়টিতে সাহিত্যের আধুনিকতাবাদী আন্দোলনের প্রকাশ ও বিকাশ, তা-ই 'কল্লোল-যুগ' নামে পরিচিত। এ যুগের সাহিত্যকে 'ত্রিশোত্তর সাহিত্য' বলার কারণ– এরা গতানুগতিক সাহিত্যচর্চা থেকে বের হয়ে স্বতন্ত্র ধারার সাহিত্য রচনায় মনোনিবেশ করেন। সাহিত্যে আধুনিকতার সঞ্চার করেন।

**ড. অ্যাবসার্ড নাটক কী? বাংলাদেশে যেসব নাট্যকার অ্যাবসার্ড নাটক লিখেছেন তাদের নামোল্লেখ করুন।**

উত্তর : অ্যাবসার্ড নাটক হলো হতাশাপূর্ণ, উদ্বিগ্নধর্মী, অবাস্তব, অলীক কাহিনীনির্ভর ঘটনাবহুল নাটক, যে নাটকে বাস্তবতার সাথে কাহিনী বা ঘটনার কোনো মিল বা সাদৃশ্য নেই। The Theater of the Absurd-এর মতে, 'Sense of metaphysical anguish at the absurdity of the human condition.'
বাংলাদেশে অ্যাবসার্ড নাটক লিখেছেন সাঈদ আহমেদ, মমতাজ উদ্দীন আহমদ, জিয়া হায়দার প্রমুখ নাট্যকার।

**ঢ. শামসুর রাহমানের কবি-প্রতিভার পরিচয় দিন।**

উত্তর : আধুনিক কবি শামসুর রাহমান-এর মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত ৬৫টি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। তার উল্লেখযোগ্য কাব্য গ্রন্থগুলো হলো– বিধ্বস্ত নীলিমা, বাংলাদেশ স্বপ্ন দ্যাখে, উদ্ভট উটের পিঠে চলেছে স্বদেশ, না বাস্তব না দুঃস্বপ্ন, বন্দী শিবির থেকে প্রভৃতি। তার দুটি বিখ্যাত কবিতা হলো 'স্বাধীনতা তুমি' ও 'তুমি আসবে বলে হে স্বাধীনতা'। তার অসাধারণ কাব্য প্রতিভার জন্য তিনি আদমজি পুরস্কার, বাংলা একাডেমি পুরস্কার, একুশে পদক, স্বাধীনতা পুরস্কারসহ অসংখ্য পুরস্কার লাভ করেন।

**ণ. বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকেন্দ্রিক যে কোনো একটি উপন্যাসের ঘটনাংশ বর্ণনা করুন।**

উত্তর : শওকত ওসমানের 'জলাংগী' উপন্যাসে গ্রাম্য এক কৃষক পরিবারের শহরে কলেজ পড়ুয়া ছাত্র জামিরালীর মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ এবং সে পরিস্থিতিতে প্রতিফলিত তার পরিবারের চালচিত্র তুলে ধরা হয়েছে। যাতে রয়েছে পাকিস্তানি সেনাদের পাশবিক নিষ্ঠুরতার চালচিত্র। জামিরালী তার বৃদ্ধ মা, বাবা, প্রিয়তমা হাজেরাকে উপেক্ষা করে যুদ্ধে অংশ নেয়। যুদ্ধকালীন সময়ে বাড়িতে এসে দেখে তার গ্রাম মিলিটারিরা আগুনে পুড়িয়ে দিয়েছে। আগুনে তার বাবা-মা মারা গেছে। হাজেরার খোঁজ পেয়ে তাকে দেখতে গেলে পথিমধ্যে মিলিটারির হাতে ধরা পড়ে এবং ক্যাম্পে হাজেরাকে দেখতে পায়। জামিরালী ও হাজেরাকে গ্রামে জনসভা করে মেঘনার বুকে গলায় পাথর বেঁধে ডুবিয়ে দেয়া হয়। জামিরালী মৃত্যু নিশ্চিত জেনেও ভ্রষ্ট হয়নি– তার মুখ থেকে জয় বাংলা জয় বেরিয়ে আসে।



## ২৯তম বিসিএস ২০১০, বাংলা : দ্বিতীয় পত্র

*[দ্রষ্টব্য : ইংরেজি অথবা বাংলা যে কোনো একটি ভাষায় প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। তবে টেকনিক্যাল শব্দগুলো ইংরেজিতে লেখা চলবে। প্রত্যেক প্রশ্নের মান প্রশ্নের শেষ প্রান্তে দেখানো হয়েছে।]* নম্বর

১. যে কোনো একটি বিষয়ে রচনা লিখুন : ৪০

ক. ভাষা আন্দোলনভিত্তিক বাংলা সাহিত্য
উত্তর : পৃষ্ঠা ৭৮৮।

খ. নারী শিক্ষা উন্নয়ন
উত্তর : পৃষ্ঠা ৮৩৮।

গ. বিশ্ব জলবায়ু পরিবর্তন
উত্তর : পৃষ্ঠা ৮৭১।

ঘ. ভেজাল বিরোধী অভিযান
উত্তর : পৃষ্ঠা ৬৮৬।

ঙ. বাংলাদেশে তথ্য অধিকার

২. বন্ধনীর মধ্যে উল্লেখিত সংকেতের ইঙ্গিতে একটি প্রবন্ধ লিখুন : ৪০

**ক. ইন্টারনেট ও তথ্যপ্রযুক্তি :**

[ইন্টারনেট কী? ইন্টারনেটের বহুবিদ ব্যবহার; ইন্টারনেট ব্যবহারের সুবিধা; ইন্টারনেট ব্যবহারের অসুবিধা; তথ্য-প্রযুক্তি ক্ষেত্রে ইন্টারনেটের প্রয়োজনীয়তা; ইন্টারনেটের সহজ লভ্যতা; ইন্টারনেটের সম্প্রসারণ; ইন্টারনেট ব্যবহারে সরকারি ও বেসরকারি সহযোগিতা।]
উত্তর : পৃষ্ঠা ৭০৬।

**খ. বাংলাদেশে পর্যটন শিল্প :**

[ভ্রমণ ও পর্যটন; সংজ্ঞার্থ ও পরিচয়; পর্যটনের যৌক্তিকতা, উদ্দেশ্য ও পদ্ধতি; বাংলাদেশে পর্যটন শিল্প বিকাশের প্রেক্ষাপট; বাংলাদেশে পর্যটন শিল্পের হালচাল; বেসরকারি খাতে পর্যটন; পর্যটনের নীতিমালা; বাংলাদেশে বিদেশী পর্যটকদের আগমন; আন্তর্জাতিক পর্যটন; সেবা হিসেবে পর্যটন; পর্যটন তথ্য-সার্ভিস; বাংলাদেশে পর্যটন শিল্পের সংকটসমূহ; পর্যটনশিল্পের উন্নয়নে সুপারিশ; উপসংহার।]
উত্তর : পৃষ্ঠা ৬৬৫।

**গ. বিশ্বায়ন বা গ্লোবালাইজেশন :**

[বিশ্বায়নের ধারণা; বিশ্বায়নের গতি-প্রকৃতি; বিশ্বায়নের নানাদিক; বিশ্বায়ন বনাম তৃতীয় বিশ্ব; বিশ্বায়নের ৫টি ইতিবাচক দিক; বিশ্বায়নের ৫টি নেতিবাচক দিক; বাংলাদেশ কি বিশ্বায়নের চ্যালেঞ্জ গ্রহণে সক্ষম? ধনবান দেশগুলোর দৃষ্টিভঙ্গি; W.T.O সহ আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের ভূমিকা।]
উত্তর : পৃষ্ঠা ৭২৮।

৩. যে কোনো একটি বিষয়ে পত্র লিখুন : ২০

**ক. শিক্ষা কমিশন রিপোর্টের কতিপয় প্রস্তাব সম্পর্কে মতামত জানিয়ে শিক্ষামন্ত্রী বরাবর স্মারকলিপি লিখুন।**

শিক্ষা কমিশন রিপোর্টের কতিপয় প্রস্তাব সম্পর্কে প্রাসঙ্গিক ভাবনা তুলে ধরতে
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী সমীপে–

### স্মারকলিপি

হে শিক্ষা সাধক,

একটা উন্নত আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠনের জন্য, একটা সুষম সুস্থ-পরিচ্ছন্ন মানবিক সমাজ গড়ে তোলার জন্য সর্বজনীন শিক্ষার গভীরতা উপলব্ধি করে আপনি যে 'জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০' প্রণয়ন করেছেন তার জন্য দেশবাসীর পক্ষ থেকে জানাই সশ্রদ্ধ অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



হে শিক্ষানুরাগী,
১৯৭২ সালের ড. কুদরত-এ-খুদা এবং ১৯৯৭ সালের অধ্যাপক শামসুল হক শিক্ষা কমিশনের সুপারিশের ওপর ভিত্তি করে যে শিক্ষানীতি প্রণয়ন করেছেন তা পুরোপুরি না হলেও অনেকাংশেই যুগোপযোগী ও সবার কাছে গ্রহণযোগ্য হয়েছে। আর এ কাজটি করতে গিয়ে আপনি যে দুঃসাহসিক ঝুঁকি নিয়েছিলেন তার জন্য এ দেশের মানুষ আপনাকে চিরদিন মনে রাখবে।

হে শিক্ষাচার্য,
আপনি আপনার শিক্ষানীতিতে অনেক পরিবর্তন এনেছেন, যার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ জানালেও কম হবে। তা সত্ত্বেও এ শিক্ষানীতি কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমাদের প্রত্যাশা পূরণে ব্যর্থ হয়েছে। সচেতন মানুষের চেতনার আলোকে এ শিক্ষানীতি যুগোপযোগী হলেও বাস্তবধর্মী হয়নি। আপনি জানেন এ দেশে শিক্ষিত বেকারের অভাব নেই। এর একটাই কারণ পুঁথিগত বিদ্যা তথা কারিগরি বা হাতে কলমে শিক্ষার অভাব। যার বেড়াজাল থেকে এ শিক্ষানীতিও বেরিয়ে আসতে পারেনি। তাই মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের নিকট আকুল আবেদন যেভাবেই হোক এ শিক্ষানীতিকে কর্মমুখী করা হোক। আর এটা সম্ভব হলেই কেবল এ দেশে প্রকৃত শিক্ষার মূল প্রথিত হবে।

হে শিক্ষামোদী,
আপনি এ শিক্ষানীতিতে যে সুনিপুণ স্তরবিন্যাসের অবতারণা করেছেন তা সত্যিই প্রশংসার দাবি রাখে। কিন্তু এর প্রতিটি স্তরে ভর্তি নিয়ে যে টানাপোড়েন তা সমাধানে কোনো নির্দেশনা দেয়া হয়নি। অথচ এই ভর্তি যুদ্ধের কোপানলে পড়ে অনেক শিক্ষার্থীই ঝরে পড়ে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ থেকে। তাই মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের নিকট আকুল মিনতি আপনি যেমন শিক্ষানীতিতে প্রত্যেক গ্রামে একটি করে প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কথা বলেছেন, তার পাশাপাশি এমন কিছু কথা যুক্ত করুন যার আলোকে স্বল্প শিক্ষিতরা উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের নিশ্চয়তা পায়।

হে জ্ঞানদ্বীপ,
মাদ্রাসা শিক্ষার আধুনিকায়নে যেসব গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপের কথা আপনি শিক্ষানীতিতে তুলে ধরেছেন তার জন্য এ দেশের মুসলিম সমাজ আজীবন আপনার অবদানের কথা স্মরণ করবে। পাশাপাশি আপনি যে ইংরেজি মাধ্যমসহ বিভিন্ন ধারার শিক্ষা ব্যবস্থার দুর্বল দিকগুলোয় হস্তক্ষেপ করেছেন তা সত্যিই আপনার দূরদর্শিতার পরিচয়ক। তাছাড়া মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা ক্ষেত্রে আপনার বিজ্ঞানমনস্ক ও দূরদর্শী দিক নির্দেশনা দেশের শিক্ষার মান উন্নয়নে নিঃসন্দেহে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। তবে এ ক্ষেত্রে যে বিষয়টি অনুপস্থিত তা হলো বিভিন্ন ধারার শিক্ষা পদ্ধতিকে একটি নির্দিষ্ট সর্বজনীন ধারায় আনয়নের অভাব। আপনিও হয়তো জানেন এটা সম্ভব না হলে বিভিন্ন ধারার শিক্ষার্থীর লব্ধ জ্ঞানে যে বৈষম্য তা অক্ষুণ্ন থেকে যাবে, যা অনেক শিক্ষার্থীর ভবিষ্যতকে অন্ধকারে ঠেলে দেয়। তাই এ বিষয়টি বিবেচনায় এনে যাতে কাঙ্ক্ষিত একটি পন্থা শিক্ষানীতিতে তুলে ধরা যায় তার জন্য আপনার সদয় দৃষ্টি কামনা করছি।

সর্বোপরি আপনার সুচিন্তিত শিক্ষানীতিতে আলোকিত হোক এ দেশের মানুষ, জাগরিত হোক দেশের প্রতিটি শিক্ষাঙ্গন, শক্তিশালী হোক জাতির শিক্ষার মেরুদণ্ড। আপনার দীর্ঘ জীবন ও সুন্দর ভবিষ্যৎ কামনায়– আন্তরিক শুভেচ্ছা।

তারিখ : ২০.০২.২০১৪

বিনীত নিবেদক
দেশবাসীর পক্ষে
ক



খ. আপনার এলাকায় একজন সাদা মনের মানুষের সংবর্ধনা হবে। সে অনুষ্ঠানে পাঠ করার জন্য একটি মানপত্র রচনা করুন।

**সেবা ও আদর্শের মহান প্রতীক, বিশিষ্ট সমাজ সেবক ও সাদা মনের মানুষ জনাব হাবিবুর রহমানকে আমাদের হৃদয়োষ্ণ সংবর্ধনা–**

## মানপত্র

হে মহান অতিথি,
আজ আমাদের পরম সৌভাগ্য যে, আমরা আপনার মতো উদার হৃদয়ের, দরদী মানুষের সংস্পর্শে আসতে পেরেছি। অত্র অঞ্চলে আপনার পদধূলি পড়ায় আমরা আনন্দে অভিভূত। একটানা বৈচিত্র্যহীন জীবনযাত্রায় আপনার আগমনে অভূতপূর্ব কোলাহল উঠেছে। এ কোলাহল আনন্দ, ভালোবাসা ও মিলনের। আপনি আমাদের প্রাণঢালা উষ্ণ অভিনন্দন ও শ্রদ্ধাঞ্জলি গ্রহণ করুন।

হে জনদরদী,
আপনার প্রচেষ্টা ও ত্যাগ বাংলার মাটিতে এক নতুন ইতিহাসের সৃষ্টি করেছে। আপনি কঠোর পরিশ্রম, দৃঢ় মানসিকতা দিয়ে নিঃস্বার্থভাবে দেশ ও জাতির সেবা করেছেন। এ জন্য জাতি আজ আপনার কাছে ঋণী। আপনি সময়জ্ঞানকে তুচ্ছ করে সুখে-দুঃখে মানুষের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন, সহযোগিতার হাতকে প্রসারিত করেছেন। আপনার উপকারভোগী মানুষ দেশে অজস্র। দেশ ও জাতি বিনম্র চিত্তে আপনার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছে।

হে শিক্ষানুরাগী,
আপনার স্বার্থহীন অক্লান্ত প্রচেষ্টায় আজ বহু দরিদ্র সন্তান শিক্ষার আলোয় আলোকিত হয়েছে। এ অঞ্চলের যারা আজ বিভিন্ন চাকরিতে কর্তব্যরত বা উচ্চ শিক্ষায় রত তারাও আজ শ্রদ্ধার সাথে আপনাকে স্মরণ করে। আপনার প্রদর্শিত পথ ব্যতীত এ অঞ্চলের মানুষের পক্ষে শিক্ষাগত মুক্তি এখনও অসম্ভব। আজ তাই আমরা আপনাকে সাদা মনের মানুষ হিসেবে বেছে নিয়েছি। আমাদের মনের যে স্থানে আজ জায়গা করে নিয়েছেন তা আরও দীর্ঘায়িত ও সুদূরপ্রসারী হোক এমনটিই সবার প্রত্যাশা।

হে আলোর দিশারী,
আপনি পল্লীর ঘরে ঘরে জ্বালিয়ে দিয়েছেন শিক্ষার আলো। পল্লীবাসীদের ভগ্ন স্বাস্থ্য ফিরিয়ে আনার জন্য স্থানে স্থানে গড়ে তুলেছেন স্বাস্থ্যকেন্দ্র। তাই পল্লীবাসীর অন্তরে আপনার প্রতি জন্মেছে অকৃত্রিম ভালোবাসা। আপনি আমাদের অন্তরের গভীর কৃতজ্ঞতা গ্রহণ করুন।

হে বরণীয়,
আপনাকে সংবর্ধনা জানাতে আমরা তেমন কিছু আয়োজন করতে পারিনি। আজ আমাদের আয়োজনে অনেক ত্রুটি রয়ে গেছে। আমরা জানি, আমাদের এ অনিচ্ছাকৃত ত্রুটিগুলো আপনি ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন। আপনি বাইরের আয়োজনকে বাদ দিয়ে আমাদের অন্তরের ভাষাতীত প্রীতি ও ভালোবাসা গ্রহণ করবেন।

আল্লাহর নিকট কায়মনে প্রার্থনা করি, দীর্ঘ জীবন লাভ করে সুস্থ দেহে আপনি আপনার জীবনকে ভোগ করুন। জাতি ও দেশ আপনার অপূর্ব অবদানে আরো শক্তিশালী হয়ে উঠুক।

তারিখ : ২০.০৫.২০১৪
সিরাজগঞ্জ

আপনার গুণমুগ্ধ
কাজীপুর এলাকাবাসী
কাজীপুর, সিরাজগঞ্জ

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



গ. মফস্বলের কোনো প্রতিষ্ঠান থেকে ঢাকার কোনো প্রতিষ্ঠানের এজেন্সি চেয়ে বাণিজ্যিক পত্র লিখুন।

প্রিমিয়ার এন্টারপ্রাইজ
আল-আমীন সুপার মার্কেট
কাঁঠালিয়া, ঝালকাঠি

তারিখ : ০২.০২.২০১৪

ব্যবস্থাপক (বিপণন)
রুচিতা কনজিউমার প্রডাক্টস
৭৩ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা
ঢাকা-১০০০

বিষয় : এজেন্সির জন্য আবেদন।

জনাব,
আপনার সদয় অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে, ঝালকাঠি জেলার কাঁঠালিয়া উপজেলাধীন চিংড়াখালী এক ব্যাপক ও বিস্তৃত এলাকা। এ এলাকায় ন্যূনতম ২০ হাজার লোকের বসবাস। অত্র এলাকায় যাতায়াত সুবিধা ভালো থাকার দরুন দক্ষিণাঞ্চলের বিভিন্ন এলাকা থেকে ব্যবসা বাণিজ্যের স্বার্থে অত্র এলাকায় ব্যবসায়ীরা আগমন করেন। তাছাড়া এ অঞ্চলে আপনাদের উৎপাদিত ও বাজারজাতকৃত 'রুচিতা' ব্র্যান্ডের পণ্যসামগ্রীর যথেষ্ট সুনাম রয়েছে এবং পণ্যের কাটতিও রয়েছে। অথচ অত্যন্ত দুঃখের বিষয় এ অঞ্চলে আপনাদের কোনো এজেন্সি নেই। তাই অত্র অঞ্চলের ব্যবসায়ীদেরকে আপনাদের পণ্য ঝালকাঠি জেলা থেকে নিয়ে আসতে হয়, যা বেশ ব্যয়বহুল ও সময়সাপেক্ষ।

এরূপ সমস্যাজনিত কারণে 'রুচিতা কনজিউমার প্রডাক্টস'-এর সুনাম বিনষ্ট হচ্ছে এবং বর্তমান প্রতিযোগিতাপূর্ণ বাজারে অন্য প্রতিষ্ঠানগুলো আপনাদের বাজার দখল করছে। কাজেই 'রুচিতা কনজিউমার প্রডাক্টস'-এর মার্কেট বৃদ্ধি ও সুনাম অক্ষুণ্ন রাখতে জনগণের চাহিদা পূরণে অত্র অঞ্চলে 'রুচিতা কনজিউমার প্রডাক্টস'-এর একটি এজেন্সি জরুরি।

আপনার জ্ঞাতার্থে জানাচ্ছি যে, আমাদের প্রতিষ্ঠান প্রিমিয়ার এন্টারপ্রাইজ প্রায় দুই দশক যাবত এতদাঞ্চলে অত্যন্ত সুনামের সাথে ব্যবসা পরিচালনা করছে। বর্তমানে আমরা এ অঞ্চলে ম্যাটাডোর বল পেন, আমিন ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানিসহ ৫টি কোম্পানির ডিস্ট্রিবিউটর হিসেবে কাজ করছি।

আশা করি অত্র পত্র প্রাপ্তির পর কর্তৃপক্ষকে বিষয়টি সুবিবেচনায় নিয়ে আমাদের বহুল পরিচিত ও সুনামধারী প্রতিষ্ঠান প্রিমিয়ার এন্টারপ্রাইজকে আপনাদের স্থানীয় এজেন্সি দেয়ার বিষয়টি বিশেষভাবে বিবেচনা করবেন।

আপনাদের ব্যবসায়িক মঙ্গল ও সমৃদ্ধি কামনা করছি।

বিনীত
রফিকুল আলম
ব্যবস্থাপক, প্রিমিয়ার এন্টারপ্রাইজ



## ২৮তম বিসিএস ২০০৯, বাংলা : প্রথম পত্র

*[দ্রষ্টব্য : প্রত্যেক প্রশ্নের মান প্রশ্নের শেষ প্রান্তে দেখানো হয়েছে।]* নম্বর

১. ক. বানান, শব্দ প্রয়োগ, বিন্যাস, চলিতরীতি ইত্যাদি শুদ্ধ করে নিম্নের বাক্যগুলো পুনরায় লিখুন : ০.৫ ×১২ = ৬

১. এমন মাধুর্যতাপূর্ণ আচরন সকলের মুগ্ধ সৃষ্টি কোরবেই।
উত্তর : এমন মাধুর্যপূর্ণ আচরণ সবার মুগ্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করবেই।

২. সশঙ্কিত মানুষটি বুদ্ধিহীনতা ভুগিবে এমন ভাবছ কেমন কারনেই?
উত্তর : শঙ্কিত মানুষ বুদ্ধিহীনতায় ভুগবে, এমন ভাবার কারণ নেই।

৩. কবি সামগ্রের ধারনা ত্রুটি রহিয়াছে বলে মনে হয়।
উত্তর : কবির সামগ্রিক ধারণায় ত্রুটি রয়েছে বলে মনে হয়।

৪. প্রতিভা ফরমাইশ দিয়া গড়া যায় নাই, উহা প্রকৃতির দান, কৃতাঞ্জলীপুটে গ্রহণ করতে হয়।
উত্তর : প্রতিভা ফরমাশ দিয়ে গড়া যায় না, এটা প্রকৃতির দান, কৃতাঞ্জলিপুটে গ্রহণ করতে হয়।

৫. হল বিশাল খুড়িতেই কেচো গর্ত লম্বা বাহির সর্প থেকে।
উত্তর : কেঁচোর গর্ত খুড়তেই বিশাল লম্বা সাপ বের হলো।

৬. সকল ঝাড়ুদার মহিলারা রাস্তা পরিস্কার করছিল এবং রাশি রাশি পাতাগুলো রাস্তার এক পার্শ্বে স্তুপিকৃত করে রাখিতেছিল।
উত্তর : ঝাড়ুদার মহিলারা রাস্তা পরিষ্কার করছিল এবং পাতাগুলো রাস্তার একপাশে স্তূপ করে রাখছিল।

৭. বর্শা সজল মেঘকজ্জ্বল দিবসে সূর্য্যের উজ্জ্বলতা থাকে না।
উত্তর : বর্ষাসজল মেঘলা দিনে সূর্যের উজ্জ্বলতা থাকে না।

৮. বাংলাদেশের সপক্ষে কী ভালো কী মন্দ, তাহা বাংলাদেশই ঠিক করবে।
উত্তর : বাংলাদেশের জন্য কী ভালো কী মন্দ, তা বাংলাদেশই ঠিক করবে।

৯. বৈস্য সভ্যতার রোগ সারাইবার বৈধ উপায় হচ্ছে মন্ত্রোষধি।
উত্তর : বৈশ্য সভ্যতার রোগ সারানোর উত্তম উপায় হচ্ছে মন্ত্রৌষধি।

১০. মানুষের শারীরিক-ঘেষা যে-সব সংস্কার, জীবসৃষ্টির ইতিহাসে সেইগুলো অনেক পুরান।
উত্তর : মানুষের শরীর সংক্রান্ত যেসব সংস্কার, জীবসৃষ্টির ইতিহাসে সেগুলো অনেক পুরনো।

১১. অন্যের সঙ্গে ঐক্যতাবোধের দ্বারা যে মহাত্ব ঘটাইয়া থাকে সেইটিই হচ্ছে মনের ঐশ্বর্য্য।
উত্তর : অন্যের সাথে একতাবোধের দ্বারা যে মহত্ত্ব ঘটে থাকে সেটাই মনের ঐশ্বর্য।

১২. এখনকার দিনে বাংলাদেশের সাহিত্য লোক লোকারণ্য বলে মনে হয়।
উত্তর : এখনকার বাংলাদেশের সাহিত্য লোকারণ্য বলে মনে হয়।

খ. শূন্যস্থান পূর্ণ করুন : ৬

আমরা একটি ফুলের জন্য — করি, কিন্তু ভুলের জন্য ক্ষমা — না। ভুল লিখতে — ভুল করি। তার — তাকে সংশোধন — না। ফলে — বাড়তেই থাকে।

উত্তর : আমরা একটি ফুলের জন্য <u>যুদ্ধ</u> করি, কিন্তু ভুলের জন্য ক্ষমা <u>চাই</u> না। ভুল লিখতে <u>বানান</u> ভুল করি। তার <u>জন্য</u> তাকে সংশোধন <u>করি</u> না। ফলে <u>ভুল</u> বাড়তেই থাকে।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



**গ. ছয়টি পরিপূর্ণ বাক্য লিখে প্রবাদটির অর্থ প্রকাশ করুন :** ৬

**যে যায় লঙ্কায় সেই হয় রাবণ**

**উত্তর :** 'যে যায় লঙ্কায় সেই হয় রাবণ'— একটি বহুল প্রচলিত প্রবাদ। প্রবাদের একটা প্রত্যক্ষ ও একটা পরোক্ষ অর্থ থাকে। এখানে 'লঙ্কা', 'রাবণ' শব্দগুলো নেয়া হয়েছে পুরাণ থেকে। এ শব্দগুলোর বাস্তব প্রয়োগ ভিন্ন অর্থ প্রকাশ করে। প্রবাদটির অর্থ এভাবে করা যায়, ক্ষমতায় গেলে সবাই ক্ষমতার অপব্যবহার করে থাকে। একটি উদাহরণ দিয়ে বলা যায় এভাবে—'কাকে বিশ্বাস করব ভাই! বাংলাদেশের রাজনীতির যা অবস্থা; যে যায় লঙ্কায় সেই হয় রাবণ।

**ঘ. নিম্নলিখিত শব্দগুলো দিয়ে পূর্ণ বাক্য লিখুন :** ৬

অফিস স্মারক; বিজ্ঞপ্তি; পরিপত্র; অভিযুক্তকরণ; সংশোধনী; সংস্থাপন ব্যয়ের হিসাব।

**উত্তর : অফিস স্মারক—** দাপ্তরিক চিঠিতে অফিস স্মারক থাকবে না, এটা ভাবা যায় না।

**বিজ্ঞপ্তি—** ৩৩তম বিসিএস-এর নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছিল 'দৈনিক ইত্তেফাক' পত্রিকায়।

**পরিপত্র—** অধ্যক্ষগণের আর্থিক ক্ষমতা দিয়ে সরকার নতুন পরিপত্র জারি করেছে।

**অভিযুক্তকরণ—** আর্থিক দুর্নীতির দায়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের বিভাগীয় প্রধান মকলেছার রহমানকে অভিযুক্তকরণের আওতায় আনা হয়েছে।

**সংশোধনী—** গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সংবিধানে এ পর্যন্ত ১৬টি সংশোধনী আনা হয়েছে।

**সংস্থাপন ব্যয়ের হিসাব—** অর্থ মন্ত্রণালয়ের বাজেট কমিটি সংস্থাপন ব্যয়ের হিসাবকে বিশেষভাবে বিবেচনা করে থাকে।

**ঙ. বাক্য রূপান্তর করুন (সূত্রানুযায়ী) :** ৬

**ক. আমার দ্বারা এ কাজ হবে না। (হ্যাঁ বাচক)**

**উত্তর :** আমার দ্বারা এ কাজ অসম্ভব।

**খ. আমি পরীক্ষা দিতে চেয়েছি। (না বাচক)**

**উত্তর :** আমি পরীক্ষা দিতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করিনি।

**গ. তিনি অফিসে গিয়ে কাজ করছেন। (সরল বাক্য)**

**উত্তর :** তিনি অফিসে কাজ করছেন।

**ঘ. সে এল; কথা বলল; চলে গেল। (জটিল বাক্য)**

**উত্তর :** সে এসে কথা বলল তারপর চলে গেল।

**ঙ. সে 'কি' নিয়ে তর্ক করছে। (প্রশ্ন বাক্য)**

**উত্তর :** সে কি 'কি' নিয়ে তর্ক করছে?

**চ. আমি প্রশ্ন করিনি। (উত্তর বাক্য)**

**উত্তর :** আমি নিরুত্তর ছিলাম।

**২. যে কোনো একটি প্রবাদের ভাব-সম্প্রসারণ করুন (অনধিক ২০টি বাক্য) :** ২০

**ক. অজ্ঞতার সঙ্গে মনের দাসত্বের যোগ অতি ঘনিষ্ঠ;**

**ভাব-সম্প্রসারণ :** অজ্ঞতা সামাজিক কুসংস্কার, পশ্চাৎপদতা ও কর্মবিমুখতার মূল কারণ। আর এসব নেতিবাচক অনুষঙ্গ মানুষকে সংকীর্ণ করে রাখে। সমাজে নিজেকে নেতিবাচকভাবে উপস্থাপন করে। জীবনে শিক্ষার ছোঁয়া যে পায়নি তার পক্ষে আত্মস্বরূপ চিনে নেয়া অসম্ভব। সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সকল বিষয়ে কোনো মৌলিক ধারণাও তার সৃষ্টি হয় না। আর এখানেই মনের দাসত্বের বহিঃপ্রকাশ।





সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব মানুষ। বিচার-বুদ্ধি বা জ্ঞানলাভের যোগ্যতা আছে বলেই মানুষের এ বিশিষ্টতা। কিন্তু কোনো মানুষ মানবকুলে জন্মগ্রহণ করেও যদি জ্ঞানলাভের সুযোগ বা অনুকূল পরিবেশ থেকে বঞ্চিত হয় তাহলে সে অজ্ঞানরূপ অন্ধকারে অবগাহন করে। কুসংস্কার, ধর্মান্ধতা, প্রচলিত সামাজিক কুপ্রথা তাকে গ্রাস করে ফেলে। ফলে মিথ্যাকে সে সত্য বলে মানতে শিখে। জ্ঞানের বিকাশ না ঘটায় সঠিক বা সত্যকে চিনতে না পেরে মিথ্যার কাছে বশ্যতা স্বীকার করে। জ্ঞানহীন মানুষ জৈবিক কামনা-বাসনার দাসানুদাসে পরিণত হয়। তারা কুপ্রবৃত্তির দাসত্বে সর্বদা নিমগ্ন থাকে, তাদের দ্বারা সমাজের কোনো কল্যাণকর কাজ হয় না। সমাজের একজন মানুষ ততক্ষণ পর্যন্ত একটি প্রথার বিরুদ্ধাচারণ করতে পারে না যতক্ষণ না সে ঐ প্রথাকে মিথ্যা বলে প্রমাণ করার মতো যথার্থ জ্ঞান লাভ করতে পারে। সমাজের নানা অসঙ্গতি বা অন্যায়ের বিরুদ্ধে দেশের প্রচলিত আইন সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণে মানুষ নানা অন্যায় শাস্তি মাথা পেতে নিতে বাধ্য হয়। আর অজ্ঞতার দরুন অন্যায় মেনে নেয়ার এ প্রবণতা থেকে বহিঃপ্রকাশ ঘটে তার মনের দাসত্বের। কিন্তু আইনবিষয়ক জ্ঞানালোকে যদি কেউ আলোকিত হয় তাহলে সে এর বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নিয়ে সমাজকে এ ধরনের ধর্মান্ধতা বা কুপ্রথা থেকে মুক্ত করতে পারে।

তাই বলা যায় যে, অজ্ঞতার সাথে মনের দাসত্বের যোগ অতি ঘনিষ্ঠ।

**খ. কষ্ট না করলে কেষ্ট পাওয়া যায় না।**

**ভাব-সম্প্রসারণ :** সাধনা ব্যতীত সিদ্ধিলাভ ঘটে না। ধর্মের পথেই হোক কি সংসারের পথেই হোক 'সাধনা' একান্ত আবশ্যক। উদ্যোগ, উদ্যম, আয়োজন, পরিশ্রম, কর্মশক্তি ও সুদৃঢ় প্রতিজ্ঞা— এসব সে সাধনারই অঙ্গ।

সাফল্য অর্জন করতে হলে কঠোর সাধনা অত্যাবশ্যক। পরিশ্রম ও উদ্যম ছাড়া কারো মনোবাসনা পূর্ণ হয় না। সিদ্ধিলাভে দৃঢ়সংকল্প হতে হয়, অনন্যমনা হয়ে কঠিন পরিশ্রম করতে হয়— ত্যাগ স্বীকারে, কষ্ট স্বীকারে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হলে চলে না। 'কেষ্ট'কে লাভ করতে হলে অর্থাৎ জীবনে পরম সাফল্য লাভ করতে হলে চরম ত্যাগ-তিতিক্ষার সম্মুখীন হতে হবে, সর্বশক্তি প্রয়োগ করে সাফল্যের স্বর্ণাসনে আরোহণের প্রয়াস পেতে হবে। এ ছাড়া সফলতার বিকল্প কোনো সহজ পথ বা পন্থা নেই। রাজপুত্র যে, তাকেও বিদ্যালাভের জন্য সাধনা করতে হবে। দশজন পণ্ডিত তাকে বিদ্যা গিলিয়ে দিতে পারবে না— তাকে নিজে পড়তে হবে, লিখতে হবে, শিখতে হবে এবং সেজন্য আবশ্যক অধ্যবসায়। ইউক্লিডের কথায়, 'জ্যামিতিতে রাজার জন্য বিশেষ পথ নেই।' ব্যবসা-বাণিজ্যে ধনীর সুযোগ-সুবিধা আছে বটে, কিন্তু বুদ্ধি প্রয়োগ না করলে তাকে ডুবতে বেশি দেরি হয় না। পরিশ্রমই যে উন্নতির সোপান ও সমৃদ্ধির চাবিকাঠি এর দৃষ্টান্ত আমরা পাই ছোট পিপীলিকা ও মৌমাছির কাছ থেকেও। ছোট পিপীলিকা ও মৌমাছি সারাদিন পরিশ্রম করে যে খাদ্য আহরণ করে, এ খাদ্যই যখন দুর্দিন আসে তখন সে তা খেয়ে সুখী হয়। ঠিক তেমনি প্রত্যেকটি মানুষকে সৌভাগ্য ও সুখ নামক সোনার হরিণের সন্ধান পেতে হলে নিরলস পরিশ্রম ও সাধনা করতে হবে।

এ কথা যথার্থ যে, মানুষকে পরিশ্রমের দ্বারাই জীবিকা নির্বাহ করতে হয়। এটা মানবজীবনের সাধারণ ধর্ম। জীবনের প্রতি পদে মানুষকে কষ্ট স্বীকার করতে হয়। তবেই তার পক্ষে জীবনযুদ্ধে জয়লাভ করা সম্ভব হয়।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



৩. 'ক' ও 'খ' অংশ দুটির সারমর্ম লিখুন : ১০×২=২০

ক. রাঙা পথের ভাঙন-ব্রতী অগ্রপথিক দল।
নাম্‌রে ধূলায় — বর্তমানের মর্ত্যপানে চল।
ভবিষ্যতের স্বর্গ লাগি'
শূন্যে চেয়ে আছিস জাগি;
অতীতকালের রত্ন মাগি'
নাম্‌লি রসাতল।
অন্ধ মাতাল। শূন্য পাতাল হাতালি নিষ্ফল॥
ভোলরে চির-পুরাতনের সনাতনের বোল্।
তরুণ তাপস। নতুন জগৎ সৃষ্টি করে তোল্।
আদিম যুগের পুঁথির বাণী
আজো কি তুই চলবি মানি?
কালের বুড়ো টানছে ঘানি
তুই সে বাঁধন খোল্।
অভিজাতের পানসে বিলাস — দুখের তাপস। ভোল॥

সারমর্ম : সুন্দর ভবিষ্যতের জন্য তরুণদেরকে অতীতকে আঁকড়ে ধরে হাত গুটিয়ে বসে থাকলে চলে না। তার জন্য রাঙা পথের ভাঙনব্রতী অগ্রপথিক হয়ে সনাতনকে ছিন্নভিন্ন করে নতুন জগৎ সৃষ্টি করতে হয়। সব কুসংস্কারকে পিছনে ফেলে, সব বাধাকে অতিক্রম করে সামনে এগিয়ে যেতে হয়। নইলে নিষ্ফলতার কোপানলে রসাতল অনিবার্য হয়ে পড়ে।

খ. জীবনটা একটা রহস্য বলেই মানুষের বেঁচে সুখ। কিন্তু তাই বলে এ রহস্যের মর্ম উদ্‌ঘাটন করবার চেষ্টা যে পাগলামি নয় তার প্রমাণ, মানুষ যুগে যুগে এ চেষ্টা করে এসেছে, এবং শতবার বিফল হয়েও অদ্যাবধি সে চেষ্টা থেকে বিরত হয়নি। পৃথিবীর মধ্যে যা সবচেয়ে বড়ো জিনিস তা জানবার ও বোঝবার প্রবৃত্তি মানুষের মন থেকে যে দিন চলে যাবে সে দিন মানুষ আবার পশুত্ব লাভ করবে। জীবনের যা-হয়-একটা অর্থ স্থির করে না নিলে মানুষে জীবনযাপন করতেই পারে না এবং এ পদার্থের কে কি অর্থ করেন তার উপর তাঁর জীবনের মূল্য নির্ভর করে। এ কথা ব্যক্তির পক্ষেও যেমন সত্য জাতির পক্ষেও তেমনি সত্য। দর্শন-বিজ্ঞান জীবনের ঠিক অর্থ বার করতে পারুক আর না পারুক এ সম্বন্ধে অনেক ভুল বিশ্বাস নষ্ট করতে পারে। এও বড়ো কম লাভের কথা নয়। সত্য না জানলেও মানুষের তেমন ক্ষতি নেই — মিথ্যাকে সত্য বলে ভুল করাই সকল সর্বনাশের মূল।

সারাংশ : জীবনের রহস্য ভেদ করতে মানুষের জানার বা বোঝার প্রচেষ্টা থেমে নেই। আর এ প্রবৃত্তি আছে বলেই মানুষ অন্যান্য প্রাণী থেকে আলাদা। মানুষের এ প্রচেষ্টালব্ধ জ্ঞান জীবনের ঠিক অর্থ বের করতে না পারলেও অনেক ভুল বিশ্বাস বা মিথ্যাকে নষ্ট করতে পারে। বস্তুত এখানেই মানুষের জ্ঞান লাভের সার্থকতা।

৪. অতি সংক্ষেপে নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলোর উত্তর লিখুন : ২×১৫=৩০

ক. চর্যাপদ আবিষ্কারের বৃত্তান্ত লিখুন এবং চর্যাপদের ভাষা প্রসঙ্গে আবিষ্কারকের অভিমত দিন।
উত্তর : বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন যুগের একমাত্র নির্ভরযোগ্য ঐতিহাসিক নিদর্শন 'চর্যাপদ'। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদশাস্ত্রী নেপালের রাজগ্রন্থাগার থেকে ১৯০৭ সালে চর্যাপদের



কতকগুলো পদ আবিষ্কার করেন। তার সম্পাদনায় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে সেসব পদ ১৯১৬ সালে 'হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধগান ও দোহা' নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। চর্যাপদের ভাষা মূলত প্রাচীন বাংলা। তবে হিন্দি, অপভ্রংশ তথা মৈথিলী, অসমীয়া ও উড়িয়া ভাষার প্রভাব এতে দেখা যায়। চর্যাপদের ভাষাকে কেউ কেউ 'সন্ধ্যা ভাষা' বলেছেন। কারণ এর ভাব ও ভাষা কোথাও স্পষ্ট, কোথাও অস্পষ্ট।

খ. রচয়িতাসহ পাঁচটি রোমাঞ্চমূলক প্রণয়োপাখ্যানের নাম লিখুন এবং এ শ্রেণীর কাব্যের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করুন।
উত্তর : রোমান্টিক কাব্যধারায় যেসব উল্লেখযোগ্য প্রণয়োপাখ্যান বাংলা সাহিত্যের উর্বর ভূমিতে অসামান্য কাব্য প্রতিভার অকল্পনীয় বিকাশ ঘটিয়ে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসকে রোমাঞ্চিত করেছে সেরকম পাঁচটি প্রণয়োপাখ্যান হলো : ১. ইউসুফ-জোলেখা (শাহ মুহম্মদ সগীর), ২. লায়লী মজনু (দৌলত উজির বাহরাম খান), ৩. মধুমালতী (মুহম্মদ কবীর), ৪. পদ্মাবতী (আলাওল) ও ৫. সতীময়না-লোরচন্দ্রানী (দৌলত কাজী)। রোমাঞ্চমূলক প্রণয়োপাখ্যান মুসলমান কবিগণের সবচেয়ে বড় অবদান। এ শ্রেণীর কাব্যের বৈশিষ্ট্য হলো প্রাচীন ও মধ্যযুগের ধর্মকেন্দ্রিক ও দেবতাকেন্দ্রিক সাহিত্য ছেড়ে এ কাব্যগুলোতে প্রথমবারের মতো মানবীয় বৈশিষ্ট্য প্রতিফলিত হয়েছে।

গ. 'মনসামঙ্গল' কাব্যের উদ্ভবের সামাজিক প্রেক্ষাপট বর্ণনা করুন।
উত্তর : মঙ্গলকাব্য ধারায় 'মনসামঙ্গল' বিশিষ্টতা অর্জন করেছে নিয়তির বিরুদ্ধে মানুষের বিদ্রোহের কাহিনীর জন্য। এর পিছনে আছে মুসলিম প্রভাব। এ দেশে মুসলমানদের আগমনের পরিপ্রেক্ষিতে সমাজব্যবস্থায় যে ব্যাপক পরিবর্তনের সূচনা হয়েছিল তা থেকে হিন্দু সমাজকে রক্ষা করার প্রচেষ্টার পরিণামে মঙ্গলকাব্য ধারার সৃষ্টি। 'বাঙলার কাব্য' গ্রন্থে হুমায়ুন কবির লিখেছেন— 'হিন্দু-মুসলিম সমাজের অস্তিত্বের সংঘাতে হিন্দু সমাজকে রক্ষা করতে হিন্দুমানসে মনসামঙ্গলের সৃষ্টি।'

ঘ. কোন উদ্দেশ্যে কোন বছরে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়? কলেজটির নাম ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ কেন?
উত্তর : বাংলাদেশে কর্মরত ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ইংরেজ কর্মচারীদের দেশীয় ভাষায় শিক্ষাদানের জন্য তৎকালীন ইংরেজ শাসিত ভারতের গভর্নর জেনারেল লর্ড ওয়েলেসলি কর্তৃক ১৮০০ খ্রিস্টাব্দে কলকাতায় ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। কলকাতার ফোর্ট উইলিয়াম কমপ্লেক্সের নামকরণ করা হয়েছে ইংল্যান্ডের রাজা তৃতীয় উইলিয়ামের নামে। আর এ কমপ্লেক্সের অভ্যন্তরে কলেজটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বলে এর নাম হয়েছিল ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ।

ঙ. সাহিত্যকর্ম ও সমাজকর্ম এ দুইয়ের মধ্যে কোনটির জন্যে বিদ্যাসাগর অধিক সুপরিচিত? আপনার অভিমত ব্যক্ত করুন।
উত্তর : বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের বিবর্তনের ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-৯১)। পাণ্ডিত্যের গভীরতায়, মানসিকতার উদারতায়, সমাজ সংস্কারের তৎপরতায় তার যে চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পেয়েছে তা এ দেশের সমাজ-সংস্কৃতির ইতিহাসে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হিসেবে গ্রাহ্য। যে কর্মবহুল সফল জীবন তিনি অতিবাহিত করেছিলেন তা ধর্ম ও সমাজের সংস্কারে যেমন গুরুত্বপূর্ণ তেমনি সাহিত্যের ক্ষেত্রেও বিশিষ্টতার অধিকারী।

চ. "বঙ্কিমচন্দ্রের সব উপন্যাসই রোমাঞ্চমূলক"। –বিষয়টি অল্প কথায় বুঝিয়ে দিন।
উত্তর : উপন্যাস রচনায় বঙ্কিমচন্দ্র প্রখ্যাত ইংরেজ ঔপন্যাসিক স্যার ওয়াল্টার স্কটের রোমান্স আশ্রয়ী ঐতিহাসিক উপন্যাসের আদর্শের অনুসারী ছিলেন। আবার তিনি সামাজিক-পারিবারিক কথাসাহিত্যের আদর্শেও কতিপয় উপন্যাস রচনা করেন। এসব উপন্যাসে বাঙালির অতীত

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



ইতিহাস যেমন স্থান পেয়েছে, তেমনি ব্যক্ত হয়েছে সমকালীন সমাজজীবনের কথা। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস বাস্তব জীবনকে ভিত্তিভূমি হিসেবে গ্রহণ করে বিস্ময়কর ও অলৌকিকের প্রতি প্রবণতা প্রকাশমান। এতে রোমান্সের বৈশিষ্ট্য নিহিত। রোমান্স রচনায় ইতিহাস ও দৈবশক্তির সংমিশ্রণ ঘটিয়ে তার সাথে সংযুক্ত করেছেন রহস্যময় দৃঢ় ব্যক্তিত্বশালী মনুষ্যচরিত্র।

**ছ. 'বিষাদ সিন্ধু' গ্রন্থ নামের তাৎপর্য বুঝিয়ে দিন।**

**উত্তর :** মীর মশাররফ হোসেনের অমর সৃষ্টি 'বিষাদ সিন্ধু'। কারবালার সেই মর্মান্তিক বিষাদ কাহিনীই এই উপন্যাসের বিষয়বস্তু। নিয়তি নির্ধারিত মানবভাগ্যের বেদনাবহ পরিণতিই এ কাব্যে প্রকাশ ঘটেছে। বিষাদ সিন্ধু নামটি রূপক অর্থে ব্যবহৃত। উপন্যাসে মহরম পর্বে এজিদের জয়নবকে না পাওয়ার বিরহ, আব্দুল জব্বার কর্তৃক জয়নবের তালাকপ্রাপ্তির সংবাদ এবং শেষ পর্বে হযরত হোসেনের মর্মান্তিক শাহাদৎবরণকে লেখক বিষাদ সিন্ধুর সাথে তুলনা করেছেন। এ অর্থে বিষাদ সিন্ধু নামটি সার্থক।

**জ. বাংলা সাহিত্যে মধুসূদন কোন কোন শিল্পাঙ্গিক নিয়ে কাজ করেছেন? এগুলির একটি প্রসঙ্গে লিখুন।**

**উত্তর :** বাংলা সাহিত্যে মাইকেল মধুসূদন দত্তের (১৮২৪-৭৩) সগৌরব আবির্ভাব ঘটেছিল নাট্য রচনার সূত্র ধরে। এরপর তার বিস্ময়কর প্রতিভা বৈচিত্র্যময় হয়ে ওঠে। প্রহসন, কাব্যগ্রন্থ, মহাকাব্য ও সনেট রচনায় তিনি প্রতিভার স্বাক্ষর রাখেন। তবে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে মহাকাব্যের সূত্রপাত ঘটান মাইকেল মধুসূদন দত্ত। ১৮৬১ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত মেঘনাদবধ কাব্যের মাধ্যমে মহাকাব্যের পূর্ণাঙ্গ রূপের অনবদ্য প্রকাশ ঘটে এবং বাংলা সাহিত্যে তা প্রথম ও শ্রেষ্ঠ মহাকাব্য হিসেবে স্বীকৃতি পায়।

**ঝ. রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পের বৈশিষ্ট্যগুলি কী কী?**

**উত্তর :** বাংলা সাহিত্যে ছোটগল্পের সার্থক সূচনা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের হাতেই। ছোটগল্প সৃষ্টি তাকে সাহিত্যিক হিসেবে বিশ্বজনীন খ্যাতি ও স্বীকৃতি প্রদান করেছে। তার ছোটগল্প যেন আনন্দময় বৈচিত্র্যে ভরা। বাংলার নির্জন প্রান্তর, তার নদী তীর, উন্মুক্ত আকাশ, বালুর চর, অবারিত মাঠ, ছায়া-সুনিবিড় গ্রামে সহজ অনাড়ম্বর পল্লীজীবন, অভাবক্লিষ্ট অথচ শান্ত সহিষ্ণু গ্রামবাসী ইত্যাদি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছোটগল্পের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। রবীন্দ্রনাথ তার 'সোনার তরী' কাব্যে 'বর্ষাযাপন' নামক কবিতায় ছোটগল্প সম্পর্কে যে মনোভাব প্রকাশ করেছিলেন তাতে ছোটগল্পের বৈশিষ্ট্য চমৎকারভাবে ফুটে উঠেছে।

ছোট প্রাণ ছোট ব্যথা,　　ছোট ছোট দুঃখ কথা
　　নিতান্তই সহজ সরল,
সহস্র বিস্মৃতি রাশি　　প্রত্যহ যেতেছে ভাসি
　　তারি দু-চারিটি অশ্রুজল।
নাহি বর্ণনার ছটা,　　ঘটনার ঘনঘটা
　　নাহি তত্ত্ব নাহি উপদেশ
অন্তরে অতৃপ্তি রবে　　সাঙ্গ করি মনে হবে
　　শেষ হয়ে হইল না শেষ।

**ঞ. 'নীলদর্পণ' নাটকের সাহিত্য-মূল্যের চেয়ে সামাজিক মূল্য বেশি।" –মন্তব্যটির পক্ষে কিছু লিখুন।**

**উত্তর :** দীনবন্ধু মিত্রের প্রথম নাটক বেনামীতে মুদ্রিত 'নীলদর্পণ'। ইংরেজ নীলকরদের অত্যাচারে এ দেশের কৃষক জীবনের দুর্বিষহ অবস্থার পরিবর্তন ঘটানোর ক্ষেত্রে এই নাটকটির গুরুত্ব অপরিসীম। নীলকরদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে উদ্দেশ্যমূলক নাটক হিসেবে রচিত হলেও এর মধ্যে গ্রাম্যসমাজের যে পরিচয় ফুটে উঠেছে তা তৎকালীন নাট্যসাহিত্যে ছিল



একান্তই অভিনব। নাটকটির মধ্যে এ দেশের শাসক ও শাসিতজনের সম্বন্ধ, অর্থনৈতিক দিক দিয়ে দেশের অবস্থা, সভ্য মানুষের মধ্যে বর্বরতার পরিচয় ইত্যাদি সামাজিক দিক সার্থকভাবে রূপায়িত হয়েছিল। তাই 'নীলদর্পণ' নাটকটির সাহিত্য-মূল্যের চেয়ে সামাজিক মূল্য বেশি।

**ট. নজরুলের বিদ্রোহের নানা প্রান্ত উন্মোচন করুন।**

**উত্তর :** বাংলা সাহিত্যে বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের আবির্ভাব ধূমকেতুর মতো। অন্যায়-অত্যাচারের বিরুদ্ধে নজরুল ইসলাম বলিষ্ঠ বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন। তার গভীরতম চেতনায় যে ক্ষোভ, বঞ্চিতের প্রতি যে নিবিড় সহানুভূতি, তা বজ্রাগ্নির মতো অসহনীয় উত্তাপে ফুটে উঠেছিল। 'অগ্নিবীণা'র বিদ্রোহী কবিতার মধ্য দিয়ে তার বিদ্রোহের প্রকাশ। পরে তিনি 'বিষের বাঁশী', 'ভাঙার গান', 'প্রলয়শিখা' প্রভৃতি কাব্য এবং 'যুগবাণী' প্রবন্ধ গ্রন্থ ও 'চন্দ্রবিন্দু' গানের বইতে বিদ্রোহের সার্থক প্রকাশ ঘটিয়েছেন।

**ঠ. "বেগম রোকেয়াই বাংলা সাহিত্যে প্রথম নারীবাদী লেখক" –কথাটি বুঝিয়ে দিন।**

**উত্তর :** মুসলিম নারী জাগরণের অগ্রদূত বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন। পর্দার নামে নারীর ব্যক্তিত্বের অবমাননা শৈশব থেকেই রোকেয়ার মনে তীব্র বেদনাবোধের সঞ্চার করে এবং নারীর প্রতি সমাজের নানা অত্যাচার ও অসহিষ্ণুতা তার মনে বিদ্রোহের সুর ধ্বনিত করে তোলে। অবরোধবাসিনী নারীকে মুক্ত করতে তিনিই প্রথম লেখনী ধারণ করেন। এজন্য তিনি বাংলা সাহিত্যের প্রথম নারীবাদী লেখক।

**ড. "জসীমউদ্দীনের কবিতার বিষয় কেবলই গ্রাম"। —কেন?**

**উত্তর :** 'পল্লীকবি' নামে খ্যাত জসীমউদ্দীন গতানুগতিক কাব্যপ্রবাহে ব্যতিক্রমের সৃষ্টি করেছেন। গ্রাম বাংলার জীবনালেখ্য তার কাব্যে চমৎকার সার্থকতা সহকারে বিধৃত হয়েছে। গ্রামের অশিক্ষিত মানব-মানবীর সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা তার কাব্যে বিশেষভাবে ফুটে উঠেছে। 'নকশী কাঁথার মাঠ' এদিক থেকে অনন্য। জসীমউদ্দীন তৎকালীন বিক্ষোভ ও আলোড়ন থেকে নিজেকে সন্তর্পণে সরিয়ে রেখে গ্রামীণ প্রকৃতির অনাবিল সৌন্দর্যের মধ্যে নিজেকে বিলীন করেছিলেন। এজন্য তার কবিতার বিষয় কেবলই গ্রাম।

**ঢ. বাংলাদেশের একজন গদ্য লেখকের পরিচয় দিন।**

**উত্তর :** বাংলা গদ্যের বিশিষ্ট শিল্পী প্রমথ চৌধুরী। তিনি ৭ আগস্ট ১৮৬৮ সালে পিতার কর্মক্ষেত্র যশোরে জন্মগ্রহণ করেন। তার পৈতৃক নিবাস পাবনা জেলায়। বাংলা, ইংরেজি ও ফরাসি সাহিত্যে সুপণ্ডিত প্রমথ চৌধুরী 'বীরবল' ছদ্মনামে অনেক রচনা প্রকাশ করেন। তিনি বাংলা গদ্যের বিশিষ্ট শিল্পী। মার্জিত নাগরিক রুচি, প্রখর বুদ্ধির দীপ্তি, অপূর্ব বাকচাতুর্য ও স্মিত রসিকতায় তিনি তার গদ্য রচনা সমৃদ্ধ করেন। গদ্যের চলিত রীতির জন্য তিনি বিশেষভাবে স্মরণীয়। ২ সেপ্টেম্বর ১৯৪৬ সালে তিনি শান্তিনিকেতনে মৃত্যুবরণ করেন।

**ণ. 'একুশে ফেব্রুয়ারি' বাংলা কবিতার অন্তহীন প্রেরণার উৎস– এ প্রসঙ্গে অল্প কথায় লিখুন।**

**উত্তর :** ভাষা আন্দোলন তথা একুশে ফেব্রুয়ারি বাংলার মানুষের মধ্যে জাতীয় সত্তা ও চেতনা যেমন জাগ্রত করেছে তেমনি সাহিত্যকেও ঋদ্ধ করে তুলেছে। একুশের প্রথম কবিতা মাহবুব-উল-আলম চৌধুরীর 'কাঁদতে আসিনি, ফাঁসির দাবি নিয়ে এসেছি' '৫২-এর ২১ ফেব্রুয়ারির রক্তাক্ত ঘটনার ২৮ ঘণ্টার মধ্যে এ কবিতা রচনা করেন। আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ, আল মাহমুদ, শামসুর রাহমান, সিকান্দার আবু জাফর, আব্দুল গাফফার চৌধুরী প্রমুখ কবির কবিতায় একুশে ফেব্রুয়ারি বিশেষ স্থান দখল করে আছে। তাছাড়া সমসাময়িক অন্যান্য কবিও একুশে ফেব্রুয়ারির মাঝে কবিতার অন্তহীন প্রেরণার উৎস দেখেছেন।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



## ২৮তম বিসিএস ২০০৯, বাংলা : দ্বিতীয় পত্র

১. যে কোনো একটি বিষয়ের রচনা লিখুন : ৪০

ক. সাহিত্যে আদর্শবাদ ও বাস্তববাদ

খ. সুশাসনে নাগরিক সমাজের ভূমিকা

গ. পার্বত্য শান্তিচুক্তি

উত্তর : পৃষ্ঠা ৬৩৬।

ঘ. শিল্পীর স্বাধীনতা

ঙ. আলস্যের আনন্দ।

২. বন্ধনীর মধ্যে উল্লেখিত সংকেতের ইংগিতে একটি প্রবন্ধ রচনা করুন : ৪০

**ক. সাহিত্যের নাগরিকতা ও আধুনিকতা**

[সাহিত্য, নাগরিকতা ও আধুনিকতার সংজ্ঞা ও লক্ষণ; বাংলা সাহিত্যে-নাগরিক জীবনের উন্মেষ ও বিকাশ, কালগত ও বিষয়গত আধুনিকতা; বাংলা সাহিত্যে যথার্থ আধুনিক মননের প্রতিফলন, বাংলাদেশের সমকালীন সাহিত্যে নগর-জীবন ও আধুনিক ভাবধারার প্রভাব।]

**খ. সাহিত্য ও গণমাধ্যম**

[সাহিত্যের সংজ্ঞা; গণমাধ্যমের বৈশিষ্ট্য ও প্রকারভেদ; গণমাধ্যমের অন্যতম শাখা সংবাদপত্রের সঙ্গে সাহিত্যের মিল-অমিল; বাংলা সাহিত্যে গদ্যের উদ্ভব ও বিকাশে উনিশ ও বিশ শতকের সংবাদ সাময়িকপত্রের ভূমিকা; বৈদ্যুতিক গণমাধ্যম তথা বেতার, টিভির বিনোদনমূলক অনুষ্ঠানের উপকরণরূপে সাহিত্যের ব্যবহার, বাংলাদেশের সাম্প্রতিক সাহিত্যের প্রতিফলনে গণমাধ্যমের সহায়ক ভূমিকা।]

**গ. সংবাদপত্রের স্বাধীনতা**

[সংবাদপত্রের উদ্ভব ও বিকাশের রেখাচিত্র, গণতান্ত্রিক সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থায় সংবাদপত্রের ভূমিকা, রাজনৈতিক ও সামরিক বেসামরিক আমলাতন্ত্রের সমালোচকরূপে সংবাদপত্রের অপরিহার্যতা ও অবদান, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পূর্বে ও পরের ভূমিকা, শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীদের মালিকানাধীন সংবাদপত্রের স্বাধীনতা নিশ্চিতকরণে রাষ্ট্রের ও সরকারের করণীয় ইত্যাদি।]

উত্তর : পৃষ্ঠা ৭১০।

৩. যে-কোনো একটি বিষয়ে পত্র লিখুন : ২০

ক. ব্যবসায়ে মূলধন বিনিয়োগের বিষয়ে একটি চুক্তিপত্র রচনা করুন।

উত্তর

### চুক্তিপত্র

| প্রথম পক্ষ | দ্বিতীয় পক্ষ |
|---|---|
| মোঃ হাসিবুর রহমান | মোঃ সোহরাব হোসেন |
| ১০ হোসনী দালান রোড | ৬৩ কাগজীটোলা |
| চানখারপুল, লালবাগ, ঢাকা | সূত্রাপুর, ঢাকা |

আমরা উভয়পক্ষ নিম্নবর্ণিত শর্তাবলী মেনে নিয়ে সম্পূর্ণ সুস্থ মস্তিষ্কে ও স্বেচ্ছায় নিম্নস্বাক্ষরকারী সাক্ষীগণের উপস্থিতিতে এ চুক্তিপত্র সম্পাদন করলাম।



### চুক্তির শর্তসমূহ

১. মেসার্স রহমান-হোসেন অ্যান্ড কোং নামে এ ব্যবসায় সংগঠনটি পরিচিত ও পরিচালিত হবে।

২. সমগ্র বাংলাদেশে কার্যক্রম পরিচালিত হতে পারবে। ৩৬ ইসলামপুর, ঢাকা-১১০০ ঠিকানায় প্রতিষ্ঠানের বর্তমান প্রধান কার্যালয় থাকবে এবং ভবিষ্যতে প্রয়োজনবোধে অন্য যে কোনো স্থানে শাখা কার্যালয় খোলা যাবে।

৩. প্রতিষ্ঠানটি তৈরি পোশাক উৎপাদনকারী ও সরবরাহকারী হিসেবে ব্যবসায় পরিচালনা করবে।

৪. আপাতত ২০ লাখ টাকা মূলধন নিয়ে ব্যবসায় আরম্ভ হবে এবং উভয় অংশীদার সমহারে মূলধন সরবরাহ করবে। ভবিষ্যতে প্রয়োজন হলে তারা সমহারে অতিরিক্ত মূলধন যোগান দিবে।

৫. সমঅনুপাতে উভয় অংশীদার ব্যবসায়ের লাভ-ক্ষতি ভোগ করবেন।

৬. উভয় অংশীদার ব্যবসায় পরিচালনার দায়িত্বে থাকবেন। তবে প্রথম পক্ষ ব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন এবং তার প্রাতিষ্ঠানিক গঠনমূলক সিদ্ধান্ত গ্রহণে দ্বিতীয় পক্ষের অংশীদারিত্ব থাকবে।

৭. প্রথম পক্ষ মাসিক ৩০,০০০ টাকা এবং দ্বিতীয় পক্ষ মাসিক ২০,০০০ টাকা হারে বেতন পাবেন।

৮. প্রত্যেক অংশীদার প্রতিমাসে ২০,০০০ টাকা পর্যন্ত উত্তোলন করতে পারবেন এবং এর ওপর ৫% সুদ ধার্য হবে।

৯. প্রতিষ্ঠানের বৃহত্তর স্বার্থে এবং উভয় পক্ষের সম্মতিক্রমে প্রয়োজনবোধে নতুন অংশীদার গ্রহণ করা যাবে।

১০. চুক্তির শর্তানুযায়ী বা পরস্পরের সম্মতিক্রমে যে কোনো অংশীদার অবসর গ্রহণ করতে পারবেন। তবে অবসর গ্রহণের ছয় মাস আগে অবসর গ্রহণের নোটিশ দিতে হবে।

১১. কোনো অংশীদারের মৃত্যু হলে তার আইনানুগ উত্তরাধিকারী অথবা প্রতিনিধি জীবিত অংশীদারের সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়ে ব্যবসায় চালিয়ে যেতে পারবেন।

১২. অবসর গ্রহণকৃত বা মৃত অংশীদারের পাওনা পরবর্তী ৩ মাসের মধ্যে নির্ধারণ করতে হবে এবং পরবর্তী ৬ মাসের মধ্যে সমান ৩ কিস্তিতে পরিশোধ্য হবে।

১৩. অত্র চুক্তিপত্রের যে কোনো ধারা পরিবর্তনের প্রয়োজন দেখা দিলে তা পারস্পরিক সম্মতিক্রমে করতে হবে। তদুপরি প্রয়োজনে যে কোনো নতুন ধারাও উভয়পক্ষের সম্মতিক্রমে অন্তর্ভুক্ত করা যাবে।

উপর্যুক্ত ধারাসমূহ মেনে নিয়ে আমরা উভয়পক্ষ নিম্ন সাক্ষীগণের উপস্থিতিতে স্বাক্ষর প্রদান করলাম।

| সাক্ষীগণের স্বাক্ষর | পক্ষদ্বয়ের স্বাক্ষর ও তারিখ |
|---|---|
| ১. আব্দুর রহমান | প্রথম পক্ষ : মোঃ হাসিবুর রহমান |
| ১৭ ইসলামপুর, ঢাকা | তাং ০৮.০৮.২০১৪ |
| ২. শাহানা ইসলাম | |
| ১৫/২ লালমাটিয়া, ঢাকা | দ্বিতীয় পক্ষ : মোঃ সোহরাব হোসেন |
| ৩. শরিফুল ইসলাম | তাং ০৮.০৮.২০১৪ |
| ১৪/৩ নবাবপুর, ঢাকা | |

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



**খ. ক্যান্টনমেন্টের অভ্যন্তরের সড়ক ব্যবহারের অনুমতি প্রার্থনা করে প্রতিরক্ষা সচিবের কাছে একটি স্মারকলিপি রচনা করুন।**

উত্তর :

ক্যান্টনমেন্টের অভ্যন্তরের সড়ক ব্যবহারের অনুমতি প্রার্থনা করে প্রতিরক্ষা সচিব মহোদয়ের নিকট স্মারকলিপি

জনাব,

আমরা ঢাকা ক্যান্টনমেন্টের উত্তরপ্রান্তের মাগুা, বাইদারটেক, বালুরঘাট এলাকার সাধারণ জনগণ। ক্যান্টেনমেন্টের দক্ষিণ পাশেই রয়েছে রাজধানীর অন্যতম শিল্প এলাকা তেজগাঁও থানা। তেজগাঁও শিল্প এলাকা থেকে ক্যান্টনমেন্টের অভ্যন্তরে চলাচলকারী সড়কটি শুধু সামরিক ও ভিআইপিদের জন্য। তেজগাঁও এলাকায় যেতে আমাদের মতো সাধারণ জনগণের এ সড়ক ব্যবহারের অনুমতি নেই। ক্যান্টনমেন্ট এলাকাটি ডিম্বাকার। আমাদেরকে তেজগাঁওয়ে যেতে হয় ক্যান্টনমেন্টের পাশ দিয়ে গমনকারী সড়কটি দিয়ে যার দৈর্ঘ্য ১৫ কিমি। এ সড়ক বেশি প্রশস্ত নয়। নিত্যই লেগে থাকে যানজট। তাছাড়া এ সড়কে রিকশা-ভ্যানের জন্য কোনো আলাদা লেন নেই। ফলে সামান্য ১৫ কিমি পথ অতিক্রম করতে আমাদের ব্যয় হয় পাক্কা দুই ঘন্টা। আমাদের এলাকার অধিকাংশ ছেলেমেয়ে তেজগাঁও থানার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে লেখাপড়া করে। তেজগাঁও থানায় রয়েছে সব নামকরা স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়। ফলে এসব ছেলেমেয়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পৌঁছাচ্ছে নির্ধারিত সময়ের অনেক পরে। এতে করে তাদের পড়ালেখা বিঘ্নিত হচ্ছে। এছাড়া তেজগাঁও হচ্ছে দেশের তথা রাজধানীর শিল্প এলাকা। এসব শিল্পসামগ্রীর জন্য আমরা অধিকাংশেই তেজগাঁও এলাকার ওপর নির্ভরশীল। এসব শিল্পসামগ্রী আমাদের এলাকায় জরুরি ভিত্তিতে অর্ডার দেয়া হলেও তারা সঠিক সময়ে সরবরাহ করতে পারছে না।

শুধু ক্যান্টনমেন্টের অভ্যন্তরীণ সড়ক ব্যবহারের অনুমতি না থাকায় আমাদেরকে এ অশেষ দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে। তাই আপনার কাছে আমাদের আন্তরিক প্রার্থনা যে, আপনি আমাদেরকে এ দুর্ভোগ দূরীকরণার্থে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন এবং এ অভ্যন্তরীণ সড়ক ব্যবহারের অনুমতি নিশ্চিত করবেন।

নিবেদক

তারিখ : ০৬.০৮.২০১৪ মোঃ শাহাদাৎ হোসেন

ঢাকা মাগুা, বাইদারটেক, বালুরঘাট এলাকার সাধারণ জনসাধারণের পক্ষে

**গ. আমদানি ও রপ্তানি ব্যবসায় বিশেষ কর সুবিধা প্রদানের যৌক্তিকতা ও দাবি জানিয়ে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডকে একটি চিঠি লিখুন।**

উত্তর :

তারিখ : ০৫.০৮.২০১৪

চেয়ারম্যান

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

সেগুনবাগিচা, ঢাকা।

**বিষয় : আমদানি ও রপ্তানি ব্যবসায় বিশেষ কর সুবিধা প্রদান প্রসঙ্গে।**

জনাব,

আমাদের দেশ একটি কৃষিপ্রধান দেশ। আমাদের দেশের জনসংখ্যাধিক্যের কারণে কৃষিজমির পরিমাণ খুবই কম। চাহিদা অনুসারে আমরা আমাদের সকল খাদ্যদ্রব্য, পণ্যসামগ্রী উৎপাদন করতে পারছি না। ফলে নিত্যপ্রয়োজনীয় এসব সামগ্রীর (চাল, ডাল, পেঁয়াজ ইত্যাদি) একটা বিরাট অংশ বিদেশ থেকে আমদানি করতে হয়। কিন্তু আমদানি শুল্ক বেশি (১০%) হওয়ার কারণে এসব দ্রব্যসামগ্রী চাহিদা অনুসারে আমদানি করা সম্ভব হচ্ছে না। এমতাবস্থায় আমাদের ব্যবসায়ী সংগঠনের পক্ষ থেকে আমি আপনার কাছে আমদানি শুল্ক ৩% করার দাবি জানাচ্ছি।



আবার, কতিপয় দুষ্প্রাপ্য ওষুধপথ্য, ইলেকট্রনিক্স সামগ্রীর জন্য আমাদেরকে সম্পূর্ণ বাইরের দেশের ওপর নির্ভর করতে হয়। এসব দ্রব্যসামগ্রীর ওপর ৫% এর স্থলে কর অবকাশের দাবি জানাচ্ছি।

এছাড়া, এসব সামগ্রীর রপ্তানি শুল্কও রয়েছে অতিমাত্রায়। শুল্কাধিক্যের কারণে তৈরি পোশাক, শিল্প, চা, পাট, তামাকসহ অন্যান্য পণ্যের রপ্তানি কমে যাচ্ছে। ফলে সরকার হারাচ্ছে একটা বড় অঙ্কের বৈদেশিক মুদ্রা। তাই আমাদের ব্যবসায়ী সংগঠনের পক্ষ থেকে আপনার কাছে দাবি, এ ব্যাপারে আপনি সরকারের সাথে একটা সমঝোতা আনয়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন।

অতএব, বিনীত প্রার্থনা, আমদানি ও রপ্তানির উপরিল্লিখিত বিষয়গুলো বিবেচনা করে সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে আপনার একান্ত মর্জি হয়।

নিবেদক

(মোঃ সায়েম চৌধুরী)

আমদানি-রপ্তানি ব্যবসায়ী সংগঠনের পক্ষে

## ২৭তম বিসিএস ২০০৬, বাংলা প্রথম পত্র

*[দ্রষ্টব্য : বাংলা ভাষায় প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। তবে টেকনিক্যাল শব্দগুলো ইংরেজিতে লেখা চলবে। প্রত্যেক প্রশ্নের মান প্রশ্নের শেষ প্রান্তে দেখানো হয়েছে।]* নম্বর

**১. ভাব-সম্প্রসারণ করুন :** ২০

**ক. মানুষ বাঁচে তার কর্মের মধ্যে, বয়সের মধ্যে নয়।**

ভাব-সম্প্রসারণ : জন্ম-মৃত্যু স্রষ্টার নিয়মের অধীন। কিন্তু কর্ম মানুষের হাতে। এক মুহূর্তের কর্মবলে মানুষ চিরঞ্জীব হয়ে থাকতে পারে। কাজেই আয়ুষ্কাল বা বয়স বড় কথা নয়। বড় কথা হলো মানুষের কর্ম।

মানুষ মরণশীল। মৃত্যুর স্বাদ প্রত্যেক মানুষকেই গ্রহণ করতে হয়। কেবল দুদিন আগে আর পরে। মৃত্যুর পর মানুষের দেহ পচে যায়। কিন্তু মানুষ পৃথিবীতে এসে যে কর্ম করে তা নষ্ট হয় না। তাই মানুষকে যুগের পর যুগ বাঁচিয়ে রাখে, কাউকে সুজন হিসেবে আর কাউকে দুর্জন হিসেবে। যেমন– অনেক আগে হিটলারের মৃত্যু হয়েছে। কিন্তু পৃথিবীর বুকে তিনি যে বিভীষিকার ক্ষত চিহ্ন এঁকে দিয়ে গেছেন তার জন্য মানুষ যতদিন পৃথিবী টিকে থাকবে ততদিন তাকে ঘৃণার্থে স্মরণ করে যাবে। অন্যদিকে মহামানব হযরত মুহাম্মদ (স), গৌতম বুদ্ধ, ঈসা (আ), আইনস্টাইন, নিউটন, গ্যালিলিও, মাদার তেরেসা, রবীন্দ্রনাথ, শেক্সপিয়র প্রমুখ ব্যক্তি তাদের সৎ ও মহৎ কর্মের দ্বারা যে ইতিহাস সৃষ্টি করে গেছেন তা পৃথিবীর ইতিহাসে চিরদিন অম্লান হয়ে থাকবে। মানুষের হৃদয়ে তাদের অধিষ্ঠান চুল পরিমাণও নড়চড় হবে না। তাদের হাড়-মাংস পচে নাশ হয়ে গেছে। কিন্তু তারপরও তারা চিরঞ্জীব। তাদের মৃত্যু নেই। আর সেজন্যই বলা হয়ে থাকে যে, 'কীর্তিমানের মৃত্যু নেই।' কাজেই শুধু খেয়ে-পরে বাঁচার জন্য আমাদের জন্ম হয়নি। সৎকর্মের দ্বারা মানব কল্যাণ সাধন করার জন্যই

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



পৃথিবীতে আমাদের আগমন ঘটেছে। আর মানুষ হিসেবে প্রত্যেককেই আমাদের সে কথা মনে রেখে সম্মুখ পানে অগ্রসর হওয়া উচিত।

Man may live not by years but by achievement. অর্থাৎ এ কথাই স্বতঃসিদ্ধ যে, 'মানুষ বাঁচে তার কর্মে, বয়সে নয়।'

*অথবা,*

**খ. পুষ্প আপনার জন্য ফোটে না।**

ভাব-সম্প্রসারণ : সমাজের বৃহত্তর কল্যাণে নিজেকে নিবেদন করাতেই মানুষের জীবনের সার্থকতা। পুষ্পের সার্থকতা যেমন আত্মত্যাগে, ব্যক্তিজীবনের সার্থকতাও তেমনি সামগ্রিক সামাজিক কল্যাণে নিজকে বিলিয়ে দেয়ার মাঝে। পরের জন্য নিজেদের নিঃশেষে বিলিয়ে দেয়ার মাঝে আছে পরম সুখ, অনির্বচনীয় আনন্দ ও অপরিসীম পরিতৃপ্তি। পুষ্প যেন মানবব্রতী জীবনেরই প্রতিচ্ছবি। সৌন্দর্য ও সৌরভে পুষ্প অনুপম। অরণ্যে কিংবা উদ্যানে যেখানেই ফুল ফুটুক সে নিজের জন্য ফোটে না। নিজের সৌন্দর্য ও সৌরভকে অন্যের কাছে বিলিয়ে দেয়াতেই তার পুষ্প জীবনের সার্থকতা। পবিত্রতার প্রতীক বলে ফুল দেবতার চরণে নিবেদিত হয় নৈবেদ্য হিসেবে। ফুলের সৌরভ ও সৌন্দর্য তার নিজের হলেও সকলের কাছে নিজেকে উজাড় করে দিয়েই ফুল জীবনের সার্থকতা পায়। মানুষের জীবনও অনেকটা ফুলের মতো। তাই চারিত্রিক মাধুর্যে সে জীবন হওয়া উচিত ফুলের মতোই সুন্দর, সুরভিত, পবিত্র ও নির্মল। ফুলের মতোই তা নিবেদিত হওয়া উচিত পরের জন্য, সমাজের স্বার্থে। সমাজবদ্ধ জীবনের আশ্রয়েই মানুষের অস্তিত্ব। তাই সমাজের প্রতিটি মানুষের রয়েছে বহু দায়বদ্ধতা। সামাজিক দায়িত্ব ও কর্তব্যকে ভুলে কেবল নিজের ভোগসুখে মত্ত হলে মানুষ হয়ে পড়ে সংকীর্ণ ও স্বার্থপর। তার চেয়ে পরের কল্যাণে আত্মনিবেদনের ব্রতে অনেক সুখ। সমাজে যারা দুঃখ-যন্ত্রণায় পর্যুদস্ত, সেবা ও সহমর্মিতার চেতনা নিয়ে তাদের পাশে দাঁড়াতে পারলে, দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফোটাতে পারলেই মানুষের জীবন সার্থক হয়। তাই মানবজীবনের মূলমন্ত্র হওয়া উচিত— 'সকলের তরে সকলে আমরা, প্রত্যেকে আমরা পরের তরে।' সব মানুষ যেদিন ফুলের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে পরের কল্যাণে জীবনকে বিলিয়ে দিতে পারবে সেদিনই সমাজজীবনে দুঃখ, যন্ত্রণা, বৈষম্যের অবসান হবে। মানুষের জীবন হয়ে উঠবে আনন্দঘন ও কল্যাণময়।

**২. সারমর্ম লিখুন :** ২০

ক. মহাসমুদ্রের শত বৎসরের কল্লোল কেহ যদি এমন করিয়া বাঁধিয়া রাখিতে পারিত যে, সে ঘুমন্ত শিশুটির মত চুপ করিয়া থাকিত, তবে সেই নীরব মহাশব্দের সহিত এই পুস্তকাগারের তুলনা হইত। এখানে ভাষা চুপ করিয়া আছে, প্রবাহ স্থির হইয়া আছে, মানবাত্মার অমর অগ্নি কাল অক্ষরের শৃঙ্খলে কাল চামড়ার কারাগারে বাঁধা পড়িয়া আছে। ইহারা সহসা যদি বিদ্রোহী হইয়া উঠে, নিস্তব্ধতা ভাঙ্গিয়া ফেলে, অক্ষরের বেড়া দগ্ধ করিয়া একবার বাহির হইয়া আসে, কালের শঙ্খ-রন্ধ্রে এই নীরব সহস্র বৎসর যদি এককালে ফুৎকার দিয়া উঠে, তবে সে বন্ধনমুক্ত উচ্ছ্বসিত শব্দের স্রোতে দেশ-বিদেশ ভাসিয়া যাইত। হিমালয়ের মাথার উপরে কঠিন তুষারের মধ্যে যেমন শত শত বন্যা বাঁধা পড়িয়া আছে, তেমনি এই পুস্তকাগারের মধ্যে মানব হৃদয়ের বন্যাকে বাঁধিয়া রাখা হইয়াছে। বিদ্যুৎকে মানুষ লোহার তার দিয়া বাঁধিয়াছে। কিন্তু কে জানিত মানুষ শব্দকে নিঃশব্দের মধ্যে বাঁধিতে পারিবে। কে জানিত সঙ্গীতকে, হৃদয়ের আশাকে জাগ্রত আত্মার আনন্দ-ধ্বনিকে, আকাশের দৈববাণীকে সে কাগজে পুরিয়া রাখিবে, অতলস্পর্শ কাল সমুদ্রের উপর কেবল একখানা বই দিয়া সাঁকো বাঁধিয়া দিবে।



সারমর্ম : জ্ঞানের মহাসমুদ্র গ্রন্থাগার। ইতিহাস, সভ্যতা, সংস্কৃতি, ধ্যান-ধারণা, চিন্তা-চেতনা লাইব্রেরির পুস্তকরাজিতে বাঁধা পড়ে আছে। এ ভাবের বন্যা মানুষের মনোজগতকে জ্ঞান শক্তিতে সমৃদ্ধ করতে পারে। আর গ্রন্থের জ্ঞান প্রজন্ম থেকে প্রজন্ম, দেশ থেকে দেশান্তর, কাল থেকে কালান্তর পর্যন্ত অতীত ও ভবিষ্যতের মাঝে সেতুবন্ধন রচনা করে।

*অথবা,*

খ. এ দুর্ভাগ্য দেশ হতে, হে মঙ্গলময়,
দূর করে দাও তুমি সর্ব তুচ্ছ ভয়–
লোকভয়, রাজভয়, মৃত্যুভয় আর।
দীনপ্রাণ দুর্বলের এ পাষাণভার,
এই চির পেষণ যন্ত্রণা, ধূলিতলে
এই নিত্য অবনতি, দণ্ডে পলে পলে
এই আত্ম-অবমান, অন্তরে বাহিরে
এই দাসত্বে রজ্জু অস্ত নতশিরে
সহস্রের পদপ্রান্ততলে বারম্বার
মনুষ্যমর্যাদাগর্ব চির পরিহার–
এ বৃহৎ লজ্জারাশি চরণ-আঘাতে
চূর্ণ করি দূর করো।

সারমর্ম : মানুষের জীবনকে সুন্দর ও সার্থক করতে হলে চাই মুক্তি। বন্ধনের দাসত্বে জীবনের বিকাশ রুদ্ধ হয়ে পড়ে, মনুষ্যত্ববোধ ও মর্যাদা হয় খণ্ডিত। আত্ম-অবমাননা মানুষের জীবনস্রোতকে ক্ষীণ ও সংকীর্ণ করে তোলে। উদার মুক্তির স্পর্শেই মানুষ মহৎ হতে পারে এবং ব্যক্তিত্ব ও মনুষ্যত্বের বিকাশ ঘটাতে পারে। তাই সমস্ত লাঞ্ছনা আর বঞ্চনা উপেক্ষা করে মুক্ত আকাশের নিচে জাতি মাথা উঁচু করে দাঁড়াক—এটাই আজকের কামনা।

**৩. শুদ্ধ করে লিখুন :** ১০

| অশুদ্ধ | শুদ্ধ |
|---|---|
| ক. তিনি শহীদ মিনারে শ্রদ্ধাঞ্জলী অর্পণ করেছেন। | ক. তিনি শহীদ মিনারে শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করেছেন। |
| খ. জাপান একটি সমৃদ্ধশালী দেশ। | খ. জাপান একটি সমৃদ্ধ দেশ। |
| গ. কাব্যটির উৎকর্ষতা প্রশংসনীয়। | গ. কাব্যটির উৎকর্ষ/উৎকৃষ্টতা প্রশংসনীয়। |
| ঘ. রবীন্দ্রনাথ ভয়ঙ্কর প্রতিভাবান কবি ছিলেন। | ঘ. রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত প্রতিভাবান কবি ছিলেন। |
| ঙ. তার কথার সঙ্গে কাজের সামঞ্জস্যতা নেই। | ঙ. তার কথার সঙ্গে কাজের সামঞ্জস্য নেই। |
| চ. দারীদ্র্যতাই মধুসূদনের শেষ জীবনের বৈশিষ্ট্য। | চ. দারিদ্র্যই মধুসূদনের শেষ জীবনের বৈশিষ্ট্য। |
| ছ. দূর্জন বিদ্যান হলেও পরিত্যজ্য। | ছ. দুর্জন বিদ্বান হলেও পরিত্যাজ্য। |
| জ. নেপালের ভৌগলিক সীমা বর্ণনা কর। | জ. নেপালের ভৌগোলিক সীমানা বর্ণনা কর। |
| ঝ. সে কৌতূক করার কৌতুহল সম্বরন করতে পারল না। | ঝ. সে কৌতুক করার কৌতূহল সংবরণ করতে পারল না। |
| ঞ. স্বাধীনোত্তরকালে বাংলা নাটকের অত্যাধিক উন্নতি সাধিত হয়েছে। | ঞ. স্বাধীনতাত্তোরকালে বাংলা নাটকের অত্যধিক উন্নতি সাধিত হয়েছে। |

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



৪. উপযুক্ত শব্দ বা শব্দসমষ্টি দিয়ে শূন্যস্থান পূরণ করুন : ৫
ক. গরিবের গায়ে — ভাল নয়। (হাত তোলা)
খ. — আছে বলে চাকরটাকে বিদায় করে দিয়েছি। (হাতটান)
গ. রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয়, — প্রাণ যায়। (উলুখাগড়ার)
ঘ. আমার সন্তান যেন থাকে —। (দুধে-ভাতে)
ঙ. তপ্ত ভাতে নুন জোটে না, — ঘি। (পান্তা ভাতে)

৫. যে কোনো পাঁচটি বাগধারা দিয়ে বাক্য রচনা করুন : ৫
ক. অকালবোধন (অসময়ে আহ্বান) : খাওয়ার সময় ঘুমের জন্য অকালবোধন করো না।
খ. ঈদের চাঁদ (আকাঙ্ক্ষিত বস্তু) : অনেক দিন পর ছেলেকে কাছে পেয়ে বৃদ্ধ মা যেন ঈদের চাঁদ হাতে পেলেন।
গ. পাথরে পাঁচকিল (উন্নত অবস্থা) : যুদ্ধের সময় অবৈধ সম্পদে অনেকে পাথরে পাঁচকিল দিয়েছে।
ঘ. আমড়া কাঠের ঢেঁকি (অপদার্থ) : তোমার মতো আমড়া কাঠের ঢেঁকি দিয়ে এ কাজ হবে না।
ঙ. গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল (প্রাপ্তির পূর্বেই ভোগের আয়োজন) : গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল মেখে বসে না থেকে মন দিয়ে কাজ কর।
চ. চশমখোর (লজ্জাহীন) : ছেলের চশমখোর কাণ্ডে পিতা স্তম্ভিত হয়ে গেলেন।
ছ. হাড়ে বাতাস লাগা (স্বস্তিবোধ করা) : সন্ত্রাসীটা মারা যাওয়ায় এলাকার লোকের হাড়ে বাতাস লাগলো।
জ. রগচটা (যে একটুতেই রাগে) : করিমের রগচটা স্বভাব বন্ধুমহলে কেউ পছন্দ করে না।
ঝ. সোনার পাথরবাটি (অসম্ভব বস্তু) : জীবনে সোনার পাথরবাটি খোঁজা বৃথা।
ঞ. ছেঁড়া চুলে খোঁপা বাঁধা (বৃথা চেষ্টা) : সবকিছু শেষ হয়ে গেছে, এখন ছেঁড়া চুলে খোঁপা বাঁধার চেষ্টা করে লাভ নেই।

৬. বাক্য রূপান্তর করুন (বন্ধনীর অন্তর্গত নির্দেশ অনুযায়ী) : ৫
ক. চরিত্রহীন লোক পশুর চেয়েও অধম। (জটিল বাক্যে)
উত্তর : যে চরিত্রহীন সে পশুর চেয়েও অধম।
খ. যে মিথ্যা কথা বলে, তাকে কেউ পছন্দ করে না। (সরল বাক্যে)
উত্তর : মিথ্যাবাদীকে কেউ পছন্দ করে না।
গ. তার প্রচুর ধনসম্পদ থাকলেও সে সুখী নয়। (যৌগিক বাক্যে)
উত্তর : তার প্রচুর ধনসম্পদ আছে কিন্তু সে সুখী নয়।
ঘ. মন দিয়ে লেখাপড়া কর, ভবিষ্যতে সুখী হবে। (জটিল বাক্যে)
উত্তর : যদি মন দিয়ে লেখাপড়া কর, তবে ভবিষ্যতে সুখী হবে।
ঙ. যেহেতু তার ধনসম্পদ আছে, তাই সে অত্যন্ত গর্বিত। (যৌগিক বাক্যে)
উত্তর : তার ধন সম্পদ আছে তাই সে অত্যন্ত গর্বিত।

৭. যে কোনো পাঁচটির বাংলা পরিভাষা দিয়ে বাক্য রচনা করুন : ৫
ক. Allotment; খ. Bankrupt; গ. Charter; ঘ. Embargo; ঙ. Ombudsman; চ. Referendum; ছ. Subjudice; জ. Inauguration; ঝ. Deadlock; ঞ. Enterprise.
উত্তর :
ক. **Allotment** (বরাদ্দ)— সরকার বাজেটে প্রতিটি মন্ত্রণালয়ের ব্যয় বরাদ্দ দিয়ে থাকে।
খ. **Bankrupt** (দেউলিয়া)— দেউলিয়া লোক সমাজ ও রাষ্ট্রের জন্য হিতকর নয়।



গ. **Charter** (সনদ)— জাতিসংঘ সনদ প্রতিটি সদস্য রাষ্ট্র অনুসরণ করে থাকে।
ঘ. **Embargo** (নিষেধাজ্ঞা)— ধূমপান সংক্রান্ত বিজ্ঞাপনে সরকারি নিষেধাজ্ঞা আছে।
ঙ. **Ombudsman** (ন্যায়পাল)— আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে ন্যায়পাল থাকা অত্যন্ত জরুরি।
চ. **Referendum** (গণভোট) — সংবিধানের কিছু অনুচ্ছেদ পরিবর্তনের জন্য গণভোট প্রয়োজন হয়।
ছ. **Subjudice** (বিচারাধীন) — দুর্নীতি বিরোধী অভিযানে আটক নেতা-কর্মীদের অনেকে এখনও বিচারাধীন।
জ. **Inauguration** (অভিষেক) — টেস্ট ক্রিকেটে অভিষেক ম্যাচে আশরাফুল সেঞ্চুরি করেছিল।
ঝ. **Deadlock** (অচলাবস্থা) — কর্মচারীদের আন্দোলনে বন্দরে এখন অচলাবস্থা বিরাজ করছে।
ঞ. **Enterprise** (সাহসী উদ্যোগ) — রাজনৈতিক নেতা-কর্মীদের গ্রেফতার করে বিচারের আওতায় আনা সরকারের একটি সাহসী উদ্যোগ।

৮. নিচের প্রশ্নগুলির উত্তর দিন : $১\frac{১}{২} \times ২০ = ৩০$
ক. **বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন কী? এটি কে, কখন, কোথায় আবিষ্কার করেন?**
উত্তর : বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন– চর্যাপদ। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ১৯০৭ সালে নেপাল রাজ দরবারের গ্রন্থাগার থেকে চর্যাপদ আবিষ্কার করেন।
খ. **বাংলা মঙ্গলকাব্যধারার দুজন বিখ্যাত কবির নাম লিখুন, প্রত্যেকের একটি করে কাব্যের নামসহ।**
উত্তর : বাংলা মঙ্গলকাব্য ধারার দু'জন বিখ্যাত কবি হলেন কানাহরি দত্ত ও মানিক দত্ত। কানাহরি দত্ত রচনা করেন 'মনসামঙ্গল' আর মানিক দত্ত রচনা করেন 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্য।
গ. **রচয়িতার নামসহ মধ্যযুগের তিনটি রোমান্টিক কাব্যের নাম লিখুন।**
উত্তর : মধ্যযুগের ৩টি রোমান্টিক কাব্য এবং কবি হলেন–

| কাব্য | কবি |
|---|---|
| ১. ইউসুফ জুলেখা | শাহ মুহম্মদ সগীর |
| ২. লাইলী মজনু | দৌলত উজির বাহরাম খান |
| ৩. মধুমালতী | মুহম্মদ কবীর |

ঘ. **ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ কত সালে কী উদ্দেশ্যে স্থাপিত হয়েছিল?**
উত্তর : বাংলাদেশে কর্মরত ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ইংরেজ কর্মচারীদের দেশীয় ভাষায় শিক্ষাদানের জন্য তৎকালীন ইংরেজ শাসিত ভারতের গভর্নর জেনারেল লর্ড ওয়েলেসলি কর্তৃক ১৮০০ খিষ্টাব্দে কলকাতায় ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়।
ঙ. **ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ কী এবং এটি কত সালে প্রকাশিত হয়?**
উত্তর : ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ 'বেতাল পঞ্চবিংশতি'। গ্রন্থটি ১৮৪৭ সালে প্রকাশিত হয়।
চ. **বঙ্কিমচন্দ্রের তিনটি উপন্যাসের নাম লিখুন।**
উত্তর : বিখ্যাত সাহিত্যিক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ৩টি উপন্যাস হলো– ১. দুর্গেশনন্দিনী (১৮৬৫) ২. কপালকুণ্ডলা (১৮৬৬) ৩. কৃষ্ণকান্তের উইল (১৮৭৮)।
ছ. **মধুসূদন দত্তের একটি মহাকাব্য, একটি পত্রকাব্য ও একটি নাটকের নাম লিখুন।**
উত্তর : মাইকেল মধুসূদন দত্ত রচিত মহাকাব্য হলো 'মেঘনাদবধ কাব্য' (১৮৬১), তার বিখ্যাত পত্রকাব্য হলো 'বীরাঙ্গনা' (১৮৬২) এবং তার রচিত নাটক 'শর্মিষ্ঠা' (১৮৫৮)।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



জ. **'বিষাদ সিন্ধু' কার লেখা? তার আর একটি গ্রন্থের নাম লিখুন।**
উত্তর : তিনটি পর্বে রচিত 'বিষাদ সিন্ধু' গ্রন্থটি রচনা করেছেন মীর মশাররফ হোসেন। তার রচিত অন্য একটি গ্রন্থ 'রত্নবতী' (১৮৬৯)।

ঝ. **রবীন্দ্রনাথ কত সালে কোন গ্রন্থের জন্য নোবেল পুরস্কার লাভ করেন?**
উত্তর : বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তার 'গীতাঞ্জলি' কাব্য ও অন্যান্য কাব্যের কিছু কবিতা 'Song Offerings' নামে প্রকাশ করে ১৯১৩ সালে নোবেল পুরস্কার পান।

ঞ. **'নীলদর্পণ' কে লিখেছেন? তাঁর একটি বিখ্যাত প্রহসনের নাম লিখুন।**
উত্তর : 'নীলদর্পণ' (১৮৬০) নাটকটি রচনা করেন দীনবন্ধু মিত্র। দীনবন্ধু মিত্রের বিখ্যাত প্রহসন 'সধবার একাদশী' (১৮৬৬)।

ট. **নজরুলের জন্ম সাল ও মৃত্যু সাল লিখুন।**
উত্তর : বাংলা সাহিত্যের 'বিদ্রোহী' খ্যাত কবি কাজী নজরুল ইসলাম ২৪ মে ১৮৯৯ (বাংলা ১১ জ্যৈষ্ঠ ১৩০৬) সালে জন্মগ্রহণ করেন। ২৯ আগস্ট ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দে (বাংলা ১২ ভাদ্র ১৩৮৩) মৃত্যুবরণ করেন।

ঠ. **জসীমউদ্দীনের তিনটি কাব্যের নাম লিখুন।**
উত্তর : পল্লীকবি জসীমউদ্দীন রচিত ৩টি কাব্য হলো– ১. রাখালী (১৯২৭) ২. বালুচর (১৯৩০) ৩. ধানখেত (১৯৩৩)।

ড. **'অবরোধবাসিনী' কে লিখেছেন? তিনি কী হিসাবে বিখ্যাত?**
উত্তর : 'অবরোধবাসিনী' (১৯৩১) বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের গদ্যগ্রন্থ। তিনি মুসলিম নারীমুক্তি আন্দোলনের একজন অন্যতম পথিকৃৎ।

ঢ. **ফররুখ আহমদের দুটি কাব্যের নাম লিখুন।**
উত্তর : ইসলামী রেনেসাঁর কবি ফররুখ আহমদ রচিত দুটি কাব্য হলো– ১. সাত সাগরের মাঝি (১৯৪৪) ২. সিরাজাম মুনীরা (১৯৫২)।

ণ. **কায়কোবাদের আসল নাম কী? তার বিখ্যাত মহাকাব্যের নাম কী?**
উত্তর : কায়কোবাদের প্রকৃত নাম মুহম্মদ কাজেম আল কুরায়শী। তার বিখ্যাত মহাকাব্যের নাম 'মহাশ্মশান' (১৯০৪)।

ত. **বাংলাদেশের একজন কবি, একজন ঔপন্যাসিক ও একজন নাট্যকারের নাম লিখুন।**
উত্তর : বাংলাদেশের একজন কবি হলেন শামসুর রাহমান, ঔপন্যাসিক হুমায়ূন আহমেদ এবং নাট্যকার সেলিম আল-দীন।

থ. **বাংলাদেশের দুজন প্রধান কবি কে কে? তাদের প্রত্যেকের একটি করে কাব্যের নাম লিখুন।**
উত্তর : বাংলাদেশের দুজন প্রধান কবি হলেন শামসুর রাহমান ও আল মাহমুদ। শামসুর রাহমানের কাব্য হলো 'বিধ্বস্ত নীলিমা' (১৯৬৭)। আল মাহমুদের কাব্য হলো 'সোনালী কাবিন' (১৯৭৩)।

দ. **'কবর' নাটক কে লিখেছেন? তাঁর আর একটি নাটকের নাম লিখুন।**
উত্তর : 'কবর' (১৯৫৩) নাটক লিখেছেন খ্যাতিমান নাট্যকার মুনীর চৌধুরী। তার অন্য একটি নাটক হলো 'রক্তাক্ত প্রান্তর' (১৯৬২)।

ধ. **সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ, শহীদুল্লাহ কায়সার ও আবু ইসহাক— এদের প্রত্যেকের একটি করে উপন্যাসের নাম লিখুন।**
উত্তর : সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ রচিত একটি উপন্যাস হলো 'লালসালু' (১৯৪৮)। শহীদুল্লাহ কায়সার রচিত উপন্যাস হলো 'সংশপ্তক' (১৯৬৫) এবং আবু ইসহাক রচিত একটি উপন্যাস হলো 'সূর্য দীঘল বাড়ি' (১৯৫৫)।

ন. **'পিঁজরাপোল', 'জেগে আছি' এবং 'আত্মজা ও একটি করবী গাছ' গ্রন্থ তিনটির লেখকদের নাম লিখুন।**
উত্তর : পিঁজরাপোল – শওকত ওসমান; জেগে আছি– আলাউদ্দিন আল আজাদ; আত্মজা ও একটি করবী গাছ– হাসান আজিজুল হক।



## ২৭তম বিসিএস ২০০৬, বাংলা দ্বিতীয় পত্র

*[দ্রষ্টব্য : বাংলা ভাষায় প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। তবে টেকনিক্যাল শব্দগুলো ইংরেজিতে লেখা চলবে। প্রত্যেক প্রশ্নের মান প্রশ্নের শেষ প্রান্তে দেখানো হয়েছে]* নম্বর

১. **যে কোনো একটি বিষয়ে প্রবন্ধ লিখুন :** ৪০

ক. বাংলাদেশে দুর্নীতি ও সন্ত্রাস : সমাধানের উপায়
উত্তর : পৃষ্ঠা ৬৭৬।

খ. জাতীয়তাবাদ ও আন্তর্জাতিকতাবাদ বনাম বিশ্বায়নের মতবাদ

গ. জাতীয় সংস্কৃতি ও বিশ্বায়নের সংস্কৃতি
উত্তর : পৃষ্ঠা ৭৩৫।

ঘ. আজকের দিনের প্রচার মাধ্যম
উত্তর : পৃষ্ঠা ৭১৫।

ঙ. আইন ও বিচারব্যবস্থা : বাংলাদেশের বাস্তবতা।

২. **প্রদত্ত ইঙ্গিত অবলম্বন করে যে কোনো একটি বিষয়ে প্রবন্ধ লিখুন :** ৪০

ক. বাংলা ভাষার ভবিষ্যৎ (বাংলাদেশের ঐতিহ্য, বর্তমান অবস্থান, বিশ্বায়নের অভিঘাত, লেখকদের ও রাজনীতিবিদদের মনোভাব, আন্তর্জাতিক ভাষা পরিস্থিতি, ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা)।

খ. বাংলাদেশে উচ্চশিক্ষা (বাংলাদেশে আধুনিক উচ্চশিক্ষার ইতিহাস, পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় ও প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়, রাষ্ট্রীয় নীতি, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের সাম্প্রতিক উচ্চশিক্ষার উন্নতির জন্য কী দরকার)।

গ. বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষা (আধুনিক প্রাথমিক শিক্ষার ইতিহাস, বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষার বর্তমান অবস্থা : সরকারি বিদ্যালয়-বেসরকারি বিদ্যালয়-মাদ্রাসা-ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল-জাতীয় মানস গঠনে প্রাথমিক শিক্ষা, পাঠ্যপুস্তকের অবস্থা, বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষার সংস্কারের প্রয়োজন)।
উত্তর : পৃষ্ঠা ৮১৪।

ঘ. আমাদের এই বাংলাদেশ (বাংলাদেশের ভৌগোলিক পরিচয় ও প্রকৃতি, জলপ্রবাহ, রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠা, বাংলাদেশের তেত্রিশ বছরের অগ্রগতি-রাজনীতি-অর্থনীতি-সংস্কৃতি, এনজিওসমূহের ভূমিকা সার্বিক উন্নতির উপায়)।

ঙ. বাংলা বর্ণমালা ও বানান (বাংলা বর্ণমালার বৈশিষ্ট্য, বানানের সমস্যা, বর্তমান বাংলা ভাষা ও বানানের সমস্যা, বানান সংস্কার বিষয়ে বিভিন্ন মত, বানান-সংস্কারের সাথে বর্ণমালা সংস্কারও কি বিবেচ্য?)

৩. ক. নববর্ষের দিন দেশের সার্বিক অবস্থার বর্ণনা দিয়ে নিউইয়র্কে প্রবাসী ভাইয়ের কাছে একটি পত্র লিখুন। ২০

*অথবা,*

খ. বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র হিসেবে নিজের আর্থিক দুরবস্থার বর্ণনা দিয়ে অর্থ সাহায্যের জন্য উপাচার্য সমীপে একটি পত্র লিখুন।

*অথবা,*

গ. আপনার এলাকায় শিক্ষামন্ত্রীর আগমন উপলক্ষে এলাকার শিক্ষার সম্ভাব্য উন্নতির আবেদন সংবলিত একটি স্মারকপত্র রচনা করুন।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



## ২৫তম বিসিএস : ২০০৫

নির্ধারিত সময় : ৩ ঘণ্টা; পূর্ণমান : ১০০

[দ্রষ্টব্য : *বাংলা ভাষায় প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। তবে টেকনিক্যাল শব্দগুলো ইংরেজিতে লেখা চলবে। প্রত্যেক প্রশ্নের মান প্রশ্নের ডান পাশে দেখানো হয়েছে।*]

১. যে কোনো একটি বিষয় অবলম্বনে প্রবন্ধ লিখুন : ৩০

ক. আইনের শাসন ও বাংলাদেশ

**উত্তর : পৃষ্ঠা ৬২৭।**

খ. মুক্তবাজার অর্থনীতি

গ. বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সুফল ও কুফল

ঘ. বাংলাদেশে আর্সেনিক সমস্যা

ঙ. তথ্যপ্রযুক্তি ও বর্তমান বিশ্ব

**উত্তর : পৃষ্ঠা ৭০১ ও ৭০৬।**

২. ভাব-সম্প্রসারণ করুন : ১৫

**ক. সংস্কৃতি শব্দটি উচ্চারণ করা সহজ, বোঝা কঠিন এবং বোঝানো কঠিনতর।**

ভাব-সম্প্রসারণ : ইংরেজি 'Culture' শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ 'সংস্কৃতি'। সামাজিক জীব হিসেবে মানুষ তার সৃষ্টির যেসব বিষয়ের পারস্পরিক সংস্পর্শে আসে সেগুলোকে সংস্কৃতি বলে। মূলত কোনো সমাজের সংস্কৃতি বলতে ঐ সমাজের জীবনযাপন প্রণালীকে বোঝায়। প্রকৃতপক্ষে সংস্কৃতি হচ্ছে সামাজিক সৃষ্টির সমন্বিত রূপ। মানুষ তার অস্তিত্বের নিশ্চয়তা বিধানে যা কিছু সৃষ্টি করেছে তাই সংস্কৃতি। এ সংস্কৃতি শব্দটি আমরা সহজেই উচ্চারণ করতে পারি। কিন্তু এটি এতই ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত যে এটাকে এক কথায় বোঝানো কঠিন। সংস্কৃতি মানবিক উপলব্ধির ব্যাপার— বিজ্ঞানের মতো তথ্য-উপাত্ত-পরিসংখ্যান সারণি দিয়ে কিংবা জ্যামিতিক চিত্র এঁকে বোঝানোর ব্যাপার নয়। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'কমল হীরের পাথরটাকে বলি বিদ্যে আর তা থেকে যা ঠিকরে বেরোয়, তাকে বলি কালচার।' অর্থাৎ সংস্কৃতি সেই চিৎপ্রকর্ষ বা আলো যা চেনায় জাতির স্বরূপকে। মোতাহের হোসেন চৌধুরী বলেছেন, 'সংস্কৃতি মানে বাঁচা, সুন্দরভাবে বাঁচা।

সংস্কৃতির দুটি রূপ আছে– বস্তুগত সংস্কৃতি ও অবস্তুগত সংস্কৃতি। মানুষ তার জীবনযাপনের দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় যেসব বস্তুগত সামগ্রী সৃষ্টি করেছে তার সমষ্টিই হলো বস্তুগত সংস্কৃতি। যেমন– ঘর-বাড়ি, তৈজসপত্র, আসবাবপত্র, শিল্প-কারখানা, রাস্তাঘাট ইত্যাদি। বস্তুগত সংস্কৃতি বলতে মূলত অবকাঠামো সংক্রান্ত বিষয়কে বোঝানো হয়ে থাকে। অপরপক্ষে মানুষ জীবনধারণের বিভিন্ন অবস্থায় তার উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যেসব অবস্তুগত সামগ্রী বা উপাদান সৃষ্টি করেছে তার সমষ্টি হলো অবস্তুগত সংস্কৃতি। যেমন– আচার-আচরণ, রীতিনীতি, ধর্ম বিশ্বাস, জ্ঞান, দক্ষতা ইত্যাদি। সৃষ্টির আদিতে এ ধরণীতে কিছুই ছিল না। মানুষের ধারাবাহিক প্রচেষ্টার মাধ্যমে বস্তুগত ও অবস্তুগত সংস্কৃতির মিথস্ক্রিয়ায় গড়ে উঠেছে বর্তমানের বিশ্ব সংস্কৃতি। এই যে এত ব্যাপক ও বিস্তৃত বিষয় এটাকে এক কথায় বা অল্প কথায় বোঝানো অত্যন্ত কঠিন। কারণ সংস্কৃতি স্থির কোনো বিষয় নয়; সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এটির পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও রূপান্তর ঘটছে। তাছাড়া এক সমাজের সংস্কৃতির সঙ্গে অপর সমাজের সংস্কৃতিরও রয়েছে বিস্তর পার্থক্য। কেননা প্রত্যেক সংস্কৃতিই নিজের মতো করে বিকশিত হওয়ার অধিকার রাখে। তাই বলা যায়, মাত্র একটি শব্দ উচ্চারণ করে সংস্কৃতি শব্দটি প্রকাশ করা গেলেও এর ব্যাপকতা বোঝা এবং বোঝানো দুরূহ।



*অথবা,*

**খ. স্বাধীনতা অর্জন করার চেয়ে স্বাধীনতা রক্ষা করা কঠিন।**

ভাব-সম্প্রসারণ : অনেক ত্যাগ-তিতিক্ষা ও সংগ্রামের মাধ্যমে যে স্বাধীনতা অর্জিত হয় তা রক্ষা ও সুসংহত করার জন্য জাতীয় জীবনে অনেক গুরুদায়িত্ব পালন করতে হয়। স্বাধীনতাকে রক্ষা করে তাকে ফলপ্রসূ করতে হলে প্রয়োজন হয় জাতীয় ঐক্য নিশ্চিত করে তার মাধ্যমে অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক স্বনির্ভরতা অর্জন এবং দেশের মানুষের অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা, বাসস্থান ও চিকিৎসার মান উন্নয়ন। কিন্তু এ কাজ খুব সহজে হয় না। বিভিন্ন জাতির স্বাধীনতার অভিজ্ঞতা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, স্বাধীনতা অর্জন করা কঠিন হলেও তাকে রক্ষা ও ফলপ্রসূ করার কাজ আরো কঠিন।

যে কোনো দেশের স্বাধীনতা অর্জিত হয় যথেষ্ট ত্যাগ-তিতিক্ষার মধ্য দিয়েই। বিদেশী শাসন-শোষণের নিষ্পেষণ থেকে মুক্তির জন্য প্রয়োজন হয় কঠিন সংগ্রামের। প্রায় ক্ষেত্রেই বিদেশী শাসক শক্তি হয় পরাক্রমশালী। তাদের থাকে সুশৃঙ্খল প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা, বিপুল রণসম্ভার। তাদের বিরুদ্ধে লড়তে গেলে প্রয়োজন হয় জাতীয় ঐক্য, বলিষ্ঠ নেতৃত্ব ও বিপুল সাংগঠনিক শক্তি এবং দীর্ঘদিনের প্রস্তুতির। স্বাধীনতা যুদ্ধে সংগ্রাম হয় প্রত্যক্ষ, শত্রু থাকে প্রকাশ্য এবং লক্ষ্য হয় একমুখী। স্বাধীনতার দুর্বার আকাঙ্ক্ষায় জনগণ অগ্রসর হয় ত্যাগী মনোভাব নিয়ে; স্বার্থবুদ্ধি বা বিভেদের শক্তি তখন বড় হয়ে উঠতে পারে না। তার অস্তিত্ব থাকলে তা থাকে অদৃশ্য। কিন্তু পদে পদে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয় স্বাধীনতা-উত্তর কালে দেশগঠন পর্বে। একদিকে থাকে পরাজিত শক্তি ও তাদের দেশীয় অনুচরদের জিজ্ঞাসা ও মরণকামড়ের জ্বালা, অন্যদিকে স্বাধীনতার পক্ষের শক্তির অভ্যন্তরীণ রেষারেষি। এ পরিস্থিতিতে নব-অর্জিত স্বাধীনতাকে ধ্বংস করার চক্রান্ত মোকাবিলা সহজসাধ্য হয় না। পাশাপাশি স্বাধীনতা-উত্তর কালে প্রশাসনিক সংস্কার করে নতুন প্রশাসন-ব্যবস্থা গড়ে তোলা, অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা অর্জন, রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা আনয়ন এবং পশ্চাৎপদতা উত্তরণ করে জনগণের জীবনে স্বাধীনতাকে অর্থবহ করে তোলা অত্যন্ত কঠিন কাজ বলে প্রতীয়মান হয়। তাই স্বাধীনতা অর্জন যতই ত্যাগ সাপেক্ষ হোক না কেন সদ্য স্বাধীন দেশকে আত্মনির্ভরতা ও সমৃদ্ধির পথে অগ্রসর করা অনেক বেশি কঠিনতর কাজ।

৩. সারমর্ম লিখুন : ১৫

ক. "মনুষ্য স্বভাবতঃই স্বসুখনিরত। সে আপনার বিনা আর কিছু জানে না, আপনার বিনা আর কিছু বোঝে না, আপনার বই আর কিছুরই খবর লইতে অবসর পায় না। এইরূপ আত্মচিন্তা প্রাণিমাত্রেরই অপরিহার্য গতি। ইহা যেমন মনুষ্যে আছে, পশুপক্ষী কীট-পতঙ্গাদিতেও তেমনই বিদ্যমান রহিয়াছে। কারণ, ক্ষুধা-তৃষ্ণা যাহার জীবনশক্তির প্রণোদনা এবং শীত ঝড় যাহার স্বাভাবিক শত্রু, সে ব্রহ্মাণ্ডের সকলকে ছাড়িয়া আগে আপনার ভাবনা না ভাবিয়াই পারে না। আপনার ভাবনা ভুলিয়া গেলে, তাহার জীবনশক্তিই নিরবলম্ব হইয়া ম্রিয়মাণ হয়। কিন্তু, প্রকৃত মহত্ত্ব সেই আপনার ভাবনার সঙ্গে সঙ্গে ভাবনাকেও আপনার করিয়া লয় এবং সময়ে সময়ে, যেন আপনারাই উচ্ছ্বাসে আপনি উচ্ছ্বসিত হইয়া; যেন আপনারই প্রভাবের স্রোতবেগে আপনি প্রবাহিত হইয়া, পরার্থ আপনাকে অল্প বা অধিক পরিমাণে এবং কুত্রচিৎ কখনও সর্বতোভাবে বিসর্জন দেয়।"

সারমর্ম : জন্মগতভাবেই মানুষ আপন স্বার্থে মগ্ন। নিজের ভালোমন্দ নিয়েই তার যত চিন্তা। অন্যান্য জীবজন্তুর মধ্যেও অনুরূপ লক্ষণ দেখা যায়। পৃথিবীর সবাই যেন নিজের স্বার্থের জন্য ছুটছে। কিন্তু এ স্বার্থপরতার মধ্যেও যারা প্রকৃত মহৎ তারা নিজের সুখের কথা চিন্তা না করে অন্যের সুখের জন্য স্বার্থত্যাগ করে থাকেন।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



অথবা,

খ. জীর্ণ পৃথিবীতে ব্যর্থ, মৃত আর ধ্বংসস্তূপ-পিঠে
চলে যেতে হবে আমাদের।
চলে যাব– তবু আজ যতক্ষণ দেহে আছে প্রাণ
প্রাণপণে পৃথিবীর সরাবো জঞ্জাল,
এ বিশ্বকে এ শিশুর বাসযোগ্য ক'রে যাব আমি–
নবজাতকের কাছে এ আমার দৃঢ় অঙ্গীকার।

সারমর্ম : মানবজীবন খুবই ক্ষণস্থায়ী। অসংখ্য সমস্যায় জর্জরিত পৃথিবী ক্রমান্বয়ে জীর্ণ-শীর্ণ ও ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে; তাই ক্ষণস্থায়ী জীবনে যতদিন পৃথিবীতে থাকা হবে ততদিন প্রত্যেকেরই উচিত ভালো কাজের মাধ্যমে পরবর্তী বংশধরদের জন্য সুখী-সমৃদ্ধ সুন্দর পৃথিবী গড়ার দৃঢ় অঙ্গিকারবদ্ধ হওয়া। এভাবেই সম্ভব পৃথিবীকে মনুষ্য বাসের যোগ্য রাখা।

৪. যে কোনো পাঁচটি বাগধারা দিয়ে বাক্য রচনা করুন : ৫

ক. আঠারো মাসে বছর (দীর্ঘসূত্রিতা)— আশরাফের তো আঠারো মাসে বছর, এমন জরুরি কাজ তাকে দিয়ে হবে না।

খ. কালনেমির লঙ্কাভাগ (দুর্লভ বস্তু লাভের আগে তা উপভোগ করার অলীক কল্পনা)—গলির মুখে একটি মুদি দোকান করেই সোহেল গুলশানে একটি পাঁচতলা বাড়ি কিনে সেখানে সুইমিং পুল তৈরির কথা ভাবছে, এ যে কালনেমির লঙ্কাভাগ।

গ. ঘর-জাত করা (অভ্যন্তরীণ সমস্যা সমাধান করা)— বন্ধু, অপরের সমস্যা না দেখে নিজের ঘর-জাত করো আগে।

ঘ. ঘাট মানা (দোষ স্বীকার করা)— ঘাট মানলাম, এমনটি আর হবে না।

ঙ. চড় মেরে গড় (অপমানের পর সম্মান প্রদর্শন)— প্রকাশ্য জনসভায় সকলের সামনে যাচ্ছে-তাই বলে এখন এসেছো দোয়া নিতে, এ তো চড় মেরে গড় হলো।

চ. শিয়ালের ডাক (অশুভ লক্ষণ)— এমনিতেই সন্ত্রাস, চাঁদাবাজী, দলীয়করণে দেশের মানুষের নাভিশ্বাস উঠেছে, তার ওপর আবার জঙ্গিবাদ তৎপরতাকে মনে হচ্ছে শিয়ালের ডাক।

ছ. হাড়-হদ্দ (নাড়ী নক্ষত্র)— আনিসকে পাত্তা দেবেন না, সে একটা ভণ্ড, আমি তার হাড়-হদ্দ জানি।

জ. অতি আশা বাঘের বাসা (অতিরিক্ত কোনো কিছুই ভালো না)— ক্যাডার সার্ভিসে যোগ দেবে বলে মজিদ অন্য চাকরিতে যোগ দিল না, এখন দেখা যাচ্ছে চাকরির বয়স শেষ হয়ে যাচ্ছে কিন্তু ক্যাডার সার্ভিসের দেখা নেই, এ যে দেখছি অতি আশা বাঘের বাসার মতো অবস্থা।

ঝ. পেট গরম (খাবারে অরুচি হওয়া)— মধ্যাহ্ন ভোজের সময় পরিমাণের দিকে খেয়াল না করায় বজলুর পেট গরম হয়েছে, এখন সামান্য একটি আপেলও খেতে চাচ্ছে না।

ঞ. ছ আঙ্গুলের আঙ্গুল (অতিরিক্ত)— ঘরজামাই জহির সাহেব সরকার বাড়িতে হয়েছে ছ আঙ্গুলের আঙ্গুল, তার কোনো গুরুত্বও নেই কাজও নেই।

৫. এক কথায় প্রকাশ করুন (যে কোনো পাঁচটি) : ৫

ক. আপনার রং যে লুকায় —বর্ণচোরা।
খ. একই গুরুর শিষ্য—সতীর্থ।
গ. কষ্টে গমন করা যায় যেখানে—দুর্গম।
ঘ. জয়ের জন্য যে উৎসব—জয়োৎসব।
ঙ. সরোবরে জন্মে যা—সরোজ।



চ. মৃত্তিকা দিয়ে নির্মিত—মৃন্ময়।
ছ. পুনঃপুনঃ দীপ্তি পাচ্ছে যা—দেদীপ্যমান।
জ. দুবার জন্মে যে—দ্বিজ।
ঝ. সামনে অগ্রসর হয়ে অভ্যর্থনা—প্রত্যুদ্গমন।
ঞ. যে মেয়ের বিয়ে হয়নি—অনূঢ়া।

৬. শুদ্ধ করে লিখুন : ১০

| অশুদ্ধ | শুদ্ধ |
|---|---|
| ক. গড্ডালিকা প্রবাহ। | ক. গড্ডলিকা প্রবাহ। |
| খ. ইহার আবশ্যক নাই। | খ. ইহার আবশ্যকতা নাই। |
| গ. এটা হচ্ছে ষষ্ঠদশ বার্ষিক সাধারণ সভা। | গ. এটা হচ্ছে ষোড়শ বার্ষিক সাধারণ সভা। |
| ঘ. সকল সদস্যবৃন্দ সভায় উপস্থিত ছিলেন। | ঘ. সকল সদস্য সভায় উপস্থিত ছিলেন। |
| ঙ. তিনি স্বস্ত্রীক কুমিল্লায় বাস করেন। | ঙ. তিনি সস্ত্রীক কুমিল্লায় বসবাস করেন। |
| চ. লোকটি তোমার বিরুদ্ধে সাক্ষী দিয়েছে। | চ. লোকটি তোমার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিয়েছে। |
| ছ. বর্ণিত অবস্থা প্রেক্ষিতে তার আবেদন মঞ্জুর করা যায়। | ছ. বর্ণিত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তার আবেদন মঞ্জুর করা যায়। |
| জ. মেধাবী ছাত্রছাত্রীদেরকে সম্বর্ধনা দেওয়া হয়েছে। | জ. মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদেরকে সংবর্ধনা দেয়া হয়েছে। |
| ঝ. স্বাক্ষরতা কর্মসূচী সফল হয়েছে। | ঝ. সাক্ষরতা কর্মসূচি সফল হয়েছে। |
| ঞ. উপরোক্ত। | ঞ. উপর্যুক্ত। |

৭. সন্ধি বিচ্ছেদ করুন : ১০

ক. ষাণ্মাসিক = ষট্ + মাস + ইক
খ. রাজ্ঞী = রাজ্ + নী
গ. শয়ন = শে + অন
ঘ. মিথ্যা = মিথ্ + য + আ
ঙ. বিদ্যুদ্বেগ = বিদ্যুৎ + বেগ
চ. পর্যালোচনা = পরি + আলোচনা
ছ. ঐশ্বরিক = ঈশ্বর + ইক
জ. অতীব = অতি + ইব
ঝ. তস্কর = তৎ + কর
ঞ. উৎসর্গ = উৎ + সর্গ

৮. নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলোর উত্তর দিন : ১০

ক. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল কত সালে?
— ১৯২১ সালে।

খ. শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের আবিষ্কারকের পূর্ণনাম লিখুন, উপাধিসহ।
— শ্রী বসন্তরঞ্জন রায়, তার উপাধি ছিল 'বিদ্বদ্বল্লভ'। (বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুরের নিকটবর্তী কাঁকিল্যা গ্রামের দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের বাড়ির গোয়াল ঘরের মাচা থেকে তিনি শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যটি সংগ্রহ করেন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ তাকে 'বিদ্বদ্বল্লভ' উপাধি প্রদান করে)।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



গ. মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে প্রথম মুসলিম কবি কে?

— শাহ মুহম্মদ সগীর।

ঘ. আলাওল রচিত তিনটি কাব্যের নাম লিখুন।

— সয়ফুলমুলক বদিউজ্জামাল, হপ্ত পয়কর, পদ্মাবতী।

ঙ. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর রচিত 'ভ্রান্তিবিলাস' ইংরেজি কোন বইয়ের অনুবাদ?

— Comedy of Erros. (১৮৬৯ সালে বিদ্যাসাগর শেক্সপীয়রের Comedy of Erros বইটি অনুবাদ করেন)।

চ. বৈষ্ণব পদাবলীর দুজন পদকর্তার নাম লিখুন।

— বিদ্যাপতি, জ্ঞানদাস।

ছ. 'বেতাল পঞ্চবিংশতি' কার লেখা?

— ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

জ. প্রমথ চৌধুরীর ছদ্মনাম কি?

— বীরবল।

ঝ. মুনীর চৌধুরীর দুটি নাটকের নাম লিখুন।

— 'কবর' ও 'রক্তাক্ত প্রান্তর'।

ঞ. 'অশ্রুমালা' কাব্যের রচয়িতা কে?

— কায়কোবাদ (তার প্রকৃত নাম মুহম্মদ কাজেম আল কুরায়শী)।

## ২৪তম বিসিএস : ২০০৩

[দ্রষ্টব্য : *বাংলা ভাষায় প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। তবে টেকনিক্যাল শব্দগুলো ইংরেজিতে লেখা চলবে। প্রত্যেক প্রশ্নের মান প্রশ্নের শেষ প্রান্তে দেখানো হয়েছে।]* নম্বর

১. যে কোনো একটি বিষয় অবলম্বনে প্রবন্ধ লিখুন : ৩০

ক. সবার জন্য শিক্ষা

উত্তর : পৃষ্ঠা ৮১৪।

খ. প্রসঙ্গ বাংলাদেশ এবং সার্ক

গ. মূল্যবোধের অবক্ষয় ও যুবসমাজ

উত্তর : পৃষ্ঠা ৬৮২।

ঘ. পরিবেশ দূষণ ও প্রতিকার

উত্তর : পৃষ্ঠা ৮৪৯।

ঙ. একুশ শতকের পৃথিবী : আমাদের প্রত্যাশা

২. ভাব-সম্প্রসারণ করুন : ১৫

ক. বই কিনে কেউ দেউলিয়া হয় না।

উত্তর : পৃষ্ঠা ১৫৭।

অথবা,

খ. সাহিত্য, শিল্প, সঙ্গীত কালচারের উদ্দেশ্য নয়-উপায়।

উত্তর : পৃষ্ঠা ১৬৮।



৩. সারমর্ম লিখুন : ১৫

ক. বিপুলা এ পৃথিবীর কতটুকু জানি!
দেশে দেশে কত-না নগর রাজধানী
মানুষের কত কীর্তি, কত নদী গিরি সিন্ধু মরু,
কত-না অজানা জীব, কত-না অপরিচিত তরু
রয়ে গেল অগোচরে, বিশাল বিশ্বের আয়োজন;
মন মোর জুড়ে থাকে অতিক্ষুদ্র তারি এক কোণ।

উত্তর : পৃষ্ঠা ২৬৭।

অথবা,

খ. যুগধর্মের সহিত আমাদিগকে পা মিলাইয়া চলিতে হইবে, কিন্তু তাহার নিকট অমন করিয়া আত্মসমর্পণ করিলে চলিবে না। আমাদের বুঝিতে হইবে-যাহাকে আমরা যুগধর্ম বলি, তাহার অনেকখানি হুজুগ-ধর্ম। এই হুজুগ-ধর্মের তাড়নায় ভাসিয়া না গিয়া তাহাকে রোধ করিতে পারিলেই আমাদের মঙ্গল। যাহারা চিন্তাশীল, যাহারা মহাপুরুষ, তাহারা আপন চিন্তা, পৌরুষ ও মহিমা দ্বারা যুগ প্রবাহকে ফিরাইয়া দেন- যুগ-ধর্মের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া তাঁহারা যুদ্ধ করেন। আর যাহারা দুর্বল ও অপরিণামদর্শী, তাহারাই নূতনের প্রথম আঘাতেই পরাজয় স্বীকার করে।

উত্তর : পৃষ্ঠা ২৬৭।

৪. শুদ্ধ করে লিখুন : ১০

| অশুদ্ধ | শুদ্ধ |
|---|---|
| ক. বনান ভুল দোষণীয়। | ক. বানান ভুল দূষণীয়। |
| খ. ইহা প্রমাণ হয়েছে। | খ. ইহা প্রমাণিত হয়েছে। |
| গ. উৎপন্ন বৃদ্ধির জন্যে চাই কঠোর পরিশ্রম। | গ. উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য চাই কঠোর পরিশ্রম। |
| ঘ. অধীনস্ত কর্মচারীরা করেছে। | ঘ. অধীন কর্মচারীরা করেছে। |
| ঙ. ছেলেটি ভয়ানক মেধাবী। | ঙ. ছেলেটি অত্যন্ত মেধাবী। |
| চ. জাপান উন্নতশীল দেশ। | চ. জাপান উন্নত দেশ। |
| ছ. বিনয় উন্নত ব্যক্তিত্যের উপাদান। | ছ. বিনয় উন্নত ব্যক্তিত্বের উপাদান। |
| জ. দুষ্কৃতকারীরা সমাজের শত্রু। | জ. দুষ্কৃতকারী সমাজের শত্রু। |
| ঝ. দৈন্যতা প্রশংসনীয় নয়। | ঝ. দৈন্য/দীনতা প্রশংসনীয় নয়। |
| ঞ. বিবিধ প্রকার দ্রব্য কিনলাম। | ঞ. বিবিধ দ্রব্য কিনলাম। |

৫. উপযুক্ত শব্দ বসিয়ে শূন্যস্থান পূরণ করুন : ১০

ক. সারাবছর না পড়লে পরীক্ষার আগে — স্বাভাবিক। (চোখে সরষে ফুল দেখাটাই)

খ. আমার বিষয়ে আপনি কেন — করবেন? (অনধিকার চর্চা)

গ. — ভাবতে ভাবতে দিন শেষ হয়ে গেল। (আকাশ কুসুম)

ঘ. সব সময় নিজের — চলবে। (ওজন বুঝে)

ঙ. অধ্যয়নই ছাত্র জীবনের তপস্যা, একথা সত্য, তবে — সত্য নয়। (একমাত্র)

চ. আজকাল অনেকেই — মালিক হয়েছে। (কালো টাকার)

ছ. পুলিশের ভয়ে লাফ দিতে গিয়ে চোর — গেল। (মারা)

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



জ. বিসিএস পরীক্ষা — নয় যে এত কম পড়ে পেরে যাবে। (ছেলের হাতে মোয়া)
ঝ. হরিপদ কেরানী কারো — নাই। (সাতেও নাই, পাঁচেও)
ঞ. স্রষ্টা তাঁর সৃষ্টির মধ্যে ওতপ্রোতভাবে — থাকেন। (জড়িত/ মিশে)

৬. যে কোনো পাঁচটি বাগধারা দিয়ে বাক্য রচনা করুন : ৫
ক. কড়ায়-গণ্ডায় (পুরোপুরি) : হিসাবটা আমি আজ কড়ায়-গণ্ডায় নিব।
খ. আড়িপাতা (গোপনে শোনা) : সুমন আড়ি পেতে সব কথা শুনে ফেলেছে।
গ. আমড়া কাঠের ঢেঁকি (অপদার্থ) : তার মতো আমড়া কাঠের ঢেঁকি দিয়ে এ কাজ হবে না।
ঘ. কাঠের পুতুল (নির্বাক, অসার) : কাঠের পুতুলের মতো দাঁড়িয়ে কি দেখছ?
ঙ. উড়নচণ্ডী (অমিতব্যয়ী) : এত উড়নচণ্ডী হইও না, ভবিষ্যতে ভুগতে হবে।
চ. গুঁড়েবালি (আশায় নৈরাশ্য) : ভেবেছিলাম তোমার কাছ থেকে সাহায্য পাব, কিন্তু এখন দেখছি সে আশায় গুঁড়েবালি।
ছ. ইতরবিশেষ (পার্থক্য) : সৃষ্টিকর্তার নিকট সব মানুষই সমান, ইতরবিশেষ নেই।
জ. জিলাপির প্যাঁচ (কূটবুদ্ধি) : তোমার ভেতরে যে এতো জিলাপির প্যাঁচ তা আগে জানতাম না।

৭. এক কথায় প্রকাশ করুন (যে কোনো পাঁচটি) : ৫
ক. চৈত্র মাসের ফসল– চৈতালী।
খ. পাওয়ার ইচ্ছা– কামনা/অভিলাষ।
গ. যে উপকারীর ক্ষতি করে– কৃতঘ্ন।
ঘ. বিদেশ থেকে আগত– বৈদেশিক।
ঙ. প্রিয় বাক্য বলে যে নারী– প্রিয়ংবদা।
চ. যা অধ্যয়ন করা হয়েছে– অধীত।
ছ. শত বর্ষের সমাহার– শতাব্দী।
জ. যার আকার কুৎসিত– কদাকার।

৮. নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলোর উত্তর দিন : ১০
ক. চর্যাপদ কি? তিন জন পদকর্তার নাম লিখুন।
— বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন যুগের একমাত্র নিদর্শন হচ্ছে চর্যাপদ। বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যদের সাধন সঙ্গীত এ চর্যাপদ মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী নেপালের রাজদরবার থেকে আবিষ্কার করেন ১৯০৭ সালে। চর্যাপদের তিনজন পদকর্তার নাম হচ্ছে– লুইপা, কাহ্নপা ও কুক্কুরীপা।
খ. ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে কত সালে বাংলা বিভাগ খোলা হয়?
— ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে বাংলা বিভাগ খোলা হয় ১৮০১ সালে।
গ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পাঁচটি ছোটগল্পের নাম লিখুন।
— রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পাঁচটি ছোটগল্প হলো– পোস্টমাস্টার, দেনা-পাওনা, মধ্যবর্তিনী, সমাপ্তি ও নষ্টনীড়।
ঘ. নজরুল ইসলামের কোন গ্রন্থ ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত হয়?
— কাজী নজরুল ইসলাম রচিত যেসব গ্রন্থ ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত হয় : বিষের বাঁশি, ভাঙ্গার গান, প্রলয়-শিখা, যুগবাণী ও চন্দ্রবিন্দু।
ঙ. লালসালু, সূর্য-দীঘল বাড়ী, চিলেকোঠার সেপাই—কার লেখা?
— লালসালু : সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ।
সূর্য-দীঘল বাড়ী : আবু ইসহাক।
চিলেকোঠার সেপাই : আখতারুজ্জামান ইলিয়াস।



চ. রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন কেন বিখ্যাত?
— মুসলিম নারী জাগরণের অগ্রদূত বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন নারী শিক্ষায় অবদানের পাশাপাশি বাংলা সাহিত্যকে নানাভাবে সমৃদ্ধ করেছেন। মতিচূর, অবরোধবাসিনী, সুলতানার স্বপ্ন, পদ্মরাগ ইত্যাদি তার উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ।
ছ. বাংলাদেশের তিনজন নাট্যকার ও তাঁদের একটি করে নাটকের নাম লিখুন।
— মীর মশাররফ হোসেন : বসন্তকুমারী।
মুনীর চৌধুরী : কবর।
আবদুল্লাহ আল মামুন : সুবচন নির্বাসনে।
জ. রবীন্দ্রনাথের 'শেষের কবিতা' কোন ধরনের গ্রন্থ?
— একটি কাব্যধর্মী উপন্যাস।
ঝ. জসীমউদ্দীন কোন অর্থে পল্লীকবি?
— পল্লী বাংলার জীবন ও প্রকৃতিকে তিনি তার লেখায় অত্যন্ত দক্ষতায় আধুনিক শিল্পীর তুলি দিয়ে চিত্রায়িত করেছেন। এজন্য তিনি বাংলা সাহিত্যে পল্লীকবি নামে পরিচিত।
ঞ. 'কল্লোল' কী?
— 'কল্লোল' হচ্ছে দীনেশরঞ্জন দাস সম্পাদিত একটি পত্রিকা। ১৯২৩ সালে এ পত্রিকাটি প্রথম প্রকাশিত হয়।

## ২৩তম (বিশেষ) বিসিএস : ২০০১

[দ্রষ্টব্য : *বাংলা ভাষায় প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। টেকনিক্যাল শব্দগুলো ইংরেজিতে লেখা চলবে। প্রত্যেক প্রশ্নের মান প্রশ্নের শেষ প্রান্তে দেখানো হয়েছে।*]

১. যে কোনো একটি বিষয়ে প্রবন্ধ লিখুন : ৩০
ক. আন্তর্জাতিকতা ও জাতীয় চেতনা
খ. বাংলাদেশের জনসংখ্যা সমস্যা ও তার সমাধান পরিকল্পনা
গ. পহেলা বৈশাখ
ঘ. সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা : পরিকল্পনা ও সাফল্য
উত্তর : পৃষ্ঠা ৮১৪।
ঙ. বাংলাদেশের কবিতায় মুক্তিযুদ্ধের প্রতিফলন

২. ভাব-সম্প্রসারণ করুন : ১৫
ক. পুষ্প আপনার জন্য ফোটে না।
উত্তর : পৃষ্ঠা ২৬৭।
*অথবা,*
খ. বিদ্যা যতই বাড়ে ততই জানা গেল যে, কিছুই জানা হলো না।
উত্তর : পৃষ্ঠা ২৬৮।

৩. সারমর্ম লিখুন : ১৫
ক. এ দুর্ভাগা দেশ হতে হে মঙ্গলময়
দূর করে দাও তুমি সর্ব তুচ্ছ ভয়–

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



লোকভয়, রাজভয়, মৃত্যুভয় আর।
দীন প্রাণ দুর্বলের এ পাষাণ ভার,
এই চিরপেষণ যন্ত্রণা, ধূলিতলে
এই নিত্য অবনতি, দণ্ডে পলে পলে
এই আত্মঅবমান, অন্তরে বাহিরে
এই দাসত্বের রজ্জু, ত্রস্ত নতশিরে
সহস্রের পদপ্রান্ততলে বারম্বার
মনুষ্যমর্যাদাগর্ব বিষপরিহার—
এ বৃহৎ লজ্জা রাশি চরণ আঘাতে
চূর্ণ করি দূর কর। মঙ্গল প্রভাতে
মস্তক তুলিতে দাও অনন্ত আকাশে
উদার আলোক মাঝে উন্মুক্ত বাতাসে।

**উত্তর : পৃষ্ঠা ২৬৭।**

*অথবা,*

খ. চরিত্র শুধু মানবজীবনের অলংকার নহে, ইহা আবার একটি অমূল্য সম্পত্তিও। আমাদের পার্থিব ধন-সম্পত্তির মূল্য নির্ধারণ করা যায়, কিন্তু চরিত্রের কোনো মূল্য নির্ধারণ করা যায় না। চরিত্রবান লোক নির্ধন হইলেও ধনীর ন্যায় সম্মান লাভ করিয়া থাকেন। চরিত্র বলে মানুষ বহুর ওপরে আধিপত্য স্থাপন করে। ধনী ধন লইয়া সকল সময় শান্তিলাভ করিতে পারে না, কিন্তু চরিত্রধনে ধনী ব্যক্তি সততই চিত্তের শান্তিলাভ করিতে পারেন। চরিত্র মানুষের মনুষ্যত্বের উপাদান। সুতরাং চরিত্রই মানব জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ— একমাত্র কাম্যবস্তু।

**উত্তর : পৃষ্ঠা ২৬৭।**

৪. **শুদ্ধ করে লিখুন :** ১০

| অশুদ্ধ | শুদ্ধ |
|---|---|
| ক. জ্ঞানী মানুষ অবশ্যই যশলাভ করেন। | ক. জ্ঞানী মানুষ অবশ্যই যশোলাভ করেন। |
| খ. নিজের বিষয়ে তার কোন মনযোগ নেই। | খ. নিজের বিষয়ে তার কোনো মনোযোগ নেই। |
| গ. তার দুরাবস্থা দেখে দুঃখ হয়। | গ. তার দুরবস্থা দেখে দুঃখ হয়। |
| ঘ. নিরপরাধী ব্যক্তিকে ক্ষমা কর। | ঘ. নিরপরাধ ব্যক্তিকে ক্ষমা কর। |
| ঙ. সে আকণ্ঠ পর্যন্ত পান করেছে। | ঙ. সে আকণ্ঠ পান করেছে। |
| চ. মৃত্যু ভয়ে সে সশঙ্কিত হল। | চ. মৃত্যু ভয়ে সে শঙ্কিত হল। |
| ছ. বন্ধুর ভুল সম্পর্কে সতর্কিত করা উচিত। | ছ. বন্ধুর ভুল সম্পর্কে সতর্ক করা উচিত। |
| জ. এ প্রশংসা তার সম্পর্কে প্রযুজ্য নয়। | জ. এ প্রশংসা তার সম্পর্কে প্রযোজ্য নয়। |
| ঝ. তার সৃজিত ভুলে তার ভবিষ্যৎ নষ্ট হল। | ঝ. সৃজিত ভুলে তার ভবিষ্যৎ নষ্ট হল। |
| ঞ. সে খুবই বিদ্যান ব্যক্তি। | ঞ. সে খুবই বিদ্বান ব্যক্তি। |

৫. **উপযুক্ত শব্দ বসিয়ে শূন্যস্থান পূর্ণ করুন :** ১০

ক. আমি আজ পর্যন্ত কারো নিকট — পাতিনি। (হাত)
খ. এই ছেলেটি দেশের — উজ্জ্বল করবে। (মুখ)



গ. — বয়স না হলে পাকা বুদ্ধি হয় না। (পাকা)
ঘ. এ কাজ করলে তোমার — চুনকালি লাগবে। (মুখে)
ঙ. বুদ্ধিতে তোমার কাছে সে কোথায় —? (পারে)
চ. সে একজন — বলে —। (উড়নচণ্ডী, পরিচিত)
ছ. আমি কারো পাকা ধানে — দিয়েছি যে ভয় পাব? (মই)
জ. পুরনো বন্ধুর সাথে এখন তো তার — সম্পর্ক। (সাপে নেউলে)
ঝ. এ তোমার ভুল, অনুরোধে তুমি — গেলাতে পারবে না। (ঢেঁকি)
ঞ. এমন — লোক দিয়ে বিশ্বদর্শন হয় না। (গোঁফখেজুরে)

৬. **যে কোনো পাঁচটি বাগধারা দিয়ে বাক্য রচনা করুন :** ৫

ক. **অন্ধের নড়ি** (একমাত্র অবলম্বন) : ছেলেটি তার দুঃখিনী মায়ের একমাত্র অন্ধের নড়ি।
খ. **অরণ্যে রোদন** (বৃথা ক্রন্দন) : বড় সাহেবের কাছে ছুটি চাওয়া শুধুই অরণ্যে রোদন।
গ. **আষাঢ়ে গল্প** (অবিশ্বাস্য কাহিনী) : রহমত আষাঢ়ে গল্প বলায় বেশ পারদর্শী।
ঘ. **এলাহী কাণ্ড** (বিরাট ব্যাপার) : এ তো দেখছি বিয়ে নয়, যেন এক এলাহী কাণ্ড।
ঙ. **ভিজা বিড়াল** (কপটচারী) : রহিম যে একটা ভিজা বিড়াল তা বাইরে থেকে বোঝা যায় না।
চ. **মগের মুল্লুক** (অরাজক) : এটা কি মগের মুল্লুক যে ছাত্রনেতারা যা ইচ্ছা তাই করবে?
ছ. **মণিহারা ফণী** (প্রিয় বস্তু হারানোয় অস্থিরচিত্ত ব্যক্তি) : দেওয়ান সাহেব তার ছেলের মৃত্যুতে এমনই দিশেহারা যেন মণিহারা ফণী।
জ. **শাপে বর** (অকল্যাণে কল্যাণ) : বাজারের সেক্রেটারি না হয়ে আমার সাপে বর হয়েছে, কারণ বাজারে চুরির ঝামেলা আমাকেই পোহাতে হতো।
ঝ. **সবেধন নীলমণি** (একমাত্র অবলম্বন) : আমি তো আমার মায়ের সবেধন নীলমণি, তাই আমাকে সাবধানে চলতে হয়।

৭. **এক কথায় প্রকাশ করুন (যে কোনো পাঁচটি) :** ৫

ক. অকালে পক্ব হয়েছে যা— অকালপক্ব।
খ. অনেকের মধ্যে একজন— অন্যতম।
গ. অহংকার নেই যার— নিরহংকার।
ঘ. আপনাকে কেন্দ্র করেই যার চিন্তা— আত্মকেন্দ্রিক।
ঙ. আপনাকে যে পণ্ডিত মনে করে— পণ্ডিতম্মন্য।
চ. ইতিহাস বিষয়ে অভিজ্ঞ যিনি— ইতিহাসবেত্তা।
ছ. ইন্দ্রিয়কে জয় করেছে যে— জিতেন্দ্রিয়।
জ. যা দমন করা যায় না— অদম্য।
ঝ. যা বার বার দুলছে— দোদুল্যমান।

৮. **নিম্নলিখিত প্রশ্নের উত্তর দিন :** ১০

ক. **বাংলা কোন ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্গত?**
— ইন্দো-ইউরোপীয়।

খ. **কাব্যে আমপারা কে লিখেছেন?**
— কাজী নজরুল ইসলাম।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



গ. রবীন্দ্রনাথের শেষ কাব্যের নাম কি?
— শেষলেখা।
ঘ. কাজী নজরুল ইসলামের ছোটগল্পের বইয়ের নাম কি?
— শিউলিমালা।
ঙ. জসীমউদ্দীনের সোজন বাদিয়ার ঘাট কাব্যের প্রধান চরিত্রগুলোর নাম লিখুন?
— সোজন ও দুলি।
চ. 'চাঁদের অমাবস্যা' কার লেখা?
— সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ।
ছ. মুনীর চৌধুরীর 'কবর' নাটকের বিষয় কি?
— ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন।
জ. 'সংশপ্তক' কার লেখা?
— শহীদুল্লাহ কায়সারের।
ঝ. 'কাঞ্চনগ্রাম' কার লেখা?
— শামসুদ্দীন আবুল কালামের।
ঞ. হাসান হাফিজুর রহমানের ভাষা আন্দোলনবিষয়ক সংকলন গ্রন্থের নাম কি?
— 'একুশে ফেব্রুয়ারি'।

## ২২তম বিসিএস : ২০০১

[দ্রষ্টব্য : *বাংলা ভাষায় প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। তবে টেকনিক্যাল শব্দগুলো ইংরেজিতে লেখা চলবে। প্রত্যেক প্রশ্নের মান প্রশ্নের শেষ প্রান্তে দেখানো হয়েছে।*]

১. যে কোনো একটি বিষয় অবলম্বনে প্রবন্ধ লিখুন : ৩০
ক. মাতৃভাষা বনাম দ্বিতীয় ভাষা
খ. আকাশ-সংস্কৃতি
উত্তর : পৃষ্ঠা ৭২০।
গ. আইনের শাসন
উত্তর : পৃষ্ঠা ৬২৭।
ঘ. বাংলাদেশের পানীয় জলে আর্সেনিক সমস্যা
ঙ. বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক একটি উপন্যাস।
উত্তর : পৃষ্ঠা ৭৯৭।

২. ভাব-সম্প্রসারণ করুন : ১৫
ক. স্ফুলিঙ্গ তার পাখায় পেল
ক্ষণকালের ছন্দ
উড়ে দিয়ে ফুরিয়ে গেল
সেই তারি আনন্দ।
উত্তর : পৃষ্ঠা ১৬৬।

*অথবা,*
খ. বার্ধক্য তাহাই যাহা পুরাতনকে, মিথ্যাকে, মৃতকে আঁকড়িয়া পড়িয়া থাকে।
উত্তর : পৃষ্ঠা ১৬৭।



৩. সারমর্ম লিখুন : ১৫
ক. আমাদের একরত্তি উঠোনের কোণে
উড়ে-আসা চৈত্রের পাতায়
পাণ্ডুলিপি বই ছেঁড়া মলিন খাতায়
গ্রীষ্মের দুপুরে ঢক্‌ঢক্‌
জল-খাওয়া কুঁজোয় গেলাশে, শীত ঠক্‌ঠক্‌
রাত্রির নরম লেপে দুঃখ তার বোনে
নাম
অবিরাম।
উত্তর : পৃষ্ঠা ২৬৬।

*অথবা,*
খ. জন্তুরা আহার পায় বাঁচে, আঘাত পায় মরে, যেটাকে পায় সেটাকেই বিনা তর্কে মেনে নেয়। কিন্তু মানুষের সবচেয়ে বড়ো স্বভাব হচ্ছে মেনে না নেওয়া। জন্তুরা বিদ্রোহী নয়, মানুষ বিদ্রোহী। বাইরে থেকে যা ঘটে, যাতে তার নিজের কোনো হাত নেই, কোনো সায় নেই, সেই ঘটনাকে মানুষ একেবারে চূড়ান্ত বলে স্বীকার করেনি বলেই জীবের ইতিহাসে সে আজ এতো বড়ো গৌরবের পদ দখল করে বসেছে।
উত্তর : পৃষ্ঠা ২৬৬।

৪. শুদ্ধ করে লিখুন : ১০

| অশুদ্ধ | শুদ্ধ |
|---|---|
| ক. জমিজমার সামান্ন আয় থেকে তিনি কোনমতে ক্ষুন্নিবৃত্তি নিবারণ করেন। | ক. জমিজমার সামান্য আয় থেকে তিনি কোনোমতে ক্ষুণ্ণিবৃত্তি করেন। |
| খ. শামসুর রাহমান বাংলাদেশের একজন অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি। | খ. শামসুর রাহমান বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ কবি। |
| গ. কলেজের পুর্নর্মিলনী উৎসবে বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ যোগদান করেন। | গ. কলেজের পুনর্মিলনী উৎসবে বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ যোগদান করেন। |
| ঘ. বিয়েবাড়িতে গিয়ে তিনি আকণ্ঠ পর্যন্ত খেয়ে এলেন। | ঘ. বিয়েবাড়িতে গিয়ে তিনি আকণ্ঠ খেয়ে এলেন। |
| ঙ. বাংলা ব্যাকরণ অত্যান্ত জটিল। | ঙ. বাংলা ব্যাকরণ অত্যন্ত জটিল। |
| চ. বমালশুদ্ধ চোর গ্রেপ্তার হয়েছে। | চ. মালশুদ্ধ চোর গ্রেপ্তার হয়েছে। |
| ছ. আদালত তাকে সশরীরে হাজির হইবার নির্দেশ দিয়েছেন। | ছ. আদালত তাকে হাজির হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। |
| জ. তার কঠিন পরিশ্রমের ফলশ্রুতিতে সে সাফল্য অর্জন করল। | জ. কঠোর পরিশ্রমের ফলে সে সাফল্য অর্জন করল। |
| ঝ. সে বড় দুরাবস্থায় পরেছে। | ঝ. সে বড় দুরবস্থায় পড়েছে। |
| ঞ. সাধারণ জন গড্ডালিকা প্রবাহে ভেসে চলে। | ঞ. সাধারণ জনগণ গড্ডলিকা প্রবাহে ভেসে চলে। |

৫. উপযুক্ত শব্দ বসিয়ে শূন্যস্থান পূর্ণ করুন : ১০
ক. গণপিটুনিতে মাস্তানটি — পেল। (অক্কা)
খ. ওকে — দিয়ে বের করে দাও। (গলাধাক্কা)
গ. যত গর্জে তত — না। (বর্ষে)
ঘ. তোমার মুখ — এবারে ওকে মাফ করে দিলাম। (রাখতে)
ঙ. তুমি দেখছি একটা — এ সামান্য কথাটা বুঝতে পারলে না? (বুদ্ধির ঢেঁকি)
চ. পরীক্ষার ফল শুনে — পড়ল। (মাথায় বাজ)
ছ. চোখে — দিয়ে দেখালে তবে তিনি দেখতে পান। (আঙ্গুল)

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



জ. কোথা থেকে এটা — এসে জুড়ে বসল। (উড়ে)
ঝ. লজ্জায় সে — সঙ্গে মিশে গেল। (মাটির)
ঞ. তাকে আমি হাড়ে — চিনেছি। (হাড়ে)

৬. যে কোনো পাঁচটি বাগধারা দিয়ে বাক্য রচনা করুন : ৫

ক. কানাকড়ির সম্পর্ক (তুচ্ছ সম্পর্ক) : আত্মীয় হলেই বা কি, তার সাথে আমাদের কানাকড়ির সম্পর্কও নাই।
খ. চোখের চামড়া (লজ্জা) : সুদখোরদের চোখের চামড়া থাকে না বলেই সুদ চাইতে পারে।
গ. পায়াভারি (অহঙ্কার) : চেয়ারম্যান হয়ে রহমান সাহেবের পায়াভারি হয়েছে।
ঘ. ব্যাঙের সর্দি (অসম্ভব কিছু) : কাদাজলেই যে সারাজীবন কাটাল সামান্য ঠাণ্ডায় তার অসুখ করার কথা ব্যাঙের সর্দির মতোই মনে হয়।
ঙ. ষোলআনা (সার্থক/সম্পূর্ণ) : ফার্স্টক্লাস তো পেল, এবার একটা চাকরি পেলেই তার জীবন ষোলআনা পূর্ণ হবে।
চ. কান পাতলা (যে সব কথাই বিশ্বাস করে) : আমি তোর বাবার মতো কান পাতলা নই যে সব কথাই বিশ্বাস করব।
ছ. ঘোড়ারোগ (অবস্থার অতিরিক্ত ভাবনা) : বিছানার চাটাই নেই, আবার গাড়ি কিনতে চাও; তোমার দেখছি ঘোড়ারোগ হয়েছে।
জ. তালকানা (বোধহীন) : তালকানা ছেলেটি পকেটে কলম রেখে সারা ঘরে খোঁজাখুঁজি করছে।

৭. এক কথায় প্রকাশ করুন (যে কোনো পাঁচটি) : ৫

ক. যা অবশ্যই হবে — অবশ্যম্ভাবী।
খ. যে বেশি কথা বলে — বাচাল।
গ. যা পূর্বে শোনা যায় নাই — অশ্রুতপূর্ব।
ঘ. যা সহজে পাওয়া যায় না — দুর্লভ।
ঙ. যে নারীর একটি সন্তান হয়েছে — কাকবন্ধ্যা।
চ. যে ব্যক্তির স্ত্রী মৃত — বিপত্নীক।
ছ. যার অন্য উপায় নেই — অনন্যোপায়।
জ. যে পরের উপকার স্বীকার করে না — অকৃতজ্ঞ।

৮. নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলোর উত্তর দিন : ১০

**ক. বড়ু চণ্ডীদাসের কাব্যের নাম কি?**
— শ্রীকৃষ্ণকীর্তন।
**খ. ইংরেজ ঔপনিবেশিক আমলে নজরুলের নিষিদ্ধ গ্রন্থগুলোর নাম লিখুন।**
— বিষের বাঁশি, ভাঙার গান, প্রলয়-শিখা, যুগবাণী ও চন্দ্রবিন্দু।
**গ. দৌলত কাজী কোন কাব্যের জন্য বিখ্যাত?**
— সতী ময়না ও লোর চন্দ্রানী (হিন্দি কবি সাধনের 'মৈনাসত' কাব্য অবলম্বনে রচিত। কাব্যটির তৃতীয় খণ্ড রচনাকালে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। পরে কবি আলাওল বাকি অংশ রচনা করেন)।
**ঘ. জীবনানন্দ দাশের তিনটি কাব্যগ্রন্থের নাম লিখুন।**
— বনলতা সেন, রূপসী বাংলা, সাতটি তারার তিমির।
**ঙ. 'চরিত্রহীন' উপন্যাসটি কার লেখা?**
— শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।
**চ. শামসুর রাহমানের প্রথম কাব্যের নাম কি?**
— প্রথম গান দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে।



**ছ. মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে লেখা একটি উপন্যাস, একটি নাটক ও একটি স্মৃতিকথার নাম লিখুন।**
— উপন্যাস : আগুনের পরশমণি (হুমায়ূন আহমেদ), নাটক : চারিদিকে যুদ্ধ (আবদুল্লাহ আল মামুন), স্মৃতিকথা : একাত্তরের দিনগুলি (জাহানারা ইমাম)।
**জ. 'একুশে ফেব্রুয়ারী' সংকলনের সম্পাদক কে?**
— হাসান হাফিজুর রহমান।
**ঝ. মাসিক মোহাম্মদী, সওগাত ও পাক্ষিক বেগম পত্রিকার সম্পাদকের নাম লিখুন।**
— মাসিক মোহাম্মদী : মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ, সওগাত : মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন, পাক্ষিক বেগম : নূরজাহান বেগম।
**ঞ. পবিত্র কোরআন শরীফের প্রথম বাংলা গদ্যানুবাদকের নাম লিখুন।**
— ভাই গিরিশচন্দ্র সেন।

## ২১তম বিসিএস : ২০০০

*[দ্রষ্টব্য : বাংলা ভাষায় প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। তবে টেকনিক্যাল শব্দগুলো ইংরেজিতে লেখা চলবে। প্রত্যেক প্রশ্নের মান প্রশ্নের শেষ প্রান্তে দেখানো হয়েছে।]*

১. যে কোনো একটি বিষয় অবলম্বনে প্রবন্ধ লিখুন : ৩০

ক. বিশ্বায়ন ও আমাদের সংস্কৃতি
উত্তর : পৃষ্ঠা ৭৩৫।
খ. আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস
গ. পরিবেশ দূষণ ও প্রতিকার
উত্তর : পৃষ্ঠা ৮৪৯।
ঘ. আপনার শিশুকে টিকা দিন
ঙ. বাংলাদেশের কবিতায় ভাষা আন্দোলনের প্রতিফলন।

২. ভাব-সম্প্রসারণ করুন : ১৫

ক. লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু।
উত্তর : পৃষ্ঠা ১৬৫।

অথবা,

খ. মেঘ দেখে কেউ করিসনে ভয়
আড়ালে তার সূর্য হাসে,
হারা শশীর হারা হাসি
অন্ধকারেই ফিরে আসে।
উত্তর : পৃষ্ঠা ১৬৬।

৩. সারমর্ম লিখুন : ১৫

ক. পৃথিবীতে কত দ্বন্দ্ব, কত সর্বনাশ,
নূতন নূতন কত গড়ে ইতিহাস—
রক্তপ্রবাহের মাঝে ফেনাইয়া উঠে,
সোনার মুকুট কত ফুটে আর টুটে!
সভ্যতার নব নব কত তৃষ্ণা ক্ষুধা—
উঠে কত হলাহল, উঠে কত সুধা!

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



শুধু হেথা দুই তীরে, কেবা জানে নাম,
দোঁহা-পানে চেয়ে আছে দুইখানি গ্রাম।
এই খেয়া চিরদিন চলে নদী স্রোতে—
কেহ যায় ঘরে, কেহ আসে ঘর হতে।

উত্তর : পৃষ্ঠা ২৬৫।

*অথবা,*

খ. মানুষের মূল্য কোথায়? চরিত্র, মনুষ্যত্ব, জ্ঞান ও কর্ম। বস্তুত চরিত্র বললেই মানুষের জীবনের যা কিছু শ্রেষ্ঠ তা বুঝতে হবে। চরিত্র ছাড়া মানুষের গৌরব করার আর কিছুই নাই। মানুষের শ্রদ্ধা যদি মানুষের প্রাপ্য হয়, মানুষ যদি মানুষকে শ্রদ্ধা করে, সে শুধু চরিত্রের জন্য। অন্য কোনো কারণে মানুষের মাথা মানুষের সামনে নত হয় না। জগতে যে সকল মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করেছেন, তাদের গৌরবের মূল এই চরিত্রশক্তি। তুমি চরিত্রবান লোক, এ কথার অর্থ এই নয় যে, তুমি শুধু লম্পট নও। তুমি সত্যবাদী, বিনয়ী এবং জ্ঞানের প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ কর। তুমি পরদুঃখকাতর, ন্যায়বান এবং মানুষের ন্যায় স্বাধীনতাপ্রিয়—চরিত্রবান মানে এই।

উত্তর : পৃষ্ঠা ২৬৫।

৪. শুদ্ধ করে লিখুন : ১০

| অশুদ্ধ | শুদ্ধ |
|---|---|
| ক. জ্ঞানি মুর্খ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর। | ক. জ্ঞানী মূর্খ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। |
| খ. শিক্ষার্থিগণের মধ্যে অনুপস্থিতের সংখ্যা কম। | খ. শিক্ষার্থীদের মধ্যে অনুপস্থিতির সংখ্যা কম। |
| গ. ধৈর্যতা, সহিষ্ণুতা মহত্ত্বের লক্ষণ। | গ. ধৈর্য, সহিষ্ণুতা মহত্ত্বের লক্ষণ। |
| ঘ. অঙ্ক কষিতে ভুল করা উচিৎ নয়। | ঘ. অঙ্ক কষতে ভুল করা উচিত নয়। |
| ঙ. অনাবশ্যকীয় ব্যাপারে কৌতুহল ভাল নয়। | ঙ. অনাবশ্যক ব্যাপারে কৌতূহল ভালো নয়। |
| চ. এই দুর্ঘটনা দৃষ্টে আমার হৃদকম্প উপস্থিত হইল। | চ. এ দুর্ঘটনা দেখে আমার হৃদকম্প শুরু হলো। |
| ছ. তিনি স্বস্ত্রীক ষ্টেসনে গিয়াছেন। | ছ. তিনি সস্ত্রীক স্টেশনে গিয়েছেন। |
| জ. সন্মান, সান্তনা, সন্তান, সমিচিন ইত্যাদি শব্দাবলী অনেক ছাত্র-ছাত্রীরা শুদ্ধ লিখতে পারে না। | জ. সম্মান, সান্ত্বনা, সন্তান, সমীচীন ইত্যাদি শব্দ অনেক ছাত্রছাত্রী শুদ্ধ লিখতে পারে না। |
| ঝ. রচণাটি ভাবগভীর, তবে ভাষার দৈন্যতা রহিয়াছে। | ঝ. রচনাটি ভাবগম্ভীর, তবে ভাষার দীনতা রয়েছে। |
| ঞ. তাহার বৈমাত্রেয় সহোদর অসুস্থ। | ঞ. তার বৈমাত্রেয় ভাই অসুস্থ। |

৫. উপযুক্ত শব্দ বসিয়ে শূন্যস্থান পূর্ণ করুন : ১০

ক. ভাইয়ে ভাইয়ে — থাকা ভালো নয়। (অহিনকুল সম্বন্ধ)
খ. কৃপণের কাছে সাহায্য চাওয়া — মাত্র। (অরণ্যে রোদন)
গ. নীতিবান লোক অন্যায় দেখলে — হয়ে ওঠেন। (অগ্নিশর্মা)
ঘ. অধিক সন্ন্যাসীতে — নষ্ট। (গাঁজন)
ঙ. লাগে টাকা দেবে —। (গৌরীসেন)
চ. ওর তো সব সময়ে ধরি — না ছুঁই পানি নীতি। (মাছ)
ছ. হাতের লক্ষ্মী — ঠেলো না। (পায়ে)
জ. এক — শীত যায় না। (মাঘে)
ঝ. — মতো বসে আছ কেন, কাজে মন দাও। (কাঠের পুতুলের)



৬. যে কোনো পাঁচটি বাগধারা দিয়ে বাক্য রচনা করুন : ৫

ক. অকাল কুষ্মাণ্ড (অপদার্থ) : তার মতো অকাল কুষ্মাণ্ড দিয়ে এ কাজ হবে না।
খ. শিরে সংক্রান্তি (সমূহ বিপদ) : আমার এখন শিরে সংক্রান্তি অবস্থা, কোনো দিকে মন দেবার সময় নেই।
গ. আলালের ঘরের দুলাল (অতি আদরের বখাটে ছেলে) : তোমার মতো আলালের ঘরের দুলাল দিয়ে এত বড় কঠিন কাজ হবে না।
ঘ. ইঁচড়ে পাকা (অকাল পক্ব) : মেয়েটি একেবারে ইঁচড়ে পাকা, ওর সামনে কোনো কথা বলার উপায় নেই।
ঙ. কপাল ফেরা (সুদিন আসা) : তার এখন কপাল ফিরেছে, আগের মতো দিন এনে দিন খাওয়া অবস্থা নেই।
চ. গুঁড়ে বালি (আশায় নৈরাশ্য) : তুমি তোমার বাবার অঢেল সম্পত্তি নিয়ে ভবিষ্যতে বড় ব্যবসায়ী হবে। কিন্তু এখন সে গুঁড়ে বালি।
ছ. কাঠের পুতুল (নিশ্চল) : পিতার মৃত্যু সংবাদ শুনে সে কাঠের পুতুলের মতো দাঁড়িয়ে রইল।
জ. রাবণের চিতা (চির অশান্তি) : একমাত্র ছেলের মৃত্যুর শোকে চৌধুরী সাহেবের অন্তর রাবণের চিতার মতো জ্বলছে।
ঝ. গোবর গণেশ (মূর্খ) : অনেক শিক্ষিত লোকের ছেলেমেয়ে কখনো কখনো গোবর গণেশ হয়ে থাকে।
ঞ. অমাবস্যার চাঁদ (দুর্লভ বস্তু) : তুমি কি একেবারে অমাবস্যার চাঁদ হয়ে গেলে যে আজকাল দেখাই যায় না।

৭. এক কথায় প্রকাশ করুন (যে কোনো পাঁচটি) : ৫

ক. যে ব্যক্তি বিদেশে থাকে — প্রবাসী।
খ. শত্রুকে হনন করে যে — শত্রুঘ্ন।
গ. জীবিত থেকেও যে মৃত — জীবন্মৃত।
ঘ. যে কন্যার বিয়ে হয়নি — অনূঢ়া।
ঙ. প্রিয় বাক্য বলে যে নারী — প্রিয়ংবদা।
চ. যা মাটি ভেদ করে ওঠে — উদ্ভিদ।
ছ. যে অন্যদিকে মন দেয় না — অনন্যমনা।
জ. কি কর্তব্য তা যে বুঝতে পারে না — কিংকর্তব্যবিমূঢ়।

৮. নিম্নলিখিত প্রশ্নের উত্তর দিন : ১০

ক. বাংলা ভাষার প্রথম কাব্যের নাম কি?
— চর্যাপদ।

খ. তিনজন বৈষ্ণব পদকর্তার নাম লিখুন।
— ১. বিদ্যাপতি, ২. চণ্ডীদাস, ৩. জ্ঞানদাস।

গ. রবীন্দ্রনাথের নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত গ্রন্থের নাম কি?
— গীতাঞ্জলি ও তার অন্যান্য কাব্যের কিছু কবিতার ইংরেজি অনুবাদ Song Offerings গ্রন্থের জন্য।

ঘ. কাজী নজরুল ইসলামের তিনটি কাব্যগ্রন্থের নাম লিখুন।
— ১. অগ্নিবীণা, ২. বিষের বাঁশি, ৩. দোলনচাঁপা।

ঙ. জসীমউদ্দীনের 'নকশী কাঁথার মাঠ' কাব্যের বিষয় ও প্রধান চরিত্রগুলোর নাম লিখুন।
— 'নকশী কাঁথার মাঠ' কাব্যের বিষয় হলো গ্রাম-বাংলার মানুষের সামাজিক চিত্র। প্রধান চরিত্র হলো রুপাই ও সাজু।

চ. সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র একটি গল্প, একটি উপন্যাস ও একটি নাটকের নাম লিখুন।
— গল্প — নয়নচারা; উপন্যাস — কাঁদো নদী কাঁদো; নাটক — সুড়ঙ্গ।

ছ. মুনীর চৌধুরীর 'রক্তাক্ত প্রান্তর' নাটকের বিষয় কি?
— পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধ।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



জ. সত্যেন সেনের তিনটি উপন্যাসের নাম লিখুন।
— ১. রুদ্ধদ্বার মুক্ত প্রাণ, ২. সাত নম্বর ওয়ার্ড, ৩. অভিশপ্ত নগরী।
ঝ. মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ে শওকত ওসমানের দুটি উপন্যাসের নাম লিখুন।
— ১. দুই সৈনিক, ২. জাহান্নাম হতে বিদায়।
ঞ. 'সমকাল' পত্রিকা বিশ শতকের কোন দশকে প্রকাশিত হয়? এর সম্পাদকের নাম কি?
— 'সমকাল' পত্রিকা বিশ শতকের পঞ্চাশের দশকে (১৯৫৪ সালে) প্রকাশিত হয়। সম্পাদক সিকান্দার আবু জাফর।

## ২০তম বিসিএস : ১৯৯৮-৯৯

*[দ্রষ্টব্য : বাংলা ভাষায় প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। তবে টেকনিক্যাল শব্দগুলো ইংরেজিতে লেখা চলবে।]*

১. যে কোনো একটি বিষয় অবলম্বনে প্রবন্ধ লিখুন : ৩০
ক. নারী নির্যাতন ও প্রতিকারের উপায়
খ. একবিংশ শতাব্দীর প্রত্যাশা ও প্রস্তুতি
গ. জাতীয় শিক্ষা নীতি ও দেশপ্রেম
ঘ. সর্বস্তরে বাংলা ভাষার ব্যবহার
ঙ. বাংলাদেশের কথাসাহিত্য ও তার ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা।

২. ভাব-সম্প্রসারণ করুন : ১৫
ক. যৌবনে অর্জিত সুখ অল্প, কিন্তু সুখের আশা অপরিমিত।
উত্তর : পৃষ্ঠা ১৬৪।

*অথবা,*

খ. অন্যায় যে করে অন্যায় যে সহে
তব ঘৃণা তারে যেন তৃণসম দহে।
উত্তর : পৃষ্ঠা ১৬৪।

৩. সারাংশ লিখুন : ১৫
ক. ছোট ছোট বালু কণা, বিন্দু বিন্দু জল,
গড়ি তোলে মহাদেশ সাগর অতল।
মুহূর্তে নিমেষ কাল, তুচ্ছ পরিমাণ,
গড়ে যুগ-যুগান্তর-অনন্ত মহান।
প্রত্যেক সামান্য ত্রুটি, ক্ষুদ্র অপরাধ,
ক্রমে টানে পাপ পথে, ঘটায় প্রমাদ।
প্রতি করুণার দান, স্নেহপূর্ণ বাণী,
এ ধরায় স্বর্গ শোভা নিত্য দেয় আনি।
উত্তর : পৃষ্ঠা ২৬৪।

*অথবা,*

খ. বার্ধক্য তাই—যাহা পুরাতনকে, মিথ্যাকে, মৃতকে আঁকড়াইয়া পড়িয়া থাকে। বৃদ্ধ তাহারাই—যাহারা মায়াচ্ছন্ন; নব মানবের অভিনব জয়যাত্রায় যাহারা শুধু বোঝা নয়, বিঘ্ন। শতাব্দীর নবযাত্রীর চলার ছন্দে ছন্দ মিলাইয়া যাহারা কুচকাওয়াজ করিতে জানে না, পারে না। যাহারা জীব হইয়াও জড়। যাহারা অটল সংস্কারের পাষাণস্তূপ আঁকড়াইয়া শুধু পড়িয়া থাকে। বৃদ্ধ তাহারাই—যাহারা নব অরুণোদয় দেখিয়া নিদ্রাভঙ্গের ভয়ে দ্বার রুদ্ধ করিয়া পড়িয়া থাকে। আলোক পিয়াসী প্রাণচঞ্চল শিশুদের কলকোলাহলকে যাহারা বিরক্ত হইয়া অভিসম্পাত করিতে থাকে। জীর্ণ পুঁথি চাপা পড়িয়া যাহাদের নাভিশ্বাস বহিতেছে। ইহাদের ধর্ম বার্ধক্য। বার্ধক্যকে সব সময় বয়সের ফ্রেমে বাঁধা যায় না। বহু যুবককে দেখিয়াছি—যাহাদের যৌবনের উর্দির নিচে বার্ধক্যের কঙ্কাল মূর্তি। আবার বহু বৃদ্ধকে দেখিয়াছি—যাহাদের বার্ধক্যের জীর্ণাবরণের তলে মেঘলুপ্ত সূর্যের মত প্রদীপ্ত যৌবন। তরুণ নামের জয়মুকুট শুধু তাহার, যাহার মুক্তি অপরিসীম। গতিবেগ যাত্রার ন্যায়, তেজ নির্মেঘ আষাঢ়—মধ্যাহ্নের মার্তণ্ডপ্রায়; বিপুল যাহার আশা, ক্লান্তিহীন যাহার উৎসাহ, বিরাট যাহার সাধ, মৃত্যু যাহার মুষ্ঠিতলে।
উত্তর : পৃষ্ঠা ২৬৫।

৪. শুদ্ধ করে লিখুন : ১০

| অশুদ্ধ | শুদ্ধ |
|---|---|
| ক. রচনাটির উৎকর্ষতা অনস্বীকার্য। | ক. রচনাটির উৎকর্ষ অনস্বীকার্য। |
| খ. তার উদ্ধতপূর্ণ আচরণে ব্যথিত হয়েছি। | খ. তার ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণে ব্যথিত হয়েছি। |
| গ. সকল সভ্যগণ সভায় উপস্থিত ছিলেন। | গ. সকল সভ্য সভায় উপস্থিত ছিলেন। |
| ঘ. অন্যায়ের প্রতিদান দুর্নিবার্য। | ঘ. অন্যায়ের প্রতিফল দুর্নিবার। |
| ঙ. তাদের মধ্যে বেশ সখ্যতা দেখতে পাই। | ঙ. তাদের মধ্যে বেশ সখিত্ব/সখ্য দেখতে পাই। |
| চ. এ দায়িত্ব আমাকে দিওনা। | চ. এ দায়িত্বভার আমাকে দিওনা। |
| ছ. শরীর অসুস্থ্যের জন্য আমি কাল আসিনি। | ছ. শারীরিক অসুস্থতার জন্য আমি কাল আসিনি। |
| ছ. আমাকে যদি অসামান্য সুন্দরী, তবে ঐ মেয়েটিকে কি বলবেন? | জ. আমাকে যদি অসামান্য সুন্দরী বলেন, তবে ঐ মেয়েটিকে কি বলবেন? |
| জ. আমি সকলের সহযোগীতায় আবশ্যকীয় স্বার্থকতা লাভ করতে চাই। | ঝ. আমি সকলের সহযোগিতায় আবশ্যক সার্থকতা লাভ করতে চাই। |
| ঝ. তিনি এ ঘটনার চাক্ষুস সাক্ষী। | ঞ.তিনি এ ঘটনার চাক্ষুষ/প্রত্যক্ষ সাক্ষী। |

৫. উপযুক্ত শব্দ বসিয়ে শূন্যস্থান পূর্ণ করুন : ১০
ক. রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয় — প্রাণ যায়। (উলুখাগড়ার)
খ. তার পিছনে এত — খেয়ে লেগেছ কেন? (আদাজল)
গ. — বাদ দিয়ে আসল কথাটা বল। (গৌরচন্দ্রিকা)
ঘ. এরকম দিনেদুপুরে — ধরা পড়বেই। (পুকুরচুরি)
ঙ. এত বড় সম্পত্তিটা একবারে — হয়ে গেল। (হাতছাড়া)
চ. ইটটি মারলে — খেতে হয়। (পাটকেলটি)
ছ. তোমার তো — মাসে বছর। (আঠারো)
জ. — মানে না — মোড়ল। (গাঁয়ে, আপনি)
ঝ. 'যবে— ক্রন্দনরোল— বাতাসে ধ্বনিবে না'। (উৎপীড়িতের, আকাশে)
ঞ.'মোদের — মোদের আশা,— বাংলা ভাষা'। (গরব, আ-মরি)

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



৬. যে কোনো পাঁচটি বাগধারা দিয়ে উপযুক্ত বাক্য রচনা করুন : ৫

ক. আকাশ কুসুম (অসম্ভব কল্পনা) : মহাশূন্যে ভ্রমণ এখন আর আকাশ কুসুম কল্পনা নয়।

খ. অরণ্যে রোদন (নিষ্ফল আবেদন) : তার কাছে তোমার দুঃখের কথা বলা আর অরণ্যে রোদন সমান কথা।

গ. আক্কেল সেলামী (নির্বুদ্ধিতার দণ্ড) : তোমার বোকামীর জন্যই আমার এ আক্কেল সেলামী দিতে হলো।

ঘ. খয়ের খাঁ (খোশামোদকারী) : খয়ের খাঁ জাতীয় লোকেরা চিরকালই ক্ষতির কারণ।

ঙ. দহরম মহরম (ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক/অতি খাতির) : এত দহরম মহরম ভালো নয় বাপু।

চ. কই মাছের প্রাণ (শক্ত প্রাণ) : পকেটমারটার কই মাছের প্রাণ, এত মার খেয়েও কিছুই হলো না।

ছ. রাঘব বোয়াল (প্রভাবশালী ব্যক্তি) : ঋণখেলাপীরা রাঘব বোয়াল, এদের ধরা খুব কঠিন।

জ. কান কাটা (বেহায়া) : তোমার মতো কান কাটা লোকতো আগে দেখিনি।

ঝ. পায়াভারী (অহংকার) : রফিক এখন বড় চাকরি করে, তাই এখন তার পায়াভারী হয়েছে।

৭. এক কথায় প্রকাশ করুন (যে কোনো পাঁচটি) : ৫

ক. অনুসন্ধান করতে ইচ্ছুক – অনুসন্ধিৎসু।

খ. আচারে যার নিষ্ঠা আছে – আচারনিষ্ঠ।

গ. আদি হতে অন্ত পর্যন্ত – আদ্যন্ত।

ঘ. যে উপকারীর উপকার স্বীকার করে – কৃতজ্ঞ।

ঙ. যে জমিতে ফসল জন্মায় না – উষর।

চ. যিনি প্রথম পথ দেখান – পথ প্রদর্শক।

ছ. যার দাড়ি ওঠেনি – অজাতশ্মশ্রু।

৮. যে কোনো দশটি প্রশ্নের উত্তর দিন : ১০

ক. বড়ু চণ্ডীদাসের গ্রন্থের নাম কি?

— শ্রীকৃষ্ণকীর্তন।

খ. ভারতচন্দ্রের কাব্যের নাম কি? কাব্যে আরবি, ফারসি শব্দ ব্যবহার প্রসঙ্গে তিনি কি বলেছেন?

— ভারতচন্দ্রের বিখ্যাত কাব্যের নাম 'অন্নদামঙ্গল'। কাব্যে আরবি, ফারসি শব্দ ব্যবহার প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন :

'প্রাচীন পণ্ডিতগণ গিয়েছেন কয়ে
যে হৌক সে হৌক ভাষা কাব্যরস লয়ে।'

গ. কাজী নজরুল ইসলামের 'মৃত্যুক্ষুধা' উপন্যাসের মূল বক্তব্য সম্পর্কে তিনটি বাক্য লিখুন।

— ব্রিটিশ শাসিত অবিভক্ত ভারতবর্ষের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে রচিত হয়েছে 'মৃত্যুক্ষুধা' উপন্যাসটি। চল্লিশের দশকের ভঙ্গুর ও বিপর্যস্ত সময় এ উপন্যাসের উপজীব্য। লেখক অত্যন্ত মমতার সঙ্গে এ সময়ের এক সজীব ও সংক্ষুব্ধ চিত্র রূপায়িত করেছেন এ উপন্যাসে।

ঘ. জীবনানন্দ দাশের তিনটি কাব্যগ্রন্থের নাম লিখুন।

— ঝরা পালক, রূপসী বাংলা, বনলতা সেন।

ঙ. ফররুখ আহমদের প্রথম কাব্যগ্রন্থ, কাহিনীকাব্য এবং কাব্যনাট্যের নাম লিখুন।

— প্রথম কাব্যগ্রন্থ : সাত সাগরের মাঝি। কাহিনীকাব্য : হাতেমতায়ী। কাব্যনাট্য : নৌফেল ও হাতেম।

চ. 'কবর' নাটকের বিষয় ও চরিত্রগুলোর নাম লিখুন; নাটকটির রচয়িতার নাম কি?

— বিষয়বস্তু : বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন।

চরিত্রসমূহ : নেতা, হাফিজ, মুর্দা ফকির, গার্ড ও কয়েকটি ছায়ামূর্তি।

রচয়িতা : মুনীর চৌধুরী।



ছ. 'হাজার বছর ধরে' কার লেখা? কি বিষয়ে কোন আঙ্গিকে লেখা?

— রচয়িতা : জহির রায়হান। বিষয় : আবহমান বাংলার জনজীবন। আঙ্গিক : উপন্যাস।

জ. চর্যাপদ কি?

— বাংলা ভাষার প্রাচীন নিদর্শন।

ঝ. 'ময়মনসিংহ গীতিকা' কি? এর অন্তত দুটি পালার নাম বলুন।

— ময়মনসিংহ অঞ্চলের লোকমুখে প্রচলিত পালাগানগুলোকে বলা হয় 'ময়মনসিংহ গীতিকা'। এর অন্যতম দুটি পালা হচ্ছে 'মহুয়া' ও 'মলুয়া'।

ঞ. রবীন্দ্রনাথের প্রথম ঐতিহাসিক উপন্যাস কোনটি? (১) গোরা; (২) মুকুট; (৩) বৌ-ঠাকুরানীর হাট।

— বৌ-ঠাকুরানীর হাট।

## ১৮তম বিসিএস : ১৯৯৭-৯৮

[দ্রষ্টব্য : *বাংলা ভাষায় প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। সাধু ও চলিত ভাষার মিশ্রণ দূষণীয়। প্রত্যেক প্রশ্নের মান প্রশ্নের শেষ প্রান্তে দেখানো হয়েছে।*]

১. যে কোনো একটি বিষয় অবলম্বনে একটি প্রবন্ধ লিখুন : ৩০

ক. ধর্ম ও বিজ্ঞান

খ. জাতীয় সংহতি

উত্তর : পৃষ্ঠা ৬৩১।

গ. ভারত ও বাংলাদেশ সম্পর্ক

উত্তর : পৃষ্ঠা ৭২৩।

ঘ. আমাদের জাতীয় বাজেট ও দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি

ঙ. আমি যদি জাতীয় সংসদে বিরোধী দলের নেতা/নেত্রী হতাম।

২. ভাব-সম্প্রসারণ করুন : ১৫

ক. আগে চুরি করে জেল খাটে পরে
নির্বোধ চোর তারা,
আগে জেল খাটে পরে চুরি করে
সেয়ানা স্বদেশী তারা।

উত্তর : পৃষ্ঠা ১৬৩।

অথবা,

খ. সত্য মূল্য না দিয়েই সাহিত্যের খ্যাতি করা চুরি
ভালো নয়, ভালো নয়, নকল সে শৌখিন মজদুরী।

উত্তর : পৃষ্ঠা ১৬৩।

৩. সারমর্ম লিখুন : ১৫

ক. আমি দেখে এসেছি নদীর ঘাড় ধরে
আদায় করা হচ্ছে বিদ্যুৎ
ভাল কথা।
কলে তৈরি হচ্ছে বড় বড় রেলের ইঞ্জিন
খুব ভাল।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



মশা মাছি সাপ বাঘ তাড়িয়ে
ইস্পাতের শহর বসছে—
আমরা সত্যই খুশি হচ্ছি।
কিন্তু মোটেই খুশি হচ্ছিনা যখন দেখছি
যার হাত আছে তার কাজ নেই,
যার কাজ আছে তার ভাত নেই,
যার ভাত আছে তার হাত নেই।

উত্তর : পৃষ্ঠা ২৬৩।

*অথবা,*

**খ. কবি ও কবিতার নাম উল্লেখ করে সারমর্ম লিখুন :**

হে দারিদ্র্য, তুমি মোরে করেছ মহান।
তুমি মোরে দানিয়াছ খ্রিস্টের সম্মান
কণ্টক-মুকুট, শোভা– দিয়াছ তাপস,
অসঙ্কোচ প্রকাশের দুরন্ত সাহস;
উদ্ধত উলঙ্গ দৃষ্টি; বাণী ক্ষুর ধার;
বীণা মোর শাপে তব হলো তরবার।

উত্তর : পৃষ্ঠা ২৬৪।

**৪. শুদ্ধ করে লিখুন :** ১০

| অশুদ্ধ | শুদ্ধ |
|---|---|
| ক. ইদানিংকালে অনেক মহিলাই ববকাটি করেন। | ক. ইদানীং অনেক মহিলাই ববকাট করেন। |
| খ. প্রাণে ঐক্যতান বাজলে দুঃখ থাকে না। | খ. প্রাণে ঐকতান বাজলে দুঃখ থাকে না। |
| গ. তিনি প্রভাতেই বাড়ি হইতে বাহির হয়েছেন। | গ. তিনি প্রভাতেই বাড়ি থেকে বের হয়েছেন। |
| ঘ. এ কাজটি আমার পক্ষে সম্ভব নহে। | ঘ. এ কাজটি করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। |
| ঙ. জাতীয় প্রেসক্লাবে তিনি এক সংবাদ সম্মেলনে বক্তৃতা করেন। | ঙ. তিনি জাতীয় প্রেসক্লাবে এক সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তৃতা করেন। |
| চ. পাঁচ সদস্যবিশিষ্ট সৌদি আরবের শিক্ষামিশন ঢাকা সফরে এসেছেন। | চ. সৌদি আরবের পাঁচ সদস্যবিশিষ্ট শিক্ষামিশন ঢাকা সফরে এসেছে। |
| ছ. নীরিহ অতিথী শুধু আর্শিবাদ চেয়েছিলেন। | ছ. নিরীহ অতিথি শুধু আশীর্বাদ চেয়েছিলেন। |
| জ. সুশিক্ষত ব্যক্তি মাত্রই সশিক্ষিত। | জ. সুশিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রই স্বশিক্ষিত। |
| ঝ. ভ্রান্তি কিছুতেই গুচেনা। | ঝ. ভ্রান্তি কখনো ঘুচেনা। |
| ঞ. ব্যাধিই সংক্রেমক, স্বাস্থ নয়। | ঞ. ব্যাধিই সংক্রামক, স্বাস্থ্য নয়। |

**৫. উপযুক্ত শব্দ বসিয়ে শূন্যস্থান পূর্ণ করুন :** ১০

ক. গফুরের এত — মাথা নাড়া ভাল লাগেনি। (ঘন ঘন)
খ. মহেষ গফুরের — প্রিয় ছিল। (অত্যন্ত)
গ. কন্যার — জন্যই সে কখনও কলকারখানায় চাকরি নিতে চায়নি। (নিরাপত্তার)
ঘ. ছলের টাকা — যায়। (জলে)
ঙ. সে ছিল সরল — নারী। (অবলা)
চ. প্রলুব্ধ করতেও — ছিলেন হাসান মামা। (ওস্তাদ)



ছ. শেলী অজ্ঞ হলেও মানব মনস্তত্ত্বে— সম্বন্ধে সে অজ্ঞ নয়। (গভীরতা)
জ. যারা তাকে— করেছে, চাঁদপুরের মাজেদা তাদের ফাঁসি চায়। (ধর্ষণ)
ঝ. নাটোরের রাণী ভবানীর দীঘিটি — মূল্যে বিক্রি করায় জোর প্রতিবাদ হয়েছে। (নামমাত্র)
ঞ. তিন পুলিশ কর্মকর্তাকে বরখাস্ত করে ৪ দিনের — নেয়া হয়েছে। (রিমান্ডে)

**৬. যে কোনো পাঁচটি বাগধারা দিয়ে উপযুক্ত বাক্য রচনা করুন :** ৫

ক. লেজে গোবরে (বিশৃঙ্খলা) : সব কিছু তুমি কেমন করে লেজে গোবরে করে ফেলেছো, বুঝতে পারছো?
খ. রাখঢাক (গোপন কথা) : কোনো রাখঢাক আমার পছন্দ নয়, সবকিছু স্পষ্ট করে বলো।
গ. গা ছাড়া ভাব (গুরুত্ব না দেয়া) : সবকিছুতেই এমন গা ছাড়া ভাবের হলে জীবনে উন্নতি করবে কি করে?
ঘ. ঘাটের মড়া (অতি বৃদ্ধ) : তোমাকে ঘাটের মড়ার মতো লাগছে কেন, কি হয়েছে?
ঙ. পেট পাতলা (গোপনীয়তা রক্ষা করতে পারে না যে) : সে হচ্ছে এক পেট পাতলা লোক, আর তুমি কিনা তার কাছেই বলেছ গোপন কথা।
চ. আমড়া কাঠের ঢেঁকি (অকর্মা) : তুমি হচ্ছো একটা আমড়া কাঠের ঢেঁকি, তোমার উপর নির্ভর করা যায় না।
ছ. কান পাতলা (বিশ্বাসপ্রবণ): হাসানকে কান পাতলা লোক বলে তো মনে হয় না।

**৭. এক কথায় প্রকাশ করুন (যে কোনো পাঁচটি) :** ৫

ক. যা কাঁপছে – কম্পমান।
খ. যে নিজেকে পণ্ডিত মনে করে– পণ্ডিতম্মন্য।
গ. মাটি দিয়ে তৈরি– মৃন্ময়।
ঘ. প্রায় মৃত– মুমূর্ষু।
ঙ. একই গুরুর শিষ্য– সতীর্থ।
চ. মুক্তি পেতে ইচ্ছুক– মুমুক্ষু।

**৮. যে কোনো দশটি প্রশ্নের উত্তর দিন :** ১০

**ক. কবিগান বলতে কি বুঝায়? চারটি বাক্যে উত্তর দিন।**

— কবিদের গান এই অর্থে 'কবিগান' কথাটির প্রচলন ঘটে এবং এটি লোকসঙ্গীতের একটি বিশেষ ধারা। প্রতিযোগিতামূলকভাবে অনুষ্ঠিত এই গানে প্রশ্নোত্তর পর্ব ও জয়-পরাজয় থাকে। প্রতি দলে একজন কবিয়াল থাকেন, যিনি তার নিজ দলের নেতৃত্ব দেন। মূলত দুই কবির মধ্যে সংঘটিত এক প্রকার বিশেষ গানই হচ্ছে কবিগান।

**খ. কবি গোলাম মোস্তফার তিনটি গ্রন্থের নাম লিখুন।**

— খোশরোজ, বুলবুলিস্তান ও বিশ্বনবী।

**গ. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বিধবা বিবাহ বিষয়ক গ্রন্থটির নাম লিখুন।**

— 'বিধবা-বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব' (১৮৫৫)।

**ঘ. 'কাশবনের কন্যা' কোন জাতীয় রচনা এবং গ্রন্থটির রচয়িতা কে?**

— একটি উপন্যাস। রচয়িতা শামসুদ্দীন আবুল কালাম।

**ঙ. বাংলা কথ্যরীতিতে প্রথম গ্রন্থ রচনা করেন কে? তাঁর এ গ্রন্থের নাম লিখুন।**

— প্যারীচাঁদ মিত্র বা টেকচাঁদ ঠাকুর। গ্রন্থের নাম : আলালের ঘরের দুলাল।

**চ. গফুর, মহিম ও মজিদ কোন উপন্যাসের/গল্পের চরিত্র?**

— গফুর 'মহেশ' গল্পের, মহিম 'গৃহদাহ' উপন্যাসের এবং মজিদ 'লালসালু' উপন্যাসের চরিত্র।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



ছ. মঙ্গলকাব্যকে এ নাম দেয়ার কারণ কি?

— বাংলা সাহিত্যে প্রাচীন ও মধ্যযুগে দেব-দেবীর মাহাত্ম্য বর্ণনা করে এক ধরনের ভক্তিরসমূলক কাহিনী-কাব্য রচিত হতো। এর রচয়িতারা মনে করতেন এতে দেব-দেবীরা তুষ্ট হয়ে মঙ্গল সাধন করেন। তাই এ ধারার নাম হয় মঙ্গলকাব্য।

জ. শেষের কবিতার তিনটি পঙ্‌ক্তি লিখুন।

— 'মোর পাত্র রিক্ত হয় নাই/শূন্যেরে করিব পূর্ণ/এই ব্রত বহিব সদাই।'

ঝ. 'নান্দাইল-এর ইউনুস' টিভি নাটকের নাম ভূমিকায় কে অভিনয় করেন?

— আসাদুজ্জামান নূর।

ঞ. ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ কখন, কেন ও কোথায় প্রতিষ্ঠিত হয়?

— ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ভাষা, প্রশাসন ও ব্যবসা শিক্ষার জন্য লর্ড ওয়েলেসলি ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮০০ সালের ৪ মে কলকাতায় এ কলেজ প্রতিষ্ঠিত হলেও কলেজের কার্যক্রম শুরু হয় ২৪ নভেম্বর।

ট. তাপস কাহিনী, মহর্ষি মনসুর প্রভৃতি গ্রন্থের রচয়িতার নাম কি?

— মোজাম্মেল হক।

## ১৭তম বিসিএস : ১৯৯৫-৯৬

*দ্রষ্টব্য : বাংলা ভাষায় প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। তবে টেকনিক্যাল শব্দগুলো ইংরেজিতে লেখা চলবে। প্রশ্নোত্তর যথাযথ ও সংক্ষিপ্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। সাধু ও চলিত ভাষার মিশ্রণ দূষণীয়। প্রত্যেক প্রশ্নের মান প্রশ্নের শেষ প্রান্তে দেখানো হয়েছে।*

১. যে কোনো একটি বিষয় অবলম্বনে রচনা লিখুন : ৩০

ক. যানজট

খ. লোকসঙ্গীত বনাম পল্লীগীতি

গ. মানবাধিকার

ঘ. বাংলাদেশে শিশু শ্রমিক

উত্তর : পৃষ্ঠা ৮৪৩।

ঙ. অনুবাদ সাহিত্য

চ. নন্দন তত্ত্ব

ছ. সামাজিক অবক্ষয়

উত্তর : পৃষ্ঠা ৬৮২।

জ. ধূমায়িত এক কাপ চা

ঝ. ডিস অ্যান্টিনার সুফল ও কুফল

উত্তর : পৃষ্ঠা ৭২০।

ঞ. অর্থই অনর্থ।

২. ভাবসম্প্রসারণ করুন : ১৫

ক. ফ্যাশনটা হলো মুখোশ, স্টাইলটা হলো মুখশ্রী

উত্তর : পৃষ্ঠা ১৬২।

*অথবা,*

খ. দখিন হাওয়া শরতের আলো এসবের মাধুর্যের পরিমাপ তাপমাত্রা যন্ত্রের দ্বারা হয় না, মনের বীণায় এরা আপনার পরশ বুলিয়ে জানায় যখন, তখন বুঝি কতখানি মধুর এবং কতখানি সুন্দর এরা।

উত্তর : পৃষ্ঠা ১৬২।



৩. সারাংশ লিখুন : ১৫

ক. জোটে যদি মোটে একটি পয়সা
খাদ্য কিনিও ক্ষুধার লাগি
দুটি যদি জোটে তবে অর্ধেকে
ফুল কিনে নিও, হে অনুরাগী।
বাজারে বিকায় ফল তন্ডুল;
সে শুধু মিটায় দেহের ক্ষুধা
হৃদয় প্রাণের ক্ষুধা নাশে ফুল
দুনিয়ার মাঝে সেই-তো সুধা।

উত্তর : পৃষ্ঠা ২৬৩।

*অথবা,*

খ. অদ্ভুত আঁধার এক এসেছে এ-পৃথিবীতে আজ,
যারা অন্ধ সবচেয়ে বেশি আজ চোখে দ্যাখে তারা;
যাদের হৃদয়ে কোনো প্রেম নেই—প্রীতি নেই—করুণার
আলোড়ন নেই পৃথিবী অচল আজ তাদের সুপরামর্শ ছাড়া।
যাদের গভীর আস্থা আছে মানুষের প্রতি
এখনো যাদের কাছে স্বাভাবিক বলে মনে হয়
মহৎ সত্য বা রীতি, কিংবা শিল্প অথবা সাধনা
শকুন ও শেয়ালের খাদ্য আজ তাদের হৃদয়।

উত্তর : পৃষ্ঠা ২৬৩।

৪. শুদ্ধ করে লিখুন (যে কোনো দশটি) : ১০

| অশুদ্ধ | শুদ্ধ |
|---|---|
| ক. তাহার জন্য অপেক্ষা করা সমীচিন হবে না। | ক. তার জন্য অপেক্ষা করা সমীচীন হবে না। |
| খ. শারিরিক অবস্থা বুঝিয়া চিকিৎসক ডাকাবে। | খ. শারীরিক অবস্থা বুঝে চিকিৎসক ডাকবে। |
| গ. মুর্খ লোকের দুর্গতির সীমা থাকে না। | গ. মূর্খ লোকের দুর্গতির সীমা থাকে না। |
| ঘ. মুহূর্তের ভুলে বিদুষীরাও বিপাকে পড়ে। | ঘ. মুহূর্তের ভুলে বিদুষীরাও বিপদে পড়ে। |
| ঙ. পুরাণ চাল ভাতে বাড়ে। | ঙ. পুরান চালে ভাত বাড়ে। |
| চ. সলজ্জিত হাসি হেসে মেয়েটি উত্তর দিল। | চ. সলজ্জ (লজ্জিত) হাসি হেসে মেয়েটি উত্তর দিল। |
| ছ. তার মত কুশলী শিল্পী ইদানিং কালে বিরল। | ছ. তার মত কুশলী শিল্পী ইদানীং বিরল। |
| জ. আমার অধীনস্থ এ কর্মচারী বেশ বিশ্বস্থ। | জ. আমার অধীন এ কর্মচারী বেশ বিশ্বস্ত। |
| ঝ. তিনি অযথা অশ্রুজল বিসর্জন করিয়া সময় নষ্ট করছেন। | ঝ. তিনি অযথা অশ্রু বিসর্জন করে সময় নষ্ট করছেন। |
| ঞ. একবিংশ শতক আসিতে আর মাত্র চারি বৎসর বাকি রয়েছে। | ঞ. একবিংশ শতাব্দী আসতে আর মাত্র চার বছর বাকি রয়েছে। |
| ট. সরকারের বাৎসরিক আয় ব্যয়ের হিসাব নিকাশের নাম হতেছে বাজেট। | ট. সরকারের বার্ষিক আয়-ব্যয়ের হিসাব-নিকাশের নাম হচ্ছে বাজেট। |
| ঠ. স্বাধিনতা ও বিজয় দিবশে সাভার জাতীয় সৃতিসৌধে শ্রদ্ধাঞ্জলী দিবার ব্যবস্থা আছে। | ঠ. স্বাধীনতা ও বিজয় দিবসে সাভার জাতীয় স্মৃতিসৌধে শ্রদ্ধাঞ্জলি দেবার ব্যবস্থা আছে। |
| ড. নত্ববিধান ও সত্ববিধান জানা থাকিলে বানান ভুল হবে না। | ড. ণত্ববিধান ও ষত্ববিধান জানা থাকলে বানান ভুল হবে না। |

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



৫. উপযুক্ত শব্দ বসিয়ে শূন্যস্থান পূর্ণ করুন (যে কোনো দশটি) : ১০

ক. আমি আমার পাওনা — আদায় করব। (কড়ায় গণ্ডায়/ ষোল আনা)
খ. ঐ ধূর্ত লোকটিকে — রাখতে হবে। ( চোখে চোখে)
গ. সবই তো হল এখন — বিদায় নাও। (ভালোয় ভালোয়)
ঘ. সে কথায় কথায় — মারে। (বাঘ ভাল্লুক)
ঙ. চায়ের কাপে — কিছু হবে না। (ঝড় তুলে)
চ. সততার — তোমাকে উত্তীর্ণ হতেই হবে। (পরীক্ষায়)
ছ. — লোক হয়ে এমন কাঁচা কাজ করলে। (পাকা)
জ. বড়ো — করে এসেছিলাম হতাশ করবেন না। (মুখ/আশা)
ঝ. এই ব্যবসা সূত্রেই তার — ফিরে গেল। (কপাল)
ঞ. বর্ষার পানি পেয়ে পুকুরটা — হয়ে গিয়েছে। (টইটুম্বর)
ট. আমার এই চাকরি হয়েছে — ছাড়লেও বিপদ, রাখলেও বিপদ। (শাঁখের করাত)
ঠ. আমি — ভেবেও কিছু স্থির করতে পারছিনে। (আকাশ-পাতাল)
ড. এমন — ছেলেতো কখনও দেখিনি। (ইঁচড়ে পাকা)
ঢ. তুমি কি — বসে আছ, কিছুই শুনতে পাও না? (কানে তুলো দিয়ে)

৬. যে কোনো পাঁচটি বাগধারা দিয়ে উপযুক্ত বাক্য রচনা করুন : ৫

ক. **অহিনকুল** (চির শত্রুতা) : ফিরোজ ও আজিজ দুজনের মধ্যে অহিনকুল সম্বন্ধ, কেউ কারো মুখ দেখে না।
খ. **আকাশ কুসুম** (অবাস্তব কল্পনা) : চাকরিটা না হতেই আকাশ কুসুম ভাবতে শুরু করেছ।
গ. **টনক নড়া** (সচেতন হওয়া) : মিলে শ্রমিকরা ধর্মঘট করায় মালিকপক্ষের টনক নড়ছে।
ঘ. **মগের মুল্লুক** (অরাজক দেশ) : দিনে দুপুরে ডাকাতি! এ যে মগের মুল্লুক।
ঙ. **জিলাপির প্যাঁচ** (কুটিল বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি) : রফিককে দেখতে গোবেচারার মত মনে হলে কি হবে, ওর মধ্যে জিলাপির প্যাঁচ রয়েছে।
চ. **ডামাডোল** (তীব্র গণ্ডগোল) : যুদ্ধের ডামাডোলে কে কোথায় ছড়িয়ে পড়ল, আর হদিস পাওয়া গেল না।
ছ. **ঘোড়া রোগ** (সাধ্যের অতিরিক্ত সাধ) : গাড়ি চাই, বাড়ি চাই, গরিবের আবার এ ঘোড়ার রোগ কেন?
জ. **কাষ্ঠ হাসি** (কপট হাসি) : ভদ্রতার খাতিরে বাদী কাষ্ঠহাসি হেসে বিবাদীকে নমস্কার করল।

৭. এক কথায় প্রকাশ করুন (যে কোনো পাঁচটি) : ৫

ক. কৃতজ্ঞতা লাভের পাত্র— কৃতজ্ঞ।
খ. যার অনুরাগ দূর হয়েছে— বীতরাগ।
গ. যে কাউকে ভয় করে না— অকুতোভয়।
ঘ. যে কন্যা পূর্বে বাগদত্তা বা বিবাহিতা হয়েছিল— অন্যপূর্বা।
ঙ. অরণ্যের অগ্নিকাণ্ড— দাবানল।
চ. যা সহজেই ভেঙ্গে যায়— ভঙ্গুর।
ছ. ঢাকায় উৎপন্ন— ঢাকাই।
জ. যা বাক্যে প্রকাশ করা যায় না— অনির্বচনীয়।

৮. যে কোনো দশটি প্রশ্নের উত্তর দিন : ১০

**ক. বাংলা কাব্যের আদি নিদর্শন কি?**
— চর্যাপদ।



**খ. 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যের রচয়িতা কে? কোন শতাব্দীর রচনা?**
— মুকুন্দরাম চক্রবর্তী। রচনাকাল আনুমানিক ষোড়শ শতক (১৫৯৪/১৫৯৫)।

**গ. মনসুর বয়াতী কে? তাঁর কাব্যের নাম কি?**
— বিখ্যাত লোকসাহিত্যের রচয়িতা ও মৈমনসিংহ গীতিকার অন্যতম কবি। তার কাব্যের নাম 'দেওয়ানা মদিনা'।

**ঘ. 'যুগসন্ধির কবি' কাকে বলা হয়, কেন?**
— ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তকে । তার কবিতায় মধ্যযুগ ও আধুনিক যুগের চিন্তাধারার সম্মিলন ঘটেছে বলে তাকে 'যুগসন্ধিক্ষণের কবি' বলা হয়।

**ঙ. মধ্যযুগের কোন কাব্য প্রথমে এক কবি শুরু করেন এবং পরে আর এক কবি শেষ করেন? কবি দুজনের নাম কি?**
— কাব্যের নাম 'আমীর হামজা'। শুরু করেন ফকির গরীবুল্লাহ এবং শেষ করেন সৈয়দ হামজা।

**চ. 'তোহফা' কাব্যটি কে রচনা করেন? কাব্যটি কোন ভাষা থেকে অনূদিত?**
— মহাকবি আলাওল। তিনি এটি হিন্দি ভাষা থেকে অনুবাদ করেন।

**ছ. 'প্রাচীন বঙ্গ সাহিত্যে মুসলমানের অবদান' গ্রন্থের রচয়িতা কে?**
— আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ।

**জ. ভানুসিংহ কার ছদ্মনাম? এই ছদ্মনামে কোন গ্রন্থটি রচিত হয়?**
— রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের। গ্রন্থের নাম 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী'।

**ঝ. ফররুখ আহমদ রচিত সনেট গ্রন্থের নাম কি?**
— মুহূর্তের কবিতা (১৯৬৩)।

**ঞ. প্রাচীন যুগে রচিত বাংলা সাহিত্যের নিদর্শন কোন কোন নামে পরিচিত?**
— চর্যাপদ, চর্যাগীতি, চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয়, আশ্চর্য্যচর্য্যাচয়।

**ট. 'ইউসুফ-জোলেখা' ও 'লাইলী-মজনু' কাব্যের উপাখ্যানসমূহ কোন দেশের?**
— 'ইউসুফ-জোলেখা' মিশরের ও 'লাইলী-মজনু' ইরানের (পারস্য দেশ)।

**ঠ. 'রামায়ণ' ও 'মহাভারত' কাব্যের মূল রচয়িতাদের নাম কি? কোন ভাষায় লেখা?**
— 'রামায়ণ' রচনা করেন মহাকবি বাল্মীকি এবং 'মহাভারত' কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসদেব। ভাষা: সংস্কৃত।

**ড. দোভাষী পুঁথি সাহিত্যের কয়েকজন রচয়িতার নাম লিখুন।**
— ফকির গরীবুল্লাহ, সৈয়দ হামজা, এয়াকুব আলী, মুহম্মদ দানেশ, মালে মুহম্মদ, আবদুল মজিদ খোন্দকার প্রমুখ উল্লেখযোগ্য।

**ঢ. আটচল্লিশ থেকে বায়ান্ন সালের বাংলা ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস ও রচয়িতার নাম লিখুন।**
— পূর্ব বাংলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি। রচয়িতা : বদরুদ্দীন ওমর।

## ১৫তম বিসিএস : ১৯৯৪-৯৫

*[দ্রষ্টব্য : বাংলা ভাষায় প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। তবে টেকনিক্যাল শব্দগুলো ইংরেজিতে লেখা চলবে। প্রশ্নোত্তর যথাযথ ও সংক্ষিপ্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। সাধু ও চলিত ভাষার মিশ্রণ দূষণীয়। প্রত্যেক প্রশ্নের মান প্রশ্নের শেষ প্রান্তে দেখানো হয়েছে।]*

১. যে কোনো একটি বিষয় অবলম্বনে রচনা লিখুন : ৩০

ক. নাগরিক জীবনে নিঃসঙ্গতা
খ. চিত্রকলা উপভোগ

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



গ. দারিদ্র্য বিমোচন
উত্তর : পৃষ্ঠা ৬৪৭।
ঘ. বই মেলা
ঙ. বাংলাদেশে পর্যটন শিল্পের ভবিষ্যৎ
উত্তর : পৃষ্ঠা ৬৬৫।
চ. সড়ক দুর্ঘটনা
উত্তর : পৃষ্ঠা ৬৯৫।
ছ. বাংলাদেশের শিশু
জ. তৃতীয় বিশ্বে এইডস রোগের বিস্তার ও প্রতিরোধ
উত্তর : পৃষ্ঠা ৮২৭।
ঝ. সৌজন্যবোধ
ঞ. চতুর্দশ শতাব্দী

২. ভাব-সম্প্রসারণ করুন : ১৫
ক. বিশ্বে যা-কিছু মহান সৃষ্টি চিরকল্যাণকর
অর্ধেক তার করিয়াছে নারী, অর্ধেক তার নর।
উত্তর : পৃষ্ঠা ১৬১।
*অথবা,*
খ. জ্ঞান যেখানে সীমাবদ্ধ, বুদ্ধি যেখানে আড়ষ্ট, মুক্তি সেখানে অসম্ভব।
উত্তর : পৃষ্ঠা ১৬১।

৩. সারাংশ লিখুন : ১৫
ক. নদীমাতৃক দেশে নদী যদি একবারে শুকিয়ে যায় তাহলে তার মাটিতে ঘটে কৃপণতা, তার অন্ন উৎপাদনের শক্তি ক্ষীণ হয়। দেশের আপন জীবিকা যদিবা কোনো মতে চলে, কিন্তু সে অন্ন-প্রাচুর্যের দ্বারা বাইরের বৃহৎ জগতের সঙ্গে তার যোগ, সেটা যায় দরিদ্র হয়ে। যেমন বিশেষ দেশ নদীমাতৃক, তেমনি বিশেষ জনচিত্ত আছে যাকে নদীমাতৃক বলা চলে, সে চিত্তের এমন নিত্যপ্রবাহিত মননধারা যায় যোগে বাহিরকে সে আপনার মধ্যে টেনে আনে; নিজের মধ্যেকার ভেদ-বিভেদ তার ভেসে যায়—যে প্রবাহ চিন্তার ক্ষেত্রকে নব-নব সফলতায় পরিপূর্ণ করে, নিরন্তর অন্ন জোগায় সকল দেশকে, সকল কালকে।
উত্তর : পৃষ্ঠা ২৬২।
*অথবা,*
খ. আশার ছলনে ভুলি কি ফল লভিনু হায়, তাই ভাবি মনে।
জীবন-প্রবাহ বহি কাল-সিন্ধু পানে ধায়,
ফিরাব কেমনে? দিন দিন আয়ুহীন,
হীনবল দিন দিন, তবু এ আশার নেশা ছুটিল না? এ কি দায়!
উত্তর : পৃষ্ঠা ২৬২।



৪. শুদ্ধ করে লিখুন (যে কোনো দশটি) : ১০

| অশুদ্ধ | শুদ্ধ |
|---|---|
| ক. আমি, তুমি ও সে কাল সাভার জাতীয় স্মৃতিসৌধ দেখিতে যাব। | ক. তুমি সে ও আমি কাল সাভার জাতীয় স্মৃতিসৌধ দেখতে যাব। |
| খ. যিনি যথার্থই বিদ্যান, তিনি কখনও নিজের বিদ্যার গৌরব করে না। | খ. যিনি যথার্থই বিদ্বান, তিনি কখনও নিজের বিদ্যার গৌরব করেন না। |
| গ. তার জৈ্যষ্ঠ পুত্র ও কনিষ্ট কন্যা বিদেশ গিয়াছে। | গ. তার জ্যেষ্ঠপুত্র ও কনিষ্ঠ কন্যা বিদেশে গেছে। |
| ঘ. বিষয়টির বিষদ ব্যাখ্যার প্রয়োজন নাই। | ঘ. বিষয়টির বিশদ ব্যাখ্যার প্রয়োজন নাই। |
| ঙ. ইহা একটি মুক ও বধির প্রশিক্ষণ কেন্দ্র। | ঙ. ইহা একটি মূক ও বধির প্রশিক্ষণ কেন্দ্র। |
| চ. পরিবেশ দোষণ সমস্যা দিন দিন জটিল হচ্ছে। | চ. পরিবেশ দূষণ সমস্যা দিন দিন জটিল হচ্ছে। |
| ছ. দারিদ্রতা বাংলাদেশের প্রধান সমস্যা। | ছ. দারিদ্র্য বাংলাদেশের প্রধান সমস্যা। |
| জ. এই সব মানুষগুলির কোন ঠিকানা নেই। | জ. এসব মানুষের কোনো ঠিকানা নেই। |
| ঝ. শোকসভায় বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী, বিজ্ঞানী, দার্শনিক প্রমুখগণ শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করেন। | ঝ. শোকসভায় বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী, বিজ্ঞানী, দার্শনিক প্রমুখ শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করেন। |
| ঞ. মণিষী মুহম্মদ শহীদুল্লাহ একটি আদর্শ বাংলা ব্যাকরণ রচনা করেন। | ঞ. মনীষী মুহম্মদ শহীদুল্লাহ একটি আদর্শ বাংলা ব্যাকরণ রচনা করেন। |
| ট. তারা যাইতে যাইতে এ দৃশ্য দেখিয়া মুগ্ধ ও বিস্মিত হল। | ট. তারা যেতে যেতে এ দৃশ্য দেখে মুগ্ধ ও বিস্মিত হল। |
| ঠ. তাহার প্রতি এতটা অন্যায় করিলে সবাই দোষ দিবে। | ঠ. তার প্রতি এতটা অন্যায় করলে সবাই দোষ দেবে। |
| ড. তোমার সুখে দুঃখে পরস্পরের সাথী হও। | ড. তোমরা সুখে-দুঃখে পরস্পরের সাথী হও। |
| ঢ. বাংলাদেশের ভৌগলিক অবস্থান দক্ষিণ এশিয়াতে। | ঢ. বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান দক্ষিণ এশিয়াতে। |

৫. উপযুক্ত শব্দ বসিয়ে শূন্যস্থান পূর্ণ করুন (যে কোনো দশটি) : ১০
ক. সে সারাটা জীবন — খেটেই গেল। (কলুর বলদের মত)
খ. তার সঙ্গে— দেখা হয়। (কালেভদ্রে)
গ. তিনি একজন — মানুষ। (মাটির)
ঘ. সাবধান একথা যেন কেউ — জানতে না পারে। (ঘুণাক্ষরেও)
ঙ. পরীক্ষায় পাস করার জন্যে সে — পণ করেছে। (আদাজল খেয়ে)
চ. ক্ষমতার অহংকারে — জ্ঞান করো না। (ধরাকে সরা)
ছ. আমাকে রাগিয়োনা, — ভেঙ্গে দেব। (হাটে হাড়ি)
জ. এই সুযোগে সে অনেক টাকা — মারলো। (দাও)
ঝ. বাইরে থেকে দেখে তাকে ধার্মিক মনে হয় কিন্তু আসলে —। (বকধার্মিক)
ঞ. কার এত বড় — যে সে এ কাজ করতে পারলো। (বুকের পাটা)
ট. সে কি পেয়েছে? এটা — নাকি? (মগের মুল্লুক)
ঠ. তার অকাল মৃত্যু — বজ্রপাতের শামিল। (বিনা মেঘে)
ড. তিনি খুব — মানুষ, যে যা বলে তা-ই বিশ্বাস করেন। (কানপাতলা)

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



৬. যে কোনো পাঁচটি বাগধারা দিয়ে উপযুক্ত বাক্য রচনা করুন : ৫

ক. আলালের ঘরের দুলাল (অতি আদরের বখাটে পুত্র) : বুলবুল সাহেবের আলালের ঘরের দুলালটি সকল নষ্টের মূল।

খ. উলুবনে মুক্ত ছড়ানো (অপাত্রে জ্ঞান দান) : তার মতো নির্বোধের কাছে কবিতা আলোচনা করা আর উলুবনে মুক্ত ছড়ানো একই কথা।

গ. গড্ডলিকা প্রবাহ (অন্ধ অনুকরণ) : এমন গড্ডলিকা প্রবাহে গা ভাসিয়ে কতদিন চলবে?

ঘ. গোড়ায় গলদ (শুরুতেই ভুল) : গোড়ায় গলদ থাকলে কেউ পরীক্ষায় ভালো ফল লাভ করতে পারে না?

ঙ. উভয়-সংকট (দুই দিকে বিপদ) : একদিকে বড় সাহেব অন্যদিকে ছোট সাহেব দু'জনের মন রাখতে কি উভয় সংকটেই না পড়েছি।

চ. কড়ায়-গণ্ডায় (পুরোপুরি) : আসলামের পাওনা টাকা কড়ায়-গণ্ডায় শোধ করেছি।

ছ. আদা-জল খেয়ে লাগা (কোমর বেঁধে লাগা) : করিম একেবারে আদা জল খেয়ে লেগেছে, অঙ্কটা না কষে কিছুতেই উঠবে না।

জ. আমড়া কাঠের ঢেঁকি (অপদার্থ) : সাত পাঁচ জ্ঞান যার নেই অমন আমড়া কাঠের ঢেঁকিকে দিয়ে কি হবে।

৭. এক কথায় প্রকাশ করুন (যে কোনো পাঁচটি) : ৫

ক. যুক্তিসংগত নয়– অযৌক্তিক।

খ. যা বলা হয়েছে– উক্ত।

গ. অনুসন্ধান করবার ইচ্ছা– অনুসন্ধিৎসা।

ঘ. একই সময়ে বর্তমান– সমসাময়িক।

ঙ. চক্ষু দ্বারা গৃহীত– চাক্ষুষ।

চ. যা পূর্বে শোনা যায়নি– অশ্রুতপূর্ব।

ছ. যার সর্বস্ব খোয়া গিয়েছে– সর্বহারা।

জ. যা লাভ করা দুঃসাধ্য– দুর্লভ।

৮. যে কোনো দশটি প্রশ্নের উত্তর দিন : ১০

ক. **'সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই'– কোন কবির বাণী?**

— চণ্ডীদাসের।

খ. **'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য'-এর রচয়িতা কে? কাব্যটির রচনাকাল ও গুরুত্ব কি?**

— রচয়িতা : বড়ু চণ্ডীদাস। রচনাকাল : ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর মতে ১৪০০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে এবং সুকুমার সেনের মতে ১৭৮০ খ্রিস্টাব্দ। গুরুত্ব : এটি মধ্যযুগের প্রথম এবং সর্বজনস্বীকৃত প্রথম খাঁটি বাংলায় রচিত অন্যতম সাহিত্য নিদর্শন। ধর্মীয় দিক থেকেও এর গুরুত্ব অপরিসীম।

গ. **শাহ মুহম্মদ সগীর রচিত একটি কাব্যের নাম লিখুন এবং বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে ঐ কাব্যের গুরুত্ব নির্দেশ করুন।**

— 'ইউসুফ-জুলেখা'। এটি বাংলা ভাষায় রচিত প্রথম প্রণয়োপাখ্যান এবং কোনো মুসলিম রচিত প্রথম গ্রন্থ।

ঘ. **'লাইলী-মজনু' কাব্যের রচয়িতা কে? এটি কি মৌলিক, না অনুবাদ কাব্য?**

— 'লাইলী-মজনু' কাব্যের রচয়িতা দৌলত-উজীর বাহরাম খাঁ এবং এটি একটি অনুবাদ কাব্য।

ঙ. **কৃত্তিবাস কোন কাব্যের জন্য বিখ্যাত? তিনি কোন সময় এ কাব্যটি রচনা করেন?**

— রামায়ণ। তিনি পঞ্চদশ শতকে এ কাব্যটি রচনা করেন।



চ. **বিজয় গুপ্তের দেশ কোথায়? তিনি কোন উপাখ্যান নিয়ে কোন সময় কাব্য লেখেন?**

— বরিশাল জেলার ফুল্লশ্রী গ্রামে (বর্তমান গৈলা)। পঞ্চদশ শতকে (১৪৮৪-১৪৮৫) তিনি মনসার কাহিনী নিয়ে 'পদ্মাপুরাণ' কাব্য রচনা করেন।

ছ. **বাংলা ভাষার প্রথম ব্যাকরণ কে, কোন ভাষায়, কোথায় রচনা করেন?**

— পর্তুগিজ পাদ্রি মনোএল-দ্য-আসসুম্পসাঁও পর্তুগিজ ভাষায় গাজীপুরের ভাওয়ালে ১৭৩৪ সালে বাংলা ভাষার প্রথম ব্যাকরণ রচনা করেন। (এর বাংলা নাম ছিল ভোকাবুলারিও এম ইদিওমা বেনগল্লা ই-পর্তুগীজ। এটি পর্তুগালের রাজধানী লিসবন থেকে ১৭৪৩ সালে প্রকাশিত হয়)।

জ. **বাংলা গদ্যের জনক বলা হয় কাকে? বাংলা গদ্যে তিনি কি সংযোজন করেন?**

— ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে। তিনি বাংলা ভাষায় প্রথম যতিচিহ্নের ব্যবহার শুরু করেন।

ঝ. **কারবালা কাহিনী নিয়ে ইংরেজ আমলে কে গ্রন্থ রচনা করেন? লেখক ও গ্রন্থের নাম কি?**

— মীর মশাররফ হোসেন। গ্রন্থ : বিষাদ সিন্ধু।

ঞ. **'কৃষ্ণকুমারী' নাটকের রচয়িতা কে? এ নাটকের গুরুত্ব কি?**

— মাইকেল মধুসূদন দত্ত। এটি বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক ট্র্যাজেডি।

ট. **কুহেলিকা গ্রন্থটির আঙ্গিক কি? রচয়িতা কে?**

— একটি উপন্যাস। রচয়িতা কাজী নজরুল ইসলাম।

ঠ. **বাংলাদেশের সাহিত্যে (১৯৪৭–৯৩) প্রথম উল্লেখযোগ্য উপন্যাস কোনটি? রচয়িতা কে?**

— সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর 'লালসালু'।

ড. **'কবর' কোন ঐতিহাসিক ঘটনা নিয়ে রচিত? রচয়িতা কে?**

— একুশের ভাষা আন্দোলন। রচয়িতা মুনীর চৌধুরী।

ঢ. **একুশের প্রথম সংকলন এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিলপত্র সংকলনের সম্পাদনা করেন কে?**

— হাসান হাফিজুর রহমান।

## ১৩তম বিসিএস : ১৯৯১-৯২

*[দ্রষ্টব্য : বাংলা ভাষায় প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। তবে টেকনিক্যাল শব্দগুলো ইংরেজিতে লেখা চলবে। প্রশ্নোত্তর যথাযথ ও সংক্ষিপ্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। সাধু ও চলিত ভাষার মিশ্রণ দূষণীয়। প্রত্যেক প্রশ্নের মান প্রশ্নের শেষ প্রান্তে দেখানো হয়েছে।]*

১. যে কোনো একটি বিষয় অবলম্বনে রচনা লিখুন : ৩০

ক. আধুনিক কাব্যে দুর্বোধ্যতা

খ. লোকসাহিত্য অনুশীলনের উপযোগিতা

উত্তর : পৃষ্ঠা ৭৫২।

গ. সমাজতন্ত্রের সংকট ও বিশ্ব রাজনীতির ভবিষ্যৎ

ঘ. উপসাগরীয় যুদ্ধ এবং তার প্রতিক্রিয়া

ঙ. বাংলাদেশে সন্ত্রাসী তৎপরতায় গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ

চ. প্রাকৃতিক দুর্যোগ

উত্তর : পৃষ্ঠা ৮৫২।

ছ. সমকালীন সংস্কৃতিতে সংকটের ছায়া

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



জ. পরিবেশগত ভারসাম্য সংরক্ষণের ভাবনা-চিন্তা
উত্তর : পৃষ্ঠা ৮৪৯।
ঝ. যখন পড়বে না মোর পায়ের চিহ্ন এই বাটে
ঞ. সবার জন্য স্বাস্থ্য এবং শিক্ষা।

২. ভাব-সম্প্রসারণ করুন : ১৫
ক. কবিতা তোমায় দিলাম আজকে ছুটি
পূর্ণিমার চাঁদ যেন ঝলসানো রুটি।
উত্তর : পৃষ্ঠা ১৬০।
*অথবা,*
খ. ভূতের ভয় অবিশ্বাসে কাটে না।
উত্তর : পৃষ্ঠা ১৬০।

৩. সারাংশ লিখুন : ১৫
ক. নব্যযুগের গ্রিসের বিজ্ঞানবল প্লেটোর যুগের এথেন্সের চেয়ে অনেক বেশি। এখন গ্রিসে রেলগাড়ি আছে, সেখানে মটর ছুটছে, ষ্টিমার ছুটছে, তোপ, কামান-বন্দুক, কলকারখানা সবই আছে; আর প্রাচীন এথেন্সে এসবের কোনো চিহ্নই ছিল না। এসব সত্ত্বেও প্লেটোর এথেন্সকে আমরা নবীন গ্রিস অপেক্ষা বেশি সভ্য বলে মনে করি। এর কারণ কি?—এর কারণ হচ্ছে এই যে, প্রাচীন এথেন্সে মানবাত্মার যে বিকাশ হয়েছিল আজকালকার গ্রিসে তার কোনো লক্ষণ দেখতে পাওয়া যায় না। জীবনের মূল উদ্দেশ্যের সন্ধানে এথেন্স যে বিকাশ দেখিয়েছিল, এখনকার গ্রিসে তা দেখতে পাওয়া যায় না। ব্যক্তিত্বের সম্যক বিকাশের চেষ্টা এথেন্সই করেছিল; এখনকার গ্রিসে সে প্রচেষ্টা নেই।
উত্তর : পৃষ্ঠা ২৬১।
*অথবা,*
খ. আমি যে দেখিনু তরুণ বালক উন্মাদ হয়ে ছুটে
কি যন্ত্রণায় মরিছে পাথরে নিষ্ফল মাথা কুটে।
কণ্ঠ আমার রুদ্ধ আজিকে বাঁশী সঙ্গীত হারা,
অমাবস্যার কারা—
লুপ্ত করেছে আমার ভুবন দুঃস্বপনের তলে,
তাই তো তোমায় শুধাই অশ্রুজলে—
যাহারা তোমার বিষাইছে বায়ু নিভাইছে তব আলো,
তুমি কি তাদের ক্ষমা করিয়াছ, তুমি কি বেসেছ ভাল?
উত্তর : পৃষ্ঠা ২৬২।

৪. শুদ্ধ করে লিখুন (যে কোনো দশটি) : ১০

| অশুদ্ধ | শুদ্ধ |
|---|---|
| ক মনস্কামনা পূর্ণ না হওয়ায় সে মনোস্তাপ ভুগছে। | ক. মনস্কামনা পূর্ণ না হওয়ায় সে মনস্তাপে ভুগছে। |
| খ. অত্যান্ত গরমে কষ্ট পাচ্ছি, বাতাস করিতেছ না কেন? | খ. অত্যন্ত গরমে কষ্ট পাচ্ছি, বাতাস করছ না কেন? |
| গ. আমাদের দৈন্যতা দৃষ্টি তোমার পুলকের কারণ কি? | গ. আমাদের দীনতা দৃষ্টে তোমার পুলকের কারণ কি? |
| ঘ. পিপীলিকা আর মরিচিকার পিছু ধাওয়া করা একই কথা। | ঘ. পিপীলিকা আর মরীচিকার পিছু ধাওয়া করা একই কথা। |



| অশুদ্ধ | শুদ্ধ |
|---|---|
| ঙ. বাবু চলিলেন, যেন গজেন্দ্রগামিনী। | ঙ. বাবু চলিলেন যেন গজেন্দ্রগমন। |
| চ. ইতিমধ্যে যা ঘটেছে তাতেই তার মনবিকার দেখা দিয়েছে। | চ. ইতোমধ্যে যা ঘটেছে তাতেই তার মনোবিকার দেখা দিয়েছে। |
| ছ. সর্বদেহে অসহ্যনীয় ব্যথা, ঔষধ দেব কোথায়? | ছ. সর্বদেহে অসহ্য/অসহনীয় ব্যথা, ঔষধ দেব কোথায়? |
| জ. কালনুক্রমানুসারে আমি সবই জানিতে পারিব, কিন্তু তখন আর উপায় থাকবে না। | জ. কালক্রমে আমি সবই জানতে পারব, কিন্তু তখন আর উপায় থাকবে না। |
| ঝ. বিস্ময়াভিভূত হতবাক চিত্তে আমি তখন তোমাকে দেখিতেছিলাম। | ঝ. বিস্ময়াভিভূত চিত্তে আমি তখন তোমাকে দেখিতেছিলাম। |
| ঞ. মনোনীত কবিতা হইতে একটি বেছে নাও এবং আবৃত্তি করিয়া পড়। | ঞ. নির্বাচিত কবিতা থেকে একটি বেছে নাও এবং আবৃত্তি কর। |
| ট. মাননীয় সভানেত্রী এবং উপস্থিত সকল শিক্ষকগণকে লক্ষ্য করে তিনি কথাগুলি বললেন। | ট. মাননীয়া সভানেত্রী এবং উপস্থিত সকল শিক্ষককে লক্ষ্য করে তিনি কথাগুলো বললেন। |
| ঠ. অনাদি অনন্তকাল ধরে আমি চিরদিন তোমাকে স্মরণ করবো। | ঠ. আমি চিরদিন তোমাকে স্মরণ করব। |
| ড. রাষ্ট্রপ্রধানগণ আপাতত ঐকমত্যে পৌছুলেন, তবু আগামীতে কি ঘটবে বলা যায় না। | ড. রাষ্ট্রপ্রধানগণ আপাত ঐকমত্যে পৌছলেন, তবু আগামীতে কি ঘটবে বলা যায় না। |
| ঢ. অনোন্যপায়ী হইয়া আমি তোমার সরণাপন্ন হইলাম। | ঢ. অনন্যোপায় হইয়া আমি তোমার শরণাপন্ন হইলাম। |

৫. উপযুক্ত শব্দ বসিয়ে শূন্যস্থান পূরণ করুন (যে কোনো দশটি) : ১০
ক. শেষ পর্যন্ত কাগজটি হস্তগত হওয়ায় আমার — দিয়া জ্বর ছাড়িল। (ঘাম)
খ. উনি হচ্ছেন গভীর জলের মাছ, উনাকে — পাওয়া সহজ নয়। (বাগে)
গ. বিনা টিকিটে ট্রেনে চেপে — সেলামীটা ভালই হলো। (আক্কেল)
ঘ. আমি কি — ঘাস কাটতে এখানে বসে আছি। ( ঘোড়ার)
ঙ. ওর আঙ্গুল দিয়ে — পর্যন্ত গলবে না, আর তুমি প্রত্যাশা করছ সাহায্য। (পানি)
চ. ছুটকো ভাইরা সবাই সব সময় — উজির মারছেন, কিন্তু সবই গলাবাজী মাত্র। (রাজা)
ছ. কথার মধ্যে — কাটা আমি এক্কেবারে পছন্দ করি না বাপু। (ফোড়ন)
জ. ও সন্ন্যাসী না আর কিছু, আসলে একটা আস্ত— তপস্বী। (বিড়াল)
ঝ. আধুনিকাদের উগ্র প্রসাধনী দেখলে অনেক সময় মনে হয়— নাকে তিলক পড়েছে। (খাদা)
ঞ. এতদিনে হেড মাস্টারটা বদলী হল, আর আমার— বাতাস লাগলো। (হাড়ে)
ট. মনে— ধরেছে বুঝি, তাইতো দেখি খুশিতে বাগবাগ। (রং)
ঠ. ভারতে যেতে আমার বেশি পয়সার দরকার হবে না, কারণ আমি — ধাক্কা পাসপোর্টে যাব। (ঘাড়/গলা)
ড. দুই সতীনকেই বাপের বাড়ি পাঠাবো, ওদের — কচকচি আর ভাল লাগে না। (ঢেঁকির)
ঢ. সুখের দিনে ওমন — মাছি কত দেখা যায়। (দুধের)

৬. যে কোনো পাঁচটি বাগধারা দিয়ে উপযুক্ত বাক্য রচনা করুন? ৫
ক. ক অক্ষর গোমাংস (বর্ণজ্ঞানহীন) : এত বড় বিদ্বান লোকটার ছেলে কিনা ক অক্ষর গোমাংস।
খ. গণপিটুনি (প্রচণ্ড মার) : গণপিটুনিতে কথিত চোরটা মারা গেল।
গ. গোঁফ খেজুরে (অত্যন্ত অলস) : এ রকম গোঁফ খেজুরে লোক জীবনে কখনও উন্নতি করতে পারবে না।
ঘ. পর্বতের মূষিক প্রসব (বিরাট সম্ভাবনা) : এত আলোচনা এত প্রতিশ্রুতির পরে এইটুকু পেলাম? এতো পর্বতের মূষিক প্রসব হলো।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



ঙ. শিরে সংক্রান্তি (আসন্ন বিপদ) : পরীক্ষার মাত্র একমাস আগে শিরে সংক্রান্তি নিয়ে ভীষণভাবে পড়তে আরম্ভ করেছো দেখছি।

চ. চাঁদের হাট (আনন্দ সমাবেশ) : বিয়ে বাড়িতে ছেলে, জামাই, মেয়ে সবাই এসেছে, যেন চাঁদের হাট বসেছে।

ছ. বিদুরের খুদ (গরিবের সামান্য উপহার) : আমার আয়োজন সামান্য, এটা যেন বিদুরের খুদ, কিন্তু এতে হৃদয়ের স্পর্শ পাবেন।

জ. একাদশে বৃহস্পতি (সুসময়) : তোমার তো এখন একাদশে বৃহস্পতি, ধুলো মুঠো সোনা হয়।

৭. এক কথায় প্রকাশ করুন (যে কোনো পাঁচটি) : ৫

ক. যে নারী জীবনে সন্তান প্রসব করেনি–বন্ধ্যা।
খ. হনন করার ইচ্ছা– জিঘাংসা।
গ. ক্রমশই বর্ধিত হচ্ছে যা– ক্রমবর্ধমান।
ঘ. কাচের দ্বারা নির্মিত যে ভবন– কাচভবন।
ঙ. গোপন করিবার ইচ্ছা–জুগুপ্সা।
চ. অনেকের মধ্যে একজন–অন্যতম।
ছ. পূর্বে জন্মেছে যে–অগ্রজ।
জ. অগ্রসর হয়ে অভ্যর্থনা–প্রত্যুদ্গমন।

৮. যে কোনো দশটি প্রশ্নের উত্তর দিন : ১০

ক. 'ধনধান্যে পুষ্পে ভরা আমাদের এই বসুন্ধরা' দিয়ে শুরু সঙ্গীতটির রচয়িতা কে?
— ডি.এল. রায় (দ্বিজেন্দ্রলাল রায়)।

খ. 'চর্যাপদ' গ্রন্থে কোন পদকর্তার সর্বাধিক এবং কতটি পদ রয়েছে?
— সর্বাধিক পদ রচনা করেছেন কাহ্নপা এবং তাঁর পদসংখ্যা ১৩টি।

গ. জয়দেব রচিত একটি সংস্কৃত কাব্যগ্রন্থের নাম লিখুন, যা বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।
— গীতগোবিন্দ।

ঘ. আলাওলের 'পদ্মাবতী' কোন ভাষার, কোন কবির এবং কোন গ্রন্থের অনুবাদ?
— হিন্দি ভাষায় রচিত মালিক মুহম্মদ জায়সীর 'পদুমাবৎ' গ্রন্থের অনুবাদ।

ঙ. ভারতচন্দ্র কোন রাজসভার কবি ছিলেন?
— মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র।

চ. ফকির গরীবুল্লাহ রচিত দুটি গ্রন্থের নাম লিখুন।
— আমীর হামজা ও জঙ্গনামা।

ছ. 'সংবাদ প্রভাকর' কত সালে, কার সম্পাদনায় প্রথম প্রকাশিত হয়?
— ১৮৩১ সালে, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের সম্পাদনায়।

জ. মুসলমান সম্পাদকের সম্পাদনায় প্রথম কোন পত্রিকা প্রকাশিত হয়? সম্পাদকের নাম কি?
— সমাচার সভারাজেন্দ্র (১৮৩১)। সম্পাদক শেখ আলীমুল্লাহ।

ঝ. 'সধবার একাদশী' কার লেখা ও কি ধরনের বই?
— দীনবন্ধু মিত্র রচিত একটি প্রহসন।



ঞ. শেক্সপীয়র রচিত কোন নাটকটি বিদ্যাসাগর অনুবাদ করেন এবং অনূদিত গ্রন্থটির বাংলা নাম কি?
— নাটক : কমেডি অব এররস (Comedy of Erros)। অনূদিত গ্রন্থ : ভ্রান্তিবিলাস।

ট. 'নৌফেল ও হাতেম' কোন জাতীয় রচনা? রচয়িতার নাম কি?
— কাব্যনাট্য। রচয়িতা ফররুখ আহমদ।

ঠ. 'চাঁদের অমাবস্যা' কোন জাতীয় রচনা এবং গ্রন্থটির লেখক কে?
— উপন্যাস এবং রচয়িতা সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ।

ড. বাংলাদেশের দুজন অকালপ্রয়াত বিশিষ্ট কবির নাম লিখুন?
— আবুল হাসান ও রুদ্র মুহম্মদ শহীদুল্লাহ।

## ১১তম বিসিএস : ১৯৯০-৯১

*[দ্রষ্টব্য : বাংলা ভাষায় প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। তবে টেকনিক্যাল শব্দগুলো ইংরেজিতে লেখা চলবে। প্রশ্নোত্তর যথাযথ ও সংক্ষিপ্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। সাধু ও চলিত ভাষার মিশ্রণ দূষণীয়। প্রত্যেক প্রশ্নের মান প্রশ্নের শেষ প্রান্তে দেখানো হয়েছে।]*

১. যে কোনো একটি বিষয়ে প্রবন্ধ লিখুন : ৩০

ক. বাংলাদেশের সাম্প্রতিক নাট্যচর্চা
উত্তর : পৃষ্ঠা ৭৬৯।
খ. বাংলাদেশের উপন্যাস
গ. বিক্ষুব্ধ পূর্ব ইউরোপ
ঘ. পরিবেশ দূষণ ও তার প্রতিকার
উত্তর : পৃষ্ঠা ৮৪৯।
ঙ. সাম্প্রতিক পণ্যমূল্য বৃদ্ধি ও গণ-জীবন
উত্তর : পৃষ্ঠা ৬৫২।
চ. কৃষিকার্যে বিজ্ঞান
ছ. বাংলাদেশের সংস্কৃতি ও তার রূপান্তর
উত্তর : পৃষ্ঠা ৭৪০।
জ. আমাদের শহর ও গ্রামের ব্যবধান অপসারণ
ঝ. বাংলাদেশের পশুপাখি
ঞ. বাংলাদেশের বন্যা নিয়ন্ত্রণের সমস্যা ও সম্ভাবনা।
উত্তর : পৃষ্ঠা ৮৬১।

২. ভাব-সম্প্রসারণ করুন : ১৫

ক. 'যত মত তত পথ'।
উত্তর : পৃষ্ঠা ১৫৯।
অথবা,
খ. যে নদী হারায়ে স্রোত চলিতে না পারে
সহস্র শৈবালদাম বাঁধে আসি তারে,
যে জাতি জীবনহারা অচল অসাড়
পদে পদে বাঁধে তারে জীর্ণ লোকাচার।
উত্তর : পৃষ্ঠা ১৫৯।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



৩. সারাংশ লিখুন : ১৫

ক. এখন দিন গিয়েছে। অন্ধকার হয়ে আসে। একদিন এই পথকে মনে হয়েছিল আমারই পথ, একান্তই আমার; এখন দেখছি, কেবল একটি বার মাত্র এই পথ দিয়ে চলার হুকুম নিয়ে এসেছি, আর নয়। নেবুতলা উজিয়ে সেই পুকুরপাড়, দ্বাদশ দেউলের ঘাট, নদীর চর, গোয়ালবাড়ি, ধানের গোলা পেরিয়ে–সেই চেনা চাউনি, চেনা কথা, চেনা মুখের মহলে আর একটি বারও ফিরে গিয়ে বলা হবে না। 'এইযে'! এই পথ যে চলার পথ, ফেরার পথ নয়। আজ ধূসর সন্ধ্যায় একবার পেছনে ফিরে তাকালুম; দেখলুম; এই পথটি বহু বিস্মৃত পদচিহ্নের পদাবলী, বৈরবীর সুরে বাঁধা। যতকাল যত পথিক চলে গেছে তাদের জীবনের সমস্ত কথাকেই এই পথ আপনার একটি মাত্র ধূলি রেখায় সংক্ষিপ্ত করে এঁকেছে; সে একটি রেখা চলেছে সূর্যোদয়ের দিক থেকে সূর্যাস্তের দিকে এক সোনার সিংহাদ্বার থেকে আর এক সোনার সিংহদ্বার।

**উত্তর : পৃষ্ঠা ২৬১।**

***অথবা,***

খ. অদ্ভুত আঁধার এসেছে এ পৃথিবীতে আজ
যারা অন্ধ সবচেয়ে বেশি আজ চোখে দ্যাখে তারা;
যাদের হৃদয়ে, কোনো প্রেম নেই—প্রীতি নেই—করুণার আলোড়ন নেই
পৃথিবী অচল আজ তাদের সুপরামর্শ ছাড়া
যাদের গভীর আস্থা আছে আজো মানুষের প্রতি
এখনো যাদের কাছে স্বাভাবিক বলে মনে হয়
মহৎ সত্য বা রীতি, কিংবা শিল্প অথবা সাধনা
শকুন ও শেয়ালের খাদ্য
আজ তাদের হৃদয়।

**উত্তর : পৃষ্ঠা ২৬১।**

৪. **শুদ্ধ করে লিখুন (যে কোনো দশটি) :** ১০

| অশুদ্ধ | শুদ্ধ |
|---|---|
| ক. এমন অসহ্যনীয় ব্যাথ্যা কখনও অনুভব করিনি। | ক. এমন অসহ্য ব্যথা কখনও অনুভব করিনি। |
| খ. সে কৌতুক করার কৌতুহল সম্বরণ করতে পারল না। | খ. সে কৌতুক করার কৌতূহল সংবরণ করতে পারলো না। |
| গ. মহারাজ সভাগৃহে প্রবেশ করলেন। | গ. মহারাজ সভাকক্ষে প্রবেশ করলেন। |
| ঘ. সর্ববিষয়সমূহে বাহুল্যতা বর্জন করবে। | ঘ. সর্ব বিষয়ে বাহুল্য বর্জন করবে। |
| ঙ. অন্নাভাবে প্রতি ঘরে ঘরে হাহাকার। | ঙ. অন্নাভাবে ঘরে ঘরে হাহাকার। |
| চ. শশীভূষণ গীতাঞ্জলী পাঠ করেছে। | চ. শশিভূষণ গীতাঞ্জলি পাঠ করেছে। |
| ছ. তিনিও তোমার বিরুদ্ধে সাক্ষী দিলেন, আমার আর বাচার স্বাদ নেই। | ছ. তিনি তোমার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিলেন, আমার আর বাঁচার সাধ নেই। |
| জ. সে সঙ্কট অবস্থায় পড়েছে। | জ. সে সঙ্কটে পড়েছে। |
| ঝ. আবাল হতেই সযত্নপূর্বক ব্যাকরণ পাঠ করা উচিত। | ঝ. আবাল্য সযত্নে ব্যাকরণ পাঠ করা উচিত। |



| অশুদ্ধ | শুদ্ধ |
|---|---|
| ঞ. সব ধনাঢ্য ব্যক্তিবর্গের আতিথ্য সংকার করা উচিৎ। | ঞ. সব ধনাঢ্য ব্যক্তির অতিথিসৎকার করা উচিত। |
| ট. তার কাজ করার জন্য আমি আপ্রাণ চেস্টা করব। | ট. তার কাজ করার জন্য আমি আপ্রাণ চেষ্টা করব। |
| ঠ. মাতৃবিয়োগে তিনি শোকানলে মগ্ন। | ঠ. মাতৃবিয়োগে তিনি শোকানলে দগ্ধ। |
| ড. গতকাল নীলিয়া লাল পেড়ে শাড়ি পরেছিল। | ড. গতকাল নীলিমা লাল পাড়ের শাড়ি পরেছিল। |
| ঢ. তোমার গোপন কথা শোনা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। | ঢ. তোমার গোপনীয় কথা শোনা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। |

৫. **উপযুক্ত শব্দ দিয়ে শূন্যস্থান পূরণ করে বাক্য অর্থপূর্ণ করুন (যে কোনো দশটি) :** ১০

ক. সেটা ছিল তার — যাত্রা; সেই যে সে গেল, আর ফিরে এলো না। (অগস্ত্য)

খ. যে যা পারল লুটে নিল, আর আমার ভাগ্যে — ডিম্ব। (অশ্ব)

গ. তোমার তো — বছর; দেখা যাবে, কাজটা কবে শেষ হয়। (আঠার মাসে)

ঘ. সারাদিন ধরে— গুড়ি ঝরছিল। (ইলশে)

ঙ. তব ঘৃণা যেন তারে— দহে। (তৃণসম)

চ. — বলদের মতো না চলে একটু নিজের বিদ্যাবুদ্ধি খাটাও। (কলুর)

ছ. এই বয়সে এসে দেখছি, কাঁচা — ঘুণ ধরেছে। (বাঁশে)

জ. মেয়েটি সামান্য ঘরে জন্মালেও কিন্তু — পদ্মফুল। (গোবরে)

ঝ. ওকে একবার হাতে পেলে — খাইয়ে ছাড়বো। (ঘোল)

ঞ. দুর্বৃত্তেরা চলে যেতেই আমার যেন — জ্বর ছাড়লো। (ঘাম দিয়ে)

ট. জল পড়ে — নড়ে। (পাতা)

ঠ. পাখির — চোখ তুলে নাটোরের বনলতা সেন। (নীড়ের মত)

ড. লোকটি সাধু সেজে বেড়ালে কি হবে, আসলে উনি — বাঘ। (তুলসী বনের)

ঢ. এখন আমার — পা; কাকে ছাড়ি, কাকে রাখি? (দু নৌকায়)

৬. **যে কোনো পাঁচটি বাগধারা দিয়ে অর্থসহ পাঁচটি বাক্য রচনা করুন :** ৫

ক. **দুধের মাছি (সুসময়ের বন্ধু) :** দুর্দিন দেখা দিলে দুধের মাছিরা আর থাকে না।

খ. **ভূতের বাপের শ্রাদ্ধ (অপরিমিত অপব্যয়) :** তোমাদের ক্লাবে একদিন গিয়ে দেখেছি, সেখানে যেন ভূতের বাপের শ্রাদ্ধ চলছে।

গ. **গোকুলের ষাঁড় (স্বেচ্ছাচারী) :** তোমার মত গোকুলের ষাঁড়কে আশ্রয় দেবার মত জায়গা আমার নেই।

ঘ. **পাকা ধানে মই (বিপুল ক্ষতি করা) :** আমি তোমার এমন কি পাকা ধানে মই দিয়েছি যে, আমার সঙ্গে এতবড় শক্রতা করলে?

ঙ. **ব্যাঙের আধুলি (অতি সামান্য ধন) :** শামীম তার ব্যাঙের আধুলি একশত টাকা দিয়ে অনেক কিছু কিনবে ভাবছে।

চ. **মান্ধাতার আমল (পুরানো আমল) :** সেই মান্ধাতার আমলের কথা বাদ দিয়ে বর্তমান নিয়ে কথা বল।

ছ. **দূর্বা গজান (উৎখাত) :** গ্রামবাসীকে অত্যাচার করলে গ্রাম থেকে দূর্বা গজাতে হবে।

জ. **সাপে নেউলে (শক্রভাব) :** তাদের সেই বন্ধুত্ব কোথায় গেল, এখন দাঁড়িয়েছে সাপে-নেউলে সম্বন্ধ।

ঝ **রাবণের চিতা (চির অশান্তি) :** রামবাবুর এই পুত্রশোক রাবণের চিতার মত জ্বলতে থাকবে।

ঞ. **মাকাল ফল (অন্তঃসারশূন্য) :** আমজাদ একটা মাকাল ফল, তার দ্বারা কোনো কাজ হবে না।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



৭. যে কোনো পাঁচটি বাক্য বা প্রকাশভঙ্গি সংকোচন করুন : ৫

ক. মুক্তি লাভের ইচ্ছা–মুমুক্ষা।
খ. যা বলা হবে– বক্ষ্যমাণ/বক্তব্য।
গ. মধু পান করে যে– মধুকর/মধুপ।
ঘ. সরোবরে জন্মে যা– সরোজ।
ঙ. নৌ চলাচলের যোগ্য– নাব্য।
চ. জয়সূচক যে উৎসব–জয়োৎসব/জয়ন্তী।
ছ. যা হেমন্তকালে জন্মে– হৈমন্তিক।
জ. একই গুরুর শিষ্য– সতীর্থ।
ঝ. একই সময়ে বর্তমান– সমসাময়িক।
ঞ. ময়ূরের ডাক– কেকা।

৮. যে কোনো দশটি প্রশ্নের উত্তর দিন : ১০

ক. **প্রথম কোন মহিলা কবি রামায়ণ রচনা করেন?**
— চন্দ্রাবতী।
খ. **'অন্নদামঙ্গল' কার রচনা?**
— ভারতচন্দ্র রায় গুণাকরের।
গ. **'গোরক্ষ বিজয়'-এর আদি কবির নাম কি?**
— শেখ ফয়জুল্লাহ।
ঘ. **'মধুমালতী' কাব্যের অনুবাদক কে? এটি কোন ভাষা থেকে অনূদিত হয়েছে?**
— সৈয়দ হামজা কর্তৃক ফারসি ভাষা থেকে অনূদিত।
ঙ. **ঈশ্বর গুপ্ত সম্পাদিত পত্রিকার নাম কি?**
— সংবাদ প্রভাকর।
চ. **'প্রফুল্ল' কোন জাতীয় রচনা? রচয়িতার নাম কি?**
— নাটক এবং রচয়িতা গিরিশচন্দ্র ঘোষ।
ছ. **'কল্লোল' পত্রিকা কত সালে প্রকাশিত হয়?**
— ১৯২৩ সালে।
জ. **'আরণ্যক' উপন্যাসের রচয়িতার নাম কি?**
— বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।
ঝ. **'উদাসীন পথিকের মনের কথা' কোন শ্রেণীর রচনা? লেখকের নাম কি?**
— আত্মজীবনীমূলক রচনা। লেখক মীর মশাররফ হোসেন।
ঞ. **আহসান হাবীব-এর প্রথম কাব্যগ্রন্থ কোনটি?**
— রাত্রিশেষ।
ট. **'নেমেসিস' কোন শ্রেণীর রচনা? রচয়িতার নাম কি?**
— নাটক। রচয়িতা নূরুল মোমেন।
ঠ. **'নদীবক্ষে' কার রচনা?**
— কাজী আবদুল ওদুদ।



ড **'সমকাল' পত্রিকার প্রথম সম্পাদকের নাম কি?**
— সিকানদার আবু জাফর।
ঢ. **'অমর একুশে' শীর্ষক কবিতার কবির নাম কি?**
— আলাউদ্দিন আল আজাদ।
ণ. **মুনীর চৌধুরী কি জন্য বিখ্যাত?**
— অধ্যাপক, বুদ্ধিজীবী, প্রাবন্ধিক ও নাট্যকার হিসেবে খ্যাতিমান এবং বাংলা টাইপরাইটার 'মুনীর অপটিমা' উদ্ভাবনের জন্যও তিনি বিখ্যাত।

## ১০ম বিসিএস : ১৯৮৯-৯০

*দ্রষ্টব্য : বাংলা ভাষায় প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। তবে টেকনিক্যাল শব্দগুলো ইংরেজিতে লেখা চলবে। প্রশ্নোত্তর যথাযথ ও সংক্ষিপ্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। সাধু ও চলিত ভাষার মিশ্রণ দূষণীয়। প্রত্যেক প্রশ্নের মান প্রশ্নের শেষ প্রান্তে দেখানো হয়েছে।*

১. যে কোনো একটি বিষয়ে প্রবন্ধ লিখুন : ৩০

ক. লেখকের দায়িত্ব
খ. সমকালীন বাংলা নাটক
**উত্তর : পৃষ্ঠা ৭৬৯।**
গ. লোকশিল্প
**উত্তর : পৃষ্ঠা ৭৪৪।**
ঘ. আমাদের অর্থনৈতিক সম্পদ
ঙ. বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি
চ. বিক্ষুব্ধ পূর্ব ইউরোপ
ছ. জাতীয় উন্নয়নে বিজ্ঞান
জ. নারী নির্যাতন প্রতিরোধ আন্দোলন
ঝ. সমুদ্র দর্শন
ঞ. শিক্ষাই আলো।

২. ভাব-সম্প্রসারণ করুন : ১৫

ক. মূর্খ মিত্রের চেয়ে শিক্ষিত শত্রু ভালো
**উত্তর : পৃষ্ঠা ১৫৮।**
*অথবা,*
খ. ভাবের ললিত ক্রোড়ে না রাখি নিলীন,
কর্মক্ষেত্রে করি দাও সক্ষম স্বাধীন।
**উত্তর : পৃষ্ঠা ১৫৮।**

৩. সারাংশ লিখুন : ১৫

ক. তরুণ বিশ্ব শক্তির অধিকারী, অনন্ত সম্ভাবনাপূর্ণ তার জীবন। সে যদি শুধু ঘরের কোণে বসে পূর্ব-পুরুষের লিখিত পুঁথি ঘেঁটে তার অমূল্য মানবজীবনকে সার্থক করতে চায় এবং মনে করে, বর্তমানের সবকিছু অতীতে সৃষ্ট হয়েছিল, তা হলে সে শুধু তার অনন্ত শক্তিকে অপব্যয় করে তা নয়, তার সেই শক্তিদাতাকেও অবমাননা করে। অতীত সৃষ্টির জন্মদাতা অতীতের

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



ঘটনা ও অতীতের পরিবেষ্টন। বর্তমান ঘটনা ও বর্তমান পরিবেষ্টন চিরকালই নতুন। বর্তমান অতীতের কুঁড়ি বৈ আর কিছু নয়। বর্তমানের আপন শক্তিতে সেই কুঁড়ি ফুটে নব পুষ্পে পরিণত হয়। সুতরাং তার ফলও নতুন হওয়া চাই। কিন্তু দুঃখের বিষয়, মানব-মন অতীতের মোহ ছাড়তে পারে না। সে এই বর্তমানের পরিবর্তিত নব পরিবেষ্টনেও সেই অতীতের ইতিহাসকে হুবহু বজায় রাখতে চায়—বর্তমানের নব প্রসব-বেদনাকে উপেক্ষা করে। তাই মানব ইতিহাসের স্তরে স্তরে দেখতে পাই কত দ্বন্দ্ব, কত সংঘর্ষ, কত বিগ্রহ-বিপ্লব, কত রক্ত-বন্যা। এর মূল কারণ হচ্ছে অতীতের সৃষ্টিকে অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য মানব-মনের স্বাভাবিক দুর্জয়। চিরকালই তরুণ এই প্রকৃতির বিরুদ্ধে অভিযান করেছে। বর্তমান বেদনায় অনুভূতিতে চঞ্চল হয়ে ভবিষ্যতের আদর্শকে সার্থক করার জন্য।

উত্তর : পৃষ্ঠা ২৬০।

*অথবা,*

খ. দেখিলাম এ কালের
আত্মঘাতী মূঢ় উন্মত্ততা, দেখিনু সর্বাঙ্গে তার
বিকৃতির কদর্য বিদ্রূপ। একদিকে স্পর্ধিত ক্রূরতা,
মত্ততার নির্লজ্জ হুংকার, অন্যদিকে ভীরুতার
দ্বিধাগ্রস্ত চরণবিক্ষেপ, বক্ষে আলিঙ্গিয়া ধরি
কৃপণের সতর্ক সম্বল-সন্ত্রস্ত প্রাণীর মতো
ক্ষণিক গর্জন-অন্তে ক্ষীণ স্বরে তখনই জানাই
নিরাপদ নীরব নম্রতা।

উত্তর : পৃষ্ঠা ২৬০।

৪. শুদ্ধ করে লিখুন (যে কোনো দশটি) : ১০

| অশুদ্ধ | শুদ্ধ |
|---|---|
| ক. তিনি সানন্দিত চিত্তে সম্মতি দিলেন। | ক. তিনি সানন্দ চিত্তে সম্মতি দিলেন। |
| খ. লেখাপড়ায় তার মনোযোগ নেই। | খ. লেখাপড়ায় তার মনোযোগ নেই। |
| গ. তার দেহ আপাদমস্তক পর্যন্ত আবৃত ছিল। | গ. তার দেহ আপাদমস্তক আবৃত ছিল। |
| ঘ. তার মত ত্বরিত কর্মী লোক হয় না। | ঘ. তার মত তড়িৎকর্মা লোক হয় না। |
| ঙ. সে দলের মধ্যে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠতম খেলোয়াড়। | ঙ. সে দলের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম খেলোয়াড়। |
| চ. বিবাদমান দুটি দলের মধ্যে সংঘটিত হয়েছে। | চ. বিবদমান দুটো দলের মধ্যে সংঘর্ষ হয়েছে। |
| ছ. হিমালয় পর্বত দুর্লঙ্ঘনীয়। | ছ. হিমালয় পর্বত দুর্লঙ্ঘ্য |
| জ. তিনি এখন সমাজে লব্ধ প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি। | জ. তিনি এখন সমাজে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি। |
| ঝ. সে ভিড়ে অন্যান্যদের মধ্যে হারিয়ে গেল। | ঝ. সে ভিড়ে হারিয়ে গেল। |
| ঞ. তুমি সেখানে গেলে অপমান হবে। | ঞ. তুমি সেখানে গেলে অপমানিত হবে। |
| ট. সর্ব বিষয়ে বাহুল্যতা বর্জন করা উচিত। | ট. সর্ব বিষয়ে বাহুল্য বর্জন করা উচিত। |
| ঠ. মুমূর্ষু ব্যক্তিরা সেবা করবে। | ঠ. মুমূর্ষু ব্যক্তির সেবা করবে। |
| ড. অন্যায়ের প্রতিফল দুর্নিবার্য। | ড. অন্যায়ের প্রতিফল দুর্নিবার। |
| ঢ. মিথ্যা একদিন না একদিন প্রমাণ হয়। | ঢ. মিথ্যা একদিন না একদিন প্রমাণিত হয়। |



৫. উপযুক্ত শব্দ প্রয়োগে শূন্যস্থান পূরণ করে বাক্য অর্থপূর্ণ করুন। (যে কোনো দশটি) : ১০

ক. লোভের — পড়ে জীবনটা মাটি করো না। ( টোপে)
খ. নতুন — হবে নবান্ন। (ধান্যে)
গ. শরতে ধরাতল — ঝলমল। (শিশিরে)
ঘ. গরীবের — রোগ ভাল নয়। ( ঘোড়া)
ঙ. ওর বয়সের — নেই। (হিসাব)
চ. তিনি রঙ্গমঞ্চে শ্রেষ্ঠ —। (অভিনেতা)
ছ. এই তো — চলার পথ। (সামনে)
জ. — রবে বনভূমি মুখরিত হল। ( কেকা)
ঝ. তার মত — খোর আর দেখিনি। (চশম)
ঞ. শীতকালে — পাখিরা ভিড় জমায়। (অতিথি)
ট. হারানো ছেলে ফিরে পেয়ে মা যেন — চাঁদ হাতে পেলেন। (আকাশের)
ঠ. তার এখন — দশা। (শনির)
ড তার সাধ আছে,— নেই। (সাধ্য)

৬. যে কোনো পাঁচটি বাগধারা দিয়ে অর্থসহ পাঁচটি বাক্য রচনা করুন : ৫

ক. মাছের মার কান্না (মমতাহীন কান্না) : নিজে নিদারুণ অবহেলা করে অবশেষে অনাথ ভাইপোটার মৃত্যুর কারণ হলো, আর এখন তুমি কাঁদছো? মাছের মার আবার কান্না!

খ. কান পাতলা (যে সব কথাই বিশ্বাস করে) : এমন কান পাতলা লোকের কাছে ব্যাপারটি এভাবে বলা উচিত নয়।

গ. কলির সন্ধ্যা (কষ্টের সূচনা) : সবে তো কলির সন্ধ্যা, কে বলতে পারে এরপর কি ভয়াবহ পরিণতি হবে।

ঘ. লম্বা দেওয়া (চম্পট দেয়া) : পুলিশ আসতে দেখে চোরটি লম্বা দিল।

ঙ. সোনায় সোহাগা (সুন্দর মিলন) : ছেলেটি যেমন শিক্ষিত তেমনি ভদ্র যেন সোনায় সোহাগা।

চ. মিছরির ছুরি (মিষ্টি কথায় তীক্ষ্ণ আঘাত) : তার উপদেশগুলো যেন মিছরির ছুরি, শুনতে মিষ্টি কিন্তু অন্তর জ্বলে।

ছ. মাকাল ফল (অন্তঃসারশূন্য লোক) : আমজাদ একটা মাকাল ফল, তার দ্বারা কোনো কাজ হবে না।

জ. জিলাপির প্যাঁচ (কূটবুদ্ধি) : রফিককে দেখতে গোবেচারার মতো মনে হলে কি হবে, ওর মধ্যে জিলাপির প্যাঁচ রয়েছে।

ঝ. তীর্থের কাক (লোভের প্রতীক্ষাকারী) : সরকারি রিলিফের আশায় তীর্থের কাকের মতো বসে না থেকে কাজের চেষ্টা করা ভাল।

ঞ. তুলকালাম (বিরাট ব্যাপার) : জমির সীমানা নিয়ে দুই শরিকের মধ্যে সে কি তুলকালাম ব্যাপার।

৭. এক কথায় প্রকাশ করুন (যে কোনো পাঁচটি) : ৫

ক. যা অবশ্যই ঘটবে –অবশ্যম্ভাবী।
খ. দিবসের পূর্বভাগ– পূর্বাহ্ণ।
গ. যে ভূমিতে ফসল জন্মায় না–উষর।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



ঘ. যিনি সব জানেন– সবজান্তা।
ঙ. যিনি কম কথা বলেন– মিতভাষী।
চ. দেখিবার ইচ্ছা– দিদৃক্ষা।
ছ. অনুসন্ধান করতে ইচ্ছুক–অনুসন্ধিৎসু।
জ. যার নিজের বলতে কিছুই নেই– নিঃস্ব।
ঝ. যার কোথাও ভয় নেই– অকুতোভয়।
ঞ. না নষ্ট হয়– নশ্বর।

**৮. যে কোনো দশটি প্রশ্নের উত্তর দিন :** ১০

**ক. কাহ্নপা কে ছিলেন?**
— চর্যাপদের অন্যতম পদকর্তা।

**খ. বাংলা ভাষার পূর্ববর্তী স্তরের নাম কি?**
— বঙ্গ-কামরূপী। বাংলা ভাষার বিবর্তন : ইন্দো-ইউরোপীয় → শতম → আর্য → ভারতীয় → প্রাচীন ভারতীয় আর্য → প্রাচীন ভারতীয় কথ্য আর্য → প্রাচীন প্রাচ্য → গৌড়ী প্রাকৃত → গৌড়ী অপভ্রংশ → বঙ্গকামরূপী → বাংলা।

**গ. বড়ু চণ্ডীদাসের কাব্যের নাম কি?**
— শ্রীকৃষ্ণকীর্তন।

**ঘ. দৌলত উজীর বাহরাম খানের কাব্যের নাম কি?**
— লাইলী-মজনু।

**ঙ. 'ইউসুফ-জুলেখা' কাব্যের রচয়িতা কে ছিলেন?**
— শাহ মুহম্মদ সগীর।

**চ. আলাওলের শ্রেষ্ঠ কাব্যের নাম কি?**
— পদ্মাবতী।

**ছ. লালন শাহ কি রচনা করেন?**
— বাউল গান, যা লালনগীতি নামে পরিচিত।

**জ. মধুসূদন দত্তের মহাকাব্যের নাম কি?**
— মেঘনাদবধ কাব্য।

**ঝ. রবীন্দ্রনাথের 'বলাকা' কাব্যের প্রথম প্রকাশ কোন সালে?**
— ১৯১৫ সালে (বাংলা ১৩২২)।

**ঞ. নজরুল ইসলামের 'বিদ্রোহী' কবিতা কোন কাব্যের অন্তর্গত?**
— অগ্নিবীণা।

**ট. 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' কার রচনা?**
— কবি জীবনানন্দ দাশ।

**ঠ. 'লালসালু'র লেখক কে?**
— সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ।

**ড. জহির রায়হানের জনপ্রিয় উপন্যাস কোনটি?**
— হাজার বছর ধরে।

# ৩৫তম বিসিএস

# বাংলা প্রথম পত্র

(সাধারণ এবং টেকনিক্যাল/পেশাগত-উভয় ক্যাডারের জন্য)

পূর্ণমান-১০০

| | |
|---|---|
| ১। ব্যাকরণ | ৫ × ৬ = ৩০ |
| ক) শব্দগঠন<br>খ) বানান/বানানের নিয়ম<br>গ) বাক্যশুদ্ধি/প্রয়োগ-অপপ্রয়োগ<br>ঘ) প্রবাদ-প্রবচনের নিহিতার্থ প্রকাশ<br>ঙ) বাক্যগঠন | |
| ২। ভাব-সম্প্রসারণ | ২০ |
| ৩। সারমর্ম | ২০ |
| ৪। বাংলা ভাষা ও সাহিত্য-বিষয়ক প্রশ্নের উত্তর | ৩০ |

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

## বাংলা লিপির উৎপত্তি ও বিবর্তন

৩৫তম বিসিএস

# ১ ব্যাকরণ

৫ × ৬ = ৩০

## ক

## শব্দগঠন

সাধারণত দুই বা ততোধিক ধ্বনি মিলে তৈরি হয় একটি শব্দ। যেমন : ক + ল + ম = কলম; আ + ম + আ + এ + দ + র = আমাদের ইত্যাদি। আবার একটিমাত্র স্বরধ্বনি দিয়েও শব্দ তৈরি হতে পারে। যেমন : আ, ই, উ। (কিন্তু একটি ব্যঞ্জনধ্বনির সাহায্যে শব্দ তৈরি হয় না)। 'আ', 'ই', 'উ' স্বরধ্বনিগুলো সাধারণত আমরা বেদনা, ক্ষোভ, দুঃখ ইত্যাদি ভাব প্রকাশের জন্য ব্যবহার করে থাকি। তবে অর্থই হলো শব্দের প্রাণ। এক বা একাধিক ধ্বনি মিলে কোনো নির্দিষ্ট অর্থ প্রকাশ করলে তাকে শব্দ বলে। যেমন : ক + ল + ম-এ তিনটি ধ্বনি এক সাথে মিলে হয় = কলম, যা লেখার একটি উপকরণ। তাই এটি একটি শব্দ। এরূপ তুমি, স্কুল, যাও ইত্যাদিও শব্দ। এগুলোর ভিন্ন ভিন্ন অর্থ আছে। কিন্তু এ রকম ভিন্ন ভিন্ন শব্দ মনের ভাব সম্পূর্ণ প্রকাশ করতে পারে না। তাই অর্থপূর্ণ শব্দ জুড়ে জুড়ে মানুষ তার মনের ভাব প্রকাশ করে থাকে। যেমন : 'তুমি স্কুলে যাও।'– এটি একটি বাক্য। এখানে বক্তার মনোভাব সম্পূর্ণ প্রকাশ পেয়েছে।

শব্দ হলো বাক্যের ক্ষুদ্রতম একক। অর্থপূর্ণ ধ্বনি বা ধ্বনিসমষ্টির দ্বারা শব্দ গঠিত হয়ে থাকে এবং তা সুশৃঙ্খল পদবিন্যাসের মাধ্যমে বাক্য গঠন করে। পারস্পরিক সম্পর্ক স্থাপন এবং নতুন নতুন ভাব প্রকাশের প্রয়োজনে প্রতিনিয়ত নতুন নতুন শব্দের জন্ম হচ্ছে। প্রত্যেক ভাষারই শব্দগঠনের কিছু নির্দিষ্ট নিয়ম রয়েছে। বাংলা শব্দ গঠনের ক্ষেত্রেও কিছু নিয়ম মেনে শব্দগঠন করা হয়। বাংলায় নানা প্রক্রিয়ায় শব্দগঠন হয়ে থাকে। প্রধান কয়েকটি প্রক্রিয়া হলো :

১. সন্ধির সাহায্যে শব্দগঠন
২. উপসর্গযোগে শব্দগঠন
৩. প্রত্যয়যোগে শব্দগঠন
৪. সমাসের সাহায্যে শব্দগঠন
৫. পদ পরিবর্তনের মাধ্যমে শব্দগঠন
৬. দ্বিরুক্তির সাহায্যে শব্দগঠন

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



## ১. সন্ধির সাহায্যে শব্দগঠন

সন্ধি মূলত ধ্বনিতত্ত্বের অন্যতম আলোচ্য বিষয়। কিন্তু শব্দগঠনেও এর ভূমিকা রয়েছে। দ্রুত উচ্চারণের ফলে পরস্পর সন্নিহিত দুটো ধ্বনির মিলনে যে ধ্বনিগত পরিবর্তন হয় তাকেই বলা হয় সন্ধি। যেমন—

স্ব + অধীনতা = স্বাধীনতা (উভয় ধ্বনির মিলন)
শিক্ষা + অনুরাগ = শিক্ষানুরাগ (পরধ্বনির লোপ)

ধ্বনি পরিবর্তনের ক্ষেত্রে সন্ধি বিশেষ ভূমিকা পালন করে, এর প্রভাব বানানেও পড়ে। ভাষার মাধুর্য বাড়াতেও সন্ধির বিশেষ ভূমিকা দেখা যায়।

**বাংলা সন্ধি :** বাংলা ভাষার নিজস্ব উচ্চারণ আলাদা বলে বাংলা সন্ধির নিয়মও আলাদা বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। বাংলা মৌখিক ভাষায় সন্ধি বা ধ্বনি পরিবর্তনের যে নিজস্ব বৈশিষ্ট্য রয়েছে তা খাঁটি বাংলা সন্ধি নামে পরিচিত। সাধারণত অর্ধতৎসম, তদ্ভব, দেশি ও বিদেশি শব্দে সন্নিহিত দুই ধ্বনির মিলনে যে রূপান্তর হয়ে থাকে তাই বাংলা সন্ধি বা খাঁটি বাংলা সন্ধি।

**সংস্কৃতাগত সন্ধি :** সংস্কৃতাগত সন্ধি তিন রকম– স্বরসন্ধি, ব্যঞ্জনসন্ধি ও বিসর্গসন্ধি।

**সংস্কৃত স্বরসন্ধি :** একটি স্বরধ্বনির সঙ্গে অন্য একটি স্বরধ্বনির সন্ধিকে বলা হয় স্বরসন্ধি। স্বরসন্ধির নিয়মগুলো এখানে দেখানো হলো :

১. [প্রথম পদের শেষের] অ-ধ্বনি বা আ-ধ্বনির সঙ্গে [দ্বিতীয় পদের গোড়ার] অ-ধ্বনি বা আ-ধ্বনির যোগে আ-ধ্বনি হয়। বানানে তা আ-কার রূপে আগের বর্ণে যুক্ত হয়। যেমন—
   ক. অ + অ = আ (অ-ধ্বনির আ-তে রূপান্তর)
   অন্য + অন্য = অন্যান্য, নর + অধম = নরাধম ইত্যাদি।
   খ. অ + আ = আ (প্রথম শব্দের অন্ত্য অ-ধ্বনির লোপ)
   চিত্ত + আকর্ষক = চিত্তাকর্ষক, স্ব + আয়ত্ত = স্বায়ত্ত ইত্যাদি।
   গ. আ + অ = আ (দ্বিতীয় শব্দের আদ্য অ-ধ্বনির লোপ)
   আশা + অনুরূপ = আশানুরূপ, বিদ্যা + অভ্যাস = বিদ্যাভ্যাস ইত্যাদি।
   ঘ. আ + আ = আ (দ্বিতীয় শব্দের অন্ত্য আ-ধ্বনির লোপ)
   কারা + আগার = কারাগার, জ্যোৎস্না + আলোক = জ্যোৎস্নালোক ইত্যাদি।

২. [প্রথম পদের শেষের] হ্রস্ব-ই বা দীর্ঘ-ঈ ধ্বনির সঙ্গে [দ্বিতীয় পদের গোড়ার] হ্রস্ব-ই বা দীর্ঘ-ঈ ধ্বনির যোগে দীর্ঘ-ঈ হয়। বানানে তা দীর্ঘ-ঈ-কার হয়ে আগের বর্ণে যুক্ত হয়।
   ক. ই + ই = ঈ (ই-ধ্বনির ঈ-তে রূপান্তর)
   অতি + ইত = অতীত, অতি + ইন্দ্র = অতীন্দ্র ইত্যাদি।
   খ. ই + ঈ = ঈ (প্রথম শব্দের অন্ত্য ই-ধ্বনির লোপ)
   অতি + ঈশ = অতীশ, প্রতি + ঈক্ষা = প্রতীক্ষা ইত্যাদি।
   গ. ঈ + ই = ঈ (দ্বিতীয় শব্দের গোড়ার ই-ধ্বনির লোপ)
   ফণী + ইন্দ্র = ফণীন্দ্র, সুধী + ইন্দ্র = সুধীন্দ্র ইত্যাদি।
   ঘ. ঈ + ঈ = ঈ (দ্বিতীয় পদের গোড়ার ঈ-ধ্বনির লোপ)
   মহী + ঈশ্বর = মহীশ্বর, যতী + ঈশ = যতীশ ইত্যাদি।



৩. [প্রথম পদের শেষের] হ্রস্ব-উ বা দীর্ঘ-ঊ ধ্বনির সঙ্গে দ্বিতীয় পদের গোড়ার হ্রস্ব-উ বা দীর্ঘ-ঊ ধ্বনির যোগে দীর্ঘ-ঊ হয়। তা বানানে দীর্ঘ-ঊ-কার হয়ে আগের বর্ণের সঙ্গে যুক্ত হয়।
   ক. উ + উ = ঊ (হ্রস্ব-উ ধ্বনির দীর্ঘ-ঊ-তে রূপান্তর)
   কটু + উক্তি = কটূক্তি, মরু + উদ্যান = মরূদ্যান ইত্যাদি।
   খ. উ + ঊ = ঊ (প্রথম পদের উ-ধ্বনির লোপ)
   তনু + ঊর্ধ্ব = তনূর্ধ্ব, লঘু + ঊর্মি = লঘূর্মি ইত্যাদি।
   গ. ঊ + উ = ঊ (দ্বিতীয় পদের উ-ধ্বনির লোপ)
   বধূ + উচিত = বধূচিত, বধূ + উৎসব = বধূৎসব ইত্যাদি।
   ঘ. ঊ + ঊ = ঊ (দ্বিতীয় পদের ঊ-ধ্বনির লোপ)
   ভূ + ঊর্ধ্ব = ভূর্ধ্ব, সরযূ + ঊর্মি = সরযূর্মি ইত্যাদি।

**সংস্কৃত ব্যঞ্জনসন্ধি**

ব্যঞ্জনধ্বনির সঙ্গে স্বরধ্বনির কিংবা ব্যঞ্জনধ্বনির সঙ্গে ব্যঞ্জনধ্বনির সন্ধিকে ব্যঞ্জনসন্ধি বলে। যেমন : দিক্ + অন্ত = দিগন্ত [ক্ + অ = গ]

ব্যঞ্জনসন্ধিকে প্রধানত তিনটি শ্রেণিতে ভাগ করা যায় : ১. ব্যঞ্জনে-স্বরে সন্ধি; ২. স্বরে-ব্যঞ্জনে সন্ধি; ৩. ব্যঞ্জনে-ব্যঞ্জনে সন্ধি।

১. ব্যঞ্জনে-স্বরে সন্ধি

সূত্র-১ : পূর্বপদের শেষে বর্গের প্রথম ব্যঞ্জন (= ক্/চ্/ট্/ত্/প্) থাকলে, আর পরপদের প্রথমটি স্বরধ্বনি হলে ব্যঞ্জনধ্বনিটি ওই বর্গের তৃতীয় ধ্বনিতে (= গ্/জ্/ড্(ড়)/দ্/ব্) পরিণত হয়।
   ক. [ক্ + স্বরধ্বনি] = [গ্ + স্বরধ্বনি]
   দিক্ + অন্ত = দিগন্ত, পৃথক + অন্ন = পৃথগন্ন ইত্যাদি।
   খ. [চ্ + স্বরধ্বনি] = [জ্ + স্বরধ্বনি]
   ণিচ্ + অন্ত = ণিজন্ত, অচ্ + অন্ত = অজন্ত ইত্যাদি।
   গ. [ট্ + স্বরধ্বনি] = [ড্ + স্বরধ্বনি]
   ষট্ + আনন = ষড়ানন, ষট্ + ঋতু = ষড়ঋতু ইত্যাদি।
   ঘ. [ত্/ৎ + স্বরধ্বনি] = [দ্ + স্বরধ্বনি]
   মৃৎ + অঙ্গ = মৃদঙ্গ

২. স্বরে-ব্যঞ্জনে সন্ধি

সূত্র-২ : পূর্বপদের শেষে যদি স্বরধ্বনি থাকে এবং পরপদের প্রথম ধ্বনি ছ হয় তবে দুয়ের সন্ধিতে ছ-ধ্বনি চ্ছ হয়ে যায়। স্বরধ্বনি চ্ছ-এর সঙ্গে যুক্ত হয়। যেমন :
   ক. অ + ছ্ = অ + চ্ছ্
   এক + ছত্র = একচ্ছত্র, মুখ + ছবি = মুখচ্ছবি ইত্যাদি।
   খ. আ + ছ্ = আ + চ্ছ্
   আ + ছন্ন = আচ্ছন্ন, কথা + ছলে = কথাচ্ছলে ইত্যাদি।
   গ. ই + ছ্ = ই + চ্ছ্
   পরি + ছন্ন = পরিচ্ছন্ন, বি + ছেদ = বিচ্ছেদ ইত্যাদি।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



৩. ব্যঞ্জনে-ব্যঞ্জনে সন্ধি

সূত্র-৩ : আগে ত্ [ ৎ } বা দ্ আর পরে চ্ বা ছ্ থাকলে ত্ বা দ্ স্থানে চ্ হয়। যেমন :

ক. ত্ + চ্ = চ্চ

উৎ + চকিত = উচ্চকিত, শরৎ + চন্দ্র = শরচ্চন্দ্র ইত্যাদি।

খ. দ্ + চ্ = চ্চ

তদ্ + চিত্র = তচ্চিত্র, বিপদ্ + চিন্তা = বিপচ্চিন্তা ইত্যাদি।

গ. ত্ + ছ্ = চ্ছ

উৎ + ছিন্ন = উচ্ছিন্ন, উৎ + ছেদ = উচ্ছেদ ইত্যাদি।

ঘ. দ্ + ছ্ = চ্ছ

তদ্ + ছবি = তচ্ছবি, বিপদ + ছায়া = বিপচ্ছায়া ইত্যাদি।

### নিপাতনে সিদ্ধ সংস্কৃত ব্যঞ্জনসন্ধি

ব্যঞ্জনসন্ধির ক্ষেত্রে এমন কিছু সন্ধি রয়েছে যেগুলো নিয়মের সঙ্গে মেলে না। এসব সন্ধিকে নিপাতনে সিদ্ধ বা নিয়ম বহির্ভূত সন্ধি হিসেবে মেনে নেওয়া হয়েছে। যেমন :

আ + চর্য = আশ্চর্য (নিয়ম বহির্ভূত 'শ')

বন্ + প্রতি = বনস্পতি (নিয়ম বহির্ভূত 'স')

বিশ্ব + মিত্র = বিশ্বামিত্র (হওয়া উচিত বিশ্বমিত্র)

তদ্ + কর = তস্কর (হওয়া উচিত তৎকর)

### সংস্কৃত বিসর্গসন্ধি

পূর্বপদের শেষ ধ্বনি বিসর্গ হলে এবং পরপদের প্রথম ধ্বনি ব্যঞ্জন কিংবা স্বর হলে এ দুইয়ের মধ্যে যে সন্ধি হয় তাকে বিসর্গসন্ধি বলে। এ ধরনের সন্ধি প্রধানত সংস্কৃত শব্দেই প্রচলিত।

ক. বিসর্গ লোপ

সূত্র ১ : অঃ-এর পরে অ-ছাড়া অন্য স্বরধ্বনি থাকলে বিসর্গের লোপ হয় এবং এর পর সন্ধি হয় না। যেমন :

অঃ + আ = অ + আ, মনঃ + আশা = মন-আশা

খ. বিসর্গ লোপ এবং অ-স্থানে ও

সূত্র ২ : স্-জাত বিসর্গযুক্ত অ-ধ্বনির ও-ধ্বনিতে রূপান্তর [স্-জাত বিসর্গযুক্ত অ-ধ্বনি + অ-ধ্বনি] = [ও-ধ্বনি + অ লোপ]

পূর্বপদের শেষে যদি অঃ (=অস্) থাকে, এবং তার পরে অ থাকে তবে সন্ধির ফলে 'অঃ' রূপান্তরিত হয়ে 'ও' হয়ে পূর্ববর্ণে যুক্ত হয় এবং পরের অ-ধ্বনি লোপ পায়। যেমন : মনঃ + অভিলাষ = মনোভিলাষ, ততঃ + অধিক = ততোধিক।

### বাংলা স্বরসন্ধি

বাংলা স্বরসন্ধির বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, পাশাপাশি দুটি স্বরধ্বনি থাকলে দ্রুত উচ্চারণের সময়ে এদের মধ্যে উচ্চারণগত নিম্নলিখিত ধরনের কোনো-না-কোনো পরিবর্তন ঘটে :

১. কোনো কোনো ক্ষেত্রে দুটি স্বরধ্বনির একটি লুপ্ত হয়; ২. কোথাও স্বরধ্বনি দুটির কিছুটা বিকৃতি ঘটে; ৩. কোনো কোনো ক্ষেত্রে স্বরধ্বনি ধ্বনি দুটির মিলন হয়।



ক. স্বরধ্বনির লোপ :

সূত্র ১ : পূর্বপদের শেষে অ, আ কিংবা ই এবং পরপদের গোড়ায় স্বরধ্বনি থাকলে পূর্বস্বর (অ/আ/ই) লুপ্ত হয়। যেমন :

অ-লোপ : অর্ধ + এক = অর্ধেক।

আ-লোপ : খানা + এক = খানেক।

ই-লোপ : খানি + এক = খানেক।

খ. স্বরধ্বনির বিকৃতি :

সূত্র ৪ : স্বরধ্বনির পর আ থাকলে তা বিকৃত হয়ে যা হয়ে যায়। যেমন : বাবু + আনা = বাবুয়ানা

গ. সংস্কৃত সন্ধির অনুকরণে পাশাপাশি স্বরধ্বনির মিলন :

সূত্র ৬ : সংস্কৃতি সন্ধির অনুকরণে পাশাপাশি দুটি স্বরধ্বনির মিলন হয়। তবে এ সন্ধি পুরোপুরি সংস্কৃত সন্ধি নয়। কারণ, এক্ষেত্রে অতৎসম শব্দের সঙ্গে তৎসম শব্দের মিলন হয়ে থাকে। যেমন : উপর + উক্ত = উপরোক্ত, দিল্লি + ঈশ্বর = দিল্লিশ্বর।

### বাংলা ব্যঞ্জনসন্ধি

সূত্র ১ : পূর্বপদের শেষে হসন্ত ব্যঞ্জন এবং পরপদের গোড়ায় স্বরধ্বনি থাকলে স্বরধ্বনি হসন্ত ব্যঞ্জনের সঙ্গে যুক্ত হয়। যেমন :

এক + এক = একেক, বার + ওয়ারি = বারোয়ারি, জন + এক = জনৈক।

## ২. উপসর্গযোগে শব্দগঠন

### বিভিন্ন অর্থে উপসর্গের প্রয়োগ

একই উপসর্গ প্রয়োগ অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন অর্থের দ্যোতনা দেয়। এখানে গুরুত্বপূর্ণ উপসর্গের অর্থদ্যোতনা অনুসারে শব্দগঠনের উদাহরণ দেওয়া হলো :

ক. বাংলা উপসর্গের অর্থ-বৈচিত্র্য

| | | |
|---|---|---|
| অ– | বিপরীত বা নয় অর্থে | : অতুলনীয়, অদৃশ্য, অবাঙালি, অমুসলমান, অযোগ্য, অমিল, অধর্ম। |
| | মন্দতা (অপকর্ষ) অর্থে | : অকাজ, অকাল, অঘাট, অকেজো, অন্যায়, অসৎ, অবৈধ, অমঙ্গল। |
| অনা– | মন্দতা ও অদ্ভুত অর্থে | : অনাচার, অনামুখো। |
| | অদ্ভুত অর্থে | : অনাসৃষ্টি। |
| | নেতি অর্থে | : অনাবৃষ্টি। |
| আ– | নেতি ও মন্দতা অর্থে | : আকাঁড়া, আধোয়া, আভাজা। |
| | মন্দতা অর্থে | : আকথা, আকাম, আঘাটা, আগাছা, আকাল। |
| | অভাব অর্থে | : আলুনি, আবুদ্ধিয়া। |
| কু– | মন্দতা অর্থে | : কুকাজ, কুকথা, কুরুচি, কুখ্যাতি, কুনজর, কুপথ, কুপথ্য, কুশাসন, কুফল, কুসংস্কার। |

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



| | | |
|---|---|---|
| নি– | নেতি অর্থে | : নিখুঁত, নিখোঁজ, নিখরচা, নিখাদ, নিপাট, নিলাজ। |
| স– | সহ, সঙ্গে অর্থে | : সজোর, সটান, সপাট, সলাজ। |
| | সম্পূর্ণ অর্থে | : সঠিক, সক্ষম। |
| সু– | ভালো অর্থে | : সুচরিত্র, সুনজর, সুকাজ, সুঠাম, সুজন, সুদিন, সুনাম, সুখবর। |
| হা– | অভাব অর্থে | : হাঘরে, হা-পিত্যেশ, হাভাতে। |

খ. সংস্কৃত উপসর্গের অর্থ-বৈচিত্র্য

| | | |
|---|---|---|
| অতি– | আধিক্য অর্থে | : অতিচালাক, অতিবল, অতিবৃদ্ধি, অতিবৃষ্টি, অতিভক্তি, অতিভোজন, অতিমন্দা, অতিরঞ্জন, অতিরিক্ত, অতিশয়, অত্যধিক (অতি + অধিক), অত্যন্ত (অতি + অন্ত), অত্যাচার (অতি + আচার), অত্যুক্তি (অতি + উক্তি)। |
| | ছাড়িয়ে যাওয়া অর্থে | : অতিপ্রাকৃত, অতিমানব, অতিলৌকিক। |
| | উত্তীর্ণ হওয়া অর্থে | : অতিক্রম, অতিক্রমণ। |
| অধি– | প্রধান অর্থে | : অধিকর্তা, অধিদেবতা, অধিনায়ক, অধিপতি, অধীশ্বর, অধ্যক্ষ (অধি + অক্ষ)। |
| | অন্তর্গত বা মধ্যে অর্থে | : অধিকার, অধিকৃত, অধিগ্রহণ, অধিগত, অধিবাসী। |
| | উপরে অর্থে | : অধিত্যকা, অধিরোহণ, অধিশয়ন। |
| অনু– | পরে অর্থে | : অনুচিন্তন, অনুজ, অনুশোচনা, অনুসর্গ। |
| | পেছন অর্থে | : অনুচিন্তন, অনুজ, অনুশোচনা, অনুসর্গ। |
| | পৌনঃপুনিকতা বা নিরন্তরতা অর্থে | : অনুক্ষণ, অনুদিন, অনুশীলন। |
| | অভিমুখী অর্থে | : অনুপ্রবেশ, অনুবিদ্ধ। |
| | সাদৃশ্য অর্থে | : অনুকরণ, অনুকার, অনুরূপ, অনুলিপি, অনুলিখন। |
| অপ– | বিপরীত অর্থে | : অপকার, অপচয়, অপমান। |
| | অপকর্ষ বা মন্দ অর্থে | : অপকর্ম, অপকীর্তি, অপকৌশল, অপচেষ্টা, অপজাত, অপদেবতা, অপপ্রয়োগ, অপপ্রচার, অপবাদ, অপযশ, অপরাধ, অপসংস্কৃতি। |
| | স্থান পরিবর্তন বা দূরীকরণ অর্থে | : অপগমন, অপনোদন, অপভ্রষ্ট, অপসারণ, অপহরণ। |
| | অস্বাভাবিক অর্থে | : অপঘাত, অপমৃত্যু। |
| | বৃথা অর্থে | : অপচয়, অপব্যয়। |
| অব– | নিম্নমুখী অর্থে | : অবক্ষেপ, অবগমন, অবগাহন, অবতরণ, অবনতি, অবনমন, অবরোহণ, অবতীর্ণ, অবনত। |
| | অপকৃষ্ট বা মন্দ অর্থে | : অবজ্ঞা, অবনতি, অবমাননা। |
| | সবদিকে বিস্তার অর্থে | : অবগুণ্ঠন, অবরোধ, অবক্ষয়। |



| | | |
|---|---|---|
| অভি– | দিকে অর্থে | : অভিকেন্দ্র, অভিগমন, অভিমুখ, অভিযাত্রী। |
| | সম্যক বা পরিপূর্ণ অর্থে | : অভিজ্ঞাত, অভিনিবেশ, অভিব্যক্ত, অভিষেক, অভিভূত, অভিমত, অভিভাষণ। |
| | অধিক বা প্রবল মাত্রা অর্থে | : অভিঘাত। |
| আ– | পর্যন্ত বা ব্যাপ্তি অর্থে | : আকণ্ঠ, আকীর্ণ, আমরণ, আমৃত্যু, আপাদমস্তক, আজানু, আসমুদ্র-হিমাচল। |
| | কম বা ঈষৎ অর্থে | : আকুঞ্চিত, আনত, আনম্র, আভাস, আরক্তিম। |
| | সম্যক বা ভালোভাবে অর্থে | : আচ্ছাদন, আবাসন, আবেগ। |
| | অভিমুখে ক্রিয়া বোঝাতে | : আক্রমণ, আকর্ষণ। |
| উৎ/উদ্ | উপরের দিকে অর্থে | : উৎপাটন, উত্তোলন, উদ্‌গম, উন্নয়ন (উৎ + নয়ন), উদ্‌গিরণ (উৎ + গিরণ), উদ্‌গ্রীব, উদ্বাহু, উল্লিখিত (উৎ + লিখিত)। |
| | বাইরের দিকে অর্থে | : উচ্চারণ (উৎ + চারণ), উদ্‌বোধন, উদ্দেশ। |
| | খারাপ অর্থে | : উৎকট, উৎকোচ, উচ্ছৃঙ্খল (উৎ + শৃঙ্খল), উন্মার্গ (উৎ + মার্গ)। |
| | আতিশয্য অর্থে | : উৎপীড়ন, উচ্ছেদ। |
| উপ– | নিকট অর্থে | : উপকণ্ঠ, উপকূল, উপস্থিত, উপনীত। |
| | সহকারী অর্থে | : উপনেতা, উপমন্ত্রী, উপসচিব, উপরাষ্ট্রপতি, উপাচার্য, উপাধ্যক্ষ। |
| | গৌণ বা অপ্রধান অর্থে | : উপগ্রহ, উপনগরী, উপদেবতা, উপজাতি, উপপদ, উপবিধি, উপভাষা, উপনদী, উপধর্ম, উপবন, উপবিধি, উপশিরা। |
| | সাদৃশ্য অর্থে | : উপকথা, উপবন, উপদ্বীপ। |
| | অতিরিক্ত অর্থে | : উপজাত, উপমাংস, উপরোধ, উপাঙ্গ। |
| | সম্যক বা পুরোপুরি অর্থে | : উপকার, উপশম, উপভোগ, উপহার। |
| দুঃ– | [দুর্, দুশ্, দুষ্, দুস্] মন্দ বা খারাপ অর্থে | : দুরদৃষ্ট, দুঃশাসন, দুঃসময়, দুরাচার, দুরাশয়, দুর্ভাগ্য, দুরাত্মা, দুশ্চিন্তা, দুষ্কর্ম। |
| | অভাব অর্থে | : দুর্বল, দুর্ভিক্ষ, দুষ্প্রাপ্য। |
| | কষ্টকর বা কঠিন অর্থে | : দুর্গম, দুর্ভেদ্য, দুরতিক্রম্য, দুরূহ, দুষ্কর। |
| | আধিক্য অর্থে | : দুর্মূল্য। |
| নি– | আধিক্য অর্থে | : নিপীড়ন, নিগৃহীত, নিদারুণ, নিবিড়, নিশ্চুপ, নিস্তব্ধ। |
| | সম্যক বা পুরোপুরি অর্থে | : নিগূঢ়, নিবন্ধন, নিবিষ্ট, নিবেশ, নিয়োগ, নিবারণ। |
| | নিচে অর্থে | : নিপাত, নিপতন, নিক্ষেপ। |
| | মন্দ অর্থে | : নিকৃষ্ট। |
| নিঃ– | [নির্,নিশ্, নিষ্, নিস্] অভাব বা নেই অর্থে | : নিরপরাধ, নিরাশ, নিরাশ্রয়, নির্জন, নির্দোষ, নির্ধন, নির্লোভ, নিষ্কর্ম, নিঃসন্দেহ, নির্দ্বন্দ্ব, নিঃসীম। |
| | আতিশয্য অর্থে | : নিরতিশয়, নিরাকুল। |
| | বিশেষভাবে অর্থে | : নির্ণয়, নির্ধারণ, নিশ্চয়, নিষ্পন্ন, নিষ্ক্রমণ। |
| | বাইরে অর্থে | : নির্গমন, নিঃসরণ, নিষ্কাশন। |

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



| | | |
|---|---|---|
| পরা– | বিপরীত অর্থে | : পরাজয়, পরাভব, পরাঙ্মুখ, পরাবর্তন। |
| | আতিশয্য অর্থে | : পরাক্রান্ত, পরাক্রম, পরাশক্তি, পরাকাষ্ঠা। |
| | সম্যক বা বিশেষভাবে অর্থে | : পরামর্শ। |
| পরি– | চতুর্দিক অর্থে | : পরিক্রমা, পরিপার্শ্ব, পরিবৃত, পরিভ্রমণ, পরিসীমা, পরিবেষ্টন। |
| | বিশেষভাবে অর্থে | : পরিগণনা, পরিচালনা, পরিদর্শন, পর্যালোচনা (পরি + আলোচনা)। |
| | সম্পূর্ণভাবে অর্থে | : পরিচ্ছন্ন, পরিপাক, পরিপক্ব, পরিপূর্ণ, পরিতৃপ্ত, পরিশোধ, পরিত্যাগ। |
| | বিপরীত অর্থে | : পরিপন্থী, পরিবাদ। |
| প্র– | সামনের দিকে অর্থে | : প্রগতি, প্রণিপাত, প্রাগ্রসর। |
| | সম্যক উৎকর্ষ অর্থে | : প্রকৃষ্ট, প্রজ্ঞান, প্রবর্ধন, প্রবুদ্ধ, প্রমূর্ত। |
| | বিশেষভাবে অর্থে | : প্রচেষ্টা, প্রদান, প্রশংসা, প্রয়োগ। |
| | আধিক্য অর্থে | : প্রকোপ, প্রগাঢ়, প্রচার, প্রবল, প্রমত্ত, প্রসার, প্রলাপ, প্রকম্পিত, প্রদূষণ। |
| | উপক্রম অর্থে | : প্রদোষ, প্রবর্তন, প্রস্তাবনা, প্রকল্পন। |
| প্রতি– | বিপরীত অর্থে | : প্রতিকার, প্রতিপক্ষ, প্রতিবাদ, প্রতিদ্বন্দ্বী, প্রতিষেধক। |
| | সাদৃশ্য অর্থে | : প্রতিকৃতি, প্রতিচ্ছবি, প্রতিচ্ছায়া, প্রতিমা, প্রতিবিম্ব, প্রতিরূপ, প্রতিশব্দ। |
| | বিপরীত ক্রিয়া অর্থে | : প্রতিক্রিয়া, প্রতিঘাত, প্রতিদান, প্রতিধ্বনি, প্রতিশোধ, প্রতিহিংসা, প্রত্যর্পণ, প্রত্যুপকার, প্রত্যাদেশ। |
| | সামীপ্য বা নৈকট্য অর্থে | : প্রতিবেশী, প্রতিবেশ, প্রতিহারী। |
| বি– | বিপরীত অর্থে | : বিক্রয়, বিরাগ, বিকর্ষণ। |
| | ভিন্ন বা অন্য অর্থে | : বিধর্মী, বিপক্ষ, বিভাষা। |
| | সম্যক বা বিশেষভাবে অর্থে | : বিখ্যাত, বিজ্ঞান, বিজয়, বিমুক্ত, বিবরণ। |
| | নেই বা অভাব অর্থে | : বিতৃষ্ণা, বিনিদ্র, বিবর্ণ, বিবস্ত্র, বিশ্রী। |
| | আতিশয্য অর্থে | : বিশীর্ণ। |
| | বহুরকম অর্থে | : বিচিত্র। |
| সম্– | [সং, সঙ্, সঞ্, সন্] একত্রে সন্নিবেশ অর্থে | : সংকলন, সংযোগ, সংযোজন, সংহতি, সমাহার, সম্মিলন, সংসর্গ। |
| | অভিমুখী অর্থে | : সম্মুখ, সমুপস্থিত। |
| | আতিশয্য অর্থে | : সন্তাপ, সমাসন্ন, সমুচ্ছ্বাস, সমুজ্জ্বল, সমুৎসুক, সমুদ্ধত। |

**বিদেশি উপসর্গের অর্থ-বৈচিত্র্য**

| | | |
|---|---|---|
| আম– | সর্বসাধারণ অর্থে | : আমদরবার, আমজনতা, আমমোক্তার, আমরাস্তা, আমহুকুম। |
| কার– | কাজ অর্থে | : কারখানা, কারবার, কারচুপি। |



| | | |
|---|---|---|
| খাস– | ব্যক্তিগত অর্থে | : খাসকামরা, খাসদরবার, খাসমহল, খাস-তালুক, খাসদখল। |
| | আসল অর্থে | : খাসখবর। |
| খোশ– | আনন্দদায়ক অর্থে | : খোশগল্প, খোশমেজাজ, খোশনসিব, খোশরোজ। |
| গর– | নেই অর্থে | : গরমিল, গরহাজির, গররাজি। |
| | ভুল অর্থে | : গরঠিকানা। |
| দর– | কর্ম বা ঈষৎ অর্থে | : দরকাঁচা, দরপোক্ত। |
| | নিম্নস্থ বা অধীনস্থ অর্থে | : দরইজারা, দরদালান, দরপত্তনি, দরপাট্টা। |
| না– | নয় অর্থে | : নালায়েক, নাচার, নারাজ, নাখোশ, নাপাক, নাবালক, নামঞ্জুর, নাহক। |
| নিম– | অর্ধ বা প্রায় অর্থে | : নিমখুন, নিমরাজি। |
| ফি– | প্রত্যেক অর্থে | : ফি-বছর, ফি-রোজ, ফি-মাস, ফি-সন, ফি-হপ্তা। |
| ফুল– | পুরো অর্থে | : ফুল টিকেট, ফুলবাবু, ফুলমোজা, ফুলহাতা। |
| ব– | সহ বা সঙ্গে অর্থে | : বমাল, বকলম। |
| বদ– | খারাপ বা মন্দ অর্থে | : বদগন্ধ, বদখেয়াল, বদভ্যাস, বদনাম, বদনসিব। |
| | উগ্র বা রুক্ষ অর্থে | : বদমেজাজ, বদরাগী, বদরাগ। |
| বে– | নেই অর্থে | : বেআক্কেল, বেহুঁশ, বেহিসেব, বেঠিক, বেতার। |
| | খারাপ অর্থে | : বেচাল, বেবন্দোবস্ত, বেহেড, বেঢপ, বেনিয়ম। |
| | ভিন্ন অর্থে | : বেআইন, বেজায়গা, বেলাইন। |
| হর– | প্রত্যেক অর্থে | : হররোজ, হরবেলা, হরহামেশা। |
| | সব বা বিভিন্ন অর্থে | : হরকিসিম, হরবোলা। |
| হাফ– | অর্ধেক অর্থে | : হাফ-আখরাই, হাফ-টিকেট, হাফ-নেতা, হাফ-মোজা, হাফ-শার্ট, হাফ-হাতা। |
| হেড– | প্রধান অর্থে | : হেড-কারিগর, হেড-পণ্ডিত, হেড-বাবু, হেড-মিস্ত্রি, হেড-মৌলভি। |

## ৩. প্রত্যয়যোগে শব্দগঠন

**অন্ত্যপ্রত্যয় ও অন্ত্যপ্রত্যয় যোগে শব্দগঠন :** বাংলা ভাষায় ক্রিয়ামূল বা ধাতুর শেষে শব্দখণ্ড যোগ হয়ে অনেক নতুন শব্দ গঠিত হয়ে থাকে। যেমন :

√চল্ + আ = চলা [এ রাস্তায় চলা যায় না]

√চল্ + অন্ত = চলন্ত [চলন্ত বাস থেকে পড়ে গিয়ে ওর এই অবস্থা]

যে শব্দখণ্ড ধাতু বা ক্রিয়ামূল অথবা শব্দের পরে বসে নতুন শব্দ গঠন করে তাকে অন্ত্যপ্রত্যয় বলে। বাংলা ভাষায় অন্ত্যপ্রত্যয় দুই রকম :

১. কৃৎ প্রত্যয় বা ধাতু প্রত্যয় : যা ধাতু বা ক্রিয়ামূলের পরে যোগ হয়;

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



২. **তদ্ধিত প্রত্যয় বা শব্দ প্রত্যয় :** যা শব্দের সঙ্গে বা শব্দের মূল অংশের পরে যোগ হয়।

**কৃদন্ত শব্দ :** কৃৎ প্রত্যয় যোগ করে যে শব্দ গঠিত হয় তাকে কৃদন্ত শব্দ বলে। যেমন : √ডুব্ + অন্ত = ডুবন্ত, √নি + অন = নয়ন।

**তদ্ধিতান্ত শব্দ :** তদ্ধিত প্রত্যয় যোগ করে যে শব্দ গঠিত হয় তাকে তদ্ধিতান্ত শব্দ বলে। যেমন : বড় + আই = বড়াই, মামলা + বাজ = মামলাবাজ।

**বাংলা কৃৎ প্রত্যয় বা ধাতু প্রত্যয় :** বাংলার নিজস্ব অনেক ধাতু রয়েছে যেগুলো সংস্কৃত বা তৎসম নয়, এগুলো এসেছে প্রাকৃত ভাষা থেকে। এসব ধাতুর সঙ্গে প্রাকৃত ভাষা থেকে আগত কিছু প্রত্যয় যোগ হয়ে নতুন শব্দ গঠন করে। এসব প্রত্যয়কে বাংলা কৃৎ প্রত্যয় বা ধাতু প্রত্যয় বলা হয়।

**অন** এই প্রত্যয়টি ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য শব্দ গঠন করে : √কাঁদ্ + অন = কাঁদন

**অনা** এই প্রত্যয় অন্ প্রত্যয়ের প্রসারিত রূপ : অন্ + আ = অনা। এই প্রত্যয় ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য শব্দ গঠন করে।

**অন্ত/অন্তি** ঘটমান অর্থে বিশেষণ শব্দ গঠন করে : √উড়্ + অন্ত = উড়ন্ত।

**আ** ক্রিয়াবাচক বা ভাববাচক বিশেষ্য ও অতীত কালবাচক বিশেষণ শব্দ গঠন করে : √কর্ + আ = করা।

**আই** ক্রিয়ার ভাব প্রকাশক ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য গঠন করে : √বাছ্ + আই = বাছাই।

**সংস্কৃত কৃৎ প্রত্যয় বা ধাতু প্রত্যয় :** বাংলা ভাষায় সংস্কৃত থেকে আগত বহু শব্দ আছে। এসব শব্দ গঠিত হয়েছে সংস্কৃত প্রত্যয় যোগে। ধাতুর সঙ্গে যে সব সংস্কৃত প্রত্যয় যোগ হয়ে নতুন শব্দ গঠিত হয় তাদের বলা হয় সংস্কৃত কৃৎ প্রত্যয়।

**অক** বিশেষ্য (কর্তৃপদ) গঠন করে : √গৈ + অক = গায়ক, √পঠ্ + অক = পাঠক।

**অন** বিশেষ্য শব্দ গঠন করে : √গম্ + অন = গমন, √জ্বল্ + অন = জ্বলন।

**অনীয়** 'যোগ্য' বা উচিত অর্থে বিশেষণ শব্দ গঠন করে : √দৃশ্ + অনীয় = দর্শনীয়।

**বিদেশি শব্দ প্রত্যয় বা বিদেশি তদ্ধিত প্রত্যয় :** শব্দের সঙ্গে যে সব বিদেশি প্রত্যয় যুক্ত হয়ে নতুন শব্দ গঠিত হয় সেগুলোকে বিদেশি শব্দ প্রত্যয় বা বিদেশি তদ্ধিত প্রত্যয় বলে।

**আনা/আনি** ভাব, অভ্যাস বা আচরণ অর্থে বিশেষ্য শব্দ গঠন করে : বাবু + আনা = বাবুয়ানা, বাবু + আনি = বাবুয়ানি।

**ওয়ান** চালক, রক্ষক অর্থে বিশেষ্য শব্দ গঠন করে : গাড়ি → গাড়োয়ান।

**খানা** স্থান বা দোকান অর্থে বিশেষ্য শব্দ গঠন করে : মুদি → মুদিখানা।

**খোর** মন্দ কিছু সেবনে বা গ্রহণে অভ্যস্ত অর্তে বিশেষণ শব্দ গঠন করে : আফিমখোর, গাঁজাখোর, গুলিখোর, ঘুষখোর, ভাঙখোর, হারামখোর।

**গর** যে করে বা যে গড়ে অর্থে বিশেষ্য শব্দ গঠন করে : কারি (শিল্পকর্ম) + গর = কারিগর।

**চা/চি** ছোট অর্থে বিশেষ্য শব্দ গঠন করে : ডেগ → ডেগচি/ডেকচি, ব্যাঙ → ব্যাঙাচি, বাগ → বাগিচা।



## ৪. সমাসের সাহায্যে শব্দগঠন

সমাস কথাটির অর্থ হচ্ছে সংক্ষেপ, মিলন, একাধিক পদের একপদীকরণ। পরস্পর অর্থসঙ্গতি সম্পন্ন দুই বা ততোধিক পদের এক পদে পরিণত হওয়াকে সমাস বলে।

**সমাসের কয়েকটি পরিভাষা**

| | |
|---|---|
| সমস্তপদ | সমাসবদ্ধ বা সমাস নিষ্পন্ন পদটির নাম সমস্তপদ। |
| সমস্যমান পদ | যে যে পদে সমাস হয়, তাদের প্রত্যেককে সমস্যমান পদ বলে। |
| পূর্বপদ | সমাসযুক্ত পদের প্রথম অংশকে পূর্বপদ বলে। |
| পরপদ | সমাসযুক্ত পদের পরবর্তী অংশকে বলা হয় পরপদ। |
| সমাসবাক্য বা বিগ্রহবাক্য বা ব্যাসবাক্য | সমস্ত পদকে ভাঙলে যে বাক্যাংশ পাওয়া যায় তাকে বলা হয় ব্যাসবাক্য। |

### ১. দ্বন্দ্ব সমাস

দ্বন্দ্ব মানে জোড়া। যে সমাসে সমস্যমান প্রত্যেক পদের অর্থ প্রধানরূপে প্রতীয়মান হয়, তাকে বলা হয় দ্বন্দ্ব সমাস। যেমন– মা ও বাবা = মা-বাবা।

| সমাসের নাম | সংজ্ঞা | উদাহরণ |
|---|---|---|
| সাধারণ দ্বন্দ্ব | সাধারণত দুই বা ততোধিক পদের মিলন হলে, তাকে বলা হয় সাধারণ দ্বন্দ্ব। | মা ও বাবা = মা-বাবা |
| মিলনার্থক দ্বন্দ্ব | যখন অর্থের দিক থেকে পরস্পর মিলন বুঝায়, তখন দুটি পদের মিলন হলে তাকে বলে মিলনার্থক দ্বন্দ্ব। | ভাই ও বোন = ভাই-বোন |
| বিরোধার্থক দ্বন্দ্ব | অর্থের দিক থেকে যে দ্বন্দ্ব পরস্পরের মধ্যে বিরোধ বা বৈপরিত্য বুঝায়, তাকে বলা হয় বিরোধার্থক দ্বন্দ্ব। | সাদা ও কালো = সাদা-কালো |
| সমার্থক দ্বন্দ্ব | সম অর্থপূর্ণ দুটি পদের মিলন হলে তাকে বলা হয় সমার্থক দ্বন্দ্ব। | হাট ও বাজার = হাট-বাজার |
| বহুপদী দ্বন্দ্ব | বহুপদ মিলে যে দ্বন্দ্ব সমাস হয় তাকে বলা হয় বহুপদী দ্বন্দ্ব। | সে, তুমি ও আমি = আমরা |
| ইত্যাদি অর্থে দ্বন্দ্ব | মূল পদের সঙ্গে ইত্যাদিবাচক বিকৃতপদ মিলিত হলে তাকে বলে ইত্যাদিবাচক দ্বন্দ্ব। | কাপড় ও চোপড় = কাপড়চোপড় |
| অলুক দ্বন্দ্ব | যে সমাসে পূর্বপদের বিভক্তি লোপ হয় না, তাকে বলা হয় অলুক দ্বন্দ্ব। | দুধে ও ভাতে = দুধেভাতে |
| একশেষ দ্বন্দ্ব | যে সমাসে অন্যান্য পদের বিলুপ্তি ঘটিয়ে প্রথম পদটির সঙ্গে শেষ পদটির সামঞ্জস্য রচিত হয়, তাকে বলে একশেষ দ্বন্দ্ব। | জায়া ও পতি = দম্পতি |

### ২. কর্মধারয় সমাস

বিশেষণ ও বিশেষ্য পদ মিলে যে সমাস হয় এবং বিশেষ্যের বা পরপদের অর্থই প্রধানরূপে প্রতীয়মান হয়, তাকে বলা হয় কর্মধারয় সমাস। যেমন– নীল যে পদ্ম = নীলপদ্ম।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



| সমাসের নাম | সংজ্ঞা | উদাহরণ |
| --- | --- | --- |
| মধ্যপদলোপী কর্মধারয় | যে কর্মধারয় সমাসে ব্যাসবাক্যের মধ্যপদের লোপ হয়, তাকে মধ্যপদলোপী কর্মধারয় সমাস বলে। | পল মিশ্রিত অন্ন = পলান্ন |
| উপমান কর্মধারয় সমাস | যে কর্মধারয় সমাসে সাধারণ কর্মবাচক পদের সঙ্গে উপমানবাচক পদের মিলন হয়, তাকে বলে উপমান কর্মধারয় সমাস। | শশকের মতো ব্যস্ত = শশব্যস্ত, মিশির ন্যায় কালো = মিশকালো |
| উপমিত কর্মধারয় | সাধারণ গুণের উল্লেখ ব্যতীত উপমেয়ের সঙ্গে উপমান পদের যে সমাস হয়, তাকে বলে উপমিত কর্মধারয় সমাস। | কুমারী ফুলের ন্যায় = ফুলকুমারী |
| রূপক কর্মধারয় | উপমিত ও উপমানের অভেদ কল্পনামূলক সমাসকে বলা হয় রূপক কর্মধারয় সমাস। | আঁখি রূপ পাখি = আঁখিপাখি, বিষাদ রূপ সিন্ধু = বিষাদসিন্ধু |

### ৩. তৎপুরুষ সমাস

যে সমাসে পূর্বপদের বিভক্তি লোপ পায় এবং পরপদের অর্থ প্রধানরূপে প্রতীয়মান হয়, তাকে বলা হয় তৎপুরুষ সমাস। যেমন—ঢেঁকিতে ছাঁটা = ঢেঁকিছাঁটা

| সমাসের নাম | সংজ্ঞা | উদাহরণ |
| --- | --- | --- |
| দ্বিতীয়া তৎপুরুষ সমাস | পূর্বপদে দ্বিতীয়া বিভক্তি লোপ পেয়ে যে সমাস হয়, তাকে বলা হয় দ্বিতীয়া তৎপুরুষ সমাস। | সাহায্যকে প্রাপ্ত = সাহায্যপ্রাপ্ত |
| তৃতীয়া তৎপুরুষ সমাস | পূর্বপদের তৃতীয়া বিভক্তি লোপ পেয়ে যে তৎপুরুষ সমাস হয়, তাকে তৃতীয়া তৎপুরুষ সমাস বলা হয়। | মন দ্বারা গড়া = মনগড়া |
| চতুর্থী তৎপুরুষ সমাস | পূর্বপদে চতুর্থী বিভক্তি লোপ পেয়ে যে তৎপুরুষ সমাস হয়, তাকে চতুর্থী তৎপুরুষ সমাস বলে। | দেবকে দত্ত = দেবদত্ত |
| পঞ্চমী তৎপুরুষ সমাস | পূর্বপদে পঞ্চমী বিভক্তি লোপের ফলে যে সমাস হয়, তাকে পঞ্চমী তৎপুরুষ সমাস বলে। | স্কুল থেকে পালানো = স্কুলপালানো |
| ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস | পূর্বপদে ষষ্ঠী বিভক্তি লোপ পেয়ে যে সমাস হয়, তাকে বলা হয় ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস। | পিতার তুল্য = পিতৃতুল্য |
| সপ্তমী তৎপুরুষ সমাস | পূর্বপদে সপ্তমী বিভক্তি (এ, য়, তে) লোপ পেয়ে যে সমাস হয়, তাকে বলা হয় সপ্তমী তৎপুরুষ সমাস। | গাছে পাকা = গাছপাকা |
| নঞ তৎপুরুষ সমাস | নঞ অব্যয় (না, নেই, নাই, নয়) পূর্বে বসে যে তৎপুরুষ সমাস হয়, তাকে নঞ তৎপুরুষ সমাস বলে। | ন আদর = অনাদর |
| উপপদ তৎপুরুষ | যে পদের পরবর্তী ক্রিয়ামূলের সঙ্গে কৃৎ প্রত্যয় যুক্ত হয়, সে পদকে উপপদ বলে। কৃদন্ত পদের সাথে উপপদের যে সমাস হয়, তাকে উপপদ তৎপুরুষ সমাস বলে। | জল দেয় যে = জলদ |
| অলুক তৎপুরুষ সমাস | যে তৎপুরুষ সমাসে পূর্বপদের বিভক্তির লোপ হয় না, তাকে বলা হয় অলুক তৎপুরুষ সমাস। | বনে চরে যে = বনচর |



### ৪. বহুব্রীহি সমাস

যে সমাসের সমস্তপদে পূর্বপদ ও পর পদের অর্থ প্রধান রূপে প্রতীয়মান না হয়ে অন্য একটি পদের অর্থ প্রধানরূপে প্রতীয়মান হয়, তাকে বহুব্রীহি সমাস বলে। যেমন—বহুব্রীহি = বহু ব্রীহি (ধান) আছে যার, পোড়া কপাল যার = পোড়াকপাল।

| সমাসের নাম | সংজ্ঞা | উদাহরণ |
| --- | --- | --- |
| সমানাধিকরণ বহুব্রীহি | বিশেষণ ও বিশেষ্যের মধ্যে যে সমাস হয়, তাকে সমানাধিকরণ বহুব্রীহি সমাস বলে। | নীল কণ্ঠ যার = নীলকণ্ঠ |
| ব্যাধিকরণ বহুব্রীহি | যে বহুব্রীহি সমাসে সমস্যমান পদের দুটিই বিশেষ্য পদ হয়, তাকে বলা হয় ব্যাধিকরণ বহুব্রীহি সমাস। | বীণা পানিতে যার = বীণাপানি |
| মধ্যপদলোপী বহুব্রীহি | বহুব্রীহি সমাসের ব্যাখ্যার জন্য বাক্যাংশের কোনো অংশ যদি সমস্ত পদে লোপ পায়, তাকে বলা হয় মধ্যপদলোপী বহুব্রীহি সমাস। | গোঁফে খেজুর পড়ে থাকলেও খায় না যে = গোঁফখেজুরে |
| ব্যতিহার বহুব্রীহি | একই রূপ দুটি বিশেষ্যপদ এক সঙ্গে বসে পরস্পর একই জাতীয় কাজ করলে যে সমাস হয় তাকে বলা হয় ব্যতিহার বহুব্রীহি সমাস। | কানে কানে যে কথা = কানাকানি |
| অলুক বহুব্রীহি | যে বহুব্রীহি সমাসে সমস্ত পদে সমস্যমান পদগুলোর বিভক্তি লোপ পায় না, তাকে অলুক বহুব্রীহি সমাস বলে। | গায়ে হলুদ দেয়া হয় যে অনুষ্ঠানে = গায়েহলুদ |
| নঞ বহুব্রীহি | নঞ অর্থাৎ নাবাচক অব্যয় পূর্ব পদে বসে যে বহুব্রীহি সমাস হয়, তাকে নঞ বহুব্রীহি সমাস বলে। | নয় জানা যা = অজানা |
| প্রত্যয়ান্ত বহুব্রীহি | যে বহুব্রীহি সমাসের সমস্ত পদে আ, এ, ও ইত্যাদি প্রত্যয় যুক্ত হয়, তাকে বলা হয় প্রত্যয়ান্ত বহুব্রীহি সমাস। | দো (দুদিকে) টান যার = দোটানা |
| দ্বিগু বা সংখ্যাবাচক বহুব্রীহি | পূর্বপদে সংখ্যাবাচক শব্দ লোপে যে সমাস হয়, তাকে বলে দ্বিগু বা সংখ্যাবাচক বহুব্রীহি সমাস। | দশ আনন যার = দশানন |

### ৫. দ্বিগু সমাস

যে সমাসে পূর্বপদটি সংখ্যাবাচক বিশেষণ হয়ে সমাহার বা সমষ্টি বুঝায় এবং পরপদের অর্থ প্রধানরূপে প্রতীয়মান হয়, তাকে দ্বিগু সমাস বলে। যেমন—তিন পদের সমাহার = ত্রিপদী।

### ৬. অব্যয়ীভাব সমাস

যে সমাসে সমস্যমান পদদ্বয়ের পূর্বপদ অব্যয় হয়ে অর্থের দিক থেকে প্রাধান্য লাভ করে, তাকে অব্যয়ীভাব সমাস বলে। যেমন— দিন দিন = প্রতিদিন।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



### বিশেষ অর্থে কয়েকটি সমাস

| সমাসের নাম | সংজ্ঞা | উদাহরণ |
|---|---|---|
| অলুক সমাস | যে সমাসে কখনো পূর্বপদে বিভক্তি লোপ হয় না। অলুক সমাস কোনো স্বতন্ত্র সমাস নয়, যে কোনো শ্রেণির সমাস অলুক হতে পারে। | যুদ্ধে স্থির থাকে যে = যুধিষ্ঠির |
| প্রাদি সমাস | প্র, প্রতি, অনু প্রভৃতি অব্যয়ের সঙ্গে যদি কৃৎ প্রত্যয় সাধিত বিশেষ্যের সমাস হয়, তবে তাকে বলে প্রাদি সমাস। | প্র (প্রকৃষ্ট) যে বচন = প্রবচন |
| নিত্য সমাস | যে সমাসে সমস্যমান পদগুলো নিত্য সমাসবদ্ধ থাকে, ব্যাসবাক্যের দরকার হয় না, তাকে নিত্য সমাস বলে। | অন্য গ্রাম = গ্রামান্তর |
| সুপসুপা সমাস | বিভক্তিযুক্ত শব্দের সাথে তৎসম শব্দ যুক্ত হয়ে যে সমাস হয় এবং সমস্ত পদে তৎসম পদটির পর নিপাত হলে তাকে সুপসুপা সমাস বলে। | পূর্বে দৃষ্ট = দৃষ্টপূর্ব |

## ৫. পদ পরিবর্তনের মাধ্যমে শব্দগঠন

একপদ অন্য পদে পরিবর্তন করার মাধ্যমে নতুন শব্দ ও অর্থের সৃষ্টি হয়। যেমন : অর্থ > আর্থিক, আত্মা > আত্মিক, খেয়াল > খেয়ালি, সোনা > সোনালি ইত্যাদি।

### বিশেষ্য থেকে বিশেষণ পদে পরিবর্তনের মাধ্যমে শব্দ গঠন

| বিশেষ্য | বিশেষণ | বিশেষ্য | বিশেষণ | বিশেষ্য | বিশেষণ | বিশেষ্য | বিশেষণ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| অগ্নি | আগ্নেয় | অভ্যাস | অভ্যস্ত | অধ্যয়ন | অধীত | আষাঢ় | আষাঢ়ী |
| অণু | আণবিক | আকুল | আকুলতা | অধুনা | আধুনিক | অন্ত | অন্তিম |
| অংকুর | অংকুরিত | ঋষি | আর্য | অন্তর | আন্তরিক | আহ্বান | আহুত |
| অংশ | আংশিক | ঋণ | ঋণী | অবধান | অবহিত | আনন্দ | আনন্দিত |
| অর্থ | আর্থিক | ঐক্য | এক | আত্মা | আত্মিক | অলস | আলস্য |
| অনুরাগ | অনুরক্ত | কাজ | কেজো | আতংক | আতংকিত | আক্রমণ | আক্রান্ত |
| আবাদ | আবাদী | কর্ম | কর্মঠ | অরণ্য | আরণ্যক | আহলাদ | আহলাদিত |
| আসমান | আসমানী | কাঠিন্য | কঠিন | অনুবাদ | অনূদিত | আলোড়ন | আলোড়িত |
| আহরণ | আহরিত | জটা | জটিল | অবস্থান | অবস্থিত | ইচ্ছা | ঐচ্ছিক |
| আদর | আদুরে | ঝড় | ঝড়ো | আশ্রয় | আশ্রিত | ইন্দ্রজাত | ইন্দ্রজালিক |
| আঘাত | আহত | অনুমান | অনুমিত | আদি | আদিম | ইতিহাস | ঐতিহাসিক |
| আবিষ্কার | আবিষ্কৃত | আগমন | আগত | অপহরণ | অপহৃত | ইমান | ঈমানদার |
| আয়ু | আয়ুষ্কাল | আলাপ | আলাপী | উল্লাস | উল্লসিত | জয় | জেয় |
| ক্রয় | ক্রীত | আসন | আসীন | উচ্ছ্বাস | উচ্ছ্বসিত | তিরোধান | তিরোহিত |
| আবরণ | আবৃত | আমোদ | আমোদিত | উন্মাদ | উন্মত্ত | তন্দ্রা | তন্দ্রালু |



| বিশেষ্য | বিশেষণ | বিশেষ্য | বিশেষণ | বিশেষ্য | বিশেষণ | বিশেষ্য | বিশেষণ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| উত্তাপ | উত্তপ্ত | তরঙ্গ | তরঙ্গিত | কাগজ | কাগুজে | ধারণ | ধৃত |
| উপন্যাস | ঔপন্যাসিক | তামা | তামাটে | খণ্ড | খণ্ডিত | ন্যায় | ন্যায্য |
| উপকার | উপকৃত | তাপ | তপ্ত | জাত | জাতীয় | বিমান | বৈমানিক |
| উদ্যম | উদ্যত | তেজ | তেজালো/তেজস্বি | ঝংকার | ঝংকৃত | বিবাদ | বিবদমান |
| উৎপাদন | উৎপাদিত | তিরস্কার | তিরস্কৃত | ঝগড়া | ঝগড়াটে | বরণ | বৃত |
| উদ্বেগ | উদ্বিগ্ন | দর্শন | দার্শনিক | ডাক্তার | ডাক্তারী | চিহ্ন | চিহ্নিত |
| উপদ্রব | উপদ্রুত | দেশ | দেশীয় | ঢাকা | ঢাকাই | চক্ষু | চাক্ষুষ |
| দিন | দৈনিক | তর্ক | তার্কিক | জল | জলীয় | দেহ | দৈহিক |
| চিত্র | চিত্রিত | দোষ | দুষ্ট | জাঁক | জাঁকালো | দানব | দানবিতক |
| চৈত | চৈতালি | দীক্ষা | দীক্ষিত | জন্ম | জাত | দুধ | দুধাল/দুধেল |
| ছন্দ | ছান্দিক | চরিত্র | চারিত্রিক | জন্তু | জান্তব | হেমন্ত | হৈমন্তিক |
| জীবন | জীবিত | ধর্ম | ধার্মিক | দুঃখী | দুঃখিত | নগর | নাগরিক |
| জ্ঞান | জ্ঞাত | ধার | ধারালো | খয়ের | খয়েরি | নিয়ন্ত্রণ | নিয়ন্ত্রিত |
| কৃষি | কৃষিজ | বসন্ত | বাসন্তি | খেয়াল | খেয়ালি | দরদ | দরদী |

## ৬. দ্বিরুক্তির সাহায্যে শব্দগঠন

পদের দ্বিরুক্তির সাহায্যে নতুন শব্দের সৃষ্টি হয়। যেমন : ঘরে ঘরে, ধন্য ধন্য, রাজায় রাজায় ইত্যাদি। বাংলা ভাষায় একই পদ, শব্দ বা ধ্বনি দু'বার ব্যবহৃত হয়ে ভিন্ন একটি অর্থ প্রকাশ করাকেই দ্বিরুক্ত বা শব্দদ্বৈত বলে। যথা– 'শীত শীত লাগে'। এক্ষেত্রে 'শীত শীত' হলো ঠিক শীত নয়, শীতের ভাব।

**দ্বিরুক্তির শ্রেণিবিভাগ**

গঠনগতভাবে দ্বিরুক্ত শব্দ– ৩ প্রকার। যথা : ক. শব্দের দ্বিরুক্তি, খ. পদের দ্বিরুক্তি, গ. অনুকার অব্যয়ের দ্বিরুক্তি।

**ক. শব্দের দ্বিরুক্তি**

একই শব্দের অবিকৃতভাবে দু'বার উচ্চারণ রীতিকে বলে শব্দের দ্বিরুক্তি। যথা : ঘরে ঘরে, হাসি হাসি, লাল লাল, টান টান ইত্যাদি।

**খ. পদের দ্বিরুক্তি**

পদের দ্বিরুক্তি বলতে বোঝায় একই বিভক্তিযুক্ত পদ। পদের দ্বিরুক্তিতে দ্বিতীয় পদের ধ্বনিগত পরিবর্তন হয় এবং বিভক্তির পরিবর্তন হয় না।

**বিশেষ্যপদের বিশেষণরূপে ব্যবহার :**

আধিক্য বোঝাতে : গাড়ি গাড়ি বালি, রাশি রাশি ধন।

সামান্যতা বোঝাতে : জ্বর জ্বর ভাব, শীত শীত ভাব।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



বিশেষণ পদের বিশেষণরূপে ব্যবহার :

আধিক্য বোঝাতে : লাল লাল ফুল, সাদা-সাদা বক।

সামান্যতা বোঝাতে : রোগা-রোগা চেহারা। কালো কালো চেহারা।

সর্বনাম পদের দ্বিরুক্ত রীতি :

আধিক্য বোঝাতে : কেউ কেউ বলেন। কে কে যাবে।

ক্রিয়াপদের দ্বিরুক্ত রীতি :

বিশেষণ অর্থে : যায় যায় অবস্থা। খাই খাই দশা।

স্বল্পকাল/আকস্মিকতা অর্থে : দেখতে দেখতে গেলাম। উঠতে উঠতে পড়ে গেল।

পৌনঃপুন্য বা বারংবার অর্থে : ডাকতে ডাকতে হয়রান হয়ে গেলাম।

ক্রিয়া বিশেষণ : দেখে দেখে যেও।

অব্যয়ের দ্বিরুক্ত শব্দ :

ভাবের অভিব্যক্তি বোঝাতে : হায়! হায়! কী সর্বনাশ। ছি! ছি! লজ্জায় মরে যাই।

বিশেষণ অর্থে : হায়-হায় শব্দ। ছিঃ ছিঃ ধিক্কার।

ধ্বনি ব্যঞ্জনা বোঝাতে : বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর।

গ. অনুকার অব্যয়ের দ্বিরুক্তি/ধ্বন্যাত্মক দ্বিরুক্তি

কোনো কিছুর ধ্বনি বা আওয়াজের অনুকরণে গঠিত শব্দকে অনুকার অব্যয়ের দ্বিরুক্তি বা ধ্বন্যাত্মক দ্বিরুক্তি বলে। যথা– ঢং একটি অনুকার অব্যয়। ঢং ঢং দ্বিরুক্ত শব্দ।

এরূপ : ঝমঝম, খাঁখাঁ, সাঁসাঁ, ছলছল, টাপুর টুপুর।

খ

# বানান/বানানের নিয়ম

বাংলা বানানের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, উনিশ শতকের পূর্ব পর্যন্ত বাংলা বানানের কোনো নিয়ম ছিল না। উনিশ শতকে এ বিষয়ে উদ্যোগ নেয়া হলেও বাংলা বানানের নিয়ম বেঁধে দেয়ার প্রথম দায়িত্ব পালন করে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। ১৯৩৫ সালে গঠিত বাংলা বানান সংস্কার কমিটির প্রতিবেদন ১৯৩৬ সালে প্রকাশিত হয়। সামান্য পরিবর্তনের পর ১৯৩৭ সালে বাংলা বানানের নিয়ম বই আকারে প্রকাশিত হয়। বাংলা বানানের বিশৃঙ্খলা ও বিভ্রান্তি দূর করার লক্ষ্যে ১৯৪৭ সালের পর বাংলাদেশে ব্যক্তি, প্রাতিষ্ঠানিক ও সরকারিভাবে বাংলা বানান সংস্কারের উদ্যোগ নেয়া হলেও তা সফলতার মুখ দেখেনি। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৭৪ সালে বাংলাদেশ শিক্ষা কমিশনের রিপোর্টে এবং ১৯৭৬ সালে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি প্রণয়ন কমিটির রিপোর্টে পাঠ্যপুস্তকের জন্য একটি সুনির্দিষ্ট বানান রীতি প্রণয়ন ও তা অনুসরণ করার ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়। পাঠ্যপুস্তকে বানানের সমতাবিধান করার জন্য জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড ১৯৮৪ সালে একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করে। অভিন্ন বানানের জন্য তারা কিছু নিয়ম সুপারিশ করে। কিন্তু নানা কারণে তা প্রচলিত ও গৃহীত হয়নি। অতঃপর অধ্যাপক ড. আনিসুজ্জামানের নেতৃত্বে একটি বিশেষজ্ঞ কমিটির মাধ্যমে এই বানানের নিয়ম ও শব্দ তালিকা চূড়ান্ত করা হয় এবং তা ১৯৯২ সালে পাঠ্যবইয়ের বানান নামে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড প্রকাশ করে। ১৯৯৪ সালের জানুয়ারিতে এ বানানের পরিমার্জিত সংস্করণ প্রকাশিত হয়। প্রমিত বাংলা বানানের নিয়ম অনুসরণে বিশেষজ্ঞ কমিটির অন্যতম সদস্য জামিল চৌধুরী বাংলা বানান অভিধান প্রণয়ন করেন। বাংলা একাডেমি কর্তৃক ১৯৯৪ সালের জুন মাসে এ অভিধান প্রথম প্রকাশিত হয়।

## বাংলা একাডেমি প্রমিত বাংলা বানানের নিয়ম

তৎসম শব্দ

১.০১ : তৎসম অর্থাৎ বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত অবিকৃত সংস্কৃত শব্দের বানান যথাযথ ও অপরিবর্তিত থাকবে। কারণ এইসব শব্দের বানান ও ব্যাকরণগত প্রকরণ ও পদ্ধতি নির্দিষ্ট রয়েছে।

১.০২ : তবে যে-সব তৎসম শব্দে ই, ঈ বা উ, ঊ উভয় শুদ্ধ সেইসব শব্দে কেবল ই বা উ এবং তার-কারচিহ্ন ি ু ব্যবহৃত হবে। যেমন : কিংবদন্তি, খঞ্জনি, চিৎকার, ধমনি, ধূলি, পঞ্জি, পদবি, ভঙ্গি, মঞ্জুরি, মসি, লহরি, সরণি, সূচিপত্র, উর্ণা, উষা।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



১.০৩ : রেফ-এর পরে ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বিত্ব হবে না। যেমন : অর্চনা, অর্জন, অর্থ, অর্ধ, কর্দম, কর্তন, কর্ম, কার্য, গর্জন, মূর্ছা, কার্তিক, বার্ধক্য, বার্তা, সূর্য।

১.০৪ : ক খ গ ঘ পরে থাকলে পদের অন্তস্থিত ম্ স্থানে অনুস্বার (ং) লেখা যাবে। যেমন : অহংকার, ভয়ংকর, সংগীত, শুভংকর, হৃদয়ংগম, সংঘটন ইত্যাদি। বিকল্পে ঙ লেখা যাবে। ক্ষ-এর পূর্বে ঙ্ হবে। যেমন : আকাঙ্ক্ষা।

## অ-তৎসম অর্থাৎ তদ্ভব, দেশী, বিদেশী, মিশ্র শব্দ

২.০১ : ই ঈ উ ঊ

সকল অ-তৎসম অর্থাৎ তদ্ভব, দেশী, বিদেশী, মিশ্র শব্দে কেবল ই এবং উ এদের-কার চিহ্ন ি ু ব্যবহৃত হবে। এমনকি স্ত্রীবাচক ও জাতিবাচক ইত্যাদি শব্দের ক্ষেত্রেও এই নিয়ম প্রযোজ্য হবে। যেমন : গাড়ি, চুরি, দাড়ি, বাড়ি, ভারি, শাড়ি, তরকারি, বোমাবাজি, দাবি, হাতি, বেশি, খুশি, হিজরি, আরবি, ফারসি, ফরাসি, বাঙালি, ইংরেজি, জাপানি, জার্মানি, ইরানি, হিন্দি, সিন্ধি, ফিরিঙ্গি, সিঙ্গি, ছুরি, টুপি, সরকারি, মালি, পাগলামি, পাগলি, দিঘি, কেরামতি, রেশমি, পশমি, পাখি, ফরিয়াদি, আসামি, বে-আইনি, ছড়ি, কুমির, নানি, দাদি, বিবি, মামি, মাসি, চাচি, দিদি, বুড়ি, ছুঁড়ি নিচে, নিচু, ইমান, চুন, পুব, ভুখা, মুলা, পুজো, উনিশ, উনচল্লিশ।

অনুরূপভাবে আলি প্রত্যয়যুক্ত শব্দে ই-কার হবে। যেমন : খেয়ালি, বর্ণালি, মিতালি, সোনালি, হেঁয়ালি।

তবে কোনো কোনো স্ত্রীবাচক শব্দের শেষে ঈ-কার দেয়া যেতে পারে। যেমন : রানী, পরী, গাভী।

সর্বনাম পদরূপে এবং বিশেষণ ও ক্রিয়া-বিশেষণ পদরূপে কী শব্দটি ঈ-কার দিয়ে লেখা হবে। যেমন : কী করছ? কী পড়ো? কী খেলে? কী আর বলব? কী জানি? কী যে করি! তোমার কী? এটা কী বই? কী করে যাব? কী বুদ্ধি নিয়ে এসেছিলে? কী আনন্দ! কী দুরাশা!

অন্য ক্ষেত্রে অব্যয় পদরূপে ই-কার দিয়ে কি শব্দটি লেখা হবে। যেমন : তুমিও কি যাবে? সে কি এসেছিল? কি বাংলা কি ইংরেজি উভয় ভাষায় তিনি পারদর্শী।

পদাশ্রিত নির্দেশক টি-তে ই-কার হবে। যেমন : ছেলেটি, লোকটি, বইটি।

২.০২ : ক্ষ

ক্ষীর, ক্ষুর ও ক্ষেত শব্দ খির, খুর ও খেত না লিখে সংস্কৃত মূল অনুসরণে ক্ষীর, ক্ষুর ও ক্ষেত-ই লেখা হবে। তবে অ-তৎসম শব্দে খুদ, খুদে, খুর, খেপা, খিধে ইত্যাদি লেখা হবে।

২.০৩ : মূর্ধন্য ণ, দন্ত্য ন

তৎসম শব্দের বানানে ণ, ন-য়ের নিয়ম ও শুদ্ধতা রক্ষা করতে হবে। এ ছাড়া তদ্ভব, দেশী, বিদেশী, মিশ্র কোনো শব্দের বানানে ণ-ত্ব বিধি মানা হবে না অর্থাৎ ণ ব্যবহার করা হবে না। যেমন : অঘ্রান, ইরান, কান, কোরান, গুনতি, গোনা, ঝরনা, ধরন, পরান, সোনা, হর্ন।

তৎসম শব্দে ট ঠ ড ঢ-য়ের পূর্বে ণ হয়, যেমন : কণ্টক, লুণ্ঠন, প্রচণ্ড। কিন্তু তৎসম ছাড়া অন্য সকল শব্দের ক্ষেত্রে ট ঠ ড ঢ-য়ের আগেও কেবল ন হবে। অ-তৎসম শব্দে যুক্তাক্ষরের বানানের জন্য ৪.০১ দ্রষ্টব্য।



২.০৪ : শ, ষ, স

তৎসম শব্দের বানানে শ, ষ, স-য়ের নিয়ম মানতে হবে। এছাড়া অন্য কোনো ক্ষেত্রে সংস্কৃতের ষ-ত্ব বিধি প্রযোজ্য হবে না।

বিদেশী মূল শব্দে শ, স-য়ের যে প্রতিষঙ্গী বর্ণ বা ধ্বনি রয়েছে বাংলা বানানে তাই ব্যবহার করতে হবে। যেমন : সাল (= বৎসর), সন, হিসাব, শহর, শরবত, শামিয়ানা, শখ, শৌখিন, মসলা, জিনিস, আপস, সাদা, পোশাক, বেহেশ্‌ত, নাশতা, কিশমিশ, শরম, শয়তান, শার্ট, স্মার্ট। তবে পুলিশ শব্দটি ব্যতিক্রমরূপে শ দিয়ে লেখা হবে। তৎসম শব্দে ট, ঠ বর্ণের পূর্বে ষ হয়। যেমন : বৃষ্টি, দুষ্ট, নিষ্ঠা, পৃষ্ঠা। কিন্তু বিদেশী শব্দে এই ক্ষেত্রে স হবে। যেমন : স্টল, স্টাইল, স্টিমার, স্টুডিও, স্টেশন, স্টোর, স্ট্রিট।

কিন্তু খ্রিষ্ট যেহেতু বাংলায় আত্তীকৃত শব্দ এবং এর উচ্চারণও হয় তৎসম কৃষ্টি, তুষ্ট, ইত্যাদি শব্দের মতো তাই ষ্ট দিয়ে খ্রিষ্ট শব্দটি লেখা হবে।

২.০৫ : আরবি-ফারসি শব্দে 'সে', 'সিন', 'সোয়াদ' বর্ণগুলোর প্রতিবর্ণরূপে স এবং 'শিন'-এর প্রতিবর্ণ-রূপ শ ব্যবহৃত হবে। যেমন : সালাম, তসলিম, ইসলাম, মুসলিম, মুসলমান, সালাত, এশা, শাবান (হিজরি মাস), শাওয়াল (হিজরি মাস), বেহেশ্‌ত।

এই ক্ষেত্রে স-এর পরিবর্তে ছ লেখার কিছু কিছু প্রবণতা দেখা যায়, তা ঠিক নয়। তবে যেখানে বাংলায় বিদেশী শব্দের বানান সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হয়ে স, ছ-য়ের রূপ লাভ করেছে সেখানে ছ ব্যবহার করতে হবে। যেমন : পছন্দ, মিছিল, মিছরি, তছনছ।

২.০৬ : ইংরেজি ও ইংরেজির মাধ্যমে আগত বিদেশী শ বর্ণ বা ধ্বনির জন্য স এবং সা, –sion, –ssion, –tion প্রভৃতি বর্ণগুচ্ছ বা ধ্বনির জন্য শ ব্যবহৃত হবে। তবে question ইত্যাদি শব্দে বানান অন্যরূপ, যেমন : কোএস্‌চন্‌ হতে পারে।

২.০৭ : জ য

বাংলায় প্রচলিত বিদেশী শব্দ সাধারণভাবে বাংলা ভাষার ধ্বনিপদ্ধতি-অনুযায়ী লিখতে হবে। যেমন– কাগজ, জাহাজ, হুকুম, হাসপাতাল, টেবিল, পুলিশ, ফিরিস্তি, হাজার, বাজার, জুলুম, জেব্রা।

কিন্তু ইসলাম ধর্ম-সংক্রান্ত কয়েকটি বিশেষ শব্দে 'যে', 'যাল', 'যোয়াদ', 'যেই' রয়েছে, যার ধ্বনি ইংরেজি z-এর মতো, সে ক্ষেত্রে উক্ত আরবি বর্ণগুলোর জন্য য ব্যবহৃত হতে পারে। যেমন : আযান, এযিন, ওযু, কাযা, নামায, মুয়ায্‌যিন, যোহর, রমযান, তবে কেউ ইচ্ছা করলে এই ক্ষেত্রে য-এর পরিবর্তে জ ব্যবহার করতে পারেন।

জাদু, জোয়াল, জো ইত্যাদি শব্দ জ দিয়ে লেখা বাঞ্ছনীয়।

২.০৮ : এ, অ্যা

বাংলায় এ বা ে-কার দ্বারা অবিকৃত এ এবং বিকৃত বা বাঁকা অ্যা এই উভয় উচ্চারণ বা ধ্বনি নিষ্পন্ন হয়। তৎসম বা সংস্কৃত ব্যাস, ব্যায়াম, ব্যাহত, ব্যাপ্ত, জ্যামিতি, ইত্যাদি শব্দের বানান অনুরূপভাবে লেখার নিয়ম রয়েছে। অনুরূপ তৎসম এবং বিদেশী শব্দ ছাড়া অন্য সকল বানানে অবিকৃত-বিকৃত নির্বিশেষে এ বা ে-কার হবে। যেমন : দেখে, দেখি, যেন, জেনো, কেন, কেনো (ক্রয় করা), গেল, গেলে, গেছে।

বিদেশী শব্দে অবিকৃত উচ্চারণের ক্ষেত্রে এ বা ে-কার ব্যবহৃত হবে। যেমন : এন্ড, নেট, বেড, শেড।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



বিদেশী শব্দে বিকৃত বা বাঁকা উচ্চারণে অ্যা বা ্যা ব্যবহৃত হবে। যেমন– অ্যান্ড, অ্যাবসার্ড, অ্যাসিড, ক্যাসেট, ব্যাক, ম্যানেজার, হ্যাট।

তবে কিছু তদ্ভব এবং বিশেষভাবে দেশী শব্দ রয়েছে যার ্যা-কারযুক্ত রূপ বহুল-পরিচিত। যেমন : ব্যাঙ, চ্যাঙ, ল্যাঙ, ল্যাঠা। এসব শব্দে ্যা অপরিবর্তিত থাকবে।

২.০৯ : ও

বাংলায় অ-কারের উচ্চারণ বহু ক্ষেত্রে ও-কার হয়। এই উচ্চারণকে লিখিত রূপ দেয়ার জন্য ক্রিয়াপদের বেশ কয়েকটি রূপের এবং কিছু বিশেষণ ও অব্যয় পদের শেষে, কখনো আদিতে অনেকে যথেচ্ছভাবে ো-কার ব্যবহার করছেন। যেমন : ছিলো, করলো, বলতো, কোরছ, হোলে, যেনো, কেনো (কীজন্য) ইত্যাদি ও-কার যুক্ত বানান লেখা হচ্ছে। বিশেষ ক্ষেত্র ছাড়া অনুরূপ ো-কার ব্যবহার করা হবে না। বিশেষ ক্ষেত্রের মধ্যে রয়েছে এমন অনুজ্ঞাবাচক ক্রিয়াপদ এবং বিশেষণ ও অব্যয় পদ বা অন্য শব্দ যার শেষে ো-কার যুক্ত না করলে অর্থ অনুধাবনে ভ্রান্তি বা বিলম্ব ঘটতে পারে। যেমন : ধরো, চড়ো, বলো, বোলো, জেনো, কেনো (ক্রয় করো), করানো, খাওয়ানো, শেখানো, করাতো, মতো, ভালো, আলো, কালো, হলো ইত্যাদি।

২.১০ : ং, ঙ

তৎসম শব্দে ং এবং ঙ যেখানে যেমন ব্যবহার্য ও ব্যাকরণসম্মত সেইভাবে ব্যবহার করতে হবে। এ-সম্পর্কে পূর্বে ১.০৪ অনুচ্ছেদে কিছু নিয়মের কথা বলা হয়েছে। তদ্ভব, দেশী, বিদেশী, মিশ্র শব্দের বানানের ক্ষেত্রে ঐ নিয়মের বাধ্যবাধকতা নেই। তবে এই ক্ষেত্রে প্রত্যয় ও বিভক্তিহীন শব্দের শেষে সাধারণভাবে অনুস্বার (ং) ব্যবহৃত হবে। যেমন : রং, সং, পালং, ঢং, রাং, গাং। তবে শব্দে অব্যয় বা বিভক্তি যুক্ত হলে কিংবা পদের মধ্যে বা শেষে স্বরচিহ্ন থাকলে ঙ হবে। যেমন : বাঙালি, ভাঙা, রঙিন, রঙের। বাংলা ও বাংলাদেশ শব্দ-দুটি ং দিয়ে লিখতে হবে, বাংলাদেশের সংবিধানে তাই করা হয়েছে।

২.১০ : রেফ (´) ও দ্বিত্ব

তৎসম শব্দের অনুরূপ বানানের ক্ষেত্রে যেমন পূর্বে বলা হয়েছে, অ-তৎসম সকল শব্দেও রেফের পর ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বিত্ব হবে না। যেমন : কর্জ, কোর্তা, মর্দ, সর্দার ইত্যাদি।

২.১১ : বিসর্গ (ঃ)

শব্দের শেষে বিসর্গ (ঃ) থাকবে না। যেমন : কার্যত, মূলত, প্রধানত, প্রয়াত, বস্তুত, ক্রমশ, প্রায়শ। পদমধ্যস্থ বিসর্গ থাকবে। তবে অভিধানসিদ্ধ হলে পদমধ্যস্থ বিসর্গ বর্জনীয়। যেমন : দুস্থ, নিস্পৃহ।

২.১২ : – আনো প্রত্যয়ান্ত শব্দ

আনো প্রত্যয়ান্ত শব্দের শেষে ো-কার যুক্ত করা হবে। যেমন : করানো, বলানো, খাওয়ানো, পাঠানো, নামানো, শোয়ানো।

২.১৩ : বিদেশী শব্দ ও যুক্তবর্ণ

বাংলায় বিদেশী শব্দের বানানে যুক্তবর্ণকে বিশ্লিষ্ট করার প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। যুক্তবর্ণের সুবিধা হচ্ছে তা উচ্চারণের দ্বিধা দূর করে। তাই ব্যাপকভাবে বিদেশী শব্দের বানানে যুক্তবর্ণ বিশ্লিষ্ট করা অর্থাৎ ভেঙে দেয়া উচিত নয়। শব্দের আদিতে তো অনুরূপ বিশ্লেষ সম্ভবই নয়। যেমন : স্টেশন, স্ট্রিট, স্প্রিট, স্প্রিং। তবে কিছু কিছু বিশ্লেষ করা যায়। যেমন : সেপটেম্বর, অকটোবর, মার্কস, শেক্‌স্‌পিয়র, ইস্‌রাফিল।



২.১৪ : হস্-চিহ্ন

হস্-চিহ্ন যথাসম্ভব বর্জন করা হবে। যেমন : কাত, মদ, চট, ফটফট, কলকল, ঝরঝর, তছনছ, জজ, টন, হুক, চেক, ডিশ, করলেন, বললেন, শখ, টাক, টক। তবে যদি ভুল উচ্চারণের আশঙ্কা থাকে তাহলে হস্-চিহ্ন ব্যবহার করা যেতে পারে। যেমন : কর্, ধর্, মর্, বল্।

২.১৫ : ঊর্ধ্ব-কমা

ঊর্ধ্ব-কমা যথাসম্ভব বর্জন করা হবে। যেমন : করল (= করিল), ধরত, বলে (= বলিয়া), হয়ে, দু জন, চার শ, চাল (= চাউল), আল (= আইল)।

বিবিধ

৩.০১ : যুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণগুলো যতদূর সম্ভব স্বচ্ছ করতে হবে অর্থাৎ পুরাতন রূপ বাদ দিয়ে এগুলোর স্পষ্ট রূপ দিতে হবে। তার জন্য কতকগুলো স্বরচিহ্নকে বর্ণের নিচে বসাতে হবে। যেমন : গু, রু, শু, দ্রু, শ্রু, রূ, ন্তু, হু, ত্রু, ভ্রু।

তবে ক্ষ-এর পরিচিত যুক্ত-রূপ অপরিবর্তিত থাকবে।

৩.০২ : সমাসবদ্ধ পদগুলো একসঙ্গে লিখতে হবে, মাঝখানে ফাঁক রাখা চলবে না। যেমন : সংবাদপত্র, অনাস্বাদিতপূর্ব, পূর্বপরিচিত, রবিবার, মঙ্গলবার, স্বভাবগতভাবে, লক্ষ্যভ্রষ্ট, বারবার, বিষাদমণ্ডিত, সমস্যাপূর্ণ, অদৃষ্টপূর্ব, দৃঢ়সঙ্কল্প, সংযতবাক, নেশাগ্রস্ত, পিতাপুত্র।

বিশেষ প্রয়োজনে সমাসবদ্ধ পদটিকে একটি, কখনো একটির বেশি হাইফেন (-) দিয়ে যুক্ত করা যায়। যেমন : মা-মেয়ে, মা-ছেলে, বেটা-বেটি, বাপ-বেটা, ভবিষ্য-তহবিল, সর্ব-অঙ্গ, বে-সামরিক, স্থল-জল-আকাশ-যুদ্ধ, কিছু-না-কিছু।

৩.০৩ : বিশেষণপদ সাধারণভাবে পরবর্তী পদের সঙ্গে যুক্ত হবে না। যেমন : সুনীল আকাশ, স্তব্ধ মধ্যাহ্ন, সুগন্ধ ফুল, লাল গোলাপ, ভালো দিন, সুন্দরী মেয়ে। কিন্তু যদি সমাসবদ্ধ পদ অন্য বিশেষ্য বা ক্রিয়াপদের গুণ বর্ণনা করে তাহলে স্বভাবতই সেই যুক্তপদ একসঙ্গে লিখতে হবে। যেমন : কতদূর যাবে, একজন অতিথি, তিনহাজার টাকা, বেশির-ভাগ ছেলে, শ্যামলা-বরণ মেয়ে। তবে কোথাও কোথাও সংখ্যাবাচক শব্দ একসঙ্গে লেখা যাবে। যেমন : দুজনা।

৩.০৪ : নাই, নেই, না, নি এই নঞর্থক অব্যয় পদগুলো শব্দের শেষে যুক্ত না হয়ে পৃথক থাকবে। যেমন : বলে নাই, যাই নি, পাব না, তার মা নাই, আমার ভয় নেই।

তবে শব্দের পূর্বে নঞর্থক উপসর্গরূপে না উত্তরপদের সঙ্গে যুক্ত থাকবে। যেমন : নারাজ, নাবালক, নাহক।

অর্থ পরিস্ফুট করার জন্য কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রয়োজন অনুভূত হলে না-এর পর হাইফেন ব্যবহার করা যায়। যেমন : না-বলা বাণী, না-শোনা কথা, না-গোনা পাখি।

৩.০৫ : উদ্ধৃতি মূলে যেমন আছে ঠিক তেমনি লিখতে হবে। কোনো পুরাতন রচনায় যদি বানান বর্তমান নিয়মের অনুরূপ না হয়, উক্ত রচনার বানানই যথাযথভাবে উদ্ধৃত করতে হবে। উদ্ধৃত রচনায় বানানের ভুল বা মুদ্রণের ত্রুটি থাকে, ভুলই উদ্ধৃত করে তৃতীয় বন্ধনীর মধ্যে বানানটির উল্লেখ করতে হবে। এক বা দুই ঊর্ধ্ব-কমার দ্বারা উদ্ধৃত অংশকে চিহ্নিত করতে হবে। তবে উদ্ধৃত অংশকে যদি ইনসেট করা হয় তাহলে ঊর্ধ্ব-কমার চিহ্ন ব্যবহার করতে হবে না। তা

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



ছাড়া কবিতা যদি মূল চরণ-বিন্যাস অনুযায়ী উদ্ধৃত হয় এবং কবির নামের উল্লেখ থাকে সে ক্ষেত্রেও উদ্ধৃতি-চিহ্ন দেয়ার দরকার নেই। ইনসেট না হলে গদ্যের উদ্ধৃতিতে প্রথমে ও শেষে উদ্ধৃতি-চিহ্ন দেয়া ছাড়াও প্রত্যেক অনুচ্ছেদের প্রারম্ভে উদ্ধৃতি-চিহ্ন দিতে হবে। প্রথমে, মধ্যে বা শেষে উদ্ধৃত রচনার কোনো অংশ যদি বাদ দেয়া হয় অর্থাৎ উদ্ধৃত করা না হয়, বাদ দেয়ার স্থানগুলোকে তিনটি বিন্দু বা ডট্ (অবলো-চিহ্ন) দ্বারা চিহ্নিত করতে হবে। গোটা অনুচ্ছেদ, স্তবক বা একাধিক ছত্রের কোনো বৃহৎ অংশ বাদ দেয়ার ক্ষেত্রে তিনটি তারকার দ্বারা একটি ছত্র রচনা করে ফাঁকগুলোকে চিহ্নিত করতে হবে।

কোনো পুরাতন রচনার অভিযোজিত বা সংক্ষেপিত পাঠে অবশ্য পুরাতন বানানকে বর্তমান নিয়ম অনুযায়ী পরিবর্তিত করা যেতে পারে।

**৪.০১ : ণ-ত্ব বিধি সম্পর্কে দুই মত**

অ-তৎসম শব্দের যুক্তাক্ষরের বানানের ক্ষেত্রে কমিটির সদস্যগণ একমত হতে পারেন নি। একটি মতে বলা হয়েছে যে, এসব শব্দে যুক্তাক্ষরের ণ্ট, ণ্ঠ, ণ্ড, ণ্ঢ হবে। যথা : ঘণ্টা, লণ্ঠন, গুণ্ডা। অন্যমতে বলা হয়েছে যে, এসব শব্দের যুক্তাক্ষরে ন্ট, ন্ঠ, ন্ড, ন্ঢ ব্যবহৃত হবে। যথা : ঘন্টা, প্যান্ট, প্রেসিডেন্ট, লন্ঠন, গুন্ডা, পান্ডা, ব্যান্ড লন্ডভন্ড।

## জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের বানানরীতি

১.০০ : পাঠ্যপুস্তকে বাংলা বানানের জন্য নিম্নলিখিত নীতি অনুসরণ করা হবে।

১.০১ : রেফের পর কোথাও ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বিত্ব হবে না। যেমন : কর্ম, কার্য, শর্ত, সূর্য।

১.০২ : সন্ধিতে প্রথম পদের শেষে ম্ থাকলে ক বর্গের পূর্বে ম্ স্থানে ং লেখা হবে। যেমন : অহংকার, ভয়ংকর, সংগীত। অন্যান্য ক্ষেত্রে ক খ গ ঘ এবং ক্ষ-র পূর্বে নাসিক্য বর্ণ যুক্ত করার জন্য সর্বত্র ঙ্ লেখা হবে। যেমন : অঙ্ক, আকাঙ্ক্ষা, সঙ্গে। প্রত্যয় ও বিভক্তিহীন শব্দের শেষে অনুস্বার ব্যবহৃত হবে। যেমন : রং। তবে শব্দে অব্যয় বা বিভক্তিযুক্ত হলে কিংবা পদের মধ্যে বা শেষে স্বরবর্ণ থাকলেও ঙ হবে। যেমন : বাঙালি, ভাঙা, রঙিন, রঙের।

১.০৩ : হস্‌চিহ্ন ও ঊর্ধ্বকর্মা যথাসম্ভব বর্জন করা হবে। যেমন : করব, চট, দুজন।

১.০৪ : যে শব্দের বানানে হ্রস্ব ও দীর্ঘ উভয় স্বর অভিধান সিদ্ধ, সে ক্ষেত্রে এবং অ-তৎসম ও বিদেশী শব্দের বানানে শুধু হ্রস্ব স্বর প্রযুক্ত হবে। যেমন : পাখি, বাড়ি, হাতি।

১.০৫ : ক্ষ-বিশিষ্ট সকল শব্দে ক্ষ অক্ষুণ্ন থাকবে। যেমন : অক্ষর, ক্ষেত, পক্ষ।

১.০৬ : কয়েকটি স্ত্রীবাচক শব্দের শেষে ঈ-কার হবে। যেমন : গাভী, রানী, হরিণী; কিঙ্করী, পিশাচী, মানবী।

১.০৭ : ভাষা ও জাতির নামের শেষে ই-কার থাকবে। যেমন : ইংরেজি, জাপানি, বাঙালি।

১.০৮ : বিশেষণবাচক 'আলি' প্রত্যয়যুক্ত শব্দে ই-কার হবে। যেমন : বর্ণালি, রূপালি, সোনালি।

১.০৯ : পদাশ্রিত নির্দেশক 'টি' তে ই-কার হবে। যেমন : লোকটি।

১.১০ : অর্থভেদ বোঝাবার জন্য প্রয়োজন অনুযায়ী হ্রস্ব ও দীর্ঘস্বর ব্যবহার করা হবে। যেমন : কি (অব্যয়) ঃ কী (সর্বনাম), তৈরি (ক্রিয়া), তৈরী (বিশেষণ), নিচ (নিম্ন অর্থে) ঃ নীচ (হীন অর্থে) কুল (বংশ অর্থে) কূল (তীর অর্থে)।



১.১১ : বাংলায় প্রচলিত কৃতঋণ, বিদেশী শব্দ বাংলা ভাষার ধ্বনি পদ্ধতিতে লিখিত হবে। যেমন : কাগজ, জাহাজ, হাসপাতাল। তবে কয়েকটি ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম হবে :

ক. ইসলাম ধর্ম সম্পর্কিত নিম্নলিখিত শব্দে (যোয়াদ ও যাল-এর) য (ইংরেজি z ধ্বনির মত) ব্যবহৃত হবে। যেমন : আযান, ওযু, কাযা, নামায, মুয়াযযিন, যাকাত, যিকির, যোহর, রমযান, হযরত।

খ. অনুরূপ শব্দে আরবি (সোয়াদ ও সিন-এর) জন্য স এবং সা ও শিন-এর জন্য শ হবে। যেমন : সালাম, মসজিদ, সালাত, এশা।

গ. ইংরেজি এবং ইংরেজির মাধ্যমে আগত s ধ্বনির জন্য স ও -sh, -ssion, -tion প্রভৃতি ধ্বনির জন্য শ এবং st ধ্বনির জন্য স্ট যুক্ত বর্ণ লেখা হবে।

ঘ. ইংরেজি বর্ণ a ধ্বনির জন্য শব্দের প্রারম্ভে এ ব্যবহার্য। যেমন : এলকোহল, এসিড।

ঙ. Chirst ও Christian শব্দের বাংলা রূপ হবে খ্রিষ্ট ও খ্রিষ্টান। এ নিয়মে খ্রিষ্টাব্দ হবে।

১.১২ : পূর্ববর্তী নিয়মের (ক) থেকে (ঘ) পর্যন্ত বর্ণিত বিধি ব্যতিক্রম বলে গণ্য হবে। তা ছাড়াও সংস্কৃত শব্দ ব্যতীত অন্য কোনো ক্ষেত্রে ণ-ত্ব, ষ-ত্ব বিধি অনুসরণ করা হবে না। তবে মনে রাখা প্রয়োজন যে, নাসিক্যধ্বনি যুক্ত করার জন্য চ-বর্গের পূর্বে কেবল ঞ (যেমন : অঞ্চল, অঞ্জলি, বাঞ্ছা) ট বর্গের পূর্বে কেবল ণ (যেমন : কাণ্ড, ঘণ্টা) এবং ত বর্গের পূর্বে কেবল ন (যেমন : তন্তু, পান্থ) লেখা হবে। অনুরূপভাবে, শিশধ্বনি যুক্ত করার জন্য চ-বর্গের অঘোষধ্বনির পূর্বে কেবল শ (যেমন : নিশ্চয়, নিশ্ছিদ্র), ট-বর্গের অঘোষধ্বনির পূর্বে ষ (যেমন : কষ্ট, কাষ্ঠ) এবং ত বর্গের অঘোষধ্বনির পূর্বে কেবল স (যেমন : অস্ত, আস্থা) ব্যবহৃত হবে।

১.১৩ : পদান্তে বিসর্গ থাকবে না। যেমন : ক্রমশ, প্রধানত, মূলত।

১.১৪ : ক্রিয়াপদের বানানে পদান্তে ও-কার অপরিহার্য নয়। যেমন : করব, হল ইত্যাদি। এত, মত, কোন প্রভৃতি শব্দে ও-কার আবশ্যক নয়। তবে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞায় ও-কার রাখা যাবে। যেমন : করো, কোরো, বলো, বোলো।

১.১৫ : ব্যঞ্জনবর্ণে উ-কার (ু), ঊ-কার (ূ), ঋ-কারের (ৃ) একাধিক রূপ পরিহার করে এই কারগুলো বর্ণের নিচে যুক্ত করা হবে। যেমন : শুভ, রূপ, হৃদয়।

১.১৬ : যুক্তব্যঞ্জন স্বচ্ছ করার জন্য প্রথম বর্ণের রূপ ক্ষুদ্রাকারে এবং দ্বিতীয় বর্ণের রূপ পূর্ণরূপে লিখিত হবে। যেমন : অঙ্ক, সঙ্গে, স্পষ্ট।

১.১৭ : যেসব ব্যঞ্জনবর্ণ বাংলা উচ্চারণে নতুন ধ্বনি গ্রহণ করে। যেমন : ক্ষ (ক্ + ষ), জ্ঞ (জ্ + ঞ), হ্ম বা হ্ম (হ্ + ম), সেগুলোর রূপ অক্ষুণ্ন থাকবে। তা ছাড়া নন্দনতাত্ত্বিক বিচারে ঞ্চ (ঞ্ + চ), ঞ্ছ (ঞ্ + ছ), ঞ্জ (ঞ্ + জ), ট্ট (ট্ + ট) ট্র (ট্ + র), ত্ত (ত্ + ত), ত্থ (ত্ + থ্), ত্র (ত্ + র), ভ্র (ভ্ + র), হ্ন (হ্ + ন), হ্ণ (হ্ + ণ), ষ্ণ (ষ্ + ণ) ইত্যাদি যুক্ত বর্ণের প্রচলিত রূপও অক্ষুণ্ন রাখা হবে। তবে প্রতিটি ক্ষেত্রে যুক্ত ব্যঞ্জন গঠনের রূপ ব্যাখ্যা করা হবে।

১.১৮ : সমাসবদ্ধ পদ এক সঙ্গে লিখতে হবে। যেমন : জটিলতামুক্ত, বিজ্ঞানসম্মত, সংবাদপত্র। অর্থগতভাবে একক হলেও তা একসঙ্গে লেখা হবে। যেমন : ষোলকলা। প্রয়োজনবোধে শব্দের মাঝখানে হাইফেন দেয়া যেতে পারে। যেমন : কিছু না-কিছু, লজ্জা-সরম, সংগত-পাঠ-নির্ধারণ।

১.১৯ : বিশেষণবাচক পদ (গুণ, সংখ্যা বা দূরত্ব ইত্যাদি বাচক) হলে সেটি আলাদা বসবে। যেমন : এক জন, কত দূর, সুন্দর ছেলে।

১.২০ : নঞর্থক শব্দ পৃথকভাবে বসবে। যেমন : ভয়ে নয়, হয় না, আসিনি, হাতে নেই।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



১.২১ : হযরত মুহাম্মদ (স)-এর নামের সঙ্গে প্রথম বন্ধনীর মধ্যে (স), অন্য নবী ও রাসূলের নামের পরে বন্ধনীর মধ্যে (আ), সাহাবীদের নামের পরে (রা) এবং বিশিষ্ট মুসলিম ধার্মিক ব্যক্তির নামের পরে (র) লিখতে হবে।

১.২২ : লেখক ও কবি নিজেদের নামের বানান যেভাবে লেখেন বা লিখবেন সেভাবে লেখা হবে।

১.২৩ : বাংলাদেশের টাকার প্রতীক চিহ্নের সঙ্গে শিক্ষার্থীদের পরিচয় করিয়ে দেয়ার জন্য অঙ্কের বইতে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে এবং অন্যান্য বইতে তার মূল্য-নির্দেশক সংখ্যার পূর্বে টাকার চিহ্ন ব্যবহার করা হবে।

১.২৪ : পূর্ববর্ণিত নিয়মাবলির বহির্ভূত শব্দের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত অভিধানগুলোতে প্রদত্ত প্রথম বানান গ্রহণ করা যেতে পারে।

চলন্তিকা : রাজশেখর বসু।
ব্যবহারিক শব্দকোষ : কাজী আবদুল ওদুদ।
বাঙ্গালা ভাষার অভিধান, দুখণ্ড : জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস।
বাঙ্‌লা সাহিত্যে আরবী-ফারসী শব্দ সংকলন : হরেন্দ্রচন্দ্র পাল।
পারসো-এরাবিক এলিমেন্টস ইন বেঙ্গলি : গোলাম মাসুদ হিলালী।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের এই বানানের নিয়ম বোর্ডের নিজস্ব প্রকাশনার ক্ষেত্রে অনুসরণ করা হয়।

## কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়-প্রবর্তিত বাঙ্গালা বানানের নিয়ম, ১৯৩৬

### সংস্কৃত বা তৎসম শব্দ

**নিয়ম-১ : রেফের পর ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বিত্ব :** রেফের পর ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বিত্ব হইবে না, যথা– 'অর্চনা, মূর্ছা, অর্জুন, কর্তা, কার্তিক, কর্দম, অর্ধ, বার্ধক্য, কর্ম, সর্ব'।

**নিয়ম-২ : সন্ধিতে ঙ-স্থানে অনুস্বার :** যদি ক খ গ ঘ পরে থাকে তবে পদের অন্তস্থিত ম্-স্থানে অনুস্বার অথবা বিকল্পে ঙ্ বিধেয়, যথা– 'অহংকার, ভয়ংকর, শুভংকর, সংখ্যা, সংগম, হৃদয়ংগম, সংঘটন', অথবা, 'অহঙ্কার, ভয়ঙ্কর' ইত্যাদি।

### অ-সংস্কৃত অর্থাৎ তদ্ভব, দেশজ ও বিদেশী শব্দ

**নিয়ম-৩ : রেফের পর ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বিত্ব :** রেফের পর ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বিত্ব হইবে না। যথা– 'কর্জ, শর্ত, পর্দা, সর্দার, চর্বি, ফর্মা, জার্মানি'।

**নিয়ম-৪ : হস্-চিহ্ন :** শব্দের শেষে সাধারণতঃ হস্-চিহ্ন দেয়া হইবে না। যথা– 'ওস্তাদ, কংগ্রেস, চেক, জজ, টন, টি-পট, ট্রাম, ডিশ, তছনছ, পকেট, মক্তব, হুক, করিলেন, করিস।' কিন্তু যদি ভুল উচ্চারণের সম্ভাবনা থাকে তবে হস্-চিহ্ন দেওয়া যাইতে পারে। হ এবং যুক্ত ব্যঞ্জনের উচ্চারণ সাধারণতঃ স্বরান্ত, যথা– 'দহ, অহরহ, কাণ্ড, গঞ্জ'। যদি হসন্ত উচ্চারণ অভীষ্ট হয় তবে হ ও যুক্ত ব্যঞ্জনের পর হস্-চিহ্ন দেওয়া উচিত। যথা– 'শাহ্, তখ্‌ত্ জেম্‌স্, বন্ড্'। কিন্তু সুপ্রচলিত শব্দে না দিলে চলিবে, যথা– 'আর্ট, কর্ক, গভর্নমেন্ট, স্পঞ্জ'। মধ্য-বর্ণে প্রয়োজন হইলে হস্-চিহ্ন বিধেয়, যথা– 'উল্‌কি, সট্‌কা'। যদি উপান্ত্য স্বর অত্যন্ত হ্রস্ব হয় তবে শেষে হস্-চিহ্ন বিধেয়, যথা– 'কট্‌কট্, খপ্, সার্'।

বাংলার কতকগুলি শব্দের শেষে অ-কার উচ্চারিত হয়, যথা– গলিত, ঘন, দৃঢ়, প্রিয়, করিয়াছ, করিত, ছিল, এস। কিন্তু অধিকাংশ শব্দের শেষের অ-কার গ্রস্ত অর্থাৎ শেষ অক্ষর হসন্তবৎ, যথা– অচল, গভীর, পাঠ, করুক, করিস, করিলেন। এই প্রকার সুপরিচিত শব্দের শেষে অ-ধ্বনি হইবে কি হইবে না তাহা বুঝাইবার জন্য কেহই চিহ্ন প্রয়োগ করেন না। অধিকাংশ স্থলে অ-সংস্কৃত শব্দে অন্ত্য হস্-চিহ্ন অনাবশ্যক, বাংলাভাষার প্রকৃতি অনুসারেই হসন্ত-উচ্চারণ হইবে। অল্প কয়েকটি বিদেশী শব্দের শেষে অ উচ্চারণ হয়, যথা– বাই-ল। কিন্তু প্রভেদরক্ষার জন্য অপর বহু বহু শব্দে হস্-চিহ্নের ভার চাপান অনাবশ্যক। কেবল ভুল উচ্চারণের সম্ভাবনা থাকিলে হস্-চিহ্ন বিধেয়।



**নিয়ম-৫ : ই, ঈ, উ, ঊ :** যদি মূল সংস্কৃত শব্দে ঈ বা ঊ থাকে তবে তদ্ভব বা তৎসদৃশ শব্দে ঈ বা ঊ অথবা বিকল্পে ই বা উ হবে। যথা– কুমীর, পাখী, বাড়ী, শীষ, ঊনিশ, চূন, পূব অথবা কুমির, পাখি, বাড়ি, শিষ, উনিশ, চুন, পুব। কিন্তু কতকগুলি শব্দে কেবল ঈ, কেবল ই অথবা কেবল উ হইবে। যথা– নীলা (নীলক), হীরা (হীরক), দিয়াশলাই (দীপশলাকা), খিল (কীল), পানি (পানীয়), চুল (চূল), তাড়ু (তর্দু), জুয়া (দ্যুত)। স্ত্রীলিঙ্গ এবং জাতি, ব্যক্তি, ভাষা ও বিশেষণ-বাচক শব্দের অন্তে ঈ হইবে। যথা– কলুনী, বাঘিনী, কাবুলী, কেরানী, ঢাকী, ফরিয়াদী, ইংরেজী, বিলাতী, দাগী, রেশমী। কিন্তু কতকগুলি শব্দে ই হইবে। যথা– ঝি, দিদি, বিবি, কচি, মিহি, মাঝারি, চল্‌তি। পিসী, মাসী স্থানে বিকল্পে পিসি মাসি লেখা চলিবে।

অন্যত্র মনুষ্যেতর জীব, বস্তু, গুণ, ভাব ও কর্মবাচক শব্দের এবং দ্বিরাবৃত্ত শব্দের অন্তে কেবল ই হইবে। যথা– বেঙাচি, বেজি, কাঠি, সুজি, কেরামতি, চুরি, পাগলামি, বাবুগিরি, তাড়াতাড়ি, সরাসরি, সোজাসুজি। নবাগত বিদেশী শব্দে ঈ উ প্রয়োগ-সম্বন্ধে পরে দ্রষ্টব্য।

**নিয়ম-৬ : জ য :** এইসকল শব্দে য না লিখিয়া জ লেখা বিধেয়। যথা— কাজ, জাউ, জাঁতা, জাঁতি, জুই, জুত, জো, জোড়, জোত, জোয়ান।

**নিয়ম-৭ : ণ ন :** অ-সংস্কৃত শব্দে কেবল 'ন' হইবে। যথা– কান, সোনা, বামুন, কোরান, করোনার। কিন্তু যুক্তাক্ষর ন্ট ণ্ঠ, ণ্ড, ন্ঢ চলিবে। যথা– ঘুন্টি, লুণ্ঠন, ঠাণ্ডা।
'রানী' স্থানে বিকল্পে 'রাণী' চলিতে পারিবে।

**নিয়ম-৮ : ও-কার ও ঊর্ধ্ব কমা প্রভৃতি :** সুপ্রচলিত শব্দের উচ্চারণ, উৎপত্তি বা অর্থের ভেদ বুঝাইবার জন্য অতিরিক্ত ও কার, ঊর্ধ্ব-কমা বা অন্য চিহ্ন যোগ যথাসম্ভব বর্জনীয়। যদি অর্থগ্রহণে বাধা হয় তবে কয়েকটি শব্দে অন্ত্য অক্ষরে ও-কার এবং আদ্য বা মধ্য অক্ষরে ঊর্ধ্ব-কমা বিকল্পে দেওয়া যাইতে পারে। যথা– কাল, কালো; ভাল, ভালো; মত, মতো; পড়ো, প'ড়ো। (পড়ুয়া বা পতিত)।
এই সকল বানান বিধেয়—এত, কত, যত, তত; তো, হয়তো; কাল (সময়, কল্য), চাল, (চাউল, ছাত গতি), ডাল (ডাইল, শাখা)।

**নিয়ম-৯ : ং ঙ :** 'বাঙ্গলা, বাঙ্গালা, বাঙ্গালী, ভাঙ্গন' প্রভৃতি 'বাংলা, বাঙালা, বাঙালী, ভাঙন' প্রভৃতি উভয়প্রকার বানানই চলিবে। হসন্ত-ধ্বনি হইলে বিকল্পে ং ঙ বিধেয়। যথা– 'রং, রঙ; সং, সঙ; বাংলা, বাঙলা'। স্বরাশ্রিত হইলে ঙ বিধেয়, যথা– 'রঙের, বাঙালী, ভাঙন'।

**নিয়ম-১০ :** ং ও ঙ-র প্রাচীন উচ্চারণ যাহাই হউক, আধুনিক বাংলা উচ্চারণ সমান, সেজন্য অনুস্বার স্থানে বিকল্পে ঙ লিখিলে আপত্তির কারণ নাই। 'রং-এর' অপেক্ষা 'রঙের' লেখা সহজ। 'রঙ্গের' লিখিলে অভীষ্ট উচ্চারণ আসিবে না, কারণ 'রঙ্গ' ও 'রং'-এর উচ্চারণ সমান নয় কিন্তু 'রং' ও 'রঙ' সমান।

**নিয়ম-১১ : শ ষ স :** মূল সংস্কৃত শব্দ-অনুসারে তদ্ভব শব্দে শ ষ বা স হইবে, যথা– আঁশ (অংশু), আঁষ (আমিষ), শাঁস (শস্য), মশা (মশক), পিসী (পিতৃঃস্বসা)। কিন্তু কতকগুলি শব্দে ব্যতিক্রম হইবে, যথা– মিন্‌সে (মনুষ্য), সাধ (শ্রদ্ধা)।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



বিদেশী শব্দে মূল উচ্চারণ-অনুসারে s স্থানে স, sh স্থানে শ হইবে, যথা– আসল, ক্লাস, খাস, জিনিস, পুলিশ, পেনসিল, মসলা, মাসুল, সাদা, সিমেন্ট, খুশি, চশমা, তক্তাপোশ, পশম, পোশাক, পালিশ, পেনশন, শখ, শৌখিন, শয়তান, শরবত, শরম, শহর, শার্ট, শেক্‌স্‌পিয়র। কিন্তু কতকগুলি শব্দে বিকল্পে ব্যতিক্রম হইবে, যথা– ইস্তাহার (ইশ্‌তিহার), গোমস্তা (গুমাশতাহ্), ভিস্তি (বিহিশ্‌তী), খ্রীস্ট, খ্রিষ্ট (Christ)।

শ, ষ, স এই তিন বর্ণের একটি বা দুইটি বর্জন করিলে বাংলা উচ্চারণে বাধা হয় না, বরং বানান সরল হয়। কিন্তু অধিকাংশ তদ্ভব শব্দে মূল-অনুসারে শ, ষ, স প্রয়োগ বহুপ্রচলিত এবং একই শব্দের বিভিন্ন বানান প্রায় দেখা যায় না। এই রীতি সহসা পরিবর্তন বাঞ্ছনীয় নয়। বহু বিদেশী শব্দের প্রচলিত বাংলা বানানে মূল-অনুসারে শ বা স লেখা হয়, কিন্তু কতকগুলি শব্দে ব্যতিক্রম বা বিভিন্ন বানানই দেখা যায়, যথা– সরবত, শরবত; সরম, শরম; শহর, সহর; শয়তান, সয়তান; পুলিশ, পুলিস। সামঞ্জস্যের জন্য যথাসম্ভব একই নিয়ম গ্রহণীয়।

বিদেশী শব্দের s-ধ্বনির জন্য বাংলায় ছ-অক্ষর বর্জনীয়। কিন্তু যেখানে প্রচলিত বানানে ছ আছে এবং উচ্চারণেও ছ হয়, সেখানে প্রচলিত বানানই বজায় থাকিবে, যথা– কেচ্ছা, ছয়লাপ, তছনছ, পছন্দ।

দেশজ বা অজ্ঞাতমূল শব্দের প্রচলিত বানান হইবে, যথা– করিস, ফরসা, (ফরশা), সরেস (সরেশ), উসখুস (উশখুশ)।

**নিয়ম-১২ : কতকগুলি সাধু শব্দের চলিত রূপ :** কুয়া, সুতা, মিছা, উঠান, পুরান, পিছন, পিতল, ভিতর, উপর, প্রভৃতি কতকগুলি সাধুশব্দের মৌখিক রূপ কলিকাতা অঞ্চলে অন্যপ্রকার।

যে শব্দের মৌখিক বিকৃতি আদ্য অক্ষরে (যথা পেছন ভেতর) তাহার সাধু রূপই চলিত ভাষায় গ্রহণীয়, যথা– 'পিছন, পিতল, ভিতর, উপর'। যাহার বিকৃতি মধ্য বা শেষ অক্ষরে তাহার চলিত রূপ মৌখিক রূপের অনুযায়ী করা বিধেয়, যথা– 'কুয়ো, সুতো, মিছে, উঠন, উনন, পুরনো'।

### নবাগত ইংরেজি ও অন্যান্য বিদেশীয় শব্দ

Cut-এর u, cat -এর a এবং f, v, w, z প্রভৃতির প্রতিবর্ণ বাংলায় নাই। অল্প কয়েকটি নূতন অক্ষর বা চিহ্ন বাংলা লিপিতে প্রবর্তিত করিলে মোটামুটি কাজ চলিতে পারে। বিদেশী শব্দের বাংলা বানান যথাসম্ভব উচ্চারণসূচক হওয়া উচিত। কিন্তু নূতন অক্ষর বা চিহ্নের বাহুল্য বর্জনীয়। এক ভাষার উচ্চারণ অন্য ভাষার লিপিতে যথাযথ প্রকাশ করা অসম্ভব। নবাগত বিদেশী শব্দের শুদ্ধি-রক্ষার জন্য অধিক আয়াসের প্রয়োজন নাই, কাছাকাছি বাংলা রূপ হইলেই লেখার কাজ চলিবে। যে-সকল বিদেশী শব্দের বিকৃত উচ্চারণ ও তদনুযায়ী বানান বাংলায় চলিয়া গিয়াছে সে-সকল শব্দের প্রচলিত বানানই বজায় থাকিবে, যথা– 'কলেজ, টেবিল, বাইসিকেল, সেকেন্ড'।

**নিয়ম-১৩ : বিবৃত অ (cut-এর u) :** মূল শব্দে যদি বিবৃত অ থাকে তবে বাঙ্গালা বানানে আদ্য অক্ষরে আ-কার এবং মধ্য অক্ষরে অ-কার বিধেয়, যথা– ক্লাব (club), বাস্ (bus), বাল্‌ব্ (bulb), সার্ (sir), থার্ড (third), বাজেট (budget), জার্মান (German), কাটলেট (cutlet), সার্কাস (circus), ফোকাস (focus), রেডিয়ম (radium), ফস্‌ফরস (phosphorus) হিরোডোটস (Herodotus)।

**নিয়ম-১৪ : বক্র আ (বা বিকৃত এ-cat-এর a) :** মূল শব্দে বক্র আ থাকলে বাঙ্গালায় আদিতে 'অ্যা' এবং মধ্যে '্যা' বিধেয়, যথা– 'অ্যাসিড (acid), হ্যাট (hat)'।



এইরূপ বানানে '্যা'-কে য-ফলা + আকার মনে না করিয়া একটি বিশেষ স্বরবর্ণের চিহ্ন মনে করা যাইতে পারে, যেমন হিন্দিতে এই উদ্দেশ্যে ঐ-কার চলিতেছে (hat = हैट)। নাগরি লিপিতে যেমন অ-অক্ষরে ও-কার যোগ করিয়া ও (ऑ) হয়, সেইরূপ বাংলায় অ্যা হইতে পারে।

**নিয়ম-১৫ : ঈ, ঊ :** মূল শব্দের উচ্চারণে যদি ঈ, ঊ থাকে তবে বাঙ্গালা বানানে ঈ, ঊ বিধেয়, যথা– 'সীল (seal), ঈস্ট (east), উস্টার, (worcester), স্পূল (spool)'।

**নিয়ম-১৬ :** f ও v স্থানে যথাক্রমে ফ, ভ, বিধেয়, যথা– 'ফুট (Foot), ভোট (Vote)'। যদি মূল শব্দে -v-এর উচ্চারণ f-এর তুল্য হয়, তবে বাংলা বানানে ফ হইবে। যথা– ফন (von)।

**নিয়ম-১৭ :** w : w স্থানে প্রচলিত রীতি অনুসারে উ বা ও বিধেয়, যথা– 'উইলসন (Wilson), উড (wood), ওয়ে (way)'।

**নিয়ম-১৮ :** য় : নবাগত বিদেশী শব্দে অনর্থক য় প্রয়োগ বর্জনীয়। 'মেয়র, চেয়ার, রেডিয়ম, সোয়েটার' প্রভৃতি বানান চলিতে পারে, কারণ য় লিখিলেও উচ্চারণ বিকৃত হয় না। কিন্তু উ-কার বা ও-কারের পর অকারণে য়, য়া, য়ো লেখা অনুচিত। 'এডোয়ার্ড ওয়ারবন্ড না লিখিয়া' 'এড্‌ওআর্ড ওঅরবন্ড' লেখা উচিত। 'হার্ডওয়ার' (hardware) বানানে দোষ নাই।

**নিয়ম-১৯ :** s, sh : ১১ সংখ্যক নিয়ম দ্রষ্টব্য।

**নিয়ম-২০ :** st : ইংরেজির st স্থানে নূতন সংযুক্ত বর্ণ স্ট বিধেয়। যথা– 'স্টেশন'।

**নিয়ম-২১ :** z স্থানে জ বা জ বিধেয়।

**নিয়ম-২২ :** হস চিহ্ন : ৪নং সংখ্যক নিয়ম দ্রষ্টব্য।

মন্তব্য

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বানান সংস্কার-সমিতি বাংলা বানানের এইসব নিয়ম প্রবর্তিত করেছিলেন পঁয়ষট্টি বছর আগে। ইতিমধ্যে প্রচুর বিতর্ক ও আলোচনা গড়িয়ে গেছে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বানানে পরিবর্তন এসেছে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রস্তাবের মূল কাঠামো স্বীকার করে নিলেও পরবর্তী সময় বিভিন্ন সংস্থা অনেকগুলি পরিবর্তন সাধন করেছেন, কিছু-কিছু পরিবর্তন ভাষায় স্বাভাবিকভাবে এসেও গেছে।

১. *পঞ্চম নিয়মে আর এখন বিকল্প নেই– কুমির, বাড়ি, পুব, পাখি চলছে। ইংরেজি, বিলাতি, দাগি, রেশমি, কেরানি চলছে।*

২. *অসংস্কৃত শব্দে যুক্তাক্ষরে (৭ নং) ঠাণ্ডা, লুণ্ঠন, ডাণ্ডা চলছে। রানী নয়, রাণী নয়, এখন চলছে রানি।*

৩. *বাঙ্গালা, বাঙ্গালী নয় (৯ নং), এখন চলছে বাংলা, বাঙালি।*

৪. *প্রযোজক ক্রিয়ায় এবং ক্রিয়াবিশেষ্যে ও-কার প্রচলিত হয়েছে। এখন তার করান, পাঠান, দেখান নয়। লিখতে হবে করানো, পাঠানো, দেখানো।*

৫. *স্ত্রীলিঙ্গে এবং জাতিবাচক বা বিশেষণ শব্দেও এখন দীর্ঘ স্বরচিহ্ন বর্জিত। এখন লেখা হয়– কলুনি, বাঘিনি, কাবুলি, কেরানি, চাকি, ফরিয়াদি, বিলতি, দাগি, আসামি প্রভৃতি।*

৬. *বিদেশি শব্দে দীর্ঘ-ঈ বা দীর্ঘ-ঊ বর্জিত হয়েছে, মূর্ধন্য-ণ, মূর্ধন্য-ষ বর্জিত হয়েছে। এখন লেখা হচ্ছে– গ্রিক, উস্টার, ইস্ট, কর্নওয়ালিস, গ্রিস ইত্যাদি।*

৭. *বহু শব্দে স্বাভাবিকভাবে তালব্য-শ এসেছে– শরবত, পুলিশ, মজলিশ। এসব ক্ষেত্রে এখন আর বিকল্পের প্রয়োজন নেই।*

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



## বাংলা বানানের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ নিয়ম

১. বস্তুবাচক শব্দ ও প্রাণিবাচক অ-তৎসম শব্দের শেষে ই-কার (ি) হবে। যেমন—
বস্তুবাচক শব্দ : বাড়ি, গাড়ি, শাড়ি, চাবি ইত্যাদি।
প্রাণিবাচক শব্দ : মুরগি, পাখি, হাতি ইত্যাদি।

২. দেশ, জাতি ও ভাষার নাম লিখতে সর্বদা ই-কার (ি) হবে। যেমন—
দেশ : জার্মানি, ইতালি, গ্রিস, চিলি, গিনি, হাইতি, হাঙ্গেরি ইত্যাদি।
জাতি : বাঙালি, জাপানি, পর্তুগিজ, তুর্কি ইত্যাদি।
ভাষা : ইংরেজি, হিন্দি, আরবি, ফারসি, নেপালি ইত্যাদি।

৩. স্ত্রীবাচক শব্দের শেষে সর্বদা ঈ-কার (ী) হবে। যেমন— যুবতী, তরুণী, মানবী, জননী, স্ত্রী, নারী ইত্যাদি।

৪. বিদেশী শব্দের বানান বাংলায় লেখার সময় 'ষ' ও 'ণ' না হয়ে 'স' ও 'ন' হবে।

| অশুদ্ধ | শুদ্ধ | অশুদ্ধ | শুদ্ধ |
|---|---|---|---|
| ষ্টেশন | স্টেশন | গভর্ণর | গভর্নর |
| ষ্টুডিও | স্টুডিও | কর্ণার | কর্নার |
| ফটোষ্ট্যাট | ফটোস্ট্যাট | কর্ণেল | কর্নেল |

৫. বানানে যে বর্ণের উপর রেফ থাকবে, সেই বর্ণে দ্বিত্ব হবে না। যেমন—

| অশুদ্ধ | শুদ্ধ | অশুদ্ধ | শুদ্ধ |
|---|---|---|---|
| কার্য্যালয় | কার্যালয় | ধর্ম্মসভা | ধর্মসভা |
| নির্দ্দিষ্ট | নির্দিষ্ট | পর্ব্বত | পর্বত |

৬. বিস্ময়সূচক অব্যয় (যেমন : বাঃ /ছিঃ / উঃ ইত্যাদি) ব্যতীত বাংলা কোনো শব্দের শেষে বিসর্গ থাকবে না। যেমন—

| অশুদ্ধ | শুদ্ধ | অশুদ্ধ | শুদ্ধ |
|---|---|---|---|
| কার্যতঃ | কার্যত | প্রায়শঃ | প্রায়শ |
| বিশেষতঃ | বিশেষত | প্রথমতঃ | প্রথমত |

৭. কোনো শব্দের শেষে যদি ঈ-কার (ী)থাকে, সেই শব্দের সঙ্গে জগৎ, বাচক, বিদ্যা, সভা, ত্ব, তা, নী, ণী, পরিষদ, তত্ত্ব ইত্যাদি যুক্ত হয়ে যদি নতুন শব্দ গঠন করে, তবে পূর্ববর্তী শব্দের ঈ-কার (ী) নবগঠিত শব্দে সাধারণত ই-কারে (ি) পরিণত হয়।
যেমন : প্রাণী + বিদ্যা = প্রাণিবিদ্যা
মন্ত্রী+সভা = মন্ত্রিসভা
কৃতী+ত্ব = কৃতিত্ব
প্রতিদ্বন্দ্বী+তা = প্রতিদ্বন্দ্বিতা
সঙ্গী+নী = সঙ্গিনী



৮. শব্দে ঊর্ধ্বকমা ও হস্‌চিহ্ন যথাযথ বর্জন করা হবে।

| অশুদ্ধ | শুদ্ধ | অশুদ্ধ | শুদ্ধ |
|---|---|---|---|
| হ'ল | হল | চট্ | চট |
| দু'টি | দুটি | চেক্ | চেক |
| তা'র | তার | করব্ | করব |

৯. অদ্ভুত-এর ভুত ব্যতীত আর সব ভূত-এ (ূ) হবে। যেমন– অভিভূত, একীভূত, আবির্ভূত, দ্রবীভূত, অভূতপূর্ব, অঙ্গীভূত, উদ্ভূত, কিম্ভূত, প্রভূত, পরাভূত, সম্ভূত, বশীভূত ইত্যাদি।

১০. সন্ধিতে প্রথম পদের শেষে ম্ থাকলে ক বর্গের পূর্বে ম্ স্থানে ং লেখা হবে। যেমন– অহংকার, ভয়ংকর, সংগীত। অন্যান্য ক্ষেত্রে ক খ গ ঘ এবং ক্ষ-র পূর্বে নাসিক্য বর্ণ যুক্ত করার জন্য সর্বত্র ঙ্ লেখা হবে। যেমন– অঙ্ক,আকাঙ্ক্ষা।

১১. বিশেষণবাচক 'আলি' প্রত্যয়যুক্ত শব্দে ই-কার (ি) হবে।

| অশুদ্ধ | শুদ্ধ |
|---|---|
| বর্ণালী | বর্ণালি |
| রূপালী | রুপালি |
| সোনালী | সোনালি |

১২. যেসব তৎসম শব্দে ই, ঈ বা উ, ঊ উভয় শুদ্ধ সেসব শব্দে কেবল ই বা উ এবং তার কারচিহ্ন ি ু ব্যবহৃত হবে। যেমন– কিংবদন্তি, খঞ্জনি, চিৎকার, ধমনি, ধূলি, পঞ্জি, পদবি, ভঙ্গি, মঞ্জরি, মসি, লহরি, সরণি, সূচিপত্র, উষা।

## কিছু জটিল শব্দের বানান

| | |
|---|---|
| অ | অকস্মাৎ, অগ্ন্যাশয়, অগ্ন্যুৎপাত, অচিন্ত্য, অত্যধিক, অধ্যাত্ম, অনিন্দ্য, অনূর্ধ্ব, অন্তঃসত্ত্বা, অন্তর্জ্বালা, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া, অপাঙ্‌ক্তেয়, অমর্ত্য, অলঙ্ঘ্য, অশ্বত্থ |
| আ | আকাঙ্ক্ষা, আর্দ্র, আবিষ্কার, অপরাহ্ণ, আহ্নিক, আনুষঙ্গিক |
| উ | উচ্চৈঃস্বরে, উচ্ছ্বাস, উজ্জ্বল, উত্ত্যক্ত, উদ্ভিজ্জ, উপর্যুক্ত, উপলব্ধি, ঊর্ধ্ব |
| এ, ঐ | এতদ্দ্বারা, এতদ্ব্যতীত, ঐকাত্ম্য, ঐন্দ্রজালিক, ঐশীশক্তি, ঐষীক |
| ও, ঔ | ওষ্ঠাধর, ওজস্বিতা, ওতপ্রোতভাবে, ঔজ্জ্বল্য, ঔদ্ধত্য, ঔর্ণনাভ |
| ক | কর্তৃ, কর্তৃক, কর্ত্রী, কাঙ্ক্ষিত, কৃচ্ছ্র, কৃত্তিবাস, ক্বচিৎ, ক্রূর, কঙ্কণ, কনীনিকা |
| ক্ষ | ক্ষুব্ধ, ক্ষুন্নিবৃত্তি, ক্ষিতিশ, ক্ষেপণাস্ত্র, ক্ষুধানিবৃত্তি, ক্ষুন্নিবারণ |
| গ | গার্হস্থ্য, গ্রীষ্ম, গৃহিণী, গণনা, গণ্ডেপিণ্ডে, গন্ধেশ্বরী |
| ঘ | ঘূর্ণায়মান, ঘটনাবলি, ঘণ্টা, ঘনিষ্ঠতা, ঘৃতাহুতি, ঘ্রাণেন্দ্রিয় |
| জ | জলোচ্ছ্বাস, জাজ্বল্যমান, জীবাশ্ম, জ্বর, জ্বলজ্বল, জ্বলা, জ্বালা, জ্বালানি, জ্যেষ্ঠ, জ্যৈষ্ঠ, জ্যোৎস্না, জ্যোতি, জ্যোতিষী, জ্যোতিষ্ক। |
| ট, ঠ | টইটম্বুর, টীকাটিপ্পনী, টানাপড়েন, টানাহেঁচড়া, ঠাট্টাতামাশা, ঠাকুরপূজা। |

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



| | |
|---|---|
| ত | তৎক্ষণাৎ, তত্ত্ব, তত্ত্বাবধান, তদ্ব্যতীত, তাত্ত্বিক, তীক্ষ্ণ, তূষ্ণীম্ভাব, ত্বক, ত্বরণ, ত্বরান্বিত, ত্বরিত, ত্যক্ত। |
| দ | দয়ার্দ্র, দারিদ্র্য, দুরাকাঙ্ক্ষা, দুর্নিরীক্ষ্য, দৌরাত্ম্য, দ্বন্দ্ব, দ্বিতীয়, দ্বিধা, দ্বেষ, দ্বৈত, দ্ব্যর্থ, দ্যূতক্রীড়া। |
| ধ | ধ্বংস, ধ্বজা, ধ্বনি, ধ্বন্যাত্মক। |
| ন | নঞর্থক, নিক্বণ, নির্দ্বন্দ্ব, নির্দ্বিধ, নৈর্ঋত, ন্যস্ত, ন্যুব্জ, ন্যূনতম, নিশীথিনী। |
| প | পক্ব, পঙ্‌ক্তি, পক্ষ্ম, পরাঙ্মুখ, পরিস্রাবণ, পার্শ্ব, প্রতিদ্বন্দ্বিতা, প্রতিদ্বন্দ্বী, প্রত্যুষ, প্রাতঃকৃত্য, প্রাতভ্রমণ, প্রাতভোজন, প্রোজ্জ্বল, পৌরোহিত্য, পৈতৃক, পিপীলিকা। |
| ব | বক্ষ্যমাণ, বন্দ্যোপাধ্যায়, বন্ধ্যা, বয়োজ্যেষ্ঠ, বহিরিন্দ্রিয়, বাত্যাবিধ্বস্ত, বাল্মীকি, বিদ্বজ্জন, বিভীষিকা, বিভূতিভূষণ, বৈচিত্র্য, বৈদগ্ধ্য, বৈশিষ্ট্য, ব্যক্ত, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, ব্যগ্র, ব্যঙ্গ, ব্যঞ্জনা, ব্যতিক্রম, ব্যতিরেকে, ব্যতিব্যস্ত, ব্যতীত, ব্যত্যয়, ব্যথা, ব্যথিত, ব্যপদেশ, ব্যবচ্ছেদ, ব্যবধান, ব্যবসা, ব্যবস্থা, ব্যবহার, ব্যয়, ব্যর্থ, ব্যস্ত, ব্যুৎপত্তি, ব্যূহ, ব্রাহ্মণ। |
| ভ | ভৌগোলিক, ভ্রাতৃত্ব, ভ্রাতুষ্পুত্র, ভ্রান্ত, ভ্রাম্যমাণ। |
| ম | মধুসূদন, মনস্তত্ত্ব, মন্বন্তর, মর্ত্য, মহত্ত্ব, মাহাত্ম্য, মুহুর্মুহু, মুমূর্ষু, মুহূর্ত, মহৌষধ, মৃণালিনী, মৃত্তিকা, ম্রিয়মাণ। |
| য | যথোপযুক্ত, যদ্যপি, যশঃপ্রার্থী, যক্ষ্মা, যশস্বী, যাজ্ঞা, যাথার্থ্য, যূপকাষ্ঠ, যোগরূঢ়, যৌবনোত্তীর্ণ। |
| র | রশ্মি, রৌদ্র, রুক্মিণী, রুচিবিগর্হিত, রূপণ, রৌদ্রকরোজ্জ্বল, রৌরব, রৌপ্য, রৌশন। |
| ল | লক্ষ্মণ, লক্ষ্মী, লক্ষ্য, লঘূকরণ, লুপ্তোদ্ধার, লোমোদ্গম। |
| শ | শস্য, শাশ্বত, শিরশ্ছেদ, শিষ্য, শ্বশুর, শ্বশ্রূ (শাশুড়ি), শ্বাপদ, শ্মশান, শ্মশ্রু (দাড়ি), শ্রদ্ধাস্পদেষু, শ্রীমতী, শ্যেন, শ্লেষ্মা, শিরঃপীড়া, শুশ্রূষা |
| ষ | ষড়ানন, ষাণ্মাতুর, ষাণ্মাসিক। |
| স | সংবর্ধনা, সত্তা, সত্ত্ব, সত্ত্বেও, সন্ধ্যা, সন্ন্যাস, সন্ন্যাসী, সম্মেলন, সরস্বতী, সাত্ত্বিক, সান্ত্বনা, সিন্দূর, সূক্ষ্ম, সৌহার্দ্য, স্বতঃস্ফূর্ত, স্বত্ব, স্বাচ্ছন্দ্য, স্বাতন্ত্র্য, স্বায়ত্তশাসন, স্বাস্থ্য, স্মরণ। |
| হ | হীনম্মন্যতা, হ্রস্ব, হ্রাস, হৃৎপিণ্ড, হোঁচট, হ্রস্বীভূত, হ্রেষা, হ্রদ। |

## আরও যেসব শব্দের বানান জানা জরুরি

বাক্যের অশুদ্ধি সংশোধন করতে গেলে দেখা যায়, শুধু শব্দ শুদ্ধ করে লিখলেই অনেক ক্ষেত্রে বাক্য সঠিক হয়। বাক্যের কোনো একটি শব্দের বানান ভুলের কারণে পুরো বাক্যের অর্থ পরিবর্তিত হতে পারে। শব্দ ব্যবহারের সময় যেসব শব্দের বানান প্রায়ই আমরা ভুল করি সেগুলোর কিছু অংশ নিচে উল্লেখ করা হলো :

| অশুদ্ধ | শুদ্ধ |
|---|---|
| অন্তপুর | অন্তঃপুর |
| অনুদিত | অনূদিত |
| অদ্ভুত | অদ্ভুত |
| অকল্যান | অকল্যাণ |
| অকৃতত্ব | অকৃতিত্ব |
| অন্তঃসত্তা | অন্তঃসত্ত্বা |

| অশুদ্ধ | শুদ্ধ |
|---|---|
| অন্বেষন | অন্বেষণ |
| অনুসঙ্গ | অনুষঙ্গ |
| অপরাহ্ন | অপরাহ্ণ |
| অধ্যাত্ব | অধ্যাত্ম |
| অকস্মাত | অকস্মাৎ |
| অকৃত্তিম | অকৃত্রিম |



| অশুদ্ধ | শুদ্ধ |
|---|---|
| অগ্রহায়ন | অগ্রহায়ণ |
| অতিন্দ্রিয় | অতীন্দ্রিয় |
| অধ্যায়ন | অধ্যয়ন |
| অত্যান্ত | অত্যন্ত |
| অধীনস্থ | অধীন |
| অদ্যবধি | অদ্যাবধি |
| অদ্যপি | অদ্যাপি |
| অধগতি | অধোগতি |
| অনুমদিত | অনুমোদিত |
| অনু-পরমানু | অণু-পরমাণু |
| অত্যাধিক | অত্যধিক |
| অধ্যাবসায় | অধ্যবসায় |
| অপাঙ্তেয় | অপাঙ্‌ক্তেয় |
| অশ্রুজল | অশ্রু |
| অনুবাদিত | অনূদিত |
| অর্ধাঙ্গিনী | অর্ধাঙ্গী |
| অনাথিনী | অনাথা |
| আবশ্যকীয় | আবশ্যক |
| আভ্যন্তরীণ | অভ্যন্তরীণ |
| আকষ্মিক | আকস্মিক |
| আকূল | আকুল |
| আরোগ্য হওয়া | আরোগ্য লাভ করা |
| আশ্চর্য হওয়া | আশ্চর্যান্বিত হওয়া |
| আমাবস্যা | অমাবস্যা |
| আলস্যতা | অলসতা/আলস্য |
| আপোষ | আপস |
| আশির্বাদ | আশীর্বাদ |
| আশীষ | আশিস |
| আকাঙ্খা | আকাঙ্ক্ষা |
| আহ্নিক | আহ্নিক |
| আনুসঙ্গিক | আনুষঙ্গিক |

| অশুদ্ধ | শুদ্ধ |
|---|---|
| ইর্ষা | ঈর্ষা |
| ইগল | ঈগল |
| ইদানীংকাল | ইদানীং |
| ইতোপূর্বে | ইতঃপূর্বে |
| ইতিমধ্যে | ইতোমধ্যে |
| উৎকর্ষতা | উৎকর্ষ |
| উপরোক্ত | উপর্যুক্ত |
| উদ্ধতপূর্ণ | ঔদ্ধত্যপূর্ণ |
| উদাসীন্য | ঔদাসীন্য |
| উদ্বিঘ্ন | উদ্বিগ্ন |
| উল্লেখিত | উল্লিখিত |
| উপন্যাসিক | ঔপন্যাসিক |
| উজ্জ্বল্য | ঔজ্জ্বল্য |
| উর্মি | ঊর্মি |
| উর্ধ্ব | ঊর্ধ্ব |
| উষা | ঊষা |
| উদিচী | উদীচী |
| উদ্ভুত | উদ্ভূত |
| উপলব্দি | উপলব্ধি |
| উদ্বত | উদ্ধত |
| উদ্বাবন | উদ্ভাবন |
| উদবাস্তু | উদ্বাস্তু |
| উচ্ছাস | উচ্ছ্বাস |
| উচ্ছসিত | উচ্ছ্বসিত |
| ঋণগ্রস্থ | ঋণগ্রস্ত |
| একত্রিত | একত্র |
| একিভুত | একীভূত |
| এসিড | অ্যাসিড |
| এমতাবস্তায় | এ অবস্থায় |
| ঐক্যতা | একতা |
| ঐক্যতান | ঐকতান |

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



| অশুদ্ধ | শুদ্ধ |
|---|---|
| ঐক্যমত | ঐকমত্য |
| ঐশ্বর্যতা | ঐশ্বর্য |
| ঐশ্বর্য্য | ঐশ্বর্য |
| ঐরাবৎ | ঐরাবত |
| ওষ্ঠ | ঔষ্ঠ্য |
| কচিৎ | ক্বচিৎ |
| কৌতুহল | কৌতূহল |
| কৃতীত্ব | কৃতিত্ব |
| কুটনীতি | কূটনীতি |
| কল্যানীয়াষু | কল্যাণীয়াসু |
| কর্ত্তা | কর্তা |
| কৃতি | কৃতী |
| কৌতুহল | কৌতূহল |
| কল্যানীয়েসু | কল্যাণীয়েষু |
| কিম্বদন্তি | কিংবদন্তি |
| কতৃপক্ষ | কর্তৃপক্ষ |
| কল্যান | কল্যাণ |
| কঙ্কন | কঙ্কণ |
| কণক | কনক |
| কিরিট | কিরীট |
| কিম্বা | কিংবা |
| ক্রীরা | ক্রীড়া |
| খসরা | খসড়া |
| খিচুরি | খিচুড়ি |
| গড়মিল | গরমিল |
| গোপন কথা | গোপনীয় কথা |
| গীতাঞ্জলী | গীতাঞ্জলি |
| গ্রামিন | গ্রামীণ |
| গুন | গুণ |
| গগণ | গগন |
| গর্ধব | গর্দভ |

| অশুদ্ধ | শুদ্ধ |
|---|---|
| গৃহীতা | গ্রহীতা |
| গৃহিনী | গৃহিণী |
| ঘনিষ্ট | ঘনিষ্ঠ |
| চব্য | চর্ব্য |
| চক্ষূরোগ | চক্ষুরোগ |
| চাক্ষুস | চাক্ষুষ |
| চাঞ্চলতা | চাঞ্চল্য/চঞ্চলতা |
| জনাবা | মিসেস/বেগম |
| জেষ্ঠ্য | জ্যেষ্ঠ |
| জ্যোস্না | জ্যোৎস্না |
| জলোচ্ছাস | জলোচ্ছ্বাস |
| জ্যোতিস | জ্যোতিষ |
| জৈষ্ট্য | জ্যৈষ্ঠ |
| জগবন্ধ | জগদ্বন্ধু |
| জাগরুক | জাগরূক |
| জিবীকা | জীবিকা |
| জাগরত | জাগ্রত |
| ঝঞ্জা | ঝঞ্ঝা |
| তিক্ষ্ম | তীক্ষ্ণ |
| তারুন্য | তারুণ্য |
| তরিৎ | তড়িৎ |
| তেজ্য | ত্যাজ্য |
| ততধিক | ততোধিক |
| ত্যজ্য | ত্যাজ্য |
| তদ্ধিৎ | তদ্ধিত |
| তৎকালিন | তৎকালীন |
| তাড়িৎ | তাড়িত |
| ত্যাক্ত | ত্যক্ত |
| তিরস্কার | তিরস্কার |
| দৈন্যতা | দৈন্য/দীনতা |
| দারিদ্র্যতা | দারিদ্র্য |



| অশুদ্ধ | শুদ্ধ |
|---|---|
| দুতাবাস | দূতাবাস |
| দূর্নীতি | দুর্নীতি |
| দারিদ্রতা | দরিদ্রতা/দারিদ্র্য |
| দায়ীত্ব | দায়িত্ব . |
| দীর্ঘজীবি | দীর্ঘজীবী |
| দূরবস্থা | দুরবস্থা |
| দোষণীয় | দূষণীয় |
| দধিচি | দধীচি |
| দুর্ণাম | দুর্নাম |
| ধৈর্যতা | ধৈর্য্য |
| ধুমপান | ধূমপান |
| ধংস | ধ্বংস |
| নৈব্যক্তিক | নৈর্ব্যক্তিক |
| নিষ্পাপী | নিষ্পাপ |
| নিরপরাধী | নিরপরাধ |
| নির্দোষী | নির্দোষ |
| নিরহঙ্কারী | নিরহঙ্কার |
| নিরোগী | নীরোগ |
| নৈরাশা | নৈরাশ্য |
| নূন্যতম | ন্যূনতম |
| ননদিনী | ননদ |
| নিলীমা | নীলিমা |
| নীরিহ | নিরীহ |
| নৈপুন্য | নৈপুণ্য |
| নিহারিকা | নীহারিকা |
| নিস্কলঙ্ক | নিষ্কলঙ্ক |
| নীরিক্ষণ | নিরীক্ষণ |
| নৃসংশ | নৃশংস |
| পোষ্টার | পোস্টার |
| পরিক্ষীত | পরীক্ষিত |
| পথমধ্যে | পথিমধ্যে |

| অশুদ্ধ | শুদ্ধ |
|---|---|
| পুরহিত | পুরোহিত |
| পিপিলিকা | পিপীলিকা |
| পিপড়া | পিঁপড়া |
| প্রতিবন্দী | প্রতিবন্ধী |
| পরিত্যাক্ত | পরিত্যক্ত |
| পুংখানুপুঙ্খ | পুঙ্খানুপুঙ্খ |
| প্রতীকি | প্রতীকী |
| প্রবীন | প্রবীণ |
| পক্ক | পক্ব |
| প্রতিদ্বন্দ্বি | প্রতিদ্বন্দ্বী |
| প্রতিদ্বন্দ্বীতা | প্রতিদ্বন্দ্বিতা |
| পিচাশ | পিশাচ |
| বৈচিত্র্যতা | বৈচিত্র্য/বিচিত্রতা |
| বিবাদমান | বিবদমান |
| বৈশিষ্ট্যতা | বৈশিষ্ট্য |
| বয়সন্ধি | বয়ঃসন্ধি |
| ব্যাক্তিত্ব | ব্যক্তিত্ব |
| বহিস্কার | বহিষ্কার |
| বুৎপত্তি | ব্যুৎপত্তি |
| ব্যাতিক্রম | ব্যতিক্রম |
| ব্যতিত | ব্যতীত |
| বিষন্ন | বিষণ্ন |
| ব্রাক্ষন | ব্রাহ্মণ |
| ব্যাগ্র | ব্যগ্র |
| ভূগলিক | ভৌগোলিক |
| ভারসাম্যতা | ভারসাম্য |
| মনুষত্ব | মনুষ্যত্ব |
| মাতাহীন | মাতৃহীন |
| মাধুর্যতা | মাধুর্য/মধুরতা |
| মরিচিকা | মরীচিকা |
| মৃণ্ময় | মৃন্ময় |

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



| অশুদ্ধ | শুদ্ধ |
|---|---|
| মধুসুদন | মধুসূদন |
| মনিষী | মনীষী |
| মুহুর্ত | মুহূর্ত |
| মন্ত্রীসভা | মন্ত্রিসভা |
| মনোযোগি | মনোযোগী |
| মনোকষ্ট | মনঃকষ্ট |
| যক্ষা | যক্ষ্মা |
| যশরাশি | যশোরাশি |
| যদ্যাপি | যদ্যপি |
| রূপালি | রুপালি |
| রজকিনী | রজকী |
| রাজনৈতিক | রাজনীতিক |
| রবী ঠাকুর | রবি ঠাকুর |
| রুপ | রূপ |
| রক্তছবি | রক্তচ্ছবি |
| লজ্জাস্কর | লজ্জাকর |
| লাবণ্যতা | লাবণ্য |
| বারম্বার | বারংবার |
| শারিরিক | শারীরিক |
| শিরোচ্ছেদ | শিরশ্ছেদ |
| শূণ্য | শূন্য |
| শিরচ্ছেদ | শিরশ্ছেদ |
| শশ্মান | শ্মশান |
| শুভাশীষ | শুভাশিস |
| শ্রেষ্ঠতম | সর্বশ্রেষ্ঠ |
| শুশ্রুষা | শুশ্রূষা |
| শান্তনা | সান্ত্বনা |
| শিরোপীড়া | শিরঃপীড়া |
| শুধুমাত্র | শুধু |
| শ্রেষ্ঠতম | শ্রেষ্ঠ |
| শ্রেষ্ঠতর | শ্রেষ্ঠ |

| অশুদ্ধ | শুদ্ধ |
|---|---|
| সমূলসহ | সমূলে/মূলসহ |
| স্বাতন্ত্র | স্বাতন্ত্র্য |
| সম্ভাব্যতা | সম্ভাব্য |
| সৌজন্যতা | সৌজন্য |
| সুস্বাগতম | স্বাগতম |
| সারল্যতা | সরলতা/সারল্য |
| সুষ্ঠ | সুষ্ঠু |
| সংসপ্তক | সংশপ্তক |
| সম্বর্ধনা | সংবর্ধনা |
| সমিচীন | সমীচীন |
| সুচী | সূচি |
| সত্যেও | সত্ত্বেও |
| সমিরন | সমীরণ |
| স্বরসতী | সরস্বতী |
| সত্যায়িত | প্রত্যায়িত |
| সংস্কৃতবান | সংস্কৃতিবান |
| সদাসর্বদা | সদা |
| সখ্যতা | সখ্য |
| সকল সভ্যবৃন্দ | সকল সভ্য/সভ্যবৃন্দ |
| সুপারিস | সুপারিশ |
| স্বস্ত্রীক | সস্ত্রীক |
| সুষ্ঠ | সুষ্ঠু |
| সহযোগীতা | সহযোগিতা |
| সন্মান | সম্মান |
| সুক্ষ | সূক্ষ্ম |
| সম্বরণ | সংবরণ |
| সম্বাদ | সংবাদ |
| সম্বলিত | সংবলিত |
| সন্মুখ | সম্মুখ |
| হীনমন্যতা | হীনম্মন্যতা |
| ক্ষীণজিবী | ক্ষীণজীবী |
| ক্ষচিত | খচিত |



## বানান ও ভাষারীতি বিষয়ক শুদ্ধিকরণ

১. অবস্থা দৃষ্টিতে মনে হয় তারা যেন সবাই ভুল করার প্রতিযোগীতায় অবতীর্ন হয়েছে।
শুদ্ধ : অবস্থা দেখে মনে হয়, তারা যেন সবাই ভুল করার প্রতিযোগিতায় নেমেছে।

২. ফলশ্রুতিতে একদিকে দেখা দিয়েছে নির্লজ্ব্য আত্বপ্রচার আর পরশ্রীকাতরতা, অন্যদিকে দুর্নিবার্য হইয়া উঠিয়াছে আত্ম সংকোচ আর তোশামোদ প্রবিত্তি।
শুদ্ধ : ফলে একদিকে দেখা দিয়েছে নির্লজ্জ আত্মপ্রচার আর পরশ্রীকাতরতা, অন্যদিকে দুর্নিবার্য হয়ে উঠেছে আত্মসংকোচ ও তোষামোদ প্রবৃত্তি।

৩. যেইটি তার নিজের সর্বশ্রেষ্ঠ বাহ্যবিকাশ তা অশ্রেয় করিতে করিতেই তার ক্রমাগত পুষ্টিসাধন হয়।
শুদ্ধ : যেটা তার নিজের সবচেয়ে বাইরের বিকাশ তাই অশ্রেয় করতে করতেই তার ক্রমাগত পুষ্টিসাধন হয়।

৪. এবার জখন মেলায় যাচ্ছিলাম আমি, তখন হটাৎ কালো হয়ে উঠলো মেঘ এবং হয়ে গেলো বৃষ্টি এক পসলা।
শুদ্ধ : এবার যখন আমি মেলায় যাচ্ছিলাম, তখন হঠাৎ মেঘ কালো হয়ে উঠে এবং এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেল।

৫. সকল বালিকাগণ পানি সিঞ্চন করবার জন্য ম্মৃন্ময় পাত্র লইয়া বাগানে গেল।
শুদ্ধ : সকল বালিকা/বালিকাগণ পানি সেচন করবার জন্য মাটির পাত্র নিয়ে বাগানে গেল।

৬. পরিস্কার পোষাক পরিহিত ছেলেটি উড়োজাহাজের আবিষ্কারের নাম পারায় বলতে পাইল পুরস্কার ও চলে গেল নমস্কার করে।
শুদ্ধ : পরিষ্কার পোশাক পরিহিত ছেলেটি উড়োজাহাজের আবিষ্কারকের নাম বলতে পারায় পুরস্কার পেল ও নমস্কার করে চলে গেল।

৭. যদি পরিচিত সকল বশন-ভূসন বাদ দিয়া বর্ষার ণগ্নমুর্তির বর্ণনা করতে উদ্ধ্যত হই, তা হইলেও বড় সুবিধা করতে পারা যাইবে না।
শুদ্ধ : যদি পরিচিত সকল  বসন-ভূষণ বাদ দিয়ে বর্ষার নগ্নমূর্তির বর্ণনা করতে উদ্যত হই তাহলেও বড় সুবিধে করা যাবে না।

৮. তোমার মতো একটি মুর্খের পিছনে অর্থ খরচ করে কোনো লাভ হবে না। তোমার পিছনে টাকা লগ্নি করা আর পান্তাভাতে ঘি ঢালা সমান কথা।
শুদ্ধ : তোমার মতো মূর্খের পেছনে টাকা খরচ করে কোনো লাভ হবে না। তোমার পেছনে টাকা খরচ করা আর ভস্মে ঘি ঢালা সমান কথা।

৯. ইচরে পক্ক ছেলেদিগকে আদেশ দিয়ে পথে আনবে ভাবিয়াছ, কিন্তু আমি জানি তাহারা তোমার কথা শুনবে না। কচু বনে মুক্তা ছড়িয়ে লাভ কী!
শুদ্ধ : ইঁচড়ে পাকা ছেলেদের উপদেশ দিয়ে পথে আনবে ভেবেছ; কিন্তু আমি জানি তারা তোমার কথা শুনবে না, উলুবনে মুক্তা ছড়িয়ে লাভ কী?

১০. পুত্রের বখাটে কার্যকলাপ শিরপীড়ার কারণ পিতার হয়েছে।
শুদ্ধ : বখাটে পুত্রের কার্যকলাপ পিতার শিরঃপীড়ার কারণ হয়েছে।

১১. অস্তমান সূর্যের গোলাপ আভাষ পরেছে আকাশে ছড়িয়ে।
শুদ্ধ : অস্তায়মান সূর্যের গোলাপী আভা আকাশে ছড়িয়ে পড়েছে।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



১২. জীবজন্তু পরিপূর্ণ এই বন্যে মনুষ্যের চলাচল কোনো নেই।
শুদ্ধ : শ্বাপদসঙ্কুল এই বনে কোনো মানুষের চলাচল নেই।

১৩. গ্রামঅঞ্চলে ক্ষুদ্রঋণগৃহীতার সংখ্যা দৈনিক বাড়ছে।
শুদ্ধ : গ্রামাঞ্চলে ক্ষুদ্রঋণ গ্রহীতার সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে।

১৪. সাম্প্রতিক এই দেশে এডিস মসার বিস্তার এবং ডেঙ্গুজ্বরের প্রদুভাব জনজীবনকে অতিস্ট করে তুলেছে।
শুদ্ধ : সম্প্রতি এদেশে এডিস মশার বিস্তার এবং ডেঙ্গুজ্বরের প্রাদুর্ভাব জনজীবনকে অতিষ্ঠ করে তুলেছে।

১৫. জেলা পর্যায়ে পানি পরিক্ষা ও শোদনাগার করতে হবে স্থাপনের ব্যবস্থা।
শুদ্ধ : জেলা পর্যায়ে পানি পরীক্ষা ও শোধনাগার স্থাপনের ব্যবস্থা করতে হবে।

১৬. জীবন্ত বিস্ফোরক আগ্নেয়গিরি হইতে বিস্ফোরন ঘটলে পার্শ্ববর্তী এলাকা থেকে বিরামহীন ভূমিকম্প অনুভূত হয়।
শুদ্ধ : জীবন্ত বিস্ফোরক আগ্নেয়গিরি থেকে বিস্ফোরণ ঘটলে পার্শ্ববর্তী এলাকা থেকে বিরামহীন ভূমিকম্প অনুভূত হয়।

১৭. সল্পোন্নত দেশগুলোতে নেতিবাচক প্রভাবই সাধারণত বিশ্বায়নের লক্ষ্য বেশি করা যায়।
শুদ্ধ : স্বল্পোন্নত দেশগুলোতে সাধারণত বিশ্বায়নের নেতিবাচক প্রভাবই বেশি লক্ষ করা যায়।

১৮. নারীর অধিকারসমূহ বলতে বুঝায় নারীর মৌলিক ক্ষমতায়ণ ও উন্নয়ণ নিশ্চিতকরণ।
শুদ্ধ : নারীর উন্নয়ন ও ক্ষমতায়ন বলতে বোঝায় নারীর মৌলিক অধিকারসমূহ নিশ্চিতকরণ।

১৯. অনুভূতির ঝঞ্জা স্রোতরূপে উদ্দেলিত বুকের সমতলে ফুঁসে উঠিছে।
শুদ্ধ : অনুভূতির ঝঞ্ঝা স্রোতরূপে উদ্বেলিত বুকের সমতলে ফুঁসে উঠেছে।

২০. এক একদিন জ্যোৎস্না রাতে বাতাস প্রবাহিত হয়, শয্যার পরে জেগে বসে বুক ব্যথিয়ে ওঠে।
শুদ্ধ : এক একদিন জোছনা রাতে হাওয়া বয়, বিছানায় জেগে বসে ব্যথায় ভরে ওঠে বুক।

২১. আমরা যদি রত্ন পরিক্ষা করতে শিখতাম তাহলে আমরা সাহিত্যে কাচকে মনি এবং মনিকে কাঁচ বলতে ইতস্তত করতাম।
শুদ্ধ : আমরা যদি রত্ন পরীক্ষা করতে শিখতাম তাহলে আমরা সাহিত্যে কাচকে মণি এবং মণিকে কাচ বলতে ইতস্তত করতাম।

২২. এ যুগে কিছুই আমরাই স্কুল কলেজে পরিক্ষীত হই, পরীক্ষা শিখি নাই করতে।
শুদ্ধ : এ যুগে স্কুল-কলেজে আমরাই পরীক্ষিত হই, কিছুই পরীক্ষা করতে শিখি না।

২৩. দুর্যোগপুর্ন শ্রাবন সন্ধা; গ্রামান্তের পথ নির্জণ; প্রকৃতির কোল জুরে বিশন্নতা।
শুদ্ধ : দুর্যোগপূর্ণ শ্রাবণ সন্ধ্যা; গ্রামান্তের পথ নির্জন; প্রকৃতির কোল জুড়ে বিষণ্ণতা।

২৪. আমার সমস্ত হৃদয়ের কঠিন্য দুর হয়ে ও অসারতা এক রোমান্টিক ভাবের উদিত হয়।
শুদ্ধ : আমার হৃদয়ের সমস্ত কাঠিন্য ও অসারতা দূর হয়ে এক রোমান্টিক ভাবের উদয় হয়।

২৫. এই স্বাধীন জরতাগ্রস্থ সমাজের বুকে তিনি সঞ্চারিত করেছিলেন ভরা-যৌবনের জয়গান।
শুদ্ধ : এ পরাধীন জড় সমাজের বুকে তিনি সঞ্চারিত করেছিলেন নব-যৌবনের জয়গান।

গ

# বাক্যশুদ্ধি/প্রয়োগ-অপপ্রয়োগ

## i. বাক্যশুদ্ধি

বাংলা ব্যাকরণের বিভিন্ন তত্ত্ব এবং বাংলা বানানের বিভিন্ন নিয়ম জানা থাকলেই এগুলোর উত্তর করা সম্ভব। তবে আশার কথা এই, যে নিয়মগুলো বাক্য শুদ্ধিকরণে কাজে লাগে তার অধিকাংশই আপনারা স্কুল-কলেজে পড়েছেন। এখন আপনাদের কাজ নতুন করে বিষয়গুলোর ওপর আর একবার চোখ বুলানো। বিসিএস বাংলা প্রশ্নপত্র বিশ্লেষণ করলে 'বাক্য শুদ্ধিকরণ' অংশে ভুলের যে ধরন আমরা দেখতে পাই সেগুলো নিম্নরূপ :

এক : **বানান ভুল।** যেমন– আমার আকাঙ্খা পূর্ণ হলো না।
শুদ্ধ : আমার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হলো না।

দুই : **সাধু ও চলিত ভাষারীতির মিশ্রণজনিত ত্রুটি।** যেমন– তাহারা এইখানে এসেছিল।
শুদ্ধ : তারা এখানে এসেছিল।

তিন : **শব্দের বাহুল্য প্রয়োগ।** যেমন– সকল আলেমগণ সেখানে উপস্থিত ছিলেন।
শুদ্ধ : সকল আলেম সেখানে উপস্থিত ছিলেন।

চার : **পুরুষ-স্ত্রীবাচক শব্দজনিত ভুল।** যেমন– কে এই ভাগ্যবান মহিলা তাকে ডেকে আনো।
শুদ্ধ : কে এই ভাগ্যবতী মহিলা তাকে ডেকে আনো।

পাঁচ : **গুরুচণ্ডালী দোষ :** সংস্কৃত বা তৎসম শব্দের সঙ্গে অসংস্কৃত (খাঁটি বাংলা, বিদেশী, দেশী) শব্দের মিশ্রণ। যেমন– সর্ববিষয়ে বাহুল্য বাদ দেবে।
শুদ্ধ : সর্ববিষয়ে বাহুল্য বর্জন করবে।

ছয় : **সমাসঘটিত ভুল।** যেমন– আকণ্ঠ পর্যন্ত ভোজনে স্বাস্থ্যহানি ঘটে।
শুদ্ধ : আকণ্ঠ ভোজনে স্বাস্থ্যহানি ঘটে।

সাত : **বিরাম চিহ্নের ভুল।** যেমন : স্যার আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার নাম কী?
শুদ্ধ : স্যার আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, "তোমার নাম কী?"

আট : **প্রবাদ-প্রবচন জনিত ভুল।** যেমন : দশচক্রে ঈশ্বর ভূত।
শুদ্ধ : দশচক্রে ভগবান ভূত।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



এছাড়া কোনো কোনো বাক্যে একের অধিক ভুল থাকে। এখানে যে বিষয়গুলো উল্লেখ করা হয়েছে তার আবার বিভিন্ন প্রকারভেদ রয়েছে। সব মিলিয়ে 'বাক্য শুদ্ধকরণ' অধ্যায়টির রয়েছে ব্যাপক বিস্তৃতি। পরীক্ষার্থীদের সুবিধার জন্য প্রয়োজনীয় বিষয়গুলো সংক্ষেপে আলাদা আলাদাভাবে উদাহরণসহ আলোচনা করা হলো।

## ণ-ত্ব ও ষ-ত্ব বিধানঘটিত অশুদ্ধি/ ভুল

ণ-ত্ব বিধান ও ষ-ত্ব বিধান প্রথাগত ব্যাকরণের ধ্বনিতত্ত্বে আলোচিত হয়। বাংলা ভাষায় অনেক তৎসম বা সংস্কৃত শব্দের ব্যবহার আছে। এই তৎসম শব্দে মূর্ধন্য 'ণ' ও মূর্ধন্য 'ষ' এর ব্যবহার রয়েছে। তৎসম শব্দের বানানে 'ণ' এর সঠিক ব্যবহারের নিয়মই হচ্ছে ণ-ত্ব বিধান।

### 'ণ' ব্যবহারের নিয়ম

ক. ট-বর্গীয় ধ্বনির আগে দন্ত্য 'ন' এলে তা 'ণ' হয়ে যায়। যেমন : ঘণ্টা, খণ্ড, কাণ্ড ইত্যাদি।

খ. ঋ, র, ষ এর পরে মূর্ধন্য 'ণ' হয়। যেমন : ঋণ, ভীষণ, মরণ ইত্যাদি।

গ. ঋ, র, ষ এর পরে স্বরধ্বনি য, য়, র, হ, ং এবং ক বর্গীয় ও প বর্গীয় ধ্বনি থাকলে পরবর্তী 'ন' মূর্ধন্য 'ণ' হয়। যেমন : কৃপণ, রামায়ণ, লক্ষণ ইত্যাদি।

ঘ. কতগুলো শব্দে স্বভাবতই মূর্ধন্য 'ণ' হয়।

চাণক্য মাণিক্য গণ বাণিজ্য লবণ মণ
বেণু বীণা কঙ্কণ কণিকা
কল্যাণ শোণিত মণি স্থাণু গুণ পুণ্য বেণী
ফণী অণু বিপণী গণিকা।
আপণ লাবণ্য বাণী নিপুণ ভণিতা পাণি
গৌণ কোণ ভাণ পণ শাণ
চিক্কণ নিক্কণ তূণ কফোণি বণিক গুণ
গণনা পিণাক পণ্য বাণ

□ সমাসবদ্ধ শব্দে সাধারণত ণ-ত্ব বিধান খাটে না। এরূপ ক্ষেত্রে দন্ত্য 'ন' হয়। যেমন : দুর্নীতি, পরনিন্দা, ত্রিনয়ন ইত্যাদি।

□ 'ত' বর্গীয় বর্ণের সঙ্গে সবসময় দন্ত্য 'ন' যুক্ত হয়। মূর্ধন্য 'ণ' হয় না। যেমন : দন্ত, রন্ধন, রত্ন ইত্যাদি।

### ষ-ত্ব বিধান

তৎসম শব্দের বানানে মূর্ধন্য 'ষ' ব্যবহারের নিয়মকে ষ-ত্ব বিধান বলে।

### ষ-ব্যবহারের নিয়ম

ক. অ, আ ভিন্ন অন্য স্বরধ্বনি এবং ক ও র-এর পরে প্রত্যয়াদির দন্ত্য স এলে মূর্ধন্য ষ-তে পরিবর্তিত হয়। যেমন : ভবিষ্যৎ, চিকীর্ষা ইত্যাদি।



খ. ই-কারান্ত ও উ-কারান্ত উপসর্গের পর কতগুলো ধাতুতে 'ষ' হয়। যেমন : অভিষেক, অনুষ্ঠান, সুষমা, প্রতিষেধক ইত্যাদি।

গ. ঋ ও র-এর পরে মূর্ধন্য 'ষ' হয়। যেমন : কৃষক, বর্ষণ, সৃষ্টি ইত্যাদি।

ঘ. ট ও ঠ-এর সঙ্গে যুক্ত হলে দন্ত্য 'স' না হয়ে মূর্ধন্য 'ষ' হয়। যেমন : কাষ্ঠ, ওষ্ঠ, নষ্ট ইত্যাদি।

ঙ. কতগুলো শব্দে স্বভাবতই মূর্ধন্য 'ষ' হয়। যেমন : আষাঢ়, উষা, আভাষ, অভিলাষ, ঈষৎ, পাষণ্ড, পাষাণ, ভাষণ, মানুষ, সরিষা, পৌষ, কলুষ, শোষণ, ষড়যন্ত্র ইত্যাদি।

চ. বিদেশী শব্দ থেকে আগত শব্দে 'ষ' হবে না। যেমন : পোস্ট, মাস্টার, জিনিস, পোশাক ইত্যাদি।

ছ. সংস্কৃত 'সাৎ' প্রত্যয়যুক্ত পদে 'ষ' হয় না। যেমন : ধূলিস্যাৎ, ভূমিসাৎ।

## সন্ধিঘটিত ভুল

সন্ধি ব্যাকরণের গুরুত্বপূর্ণ অংশ। সন্ধির নিয়ম সঠিকভাবে জানা না থাকলে শব্দ গঠন শুদ্ধ হয় না। নিচে সন্ধির প্রয়োজনীয় কিছু নিয়ম নিয়ে আলোচনা করা হলো :

এক : অ-কার কিংবা আ-কারের পর অ-কার কিংবা আ-কার থাকলে উভয় মিলে আ-কার হয়; আ-কার পূর্ববর্তী ব্যঞ্জনের সাথে যুক্ত হয়। অ/আ + অ/আ = আ

যেমন : হিম + অচল = হিমাচল
অ + অ = আ
সিংহ + আসন = সিংহাসন
অ + আ = আ

দুই : অ-কার কিংবা আ-কারের পর উ-কার কিংবা ঊ-কার থাকলে উভয় মিলে ও-কার হয়; ও কার পূর্ববর্তী ব্যঞ্জনে যুক্ত হয়। অ/আ + উ/ঊ = ও

যেমন : সূর্য + উদয় = সূর্যোদয়  যথা + উচিত = যথোচিত
অ + উ = ও  আ + উ = ও

এরূপ— মহোৎসব, ফলোদয়, যথোপযুক্ত, হিতোপদেশ, পরোপকার ইত্যাদি।

তিন : ই-কার কিংবা ঈ-কারের পর ই-কার কিংবা ঈ-কার থাকলে উভয় মিলে 'ঈ' কার হয়। ই/ঈ + ই/ঈ = ঈ

যেমন : অতি + ইত = অতীত
ই + ই = ঈ
দিল্লী + ঈশ্বর = দিল্লীশ্বর
ঈ + ঈ = ঈ

এরূপ— রবীন্দ্র, প্রতীক্ষা, অতীব, পরীক্ষা ইত্যাদি।

চার : ই-কার কিংবা ঈ-কারের পর ই ও ঈ ভিন্ন অন্য স্বর থাকলে ই/ঈ স্থলে 'য' হয়। 'য' 'য' ফলা অথবা 'য' আকারে পূর্ববর্তী ব্যঞ্জনে অথবা স্বাধীনভাবে যুক্ত হয়।

যেমন : প্রতি + এক = প্রত্যেক, পরি + অন্ত = পর্যন্ত
ই + এ = য + এ  ই + অ = য + অ

এরূপ, প্রত্যূষ, অত্যুক্তি, অত্যন্ত, প্রত্যহ, প্রত্যুপকার

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



পাঁচ : উ-কার কিংবা ঊ-কারের পর উ-কার কিংবা ঊ-কার থাকলে উভয় মিলে ঊ-কার হয়। ঊ-কার পূর্ববর্তী ব্যঞ্জনের সাথে যুক্ত হয়। উ/ঊ + উ/ঊ = ঊ

মরু + উদ্যান = মরূদ্যান

উ + উ = ঊ

ভূ + ঊর্ধ্ব = ভূর্ধ্ব

ঊ + ঊ = ঊ

ছয় : কতগুলো স্বরসন্ধিজাত শব্দ আছে যেগুলো কোনো নিয়ম অনুসারে হয় না, এগুলোকে নিপাতনে সিদ্ধ বলে। যেমন : কুল + অটা = কুলটা অন্য + অন্য = অন্যান্য

গো + অক্ষ = গবাক্ষ শুদ্ধ + ওদন = শুদ্ধোদন

প্র + ঊঢ় = প্রৌঢ়

সাত : ক, চ, ট, ত, প-এর পরে স্বরধ্বনি থাকলে সেগুলো যথাক্রমে গ্, জ্, ড্, (ড়্) দ্, ব্ হয়।

যেমন : দিক্ + অন্ত = দিগন্ত

সুপ্ + অন্ত = সুবন্ত

এরূপ— তদন্ত, কৃদন্ত, সদুপদেশ, সদানন্দ ইত্যাদি।

আট : বিসর্গের পর অঘোষ অল্পপ্রাণ কিংবা মহাপ্রাণ তালব্য ব্যঞ্জনের স্থলে শিশধ্বনি হয়। অঘোষ অল্পপ্রাণ কিংবা অঘোষ মহাপ্রাণ মূর্ধন্য ব্যঞ্জনের স্থলে মূর্ধন্য শিশ ধ্বনি হয়। অঘোষ অল্পপ্রাণ কিংবা অঘোষ মহাপ্রাণ দন্ত্য ব্যঞ্জনের স্থলে দন্ত্য শিশ ধ্বনি হয়।

যেমন : নিঃ + চয় = নিশ্চয় নিঃ + ঠুর = নিষ্ঠুর দুঃ + থ = দুস্থ

শিরঃ + ছেদ = শিরশ্ছেদ ধনু ঃ + টঙ্কার = ধনুষ্টঙ্কার দুঃ + তর = দুস্তর

ঃ + চ/ছ = শ ঃ + ট/ঠ = ষ ঃ + ত/থ = স

নয় : অ-এর পরে বিসর্গ ক, খ, প, ফ থাকলে 'স' এবং অ ভিন্ন অন্য স্বরধ্বনি থাকলে 'ষ' হয়। যেমন–

নমঃ + কার = নমস্কার নিঃ + কর = নিষ্কর

পুর ঃ + কার = পুরস্কার আবিঃ + কার = আবিষ্কার

মন ঃ + কামনা = মনস্কামনা পরিঃ + কার = পরিষ্কার

দশ : নিম্নলিখিত শব্দের ক্ষেত্রে সন্ধির কোনো নিয়ম প্রযোজ্য নয়।

যেমন : প্রাতঃ + কাল = প্রাতঃকাল

মনঃ + কষ্ট = মনঃকষ্ট

শিরঃ + পীড়া = শিরঃপীড়া

মনস্ + ঈষা = মনীষা

পর + পর = পরস্পর

বন + পতি = বনস্পতি



## সন্ধিঘটিত কিছু অশুদ্ধ বাক্যের শুদ্ধিকরণ

১. তোমার তিরস্কার বা পুরস্কার কিছুই চাই না।
শুদ্ধ : তোমার তিরস্কার বা পুরস্কার কিছুই চাই না।

২. প্রাতকালে লোকটি গাত্রোত্থান করে।
শুদ্ধ : প্রাতঃকালে লোকটি গাত্রোত্থান করে।

৩. সে মনকষ্টে গ্রাম ছাড়িল।
শুদ্ধ : সে মনঃকষ্টে গ্রাম ছাড়িল।

৪. প্রত্যপকার মহৎ গুণ।
শুদ্ধ : প্রত্যুপকার মহৎ গুণ।

৫. তপবনে সবাই যেতে চায়।
শুদ্ধ : তপোবনে সবাই যেতে চায়।

৬. তার দুরাবস্থা দেখলে আমার কষ্ট হয়।
শুদ্ধ : তার দুরবস্থা দেখলে আমার কষ্ট হয়।

৭. দৃশ্যটি বড়ই মনরম।
শুদ্ধ : দৃশ্যটি বড়ই মনোরম।

৮. ইতিমধ্যে সে এসে পড়ল।
শুদ্ধ : ইতোমধ্যে সে এসে পড়ল।

৯. নিরোগ লোক প্রকৃত সুখী।
শুদ্ধ : নীরোগ লোক প্রকৃত সুখী।

১০. সে শিরপীড়ায় কষ্ট পাচ্ছে।
শুদ্ধ : সে শিরঃপীড়ায় কষ্ট পাচ্ছে।

## বচনঘটিত ভুল

'বচন' ব্যাকরণের একটি পারিভাষিক শব্দ। এর অর্থ সংখ্যার ধারণা। বাংলায় বহুবচন প্রকাশের জন্য বিভিন্ন ধরনের সমষ্টিবোধক শব্দ ব্যবহৃত হয়। সমষ্টিবোধক শব্দগুলোর বেশির ভাগই তৎসম বা সংস্কৃত ভাষা থেকে আগত।

☐ রা : কেবল উন্নত প্রাণিবাচক শব্দের সাথে 'রা' বিভক্তির ব্যবহার পাওয়া যায়। তবে ক্ষেত্রবিশেষে কবিতা বা অন্যান্য প্রয়োজনে অপ্রাণী ও ইতর প্রাণিবাচক শব্দেও রা, এরা যুক্ত হয়।

উদাহরণ : শিক্ষকেরা জ্ঞান দান করেন।

ছাত্ররা খেলা দেখতে গেছে।

কাকেরা একটি বিরাট সভা করিল। (বিশেষ ক্ষেত্রে)

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



- গুলা, গুলি, গুলো প্রাণিবাচক ও অপ্রাণিবাচক শব্দের বহুবচনে যুক্ত হয়।
  উদাহরণ : আমগুলো টক
  ময়ূরগুলো পুচ্ছ নাড়িয়ে নাচছে।
- উন্নত প্রাণিবাচক মনুষ্য শব্দের বহুবচন গণ, বৃন্দ, মণ্ডলী, বর্গ ইত্যাদি বহুবচনবোধক শব্দ যুক্ত হয়।
  উদাহরণ : শিক্ষকবৃন্দ এখানে উপস্থিত আছেন।
  পণ্ডিতবর্গ পাণ্ডিত্যপূর্ণ কথা বললেন।
  সম্পাদকমণ্ডলীর মতামতই অবশেষে গৃহীত হলো।
- কুল, সকল, সব, সমূহ– এ বহুবচনবোধক শব্দগুলো প্রাণিবাচক ও অপ্রাণিবাচক উভয়ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। যেমন– কবিকুল, পক্ষিকুল, ভাইসব, পাখিসব ইত্যাদি।
- আবলি, গুচ্ছ, দাম, নিকর, পুঞ্জ, মালা, রাজি, রাশি – বহুবচনবোধক এ শব্দগুলো শুধুমাত্র অপ্রাণিবাচক শব্দে ব্যবহৃত হয়। যেমন– পুস্তকাবলি, পর্বতমালা, কুসুমনিচয় ইত্যাদি।
- পাল ও যূথ শব্দ দুটো কেবল জন্তুর বহুবচনে ব্যবহৃত হয়।
  উদাহরণ : রাখাল গরুর পাল লয়ে যায় মাঠে
  হস্তীযূথ মাঠের ফসল নষ্ট করছে।
- একই সঙ্গে দু'বার বহুবচনবাচক প্রত্যয় বা শব্দ ব্যবহৃত হয় না। প্রয়োজনের অতিরিক্ত শব্দ ব্যবহারে বাহুল্য দোষ ঘটে এবং এর ফলে বাক্য তার যোগ্যতা গুণটি হারিয়ে ফেলে।
  উদাহরণ : অশুদ্ধ : সকল ছাত্রদের অবগতির জন্য বিজ্ঞপ্তি দেয়া হয়েছে।
  শুদ্ধ : সকল ছাত্রের অবগতির জন্য বিজ্ঞপ্তি দেয়া হয়েছে।

### বাক্যে বচনঘটিত ভুল

অশুদ্ধ : ক্লাসে অনেক ছাত্রছাত্রীরা এসেছিল।
শুদ্ধ : ক্লাসে অনেক ছাত্রছাত্রী এসেছিল।
অশুদ্ধ : সব সমস্যাগুলোর সমাধান কয়েকদিনের মধ্যে দেয়া চাই।
শুদ্ধ : সব সমস্যার সমাধান কয়েকদিনের মধ্যে দেয়া চাই।
অশুদ্ধ : সকল শিক্ষার্থীগণ পাঠে মনোযোগী নয়।
শুদ্ধ : সকল শিক্ষার্থী পাঠে মনোযোগী নয়।
অশুদ্ধ : তারকাবৃন্দ আকাশে জ্বলজ্বল করছে।
শুদ্ধ : তারকারাজি আকাশে জ্বলজ্বল করছে।
অশুদ্ধ : সকল শিক্ষকগণ এখানে উপস্থিত আছেন।
শুদ্ধ : সকল শিক্ষক এখানে উপস্থিত আছেন।

### পুরুষ ও স্ত্রীবাচক শব্দঘটিত অশুদ্ধি

পুরুষ ও স্ত্রীবাচক শব্দ বাংলা ব্যাকরণের রূপতত্ত্ব অংশে আলোচিত হয়। লিঙ্গভেদ বাংলায় যদিও দিনের পর দিন হ্রাস পাচ্ছে, তবুও প্রথাগত বাংলা ব্যাকরণে লিঙ্গের উল্লেখযোগ্য আলোচনা লক্ষ্য করা যায়। সাধারণত পুংলিঙ্গ থেকে স্ত্রলিঙ্গে অথবা স্ত্রীলিঙ্গ থেকে পুংলিঙ্গের রূপান্তরে আমাদের অশুদ্ধির



বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। পুংলিঙ্গ হতে স্ত্রীলিঙ্গে রূপান্তরকালে মূলশব্দের সাথে বিভিন্ন প্রকার প্রত্যয়, বিভক্তি অথবা অতিরিক্ত শব্দ বা শব্দাংশ যোগ করা হয়। লিঙ্গ রূপান্তরে সহায়ক এসব উপাদান ভুল হলে ব্যাকরণজনিত অশুদ্ধি দেখা দেয়। নিচে গুরুত্বপূর্ণ কিছু রূপান্তর দেয়া হলো :

| পুং. — স্ত্রী | পুং. — স্ত্রী | পুং. — স্ত্রী |
|---|---|---|
| নন্দাই — ননদ | মৃত — মৃতা | নাটক — নাটিকা |
| দেওর — জা/ননদ | বৃদ্ধ — বৃদ্ধা | গীত — গীতিকা |
| বামন — বামনী | চতুর — চতুরা | পুস্তক — পুস্তিকা |
| কামার — কামারনী | নবীন — নবীনা | হিম — হিমানী |
| মজুর — মজুরনী | অজ — অজা | মেধাবী — মেধাবিনী |
| ভিখারী — ভিখারিনী | শিষ্য — শিষ্যা | শ্রোতা — শ্রোত্রী |
| চাকর — চাকরানী | নিশাচর — নিশাচরী | সভাপতি — সভানেত্রী |
| কাঙাল — কাঙালিনী | রজক — রজকী | বিদ্বান — বিদুষী |
| অভাগা — অভাগী/অভাগিনী | সহপাঠী — সহপাঠিনী | তনয় — তনয়া |
| বিরহী — বিরহিনী | অনুজ — অনুজা | তনু — তন্বী |
| অধম — অধমা | ক্ষুদ্র — ক্ষুদ্রা | পিশাচ — নিশাচী |
| সুকেশ — সুকেশা | হরিণ — হরিণী | পাচক — পাচিকা |
| বিহঙ্গ — বিহঙ্গী | চাতক — চাতকী | |

- বিধেয় বিশেষণ অর্থাৎ বিশেষ্যের পরবর্তী বিশেষণও স্ত্রীবাচক হয় না।
  যেমন : মেয়েটি পাগল হয়ে গেছে। (পাগলি হবে না)
  আসমা ভয়ে অস্থির। (অস্থিরা হবে না)

### লিঙ্গঘটিত কিছু অশুদ্ধ বাক্য শুদ্ধিকরণ

১. ছোট নাটকটি সবাইকে মুগ্ধ করল।
   শুদ্ধ : নাটিকাটি সবাইকে মুগ্ধ করল।
২. সে এমন রূপসী যেন অপ্সরী।
   শুদ্ধ : সে এমন রূপবতী যেন অপ্সরা।
৩. রুনা তার প্রেমিকার জন্য পাগলী হয়ে গেছে।
   শুদ্ধ : রুনা তার প্রেমিকের জন্য পাগল হয়ে গেছে।
৪. আমি ঘুরিফিরি রজকিনীর আশে।
   শুদ্ধ : আমি ঘুরিফিরি রজকীর আশে।
৫. সিংহিনী দেখে সিংহটি অগ্রসর হলো।
   শুদ্ধ : সিংহী দেখে সিংহটি অগ্রসর হলো।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



## প্রত্যয়ঘটিত কিছু অশুদ্ধ বাক্যের শুদ্ধিকরণ

১. এই কথা প্রমাণ হয়েছে।
শুদ্ধ : এই কথা প্রমাণিত হয়েছে।

২. ইহার আবশ্যক নেই।
শুদ্ধ : ইহার আবশ্যকতা নাই।

৩. আবশ্যকীয় ব্যয়ে কার্পণ্যতা অনুচিত।
শুদ্ধ : আবশ্যক ব্যয়ে কার্পণ্য অনুচিত।

৪. আধুনিক চেতনাই এই কবির বৈশিষ্টতা।
শুদ্ধ : আধুনিক চেতনাই এ কবির বৈশিষ্ট্য।

৫. ঘটনাটি শুনিয়া গ্রামবাসী আশ্চর্যান্বিত হয়ে গেল।
শুদ্ধ : ঘটনাটি শুনে গ্রামবাসী আশ্চর্য হয়ে গেল।

৬. দারিদ্র্যতার মধ্যেই মহত্ত্ব আছে।
শুদ্ধ : দারিদ্র্যের মধ্যেই মহত্ত্ব আছে।/ দরিদ্রতার মধ্যেই মহত্ত্ব আছে।

৭. একটা গোপন কথা বলি।
শুদ্ধ : একটা গোপনীয় কথা বলি।

৮. আমি বড় অপমান হয়েছি।
শুদ্ধ : আমি বড় অপমানিত হয়েছি।

৯. দৈন্যতা প্রশংসনীয় নয়।
শুদ্ধ : দীনতা প্রশংসনীয় নয়।

১০. প্রতিযোগীতায় ইলার নাম নেই।
শুদ্ধ : প্রতিযোগিতায় ইলার নাম নেই।

## বিভক্তিজনিত অশুদ্ধি

ধাতু উত্তর যেসব বর্ণ বা বর্ণসমষ্টি যুক্ত হয়ে ক্রিয়া গঠিত হয়, ঐসব বর্ণ বা বর্ণসমষ্টিকে ক্রিয়া বিভক্তি বলে। আর শব্দোত্তর যেসব বর্ণ বা বর্ণসমষ্টি যুক্ত হয়ে শব্দ গঠন করে ঐ সব বর্ণ বা বর্ণসমষ্টিকে শব্দ বিভক্তি বলে। বাক্যের একটি শব্দের সাথে অন্য শব্দের সম্পর্ক স্থাপনে বিভক্তির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। সংক্ষেপে বলা যায়, বাক্যস্থিত এক পদের সাথে অন্য পদের সম্পর্ক স্থাপনের জন্য যেসব বর্ণ বা বর্ণসমষ্টি যুক্ত হয় তাই বিভক্তি। বিভক্তির অপপ্রয়োগে অনেক সময় ভাষার অশুদ্ধি ঘটে।

উদাহরণ :

অশুদ্ধ : বালকরা খেলাধুলায় পটু।
শুদ্ধ : বালকেরা খেলাধুলায় পটু।

অশুদ্ধ : রসমালাই ভালো পাওয়া যায় কুমিল্লা।
শুদ্ধ : রসমালাই ভালো পাওয়া যায় কুমিল্লায়।



অশুদ্ধ : শ্রমিকরা ধর্মঘট নিষিদ্ধের প্রতিবাদে সভা করেছে।
শুদ্ধ : শ্রমিকরা ধর্মঘট নিষিদ্ধ করার প্রতিবাদে সভা করেছে।

অশুদ্ধ : টাঙ্গাইল চমচম দেশখ্যাত।
শুদ্ধ : টাঙ্গাইলের চমচম দেশখ্যাত।

## সমাসঘটিত অশুদ্ধি

সমাস অনেকের কাছে দুর্বোধ্য বলে মনে হয়; সে কারণে বাক্যে সমাসঘটিত অশুদ্ধি লক্ষ্য করা যায়। সমাসঘটিত অশুদ্ধির ক্ষেত্রে যেটা বেশি দেখা যায় সেটা হচ্ছে সমস্তপদের মাঝখানে ফাঁকা রাখা। সমস্তপদ সবসময় একসাথে লিখতে হবে। বিশেষ প্রয়োজনে সমাসবদ্ধ পদটিকে একটি, কখনো একটির বেশি হাইফেন (-) দিয়ে যুক্ত করা যায়। যেমন : বিষাদমণ্ডিত, সংযতবাক, মা-মেয়ে ইত্যাদি। 'সহ' কিংবা 'সহিত' শব্দের সাথে অন্য পদের বহুব্রীহি সমাস হলে 'সহ' ও 'সহিত'-এর স্থলে 'স' হয়। যেমন : বন্ধুর সহিত বর্তমান– সবান্ধব।

**সমাসঘটিত কিছু অশুদ্ধ বাক্য শুদ্ধকরণ :**

১. সংবাদ পত্র না পড়লে কিছু জানা যায় না।
শুদ্ধ : সংবাদপত্র না পড়লে কিছু জানা যায় না।

২. তিনি স্বস্ত্রীক কুমিল্লা বাস করেন।
শুদ্ধ : তিনি সস্ত্রীক কুমিল্লা বাস করেন।

৩. আকণ্ঠ পর্যন্ত ভোজনে স্বাস্থ্যহানি ঘটে।
শুদ্ধ : আকণ্ঠ ভোজনে স্বাস্থ্যহানি ঘটে।

৪. ছেলে ভুলানো ছড়াটি বলত দেখি।
শুদ্ধ : ছেলেভুলানো ছড়াটি বলত দেখি।

৫. বৃক্ষটি সমূলসহ উৎপাটিত হইয়াছে।
শুদ্ধ : বৃক্ষটি মূলসহ/সমূলে উৎপাটিত হয়েছে।

৬. আবাল্য হইতে তিনি কাব্যপ্রিয়।
শুদ্ধ : বাল্য হইতেই তিনি কাব্য প্রিয়।

## শব্দ প্রয়োগজনিত শুদ্ধিকরণ

১. বাজীকরের অদ্ভুত ক্রিয়া দেখিয়া ছাত্রগণেরা প্রফুল্লিত হল।
শুদ্ধ : বাজীকরের অদ্ভুত খেলা দেখে ছাত্ররা প্রফুল্ল হলো।

২. অর্ধাঙ্গিনীর অশ্রুজল দেখে স্বামী শোকে মূহ্যমান হলেন।
শুদ্ধ : অর্ধাঙ্গীর অশ্রু দেখে স্বামী শোকে মুহ্যমান হলেন।

৩. তার বৈমাত্রেয় সহোদর অসুস্থ হয়ে চলদশক্তি হারিয়েছেন।
শুদ্ধ : তার বৈমাত্রেয় ভাই অসুস্থ হয়ে চলনশক্তি হারিয়েছেন।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



৪. এই দুর্ঘটনা দৃষ্টে আমার হৃৎকম্প উপস্থিত হইল।
শুদ্ধ : এ দুর্ঘটনা দেখে আমার হৃদকম্প শুরু হলো।

৫. মনোনীত কবিতা হতে একখানা বেছে নাও এবং আবৃত্তি করিয়া পড়।
শুদ্ধ : নির্বাচিত কবিতা থেকে একটি বেছে নাও এবং আবৃত্তি কর।

৬. তিনি অনাথিনী আসামির স্বপক্ষে সাক্ষী দিলেন।
শুদ্ধ : তিনি অনাথা আসামীর পক্ষে সাক্ষ্য দিলেন।

৭. সদ্যজাত শিশুর সর্বাঙ্গীন কুশল কামনা করে তিনি কাব্য রচনা করেছেন।
শুদ্ধ : নবজাত শিশুর সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ কামনা করে তিনি কবিতা রচনা করেছেন।

৮. ইতিপূর্বে তিনি স্বস্ত্রীক বেড়াতে এসেছিলেন।
শুদ্ধ : ইতোপূর্বে তিনি সস্ত্রীক বেড়াতে এসেছিলেন।

৯. সমৃদ্ধশালী বাংলাদেশ আমাদের একান্তভাবেই কাম্য।
শুদ্ধ : সমৃদ্ধ বাংলাদেশ আমাদের একান্তই কাম্য।
শুদ্ধ : সমৃদ্ধিশালী বাংলাদেশ আমাদের একান্তই কাম্য।

১০. সে যে শিক্ষকের একান্ত বাধ্যগত ছাত্র তা প্রমান হয়েছে।
শুদ্ধ : সে যে শিক্ষকের একান্ত বাধ্য ছাত্র তা প্রমাণিত হয়েছে।

১১. পড়াশুনায় বেলালের মনোযোগিতা নেই কিন্তু ব্যবহারেও মাধুর্যতা নেই।
শুদ্ধ : পড়াশুনায় বেলালের মনোযোগ নেই এমনকি ব্যবহারেও মধুরতা/মাধুর্য নেই।

১২. বঙ্কিমচন্দ্র বিদ্যাণ ছিলো এবং তাঁর ভয়ঙ্কর প্রতিভা ছিল।
শুদ্ধ : বঙ্কিমচন্দ্র বিদ্বান ছিলেন এবং তাঁর অসাধারণ প্রতিভা ছিল।

১৩. এই লেখাটি ভাবগম্বীর, তবে ভাষার দৈন্যতা রয়েছে।
শুদ্ধ : এ লেখা ভাবগম্ভীর, তবে ভাষায় দীনতা রয়েছে।

১৪. উন্নতশীল রাষ্ট্রের নাগরিকগণদের পরিশ্রমি হওয়া আবশ্যক।
শুদ্ধ : উন্নয়নশীল রাষ্ট্রের নাগরিকগণের পরিশ্রমী হওয়া আবশ্যক।

১৫. আকন্ট পর্যন্ত ভোজনে স্বাস্থহানি ঘটে।
শুদ্ধ : আকণ্ঠ ভোজনে স্বাস্থ্যহানী ঘটে।

১৬. সে অপমান হয়েছে, এ ঘটনা আমি চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করিয়াছি।
শুদ্ধ : সে অপমানিত হয়েছে, এ ঘটনা আমি প্রত্যক্ষ করেছি।

১৭. তিনি শিরোপীড়ায় ভুগছিলেন, কিছুক্ষণ যাবৎ আরোগ্য হইয়াছেন।
শুদ্ধ : তিনি শিরঃপীড়ায় ভুগছিলেন, কিছুদিন হলো আরোগ্য লাভ করিয়াছেন।

১৮. উৎপন্ন বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজন জটিল পরিশ্রম এবং দুর্দান্ত মেধাবী শ্রমিকের।
শুদ্ধ : উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজন কঠোর পরিশ্রম এবং অত্যন্ত মেধাবী শ্রমিকের।

১৯. আপনার জ্ঞাতার্থে লিখলাম, সে কৃতকার্যতার সাথে কাজটি করেছে।
শুদ্ধি : আপনার অবগতির জন্য লিখলাম, সে কৃতিত্বের সাথে কাজটি করেছে।



২০. সীমার উদ্ধত্যপূর্ণ ব্যবহারে ব্যথিত হয়েছি কিন্তু শিমুর সৌজন্যতায় মুগ্ধ হয়েছি।
শুদ্ধ : সীমার ঔদ্ধত্যপূর্ণ/উদ্ধত্য ব্যবহারে ব্যথিত হয়েছি কিন্তু শিমুর সৌজন্যে মুগ্ধ হয়েছি।

২১. সামান্য ব্যাপারটাকে অদ্ভূতভাবে বাড়িয়ে তোলা মানেই সরিষাকে তিল করে তোলা।
শুদ্ধ : সামান্য ব্যাপারকে অদ্ভুতভাবে বাড়িয়ে তোলা মানে তিলকে তাল করে তোলা।

২২. সুখ-দুঃখের অনুভুতি ধনী-নির্ধনী সকলেরই সমান।
শুদ্ধ : সুখ-দুঃখের অনুভূতি ধনী-নির্ধন সকলেরই একরূপ।

২৩. নিরপরাধী, নিস্পাপীকে শাস্তি দেবে কেন?
শুদ্ধ : নিরপরাধ নিষ্পাপকে শাস্তি দেবে কেন?

২৪. দারিদ্র্যতার মধ্যেই মহত্ব আছে।
শুদ্ধ : দরিদ্রতার মধ্যেই মহত্ত্ব আছে/দারিদ্র্যের মধ্যেই মহত্ত্ব আছে।

২৫. সাপ হয়ে কাটো তুমি, কবিরাজ হয়ে ঝাড়ো।
শুদ্ধ : সাপ হয়ে কাটো তুমি, ওঝা হয়ে ঝাড়ো।

২৬. ইহা অতি লজ্জাস্কর ব্যাপার।
শুদ্ধ : ইহা অতি লজ্জাকর ব্যাপার।

২৭. তিনি আরোগ্য হইয়াছেন।
শুদ্ধ : তিনি আরোগ্য লাভ করিয়াছেন।

২৮. সবিনয়ে বা সবিনয়পূর্বক নিবেদন করছি।
শুদ্ধ : সবিনয় নিবেদন বা বিনয়পূর্বক নিবেদন করছি।

২৯. আমার সাবকাশ নাই।
শুদ্ধ : আমার অবকাশ নাই।

৩০. উপরোক্ত বাক্যটি শুদ্ধ নয়।
শুদ্ধ : উপর্যুক্ত বাক্যটি শুদ্ধ নয়।

৩১. বাংলাদেশ সমৃদ্ধশালী দেশ।
শুদ্ধ : বাংলাদেশ সমৃদ্ধ দেশ।

৩২. অন্যায়ের প্রতিফল দুর্নিবার্য।
শুদ্ধ : অন্যায়ের প্রতিফল দুর্নিবার।

৩৩. তাহার সৌজন্যতা ভুলতে পারব না।
শুদ্ধ : তার সৌজন্য ভুলতে পারব না।

৩৪. এ কাজ করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।
শুদ্ধ : এ কাজ করা আমার পক্ষে সম্ভবপর নয়।

৩৫. তাহার সমতুল্য জ্ঞানী এখানে নাই।
শুদ্ধ : তাহার তুল্য জ্ঞানী বা সমান জ্ঞানী এইখানে নাই।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



## বাক্যের পদক্রমজনিত অশুদ্ধি

প্রত্যেক ভাষার বাক্যের গঠনের তথা পদবিন্যাসের একটি সাধারণ নিয়ম আছে। বাংলা ভাষাও এ নিয়মের বাইরে নয়। বাক্যে শব্দের পদবিন্যাসের ওপর বাক্যের অর্থ নির্ভরশীল বলে অনেক সময় কোনো শব্দের অবস্থান পরিবর্তনের ফলে বাক্যের অর্থ সম্পূর্ণ বদলে যেতে পারে। এ কারণে প্রয়োজনীয় শব্দ সঠিক স্থানে ব্যবহার করা উচিৎ। উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টি স্পষ্ট করা হলো :

১. মানুষ বাঘের মাংস খায়।
শুদ্ধ : বাঘ মানুষের মাংস খায়।

২. সে হাবুডুবু সাগরে দুঃখ খাচ্ছে।
শুদ্ধ : সে দুঃখের সাগরে হাবুডুবু খাচ্ছে।

৩. আমি করব না কাজ এমন আর।
শুদ্ধ : আমি এমন কাজ আর করব না।

৪. শাড়ি পরা লাল মেয়েটিকে আমি ভালোভাবে চিনি না।
শুদ্ধ : লাল শাড়ি পরা মেয়েটিকে আমি ভালোভাবে চিনি না।

৫. পড়ুয়া বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থী আজকাল রাজনীতিতে বেশি মনযোগী।
শুদ্ধ : বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া শিক্ষার্থী আজকাল রাজনীতিতে বেশি মনযোগী।

৬. স্পষ্ট কথা বলার সময় বাক্যের প্রকাশের জন্য অর্থ বিভিন্ন স্থানে থামতে হয়।
শুদ্ধ : কথা বলার সময় স্পষ্ট অর্থ প্রকাশের জন্য বাক্যের বিভিন্ন স্থানে থামতে হয়।

৭. প্রত্যেক পদ বিন্যাসের ভাষার বাক্যের গঠনের তথা একটি সাধারণ নিয়ম আছে।
শুদ্ধ : প্রত্যেক ভাষার বাক্যের গঠনের তথা পদ বিন্যাসের একটি সাধারণ নিয়ম আছে।

৮. তারপরে জানালার বাইরে বন্ধ করে ঝাপসা সেলাই গাছগুলোর দিকে চেয়ে রইল।
শুদ্ধ : তারপরে সেলাই বন্ধ করে জানালার বাইরে ঝাপসা গাছগুলোর দিকে চেয়ে রইল।

৯. চিত্রকর ছবি আঁকার ফাঁকে একজন ফাঁকে সনেট প্রায়ই লিখতেন।
শুদ্ধ : একজন চিত্রকর ছবি আঁকার ফাঁকে ফাঁকে প্রায়ই সনেট লিখতেন।

১০. যে সমাধান এখনো হয়নি তার প্রশ্নের বৈজ্ঞানিক সমাধান উত্তর দেয়া অবশ্য অসম্ভব।
শুদ্ধ : যে প্রশ্নের বৈজ্ঞানিক সমাধান এখনো হয়নি তার উত্তর দেয়া অবশ্য অসম্ভব।

১১. সে সুন্দর ধরণীকে ফেলে এ দুঃখের স্বর্গলোকে যেতে চায় না।
শুদ্ধ : সে এ দুঃখের ধরণিকে ফেলে সুন্দর স্বর্গলোকে যেতে চায় না।

১২. প্রকৃতি প্রদত্ত সাহিত্যিক হইতে প্রতিভা না থাকিলে কেহ পারেন না।
শুদ্ধ : প্রকৃতি প্রদত্ত প্রতিভা না থাকিলে কেহ সাহিত্যিক হইতে পারেন না।

১৩. জীব আপনাকে প্রকাশ করতে যুগ-যুগান্তরের ভেতর দিয়ে চায়।
শুদ্ধ : জীব যুগ-যুগান্তরের ভেতর দিয়ে আপনাকে প্রকাশ করতে চায়।



১৪. সংসারে যাওয়ার মত বিরক্তিকর আর কিছু অবুঝকে বুঝাতে নেই।
শুদ্ধ : সংসারে অবুঝকে বোঝাতে যাওয়ার মতো বিরক্তিকর আর কিছু নেই।

১৫. জলের তীরে তীরে ধারে মাঠে মাঠে গরু চরাইতেছে রাখালরা।
শুদ্ধ : জলের ধারে তীরে তীরে মাঠে মাঠে রাখালরা গরু চরাইতেছে।

১৬. আমাদের একান্ত প্রয়োজন পরীক্ষাবিদ্যা পক্ষে শেখা হয়ে পড়েছে।
শুদ্ধ : আমাদের পক্ষে পরীক্ষা-বিদ্যা শেখা একান্ত প্রয়োজন হয়ে পড়েছে।

১৭. পিটারের ভিতরে ভিতরে বুঝিতে পারে না যে কি রকম একটা কষ্ট হইতে থাকে।
শুদ্ধ : পিটারের ভিতরে ভিতরে কিরকম একটা কষ্ট হইতে থাকে, সে বুঝিতে পারে না।

১৮. উচ্চ শিক্ষাকে দেশের জিনিস আমাদের দেশের ভাষায় করে নিতে হবে।
শুদ্ধ : উচ্চ শিক্ষাকে আমাদের দেশের ভাষায় দেশের জিনিস করে নিতে হবে।

১৯. হাতের ও পিঠের মাংসপেশী প্রতিটি অঙ্গ সঞ্চালনে নেচে উঠতে লাগল।
শুদ্ধ : প্রতিটি অঙ্গ সঞ্চালনে হাত ও পিঠের মাংসপেশী নেচে উঠতে লাগল।

২০. ঘোড়ায় চড়া ব্যক্তি সামনে লাফ দিয়ে বিপদ দেখে মাটিতে নামলেন।
শুদ্ধ : সামনে বিপদ দেখে ঘোড়ায় চড়া ব্যক্তি লাফ দিয়ে মাটিতে নামলেন।

২১. বিষবৃক্ষের কুঠারাঘাত মূলে করেছিলেন এই টেকচাঁদ ঠাকুর প্রথমে।
শুদ্ধ : টেকচাঁদ ঠাকুর প্রথমে এ বিষবৃক্ষের মূলে কুঠারাঘাত করেছিলেন।

২২. সিংহলে থেকে একজন রাজপুত গিয়ে বাংলাদেশে স্থাপন করেছিলেন উপনিবেশ।
শুদ্ধ : বাংলাদেশ থেকে একজন রাজপুত সিংহলে গিয়ে উপনিবেশ স্থাপন করেছিলেন।

২৩. তাহার সম্পদের অভাব নাই কিন্তু ভাব চিত্তে যেন তাহা প্রকাশিত হচ্ছে না।
শুদ্ধ : তাহার চিত্তে ভাবসম্পদের অভাব নাই কিন্তু কেন যেন তাহা প্রকাশিত হইতেছে না।

২৪. বাল্যের পাশে আমরা তার মিলন সাধন বার্ধক্যকে এনে ফেললেও করতে পারিনে।
শুদ্ধ : বার্ধক্যকে বাল্যের পাশে এনে ফেললেও আমরা তার মিলন সাধন করতে পারিনে।

২৫. ধরনীর স্পর্শে বসন্তের সর্বাঙ্গ শিউরে ওঠে।
শুদ্ধ : বসন্তের স্পর্শে ধরণির সর্বাঙ্গ শিউরে ওঠে।

২৬. নায়কদের মধ্যে বাংলাদেশের আলমগীর আমার প্রিয়।
শুদ্ধ : বাংলাদেশের নায়কদের মধ্যে আলমগীর আমার প্রিয়।

২৭. এখানে খাঁটি গরুর দুধ পাওয়া যায়।
শুদ্ধ : এখানে গরুর খাঁটি দুধ পাওয়া যায়।

২৮. আশ্চর্য এমন কথা তো আগে শুনিনি।
শুদ্ধ : এমন আশ্চর্য কথা তো আগে শুনিনি।

২৯. তোমার আল্লাহ্ সহায় হোন।
শুদ্ধ : আল্লাহ্ তোমার সহায় হোন।

৩০. বাণিজ্যমেলা মাসব্যাপী আগারগাঁওয়ে অনুষ্ঠিত হবে।
শুদ্ধ : মাসব্যাপী বাণিজ্যমেলা আগারগাঁওয়ে অনুষ্ঠিত হবে।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



## প্রবাদ-প্রবচনজনিত অশুদ্ধি

প্রবাদ-প্রবচন বাংলা ভাষার এক অমূল্য সম্পদ। যুগ যুগ ধরে এগুলো লোকমুখে চর্বিত, লালিত, সংরক্ষিত হয়ে আসছে। যুগ যুগান্তরে প্রচলিত প্রবাদের যথেচ্ছ বিকৃতি বা পরিবর্তন চলে না। প্রবাদ-প্রবচনের বিকৃত প্রয়োগ বাক্য অশুদ্ধির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। যেমন :

১. তপ্ত ভাতে নুন জোটে না, ঠাণ্ডা ভাতে ঘি।
শুদ্ধ : তপ্ত ভাতে নুন জোটে না, পান্তা ভাতে ঘি।
২. নগদ বিক্রি পেটে ভাত বাকি বিক্রি পিঠে হাত।
শুদ্ধ : নগদ বিক্রি পেটে ভাত, বাকি বিক্রি মাথায় হাত।
৩. পরের মাথায় বন্দুক রেখে শিকার।
শুদ্ধ : পরের কাঁধে বন্দুক রেখে শিকার।
৪. গৃহস্থের খেয়ে বনের মোষ তাড়াতে পারব না।
শুদ্ধ : ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়াতে পারব না।
৫. ইট মারলে ইট খেতে হয়।
শুদ্ধ : ইট মারলে পাটকেলটি খেতে হয়।
৬. ভাত ছড়ালে শালিখের অভাব হয় না।
শুদ্ধ : ভাত ছড়ালে কাকের অভাব হয় না।
৭. যার লাঠি, তার ঘাঁটি।
শুদ্ধ : যার লাঠি, তার মাটি।

## বাংলা একাডেমির প্রমিত বাংলা বানানের নিয়ম

বাংলা ব্যাকরণের বিভিন্ন সূত্র ছাড়াও বাংলা বানানের বিভিন্ন নিয়ম-পদ্ধতি শুদ্ধ বাক্য গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। তাই বাক্য শুদ্ধিকরণে বাংলা বানানের নিয়মগুলো জানা প্রয়োজন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড বাংলা বানানের শৃঙ্খলার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। পরবর্তী সময়ে বাংলা একাডেমি বিভিন্ন বানান রীতি সমন্বয় করে একটি বানান রীতি লিপিবদ্ধ করেন। নিচে বাংলা একাডেমির প্রমিত বাংলা বানানের নিয়মের গুরুত্বপূর্ণ অংশ সংক্ষেপে তুলে ধরা হলো :

### তৎসম শব্দ

১. তৎসম অর্থাৎ বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত অবিকৃত সংস্কৃত শব্দের বানান যথাযথ ও অপরিবর্তিত থাকবে। তবে এই বানানরীতিতে যেসব ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম প্রস্তাবিত হয়েছে, তা অনুসৃত হবে।
২. যেসব তৎসম শব্দে ই ঈ বা উ ঊ উভয়ই শুদ্ধ সেইসব শব্দে কেবল ই, উ অথবা এর 'কার' চিহ্ন ব্যবহৃত হবে। যেমন : পদবি, ধমনি, সূচিপত্র, ঊষা ইত্যাদি।
৩. রেফ (র্)-এর পর ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বিত্ব হবে না। যেমন : কার্য, সূর্য, অর্থ ইত্যাদি।
৪. ক, খ, গ, ঘ পরে থাকলে পদের অন্তস্থিত ম্ স্থানে অনুস্বার (ং) লেখা যাবে। যেমন : অহংকার, সংগীত; বিকল্পে 'ঙ' লেখা যাবে। 'ক্ষ'-এর পূর্বে সর্বত্র ঙ্ হবে। যেমন : আকাঙ্ক্ষা।



### অ-তৎসম অর্থাৎ তদ্ভব, দেশী, বিদেশী, মিশ্র শব্দ

১. সকল অ-তৎসম শব্দে কেবল ই ও উ এবং এদের কার চিহ্ন ি ু ব্যবহৃত হবে। এমনকি স্ত্রীবাচক ও জাতিবাচক ইত্যাদি শব্দের ক্ষেত্রেও এই নিয়ম প্রযোজ্য হবে। যেমন : গাড়ি, বাড়ি, শাড়ি, হিজরি, বাঙালি, মুলা, পুজো ইত্যাদি।
২. 'আলি' প্রত্যয়যুক্ত শব্দে ই-কার হবে। বর্ণালি, সোনালি, মিতালি ইত্যাদি।
৩. সর্বনাম পদরূপে এবং বিশেষণ ও ক্রিয়া বিশেষণ পদরূপে 'কী' শব্দটি ঈ-কার দিয়ে লেখা হবে। যেমন : কী করছ? কী আর বলব?
অন্যক্ষেত্রে অব্যয় পদরূপে ই-কার দিয়ে কি শব্দটি লেখা হবে।
৪. ক্ষীর, ক্ষুর, ক্ষেত শব্দ খির, খুর, খেত না লিখে ক্ষীর, ক্ষুর, ক্ষেত-ই লেখা হবে।
৫. তৎসম শব্দের বানানে মূর্ধন্য 'ণ' ও মূর্ধন্য 'ষ'-এর ব্যবহার সঠিকভাবে করতে হবে। এক্ষেত্রে ণত্ব-বিধান ও ষত্ব-বিধানের নিয়ম মেনে চলতে হবে। তবে অ-তৎসম শব্দে এ বিধানের ব্যবহার নেই।
৬. ইংরেজি ও ইংরেজির মাধ্যমে আগত বিদেশী 's' বর্ণ বা ধ্বনির জন্য 'স' এবং sh,-sion, -ssion, -tion, প্রভৃতি বর্ণগুচ্ছ বা ধ্বনির জন্য স ব্যবহৃত হবে।
৭. তৎসব শব্দের অনুরূপ বানানের ক্ষেত্রে যেমন পূর্বে বলা হয়েছে, অ-তৎসম সকল শব্দেও রেফের পর ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বিত্ব হবে না। যেমন : কর্জ, মর্দ ইত্যাদি।
৮. শব্দের শেষে বিসর্গ (ঃ) থাকবে না। যেমন : কার্যত, মূলত, বস্তুত, প্রায়শ ইত্যাদি। তবে যেসব শব্দের শেষে বিসর্গ না থাকলে অর্থের বিভ্রান্তি ঘটার আশঙ্কা থাকে, সেখানে শব্দ শেষের বিসর্গ থাকবে। যেমন : পুনঃ পুনঃ।
৯. - আনো প্রত্যয়ান্ত শব্দের শেষে 'ো'-কার যুক্ত করা হবে। যেমন : করানো, নামানো ইত্যাদি।
১০. হস্ চিহ্ন যথাসম্ভব বর্জন করা হবে। যেমন : চট, কলকল, তছনছ ইত্যাদি। তবে ভুল উচ্চারণের আশঙ্কা থাকলে হস্ চিহ্ন ব্যবহার করা যেতে পারে। যেমন– কর্, বল্।
১১. ঊর্ধ্বকমা যথাসম্ভব বর্জন করা হবে। যেমন– দু'শত-দুশত ইত্যাদি।

### বিবিধ

১. সমাসবদ্ধ পদগুলো একসঙ্গে লিখতে হবে, মাঝখানে ফাঁক রাখা চলবে না। যেমন– সংবাদপত্র, লক্ষ্যভ্রষ্ট।
২. নাই, নেই, না, নি এই নঞর্থক অব্যয় পদগুলো শব্দের শেষে একসাথে যুক্ত না হয়ে পৃথক থাকবে। যেমন : যাই নি, বলে নি, ভয় নেই ইত্যাদি।
৩. লেখক ও কবি নিজেদের নামের বানান যেভাবে লিখেন বা লিখতেন, সেভাবে লিখতে হবে।

<u>উদাহরণ</u>

১. দারিদ্রতা মধুসুদনের শেষ জীবন ঘিরে ফেলেছিল।
শুদ্ধ : দারিদ্র্য মধুসূদনের শেষ জীবন ঘিরে ফেলেছিল।
২. কীর্তিবাস বাংলা রামায়ন লিখেছেন।
শুদ্ধ : কৃত্তিবাস বাংলা রামায়ণ লিখেছেন।
৩. মুমূর্ষ ব্যক্তির প্রতি সকলের সহানুভূতি ছিল।
শুদ্ধ : মুমূর্ষু ব্যক্তির প্রতি সকলের সহানুভূতি ছিল।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



৪. সে পূর্বাহ্নে এসে মধ্যাহ্ন কাটিয়ে অপরাহ্নের পর সায়াহ্নে চলে গেল।
শুদ্ধ : সে পূর্বাহ্ণে এসে মধ্যাহ্ন কাটিয়ে অপরাহ্ণের পর সায়াহ্নে চলে গেল।

৫. যশলাভ করার জন্য তার আকাঙ্খা খুব বেশি।
শুদ্ধ : যশোলাভ করার জন্য তার আকাঙ্ক্ষা খুব বেশি।

৬. এই দুর্ঘটনা দৃষ্টে আমার হৃদকম্প উপস্থিত হল।
শুদ্ধ : এই দুর্ঘটনা দর্শনে আমার হৃৎকম্প শুরু হল।

৭. অভাবগ্রস্থ ছেলেটি তার দুরাবস্থার কথা বর্ণনা করল।
শুদ্ধ : অভাবগ্রস্ত ছেলেটি তার দুরবস্থার কথা বর্ণনা করল।

৮. তোমার তিরষ্কার বা পুরষ্কার কিছুই চাই না।
শুদ্ধ : তোমার তিরস্কার বা পুরস্কার কিছুই চাই না।

৯. মানুষের বড় বড় সভ্যতা এ শক্তির প্রভাবেই পূর্ন মাহাত্য লাভ করেছে।
শুদ্ধ : মানুষের বড় বড় সভ্যতা এ শক্তির প্রভাবেই পূর্ণ মাহাত্ম্য লাভ করেছে।

১০. সূর্য কেন কিরন দিচ্ছে না, তার কারণ কে জানে?
শুদ্ধ : সূর্য কেন কিরণ দিচ্ছে না, তার কারণ কে জানে?

১১. ত্রানসামগ্রী সুসম বন্টনের আভাস দেয়া হয়েছে।
শুদ্ধ : ত্রাণসামগ্রীর সুষম বণ্টনের আভাষ দেয়া হয়েছে।

১২. যক্ষার প্রতিসেধক টিকা আবিকৃত হয়েছে।
শুদ্ধ : যক্ষ্মার প্রতিষেধক টিকা আবিষ্কৃত হয়েছে।

১৩. সে কৌতূক করার কৌতুহল সম্বরন করতে পারল না।
শুদ্ধ : সে কৌতুক করার কৌতূহল সংবরণ করতে পারল না।

১৪. সবিনয়ে বা সবিনয়পূর্বক নিবেদন করছি।
শুদ্ধ : সবিনয় নিবেদন বা বিনয়পূর্বক নিবেদন করছি।

১৫. উপরোক্ত বাক্যটি সুদ্ধ নয়।
শুদ্ধ : উপর্যুক্ত বাক্যটি শুদ্ধ নয়।

১৬. গীতাঞ্জলী নামে রবীঠাকুর একখানা কাব্য লিখেছেন।
শুদ্ধ : গীতাঞ্জলি নামে রবি ঠাকুর একখানা কাব্য লিখেছেন।

১৭. ইতিপূর্বে মন্ত্রীসভায় বিষয়টি সুপারিস করা হয়েছে।
শুদ্ধ : ইতঃপূর্বে মন্ত্রিসভায় বিষয়টি সুপারিশ করা হয়েছে।

১৮. মনোযোগি শিক্ষার্থীদের শিক্ষকরা সহযোগিতা করেন।
শুদ্ধ : মনোযোগী শিক্ষার্থীদের শিক্ষকরা সহযোগিতা করেন।

১৯. অনুবাদিত রচনাটির উৎকর্ষতা সবাইকে আকৃষ্ট করেছে।
শুদ্ধ : অনূদিত রচনাটির উৎকর্ষ সবাইকে আকৃষ্ট করেছে।

২০. জোতিষী বিদূষী মহিলাটির হস্তগননা করল।
শুদ্ধ : জ্যোতিষী বিদুষী মহিলাটির হস্তগণনা করল।



২১. নীরিহ কনষ্টেবল তার ভূল শিকার করল।
শুদ্ধ : নিরীহ কনস্টেবল তার ভুল স্বীকার করল।

২২. উপন্যাসিকের সাথে সমালোচক একটি বিষয়ে ঐক্যমতে পৌছেছেন।
শুদ্ধ : ঔপন্যাসিকের সাথে সমালোচক একটি বিষয়ে ঐকমত্য পৌঁছেছেন।

২৩. সদ্যজাত শিশুটি হৃদপিন্ডের সমস্যায় ভুগছে।
শুদ্ধ : সদ্যোজাত শিশুটি হৃৎপিণ্ডের সমস্যায় ভুগছে।

২৪. তিনি স্বস্ত্রীক ষ্টেশনে গেলেন।
শুদ্ধ : তিনি সস্ত্রীক স্টেশনে গেলেন।

২৫. সন্মান, সান্তনা, প্রতিযোগীতা, জাতী, মুহুর্ত, সমিচিন ইত্যাদি শব্দগুলি আজকাল অনেক ছাত্র-ছাত্রীরা শুদ্ধ করে লিখতে পারে না।
শুদ্ধ : সম্মান, সান্ত্বনা, প্রতিযোগিতা, জাতি, মুহূর্ত, সমীচীন ইত্যাদি শব্দ আজকাল অনেক ছাত্র-ছাত্রী শুদ্ধ করে লিখতে পারে না।

২৬. পুর্নিমার চাদ স্নিগ্ধ জোতি ছরায়।
শুদ্ধ : পূর্ণিমার চাঁদ স্নিগ্ধ জ্যোতি ছড়ায়।

## সাধু ও চলিত ভাষারীতির মিশ্রণজনিত ভুল

বাংলা ভাষার গদ্যরীতিতে সাধু ও চলিতরীতির মিশ্রণ হলে বাক্যটি অশুদ্ধ হয়ে যায়। তাই বাক্য তৈরি করার সময় বিষয়টি খেয়াল রাখতে হয়। আপনারা জানেন সাধু ও চলিতরীতির পার্থক্য সাধারণত ধরা পড়ে ক্রিয়া এবং সর্বনাম পদের ব্যবহারে।

যেমন : সাধু– তাহারা যাইতেছিল।
চলিত– তারা যাচ্ছিল।

শুধু ক্রিয়া এবং সর্বনাম পদ নয় অন্যান্য পদেও সাধুরীতি ও চলিতরীতির পার্থক্য দেখা যায়।

যেমন : মস্তক – মাথা
তুলা – তুলো
জুতা – জুতো
সহিত – সাথে
শুকনা – শুকনো
বন্য – বুনো
পূর্বেই – আগেই

এবার কিছু বাক্যের উদাহরণ :

১. যখন, তুমি এত সত্ত্বর চলে যাইবে বলে স্থির করিয়া রাখিয়াছিলে, তখন তোমার সংসারে না আসাই সর্বাংশে উচিত ছিল।
শুদ্ধ : যখন, তুমি এত তাড়াতাড়ি চলে যাবে বলে ঠিক করে রেখেছিলে, তখন তোমার সংসারে না আসাই সর্বাংশে উচিৎ ছিল।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



২. পরীক্ষা ব্যতীত কোনো বস্তুরই সম্যক পরিচয় পাওয়া যায় না। কিন্তু কোনো বস্তুকেই পরীক্ষা করবার প্রবৃত্তি আমাদের নেই।
শুদ্ধ : পরীক্ষা ছাড়া কোনো বস্তুরই পুরোপুরি পরিচয় পাওয়া যায় না। কিন্তু কোনো বস্তুকেই পরীক্ষা করার ইচ্ছে আমাদের নেই।

৩. ইহার পরে হৈমর মুখে তার চিরদিনের সেই স্নিগ্ধ হাসিটুকু আর এক দিনের জন্যও দেখি নাই।
শুদ্ধ : এর পরে হৈমর মুখে তার চিরদিনের সেই স্নিগ্ধ হাসিটুকু আর একদিনের জন্যও দেখিনি।

৪. কিঞ্চিৎ হতাশ হয়ে তাহারা তুলসী বৃক্ষটির দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে।
শুদ্ধ : একটু হতাশ হয়ে তারা তুলসী গাছটির দিকে তাকায়।

৫. প্রাঙ্গণের শেষে তুলসী বৃক্ষটি পুনরায় শুকিয়ে উঠিছে।
শুদ্ধ : উঠানের শেষে তুলসী গাছটি আবার শুকিয়ে উঠেছে।

৬. সেই দিন হতে গৃহকর্ত্রীর সজল চক্ষুর কথাও আর কাহারও মনে পড়েনি।
শুদ্ধ : সেদিন থেকে গৃহকর্ত্রীর ছলছল চোখের কথাও আর কারো মনে পড়েনি।

৭. কবিতার ভাষা ভাবের দেহস্বরূপ, কিছুতেই তাহা ভাব হতে পৃথক করিতে পারা যায় না।
শুদ্ধ : কবিতার ভাষা ভাবের দেহের মতো, কিছুতেই তা ভাব থেকে আলাদা করতে পারা যায় না।

৮. বাষ্পতো হাওয়ায় ভেসে বেড়াইতেছে, কিন্তু ফুলের পাপড়ির শীতল স্পর্শটুকু পাইবা মাত্র জমে শিশির হয়ে যায়।
শুদ্ধ : বাষ্পতো হাওয়ায় ভেসে বেড়াচ্ছে, কিন্তু ফুলের পাপড়ির শীতল পরশটুকু পাওয়া মাত্র জমে শিশির হয়ে যায়।

৯. আমরা ক্ষণকালের মধ্যে আটক করিয়া ধরিয়া যাকে জমাট করিয়া দেখি বস্তুত তাহার সেরূপ নেই; কেননা সত্যই তাহা বদ্ধ হইয়া নাই এবং ক্ষণকালেই তাহার শেষ নয়।
শুদ্ধ : আমরা অল্প সময়ের মধ্যে আটক করে ধরে যাকে জমাট করে দেখি, মূলত তার সেরূপ নেই; কেননা সত্যিই তা আটক হয়ে নেই এবং অল্প সময়েই তার শেষ নয়।

১০. এই রূপ চারিদিকে চাহিয়া দেখিতে দেখিতে সম্মুখস্থ দ্বারে একটি কি ছায়ার মতো দেখলেন। মনুষ্যাকৃতি বোধ হয়, কিন্তু মনুষ্যও বোধ হয় না।
শুদ্ধ : এরূপ চারদিক চেয়ে দেখতে দেখতে সামনের দরজায় একটি কি ছায়ার মতো দেখলেন। মানুষের মতো আকৃতি মনে হয় কিন্তু মানুষ মনে হয় না।

১১. অল্পকালের ভিতরে মহারবে নৈদাঘ ঝটিকা প্রবাহিত হইল; এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রবল বৃষ্টিধারা পড়তে লাগল।
শুদ্ধ : কিছুক্ষণের মধ্যে শো শো শব্দে গ্রীষ্মের ঝড় এল এবং সাথে সাথে জোরে বৃষ্টির ফোটা পড়তে লাগল।

১২. বিদ্যুৎ প্রকাশ হওয়াতে পথিক সম্মুখে প্রকাণ্ড ধবলাকার কোনো পদার্থ চকিত মাত্র দেখতে পেলেন।
শুদ্ধ : বিদ্যুৎ চমকালে পথিক তার সামনে সাদা আকারের বিরাট কোন জিনিস খুব অল্পসময়ের জন্য দেখতে পেলেন।

১৩. যারা একটি সর্বব্যাপী মনের মধ্যে এক হইয়াছিল, তারা আজ সব বাহির হইয়া পড়িয়াছে।
শুদ্ধ : যারা একটি বিস্তৃত মনের মাঝে এক হয়েছিল, তারা আজ সব বের হয়ে পড়েছে।

১৪. পরদিন প্রাতঃকালে সমস্ত ব্যাপারটি পরম হাস্যজনক বলে বোধ হলো।
শুদ্ধ : পরদিন সকালে পুরো ব্যাপারটি খুব হাসির বলে মনে হলো।

১৫. বহুকাল বিস্মৃত সুখস্বপ্নের স্মৃতির ন্যায় ঐ মধুর গীতি কর্ণরন্ধ্রে প্রবেশ করিল।
শুদ্ধ : বহুকাল ভুলে যাওয়া সুখস্বপ্নের স্মৃতির মতো ঐ মধুর গান কানের ভেতর প্রবেশ করল।



১৬. এরূপ সংস্কৃতপ্রিয়তা এবং সংস্কৃতানুকারিতা হেতু বাঙ্গালা সাহিত্য অত্যন্ত নীরস, শ্রীহীন, দুর্বল এবং বাঙ্গালা সমাজে অপরিচিত হয়ে রইল।
শুদ্ধ : এরূপ সংস্কৃতপ্রিয়তা এবং সংস্কৃত অনুকরণের কারণে বাংলা সাহিত্য খুব নীরস, বিশ্রী, দুর্বল এবং বাঙালি সমাজে অপরিচিত হয়ে থাকল।

১৭. বাঙ্গালার লিখিত এবং কথিত ভাষার যতটা প্রভেদ দেখা যায়, অন্যত্র তত নয়।
শুদ্ধ : বাংলায় লেখ্য ও কথ্য ভাষায় যতটা পার্থক্য দেখা যায়, অন্য ভাষায় তত নয়।

১৮. তৈলের এমন একটি আশ্চর্য সম্মোহনী শক্তি আছে যাতে অন্য সকল পদার্থের গুণই আত্মসাৎ করতে পারে।
শুদ্ধ : তেলের এমন এক মোহশক্তি আছে যে, অপর সব পদার্থের গুণই আত্মসাৎ করতে পারে।

১৯. জ্ঞানে মানুষমাত্রেই তুল্যাধিকার।
শুদ্ধ : জ্ঞানে সব মানুষের সমান অধিকার।

২০. মনুষ্যেরা পশুপক্ষ্যাদি ইতর প্রাণীর মতো অযত্নসম্ভূত অন্নাচ্ছাদন ও স্বভাবজাত বাসস্থান প্রাপ্ত হননি।
শুদ্ধ : মানুষেরা পশুপাখি এবং ইতর প্রাণীর মতো অযত্নে ভাতকাপড় ও স্বাভাবিকভাবে বাসস্থান পায়নি।

২১. সে কথাই ভাবছিলাম– ভোগের দ্বারা এই বিপুল পৃথিবী, এই চিরকালের পৃথিবী, আমার কাছে খর্ব হয়ে গেছে।
শুদ্ধ : সে কথাই ভাবছিলাম- ভোগের দ্বারা এ বিপুল পৃথিবী, এ চিরকালের পৃথিবী, আমার কাছে ছোট হয়ে গেছে।

২২. চমকের সহিত নিদ্রাভঙ্গ হল, অতি ব্যস্তে কুমার কক্ষ মধ্যে পদচারণ করতে লাগলেন।
শুদ্ধ : চমকের সাথে ঘুম ভাঙল; ব্যস্তভাবে কুমার ঘরের মধ্যে পায়চারী করতে লাগলেন।

২৩. শরীর সঞ্চালন না করিলে, পীড়িত হয়ে, ক্লেশ ভোগ করতে হয়।
শুদ্ধ : শরীর সঞ্চালন না করলে, অসুস্থ হয়ে, যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়।

২৪. বর্ষার আরম্ভে গঙ্গা যেমন প্রতিদিন দেখতে দেখতে ভরিয়া উঠে, কুসুম তেমনি দেখতে দেখতে প্রতিদিন সৌন্দর্যে, যৌবনে ভরিয়া উঠিতে লাগল।
শুদ্ধ : বর্ষার শুরুতে গঙ্গা যেমন প্রতিদিন দেখতে দেখতে ভরে ওঠে, কুসুম তেমনি দেখতে দেখতে প্রতিদিন সৌন্দর্যে, যৌবনে ভরে উঠতে লাগল।

২৫. খবরের কাগজ পড়িয়া এবং মোগলাই খানা খেয়ে একটি ক্ষুদ্র কোণের ঘরে প্রদীপ নিভাইয়া দিয়ে বিছানায় গিয়ে শয়ন করিলাম।
শুদ্ধ : খবরের কাগজ পড়ে এবং মোগলাই খাবার খেয়ে একটি ছোট কোণের ঘরে প্রদীপ নিভিয়ে বিছানায় গিয়ে শুলাম।

২৬. তারা যেন সবাই ভুল করিবার প্রতিযোগিতায় নামিয়াছে।
শুদ্ধ : তারা যেন সবাই ভুল করার প্রতিযোগিতায় নেমেছে।

২৭. বাংলাদেশে ছাত্রগণ অধ্যয়ন ছাড়িয়া রাজনীতি করছে।
শুদ্ধ : বাংলাদেশে ছাত্রগণ অধ্যয়ন ছেড়ে রাজনীতি করছে।

২৮. তাহাকে কলেজে যেতে হবে।
শুদ্ধ : তাহাকে কলেজে যাইতে হইবে।
শুদ্ধ : তাকে কলেজে যেতে হবে।

২৯. তাহারই মধ্য দিয়ে রাস্তা।
শুদ্ধ : তারি মধ্য দিয়ে রাস্তা।
শুদ্ধ : তাহারই মধ্য দিয়া রাস্তা।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

# ii. প্রয়োগ-অপপ্রয়োগ

নদীর মতো ভাষাও প্রবহমান। নদীর বাঁকের মতো ভাষায়ও নিত্যনতুন উপাদান গৃহীত হয়। ভাষা ব্যবহার সম্পর্কে জনগোষ্ঠীর মধ্যে লক্ষ্য করা যায় নানা প্রবণতা, ফলে দেখা দেয় বহুমুখী সমস্যা। ভাষা পরিবর্তনের যে অন্তর্নিহিত স্রোত রয়েছে, নিয়মাবলি দিয়ে তা রোধ করা যায়। বাংলা ভাষায় এমন অনেক শব্দ ব্যবহৃত হচ্ছে, যা ব্যাকরণের নিয়মে অশুদ্ধ হলেও বহুল প্রচলিত। দীর্ঘকাল ধরে ব্যবহারের ফলে একটি অশুদ্ধ শব্দই আপাত শুদ্ধ হয়ে ওঠে, কখনো কখনো একটি অপপ্রয়োগ ভাষা ব্যবহারকারীদের চেতনায় এমনভাবে গেঁথে যায়, শুদ্ধ প্রয়োগটাই অপপ্রয়োগ বলে মনে হয়।

বাংলা ভাষার বয়স এক হাজার বছরেরও বেশি। এ দীর্ঘ সময়ে বাংলা ভাষায় সংযুক্ত হয়েছে নতুন নতুন উপাদান। বিভিন্ন উপাদানে গঠিত বাংলা ভাষায় তাই লক্ষ্য করা যায় এক ধরনের সংকর চারিত্র্য। প্রায় ২৪ কোটি লোকের ভাষা বাংলা ভাষার ব্যবহার সম্যক বৃদ্ধি পেয়েছে সন্দেহ নেই। তবে একটি দুঃখজনক বিষয় নজরে পড়ে, তা হচ্ছে ভাষা ব্যবহারে অশুদ্ধি। ভাষার নিয়ম-শৃঙ্খলা সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণেই ঘটে ভাষার অপপ্রয়োগ। ভাষা ব্যবহারে অশুদ্ধি সাধারণত তিনটি কারণে হয়ে থাকে। যথা :

ক. উচ্চারণ দোষে
খ. শব্দ গঠন ত্রুটিতে এবং
গ. শব্দের অর্থগত বিভ্রান্তিতে।

বাংলা ভাষার উচ্চারণে যথেচ্ছাচার লক্ষ্য করা যায়। আঞ্চলিক ভাষার উচ্চারণ-প্রভাব থেকে অনেকেই মুক্ত হতে পারেন না। অন্যদিকে শব্দের শুদ্ধ উচ্চারণের প্রতিও সতর্ক থাকেন না। এই উচ্চারণ-বিকৃতির প্রভাবে বানানেও অশুদ্ধি ঘটে। 'অত্যাধিক', 'অদ্যপি', 'অনাটন', 'উত্যাক্ত' ইত্যাদি ভুল বানান উচ্চারণদোষেই ঘটেছে।

বানান ভাষাপ্রয়োগের একটি প্রধান অংশ। শব্দের গঠনরীতি সম্পর্কে অজ্ঞতার ফলে শব্দের বানান-বিভ্রান্তি ঘটে থাকে। বানানের শুদ্ধাশুদ্ধি-বিচারে ব্যাকরণের আলোচনা তাই অপরিহার্য। বিশেষ্য-বিশেষণকে যথাযথ চিহ্নিত না করার কারণেই উৎকর্ষতা, সখ্যতা, অপকর্ষতা, সৌজন্যতা ইত্যাদি লিখিত হয়।

শব্দের যথাযথ অর্থ সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান না থাকার কারণেও প্রয়োগ বিভ্রান্তি ঘটে থাকে। এই বিভ্রান্তির ফলে ভুল শব্দ যেমন ব্যবহৃত হয়, তেমনি বাক্যেও যথাস্থানে শব্দ অন্বিত হয় না।

এছাড়া বহুবচনের দ্বিত্ব ব্যবহার, অনন্বয় দোষ, বিশেষ্য ও বিশেষণ সম্পর্কে ধারণার অভাব, শব্দের গঠনগত অশুদ্ধি, শব্দকে বিনা প্রয়োজনে নারীবাচক করা ইত্যাদি কারণেও শব্দের অপপ্রয়োগ ঘটে থাকে।

বলার সময় আমরা যেভাবেই বলি না কেন, লেখার সময় বাক্যে ব্যবহৃত শব্দাবলির নির্ভুল প্রয়োগে সতর্ক থাকতে হবে। লেখার ক্ষেত্রে অবশ্যই বানানের অশুদ্ধি; বাক্যে পদের অপপ্রয়োগ; পদবিন্যাসের ত্রুটি এবং সাধু ও চলিত ভাষার মিশ্রণজনিত ত্রুটি সম্পর্কে সতর্ক থাকতে হবে।



### বহুবচনের অপপ্রয়োগজনিত ভুল

অনেক সময় অশুদ্ধভাবে বহুবচনের দ্বিত্ব ব্যবহার করা হয়। এ প্রবণতা এত ব্যাপক যে, এ ত্রুটি নিরূপণ করা দুরূহ হয়ে ওঠে। যেমন–

| অপপ্রয়োগ | শুদ্ধ প্রয়োগ |
|---|---|
| সার্কভুক্ত অন্যান্য দেশগুলো | সার্কভুক্ত অন্যান্য দেশ; অথবা, সার্কভুক্ত অন্য দেশগুলো |
| সব প্রকাশ মাধ্যমগুলো | প্রকাশ মাধ্যমগুলো; অথবা, সব প্রকাশ মাধ্যম |
| অনেক ছাত্রগণ | অনেক ছাত্র |
| নিম্নলিখিত সব শিক্ষার্থীগণ | নিম্নলিখিত সব শিক্ষার্থী; অথবা, নিম্নলিখিত শিক্ষার্থীগণ |
| সকল দর্শকমণ্ডলী | সকল দর্শক; অথবা, দর্শকমণ্ডলী |
| সব উপদেষ্টামণ্ডলী | সব উপদেষ্টা; অথবা উপদেষ্টামণ্ডলী |
| সকল বন্যার্তদের | সকল বন্যার্তকে |
| কতিপয় সিদ্ধান্তগুলো | কতিপয় সিদ্ধান্ত |
| পশ্চিমাঞ্চলের সব জেলাসমূহে | পশ্চিমাঞ্চলের সব জেলায়; অথবা, পশ্চিমাঞ্চলের জেলাসমূহে |
| অন্যান্য বিষয়গুলোর | অন্য বিষয়গুলোর; অথবা, অন্যান্য বিষয়ের |

*[স্মরণ রাখতে হবে বহুবচনের পর দ্বিত্ব প্রয়োগ হয় না।]*

### শব্দের অপপ্রয়োগজনিত ভুল

শব্দ প্রয়োগের নিয়ম জানা থাকলে অপপ্রয়োগের হাত থেকে রেহাই পাওয়া যায়। নিচে শব্দের অপপ্রয়োগের কিছু উদাহরণ কারণসহ তুলে ধরা হলো :

অশ্রুজল : চোখের জল অর্থে ব্যবহার অশুদ্ধ। 'অশ্রু' অর্থই চোখের জল।
অজ্ঞানতা : 'অজ্ঞানতা' শব্দটি অজ্ঞতা অর্থে প্রয়োগ অশুদ্ধ। 'অজ্ঞানতা' শব্দের প্রকৃত অর্থ জ্ঞানশূন্যতা।
আয়ত্তাধীন : 'আয়ত্ত' শব্দের অর্থই অধীন। আয়ত্তের পর অধীন ব্যবহার বাহুল্য।
আকণ্ঠ পর্যন্ত : 'আকণ্ঠ' শব্দই কণ্ঠ পর্যন্ত বোঝায়। এখানে 'পর্যন্ত' ব্যবহার বাহুল্য।
আশ্চর্য : মূল অর্থ বিস্ময়কর। বিস্মিত অর্থে ব্যবহার প্রচলিত হলেও ভুল, শুদ্ধরূপ হবে আশ্চর্যান্বিত।
ইদানীংকালে : ইদানীং অর্থ বর্তমান কাল। এর সঙ্গে 'কাল' যোগ করা অপপ্রয়োগ।
খাঁটি গরুর দুধ : কথাটি অর্থহীন। শুদ্ধরূপ হবে 'গরুর খাঁটি দুধ'।
জন্মবার্ষিকী : জন্মবার্ষিক শব্দই যথেষ্ট। এক্ষেত্রে স্ত্রী প্রত্যয় যোগ বহুল প্রচলিত হলেও অশুদ্ধ।
প্রেক্ষিত : মূল অর্থ প্রেক্ষণ বা দর্শন করা হয়েছে। প্রেক্ষিত হচ্ছে প্রেক্ষণ শব্দের বিশেষণ। পরিপ্রেক্ষিত (পটভূমি বা পারিপার্শ্বিক) অর্থে প্রেক্ষিত শব্দটির ব্যবহার অশুদ্ধ।
জন্মজয়ন্তী : 'জয়ন্তী' শব্দের মাঝেই আছে জন্ম-প্রসঙ্গ। কাজেই জয়ন্তীর পূর্বে 'জন্ম' শব্দের ব্যবহার অশুদ্ধ।
অত্র-তত্র-যত্র : অত্র শব্দের অর্থ 'এখানে', 'তত্র' অর্থ 'সেখানে' এবং 'যত্র' শব্দের অর্থ 'যেখানে'। তাই 'অত্র' বললে 'এই' বোঝার কারণ নেই। যেমন : 'এই অফিস' অর্থে 'অত্র অফিস' লিখলে অশুদ্ধ হবে।
অন্তরীণ : 'অন্তরিন' শব্দের অর্থ কারাগারের বাইরে কাউকে আবদ্ধ করে রাখা। অনেকে 'অন্তরিন' শব্দটিকে 'অন্তরীণ' লিখে থাকেন, যা প্রমিত বানানরীতি অনুযায়ী অশুদ্ধ।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



বৈদেহী/বিদেহী : 'বিদেহ' শব্দের অর্থ দেহশূন্য বা অশরারী। বিদেহ শব্দটি বিশেষণ, কিন্তু 'ঈ'-প্রত্যয়যোগে পুনরায় বিশেষণ করা হয় 'বিদেহী'। প্রচলিত হলেও 'বিদেহী' ও 'বৈদেহী' উভয় শব্দের প্রয়োগই অশুদ্ধ।

ভাষাভাষী : ভাষা ব্যবহারকারী অর্থে ভাষীই যথার্থ ও যথেষ্ট। ভাষাভাষী প্রয়োগ অশুদ্ধ।

শায়িত : 'শায়িত' শব্দের অর্থ 'শয়ন করা হয়েছে এমন'। যিনি নিজে শুয়ে আছেন তাকে 'শয়ান' বলা হয়। শুয়ে আছেন অর্থে 'শায়িত' শব্দের প্রয়োগ প্রচলিত হলেও অশুদ্ধ।

সমৃদ্ধশালী/সম্পদশালী: সমৃদ্ধ (বিশেষণ) শব্দের অর্থ সম্পদশালী বা প্রাচুর্যযুক্ত। 'শালী' যোগ করে বিশেষণ পদ পুনরায় বিশেষণ করা অর্থহীন ও অশুদ্ধ।

ফলশ্রুতি : শব্দটির আভিধানিক অর্থ পুণ্যকর্ম করলে যে ফল হয় তার বিবরণ বা তা শোনা। অফিস-আদালত, স্কুল-কলেজে যে অর্থে ফলশ্রুতি লেখা হচ্ছে তা ভুল। তার বদলে ফলাফল, ফল, পরিণতি ব্যবহার শুদ্ধ।

## শব্দের বানানগত অশুদ্ধি/অপপ্রয়োগ

বানান ভাষাপ্রয়োগের একটি প্রধান অংশ। বানানরীতি সম্পর্কে অজ্ঞতার ফলে শব্দের বানান-বিভ্রান্তি ঘটে থাকে। এ রকম কিছু অপপ্রয়োগের উদাহরণ নিচে দেয়া হলো :

| অশুদ্ধ | শুদ্ধ | অশুদ্ধ | শুদ্ধ |
|---|---|---|---|
| অপেক্ষমান | অপেক্ষমাণ | প্রাণীবিদ্যা | প্রাণিবিদ্যা |
| উদ্গীরণ | উদ্গিরণ | মনোকষ্ট | মনঃকষ্ট |
| উল্লেখিত | উল্লিখিত | মন্ত্রীসভা | মন্ত্রিসভা |
| চোষ্য | চুষ্য | মন্ত্রীপরিষদ | মন্ত্রিপরিষদ |
| ছত্রছায়া | ছত্রচ্ছায়া | শিরচ্ছেদ | শিরশ্ছেদ |

## শব্দের গঠনগত অপপ্রয়োগ

শব্দের গঠনরীতি সম্পর্কে অজ্ঞতার ফলে শব্দ ব্যবহারে বিভ্রান্তি ঘটে থাকে। যেমন :

| অশুদ্ধ | শুদ্ধ | অশুদ্ধ | শুদ্ধ |
|---|---|---|---|
| অতলস্পর্শী | অতলস্পর্শ | কৃচ্ছ্রতা | কৃচ্ছ্র |
| অর্ধাঙ্গিনী | অর্ধাঙ্গী | কেবলমাত্র | কেবল, মাত্র |
| আপ্রাণ | প্রাণপণ | চলমান | চলন্ত |
| আয়ত্তাধীন | আয়ত্ত | নিঃশেষিত | নিঃশেষ |
| আভ্যন্তরীণ | অভ্যন্তরীণ | নিরাশা | নৈরাশ্য |
| ইতিপূর্বে | ইতঃপূর্বে | বিদ্বানজন | বিদ্বজ্জন |
| ইতিমধ্যে | ইতোমধ্যে | মুহ্যমান | মোহ্যমান |
| একত্রিত | একত্র | শুধুমাত্র | শুধু, মাত্র |
| কনিষ্ঠতম | সর্বকনিষ্ঠ | সকাতর | কাতর |
| কর্তাগণ | কর্তৃগণ | সঠিক | ঠিক |
| কর্মকর্তাগণ | কর্মকর্তৃগণ | সমতুল্য | সম, তুল্য |
| সম্ভব | সম্ভবপর | ভাষাভাষী | ভাষী |



## প্রায় সমোচ্চারিত শব্দের বানান

শব্দের যথার্থ অর্থ সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান না থাকার কারণেও প্রয়োগ বিভ্রান্তি ঘটে থাকে। এই বিভ্রান্তির ফলে বাক্যে ভুল শব্দ ব্যবহৃত হয়। যেমন :

| শব্দ | অর্থ | শব্দ | অর্থ |
|---|---|---|---|
| অণু | বস্তুর ক্ষুদ্রতম অংশ | অবদান | কীর্তি |
| অনু | পশ্চাৎ | অবধান | মনোযোগ |
| অশ্ব | ঘোড়া | আদি | প্রথম |
| অশ্ম | পাথর | আধি | বিপদ |
| আবরণ | আচ্ছাদন | আবাস | বাসস্থান |
| আভরণ | অলঙ্কার | আভাষ | ভূমিকা, আলাপ |
| আষাঢ় | বর্ষাঋতুর প্রথম মাস | কাঁদা | ক্রন্দন |
| আসার | বৃষ্টি, জলকণা | কাদা | কর্দম |
| গর্ব | অহঙ্কার | গাদা | স্তূপ, রাশি |
| গর্ভ | উদর, অভ্যন্তর | গাধা | গর্দভ |
| ছাড় | ত্যাগ, বাদপড়া | জাল | ফাঁদ, নকল |
| ছার | তুচ্ছ, নগণ্য, অধম | জ্বাল | আগুনের আঁচ, অগ্নিশিখা |
| ডাকা | আহবান করা | দিন | দিবস |
| ঢাকা | আবৃত করা | দীন | দরিদ্র, ধর্ম |
| দীপ | প্রদীপ | নাড়ি | ধমনী |
| দ্বিপ | হাতি | নারী | রমণী |
| নীড় | পাখির বাসা | পদ্য | কবিতা |
| নীর | জল, পানি | পদ্ম | কমল |
| বাঁক | বক্র | বিশ | কুড়ি |
| বাক্য | কথা, বচন | বিষ | গরল |
| বাঁশী | বংশী | বিত্ত | সম্পদ |
| বাসি | টাটকা নয়, অপরিষ্কৃত | বৃত্ত | গোল |
| ভাষা | কথা | শন | শন গাছ |
| ভাসা | জল বা বায়ুর উপর ভর করে থাকা | সন | অব্দ, বছর |
| শক্ত | কঠিন | শপ্ত | অভিশাপ |
| সক্ত | আসক্ত | সপ্ত | সাত |
| শীত | শীত ঋতু, শীতল | সুত | পুত্র |
| সিত | ধবল, সাদা | সৃত | উৎপন্ন, জাত |
| হার | পরাজয়, অলঙ্কার বিশেষ | সাক্ষর | অক্ষরজ্ঞানবিশিষ্ট |
| হাড় | অস্থি | স্বাক্ষর | দস্তখত |

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

# সম্ভাব্য বাক্য শুদ্ধিকরণ ও প্রয়োগ-অপপ্রয়োগ

১. উহার উদ্ধতপূর্ণ আচরণে ব্যথিত হইয়াছি।
শুদ্ধ : তাহার উদ্ধত (বা ঔদ্ধত্যপূর্ণ) আচরণে ব্যথিত হইয়াছি।

২. উৎপন্ন বৃদ্ধির জন্য কঠোর পরিশ্রম প্রয়োজন।
শুদ্ধ : উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য কঠোর পরিশ্রম প্রয়োজন।

৩. শিল্পায়নের সাহায্যে দেশ সমৃদ্ধশালী হতে পারে।
শুদ্ধ : শিল্পায়নের সাহায্যে দেশ সমৃদ্ধ (বা সমৃদ্ধশালী) হতে পারে।

৪. শরীর অসুস্থের জন্য আমি কাল আসিতে পারি নাই।
শুদ্ধ : অসুস্থতার জন্য আমি কাল আসিতে পারি নাই।

৫. বাংলাদেশ একটি উন্নতশীল আধুনিক রাষ্ট্র।
শুদ্ধ : বাংলাদেশ একটি উন্নতিশীল (বা উন্নয়নশীল) আধুনিক রাষ্ট্র।

৬. এমন অসহ্যনীয় ব্যথা আমি আর কখনও অনুভব করি নাই।
শুদ্ধ : এমন অসহ্য (বা অসহনীয়) ব্যথা আমি আর কখনো অনুভব করি নাই।

৭. আমি আপনার জ্ঞাতার্থে এই সংবাদ লিখিলাম।
শুদ্ধ : আমি আপনার অবগতির জন্য (বা আপনাকে জ্ঞাপনার্থে) এ সংবাদ লিখিলাম।

৮. এই দুর্ঘটনা দৃষ্টে আমার হৃদকম্প উপস্থিত হইল।
শুদ্ধ : এই দুর্ঘটনা দর্শনে আমার হৃদকম্প শুরু হইল।

৯. অভাবগ্রস্ত ছাত্রটি তাহার দুরাবস্থার কথা সাশ্রুনয়নে বর্ণনা করিল।
শুদ্ধ : অভাবগ্রস্ত ছাত্রটি তাহার দুরবস্থার কথা অশ্রুপূর্ণ নয়নে বর্ণনা করিল।

১০. মেয়েটি সুকেশিনী এবং সুহাসি।
শুদ্ধ : মেয়েটি সুকেশা (বা সুকেশী) এবং সুহাসিনী।

১১. তুমি কি বার্ষিক ক্রীরা প্রতিযোগীতায় অংশগ্রহণ করিবে না?
শুদ্ধ : তুমি কি বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করিবে না?

১২. সে দুগ্ধফেননিভ বিছানায় শুইয়া আছে।
শুদ্ধ : সে দুগ্ধফেননিভ শয্যায় শুইয়া আছে।



১৩. আমি ও আমার চাচা ঢাকা গিয়েছিলাম।
শুদ্ধ : আমার চাচা ও আমি ঢাকা গিয়েছিলাম।

১৪. এক সদ্যজাত শিশুর সর্বাঙ্গীন কুশলতা কামনা করে তিনি কাব্যিকতা করেছেন।
শুদ্ধ : এক সদ্যোজাত শিশুর সর্বাঙ্গীণ কুশল কামনা করে তিনি কাব্যি করেছেন।

১৫. হীন চরিত্রবান লোক পশ্বাধর্ম।
শুদ্ধ : হীন চরিত্রের (বা চরিত্রহীন) লোক পশ্বাধম।

১৬. তেল-ভাজা জিলিপি খাওয়া ভাল?
শুদ্ধ : তেলেভাজা জিলিপি খাওয়া কি ভালো?

১৭. এ দায়ীত্ব আমাকে দিও না।
শুদ্ধ : এ দায়িত্ব আমাকে দিয়ো না।

১৮. দেবী অন্তর্ধান হইলেন।
শুদ্ধ : দেবী অন্তর্হিত হইলেন।

১৯. গোময় জ্বালানী কাষ্ঠরূপে ব্যবহৃত হয়।
শুদ্ধ : গোময় জ্বালানিরূপে ব্যবহৃত হয়।

২০. তাহার সাংঘাতিক আনন্দ হইল।
শুদ্ধ : তাহার অপরিসীম আনন্দ হইল।

২১. শুধুমাত্র গায়ের জোরে কাজ হয় না।
শুদ্ধ : শুধু গায়ের জোরে কাজ হয় না।

২২. তাহার বৈমাত্রেয় সহোদর অসুস্থ।
শুদ্ধ : তাহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা অসুস্থ।

২৩. তাহার অন্তর অজ্ঞান সমুদ্রে আচ্ছন্ন।
শুদ্ধ : তাহার অন্তর অজ্ঞান-সমুদ্রে নিমজ্জিত।

২৪. কথাটা শুনিয়া তিনি কুম্ভীরাশ্রু বিসর্জন করিলেন।
শুদ্ধ : কথাটা শুনিয়া তিনি কপটাশ্রু বিসর্জন করিলেন।

২৫. নিরপরাধী, নিষ্পাপীকে শাস্তি দেবে কেন?
শুদ্ধ : নিরপরাধ, নিষ্পাপকে শাস্তি দেবে কেন?

২৬. অন্যান্য বিষয়গুলোর আলোচনা পরে হবে।
শুদ্ধ : অন্য বিষয়গুলোর/অন্যান্য বিষয়ের আলোচনা পরে হবে।

২৭. সকল দর্শকমণ্ডলীকে স্বাগত জানাই।
শুদ্ধ : সকল দর্শককে স্বাগত জানাই/দর্শকমণ্ডলীকে স্বাগত জানাই।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



২৮. সকল বন্যার্তদের ত্রাণসামগ্রী দেয়া হয়েছে।
শুদ্ধ : সকল বন্যার্তকে ত্রাণসামগ্রী দেয়া হয়েছে।

২৯. অন্যায়ের প্রতিফল দুর্নিবার্য।
শুদ্ধ : অন্যায়ের প্রতিফল দুর্নিবার/অনিবার্য।

৩০. অসুস্থবশত সে কলেজে আসতে পারেনি।
শুদ্ধ : অসুস্থতাবশত সে কলেজে আসতে পারেনি।

৩১. পৃথিবী সর্বদা সূর্যের চারদিকে ঘূর্ণয়মান।
শুদ্ধ : পৃথিবী সর্বদা সূর্যের চারদিকে ঘূর্ণায়মান (বা ঘূর্ণ্যমান)।

৩২. ডালিম ফুলের রক্তিমতা চোখে পড়ার মতো।
শুদ্ধ : ডালিম ফুলের রক্তিমা চোখে পড়ার মতো।

৩৩. অনাবশ্যকীয় ব্যাপারে কৌতূহল ভালো নয়।
শুদ্ধ : অনাবশ্যক ব্যাপারে কৌতূহল ভালো নয়।

৩৪. আবশ্যকীয় ব্যয়ে কার্পণ্য অনুচিত।
শুদ্ধ : আবশ্যক ব্যয়ে কার্পণ্য অনুচিত।

৩৫. রাঙামাটি পার্বত্যীয় এলাকা।
শুদ্ধ : রাঙামাটি পার্বত্য (বা পর্বতীয়) এলাকা।

৩৬. সমৃদ্ধশালী বাংলাদেশ আমাদের একান্ত কাম্য।
শুদ্ধ : সমৃদ্ধ (বা সমৃদ্ধিশালী) বাংলাদেশ আমাদের একান্ত কাম্য।

৩৭. পুলিশ অপরাধী সম্পর্কে নিঃসন্দিহান।
শুদ্ধ : পুলিশ অপরাধী সম্পর্কে নিঃসন্দেহ।

৩৮. সমৃদ্ধমান পরিবারে তার জন্ম।
শুদ্ধ : সমৃদ্ধ (বা সমৃদ্ধিমান) পরিবারে তার জন্ম।

৩৯. আকণ্ঠ পর্যন্ত ভোজনে স্বাস্থ্যহানি ঘটে।
শুদ্ধ : আকণ্ঠ (বা কণ্ঠ পর্যন্ত) ভোজনে স্বাস্থ্যহানি ঘটে।

৪০. বৃক্ষটি সমূলসহ উৎপাটিত হয়েছে।
শুদ্ধ : বৃক্ষটি সমূলে (বা মূলসহ) উৎপাটিত হয়েছে।

৪১. সশঙ্কিতচিত্তে সে কথাটা বলল।
শুদ্ধ : সশঙ্কচিত্তে (বা শঙ্কিতচিত্তে) সে কথাটা বলল।

৪২. কেবলমাত্র দুর্নীতিই এ সঙ্কটের জন্য দায়ী।
শুদ্ধ : কেবল দুর্নীতিই এ সঙ্কটের জন্য দায়ী।



৪৩. ব্যাপারটা আমার আয়ত্তাধীন নয়।
শুদ্ধ : ব্যাপারটা আমার আয়ত্তে (বা অধীন) নয়।

৪৪. তৎকালীন সময়ে সরকারের ভূমিকা সমালোচিত হয়।
শুদ্ধ : তৎকালে (বা সে সময়ে) সরকারের ভূমিকা সমালোচিত হয়।

৪৫. বিশ্বে বাংলা ভাষাভাষীর সংখ্যা প্রায় পঁচিশ কোটি।
শুদ্ধ : বিশ্বে বাংলাভাষীর সংখ্যা প্রায় পঁচিশ কোটি।

৪৬. তার দুচোখ অশ্রুজলে ভেসে গেল।
শুদ্ধ : তার দুচোখ অশ্রুতে ভেসে গেল।

৪৭. যদ্যাপিও ইহা আদেশ তথাপিও ইহা পালন করা কঠিন।
শুদ্ধ : যদ্যপি ইহা আদেশ তথাপি ইহা পালন করা কঠিন।

৪৮. লেখাপড়ার পাশাপাশি সুস্বাস্থ্য রক্ষাও দরকার।
শুদ্ধ : লেখাপড়ার পাশাপাশি স্বাস্থ্য রক্ষাও দরকার।

৪৯. আমি সন্তোষ হলাম।
শুদ্ধ : আমি সন্তুষ্ট হলাম।

৫০. তোমাকে দেখে সে আশ্চর্য হয়েছে।
শুদ্ধ : তোমাকে দেখে সে আশ্চর্যান্বিত হয়েছে।

৫১. বর্তমানে বিদ্বান নারীর সংখ্যা উল্লেখযোগ্য।
শুদ্ধ : বর্তমানে বিদুষী নারীর সংখ্যা উল্লেখযোগ্য।

৫২. এ মহান নারীর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাই।
শুদ্ধ : এ মহিয়সী নারীর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাই।

৫৩. তোমার খোদার ওপর কারসাজি করার অভ্যাস গেল না।
শুদ্ধ : তোমার খোদার ওপর খোদকারি করার অভ্যাস গেল না।

৫৪. পরীক্ষা এলেই কেউ কেউ চোখে হলুদ ফুল দেখে।
শুদ্ধ : পরীক্ষা এলেই কেউ কেউ চোখে সর্ষে ফুল দেখে।

৫৫. মাখনের পুতুলটা কি আমাদের সাথে অতদূর হেঁটে যেতে পারবে?
শুদ্ধ : ননীর পুতুলটা কি আমাদের সাথে অতদূর হেঁটে যেতে পারবে?

৫৬. যেমন বুনো কচু তেমনি বাঘা তেঁতুল।
শুদ্ধ : যেমন বুনো ওল তেমনি বাঘা তেঁতুল।

৫৭. আমি কারো সাথেও নেই সতেরতেও নেই।
শুদ্ধ : আমি কারো সাতেও নেই পাঁচেও নেই।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



৫৮. সারা জীবন ভূতের মজুরি খেটে মরলাম।
শুদ্ধ : সারা জীবন ভূতের বেগার খেটে মরলাম।

৫৯. যিনি কাজটা করেছে তিনি ভালো লোক নয়।
শুদ্ধ : যিনি কাজটা করেছেন তিনি ভালো লোক নন।

৬০. আমাদের ক্লাসে যে নব্বই জন শিক্ষার্থী তার মধ্যে পঞ্চাশ জনই ছাত্রী।
শুদ্ধ : আমাদের ক্লাসে যে নব্বই জন শিক্ষার্থী আছে তাদের মধ্যে পঞ্চাশ জনই ছাত্রী।

৬১. দলীয় কর্মীরা স্বার্থ উদ্ধারে নিজেকে নিয়োজিত করেছে।
শুদ্ধ : দলীয় কর্মীরা স্বার্থ উদ্ধারে নিজেদের নিয়োজিত করেছে।

৬২. এমন কিছু লোকদের জানি, যারা এ অপরাধের সাথে জড়িত।
শুদ্ধ : এমন কিছু লোককে জানি, যারা এ অপরাধের সাথে জড়িত।

৬৪. আলফাজ অথবা মুন্না নিজেরা গোলটি করেছে।
শুদ্ধ : আলফাজ অথবা মুন্না নিজে গোলটি করেছে।

৬৫. কিছু কিছু লোক আছে যে অন্যের ভালো সইতে পারে না।
শুদ্ধ : কিছু কিছু লোক আছে যারা অন্যের ভালো সইতে পারে না।

৬৬. তাহারা যেন সবাই ভুল করিবার প্রতিযোগিতায় নেমেছে।
শুদ্ধ : তারা যেন সবাই ভুল করার প্রতিযোগিতায় নেমেছে।

৬৭. এ প্রেক্ষিতে আমাদের আবেদন ....।
শুদ্ধ : এ পরিপ্রেক্ষিতে (প্রেক্ষাপটে) আমাদের আবেদন ...।

৬৮. সর্বশেষ ঘটনার ফলশ্রুতিতে ....।
শুদ্ধ : সর্বশেষ ঘটনার ফলে ....।

৬৯. আগামীতে যেন এ ধরনের পরিস্থিতির উদ্ভব না হয়।
শুদ্ধ : ভবিষ্যতে যেন এ ধরনের পরিস্থিতির উদ্ভব না হয়।

৭০. পরবর্তীতে দুজনকে গ্রেপ্তার করা হয়।
শুদ্ধ : পরবর্তীকালে দুজনকে গ্রেপ্তার করা হয়।

৭১. তিনি ফ্রান্স ও জার্মানি ভাষায় অভিজ্ঞ।
শুদ্ধ : তিনি ফরাসি ও জার্মান ভাষায় অভিজ্ঞ।

৭২. এক শ্রেণীর কর্মকর্তারা দুর্নীতিতে নিমজ্জিত।
শুদ্ধ : এক শ্রেণীর কর্মকর্তা দুর্নীতিতে নিমজ্জিত।

৭৩. বহু ঘরে-ঘরে ভাত নেই।
শুদ্ধ : বহু ঘরে/ঘরে ঘরে ভাত নেই।



৭৪. সব আমগুলো খাওয়া শেষ।
শুদ্ধ : আমগুলো/সব আম খাওয়া শেষ।

৭৫. ভালো ভালো ছেলেরা এখানে উপস্থিত।
শুদ্ধ : ভালো ভালো ছেলে/ভালো ছেলেরা এখানে উপস্থিত।

৭৬. সব আরোহীরা অবতরণ করলেন।
শুদ্ধ : সব আরাহী/আরোহীরা অবতরণ করলেন।

৭৭. ডাক্তার তাকে ব্রঙ্কাইটিসের চিকিৎসা করছেন।
শুদ্ধ : ডাক্তার তার ব্রঙ্কাইটিসের চিকিৎসা করছেন।

৭৮. কারখানার ধোঁয়া পরিবেশকে দূষণ করে।
শুদ্ধ : কারখানার ধোঁয়া পরিবেশ দূষণ করে/পরিবেশকে দূষিত করে।

৭৯. শত্রুকে মোকাবিলা করতে হবে।
শুদ্ধ : শত্রুর মোকাবিলা করতে হবে।

৮০. মেয়েদেরকে সে সময়ে সীমাহীন অত্যাচার করা হতো।
শুদ্ধ : মেয়েদের সে সময়ে সীমাহীন অত্যাচার করা হতো।

৮১. আমি আপনাকে পরীক্ষা নেব।
শুদ্ধ : আমি আপনার পরীক্ষা নেব।

৮২. আমাদের টেলিফোন নম্বর পরিবর্তন হয়েছে।
শুদ্ধ : আমাদের টেলিফোন নম্বর পরিবর্তিত হয়েছে/ আমাদের টেলিফোন নম্বরের পরিবর্তন হয়েছে।

৮৩. তিনি বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন।
শুদ্ধ : তিনি বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার দেন।

৮৪. ধৈর্য্য ও সাহসিকতার সাথে পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে হবে।
শুদ্ধ : ধৈর্য্য ও সাহসের সাথে পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে হবে।

৮৫. যাতায়াতের সুবিধার্থে রাস্তা নির্মাণ করা হবে।
শুদ্ধ : যাতায়াতের সুবিধার জন্য রাস্তা নির্মাণ করা হবে।

৮৬. প্রধানমন্ত্রী মাছের পোনা অবমুক্ত করলেন।
শুদ্ধ : প্রধানমন্ত্রী মাছের পোনা ছাড়লেন।

৮৭. অল্প জ্ঞানী লোক বিপদজনক।
শুদ্ধ : অল্পজ্ঞান লোক বিপজ্জনক।

৮৮. অশুদ্ধ : অনন্যোপায়ী হয়ে আমি তার স্মরণাপন্ন হয়েছিলাম।
শুদ্ধ : অনন্যোপায় হয়ে আমি তার শরণাপন্ন হয়েছিলাম।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



৮৯. অদ্যাপিও সে অনুপস্থিত।
শুদ্ধ : অদ্যাপি/আজও সে অনুপস্থিত।

৯০. অনাবশ্যকীয় ব্যাপারে কৌতুহল ভালো নয়।
শুদ্ধ : অনাবশ্যক কৌতূহল ভালো নয়।

৯১. আজকালকার মেয়েরা যেমন মুখরা তেমন বিদ্বানও বটে।
শুদ্ধ : আজকালকার মেয়েরা যেমন মুখরা তেমন বিদুষীও বটে।

৯২. আজকের সন্ধ্যা বড়ই মনমুগ্ধকর।
শুদ্ধ : আজকের সন্ধ্যা বড়ই মনোমুগ্ধকর।

৯৩. আবার আপনি আরোগ্য হবেন।
শুদ্ধ : আবার আপনি আরোগ্য লাভ করবেন।

৯৪. আমি জোড় করে নিবেদন করিতেছি।
শুদ্ধ : আমি যুক্ত করে নিবেদন করিতেছি।

৯৫. আবাল্য হতেই যত্নপূর্বক ব্যাকরণ পাঠ করা উচিত।
শুদ্ধ : আবাল্য সযত্নে ব্যাকরণ পাঠ করা উচিত।

৯৬. অনাদি অনন্তকাল ধরে আমি চিরদিন তোমাকে স্মরণ করবো।
শুদ্ধ : আমি চিরদিন তোমাকে স্মরণ করবো।

৯৭. ইতিমধ্যে যা ঘটেছে তাতেই তার মানবিকার দেখা দিয়েছে।
শুদ্ধ : ইতোমধ্যে যা ঘটেছে তাতেই তার মনোবিকার দেখা দিয়েছে।

৯৮. ইহা একটি মুক ও বধির প্রশিক্ষণ কেন্দ্র।
শুদ্ধ : ইহা একটি মূক ও বধির প্রশিক্ষণ কেন্দ্র।

৯৯. ইদানিংকালে অনেক মহিলাই ববকাট করেন।
শুদ্ধ : ইদানীং অনেক মহিলাই ববকাট করেন।

১০০. এ ব্যক্তি সকলের মাঝে বয়স্ক।
শুদ্ধ : এ ব্যক্তি সকলের মাঝে বয়োজ্যেষ্ঠ।

১০১. এ দায়ীত্ব আমাকে দিও না।
শুদ্ধ : এ দায়িত্বভার আমাকে দিও না।

১০২. ঐক্যতান শুনতে ভালো লাগে।
শুদ্ধ : ঐকতান শুনতে ভালো লাগে।



১০৩. কালাকানুক্রমানুসারে আমি সবই জানিতে পারিব, কিন্তু তখন আর উপায় থাকবে না।
শুদ্ধ : কালক্রমে আমি সবই জানতে পারব, কিন্তু তখন আর উপায় থাকবে না।

১০৪. কলেজের পূনর্মিলনী উৎসবে বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ যোগদান করেন।
শুদ্ধ : কলেজের পুনর্মিলনী উৎসবে বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি যোগদান করেন।

১০৫. খেলা চলাকালীন সময়ে গোলমাল শুরু হলো।
শুদ্ধ : খেলা চলার সময়ে গোলমাল শুরু হলো।

১০৬. চন্দ্র ও সূর্য গ্রহণ দুটি বিস্ময়কর ঘটনা।
শুদ্ধ : চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্যগ্রহণ দুটি বিস্ময়কর ঘটনা।

১০৭. চাপল্যতা পরিহার কর।
শুদ্ধ : চাঞ্চল্য পরিহার কর।

১০৮. জনাব প্রধান শিক্ষক সাহেব সমীপেষু।
শুদ্ধ : জনাব প্রধান শিক্ষক সমীপে।

১০৯. যাদুঘরে কিন্তু যাদু দেখানো হয় না।
শুদ্ধ : জাদুঘরে কিন্তু জাদু দেখানো হয় না।

১১০. জ্ঞানী মানুষ অবশ্যই যশলাভ করেন।
শুদ্ধ : জ্ঞানী মানুষ অবশ্যই যশোলাভ করেন।

১১১. জমিজমার সামান্য আয় থেকে তিনি কোনমতে ক্ষুন্নিবৃত্তি নিবারণ করেন।
শুদ্ধ : জমিজমার সামান্য আয় থেকে তিনি কোনমতে ক্ষুন্নিবৃত্তি করেন।

১১২. জ্ঞানি মুর্খ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর।
শুদ্ধ : জ্ঞানী মূর্খ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

১১৩. তারা শব পোড়াতে গেল।
শুদ্ধ : তারা শব দাহ করতে গেল।

১১৪. তার আচরণ উদ্ধতপূর্ণ।
শুদ্ধ : তার আচরণ ঔদ্ধত্যপূর্ণ।

১১৫. তিনি এ ঘটনার চাক্ষুস সাক্ষী।
শুদ্ধ : তিনি এ ঘটনার প্রত্যক্ষ সাক্ষী।

১১৬. তদৃষ্টে সকলেই আনন্দিত হইল।
শুদ্ধ : তদ্দর্শনে সকলেই আনন্দিত হইল।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



১১৭. তিনি সানন্দিত চিত্তে সম্মতি দিলেন।
শুদ্ধ : তিনি সানন্দ চিত্তে সম্মতি দিলেন।

১১৮. তার দেহ আপাদমস্তক পর্যন্ত আবৃত্ত ছিল।
শুদ্ধ : তার দেহ আপাদমস্তক আবৃত ছিল।

১১৯. তিনিও তোমার বিরুদ্ধে সাক্ষী দিলেন, আমার আর বাঁচার স্বাদ নেই।
শুদ্ধ : তিনিও তোমার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিলেন, আমার আর বাঁচার সাধ নেই।

১২০. তার জ্যৈষ্ঠ পুত্র ও কনিষ্ঠ কন্যা বিদেশে গিয়েছে।
শুদ্ধ : তার জ্যেষ্ঠ পুত্র ও কনিষ্ঠা কন্যা বিদেশে গিয়েছে।

১২১. তারা যাইতে যাইতে এ দৃশ্য দেখিয়া মুগ্ধ ও বিস্মিত হলো।
শুদ্ধ : তারা যেতে যেতে এ দৃশ্য দেখে মুগ্ধ ও বিস্মিত হলো।

১২২. তাহার জন্য অপেক্ষা করা সমীচিন হবে না।
শুদ্ধ : তার জন্য অপেক্ষা করা সমীচীন হবে না।

১২৩. তার মত কৃশলী শিল্পী ইদানিং কালে বিরল।
শুদ্ধ : তার মত কুশলী শিল্পী ইদানীং বিরল।

১২৪. তার কঠিন পরিশ্রমের ফলশ্রুতিতে সে সাফল্য অর্জন করল।
শুদ্ধ : কঠোর পরিশ্রমের ফলে সে সাফল্য অর্জন করল।

১২৫. দূরাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করলে সুখী হবে।
শুদ্ধ : দুরাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করলে সুখী হবে।

১২৬. দিনবন্ধু মিত্র মূলত নাট্যকার।
শুদ্ধ : দীনবন্ধু মিত্র মূলত নাট্যকার।

১২৭. দারিদ্রতা বাংলাদেশের প্রধান সমস্যা।
শুদ্ধ : দারিদ্র্য বাংলাদেশের প্রধান সমস্যা।

১২৮. নতুন নতুন ছেলেগুলো ইস্কুলে এসে বড় উৎপাত করছে।
শুদ্ধ : নতুন ছেলেগুলো স্কুলে এসে বড় উৎপাত করছে।

১২৯. নীরিহ অতিথী শুধুমাত্র আশির্বাদ চেয়েছিলেন।
শুদ্ধ : নিরীহ অতিথি শুধু আশীর্বাদ চেয়েছিলেন।

১৩০. পনপ্রথা আজও শেষ হয়নি।
শুদ্ধ : পণপ্রথা আজও শেষ হয়নি।

১৩১. পিপিলিকা আর মরিচিকার পিছু ধাওয়া করা একই কথা।
শুদ্ধ : পিপীলিকা আর মরীচিকার পিছে ধাওয়া করা একই কথা।



১৩২. প্রানে ঐক্যতান বাজলে দুঃখ থাকে না।
শুদ্ধ : প্রাণে ঐকতান বাজলে দুঃখ থাকে না।

১৩৩. ব্যাকুলিত চিত্তে আমি তাকে দেখতে গেলাম।
শুদ্ধ : ব্যাকুল চিত্তে আমি তাকে দেখতে গেলাম।

১৩৪. বাল্যাবধি হইতে সে এখানে আছে।
শুদ্ধ : বাল্যবধি বা বাল্য হইতে সে এখানে আছে।

১৩৫. বাংলা বানান আয়ত্ব করা কঠিন।
শুদ্ধ : বাংলা বানান আয়ত্ত করা কঠিন।

১৩৬. বিস্ময়াভিভূত হতবাক চিত্তে আমি তোমাকে দেখিতেছিলাম।
শুদ্ধ : বিস্ময়াভিভূত চিত্তে আমি তোমাকে দেখিতেছিলাম।

১৩৭. বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান দক্ষিণ এশিয়াতে।
শুদ্ধ : ভৌগোলিক দিক থেকে বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার অন্তর্ভুক্ত।

১৩৮. ভাইয়ে ভাইয়ে ঐক্যতা নাই।
শুদ্ধ : ভাইয়ে ভাইয়ে ঐক্য নাই।

১৩৯. ভ্রান্তি কিছুতেই ঘুচে না।
শুদ্ধ : ভ্রান্তি কখনো ঘোচে না।

১৪০. মাতাহীন শিশুর কি দুঃখ!
শুদ্ধ : মাতৃহীন শিশুর কি দুঃখ!

১৪১. মিঠুর কোন ভৌগলিক জ্ঞান নেই।
শুদ্ধ : মিঠুর কোনো ভৌগোলিক জ্ঞান নেই।

১৪২. মুহুর্তকাল নিরব থেকে সে বলল, 'আমার কেউ নেই।'
শুদ্ধ : মুহূর্তকাল নীরব থেকে সে বলল, 'আমার কেউ নেই।'

১৪৩. মেয়েটির সঙ্গীতে কোন মাধুর্যতা নেই।
শুদ্ধ : মেয়েটির সঙ্গীতে কোন মাধুর্য নেই।

১৪৪. মহারাজ সভাগৃহে প্রবেশ করলেন।
শুদ্ধ : মহারাজ সভাকক্ষে প্রবেশ করলেন।

১৪৫. মাতৃবিয়োগে তিনি শোকানলে মগ্ন।
শুদ্ধ : মাতৃবিয়োগে তিনি শোকানলে দগ্ধ।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



১৪৬. মনস্কামনা পূর্ণ না হওয়ায় সে মনোস্তাপে ভুগছে।
শুদ্ধ : মনস্কামনা পূর্ণ না হওয়ায় সে মনস্তাপে ভুগছে।

১৪৭. যিনি যথার্থই বিদ্যান, তিনি কখনো নিজের বিদ্যার গৌরব করে না।
শুদ্ধ : যিনি যথার্থই বিদ্বান, তিনি কখনো নিজের বিদ্যার গৌরব করেন না।

১৪৮. রবীন্দ্রনাথ একজন কৃতিপুরুষ।
শুদ্ধ : রবীন্দ্রনাথ একজন কীর্তিমান পুরুষ।

১৪৯. রাষ্ট্রপ্রধানগণ আপাতত ঐক্যমতে পৌঁছলেন, তবু আগামীতে কি ঘটবে বলা যায় না।
শুদ্ধ : রাষ্ট্রপ্রধানগণ আপাতত ঐকমত্যে পৌঁছলেন, তবু ভবিষ্যতে কি ঘটবে বলা যায় না।

১৫০. শিক্ষার অন্যতম একটি উদ্দেশ্য মনের প্রসারতা বর্ধন।
শুদ্ধ : শিক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য মানসিক প্রসারতা বর্ধন।

১৫১. শোক সভায় বিশিষ্ট বুদ্ধিজিবি, বিজ্ঞানী, দার্শনিক প্রমুখগণ শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করেন।
শুদ্ধ : শোকসভায় বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী, বিজ্ঞানী, দার্শনিক প্রমুখ শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করেন।

১৫২. শামসুর রাহমান বাংলাদেশের একজন অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি।
শুদ্ধ : শামসুর রাহমান বাংলাদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি।

১৫৩. সদা সর্বদা তোমার উপস্থিতি প্রার্থনীয়।
শুদ্ধ : সদা বা সর্বদা তোমার উপস্থিতি প্রার্থনীয়।

১৫৪. সকলেই দৈব্যের আয়ত্তাধীন।
শুদ্ধ : সকলেই দৈবের অধীন।

১৫৫. সে আজকাল ভয়ানক সুখে আছে।
শুদ্ধ : সে আজকাল খুব সুখে আছে।

১৫৬. স্বাক্ষর লোক মাত্রই শিক্ষিত নয়।
শুদ্ধ : সাক্ষর লোক মাত্রই শিক্ষিত নয়।

১৫৭. সে কৌতুক করার কৌতুহল সম্বরণ করতে পারলো না।
শুদ্ধ : সে কৌতুক করার কৌতূহল সংবরণ করতে পারলো না।

১৫৮. সব ধনাঢ্য ব্যক্তিবর্গের আতিথ্য সৎকার করা উচিত।
শুদ্ধ : সব ধনাঢ্য ব্যক্তির অতিথি সেবা করা উচিত।

১৫৯. সম্মান, সান্তনা, সন্ত্বনা, সমিচিন ইত্যাদি শব্দাবলী অনেক ছাত্র-ছাত্রীরা শুদ্ধ লিখতে পারে না।
শুদ্ধ : সম্মান, সান্ত্বনা, সন্তান, সমীচীন প্রভৃতি শব্দ অনেক ছাত্র-ছাত্রী শুদ্ধ লিখতে পারে না।

১৬০. সাধারণ জন গড্ডালিকা প্রবাহে ভেসে চলে।
শুদ্ধ : সাধারণ মানুষ গড্ডলিকা প্রবাহে ভেসে চলে।

# বিগত বিসিএস পরীক্ষার প্রশ্ন সমাধান

## ৯ম বিসিএস : ১৯৮৮-১৯৮৯

| অশুদ্ধ | শুদ্ধ |
|---|---|
| ১. তিনি এই ঘটনা চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করেছেন। | ১. তিনি এ ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছেন। |
| ২. তিনি স্বস্ত্রীক বেড়াতে এসেছিলেন। | ২. তিনি সস্ত্রীক বেড়াতে এসেছিলেন। |
| ৩. অন্নাভাবে প্রতি ঘরে ঘরে হাহাকার। | ৩. অন্নাভাবে ঘরে ঘরে হাহাকার। |
| ৪. নতুন নতুন ছেলেগুলো স্কুলে এসে বড় উৎপাত করছে। | ৪. নতুন ছেলেগুলো স্কুলে এসে উৎপাত শুরু করেছে। |
| ৫. সর্ববিষয়ে বাহুল্যতা বর্জন কর। | ৫. সব বিষয়ে বাহুল্য বর্জন কর। |
| ৬. আমি ও আমার মামা ঢাকায় গিয়েছিলাম। | ৬. আমার মামা ও আমি ঢাকায় গিয়েছিলাম। |
| ৭. যাবতীয় লোকসমূহ সভায় উপস্থিত ছিল। | ৭. যাবতীয় লোক সভায় উপস্থিত ছিল। |
| ৮. নিরপরাধী নিষ্পাপীকে শাস্তি দিবে কেন? | ৮. নিরপরাধ নিষ্পাপীকে শাস্তি দিবে কেন? |
| ৯. আবশ্যকীয় ব্যয়ে কার্পণ্যতা অনুচিত। | ৯. আবশ্যক ব্যয়ে কার্পণ্য করা অনুচিত। |
| ১০. আধুনিক চেতনাই এই কবির বৈশিষ্ট্যতা। | ১০. আধুনিক চেতনাই এ কবির বৈশিষ্ট্য। |
| ১১. মুহুর্তকাল নিরব থেকে সে বললো "আমার কেউ নেই"। | ১১. মুহূর্তকাল নীরব থেকে সে বললো, "আমার কেউ নেই।" |
| ১২. বাংলাদেশ একটি উন্নতশীল রাষ্ট্র। | ১২. বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল রাষ্ট্র। |
| ১৩. সুখ-দুঃখের অনুভূতি ধনী-নির্ধনী সকলের একরূপ। | ১৩. সুখ-দুঃখের অনুভূতি ধনী-নির্ধন সবার একরূপ। |
| ১৪. উৎপন্ন বৃদ্ধির জন্যে কঠোর পরিশ্রম প্রয়োজন। | ১৪. উৎপাদন বৃদ্ধির জন্যে কঠোর পরিশ্রম প্রয়োজন। |

## ১০ম বিসিএস : ১৯৮৯-১৯৯০

| অশুদ্ধ | শুদ্ধ |
|---|---|
| ১. তিনি সানন্দিত চিত্তে সম্মতি দিলেন। | ১. তিনি সানন্দ চিত্তে সম্মতি দিলেন। |
| ২. লেখাপড়ায় তার মনোযোগ নেই। | ২. লেখাপড়ায় তার মন নেই। |
| ৩. তার দেহ আপাদমস্তক পর্যন্ত আবৃত ছিল। | ৩. তার দেহ আপাদমস্তক আবৃত ছিল। |
| ৪. তার মত ত্বরিত কর্মী লোক হয় না। | ৪. তার মতো তড়িৎকর্মা লোক হয় না। |
| ৫. সে দলের মধ্যে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠতম খেলোয়াড়। | ৫. সে দলের শ্রেষ্ঠতম খেলোয়াড়। |
| ৬. বিবাদমান দুটি দলের মধ্যে সংঘটিত হয়েছে। | ৬. বিবদমান দুটি দলের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। |
| ৭. হিমালয় পর্বত দুর্লঙ্ঘনীয়। | ৭. হিমালয় পর্বত দুরতিক্রম্য। |
| ৮. তিনি এখন সমাজে লব্ধ প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি। | ৮. তিনি এখন সমাজে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি। |
| ৯. সে ভিড়ে অন্যান্যদের মধ্যে হারিয়ে গেল। | ৯. সে ভিড়ে হারিয়ে গেল। |
| ১০. তুমি সেখানে গেলে অপমান হবে। | ১০. তুমি সেখানে গেলে অপমানিত হবে। |
| ১১. সর্ব বিষয়ে বাহুল্যতা বর্জন করা উচিত। | ১১. সব বিষয়ে বাহুল্য বর্জন করা উচিত। |
| ১২. মুমূর্ষ ব্যক্তিরা সেবা করবে। | ১২. মুমূর্ষু ব্যক্তির সেবা করবে। |
| ১৩. অন্যায়ের প্রতিফল দুর্নিবার্য। | ১৩. অন্যায়ের প্রতিফল অনিবার্য। |
| ১৪. মিথ্যা একদিন না একদিন প্রমাণ হয়। | ১৪. মিথ্যা একদিন না একদিন প্রমাণিত হয়। |

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



## ১১তম বিসিএস : ১৯৯০-১৯৯১

| অশুদ্ধ | শুদ্ধ |
|---|---|
| ১. এমন অসহনীয় ব্যাথ্যা কখনও অনুভব করিনি। | ১. এমন অসহ্য ব্যথা কখনও অনুভব করিনি। |
| ২. সে কৌতুক করার কৌতূহল সম্বরণ করতে পারল না। | ২. সে কৌতুক করার কৌতূহল সংবরণ করতে পারলো না। |
| ৩. মহারাজ সভাগৃহে প্রবেশ করলেন। | ৩. মহারাজ সভাকক্ষে প্রবেশ করলেন। |
| ৪. বিষয়সমূহে বাহুল্যতা বর্জন করবে। | ৪. সব বিষয়ে বাহুল্য বর্জন করবে। |
| ৫. অন্নাভাবে প্রতি ঘরে ঘরে হাহাকার। | ৫. অন্নাভাবে ঘরে ঘরে হাহাকার। |
| ৬. শশীভূষণ গীতাঞ্জলী পাঠ করেছে। | ৬. শশিভূষণ গীতাঞ্জলি পাঠ করেছে। |
| ৭ তিনিও তোমার বিরুদ্ধে সাক্ষী দিলেন, আমার আর বাচার স্বাদ নেই। | ৭. তিনি তোমার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিলেন, আমার আর বাঁচার সাধ নেই। |
| ৮. সে সঙ্কট অবস্থায় পড়েছে। | ৮. সে সঙ্কটে পড়েছে। |
| ৯. আবাল হতেই সযত্নপূর্বক ব্যাকরণ পাঠ করা উচিত। | ৯. আবাল্য সযত্নে ব্যাকরণ পাঠ করা উচিত। |
| ১০. সব ধনাঢ্য ব্যক্তিবর্গের আতিথ্য সংকার করা উচিৎ। | ১০. সব ধনাঢ্য ব্যক্তির অতিথি সৎকার করা উচিত। |
| ১১. তার কাজ করার জন্য আমি আপ্রাণ চেষ্টা করব। | ১১. তার কাজের জন্য আমি প্রাণপণ চেষ্টা করব। |
| ১২. মাতৃবিয়োগে তিনি শোকানলে মগ্ন। | ১২. মাতৃবিয়োগে তিনি শোকানলে দগ্ধ। |
| ১৩. গতকাল নীলিমা লাল পেড়ে শাড়ি পরেছিল। | ১৩. গতকাল নীলিমা লালপেড়ে শাড়ি পরেছিল। |
| ১৪. তোমার গোপন কথা শোনা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। | ১৪. তোমার গোপনীয় কথা শোনা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। |

## ১২তম বিসিএস : ১৯৯১-১৯৯২

| অশুদ্ধ | শুদ্ধ |
|---|---|
| ১. মনস্কামনা পূর্ণ না হওয়ায় সে মনোস্তাপ ভুগছে। | ১. মনস্কামনা পূর্ণ না হওয়ায় সে মনস্তাপে ভুগছে। |
| ২. অত্যান্ত গরমে কষ্ট পাচ্ছি, বাতাস করিতেছ না কেন? | ২. অত্যন্ত গরমে কষ্ট পাচ্ছি, বাতাস করছ না কেন? |
| ৩. আমাদের দৈন্যতা দৃষ্টি তোমার পুলকের কারণ কি? | ৩. আমাদের দীনতা দেখে তোমার পুলকের কারণ কি? |
| ৪. পিপীলিকা আর মরিচিকার পিছু ধাওয়া করা একই কথা। | ৪. আলেয়া আর মরীচিকার পিছে ধাওয়া করা একই কথা। |
| ৫. বাবু চলিলেন, যেন গজেন্দ্রগামিনী। | ৫. বাবু চলিলেন যেন গজেন্দ্রগমন। |
| ৬. ইতিমধ্যে যা ঘটেছে তাতেই তার মনবিকার দেখা দিয়েছে। | ৬. ইতোমধ্যে যা ঘটেছে তাতেই তার মনোবিকার দেখা দিয়েছে। |
| ৭. সর্বদেহে অসহ্যনীয় ব্যথা, ঔষধ দেব কোথায়? | ৭. সর্বদেহে অসহ্য/অসহনীয় ব্যথা, ঔষধ দেব কোথায়? |
| ৮. কালনুক্রমানুসারে আমি সবই জানিতে পারিব, কিন্তু তখন আর উপায় থাকবে না। | ৮. কালক্রমে আমি সবই জানতে পারব, কিন্তু তখন আর উপায় থাকবে না। |
| ৯. বিস্ময়াভিভুত হতবাক চিত্তে আমি তখন তোমাকে দেখিতেছিলাম। | ৯. বিস্ময়াভিভূত চিত্তে আমি তখন তোমাকে দেখিতেছিলাম। |
| ১০ মনোনীত কবিতা হইতে একটি বেছে নাও এবং আবৃত্তি করিয়া পড়। | ১০. নির্বাচিত কবিতা থেকে একটি বেছে নাও এবং আবৃত্তি কর। |
| ১১. মাননীয় সভানেত্রী এবং উপস্থিত সকল শিক্ষকগণকে লক্ষ্য করে তিনি কথাগুলি বললেন। | ১১ মাননীয়া সভানেত্রী এবং উপস্থিত সব শিক্ষককে লক্ষ্য করে তিনি কথাগুলো বললেন। |
| ১২. অনাদি অনন্তকাল ধরে আমি চিরদিন তোমাকে স্মরণ করবো। | ১২. আমি চিরদিন তোমাকে স্মরণ করব। |
| ১৩. রাষ্ট্রপ্রধানগণ আপাতত ঐকমত্যে পৌছুলেন, তবু আগামীতে কি ঘটবে বলা যায় না। | ১৩. রাষ্ট্রপ্রধানগণ আপাতত ঐকমত্যে পৌছলেন, তবে ভবিষ্যতে কী ঘটবে বলা যায় না। |
| ১৪. অনোন্যপায়ী হইয়া আমি তোমার সরণাপন্ন হইলাম। | ১৪. অনন্যোপায় হইয়া আমি তোমার শরণাপন্ন হইলাম। |



## ১৫তম বিসিএস : ১৯৯৪-১৯৯৫

| অশুদ্ধ | শুদ্ধ |
|---|---|
| ১. আমি, তুমি ও সে কাল সাভার জাতীয় স্মৃতিসৌধ দেখিতে যাব। | ১. সে, তুমি ও আমি কাল সাভার জাতীয় স্মৃতিসৌধ দেখতে যাব। |
| ২. যিনি যথার্থ্যই বিদ্যান, তিনি কখনও নিজের বিদ্যার গৌরব করে না। | ২. যিনি যথার্থই বিদ্বান, তিনি কখনো নিজের বিদ্যার গৌরব করেন না। |
| ৩. তার জ্যৈষ্ঠ পুত্র ও কনিষ্ট কন্যা বিদেশ গিয়াছে। | ৩. তার জ্যেষ্ঠপুত্র ও কনিষ্ঠ কন্যা বিদেশে গেছে। |
| ৪. বিষয়টির বিষদ ব্যাখ্যার প্রয়োজন নাই। | ৪. বিষয়টির বিশদ ব্যাখ্যার প্রয়োজন নাই। |
| ৫. ইহা একটি মুক ও বধির প্রশিক্ষণ কেন্দ্র। | ৫. ইহা একটি মূক ও বধির প্রশিক্ষণকেন্দ্র। |
| ৬. পরিবেশ দোষণ সমস্যা দিন দিন জটিল হচ্ছে। | ৬. পরিবেশ দূষণ সমস্যা দিন দিন জটিল হচ্ছে। |
| ৭. দারিদ্রতা বাংলাদেশের প্রধান সমস্যা। | ৭. দারিদ্র্য বাংলাদেশের প্রধান সমস্যা। |
| ৮. এই সব মানুষগুলির কোন ঠিকানা নেই। | ৮. এসব মানুষের কোনো ঠিকানা নেই। |
| ৯. শোকসভায় বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী, বিজ্ঞানী, দার্শনিক প্রমুখগণ শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করেন। | ৯. শোকসভায় বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী, বিজ্ঞানী, দার্শনিক প্রমুখ শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করেন। |
| ১০. মণিষী মুহম্মদ শহীদুল্লাহ একটি আদর্শ বাংলা ব্যাকরণ রচনা করেন। | ১০. মনীষী মুহম্মদ শহীদুল্লাহ একটি আদর্শ বাংলা ব্যাকরণ রচনা করেন। |
| ১১. তারা যাইতে যাইতে এ দৃশ্য দেখিয়া মুগ্ধ ও বিস্মিত হল। | ১১. তারা যেতে যেতে এ দৃশ্য দেখে মুগ্ধ ও বিস্মিত হলো। |
| ১২. তাহার প্রতি এতটা অন্যায় করিলে সবাই দোষ দিবে। | ১২. তার প্রতি এতটা অন্যায় করলে সবাই দোষ দেবে। |
| ১৩. তোমার সুখে দুঃখে পরস্পরের সাথী হও। | ১৩. তোমরা সুখে-দুঃখে একে অন্যের সাথি হও। |
| ১৪. বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান দক্ষিণ এশিয়াতে। | ১৪. বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায়। |

## ১৭তম বিসিএস : ১৯৯৫-১৯৯৬

| অশুদ্ধ | শুদ্ধ |
|---|---|
| ১. তাহার জন্য অপেক্ষা করা সমীচিন হবে না। | ১. তার জন্য অপেক্ষা করা সমীচীন হবে না। |
| ২. শারিরিক অবস্থা বুঝিয়া চিকিৎসক ডাকাবে। | ২. শারীরিক অবস্থা বুঝে চিকিৎসক ডাকবে। |
| ৩. মুর্খ লোকের দুর্গতির সীমা থাকে না। | ৩. মূর্খ লোকদের দুর্গতির সীমা থাকে না। |
| ৪. মুহুর্তের ভুলে বিদুষীরাও বিপাকে পড়ে। | ৪. মুহূর্তের ভুলে বিদুষীও বিপদে পড়ে। |
| ৫. পুরাণ চাল ভাতে বাড়ে। | ৫. পুরান চালে ভাত বাড়ে। |
| ৬. সলজ্জিত হাসি হেসে মেয়েটি উত্তর দিল। | ৬. সলজ্জ (লজ্জিত) হাসি হেসে মেয়েটি উত্তর দিল। |
| ৭. তার মত কুশলী শিল্পী ইদানিং কালে বিরল। | ৭. তার মতো কুশলী শিল্পী ইদানীং বিরল। |
| ৮. আমার অধীনস্থ এ কর্মচারী বেশ বিশ্বস্থ। | ৮. আমার অধীন এ কর্মচারী বেশ বিশ্বস্ত। |
| ৯. তিনি অযথা অশ্রুজল বিসর্জন করিয়া সময় নষ্ট করছেন। | ৯. তিনি অযথা অশ্রু বিসর্জন দিয়ে সময় নষ্ট করছেন। |
| ১০. একবিংশ শতক আসিতে আর মাত্র চারি বৎসর বাকি রয়েছে। | ১০. একবিংশ শতাব্দী আসতে আর মাত্র চার বছর বাকি রয়েছে। |
| ১১. সরকারের বাৎসরিক আয় ব্যয়ের হিসাব নিকাশের নাম হতেছে বাজেট। | ১১. সরকারের বার্ষিক আয়-ব্যয়ের হিসাব-নিকাশের নাম হচ্ছে বাজেট। |
| ১২. স্বাধিনতা ও বিজয় দিবশে সাভার জাতীয় সৃতিসৌধে শ্রদ্ধাঞ্জলী দিবার ব্যবস্থা আছে। | ১২. স্বাধীনতা ও বিজয় দিবসে সাভার জাতীয় স্মৃতিসৌধে শ্রদ্ধাঞ্জলি দেয়ার ব্যবস্থা আছে। |
| ১৩. নত্ত্ববিধান ও সত্ত্ববিধান জানা থাকিলে বানান ভুল হবে না। | ১৩. ণত্ববিধান ও ষত্ববিধান জানা থাকলে বানান ভুল হবে না। |

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



## ১৮তম বিসিএস : ১৯৯৭-১৯৯৮

| অশুদ্ধ | শুদ্ধ |
|---|---|
| ১. ইদানিংকালে অনেক মহিলাই ববকাট করেন। | ১. ইদানীং অনেক মহিলাই ববকাট করেন। |
| ২. প্রাণে ঐক্যতান বাজলে দুঃখ থাকে না। | ২. প্রাণে ঐকতান বাজলে দুঃখ থাকে না। |
| ৩. তিনি প্রভাতেই বাড়ি হইতে বাহির হয়েছেন। | ৩. তিনি প্রভাতেই বাড়ি থেকে বের হয়েছেন। |
| ৪. এ কাজটি আমার পক্ষে সম্ভব নহে। | ৪. এ কাজটি করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। |
| ৫. জাতীয় প্রেসক্লাবে তিনি এক সংবাদ সম্মেলনে বক্তৃতা করেন। | ৫. তিনি জাতীয় প্রেসক্লাবে এক সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তৃতা করেন। |
| ৬. পাঁচ সদস্যবিশিষ্ট সৌদি আরবের শিক্ষামিশন ঢাকা সফরে এসেছেন। | ৬. সৌদি আরবের পাঁচ সদস্যবিশিষ্ট শিক্ষামিশন ঢাকা সফরে এসেছে। |
| ৭. নীরিহ অতিথী শুধু আর্সিবাদ চেয়েছিলেন। | ৭. নিরীহ অতিথি শুধু আশীর্বাদ চেয়েছিলেন। |
| ৮. সুশিক্ষত ব্যক্তি মাত্রই সশিক্ষিত। | ৮. সুশিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রই স্বশিক্ষিত। |
| ৯. ভ্রান্তি কিছুতেই গুচেনা। | ৯. ভ্রান্তি কখনো ঘোচে না। |
| ১০. ব্যাধিই সংক্রমক, স্বাস্থ নয়। | ১০. ব্যাধি মাত্রই সংক্রামক, স্বাস্থ্য নয়। |

## ২০তম বিসিএস : ১৯৯৮-১৯৯৯

| অশুদ্ধ | শুদ্ধ |
|---|---|
| ১. রচনাটির উৎকর্ষতা অনস্বীকার্য। | ১. রচনাটির উৎকর্ষ অনস্বীকার্য। |
| ২. তার উদ্ধতপূর্ণ আচরণে ব্যথিত হয়েছি। | ২. তার ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণে আহত হয়েছি। |
| ৩. সকল সভ্যগণ সভায় উপস্থিত ছিলেন। | ৩. সভ্যগণ সভায় উপস্থিত ছিলেন। |
| ৪. অন্যায়ের প্রতিদান দুর্নিবার্য। | ৪. অন্যায়ের প্রতিদান দুর্নিবার। |
| ৫. তাদের মধ্যে বেশ সখ্যতা দেখতে পাই। | ৫. তাদের মধ্যে বেশ সখ্যভাব দেখতে পাই। |
| ৬. এ দায়িত্ব আমাকে দিওনা। | ৬. এ দায়িত্বভার আমাকে দিও না। |
| ৭. শরীর অসুস্থ্যের জন্য আমি কাল আসিনি। | ৭. অসুস্থতার জন্য আমি কাল আসিনি। |
| ৮. আমাকে যদি অসামান্য সুন্দরী, তবে ঐ মেয়েটিকে কি বলবেন? | ৮. আমি যদি অসামান্য সুন্দরী হই, তবে ঐ মেয়েটিকে কি বলবেন? |
| ৯. আমি সকলের সহযোগীতায় আবশ্যকীয় স্বার্থকতা লাভ করতে চাই। | ৯. আমি সকলের সহযোগিতায় উপযুক্ত সার্থকতা লাভ করতে চাই। |
| ১০. তিনি এ ঘটনার চাক্ষুস সাক্ষী। | ১০. তিনি এ ঘটনার প্রত্যক্ষ সাক্ষী। |

## ২১তম বিসিএস : ২০০০

| অশুদ্ধ | শুদ্ধ |
|---|---|
| ক. জ্ঞানি মুর্খ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর। | ক. জ্ঞানী মূর্খ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। |
| খ. শিক্ষার্থিগণের মধ্যে অনুপস্থিতের সংখ্যা কম। | খ. শিক্ষার্থীদের মধ্যে অনুপস্থিতির সংখ্যা কম। |
| গ. ধৈর্যতা, সহিষ্ণুতা মহত্ত্বের লক্ষণ। | গ. ধৈর্য, সহিষ্ণুতা মহত্ত্বের লক্ষণ। |
| ঘ. অঙ্ক কষিতে ভূল করা উচিৎ নয়। | ঘ. অঙ্ক কষতে ভুল করা উচিত নয়। |
| ঙ. অনাবশ্যকীয় ব্যাপারে কৌতুহল ভাল নয়। | ঙ. অনাবশ্যক ব্যাপারে কৌতূহল ভালো নয়। |
| চ. এই দুর্ঘটনা দৃষ্টে আমার হৃদকম্প উপস্থিত হইল। | চ. এ দুর্ঘটনা দেখে আমার হৃদকম্প উপস্থিত হলো। |
| ছ. তিনি স্বস্ত্রীক ষ্টেসনে গিয়াছেন। | ছ. তিনি সস্ত্রীক স্টেশনে গিয়েছেন। |
| জ. সন্মান, সান্তনা, সন্থান, সমিচিন ইত্যাদি শব্দাবলী অনেক ছাত্র-ছাত্রীরা শুদ্ধ লিখতে পারে না। | জ. সম্মান, সান্ত্বনা, সন্তান, সমীচীন ইত্যাদি শব্দাবলী অনেক ছাত্রছাত্রী শুদ্ধ করে লিখতে পারে না। |
| ঝ. রচণাটি ভাবগভীর, তবে ভাষার দৈন্যতা রহিয়াছে। | ঝ. রচনাটি ভাবগম্ভীর, তবে ভাষায় দীনতা রয়েছে। |
| ঞ. তাহার বৈমাত্রেয় সহোদর অসুস্থ। | ঞ. তার বৈমাত্রেয় ভাই অসুস্থ। |



## ২২তম বিসিএস : ২০০১

| অশুদ্ধ | শুদ্ধ |
|---|---|
| ক. জমিজমার সামান্ন আয় থেকে তিনি কোনমতে ক্ষুন্নিবৃত্তি নিবারণ করেন। | ক. জমিজমার সামান্য আয় থেকে তিনি কোনোমতে ক্ষুণ্নিবৃত্তি করেন। |
| খ. শামসুর রাহমান বাংলাদেশের একজন অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি। | খ. শামসুর রাহমান বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ কবি। |
| গ. কলেজের পুনর্মিলনী উৎসবে বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ যোগদান করেন। | গ. কলেজের পুনর্মিলনী উৎসবে বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ যোগদান করেন। |
| ঘ. বিয়েবাড়িতে গিয়ে তিনি আকণ্ঠ পর্যন্ত খেয়ে এলেন। | ঘ. বিয়েবাড়িতে গিয়ে তিনি আকণ্ঠ খেয়ে এলেন। |
| ঙ. বাংলা ব্যাকরণ অত্যান্ত জটিল। | ঙ. বাংলা ব্যাকরণ অত্যন্ত জটিল। |
| চ. বমালশুদ্ধ চোর গ্রেপ্তার হয়েছে। | চ. বামালসহ চোর গ্রেপ্তার হয়েছে। |
| ছ. আদালত তাকে সশরীরে হাজির হইবার নির্দেশ দিয়েছেন। | ছ. আদালত তাকে সশরীরে হাজির হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। |
| জ. তার কঠিন পরিশ্রমের ফলশ্রুতিতে সে সাফল্য অর্জন করল। | জ. তার কঠোর পরিশ্রমের ফলে সে সাফল্য অর্জন করল। |
| ঝ. সে বড় দুরাবস্থায় পরেছে। | ঝ. সে বড় দুরবস্থায় পড়েছে। |
| ঞ. সাধারণ জন গড্ডালিকা প্রবাহে ভেসে চলে। | ঞ. সাধারণ জনগণ গড্ডলিকা প্রবাহে ভেসে চলে। |

## ২৩তম বিসিএস : ২০০১

| অশুদ্ধ | শুদ্ধ |
|---|---|
| ক. জ্ঞানী মানুষ অবশ্যই যশলাভ করেন। | ক. জ্ঞানী মানুষ অবশ্যই যশোলাভ করেন। |
| খ. নিজের বিষয়ে তার কোন মনযোগ নেই। | খ. নিজের বিষয়ে তার কোনো মনোযোগ নেই। |
| গ. তার দুরাবস্থা দেখে দুঃখ হয়। | গ. তার দুরবস্থা দেখে দুঃখ হয়। |
| ঘ. নিরপরাধী ব্যক্তিকে ক্ষমা কর। | ঘ. নিরপরাধ ব্যক্তিকে ক্ষমা কর। |
| ঙ. সে আকণ্ঠ পর্যন্ত পান করেছে। | ঙ. সে আকণ্ঠ পান করেছে। |
| চ. মৃত্যু ভয়ে সে সশঙ্কিত হল | চ. মৃত্যু ভয়ে সে শঙ্কিত হলো। |
| ছ. বন্ধুর ভুল সম্পর্কে সতর্কিত করা উচিত। | ছ. বন্ধুকে তার ভুল সম্পর্কে সতর্ক করা উচিত। |
| জ. এ প্রশংসা তার সম্পর্কে প্রযুজ্য নয়। | জ. এ প্রশংসা তার সম্পর্কে প্রযোজ্য নয়। |
| ঝ. তার সৃজিত ভুলে তার ভবিষ্যৎ নষ্ট হল। | ঝ. তার সৃষ্ট ভুলে তার ভবিষ্যৎ নষ্ট হলো। |
| ঞ. সে খুবই বিদ্ধান ব্যক্তি। | ঞ. সে খুবই বিদ্বান ব্যক্তি। |

## ২৪তম বিসিএস : ২০০৩

| অশুদ্ধ | শুদ্ধ |
|---|---|
| ক. বনান ভূল দোষণীয়। | ক. বানান ভুল দূষণীয়। |
| খ. ইচ্ছা প্রমাণ হয়েছে। | খ. ইচ্ছা প্রমাণিত হয়েছে। |
| গ. উৎপন্ন বৃদ্ধির জন্যে চাই কঠোর পরিশ্রম। | গ. উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য চাই কঠোর পরিশ্রম। |
| ঘ. অধীনস্ত কর্মচারীরা করেছে। | ঘ. অধীন কর্মচারীরা কাজটি করেছে। |
| ঙ. ছেলেটি ভয়ানক মেধাবী। | ঙ. ছেলেটি অত্যন্ত মেধাবী। |
| চ. জাপান উন্নতশীল দেশ। | চ. জাপান উন্নত দেশ। |
| ছ. বিনয় উন্নত ব্যক্তিত্যের উপাদান। | ছ. বিনয় উন্নত ব্যক্তিত্বের উপাদান। |
| জ. দুস্কৃতকারীরা সমাজের শত্রু। | জ. দুষ্কৃতকারী সমাজের শত্রু। |
| ঝ. দৈন্যতা প্রশংসনীয় নয়। | ঝ. দীনতা প্রশংসনীয় নয়। |
| ঞ. বিবিধ প্রকার দ্রব্য কিনলাম। | ঞ. বিবিধ দ্রব্য কিনলাম। |

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



## ২৫তম বিসিএস : ২০০৫

| অশুদ্ধ | শুদ্ধ |
|---|---|
| ক. গড্ডালিকা প্রবাহ। | ক. গড্ডলিকা প্রবাহ। |
| খ. ইহার আবশ্যক নাই। | খ. ইহার আবশ্যকতা নাই। |
| গ. এটা হচ্ছে ষষ্ঠদশ বার্ষিক সাধারণ সভা। | গ. এটা ষোড়শতম বার্ষিক সাধারণ সভা। |
| ঘ. সকল সদস্যবৃন্দ সভায় উপস্থিত ছিলেন। | ঘ. সদস্যবৃন্দ সভায় উপস্থিত ছিলেন। |
| ঙ. তিনি সস্ত্রীক কুমিল্লায় বাস করেন। | ঙ. তিনি সস্ত্রীক কুমিল্লায় বসবাস করেন। |
| চ. লোকটি তোমার বিরুদ্ধে সাক্ষী দিয়েছে। | চ. লোকটি তোমার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিয়েছে। |
| ছ. বর্ণিত অবস্থার প্রেক্ষিতে তার আবেদন মঞ্জুর করা যায়। | ছ. বর্ণিত অবস্থার প্রেক্ষিতে তার আবেদন মঞ্জুর করা যায়। |
| জ. মেধাবী ছাত্রছাত্রীদেরকে সম্বর্ধনা দেওয়া হয়েছে। | জ. মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদেরকে সংবর্ধনা দেয়া হয়েছে। |
| ঝ. স্বাক্ষরতা কর্মসূচী সফল হয়েছে। | ঝ. সাক্ষরতা কর্মসূচি সফল হয়েছে। |
| ঞ. উপরোক্ত। | ঞ. উপর্যুক্ত। |

## ২৭তম বিসিএস : ২০০৬

| অশুদ্ধ | শুদ্ধ |
|---|---|
| ক. তিনি শহীদ মিনারে শ্রদ্ধাঞ্জলী অর্পণ করেছেন। | ক. তিনি শহিদমিনারে শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করেছেন। |
| খ. জাপান একটি সমৃদ্ধশালী দেশ। | খ. জাপান একটি সমৃদ্ধ দেশ। |
| গ. কাব্যটির উৎকর্ষতা প্রশংসনীয়। | গ. কাব্যটির উৎকর্ষ/উৎকৃষ্টতা প্রশংসনীয়। |
| ঘ. রবীন্দ্রনাথ ভয়ঙ্কর প্রতিভাবান কবি ছিলেন। | ঘ. রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত প্রতিভাবান কবি ছিলেন। |
| ঙ. তার কথার সঙ্গে কাজের সামঞ্জস্যতা নেই। | ঙ. তার কথার সাথে কাজের সামঞ্জস্য নেই। |
| চ. দারীদ্র্যতাই মধুসূদনের শেষ জীবনের বৈশিষ্ট্য। | চ. দারিদ্র্যই মধুসূদনের শেষ জীবনের বৈশিষ্ট্য। |
| ছ. দূর্জন বিদ্যান হলেও পরিত্যজ্য। | ছ. দুর্জন বিদ্বান হলেও পরিত্যাজ্য। |
| জ. নেপালের ভৌগলিক সীমা বর্ণনা কর। | জ. নেপালের ভৌগোলিক সীমানা বর্ণনা কর। |
| ঝ. সে কৌতূক করার কৌতুহল সম্বরন করতে পারল না। | ঝ. সে কৌতুক করার কৌতূহল সম্বরণ করতে পারল না। |
| ঞ. স্বাধীনতাত্তোরকালে বাংলা নাটকের অত্যাধিক উন্নতি সাধিত হয়েছে। | ঞ. স্বাধীনতাত্তোরকালে বাংলা নাটকের অত্যধিক উন্নতি সাধিত হয়েছে। |

## ২৮তম বিসিএস : ২০০৯

বানান, শব্দ প্রয়োগ, বিন্যাস, চলিতরীতি ইত্যাদি শুদ্ধ করে নিম্নের বাক্যগুলো পুনরায় লিখুন :

১. এমন মাধুর্যতাপূর্ণ আচরন সকলের মুগ্ধ সৃষ্টি কোরবেই।
উত্তর : এমন মাধুর্যপূর্ণ আচরণ সবাইকে মুগ্ধ করবেই।

২. সশঙ্কিত মানুষটি বুদ্ধিহীনতা ভুগিবে এমন ভাবছ কেমন কারনেই?
উত্তর : শঙ্কিত মানুষ বুদ্ধিহীনতায় ভুগবে, এমন ভাবার কারণ নেই।

৩. কবি সামগ্রের ধারনা ত্রুটি রহিয়াছে বলে মনে হয়।
উত্তর : কবির সামগ্রিক ধারণায় ত্রুটি আছে বলে মনে হয়।

৪. প্রতিভা ফরমাইশ দিয়া গড়া যায় নাই, উহা প্রকৃতির দান, কৃতাঞ্জলীপূটে গ্রহণ করতে হয়।
উত্তর : প্রতিভা ফরমাশ দিয়ে গড়া যায় না, এটা প্রকৃতির দান, কৃতাঞ্জলিপুটে গ্রহণ করতে হয়।

৫. হল বিশাল খুড়িতেই কেচো গর্ত লম্বা বাহির সর্প থেকে।
উত্তর : কেঁচোর গর্ত খুড়তেই বিশাল লম্বা সাপ বের হলো।



৬. সকল ঝাড়ুদার মহিলারা রাস্তা পরিষ্কার করছিল এবং রাশি রাশি পাতাগুলো রাস্তার এক পার্শ্বে স্তুপিকৃত করে রাখিতেছিল।
উত্তর : ঝাড়ুদার মহিলারা রাস্তা পরিষ্কার করছিল এবং পাতাগুলো রাস্তার এক পাশে স্তূপ করে রাখছিল।

৭. বর্শা সজল মেঘকজ্জ্বল দিবসে সূর্য্যের উজ্জ্বলতা থাকে না।
উত্তর : বর্ষাস্নাত মেঘাচ্ছন্ন দিনে সূর্যের উজ্জ্বলতা থাকে না।

৮. বাংলাদেশের সপক্ষে কী ভালো কী মন্দ, তাহা বাংলাদেশই ঠিক করবে।
উত্তর : বাংলাদেশের জন্য কী ভালো কী মন্দ, তা বাংলাদেশই ঠিক করবে।

৯. বৈস্য সভ্যতার রোগ সারাইবার বৈধ উপায় হচ্ছে মন্ত্রোষধি।
উত্তর : বৈশ্য সভ্যতায় রোগ সারানোর উত্তম উপায় ছিল মন্ত্রৌষধী।

১০. মানুষের শারীরিক-ঘেষা যে-সব সংস্কার, জীবসৃষ্টির ইতিহাসে সেইগুলো অনেক পুরান।
উত্তর : মানুষের শরীর সংক্রান্ত যেসব সংস্কার, জীবসৃষ্টির ইতিহাসে সেগুলো অনেক পুরানো।

১১. অন্যের সঙ্গে ঐক্যতাবোধের দ্বারা যে মহাত্ম ঘটাইয়া থাকে সেইটিই হচ্ছে মনের ঐশ্বর্য্য।
উত্তর : অন্যের সাথে একতাবোধের দ্বারা যে মহত্ত্ব ঘটে থাকে সেটাই মনের ঐশ্বর্য।

১২. এখনকার দিনে বাংলাদেশের সাহিত্য লোক লোকারণ্য বলে মনে হয়।
উত্তর : এখনকার বাংলাদেশের সাহিত্যাঙ্গণ লোকারণ্যে ভারাক্রান্ত বলে মনে হয়।

## ২৯তম বিসিএস : ২০১০

বানান, শব্দ প্রয়োগ, বিন্যাস, চলিতরীতি ইত্যাদি শুদ্ধ করে নিচের বাক্যগুলো পুনরায় লিখুন :

১. বঙ্কিমচন্দ্রের রচনারীতির উৎকর্ষতা অনস্বীকার্য।
উত্তর : বঙ্কিমচন্দ্রের রচনারীতির উৎকর্ষ অনস্বীকার্য।

২. সুশিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রই সশিক্ষিত।
উত্তর : সুশিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রই স্বশিক্ষিত।

৩. সকলের সহযোগীতায় আমি স্বার্থকতা লাভ করতে চাই।
উত্তর : সকলের সহযোগিতায় আমি সার্থকতা লাভ করতে চাই।

৪. ঝুড়িতে রাখা সমস্ত মাছগুলোর আকার একই রকমের।
উত্তর : ঝুড়িতে রাখা সব মাছের আকার একই রকম।

৫. তাহার শুশ্রুষা ও সান্তনায় আমি শক্তি ও উৎসাহ পাইলাম।
উত্তর : তার শুশ্রূষা ও সান্ত্বনায় আমি শক্তি ও উৎসাহ পেলাম।

৬. এমন অসহ্যনীয় ব্যাথা কখনো অনুভব করিনি।
উত্তর : এমন অসহ্য ব্যথা কখনো অনুভব করিনি।

৭. স্ব স্ব ভূমির পুষ্করিনী পরিষ্কার করার নিমিত্ত কর্তৃপক্ষ পুরষ্কার ঘোষণা করিয়াছে।
উত্তর : নিজ নিজ পুকুর পরিষ্কার করার জন্য কর্তৃপক্ষ পুরস্কার ঘোষণা করেছে।

৮. কবির শোকসভায় বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবিরা শ্রদ্ধাঞ্জলী জ্ঞাপন করেছে।
উত্তর : কবির শোকসভায় বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবীগণ শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করেছেন।

৯. তিনি সানন্দিতচিত্তে সম্মতি দিলেন।
উত্তর : তিনি সানন্দে সম্মতি দিলেন।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



১০. সে যে ব্যাকারণের বিভিষীকায় ভিত নয়, আশা করি তুমি তা জান।
উত্তর : সে যে ব্যাকরণের ভয়ে ভীত নয়, আশা করি তুমি তা জান।

১১. নদীর তীরের সব জমিগুলো আমার আয়ত্ত্বাধীনে আছে।
উত্তর : নদীর তীরের সব জমি আমার আয়ত্তে আছে।

১২. ভূমিকম্পে উর্ধমুখী দালানটি ধ্বসে পড়লো।
উত্তর : ভূমিকম্পে দালানটি ধসে পড়লো।

## ৩০তম বিসিএস : ২০১১

বানান, শব্দ প্রয়োগ, বিন্যাস, ভাষারীতি ইত্যাদি শুদ্ধ করে নিম্নের বাক্যগুলো পুনরায় লিখুন।

১. অস্তমান সূর্য দেখতে পর্যটকেরা সমুদ্রের সৈকতে ভীড় করেছে।
উত্তর : অস্তমান সূর্য দেখতে পর্যটকরা সমুদ্র সৈকতে ভিড় জমিয়েছে।

২. তিনি স্বস্ত্রীক বাহিরে গেছেন।
উত্তর : তিনি সস্ত্রীক বাইরে গেছেন।

৩. সকল ছাত্রদের অবগতির জন্য বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়েছে।
উত্তর : সকল ছাত্রের অবগতির জন্য বিজ্ঞপ্তি দেয়া হয়েছে।

৪. অন্তরের অন্তস্থল থেকে আমি শ্রদ্ধা নিবেদন করছি।
উত্তর : অন্তরের অন্তস্তল থেকে আমি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি।

৫. মরুভুমিতে বিচরণ করলে অনেক সময় মরুদ্যানের সন্ধান পাওয়া যায়।
উত্তর : মরুভূমিতে বিচরণ করলে অনেক সময় মরূদ্যানের সন্ধান মেলে।

৬. আমি এ ঘটনা চাক্ষুস প্রত্যক্ষ করেছি।
উত্তর : আমি এ ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছি।

৭. আবশ্যকীয় ব্যয়ে কার্পণ্যতা করা অনুচিত।
উত্তর : আবশ্যক ব্যয়ে কার্পণ্য অনুচিত।

৮. নতুন নতুন ছেলেগুলি বড়ই উতপাত করছে।
উত্তর : নতুন ছেলেগুলো বড়ই উৎপাত করছে।

৯. তার মতো কৃতি ছাত্র খুব কম দেখা যায়।
উত্তর : তার মতো কৃতী ছাত্র খুব কম দেখা যায়।

১০. রবিন্দ্র প্রতীভা বিশ্বের বিস্ময়।
উত্তর : রবীন্দ্র প্রতিভা বিশ্বের বিস্ময়।

১১. বিমানের সিলেটগামী আভ্যন্তরীন ফ্লাইটটি দেরীতে ছাড়বে।
উত্তর : সিলেটগামী বিমানের অভ্যন্তরীণ ফ্লাইটটি বিলম্বে ছাড়বে।

১২. ছাত্রদের কঠোর অধ্যাবসায় প্রশংসনীয়।
উত্তর : ছাত্রদের কঠোর অধ্যবসায় প্রশংসনীয়।



## ৩১তম বিসিএস : ২০১১

বানান, শব্দ প্রয়োগ ও বিন্যাস, ভাষারীতি ইত্যাদি শুদ্ধ করে নিচের বাক্যগুলো পুনরায় লিখুন :

১. সমস্ত প্রাণীকূলই পরিবেশের জন্য নিতান্ত প্রয়োজন।
শুদ্ধ : সব প্রাণিই পরিবেশের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

২. মুমুর্ষ লোকটির সাহায্য করা উচিৎ।
শুদ্ধ : মুমূর্ষু লোকটিকে সাহায্য করা উচিত।

৩. তোমার কটুক্তি শুনিয়া তিনি মর্মাহত হয়েছেন।
শুদ্ধ : তোমার কটূক্তি শুনে তিনি মর্মাহত হয়েছেন।

৪. রুগ্ন ব্যক্তিটির জন্য আরও অধিকতর সাহায্য প্রয়োজন।
শুদ্ধ : রুগ্ন ব্যক্তিটির জন্য আরও অধিক সাহায্য প্রয়োজন।

৫. কারোর জন্যই দৈন্যতা কাংখিত হতে পারে না।
শুদ্ধ : কারো জন্যই দৈন্য/দীনতা কাম্য হতে পারে না।

৬. আমি বিভূতিভূষন বন্ধোপাধ্যায়ের কোনো উপন্যাস পড়ি নি।
শুদ্ধ : আমি বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কোনো উপন্যাস পড়িনি।

৭. পুকুর পরিস্কারের জন্য কতৃপক্ষ পুরষ্কার ঘোষনা করেছে।
শুদ্ধ : পুকুর পরিষ্কারের জন্য কর্তৃপক্ষ পুরস্কার ঘোষণা করেছেন।

৮. অদ্যক্ষ মহদয় ঘটনার বিশৎ বিবরন জানতে চাইল।
শুদ্ধ : অধ্যক্ষ মহোদয় ঘটনাটির বিশদ বিবরণ জানতে চাইলেন।

৯. বিষয়টি মস্তিস্ক গ্রহন করার নয়, অন্তরে উপলদ্ধির যোগ্য।
শুদ্ধ : বিষয়টি মস্তিষ্কগ্রাহ্য নয়, অন্তরে উপলব্ধিযোগ্য।

১০. অনুষ্ঠানে স্ববান্দবে আপনি আমন্ত্রিত।
শুদ্ধ : অনুষ্ঠানে আপনি সবান্ধব আমন্ত্রিত।

১১. সেই ভীবৎসো ঘটনা এখনও বিস্মিত হতে পারি নি।
শুদ্ধ : সেই বীভৎস ঘটনা এখনও বিস্মৃত হতে পারিনি।

১২. লক্ষী মেয়ে যারা ছিল, এখন তারা চরছে ঘোটক।
শুদ্ধ : যারা লক্ষ্মী ছিল, তারা এখন ঘোড়ায় চড়ছে।

## ৩২তম বিসিএস : ২০১২

বানান, শব্দ প্রয়োগ ও বিন্যাস, ভাষারীতি ইত্যাদি শুদ্ধ করে নিচের বাক্যগুলো পুনরায় লিখুন :

১. দৈন্যতা প্রশংসনীয় নয়।
উত্তর : দৈন্য/দীনতা প্রশংসনীয় নয়।

২. ছাত্রীগণের মধ্যে অনুপস্থিতের সংখ্যা কম।
উত্তর : ছাত্রীদের মধ্যে অনুপস্থিতির সংখ্যা কম।

৩. এমন অসহ্যনীয় ব্যাথা আমি আর কখনও অনুভব করি নাই।
উত্তর : এমন অসহ্য ব্যথা আমি কখনো অনুভব করিনি।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



৪. আকণ্ঠ পর্যন্ত ভোজনে স্বাস্থ্যহানি ঘটে।
উত্তর : আকণ্ঠ ভোজনে স্বাস্থ্যহানি ঘটে।

৫. আবশ্যকীয় ব্যায়ে কার্পণ্যতা অনুচিত।
উত্তর : আবশ্যক ব্যয়ে কার্পণ্য অনুচিত।

৬. তাহার বৈমাত্রেয় সহোদর অসুস্থ।
উত্তর : তার বৈমাত্রেয় ভাই অসুস্থ।

৭. সমুদয় সভ্যগণ আসিয়াছেন।
উত্তর : সভ্যগণ এসেছেন।

৮. পাতায় পাতায় পরে শিশির শিশির।
উত্তর : পাতায় পাতায় পড়ে নিশির শিশির।

৯. ঝন্ঝা শেষ হইতে না হতে কুঝ্ঝটি অনচলটি ছাইয়া ফেললো।
উত্তর : ঝঞ্ঝা শেষ হতে না হতে কুজ্ঝটিকা অঞ্চলটি ছেয়ে ফেললো।

১০. পৈত্রিক সম্পত্তির মাদ্যমে ভদ্রস্থতা রক্ষা হয়, মহদুপকারও হয়।
উত্তর : পৈতৃক সম্পত্তির মাধ্যমে ভদ্রতা রক্ষা হয়, মহোপকারও হয়।

১১. সকলে একত্রিত হয়ে ধুমপান পরিত্যায্য ঘোষণা করিলেন।
উত্তর : সকলে একত্র হয়ে ধূমপান পরিত্যাজ্য ঘোষণা করলেন।

১২. অনুবাদিত কবিতাটি পড়ে সে উচ্ছাসে উচ্ছল হয়ে উঠল।
উত্তর : অনূদিত কবিতাটি আবৃত্তি করে সে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল।

## ৩৩তম বিসিএস : ২০১২

**বানান, শব্দ প্রয়োগ ও বিন্যাস, ভাষারীতি ইত্যাদি শুদ্ধ করে নিচের বাক্যগুলো পুনরায় লিখুন :**

১. এসব লোকগুলোকে আমি চিনি।
উত্তর : এসব লোককে আমি চিনি।/ এ লোকগুলোকে আমি চিনি।

২. তুমি আমার কাছে আরও প্রিয়তর।
উত্তর : তুমি আমার কাছে আরও প্রিয়।

৩. শুধুমাত্র গায়ের জোরে কাজ হয় না।
উত্তর : শুধু গায়ের জোরে কাজ হয় না।

৪. তিনি নিরহঙ্কারী ও নিরপরাধী মানুষ।
উত্তর : তিনি নিরহঙ্কার ও নিরপরাধ মানুষ।

৫. সে গাছ হইতে অবতরণ করিল।
উত্তর : সে গাছ থেকে নামলো।

৬. অচিরেই বাংলাদেশ একটি সমৃদ্ধশালী দেশে পরিণত হবে।
উত্তর : অচিরেই বাংলাদেশ একটি সমৃদ্ধ দেশে পরিণত হবে।

৭. আসছে আগামীকাল কলেজ বন্ধ থাকবে।
উত্তর : আগামীকাল কলেজ বন্ধ থাকবে।



৮. তার দারিদ্র্যতায় কষ্ট পেয়েছি আর সৌজন্যতায় মুগ্ধ হয়েছি।
উত্তর : তার দারিদ্র্যে কষ্ট পেয়েছি আর সৌজন্যে মুগ্ধ হয়েছি।

৯. আমি অপমান হয়েছি।
উত্তর : আমি অপমানিত হয়েছি।

১০. ইতোমধ্যে গ্রামের সমস্ত লোকেরা সম্বর্ধনা সভায় যোগ দিল।
উত্তর : ইতোমধ্যে গ্রামের সব লোক সংবর্ধনা সভায় যোগ দিয়েছে।

১১. নিরপরাধী লোক কাকেও ভয় করে না।
উত্তর : নিরপরাধ লোক কাউকেই ভয় করে না।

১২. অপরাহ্ন লিখতে অনেকেই ভুল করে।
উত্তর : অপরাহ্ণ লিখতে অনেকেই ভুল করে।

## ৩৪তম বিসিএস : ২০১৪

**বাক্যগুলো শুদ্ধ করুন :**

১. তিনি স্বচ্ছল পরিবারের সন্তান।
উত্তর : তিনি সচ্ছল পরিবারের সন্তান।

২. এ খবরটি অত্যান্ত বেদনাদায়ক।
উত্তর : খবরটি অত্যন্ত বেদনাদায়ক।

৩. মুখস্তবিদ্যা পরিহার করা দরকার।
উত্তর : মুখস্থবিদ্যা পরিহার করা দরকার।

৪. তিনি পৈত্রিক ভিটায় বসবাস করেন।
উত্তর : তিনি পৈতৃক ভিটায় বসবাস করেন।

৫. সুশিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রই সশিক্ষিত।
উত্তর : সুশিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রই স্বশিক্ষিত।

৬. এটি একটি অনুবাদিত গ্রন্থ।
উত্তর : এটি একটি অনূদিত গ্রন্থ।

৭. আমি অপমান হয়েছি।
উত্তর : আমি অপমানিত হয়েছি।

৮. এ ব্যক্তি সকলের মাঝে বয়স্ক।
উত্তর : এ ব্যক্তি সকলের মাঝে বয়োজ্যেষ্ঠ।

৯. এ তো তার দূর্লভ সৌভাগ্য।
উত্তর : এ তো তার দুর্লভ সৌভাগ্য।

১০. তোমার সঙ্গে আমার একটা গোপন পরামর্শ আছে।
উত্তর : তোমার সাথে আমার একটা গোপনীয় পরামর্শ আছে।

১১. বালকটি আরোগ্য হয়েছে।
উত্তর : বালকটি আরোগ্য লাভ করেছে।

১২. সাভার ট্র্যাজেডির শোকসভায় বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবি, বিজ্ঞানী, দার্শনিক প্রমুখগণ শ্রদ্ধাঞ্জলী নিবেদন করেন।
উত্তর : সাভার ট্র্যাজেডির শোকসভায় বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী, বিজ্ঞানী, দার্শনিক প্রমুখ শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেন।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

ঘ

# প্রবাদ-প্রবচনের নিহিতার্থ প্রকাশ

লোক পরম্পরায় প্রচলিত উক্তি বা বাক্যকেই বলা হয় প্রবাদ। আর 'প্র' অর্থ প্রকৃষ্ট এবং 'বচন' অর্থ উক্তি– এ থেকে প্রবচন শব্দটির উৎপত্তি। প্রবাদ-প্রবচন বিশিষ্ট ও তাৎপর্যমূলক অর্থ প্রকাশ করে। এর মধ্যে লুকিয়ে রয়েছে নীতিবাক্য, উপদেশ, হাস্যরস প্রভৃতি। প্রবাদ ও প্রবচনের মধ্যে পার্থক্য এতই সূক্ষ্ম যে, এদের একটি থেকে অন্যটি পৃথক করা দুরূহ। এছাড়া কিছু কিছু প্রবাদ-প্রবচন বাগধারায় অন্তর্ভুক্ত হয়ে গিয়েছে। বাগধারা ও প্রবাদ-প্রবচনে অনেক ক্ষেত্রে সাদৃশ্য দেখা যায়।

কখন, কিভাবে এবং কোন উৎস থেকে প্রবাদ-প্রবচনের উৎপত্তি তা নির্ণয় করা কঠিন। প্রচলিত প্রবাদ-প্রবচনগুলো যুগ যুগ ধরে লোকসমাজে প্রচলিত হয়ে আসছে। শুধু বাংলা ভাষায় নয়- পৃথিবীর সব ভাষাতেই এ ধরনের প্রবাদ-প্রবচন প্রচলিত আছে। কবি হাফিজ, সাদী, মিলটন, শেক্সপিয়র প্রমুখ বিশ্ববিশ্রুত লেখকদের রচনায় অসংখ্য প্রবাদ-প্রবচনের উল্লেখ দেখা যায়। এগুলো প্রত্যেক ভাষারই অমূল্য সম্পদ। ভাব বা বিষয়বস্তু প্রকাশের অপরিসীম ক্ষমতার জন্যই প্রবাদ-প্রবচনগুলো যুগ যুগ ধরে কবি-সাহিত্যিক ও পণ্ডিতসমাজ স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাদের লেখায় ব্যবহার করে আসছেন। এগুলোর যথাযথ ব্যবহার বক্তব্যকে তাৎপর্যপূর্ণ ও জোরদার করে তোলে। বিশ্বের প্রতিভাধর মনীষীদের বক্তব্য ও সারগর্ভ ভাষণের মধ্যে প্রবাদ-প্রবচন পরিদৃষ্ট হয় বলে এগুলোকে 'Saying of the Wise' বলা হয়।

## বাংলা সাহিত্যে প্রবাদ-প্রবচনের জনপ্রিয়তার কারণ

প্রবাদ-প্রবচন বাংলা ভাষার নিজস্ব সম্পদ বলে পরিগণিত বা বিবেচিত। জনপ্রিয় প্রবাদ-প্রবচনগুলো যে সর্বজনগ্রাহ্য বৈশিষ্ট্য অর্জন করেছে তার কারণগুলো নিম্নরূপ :

১. **সহজ অর্থদ্যোতকতা** : প্রাত্যহিক জীবনের সহজ সরল অনাড়ম্বর ভাষায় রচিত হয় বলে প্রবাদ-প্রবচনের অর্থ সহজেই বোঝা যায়। সহজ, সরল ও অনায়াস অর্থবোধগম্যতার জন্য সাধারণ মানুষ তাই প্রাত্যহিক জীবনে প্রবাদ প্রয়োগে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে।

২. **ভাবসংহতি** : অনেক শব্দ প্রয়োগ করে যে ভাব প্রকাশ করা কঠিন হয়ে পড়ে, প্রবাদে তা অল্পকথায় সংহতভাবে প্রকাশিত হয়। ফলে যে অভিজ্ঞতা প্রকাশের জন্য আমরা উপযুক্ত কথার জন্য হাতড়াই প্রবাদে তা সহজে বাঙ্ময় হতে দেখে শেষপর্যন্ত প্রবাদটিকেই ভাব প্রকাশের জন্য গ্রহণ করি। এভাবে যেসব ভাব প্রকাশে প্রবাদই সবচেয়ে বেশি সহায়ক হয় সেসব ক্ষেত্রে আমরা প্রবাদের সাহায্য নেই।



৩. **সরল প্রকাশভঙ্গি** : প্রবাদের সরল প্রকাশভঙ্গি সহজেই শ্রোতার মনে গেঁথে যায়। স্মৃতিতে ধরে রেখে লোকপরম্পরায় মুখে মুখে সমপ্রচলিত হওয়ার ক্ষেত্রে প্রবাদের মধ্যে কিছু স্মৃতি-সহায়ক বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়। যেমন :

ক. ছন্দ : আগে গেলে বাঘে খায়
পিছে গেলে সোনা পায়।

খ. অনুপ্রাস : অর্থই অনর্থের মূল। অভাবে স্বভাব নষ্ট। যেখানে যেমন, সেখানে তেমন।

গ. অন্ত্যমিল : অল্প শোকে কাতর, অধিক শোকে পাথর।

৪. **শোভন ভাব প্রকাশ** : মানবচরিত্রের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন ও সমালোচনা অধিকাংশ প্রবাদের মুখ্য উদ্দেশ্য। জীবনের নির্মম সত্যকে কঠিন বা স্থূল ভাষায় না বলে প্রবাদে ইঙ্গিতময় শোভন ভাষায় বলা হয়ে থাকে। রুচিবান মানুষের কাছে শোভন পন্থায় মানবচরিত্র সম্পর্কে সতর্ক সংবাদ এবং হিতকর পরামর্শ ও যথাযথ উপদেশ প্রবাদ-প্রবচনের মাধ্যমে মূর্ত হয়ে ওঠে।

৫. **অভিজ্ঞতার সারাৎসার** : প্রবাদের আকর্ষণ ও তাৎপর্যের মূলে রয়েছে সমৃদ্ধ জীবন অভিজ্ঞতার সরল ও সংহত প্রকাশ। যুগ-যুগান্তরের সঞ্চিত অভিজ্ঞতা আমাদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় এমনভাবে মিলে যায় যে, আমরা প্রবাদে তার প্রতিফলন দেখে তার প্রতি আকৃষ্ট হই।

৬. **অর্থব্যঞ্জকতা** : প্রবাদের রয়েছে গভীর অর্থব্যঞ্জকতা বা স্বল্প শব্দ প্রয়োগে গভীর ভাব প্রকাশের আশ্চর্য ক্ষমতা। এক্ষেত্রে প্রবাদের বাচনিক অর্থ প্রধান নয়, অভিলষিত অর্থ বা রূপক অর্থই প্রধান।

৭. **সর্বজনগ্রাহ্যতা** : প্রবাদে সাধারণত এমন অভিজ্ঞতাই বাণীরূপ পায়, যা সচরাচর সাধারণ মানুষের অভিজ্ঞতার জগৎ থেকে বাইরে নয়। প্রবাদের ভাবসত্যের জগৎ আমাদের সাধারণ অভিজ্ঞতার পরিমণ্ডলের মধ্যে থাকে বলে তা সর্বজনগ্রাহ্য হয়ে ওঠে।

## বাক্য দিয়ে প্রবাদ প্রবচনের নিহিতার্থ প্রকাশ

### ১. অর্থই অনর্থের মূল

অর্থ মানবজীবনের জন্য অপরিহার্য হলেও অর্থের যথাযোগ্য ব্যবহার না হলে ব্যক্তি ও সমাজজীবনে নেমে আসে অকল্যাণ। অর্থ উপার্জনের পন্থা যদি সৎ না হয়, কিংবা অন্যায় স্বার্থ হাসিলের জন্য যদি অর্থের অপব্যবহার করা হয় তবে তা বিরাট ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। অর্থ ও সম্পদ ছাড়া জীবনে সুখ, শান্তি, কল্যাণ নিশ্চিত করা যায় না। কিন্তু হীন চরিত্রের লোকের হাতে যখন এই অর্থ অন্যায় কাজে ব্যবহৃত হয় তখন অর্থই অশান্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। অর্থলোলুপ মানুষ অর্থের লোভে জঘন্য কাজে লিপ্ত হয়। অন্যায় পথে অর্জিত অর্থ মানুষকে বিবেকহীন ও দাম্ভিক করে তোলে। 'দুনিয়াটা টাকার বশ' এ চিন্তা-চেতনায় বিশ্বাসী লোকজন তখন সমাজে একটি অশুভ প্রতিযোগিতা সৃষ্টি করে মানবসমাজকে বিভক্তির দিকে ঠেলে দেয়।

### ২. অসির চেয়ে মসি বড়

অসি অর্থাৎ তরবারী, যার ক্ষমতা বিশাল। যে মারণাস্ত্রের সাহায্যে শত্রু দমন হয়, মুহূর্তে লাখ লাখ প্রাণ বিনষ্ট হয়। এমনকি গোটা দেশও সমূলে ধ্বংস হয়। আপাতদৃষ্টিতে অসি অপেক্ষা মসির ক্ষমতা নগণ্য মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে তা সত্য নয়। কারণ, অসির ক্ষমতা সাময়িক বা ক্ষণস্থায়ী। পক্ষান্তরে,

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



মসি বা লেখনীরূপী অস্ত্রের মাধ্যমে অনেক মনীষী তাঁদের জ্ঞানগর্ভ দর্শন, বিজ্ঞান, সাহিত্য, ইতিহাস, চিকিৎসাশাস্ত্র, রাজনীতি প্রভৃতি বিষয়ে বিশ্ব-মানবতার কল্যাণে তাদের চিন্তাধারা লিপিবদ্ধ করে গেছেন, তাঁরা মানব-সভ্যতার ইতিহাসে স্মরণীয় ও বরণীয় হয়েছেন। তাদের অবদানের কথা মানুষ চিরকাল শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করবে। কাজেই অসি অপেক্ষা মসি অধিকতর শক্তিমান।

### ৩. অধর্মের ফল হইতে নিষ্কৃতি নাই

মানুষের ধর্ম পরোপকার করা। কিন্তু মানুষ যখন ধর্মচ্যুত হয় তার পরিণাম হয় ভয়াবহ নৈতিক অবক্ষয়ের দরুন পাপবোধ সবসময় তাকে পীড়িত করে তোলে। যার হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া সম্ভব হয় না। পরিণামে তার ধ্বংস অনিবার্য। সত্যবোধই মানুষকে আত্মিক বলে বলীয়ান করে। আর তার ফলেই মানুষ মৃত্যু থেকে অমৃতের দিকে এগুতে পারে। কিন্তু যে অধর্মের পথে চলে সে আপাতদৃষ্টিতে জয়ী হয়েও পরিণামে মানসিক শান্তি হারিয়ে জীবন ব্যর্থ করে তোলে, নিজের এবং আত্মীয়স্বজনের সর্বনাশ ডেকে আনে। সৎকর্ম যেমন কল্যাণকামী ও সৃষ্টিশীল, অশুভকর্ম তেমনি অকল্যাণকামী ও ধ্বংসাত্মক। সাধুতার জয় যেমন নিশ্চিত তেমনিই অমোঘ অধর্মের দরুন অন্তরে সৃষ্টি করে নরকযন্ত্রণা।

### ৪. আপনি আচরি ধর্ম পরের বোঝাও

মহৎ কর্ম নিজের জীবনে আয়ত্ত করে অপরকে তা করার জন্য নির্দেশ দিতে হবে। ধর্ম মানুষকে সৎ ও কল্যাণের পথে পরিচালিত করে— এ কথা যদি একজন অধার্মিক লোক পুনঃপুন বলতে থাকে তখন তা সবার কাছেই বিরক্তিকর মনে হয়। এক্ষেত্রে প্রথমে নিজে ধর্মের দীক্ষা নিয়ে বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করে পরে তা অন্যকে পালন করতে বলা উচিত। নিজের মধ্যে যে গুণের অভিব্যক্তি নেই তা অন্যকে শিক্ষা দিতে গেলে বিড়ম্বনার শিকার হতে হয়। যে কোনো বিষয় সম্পর্কে মানুষকে শিক্ষা দিতে গেলে, উপদেশ দিতে গেলে বা বোঝাতে গেলে আগে দেখতে হবে তা নিজের মধ্যে কতটুকু আছে। নিজের মধ্যে যা নেই অন্যকে তা বোঝাতে বা শিক্ষা দিতে যাওয়া চরম বোকামি।

### ৫. ইচ্ছা থাকলে উপায় হয়

প্রতিটি কাজের পেছনেই তীব্র ইচ্ছে থাকা প্রয়োজন। ইচ্ছেশক্তির বলেই যে কোনো অসাধ্য সাধন করা যায়। এ শক্তির দ্বারা চিত্তের একাগ্রতা, ধৈর্য ও অধ্যবসায়ের সৃষ্টি হয়, যা মানুষকে তার অভীষ্ট লক্ষ্যে ধাবিত করে। সংগ্রামমুখর মানবজীবনে সহজলভ্য বলতে কিছু নেই, কিন্তু তাই বলে কোনো কাজ মানুষের অসাধ্য নয়। আগ্রহ, ধৈর্য ও নিষ্ঠার সাথে কাজ করলে কাজে অবশ্যই সফলতা আসবে। মানুষ অপরাজেয় ইচ্ছাশক্তির ধারক বলেই বিশ্ব আজ দ্রুত উন্নতির দিকে ধাবিত হচ্ছে।

### ৬. এক মাঘে শীত যায় না

ঋতুচক্রের পর্যায়ক্রমিক ধারায় মাঘ মাস তীব্র শীত নিয়ে যেমন বারবার আসে তেমনি জীবনচক্রের আবর্তনে মানুষ বহুবার বিপদের সম্মুখীন হতে পারে। প্রকৃতিতে মাঘ মাস তীব্র শীত নিয়ে আসে এবং এর তীব্রতা মানুষ ও প্রাণীকুলকে দারুণ ভোগায়। তাই শীতের তীব্রতার কথা ভুলে যাওয়া একেবারেই বোকামি। কারণ পালাবদলের খেলায় সে পুনরায় ফিরে আসে। অনুরূপভাবে, মানুষের জীবনে বিপদ কেবল একবারের জন্য আসে না, জীবনচক্রের আবর্তনে এটি বহুবার আসতে পারে। তাই বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়ার পর বিপদের কথা বিস্মৃত হওয়া মোটেই ঠিক নয়। যারা বিপদ আর বিপদের বন্ধুদের ভুলে যায় তারা পরবর্তীকালে আর ঠিকমতো বিপদ মোকাবিলা করতে পারে না।



### ৭. কাক কোকিলের একই বর্ণ স্বরে কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন

জগৎ সংসারে সকলেরই শরীরের গঠন, রক্তের বর্ণ এক হওয়া সত্ত্বেও আচরণ ও ব্যবহারে তাদের মাঝে অনেক পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। এই আচরণ ও ব্যবহার দ্বারাই অনুধাবন করা যায় কে কোন ধরনের ব্যক্তিত্বের অধিকারী। কাক ও কোকিলের বর্ণ, ধরন একই হওয়া সত্ত্বেও তাদের কণ্ঠস্বরই জানিয়ে দেয় কে কাক আর কে কোকিল। আমাদের সমাজে এ ধরনের অনেক কাকরূপী মানুষকে আমরা কোকিল মনে করে বিভ্রান্ত হই কারণ এদের আকার-আয়তন দেখে এদের পার্থক্য করা দুষ্কর। কিন্তু আমরা যখন তাদের চরিত্রের মূল বৈশিষ্ট্যগুলো বিশ্লেষণ করি তখন সহজেই ধরা পড়ে, কে মানুষরূপী কোকিল, আর কে মানুষরূপী কাক। কোনোকিছুর বাহ্যিক সৌন্দর্যে আকৃষ্ট না হয়ে সৌন্দর্যের কাঠামো বিশ্লেষণের মাধ্যমেই তার সঠিক মূল্যায়ন করা প্রয়োজন।

### ৮. কাজের বেলায় কাজী কাজ ফুরালে পাজী

জীবনে একে অন্যের বিপদে এগিয়ে আসবে এবং প্রতিদানে উপকার গ্রহণকারী ব্যক্তি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করবে এটাই স্বাভাবিক নিয়ম। মানবসভ্যতার ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় তারা সমাজবদ্ধ হয়ে একত্রে বসবাস করে আসছে এবং দুর্দিনে একে অন্যের কাছে সাহায্যের জন্য ছুটে গেছে। তবে তাদের মধ্যেই আবার এক শ্রেণীর মানুষ আছে যারা নিজের স্বার্থ উদ্ধারের জন্য সঙ্গতিপূর্ণ লোকের সাথে বন্ধুর মতো আচরণ করে, স্বার্থ উদ্ধার হয়ে গেলে সে তার ছায়া পর্যন্ত মাড়ায় না। এতে উপকারকারী ব্যক্তির মহৎ হৃদয়ের পরিচয় ফুটে উঠলেও উপকার গ্রহণকারীর নিচু মানসিকতার পরিচয় ফুটে ওঠে। স্বার্থান্বেষী এ মহল উপকার গ্রহণের জন্য অন্যের কাছে ছুটে যায় এবং তার তোষামোদী করে নিজের স্বার্থ আদায় করে নেয় কিন্তু স্বার্থ উদ্ধার হলেই সে কৃতঘ্ন ব্যক্তিতে পরিণত হয়। উপকারকারী ব্যক্তির প্রতিদান দিতে হবে উপকার দিয়ে, কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে; অবজ্ঞা বা ঘৃণা দিয়ে নয়।

### ৯. কষ্ট না করিলে কেষ্ট মেলে না

ধর্মের পথেই হোক কি সংসারের পথেই হোক সাধনা ব্যতীত সিদ্ধিলাভ ঘটে না। সাফল্য অর্জন করতে হলে কঠোর সাধনা অত্যাবশ্যক। সিদ্ধিলাভে দৃঢ়সংকল্প হয়ে অনন্যমনে কঠিন পরিশ্রম করলেই লক্ষ্যে পৌঁছানো সম্ভব। কেষ্টকে অর্থাৎ জীবনে পরম সাফল্য লাভ করতে হলে চরম ত্যাগ-তিতিক্ষার মাধ্যমেই তা সম্ভব। একজন শিক্ষার্থীকে চরম সাফল্য লাভ করতে হলে তাকে হতে হবে অধ্যবসায়ী, নতুবা সে সফলকাম হবে না। জীবনে প্রতি পদে পদে মানুষকে কষ্ট স্বীকার করে জীবনযুদ্ধে জয়ী হতে হয়।

### ১০. গাইতে গাইতে গায়েন, বাজাতে বাজাতে বায়েন

মানুষ একদিনেই কোনো কাজে দক্ষ হয়ে ওঠে না। তার দক্ষতা লাভের পেছনে রয়েছে দীর্ঘদিনের অভ্যাস ও অনুশীলন। কোনো কাজে সাফল্য লাভের জন্য বারবার চেষ্টা করার মহৎ প্রবৃত্তি থাকা প্রয়োজন। অধ্যবসায় সহকারে ধীরে ধীরে অগ্রসর হলে মানুষ একদিন না একদিন সফল হবেই। পরিশ্রম ও উদ্যম ছাড়া কোনো কাজে সফলতা লাভ করা যায় না। অনুশীলন ও অধ্যবসায়ই মানুষকে তার ইপ্সিত লক্ষ্যে পৌঁছে দেয়।

### ১১. গেয়ো যোগী ভিখ পায় না

দূরবর্তী সস্তা জিনিসকে মূল্যবান মনে করে কাছের মূল্যবান জিনিসকে অবহেলা করা মানুষের সহজাত স্বভাব। বাংলাদেশের তৈরি শার্ট আমেরিকা থেকে কিনলে আমরা তার গুরুত্ব দেই। কিন্তু

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



দেশে এর চেয়ে ভালো শার্টকে আমাদের অবহেলা করতে বাধে না। আসলে আমাদের মানসিক গঠনটাই হয়ে গেছে এমন সে, 'দেশের ঠাকুর ফেলিয়া বিদেশের কুকুর ধরি'। রাষ্ট্রীয় জীবনে দেশী জিনিসের অবহেলা প্রকারান্তরে দেশপ্রেমহীনতার নামান্তর। অনেক সময় দেখা যায় নিজের বাবা-মা, ভাই-বোনকে দূরে ঠেলে দিয়ে আমরা পরকে আপন ভাবি, যা সঠিক নয়। মূলত দেশপ্রেম, স্বজাত্যবোধ ও মানবিকতাবোধসম্পন্ন হতে পারলেই আমাদের এ ভ্রান্ত ধারণা কেটে যাবে।

১২. চকচক করলেই সোনা হয় না

বাইরের দিক থেকে যা সুন্দর দেখায় তা-ই সত্য এমন নাও হতে পারে– ভিতরে তার ভিন্ন রূপ থাকা অস্বাভাবিক নয়। ভিতরে একরকম, বাইরে অন্যরকম এ ধরনের মানুষ যথার্থ গুণের অধিকারী নয়। কোনো বস্তুর বাইরের চাকচিক্য দেখেই ভুললে চলবে না, তার ভিতরের পরিচয় নিয়ে সত্যকে চিনতে হবে। সোনার বাইরের উজ্জ্বলতা তার আসল পরিচয় নয়। খাঁটি সোনা চিনতে হলে তা কষ্টিপাথরে যাচাই করতে হয়। মানুষের জীবনেও এমন বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়– মানুষের কথাবার্তায়, চালচলনে ভিতরের পরিচয় বের হয়ে আসে।

১৩. তেলা মাথায় তেল দেয়া মনুষ্য জাতির রোগ

প্রকৃতির রাজ্যে মানুষে মানুষে কোনো ভেদাভেদ না থাকলেও মানবসমাজে বিরাজ করছে অর্থনৈতিক ভেদাভেদ ও বৈষম্য। একদিকে ভোগ-সুখ ও বিলাস-বৈভবের প্রাচুর্য, অন্যদিকে রিক্ত নিঃস্ব মানুষের চরম দারিদ্র্য। এই দুঃস্থ, পীড়িত, দরিদ্র, ভাগ্যাহত মানুষ মানবসমাজে সহানুভূতির পাত্র হলেও তাদের দিকে তাকানোর লোকের খুব অভাব। বরং এক শ্রেণীর লোক বিত্তবান ও ক্ষমতাধরদের আরো শক্তিশালী করে তোলার কাজে ব্যস্ত। বিত্তবান ক্ষমতাশালীদের দৈনন্দিন প্রয়োজন সম্পূর্ণ মিটে যাওয়া সত্ত্বেও ঐ শ্রেণী তাদের হাতে উপহারের উপাচার পৌঁছে দিতে সদা ব্যগ্র। ধনীর তোষামোদি করতে গিয়ে এরা দরিদ্র আত্মীয়-পরিজনদের দিকে তাকানোর সুযোগ কখনোই পায় না। সমাজে এ মানসিকতার কারণে গরিব নিরন্নের দল বরাবরই থাকে বঞ্চিত ও উপেক্ষিত।

১৪. দশের লাঠি একের বোঝা

দশজনে মিলেমিশে কাজ করার আনন্দ ও শক্তি দু-ই আলাদা। যে কাজটি একা করতে লজ্জা বা ভয় পাই, সেটি যদি কয়েকজন মিলেমিশে করি, তবে আর সেখানে কোনো লাজ-লজ্জা, ভয়-ডর থাকে না। কারণ সেখানে হারলে সবাই হারবে– জিতলে সবাই জিতবে। তাছাড়া একতাবদ্ধ হয়ে আজ করলে যেমন আনন্দ পাওয়া যায় তেমনি শক্তিও বেশি পাওয়া যায়। ঐক্যবদ্ধ শক্তি ছাড়া বৃহৎ কোনো কাজ সম্পন্ন করা যায় না। সম্মিলিত প্রচেষ্টা সাধারণত সর্বত্রই বিজয়ী হয়।

১৫. ধর্মের ঢাক আপনি বাজে

সৎ কাজ বা পুণ্যকর্ম যত গোপনেই করা হোক না কেন, অতি অল্প সময়ের মধ্যেই তা জনসাধারণের গোচরীভূত হয়। তদ্রূপ, পাপকর্ম অতি গোপনীয়ভাবে করা হলেও তা আপনা আপনি লোকসমাজে জানাজানি হয়ে যায়। স্বার্থপরেরা ধর্মকে চাপা দিয়ে স্বার্থান্বেষী হয়ে বিপথে পরিচালিত হয়। কিন্তু সত্যকে চাপা দিয়ে কোনো অসত্যই প্রতিষ্ঠিত হয় না, কপটাচারীর মুখোশ একদিন খসে পড়বেই। যা ন্যায় এবং সত্য তা অন্যায় বা অসত্যকে দূরে ঠেলে দিয়ে দিবালোকের মতোই উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে। সত্যের জয় অবশ্যম্ভাবী, তা মিথ্যার জাল ছিন্ন করে প্রকাশ পাবেই।



১৬. নাচতে না জানলে উঠানের দোষ

কাজে কুশলতা দেখাতে না পারলে মানুষ অপরের ওপর দোষ চাপাতে চেষ্টা করে। নিজের অক্ষমতা ঢেকে রাখার জন্য মানুষের এ ধরনের প্রবণতা লক্ষ করা যায়। নিজের কোনো দোষ-ত্রুটি কেউ স্বীকার করতে চায় না বলে অপরের ওপর দোষ চাপানোর বৈশিষ্ট্য মানুষ দেখিয়ে থাকে। নাচে দক্ষতা অর্জন করা সম্ভব না হলে তখন দোষ চাপানো হয় নাচের উঠানের ওপর। মানুষ অন্যের ওপর দোষারোপ করে নিজের গ্লানি থেকে রেহাই পেতে চায়। জীবনে ব্যর্থতা থাকবে না এমন হতে পারে না, দুর্বল মনের মানুষ ব্যর্থতাকে স্বীকার করে না। মানুষকে বড় মনের অধিকারী হতে হবে এবং সত্যকে স্বীকার করে নিতে হবে।

১৭. নগর পুড়িলে দেবালয় কি এড়ায়?

নগর অগ্নি দ্বারা আক্রান্ত হলে মন্দির, মসজিদ, দেবগৃহ কিছুই রেহাই পায় না। তেমনি রাজ্য শত্রু দ্বারা আক্রান্ত হলে সাধারণ মানুষও তা থেকে নিস্তার পায় না। নগর, রাষ্ট্র, রাজ্য, রাজা, মন্দির, মসজিদ সবগুলোই একে অপরের সাথে সম্পর্কিত; তাই একটির অবনতি হলে অন্যটিরও অবনতি হয়। কোনো রাষ্ট্র যদি বহিঃশত্রু দ্বারা আক্রান্ত হয় এবং রাষ্ট্রের অধীশ্বর যদি পরাজিত হয়, তবে সাধারণ নাগরিকরাও ক্ষতির সম্মুখীন হন। পরাধীনতার শৃঙ্খল গলায় নিয়ে তাদেরকে যুগ যুগ নির্যাতিত হতে হয়। মনিব বা রক্ষাকর্তারই যদি অস্তিত্ব না থাকে তবে রক্ষিতের অস্তিত্ব থাকার কোনো প্রশ্নই আসে না।

১৮. পরিশ্রমই সৌভাগ্যের প্রসূতি

পরিশ্রম হচ্ছে আমাদের সুখ-শান্তি, আশা-ভরসার চাবিকাঠি। প্রকৃত ও যথার্থ পরিশ্রমই মানুষের জীবনে সৌভাগ্যের লক্ষ্মী ডেকে আনে। প্রতিষ্ঠা, খ্যাতি, প্রতিপত্তি, যশ-সুনাম, মর্যাদা, এসব ত্রিবেণী ত্রিধারার দুর্বার স্রোতের মুখে টিকে থাকার জন্যই তো পরিশ্রম ও কঠোর সাধনা দরকার। অন্যথায় ব্যর্থতা এসে জীবনকে অক্টোপাসের মতো ঘিরে ফেলে। পৃথিবীতে অর্থ, বিদ্যা, খ্যাতি, প্রতিষ্ঠা কিছুই পরিশ্রম ছাড়া লাভ করা যায় না। এমন অনেক দৃষ্টান্ত আছে যারা অতি সাধারণ দরিদ্র অবস্থা থেকে নিজ পরিশ্রম ও কর্ম কৌশল দ্বারা জগদ্বিখ্যাত হয়েছেন। পরিশ্রম দ্বারা চীন, জাপান, আমেরিকা, ব্রিটেন প্রভৃতি দেশ আজ উন্নতির স্বর্ণশিখরে আরোহণ করেছে এবং বিশ্বের মানচিত্রে খ্যাতনামা শক্তিশালী ও প্রতিষ্ঠিত দেশ হিসেবে স্থান করে নিয়েছে।

১৯. পুষ্প আপনার জন্য ফোটে না

সমাজের বৃহত্তর কল্যাণে নিজেকে নিবেদন করাতেই মানুষের জীবনের সার্থকতা। পুষ্পের সার্থকতা যেমন আত্মত্যাগে, ব্যক্তিজীবনের সার্থকতাও তেমনি সামগ্রিক সামাজিক কল্যাণে নিজকে বিলিয়ে দেয়ার মাঝে। পরের জন্য নিজেদের নিঃশেষে বিলিয়ে দেয়ার মাঝে আছে পরম সুখ, অনির্বচনীয় আনন্দ ও অপরিসীম পরিতৃপ্তি। পুষ্প যেন মানবব্রতী জীবনেরই প্রতিচ্ছবি। অরণ্যে কিংবা উদ্যানে যেখানেই ফুল ফুটুক সে নিজের জন্য ফোটে না। নিজের সৌন্দর্য ও সৌরভকে অন্যের কাছে বিলিয়ে দেয়াতেই তার পুষ্প জীবনের সার্থকতা। মানুষের জীবনও অনেকটা ফুলের মতো। তাই চারিত্রিক মাধুর্যে সে জীবন হওয়া উচিত ফুলের মতোই সুন্দর, সুরভিত, পবিত্র ও নির্মল। ফুলের মতোই তা নিবেদিত হওয়া উচিত পরের জন্য, সমাজের স্বার্থে। সমাজে যারা দুঃখ-যন্ত্রণায় পর্যুদস্ত, সেবা ও সহমর্মিতার চেতনা নিয়ে তাদের পাশে দাঁড়াতে পারলে, দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফোটাতে পারলেই মানুষের জীবন সার্থক হয়।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



২০. বড়র পিরীতি বালির বাঁধ

গোষ্ঠীস্বার্থেই নিম্নশ্রেণী সবসময় উচ্চশ্রেণীর সাথে সম্পর্ক বজায় রাখতে চায়। আমাদের সমাজে কিছু তথাকথিত ধনী শ্রেণী আছে যারা নিজ স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য দরিদ্র শ্রেণীর লোকদের ব্যবহার করে। আর ঐ দরিদ্র শ্রেণীর লোকেরা ধনী লোকদের কৃত্রিম আচরণে মুগ্ধ হয়ে তাদেরকে আপন ভাবতে শুরু করে। সে আবেগের বশবর্তী হয়ে বাস্তবতাকে অস্বীকার করতে চায়। ধনীক শ্রেণীর স্বার্থসিদ্ধির পর যখন তার প্রকৃত আচরণ ফুটে ওঠে তখন দরিদ্র শ্রেণী তার ভুল বুঝতে পারে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায়, দরিদ্র শ্রেণীর প্রতি তথাকথিত ধনী শ্রেণীর মানুষের ভালোবাসা বালির বাঁধের মতো। বালির বাঁধ যেমন ঢেউ এলেই ভেঙে পড়ে তেমনি স্বার্থ সিদ্ধি হলেই ধনী শ্রেণীর ভালোবাসা আর থাকে না।

২১. বন্যেরা বনে সুন্দর, শিশুরা মাতৃক্রোড়ে

সৃষ্টিজগতে সবকিছুই নিজ নিজ পরিবেশ ও পারিপার্শ্বিকতায় স্বাভাবিক সৌন্দর্যে অনুপমতা পায়। পরিবেশের সাথে থাকে তার স্বাভাবিক ও স্বচ্ছন্দ সম্পর্ক। পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে নিজস্ব পন্থায় তারা প্রকৃতির সাথে জীবন-সম্পর্ক গড়ে তোলে। শিশুর সৌন্দর্যও সর্বাধিক মহিমা পায় মায়ের কোলে। মায়ের কোল থেকে শিশুকে বিচ্ছিন্ন করা হলে সে কেবল সৌন্দর্য হারায় না, বরং নিরাপদ আশ্রয়চ্যুত হওয়ার শঙ্কা ও অনিশ্চয়তায় তার মুখে বেদনার ছাপ পড়ে। এমনিভাবে স্বাভাবিক জীবন পরিবেশ থেকে বিচ্ছিন্ন হলে প্রতিটি প্রাণীই তার স্বাভাবিক সৌন্দর্য হারায়। জীবনের সঙ্গে পরিবেশের যোগ যেমন অবিচ্ছিন্ন তেমনি স্ব-স্ব পরিবেশের পটভূমিতেই জীবসত্তা পায় স্বাভাবিক সৌন্দর্য ও অনুপম বৈশিষ্ট্য।

২২. বিত্ত হতে চিত্ত বড়

বিত্ত শব্দের আভিধানিক অর্থ 'ধন', 'সম্পদ'। আর 'চিত্ত' শব্দের আভিধানিক অর্থ 'হৃদয়', 'অন্তঃকরণ'। পার্থিব মানুষের কাছে আপাতদৃষ্টিতে বিত্ত বড়ই লোভনীয়, কাম্য। কিন্তু একটু তলিয়ে দেখলে বেশ অনুভব করা যায় মানুষ আজকে যখন অর্থের পাহাড় তৈরি করে নিজেদের মধ্যে ভেদাভেদ সৃষ্টি করছে, তখন মলিনতাই বাড়ছে। সুখ-সম্পদের প্রাচুর্য জড় করে আমরা আজ মনের মুক্তিকে অনুসন্ধান করে চলেছি। পৃথিবীর বুকে কত রাজা মহারাজারা বিপুল সম্পদের পাহাড় বানিয়ে গেছেন, রাজত্বের সীমানা বাড়িয়েছেন অথচ তাদের কথা সেভাবে কে মনে রেখেছে। অন্যদিকে বিত্তের হাতছানিকে তুচ্ছ করে যাঁরা চিত্তমুক্তির পথে পা বাড়িয়েছেন, মানবসভ্যতার ইতিহাসে তারাই প্রাতঃস্মরণীয় হয়ে আছেন। কাজেই আমরা যদি বাইরের চাকচিক্যের চেয়ে অন্তরের মহত্ত্বকে বড় বলে জ্ঞান করি, তাহলে পাশ্চাত্যের মতো ভবিষ্যতে আমাদের হতাশার শিকার হতে হবে না।

২৩. বুদ্ধি যার বল তার

বুদ্ধিই মানুষের সবচেয়ে বড় শক্তি বলে বিবেচিত হয়ে থাকে। বুদ্ধি থাকলে নানা বিপদ-আপদ থেকে যেমন রেহাই পাওয়া যায়, তেমনি বুদ্ধির জোরে জীবনকে সুন্দর ও সফল করে তোলা সম্ভব। মানব জীবনের অপরাপর গুণের চেয়ে বুদ্ধির গুরুত্ব ও অবদান অনেক বেশি এতে কোনো সন্দেহ নেই। মানুষের জীবনে বেঁচে থাকার জন্য শক্তির বিশেষ প্রয়োজনীয়তা আছে। শক্তি আছে



অথচ বুদ্ধি নেই, এমন হলে সে শক্তি কোনো কাজে আসে না। তেমন শক্তি নেই, অথচ ভালো বুদ্ধি আছে এমন লোক বুদ্ধির জোরে জীবনে অনেক কিছু করতে পারে। তার পক্ষে জীবনের উদ্দেশ্য সফল করা সম্ভব। বুদ্ধির কৌশলে প্রবল শক্তিমানকেও বশ করা যায়। বুদ্ধিকে কৌশলে কাজে লাগাতে পারলে জীবনের উদ্দেশ্য সফল করা যায়। বুদ্ধির কুশলতার সামনে শক্তি পরাজিত হয়। যে যত বেশি বুদ্ধি রাখে সে তত বেশি সফল।

২৪. বড় যদি হতে চাও, ছোট হও তবে

অহংবোধ ও দাম্ভিকতা পরিহারের মাধ্যমে নিজেকে তুচ্ছজ্ঞান করে মানবীয় গুণাবলি বিকাশের মাধ্যমে স্মরণীয় ও বরণীয় হওয়া যায়। কেননা ক্ষুদ্র থেকেই মহত্ত্বের সৃষ্টি, সীমার মধ্যেই অসীমের বসবাস। মানুষের জীবনকে বিভিন্ন গুণে গুণান্বিত করে বিকশিত করতে হয়। মানবিক গুণাবলি সহযোগেই মানুষের মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। সেজন্য মানুষকে সাধনা করতে হয় এবং সাধনার ফলে জীবনে মহত্ত্বের যথার্থ বিকাশ ঘটে। মানুষের মহৎ গুণাবলির মধ্যে বিনয় অন্যতম। বিনয় মানবজীবনকে মাধুর্যমণ্ডিত করে তোলে। বিনয় মানুষকে অপরের কাছে শ্রদ্ধান্বিত করে বড় করে। জীবনে অহঙ্কার থাকা মোটেই উচিত নয়। অহঙ্কারকে পতনের মূল বলে বিবেচনা করা হয়।

২৫. ভূতের ভয় অবিশ্বাসে কাটে না

ভয় হলো মানুষের মনের ব্যাপার। নিজের ওপর যদি মানুষের আস্থা না থাকে তাহলে কোনো কাজই নিজেকে দিয়ে সম্ভব হয় না। কিন্তু যদি সত্যিই দুর্বলতা থাকে তাহলে নিজের ওপর যতই বিশ্বাস বা আস্থা থাকুক না কেন সেটির সফলতা আসে না। মনের দুর্বলতা দূর করতে কেবল সাহস আর আত্মবিশ্বাসই যথেষ্ট নয়। তার জন্য দরকার আপন দুর্বলতাকে আগে সবল করে তোলা। যদি নিজেই সবল না হয়, তাহলে যে কোনো সহজ কাজকেই কঠিন মনে হবে। আর স্বাভাবিক নিয়মেই সেই কাজটি করা দুরূহ হয়ে উঠবে। মূলত নিজে শক্ত সমর্থ না হলে সবসময়ই নিজের মধ্যে একটা লুকায়িত ভয় কাজ করবে, যা প্রতিটা মুহূর্তেই পিছুটান দিবে। কিন্তু নিজের মধ্যে এই লুকায়িত ভয় নেই, তা যতই অবিশ্বাস কার হোক না কেন, সে ভয় কখনোই দূরীভূত হবে না।

২৬. মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন

সত্যিকার কোনো আদর্শ বিনা আয়াসে বাস্তবায়ন করা যায় না। আদর্শকে প্রয়োগ করতে গিয়ে, দর্শনকে মানুষের মাঝে বাস্তবায়িত করতে গিয়ে আদর্শবান ব্যক্তিকে বিভিন্ন ত্যাগ স্বীকার করতে হয়েছে। দুঃখ-কষ্ট এবং ত্যাগ-তিতিক্ষা ছাড়া সহজে কেউ তার আদর্শকে বাস্তবায়ন করতে পারেনি। এই পৃথিবীকে যারা অন্ধকারাচ্ছন্ন করে রাখতে চাইত তারাই সবসময় মহাপুরুষদের আদর্শকে বাস্তবায়নের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতো। তাই দেখা যায়, তাদের আদর্শকে বাস্তবায়ন করতে গিয়ে অনেক নির্যাতন সহ্য করতে হয়েছে। অনেককে মৃত্যুবরণ করতে হয়েছে। মন্ত্র অর্থাৎ আদর্শকে বাস্তবায়ন করতে হলে শরীর পাতন অর্থাৎ মৃত্যুকে সহজভাবে মেনে নিতে হয়।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



**২৭. মূর্খ মিত্রের চেয়ে শিক্ষিত শত্রু ভাল**

জীবনে চলার পথে মূর্খ বন্ধু অনিচ্ছাকৃতভাবে হলেও এমন ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে যা কোনো শিক্ষিত শত্রুর দ্বারাও সম্ভব নয়। শত্রুকে আমরা সাধারণত অনিষ্টের কারণ হিসেবেই বিবেচনা করি। কিন্তু তুলনামূলক বিচারে দেখা যায়, একজন মূর্খ বন্ধু অজ্ঞতাবশত যা করতে পারে, একজন শিক্ষিত শত্রু সজ্ঞানে তেমনটি করতে পারে না। জ্ঞানের নির্মল পরশ অন্তত তাকে এ কাজ থেকে ফিরিয়ে রাখতে পারে। অথচ এ অসতর্কতার ফাঁকে মূর্খ বন্ধুর অজ্ঞতাই তার জন্য কাল হয়ে দাঁড়াতে পারে। তাই বন্ধু নির্বাচনে জ্ঞান, প্রজ্ঞা আর শিক্ষাকে গুরুত্ব দিতে হবে। কেননা জ্ঞান আলো এবং মূর্খতা অন্ধকারের সমতুল্য। আলোতে অনেক বিপদেও নিরাপদ থাকা যায়, অন্যদিকে অন্ধকারে সর্বদাই বিপদের আশঙ্কা থাকে।

**২৮. মৃত সিংহের চেয়ে জীবিত কুকুরও ভালো**

অধিক মূল্যবান বস্তু যদি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় তবে তার চেয়ে কম মূল্যবান বস্তুও উত্তম বলে প্রতিভাত হবে, যদি তা মৃত বা ধ্বংসপ্রাপ্ত না হয়। সিংহকে বলা হয় বনের রাজা। কারণ, তার রয়েছে অমিত তেজ, সৌন্দর্যশোভিত কেশরগুচ্ছ এবং শিকার করার অফুরন্ত ক্ষমতা। এদিক থেকে কুকুরের সঙ্গে সিংহের কোনো তুলনাই হয় না। প্রভুভক্ত প্রাণী হলেও কুকুরকে অধিকাংশ সময় মানুষের এঁটো-কাঁটা, লাঠিপেটা খেয়ে অসহায়ের মতো বেঁচে থাকতে হয়। সে অর্থে কুকুরের কোনো গুরুত্বই নেই। কিন্তু অমিত তেজি সিংহটি যদি হয় মৃত, তবে তার গুরুত্ব আরো কমে যায়। তখন জীবিত কুকুরটিই মৃত সিংহের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। কোনো জিনিসের মূল্য বা গুরুত্ব ততক্ষণই, যতক্ষণই তা প্রয়োজনে লাগে। অর্থাৎ অপ্রয়োজনীয় বৃহতের চেয়ে প্রয়োজনীয় তুচ্ছ জিনিস ও উত্তম।

**২৯. যতনে রতন মেলে**

পরিশ্রম না করলে ভালো ফলাফল লাভ করা যায় না। সাফল্য আর শ্রম এবং এর পরিচর্যা অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। যারা যতন করতে জানে অমূল্য রত্ন তাদেরই হাতে ধরা দেয়। কৃষক মাঠে ফসল রোপণ করে, যত্ন না নিলে তাতে আগাছা জন্মে; ফসল নষ্ট হয়ে যায়। যে সরকার যত্নসহকারে সুন্দরভাবে দেশ চালাতে ব্যর্থ হয়, সে সরকার ক্ষমতায় টিকে থাকতে পারে না। যে মানুষ আত্মার উন্নতির জন্য প্রচেষ্টা করে না, তার আত্মা কলুষিত হয়। চর্চা না করলে, যত্ন না করলে কোনোকিছুরই উন্নতি হয় না। আত্মোন্নয়ন, সমাজোন্নয়ন, দেশের উন্নয়ন, জাতির উন্নয়ন সর্বোপরি পৃথিবীর সার্বিক উন্নয়নের পেছনে চাই যত্ন।

**৩০. যেমন কর্ম তেমন ফল**

মানব জীবনের সাফল্য-ব্যর্থতা নির্ভর করে কৃতকর্মের ওপর। যে যেমন কর্ম করবে সে তেমন ফল পাবে– এটাই নিয়ম। ভালো কাজের জন্য যেমন আছে পুরস্কার তেমনই মন্দ কাজের জন্য আছে তিরস্কার বা শাস্তি। পৃথিবীতে যেসব মানুষকে ভালো কাজ করতে দেখা গেছে তারাই পৃথিবীতে অমর হয়ে আছেন। আর যারা মন্দকাজ করেছেন মানুষ তাদের ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেছে। ফলে তারা মৃত্যুর সাথে সাথে পৃথিবীর বুক থেকে হারিয়ে গেছে। যে যেমন কর্ম করবে সে তেমনই ফল লাভ করবে– এ নিয়মের ব্যতিক্রম হওয়া কখনোই সম্ভব নয়।



**৩১. যে সহে সে রহে**

মানুষের মতো বাঁচতে হলে বা আপনার অস্তিত্ব বজায় রাখতে হলে এবং জীবনে সাফল্য অর্জন করতে হলে সর্বাগ্রে প্রয়োজন সহনশীলতা। সহনশীলতা মানব জীবনের অন্যতম সাম্যনীতি। পৃথিবীতে অবিমিশ্র সুখ-দুঃখ বলে কিছু নেই। সুখ-দুঃখ আসলে মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ। বিপদাপদের মধ্য দিয়েই মানুষের যাত্রা শুরু হয়। তাকে সংগ্রাম করতে হয় নানা প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে। রোগ-শোক, দুঃখ-দারিদ্র্য, অন্যায়-অবিচার এসবের চাপে মানব পর্যুদস্ত হয়। চোখে বিভীষিকা দেখে। কিন্তু এসব প্রতিরোধ করার জন্য চাই শক্তি, অধ্যবসায় ও সহিষ্ণুতা। যুদ্ধে জয়-পরাজয় আছেই কিন্তু যে মানুষ পরাজয়কে অম্লান বদনে মাথা পেতে নিয়ে পরবর্তী বিজয়ের জন্য ব্রতী হয় এবং বিজয় অর্জন করতে পারে, সেই যথার্থ বীর।

**৩২. যত মত, তত পথ**

সৃষ্টির আদিকাল থেকে মানুষের মধ্যে ভিন্নতার বিষয়টি বিদ্যমান। মানুষ চিন্তা-চেতনা আর দৃষ্টিভঙ্গি এবং বিশ্বাসের ক্ষেত্রে স্বাভাবিকভাবেই পরস্পর থেকে ভিন্ন হতে পারে। এ ভিন্নতা তাদের জীবনাচার, ধর্ম-কর্ম ও লেনদেনের ক্ষেত্রে প্রতীয়মান হয়। এক ধর্মে বিশ্বাসী বা অনুসারীদের জীবনাচার, চালচলন, রীতি-নীতি অন্যদের চেয়ে ভিন্ন হবে। কেননা মত ও বিশ্বাসের ভিন্নতার সাথে জীবনের বাহ্যিক ও আত্মিক অনেক বিষয়ই জড়িত। মতের ভিন্নতার কারণে যে পথেরও ভিন্নতা হতে পারে এ সত্যটাকে যখন মানুষ উপলব্ধি করতে পারে তখন ভিন্নতার মাঝেও ঐক্যের সুর শোনা যায়; পারস্পরিক সহনশীলতার মাধ্যমে মৈত্রীর বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া যায়। কেননা মানুষ যখন বুঝতে পারে, তার নিজের যেমন একটা মত বা একটা বিশ্বাস আছে এবং সে মত ও বিশ্বাস তাকে একটা নির্দিষ্ট পথে পরিচালিত করে, তেমনি অন্যের ক্ষেত্রেও তা স্বাভাবিক।

**৩৩. রোম নগরী একদিনে গড়িয়া উঠে নাই**

যে কোনো বড় কাজ করতে গেলে অসীম ধৈর্য ও বুদ্ধির প্রয়োজন। ধীর অথচ দৃঢ় পদক্ষেপেই ক্রমে সাফল্যের চূড়ায় আরোহণ করা সম্ভব। এক লাফে যেমন উঁচু মগডালে ওঠা যায় না– কঠোর পরিশ্রম এবং চেষ্টা ছাড়া কোনো কাজেও তেমনি হঠাৎই সাফল্য অর্জন করা সম্ভব নয়। শত শত বছর ধরে হাজার হাজার মানুষের নিরলস কঠোর কর্মসাধনা ও একাগ্রতার মধ্য দিয়েই রোমের ওঠেনি। সে কারণেই বলা হয় উন্নতি ও সমৃদ্ধি মাত্রই সময়সাপেক্ষ।

**৩৪. লোভে পাপ পাপে মৃত্যু**

লোভ মানব চরিত্রের এক দুর্দমনীয় প্রবৃত্তি। মানুষ যখন লোভের পথে পা বাড়ায়, তখন তার হিতাহিত জ্ঞান থাকে না। লোভ মানুষকে কুপথে ধাবিত করে আর এ জন্যই মানবজীবনের পরিণাম অনেক সময় দুঃখময় হয়ে ওঠে। কখনো কখনো ঘটে মৃত্যু। লোভে মানুষ পরিণামের কথা চিন্তা না করে এমন সব কাজ করে যা আইনের চোখে দণ্ডনীয়। ফলে পাপীকে ভোগ করতে হয় চরম পরিণতি। লোভ আর স্বার্থবুদ্ধির দ্বারা তাড়িত হয়ে মানুষ ভাইকে, বন্ধুকে হত্যা করেছে। পরিণামে নিজের আত্মহননের পথ নিজেই তৈরি করেছে। যে অন্যায় অসত্য পথে ধাবিত হয় সে অকালমৃত্যুতে পতিত হয়।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



**৩৫. সঙ্গদোষে লোহা ভাসে**

সংসর্গের প্রভাব অনস্বীকার্য। ভারি লোহাকে যদি হালকা কাষ্ঠখণ্ডের সাথে গেঁথে দেয়া হয় তবে সঙ্গগুণে সে লোহাও ভাসতে থাকে। মানুষের মধ্যেও এ সাহচর্যের প্রভাব বিশেষভাবে কার্যকর। সঙ্গদোষে মানুষ পরিবর্তিত হয়ে যায়। কুসংসর্গে চললে মানুষের স্বভাব ও চরিত্র খারাপ না হয়ে পারে না। এ জগতে যত লোকের অধঃপতন হয়েছে, অসৎ সংসর্গই এর কারণ। মানুষ সতর্ক থাকলেও কুসংসর্গে পড়ে নিজের অজান্তে পাপের পথে পরিচালিত হয়। এজন্যই বলা হয়- 'সৎ সঙ্গে স্বর্গবাস, অসৎ সঙ্গে সর্বনাশ'।

**৩৬. সবুরে মেওয়া ফলে**

জীবনে সফলতা আনার অন্যতম প্রধান উপায় হলো ধৈর্য। অতি অল্প সময়ে কোনোকিছুতে সফলতা আশা করা ঠিক নয়। সবুরের মধ্যে নিহিত রয়েছে যথার্থ বিজয় ও উত্তম ফলাফল। যার জীবনে যে যত ধৈর্য ধরতে পেরেছে তার জীবনে বিজয় ও সফলতার মাত্রা তত বেশি। পৃথিবীর যে কোনো সফলতা ও বিজয়ের পেছনে ছিল অগাধ বিশ্বাস ও ধৈর্য, বাস্তবিক পক্ষে মানুষের জীবনে সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় সকল ব্যাপারে সফলতার নেপথ্যে মূলমন্ত্র হিসেবে কাজ করেছে ধৈর্য।

**৩৭. সময়ের এক ফোঁড়, অসময়ের দশ ফোঁড়**

প্রতিটি মুহূর্তকে জীবনের পর্যায় অনুসারে প্রয়োজনের দিকে তাকিয়ে যদি যথাযথ কাজের মধ্যে সার্থক করে তোলা যায় তাহলেই জীবনে আসে সার্থকতা। সময়কে কাজের মধ্যে বেঁধে রাখা এবং সঠিক কাজকে সঠিক সময়ের হাতে সমর্পণ করাই সফলতার পূর্বশর্ত। সঠিক সময়ে সঠিক কাজটি করা উচিত। আজকের কাজ আগামীর জন্য ফেলে না রাখাই উত্তম, কেননা আজকের কাজটা আগামী দিন সহজসাধ্য নাও হতে পারে। তাছাড়া সময়ের কাজ সময়ে না করে ফেলে রাখলে পরে ঐ কাজ করেও কোনো ফল হয় না। জীবনকে সার্থক করে তুলতে চাই সময়ানুবর্তিতা অর্থাৎ সঠিক সময়ে সঠিক কাজটি করার মাধ্যমে সময়ের সদ্ব্যবহার করে।

**৩৮. সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই**

মানুষ নিজ সাধনা, যোগ্যতা, বুদ্ধিমত্তা ও ভালোবাসা দিয়ে প্রমাণ করেছে তার উপর কোনো সত্য নেই। মানুষ যেভাবেই সৃষ্টি হোক না কেন এটা সত্য যে মানুষ সৃষ্টির সেরা জীব। মানুষের জীববৃত্তি ছাড়াও রয়েছে বুদ্ধিবৃত্তি যা অন্য কোনো প্রাণীর মধ্যে নেই। নিজের সাধনার মাধ্যমেই মানুষ নিজেকে সর্বত্র একক আধিপত্য বিস্তারে সমর্থ হয়েছে। নিজ বুদ্ধিমত্তাবলে সে বিভিন্ন আবিষ্কারের মাধ্যমে ও সহযোগিতার মাধ্যমে গড়ে তুলেছে এই সভ্যতা। মানুষ প্রকৃতির অন্যান্য জীবদেরও সেবা করে, ভালোবাসে। প্রেম, দয়া, ন্যায়, সত্য প্রভৃতি ধারণাগুলো সৃষ্টি করেছে মানুষ।

**৩৯. সে কহে বিস্তর মিছা, যে কহে বিস্তর।**

মিথ্যাবাদীরা সাধারণত বেশি কথা বলেন। তারা যে কোনো ঘটনা বা বিষয় বর্ণনার ক্ষেত্রে যেমন প্রচুর মিথ্যার অবতারণা ঘটান তেমনি এসব মিথ্যাকে স্বাভাবিক সত্য হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে প্রাসঙ্গিক-অপ্রাসঙ্গিক প্রচুর যুক্তি তুলে ধরেন। পক্ষান্তরে, একজন সত্যবাদী লোক স্বল্পভাষী হন। সত্যবাদী লোক যে কোনো ঘটনা বা বিষয়কে যথাযথভাবে বর্ণনা করে সমাজের ইতিবাচক ধারাকে বজায় রাখতে সহায়তা করেন। মিথ্যাবাদী তার বর্ণনায় সত্য-মিথ্যার মিশ্রণ ঘটিয়ে বিষয়টিকে অতিরঞ্জিত করে তোলেন। তার প্রচুর কথাবার্তা তাকে আরো পাপী করে তোলে এবং সমাজে দ্বন্দ্ব-কলহ সৃষ্টি করে।



**৪০. সাধনা নাই, যাতনা নাই।**

জগতে দুঃখ-কষ্ট আছে এবং থাকবে কিন্তু দৃঢ় প্রতিশ্রুতি, প্রবল চেষ্টা ও সাধনার মাধ্যমে সকল দুঃখ-কষ্ট-যাতনাকে জয় করতে পারলে কোনো যাতনাই থাকবে না। প্রতিনিয়ত এখানে মানুষের জীবন নানা সমস্যা, দুঃখ-কষ্ট আর বিরূপতার মাঝে পতিত হয়ে থাকে। তাই মানুষকে কন্টকাকীর্ণ এবং বন্ধুর পথ পরিক্রমায় জীবন অতিবাহিত করতে হয়। কিন্তু তাই বলে মানুষ যে দুঃখ-যাতনা আর কন্টকদাতার দাস তাও ঠিক নয়। মানুষ তার আপন প্রচেষ্টা, দৃঢ় মনোভাব আর অবিরত সাধনার মাধ্যমে সকল কষ্টকেই অনায়াসে জয় করতে পারে। মানুষের উদ্যম আর সাধনার কাছে কোনো বাধাই অজেয় নয়। জীবনে সমস্যা থাকা স্বাভাবিক। কিন্তু সমস্যাকে জয় করার জন্য সাধনার কোনো বিকল্প নেই। আর কঠোর সাধনার কাছে কোনো সমস্যা আর যাতনাই গুরুত্ব পায় না।

## প্রবাদ-প্রবচনের কতিপয় নমুনা

### অ

১. **অতি দর্পে হত লঙ্কা** (অহঙ্কার পতনের মূল) — বেশি বাহাদুরি করো না; শেষে অতি দর্পে হত লঙ্কা ঘটবে।
২. **অতি লোভে তাঁতি নষ্ট** (বেশি লোভ করলে আসলই নষ্ট হয়ে যায়) — বেশি লাভের আশায় রশীদ চাল গুদামজাত করেছিল, কিন্তু পোকায় ধরে নষ্ট করে ফেলেছে। অতি লোভে তাঁতি নষ্ট আর কি!
৩. **অল্প বিদ্যা ভয়ঙ্করী** (অল্প বিদ্যার শোচনীয় পরিণতি) — তুমি ধর রকিবের ভুল; তোমার এ আচরণেই প্রমাণ হয় অল্প বিদ্যা ভয়ঙ্করী।
৪. **অতি চালাকের গলায় দড়ি** (বেশি চালাক সহজেই বিপদে পড়ে)— ওই লোকটা বোরকা পরে জাল ভোট দিতে গিয়ে ধরা পড়েছে। একেই বলে অতি চালাকের গলায় দড়ি।
৫. **অতি ভক্তি চোরের লক্ষণ** (অসৎ মতলব লুকানোর কৌশল হিসেবে ভক্তির আতিশায্য)— তদন্তকারী পুলিশ অফিসার লোকজনের সালামের ঘটা দেখেই বুঝলেন, নিশ্চয়ই একটা গোলমাল আছে—অতি ভক্তি চোরের লক্ষণ বটে।
৬. **অধিক/অনেক সন্ন্যাসীতে গাঁজন নষ্ট** (অতিরিক্ত লোকের খবরদারিতে কাজ পণ্ড)— মাত্র পঞ্চাশ জনের রান্না, তার তদারকিতে এতজন! অধিক সন্ন্যাসীতে যে গাঁজন নষ্ট হবে, তাতে আর সন্দেহ কী?
৭. **অভাগা যে দিকে চায়, সাগর শুকিয়ে যায়** (ভাগ্য যার খারাপ, কোনো দিকেই সে আশা দেখতে পায় না)– মজিদ ভাইয়ের চাকরি হলো না, ব্যবসায় করতে গিয়ে টাকা মার গেল, শেষে মাছের চাষ করে যাওবা একটু সম্ভাবনা ছিল বন্যায় সব শেষ। আসলে অভাগা যে দিকে চায়, সাগর শুকিয়ে যায়।
৮. **অভাবে স্বভাব নষ্ট** (অভাবের কবলে পড়ে সৎ লোকও অসৎ হয়ে যায়)– এমন সাধু সজ্জন কর্মকর্তা, তিনি অভিযুক্ত হলেন তহবিল তসরুফের জন্য! এ নিশ্চয়ই অভাবে স্বভাব নষ্ট।

### আ

১. **আকাশের চাঁদ হাতে পাওয়া** (অপ্রত্যাশিত আনন্দ লাভ করা)— অজানা স্থানে হঠাৎ বন্ধুর দেখা পেয়ে সে যেন আকাশের চাঁদ হাতে পেল।
২. **আলালের ঘরের দুলাল** (ধনীর অতি আদরের ছেলে)— ছেলেকে আদর দিয়ে আলালের ঘরের দুলাল করে তুললে পরিণামে তার সর্বনাশই হবে।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



৩. **আপ ভালো তো জগৎ ভালো** (নিজে ভালো হলে সকলই ভালো হয়)— সে ভালো বলে যেখানে যায় সবাই তাকে ভালোবাসে; এটাতো হবেই—আপ ভালো তো জগৎ ভালো।

৪. **আপনি বাঁচলে বাপের নাম** (নিজের স্বার্থ দেখা)— এ দুর্দিনে তোমাকে সাহায্য করব কিভাবে? নিজেরই কোনো উপায় দেখছি না; আপনি বাঁচলে বাপের নাম।

৫. **আসলে মুষল নেই ঢেঁকি ঘরে চাঁদোয়া** (উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বনের অভাব)— নিজের পরিবারের প্রতি খেয়াল নেই, তিনি যান সমাজসেবা করতে; এ যেন আসলে মুষল নেই ঢেঁকি ঘরে চাঁদোয়া।

### ই

১. **ইচ্ছা থাকলে উপায় হয়** (কাজে ব্রতী হলে একটা না একটা উপায় বের হবেই)- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে চাও তো এখন থেকেই প্রস্তুতি নাও। ইচ্ছা থাকলেই উপায় হয়।

২. **ইটটি মারলে পাটকেলটি খেতে হয়** (অন্যের অনিষ্ট করলে পাল্টা ক্ষয়ক্ষতির আশঙ্কা থাকে)- আজ ওকে তুমি দু'ঘুষি মেরেছ, কাল বাগে পেলে ও তোমাকে চার ঘুষি দেবে। মনে রেখো, ইটটি মারলে পাটকেলটি খেতে হয়।

### উ

১. **উঠন্তি মুলো পত্তনেই চেনা যায়** (প্রাথমিক অবস্থাই পরিণাম নির্দেশ করে)- রবীন্দ্রনাথ ছেলেবেলায় ছন্দ মিলিয়ে লিখেছিলেন, 'জল পড়ে পাতা নড়ে'। বড় হয়ে তিনি হলেন কবি। বোঝা যাচ্ছে, উঠন্তি মুলো পত্তনেই চেনা যায়।

২. **উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে** (একের অপরাধ বা দায় অন্যের ঘাড়ে চাপানো)- ক্লাসে দুষ্টুমি করল রকিব, আর সাজা পেল কিনা শফিক। এ যে দেখছি উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে।

### এ

১. **এক মাঘে শীত যায় না** (বিপদ একবার কেটে গেলেও বারবার যে কাটবে এমন নয়)- ভেবেছ, রক্ষা পেয়ে গেলে কিন্তু মনে রেখ, এক মাঘে শীত যায় না।

২. **এক হাতে তালি বাজে না** (দুই পক্ষ না হলে ঝগড়া হয় না)- তোমরা কিছুই করোনি অথচ এত ঝগড়াঝাঁটি হলো। এটা কী করে বিশ্বাস করি? এক হাতে যে তালি বাজে না তা সবাই জানে।

### ক

১. **কোথা যাও গোপাল সঙ্গে যাবে কপাল** (অদৃষ্ট চিরসঙ্গী)— শহরে কলেরা দেখে রফিক গ্রামে পালাল, কিন্তু সেখানেও তার কলেরা হলো, একেই বলে কোথা যাও গোপাল সঙ্গে যাবে কপাল।

২. **কারও পৌষ মাস কারও সর্বনাশ** (একই ঘটনায় একজনের যখন বিপদ অন্য জনের তখন আনন্দ)— একদিকে নদীর ভাঙনে মানুষ বাড়িঘর হারালো। অন্যদিকে আরেক দল দখল করল নতুন চর। একেই বলে কারও পৌষমাস কারও সর্বনাশ।

৩. **কাজের বেলায় কাজি কাজ ফুরালে পাজি** (সুযোগ সন্ধানী)— আনসার কাজের বেলায় কাজি কাজ ফুরালে পাজি। তার উপর কিছুতেই নির্ভর করতে পারি না।

৪. **কইয়ের তেলে কই ভাজা** (অন্যের উপর দিয়ে স্বার্থ উদ্ধার)— তার ভাইকে দিয়ে তার সর্বনাশ করে কইয়ের তেলে কই ভাজা আর কি!



৫. **কাটা ঘায়ে নুনের ছিটা** (এক কষ্টের উপর আরেক কষ্ট)— এমনিতে অপমানের জ্বালায় পুড়ে মরছি আবার তুমি এসেছ দু'কথা শুনিয়ে যেতে; কাটা ঘায়ে নুনের ছিটা দিয়ে তোমাদের কি লাভ হবে বুঝতে পারছি না।

৬. **কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলা** (শত্রু দিয়ে শত্রু নাশ)— হামিদের আপন লোককে দিয়ে তাকে শেষ করতে হবে; কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলাই নিরাপদ।

৭. **কানা ছেলের নাম পদ্মলোচন** (যার যে গুণ নেই, তার উপর সেই গুণ আরোপ করা)— করিম লেখাপড়া তেমন জানে না, আর তাকে বলা হয় বিদ্যানুরাগী। কানা ছেলের নাম পদ্মলোচন আর কি!

৮. **কুল রাখি না শ্যাম রাখি** (উভয় সংকট)— বিয়ে করলে আম্মা রাগ করেন আর বিয়ে না করলে আব্বা রাগ করেন; আমার হয়েছে ঠিক কুল রাখি না শ্যাম রাখি অবস্থা।

৯. **কালনেমির লঙ্কাভাগ** (কাজ আরম্ভ করার আগেই ফল পাওয়ার আশা)— ব্যবসায় শুরু না করতেই যদি কালনেমির লঙ্কাভাগে লেগে যাও, তবে কি আর ব্যবসায় দাঁড় করাতে পারবে?

১০. **কেঁচো খুড়ঁতে সাপ** (তুচ্ছ ব্যাপারে খোঁজ নিতে গিয়ে গুরুতর ব্যাপার উদঘাটিত হওয়া বা বড় ধরনের বিপদে পড়া)— বেআইনি অস্ত্রের সূত্র ধরে অস্ত্র তৈরির গোপন কারখানার সন্ধান পেয়েছে পুলিশ। এ যে কেঁচো খুঁড়তে সাপ!

### খ

১. **খাল কেটে কুমির আনা** (নিজের দোষে বিপদ ডেকে আনা)— ভাগনেকে ঘরে ঠাঁই দিয়ে খাল কেটে কুমির এনেছ; টের পাবে কিছুদিন পর।

২. **খাজনার চেয়ে বাজনা বেশি** (আয়ের চেয়ে ব্যয় বা আড়ম্বর বেশি)— পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে পাস করেছে বলে কমিউনিটি সেন্টারে হাজার হাজার লোকের দাওয়াত। এ যে খাজনার চেয়ে বাজনা বেশি।

### গ

১. **গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল** (প্রাপ্তির আগে ভোগের আয়োজন)— ব্যবসায় শুরু না করতেই লাভের হিসাব করছ; এটা গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল ছাড়া আর কিছুই নয়।

২. **গেঁয়ো যোগী ভিখ পায় না** (নিজের দেশের লোকের কাছে আদর থাকে না)— তোমার যত গুণই থাকুক না কেন, দেশের লোক কদর করবে না; জানই তো গেঁয়ো যোগী ভিখ পায় না।

৩. **গাছে না উঠতেই এক কাঁদি** (কাজ শুরু করতে না করতেই ফল লাভের আশা)— কাজ শুরু করেই তুমি লাভের জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েছ; এ যে গাছে না উঠতেই এক কাঁদি।

৪. **গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল** (স্বঘোষিত নেতা)— কেউ তাকে সমর্থন করছে না; তবুও সে গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল সেজে বসে আছে।

৫. **গাছেরও খায় তলারও কুড়ায়** (সবকিছু আত্মসাৎ করা)— দেশের উন্নতির আশা করা বাতুলতা; নেতারা তো গাছেরও খায় তলারও কুড়ায়।

৬. **গাছে তুলে মই কাড়া** (সাহায্যদানের আশা দিয়ে সাহায্য না করা)— আবুল আমাকে টাকা দেবে বলে ব্যবসায় নামলাম, সে যে আমাকে গাছে তুলে মই কেড়ে নেবে তা কোনোদিন ভাবিনি।

৭. **গরিবের ঘোড়া রোগ** (অক্ষমের অতিরিক্ত প্রত্যাশা)— ছেলেটা করে সামান্য পিওনের চাকরি। ঘাড়ের ওপর বুড়ো বাবা-মা। কিন্তু তার টিভি চাই, ফ্রিজ চাই।

৮. **গাইতে গাইতে গায়েন, বাজাতে বাজাতে বায়েন** (অভ্যাস ও অধ্যবসায়ের ফলে দক্ষতা আসে)-ওকে লেগে থাকতে বল। ও যেন গান না ছাড়ে। জানোই তো, গাইতে গাইতে গায়েন, বাজাতে বাজাতে বায়েন।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



### ঘ

১. **ঘটি ডোবে না নামে তালপুকুর** (ছোটর বড় নাম গ্রহণ)— সম্পত্তির মাঝে আছে একখানা মাত্র বাড়ি; তাতেই এত বড়াই; কথায় বলে ঘটি ডোবে না নামে তালপুকুর।

২. **ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খাওয়া** (যেখানে কাজ সেখানে চেষ্টা না করে অন্য জায়গায় চেষ্টা করা)— কাজটা তো ছোট সাহেবের হাতে, তাকেই ধরতে হবে। ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খাওয়ার চেষ্টা করলে কোনো কাজ হবে না।

৩. **ঘর পোড়া গরু সিঁদুরে মেঘ দেখলে ডরায়** (বিগত বিপদের কথা স্মরণ করে অনুরূপ বিপদের ভয়ে কাতর)— প্রচণ্ড জলোচ্ছ্বাসে জানমাল নষ্ট হওয়ার পর থেকে উপকূলের লোকজন বিপদ সংকেত শুনলেই নিরাপদ আশ্রয়ে চলে যায়। ঘর পোড়া গরু সিঁদুরে মেঘ দেখলে যেমন ডরায় এদের অবস্থাও তেমনি।

৪. **ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানো** (বিনা পারিশ্রমিকে অপ্রয়োজনীয় কাজে ব্যস্ত হওয়া)— আমাকে বলছ ক্লাবের সম্পাদক হতে। আমাকে বাদ দাও ভাই। ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়াবার সময় আমার কোথায়?

৫. **ঘরের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলা** (কাম্যবস্তুকে অনাদর করা)— তখন ডেকে নিয়ে চাকরি দিতে চেয়েছি, কিন্তু তুমি ঘরের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলেছ। এখন চাকরি মিলছে না। কষ্ট তো পেতেই হবে।

### চ

১. **চকচক করলেই সোনা হয় না** (বাইরের চটকদারিতে আসল পরিচয় ফুটে ওঠে না)— অমায়িক আচরণ আর আন্তরিকতা দেখে মনে হয় লোকটা খুবই ভালো। কিন্তু সত্যি বলতে কি, চকচক করলেই সোনা হয় না।

২. **চেনা বামুনের পৈতে লাগে না** (পরিচিত ব্যক্তিকে নতুন করে পরিচয় করিয়ে দেয়ার দরকার পড়ে না)— তুমি ড. আনিসুজ্জামানের কথা বলছ তো? উনাকে চেনে না কে? চেনা বামুনের পৈতে লাগে না।

৩. **চোরকে বলে চুরি করতে, গেরস্তকে বলে সজাগ থাকতে** (দুই দিক বজায় রাখার চেষ্টা)— এক ধরনের লোক আছে যারা উভয় দিক বজায় রাখতে ওস্তাদ। তারা চোরকে বলে চুরি করতে, গেরস্তকে বলে সজাগ থাকতে।

৪. **চোরে না শোনে ধর্মের কাহিনী** (অসাধু লোককে উপদেশ দান বৃথা)- যারা শিখতে চায় না কেবল সার্টিফিকেট চায়, নকল করা তাদের মজ্জাগত অভ্যাস হয়ে গেছে। যতই বারণ কর শুনবে না- আসলে চোরে না শোনে ধর্মের কাহিনী।

৫. **চোরে চোরে মাসতুতো ভাই** (অসজ্জনের সঙ্গে অসজ্জনেরই ভাব গড়ে ওঠে)— সন্ত্রাসীরা যে দলেরই হোক ভিতরে ভিতরে তারা সবাই চোরে চোরে মাসতুতো ভাই।

৬. **চোখে সরিষার ফুল দেখা** (অপ্রত্যাশিত বিপদ অনুভব করা)— সারাবছর লেখাপড়া না করলে বার্ষিক পরীক্ষার সময় সব ছাত্রকেই চোখে সরিষার ফুল দেখতে হয়।

৭. **চাল না চুলো ঢেঁকি না কুলো** (নিতান্ত নিঃস্ব)— নাসিরের যে চাল না চুলো ঢেঁকি না কুলো অবস্থা; তার নিকট চাঁদা চেয়ে কি হবে?

৮. **চাচা আপন প্রাণ বাঁচা** (নিজ নিজ স্বার্থ চিন্তা)— আজকাল প্রায় সবাই চাচা আপন প্রাণ বাঁচার দলে; পরের মঙ্গলের কথা চিন্তা করার মতো মন কারো নেই।

### ছ

১. **ছাই ফেলতে ভাঙা কুলো** (সামান্য কাজ করতে অবহেলার পাত্রের খোঁজ করা)— যে কাজ কেউ করতে চায় না তার জন্য খোঁজ করা হয় আমাকে; ছাই ফেলতে ভাঙা কুলো আর কি!

২. **ছুঁচো মেরে হাত গন্ধ করা** (তুচ্ছ কাজে হাত দিয়ে দুর্নাম পাওয়া)— কী যে বলেন সাহেব, মাত্র দুশো টাকা দিয়ে কাজ হাসিল করবেন। যান সাহেব, ছুঁচো মেরে হাত গন্ধ করা আমার কাজ নয়।



৩. **ছেড়ে দে মা, কেঁদে বাঁচি** (অবাঞ্ছিত ঝঞ্ঝাট থেকে রেহাই পাওয়ার আকুলতা)— সন্ত্রাসী পাকড়াও করতে এসে হোস্টেল থেকে বেচারা রকিবকে ধরে নিয়ে গেল পুলিশ। বেচারার এখন ছেড়ে দে মা, কেঁদে বাঁচি অবস্থা।

৪. **ছেলের হাতের মোয়া** (ফাঁকি দিয়ে সহজে করায়ত্ত করা যায় এমন জিনিস)— গণতন্ত্র ছেলের হাতের মোয়া নয়, তা কষ্ট করে অর্জন করতে হয়, সযত্নে রক্ষা করতে হয়।

### জ

১. **জলে কুমির ডাঙায় বাঘ** (উভয় সংকট)— এখন টাকা-পয়সাওয়ালাদের অবস্থা হয়েছে জলে কুমির ডাঙায় বাঘের মতো; একদিকে চাঁদাবাজদের উৎপাত, অন্যদিকে লুটপাটের ভয়।

২. **জলের রেখা, খলের পিরিতি** (ক্ষণস্থায়ী)— জলের রেখা আর খলের পিরিতিকে বিশ্বাস করা বোকামি।

৩. **জন্ম, মৃত্যু, বিয়ে-তিন বিধাতা নিয়ে** (যে ব্যাপারে মানুষের হাত নেই)— ছেলের মৃত্যুতে এমন ভেঙে পড়লে চলবে কি? কথায় বলে—জন্ম, মৃত্যু, বিয়ে-তিন বিধাতা নিয়ে।

### ঝ

১. **ঝিকে মেরে বউকে শেখানো** (ইশারায় তিরস্কার)— অপরাধ করল বড় সাহেবের ছেলে আর ছোট সাহেব শাস্তি দিল তার নিজের ছেলেকে; ঝিকে মেরে বউকে শেখানো হলো আর কি!

২. **ঝোপ বুঝে কোপ মারা** (অবস্থা বুঝে সুযোগ গ্রহণ করা)— তাকে আর এ ব্যাপারে বুদ্ধি দিতে হবে না; কি করে ঝোপ বুঝে কোপ মারতে হয় তা সে ভালোই জানে।

### ঠ

১. **ঠগ বাছতে গাঁ উজাড়** (মন্দের সংখ্যা এত বেশি যে ভালো লোক পাওয়াই মুশকিল)— দেশে দুর্নীতি এমন বেড়েছে যে দুর্নীজিবাজদের চিহ্নিত করতে গেলে ঠগ বাছতে গাঁ উজাড় হয়ে যাবে।

২. **ঠেলার নাম বাবাজি** (বাধ্য হয়ে নতি স্বীকার করা)— তখন তো উনি কথা রাখলেন না। এখন ওপর থেকে চিঠি আসায় আমাকে আবার চাকরিতে বহাল করলেন। বলেছি না, ঠেলার নাম বাবাজি।

### ড

১. **ডুবে ডুবে পানি খাওয়া** (গোপনে কাজ করা)— তুমি যে ডুবে ডুবে পানি খাচ্ছ সে কথা সবাই জানে; সময় হলে তা ঠিকই বুঝতে পারবে।

### ঢ

১. **ঢাল নেই, তলোয়ার নেই, নিধিরাম সর্দার** (ক্ষমতা না থাকলে কর্তৃত্ব করতে যাওয়া বৃথা)— ইঞ্জিন মেরামত করতে এসেছেন খালি হাতে? এ তো দেখছি ঢাল নেই, তলোয়ার নেই, নিধিরাম সর্দার।

২. **ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে** (অবস্থানের উন্নতি হলেও কাজ বা স্বভাবের পরিবর্তন না হওয়া)— কক্সবাজারে বেড়াতে গিয়েও ডাক্তার সাহেবকে রোগী দেখতে হয়েছে। বোঝা যায়, ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে।

### ত

১. **তেলা মাথায় তেল দেয়া** (যার অনেক আছে তাকেই আরও দেয়ার প্রবৃত্তি)— তেলা মাথায় তেল দেয়া এখন জাতির অভ্যাসে পরিণত হয়েছে।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



### দ

১. **দুষ্ট গরুর চেয়ে শূন্য গোয়াল ভালো** (বিঘ্ন সৃষ্টিকারী লোক কাজের হলেও তার হাত থেকে রেহাই পাওয়া মঙ্গলজনক)— ফ্যাক্টরির দারোয়ানটা কাজের চেয়ে গোল পাকাচ্ছে বেশি। দাও ওকে বিদেয় করে। জানোই তো, দুষ্ট গরুর চেয়ে শূন্য গোয়াল ভালো।

২. **দুধ কলা দিয়ে সাপ পোষা** (সযত্নে শত্রুকে প্রতিপালন করা)— তাকে এত স্নেহ করে বড় করেছি, আর আজ সেই দাঁড়িয়েছে আমার বিরুদ্ধে; দুধ কলা দিয়ে সাপ পুষলে এমনই হয়ে থাকে।

### ধ

১. **ধরাকে সরাজ্ঞান করা** (তুচ্ছ জ্ঞান করা)—কালোবাজারিতে মোটা টাকা রোজগার করে ধরাকে সরাজ্ঞান করবে, তাতে আর বিচিত্র কি!

২. **ধর্মের ঢাক আপনি বাজে** (পাপ কখনও চাপা থাকে না)— খুব গোপনে ঘুষ নিলেও কিছুতেই সে তা গোপন রাখতে পারল না; একেই বলে ধর্মের ঢাক আপনি বাজে।

৩. ধান ভানতে শিবের গীত (অপ্রাসঙ্গিক কথা)— ধান ভানতে শিবের গীত গেয়ে লাভ নেই; আসল কথাটা বলে ফেল।

### ন

১. **নাই মামার চেয়ে কানা মামা ভালো** (কিছুই না থাকার চেয়ে যৎসামান্য থাকাও ভালো)— চেয়েছিলাম সুবর্ণ এক্সপ্রেসে যেতে। কিন্তু আসন নেই। কোনো মতে মহানগরীতে একটা সিট পেলাম। যাক, নাই মামার চেয়ে কানা মামা ভালো।

২. **নাচতে না জানলে উঠোন বাঁকা** (অক্ষমতা ঢাকার জন্য বাজে অজুহাত)— যতবারই মিস শিল্পীকে আমাদের অনুষ্ঠানে গান গাইতে বলি ততবারই তিনি বলেন, এখানে নাকি সঙ্গীত করার ভালো লোক নেই। আসলে নাচতে না জানলে উঠোন বাঁকা।

৩. **নিজের নাক কেটে পরের যাত্রা ভঙ্গ** (নিজের ক্ষতি করেও অন্যের সর্বনাশের চেষ্টা)— ওকে বেকায়দায় ফেলার জন্য তুমি পুলিশের কাছে ধরা দিলে? এ যে নিজের নাক কেটে পরের যাত্রা ভঙ্গ।

### প

১. **পরের ধনে পোদ্দারি** (অন্যের অর্থ ইচ্ছামতো খরচ করে বড়লোকি দেখানো)— নিজের টাকা অর্জন করার চেষ্টা কর। মামার বাড়িতে থেকে পরের ধনে আর কত পোদ্দারি করবে?

২. **পুরানো চাল ভাতে বাড়ে** (বহুদর্শী বিজ্ঞ লোকের গুণ অনেক)– বুদ্ধি যদি নিতে হয় তবে প্রবীণ ও বিজ্ঞ লোকের কাছ থেকেই নেয়া ভালো। জান তো, পুরানো চাল ভাতে বাড়ে।

৩. **পেটে খেলে পিঠে সয়** (লাভের সম্ভাবনা থাকলে কষ্ট সহ্য করা যায়) — যতই যা বল, পেটে খেলে পিঠে সয়। সেজন্যই তো শিক্ষিত মানুষও বিদেশে চাকর-বাকরের কাজ করছে।

### ফ

১. **ফুলের ঘায়ে মূর্ছা যাওয়া** (সামান্য কষ্ট সহ্য করতে না পারা)— বর্তমানে পরিশ্রম করেই অন্নবস্ত্রের সংস্থান করতে হবে; ফুলের ঘায়ে মূর্ছা গেলে চলবে না।

### ব

১. **বিড়ালের ভাগ্যে শিকে ছেঁড়া** (বিনা চেষ্টাতেই বাঞ্ছিত জিনিস লাভ করা)— নিঃসন্তান চাচার মৃত্যুতে সে সমস্ত সম্পত্তির মালিক হয়েছে; এ যেন ঠিক বিড়ালের ভাগ্যে শিকে ছেঁড়া।



২. বিনা মেঘে বজ্রাঘাত (আকস্মিক বিপদ)— পিতার মৃত্যু সংবাদ বিনা মেঘে বজ্রাঘাতের মতো তাকে হতভম্ব করে দিল।

৩. **বিষ নেই কুলোপনা চক্কর** (ক্ষমতাহীনের মৌখিক আস্ফালন)— তোমার ক্ষমতার দৌড় আমাদের জানা আছে, আর লাফাতে হবে না, বিষ নেই তার আবার কুলোপনা চক্কর।

৪. **বেনাবনে মুক্তা ছড়ানো** (অপাত্রে মূল্যবান বস্তু দান)— এসব দুষ্ট ছেলেকে উপদেশ দেয়া আর বেনাবনে মুক্তা ছড়ানো একই কথা।

৫. **বজ্র আঁটুনি ফস্কা গেরো** (কড়াকড়ির ঢিলেঢালা ফল)— আমাদের স্কুলে নিয়মকানুন ছিল একেবারেই কড়া। কিন্তু তার অনেকগুলোই প্রয়োগ হতো না বলে ব্যাপারটা ছিল বজ্র আঁটুনি ফস্কা গেরোর মতো।

৬. **বানরের গলায় মুক্তোর মালা** (অযোগ্যের সুন্দর বস্তু লাভ)— ঐ কদাকার বদমাশটার এমন সুন্দরী শিক্ষিত বৌ– এ যে বানরের গলায় মুক্তোর মালা।

৭. বিনা মেঘে বজ্রপাত (আকস্মিক বিপদের উদয়)— বিশ বছর চাকরির পর অসুস্থতার অজুহাতে সিরাজ সাহেব যখন চাকরি থেকে বরখাস্তের নোটিশ পেলেন তখন তা তার কাছে বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতো মনে হলো।

৮. বোঝার ওপর শাকের আঁটি (গুরুভারের ওপর হালকা বাড়তি ওজন)— এত লটবহরের সঙ্গে তোমার এই ছোট্ট প্যাকেটটা নিতে আমার অসুবিধা হবে বলছ? আরে না না। এতো বোঝার উপর শাকের আঁটি।

### ভ

১. **ভিক্ষার চাল কাঁড়া আর আকাঁড়া** (বিনামূল্যে যা পাওয়া যায় তাই লাভ)— এ দুর্দিনে রেশনের চাল আতপ কি সেদ্ধ সে প্রশ্ন তুলো না; ভিক্ষার চাল কাঁড়া আর আকাঁড়া।

### ম

১. **মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন** (প্রাণের বিনিময়ে হলেও সংকল্প পালন)— বীর মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে স্বাধীনতা সংগ্রাম ছিল মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন।

২. **মশা মারতে কামান দাগা** (সামান্য ব্যাপারে বৃহৎ আয়োজন)— এই কয়টা টাকার জন্য আদালতে যাব নালিশ করতে? তুমি যে আমাকে মশা মারতে কামান দাগার বুদ্ধি দিচ্ছ।

### য

১. **যার বিয়ে তার খোঁজ নেই, পাড়াপড়শির ঘুম নেই** (একের জন্য অন্যের দুশ্চিন্তা)— পরীক্ষার আর মাত্র সাত দিন বাকি, এখনও কেবল ঘুমাচ্ছ; একটু ভালো করে পড়। কথায় বলে যার বিয়ে তার খোঁজ নেই, পাড়াপড়শির ঘুম নেই।

২. যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ (শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আশা রাখা)— খুনের দায়ে ফাঁসির দণ্ড মাথায় নিয়েও বাঁচার আশা ওই দাগী আসামিটার— যদি রাষ্ট্রপতি ক্ষমা করে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেন। আসলে যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ।

৩. যত গর্জে তত বর্ষে না (মুখে যত, কাজে তত নয়)— নির্বাচনের আগে এটা করব, ওটা হবে– কত ওয়াদা! আর জেতার পর রাটি নেই। যত গর্জে তত বর্ষে না– এতো দেখাই যাচ্ছে।

৪. যারে দেখতে নারি, তার চরণ বাঁকা (অপ্রিয় ব্যক্তির খুঁত অনুসন্ধান)— রকিবের আর কোনো গুণ থাক বা না থাক সে ভালো গায়। তুমি তাও স্বীকার করতে নারাজ। তোমার ব্যাপারটা হলো, যারে দেখতে নারি, তার চরণ বাঁকা।

৫. **যেখানে বাঘের ভয়, সেখানে সন্ধ্যা হয়** (বিপদের আশঙ্কা-স্থলে বিপদ নেমে আসা)— কেউ নেই দেখে যেই নকল বের করেছে অমনি পেছন থেকে এসে শিক্ষক ধরে ফেললেন। ব্যাস, যেখানে বাঘের ভয়, সেখানেই সন্ধ্যা হয়।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



৬. যে যায় লঙ্কায় সে হয় রাবণ (কোনো পদে বৃত হলে সেই পদসুলভ স্বভাব লাভ)– এক একটা দল ক্ষমতায় যায়। লোকে ভাবে পরিবর্তন আসবে। কিন্তু সবই আগের মতো। আসলে যে যায় লঙ্কায় সে হয় রাবণ।

৭. যেমন বুনো ওল তেমন বাঘা তেঁতুল (দুষ্টের যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী)— বজ্জাতিতে দুজনের কেউ কারো চেয়ে কম নয়, যেমন বুনো ওল তেমন বাঘা তেঁতুল।

### র

১. রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয়, উলুখাগড়ার প্রাণ যায় (ক্ষমতাবানে ক্ষমতাবানে লড়াই হলে মাঝে থেকে গরিব ও নিরীহ লোকের ক্ষতি হয়)– সরকার ও বিরোধী দলের আন্দোলনে সাধারণ মানুষের ক্ষতি হচ্ছে। এ যেন রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয়, উলুখাগড়ার প্রাণ যায়।

### শ

১. শাক দিয়ে মাছ ঢাকা (তুচ্ছ কারণ দেখিয়ে অপরাধ গোপনের চেষ্টা)— শাক দিয়ে মাছ ঢাকার চেষ্টা করো না। তুমিই যে পরীক্ষা পেছানোর তালটা তুলেছ তা আর জানতে বাকি নেই।

২. শিকারি বেড়ালের গোঁফ দেখলে চেনা যায় (ভাবভঙ্গি দেখেই কাজের লোক চেনা যায়)— নতুন আসা অফিসারটি যে বেশ কাজের হবে তাতে সন্দেহ নেই। শিকারি বেড়ালের গোঁফ দেখলেই চেনা যায় যে।

### স

১. সাতেও নেই পাঁচেও নেই (ঝুট-ঝামেলা থেকে মুক্ত থাকা)– ভদ্রলোক একেবারে আলাদা ধরনের মানুষ। কারো সাতেও নেই পাঁচেও নেই।

২. সোজা আঙুলে ঘি ওঠে না (জটিল কাজ সম্পাদনে কূটকৌশলের প্রয়োজন হয়)— বুঝলে সোজা আঙুলে ঘি উঠবে না! ও যেমন ত্যাঁদড়, ওকে শায়েস্তা করতে হলে পুলিশের কাছে যেতে হবে।

৩. স্বর্গে দাসত্ব অপেক্ষা নরকে রাজত্ব ভালো (স্বাধীনতাই অগ্রগণ্য)— তোমার মতো ছেলে ঘরজামাই হবে ভাবতে পারিনি। জান না স্বর্গে দাসত্ব অপেক্ষা নরকে রাজত্ব ভালো?

### হ

১. হবুচন্দ্র রাজার গবুচন্দ্র মন্ত্রী (মূর্খ লোকের আরও মূর্খ উপদেষ্টা)– দলের লোক হয়েছে স্থানীয় কমিটির প্রধান ও উপপ্রধান। এ যেন হবুচন্দ্র রাজার গবুচন্দ্র মন্ত্রী।

২. হাতি কাদায় পড়লে চামচিকেও লাথি মারে (বিপদে পড়লে শক্তিশালী লোককেও তুচ্ছ লোকের গঞ্জনা সইতে হয়)– মন্ত্রিত্ব হারিয়ে আমাদের এলাকার নেতার এখন ভারি খারাপ অবস্থা। এজন্যই লোকে বলে হাতি কাদায় পড়লে চামচিকেও লাথি মারে।

৩. হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলা (বুদ্ধি দোষে সৌভাগ্যের সুযোগ নষ্ট করা)— হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলে এখন আফসোস করে কী হবে?

৪. হাতেরও যাবে পাতেরও যাবে (একূল ওকূল দুকূলই হারানো)— তোমার কথামতো কাজ করলে হাতেরও যাবে, পাতেরও যাবে।

৫. হায়রে আমড়া, কেবল আঁটি আর চামড়া (অন্তঃসারশূন্য)— রহিমা কোনো কাজই করতে পারে না, হায়রে আমড়া, কেবল আঁটি আর চামড়া।

## বিগত বিসিএস পরীক্ষার প্রশ্ন সমাধান

### ২৮তম বিসিএস : ২০০৯

**যে যায় লঙ্কায় সেই হয় রাবণ**

উত্তর : 'যে যায় লঙ্কায় সেই হয় রাবণ'—একটি বহুল প্রচলিত প্রবাদ। প্রবাদের একটা প্রত্যক্ষ ও একটা পরোক্ষ অর্থ থাকে। এখানে 'লঙ্কা', 'রাবণ' শব্দগুলো নেয়া হয়েছে পুরাণ থেকে। এ শব্দগুলোর বাস্তব প্রয়োগ ভিন্ন অর্থ দেয়। প্রবাদটির অর্থ এভাবে করা যায় যে, ক্ষমতায় গেলে সবাই ক্ষমতার অপব্যবহার করে থাকে। একটি উদাহরণ দিয়ে বলা যায় এভাবে— 'কাকে বিশ্বাস করব ভাই! বাংলাদেশের রাজনীতির যা অবস্থা; যে যায় লঙ্কায় সেই হয় রাবণ।'

### ২৯তম বিসিএস : ২০১০

**মাছের মা'র পুত্রশোক।**

উত্তর : মাছের মা'র পুত্রশোক কথাটির অর্থ কপট বেদনাবোধ। যাকে আরও সহজে বলা যায় আন্তরিকতাহীন লোকদেখানো কৃত্রিম শোক। অন্তর্দলীয় সংঘর্ষে প্রতিদ্বন্দ্বীর মৃত্যু বা নিহত হওয়ার পর লোকদেখানোর জন্য কোনো কোনো রাজনীতিবিদ চোখের পানি ফেলে, এ যেন মাছের মা'র পুত্র শোক। তেমনি সংসারেও দেখা যায় এর নানা উদাহরণ। জীবিত থাকা অবস্থায় দুই সতীনের মধ্যে কখনও সদ্ভাব ছিল না। অথচ এক সতীনের মৃত্যুতে আরেক সতীন কাঁদছে, দেখে মনে হয় মাছের মা'র পুত্রশোক।

### ৩০তম বিসিএস : ২০১১

**অতি দর্পে হত লঙ্কা।**

উত্তর : 'অতি দর্পে হত লঙ্কা'—প্রবাদটির অর্থ বেশি অহংকারে পতন। সমাজে অনেক সময় দেখা যায়, মানুষ বিপুল ধন-সম্পদ ও ক্ষমতার অধিকারী হয়ে ধরাকে সরা জ্ঞান করে। তার আচরণ হয় উদ্ধত, চলাফেরা হয় বেপরোয়া। কাউকে সে তোয়াক্কা করতে চায় না। প্রকৃতপক্ষে অহংকার মদমত্ত এই মানুষ কিন্তু তার সর্বনাশ তথা পতনের দিকে এগিয়ে যায়। পরিণামে তার ধ্বংস বা পতন অনিবার্য হয়ে ওঠে।

### ৩১তম বিসিএস : ২০১১

**যে সহে, সে রহে**

উত্তর : সহনশীলতা একটি মহৎ গুণ এবং মানবজীবনে সুপ্রতিষ্ঠার জন্য এ গুণের বিশেষ গুরুত্ব বিদ্যমান। মানুষের মতো বাঁচতে হলে এবং জীবনে সাফল্য অর্জন করতে হলে সর্বাগ্রে প্রয়োজন সহনশীলতা। রোগ-শোক, দুঃখ-দারিদ্র্য, অন্যায়-অবিচার এসবের চাপে মানুষ পর্যুদস্ত হয়ে চোখে বিভীষিকা দেখে। কিন্তু এসব প্রতিরোধে চাই শক্তি, অধ্যবসায় ও সহিষ্ণুতা। যুদ্ধে জয়-পরাজয় আছেই কিন্তু যে মানুষ পরাজয়কে অম্লান বদনে মাথা পেতে নিয়ে পরবর্তী বিজয়ের জন্য ব্রতী হয়, সেই বিজয় অর্জন করতে পারে, সে-ই যথার্থ বীর। সহিষ্ণুতার গুণেই রবার্ট ব্রুস সপ্তমবারের যুদ্ধে শত্রুর কবল থেকে দেশকে উদ্ধার করেন।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



### ৩২তম বিসিএস : ২০১২

**সে কহে বিস্তর মিছা, যে কহে বিস্তর।**

**উত্তর :** মিথ্যাবাদীরা সাধারণত বেশি কথা বলেন। তারা যে কোনো ঘটনা বা বিষয় বর্ণনার ক্ষেত্রে যেমন প্রচুর মিথ্যার অবতারণা ঘটান তেমনি এসব মিথ্যাকে স্বাভাবিক সত্য হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে প্রাসঙ্গিক-অপ্রাসঙ্গিক প্রচুর যুক্তি তুলে ধরেন। পক্ষান্তরে, একজন সত্যবাদী লোক স্বল্পভাষী হন। সত্যবাদী লোক যে কোনো ঘটনা বা বিষয়কে যথাযথভাবে বর্ণনা করে সমাজের ইতিবাচক ধারাকে বজায় রাখতে সহায়তা করেন। মিথ্যাবাদী তার বর্ণনায় সত্য-মিথ্যার মিশ্রণ ঘটিয়ে বিষয়টিকে অতিরঞ্জিত করে তোলেন। তার প্রচুর কথাবার্তা তাকে আরো পাপী করে তোলে এবং সমাজে দ্বন্দ্ব-কলহ সৃষ্টি করে।

### ৩৩তম বিসিএস : ২০১২

**পুষ্প আপনার জন্য ফোটে না।**

**উত্তর :** সমাজের বৃহত্তর কল্যাণে নিজেকে নিবেদন করাতেই মানুষের জীবনের সার্থকতা। এ জগতে বহু মহৎ লোক আছেন যারা পরের মঙ্গলের জন্য নিজেদের বিলিয়ে দেন। তাদের একমাত্র চিন্তা, কি করলে অপরের দুঃখ তিরোহিত হয়ে তার মুখে হাসি ফুটবে, কিসে সমাজ-সংসারের কল্যাণ হবে। তারা নিজেদের সুখ-শান্তির বিষয়ে কখনো চিন্তা করে না এবং নিজেদের সর্বস্ব বিসর্জন দিয়ে পরের মঙ্গল সাধন করেই সুখানুভব করে থাকেন। তাই তারা এ নশ্বর জগতে চিরস্মরণীয় ও বরণীয় এবং তাদেরকে 'মনের মন্দিরে নিত্য সেবে সর্বজন'। সকলের উচিত স্বার্থপরতা ত্যাগ করে এ রকম পরহিতব্রতে নিজেদের উৎসর্গ করা।

### ৩৪তম বিসিএস : ২০১৪

**আগে-পিছে লণ্ঠন, কাজের বেলা ঠন্ঠন্!**

**উত্তর :** প্রবাদটির অর্থ গুণহীনের বৃথা আস্ফালন। অনেক আয়োজন থাকলেও সঠিকভাবে দায়িত্ব পালনে অনীহা পোষণকারী মানুষের দ্বারা বড় কোনো কাজ করা অসম্ভব। কর্ম পরিকল্পনার সাথে কাজের কোনো সমন্বয় সাধন না করলে শুধুমাত্র আয়োজনেই কর্মযজ্ঞের সমাপ্তি ঘটে। আমাদের সমাজে আগে-পিছে লণ্ঠন নিয়ে অনেক লোকই ঘুরে বেড়ায় কিন্তু প্রকৃত কাজের লোকেরা নিরলসভাবে কাজ করে থাকেন। তাদের অযাচিত আয়োজনের প্রয়োজন পড়ে না, তারা কর্মে নিবিড়ভাবে নিয়োজিত থাকেন। মানুষের উচিত আগে-পিছে লণ্ঠন নিয়ে না ঘুরে সঠিকভাবে নিজ দায়িত্ব পালন করা। প্রকৃত পরিশ্রমীরাই সফলতা অর্জন করে থাকে।

## ঙ

# বাক্যগঠন

বাক্য শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ কথ্য বা কথিত বিষয়। যথাযথ বিন্যস্ত শব্দসমষ্টি যদি একটি সম্পূর্ণ মনোভাব প্রকাশ করে তবে তাকে বাক্য বলে। মহাভাষ্যে বাক্যলক্ষণ এভাবে প্রকাশ করা হয়েছে,

'আখ্যাতং সাব্যয়ং সকারকং সকারকবিশেষণং বাক্যসংজ্ঞকং ভবতি।'

অর্থাৎ অব্যয়যুক্ত, কারকযুক্ত এবং কারকের বিশেষণযুক্ত ক্রিয়াকে বাক্য বলা হয়। শুধু অব্যয় আর ক্রিয়াতেও বাক্য হতে পারে, কোনো একটি কারকযুক্ত ক্রিয়াতেও বাক্য হতে পারে, আর ঐসব কারকের বিশেষণ থাকতেও পারে নাও থাকতে পারে।

এই সংজ্ঞায় ক্রিয়ার গুরুত্ব লক্ষণীয়। সম্পূর্ণ মনের ভাব প্রকাশ করার ব্যাপারটা এখানে উল্লেখ করা হয়নি। ইংরেজি Sentence কথাটির মধ্যে মনোভাব প্রকাশের বিষয়টি প্রচ্ছন্ন আছে। শব্দটির মূলে আছে sentir ধাতুটি যার অর্থ feel বা express.

সাহিত্য দর্পণের মতে, যোগ্যতা, আকাঙ্ক্ষা আর আসত্তিযুক্ত পদ সমুচ্চয়কে বাক্য বলে।

বাক্যের কয়েকটি সংজ্ঞা নিচে দেয়া হলো :

* যে সুবিন্যস্ত পদ সমষ্টি বক্তার কোনো মনোভাবকে সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করে, তাকে বাক্য বলে।
* দুই বা ততোধিক শব্দ বা পদ একত্রিত হয়ে যখন মনের একটি সম্পূর্ণ ভাব বা অর্থ প্রকাশ করে, তখন তাকে বাক্য বলে।
* যে সুবিন্যস্ত পদসমষ্টি দ্বারা কোনো বিষয়ে বক্তার মনোভাব সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হয়, তাকে বাক্য বলে।

বাক্যের অংশ : বাক্যের দুটি অংশ। যথা– উদ্দেশ্য ও বিধেয়।

উদ্দেশ্য : বাক্যে যার সম্পর্কে কিছু বলা হয় তাকে উদ্দেশ্য বলে। যেমন– **রুমা** একজন ভালো গায়ক। এখানে রুমা সম্বন্ধে বলা হচ্ছে। অতএব, রুমা হচ্ছে এ বাক্যের উদ্দেশ্য। উদ্দেশ্য পদ কখনো কখনো বাক্যে উহ্য থাকতে পারে। যেমন– ছোট্ট একটা ঘর বাঁধব সেখানে। বাক্যে আমি শব্দটি উহ্য রয়েছে। কখনো কখনো একই বাক্যে একাধিক উদ্দেশ্য পদ থাকতে পারে। যেমন– ফাহিম, জেরিন ও ফয়সাল পরীক্ষায় ভালো করেছে।

বিধেয় : কোনো বাক্যে উদ্দেশ্য সম্বন্ধে যা কিছু বলা হয়, তাকে বলা হয় বিধেয়। যেমন– সেলিম ভালো ছেলে। এ বাক্যের বিধেয় হলো ভালো ছেলে।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



**উদ্দেশ্য ও বিধেয়ের সম্প্রসারক :** বাক্যকে অনেক সময় উদ্দেশ্য ও বিধেয়ের প্রসারণের মাধ্যমে সম্প্রসারণ করা হয়।

| উদ্দেশ্য | বিধেয় |
|---|---|
| সিরাজ সাহেব | একজন চাকরিজীবী |
| গনি মিয়া | একজন ভালো কৃষক |
| ছেলেটি | ভারি দুষ্ট |
| আবদুস সাত্তার | ইংরেজিতে দক্ষ |
| সে | আজ চট্টগ্রাম যাবে |
| নাসির | আমেরিকায় বাস করে |
| শাহনাজ | নাসিরের স্ত্রী |

**উদ্দেশ্য সম্প্রসারণের উপায়**

বিশেষণ দ্বারা : **লাল ফুল ফুটেছে।**
সমকারক পদ দ্বারা : আমাদের অধ্যাপক স্যার আজ খুলনা যাবেন।
বিশেষণ স্থানীয় পদ দ্বারা : গতকাল যিনি এসেছিলেন তিনি আমাদের স্যার।
সম্বন্ধপদ দ্বারা : **মিন্টুর বন্ধু,** কোথায় থাকে?
অসমাপিকা ক্রিয়া সংযুক্ত পদসমষ্টি দ্বারা : পথ **চলতে চলতে** তারা ক্লান্ত হয়ে পড়ল।
অসমাপিকা ক্রিয়া সকর্মক হলে তার কর্মপদ প্রয়োগ করে : সে **চালাকি করে** ধরা পড়েছে।
অসমাপিকা ক্রিয়ার কর্মপদে বিশেষণ যোগ করে : সে **বহু কষ্ট করে** ধন লাভ করেছে।
অসমাপিকা ক্রিয়ার কর্মপদে অধিকরণ কারক যোগ করে : সে **এ বছর** কষ্ট করে পাস করেছে।
অসমাপিকা ক্রিয়ার কর্মপদে সম্প্রদান কারক যোগ করে : তিনি তার সবকিছু **দরিদ্রকে** দান করেছেন।
অসমাপিকা ক্রিয়ার কর্মপদে অপাদান কারক যোগ করে : সে **গাছ থেকে** আনারস এনে আমাকে দিল।
সম্বোধন পদ প্রয়োগ করে : **মামা** আপনি আমাকে ক্ষমা করুন।

**বিধেয় সম্প্রসারণের উপায়**

ক্রিয়া বিশেষণ দ্বারা : যমুনা নদী **খরবেগে** প্রবাহিত হচ্ছে।
অসমাপিকা ক্রিয়া দ্বারা : নদী আর কালের গতি চিরকাল **ব্যাপিয়া প্রবাহিত** হচ্ছে।
বিশেষণের বিশেষণ দ্বারা : সুমি **খুব** ভালো মেয়ে।
করণ কারক দ্বারা : সেলিম **কলম** দিয়ে লেখে।
অপাদান কারক দ্বারা : আমটি **গাছ থেকে** নিচে পড়ল।
অধিকরণ কারক দ্বারা : মাছ **পানিতে** বাস করে।

**বাক্যে পদবিন্যাসের সাধারণ ক্রম**

বাংলা বাক্যের প্রধান ব্যাকরণিক উপাদান তিনটি : কর্তা, কর্ম ও ক্রিয়া। বাংলা বাক্যে এই তিনটি মূল উপাদান যে ছকে বসে তা হলো :

| [কর্তা] | [কর্ম] | [ক্রিয়া] |
|---|---|---|
| আমি | বই | পড়ি |
| [S] | [O] | [V] |
| উদ্দেশ্য | বিধেয় | |



**কর্তা-কর্ম-ক্রিয়া :** এই বিন্যাসক্রমই বাংলা ভাষায় বাক্য গঠনের স্বীকৃত ক্রম। এজন্যেই ভাষাবিজ্ঞানে বাংলা ভাষাকে S-O-V Language-এর পর্যায়ভুক্ত করা হয়ে থাকে।

কর্তা, কর্ম, ক্রিয়া— এই তিনটি প্রধান উপাদান ছাড়াও বাক্যে আরও কিছু উপাদান ব্যবহৃত হয়। সে সব উপাদান সাধারণত নিম্নলিখিত পদক্রম অনুসারে বিন্যস্ত হয়ে থাকে :

১. ক. ক্রিয়াবিশেষণ ক্রিয়ার আগে বসে :

| [কর্তা] | [ক্রিয়া বিশেষণ] | [ক্রিয়া] |
|---|---|---|
| সে | নীরবে | শুনছে। |

খ. বাক্যে কর্ম থাকলে ক্রিয়া বিশেষণ কর্মের আগে বসে :

| [কর্তা] | [ক্রিয়া বিশেষণ] | [কর্ম] | [ক্রিয়া] |
|---|---|---|---|
| সে | নীরবে | গান | শুনছে। |

২. সময়বাচক ও স্থানবাচক পদ (ক্রিয়া বিশেষণ বলে) কর্মের আগে বসে :

| [কর্তা] | [সময়বাচক পদ] | [স্থানবাচক পদ] | [কর্ম] | [ক্রিয়া] |
|---|---|---|---|---|
| সে | কাল | রেস্তোরাঁয় | বিরানি | খাওয়াবে। |

৩. কর্মপদ যদি গৌণ কর্ম ও মুখ্য কর্মে বিভক্ত হয় তবে গৌণ কর্ম সাধারণত মুখ্য কর্মের আগে বসে :

| [কর্তা] | [গৌণ কর্ম] | [মুখ্য কর্ম] | [ক্রিয়া] |
|---|---|---|---|
| আমি | তোমাকে | বইটা | দেব। |

৪. ক. নঞর্থক অব্যয় সাধারণত সমাপিকা ক্রিয়ার পরে বসে :

| [কর্তা] | [কর্ম] | [সমাপিকা ক্রিয়া] | [নঞর্থক অব্যয়] |
|---|---|---|---|
| সে | নাশতা | খায় | নি। |

খ. নঞর্থক অব্যয় অসমাপিকা ক্রিয়ার আগে বসে :

| [কর্তা] | [নঞর্থক অব্যয়] | [অসমাপিকা ক্রিয়া] | [সমাপিকা ক্রিয়া] |
|---|---|---|---|
| সে | না | খেয়ে | রয়েছে। |

৫. ক. প্রশ্নবোধক অব্যয় ক্রিয়ার পরে বসে :

| [কর্তা] | [কর্ম] | [ক্রিয়া] | [প্রশ্নবোধক অব্যয়] |
|---|---|---|---|
| আপনি | চিঠিটা | পেয়েছেন | কি? |

খ. প্রশ্নবোধক অব্যয় কর্তার ঠিক পরেও বসতে পারে :

| [কর্তা] | [প্রশ্নবোধক অব্যয়] | [কর্ম] | [ক্রিয়া] |
|---|---|---|---|
| আপনি | কি | বইটা | পেয়েছেন? |

৬. প্রশ্নবোধক সর্বনাম ক্রিয়ার আগে বসে :

| [কর্তা] | [প্রশ্নবোধক সর্বনাম] | [ক্রিয়া] |
|---|---|---|
| আপনি | কী | চান? |

৭. ক. বিশেষণ পদ বাক্যে সাধারণত বিশেষ্য পদের আগে বসে :

| [কর্তা] | [কর্ম] | [ক্রিয়া] | [নঞর্থক অব্যয়] |
|---|---|---|---|
| বোকা ছেলে | পাকা আমটা | খেল | না। |

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



খ. বিধেয় বিশেষণ বিশেষ্যের পরে বসে :

[বিশেষ্য] [বিধেয় বিশেষণ]

ছেলেটি বুদ্ধিমান।

৮. ক. সম্বন্ধ পদ বিশেষ্যের আগে বসে :

আমি তৌকিরের ভাইকে চিনি।

খ. বিশেষ প্রয়োগে সম্বন্ধ পদ বিশেষ্যের পরে বসে :

মেয়েটি তোমার খুবই ভাগ্যবতী।

## সার্থক বাক্যের লক্ষণসমূহ

অর্থবোধক কিছু শব্দ বা পদ মিলে একটি বাক্য তৈরি হয়। অবশ্য তার মাঝে অর্থ প্রকাশের গুণ থাকতে হবে। এ জন্য প্রয়োজন বাক্যে ব্যবহৃত পদগুলোর মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক বজায় থাকা। যদি বাক্যের পদগুলো মিলে একটি অখণ্ড ভাব প্রকাশ করে তবেই তা সার্থক বাক্য হতে পারে।

অতএব, একটি সার্থক বাক্যের নিম্নলিখিত তিনটি গুণ থাকবে। যথা : ১. আকাঙ্ক্ষা, ২. আসত্তি, ৩. যোগ্যতা।

১. **আকাঙ্ক্ষা :** বাক্যের অর্থ পরিষ্কারভাবে বোঝার জন্য বাক্যে ব্যবহৃত একটি পদের পর অন্য পদ শোনার যে আগ্রহ জাগে তাকে আকাঙ্ক্ষা বলে। অন্যভাবে বলা যায়, বাক্যের অর্থ পরিষ্কারভাবে বোঝার জন্য এক পদের পর অন্য পদ শোনার যে ইচ্ছা তা-ই হলো আকাঙ্ক্ষা। যেমন- সূর্য পূর্বদিকে উদিত হয়।

এ বাক্যটি বললে, শ্রোতার আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি হয় বা কথাটি দ্বারা বাক্যের অর্থ পরিষ্কার রূপে অনুধাবন করা যায়। কিন্তু যদি বলা হয়, সূর্য পূর্বদিকে ... তাহলে কথাটি অসম্পূর্ণ থেকে যায়। অতএব 'উদিত হয়' শব্দটির শোনার জন্য যে আগ্রহ তাই হলো আকাঙ্ক্ষা।

২. **ক্রম বা আসত্তি :** বাক্যে ব্যবহৃত পদগুলোর মাঝে অর্থের সঙ্গতি বা মিল রাখার জন্য সুশৃঙ্খলভাবে পদ বিন্যাসকেই বলা হয় ক্রম বা আসত্তি। যেমন–আছে নামে যন্ত্র একরকম অনুবীক্ষণ। এখানে শব্দগুলো এলোমেলোভাবে সাজানো রয়েছে এবং শব্দগুলোর মধ্যে কোনো অর্থগত মিল নেই। সুতরাং এটি বাক্য নয়। কিন্তু যদি বলা হয়–অণুবীক্ষণ নামে একরকম যন্ত্র আছে। তাহলে এখানে বাক্যের শব্দগুলো সঠিকভাবে সাজানো রয়েছে এবং বাক্যের অর্থ প্রকাশে কোনো প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়নি। অর্থাৎ মনোভাব প্রকাশের জন্য পদগুলো এমনভাবে পর পর সাজাতে হবে যাতে মনোভাব প্রকাশে বাধাগ্রস্ত না হয়। বাক্যের অর্থসঙ্গতি রক্ষার জন্য সুশৃঙ্খল পদ বিন্যাসই আসত্তি।

৩. **যোগ্যতা :** বাক্যে ব্যবহৃত পদগুলোর অর্থগত ও ভাবগত মিলন বন্ধনের নামই যোগ্যতা। যেমন- মানুষটি একটি বাঘ খেয়েছে। বাক্যটির অর্থের সাথে বাস্তবের কোনো মিল নেই। তেমনি- গরু আকাশে ওড়ে। এখানেও বাক্যটির অর্থের সঙ্গে বাস্তবতার কোনো মিল নেই। অথচ বাক্যের অর্থ ও বাস্তবতার সঙ্গে মিল থাকতে হবে। অর্থাৎ বাক্যস্থিত শব্দসমূহের অন্তর্গত এবং ভাবগত মিলন বন্ধনের নাম যোগ্যতা। শব্দের যোগ্যতার সাথে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো সংশ্লিষ্ট।



ক. **রীতিসিদ্ধ অর্থবাচকতা :** প্রকৃতি প্রত্যয়জাত অর্থে শব্দ সর্বদা ব্যবহৃত হয়। যোগ্যতার দিক থেকে রীতিসিদ্ধ অর্থের দিকে লক্ষ রেখে কতগুলো শব্দ ব্যবহার করতে হয়। যেমন–

| শব্দ | রীতিসিদ্ধ অর্থ | প্রকৃতি + প্রত্যয় | প্রকৃতি + প্রত্যয়জাত অর্থ |
|---|---|---|---|
| ১. বাধিত | অনুগৃহীত বা কৃতজ্ঞ | বাধ + ইত | বাধাপ্রাপ্ত |
| ২. তৈল | তিল জাতীয় | তিল + ষ্ণ | তিলজাত স্নেহপদার্থ, যে কোনো শস্যের রস |

খ. **উপমার ভুল প্রয়োগ :** বাক্যে অনেক সময় উপমা ঠিকমত ব্যবহার না করলে বাক্য তার যোগ্যতা হারায়। যেমন- আমার হৃদয় মন্দিরে আশার বীজ উপ্ত হলো। বাক্যটিতে উপমার ভুল প্রয়োগ করা হয়েছে। কেননা, বীজ বপন করা হয় জমিতে হৃদয়ে নয়।

গ. **বাহুল্য দোষ :** প্রয়োজনের অতিরিক্ত শব্দ ব্যবহার করলে বাক্য তার যোগ্যতা হারায়। যেমন- দেশের সব আলেমগণই এ ব্যাপারে আমাদের সমর্থন দান করেন।

এখানে আলেমগণ বহুবচনবাচক শব্দ। এখানে সব শব্দটির ব্যবহারও বহুগুণবাচক। একই বাক্যে এরূপ একাধিক বহুবচনসূচক শব্দ ব্যবহার করাতেই বাক্যে বাহুল্য দোষ ঘটেছে।

ঘ. **দুর্বোধ্যতা :** অপ্রচলিত, দুর্বোধ্য শব্দ ব্যবহার করলে বাক্য তার যোগ্যতা হারায়, যেমন- তুমি আমার সঙ্গে প্রপঞ্চ করেছ। (চাতুরী বা মায়া অর্থে বাংলায় অপ্রচলিত)

ঙ. **গুরুচণ্ডালী দোষ :** তৎসম শব্দের সঙ্গে দেশীয় শব্দের ব্যবহার করলে যে দোষের সৃষ্টি হয়, তাকে বলা হয় গুরুচণ্ডালী দোষ। শব্দের গুরুচণ্ডালী দোষ ঘটলে শব্দ তার যোগ্যতা হারায়। যেমন- গরুর গাড়ি- গরুর শকট, শবদাহ- শবপোড়া

গরুর গাড়ির বদলে গরুর শকট, শবদাহের পরিবর্তে 'শবপোড়া' ব্যবহার করলে শব্দ তার যোগ্যতা হারায় এবং গুরুচণ্ডালী দোষে দুষ্ট হয়।

চ. **বাগধারা রদবদল :** বাগধারার পরিবর্তন করলে শব্দ তার যোগ্যতা হারায়, যেমন- অরণ্যেরোদন না বলে অরণ্যে ক্রন্দন বললে শব্দ তার যোগ্যতা হারাবে।

## বাক্যের গঠনগত দিক

গঠনের দিক থেকে বাক্য তিন প্রকার। যথা : ১. সরল বাক্য, ২. জটিল বাক্য ও ৩. যৌগিক বাক্য।

১. **সরল বাক্য :** যে বাক্যে একটি মাত্র উদ্দেশ্য (কর্তা) ও একটি মাত্র বিধেয় (সমাপিকা ক্রিয়া) থাকে, তাকে সরল বাক্য বলে। যেমন- দিপা বই পড়ে। রাসেল ক্রিকেট খেলে।

বাক্য দুটির কর্তা হচ্ছে দিপা ও রাসেল। পড়ে ও খেলে বাক্য দুটির সমাপিকা ক্রিয়া।

২. **জটিল বা মিশ্র বাক্য :** একটি পূর্ণ বাক্যে যদি একটি প্রধান খণ্ডবাক্য ও এক বা একাধিক অপ্রধান খণ্ডবাক্য পরস্পর সম্পর্কযুক্ত থাকে, তবে তাকে জটিল বাক্য বলে। যেমন- যারা মাতৃভাষার মূল্য দেয় না, তারা মায়ের মূল্য দিতে জানে না।

এ বাক্যে দুটি খণ্ডবাক্য রয়েছে – যারা মাতৃভাষার মূল্য দেয় না তারা মায়ের মূল্য দিতে জানে না। দুটি বাক্যের একটি অপরটির ওপর নির্ভরশীল। একটি বাদে অন্যটির স্বয়ংসম্পূর্ণ অর্থ প্রকাশ সম্ভব নয়। অতএব, এটি একটি জটিল বা মিশ্র বাক্য।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



**আশ্রিত খণ্ডবাক্য তিন প্রকার :** (ক) বিশেষ্য স্থানীয় আশ্রিত খণ্ডবাক্য, (খ) বিশেষণ স্থানীয় আশ্রিত খণ্ডবাক্য, (গ) ক্রিয়া বিশেষণ স্থানীয় আশ্রিত খণ্ডবাক্য।

ক. **বিশেষ্য স্থানীয় আশ্রিত খণ্ডবাক্য :** যে আশ্রিত খণ্ডবাক্য প্রধান খণ্ডবাক্যের যে কোনো পদের আশ্রিত থেকে বিশেষ্যের কাজ করে, তাকে বিশেষ্যস্থানীয় আশ্রিত খণ্ডবাক্য বলে। যথা :
**আমি মাঠে গিয়ে দেখলাম, খেলা শেষ হয়ে গিয়েছে।** (বিশেষ্য স্থানীয় খণ্ডবাক্য ক্রিয়ার কর্মরূপে ব্যবহৃত)
**তদ্রূপ :** তিনি বাড়ি আছেন কি না,আমি জানি না। ব্যাপারটি নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করলে ফল ভালো হবে না।

খ. **বিশেষণ স্থানীয় আশ্রিত খণ্ডবাক্য :** যে আশ্রিত খণ্ডবাক্য প্রধান খণ্ডবাক্যের অন্তর্গত কোনো বিশেষ্য বা সর্বনামের দোষ, গুণ এবং অবস্থা প্রকাশ করে, তাকে বিশেষণ স্থানীয় আশ্রিত খণ্ডবাক্য বলে। যথা :
– লেখাপড়া করে যেই, গাড়ি ঘোড়া চড়ে সেই। (আশ্রিত বাক্যটি 'সেই' সর্বনামের অবস্থা প্রকাশ করছে)।
**তদ্রূপ : 'খাঁটি সোনার চাইতে খাঁটি, আমার দেশের মাটি'।**
**'ধনধান্য পুষ্পে ভরা, আমাদের এই বসুন্ধরা।'**
**যে এ সভায় অনুপস্থিত, সে বড় দুর্ভাগা।**

গ. **ক্রিয়া-বিশেষণ স্থানীয় খণ্ডবাক্য :** যে আশ্রিত খণ্ডবাক্য ক্রিয়াপদের স্থান, কাল কারণ নির্দেশক অর্থে ব্যবহৃত হয় তাকে ক্রিয়া-বিশেষণ স্থানীয় আশ্রিত খণ্ডবাক্য বলে। যেমন–
**'যতই করিবে দান, তত যাবে বেড়ে।'**
**তুমি আসবে বলে আমি অপেক্ষা করছি।**
**যেখানে আকাশ আর সমুদ্র একাকার হয়ে গেছে, সেখানেই দিকচক্রবাল।**

৩. **যৌগিক বাক্য :** পরস্পর নিরপেক্ষ দুই বা ততোধিক বাক্য যখন ও, এবং, আর, কিন্তু, তথাপি ইত্যাদি অব্যয়ের সাহায্যে যুক্ত থাকে, তখন তাকে যৌগিক বাক্য বলে। উল্লেখ্য, যৌগিক বাক্যে দুটি স্বাধীন বাক্য থাকে। যেমন– সে গরিব কিন্তু অসৎ। তুমি এবং আমি ঢাকা যাব।

## বাক্য পরিবর্তন

বাক্য পরিবর্তনের কিছু উদাহরণ নিচে দেয়া হলো :

### সরল বাক্য থেকে জটিল বাক্যে পরিবর্তন

সরল বাক্যকে মিশ্র বাক্যে পরিণত করতে হলে সরল বাক্যের কোনো অংশকে খণ্ডবাক্যে পরিণত করতে হয় এবং উভয়ের সংযোগ বিধানে সম্বন্ধসূচক (যদি, তবে, যে, সে, যারা, তারা প্রভৃতি) পদের সাহায্যে উক্ত খণ্ডবাক্য ও প্রধান বাক্যটি পরস্পর সাপেক্ষ করতে হয়। যথা :

**সরল বাক্য :** ধার্মিকেরা প্রকৃত সুখী
**জটিল বাক্য :** যারা ধার্মিক তারাই প্রকৃত সুখী

**সরল বাক্য :** পরিশ্রমী লোকেরাই উন্নতি করে।
**জটিল বাক্য :** যে লোকেরা পরিশ্রমী তারাই উন্নতি করে।

**সরল বাক্য :** খাওয়ার সময় খাবে।
**জটিল বাক্য :** যখন খাওয়ার সময় হবে তখন খাবে।

**সরল বাক্য :** চোরের কোনো সুখ নেই।
**জটিল বাক্য :** যারা চোর তাদের কোনো সুখ নেই।



**সরল বাক্য :** কলমটি কিনতে আমার আশি টাকা লেগেছিল।
**জটিল বাক্য :** যে কলমটি কিনেছি তাতে আমার আশি টাকা লেগেছে।

**সরল বাক্য :** শরীর ভালো থাকলে খেলতে যাবো।
**জটিল বাক্য :** যদি শরীর ভালো থাকে তাহলে খেলতে যাবো।

**সরল বাক্য :** আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করছি।
**জটিল বাক্য :** আমি যতটা সাধ্য ততটা চেষ্টা করছি।

**সরল বাক্য :** বর্ষা গেলে আমরা গ্রামের বাড়ি যাব।
**জটিল বাক্য :** যখন বর্ষা শেষ হবে তখন আমরা গ্রামের বাড়ি যাব।

**সরল বাক্য :** মানুষ তার কর্ম অনুযায়ী ফলভোগ করে।
**জটিল বাক্য :** মানুষ যেমন কর্ম করে সে অনুযায়ী ফলভোগ করে।

### সরল বাক্য থেকে যৌগিক বাক্যে পরিবর্তন

সরল বাক্যকে যৌগিক বাক্যে পরিণত করতে হলে সরল বাক্যের কোনো অংশকে নিরপেক্ষ বাক্যে রূপান্তর করতে হয়। এবং যথাসম্ভব সংযোজক বা বিয়োজক অব্যয়ের প্রয়োগ করতে হয়। যথা :

**সরল বাক্য :** তিনি বিদ্বান হলেও দরিদ্র
**যৌগিক বাক্য :** তিনি বিদ্বান কিন্তু দরিদ্র

**সরল বাক্য :** এখন না গেলে পৌঁছতে পারবে না।
**যৌগিক বাক্য :** এখন যাও, নতুবা পৌঁছতে পারবে না।

**সরল বাক্য :** নেতার ভাষণ শেষ হলে আমরা বাড়ি ফিরে এলাম।
**যৌগিক বাক্য :** নেতার ভাষণ শেষ হলো এবং আমরা বাড়ি ফিরে এলাম।

**সরল বাক্য :** তার অনেক টাকা থাকা সত্ত্বেও কোনো দান-দক্ষিণা করেন না।
**যৌগিক বাক্য :** তার অনেক টাকা আছে কিন্তু কোনো দান-দক্ষিণা করেন না।

**সরল বাক্য :** তুমি আসবে বলে অপেক্ষা করেছিলাম।
**যৌগিক বাক্য :** তুমি আসবে, অতএব অপেক্ষা করেছিলাম।

**সরল বাক্য :** সারা বছর পড়া ফাঁকি দিয়েছ বলে পরীক্ষায় ফেল করেছ।
**যৌগিক বাক্য :** সারা বছর পড়ায় ফাঁকি দিয়েছ আর সে জন্যই পরীক্ষায় ফেল করেছ।

**সরল বাক্য :** দেরি করে স্কুলে আসার জন্য সে প্রতিদিন বকুনি খায়।
**যৌগিক বাক্য :** সে দেরি করে স্কুলে আসে এবং সে জন্য প্রতিদিন বকুনি খায়।

### জটিল বাক্যকে সরল বাক্যে পরিবর্তন

জটিল বাক্যকে সরল বাক্যে রূপান্তর করতে হলে জটিল বাক্যের অপ্রধান খণ্ডবাক্যটিকে সংকুচিত করে একটি পদ বা একটি বাক্যাংশে পরিণত করতে হয়। যথা :

**জটিল বাক্য :** যে বাংলা আমার দেশ, এমন দেশ আর পৃথিবীতে নেই।
**সরল বাক্য :** আমার বাংলার মতো দেশ আর পৃথিবীতে নেই।

**জটিল বাক্য :** যারা সৎ ব্যক্তি, তারাই সুখী।
**সরল বাক্য :** সৎ ব্যক্তিরাই সুখী।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



জটিল বাক্য : তোমার এ অবস্থা হবে তা কখনো ভাবিনি।
সরল বাক্য : তোমার এ অবস্থার কথা কখনো ভাবিনি।

জটিল বাক্য : আপনি যে নির্দেশ দেবেন সে মত কাজ করব।
সরল বাক্য : আপনার নির্দেশ মতো কাজ করব।

জটিল বাক্য : যে মানুষের কথা রাখে না তাকে কেউ বিশ্বাস করে না।
সরল বাক্য : মানুষের কথা রাখে না এমন লোককে কেউ বিশ্বাস করে না।

### জটিল বাক্য থেকে যৌগিক বাক্যে পরিবর্তন

জটিল বাক্যকে যৌগিক বাক্যে পরিবর্তন করতে হলে খণ্ডবাক্যগুলোকে এক একটি স্বাধীন বাক্যে পরিবর্তন করে তাদের মধ্যে সংযোজক অব্যয়ের ব্যবহার করতে হয়। যথা :

জটিল বাক্য : যদিও তিনি অঙ্ক শিক্ষক তবুও মাঝে মধ্যে ইংরেজি পড়ান।
যৌগিক বাক্য : তিনি অঙ্ক শিক্ষক বটে, কিন্তু তবুও মাঝে মধ্যে ইংরেজি পড়ান।

জটিল বাক্য : আমার বয়স যখন পাঁচ বছর তখন আমি স্কুলে ভর্তি হই।
যৌগিক বাক্য : আমার তখন পাঁচ বছর বয়স, সুতরাং আমি স্কুলে ভর্তি হই।

জটিল বাক্য : যদিও লোকটি দরিদ্র, তা সত্ত্বেও অহংকারী।
যৌগিক বাক্য : লোকটি দরিদ্র কিন্তু অহংকারী।

জটিল বাক্য : যদি তুমি ভালো হও, তাহলে সবাই তোমায় ভালোবাসবে।
যৌগিক বাক্য : তুমি ভালো হও, তবে তোমায় সবাই ভালোবাসবে।

### যৌগিক বাক্য থেকে সরল বাক্যে পরিবর্তন

যৌগিক বাক্যকে সরল বাক্যে রূপান্তর করতে হলে—

১. বাক্যসমূহের একটি সমাপিকা ক্রিয়াকে অপরিবর্তিত রাখতে হয়।
২. অন্যান্য সমাপিকা ক্রিয়াকে অসমাপিকা ক্রিয়ায় পরিণত করতে হয়।
৩. অব্যয়পদ থাকলে তা বর্জন করতে হয়।
৪. কোনো কোনো স্থলে একটি বাক্যকে হেতুবোধক বাক্যাংশে পরিণত করতে হয়। যথা :

যৌগিক বাক্য : বাড়িতে উৎসব ছিল অথচ সে যায়নি।
সরল বাক্য : উৎসব বাড়িতে সে যায়নি।

যৌগিক বাক্য : এখন যাও নতুবা পৌছতে পারবে না।
সরল বাক্য : এখন না গেলে পৌছতে পারবে না।

যৌগিক বাক্য : তোমাকে ওখানে দেখলাম এবং এগিয়ে গেলাম।
সরল বাক্য : তোমাকে ওখানে দেখে এগিয়ে গেলাম।

যৌগিক বাক্য : তুমি আসবে, অতএব অপেক্ষা করছিলাম।
সরল বাক্য : তুমি আসবে বলে অপেক্ষা করছিলাম।

যৌগিক বাক্য : তিনি বিদ্যানুরাগী ব্যক্তি, সুতরাং সবাই তাকে সম্মান করে।
সরল বাক্য : তিনি বিদ্যানুরাগী ব্যক্তি বলে সবাই তাকে সম্মান করে।



### যৌগিক বাক্য থেকে জটিল বাক্যে পরিবর্তন

যৌগিক বাক্যের অন্তর্গত পরস্পর নিরপেক্ষ বাক্য দুটির প্রথমটির পূর্বে 'যদি' কিংবা 'যদিও' এবং দ্বিতীয়টির পূর্বে 'তাহলে' কিংবা 'তথাপি' অব্যয়গুলো ব্যবহার করতে হয়। যথা :

যৌগিক বাক্য : সে দরিদ্র কিন্তু অসৎ নয়।
জটিল বাক্য : যদিও সে দরিদ্র তবুও সে অসৎ নয়।

যৌগিক বাক্য : তিনি একজন সৎ লোক এবং তা সকলেই জানে।
জটিল বাক্য : তিনি যে একজন সৎ লোক তা সকলেই জানে।

যৌগিক বাক্য : যথাসময়ে এলাম ঠিকই কিন্তু কাজটি হলো না।
জটিল বাক্য : যদিও যথাসময়ে এলাম তবু কাজটি হলো না।

যৌগিক বাক্য : জীবনে অনেক কষ্ট করেছি কিন্তু আশা তবু মেটেনি।
জটিল বাক্য : যদিও জীবনে অনেক কষ্ট করেছি আশা মিটল না।

## অর্থানুসারে বাক্যের শ্রেণিবিন্যাস

অর্থানুসারে বাক্য পাঁচ প্রকার। যথা :

১. বিবৃতিমূলক বাক্য
২. প্রশ্নবোধক বাক্য
৩. অনুজ্ঞাসূচক বাক্য
৪. ইচ্ছা বা ইচ্ছাসূচক বাক্য
৫. আবেগ বা বিস্ময়সূচক বাক্য

১. **বিবৃতিমূলক বাক্য :** যে বাক্যে কোনো ঘটনার ভাব বা অবস্থার বিবৃতি থাকে তাকে বিবৃতিমূলক, বর্ণনাত্মক বা নির্দেশক বাক্য বলা হয়। যেমন–

সূর্য পূর্ব দিকে ওঠে।
সে রোজ এখানে আসে।
আমি তাকে ভালো বলেই জানি।

বর্ণনামূলক বাক্যকে দু ভাগে ভাগ করা যায় : ক. সদর্থক হ্যাঁ সূচক (Affirmative) ও খ. নঞর্থক না সূচক (Negative)

ক. **হ্যাঁ-সূচক বর্ণনামূলক বাক্য :** যে বর্ণনামূলক বাক্যের দ্বারা কোনো কিছু স্বীকার করে নেয়া হয়, তাকে হ্যাঁ-সূচক বা সদর্থক বর্ণনামূলক বাক্য বলে। যেমন–

পৃথিবী সূর্যের চারদিকে ঘোরে।
আমি আজ সেখানে যাব।

খ. **না-সূচক বর্ণনামূলক বাক্য :** যে বর্ণনামূলক বাক্যের সাহায্যে কোনো কিছু অস্বীকার করে নেয়া হয়, তাকে না-সূচক বর্ণনামূলক বাক্য বলে। যেমন–

শরীফ মাহমুদ আজ বাড়ি যাবে না।
মিন্টু চুপ করে রইল না।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



২. **প্রশ্নসূচক বাক্য :** কোনো ঘটনা, ভাব বা অবস্থা সম্বন্ধে কিছু জানবার ইচ্ছা প্রকাশ পেলে, তাকে প্রশ্নসূচক বাক্য বলে। যেমন–

কোথায় গিয়েছিলে সেদিন?
কেন দেশের এই দুরবস্থা?

৩. **অনুজ্ঞাসূচক বাক্য :** যে বাক্যের সাহায্যে কোনো কিছু আজ্ঞা, অনুরোধ বা নিষেধ বোঝায়, তাকে অনুজ্ঞাসূচক বাক্য বলে। যেমন—

সময় কাজে লাগাও।
দয়া করে আমাকে বসতে দিন।
এখন যেয়ো না।

৪. **ইচ্ছা বা ইচ্ছাসূচক বাক্য :** যে বাক্যের সাহায্যে আশীর্বাদ, প্রার্থনা ও ইচ্ছা প্রকাশ করা হয় তাকে ইচ্ছাসূচক বাক্য বলে। যেমন—

তুমি দীর্ঘজীবী হও। আল্লাহ তোমার মঙ্গল করুন।

৫. **আবেগ বা বিস্ময়সূচক বাক্য :** যে বাক্যে আনন্দ, বিরক্তি, ভয়, দুঃখ, ধিক্কার ইত্যাদি মনের আবেগ বোঝায়, তাকে আবেগসূচক বাক্য বলে। যেমন—

কি আনন্দ! আমাদের টিম জিতেছে।
ওঃ কি গরম!
ছিঃ এমন কাজ করলে?

এ ছাড়াও অর্থানুসারে বাক্যকে আরো নিম্নলিখিত ভাগে ভাগ করা যায় :

**কার্যকারণাত্মক বাক্য :** যদি কোনো বাক্যে ক্রিয়ার নিষ্পত্তি কোনো ও বিশেষ শর্তের অধীন এমন বোঝায়, তাহলে তাকে কার্যকারণাত্মক বাক্য বলে। যেমন—

বৃষ্টি হলে ফসল ভালো হবে।
যদি বল আসব।
তুমি গেলে আমি যাব।

**সন্দেহসূচক বাক্য :** যদি কোনো বাক্যে ক্রিয়ার নিষ্পত্তি সংশয় বা সন্দেহজনক হয় তবে তাকে সন্দেহসূচক বাক্য বলা হয়। যেমন—

আজ বোধ হয় বৃষ্টি হবে।
খেলাটা হয়ত বন্ধ হয়ে যাবে।
ভারত খেলায় হয়ত হেরে যাবে।

**ক্রিয়াহীন বাক্য :** কোনো কোনো বাক্যে ক্রিয়া উহ্য থাকতে পারে। যেমন—

আমি ছাত্র (হই)
তুমি একজন শিক্ষক (হও)

ওপরের বাক্যে ক্রিয়া নেই তা নয়। কিন্তু উহ্য রয়েছে। তবুও এ ধরনের বাক্যকে ক্রিয়াহীন বাক্য বলে গণ্য করা হয়।

# ৩৫তম বিসিএস

## ২

# ভাবসম্প্রসারণ

নম্বর
২০

## সাধারণ আলোচনা

ব্যাপক ঐশ্বর্যমণ্ডিত কোনো ভাব অনেক সময় প্রচ্ছন্ন সংহতি লাভ করে নির্মেদ কবিতা বা গদ্যের প্রবাদ-প্রতিম মিত অবয়বে। সে অবয়বের ক্ষুদ্রতম সীমা একটি কবিতার চরণ কিংবা একটি গদ্যাংশ। এ ধরনের সীমিত পরিসরে বীজধর্মী সংহতি পায় ব্যাপক ভাবব্যঞ্জনা। সেই ভাববীজটির উন্মোচন ও সম্প্রসারিত প্রকাশের কাজটিকেই বলা হয় ভাবসম্প্রসারণ।

তবে মনে রাখতে হবে, ভাবসম্প্রসারণ যেমন প্রবন্ধ নয়, তেমনি এটি ব্যাখ্যার পর্যায়েও পড়ে না।

### ভাবসম্প্রসারণ কথাটির তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ

'ভাব' শব্দটি বহু অর্থবাচক, অর্থাৎ একাধিক অর্থ বহন করে এবং এর ব্যবহারও বহুমাত্রিক। এখানে 'ভাব' শব্দটির অর্থ 'মর্ম' বা 'নিগূঢ় অর্থ'। আমরা জানি, সাহিত্যমাত্রই ভাবাশ্রয়ী। গদ্য কিংবা কাব্য যে কোনো রীতির সাহিত্যে সাহিত্যিকের 'অনুভূতির গাঢ়তা' (Emotion) লুকিয়ে থাকে। একে বলা হয় সাহিত্যের ভাব। তাহলে শাব্দিক অর্থে, ভাবসম্প্রসারণ বলতে 'ভাব'-এর তথা 'অনুভূতির গাঢ়তা'-এর প্রসারণকেই বোঝায়। যে কোনো রীতির সাহিত্যের দু একটি চরণে বা অংশে একটি 'ভাব' বা 'নিগূঢ় অর্থ' প্রচ্ছন্ন থাকে, যা মানবজীবনের সাথে গভীরভাবে সম্পৃক্ত। যথাযথ যুক্তি, বিশ্লেষণ ও সহজবোধ্য ভাষায় সেই গভীর 'ভাব'-এর প্রসারণকে ভাবসম্প্রসারণ বলা হয়। সহজ কথায় ভাবসম্প্রসারণ হলো প্রাঞ্জল ভাষায় কোনো উদ্ধৃত সাহিত্যাংশের মূলভাবের বিস্তৃতি ঘটানো।

### ভাবসম্প্রসারণের প্রয়োজনীয়তা

কবি-সাহিত্যিকদের লিখিত প্রতিটি চরণ ও বাক্যাংশ তাৎপর্যপূর্ণ। এতে মানুষের জীবন ও জগৎ সম্পর্কে গূঢ় কথাগুলো তাদের উপমা, অলঙ্কার, যুক্তি ইত্যাদির আবরণে ভাবের গভীরে লুক্কায়িত থাকে। এ গূঢ় কথাগুলো সর্বসাধারণের কাছে সহজবোধ্য করার নিরিখেই ভাবসম্প্রসারণের উদ্ভব। গূঢ়ার্থক সাহিত্যকে সহজবোধ্য করার ক্ষেত্রে ভাবসম্প্রসারণের গুরুত্ব অপরিসীম। নিয়মিত অনুশীলনের মাধ্যমে একটি সংক্ষিপ্ত অথচ অর্থপূর্ণ বক্তব্যকে বিশদভাবে ব্যাখ্যা করার কৌশল ও ক্ষমতা রপ্ত করা যায়।

### ভাবসম্প্রসারণের প্রক্রিয়া

ভাবসম্প্রসারণের কাজটি যথাযথ ও বিশদভাবে করার ক্ষেত্রে নিচের নির্দেশনাগুলো সহায়ক হতে পারে :

১. **মূলভাব শনাক্তকরণ**

ক. প্রদত্ত চরণ বা বাক্যটি সাধারণত সারগর্ভ বাক্য, ভাবগর্ভ চরণ কিংবা মননগর্ভ প্রবাদ হয়ে থাকে। একাধিকবার অভিনিবেশ সহকারে তা পড়ে নিতে হবে। যেন প্রচ্ছন্ন বা অন্তর্নিহিত ভাবটি কী তা বোঝা যায়।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



খ. মূলভাব উপমা, রূপক, প্রতীক বা সংকেতের আড়ালে আছে কিনা তা বিশেষ বিবেচনায় নিতে হবে। ভাব বিশ্লেষণে অগ্রসর হওয়ার ক্ষেত্রে উপমা-রূপক-প্রতীক বা সংকেতের মর্ম উপলব্ধি করা বিশেষ প্রয়োজন। তাহলে ভাবের মূল অভিমুখিনতা স্পষ্ট হবে। এ রকম স্থলে ভাবসম্প্রসারণে একটি বা দুটি অতিরিক্ত অনুচ্ছেদ থাকতে পারে। তাতে (ক) উপমা, রূপক ইত্যাদির অর্থপ্রকাশ এবং (খ) তার তাৎপর্য বিশ্লেষণ করতে হবে।

গ. প্রদত্ত ভাবসত্য বা বক্তব্যে উপনীত হওয়ার পেছনে যেসব যুক্তিসূত্র কাজ করেছে এবং যে ধরনের প্রেক্ষাপটে ভাবসত্যটি তাৎপর্যপূর্ণ বলে বিবেচিত হয় সেগুলো অনুধাবনে সচেষ্ট হতে হবে। সহজ ভাষায় সংক্ষেপে সেগুলো প্রয়োজনমতো উপস্থাপন করতে হবে।

### ২. ভাবের সম্প্রসারণ

মূল ভাববীজকে বিশদ করার সময় সহায়ক দৃষ্টান্ত, তথ্য ও প্রাসঙ্গিক উদ্ধৃতির ব্যবহার করা চলে। এমনকি প্রয়োজনে ঐতিহাসিক, পৌরাণিক বা বৈজ্ঞানিক তথ্য উল্লেখ করা যায়। তবে অবশ্যই তা হতে হবে প্রাসঙ্গিক। অপ্রয়োজনীয় ও অপ্রাসঙ্গিক তথ্যের সমাবেশ ঘটলে সম্প্রসারিত ভাব ভারাক্রান্ত ও নীরস হয়ে পড়ার আশঙ্কা থাকে। কোনো প্রবাদ-প্রবচন বা সুভাষিত উদ্ধৃতি হিসেবে ব্যবহার করলে তা যথাযথ ও নির্ভুল হওয়া চাই। ভুল বা অপ্রাসঙ্গিক উদ্ধৃতি দেয়ার চেয়ে না দেয়াই ভালো।

### ৩. ভাষা কৌশল

ভাবসম্প্রসারণের ভাষা যথাসম্ভব সহজ, সরল ও স্পষ্ট হওয়া চাই। দীর্ঘ, কঠিন ও সমাসবদ্ধ শব্দ ও জটিল বাক্য যথাসম্ভব পরিহার করে চলা উচিত। ভাষা উচ্ছ্বাসময় হবে না, বরং অলংকৃত ও সাহিত্য গুণান্বিত হবে। প্রারম্ভিক বাক্যে সাধারণত সাধারণ ভাবটি উপস্থিত হওয়া উচিত। তা শ্রুতিমধুর, ভাবঘন ও সৌকর্যমণ্ডিত (Decorative) হলে ভালো হয়।

### ৪. গঠন কাঠামো

ক. একই কথার পুনরাবৃত্তি ও অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ের অবতারণা ভাবসম্প্রসারণের ক্ষেত্রে দোষের। প্রদত্ত কবিতা বা গদ্যের শব্দ বা শব্দগুচ্ছ হুবহু ব্যবহার করাও সঙ্গত নয়।

খ. ভাবসম্প্রসারণ যেহেতু মূলভাবের সম্প্রসারণ সেজন্য প্রদত্ত রচনাংশের কবি বা লেখকের নাম জানা থাকলেও তা উল্লেখের প্রয়োজন নেই। কোনো শব্দের টীকা-টিপ্পনী দেয়ার প্রশ্নও এখানে ওঠে না। ব্যাখ্যার মতো 'কবি এখানে বলতে চেয়েছেন', 'লেখকের ধারণা' ইত্যাদি বাক্যবন্ধও লেখা উচিত নয়।

গ. ভাবসম্প্রসারণ কত বড় হবে তা পরীক্ষার বেলায় প্রধানত প্রদেয় নম্বরের ওপর নির্ভর করে। এটা যেন প্রবন্ধের মতো দীর্ঘ কলেবর না হয়, আবার আকারে ব্যাখ্যার মতো অনুদীর্ঘ না হয়। সাধারণত শব্দ সংখ্যা হবে দুইশ' থেকে আড়াইশ'। লাইন হবে বিশ থেকে পঁচিশটি। বিশেষ ক্ষেত্রে এ পরিসরের বাড়তি বা কমতি হতে পারে।

ঘ. ভাবসম্প্রসারণের অনুচ্ছেদ সংখ্যা নির্ভর করে মূল ভাবের ওপর। সে হিসেবে এক বা একাধিক অনুচ্ছেদে ভাবসম্প্রসারণ করা চলে। তবে ভাবসম্প্রসারণ দুই-তিন অনুচ্ছেদের বেশি না হওয়াই ভালো।

### ৫. উদ্ধৃতি ব্যবহার

ভাবসম্প্রসারণে বিখ্যাত মনীষীদের উক্তি ব্যবহার করা যেতে পারে। তবে লক্ষ রাখতে হবে, তা যেন মূলভাব পরিস্ফুটনে সহায়ক হয়। অন্যথায়, অপ্রাসঙ্গিক উদ্ধৃতির ব্যবহার লেখার মান কিংবা মূলভাবের প্রসারণকে দুর্বল করে তুলবে।

### ৬. বিশেষ সতর্কতা

ক. বক্তব্যের পুনরাবৃত্তি পরিহার করতে হবে।

খ. ভাবসম্প্রসারণে কবি/লেখকের নাম বা উদ্ধৃতির উৎস নির্দেশের প্রয়োজন নেই।

গ. 'কবি বলেছেন' কিংবা 'এখানে বক্তব্য হলো'–এ ধরনের প্রকাশভঙ্গি ভাবসম্প্রসারণে পরিত্যাজ্য।

ঘ. ভাবসম্প্রসারণ মানে প্রদত্ত ভাবের প্রসারণ। কাজেই, ভাবসম্প্রসারণে সমালোচনামূলক কোনো মন্তব্য করা অনুচিত।

# গুরুত্বপূর্ণ ভাবসম্প্রসারণ

## ১ অধর্মের ফল হইতে নিষ্কৃতি নাই

মানবধর্ম পরের উপকার করা। সত্যে ধর্মের উৎপত্তি, দয়াতে বৃদ্ধি, ক্ষমাতে স্থিতি এবং লোভে হয় বিনাশ। কিন্তু মানুষ যখন এই ধর্ম বা সত্য থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়ে তখন তার পরিণাম হয় ভয়াবহ। অন্যায়, অসত্য ও কুকর্ম তাকে জড়ত্বে পরিণত করে। নৈতিক অবক্ষয়ের দরুন পাপবোধ সবসময় তাকে পীড়িত করে রাখে; ফলে ভিতরে ভিতরে সে মানসিকভাবে দুর্বল ও বিকারগ্রস্ত হয়ে পড়ে। তখন এ থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া কারো পক্ষেই সম্ভব হয় না। পরিণামে তার ধ্বংস অনিবার্য হয়ে ওঠে।

কবি বার্নার্ড'শ লিখেছেন, মানুষের সবচেয়ে বড়ো পরিচয় সে মানুষ, আর কিছু নয় (Man is a man for all that)। ধর্ম ও সত্যবোধই মানুষকে আত্মিক বলে বলীয়ান করে। আর এই আত্মিক শক্তির বলেই মানুষ মৃত্যু থেকে অমৃতের দিকে এগুতে পারে। কিন্তু যে অধর্মের পথে চলে সে আপাতদৃষ্টিতে জয়ী হন পরিণামে মানসিক শান্তি হারিয়ে নিজের জীবনকে ব্যর্থ করে তোলে এবং ডেকে আনে সর্বনাশ। অসত্যকে ভিত্তি করে যিনি পথ চলেন মানসিক দিক দিয়ে তিনি সবসময় দুর্বল থাকেন, শ্রদ্ধার জগৎ থেকে সর্বদাই থাকেন নির্বাসিত। ধর্মের নীতিআদর্শ শুধু কথার কথা নয়—এই নীতিআদর্শ জগৎ ও জীবনকে সত্যিই নিয়ন্ত্রণ করছে। সৎকর্ম যেমন কল্যাণকামী ও সৃষ্টিশীল, অশুভকর্মও তেমনি অকল্যাণকামী ও ধ্বংসাত্মক। সততার জয় যেমন সুনিশ্চিত তেমনিই অধর্মের দরুন শুরু হয় অন্তরের নরক যন্ত্রণা।

## ২ অর্থই অনর্থের মূল

অর্থ বা সম্পদ মানব জীবনের জন্য অপরিহার্য হলেও অর্থের যথাযোগ্য ব্যবহার করা না হলে ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে নেমে আসে অকল্যাণ। অর্থ উপার্জনের পন্থা যদি সৎ না হয়, কিংবা অন্যায় স্বার্থ হাসিলের জন্য যদি অর্থের অপব্যবহার করা হয়, কিংবা হীনস্বার্থে ব্যক্তিগত ও জাতীয় সম্পদের অপচয় করা হয় তবে তা বিরাট ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

জীবনের প্রয়োজনে অর্থের ভূমিকা ও প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করা যায় না। এমন কি অর্থ ও সম্পদ ছাড়া জীবনে সুখ, শান্তি ও কল্যাণ নিশ্চিত করা যায় না। কিন্তু অর্থ ও সম্পদ অনেক সময় সুখ ও কল্যাণের বদলে অকল্যাণ বয়ে আনে। পৃথিবীতে এ পর্যন্ত যুদ্ধ সংগ্রাম ও সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে, এর মূলে বিরাজ করছে অর্থ ও সম্পদের অধিকার আদায়। দেখা যায়, সবরকম অঘটন-ঘটনার পিছনের চালিকা শক্তি হিসেবে অর্থই বারবার অনর্থ ডেকে আনে। বর্তমান পৃথিবীর ক্ষমতার দ্বন্দ্ব। দেশে-দেশে, জাতিতে-জাতিতে যে উৎকণ্ঠা ও সংকটের বৈরী পরিবেশ এর উদ্দেশ্যই হচ্ছে লাভবান হওয়া, অর্থাৎ অর্থ জোগার ও সঞ্চয় করা। তাহলে স্পষ্ট যে জগতে সকল অপকর্মের মূলে রয়েছে অর্থ। অন্যায় স্বার্থ হাসিলের জন্য অর্থকে টোপ হিসেবে কাজে লাগায় হীনচরিত্রের মানুষ। অর্থলোলুপ মানুষ অর্থের লোভে জঘন্য কাজে লিপ্ত হয়। তখন তার ন্যায়-অন্যায় বিবেচনা, নীতি-আদর্শ লোপ পায়। সমাজে নৈতিক অবক্ষয় ও সীমাহীন দুর্নীতির মূলকারণ উদগ্র অর্থের লালসা। অন্যায় পথে অর্জিত অর্থ মানুষকে বিবেকহীন ও দাম্ভিক করে তোলে। অর্থের দাপটে তার বুদ্ধি-বিবেচনা লোপ পায়। 'দুনিয়াটা টাকার বশ'–এটাই তার অর্থ-বিত্ত ব্যবহারের মূলমন্ত্র হয়ে দাঁড়ায়। পৃথিবীতে সকল মানুষ সমান হলেও একশ্রেণীর লোক অর্থ-বিত্ত কুক্ষিগত করে মানব সমাজকে শ্রেণীবিভক্ত করেছে।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



সমাজে সৃষ্টি হয়েছে ধনী-দরিদ্রের বৈষম্য। অর্থলালসার কারণেই রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে বেধেছে সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসী যুদ্ধ। অর্থের লোভেই মানুষ খাদ্যে ও ওষুধে ভেজাল দেয়, নকল জিনিস বাজারে ছাড়ে, নির্মাণসামগ্রীসহ ব্যবহার্য সামগ্রীর মান নষ্ট করে। নিত্যব্যবহার্য পণ্য গুদামজাত করে কৃত্রিম সংকট তৈরি করে জিনিসপত্রের দাম বাড়ায়। দেখা যায় অর্থের লালসা মানুষকে বিবেকহীন পশুতে পরিণত করে। তাই অর্থ অনর্থের মূল হিসেবে সমাজকে কুলষিত করার ঘটনা ঘটে।

## ৩ অনুকরণের দ্বারা পরের ভাব আপন হয় না অর্জন না করলে কোন বস্তুই নিজের হয় না

অনুকরণ ও অনুশীলনের সাহায্যে কোনো বস্তু সাময়িকভাবে অর্জন করা যায় বটে, কিন্তু তাতে আপন বৈশিষ্ট্য ও স্বকীয়তা ফুটে ওঠে না।

প্রগতিশীল এই সমাজে সকল মানুষ চায় নিজেকে প্রকাশ করতে; নিজের স্বতন্ত্র সত্তা সবার সামনে তুলে ধরতে। নিজেকে অন্যের কাছে তুলে ধরার বাসনা মানুষের চিরন্তন। মানুষ সর্বদা নিজেকে জাহির করার চেষ্টা চালায়। আর তাই সে বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করে। গড্ডলিকা প্রবাহে গা ভাসিয়ে দেয়া মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি। তাই সে অন্যকে অনুকরণ করে নিজের মধ্যে কৃত্রিম ভাবের সৃষ্টি করতে চায়। কিন্তু তাতে কেবলই সে ব্যর্থ হয়। কারণ পরের অনুকরণে যাই করা হোক না কেন তাতে কখনো নিজের প্রতিভার বিকাশ হয় না। বরং এতে তার প্রতিভা সুপ্তই থেকে যায়। প্রতিভার স্ফূরণ ঘটানোর একমাত্র উপায় হচ্ছে নিজের মধ্যে আপন ভাবের সৃষ্টি করা। এতে তার সৃষ্ট ভাব নিজের ব্যক্তিত্বকে অনেকখানি ফুটিয়ে তোলে। পরের অনুকরণে নিজের ভাবতো ফুটে ওঠেই না, বরং তার বোকামির পরিচয় পাওয়া যায়। নিজ সৃষ্ট বস্তু যেমন একজন ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের সাথে মিলে যায়, অন্যের অনুকরণে তা কেবলই দৃষ্টিকটু মনে হয়। নিজে সৃষ্টি করলে সে বস্তুটি তার কাছে যতটা আপন মনে হবে অন্যের সৃষ্ট বস্তুটা কখনো তার নিজের মনে হবে না। মানুষ তার প্রতিভার বিকাশ ঘটিয়ে যখন একটি জিনিস আবিষ্কার করে তখন সে-ই আবিষ্কারটির একচেটিয়া অধিকারী। তার আবিষ্কারের ওপর অন্য কারো অধিকার থাকে না। রবীন্দ্রনাথ নিজের মেধা ও শ্রম দিয়ে 'গীতাঞ্জলি' রচনা করেছেন। এর একমাত্র স্বত্বাধিকারী তিনিই। অন্য কোনো কবি এটাকে নিজের বলে দাবি করতে পারবে না। কাজেই অনুকরণ নয়, স্বকীয়তাই মানুষকে মহান করে; এনে দেয় যশ ও খ্যাতি।

অপরের কাজের অন্ধ অনুকরণ না করে নিজের স্বকীয়তাকে বিকশিত করা ও তা জীবনে প্রয়োগ করাই ব্যক্তিত্বের পরিচায়ক।

## ৪ অসি অপেক্ষা মসী অধিকতর শক্তিমান

মানুষকে বিধাতা জ্ঞান ও বুদ্ধি দিয়ে শ্রেষ্ঠ জীব হিসেবে সৃষ্টি করে এই সুন্দর পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন। শারীরিক শক্তি বা বল প্রয়োগে এই পৃথিবীকে জয় করার জন্য স্রষ্টা মানুষকে জ্ঞান-বুদ্ধি দেননি, বরং সুষ্ঠু ও স্বাভাবিক পরিবেশ বজায় রেখে পৃথিবীকে জয় করার জন্য জ্ঞান-বুদ্ধি দিয়েছেন।

অসি অর্থাৎ তলোয়ার বা তরবারী, যার ক্ষমতা বিশাল। যে মারণাস্ত্রের সাহায্যে শত্রু দমন হয়, মুহূর্তে জীবিত জনকে মৃত অস্তিত্বে পরিণত করা সম্ভব। অন্যদিকে মসী অর্থ হলো কলম বা লেখনী বস্তু। যার উদ্দেশ্য হচ্ছে মেধার মনন ঘটিয়ে সৃষ্টিশীলতার পরিচয় দেয়া। এমনকি গোটা দেশও সমূলে ধ্বংস হয়। তাই আপাতদৃষ্টিতে অসি অপেক্ষা মসীর ক্ষমতা নগণ্য মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে তা সত্য নয়। কারণ, অসির ক্ষমতা সাময়িক বা ক্ষণস্থায়ী। বিশ্বের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়– চেঙ্গিস খান, নাদির শাহ, হিটলার প্রমুখ তাদের মারণাস্ত্রের সাহায্যে রক্তের বন্যা বইয়ে দিগ্বিজয়ী বীর আখ্যায়িত হলেও ইতিহাসে অক্ষয় সম্মানের আসন লাভ করতে তারা ব্যর্থ হয়েছেন। ক্ষণিকের জন্য তারা পৃথিবীতে প্রভাব বিস্তার করলেও, তাদের কার্যক্রম নৃশংস ও কলঙ্কিত হওয়ায় মৃত্যুর পর তারা নিন্দিত হয়েছেন, ধিকৃত হয়েছেন এবং চিরতরে হারিয়ে যাচ্ছেন বিস্মৃতির অতল অন্ধকারে।



পক্ষান্তরে, মসী বা লেখনীরূপী অস্ত্রের মাধ্যমে অনেক মনীষী তাঁদের জ্ঞানগর্ভ দর্শন, বিজ্ঞান, সাহিত্য, ইতিহাস, চিকিৎসাশাস্ত্র, রাজনীতি প্রভৃতি বিষয়ে বিশ্ব-মানবতার কল্যাণে তাঁদের চিন্তাধারা লিপিবদ্ধ করে গেছেন। আজ তাঁরা মানব-সভ্যতার ইতিহাসে স্মরণীয় ও বরণীয় হয়ে আছেন। তাঁদের অবদানের কথা মানুষ চিরকাল শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করবে। কাজেই অসি অপেক্ষা মসী অধিকতর শক্তিমান। আর এজন্যই বলা হয়, 'Pen is mightier than the sword.' এমনকি হাদীস শরীফেও বর্ণনা করা হয়েছে, কলমের কালী শহীদের রক্তের চেয়েও পবিত্র।

পার্থিব জীবনে যা কিছু শক্তি বা বল দিয়ে জয় করা যায় না তা জ্ঞান ও বুদ্ধি দিয়ে খুব সহজেই জয় করা যায়।

## ৫ অর্থসম্পত্তির বিনাশ আছে কিন্তু জ্ঞানসম্পদ কখনো বিনষ্ট হয় না

পৃথিবীতে যা কিছু দৃশ্যমান তার সবই ক্ষণস্থায়ী এবং তাদের পরিবর্তন ও ক্ষয় অহরহ। যে জিনিসটি ক্ষণস্থায়ী নয়, যার ক্ষয় নেই বরং বিকাশ আছে, তা হলো জ্ঞান। জ্ঞানই মানুষের চরম, পরম ও একান্ত নিজস্ব মহামূল্যবান সম্পদ।

মানুষের বেঁচে থাকার জন্য অর্থের প্রয়োজন অনস্বীকার্য। অর্থের জন্য মানুষ উদয়-অস্ত পরিশ্রম করে। অর্থ এমন একটি সম্পদ যা দিয়ে আমরা ব্যক্তি ও সমাজজীবনে মানুষের অবস্থানকে নির্ণয় করে থাকি। কিন্তু এ অর্থসম্পদ কেবল মানুষের বাইরের দিকটিকেই প্রকাশ করে। অর্থসম্পদ যতই শক্তির অধিকারী হোক না কেন, জ্ঞানসম্পদের কাছে তা নিষ্প্রভ। সত্যিকারের জ্ঞানী ব্যক্তি বিত্তশালী লোকের চেয়ে অনেক বেশি ধনবান এবং শক্তিমান।

অর্থসম্পদের কোনো স্থায়িত্ব নেই। বিত্তবানের ধনভাণ্ডার এক সময়ে নিঃশেষ হয়ে আসে, কিন্তু বিদ্বানের জ্ঞানভাণ্ডার ক্রমাগত সমৃদ্ধ হতে থাকে। সময়ের ব্যবধানে সে অধিকতর জ্ঞানী হতে থাকে। নশ্বর পৃথিবীতে জ্ঞান অবিনশ্বর। তাই অর্থসম্পদে নয়, জ্ঞানসম্পদে সমৃদ্ধ ব্যক্তিগণই দেশ ও জাতির প্রকৃত সম্পদ। আর এ জন্য অর্থসম্পদের মাপকাঠিতে নয়, জ্ঞানসম্পদের মাপকাঠিতে মানুষের মূল্যায়ন হওয়া উচিত। মহানবী (স)ও যথার্থই বলেছেন, এক হাজার অশিক্ষিত মূর্খ লোকের চেয়ে শিক্ষিত একজন উত্তম। তিনি 'দোলনা থেকে কবর পর্যন্ত' মানুষকে জ্ঞানার্জনের উপদেশ দিয়েছেন এবং এ জন্য 'সুদূর চীনে যেতেও' উৎসাহিত করেছেন।

## ৬ অধিকার পাওয়া এবং অধিকারী হওয়া এক বস্তু নয়

কোনো বস্তু বা সামগ্রীর অধিকার পাওয়া বড় সুখের। এই অধিকারের ফলে কখনো বিরোধী শক্তির পরাজয় ঘটিয়ে আপন আধিপত্য বিস্তার সম্ভব হয়। ভোগবাদী পৃথিবীতে অধিকার পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রতিদিন অসংখ্য কণ্ঠে ধ্বনিত হয়ে ওঠে বন্দনা। চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে তার প্রতাপ। এই অধিকার পাওয়ার জন্য, প্রভুত্ব বিস্তারের নেশায় মানুষ নিষ্ঠুর ধ্বংসলীলা ঘটাতেও কুণ্ঠিত হয় না। মিথ্যাচার, শঠতা, গুপ্তচরবৃত্তি, নিরস্ত্রকে হত্যা ইত্যাদি পাপের স্রোত বয়ে যায়। ঐশ্বর্যের মোহে মনুষ্যত্ব যে কত কলঙ্কিত হয় তার ইয়ত্তা নেই।

অথচ অধিকারী হওয়ার জন্য যে শ্রেষ্ঠ গুণাবলীর দরকার তা হিংস্র মানুষের কোনোদিন আয়ত্ত হয় না। 'রাজাকে বধ করিয়া রাজত্ব মিলে না ভাই, পৃথিবীকে বশ করিয়া রাজা হইতে হয়।' বস্তুত সিংহাসনে আহরণ এবং বিরোধী শক্তিকে দমন করাই রাজার একমাত্র কাজ নয়। যিনি প্রকৃত রাজা হবেন, প্রজাকে সন্তানবৎ সুখে-দুঃখে, বিপদে-আপদে রক্ষা করার দায়িত্ব তো তারই। তাকে ভালোবাসার মধ্য দিয়ে প্রজার হৃদয়ের সিংহাসনে বসতে হবে। তাই প্রকৃত অধিকারী তিনিই যিনি অধিকৃত বস্তু বা সামগ্রীকে হৃদয়ের সঙ্গে এক করে নিতে পারেন।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



## ৭ অন্যের পাপ গণনার আগে নিজের পাপ গোন

সাধারণত প্রতিটি মানুষই নিজের ত্রুটি-বিচ্যুতির প্রতি সতর্ক দৃষ্টি না দিয়ে অন্যের ত্রুটি-বিচ্যুতির সমালোচনায় তৎপর হয়ে ওঠে। এটা সম্পূর্ণ অন্যায়, অনুচিত। কেননা এভাবে পৃথিবী থেকে অন্যায়-অবিচার ও পাপ দূর করা যায় না, বরং সংঘাত বাড়ে ও একে অপরের ক্ষতিসাধন করার সুযোগ খুঁজতে থাকে। এতে শেষ পর্যন্ত পাপ ও অন্যায় বেড়ে যায়। পৃথিবীর বুক থেকে অন্যায়-অবিচার ও পাপ দূর করতে হলে নিজের ত্রুটি-বিচ্যুতি যাতে না ঘটে সেজন্য তৎপর হতে হবে। তাই পরের দোষ ত্রুটি না খুঁজে নিজের দোষ-ত্রুটি সর্বাগ্রে দেখেই মানুষের আত্মসমালোচনা করা উচিত। আত্মসমালোচনা তাদেরকে অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখে। এভাবে প্রতিটি লোকই যদি অন্যায়-অবিচার ও পাপ থেকে বিরত থাকতে পারে তবে পৃথিবীতে পাপ ও অন্যায় থাকবে না; কেউ সমালোচনা ও পরনিন্দা করার সুযোগ পাবে না। ফলে পৃথিবীতে হিংসা-বিদ্বেষ ও মারামারি-হানাহানি থাকবে না এবং একটা পাপ ও অন্যায় প্রতিরোধের জন্যে বহু পাপ বা অন্যায় করতে হবে না। তাই অন্যের ছিদ্র অন্বেষণ করার আগে নিজের প্রতি দৃষ্টি দেয়াই প্রতিটি মানুষের প্রথম ও প্রধান কর্তব্য।

## ৮ অনেক কিছু ভাবার চেয়ে অল্প কিছু করাই শ্রেয়

কোনো একটি কাজ ভালোভাবে সম্পূর্ণ করার পূর্বশর্ত হলো পরিকল্পনা। তবে কাজের পরিকল্পনার চেয়ে কাজে লেগে যাওয়ার গুরুত্ব অনেক বেশি। তাই ভাবনা-বাহুল্যের প্রয়োজন নেই, প্রয়োজন হলো কর্মবাহুল্যের। সুতরাং যা ভাবতে হবে, তা কাজে রূপদান করেই সে ভাবনাকে সার্থক করতে হবে। কর্মের মধ্যেই জীবনের সাফল্যের বীজ নিহিত রয়েছে। সেজন্য কাজ করতে হয়। আর কাজের মাধ্যমেই মানবজীবনকে ধন্য করতে হয়।

উলুবনে যেমন মুক্তা ছড়িয়ে লাভ হয় না, তেমনি শুধু শুধু ভাবনার কোনো গুরুত্ব নেই। তা কোনো কাজে লাগে না, অর্থহীন। কারণ, আমরা শুধু জ্বালানি কাঠকে আগুন বলি না, আর তাতে আগুন না দিলে তা জ্বলে না। ফলে তা কাঙ্ক্ষিত ফলও দেয় না। সুতরাং অনেক ভাবনার সার্থকতা নেই। তা থেকে অন্তত কিছু কাজে রূপদান করার মধ্যেই রয়েছে সার্থকতা।

অনেকে বড় বড় কাজের পরিকল্পনা আঁটে, এটা করবে সেটা করবে বলে বাগাড়ম্বর করে কিন্তু কাজের বেলায় তারা ঠনঠন। বড় পরিকল্পনা আঁটা ভালো কিন্তু তা কাজে রূপান্তরিত করা যাবে কিনা সেটিই প্রকৃত জিজ্ঞাসা। এ ক্ষেত্রে দেখা যায় বাগাড়ম্বর কোনো কাজের সিদ্ধি নিয়ে আসে না। তার চেয়ে পরিকল্পিত অল্প কাজ করাই ভালো। সামর্থ্যের বাইরে কোনো কিছু করতে যাওয়া আরেক ধরনের দুর্বলতা। ভাবনার চেয়ে কর্মের গুরুত্ব অনেক বেশি, সে ভাবনা যতই বড় হোক না কেন।

## ৯ আপনি আচরি ধর্ম পরের বোঝাও

নিজের মধ্যে লালন না করা আচার-ব্যবহার, বিশ্বাস, বৈশিষ্ট্য বা ধর্ম অন্যকে দিতে গেলেই বাঁধে বিড়ম্বনা। আর তাই নিজের আচরিত বিষয়ই কেবল অন্যকে প্রদান করা উচিত। এর ব্যতিক্রম হলে হিতে বিপরীত হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে।

ধর্ম মানুষকে সৎ ও কল্যাণের পথ দেখায়, মানুষকে মহৎ ও ভালো হতে শেখায়। কিন্তু অধার্মিক ব্যক্তি যদি ধর্মের বুলি আওড়ায় তবে তা বেসুরো বাজে। সবার কাছেই তা চরম বিরক্তিকর বলে মনে হয়। তাই প্রথমে নিজে ধর্মের দীক্ষা নিয়ে বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করে পরে তা অন্যকে পালন করতে বলা উচিত। নিজের মধ্যে যে গুণের অভিব্যক্তি নেই তা অন্যকে শিক্ষা দিতে বা বোঝাতে গেলে বিড়ম্বনার



শিকার হতে হয়। যেমন একজন চোর যদি এসে মানুষকে চুরি করতে নিষেধ করে, তবে সবার কাছেই তা হাস্যকর বলে মনে হবে। কেউ তার কথা শুনবে না। তদ্রূপ কোনো ভণ্ড, প্রতারক, অসাধু ব্যক্তি মুখে যত ভালো কথাই বলুক না কেন, কেউ তা থেকে শিক্ষাগ্রহণ করবে না। যে কোনো বিষয় সম্পর্কে মানুষকে শিক্ষা দিতে গেলে, উপদেশ দিতে গেলে বা বোঝাতে গেলে আগে দেখতে হবে তা নিজের মধ্যে কতটুকু আছে। আগে নিজের আচরণে তার প্রতিফলন ঘটাতে হবে এবং পরে তা অন্যদের বোঝাতে হবে। অন্যথায় তা মোটেও কার্যকর হবে না।

নিজের মধ্যে যা নেই অন্যকে তা বোঝাতে বা শিক্ষা দিতে যাওয়া চরম বোকামি।

## ১০ আলস্য এক ভয়ানক ব্যাধি

অলসতায় যাকে পেয়ে বসেছে, সে কখনো সৃষ্টিশীল কিছু করতে পারে না। তার জীবন রোগগ্রস্ত, অকর্মণ্য, স্থবির এবং সমাজে সে ঘৃণিত।

সমাজে যে অকর্মক, সে কাজ না করতে করতে ভীষণ অলস হয়ে পড়েছে। অভ্যাসগতভাবে সে মারাত্মক রোগগ্রস্ত প্রায়। এমন অলসতা সাধারণত সমাজের জন্য, দেশ ও জাতির জন্য মারাত্মক ক্ষতিও বয়ে আনে।

অলসতা আমাদের সমাজ ও দেশের জন্য মারাত্মক এক রোগ। যাকে অলসতায় পেয়ে বসেছে সে কখনো মননশীল কিছু করতে পারে না। মানুষের কাছে সে সর্বদা ঘৃণিত ও ধিকৃত। জীবন সম্পর্কে অলসে মানুষের কোনো হিতাহিত জ্ঞান থাকে না। তারা কেবলই ধ্বংসের পথে পা বাড়ায়। অবশেষে ভ্রষ্টতায় নিমজ্জিত হয়ে মনুষ্যত্ববোধ হারিয়ে ফেলে। কোনো কূল না পেয়ে জীবন সাঙ্গ হয়। এমন আলস্য রোগ সমাজ বিকাশের ক্ষেত্রে অন্তরায়স্বরূপ। এতে অবনতি ছাড়া কোনো কিছু পাওয়া যায় না। যারা আলস্যকে জীবনে পুষে রাখে, তারা সারা জীবন তুষের আগুনের মতো জ্বলতে থাকে। কোনো দিক-নির্দেশনা তাদের জীবনে আসে না। লক্ষ্যহীন জীবনে পরিণত হয়। বিশেষ করে একজনের অলসতার কারণে আরো অনেকে এ রোগে সংক্রমিত হতে পারে। তাই আমাদের জাতীয় জীবনে এ রোগ মারাত্মক ক্ষতি করে। যা সামাজিক, অর্থনৈতিক, শিক্ষা, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় সকল দিক দিয়ে প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। এ রোগ থেকে সংযত হওয়া দরকার।

অলসতা মানুষের জীবনে শান্তি আনতে পারে না। সারাজীবন শুধু অশান্তির বীজ বপন করে। আলস্য এক অভিশপ্ত রোগ।

## ১১ ইচ্ছা থাকলে উপায় হয়

প্রতিটি কাজের পেছনেই তীব্র ইচ্ছা থাকা দরকার। ইচ্ছাশক্তি প্রবল হলে কার্যে সফলতা সুনিশ্চিত। ইচ্ছাশক্তির বলেই যে কোনো অসাধ্য সাধন করা যায়।

ইচ্ছা একটি শক্তি। এ শক্তির দ্বারা চিত্তের একাগ্রতা, ধৈর্য ও অধ্যবসায়ের সৃষ্টি হয়, যা মানুষকে তার অভীষ্ট লক্ষ্যে ধাবিত করে।

ইচ্ছাই মানবজীবনের সফলতার চাবিকাঠি। কোনো কাজ করার জন্য ইচ্ছাই যথেষ্ট। মানবজীবন সংগ্রামমুখর। এ পৃথিবীতে মানুষকে সংগ্রাম করে বেঁচে থাকতে হয়। এখানে সহজলভ্য বলতে কিছু নেই। বহু বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করে মানুষকে এগিয়ে যেতে হয়। কিন্তু তাই বলে কোনো কাজ মানুষের অসাধ্য নয়। আগ্রহ, ধৈর্য ও নিষ্ঠার সাথে কাজ করলে কাজে সফলতা অবশ্যই আসবে। আর একেই আমরা ইচ্ছা বলি।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



ইচ্ছার বলেই মানবসভ্যতার এত অগ্রগতি ও উন্নতি সাধিত হয়েছে। ইচ্ছার বলে একমাত্র জীবনদান ছাড়া পৃথিবীতে সবকিছুই সম্ভব হয়েছে। ইচ্ছার বলে মানুষ পাতাল থেকে মহাশূন্য বিজয় করেছে, বিজ্ঞানের এত উন্নতি হয়েছে। ইচ্ছা থাকলে মানুষ যে কোনো অবস্থায় সফলতা পেতে পারে। ইচ্ছার বলেই আব্রাহাম লিংকন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হয়েছিলেন, নেপোলিয়ন বোনাপার্ট ইউরোপ জয় করতে সমর্থ হয়েছিলেন। প্রবল ইচ্ছার বলেই রবার্ট ব্রুস, শিবাজী ফিরে পেয়েছিলেন দেশ। প্রবল ইচ্ছার বলেই পরাধীন জাতি সমস্ত বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করে স্বাধীনতা লাভ করেছে। বাংলাদেশও স্বাধীনতা শক্তিতে বলীয়ান হয়ে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর স্বাধীন হয়েছে। পৃথিবীতে যারা জ্ঞান-বিজ্ঞান ও দিগ্বিজয়ের ক্ষেত্রে যশস্বী হয়েছেন, তারা দুর্দমনীয় ইচ্ছার দ্বারাই জয়যুক্ত হয়েছেন। যে ব্যক্তি দুর্বল এবং যার মনে প্রবল ইচ্ছাশক্তির অভাব রয়েছে সে জীবনে সাফল্য আশা করতে পারে না। সুতরাং মানুষের ইচ্ছাশক্তিই তাকে অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছে দেয়।

ইচ্ছা থাকলে মানুষের সফলতা লাভ সহজ হয়। এ ইচ্ছাশক্তি যার যত প্রবল হবে সফলতা লাভও তার ততো সহজ হবে। মানুষ অপরাজেয় ইচ্ছাশক্তির ধারক বলেই বিশ্ব আজ দ্রুত উন্নতির দিকে ধাবিত হচ্ছে।

## ১২ উত্তম নিশ্চিন্তে চলে অধমের সাথে তিনি মধ্যম যিনি চলেন তফাতে

মহৎ ব্যক্তিরা তাদের জীবদ্দশায় সকল মানুষের কল্যাণে নিয়োজিত থাকেন। কিন্তু এমন কিছু মানুষ আছেন যারা অন্যান্য শ্রেণীকে সর্বদা এড়িয়ে চলেন। এ জগতে তিন শ্রেণীর মানুষ রয়েছে : উত্তম, মধ্যম ও অধম। উত্তম ও অধমের মধ্যে একটা সুস্পষ্ট সীমারেখা বিদ্যমান। যিনি উত্তম তার চরিত্র ও আচার-আচরণ সৎ, আদর্শ ও ন্যায়নিষ্ঠ হওয়ায় তিনি নিশ্চিন্তে অধমের সাথে মিশতে পারেন। তার চরিত্র অধমের প্রভাবে স্খলিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। কিন্তু মধ্যমরা নিজেদের ক্ষতি ও পতন সম্বন্ধে শঙ্কিত। দোষে-গুণে মিলেই মধ্যম ব্যক্তির চরিত্র গড়ে ওঠে বলে তাদের অর্জিত মহত্ত্ব ও আদর্শটুকু অধমের সাথে মিশলে হারিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তারা ভাবে, মন্দের সংস্রবে এলেই বিপদের সম্ভাবনা, মন্দরা তাদের অনিষ্ট করবে। তাই মধ্যম সব সময় অধমের কাছ থেকে দূরে থাকে। কিন্তু প্রকৃত মহৎ উত্তম ব্যক্তি সর্বস্তরের জনগণকে নিঃসংকোচে অভিনন্দন জানায়। উত্তম দৃঢ়চিত্তে অধমের সাথে চলে। তার চরিত্র এতই বলিষ্ঠ যে, কোনো দুর্বলতা তাকে স্পর্শ করতে পারে না। অধমের সংস্পর্শে উত্তমের চরিত্রে কোনো কালিমা লেপনের আশঙ্কা নেই। কিন্তু মধ্যম দৃঢ়চিত্ত নয় বলেই অধমের সংস্পর্শ এড়িয়ে চলতে চায়। অতএব দেখা যায়, উত্তম অধমের সাথে স্বাভাবিক যোগাযোগ ও চলাচল রাখলেও অধম নির্দিষ্ট দূরত্ব নিয়েই ভালো থাকতে সচেষ্ট।

## ১৩ এমন অনেক দুঃখ আছে যাকে ভোলার মতো দুঃখ আর নেই

নিঃসন্দেহে দুঃখ বেদনার। আমরা মানুষমাত্রই তাই। চাই শুধু আনন্দ, সুখ, ভোগে নিজেকে পরিপূর্ণ রাখতে আর সুখের স্মৃতি তিল তিল করে স্মৃতির মন্দিরে জমা রেখে দুঃখের কণ্টকিত দিনগুলোকে ভুলে যেতে চাই। দুঃখের মতো দুঃখের স্মৃতিচারণও আপাতচক্ষে বড় কষ্টের, বড় যন্ত্রণার কথা ভেবে পাশ কাটিয়ে যেতে চাই। কিন্তু সুখ-দুঃখের সংমিশ্রণেই মানুষের জীবন পূর্ণ। হাসি-অশ্রু এত বর্ণময় বলেই কোনো মানুষের জীবনই ছকে বাঁধা নয়। দুঃখের, বেদনার স্মৃতি জীবনপট থেকে মুছে মানুষ যদি কেবল সুখস্মৃতিটুকু বাঁচিয়ে রাখতে প্রয়াসী হয়, তবে তার জীবনে পূর্ণচ্ছেদ নেমে আসে। ছায়া যেমন মানুষকে কখনো



পরিত্যাগ করে না, সেই রকম দুঃখের স্মৃতিও সুখের সময় মানুষকে কখনো পরিত্যাগ করে না। সুখ-দুঃখের স্বরূপ নির্ণয় করা মানুষের পক্ষে যতটা কঠিন, ততোধিক কঠিন দুঃখকে, দুঃখের স্মৃতিকে চিরতরে বিসর্জন দেয়া। দুঃখের মাঝেই যেন লুকিয়ে রয়েছে কিছুটা সুখের ইঙ্গিত, কিছুটা সুখের ঐশ্বর্য। দুঃখের পরশমণির ছোঁয়ায়, অন্তরের তীব্র জ্বালায় এ জীবন শুধু যে পুণ্যময় হয়ে ওঠে তাই নয়– তার স্মৃতি প্রবিত্ত হয়ে ওঠে কর্মপ্রেরণা, উদ্দীপনা ও অগ্রগতির পাথেয়। যত দুঃখ জীবনে আমরা পাই আসলে তাই যে দুঃখ এবং সুখ বলে যাকে আঁকড়ে ধরতে চাই তা যে মনের অসুখ। কারণ, সমস্যা ও কষ্টের গভীরে পড়েই আমরা ঈশ্বর কতইনা বেশি ব্রতী হই। আর যদি এমনটি না হতো তাহলে আমরা ঈশ্বরকেই ভুলে যেতাম। তাই বিচক্ষণ মানুষ দুঃখস্মৃতিকে সুখস্মৃতির সম-মর্যাদায় স্বাগত জানান এভাবে, 'মাঝে মাঝে প্রাণে তোমার পরশখানি দিও।' দীর্ঘ সংগ্রামের পর মানুষ যখন সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেন তখন তিনি তাই দুঃখময় অতীতের দিনগুলোকে ভুলতে চান না, চেষ্টাও করেন না। সে দিনগুলোর মধ্যেই যে লুকিয়ে রয়েছে তার সাফল্য, স্বপ্নের ইঙ্গিত।

## ১৪ কাক কোকিলের একই বর্ণ স্বরে কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন

শরীরের বর্ণ ও গঠন এবং রক্তের বর্ণ এক হওয়া সত্ত্বেও আচরণ ও ব্যবহারে মানুষ ও প্রকৃতির অনেক কিছুর মাঝে অনেক পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। এ পার্থক্যের দ্বারাই অনুধাবন করা যায় কে কোন ধরনের ব্যক্তিত্বের অধিকারী কে কোন গুণের ও বৈশিষ্ট্যের।

কোনো জিনিসের বর্ণের সাথে অন্য বা আকারের সাথে আরেকটা জিনিসের বর্ণের, আকারের মিল হতে পারে, তাই বলে তা এক নয়। কাক ও কোকিলের বর্ণ একই হওয়া সত্ত্বেও তাদেরকে এক বলা যায় না। তাদের কণ্ঠস্বরই জানিয়ে দেয় কে কাক, কে কোকিল। যেখানে কোকিলের সুরেলা কণ্ঠে মানুষের মন জুড়ায়, সেখানে কাকের কর্কশ শব্দে মানুষের বিরক্তি আসে। এ কণ্ঠের পার্থক্য তাদের জাত চিনতে সাহায্য করে, তেমনি আমরা আমাদের সমাজে একইরকম অনেক মানুষরূপী কাক কোকিলকে একসঙ্গে চলতে দেখি। কিন্তু তাদের মাঝে মিলের যে প্রাচুর্য তাতে তাদের মধ্যে প্রভেদ বের করাই যেন দুষ্কর। এক্ষেত্রে তাদের চরিত্রের মূল বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করলে সহজেই বুঝা যায় কে মানুষরূপী কোকিল, আর কে মানুষরূপী কাক। কাক আর কোকিলের মধ্যে যে পার্থক্য তা বুঝতে হলে দরকার অনুধাবন করার মতো শক্তি, যার দ্বারা যাচাই করে সঠিক ব্যক্তিত্বের রস আহরণ করা যায়। আমরা কারও ভিতরটা অনুধাবন করার চেষ্টা না করেই তাকে হৃদয়ের আসনে ঠাঁই দেই। তার গুণাগুণ যখন আমাদের কাছে ফাঁস হয়ে যায়, ততক্ষণে কাকের কর্কশধ্বনিতে আমাদের বোধশক্তি ফিরে আসে। আমরা জেগে ওঠি। জেগে উঠে দেখি আর সময় নেই। এ কারণেই কোকিলদের মধ্যে অসদুপায়ী কাক অবাধে বিচরণ করে, তারা সকলের ধরাছোঁয়ার বাইরে চলে যায়। কারণ সাধারণের সাথে তাদের যে সাদৃশ্য তাতে তাদেরকে ছেঁকে বের করাই রীতিমতো অসাধ্য কাজ। আর এই অসাধ্যকে সম্ভব করতে হলে দরকার, তাদের বর্ণ আর মুখরোচক কথায় প্ররোচিত না হয়ে যথাসময়ে তাদেরকে চিহ্নিত করে দূরে সরিয়ে রাখা, যাতে তারা সাধারণ্যে এসে ভেজালের সমারোহ না ঘটাতে পারে। আর সুন্দর পৃথিবী যাতে সুন্দরই থাকে, কলুষিত না হয়।

কোনো কিছুর বাহ্যিক সৌন্দর্যে আকৃষ্ট না হয়ে তার সৌন্দর্যের কাঠামোগত বিশ্লেষণের মাধ্যমেই তার সঠিক মূল্যায়ন করা প্রয়োজন।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



## ১৫ কঠোরতার সঙ্গে কোমলতার সমাবেশ ব্যতীত মনুষ্যচরিত্র সম্পূর্ণতা পায় না

কঠোরতা ও কোমলতা দুটি সম্পূর্ণ বিপরীত বিষয়, বিপরীত গুণ, বিপরীত ধর্ম। একই বস্তুর মধ্যে তাদের সমাবেশ আমরা সাধারণত দেখতে পাই না। যে বস্তু কঠোর, তা কখনো কোমল হতে পারে না; আবার যা কোমল, তার মধ্যে কঠোরতার লক্ষণ অন্বেষণ বিড়ম্বনা মাত্র। কিন্তু এ পৃথিবীতে যারা লোকোত্তর পুরুষ, কেবলমাত্র তারাই এ নিয়মের ব্যতিক্রম। সকল মহামানবের চরিত্র বিশ্লেষণ করলে আমরা দেখতে পাই যে, তাদের চরিত্রে কঠোরতা ও কোমলতা একই সঙ্গে আশ্চর্যরূপে মিশে আছে। তারা যদি শুধু কঠোর হতেন, তবে তাদের সেই অপরূপ দৃঢ়তায় আমরা বিস্মিত হতাম সন্দেহ নেই; কিন্তু অন্তর থেকে তাদেরকে ভালোবাসতে পারতাম না। আবার তারা যদি কেবলই কোমল হতেন, তবে স্থানবিশেষে দৃঢ়তার অভাবে আমরা তাদের বিরূপ সমালোচনা করতাম। চরিত্রের সম্যক বিকাশের জন্য এ দুই গুণেরই প্রয়োজন। কারণ, মানুষকে স্থানবিশেষে যেমন দৃঢ় হতে হয়, তেমনি স্থানবিশেষে আবার নমনীয়ও হতে হয়। মহামানব হযরত মুহাম্মদ (স)-কে আমরা নিশ্চয়ই সম্পূর্ণচরিত্রের মানুষ বলব। তার চরিত্র বিশ্লেষণ করলেও দেখতে পাই যে, তিনি একাধারে কঠোর ও কোমল ছিলেন। অন্যায়ের প্রতিবাদে, সত্য বিশ্বাসের প্রতি নিষ্ঠায় তিনি চিরকাল ছিলেন অবিচলিত, কোনো ভয় বা দুঃখ তাকে কখনো অবদমিত করতে পারেনি। আবার এই বজ্রকঠোর ব্যক্তিই কারো সামান্য দুঃখের কথা শুনলে কেঁদে বুক ভাসাতেন। সম্পূর্ণচরিত্র মানবের পক্ষে এটাই স্বাভাবিক।

## ১৬ কীর্তিমানের মৃত্যু নাই

সময় অনন্ত, জীবন সংক্ষিপ্ত। সংক্ষিপ্ত এ জীবনে মানুষ তার মহৎ কর্মের মধ্য দিয়ে এ পৃথিবীতে স্মরণীয়-বরণীয় হয়ে থাকে। আবার নিন্দনীয় কর্মের মাধ্যমে এই জগতে অনেকে বেঁচেও মরে থাকে। কেননা ব্যক্তি, পরিবার তাকে ভালোবাসে না; সমাজ, দেশ ও জাতি তাকে শ্রদ্ধা করে না, স্মরণ করে না; তার মৃত্যুতে কারো যায়-আসে না।

মানুষ মাত্রই জন্ম-মৃত্যুর অধীন। পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করলে একদিন তাকে মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে- এটা চিরন্তন সত্য। আর মৃত্যুর মধ্য দিয়েই সে পৃথিবী থেকে চির বিদায় নেয়। কিন্তু পেছনে পড়ে থাকে তার মহৎ কর্মের ফসল। যে কর্মের জন্য সে মরে যাওয়ার পরও পৃথিবীতে যুগ যুগ বেঁচে থাকে।

মানুষের জীবনকে দীর্ঘ বয়সের সীমারেখা দিয়ে পরিমাপ করা যায় না। জীবনে কেউ যদি কোনো ভালো কাজ না করে থাকে তবে সে জীবন অর্থহীন, নিষ্ফল। সেই নিষ্ফল জীবনের অধিকারী মানুষটিকে কেউ মনে রাখে না। নীরব জীবন নীরবেই ঝরে যায়। পক্ষান্তরে, যে মানুষ জীবনকে কর্মমুখর করে রাখে এবং যার কাজের মাধ্যমে জগৎ ও জীবনের উপকার সাধিত হয় তাকে বিশ্বের মানুষ শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করে। সেই সার্থক মানুষের কাজের অবদান বিশ্বের বুকে কীর্তিত হয়ে কৃতী লোকের গৌরব প্রচারিত হতে থাকে। কীর্তিমান ব্যক্তির যেমন মৃত্যু নেই, তেমনি শেষও নেই। কারণ এ পৃথিবীতে সে নিজস্ব কীর্তির মহিমায় লাভ করে অমরত্ব। কীর্তিমানের মৃত্যু হলে তাঁর দেহের ধ্বংস সাধন হয় বটে, কিন্তু তাঁর সৎ কাজ এবং অম্লান কীর্তি পৃথিবীর মানুষের কাছে তাঁকে বাঁচিয়ে রাখে। তাঁর মৃত্যুর শত শত বছর পরেও মানুষ তাঁকে স্মরণ করে। তাই সন্দেহাতীতভাবে বলা যায়, মানবজীবনের প্রকৃত সার্থকতা তার কর্ম-সাফল্যের ওপর নির্ভরশীল। একটা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য মানুষ পৃথিবীতে আসে এবং সে সময়সীমা পার হওয়ার সাথে সাথে সে বিদায় নেয় পৃথিবী থেকে। এ নির্দিষ্ট সময়সীমায় সে যদি গৌরবজনক কীর্তির স্বাক্ষরে জীবনকে মহিমান্বিত করে তুলতে সক্ষম হয়, মানবকল্যাণে নিজের জীবন উৎসর্গ করে, তবে তাঁর নশ্বর দেহের মৃত্যু হলেও তাঁর স্বকীয় সত্তা থাকে মৃত্যুহীন। গৌরবোজ্জ্বল কৃতকর্মই তাঁকে বাঁচিয়ে রাখে যুগ থেকে যুগান্তরে। মানুষের দেহ নশ্বর কিন্তু কীর্তি অবিনশ্বর। কেউ যদি মানুষের কল্যাণে নিজেকে নিবেদিত করে, তবে মৃত্যুর পরেও তাঁর এ কীর্তির মধ্য দিয়ে সে মানুষের হৃদয়ের মণিকোঠায় চিরকাল বেঁচে থাকে।



## ১৭ কার্পণ্য ও মিতব্যয়িতা এক কথা নয়। এই দুইকে এক মনে করা নিতান্তই ভ্রম

অর্থ ব্যয়ের ব্যাপারে মানুষের সঞ্চয়ী মনোবৃত্তি দুভাবে প্রকাশ পায়। একটি কার্পণ্য এবং অপরটি মিতব্যয়িতা। আপাতদৃষ্টিতে উভয় ক্ষেত্রেই ব্যয়ের ব্যাপারে কুণ্ঠা প্রকাশ পেলেও তাদের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান। কার্পণ্যের মধ্যে আছে সংকীর্ণতা আর মিতব্যয়িতার মধ্যে আছে সংযম আর বিবেচনাশীলতা।

অর্থসম্পদ ব্যয় করার বিষয়ে বিশেষ সচেতনতার পরিচয় দিয়ে থাকে মানুষ। সম্পদ অর্জন করা কঠিন বলে তা ব্যয়ের ব্যাপারেও মানুষের নানাদিক বিবেচ্য। অনেকে অর্থ ব্যয় করতে মোটেই ইচ্ছুক থাকে না। কিভাবে অর্থ ব্যয় না করে চলা যায় সেদিকেই দৃষ্টি থাকে। এ ধরনের লোকেরা কৃপণ বলে অভিহিত হয়। অর্থ ব্যয়ে অনিচ্ছাই কার্পণ্য। অপরদিকে একশ্রেণীর লোক অর্থ ব্যয় করার সময় খুব বিবেচনা করে ব্যয় করে। প্রয়োজনীয়তা, উপযোগিতা ইত্যাদি দিক বিবেচনা করে অর্থ ব্যয় করা হলে সেটাকে মিতব্যয়িতা বলে আখ্যা দেয়া যায়। পরিমিত ব্যয়ের মধ্যে অর্থের সদ্ব্যবহার হয়ে থাকে। কার্পণ্য ও মিতব্যয়িতা অর্থব্যয় সংক্রান্ত হলেও তা এক পর্যায়ভুক্ত হয় না। উভয়ের মধ্যে মিল নেই, বরং ভিন্নধর্মী বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। কৃপণতায় আছে মনের সংকীর্ণতা। প্রয়োজনের সময় কৃপণের অর্থ উপকারে আসে না। শুধু সঞ্চয় করে রাখার মধ্যে সম্পদ সংগ্রহের সার্থকতা নেই। বরং মিতব্যয়িতার মাধ্যমে অর্থ ব্যয় করা হলে সর্বোত্তমভাবে তা কাজে লাগে। তাই কার্পণ্য ও মিতব্যয়িতা এক পর্যায়ভুক্ত নয়। তাই এই দুইকে এক মনে করাও ভুলের শামিল।

## ১৮ গতিই জীবন, স্থিতিতে মৃত্যু

সৃষ্টিশীল যা কিছু দৃশ্যমান, তার সবকিছুই প্রবহমান। চলমানতাই জীবনের বৈশিষ্ট্য, নিশ্চলতা মৃত্যুর প্রতীক। স্থবিরতা ব্যক্তি ও সমাজ জীবনকে যেমন স্তিমিত করে দেয়, জাতীয় জীবনকেও করে বিপর্যস্ত। ঐশ্বর্যমণ্ডিত ও সমৃদ্ধ জাতীয় জীবনে তাই গতিশীলতার কোনো বিকল্প নেই।

নদী সতত প্রবহমান থাকলে তার বুকে কোনোরূপ শৈবাল বা আবর্জনা জমতে পারে না। কিন্তু তার গতি যদি স্থির হয়ে যায়, তার বুকে শৈবাল বা আবর্জনায় ভরে ওঠে। তদ্রূপ, ব্যক্তিগত তথা সামাজিক জীবনে কোনো ব্যক্তি যদি অলস বা স্থবির হয় তবে তার জীবনে উন্নতির আশা অবাস্তব কল্পনা ছাড়া আর কিছুই নয়।

জীবনে উন্নতির চাবিকাঠি হলো সংস্কারমুক্ত হয়ে গতিময়-জীবনের দিকে অগ্রসর হওয়া। যে জাতি যতদিন উন্নয়নকামী ও কর্মঠ থাকে, ততোদিন কোনোরূপ কুসংস্কার তার গতিরোধ করতে পারে না। কিন্তু কোনো জাতি যদি তার পুরাতন ঐতিহ্যকে বুকে ধারণ করে অগ্রগতির পথে না এগোয় তবে স্রোতহীন নদীর মতোই শত সংস্কার এসে তাকে ঘিরে ফেলে। ফলে ধীরে ধীরে সে এ ধরা থেকে লয়প্রাপ্ত হয়।

যে জাতির জীবনধারা অচল, অসার সে জাতির অপমৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। গতিশীল জীবনপ্রবাহই জাতীয় জীবনকে করে জীবন্ত ও উজ্জ্বল।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



## ১৯ ঘুমিয়ে আছে শিশুর পিতা সব শিশুদের অন্তরে

ক্ষুদ্রের মাঝে বৃহত্তের প্রকাশ। আজকের ছোট্ট চারাগাছটি আগামী দিনের শক্তিময় বৃক্ষ। এখন যেটি পরিচর্যার প্রয়োজনীয়তায় দুর্বল অবস্থায় রয়েছে, আগামীতে এটিই বৃহত্তর ও শক্তিশালী বৃক্ষরূপে ফুল ও ফল প্রদান করবে। প্রকৃতির এমনি নিয়মে আজকের শিশু আগামী দিনের কর্ণধার, আগামীর রূপকার। পৃথিবীর সমস্ত শিশুই জন্মের সাথে নিয়ে আসে এ মহতী ও শক্তিমান রূপ। আর তাই এদের দিতে হয় ভালোভাবে বেড়ে ওঠার সুযোগ্য পরিবেশ।

কেননা আজকের শিশুরা একদিন বড় হয়ে জীবনের বৃহত্তর দায়িত্ব পালন করবে। তাই বর্তমান শিশুর জীবন খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং সে গুরুত্বের কথা চিন্তা করে শিশুদের যথাযোগ্য পরিচর্যা করতে হবে। শিশুর পিতারা আজকে যে দায়িত্বের ভার বহন করছেন একদিন শিশুরা বড় হয়ে সে পর্যায়ে উপনীত হবে। তাই শিশুর পিতার বৈশিষ্ট্য এখনকার শিশুদের মধ্যে নিহিত আছে। তার মধ্যে যেন তার পিতা ঘুমিয়ে আছে। শিশু জীবনের এই বৈশিষ্ট্য বিবেচনা করলে তার গুরুত্ব সম্পর্কে ধারণা করা যায়। একদিন শিশুটি বড় হয়ে যখন জীবনের গুরুদায়িত্ব বহন করবে তখন যাতে সে তা সুষ্ঠুভাবে পালন করতে পারে সে ব্যাপারে তাকে তৈরি করতে হবে। তার এমন পরিচর্যা করা বাঞ্ছনীয় যাতে সে যথার্থ যোগ্য হয়ে উঠতে পারে– তার পিতার মতো দায়িত্ব বহনের ক্ষমতা জন্মায়। শিশু জীবনের এই গুরুত্ব অবশ্যই স্বীকার করে তার জীবন গঠনে তৎপর হতে হবে।

## ২০ চরিত্র জীবনের অলংকার ও অমূল্য সম্পত্তি

মানুষের জীবনের উৎকর্ষ-অপকর্ষের বিচার হয় তার চরিত্র-পরিচয়ে। মানুষের জীবন ও কর্মের মহিমা তার চরিত্রের আলোকেই পায় দীপ্তি। মানুষ তার চরিত্র-বৈশিষ্ট্য অনুসারেই কাজ ও চিন্তা করে এবং সেই অনুযায়ীই সমাজ-জীবনে ভূমিকা রাখে। মানুষের জীবনে চরিত্র যেন তার অলংকার ও সম্পদ। তা তাকে দেয় উজ্জ্বল শোভা ও সমুন্নত মহিমা।

ফুলের সম্পদ যেমন তার সৌন্দর্য ও সুরভি, মানুষের সম্পদও তেমনি তার চরিত্রশক্তি। নানা সদগুণের সমন্বয়ে মানুষ হয়ে ওঠে চরিত্রবান। সদাচরণ, সত্যবচন, সৎসংকল্প ও সৎজ্ঞান হয় তার জীবনের আদর্শ। মানব হিতৈষণা হয় তার জীবনব্রত। তার চারিত্রিক গুণাবলীর স্পর্শে সমাজের অধম ব্যক্তিও নিজের কলুষিত জীবনকে শুধরে নেয়ার সুযোগ পায়। স্পর্শমণির ছোঁয়ায় লোহা যেমন সোনা হয়ে ওঠে তেমনি সৎ চরিত্রের প্রভাবে মানুষের পশু প্রবৃত্তি ঘুচে যায়, জন্ম নেয় সৎ, সুন্দর ও মহৎ জীবনের আকাঙ্ক্ষা। চরিত্রশক্তিতে বলীয়ান না হলে মানুষ সহজেই হীনলালসার কবলে পড়ে অপকর্মের শিকার হয়। চরিত্রহীন মানুষের সংখ্যা বাড়লে সমাজজীবনে দেখা দেয় নৈতিক অধঃপতন, সমাজে দেখা দেয় মূল্যবোধের অবক্ষয়। নীতি-আদর্শে উজ্জীবিত চরিত্রশক্তির অভাবে জ্ঞান-বিজ্ঞানে উন্নত জাতির জীবনও হয়ে পড়ে কলঙ্কিত। নৈতিক অধঃপতনের কবলে পড়লে শিক্ষিত মানুষের শিক্ষাও হয়ে পড়ে মূল্যহীন। তাদের শিক্ষা ও জ্ঞান সমাজের কল্যাণে আসে না। পক্ষান্তরে চরিত্রবান লোক কেবল জীবনে মহত্ত্ব অর্জন করেন না, মৃত্যুর পরও তাঁরা হন স্মরণীয়-বরণীয়। কারণ, তাঁদের চারিত্রিক প্রভা সমাজ ও জাতীয় জীবনের অগ্রগতি ও উন্নতির পথে আলোকবর্তিকার মতো কাজ করে। হযরত মুহম্মদ (স), যিশু খ্রিস্ট, গৌতম বুদ্ধ প্রমুখ ধর্মবেত্তা; লেনিন, আব্রাহাম লিংকন প্রমুখ রাষ্ট্রনায়ক; ঈশপ, সক্রেটিস, বিদ্যাসাগরের মতো শিক্ষাগুরুর চরিত্রশক্তি তারই উজ্জ্বল প্রমাণ। বস্তুত চরিত্রের শক্তিতেই মানুষ মহৎ হয়। পায় সত্যিকারের গৌরব ও মর্যাদা। মানবজীবনকে করে সৌন্দর্যময় ও উৎকর্ষমণ্ডিত। চরিত্রকে মানবজীবনের অলংকার ও সম্পত্তি হিসেবে দেখা হয় এ কারণেই।



## ২১ চকচক করলেই সোনা হয় না

বাইরের দিক থেকে যা সুন্দর দেখায় তা-ই যে সত্য এমন নাও হতে পারে–ভিতরে তার ভিন্ন রূপ থাকা অস্বাভাবিক নয়। ভিতরে এক রকম, বাইরে অন্য রকম– এ ধরনের মানুষ যথার্থ গুণের অধিকারী নয়। নিজের ত্রুটি ঢেকে রাখার জন্য অনেকে বাইরে কৃত্রিমতার মুখোশ পরে। এতে আসল পরিচয় ঢাকা গেলেও তা সাময়িক এবং অচিরেই তার স্বরূপ প্রকাশ হয়ে পড়ে। তাই বাইরের চাকচিক্য দেখে ভুললে চলবে না, তার ভিতরের পরিচয় নিয়ে সত্যকে চিনতে হবে।

সোনার বাইরের উজ্জ্বলতা তার আসল পরিচয় নয়। খাঁটি সোনা চিনতে হলে তা কষ্টিপাথরে যাচাই করতে হয়। কষ্টিপাথরে ঘষা দিলেই তা আসল না নকল জানা যায়। বাইরে চকচক করলেও নকল সোনা খাঁটি বলে চালানো যায় না। নকল সোনা বাইরে ঘষে চক চক করা যায়। পিতলকেও এমন করা সম্ভব। কিন্তু সোনার খাঁটিত্ব প্রমাণ করার জন্য চক চক করা কোন কাজে আসে না। মানুষের জীবনেও এমন বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। ভিতরের পরিচয়ই তার আসল পরিচয়। মানুষের কথাবার্তায়, চালচলনে ভিতরের পরিচয় বের হয়ে আসে। নকল দাঁত, কলপ দেয়া চুল, দামি প্রসাধনী সবই কৃত্রিম। এই কৃত্রিম পরিচয় স্থায়ী নয়। একদিন আসল পরিচয় প্রকাশ পাবে, তখন সব ফাঁকি ধরা পড়ে যাবে।

## ২২ জ্ঞানই শক্তি

জ্ঞান যে অনেক বড় শক্তি তাতে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। পৃথিবীতে মানুষ তার শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছে জ্ঞানের সাহায্যে। জ্ঞান ও বুদ্ধি দিয়ে মানুষ জীবনের সকল বাধা দূর করেছে; সভ্যতার বিকাশ ঘটিয়েছে। মানুষের অর্থবিত্ত ও জনবল শক্তি হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে। কিন্তু জ্ঞানের সঙ্গে তার তুলনা হতে পারে না। জ্ঞানের বিনাশ নেই। অথচ ধন-সম্পদ সবই একদিন ধ্বংস হয়ে যেতে পারে। মানুষ জ্ঞানের অধিকারী হয়েছে বলেই সে মানুষ। মানুষ তার জীবন বিকাশের জন্য জ্ঞানের সাহায্য নেয়। জীবনকে সুখকর ও সুন্দর করে তোলে জ্ঞানের সাহায্যে। তাই জ্ঞান শুধু শক্তিই নয়–শ্রেষ্ঠ শক্তি। মানুষ পৃথিবীর পরিবেশকে তার অনুকূলে এনেছে নিজের জ্ঞানবুদ্ধির জোরে। মানুষের জীবনে যা কিছু সুখের উপকরণ তা এসেছে জ্ঞানের ব্যবহারের ফলে; যা কিছু বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার তা যত বিস্ময়কর হোক সবই মানুষের জ্ঞান সাধনার ফল। যেসব জাতি আজ উন্নতির শিখরে উঠেছে তারা জ্ঞান থেকেই শক্তি পেয়েছে। ধন-সম্পদ, গোলা-বারুদ দিয়ে যা করা যায় না তা করা যায় জ্ঞানের প্রয়োগের মাধ্যমে। জ্ঞানের প্রভাব সর্বব্যাপী। জ্ঞান মানুষের মনের ওপর প্রভাব বিস্তার করে, তার পরিবর্তন ঘটায়। অপর কোনো শক্তির সাহায্যে তা করা যায় না। জ্ঞান-বুদ্ধি'র বিকাশই মানুষকে অগ্রগতির পথে, শ্রেষ্ঠত্বের পথে চালিত করে। তাই সকল মানুষের উচিত জ্ঞানের সাধনায় নিজেদের নিয়োজিত করে যথার্থ শক্তিমান হয়ে ওঠা।

## ২৩ জ্ঞান মানুষের মধ্যে সকলের চেয়ে বড় ঐক্য

জ্ঞানের উপযোগিতা ও গুরুত্বের কোনো তুলনা নেই। জ্ঞানই শক্তি বলে বিবেচনা করা হয়। মানব জীবনে জ্ঞানের সীমাহীন প্রয়োগে সভ্যতার বিকাশ ঘটেছে। জ্ঞানের পথ ধরেই মানুষ আদিম জীবন থেকে বর্তমানের উন্নত জীবনে এসে পৌঁছেছে। বিশ্বের সকল মানুষের মধ্যে জ্ঞান বাহন হিসেবে কাজ করছে। জ্ঞানের গুরুত্ব মানবজীবনে অপরিসীম।

পৃথিবী জুড়ে ছড়ানো মানুষ নানা জাতি, ধর্ম ও বর্ণে বিভক্ত। মানুষের আচার-আচরণ সর্বত্র এক নয়। আকারে-প্রকারে, ধর্মে-বর্ণে মানুষের এই পার্থক্য বিশ্বের স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য বলে বিবেচনার যোগ্য। মানুষে মানুষে এই পার্থক্য বর্তমান থাকলেও একটি ক্ষেত্রে মানুষের ঐক্য রয়েছে এবং তা হলো জ্ঞানের বিষয়ে। জ্ঞান মানুষকে ঐক্যের বন্ধনে আবদ্ধ করে রেখেছে, এক মহামিলনের তীর্থে মানুষকে মিলিত করেছে। মানুষ দেশ, জাতি, ধর্ম, বর্ণে যতই পৃথক হোক না কেন, জ্ঞান সাধনার পথে মানুষের কোনো

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



ব্যবধান নেই। সবাই একই পথের পথিক, কারণ জ্ঞানের ব্যাপারে মানুষের ভিন্নতা নেই। জ্ঞান সকলের মনকে সমানভাবে উচ্চকিত করে। জ্ঞানের তাৎপর্য একজনের কাছে একরকম, অন্যজনের কাছে ভিন্ন রকম এমন মনে করার কোনো কারণ নেই। মাধ্যাকর্ষণ শক্তির জ্ঞান সকল বিশ্বমানবের কাছে একই মর্যাদায় বিধৃত হয়। জ্ঞান সাধনার ক্ষেত্রে জ্ঞানের প্রয়োগের ব্যাপারে মানুষ ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করে। জ্ঞানের রাজ্যের মানুষের মনের কোনো পার্থক্য নেই। জ্ঞান মানুষের মধ্য থেকে সকল পার্থক্য দূর করে। জ্ঞানের সুফল সকল মানুষই ভোগ করে। সবাই জ্ঞান থেকে উপকৃত হতে পারে। জ্ঞানের সীমাহীন তাৎপর্য বিশ্বের মানুষকে ঐক্যসূত্রে আবদ্ধ করে রেখেছে।

## ২৪ জীবনের জন্য মৃত্যু, মৃত্যুর জন্য জীবন নয়

মহান সৃষ্টিকর্তার এক অনন্য দান মানবজীবন। এ জীবনের পরিসর ও পরিণতি আছে। জীবন দিয়ে যেমন সময় বেঁধে দেয়া আছে, তা যবনিকাপাতের জন্য রয়েছে মৃত্যু। কিন্তু মৃত্যু তো মাত্র পরিণতির নাম, মৃত্যুর জন্য জীবন নয়।

মানবজীবন একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে আবর্তিত। এই সময়ের সমষ্টির নামই জীবন। এ সময়ের সমাপ্তির একটি সাধারণ ও প্রাকৃতিক মাধ্যম হলো মৃত্যু। কিন্তু মৃত্যুর ক্রান্তির জন্য প্রতীক্ষা ও সময়ক্ষেপণ জীবন নয়। জীবনের একটি আলাদা মূল্য রয়েছে, রয়েছে বিশেষ মূল্যায়ন।

জীবন একটি বক্র। জীবন একটি গতির নাম। এ গতির মৌলিক ধারা রয়েছে, যে ধারা মানুষ তথা প্রত্যেক জীবের মাঝে কাজ করে। জীবন হলো সজীব শক্তি। অন্যদিকে মৃত্যু যবনিকা বা শেষ পরিণতি। জীবন হলো মূল্যবান ও অপার শক্তি। যার ধারাবাহিকতার পরিসীমা রয়েছে। যেদিন এ পরিসীমা শেষ হবে তখন মৃত্যু নামের শৃঙ্খলার মাধ্যমে এ জগৎ ত্যাগ করাই হবে জীবনের সঙ্গত গতানুগতিক কাজ। জীবন আছে বলেই মৃত্যু অনিবার্য। অর্থাৎ জীবনের জন্যই মৃত্যু। কিন্তু মৃত্যুর জন্য জীবন নয়। মৃত্যু বললেই জীবন শেষ হয়ে যায় না। মৃত্যুর কোনো পরিসীমা বা শৃঙ্খলা নেই। যার ফলে জীবনের জন্য মৃত্যু হলেও মৃত্যুর জন্য জীবন হতে পারে না। এটিই বাস্তবতা, এটিই অবনীর ধ্রুব সত্যতার ধারা। এখানে লক্ষণীয় ব্যাপার হলো জীবন ও মৃত্যু উভয়ই স্রষ্টার দান। তবে জীবন সৃষ্টি করা হয়েছে বলে দুনিয়া থেকে সাময়িক বিদায়ের জন্য মৃত্যু নামের শৃঙ্খল ঘোষণা হয়েছে বিধায় মৃত্যুর জন্য জীবন নয়।

জীবন স্রষ্টার সৃষ্টি, মৃত্যুও তাঁর ঘোষিত শৃঙ্খল। কিন্তু জীবন আছে বলেই মৃত্যু, মৃত্যুর জন্য জীবন নয়। কেননা জীবন হলো সৃষ্টির জন্য, কল্যাণ ও উন্নয়নের জন্য; মৃত্যুর জন্য নির্ধারিত এক পাক্ষিক বিষয় নয়।

## ২৫ জীবনের কাছ থেকে পালানো সহজ, তার সঙ্গে লড়ে জয়ী হওয়াই কঠিন

লিওটলস্টয় বলেছেন, "Life is nothing but struggle for to do." সংগ্রামই জীবন। আর বেঁচে থাকার নাম সংগ্রাম। এই সংগ্রামমুখর জীবন থেকে পলায়নের নামই জীবন থেকে সরে যাওয়া। অর্থাৎ ব্যর্থতার বোঝা নিয়ে জড়বৎ হয়ে মৃত্যুর জন্য প্রহর গোনা। এতে জীবনের কোনো সার্থকতা নেই। এতে মানবজীবনের মর্যাদা ক্ষুণ্ন হয়। জন্মলাভের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের জীবন শুরু হয়ে যায়। মানুষ আস্তে আস্তে বড় হয়। তারপর এক সময় তাকে জীবনের দায়িত্ব গ্রহণ করতে হয়। কিন্তু জীবনের পথ সংগ্রামমুখর, কুসুমাস্তীর্ণ নয়। জীবনের চারদিকেই থাকে প্রতিকূলতা আর প্রতিকূলতা। জীবনে চলার পথে থাকে বাধা আর বিপত্তি। এই বাধা অতিক্রম করেই জীবনে সাফল্যের মুখ দেখতে হয়। জীবন সংগ্রামে ব্যর্থ হয়ে জীবন থেকে পালিয়ে যাওয়ার মধ্যে জীবনের কোনো সার্থকতা নেই। এ পলায়ন জীবনে পরাজয় আনে।



এ কথা ঠিক যে, জীবন সব সময় সুখের নয়। দুঃখের ব্যথাদীর্ণ রূপ দেখতে দেখতে মানুষ এক সময় ক্লান্ত হয়ে পড়ে। তার মধ্যে বিপুল হতাশার জন্ম হয়। হতাশায় জর্জরিত হয়ে মানুষ মৃত্যুকেই শ্রেয় মনে করে। অনেক মানুষকে দেখা যায়, সংসারের জ্বালা-যন্ত্রণা সইতে না পেরে সে ফকির-সন্ন্যাসীর জীবন অবলম্বন করে। অর্থাৎ সে রূঢ় জীবন থেকে পালাতে চায়। কিন্তু এটি সমীচীন নয়। দুঃখ-যন্ত্রণা সইতে হবে, হতাশাকে অতিক্রম করতে হবে। জীবনে লড়ে যেতে হবে। এটি কঠিন হলেও এর মাধ্যমেই জীবনে সাফল্য আসে।

## ২৬ জন্ম হোক যথা তথা কর্ম হোক ভালো

আপন জন্মের ব্যাপারে মানুষের নিজের কোনো ভূমিকা থাকে না। উঁচু বা নিচু, ধনী বা দরিদ্র পরিবারে তার জন্ম হওয়াটা তার ইচ্ছা বা কর্মের ওপর নির্ভর করে না। কিন্তু কর্মজীবনে তার ভূমিকা ও অবদানের দায় তার নিজের ওপর বর্তায়। তাই পৃথিবীতে মানুষের প্রকৃত বিচারে তার জন্ম-পরিচয় তেমন গুরুত্ব বহন করে না। বরং কর্ম-অবদানের মাধ্যমেই মানুষ পায় মর্যাদার আসন, হয় বরণীয়-স্মরণীয়।

সমাজে একদল লোক আছেন যারা বংশ আভিজাত্যে নিজেদের সম্ভ্রান্ত মনে করেন। তারা বংশ মর্যাদার অজুহাতে সমাজে বিশেষ মর্যাদা দাবি করেন। কিন্তু তাদের এই প্রয়াস বাস্তবতা বিবর্জিত ও হাস্যকর। সমাজের নিচুতলায় জন্ম নিয়েও মানুষ কর্ম ও অবদানে বড় হতে পারে। মানবসমাজের ইতিহাসে এ রকম উদাহরণ অজস্র। পদ্মফুলের সৌন্দর্যই বড়। পঙ্কে জন্মেছে বলে তাকে হেয় গণ্য করা হয় না। তেমনি মানুষের কর্মের সাফল্যই বড়, জন্ম-পরিচয়ে মানুষের বিচার হীনম্মন্যতারই পরিচায়ক। বস্তুত প্রকৃতির রাজ্যে মানুষে মানুষে কোনো ভেদাভেদ নেই। একদল মানুষ মানুষের ওপর আধিপত্য কায়েমের জন্য সমাজে বড়-ছোট, ধনী-দরিদ্র ইত্যাদি ব্যবধান সৃষ্টি করেছে। ধর্মীয় ব্যবধান রচনা করেছে মানুষই। ফলে সমাজে মানুষে মানুষে আপাতদৃষ্টে ভেদাভেদ সৃষ্টি হয়েছে। তাই যে কোনো পেশা, যে কোনো কাজ মানুষ করুক না কেন, তা সমাজে গুরুত্বহীন নয়। তাকে অপ্রয়োজনীয় ও অবজ্ঞেয় করা সূহতার পরিচায়ক নয়। মানুষ যেখানেই জন্মাক, যে কাজই করুক, সে সততা ও নিষ্ঠার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করছে কিনা সেটাই বিবেচ্য। মানুষের কল্যাণে, সমাজের অগ্রগতিতে সে যতটা অবদান রাখে তার ভিত্তিতেই তাকে মূল্যায়ন করা হয়। সেই অনুযায়ীই তাকে সমাজে স্বীকৃতি দিতে হয়। বংশ-পরিচয়ের অজুহাতে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সম্পদ, ক্ষমতা ও দম্ভের শক্তিতে মানুষের ওপর জবরদস্তি করে সমাজে মর্যাদার আসন লাভ করা যায় না। তাই জন্ম-পরিচয়ের উর্ধ্বে আপন কর্ম-পরিচয় তুলে ধরাই হওয়া উচিত মানুষের জীবনব্রত। তাহলেই সুকর্মের মাধ্যমে মানুষ গৌরব ও মর্যাদার আসনে আসীন হতে পারে।

## ২৭ তুমি অধম, তাই বলিয়া আমি উত্তম হইব না কেন?

অন্যের অন্যায়, অমানবিক ও অশুভ আচরণ কখনো মানুষের অনুকরণীয় ও অনুসরণীয় আদর্শ হতে পারে না। কলুষময় পরিবেশের মধ্যে থাকলেও প্রকৃত মানুষের সাধনা হওয়া উচিত সত্য, ন্যায় ও মানবিকতার আদর্শে জীবন গঠন। মনুষ্যত্বের এই সাধনাতেই মানুষ প্রকৃত মানুষ হয়ে উঠতে পারে। পরের সুকৃতিতে অনুপ্রাণিত হওয়া প্রশংসনীয় কিন্তু পরের স্বার্থপরতায় প্রভাবিত হওয়া অনাকাঙ্ক্ষিত।

চরিত্র-বৈশিষ্ট্য ও মানসিকতার বিচারে সংসারে সব মানুষ অভিন্ন চরিত্রের হয় না, মানুষের মধ্যে ভালোও আছে মন্দও আছে; সৎও আছে, অসৎও আছে। এদের মধ্যে উত্তম মানুষই হলো সমাজের আদর্শ। তারা চিন্তা ও কর্মে সত্য ও ন্যায়ের অনুসারী, এদের জীবনযাপন সহজ-সরল অনাড়ম্বর। অন্যায় পথে অর্থবিত্ত অর্জনের সব ধরনের মোহ থেকে এঁরা মুক্ত। নিজের সাধ্য ও সামর্থ্যমতো তাঁরা অন্যের কল্যাণের চেষ্টায় সচেষ্ট থাকেন। পক্ষান্তরে যারা অধম তারা স্বার্থান্বেষী, অর্থলোলুপ। সমাজের

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



মঙ্গলের চেয়ে ছলে-বলে-কৌশলে অন্যায় পন্থায় নিজের স্বার্থ হাসিলই এদের একমাত্র লক্ষ্য। স্বভাব-বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে তারা নীচ ও খল প্রকৃতির। অবৈধ পন্থায় উপার্জিত অর্থ ও বিত্তের দম্ভে তারা ধরাকে সরা জ্ঞান করে। অন্যকে শোষণ ও লুণ্ঠন করে সম্পদ বৃদ্ধিতে তাদের আনন্দ। অন্যকে অত্যাচার করে তারা পায় বিকৃত পরিতৃপ্তি। ঈর্ষা, হিংসা, জিঘাংসা তাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। অর্থবিত্ত ও ক্ষমতার জোরে তারা সমাজে হয়তো সাময়িক দাপটে রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করেন, কিন্তু চূড়ান্ত বিচারে তারা নিন্দিত হয়। ইতিহাস এই শ্রেণীর লোকদের মনে রাখে না। যদি রাখে তবে তা এদের ঘৃণিত ভূমিকা স্মরণ করিয়ে দেয়ার জন্য, যেন অন্যেরা এদের পথ অনুসরণ না করেন। এসব নীচ ও অধম লোকের পশুস্বভাব কখনো মানুষের অনুকরণীয় আদর্শ হতে পারে না। এদের পথ সর্বদাই পরিত্যাজ্য। এদের সঙ্গে সম্পর্কও পরিহার্য। বস্তুত অধম না হয়ে উত্তম হওয়াই মনুষ্যত্বের সাধনা। উত্তম আদর্শই মানবজীবনের আদর্শ। অধমের কার্যকলাপের বিপরীতে উত্তম কার্যকলাপের আদর্শ স্থাপনই প্রকৃতপক্ষে উত্তম চরিত্রের মানুষের লক্ষণ। সেই জন্যই ছন্দের জাদুকর সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত লিখেছেন—

'কুকুরের কাজ কুকুরে করেছে কামড় দিয়েছে পায়,
তাই বলে কি কুকুরকে কামড়ানো মানুষের শোভা পায়?'

প্রকৃত মানুষ হতে হলে অন্যের কদর্য ব্যবহারে প্রভাবিত হলে চলবে না। মহৎ অভিপ্রায় সফল করে তুলতে হলে এই সহিষ্ণুতা অপরিহার্য।

## ২৮ তরুলতা সহজেই তরুলতা, পশুপাখি সহজেই পশুপাখি, কিন্তু মানুষ প্রাণপণ চেষ্টায় তবে মানুষ

মানুষের জীবন সার্থকতা পায় মনুষ্যত্ব অর্জনের সাধনায় সফলতা অর্জনের মাধ্যমে। মানবিক গুণাবলী মানুষের সহজাত অর্জন নয়। শিক্ষা ও সাধনার মাধ্যমে বিবেক, বুদ্ধি ও মননশক্তি অর্জন করে মানুষ প্রকৃত মানুষ হয়ে ওঠে।

তরুলতা ও পশুপাখির মতো মানুষও একই স্রষ্টার সৃষ্টি। কিন্তু অন্যান্য সৃষ্টির চেয়ে বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে মানুষ একেবারে আলাদা। জন্মসূত্রে তরুলতা ও পশুপাখি সহজাত স্বভাব-বৈশিষ্ট্য পায়। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত তাদের জন্মগত স্বভাব, প্রকৃতি প্রদত্ত গুণাবলী ও প্রকৃতিনির্ভর বৈশিষ্ট্য অব্যাহত থাকে। কিন্তু জন্মগত সহজাত বৈশিষ্ট্যে মানুষের পরিচয় সীমিত নয়। অসহায় অবস্থায় জন্ম নিয়েও মানুষ সচেষ্ট সাধনায় শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা অর্জন করে হয়ে ওঠে পরিপূর্ণ মানুষ। এজন্য সামাজিক মানুষ হিসেবে মানুষকে সমাজজীবন থেকেও শিক্ষা নিতে হয়। তরুলতা বা পশুপাখি সাধারণত তার সহজাত গুণের বাইরে নতুন জ্ঞান সৃষ্টি বা তা আয়ত্ত করার ক্ষমতা রাখে না। কিন্তু মানুষ তার সহজাত ক্ষমতার ওপর ভিত্তি করেই সহজাত ক্ষমতার বাইরে নিত্যনতুন জ্ঞান আহরণ করতে পারে, সৃষ্টি করতে পারে নিত্যনতুন সম্পদ। এভাবে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি চর্চার মাধ্যমে মানুষ গড়ে তুলেছে নিজস্ব সভ্যতা এবং জগৎ বিকাশের নিয়মগুলো আয়ত্ত করে সৃষ্টি জগতে বিস্তার করেছে আপন আধিপত্য। কিন্তু মানুষ এই ক্ষমতা একদিনে অর্জন করেনি কিংবা জন্মসূত্রেও সেই অভিজ্ঞতা কেউ লাভ করতে পারে না। এজন্য তাকে নিরন্তর সাধনায় নানা বিদ্যা শিখতে হয়, জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা করতে হয়, শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির নানা দিক আয়ত্ত করতে হয়। চেষ্টা ও সাধনা ছাড়া এসব অর্জন করা যায় না। তাই প্রকৃত মানুষ হয়ে ওঠার জন্য চাই নিরবচ্ছিন্ন চেষ্টা ও সাধনা। বিশ্বজগতের সমস্ত সৃষ্টির সঙ্গে এখানেই মানুষের পার্থক্য ও স্বাতন্ত্র্য। আর এ জন্যই মানুষ সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব।

## ২৯ দাও ফিরে সে অরণ্যে, লও এ নগর

সভ্যতা মানুষকে যেমন অনেক কিছু দিয়েছে, তেমনি কেড়ে নিয়েছে অনেক কিছু। পরিভোগের নানা উপকরণ মানুষের জীবনে এখন ছড়ানো, কিন্তু নগর সভ্যতার জঠরে বস্তুভারের বেড়াজালে মানুষ হারিয়েছে নিসর্গবেষ্টিত জীবনের শান্ত সৌন্দর্য। হারিয়েছে প্রকৃতির মুক্ত অঙ্গনে দেহ-মনের অবাধ ও



স্বচ্ছন্দ বিকাশের সুযোগ। মানুষের জীবনে এসেছে অনেক অনাকাঙ্ক্ষিত জটিলতা। আধুনিক সভ্যতার পাষাণ-পিঞ্জরে অবরুদ্ধ মানুষ মুক্তি প্রত্যাশায় আবার উন্মুখ হয়ে উঠেছে প্রকৃতিচালিত হৃত জীবনকে ফিরে পাওয়ার জন্য। আধুনিক নগর সভ্যতা মানবজীবনে অনেক অগ্রগতি এনেছে এ কথা সত্য, কিন্তু এ সভ্যতা আজ মানুষের হৃদয়বৃত্তির ওপর এমনভাবে চেপে বসেছে যে, মানুষ হয়ে পড়ছে ক্রমেই হৃদয়হীন নিষ্ঠুর। এ সভ্যতা মানুষকে করে তুলেছে পরিভোগমুখী, উচ্চাভিলাষী, আত্মকেন্দ্রিক ও স্বার্থসর্বস্ব। মানুষের জীবন থেকে মানবিকতাবোধের অবসান ঘটছে। মানুষ হয়ে উঠছে অনেক বেশি যান্ত্রিক। সমাজ-জীবনে স্বার্থসচেতনতা হয়ে উঠছে ক্রমবর্ধমান। মানুষের পরিভোগ চাহিদা হয়ে উঠছে আকাশচুম্বী। মানুষে মানুষে বৈষম্য হচ্ছে প্রকট। মানব সম্পর্কের ক্ষেত্রে প্রাধান্য ঘটছে কুটিলতা ও কপটতার। সব কিছুকে বিচার করা হচ্ছে ব্যক্তিগত স্বার্থের মানদণ্ডে। মানবসভ্যতার এই দুঃসহ অবরোধ থেকে মুক্তি পেতে চান হৃদয়বান মানুষ। তাঁরা জটিলতাহীন শান্ত সমাহিত হৃত জীবনের স্বপ্ন দেখেন। জীবনের সৌন্দর্য ফিরে পাওয়ার জন্য তাঁরা ফিরে যেতে চান প্রকৃতিনির্ভর প্রসন্ন, উদার, শান্ত জীবনে। যে জীবনে নেই ভোগের পঙ্কিলতা, নেই লোভের বিকার। মাটির কাছাকাছি সে জীবনে তাঁরা ফিরে পেতে চান স্বেদের গন্ধ আর শ্রমের স্পন্দন। পণ্যবিলাসী জীবনের চেয়ে সরল, সহজ জীবন তাঁদের কাছে অনেক বেশি আকর্ষণীয়। সেই মানসিক প্রশান্তিময় জীবনে ফেরার জন্য হৃদয়ানুভূতিশীল মানুষ আজ ব্যাকুল হয়ে উঠেছেন।

## ৩০ দুর্নীতি জাতীয় জীবনে অভিশাপস্বরূপ

জাতীয় জীবনে দুর্নীতি বিরাজ করলে তা জাতির চরম সর্বনাশ ডেকে আনে। তখন জাতির জীবনে তাকে অভিশাপ হিসাবে বিবেচনা করা চলে।

সত্য ও ন্যায়ের পথে অগ্রসর হলে জাতির উন্নতি সহজ হয়। তাই উন্নয়নে আগ্রহী জাতির প্রধান কাজ সত্যের সাধনা। ন্যায়নীতির ওপর নির্ভর করে, ন্যায়নীতির পথে চলে জাতি উন্নতির শীর্ষে উঠতে পারে। পৃথিবীর ইতিহাসে যেসব জাতি উন্নতির দিকে অগ্রসর হতে পেরেছে তার পেছনে কাজ করেছে সততা ও ন্যায়নিষ্ঠা। অন্যদিকে জাতীয় জীবনে যদি দুর্নীতির প্রবেশ ঘটে তবে সে জাতির উন্নতির পথ রুদ্ধ হয়ে যায়। তখন জাতির সামনে নেমে আসে ঘোর অন্ধকার। অন্যায় বা দুর্নীতি যে জাতির মধ্যে বিরাজ করে সে জাতি নানাবিধ অনাচারে লিপ্ত হয়। ফলে জাতির উন্নতির কথা ভুলে গিয়ে নিজের সুখ, সুবিধা ও স্বার্থের কথা লোকে ভাবতে থাকে। কিভাবে অন্যকে প্রতারণা করে নিজের লাভের পরিমাণ বাড়ানো যায় দুর্নীতিবাজ মানুষ তা চিন্তা করে। এক্ষেত্রে নিজের লোভই বড় হয়ে দেখা দেয়, অন্যের মঙ্গলের কথা লোকের ভাবনায় আসে না। কোনো জাতির জীবনে যদি দুর্নীতি প্রবেশ করে তবে সেখানে স্বার্থের যে খেলা চলে তাতে জাতির উন্নতির পথ বন্ধ হয়ে যায়। সে কারণে দুর্নীতিকে জাতির জীবনে অভিশাপ বিবেচনা করা হয়। এই অভিশাপ জাতির সর্বনাশ ঘটায়। মানুষের জীবনে তখন নেমে আসে চরম দুঃখ-দুর্দশা।

## ৩১ দুর্জন বিদ্বান হলেও পরিত্যাজ্য

দুর্জন হলো খারাপ স্বভাবের লোক। কথা, কাজ প্রভৃতি দ্বারা অন্যের ক্ষতি বা অনিষ্ট সাধনের স্বভাব ধর্ম দুর্জনের বৈশিষ্ট্য। দুর্জন ব্যক্তি শিক্ষিত ও অশিক্ষিত দুই হতে পারে। তবে দুর্জন বিদ্বান হলেও অকল্যাণকর, অশুভ তাই পরিত্যাজ্য।

মনুষ্যত্ব-বিরোধী কুপ্রবৃত্তিগুলো দুর্জন লোকের নিত্যসঙ্গী। এ ধরনের ব্যক্তির নৈতিক চরিত্র দুর্বল, ব্যবহারে এরা রূঢ়, চিন্তায় তরল। সমাজ, দেশ বা জাতি কেউ এদের দ্বারা উপকৃত হয় না। এরা সমাজের কলঙ্ক। এরা আত্মকেন্দ্রিক, লোভী এবং স্বার্থপর। কোনো কোনো দুর্জন লোক প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় শিক্ষিত হয় বটে, কিন্তু বাস্তবিকভাবে গুণী ও মহৎ হয় না। তাদের শিক্ষার সার্টিফিকেট একটি কাগজ ছাড়া অন্য কিছু নয়। সার্টিফিকেট-সর্বস্ব শিক্ষা এদের চরিত্র ও মানসিকতায় কোনো পরিবর্তন

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



ঘটাতে পারে না। এরা শিক্ষিত হয়ে আরো ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে। চাতুরী ও ছলনায় আরও কূটকৌশলী হয়ে এরা সহজ-সরল মানুষকে প্রতারিত করে। এদের সাহচর্যে সততার অপমৃত্যু ঘটে। মানুষের সবচেয়ে বড় গুণ তার উত্তম চরিত্র। মানুষের এই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ঠিক রেখে অপরাপর বৈশিষ্ট্যের বিকাশ ঘটানো আবশ্যক। তেমনি বিদ্বান হওয়াও একটি গুণ। বিদ্যা অর্জনের মাধ্যমে মানুষ যথার্থ মানুষ হয়ে ওঠে। বিদ্যা মানুষের মনের চোখ খুলে দেয়। বিদ্যা মানবজীবনের সফলতার সহায়ক। বিদ্বানের সংস্পর্শে এলে জ্ঞানের আলোয় মন আলোকিত হয়। কিন্তু বিদ্বান ব্যক্তি যদি চরিত্রহীন হয়, তবে তার বিদ্যার কোনো মূল্য থাকে না, সে তার বিদ্যাকে অন্যায় কাজে লাগায়। এরা নিজের স্বার্থ বা অসৎ উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য যে কোনো কৌশলের অশ্রেয় নিতে পারে। চরিত্রহীন বিদ্বান ব্যক্তির কাছ থেকে বিদ্যা লাভ করে জীবনের কোনো কল্যাণ সাধন করা যায় না। তাই দুর্জন যদি বিদ্বানও হয়, তবু তার সান্নিধ্য ও সংস্রব ত্যাগ করাই মঙ্গলজনক।

## ৩২ দুঃখের মতো এত বড় পরশপাথর আর নেই

এ পৃথিবীতে প্রতিটি মানুষের জীবনে রয়েছে সুখ-দুঃখের সহাবস্থান। একটিকে ছাড়া অন্যটিকে মানুষ সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে পারে না। দুঃখের সংস্পর্শে না এলে মানুষের স্বীয় সত্তা ও অন্তরশক্তি সঠিকভাবে জাগ্রত হয় না। দুঃখের পরশেই মানুষের বিবেক জাগ্রত হয়, মানুষের জীবন হয় মানবিক বোধে আলোকিত, মানুষ হয়ে ওঠে মহানুভব, মহীয়ান। দুঃখই মানুষের সকল দৈন্য দূর করে তাকে খাঁটি মানুষে পরিণত করে।

সুখবিলাসী মানুষ জীবনকে পুরোপুরি উপলব্ধি করতে পারে না। দুঃখে পড়লে মানুষ সুখের যথার্থ মর্ম বুঝতে পারে, জীবনের প্রকৃত সত্যকে উপলব্ধি করতে পারে। দুঃখের দারুণ দহন শেষে মানুষের জীবনে যে সুখ আসে তা অনাবিল ও অতুলনীয়। দুঃখই পারে মানুষের অন্তর্নিহিত মনুষ্যত্ব ও বিবেককে জাগ্রত করতে, মানুষকে খাঁটি মানুষে পরিণত করতে। দুঃখ মোকাবিলা করার শক্তি দিয়েই মানুষ আপন শক্তির পরিচয় দিতে পারে। পৃথিবীতে মহৎ কিছু অর্জন করতে হলে মানুষকে কষ্ট সইতে হয়। প্রবাদ আছে, 'কষ্ট ছাড়া কেষ্ট মেলে না।' তাই পৃথিবীতে মহামনীষীরা দুঃখকে তুলনা করেছেন পরশপাথরের সঙ্গে। পরশপাথরের ছোঁয়ায় লোহা যেমন স্বর্ণপিণ্ডে রূপান্তরিত হয়, দুঃখও তেমনি মানুষের জীবনকে নতুন রূপ দেয় ক্লেদ ও গ্লানি থেকে মুক্ত ও নির্মল করে। দুঃখ-কষ্ট ও ত্যাগ-তিতিক্ষা ছাড়া জীবনের স্বর্ণশিখরে আরোহণ অসম্ভব।

পৃথিবীর বিখ্যাত মনীষীগণ স্বীয় সাধনার পথে দুঃখকে অন্তর দিয়ে অনুভব করেছিলেন, দুঃখকে বরণ করে নিয়েছিলেন বলেই আজও তাঁরা স্মরণীয়-বরণীয় হয়ে আছেন। মহানবী হজরত মুহাম্মদ (স), যীশু খ্রিস্ট, গৌতম বুদ্ধ প্রমুখ মহান ধর্মবেত্তা দুঃখকে জয় করে খাঁটি মানুষে পরিণত হয়েছিলেন, কাজ করেছিলেন সমগ্র মানব জাতির কল্যাণের জন্য। বস্তুত মানুষের মনুষ্যত্ব ও অন্তর্নিহিত গুণাবলীর বিকাশের জন্য দুঃখ মানুষের জীবনে পরশপাথরের মতোই কাজ করে।

## ৩৩ ধর্মের ঢাক আপনি বাজে

ধর্ম ও অধর্ম বলে দুটি কথা আছে। ধর্ম মানুষকে সঠিক পথে এবং অধর্ম মানুষকে বিপথে পরিচালিত করে। সৎ ও পুণ্যকর্ম যত গোপনেই করা হোক না কেন, এক সময় তা জনসাধারণের গোচরীভূত হয়। তদ্রূপ পাপকর্ম অতি গোপনীয়ভাবে করা হলেও তা লোকসমাজে জানাজানি হয়ে যায়। কথায় বলে, সত্য কোনোদিন গোপন থাকে না। ধর্ম মেনে চললে স্বার্থত্যাগ করে পরার্থে নিজেকে ব্যাপৃত রাখতে হয়। কিন্তু স্বার্থপরেরা ধর্মকে চাপা দিয়ে স্বার্থান্বেষী হয়ে বিপথে পরিচালিত হয়। কিন্তু সত্যকে চাপা দিয়ে কোনো অসত্যই প্রতিষ্ঠিত হয় না, কপটাচারীর মুখোশ একদিন খসে পড়বেই। কারণ, যা সত্য–তা কোনো আবরণ



দিয়ে ঢেকে রাখা যায় না। যা ন্যায় এবং সত্য তা অন্যায় বা অসত্যকে দূরে ঠেলে দিয়ে দিবালোকের মতই উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে। একটা সত্যকে চাপা দিতে হলে বহু মিথ্যার আশ্রয় নিতে হয়। তাই সত্যের জয় অবশ্যম্ভাবী, তা মিথ্যার জাল ছিন্ন করে প্রকাশ পাবেই। তাই সৎ ও মহৎ কাজ ঢাক-ঢোল বাঁজিয়ে না করলেও প্রকৃতি তার আপন নিয়মে সকলের নিকট উন্মোচন করে এবং প্রশংসা কুড়িয়ে থাকে।

## ৩৪ নীচ যদি উচ্চভাসে, সুবুদ্ধি উড়ায়ে হেসে

সব জিনিসের মর্যাদা সবাই বোঝে না। তাই যথাযথ স্থানে যথাযোগ্য ব্যক্তি অধিষ্ঠিত না হলে সত্য, সুন্দর, মঙ্গল ধূলিস্মাৎ হয়। সেখানে স্থান করে নেয় অত্যাচার, জুলুম ও দুর্নীতি।

সমাজে ভালো-মন্দ উভয়ের অবস্থান পাশাপাশি রাত ও দিনের মতো। তাই দেখা যায় একটিকে বাদ দিয়ে অন্যটি ভাবা যায় না। আলো প্রজ্জ্বলিত হলে যেমন অন্ধকার থাকে না। তেমনি অন্ধকার প্রবল হয় আলোর অভাবে। তখন পথিক পথ হারায়, ভুবনের সৌন্দর্য হারিয়ে যায়, তেমনি সমাজে উঁচু-নীচু, ভালো-মন্দ, মান-অপমান বিদ্যমান। যারা উঁচু সম্মান, গৌরবের অধিকারী তারা সমাজের সকল কলুষতা দূর করে, পঙ্কিলতা মুছে দিয়ে আবিলতা দূর করে সমাজকে সত্য, সুন্দরের পরশপাথরে শোভিত করে তোলে। মানুষের প্রত্যাশা ও চাহিদানুযায়ী স্বর্গীয় সমাজ গড়ে তোলে। আর এর জন্য প্রয়োজনে তারা জীবনের শেষ রক্তবিন্দু দিতেও দ্বিধা করে না। তারা মহৎ, সুতরাং তারা বোঝে মহত্ত্বের মূল্য, কল্যাণের প্রয়োজন, মানবতার মুক্তি। তাই তারা যেমন প্রাণপণ চেষ্টা করে তা প্রতিষ্ঠা করে, আবার তা টিকিয়ে রাখার জন্যও তেমনি জীবন বাজি রাখে। অন্যদিকে যারা হীন নীচু, মানবতাহীন, সংকীর্ণমনা, তারা সৎ, ন্যায়, কল্যাণ আদর্শের মর্ম বোঝে না বরং এগুলো শুনলে তাদের যেন গায়ে জ্বালা ধরে, তারা তাদের কলুষ মনোবৃত্তি বাস্তবায়নে হীনপ্রবৃত্তিকে লাগামহীন ঘোড়ার মতো ছেড়ে দেয়। শুধু স্বার্থপরতা, সংকীর্ণমনা মনোভাব তাদেরকে পরিচালিত করে। আর যা ভালো ঐশ্বরিক গুণাবলী, মানবীয় গুণাবলী তাদের চলার পথে বাঁধা হয়ে দাঁড়ায়। ফলে তারা তখন সেগুলোকে পদদলিত, মথিত ও সমূলে উৎপাটনে ব্রতী হয় এবং বাস্তবায়নের জন্য নীতিহীন একটি দানবে পরিণত হয়। ফলে সমাজ-সভ্যতা এক চরম সংকটে নিপতিত হয়। যেমন হয়েছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জার্মানির নাৎসি বাহিনী শত শত লাইব্রেরি পুড়িয়ে উল্লাস করত, জ্ঞানী-গুণীদের বিনা কারণে হত্যা করত। পাকিস্তান হানাদার বাহিনী যেমন একাত্তরের ২৫ মার্চে চরম উল্লাস ও উৎসাহে নিধনযজ্ঞ চালিয়েছিল আমাদের বুদ্ধিজীবী সমাজের। আর এরই প্রতিবাদে যুগে যুগে মানব-মানবতা ও আদর্শপ্রেমিকরা রুখে দাঁড়িয়েছে, জীবন বাজি রেখেছে। যার ফলশ্রুতিতে আমাদের সভ্যতা আজও টিকে আছে এবং টিকে থাকবে। তাই আমাদের উচিত সৎ, যোগ্য, উপযুক্ত লোককে যথাযথ স্থানে বসানো।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছিলেন, দুর্বলকে ক্ষমতা দেয়া আরো বেশি ভয়ংকর। এ জন্য অনুপযুক্ত ও নীচ প্রকৃতির লোকের ক্ষমতায় আরহণ যথেচ্ছাচার জীবনের সূচনা ঘটায়, আর জন্ম দেয় নষ্ট ইতিহাসের।

## ৩৫ নতুনই পুরাতনকে রক্ষা করে থাকে। পুরাতনের মাঝেই নতুনের বাস নতুন পুরাতন বিচ্ছেদ হলে হয় জীবনের অবসান

নতুন যেমন পুরাতনকে লালন করে তেমনি আবার পুরাতনের মাঝেই পাওয়া যায় নতুনের দিক-নির্দেশনা। নতুন পুরাতন নিয়েই তাই পৃথিবীর বৈচিত্র্যময় ইতিহাস।

নতুন এবং পুরাতন একে অপরের পরিপূরক নয়। নতুন পুরাতনকে রক্ষা করেন বটে। তবে পুরাতনকে ঝেড়ে ফেলে দিলে হবে না। কেননা পুরাতন অভিজ্ঞতালব্ধ ফল। তাই তো পুরাতনকে শ্রদ্ধা জানাতে হবে। এ ক্ষেত্রে এগিয়ে আসতে হবে নতুনকে। তাদেরই রক্ষা করতে হবে অভিজ্ঞতাকে। মানুষের

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



স্বাভাবিক প্রবণতা পুরাতনের প্রতি মোহাবিষ্ট থাকা। ইতিহাসের বহু দ্বন্দ্ব বিগ্রহের অন্যতম কারণ পুরাতনের প্রতি দুর্বলতা। অতীত কোন্ সৃষ্টির জন্মদাতা আর বর্তমান অতীতের শিশু ও কুঁড়ি বৈ আর কিছুই নয়। অর্থাৎ পুরাতন কুঁড়িকে নতুন আপন শক্তিতে ফুটিয়ে নবপুষ্পে পরিণত করে। যেমন লাইব্রেরির পুঞ্জীভূত গ্রন্থরাজির মধ্যে রয়েছে মানুষের কাল-কালান্তরের ভাব-ভাবনা ও মননের ফসল। আজকের নতুন ঐ পুরাতনকে গ্রহণ করে বর্তমানকে করে সমৃদ্ধ। এগিয়ে যায় নতুন নতুন আবিষ্কারের পথে। পুরাতনের মাঝেই রয়েছে নতুনের বসবাস। কম্পিউটার আবিষ্কৃত হয় সেই পুরাতন হিসাবকারী যন্ত্রের অনুসরণেই। পুরাতনের মাঝেই রয়েছে নতুনের জন্য দিক-নির্দেশনা। পুরাতনকে বিশ্লেষণ করে তার মাঝে ভুলগুলোকে শুধরে আজকের নতুন পেতে পারে সুন্দর ভবিষ্যৎ। নতুন সৃষ্টির প্রয়োজনে পুরাতনকে ধ্বংস করা ঠিক নয়। পুরাতনের মাঝ থেকে কুসংস্কার ঝেড়ে ফেলে নতুনত্বের স্বাদ আনা সম্ভব হলে উপকৃত হয় জাতি। নতুন ও পুরাতন যেন একটি শিশুর ছোটবেলা থেকে বেড়ে ওঠার ঘটনা। পুরাতন এবং নতুন মিলেই ভবিষ্যৎ। কাজেই সুন্দর ভবিষ্যতের জন্য নতুন ও পুরাতন কোনোটিকে বাদ দেয়া সম্ভব নয়। কেননা নতুন এবং পুরাতনের বিচ্ছেদ মানে জীবনেরই অবসান।

পুরাতনের মাঝেই রয়েছে নতুনত্বের বসবাস। কাজেই কাউকে আলাদা করা সম্ভব নয়।

## ৩৬ নদী কভু পান নাহি করে নিজ জল,
## তরুগণ নাহি খায় নিজ নিজ ফল।
## গাভী কভু নাহি করে নিজ দুগ্ধ পান,
## কাষ্ঠ দগ্ধ হয়ে করে পরে অন্ন দান।

নদী তার জলধারা দিয়ে বৃক্ষলতা ও প্রাণিকুলের জীবনীশক্তি সঞ্চার করে তাদের বাঁচিয়ে রাখে। বৃক্ষরাজি আপন ফল ও ছায়া প্রদান করে তাপিত জীব-জগতের শ্রান্তি অপনোদন ও ক্ষুণ্নিবৃত্তি করে অপরের মঙ্গল সাধন করে। গাভী তার দুগ্ধ দিয়ে পরের জীবনীশক্তি প্রদান করে। কাষ্ঠখণ্ড নিজে পুড়ে অপরের রন্ধনকার্যে সহায়তা এবং মানুষের শীত নিবারণ করে। বাঁশি আপন সুর-লহরীর অপূর্ব মূর্ছনায় অপরের চিত্তকে বিমুগ্ধ ও মোহিত করে। এরা সকলেই পরহিতব্রতে নিজেদের উৎসর্গ করে। স্বার্থপরতার কথা এদের মনে কখনো স্থান পায় না। এ জগতে বহু মহৎ লোক আছেন যারা পরের মঙ্গলের জন্য নিজেদের বিলিয়ে দেন। তাদের একমাত্র চিন্তা, কি করলে অপরের দুঃখ তিরোহিত হয়ে তার মুখে হাসি ফুটবে, কিসে সমাজ-সংসারের কল্যাণ হবে। তারা নিজেদের সুখ-শান্তির বিষয় কখনো চিন্তা করেন না এবং নিজের সর্বস্ব বিসর্জন দিয়ে পরের মঙ্গলের জন্য জীবনপাত করেন। পরের মঙ্গল সাধন করেই তারা সুখানুভব করে থাকেন। তাই তারা এ নশ্বর জগতে চিরস্মরণীয় ও বরণীয় এবং 'মনের মন্দিরে নিত্য সেবে সর্বজন'। সুতরাং পার্থিব জগতের শত সুখ-সুবিধা ও ভোগবিলাস তুচ্ছজ্ঞান করে পরহিতব্রতে আত্মোৎসর্গ করে জীবন ধন্য ও বরণীয় করাই মহত্ত্বের পরিচয়।

## ৩৭ নাম মানুষকে বড় করে না, মানুষই নামকে বড় করে তোলে

মহাকালের অনন্ত প্রবাহে মানুষ পায় সীমাবদ্ধ এক জীবন। সেখানে Life is a vision between a sleep and a sleep— অনন্ত ঘুমের মধ্যে ক্ষণিকের জন্য চোখ মেলে তাকানো। এই ক্ষণিক সময়ে প্রত্যেক মানুষই তার পরিচয় চিহ্নিত করার জন্য পায় নিজস্ব একটি নাম। কালের প্রবাহে তাদের অনেকের নামই হারিয়ে যায়। কিন্তু কর্মকৃতির জন্য কারো কারো নাম পায় মহিমা, উত্তর-পুরুষের কাছে হয় স্মরণীয়। জীবন অবসান হলেও যেসব মানুষের নাম স্মরণীয় হয়ে থাকে তাঁরা তাঁদের নামের কারণে স্মরণীয় হন না, স্মরণীয় বরণীয় মহিমা পান তাঁদের কর্মের জন্য। মহৎ সাধনা ও অসামান্য কর্ম-অবদানের জন্য মানুষের নাম মানুষ মনে রাখে। কোনো কীর্তি না থাকলে কারো নাম মানুষ স্মরণ করে না। যতই বিত্ত-বৈভব, প্রভাব-প্রতিপত্তি থাকুক, নাম যতই জৌলুসপূর্ণ হোক; কর্মসাধনায় নিবেদিতপ্রাণ না হলে সে নাম মুছে যায়। রবীন্দ্রনাথ বিখ্যাত ঠাকুর পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছেন কিন্তু ঐ পরিবারের সকলকে ছাপিয়ে বড় হয়ে উঠেছে রবীন্দ্রনাথের নাম। নজরুল সাধারণ পরিবারে জন্মেছিলেন। কিন্তু অসামান্য অবদানের জন্য তাঁর নাম চিরজাগরূক হয়ে আছে আমাদের মধ্যে। মানুষ ক্ষণস্থায়ী জীবনকে মহিমান্বিত করতে পারে তাঁর কর্ম-অবদানের মধ্য দিয়ে। মহৎ কীর্তির বলেই মানুষের নাম দেশ-কালের সীমারেখা ছাড়িয়ে যায়।



## ৩৮ নিরক্ষরতা দুর্ভাগ্যের প্রসূতি

নিরক্ষরতা মানুষের জীবনের অভিশাপ, যা মনুষ্যত্বের বিকাশের অন্তরায়। যাদের মাঝে এ জরাগ্রস্ত রোগ বাসা বাঁধে তাদের ভাগ্য সত্যিই খারাপ। অশিক্ষিত মানুষ সমাজের জন্য জাতির উন্নয়নের জন্য অন্তরায়। তাদের দ্বারা সুপ্রসন্ন কোনো কাজ করা যায় না। এজন্য বলা হয়ে থাকে নিরক্ষরতা দুর্ভাগ্যের প্রসূতি।

নিরক্ষরতা সমাজের অভিশাপ। জীবনে অশিক্ষার ছোঁয়ায় মননশীল কোনো ধারায় স্বীয় সত্তাকে মূল্যায়ন করা যায় না। মানুষের সাথে সমভাবে মেলামেশা, চলাফেরা সকল দিক দিয়ে সৌভাগ্যের পরিবর্তে দুর্ভাগ্যে পরিণত হয়। একজন মানুষ নিরক্ষর হলে সে সমাজে মূল্যায়িত হয় না। অশিক্ষিত মানুষ জাতীয় জীবনেও উন্নয়নের অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। সামাজিক, রাজনৈতিক, শিক্ষা, সাংস্কৃতিক সকল বিষয়ে কোনো মৌলিক ধারণাও তার থাকে না। ফলে এসব বিষয়ে সে থাকে একদম অন্ধ। চক্ষু থেকেও আলোর দুনিয়ায় ব্যথার মুকুট মাথায় পরে তারা জীবন অতিবাহিত করে। জীবনের স্বাদ-আহ্লাদ সম্পর্কে তাদের কোনো রকম কৌতূহলও হয় না। তাদের জীবন চলার পথে শুধু বাধা আর বাধায় ভরা। সৌভাগ্যের পরিবর্তে আসে দুর্ভাগ্যের নানান গঞ্জনা। নিরক্ষর ব্যক্তি জীবনপ্রভাতে ব্যথার মুকুট পরেই বড় হতে শুরু করেছে। এরা মানুষের কাছ থেকে ভালো ব্যবহারের পরিবর্তে পায় ধিক্কার। নিরক্ষর ব্যক্তি সাধারণত ভালো-মন্দ, সাদা-কালো চিনে চলতে পারে না। এসব দিক দিয়ে তার জীবন অনেকটা ব্যতিক্রমী। তাই বাস্তবতার প্রেক্ষিতে ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে যে, নিরক্ষরতা জীবনের জন্য মারাত্মক অভিশাপ। এর অভিশাপ যার গায়ে লেগেছে সে সত্যিই দুর্ভাগ্যের সাগরে হাবুডুবু খাচ্ছে।

নিরক্ষর ব্যক্তি সমাজ ও জাতির কাছে অপাঙ্‌ক্তেয়। জাতীয় জীবনে উন্নয়নের অন্তরায়স্বরূপ। সামাজিক জীবনে তারা ধিকৃত ও ঘৃণিত।

## ৩৯ প্রীতিহীন হৃদয় আর প্রত্যয়হীন কর্ম দুই-ই অসার্থক

মানুষ সৃষ্টির সেরা জীব। জ্ঞানকর্মে ও পুণ্য-প্রীতিতে মানুষ তার জীবনকে সার্থক করে তুলছে। বাঁচার জন্য মানুষ নীরবে সংগ্রাম করে। মানুষের বাঁচা তখনই সার্থক হয়, যখন সে প্রীতির পরশে আপন আলয়ে স্বর্গ রচনা করতে পারে। ভোগ, ঐশ্বর্য, ক্ষমতা মানুষের কাম্য হতে পারে কিন্তু এসবে প্রকৃত সুখ নেই। মানুষ সুখ পায় প্রীতিময় সংসারে মমতাময় অনুভবে। তাই কবি বলেন–

'প্রীতি-প্রেমের পুণ্য বাঁধনে/ যবে মিলি পরস্পরে, স্বর্গ আসিয়া দাঁড়ায় তখন/ আমাদেরি কুঁড়ে ঘরে।' প্রীতি মানুষের জীবনে স্বর্গসুখ এনে দেয়। যে হৃদয়ে প্রীতি নেই, প্রেম নেই সে হৃদয় নিষ্ঠুর, নির্মম। বিধাতা মানুষকে বিবেক দিয়েছেন ভালোবাসার মাঝে এক সুন্দর জীবন গড়ে তোলার জন্য। মানুষ জীবনে ও কর্মে সার্থক হয় তখনই, যখন প্রীতিপ্রেমের পুণ্য বাঁধনে সে জীবনকে উপভোগ করতে গেলে প্রীতিহীন যে হৃদয় সে হৃদয়ে শান্তি ও সুখ থাকতে পারে না। শান্তি ও সুখের জন্য তথা সুষ্ঠুভাবে বেঁচে থাকার জন্য কর্ম করতে হয় এবং প্রতিটি কর্মই করতে হয় দৃঢ়প্রত্যয়ে। কারণ কোনো কাজ যদি

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



অর্ধপথে পরিত্যক্ত হয়, তাহলে শ্রম, অর্থ, সময় সবই নষ্ট হয়। একনিষ্ঠভাবে সফল হবার প্রতিজ্ঞায় দৃঢ় হয়ে কোনো কাজে হাত দিলে সে কাজ সুষ্ঠুভাবে সমাধা হয়। লক্ষ্যহীন পরিণামহীন কর্ম মানুষকে গৌরব বা কৃতিত্ব কোনোটিই এনে দিতে পারে না। তাই লক্ষ্য স্থির করে অধিক মনোবল নিয়ে কর্ম সম্পাদনে অগ্রসর হতে হবে। তাহলেই সফলতা আসবে, জীবন সার্থক হবে।

## ৪০ পথ পথিকের সৃষ্টি করে না, পথিকই পথ সৃষ্টি করে

মানুষের সকল সৃষ্টির মূলে রয়েছে সাধনা ও প্রচেষ্টা। চেষ্টার বলেই মানুষ অসাধ্যকে সাধন করেছে। পথিককে যেমন দীর্ঘদিন ধরে চলাফেরা করে তাঁর চলার পথ সৃষ্টি করে নিতে হয়, ঠিক তেমনি মানুষকেও দীর্ঘদিন ধরে চেষ্টা ও সাধনার দ্বারা তার সফলতার মুখ দেখতে হয়।

পথিক ও পথ এ দুটি কথা পরস্পর পরস্পরের সাথে জড়িত। পথ ছাড়া যেমন পথিকের কোনো মূল্য নেই, ঠিক তেমনি পথিক ছাড়া পথের কোনো মূল্য নেই। কিন্তু পথ পথিকের সৃষ্টি করে না, পথিককেই তার পথ সৃষ্টি করে নিতে হয়। পথিক জীবনের কর্মক্ষেত্রে যে নির্দিষ্ট পথ দিয়ে প্রতিনিয়ত যাতায়াত করে সেখানেই পথের সৃষ্টি হয়। এ পথ একদিনে সৃষ্টি হয় না। পথিকের অনবরত যাতায়াতের ফলে চরণাঘাতে পথের জঞ্জাল বিদূরিত হয় অর্থাৎ পায়ের চাপে সবুজ ঘাস সজীবতা হারিয়ে ধীরে ধীরে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় এবং এতে একটি সুগম পথের সৃষ্টি হয়। পথের মতো মানবজীবনও নানা সমস্যায় পরিপূর্ণ। এসব সমস্যা কাটিয়ে ওঠার জন্য পথিকের মতো মানুষকেও অনবরত সংগ্রাম করে যেতে হয়। তবেই সে সফলতার মুখ দেখতে পায়। কোনো মানুষের জীবনেই সফলতা স্বেচ্ছায় ধরা দেয় না। সফলতা পেতে হলে তাকে প্রচুর পরিশ্রম ও সাধনা করতে হয়। এ পরিশ্রম ও সাধনার মাধ্যমেই মানুষ আজ সভ্যতার চরম শিখরে আরোহণ করতে সক্ষম হয়েছে। পৃথিবীর মহাপুরুষগণের জীবনী পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, তাদের জীবনে সফলতা এমনিই ধরা দেয়নি। এ সফলতা অর্জন করার জন্য তাদের প্রচুর ত্যাগ-তিতিক্ষা ও অবর্ণনীয় দুঃখ-কষ্ট ভোগ করতে হয়েছে। কাজেই মানুষকে জীবনে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও সফলতা পেতে হলে একাগ্র সাধনা ও চেষ্টার দ্বারা সকল বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে হবে।

মানুষ নিজেই তার সৌভাগ্যের স্রষ্টা ও নিয়ন্ত্রক। মানুষ সাধনা দিয়েই তার প্রয়োজনকে সহজ করে, চলার পথ মসৃণ করার জন্য শত বাধা-বিপত্তি মোকাবিলা করে। ফলে সে পথ পায় জীবন প্রতিষ্ঠার।

## ৪১ পরিশ্রমই সৌভাগ্যের প্রসূতি

পরিশ্রম হচ্ছে আমাদের সুখ-শান্তি, আশা-ভরসার চাবিকাঠি। পরিশ্রম ছাড়া ভাগ্যের চাকা কখনো সচল হয় না। মানুষকে বেঁচে থাকার জন্য এই কর্মময় পৃথিবীতে কোনো না কোনো কাজে লিপ্ত থাকতে হয়। কারণ জাগতিক পরিধিতে, সাংসারিক জীবনে বিভিন্ন অভাব অনটন হতাশা ইত্যাদি দেখা দেয়। আর এই হতাশ জীবনে আশার আলো ফিরিয়ে আনতে মানুষকে অর্থোপার্জনে মনোযোগী হতে হয়। আর অর্থের জন্য পরিশ্রম করতে হয়। প্রকৃত ও যথার্থ পরিশ্রমই মানুষের জীবনে সৌভাগ্যের লক্ষ্মী ডেকে আনে। শ্রমবিমুখ ও অলস ব্যক্তির জন্য তার কাম্য বস্তু নাগালের বাইরে থাকতে বাধ্য। কারণ পরিশ্রম ছাড়া নিতান্ত তুচ্ছ জিনিসও লাভ করা যায় না। জীবন পুষ্পশয্যা নয়, সংসারও কুসুমাস্তীর্ণ নয়। সংগ্রাম করে জীবন ও সংসারে প্রতিষ্ঠা সম্ভব। বিনা পরিশ্রমে তা সম্ভব নয়। জীবনের সর্বক্ষেত্রে উন্নতির একমাত্র চাবিকাঠি পরিশ্রম। প্রতিষ্ঠা, খ্যাতি, প্রতিপত্তি, যশ-সুনাম, মর্যাদা, এসব ত্রিবেণী ত্রিধারার দুর্বার স্রোতমুখে টিকে থাকার জন্যই তো পরিশ্রম ও কঠোর সাধনা দরকার। অন্যথায় ব্যর্থতা এসে জীবনকে



অক্টোপাসের মতো ঘিরে ফেলে। পৃথিবীর অর্থ, বিদ্যা, খ্যাতি, প্রতিষ্ঠা কিছুই পরিশ্রম ছাড়া লাভ করা যায় না। এমন অনেক দৃষ্টান্ত আছে যারা অতি সাধারণ দরিদ্র অবস্থা থেকে নিজ পরিশ্রম ও কর্মকৌশল দ্বারা জগদ্বিখ্যাত হয়েছেন। পরিশ্রম দ্বারা চীন, জাপান, আমেরিকা, ব্রিটেন প্রভৃতি দেশ আজ উন্নতির স্বর্ণশিখরে আরোহণ করেছে এবং বিশ্বের মানচিত্রে খ্যাতনামা শক্তিশালী ও প্রতিষ্ঠিত দেশ হিসেবে স্থান করে নিয়েছে। ইতর প্রাণীদের মধ্যেও পরিশ্রমলব্ধ জীবন লক্ষ্য করা যায়। মৌমাছি কত পরিশ্রম করে মৌচাকে মধু সঞ্চয় করে রাখে আর সারা বছর মধু খায়। পিপীলিকাও তাদের মতো সারা বছর খাদ্য সঞ্চয় করে রাখে। আর এ জন্যই তারা এত সুখী।

## ৪২ প্রয়োজনীয়তাই উদ্ভাবনের জনক

প্রয়োজনীয়তা মানুষের নিত্যনতুন কর্মপ্রেরণা ও উদ্ভাবনী প্রয়াসের উৎস বিন্দু। সমাজ ও সভ্যতার বিকাশের ধারায় মানুষের জীবনে নিত্যনতুন উপযোগ সৃষ্টি হয়, মানুষ নিত্যনতুন জিনিসের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। সেসব প্রয়োজন মেটানোর জন্য নিরন্তর চেষ্টা থেকেই মানুষের প্রতিটি প্রয়োজনীয় সামগ্রী উদ্ভাবিত হয়েছে। নিত্যনতুন প্রয়োজনের অনুষঙ্গেই ঘটেছে নিত্যনতুন উদ্ভাবন।

সৃষ্টির উষালগ্নে প্রকৃতির সন্তান মানুষ ছিল অসহায়। অপরিচিত বৈরী পরিবেশে অস্তিত্ব রক্ষায় সংগ্রাম করতে গিয়ে মানুষ হাতিয়ারের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিল। সেই প্রয়োজনীয়তার প্রথম উদ্ভাবন আত্মরক্ষায় পাথুরে হাতিয়ার। সেই শুরু। তারপর সুদীর্ঘ কালপরিক্রমায় মানুষ বন্যজীবন থেকে উঠে এসেছে আধুনিক সভ্যজীবনে। মানবসভ্যতা ও সংস্কৃতির বিকাশের প্রতিটি পর্যায়ে মানুষ উন্নত জীবনধারায় নিত্যনতুন প্রয়োজনে নিত্যনতুন জিনিস আবিষ্কার করেছে। তারই সর্বশেষ উদাহরণ মহাবিস্ময়কর কম্পিউটার। জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিক্ষা-সংস্কৃতির সকল ক্ষেত্রে প্রতিটি আবিষ্কারের পেছনেই রয়েছে মানুষের প্রয়োজনীয়তার ভূমিকা। গৃহস্থালির প্রয়োজনে উদ্ভাবিত হয়েছে নানা আসবাবপত্র। নদীর ওপর ভেসে থাকার প্রয়োজনে তৈরি হয়েছে ভেলা, নৌকা, জাহাজ। আকাশে ওড়ার প্রয়োজনে সৃষ্টি হয়েছে বেলুন, উড়োজাহাজ। যুদ্ধের প্রয়োজনে তৈরি হয়েছে নানা মারণাস্ত্র। খেলাধুলার প্রয়োজনে খেলাধুলার নানা উপকরণ, রোগ নিরাময়ের প্রয়োজনে উদ্ভাবিত হয়েছে ওষুধ ও চিকিৎসার যন্ত্রপাতি, মহাশূন্যে বিচরণের জন্য তৈরি হয়েছে মহাশূন্যযান। এভাবে প্রতিটি আবিষ্কারই মানুষের প্রয়োজনীয়তারই ফসল। মানুষের জীবনে প্রয়োজনের পরিসীমা ও পরিসর যতই বেড়েছে ততই সম্প্রসারিত হয়েছে উদ্ভাবন ও আবিষ্কারের ক্ষেত্র। মানুষের সমস্ত কর্মকাণ্ডই আজ পরিচালিত মানুষের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রয়োজনকে ঘিরে। প্রয়োজনের মাত্রা ও গুরুত্ব যত বেশি, উদ্ভাবনের দিকটাও গুরুত্ব পায় তত বেশি। ক্যান্সার ও এইডস নিয়ে যে ব্যাপক গবেষণা এখন হচ্ছে তার কারণ এসব জীবনঘাতী রোগের হাত থেকে পরিত্রাণ পাবার ব্যাপক আকাঙ্ক্ষা। মানুষের সমস্ত উদ্ভাবন ও আবিষ্কারের লক্ষ্য মানুষের প্রয়োজন মিটিয়ে মানুষকে সুখ ও আনন্দ দান। কিন্তু মানুষের প্রয়োজনীয়তার কোনো সীমা নেই। তাই উদ্ভাবনের ধারাও স্থির না হয়ে অগ্রসর হচ্ছে অব্যাহত ধারায়।

## ৪৩ পাপীকে নয়, পাপকে ঘৃণা কর

প্রত্যেক মানুষেরই উচিত পাপকে ঘৃণা করা এবং পাপের পথ পরিত্যাগ করে সত্য ও ন্যায়ের পথে চলা। মানুষ সামাজিক পারিপার্শ্বিকতার কারণে পাপ কাজ করে পাপী হয়। আর এ পাপী তার বিবেকের জাগরণ ঘটলে অতীত পাপ কাজের অনুশোচনা করে সত্যের পথে চলতে চায়। কাজেই পাপীকে নয় বরং পাপকে ঘৃণা করা উচিত।

মানুষ সৃষ্টির সেরা জীব। মানুষের এ শ্রেষ্ঠত্বের প্রধান কারণ তার বিবেক-বুদ্ধি, যা অন্য কোনো জীবের নেই। এ বিবেকের কারণেই মানুষ ভালো-মন্দ, ন্যায়-অন্যায় বুঝতে সক্ষম। বিবেক মানুষকে সত্যের

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



পথে পরিচালিত করে, অন্যায় কাজে বাধা দেয়। বিবেকের কারণেই মানুষ সকল অপরাধমূলক কার্যকলাপ থেকে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। এ অপরাধমূলক কার্যকলাপই পাপ নামে অভিহিত। যেসব ব্যক্তি পাপাচারে লিপ্ত হয় তারাই পাপী। মানুষ সাধারণত পাপীকে ঘৃণা করে। কিন্তু পাপীকে ঘৃণা না করে পাপকে ঘৃণা করা উচিত। কেননা, পাপী অন্যদের মতো একজন সাধারণ মানুষ। তার পাপী হওয়ার কারণ অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে যে, সামাজিক বৈষম্য, প্রতিকূল পরিবেশ, মানসিক অস্থিরতা এবং দারিদ্র্য ও নিপীড়নই মানুষকে পাপপথে ঠেলে দেয়। অস্থিরতা ও দারিদ্র্য দূর করার জন্য এবং অনেক সময় স্বার্থ আদায়ের জন্য নিজের বিবেক-বুদ্ধি জলাঞ্জলি দিয়ে পাপের পথ অনুসরণ করে হয় পাপী। এ অবস্থায় তার বিবেক-বুদ্ধি লোপ পায় বলে তার কোনো হিতাহিত জ্ঞান থাকে না। কিন্তু যখনই তার হিতাহিত জ্ঞান ফিরে আসে এবং বিবেকের পুনর্জাগরণ ঘটে তখনই সে তার অতীত পাপের জন্য অনুতপ্ত হৃদয়ে অনুশোচনার জন্য যে কোনো শাস্তি মাথা পেতে নিতে দ্বিধাবোধ করে না। কাজেই তাকে ঘৃণা করা উচিত নয় বরং সে যাতে ভালো হতে পারে সেজন্য বিভিন্ন সুযোগ দেয়া উচিত। পাপী নয়, পাপকার্যই ঘৃণিত বিধায় তাকে ঘৃণাভরে পরিত্যাগ করা উচিত। পাপীকে ঘৃণা করে কোনো অন্যায় দমিত হয় না বরং পাপকার্যকে ঘৃণা করলে অন্যায় ও অসত্য থেকে দূরে থাকা যায়।

পাপীকে ঘৃণা করা কোনোক্রমেই উচিত হবে না। পাপকার্যকে ঘৃণা করে তা পরিত্যাগ করে সত্য ও ন্যায়ের পথে চলার মধ্যেই মানবজীবনের সার্থকতা নিহিত।

## ৪৪ বিদ্যার সঙ্গে সম্পর্কহীন জীবন অন্ধ এবং জীবনের সঙ্গে সম্পর্কহীন বিদ্যা পঙ্গু

মানুষের জীবন গঠনের জন্য বিদ্যা অর্জন অপরিহার্য। জ্ঞানের আলো অজ্ঞতা ও মূর্খতার হাত থেকে মানুষকে মুক্তি দেয়। বিদ্যার আলোয় আলোকিত না হলে মানুষের জীবন হয়ে যায় অন্ধের জীবনের মতো। প্রতি পদক্ষেপে সে অন্ধকারে পথ হাতড়ায়। অন্যদিকে অর্জিত বিদ্যা বা জ্ঞানকে হতে হয় জীবনমুখী। জীবনে বিদ্যা কোনো কাজে না এলে তা হয়ে যায় কেবলমাত্র কেতাবি বিষয়। বস্তুত, বিদ্যার সঙ্গে জীবনের নিবিড় যোগাযোগের মাধ্যমেই বিদ্যা ও মানবজীবনের সার্থকতা নির্ভরশীল।

বিদ্যা মানবজীবনের অমূল্য সম্পদ। বিদ্যার আলোয় মানুষের জীবনের অজ্ঞানতার অন্ধকার দূর হয়। তা মানুষকে মানুষ হতে সাহায্য করে। বিদ্বানের ভূমিকায় সমাজ ও দেশ হয় সমৃদ্ধির আলোয় আলোকিত। শিক্ষার আলো ব্যক্তির জীবন থেকে যেমন দূর করে সংকীর্ণতার অন্ধকার, তেমনি তা সমাজকেও করে প্রগতির আলোয় আলোকিত। তাই জ্ঞানের আলো যদি জীবনকে আলোকিত না করে তবে সে জীবন ব্যর্থ। বিদ্যার সঙ্গে সম্পর্কহীন জীবন হয়ে পড়ে বিচার-বুদ্ধিহীন। তার চোখ থাকলেও অন্তর-চক্ষু বলে কিছু থাকে না। মানব সন্তান কেবল জন্ম নিয়েই মানুষ হয় না, জ্ঞান অর্জনের সাধনা করেই তাকে প্রকৃত মানুষ হয়ে উঠতে হয়। অন্যদিকে বিদ্যার সঙ্গে থাকা চাই জীবনের নিবিড় সম্পর্ক। যে বিদ্যা কেবল সার্টিফিকেট সর্বস্ব তার কোনো মূল্য নেই। মানুষ অনেক বড় বড় ডিগ্রি লাভ করে খ্যাতি অর্জন করে কিন্তু সে বিদ্যাকে মানবজীবনের কল্যাণে কাজে লাগানো না হলে সে ধরনের বিদ্যার কোনো সার্থকতা থাকে না। বস্তুত, জীবনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক যে শিক্ষায়, সে শিক্ষাই প্রকৃত শিক্ষা। যথার্থ বিদ্বান ব্যক্তি জীবনকে সুন্দর ও গতিশীল করার পাশাপাশি সমাজকেও উন্নত করার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। এভাবে বিদ্যাকে কাজে লাগাতে পারলে জ্ঞানের আলোয় সমাজ আলোকিত হয়, দেশ ও জাতি প্রগতির পথে এগিয়ে যায়। এভাবে জীবন আর বিদ্যার সমন্বয় ঘটাতে পারলেই জীবন সুন্দর হয়ে ওঠে। তাতে বিদ্যা অর্জনও সার্থক হয়। তাই ব্যক্তিজীবন ও সমাজজীবনের আলোময় বিকাশের জন্য চাই জীবনঘনিষ্ঠ শিক্ষা।



## ৪৫ বিদ্যার সাধনা শিষ্যকে নিজে অর্জন করতে হয়, গুরু উত্তরসাধক মাত্র

শিক্ষার পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হতে হলে মানুষকে নিজস্ব প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে এবং সুশিক্ষিত হওয়ার জন্য স্বশিক্ষা বা নিজে নিজে শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে।

শিক্ষা সম্পূর্ণভাবেই অর্জনসাপেক্ষ। শিক্ষালাভের জন্য বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে। ধাপে ধাপে এগিয়ে শিক্ষার্থীগণ সেসব প্রতিষ্ঠান থেকে ডিগ্রি অর্জন করে এবং শিক্ষিত হিসেবে পরিচিত হয়। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষাগুরু প্রতিটি ছাত্রের জন্য পথপ্রদর্শক। শিক্ষক ছাত্রের ভাবী জীবনের স্রষ্টা। শিক্ষক ছাত্রের ভবিষ্যৎ জীবন গঠনের পবিত্র দায়িত্ব গ্রহণ করেন। কিন্তু ছাত্র যদি শিক্ষাগুরুর নির্দেশ, আদেশ, উপদেশ পালন না করে তাহলে তার শিক্ষা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। শিক্ষক শিক্ষা দান করেন এবং কিভাবে শিক্ষা অর্জন করতে হবে তার পথ নির্দেশ করে দেন। কিন্তু ছাত্র যদি সে শিক্ষা গ্রহণ না করে তাহলে শিক্ষকের কিছু করার থাকে না। শিক্ষাগুরু তাঁর শিষ্যকে ভালো-মন্দ, সত্য-মিথ্যা ও ন্যায়-অন্যায়ের পার্থক্য বুঝিয়ে দিয়ে তাকে সঠিক পথ দেখিয়ে দেন। শিষ্য সে পথ অনুসরণ করে জীবনকে সার্থক করে তুলবে এটাই কাম্য। বস্তুত জ্ঞানকে আত্মস্থ করার জন্য আত্মপ্রয়াসের কোনো বিকল্প নেই। শিক্ষার পরিধি অনেক বড়। 'দোলনা থেকে কবর পর্যন্ত শিক্ষা লাভের সময়।' তাই যথেষ্ট জ্ঞান অনুশীলন ব্যতীত কেউ সুশিক্ষিত হতে পারে না। অনেক স্বশিক্ষিত ব্যক্তি প্রাতিষ্ঠানিক ডিগ্রি ছাড়াও দেশ ও জাতি তথা বিশ্বমানবের কল্যাণের জন্য অনেক কিছু করে গেছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ– সক্রেটিস, এরিস্টটল, প্লেটো, নিউটন, গ্যালিলিও, কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, নজরুল ইসলাম প্রমুখের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। তাঁরা বিদ্যার সাধনায় নিজেকে সুশিক্ষিত হিসেবে গড়ে তুলেছিলেন বলেই মরেও অমর হয়ে আছেন।

প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা শেষে যথার্থ জ্ঞানার্জনের জন্য জ্ঞানের রাজ্যে বিচরণ করতে হয়। সুশিক্ষার জন্য নিজের উদ্যোগের প্রয়োজন হয়। সেজন্য সারাজীবন ধরে চলে মানুষের জ্ঞান সাধনা।

## ৪৬ বুদ্ধি যার বল তার

বুদ্ধিই মানুষের সবচেয়ে বড় শক্তি বলে বিবেচিত। বুদ্ধি থাকলে নানা বিপদ-আপদ থেকে যেমন রেহাই পাওয়া যায়, তেমনি বুদ্ধির জোরে জীবনকে সুন্দর ও সফল করেও তোলা যায়। মানব জীবনের অপরাপর গুণের চেয়ে বুদ্ধির গুরুত্ব ও অবদান অনেক বেশি তাতে কোনো সন্দেহ নেই। দুর্বল লোক কাজের অযোগ্য। আর শক্তিহীন লোক মরণের প্রতীক্ষা করা ছাড়া আর কিছু করতে পারে না। শক্তি দিয়ে অপরের ওপর প্রাধান্য লাভ করা যায়। শক্তিশালী লোককে সবাই ভয় পায়। জীবজগতে শক্তিরই প্রাধান্য। তাই বিশ্বের সবখানেই শক্তির অত্যাচার লক্ষ্য করা যায়। তবে এ প্রসঙ্গে আরেকটি বিবেচনার বিষয় রয়েছে। শুধু শক্তি থাকলেই চলে না, সেই সঙ্গে বুদ্ধি থাকার দরকার। বুদ্ধি না থাকলে জীবনের কোনো দাম নেই। শক্তি আছে অথচ বুদ্ধি নেই এমন হলে সে শক্তি কোনো কাজে আসে না। উদাহরণ হিসেবে বলের বৃহত্তম ও শক্তিশালী প্রাণী হাতির নাম বলা চলে, এই প্রাণীর শক্তির খবর সে রাখে না, কাজে লাগাতে পারে না তার বুদ্ধি। তেমন শক্তি নেই, অথচ ভালো বুদ্ধি আছে এমন লোক বুদ্ধির জোরে জীবনে অনেক কিছু করতে পারে। তার পক্ষে জীবনের উদ্দেশ্য সফল করা সম্ভব। বুদ্ধির কৌশলে প্রবল শক্তিমানকেও বশ করা যায়। বুদ্ধিকে কৌশলে কাজে লাগাতে পারলে জীবনের উদ্দেশ্য সফল করা যায়। বুদ্ধির কুশলতার সামনে শক্তি পরাজিত হয়। যে যত বেশি বুদ্ধি রাখে সে তত বেশি সফল। তাই বুদ্ধিই বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

## ৪৭ বিত্ত হতে চিত্ত বড়

বিত্ত শব্দের আভিধানিক অর্থ 'ধন' বা 'সম্পদ'। অপরদিকে 'চিত্ত' শব্দের আভিধানিক অর্থ 'হৃদয়' বা 'অন্তঃকরণ'। পার্থিব জগতে মানুষের কাছে আপাতদৃষ্টিতে বিত্ত বড়ই লোভনীয় ও কাম্য বিষয়। কিন্তু

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



একটু তলিয়ে দেখলে বেশ অনুভব করা যায় মানুষ আজকে যখন অর্থের পাহাড় তৈরি করে নিজেদের মধ্যে ভেদাভেদ সৃষ্টি করছে, তখন মানুষে মানুষে মলিনতাই বাড়ছে। সুখ-সম্পদের প্রাচুর্য জড়ো করে আমরা আজ মনের মুক্তিকে অনুসন্ধান করে চলেছি। পাশ্চাত্যের দিকে তাকালে দেখব, পার্থিব উপকরণের সেখানে অভাব নেই, চিত্তের থেকে বিত্তেরই সেখানে প্রাধান্য। তবু তারা চিত্তমুক্তির অভাবে হতাশাগ্রস্ত। মানুষ হিসেবে তারা আঁকড়ে ধরতে চাইছেন—ত্যাগের মাধ্যমেই আসে ভোগের সার্থকতা। কাজেই মন যখন প্রসন্নভাবে মনুষ্যত্বকে একমাত্র মূলধনরূপে গ্রহণ করে বিলাসসামগ্রীর পরিমাণে সে বদ্ধ হয় না। আবার বিষয়বোধের জন্য যে প্রেরণা জাগে, তাতে মানুষ মানুষকে ঘৃণা করে। অথচ চিত্তের ঐশ্বর্যে যিনি ধনী তিনি সংকটের মুখোমুখি হন না। বুদ্ধদেব, শ্রীচৈতন্য পার্থিব ভোগসুখ ছেড়ে পথের মানুষের জন্য ভিক্ষাব্রত নিয়েছেন। পৃথিবীর বুকে কত রাজা মহারাজা বিপুল সম্পদের পাহাড় বানিয়ে গেছেন, রাজত্বের সীমানা বাড়িয়েছেন অথচ তাদের কথা সেভাবে কে মনে রেখেছে! অন্যদিকে বিত্তের হাতছানিকে তুচ্ছ করে যাঁরা চিত্তমুক্তির পথে পা বাড়িয়েছেন, মানবসভ্যতার ইতিহাসে তাঁরাই প্রাতঃস্মরণীয় হয়ে আছেন। কাজেই আমরা যদি বাইরের চাকচিক্যের চেয়ে অন্তরের মহত্ত্বকে বড় বলে জ্ঞান করি, তাহলে পাশ্চাত্যের মতো ভবিষ্যতে আমাদের হতাশার শিকার হতে হবে না।

## ৪৮ বন্দি যেমন বদ্ধ বিচারকও তেমনি বদ্ধ

আইনের চৌহদ্দিতে বন্দি ও বিচারক দুজনেই বাঁধা পড়ে থাকেন। সমাজের এবং রাষ্ট্রের সামগ্রিক কল্যাণ বিধানের উদ্দেশ্যেই শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ একটি নিয়মশৃঙ্খলা গড়ে তোলে। প্রচলিত অর্থে তাই সে দেশের আইন। কোনো মানুষ যখন সেই নিয়মশৃঙ্খলা লঙ্ঘন করে তখন সমাজ ও রাষ্ট্রের অকল্যাণ হয়। সমাজ ও রাষ্ট্রের চোখে তখন সেই ব্যক্তি অভিযুক্ত আসামি। আসামিকে বন্দি করে বিচারকের কাছে নিয়ে আসা হয়। অভিযোগের সকল দিক বিচার করার দায় তখন বিচারকের। যতদিন এই বিচারের কাজ শেষ না হয় ততদিন অভিযুক্তকে বন্দি অবস্থায় থাকতে হয়। তখন তার স্বাধীনতা থাকে না। আপাতদৃষ্টিতে আমরা মনে করি বিচারাধীন এই বন্দিই কেবলমাত্র পরাধীন বা বদ্ধ। কিন্তু একবারও আমাদের মনে আসে না বন্দির সঙ্গে আর একটি মানুষও তার স্বাধীনতা হারিয়ে ফেলেন– তিনি তার অপরাধের বিচারক। বিচারক খুশিমতো বিচারাধীন ব্যক্তিকে বেকসুর খালাস করে দিতে পারেন না, আবার দণ্ডবিধানও করতে পারেন না। তার ব্যক্তিগত ইচ্ছা-অনিচ্ছার কোনো মূল্যই থাকে না। তাকে সংশ্লিষ্ট দেশের আইনের আশ্রয় এবং অভিযুক্তের সপক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তিগ্রাহ্য প্রমাণ সম্বল করে এগিয়ে যেতে হয়। দেশের আইন মোতাবেক বিচারককে কাজ করতে হয়। বিচারক স্বাধীনভাবে চলতে চাইলে বিচার ব্যবস্থা প্রহসনে পরিণত হবে। কাজেই তার আপন খেয়ালখুশির স্বাধীনতা বলতে কিছু থাকে না। আইনের বেড়াজালে বিচারাধীন বন্দি যেমন বাঁধা তেমনি বাঁধা পড়ে থাকেন স্বয়ং বিচারকও। তাই বলা হয়, বন্দি যেমন বদ্ধ, বিচারকও তেমনি বদ্ধ।

## ৪৯ বন থেকে জানোয়ার তুলে আনা যায়, কিন্তু জানোয়ারের মন থেকে বন তুলে ফেলা যায় না

বনে বাস করে বন্যজন্তু, লোকালয়ে বাস করে মানুষ। কাজেই জন্তু ও মানুষের মধ্যে স্বভাব ও প্রকৃতিগত পার্থক্য রয়েছে। কিন্তু মানুষও প্রাণী। হিংসা, বিদ্বেষ, পাশবিকতা, হিংস্রতা, লোলুপতা ইত্যাদি মানুষের মধ্যে রয়েছে। কিন্তু এসব অতিক্রম করে প্রীতি, মমত্ব, সুস্থভাব ও সুচরিত্র অর্জন করাই মনুষ্য জীবনের সার্থকতা। এ সব গুণাবলীর জন্য মানুষ জন্তু থেকে পৃথক। মনুষ্যত্বের সাধনা মানুষকে মহীয়ান ও গরীয়ান করেছে,



সুসভ্য করেছে। জন্তুকেও সুসভ্য করার একটা প্রয়াস হয়তো নেয়া যেতে পারে। কিন্তু মানবিক স্বভাবের যে উত্তরণ আছে, জন্তুর মধ্যে তা পাওয়া যায় না। জন্তুকে মানবসমাজে নিয়ে এলেও জন্তুর স্বভাবের পরিবর্তন হবে না। জন্তুর মনের মধ্যে রয়েছে বন, বনই তার এলাকা, সেখানে সে আপন স্বভাবে বিচরণরত। বন থেকে তুলে এনে যতই তাদের সুসভ্য করার চেষ্টা করা হোক না কেন, তারা বন্য স্বভাবেই থাকবে। বৃহত্তর অর্থে মানুষের ক্ষেত্রেও একথা সত্যি। নীচ প্রকৃতি, প্রবৃত্তি বা স্বভাবের মানুষদের আমরা যতই ভালো করার চেষ্টা করি না কেন, তা ব্যর্থ হবে। কারণ, স্বভাব কখনো বদলায় না। মানুষের সমাজে থেকেও তারা জন্তু-জানোয়ারের মতো আচরণ করে। হিংস্র, জঘন্য ও নীচ প্রকৃতির স্বভাবের কারণেই এরা ঘৃণিত ও অনাকাঙ্ক্ষিত সকলের নিকট।

## ৫০ বন্যেরা বনে সুন্দর; শিশুরা মাতৃক্রোড়ে

সৃষ্টিজগতে সবকিছুই নিজ নিজ পরিবেশ ও পারিপার্শ্বিকতায় স্বাভাবিক সৌন্দর্যে অনুপমতা পায়। পরিবেশের সঙ্গে থাকে তার স্বাভাবিক ও স্বচ্ছন্দ সম্পর্ক। পরিবেশগত বৈশিষ্ট্যের অনুষঙ্গেই বিকশিত হয় তার স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য। পরিবেশ-বিচ্ছিন্ন হলে তার সে স্বাভাবিক সৌন্দর্য ম্লান হয়ে যায়।

মানবজীবনে পরিবেশের প্রভাব অসামান্য। বিচিত্র পরিবেশ মানবজীবনে ফেলেছে বৈচিত্র্যময় প্রভাব। অরণ্যচারী মানুষ আরণ্যক জীবনেই পায় স্বতঃস্ফূর্ত স্বাচ্ছন্দ্য। পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিজস্ব পন্থায় তারা প্রকৃতির সঙ্গে জীবন-সম্পর্ক গড়ে তোলে। তাদের জীবন পদ্ধতি ও সংস্কৃতি গড়ে ওঠে আরণ্যক পরিবেশের সঙ্গে যোগসূত্র ও সঙ্গতি রেখে। অরণ্যলালিত সহজ-সরল অনাড়ম্বর জীবনেই তারা পরিতৃপ্ত। প্রাকৃতিক পরিবেশেই এরা সুন্দর, মানানসই। আলো-ঝলমল নাগরিক পরিবেশে এরা স্বাভাবিক স্বাচ্ছন্দ্য ও সৌন্দর্য হারায়; পরিবেশের সঙ্গে হয় বেমানান। আরণ্যক পটভূমিতেই অরণ্যচারী মানুষের সৌন্দর্য পায় সর্বাধিক সুষমা। শিশুর সৌন্দর্যও সর্বাধিক মহিমা পায় মায়ের কোলে। মায়ের কোল শিশুর নিরাপদ আশ্রয়স্থল। শিশু তার মাতৃসান্নিধ্যে পায় অনুপম স্নেহ। মায়ের কোল থেকে শিশুকে বিচ্ছিন্ন করা হলে সে কেবল সৌন্দর্য হারায় না, বরং নিরাপদ আশ্রয়চ্যুত হওয়ার শংকা ও অনিশ্চয়তায় তার মুখে বেদনার ছাপ পড়ে। এমনিভাবে স্বাভাবিক জীবন পরিবেশ থেকে বিচ্ছিন্ন হলে প্রতিটি প্রাণীই তার স্বাভাবিক সৌন্দর্য হারায়। জীবনের সঙ্গে পরিবেশের যোগ যেমন অবিচ্ছিন্ন তেমনি স্ব-স্ব পরিবেশের পটভূমিতেই জীবসত্তা পায় স্বাভাবিক সৌন্দর্য ও অনুপম বৈশিষ্ট্য। তা না হলে কেবল অসঙ্গতি ঘটে না, অনেক সময় তা দৃষ্টিকটু হয়ে ওঠে।

## ৫১ বিশ্রাম কাজের অঙ্গ এক সঙ্গে গাঁথা নয়নের অংশ যেমন নয়নের পাতা

কাজই জীবন, কাজের মধ্যেই মানুষ বেঁচে থাকে। যে ব্যক্তি জীবনে যত বেশি কাজ করতে পারে তার সফলতা ও সুখ তত বেশি। তবে এ কথা মনে রাখতে হবে যে, মানুষ শুধু কাজের খাতিরেই কাজ করে না, মানুষ কাজ করে সুখের জন্য, শান্তির জন্য। সুতরাং সেই সুখকে অনুভব করার জন্য তাকে পর্যাপ্ত বিশ্রাম নিতে হয়। যেখানে কাজ আছে বিশ্রামকে সেখানে থাকতেই হবে। চোখের পাতা যেমন চোখেরই একটা অংশ তেমনি বিশ্রামও কাজের একটা অংশ। চোখের কাজ দেখা কিন্তু চোখের পাতা সেই দেখার কাজ কখনো কখনো বন্ধ রেখে চোখকে অবসর দেয়। এতে চোখকে আরো বেশি কাজ করার সুযোগ দেয়া হয়। আমরা যদি কিছু সময় একটানা কাজ করি, তবে আমাদের শরীর ক্লান্ত হয়ে পড়ে এবং কর্মক্ষমতা লোপ পায়। তখন আমরা বিশ্রামের প্রয়োজন অনুভব করি। কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিলে আমাদের ক্লান্তি দূর হয়, মন প্রশান্ত হয় এবং আমাদের কর্মশক্তি ফিরে আসে। আমরা তখন নতুন উৎসাহ ও উদ্দীপনা নিয়ে কাজে

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



আত্মনিয়োগ করতে সক্ষম হই। এ জীবন কর্মময়। জীবনধারণ ও জীবনযাপনের জন্য মানুষের কর্ম সম্পাদন অপরিহার্য। সেদিক থেকে বিচারে মানুষের জীবন কর্মচক্রের অনিবার্য বন্ধনে আবদ্ধ। সে বন্ধন থেকে মানুষের মুক্তি নেই। কিন্তু বিরতিহীন কর্ম সম্পাদনে মানুষের জীবন হয় দুর্বিষহ।

সেজন্যে কর্মময় জীবনের ধূসর মরুভূমিতে ছায়াশীতল মরুদ্যানের মতো আবির্ভূত হয় বহু কাঙ্ক্ষিত অবকাশ। কর্মবিরতির অমূল্য ছাড়পত্র বহন করে সে নিয়ে আসে ছুটির নিমন্ত্রণ। এ অবসরে নতুন কর্মোদ্যমের প্রেরণা সৃষ্টি হতে থাকে দেহ ও মনে। কর্মবিরতি তাই কর্মময় জীবন ও জগতের একমাত্র চাবিকাঠি।

## ৫২ ভোগে সুখ নাই, কর্ম সম্পাদনেই প্রকৃত সুখ

সুখী হওয়ার আকাঙ্ক্ষা মানুষের চিরন্তন। সাধারণ মানুষের ধারণা, ভোগের মধ্যেই সুখ নিহিত। তাই সুখপ্রয়াসী সাধারণ মানুষ নিরন্তর ভোগের উপকরণ সংগ্রহেই মত্ত হয়ে থাকে। কিন্তু চূড়ান্ত বিচারে ভোগপ্রবণতা মানুষকে বিলাসী, আরামপ্রিয়, কর্মবিমুখ ও স্বার্থপর প্রাণীতে পরিণত করে। শেষ পর্যন্ত তার ভোগের ক্ষমতাও লোপ পায়। সুখ সম্বন্ধে এদের ধারণা যথার্থ নয়। যথার্থ সুখ পরিভোগ প্রবণতার মধ্যে পাওয়া যায় না, পাওয়া যায় নিরন্তর কাজের মধ্যে, দেশব্রতী ও মানবব্রতী ভূমিকার মধ্যে।

সুখ সম্পর্কে অনেকের ধারণা ভ্রান্তিজনক। তারা ভোগ-বিলাসিতা, দৈহিক আরাম-আয়েশকে সুখের উৎস ও মাধ্যম বলে মনে করে। আর তাই ভোগ-বিলাসের নানা উপকরণ আয়ত্তে আনার জন্য তাদের চেষ্টার শেষ থাকে না। ভোগের এ ধর্ম আরো ভোগাকাঙ্ক্ষার জন্ম দেয়। ফলে সৃষ্টি হয় গভীর অপরিতৃপ্তির। শেষ পর্যন্ত দেখা যায়, অনেকের মতো ভোগাকীর্ণ জীবন চূড়ান্ত বিচারে সুখ নিশ্চিত করতে পারে না। ভোগই যদি সুখের আকর হতো তবে বিত্ত ও ক্ষমতাবানরাই পৃথিবীর সবচেয়ে সুখী বলে গণ্য হতো। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায়, এরাও জীবনে সুখী হতে পারে না। আসলে ভোগ-বিলাসের উর্ধ্বে মানুষের এক মূল্যবান প্রাপ্তি হলো সুখ। প্রকৃত সুখ পাওয়া যায় মহৎ কর্ম সম্পাদনে। মানুষের জীবন কর্মের মধ্যেই সৃষ্টিশীল হয়, সার্থক হয়। মানুষের সৃজন ক্ষমতা চূড়ান্ত স্ফূর্তি পায় কর্মে। দেশব্রতী, মানবব্রতী কর্মেই মানুষ লাভ করে জীবনের সার্থকতা। এসব কাজের মধ্য দিয়ে মানুষের ব্যক্তিত্বের, আবেগের, মননশীলতার প্রকাশ ঘটে। মানুষ হয়ে ওঠে সার্থক ও পরিপূর্ণ। মানুষের সৃজনশীল ও সার্থক কর্ম যে সুখবোধের জন্ম দেয় তার চেয়ে বেশি সুখ আর কিছুতেই পাওয়া যায় না। দেশের জন্য, মানবতার জন্য যারা আত্মত্যাগের পথ বেছে নেন তাদের সেই আত্মত্যাগের চেয়ে বড় সুখ আর কি আছে। আমাদের দেশে অজস্র শ্রমজীবী মানুষ যারা প্রচণ্ড পরিশ্রম করে আমাদের জীবনের অগ্রগতি নিশ্চিত করছে, তারা খুব সামান্য পেয়েই সন্তুষ্ট হয়। শত অভাবের মধ্যেও কর্ম ও ত্যাগের সুখে তারা বেঁচে থাকে। প্রকৃতপক্ষে ভোগে নয়, ত্যাগ ও সুকর্ম সম্পাদনের মধ্যেই মানব জীবনের চরম ও পরম সুখ নিহীত।

## ৫৩ মঙ্গল করিবার শক্তিই ধন, বিলাস ধন নহে

মানবজীবনে ধন-সম্পদের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। কিন্তু ধন-সম্পদের প্রকৃত গুরুত্ব নির্ভর করে মানবকল্যাণে ও সামাজিক অগ্রগতিতে তা কাজে লাগানোর ওপর। ধন-সম্পদ যদি অপরিমিত পরিভোগ ও বিপুল বিলাসিতায় ব্যয়িত হয় তবে অর্থ তার মৌলিক উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য হারায়। অপচয় না করে মানবকল্যাণে ও সামাজিক অগ্রগতিতে ব্যয় করতে পারলেই ধন-সম্পদের প্রকৃত মূল্যায়ন হয়। ধন-সম্পদের প্রকৃত তাৎপর্য তার সদ্ব্যবহারের সঙ্গেই সম্পৃক্ত। অর্থ-বিত্তের যারা মালিক তারা অনেকেই এ কথা বোঝেন না বা বুঝতে চান না। অনেকেই নানাভাবে বিপুল বিত্ত-বৈভবের মালিক হন। তারা সে সম্পদ ব্যয় করেন বিপুল বিলাসিতা ও ভোগ-লালসা চরিতার্থতার পেছনে। এ অপব্যয় অর্থের সদ্ব্যবহার নয়। তা ব্যক্তিগত অপরিমিত ফূর্তির খোরাক জোগায় বটে, কিন্তু সমাজের কোনো কল্যাণে আসে না। অপব্যয়ী ও বিলাসীরা ভুলে যান যে, প্রায় ক্ষেত্রেই তারা যে বিত্ত-সম্পদের মালিক হন তার পেছনে রয়েছে সমাজের দরিদ্র-নিপীড়িত জনগণের শ্রম। তাদের ধন-সম্পদে সমাজের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর অধিকার রয়েছে। যে সমাজে মানুষ নিরন্ন ও নিরাশ্রয় অবস্থায় ধুঁকে ধুঁকে মরে সে সমাজে বিলাসব্যসনে গা ঢালা রীতিমতো অন্যায়। দারিদ্র্যপীড়িত সমাজে বিলাসিতার পেছনে অপব্যয় কখনো গৌরবের ব্যাপার হতে পারে না। বিলাসিতা এ ক্ষেত্রে সম্পদের অপচয় মাত্র। যে ধন কেবল পরিভোগের পেছনে ব্যয় হয়, সমাজের কোনো কল্যাণে আসে না তা যথার্থ অর্থে ধন নয়। সামাজিক স্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়ে সম্পদের অপব্যয় কখনো সমর্থনযোগ্য হতে পারে না। ধন-সম্পদ মানবকল্যাণে যত বেশি ব্যয় হয়, দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফোটানোর জন্য যদি কাজে লাগানো যায় তবেই ধন-সম্পদের প্রকৃত মূল্যায়ন হয়। সঞ্চয় ও বিনিয়োগের মাধ্যমে দেশে নতুন নতুন কর্মোদ্যোগ গ্রহণ করে উন্নয়ন সাধন করা হলে, মানুষের জন্য কাজের পরিসর বৃদ্ধি করা হলে ধন-সম্পদ সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে উত্তরোত্তর সাফল্য নিয়ে আসে। বস্তুত ভোগবিলাসিতা ধনকে অপচয়ের পথে নিয়ে যায়। সমাজের মঙ্গল সাধনের মধ্যেই ধন পায় তার তাৎপর্যময় গুরুত্ব।



## ৫৪ মুকুট পরা শক্ত, কিন্তু মুকুট ত্যাগ আরো কঠিন

ক্ষমতা অর্জন করা কঠিন, কিন্তু ক্ষমতা থেকে সরে দাঁড়ানো আরো কঠিন। রাজমুকুট ক্ষমতা ও দায়িত্বের প্রতীক। কিন্তু লোভী, ক্ষমতালিপ্সু, উচ্চাকাঙ্ক্ষী মানুষ রাজকীয় ক্ষমতা দখলের জন্য উন্মাদ হয়ে ওঠে। ফলে তার পক্ষে রাজমুকুট ত্যাগ করা কঠিন হয়ে পড়ে। মুকুট পরা অর্থাৎ কোনো জাতি বা সমাজের কর্ণধার হওয়া সহজ ব্যাপার নয়। বিশেষ গুণের অধিকারী না হলে সে দায়িত্ব কেউ পালন করতে পারে না। কঠোর সাধনা ও পরিশ্রমের মাধ্যমে সর্বসাধারণের আস্থাভাজন হতে পারলেই জাতি ও সমাজের নেতৃত্ব দেয়া সম্ভব হতে পারে। পৃথিবীর ইতিহাসে দেখা যায় যাঁরা ক্ষমতায় এসেছিলেন, তাদের বহু সাধনা, শক্তি ও সামর্থ্যের প্রয়োজন হয়েছে। আর ক্ষমতায় আসার পর তাঁর দায়িত্ব ও কর্তব্য আরো কয়েকগুণ বেড়ে যায়। সেসব কর্তব্য শেষ না করা পর্যন্ত ক্ষমতা থেকে সরে যাওয়া মোটেই বাঞ্ছনীয় নয়। একজন সৎ ও ন্যায়পরায়ণ রাজার কাছে রাজমুকুট এক বিশাল দায়িত্ব। কেননা অজস্র ঐশ্বর্যের মধ্যেও তাঁকে বিলাসবিমুখ জীবনযাপন করতে হয়। প্রজাদের সুখ-দুঃখ নিয়েই তাঁর সর্বক্ষণিক চিন্তা। এ দৃষ্টিকোণ থেকে রাজমুকুট পরা এক কঠিন দায়িত্ব। অপরপক্ষে লোভী মানুষ একবার ক্ষমতায় আসতে পারলে ক্ষমতায় থাকার নেশায় সে মত্ত হয়ে ওঠে। এরূপ ক্ষমতার উচ্চাসন থেকে সে কিছুতেই সরে যেতে চায় না। তখন সে অন্যায়ভাবে হলেও ক্ষমতায় টিকে থাকতে চেষ্টা করে; ক্ষমতা ও ভোগের মায়া সে ত্যাগ করতে পারে না। ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়া নিঃসন্দেহে কঠিন ব্যাপার, কিন্তু তার চেয়েও কঠিন ক্ষমতা ত্যাগ করা। কারণ ক্ষমতায় গেলে মানুষের দায়িত্ব-কর্তব্য বেড়ে যায়, তাছাড়া ক্ষমতার মোহও ক্ষমতা ছাড়তে বাধা দেয়। কাজেই মুকুট পরা যেমন শক্ত তেমনি মুকুট পরিত্যাগ করা আরো কঠিন।

## ৫৫ মিথ্যা শুনিনি ভাই
## এই হৃদয়ের চেয়ে বড় কোন মন্দির কাবা নাই

সব উপাসনালয় থেকে শ্রেষ্ঠ মানুষের হৃদয় বা মন। কেননা পবিত্র হৃদয়েই অবস্থান করে স্রষ্টা। তাই হৃদয়ই স্বর্গ—হৃদয়ই সত্য— হৃদয়ই স্রষ্টা।

হৃদয় আছে বলেই মানুষ সৃষ্টির সেরা জীব। হৃদয় আছে বলেই মানুষের মধ্যে প্রেম আছে, কল্পনা আছে, সৌন্দর্যবোধ আছে, ধর্ম আছে। পৃথিবীর সকল পাপ-পুণ্য, ভালো-মন্দ, ধর্ম-অধর্মের পার্থক্য নির্ধারণে মানুষকে পরিচালিত করে তার মন। এ মন বা হৃদয় দ্বারা পরিচালিত হয়ে মানুষ সৎ কাজ

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



আত্মনিয়োগ করতে সক্ষম হই। এ জীবন কর্মময়। জীবনধারণ ও জীবনযাপনের জন্য মানুষের কর্ম সম্পাদন অপরিহার্য। সেদিক থেকে বিচারে মানুষের জীবন কর্মচক্রের অনিবার্য বন্ধনে আবদ্ধ। সে বন্ধন থেকে মানুষের মুক্তি নেই। কিন্তু বিরতিহীন কর্ম সম্পাদনে মানুষের জীবন হয় দুর্বিষহ।

সেজন্যে কর্মময় জীবনের ধূসর মরুভূমিতে ছায়াশীতল মরুদ্যানের মতো আবির্ভূত হয় বহু কাঙ্ক্ষিত অবকাশ। কর্মবিরতির অমূল্য ছাড়পত্র বহন করে সে নিয়ে আসে ছুটির নিমন্ত্রণ। এ অবসরে নতুন কর্মোদ্যমের প্রেরণা সৃষ্টি হতে থাকে দেহ ও মনে। কর্মবিরতি তাই কর্মময় জীবন ও জগতের একমাত্র চাবিকাঠি।

## ৫২ ভোগে সুখ নাই, কর্ম সম্পাদনেই প্রকৃত সুখ

সুখী হওয়ার আকাঙ্ক্ষা মানুষের চিরন্তন। সাধারণ মানুষের ধারণা, ভোগের মধ্যেই সুখ নিহিত। তাই সুখপ্রয়াসী সাধারণ মানুষ নিরন্তর ভোগের উপকরণ সংগ্রহেই মত্ত হয়ে থাকে। কিন্তু চূড়ান্ত বিচারে ভোগপ্রবণতা মানুষকে বিলাসী, আরামপ্রিয়, কর্মবিমুখ ও স্বার্থপর প্রাণীতে পরিণত করে। শেষ পর্যন্ত তার ভোগের ক্ষমতাও লোপ পায়। সুখ সম্বন্ধে এদের ধারণা যথার্থ নয়। যথার্থ সুখ পরিভোগ প্রবণতার মধ্যে পাওয়া যায় না, পাওয়া যায় নিরন্তর কাজের মধ্যে, দেশব্রতী ও মানবব্রতী ভূমিকার মধ্যে।

সুখ সম্পর্কে অনেকের ধারণা ভ্রান্তিজনক। তারা ভোগ-বিলাসিতা, দৈহিক আরাম-আয়েশকে সুখের উৎস ও মাধ্যম বলে মনে করে। আর তাই ভোগ-বিলাসের নানা উপকরণ আয়ত্তে আনার জন্য তাদের চেষ্টার শেষ থাকে না। ভোগের এ ধর্ম আরো ভোগাকাঙ্ক্ষার জন্ম দেয়। ফলে সৃষ্টি হয় গভীর অপরিতৃপ্তির। শেষ পর্যন্ত দেখা যায়, অনেকের মতো ভোগাকীর্ণ জীবন চূড়ান্ত বিচারে সুখ নিশ্চিত করতে পারে না। ভোগই যদি সুখের আকর হতো তবে বিত্ত ও ক্ষমতাবানরাই পৃথিবীর সবচেয়ে সুখী বলে গণ্য হতো। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায়, এরাও জীবনে সুখী হতে পারে না। আসলে ভোগ-বিলাসের ঊর্ধ্বে মানুষের এক মূল্যবান প্রাপ্তি হলো সুখ। প্রকৃত সুখ পাওয়া যায় মহৎ কর্ম সম্পাদনে। মানুষের জীবন কর্মের মধ্যেই সৃষ্টিশীল হয়, সার্থক হয়। মানুষের সৃজন ক্ষমতা চূড়ান্ত স্ফূর্তি পায় কর্মে। দেশব্রতী, মানবব্রতী কর্মেই মানুষ লাভ করে জীবনের সার্থকতা। এসব কাজের মধ্য দিয়ে মানুষের ব্যক্তিত্বের, আবেগের, মননশীলতার প্রকাশ ঘটে। মানুষ হয়ে ওঠে সার্থক ও পরিপূর্ণ। মানুষের সৃজনশীল ও সার্থক কর্ম যে সুখবোধের জন্ম দেয় তার চেয়ে বেশি সুখ আর কিছুতেই পাওয়া যায় না। দেশের জন্য, মানবতার জন্য যারা আত্মত্যাগের পথ বেছে নেন তাদের সেই আত্মত্যাগের চেয়ে বড় সুখ আর কি আছে। আমাদের দেশে অজস্র শ্রমজীবী মানুষ যারা প্রচণ্ড পরিশ্রম করে আমাদের জীবনের অগ্রগতি নিশ্চিত করছে, তারা খুব সামান্য পেয়েই সন্তুষ্ট হয়। শত অভাবের মধ্যেও কর্ম ও ত্যাগের সুখে তারা বেঁচে থাকে। প্রকৃতপক্ষে ভোগে নয়, ত্যাগ ও সুকর্ম সম্পাদনের মধ্যেই মানব জীবনের চরম ও পরম সুখ নিহীত।

## ৫৩ মঙ্গল করিবার শক্তিই ধন, বিলাস ধন নহে

মানবজীবনে ধন-সম্পদের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। কিন্তু ধন-সম্পদের প্রকৃত গুরুত্ব নির্ভর করে মানবকল্যাণে ও সামাজিক অগ্রগতিতে তা কাজে লাগানোর ওপর। ধন-সম্পদ যদি অপরিমিত পরিভোগ ও বিপুল বিলাসিতায় ব্যয়িত হয় তবে অর্থ তার মৌলিক উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য হারায়। অপচয় না করে মানবকল্যাণে ও সামাজিক অগ্রগতিতে ব্যয় করতে পারলেই ধন-সম্পদের প্রকৃত মূল্যায়ন হয়। ধন-সম্পদের প্রকৃত তাৎপর্য তার সদ্ব্যবহারের সঙ্গেই সম্পৃক্ত। অর্থ-বিত্তের যারা মালিক তারা অনেকেই এ কথা বোঝেন না বা বুঝতে চান না। অনেকেই নানাভাবে বিপুল বিত্ত-বৈভবের মালিক হন। তারা সে সম্পদ ব্যয় করেন বিপুল বিলাসিতা ও ভোগ-লালসা চরিতার্থতার পেছনে। এ অপব্যয় অর্থের সদ্ব্যবহার নয়। তা ব্যক্তিগত অপরিমিত ফুর্তির খোরাক জোগায় বটে, কিন্তু সমাজের কোনো কল্যাণে আসে না।



অপব্যয়ী ও বিলাসীরা ভুলে যান যে, প্রায় ক্ষেত্রেই তারা যে বিত্ত-সম্পদের মালিক হন তার পেছনে রয়েছে সমাজের দরিদ্র-নিপীড়িত জনগণের শ্রম। তাদের ধন-সম্পদে সমাজের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর অধিকার রয়েছে। যে সমাজে মানুষ নিরন্ন ও নিরাশ্রয় অবস্থায় ধুঁকে ধুঁকে মরে সে সমাজে বিলাসব্যসনে গা ঢালা রীতিমতো অন্যায়। দারিদ্র্যপীড়িত সমাজে বিলাসিতার পেছনে অপব্যয় কখনো গৌরবের ব্যাপার হতে পারে না। বিলাসিতা এ ক্ষেত্রে সম্পদের অপচয় মাত্র। যে ধন কেবল পরিভোগের পেছনে ব্যয় হয়, সমাজের কোনো কল্যাণে আসে না তা যথার্থ অর্থে ধন নয়। সামাজিক স্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়ে সম্পদের অপব্যয় কখনো সমর্থনযোগ্য হতে পারে না। ধন-সম্পদ মানবকল্যাণে যত বেশি ব্যয় হয়, দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফোটানোর জন্য যদি কাজে লাগানো যায় তবেই ধন-সম্পদের প্রকৃত মূল্যায়ন হয়। সঞ্চয় ও বিনিয়োগের মাধ্যমে দেশে নতুন নতুন কর্মোদ্যোগ গ্রহণ করে উন্নয়ন সাধন করা হলে, মানুষের জন্য কাজের পরিসর বৃদ্ধি করা হলে ধন-সম্পদ সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে উত্তরোত্তর সাফল্য নিয়ে আসে। বস্তুত ভোগবিলাসিতা ধনকে অপচয়ের পথে নিয়ে যায়। সমাজের মঙ্গল সাধনের মধ্যেই ধন পায় তার তাৎপর্যময় গুরুত্ব।

## ৫৪ মুকুট পরা শক্ত, কিন্তু মুকুট ত্যাগ আরো কঠিন

ক্ষমতা অর্জন করা কঠিন, কিন্তু ক্ষমতা থেকে সরে দাঁড়ানো আরো কঠিন। রাজমুকুট ক্ষমতা ও দায়িত্বের প্রতীক। কিন্তু লোভী, ক্ষমতালিপ্সু, উচ্চাকাঙ্ক্ষী মানুষ রাজকীয় ক্ষমতা দখলের জন্য উন্মাদ হয়ে ওঠে। ফলে তার পক্ষে রাজমুকুট ত্যাগ করা কঠিন হয়ে পড়ে। মুকুট পরা অর্থাৎ কোনো জাতি বা সমাজের কর্ণধার হওয়া সহজ ব্যাপার নয়। বিশেষ গুণের অধিকারী না হলে সে দায়িত্ব কেউ পালন করতে পারে না। কঠোর সাধনা ও পরিশ্রমের মাধ্যমে সর্বসাধারণের আস্থাভাজন হতে পারলেই জাতি ও সমাজের নেতৃত্ব দেয়া সম্ভব হতে পারে। পৃথিবীর ইতিহাসে দেখা যায় যাঁরা ক্ষমতায় এসেছিলেন, তাদের বহু সাধনা, শক্তি ও সামর্থ্যের প্রয়োজন হয়েছে। আর ক্ষমতায় আসার পর তাঁর দায়িত্ব ও কর্তব্য আরো কয়েকগুণ বেড়ে যায়। সেসব কর্তব্য শেষ না করা পর্যন্ত ক্ষমতা থেকে সরে যাওয়া মোটেই বাঞ্ছনীয় নয়। একজন সৎ ও ন্যায়পরায়ণ রাজার কাছে রাজমুকুট এক বিশাল দায়িত্ব। কেননা অজস্র ঐশ্বর্যের মধ্যেও তাঁকে বিলাসবিমুখ জীবনযাপন করতে হয়। প্রজাদের সুখ-দুঃখ নিয়েই তাঁর সর্বক্ষণিক চিন্তা। এ দৃষ্টিকোণ থেকে রাজমুকুট পরা এক কঠিন দায়িত্ব। অপরপক্ষে লোভী মানুষ একবার ক্ষমতায় আসতে পারলে ক্ষমতায় থাকার নেশায় সে মত্ত হয়ে ওঠে। এরূপ ক্ষমতার উচ্চাসন থেকে সে কিছুতেই সরে যেতে চায় না। তখন সে অন্যায়ভাবে হলেও ক্ষমতায় টিকে থাকতে চেষ্টা করে; ক্ষমতা ও ভোগের মায়া সে ত্যাগ করতে পারে না। ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়া নিঃসন্দেহে কঠিন ব্যাপার, কিন্তু তার চেয়েও কঠিন ক্ষমতা ত্যাগ করা। কারণ ক্ষমতায় গেলে মানুষের দায়িত্ব-কর্তব্য বেড়ে যায়, তাছাড়া ক্ষমতার মোহও ক্ষমতা ছাড়তে বাধা দেয়। কাজেই মুকুট পরা যেমন শক্ত তেমনি মুকুট পরিত্যাগ করা আরো কঠিন।

## ৫৫ মিথ্যা শুনিনি ভাই
## এই হৃদয়ের চেয়ে বড় কোন মন্দির কাবা নাই

সব উপাসনালয় থেকে শ্রেষ্ঠ মানুষের হৃদয় বা মন। কেননা পবিত্র হৃদয়েই অবস্থান করে স্রষ্টা। তাই হৃদয়ই স্বর্গ—হৃদয়ই সত্য— হৃদয়ই স্রষ্টা।

হৃদয় আছে বলেই মানুষ সৃষ্টির সেরা জীব। হৃদয় আছে বলেই মানুষের মধ্যে প্রেম আছে, কল্পনা আছে, সৌন্দর্যবোধ আছে, ধর্ম আছে। পৃথিবীর সকল পাপ-পুণ্য, ভালো-মন্দ, ধর্ম-অধর্মের পার্থক্য নির্ধারণে মানুষকে পরিচালিত করে তার মন। এ মন বা হৃদয় দ্বারা পরিচালিত হয়ে মানুষ সৎ কাজ

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



করে এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করে। দৈনন্দিন জীবনের দ্বন্দ্ব-সংঘাত, হিংসা-বিদ্বেষ, লোভ-লালসা, স্বার্থচিন্তা, কুমন্ত্রণা প্রভৃতির ক্লেদাক্ত সংস্পর্শে হৃদয়ের অকৃত্রিম হৃদয়বৃত্তি ক্রমশ ক্ষয়ে যেতে থাকে। তা তখন বাইরের বস্তুগত জিনিসের প্রতিবিম্বে ভরপুর হয়ে ওঠে। ব্যক্তির হৃদয়টা পূর্ণ হয়ে যায় পাপে আর জঘন্যতায়। তখন জীবন ও জগতের মহাসত্যের সন্ধানে মসজিদ, মন্দির, গীর্জায় উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে যেতে হয়। মুক্তির সন্ধানে তাকে বাইরের ভুবনে কেঁদে ফিরতে হয়। কিন্তু মুক্তি তো ভেতরের জিনিস, তাকে কি আর বাইরে মসজিদ-মন্দিরে পাওয়া যায়? মুক্তি-সুধার স্বতঃস্ফূর্ত ঝর্ণাধারা থেকে পান করতে হলে তার উৎসমূল হৃদয়েই খোঁজ করতে হবে। কারণ, প্রকৃত মুক্তির সন্ধান রয়েছে একমাত্র হৃদয়ের স্বর্গীয় মন্দিরে। তার চেয়ে বড় উপাসনালয় আর নেই। সুতরাং এ হৃদয়ই সমস্ত উপাসনালয়ের সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান। হৃদয় কলুষিত হলে দিনরাত আরাধনা করলেও কোনো ফল হবে না।

## ৫৬ মানুষ আপনার ঘর আপনি রচনা করে

ব্যক্তিই আপন ভাগ্যনিয়ন্তা। জীবনের পথে যিনি নির্ভয়ে, নির্বিঘ্নে যাত্রা শুরু করেন তিনি অবলীলায় পার হয়ে যান বাধা-বিপত্তির সাত সমুদ্র তেরো নদী; 'সৌভাগ্যের জয়টিকা' তার করায়ত্ত হয়। সংগ্রামমুখর জীবন দৈবকে ভয় পায় না। কারণ কর্ম ও প্রচেষ্টা তার নিত্য সহচররূপে সাহস জোগায়। পৌরুষই হয় তার আসল শক্তি। আর এই শক্তিবলে মানুষ অসম্ভবকে সম্ভব করে, অজেয়কে জয় করে, দুর্লভকে সুলভ করে। ইংরেজিতে একটা প্রবাদ আছে, 'Man is the architect of his own fortune'— মানুষ নিজের ভাগ্য নিজেই তৈরি করে। আর যারা ভীরু, দুর্বল তারা দৈবের দোহাই দিয়ে পড়ে পড়ে মার খায়। সংস্কৃতে আছে–

'উদ্যোগনং পুরুষসিংহমুপৈতি লক্ষ্মীঃ
দৈবেন দিয়মিতি কাপুরুষাঃ বদন্তি।'

যারা উদ্যোগী পুরুষ তারা সিংহের মতো শক্তিশালী। এ পুরুষসিংহদের ভাগ্য সুপ্রসন্ন হয়; ভাগ্যলক্ষ্মী তাদের কাছে ধরা দেয়। আর যাদের মনে সাহস ও দেহে বল না থাকার দরুন উদ্যমহীন তারা দৈবের দোহাই দিয়ে সন্তুষ্ট থাকার চেষ্টা করে। কাপুরুষরা নিজেদের অক্ষমতা ঢাকার জন্য বহু অজুহাত দাঁড় করতে পারে, কিন্তু সৌভাগ্য ইমারতে প্রবেশের ছাড়পত্র কখনোই পায় না। সৌভাগ্য ইমারতের অধীশ্বর তিনিই হতে সক্ষম- যার উদ্যম আছে, শ্রম এবং সংগ্রামকে যিনি ভয় না পেয়ে জয় করার মানসিকতা অর্জন করেন।

## ৫৭ যে সমাজ গতিবিশিষ্ট, সেই সমাজ উন্নতিশীল

গ্রিক পণ্ডিত হেরাক্লিটাস বলেছিলেন, 'পরিবর্তনই প্রকৃতির অপরিবর্তনীয় বিধান।' যে সমাজ এগিয়ে চলে সবেগে, সে সমাজ ক্লেদ-গ্লানি-কুসংস্কার সরিয়ে ফেলে নিজের পথ তৈরি করে নেয়। চলমান জাতি ও সমাজ নতুনকে বরণ করে নেয় বলে চিরভাস্বর হয়ে থাকে। তাতে কুসংস্কার, অবিজ্ঞান বাসা বাঁধতে পারে না; জ্ঞানের আলো সমাজে সর্বত্রগামী হয়। ফলে সে সমাজ অচিরেই প্রতিষ্ঠা পায়। কিন্তু নদীর মতো সমাজও যখন গতি হারায় তখন সেই সমাজে পচন ধরে। মানুষে মানুষে ভেদাভেদ তৈরি হয়, কুসংস্কারে আবদ্ধ হয় নরনারী। শিক্ষা, স্বাস্থ্য সবেতেই অসাম্য ঘোর অমঙ্গল ডেকে আনে। শুরু হয় মনুষ্যত্ব হারিয়ে পশুত্বে এগিয়ে যাবার পাঠ। কথাসাহিত্যিক তারাশঙ্করের কথায়, 'আচার রক্ষা করিতে হইলে বিচার করার কোনো প্রয়োজন হয় না।' লোকাচারের অলঙ্কারে সমাজ সেজে ওঠে। বিধি-নিষেধের গণ্ডিতে আবদ্ধ হয়ে সমাজ ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যায়।



## ৫৮ যে জাতি জীবন হারা অচল অসাড়<br>পদে পদে বাঁধে তার জীর্ণ লোকাচার

গতিশীলতাই জীবনের ধর্ম। যে জাতির প্রাণপ্রবাহ গতিহীন, যারা জড়ের মতো অসাড় তারা কখনো উন্নতি করতে পারে না। স্রোতহীন নদীতে যেমন শৈবাল নিজেকে অচল করে বাধে, চিন্তা ও কর্মে প্রগতিহীন জাতির জীবনে তেমনি জীর্ণ লোকাচার এসে বাধা সৃষ্টি করে। তারা দিন দিন সবদিক থেকে পিছিয়ে পড়তে থাকে।

মানুষ চিন্তা-চেতনা, বিবেক-বুদ্ধি, বিচার-বিবেচনা, কাজকর্ম প্রভৃতির মাধ্যমে নিজেকে প্রাণবন্ত ও প্রগতিশীল রাখে। আত্মোন্নয়ন এর মাধ্যমে জাতীয় উন্নয়নের জোয়ার বয়ে আনে। কিন্তু যে মানুষ প্রগতির ধার ধারে না, অর্থাৎ উন্নয়ন ও পরিবর্তনের কোনো চেষ্টা করে না, তার ভাগ্য কোনোদিন পরিবর্তিত হয় না। তদ্রূপ যে জাতি নিজেদের উন্নয়নের জন্য চেষ্টা না করে, তারা কখনো মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারে না। তারা দিন দিন পিছিয়ে পড়তে থাকে। স্রোতহীন নদীতে যেমন শেওলা জমে, শৈবাল দাম বাধে, তেমনি চিন্তা ও কর্মে গতিহীন জাতির জীবনেও নানা রকম জীর্ণ-শীর্ণ বা তুচ্ছ ও নগণ্য জীবনবোধ লোকাচার তাদের ঘিরে বাসা বাঁধে। তারা নানা রকম কুসংস্কার, অন্ধবিশ্বাসের বেড়াজালে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। আত্মোন্নয়ন, ভাগ্যোন্নয়ন ও জাতীয় উন্নয়ন তাদের কাছে অলৌকিক বলে মনে হয়। তারা অদৃষ্টের দিকে তাকিয়ে থাকে স্থূল বা জড় পদার্থের মতো। আস্তে আস্তে প্রাণচাঞ্চল্য হারিয়ে ফেলে তারা। অন্ধকারাচ্ছন্নতায়, কুসংস্কারে, অলসতায় গা ভাসিয়ে তারা জাতীয় চেতনার কথাও ভুলে যায়। স্বাধীনভাবে চলার ক্ষমতাও তারা হারিয়ে ফেলে। এক সময় পরাধীনতার কালো ছায়া নেমে আসে তাদের ওপর।

যে জাতি গতিশীল, প্রাণচঞ্চল, তাদের মধ্যে জরাজীর্ণতা বাসা বাধতে পারে না। ফলে তারা উন্নতির স্বর্ণশিখরে আরোহণ করতে পারে।

## ৫৯ যে নৌকা হালের শাসন মানে না, তাকে বেসামাল হতেই হয়

হাল ছাড়া নৌকা চলে না, কর্তা ছাড়া সংসার চলে না, রাজা ছাড়া রাজ্য চলে না, নীতি ছাড়া মানুষ চলে না। হাল ছাড়া নৌকা যেমন দিকশূন্য, বেসামাল; অভিভাবকের অবাধ্য সন্তান তেমনি নীতিহীন, বেসামাল, পতন তার অনিবার্য।

প্রতিটি জিনিসেরই একটা চালিকাশক্তির প্রয়োজন আছে। আপনা আপনি কোনো কিছুই চলতে পারে না। এমনকি মানুষও আপনা-আপনি চলতে পারে না। তার বিবেক-বুদ্ধি তাকে চালনা করে। এটাই তার হাল। কিন্তু এ হালের শাসনকে যারা উপেক্ষা করে, তারা পদে পদে লাঞ্ছিত হয়। নদীতে ভাসমান নৌকা যদি হালের শাসন না মানে, তবে তা দিক-বিদিক ছুটতে থাকবে। স্রোতের টানে, বায়ুর প্রবাহে এক এক সময় এক এক দিক যায়; কোনো গন্তব্যে পৌছতে পারে না। হয়ত স্রোতের পাকে পড়ে তা একসময় ডুবে যায়। অস্তিত্ব বিলীন হয়ে যায় তার। মানুষের ক্ষেত্রেও ব্যাপারটি ঠিক সে রকমই। যে পুত্র পিতার শাসন মানে না, যে স্ত্রী স্বামীর কথামতো চলে না, যে ছাত্র শিক্ষকের নির্দেশমতো কাজ করে না, যে জাতি রাষ্ট্রীয় আইন মানে না, সর্বোপরি যে মানুষ মানবতার বা নীতির ধার ধারে না– সে জীবনেও ভালো কিছু করতে পারে না। যে কোনো ক্ষেত্রে সফলতা অর্জন তার কাছে সোনার হরিণের মতো হয়ে দাঁড়ায়। জীবন তাকে বঞ্চিত করে। পতন তার অনিবার্য হয়ে ওঠে। আর সে কারণেই বলা হয়েছে, 'যে নৌকা হালের শাসন মানে না, তাকে বেসামাল হতেই হয়।'

হালের অবাধ্য নৌকা যেমন গন্তব্যে পৌছতে পারে না, ন্যায়-নীতির অবাধ্য মানুষও তেমনি মনুষ্যত্ব অর্জন বা সফলতা অর্জন করতে পারে না।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



## ৬০ যারে তুমি নিচে ফেল, সে তোমারে বাঁধিছে যে নিচে, পশ্চাতে রেখেছ যারে, সে তোমারে পশ্চাতে টানিছে

জীবনের পরিপূর্ণ বিকাশ ও সার্থকতার পিছনে রয়েছে সমষ্টিগত সহযোগিতা। পরস্পরের বোঝাপড়া, সহযোগিতা ও বিশ্বাসই মানুষের সামগ্রিক উন্নয়নের চাবিকাঠি। এর মধ্যেই ব্যক্তি ও সমাজের প্রকৃত কল্যাণ নিহিত রয়েছে।

মানুষ যেহেতু সামাজিক জীব, সেহেতু সমাজজীবনে পরস্পরের সহযোগিতা ছাড়া সে চলতে পারে না। কিন্তু সমাজে একশ্রেণীর মানুষ আছে, যারা ব্যক্তিস্বার্থ বৃদ্ধি, সঙ্কীর্ণতা ও অনুদারতাবশত অন্যদের পিছনে ফেলে রেখে এগিয়ে যেতে চায়। সে শুধু নিজের উন্নতি চায়, অন্যদের নয়। শুধু তাই নয়, অন্যের বড় হওয়ার পথে বাধা সৃষ্টি করে সে সমাজে সমূহ অকল্যাণের সৃষ্টি করে। ফলে ব্যক্তি ও সমাজ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কারণ, যাকে নিচে ফেলে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করা হয় প্রকৃত অর্থে এই এগিয়ে যাওয়াটা নিষ্কণ্টক হয় না। কারণ, পিছনে থেকে সে-ই টেনে ধরে তাকে পিছিয়ে আসতে বাধ্য করে।

সুতরাং কাউকে ক্ষতিগ্রস্ত করে বা পিছনে ফেলে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা না করে পরস্পর সহযোগিতার মাধ্যমেই এগিয়ে যাওয়া সম্ভব। এর মধ্যেই প্রকৃত কল্যাণ নিহিত রয়েছে। একাই উন্নতি করব, আর অন্যদের দাবিয়ে রাখব–এটি কোনো ভালো ও প্রশংসনীয় নীতি হতে পারে না। একা উপরে উঠতে চাইলে পতন হবেই। সে জন্য সকলকে সুযোগ দিতে হবে, সকলের জন্য ভাবতে হবে। সংকীর্ণ ও স্বার্থপর অনুদারতা সমাজের সমূহ ক্ষতি করে। তাই পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে ব্যক্তি, জাতি ও রাষ্ট্রের স্বার্থ বিবেচনা করতে হয়।

## ৬১ যৌবনে অর্জিত সুখ অল্প, কিন্তু সুখের আশা অপরিমিত

মানবজীবন সময়ের হিসেবে খুবই হ্রস্ব। কিন্তু এই স্বল্প সময়ের পরিসরেও এতে রয়েছে নানা বৈচিত্র্য ও পরিবর্তন। শৈশব, কৈশোর যৌবন, বার্ধক্য– এ রকম অনেক ধাপ বা স্তর রয়েছে মানবজীবনের। এর মধ্যে যৌবনকাল নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠ সময়। এ সময় মানুষ আবিষ্কার করে নিজকে। তার ভেতরের নানা সম্ভাবনা, সৌন্দর্য, স্বপ্ন, আকাঙ্ক্ষা, উন্মাদনা প্রবলভাবে সক্রিয় হয়ে ওঠে। শৈশবে মানুষ থাকে অসহায়, অন্যের ওপর নির্ভর করে তার জীবন-মরণ। কৈশোরে দেহমন ধীরে ধীরে পূর্ণতা পেতে থাকে। বার্ধক্যে শরীরমন ও কর্মশক্তি ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হতে থাকে। শুধুমাত্র যৌবনেই মানুষ শক্তি, সাহস ও শরীর-মনের পূর্ণতা পায়। জীবন অমিত সম্ভাবনার আধার হিসেবে প্রতিভাত হয় এবং মানুষ ঝাঁপিয়ে পড়ে বিশাল কর্মযজ্ঞে। তার মন সুখপ্রত্যাশী হয়ে ওঠে এবং এ সুখের পেছনে সে তৃষ্ণার্ত হরিণীর মতো ছুটতে থাকে। তার কাজকর্ম, চিন্তা-চেতনা, লক্ষ্য সবই ধাবিত হয় সেই সুখের দিকে। কিন্তু সুখ নামক সোনার হরিণ এ সময় খুব কমই ধরা দেয়। জীবনের জটিলতা, কর্মব্যস্ততা ও বৈচিত্র্যময় ব্যাপ্তির কারণে এ সময় সুখ অর্জিত হয় খুবই কম। কিন্তু মানুষ যেহেতু কল্পনাবিলাসী ও সুখের মায়ায় আবদ্ধ এক সজ্ঞান জীব এবং যৌবন যেহেতু জীবনের সবচেয়ে সম্ভাবনাময় সময়, সেহেতু তার ভেতর সুখের আকাঙ্ক্ষা খুব তীব্রভাবে বিরাজ করে।

## ৬২ যে সহে সে রহে

মানুষের মতো বাঁচতে হলে বা আপনার অস্তিত্ব বজায় রাখতে হলে এবং জীবনে সাফল্য অর্জন করতে হলে সর্বাগ্রে প্রয়োজন সহনশীলতা। প্রকৃতিবিজ্ঞানী ডারউইন-এর তত্ত্ব Survival of the fittest অনুযায়ী পৃথিবীতে যোগ্যেরই বেঁচে থাকার অধিকার আছে। তাই বিশ্বসংসারে সহ্য করার শক্তি ও যোগ্যতা যার আছে সেই কেবল বেঁচে থাকার অধিকারী।



সহনশীলতা মানবজীবনের অন্যতম সাম্যনীতি। পৃথিবীতে অবিমিশ্র সুখ-দুঃখ বলে কিছু নেই। সুখ-দুঃখ আসলে মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ। বিপদাপদের মধ্য দিয়েই মানুষের যাত্রা শুরু হয়। তাকে সংগ্রাম করতে হয় নানা প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে। রোগ-শোক, দুঃখ-দারিদ্র্য, অন্যায়-অবিচার এসবের চাপে মানব পর্যুদস্ত হয়; চোখে বিভীষিকা দেখে। কিন্তু এসব প্রতিরোধ করার জন্য চাই শক্তি, অধ্যবসায় ও সহিষ্ণুতা। যুদ্ধে জয়-পরাজয় আছেই কিন্তু যে মানুষ পরাজয়কে অম্লান বদনে মাথা পেতে নিয়ে পরবর্তী বিজয়ের জন্য ব্রতী হয় এবং বিজয় অর্জন করতে পারে, সেই যথার্থ বীর।

ইতিহাসের পাতায় এরূপ বহু দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া যায়। স্কটল্যান্ডের রাজা রবার্ট ব্রুস ইংল্যান্ডের রাজা এডওয়ার্ড-এর সাথে ছয়বার যুদ্ধে পরাস্ত হয়েও ধৈর্য ধারণ করেছিলেন এবং সহিষ্ণুতার গুণে পুনরায় যুদ্ধ করে সপ্তমবারের প্রচেষ্টায় শত্রুর কবল থেকে স্বদেশ উদ্ধার করেন। দরিদ্রের ঘরে জন্মগ্রহণ করেও একমাত্র ধৈর্য-সহিষ্ণুতার কারণে জন ব্রিটন ল্যান্ডেন, স্যামুয়েল হয়েছিলেন জগৎ বিখ্যাত। রুটিওয়ালার ছেলে জন ব্রিটন প্রসিদ্ধ সাহিত্যিকরূপে জীবনে মোট ৮৭টি গ্রন্থ রচনা করে গেছেন। ল্যান্ডেন ছিলেন কৃষকের ছেলে আর স্যামুয়েল মুচির ছেলে। বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলাম আজীবন দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রাম করেছেন; সহ্য করেছেন দারিদ্র্যের কষাঘাত। তাঁর সহনশীলতা তাঁর প্রতিভাকে করেছে বিকশিত। যীশুকে ক্রুশবিদ্ধ করার পরও তিনি অসহিষ্ণু হননি। মহানবীর জীবনালেখ্য সহনশীলতার এক অসামান্য দলিল। তাই তো তিনি মক্কা বিজয়ের পরও বন্দিদেরকে দিলেন নিঃশর্ত মুক্তি। ঘোষণা করেন, 'তোমরা সবাই মুক্ত, স্বাধীন।' এই সহনশীলতায় মুগ্ধ হয়েই আশ্চর্য কণ্ঠে বলে ওঠেন উইলিয়াম মুর, 'The magnanimity with which Mohammed treated a people who had so long hated and rejected him is worthy of admiration.'

## ৬৩ শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড

শিক্ষা বা জ্ঞানই মানুষের জীবনধারণ ও উন্নতির প্রধানতম সহায়ক বা নিয়ামক। একদা গুহাবাসী আদিম মানব আজ যে বিস্ময়কর সভ্যতার বিকাশ ঘটিয়েছে তার পেছনে রয়েছে মানুষের যুগ-যুগান্তরের অর্জিত জ্ঞান ও অর্জনের প্রক্রিয়া। এ প্রক্রিয়ার নামই শিক্ষা। এক সময় শারীরিক সামর্থ্য জাতির গর্বের বিষয় ছিল, প্রকৃতি-প্রদত্ত ঐশ্বর্য জাতির অহমিকার উপাদান যুগিয়েছে। কিন্তু জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিস্ময়কর উন্নতির এ যুগে জাতীয় জীবনে শিক্ষার কোনো বিকল্প নেই।

ব্যক্তি ও জাতীয় জীবনের বিকাশে শিক্ষা এক অবিকল্প ব্যাপার। শিক্ষাহীন মানুষ তার নিজের মঙ্গল বোঝে না। জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোয় আলোকিত নয় বলে পদে পদে সে অন্ধকার দেখে। অজ্ঞানতার অন্ধকারে নিমজ্জিত নিরক্ষর জনগোষ্ঠী তাই জাতির জন্যে বোঝাস্বরূপ। 'নিশ্চল জীবনপঙ্কে' রুদ্ধ এ মানুষেরা যতদিন শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত থাকবে, জাতির দুর্ভাগ্য ততই প্রবলতর হতে থাকবে। এ দুস্থ মানুষেরা নিজেরাই মানবেতর জীবনযাপন করবে, সেই সাথে জাতির অগ্রগতির পথে দুর্লঙ্ঘ্য বাধা সৃষ্টি করবে। জাতি আত্মনির্ভর হয়ে সমাজ প্রগতির পথে এগিয়ে যেতে পারবে না। তেত্রিশটি কশেরুকার সমন্বয়ে গঠিত একটি ঋজু অস্থি আমাদের এই সুঠাম দেহকে কর্মক্ষম রেখেছে। এরই নাম মেরুদণ্ড। এর কোনো ক্ষতি মানুষকে জড়প্রায় নির্জীব প্রাণীতে পরিণত করে– যার অস্তিত্বই হয় পরনির্ভর। কোনো আশা বা স্বপ্ন তার কাছে অলীক, অচেনা। শিক্ষাবঞ্চিত জনগোষ্ঠী একই রকমভাবে অস্তিত্বের জন্যই পরান্মুখ, প্রতিযোগিতা পৃথিবীতে একেবারেই অসহায়। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির এ যুগে অশিক্ষিত মানুষের কর্মদক্ষতা ও উৎপাদন ক্ষমতার মান স্বাভাবিকভাবেই নিম্ন হয়। ফলে জাতির যে

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



কোনো কল্যাণমুখী পদক্ষেপে এরা বাধা হয়ে দাঁড়ায়। প্রথাবদ্ধ সংস্কারবশত শিক্ষাহীন মানুষ জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণকে মেনে নিতে পারছে না বলে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে আমাদের দেশে ঈপ্সিত অগ্রগতি হচ্ছে না। অন্ধবিশ্বাস তাদের এমন নির্বোধ করে রেখেছে যে সর্বজনীন কোনো কর্মসূচিতে নিরক্ষর মানুষের অংশগ্রহণ ঘটছে না। শিক্ষা বিবর্জিত এসব মানুষ জাতিকে পিছিয়ে দেয়, জাতিকে পরিণত করে ন্যুব্জ, গর্বহীন, দীপ্তিহীন জনগোষ্ঠীতে। বস্তুত, শিক্ষার প্রসারই পারে সব সংস্কার, জড়তা দূর করে জাতিকে গতিশীল করতে, সমস্যা মোকাবিলায় সক্ষম করে তুলতে, আশা ও স্বপ্ন দেখার সাহস যোগাতে। তাই ব্যক্তি ও জাতীয় জীবনে শিক্ষার গুরুত্ব অপরিহার্য।

## ৬৪ শিক্ষাই শক্তি শিক্ষাই মুক্তি

শিক্ষা মানবজাতির জন্য এক মহার্ঘ্য বিষয়। এটা ব্যতীত মানুষের মনুষ্যত্ব কখনই বিকশিত হয় না। এজন্যই সর্বত্র শিক্ষাকে অত্যন্ত আবশ্যকীয় বিষয় হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এমনকি আমাদের ধর্মেও এর প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব বিবেচনা করে একে সকল নারী-পুরুষের জন্য ফরজ করা হয়েছে। বস্তুত, শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা এবং উপকারিতা এত ব্যাপক যে, এর গুণ বলে শেষ করা যাবে না। প্রাচীনকাল থেকেই দেখা গেছে, যে জাতি শিক্ষা-দীক্ষায় উন্নত, সে জাতির জ্ঞান-বিজ্ঞান, শৌর্য-বীর্য ও প্রভাব-প্রতিপত্তি তত বেশি। প্রাচীন গ্রিক জাতি তাদের শিক্ষা-দীক্ষার জন্যই আজও আমাদের প্রাতঃস্মরণীয় হয়ে আছেন। আর আজকের পৃথিবীর এই যে প্রগতি ও প্রাচুর্য, তার মূলেও রয়েছে শিক্ষার বিস্তৃত প্রভাব।

প্রকৃত প্রস্তাবে শিক্ষার বহুমুখী প্রভাব আমাদের জীবনে বিদ্যমান এবং আমাদের জীবনযাপনে সুষ্ঠু শিক্ষা ব্যতীত আমরা কোনোভাবে উন্নত জীবন অর্জন করতে পারব না। বিশেষত বর্তমানে বিশ্বের প্রধান সমস্যা ক্ষুধা ও দারিদ্র্য। আমরা যদি এসবের কারণ উদঘাটন করতে যাই, তাহলে দেখব এর মূলে রয়েছে অশিক্ষা বা শিক্ষার অভাব। কারণ, শিক্ষা বা জ্ঞানচর্চা আমাদের বিভিন্ন সমস্যার যথার্থ সমাধানের পথের সন্ধান দেয়। বিভিন্ন সমস্যা মোকাবিলার কৌশল অর্জনে সাহায্য করে। আমরা যদি ইতিহাসের দিকে লক্ষ্য করি তাহলে দেখব, মানুষ যখনই বিভিন্ন সমস্যার মুখোমুখি হয়েছে, তখন সে তার অর্জিত শিক্ষা বা জ্ঞান দ্বারা এর সমাধানের কৌশল উদ্ভাবন করেছে। আর এভাবেই মানুষ পৃথিবীকে একটি সুন্দর আবাসভূমি হিসেবে নির্মাণের প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু আজও বহুলাংশে মানুষ ক্ষুধা ও দারিদ্র্য দ্বারা পীড়িত। কিন্তু পৃথিবীর সবাই বা সব জাতি এ সমস্যা দ্বারা পীড়িত নয়। এর কারণও শিক্ষা। আমরা দেখছি, উন্নত বা সুশিক্ষিত জাতি ক্ষুধা ও দারিদ্র্য দ্বারা পীড়িত নয়। বরং তারা তাদের শিক্ষার দ্বারা অর্জিত জ্ঞান ও প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে এ সমস্যা মোকাবিলার শক্তি ও সামর্থ্য অর্জন করেছে। আর যেসব জাতি সুশিক্ষিত নয় বা শিক্ষার হার যথেষ্ট কম, তারাই ক্ষুধা ও দারিদ্র্যের যাঁতাকলে নিষ্পৃষ্ট হচ্ছে।

অতএব, এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায়, শিক্ষা অবশ্যম্ভাবীরূপে সমাজ থেকে ক্ষুধা ও দারিদ্র্য দূরীকরণের কার্যকর উপায়। কেননা শিক্ষার দ্বারা মানুষ এ সমস্যা উত্তরণের শক্তি অর্জন করে এবং শিক্ষার দ্বারাই কেবল মানুষ এ সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে পারে।

## ৬৫ সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই

চিন্তা ও কর্মে, বিবেক ও শক্তিতে, হৃদয়ধর্ম ও নান্দনিকতা বোধে পৃথিবীতে মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব অবিসংবাদিত। সমরূপ মানব বৈশিষ্ট্যে বিশ্বের মানবসমাজ এক অভিন্ন পরিবারভুক্ত। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে স্বার্থান্বেষী ও ক্ষমতাদর্পী কিছু মানুষ হীনউদ্দেশ্যে মানুষে মানুষে সংকীর্ণ ভেদাভেদ সৃষ্টি করতে প্রয়াসী। তারা ধর্ম, বর্ণ ও সম্প্রদায়গত পার্থক্য উসকে দিয়ে জাতিগত বিভেদ ও শ্রেণীগত বৈষম্য সৃষ্টি করে



সংঘাত, সংঘর্ষ ও হানাহানির মধ্যে মানুষকে ঠেলে দিতে চায়, মানবিক সম্প্রীতির বন্ধনকে ছিন্নভিন্ন করতে চায়। কিন্তু মানুষের আসল পরিচয় তার মনুষ্যত্বে, তার সবচেয়ে বড়ো ধর্ম মানবধর্ম।

বিশ্ব প্রকৃতিতে মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা ঐতিহাসিক বাস্তবতা। সভ্যতার আদিলগ্নে মানুষ অসহায় হলেও প্রতিকূল পরিবেশের সঙ্গে দুর্মর সংগ্রামে মানুষ কেবল আপন অস্তিত্ব রক্ষা করেনি, প্রকৃতির ওপর ক্রমেই আধিপত্য বিস্তার করেছে। সভ্যতা নির্মাণ করতে গিয়ে মানুষ লোকালয়, গ্রাম ও নগর গড়েছে। মানুষের জ্ঞান, বুদ্ধি, শ্রম ও কৌশলের কাছে নদী, সাগর, মরু, গিরি-অরণ্য-পর্বত হয়েছে পদানত। আগুন ও বিদ্যুতের মতো শক্তিকে মানুষ নিয়ে এসেছে হাতের মুঠোয়। মহাকাশে তুলেছে বিজয় কেতন। পা বাড়িয়েছে ভিন গ্রহে। রোবট ও কম্পিউটারের মতো ক্ষমতাধর বিস্ময়কে উদ্ভাবন করেছে মানুষ। শিল্প, সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন ও প্রযুক্তির নিত্যনতুন শাখায় একের পর এক সাফল্য অর্জন করে মানুষ প্রমাণ করেছে তার অবিসংবাদিত শ্রেষ্ঠত্ব। এই শ্রেষ্ঠত্বের দাবিদার কোনো একক মানুষ নয়, সমগ্র মানবসত্তা। দেশে দেশে কালে কালে মহামানবরা সেই মানবতার জয়গানেই মুখর হয়েছেন। মানবসভ্যতার দুর্দিনে জাতি-ধর্ম-বর্ণ সম্প্রদায়ের ঊর্ধ্বে এ মানবতারই জয় হয়েছে। প্রমাণিত হয়েছে সবার ওপরে মানুষ সত্য।

## ৬৬ সবলের পরিচয় আত্মপ্রসারে আর দুর্বলের পরিচয় আত্মগোপনে

মানুষ সৃষ্টির সেরা জীব। তাকে আত্মকেন্দ্রিক থাকলে চলবে না। তাকে বিলিয়ে দিতে হবে বিশ্ব মানবতার কল্যাণে। মানুষ নিজেকে কতটা জানল, কতটা অন্যের প্রয়োজনে নিজেকে নিয়োজিত রাখল তার মাঝেই ফুটে ওঠে তার সবলতা বা দুর্বলতা।

আমাদের মনের একটি স্বাভাবিক প্রবৃত্তিই এই, সে নানা মনের মধ্যে নিজেকে অনুভূত করতে চায়। প্রকৃতিতে আমরা দেখি ব্যাপ্ত হবার জন্য বা টিকে থাকার জন্য সর্বদা একটা চেষ্টা চলছে। যে জীব নিজের অস্তিত্বকে বেশি প্রসার করতে পারে তার টিকে থাকার সম্ভাবনা তত বেশি। তেমনি সবলেরা মানুষের মাঝে মনের ভাবকে ছড়িয়ে নিজের অস্তিত্বকে স্থায়িত্ব দিতে চায়। তারা শুধু নিজেকে নিয়ে ভাবে না; সমগ্র মানুষের মাঝে তার জ্ঞান, আত্মোপলব্ধি ছড়িয়ে দিয়ে অমর হতে চায়। বৈচিত্র্যময় কর্মপ্রবাহের মাধ্যমে মানুষ নিজের কৃতিত্বের পরিচয় দিতে পারে। তারা নিজের স্বার্থ ত্যাগ করে পরোপকারের মাধ্যমে চরিত্রের মহত্ত্ব প্রকাশ করতে পারে। এখানেই সবলদের যথার্থ গৌরব নিহিত থাকে। তারা জীবনকে পরার্থে নিয়োজিত করে জীবনে সার্থকতা আনয়ন করে তারা স্নেহ, প্রেম, মায়ার বন্ধন, সুকঠিন কর্তব্যকর্মের বন্ধনে এগিয়ে যায় সামনে। যুগে যুগে এসব মানুষ আপন উপলব্ধি, অভিজ্ঞতা, সঞ্চিত জ্ঞান, ধর্ম, দর্শন প্রভৃতির মাধ্যমে মানুষকে দিয়েছে মুক্তির সন্ধান। তারাই বীর, সমাজ তাদের দ্বারা উপকৃত হয়। তেমনি অনেক মানুষ রয়েছে যারা বস্তুবাদী ও স্বার্থপর। তারা নিজেকে ছাড়া অন্যদিকে তাকাবার সময় পায় না। শামুকের মতো নিজেকে লুকিয়ে রাখে খোলসের মাঝে। নিজেকে বিশ্বসমাজে প্রকাশ করতে তারা ভয় পায়। প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার মানসিকতা তাদের নেই। তারা আত্মকেন্দ্রিক। তাদের আত্মকেন্দ্রিকতা বা আত্মগোপন প্রবণতা তাদের পরিচয় বহন করে। তারা ভীরু, তারা দুর্বল প্রকৃতির মানুষ। তাদের দ্বারা বিশ্ব মানবতার কোনো উপকার হয় না। কেননা, 'স্বার্থমগ্ন যে জন বিমুখ বৃহৎ জগৎ হতে, সে কখনো শেখেনি বাঁচিতে।' ঝিনুকের মতো স্বল্প পরিসরে, গৃহ প্রাঙ্গণে আবদ্ধ থাকলে, আত্মকেন্দ্রিক থাকলে মন ও হৃদয় সংকুচিত হবে। নিজেকে বিলিয়ে দিতে হবে সবলের মতো বিশ্ব মানবের কল্যাণে; তবেই প্রকৃত সুখ, বেঁচে থাকার সার্থকতা।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



## ৬৭ সাহিত্য জাতির দর্পণস্বরূপ

সাহিত্যের মাধ্যমে একটি জাতির ধ্যান-ধারণা ও চিন্তার প্রকাশ ঘটে। আয়নার সামনে দাঁড়ালে আমরা যেমন নিজেদের প্রতিবিম্ব দেখতে পাই, তেমনি সাহিত্যের মধ্যে একটি জাতির সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয়, রাজনৈতিক, রাষ্ট্রীয় তথা সামগ্রিক পরিবেশ ফুটে ওঠে অর্থাৎ জাতি সাহিত্য-দর্পণে নিজেদেরকে যাচাই করার সুযোগ পায়।

যে কথাগুলো মানুষের কল্যাণ বর্ধন করে, যা অর্থপূর্ণ, যা শুনলে শ্রোতার মনে জ্ঞানের উদয় হয়, তা-ই সাহিত্য। সাহিত্য জীবনের সঙ্গে সম্পর্কিত, জীবনের জন্য, জীবনকে নিয়ে, জীবননির্ভর। Literature is the criticism of life—সাহিত্য জীবন সমালোচনা। সাহিত্য দুর্বল মানুষকে দেয় প্রেরণা, তার সুপ্ত শক্তিকে করে জাগ্রত, দরিদ্রকে করে নির্লোভ, প্রবৃত্তিকে দেয় আনন্দ। সাহিত্যে বিধৃত হয় যুগ-পরিবেশ। একসময় ভারতবর্ষে দ্রৌপদী পাঁচ স্বামী নিয়ে সংসার বেঁধেছিল, তা সত্ত্বেও সে ছিল সতী, পতিব্রতা। কিন্তু আজকের উপমহাদেশে পাঁচ স্বামী নিয়ে সংসার যেমন রুচি বিগর্হিত তেমনি কলঙ্কিত। অন্যদিকে রবীন্দ্র-ছোটগল্পের নায়িকা, উনবিংশ শতাব্দীর নারীদের অধিকাংশ পাঁচ থেকে বারো বছরের মধ্যে সংসার করেছে, ছেলে-পুলে নিয়ে সুখী হয়েছে, কুড়িতেই হয়েছে বুড়ি। কিন্তু বর্তমান বাংলা সাহিত্যের নায়িকাদের বয়স বিশ ছাড়িয়ে যাচ্ছে, কুড়িতেও তারা বুড়ি নয়, পঁচিশ-ত্রিশে বিয়ের কথা ভাবছে বড়জোর। আধুনিক সাহিত্যের নায়িকারা রবীন্দ্র-নায়িকাদের মতন কলতলা, পুকুর ঘাট, নদীর ঘাট, ফল বাগানে দেখা করে না। তারা পার্কে-রেস্তোরাঁয়, নিউমার্কেটের বিপণি বিতান, ভার্সিটির করিডোরে মিলিত হয়। এভাবে যুগের পরিবর্তনের সাথে সাথে মানুষের জীবনের পরিবর্তনকে সাহিত্য ফুটিয়ে তুলছে। জাতির সামগ্রিক জীবনযাত্রা প্রতিফলিত হচ্ছে সে দর্পণে।

সাহিত্যের পরিধি বিশাল ও ব্যাপক। মানুষের জীবনের বিচিত্র ভাবকে চিত্রিত করে সাহিত্য। সিরাজউদ্দৌলা নাটক থেকে বিশ্বাসঘাতক হতে চায় না মানুষ, দেশপ্রেমিক নবাব হতে চায়। রামায়ণ পড়ে সীতার মতো সতীত্বের ঔজ্জ্বল্যে দীপ্তিময় হতে চায় রমণীরা। বিষাদসিন্ধুর ইমাম হাসান, হোসেন ও পৌত্তলিক আজরের প্রাণ বিসর্জন মানুষকে করে উদ্দীপ্ত। লিও টলস্টয়ের ওয়ার অ্যান্ড পীসে যুদ্ধ নয় শান্তিই বড় হয়ে ওঠে। সাহিত্য নিষ্ঠুর অত্যাচারী মানুষের বিরুদ্ধে সংগ্রামের বাণী উচ্চারণ করে। ভলটেয়ার, রুশোর সাহিত্য স্বেচ্ছাচারী ফরাসি রাজশক্তির বিরুদ্ধে গণমনকে চেতনাদীপ্ত, অনুপ্রাণিত করেছে। ম্যাক্সিম গোর্কির সাহিত্য জারের শাসনের মৃত্যুঘণ্টা বাজিয়েছিল। বিদ্রোহী কবি নজরুল ব্রিটিশ শাসকের শোষণ থেকে দেশকে মুক্ত করার জন্য বলে উঠেছিলেন–

'শিকল পরা ছল
মোদের এই শিকল পরা ছল'

এমনিভাবে সাহিত্যে জাতির সমসাময়িক গৌরব ও উন্নতি-অবনতির কাহিনী বিধৃত হয়। প্রেম-ভালবাসা, ত্যাগ, যুদ্ধ, হিংসা, জয়-পরাজয়, ব্যক্তিত্ব, নীতিহীনতা, উদারতা, ক্ষমা সবই সাহিত্যের বিষয়। সাহিত্য জীবন সম্পর্কে দেয় সত্যতম, গভীরতম ধারণা।

## ৬৮ সততাই সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা বা নীতি

সততা একটি পরম গুণ। এই সততা পরম দুঃখ-কষ্টে অর্জিত ধন। কর্মক্ষেত্রে একমাত্র সততার দ্বারাই প্রতিষ্ঠা লাভ সম্ভব। এ পৃথিবীতে ভালো-মন্দ, সৎ-অসৎ, সত্য-মিথ্যা পাশাপাশি বিরাজমান। এখানে সাধু ও সৎপথের যাত্রী যেমন রয়েছে তেমনি রয়েছে মিথ্যা ও অসৎ পথের যাত্রী। জীবনে প্রকৃত ও স্থায়ী সাফল্য লাভ করতে হলে সৎপথে জীবন চালিত করাই উত্তম কাজ। কেননা সৎ পথের কোনো বিকল্প নেই। জীবনের যে কোনো ক্ষেত্রে



সততার মূল্য সবকিছুর উর্ধ্বে। একমাত্র একজন সৎ লোকই সবার কাছে বিশ্বস্ত ও শ্রদ্ধাভাজন হতে পারে। অনেক সময় দেখা যায়, অনেকে অসৎ পথে চলেও বিরাট উন্নতি সাধন করেছে। কিন্তু মনে রাখা উচিত তার এ উন্নতি সাময়িক ও ক্ষণস্থায়ী। তাসের ঘরের মতো যে কোনো মুহূর্তে তা ভেঙ্গে যেতে পারে। অসৎ পথে অর্জিত সাফল্য একদিন না একদিন ধ্বংস হবেই। তাছাড়া অসৎ পথের যাত্রী টাকার জোরে সম্মান ও প্রতিপত্তি লাভ করলেও, আকাশে আরোহণ করলেও মানুষ মনে মনে তাকে ঘৃণা করে।

পক্ষান্তরে সৎ পথের যাত্রী যত দুঃখ ও দৈন্যের মধ্যেই জীবনযাপন করুক না কেন, মানুষের কাছে সে শ্রদ্ধার পাত্র। ব্যবসা-বাণিজ্য, রাজনীতি, সমাজনীতি ইত্যাদি যে কোনো ক্ষেত্রে একমাত্র সৎপথের যাত্রীই পরিণামে সাফল্যের স্বর্ণশিখরে আরোহণ করতে পারে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের প্রতি দৃষ্টিপাত করলে এ কথা সহজেই অনুধাবন করা যায়। একমাত্র সততার দরুনই আমেরিকা বিশ্বের রাষ্ট্রসমূহের সর্বোন্নত ও সর্বশ্রেষ্ঠ দেশ হিসেবে আজ বিশ্বরাষ্ট্রের নেতৃত্ব দেয়ার সাহস অর্জন করেছে। ইতিহাসের পাতা থেকে জানা যায়, কবি নজরুল ইসলাম একজন অতি দরিদ্র লোক ছিলেন। কিন্তু তিনি এই দরিদ্র অবস্থা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য কোনো অসৎ পথ অবলম্বন করেননি। এ কারণে বিভিন্ন অভাব-অভিযোগ, দুঃখ-কষ্ট এসে বাসা বেঁধেছিল তাঁর জীবনে। কিন্তু তিনি সেসব দুঃখ-কষ্টকে উপেক্ষা করে অসত্যের কাছে হার না মেনে আজ বিশ্বের দরবারে প্রতিষ্ঠিত এক কবি ও সাহিত্যিক।

মহৎ কাজ করতে গেলে ও সৎপথে চলতে গেলে হাজার দুঃখ-কষ্ট এসে আমাদের পথ রোধ করে দাঁড়াবেই। কিন্তু এসব দুঃখ-কষ্টকে বাধা হিসেবে না মেনে, সত্যের পথ পরিত্যাগ না করে কর্মক্ষেত্রে অগ্রসর হওয়া উচিত। মনে রাখা দরকার যে, একদিন না একদিন সততার জয় এবং অসততার পরাজয় অবশ্যম্ভাবী।

## ৬৯ সুশিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রই স্বশিক্ষিত

শিক্ষা সম্পূর্ণভাবে অর্জনসাপেক্ষ। একে কেনা যায় না, দান করা যায় না। শিক্ষার্থীর পরিশ্রম, নিষ্ঠা আর মেধাই তাকে শিক্ষিত করে তুলতে পারে। শিক্ষক তাকে সাহায্য করেন, দিক-নির্দেশনা দেন। শিক্ষকের ভূমিকা নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ। তবে স্বাভাবিকভাবেই তা একটা পর্যায়ে সীমিত। সেই পর্যায় অতিক্রম করার দায়িত্ব একান্তভাবে শিক্ষার্থীর এবং এক্ষেত্রে সফল হওয়াই সুশিক্ষিত হয়ে ওঠার নামান্তর।

জন্মের পর থেকেই মানুষের শিক্ষা জীবন শুরু হয়। মানুষ প্রথমে অনুকরণের মাধ্যমে পরিজন ও পরিবেশ থেকে শিক্ষা নেয়। তারপর তার জীবনে আসে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার সুযোগ। কিন্তু শুধু পরীক্ষা পাস বা সার্টিফিকেট দিয়ে প্রকৃত শিক্ষা নিরূপণ করা যায় না। উন্নত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, পেশাদারি দক্ষ শিক্ষক, আধুনিক উপকরণ কখনো কখনো শিক্ষার্থীর সীমাবদ্ধতাকে আড়াল করে পরীক্ষায় তার কৃতিত্ব প্রদর্শন সম্ভব করে তোলে। কিন্তু এটাকে সুশিক্ষিত হওয়া বলে না। কারণ, প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় জ্ঞানচর্চার পথ সুগম হলেও জ্ঞানের পূর্ণতা আসে না। জ্ঞানকে আত্মস্থ করার জন্য বস্তুত আত্মপ্রয়াসের বিকল্প নেই। সাধকের একাগ্রতা আর প্রচণ্ড পরিশ্রমের গুণে মানুষ জ্ঞানের গভীরতর প্রদেশে প্রবেশ করতে পারে। স্বীয় চেষ্টায় সে তার বুদ্ধিবৃত্তিকে পরিশীলিত করে অসাধারণ পর্যায়ে নিয়ে যায়। তার মধ্যে স্বকীয়তা বা মৌলিকতার উন্মেষ ঘটে, শিক্ষার সর্বোচ্চ স্তরে সে অবাধে বিচরণ করতে পারে। এই অর্জন যোগ্যতা ছাড়া সম্ভব নয়। ডিগ্রি বা সার্টিফিকেটের গণ্ডিতে এর স্বীকৃতি নেই। তাই প্রকৃত শিক্ষায় প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা গৌণ। পৃথিবীতে এমন অনেক সুশিক্ষিত লোক আছেন যাঁরা প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার গণ্ডি অতিক্রম করেননি। রবীন্দ্র-নজরুল এর উৎকৃষ্ট উদাহরণ। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা যাঁদের আছে তাঁরাও যে সবাই সুশিক্ষিত, তা নয়। যিনি কুসংস্কার ও প্রথার বন্ধনে নিজেকে বেঁধে রেখেছেন, তিনি ডিগ্রিধারী হলেও সুশিক্ষিত তাকে বলা চলে না। সুশিক্ষিত লোকের মন মুক্তবুদ্ধির আলোকে উদ্ভাসিত হয়, তিনি বিজ্ঞানমনস্কতা ও যুক্তিবাদী দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী হন। পরিশীলিত রুচিবোধে তিনি হন উদার ও বিনম্র। সব মিলিয়ে সুশিক্ষিত মানুষ নিঃসন্দেহে হন আলোকিত মানুষ। আত্মশিক্ষার পথেই মানুষ আলোকিত মানুষ হয়ে উঠতে পারে।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



## ৭০ সঞ্চয়ই উন্নয়নের মূল চাবিকাঠি

সঞ্চয় হলো সমৃদ্ধির চাবিকাঠি। ক্ষুদ্র সঞ্চয় থেকে বৃহৎ পুঁজি অর্জিত হয়। ব্যক্তি সঞ্চয় থেকে রাষ্ট্রীয় সঞ্চয়ের উৎস তৈরি হয়। তাই সঞ্চয়ী মনোভাবসমৃদ্ধ জাতি ধীরে ধীরে উন্নতির শীর্ষে আরোহণ করতে পারে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বালুকণা এবং বিন্দু বিন্দু জল থেকেই মহাদেশ এবং মহাসমুদ্রের সৃষ্টি। মৌমাছি এবং পিপীলিকা সঞ্চয়ী মনোভাবের কীটপতঙ্গ। তারা সঞ্চয়ী হওয়ায় বিরূপ পরিবেশে আজও টিকে আছে। প্রকৃতির শ্রেষ্ঠ জীব মানুষ হিসেবে আমাদের টিকে থাকতে হলেও সঞ্চয়ী অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে। পৃথিবীর উন্নত জাতিগুলো তাদের সঞ্চয়ী মনোভাবের জন্যই উন্নতির স্বর্ণশিখরে উঠতে পেরেছে। তাই শৈশবকাল থেকেই সঞ্চয়ী হওয়ার অভ্যাস গঠন করতে হয়। প্রত্যেক ধর্মেই মিতব্যয়ী বা সঞ্চয়ী হওয়ার অভ্যাস গঠনের কথা বলা হয়েছে। কেননা সুদিনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয় আমাদের দুর্দিনে মহান আশীর্বাদ হয়ে দেখা দেয়। জাতিগতভাবে সঞ্চয়ী সম্পদ রাষ্ট্রীয় উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে সহায়ক ভূমিকা রাখে। তাই ব্যক্তি, গোষ্ঠী তথা দেশের মঙ্গলের জন্য আমাদের সবাইকে সঞ্চয়ী হওয়া উচিত। তবেই সুখ ও সমৃদ্ধি আমাদের কাছে সোনার হরিণ হয়ে দেখা দিতে বাধ্য এবং উন্নত জাতি হিসেবে বিশ্বের দরবারে আমরা ঠাঁই পাব।

## ৭১ সাধনা নাই, যাতনা নাই

জগতে দুঃখ-কষ্ট আছে এবং থাকবে কিন্তু দৃঢ় প্রতিশ্রুতি, প্রবল চেষ্টা ও সাধনার মাধ্যমে সকল দুঃখ-কষ্ট-যাতনাকে জয় করতে পারলে কোনো যাতনাই থাকে না।

জগতে মানুষের জীবন খুবই জটিল। প্রতিনিয়ত এখানে মানুষের জীবন নানা সমস্যা, দুঃখ-কষ্ট আর বিরূপতার মাঝে পতিত হয়ে থাকে। তাই মানুষকে কণ্টকাকীর্ণ এবং বন্ধুর পথপরিক্রমায় জীবন অতিবাহিত করতে হয়। কিন্তু তাই বলে মানুষ যে দুঃখ-যাতনা আর কণ্টকদাতার দাস, তাও ঠিক নয়। মানুষ তার আপন প্রচেষ্টা, দৃঢ় মনোভাব আর অবিরত সাধনার মাধ্যমে সকল কষ্টকেই অনায়াসে জয় করতে পারে। মানুষের উদ্যম আর সাধনার কাছে কোনো বাধাই অজেয় নয়। তবে এজন্য চাই কঠোর সাধনা। সাধনা না থাকলে জীবনের কণ্টকাকীর্ণ পথে প্রতিনিয়তই মানুষকে নানা বাধা-বিপত্তি আর অশুভ শক্তির কবলে পড়তে হতে পারে। অলস, অকর্মণ্য আর উদ্যমহীন মানুষ এ সকল বিপদে সহজেই বিচলিত হয়ে যায়। তখন তার কাছে পুরো দুনিয়াটাই মনে হবে একটা জঞ্জাল। তখন তার জীবন হয়ে পড়বে ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ। জাতীয় জীবনেও একই কথা খাটে। কোনো জাতি যখন অলস অসার হয়ে কোনো চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় ব্যর্থ হয় তখন তার অগ্রগতি বাধাগ্রস্ত হবে নিশ্চিত। উন্নতি আর প্রতিযোগিতার দৌড়ে তাকে পেছনেই পড়ে থাকতে হবে। নতুন নতুন সমস্যা আর বিপত্তির মুখে পড়ে জাতি ক্রমাগত অবনতির দিকে ধাবিত হতে থাকে।

জীবনে সমস্যা থাকা স্বাভাবিক। কিন্তু সমস্যাকে জয় করার জন্য সাধনার কোনো বিকল্প নেই। আর কঠোর সাধনার কাছে কোনো সমস্যা আর যাতনাই গুরুত্ব পায় না।

## ৭২ স্পষ্টভাষী শত্রু নির্বাক মিত্র অপেক্ষা ভালো

জীবনে চলার পথে যেমন অনেক বন্ধু জোটে তেমনি অনেক শত্রুও সৃষ্টি হয়। তবে বন্ধুর ভূমিকা যেমন সর্বক্ষেত্রে মানুষের চলার পথে সহায়ক হয় না তেমনি কোনো কোনো ক্ষেত্রে শত্রুর ভূমিকা থেকেও মানুষ উপকৃত হয়ে থাকে। দৈনন্দিন বাস্তব জীবনে মানুষের বন্ধু সংসর্গের প্রয়োজন হয়। সুখ-দুঃখে সহমর্মিতা প্রকাশ, বিপদে সহায়তা, দ্বিধাগ্রস্ত অবস্থায় সুপরামর্শ দান, ভুল পদক্ষেপ নিরস্ত্রীকরণের মাধ্যমে বন্ধু মানুষের জীবনে পরম সুহৃদের ভূমিকা রাখে। কিন্তু অনেক সময় বন্ধুত্বের কারণে অনেকে



লোকের ত্রুটি-বিচ্যুতি নির্দেশ করে না। ফলে মানুষ নিজেকে সংশোধন করার সুযোগ পায় না। অনেক সময় বন্ধুত্ব নষ্ট হওয়ার আশঙ্কায় বন্ধু বন্ধুর প্রয়োজনের মুহূর্তে স্পষ্ট সত্য উচ্চারণ করার ভয়ে নীরব ভূমিকা পালন করে। প্রয়োজনের মুহূর্তে বন্ধু যদি নির্বাক ভূমিকা পালন করে, উপযুক্ত পদক্ষেপ নেয়ার পরামর্শ না দেয় তবে বন্ধুর ভূমিকা বন্ধুসুলভ না হয়ে বরং বিপরীত হয়। পক্ষান্তরে পরম শত্রুও যদি সুস্পষ্ট ভাষায় কারো ভুল-ত্রুটি ও সীমাবদ্ধতা নির্দেশ করে তবে উপযুক্ত পদক্ষেপ নিয়ে সে ভুল-ত্রুটি শুধরে নেয়া সম্ভব। এ ধরনের শত্রু মানুষের জীবনে নির্বাক মিত্রের চেয়ে বরং উপকারী সুহৃদের ভূমিকা রাখে। এ জন্য প্রজ্ঞাবান লোকেরা নির্বাক মিত্রের চেয়ে স্পষ্টভাষী শত্রুর ভূমিকাকে অধিকতর গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। তাদের ধারণা, স্পষ্টভাষী শত্রু যেভাবে মানুষের দোষ-ত্রুটির দিকে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করে তাতে মানুষ সচেতন ও সতর্ক হওয়ার সুযোগ পায়, নিজেদের ত্রুটি-বিচ্যুতি সংশোধনের জন্য সচেষ্ট হতে পারে। পরিণামে মানুষ সঠিক পন্থা ও পদক্ষেপ নিতে পারে, চারিত্রিক ত্রুটি সংশোধন করতে সক্ষম হয়। প্রকৃত মিত্র যিনি তার ভূমিকা নির্বাক মিত্রের অনুরূপ হওয়া উচিত নয়। স্পষ্ট ভাষায় বন্ধুর ভুল-ত্রুটি দেখিয়ে দিয়ে তা সংশোধনের পরামর্শ দেয়া প্রকৃত বন্ধুর কাজ।

## ৭৩ সৌজন্যই সংস্কৃতির পরিচয়

সৌজন্যবোধ একটি জাতির সংস্কৃতির পরিচয় বহন করে অর্থাৎ ব্যবহারের মাধ্যমে কারো সত্যিকারের পরিচয় পাওয়া যায়।

সৌজন্য হচ্ছে মানুষের আচার-ব্যবহার, যা অন্যের সংস্পর্শে এলে ফুটে ওঠে। শিক্ষার নির্যাসকে সৌজন্য হিসেবে অভিহিত করা যায়। একজন মানুষ শিক্ষিত নাকি অশিক্ষিত তা বাইরে থেকে বোঝা সম্ভব নয়। কিন্তু যখন তার সাথে কথা বলা হয় তখন তার ব্যবহার ও আচরণ দেখে বলে দেয়া সম্ভব তার পরিচয়। পুঁথিগত শিক্ষাই শুধু সৌজন্য শিক্ষা দেয় না, মূলত তা শেখার জন্য পরিবার ও জাতির সংস্কৃতি ও প্রজ্ঞা সবচেয়ে বড় ভূমিকা রাখে। বস্তুত পরিবার হচ্ছে সমাজ তথা জাতির একক। তাই পরিবারে যখন কোনো বিষয়ের চর্চা হয় তা ক্রমে ক্রমে জাতীয় পর্যায়ে স্থান করে নেয়। পরিবার হচ্ছে সকল শিক্ষার সূতিকাগার। পরিবারের সদস্যের সাথে চলাফেরা করলে তাদের আচার-ব্যবহার থেকে ঐ পরিবার সম্পর্কে যেমন ধারণা পাওয়া যায়, তেমনিভাবে যখন কোনো জাতির কোনো সদস্যের সাথে আমরা কথা বলি, এক সাথে চলাফেরা করি, তার সৌজন্য, তার শিষ্টাচার আমাদের বলে দেবে তার সংস্কৃতি, জাতি হিসেবে তারা সভ্য না অসভ্য, শিক্ষিত নাকি অশিক্ষিত। পথ ভুলে যাওয়া একজন পথিক, মরুভূমিতে তৃষ্ণায় ছটফট করতে করতে জ্ঞান হারাল, জ্ঞান ফেরার পর সে দেখল দীর্ঘকায় আলখাল্লা পরিহিত একজন মানুষ তাকে পানি পান করাচ্ছে। লোকটি কথা না বললেও বুঝতে পারল সে অবশ্যই একজন আফগান। কেননা আতিথিয়েতায় তারা বিশ্ব বিখ্যাত।

এমনি করে সৌজন্য গুচিয়ে দেয় ভাষার ব্যবধান, পরিচয়ে সমুন্নত করে কোনো জাতিকে। আবার সৌজন্য ও শিষ্টাচারবর্জিত জাতিকে ঘৃণিত করে। কাজেই বলা যায় সৌজন্যই সংস্কৃতির পরিচয়।

## ৭৪ হাতে কাজ করায় অগৌরব নাই, অগৌরব হয় মিথ্যায়, মূর্খতায়

মানুষের প্রকৃত গৌরব কর্মসাফল্যের ওপর নির্ভরশীল। মিথ্যা এবং মূর্খতা মানুষের জীবনে অগৌরব ডেকে আনে। সকল উন্নতির চাবিকাঠিই হচ্ছে পরিশ্রম। পরিশ্রমের বলেই মানুষ আজ অসাধ্য সাধন করেছে। আর এ পরিশ্রম মানুষ হাত দ্বারাই সম্পাদন করে। হাতের পরিশ্রমে অগৌরব নেই। বরং হাতের পরিশ্রম মানুষকে তার ভাগ্য

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



গড়তে সাহায্য করে। আর এ পরিশ্রমের সাথে যদি জ্ঞান ও শিক্ষা এবং সততা যুক্ত হয় তবে সে পরিশ্রম সবচেয়ে উৎকৃষ্ট পরিশ্রম এবং এ ধরনের পরিশ্রমের মাধ্যমেই জগতের অশেষ কল্যাণ সাধন করা যায়। আর এ কল্যাণই মানুষকে মহান মানুষে পরিণত করে জগতে চিরস্মরণীয় ও বরণীয় করে রাখে। কেননা শিক্ষা মানুষকে ভালো-মন্দ বোঝার ক্ষমতা দেয়। সত্য-মিথ্যা, ন্যায়-অন্যায় জ্ঞান শিক্ষার মাধ্যমেই লাভ করা যায়। আর এ জ্ঞানের সাথে যদি সত্যের সংমিশ্রণ ঘটে তবে সে জ্ঞানই প্রকৃত জ্ঞান। সত্যবাদী জগতের শোভা, দেশের গৌরব। নির্মল চরিত্র উন্নত মন পরহিতব্রতী হৃদয় সৎপথ ধরে অর্জন করা সম্ভব। জ্ঞান ও সততার গুণে গুণান্বিত সমর্থ ব্যক্তিগণ হাতে পরিশ্রম করে জগতের অশেষ কল্যাণ সাধন করে চিরস্মরণীয় হয়ে রয়েছেন।

জগতে গৌরবান্বিত হতে হলে অশিক্ষা ও মিথ্যা পরিহার করে সততা ও জ্ঞান অর্জন করে মানব সেবামূলক কাজে নিজেকে নিয়োজিত করতে হবে।

## ৭৫ ক্ষুদ্রত্বের মধ্যেও মহত্ত্ব আছে

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বস্তু নিয়েই বৃহতের সৃষ্টি। সামান্য ত্রুটি কিংবা ক্ষুদ্র অপরাধ মানুষকে যেমন পাপপথে চালিত করে তেমনি করুণা, দয়া ও ছোট ছোট মহৎ গুণ দ্বারা মানুষ পৃথিবীকে স্বর্গীয় আনন্দে ভরিয়ে তুলতে পারে। তাই ক্ষুদ্রকে তুচ্ছজ্ঞান করা ঠিক নয়।

কাজের পরিকল্পনার চেয়ে কাজে লেগে যাওয়ার গুরুত্ব অনেক বেশি। কারণ পরিকল্পনা যদি বৃহৎ হয় আয়ত্তের বাইরে থাকে তাহলে সেটা অর্জন করা কঠিন। কিন্তু আমরা যদি পরিকল্পনার দিকে না তাকিয়ে কাজ করি তাহলে দেখা যাবে এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাজ একদিন বৃহদাকার ধারণ করবে। আমরা যদি এ জগতের দিকে দৃষ্টিপাত করি তাহলে দেখতে পাব ছোট ছোট বালুকণা দ্বারা গড়ে ওঠে মহাদেশ। বিন্দু বিন্দু জল থেকে সৃষ্টি হয় মহাসাগর। অল্প অল্প মুহূর্ত নিয়ে গড়ে ওঠে জীবনের পরিপূর্ণ সময়। পৃথিবীতে সকলেই নিজেকে অক্ষয় করে রাখতে চায়। সেজন্য সে হতে চায় বড়। আর বড় হতে হলে তাকে কতগুলো গুণের অধিকারী হতে হয়। প্রথমত তাকে সচ্চরিত্রের অধিকারী হতে হবে। মানুষের কল্যাণে নিঃস্বার্থভাবে কাজ করতে হবে। তাহলে সে জগতে তার কাজের বিনিময়ে স্মরণীয়-বরণীয় হয়ে থাকতে পারবে। কিন্তু মানুষ যদি কর্ম না করে বৃহৎ কিছু হওয়ার কথা ভাবে তবে সে না পারবে ফুল ফোটাতে না পারবে ফল ফলাতে। বড় পরিকল্পনা থাকা ভালো কিন্তু সেটা কাজে রূপান্তরিত করা যাবে কিনা সেটাই প্রকৃত ভাবনা। এর চেয়ে ছোট ছোট পরিকল্পনা করা ভালো। সামর্থ্যের বাইরে কোনো কিছু করতে যাওয়া অনুচিত। ভাবনার চেয়ে কর্মের গুরুত্ব অনেক বেশি; সে কর্ম যতই ক্ষুদ্র হোক না কেন। আমরা যদি জগতের দিকে দৃষ্টি দিই তাহলে দেখতে পাব পৃথিবীতে যারা মহৎ কাজের দ্বারা স্মরণীয় হয়ে আছেন তারা পরের কল্যাণে নিজেদের জীবন বিলিয়ে দিয়েছেন। মহৎ ব্যক্তিরা নিজেদের ছোট ছোট মহৎ কর্মের দ্বারা জগতে স্মরণীয় হয়ে আছেন। অর্থাৎ কর্ম যদি মহৎ হয় এবং সেটা যদি ক্ষুদ্রও হয় তাহলে এই ক্ষুদ্রত্বই তাকে মহৎ করে তুলবে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ইটের সমন্বয়ে যেমন বিশাল অট্টালিকা নির্মিত হয়, তেমনি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাজের মাধ্যমেই একজন লোক পৃথিবীতে অমরত্ব লাভ করে। কাজেই ক্ষুদ্র বলেই কোনো কিছুকে তুচ্ছজ্ঞান করা উচিত নয়।

ক্ষুদ্র বলে কোনো কিছুকে তুচ্ছ করা উচিত নয়। কেননা ক্ষুদ্র থেকেই বৃহত্তের জন্ম। তাই আমরা যদি সচেষ্ট হয়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অন্যায়কে পরিহার করে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মহৎ কাজ করতে পারি, তাহলে আমাদের এই ক্ষুদ্র মহৎ কাজগুলো একদিন পৃথিবীকে স্বর্গময় করে তুলবে।

# বিগত বিসিএস পরীক্ষার প্রশ্ন সমাধান

## ৯ম বিসিএস : ১৯৮৮-১৯৮৯

### বই কিনে কেউ কখনো দেউলিয়া হয় না

একটি সৃজনশীল বই অপরিসীম জ্ঞানের আধার। এতে যে অল্প অর্থ ব্যয় হয় তা অর্জিত জ্ঞানের তুলনায় খুবই নগণ্য। সৃজনশীল পুস্তক অধ্যয়ন জ্ঞানার্জনের সর্বোৎকৃষ্ট মাধ্যম। তাই প্রকৃত জ্ঞানার্জনে বইয়ের কোনো বিকল্প নেই। জগতের শ্রেষ্ঠ মনীষীদের চিন্তা-চেতনা ও সৃষ্টির অন্যতম আধার হলো বই। বই-ই এক যুগের মানুষকে পরবর্তী যুগের মানুষের কাছে নিয়ে যেতে পারে; সুযোগ করে দিতে পারে অতীতের অভিজ্ঞতা আর জ্ঞান-বিজ্ঞানকে জানার। কিন্তু অধিকাংশ সময়ই আমরা এ সত্যটি উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হই। যারা কুরুচিপূর্ণ সিনেমা কিংবা স্টেডিয়ামে খেলা দেখার টিকেট কিনতে অকপটে অর্থ ব্যয় করে, তারাই আবার বই কেনার ক্ষেত্রে চূড়ান্ত কৃপণতার পরিচয় দেয়। বই কেনার জন্য অর্থ ব্যয়কে তারা বাহুল্য বলে মনে করে। অনেকে আবার বইয়ের অগ্নিমূল্য বা আর্থিক অসচ্ছলতার অজুহাত দাঁড় করিয়ে বসে। কিন্তু এসব শুধু অযৌক্তিকই নয়, অনাকাঙ্ক্ষিতও বটে। প্রকৃতপক্ষে এ জাতীয় ধারণা কেবল তারাই প্রচার করে যারা বই পড়ায় আদৌ আগ্রহী নয় বা জ্ঞানার্জনের পক্ষপাতী নয়। কিন্তু বই পড়ার মাধ্যমে চিত্তের যে পরম সুখ লাভ সম্ভব তা তারা কখনো অনুভব করতে পারে না। আর পারে না বলেই তারা বেশি দামের অজুহাতে বই কিনতে চায় না। অথচ বই কিনে কেউ দেউলিয়া হয়েছে এমন নজির খুঁজে পাওয়া কঠিন। কেননা জ্ঞানপিপাসা মেটানোর উপযোগিতার তুলনায় বইয়ের দাম খুবই তুচ্ছ।

### দ্বার বন্ধ করে ভ্রমটারে রুখি
### সত্য বলে, আমি তবে কোথা দিয়ে ঢুকি

পৃথিবীতে যারা মিথ্যা ও ভুলভ্রান্তিকে বাদ দিয়ে কেবল সত্যলাভের পথ খোঁজে তারা দুর্লভ সত্যকে পায় না। সত্য মানবজীবনের অমৃতস্বরূপ কিন্তু তা সহজলভ্য নয়। পার্থিব জগতে সত্য ও মিথ্যা পাশাপাশি অবস্থান করে। সত্য ও মিথ্যা পরস্পর এমন অবিচ্ছেদ্য যে, নিরবচ্ছিন্ন সত্য এবং মিথ্যাকে পৃথকভাবে উদঘাটন করা সম্ভব নয়। আলোর সঙ্গে অন্ধকার যেমন সম্পৃক্ত, তেমনি সত্যও নানা ভুলভ্রান্তি এবং মিথ্যা দ্বারা আবৃত। জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতার দুর্গম পথে চলতে চলতে এই সকল ভুলভ্রান্তি ও মিথ্যাকে অপসারিত করেই মানুষকে সত্যের মুখোমুখি দাঁড়াতে হয়। অজস্র ভুলভ্রান্তিকে অতিক্রম করলেই যথার্থ সত্যের সন্ধান মেলে। অন্ধকারের মধ্যে যেমন আলোর উজ্জ্বলতা ফুটে ওঠে, তেমনি ভ্রান্তির মোহাবরণকে ছিন্ন করতে পারলেই কেবল সত্যের যথার্থ প্রতিচ্ছবি ফুটে ওঠে। মাঝেমধ্যে ভুল না করে সত্য ও সুন্দরের সন্ধান পাওয়া যায় না। কেননা জীবন কখনো কণ্টকমুক্ত নয়। জীবনের কণ্টকাকীর্ণ পথে পরিভ্রমণ করতে গিয়ে মানুষ যেসব ভুলভ্রান্তি করে তার সংশোধনের মাধ্যমেই কেবল প্রকৃত সত্যলাভ ও জীবনের সুন্দরতম অধ্যায়ের সূচনা করতে পারে। অন্যদিকে ভ্রান্তির ভয়ে জীবনের গতি শ্লথ করে দিয়েও ভ্রমকে রোখা যায়। কিন্তু এটা যেমন সত্য লাভের যথার্থ পথ নয় এবং তেমনি ভ্রমের হাত থেকে বাঁচার যথার্থ উপায়ও নয়। বরং ভুল থেকে শিক্ষা নিয়ে এর হাত থেকে বাঁচার যেমন চেষ্টা করতে হবে, তেমনি সত্য লাভের বিভিন্ন পথ উদঘাটনেও মনোনিবেশ করতে হবে। আর তাহলেই সত্য ও সার্থক জীবনের সন্ধান পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



## ১০ম বিসিএস : ১৯৮৯-১৯৯০

### মূর্খ মিত্রের চেয়ে শিক্ষিত শত্রু ভাল

জীবনে চলার পথে মূর্খ বন্ধু অনিচ্ছাকৃতভাবে হলেও এমন ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে যা কোনো শিক্ষিত শত্রুর দ্বারাও সম্ভব নয়।

সমাজে বসবাস করতে হলে মানুষকে একে অপরের সাথে সম্পর্ক বজায় রেখে চলতে হয় এবং সমাজে শত্রু-মিত্র উভয়ের সাথেই কোনো না কোনোভাবে মেলামেশা করতে হয়। কিন্তু এক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয় সেটি হলো শিক্ষা। মানুষের বন্ধু নির্বাচনের ক্ষেত্রে শিক্ষার মানদণ্ডটি অতীব জরুরি। কেননা অশিক্ষিত বন্ধুর যত আন্তরিকতাই থাক না কেন, সে যে কোনো মুহূর্তে নিজের অজ্ঞতাবশত অনেক ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। বলা হয়, মূর্খ ব্যক্তি পশুর সমান। ভালোমন্দ বিচার করার যথাযথ ক্ষমতা তার নেই। অনেক সময় বন্ধুর ভালোর জন্য কিছু করলেও তার অজ্ঞতার কারণে তা বন্ধুর ক্ষতি বয়ে আনতে পারে। এজন্য তাকে দোষও দেয়া যায় না। অন্যদিকে শত্রুকে আমরা সাধারণত অনিষ্টের কারণ হিসেবেই বিবেচনা করি। কিন্তু তুলনামূলক বিচারে দেখা যায়, একজন মূর্খ বন্ধু অজ্ঞতাবশত যা করতে পারে, একজন শিক্ষিত শত্রু সজ্ঞানে তেমনটি করতে পারে না। জ্ঞানের নির্মল পরশ অন্তত তাকে এ কাজ থেকে ফিরিয়ে রাখতে পারে। যদি অনিষ্ট সে করে তবে সেটা হবে তার দুরাচার। আর মানুষ সব সময়ই শত্রুর দুরাচার সম্পর্কে সজাগ থাকে। ফলে শত্রুর এ চেষ্টা সফল নাও হতে পারে। কিন্তু বন্ধুর ব্যাপারে কোনো সন্দেহ না থাকায় মানুষ এতটা সতর্ক থাকে না। অথচ এ অসতর্কতার ফাঁকে মূর্খ বন্ধুর অজ্ঞতাই তার জন্য কাল হয়ে দাঁড়াতে পারে। তাই বন্ধু নির্বাচনে জ্ঞান, প্রজ্ঞা আর শিক্ষাকে গুরুত্ব দিতে হবে। কেননা জ্ঞান আলো এবং মূর্খতা অন্ধকারের সমতুল্য। আলোতে অনেক বিপদেও নিরাপদ থাকা যায়, অন্যদিকে অন্ধকারে সর্বদাই বিপদের আশঙ্কা থাকে।

### ভাবের ললিত ক্রোড়ে না রাখি নিলীন
### কর্মক্ষেত্রে করি দাও সক্ষম স্বাধীন

ভাব আর চিন্তার জগতে নিমগ্ন থাকার চেয়ে বাস্তব জীবনের সাথে পরিচিত হওয়া ও তার সাথে খাপ খাইয়ে যোগ্যতার সাথে বেঁচে থাকাটা মানুষের অনেক বেশি জরুরি।

মানুষ তার প্রচেষ্টা দুটি দিকে নিয়োজিত করতে পারে। অনেকে আছে যারা সর্বদা চিন্তা আর ভাবের সাগরে নিজেকে নিয়োজিত রাখে। আবার অনেকে আছে যারা ধ্যান আর চিন্তাকে তেমন প্রাধান্য দেয় না, বরং প্রতিদিনের জীবন সংগ্রামে টিকে থাকার প্রয়োজনীয় বাস্তব বিষয়ে জ্ঞানলাভ ও সে অনুযায়ী নিজেকে গড়ে তুলতে বেশি আগ্রহী। মানবজীবনে এর কোনোটিকেই অস্বীকার করার উপায় নেই। তবে আধুনিক ও গতিশীল বিশ্বে টিকে থাকার জন্য দর্শনচর্চা আর সাহিত্য সাধনার তুলনায় বাস্তব কর্মক্ষেত্রে টিকে থাকার প্রায়োগিক জ্ঞানলাভকেই বেশি গুরুত্বপূর্ণ মনে করা হয়। কোনো বিষয়ে ভাবতে ভাবতে ভাবুক হওয়ার চেয়ে সে বিষয়ে বাস্তব জ্ঞানার্জন অনেক বেশি কার্যকর ও জীবনের জন্য উপযোগী। তাই বর্তমান বিশ্বে জ্ঞানার্জনের ক্ষেত্রেও দেখা যায়, দর্শন, সাহিত্য, কলা আর শিল্প বিষয়ে জ্ঞানলাভের চেয়ে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ে জ্ঞানার্জন এবং পরিবর্তিত বিশ্ব ও তার বিশাল কর্মক্ষেত্রে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হওয়ার উপযুক্ত করে নিজেকে গড়ে তোলাকেই বেশি গুরুত্বপূর্ণ মনে করা হয়। অবশ্য এর ব্যতিক্রম দেখা গেলেও এদের সংখ্যা অল্প। পৃথিবীর সকল জাতি ও দেশই আজ প্রায়োগিক শিক্ষাকে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে। তাছাড়া বর্তমান যুগের উন্নয়ন চিন্তায়ও ব্যক্তিমানুষের উন্নয়নের ওপরই বেশি গুরুত্ব দেয়া হয়। শিক্ষা বলতে বর্তমান পরিবর্তিত অবস্থার সাথে ব্যক্তির নিজেকে খাপ খাওয়ানোর উপযোগী করে গড়ে তোলার যোগ্যতাকেই বোঝায়। তাই তত্ত্বের চেয়ে প্রায়োগিক জ্ঞান আর দক্ষতাই যোগ্যতার মাপকাঠি হিসেবে অধিক গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হয়।



## ১১তম বিসিএস : ১৯৯০-১৯৯১

### যত মত, তত পথ

পৃথিবীতে বিভিন্ন মত ও দৃষ্টিভঙ্গি থাকবে এটা স্বাভাবিক। মত আর দৃষ্টিভঙ্গির এ ভিন্নতাহেতু মানুষের জীবন এবং কর্মের ভিন্নতাও খুবই স্বাভাবিক বিষয়।

সৃষ্টির আদিকাল থেকে মানুষের মধ্যে ভিন্নতার বিষয়টি বিদ্যমান। মানুষ চিন্তা-চেতনা আর দৃষ্টিভঙ্গি এবং বিশ্বাসের ক্ষেত্রে স্বাভাবিকভাবেই পরস্পর থেকে ভিন্ন হতে পারে। এ ভিন্নতা তাদের জীবনাচার, ধর্ম-কর্ম ও লেনদেনের ক্ষেত্রে প্রতীয়মান হয়। এক ধর্মে বিশ্বাসী বা অনুসারীদের জীবনাচার, চালচলন, রীতিনীতি অন্যদের চেয়ে ভিন্ন হবে। কেননা মত ও বিশ্বাসের ভিন্নতার সাথে জীবনের বাহ্যিক ও আত্মিক অনেক বিষয়ই জড়িত। ব্যক্তির জীবনাচার ও কর্মের মাঝে তার মতের প্রতিফলন ঘটতে পারে। মতের ভিন্নতার কারণে যে পথেরও ভিন্নতা হতে পারে এ সত্যটাকে যখন মানুষ উপলব্ধি করতে পারে তখন ভিন্নতার মাঝেও ঐক্যের সুর শোনা যায়; পারস্পরিক সহনশীলতার মাধ্যমে মৈত্রীর বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া যায়। কেননা মানুষ যখন বুঝতে পারে, তার নিজের যেমন একটা মত বা একটা বিশ্বাস আছে এবং সে মত ও বিশ্বাস তাকে একটা নির্দিষ্ট পথে পরিচালিত করে, তেমনি অন্যের ক্ষেত্রেও তা স্বাভাবিক। এবং তখন তার মাঝে এসব কিছু মেনে নেয়ার মনোবৃত্তি জন্ম নেয়। এমনিভাবে সকল মানুষের মাঝে এরূপ মনোবৃত্তির বিকাশ হলে অনেক ভিন্নতার মাঝেও মানবসমাজে শান্তির ধারা প্রবাহিত হতে পারে। কিন্তু যখনই এর ব্যতিক্রম ঘটে তখনই দেখা যায় এক ধর্ম আর বর্ণের মানুষ অন্যদের সহ্য করতে চায় না। শুরু হয় সাম্প্রদায়িক রেষারেষি, বিনষ্ট হয় মানবসমাজের শান্তি আর সমৃদ্ধি। মানুষের নিজের মতকে অপরের ওপর চাপিয়ে দেয়ার নীচু মনোবৃত্তি তাকে যেমন করে তোলে উগ্র, তেমনি সেও অনেক ক্ষেত্রে প্রতিবাদ আর প্রতিরোধের মুখোমুখি হয়। যুগে যুগে মানবজাতিকে অনেক মূল্য দিতে হয়েছে এবং বর্তমানেও বিশ্বের আনাচেকানাচে মানুষকে তার মাশুল গুনতে হচ্ছে। শক্তিশালী জাতি, ধর্ম আর বর্ণের মানুষ নিজের মতকে অন্যের ওপর চাপিয়ে দেয়ার ঘৃণ্য তৎপরতা আজও থামায়নি, বরং প্রতিনিয়ত এর জন্য নানা ফন্দিফিকির আবিষ্কার করছে। সুতরাং মানবসমাজ থেকে এ ঘৃণ্য প্রবৃত্তির উচ্ছেদ যতদিন সম্ভব না হবে ততদিন মানবজাতিকে এর মূল্য দিতেই হবে।

### যে নদী হারায়ে স্রোত চলিতে না পারে
### সহস্র শৈবাল ধাম বাঁধে আসি তারে,
### যে জাতি জীবনহারা অচল অসাড়
### পদে পদে বাঁধে তারে জীর্ণ লোকাচার।

গতিতেই জীবন, গতিতেই উন্নতি। স্থবিরতায় মৃত্যু। জাতীয় জীবনে উন্নত চেতনা ও মুক্তির পথে আগুয়ান জাতিকে কোনো বাধা-বিপত্তিই আটকাতে পারে না। অন্যদিকে যে জাতি জাতীয় আদর্শ, আদর্শিক চেতনা ও অগ্রগতির ধারাবাহিকতা হারিয়ে ফেলে সে জাতি সার্বিক উন্নয়ন এবং অগ্রসরমান পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়ে। জাতীয় জীবনে স্থবিরতার সুযোগে নানা কুসংস্কার ও জরাজীর্ণ লোকাচার বাসা বাঁধে। তখন স্থবির জাতি অন্ধ কুসংস্কার, অর্থহীন জীর্ণ লোকাচারে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। তাদের হস্তপদ তখন বাঁধা পড়ে যায়। জাতির চিন্তা-চেতনা, আদর্শবোধ তখন মিথ্যা কুসংস্কারে আর অন্ধ বিশ্বাস ও ধারণার বেড়াজালে আবদ্ধ হয়ে যায়। ক্রমে জাতি উন্নয়নের পথ থেকে দূরে সরে ধ্বংসের পথে এগিয়ে যায়। ব্যক্তি জীবনে আলস্য, কুসংস্কার আর অন্ধবিশ্বাস ও অনুকরণ যেমন পশ্চাৎপদতার

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



কারণ, জাতির জীবনেও তা অনগ্রসরতার কারণ। কোনো জাতির লোকেরা যখন তাদের চিন্তা-চেতনা, মন-মানসিকতা ও কর্মে উদ্যম হারিয়ে ফেলে, পরিবর্তনকে স্বাগত জানাতে ব্যর্থ হয়, সে জাতির উন্নতি সম্ভব নয়। কেননা উন্নতির জন্য চাই পরিবর্তন। আর পরিবর্তনের জন্য চাই গতি ও উদ্ভাবনী শক্তির বিকাশ। জাতীয় জীবনের অপ্রয়োজনীয় ও অনাকাঙ্ক্ষিত বিষয়গুলোকে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে নতুনের আহ্বানে সাড়া দিয়ে পরিবর্তনের পথে এগিয়ে যেতে না পারলে জাতি প্রতিটি ক্ষেত্রেই বাধা-বিপত্তি আর স্থবিরতার মুখোমুখি দাঁড়াতে বাধ্য। তাই জাতির উন্নয়নের গতিকে কোনো অবস্থাতেই থামিয়ে দিতে নেই। জাতির পরিচিতি, চিন্তা-চেতনা, মেধা-মনন, ইতিহাস-ঐতিহ্য, আদর্শ-বিশ্বাস এ সবকিছুকেই সচল রাখতে হয়। তাতেই জাতির উত্তরোত্তর উন্নতি হয়। নতুবা তার গতি ব্যাহত হয় এবং ভবিষ্যৎ মুখথুবড়ে পড়ে।

## ১৩তম বিসিএস : ১৯৯১-১৯৯২

### কবিতা তোমায় দিলাম আজকে ছুটি, পূর্ণিমার চাঁদ যেন ঝলসানো রুটি

অভাব আর দারিদ্র্যের তীব্রতার কাছে শিল্প-সাহিত্য আর কলার আবেদন খুবই ক্ষীণ। ক্ষুধার জ্বালার কাছে সবকিছুই বিরক্তিকর।

মানুষের জীবনে উদরপূর্তি এবং চিত্তের প্রশান্তি এ দুটি জিনিসের খুবই প্রয়োজন। এদের একটি আরেকটির পরিপূরক। কেবল উদরপূর্তি তথা প্রচুর ধনসম্পদ আর ঐশ্বর্যের মাঝে মানুষ বাঁচতে পারে না, বরং পরিপূর্ণ জীবনের জন্য হৃদয়ের প্রশান্তি দরকার হয়। তেমনি কেবল হৃদয়ের প্রশান্তি আর চিত্তের প্রশান্তিতেই মানুষ বাঁচতে পারে না। বাহ্যিকভাবে জীবনধারণের জন্য ক্ষুধা নিবারণও জরুরি। জীবনধারণের জন্য ন্যূনতম প্রয়োজন যদি মানুষের পূর্ণ না হয় তাহলে আর কোনো কিছুই তাকে বাঁচিয়ে রাখতে পারে না। এটা মানুষের মৌলিক প্রয়োজন। শিল্প-সাহিত্য-কলা ইত্যাদি মানুষের জীবনে প্রয়োজনীয়, তবে অত্যাবশ্যকীয় নয়। এগুলো না থাকলেও মানুষের প্রাণ রক্ষা হয়। তবে এগুলো মানুষের ক্ষুধা-দারিদ্র্যের নিবৃত্তির পর জীবনকে পরিপূর্ণ করতে সহযোগী হিসেবে কাজ করে। তাই দেখা যায়, মানুষের বেঁচে থাকার যে ন্যূনতম চাহিদা অন্নাভাব, তার পরিপূরণ না হলে এসবই অর্থহীন। কেননা ক্ষুধার জ্বালার বিপরীতে এগুলো কোনো আবেদনই সৃষ্টি করতে পারে না। এসব তখন অনেক ক্ষেত্রে বিরক্তিরও উদ্রেক করে। পূর্ণিমার চাঁদ, জ্যোৎস্না রাত ও কুসুমবন কিছুই হৃদয়ে আলোড়ন সৃষ্টি করতে পারে না। মানুষের সুকুমার বৃত্তিগুলো তখন ভোঁতা হয়ে যায়। সকল ধ্যান-ধারণা আর মন-মনন নিবেদিত থাকে ক্ষুধা নিবারণের মৌলিক চাহিদার দিকে। আর এ লক্ষ্যে নিয়োজিত হয় মানুষের সকল প্রচেষ্টা। তাই মানুষের জীবনে প্রথমে চাই ক্ষুধা পূরণ। তাহলে অন্য সবই ফলপ্রসূ হতে বাধ্য, নতুবা সবই ব্যর্থ।

### ভূতের ভয় অবিশ্বাস কাটে না

ভয় হলো মানুষের মনের ব্যাপার। নিজের ওপর যদি মানুষের আস্থা না থাকে তাহলে কোনো কাজই তাকে দিয়ে করা সম্ভব নয়। যদি কোনো কিছুর প্রতি সত্যিই দুর্বলতা থাকে তাহলে নিজের ওপর যতই বিশ্বাস বা আস্থা থাকুক না কেন সেটির সফলতা আসে না।

ভয়, আতঙ্ক এ সবকিছুর কেন্দ্রস্থল হলো মানুষের মন। মানুষের মনই হলো সবচেয়ে অনুভূতিপূর্ণ। যে কোনো ধরনের আশা-আকাঙ্ক্ষা, হতাশা, নিরাশা-ভয় সেখানে জাগ্রত হয়। এই জাগরণটা যদি বেশি মাত্রায় হয় তাহলে ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব এবং কার্যপ্রণালীর ওপর এর ব্যাপক প্রভাব পড়ে। এটি প্রতিটি



ক্ষেত্রেই ব্যক্তিকে কোনো কাজে এগিয়ে অথবা পিছিয়ে দেয়। আর ব্যক্তি যখন পিছিয়ে যায় তখন তার ব্যর্থতা স্বীকার করা ছাড়া কিছুই থাকে না। ব্যর্থতার ছাপ যদি সত্যিই কারো ওপর পড়ে, তাহলে সে যতই নিজের মধ্যে আত্মবিশ্বাস গঠনের চেষ্টা করুক না কেন সে ব্যর্থ হবেই। কারণ মনের দুর্বলতা দূর করতে কেবল সাহস আর আত্মবিশ্বাসই যথেষ্ট নয়। তার জন্য দরকার আপন দুর্বলতাকে আগে সবল করে তোলা। যদি নিজেই সবল না হয়, তাহলে যে কোনো সহজ কাজকেই কঠিন মনে হবে। আর স্বাভাবিক নিয়মেই সেই কাজটি করা দুরূহ হয়ে উঠবে। মূলত নিজে শক্ত-সমর্থ না হলে সবসময়ই নিজের মধ্যে একটা লুকায়িত ভয় কাজ করবে, যা প্রতিটা মুহূর্তেই পিছুটান দেবে। কিন্তু নিজের মধ্যে এই লুকায়িত ভয় নেই, তা যতই অবিশ্বাস করা হোক না কেন, সে ভয় কখনোই দূরীভূত হবে না।

## ১৫তম বিসিএস : ১৯৯৩-১৯৯৪

### বিশ্বে যা কিছু মহান সৃষ্টি চিরকল্যাণকর অর্ধেক তার করিয়াছে নারী, অর্ধেক তার নর

নারী-পুরুষের যৌথ প্রচেষ্টার ফসল এ বিশ্বসভ্যতা। এখানে কারো অবদানকে ছোট কিংবা বড় করে দেখার কোনো অবকাশ নেই।

সৃষ্টির শুরুতে বিধাতা নারী এবং পুরুষকে জোড়ায় জোড়ায় পৃথিবীতে প্রেরণ করেছেন। উভয়ের যৌথ প্রচেষ্টার ফলেই পৃথিবী ক্রমশ উন্নতির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। কোনো কিছুই এখানে কারো একার প্রচেষ্টায় সফল বা কল্যাণকর হয়ে ওঠেনি। সৃষ্টির উষালগ্ন থেকেই তারা একে অপরের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করে এসেছে। তবে স্থান-কাল-পাত্র ও পরিস্থিতিভেদে এদের ভূমিকার ধরন ও মাত্রার পার্থক্য স্বাভাবিকভাবেই ছিল এবং আছে। নারীরা যেসব ক্ষেত্রে নিজেরা সরাসরি মুখ্য ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে পারেনি, সেখানে তারা পুরুষের কাজে সমর্থন ও প্রেরণা যুগিয়েছে। আর তাদের প্রেরণা ও উৎসাহ পেয়েই পুরুষরা গড়ে তুলেছে আধুনিক সভ্যতার এ তিলোত্তমা বিশ্ব। তবে যুগে যুগে নারীরা তাদের ভূমিকার সে স্বীকৃতিটুকু থেকে বঞ্চিত হয়ে এসেছে এবং এখনো তাদেরকে নিজেদের ন্যায্য অধিকার আদায় করার জন্য লড়াই করতে হচ্ছে। কিন্তু পুরুষরা শাসনদণ্ড নিজেদের হাতে রাখতে পারার সুবাদে কখনোই নারীদের ভূমিকার স্বীকৃতিটুকু দিতে রাজি হয়নি। এমনকি পৃথিবীতে সন্তান জন্মদান, লালন-পালন এবং তাদেরকে ভবিষ্যৎ পৃথিবীর জন্য গড়ে তোলায় নারীর ভূমিকাকে পুরুষেরা সব সময়ই হেয়প্রতিপন্ন করে আসছে। যদিও বর্তমান যুগে ধীরে ধীরে এ দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটছে এবং নারীরা বর্তমানে পূর্বের চেয়ে ক্রমশ ভালো অবস্থানের দিকে যাচ্ছে। ইতিহাসের পাতা খুঁজলে প্রতিটি পরতে পরতেই চোখে পড়ে নারীর গৌরবময় ভূমিকার কথা। সংসারে যেমন তারা পুরুষের সঙ্গী হয়েছে, তেমনি রণক্ষেত্রে হয়েছে প্রেরণার উৎস। তাই বর্তমান বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও উন্নয়নের এ যুগেও আমাদের খেয়াল রাখতে হবে যে, পৃথিবীর জনসংখ্যার অর্ধাংশ এ নারী সমাজকে বাদ দিয়ে উন্নয়ন, অগ্রগতি আর শান্তির আশা কেবলই দুরাশা। বরং নারী এবং পুরুষের সমউন্নয়ন ও ভূমিকার মাধ্যমেই মানুষের সার্বিক কল্যাণ ও সমৃদ্ধি সম্ভব।

### জ্ঞান যেখানে সীমাবদ্ধ, বুদ্ধি যেখানে আড়ষ্ট, মুক্তি সেখানে অসম্ভব

জ্ঞান না থাকলে বুদ্ধি আসে না আর বুদ্ধি ছাড়া মুক্তি আসতে পারে না।

মানুষের জ্ঞান তার সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ। মানুষের এ সম্পদের কোনো বিনাশ নেই। এ সম্পদ মানুষকে বুদ্ধির গভীরে প্রবেশের পথ খুলে দেয় এবং তখন মানুষ অতি সহজেই তার মুক্তির পথ খুঁজে নিতে পারে। বলা হয়, জ্ঞানহীন মানুষ পশুর সমান। পশুর সাথে মানুষের পার্থক্য হলো মানুষের বুদ্ধি ও

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



বিবেক আছে আর পশুর বুদ্ধি ও বিবেক নেই। জ্ঞানহীন মানুষের বুদ্ধিবৃত্তিগুলো সঠিকভাবে বিকশিত হয় না। আর হয় না বলেই সে আপনার ভালো-মন্দ, ন্যায়-অন্যায় সম্পর্কে সঠিক ধারণা লাভ করতে পারে না। জ্ঞান আর বুদ্ধির এ সীমাবদ্ধতাহেতু তাকে প্রতিনিয়ত প্রতিকূল পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে হয়। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, জ্ঞানবান ব্যক্তি তার যুক্তির নিরিখে অনেক কঠিন বিষয়কেও নিজের জন্য এবং অপরের জন্য সহজতর করে তুলে ধরতে পারেন। এ কথাটি ব্যক্তির জীবনে যেমন সত্য, তেমনি জাতির জীবনেও সত্য। কোনো জাতির লোকেরা যদি জ্ঞানের চর্চা না করে তাহলে সে জাতি কোনো দিন উন্নতি করতে পারে না। যে জাতি যত বেশি শিক্ষিত সে জাতি তত বেশি উন্নত। জাতীয় জীবনে জ্ঞানচর্চার উপযুক্ত পরিবেশ না পেলে মানুষের বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ ঘটানোর সুযোগ সীমিত হয়ে আসে। তখন অনেক মেধার অপচয় হয়। কোনো জাতি যখন মেধার এ অপচয় রোধ করে জ্ঞান ও মেধার সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করতে পারে, তখন সে জাতির মুক্তি ও উন্নতি নিশ্চিত। অন্যথায় তাদের পিছিয়ে পড়া ছাড়া কোনো পথ নেই। তাছাড়া পৃথিবীর উন্নত দেশগুলোর দিকে তাকালেও আমরা এর সত্যতা দেখতে পাই। তাই জাতীয় মুক্তি ও অগ্রগতির পূর্বশর্ত জনগণের বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশ। এর জন্য চাই জ্ঞানের চর্চা ও গুণীর কদর। এটা যত ব্যাপক হবে জাতীয় মুক্তি ও অগ্রগতিও ততই ত্বরান্বিত হবে।

## ১৭তম বিসিএস : ১৯৯৫-১৯৯৬

### ফ্যাশনটা হলো মুখোশ, স্টাইলটা হলো মুখশ্রী

অনুকরণপ্রিয়তা মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি। এর ফলে অনেক সময়ই সে নিজস্বতা ভুলে গিয়ে অপরের অনুকরণে মত্ত হয়ে ওঠে। অনুকরণপ্রিয়তা সবসময়ই কল্যাণকর নয়, বরং অনেক ক্ষেত্রেই তা ক্ষতিকারক হয়ে ওঠে। একটি জাতি যখন তার নিজস্ব কৃষ্টি, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ভুলে গিয়ে অন্ধভাবে বিদেশি অনুকরণে নিজের আত্মতৃপ্তি খুঁজে পায়, তখন তা আসলে নিজেদের দৈন্যকেই প্রকটিত করে তোলে। কেননা একটি জাতির অস্তিত্বের সঙ্গে তার কৃষ্টি-সংস্কৃতি, সভ্যতা ওতপ্রোতোভাবে জড়িত এবং একটি জাতির ব্যক্তিত্ব ও গৌরব তার কৃষ্টি ও ঐতিহ্য দ্বারাই নির্ণীত হয়। তাই মানুষের অন্ধ অনুকরণপ্রিয়তা অনেক ক্ষেত্রেই কপটতার শামিল এবং এটা আসলে মুখোশ দ্বারা নিজেকে ঢেকে রাখার মতোই।

অবশ্য অনুকরণপ্রিয়তা সবক্ষেত্রেই অমর্যাদাকর বা ক্ষতিকর নয়। অন্যের যা ভালো তা গ্রহণ করা বা চর্চা করা দোষণীয় কিছু নয়। কেননা, উন্নত জাতির কাছ থেকে আমাদের গ্রহণ করার অনেক কিছু আছে। আমরা যদি তাদের মন্দটুকু বাদ দিয়ে ভালোটুকু গ্রহণ করি এবং তা আমাদের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের সাথে আত্তীকরণ করি তাহলে সেটা আমাদের জন্য কল্যাণকরই হবে।

সমস্যা ঘটে তখনই যখন আমরা ভালোমন্দ বিচার না করে নির্বিচারে অপরের অনুকরণ করতে থাকি। এতে নিজের ভেতর হীনতা তৈরি হয় এবং ব্যক্তি বা জাতির স্বকীয়তা ধ্বংস করে দেয়। তাই অপরের অনুকরণে মুখোশ না পরে নিজের ব্যক্তিত্বকে নিজের মতো করে প্রকাশ করাটাই সৌন্দর্য।

**দখিন হাওয়া শরতের আলো এসবের মাধুর্যের পরিমাপ তাপমাত্রা যন্ত্রের দ্বারা হয় না, মনের বীণায় এরা আপনার সুন্দর পরশ বুলিয়ে জানায় যখন, তখন বুঝি কতখানি মধুর এবং কতখানি সুন্দর এরা।**

প্রকৃতি আমাদের চারপাশে খুলে রেখেছে সৌন্দর্যের অবারিত দুয়ার। তাই আমরা যখন প্রকৃতির সান্নিধ্যে যাই আমাদের হৃদয়ের দরোজাও তখন খুলে যায়। ভোরের সূর্যোদয়, বিকেলের কোমল রোদ্দুর, গোধূলিবেলার সূর্যাস্ত কিংবা জ্যোৎস্নালোকিত রাত্রি আমাদের হৃদয়ে অনাবিল প্রশান্তি নিয়ে বিরাজ করে। দিন-রাত্রির পালাবদলের সঙ্গে সঙ্গে ঋতুও নানা বৈচিত্র্য ও সৌন্দর্য নিয়ে আমাদের হৃদয়ে দোলা দেয়। বসন্তের দখিনা হাওয়া আমাদেরকে অজানা পুলকে হিল্লোলিত করে। বর্ষার রিমঝিম বৃষ্টি কিংবা মেঘলা দিন আমাদেরকে ধরে তোলে আনমনা, বিষণ্ন। আবার শরতের রাতের আলোয় আমরা বিমোহিত হয়ে পড়ি। এভাবে প্রকৃতি নানাভাবে আমাদের মনোজগতে সৌন্দর্য নিয়ে বিরাজ করে। প্রকৃতির এই সৌন্দর্যকে নিয়ে লেখক-শিল্পী-কবি-সাহিত্যিকরা নানাভাবে প্রশস্তি করেছেন এবং যুগ-যুগান্তর ধরে মানুষ প্রকৃতির এই লীলা বৈচিত্র্যের সান্নিধ্যে নিজেকে বিকশিত করে যাচ্ছেন। মানুষের হৃদয় সৌন্দর্য-চর্চার যত বিদ্যা আয়ত্ত করেছে, তার মধ্যে প্রকৃতির কাছে তার শিক্ষা গ্রহণ ও ঋণের পরিমাণ বেশি।



কিন্তু প্রকৃতির এই সৌন্দর্য পরিমাপ করার বিষয় নয় কিংবা গবেষণাগারে পরীক্ষারও কোনো বিষয় নয়। প্রকৃতির সৌন্দর্য বিচারের জন্য হৃদয়ই একমাত্র মাপকাঠি। কারণ প্রকৃতি যখন তার নিজস্ব সৌন্দর্য নিয়ে মানবহৃদয়ে আবির্ভূত হয়, তখনই তার প্রকৃত স্বরূপ প্রস্ফুটিত হয়ে ওঠে।

## ১৮তম বিসিএস : ১৯৯৭-১৯৯৮

### আগে চুরি করে জেল খাটে পরে<br>নির্বোধ চোর তারা<br>আগে জেল খাটে পরে চুরি করে<br>সেয়ানা স্বদেশী তারা।

চুরি করা একটি অনৈতিক কাজ। লোভ-লালসার প্রবৃত্তির বশেই মানুষ চুরির মতো অপকর্মে লিপ্ত হয়। তাছাড়া অনেক সময় মানুষ অভাব-অনটনের কারণেও চুরি করতে বাধ্য হয়। তবে সব সমাজেই চুরি করা একটি অপরাধমূলক কর্ম। এবং যতই কারণ থাকুক, চুরির ক্ষেত্রে লোভ নামক রিপুই সবচেয়ে বেশি ক্রিয়াশীল থাকে।

লোভ মানুষের বড় শত্রু এবং লোভী ব্যক্তি সমাজের জন্য খুবই ক্ষতিকর। এই লোভের বশবর্তী হয়েই মানুষ সমাজ ও জীবনের সর্বনাশ ডেকে আনে। লোভী ব্যক্তির মনে কোনো নীতি-নৈতিকতা থাকে না। সে তার স্বার্থোদ্ধারে যে কোনো অপরাধ করতেও কুণ্ঠিত হয় না। লোভের কারণেই রাষ্ট্র ও সমাজজীবনে বিভিন্ন ধরনের বিশৃঙ্খলা, অনাচার ও হানাহানির ঘটনা ঘটে। চুরির নানা রকমফের আছে। সব চুরিই সমানভাবে প্রতিভাত হয় না। সমাজে একটি শ্রেণী রয়েছে, যারা মুখোশধারী। এরা দেশপ্রেমিক নামে পরিচিত হলেও মানুষের চোখে ধুলা দিয়ে বড় বড় পুকুরচুরি করে থাকে। তাদের দুর্নীতি, লোভ, স্বার্থপরতা সমাজের ধ্বংস ডেকে আনলেও তাদের থৈ পাওয়া মুশকিল হয়। এরা সামান্য ত্যাগের বিনিময়ে দেশ ও জাতির কাছ থেকে অনেক বেশি সুবিধা আদায় করে নেয় এবং নানাভাবে তাদের লোভের থাবা বিস্তার করে সমাজকে তিলে তিলে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায়। এরাই আসলে বড় চোর।

### সত্য মূল্য না দিয়েই সাহিত্যের খ্যাতি করা চুরি<br>ভালো নয়, ভালো নয়, নকল সে সৌখিন মজদুরী

সততা মানবজীবনের সবচেয়ে বড় সম্পদ। সততার চর্চা একটি জাতিকে সামাজিক, মানসিক ও নৈতিকভাবে মহীয়ান করে তোলে। শিল্প-সাহিত্যের ক্ষেত্রেও এ কথা সমানভাবে সত্যি। মানবজীবনে যেমন, তেমনি সাহিত্যের ক্ষেত্রেও সত্যের চর্চা মানুষকে বিশেষভাবে বড় করে তোলে। সত্যের চর্চা দ্বারা সাহিত্যে লেখকের যে খ্যাতি অর্জিত হয়, তা মহৎ অর্জন। কিন্তু বিভিন্ন কারণে কিংবা লোভের বশবর্তী হয়ে কোনো কোনো লেখকও সত্যকে দাবিয়ে রাখেন কিংবা বিকৃত করেন। ফলে সাহিত্য তার প্রকৃত মর্যাদা হারায়। সত্যকে সত্যভাবে দেখা, নিজের ভালো লাগা মন্দ লাগাকে নির্ভীকভাবে

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



উপস্থাপন করা, কোনো কিছুর সঠিক ও যথার্থ স্বীকৃতি দেয়া, প্রকৃত সত্যকে তুলে আনা সত্যের ধর্ম এবং একটি সুন্দর কাজ। এতে মানুষের মহত্ত্ব প্রকাশিত হয়। এই মহত্ত্ব একটি চর্চার ব্যাপার। মহৎ সাহিত্য উপলব্ধি করার জন্য মহৎ উপলব্ধি থাকা দরকার। নিজেদের মনগড়া তত্ত্ব উপস্থাপন করা, নিজের অযোগ্যতার দায় অন্যের ঘাড়ে চাপিয়ে দেয়া, সুন্দরকে অসুন্দর কিংবা অসুন্দরকে সুন্দর হিসেবে অভিহিত করা কপটতা এবং এটা অবশ্যই অপরাধ। অন্যায় সমালোচনা বা মিথ্যা প্রশংসা কোনো ভালো কাজ নয় এবং এটা অযোগ্যতারই পরিচায়ক।

## ২০তম বিসিএস : ১৯৯৮-১৯৯৯

### যৌবনে অর্জিত সুখ অল্প, কিন্তু সুখের আশা অপরিমিত

মানবজীবন সময়ের হিসেবে খুবই হ্রস্ব। কিন্তু এই স্বল্প সময়ের পরিসরেও তাতে রয়েছে নানা বৈচিত্র্য ও পরিবর্তন। শৈশব, কৈশোর, যৌবন, বার্ধক্য—এ রকম অনেক ধাপ বা স্তর রয়েছে মানবজীবনের। এর মধ্যে যৌবনকাল নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠ সময়। এ সময় মানুষ আবিষ্কার করে নিজেকে। তার ভেতরের নানা সম্ভাবনা, সৌন্দর্য, স্বপ্ন, আকাঙ্ক্ষা, উন্মাদনা প্রবলভাবে সক্রিয় হয়ে ওঠে। শৈশবে মানুষ থাকে অসহায়, অন্যের ওপর নির্ভর করে তার জীবন-মরণ। কৈশোরে দেহমন ধীরে ধীরে পূর্ণতা পেতে থাকে। বার্ধক্যে শরীর-মন ও কর্মশক্তি ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হতে থাকে। শুধুমাত্র যৌবনে মানুষ শক্তি, সাহস ও শরীর-মনের পূর্ণতা পায়। জীবন অমিত সম্ভাবনার আধার হিসেবে প্রতিভাত হয় এবং মানুষ ঝাঁপিয়ে পড়ে বিশাল কর্মযজ্ঞে। তার মন প্রত্যাশী হয়ে ওঠে এবং এ সুখের পেছনে সে তৃষ্ণার্ত হরিণীর মতো ছুটতে থাকে। তার কাজকর্ম, চিন্তা-চেতনা, লক্ষ্য সবই ধাবিত হয় সেই সুখের দিকে। কিন্তু সুখ নামক সোনার হরিণ এ সময় খুব কমই ধরা দেয়। জীবনের জটিলতা, কর্মব্যস্ততা ও বৈচিত্র্যময় ব্যাপ্তির কারণে এ সময় সুখ অর্জিত হয় খুবই কম। কিন্তু মানুষ যেহেতু কল্পনাবিলাসী ও সুখের মায়ায় আবদ্ধ এক সজ্ঞান জীব এবং যৌবন যেহেতু জীবনের সবচেয়ে সম্ভাবনাময় সময়, সেহেতু তার ভেতর সুখের আকাঙ্ক্ষা খুব তীব্রভাবে বিরাজ করে।

### অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে
### তব ঘৃণা তারে যেন তৃণসম দহে

সুন্দর সমাজ গঠনের প্রয়াসী মানুষ ব্যক্তি ও সমাজ জীবনের বৃহত্তর কল্যাণ ও সামাজিক শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য গড়ে তুলেছে অনেক মান্য অনুশাসন ও অনুসরণীয় ন্যায়নীতি। কিন্তু সমাজ জীবনে এমন কিছু লোক থাকে যারা এসব অনুশাসন ও ন্যায়নীতি মান্য ও অনুসরণ করে না। তারা অন্যকে উৎপীড়ন করে, অন্যের অধিকারে অন্যায় হস্তক্ষেপ করে, উচ্ছৃঙ্খল আচরণে সামাজিক শৃঙ্খলাকে নস্যাৎ করে, সামাজিক স্বার্থবিরোধী অন্যায় ও অবৈধ কর্মতৎপরতায় লিপ্ত হয়। এরা সমাজের চোখে অন্যায়কারী ও আইনের চোখে অপরাধী বলে বিবেচিত হয়। এদের অপরাধ অবশ্যই দণ্ডনীয়। কিন্তু বিবেকবান মানুষ হিসেবে অন্যায়ের প্রতিবাদ করার চেতনার অধিকারী হলেও অনেক সময় মানুষ নানা কারণে দিনের পর দিন অন্যায়কে সহ্য করেন। সরাসরি অন্যায় না করলেও এটি অন্যায়কে সহযোগিতা করার নামান্তর। এতে অন্যায়কারী আরো প্রশ্রয় পেয়ে যায়।

বস্তুত অন্যায়প্রবণ মানুষ সংখ্যায় কম হলেও এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ অন্যায়ের প্রতিবাদ করা সঙ্গত মনে করলেও অনেকে বিপদের ঝুঁকি থাকায় নীরবে অন্যায় সহ্য করে চলে। পরিভোগপ্রবণ, সুখকাতর ও আত্মকেন্দ্রিক অনেক মানুষ অন্যায়ের প্রতিবাদ করার চেয়ে প্রভাব-প্রতিপত্তিশালী অন্যায়কারীর সঙ্গে



আপোস বা আঁতাত করে চলাই পছন্দ করে। অনেকে সমস্ত ঝুট-ঝামেলার মধ্যে থেকে সব বুঝেও নির্বিকার নিশ্চেতন থাকার ভান করে অন্যায়কে প্রকারান্তরে প্রশ্রয় দিয়ে যায়। অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদহীন এই নির্লিপ্ততা, এই পলায়নপ্রবণ মনোভাব প্রকারান্তরে অন্যায়কারীকে আরো বেপরোয়া করে তোলে। তার স্বেচ্ছাচারিতার মাত্রা হয়ে ওঠে আকাশচুম্বী। দিনে দিনে বাড়ে তার শক্তি-সাহস। শাসনযন্ত্রেও সে প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয় এবং শেষ পর্যন্ত দুর্বিনীত অন্যায়কারী সবার কাছ থেকে সমীহ পেতে ব্যস্ত হয়ে ওঠে। আর ন্যায়-অন্যায় বিবেচনাবোধ সত্ত্বেও সাধারণ মানুষ মেরুদণ্ডহীনের মতো বিস্ময়কর নির্লিপ্ততায় মুখ বুজে থাকে, প্রতিবাদে সোচ্চার হতে ভয় পায়।

অন্যায় সহ্য করার এই অপরিণামদর্শী প্রবণতার কারণে আজ সমাজ জীবনে অপরাধীদের দৌরাত্ম্য বাড়ছে। স্পষ্টতই প্রতীয়মান হচ্ছে অন্যায়কারীর মতো অন্যায় সহ্যকারীও সমানভাবে অপরাধী। এ সচেতনতা নিয়ে সকল বিবেকবান মানুষকে আজ সক্রিয় ও সম্মিলিতভাবে অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে। এ ভূমিকা পালনে ব্যর্থ হলে আমরা যে কেবল বিবেকের কাছে ও সামজের কাছে দায়ী থাকব তাই নয়, বিশ্ববিধাতার কাছেও অপরাধী বলে গণ্য হব।

## ২১তম বিসিএস : ২০০০

### লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু

লোভ মানব চরিত্রের এক দুর্দমনীয় প্রবৃত্তি। মানুষ যখন লোভের পথে পা বাড়ায়, তখন তার হিতাহিত জ্ঞান থাকে না। সমাজের অধিকাংশ মানুষ লোভের দ্বারা কমবেশি তাড়িত হয়। লোভ মানুষকে পাপ কাজে নিয়োজিত করে; কুপথে ধাবিত করে। আর এজন্যই মানবজীবনের পরিণাম অনেক সময় দুঃখময় হয়ে ওঠে, কখনো কখনো ঘটে মৃত্যু।

নিজের ভোগ-বিলাসের জন্য দুর্দমনীয় বাসনাই লোভ। আমাদের চারপাশে সর্বত্র লোভের হাতছানি। অর্থ, বিত্ত, খ্যাতি, প্রতিষ্ঠা প্রভৃতির প্রতি মানুষের প্রচণ্ড লোভ। লোভে মানুষ পরিণামের কথা চিন্তা না করে এমন সব কাজ করে যা আইনের চোখে দণ্ডনীয়। ফলস্বরূপ বরণ করে নেয় জীবনের করুণ পরিণতি। লোভের মায়াজালে আচ্ছন্ন হয়ে মানুষ তার মা, বাবা, ভাইবোন সবাইকে অবজ্ঞা করে। স্বীয় বাসনা পূর্ণ করার জন্য সবাইকে ভুলে যেতে দ্বিধাবোধ করে না। টাকার মোহ তাকে পাগল করে তোলে। লোভ মানবজীবনের বড় শত্রু। লোভকে এজন্য পাপের আধার বলা যেতে পারে। তিনটি জিনিস মানুষকে ধ্বংস করে– লোভ, অহংকার এবং হিংসা। লোভ তাদের মধ্যে একটি। মানুষ আল্লাহর প্রিয় বান্দা এবং আল্লাহর সৃষ্টির সেরা জীব। কিন্তু স্বয়ং আল্লাহও লোভীদের পছন্দ করেন না। লোভ আর স্বার্থবুদ্ধির দ্বারা তাড়িত হয়ে মানুষ ভাইকে, বন্ধুকে হত্যা করেছে। পরিণামে নিজের আত্মহননের পথ নিজেই তৈরি করেছে। এ কথা সত্য যে, লোভের পথে পা দিলে একদিন তার মৃত্যু হবেই। লোভ মানুষকে জঘন্য পথে ক্রমশ তাড়িত করে। বেশি লোভ করা ভালো নয়। কথায় আছে– 'অতি লোভে তাঁতি নষ্ট'। আর এভাবেই লোভী ব্যক্তি পথভ্রষ্ট হয়। সে অন্যায়, অসত্য আর পাপের পথে ধাবিত হয়ে অকাল মৃত্যুর মুখোমুখি হয়। পরিণামে নেমে আসে ভয়ংকর মৃত্যু। লোভকে বর্জন করতে হবে। তবেই জীবন সুন্দর হবে সার্থক হবে। নির্লোভ জীবনের মাঝেই নিহিত আছে প্রকৃত সুখ। নির্লোভ জীবন সকলের শ্রদ্ধা ও ভক্তি অর্জন করে। তাই আমাদের প্রত্যেকের উচিত লোভ-লালসা পরিহার করা।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



**মেঘ দেখে কেউ করিসনে ভয়**
**আড়ালে তার সূর্য হাসে,**
**হারা শশীর হারা হাসি**
**অন্ধকারেই ফিরে আসে।**

সংগ্রামমুখর মানবজীবনের বিভিন্ন ধাপে নানা বাধাবিঘ্ন আসে। এতে ভয় পেয়ে সাহস হারালে জীবনের কাম্য লক্ষ্যে পৌছানো যায় না। বরং এসব বাধা তুচ্ছ করে এগিয়ে গেলেই সার্থকতা লাভ করা যায়। কেননা অন্ধকারের পর যেমন আলো আসে, তেমনি ব্যর্থতার পরেই আসে সফলতা। মানুষের জীবনের চলার পথ কুসুমাস্তীর্ণ নয়। প্রতি মুহূর্তে মানুষকে নানা প্রতিকূল অবস্থার সাথে সংগ্রাম করে অগ্রসর হতে হয়। চলার পথে মানুষের জীবনে এমন কঠিন সমস্যা আসে যখন সাফল্যের আর কোনো আশা নেই বলেই মনে হয়। এতে যদি আমরা ভীত হই, পথ চলার সাহস হারিয়ে ফেলি তাহলে জীবন ব্যর্থ হয়ে যাবে। বরং এসব বাধা-বিপত্তি তুচ্ছ করে প্রবল সাহসে দৃপ্ত পদক্ষেপে এগিয়ে যেতে হবে। একবার ব্যর্থ হলেই হাল ছেড়ে দিয়ে বসে থাকা যাবে না। কেননা, Failure is the piller of success. পৃথিবীতে যেসব মানুষ সার্থকতার সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করেছেন, যাদের নাম পৃথিবীর মানুষ শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করে, তাদের জীবনী পর্যালোচনা করলে আমরা দেখব কঠিন সাধনার পরেই তারা সার্থকতা লাভ করেছেন। এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহম্মদ (স)। কাফেরদের প্রবল বিরোধিতা, নির্যাতনে তিনি যদি পিছ পা হতেন তাহলে ইসলাম আজ বিশ্বব্যাপী প্রসারিত হতো না। তাই একবার ব্যর্থ হলেই চলা থামিয়ে না দিয়ে নতুন করে আবার শুরু করাই মানুষের কর্তব্য হওয়া উচিত। কেননা, জীবনে যে কোনো জিনিস পেতে হলে প্রয়োজন তপস্যা ও সাধনা।

## ২২তম বিসিএস : ২০০১

**স্ফুলিঙ্গ তার পাখায় পেল**
**ক্ষণকালের ছন্দ**
**উড়ে গিয়ে ফুরিয়ে গেল**
**সেই তারি আনন্দ।**

স্ফুলিঙ্গ অত্যন্ত অল্প সময় স্থায়ী হয়ে থাকে। এ স্বল্প সময়েই সে তার জ্বলে ওঠার মাঝে একটা ছন্দ, একটা ঝলক খুঁজে পায় এবং মুহূর্তের মাঝেই সে ফুরিয়ে যায়। কিন্তু তার অবস্থান যত অল্পক্ষণের জন্যই হোক, তার মাঝে বিদ্যমান ছন্দ তাকে যে আনন্দ দিয়েছে, এতেই সে সার্থক। তদ্রূপ মানুষও জগতে অমর নয়। ক্ষুদ্র এ জীবনে মানুষ যদি একটা আলোকিত জীবন লাভ করতে পারে এতেই জীবনের সার্থকতা। পরার্থপরতা, পরদুঃখানুভূতি, মঙ্গল সাধন ইত্যাদি শুভকর্ম সম্পাদনের মাধ্যমে মানুষ তার মনুষ্যত্বের স্বাদ গ্রহণ করতে পারে। সেজন্য চাই জীবনে মানবিক গুণাবলীর সুষম বিকাশ। যথার্থ জ্ঞানার্জন আর মনুষ্যত্বের বিকাশের পরিবর্তে যখন মানুষ তার জীবনকে ভোগ-লালসা আর সংকীর্ণতার মাঝে নিমজ্জিত করে রাখে, তার জীবন তখন নিরর্থক হয়ে পড়ে। কেননা মানবজীবন সার্থক হয় পরের উপকার আর সংসারের স্থায়ী মঙ্গল সাধনের মধ্য দিয়ে। এতে জীবন যত ক্ষুদ্রই হোক, মানুষের মাঝে সে স্থায়ী আসন করে নিতে পারে। পৃথিবীতে যে সকল মহাপুরুষ মানুষের কল্যাণ সাধন করে গিয়েছেন তারা কেবল স্বার্থত্যাগ করে নিশ্চিন্ত থাকতে পারেননি, তাদেরকে অনেক নির্যাতনও সহ্য করতে হয়েছে। সুতরাং যাদের মাঝে মানবিক জ্ঞানের বিকাশ ঘটে তারা সংকীর্ণ সীমাবদ্ধ সংসারের নানা দুঃখ বিমিশ্রিত সুখকে অতি ক্ষণস্থায়ী ও অকিঞ্চিৎকর মনে করে বিশ্বের বিরাট ব্যাপ্তির মাঝে নিজের জীবনকে উপভোগ ও উপলব্ধি করার চেষ্টা করেন। আর এটাই সীমাবদ্ধ এ মনুষ্য জীবনের সার্থক পরিণতির একমাত্র পথ।



**বার্ধক্য তাহাই যাহা পুরাতনকে, মিথ্যাকে, মৃত্যুকে আঁকড়িয়া পড়িয়া থাকে**

সাধারণত বয়সের মাপকাঠিতে তারুণ্য ও বার্ধক্যের পরিমাপ করা হলেও বার্ধক্যের প্রকৃত নির্ধারক বয়স নয়। কেবল বয়সের আধিক্যেই মানুষ বৃদ্ধ হয় না। এমন অনেক তরুণ আছে যারা বয়সে তারুণ্যের অধিকারী হয়েও আচার-আচরণে, অন্ধবিশ্বাসে ও কর্মবিমুখতায় বৃদ্ধের সমতুল্য। পক্ষান্তরে এমন অনেক বৃদ্ধ রয়েছেন যারা মনের দিক থেকে তারুণ্যের তেজোদীপ্ততায় ভরপুর। সুতরাং যারা গতানুগতিক ভাবধারা ও জরাজীর্ণ পুরাতনকে, কুসংস্কারকে, মিথ্যাকে আঁকড়ে ধরে দিনাতিপাত করে তারা যে বয়সেরই হোক না কেন, তারা বৃদ্ধ। এরা জীবনের মোহমায়ায় তারুণ্যের শঙ্কাহীন অভিযানে অংশগ্রহণ করে না। সমাজ ও সংস্কৃতির যুগোপযোগী পরিবর্তনকে এরা স্বাগত জানাতে জানে না। নব সূর্যের সোনালী উষা এদের কাম্য নয়। তাই এরা প্রত্যূষেও দ্বার রুদ্ধ করে নিদ্রায় আচ্ছন্ন থাকে, অর্থাৎ নতুন সংস্কারকে এরা এড়িয়ে চলে। নতুনের কেতন উড়িয়ে ভুবন জয়ের পথে এরা পাড়ি জমাতে পারে না। আধুনিকতার সাথে এরা তাল মেলাতে অক্ষম। এরা শতাব্দীর অগ্রযাত্রায় আগুয়ান জনতার কাফেলায় কুচকাওয়াজ করতে জানে না, তারা আলোর পিয়াসী নয় বরং বিভিন্ন কুসংস্কারে বিশ্বাসী। কোনো ঝুঁকিপূর্ণ কাজে তারা যেতে নারাজ। তাই তারা সৃষ্টিসুখের উল্লাসে মেতে ওঠে না। সুতরাং বয়স তাদের যাই হোক তারা বার্ধক্যের বৈশিষ্ট্যধারী। কবি নজরুলের ভাষায় 'বহু যুবককে দেখিয়াছি যাদের যৌবনের উর্দির নিচে বার্ধক্যের কংকালমূর্তি।'

## ২৩তম বিসিএস : ২০০১

**পুষ্প আপনার জন্য ফোটে না**

পরের তরে আপনাকে বিলিয়ে দেয়ার মাঝেই মনুষ্য জন্মের সার্থকতা। নিজের স্বার্থকে জলাঞ্জলি দিয়ে অপরের কল্যাণে নিজেকে নিয়োজিত করতে পারলেই মানুষের জীবনের উদ্দেশ্য সফল হয়। আর এর মাঝেই মানুষ তার প্রকৃত সুখ খুঁজে পায়।

মানুষের জীবন অনেকটা ফুলের মতো। ফুল ফোটে, সুবাস ছড়ায়, তার সৌরভে চারদিক মুখরিত হয়। এভাবে তার প্রস্ফুটিত ঘ্রাণে অপরকে সুরভিত করার মধ্যে তার সার্থকতা নিহিত। ফুল নিজের কাজে লাগে না। তার মধুর গন্ধ অপরকে মুগ্ধ করে। ফুলের গন্ধে মন আমোদিত হয়। এভাবে আপনাকে বিলিয়ে অপরকে আমোদিত করেই ফুল আপনার সুরভি অনুভব করে। মানুষের জীবনও ঠিক তাই। স্বল্পকালের এ দুনিয়ার কর্মকোলাহলের মাঝে মানুষ সাধনা ছাড়াই নিজের বিকাশ ঘটাতে সচেষ্ট হয়। অনেক কাজের মধ্যে সে নিজেকে মুখরিত করে তোলে। কাজের মাঝেই তার পরিচয়। কিন্তু সে কাজের ফল যদি অপরের উপকারে আসে কেবল তখনি সে কাজের সার্থকতা প্রমাণিত হয়। নিজের ভোগ-বিলাস আর স্বার্থের জন্য কাজ সীমাবদ্ধ হলে তাতে মানুষের সংকীর্ণতা ও স্বার্থপরতাই প্রকাশ পায়। তাই নিজের সুখ-ভোগ ত্যাগ করে অপরের কল্যাণ সাধনের জন্য জীবনকে কাজে লাগাতে পারলে তাতে মহত্ত্বের প্রকাশ ঘটে। পরের সুখ-দুঃখের প্রতি খেয়াল না করে কেবল নিজের সুখ-সুবিধার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করলে তাতে কারোই মঙ্গল হতে পারে না। Emmons-এর ভাষায়, Selfishness is the root and source of all natural and moral evils. অপরের কল্যাণচিন্তা ব্যক্তিকে অমরত্ব দান করে। সুতরাং অপরের জন্য জীবন বিসর্জন কখনো জীবনের অবসান নয়; তা মনুষ্য জীবনের চরম ও পরম সার্থকতা। সুতরাং বিশ্বমানবকে আপনার উদার হৃদয়ে গ্রহণ করে তাদের মঙ্গল সাধনে নিজেকে বিলিয়ে দেওয়াই সকল মানুষের কর্তব্য।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



### বিদ্যা যতই বাড়ে ততই জানা গেল যে, কিছুই জানা হল না

বিদ্যার্জন মানুষের জন্য একটি সার্বক্ষণিক চলমান প্রক্রিয়া। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত মানুষ নতুন নতুন বিষয়ের সাথে পরিচিত হতে থাকে এবং এভাবে জ্ঞানার্জনেরও নতুন নতুন ক্ষেত্র তৈরি হতে থাকে। কেউ কোনো একটি ক্ষেত্রে বিশেষ জ্ঞানার্জন করলেও তার জন্য নতুন আরেকটি ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়ে থাকে। এভাবে জ্ঞানার্জনের চলমান প্রক্রিয়ায় মানুষের জ্ঞান যত বাড়ে ততই তার ক্ষেত্র প্রসারিত হতে থাকে এবং এ প্রসারণের পরিধি এতই ব্যাপক যে, মৃত্যুর আগ পর্যন্ত মানুষের জ্ঞানার্জনের পিপাসা থেকেই যায়। কেউ হয়তো কোনো একটি বিষয়ে জ্ঞানার্জনের পর সাময়িকভাবে নিজেকে জ্ঞানী ভাবতে পারেন, কিন্তু এ জ্ঞানই তাকে আবশ্যিকভাবে জ্ঞানের নতুন দিগন্তে নিয়ে যায় এবং এ নবতর জ্ঞানার্জন এত প্রসারিত হতে থাকবে যে, তিনি যতই জানুন প্রতিদিনই ভাববেন যে, আসলে তার কিছুই শেখা হয়নি। যেমন বিখ্যাত বিজ্ঞানী বলেছিলেন, আমি এতদিন কেবল জ্ঞানসমুদ্রের তীরে নুড়ি পাথর কুড়িয়েছি, জ্ঞানসমুদ্রে এখনো আমার নামা হয়নি। জ্ঞানার্জনের কোনো শেষ নেই। প্রকৃতির বিশাল ব্যাপ্তি এবং মানুষের জানার এ আগ্রহই জ্ঞানের পরিধিকে ক্রমশ ব্যাপ্ত করতে থাকে। মানুষ যত জানে ততই বেশি পরিমাণে জানতে আগ্রহী হয়ে ওঠে। তখন তার জ্ঞানপিপাসা প্রবল হতে থাকে এবং জ্ঞানার্জনের নতুন পথে অগ্রসর হওয়ার নির্দেশনা প্রদান করে। চলমান এ প্রক্রিয়ায় জ্ঞানার্জনের পথপরিক্রমায় জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত মানুষ বিরামহীন ধাবিত হতে থাকে। ধাবিত হওয়ার এ প্রক্রিয়ায় জ্ঞানার্জনের পথে সে কতটা দ্রুততার সাথে ধাবিত হতে পারে তা ব্যক্তির জ্ঞানার্জনের আগ্রহের ওপর নির্ভর করে। যে যত বেশি জানবে সে তত বেশি নবতর জ্ঞানের জন্য অগ্রসর হতে পারবে। সুতরাং জ্ঞানার্জনের কোনো শেষ নেই এবং কোনো জ্ঞানই চূড়ান্ত নয়।

## ২৪তম বিসিএস : ২০০৩

### বই কিনে কেউ কখনো দেউলিয়া হয় না

[নবম বিসিএস দেখুন]

### সাহিত্য, শিল্প, সঙ্গীত কালচারের উদ্দেশ্য নয়—উপায়

মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সার্বিক জীবনব্যবস্থার মার্জিত রূপ হচ্ছে কালচার বা সংস্কৃতি। সাহিত্য, সঙ্গীত ও শিল্পের মাধ্যমে মানুষ এই মার্জিত রূপের সন্ধান লাভ করে। তাই বলা হয়ে থাকে, সাহিত্য, শিল্প, সঙ্গীত কালচারের উদ্দেশ্য নয়—উপায়।

মানব-জীবনের প্রতিচ্ছবি প্রতিফলিত হয় সাহিত্যে। জীবন-জগতের উপলব্ধি ও অভিজ্ঞতাই একজন সাহিত্যিক প্রকাশ করেন তার সাহিত্যে। তিনি একদিকে ব্যক্তি মানুষ—তার নিজস্ব হৃদয় বাসনা, স্বপ্নকল্পনা, সুখ-দুঃখের অনুভূতি আছে; অন্যদিকে তিনি এ সমাজেরই একজন। এ কারণে একদিকে তার আত্মানুভূতি, অন্যদিকে প্রবহমান বস্তুজগৎকে উপস্থাপিত করেন তার রচনায়। এ জন্যই সাহিত্য জীবনের দর্পণ, জীবনের প্রতিচ্ছবি। সাধারণ মানুষের চোখে বা মনে যা ধরা পড়ে না, লেখকের কাছে তা ভেতরের সত্য নিয়ে বিধৃত হয়। সাহিত্যে সমাজের কথা, সামাজিক মানুষের কথা ও বস্তুজগতের কথা আসে জীবনের অবশ্যম্ভাবী প্রকাশ ধর্মে। আর একজন সংস্কৃতিবান ব্যক্তি জীবনসংশ্লিষ্ট এ সাহিত্যের মাধ্যমে জীবনকে সুন্দর ও সুকুমার করে তোলেন। সাহিত্যের মতো সঙ্গীতশিল্পও কালচারের বাহন। কেননা সঙ্গীত হচ্ছে হৃদয়ের আনন্দের বা দুঃখের অনুরণন, খেয়ালী মনের রেখাঙ্কন। গান



গাওয়া, ছবি আঁকা ইত্যাদি হচ্ছে শিল্প। শিল্প বা আর্ট হচ্ছে অনুভূতির সৌন্দর্যময় প্রকাশ। মানুষ মাত্রই অনুভূতিশীল। যে মানুষ অনুভূতিকে অন্যের চেয়ে আরো সংবেদনশীল করে, অনুভব করে এবং প্রকাশের জন্য ব্যাকুল হয় ও প্রকাশে সক্ষম হয় তিনিই তো শিল্পী। ব্যক্তি বিশেষে নানাভাবে তার প্রকাশ ঘটে—কেউ রঙে-রেখায়, কেউ সুরে, কেউ ভাষায়, কেউ পাথরের মধ্যে জীবন সৃষ্টি করে, কেউ বা কাঠের কারুকাজে। এ শিল্পের উৎস হচ্ছে মানবজীবন ও মানবজগৎ। একজন সংস্কৃতিবান ব্যক্তি সাহিত্য, শিল্প ও সঙ্গীতের মাধ্যমে সুন্দর ও সুকুমার এ গুণাবলী আয়ত্ত করেন। সাহিত্য, সঙ্গীত বা শিল্প কালচারের উদ্দেশ্য নয় বরং উপায় বা মাধ্যম। জীবনে যা সুন্দর ও সাবলীল তাই সংস্কৃতি। যে মানুষ এ সুন্দর ও সুকুমার বৈশিষ্ট্যগুলো আয়ত্ত করতে পারেন, তিনিই কালচারড বা সংস্কৃতিবান। কেননা, কালচার মানে উন্নততর জীবন সম্বন্ধে চেতনা—সৌন্দর্য, আনন্দ ও প্রেম সম্বন্ধে অবিহিতি।

## ২৫তম বিসিএস ২০০৫

### সংস্কৃতি শব্দটি উচ্চারণ করা সহজ, বোঝা কঠিন এবং বোঝানো কঠিনতর

ইংরেজি 'Culture' শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ 'সংস্কৃতি'। সামাজিক জীব হিসেবে মানুষ তার সৃষ্টির যেসব বিষয়ের পারস্পরিক সংস্পর্শে আসে সেগুলোকে সংস্কৃতি বলে। মূলত কোনো সমাজের সংস্কৃতি বলতে ঐ সমাজের জীবনযাপন প্রণালীকে বুঝায়। প্রকৃতপক্ষে সংস্কৃতি হচ্ছে সামাজিক সৃষ্টির সমন্বিত রূপ। মানুষ তার অস্তিত্বের নিশ্চয়তা বিধানে যা কিছু সৃষ্টি করেছে তাই সংস্কৃতি। এ সংস্কৃতি শব্দটি আমরা সহজেই উচ্চারণ করতে পারি। কিন্তু এটি এতই ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত যে, এটাকে এক কথায় বুঝানো কঠিন। সংস্কৃতি বিজ্ঞানের মতো তথ্য-উপাত্ত-পরিসংখ্যান সারণি দিয়ে কিংবা জ্যামিতিক চিত্র এঁকে বোঝানোর ব্যাপার নয়। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'কমল হীরের পাথরটাকে বলে বিদ্যে আর তা থেকে যা ঠিকরে বেরোয়, তাকে বলি কালচার।' অর্থাৎ সংস্কৃতি সেই চিৎপ্রকর্ষ বা আলো যা চেনায় জাতির স্বরূপকে। মোতাহের হোসেন চৌধুরী বলেছেন, 'সংস্কৃতি মানে বাঁচা, সুন্দরভাবে বাঁচা।' আর ড. আহমদ শরীফ সংস্কৃতির সংজ্ঞা দিতে গিয়ে লিখেছেন, 'পরিশীলিত ও পরিশ্রুত জীবনচেতনাই সংস্কৃতি।' সংস্কৃতির দুটি রূপ আছে– বস্তুগত সংস্কৃতি ও অবস্তুগত সংস্কৃতি। মানুষের জীবনযাপনের দীর্ঘ পথপরিক্রমায় যেসব বস্তুগত সামগ্রী সৃষ্টি করেছে তার সমষ্টিই হলো বস্তুগত সংস্কৃতি। যেমন– ঘর, বাড়ি, তৈজসপত্র, আসবাবপত্র, শিল্প কারখানা, রাস্তাঘাট ইত্যাদি। বস্তুগত সংস্কৃতি বলতে মূলত অবকাঠামো সংক্রান্ত বিষয়কে বোঝানো হয়ে থাকে।

অপরপক্ষে মানুষ জীবনধারণের বিভিন্ন অবস্থায় তার উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যেসব অবস্তুগত সামগ্রী বা উপাদান সৃষ্টি করেছে তার সমষ্টি হলো অবস্তুগত সংস্কৃতি। যেমন– আচার-আচরণ, রীতিনীতি, ধর্মবিশ্বাস, জ্ঞান, দক্ষতা ইত্যাদি। সৃষ্টির আদিতে এ ধরণীতে কিছুই ছিল না। মানুষের ধারাবাহিক প্রচেষ্টার মাধ্যমে বস্তুগত ও অবস্তুগত সংস্কৃতির মিথস্ক্রিয়ায় গড়ে উঠেছে বর্তমানের বিশ্ব সংস্কৃতি। এ যে এত ব্যাপক ও বিস্তৃত বিষয় এটাকে এক কথায় বা অল্প কথায় বোঝানো অত্যন্ত কঠিন। কারণ সংস্কৃতি স্থির কোনো বিষয় নয়; এটি সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও রূপান্তর ঘটছে। তাছাড়া এক সমাজের সংস্কৃতির সঙ্গে অপর সমাজের সংস্কৃতিরও রয়েছে বিস্তর পার্থক্য। কেননা প্রত্যেক সংস্কৃতিই নিজের মতো করে বিকশিত হওয়ার অধিকার রাখে। তাই বলা যায়, সংস্কৃতি শব্দটির প্রকাশ মাত্র একটি শব্দে উচ্চারণ করা গেলেও এর ব্যাপকতা বোঝা এবং বোঝানো দুরূহ।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



## স্বাধীনতা অর্জনের চেয়ে স্বাধীনতা রক্ষা করা কঠিন

অনেক ত্যাগ ও তিতিক্ষার বিনিময়ে, অনেক সংগ্রামের মাধ্যমে পরাধীনতার নাগপাশ ছিন্ন করে যে স্বাধীনতা অর্জিত হয় তা রক্ষা ও সুসংহত করার জন্য জাতীয় জীবনে অনেক গুরুদায়িত্ব পালন করতে হয়। স্বাধীনতাকে রক্ষা করে তাকে ফলপ্রসূ করতে হলে প্রয়োজন হয় জাতীয় ঐক্য নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক স্বনির্ভরতা অর্জন এবং দেশের মানুষের অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা, বাসস্থান ও চিকিৎসার মান উন্নয়ন। কিন্তু এ কাজ খুব সহজে হয় না। বিভিন্ন জাতির স্বাধীনতার অভিজ্ঞতা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, স্বাধীনতা অর্জন করা কঠিন হলেও তাকে রক্ষা ও ফলপ্রসূ করার কাজ আরো কঠিন।

যে কোনো দেশের স্বাধীনতা অর্জিত হয় যথেষ্ট ত্যাগ-তিতিক্ষার মধ্য দিয়েই। বিদেশী শাসন-শোষণের নিষ্পেষণ থেকে মুক্তির জন্য প্রয়োজন হয় কঠিন সংগ্রামের। প্রায় ক্ষেত্রেই বিদেশী শাসকশক্তি হয় পরাক্রমশালী। তাদের থাকে সুশৃঙ্খল প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা, বিপুল রণসম্ভার। তাদের বিরুদ্ধে লড়তে গেলে প্রয়োজন হয় জাতীয় ঐক্য, বলিষ্ঠ নেতৃত্ব ও বিপুল সাংগঠনিক শক্তি এবং দীর্ঘদিনের প্রস্তুতির। স্বাধীনতা সংগ্রামে সংগ্রাম হয় প্রত্যক্ষ, শত্রু থাকে প্রকাশ্য এবং লক্ষ্য হয় একমুখী। স্বাধীনতার দুর্বার আকাঙ্ক্ষায় জনগণ অগ্রসর হয় ত্যাগী মনোভাব নিয়ে; স্বার্থবুদ্ধি বা বিভেদের শক্তি তখন বড় হয়ে উঠতে পারে না। তার অস্তিত্ব থাকলে তা থাকে অদৃশ্য। কিন্তু পদে পদে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয় স্বাধীনতা-উত্তরকালে দেশগঠন পর্বে। একদিকে থাকে পরাজিত শক্তি ও তাদের দেশীয় অনুচরদের জিঘাংসা ও মরণকামড়ের জ্বালা; অন্যদিকে স্বাধীনতার পক্ষের শক্তির অভ্যন্তরীণ রেষারেষি। এই পরিস্থিতিতে নব-অর্জিত স্বাধীনতাকে ধ্বংস করার চক্রান্ত মোকাবিলা সহজসাধ্য হয় না। পাশাপাশি স্বাধীনতা-উত্তরকালে প্রশাসনিক সংস্কার করে নতুন প্রশাসন-ব্যবস্থা গড়ে তোলা, অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা অর্জন, রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা আনয়ন এবং পশ্চাৎপদতা উত্তরণ করে জনগণের জীবনে স্বাধীনতাকে অর্থবহ করে তোলা অত্যন্ত কঠিন কাজ বলে প্রতীয়মান হয়। তাই স্বাধীনতা অর্জন যতই ত্যাগসাপেক্ষ হোক না কেন, সদ্য স্বাধীন দেশকে আত্মনির্ভরতা ও সমৃদ্ধির পথে অগ্রসর করা অনেক বেশি কঠিনতর কাজ।

## ২৭তম বিসিএস ২০০৬

### মানুষ বাঁচে তার কর্মের মধ্যে, বয়সের মধ্যে নয়

জন্ম-মৃত্যু স্রষ্টার নিয়মের অধীন। কিন্তু কর্ম মানুষের হাতে। এক মুহূর্তের কর্ম বলে মানুষ চিরঞ্জীব হয়ে থাকতে পারে। কাজেই আয়ুষ্কাল বা বয়স বড় কথা নয়। বড় কথা হলো মানুষের কর্ম।

মানুষ মরণশীল। মৃত্যুর স্বাদ প্রত্যেক মানুষকেই গ্রহণ করতে হয়। কেবল দুদিন আগে আর পরে। মৃত্যুর পর মানুষের দেহ পচে যায়। কিন্তু মানুষ পৃথিবীতে এসে যে কর্ম করে তা নষ্ট হয় না। তাই মানুষকে যুগের পর বাঁচিয়ে রাখে, কাউকে সুজন হিসেবে আর কাউকে দুর্জন হিসেবে। যেমন অনেক আগে হিটলারের মৃত্যু হয়েছে। কিন্তু পৃথিবীর বুকে তিনি যে বিভীষিকার ক্ষতচিহ্ন এঁকে দিয়ে গেছেন তার জন্য মানুষ যতদিন পৃথিবী টিকে থাকবে ততদিন তাকে ঘৃণার্থে স্মরণ করে যাবে। অন্যদিকে মহামানব হযরত মুহাম্মদ (স), গৌতম বুদ্ধ, ঈসা (আ), আইনস্টাইন, নিউটন, গ্যালিলিও, মাদার তেরেসা, রবীন্দ্রনাথ, শেক্সপিয়ার প্রমুখ ব্যক্তি তাদের সৎ ও মহৎ কর্মের দ্বারা যে ইতিহাস সৃষ্টি করে গেছেন তা পৃথিবীর ইতিহাসে চিরদিন অম্লান হয়ে থাকবে। মানুষের হৃদয়ে তাদের অধিষ্ঠান চুল পরিমাণও নড়চড় হবে না। তাদের হাড়-মাংস পচে নাশ হয়ে গেছে। কিন্তু তারপরও তারা চিরঞ্জীব। তাদের মৃত্যু নেই। আর সে



জন্যই বলা হয়ে থাকে যে, 'কীর্তিমানের মৃত্যু নেই।' কাজেই শুধু খেয়ে-পরে বাঁচার জন্য আমাদের জন্ম হয়নি। সৎকর্মের দ্বারা মানবকল্যাণ সাধন করার জন্যই পৃথিবীতে আমাদের আগমন ঘটেছে। আর মানুষ হিসেবে প্রত্যেককেই আমাদের সে কথা মনে রেখে সম্মুখপানে অগ্রসর হওয়া উচিত।

Man may live not by years but by achievement. অর্থাৎ এ কথাই শতসিদ্ধ যে, 'মানুষ বাঁচে তার কর্মে, বয়সে নয়।'

## পুষ্প আপনার জন্য ফোটে না

সমাজের বৃহত্তর কল্যাণে নিজেকে নিবেদন করাতেই মনুষ্য জীবনের সার্থকতা। পুষ্পের সার্থকতা যেমন আত্মত্যাগে, ব্যক্তিজীবনের সার্থকতাও তেমনি সামগ্রিক সামাজিক কল্যাণে নিজকে বিলিয়ে দেয়ার মাঝে। পরের জন্য নিজেদের নিঃশেষে বিলিয়ে দেয়ার মাঝে আছে পরম সুখ, অনির্বচনীয় আনন্দ ও অপরিসীম পরিতৃপ্তি। পুষ্প যেন মানবব্রতী জীবনেরই প্রতিচ্ছবি। সৌন্দর্য ও সৌরভে পুষ্প অনুপম। অরণ্যে কিংবা উদ্যানে যেখানেই ফুল ফুটুক সে নিজের জন্য ফোটে না। নিজের সৌন্দর্য ও সৌরভকে অন্যের কাছে বিলিয়ে দেয়াতেই তার পুষ্প জীবনের সার্থকতা। পবিত্রতার প্রতীক বলে ফুল দেবতার চরণে নিবেদিত হয় নৈবেদ্য হিসেবে। ফুলের সৌরভ ও সৌন্দর্য তার নিজের হলেও সকলের কাছে নিজেকে উজাড় করে দিয়েই ফুল জীবনের সার্থকতা খুঁজে পায়। মানুষের জীবনও অনেকটা ফুলের মতো। তাই চারিত্রিক মাধুর্যে সে জীবন হওয়া উচিত ফুলের মতোই সুন্দর, সুরভিত, পবিত্র ও নির্মল। ফুলের মতোই তা নিবেদিত হওয়া উচিত পরের জন্য, সমাজের স্বার্থে। সমাজবদ্ধ জীবনের আশ্রয়েই মানুষের অস্তিত্ব। তাই সমাজের প্রতিটি মানুষের রয়েছে বহু দায়বদ্ধতা। সামাজিক দায়িত্ব ও কর্তব্যকে ভুলে কেবল নিজের সুখভোগে মত্ত হলে মানুষ হয়ে পড়ে সংকীর্ণ ও স্বার্থপর। তার চেয়ে পরের কল্যাণে আত্মনিবেদনের ব্রতে অনেক সুখ। সমাজে যারা দুঃখ-যন্ত্রণায় পর্যুদস্ত, সেবা ও সহমর্মিতার চেতনা নিয়ে তাদের পাশে দাঁড়াতে পারলে, দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফোটাতে পারলেই মানুষের জীবন সার্থক হয়। তাই মানবজীবনের মূলমন্ত্র হওয়া উচিত— 'সকলের তরে সকলে আমরা, প্রত্যেকে আমরা পরের তরে।' সব মানুষ যেদিন ফুলের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে পরের কল্যাণে জীবনকে বিলিয়ে দিতে পারবে সেদিনই সমাজজীবনে দুঃখ, যন্ত্রণা, বৈষম্যের অবসান হবে। মানুষের জীবন হয়ে উঠবে আনন্দঘন ও কল্যাণময়।

## ২৮তম বিসিএস ২০০৯

### অজ্ঞতার সঙ্গে মনের দাসত্বের যোগ অতি ঘনিষ্ঠ

অজ্ঞতা সামাজিক কুসংস্কার, পশ্চাৎপদতা ও কর্মবিমুখতার মূল। কারণ এসব নেতিবাচক অনুষঙ্গ মানুষকে সংকীর্ণ করে রাখে; সমাজে নিজেকে নেতিবাচকভাবে উপস্থাপন করে। জীবনে শিক্ষার ছোঁয়া যে পায়নি তার পক্ষে আত্মস্বরূপ চিনে নেয়া অসম্ভব। সামাজিক, রাজনৈতিক, শিক্ষা, সাংস্কৃতিক সকল বিষয়ে কোনো মৌলিক ধারণাও তার সৃষ্টি হয় না। আর এখানেই মানুষের মনের দাসত্বের বহিঃপ্রকাশ।

সৃষ্টিকুলের শ্রেষ্ঠ জীব মানুষ। বিচার-বুদ্ধি বা জ্ঞানলাভের যোগ্যতা আছে বলেই মানুষের এ বিশিষ্টতা। কিন্তু কোনো মানুষ মানবকুলে জন্মগ্রহণ করেও যদি জ্ঞানলাভের সুযোগ বা অনুকূল পরিবেশ থেকে বঞ্চিত হয় তাহলে সে অজ্ঞানরূপ অন্ধকারে অবগাহন করে। কুসংস্কার, ধর্মান্ধতা, প্রচলিত সামাজিক কুপ্রথা তাকে গ্রাস করে ফেলে। ফলে মিথ্যাকে সে সত্য বলে মানতে শিখে। জ্ঞানের বিকাশ না ঘটায় সঠিক বা সত্যকে চিনতে না পেরে মিথ্যার কাছে বশ্যতা স্বীকার করে। জ্ঞানহীন মানুষ জৈবিক কামনা-বাসনার দাসানুদাসে পরিণত হয়, তারা কুপ্রবৃত্তির দাসত্বে সর্বদা নিমগ্ন থাকে। তার দ্বারা সমাজের

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



কোনো কল্যাণকর কাজ হয় না। সমাজের একজন মানুষ ততক্ষণ পর্যন্ত একটি প্রথার বিরুদ্ধাচরণ করতে পারে না যতক্ষণ না সে ঐ প্রথাকে মিথ্যা বা ভ্রান্ত বলে প্রমাণ করার মতো যথাযোগ্য জ্ঞান লাভ করতে পারে। সমাজের নানা অসঙ্গতি বা অন্যায়ের বিরুদ্ধে দেশের প্রচলিত আইন সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণে মানুষ নানা অন্যায় শাস্তি মাথা পেতে নিতে বাধ্য হয়। আর অজ্ঞতার দরুন অন্যায় মেনে নেয়ার এ প্রবণতা থেকে বহিঃপ্রকাশ ঘটে তার মনের দাসত্বের। কিন্তু আইনবিষয়ক জ্ঞানালোকে যদি কেউ আলোকিত হয় তাহলে সে এর বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নিয়ে সমাজকে এ ধরনের ধর্মান্ধতা বা কুপ্রথা থেকে মুক্ত করতে পারে।

তাই বলা যায় যে, অজ্ঞতার সাথে মনের দাসত্বের যোগ অতি ঘনিষ্ঠ।

### কষ্ট না করলে কেষ্ট পাওয়া যায় না

সাধনা ব্যতীত সিদ্ধিলাভ ঘটে না। ধর্মের পথেই হোক কি সংসারের পথেই হোক 'সাধনা' একান্ত আবশ্যক। উদ্যোগ, উদ্যম, আয়োজন, পরিশ্রম, কর্মশক্তি, দৃঢ়প্রতিজ্ঞা— এসব যে সাধনারই অঙ্গ। সাফল্য অর্জন করতে হলে কঠোর সাধনা অত্যাবশ্যক। পরিশ্রম ও উদ্যম ছাড়া কারো মনোবাসনা পূর্ণ হয় না। সিদ্ধিলাভে দৃঢ়সংকল্প হতে হয়, অনন্যমনা হয়ে কঠিন পরিশ্রম করতে হয়— ত্যাগ স্বীকারে, কষ্ট স্বীকারে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হলে চলে না। 'কেষ্ট'কে লাভ করতে হলে অর্থাৎ জীবনে পরম সাফল্য লাভ করতে হলে চরম ত্যাগ-তিতিক্ষার সম্মুখীন হতে হবে, সর্বশক্তি প্রয়োগ করে সাফল্যের স্বর্ণাসনে আরোহণের প্রয়াস পেতে হবে। এছাড়া সফলতার বিকল্প কোনো সহজ পথ বা পন্থা নেই। রাজপুত্র যে, তাকেও বিদ্যালাভের জন্য সাধনা করতে হবে। দশজন পণ্ডিত তাকে বিদ্যা গিলিয়ে দিতে পারবে না— তাকে নিজে পড়তে হবে, লিখতে হবে, শিখতে হবে এবং সেজন্য আবশ্যক অধ্যবসায়। ইউক্লিডের কথায়, জ্যামিতিতে রাজার জন্য বিশেষ পথ নেই। ব্যবসা-বাণিজ্যে ধনীর সুযোগ-সুবিধা আছে বটে, কিন্তু বুদ্ধি প্রয়োগ না করলে তাকে ডুবতে বেশি দেরি হয় না। সাধনাই যে উন্নতির সোপান ও সমৃদ্ধির চাবিকাঠি— এর দৃষ্টান্ত আমরা পাই ছোট পিপীলিকা ও মৌমাছির কাছ থেকেও। ছোট পিপীলিকা ও মৌমাছি সারাদিন পরিশ্রম করে যে খাদ্য আহরণ করে, এ খাদ্যই যখন দুর্দিন আসে তখন সে তা খেয়ে সুখী হয়। ঠিক তেমনি প্রত্যেকটি মানুষকে সৌভাগ্য ও সুখ নামক সোনার হরিণের সন্ধান পেতে হলে নিরলস পরিশ্রম ও সাধনা করতে হবে।

এ কথা যথার্থ যে, মানুষকে পরিশ্রমের দ্বারাই জীবিকা নির্বাহ করতে হয়। এটা মানবজীবনের সাধারণ ধর্ম। জীবনের প্রতিপদে মানুষকে কষ্ট স্বীকার করতে হয়। তবেই তার পক্ষে জীবনযুদ্ধে জয়লাভ করা সম্ভব হয়।

## ২৯তম বিসিএস ২০১০

### যে সহে, সে রহে

সহনশীলতা একটি মহৎ গুণ এবং মানবজীবনে সুপ্রতিষ্ঠার জন্য এই গুণের বিশেষ গুরুত্ব বিদ্যমান। মানুষের মতো বাঁচতে হলে এবং জীবনে সাফল্য অর্জন করতে হলে সর্বাগ্রে প্রয়োজন সহনশীলতা। সহনশীলতা মানবজীবনের অন্যতম সাম্যনীতি। পৃথিবীতে অবিমিশ্র সুখ-দুঃখ বলে কিছু নেই। সুখ-দুঃখ আসলে মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ। বিপদাপদের মধ্য দিয়েই মানুষের যাত্রা শুরু হয়। তাকে সংগ্রাম করতে হয় নানা প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে। রোগ-শোক, দুঃখ-দারিদ্র্য, অন্যায়-অবিচার এসবের চাপে মানব পর্যুদস্ত হয়। চোখে বিভীষিকা দেখে। কিন্তু এসব প্রতিরোধ করার জন্য চাই শক্তি, অধ্যবসায় ও সহিষ্ণুতা। যুদ্ধে জয়-পরাজয় আছেই কিন্তু যে মানুষ পরাজয়কে অম্লান বদনে মাথা পেতে নিয়ে



পরবর্তী বিজয়ের জন্য ব্রতী হয়— সে-ই বিজয় অর্জন করতে পারে, সে-ই যথার্থ বীর। বিখ্যাত মনীষীদের জীবন পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, সফলতা অনায়াসে তাদের কাছে ধরা দেয়নি। এ সফলতার জন্য তাদের সহ্য করতে হয়েছে নানা লাঞ্ছনা-গঞ্জনা। কিন্তু মহৎ লোকেরা এতে পিছপা হননি বরং ধৈর্যসহকারে এগিয়ে বিজয়ের মালা ছিনিয়ে এনেছেন। তারা যদি ধৈর্য হারিয়ে ফেলতেন তবে তাদের সাফল্য আসত না। কাজেই সহ্য ক্ষমতা যার আছে বেঁচে থাকার অধিকার কেবল তারই। ইতিহাসের পাতায় এরূপ বহু দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া যায়। মহানবীর জীবনালেখ্য সহনশীলতার এক অসামান্য দলিল। তাই তো তিনি মক্কা বিজয়ের পরও বন্দিদেরকে দিলেন নিঃশর্ত মুক্তি। ঘোষণা করেন, 'তোমরা সবাই মুক্ত, স্বাধীন।' এ সহনশীলতায় মুগ্ধ হয়েই আশ্চর্য কণ্ঠে বলে ওঠেন উইলিয়াম ম্যুর, 'ধৈর্যহীন হলে কোনো কিছুই নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভবপর হয় না।' ধৈর্য না থাকলে যে কোনো সমস্যা মোকাবিলা করা কঠিন হয়ে পড়ে। এ অবস্থা জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভের অন্তরায়। সহনশীল বা ধৈর্যশীল হলে মানুষ ধীরস্থিরভাবে কর্মপন্থা নির্ধারণ করতে পারে এবং প্রতিপক্ষকে মোকাবিলা করার উত্তম কৌশল অর্জন করতে সক্ষম হয়। তাই জীবনে সফলতার জন্য সকলকে ধৈর্যশীল বা সহনশীল হতে হবে। 'The magnanimity with which Mohammed treated a people who had so long hated and rejected him is worthy of admiration.' স্কটল্যান্ডের রাজা রবার্ট ব্রুস ইংল্যান্ডের রাজা এডওয়ার্ডের সাথে ছয়বার যুদ্ধে পরাস্ত হয়েও ধৈর্যধারণ করেছিলেন এবং সহিষ্ণুতার গুণে পুনরায় যুদ্ধ করে সপ্তমবারের প্রচেষ্টায় শত্রুর কবল থেকে স্বদেশ উদ্ধার করেন।

### অভাগার গরু মরে, ভাগ্যবানের বউ মরে

গরু গার্হস্থ্য জীবনের অর্থকরী সম্পদ। গরুসম্পদ ব্যবহার করে দরিদ্র কৃষকের অর্থনৈতিক কল্যাণ সাধিত হয়। দরিদ্র কৃষকের গরু মরলে অনেক সময় তার কৃষিকাজ বাধাগ্রস্ত হয়। আরেকটি গরু কিনতে তাকে প্রায় সর্বস্বান্ত হতে হয়। এটি জীবনযাপনের একটি দিক। অন্যদিকে পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় নারীকে পদে পদে শাসন-শোষণ, বঞ্চনা, নির্যাতনের শিকার হতে হয়। পুরুষ নারীকে তাদের প্রয়োজনে ভোগ্যপণ্যে রূপান্তরিত করেছে। নারীকে ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছে। নারী হয়ে পড়েছে শিক্ষায় অনগ্রসর। ফলে তারা হয়েছে অবহেলিত ও পশ্চাৎপদ। লেখাপড়া কম জানা বা না জানার কারণে দেশের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডেও নারীর অবদান কম এবং গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হয় না। সামাজিক দিক দিয়ে নারীরা বিপর্যস্ত। নারীকে ধর্মীয় কুসংস্কার, গোঁড়ামির বেড়াজালে আবদ্ধ রেখে ঘরের চার দেয়ালের মধ্যে তাদের বন্দি করা হয়েছে। পুরুষতান্ত্রিক সমাজ কাঠামোয় জন্ম থেকেই শুরু হয় নারীর প্রতি বৈষম্য, অনাচার, বঞ্চনা, সহিংসতা। অভাবের সংসারে ছেলের পাতে এক মুঠো ভাত জুটলেও মেয়েটিকে থাকতে হয় উপোস বা অর্ধাহারে। স্বাস্থ্যগত দিক দিয়ে নারী ভোগে অপুষ্টিতে। বিয়ের সময় ছেলেকে দিতে হয় যৌতুক, অন্যথায় হতে হয় নির্যাতনের শিকার। এমনকি স্বামী কর্তৃক পরিত্যক্ত পর্যন্ত হতে হয়। স্বামীগৃহে গৃহবধূকে নানা অত্যাচারের শিকার হতে হয়। শুনতে হয় কটুক্তি। অর্থনৈতিকভাবে নারীকে দুর্বল রেখে পুরুষ নারীকে করে তোলে পরনির্ভরশীল। সমাজ ও সংসারে নারী বঞ্চিত হয় ন্যায্য অধিকার থেকে। উপেক্ষিত হয় জীবনের সর্বক্ষেত্রে। নারী পরিণত হয় পুরুষের ক্রীড়নকে। শিক্ষা, অভিজ্ঞতা, মননের উৎকর্ষে নারীকে পিছিয়ে রাখা হয়। যে নারী সন্তান জন্ম দিল, তাকে লালন-পালন করে বড় করল, অথচ সেই নারীকে তার সন্তানের ভবিষ্যৎ নিয়ে কোনো সিদ্ধান্ত নিতে দেয়া হয় না, বা দিলেও তা গৃহীত হয় না। এভাবে পুরুষতান্ত্রিক সমাজকাঠামোয় সামাজিক কুসংস্কার,

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



নিপীড়ন ও বৈষম্যের বেড়াজালে নারীকে সর্বদা অবদমিত করে রাখা হয়েছে। আলোচ্য প্রবাদটিতে গরুর মৃত্যুতে দুঃখ প্রকাশ ও গৃহবধূর মৃত্যুতে সুখ প্রকাশ পুরুষের মানসিক বিকৃতির পরিচায়ক। ভোগী পুরুষ স্ত্রীর মৃত্যু হলে অনায়াসে আরেকটি বিয়ে করে নতুন নারী উপভোগ ও যৌতুক লাভ করতে পারবে বলে গৃহবধূর মৃত্যুকে সে সৌভাগ্যের লক্ষণ বলে মনে করে। এ দ্বারা নারীকে পশুর চেয়েও নিচে নামানো হয়েছে। বহু আগে প্রচলিত এ প্রবাদের অকার্যকারিতার লক্ষ্যে বহুবিধ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। পাশাপাশি নারী উন্নয়নে আন্তর্জাতিকভাবেও নানা উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। আশা করা যায়, অদূর ভবিষ্যতে পুরুষের এরূপ নীচ, হেয় মানসিকতার পরিবর্তন ঘটবে। নারী-পুরুষের সমতা অর্জিত হবে।

## ৩০তম বিসিএস ২০১১

### নাচতে না জানলে উঠান বাঁকা

কাজে কুশলতা দেখাতে না পারলে মানুষ অপরের ওপর দোষ চাপাতে চেষ্টা করে। নিজের অক্ষমতা ঢেকে রাখার জন্য মানুষের এ ধরনের প্রবণতা লক্ষ করা যায়। নিজের কোনো দোষ-ত্রুটি কেউ স্বীকার করতে চায় না বলে অপরের ওপর দোষ চাপানোর বৈশিষ্ট্য মানুষ দেখিয়ে থাকে। নাচতে জানলেই তবে নৃত্যশিল্পী হয়ে ওঠা সম্ভব। দক্ষতার জন্য বাহাদুরি তারই প্রাপ্য। কিন্তু নাচে দক্ষতা অর্জন করা সম্ভব না হলে তখন দোষ চাপানো হয় উঠানের ওপর। উঠান বাঁকা সেজন্য নাচা গেল না। এমন কৈফিয়ৎ অক্ষম নৃত্যশিল্পীরাই দিয়ে থাকে। এ ধরনের প্রবণতা মানুষ তার বিভিন্ন কাজে ফুটিয়ে তোলে। নিজের ব্যর্থতা বা অক্ষমতার কথা মানুষ সহজে স্বীকার করতে চায় না। অন্যের ওপর দোষারোপ করে নিজের গ্লানি থেকে রেহাই পেতে চায়। সেজন্য মানুষ যুক্তির আড়ালে ত্রুটি গোপন করে। নিজেকে নির্মল করে রাখার চেষ্টা মানুষের থাকে। কিন্তু জীবনে ব্যর্থতা থাকবে না এমন হতে পারে না। দুর্বল মনের মানুষ সে ব্যর্থতাকে স্বীকার করে না। যার সাহস নেই, উদারতা নেই সে-ই এমন পরের ওপর দোষ চাপায়। মানুষকে বড় মনের অধিকারী হতে হবে এবং সত্যকে যথাযথভাবে স্বীকার করে নিতে হবে। নিজের দোষ স্বীকার করা বড় গুণ। মানুষকে এ গুণের অধিকারী হওয়া উচিত।

### অল্প জলের তিত পুঁটি, তার এত ছটফটি

তিত পুঁটি এক ধরনের ছোট মাছ, যেগুলো অল্প ও অগভীর জলে বসবাস করে। সমুদ্রের বিশাল জলের সাথে এদের পরিচয় নেই, নেই অভিজ্ঞতা ও বিচরণ জীবনের অন্য বিষয়ের সাথে। আমাদের সমাজেও তিত পুঁটি সদৃশ এমন কিছু ব্যক্তি রয়েছেন যাদের জ্ঞান কিংবা গুণ খুবই সামান্য কিন্তু উচ্চ বাক্য, মুখের বুলি আর ভাবখানা এমন যে, সে যেন অবিরতই বিশ্ব জয় করে চলছে।

মানুষ সৃষ্টির সেরা জীব। আল্লাহ সকল মানুষকে অতি সুন্দরভাবে সৃষ্টি করেছেন। তবে এই মানুষের মাঝে কিছু পার্থক্য আছে। তাই সমাজে এমন অনেক লোক দেখা যায় যারা নিজের ক্ষমতা বা অবস্থার কথা চিন্তা না করে কেবলমাত্র মুখের জোরে দিনকে রাত করার চেষ্টা করেন। যার নেই ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবোধ, নেই নিজস্ব গুণাবলী কিংবা যিনি খোঁজ রাখেন না নিজের সীমাবদ্ধতার— দেখা যায় তিনি শুধু অহংকার, আত্ম-গৌরব ও ফাঁকাবুলি দিয়ে ধরাকে সড়া জ্ঞান করে চলার চেষ্টা করেন। এ ধরনের মানুষ সমাজের সর্বস্তরেই রয়েছে আর সমাজের ভেতর থেকে সমাজকে ও নিজেকে কলুষিত করে চলছে। প্রকৃতপক্ষে এমন মনোবৃত্তি ধারণ ও লালন করা সত্যিই লজ্জাকর এবং হীনমনোবৃত্তির পরিচয়। আর এ জন্যই ইংরেজিতে বলা হয় 'An empty vessel sound much' অর্থাৎ খালি কলস বাজে বেশি। পক্ষান্তরে যাদের অভিজ্ঞতা বেশি, জ্ঞানের প্রাচুর্যে যারা বলিষ্ঠ, স্বভাবগতভাবেই তারা নমনীয় ও



মহৎ প্রকৃতির হন। এরা নিজের বড়াই নিজে করেন না, মিথ্যা অহমিকা দেখান না, আত্মগৌরব ফুটিয়ে তুলতে নিজেকে হাস্যকর ব্যক্তি বা বস্তুতে পরিণত করেন না। বেশি আড়ম্বর না করে আমাদের অবস্থান নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হবে। যার নিজের শক্তি, সামর্থ্য কিংবা যোগ্যতা নেই, অথচ সে যদি ভাগ্য বা কপালের ওপর দোষ চাপিয়ে বড় হতে চায় তাহলে তার স্বপ্ন পূরণ হবার নয় এবং যদি মিথ্যা বাড়াবাড়ি করে নিজেকে বড় বলে প্রতিষ্ঠিত করতে চায় সেটা কখনোই সম্ভব নয়। অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানের গভীরতার কারণেই মূলত মানুষের চিন্তা ও কর্মের বহিঃপ্রকাশ। যে যত জানে সে তত মানে, যার যত আছে তার প্রকাশ তত কম। মানব সমাজ এমনই বৈচিত্রময় কাঠামোতে প্রতিষ্ঠিত।

## ৩১তম বিসিএস ২০১১

### চাঁদেরও কলঙ্ক আছে

প্রতিটি মানুষেরই যেমন কিছু ভালো দিক বা গুণ রয়েছে তেমনি কিছু খারাপ দিকও রয়েছে। এমনকি মহৎ ব্যক্তিবর্গও একেবারে পুরোপুরি ত্রুটিমুক্ত নন।

ভুল করা মানুষের স্বভাব। এই ভুলের কারণে সৃষ্ট কলঙ্ক মানুষকে সমাজে হেয় করে দেয়। সাধারণ মানুষ অহরহ এই ভুল করে থাকে, তাদের জীবনে এ রকম ছোটখাট ভুল তারা নির্দ্বিধায় করে থাকে। কিন্তু মনীষীগণ কিংবা মহামানবেরা কি এ রকম ভুল বা অপরাধ করেছেন? আমরা তাদের জীবনী ভালোভাবে পর্যালোচনা করলে দেখতে পাব যে, তারাও জীবনে অল্প হলেও অপরাধ করেছেন। যদিও তারা যে পরিবেশ ও পরিস্থিতিতে অন্যায়-অপরাধ করেছেন তা সাধারণ মানুষের ভুল বা অন্যায় করার পরিস্থিতি থেকে ভিন্ন, তবুও তারা অপরাধ তো অন্তত করেছেন। তাই পৃথিবীর যত বড় মনীষী বা মহামানবের জীবনীর দিকে আমরা তাকাই না কেন কিছু অপরাধ আমরা দেখতে পাব, যা তাদের কাছ থেকে আশা করা যায় না।

চাঁদ দেখতে অনেক সুন্দর। অনেক কবি-সাহিত্যিক তাদের কাব্য রচনার অনুপ্রেরণা পান চাঁদ দেখে। কিন্তু চাঁদ সুন্দরের যথার্থ উপমা হলেও এই চাঁদের নিজের গায়েই রয়েছে অসংখ্য কলঙ্কচিহ্নস্বরূপ দাগ। তেমনি মহামানবগণ পৃথিবীতে প্রেরিত হয়েছিলেন মানবজাতিকে সুপথ দেখানোর জন্য, অথচ তাদের দ্বারাও কোনো কোনো সময় এমন অপরাধ বা ত্রুটি সংঘটিত হয়েছে যা তাদের প্রেরণের উদ্দেশ্যের সম্পূর্ণ বিপরীত। তবে আমাদেরকে এ সকল মহামানবের জীবনের ত্রুটিগুলো দেখে সেখান থেকে ভালো শিক্ষা নিতে হবে এবং চেষ্টা করতে হবে। তাদের জীবনের ত্রুটি ধরে বসে থাকলে চলবে না।

### গঙ্গাজলে গঙ্গপূজো

পূজো দেয়া হিন্দুদের কাছে একটি অতি পুণ্যের কাজ। গঙ্গপূজোর ক্ষেত্রে যেমন দেখা যায় যে, গঙ্গামাতার জল দিয়ে পূজো দিয়ে গঙ্গাকে সন্তুষ্ট করতে চেষ্টা করা হয় তেমনি সমাজে অনেক লোক দেখা যায় যারা কৌশলে অপরের অবদান দিয়েই অপরকে সহায়তা করে নিজের স্বার্থ আদায় করে নেন।

পৃথিবীর ইতিহাস ঘাটলে আমরা এরকম অসংখ্য দৃষ্টান্ত দেখতে পাব যেখানে অন্যের সম্পদ দিয়েই অন্যকে পরিতুষ্ট করা হয়েছে, অথচ এ রকম কর্ম সাধনকারী ব্যক্তিকে জগতে সবাই আজও শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করে। স্বাধীনতাযুদ্ধের পর বিভিন্ন দেশ থেকে যে বিভিন্ন ধরনের সাহায্য পাওয়া গেছে তার অধিকাংশই ছিল শর্তযুক্ত, সে শর্ত পূরণ করতে গিয়ে দেখা গেছে যে, বিদেশ থেকে আগত সাহায্যের শতকরা ৮০ ভাগই আবার ঐ দেশে ফিরে গেছে। অথচ বিশ্ব জেনেছে তাদের উদারতার কথা, বর্তমান কালেও যে সব শর্তযুক্ত ঋণ সহায়তা এবং অনুন্নত দেশগুলোকে এমনভাবে কারিগরি ও প্রযুক্তিগত সহায়তা দেয়া হয় যার ফলে ঐ

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



সহায়তার উপকার পাওয়া অনুন্নত দেশগুলোর পক্ষে আর সম্ভবপর হয়ে ওঠে না। যেমন কারিগরি সহায়তার ক্ষেত্রে কারিগরি সহায়তা প্রদানকারী দেশগুলোর কাছ থেকেই বিশেষজ্ঞ বা এক্সপার্ট নিয়োগ করার শর্ত দেয়া থাকে যাদেরকে অনেক বেশি বেতন-ভাতাসহ অন্যান্য অনেক সুবিধা প্রদান করতে হয় এর ফলে বরং উন্নত দেশগুলোই তাদের উদ্বৃত ঋণ এবং বেকার সমস্যার সমাধান করে।

এভাবে উপসাগরীয় যুদ্ধের সময় ইরানের কাছে অস্ত্র বিক্রি করে সেই অর্থ আমেরিকা তুলে দিয়েছিল নিকারাগুয়ার কন্ট্রা বিদ্রোহীদের হাতে। এভাবেই স্বার্থান্বেষী মহল কৌশলে তাদের স্বার্থ উদ্ধারে সব সময় সচেষ্ট রয়েছে। তাই আমাদেরকে এ সকল সুযোগ সন্ধানী কুচক্রীদের ব্যাপারে সতর্ক হতে হবে।

## ৩২তম বিসিএস ২০১২

### জন্ম হোক যথা তথা কর্ম হোক ভাল।

আপন জন্মের ব্যাপারে মানুষের নিজের কোনো ভূমিকা থাকে না। উঁচু বা নিচু, ধনী বা দরিদ্র পরিবারে তার জন্ম হওয়াটা তার ইচ্ছা বা কর্মের ওপর নির্ভর করে না। কিন্তু কর্মজীবনে তার ভূমিকা ও অবদানের দায় তার নিজের ওপর বর্তায়। তাই পৃথিবীতে মানুষের প্রকৃত বিচারে তার জন্ম-পরিচয় তেমন গুরুত্ব বহন করে না। বরং কর্ম-অবদানের মাধ্যমেই মানুষ পায় মর্যাদার আসন, হয় বরণীয়-স্মরণীয়।

সমাজে একদল লোক আছেন যারা বংশ আভিজাত্যে নিজেদের সম্ভ্রান্ত মনে করেন। তারা বংশ মর্যাদার অজুহাতে সমাজে বিশেষ মর্যাদা দাবি করেন। কিন্তু তাদের এই প্রয়াস বাস্তবতা বিবর্জিত ও হাস্যকর। সমাজের নিচুতলায় জন্ম নিয়েও মানুষ কর্ম ও অবদানে বড় হতে পারে। মানবসমাজের ইতিহাসে এ রকম উদাহরণ অজস্র। পদ্মফুলের সৌন্দর্যই বড়। পঙ্কে জন্মেছে বলে তাকে হেয় গণ্য করা হয় না। তেমনি মানুষের কর্মে সাফল্যই বড়, জন্ম-পরিচয়ে মানুষের বিচার হীনমন্যতারই পরিচায়ক। বস্তুত প্রকৃতির রাজ্যে মানুষে মানুষে কোনো ভেদাভেদ নেই। একদল মানুষ মানুষের ওপর আধিপত্য কায়েমের জন্য সমাজে বড়-ছোট, ধনী-দরিদ্র ইত্যাদি ব্যবধান সৃষ্টি করেছে। ধর্মীয় ব্যবধান রচনা করেছে মানুষই। ফলে সমাজে মানুষে মানুষে আপাতদৃষ্টে ভেদাভেদ সৃষ্টি হয়েছে। তাই যে কোনো পেশা, যে কোনো কাজ মানুষ করুক না কেন, তা সমাজে গুরুত্বহীন নয়। মানুষ যেখানেই জন্মাক, যে কাজই করুক, সে সততা ও নিষ্ঠার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করছে কিনা সেটাই বিবেচ্য। মানুষের কল্যাণে, সমাজের অগ্রগতিতে সে যতটা অবদান রাখে তার ভিত্তিতেই তাকে মূল্যায়ন করা হয়। সেই অনুযায়ীই তাকে সমাজে স্বীকৃতি দিতে হয়। বংশ-পরিচয়ের অজুহাতে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সম্পদ, ক্ষমতা ও দম্ভের শক্তিতে মানুষের ওপর জবরদস্তি করে সমাজে মর্যাদার আসন লাভ করা যায় না। তাই জন্ম-পরিচয়ে ঊর্ধ্বে আপন কর্ম-পরিচয় তুলে ধরাই হওয়া উচিত মানুষের জীবনব্রত। তাহলেই সুকর্মের মাধ্যমে মানুষ গৌরব ও মর্যাদার আসনে অসীন হতে পারে।

### জ্ঞানহীন মানুষ পশুর সমান।

জ্ঞানে মানুষ যথার্থ মনুষ্যত্বের অধিকারী হয়ে ওঠে। মানুষ হিসেবে বৈশিষ্ট্যের প্রকাশ পায় জ্ঞানের অধিকারী হলে। অন্যদিকে, জ্ঞানহীন মানুষ পশুত্বের পর্যায় থেকে উন্নীত হতে পারে না। তাই মানুষের সবসময় জ্ঞান সাধনায় নিয়োজিত থাকা অত্যাবশ্যক।

মানুষ হিসেবে জন্ম নিলেই মানুষের জীবন মানবিক গুণসম্পন্ন হয় না। মানুষকে মনুষ্যত্ব অর্জন করতে হয়। শিক্ষা-দীক্ষা ও অভিজ্ঞতার প্রভাবে মানুষের জীবন ক্রমেই জ্ঞান দ্বারা সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। জ্ঞান মানুষকে যোগ্যতা দান করে। নানা বিদ্যায় সে পারদর্শী হতে থাকে। জ্ঞানের আলোকেই মানুষের



জীবন বিকশিত হয়। জ্ঞান মানুষকে বিশ্বজগতের সাথে পরিচিত করে। মানুষ হিসেবে শ্রেষ্ঠত্ব লাভের জন্য জ্ঞানের সহায়তা অপরিহার্য। অন্য প্রাণীর সাথে মানুষের পার্থক্য এখানেই। বিশ্বের তাবৎ প্রাণীর ওপর মানুষ প্রভুত্ব করছে জ্ঞানের শক্তিতে। বিশ্ব সভ্যতার বিকাশ ঘটেছে জ্ঞানের অবদানের ফলে। বিশ্বজগতের বর্তমান উন্নতির পেছনে দাঁড়িয়ে আছে মানুষের জ্ঞানের সাধনা। অপরদিকে, শিক্ষা-দীক্ষার অভাবে জ্ঞানের সাথে যেসব মানুষ পরিচিত হতে পারেনি তারা যথার্থ মনুষ্যত্বের মর্যাদা পায়নি। তারা অজ্ঞতার আঁধারে চিরদিন আবদ্ধ হয়ে আছে। তারা যোগ্যতাহীন। কিছু অবদান রাখার মতো সামর্থ্য তাদের নেই। তারা উন্নত জীবনের সন্ধান পায়নি। জ্ঞানের অভাবে তারা আধুনিক জীবনের সম্পদও ভোগ করতে পারে না। তাদের জীবনের সাথে পশুর জীবনের কোনো পার্থক্য নেই। মানুষ ও পশুর মধ্যে জ্ঞানই ভেদরেখা টেনে রাখে। তাই জ্ঞান অর্জিত না হলে মানুষ আর পশুর মধ্যে কোনো ব্যবধান থাকে না।

## ৩৩তম বিসিএস ২০১২

### শৃঙ্খলিত সিংহের চেয়ে স্বাধীন গাধা উত্তম

স্বাধীনভাবে কোনোমতে জীবনযাপন করাটাও পরাধীন হয়ে বাহ্যিক আরাম-আয়েশের মধ্যে জীবনযাপনের চেয়ে ভালো।

একজন পরাধীন ব্যক্তির কাছে যদি কোনো কিছুর অভাব না-ও থাকে তথাপি সে মানসিকভাবে সুখী থাকতে পারে না। কারণ, যে কোনো ব্যক্তির কাছে স্বাধীনতার সুখের বিকল্প আর কিছুই হতে পারে না। মানুষ সব সময় তার নিজ ইচ্ছায় চলতে চায়, কারও অধীনে থেকে তার নির্দেশনা মোতাবেক তাকে চলতে হবে, এটা কোনোমতেই সে মেনে নিতে চায় না। স্বাধীনভাবে সে বহু কষ্ট স্বীকার করে বেঁচে থাকতে রাজি আছে, কিন্তু পরাধীন হয়ে অঢেল ধন-সম্পদের অধিকারী হয়েও বেঁচে থাকতে রাজি নয় সে। পরের তৈরি সুরম্য অট্টালিকায় বসবাস করার চেয়ে নিজের খড়কুটো দিয়ে তৈরি ভাঙা ঘরে থাকা অনেক সুখের মনে হয় প্রত্যেকের কাছেই।

স্বাধীনতা সকলের কাছেই এক অমীয় সুধা। এ সুধা পান করার জন্য মানুষ রক্তের সাগর পাড়ি দেয়। এ স্বাধীনতা রক্ষায় তাকে হতে হয় আরও সতর্ক। এত কষ্ট করে স্বাধীনভাবে বেঁচে থাকা অন্যের অধীনে এসব কষ্ট ত্যাগ ব্যতীত বেঁচে থাকার চেয়ে শত-সহস্র গুণ শ্রেয়। স্বাধীনভাবে একদিন বেঁচে থাকা পরাধীন হয়ে সহস্র দিন বেঁচে থাকার চেয়ে মঙ্গলজনক।

স্বাধীনতার এ অমূল্য সুখ পেতে হলে আমাদেরকে স্বাধীনতা রক্ষায় সর্বদা সজাগ এবং সতর্ক থাকতে হবে।

### ক্ষুধার রাজ্যে পৃথিবী গদ্যময়

সুন্দরের সাধক হলেও মানুষের কাজ শুধু কল্পনার জগৎ নির্মাণ করা নয়, কঠিন ও কঠোর বাস্তবের মুখে তাকে রূঢ় সত্যকে স্বীকার করে মেনে চলতে হয়। আমরা জানি, জীবনধারণের দাবি যেখানে উপেক্ষিত সেখানে কল্পনা-বিলাসিতা নিরর্থক। রূঢ় বাস্তবতার মোকাবিলাই তখন মূল লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায়।

মানুষের জীবন বেশ কয়েকটি অধ্যায়ের সমষ্টি। এ মহাজীবনে এক অধ্যায়ে যেমন পদ্যের ঝঙ্কার বা কবিতার স্নিগ্ধতা রয়েছে তেমনি অন্য অধ্যায়ে রয়েছে গদ্যের কড়া হাতুড়ি বা বাস্তবতা। মানুষের জীবন কেবল কবিতার মতো কল্পনার বা উচ্ছাশার দ্বারাই গঠিত এমন নয়, সুখের পিঠে যেমন দুঃখ থাকে, আলোর পরে আঁধার, তেমনি এই কল্পনার জগৎ ছাড়াও এখানে রয়েছে কঠোর-কঠিন বাস্তবতা। এ বাস্তবতা মেনে নিয়েই তাকে চলতে হবে। এটি তার অস্তিত্বের সাথে সম্পর্কিত। তাকে পৃথিবীর বুকে

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



টিকে থাকতে হলে প্রথমেই জীবন ধারণের মৌলিক দাবিসমূহের বাস্তবতা স্বীকার করে তা অর্জনের প্রচেষ্টা চালাতে হবে। এসব মৌলিক প্রয়োজনের ব্যবস্থা হয়ে যাবার পর সে কল্পনা-বিলাসিতার কথা চিন্তা করতে পারে। কবিতা মানুষকে আনন্দ দেয় কিন্তু একজন ক্ষুধার্ত ব্যক্তির কাছে কবিতা পাঠ করে আনন্দ দেয়ার চেষ্টা করাটা তার কষ্টই কেবল বাড়াবে। পূর্ণিমার চাঁদ মানুষের কাছে খুবই প্রিয়। কিন্তু একজন ক্ষুধার্ত মানুষ ঐ চাঁদ দেখে ঐ চাঁদের মত ঝলসানো রুটির কথাই চিন্তা করবে। চাঁদের চেয়ে রুটি তখন তাকে বেশি আনন্দ দিবে।

বাস্তবতা নির্মম এবং কঠিন হলেও তাকে মেনে নিয়েই আমাদের চলতে হবে।

## ৩৩৪ম বিসিএস ২০১৪

### মানুষের মৃত্যু হলে তবুও মানব থেকে যায়।

সময় অনন্ত, জীবন সংক্ষিপ্ত। সংক্ষিপ্ত এ জীবনে মানুষ তার মহৎ কর্মের মধ্য দিয়ে এ পৃথিবীতে স্মরণীয়-বরণীয় হয়ে থাকে। আবার নিন্দনীয় কর্মের মাধ্যমে এই জগতে অনেকে বেঁচেও মরে থাকে। কেননা ব্যক্তি, পরিবার তাকে ভালোবাসে না; সমাজ, দেশ ও জাতি তাকে শ্রদ্ধা করে না, স্মরণ করে না; তার মৃত্যুতে কারো যায়-আসে না।

মানুষ মাত্রই জন্ম-মৃত্যুর অধীন। পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করলে একদিন তাকে মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে– এটা চিরন্তন সত্য। আর মৃত্যুর মধ্য দিয়েই সে পৃথিবী থেকে চির বিদায় নেয়। কিন্তু পেছনে পড়ে থাকে তার মহৎ কর্মের ফসল। যে কর্মের জন্য সে মরে যাওয়ার পরও পৃথিবীতে যুগ যুগ বেঁচে থাকে।

মানুষের জীবনকে দীর্ঘ বয়সের সীমারেখা দিয়ে পরিমাপ করা যায় না। জীবনে কেউ যদি কোনো ভালো কাজ না করে থাকে তবে সে জীবন অর্থহীন, নিষ্ফল। সেই নিষ্ফল জীবনের অধিকারী মানুষটিকে কেউ মনে রাখে না। নীরব জীবন নীরবেই ঝরে যায়। পক্ষান্তরে, যে মানুষ জীবনকে কর্মমুখর করে রাখে এবং যার কাজের মাধ্যমে জগৎ ও জীবনের উপকার সাধিত হয় তাকে বিশ্বের মানুষ শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করে। সেই সার্থক মানুষের কাজের অবদান বিশ্বের বুকে কীর্তিত হয়ে কৃতী লোকের গৌরব প্রচারিত হতে থাকে। কীর্তিমান ব্যক্তির যেমন মৃত্যু নেই, তেমনি শেষও নেই। কারণ এ পৃথিবীতে সে নিজস্ব কীর্তির মহিমায় লাভ করে অমরত্ব। কীর্তিমানের মৃত্যু হলে তাঁর দেহের ধ্বংস সাধন হয় বটে, কিন্তু তার সৎ কাজ এবং অম্লান-কীর্তি পৃথিবীর মানুষের কাছে তাকে বাঁচিয়ে রাখে। তার মৃত্যুর শত শত বছর পরেও মানুষ তাকে স্মরণ করে। তাই সন্দেহাতীতভাবে বলা যায়, মানবজীবনের প্রকৃত সার্থকতা তার কর্ম-সাফল্যের ওপর নির্ভরশীল। একটা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য মানুষ পৃথিবীতে আসে এবং সে সময়সীমা পার হওয়ার সাথে সাথে সে বিদায় নেয় পৃথিবী থেকে। এ নির্দিষ্ট সময়সীমায় সে যদি গৌরবজনক কীর্তির স্বাক্ষরে জীবনকে মহিমান্বিত করে তুলতে সক্ষম হয়, মানবকল্যাণে নিজের জীবন উৎসর্গ করে, তবে তার নশ্বর দেহের মৃত্যু হলেও তার স্বকীয় সত্তা থাকে মৃত্যুহীন। গৌরবোজ্জ্বল কৃতকর্মই তাকে বাঁচিয়ে রাখে যুগ থেকে যুগান্তরে।

মানুষের দেহ নশ্বর কিন্তু কীর্তি অবিনশ্বর। কেউ যদি মানুষের কল্যাণে নিজেকে নিবেদিত করে, তবে মৃত্যুর পরেও তার এ কীর্তির মধ্য দিয়ে সে মানুষের হৃদয়ের মণিকোঠায় চিরকাল বেঁচে থাকে।

৩৫তম বিসিএস

৩

# সারমর্ম

নম্বর ২০

বিশেষ কোনো পদ্য বা কবিতাংশের মূলভাব নির্ণয় করে তাকে সহজ ও সুন্দর ভাষায় সংক্ষিপ্ত আকারে প্রকাশ করাকে সারমর্ম বলে। অর্থাৎ মূল মর্মবস্তুটি উদঘাটন করে প্রকাশ করাটাই হলো সারমর্ম। সারমর্ম লেখার সময় নিচের বিষয়গুলো মনে রাখতে হবে—

১. সারমর্মে উদ্ধৃতাংশের মূল কথাটি কী তা প্রকাশ করতে হবে।
২. ভাব-সম্প্রসারণের মতো দীর্ঘ ও বিশ্লেষণমূলক বক্তব্য সারমর্মে থাকবে না।
৩. মূল উদ্ধৃতাংশের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে কোনো অপ্রাসঙ্গিক বক্তব্য দীর্ঘ করার প্রবণতা ও বিশ্লেষণমূলক বক্তব্য সারমর্মে থাকবে না।
৪. সারমর্মের আয়তন যেন দীর্ঘ না হয় সেদিকে লক্ষ রাখতে হবে। মূল উদ্ধৃতাংশের অর্ধেকের বেশি যেন লিখিত সারমর্মের আয়তন না হয় সে বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে।
৫. সারমর্ম লেখার আগে উদ্ধৃত অংশটি কয়েকবার পড়তে হবে এবং মূল বক্তব্য কী তা বুঝতে চেষ্টা করতে হবে। অতঃপর মূল বিষয়টিকে সংক্ষিপ্ত আকারে নিজের ভাষায় লিখতে হবে।

সারাংশ ও সারমর্মের মধ্যে একটু পার্থক্য আছে। আর তা হলো— সারাংশ হচ্ছে মূল বক্তব্য আর সারমর্ম হচ্ছে মূল বক্তব্যের মর্মকথা। কোনো রচনাংশের সারমর্ম লিখতে হলে লেখক-কবি কী বলতে চেয়েছেন সে ভাবকে খুবই সংক্ষেপে তুলে ধরতে হবে। অতএব, দেখা যাচ্ছে সারমর্ম সারাংশ থেকেও আকারে ছোট। সারমর্মকে মর্মার্থ বা ভাবার্থও বলা হয়।

উল্লেখ্য, ভালোভাবে সারমর্ম লেখার জন্য দরকার প্রচুর অনুশীলন।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

# গুরুত্বপূর্ণ সারমর্ম

**০১**

অ

অদ্ভুত আঁধার এক এসেছে এ পৃথিবীতে আজ,
যারা অন্ধ সবচেয়ে বেশি আজ চোখে দেখে তারা।
যাদের হৃদয়ে কোনো প্রেম নেই—প্রীতি নেই—করুণার আলোড়ন নেই
পৃথিবী অচল আজ তাদের সুপরামর্শ ছাড়া।
যাদের গভীর আস্থা আছে আজো মানুষের প্রতি,
এখনো যাদের কাছে স্বাভাবিক বলে মনে হয়
মহৎ সত্য বা রীতি, কিংবা শিল্প অথবা সাধনা
শকুন ও শেয়ালের খাদ্য আজ তাদের হৃদয়।

**সারমর্ম :** বর্তমান পৃথিবী প্রীতিহীন, মমতাহীন, মনুষ্যত্বহীন অন্ধ ক্ষমতাধর মানুষদের করায়ত্ত। জটিলতা ও বিশৃঙ্খলায় পরিপূর্ণ এ পৃথিবীতে শিল্প-সংস্কৃতির সাধনা উপেক্ষিত। যারা আজ সত্য সুন্দরের পূজারী ন্যায়-নীতিতে বিশ্বাসী আজ তাদের স্থান নেই এ পৃথিবীতে তারা আজ অবাঞ্ছিত, অবহেলিত।

**০২**

অধম রতন পেলে কী হ'বে ফল?
উপদেশে কখনও কি সাধু হয় খল?
ভালো মন্দ দোষগুণ আঁধারেতে ধরে,
ভুজঙ্গ অমৃত খেলে গরল উগরে
লবণ জলধি জল করিয়া ভক্ষণ
জলধর করে দেখ সুধা বরিষণ।
সুজনে সু-যশ গায় কু-যশ ঢাকিয়া
কুজনে কুরব করে সু-রব ঢাকিয়া।

**সারমর্ম :** সৎ লোকের ধর্ম অন্যের ভালো দিকগুলোতেই আকৃষ্ট হওয়া। আর মন্দ লোকের ধর্ম কেবল অন্যের খুঁত খুঁজে বেড়ানো। বস্তুত জগতে ভালো ও মন্দ লোকের স্বভাবই আলাদা।



**০৩**

অন্ধকার গর্তে থাকে অন্ধ সরীসৃপ;
আপনার ললাটের রতন প্রদীপ
নাহি জানে, নাহি জানে সূর্যালোকলেশ।
তেমনি আঁধারে আছে এই অন্ধ দেশ।
হে দণ্ডবিধাতা রাজা—যে দীপ্ত রতন
পরায়ে দিয়েছ ভালে তাহার যতন
নাহি জানে, নাহি জানে তোমার আলোক।
নিত্য বহে আপনার অস্তিত্বের শোক,
জনমের গ্লানি। তব আদর্শ মহান
আপনার পরিমাপে করি খান-খান
রেখেছে ধূলিতে। প্রভু, হেরিতে তোমায়
তুলিতে হয় না মাথা ঊর্ধ্ব-পানে হায়।
যে এক তরণী লক্ষ লোকের নির্ভর
খণ্ড খণ্ড করি তারে তরিবে সাগর?

**সারমর্ম :** রত্নভাস্বর এই দেশ তার ঐশ্বর্য ভুলে অজ্ঞানতার অন্ধকার ও দুঃখ-গ্লানিতে আচ্ছন্ন। বিশাল ঐতিহ্য ভুলে তা বিভেদের আবর্তে নিমগ্ন। ঐতিহ্যবোধ ও ঐক্যচেতনার শক্তিতেই এই দেশ যথার্থ গৌরব পুনরুদ্ধারে সক্ষম হবে।

**০৪**

অন্ধ মোহবন্ধ তব দাও মুক্ত করি
রেখো না বসায়ে দ্বারে জাগ্রত প্রহরী
হে জননী, আপনার স্নেহকারাগারে
সন্তানের চিরজন্ম বন্দী রাখিবারে।
বেষ্টন করিয়া তারে আগ্রহপরশে,
জীর্ণ করি দিয়া তারে লালনের রসে,
মনুষ্যত্ব-স্বাধীনতা করিয়া শোষণ
আপন ক্ষুধিত চিত্ত করিবে পোষণ?
দীর্ঘ গর্ভবাস হতে জন্ম দিলে যার
স্নেহগর্ভে গ্রাসিয়া কি রাখিবে আবার।
চলিবে সে এ সংসারে তব পিছু পিছু?
সে কি শুধু অংশ তব, আর নহে কিছু?
নিজের সে, বিশ্বের সে, বিশ্বদেবতার—
সন্তান নহে গো মাতঃ সম্পত্তি তোমার।

**সারমর্ম :** সন্তান শুধুমাত্র তার পিতামাতারই সম্পদ নয়, সে জগৎ-সংসারের, বিশ্বনিয়ন্তারও। স্নেহগ্রাসে সন্তানকে আবদ্ধ রেখে তার মনুষ্যত্ব ও স্বাধীনতা খর্ব করা কোনো জননীর উচিত নয়। কেননা আত্মবিকাশের ও আত্মপ্রসারের অধিকার প্রতিটি মানুষের রয়েছে।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



০৫

অহংকার-মদে কভু নহে অভিমানী।
সর্বদা রসনারাজ্যে বাস করে বাণী।
ভুবন ভূষিত সদা বক্তৃতার বশে।
পর্বত সলিল হয় রসনার রসে।
মিথ্যার কাননে কভু ভ্রমে নাহি ভ্রমে।
অঙ্গীকার অস্বীকার নাহি কোন ক্রমে।
অমৃত নিঃসৃত হয় প্রতি বাক্যে যার!
মানুষ তারেই বলি মানুষ কে আর?

সারমর্ম : মানুষের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নিয়ে জন্মগ্রহণ করলেই তাকে মানুষ বলা যায় না। মানুষ হতে হলে মনুষ্যত্বের বিকাশ ঘটাতে হয়। আর এটা যার মধ্যে ঘটে সে হয় নিরহঙ্কার, নিরভিমান। সে কখনো মিথ্যাচার করে না, ভঙ্গ করে না অঙ্গীকার। তার ভাষণ সম্মোহনী, বাক্য হৃদয়গ্রাহী।

০৬

আ

আমরা সিঁড়ি,
তোমরা আমাদের মাড়িয়ে
প্রতিদিন অনেক উঁচুতে উঠে যাও,
তারপর ফিরেও তাকাও না পিছনের দিকে;
তোমাদের পদধূলিধন্য আমাদের বুক
পদাঘাতে ক্ষতবিক্ষত হয়ে যায় প্রতিদিন।
তোমরাও তা জানো,
তাই কার্পেটে মুড়ে রাখতে চাও আমাদের বুকের ক্ষত,
ঢেকে রাখতে চাও তোমাদের অত্যাচারের চিহ্নকে
আর চেপে রাখতে চাও তোমাদের অত্যাচারের চিহ্নকে
আর চেপে রাখতে চাও পৃথিবীর কাছে
তোমাদের গর্বোদ্ধত, অত্যাচারী পদধ্বনি।
তবু আমরা জানি,
চিরকাল আর পৃথিবীর কাছে
চাপা থাকবে না
আমাদের দেহে তোমাদের এই পদাঘাত।
আর সম্রাট হুমায়ুনের মতো
একদিন তোমাদেরও হতে পারে পদস্খলন—

সারমর্ম : সভ্যতার নির্মাতা মেহনতি মানুষকে সিঁড়ির মতো ব্যবহার করে অত্যাচারী শোষকগোষ্ঠী ক্রমশ ভোগবিলাসের উঁচু প্রাসাদে আরোহণ করে। লাঞ্ছিত-নিপীড়িত মানুষের বেদনা ও জ্বালাকে তারা গোপন করে কার্পেটে মোড়া সিঁড়ির মতোই। কিন্তু দিন আসছে—একদিন শোষক ও অত্যাচারীর স্বরূপ প্রকাশ হয়ে পড়বে এবং তার পতন হবে অনিবার্য।



০৭

আমার একূল ভাঙিয়াছে যেবা আমি তার কূল বাঁধি,
যে গেছে বুকেতে আঘাত হানিয়া তার লাগি আমি কাঁদি।
যে মোরে দিয়েছে বিষে ভরা বাণ,
আমি দেই তারে বুকভরা গান।
কাঁটা পেয়ে তারে ফুল করি দান সারাটি জনমভর,—
আপন করিতে কাঁদিয়া বেড়াই যে মোরে করেছে পর।
মোর বুকে যেবা কবর বেঁধেছে, আমি তার বুক ভরি,
রঙিন ফুলের সোহাগ-জড়ানো ফুল-মালঞ্চ ধরি।
যে মুখে সে কহে নিঠুরিয়া বাণী,
আমি লয়ে করে তারি মুখখানি,
কত ঠাঁই হতে কত কী যে আনি, সাজাই নিরন্তর—
আপন করিতে কাঁদিয়া বেড়াই যে মোরে করেছে পর।

সারমর্ম : প্রেম ও প্রীতির শক্তিতে মানুষে মানুষে সৌহার্দ্য ও মৈত্রীর সম্পর্ক রচনাই মনুষ্যত্বের লক্ষণ। পরের দেয়া দুঃখ সহ্য করে পরকে আপন করতে পারলে, ভালোবাসা দিয়ে শত্রুর মন জয় করতে পারলে মানুষের জীবন সুন্দর হয় এবং মানব জীবন সার্থক হয়।

০৮

আমি কবি যত কামারের আর কাঁসারির আর ছুতোরের
মুটে মজুরের,
—আমি কবি যত ইতরের।
আমি কবি ভাই কর্মের আর ঘর্মের,
বিলাস বিবশ মর্মের যত স্বপ্নের তরে ভাই,
সময় যে হায় নাই!
মাটি মাগে ভাই হালের আঘাত,
সাগর মাগিছে হাল,
পাতালপুরীর বন্দিনী ধাতু
মানুষের লাগি কাঁদিয়া কাটায় কাল।
দুরন্ত নদীর সেতুবন্ধনে বাঁধা যে পড়িতে চায়,
নেহারি আলসে নিখিল মাধুরী
সময় নাহি যে হায়!

সারমর্ম : নবযুগের কবি কাব্যবিলাসীদের দলে নন, বিশ্বের শ্রমজীবী মানুষের কর্মসাধনার সঙ্গে একাত্ম। কর্মহীন ভাবালুতায় বিভোর হওয়া নয়, বরং কর্মব্রতী মানুষের কর্মসাধনার বিপুল প্রবাহের অংশীদার হওয়াই তার কাম্য। ভাব বিলাসিতার পরিবর্তে শ্রমজীবী মানুষের কর্মযজ্ঞই হবে তার কবিতার উপজীব্য।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



০৯

আমি যে দেখেছি গোপন হিংসা কপটরাত্রি-ছায়ে
হেনেছে নিঃসহায়ে।
আমি যে দেখেছি—প্রতিকারহীন, শক্তের অপরাধে
বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদে।
আমি যে দেখিনু তরুণ বালক উন্মাদ হয়ে ছুটে
কী যন্ত্রণায় মরেছে পাথরে নিষ্ফল মাথা কুটে ॥
কণ্ঠ আমার রুদ্ধ আজিকে, বাঁশি সংগীতহারা,
অমাবস্যার কারা
লুপ্ত করেছে আমার ভুবন দুঃস্বপনের তলে।
তাই তো তোমায় শুধাই অশ্রুজলে—
যাহারা তোমার বিষাইছে বায়ু, নিভাইছে তব আলো,
তুমি কি তাদের ক্ষমা করিয়াছ, তুমি কি বেসেছ ভালো?

সারমর্ম : সমাজদ্রষ্টা কবি দুঃখভরে লক্ষ্য করেন, হিংসাশ্রয়ীর চক্রান্ত ও শক্তির দাপটের কাছে মানবতা ভূলুণ্ঠিত। অত্যাচারীর দৌরাত্ম্যে নিপীড়িত মানুষ ন্যায়বিচারহীন অসহায়ত্বের অপমান মুখ বুঁজে সইতে বাধ্য হচ্ছে। অন্যায়ের প্রতিকারে অগণিত তরুণ প্রাণের আত্মদানেও জাগ্রত হয়নি বিশ্ববিবেক। বিধাতার রাজ্যে মনুষ্যত্বের এই অবমাননায় কবি রুদ্ধবাক। তবু কবির স্থির বিশ্বাস, বিবেক-বর্জিত অত্যাচারীর দল একদিন নিশ্চয় বিধাতার ক্ষমাহীন বিচারে চরম দণ্ড লাভ করবে।

১০

আমি যে দেখিনু তরুণ বালক উন্মাদ হয়ে ছুটে
কি যন্ত্রণায় মরিছে পাথরে নিষ্ফল মাথা কুটে।
কণ্ঠ আমার রুদ্ধ আজিকে বাঁশি সঙ্গীত হারা,
অমাবস্যার কারা
লুপ্ত করেছে আমার ভুবন দুঃস্বপনের তরে
তাই তো তোমার শুধুই অশ্রুজলে–
যাহারা তোমার বিষাইছে বায়ু নিভাইছে তব আলো,
তুমি কি তাদের ক্ষমা করিয়াছ, তুমি কি বেসেছ ভাল?

সারমর্ম : ক্ষমা মানব জীবনের এক পরম ধর্ম। জীবনে চলার পথে অপরের দ্বারা আঘাত পেলে তখন নিজেকে অসহায় ও নিস্ব মনে হয়। কিন্তু এমনটি ভাবা ঠিক নয়। কেননা মহৎ ব্যক্তির উদার মনোভাবের কারণে অত্যাচারীর বোধোদয় হতে পারে; সমাজে তখন শান্তি বিরাজ করে।

১১

আশার ছলনে ভুলি ফল লভিনু হায়, তাই ভাবি মনে।
জীবন প্রবাহ বহি কাল-সিন্ধু পানে যায়
ফিরাব কেমনে? দিন দিন আয়ুহীন,
হীনবল দিন দিন, তবু এ আশার নেশা ছুটিল না? এ কি দায়!

সারমর্ম : মানব জীবন নদীর মতোই গতিশীল। প্রতিটি মুহূর্তকে জীবনের পর্যায় অনুসারে প্রয়োজনের দিকে তাকিয়ে যদি যথাযথ কাজের মধ্যে সার্থক করে তোলা যায় তবেই জীবনের সার্থকতা। কিন্তু আশার ছলনায় ভুলে গড্ডলিকা প্রবাহে চলতে থাকলে জীবনের অভিষ্ট লক্ষ্য ব্যাহত হয়। তখন জীবনে নেমে আসে দুর্বিষহ যন্ত্রণা ও হতাশা।



১২

আমি দেখে এসেছি নদীর ঘাড় ধরে
আদায় করা হচ্ছে বিদ্যুৎ–
ভাল কথা।
কলে তৈরি হচ্ছে বড় বড় রেলের ইঞ্জিন
খুব ভাল।
মশা মাছি সাপ বাঘ তাড়িয়ে
ইস্পাতের শহর বসছে–
আমরা সত্যই খুশি হচ্ছি।
কিন্তু মোটেই খুশি হচ্ছি না যখন দেখছি–
যার হাত আছে তার কাজ নেই,
যার কাজ আছে তার ভাত নেই,
যার ভাত আছে তার হাত নেই।

সারমর্ম : মানুষ প্রাকৃতিক শক্তিকে কাজে লাগিয়ে তৈরি করেছে বিশাল সভ্যতা। যার ফলে নদীকে নিয়ন্ত্রণ করে তৈরি হচ্ছে বিদ্যুৎ, বিশাল বিশাল কারখানায় তৈরি হচ্ছে রেলের ইঞ্জিন, দুর্গম জীবজন্তুপূর্ণ অরণ্যে তৈরি হচ্ছে অত্যাধুনিক শহর। এসবই অত্যন্ত আনন্দের কথা। কিন্তু যখন এই সভ্যতাই মানুষের রুটি-রুজির নিশ্চয়তা কেড়ে নেয়, মানুষকে যান্ত্রিক করে তোলে এবং সমাজে বৈষম্য সৃষ্টি করে তখন তা হয়ে দাঁড়ায় খুবই মর্মান্তিক ব্যাপার। কারণ, মানুষের প্রয়োজনেই এবং তার কল্যাণের জন্যই সভ্যতার সৃষ্টি।

১৩

আসিতেছে শুভদিন,—
দিনে দিনে বহু বাড়িয়াছে দেনা, শুধিতে হইবে ঋণ!
হাতুড়ি শাবল গাঁইতি চালায়ে ভাঙিল যারা পাহাড়,
পাহাড়-কাটা সে পথের দু পাশে পড়িয়া যাদের হাড়,
তোমারে সেবিতে হইল যাহারা মজুর মুটে ও কুলি,
তোমারে সেবিতে যারা পবিত্র অঙ্গে লাগাল ধূলি;
তারাই মানুষ, তারাই দেবতা, গাহি তাহাদেরি গান,
তাদেরি ব্যথিত বক্ষে পা ফেলে আসে নব-উত্থান।

সারমর্ম : মেহনতি মানুষের শ্রমে ও ত্যাগে গড়ে উঠেছে মানব সভ্যতা। আত্মত্যাগের মহিমায় মানবরূপী দেবতা হলেও সমাজ জীবনে এরা বঞ্চিত ও অবহেলিত। কিন্তু পালাবদলের দিন এসেছে। একদিন শ্রমজীবী মানুষেরাই বিশ্বে নবজাগরণের সূচনা করবে।

১৪

আমাদের একরত্তি উঠোনের কোণে
উড়ে আসা চৈত্রের পাতায়
পাণ্ডুলিপি বই ছেঁড়া মলিন খাতায়
গ্রীষ্মের দুপুরে ঢকঢক্
জল খাওয়া কুঁজোয় গেলাশে, শীত ঠক্ঠক্
রাত্রির নরম লেপে দুঃখ তার বোনে
নাম
অবিরাম।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



সারমর্ম : মানব জীবন বৈচিত্র্যপূর্ণ। দুঃখ-তরঙ্গের মাঝে বা প্রতিকূল পরিবেশের ঘনঘটায় ও সামান্য প্রশান্তিতে জীবনে সুখের দোলা লাগে। তখন মুক্ত প্রকৃতির সৌন্দর্যের সামান্য সমারোহও আনন্দের উৎস হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। দুঃখ-ভারাক্রান্ত মানব মনে তখন প্রশান্তির সুবাতাস বহে।

১৫
আঠারো বছর বয়সে আঘাত আসে
অবিশ্রান্ত; একে একে হয় জড়ো,
এ বয়স কালো লক্ষ দীর্ঘশ্বাসে
এ বয়স কাঁপে বেদনায় থরোথরো।
তবু আঠারোর শুনেছি জয়ধ্বনি,
এ বয়স বাঁচে দুর্যোগে আর ঝড়ে,
বিপদের মুখে এ বয়স অগ্রণী
এ বয়স তবু নতুন কিছু তো করে।

সারমর্ম : আঠারো বছর বয়স প্রবল অবেগের বয়স, জীবনে ঝুঁকি নেয়ার বয়স। অবক্ষয়ের অজস্র অভিঘাতে এ বয়সে জীবন হয়তো হয়ে উঠতে পারে ক্ষতবিক্ষত। কিন্তু তার চেয়ে বড় কথা অদম্য, প্রাণশক্তি, দুর্বার সাহসিকতা, নবজীবনের স্বপ্ন রূপায়ণে এ বয়স হতে পারে জাতির অগ্রযাত্রার চালিকাশক্তি।

১৬
আমরা চলিব পশ্চাতে ফেলি পচা অতীত,
গিরি-গুহা ছাড়ি খোলা প্রান্তরে গাহিব গীত।
সৃজিব জগৎ বিচিত্রতর, বীর্যবান,
তাজা জীবন্ত সে নব সৃষ্টি শ্রম-মহান।
চলমান-বেগে প্রাণ-উচ্ছল,
রে নবযুগের স্রষ্টাদল,
জোর্ কদম্ চল্ রে চল্—

সারমর্ম : তারুণ্যে উদ্দীপ্ত আত্মপ্রত্যয়ী যুবসমাজই সৃষ্টি করতে পারে প্রাণ উচ্ছল এক নতুন জগৎ। এজন্য জরাগ্রস্ত অতীতকে পেছনে ফেলে নবতর পৃথিবী সৃষ্টির উন্মাদনায় তাদের হতে হবে বিপ্লবী। এক্ষেত্রে কাল ক্ষেপণের কোনো সুযোগ নেই।

১৭
আমারই চেতনার রঙে পান্না হলো সবুজ,
চুনি উঠল রাঙা হয়ে
আমি চোখ মেললুম আকাশে—
জ্বলে উঠল আলো
পূর্বে পশ্চিমে।
গোলাপের দিকে চেয়ে বললুম 'সুন্দর'
সুন্দর হল সে।
তুমি বলবে, এ যে তত্ত্বকথা
এ কবির বাণী নয়।
আমি বলব এ সত্য,



তাই এ কাব্য।
এ আমার অহঙ্কার,
অহঙ্কার-সমস্ত মানুষের হয়ে।
মানুষের অহংকার পটেই
বিশ্বকর্মার বিশ্বশিল্প।

সারমর্ম : স্রষ্টার সৃষ্টিশালায় চলে সৃষ্টির বিচিত্র সাধনা। ফলে সুন্দরের বিচিত্র সম্ভারে প্রকৃতি নিজেকে করে তোলে অপরূপ। কিন্তু প্রকৃতির সে সৌন্দর্য যদি মানুষের চেতনায় উপভোগ্য না হয়ে উঠত, তাহলে বিধাতার সে সৃষ্টিলীলা নিরর্থক হয়ে পড়ত। কেননা মানব মনের সৌন্দর্যানুভূতির কাছেই প্রকৃতির রূপ, রং, রস ধরা পড়ে। এখানেই মানুষের অহংকার। এ শুধু তত্ত্ব কথা নয়। এ হলো চিরন্তন সত্য।

১৮
আমার একার সুখ, সুখ নহে ভাই,
সকলের সুখ, সখা, সুখ শুধু তাই।
আমার একার আলো সে যে অন্ধকার
যদি না সবারে অংশ আমি দিতে পাই।
সকলের সাথে বন্ধু সকলের সাথে,
যাইব কাহারে বলো ফেলিয়া পশ্চাতে?
ভাইটি আমার সে তো ভাইটি আমার।
নিয়ে যদি নাহি পারি হতে অগ্রসর,
সে আমার দুর্বলতা, শক্তি সে তো নয়।
সবই আপন হেথা, কে আমার পর?
হৃদয়ের যোগ সে কি কভু ছিন্ন হয়?
এক সাথে বাঁচি আর এক সাথে মরি
এসো বন্ধু, এ জীবন মধুময় করি।

সারমর্ম : সমগ্র মানবজাতিই পরস্পর আত্মার নিবিড় বন্ধনে আবদ্ধ। তাই সুখ লাভ দূরে থাক মানুষ একা এক মুহূর্তও চলতে পারে না। সুতরাং সবাই মিলে সুখ-দুঃখ ভাগাভাগি করে একত্রে বসবাসেই প্রকৃত সুখ নিহিত।

১৯
আমি মরু-কবি-গাহি-সেই বেদে-বেদুঈনদের গান,
যুগে যুগে যারা করে অকারণ বিপ্লব-অভিযান।
জীবনের আতিশয্যে যাহারা দারুণ উগ্র সুখে
সাধ করে নিল গরল-পিয়ালা, বর্শা হানিল বুকে!
আষাঢ়ের গিরি-নিস্রাব–সম কোন বাধা মানিল না,
বর্বর বলি যাহাদের গালি পাড়িল ক্ষুদ্রমনা,
কূপ-মণ্ডূক 'অসংযমী'র আখ্যা দিয়াছে যারে,
তারি তরে ভাই গান রচে যাই, বন্দনা করি তারে।

সারমর্ম : জীবনের তারুণ্যে সমস্ত বাধাবিপত্তি অগ্রাহ্য করে এগিয়ে চলা, প্রাণচঞ্চল, বাঁধভাঙা মানুষের বন্দনা করা উচিত। সেক্ষেত্রে সংকীর্ণমনাদের কোনো সমালোচনারই স্থান নেই।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



২০

আমি আলো এবং অন্ধকারকে চিনি
ফুল এবং পাখিকে চিনি
সামান্য স্তন্যপায়ী থেকে
বহুভোজী বহু প্রাণী চিনি;
শ্রমে প্রেমে ক্রোধে প্রতিশোধে
মানুষের মত কেউ নয়।
গড়ে ওঠে আরণ্যভেদী লোকালয়
—মানুষের শ্রমে,
গড়ে ওঠে মধুকুঞ্জ বংশধারা
—মানুষের প্রেমে কামে,
জ্বলে ওঠে দাবানল
—মানুষের ক্রোধে,
লোকালয় অরণ্য হয়
—মানুষের ঘৃণায়, প্রতিশোধে।

সারমর্ম : সৃষ্টির সেরা জীব মানুষ। মানুষ যেমন অরণ্য পরিকীর্ণ পৃথিবীর বুকে বিশাল সভ্যতা গড়ে তোলে, তেমনি ক্রোধোন্মত্ততায় জ্বালিয়ে দেয় দাবানল, প্রতিশোধপরায়ণতায় পুড়ে তছনছ হয় জনবসতি। আর এভাবেই গড়ার মাঝেই ধ্বংস নিহিত।

২১

আমি চাই মহত্ত্বের মহৎ পরাণ
মুকুতা মাণিক্য নিধি
আমারে দিওনা বিধি।
চাহিনে এ জগতের রাজত্ব সম্মান।
বাঞ্ছিত পরাণ পেলে
মেখে নেব মনুষ্যত্ব-শ্রেষ্ঠ উপাদান
প্রাণের সাধক আমি, সাধনীয় প্রাণ।

সারমর্ম : মানবজীবনের শ্রেষ্ঠ অলঙ্কার মনুষ্যত্ব। তাই ঐশ্বর্যময় জাগতিক সম্মানবহুল রাজত্ব নয়, সহজ-সরল ও মহৎ হৃদয়ের অধিকারী হওয়াই সবার কাম্য। সবাইকে মনুষ্যত্বের বাঁধনে বেঁধে মহৎ প্রাণের অধিকারী হওয়াতেই প্রকৃত সার্থকতা।

২২

আপন করে ভাবিস নি তুই এই দুনিয়ার কোনো চিজ
কালে যাত্রাপথে শত্রু হয়ে তত্ত্বকথায় ঢালবে বিষ।
তাই রজনী-দিন এবাদত কর।
ভুলেও কভু বাড়াস নি তুই মিছে মায়ার আড়ম্বর
সাপের ফণা ভয় মানে না, তার সব-যে আপন সব-যে পর।

সারমর্ম : মানুষ পার্থিব জীবনের সংক্ষিপ্ত যাত্রাপথে অনেককিছুই মায়ার বাঁধনে প্রলোভনে বাঁধতে চায়। তাই মিছে মায়ার বাঁধন এড়িয়ে জাগতিক বিষজ্বালাকে উপেক্ষা করে স্রষ্টার উপাসনা করাই সবার উচিত।



২৩

আঠারো বছর বয়সে কী দুঃসহ
স্পর্ধায় নেয় মাথা তোলবার ঝুঁকি,
আঠারো বছর বয়সেই অহরহ,
বিরাট দুঃসাহসেরা দেয় যে উঁকি।
আঠারো বছর বয়সের নেই ভয়
পদাঘাতে চায় ভাঙতে পাথরবাধা,
এ বয়সে কেউ মাথা নোয়াবার নয়—
আঠারো বছর বয়স জানে না কাঁদা।

সারমর্ম : আঠারো বছর বয়সে দুর্বিনীত যৌবনে পদার্পণের আহ্বান জানায়। বাল্যের পরনির্ভরশীলতা, সংশয়, শঙ্কা ত্যাগ করে দুঃসাহসী স্বপ্ন, কল্পনা ও উদ্যোগ গ্রহণের উপযুক্ত সময় হচ্ছে এই সন্ধিক্ষণ।

২৪

আমি যেন কোন এক বসন্তের রাতের জোনাকি,
অথবা দিনের শেষে কোন নীল আকাশের পাখি,
আমি যেন ছোট নদীর বুক ভরা ছোট ছোট ঢেউ,
সে নদীতে স্নান করে গাঁয়ের মেয়েরা কেউ কেউ।
আমি যেন কোনো এক পথশ্রান্ত অচেনা পথিক,
দুদণ্ড তাকিয়ে থাকি যে-আকাশ আলো ঝিকমিক,
আমি যেন কত বন, কত মেঘ, বালুতীর,
অথবা অনেক রাতে একমুঠো চাঁদের আবির।

সারমর্ম : অপরূপ সৌন্দর্যের লীলাভূমি এ পৃথিবী। এ সৌন্দর্য মানুষের মনকে নাড়া দেয়। ফলে এ সৌন্দর্যের সাথে সে একাত্ম হয়ে যায়। আর এ একাত্মতার আনন্দরস উপভোগের জন্য সে, রাতের জোনাকি, নীল আকাশের পাখি বা প্রবাহমান নদীর বুকে সৌন্দর্য খুঁজে ফেরে।

২৫

আমার গানের সবটুকু সুর সবটুকু আরাধনা
এই হৃদয়ের সব সৌরভ-বাসনার ব্যঞ্জনা
একাগ্র আর অকুণ্ঠ হয়ে বহু বাতায়ন দ্বারে
আঘাত হেনেছে, পেতেছে দুহাত দুরাশায় বারে বারে।
মেলেনি কিছুই।
বুঝেছি সেদিন মানুষ এমনই দীন,
এ মাটির কাছে আছে আমাদের এমনি অশেষ ঋণ।
অনাদি কালের বন্ধন আর বঞ্চনা একাসনে
চিরজীবনের শৃঙ্খল সম জড়ানো মানব-মনে।
তাই বেদনার বহ্নি ও প্রাণে মাধুর্যে সুনিবিড়,
ঝরা পালকের ভস্মস্তূপে তাই বাঁধিলাম নীড়।
তীক্ষ্ণ নখর উদ্যত যার তারে ভালোবাসিলাম
দুনয়নে যার হিংস্র আগুন আজো জপি তার নাম।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



সারমর্ম : অন্যের সেবাব্রতী ও ত্যাগী মানুষ জীবনের সবটুকু শক্তি দিয়ে প্রাণের সম্পূর্ণ ভালোবাসা দিয়ে নিজেদেরকে কল্যাণে নিয়োজিত করেন। প্রতিদানে অজ্ঞতা ও কুসংস্কারে আচ্ছন্ন বৃহৎ মানবগোষ্ঠী এদেরকে আঘাত করলেও এরা সে পথ থেকে সরে আসেন না। বরং তাদের কল্যাণেই কাজ করে যান।

২৬

আমরা নতুন আমরা কুঁড়ি নিখিল বন নন্দনে,
ওষ্ঠে রাঙা হাসির রেখা জীবন জাগে স্পন্দনে।
লক্ষ আশা অন্তরে
ঘুমিয়ে আছে মন্তরে
ঘুমিয়ে আছে বুকের ভাষা পাঁপড়ি পাতার বন্ধনে।
সকল কাঁটা ধন্য করে ফুটবো মোরা ফুটবো গো,
অরুণ রবির সোনার আলো দু'হাত দিয়ে লুটবো গো।
নিত্য নবীন গৌরবে
ছড়িয়ে দেব সৌরভে,
আকাশ পানে তুলব মাথা, সকল বাধা টুটবো গো।
সাগর জলে পাল তুলে দে, কউেবা হবে নিরুদ্দেশ,
কলম্বসের মতোই বা কেউ পৌঁছে যাবে নতুন দেশ।
জাগবে সারা বিশ্বময়।
এ বাঙালী নিঃস্ব নয়,
জ্ঞান-গরিমা শক্তি-সাহস আজও এদের হয়নি শেষ।

সারমর্ম : শিশু-কিশোরদের অবুঝ মন সবুজের প্রাণ প্রাচুর্যে ভরা। এই প্রাণ প্রাচুর্যের আবেগে তারা বিশ্বের সর্বত্র নব নব অভিযানে অবতীর্ণ হয়ে প্রমাণ করতে পারে জ্ঞানগরিমা-শক্তি-সাহসে বাঙলির শ্রেষ্ঠত্ব।

২৭

আমি ভালোবাসি দেব, এই বাঙলার
দিগন্ত প্রসার ক্ষেত্রে যে শান্তি উদার
প্রচ্ছায় আলোক গাহে বৈরাগের স্বরে
যে ভৈরবী গান, যে মাধুরী একাকিনী
নদীর নির্জন তটে বাজায় কিঙ্কিনী
তরল কল্লোলরোলে, যে সরল স্নেহ
তরুচ্ছায়া সাথে মিশি স্নিগ্ধপল্লী গেহ
অঞ্চলে আবরি আছে, যে মোর ভবন
আকাশে বাতাসে আর আলোকে মগন
সন্তোষে কল্যাণে প্রেমে—
করো আশীর্বাদ,
যখনি তোমার দূত আনিবে সংবাদ
তখনি তোমার কার্যে আনন্দিত মনে
সব ছাড়ি যেতে পারি দুঃখে ও মরণে।

সারমর্ম : বাংলার অপরূপ পল্লি প্রকৃতির মাঝে স্নিগ্ধ জীবন-যাপন সবারই প্রিয়। কিন্তু দেশ রক্ষার প্রয়োজনে, কর্তব্যের আহ্বানে এ জীবন বিসর্জন দেয়ার জন্যও সবার প্রস্তুত থাকা উচিত।



২৮

আমার কবির চিত্ত দেখেছে তোমার সত্য ছবি,
তোমার হৃদয়ে সখা, নাই দৈন্য, নাই কোন ব্যথা,
লভিয়াছে আপনাতে আপনার পূর্ণ সার্থকতা,
হে শরৎ, হে কিশোর কবি!
মনের মাধুরী তব স্নিগ্ধতর করেছে জ্যোৎস্না,
স্বর্ণাভ করেছে রৌদ্রে দীপ্ত তব গোপন বাসনা।
মরমের গভীরতা একান্ত যা তোমারি আপনা,
সে-ই তো করেছে এই নীল নভ সুনীল গভীর
প্রাণের তারুণ্যে তব শ্যামলতা করেছে রচনা,
শ্যামাঞ্চল এই পৃথিবীর।

সারমর্ম : শরতে বাংলার প্রকৃতি অপরূপ সাজে সজ্জিত হয়। সোনা ঝরা রোদ, জ্যোৎস্নামাখা রাত, সুনীল আকাশের মাঝে যেন শরতের পূর্ণ প্রকাশ ঘটে। তার এ শ্যামল রূপ যেন পৃথিবীর শ্যামাঞ্চলেরই প্রতিচ্ছব।

২৯

আয় অন্ধকারে বন্ধ দুয়ার খুলে
বুনো হাওয়ার মত আয়রে দুলে দুলে
গেয়ে নতুন গান,
যত আবর্জনা উড়িয়ে দেরে দূরে
আজ মরা গাঙের বুকে নতুন সুরে
ছড়িয়ে দেরে প্রাণ।
যাক বান ডেকে যাক বাইরে এবং ঘরে,
আর নাচুক আকাশ শূন্য মাথার 'পরে,
আসুক জোরে হাওয়া,
আকাশ-মাটি উঠুক কেঁপে কেঁপে
শুধু ঝড় বয়ে যাক মরা জীবন ছেপে,
বিচালি দিয়ে ছাওয়া—
আয় ভাই বোনেরা ভয়-ভাবনা হীন
সেই বিচালি দিয়ে গড়ি নতুন দিন।

সারমর্ম : স্থিতিতে নয়, গতিতেই মুক্তি। তাই গতিশীল জীবনের মাধুর্য উপভোগই সবার কাম্য হওয়া উচিত। হোক না তা ঝড়ো হাওয়ায় ধূলি-ধূসর এবং দীনহীন।

৩০

আশার ছলনে ভুলি কি ফল লভিনু, হায়
তাই ভাবি মনে।
জীবন-প্রবাহ বহি কাল-সিন্ধু পানে যায়;
ফিরাব কেমনে?
দিন দিন আয়ুহীন হীন বল দিন দিন,
তবু এ আশার
নেশা ছুটিল না? এ কি দায়!

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



সারমর্ম : প্রত্যেক মানুষকে একদিন মৃত্যুর স্বাদ নিতেই হয়। কালের আবর্তনে মানুষ বৃদ্ধ হয়। শক্তি হারায় তবু তার পার্থিব সুখ-সম্পদের মোহ কাটে না। ফলে আশার ছলনায় ভুলে সে জীবনের প্রকৃত দর্শন উপলব্ধি করতে পারে না।

৩১ ই

ইচ্ছা করে মনে মনে
স্বজাতি হইয়া থাকি সর্বলোক সনে
দেশে দেশান্তরে; উষ্ট্রদুগ্ধ করি পান
মরুতে মানুষ হই আরব সন্তান
দুর্দম স্বাধীন, তিব্বতের গিরিতটে
নির্লিপ্ত প্রস্তরপুরী মাঝে, বৌদ্ধ মঠে
করি বিচরণ। দ্রাক্ষাপায়ী পারসিক
গোলাপ কাননবাসী তাতার নির্ভীক
অশ্বারূঢ়, শিষ্টাচারী সতেজ জাপান
প্রবীণ প্রাচীন চীন নিশি দিনমান
কর্ম-অনুরত—সকলের ঘরে ঘরে
জন্মলাভ করে লই হেন ইচ্ছা করে।

সারমর্ম : জগতের মাঝে নিজেকে বিলিয়ে দিয়ে বিশ্বের সব মানুষের আত্মীয় হতে পারলে, সব মানুষকে ভালোবাসতে পারলেই জীবন সার্থক ও সুন্দর হয়ে ওঠে। তখন পরের ঘর আর পর থাকে না, সকলকেই আপন মনে হয়।

৩২

ইসলাম বলে, সকলের তরে মোরা সবাই,
সুখ-দুঃখ সমভাগ করে নেব সকলে ভাই
নাই অধিকার সঞ্চয়ের।
কারো আঁখি জলে কারো ঝাড়ে কিরে জ্বলিবে দীপ?
দু'জনার হবে বুলন্দ নসীব, লাখে লাখে হবে বদ নসীব।
এ নহে বিধান ইসলামের।
ঈদ-উল-ফিতর আনিয়াছে তাই নব বিধান,
ওগো সঞ্চয়ী উদ্বৃত্ত যা তা কর দান,
ক্ষুধার অন্ন হোক সবার।
ভোগের পেয়ালা উপচায়ে পড়ে তব হাতে
তৃষাতুরের হিস্যা আছে ও-পেয়ালাতে
দিয়া ভোগ কর বীর, দেদার।

সারমর্ম : অর্থনৈতিক বৈষম্য নয়, শান্তি ও সাম্যের ধর্ম ইসলাম। ঈদুল ফিতরে নিজের উদ্বৃত্ত অপরকে দান করার মধ্যেই উক্ত সাম্যের প্রমূর্ত প্রকাশ। ভোগে নয়; ত্যাগ, সাম্য ও সমবণ্টনেই ইসলামের প্রকৃত তাৎপর্য নিহিত।



৩৩ ঊ

উড়িয়া মেঘের দেশে চিল কহে ডাকি,
কি কর চাতক ভায়া ধূলি মাঝে থাকি।
কোথায় উঠেছি চেয়ে দেখ একবার
এখানে আসিতে পার সাধ্য কি তোমার।
চাতক কহিছে, তবু নিচে দৃষ্টি তব,
সদা ভাব কার কিবা ছোঁ মারিয়া লব।
মেঘ বারি ভিন্ন অন্নজল নাহি খাই,
তাই আমি নিচে থেকে ঊর্ধ্ব মুখে চাই।

সারমর্ম : সামাজিক অবস্থান বা বংশ পরিচয় নয় যে কোনো অবস্থানে থেকেই কর্মের মাধ্যমে মানবিক গুণাবলির বিকাশ ঘটানো সম্ভব। তাই নিজের সুপ্ত মনুষ্যত্বকে জাগ্রত করার মাধ্যমে জাগতিক কল্যাণ সাধনই সবার কাম্য।

৩৪

উড়িল ধানের ধূলি নামায় বসন তুলি
নব্য সভ্য যুবক যখন
একী অসভ্যের দেশ যন্ত্রণার একশেষ
বলি, দূরে করে পলায়ন;
দুই হাতে ধূলিরাশি মাখিয়া কৃষক হাসি,
হর্ষ গদ্ গদ্ ভাষে কয়–
চিরদিন এই ধূলি মাখি যেন সব ভুলি
এ ধূলি সোনার বাড়া জীবনে হয়ো না হারা
চিরদিন মোর দেশে র'য়ো
রোগের ওষুধ তুমি সম্পদ জন্মভূমি
মরণের শেষ শয্যা হয়ো।

সারমর্ম : পাশ্চাত্য শিক্ষিত নগরবাসী এদেশকে চাষা-ভূষা ও অসভ্যের বলে অবজ্ঞা করে। তারা আধুনিক সভ্যতার মোহে অন্ধ হয়ে জননী, জন্মভূমিকে উপযুক্ত মর্যাদা দিতে পারে না। অথচ তারা জানে না সভ্য তারাই যারা তাদের জন্মভূমিকে জন্মভূমির ধূলিকে আশির্বাদ বলে মনে করে।

৩৫ এ

এ দুর্ভাগা দেশ হতে হে মঙ্গলময়,
দূর করে দাও তুমি সর্ব তুচ্ছ ভয়—
লোকভয়, রাজভয়, মৃত্যুভয় আর।
দীনপ্রাণ দুর্বলের এ পাষাণভার,
এই চিরপেষণযন্ত্রণা, ধূলিতলে
এই নিত্য অবনতি, দণ্ডে পলে পলে
এই আত্ম-অবমান, অন্তরে বাহিরে
এই দাসত্বের রজ্জু, ত্রস্ত নতশিরে
সহস্রের পদপ্রান্ততলে বারংবার

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



মনুষ্য-মর্যাদা-গর্ব চির পরিহার—
এ বৃহৎ লজ্জারাশি চরণ-আঘাতে
চূর্ণ করি দূর করো। মঙ্গলপ্রভাতে
মস্তক তুলিতে দাও অনন্ত আকাশে
উদার আলোক-মাঝে, উন্মুক্ত বাতাসে।

সারমর্ম : মানুষের জীবনকে সুন্দর ও সার্থক করতে হলে চাই মুক্তি। বন্ধনের দাসত্বে জীবনের বিকাশ রুদ্ধ হয়ে পড়ে, মনুষ্যত্ববোধ ও মর্যাদা হয় খণ্ডিত। আত্ম-অবমাননা মানুষের জীবনস্রোতকে ক্ষীণ ও সংকীর্ণ করে তোলে। উদার মুক্তির স্পর্শেই মানুষ মহৎ হতে পারে এবং ব্যক্তিত্ব ও মনুষ্যত্বের বিকাশ ঘটাতে পারে। তাই সমস্ত লাঞ্ছনা আর বঞ্চনা উপেক্ষা করে মুক্ত আকাশের নিচে জাতি মাথা উঁচু করে দাঁড়াক—এটাই আজকের কামনা।

৩৬

এই-সব মূঢ় ম্লান মূক মুখে
দিতে হবে ভাষা; এই-সব শ্রান্ত শুষ্ক ভগ্ন বুকে
ধ্বনিয়া তুলিতে হবে আশা; ডাকিয়া বলিতে হবে—
'মুহূর্ত তুলিয়া শির একত্র দাঁড়াও দেখি সবে;
যার ভয়ে তুমি ভীত সে অন্যায় ভীরু তোমা-চেয়ে,
যখনি জাগিবে তুমি, তখনি সে পলাইবে ধেয়ে।
যখনি দাঁড়াবে তুমি সম্মুখে তাহার, তখনি সে
পথকুক্কুরের মত সংকোচে সত্রাসে যাবে মিশে।
দেবতা বিমুখ তারে, কেহ নাহি সহায় তাহার;
মুখে করে আস্ফালন, জানে সে হীনতা আপনার
মনে মনে॥

সারমর্ম : দারিদ্র্যের নিষ্পেষণে জর্জরিত, অত্যাচারে পর্যুদস্ত, হতাশাগ্রস্ত দুঃখী মানুষের দুঃখ ও অগৌরব দূর করার জন্যে চাই নতুন শক্তি ও প্রেরণা। তাহলেই অন্যায় ও অত্যাচারের অপশক্তির বিরুদ্ধে তাদের ঐক্যবদ্ধ, সংগঠিত ও অনুপ্রাণিত করা সম্ভব হবে। ঐক্যবদ্ধ জনতার সম্মিলিত প্রতিরোধ ও তীব্র ঘৃণার সামনে অত্যাচারীর পরাজয় অনিবার্য।

৩৭

একদা পরমমূল্য জন্মক্ষণ দিয়েছে তোমায়
আগন্তুক। রূপের দুর্লভসত্তা লভিয়া বসেছ
সূর্য-নক্ষত্রের সাথে। দূর আকাশের ছায়াপথে
যে আলোক আসে নামি ধরণীর শ্যামল ললাটে
সে তোমার চক্ষু চুমি তোমারে বেঁধেছে অনুক্ষণ
সখ্যডোরে দ্যুলোকের সাথে; দূর যুগান্তর হতে
মহাকাল যাত্রী মহাবাণী পুণ্য মুহূর্তেরে তব
শুভক্ষণে দিয়েছে সম্মান; তোমার সম্মুখ দিকে
আত্মার যাত্রার পন্থ গেছে চলি অনন্তের পানে—
সেথা তুমি একা যাত্রী অফুরন্ত এ মহাবিস্ময়।



সারমর্ম : জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত মানুষ অন্তহীন বিশ্বলোকের সঙ্গে অনুভব করে অবিচ্ছেদ্য ও নিরন্তর সম্পর্ক। প্রকৃতির সঙ্গে সুগভীর সম্পর্কের মধ্য দিয়েই বিকশিত হয় তার জীবন। তার অস্তিত্বও সেই সম্পর্কের ওপর নির্ভরশীল। কিন্তু জীবন শেষে অনিবার্য মৃত্যুর পথযাত্রায় মানুষ নিঃসন্দেহে নিঃসঙ্গ পথিক।

৩৮

এসেছে নতুন শিশু, তাকে ছেড়ে দিতে হবে স্থান;
জীর্ণ পৃথিবীতে ব্যর্থ, মৃত আর ধ্বংসস্তূপ-পিঠে
চলে যেতে হবে আমাদের।
চলে যাবো— তবু আজ যতক্ষণ দেহে আছে প্রাণ
প্রাণপণে পৃথিবীর সরাবো জঞ্জাল।
এ বিশ্বকে এ শিশুর বাসযোগ্য ক'রে যাবো আমি—
নবজাতকের কাছে এ আমার দৃঢ় অঙ্গীকার।

সারমর্ম : ভবিষৎ প্রজন্মের সুখময় জীবনের জন্য বাসযোগ্য পৃথিবী নির্মান প্রত্যেকের কর্তব্য। পুরাতন পৃথিবী থেকে জরা-জীন, ব্যর্থতা ও গ্লানী অপসারণ না করলে নতুনের প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। তাই পৃথিবীকে সুন্দর ও স্বপ্নীল করে সাজিয়ে শিশুদের বাসযোগ্য করে যাওয়া উচিত।

৩৯

একদা ছিল না জুতা চরণ যুগলে
দহিল হৃদয় মম সেই ক্ষোভানলে।
ধীরে ধীরে চুপি চুপি দুঃখাকুল মনে
গেলাম ভজনালয়ে ভজন কারণে।
দেখি সেথা এক জন পদ নাহি তার
অমনি জুতার খেদ ঘুচিল আমার।
পরের দুঃখের কথা করিলে চিন্তন
আপনার মনে দুঃখ থাকে কতক্ষণ।

সারমর্ম : পরের দুঃখকষ্টকে উপলব্ধি করার মধ্যে জীবনের প্রকৃত সার্থকতা নিহিত। কেননা দুঃখীজনের কথা চিন্তা করলে আপনার দৈন্য মনে স্থান পায় না।

৪০

এই যে মায়ের অনাদরে ক্লিষ্ট শিশুগুলি
পরনে নেই ছেঁড়া কানি সারা গায়ে ধূলি—
সারাদিনের অনাহারে শুষ্ক বদনখানি,
ক্ষিদের জ্বালায় ক্ষুণ্ণ তাতে জ্বরে ধুকধুকানি,
অযতনে বাছাদের হায়, গা গিয়েছে ফেটে
ক্ষুদ ঘাঁটা তাও জোটে না'ক সারাটি দিন খেটে,
এদের ফেলে ওগো ধনী, ওগো দেশের রাজা,
কেমন করে রোচে মুখে মণ্ডা মিঠাই খাজা?
ক্ষুধায় কাতর যখন এরা দেখে তোমায় খেতে,
সে কি নীরব যাচ্ঞা করুণ ফোটে নয়নেতে
তা দেখে ছিঃ অকাতরে কেমনে গেলো অন্ন?
দাঁড়িয়ে পাশে ভুখা শিশু ধূসর বর্ণ।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



সারমর্ম : ক্ষুধাকাতর ও বিপন্ন মানুষের পাশে দাঁড়ানো সামর্থ্যবান মানুষদের নৈতিক দায়িত্ব। নিজের সামর্থ্যকে কাজে লাগিয়ে দুঃখী-নিরন্নের কষ্টকে ভাগাভাগি করে নেয়ার মধ্যেই মেলে মহত্ত্বের পরিচয়। তাই এটাই সবার কাম্য হওয়া উচিত।

৪১

এ জীবনে যে যাহারে প্রাণ ভরি ভালবাসিয়াছে—
উচ্চ হোক তুচ্ছ হোক দূরে কিংবা থাক তাহা কাছে,
পাত্র বা অপাত্র হোক, প্রেমেই প্রেমের সার্থকতা;
বিশ্বজয়ী প্রেম প্রভু বিশ্ব মাঝে জানে না ব্যর্থতা।
প্রেমিকের অশ্রুজলে মন্দাকিনী চির-প্রবাহিত,
প্রণয়ীর দীর্ঘশ্বাস স্বর্গে গিয়া হয় যে সঞ্চিত,
মর্ত্যের নিস্ফল-প্রেম স্বর্গে গিয়া হয় যে সফল,
নন্দন-মান্দারে রয় প্রণয়ের পরিমল।'

সারমর্ম : প্রেম মহান। প্রেমে ব্যর্থতা বা বিরহ বলে কিছু নেই। কেননা প্রকৃত প্রেম ব্যর্থতাকে স্বীকার করে নেয়। তাই সাময়িক লাভ ক্ষতির হিসাবে নয়, প্রেমকে দেখতে হবে চিরায়ত ও স্বর্গীয় আনন্দের মর্যাদায়। বস্তুত প্রেমেই প্রেমের সার্থকতা।

৪২

এক কূল ভেঙে নদী অন্য কূল গড়ে,
দূষিত বায়ুরে লয় উড়াইয়া ঝড়ে।
তীব্র কাল কূটে হয় শুদ্ধ রসায়ন,
কাক করে কোকিলের সন্তান পালন।
দংশে বটে, মধুচক্র গড়ে মধুকর
বজ্র হানে যদিও বারি ঢালে জলধর
সুখ-দুঃখ, ভাল-মন্দ জড়িত সংসারে
অবিমিশ্র কিছু নাই সৃষ্টি বিধাতার।

সারমর্ম : মানবজীবনে সুখ এবং দুঃখ পর্যায়ক্রমে আসে। পৃথিবীতে অবিমিশ্র সুখ বা দুঃখ বলে কিছু নেই। সুখ-দুঃখ মিলেই এই জগৎ।

৪৩

একি রঙ্গ! অফুরন্ত জন্ম মৃত্যু খেলা,
তরু বল্লী পশু-পক্ষী-পতঙ্গের মেলা।
মুক্ত দ্বার, অবারিত প্রাণের ভাণ্ডার,
অকস্মাৎ যবনিকা মাঝখানে তার;
কবে বল, কোথা কোন নেপথ্য আড়ালে,
কোন রজনীর প্রান্তে দীপ্ত চক্রবালে,
ফুরাইবে এই বিরহ: পারাবার শেষে
চুম্বিব অনন্ত বেলা তোমারি উদ্দেশ্যে।

সারমর্ম : নশ্বর জীবকুল জন্ম-মৃত্যুর মাধ্যমে অবারিত প্রাণের ভাণ্ডার রচনা করে। তাই নশ্বরতা থাকলেও সমষ্টিগত অমরতা লক্ষণীয়। এজন্য বিরহ কখনো ফুরায় না।



৪৪

ওরা চিরকাল
টানে দাঁড়, ধরে থাকে হাল;
ওরা মাঠে মাঠে
বীজ বোনে, পাকা ধান কাটে—
ওরা কাজ করে
নগরে প্রান্তরে।
রাজছত্র ভেঙ্গে পড়ে, রণডঙ্কা শব্দ নাহি তোলে;
জয়স্তম্ভ মূঢ়সম অর্থ তার ভোলে;
রক্তমাখা অস্ত্র হাতে যত রক্ত-আঁখি
শিশুপাঠ্য কাহিনীতে থাকে মুখ ঢাকি।
ওরা কাজ করে
দেশ-দেশান্তরে।

সারমর্ম : মানবসভ্যতার ইতিহাস বহু সাম্রাজ্যের উত্থান-পতনের ঘটনায় পরিকীর্ণ হলেও কালগর্ভে রাজশক্তির সব কীর্তি বিলীন হয়ে গেছে। অন্যদিকে শ্রমজীবী মানুষের অবদান ইতিহাসে ঠাঁই না পেলেও তাদের শ্রমের ফসলে রক্ষা পেয়েছে মানব অস্তিত্ব, গড়ে উঠেছে মানবসভ্যতা। তাই রাজা-রাজড়ার কাহিনী বিস্মৃতির অতল গর্ভে তলিয়ে গেলেও শ্রমজীবী মানুষের এই ভূমিকা মহাকালের পাতায় চির ভাস্বর হয়ে থাকবে।

৪৫

ওই দূর বনে সন্ধ্যা নামিছে ঘন আবিরের রাগে,
অমনি করিয়া লুটায়ে পড়িতে বড় সাধ আজ জাগে।
মজিদ হইতে আযান হাঁকিছে বড় সকরুণ সুর,
মোর জীবনের রোজকেয়ামত ভাবিতেছি কত দূর।
জোড়হাতে দাদু মোনাজাত কর, "আয় খোদা! রহমান।
ভেস্ত নসিব করিও সকল মৃত্যু-ব্যথিত-প্রাণ।"

সারমর্ম : বার্ধক্য জীবনের শেষ স্তর যখন মৃত্যু চেতনা প্রবল হয়ে পড়ে। অন্যদিকে সন্ধ্যার আযান দিনের অবসান ঘটিয়ে জীবনের ইতিচেতনাকে জাগিয়ে তোলে। ফলে আযানের করুণ সুরের সাথে জীবনাবসানের ভাবনা একাকার হয়ে মৃত্যু চিন্তাজনিত কষ্ট দূরীভূত হয়।

৪৬

ওরা কারা বুনো দল ঢোকে
এরি মধ্যে (থামাও, থামাও), স্বর্ণশ্যাম বুক ছিঁড়ে
অস্ত্র হাতে নামে সাস্ত্রী কাপুরুষ, অধম রাষ্ট্রের
রক্ত পতাকা তোলে, কোটি মানুষের সমবায়ী
সভ্যতার ভাষা এরা রদ করবে ভাবে, মরু-পশু
মারীর অন্ধতা ঝড়ে হানে অসহায় নরনারী।

সারমর্ম : রাতের আঁধারে নিরস্ত্র মানুষের ওপর আঘাত হেনে অধম হানাদার বাহিনী চরম কাপুরুষতার পরিচয় দিয়েছে। এ ধরনের কাপুরুষোচিত চিন্তা-চেতনার কারণেই তারা এদেশবাসীর মুখের ভাষা কেড়ে নিতে চেয়েছে, তছনছ করেছে স্বপ্নে গড়া দেশকে। যদিও এদেশবাসী তাদের পশুত্বের কাছে মাথা নত করেনি।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



**৪৭**

ওই যে লাউয়ের জাংলা-পাতা ঘর দেখা যায় একটু দূরে,
কৃষকবালা আসছে ফিরে পুকুর হতে কলসী পুরে।
ওই কুঁড়েঘর উহার মাঝেই যে চিরসুখ বিরাজ করে,
নাই রে সে সুখ অট্টালিকায়, নাই রে সে সুখ রাজার ঘরে।
কত গভীর তৃপ্তি যে লুকিয়ে আছে পল্লী-প্রাণে,
জানুক কেহ নাই বা জানুক সে কথা মোর মনই জানে।
মায়ের গোপন বিত্ত যা তার খোঁজ পেয়েছে ওরাই কিছু,
মোদের মতো তাই ওরা আর ছুটে নাকো মোহের পিছু।

**সারমর্ম :** সবুজ-শ্যামলে ঘেরা পল্লীর ছোট্ট কুঁড়েঘরে যে প্রশান্তি আছে, শহরের বিশাল অট্টালিকার প্রাচুর্যের মধ্যেও তা নেই। কেননা শহরের মতো পল্লীতে মোহ ও অর্বাচীন সুখের পিছনে ছোটার প্রবণতা নেই।

**৪৮**

ওই-যে দাঁড়ায়ে নতশির
মূক সবে, ম্লান মুখে লেখা শুধু শত শতাব্দীর
বেদনার করুণ কাহিনী, স্কন্ধে যত চাপে ভার
বহি চলে মন্দগতি যতক্ষণ থাকে প্রাণ তার–
তার পরে সন্তানেরে দিয়ে যায় বংশ বংশ ধরি,
নাহি ভর্ৎসে অদৃষ্টেরে নাহি নিন্দে দেবতারে স্মরি,
মানবেরে নাহি দেয় দোষ। নাহি জানে অভিমান,
শুধু দু'টি অন্ন খুঁটি কোনোমতে কষ্ট ক্লিষ্ট প্রাণ
রেখে দেয় বাঁচাইয়া। সে অন্ন যখন কেহ কাড়ে,
সে প্রাণে আঘাত দেয় গর্বান্ধ নিষ্ঠুর অত্যাচারে,
নাহি জানে কার দ্বারে দাঁড়াইবে বিচারের আশে,
দরিদ্রের ভগবানে বারেক ডাকিয়া দীর্ঘশ্বাসে
মরে সে নীরবে। এই সব শ্রান্ত-শুষ্ক ভগ্ন বুকে
ধ্বনিয়া তুলিতে হবে আশা, ডাকিয়া বলিতে হবে–
মুহূর্তে তুলিয়া শির একত্র দাঁড়াও দেখি সবে;
যার ভয়ে তুমি ভীত সে অন্যায় ভীরু তোমা-চেয়ে
যখনি দাঁড়াবে তুমি সম্মুখে তাহার তখনি সে
পথকুক্কুরের মতো সংকোচে সন্ত্রাসে যাবে মিশে।
দেবতা বিমুখ তারে, কেহ নাহি সহায় তাহার;
মুখে করে আস্ফালন, জানে সে হীনতা আপনার
মনে মনে।

**সারমর্ম :** শিক্ষা ও জ্ঞানের আলো থেকে বঞ্চিত মানুষ অত্যাচার-অবিচারকে বিধাতার বিধান বলে মনে করে। এরা জানে না এটা অন্যায়। তাই এদের জাগাতে হবে। এদের মুখে দিতে হবে অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ভাষা। তবেই সম্ভব গণজাগরণ।



**৪৯**

ক

কতবার এল কত না দস্যু, কত না বার
ঠগে ঠগে হল আমাদের কত গ্রাম উজাড়
কত বুলবুলি খেল কত ধান
কত মা গাইল বর্গীর গান
তবু বেঁচে থাকে আমার প্রাণ
এ জনতার—
কৃষাণ, কুমোর, জেলে, মাঝি, তাঁতি আর কামার,
অমর দেশের মাটিতে মানুষ তাদের প্রাণ,
মূঢ় মৃত্যুর মুখে জাগে তাই কঠিন গান।

**সারমর্ম :** বাংলার মানুষ অপরাজেয় প্রাণশক্তির অধিকারী। ইতিহাসের সুদীর্ঘ কাল পরিক্রমায় বাংলার বুকে নেমে এসেছে ঠগ, দস্যু ও বর্গীর আক্রমণ, জনপদ হয়েছে লুণ্ঠিত। কিন্তু গ্রাম বাংলার শ্রমজীবী মানুষের শ্রমে ও সৃজনে অব্যাহত রয়েছে জীবনধারা। তাদের মৃত্যুঞ্জয়ী কর্মশক্তিতে জেগেছে অমরত্বের গান।

**৫০**

কবি, তবে উঠে এসো—যদি থাকে প্রাণ
তবে তাই লহ সাথে, তবে তাই করো আজি দান।
বড় দুঃখ, বড় ব্যথা—সম্মুখেতে কষ্টের সংসার
বড়ই দরিদ্র, শূন্য, বড়ো ক্ষুদ্র, বদ্ধ, অন্ধকার।
অন্ন চাই, প্রাণ চাই, আলো চাই, চাই মুক্ত বায়ু,
চাই বল, চাই স্বাস্থ্য, আনন্দ-উজ্জ্বল পরমায়ু,
সাহসবিস্তৃত বক্ষপট। এ দৈন্য মাঝারে, কবি,
এবার নিয়ে এসো স্বর্গ হতে বিশ্বাসের ছবি—

**সারমর্ম :** জাতীয় জীবনে সংকট উত্তরণে ও জাতির পুনরুজ্জীবনে কবিকে পালন করতে হয় মহৎ সামাজিক দায়িত্ব, হতে হয় সচেতন ও অগ্রণী। আপন সৃষ্টিকর্মের মাধ্যমে তিনি জাতীয় জীবনে সঞ্চার করতে পারেন বলিষ্ঠ ও প্রত্যয়দীপ্ত জীবনের আকাঙ্ক্ষা, সংকট উত্তরণে জোগাতে পারেন সাহস ও শক্তি, হতাশা-নিমজ্জিত জাতিকে তিনি দেখাতে পারেন নবজীবনের স্বপ্ন।

**৫১**

কহিল মনের খেদে মাঠ সমতল
মাঠ ভরে দেই আমি কত শস্য ফল
পর্বত দাঁড়ায়ে রহে কি জানি কি কাজ
পাষাণের সিংহাসনে তিনি মহারাজ
বিধাতার অবিচার কেন উঁচু-নিচু
সে কথা আমি নাহি বুঝিতে পারি কিছু।
গিরি কহে, সব হলে সমতল পারা,
নামিত কি ঝরণার সমধুর ধারা?

**সারমর্ম :** উর্বর সমতল ক্ষেত্রের তুলনায় অটল পর্বতকে নিষ্ফলা পাষাণ মনে হলেও জগতে পর্বতেরও নিজস্ব ভূমিকা রয়েছে। পর্বত থেকে নেমে আসা ঝর্নাধারাতেই পুষ্ট হয় সমতল ভূমির ফসলের ক্ষেত। বস্তুত জগতে ছোট-বড়, উঁচু-নিচু কোনো কিছুই অপ্রয়োজনীয় নয়। সবকিছুরই পরস্পর পরিপূরক ভূমিকা আছে।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



৫২

কিসের তরে অশ্রু ঝরে, কিসের লাগি দীর্ঘশ্বাস।
হাস্যমুখে অদৃষ্টেরে করব মোরা পরিহাস।
রিক্ত যারা সর্বহারা, সর্বজয়ী বিশ্বে তারা,
গর্বময়ী ভাগ্যদেবীর নয়কো তারা ক্রীতদাস।
হাস্য মুখে অদৃষ্টেরে করব মোরা পরিহাস।
আমরা সুখের স্ফীত বুকের ছায়ার তলে নাহি চরি।
আমরা দুঃখের বক্রমুখের চক্র দেখে ভয় না করি।
ভগ্ন ঢাকে যথাসাধ্য বাজিয়ে যাব জয়বাদ্য,
ছিন্ন আশার ধ্বজা তুলে ভিন্ন করব নীলাকাশ।
হাস্যমুখে অদৃষ্টেরে করব মোরা পরিহাস—

সারমর্ম : মানবজীবন এক বৃহত্তর সংগ্রামের ক্ষেত্র। সেখানে সুখ-দুঃখ দুইই আছে। তাই দুঃখে ভেঙে পড়া কখনো কাম্য হতে পারে না। আত্মশক্তিতে বলীয়ান হয়ে সমস্ত দুঃখ-কষ্ট ও বিপদ-বাধাকে জয় করাই প্রতিটি মানুষের কর্মপ্রচেষ্টার লক্ষ্য হওয়া উচিত।

৫৩

কোথায় স্বর্গ, কোথায় নরক, কে বলে তা বহুদূর?
মানুষের মাঝে স্বর্গ-নরক, মানুষেই সুরাসুর।
রিপুর তাড়নে যখনি মোদের বিবেক পায় গো লয়,
আত্মগ্লানির নরক অনলে তখনি পুড়িতে হয়।
প্রীতি ও প্রেমের পুণ্য বাঁধনে যবে মিলি পরস্পরে,
স্বর্গ আসিয়া দাঁড়ায় তখন আমাদের কুঁড়েঘরে।

সারমর্ম : স্বর্গ ও নরক পরলোকের ব্যাপার হলেও ইহলোকেও তাদের অস্তিত্ব অনুভব করা যায়। বিবেকবোধ বিসর্জন দিয়ে অন্যায় ও অপকর্মে লিপ্ত হলে মানবজীবনের নেমে আসে নরক-যন্ত্রণা। আর মানুষে-মানুষে প্রেম-প্রীতিময় সুসম্পর্ক গড়ে উঠলে পৃথিবী হয়ে ওঠে স্বর্গরাজ্য।

৫৪

কে তুমি খুঁজিছ জগদীশে ভাই,
আকাশপাতাল জুড়ে কে তুমি ফিরিছ বন জঙ্গলে,
কে তুমি পাহাড়-চূড়ে? হায় ঋষি দরবেশ,
বুকের মানিককে বুকে ধরে তুমি খোঁজ তারে দেশ দেশ।
সৃষ্টি রয়েছে তোমা পানে চেয়ে তুমি আছ চোখ বুঁজে,
স্রষ্টারে খোঁজে—আপনারে তুমি আপনি ফিরিছ খুঁজে।
ইচ্ছা-অন্ধ! আঁখি খোলো, দেখ দর্পণে নিজ কায়া,
দেখিবে তোমারি সব অবয়বে পড়েছে তাঁহার ছায়া।
সকলের মাঝে প্রকাশ তাঁহার, সকলের মাঝে তিনি,
আমাদের দেখিয়া আমার অদেখা জন্মদাতারে চিনি।

সারমর্ম : স্রষ্টা তার সৃষ্টি মধ্যেই বিরাজমান। তাই সংসারধর্ম ত্যাগ করে দেশ-দেশান্তরে কিংবা বনজঙ্গলে ঘুরে বেড়ালেই তাকে পাওয়া যায় না, তাঁকে পেতে হলে মনুষ্যত্বের বিকাশ ঘটাতে হয়, অন্তরাত্মাকে জাগিয়ে তুলতে হয়, সর্বোপরি মানবপ্রেমে নিজেকে বিলিয়ে দিতে হয়।



৫৫

কহিল গভীর রাত্রে সংসার বিরাগী,
"গৃহ তেয়াগিব আজি ইষ্ট-দেব লাগি।
কে আমারে ভুলাইয়া রেখেছে এখানে!"
দেবতা কহিলা, "আমি।" শুনিল না কানে।
সুপ্তিমগ্ন শিশুটিরে আঁকড়িয়া বুকে
প্রেয়সী শয্যার প্রান্তে ঘুমাইছে সুখে।
কহিল, "কে তোরা, ওরে মায়ার ছলনা।"
দেবতা কহিলা, "আমি"। কেহ শুনিল না।
ডাকিল শয়ন ছাড়ি, "তুমি কোথা প্রভু!"
দেবতা কহিলা, "হেথা।" শুনিল না তবু।
স্বপনে কাঁদিল শিশু জননীরে টানি,
দেবতা কহিলা, "ফির।" শুনিল না বাণী।
দেবতা নিঃশ্বাস ছাড়ি কহিলেন, "হায়,
আমারে ছাড়িয়া ভক্ত চলিল কোথায়!"

সারমর্ম : সংসারধর্ম ত্যাগ করে কখনো বিধাতাকে পাওয়া যায় না। তাকে পেতে হলে তার সৃষ্টিকেই আগে ভালোবাসতে হবে। কেননা স্রষ্টা তার সকল সৃষ্টির মধ্যেই বিরাজমান।

৫৬

কে বলে তোমারে বন্ধু, অস্পৃশ্য অশুচি
শুচিতা ফিরিছে সদা তোমারি পিছনে।
তুমি আছ, গৃহবাসে তাই আছে রুচি,
নইলে মানুষ বুঝি ফিরে যেত বনে।
শিশুজ্ঞানে সেবা তুমি করিতেছ সবে,
ঘুচাইছ রাত্রিদিন সর্ব ক্লেদ গ্লানি।
ঘৃণার নাহিক কিছু স্নেহের মানবে,
হে বন্ধু, তুমিই একা জেনেছ সে বাণী।
নির্বিচারে আবর্জনা বহ অহর্নিশ
নির্বিকার সদা শুচি তুমি গঙ্গাজল।
নীলকণ্ঠ করেছেন পৃথ্বীরে নির্বিষ;
আর তুমি? —তুমি তারে করেছ নির্মল।
এস বন্ধু, এস বীর, শক্তি দাও চিতে—
কল্যাণের কর্ম করি লাঞ্ছনা সহিতে।

সারমর্ম : সভ্য সমাজে নিম্নশ্রেণীর কর্মকাণ্ডে জড়িতদেরকে অস্পৃশ্য বা অশুচি বলে মনে করা হয়। অথচ তাদের কল্যাণেই পৃথিবী আজ বসবাসের উপযোগী হয়েছে। তাই তাদের কাজকে ঘৃণা না করে তাদের প্রতি সকলের সম্মান দেখানো উচিত।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



৫৭

কী গভীর দুঃখে মগ্ন সমস্ত আকাশ,
সমস্ত পৃথিবী চলিতেছে যতদূর
শুনিতেছি একমাত্র মর্মান্তিক সুর,
'যেতে আমি দেব না তোমায়।' ধরণীর
প্রান্ত হতে নীলাভ্রের সর্বপ্রান্ততীর
ধ্বনিতেছে চিরকাল অনাদ্যন্ত রবে,
'যেতে নাহি দিব; যেতে নাহি দিব।' সবে
কহে, 'যেহে নাহি দিব।' তৃণ ক্ষুদ্র অতি,
তাঁরেও বাঁধিয়া বক্ষে মাতা বসুমতী
কহিছেন প্রাণপণে, 'যেতে নাহি দিব।'
আয়ুক্ষীণ দীপমুখে শিখা নিব-নিব,—
আঁধারে গ্রাস হতে কে টানিছে তারে,
কহিতেছে শতবার, 'যেতে দিব না রে।'
এ অনন্ত চরাচরে স্বর্গমর্ত্য ছেয়ে
সবচেয়ে পুরাতন কথা, সবচেয়ে
গভীর ক্রন্দন, 'যেতে নাহি দিব।' হায়,
তবু যেতে দিতে হয়, তবু চলে যায়।

সারমর্ম : জন্মালে মরতে হবে— এটাই প্রকৃতির নিয়ম। তাই কেউ প্রিয়জনকে ছেড়ে এ পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে না চাইলেও মহাকালের অমোঘ ডাকে সাড়া দিয়ে পালাক্রমে সবাইকেই বিদায় নিতে হবে।

৫৮

কুকুর আসিয়া এমন কামড় দিল পথিকের পায়,
কামড়ের চোটে বিষদাঁত ফুটে বিষ লেগে গেল তায়।
ঘরে ফিরে এসে রাত্রে বেচারা বিষম ব্যথায় জাগে,
মেয়েটি তাহার, তারি সাথে হায়, জাগে শিয়রের আগে।
বাপেরে সে বলে ভর্ৎসনা ছলে কপালে রাখিয়া হাত,
তুমি কেন বাবা ছেড়ে দিলে তারে, তোমার কি নেই দাঁত?
কষ্টে হাসিয়া আর্ত কহিল, "তুইরে হাসালি মোরে,
দাঁত আছে বলে কুকুরে পায়ে দংশি কেমন করে?
কুকুরের কাজ কুকুর করেছে, কামড় দিয়েছে পায়,
তা'বলে কুকুরে কামড়ানো কিরে মানুষের শোভা পায়?"

সারমর্ম : ক্ষমা মহৎ ব্যক্তির চরিত্রের অন্যতম গুণ। হীন ব্যক্তি তার ক্ষতিসাধন করতেই পারে। কারণ তার পক্ষে হীন ও ঘৃণ্য আচরণ করাই স্বাভাবিক। কিন্তু মহৎ ব্যক্তি তার প্রতিশোধ নিতে পারেন না। বরং ক্ষমার মাধ্যমেই লাভ করতে পারেন মহত্ত্ব।



৫৯

কী সহজে হয়ে গেল বলা,
কাঁপলো না গলা
এতটুকু, বুক চিরে বেরুলো না দীর্ঘশ্বাস, চোখ ছলছল
করলো না এবং নিজের কণ্ঠস্বর শুনে
নিজেই চমকে উঠি, কী নিস্পৃহ, কেমন শীতল।

সারমর্ম : সময়ের ব্যবধানে মানুষ সবকিছুই ভুলে যায়, এমনকি অতি আপনজন হারানোর বেদনাও। কিন্তু এমনও সময় আসে যখন নিস্পৃহ শীতল কণ্ঠে সে সেই হৃদয়বিদারক ঘটনা বলতে পারলেও মন থেকে তা মুছে ফেলতে পারে না।

৬০

কাননের বৃক্ষ আর প্রান্তরের লতা
একত্র করিল মালী, যারে পেল যেথা,
ভালবেসে জল দিল আলি চারিপাশে,
সুন্দর বাগানখানি ফুল ফুটে হাসে।
ফলভরে বৃক্ষলতা গড়াগড়ি যায়,
একটি মরিল যেই আরটি শুকায়।
কারেও ছাড়িয়া কারো নাহি বাঁচে প্রাণ;
আমাদের গৃহ যেন মালীর বাগান।

সারমর্ম : সংসার এবং মালির বাগান দুটি অভিন্ন সত্তা। বৃক্ষ লতাগুলো যেমন পারস্পরিক বন্ধনে মালির বাগানকে শোভিত করে আবার পর্যায়ক্রমে মারা যায়, তদ্রূপ পরিবারের সদস্যরাও পারস্পরিক সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে সুখের সংসার গড়ে আবার একদিন এ সম্পর্ক ছিন্ন করে সবাইকেই বিদায় নিতে হয় পর্যায়ক্রমে। আর এখানেই অভিন্ন সত্তার বহিঃপ্রকাশ।

৬১

ক্ষমা যেথা ক্ষীণ দুর্বলতা,
হে রুদ্র, নিষ্ঠুর যেন হতে পারি তথা
তোমার আদেশে। যেন রসনায় মম
সত্যবাক্য ঝলি ওঠে খরখড়গ সম।
তোমার ইঙ্গিতে। যেন রাখি তব মান
তোমার বিচারাসনে লয়ে নিজ স্থান।
অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে,
তব ঘৃণা যেন তারে তৃণসম দহে।

সারমর্ম : ক্ষমা মহত্ত্বের লক্ষণ, কিন্তু তা যেন সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার অন্তরায় হয়ে না দাঁড়ায়, যেন অন্যায়কে প্রশ্রয় না দেয়। কারণ, অন্যায় করা আর অন্যায়কে প্রশ্রয় দেওয়া দুই-ই সমান অপরাধের সামিল।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



৬২

ক্ষুদ্র এই তৃণদল ব্রহ্মাণ্ডের মাঝে
সরল মাহাত্ম্য লয়ে সহজে বিরাজে।
পূরবের না সূর্য, নিশীথের শশী
তৃণটি তাদেরি সাথে একাসনে বসি।
আমার এ গান এও জগতের গানে
মিশে যায় নিখিলের মর্ম মাঝখানে।
শ্রাবণের ধারাপাত, বনের মর্মর
সকলের মাঝে তার আপনার ঘর।
কিন্তু হে বিলাসী, তব ঐশ্বর্যের ভার
ক্ষুদ্র রুদ্ধ দ্বারে শুধু একাকী তোমার।
নাহি পড়ে সূর্যালোক, নাহি চাহে চাঁদ,
নাহি তাহে নিখিলের নিত্য আশীর্বাদ।
সম্মুখে দাঁড়ালে মৃত্যু মুহূর্তেই হায়
পাংশুপাণ্ডু শীর্ণ ম্লান মিথ্যা হয়ে যায়।

সারমর্ম : ছোট্ট যে তৃণলতা তারও যোগ রয়েছে বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে। নৈসর্গিক সৌন্দর্যের সরল মাধুর্যে তা চাঁদ ও সূর্যের সমগোত্রীয়। কবি যে গান রচনা করেন তাও বিশ্বপ্রকৃতির সুরমূর্ছনার সঙ্গে একস্রোতে মিশে যেতে পারে। কিন্তু ভোগবিলাসীর সম্পদ একান্তভাবে তার নিজস্ব, বিশ্বপ্রকৃতি থেকে তা একেবারেই বিচ্ছিন্ন। বিলাসীর সামনে যখন মৃত্যু এসে দাঁড়ায় তখনই তা ম্লান ও মূল্যহীন হয়ে পড়ে।

৬৩

খ

খেয়া নৌকা পারাপার করে নদীস্রোতে,
কেহ যায় ঘরে, কেহ আসে ঘর হতে।
দুই তীরে দুই গ্রাম আছে জানাশোনা,
সকাল হইতে সন্ধ্যা করে আনাগোনা।
পৃথিবীতে কত দ্বন্দ্ব, কত সর্বনাশ,
নূতন নূতন কত গড়ে ইতিহাস—
রক্তপ্রবাহের মাঝে ফেনাইয়া উঠে
সোনার মুকুট কত ফুটে আর টুটে।
সভ্যতার নব নব কত তৃষ্ণা ক্ষুধা
উঠে কত হলাহল, উঠে কত সুধা।
শুধু হেথা দুই তীরে, কে বা জানে নাম,
দোঁহাপানে চেয়ে আছে দুইখানি গ্রাম।
এই খেয়া চিরদিন চলে নদীস্রোতে—
কেহ যায় ঘরে, কেহ আসে ঘর হতে।

সারমর্ম : সভ্যতার উষাকাল থেকে পৃথিবীতে চলে আসছে দ্বন্দ্ব-সংঘাত। তাতে ঘটেছে কত না সাম্রাজ্যের উত্থান-পতন, কত না ভাঙা-গড়া। কিন্তু বাংলার গ্রামজীবন তার ব্যতিক্রম। সেখানকার প্রীতিবন্ধনময় সহজ-সরল জীবনযাত্রা আজও অব্যাহত।



৬৪

খোদা বলিবেন, "হে আদম সন্তান,
আমি চেয়েছিনু ক্ষুধার অন্ন, তুমি কর নাই দান।"
মানুষ বলিবে, "তুমি জগতের প্রভু,
আমরা তোমারে কেমনে খাওয়াব, সে কাজ কি হয় কভু?"
বলিবেন খোদা—"ক্ষুধিত বান্দা গিয়েছিল তব দ্বারে,
মোর কাছে তুমি ফিরে পেতে তাহা যদি খাওয়াইতে তারে।"

সারমর্ম :আল্লাহর সৃষ্টি মানুষকে উপেক্ষা করে সৃষ্টিকর্তার সন্তুষ্টি মেলে না। ক্ষুধিত-বঞ্চিতের সেবাই বিধাতার কাছে পুণ্য বলে গণ্য হয়। মানবসেবাই স্রষ্টার প্রতি কর্তব্য পালনের প্রকৃষ্ট পথ।

৬৫

গ

গাহি তাহাদের গান—
ধরণীর হাতে দিল যারা আনি ফসলের ফরমান।
শ্রম-কিণাঙ্ক-কঠিন যাদের নির্দয় মুঠি-তলে
ত্রস্তা ধরণী নজরানা দেয় ডালি ভরে ফুলে ফলে।
বন্য-শ্বাপদ-সঙ্কুল জরা-মৃত্যু-ভীষণা ধরা
যাদের শাসনে হলো সুন্দর কুসুমিতা মনোহরা।
যারা বর্বর হেথা বাঁধে ঘর পরম অকুতোভয়ে
বনের ব্যাঘ্র ময়ূর সিংহ বিবরের ফণী লয়ে।

সারমর্ম : যাদের কঠোর পরিশ্রমে পৃথিবী ভরে উঠেছে ফল ও ফসলে, যাদের আমৃত্যু প্রচেষ্টায় অরণ্যময় পৃথিবী হয়ে উঠেছে অনুপম সুন্দর, পুষ্পময় ও মনোমুগ্ধকর; মানবকল্যাণে যারা দিয়েছেন আত্মাহুতি— প্রকৃতপক্ষে তারাই বন্দনার যোগ্য।

৬৬

চ

চাব না পশ্চাতে মোরা, মানিব না বন্ধন ক্রন্দন,
হেরিব না দিক—
গণিব না দিনক্ষণ, করিব না বিতর্ক বিচার,
উদ্দাম পথিক।
মুহূর্তে করিব পান মৃত্যুর ফেনিল উন্মত্ততা
উপকণ্ঠ ভরি—
ক্ষীণ শীর্ণ জীবনের শত লক্ষ ধিক্কৃত লাঞ্ছনা
উৎসর্জন করি।

সারমর্ম : অতীতের মোহবন্ধন কখনো প্রাণশক্তিতে বলীয়ান জাতির অগ্রযাত্রার অন্তরায় হতে পারে না। সব পিছুটান, সংস্কার ও বিধি-নিষেধের বেড়াজাল ছিন্ন করে জীবন বাজি রেখে তারা এগিয়ে যায়। জরাগ্রস্ত লাঞ্ছিত জীবনের পরিবর্তে নতুন সম্ভাবনাময় জীবন রচনাই তাদের লক্ষ্য।

৬৭

চিত্ত যেথা ভয়শূন্য, উচ্চ যেথা শির,
জ্ঞান যেথা মুক্ত, যেথা গৃহের প্রাচীর
আপন প্রাঙ্গণতলে দিবসশর্বরী
বসুধারে রাখে নাই খণ্ড ক্ষুদ্র করি,
যেথা বাক্য হৃদয়ের উৎসমুখ হতে

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



উচ্ছ্বসিয়া উঠে, যেথা নির্বারিত স্রোতে
দেশে দেশে দিশে দিশে কর্মধারা ধায়
অজস্র সহস্রবিধ চরিতার্থতায়–
যেথা তুচ্ছ আচারের মরুবালুরাশি
বিচারের স্রোতঃপথ ফেলে নাই গ্রাসি,
পৌরুষেরে করে নি শতধা– নিত্য যেথা
তুমি সর্ব-কর্ম-চিন্তা-আনন্দের নেতা।

সারমর্ম : বিশ্বব্যাপী প্রতিটি মানুষের প্রয়োজন নির্ভীক হৃদয়, উন্নত মস্তক, সংস্কারহীন অখণ্ড বিশ্বজ্ঞান, আবেগময় নির্বাধ বাক-স্বাধীনতা। যা বয়ে আনবে সুবিপুল সফল কর্মোচ্ছ্বাস, ন্যায়বোধ ও বিচারবুদ্ধি এবং অনমনীয় পৌরুষ; গড়ে তুলবে মুক্ত পরিবেশ ও সর্ববন্ধনমুক্ত দীপ্ত মানবতা।

৬৮

চড়ুইভাতি করছে মাঠে ছোট ছেলের দল,
ভোজন চেয়ে দ্বিগুণ বেশি পুলক কোলাহল।
উনানে ফুঁ দেয় কেহ, চক্ষু করে লাল,
কাঠের লাগি' ভাঙছে কেহ শুকনো মোটা ডাল,
আনছে কেহ বেগুন তুলি' আনছে কেহ শাক,
ঐ যেন উনান জ্বলল– বিষম চিন্তা গেল, যাক।
আতপ আছে, দুগ্ধ আছে, আছে নলেন গুড়,
সবার চেয়ে অধিক আছে আনন্দ প্রচুর।

সারমর্ম : সবাই একত্রিত হয়ে যে কোনো কাজ করলেই দারুণ আনন্দ পাওয়া যায়। চড় ইভাতির লক্ষ্য খাওয়া হলেও, সবাই দৌড়াদৌড়ি করে; আনুষঙ্গিক কাজকর্ম করে যে আনন্দ পায় সেটাই মুখ্য। বস্তুত মিলনের আনন্দই সবচেয়ে বড় আনন্দ।

৬৯

ছ

ছোট বালুকার কণা, বিন্দু বিন্দু জল,
গড়ি তোলে মহাদেশ সাগর অতল।
মুহূর্তে নিমেষ কাল, তুচ্ছ পরিমাণ,
গড়ে যুগ-যুগান্তর-অনন্ত মহান।
প্রত্যেক সামান্য ত্রুটি, ক্ষুদ্র অপরাধ,
ক্রমে টানে পাপ পথে, ঘটায় প্রমাদ।
প্রতি করুণার দান, স্নেহপূর্ণ বাণী,
এ ধরায় স্বর্গ শোভা নিত্য দেয় আনি।

সারমর্ম : সকল বড় বস্তুই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বস্তুর সমন্বয়ে সৃষ্টি। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অণু-পরমাণু দ্বারাই বিশাল জগতের সৃষ্টি হয়েছে। তাই ক্ষুদ্রকে বাদ দিয়ে বৃহৎ কিছুর কল্পনা করা অযৌক্তিক। ছোট ছোট বালুকণা কিংবা বিন্দু বিন্দু পানি দ্বারাই সৃষ্টি হয় মহাদেশ বা বিশাল সাগর। আবার ছোট ছোট মুহূর্তের সমবায়েই সৃষ্টি হয় মহাকালের। সামান্য অপরাধ কিংবা কাজের সামান্য ভুলত্রুটি যেমন মহাপাপী বা মহাবিপদ সৃষ্টি করতে পারে, তেমনি সামান্য দয়া, সহানুভূতি বা স্নেহসিক্ত কথা জগতে সৃষ্টি করতে পারে স্বর্গীয় সুখের ধারা।



৭০

জ

জগতের যত বড় বড় জয় বড় বড় অভিযান;
মাতা-ভগ্নী ও বধূদের ত্যাগে হইয়াছে মহীয়ান।
কোন্ রণে কত খুন দিল নর, লেখা আছে ইতিহাসে,
কত নারী দিল সিঁথির সিঁদুর, লেখা নাই তার পাশে।
কত মাতা দিল হৃদয় উপাড়ি, কত বোন দিল সেবা,
বীরের স্মৃতি-স্তম্ভের গায়ে লিখিয়া রেখেছে কেবা?
কোন কালে একা হয়নি ক' জয়ী পুরুষের তরবারি,
প্রেরণা দিয়াছে, শক্তি দিয়াছে, বিজয়-লক্ষ্মী নারী।

সারমর্ম : যুগ যুগ ধরে পৃথিবীর সকল বড় বড় কাজের মূলে রয়েছে নারী ও পুরুষের যৌথ ভূমিকা ও অবদান। পুরুষের পাশে থেকে সব সময় প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নারী তাদের কাজে শক্তি, সাহস ও প্রেরণা যুগিয়েছে। কিন্তু তবুও নারীর ভূমিকার যথাযথ মূল্যায়ন হয়নি; ইতিহাসের পাতায় তাদের ভূমিকা যথাযোগ্যভাবে লিপিবদ্ধ হয়নি।

৭১

জলহারা মেঘখানি বরষার শেষে
পড়ে আছে গগনের এক কোণ ঘেঁষে।
বর্ষাপূর্ণ সরোবর তারি দশা দেখে
সারাদিন ঝিকিমিকি হাসে থেকে থেকে।
কহে, ওটা লক্ষ্মীছাড়া, চালচুলাহীন,
নিজেরে নিঃশেষ করি, কোথায় বিলীন।
আমি দেখো চিরকাল থাকি জলভরা
সরোবর, সুগম্ভীর, নাই নড়াচড়া।
মেঘ কহে, ওহে বাপু, করো না গরব,
তোমার পূর্ণতা সে যে আমারই গৌরব।

সারমর্ম : পরের জন্য অকাতরে সর্বস্ব দানে মহতের মহত্ত্ব ও গৌরব। কিন্তু দাতার এই মহানুভবকে স্বীকার করা দূরে থাক অনেক গ্রহীতা দাতার ঔদার্যকে তির্যক পরিহাসে উপেক্ষা করে। দাতার মহত্ত্বকে খাটো করার জন্য নিজেকে বড়ো করে জাহির করতে চায়। কিন্তু তাতে দাতার মর্যাদা খাটো হয় না। কারণ, স্বার্থহীন দানের গৌরব কখনো ম্লান হবার নয়।

৭২

জাতিতে জাতিতে ধর্মে নিশিদিন হিংসা ও বিদ্বেষ
মানুষে করিছে ক্ষুদ্র, বিষাইছে বিশ্বের আকাশ,
মানবতা মহাধর্ম রোধ করি করিছে উল্লাস
বর্বরের হিংস্র নীতি, ঘৃণা দেয় বিকৃত নির্দেশ।
জাতি-ধর্ম-দেশ ঊর্ধ্বে ঘৃণা ঊর্ধ্বে পাচ্ছ যেই দেশ,
সেথায় সকলে এক, সেথায় মুক্ত সত্যের প্রকাশ,
মানব সভ্যতা সেই মুক্ত সত্য লভুক বিকাশ,
মহৎ সে মুক্তি-সংজ্ঞা মঙ্গল সে নির্বার অশেষ।
জাতি-ধর্ম-রাষ্ট্র ন্যায় সকলি যে মানুষের তরে
মানুষ সবার ঊর্ধ্বে—নহে কিছু তাহার অধিক।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



সারমর্ম : মানুষে মানুষে হিংসা-বিদ্বেষ ও বিভেদের মূল কারণ জাতিগত ও ধর্মীয় পার্থক্য। অথচ জাতি-ধর্ম ও দেশকালের উর্ধ্বে মানবতার স্থান। বিশ্বে ক্রমবর্ধমান হিংসা-বিদ্বেষের ফলে মানুষের সবচেয়ে বড় ধর্ম মানবতা আজ পর্যুদস্ত। এ অবস্থায় পৃথিবীতে মানুষের মঙ্গল নিশ্চিত করতে হলে মানবতাকেই সবার উর্ধ্বে স্থান দিতে হবে।

৭৩

জীবনে যত পূজা হল না সারা,
জানি হে, জানি তাও হয় নি হারা।
যে ফুল না ফুটিতে ঝরেছে ধরণীতে,
যে নদী মরুপথে হারালো ধারা,
জানি হে, জানি তাও হয় নি হারা—
জীবনে আজও যাহা রয়েছে পিছে,
জানি হে, জানি তাও হয় নি মিছে।
আমার অনাগত আমার অনাহত
তোমার বীণাতারে বাজিছে তারা—
জানি হে, জানি তাও হয় নি হারা—

সারমর্ম : এ বিশ্বের বিপুল কর্মযজ্ঞে কোনো কর্মপ্রচেষ্টাই মূল্যহীন বা তুচ্ছ নয়। দৈনন্দিন জীবনে আমরা অসম্পূর্ণ ও অসফল কর্মপ্রয়াসকে মোটেও গুরুত্ব দিতে চাই না। কিন্তু আপাতবিচারে যা তুচ্ছ, ব্যর্থ ও মূল্যহীন তার মধ্যে যে ভাবীকালের পূর্ণতার ইঙ্গিত লুকিয়ে নেই তা কে বলতে পারে? তাই অসমাপ্ত বা অর্ধসমাপ্ত কাজের জন্য নিশ্চেষ্ট বা হতাশ হওয়া উচিত নয়।

৭৪

জীবন্ত ফুলের ঘ্রাণে
দুপুরে মিছি ঘুম ছিঁড়ে খুঁড়ে গেল;
জেগে দেখি আমি
আমার ঘরেতে ওড়ে ছোট এক বুনো মৌমাছি,
ডানায় ডানায় যার সোঁদাগন্ধ অজানা বনের।
কেমন সুন্দর ওই উড়ন্ত মৌমাছি।
অশ্রান্ত করুণ ও গুনগুনানিতে
কেঁপে ওঠে মাটির মসৃণতম গান,
আর দূর পাহাড়ের বন্ধুর বিষণ্ন প্রতিধ্বনি!
যেন আজ বাহিরের সমস্ত পৃথিবী আর সমস্ত আকাশ
আমার ঘরের মাঝে তুলে নিয়ে এল
কোথাকার ছোট এক বুনো মৌমাছি।

সারমর্ম : ঘরের চার দেয়ালের কৃত্রিম পরিবেশ প্রকৃতির মুক্ত জীবন থেকে মানুষকে করেছে বিচ্ছিন্ন। সেই কৃত্রিম পরিবেশে কখনো যদি প্রকৃতির মুক্ত সৌন্দর্যের ক্ষণিক ছোঁয়া লাগে তবে আবার মানুষের আত্মজাগরণ হয়। প্রকৃতির সঙ্গে মানব মনের যোগে জীবনের পূর্ণতা ও সমগ্রতার রূপটি ধরা পড়ে।



৭৫

জেগে যারা ঘুমিয়ে আছে তাদের দ্বারে আসি'
ওরে পাগল, আর কতদিন বাজাবি তোর বাঁশি!
ঘুমায় যারা মখমলের ঐ কোমল শয়ন পাতি
অনেক আগেই ভোর হয়েছে তাদের দুঃখের রাতি।
আরাম সুখের নিদ্রা তাদের; তোর এ জাগার গান
ছোঁবে না ক প্রাণরে তাদের, যদিই বা ছোঁয় কান!
নির্ভয়ের ওই সুখের কুলে বাঁধল যারা বাড়ি,
আবার তারা দেবে না রে ভয়ের সাগর পাড়ি।
ভিতর হতে যাদের আগল শক্ত করে আঁটা
'দ্বার খোল গো' বলে তাদের দ্বারে মিথ্যা হাঁটা।

সারমর্ম : নিদ্রিত মানুষকে জাগানো যায়; কিন্তু জাগ্রত অবস্থায় যারা নিদ্রার ভান করে পড়ে থাকে তাদের জাগানো যায় না। যারা সুখনিদ্রায় বিভোর, যারা সচেতনভাবে মিথ্যার পথ বেছে নিয়ে দুয়ার বন্ধ করে রাখে তাদের ভুল ভাঙিয়ে মনুষ্যত্বের পথে উজ্জীবিত করা সহজ কাজ নয়।

৭৬

জোটে যদি মোটে একটি পয়সা
খাদ্য কিনিও ক্ষুধার লাগি
দুটি যদি জোটে তবে অর্ধেকে
ফুল কিনে নিও, হে অনুরাগী।
বাজারে বিকায় ফল তন্দুল;
সে শুধু মিটায় দেহের ক্ষুধা
হৃদয় প্রাণের ক্ষুধা নাশে ফুল
দুনিয়ার মাঝে সেই-তো সুধা।

সারমর্ম : দৈহিক ও মানসিক ক্ষুধা নিয়েই মানবজীবন। এর একটিকে বাদ দিয়ে পূর্ণ পরিতৃপ্তি অসম্ভব। পেটের খিদে মিটে গেলে মনের প্রফুল্লতার জন্য অর্থের বিনিময়ে হলেও অন্তত একটি ফুল সংগ্রহ করে অনাবিল আনন্দ লাভে সচেষ্ট হতে সবাই কামনা করে।

৭৭

জলে না নামিলে কেহ শিখে না সাঁতার
হাঁটতে শিখে না কেহ না খেয়ে আছাড়,
সাঁতার শিখিতে হলে
আগে তবে নাম জলে,
আছাড়ে করিয়া হেলা হাঁট বার বার
পারিব বলিয়া সুখে হও আগুসর।

সারমর্ম : অনুশীলন ব্যতীত দক্ষতা অর্জন অসম্ভব। আর অনুশীলনও কষ্টসাধ্য, যন্ত্রণাময়। তাই সাফল্য অর্জনে শুরুতেই হতাশ না হয়ে, নিচেষ্ট না থেকে সকল কষ্ট, যন্ত্রণা সহ্য করে অনুশীলনে তৎপর হতে হবে।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



## ঠ

৭৮

ঠাঁই নাই, ঠাঁই নাই—ছোট সে তরী
আমারি সোনার ধানে গিয়েছে ভরি।
শ্রাবণ গগন ঘিরে
ঘন মেঘ ঘুরে ফিরে,
শূন্য নদীর তীরে
রহিনু পড়ি—
যাহা ছিল নিয়ে গেল সোনার তরী॥

সারমর্ম : মহাকালের তরণীতে ব্যক্তিমানুষের ঠাঁই হয় না; ঠাঁই হয় কেবল মানুষের মহৎ সৃষ্টিকর্মের। ব্যক্তিমানুষ মহাকালের অনিবার্য ও নিষ্ঠার কালগ্রাসের শিকার হওয়ার জন্য অপূর্ণতার বেদনা নিয়ে নিঃসঙ্গভাবে অপেক্ষা করে।

## ত

৭৯

তব কাছে এই মোর শেষ নিবেদন—
সকল ক্ষীণতা মম করহ ছেদন
দৃঢ়বলে, অন্তরের অন্তর হইতে
প্রভু মোরে। বীর্য দেহো সুখেরে সহিতে,
সুখেরে কঠিন করি। বীর্য দেহো দুখে,
যাহে দুঃখ আপনারে শান্তস্মিত মুখে
পারে উপেক্ষিতে! ভকতিরে বীর্য দেহো
কর্মে যাহে হয় সে সফল, প্রীতি স্নেহ
পুণ্যে উঠে ফুটি। বীর্য দেহো ক্ষুদ্র জনে
না করিতে হীনজ্ঞান, বলের চরণে
না লুটিতে। বীর্য দেহো চিত্তেরে একাকী
প্রত্যহের তুচ্ছতার ঊর্ধ্বে দিতে রাখি।
বীর্য দেহো তোমার চরণে পাতি শির
অহর্নিশি আপনারে রাখিবারে স্থির।

সারমর্ম : সকল দীনতা ও ক্ষুদ্রতা থেকে মুক্তি লাভের জন্য কবি বিধাতার কাছে মনোবল প্রার্থনা করছেন। সে প্রার্থনা জীবনের সকল কাঠিন্য সইতে পারার, দুঃখ-বেদনাকে জয় করার এবং কর্মে সাফল্য অর্জনের। দুঃখী মানুষকে ভালোবেসে, শক্তির দম্ভকে উপেক্ষা করে দৃঢ়চিত্তে কর্তব্য পালনের জন্য কবি বিধাতার উপর নির্ভরতা প্রার্থনা করেন।

৮০

তোমার ন্যায়ের দণ্ড প্রত্যেকের করে
অর্পণ করেছ নিজে। প্রত্যেকের 'পরে
দিয়েছ শাসনভার হে রাজাধিরাজ।
সে গুরু সম্মান তব সে দুরূহ কাজ
নমিয়া তোমারে যেন শিরোধার্য করি
সবিনয়ে। তব কার্যে যেন নাহি ডরি
কভু কারে।
ক্ষমা যেথা ক্ষীণ দুর্বলতা,
হে রুদ্র, নিষ্ঠুর যেন হতে পারি তথা
তোমার আদেশে।



সারমর্ম : বিশ্ববিধাতা মানুষকে ন্যায়-অন্যায় বিচারক্ষমতা ও বিবেকবোধ দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। তাই অন্যায়ের ক্ষেত্রে ক্ষমাসুলভ দুর্বলতাকে কোনো রকম প্রশ্রয় না দিয়ে ন্যায় ও সত্য প্রতিষ্ঠায় কঠোরভাবে ব্রতী হওয়া প্রত্যেকেরই নৈতিক দায়িত্ব।

৮১

তোমার মাপে হয় নি সবাই
তুমিও হও নি সবার মাপে,
তুমি মর কারো ঠেলায়
কেউ-বা মরে তোমার চাপে।
তবু ভেবে দেখতে গেলে
এমনি কিসের টানাটানি,
তেমন করে হাত বাড়ালে
সুখ পাওয়া যায় অনেকখানি।
আকাশ তবু সুনীল থাকে
মধুর থাকে ভোরের আলো,
মরণ এলে হঠাৎ দেখি
মরার চেয়ে বাঁচাই ভালো।
যাহার লাগি চক্ষু বুঁজে
বহিয়ে দিলাম অশ্রু সাগর,
তারে বাদ দিয়েও দেখি
বিশ্বভুবন মস্ত ডাগর।
মনে রে তাই কই যে,
ভাল-মন্দ যাহাই আসুক
সত্যেরে লও সহজে!

সারমর্ম : জগতে সব মানুষ যেমন সমান নয়, তেমনি অর্থ, অবস্থান ও মর্যাদাও সবার এক রকম নয়। এটাই বাস্তব সত্য। এই সত্যকে মেনে নিতে না পারলে না-পাওয়ার বেদনা মানুষকে আঁকড়ে ধরে। তাতে কেবল দুঃখই বাড়ে। এই বিশাল বিশ্বে মানুষের ব্যক্তিগত চাওয়া-পাওয়ার দিকটা নিতান্তই নগণ্য। মানুষ যদি দুঃখের জন্য অযথা হা-হুতাশ না করে বাস্তব সত্যকে সহজভাবে গ্রহণ করতে পারে তবেই তার জীবন ভরে ওঠে সুখ ও আনন্দে।

৮২

তোমারি ক্রোড়েতে মোর পিতামহগণ
নিদ্রিত আছেন সুখে জীবনলীলা-শেষে
তাদের শোণিত, অস্থি সকলি এখন
তোমারি দেহের সঙ্গে গিয়েছে মা মিশে;
তোমার ধূলিতে গড়া এ দেহ আমার
তোমার ধূলিতে কালে মিলাবে আবার।

সারমর্ম : জন্মভূমির আলো-বাতাসে বর্ধিত হয়ে, তার ফসলে পরিপুষ্ট হয়ে পূর্বপুরুষেরা যেমন জীবন শেষে জন্মভূমির মাটিতে মিশে গেছে তেমনি বর্তমান মানুষও একদিন জন্মভূমির মাটিতে মিশে যাবে। পুরুষ পরম্পরায় জন্মভূমির মাটিতে গড়া মানুষ জন্মভূমির কোলেই শেষ আশ্রয় নিতে উন্মুখ।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



৮৩

তেলের শিশি ভাঙলো বলে খুকুর 'পরে রাগ করো
তোমরা যে সব বুড়ো খোকা ভারত ভেঙে ভাগ করো।
তার বেলা?
ভাঙছো প্রদেশ, ভাঙছো জেলা, জমিজমা ঘরবাড়ি
পাটের আড়ত, ধানের গোলা, কারখানা আর রেলগাড়ি।
তার বেলা?
চায়ের বাগান কয়লা খনি কলেজ থানা আপিস ঘর
চেয়ার টেবিল দেয়াল ঘড়ি পিয়ন পুলিশ প্রোফেসর।
তার বেলা?
যুদ্ধ জাহাজ জঙ্গী মোটর কামান বিমান অশ্ব উট
ভাগাভাগির ভাঙাভাঙির চলছে যেন হরির লুট
তার বেলা?

সারমর্ম : পৃথিবী জুড়ে চলেছে ভাঙনের এক অপ্রতিরোধ্য মহামারী। ভাঙনের সর্বনাশা খেলায় মত্ত কাণ্ডজ্ঞানশূন্য পৃথিবীর বহু দায়িত্বশীল ব্যক্তি। বিশ্বব্যাপী তাদের এ ভয়াবহ ধ্বংসলীলার তুলনায় জগতের শিশুদের অসতর্ক ভাঙন নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর।

৮৪

তারপর এই শূন্য জীবনে যত কাটিয়াছি পাড়ি
যেখানে যাহারে জড়ায়ে ধরেছি সেই চলে গেছে ছাড়ি।
শত কাফনের, শত কবরের অঙ্ক হৃদয়ে আঁকি,
গণিয়া গণিয়া ভুল করে গণি সারা দিনরাত জাগি।
এই মোর হাতে কোদাল ধরিয়া কঠিন মাটির তলে,
গাড়িয়া দিয়াছি কত সোনামুখ নাওয়ায়ে চোখের জলে।
মাটিরে আমি যে বড় ভালবাসি, মাটিতে মিশায়ে বুক,
আয়-আয় দাদু, গলাগলি ধরি কেঁদে যদি হয় সুখ।

সারমর্ম : নিজের চোখের সম্মুখে সকল অবলম্বনের মৃত্যু যন্ত্রণাভোগ বড়ই দুর্বিষহ। তারা আজ কবরের মাটিতে চির শায়িত। তাই শোকাগ্রস্ত জীবিত ব্যক্তি শোকের যন্ত্রণা লঘু করতে প্রিয়জনের সান্নিধ্যের আস্বাদ পেতে কবরের মাটির সান্নিধ্যে যেতে আকুল হন।

৮৫

তোমাতে আমার পিতা-পিতামহগণ
জন্মেছিলে একদিন আমারি মতন।
তোমারি এ বায়ুতাপে তাহাদের দেহ
পুষেছিলে পুষিতেছ আমায় যেমন।
জন্মভূমি জননী আমার যেথা তুমি
তাহাদেরও সেইরূপ তুমি মাতৃভূমি।
তোমারি ক্রোড়েতে মোর পিতামহগণ



নিদ্রিত আছেন সুখে জীবন লীলা শেষে।
তাদের শোণিত অস্থি সকলি এখন
তোমার দেহের সঙ্গে গিয়েছে মা মিশে।
তোমার ধূলিতে গড়া এ দেহ আমার
তোমার ধূলিতে কালে মিলাবে আবার।

সারমর্ম : জন্মভূমি এমন এক স্থান যেখানে প্রজন্ম পরম্পরায় মানুষ আবির্ভূত হয়, ধীরে ধীরে বড় হয়ে ওঠে এবং জীবন শেষে আবার অন্তিমশয়ন রচনা করে; মিশে যায় জন্মভূমির ধূলিমাটিতে। তাই জন্মভূমি মানব অস্তিত্বের অবিচ্ছেদ্য অংশ।

৮৬

তরুতলে বসি পান্থ শ্রান্তি করে দূর
ফল আস্বাদনে পায় আনন্দ প্রচুর।
বিদায়ের কালে হাতে ডাল ভেঙ্গে লয়,
তরু তবু অকাতর— কিছু নাহি কয়।
দুর্লভ মানব জন্ম পেয়েছ যখন,
তরুর আদর্শ কর জীবনে গ্রহণ,
পরার্থে আপন সুখ দিয়া বিসর্জন,
তুমিও হওগো ধন্য তরুর মতন।
জড় ভেবে তাহাদের করিও না ভুল,
তুলনায় বড় তারা মহত্ত্বে অতুল।

সারমর্ম : বৃক্ষ যেমন অপরের আঘাত সত্ত্বেও প্রতিবাদ না করে নীরবে দান করে যায় তদ্রূপ অপরের আঘাতে জর্জরিত হয়েও তাদের মঙ্গল কামনায় আত্মদানই জীবনের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য হওয়া উচিত।

৮৭

তবু আঠারোর শুনেছি জয়ধ্বনি,
এ বয়স বাঁচে দুর্যোগে আর ঝড়ে,
বিপদের মুখে এ বয়স অগ্রণী
এ বয়স তবু নতুন কিছু তো করে।
এ বয়স জেনো ভীরু, কাপুরুষ নয়
পথ চলতে এ বয়স যায় না থেমে,
এ বয়সে তাই নেই কোনো সংশয়—
এদেশের বুকে আঠারো আসুক নেমে।

সারমর্ম : আঠারো বছর বয়সের তারুণ্য স্বপ্ন দেখায় নব জীবনের। অদম্য এ বয়সের মাঝেই নিহীত দুর্যোগ ও দুর্বিপাক মোকাবিলার অসীম শক্তি। এ বয়সের তারুণ্যই দুর্বার বেগে এগিয়ে নেয় অগ্রযাত্রার পথে। তাই দেশের উন্নয়নে তারুণ্যের উথান একান্ত কাম্য।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



৮৮ 'তোমারে রাখি যে বাঁধিয়া,
হে রবি, এমন নাহিকো আমার বর।
তোমা বিনা তাই ক্ষুদ্র জীবন কেবলই অশ্রুজল।'
'আমি বিপুল কিরণে ভুবন করি যে আলো,
তবু শিশিরটুকুরে ধরা দিতে পারি, বাসিতে পারি যে ভালো।'
শিশিরের বুকে আসিয়া
কহিলা তখন হাসিয়া—
'ছোটো হয়ে আমি রহিব তোমারে ভরি,
তোমার ক্ষুদ্র জীবন গড়িব হাসির মতন করি।'

সারমর্ম : শিশিরের সাধ্য নেই সূর্যের সান্নিধ্য লাভ করার। কিন্তু তার সাধ আছে— তাই সে কামনা করে জ্যোতিষ্মান সূর্যের সান্নিধ্য। অথচ শিশির রূপ সামান্যের সে প্রার্থনাকে পূরণ করতে সূর্য আপন জ্যোতি প্রতিফলিত করে উজ্জ্বল প্রতিবিম্বের মধ্য দিয়ে শিশিরের হৃদয়সত্তাকে ভরিয়ে তোলে আলোর কণিকারূপে। বস্তুত সাধনার মাঝেই মেলে মহত্ত্বের পরশ।

৮৯ তোমাদেরি মাঝে আসে মাঝে মাঝে রাজার দুলাল ছেলে,
পরের দুঃখে কেঁদে কেঁদে যায় শত সুখ পায়ে ঠেলে।
কবি-আরাধ্য প্রকৃতির মাঝে কোথা আছে এর জুড়ি?
অবিচারে মেঘ ঢালে জল, তাও সমুদ্র হতে চুরি!
সৃষ্টির সুখে মহা খুশি যারা তারা নর নহে, জড়;
যারা চিরদিন কেঁদে কাটাইল, তারাই শ্রেষ্ঠতর।
মিথ্যা প্রকৃতি, মিছে আনন্দ, মিথ্যা রঙিন সুখ;
সত্য সত্য সহস্রগুণ সত্য জীবের দুখ।

সারমর্ম : ত্যাগেই প্রকৃত সুখ, ভোগে নয়। নিজেদের জীবনাচরণের মধ্য দিয়ে বিশ্ববাসীকে এ শিক্ষা দিতে মহাপুরুষেরা যুগে যুগে পৃথিবীতে আবির্ভূত হন। তারা আত্মসুখের অন্বেষণে নয়, পরার্থে নিজের জীবনকেও উৎসর্গ করতে কুণ্ঠিত হন না।

৯০ তোমার প্রেম যে বইতে পারি
এমন সাধ্য নাই।
এ সংসারে তোমার আমার
মাঝখানেতে তাই–
কৃপা করে রেখেছ, নাথ,
অনেক ব্যবধান–
দুঃখ-সুখের অনেক বেড়া
ধন জন-মান।
আড়াল থেকে ক্ষণে ক্ষণে
আভাসে দাও দেখা–
কালো মেঘের ফাঁকে ফাঁকে
রবির মৃদু রেখা।
শক্তি যারে দাও বহিতে
অসীম প্রেমের ভার
একেবারে সকল পর্দা
ঘুচায়ে দাও তার।



সারমর্ম : সৃষ্টা থেকেই সৃষ্টির উদ্ভব হলেও সৃষ্ট তাকে উপলব্ধি করতে পারে না। পার্থিব জীবনের কামনাবাসনা, ধন-জন-মান সে উপলব্ধির পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। তাই এগুলোকে ত্যাগ করতে পারলেই সৃষ্ট লাভ করতে পারেন স্রষ্টার সান্নিধ্য ধন্য ও সার্থক হয় তার সাধনা।

৯১ তৃণ ক্ষুদ্র অতি,
তারেও বাঁধিয়া বক্ষে মাতা বসুমতী
কহিছেন প্রাণপণে 'যেতে নাহি দিব'।
আয়ুক্ষীণ দীপমুখে শিখা নিব-নিব
আঁধারের গ্রাস হতে কে টানিছে তারে,
কহিতেছে শতবার, 'যেতে দিব না রে'।
এ অনন্ত চরাচরে স্বর্গ মর্ত্য ছেয়ে
সবচেয়ে পুরাতন কথা, সবচেয়ে
গভীর ক্রন্দন 'যেতে নাহি দিব। হায়,
তবু যেতে দিতে হয়, তবু চলে যায়।'

সারমর্ম : জন্মালে মরতে হয়। প্রিয়জনকে চিরকাল স্নেহের বন্ধনে বেঁধে রাখা যায় না। সময় ফুরিয়ে আসলে কেউ তাকে ঠেকিয়ে রাখতে পারে না। ত্রিলোক ব্যাপী উচ্চকণ্ঠে তাকে যেতে দেব না' বলে চিৎকার করলেও প্রিয়জনকে রাখা যায় না। কেননা এটা প্রকৃতির অমোঘ নিয়ম।

৯২ তোমার কাছে আরাম চেয়ে পেলেম শুধু লজ্জা,
এবার সকল অঙ্গ ছেয়ে পরাও রণসজ্জা।
ব্যাঘাত আসুক নব নব আঘাত খেয়ে অচল রব
বক্ষে আমার দুঃখ তব বাজবে জয়ডঙ্ক,
দেব সকল শক্তি, লব অভয় তব শৃঙ্খল।

সারমর্ম : সংকীর্ণ আত্মসুখের চিন্তায় ব্যাপৃত থেকে কখনোই মহৎ-প্রাণের অধিকারী হওয়া যায় না। দুঃখ জয়ের মধ্য দিয়ে কঠিন সত্যোপলব্ধির মাঝেই মানবজীবনের প্রকৃত সার্থকতা।

৯৩ তারাই মানুষ, তারাই দেবতা, তাহাদেরি গান–
তাদেরি ব্যথিত বক্ষে পা ফেলে আসে নব উত্থান।
তুমি শুয়ে রবে তেতালার পরে, আমরা রহিব নিচে,
অথচ তোমারে দেবতা বলিব সে ভরসা আজ মিছে।
সিক্ত যাদের সারা দেহ-মন মাটির মমতা-রসে,
এই ধরণীর তরণীর হাল রবে তাহাদেরি বশে।
তারি পদরজ অঞ্জলি করি মাথায় লইব তুলে,
সকলের সাথে পথে চলি' যার পায়ে লাগিয়াছে ধূলি।
আজ নিখিলের বেদনা– আর্ত পীড়িতের মাখি খুন
লালে লাল হয়ে উদিছে নবীন প্রভাতের নবারুণ!

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



সারমর্ম : বর্তমান যুগ সাম্যবাদের যুগ। এ যুগে অন্যায় শাসন, শোষণ, পীড়ন ও লাঞ্ছনা নয়, মাটির সাথে যাদের যোগ, যাদের ওপর সংসার নির্ভর করে, যাদের বেদনার মধ্য দিয়েই নব উত্থান এসেছে তারাই প্রকৃত মানুষ, দেবতুল্য; অন্যরা নয়। তাদের জয়গান গাওয়াই সবার কাম্য।

৯৪

## থ

থাকো, স্বর্গ, হাস্যমুখে—করো সুধাপান
দেবগণ! স্বর্গ তোমাদেরই সুখস্থান,
মোরা পরবাসী। মর্তভূমি স্বর্গ নহে,
সে যে মাতৃভূমি—তাই তার চক্ষে বহে
অশ্রুজলধারা, যদি দু দিনের পরে
কেহ তারে ছেড়ে যায় দু দণ্ডের তরে।
যত ক্ষুদ্র, যত ক্ষীণ, যত অভাজন,
যত পাপীতাপী মেলি ব্যগ্র আলিঙ্গন
সবারে কোমল বক্ষে বাঁধিবারে চায়—
ধূলিমাখা তনুস্পর্শে হৃদয় জুড়ায়
জননীর। স্বর্গে তব বহুক অমৃত,
মর্তে থাক সুখে-দুঃখে-অনন্ত-মিশ্রিত
প্রেমধারা অশ্রুজলে চিরশ্যাম করি
ভূতলের স্বর্গখণ্ডগুলি—

সারমর্ম : স্বর্গলোক আনন্দ ও অমৃতের অনন্ত উৎস হলেও পৃথিবীর মানুষ সংসারের সুখ-দুঃখের মায়াময় বন্ধনের মধ্যে বেশি পরিতৃপ্তি অনুভব করে। স্বর্গের চেয়ে মাটির পৃথিবী মানুষের কাছে বেশি প্রিয়। কারণ, দূরের স্বর্গ দেবতাদের জন্মভূমি আর মানুষের আত্মীয়তা মাটির পৃথিবীর সঙ্গেই।

৯৫

থাকবো নাকো বদ্ধ ঘরে, দেখবো এবার জগৎটাকে,
কেমন করে ঘুরছে মানুষ যুগান্তরের ঘূর্ণিপাকে।
দেশ হতে দেশ-দেশান্তরে ছুটছে তারা কেমন করে,
কিসের নেশায় কেমন করে মরছে যে বীর লাখে লাখে,
কিসের আশায় করছে তারা বরণ মরণ-যন্ত্রণাকে।
কেমন করে মথলে পাথার লক্ষ্মী উঠেন পাতাল ফুঁড়ে,
কিসের অভিমানে মানুষ চড়ছে হিমালয়ের চূড়ে,
তুহিন-মেরু পার হয়ে যায় সন্ধানীরা কিসের আশায়?
হাউই চড়ে চায় যেতে কে চন্দ্রলোকের অচিন পুরে—
শুনব আমি ইঙ্গিত কোন 'মঙ্গল' হতে আসছে উড়ে।

সারমর্ম : প্রকৃতির রহস্য মাত্রই দুর্জ্ঞেয়। মানুষ সে রহস্য উন্মোচনের জন্য কৌতূহলবোধ করে। মানুষের দুরূহ বৈজ্ঞানিক গবেষণা, অজানা দেশে পাড়ি দেয়া প্রভৃতির মধ্য দিয়েই সেই কৌতূহলের নিবৃত্তি ঘটে। অজানাকে জানার এ অভিপ্রায়ই মানুষকে এক অমর্ত্য-মহিমায় প্রতিষ্ঠিত করে।



৯৬

## দ

দণ্ডিতের সাথে
দণ্ডদাতা কাঁদে যবে সমান আঘাতে
সর্বশ্রেষ্ঠ সে বিচার। যার তরে প্রাণ
ব্যথা নাহি পায় কোন, তারে দণ্ড দান
প্রবলের অত্যাচার। যে দণ্ড বেদনা
পুত্রেরে পার না দিতে, সে কারেও দিও না।
যে তোমার পুত্র নহে, তারও পিতা আছে,
মহাঅপরাধী হবে তুমি তার কাছে।

সারমর্ম : বিচারের সময় অপরাধীর প্রতি সহানুভূতিশীল হলে সে বিচার হয় আদর্শ বিচার। কারণ, অপরাধ নিন্দনীয়, অপরাধী নয়। তাই একমাত্র সহানুভূতিশীল বিচারই পারে অপরাধীর মনের পরিবর্তন করাতে ও চরিত্রের সংশোধন ঘটাতে।

৯৭

দাও ফিরে সে অরণ্য, লও এ নগর—
লও যত লৌহ লোষ্ট্র, কাষ্ঠ ও প্রস্তর
হে নব সভ্যতা! হে নিষ্ঠুর সর্বগ্রাসী,
দাও সেই তপোবন, পুণ্যচ্ছায়ারাশি,
গ্লানিহীন দিনগুলি, সেই সন্ধ্যাস্নান,
সেই গোচারণ, সেই শান্ত সামগান—
নীবার-ধান্যের মুষ্টি, বল্কল-বসন,
মগ্ন হয়ে আত্মমাঝে নিত্য আলোচন
মহাতত্ত্বগুলি। পাষাণ পিঞ্জরে তব
নাহি চাহি নিরাপদে রাজভোগ নব—
চাই স্বাধীনতা, চাই পক্ষের বিস্তার,
বক্ষে ফিরে পেতে চাই শক্তি আপনার,
পরানে স্পর্শিতে চাই ছিঁড়িয়া বন্ধন,
অনন্ত এ জগতের হৃদয়স্পন্দন।

সারমর্ম : আধুনিক নগর-সভ্যতায় ইট-পাথর আর লোহালক্কড়ের কাঠামোর জঠরে চাপা পড়েছে মানুষের হৃদয়বৃত্তি। পক্ষান্তরে প্রাচীন আরণ্যক সভ্যতায় মানুষের জীবন ছিল শান্ত সমাহিত। প্রকৃতির মুক্ত অঙ্গনে প্রাণ ও মনের স্বাভাবিক স্ফূর্তিতে সে জীবন ছিল প্রসন্ন ও উদার। সেই হৃত জীবনকে ফিরে পাওয়ার আকুলতা নগর জীবনে হাঁপিয়ে ওঠা মানুষকে আলোড়িত করে বারবার।

৯৮

দাও ভক্তি শান্তি রস,
স্নিগ্ধ সুধাপূর্ণ করি মঙ্গল কলস
সংসার ভবনদ্বারে, যে ভক্তি-অমৃত
সমস্ত জীবনে মোর হইবে বিস্তৃত
নিগূঢ় গভীর—সর্ব কর্মে দিবে বল,
ব্যর্থ শুভ-চেষ্টারেও করিবে সফল

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



আনন্দ কল্যাণে, সর্বপ্রেমে দিবে তৃপ্তি,
সর্বদুঃখে দিবে ক্ষেম, সর্বসুখে দীপ্তি
দাহহীন। সংবরিয়া ভাব-অশ্রু-নীর
চিত্ত রবে পরিপূর্ণ অমত্ত গম্ভীর।

সারমর্ম : যে ভক্তি জীবনে আনে প্রশান্তি, আনে কল্যাণ, জীবনের সর্বক্ষেত্রে আনে চরিতার্থতা সেই ভক্তিরসই সবার কাম্য। তাহলেই জীবনে আসবে সুখ, আনন্দ ও কল্যাণ। অন্তর হবে শান্ত, ভাবমহিমায় সমুন্নত।

৯৯ দুঃখী বলে,—'বিধি নাই, নাহিক বিধাতা;
চক্রসম অন্ধ ধরা চলে।'
সুখী বলে,— 'কোথা দুঃখ, অদৃষ্ট কোথায়?
ধরণী নরের পদতলে।'
জ্ঞানী বলে, — 'কার্য আছে, কারণ দুর্জ্ঞেয়
এ জীবন প্রতীক্ষা কাতর।'
ভক্ত বলে, —'ধরণীর মহারসে সদা
ক্রীড়ামত্ত রসিক শেখর।'
ঋষি বলে,—'ধ্রুব তুমি, বরেণ্য ভূমান।'
কবি বলে,—'তুমি শোভাময়।'
গৃহী আমি,—'জীবনযুদ্ধে ডাকি হে কাতরে,
দয়াময় হও হে সদয়।'

সারমর্ম : বৈচিত্র্যময় মানব জগতে এক এক মানুষ এক এক চোখে স্রষ্টা ও সৃষ্টিকে বিচার করে। দুঃখীর কাছে বিধাতা থেকেও নেই। সুখী ভাবেন, জগৎ মানুষের হাতের মুঠোয়। জ্ঞানী খোঁজেন কার্য-কারণ সম্পর্ক। ভক্তের চোখে স্রষ্টা মহাপ্রেমিক আর ঋষির চোখে তিনি পরম পুরুষ। কবি জগতে খুঁজে ফেরেন সুন্দরকে আর গৃহী চান স্রষ্টার অপার করুণা।

১০০ দূর অতীতের পানে পশ্চাতে ফিরিয়া চাহিলাম
হেরিতেছি যাত্রী দলে দলে। জানি সবাকার নাম,
চিনি সকলেরে। আজ বুঝিয়াছি পশ্চিমি আলোতে
ছায়া ওরা। নটরূপে এসেছে নেপথ্যলোক হতে
দেহ ছদ্মসাজে; সংসারের ছায়ানাট্য অন্তহীন
সেথায় আপন পাঠ আবৃত্তি করিয়া সারাদিন
কাটাইল; সূত্রধার অদৃষ্টের আভাসে আদেশে
চালাইল নিজ নিজ পালা, কভু কেঁদে কভু হেসে
নানা ভঙ্গি নানা ভাবে। শেষে অভিনয় হলে সারা
দেহবেশ ফেলে দিয়ে নেপথ্যে অদৃশ্য হল তারা।

সারমর্ম : এ বিশ্বজগৎ যেন এক বিরাট নাট্যমঞ্চ। অনাদিকাল থেকে মানুষ সেই নাট্যমঞ্চে জীবনের সুখ-দুঃখের নানা পালা অভিনয় করে। যে যার ভূমিকা শেষ করে তারপর জীবন থেকে চিরবিদায় নেয়।



১০১ দৈন্য যদি আসে, আসুক, লজ্জা কিবা তাহে,
মাথা উঁচু রাখিস।
সুখের সাথী মুখের পানে যদি নাহি চাহে,
ধৈর্য ধরে থাকিস।
রুদ্ররূপে তীব্র দুঃখ যদি আসে নেমে
বুক ফুলিয়ে দাঁড়াস,
আকাশ যদি বজ্র নিয়ে মাথায় পড়ে ভেঙে
ঊর্ধ্বে দু'হাত বাড়াস।

সারমর্ম : জীবনের চলার পথ ঘাত-প্রতিঘাতময়। দারিদ্র্যে দিশেহারা না হলে, অসহায় পরিস্থিতিকে ধৈর্যের সঙ্গে মোকাবেলা করতে পারলে, দৃঢ় মনোবল নিয়ে দুঃখকে জয় করতে পারলে জীবনে সফল হওয়া যায়।

১০২ দ্যাখ, মানুষের কষ্ট থাকে না, হয় যদি লোক খাঁটি
সোনার ফসল ফলায় যখন পায়ের তলার মাটি।
মাটিরই যদি না এ হেন মূল্য মানুষের দাম নেই?
এই সংসারে এই সোজা কথা সব আগে বোঝা চাই।
বিশ্বপিতার মহাকারবার এই দিন দুনিয়াটা,
মানুষই তাহার মহামূলধন, কর্ম তাহার খাটা;
তাঁরি নাম নিয়ে খাটিবে যে জন, অন্ন তো তার মুখে,
বিধাতার এই সাচ্চা বাচ্চা কখনো পড়ে না দুঃখে।
তবে যে এথায় দেখিবারে পাই গরিবের দুর্গতি,
অর্থ তাহার — চেনে না সে তার শক্তির সংহতি।

সারমর্ম : এই পৃথিবীতে মাটির মতোই মানুষও বিপুল সম্ভাবনার আধার। মানুষ তার কর্মশক্তির সাহায্যে সে সব সম্ভাবনাকে সফল করে তোলে। তাতে মানুষের দুঃখ ঘোচে, দুর্দশার অবসান হয়। কিন্তু যে মানুষ পরিশ্রম করে না, কিংবা আত্মশক্তির দ্বারা পরিচালিত হয় না জীবনে তাকে দুঃখ-দুর্গতির শিকার হতে হয়।

১০৩ দেখিলাম এ কালে
আত্মঘাতি মূঢ় উন্মত্ততা, দেখিনু সর্বাঙ্গে তার
বিকৃতির কদর্য বিদ্রূপ। একদিকে স্পর্ধিত ক্রূরতা,
মত্ততার নির্লজ্জ হুংকার, অন্যদিকে ভীরুতার
দ্বিধাগ্রস্ত চরণবিক্ষেপ, বক্ষে আলিঙ্গিয়া ধরি
কৃপণের সতর্ক সম্বল—সন্ত্রস্ত প্রাণীর মতো
ক্ষণিক গর্জন-অন্তে ক্ষীণ স্বরে তখনই জানাই
নিরাপদ নীরব নম্রতা।

সারমর্ম : বর্তমান পৃথিবীটা দ্বন্দ্ব-সংঘাত ও অরাজকতায় পরিপূর্ণ। দুর্বলের উপর সবলের অত্যাচার পৃথিবীর অমোঘ সত্যে পরিণত হয়েছে। একতাবদ্ধ হয়ে অন্যায়-অত্যাচারের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়া সচেতন মানবের মাঝে দিনের পর দিন লোপ পাচ্ছে। কতিপয় মানবসেবী রূপী মানুষ এ প্রতিবাদে সোচ্চার হলেও পরক্ষণেই অত্যাচারীর স্পর্ধা ও নির্লজ্জ হুঙ্কারে তা বিলীন হতে দেখা যায়।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



১০৪
দেখিনু সেদিন রেলে,
কুলি বলে এক বাবুসাব তারে ঠেলে দিল নীচে ফেলে!
চোখ ফেটে এল জল,
এমন করে কি জগৎ জুড়িয়া মার খাবে দুর্বল?
যে দধীচিদের হাড় দিয়ে ঐ বাষ্প-শকট চলে,
বাবুসাব এসে চড়িল তাহাতে, কুলিরা পড়িল তলে!
বেতন দিয়াছ? চুপ রও যত মিথ্যাবাদীর দল!
কত পাই দিয়ে কুলিদের তুই কত ক্রোর পেলি বল!
রাজপথে তব চলিছে মোটর সাগরে জাহাজ চলে,
রেলপথে চলে বাষ্প-শকট, দেশ ছেয়ে গেল কলে,
বলো ত এসব কাহাদের দান? ...
আসিয়াছে শুভদিন
দিনে দিনে বহু বাড়িয়াছে দেনা, শুধিতে হইবে ঋণ!

সারমর্ম : মানব-সভ্যতার প্রকৃত রূপকার যারা, যাদের কঠোর শ্রমের বিনিময়ে গড়ে উঠেছে সভ্যতার ভিত, যাদের লুণ্ঠিত জীবনী শক্তির ঐশ্বর্যে সভ্যতা গতিশীল, তারা থাকে চির-বঞ্চিত, চির-উপেক্ষিত এবং চির-অপমানিত। ফলে, তাদের কাছে সভ্যতা ঋণী, যা আজ সুদে ও আসলে শোধ করার সময় এসেছে সমগ্র মানবজাতির।

১০৫
দুর্গম গিরি-কান্তার, মরু দুস্তর পারাবার,
লঙ্ঘিতে হবে রাত্রি নিশীথে, যাত্রীরা হুঁশিয়ার!
দুলিতেছে তরী, ফুলিতেছে জল, ভুলিতেছে মাঝি পথ,
ছিঁড়িয়াছে পাল, কে ধরিবে হাল, আছে কার হিম্মৎ?
কে আছ জোয়ান, হও আগুয়ান, হাঁকিছে ভবিষ্যৎ।
এ তুফান ভারী, দিতে হবে পাড়ি, নিতে হবে তরী পার।
গিরি-সংকট, ভীরু যাত্রীরা, গুরু গরজায় বাজ
পশ্চাৎ-পথ যাত্রীর মনে সন্দেহ জাগে আজ!
কাণ্ডারী! তুমি ভুলিবে কি পথ? ত্যজিবে কি পথ-মাঝ?
করে হানাহানি, তবু চল টানি, নিয়াছ যে মহাভার!

সারমর্ম : প্রবাহমান জীবনে বাধা-বিপত্তি, দ্বিধা, লজ্জা, ভয় জাতিকে পদে পদে পেছনে টানে। তাই এসব বাধা অতিক্রম করে জাতিকে সাফল্যের শিখরে পৌছাতে হলে চাই যোগ্য নেতৃত্ব। একমাত্র নির্ভীক, দৃঢ়চিত্ত নেতৃত্বই জাতিকে দিতে পারে নবজীবন; বসাতে পারে সম্মানের আসনে।



১০৬
দেখি এই চরাচরে যে যেমন কর্ম করে,
সে তেমনি ফল তার পায়,
যে চাষা আলস্য করে বীজ না বপন করে,
পক্ব শস্য পাবে সে কোথায়?
যদ্যপি শক্তি থাকে, পড়িতে দেখহ যাকে,
হাত ধরে তুলে ধর তাকে,
নতুবা তুমি যেকালে পতিত হবে সেহালে,
কে তখন তুলিবে তোমারে?
তাই যদি হয়ে ধীর, দুঃখীতের অশ্রুনীর,
নিজ করে না কর মোচন,
তব অশ্রু নিরখিয়া দুঃখী হবে কার হিয়া,
কে তাহা করিবে নিবারণ?

সারমর্ম : যে যেমন কর্ম করে, সে তেমন ফল পায়। তদ্রূপ অপরকে সাহায্য করার মাঝেই প্রতিদান দেয়ার বিষয়টি নিহিত। কেননা, সহানুভূতি ও সমবেদনাই মানুষকে পরস্পরের প্রতি সমবেদনশীল হতে অনুপ্রাণিত করে। অর্থাৎ কারো উপকার করা ব্যতীত উপকার আশা করা উচিত নয়।

১০৭
ধ
ধন্য আশা কুহকিনী! তোমার মায়ায়
অসার সংসার চক্র ঘোরে নিরবধি;
দাঁড়াইত স্থিরভাবে চলিত না, হায়
মন্ত্রবলে তুমি চক্র না ঘুরাতে যদি।
ভবিষ্যৎ অন্ধ মূঢ় মানব সকল
ঘুরিতেছে কর্মক্ষেত্রে বর্তুল-আকার;
তব ইন্দ্রজালে মুগ্ধ, পেয়ে তব বল
যুঝিছে জীবন যুদ্ধে হায় অনিবার।
নাচায় পুতুল যেবা দক্ষ বাজিকরে,
নাচাও তেমনি তুমি অর্বাচীন নরে।

সারমর্ম : জীবন-সংসারে আশাই মানুষের অদৃশ্য চালিকাশক্তি। আশা না থাকলে রুদ্ধ হতো জীবনের গতি, মানবজীবন পর্যবসিত হতো জড়তায়। আশার কুহক আছে বলেই মানুষ জীবনযুদ্ধে রত হয়, মঙ্গল ও সমৃদ্ধির আশায় জীবনের কর্মপ্রবাহে নিরন্তর এগিয়ে চলে।

১০৮
ধূপ আপনারে মিলাইতে চাহে গন্ধে,
গন্ধ সে চাহে ধূপেরে রহিতে জুড়ে।
সুর আপনারে ধরা দিতে চাহে ছন্দে
ছন্দ ফিরিয়া ছুটে যেতে চায় সুরে।
ভাব পেতে চায় রূপের মাঝারে অঙ্গ,
রূপ পেতে চায় ভাবের মাঝারে ছাড়া।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



অসীম সে চাহে সীমার নিবিড় সঙ্গ,
সীমা চায় হতে অসীমের মাঝে হারা।
প্রলয়ে সৃজনে না জানি এ কার যুক্তি
ভাব হতে রূপে অবিরাম যাওয়া-আসা।
বন্ধ ফিরিছে খুঁজিয়া আপন মুক্তি,
মুক্তি মাগিছে বাঁধনের মাঝে বাসা।

**সারমর্ম :** সুর-ছন্দ, সীমা-অসীম, সৃষ্টি-ধ্বংস, মুক্তি-বাঁধন প্রভৃতি সব শক্তিই পাশাপাশি অবস্থিত; যেন সবকিছুতেই দুই ভিন্নমুখী শক্তির প্রভাব লক্ষণীয়। অথচ এই পরস্পরবিরোধী শক্তির যথার্থ সম্মিলনের মধ্যে অস্তিত্বের সার্থকতা নিহিত।

১০৯

ধান করো, ধান হবে, ধুলোর সংসারে এ মাটি
তাতে যেমন ইচ্ছে খাঁটি
বসে যদি থাক তবু আগাছায় ধরে কিছু ফল
হলদে নীল তারি মধ্যে, রুক্ষ মাটি তবু নয় ভুল,
ভুল থেকে সরে সরে অন্য কোনো নিয়মের চলা
কিছু না কিছুর খেলা, থেমে নেই হওয়ার শৃঙ্খলা,
সৃষ্টি মাটি এত মত।
তাইতো আরও বেশি ভাবি,
ফলাব না কেন তবে আশ্চর্যের জীবনীর দাবী।

**সারমর্ম :** শ্রম ছাড়া কোনোকিছুই অর্জন করা সম্ভব নয়। মাটিতে যতবেশি শ্রম দেয়া যায় তার কাছ থেকে ততবেশি ফসল লাভ করা যায়। কেননা স্বাভাবিক নিয়মে শ্রমের বিনিময়ে কিছু দান করাই মাটির ধর্ম। তাই মাটির কাছে মানুষ অনেক কিছু প্রত্যাশা করে।

১১০

ন

নদী আর কালগতি একই সমান;
অস্থির প্রবাহে করে উভয়ে প্রয়াণ।
ধীরে ধীরে নীরব গমনে গত হয়;
কিবা ধনে, কি স্তবনে ক্ষণেক না রয়।
উভয়েই গত হলে আর নাহি ফিরে,
দুস্তর সাগর শেষে গ্রাসে উভয়েরে।
বিফলে বহে না নদী যথা নদী ভরা,
নানা শস্য শিরোরত্নে হাস্যময়ী ধরা।
কিন্তু কাল, সদাত্মা ক্ষেত্রে শোভাকর,
উপেক্ষায় রেখে যায় মরু ঘোরতর।

**সারমর্ম :** মহাকালের গতি নদীর স্রোতের মতোই নিরন্তর প্রবহমান। এদের গতি রোধ করা যায় না, একবার চলে গেলে এদের ফিরিয়ে আনাও যায় না। চলার পথে নদী দিয়ে যায় শস্য সম্ভার, আর মহৎ কাজের জন্য মহাকাল মানুষকে দেয় পুরস্কার। কিন্তু সময়কে উপযুক্তভাবে কাজে লাগাতে না পারলে মানব জীবনে নেমে আসে মরুশূন্যতা।



১১১

নদী তীরে মাটি কাটে সাজাইতে পাঁজা
পশ্চিমি মজুর। তাহাদেরই ছোট মেয়ে
ঘাটে করে আনাগোনা; কত ঘষা মাজা
ঘটি বাটি থালা লয়ে। আসে ধেয়ে ধেয়ে
দিবসে শতেক বার, পিত্তল-কঙ্কণ
পিতলের থালি-পরে বাজে ঠন্ ঠন্;
বড়ো ব্যস্ত সারাদিন। তারি ছোট ভাই,
নেড়ামাথা, কাদামাখা, গায়ে বস্ত্র নাই,
পোষা প্রাণীটির মতো পিছে পিছে এসে
বসি থাকে উচ্চ পাড়ে দিদির আদেশে,
স্থিরধৈর্যভরে। ভরা ঘট লয়ে মাথে,
বামকক্ষে থালি, যায় বালা ডান হাতে
ধরি শিশু কর — জননীর প্রতিনিধি
কর্মভারে-অবনত অতি-ছোট দিদি।

**সারমর্ম :** মজুর-কন্যাকে কৈশোরেই কাঁধে তুলে নিতে হয় সংসারের কিছু দায়-দায়িত্ব। সেই কর্মব্যস্ততার মধ্যে ছোট ভাইটির প্রতি তার স্নেহকোমল যত্নশীলতার অভাব ঘটে না। এভাবে দারিদ্র্যপীড়িত মেহনতি মানুষের জীবনে অল্পবয়স্কা কিশোরীও প্রতিষ্ঠিত হয় পরিপক্ব গৃহিণীর আসনে। তার মধ্যে একই সঙ্গে ছায়াপাত ঘটে চিরায়ত মাতৃত্বের।

১১২

নানা দুঃখে চিত্তের বিক্ষেপে
যাহাদের জীবনের ভিত্তি যায় বারবার কেঁপে,
যারা অন্যমনা, তারা শোনো
আপনারে ভুলো না কখনো।
মৃত্যুঞ্জয় যাহাদের প্রাণ,
সর্ব তুচ্ছতার উর্ধ্বে দীপ যারা জ্বালে অনির্বাণ,
তাহাদের মাঝে যেন হয়
তোমাদেরি নিত্য পরিচয়।
তাহাদের খর্ব কর যদি
খর্বতার অপমানে বন্দী হয়ে রবে নিরবধি।
তাদের সম্মানে মান নিয়ো
বিশ্বে যাঁরা চিরস্মরণীয়।

**সারমর্ম :** যাঁরা কেবল সুখবিলাসী তাঁরা জীবনের মর্মসত্য উপলব্ধি করতে না পেরে দুঃখের দিনে হতাশায় ভেঙে পড়েন। কিন্তু যাঁরা জীবনসংগ্রামী তাঁরা দৃঢ় মনোবলে সব দুঃখ ও আঘাত জয় করেই স্মরণীয়-বরণীয় হন। তাঁদের জীবনাদর্শই সংকট উত্তরণের পাথেয় হওয়া উচিত।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



১১৩
নিন্দুকেরে বাসি আমি সবার চেয়ে ভালো,
যুগ জনমের বন্ধু আমার আঁধার ঘরের আলো।
সবাই মোরে ছাড়তে পারে বন্ধু যারা আছে,
নিন্দুক সে ছায়ার মতো থাকবে পাছে পাছে।
বিশ্বজনে নিঃস্ব করে পবিত্রতা আনে,
সাধকজনে বিস্তারিত তার মত কে জানে?
বিনা মূল্যে ময়লা ধুয়ে করে পরিষ্কার,
বিশ্বমাঝে এমন দয়াল মিলবে কোথা আর?
নিন্দুক সে বেঁচে থাকুক বিশ্বহিতের তরে,
আমার আশা পূর্ণ হবে তাহার কৃপাভরে।

সারমর্ম : নিন্দুকের সমালোচনার মাধ্যমে আমরা নিজেদের ত্রুটি ও সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে অবগত হই। ব্যক্তি ও সমাজের পরোক্ষ কল্যাণ সাধনে নিন্দুকের এ বিশেষ ভূমিকা অনস্বীকার্য।

১১৪
নাগিনীরা চারিদিকে ফেলিতেছে বিষাক্ত নিঃশ্বাস,
শান্তির ললিত বাণী শোনাইবে ব্যর্থ পরিহাস—
বিদায় নেবার আগে তাই
ডাক দিয়ে যাই
দানবের সাথে যারা সংগ্রামের তরে
প্রস্তুত হতেছে ঘরে ঘরে।

সারমর্ম : বিশ্বের যুদ্ধবাজরা যেমন তাদের উদ্দেশ্য চরিতার্থতার জন্য রচনা করে শান্তিকামী মানুষের বিস্তীর্ণ শ্মশান-শয্যা। তেমনি শান্তির পূজারী, বিশ্বশান্তির মহান সাধকদের শান্তি-স্থাপনের সকল প্রয়াস বারে বারে হয় উপহাসিত। কিন্তু এমন এক সময় আসে যখন চলে আর-এক যুদ্ধের প্রস্তুতি, যে যুদ্ধ বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় মানবতার শত্রুদের মানবজাতির সংঘবদ্ধ যুদ্ধ।

১১৫
নমি আমি প্রতিজনে, আদ্বিজ-চণ্ডাল,
প্রভু, ক্রীতদাস!
সিন্ধুমূলে জলবিন্দু, বিশ্বমূলে অণু;
সমগ্রে প্রকাশ।
নমি কৃষি-তন্তুজীবী, স্থপতি, তক্ষক,
কর্ম, চর্মকার!
অদ্রিতলে শিলাখণ্ড-দৃষ্টি অগোচরে,
বহ অদ্রি-ভার!
কত রাজ্য, কত রাজা গড়িছ নীরবে
হে পূজ্য, হে প্রিয়!
একত্বে বরেণ্য তুমি, শরণ্য এককে,—
আত্মার আত্মীয়।



সারমর্ম : এ পৃথিবীতে সভ্যতা বিকাশে ছোট-বড় সকল শ্রেণীর মানুষের অবদান রয়েছে। সুতরাং সকলেই এখানে সম্মান পাওয়ার যোগ্য। তাই ভেদাভেদ ভুলে সকলের অবদানের কথা কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করা সকলেরই উচিত।

১১৬
নর কহে, "ধূলিকণা, তোর জন্ম মিছে,
চিরকাল পড়ে রলি চরণের নীচে।"
ধূলিকণা কহে, "ভাই, কেন কর ঘৃণা,
তোমার দেহের আমি পরিণাম কিনা?"
মেঘ বলে, "সিন্ধু তব জনম বিফল
পিপাসায় দিতে নার এক বিন্দু জল।"
সিন্ধু কহে, "পিতৃনিন্দা কর কোন্ মুখে
তুমিও অপেয় হবে পড়িলে এ বুকে।"

সারমর্ম : উপকারীকে সামান্য ছুতো পেলেই নিন্দা করা অকৃতজ্ঞের স্বভাব। নিজের উৎস এবং বিকাশের জন্য যার ওপর পুরোপুরি নির্ভরশীল তাকে যেন সে কোনোক্রমেই স্বীকার করতে পারে না।

১১৭
নদী তীরে মাটি কাটে সাজাইতে পাঁজা
পশ্চিমী মজুর। তাহাদেরি ছোট মেয়ে
ঘাটে করে আনাগোনা, কত ঘষামাজা।
ঘটি বাঁটি থালা লয়ে আসে ধেয়ে ধেয়ে।
দিবসে শতেক বার পিতল কঙ্কণ
পিতলের থালি পড়ে বাজে ঠন ঠন।
বড় ব্যস্ত সারাদিন। তারি ছোট ভাই,
নেড়ামাথা, কাদামাখা, গায়ে বস্ত্র নাই,
পোষা পাখিটির মতো পিছে পিছে এসে
বসি থাকে উচ্চ পাড়ে দিদির আদেশে,
স্থির ধৈর্যভরে। ভরা ঘট লয়ে সাথে,
বাম কক্ষে থালি, যায় বালা ডানহাতে
ধরি শিশু কর। জননীর প্রতিনিধি,
কর্মভারে অবনত অতি ছোট দিদি।

সারমর্ম : বড়দের অনুকরণ করেই ছোটদের আচরণ গড়ে ওঠে। ফলে তাদের অনেক কাজের মধ্য দিয়ে বড়দের বৈশিষ্ট্যের প্রতিফলন ঘটে। তদ্রূপ দরিদ্র মায়ের কাজের বৈশিষ্ট্য প্রতিফলিত হয়েছে পশ্চিমা মজুরের মেয়েটির ক্রিয়াকর্মে।

১১৮
নিখিলের এত শোভা, এত রূপ, এত হাসি গান
ছাড়িয়া মরিতে মোর কভু নাহি চাহে মন-প্রাণ।
এ বিশ্বের সব আমি প্রাণ দিয়ে বাসিয়াছি ভাল—
আকাশ, বাতাস, জল, রবি, শশী, তারকার আলো।
সকলেরই সাথে মোর হ'য়ে গেছে বহু জানা-শোনা,

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



কত কি–যে মাখামাখি, কত কি–যে মায়ামন্ত্র বোনা।
বাতাস আমাদের ঘিরে খেলা করে মোর চারিপাশ,
অনন্তের কত কথা কহে নিতি নীলিম আকাশ।
চাঁদের মধুর হাসি বিশ্বমুখে পুলক চুম্বন,
মিটি মিটি চেয়ে থাকা তারকার করুণ নয়ন,
বসন্ত নিদাঘ শোভা, বিকশিত কুসুমের হাসি,
দিকে দিকে শুধু গান, শুধু প্রেম ভালবাসা–বাসি।

সারমর্ম : পৃথিবীর আকাশ, বাতাস, জল, স্থল, নক্ষত্র, অনল, অনীল সবকিছুর সাথে মানবপ্রেমের এক নিগূঢ় সম্পর্ক বিদ্যমান। কাজেই মানবের এই অকৃত্রিম প্রেম প্রকৃতির নানা অভিব্যক্তির মধ্যে প্রত্যক্ষ করা যায়। মানবজীবন আনন্দময় বলেই নিখিল বিশ্ব গানে, প্রেমে ও আনন্দে আনন্দময়।

১১৯

নির্বোধ যারা দুর্বোধ যারা, পল্লীপারে,
অক্ষম যার ভাষা;
আদি শতাব্দী ধরিয়া যাদের উন্য বাড়ে।
চির নাবালক চাষা
হালের কলকে লক্ষ্মী-উঠবে, করিয়া দান
লক্ষ্মী মানের ঘরে,
দুর্ভিক্ষের ভিক্ষার ঝুলি—ভরিয়া প্রাণ
দেখ যারা নিজ করে,
বেতসের মত সভ্য শিক্ষা শেখেনি যারা
হাওয়ার নেশায় মাতি
বটের মতন খোলা মাঠে আজও রয়েছে যারা
তারা মানুষেরই জাতি।

সারমর্ম : চির দরিদ্র, বুদ্ধিহীন, সহজ সরল ও অপরিণত মনের পল্লীর চাষিরা শতকের পর শতক ধরে নিজেদের পরিশ্রমের ফসল ধনীর ধনভাণ্ডার পূর্ণ করতে গিয়ে হচ্ছে নিঃস্ব, সর্বস্বান্ত। অথচ এরাও যে মানুষ —এ অনুভূতি সবার মাঝে থাকা বাঞ্ছনীয়।

১২০

নমি তোমা নরদেব! কি গর্বে গৌরবে
দাঁড়িয়েছ তুমি!
সর্বাঙ্গে প্রভাতরশ্মি, শিরে চূর্ণ মেঘ,
পদে শষ্পভূমি।
পশ্চাতে মন্দির-শ্রেণী, সুবর্ণ, কলস,
ঝলসে কিরণে;
কলকণ্ঠ-সমুত্থিত নবীন উদ্‌গীথ
গগনে পবনে
হৃদয়-স্পন্দন সনে ঘুরিছে জগৎ
চলিছে সময়;
ভ্রূভঙ্গে—ফিরিছ সঙ্গে— ক্রমব্যতিক্রম
উদয়-বিলয়।

সারমর্ম : শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনসাপেক্ষ। মেধা-মনন, দক্ষতা-যোগ্যতা এবং সামগ্রিক কর্মপ্রচেষ্টায় মানুষ অর্জন করেছে সেই শ্রেষ্ঠত্বের আসন। বিবেক বোধের উন্মেষে মানবিক গুণাবলি বিকাশের ক্ষেত্রেও মানুষ প্রাণিজগতে সর্বশ্রেষ্ঠ।



১২১

নদী কভু পান নাহি করে নিজ জল,
তরুগণ নাহি খায় নিজ নিজ ফল।
গাভী কভু নাহি করে নিজ দুগ্ধ পান,
কাষ্ঠ দগ্ধ হয়ে করে পরে অন্ন দান।
স্বর্ণ করে নিজ রূপে অপরে শোভিত,
বংশী করে নিজ সুরে অপরে মোহিত।
শস্য জন্মাইয়া নাহি খায় জলধরে
সাধুর ঐশ্বর্য শুধু পরহিত তরে।

সারমর্ম : নদী, তরু, গাভী, কাষ্ঠ, স্বর্ণ, বাঁশি, মেঘ এরা কেউ আপন ফল ভোগে প্রত্যাশী নয়, অপরের মঙ্গলসাধন ও সন্তুষ্ট করাই এদের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য। তদ্রূপ সাধু ও সজ্জনেরাও নিঃস্বার্থভাবে সর্বদা পরের মঙ্গলের জন্য আত্মোৎসর্গ করে গেছেন। বস্তুত আত্মত্যাগেই প্রকৃত মহত্ত্ব।

১২২

প

পরের মুখে শেখা বুলি পাখির মত কেন বলিস?
পরের ভঙ্গি নকল করে নটের মতো কেন চলিস?
তোর নিজস্ব সর্বাঙ্গে তোর দিলেন বিধাতা আপন হাতে,
মুছে সেটুকু বাজে হলি, গৌরব কি বাড়ল তাতে?
আপনারে যে ভেঙে চুরে গড়তে চায় পরের ছাঁচে,
অলীক, ফাঁকি, মেকি সে জন, নামটা তার কদিন বাঁচে?
পরের চুরি ছেড়ে দিয়ে আপন মাঝে ডুবে যারে,
খাঁটি ধন যা সেথায় পাবি, আর কোথাও পাবি নারে।

সারমর্ম : অন্ধ পরাণুকরণ প্রবণতা মানুষের জন্যে ক্ষতিকর। কারণ, তাতে তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলির সৃজনশীল বিকাশের সম্ভাবনা নষ্ট হয়ে যায়। বস্তুত আপন প্রতিভা ও ক্ষমতার প্রকাশ ও বিকাশের মাধ্যমেই মানুষ সত্যিকারের গৌরব ও মর্যাদা অর্জন করতে পারে।

১২৩

পরের কারণে স্বার্থ দিয়া বলি
এ জীবন মন সকলি দাও,
তার মতো সুখ কোথাও কি আছে?
আপনার কথা ভুলিয়া যাও।
পরের কারণে মরণেও সুখ,
'সুখ-সুখ' করি কেঁদো না আর;
যতই কাঁদিবে যতই ভাবিবে,
ততই বাড়িবে হৃদয়-ভার।
আপনারে লয়ে বিব্রত রহিতে
আসে নাই কেহ অবনী পরে
সকলের তরে সকলে আমরা
প্রত্যেকে আমরা পরের তরে।

সারমর্ম : আত্মস্বার্থে মগ্ন হয়ে সুখের অন্বেষণ করলে সুখের সন্ধান মেলে না। ব্যক্তিগত দুঃখ সন্তাপে হা-হুতাশ না করে বরং পরের কল্যাণে জীবন উৎসর্গ করলে প্রকৃত সুখ মেলে। কারণ, মানব জীবন ব্যক্তিস্বার্থকেন্দ্রিক নয়; একে অন্যের কল্যাণে ব্রতী হওয়াই মনুষ্যত্বের বৈশিষ্ট্য।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



১২৪

পুণ্যে-পাপে দুঃখে-সুখে পতনে-উত্থানে,
মানুষ হইতে দাও তোমার সন্তানে।
হে স্নেহার্ত বঙ্গভূমি, তব গৃহ ক্রোড়ে,
চিরশিশু করে আর রাখিয়ো না ধরে।
দেশ দেশান্তর-মাঝে যার যেথা স্থান,
খুঁজিয়া লইতে দাও করিয়া সন্ধান।
পদে পদে ছোটো ছোটো নিষেধের ডোরে,
বেঁধে বেঁধে রাখিয়ো না ভাল ছেলে করে।
প্রাণ দিয়ে, দুঃখ স'য়ে, আপনার হাতে
সংগ্রাম করিতে দাও ভালোমন্দ সাথে।

সারমর্ম : মাতৃক্রোড়ে স্নেহবন্দী বাঙালি স্বদেশের সীমিত পরিসরে সমাজ ও ধর্মের নানা বিধিনিষেধের বেড়াজালে আবদ্ধ। ফলে মুক্তপ্রাণের বিকাশ ব্যাহত। কঠিন জীবন সংগ্রামের মাধ্যমে বাঙালিকে যথার্থ মানুষ হতে হলে বিশ্বের বিপুল কর্মোদ্যোগের স্রোতধারায় যুক্ত হতে হবে। তাহলেই চিন্তা ও কর্মের প্রসারিত চেতনায় জাতি হবে সমৃদ্ধ।

১২৫

পৃথিবীতে কত দ্বন্দ্ব, কত সর্বনাশ,
নূতন নূতন কত গড়ে ইতিহাস॥
রক্তপ্রবাহের মাঝে ফেনাইয়া উঠে,
সোনার মুকুট কত ফুটে আর টুটে!
সভ্যতার নব নব কত তৃষ্ণা ক্ষুধা॥
উঠে কত হলাহল, উঠে কত সুধা!
শুধু হেথা দুই তীরে, কেবা জানে নাম,
দোঁহা-পানে চেয়ে আছে দুইখানি গ্রাম।
এই খেয়া চিরদিন চলে নদী স্রোতে॥
কেহ যায় ঘরে, কেহ আসে ঘর হতে।

সারমর্ম : পৃথিবীতে প্রত্যহ নানা দ্বন্দ্ব-সংঘাত ঘটছে এবং নতুন ইতিহাসের সৃষ্টি হচ্ছে। কিন্তু এসব সংঘাত ও ধ্বংসের মাঝেও সভ্যতার স্রোত তার নিজস্ব গতিতে চলছে। সভ্যতার ফলে আমরা যেমন উপকৃত হচ্ছি তেমনি আবার দূষিতও করছি পৃথিবীকে। তারপরও সময়ের বিবর্তনে পুরাতন সভ্যতা বিলীন হচ্ছে নতুন সভ্যতা গড়ে উঠছে।

১২৬

প্রথম দিনের সূর্য
প্রশ্ন করেছিল
সত্তার নূতন আবির্ভাবে
কে তুমি–
মেলেনি উত্তর।
বৎসর বৎসর চলে গেল,



দিবসের শেষ সূর্য
শেষ প্রশ্ন উচ্চারিল পশ্চিম সাগর তীরে,
নিস্তব্ধ সন্ধ্যায়,
কে তুমি–
পেলনা উত্তর।

সারমর্ম : মানবজীবনের উৎস থেকে অন্ত পর্যন্ত নানা দুর্জ্ঞেয় রহস্যময় প্রশ্নে ঘেরা। যেন সব দার্শনিক মহাজিজ্ঞাসা, যার উত্তর এখনও অজ্ঞাত।

১২৭

পাহাড়, ওগো পাহাড়, তোমার বুকের নীড়ে,
বৃথাই তুমি চাইছো মোরে রাখতে ঘিরে।
বাইরে যেজন বেরিয়েছে সে ফিরবে না'ক,
অচল তুমি পথচলা সুখ পাওনিক, তাই দাঁড়িয়ে থাক।
সৃষ্টি করার আনন্দ কি বিপুল তার—
উষর মাটি শস্যে ভরা।
অরণ্য-গো, অরণ্য, হায় ডাকছো মোরে
লক্ষ শাখার ব্যাকুল বাহু প্রসারি বুকে,
মর্মরিয়া দীন মিনতি গুঞ্জরিছে অবোল মুখে।
আমার সময় নেইক তোমার দেহ
রাঙিয়ে গেলাম সবুজ স্নেহে।

সারমর্ম : দূর দিগন্তের পানে ছুটে চলাই প্রাণের ধর্ম। পর্বতের জড়তা সে গতিতে রুখতে পারে না। অরণ্যের সবুজ গাছপালা মুক্তি কামনায় যেমন চির মর্মর, উর্বর ভূমি শস্য জন্মিয়ে যেমন সৃষ্টির আনন্দ উপভোগ করে, তেমনি সবকিছু দেখে, উপভোগ করে সামনে চলাই সবার কাম্য হওয়া উচিত।

১২৮

ফুটিয়াছে সরোবরে; কমল নিকর,
ধরিয়াছে কি আশ্চর্য শোভা মনোহর।
গুণ গুণ গুণ রবে কত মধুকরে,
কেমন পুলকে তারা মধুপান করে,
কিন্তু এরা হারাইবে এ দিন যখন;
আসিবে কি অলি আর করিতে গুঞ্জন?
আশায় বঞ্চিত হলে আসিবে না আর,
আর না করিবে এই মধুর ঝংকার;
সুসময়ে অনেকেই বন্ধু বটে হয়,
অসময়ে হায় হায় কেহ কারো নয়।
কেবল ঈশ্বর এই বিশ্বপতি যিনি,
সকল সময়ের বন্ধু সকলের তিনি।

সারমর্ম : সুসময় ও দুঃসময় পর্যায়ক্রমে আসলেও উভয় সময়ে বন্ধুর উপস্থিতি সমান থাকে না। সুদিনে বন্ধুরা চারদিকে ঘিরে থাকলেও দুঃসময়ে কারো আর দেখা পাওয়া যায় না। কিন্তু বিশ্ববিধাতাই সকলের একমাত্র বন্ধু যিনি কাউকে কখনোই পরিত্যাগ করেন না।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



# ব

১২৯

বসুমতী, কেন তুমি এতই কৃপণা?
কত খোঁড়াখুঁড়ি করি পাই শস্য কণা।
দিতে যদি হয় দে মা, প্রসন্ন সহাস—
কেন এ মাথার ঘাম পায়েতে বহাস?
বিনা চাষে শস্য দিলে কী তাহাতে ক্ষতি?
শুনিয়া ঈষৎ হাসি কন বসুমতী,
আমার গৌরব তাতে সামান্যই বাড়ে;
তোমার গৌরব তাহে একেবারে ছাড়ে।

সারমর্ম : পৃথিবী শ্রমবিমুখ মানুষকে কিছুই দেয় না। এ জগতে সাফল্যের গৌরব আসে সুকঠিন শ্রম ও কর্মসাধনার মধ্য দিয়ে। অলস মাত্রকেই পরমুখাপেক্ষী হতে হয়। তাতে না বাড়ে মর্যাদা, না বাড়ে গৌরব। পক্ষান্তরে পরিশ্রম ও সৃষ্টিশীলতা মানুষের গৌরব ও মর্যাদা বাড়ায়।

১৩০

বহু দিন ধ'রে বহু ক্রোশ দূরে
বহু ব্যয় করি বহু দেশ ঘুরে
দেখিতে গিয়েছি পর্বতমালা,
দেখিতে গিয়েছি সিন্ধু।
দেখা হয় নাই চক্ষু মেলিয়া
ঘর হতে শুধু দুই পা ফেলিয়া
একটি ধানের শিষের উপরে
একটি শিশির বিন্দু—

সারমর্ম : প্রচুর অর্থ ও সময় ব্যয় করে এবং যথেষ্ট কষ্ট স্বীকার করে মানুষ দূর-দুরান্তের সৌন্দর্য দেখতে ছুটে যায়। কিন্তু ঘরের কাছে অনির্বচনীয় সৌন্দর্যটুকু দেখা হয় না বলে সে দেখা পূর্ণতা পায় না।

১৩১

বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি, তাই আমি পৃথিবীর রূপ
খুঁজিতে যাই না আর : অন্ধকারে জেগে উঠে ডুমুরের গাছে
চেয়ে দেখি ছাতার মতন বড় পাতাটির নিচে বসে আছে
ভোরের দয়েল পাখি— চারি দিকে চেয়ে দেখি পল্লবের স্তূপ
জাম-বট-কাঁঠালের- হিজলের-অশ্বত্থের করে আছে চুপ;
ফণীমনসার ঝোপে শটিবনে তাহাদের ছায়া পড়িয়াছে;
মধুকর ডিঙ্গা থেকে না জানি সে কবে চাঁদ চম্পার কাছে
এমনই হিজল-বট-তমালের নীল ছায়া বাংলার অপরূপ রূপ
দেখেছিল; বেহুলাও একদিন গাঙুড়ের জলে ভেলা নিয়ে—
কৃষ্ণা-দ্বাদশীর জ্যোৎস্না যখন মরিয়া আছে নদীর চড়ায়—
সোনালি ধানের পাশে অসংখ্য অশ্বত্থ বট দেখেছিল, হায়,
শ্যামার নরম গান শুনেছিল, — একদিন অমরায় গিয়ে
ছিন্ন খঞ্জনার মতো যখন সে নেচেছিল ইন্দ্রের সভায়
বাংলার নদী মাঠ ভাঁটফুল ঘুঙুরের মতো তার কেঁদেছিল পায়।



সারমর্ম : বাংলাদেশের নিসর্গ শোভার রয়েছে এক মায়াবি আকর্ষণ। বর্তমানের রূপ মাধুর্যের সঙ্গে তাতে মিশে রয়েছে অতীত স্মৃতির অনেক হৃদয়-ছোঁয়া অনুষঙ্গ। বাংলার ছায়াচ্ছন্ন বৃক্ষশোভা দেখে একদা মুগ্ধ হয়েছিলেন চাঁদ সদাগর। বাংলার প্রকৃতি মুগ্ধ করেছিল বেদনা ভারাতুর বেহুলাকেও। এমনি কত স্মৃতিময় অনুষঙ্গ মিশে আছে বাংলার প্রকৃতিতে। এই অজস্র স্মৃতিময় অপরূপ সৌন্দর্যের সঙ্গে যার পরিচয় আছে, তাঁর চোখে পৃথিবীর অন্যসব রূপের আকর্ষণ গৌণ হয়ে পড়ে।

১৩২

বিপদে মোরে রক্ষা করো, এ নহে মোর প্রার্থনা—
বিপদে আমি না যেন করি ভয়।
দুঃখতাপে-ব্যথিত চিতে নাই-বা দিলে সান্ত্বনা,
দুঃখ যেন করিতে পারি জয়।
সহায় মোর না যদি জুটে নিজের বল না যেন টুটে—
সংসারেতে ঘটিলে ক্ষতি, লভিলে শুধু বঞ্চনা,
নিজের মনে না যেন মানি ক্ষয়—
আমারে তুমি করিবে ত্রাণ, এ নহে মোর প্রার্থনা—
তরিতে পারি শকতি যেন রয়।
আমার ভার লাঘব করি নাই-বা দিলে সান্ত্বনা,
বহিতে পারি এমনি যেন হয়।

সারমর্ম : প্রতিকূল পরিস্থিতি মোকাবেলায় মানুষের প্রধান সহায় মানসিক দৃঢ়তা। অন্যের করুণা বা অনুগ্রহের ওপর নয় আত্মশক্তি ও সংগ্রামী চেতনার বলেই মানুষ জীবনে দুঃখ-কষ্ট, ক্ষয়-ক্ষতি, বিপদ-বঞ্চনা মোকাবেলা করতে পারে। জীবনে প্রতিষ্ঠিত হতে হলে মানুষের চাই প্রচণ্ড আত্মশক্তি।

১৩৩

বিপুলা এ পৃথিবীর কতটুকু জানি!
দেশে দেশে কত-না নগর রাজধানী—
মানুষের কত কীর্তি, কত নদী গিরি সিন্ধু মরু,
কত-না অজানা জীব, কত-না অপরিচিত তরু
রয়ে গেল অগোচরে। বিশাল বিশ্বের আয়োজন;
মন মোর জুড়ে থাকে অতিক্ষুদ্র তারি এক কোণ।
সেই ক্ষোভে পড়ি গ্রন্থ ভ্রমণবৃত্তান্ত আছে যাহে
অক্ষয় উৎসাহে—
যেথা পাই চিত্রময়ী বর্ণনার বাণী
কুড়াইয়া আনি।
জ্ঞানের দীনতা এই আপনার মনে
পূরণ করিয়া লই যত পারি ভিক্ষালব্ধ ধনে—

সারমর্ম : বিশ্বের বিপুল জীবন-প্রবাহের এক ক্ষুদ্র অংশীদার মানুষ। আর কালের নিরবধি বিস্তারের তুলনায় খুবই সংক্ষিপ্ত মানুষের জীবন। তাই বিশাল বিশ্বের ব্যাপক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে পরিচিত হওয়া একক মানুষের পক্ষে দুঃসাধ্য। প্রত্যক্ষ জ্ঞান ও বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জনে মানুষের এই যে সীমাবদ্ধতা তা দূর করার উপায় বই পড়া। এভাবেই অন্যের অভিজ্ঞতার সম্পদে মানুষ হয়ে ওঠে সমৃদ্ধ।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



১৩৪

বিশ্বজোড়া পাঠশালা মোর সবার আমি ছাত্র
নানাভাবে নতুন জিনিস শিখছি দিবারাত্র।
এই পৃথিবীর বিরাট খাতায়
পাঠ্য যে সব পাতায় পাতায়
শিখছি সে সব কৌতূহলে সন্দেহ নাই মাত্র।

**সারমর্ম :** মানুষের জীবনে বিশ্ব এক বিরাট শিক্ষাঙ্গন। যুগ যুগ ধরে বিশ্বের এই মহাপাঠশালা থেকেই মানুষ অর্জন করেছে অন্বেষা ও অভিজ্ঞতালব্ধ বিপুল জ্ঞান। তার উপর ভিত্তি করেই বিকশিত হচ্ছে মানব সভ্যতা ও সংস্কৃতি।

১৩৫

বৈরাগ্যসাধনে মুক্তি, সে আমার নয়—
অসংখ্য বন্ধন-মাঝে মহানন্দময়
লভিব মুক্তির স্বাদ। এই বসুধার
মৃত্তিকার পাত্রখানি ভরি বারংবার
তোমার অমৃত ঢালি দিবে অবিরত
নানা বর্ণগন্ধময়। প্রদীপের মতো
সমস্ত সংসার মোর লক্ষ বর্তিকায়
জ্বালায়ে তুলিবে আলো তোমারি শিখায়
তোমারি মন্দির মাঝে—

**সারমর্ম :** জগৎ ও জীবনকে যারা ঈশ্বর-সাধনার অন্তরায় মনে করেন তারা খেয়াল করেন না যে, বিশ্বপ্রকৃতি ও মানব জীবনের মধ্যেই রয়েছে স্রষ্টার সমস্ত মহিমার প্রকাশ। তাই সংসারের সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনার মধ্যে থেকেই স্রষ্টার প্রেমে লীন হয়ে মানুষ মুক্তির সন্ধান পেতে পারে।

১৩৬

বাড়ছে দাম
অবিরাম
চালের ডালের তেলের নুনের
হাঁড়ির বাড়ির গাড়ির চুনের।
আলু মাঙ্গা বালু মাঙ্গা,
কাপড় কিনতে লাগে দাঙ্গা,
উঠছে বাজার হু-হু করে সব কিছুর—
অভাব শুধু নাই মানুষের—
চাই কত মণ, চাই কত সের,
আণ্ডা চাও বাচ্চা চাও
জোয়ান বুড়ো—আসল ফাও
চাহিদা নাই মানুষগুলোর।
কেবলি তার পড়ছে বাজার।

**সারমর্ম :** আমাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় অপরিহার্য সামগ্রীসহ সব ধরনের পণ্যের মূল্য যেমন বাড়ছে, তেমনই বাড়ছে দুঃখ ও ভোগান্তি। কিন্তু যে মানুষের জন্য এতকিছু সে মানুষই সমাজে ক্রমে মূল্যহীন হয়ে পড়ছে।



১৩৭

বন্দরে বসে যাত্রীরা দিন গোনে,
বুঝি মৌসুমী হাওয়ায় মোদের জাহাজের ধ্বনি শোনে,
বুঝি কুয়াশায়, জোছনা-মায়ায় জাহাজের পাল দেখে।
আহা, পেরেশান মুসাফির দল
দরিয়া কিনারে জাগে তকদিরে
নিরাশার ছবি এঁকে!

**সারমর্ম :** বাস্তব জীবনে মানুষ যখন দুঃখ-দুর্দশায় জর্জরিত হয়ে অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে তখন তারা মুক্তির জন্য উদ্বেল হয়। কিন্তু নেতৃত্বের দুর্বলতার কারণে তাদের মুক্তির দিশা মেলে না। ফলে তারা নিজেদের ভাগ্য মেনে নিতে বাধ্য হয়।

১৩৮

বহু মিশ্র প্রাণের সংসারে
সেই বাংলাদেশে ছিল সহস্রের একটি কাহিনী
কারানে পুরানো শিল্পে, পালা-পার্বণের ঢাকে ঢোলে
আউল বাউল নাচে; পুণ্যাহারে সানাই রঞ্জিত
রোদ্দুরে আকাশ তলে দেখ কারা হাটে যায়, মাঝি
পাল তোলে, তাঁতি বোনে, খড়ে-ছাওয়া ঘরের আঙনে
মাঠে ঘাটে শ্রমসঙ্গী নানা জাতি ধর্মের বসতি
চিরদিন বাংলাদেশ।

**সারমর্ম :** বাংলাদেশের রয়েছে বহুদিনের পুরানো নিজস্ব ঐতিহ্য, নানা ধর্ম ও বর্ণের সমাহারে গঠিত এক অপূর্ব সংস্কৃতি। নানা পেশার শ্রমজীবীদের মহামিলনে সে ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি অজও ও বহমান।

১৩৯

বনের পাখি বলে, "আকাশ ঘন নীল,
কোথাও বাধা নাই তার।"
খাঁচার পাখি বলে, "খাঁচাটি পরিপাটি,
কেমন ঢাকা চারি ধার।"
বনের পাখি বলে, "আপনা ছাড়ি দাও
মেঘের মাঝে একেবারে।"
খাঁচার পাখি বলে, "নিরালা সুখ কোনে
বাঁধিয়া রাখো আপনারে।"
বনের পাখি বলে, "না,
সেথা কোথায় উড়িবার পাই।"
খাঁচার পাখি বলে, "হায়,
মোর কোথায় বসিবার ঠাঁই।"

**সারমর্ম :** স্বাধীনতায় আত্মনির্ভরতার সুখ, এবং পরাধীনতার কাছে পরনির্ভরতার বেদনা নিহিত। তাই পরাধীনতার শৃঙ্খলে বন্দি হওয়া নয়, স্বাধীন ও মুক্ত জীবনের প্রত্যাশাই করে সবাই।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



১৪০

বসন্ত এসেছে বনে, ফুল ওঠে ফুটি
দিন-রাত্রি গাহে পিক, নাহি তার ছুটি
কাক বলে, 'অন্য কাজ নাহি পেলে খুঁজি—
বসন্তের চাটুগান শুরু হল বুঝি!'
গান বন্ধ করি পিক উঁকি মেরে কয়,
'তুমি কোথা হতে এলে কে গো মহাশয়?'
'আমি কাক স্পষ্ট ভাষী'—কাক ডাকি বলে।
পিক কয়, 'তুমি ধন্য, নমি পদতলে!
স্পষ্ট ভাষা তব কণ্ঠে থাক্ বারোমাস,
মোর থাক মিষ্ট ভাষা আর সত্যভাষ।'

সারমর্ম : প্রকৃত গুণী সত্যভাষণকে মধুর ভাষায় মণ্ডিত করেই প্রকাশ করেন; সেখানেই তার প্রকাশের সার্থকতা। বসন্তে কোকিলের কণ্ঠে তাই প্রকাশিত হয় প্রকৃত গুণীর সত্যভাষণ ও রসচেতনার যুগপৎ স্বরূপ। পক্ষান্তরে সংকীর্ণ দৃষ্টিসম্পন্ন মানুষের রসবোধ যে থাকে না, তারই প্রমাণ কাকের স্পষ্টভাষণের দম্ভোক্তি।

১৪১

ভ

ভদ্র মোরা, শান্ত বড়ো, পোষ-মানা এই প্রাণ
বোতাম-আঁটা জামার নিচে শান্তিতে শয়ান।
দেখা হলেই মিষ্ট অতি, মুখের ভাব শিষ্ট অতি,
অলস দেহ ক্লিষ্টগতি— গৃহের প্রতি টান।
তৈল-ঢালা স্নিগ্ধ তনু নিদ্রারসে ভরা,
মাথায় ছোটো বহরে বড়ো বাঙালি সন্তান।
ইহার চেয়ে হতেম যদি আরব বেদুইন!
চরণতলে বিশাল মরু দিগন্তে বিলীন।
ছুটেছে ঘোড়া, উড়েছে বালি, জীবনস্রোত আকাশে ঢালি,
হৃদয়তলে বহ্নি জ্বালি চলেছি নিশিদিন।
বরশা হাতে, ভরসা প্রাণে, সদাই নিরুদ্দেশ,
মরুর ঝড় যেমন বহে সকল-বাধাহীন।

সারমর্ম : বাঙালি বরাবরই শান্ত ও নিস্তরঙ্গ জীবনে অভ্যস্ত। তাই গৃহ বন্ধনের মধ্যে আলস্যভরা জীবনের গণ্ডিতে সে বাঁধা পড়ে আছে। এই ঘরকুনো জীবনের গণ্ডি ভেঙে বাঙালিকে বৃহত্তর জীবনের সঙ্গে যোগসূত্র রচনা করতে হবে। কর্মচঞ্চল বৃহত্তর জীবনের সঙ্গে যুক্ত হলেই বাঙালি ঘাত-প্রতিঘাতের সঙ্গে লড়াই করার উপযুক্ত হয়ে উঠবে।

১৪২

ভালবাসি এই সুন্দর ধরণীরে
ভালবাসি তার সব ধূলিবালি মাটি,
আমার প্রাণের সকল অশ্রু নীরে
কেমন করিয়া লাগিল সোনার কাঠি।
অশ্রু কণা মুক্তার মত জ্বলে
ভরিল হৃদয় আনন্দ কোলাহলে,
আলোক আসিয়া হৃদয়ে বাজায় বাঁশি,
সুনীল গগন ভরিয়া উঠিল গানে;



সুন্দর লাগে নয়নে রবির হাসি,
গভীর হরষ উছসি উঠিছে প্রাণে,
যে দিকে তাকাই পুলকে সকল হিয়া
উঠে শান্তির সংগীতে মুখরিয়া।

সারমর্ম : বিশ্ব-প্রকৃতি, উপভোগ্য তার অমিত ও বিচিত্র সৌন্দর্য। এ সৌন্দর্য মানুষের মনকে নাড়া দেয়, তাতে জাগিয়ে তোলে সুরের ঝংকার। আর প্রকৃতির সেই প্রকৃত সৌন্দর্য উপলব্ধি করতে পারলেই মানব হৃদয় অনুপম আনন্দের অনুভূতিতে ভরে ওঠে।

১৪৩

ম

মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে,
মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই,
এই সূর্যকরে এই পুষ্পিত কাননে
জীবন্ত হৃদয়-মাঝে যদি স্থান পাই।
ধরায় প্রাণের খেলা চিরতরঙ্গিত,
বিরহ মিলন কত হাসি-অশ্রু-ময়,
মানবের সুখে দুঃখে গাঁথিয়া সংগীত
যদি গো রচিতে পারি অমর-আলয়।
তা যদি না পারি তবে বাঁচি যত কাল
তোমাদেরি মাঝখানে লভি যেন ঠাঁই,
তোমরা তুলিবে বলে সকাল বিকাল
নব নব সংগীতের কুসুম ফুটাই।
হাসিমুখে নিয়ো ফুল, তার পরে হায়,
ফেলে দিয়ো ফুল, যদি সে ফুল শুকায়।

সারমর্ম : এ সুন্দর পৃথিবীতে মানব-হৃদয়ের সান্নিধ্যে প্রতিটি মানুষই বাঁচতে চায়। সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা ও মিলন-বিরহে স্পন্দিত এ জগৎ-সংসারে নিত্য প্রবাহিত মানুষের জীবনলীলা। সে লীলাবৈচিত্র্যকেই কবি দেন সংগীতের রূপ। সে সংগীত যদি চিরকালীন মহিমা নাও পায় তাতে কবির দুঃখ নেই। তা মানব মনে ক্ষণিক আনন্দ সঞ্চার করতে পারলেই তিনি সুখী।

১৪৪

মহাজ্ঞানী মহাজন, যে পথে করে গমন,
হয়েছেন প্রাতঃস্মরণীয়,
সেই পথ লক্ষ্য করে, স্বীয় কীর্তি-ধ্বজা ধরে,
আমরাও হব বরণীয়।
সময় সাগর তীরে, পদাঙ্ক অঙ্কিত করে,
আমরাও হব যে অমর
সেই চিহ্ন লক্ষ্য করে, অন্য কোন জন পরে.
যশোদ্বারে আসিবে সত্বর।
করো না মানবগণ, বৃথা ক্ষয় এ জীবন,
সংসার সমরাঙ্গন মাঝে,
সংকল্প করেছ যাহা, সাধন করহ তাহা
ব্রতী হয়ে নিজ নিজ কাজে।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



**সারমর্ম :** মানবসমাজে অমর কীর্তি রেখে যারা স্মরণীয়-বরণীয় হয়েছেন তাদের প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করেই জীবনে সাফল্য ও খ্যাতি অর্জন সম্ভব। জীবনযুদ্ধে বৃথা অপচয়ের সময় নেই। আপন আপন লক্ষ্য স্থির করে দায়িত্ব পালনে একান্ত ব্রতী হয়েই জীবনে কৃতিত্ব অর্জন করতে হবে।

**১৪৫**

মৃত্যুও অজ্ঞাত মোর। আজি তার তরে
ক্ষণে ক্ষণে শিহরিয়া কাঁপিতেছি ডরে।
সংসারে বিদায় দিতে, আঁখি ছলছলি
জীবন আঁকড়ি ধরি আপনার বলি
দুই ভুজে।
ওরে মূঢ়, জীবন-সংসার
কে করিয়া রেখেছিল এত আপনার
জন্ম-মুহূর্ত হতে তোমার অজ্ঞাতে,
তোমার ইচ্ছার পূর্বে? মৃত্যুর প্রভাতে
সেই অচেনার মুখ হেরিব আবার
মুহূর্তে চেনার মতো। জীবন আমার
এত ভালবাসি বলে হয়েছে প্রত্যয়,
মৃত্যুরে এমনি ভালো বাসিব নিশ্চয়-

**সারমর্ম :** জীবন ও মৃত্যু মানুষের চিরসাথী। জীবন পরিচিত বলেই জীবন-সংসারের প্রতি ভালোবাসায় মানুষ আচ্ছন্ন হয়। আর মৃত্যু অচেনা-অজানা বলেই মানুষ মৃত্যুভয়ে ভীত হয়। কিন্তু জীবনের মতোই মৃত্যুও চিরন্তন সত্য। মৃত্যুকেও তাই জীবনের মতোই ভালোবাসতে হবে।

**১৪৬**

মোছ আঁখি; মনে কর, এ বিশ্ব-সংসার
কাঁদিবার নহে শুধু বিশাল প্রাঙ্গণ।
রাবণের চিতা সম যদিও আমার
জ্বলিছে জ্বলুক প্রাণ, কেন এ ক্রন্দন?
অপরের দুঃখ-জ্বালা হবে মিটাইতে
হাসি আবরণ টানি দুঃখ ভুলে যাও,
জীবনের সর্বস্ব, অশ্রু মুছাইতে
বাসনার সুর ভাঙি বিশ্বে ঢেলে দাও।
হায়, হায়, জনমিয়া যদি না ফুটালে
একটি কুসুমকলি নয়ন কিরণে,
একটি জীবনব্যথা যদি না জুড়ালে
বুকভরা প্রেম ঢেলে বিফল জীবনে।
আপনা রাখিলে ব্যর্থ জীবন সাধনা, —
জনম বিশ্বের তরে, পরার্থে কামনা।

**সারমর্ম :** মানুষের জীবনে ব্যক্তিগত দুঃখ-যন্ত্রণা থাকে। কিন্তু তাতে আচ্ছন্ন না হওয়াই শ্রেয়। বরং ব্যক্তিগত দুঃখশোক ভুলে অন্যের কল্যাণে ব্রতী হওয়াই মানুষের কর্তব্য। বিশ্বকল্যাণে নিবেদিত জীবনই সত্যিকারের সার্থকতা পায়।



**১৪৭**

মরুভূমির গোধূলির অনিশ্চয় অসীমে হারালো?
অকস্মাৎ বিভীষিকা সমুদ্রের তরঙ্গে তরঙ্গে
মূর্চ্ছাহত বালুকণা জাগলো কি মৃত্যুর আহ্বান?
অন্ধকারে প্রেতদল পথপাশে অট্টহাসে কেন?
কংকালের শ্বেত নগ্ন অস্থি গহ্বরে
প্রাণঘাতী বীভৎস রাগিনী?
মৃত্যু-শঙ্কা মূর্চ্ছনা গ্লানি আচ্ছন্ন গগন,
মানুষের দুরাশার অভিযানে টানি দিল ছেদ?
অদৃশ্য আলোর দীপ্তি অজানিত কোন নভস্তলে
সহসা চমকি' ওঠে উদ্ভাসিয়া অন্তরের ছায়া?
মরুভূমি পরপারে কোথা স্বর্ণ দ্বীপ
প্রলোভন-সম রক্তে ছন্দে দেয় আনি ;
তারি পানে উন্মিলিয়া সকল হৃদয়
গোধূলির অন্ধকারে তিমির রাত্রির বক্ষ ভেদি,
পথহীন প্রান্তরের নামহীন বিপদে উত্তরি,
অজ্ঞাত উষার পানে কারাভার যাত্রা হল শুরু?

**সারমর্ম :** মরুভূমি বা সমুদ্রের অনিশ্চিত যাত্রায় যেমন আকস্মিক বিপদের আশঙ্কা থাকে তেমনি মানবজীবনও নানা প্রতিকূলতায় বারবার প্রতিহত হয়। তবুও নতুনকে জানার তিব্র আকাঙ্ক্ষায় মানুষ মৃত্যুভয় উপেক্ষা করে অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে অগ্রসর হয়।

**১৪৮**

মান দিও মা আমায় তুমি
চাইনে আমি মানকে-
বরে নেব আমি তোমার
নিবিড় নীরব দানকে।
গভীর রাতের অন্ধকারে
গ্রহ চন্দ্র তারকারে
যে তান দিয়ে হাসাইয়ে
হাসাতে বিশ্ব প্রাণকে
প্রাণ আমার জাগাইয়ে
তোল গো সে তানকে-
আড়ম্বরে মত্ত যারা হৃদয়েতে অন্ধ
বুঝিবে না তার আমার নিরিবিলির আনন্দ
শুয়ে ধূলায় পথের 'পরে
তাকায়ে ওই নীলাম্বরে,
গাহিতে চাই আমি আমার
জগৎ জোড়া গানকে-
মান দিও না আমায় তুমি
চাইনে আমি মানকে।

**সারমর্ম :** নিজের মান বা প্রতিপত্তি নয়, সমগ্র মানবের হৃদয়ের বাণীকে বিশ্বমাঝে ধ্বনিত করাই বাঞ্ছনীয়। নিসর্গে যেমন আনন্দের প্রকাশ তেমনি সেবাময়, কর্মময়, আনন্দময় জীবনের প্রত্যাশাই সবার কাম্য।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



**১৪৯**

মৃত্যুও অজ্ঞাত মোর। আজি তার তরে
ক্ষণে ক্ষণে শিহিরিয়া কাঁদিতেছি ডরে।
সংসার বিদায় দিতে, আঁখি ছলছলি
জীবন আঁকড়ি ধরি আপনার বলি
জীবন আঁকড়ি ধরি আপনার বলি
দুই ভুজে।
ওরে মূঢ় জীবন সংসার
কে করিয়া রেখেছিল এত আপনার
জনম মুহূর্ত হতে তোমার অজ্ঞাতে
তোমার ইচ্ছার উপর। মৃত্যুর প্রভাতে
সেই অচেনার মুখ হেরিবি আবার
মুহূর্তের চেনার মতো। জীবন আমার
এত ভালোবাসি বলে হয়েছে প্রত্যয়,
মৃত্যুরে এমনি ভালোবাসি নিশ্চয়।

সারমর্ম : অজানা মৃত্যুর শঙ্কা অন্যদিকে জীবনাসক্তির তীব্রতার বেদনার্ত হয় মানব হৃদয়। অথচ জীবনাসক্তিতে নয়, জীবনের মতো মৃত্যুকে ভালোবেসে তাকে জয় করার মধ্যেই মানবজীবনের সার্থকতা নিহিত।

**১৫০**

মনের সাধ যে দিকে চাই, কেবলই চেয়ে রব
দেখিব শুধু, দেখিব শুধু কথাটি নাহি কব।
পরাণে শুধু জাগিয়ে প্রেম, নয়নে লাগে ঘোর,
জগতে যেন ডুবিয়া রব, হইয়া রব ভোর।
তটিনী যায়, বহিয়া যায়, কে জানে কোথায় যায়;
তীরেতে বসে রহিব চেয়ে, সারাটি দিন যায়।
সুদূর জলে ডুবিছে রবি সোনার লেখা লেখি,
সাঁঝের আলো জেলেতে শুয়ে করিছে ঝিকিমিকি।
দেখিব পাখী আকাশে উড়ে, সুদূরে উড়ে যায়,
মিশায়ে যায় কিরণ মাঝে আঁধার রেখা প্রায়।
তাহারি সাথে সারাটি দিন উড়বে মোর প্রাণ,
নীরবে বসি তাহারি সাথে গহিব তাহারি গান।
পথের ধারে বসিয়া রব বিজন তরু-ছায়,
সমুখ দিয়ে পথিক যত, কত না আসে যায়।
ধূলায় বসে আপন মনে ছেলেরা খেলা করে।
মুখেতে হাসি সখারা মিলে যেতেছে ফিরে ঘরে।
যায় রে সাধ জগৎ পানে কেবলি চেয়ে রই–
অবাক হয়ে আপনা ভুলে, কথাটি নাহি কই।

সারমর্ম : এ বিশ্বের অপূর্ব সৌন্দর্য সুধা পান করতে কে-না চায়। নয়ন মেলে এ অপরূপ সৌন্দর্য-নদীতে ডুব দিতে পারলেই মেলে প্রকৃত আত্মতৃপ্তি। তাই অনেকেরই মনে সাধ জাগে বিশ্বরূপে মগ্ন হয়ে থাকতে।



**১৫১**

যেখানে এসেছি আমি, আমি সেথাকার
দরিদ্র সন্তান আমি দীন ধরণীর।
জন্মাবধি যা পেয়েছি সুখ-দুঃখভার।
বহু ভাগ্য বলে তাই করিয়াছি স্থির।
অসীম ঐশ্বর্যরাশি নাই তোর হাতে
হে শ্যামলা সর্বসহা জননী মৃন্ময়ী।
সকলের মুখে অন্ন চাহিস জোগাতে,
পারিস নে কত বার,– কই অন্ন কই
কাঁদে তোর সন্তানেরা ম্লান শুষ্ক মুখ;–
জানি মাগো, তোর হাতে অসম্পূর্ণ সুখ,
যা-কিছু গাড়িয়া দিস ভেঙে ভেঙে যায়,
সব তাতে হাত দেয় মৃত্যু সর্বভুক,
সব আশা মিটাইতে পারিস নে হায়
তা বলে কি ছেড়ে যাব তোর তপ্ত বুক?

সারমর্ম : পৃথিবীর প্রতি মানুষের ভালোবাসা অসীম। কারণ, মানুষ পৃথিবীরই সন্তান। কিন্তু পৃথিবী সবসময় সবার মুখে অন্ন জোগাতে পারে না, অপমৃত্যুর হাত থেকে সবাইকে রক্ষা করতেও ব্যর্থ হয়। মানুষের সব আশা মেটানোও সম্ভব হয় না তার পক্ষে। কিন্তু তাই বলে মানুষ জননীতুল্য পৃথিবীকে কখনো ছেড়ে যাওয়ার কথা ভাবে না।

**১৫২**

যেথায় থাকে সবার অধম দীনের হতে দীন
সেইখানে যে চরণ তোমার বাজে–
সবার পিছে, সবার নীচে, সব-হারাদের মাঝে।
যখন তোমায় প্রণাম করি আমি
প্রণাম আমার কোনখানে যায় থামি,
তোমার চরণ যেথায় থামে অপমানের তলে
সেথায় আমার প্রণাম নামে না যে–
সবার পিছে, সবার নীচে, সব-হারাদের মাঝে–
অহংকার তো পায় না নাগাল যেথায় তুমি ফের
রিক্তভূষণ দীন-দরিদ্র সাজে–
সবার পিছে, সবার নীচে, সব-হারাদের মাঝে।
ধনে মানে যেথায় আছে ভরি
সেথায় তোমার সঙ্গ আশা করি,
সঙ্গী হয়ে আছ যেথায় সঙ্গীহীনের ঘরে
সেথায় আমার হৃদয় নামে না যে–
সবার পিছে, সবার নীচে, সব-হারাদের মাঝে।

সারমর্ম : বিধাতা বিরাজ করেন সর্বহারা দীন-দুঃখীজনের মাঝে। বিত্ত-বৈভবের মধ্যে তাকে পাওয়া যায় না, মানবতার অপমান করলেও তাকে মেলে না। দীন-দরিদ্রের কল্যাণে আত্মনিয়োগ করলেই বিধাতার সন্তুষ্টি লাভ করা যায়।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



১৫৩
যারে তুই ভাবিস ফণী
তারো মাথায় আছে মণি
বাজা তোর প্রেমের বাঁশি
ভবের বনে ভয় বা কারে?
সবাই যে তোর মায়ের ছেলে
রাখবি কারে, কারে ফেলে?
একই নায়ে সকল ভায়ে
যেতে হবে রে ওপারে।

সারমর্ম : ভালোমন্দ, সত্য-মিথ্যা পরস্পর অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। সত্যের প্রসাদ দান করতে চাইলে মিথ্যার স্পর্শ অনুভব করতেই হয়। তাই প্রেমের আলোয় আলোকিত হয়ে সবাইকে সবার মাঝে স্থান করে নিতে হবে। কেননা একমাত্র প্রেম দিয়েই সবকিছুকে জয় করা সম্ভব।

১৫৪
যে নদী হারায়ে স্রোত চলিতে না পারে,
সহস্র শৈবাল দাম বাঁধে আসি তারে।
যে জাতি জীবন হারা অচল অসাড়
পদে পদে বাঁধে তারে জীর্ণ লোকাচার।
সর্বজন সর্বক্ষণ চলে সেই পথে
তৃণ-গুল্ম সেথা নাহি জন্মে কোন মতে।
যে জাতি চলে না কভু তারি পথ পরে,
তন্ত্র মন্ত্র সংহিতায় চরণ না সরে।

সারমর্ম : আলস্য, কর্মবিমুখতা, স্থবিরতা মানবজীবনে কুসংস্কার, জীর্ণতা ও সংকীর্ণ লোকাচার প্রতিষ্ঠায় সহায়ক। তাই পার্থিব উন্নয়নে গতিশীল, কর্মমুখীন জীবন গড়াই সবার কাম্য হওয়া উচিত।

১৫৫
যাদের প্রাণস্রোতে ভেসে গেল পুরাতন জঞ্জাল,
সংস্কারের জগদ্দল শিলা, শাস্ত্রের কঙ্কাল,
মিথ্যা মোহের পূজামণ্ডপে যারা অকুতোভয়ে
এল নির্মল-মোহ মুদগর ভাঙ্গনের গদা লয়ে।
বিধি-নিষেধের চীনের প্রাচীরে
অসীম দুঃসাহসে দু'হাতে চালাল হাতুড়ি শাবল।
গোরস্থানের চষে ছুঁড়ে ফেলে যত
সব কঙ্কাল বসাল ফুলের মেলা।
যাহাদের ভিড়ে মধুর আজিকে জীবনের বালু মেলা।
গাহি তাহাদেরি গান।
বিশ্বের সাথে জীবনের পথে যারা আজি আগুয়ান।

সারমর্ম : পুরানোকে পেছনে ফেলে, হাজারও কুসংস্কার ও বিধি-নিষেধের বেড়াজাল ছিন্ন করে অসীম দুঃসাহস বুকে নিয়ে প্রগতির পথে চলে যারা ধ্বংসস্তূপের ওপর প্রতিষ্ঠা করে নতুনের বিজয় রথ, তারাই প্রকৃত প্রশংসার যোগ্য।



১৫৬
যাক বান ডেকে যাক বাইরে এবং ঘরে,
আর নাচুক আকাশ শূন্য মাথার পরে,
আসুক জোরে হাওয়া;
এই আকাশ মাটি উঠুক কেঁপে কেঁপে,
শুধু ঝড় বয়ে যাক মরা জীবন ছেপে,
বিজলী দিয়ে হাওয়া।
আয় ভাইবোনেরা ভয় ভাবনাহীন
সেই বিজলী নিয়ে গড়ি নতুন দিন।
আয় অন্ধকারের বন্ধ দুয়ার খুলে
বুনো হাওয়ার মত আয়রে দুলে দুলে
গেয়ে নূতন গান
যত আবর্জনা উড়িয়ে দেরে দূরে,
আজ মরা গাঙের বুকে নূতন সুরে
ছড়িয়ে দেরে প্রাণ।

সারমর্ম : মানবজীবনের অগ্রযাত্রা বিপদসংকুল। তাই কল্যাণকামী অগ্রযাত্রার পথে যত বাধাই আসুক, তা অতিক্রম করে অগ্রসর হতে হবে। পাশাপাশি নতুনের জয়গানের সুর ছড়িয়ে গতিহীন, সংস্কারাচ্ছন্ন জীবনে আনতে হবে গতি ও সমৃদ্ধি।

১৫৭
যদি দুঃখের লাগি গড়েছ আমায়, সুখ আমি নাহি চাই,
শুধু আঁধারের মাঝে হাত খানি তবু খুঁজিয়া যেন পাই
যদি নয়নের জল না পার মোছাতে,
যদি পরাণের ব্যথা না পার ঘোচাতে,
তবে আছ কাছে আছ হে মোর দরদী, কহিও আমারে তাই।
যদি হৃদয়ের প্রেম নাহি চাহে কেহ,
পাই অবহেলা নাই পাই স্নেহ,
তবে দিয়েছিলে যাহা হে মোর বিধাতা, ফিরিয়া লও হে তাই।
যদি না পারি পুরাতে মনের কামনা,
যায় হে বিফলে সকল সাধনা,
যেন এ দীন জীবনে হে দীনের বিধি, তোমারে নাহি হারাই।

সারমর্ম : সৎ ও মহৎরা একান্তভাবে বিধাতার সান্নিধ্যই কামনা করে। জীবনে যদি কিছুই না পায়, তাতেও তাদের কোনো আপত্তি থাকে না। তদ্রূপ বিধাতার সান্নিধ্য লাভ করাই সকলের কাম্য হওয়া উচিত।

১৫৮
রংহীন মিলহীন ভাষা এবং রাষ্ট্রে
বিভক্ত এ মানুষ দ্বন্দ্ব সংঘাতে লিপ্ত
যুদ্ধ মারামারি হানাহানি সবই আছে জানি
তারপরও এগিয়ে যাচ্ছে মানুষ

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



এতো প্রগতির পদক্ষেপ সভ্যতার
পদচিহ্ন এঁকে দিচ্ছে সারা বিশ্বময়
ওরা বলছে আমরা মানুষ আছি এভাবে
জগৎ জুড়ে প্রীতির বন্ধন আর স্বভাবে।

**সারমর্ম :** বিশ্বের মানুষে মানুষে রয়েছে বর্ণ, ভাষা ও সংস্কৃতির বিভিন্নতা। জাতিতে জাতিতে দেখা দিয়েছে দ্বন্দ্ব ও সংঘাত। তার মধ্যেই বিশ্বসভ্যতা আপন গতিতে অগ্রসরমান। জগৎ জোড়া মানব-সম্প্রীতির মধ্যেই নিহিত আছে বিশ্বের প্রগতিমুখী অগ্রযাত্রা।

১৫৯

রানার! রানার! কি হবে এ বোঝা বয়ে
কি হবে ক্ষুধার ক্লান্তিতে ক্ষয়ে ক্ষয়ে
রানার! রানার! ভোর তো হয়েছে— আকাশ হয়েছে লাল,
আলোর স্পর্শে কবে কেটে যাবে এই দুঃখের কাল?
রানার! গ্রামের রানার!
সময় হয়েছে নতুন খবর আনার,
শপথের চিঠি নিয়ে চলো আজ ভীরুতা পিছনে ফেলে—
পৌঁছে দাও এ নতুন খবর অগ্রগতির 'মেলে'
দেখা দিবে বুঝি প্রভাত এখনি, নেই দেরি নেই আর,
ছুটে চলো, ছুটে চলো, আরো বেগে, দুর্দম হে রানার।

**সারমর্ম :** ক্ষুধা-তৃষ্ণা-ক্লান্তি উপেক্ষা করে রানারকে নির্জন রাত্রির দূর-পথ অতিক্রম করতে হয়। সেখানে ভীরুতার স্থান নেই। কেননা ভোর হওয়ার পূর্বেই নতুন দিনের আশার বাণী ও অগ্রগতির সংবাদ তাকে পৌঁছে দিতে হবে। বস্তুত এরূপ দুর্বার একাগ্রতা ও দুঃসাহসিক কর্ম প্রচেষ্টার মাঝে নিহিত ভবিষ্যৎ সফলতা।

১৬০

## ল

লক্ষ লক্ষ হা-ঘরে দুর্গত
ঘৃণ্য যম-দূত-সেনা এড়িয়ে সীমান্তপারে ছোটে,
পথে পথে অনশনে অন্তিম যন্ত্রণা রোগে ত্রাসে
সহস্রের অবসান, হন্তারক বারুদে বন্ধুকে
মূর্ছিত-মৃতের দেহ বিদ্ধ করে, হত্যা-ব্যবসায়ী
বাংলাদেশ-ধ্বংস-কাব্যে জানে না পৌঁছল জাহান্নামে
এ জন্যেই ;
বাংলাদেশ অনন্ত অক্ষত মূর্তি জাগে॥

**সারমর্ম :** একাত্তরে উদ্বাস্তু জীবন, মৃত্যুর আর্তনাদ, নির্যাতনের যন্ত্রণা সত্ত্বেও বাঙালিরা দমেনি। তারা প্রবল বিক্রমে শত্রুর ওপর আঘাত হেনে ছিনিয়ে এনেছে বাংলাদেশের গৌরবোজ্জ্বল অক্ষয় মূর্তি। বস্তুত এখানেই ত্যাগ ও তিতিক্ষার প্রাপ্তি।



১৬১

## শ

শুধু গাফলতে, শুধু খেয়ালের ভুলে,
দরিয়া-অথই ভ্রান্তি নিয়াছি তুলে,
আমাদেরি ভুলে পানির কিনারে মুসাফির দল বসি
দেখেছে সভয়ে অস্ত গিয়াছে তাদের সেতারা, শশী।

**সারমর্ম :** জাতীয় নেতৃত্বকে হতে হয় দায়িত্ব-সচেতন, কর্তব্যনিষ্ঠ ও পরিণামদর্শী। তা না হলে জাতীয় জীবনে নেমে আসে মহা বিপর্যয়— ঘোর অন্ধকার।

১৬২

শৈশবে সদুপদেশ যাহার না রোচে,
জীবনে তাহার কভু মূর্খতা না ঘোচে।
চৈত্র মাসে চাষ দিয়া না বোনে বৈশাখে,
কবে সেই হৈমন্তিক ধান্য পেয়ে থাকে?
সময় ছাড়িয়া দিয়া করে পণ্ডশ্রম,
ফল হে সেও অতি নির্বোধ অধম।
খেয়াতরী চলে গেলে বসে থাকে তীরে,
কিসে পার হবে তারা না আসিলে ফিরে–

**সারমর্ম :** জীবনে সার্থকতা অর্জনের জন্যে ছেলেবেলা থেকেই নৈতিক সততার শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত। শৈশবে সৎকাজ করতে না শিখলে পরে আর সে অভ্যাস গড়ে ওঠে না। সময়ের কাজ সময়ে না করলে তার জন্যেও জীবনে মূল্য দিতে হয় প্রচুর। কারণ, সুযোগ চলে গেলে তা হয়ত আর ফিরে আসে না।

১৬৩

শ্বেত, পীত কালো করিয়া সৃজিলে মানবে, সে তব সাধ।
আমরা যে কালো, তুমি ভালো জান, নহে তাহা অপরাধ।
তুমি বলো নাই, শুধু শ্বেত দ্বীপে
জোগাইবে আলো রবি-শশী-দীপে
সাদা র'বে সবাকার টুটি টিপে, এ নহে তব বিধান,
সন্তান তব করিতেছে আজ তোমার অসম্মান।

**সারমর্ম :** সৃষ্টিকর্তার চোখে সকল মানুষ সমান। তিনি মানুষকে নানা বর্ণ দিয়ে সৃষ্টি করলেও তার দান সকলের জন্যে সমানভাবে বর্ষিত হয়। কিন্তু স্বার্থপরতার বশবর্তী হয়ে কোনো কোনো মানুষ হীন স্বার্থে মানুষে মানুষে ভেদাভেদ সৃষ্টি করে।

১৬৪

শ্যামল সুন্দর সৌম্য, হে অরণ্যভূমি,
মানবের পুরাতন বাসগৃহ তুমি।
নিশ্চল নির্জীব নহ সৌধের মতন–
তোমার মুখশ্রীখানি নিত্যই নূতন
প্রাণে প্রেমে ভাবে অর্থে সজীব সচল।
তুমি দাও ছায়াখানি, দাও ফুল ফল,
দাও বস্ত্র, দাও শয্যা, দাও স্বাধীনতা;
নিশিদিন মর্মরিয়া কহ কত কথা

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



এতো প্রগতির পদক্ষেপ সভ্যতার
পদচিহ্ন এঁকে দিচ্ছে সারা বিশ্বময়
ওরা বলছে আমরা মানুষ আছি এভাবে
জগৎ জুড়ে প্রীতির বন্ধন আর স্বভাবে।

সারমর্ম : বিশ্বের মানুষে মানুষে রয়েছে বর্ণ, ভাষা ও সংস্কৃতির বিভিন্নতা। জাতিতে জাতিতে দেখা দিয়েছে দ্বন্দ্ব ও সংঘাত। তার মধ্যেই বিশ্বসভ্যতা আপন গতিতে অগ্রসরমান। জগৎ জোড়া মানব-সম্প্রীতির মধ্যেই নিহিত আছে বিশ্বের প্রগতিমুখী অগ্রযাত্রা।

১৫৯

রানার! রানার! কি হবে এ বোঝা বয়ে
কি হবে ক্ষুধার ক্লান্তিতে ক্ষয়ে ক্ষয়ে
রানার! রানার! ভোর তো হয়েছে— আকাশ হয়েছে লাল,
আলোর স্পর্শে কবে কেটে যাবে এই দুঃখের কাল?
রানার! গ্রামের রানার!
সময় হয়েছে নতুন খবর আনার,
শপথের চিঠি নিয়ে চলো আজ ভীরুতা পিছনে ফেলে—
পৌছে দাও এ নতুন খবর অগ্রগতির 'মেলে'
দেখা দিবে বুঝি প্রভাত এখনি, নেই দেরি নেই আর,
ছুটে চলো, ছুটে চলো, আরো বেগে, দুর্দম হে রানার।

সারমর্ম : ক্ষুধা-তৃষ্ণা-ক্লান্তি উপেক্ষা করে রানারকে নির্জন রাত্রির দূর-পথ অতিক্রম করতে হয়। সেখানে ভীরুতার স্থান নেই। কেননা ভোর হওয়ার পূর্বেই নতুন দিনের আশার বাণী ও অগ্রগতির সংবাদ তাকে পৌছে দিতে হবে। বস্তুত এরূপ দুর্বার একাগ্রতা ও দুঃসাহসিক কর্ম প্রচেষ্টার মাঝে নিহিত ভবিষ্যৎ সফলতা।

১৬০

ল

লক্ষ লক্ষ হা-ঘরে দুর্গত
ঘৃণ্য যম-দূত-সেনা এড়িয়ে সীমান্তপারে ছোটে,
পথে পথে অনশনে অন্তিম যন্ত্রণা রোগে ত্রাসে
সহস্রের অবসান, হন্তারক বারুদে বন্দুকে
মূর্ছিত-মৃতের দেহ বিদ্ধ করে, হত্যা-ব্যবসায়ী
বাংলাদেশ-ধ্বংস-কাব্যে জানে না পৌছল জাহান্নামে
এ জন্মেই ;
বাংলাদেশ অনন্ত অক্ষত মূর্তি জাগে ॥

সারমর্ম : একাত্তরে উদ্বাস্তু জীবন, মৃত্যুর আর্তনাদ, নির্যাতনের যন্ত্রণা সত্ত্বেও বাঙালিরা দমেনি। তার প্রবল বিক্রমে শত্রুর ওপর আঘাত হেনে ছিনিয়ে এনেছে বাংলাদেশের গৌরবোজ্জ্বল অক্ষয় মূর্তি। বস্তু এখানেই ত্যাগ ও তিতিক্ষার প্রাপ্তি।



১৬১

শ

শুধু গাফলতে, শুধু খেয়ালের ভুলে,
দরিয়া-অথই ভ্রান্তি নিয়াছি তুলে,
আমাদেরি ভুলে পানির কিনারে মুসাফির দল বসি
দেখেছে সভয়ে অস্ত গিয়াছে তাদের সেতারা, শশী।

সারমর্ম : জাতীয় নেতৃত্বকে হতে হয় দায়িত্ব-সচেতন, কর্তব্যনিষ্ঠ ও পরিণামদর্শী। তা না হলে জাতীয় জীবনে নেমে আসে মহা বিপর্যয়— ঘোর অন্ধকার।

১৬২

শৈশবে সদুপদেশ যাহার না রোচে,
জীবনে তাহার কভু মূর্খতা না ঘোচে।
চৈত্র মাসে চাষ দিয়া না বোনে বৈশাখে,
কবে সেই হৈমন্তিক ধান্য পেয়ে থাকে?
সময় ছাড়িয়া দিয়া করে পণ্ডশ্রম,
ফল হে সেও অতি নির্বোধ অধম।
খেয়াতরী চলে গেলে বসে থাকে তীরে,
কিসে পার হবে তারা না আসিলে ফিরে—

সারমর্ম : জীবনে সার্থকতা অর্জনের জন্যে ছেলেবেলা থেকেই নৈতিক সততার শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত। শৈশবে সৎকাজ করতে না শিখলে পরে আর সে অভ্যাস গড়ে ওঠে না। সময়ের কাজ সময়ে না করলে তার জন্যেও জীবনে মূল্য দিতে হয় প্রচুর। কারণ, সুযোগ চলে গেলে তা হয়ত আর ফিরে আসে না।

১৬৩

শ্বেত, পীত কালো করিয়া সৃজিলে মানবে, সে তব সাধ।
আমরা যে কালো, তুমি ভালো জান, নহে তাহা অপরাধ।
তুমি বলো নাই, শুধু শ্বেত দ্বীপে
জোগাইবে আলো রবি-শশী-দীপে
সাদা র'বে সবাকার টুটি টিপে, এ নহে তব বিধান,
সন্তান তব করিতেছে আজ তোমার অসম্মান।

সারমর্ম : সৃষ্টিকর্তার চোখে সকল মানুষ সমান। তিনি মানুষকে নানা বর্ণ দিয়ে সৃষ্টি করলেও তার দান সকলের জন্যে সমানভাবে বর্ষিত হয়। কিন্তু স্বার্থপরতার বশবর্তী হয়ে কোনো কোনো মানুষ হীন স্বার্থে মানুষে মানুষে ভেদাভেদ সৃষ্টি করে।

১৬৪

শ্যামল সুন্দর সৌম্য, হে অরণ্যভূমি,
মানবের পুরাতন বাসগৃহ তুমি।
নিশ্চল নির্জীব নহ সৌধের মতন—
তোমার মুখশ্রীখানি নিত্যই নূতন
প্রাণে প্রেমে ভাবে অর্থে সজীব সচল।
তুমি দাও ছায়াখানি, দাও ফুল ফল,
দাও বস্ত্র, দাও শয্যা, দাও স্বাধীনতা;
নিশিদিন মর্মরিয়া কহ কত কথা

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



অজনা ভাষার মন্ত্র; বিচিত্র সংগীতে
গাও জাগরণগাথা, গভীর নিশীথে
পাতি দাও নিস্তব্ধতা অঞ্চলের মতো
জননীবক্ষের; বিচিত্র হিল্লোলে কত
খেলা কর শিশুসনে; বৃদ্ধের সহিত
কহ সনাতন বাণী বচন-অতীত।

সারমর্ম : শ্যামল অরণ্য ছিল মানুষের আদিমতম বাসগৃহ। একালের দালান-কোঠার মতো তা নিষ্প্রাণ ছিল না। অরণ্যের জীবন ছিল প্রাণচাঞ্চল্যে সজীব, হৃদয়াবেগে ভরপুর। অরণ্য মানুষকে দিয়েছে শ্যামল ছায়া, বাঁচার উপকরণ, আর মুক্তজীবনের আস্বাদ। মানব হৃদয়কে মন্দ্রিত করেছে মর্মর ধ্বনিতে। সহজ, সরল, প্রশান্তিময় সেই জীবনে উচ্চারিত হয়েছে কত অমর বাণী। আজ অরণ্যকে হারিয়ে মানুষ সেই জীবন-সুষমা থেকে নির্বাসিত।

১৬৫

শতাব্দীর সূর্য আজি রক্তমেঘ মাঝে
অস্ত গেল হিংসার উৎসবে আজি বাজে
অস্ত্রে অস্ত্রে মরণের উন্মাদ রাগিণী
ভয়ংকরী! দয়াহীন সভ্যতানাগিনী
তুলেছে কুটিল ফণা চক্ষের নিমিষে
গুপ্ত বিষদন্ত তার ভরি তীব্র বিষে।
স্বার্থে স্বার্থে বেধেছে সংঘাত, লোভে লোভে
ঘটেছে সংগ্রাম; প্রলয়মন্থন-ক্ষোভে
ভদ্রবেশী বর্বরতা উঠিয়াছে জাগি
পঙ্কশয্যা হতে। লজ্জা শরম তেয়াগি
জাতিপ্রেম নাম ধরি প্রচণ্ড অন্যায়
ধর্মেরে ভাসাতে চাহে বলের বন্যায়।
কবিদল চীৎকারিছে জাগাইয়া ভীতি
শ্মশানকুক্কুরদের কাড়াকাড়ি-গীতি।

সারমর্ম : স্বার্থে স্বার্থে সংঘাত, লোভে লোভে সংগ্রাম আর হিংসার উন্মত্ততায় নিত্য-নতুন মারণাস্ত্র আবিষ্কারে আজ ঘনিয়ে এসেছে সভ্যতার অন্তিম লগ্ন; ঘটেছে বর্বরতার নির্লজ্জ আত্মপ্রকাশ। যার মূলে রয়েছে অন্ধ জাতিপ্রেম। ফলে মানবধর্ম আজ পৃথিবী থেকে নির্বাসিত।

১৬৬

শ্রমে প্রেমে ক্রোধে প্রতিশোধে
মানুষের মত কেউ নয়।
গড়ে ওঠে অরণ্যভেদী লোকালয়
মানুষের শ্রমে,
গড়ে ওঠে মধুকুঞ্জ বংশধারা
মানুষের প্রেমে কামে,



জ্বলে ওঠে দাবানল
মানুষের ক্রোধে,
লোকালয় অরণ্য হয়
মানুষের ঘৃণায়, প্রতিশোধে।

সারমর্ম : বিচিত্র আচরণের সমাহার মানবচরিত্র। সে একদিকে যেমন ভালোবাসা দিয়ে জয় করে নিতে পারে সবকিছুকে, অন্যদিকে তেমন। শ্রম ও কর্তব্যনিষ্ঠায় সাজাতে পারে সুন্দর পৃথিবীকে। আবার সে মানুষই ক্রোধের বশবর্তি হয়ে ধ্বংস করে দেয় সবকিছু।

১৬৭

'শাফায়াত'-পাল-বাঁধা তরণীর মাস্তুল,
'জান্নাত' হতে ফেলে হুরী রাশ রাশ ফুল।
শিরে নত স্নেহ-আঁখি মঙ্গল-দাত্রী;
গাও জোরে সারি-গান ওপারের যাত্রী!
বৃথা ত্রাসে প্রলয়ের সিন্ধু ও দেয়া-ভার,
ঐ হলো পুণ্যের যাত্রীরা খেয়া পার!

সারমর্ম : পুণ্যার্থীরা পরকালে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আল্লাহর করুণায় হাশরের দিনের দুর্বিপাক তাদের স্পর্শ করতে পারবে না। তাই জাতিকে সত্য-সুন্দর ও কল্যাণের পথে অগ্রসর হয়ে মুক্তির সোনালি সূর্যকে হস্তগত করতে হবে।

১৬৮

শক্তি-দম্ভ স্বার্থ-লোভ মারীর মতন
দেখিতে দেখিতে আজি ঘিরিছে ভুবন।
দেশ হতে দেশান্তরে স্পর্শবিষ তার
শান্তিময় পল্লী যত করে ছারখার।
যে প্রশান্ত সরলতা জ্ঞানে সমুজ্জ্বল
স্নেহে যারা রসসিক্ত, সন্তোষে শীতল,
ছিল তাহা ভারতের তপোবনতলে।
বস্তুভারহীন মন সর্বজলে স্থলে
পরিব্যাপ্ত করি দিত উদার কল্যাণ,
জড়ে জীবে সর্বভূতে অবারিত ধ্যান
পশিত আত্মীয়রূপে।
আজি তাহা নাশি চিত্ত যেথা ছিল সেথা এল দ্রব্যরাশি,
তৃপ্তি যেথা ছিল সেথা এল আড়ম্বর।
শান্তি যেথা ছিল সেথা স্বার্থের সমর।

সারমর্ম : শক্তির মাদকতা ও উদগ্রতায় পল্লীজীবনের প্রশান্ত ও আনন্দময় সৌন্দর্যনিকেতন যেন আজ বিপর্যস্ত ও ধ্বংসপ্রাপ্ত হতে চলেছে। যেখানে একদিন বস্তু-তান্ত্রিকতার পরিবর্তে বৈরাগ্য ও কল্যাণচিন্তার প্রভাব সকলকে পরম প্রীতির সূত্রে আবদ্ধ করত, সেখানে আজ বস্তুতান্ত্রিকতা সেই পবিত্র শান্তিকে বিঘ্নিত করছে।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



১৬৯
শোনরে শ্রমিক শোনরে ভাই চাষা,
আমাদের বুকে যত ভালবাসা
ঢালিয়া বিলাব তোদের দুয়ারে অকাতরে অনিবার।
তোদের দুঃখে হায়
পাষাণ হলেও চক্ষের জলে বক্ষ ভাসিয়া যায়।
করো নাকো ভাই হীন আশঙ্কা,
এবার নয়নে ঘসি নি লঙ্কা,
সত্য সত্য ত্রিসত্য করি হৃদয় তোদের চায়।
ওরে চির পরাধীন!
তোরা না জানিস, মোরা জানি তোর কী কষ্টে কাটে দিন।
নানা পুঁথি পড়ে পেয়েছি প্রমাণ
তোরাই দেশের তেরো আনা প্রাণ,
বৎসরে হায় বিশ টাকা আয়, তবু তোরা ভাষাহীন।

সারমর্ম : হাজারও দুঃখে-কষ্টে এদেশের কৃষক-শ্রমিকদের জীবন কাটে; অথচ বিদ্রোহ করতে জানে না। সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও এরাই সর্বাপেক্ষা অবহেলিত, উপেক্ষিত শিক্ষিত সমাজে। কিন্তু এখন এদের মুক্তির জন্য সঙ্কল্প-বদ্ধ হওয়া সময়ের দাবি। নতুবা দেশের প্রকৃত মুক্তি সম্ভব নয়।

১৭০
স
সকাল বিকাল ইসটেশনে আসি,
চেয়ে চেয়ে দেখতে ভালোবাসি।
ব্যস্ত হয়ে ওরা টিকিট কেনে;
ভাটির ট্রেনে কেউ বা চড়ে, কেউ বা উজান ট্রেনে।
সকাল থেকে কেউ বা থাকে বসে,
কেউ বা গাড়ি ফেল করে তার শেষ মিনিটের দোষে।
দিনরাত গড় গড় ঘড় ঘড়
গাড়িভরা মানুষের ছোটে ঝড়।
ঘন ঘন গতি তার ঘুরবে,
কভু পশ্চিমে কভু পূর্বে।

সারমর্ম : আসা আর যাওয়া —জীবনের এই চলমানতার প্রতীক রেল স্টেশন। স্টেশন স্থির। কিন্তু যাতায়াতের গতিময়তায় জীবন সেখানে সজীব, চঞ্চল : স্টেশনের প্লাটফরম যেন কর্মকোলাহল মুখর, ব্যস্ততাময়, গতি-আন্দোলিত জীবনেরই চলচ্ছবি।

১৭১
সন্ধ্যাবেলা লাঠি কাঁখে বোঝা বহি শিরে
নদী তীরে পল্লীবাসী ঘরে যায় ফিরে।
শত শতাব্দীর পরে যদি কোনমতে
মন্ত্রবলে, অতীতের মৃত্যুরাজ্য হতে
এই চাষি দেখা দেয় হয়ে মূর্তিমান
এই লাঠি কাঁখে লয়ে, বিস্মিত নয়ান,
চারিদিকে ঘিরি তারে অসীম জনতা



কাড়াকাড়ি করি লবে তার প্রতি কথা।
তার সুখ-দুঃখ যত, তার প্রেম স্নেহ,
তার পাড়াপ্রতিবেশী, তার নিজ গেহ,
তার খেত, তার গরু, তার চাষবাস,
শুনে শুনে কিছুতেই মিটিবে না আশা।
আজি যার জীবনের কথা তুচ্ছতম
সেদিন শুনাবে তাহা কবিত্বের সম।

সারমর্ম : কোনো পল্লীবাসীর দৈনন্দিন জীবন পরিক্রমা সমকালে সাধারণত গুরুত্ব পায় না। অনেক শতাব্দী পরে তা পুরাকাহিনীর তাৎপর্য পায়। তখন সেই পল্লীবাসীর জীবন-পরিক্রমার চিত্র শিল্প-সাহিত্যের মতোই বিচিত্র জিজ্ঞাসার বিষয় হয়ে ওঠে।

১৭২
সব ঠাঁই মোর ঘর আছে, আমি সেই ঘর মরি খুঁজিয়া।
দেশে দেশে মোর দেশ আছে, আমি সেই দেশ লব যুঝিয়া।
পরবাসী আমি যে দুয়ারে চাই —
তারি মাঝে মোর আছে যেন ঠাঁই,
কোথা দিয়া সেথা প্রবেশিতে পাই, সন্ধান লব বুঝিয়া।
ঘরে ঘরে আছে পরমাত্মীয়, তারে আমি ফিরি খুঁজিয়া—

সারমর্ম : বিশ্বের মানুষকে আপন করে নেওয়াতেই মানব জীবনের সার্থকতা। দেশে দেশে মানুষে মানুষে সম্প্রীতির বন্ধন রচনা করার মাধ্যমেই গড়ে উঠতে পারে যথার্থ মানব সংস্কৃতি। আনন্দময় নতুন বিশ্ব রচনার জন্যে চাই বিশ্বজনীন প্রীতিময় মানব-সম্পর্ক।

১৭৩
সবারে বাসরে ভাল
নইলে মনের কাল মুছবে নারে!
আজ তোর যাহা ভাল
ফুলের মত দে সবারে।
করি তুই আপন আপন,
হারালি যা ছিল আপন,
এবার তোর ভরা আপন
বিলিয়ে দে তুই যারে তারে।
যারে তুই ভাবিস ফণী
তারো মাথায় আছে মণি
বাজা তোর প্রেমের বাঁশি
ভবের বনে ভয় বা কারে?
সবাই যে তোর মায়ের ছেলে
রাখবি কারে, কারে ফেলে?
একই নায়ে সকল ভায়ে
যেতে হবে রে ওপারে।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



সারমর্ম : প্রীতি ও প্রেমের সম্পর্কের বন্ধনেই মানুষ মহীয়ান হয়ে ওঠে। কেবল নিজেকে নিয়ে ভাবতে গেলে আর সবাইকে হারাতে হয়। মানব জীবনকে সফল ও সার্থক করতে হলে চাই মানুষে মানুষে মমত্ব ও সম্প্রীতির মেলবন্ধন।

১৭৪

সার্থক জনম আমার জন্মেছি এই দেশে।
সার্থক জনম মাগো, তোমায় ভালোবেসে—
জানি নে তোর ধন-রতন আছে কিনা রাণীর মতন,
শুধু জানি আমার অঙ্গ জুড়ায় তোমার ছায়ায় এসে—
কোন্ বনেতে জানি নে ফুল গন্ধে এমন করে আকুল,
কোন্ গগনে ওঠরে চাঁদ এমন হাসি হেসে—
আঁখি মেলে তোমার আলো প্রথম আমার চোখ জুড়ালো,
ওই আলোতেই নয়ন মেলে মুদব নয়ন শেষে—

সারমর্ম : জন্মভূমিকে ভালোবাসতে পারাতেই মানব জীবনের সার্থকতা। জন্মভূমি অজস্র সম্পদের আকর না হতে পারে; কিন্তু তার আলো বাতাসেই মানুষ বাঁচে, তার সৌন্দর্যের ঐশ্বর্যে পায় প্রশান্তি, তার স্নেহচ্ছায়ায় জীবন হয়ে ওঠে পরিপূর্ণ। জন্মভূমির জন্যে গভীর মমতা থেকেই মানুষ চায় দেশের মাটিতে শেষ আশ্রয়টুকু পেতে।

১৭৫

স্বাধীনতা স্পর্শমণি সবাই ভালবাসে,
সুখের আলো জ্বলে বুকে দুঃখের ছায়া নাশে।
স্বাধীনতা সোনার কাঠি খোদার সুধা দান;
স্পর্শে তাহার নেচে ওঠে শূন্য দেহে প্রাণ।
মনুষ্যত্বের বান ডেকে যায় যাহার হৃদয়তলে,
বুক ফুলিয়ে দাঁড়ায় ভীরু স্বাধীনতার বলে।

সারমর্ম : মানুষের জীবনে স্বাধীনতা পরশ-পাথরের মতো। তার ছোঁয়ায় দুঃখময় জীবনে আসে সুখ, মুমূর্ষু জাতির জীবনে জাগে প্রাণস্পন্দন। স্বাধীনতা মানুষকে উজ্জীবিত করে বীরত্ব ও মনুষ্যত্বের প্রেরণায়।

১৭৬

সকল কালের সকল দেশের সকল মানুষ আসি,
এক মোহানায় দাঁড়াইয়া শুন এ মিলনের বাঁশী।
একজনে দিলে ব্যথা
সমান হইয়া বাজে সে বেদনা সকলের বুকে হেথা।
একের অসম্মান
নিখিল মানব-জাতির লজ্জা– সকলের অপমান।
মহা-মানবের মহা-বেদনার আজি মহা-উত্থান,
উর্ধ্বে হাসিছে ভগবান, নীচে কাঁপিতেছে শয়তান!

সারমর্ম : মানব-মিলনের মধ্য দিয়েই রচিত হয় মহামানবের তীর্থভূমি। সেখানে একে অন্যের বেদনা, লজ্জা ও অপমান ভাগাভাগি করে নেয়। ফলে বিশ্বের ব্যথিত, ঘৃণিত ও অপমানিতদের সংঘবদ্ধ মহা-উত্থানে যেমন তারা সফলতা লাভ করবে তদ্রূপ মানবতার শত্রুদের ঘনিয়ে আসবে অন্তিম মুহূর্ত। এটাই বিধাতার অভিপ্রায়।



১৭৭

সবারে বাসিব ভাল, করিব না আত্মপর ভেদ
সংসারে গড়িব এক নতুন সমাজ।
মানুষের সাথে কভু মানুষের রবে না বিচ্ছেদ–
সর্বত্র মৈত্রীর ভাব করিবে বিরাজ।
দেশে দেশে যুগে যুগে কত যুদ্ধ কত না সংঘাত
মানুষে মানুষে হলো কত হানাহানি।
এবার মোদের পুণ্যে সমুদিবে প্রেমের প্রভাত
সোল্লাসে গাহিবে সবে সৌহার্দ্যের বাণী।

সারমর্ম : পৃথিবীতে মানুষে মানুষে যুদ্ধ–সংঘাত, হানাহানির যে-অবস্থা বিরাজমান তাতে শান্তি প্রতিষ্ঠা আদৌ সম্ভব নয়। তাই এসব পরিহার করে প্রেম, ভালোবাসা আর সৌহার্দ্যের সম্পর্ক গড়ে তোলাই সকলের কাম্য।

১৭৮

সন্ধ্যা যদি নামে পথে, চন্দ্র যদি পূর্বাচল কোণে নাই হয় উদয়,
তারকার পুঞ্জ যদি নিভে যায় প্রলয় জলদে,
না করিব ভয়।
হিংস্র ঊর্মি ফণা তুলি, বিভীষিকা মূর্তি ধরি যদি
গ্রাসিবারে আসে,
সে মৃত্যু লজ্মিয়া যাব সিন্ধু পারে নবজীবনের
নবীন আশ্বাসে।

সারমর্ম : প্রতিবন্ধকতাকে জয়ের মধ্যেই জীবনের সার্থকতা। তাই জীবনে যত আঘাত, বাধা-বিপত্তি, ভয় এবং দুঃখের অমানিশা ঘনিয়ে আসুক না কেন তাতে ভেঙে পড়লে চলে না। নতুন জীবন গড়তে সেসব উপেক্ষা করে প্রগতির দিকে ধাবিত হতে হবে।

১৭৯

সব সাধকের বড় সাধক আমার দেশের চাষা,
দেশ মাতারই মুক্তিকামী দেশের সে যে আশা।
দধীচি কি ইহার চেয়ে সাধক ছিলেন বড়?
পুণ্য এত হবে নাকো, সব করিলেও জড়।
মুক্তিকামী মহাসাধক মুক্ত করে দেশ,
সবারই সে অন্ন যোগায় নাইকো গর্ব লেশ।
ব্রত তাহার পরের হিত সুখ নাহি চায় নিজে,
রৌদ্রদাহ-তপ্ত তনু মুখায় মেঘে ভিজে।
আমার দেশের মাটির ছেলে করি নমস্কার,
তোমায় দেখে চূর্ণ হউক সকল অহঙ্কার।

সারমর্ম : যে সাধনার ফল সবাই ভোগ করতে পারে তা-ই বড় সাধনা। আর এ সাধনাটিই করে থাকেন আমাদের দেশের চাষী। তার অক্লান্ত পরিশ্রমে ফলানো ফসলের ওপর নির্ভর করেই দেশের আর মানুষ বেঁচে থাকে। তাই এ চাষীই সবচেয়ে বড় সাধক যার সাধনার নিকট দধীচির মহান আত্মত্যাগও ম্লান।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



১৮০

সিন্ধুতীরে খেলে শিশু বালি নিয়ে খেলা
রচি গৃহ, হাসি-মুখে ফিরে সন্ধ্যাবেলা
জননীর অঙ্কোপরে! প্রাতে ফিরে আসি
হেরে—তার গৃহখানি কোথা গেছে ভাসি।
আবার গড়িতে বসে— সেই তার খেলা,
ভাঙ্গা আর গড়া নিয়ে কাটে তার বেলা।
এই যে খেলা— হায়, এর আছে কিছু মানে?
যে জন খেলায় খেলা সেই বুঝি জানে।

সারমর্ম : ভাঙা-গড়ার ক্রমিক অনুবর্তনেই অবর্তিত মানবজীবন। অব্যাহত এ ভাঙা-গড়ার মধ্যেই আসে সীমাবদ্ধ সময়ের প্রায়োগিক অনুশীলনের সুযোগ। আর একমাত্র স্রষ্টাই জানেন ভাঙা-গড়ার এ নিগূঢ় তত্ত্ব।

১৮১

সৃজন লীলার প্রথম হতে প্রভু
ভাঙ্গা-গড়া চলছে অনুক্ষণ,
পাখী জনম, শাখী জনম হতে,
রাখছ কথা, শুনছ নিবেদন।
আজ কি হঠাৎ নিঠুর তুমি হবে?
কান্না শুনে নীরব হয়ে রবে?
এমন কভু হয় না তোমার ভবে
মনে মনে বলছে আমার মন।

সারমর্ম : সৃষ্টি, স্থিতি ও বিনাশকর্তা মহান আল্লাহ সকলের প্রতি সমান দৃষ্টি রাখেন। তিনি কাউকে নিরাশ করেন না। তাই কেউ ভক্তিভরে তাকে স্মরণ করলে তিনি অবশ্যই সাড়া দিয়ে থাকেন।

১৮২

সাগর পাড়ি দেব আমি নবীন সদাগর—
সাত সাগরে ভাসবে আমার সপ্ত মধুকর।
আমার ঘাটের সওদা নিয়ে যাবে দূরের ঘাটে,
চলবে আমার বেচাকেনা বিশ্ব জোড়া হাটে,
ময়ূরপঙ্খী বজরা আমার সাতখানা পাল তুলে
ঢেউয়ের দোলায় মরাল সম চলবে দুলে দুলে।
সিন্ধু আমার বন্ধু হবে, রতন মাণিক তার
আমার তরী বোঝাই দিতে আনবে উপহার।
দ্বীপে দ্বীপে আমার আশায় জাগবে বাতিঘর,
শুক্তি দিবে মুক্তামালা, প্রবাল দেবে কর।
আমায় ঘিরে সিন্ধু শকুন করবে এসে ভিড়
হাতছানিতে ডাকবে আমায় নতুন দেশের তীর।

সারমর্ম : কূপমণ্ডুকতায় আচ্ছন্ন হওয়াতে নয়, বিশ্বব্যাপী পরিব্যপ্ত হওয়াতেই জীবনের প্রকৃত সার্থকতা। নিজস্ব প্রচেষ্টায় নব নব অভিযানে জয়লাভের মাধ্যমেই কেবল সেটা সম্ভব।



১৮৩

সুকঠিন গার্হস্থ্য ব্যাপার
সুশৃঙ্খলে কে পারে চালাতে?
রাজ্য শাসনের রীতিনীতি
সূক্ষ্মভাবে রয়েছে ইহাতে।

সারমর্ম : ক্ষুদ্রের মধ্যেই বৃহতের অস্তিত্ব বিদ্যমান। তদ্রূপ গার্হস্থ্য জীবন পরিচালনার মাধ্যমেই মানুষ লাভ করে রাজ্য শাসনের অভিজ্ঞতা তথা জীবনযুদ্ধে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করার যোগ্যতা।

১৮৪

সেই আদি-যুগে যবে অসহায় নর
নেত্র মেলি ভবে,
চাহিয়া আকাশ পানে— কারে ডেকেছিল,
দেবে না মানবে?
কাতর আহ্বান সেই মেঘে মেঘে উঠি,
লুটি গ্রহে গ্রহে,
ফিরিয়া কি আসে নাই, না পেয়ে উত্তর,
ধরায় আগ্রহে?

সারমর্ম : মানুষ মানুষের জন্য। তাদের সকল কর্মযজ্ঞ মানবকল্যাণের নিমিত্তে। ফলে মানুষের মধ্যে গড়ে উঠেছে পারস্পরিক নির্ভরশীলতার সম্পর্ক, হয়েছে সমাজের সূচনা। তাই সভ্যতা সৃষ্টিতে দেবতা নয়, মানুষই একক কৃতিত্বের দাবি রাখে।

১৮৫

সৃষ্টির কথা ভাবে যারা আগে সংহারে করে ভয়,
যুগে যুগে সংহারের আঘাতে তাদের হয়েছে লয়।
কাঠ না পুড়ায়ে আগুন জ্বালাবে বলে কোন অজ্ঞান?
বনস্পতি ছায়া পাবে বীজ নাহি দিলে তার প্রাণ?
তলোয়ার রেখে খাপে এরা, ঘোড়া রাখিয়া আস্তাবলে
রণজয়ী হবে দন্তবিহীন বৈদান্তিকী ছলে!
প্রাণ-প্রবাহের প্রবল বন্যা বেয়ে খরস্রোতা নদী
ভেঙেছে দুকূল; সাথে সাথে ফুল ফুটায়েছে নিরবধি।
জলধির মহা-তৃষ্ণা জাগিয়েছে যে বিপুল নদীস্রোতে
সে কি দেখে, তার স্রোতে কে ডুবিল, কে মরিল তার পথে?
মানে না বারণ, ভরা যৌবন শক্তি-প্রবাহ ধায়
আনন্দ তার মরণ-ছন্দে কূলে কূলে উথলায়।

সারমর্ম : ধ্বংস ও সৃষ্টি মুদ্রার এপিট ও ওপিট। ধ্বংসেই সৃষ্টির সূচনা। তাই প্রচলিত কুসংস্কার ও প্রতিবন্ধকতার প্রাচীরকে ধ্বংস করতে না পারলে কল্যাণময় কিছু করা সম্ভব নয়। বস্তুত, ধ্বংস এবং মৃত্যুকে স্বীকার করেই নতুনের সৃষ্টি সম্ভব।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



১৮৬
সবচেয়ে দুর্গম যে মানুষ আপন অন্তরালে
তার কোনো পরিমাপ নাই বাহিরের দেশে কালে
সে অন্তরময়।
অন্তর মিলালে পরে তার অন্তরের পরিচয়।
পাইনে সর্বত্র তার প্রবেশের দ্বার,
বাধা হয়ে আছে মোর বেড়াগুলি জীবন যাত্রার।
চাষী ক্ষেত্রে চালাইছে হাল,
তাঁতী বসে তাঁত বোনে, জেলে ফেলে জাল,
বহুদূর প্রসারিত এদের বিচিত্র কর্মভার
তারি 'পরে ভর দিয়ে চলিতেছে সমস্ত সংসার।
প্রতি ক্ষুদ্র অংশে তার সম্মানের চির নির্বাসনে
সমাজের উচ্চ মঞ্চে বসেছি সংকীর্ণ বাতায়নে।
মাঝে মাঝে গেছি আমি ওপাড়ার প্রাঙ্গণের ধারে,
ভিতরে প্রবেশ করি সে শক্তি ছিল না একেবারে।
জীবনে জীবন যোগ করা
না হলে কৃত্রিম পণ্যে ব্যর্থ হয় গানের পসরা।

**সারমর্ম :** মানব মন দুর্জ্ঞেয়। সাধারণ মানুষের হৃদয়ের সম্পূর্ণ পরিচয় আভিজাত্য ও সম্মানের উচ্চস্তর থেকে পাওয়া দুঃসাধ্য। তাই জ্ঞান দিয়ে নয়, জীবনের সাথে জীবনের পূর্ণসংযোগ ঘটিয়ে গভীর সহানুভূতিশীল হৃদয় দিয়ে তাকে উপলব্ধি করতে হয়।

১৮৭
সাগর-গর্ভে, নিঃসীম নভে, দিগ্‌-দিগন্ত জুড়ে
জীবনোদ্বেগে তাড়া করে ফেরে নিতি যারা মৃত্যুরে,
মানিক আহরি' আনে যারা খুঁড়ি পাতাল যক্ষপুরী,
নাগিনীর বিষজ্বালা সয়ে করে ফণা হ'তে মণি চুরি।
হানিয়া বজ্র-পাণির বজ্র উদ্ধত শিরে ধরি,
যাহারা চপলা মেঘ-কন্যারে করিয়াছে কিঙ্করী।
পবন যাদের ব্যজনী দুলায় হইয়া আজ্ঞাবাহী;
এসেছি তাদের জানাতে প্রণাম, তাহাদের গান গাহি।

**সারমর্ম :** বৃদ্ধ নয় নবীনরাই পারে ত্রিলোকের অপার রহস্য উদ্‌ঘাটনের উদ্দেশ্যে জীবনকে বাজি রেখে ও মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ে অসীম অনন্ত সাগর-বক্ষে পাড়ি দিতে ও মহাশূন্যে অভিযানে অগ্রসর হতে। কোনোকিছুই তাদের দুঃসাহসী অভিযানে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারে না। তাই এ নবীনদেরই জয়গান গাওয়া সকলের উচিত।



১৮৮
স্বার্থের সমাপ্তি অপঘাতে। অকস্মাৎ
পরিপূর্ণ স্ফীতি-মাঝে দারুণ আঘাত
বিদীর্ণ বিকীর্ণ করি চূর্ণ করে তারে
কালঝড়া ঝংকারিত দুর্যোগ-আঁধারে।
একের স্পর্ধারে কভু নাহি দেয় স্থান
দীর্ঘকাল নিখিলের বিরাট বিধান।
স্বার্থ যত পূর্ণ হয় লোভ ক্ষুধানল
তত তার বেড়ে উঠে– বিশ্বধরাতল
আপনার খাদ্য বলি, না করি বিচার
জঠরে পুরিতে চায়। বীভৎস আহার
বীভৎস ক্ষুধারে করে নির্দয় নিলাজ–
তখন গর্জিয়া নামে তব রুদ্র বাজ।
ছুটিয়াছে জাতিপ্রেম মৃত্যুর সন্ধানে
বাহি স্বার্থতরী, গুপ্ত পর্বতের পানে।

**সারমর্ম :** লোভ ক্রমেই স্ফীত ও বীভৎস হয়ে ওঠে। তবে বিধাতার বিধানে বীভৎসতার কোনো স্থান নেই। ফলে স্বার্থ নিজেই নিজের ক্ষতি করে; সকল আশা-আকাঙ্ক্ষা চূর্ণ করে।

১৮৯
সোনা নহে, পিতল নহে, নহে সোনার মুখ–
কালো বরণ চাষির ছেলে জুড়ায় যেন বুক।
যে কালো তার মাঠেরি ধান, যে কালো তার গাও,
যেই কালোতে সিনান করে উড়াল তাহার গাঁও।
আখড়াতে তার বাঁশের লাঠি অনেক মানে মানী,
খেলার দলে তারে নিয়ে সবাই টানাটানি।
জারির গানে তার গলা উঠে সবার আগে,
শাল-সুন্দরী-বেত, যেন ও, সকল কাজে লাগে।
বুড়োরা কয়, ছেলে নয়ত, পাগলা লোহা যেন
রূপাই যেমন বাপের বেটা কেউ দেখেছে হেন?
যদিও রূপাই নয় গো রূপা– তাহার চেয়ে দামী
এক কালেতে ওরই নামে সব গাঁ হবে নামী।

**সারমর্ম :** কৃষি নির্ভর, গ্রাম প্রধান পল্লী বাংলায় চাষীদের স্থান সবার ওপরে। তাদের আত্মত্যাগ, ধৈর্য, কৃতকর্মই তাদের এ মর্যাদা দিয়েছে। সোনা, রূপা বা অন্য কোনো মূল্যবান ধাতুর সাথে এ মর্যাদ তুলনা করা যায় না। কেননা তাদের কর্মযজ্ঞ ও আত্মত্যাগের মাঝেই দেশের উজ্জ্বল ভাবমূর্তি নিহিত।

১৯০
'সুখ' 'সুখ' বলে তুমি, কেন কর হা হুতাশ,
সুখ ত পাবে না কোথা, বৃথা সে সুখের আশ।
পথিক মরুভূমির মাঝে খুঁজিয়া বেড়ায় জল,
জল ত মিলে না, সেথা মরীচিকা করে ছল,
তেমনি এ বিশ্ব মাঝে, সুখ ত পাবে না তুমি,

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



১৯১

মরীচিকা প্রায় সুখ, —এ বিশ্ব যে মরুভূমি।
ধন-রত্ন সুখৈশ্বর্য কিছুতেই সুখ নাই,
সুখ পর উপকারে, তারি মাঝে খোঁজ ভাই,
আমিত্বকে বলি দিয়া স্বার্থত্যাগ কর যদি,
পরের হিতের জন্য ভাব যদি নিরবধি,
নিজ সুখ ভুলে গিয়ে ভাবিলে পরের কথা,
মুছালে পরের অশ্রু ঘুচালে পরের ব্যথা,
আপনাকে বিলাইয়া দীন-দুঃখীদের মাঝে,
বিদূরিলে পর দুঃখ সকাল বিকালে সাঁঝে,
তবে পাইবে সুখ আত্মার ভিতরে তুমি–
যা রোপিবে— তাই পাবে, সংসার যে কর্মভূমি।

সারমর্ম : ধন-দৌলত, টাকা-পয়সার মধ্যে সুখ নেই। সুখ মরুভূমির মরীচিকার মতো। হাত বাড়িয়ে তাকে নাগালের মধ্যে পেতে চাইলে কেবলি তা দূরে সরে যায়। নিজের স্বার্থ জলাঞ্জলী দিয়ে দীন-দুঃখীর সেবাব্রতে নিয়োজিত হলেই প্রকৃত সুখের সন্ধান মিলে।

১৯২

সে যুগ হয়েছে বাসী,
সে যুগে পুরুষ দাস ছিল নাক', নারীরা ছিল যে দাসী।
বেদনার যুগ, মানুষের যুগ, সাম্যের যুগ, আজি
কেহ রহিবে না বন্দী কাহারও, উঠিছে ডঙ্কা বাজি,
নর যদি রাখে নারীরে বন্দী, তবে এর পর যুগে
আপনার রচা ঐ কারাগারে পুরুষ মরিবে ভুগে।
যুগেরই ধর্ম এই—
পীড়ন করিলে সে পীড়ন এসে পীড়া দেবে তোমাকেই।
শোন মর্ত্যের জীব।
অন্যের যত করিবে পীড়ন, নিজে হবে তত ক্লীব।

সারমর্ম : বর্তমানে নারী-পুরুষের সম অধিকার প্রতিষ্ঠিত। মানুষে মানুষে সাম্যের বন্ধন; মানবতার স্বাধীন ও দৃপ্ত পদক্ষেপে চতুর্দিক মুখরিত ও ধ্বনিত। ফলে নারীকে আজ বন্দি করে রাখতে চাইলে পীড়ককে স্মরণ রাখতে হবে— অন্যের ওপর পীড়নের অভিশাপ তাকে নিজেকেই পীড়িত করবে।

১৯৩

হউক সে মহাজ্ঞানী মহা ধনবান,
অসীম ক্ষমতা তার অতুল সম্মান,
হউক বিভব তার সম সিন্ধু জল,
হউক প্রতিভা তার অক্ষুণ্ন উজ্জ্বল,
হউক তাহার বাস রম্য হর্ম্য মাঝে,
থাকুক সে মণিময় মহামূল্য সাজে,
হউক তাহার রূপ চন্দ্রের উপম,
হউক বীরেন্দ্র সেই যেন সে রোস্তম,
শত শত দাস তার সেবুক চরণ,
করুক স্তাবকদল স্তব সংকীর্তন।



কিন্তু যে সাধে নি কভু জন্মভূমি হিত,
স্বজাতির সেবা যেবা করে নি কিঞ্চিৎ,
জানাও সে নরাধমে জানাও সত্বর,
অতীব ঘৃণিত সেই পাষণ্ড বর্বর।

সারমর্ম : স্বদেশ ও স্বজাতির সেবার চেয়ে মহৎ কিছু নেই। জ্ঞান ও বিত্ত, প্রতিভা ও শক্তি, সম্পদ ও বিলাসিতার জোরে মানুষ খ্যাতির শিখরে উঠতে পারে। কিন্তু দেশপ্রেম-বিবর্জিত মানুষ সত্যিকারের মানুষের সম্মান পেতে পারে না। দেশ ও জাতির ঘৃণাই তার প্রাপ্য।

১৯৪

'হায় গগন নহিলে তোমারে ধরিবে কেবা।
ওগো তপন তোমার স্বপন দেখি যে, করিতে পারি নে সেবা।'
শিশির কহিল কাঁদিয়া,
'তোমারে রাখি যে বাঁধিয়া
হে রবি, এমন নাহিকো আমার বল।
তোমা বিনা তাই ক্ষুদ্র জীবন কেবলই অশ্রুজল।'
'আমি বিপুল কিরণে ভুবন করি যে আলো,
তবু শিশিরটুকুরে ধরা দিতে পারি,
বাসিতে পারি যে ভালো!'
শিশিরের বুকে আসিয়া
কহিল তপন হাসিয়া,
'ছোট হয়ে আমি রহিব তোমারে ভরি,
তোমার ক্ষুদ্র জীবন গড়িব হাসির মতন করি।'

সারমর্ম : সূর্যের প্রকৃত স্থান সুবিশাল মহাকাশে। এক বিন্দু শিশিরের সাধ্য নেই বিশাল সূর্যকে ধারণ করার। বরং সূর্য ছাড়া শিশিরের অস্তিত্ব কেবল পরিণত হয় অশ্রুজলে। কিন্তু সূর্য বিশাল হলেও সামান্যের ইচ্ছাপূরণে তার একটুও দ্বিধা নেই। সূর্য তার জ্যোতিতে শিশিরকে করে তোলে সৌন্দর্যে উদ্ভাসিত। এখানেই বড়র ঔদার্য ও মহত্ত্ব।

১৯৫

হাস্য শুধু আমার সখা? অশ্রু আমার কেহই নয়?
হাস্য করেই অর্ধজীবন করেছি তো অপচয়!
চলে যা রে সুখের রাজ্য, দুঃখের রাজ্য নেমে আয়,
গলা ধরে কাঁদতে শিখি গভীর সমবেদনায়।
সুখের সঙ্গ ছেড়ে করি দুঃখের সঙ্গে বসবাস—
ইহাই আমার ব্রত হউক, ইহাই আমার অভিলাষ।
যেথায় ক্লান্তি, যেথায় ব্যাধি, যন্ত্রণা ও অশ্রুজল,
ওরে তোরা হাতটি ধরে আমায় সেথা নিয়ে চল।
পরের দুঃখে কাঁদতে শেখা তাহাই শুধু চরম নয়।
মহৎ দেখে কাঁদতে জানা—তবেই কাঁদা ধন্য হয়।

সারমর্ম : নিছক হাসি ও আনন্দ মানব জীবনের একমাত্র ও চরম পাওয়া নয়। গভীর সমবেদনা নিয়ে অন্যের দুঃখ-কষ্টের সঙ্গে নিজেকে সম্পৃক্ত করাতেই মানব জীবনের প্রকৃত সার্থকতা নিহিত। আর তাহলেই মানুষের জীবন মহৎ তাৎপর্য লাভ করে।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



১৯৬

হে চিরদীপ্ত, সুপ্তি ভাঙাও
জাগর-গানে,
তোমার শিখাটি উঠুক জ্বলিয়া
সবার প্রাণে।
ছায়া ফেলিয়াছে প্রলয়ের নিশা,
আঁধারে ধরণী হারায়েছে দিশা
তুমি দাও বুকে অমৃতের তৃষা
আলোর ধ্যানে—
ধ্বংসতিলক, আঁকে চক্রীরা
বিশ্বভালে,
হৃদয়-ধর্ম বাঁধা পড়ি ফাঁদে
স্বার্থজালে।
মৃত্যু জ্বালিয়েছে জীবন-মশাল,
চমকিছে মেঘের খর তরবার,
বাজুক তোমার মন্ত্র ভয়াল
বজ্র-তানে।

সারমর্ম : আলোকিত মানুষের মহান দায়িত্ব সকলকে নবচেতনায় উজ্জীবিত করা। সভ্যতাকে ধ্বংস করার জন্যে যখন চারধার থেকে কালো আঁধার ছেয়ে আসে, স্বার্থান্বেষীদের চক্রান্তে যখন মানবতা বিপন্ন হয়ে পড়ে তখন ধ্বংসের হাত থেকে বিশ্বকে বাঁচানোর জন্যে দৃপ্ত বলিষ্ঠতায় বিশ্ববাসীকে উজ্জীবিত করার দায়িত্ব আলোকিত মানুষদের।

১৯৭

হে দারিদ্র্য, তুমি মোরে করেছ মহান !
তুমি মোরে দানিয়াছ খ্রিস্টের সম্মান
কণ্টক মুকুট শোভা। —দিয়াছ তাপস,
অসঙ্কোচ প্রকাশের দুরন্ত সাহস;
উদ্ধত উলঙ্গ দৃষ্টি; বাণী ক্ষুরধার,
বাণী মোর শাপে তব হ'ল তরবার!
দুঃসহ দাহনে তব হে দর্পী তাপস,
অম্লান স্বর্গেরে মোর করিলে বিরস,
অকালে শুকালে মোর রূপ রস প্রাণ!
শীর্ণ করপুট ভরি' সুন্দরের দান
যতবার নিতে যাই—হে বুভুক্ষু, তুমি
অগ্রে আসি, কর পান! শূন্য মরুভূমি
হেরি মম কল্পলোক।

সারমর্ম : নির্মম ও দুঃসহ হলেও কঠিন-কঠোর জীবনদৃষ্টি ও স্পষ্ট ভাষণের ক্ষমতা দিয়ে দারিদ্র্য মানব জীবনকে করে মহিমান্বিত। কিন্তু তারই পাশাপাশি দারিদ্র্যের অগ্নিদাহনে রূপ ও রসপিপাসু মানবমন ভরে যায় রুক্ষ রিক্ততায়, আর কল্পনার রাজ্যে নেমে আসে মরুশূন্যতা।



১৯৮

হে মহাজীবন, আর এ কাব্য নয়
এবার কঠিন, কঠোর গদ্যে আনো,
পদ-লালিত্য ঝঙ্কার মুছে যাক,
গদ্যের কড়া হাতুড়িকে আজ হানো!
প্রয়োজন নেই, কবিতার স্নিগ্ধতা—
কবিতা, তোমায় দিলাম আজকে ছুটি,
ক্ষুধার রাজ্যে পৃথিবী গদ্যময়;
পূর্ণিমা-চাঁদ যেন ঝলসানো রুটি—

সারমর্ম : সুন্দরের সাধক হলেও কবির কাজ শুধু কল্পনার জগৎ নির্মাণ করা নয়, কঠিন ও কঠোর বাস্তবের মুখে তাকে রূঢ় সত্যকেও বাণীরূপ দিতে হয়। দায়বদ্ধ কবি জানেন, জীবনধারণের দাবি যেখানে উপেক্ষিত সেখানে কল্পনা-বিলাসিতা নিরর্থক। রূঢ় বাস্তবতার রূপায়ণই তখন তার কবিতার লক্ষ হয়ে দাঁড়ায়।

১৯৯

হে বঙ্গ, ভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন–
তা সবে [অবোধ আমি] অবহেলা করি,
পর-ধন-লোভে মত্ত করিনু ভ্রমণ
পরদেশে, ভিক্ষাবৃত্তি কুক্ষণে আচরি'।
কাটাইনু বহুদিন সুখ পরিহরি
অনিদ্রায়, অনাহারে সপি কায় মন,
মজিনু বিফল তপে অবরেণ্যে বরি'–
কেলিনু, শৈবাল ভুলি' কমল-কানন।
স্বপ্নে তব কুললক্ষ্মী কয়ে দিলা পরে,–
'ওরে বাছা, মাতৃকোষে রতনের রাজি,
এ ভিখারি দশা তবে কেন তোর আজি?
যা ফিরি অজ্ঞান তুই, যারে ফিরি ঘরে।'
পালিলাম আজ্ঞা সুখে পাইলাম কালে
মাতৃভাষারূপ খনি, পূর্ণ মণিজালে।

সারমর্ম : বঙ্গভাষা বিবিধ ঐশ্বর্যে পরিপূর্ণ হলেও অনেক বাঙালি বিদেশী ভাষার পেছনে মোহগ্রস্তের মতো ছুটে মরে। অথচ তারা জানে না মাতৃভাষাকে বাদ দিয়ে বিদেশী ভাষা গ্রহণ করলে শুধু প্রতিভারই অপচয় হয় না পরিণামে আত্মগ্লানিতে ভুগতে হয়। বস্তুত পরভাষার প্রতি অতি আগ্রহ ও ভিক্ষাবৃত্তি উভয়ই সমানভাবে নিন্দনীয়।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



২০০

হাতুড়ি শাবল গাঁইতি চালায়ে ভাঙিল যারা পাহাড়
পাহাড় কাটা সে পথের দুপাশে পড়িয়া যাদের হাড়,
তোমারে সেবিতে হইল যাহারা মজুর, মুটে ও কুলি,
তোমারে বহিতে যারা পবিত্র অঙ্গে লাগাল ধুলি,
তারাই মানুষ, তারাই দেবতা, গাহি তাহাদেরি গান,
তাদেরই ব্যথিত বক্ষে পা ফেলে আসে নব-উত্থান!

সারমর্ম : বিশ্বে যারা তিল তিল করে নিজেদের প্রাণশক্তি দান করে, মুটে, মজুর ও কুলিরূপে করে মানুষের অকুণ্ঠ সেবা, তারাই আজ চির নির্যাতিত, চির ব্যথিত। অথচ তাদের মধ্যেই সৃষ্টিকর্তার অধিষ্ঠান, তাদের বহু-বিচিত্র কর্মের মধ্যেই স্রষ্টার প্রকাশ। আর তাই তাদের ব্যথাহত হৃদয়ের সম্মিলিত মহাবেদনায় আজ শোনা যায় নব-জাগরণের বাণী।

২০১

"হোক, তবু বসন্তের প্রতি কেন এই তব তীব্র বিমুখতা?"
কহিলাম, "উপেক্ষায় ঋতুরাজে কেন কবি দাও তুমি ব্যথা?"
কহিল সে কাছে সরে আসি–
"কুহেলি উত্তরী তলে মাঘের সন্ন্যাসী–
গিয়াছে চলিয়া ধীরে পুষ্পশূন্য দিগন্তের পথে
রিক্ত হস্তে! তাহারেই পড়ে মনে, ভুলিতে পারি না কোন মতে।"

সারমর্ম : বসন্তের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য মানবমনের অফুরন্ত অনন্দের উৎস। কিন্তু এ মন যদি কোনো কারণে বিষণ্ন থাকে, তবে সে বসন্ত ও তাকে স্পর্শ করতে পারে না; বসন্ত উপেক্ষিত হয় মনের অজান্তেই।

২০২

হে মোর দুর্ভাগা দেশ, যাদের করেছ অপমান,
অপমান হতে হবে তাহাদের সবার সমান।
মানুষের অধিকারে বঞ্চিত করেছ যারে
সম্মুখে দাঁড়ায়ে রেখে তবু কোলে দাও নাই স্থান,
অপমান হতে হবে তাহাদের সবার সমান ॥
মানুষের পরশেরে প্রতিদিন ঠেকাইয়া দূরে
ঘৃণা করিয়াছ তুমি মানুষের প্রাণের ঠাকুরে।
বিধাতার রুদ্ররোষে দুর্ভিক্ষের দ্বারে বসে
ভাগ করে খেতে হবে সকলের সাথে অন্নপান।
অপমান হতে হবে তাহাদের সবার সমান ॥

সারমর্ম : দুর্বলরা সর্বদা সবল কর্তৃক নিগৃহীত, নির্যাতিত; তাদের ভোগ-বিলাসের শিকার। কিন্তু মানুষের প্রতি মানুষের এ আচরণ কাম্য নয়। কেননা অচিরেই এমন দিন আসবে যখন প্রায়শ্চিত্ত করতে তাকে বঞ্চিতদের কাতারে এসেই দাঁড়াতে হবে।

২০৩

হে মহামানব, একবার এস ফিরে,
শুধু একবার চোখ মেলো এই গ্রাম নগরের ভীড়ে,
এখানে মৃত্যু হানা দেয় বার বার,
লোকচক্ষুর আড়ালে এখানে জমেছে অন্ধকার।
এই যে আকাশ, দিগন্ত মাঠ স্বপ্নে সবুজ মাটি
নীরবে মৃত্যু গেড়েছে এখানে ঘাঁটি,
কোথাও নেইকো পার
মারী ও মড়ক, মন্বন্তর, ঘন ঘন বন্যার



আঘাতে আঘাতে ছিন্নভিন্ন ভাঙা নৌকার পাল,
এখানে চরম দুঃখে কেটেছে সর্বনাশের খাল,
ভাঙা ঘর, ফাঁকা ভিটাতে জমেছে নির্জনতার কালো,
হে মহামানব, এখানে শুকনো পাতায় আগুন জ্বালো।

সারমর্ম : প্রাকৃতিক দুর্যোগ, মহামারী, খাদ্যাভাবে ছিন্নভিন্ন গ্রামবাংলার অজ্ঞ, দারিদ্র্য-পীড়িত ও অবহেলিত মানুষেরা ঘোর অন্ধকারে নিমজ্জিত। এ অবস্থা থেকে মুক্তি পেতে প্রয়োজন একজন মহামানবের, যার পক্ষে সম্ভব হবে জীবন্মৃত এসব মানুষের মুক্তি নিশ্চিত করা।

২০৪

হাটে হাটে আমি ঘুরে যে বেড়াই—
সে নহে করিতে হাট;
হাটের বক্ষে দেখে যাই আমি
কত যে কাঁদিছে মাঠ।
কত যে মাঠের আঁচলের ধনে
ভরা এ হাটের ডালা,
কত যে মাঠের ছিন্ন কুসুমে
হাটের গলার মালা!

সারমর্ম : পণ্য কেনাবেচার স্থান হাটে বিরাজ করে মানুষের কর্মকোলাহল। মাঠে ফলিত নানা ফসলে সুসজ্জিত হয় গোটা হাটের ভূমি কিন্তু হাটের ক্ষেত্র আজীবন উর্বরতাশূন্য ভূমি হয়ে থাকে। এটা হাটভূমির এক নির্মম দুঃখ, যা জীবনের গভীর অনুসন্ধিৎসায় বাস্তব জগতেও প্রতিভাত হয়।

২০৫

"হোক, তবু বসন্তের প্রতি কেন এই তব তীব্র বিমুখতা?"
কহিলাম, "উপেক্ষায় ঋতুরাজে কেন কবি দাও তুমি ব্যথা?"
কহিল সে কাছে সরে আসি–
"কুহেলি উত্তরী তলে মাঘের সন্ন্যাসী–
গিয়াছে চলিয়া ধীর পুষ্প শূন্য দিগন্তের পথে
রিক্ত হস্তে! তাহারেই পড়ে মনে, ভুলিতে পারি না কোন মতে।

সারমর্ম : দুঃসময়ের অধিক দুঃখ ভোগের কাতরতায় বিমূঢ় মানবচিত্ত পরিবর্তিত পরিস্থিতির সাথে সহজে খাপ খাইয়ে নিতে পারে না। কেননা নিকট অতীতের বিরহ বেদনা তাকে আবিষ্ট করে রাখে, তাতে নব্য সুখানুভূতি কোনো প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে না।

২০৬

হায় হায় জনমিয়া যদি না ফুটালে
একটি কুসুম নয়ন কিরণে
একটি জীবন ব্যথ্যা যদি না জুড়ালে
বুক ভরা প্রেম ঢেলে বিফল জীবনে
আপনারে রাখিলে জীবন সাধনা
জনম বিশ্বের তরে পরার্থে কামনা।

সারমর্ম : ব্যক্তিস্বার্থ সিদ্ধি বা ব্যক্তির কল্যাণের জন্য নয়, পরার্থে কল্যাণকর কাজে লিপ্ত হওয়া মানুষ মাত্রেই কর্তব্য। অপরের সাথে নিজের সুখ-দুঃখের ভাগাভাগি করে নেয়াতেই জীবনের সার্থকতা।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

# বিগত বিসিএস পরীক্ষার প্রশ্ন সমাধান

## ১০ম বিসিএস : ১৯৮৯-১৯৯০

ক. তরুণ বিশ্ব শক্তির অধিকারী, অনন্ত সম্ভাবনাপূর্ণ তার জীবন। সে যদি শুধু ঘরের কোণে বসে পূর্ব পুরুষের লিখিত পুথি ঘেঁটে তার অমূল্য মানবজীবনকে সার্থক করতে চায় এবং মনে করে, বর্তমানের সবকিছু অতীতে সৃষ্ট হয়েছিল, তাহলে সে যে শুধু তার অনন্ত শক্তিকে অপব্যয় করে তা নয়, তার সেই শক্তিদাতাকেও অবমাননা করে। অতীত সৃষ্টির জন্মদাতা অতীতের ঘটনা ও অতীতের পরিবেষ্টন। বর্তমান ঘটনা ও বর্তমান পরিবেষ্টন চিরকালই নতুন। বর্তমান অতীতের কুঁড়ি বৈ আর কিছু নয়। বর্তমানের আপন শক্তিতে সেই কুঁড়ি ফুটে নব পুষ্পে পরিণত হয়। সুতরাং তার ফলও নতুন হওয়া চাই। কিন্তু দুঃখের বিষয়, মানব-মন অতীতের মোহ ছাড়তে পারে না। সে এই বর্তমানের পরিবর্তিত নব পরিবেষ্টনেও সেই অতীতের ইতিহাসকে হুবহু বজায় রাখতে চায়– বর্তমানের নব প্রসব-বেদনাকে উপেক্ষা করে। তাই মানব ইতিহাসের স্তরে স্তরে দেখতে পাই কত দ্বন্দ্ব, কত সংঘর্ষ, কত বিগ্রহ-বিপ্লব, কত রক্ত-বন্যা। এর মূল কারণ হচ্ছে অতীতের সৃষ্টিকে অক্ষুণ্ন রাখার জন্য মানব-মনের স্বাভাবিক দুর্জয়। চিরকালই তরুণ এই প্রকৃতির বিরুদ্ধে অভিযান করেছে। বর্তমান বেদনায় অনুভূতির চঞ্চল হয়ে ভবিষ্যতে আদর্শকে সার্থক করার জন্য।

সারাংশ : তরুণ শক্তি ও সম্ভাবনার প্রতীক। পূর্বেকার ইতিহাস যতোই সমৃদ্ধ হোক না কেন, তরুণদেরকেই অধ্যায় ঘেঁটে তাদের মহামূল্যবান শক্তি ও সময় নষ্ট করার মানে হয় না। কিন্তু দুঃখের বিষয় অতীতের মোহ না ছাড়তে পারাই বর্তমানের দ্বন্দ্ব ও সংঘর্ষের কারণ। এ প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে চিরদিনই সংগ্রাম করে তরুণকে ভবিষ্যৎ সার্থক করতে হয়।

খ.
দেখিলাম এ কালে
আত্মঘাতি মূঢ় উন্মত্ততা, দেখিনু সর্বাঙ্গে তার
বিকৃতির কদর্য বিদ্রূপ। একদিকে স্পর্ধিত ক্রুরতা,
মত্ততার নির্লজ্জ হুংকার, অন্যদিকে ভীরুতার
দ্বিধাগ্রস্ত চরণবিক্ষেপ, বক্ষে আলিঙ্গিয়া ধরি
কৃপণের সতর্ক সম্বল-সন্ত্রস্ত প্রাণীর মতো
ক্ষণিক গর্জন-অন্তে ক্ষীণ স্বরে তখনই জানাই
নিরাপদ নীরব নম্রতা।

সারমর্ম : বর্তমান পৃথিবীটা দ্বন্দ্ব-সংঘাত ও অরাজকতায় পরিপূর্ণ। দুর্বলের উপর সবলের অত্যাচার পৃথিবীর অমোঘ সত্যে পরিণত হয়েছে। একতাবদ্ধ হয়ে অন্যায়-অত্যাচারের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়া সচেতন মানবের সংখ্যা দিনের পর দিন লোপ পাচ্ছে; কতিপয় মানবসেবী রূপী মানুষ এর প্রতিবাদে সোচ্চার হলেও পরক্ষণেই অত্যাচারীর স্পর্ধা ও নির্লজ্জ হুঙ্কারে তা বিলীন হতে দেখা যায়।



## ১১তম বিসিএস : ১৯৯০-৯১

ক. এখন দিন গিয়েছে। অন্ধকার হয়ে আসে। একদিন এই পথকে মনে হয়েছিল আমারই পথ, একান্তই আমার। এখন দেখছি, কেবল একটি বার মাত্র এই পথ দিয়ে চলার হুকুম নিয়ে এসেছি, আর নয়। নেবুতলা উজিয়ে সেই পুকুরপাড়, দ্বাদশ দেউলের ঘাট, নদীর চর, গোয়ালবাড়ি, ধানের গোলা পেরিয়ে– সেই চেনা চাউনি, চেনা কথা, চেনা মুখের মহলে আর একটি বারও ফিরে গিয়ে বলা হবে না। 'এইযে'! এই পথ যে চলার পথ, ফেরার পথ নয়।
আজ ধূসর সন্ধ্যায় একবার পিছন ফিরে তাকালুম; দেখলুম, এই পথটি বহু বিস্মৃত পদচিহ্নে পদাবলী, বৈরবীর সুরে বাঁধা।
যতকাল যত পথিক চলে গেছে তাদের জীবনের সমস্ত কথাকেই এই পথ আপনার একটি মাত্র ধূলিরেখায় সংক্ষিপ্ত করে এঁকেছে; সে একটি রেখা চলেছে সূর্যোদয়ের দিক থেকে সূর্যাস্তের দিকে, এক সোনার সিংহদ্বার থেকে আর এক সোনার সিংহদ্বার।

সারাংশ : এক সময় জীবনের সমস্ত আয়োজনই চোখে পড়ে, ধরা পড়ে ভুল ও ভ্রম। সে সময় অবশ্য কিছু করার থাকে না, কালের গতিতে শুধু নিজেকে ঠেলে দিতে হয়। আর বিগত দিনের সমস্ত আয়োজন, পণ ও মতাদর্শ বিস্মৃতির অতলে ফেলে মানুষকে বিদায় নিতে হয় পৃথিবী থেকে।

খ.
অদ্ভুত আঁধার এসেছে এ পৃথিবীতে আজ
যারা অন্ধ সবচেয়ে বেশি আজ চোখে দ্যাখে তারা;
যাদের হৃদয়ে কোনো প্রেম নেই, প্রীতি নেই, করুণার আলোড়ন নেই
পৃথিবী অচল আজ তাদের সুপরামর্শ ছাড়া।
যাদের গভীর আস্থা আছে আজো মানুষের প্রতি,
এখনো যাদের কাছে স্বাভাবিক বলে মনে হয়
মহৎ সত্য বা রীতি, কিংবা শিল্প অথবা সাধনা
শকুন ও শেয়ালের খাদ্য আজ তাদের হৃদয়।

সারমর্ম : মহৎ ও ভালো মনের মানুষের বসবাসের অনুপযোগী হয়ে এসেছে পৃথিবী আজ। প্রেম-দয়াহীন, নিষ্ঠুর ও জ্ঞানহীন লোকেরা পৃথিবীর নিয়ন্তা হয়ে উঠেছে। প্রজ্ঞাবান, সৌন্দর্যপিপাসু, মানবপ্রেমিক, দয়ালু ও ন্যায়বান লোকেরা আজ লাঞ্ছিত, অবহেলিত।

## ১৩তম বিসিএস : ১৯৯১-৯২

ক. নব্যযুগের গ্রীসের বিজ্ঞানবল প্লেটোর যুগের এথেন্সের চেয়ে অনেক বেশি। এখন গ্রীসে রেলগাড়ি আছে, সেখানে মটর ছুটছে, স্টীমার ছুটছে, তোপ, কামান, বন্দুক, কলকারখানা সবই আছে; আর প্রাচীন এথেন্সে এসবের কোন চিহ্নই ছিল না। এসব সত্ত্বেও প্লেটোর এথেন্সকে আমরা নবীন গ্রীস অপেক্ষা বেশি সভ্য বলে মনে করি। এর কারণ কি? এর কারণ হচ্ছে এই যে, প্রাচীন এথেন্সে মানবাত্মার যে বিকাশ হয়েছিল আজকালকার গ্রীসে তার কোনও লক্ষণ দেখতে পাওয়া যায় না। জীবনের মূল উদ্দেশ্যের সন্ধানে এথেন্স যে বিকাশ দেখিয়েছিল এখনকার গ্রীসে তা দেখতে পাওয়া যায় না। ব্যক্তিত্বের সম্যক বিকাশের চেষ্টা এথেন্সই করেছিল; এখনকার গ্রীসে সে প্রচেষ্টা নেই।

সারাংশ : জ্ঞান-বিজ্ঞানের আদিভূমি নামে খ্যাত গ্রিসের এথেন্স এখন নবরূপে উদ্ভাসিত হয়েছে। তবুও প্লেটোর সমকালীন এথেন্স বর্তমানের এথেন্সের চেয়ে অধিক সভ্য বলে প্রতীয়মান হয়। কেননা জীবনের মূল উদ্দেশ্যের সন্ধানে ব্যক্তিত্বের সম্যক বিকাশে প্লেটোর এথেন্স যে ভূমিকা রেখেছিল বর্তমান বিজ্ঞান-প্রযুক্তিতে অগ্রসরমান এথেন্সও সে ভূমিকা রাখতে ব্যর্থ হচ্ছে।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



খ.
আমি যে দেখিনু তরুণ বালক উন্মাদ হয়ে ছুটে
কি যন্ত্রণায় মারিছে পাথরে নিষ্ফল মাথা কুটে।
কণ্ঠ আমার রুদ্ধ আজিকে বাঁশি সঙ্গীত হারা,
অমাবস্যার কারা
লুপ্ত করেছে আমার ভুবন দুঃস্বপনের তরে
তাই তো তোমার শুধুই অশ্রুজলে–
যাহারা তোমার বিষাইছে বায়ু নিভাইছে তব আলো,
তুমি কি তাদের ক্ষমা করিয়াছ, তুমি কি বেসেছ ভাল?

সারমর্ম : হিংসাশ্রয়ীর চক্রান্ত ও অপশক্তির দাপটের কাছে মানবতা আজ ভূলুণ্ঠিত। অত্যাচারীর দৌরাত্ম্যে নিপীড়িত মানুষ ন্যায়বিচারহীন অসহায়ত্বের অপমান মুখ বুঁজে সইতে বাধ্য হচ্ছে। অন্যায়ের প্রতিকারে অগণিত তরুণ প্রাণের আত্মদানেও জাগ্রত হয়নি বিশ্ববিবেক। মানবতা হরণকারী ও পৃথিবীকে যারা বসবাসের অনুপযোগী করে রাখছে তাদের প্রতি ঘৃণা ছাড়া ক্ষমা কিংবা ভালোবাসা প্রদর্শন করা যায় না।

## ১৫তম বিসিএস : ১৯৯৩-৯৪

ক. নদীমাতৃক দেশে নদী যদি একেবারে শুকিয়ে যায় তাহলে তার মাটিতে ঘটে কৃপণতা, তার অন্ন উৎপাদনের শক্তি ক্ষীণ হয়। দেশের আপন জীবিকা যদিবা কোনমতে চলে, কিন্তু যে অন্ন প্রাচুর্যের দ্বারা বাইরের বৃহৎ জগতের সঙ্গে তার যোগ সেটা যায় দরিদ্র হয়ে। যেমন বিশেষ দেশ নদীমাতৃক, তেমনি বিশেষ জনচিত্ত আছে যাকে নদীমাতৃক বলা চলে। সে চিত্তের এ যেন নিত্যপ্রবাহিত মননধারা যার যোগে বাহিরকে সে আপনার মধ্যে টেনে আনে; নিজের মধ্যেকার ভোগ-বিভেদ তার ভেসে যায়–যে প্রবাহ চিন্তার ক্ষেত্রকে নব-নব সফলতায় পরিপূর্ণ করে, নিরন্তর অন্ন জোগায় সকল দেশকে, সকল কালকে।

সারাংশ : মানুষের জীবন প্রবাহকে নদীর সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। শুষ্ক নদী যেমন মানব কল্যাণে তেমন ভূমিকা রাখতে পারে না, তেমনি পরবিমুখ ব্যক্তির হৃদয়ে ভালোবাসা চিত্তের মননধারা লুপ্ত হয় বলে তার মনের সংকীর্ণতা ও স্বার্থপরতা প্রকাশ পায়। অপরদিকে পরের কল্যাণে নিবেদিত প্রাণ সমাজ ও জাতিকে সত্য সুন্দর ও আলোর দিশারী বহনে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

খ.
আশার ছলনে ভুলি কী ফল লভিনু হায়, তাই ভাবি মনে।
জীবন প্রবাহ বহি কাল-সিন্ধু পানে ধায়
ফিরাব কেমনে? দিন দিন আয়ুহীন,
হীনবল দিন দিন, তবু এ আশার নেশা ছুটিল না? এ কি দায়!

সারমর্ম : মানব জীবন নদীর মতোই গতিশীল। কিন্তু আশার ছলনায় ভুলে গড্ডলিকা প্রবাহে চলতে থাকলে জীবনের অভিষ্ট লক্ষ্য ব্যাহত হয়। তখন জীবনে নেমে আসে দুর্বিষহ যন্ত্রণা ও হতাশা।

## ১৭তম বিসিএস : ১৯৯৫-৯৬

ক.
জোটে যদি মোটে একটি পয়সা
খাদ্য কিনিও ক্ষুধার লাগি।
দু'টি যদি জোটে তবে অর্ধেকে
ফুল কিনে নিও, হে অনুরাগী।
বাজারে বিকায় ফল ও তন্দুল;



সে শুধু মিটায় দেহের ক্ষুধা
হৃদয় প্রাণের ক্ষুধা নাশে ফুল
দুনিয়ার মাঝে সে-ই তো সুধা!

সারাংশ : মানবজীবনে দৈহিক চাহিদার পাশাপাশি আত্মিক চাহিদার গুরুত্বও অপরিহার্য। কেবল ক্ষুৎপিপাসার নিবৃত্তিই জীবনের মোক্ষ নয়। সৌন্দর্য চর্চা মানবজীবনেরই একটি অংশ। তাই দৈহিক চাহিদার পাশাপাশি সামর্থ্য অনুযায়ী আত্মিক চাহিদাও পূরণ করা উচিত।

খ.
অদ্ভুত আঁধার এক এসেছে এ পৃথিবীতে আজ,
যারা অন্ধ সবচেয়ে বেশি আজ চোখে দ্যাখে তারা;
যাদের হৃদয়ে কোন প্রেম নেই, প্রীতি নেই, করুণার
আলোড়ন নেই পৃথিবী অচল আজ তাদের সুপরামর্শ ছাড়া।
যাদের গভীর আস্থা আছে মানুষের প্রতি
এখনো যাদের কাছে স্বাভাবিক বলে মনে হয়
মহৎ সত্য ও রীতি, কিংবা শিল্প অথবা সাধনা
শকুন ও শেয়ালের খাদ্য আজ তাদের হৃদয়।

সারমর্ম : বর্তমান পৃথিবী নানা জটিলতা ও বিশৃঙ্খলায় পরিপূর্ণ। প্রেম-দয়াহীন, নিষ্ঠুর ও জ্ঞানহীন লোকেরা পৃথিবীর নিয়ন্তা হয়ে উঠেছে। প্রজ্ঞাবান, সৌন্দর্যপিপাসু, মানবপ্রেমিক, দয়ালু ও ন্যায়বান লোকেরা আজ লাঞ্ছিত, অবহেলিত।

## ১৮তম বিসিএস : ১৯৯৭-৯৮

ক.
আমি দেখে এসেছি নদীর ঘাড় ধরে
আদায় করা হচ্ছে বিদ্যুৎ–
ভাল কথা।
কলে তৈরি হচ্ছে বড় বড় রেলের ইঞ্জিন
খুব ভাল।
মশা মাছি সাপ বাঘ তাড়িয়ে
ইস্পাতের শহর বসছে–
আমরা সত্যই খুশি হচ্ছি।
কিন্তু মোটেই খুশি হচ্ছি না যখন দেখছি–
যার হাত আছে তার কাজ নেই,
যার কাজ আছে তার ভাত নেই,
যার ভাত আছে তার হাত নেই।

সারমর্ম : মানুষ প্রাকৃতিক শক্তিকে কাজে লাগিয়ে তৈরি করেছে বিশাল সভ্যতা। যার ফলে নদীকে নিয়ন্ত্রণ করে তৈরি হচ্ছে বিদ্যুৎ, বিশাল বিশাল কারখানায় তৈরি হচ্ছে রেলের ইঞ্জিন, দুর্গম জীবজন্তুপূর্ণ অরণ্যে তৈরি হচ্ছে অত্যাধুনিক শহর। এসবই অত্যন্ত আনন্দের কথা। কিন্তু যখন এই সভ্যতাই মানুষের রুটি-রুজির নিশ্চয়তা কেড়ে নেয়, মানুষকে যান্ত্রিক করে তোলে এবং সমাজে বৈষম্য সৃষ্টি করে তখন তা হয়ে দাঁড়ায় খুবই মর্মান্তিক ব্যাপার। কারণ, মানুষের প্রয়োজনেই এবং তার কল্যাণের জন্যই সভ্যতার সৃষ্টি।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



খ. কবি ও কবিতার নাম উল্লেখ করে সারমর্ম লিখুন :

হে দারিদ্র্য তুমি মোরে করেছ মহান।
তুমি মোরে দানিয়াছ খ্রীষ্টের সম্মান
কণ্টক-মুকুট শোভা।– দিয়াছ তাপস,
অসঙ্কোচ প্রকাশের দুরন্ত সাহস;
উদ্ধত উলঙ্গ দৃষ্টি; বাণী ক্ষুরধার;
বীণা মোর শাপে তব হল তরবার।

সারমর্ম : কবি ও কবিতা : কাজী নজরুল ইসলামের 'দারিদ্র্য'।
দারিদ্র্য যদিও নির্মম ও দুঃসহ কিন্তু এই দারিদ্র্যই মানুষকে মুক্ত, স্বাধীন ও মহান করে তোলে। মানুষের দৃষ্টিভঙ্গিকে করে তোলে উদার, সব বাধাবিঘ্নকে অতিক্রম করার সাহস ও শক্তি যোগায়। দারিদ্র্য দেয় অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার শক্তি, ক্ষুরধার বাণী ও মুক্ত দৃষ্টি।

## ২০তম বিসিএস : ১৯৯৮-৯৯

ক.
ছোট বালুকার কণা, বিন্দু বিন্দু জল,
গড়ি তোলে মহাদেশ সাগর অতল।
মুহূর্তে নিমেষ কাল, তুচ্ছ পরিমাণ,
গড়ে যুগ-যুগান্তর-অনন্ত মহান।
প্রত্যেক সামান্য ত্রুটি, ক্ষুদ্র অপরাধ,
ক্রমে টানে পাপ পথে, ঘটায় প্রমাদ।
প্রতি করুণার দান, স্নেহপূর্ণ বাণী,
এ ধরায় স্বর্গ শোভা নিত্য দেয় আনি।

সারমর্ম : সকল বড় বস্তুই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বস্তুর সমন্বয়ে সৃষ্টি। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অণু-পরমাণুর দ্বারাই বিশাল জগতের সৃষ্টি হয়েছে। তাই ক্ষুদ্রকে বাদ দিয়ে বৃহৎ কিছুর কল্পনা করা অযৌক্তিক। ছোট ছোট বালুকণা কিংবা বিন্দু বিন্দু পানি দ্বারাই সৃষ্টি হয় মহাদেশ বা বিশাল সাগর। আবার ছোট ছোট মুহূর্তের সমবায়েই সৃষ্টি হয় মহাকালের। সামান্য অপরাধ কিংবা কাজের সামান্য ভুলত্রুটি যেমন মহাপাপী বা মহাবিপদ সৃষ্টি করতে পারে, তেমনি সামান্য দয়া, সহানুভূতি বা স্নেহসিক্ত কথা জগতে সৃষ্টি করতে পারে স্বর্গীয় সুখের ধারা।

খ. বার্ধক্য তাই– যাহা পুরাতনকে, মিথ্যাকে মৃতকে আঁকড়াইয়া পড়িয়া থাকে। বৃদ্ধ তাহারাই– যাহারা মায়াচ্ছন্ন ; নব মানবের অভিনব জয়যাত্রায় যাহারা শুধু বোঝা নয়, বিঘ্ন। শতাব্দীর নবযাত্রীর চলার ছন্দে ছন্দ মিলাইয়া যাহারা কুচকাওয়াজ করিতে জানে না, পারে না। যাহারা জীব হইয়াও জড়। যাহারা অটল সংস্কারের পাষাণ স্তূপ আঁকড়াইয়া শুধু পড়িয়া থাকে। বৃদ্ধ তাহারাই যাহারা নব অরুণোদয় দেখিয়া নিদ্রাভঙ্গের ভয়ে দ্বার রুদ্ধ করিয়া পড়িয়া থাকে। আলোক পিয়াসী প্রাণচঞ্চল শিশুদের কলকোলাহলকে যাহারা বিরক্ত হইয়া অভিসম্পাত করিতে থাকে। জীর্ণ পুঁথি চাপা পড়িয়া যাহাদের নাভিশ্বাস বহিতেছে। ইহাদের ধর্ম বার্ধক্য। বার্ধক্যকে সব সময় বয়সের ফ্রেমে বাঁধা যায় না। বহু বৃদ্ধকে যুবককে দেখিয়াছি– যাহাদের যৌবনের উর্দির নিচে বার্ধক্যের কঙ্কাল মূর্তি। আবার বহু বৃদ্ধকে



দেখিয়াছি যাহাদের বার্ধক্যের জীর্ণবরণের তলে মেঘলুপ্ত সূর্যের মত প্রদীপ্ত যৌবন। তরুণ নামের জয়মুকুট শুধু তাহার, যাহার শক্তি অপরিসীম। গতিবেগ যাত্রার ন্যায়, তেজ নির্মেঘ আষাঢ়-মধ্যাহ্নের মার্তণ্ডপ্রায় ; বিপুল যাহার আশা, ক্লান্তিহীন যাহার উৎসাহ, বিরাট যাহার সাধ, মৃত্যু যাহার মুঠিতলে।

সারাংশ : বার্ধক্য বা তারুণ্য নিরূপণের জন্য বয়স কোনো সঠিক মাপকাঠি নয়। মিথ্যা, বার্ধক্য ও জীর্ণতাকে কেবল বার্ধক্যই আঁকড়ে ধরে রাখে, তারুণ্য নয়। সময়ের নতুন চলার ছন্দে যারা পা মিলাতে পারে না, যারা কুসংস্কারাচ্ছন্ন; মিথ্যা ও প্রাচীনত্বে যারা আচ্ছন্ন তারাই বৃদ্ধ– তারা যে বয়সেরই হোক না কেন। নতুনকে গ্রহণ করতে না পারা, নতুন জীবনের ছন্দে উজ্জীবিত হতে না পারা এবং পুঁথিসর্বস্ব বিদ্যা তাদের সম্বল। আর যারা প্রাণচাঞ্চল্যে ভরপুর, মানুষের নব নব যাত্রার অগ্রপথিক এবং সৌন্দর্য ও সত্যের পূজারী তারা বয়সে বৃদ্ধ হয়েও তারুণ্যের প্রতিমূর্তি।

## ২১তম বিসিএস : ২০০০

ক.
পৃথিবীতে কত দ্বন্দ্ব, কত সর্বনাশ,
নূতন নূতন কত গড়ে ইতিহাস॥
রক্তপ্রবাহের মাঝে ফেনাইয়া উঠে,
সোনার মুকুট কত ফুটে আর টুটে!
সভ্যতার নব নব কত তৃষ্ণা ক্ষুধা॥
উঠে কত হলাহল, উঠে কত সুধা!
শুধু হেথা দুই তীরে, কেবা জানে নাম,
দোঁহা-পানে চেয়ে আছে দুইখানি গ্রাম।
এই খেয়া চিরদিন চলে নদী স্রোতে॥
কেহ যায় ঘরে, কেহ আসে ঘর হতে।

সারমর্ম : পৃথিবীতে প্রত্যহ নানা দ্বন্দ্ব-সংঘাত ঘটছে এবং নতুন ইতিহাসের সৃষ্টি হচ্ছে। কিন্তু এসব সংঘাত ও ধ্বংসের মাঝেও সভ্যতার স্রোত তার নিজস্ব গতিতে চলছে। সভ্যতার ফলে আমরা যেমন উপকৃত হচ্ছি তেমনি আবার দূষিতও করছি পৃথিবীকে। তারপরও সময়ের বিবর্তনে পুরাতন সভ্যতা বিলীন হচ্ছে নতুন সভ্যতা গড়ে উঠছে।

খ. মানুষের মূল্য কোথায়? চরিত্র, মনুষ্যত্ব, জ্ঞান ও কর্ম। বস্তুত চরিত্র বললেই মানুষের জীবনের যা কিছু শ্রেষ্ঠ তা বুঝতে হবে। চরিত্র ছাড়া মানুষের গৌরব করার আর কিছুই নাই। মানুষের শ্রদ্ধা যদি মানুষের প্রাপ্য হয়, মানুষ যদি মানুষকে শ্রদ্ধা করে, সে শুধু চরিত্রের জন্য। অন্য কোনো কারণে মানুষের মাথা মানুষের সামনে নত হয় না। জগতে যে সকল মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করেছেন, তাদের গৌরবের মূল এই চরিত্রশক্তি। তুমি চরিত্রবান লোক, এ কথার অর্থ এই নয় যে, তুমি শুধু লম্পট নও। তুমি সত্যবাদী, বিনয়ী এবং জ্ঞানের প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ কর। তুমি পরদুঃখকাতর, ন্যায়বান এবং মানুষের ন্যায় স্বাধীনতাপ্রিয়—চরিত্রবান মানে এই।

সারাংশ : মানুষের সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ হলো চরিত্র। এ চরিত্রগুণের জন্যই একজন মানুষ অন্য মানুষের শ্রদ্ধার যোগ্য হতে পারে। মহাপুরুষগণের গৌরবের মূল শক্তি ছিল উন্নত চরিত্র। শুধু লাম্পট্যহীনতাই চরিত্র নয়, পরদুঃখকাতর, ন্যায়বান ও স্বাধীনতাপ্রিয় এসবের সম্মিলনই চরিত্র।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



## ২২তম বিসিএস : ২০০১

ক.

আমাদের একরত্তি উঠোনের কোণে
উড়ে আসা চৈত্রের পাতায়
পাণ্ডুলিপি বই ছেঁড়া মলিন খাতায়
গ্রীষ্মের দুপুরে ঢকঢক্
জল খাওয়া কুঁজোয় গেলাশে, শীত ঠক্ঠক্
রাত্রির নরম লেপে দুঃখ তার বোনে
নাম
অবিরাম।

সারমর্ম : দীন ও দরিদ্র মানুষের জীবন বৈচিত্র্যহীন গ্রীষ্ম কিংবা শীত সব ঋতুতেই দুঃখ ও কষ্টকে জীবনের অনিবার্য ঘটনা হিসেবে মেনে নিতে হয় তাদের।

খ. জন্তুরা আহার পায় বাঁচে, আঘাত পায় মরে, যেটাকে পায় সেটাকেই বিনা তর্কে মেনে নেয়। কিন্তু মানুষের সবচেয়ে বড়ো স্বভাব হচ্ছে মেনে না নেয়া। জন্তুরা বিদ্রোহী নয়, মানুষ বিদ্রোহী। বাইরে থেকে ঘটে, যাতে তার নিজের কোনো হাত নেই, কোনো সায় নেই, সেই ঘটনাকে মানুষ একেবারে চূড়ান্ত বলে স্বীকার করেনি বলেই জীবের ইতিহাসে সে আজ এত বড় গৌরবের পদ দখল করে বসেছে।

সারাংশ : সৃষ্টিকুলের মাঝে মানুষ শ্রেষ্ঠ। মানুষের এ শ্রেষ্ঠত্বের মূলে রয়েছে মানুষের যুক্তিবাদিতা। এর ফলে অন্যান্য প্রাণী যেখানে প্রকৃতির ক্রীড়নক, মানুষ সেখানে প্রকৃতির উপর প্রভুত্ব করতে সক্ষম।

## ২৩তম বিসিএস : ২০০১

ক.

এ দুর্ভাগা দেশ হতে হে মঙ্গলময়,
দূর করে দাও তুমি সর্ব তুচ্ছ ভয়
লোকভয়, রাজভয় মৃত্যুভয় আর,
দীনপ্রাণ দুর্বলের এ পাষাণ ভার।
এ চির পেষণ যন্ত্রণা ধূলিতলে,
এই নিত্য অবনতি, দণ্ডে পলে পলে,
এই আত্ম-অবমান, অন্তরে বাহিরে
এই দাসত্বের রজ্জু ত্রস্ত নতশিরে
সহস্রের পদপ্রান্ততলে বারংবার
মনুষ্য মর্যাদা গর্ব চির পরিহার।
এই বৃহৎ লজ্জারাশি চরণ আঘাতে
চূর্ণ করি দূর কর। মঙ্গল প্রভাতে
মস্তক তুলিতে দাও অনন্ত আকাশে
উদার আলোক মাঝে, উন্মুক্ত বাতাসে।



সারমর্ম : মানুষের জীবনকে সুন্দর ও সার্থক করতে হলে চাই মুক্তি। বন্ধনের দাসত্বে জীবনের বিকাশ রুদ্ধ হয়ে পড়ে, মনুষ্যত্ববোধ ও মর্যাদা হয় খণ্ডিত। আত্ম-অবমাননা মানুষের জীবনস্রোতকে ক্ষীণ ও সংকীর্ণ করে তোলে। উদার মুক্তির স্পর্শেই মানুষ মহৎ হতে পারে এবং ব্যক্তিত্ব ও মনুষ্যত্বের বিকাশ ঘটাতে পারে। তাই সমস্ত লাঞ্ছনা আর বঞ্চনা উপেক্ষা করে মুক্ত আকাশের নিচে জাতি মাথা উঁচু করে দাঁড়াক—এটাই আজকের কামনা।

খ. চরিত্র শুধু মানব জীবনের অলংকার নহে, ইহা আবার একটি অমূল্য সম্পত্তিও। আমাদের পার্থিব ধন-সম্পত্তির মূল্য নির্ধারণ করা যায়, কিন্তু চরিত্রের কোনো মূল্য নির্ধারণ করা যায় না। চরিত্রবান লোক নির্ধন হলেও ধনীর ন্যায় সম্মান লাভ করিয়া থাকেন। চরিত্রবলে মানুষ বহুর উপরে আধিপত্য স্থাপন করে। ধনী ধন লইয়া সকল সময় শান্তিলাভ করিতে পারেন। কিন্তু চরিত্র ধনে ধনী ব্যক্তি সততই চিত্তের শান্তি লাভ করিতে পারেন। চরিত্র মানুষের মনুষ্যত্বের উপাদান। সুতরাং চরিত্রই মানব জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ—একমাত্র কাম্যবস্তু।

সারাংশ : চরিত্র মানব জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ ও ভূষণ। এ সম্পদের সাথে অপর কোনো সম্পদের তুলনাই হয় না। মানুষের ধন-সম্পত্তি, ক্ষমতা-প্রতিপত্তি কম থাকতে পারে কিন্তু চরিত্রবান ব্যক্তির কাছে এসবের অভাব খুবই তুচ্ছ ব্যাপার। অর্থবিত্ত না থাকলেও চরিত্রবান ব্যক্তির চিত্তে সদাই প্রশান্তি বিদ্যমান থাকে। এতে সে মনুষ্যত্বের স্বাদ পায় এবং জীবন হয় সার্থক।

## ২৪তম বিসিএস : ২০০৩

ক.

বিপুলা এ পৃথিবীর কতটুকু জানি!
দেশে দেশে কত-না নগর রাজধানী
মানুষের কত কীর্তি, কত নদী গিরি সিন্ধু মরু,
কত-না অজানা জীব, কত-না অপরিচিত তরু
রয়ে গেল অগোচরে, বিশাল বিশ্বের আয়োজন;
মন মোর জুড়ে থাকে অতিক্ষুদ্র তারি এক কোণ।

সারমর্ম : অজানাকে জানার, অদেখাকে দেখার বাসনা মানুষের চিরন্তন। কিন্তু বিশাল এ পৃথিবীর অনেক তথ্য ব্যক্তিমানুষের কাছে রহস্যই থেকে যায়। কেননা, পৃথিবীর নানা দেশের গিরি-পর্বত, মানুষের কীর্তি, জীববৈচিত্র্যের রহস্য অবলোকন তার পক্ষে সম্ভব নয়। তাই বিশাল বিশ্বের এ সমারোহের মাঝে তার হৃদয় গভীরে অপূর্ণতার আর্তি বেজে ওঠে।

খ. যুগধর্মের সহিত আমাদিগকে পা মিলাইয়া চলিতে হইবে, কিন্তু তাহার নিকট অমন করিয়া আত্মসমর্পণ করিলে চলিবে না। আমাদের বুঝিতে হইবে— যাহাকে আমরা যুগধর্ম বলি, তাহার অনেকখানি হুজুগ-ধর্ম। এই হুজুগ-ধর্মের তাড়নায় ভাসিয়া না গিয়া তাহাকে রোধ করিতে পারিলেই আমাদের মঙ্গল। যাহারা চিন্তাশীল, যাহারা মহাপুরুষ, তাহারা আপন চিন্তা, পৌরুষ ও মহিমা দ্বারা যুগ প্রবাহকে ফিরাইয়া দেন— যুগ-ধর্মের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া তাঁহারা যুদ্ধ করেন। আর যাহারা দুর্বল ও অপরিণামদর্শী, তাহারাই নূতনের প্রথম আঘাতেই পরাজয় স্বীকার করে।

সারাংশ : কুসংস্কারাচ্ছন্ন, সমাজ সংস্কার ও লোকাচারে পরাভূত জীবনে সাফল্যমণ্ডিত নয়। সংকীর্ণমনা, দুর্বল ও অপরিণামদর্শীরাই অন্যায় ও কুসংস্কারের কাছে আত্মসমর্পণ করে। কিন্তু মহৎ ও মুক্ত চিন্তাশীল ব্যক্তি এসবের বিরুদ্ধে দৃঢ় অবস্থান নেন। তারাই সমাজকে গড্ডলিকা প্রবাহের হাত থেকে রক্ষা করে, সমাজকে নতুন আলোয় উদ্ভাসিত করে তোলেন।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



## ২৫তম বিসিএস : ২০০৫

ক. "মনুষ্য স্বভাবতঃই স্বসুখনিরত। সে আপনার বিনা আর কিছু জানে না, আপনার বিনা আর কিছু বোঝে না, আপনার বই আর কিছুরই খবর লইতে অবসর পায় না। এইরূপ আত্মচিন্তা প্রাণিমাত্রেরই অপরিহার্য গতি। ইহা যেমন মনুষ্যে আছে, পশুপক্ষী কীট-পতঙ্গাদিতেও তেমনই বিদ্যমান রহিয়াছে। কারণ, ক্ষুধা-তৃষ্ণা যাহার জীবনশক্তির প্রণোদনা এবং শীত ঝড় যাহার স্বাভাবিক শত্রু, সে ব্রহ্মাণ্ডের সকলকে ছাড়িয়া আগে আপনার ভাবনা না ভাবিয়াই পারে না। আপনার ভাবনা ভুলিয়া গেলে, তাহার জীবনশক্তিই নিরবলম্ব হইয়া ম্রিয়মাণ হয়। কিন্তু, প্রকৃত মহত্ত্ব সেই আপনার ভাবনার সঙ্গে সঙ্গে ভাবনাকেও আপনার করিয়া লয় এবং সময়ে সময়ে, যেন আপনারই উচ্ছ্বাসে আপনি উচ্ছ্বসিত হইয়া; যেন আপনারই প্রভাবের স্রোতবেগে আপনি প্রবাহিত হইয়া, পরার্থ আপনাকে অল্প বা অধিক পরিমাণে এবং কুত্রচিৎ কখনও সর্বতোভাবে বিসর্জন দেয়।"

সারাংশ : জন্মগতভাবেই মানুষ আপন স্বার্থে মগ্ন। নিজের ভালোমন্দ নিয়েই তার যত চিন্তা। অন্যান্য জীবজন্তুর মধ্যেও অনুরূপ লক্ষণ দেখা যায়। পৃথিবীর সবাই যেন নিজের স্বার্থের জন্য ছুটছে আর এতে করেই গতিপ্রাপ্ত হয় পৃথিবী। কিন্তু এ স্বার্থপরতার মধ্যেও যারা প্রকৃত মহৎ তারা নিজের সুখের কথা চিন্তা না করে অন্যের সুখের জন্য স্বার্থত্যাগ করে থাকেন।

খ.

জীর্ণ পৃথিবীতে ব্যর্থ, মৃত আর ধ্বংসস্তূপ-পিঠে  
চলে যেতে হবে আমাদের।  
চলে যাব– তবু আজ যতক্ষণ দেহে আছে প্রাণ  
প্রাণপণে পৃথিবীর সরাবো জঞ্জাল,  
এ বিশ্বকে এ শিশুর বাসযোগ্য করে যাব আমি–  
নবজাতকের কাছে এ আমার দৃঢ় অঙ্গীকার।

সারমর্ম : মানব জীবন খুবই ক্ষণস্থায়ী। অসংখ্য সমস্যায় জর্জরিত পৃথিবী ক্রমান্বয়ে জীর্ণ-শীর্ণ ও ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে। তাই ক্ষণস্থায়ী জীবনে যতদিন পৃথিবীতে থাকা হবে ততদিন প্রত্যেকেরই উচিত ভালো কাজের মাধ্যমে পরবর্তী বংশধরদের জন্য সুখী সমৃদ্ধ সুন্দর পৃথিবী গড়ার দৃঢ় অঙ্গিকারবদ্ধ হওয়া। এভাবেই সম্ভব পৃথিবীকে মনুষ্য বাসের যোগ্য রাখা।

## ২৭তম বিসিএস : ২০০৬

ক. মহাসমুদ্রের শত বৎসরের কল্লোল কেহ যদি এমন করিয়া বাঁধিয়া রাখিতে পারিত যে, সে ঘুমন্ত শিশুটির মত চুপ করিয়া থাকিত, তবে সেই নীরব মহাশব্দের সহিত এই পুস্তকাগারের তুলনা হইত। এখানে ভাষা চুপ করিয়া আছে, প্রবাহ স্থির হইয়া আছে, মানবাত্মার অমর অগ্নি কাল অক্ষরের শৃঙ্খলে কাল চামড়ার কারাগারে বাঁধা পড়িয়া আছে। ইহারা সহসা যদি বিদ্রোহী হইয়া উঠে, নিস্তব্ধতা ভাঙ্গিয়া ফেলে, অক্ষরের বেড়া দগ্ধ করিয়া একবার বাহির হইয়া আসে, কালের শঙ্খ-রক্তে এই নীরব সহস্র বৎসর যদি এককালে ফুৎকার দিয়া উঠে, তবে সে বন্ধনমুক্ত উচ্ছ্বসিত শব্দের স্রোতে দেশ-বিদেশ ভাসিয়া যাইত। হিমালয়ের মাথার উপরে কঠিন তুষারের মধ্যে যেমন শত শত বন্যা বাঁধা পড়িয়া আছে, তেমনি এই পুস্তকাগারের মধ্যে মানব হৃদয়ের বন্যাকে বাঁধিয়া রাখা হইয়াছে।



বিদ্যুৎকে মানুষ লোহার তার দিয়া বাঁধিয়াছে। কিন্তু কে জানিত মানুষ শব্দকে নিঃশব্দের মধ্যে বাঁধিতে পারিবে। কে জানিত সঙ্গীতকে, হৃদয়ের আশাকে জাগ্রত আত্মার আনন্দ-ধ্বনিকে, আকাশের দৈববাণীকে সে কাগজে পুরিয়া রাখিবে, অতলস্পর্শ কাল সমুদ্রের উপর কেবল একখানা বই দিয়া সাঁকো বাঁধিয়া দিবে।

সারাংশ : ইতিহাস, ঐতিহ্য, সভ্যতা, অনুভূতির অনুরণন, নান্দনিক সৌন্দর্য প্রকাশ তথা শাশ্বত কল্যাণ প্রতিষ্ঠার ভূয়োদর্শন কালো কালির অক্ষরে পুস্তকে লিপিবদ্ধ থাকে। আর গ্রন্থাগারে যুগ-যুগান্তরের সে সম্পদ সঞ্চিত থাকে বলে গ্রন্থাগারই একটি জাতির মননের প্রতীক।

খ.

এ দুর্ভাগ্য দেশ হতে, হে মঙ্গলময়,  
দূর করে দাও তুমি সর্ব তুচ্ছ ভয়–  
লোকভয়, রাজভয়, মৃত্যুভয় আর।  
দীনপ্রাণ দুর্বলের এ পাষাণভার,  
এই চির পেষণ যন্ত্রণা, ধূলিতলে  
এই নিত্য অবনতি, দণ্ডে পলে পলে  
এই আত্ম-অবমান, অন্তরে বাহিরে  
এই দাসত্বে রজ্জু অস্ত নতশিরে  
সহস্রের পদপ্রান্ততলে বারংবার  
মনুষ্য মর্যাদা গর্ব চির পরিহার–  
এ বৃহৎ লজ্জারাশি চরণ–আঘাতে  
চূর্ণ করি দূর করো।

সারমর্ম : মানুষের জীবনকে সুন্দর ও সার্থক করতে হলে চাই মুক্তি। বন্ধনের দাসত্বে জীবনের বিকাশ রুদ্ধ হয়ে পড়ে, মনুষ্যত্ববোধ ও মর্যাদা হয় খণ্ডিত। আত্ম-অবমাননা মানুষের জীবনস্রোতকে ক্ষীণ ও সংকীর্ণ করে তোলে। উদার মুক্তির স্পর্শেই মানুষ মহৎ হতে পারে এবং ব্যক্তিত্ব ও মনুষ্যত্বের বিকাশ ঘটাতে পারে। তাই সমস্ত লাঞ্ছনা আর বঞ্চনা উপেক্ষা করে মুক্ত আকাশের নিচে জাতি মাথা উঁচু করে দাঁড়াক—এটাই আজকের কামনা।

## ২৮তম বিসিএস : ২০০৯

ক. রাস্তা পথের ভাঙন-ব্রতী অগ্রপথিক দল।  
নামরে ধূলায় — বর্তমানের মর্ত্যপানে চল।  
ভবিষ্যতের স্বর্গ লাগি'  
শূন্যে চেয়ে আছিস জাগি;  
অতীতকালের রত্ন মাগি'  
নামলি রসাতল।  
অন্ধ মাতাল। শূন্য পাতাল হাতালি নিষ্ফল ॥  
ভোলরে চির-পুরাতনের সনাতনের বোল্।  
তরুণ তাপস। নতুন জগৎ সৃষ্টি করে তোল্।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



আদিম যুগের পুঁথির বাণী
আজো কি তুই চলবি মানি?
কালের বুড়ো টানছে ঘানি
তুই সে বাঁধন খোল্।
অভিজাতের পানসে বিলাস — দুখের তাপস ভোল ॥

সারমর্ম : সুন্দর ভবিষ্যতের জন্য তরুণদেরকে অতীতকে আঁকড়ে ধরে হাত গুটিয়ে বসে থাকলে চলে না। তার জন্য রাঙা পথের ভাঙনব্রতী অগ্রপথিক হয়ে সনাতনকে ছিন্নভিন্ন করে নতুন জগৎ সৃষ্টি করতে হবে। পুরাতনকে পিছনে ফেলে, সম্মুখের সব বাধাকে অতিক্রম করে সামনে এগিয়ে যেতে হবে। আভিজাত্য, অতীত গৌরব, সীমিত পুঁথি কাল ও সুখালাস্যের মোহজালে বর্তমানকে হারালে চলবে না।

খ. জীবনটা একটা রহস্য বলেই মানুষের বেঁচে সুখ। কিন্তু তাই বলে এ রহস্যের মর্ম উদ্ঘাটন করবার চেষ্টা যে পাগলামি নয় তার প্রমাণ, মানুষ যুগে যুগে এ চেষ্টা করে এসেছে, এবং শতবার বিফল হয়েও অদ্যাবধি সে চেষ্টা থেকে বিরত হয়নি। পৃথিবীর মধ্যে যা সবচেয়ে বড়ো জিনিস তা জানবার ও বোঝবার প্রবৃত্তি মানুষের মন থেকে যে দিন চলে যাবে সে দিন মানুষ আবার পশুত্ব লাভ করবে। জীবনের যা-হয়-একটা অর্থ স্থির করে না নিলে মানুষে জীবনযাপন করতেই পারে না এবং এ পদার্থের কে কি অর্থ করেন তার উপর তাঁর জীবনের মূল্য নির্ভর করে। এ কথা ব্যক্তির পক্ষেও যেমন সত্য জাতির পক্ষেও তেমনি সত্য। দর্শন-বিজ্ঞান জীবনের ঠিক অর্থ বার করতে পারুক আর না পারুক এ সম্বন্ধে অনেক ভুল বিশ্বাস নষ্ট করতে পারে। এও বড়ো কম লাভের কথা নয়। সত্য না জানলেও মানুষের তেমন ক্ষতি নেই — মিথ্যাকে সত্য বলে ভুল করাই সকল সর্বনাশের মূল।

সারাংশ : জীবনের রহস্য ভেদ করতে মানুষের জানার বা বোঝার প্রচেষ্টা থেমে নেই। আর এ প্রবৃত্তি আছে বলেই মানুষ মনুষ্যত্বের দাবিদার। মানুষের এ প্রচেষ্টালব্ধ জ্ঞান জীবনের ঠিক অর্থ বের করতে না পারলেও অনেক ভুল বিশ্বাস বা মিথ্যাকে নষ্ট করতে পারে। বস্তুত এখানেই মানুষের জ্ঞান লাভের স্বার্থকতা।

## ২৯তম বিসিএস : ২০১০

ক. নমি আমি প্রতি জনে, আদ্বিজ চণ্ডাল,
প্রভু ক্রীতদাস!
সিন্ধুমূলে জলবিন্দু, বিশ্বমূলে অণু;
সমগ্রে প্রকাশ!
নমি কৃষি-তন্তুজীবী, স্থপতি, তক্ষক,
কর্ম, চর্মকার!
অদ্রিতলে শিলাখণ্ড— দৃষ্টি অগোচরে,
বহ অদ্রিভার!
কত রাজ্য, কত রাজা গড়িছ নীরবে
হে পূজ্য, হে প্রিয়!
একত্বে বরেণ্য তুমি, শরণ্য এককে,—
আত্মার আত্মীয়।



সারমর্ম : রাজা-প্রজা, শ্রমিক-মালিক সকলের পরিশ্রমেই গড়ে উঠেছে আজকের বিশ্বসভ্যতা। কারও অংশগ্রহণ এখানে নগ্ন বা তুচ্ছ নয়, কেউই মূল্যহীন ও নিষ্কর্মা নন। মূলত এ সমস্ত কিছুর বরেণ্য সম্মানের অংশীদার হয়ে আছেন একমাত্র স্রষ্টা পরাক্রমশালী।

খ. স্বাধীন হবার জন্য যেমন সাধনার প্রয়োজন, তেমনি স্বাধীনতা রক্ষার জন্য প্রয়োজন সত্যনিষ্ঠা ও ন্যায়-পরায়ণতার। সত্যের প্রতি শ্রদ্ধাবোধহীন জাতি যতই চেষ্টা করুক, তাদের আবেদনে নিবেদনে ফল হয় না। যে জাতির অধিকাংশ ব্যক্তি মিথ্যাচারী, সেখানে দু'চারজন সত্যনিষ্ঠকে বহু বিড়ম্বনা সহ্য করতে হয়; দুর্ভোগ পোহাতে হয়। কিন্তু মানুষ ও জাতি হিসেবে মাথা তুলে দাঁড়াতে হলে সে কষ্ট সহ্য না করে উপায় নেই।

সারাংশ : মিথ্যাচারী ও অন্যায়কারী কর্তৃক সৃষ্ট দুর্ভোগ সত্যনিষ্ঠ ব্যক্তির জন্য সুখকর না হলেও, আত্মমর্যাদাশীল জাতি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হতে হলে এ দুর্ভোগ স্বীকার করে নেয়া ছাড়া উপায় নেই।

## ৩০তম বিসিএস : ২০১১

ক.
হে মহাজীবন, আর এ কাব্য নয়
এবার কঠিন, কঠোর গদ্যে আনো,
পদ-লালিত্য ঝঙ্কার মুছে যাক,
গদ্যের কড়া হাতুড়িকে আজ হানো!
প্রয়োজন নেই, কবিতার স্নিগ্ধতা—
কবিতা, তোমায় দিলাম আজকে ছুটি,
ক্ষুধার রাজ্যে পৃথিবী গদ্যময়;
পূর্ণিমা-চাঁদ যেন ঝলসানো রুটি—

সারমর্ম : সুন্দরের সাধক হলেও কবির কাজ শুধু কল্পনার জগৎ নির্মাণ করা নয়, কঠিন ও কঠোর বাস্তবের মুখে তাকে রূঢ় সত্যকেও বাণীরূপ দিতে হয়। দায়বদ্ধ কবি জানেন, জীবনধারণের দাবি যেখানে উপেক্ষিত সেখানে কল্পনা-বিলাসিতা নিরর্থক। রূঢ় বাস্তবতার রূপায়ণই তখন তার কবিতার লক্ষ হয়ে দাঁড়ায়।

খ. হিন্দুত্ব মুসলমানত্ব দুই সওয়া যায়, কিন্তু তাদের টিকিত্ব দাড়িত্ব অসহ্য, কেননা ঐ দুটোই মারামারি বাধায়। টিকিত্ব হিন্দুত্ব নয়, ওটা হয়ত পাণ্ডিত্য। তেমনি দাড়িও ইসলামত্ব নয়, ওটা মোল্লাত্ব। এই দুই ত্ব মার্কা চুলের গোছা নিয়েই আজ এত চুলোচুলি। আজ যে মারামারিটা বেধেছে, সেটাও এই পণ্ডিত-মোল্লার মারামারি, হিন্দু-মুসলমানদের মারামারি নয়। নারায়ণের গদা আর আল্লার তলোয়ার কোনোদিনই ঠোকাঠুকি বাঁধবে না, কারণ তারা দুইজনই এক, তাঁর এক হাতের অস্ত্র তাঁরই আর এক হাতের ওপর পড়বে না।

সারাংশ : মুসলিম ও হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে গোঁড়া শ্রেণী আল্লাহ কিংবা নারায়ণের নামে কোন্দলে জড়িয়ে পরলেও প্রকৃতপক্ষে মহাবিশ্বের স্রষ্টা একজনই, দু'জন নন। তাই ধর্মান্ধতা ত্যাগ করে সম্প্রীতির সাথে সকলকে জীবন যাপন করা উচিত।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



## ৩১তম বিসিএস : ২০১১

ক. রূপনারাণের কূলে
জেগে উঠিলাম,
জানিলাম এ জগৎ স্বপ্ন নয়।
রক্তের অক্ষরে দেখিলাম
আপনার রূপ,
চিনিলাম আপনারে
আঘাতে আঘাতে
বেদনায় বেদনায়;
সত্য যে কঠিন,
কঠিনেরে ভালোবাসিলাম,
সে কখনো করে না বঞ্চনা।
আমৃত্যু দুঃখের তপস্যা এ জীবন,
সত্যের দারুণ মূল্যে লাভ করিবারে,
মৃত্যুতে সকল দেনা শোধ করে দিতে।

সারমর্ম : মানবজীবন কেবল স্বপ্নের মতো সুন্দর নয়, বরং মানবজীবনের প্রকৃতরূপ চিনতে পারা যায় কঠোর ও কঠিন বাস্তবের মুখে রূঢ় সত্যকে গ্রহণের মাধ্যমে। তবে সত্য রূঢ় হলেও সত্যবাদী পরিণামে কাঙ্ক্ষিত সুফল লাভ করে। তবে সত্যনিষ্ঠ ব্যক্তি কেবল পরকালেই তার কৃতকর্মের চূড়ান্ত ও যথার্থ পুরস্কার পাবেন।

খ. যতটুকু আবশ্যক কেবল তাহারই মধ্যে কারারুদ্ধ হইয়া থাকা মানবজীবনের ধর্ম নহে। আমরা কিয়ৎ পরিমাণে আবশ্যক শৃঙ্খলে বদ্ধ হইয়া থাকি এবং কিয়ৎ পরিমাণে স্বাধীন। আমাদের দেহ সাড়ে তিন হাতের মধ্যে বদ্ধ, কিন্তু তাই বলিয়া ঠিক সেই সাড়ে তিন হাত পরিমাণ গৃহ নির্মাণ করিলে চলে না। স্বাধীন চলাফেরার জন্য অনেকখানি স্থান থাকা আবশ্যক, নতুবা আমাদের স্বাস্থ্য ও আনন্দের ব্যাঘাত ঘটে। শিক্ষা সম্বন্ধেও এই কথা খাটে। অর্থাৎ, যতটুকু মাত্র শিক্ষা আবশ্যক— তাহারই মধ্যে ছাত্রদিগকে একান্ত নিবদ্ধ রাখিলে কখনই তাহাদের মন যথেষ্ট পরিমাণে বাড়িতে পারে না। অত্যাবশ্যক শিক্ষার সহিত স্বাধীন পাঠ না মিশাইলে ছেলেরা ভাল করিয়া মানুষ হইতে পারে না। বয়ঃপ্রাপ্ত হইলেও বুদ্ধিবৃত্তি সম্বন্ধে সে অনেকটা পরিমাণে বালকই থাকিয়া যায়।

সারাংশ : প্রয়োজন না থাকলেও একটা সীমাবদ্ধ গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ থাকা উচিত নয়। নিতান্ত প্রয়োজন ছাড়াও আমাদেরকে আরো অনেক কিছু করতে ও শিখতে হবে যা আমাদের জীবনকে পরিপূর্ণতা দান করবে।

## ৩২তম বিসিএস : ২০১২

ক. সবারে বাসিব ভাল, করিব না আত্মপর ভেদ
সংসারে গড়িব এক নতুন সমাজ।
মানুষের সাথে কভু মানুষের রবে না বিচ্ছেদ–
সর্বত্র মৈত্রীর ভাব করিবে বিরাজ।



দেশে দেশে যুগে যুগে কত যুদ্ধ কত না সংঘাত।
মানুষে মানুষে হল কত হানাহানি।
এবার মোদের পুণ্যে সমুদিবে প্রেমের প্রভাত
সোল্লাসে গাহিবে সবে সৌহার্দ্যের বাণী।

সারমর্ম : আপন-পর আত্মীয়-অনাত্মীয় সকলকে একই সম্পর্কের বন্ধনে গেঁথে আমরা একটি বৈষম্যহীন সমাজ গড়ে তুলব। যুদ্ধ বা দ্বন্দ্ব-সংঘাত নয়, পারস্পরিক ভালোবাসা ও সহমর্মিতার মাধ্যমেই বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব। আমাদের প্রত্যাশা হচ্ছে প্রেম-পুণ্যে ভরা একটি সাম্য ও সৌহার্দপূর্ণ পরিবেশ।

খ. বিশ্বের যা কিছু মহান সৃষ্টি চির-কল্যাণকর।
অর্ধেক তার করিয়াছে নারী, অর্ধেক তার নর।
বিশ্বের যা কিছু এল পাপ-তাপ বেদনা অশ্রুবারি
অর্ধেক তার আনিয়াছে নর, অর্ধেক তার নারী।
নরককুণ্ড বলিয়া কে তোমা করে নারী হেয়-জ্ঞান?
তারে বল, আদি-পাপ নারী নহে, সে যে নর-শয়তান।
অথবা পাপ যে... শয়তান যে... নর নহে নারী নহে,
ক্লীব সে, তাই সে নর ও নারীতে সমান মিশিয়া রহে।
এ বিশ্বে যত ফুটিয়াছে ফুল, ফলিয়াছে যত ফল,
নারী দিল তাহে রূপ, রস-মধু-গন্ধ সুনির্মল।

সারমর্ম : জগৎ-সভ্যতা বিনির্মাণে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলের রয়েছে সমান অবদান। নারী-পুরুষ উভয়ের পরিশ্রমেই গড়ে উঠেছে আজকের বিশ্বসভ্যতা। তাই মানুষ হিসেবে কেউ ছোট নয়, সকলেই সমান পূজনীয়।

## ৩৩তম বিসিএস : ২০১২

ক. একদা ছিল না জুতা চরণযুগলে
দহিল হৃদয় মম সেই ক্ষোভানলে।
ধীরে ধীরে চুপি চুপি দুঃখাকুল মনে
গেলাম ভজনালয়ে ভজন কারণে।
দেখি সেথা একজন পদ নাহি তার
অমনি জুতার খেদ ঘুচিল আমার।
পরের দুঃখের কথা করিলে চিন্তন
আপনার মনে দুঃখ থাকে কতক্ষণ।

সারমর্ম : মানুষের প্রত্যাশার কোনো শেষ নেই। এই অসীম প্রত্যাশা পূরণ করতে না পারার ব্যর্থতা সব সময়ই তাকে কষ্ট দেয়। কিন্তু কেউ যদি অপরের এরকম অপ্রাপ্তির বেদনার কথা গভীরভাবে চিন্তা করে তাহলে তার নিজের মনে না পাওয়ার আর কোনো দুঃখ থাকে না।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



খ. মহাসমুদ্রের শত বৎসরের কল্লোল কেহ যদি এমন করিয়া বাঁধিয়া রাখিতে পারিত যে, সে ঘুমাইয়া পড়া শিশুটির মতো চুপ করিয়া থাকিত, তবে সেই নীরব মহাশব্দের সহিত এই লাইব্রেরির তুলনা হইত। এখানে ভাষা চুপ করিয়া আছে, প্রবাহ স্থির হইয়া আছে, মানবাত্মার অমর আলোক কালো অক্ষরের শৃঙ্খলে কাগজের কারাগারে বাঁধা পড়িয়া আছে। ইহারা সহসা যদি বিদ্রোহী হইয়া উঠে, নিস্তব্ধতা ভাঙ্গিয়া ফেলে অক্ষরের বেড়া দগ্ধ করিয়া একেবারে বাহির হইয়া আসে। হিমালয়ের মাথার উপরে কঠিন বরফের মধ্যে যেমন কত কত বন্যা বাঁধা আছে, তেমনি এই লাইব্রেরির মধ্যে মানব হৃদয়ের বন্যা কে বাঁধিয়া রাখিয়াছে।

সারাংশ : ইতিহাস, ঐতিহ্য, সভ্যতা, অনুভূতির অনুরণন, নান্দনিক সৌন্দর্য প্রকাশ তথা শাশ্বত কল্যাণ প্রতিষ্ঠার ভূয়োদর্শন কালো কালির অক্ষরে পুস্তকে লিপিবদ্ধ থাকে। আর গ্রন্থাগারে যুগ-যুগান্তরের সে সম্পদ সঞ্চিত থাকে বলে গ্রন্থাগারই একটি জাতির মননের প্রতীক।

## ৩৪তম বিসিএস : ২০১৪

ক.

হে চিরদীপ্ত, সুপ্তি ভাসাও
জাগার গানে;
তোমার শিখাটি উঠুক জ্বলিয়া
সবার প্রাণে।
ছায়া ফেলিয়াছে প্রলয়ের নিশা,
আঁধারে ধরণী হারায়েছে দিশা।
তুমি দাও বুকে অমৃতের তৃষা
আলোর ধ্যানে!
ধ্বংস তিলক আঁকে চক্রীরা
বিশ্ব-ভালে।
হৃদয় ধর্ম বাঁধা পরিয়াছে
স্বার্থ-জালে।

সারমর্ম : বিশৃঙ্খলায় পরিপূর্ণ বর্তমান সমাজ এমন সেবক চায়, যারা সকলের হৃদয়ে আলো জ্বেলে অন্ধকার দূর করবে। চারদিকে আজ প্রলয়ের সুর, ধরণী অন্ধকারে নিমজ্জিত, স্বার্থলোলুপ মানুষেরা চক্রান্তের থাবা বিস্তার করে আছে সর্বত্র। তাই এ সময় সত্য সেবকদের আলোর মশাল নিয়ে বিদ্যুৎ গতিতে এগিয়ে যেতে হবে। তবেই সাধারণ মানুষ পাবে আলোর দিশা।

খ.

নিন্দুকেরে বাসি আমি সবার চেয়ে ভালো
যুগ জনমের বন্ধু আমার আঁধার ঘরের আলো।
সবাই মোরে ছাড়তে পারে বন্ধু যারা আছে
নিন্দুক সে তো ছায়ার মত থাকবে পাছে পাছে।
বিশ্বজনে নিঃস্ব করে পবিত্রতা আনে
সাধকজনে বিস্তারিতে তার মত কে জানে?

সারমর্ম : নিন্দা ও সমালোচনা জ্ঞান ও কর্মের শুদ্ধতা আনয়ন করে মানুষকে পরিপূর্ণতা দান করে। তাই জাগতিক নিন্দুক মানুষকে সঠিক পথে, সৎ কাজে ও মনুষ্যত্ব বিকাশে সহায়তা করে। তাই জাগতিক সাফল্যে সমালোচনার অবদান অনস্বীকার্য।

কচ ই ঐ

# ৩৫তম বিসিএস

৪

# বাংলা ভাষা ও সাহিত্য-বিষয়ক প্রশ্নের উত্তর

নম্বর
৩০

বাংলা ভাষা ও সাহিত্য একটি বিশাল আয়তনের সিলেবাস। অধ্যায়টির জন্য বরাদ্দ রয়েছে ৩০ নম্বর। কাজেই ভাষা ও সাহিত্যের এ অংশে ভালো করতে পারলে পুরো নম্বর পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তবে পড়ার বিষয় নির্বাচন ও কিছু কিছু টেকনিক অবলম্বন করতে পারলে আপনার সফল হওয়া অবশ্যম্ভাবী।

**গুরুত্ব দিতে হবে যেসব বিষয়ে**

- ☐ বিগত বছরের বিসিএস ও পিএসসি গৃহীত অন্যান্য নিয়োগ পরীক্ষায় বাংলা সাহিত্যে আসা প্রশ্নগুলোর সঠিক উত্তর আয়ত্ত করতে হবে।
- ☐ সাহিত্য অংশে প্রাচীন যুগ ও মধ্যযুগ থেকে প্রতি পরীক্ষাতেই ৩/৪টি প্রশ্ন করা হয়, তাই এ অংশটিও গুরুত্ব সহকারে চর্চা করতে হবে।
- ☐ আধুনিক যুগের সাহিত্যিক ও সাহিত্যকর্ম, পত্রিকা-সাময়িকী, উপাধি-ছদ্মনাম, পঙ্‌ক্তি-উদ্ধৃতি ইত্যাদি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি দিতে হবে।

বিসিএস লিখিত পরীক্ষায় বাংলা সাহিত্য অংশে সাধারণত ১৫টি প্রশ্ন আসে, যার প্রতিটির মান ২ অর্থ্যাৎ ২ × ১৫ = ৩০ নম্বর। এ প্রশ্নগুলো কিছুটা বর্ণনামূলক উত্তর প্রত্যাশা করে থাকে। তাই পূর্ণ প্রস্তুতি গ্রহণের সুবিধার্থে বাংলা সাহিত্যের বিষয়গুলোকে যুগভিত্তিক আলোচনার পাশাপাশি প্রশ্নোত্তর আকারে উপস্থাপন করা হলো।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

ক

# বাংলা সাহিত্যের যুগবিভাগ

বাংলা সাহিত্যের অতীত ইতিহাস সম্পর্কে পর্যাপ্ত প্রমাণের অভাবে বাংলা ভাষার উদ্ভব সম্পর্কে সুস্পষ্ট তথ্য পাওয়া যায় না। তবে বাংলা সাহিত্যের আদি নিদর্শন হিসেবে চর্যাপদকে সবাই স্বীকার করেন। তাই বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস চর্যাপদের কাল থেকে শুরু হয়েছে বলে অনুমান করা হয়। কিন্তু চর্যাপদের রচনাকাল সম্পর্কে পণ্ডিতগণ একমত হতে পারেননি। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ মনে করেন, ৬৫০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১২০০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে চর্যাপদ রচিত। অন্যদিকে ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বলেছেন, ৯৫০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১২০০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে চর্যাপদ রচিত। গবেষকগণ বাংলা সাহিত্যের যুগবিভাগ ৬৫০ খ্রিস্টাব্দ থেকে শুরু হয়েছে বলে মনে করেন। গবেষকগণ একটি নির্দিষ্ট সময়কাল ধরে যুগবিভাগসমূহ চিহ্নিত করে থাকেন। এ হিসেবে বাংলা সাহিত্যের যুগকে তিনটি প্রধান ভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে। সেগুলো হলো : ক. প্রাচীন বা আদি যুগ (৬৫০-১২০০), খ. মধ্যযুগ (১২০১-১৮০০) এবং গ. আধুনিক যুগ (১৮০১-বর্তমান পর্যন্ত)।

ক. প্রাচীন যুগ বা আদি যুগ : বাংলা সাহিত্যের আদি নিদর্শন চর্যাপদ এ যুগের সৃষ্টি। বৌদ্ধ সহজিয়া সম্প্রদায়ের লোকেরা তাদের ধর্মীয় অনুভূতি ব্যক্ত করতে গিয়ে এ গ্রন্থ রচনা করেন। তাদের ধর্মতত্ত্ব, দর্শনতত্ত্ব, সাধন-ভজন প্রভৃতি কাব্যরূপ লাভ করে এ গ্রন্থে স্থান করে নিয়েছে। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী কর্তৃক ১৯০৭ সালে চর্যাপদ আবিষ্কৃত হয় এবং ১৯১৬ সালে চর্যাপদের সাড়ে ছেচল্লিশটি পদ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ পত্রিকায় 'হাজার বছরের পুরান বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধগান ও দোহা' নামে প্রকাশিত হয়। এ গ্রন্থই প্রাচীন যুগের বাংলা সাহিত্যের একমাত্র নিদর্শন।

খ. মধ্যযুগ : ১২০১ থেকে ১৮০০ সাল পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যে মধ্যযুগ হিসেবে পরিচিত। মধ্যযুগ ছিল বাংলা সাহিত্যের কাব্যধারার বিকাশকাল। এ কালেই রচিত হয়েছিল সাহিত্যের বিভিন্ন ধারা। ধারাগুলো ছিল বেশির ভাগই ধর্মনির্ভর। মঙ্গলকাব্য, অনুবাদ সাহিত্য, জীবনী সাহিত্য, বৈষ্ণব পদাবলী, শাক্ত পদাবলী প্রভৃতি সাহিত্য ধারা মধ্যযুগের অন্যতম সৃষ্টি। মধ্যযুগের আদি নিদর্শন বড়ু চণ্ডীদাস বিরচিত 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'। এ যুগেই বাংলা কাব্যসাহিত্যের ধারা পরিপূর্ণতা লাভ করেছিল। তাই এ যুগের সাহিত্য ধারাকে শ্রীচৈতন্যের জীবনকাল অনুযায়ী তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়। যথা : ১. প্রাক-চৈতন্য যুগ (১২০১-১৫০০), ২. চৈতন্য যুগ (১৫০১-১৬০০) এবং ৩.



চৈতন্য-পরবর্তী যুগ (১৬০১-১৮০০)। শ্রীচৈতন্যদেব ১৪৮৬ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তার ভক্ত-শিষ্যরা তার জীবিতাবস্থায়ই তার জীবন কাহিনী নিয়ে কাব্য রচনা করেন। এ জীবনীকাব্য বাংলা সাহিত্যে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে। মধ্যযুগের শেষ কবি ছিলেন ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর।

গ. আধুনিক যুগ : আধুনিক যুগ বাংলা সাহিত্যকে সম্পূর্ণ নতুন আঙ্গিকে বিন্যাস করেছে। সাহিত্যের বৈচিত্র্যে এ যুগ পরিপূর্ণ। উনিবিংশ শতাব্দীর রেনেসাঁর ফলে মধ্যযুগের দৈবনির্ভর সাহিত্যকর্মে মানবের জয়জয়কার। তাদের জীবন, জীবিকা ও কর্ম সাহিত্যে রূপায়িত হয়েছিল। এ যুগের সাহিত্যে প্রধান প্রধান যে লক্ষণগুলো খুঁজে পাওয়া যায় তা হলো : মানবতা, ব্যক্তিচেতনা বা আত্মচেতনা, আত্মপ্রসার, সমাজচেতনা, দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবোধ, রোমান্টিকতা, মৌলিকতা, মুক্তবুদ্ধির চর্চা, নাগরিক চেতনা এবং আঙ্গিকগত রূপান্তর। পাশ্চাত্য চিন্তা-চেতনার প্রভাবে আধুনিক সাহিত্যে নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়েছিল। মধ্যযুগের শেষ কবি ভারতচন্দ্রের মৃত্যুর (১৭৬০ সাল) পর থেকে যে আধুনিক যুগের শুরু তা অদ্যাবধি চলমান। তবে আধুনিক যুগের শুরু ধরা হয় ১৮০১ সাল থেকে।

**মডেল প্রশ্ন**

১. **বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে যুগবিভাগ কয়টি ও কি কি?**
উত্তর : তিনটি। ক. প্রাচীন বা আদি যুগ (৬৫০-১২০০), খ. মধ্যযুগ (১২০১-১৮০০) এবং গ. আধুনিক যুগ (১৮০১-বর্তমান পর্যন্ত)।

২. **অন্ধকার যুগের ব্যাপ্তি কত?**
উত্তর : ১২০১ থেকে ১৩৫০ সাল।

৩. **বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক যুগের বৈশিষ্ট্য কি?**
উত্তর : বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন যুগে ব্যক্তিজীবন প্রধান ছিল, ধর্ম প্রধান ছিল না। আর মধ্যযুগে ধর্মই ছিল মুখ্য, মানুষ ছিল গৌণ। আধুনিক যুগে মানুষ মুখ্য হলো এবং মানবতাই একমাত্র কাম্য হয়ে উঠল। সেই সাথে যোগ হলো অন্ধবিশ্বাসের বদলে যুক্তিশীলতা।

৪. **ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে, প্রাচীন যুগের ব্যাপ্তি কত?**
উত্তর : ৯৫০ থেকে ১২০০ খ্রিস্টাব্দ।

৫. **মধ্যযুগের সাহিত্যধারা কেমন ছিল?**
উত্তর : ধর্মনির্ভর।

৬. **মধ্যযুগের কাব্যধারার প্রধান ধারা কয়টি?**
উত্তর : ৪টি।

৭. **মধ্যযুগের শেষ কবি কে?**
উত্তর : ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর।

৮. **বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস রচয়িতাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য রচয়িতার নাম কি?**
উত্তর : ড. দীনেশচন্দ্র সেন, ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, গোপাল হালদার, অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ড. সুকুমার সেন প্রমুখ।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

# খ

# প্রাচীন যুগ ও চর্যাপদ

বাংলা সাহিত্যের আদি নিদর্শন চর্যাপদ এ যুগের সৃষ্টি। ১৮৮২ সালে প্রকাশিত 'Sanskrit Buddhist Literature in Nepal' গ্রন্থে রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র সর্বপ্রথম নেপালের বৌদ্ধতান্ত্রিক সাহিত্যের কথা প্রকাশ করেন। তাতে উদ্দীপ্ত হয়ে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী নেপালের 'রয়েল লাইব্রেরি' থেকে ১৯০৭ সালে 'চর্যাচর্যবিনিশ্চয়' নামক পুঁথিটি আবিষ্কার করেন। তিনি চর্যাপদের সাথে 'ডাকার্ণব' ও 'দোহাকোষ' নামে আরও দুটি বই নেপালের রাজ-দরবারের গ্রন্থাগার থেকে আবিষ্কার করেন।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর সম্পাদনায় 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ' থেকে প্রাপ্ত পুঁথিগুলো একত্র করে ১৯১৬ সালে 'হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধগান ও দোহা' নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। ড.সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁর ১৯২৬ সালে প্রকাশিত 'Origin and Development of the Bengali Language' গ্রন্থে গ্রন্থটির ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে প্রথম আলোচনা করেন। ১৯২৭ সালে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ চর্যাপদের ধর্মমত সম্পর্কে প্রথম আলোচনা করেন।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

বাংলার পাল বংশের রাজারা ছিলেন বৌদ্ধধর্মাবলম্বী। তাদের আমলে চর্যাগীতিগুলোর বিকাশ ঘটেছিল। সপ্তম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যবর্তী সময়ে পদগুলো রচিত। পাল বংশের পরে আসে সেন বংশ। সেন বংশ হিন্দুধর্ম এবং ব্রাহ্মণ্যসংস্কার রাজধর্ম হিসাবে গ্রহণ করে। ফলে বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যগণ এ দেশ থেকে বিতাড়িত হন এবং নেপালে আশ্রয় গ্রহণ করেন। তাই বাংলা সাহিত্যের আদি নিদর্শন বাংলাদেশের বাইরে নেপালে পাওয়া গেছে।

**বিষয়বস্তু :** চর্যার পদগুলোতে বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যের গোপন তত্ত্বদর্শন ও ধর্মচর্চাকে বাহ্যিক প্রতীকের সাহায্যে তুলে ধরা হয়েছে। এর রচয়িতাগণ দুরূহ ধর্মতত্ত্বকে সহজবোধ্য রূপকে উপস্থাপন করেছেন। পদগুলো কতগুলো গানের সংকলন।

**কবি এবং পদসংখ্যা :** চর্যাপদের কবির সংখ্যা নিয়ে মতান্তর রয়েছে। সুকুমার সেন তাঁর 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' (১ম খণ্ড) গ্রন্থে ২৪ জন কবির কথা বলেছেন। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ সম্পাদিত 'বুড্ডিস্ট মিস্টিক সঙ্স' গ্রন্থে ২৩ জন কবির নাম পাওয়া যায়। তবে ২৪ জনের পক্ষেই অধিকাংশ পণ্ডিত মত দিয়েছেন। চর্যায় প্রাপ্ত পুঁথিতে একান্নটি গান ছিল। পুঁথির কয়েকটি পাতা নষ্ট হওয়ায় তিনটি সম্পূর্ণ (২৪, ২৫ ও ৪৮ সংখ্যক ) পদ এবং একটি (২৩ সংখ্যক) পদের শেষাংশ পাওয়া যায়নি। তাই পুঁথিতে সর্বমোট সাড়ে ছেচল্লিশটি পদ পাওয়া গেছে। চর্যাপদের সবচেয়ে বেশি পদ



রচনা করেছেন কাহ্নপা। তিনি মোট ১৩টি পদ রচনা করেন এর মধ্যে পাওয়া গেছে ১২টি। এ ছাড়া চর্যাপদের উল্লেখযোগ্য পদকর্তাগণ হলেন : ভুসুকুপা, সরহপা, লুইপা, শবরপা, শান্তিপা, কুক্কুরীপা। যে কবিদের বাঙালি বলে ধারণা করা হয় তারা হচ্ছেন : লুইপা, কুক্কুরীপা, বিরুবাপা, ডোম্বীপা, শবরপা, ধামপা ও জঅনন্দি।

**চর্যাপদের ভাষা :** চর্যাপদের ভাষা মূলত প্রাচীন বাংলা। তবে হিন্দি, অপভ্রংশ তথা মৈথিলী, অসমিয়া ও উড়িয়া ভাষারও প্রভাব এতে দেখা যায়। চর্যাপদের ভাষাকে কেউ কেউ সান্ধ্য ভাষা বলেছেন। কারণ এর ভাব ও ভাষা কোথাও স্পষ্ট, কোথাওবা অস্পষ্ট। পদগুলো প্রধানত মাত্রাবৃত্ত ছন্দে লেখা। চর্যাপদ যে প্রাচীন বাংলা ভাষায় রচিত এ কথা গবেষণার মাধ্যমে প্রমাণ করেন ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়।

**চর্যার রচনাকাল :** ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্র মতে, চর্যাপদের রচনাকাল ৬৫০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১২০০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে। ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে, চর্যাপদের রচনাকাল ৯৫০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১২০০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে। ড. সুকুমার সেনসহ বাংলা সাহিত্যের প্রায় সব পণ্ডিতই সুনীতিকুমারের মতামতকে সমর্থন করেছেন।

**ডাক ও খনার বচন :** ডাক ও খনার বচনকে বাংলা সাহিত্যের আদিযুগের সৃষ্টি বলে বিবেচনা করা হয়। তবে এর কোনো লিখিত নিদর্শন বর্তমানে নেই। মানুষের মুখে মুখে প্রচলিত ছড়াকে লোকসাহিত্যের আদি নিদর্শন হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

ক. **ডাকের বচন :** জ্যোতিষ, ক্ষেত্রতত্ত্বের ও মানব চরিত্রের ব্যাখ্যা প্রাধান্য পেয়েছে।

খ. **খনার বচন :** কৃষি ও আবহাওয়ার কথা প্রাধান্য পেয়েছে।

## চর্যাপদের কবি

প্রাচীন বাংলা ভাষার চর্যাপদের মোট ৫০টি পদের ২৩ জন কবির নাম পাওয়া যায়। চর্যাপদে আরো একজন পদকর্তার নাম আছে, কিন্তু তার পদটি নেই। সেটি ধরলে চর্যার সংখ্যা ৫১ এবং কবি ২৪ জন।

| কবির নাম | কবিতার সংখ্যা |
|---|---|
| ১. আর্যদেব (আজদেব) | ১ |
| ২. কঙ্কণ (কঙ্কণপা) | ১ |
| ৩. কম্বলাম্বর (কামলি) | ১ |
| ৪. কাহ্নপা (কাহ্ন, কাহ্নি, কাহ্নিলা, কৃষ্ণচার্য, কৃষ্ণবজ্রপাদে ইত্যাদি) | ১৩ |
| ৫. কুক্কুরীপা | ৩ |
| ৬. গুন্ডরীপা (গুড্ডরী) | ১ |
| ৭. চাটিলপা (চাটিল্ল) | ১ |
| ৮. জয়নন্দী (জঅনন্দি) | ১ |
| ৯. ডোম্বীপা | ১ |
| ১০. ঢেণ্ডণপা | ১ |
| ১১. তন্ত্রী (তান্তি) | ১ |
| ১২. তাড়ক | ১ |
| ১৩. দারিক (দারক) | ১ |
| ১৪. ধামপা (ধম্মপা) | ১ |

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



| কবির নাম | কবিতার সংখ্যা |
|---|---|
| ১৫. বিরুবাপা (বিরূপা, বিরুআ) | ১ |
| ১৬. বীণাপা | ১ |
| ১৭. ভদ্রপা (ভাদে) | ১ |
| ১৮. ভুসুকুপা (ভুসুকু) | ৮ |
| ১৯. মহীধরপা (মহিআ, মহিন্তা, মহিত্তা) | ১ |
| ২০. লুইপা (লূয়ীপা) | ২ |
| ২১. লাড়ীডোম্বী | ১টি পদের উল্লেখ আছে, তবে পদটি নেই |
| ২২. শবরপা (সবর) | ২ |
| ২৩. শান্তিপা (শান্তি) | ২ |
| ২৪. সরহপা (সরহ) | ৪ |

চর্যাপদের সবচেয়ে বেশি পদ আছে কাহ্নপার, সংখ্যায় তেরোটি। তাছাড়া ভুসুকুর আট, সরহের চার, লুই, শান্তি, শবরের দুটি করে, অন্যদের একটি করে পদ বিদ্যমান। অনেকের মতে আদি চর্যাকার লুইপা। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্র মতে, প্রাচীনতম চর্যাকার শবরীপা এবং আধুনিকতম সরহপা অথবা ভুসুকুপা।

## কাহ্নপা

চর্যাপদের কবিগণের মধ্যে সর্বাধিক পদরচয়িতার গৌরবের অধিকারী কাহ্নপা। তার তেরোটি পদ চর্যাপদ গ্রন্থে গৃহীত হয়েছে। এ সংখ্যাধিক্যের পরিপ্রেক্ষিতে তাকে কবি ও সিদ্ধাচর্যদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলে অভিহিত করা যায়। কানুপা, কৃষ্ণপাদ ইত্যাদি নামেও তিনি পরিচিত। বিভিন্ন পদে কাহ্ন, কাহ্নু, কাহ্নি, কাহ্নিলা, কাহ্নিল্য প্রভৃতি ভণিতা লক্ষ্য করা যায়। খ্রিস্টীয় অষ্টম শতকে কানুপার আবির্ভাব হয়েছিল বলে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ মনে করেন। কানুপার বাড়ি ছিল উড়িষ্যায়, তিনি সোমপুর বিহারে বাস করতেন।

## ভুসুকুপা

চর্যাগীতি রচনার সংখ্যাধিক্যে দ্বিতীয় স্থানের অধিকারী হলেন ভুসুকুপা। তার রচিত আটটি পদ চর্যাপদ গ্রন্থে সংগৃহীত হয়েছে। নানা কিংবদন্তি বিচারে ভুসুকু নামটিকে ছদ্মনাম বলে মনে করা হয়। তার প্রকৃত নাম শান্তিদেব। তিনি সৌরাষ্ট্রের রাজপুত্র ছিলেন এবং শেষ জীবনে নালন্দায় বৌদ্ধ ভিক্ষু হিসেবে নিঃসঙ্গভাবে অবস্থান করেন। সেজন্য ভুক্তির ভু, সুপ্তির সু এবং কুটিরের কু—এ তিন আদ্যক্ষর যোগে তাকে ভুসুকু বলে পরিহাস করা হত। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্র মতে, শান্তিদেব ভুসুকু সাত শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বর্তমান ছিলেন। রাহুল সংকৃত্যায়নের মতে ভুসুকুর জীবৎকালের শেষ সীমা ৮০০ খ্রিস্টাব্দ। ধর্মপালের রাজত্বকালে (৭৭০-৮০৬ খ্রিস্টাব্দ) ভুসুকু জীবিত ছিলেন। তিনি রাউত বা অশ্বারোহী সৈনিক ছিলেন। পরে ভিক্ষু ও সিদ্ধা হন। তবে অনেকে এ শান্তিদেব ভুসুকু ও চর্যা রচয়িতা ভুসুকুকে পৃথক ব্যক্তি বলে অনুমান করেছেন। কারও কারও অনুমান চর্যার ভুসুকুর সময় একাদশ শতকের মধ্যভাগ।

## লুইপা

সাধারণত লুইপাকে আদি সিদ্ধাচার্য বিবেচনা করা হয়। কিন্তু ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ ও রাহুল সংকৃত্যায়ন তাকে প্রথম বলে স্বীকার করেন না। লুইপা বাঙালি বলে অনুমিত। উড়িষ্যায় তাঁর জন্মস্থান বলে কারও কারও ধারণা। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ উল্লেখ করেছেন, তারানাথের মতে লুই বাংলাদেশের গঙ্গার ধারে বাস করতেন। তিনি প্রথম জীবনে উদ্যানের (সোয়াতের) রাজার কায়স্থ বা লেখক ছিলেন।



## শবরপা

শবরপা ছিলেন বাঙালি এবং তিনি ছিলেন ব্যাধ। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্র মতে, শবরপা ৬৮০ থেকে ৭৩২ সালে বর্তমান ছিলেন। রাহুল সংকৃত্যায়নের মতে, শবরপা ছিলেন বিক্রমশীলা নিবাসী, কুলে ক্ষত্রিয় এবং অন্যতম সিদ্ধা। তিনি ৮৮০ সালের দিকে বর্তমান ছিলেন।

## বিরুবাপা

ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্র মনে করেন, জালন্ধরীপার শিষ্য বিরূপ ছিলেন বাঙালি। তার জন্মস্থান দেবপালের রাজ্য ত্রিপুরায়। তার শিষ্য ডোম্বীপা। বিরূপ আট শতকে বর্তমান ছিলেন। রাহুল সংকৃত্যায়নের মতে, বিরুবাপা ভিক্ষুরূপে সোমপুরী বিহারে বাস করতেন। তিনি দেবপালের রাজত্বকালে জীবিত ছিলেন।

## ডোম্বীপা

ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্র মতে, ডোম্বীপা ত্রিপুরা বা মগধের রাজা ছিলেন। তার গুরু ছিলেন বিরুবাপা। ডোম্বীপার জীবৎকাল ৭৯০ থেকে ৮৯০ খ্রিস্টাব্দ। রাহুল সংকৃত্যায়নের মতে, ডোম্বীপার জীবৎকালের শেষ সীমা দেবপালের রাজত্বকালে (৮০৬-৪৯) ৮৪০ খ্রিস্টাব্দ অবধি।

মডেল প্রশ্ন

**১. বাংলা সাহিত্যের আদি নিদর্শন কি? এর প্রধান প্রধান কবিদের ভূমিকা উল্লেখ করুন।**

**উত্তর :** বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন যুগের একমাত্র নির্ভরযোগ্য নিদর্শন চর্যাপদ। চর্যাপদে ২৩, মতান্তরে ২৪ জন কবি ছিলেন। চর্যাপদের কবিগণের মধ্যে সর্বাধিক পদ রচয়িতার গৌরবের অধিকারী কাহ্নপা। তার ১৩টি পদ চর্যাপদে গৃহীত হয়েছে। চর্যাপদের প্রথম পদটি লুইপার লেখা। তাই বলা যায়, চর্যাপদের আদি কবি লুইপা। চর্যাগীতির রচনার সংখ্যাধিক্যে দ্বিতীয় স্থানের অধিকারী হলেন ভুসুকুপা। তার রচিত ৮টি পদ চর্যাপদ গ্রন্থে সংগৃহীত হয়েছে।

**২. 'চর্যাপদ' কি ধরনের রচনা?**

**উত্তর :** 'চর্যাপদ' বাংলা সাহিত্যের আদি নিদর্শন। এটি মূলত বৌদ্ধদের সাধনসঙ্গীত। ১৯০৭ সালে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী নেপালের রয়েল লাইব্রেরি থেকে এটি আবিষ্কার করেন। ১৯১৬ সালে তার সম্পাদনায় 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ' থেকে 'হাজার বছরের পুরান বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধ গান ও দোহা' নামে এটি প্রকাশিত হয়।

**৩. চর্যাপদের মোট পদ সংখ্যা কতটি? এর কোন পদটি খণ্ডিত আকারে পাওয়া গেছে?**

**উত্তর :** চর্যাপদে পদসংখ্যা ৫১টি। তবে উদ্ধার করা হয়েছে সাড়ে ছেচল্লিশটি। এর মধ্যে ২৩ নং পদটি খণ্ডিত আকারে উদ্ধার করা হয়েছে অর্থাৎ এর শেষাংশ পাওয়া যায়নি। এছাড়া ২৪, ২৫ ও ৪৮ নং পদটি পাওয়া যায়নি।

**৪. চর্যাপদের আবিষ্কার বৃত্তান্ত লিখুন এবং চর্যাপদের ভাষা প্রসঙ্গে আবিষ্কারকের অভিমত দিন।**

**উত্তর :** ১৮৮২ সালে প্রকাশিত 'Sanskrit Buddhist Literature in Nepal' গ্রন্থে রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র সর্বপ্রথম নেপালের বৌদ্ধতান্ত্রিক সাহিত্যের কথা প্রকাশ করেন। তাতে উদ্দীপ্ত হয়ে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী নেপালের রয়েল লাইব্রেরি থেকে ১৯০৭ সালে 'চর্যাচর্যবিনিশ্চয়' নামক ঐ সাহিত্যের কতগুলো পুঁথি (পদ) আবিষ্কার করেন। উদ্ধারকারীর সম্পাদনায় 'বঙ্গীয় সাহিত্য

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



পরিষদ' থেকে পুঁথিগুলো ১৯১৬ সালে (১৩২৩ বঙ্গাব্দে) 'হাজার বছরের পুরান বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধগান ও দোহা' নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। এ গ্রন্থটিই পরে চর্যাপদ নামে পরিচিতি পায়। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী চর্যাপদের ভাষা সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন, 'আলো আঁধারি ভাষা, কতক আলো, কতক অন্ধকার, খানিক বুঝা যায়, খানিক বুঝা যায় না।' এ কারণেই চর্যার ভাষাকে সান্ধ্যভাষা বলা হয়।

৫. **বাংলা সাহিত্যের আদি নিদর্শন বাংলার বাইরে পাওয়া যায় কেন?**
**উত্তর :** বাংলার পাল বংশের রাজারা বৌদ্ধ ছিলেন। তাদের আমলে চর্যাগীতিকাগুলোর বিকাশ ঘটেছিল। পাল বংশের পরপরই বাংলাদেশে পৌরাণিক হিন্দুধর্ম ও ব্রাহ্মণ্যসংস্কার রাজধর্ম হিসেবে গৃহীত হয়, ফলে বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যেরা এ দেশ থেকে বিতাড়িত হয়। সেন রাজাদের প্রতাপের কারণেই বাংলাদেশের বাইরে গিয়ে তাদের অস্তিত্ব রক্ষা করতে হয়েছিল। তাই বাংলা সাহিত্যের আদি নিদর্শন বাংলার বাইরে নেপালে পাওয়া যায়।

৬. **চর্যাপদ কত সালের মধ্যে রচিত হয়?**
**উত্তর :** ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর মতে ৬৫০-১২৫০ সালের মধ্যে এবং ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে ৯৫০-১২৫০ সালের মধ্যে চর্যাপদ রচিত হয়। বাংলা সাহিত্যের অধিকাংশ পণ্ডিতই ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতকে সমর্থন করেন।

৭. **প্রথম প্রকাশের সময় চর্যাপদের নাম কি ছিল?**
**উত্তর :** হাজার বছরের পুরান বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধগান ও দোহা।

৮. **চর্যাপদের প্রথম পদটির রচয়িতা কে এবং পদটির প্রথম লাইনটি কি?**
**উত্তর :** প্রথম পদটির রচয়িতা লুইপা। পদটির প্রথম লাইন—কাআ তরুবর পাঞ্চ বি ডাল। চঞ্চল চীএ পইঠা কাল।

৯. **চর্যাপদের ভাষা বাংলা—এটি সুনিশ্চিতভাবে প্রমাণ করেন কে?**
**উত্তর :** ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় তার গবেষণাগ্রন্থ 'Origin and Development of the Bengali Language (ODBL)'-এর মাধ্যমে প্রমাণ করেন যে চর্যাপদের ভাষা বাংলা।

১০. **চর্যাপদে কোন যুগের সমাজ ও সংস্কৃতির পরিচয় পাওয়া যায়?**
**উত্তর :** পাল যুগের। চর্যাপদে পূর্ব ভারতের মানুষের জীবনচিত্র অধিকতর প্রাধান্য পেয়েছে।

১১. **চর্যাপদ কিসের সংকলন? এর বিষয়বস্তু কি?**
**উত্তর :** চর্যাপদ গানের সংকলন। এর বিষয়বস্তু বৌদ্ধধর্মের সাধন-ভজনের তত্ত্বীয় কথা।

১২. **চর্যাপদের কবিদের মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীন কে?**
**উত্তর :** শবরপা (৬৮০ থেকে ৭৬০ খ্রিষ্টাব্দ)।

১৩. **চর্যাপদের কবিদের মধ্যে বাঙালি কবি হিসেবে কারা পরিচিত?**
**উত্তর :** চর্যাপদের কবিদের মধ্যে বাঙালি বলে যাদের ধারণা করা হয় তারা হচ্ছেন– লুইপা, কুক্কুরীপা, বিরুআপা, ডোম্বীপা, শবরপা, ধামপা ও জঅনান্দ। অর্থাৎ চর্যাপদের বাঙালি কবি হলেন সাত জন।

১৪. **চর্যাপদের সবচেয়ে আধুনিক কবি কে?**
**উত্তর :** ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর মতে, চর্যাপদের আধুনিক বা সর্বশেষ কবি হলেন সরহপা অথবা ভুসুকুপা।

১৫. **সন্ধ্যা বা সান্ধ্যভাষা কি?**
**উত্তর :** যে ভাষা সুনির্দিষ্ট রূপ পায়নি, যে ভাষার অর্থও একাধিক অর্থাৎ আলো-আঁধারের মতো, সে ভাষাকে পণ্ডিতগণ সন্ধ্যা বা সান্ধ্যভাষা বলেছেন।

গ

# মধ্যযুগ

বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগ ১২০১ খ্রিষ্টাব্দ থেকে আরম্ভ হয়ে ১৮০০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত বিস্তৃত। অন্ধকার যুগ বা বন্ধ্যা যুগ এ যুগের অন্তর্ভুক্ত হলেও মধ্যযুগের সূত্রপাত ১২০১ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ধরা হয়। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য বিভিন্ন শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত। মধ্যযুগের সমস্ত বাংলা সাহিত্যকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়।

এক. মৌলিক রচনা— শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, বৈষ্ণব পদাবলী, মঙ্গলকাব্য, জীবনীসাহিত্য, লোকসাহিত্য ইত্যাদি।

দুই. অনুবাদ সাহিত্যকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়–
ক. সংস্কৃত থেকে অনূদিত– রামায়ণ, মহাভারত, ভগবত ইত্যাদি।
খ. আরবি-ফারসি-হিন্দি ভাষা থেকে অনূদিত রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যানগুলো।

## অন্ধকার যুগ

বাংলা সাহিত্যের শুরুতেই অর্থাৎ ১২০১ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৩৫০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত সময়কালকে অন্ধকার যুগ হিসেবে অভিহিত করা হয়। এই সময়ে বাংলা সাহিত্যের লিখিত উল্লেখযোগ্য কোনো নিদর্শন পাওয়া যায় না। ধারণা করা হয় তুর্কি বিজয়ের ফলে মুসলিম শাসনামলের সূচনার পটভূমিতে নানা অস্থিরতার কারণে তেমন কোনো উল্লেখযোগ্য সাহিত্য সৃষ্টি হয়নি। তবে কোনো কোনো সাহিত্যিকের মতে, এ সময় উল্লেখযোগ্য কোনো সাহিত্য পাওয়া না গেলেও 'শূন্যপুরাণ', 'নিরঞ্জনের রুষ্মা', 'সেক শুভোদয়া'র মতো কিছু অপ্রধান সাহিত্য সে সময় রচিত হয়েছিল। তাই তারা এ সময়কে অন্ধকার যুগ হিসেবে মেনে নিতে চান না।

মডেল প্রশ্ন

১. **বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগের সময়সীমা কত?**
**উত্তর :** ১২০১ থেকে ১৮০০ খ্রিষ্টাব্দ।

২. **মধ্যযুগের তিনটি সাহিত্য ধারার নাম লিখুন।**
**উত্তর :** শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, বৈষ্ণব পদাবলী, মঙ্গলকাব্য।

৩. **শূন্যপুরাণ কি?**
**উত্তর :** রামাই পণ্ডিত রচিত ধর্মপূজার শাস্ত্রগ্রন্থ।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



৪. **বাংলা সাহিত্যের অন্ধকার যুগ বলতে কোন সময়কে চিহ্নিত করা হয়েছে এবং কেন?**
**উত্তর :** বাংলা সাহিত্যের যুগবিভাগে আমরা তিনটি যুগ লক্ষ্য করি। ৬৫০ থেকে ১২০০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রাচীন যুগ, ১২০১ থেকে ১৮০০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত মধ্যযুগ এবং ১৮০১ খ্রিষ্টাব্দ থেকে বর্তমান পর্যন্ত আধুনিক যুগ। কিন্তু এ যুগবিভাগের মধ্যে ১২০১ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৩৫০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত সময়কে অনেক সমালোচক মধ্যযুগের অন্তর্ভুক্ত বলে স্বীকার করতে চান না। তারা এ সময়কে 'অন্ধকার যুগ' বলে মনে করেন। তাদের মতে, এই ১৫০ বছর বাংলা সাহিত্যে কোনো সাহিত্যকর্ম সৃষ্টি হয়নি।

৫. **প্রথম রঙ্গমঞ্চ নির্মিত হয় কোথায়? এ রঙ্গমঞ্চ সম্পর্কে টীকা লিখুন।**
**উত্তর :** কলকাতায় প্রথম রঙ্গমঞ্চ তথা নাট্যমঞ্চ নির্মিত হয় ১৭৫৩ সালে। নাটক ও নৃত্যকর্মকে উৎসাহিত করতে ব্রিটিশরা 'প্লে হাউস' নামক এ রঙ্গমঞ্চটি প্রতিষ্ঠা করে। কলকাতার লালদিঘীর পূর্ব পাশে লালবাজার রোডে এটি অবস্থিত। এ রঙ্গমঞ্চে মঞ্চস্থ হওয়া প্রথম নাটক সম্পর্কে কোনো তথ্য পাওয়া না গেলেও এটা স্পষ্ট যে উইলিয়াম উইলস এ মঞ্চটির নকশা তৈরি করেন। কিন্তু সময়ের প্রেক্ষাপটে মঞ্চটি সে অর্থে টিকতে পারেনি। এখন এটি মার্টিন বার্নের অফিস হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

## শ্রীকৃষ্ণকীর্তন

'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' মধ্যযুগের প্রথম কাব্য। এ কাব্যের রচয়িতা বড়ু চণ্ডীদাস। তিনি বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগের আদি কবি। ভাগবতের কৃষ্ণলীলা সম্পর্কিত কাহিনী অবলম্বনে বড়ু চণ্ডীদাস পঞ্চদশ

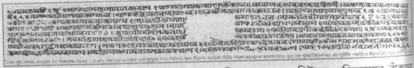

শতাব্দীতে এ কাব্য রচনা করেন। বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ ১৯০৯ খ্রিষ্টাব্দে পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়া জেলার কাঁকিল্যা গ্রামের এক গৃহস্থ বাড়ির গোয়ালঘর থেকে এ কাব্যটি উদ্ধার করেন। বৈষ্ণব মহান্ত শ্রী নিবাস আচার্যের দৌহিত্র বংশজাত দেবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের তত্ত্বাবধানে এ গ্রন্থটি রক্ষিত ছিল। এ বসন্তরঞ্জন রায়ের সম্পাদনায় গ্রন্থটি ১৯১৬ খ্রিষ্টাব্দে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে প্রকাশিত হয়। এ কাব্য মোট তেরটি খণ্ডে লিখিত। খণ্ডগুলো হচ্ছে জন্মখণ্ড, তাম্বুলখণ্ড, দানখণ্ড, নৌকাখণ্ড, ভারখণ্ড, ছত্রখণ্ড, বৃন্দাবনখণ্ড, কালিয়দমনখণ্ড, যমুনাখণ্ড, হারখণ্ড, বাণখণ্ড, বংশীখণ্ড ও রাধাবিরহখণ্ড।

### মডেল প্রশ্ন

১. **'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কোন সময়ের রচনা, লেখক কে?**
**উত্তর :** মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের প্রথম নিদর্শন 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'। এ কাব্যটি ১৯০৯ খ্রিষ্টাব্দে বাঁকুড়া জেলার কাঁকিল্যা গ্রামের এক গৃহস্থের গোয়ালঘর থেকে উদ্ধার করেন বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ। ১৯১৬ (১৩২৩ বঙ্গাব্দে) খ্রিষ্টাব্দে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে কাব্যটি প্রকাশিত হয়। এ কাব্যটির রচয়িতা বড়ু চণ্ডীদাস।

২. **মধ্যযুগের প্রথম কবি কে?**
**উত্তর :** বড়ু চণ্ডীদাস।



৩. **'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' সম্পর্কে ধারণা দিন।**
**উত্তর :** বড়ু চণ্ডীদাস রচিত 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' মধ্যযুগের প্রথম কাব্য। তিনি ভাগবতের কৃষ্ণলীলা সম্পর্কিত কাহিনী অবলম্বনে, জয়দেবের গীতগোবিন্দ কাব্যের প্রভাব স্বীকার করে, লোকসমাজে প্রচলিত রাধাকৃষ্ণ প্রেম সম্পর্কিত গ্রাম্য গল্প অবলম্বনে পঞ্চদশ শতাব্দীতে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্য রচনা করেন। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যের প্রধান চরিত্র তিনটি; কৃষ্ণ, রাধা ও বড়াই। এ কাব্যের মোট ১৩টি খণ্ড আছে। এগুলো হলো জন্মখণ্ড, তাম্বুলখণ্ড, দানখণ্ড, নৌকাখণ্ড, ভারখণ্ড, ছত্রখণ্ড, বৃন্দাবনখণ্ড, কালিয়দমনখণ্ড, যমুনাখণ্ড, হারখণ্ড, বাণখণ্ড, বংশীখণ্ড, রাধাবিরহখণ্ড।

৪. **'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' এর লেখকজনিত সমস্যা খণ্ডন করুন।**
**উত্তর :** 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগের প্রথম কাব্য। এর আদি কবি বা রচয়িতা বড়ু চণ্ডীদাস। হিন্দু শাস্ত্রের প্রাচীন ধর্মগ্রন্থ মহাভারত, ভাগবত প্রভৃতির কেন্দ্রীয় চরিত্র রাধা-কৃষ্ণের প্রেমলীলা অনুসরণে কবি বড়ু চণ্ডীদাস এ কাব্যগ্রন্থ রচনা করেন। ১৯০৯ সালে আবিষ্কৃত শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পুঁথির প্রথম দুটি পাতা এবং শেষ পাতা পাওয়া যায়নি বলে এর নাম ও কবির নাম স্পষ্ট করে পাওয়া যায়নি। কবির কবিতায় 'চণ্ডীদাস' এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে 'বড়ু চণ্ডীদাস' নামদ্বয়ের উল্লেখ থাকায় এ কাব্যের কবি হিসেবে বড়ু চণ্ডীদাসকে গ্রহণ করা হয়।

৫. **কার সম্পাদনায় ও কত সালে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ কর্তৃক শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য প্রথম প্রকাশিত হয়?**
**উত্তর :** বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভের সম্পাদনায় ১৯১৬ সালে (১৩২৩ বঙ্গাব্দে)।

৬. **শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের বড়াই চরিত্রের স্বরূপ বিশ্লেষণ করুন।**
**উত্তর :** কাব্যটি মোট তের খণ্ডে বিভক্ত। রাধা, কৃষ্ণ ও বড়াই—এ তিনটি চরিত্র অবলম্বনে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'-এর কাহিনী রূপায়িত হয়েছে। পুরো কাব্যটি আবর্তিত হয়েছে রাধা-কৃষ্ণের প্রেমনিবেদন, দেহসম্ভোগ, দুঃখভোগ ইত্যাদির মধ্য দিয়ে। আর বড়াই চরিত্রটিকে কবি সৃষ্টি করেছেন রাধা-কৃষ্ণের প্রেমের সংবাদ আদান-প্রদানকারিণী হিসেবে। বড়াই চরিত্রটি রসিকতায়, কূটবুদ্ধিতে, ছদ্ম-অভিনয়ে সার্থকতার পরিচায়ক। বড়াই অল্পেই চটে যায়, আবার অল্পেই রাধা-কৃষ্ণের দুঃখে গলে যায়। সে ছিল সরলা ও সহানুভূতিসম্পন্না নারী।

৭. **শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের মধ্যে পাওয়া চিরকুটে কি লেখা ছিল?**
**উত্তর :** শ্রী শ্রী রাধাকৃষ্ণ। শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভের পচানই (৯৫) পত্র হইতে একসত্ত দস পত্র পর্য্যন্ত একুনে শোল (১৬) পত্র শ্রীকৃষ্ণপঞ্চাননে শ্রী শ্রী মহারাজা হুজুরকে লইয়া গেলেন পুনশ্চ আনিয়া দিবেন—সন ১০৮৯।

৯. **সর্বজন স্বীকৃত ও খাঁটি বাংলা ভাষায় রচিত প্রথম কাব্যগ্রন্থ কোনটি?**
**উত্তর :** শ্রীকৃষ্ণকীর্তন।

১০. **শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য কে, কোথা থেকে আবিষ্কার করেন?**
**উত্তর :** ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দে কাব্যটি বাঁকুড়ার এক গৃহস্থের গোয়ালঘর থেকে উদ্ধার করেন শ্রী বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বলভ।

## বৈষ্ণব পদাবলী

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের মূল্যবান নিদর্শন 'বৈষ্ণব পদাবলী'। পদ বা পদাবলী বলতে বুঝায় বৌদ্ধ বা বৈষ্ণবীয় ধর্মের গুঢ় বিষয়ের বিশেষ সৃষ্টি। পদাবলী সাহিত্য বৈষ্ণবতত্ত্বের রসভাষ্য। মধ্যযুগের সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ ফসল 'বৈষ্ণব পদাবলী'। 'বৈষ্ণব পদাবলী'তে রাধা-কৃষ্ণ তাদের প্রেমলীলায় জীবাত্মা ও পরমাত্মার রূপকে উপস্থিত। বৈষ্ণব কবিতার কথা উঠলেই যাদের কথা আসে তারা হচ্ছেন বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস, গোবিন্দ দাস। বৈষ্ণব কবিতার তারা চার মহাকবি।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



### বিদ্যাপতি

বিদ্যাপতি ছিলেন মিথিলার রাজসভার কবি। রাজা শিবসিংহ তাকে 'কবিকণ্ঠহার' উপাধিতে ভূষিত করেন। তার রচিত কয়েকটি বইয়ের নাম– পুরুষ পরীক্ষা, কীর্তিলতা, গঙ্গাবাক্যাবলী, বিভাগসার। বাঙালি না হয়েও এবং বাংলায় কবিতা রচনা না করেও বিদ্যাপতি বাঙালিদের কাছে অতি শ্রদ্ধেয় কবি। তিনি ব্রজবুলি ভাষায় তার পদাবলী রচনা করেছেন। ব্রজবুলি ভাষা মূলত মৈথিলি ও বাংলার মিশ্রণে তৈরী এক কৃত্রিম ও মধুর সাহিত্যিক ভাষা। রবীন্দ্রনাথের 'ভানুসিংহের পদাবলী' ব্রজবুলির ঢঙেই রচিত হয়েছে। বিদ্যাপতিকে 'অভিনব জয়দেব' ও 'মিথিলার কোকিল' বলেও আখ্যা দেয়া হয়। তার পদাবলীর কয়েকটি লাইন–

*সখি, হামারি দুখক নাহি ওর।*
*এ ভরা বাদর মাহ ভাদর*
*শূন্য মন্দির মোর।।*

### ব্রজবুলি ভাষা

বৈষ্ণব পদাবলীর অধিকাংশই রচিত হয়েছে 'ব্রজবুলি' নামে এক কৃত্রিম মিশ্র ভাষায়। মূলত এটা মৈথিলি ও বাংলা মিশ্রণে এক মধুর সাহিত্যিক ভাষা। এতে কিছু হিন্দি শব্দও আছে। ব্রজলীলা সম্পর্কিত পদাবলীর ভাষা- এ অর্থে ভাষাটি ব্রজবুলি নামে পরিচিত। ব্রজবুলি কখনো মুখের ভাষা ছিল না; সাহিত্যকর্ম ব্যতীত অন্যত্র এর ব্যবহারও নেই। মিথিলার কবি বিদ্যাপতি এ ভাষার স্রষ্টা।

### চণ্ডীদাস

বাংলা ভাষায় বৈষ্ণব পদাবলীর আদি রচয়িতা কবি চণ্ডীদাস। শিক্ষিত বাঙালি বৈষ্ণব সাহিত্যের রস ও আনন্দের সংবাদ পেয়েছে চণ্ডীদাসের পদাবলী থেকে। চৈতন্যদেব যার পদাবলী শুনে মোহিত হতেন তিনি এই চণ্ডীদাস। তার পদের বিখ্যাত লাইন—

*সবার উপরে মানুষ সত্য,*
*তাহার উপরে নাই।*

****চণ্ডীদাস সমস্যা :** মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে তিন জন বা ততোধিক চণ্ডীদাসের সন্ধান পাওয়া যায়। উৎকৃষ্ট কবির নাম ব্যবহার করে কেউ কেউ বিখ্যাত হতে চেয়েছিলেন, ফলে পদাবলী সাহিত্যে এ ধরনের সমস্যা হয়েছিল বলে ধারণা করা হয়। তাছাড়া এ কবিদের সঠিক জন্মস্থান, জন্মতারিখ, সাহিত্যকর্ম নিয়ে যে মতবিরোধ ও অস্পষ্টতা তাই চণ্ডীদাস সমস্যা রূপে বিবেচিত।

### জ্ঞানদাস

সম্ভবত ষোড়শ শতাব্দীতে বর্ধমান জেলায় কবি জ্ঞানদাসের জন্ম। তিনি চণ্ডীদাসের কাব্যাদর্শ অনুসরণ করেন এবং তার সঙ্গে নিজের মৌলিক প্রতিভার সমন্বয়ে রাধাকৃষ্ণের লীলা বর্ণনার মাধ্যমে মানব-মানবীর শাশ্বত প্রেম-বেদনার কথাই ব্যক্ত করেছেন। জ্ঞানদাসের একটি পদের দুটি লাইন—

*রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর।*
*প্রতি অঙ্গ লাগি কান্দে প্রতি অঙ্গ মোর।।*

### গোবিন্দ দাস

বিদ্যাপতির ভাবাদর্শে গোবিন্দ দাস বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। বিদ্যাপতির অলঙ্কার এবং চিত্রকল্প তাকে মুগ্ধ করেছিল। তার কল্পনাও ছিল মোহকর। তিনি কল্পনাকে চমৎকার অলংকার পরিয়ে দেন। তার কয়েকটি পঙ্‌ক্তি :

*যাহাঁ যাহাঁ নিকসয়ে তনু তনু জ্যোতি।*
*তাহাঁ তাহাঁ বিজুরি চমকময় হোতি।।*



### মডেল প্রশ্ন

১. **পদ বা পদাবলী বলতে কি বোঝায়? পদাবলী শব্দটি প্রথম কে ব্যবহার করেন?**
**উত্তর :** পদ বা পদাবলী বলতে সাধারণত শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীচৈতন্যের লীলাকথা বা ঘটনা নিয়ে গান করার জন্য রচিত কমনীয় কবিতাকে বোঝায়। এটি একাধারে সাহিত্য ও সাধনার অবলম্বন। দ্বাদশ শতকে জয়দেব 'গীতগোবিন্দ' কাব্যে 'পদাবলী' শব্দটি ব্যবহার করেন।

২. **'ব্রজবুলি' বলতে কি বোঝায়?**
**উত্তর :** 'ব্রজবুলি' হলো মৈথিলী ও বাংলা ভাষার মিশ্রণে গঠিত এক প্রকার কৃত্রিম কবিভাষা। এ ভাষায় বৈষ্ণব পদ রচনা করেছেন অনেক কবি, যাদের মধ্যে গোবিন্দ দাস, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস ও জ্ঞানদাস অন্যতম। উল্লেখ্য, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও ব্রজবুলি ভাষায় 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী' নামে কাব্য রচনা করেন।

৩. **বিদ্যাপতি কোথাকার কবি ছিলেন? তার পরিচয় দিন।**
**উত্তর :** বিদ্যাপতি (১৩৮০-১৪৬০) মিথিলার কবি। বাংলায় একটি পঙ্‌ক্তি না লিখেও বাঙালিদের কাছে একজন শ্রদ্ধেয় কবি। 'মৈথিল কোকিল' ও 'অভিনব জয়দেব' নামে খ্যাত বিদ্যাপতি বৈষ্ণব কবি ও পদসঙ্গীত ধারার রূপকার। তার অন্যান্য উপাধি ছিল নব কবিশেখর, কবিরঞ্জন, কবিকণ্ঠহার, পণ্ডিত ঠাকুর, সদুপাধ্যায়, রাজপণ্ডিত ইত্যাদি।

৪. **'পদাবলী'র প্রথম কবি কে? বৈষ্ণব পদাবলীর একজন বিখ্যাত কবির নাম লিখুন।**
**উত্তর :** বাংলা ভাষায় বৈষ্ণব পদাবলীর আদি রচয়িতা কবি চণ্ডীদাস (আনুমানিক ১৩৭০-১৪৩৩ খ্রি.)। মিথিলার কবি বিদ্যাপতি (১৩৮০-১৪৬০ খ্রি; মতান্তরে ১৩৯০-১৪৯০ খ্রি.) ছিলেন পদাবলীর বিখ্যাত কবি।

৫. **বৈষ্ণব পদাবলী কি? বৈষ্ণব পদাবলীর তিনজন পদকর্তার নাম লিখুন।**
**উত্তর :** মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ ফসল হচ্ছে বৈষ্ণব পদাবলী। পদ বা পদাবলী বলতে বোঝায় বৌদ্ধ বা বৈষ্ণবীয় ধর্মের গুঢ় বিষয়ের বিশেষ সৃষ্টি। পদাবলী সাহিত্য বৈষ্ণব তত্ত্বের রসভাষ্য। বৈষ্ণব পদাবলীর উপজীব্য হচ্ছে, রাধা-কৃষ্ণ তাদের প্রেমলীলায় জীবাত্মা ও পরমাত্মার রূপকে উপস্থিত। বৈষ্ণব মতে, স্রষ্টা ও সৃষ্টির মধ্যে প্রেমের সম্পর্ক বিদ্যমান। এ প্রেম সম্পর্কে বৈষ্ণব মতাবলম্বীগণ রাধা-কৃষ্ণের প্রেমলীলা রূপকের মাধ্যমে উপলব্ধি করেছেন। বৈষ্ণব পদাবলীর তিনজন উল্লেখযোগ্য পদকর্তা হচ্ছেন– ১. চণ্ডীদাস, ২. বিদ্যাপতি ও ৩. জ্ঞানদাস।

৬. **অধিকাংশ বৈষ্ণব পদাবলী কোন ভাষায় রচিত?**
**উত্তর :** ব্রজবুলি ভাষায়।

৭. **ব্রজবুলি ভাষায় কয়টি 'স' ব্যবহার করা হতো?**
**উত্তর :** একটি (দন্ত্য স)।

৮. **কোন কবি বাঙালি না হয়েও এবং বাংলায় কোনো পদ রচনা না করেও বাঙালি বৈষ্ণবের গুরু স্থানীয় হয়ে আছেন?**
**উত্তর :** মিথিলার কবি বিদ্যাপতি।

৯. **মৈথিলি ছাড়া আর কোন তিনটি ভাষায় বিদ্যাপতি গ্রন্থ রচনা করেন?**
**উত্তর :** সংস্কৃত, অবহট্‌ঠ ও ব্রজবুলি।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



১০. মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ ফসল কি?
উত্তর : বৈষ্ণব পদাবলী।

১১. বাংলা ভাষায় বৈষ্ণব পদাবলীর আদি রচয়িতা কে?
উত্তর : চণ্ডীদাস।

১২. আধুনিক যুগের কবিদের মধ্যে কে পদাবলী রচনা করেন?
উত্তর : বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (ভানুসিংহের পদাবলী)।

১৩. সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু/অনলে পুড়িয়া গেল–এ অংশটির রচয়িতা কে?
উত্তর : জ্ঞানদাস।

## জীবনী সাহিত্য

বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগের গতানুগতিক ধারায় জীবনী সাহিত্য এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। শ্রীচৈতন্যদেব ও তার কতিপয় শিষ্যের জীবনকাহিনী অবলম্বনে এই জীবনী সাহিত্যের সৃষ্টি। চৈতন্য জীবনের কাহিনীতে কবিরা অলৌকিকতা আরোপ করেছেন। তবু চৈতন্য ও তার শিষ্যরা বাস্তব মানুষ ছিলেন এবং এ ধরনের বাস্তব কাহিনী নিয়ে সাহিত্যসৃষ্টি বাংলা সাহিত্যে এই প্রথম। বাংলা ভাষায় শ্রীচৈতন্যের প্রথম জীবনীকাব্য বৃন্দাবনদাসের 'শ্রীচৈতন্যভাগবত'। চৈতন্যদেবের জীবনী গ্রন্থকে 'কড়চা' নামে অভিহিত করা হয়। চৈতন্যদেবের জীবনী হিসেবে যে বইটি সবচেয়ে বিখ্যাত, তার নাম 'চৈতন্যচরিতামৃত'। এর লেখক কৃষ্ণদাস কবিরাজ। চৈতন্যদেব এক অক্ষরও কবিতা লেখেননি, তবু তিনি বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে অধিকার করে আছেন একটি বড় স্থান। মধ্যযুগের সমাজ ছিল সংস্কারের নিষ্ঠুর দেয়ালে আবদ্ধ, চৈতন্যদেব তার মধ্যে আনেন আকাশের মুক্ত বাতাস; ফলে সমাজে এসেছিল জাগরণ। এর ফলে বাংলা সাহিত্য এগিয়ে গিয়েছিল সমৃদ্ধির পথে।

**মডেল প্রশ্ন**

১. কার জীবন কাহিনী নিয়ে জীবনী সাহিত্যের সৃষ্টি?
উত্তর : শ্রী চৈতন্যদেব ও তার কতিপয় শিষ্যের।

২. কড়চা কি?
উত্তর : চৈতন্যদেবের জীবনী গ্রন্থকে কড়চা বলা হয়। 'কড়চা' (খসড়া রচনা) শব্দটি প্রাকৃত 'কটকচ্চ' ও সংস্কৃত 'কৃতকৃত্য' থেকে এসেছে।

৩. চৈতন্যদেবের জীবনভিত্তিক প্রথম কাহিনী কাব্য কে রচনা করেন?
উত্তর : চৈতন্যদেবের জীবনভিত্তিক প্রথম কাহিনীকাব্য 'শ্রীচৈতন্যভাগবত' যা রচনা করেন বৃন্দাবন দাস। এ কাব্যটির রচনাকাল সম্ভবত ১৫৪৮ সাল। এছাড়াও চৈতন্যদেবের জীবনভিত্তিক কাহিনীকাব্য 'চৈতন্যমঙ্গল' রচনা করেন দু'জন (লোচন দাস ও জয়ানন্দ)। লোচন দাসের রচনাকাল ১৫৫০-১৫৫৬ সাল আর জয়ানন্দের রচনাকাল সম্ভবত ১৫৬০ সালের দিকে।

৪. শ্রী চৈতন্যভাগবত প্রথমে কি নামে পরিচিত ছিল?
উত্তর : চৈতন্যমঙ্গল।

৫. 'গোবিন্দ দাসের কড়চা' কোন কাহিনী নিয়ে রচিত?
উত্তর : চৈতন্যদেবের দাক্ষিণাত্য ও পশ্চিম ভারত পরিভ্রমণের কাহিনী অবলম্বনে লেখা।



৬. কোন মহাপুরুষ বাংলা সাহিত্যে একটি পঙ্ক্তি না লিখলেও তার নামে একটি যুগের সৃষ্টি হয়েছে?
উত্তর : চৈতন্যদেব।

৭. চৈতন্যদেব কেন স্মরণীয়?
উত্তর : চৈতন্য প্রবর্তিত আবেগমূলক বৈষ্ণবধর্ম সংস্কারাচ্ছন্ন বাঙালির চিন্তা-চেতনার পরিবর্তনের সাথে সাথে বাংলা সাহিত্যেও যথেষ্ট পরিবর্তন আনতে পেরেছিল। তাই তিনি স্মরণীয়।

৮. বাংলা সাহিত্যের প্রথম জীবনীগ্রন্থ কোনটি?
উত্তর : বাংলা সাহিত্যের প্রথম জীবনীগ্রন্থ বৃন্দাবন দাসের 'শ্রীচৈতন্যভাগবত'।

৯. 'চৈতন্য-চরিতামৃত'-এর লেখক কে?
উত্তর : কৃষ্ণদাস কবিরাজ।

## মর্সিয়া সাহিত্য

'মর্সিয়া' একটি আরবি শব্দ। এর শাব্দিক অর্থ শোক প্রকাশ করা। মুসলমান সংস্কৃতির নানা বিষাদময় কাহিনী তথা শোকাবহ ঘটনার বর্ণনার মাধ্যমে মর্সিয়া সাহিত্যের উদ্ভব হয়েছে। এর মধ্যে প্রধানত কারবালার প্রান্তরে শহীদ ইমাম হোসেন (রা) ও অন্যান্য শহীদদের উপজীব্য করে লেখা। এছাড়া মুসলিম খলিফা ও শাসকদের বিজয় অভিযানের বীরত্বগাথা এ শ্রেণীর কাহিনীতে স্থান পেয়েছে। 'জঙ্গনামা' এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। মুঘল আমলে যেসব কবি মর্সিয়া সাহিত্য রচনা করেছেন তারা হলেন শেখ ফয়জুল্লাহ, দৌলত উজির বাহরাম খান, মুহম্মদ খান, হায়াৎ মামুদ, জাফর হামিদ প্রমুখ।

□ মর্সিয়া সাহিত্যের আদি কবি শেখ ফয়জুল্লাহকে মনে করা হয়। তিনি 'জয়নবের চৌতিশা' নামক গ্রন্থটি রচনা করেন। সম্ভবত এটি প্রথম মর্সিয়া ধরনের কাব্য।

□ মুহম্মদ খান রচিত গ্রন্থের নাম 'মক্তুল হোসেন'। এ কাব্যগ্রন্থটি ফারসি 'মক্তুল হোসেন' কাব্যের ভাবানুবাদ। মুহম্মদ খান চট্টগ্রামের কবি ছিলেন। ১৬৪৫ সালে তিনি 'মক্তুল হোসেন' রচনা করেন।

□ হায়াৎ মামুদ অষ্টাদশ শতাব্দীর একজন বিখ্যাত কবি। তিনি রংপুর জেলার ঝাড়বিশিলা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তার রচিত 'জঙ্গনামা' কাব্যটি ফারসি কাব্যের অনুসরণে রচিত। গ্রন্থটি ১৭২৩ সালে রচিত।

□ মর্সিয়া ধারার হিন্দু কবি হলেন রাধারমণ গোপ। তিনি 'ইমামগণের কেচ্ছা' ও 'আফৎনামা' নামে দুটি কাব্য রচনা করেন।

**মর্সিয়া সাহিত্যধারার উল্লেখযোগ্য কবি ও কাব্য**

| কবি | সাহিত্যকর্ম |
|---|---|
| শেখ ফয়জুল্লাহ | জয়নবের চৌতিশা |
| হায়াৎ মামুদ | জঙ্গনামা |
| মুহম্মদ খান | মক্তুল হোসেন |
| সৈয়দ সুলতান | নবীবংশ |
| কবি শেরবাজ | কাশিমের লড়াই, ফাতিমার সুরতনামা |
| রাধারমণ গোপ | ইমামগণের কেচ্ছা, আফৎনামা |

আধুনিক যুগে মীর মশাররফ হোসেন এবং কায়কোবাদ প্রমুখ সাহিত্যিকগণ এ ধারার কবি।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



মডেল প্রশ্ন

১. 'মর্সিয়া শব্দটি কোন ভাষা থেকে আগত?
উত্তর : আরবি।

২. মর্সিয়া শব্দের অর্থ কি?
উত্তর : শোক প্রকাশ করা।

৩. মূলত কোন বিষয়কে উপজীব্য করে মর্সিয়া সাহিত্য সৃষ্টি হয়েছে?
উত্তর : কারবালা প্রান্তরে ইমাম হোসেন ও অন্যান্য শহীদদের উপজীব্য করে।

৪. দুই জন উল্লেখযোগ্য মর্সিয়া সাহিত্য রচনাকারীর নাম লিখুন।
উত্তর : দৌলত উজির বাহরাম খান ও শেখ ফয়জুল্লাহ।

৫. মুহম্মদ খান রচিত 'মক্তুল হোসেন' কোন কাব্যের ভাবানুবাদ?
উত্তর : ফারসি কাব্য 'মক্তুল হোসেন'।

৬. ফকির গরীবুল্লাহ কোন আমলে 'জঙ্গনামা' নামক মর্সিয়া কাব্য রচনা করেন?
উত্তর : ইংরেজ আমলে।

## নাথ সাহিত্য

বৌদ্ধ ধর্মমতের সঙ্গে শৈবধর্ম মিশে এক নতুন ধর্মমতের উদ্ভব হয়েছিল, সে ধর্মের নাম ছিল 'নাথ ধর্ম'। বাং[illegible] সাহিত্যের মধ্যযুগে নাথ ধর্মের কাহিনী অবলম্বনে আখ্যায়িকা কাব্য রচিত হতো। এ কাব্যই 'নাথ সাহিত্য' না[illegible] খ্যাত। শিব উপাসক এক শ্রেণীর যোগী সম্প্রদায়ের আচরিত ধর্ম হলো নাথ ধর্ম। হাজার বছর আগে ভারত[illegible] জুড়ে এ সম্প্রদায়ের খ্যাতি ছিল। নাথ অর্থ প্রভু। অ-জ্ঞান মানুষের তত্ত্ব জ্ঞানের বাধা বলে অবিদ্যা দূর ক[illegible] মহাজ্ঞান লাভের মাধ্যমে বসনাক্ষয় নাথগণের লক্ষ্য। এটি ব্যালাড বা গীতিকা হিসেবেও পরিচিত। [illegible] সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য রচনার মধ্যে আছে শেখ ফয়জুল্লাহর 'গোরক্ষ বিজয়'। এটি সম্পাদনা করেন আব[illegible] করিম সাহিত্যবিশারদ। এছাড়াও শুকুর মুহাম্মদ রচিত 'গোপীচাঁদের সন্ন্যাস', যা সংগ্রহ করেন চন্দ্রকুমার দে।

মডেল প্রশ্ন

১. নাথ সাহিত্য কি?
উত্তর : নাথ সাহিত্য হলো বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগে রচিত শিব উপাসক এক শ্রেণীর ধর্মপ্রচারকারী সাহি[illegible]

২. কোন কবি মুসলমান হয়েও নাথ সাহিত্য রচনা করেন?
উত্তর : শেখ ফয়জুল্লাহ।

৩. নাথ সাহিত্যের উপজীব্য কি?
উত্তর : আদিনাথ শিব, মীননাথ, পার্বতী, গোপীচন্দ্রের কাহিনী ইত্যাদি।

৪. নাথ ধর্মে কয়জন গুরুর কথা জানা যায়?
উত্তর : ৯ (নয়) জন।

৫. দেবী কোন নাথ গুরুকে মোহিনীর বেশ ধারণ করেও আদর্শচ্যুত করতে পারেন নি?
উত্তর : গোরক্ষনাথ।

৬. মীননাথের অপর নাম কি?
উত্তর : মৎস্যেন্দ্রনাথ।



## মঙ্গলকাব্য

মঙ্গল শব্দের আভিধানিক অর্থ কল্যাণ। মধ্যযুগে বিভিন্ন লৌকিক দেবদেবীর মহিমা ও মাহাত্ম্যকীর্তন এবং পৃথিবীতে তাদের পূজা প্রতিষ্ঠার কাহিনী নিয়ে যেসব কাব্য রচিত হয়েছে, সেগুলোই বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে মঙ্গলকাব্য নামে পরিচিত। কারো কারো মতে, দেবতাদের কাছে মঙ্গল কমনা করে এ কাব্যগুলো রচিত হয়েছিল বলেই এগুলোর নাম মঙ্গলকাব্য। মঙ্গলকাব্যসমূহের বিষয়বস্তু মূলত ধর্মবিষয়ক আখ্যান। মঙ্গলকাব্য পঞ্চদশ শতকের শেষভাগ থেকে অষ্টাদশ শতকের শেষার্ধে রচিত হয়েছিল। পৌরণিক, লৌকিক ও পৌরাণিক-লৌকিক সংমিশ্রিত দেবদেবীর লীলামাহাত্ম্য, পূজা প্রচার ও ভক্তকাহিনী প্রভৃতি অবলম্বনে রচিত সম্প্রদায়গত প্রচারধর্মী ও আখ্যানমূলক কাব্য হলো মঙ্গলকাব্য। বিভিন্ন দেবদেবীর গুণগান এবং পূজা প্রতিষ্ঠার কাহিনী মঙ্গলকাব্যের উপজীব্য। বাংলা সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য মঙ্গলকাব্যগুলো হচ্ছে মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল, অন্নদামঙ্গল, ধর্মমঙ্গল ইত্যাদি।

ক. মনসামঙ্গল : বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাসে মনসামঙ্গল সম্বন্ধেই প্রাচীনতম অস্তিত্বের প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায়। এ কাব্যের কাহিনী বাংলার আদিম লোকসমাজে প্রচলিত সর্পপূজার ঐতিহ্যের সঙ্গে সম্পর্কিত। সাপের অধিষ্ঠাত্রী দেবী মনসা। লৌকিক ভয়ভীতি থেকেই এ দেবীর উদ্ভব। তার অপর নাম কেতকা ও পদ্মাবতী। এ দেবীর কাহিনী নিয়ে রচিত কাব্য মনসামঙ্গল নামে পরিচিত। কোথাও তা পদ্মপুরাণ নামেও অভিহিত হয়েছে। চাঁদ সওদাগরের বিদ্রোহ ও বেহুলার সতীত্ব নিয়ে রচিত কাহিনীর জন্য মনসামঙ্গল সর্বাধিক জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। চাঁদ সওদাগর, বেহুলা মনসামঙ্গলের বিখ্যাত চরিত্র। কানা হরিদত্তকে মনসামঙ্গলের আদিকবি হিসেবে মনে করা হয়। মনসামঙ্গলের দুই সেরা কবি বিজয়গুপ্ত এবং দ্বিজ বংশীদাস। বাংলা সাহিত্যে সুস্পষ্ট সন-তারিখযুক্ত মনসামঙ্গল কাব্যের প্রথম রচয়িতা বিজয় গুপ্ত। তার জন্ম বাংলাদেশের বরিশাল জেলার গৈলা গ্রামে। এছাড়া মনসামঙ্গলের উল্লেখযোগ্য কবিরা হচ্ছেন বিপ্রদাস পিপিলাই, নারায়ণ দেব, কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ প্রমুখ।

খ. চণ্ডীমঙ্গল : চণ্ডী দেবীর কাহিনী অবলম্বনে রচিত চণ্ডীমঙ্গল কাব্য এ দেশে যথেষ্ট জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের আদি কবি মানিক দত্ত। চণ্ডীমঙ্গলের শ্রেষ্ঠ কবি মুকুন্দরাম চক্রবর্তী। জমিদার রঘুনাথের সভাসদরূপে থাকাকালীন তার নির্দেশে মুকুন্দরাম 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্য রচনা করেন। রঘুনাথ কবিপ্রতিভার স্বীকৃতিস্বরূপ তাকে 'কবিকঙ্কণ' উপাধি দেন। 'কালকেতু উপাখ্যান' কবি মুকুন্দরামের সবচেয়ে জনপ্রিয় কাহিনীকাব্য।

- প্রচলিত কাহিনী অবলম্বনে মুকুন্দরাম এ কাব্য রচনা করেন। চণ্ডীমঙ্গলের আদি কবি মানিকদত্তের কাব্য থেকে কিছু সাহায্য গ্রহণ করলেও কাব্য রূপায়ণে তার কৃতিত্ব অপরিসীম। তার কাব্যের বিষয়বস্তু পর্যালোচনা করলে দেখা যায় প্রথমে বন্দনা ও সৃষ্টিকাহিনী বর্ণিত হয়েছে, এরপর দেব খণ্ডে সতী ও পার্বতীর কাহিনী। দ্বিতীয় খণ্ডে আছে কালকেতুর কাহিনী এবং তৃতীয় খণ্ডের নাম বণিকখণ্ড যেমন রয়েছে ধনপতি সওদাগরের কাহিনী।
- চণ্ডীমঙ্গলে কেবল দুটি কাহিনী পাওয়া যায়। অন্যান্য মঙ্গলকাব্যে একটিমাত্র কাহিনী রয়েছে। চণ্ডীমঙ্গলে ব্যাধের ওপর চণ্ডীর প্রভাব বিস্তারের মাধ্যমে নিচু পর্যায়ে এবং বণিকের উপর প্রভাব বিস্তারের মাধ্যমে অভিজাত শ্রেণীর মানুষের মধ্যে পূজা প্রচারের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে।
- চণ্ডীমঙ্গলের উল্লেখযোগ্য চরিত্র : কালকেতু, ফুল্লরা, ধনপতি, খুল্লনা, ভাড়ু দত্ত ও মুরারিশীল।

গ. অন্নদামঙ্গল : চণ্ডী ও অন্নদা অভিন্ন—একই দেবীর দুই নাম। অন্নদামঙ্গল ধারার শ্রেষ্ঠ কবি ভারতচন্দ্র রায়। ভারতচন্দ্র মধ্যযুগের শ্রেষ্ঠ এবং শেষ কবি। মধ্যযুগের এ কবি ছিলেন রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সভাকবি। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র ভারতচন্দ্রকে উপাধি দিয়েছিলেন 'রায়গুণাকর'। ভারতচন্দ্রের রচিত একটি বিখ্যাত লাইন— 'আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে'। উক্তিটি করেছিলেন ঈশ্বরী পাটনি (অন্নদামঙ্গল)। তাঁর কয়েকটি বিখ্যাত উক্তি :

*নগর পুড়িলে দেবালয় কি এড়ায়।*
*মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন।*

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



ঘ. ধর্মমঙ্গল : ধর্মঠাকুর নামে কোনো এক পুরুষ দেবতার পূজা হিন্দু সমাজের নিচু স্তরের লোকদের মধ্যে বিশেষত ডোম সমাজে প্রচলিত রয়েছে। ধর্মঠাকুরের মাহাত্ম্য প্রচারের জন্য ধর্মমঙ্গল কাব্যধারার সূত্রপাত হয়েছে। ধর্মমঙ্গল ধারার আদি কবি ময়ূর ভট্ট। ধর্মমঙ্গলের অন্যান্য কবিরা হচ্ছেন মানিকরাম, সীতারাম, ঘনরাম প্রমুখ। ধর্মমঙ্গল কাব্যের কাহিনী দুই ভাগে বিভক্ত- ১. লাউসেনের কাহিনী ও ২. রাজা হরিশ্চন্দ্রের কাহিনী। এর মধ্যে লাউসেনের কাহিনীই এ কাব্যে প্রাধান্য পেয়েছে।

☐ ধর্মমঙ্গলের প্রথম অংশ রাজা হরিশ্চন্দ্রের কাহিনী খুবই পুরাতন, কিন্তু দ্বিতীয় অংশ লাউসেনের কাহিনী অর্বাচীন বা নতুন। প্রথম কাহিনীটা পৌরাণিক ঐতিহ্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত, অপর কাহিনীর সঙ্গে ইতিহাস ও লৌকিক আখ্যান জড়িত। তবে ইতিহাসের কালের সঙ্গে এর মিল নেই। লাউসেনের যথার্থ কাহিনী ধর্মমঙ্গল নামে পরিচিত।

### মঙ্গলকাব্য ও রচয়িতা

| | কবি | গ্রন্থ |
|---|---|---|
| মনসামঙ্গল | কানাহরি দত্ত | অল্পকিছু পদ পাওয়া গেছে যা গ্রন্থাকারে নয় |
| | নারায়ণ দেব | পদ্মপুরাণ |
| | বিজয় গুপ্ত | – |
| | বিপ্রদাস পিপিলাই | মনসা বিজয় |
| | দ্বিজ বংশীদাস | – |
| | কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ | – |
| | বাইশা | বাইশ কবি মনসা |
| ধর্মমঙ্গল | ময়ূর ভট্ট | হাকন্দপুরাণ |
| | আদি রূপরাম | – |
| | খেলারাম চক্রবর্তী | গৌড়কাব্য |
| | মানিক রাম | – |
| | রূপরাম চক্রবর্তী | – |
| | শ্যাম পণ্ডিত | নিরঞ্জনমঙ্গল |
| | সীতারাম দাস | – |
| | রাজারাম দাস | – |
| | রামদাস আদক | অনাদিমঙ্গল |
| | দ্বিজ প্রভুরাম | – |
| | ঘনরাম চক্রবর্তী | – |
| | রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় | ধর্মমঙ্গল |
| | সহদেব চক্রবর্তী | অনিল পুরাণ |
| | নরসিংহ বসু | – |
| | হৃদয়রাম সাউ | – |



| | কবি | গ্রন্থ |
|---|---|---|
| চণ্ডীমঙ্গল | মানিক দত্ত | – |
| | দ্বিজ মাধব | সারদামঙ্গল বা সারদাচরিত |
| | মুকুন্দরাম চক্রবর্তী | শ্রী শ্রী চণ্ডীমঙ্গল কাব্য |
| | দ্বিজরাম দেব | অভয়ামঙ্গল |
| | মুক্তারাম সেন | সারদামঙ্গল |
| অখ্যাত | হরিরাম | – |
| | লালা জয়নারায়ণ সেন | – |
| | ভবানী শঙ্কর দাস | – |
| | অকিঞ্চন চক্রবর্তী | – |

মডেল প্রশ্ন

১. মঙ্গলকাব্য কাকে বলে?
উত্তর : যে কাব্যের কাহিনী শ্রবণ করলে সকল ধরনের অকল্যাণ দূর হয় এবং পূর্ণাঙ্গ কল্যাণ লাভ হয় তাকে মঙ্গলকাব্য বলে। এটি বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগে বিশেষ এক শ্রেণীর ধর্মবিষয়ক আখ্যান কাব্য। বিভিন্ন দেবদেবীর গুণগান মঙ্গলকাব্যের উপজীব্য। তন্মধ্যে স্ত্রী দেবতাদের প্রাধান্যই বেশি এবং মনসা ও চণ্ডীই এদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ।

২. মঙ্গলকাব্যের প্রধান শাখা কয়টি ও কি কি?
উত্তর : মঙ্গলকাব্যের প্রধান শাখা দুটি। যথা : ১. পৌরাণিক মঙ্গলকাব্য ও ২. লৌকিক মঙ্গলকাব্য। পৌরাণিক শাখার মধ্যে রয়েছে– গৌরীমঙ্গল, ভবানীমঙ্গল, দুর্গামঙ্গল, অন্নদামঙ্গল, কমলামঙ্গল, গঙ্গামঙ্গল, চণ্ডিকামঙ্গল ইত্যাদি। লৌকিক মঙ্গলকাব্যগুলো হলো শিবমঙ্গল, মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল, কালিকামঙ্গল, শীতলামঙ্গল, রায়মঙ্গল, ষষ্ঠীমঙ্গল, সারদামঙ্গল, সূর্যমঙ্গল প্রভৃতি।

৩. মনসামঙ্গলের তিনজন কবির নাম লিখুন।
উত্তর : বিজয় গুপ্ত, বিপ্রদাস পিপিলাই ও কানাহরি দত্ত।

৪. ধনপতি সদাগর কোন নগরের অধিবাসী ছিলেন?
উত্তর : উজানী নগরের।

৫. মুকুন্দরাম চক্রবর্তীকে কবি কঙ্কন উপাধি প্রদান করেন কে?
উত্তর : মেদিনীপুর জেলার বাকুড়া রায়ের পুত্র রঘুনাথ।

৬. মনসামঙ্গল কাব্যের অপর নাম কি? মনসামঙ্গল কাব্যের আদি কবি কে?
উত্তর : পদ্মপুরাণ। মনসামঙ্গল কাব্যের আদি কবি কানা হরিদত্ত।

৭. মনসামঙ্গল কাব্যের কোন কবির জন্ম বাংলাদেশে, কোথায়?
উত্তর : কবি বিজয় গুপ্তের জন্ম বাংলাদেশের বরিশাল জেলার গৈলা গ্রামে (গ্রামের প্রাচীন নাম ফুল্লশ্রী)।

৮. বাইশা কি?
উত্তর : মনসামঙ্গলের বাইশ জন ছোট-বড় কবিকে একত্রে বাইশা বলে।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



**৯. চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের আদি কবি ও শ্রেষ্ঠ কবির নাম কি?**

উত্তর : আদি কবি মানিক দত্ত, শ্রেষ্ঠ কবি মুকুন্দরাম চক্রবর্তী।

**১০. 'কালকেতু উপাখ্যান'-এর প্রধান চরিত্রগুলো কি কি?**

উত্তর : কালকেতু, ফুল্লরা, ধনপতি, ভাঁড়ু দত্ত ও মুরারিশীল।

**১১. মধ্যযুগে বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কবি কে?**

উত্তর : ভারতচন্দ্র রায়।

**১২. ভারতচন্দ্র রায়ের প্রধান দুটি কাব্যগ্রন্থ কি কি?**

উত্তর : অন্নদামঙ্গল ও সত্যপীরের পাঁচালী।

**১৩. 'মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন'-প্রবাদটি কার রচনা ?**

উত্তর : ভারতচন্দ্র রায়।

**১৪. 'আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে'-এ প্রার্থনা ছিল কার?**

উত্তর : ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর রচিত 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যের বিশেষ চরিত্র ঈশ্বরী পাটনির। তিনি অন্নদা (চণ্ডী) দেবীর কাছে এ প্রার্থনা করেছিলেন।

**১৫. ধর্মমঙ্গল ধারার প্রথম কবি কে? তার গ্রন্থের নাম কি?**

উত্তর : ময়ূর ভট্ট; হাকন্দপুরাণ।

**১৬. কালিকামঙ্গলের আদি কবি কে?**

উত্তর : কবি কঙ্ক।

**১৭. 'গোরক্ষ বিজয়' এর আদি কবির নাম কি?**

উত্তর : শেখ ফয়জুল্লাহ।

**১৮. মনসামঙ্গল কোন ধরনের কাব্য? এর বিশেষ দিকগুলো তুলে ধরুন।**

উত্তর : মঙ্গলকাব্যের প্রাচীনতম ধারা মনসামঙ্গল। লৌকিক মঙ্গল কাব্য মনসামঙ্গল সর্পের অধিষ্ঠাত্রী দেবী মনসার স্তব, স্তুতি, কাহিনী নিয়ে রচিত। চাঁদ সদাগরের প্রথম দিকে মনসা বিরূপতা, পরে মনসা দেবীর অলৌকিক শক্তির প্রভাব স্বীকার করে তার বশ্যতা স্বীকার করাই মনসামঙ্গল কাব্যের প্রধান আখ্যান। চাঁদ সদাগরের বিদ্রোহ ও বেহুলার সতীত্ব কাহিনীর জন্য এটি সর্বাধিক জনপ্রিয়তা লাভ করে। উল্লেখযোগ্য চরিত্র হলো মনসা দেবী, চাঁদ সদাগর, বেহুলা, লখিন্দর প্রভৃতি।

**১৯. মঙ্গলকাব্য ধারার প্রাচীনতম কাব্যের নাম কি? এর বিষয়বস্তু কি?**

উত্তর : মঙ্গলকাব্যগুলোর মধ্যে মনসামঙ্গল প্রাচীনতম। সাপের দেবী মনসার পূজা প্রচারের কাহিনীই এ কাব্যের বিষয়বস্তু। এ কাব্যের মূল চরিত্রগুলো হলো চাঁদ সওদাগর, বেহুলা, লখিন্দর ও মনসা দেবী।

**২০. 'চণ্ডীমঙ্গল' কি? এর কাহিনী সংক্ষেপ লিখুন।**

উত্তর : চণ্ডীমঙ্গল কাব্য হলো চণ্ডী (পার্বতীর রূপভেদ) দেবীকে অবলম্বন করে রচিত মঙ্গলকাব্য। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের রচয়িতা মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর এ কাব্যে দুটি পৃথক কাহিনীর অবতারণা ঘটেছে। প্রথমটিতে ব্যাধদম্পতি কালকেতু ও ফুল্লরার জীবন প্রসঙ্গে চণ্ডী দেবীর বর প্রদান ও নানা মাহাত্ম্যের বর্ণনা এবং দ্বিতীয়টিতে ধনপতি সদাগর খুল্লনার ছেলে শ্রীমন্ত সদাগরের সিংহল গমনের বর্ণনা করা হয়েছে।



**২১. 'ধর্মমঙ্গল' কি? এ কাব্যের কয়েকটি চরিত্রের নাম লিখুন।**

উত্তর : ধর্মমঙ্গল হলো পঞ্চদশ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গের বীরভূম, বর্ধমান, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর ইত্যাদি অঞ্চলে ধর্মঠাকুর বা ধর্ম নামের যে দেবতাকে নিম্নশ্রেণী ও কোথাও কোথাও উচ্চশ্রেণীর হিন্দুরা পূজা করত, সেই কাহিনী অবলম্বনে রচিত কাব্য। এ কাব্যের মূল চরিত্রগুলো হলো–হরিশচন্দ্র, মদনা, লুইচন্দ্র, কর্ণসেন, গৌড়েশ্বর, লাউসেন।

**২২. অন্নদামঙ্গল কাব্যের প্রেক্ষাপট কি? এ কাব্যের কয়েকটি চরিত্রের নাম লিখুন।**

উত্তর : অন্নদামঙ্গল হলো দেবী অন্নদার মাহাত্ম্য প্রচারে ভবানন্দ মজুমদারের জীবন নিয়ে রচিত কাব্য। কবি ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর রচিত এ কাব্যের মূল চরিত্রগুলো হলো ভবানন্দ, হরিহোড়, বিদ্যা, সুন্দর, মানসিংহ, ঈশ্বরী পাটনী।

**২৩. 'মনসামঙ্গল' কাব্যের উদ্ভবের সামাজিক প্রেক্ষাপট বর্ণনা করুন।**

উত্তর : এ কাব্যের কাহিনী বাংলার আদিম লোক সমাজে প্রচলিত সর্পপূজার ঐতিহ্যের সাথে সম্পর্কিত। মধ্যযুগের পূর্বে বাংলা ছিল নদ-নদী ও বনজঙ্গলে পরিপূর্ণ। বিভিন্ন ধরনের সাপের বসবাস ছিল এ অঞ্চলে। সাধারণ মানুষের এ সর্পভীতি থেকেই 'মনসামঙ্গল' কাব্যের উদ্ভব হয়েছিল। সাপের অধিষ্ঠাত্রী দেবী মনসা। এ দেবীর কাহিনী নিয়ে রচিত কাব্যই মনসামঙ্গল নামে পরিচিত।

**২৪. কার নির্দেশে মুকুন্দরাম 'শ্রীশ্রীচণ্ডীমঙ্গল কাব্য' রচনা করেন? নির্দেশদাতা মুকুন্দরামকে কি উপাধি দেন?**

উত্তর : জমিদার রঘুনাথের সভাসদরূপে থাকাকালীন তার নির্দেশে মুকুন্দরাম 'শ্রীশ্রীচণ্ডীমঙ্গল' কাব্য রচনা করেন। রঘুনাথ কবিপ্রতিভার স্বীকৃতিস্বরূপ তাকে 'কবিকঙ্কণ' উপাধি দেন।

**২৫. রামপ্রসাদ সেন কোন মঙ্গলকাব্যের কবি? তাঁকে 'কবিরঞ্জন' উপাধি দিয়েছিলেন কে?**

উত্তর : রামপ্রসাদ সেন কালিকামঙ্গলের বিশিষ্ট কবি। নবদ্বীপের রাজা কৃষ্ণচন্দ্র তাঁকে 'কবিরঞ্জন' উপাধি দেন।

**২৬. ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর কোন রাজসভার কবি? সাহিত্যে তার কি ধরনের অবদান রয়েছে?**

উত্তর : ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর আঠারো শতকের বাংলা মঙ্গলকাব্য ধারার অন্যতম কবি। তিনি নবদ্বীপাধিপতি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের রাজসভায় 'সভাকবি' নিযুক্ত হন। কৃষ্ণচন্দ্রের আদেশে তিনি 'অন্নদামঙ্গল' (১৭৫২) কাব্যটি রচনা করেন। পরবর্তীতে এ রচনা তাকে মহারাজ কর্তৃক 'রায়গুণাকর' উপাধি লাভ করিয়ে দেয়। তার অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ রচনার মধ্যে রয়েছে— বিদ্যাসুন্দর, রসমঞ্জরী, সত্যপীরের কথা, নাগাষ্টক ইত্যাদি। তিনি মধ্যযুগের শেষ কবি।

## অনুবাদ সাহিত্য ও মহাকাব্য

বিশ্বের অপরাপর সাহিত্যের মতো বিভিন্ন ভাষার সাহিত্য অনুবাদ হয়েছে বাংলা সাহিত্যে। বাংলা সাহিত্যের একটি বিশিষ্ট অঙ্গন জুড়ে অনুবাদ সাহিত্যের চর্চা হয়েছিল এবং এর মাধ্যমে বাংলা সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি ঘটেছে। বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগে কবিরা অনুবাদে হাত দিয়েছিলেন। এক্ষেত্রে প্রধানত অনুবাদ হয়েছে- ১. সংস্কৃত থেকে (মহাভারত, রামায়ণ, ভাগবত); ২. হিন্দি সাহিত্য থেকে ও ৩. আরবি-ফারসি সাহিত্য থেকে।

**রামায়ণ**

খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতকে সংস্কৃত ভাষায় রামায়ণ রচিত হয়। রামায়ণ লিখেছেন বাল্মীকি। বাল্মীকির মূল নাম দস্যু রত্নাকর।

□ 'বল্মীক' মানে হলো উই ঢিপি বা উইপোকা। দস্যু রত্নাকর রাম নাম করতে করতে উইপোকার ঢিপিতে পরিণত হয়েছিলেন বলে তার নাম হয় বাল্মীকি।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



☐ রামায়ণের প্রথম অনুবাদক পনের শতকের কবি কৃত্তিবাস ওঝা। তিনি রামায়ণের প্রথম এবং শ্রেষ্ঠ অনুবাদক। এটি প্রথম মুদ্রিত হয় ১৮০২-১৮০৩ সালে শ্রীরামপুরের মিশনারী ছাপাখানায় উইলিয়াম কেরীর উদ্যোগে।

☐ সতেরো শতকের কবি চন্দ্রাবতী রামায়ণ অনুবাদ করেন। তিনি বাংলা সাহিত্যের প্রথম মহিলা কবি। চন্দ্রাবতী হলেন মনসামঙ্গলের কবি দ্বিজ বংশীদাসের বিদুষী কন্যা।

### মহাভারত

☐ আজ হতে অন্তত আড়াই হাজার বছর পূর্বে সংস্কৃত ভাষার মহাভারত রচিত হয়।

☐ মহাভারতের মূল রচয়িতা কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসদেব বা বেদব্যাস।

☐ মহাভারতের প্রথম অনুবাদক ষোল শতকের কবি কবীন্দ্র পরমেশ্বর। তার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন পরাগল খান। এরপর মহাভারতের আংশিক (অশ্বমেধ পর্ব) বাংলায় অনুবাদ করেন শ্রীকর নন্দী। শ্রীকর নন্দীর পৃষ্ঠপোষক ছিলেন পরাগল খানের পুত্র ছুটি খান।

☐ সতেরো শতকের কবি কাশীরাম দাস হলেন মহাভারতের বিখ্যাত ও জনপ্রিয় অনুবাদক। অবশ্য তিনি মহাভারত অনুবাদ সম্পন্ন করেননি। তার মৃত্যুর পর তার ভাইয়ের ছেলে এবং আরো কয়েকজন মিলে মহাভারত অনুবাদ সম্পন্ন করেন। কাশীরাম দাসের 'মহাভারত' এর দুটি বিখ্যাত পঙ্‌ক্তি-

*মহাভারতের কথা অমৃত সমান।*
*কাশীরাম দাস ভনে শোনে পুণ্যবান*

### ভাগবত

হিন্দুধর্মের এই পবিত্র ধর্মগ্রন্থটি বাংলায় অনুবাদ করেন মালাধর বসু। এজন্য তিনি 'গুণরাজ খান' উপাধি লাভ করেন। তার ভাগবতের নাম 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়'।

**পৃথিবীর ৪টি জাত মহাকাব্য (Authentic Epic)**

| মহাকাব্য | রচয়িতা |
|---|---|
| রামায়ণ | বাল্মীকি |
| মহাভারত | কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন ব্যাসদেব |
| ইলিয়াড | হোমার |
| ওডেসি | হোমার |

**কয়েকটি বিখ্যাত সাহিত্যিক মহাকাব্য**

| মহাকাব্য | রচয়িতা |
|---|---|
| ঈনীড | ভার্জিল |
| শাহনামা | ফেরদৌসী |
| প্যারাডাইস লস্ট | মিল্টন |
| মেঘনাদবধ | মাইকেল মধুসূদন দত্ত |

আরবি-ফারসি-হিন্দি ভাষা থেকে যেসব সাহিত্যকর্ম বাংলা ভাষায় অনূদিত হয়েছিল সেগুলোকে সাধারণত রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান নাম দেয়া হয়েছিল। কিছু রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান অনূদিত হয়েছিল মিয়ানমারের আরাকান রাজসভায়। তাই এই অনুবাদ সাহিত্যকে দুই ভাগে ভাগ করে আলোচনা করা হয়েছে।



## অনুবাদ ও অনূদিত গ্রন্থ

| অনুবাদকের নাম | অনূদিত গ্রন্থ | মূলগ্রন্থ | মূল রচয়িতা |
|---|---|---|---|
| কৃত্তিবাস ওঝা | রামায়ণ* | রামায়ণ | বাল্মীকি |
| কাশীরাম দাস | মহাভারত** | মহাভারত | ব্যাসদেব |
| মালাধর বসু | ভাগবত | ভাগবত পুরাণ | ব্যাসদেব |
| নরসিংহ দাস ও নরোত্তম দাস | হংসদূত | হংসদূত | রূপগোস্বামী |
| সাবিরিদ খান | বিদ্যাসুন্দর | চৌরপঞ্চাশিকা, বিদ্যাসুন্দরম | বিলহন, বররুচি |
| শাহ মুহম্মদ সগীর, আবদুল হাকিম, ফকির গরীবুল্লাহ | ইউসুফ জোলেখা | ইউসুফ ওয়া জুলয়খা | জামী |
| দৌলত উজির বাহরাম খান | লায়লী মজনু | লায়লা ওয়া মজনুন | জামী |
| আলাওল, দোনাগাজী | সয়ফুলমুলুক বদিউজ্জামাল | আলেফ লায়লা ওয়া লায়লা | – |
| আলাওল | হপ্ত পয়কর | হফত পয়কর | নিজামী |
| আলাওল | সিকান্দারনামা | সিকান্দারনামা | নিজামী |
| নওয়াজিস খাঁ, মুহাম্মদ মুকীম | গুল-ই বকাওলী | আজুলমূলক গুল-ই বকাওলী | ইজ্জতুল্লাহ |
| শেখ পরান, আবদুল হাকিম, শেখ সুলায়মান | নসিহৎনামা | – | – |
| আবদুল হাকীম, আবদুল করিম ও মীর মুহাম্মদ শফী | নূরনামা | – | – |
| আলাওল | তোহফা | তোহফাতুন নেসায়েহ | ইউসুফ গদা |
| সৈয়দ হামজা | হাতেম তাই | আলেফ লায়লা ওয়া লায়লা | – |
| সৈয়দ হামজা | আমীর হামজা | কিস্‌সা-ই-আমীর হামজা | মোল্লা জালাল বালখি |
| ফকির গরীবুল্লাহ | মকতুল হোসেন | – | – |
| কাজী দৌলত ও আলাওল | সতীময়না ও লোরচন্দ্রানী | মৈনাসত | সাধন |
| আলাওল | পদ্মাবতী | পদুমাবত | মালিক মুহাম্মদ জায়সী |
| সৈয়দ হামজা | মধুমালতী | মধুমালত | মনঝন |

**Note :** * *রামায়ণের অন্যান্য অনুবাদক হলেন-চন্দ্রাবতী, দ্বিজ মধুকণ্ঠ, ষষ্ঠীবর সেন, গঙ্গাদাস সেন, দ্বিজ ভবানীদাস, দ্বিজ দুর্গারাম, জগৎরাম রায়, শিবচন্দ্র সেন, কবিচন্দ্র, শঙ্কর, লক্ষ্মণ বন্দ্যোপাধ্যায়, রামমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রঘুনন্দন গোস্বামী, রামানন্দ ঘোষ প্রমুখ।*

**Note :** ** *মহাভারতের অন্যান্য অনুবাদক হলেন— কবীন্দ্র পরমেশ্বর, শ্রীকর নন্দী, সঞ্জয়, ষষ্ঠীবর সেন, গঙ্গাদাস সেন, দ্বৈপায়ন দাস, নিত্যানন্দ দাস, শঙ্কর চক্রবর্তী, সরলা দাস প্রমুখ।*

**মডেল প্রশ্ন**

১. **কোন শাসকের আমলে বাংলা ভাষায় অনুবাদ কর্মের সূচনা হয়?**
**উত্তর :** সুলতান রুকনউদ্দীন বরবক শাহ।

২. **কবীন্দ্র পরমেশ্বর দাস কার নির্দেশে 'মহাভারত' রচনা করেন?**
**উত্তর :** চট্টগ্রামের সেনানী শাসক পরাগল খান।

৩. **হিন্দুদের জাতীয় মহাকাব্য কোনটি?**
**উত্তর :** রামায়ণ ও মহাভারত।

৪. **আদি মহাকাব্য কোনটি?**
**উত্তর :** রামায়ণ।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



৫. 'বাল্মীকি রামায়ণ' ও 'কৃত্তিবাসী রামায়ণের' মধ্যে পার্থক্য কি?
উত্তর : বাল্মীকি হলেন রামায়ণের মূল রচয়িতা। এটি সংস্কৃত ভাষায় রচিত। পক্ষান্তরে কৃত্তিবাস হলেন মূল রামায়ণের বাংলা অনুবাদক। অর্থাৎ কৃত্তিবাসী রামায়ণ হলো বাংলা ভাষায় অনূদিত রামায়ণ।

৬. সতীময়না ও লোরচন্দ্রানী মূল কাব্যটি কোন ভাষায় রচিত?
উত্তর : হিন্দি ভাষায়।

৭. রামায়ণ অনুবাদক প্রথম মহিলা কবি কে?
উত্তর : চন্দ্রাবতী।

৮. রামায়ণ কাব্যের মূল রচয়িতা কে? এটি কোন ভাষার কাব্য?
উত্তর : কবি বাল্মীকি। সংস্কৃত ভাষার কাব্য।

৯. রামায়ণের প্রথম অনুবাদক কে? শ্রেষ্ঠ অনুবাদক কে?
উত্তর : রামায়ণের প্রথম অনুবাদক কৃত্তিবাস ওঝা। কৃত্তিবাসই রামায়ণের শ্রেষ্ঠ অনুবাদক।

১০. মহাভারতের জনপ্রিয়, প্রাঞ্জল অনুবাদটি কার? কাব্যটির মূল রচয়িতা কে?
উত্তর : মহাভারতের জনপ্রিয়, প্রাঞ্জল অনুবাদটি সতের শতকের কবি কাশীরাম দাসের। মূল রচয়িতা কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদব্যাস।

১১. মালাধর বসু কে ছিলেন?
উত্তর : মালাধর বসু ভাগবতের প্রথম অনুবাদক। তাঁর লেখা 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের দ্বিতীয় অনুবাদ গ্রন্থ।

১২. বাংলায় প্রথম পবিত্র কুরআনের অনুবাদক হিসেবে ভাই গিরিশচন্দ্র সেনের পরিচয় দিন।
উত্তর : ভাই গিরিশচন্দ্র সেন ১৮৮১-৮৬ পর্যন্ত পাঁচ বছরের সাধনা ও পরিশ্রমে টীকাসহ সমগ্র কুরআন শরীফের প্রথম বঙ্গানুবাদ করেন। ১৮৩৫ সালে নরসিংদী জেলার পাঁচদোনা গ্রামে জন্মগ্রহণকারী গিরিশচন্দ্র সেন ১৮৭১ সালে ব্রাহ্ম ধর্মে দীক্ষা লাভ করেন। ইসলাম সম্পর্কিত তার অনুবাদ ও মৌলিক গ্রন্থের সংখ্যা ২১টি। ইসলাম সম্পর্কিত গ্রন্থ রচনায় তার অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ তাকে 'ভাই' উপাধি প্রদান করা হয়। 'তাজকেরাতুল আওলিয়া' অবলম্বন করে তিনি 'তাপসমালা' রচনা করেন। 'দিওয়ান-ই-হাফিজ', 'গুলিস্তাঁ', 'মহাপুরুষ মুহাম্মদ ও তৎপ্রবর্তিত ইসলাম ধর্ম', 'মহাপুরুষ চরিত্র' প্রভৃতি তার রচিত গ্রন্থ।

১৩. 'Tree Without Roots' কোন গ্রন্থের ইংরেজি অনুবাদ?
উত্তর : কথাসাহিত্যিক সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর (১৯২২-১৯৭১) বিখ্যাত উপন্যাস 'লালসালু' ১৯৪৮ সালে প্রকাশিত হয়। পরবর্তীতে ইংরেজিতে ১৯৬৭ সালে এটি Tree Without Roots নামে অনূদিত হয়।

১৪. মহাকাব্য কাকে বলে? পাঁচটি মহাকাব্যের নাম লিখুন।
উত্তর : সাধারণত বীররসাত্মক আখ্যানকাব্যকে মহাকাব্য বলে। ইংরেজিতে একে বলে Epic। বর্তমানে মহাকাব্যের দুটি ধারা রয়েছে। যথা– প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য আদর্শরূপ। প্রাচ্য আদর্শানুসারে, মহাকাব্যে সর্গবিভাগ থাকবে এবং সর্গ সংখ্যা হবে অষ্টাধিক। সমগ্র সর্গ এক ছন্দে রচিত হবে। এর উপজীব্য হবে পুরাণ, ইতিহাস বা কোনো সত্য ঘটনা। নায়কের জয় বা প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে মহাকাব্যের সমাপ্তি ঘটবে। পাশ্চাত্য আদর্শানুসারে, মহাকাব্য বলতে বীরত্বব্যঞ্জক উপাখ্যানকেই বোঝায়। সর্গ সংখ্যার কোনো সীমাবদ্ধতা এতে নেই, তবে এক ছন্দেই রচিত হবে। এর উপজীব্য হবে জাতীয় জীবনের ঐতিহাসিক বা পৌরাণিক তথ্য। পরিসমাপ্তি শুভান্তিক হবে এমন কোনো সীমাবদ্ধতা নেই।
পাঁচটি মহাকাব্যের নাম : (১) প্যারাডাইস লস্ট, (২) ইলিয়ড, (৩) মেঘনাদবধ কাব্য, (৪) মহাশ্মশান, (৫) স্পেন বিজয় কাব্য।



## রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান

মধ্যযুগে বাংলাদেশের বাইরে আরাকানে ব্যাপকভাবে বাংলা সাহিত্য চর্চা শুরু হয়। বাংলা সাহিত্যের বিকাশে তাই আরাকান রাজসভার অবদান অনস্বীকার্য। এখানে যারা সাহিত্যচর্চায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন তাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন দৌলত কাজী, মরদন, আলাওল প্রমুখ। আলাওল পদুমাবত কাব্যের অনুবাদ 'পদ্মাবতী' রচনা করে বিখ্যাত হয়ে আছেন। তার অন্যান্য রচনার মধ্যে আছে হপ্তপয়কর, তোহফা ও সেকান্দরনামা।

### রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের মুসলমান কবিগণের সবচেয়ে উলেখযোগ্য অবদান এই রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান। প্রাচীন ও মধ্যযুগের ধর্মকেন্দ্রিক ও দেবতাকেন্দ্রিক সাহিত্য ছেড়ে এই কাব্যগুলোতে প্রথমবারের মতো মানবীয় বৈশিষ্ট্য প্রতিফলিত হয়। চতুর্দশ শতকের শেষ দিকে বা পঞ্চদশ শতকের প্রথম দিকে বাংলা সাহিত্যে মুসলমান কবিদের প্রথম আবির্ভাব ঘটে। বাংলা ভাষায় প্রথম মুসলমান কবির নাম শাহ্ মুহম্মদ সগীর।

### শাহ মুহম্মদ সগীর

পনের শতকের কবি শাহ মুহম্মদ সগীর সুলতান গিয়াসউদ্দিন আজম শাহের রাজত্বকালে যে কাব্য রচনা করেন, সে কাব্যের নাম 'ইউসুফ-জোলেখা'। অনেকের মতে তিনি ফারসি কবি জামী রচিত ফারসি প্রেমাখ্যান 'ইউসুফ ওয়া জুলয়খা' অবলম্বনে রচনা করেন 'ইউসুফ জোলেখা' কাব্য। তবে কবি জামী শাহ মুহম্মদ সগীরের পরবর্তী কবি হওয়ায় জামীর কাব্য অনুসরণ করার সম্ভাবনা খুবই কম।

এ কাব্যের মূল বিষয়বস্তু হলো- তৈমুর বাদশাহ-কন্যা জোলেখা এবং ক্রীতদাস ইউসুফের প্রণয়কাহিনী। শাহ মুহম্মদ সগীর ব্যতীত ইউসুফ জোলেখা কাব্যের অন্যান্য রচয়িতাগণ হলেন- আবদুল হাকিম, ফকীর গরীবুল্লাহ, গোলাম সাফাতউল্লাহ, সাদেক আলী ফকির মুহম্মদ।

### দৌলত উজির বাহরাম খান

ষোল শতকের কবি দৌলত উজির বাহরাম খান ফারসি কবি জামী রচিত ফারসি প্রেমাখ্যান 'লায়লা ওয়া মজনুন' অবলম্বনে রচনা করেন 'লায়লী মজনু' কাব্য। এ কাহিনীর মূল উৎস আরবি লোকগাঁথা। বাহরাম খান মধ্যযুগের বিখ্যাত কবি। তিনি চট্টগ্রামের জাফরাবাদের অধিবাসী ছিলেন। তার পিতা মোবারক খান চট্টগ্রামের অধিপতির কাছ থেকে 'দৌলত উজির' উপাধি পেয়েছিলেন। অল্পবয়সে পিতৃহীন বাহরাম খানকে চাটিগ্রাম নৃপতি নেজাম শাহ সুর ১৫৬০ সালে 'দৌলত উজির' উপাধি প্রদান করেন। দৌলত উজির তার পিতার উপাধি ছিল।
'লাইলী মজনু'র রচনাকাল নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্র মতে, এটির রচনাকাল ১৫৬৯ সাল, ড. এনামুল হকের মতে, ১৫৬০-১৫৭৫ সাল, ড. আহমেদ শরীফের মতে, ১৫৪৩-১৫৫৩ সাল।

### আবদুল হাকিম

'নূরনামা' কাব্যের জন্য খ্যাত আবদুল হাকিম। কবি আবদুল হাকিমের প্রণয়োপাখ্যানগুলো হলো 'ইউসুফ জোলেখা' এবং 'লালমতি-সয়ফুলমুলুক'। আবদুল হাকিম ফারসি কবি জামী রচিত কাব্য অবলম্বনে 'ইউসুফ-জোলেখা' কাব্য রচনা করেন। কবি আবদুল হাকিম নিজেকে বাঙালি বলতে গর্ববোধ করতেন। মধ্যযুগে একদল মুসলমান বাংলা ভাষাকে অবজ্ঞা করতো। তাদের উদ্দেশ্যে কবির বিখ্যাত পঙ্‌ক্তি-

*যে সবে বঙ্গেত জন্মি হিংসে বঙ্গবাণী,*
*সে সব কাহার জন্ম নির্ণয় ন জানি।*

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



## অন্যান্য কবি

হানিফা ও কয়রা পরীর গল্প লিখেছেন সাবিরিদ খান। মনোহর-মধুমালতী কাহিনী লিখেছেন কবি মুহম্মদ কবির। বিদ্যাসুন্দরের কাহিনী নিয়ে চমৎকার বই লিখেছেন সাবিরিদ খান। আফজল আলী লিখেছিলেন নসিহৎনামা নামে একটি কাব্য। সৈয়দ সুলতান লিখেছিলেন নবীবংশ, রসুলবিজয়, জ্ঞানচৌতিশা, জ্ঞানপ্রদীপ ইত্যাদি কাব্য। কবি হাজি মুহম্মদের একটি কাব্য পাওয়া যায়, যার নাম নুরজামাল। কবি মুহম্মদ খানের উল্লেখযোগ্য দুটি কাব্যের নাম– সত্যকলি-বিবাদসংবাদ, হানিফার লড়াই। রোমান্টিক কাব্যধারায় যেসব উল্লেখযোগ্য কবি তাঁদের প্রতিভার নিদর্শন রেখে গেছেন তার একটি তালিকা নিচে দেয়া হলো :

| কাল | কবি | কাব্য |
|---|---|---|
| পনেরো শতক | শাহ্ মুহম্মদ সগীর | ইউসুফ-জোলেখা |
| ষোল শতক | দৌলত উজির বাহরাম খান | লাইলী-মজনু |
| ষোল শতক | মুহম্মদ কবীর | মধুমালতী |
| ষোল শতক | সাবিরিদ খান | হানিফা-কয়রাপরী, বিদ্যাসুন্দর |
| ষোল শতক | দোনা গাজী চৌধুরী | সয়ফুলমুলুক-বদিউজ্জামাল |
| সতেরো শতক | দৌলত কাজী | সতীময়না-লোরচন্দ্রানী |
| সতেরো শতক | আলাওল | পদ্মাবতী, হপ্তপয়কর, সয়ফুলমুলুক-বদিউজ্জামাল |
| সতেরো শতক | কোরেশী মাগন ঠাকুর | চন্দ্রাবতী |
| সতেরো শতক | আবদুল হাকিম | লালমতী সয়ফুলমুলুক |
| সতেরো শতক | নওয়াজিস খান | গুলে বকাওলী |
| সতেরো শতক | মঙ্গল চাঁদ | শাহজালাল-মধুমালা |
| সতেরো শতক | সৈয়দ মুহম্মদ আকবর | জেবলমুলুক শামারোখ |
| আঠার শতক | মুহম্মদ মুকীম | মৃগাবতী |
| আঠার শতক | শেখ সাদী | গদামল্লিকা |

### মডেল প্রশ্ন

১. মধ্যযুগে বাংলা সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য অবদান কি?
উত্তর : রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান।

২. রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যানের উৎস কি?
উত্তর : ফারসি ও হিন্দি সাহিত্য।

৩. ফারসি গ্রন্থ থেকে অনূদিত তিনটি প্রণয়োপাখ্যানের নাম লিখুন।
উত্তর : ইউসুফ-জোলেখা, লায়লী-মজনু, সয়ফুলমুলুক-বদিউজ্জামাল।

৪. বিদ্যাসুন্দর প্রণয়োপাখ্যানটির রচয়িতা কে?
উত্তর : সাবিরিদ খান।

৫. নওয়াজিস খান রচিত রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান গুলে বকাওলী কোন গ্রন্থ অবলম্বনে রচিত?
উত্তর : শেখ ইজ্জতুল্লাহ নামে জনৈক বাঙালি লেখক ১৭২২ সালে ফারসি ভাষায় 'গুল-ই-বকাওলী' গ্রন্থ রচনা করেন। গ্রন্থটি হিন্দি থেকে ভাষান্তরিত। গদ্যে রচিত এ গ্রন্থের কাহিনী নওয়াজিস খান কাব্যে রূপদান করেন।



৬. রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান ধারার প্রথম কবি কে?
উত্তর : শাহ্ মুহম্মদ সগীর।

৭. প্রাচীনতম মুসলমান কবি রচিত প্রাচীনতম বাংলা কাব্য কোনটি?
উত্তর : শাহ্ মুহম্মদ সগীরের 'ইউসুফ-জোলেখা'।

৮. শাহ্ মুহম্মদ সগীরের 'ইউসুফ-জোলেখা' কোন কবির মূল কাহিনী অবলম্বনে রচিত?
উত্তর : ইরানের মহাকবি ফেরদৌসীর মূল কাহিনী অবলম্বনে শাহ্ মুহম্মদ সগীর 'ইউসুফ-জোলেখা' রচনা করেন।

৯. শাহ্ মুহম্মদ সগীর ব্যতীত অন্যান্য কোন কোন কবি 'ইউসুফ-জোলেখা' রচনা করেন?
উত্তর : আবদুল হাকিম, ফকির গরীবুল্লাহ্, সাদেক্ আলী, ফকির মুহাম্মদ।

১০. লাইলী-মজনু কাব্য কোন কবির কাব্যের ভাবানুবাদ এবং এই কাহিনীর মূল উৎস কি?
উত্তর : লাইলী-মজনু কাব্য ফারসি কবি জামীর কাব্যের ভাবানুবাদ এবং এই কাহিনীর মূল উৎস আরবীয় লোকগাথা।

১১. আরব্য উপন্যাস 'আলেফ লায়লা' অবলম্বনে রচিত বাংলা সাহিত্য কোনটি?
উত্তর : সয়ফুলমুলুক বদিউজ্জামাল।

১২. মধুমালতী কাব্য কে রচনা করেন, কোন কাব্য অবলম্বনে?
উত্তর : মুহম্মদ কবীর হিন্দি কবি মনঝন রচিত হিন্দি প্রেমাখ্যান 'মধুমালত' অবলম্বনে রচনা করেন 'মধুমালতী' কাব্য।

১৩. কবি আবদুল হাকিমের তিনটি তত্ত্বমূলক গ্রন্থের নাম লিখুন।
উত্তর : নুরনামা, নসিয়তনামা, দোররে মজলিস।

১৪. রচয়িতাসহ পাঁচটি রোমাঞ্চমূলক প্রণয়োপাখ্যানের নাম লিখুন এবং এ শ্রেণীর কাব্যের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করুন।
উত্তর : রচয়িতাসহ পাঁচটি রোমাঞ্চকর প্রণয়োপাখ্যান :
ক. ইউসুফ-জোলেখা — শাহ্ মুহম্মদ সগীর;
খ. লাইলী-মজনু — দৌলত উজীর বাহরাম খান;
গ. মধুমালতী — মুহম্মদ কবীর;
ঘ. পদ্মাবতী — আলাওল;
ঙ. সতীময়না-লোরচন্দ্রানী — দৌলত কাজী।
এ শ্রেণীর কাব্যের বৈশিষ্ট্য : মূল কাব্যের লক্ষ্য অনেক ক্ষেত্রেই আধ্যাত্মপ্রেম হলেও বাংলা ভাষায় পরিবেশনকালে তা আধ্যাত্মিকতা থেকে মুক্তি পেয়েছে এবং তাতে মানবপ্রেমের বৈশিষ্ট্য প্রকাশিত হয়েছে। রোমান্টিক কথা ও কাহিনীর অসাধারণ ভাণ্ডার আরবি-ফারসি সাহিত্যের প্রত্যক্ষ অনুপ্রেরণায় বাংলা সাহিত্যে এ ধারার সৃষ্টি।

১৫. 'লাইলী-মজনু' কাব্যের কাহিনী সংক্ষেপে লিখুন।
উত্তর : আমির-পুত্র কয়েস বাল্যকালে বণিক-কন্যা লায়লীর প্রেমে পড়ে মজনু বা পাগল নামে খ্যাত হয়। লায়লীও মজনুর প্রতি গভীর আকর্ষণ অনুভব করে। কিন্তু উভয়ের বিবাহে আসে প্রবল বাধা; ফলে মজনু পাগলরূপে বনে-জঙ্গলে ঘুরে বেড়াতে থাকে। অন্যদিকে লায়লীর অন্যত্র বিয়ে হলেও তার মন থেকে মজনু সরে যায়নি। তাদের দীর্ঘ বিরহজীবনের অবসান ঘটে করুণ মৃত্যুর মাধ্যমে। এই মর্মস্পর্শী বেদনাময় কাহিনী অবলম্বনেই লায়লী-মজনু কাব্য রচিত।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



## আরাকান রাজসভায় বাংলা সাহিত্য

আরাকান রাজসভার পৃষ্ঠপোষকতায় মধ্যযুগে বাংলা সাহিত্যের যে বিকাশ সাধিত হয়েছিল তা বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আরাকানকে বাংলা সাহিত্যে 'রোসাং' বা 'রোসাঙ্গ' নামে উল্লেখ করা হয়েছে। বার্মার উত্তর-পশ্চিম সীমায় এবং চট্টগ্রামের দক্ষিণে সমুদ্রের তীরে এর অবস্থান ছিল। আরাকানের রাজসভায় স্থান পেয়েছিলেন বাংলা ভাষার কয়েকজন কবি। তাঁদের মধ্যে আছেন আলাওল, দৌলত কাজী, কোরেশী মাগন ঠাকুর। এ কবি তিনজনের সবাই সপ্তদশ শতকের।

### দৌলত কাজী

সতেরো শতকের একজন উল্লেখযোগ্য কবি দৌলত কাজী। তিনি হিন্দি কবি সাধন রচিত প্রেমাখ্যান 'মৈনাসত' অবলম্বনে রচনা করেন 'সতীময়না-লোরচন্দ্রানী' কাব্য। দৌলত কাজী কাব্যটি সমাপ্ত করতে পারেননি। তার মৃত্যুর বিশ বছর পর আলাওল কাব্যটির দ্বিতীয় খণ্ডের বর্ণনা এবং সম্পূর্ণ তৃতীয় খণ্ড রচনা করেন।

### আলাওল

আলাওল ছিলেন আরাকানের রাজসভার কবিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। শুধু তাই নয়, তিনি ছিলেন মধ্যযুগের মুসলমান কবিদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ কবি। আলাওলের শ্রেষ্ঠ কাব্যের নাম 'পদ্মাবতী' (১৬৪৮)। এটি বিখ্যাত হিন্দি কবি মালিক মুহম্মদ জায়সির 'পদুমাবত'-এর বঙ্গানুবাদ। 'পদ্মাবতী' কাব্যের নায়ক ও নায়িকা হলেন রত্নসেন ও পদ্মাবতী। এ কাব্যে শুক পাখি নামক একটি পাখির অনেক ভূমিকা আছে। তার জীবনে মাগন ঠাকুরের প্রভাব অপরিসীম। মাগন ঠাকুর কবিকে কাব্য রচনায় উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। তার রচিত অন্যান্য কাব্য- 'সয়ফুলমুলুক বদিউজ্জামাল, 'সেকান্দার নামা'।

'সয়ফুলমুলুক-বদিউজ্জামাল' গ্রন্থের কাহিনীর আদি উৎস আলিফ লায়লা বা আরব্য রজনী।

### কোরেশী মাগন ঠাকুর

সতেরো শতকের কবি কোরেশী মাগন ঠাকুর ছিলেন রোসাঙ্গ রাজসভার প্রধান উজির। মূলত তার পৃষ্ঠপোষকতায় রোসাঙ্গে বালা সাহিত্য চর্চা হয়েছিল। তার রচিত কাব্যের নাম 'চন্দ্রাবতী'। বীরভানের চিত্রার্পিত রূপ দেখে রাজকন্যা চন্দ্রাবতীর বীরভান ধ্যান, ঠিকানাসম্বলিত চন্দ্রাবতীর মনোরম চিত্র বীরভানের হস্তগত, চন্দ্রাবতী লাভে মন্ত্রীপুত্র সুতের সহায়তায় বীরভানের নাগের-বাঘের-যক্ষের সাথে দ্বন্দ্ব সংঘর্ষে জয়লাভ এবং নানা প্রতিকূলতা অতিক্রম করে অবশেষে চন্দ্রাবতী লাভ— এ কাহিনীই চন্দ্রাবতী কাব্যের কাহিনী।

**মডেল প্রশ্ন**

১. আরাকান কোথায় অবস্থিত?
উত্তর : মিয়ানমারের উত্তর-পশ্চিম সীমায় এবং চট্টগ্রামের দক্ষিণে সমুদ্রের তীরে এর অবস্থান।

২. আরাকানে কেন বাংলা সাহিত্য রচিত হয়েছিল?
উত্তর : মধ্যযুগে বাংলায় মোগল-পাঠানদের সংঘর্ষের ফলে অনেক অভিজাত মুসলমান আরাকানে আশ্রয় নিয়েছিলেন। সুফী মতাবলম্বী এসব মুসলমানেরা আরাকানে বাংলা সাহিত্য রচনায় বিশেষ ভূমিকা রেখেছিলেন।

৩. আরাকান রাজসভার প্রথম বাঙালি কবি কে?
উত্তর : দৌলত কাজী।



৪. লৌকিক কাহিনীর প্রথম রচয়িতা কে?
উত্তর : দৌলত কাজী।

৫. মধ্যযুগের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য মুসলমান কবি কে?
উত্তর : আলাওল।

৬. মূল কোন কাব্যের অনুসরণে 'পদ্মাবতী' রচিত?
উত্তর : 'পদ্মাবতী' হিন্দি কবি মালিক মুহম্মদ জায়সির 'পদুমাবত'-এর বাংলা ভাষায় কাব্যানুবাদ।

৭. 'পদ্মাবতী' কাব্য কোন কাহিনী অবলম্বনে রচিত?
উত্তর : চিতোরের রানীর।

৮. আলাওল কার আশ্রয় ও পৃষ্ঠপোষকতায় 'পদ্মাবতী' কাব্য রচনা করেন?
উত্তর : কোরেশী মাগন ঠাকুর।

৯. হিন্দি ভাষা থেকে বাংলায় অনূদিত হয়েছে এমন তিনটি কাব্যের নাম লিখুন।
উত্তর : পদ্মাবতী, সতীময়না ও লোরচন্দ্রানী, মধুমালতী।

১০. জয়নালের চৌতিশা গ্রন্থটির লেখক কে?
উত্তর : শেখ ফয়জুল্লাহ।

## পৃষ্ঠপোষক ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য

বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন যুগে ছিল বৌদ্ধ ও হিন্দুদের প্রাধান্য। অন্যদিকে মধ্যযুগে ছিল মুসলমানদের একচ্ছত্র আধিপত্য। বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগ ১২০১ থেকে ১৮০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বিস্তৃত। ১২০৪ খ্রিস্টাব্দে বাংলাদেশে প্রথম মুসলমান শাসনের সূত্রপাত এবং ১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধে ইংরেজদের বিজয়ে তার অবসান। তাই বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগের সবটুকুই মুসলিম শাসনামলের অন্তর্গত। শাসনামলভিত্তিক ভাগ করলে করা যায় এভাবে— তুর্কি যুগ (১২০০-১৩৫০); সুলতানী যুগ (১৩৫১-১৫৭৫) ও মোগল যুগ (১৫৭৬-১৭৫৭)।

ক. তুর্কি যুগ : তখন প্রধানত ভাষা গঠনের যুগ ছিল বলে মনে করা হয়। এ সময়ের কোনো উল্লেখযোগ্য সাহিত্যিক নিদর্শন পাওয়া যায়নি। তাই এ সময়কে তথাকথিত 'অন্ধকার যুগ' বলা হয়।

খ. সুলতানি যুগ : এই সময়ে গৌড়ীয় শাহী দরবার বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সাংস্কৃতিক স্নায়ুকেন্দ্র রূপে গড়ে ওঠে। গৌড়কে কেন্দ্র করে এই সময়ে বাংলা সাহিত্যের বিকাশের গুরুত্ব বিবেচনা করে।

সুলতানী যুগের পৃষ্ঠপোষক কবি ও কাব্য :

| সুলতান/পৃষ্ঠপোষক | কবি | কাব্য |
|---|---|---|
| গিয়াস উদ্দিন আজম শাহ | শাহ মুহম্মদ সগীর | ইউসুফ-জোলেখা |
| জালালুদ্দিন মুহম্মদ শাহ | কৃত্তিবাস | রামায়ণ |
| রুকনউদ্দিন বরবক শাহ | মালাধর বসু | শ্রীকৃষ্ণবিজয় |
| শামসুদ্দিন ইউসুফ শাহ | জৈনুদ্দিন | রসুলবিজয় |

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



| সুলতান/পৃষ্ঠপোষক | কবি | কাব্য |
|---|---|---|
| আলাউদ্দিন হুসেন শাহ | বিপ্রদাস | মনসাবিজয় |
| | বিজয়গুপ্ত | মনসামঙ্গল |
| | যশোরাজ খান | বৈষ্ণবপদ |

** ফকরুদ্দিন মুবারক শাহ কবি হাফিজকে বাংলাদেশে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন।*

গ. **মোগল যুগ :** আরাকান রাজসভার পৃষ্ঠপোষকতায় মুসলমান কবিগণ প্রণয়কাব্য রচনা করে বাংলা সাহিত্যে স্বতন্ত্র ধারার প্রবর্তন করেন। সমসাময়িক বিভিন্ন রাজসভার কবিদের মধ্য উল্লেখযোগ্য কবিগণ :

| রাজসভা | কবি |
|---|---|
| আকবরের রাজসভা | আবুল ফজল : সম্রাটের সভাকবি ও প্রধানমন্ত্রী। তার রচিত বিখ্যাত ঐতিহাসিক গ্রন্থ 'আইন-ই-আকবারি'। |
| আরাকান রাজসভা | দৌলত কাজী, আলাওল, কোরেশী মাগন ঠাকুর, আবদুল করীম খোন্দকার, শমশের আলী |
| কৃষ্ণনগর রাজসভা | ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর |

মধ্যযুগে বাংলা সাহিত্যের অন্যতম কয়েকজন পৃষ্ঠপোষক হলেন রুকনউদ্দিন বরবক শাহ (১৪৫৯-১৪৭৪), শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ (১৪৯৩-১৫১৯), নুশরাত শাহ (১৫১৯-১৫৩২), আলাউদ্দিন হুসেন শাহ। রুকনউদ্দিন বরবক শাহের আমলে কবি মালাধর বসু 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' লিখতে শুরু করেন। বরবক শাহ মালাধর বসুকে 'গুণরাজ খান' উপাধি দেন। শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহের সময়ে মালাধর বসু 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' লেখা সমাপ্ত করেন। 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' শ্রীকৃষ্ণের প্রণয়লীলা অবলম্বনে রচিত কাব্য। হুসেন শাহের রাজদরবারে খ্যাতনামা কবিগণ হলেন মালাধর বসু, বিপ্রদাস, বিজয়গুপ্ত, যশোরাজ প্রমুখ। বরিশালের কবি বিজয়গুপ্ত সুলতান হুসেন শাহের আমলে রচনা করেন 'পদ্মপুরাণ'। হুসেন শাহের সেনাপতি পরাগল খানের পৃষ্ঠপোষকতায় চট্টগ্রামের কবি কবীন্দ্র পরমেশ্বর বাংলায় 'মহাভারত' অনুবাদ করেন।

**মডেল প্রশ্ন**

১. **অন্ধকার যুগের অস্তিত্ব কল্পনা করা হয় কোন যুগে?**
উত্তর : তুর্কি যুগে।

২. **কৃত্তিবাস রামায়ণ অনুবাদ করেন কোন সুলতানের আমলে?**
উত্তর : রুকনউদ্দিন বরবক শাহের আমলে।

৩. **কবীন্দ্র পরমেশ্বরের বাড়ি কোন জেলায়?**
উত্তর : চট্টগ্রাম।

৪. **সম্রাট আকবরের সভাকবি কে ছিলেন?**
উত্তর : আবুল ফজল।

৫. **ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর কোন রাজসভার কবি ছিলেন?**
উত্তর : কৃষ্ণনগর রাজসভার।



## লোকসাহিত্য

লোকসাহিত্য বলতে সাধারণত মানুষের মুখে মুখে প্রচলিত গীতিকা, উপকথা, কাহিনী, লোকগান, ধাঁধা, প্রবাদ, ছড়া প্রভৃতিকে বোঝায়। লোকসাহিত্যের প্রাচীনতম সৃষ্টি ছড়া এবং ধাঁধা।

### লোকগান

লোকসমাজের মুখে মুখে যে গান চলে এসেছে। বিশেষ বিশেষ ভাব অবলম্বনে এই শ্রেণীর গান রচিত। 'হারামণি' প্রাচীন লোকগীতি সংকলন। মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন ছিলেন এর প্রধান সম্পাদক।

### গীতিকা

এক শ্রেণীর আখ্যানমূলক লোকগীতি সাহিত্যে গীতিকা নামে পরিচিত। বাংলাদেশ থেকে সংগৃহীত লোকগীতিগুলোকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়।

ক. নাথগীতিকা : স্যার জর্জ গ্রীয়ারসন রংপুর জেলার মুসলমান কৃষকদের কাছ থেকে সংগ্রহ করে 'মানিকচন্দ্র রাজার গান' নামে প্রকাশ করেন।

খ. মৈমনসিংহ গীতিকা : বৃহত্তর ময়মনসিংহের ব্রহ্মপুত্র নদের পূর্বাংশে নেত্রকোনা, কিশোরগঞ্জ জেলার হাওর, বিল, নদ-নদী প্লাবিত ভাটি অঞ্চলে যে গীতিকা বিকশিত হয়েছিল তা 'মৈমনসিংহ গীতিকা' নামে পরিচিত। গীতিকাগুলো সংগ্রহ করেছিলেন চন্দ্রকুমার দে। গীতিকাগুলো সম্পাদনা করে 'মৈমনসিংহ গীতিকা' (১৯২০) নামে প্রকাশ করেন ড. দীনেশচন্দ্র সেন। এ সকল গীতিকার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে– মহুয়া, মলুয়া, দেওয়ানা মদিনা, কাজল রেখা, কেনারামের পালা। ড. দীনেশচন্দ্র সেন লোকসাহিত্যকে দেশে-বিদেশে জনপ্রিয় করে তুলেছিলেন।

গ. পূর্ববঙ্গ গীতিকা : পূর্ববঙ্গ গীতিকা নামে পরিচিত গীতিকাগুলো কিছু পূর্ব ময়মনসিংহ থেকে এবং অবশিষ্ট গীতিকা নোয়াখালী, চট্টগ্রাম অঞ্চল থেকে সংগৃহীত। ড. দীনেশচন্দ্র সেন গীতিকাগুলো 'পূর্ববঙ্গ গীতিকা' নামে সম্পাদনা করেন।

### কাহিনী

রূপকথা সংগ্রহ করেছিলেন দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার, উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী। দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদারের রূপকথা সংগ্রহের নাম— 'ঠাকুরমার ঝুলি', 'ঠাকুরদাদার ঝুলি'। উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরীর রূপকথা সংগ্রহের নাম— 'টুনটুনির বই'।

### কবিগান

কবিগান দুই পক্ষের বিতর্কের মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হতো। দুই দলের মধ্যে প্রতিযোগিতাই এর বৈশিষ্ট্য। কবিওয়ালারা মূলত ছিলেন গায়ক, তাঁরা অর্থের বিনিময়ে জনমনোরঞ্জন করতেন। কবিওয়ালাদের মধ্যে : গোঁজলা গুই (তিনি কবিগানের আদিগুরু বলে পরিচিত), ভবানী বেনে, ভোলা ময়রা, হরুঠাকুর, কেষ্টা মুচি, এন্টনি ফিরিঙ্গি, রামবসু, রাসু-নৃসিংহ, নিতাইবৈরাগী, শ্রীধর কথক, নীলমণি পাটনী, বলরাম বৈষ্ণব, রামসুন্দর স্যাকরা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

**মডেল প্রশ্ন**

১. **লোকসাহিত্য কাকে বলে?**
উত্তর : সাহিত্য হলো একের সাথে অন্যের মিলনের মাধ্যম। লোকসাহিত্য হলো জনসাধারণের মুখে মুখে প্রচলিত গাথা, কাহিনী, গান, ছড়া, প্রবাদ ইত্যাদি। লোকসাহিত্যের উপাদান হলো জনশ্রুতিমূলক বিষয়। বহুদিন পূর্বের কোনো ঘটনা বা কাহিনী লোক পরম্পরায় কল্পনারূপক হয়ে লোকসাহিত্যে স্থান পায়।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



২. গাথা, ছড়া, প্রবাদ এগুলো কোন সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত?
উত্তর : লোকসাহিত্য।

৩. লোকসাহিত্যের প্রাচীনতম সৃষ্টি কি?
উত্তর : ছড়া।

৪. গীতিকবিতা বলতে কোন ধরনের কবিতাকে বোঝায়? এর বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করুন।
উত্তর : যে শ্রেণীর কবিতায় কবি আপন হৃদয়ের অনুভূতি বা একান্ত ব্যক্তিগত কামনা, বাসনা ও আনন্দবেদনা প্রাণের অন্তঃস্থল থেকে আবেগকম্পিত সুরে অখণ্ড ভাবমূর্তিতে প্রকাশ করে, সেই শ্রেণীর কবিতাকে গীতিকবিতা বলে। ইংরেজি সাহিত্যে গীতিকবিতাকে Lyric বলে। ভাবের বৈচিত্র্য ও ছন্দের বৈচিত্র্যপূর্ণ প্রকাশ গীতিকবিতার বৈশিষ্ট্য। উল্লেখ্য, কবি বিহারীলাল চক্রবর্তী বাংলা সাহিত্যে গীতিকবিতার প্রবর্তক।

৫. 'Ballad' শব্দটি কোন শব্দ থেকে আগত?
উত্তর : ফরাসি 'Ballet' শব্দ থেকে 'Ballad' শব্দটি এসেছে, যার অর্থ নৃত্য।

৬. ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য লোককথাকে কি কি ভাগে ভাগ করেছেন?
উত্তর : তিনি লোককথাকে তিনটি ভাগে ভাগ করেছেন। যথা—১. রূপকথা, ২. উপকথা ও ৩. ব্রতকথা।

৭. কার সম্পাদনায় 'মৈমনসিংহ গীতিকা' ও 'পূর্ববঙ্গ গীতিকা' প্রকাশিত হয়?
উত্তর : ড. দীনেশচন্দ্র সেন।

৮. 'মৈমনসিংহ গীতিকা' ও 'পূর্ববঙ্গ গীতিকা' কত খণ্ডে এবং কারা প্রকাশ করেন?
উত্তর : চার খণ্ডে। প্রথম খণ্ড মৈমনসিংহ গীতিকা ও পরবর্তী তিন খণ্ড পূর্ববঙ্গ গীতিকা এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এগুলো প্রকাশ করেন।

৯. 'মৈমনসিংহ গীতিকা'য় কোন চরিত্র প্রাধান্য পেয়েছে?
উত্তর : নারী চরিত্র।

১০. 'দেওয়ানা মদিনা' পালাটির রচয়িতা কে?
উত্তর : মনসুর বয়াতি।

১১. 'মৈমনসিংহ গীতিকা' প্রকাশের সময় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি কে ছিলেন?
উত্তর : ড. আশুতোষ মুখোপাধ্যায়।

১২. গীতিকা কি?
উত্তর : এক শ্রেণীর আখ্যানমূলক লোকগীতিকে বাংলা সাহিত্যে গীতিকা বলা হয়। ইংরেজিতে এর নাম ballad।

১৩. 'মৈমনসিংহ গীতিকা'র অধিকাংশ গীতিকার সংগ্রাহক কে?
উত্তর : চন্দ্রকুমার দে।

১৪. হারামনি কি ? এর সম্পাদক কে?
উত্তর : প্রাচীন লোকগীতি সংকলন। সম্পাদক মুহম্মদ মনসুর উদ্দিন।

১৫. 'মৈমনসিংহ গীতিকা'র মহুয়া পালাটির রচয়িতা কে?
উত্তর : দ্বিজ কানাই।

১৬. বাংলাদেশের প্রখ্যাত লোকসাহিত্য গবেষকের নাম কি?
উত্তর : ডক্টর আশরাফ সিদ্দিকী।



১৭. লৌকিক কাহিনী বলতে কোন ধরনের কাহিনীকে বোঝায়? এ ধরনের কাহিনীর প্রথম রচয়িতার ভূমিকা উল্লেখ করুন।
উত্তর : পুরুষানুক্রমে মুখে মুখে প্রচলিত বর্ণনামূলক গল্পকে লোক কাহিনী বা লৌকিক কাহিনী বলা হয়। এর মূল ভিত্তি কল্পনা। স্বর্গ-মর্ত্য পাতাল পর্যন্ত গল্পের আখ্যানের সীমানা বিস্তৃত। দেব-দৈত্য, জ্বীন-পরী, রাক্ষস-খোক্কস, রাজা-প্রজা, সাধু-সন্ন্যাসী, পীর-ফকির, কৃষক-তাঁতি, কামার-কুমার ইত্যাদি বিষয় নিয়ে লৌকিক কাহিনী রচিত হয়। লৌকিক কাহিনীর প্রথম রচয়িতা হিসেবে দৌলত কাজীই অগ্রগণ্য। দৌলত কাজী 'সতীময়না ও লোরচন্দ্রানী' কাব্য রচনা করে মানবীয় আখ্যায়িকার ধারা প্রবর্তন করেন। এর পূর্বে বাংলা কাব্যে দেবদেবীর প্রশংসাই উপজীব্য ছিল, মানুষের কাহিনী অবলম্বনে কাব্য রচনার কোনো প্রয়াসই তখন পরিলক্ষিত হয়নি। আরাকানের 'লস্কর উজির' বা সমর সচিব আশরফ খানের অনুরোধে দৌলত কাজী 'সতীময়না ও লোরচন্দ্রানী' কাব্য রচনা করেন। এ কাব্যের সঠিক রচনাকাল জানা যায়নি; অনুমান করা হয় ১৬৩৫ থেকে ১৬৩৮ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে এ কাব্য রচিত হয়েছিল। দুর্ভাগ্যবশত কাব্যটি সমাপ্ত হওয়ার পূর্বেই কবি মৃত্যুমুখে পতিত হন। কবির মৃত্যুর ২০ বছর পর ১৬৫৯ খ্রিষ্টাব্দে কবি আলাওল এ কাব্যের শেষাংশ রচনা সম্পন্ন করেন।

## শায়ের ও কবিওয়ালা

বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগের শুরুতে (১২০১-১৩৫০) দেড়শো বছর কেটেছে অন্ধকারে। আবার মধ্যযুগ যখন শেষ হয়, তখনও নামে অন্ধকার। ১৭৫৭ সালে ভারত হারায় স্বাধীনতা। সমাজে দেখা দেয় নতুন ধনিক শ্রেণী। তাদের জন্য দরকার হয় হালকা, নিম্নরুচির সাহিত্য। এ সাহিত্য সরবরাহ করেন এক শ্রেণীর কবি। তাঁদের বলা হয় 'কবিওয়ালা'। তাঁদের মধ্যে যাঁরা ছিলেন মুসলমান তাঁদের 'শায়ের'ও বলা হয়। ১৭৬০ থেকে ১৮৩০ এই সত্তর বছর আমাদের সাহিত্যে পতন ঘটেছিল। ভারতচন্দ্র রায় উৎকৃষ্ট সাহিত্য সৃষ্টি করেছিলেন কিন্তু তাঁর রচনাতেও পতনের পরিচয় রয়েছে, ভারতচন্দ্রের পরে কবিওয়ালা এবং শায়েররা সে পতনকে পূর্ণ করেন। কবিওয়ালাদের যিনি সবচেয়ে প্রাচীন তাঁর নাম গোঁজলা গুই। এছাড়া কয়েকজন বিখ্যাত কবিওয়ালার নাম রাম বসু, রাসু, নৃসিংহ, অ্যান্টনি ফিরিঙ্গি, হরু ঠাকুর, নিধুবাবু, কেষ্টা মুচি, ভবানী, রামানন্দ নন্দী। কবি অ্যান্টনি ফিরিঙ্গি ছিলেন পর্তুগীজ। টপ্পার রাজা নিধুবাবু। তাঁর পুরোনাম রামনিধি গুপ্ত (১৭৪১-১৮৩০)। তাঁর একটি অমর গানের কয়েকটি পঙ্‌ক্তি :

নানান দেশের নানান ভাষা,
বিনে স্বদেশী ভাষা,
পুরে কি আশা?

এ সময়ে মুসলমান সমাজে দেখা দিয়েছিল শায়েররা। তাঁরা মনোরঞ্জন করতেন ব্যবসায়ীদের; শোনাতেন নানা রকমের ইসলামী কাহিনী। তাঁরা যে গান বেঁধেছিলেন তাকে আজকাল বলা হয় পুঁথিসাহিত্য। তাঁদের রচিত কবিতাগুলো কলকাতার সস্তা ছাপাখানায় ছাপা হতো তাই এ বইগুলোকে 'বটতলার পুঁথি'ও বলা হয়। এ শ্রেণীর সাহিত্য রচনা করে যাঁরা খ্যাতি লাভ করেছেন, তাঁদের মধ্যে আছেন- ফকির গরীবুল্লাহ, সৈয়দ হামজা, মোহাম্মদ দানেশ, মুহম্মদ মুনশী প্রমুখ। ফকির গরীবুল্লাহ রচিত উল্লেখযোগ্য কাব্যগুলো হচ্ছে- ইউসুফ জুলেখা, আমির হামজা (১ম), জঙ্গনামা, সোনাভান, সত্যপীরের পুথি ইত্যাদি। সৈয়দ হামজা রচিত কয়েকটি উল্লেখযোগ্য কাব্য- মধুমালতী, আমির হামজা (২য়), জৈগুনের পুথি, হাতেম তাই ইত্যাদি।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



**মডেল প্রশ্ন**

১. **পুঁথি সাহিত্য বলতে কি বোঝায়? এর অপর নাম কি?**
**উত্তর :** অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে আরবি-ফারসি শব্দ মিশ্রিত এক ধরনের ভাষারীতিতে যেসব কাব্য রচিত হয়েছিল তা বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে পুঁথি সাহিত্য নামে পরিচিত। মধ্যযুগের অবসানের আগেই এ ধারার সূচনা এবং আধুনিক যুগের সূত্রপাতের পরও এর অস্তিত্ব বর্তমান ছিল। ১৮৫৫ সালে প্রকাশিত রেভারেন্ড জে. লং-এর পুস্তক তালিকায় এ শ্রেণীর কাব্যকে মুসলমানি বাংলা সাহিত্য এবং এর ভাষাকে মুসলমানি বাংলা বলা হয়েছে।

২. **পুঁথি সাহিত্য কি? এ সাহিত্যের প্রাচীনতম লেখক কে?**
**উত্তর :** অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে আরবি-ফারসি শব্দমিশ্রিত এক ধরনের বিশেষ ভাষারীতিতে যেসব সাহিত্যকর্ম রচিত হয়েছিল তা বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে 'পুঁথি সাহিত্য' নামে পরিচিত। যেমন– 'গাজী কালু', 'চম্পাবতী'। পুঁথিসাহিত্যের প্রাচীনতম লেখক দৌলত কাজী। তবে অষ্টাদশ শতকের শেষার্ধে ফকির গরীবুল্লাহ, সৈয়দ হামজা প্রমুখও এ কাব্য রচনা করেন।

৩. **কবিওয়ালাদের মধ্যে প্রাচীন কবি কে?**
**উত্তর :** গোঁজলা গুই।

৪. **'আমীর হামজা' কাব্য রচনা করেন কে?**
**উত্তর :** 'আমীর হামজা' কাব্যের প্রকৃত রচয়িতা ফকির গরীবুল্লাহ। তবে তিনি কাব্যটি শেষ করে যেতে পারেনি। কাব্যটি শেষ করেছিলেন সৈয়দ হামজা।

৫. **কবিগান রচয়িতাদের জীবনী সংগ্রহ করেছিলেন কে? তাঁকে কি কবি হিসেবে আখ্যা দেয়া হয়?**
**উত্তর :** কবিগান রচয়িতাদের জীবনী সংগ্রহ করেছিলেন কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত। তাঁকে যুগসন্ধিক্ষণের কবি হিসেবে আখ্যা দেয়া হয়।

৬. **দো-ভাষী পুঁথি সাহিত্যের প্রথম ও সার্থক কবি কে?**
**উত্তর :** ফকির গরীবুল্লাহ।

৭. **পুঁথি সাহিত্যের তিনজন কবির নাম লিখুন।**
**উত্তর :** পুঁথি সাহিত্যের তিনজন কবি- ফকির গরীবুল্লাহ, সৈয়দ হামজা, মোহাম্মদ দানেশ।

৮. **টপ্পা গান কি? বাংলা টপ্পা গানের জনক কে?**
**উত্তর :** কবিগানের সমসাময়িক কালে কলকাতা ও শহরতলীতে রাগ-রাগিনী সংযুক্ত এক ধরনের ওস্তাদি গানের প্রচলন ঘটেছিল যা টপ্পা হিসেবে পরিচিত। বাংলা টপ্পা গানের জনক রামনিধি গুপ্ত বা নিধুবাবু (১৭৪১-১৮৩০)।

৯. **অ্যান্টনি ফিরিঙ্গি কে?**
**উত্তর :** অ্যান্টনি ফিরিঙ্গি একজন কবিগান রচয়িতা। তিনি জাতিতে ছিলেন পর্তুগীজ।

১০. **ফকির গরীবুল্লাহ রচিত তিনটি কাব্যের নাম লিখুন।**
**উত্তর :** ইউসুফ জুলেখা, আমির হামজা (১ম অঙ্ক), জঙ্গনামা।

১১. **মোহাম্মদ দানেশ রচিত ৩টি কাব্যের নাম লিখুন।**
**উত্তর :** গুলবে-সানোয়ারা, চাহার দরবেশ, নুরুল ইমান।

# ঘ

# আধুনিক যুগ

## বাংলা গদ্যের উন্মেষপর্ব

মধ্যযুগে বাংলা সাহিত্য ছিল একটি সংকীর্ণ অবকাঠামোর ভিতর; সাহিত্যের সবগুলো শাখা বিকশিত হয়নি তাতে। আধুনিক যুগে বিকশিত হয় সাহিত্যের প্রায় সব শাখা, আর বাংলা সাহিত্য হয়ে ওঠে সম্পূর্ণ সাহিত্য। মানুষ চিন্তা-চেতনায় হয়ে ওঠে আধুনিক, যাতে সাহিত্য ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হয়। উনিশ শতকের সর্বশ্রেষ্ঠ ঘটনা বাংলা গদ্যের বিকাশে বিদেশিদের অবদান অসামান্য। আঠারো শতকেই এ সকল বিদেশীরা বাংলা গদ্য লেখা শুরু করেছিলেন। এদের অধিকাংশই ছিলেন পর্তুগিজ। ১৭৪৩ সালে পর্তুগালের লিসবন থেকে তিনটি বাংলা গদ্যে লেখা বই মুদ্রিত হয়। বইগুলো যদিও বাংলায় লেখা, কিন্তু এগুলো ছাপা হয়েছিল রোমান অক্ষরে। বই তিনটির একটির লেখক দোম আনতোনিও। তিনি ছিলেন ঢাকা জেলার ভূষণা অঞ্চলের জমিদারপুত্র। তার বইয়ের নাম 'ব্রাহ্মণ-রোমান-ক্যাথলিক সংবাদ'। অপর বই দুটির লেখক পাদ্রি মনোএল দা আসসুম্পসাঁউ। তার একটি বইয়ের নাম 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ' এবং অপর বইয়ের নাম 'বাংলা-পর্তুগিজ অভিধান'। বাংলা গদ্যের বিবর্তনে শ্রীরামপুর মিশন যে ভূমিকা রেখেছিল তা অস্বীকার করার নয়। এ মিশনটির মূল কাজ ছিল খ্রিষ্ট ধর্ম প্রচার করা। এ কাজ করতে গিয়ে তারা বাইবেল ও আনুষঙ্গিক অনেক বই বাংলায় অনুবাদ করেন এবং বাংলা গদ্যের বিবর্তনে ভূমিকা রাখেন। ১৮০৮ সালে শ্রীরামপুর মিশন ডেনিশদের হাত থেকে ইংরেজদের হাতে চলে আসে। মুদ্রণ উপযোগী বাংলা অক্ষর এখানেই তৈরি হয়। 'মথী রচিত মিশন সমাচার' শ্রীরামপুর মিশন থেকে বাংলায় মুদ্রিত প্রথম গদ্যগ্রন্থ।

**মডেল প্রশ্ন**

১. **আধুনিক যুগের লক্ষণ কি?**
**উত্তর :** মানবিকতা, ব্যক্তি সচেতনতা, সমাজবোধ, দেশপ্রেম বা জাতীয়তাবোধ, আত্মচেতনা ও আত্মপ্রসার, মৌলিকত্ব, নাগরিকতা, মুক্তবুদ্ধি প্রভৃতি আধুনিক যুগের লক্ষণ।

২. **বাঙালিদের লেখা প্রথম মুদ্রিত গ্রন্থ কোনটি? রচয়িতা কে?**
**উত্তর :** বাঙালির লেখা প্রথম মুদ্রিত গ্রন্থ 'ব্রাহ্মণ-রোমান-ক্যাথলিক সংবাদ'। রচয়িতা দোম আনতোনিও।

৩. **পাঠ্যপুস্তকের বাইরে সর্বপ্রথম বাংলা গদ্যরীতির ব্যবহার কে করেন?**
**উত্তর :** রাজা রামমোহন রায়।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



**৪. শ্রীরামপুর মিশন কবে প্রতিষ্ঠিত হয়? কাদের মাধ্যমে?**
**উত্তর :** উইলিয়াম ওয়ার্ড ও জশুয়া মার্শম্যানের সহায়তায় উইলিয়াম কেরীর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ১৮০০ সালে শ্রীরামপুর মিশন ও মিশনের মুদ্রণযন্ত্র স্থাপিত হয়। এটি ছিল ডেনিশদের নিয়ন্ত্রণাধীন একটি মিশন। ১৮০৮ সালে শ্রীরামপুর মিশন ডেনিশদের হাত থেকে ইংরেজদের হাতে চলে আসে।

**৫. শ্রীরামপুরের মিশনারিরা কি জন্য স্মরণীয়?**
**উত্তর :** শ্রীরামপুরে মিশনারিরা ১৮০০ সালের জানুয়ারি মাসে শ্রীরামপুর মিশন প্রতিষ্ঠা করেন। উইলিয়াম কেরি ও পঞ্চানন কর্মকারের যৌথ প্রচেষ্টায় এ মিশনের ছাপাখানা থেকে 'মিশন সমাচার' নামে বই ছাপার মধ্য দিয়ে বাংলা ভাষায় প্রথম মুদ্রণকাজের সূচনা হয়। পরে এখান থেকে কেরির নেতৃত্বে প্রায় ৪০টি ভাষা ও উপভাষায় খ্রিষ্টধর্মীয় গ্রন্থের অনুবাদ প্রকাশিত হয়। এসব কারণে শ্রীরামপুর মিশনারীরা বাংলা সাহিত্যে স্মরণীয় হয়ে আছেন।

**৬. 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ' কবে, কোথায় রচিত এবং প্রকাশিত হয়? এর রচয়িতা কে?**
**উত্তর :** 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ' বইটি রচিত হয়েছিল ১৭৩৪ সালে ঢাকার ভাওয়াল পরগণায়। প্রকাশিত হয়েছিল ১৭৪৩ সালে পর্তুগালের লিসবন থেকে। লেখক পাদ্রি মনোএল দ্য আসসুম্পাসাঁউ।

**৭. বাংলা সাহিত্যে কখন গদ্যের সূচনা হয়? মতের সপক্ষে যুক্তি দিন।**
**উত্তর :** আধুনিক গবেষণায় ষোড়শ শতক থেকে মোটামুটিভাবে ধারাবাহিকভাবে বাংলা গদ্যের কাজের গদ্য এবং ভাবের গদ্যের নিদর্শনের কথা বলা হয়। কিন্তু বাংলা সাহিত্যে গদ্যের সূচনা হয় উনিশ শতকে। কেননা, প্রাচীন ও মধ্যযুগের সাহিত্য মূলত পদ্যেই সৃষ্টি হয়েছে। মূল বিষয়ের বর্ণনা ছাড়াও কবিরা তখন নিজেদের ধ্যান-ধারণাকে পয়ারের সাবলীল ছন্দেই রূপদান করেছেন। কিন্তু আধুনিক যুগে লেখকরা সমাজের নানা সমস্যা, ঘাত-প্রতিঘাত ও জীবনযন্ত্রণার জটিল বিষয়ের প্রকাশ করার অনুপ্রেরণা পেয়েছে গদ্যের মাধ্যমে।

**৮. ইয়ং বেঙ্গল বলতে কি বোঝায়? এ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোকপাত করুন।**
**উত্তর :** ইয়ং বেঙ্গল উনিশ শতকের বাংলার নবজাগরণ বা রেনেসাঁসের বার্তাবাহী পাশ্চাত্য শিক্ষা, সভ্যতা ও সংস্কৃতির আলোকে আলোকিত বাঙালি যুবসমাজ। এ দলের প্রায় সকলেই ছিলেন হিন্দু কলেজের ছাত্র এবং অধ্যাপক ডিরোজিওর শিষ্য। হিন্দু সমাজের প্রচলিত ধর্মীয় সংস্কার ও নিয়মাদি অমান্য ও অগ্রাহ্য করে সংস্কারমুক্তির দিকে এগিয়ে যাওয়াই ছিল এদের মূল লক্ষ্য। ব্যঙ্গ্যার্থে এরা 'নববাবু' নামে পরিচিতি লাভ করেন। ইয়ং বেঙ্গলদের মধ্যে ছিলেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত, দীনবন্ধু মিত্র, রাধানাথ শিকদার, রাজনারায়ণ বসু, ভূদেব মুখোপাধ্যায় প্রমুখ বিখ্যাত বাঙালি। ইয়ং বেঙ্গলদের উচ্ছৃঙ্খলতা নিয়ে রচিত মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'একেই কি বলে সভ্যতা' এবং দীনবন্ধু মিত্রের 'সধবার একাদশী' প্রহসন দুটি বাংলা সাহিত্যের স্মরণীয় রচনা।

**৯. বাংলা ভাষায় রচিত প্রথম উপন্যাসজনিত সৃষ্ট দ্বন্দ্বের খণ্ডন করুন।**
**উত্তর :** কালগত দিক থেকে উপন্যাস হিসেবে প্রথম গ্রন্থের দাবি খ্রিস্টান বিদেশিনী হ্যানা ক্যাথারিন ম্যালেন্স (১৮২৬-৬১) রচিত 'ফুলমণি ও করুণার বিবরণ' (১৮৫২) গ্রন্থের। খ্রিষ্টধর্মের মাহাত্ম্য প্রচারের জন্য এ গ্রন্থ রচিত। খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ করায় ফুলমণির সুখ এবং যথার্থ খ্রিষ্টধর্মাচরণ না করায় করুণার দুঃখভোগ, পরে মেম সাহেবের ঈশ্বর প্রেরিত সুপরামর্শে করুণার সুমতি ও সুখের মুখদর্শন এ গ্রন্থের মূল কাহিনী। তবে বাঙালি কর্তৃক রচিত প্রথম উপন্যাস 'আলালের ঘরের দুলাল'। এর রচয়িতা প্যারীচাঁদ মিত্র বা টেকচাঁদ ঠাকুর। এটি আলালী ভাষায় রচিত। আর বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচিত 'দুর্গেশ নন্দিনী' বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক উপন্যাস।

**১০. রাজা রামমোহন রায় কি জন্য বিখ্যাত ছিলেন?**
**উত্তর :** রাজা রামমোহন রায় প্রথম বাঙালি যিনি বাংলা ভাষায় প্রথম বাংলা ব্যাকরণ রচনার জন্য বিখ্যাত হয়ে আছেন। তার রচিত বাংলা ব্যাকরণের নাম 'গৌড়ীয় ব্যাকরণ'।



**১১. আধুনিক সাহিত্য বলতে কি বোঝেন? এর উপজীব্য বিষয়গুলো উল্লেখ করুন।**
**উত্তর :** আধুনিক সাহিত্য বলতে আমরা মূলত নগরকেন্দ্রিক শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের আবির্ভাব ও বিকাশের সাথে একান্তভাবে বিজড়িত সাহিত্যকে বুঝি। আধুনিক সাহিত্য বলতে আমরা সব ধরনের সাহিত্য, রচনা যেমন– গল্প, উপন্যাস, নাটক, প্রবন্ধ, কাব্যগ্রন্থ, গদ্যগ্রন্থ সবকিছুই বুঝি। আধুনিক সাহিত্যে ফুটে উঠেছে মানবজীবনের সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনার অনুভূতি। মানবিকতা, ব্যক্তিচেতনা, আত্মচেতনা, আত্মপ্রসার, সমাজচেতনা, দেশপ্রেম বা জাতীয়তাবোধ, রোমান্টিকতা, মৌলিকতা, মুক্তবুদ্ধি, নাগরিকতা এগুলোর সবগুলোই আধুনিক সাহিত্যের অন্যতম উপজীব্য। বিশেষ করে রোমান্টিকতা বা রোমান্টিসিজম আধুনিক সাহিত্যে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে আছে। আধুনিক সাহিত্যে তুলে ধরা হয়েছে মূল্যবোধের পরিবর্তনকে। ব্যক্তিকেন্দ্রিক/ সমাজকেন্দ্রিক রচনা হওয়ার কারণে ব্যক্তির মর্যাদা, ব্যক্তিগত প্রেম-ভালোবাসা আধুনিক সাহিত্যে বিশেষভাবে ফুটে উঠেছে। আধুনিক সাহিত্যে ঘটে মুক্তবুদ্ধির চর্চাও। সবকিছু মিলিয়ে আধুনিক সাহিত্য হচ্ছে সমকালীন চিন্তাভাবনার কলোল্লাস।

## ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ ও বাংলা গদ্য

বাংলাদেশে কর্মরত ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ইংরেজ কর্মচারীদের দেশীয় ভাষায় শিক্ষাদানের জন্য তৎকালীন ইংরেজ শাসিত ভারতবর্ষের গভর্নর জেনারেল লর্ড ওয়েলেসলি কর্তৃক ১৮০০ খ্রিষ্টাব্দে কলকাতায় ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। ৪ মে কলেজ প্রতিষ্ঠা হলেও ২৪ নভেম্বর থেকে কলেজের কাজ শুরু হয়েছিল। ওয়েলেসলি অনুভব করেছিলেন যে আঠার বছরের নাবালক, স্বদেশে তাদের শিক্ষা সম্পূর্ণ হয়নি, এ দেশেও তার কোনো ব্যবস্থা ছিল না। দেশীয় ভাষা শিক্ষা দিয়ে এ সিভিলিয়ানদের উপযুক্ত করে তোলার জন্যই ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠা। ১৮০১ খ্রিষ্টাব্দে এ কলেজে বাংলা বিভাগ খোলা হলে তাতে অধ্যক্ষ হিসেবে যোগদান করেন উইলিয়াম কেরী। তিনি তার অধীন দুজন পণ্ডিত এবং ছয় জন সহকারী পণ্ডিতের সহযোগিতায় বাংলা গদ্য রচনার কাজে নিয়োজিত হন। এ সময় ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে পাঠ্য করার জন্য ৮ জন লেখক কর্তৃক মোট ১৩টি বাংলা বই রচিত হয়। এগুলো হলো :

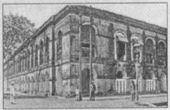

| | |
|---|---|
| রামরাম বসু | ১. রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র (১৮০১)<br>২. লিপিমালা (১৮০২) |
| উইলিয়াম কেরী | ৩. কথোপকথন (১৮০১)<br>৪. ইতিহাসমালা (১৮১২) |
| মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার | ৫. বত্রিশ সিংহাসন (১৮০২)<br>৬. হিতোপদেশ (১৮০৮)<br>৭. রাজাবলি (১৮০৮)<br>৮. প্রবোধচন্দ্রিকা (১৮১৩) |
| গোলকনাথ শর্মা | ৯. হিতোপদেশ (১৮০২) |
| তারিণীচরণ মিত্র | ১০. ওরিয়েন্টাল ফেবুলিস্ট (১৮০৩) |
| রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায় | ১১. মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্রং (১৮০৫) |
| চণ্ডীচরণ মুন্‌শী | ১২. তোতা ইতিহাস (১৮০৫) |
| হরপ্রসাদ রায় | ১৩. পুরুষ পরীক্ষা (১৮১৫) |

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



বাংলা অক্ষরে মুদ্রিত বাঙালির লেখা যে বইটি সর্বপ্রথম ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের ছাপাখানা থেকে বের হয়, তার নাম 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র' (১৮০১)। বইটি লিখেছিলেন রামরাম বসু, যিনি উইলিয়াম কেরিকে বাংলা শিখিয়েছিলেন। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের যিনি পরিচালক, সেই উইলিয়াম কেরিও লিখেছিলেন কয়েকটি বই। সেগুলোর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য 'কথোপকথন'। এটি ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের দ্বিতীয় বই। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পণ্ডিতদের মধ্যে যিনি সবচেয়ে বেশি বই লিখেছেন, তিনি মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার (১৭৬২-১৮১৯)। তিনি লিখেছিলেন পাঁচটি বই, তার মধ্যে চারটি প্রকাশ করেছিল ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ। এ সকল বই ব্যতীত উইলিয়াম কেরি দুই খণ্ডে সংকলন করেন 'বাঙলা ভাষার অভিধান'।

**মডেল প্রশ্ন**

১. **ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ কত খ্রিষ্টাব্দে কাদের প্রচেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত হয়?**
**উত্তর :** বাংলাদেশে কর্মরত ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ইংরেজ কর্মচারীদের দেশীয় ভাষায় শিক্ষাদানের জন্য তৎকালীন ইংরেজ শাসিত ভারতের গভর্নর জেনারেল লর্ড ওয়েলেসলি কর্তৃক ১৮০০ খ্রিষ্টাব্দে কলকাতায় ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়।

২. **ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ থেকে প্রকাশিত গ্রন্থগুলোর নাম লিখুন।**
**উত্তর :** ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ থেকে প্রকাশিত হয় উইলিয়াম কেরির 'কথোপকথন' ও 'ইতিহাসমালা'; রামরাম বসুর 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র' ও 'লিপিমালা'; চণ্ডীচরণ মুন্‌শীর 'তোতা ইতিহাস'; মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের 'বত্রিশ সিংহাসন', 'হিতোপদেশ', 'প্রবোধচন্দ্রিকা', 'রাজাবলি' প্রভৃতি।

৩. **ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে বাংলা ভাষার চর্চা করতেন কারা?**
**উত্তর :** ১৮০০ খ্রিষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ বাংলা গদ্যের উন্মেষ পর্বে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে বাংলা ভাষার চর্চা করতেন যেসব পণ্ডিত তারা হলেন উইলিয়াম কেরি, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, রামরাম বসু, গোলকনাথ শর্মা, রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়, তারিণীচরণ মিত্র, চণ্ডীচরণ মুন্সী, হরপ্রসাদ রায় প্রমুখ।

৪. **কোলকাতায় প্রতিষ্ঠিত ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে প্রথম বাংলা বিভাগ খোলা হয় কোন সালে? কার উদ্যোগে এ বিভাগ খোলা হয়?**
**উত্তর :** ১৮০০ খ্রিষ্টাব্দের ৪ মে কোলকাতায় ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮০১ খ্রিষ্টাব্দের মে মাসে উইলিয়াম কেরির উদ্যোগে এ কলেজে প্রথম বাংলা বিভাগ খোলা হয়। কেরি সংস্কৃত ও বাংলা শিক্ষক হিসেবে এ কলেজে যোগদান করেন।

৫. **উইলিয়াম কেরি কে?**
**উত্তর :** ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের বাংলা বিভাগের অধ্যক্ষ উইলিয়াম কেরি। তিনি ১৭৯৩ সালে কলকাতায় আসেন। ১৮০১ সালে তিনি বাংলা ও সংস্কৃত বিভাগের অধ্যাপক নিযুক্ত হন এবং এখানে ত্রিশ বছর অধ্যাপনা করেন।

৬. **উইলিয়াম কেরি রচিত দুটি বাংলা গদ্যগ্রন্থের নাম লিখুন।**
**উত্তর :** উইলিয়াম কেরি রচিত দুটি বাংলা গদ্যগ্রন্থ : ১. 'কথোপকথন' ও ২. 'ইতিহাসমালা'।



৭. **ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ কবে আনুষ্ঠানিকভাবে বন্ধ ঘোষণা করা হয়?**
**উত্তর :** ১৮১৭ সালে হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠিত হলে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের গুরুত্ব কমে যায়। রাজা রামমোহন রায়ের প্রভাবে এ কলেজের বাংলা বিভাগের গুরুত্ব আরো কমে যেতে থাকে। ১৮৫৪ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে এ কলেজ বন্ধ ঘোষণা করা হয়।

৮. **ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে থেকে প্রকাশিত প্রথম বইটির পরিচয় দিন।**
**উত্তর :** যে বইটি সর্বপ্রথম ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের ছাপাখানা থেকে বের হয়, তার নাম 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র' (১৮০১)। বইটি লিখেছিলেন রামরাম বসু।

৯. **ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ থেকে প্রকাশিত দ্বিতীয় বইটির পরিচয় দিন।**
**উত্তর :** ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ থেকে প্রকাশিত দ্বিতীয় বইটির নাম 'কথোপকথন'। বইটির লেখক উইলিয়াম কেরি।

১০. **ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পণ্ডিতদের মধ্যে বেশি গ্রন্থের রচয়িতা কে?**
**উত্তর :** ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পণ্ডিতদের মধ্যে যিনি সবচেয়ে বেশি বই লিখেছেন, তিনি মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার (১৭৬২-১৮১৯)। তিনি লিখেছিলেন পাঁচটি বই, তার মধ্যে চারটি প্রকাশ করেছিল ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ।

১১. **উইলিয়াম কেরির অভিধান গ্রন্থের নাম কি?**
**উত্তর :** উইলিয়াম কেরির দুখণ্ডের সংকলিত বই 'বাঙলা ভাষার অভিধান'। এর প্রথম খণ্ডটি বের হয় ১৮১৫ সালে এবং দ্বিতীয় খণ্ডটি বের হয় ১৮২৫ সালে।

১২. **মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের কোন বইটি বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ্য হয়েছিল? এর বিষয়বস্তু কি?**
**উত্তর :** মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের 'প্রবোধচন্দ্রিকা' বইটি বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ্য হয়েছিল। এর বিষয়বস্তু নানাবিধ— তত্ত্বকথা, ভাষারীতি, ন্যায়দর্শন ইত্যাদি।

১৩. **কোন্ উদ্দেশ্যে কোন বছরে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়? কলেজটির নাম ফোর্ট উইলিয়াম কেন?**
**উত্তর :** ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কার্য পরিচালনা করতে আসা নবীন ইংরেজ সিভিলিয়ানদের এ দেশীয় ভাষা-সাহিত্য-শিল্প-ইতিহাস-আচার-আচরণাদি শিক্ষা দেয়ার জন্য ১৮০০ সালের ৪ মে কলকাতায় ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। এ কলেজে বাংলা ছাড়াও মারাঠি ও সংস্কৃত শেখানো হয়।
ফোর্ট উইলিয়াম কলকাতা শহরের লালবাজারের কাছে অবস্থিত। প্রাচ্যে ব্রিটিশরাজের সামরিক শক্তির বড় নিদর্শন এটি। ইংল্যান্ডের রাজার সম্মানে দুর্গটির নামকরণ করা হয় ফোর্ট উইলিয়াম। কলেজটি এর অভ্যন্তরভাগে অবস্থিত বলেই কলেজটির নামকরণ হয়েছে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ।

১৪. **ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের ৫ জন লেখকের নাম লিখুন এবং তাঁদের রচিত একটি গ্রন্থের নাম লিখুন।**
**উত্তর :**
১. রামরাম বসু— রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র;
২. উইলিয়াম কেরি— কথোপকথন;
৩. মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার— হিতোপদেশ;
৪. চণ্ডীচরণ মুন্‌শী— তোতা ইতিহাস;
৫. হরপ্রসাদ রায়— পুরুষ পরীক্ষা।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



## পত্রিকা ও সাময়িকপত্র

এ দেশে সংবাদপত্রের প্রচার পাশ্চাত্য প্রভাবের ফল। বাংলাদেশের তথা ভারতবর্ষের প্রথম মুদ্রিত সংবাদপত্র 'বেঙ্গল গেজেট' (Hickey's Bengal Gazette; or the Original Calcutta General Advertifer)। এই ইংরেজি সাময়িক পত্রটি জেমস অগাস্টাস হিকি কর্তৃক ১৭৮০ খ্রিষ্টাব্দের ২৯ জানুয়ারি প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল। সংবাদপত্র প্রকাশের ব্যাপারে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি কর্তৃপক্ষ সন্তুষ্ট ছিল না। কারণ বেসরকারি ইউরোপীয়দের মালিকানার এসব সংবাদপত্র কোম্পানির কঠোর সমালোচক হিসেবে 'কোম্পানির বিঘোষিত নীতি ও শাসনপদ্ধতি এবং কর্তৃপক্ষীয় ব্যক্তিদের কার্যকলাপকে এরা ক্রমাগত আক্রমণ' করে চলেছিল। ফলে লর্ড ওয়েলেসলি সংবাদপত্র শাসনের উদ্দেশ্যে ১৭৯৯ খ্রিষ্টাব্দে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা সঙ্কোচন করে কঠোর সেন্সর ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। এ ব্যবস্থায় সকল সংবাদ সেক্রেটারি কর্তৃক পরীক্ষিত হয়ে প্রকাশিত হতো এবং নিয়ম লঙ্ঘনকারীকে ইউরোপে নির্বাসন দেয়া হতো। গভর্নর জেনারেল লর্ড হেস্টিংস ১৮১৮ খ্রিষ্টাব্দের আগস্ট মাসে এ ব্যবস্থা রহিত করেন। এর চার মাস পূর্বে ১৮১৮ খ্রিষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে প্রথম বাংলা সাময়িক পত্র 'দিগদর্শন' প্রকাশিত হয়।

বাংলা সাময়িক পত্রের সমগ্র ইতিহাসকে কয়েকটি যুগে বিভক্ত করা যায়। ১৮১৮ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত 'দিগদর্শন' থেকে ১৮২৯-এ প্রকাশিত 'বঙ্গদূত' পর্যন্ত প্রথম যুগ। ১৮৩১ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত 'সংবাদ প্রভাকর' থেকে ১৮৪৩-এ প্রকাশিত 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকার পূর্ব পর্যন্ত দ্বিতীয় যুগ। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা থেকে ১৮৭২ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত 'বঙ্গদর্শন'-এর পূর্ব পর্যন্ত তৃতীয় যুগ। বঙ্গদর্শন থেকে ১৮৭৭-এ প্রকাশিত 'ভারতী'র পূর্ব পর্যন্ত চতুর্থ যুগ। ভারতী থেকে ১৯১৪ সালে প্রকাশিত 'সবুজপত্র' পর্যন্ত পঞ্চম যুগ বলে গ্রহণ করা যেতে পারে। এ পর্যন্ত বাংলা সাময়িক পত্র যে উৎকর্ষ লাভ করেছিল পরবর্তীকালে তারই অনুসরণ লক্ষ্য করা যায়।

### গুরুত্বপূর্ণ পত্রিকার নাম ও সম্পাদক

| নাম | প্রথম প্রকাশ | সম্পাদক |
|---|---|---|
| ১. বেঙ্গল গেজেট | ১৭৮০ | জেমস অগাস্টাস হিকি |
| ২. দিগদর্শন | ১৮১৮ | জন ক্লার্ক মার্শম্যান |
| ৩. সমাচার দর্পণ | ১৮১৮ | উইলিয়াম কেরি |
| ৪. বাঙ্গাল গেজেট | ১৮১৮ | গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য |
| ৫. ব্রাহ্মণ সেবধি | ১৮২১ | রাজা রামমোহন রায় |
| ৬. সম্বাদ কৌমুদী | ১৮২১ | রাজা রামমোহন রায় ও ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় |
| ৭. মীরাৎ-উল-আখবার | ১৮২২ | রাজা রামমোহন রায় |
| ৮. সমাচার চন্দ্রিকা | ১৮২২ | ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় |
| ৯. বঙ্গদূত | ১৮২৯ | নীলমণি হালদার |
| ১০. সংবাদ প্রভাকর | ১৮৩১ | ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত |
| ১১. জ্ঞানান্বেষণ | ১৮৩১ | দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় |
| ১২. সমাচার সভারাজেন্দ্র | ১৮৩১ | শেখ আলীমুল্লাহ |
| ১৩. সংবাদ রত্নাবলী | ১৮৩২ | ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত |
| ১৪. তত্ত্ববোধিনী | ১৮৪৩ | অক্ষয়কুমার দত্ত |
| ১৫. রংপুর বার্তাবহ | ১৮৪৭ | গুরুচরণ রায় |
| ১৬. সর্বশুভকরী পত্রিকা | ১৮৫০ | ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর |
| ১৭. বিবিধার্থ সংগ্রহ | ১৮৫১ | রাজেন্দ্রলাল মিত্র |
| ১৮. মাসিক পত্রিকা | ১৮৫৪ | প্যারীচাদ মিত্র ও রাধানাথ শিকদার |
| ১৯. ঢাকা প্রকাশ | ১৮৬১ | কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার |
| ২০. গ্রামবার্তা প্রকাশিকা | ১৮৬৩ | কাঙ্গাল হরিনাথ মজুমদার |
| ২১. অমৃতবাজার পত্রিকা | ১৮৬৮ | বসন্ত কুমার ঘোষ ও শিশির কুমার ঘোষ |
| ২২. শুভ সাধিনী | ১৮৭০ | কালীপ্রসন্ন ঘোষ |
| ২৩. বঙ্গদর্শন | ১৮৭২ | বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় |
| ২৪. আজিজন্নেহার | ১৮৭৪ | মীর মশাররফ হোসেন |
| ২৫. বান্ধব | ১৮৭৪ | কালীপ্রসন্ন ঘোষ |
| ২৬. পাষণ্ড পীড়ন | ১৮৪৬ | ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত |
| ২৭. এডুকেশন গেজেট | ১৮৪৬ | রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় |
| ২৮. সংবাদ সাধুরঞ্জন | ১৮৫০ | ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত |
| ২৯. সংবাদ রসসাগর | ১৮৫০ | রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় |
| ৩০. সাপ্তাহিক বার্তাবহ | ১৮৫৩ | রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় |
| ৩১. পূর্ণিমা | ১৮৫৯ | বিহারীলাল চক্রবর্তী |
| ৩২. সংবাদ রত্নাবলী | — | ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত |
| ৩৩. সাহিত্য সংক্রান্ত | ১৮৬৩ | বিহারীলাল চক্রবর্তী |
| ৩৪. আর্য দর্শন | ১৮৬৩ | যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ |
| ৩৫. ভারতী | ১৮৭৭ | দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর |
| ৩৬. ইসলাম | ১৮৮৫ | মুন্সী মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহমদ |
| ৩৭. বালক | ১৮৮৫ | জ্ঞানদানন্দিনী দেবী |
| ৩৮. সুধাকর | ১৮৯৪ | শেখ আবদুর রহিম |
| ৩৯. সাহিত্য | ১৮৯০ | সুরেশচন্দ্র সমাজপতি |
| ৪০. সাধনা | ১৮৯১ | রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর |
| ৪১. মিহির (মাসিক) | ১৮৯২ | শেখ আবদুর রহিম |
| ৪২. হাফেজ | ১৮৯৬ | শেখ আবদুর রহিম |
| ৪৩. কোহিনূর | ১৮৯৮ | মোঃ রওশন আলী |
| ৪৪. লহরী | ১৯০০ | মোজাম্মেল হক |
| ৪৫. প্রবাসী | ১৯০১ | রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় |

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



| নাম | প্রথম প্রকাশ | সম্পাদক |
|---|---|---|
| ৪৬. নবনূর | ১৯০৩ | সৈয়দ এমদাদ আলী |
| ৪৭. মাসিক মোহাম্মদী | ১৯০৩ | মোহাম্মদ আকরম খাঁ |
| ৪৮. বাসনা | ১৯০৮ | শেখ ফজলুল করিম |
| ৪৯. সবুজপত্র | ১৯১৪ | প্রমথ চৌধুরী |
| ৫০. আল এসলাম (মাসিক) | ১৯১৫ | মোহাম্মদ আকরম খাঁ |
| ৫১. সওগাত | ১৯১৮ | মোহাম্মদ নাসিরুদ্দীন |
| ৫২. মোসলেম ভারত | ১৯২০ | মোজাম্মেল হক |
| ৫৩. আঙ্কুর (কিশোর পত্রিকা) | ১৯২০ | ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ |
| ৫৪. দৈনিক সেবক | ১৯২১ | মোহাম্মদ আকরম খাঁ |
| ৫৫. ধূমকেতু | ১৯২২ | কাজী নজরুল ইসলাম |
| ৫৬. কল্লোল | ১৯২৩ | দীনেশ রঞ্জন দাস |
| ৫৭. মুসলিম জগৎ | ১৯২৩ | খান মুহাম্মদ মঈনুদ্দীন |
| ৫৮. সাপ্তাহিক মুসলিম জগৎ | ১৯২৫ | আবুল কালাম শামসুদ্দীন |
| ৫৯. লাঙ্গল | ১৯২৫ | কাজী নজরুল ইসলাম |
| ৬০. কালি-কলম (মাসিক) | ১৯২৬ | শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় |
| ৬১. প্রগতি | ১৯২৭ | বুদ্ধদেব বসু ও অজিত দত্ত |
| ৬২. শিখা (প্রথম বছর) | ১৯২৭ | আবুল হুসেন |
| ৬৩. শিখা (২য় ও ৩য় বছর) | ১৯২৭ | কাজী মোতাহার হোসেন |
| ৬৪. বেদুঈন | ১৯২৭ | আশরাফ আলী খান |
| ৬৫. পরিচয় | ১৯৩১ | বিষ্ণু দে |
| ৬৬. দৈনিক আজাদ | ১৯৩৫ | মোহাম্মদ আকরম খাঁ |
| ৬৭. চতুরঙ্গ | ১৯৩৯ | হুমায়ুন কবীর |
| ৬৮. দৈনিক নবযুগ | ১৯৪১ | কাজী নজরুল ইসলাম |
| ৬৯. প্রতিরোধ (পাক্ষিক) | ১৯৪২ | রণেশ দাশগুপ্ত |
| ৭০. সাহিত্যপত্র | ১৯৪২ | বিষ্ণু দে |
| ৭১. কবিতা | ১৯৪৫ | বুদ্ধদেব বসু |
| ৭২. বেগম | ১৯৪৯ | নূরজাহান বেগম |
| ৭৩. ইনসাফ | ১৯৫০ | মহিউদ্দীন |
| ৭৪. সমকাল | ১৯৫৪ | সিকান্দার আবু জাফর |
| ৭৫. মাহেনও | ১৯৪৯ | আবদুল কাদির |
| ৭৬. অরুণোদয় (মাসিক) | ১৯৫৬ | রেভারেন্ড লাল বিহারী দে |
| ৭৭. জেহাদ | ১৯৬২ | আবুল কালাম শামসুদ্দীন |



| নাম | প্রথম প্রকাশ | সম্পাদক |
|---|---|---|
| ৭৮. জ্ঞানাঙ্কুর | ১২০৯ বঙ্গাব্দ | শ্রীকৃষ্ণ দাস |
| ৭৯. অবোধ বন্ধু | ১২৭৫ বঙ্গাব্দ | বিহারীলাল চক্রবর্তী |
| ৮০. পরিষৎ | ১৩০৫-১০ বঙ্গাব্দ | রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী |
| ৮১. জয়তী | ১৩৩৭ বঙ্গাব্দ | আবদুল কাদির |
| ৮২. সংলাপ | — | আবুল হোসেন |
| ৮৩. সৈনিক | — | শাহেদ আলী |
| ৮৪. গুলিস্তা | — | এস ওয়াজেদ আলী |
| ৮৫. সাম্যবাদী | — | খান মুহাম্মদ মঈনুদ্দীন |
| ৮৬. বিচিত্রা | — | ফজল শাহাবুদ্দীন |
| ৮৭. কবিতাপত্র | — | ফজল শাহাবুদ্দীন |
| ৮৮. কবিকণ্ঠ | — | ফজল শাহাবুদ্দীন |
| ৮৯. বঙ্গদর্শন (নব পর্যায়) | — | মোহিতলাল মজুমদার |
| ৯০. সন্দেশ | — | সুকুমার রায় |
| ৯১. সাহিত্য পত্রিকা | — | মুহাম্মদ আবদুল হাই |
| ৯২. Reformer | — | প্রসন্ন কুমার ঠাকুর |
| ৯৩. Hindu Intelligence | — | কাশী প্রসাদ ঘোষ |
| ৯৪. সাহিত্য পত্রিকা | — | ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (বাংলা বিভাগ) |
| ৯৫. ভাষা সাহিত্য পত্র | — | জাঃ বিশ্ববিদ্যালয় (বাংলা বিভাগ) |
| ৯৬. সাহিত্যিকী | — | রাঃ বিশ্ববিদ্যালয় (বাংলা বিভাগ) |
| ৯৭. উত্তরাধিকার | — | বাংলা একাডেমি |
| ৯৮. লেখা | — | বাংলা একাডেমি |

**মডেল প্রশ্ন**

১. বাংলা ভাষায় প্রথম সাময়িকপত্রের নাম কি? কোথা থেকে, কত সালে প্রকাশিত হয়?
উত্তর : বাংলা ভাষায় প্রথম সাময়িকপত্রের নাম 'দিগদর্শন'। এটি শ্রীরামপুর মিশন থেকে ১৮১৮ সালে প্রকাশিত হয়।

২. বাংলা ভাষার প্রথম সংবাদপত্রের নাম কি? কত সালে প্রকাশিত হয়?
উত্তর : সমাচার দর্পণ। এটি ১৮১৮ সালে প্রকাশিত হয়।

৩. বাংলা ভাষায় প্রথম প্রকাশিত দৈনিক সংবাদপত্র কোনটি?
উত্তর : বাংলা ভাষায় প্রথম প্রকাশিত দৈনিক সংবাদপত্র 'সংবাদপ্রভাকর'। এর সম্পাদক ছিলেন কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত। পত্রিকাটি সাপ্তাহিকরূপে প্রথম আত্মপ্রকাশ করে ১৮৩১ সালে। ১৮৩৯ সালে এটি পরিণত হয় দৈনিক পত্রিকায়।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



৪. **বঙ্গদর্শন পত্রিকার প্রথম সম্পাদক কে? এটি কোন সালে প্রথম প্রকাশিত হয়?**
**উত্তর :** বঙ্গদর্শন পত্রিকার প্রথম সম্পাদক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। এটি ১৮৭২ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়।

৫. **কোন পত্রিকাটি চলিত ভাষারীতির প্রবর্তনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল? এর সম্পাদক কে?**
**উত্তর :** 'সবুজপত্র' পত্রিকাটি চলিত ভাষারীতির প্রবর্তনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। পত্রিকাটি প্রথম ১৯১৪ সালে প্রকাশিত হয়। এর সম্পাদক প্রমথ চৌধুরী।

৬. **'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকার প্রকাশকাল কত? এর সম্পাদক কে ছিলেন?**
**উত্তর :** সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস, রাজনীতি, সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যা ইত্যাদি বিষয় নিয়ে ১৮৪৩ সালে 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকাটি যাত্রা শুরু করে। ১৮৩৯ সালে প্রতিষ্ঠিত তত্ত্ববোধিনী সভা কর্তৃক প্রকাশিত এ পত্রিকার মাধ্যমেই সমাজে আধুনিক দৃষ্টিসম্পন্ন নতুন চিন্তাধারার সূচনা হয়। তখন পত্রিকার সম্পাদনা করতেন অক্ষয়কুমার দত্ত।

৭. **'সওগাত' পত্রিকাটি কোথা থেকে প্রকাশিত হয়? এ পত্রিকার প্রধান সম্পাদক ও লেখক কে?**
**উত্তর :** সওগাত একটি সচিত্র মাসিক পত্রিকা। ১৩২৫ বঙ্গাব্দে (১৯১৮ সালে) মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীনের সম্পাদনায় কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়। সম্পাদক হিসেবে নাসিরউদ্দীনের উদ্দেশ্য ছিল সামাজিক ন্যায়বিচার ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষার প্রতি দায়বদ্ধ একটি উন্নতমানের পত্রিকা প্রকাশ করা। কাজী নজরুল ইসলাম ছিলেন সওগাতের প্রধান লেখকদের অন্যতম। সওগাতের অন্যান্য প্রধান লেখক ছিলেন বেগম রোকেয়া, কাজী আবদুল ওদুদ, আবুল কালাম শামসুদ্দীন, আবুল মনসুর আহমদ এবং আবুল ফজল। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরও এতে লিখেছেন।

৮. **কল্লোল যুগ ও এ যুগের কবিদের সম্পর্কে ধারণা দিন।**
**উত্তর :**'কল্লোল' পত্রিকাকে ঘিরে যে সময়টিতে সাহিত্যের আধুনিকতাবাদী আন্দোলনের প্রকাশ ও বিকাশ তাই 'কল্লোল যুগ' (১৯৫০) নামে পরিচিত। 'কল্লোল' পত্রিকায় যারা লিখতেন তাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, বুদ্ধদেব বসু, প্রেমেন্দ্র মিত্র, নজরুল ইসলাম, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখ।

৯. **ঢাকার 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ'-এর উদ্দেশ্য ও ভূমিকা সম্পর্কে ধারণা দিন।**
**উত্তর :** 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ' ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রিক একটি সাহিত্য-সংস্কৃতিবিষয়ক প্রতিষ্ঠান। এর ছত্রছায়ায় বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলন সংগঠিত হয়। বাঙালি মুসলমান সমাজে আড়ষ্ট বুদ্ধিকে মুক্ত করে জ্ঞানপিপাসা জাগিয়ে তোলার অভিপ্রায়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন শিক্ষক ও প্রবীণ ছাত্র ১৯২৬ সালের ১৭ জানুয়ারি এটি প্রতিষ্ঠা করেন। সাহিত্য সমাজের মূল ভাবযোগী ছিলেন ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট কলেজের শিক্ষক কাজী আবদুল ওদুদ ও কর্মযোগী আবুল হুসেন। ঢাকা মুসলিম সাহিত্য সমাজের বার্ষিক মুখপত্র 'শিখা'র আপ্তবাক্য ছিল 'জ্ঞান যেখানে সীমাবদ্ধ, বুদ্ধি যেখানে আড়ষ্ট, মুক্তি সেখানে অসম্ভব'।



১০. **ঢাকার 'মুসলিম সাহিত্য-সমাজ'-এর প্রতিষ্ঠা কোন খ্রিষ্টাব্দে? এ সংগঠন থেকে প্রকাশিত মুখপত্রের নাম কি?**
**উত্তর :** মুক্তবুদ্ধি চর্চার উদ্দেশ্যে কাজী আব্দুল ওদুদ, আবুল হুসেন, আব্দুল কাদির, আবুল ফজল, কাজী মোতাহার হোসেন প্রমুখ ঢাকায় ১৯২৬ সালে 'মুসলিম সাহিত্য-সমাজ' নামে এ সংগঠনটি গড়ে তোলেন। 'মুসলিম সাহিত্য-সমাজ'-এর মুখপত্রের নাম 'শিখা'।

১১. **ঢাকা থেকে প্রকাশিত বাংলা সাহিত্যে গুরুত্বপূর্ণ এমন কয়েকটি পত্রিকার নাম লিখুন।**
**উত্তর :** শিখা, প্রগতি, ক্রান্তি, লোকায়ত।

১২. **কাজী নজরুল ইসলাম সম্পাদিত তিনটি পত্রিকার নাম লিখুন।**
**উত্তর :** ধূমকেতু (১৯২২), লাঙ্গল (১৯২৫), নবযুগ (১৯৪১)।

১৩. **'ধান শালিকের দেশ' পত্রিকাটি কোন প্রকৃতির? কোথা থেকে প্রকাশিত হয়?**
**উত্তর :** ষাণ্মাসিক। বাংলা একাডেমী থেকে পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়।

১৪. **বিশ শতকের একটি সাময়িকপত্রের পরিচিতি লিখুন।**
**উত্তর :** বিশ শতকের তথা সমগ্র বাংলা সাহিত্যের অন্যতম বিশিষ্ট পত্রিকা 'কল্লোল'। দীনেশরঞ্জন দাসের সম্পাদনায় কলকাতা থেকে এই মাসিক সাহিত্য পত্রিকাটি অতি আধুনিক লেখকগোষ্ঠীর মুখপত্র হিসেবে ১৯২৩ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। তৎকালীন তরুণ লেখক রবীন্দ্র বিরোধিতার নাম করে এখানে সমবেত হয়েছিলেন। কল্লোল প্রায় সাত বছর চলেছিল, কিন্তু এই অল্প সময়েই একটা প্রগতিশীল লেখকগোষ্ঠীর সমাবেশ ঘটাতে পেরেছিল। এ পত্রিকায় যারা নিয়মিত লিখতেন তাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, প্রেমেন্দ্র মিত্র, বুদ্ধদেব বসু, কাজী নজরুল ইসলাম, মোহিতলাল মজুমদার, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখ। এই লেখকেরা তৎকালীন ইউরোপীয় আদর্শে বাস্তব জীবন, মনস্তত্ত্বের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণ এবং রাজনৈতিক অর্থনৈতিক বিষয়কে তাঁদের রচনার উপজীব্য করছিলেন।

১৫. **ঢাকার বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলনের পরিচয় দিন।**
**উত্তর :** বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলন ধর্মীয় ও সামাজিক কুসংস্কার-বিরোধী একটি প্রগতিশীল আন্দোলন। ১৯২৬ সালের ১৭ জানুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আবুল হুসেনের নেতৃত্বে ঢাকায় মুসলিম সাহিত্য সমাজ নামে একটি সাংস্কৃতিক সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয়। তার মাধ্যমেই এ আন্দোলন গড়ে ওঠে। সাহিত্য সমাজের মূল বাণী ছিল : 'জ্ঞান যেখানে সীমাবদ্ধ, বুদ্ধি যেখানে আড়ষ্ট, মুক্তি সেখানে অসম্ভব।' এ কথাটি সমাজের বার্ষিক মুখপত্র শিখার শিরোনামের নিচে লেখা থাকত। তখন শিখা পত্রিকায় যাঁরা লিখতেন তাঁরা 'শিখাগোষ্ঠী' নামে পরিচিত ছিলেন।

বাংলার মুসলমান সমাজে যে ধর্মান্ধতা, কুসংস্কার ও কুপ্রথা বিরাজমান ছিল, সেসব দূরীকরণই ছিল এ আন্দোলনের মুখ্য উদ্দেশ্য। ধর্মবিশ্বাস, পর্দাপ্রথা, সুদপ্রথা, নৃত্যগীত ইত্যাদি সম্পর্কে আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ স্বাধীনভাবে মতামত ব্যক্ত করতেন। সাহিত্য সমাজের বিভিন্ন সভায় পঠিত এবং শিখা পত্রিকায় প্রকাশিত বিভিন্ন প্রবন্ধে তাঁদের চিন্তা ও আদর্শের প্রতিফলন ঘটতো। শিখাগোষ্ঠীর এসব বক্তব্য তৎকালীন ঢাকার রক্ষণশীল সমাজ মেনে নেয়নি; যার ফলে আবুল হুসেনকে জবাবদিহি করতে হয় এবং শেষপর্যন্ত তাঁকে চাকরি ও ঢাকা ছাড়তে হয়। ১৯৩১ সালে তাঁর ঢাকা ত্যাগের ফলে আন্দোলনে ভাটা পড়ে এবং ১৯৩৮ সালের পরে তা বন্ধ হয়ে যায়।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



## ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-১৮৯১)

আধুনিক বাংলা ভাষার গদ্যের জনক ঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, যিনি বিদ্যাসাগর নামেই পরিচিত। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বাঙালির মানস গঠনে, বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের বিকাশে এবং মূল্যবোধ সৃষ্টিতে কালজয়ী ভূমিকা রেখে গেছেন। কোলকাতার মেদিনীপুর জেলার বীরসিংহে বিদ্যাসাগর জন্মগ্রহণ করেন ১৮২০ সালের ২৬ সেপ্টেম্বরে। গ্রামের পাঠশালা শেষ করে তিনি কোলকাতায় পড়াশুনা করতে যান। সংস্কৃত কলেজ থেকে তিনি কৃতিত্বের সঙ্গে পাস করে বিদ্যাসাগর উপাধি নিয়ে বের হন ১৮৪১ সালে। একই সালের ২৯ ডিসেম্বর তাকে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে হেড পণ্ডিত হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়। এরপর তিনি সংস্কৃত কলেজে যোগ দেন। কিছু দিনের মধ্যেই তিনি এ কলেজের অধ্যক্ষ হন। ১৮৯১ সালের ২৯ জুলাই তার জীবনাবসান হয়।

**গদ্যগ্রন্থ :** বেতালপঞ্চবিংশতি (হিন্দি বৈতালপচ্চীসীর বঙ্গানুবাদ, ১৮৪৭), শকুন্তলা (কালিদাসের অভিজ্ঞানশকুন্তলম নাটকের উপাখ্যান ভাগের বঙ্গানুবাদ, ১৮৫৪), সীতার বনবাস (ভবভূতির উত্তররামচরিত নাটকের প্রথম অঙ্ক ও রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের বঙ্গানুবাদ-১৮৬০), ভ্রান্তিবিলাস (শেক্সপিয়রের Comedy of Erros-এর বঙ্গানুবাদ-১৮৬৯)। সংস্কৃত ব্যাকরণের উপক্রমণিকা (১৮৫১), ব্যাকরণ কৌমুদীর (১ম ভাগ-১৮৫৩, ২য় ভাগ-১৮৫৩, ৩য় ভাগ-১৮৫৪, ৪র্থ ভাগ-১৮৬২)।

**বঙ্গানুবাদ :** ঋজুপাঠ (১ম ভাগ– পঞ্চতন্ত্রের কয়েকটি উপাখ্যানের বঙ্গানুবাদ, ১৮৫১; ২য় ভাগ–রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডের কতিপয় অংশের বঙ্গানুবাদ, ১৮৫২; ৩য় ভাগ-হিতোপদেশ, বিষ্ণুপুরাণ, মহাভারত, ভট্টিকাব্য, ঋতুসংস্থার ও বেণীসংহার থেকে বঙ্গানুবাদ ১৮৫১), বোধোদয় (নানা ইংরেজি পুস্তক থেকে বঙ্গানুবাদ, ১৮৫১), বর্ণপরিচয় (১ম ও ২য় ভাগ-১৮৫৫), কথামালা (ঈসপ-এর গল্পের বঙ্গানুবাদ, ১৮৫৬), জীবনচরিত (চেম্বার্সের বায়োগ্রাফির বঙ্গানুবাদ, ১৮৪৯), আখ্যানমঞ্জরী (ইংরেজি থেকে বঙ্গানুবাদ, ১৮৬৩)।

**বিদ্রূপ কৌতুক গ্রন্থ :** অতি অল্প হইল (১৮৭৩), আবার অতি অল্প হইল (১৮৭৩)।

**সম্মাননা :** বাংলার গভর্নর কর্তৃক সম্মাননা লিপি প্রদান (১৮৭৭) ও ভারত সরকার কর্তৃক সিআইই উপাধিতে ভূষিত।

**মডেল প্রশ্ন**

১. **ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের 'ভ্রান্তিবিলাস' কোন নাটকের গদ্য অনুবাদ? তার অন্যান্য অনুবাদ গ্রন্থ কি কি?**
উত্তর : ইংরেজি সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাট্যকার উইলিয়াম শেক্সপিয়র (১৫৬৪-১৬১৬ খ্রি.) রচিত প্রথম নাটক 'দ্য কমেডি অব এররস' (১৫৯২-৯৩) অবলম্বনে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-১৮৯১ খ্রি.) 'ভ্রান্তিবিলাস' রচনা করেন। ১৮৬৯ সালে তিনি শেক্সপিয়রের এ নাটকটির বঙ্গানুবাদ করেন। তার অন্যান্য অনুবাদ গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে 'বেতালপঞ্চবিংশতি' (হিন্দি বৈতালপচ্চীসীর বঙ্গানুবাদ, ১৮৪৭), 'শকুন্তলা' (কালিদাসের 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম' নাটকের উপাখ্যান ভাগের বঙ্গানুবাদ, ১৮৫৪) এবং 'সীতার বনবাস' (ভবভূতির উত্তরকাণ্ডের বঙ্গানুবাদ, ১৮৬০)।



২. **ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর কবে, কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?**
উত্তর : ১৮২০ সালের ২৬ সেপ্টেম্বর, কোলকাতার মেদিনীপুর জেলার বীরসিংহ গ্রামে।

৩. **ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর কোন কোন উপাধি লাভ করেন?**
উত্তর : ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মূলত সমাজসংস্কারক ছিলেন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ১৮৩৯ সালে সংস্কৃত কলেজ কর্তৃক বিদ্যাসাগর উপাধি ও ভারত সরকার কর্তৃক সিআইই উপাধিতে ভূষিত হন।

৪. **কোন প্রতিষ্ঠান থেকে তাকে 'বিদ্যাসাগর' উপাধি দেয়া হয়?**
উত্তর : সংস্কৃত কলেজ থেকে।

৫. **তিনি মূলত কি ছিলেন?**
উত্তর : লেখক, সমাজসংস্কারক, শিক্ষাবিদ।

৬. **তাঁর পিতার নাম কি?**
উত্তর : ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

৭. **তিনি কত সালে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের বাংলা বিভাগের হেড পণ্ডিত পদে নিযুক্ত হন?**
উত্তর : ১৮৪১ সালের ২৯ ডিসেম্বর।

৮. **তিনি জনশিক্ষা ও শিশুশিক্ষা প্রসারকল্পে বাঙালির জন্য কি কি গ্রন্থ রচনা করেন?**
উত্তর : বোধোদয় (১৮৫১), বর্ণপরিচয় (প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ ১৮৫৫), কথামালা (১৮৫৬), আখ্যানমঞ্জরী (১৮৬৩)।

৯. **তিনি কত সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো এবং কত সালে তত্ত্ববোধনী সভার সভ্য হন?**
উত্তর : ১৮৫৬ ও ১৮৫৮ সালে।

১০. **তিনি কোন আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন?**
উত্তর : বিধবা-বিবাহ আন্দোলন।

১১. **বিধবাবিবাহ রহিতকরণ বিষয়ে যে কলমযুদ্ধ শুরু হয়েছিল সে সম্পর্কে আলোকপাত করুন। এক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল কে?**
উত্তর : বিধবাবিবাহ রহিতকরণে তৎকালীন সময়ের সংস্কার কর্মীদের মুখপত্র 'সমাচার দর্পণ', 'জ্ঞানান্বেষণ' পত্রিকায় বহু পত্রাদি প্রকাশিত হয়। পুস্তিকা, সংবাদপত্র, সভাসমিতি ছাড়িয়ে তা ছড়া ও গানের বিষয় হয়ে ওঠে। মুদ্রণ যন্ত্র ও সংবাদপত্র ব্যতীত এ কাজে মঞ্চও এগিয়ে আসে। এ সময় এ বিষয়ে পক্ষে-বিপক্ষে যারা কলমযুদ্ধ শুরু করেন তাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। তিনি ১৮৫৫ সালের জানুয়ারি মাসে 'বিধবা-বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিৎ কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব' শীর্ষক পুস্তিকা প্রকাশ করেন। হিন্দু রক্ষণশীল সমাজ বিধবা-বিবাহের তীব্র বিরোধিতা করলে প্রতিবাদীদের প্রত্যুত্তর দানের জন্য ১৮৫৫ সালের অক্টোবর মাসে উপর্যুক্ত শিরোনামে দ্বিতীয় পুস্তক প্রকাশ করেন। তারই প্রচেষ্টায় ১৮৫৬ সালে বিধবা বিবাহ আইনে পরিণত হয়।

১২. **'বিধবা-বিবাহ' প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব শীর্ষক পুস্তিকা প্রকাশ করেন কত সালে?**
উত্তর : ১৮৫৫ সালের জানুয়ারি মাসে।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



**১৩. কত সালে বিধবা বিবাহ আইনে পরিণত হয়?**
উত্তর : ২৬ জুলাই, ১৮৫৬।

**১৪. তার কোন নিকট আত্মীয় বিধবা বিবাহ করেন?**
উত্তর : তার পুত্র নারায়ণচন্দ্র ১৮৭০ সালে বিধবা বিবাহ করেন।

**১৫. ১৮৭১ সালে প্রকাশিত তার গুরুত্বপূর্ণ পুস্তিকার নাম কি?**
উত্তর : বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক বিচার।

**১৬. তিনি কি হিসেবে খ্যাত?**
উত্তর : বাংলা গদ্যের জনক।

**১৭. বাংলা গদ্যপ্রবাহ সমৃদ্ধির জন্য তিনি তার গদ্যে কিসের সৃষ্টি করেন?**
উত্তর : 'উচ্চবচন ধ্বনিতরঙ্গ' ও 'অনতিলক্ষ্য ছন্দঃস্রোত'।

**১৮. বিদ্যাসাগরের প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ কোনটি?**
উত্তর : বেতাল পঞ্চবিংশতি (১৮৪৭)।

**১৯. বাংলা ভাষায় রচিত প্রথম মৌলিক রচনার নাম কি?**
উত্তর : প্রভাবতী সম্ভাষণ।

**২০. বিদ্যাসাগর রচিত প্রথম ব্যাকরণগ্রন্থের নাম কি?**
উত্তর : ব্যাকরণ কৌমুদী।

**২১. তিনি কি কি পুরস্কার লাভ করেন?**
উত্তর : বিদ্যাসাগর উপাধি (১৮৩৯), বাংলার গভর্নর কর্তৃক সম্মাননা লিপি (১৮৭৭) ও ভারত সরকার কর্তৃক সিআইই উপাধিতে ভূষিত।

**২২. তাঁর মৃত্যু তারিখ কত?**
উত্তর : ১৮৯১ সালের ২৯ জুলাই।

**২৩. সাহিত্যকর্ম ও সমাজকর্ম এ দুয়ের মধ্যে কোনটির জন্য বিদ্যাসাগর অধিক পরিচিত? আপনার অভিমত ব্যক্ত করুন।**
উত্তর : বিদ্যাসাগর বাংলা গদ্যকে সৌন্দর্য ও পরিপূর্ণতা দান করলেও তাঁর সমাজকর্মের জন্যই তিনি অধিক সুপরিচিত। পাশ্চাত্যের মানবতাবাদী আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি সমাজসেবায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন। সমাজ সংস্কারের মনোবৃত্তি বিদ্যাসাগরের রচনায় সহজেই লক্ষণীয়, অর্থাৎ তিনি যে সমস্ত সাহিত্য রচনা করেছেন তার মূলেও সমাজ সংস্কারের উদ্দেশ্য নিহিত ছিল। তাই আমরা বলতে পারি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সমাজকর্মের জন্য অধিক সুপরিচিত ছিলেন।

**২৪. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে বাংলা গদ্যের জনক বলা হয় কেন?**
উত্তর : বাংলা গদ্যের অনুশীলন পর্যায়ে বিদ্যাসাগর সুশৃঙ্খলতা, পরিমিতিবোধ ও ধ্বনিপ্রবাহে অবিচ্ছিন্নতা সঞ্চার করে বাংলা গদ্য রীতিকে উৎকর্ষের এক উচ্চতর পরিসীমায় উন্নীত করেন। বাংলা গদ্যে যতি সন্নিবেশ করে, পদবন্ধে ভাগ করে এবং সুললিত শব্দবিন্যাস করে বিদ্যাসাগর তথ্যের ভাষাকে রসের ভাষায় পরিণত করেন। বাংলা গদ্যের মধ্যেও যে এক প্রকার ধ্বনিঝংকার ও সুরবিন্যাস আছে তা তিনিই আবিষ্কার করেন। এ কারণেই তাকে বাংলা গদ্যের জনক বলা হয়।



## বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

বাংলা উপন্যাসের স্থপতি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ১৮৩৮ সালের ২৬ জুন (১৩ আষাঢ় ১২৪৫) পশ্চিমবঙ্গের চব্বিশ পরগণার কাঁঠালপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা ডেপুটি কালেক্টর যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং মা দুর্গাসুন্দরী। ১৮৪৪ সালে পিতার কর্মস্থল মেদিনীপুর গমন এবং সেখানকার ইংরেজি স্কুলে ভর্তি হন। ১৮৪৯ সালে মেদিনীপুর থেকে কাঁঠালপাড়ায় প্রত্যাবর্তন করেন এবং একই বছর তার এগার বছর বয়সে পাঁচ বছর বয়সী মোহিনীদেবীর সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। অতঃপর হুগলি কলেজের স্কুল বিভাগে ভর্তি (১৮৪৯) হন। কলেজের জুনিয়র ও সিনিয়র বিভাগের বৃত্তি পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন। ১৮৫৬ সালে আইন পড়ার জন্য প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হন। ১৮৫৭ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এন্ট্রান্স পরীক্ষা প্রবর্তিত হলে তাতে অংশগ্রহণ এবং প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। এর পরের বছর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সারা ভারতবর্ষের প্রথম গ্র্যাজুয়েট হিসেবে বিএ পাস করেন। কর্মজীবনে তিনি একজন সরকারি আমলা ছিলেন। তার প্রথম উপন্যাস 'দুর্গেশনন্দিনী'। সাহিত্যের রসবোদ্ধাদের কাছ থেকে 'সাহিত্য সম্রাট' ও হিন্দু ধর্মানুরাগীদের কাছ থেকে 'ঋষি' আখ্যা লাভ।

উপন্যাস : দুর্গেশনন্দিনী (১৮৬৫), কপালকুণ্ডলা (১৮৬৬), মৃণালিনী (১৮৬৯), বিষবৃক্ষ (১৮৭৩), কৃষ্ণকান্তের উইল (১৮৭৮), রজনীতে (১৮৭৭), রাজসিংহ (১৮৮২), আনন্দমঠে (১৮৮২), দেবী চৌধুরাণী (১৮৮৪), সীতারাম (১৮৮৭)।

প্রবন্ধগ্রন্থ : লোকরহস্য (১৮৭৪), বিজ্ঞানরহস্য (১৮৭৫), কমলাকান্তের দপ্তর (১৮৭৫), বিবিধ সমালোচনা (১৮৭৬), সাম্য (১৮৭৯), কৃষ্ণচরিত্র (১৮৮৬), বিবিধ প্রবন্ধ (১ম ভাগ-১৮৮৭ ও ২য় ভাগ ১৮৯২), ধর্মতত্ত্ব অনুশীলন (১৮৮৮), শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা (১৯০২)।

মৃত্যু : কোলকাতা, বহুমূত্ররোগে, ৮ এপ্রিল ১৮৯৪ (২৬ চৈত্র, ১৩০০)।

**মডেল প্রশ্ন**

**১. বঙ্কিমচন্দ্রের জন্ম ও মৃত্যুর তারিখ উল্লেখ করুন।**
উত্তর : জন্ম ২৬ জুন ১৮৩৮ খ্রিষ্টাব্দ ও মৃত্যু ৮ এপ্রিল ১৮৯৪ খ্রিষ্টাব্দ।

**২. 'সাহিত্য সম্রাট' কার উপাধি? তাকে কেন এ উপাধি দেয়া হয়?**
উত্তর : বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে বাংলা সাহিত্যে 'সাহিত্য সম্রাট' ও সার্থক উপন্যাসের জনক বলা হয়। তাকে বাংলার স্কট উপাধিতেও ভূষিত করা হয়। তিনি বাংলা সাহিত্যের সূচনালগ্নে গদ্যসাহিত্যে বিশেষ অবদানের জন্য সাহিত্য সম্রাট উপাধি লাভ করেন।

**৩. 'আনন্দমঠ' উপন্যাসটির প্রেক্ষাপট ও প্রতিপাদ্য বিষয় উল্লেখ করুন।**
উত্তর : 'আনন্দমঠ' উপন্যাসটি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়-এর লেখা। ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের পটভূমিকায় সন্ন্যাসী বিদ্রোহের ছায়া অবলম্বনে রচিত এ উপন্যাসটি প্রকাশিত হয় ১৮৮২ সালে। এ উপন্যাসটির প্রতিপাদ্য বিষয় স্বদেশভক্তি, স্বজাতি ও স্বধর্মপ্রীতি। উপন্যাসটিতে মন্বন্তরের ভূমিকা নিখুঁতভাবে তুলে ধরা হয়েছে আর সাধারণ গ্রামীণ জীবনের আখ্যান হয়ে উঠেছে বাস্তব। সর্বোপরি প্রেম ও আদর্শের দ্বন্দ্ব এ উপন্যাসকে দিয়েছে নিবিড়তা। এ গ্রন্থের 'বন্দে মাতরম' গানের ধ্বনি পরবর্তীকালে ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনকারীদের অত্যন্ত প্রিয় ও উদ্দীপক স্লোগান হিসেবে গৃহীত হয়।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



৪. **বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচিত কতিপয় উল্লেখযোগ্য উপন্যাসের নাম লিখুন।**
উত্তর : বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের প্রথম উপন্যাস দুর্গেশনন্দিনী। এটি বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক উপন্যাস। উপন্যাসটি ১৮৬৫ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। 'কপালকুণ্ডলা' দ্বিতীয় এবং 'মৃণালিনী' তার তৃতীয় উপন্যাস। এছাড়া তাঁর অন্যান্য উপন্যাস– 'বিষবৃক্ষ', 'কৃষ্ণকাণ্ডের উইল', 'রজনী', 'রাজসিংহ', 'আনন্দমঠ', 'দেবী চৌধুরানী', 'সীতারাম'। 'Rajmohon's Wife' তাঁর ইংরেজিতে লেখা প্রথম উপন্যাস।

৫. **'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসের প্রধান চরিত্রগুলো কি এবং উপন্যাসটির দুটি উল্লেখযোগ্য বাক্য/সংলাপ লিখুন।**
উত্তর : বাংলা উপন্যাসের জনক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৮৯৪) রচিত রোমান্টিক উপন্যাস 'কপালকুণ্ডলা' (১৮৬৬)-এর প্রধান চরিত্র কপালকুণ্ডলা (নায়িকা), নবকুমার (নায়ক)। এ উপন্যাসের উল্লেখযোগ্য বাক্য/সংলাপ ১. 'পথিক তুমি পথ হারাইয়াছ' ২. 'তুমি অধম তাই বলিয়া আমি উত্তম হইব না কেন?'

৬. **'কৃষ্ণকান্তের উইল'-এর রোহিণী আত্মহত্যা করতে চেয়েছিল কেন?**
উত্তর : 'কৃষ্ণকান্তের উইল' উপন্যাসটির রচয়িতা বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। এ উপন্যাসের মুখ্য চরিত্র রোহিণী। রোহিণী যুবতী, পরম রূপবতী, সর্বকর্ম নিপুণা, বুদ্ধিমতী, লাস্যময়ী, চঞ্চলা, সাহসিকা, বিধবা। বিধবা বলেই হিন্দুশাস্ত্র মতে তার ঘরণী হওয়ার পথ সারা জীবনের জন্য বন্ধ। রোহিণী জমিদার পুত্র গোবিন্দলালকে ভালোবাসতো। গোবিন্দলাল-এর স্ত্রী ভ্রমর ছিল কৃষ্ণকায়। রোহিণী গোবিন্দলালকে ভালোবেসে 'স্বীয় ব্যর্থ যৌবনের হাহাকারে' জলে ডুবে আত্মহত্যার চেষ্টা করলে গোবিন্দলালই তাকে উদ্ধার করে।

৭. **বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম সামাজিক উপন্যাসের নাম কি?**
উত্তর : বিষবৃক্ষ, ১৮৭৩ সালে প্রকাশিত হয়।

৮. **বাংলা উপন্যাসে 'বাংলার ওয়াল্টার স্কট' কাকে বলা হয়?**
উত্তর : বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে।

৯. **বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তার কোন উপন্যাসে দেশপ্রেমকে ফুটিয়ে তুলেছেন?**
উত্তর : আনন্দমঠ।

১০. **বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত পত্রিকার নাম কি এবং কত সালে প্রকাশিত হয়?**
উত্তর : বঙ্গদর্শন; ১৮৭২ সালে প্রকাশিত।

১১. **বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের প্রথম উপন্যাসের নাম কি?**
উত্তর : Rajmohan's Wife (১৮৬২)।

১২. **বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম বাংলা উপন্যাসের নাম কি?**
উত্তর : দুর্গেশনন্দিনী (১৮৫৬ সালে প্রকাশিত)।

১৩. **বঙ্কিমচন্দ্রের ত্রয়ী উপন্যাসগুলো কি?**
উত্তর : আনন্দমঠ (১৮৮২), দেবী চৌধুরাণী (১৮৮৪) ও সীতারাম (১৮৮৭)।

১৪. **বঙ্কিমচন্দ্র বিরচিত রোমান্টিক উপন্যাসের নাম লিখুন।**
উত্তর : কপালকুণ্ডলা (১৮৬৬)।

১৫. **কোন ঔপন্যাসিক 'সাহিত্য সম্রাট' নামে খ্যাত?**
উত্তর : বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।



১৬. **বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্য রচনার ক্ষেত্রে পাশ্চাত্যের কোন সাহিত্যিককে অনুসরণ করেছিলেন?**
উত্তর : ওয়াল্টার স্কট।

১৭. **বঙ্কিমচন্দ্রের ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলোর নাম লিখুন।**
উত্তর : দুর্গেশনন্দিনী (১৮৬৫), রাজসিংহ (১৮৮১) ও চন্দ্রশেখর (১৮৭৫)।

১৮. **বঙ্কিমচন্দ্রের সামাজিক উপন্যাসের মধ্যে প্রথমটির নাম কি?**
উত্তর : বিষবৃক্ষ (১৮৭৩)।

১৯. **পাশ্চাত্য ভাবাদর্শে বাংলা উপন্যাস রচনার পথিকৃৎ কে?**
উত্তর : বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

২০. **'কমলকান্তের দপ্তর' কোন শ্রেণীর রচনা?**
উত্তর : সরস ব্যঙ্গাত্মক প্রবন্ধ গ্রন্থ।

২১. **বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবন্ধ গ্রন্থগুলোর নাম উল্লেখ করুন।**
উত্তর : কমলাকান্তের দপ্তর, লোকরহস্য, কৃষ্ণচরিত্র, সাম্য, বঙ্গদেশের কৃষক ইত্যাদি।

২২. **'বঙ্কিমচন্দ্রের সব উপন্যাসই রোমান্সমূলক' – বিষয়টি অল্প কথায় বুঝিয়ে দিন।**
উত্তর : উপন্যাস রচনায় বঙ্কিমচন্দ্র প্রখ্যাত ইংরেজ ঔপন্যাসিক স্যার ওয়াল্টার স্কটের রোমান্স-আশ্রয়ী ঐতিহাসিক উপন্যাসের আদর্শের অনুসারী ছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে বাস্তব জীবনকে ভিত্তিভূমি হিসেবে গ্রহণ করে বিস্ময়কর ও অলৌকিকের প্রতি প্রবণতা প্রকাশমান। ঐতিহাসিক উপন্যাসে তিনি যেমন ইতিহাস ও দৈবশক্তির সংমিশ্রণ ঘটিয়েছেন অন্যান্য সামাজিক ও দেশাত্মবোধক উপন্যাসগুলোতেও অলৌকিকতা ও কাল্পনিকতার আশ্রয় নিয়েছেন। এ কারণেই বলা হয় বঙ্কিমচন্দ্রের সব উপন্যাসই রোমান্সমূলক।

২৪. **বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক উপন্যাসের নাম কি? এর রচয়িতা কে?**
উত্তর : বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক উপন্যাস 'দুর্গেশনন্দিনী'। এর রচয়িতা বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

২৫. **বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস কেন সার্থক?**
উত্তর : বাংলা সাহিত্যের প্রথম স্বার্থক ঔপন্যাসিক হিসেবে খ্যাত বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। তাঁর প্রথম স্বার্থক রোমান্টিক উপন্যাস 'দুর্গেশনন্দিনী'। সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় সমগ্র বঙ্কিমী উপন্যাসে তিনটি বিশিষ্ট লক্ষণ দেখেছেন :

১. বিষয়বস্তু বা theme-এর বা অসাধারণত্বের ওপর প্রাধান্য আরোপের প্রবণতা।
২. উপন্যাসের কাঠামো নির্মাণে নৈয়ায়িক বা তার্কিক শৃঙ্খলা রক্ষার চেষ্টা।
৩. মননশীলতাজনিত সুষমতার প্রয়োগ।

তাছাড়া ড. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে, 'বঙ্কিমের হাতে বাংলা উপন্যাস পূর্ণ যৌবনের শক্তি ও সৌন্দর্য লাভ করেছে।' মানবহৃদয়ের দ্বিধাদ্বন্দ্বের বিশ্লেষণও বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের বৈশিষ্ট্য। উপন্যাস রচনায় বঙ্কিমচন্দ্র প্রখ্যাত ইংরেজ ঔপন্যাসিক স্যার ওয়াল্টার স্কটের রোমান্স-আশ্রয়ী ঐতিহাসিক উপন্যাসের আদর্শের অনুসারী ছিলেন। আবার তিনি সামাজিক-পারিবারিক কথা সাহিত্যের আদর্শেও কতিপয় উপন্যাস রচনা করেন। এসব উপন্যাসে বাঙালির অতীত ইতিহাস যেমন স্থান পেয়েছে, তেমনি ব্যক্ত হয়েছে সমকালীন সমাজজীবনের কথা। তার উপন্যাসে বাস্তবজীবনকে ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করে বিস্ময়কর ও অলৌকিকের প্রতি প্রবণতা প্রকাশমান। এতে রোমান্সের বৈশিষ্ট্য নিহিত। রোমান্স রচনায় ইতিহাস ও দৈবশক্তির সংমিশ্রণ ঘটিয়ে তার সাথে সংযুক্ত করা হয়েছে রহস্যময় দৃঢ় ব্যক্তিত্বশালী মনুষ্য চরিত্র। এসব বৈশিষ্ট্যের কারণেই তার উপন্যাসকে সার্থক উপন্যাস বলা হয়।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



## মাইকেল মধুসূদন দত্ত

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে যে কয়জন প্রতিভাধরের অবদান অবিস্মরণীয় তাদের মধ্যে মাইকেল মধুসূদন দত্ত অন্যতম। বাংলা কবিতাকে তিনি নবজন্ম দিয়েছিলেন এবং মুক্ত করেছিলেন মধ্যযুগের নাগপাশ থেকে। তিনিই প্রথম বাংলা ভাষায় মহাকাব্য রচনা করেন এবং বাংলা কবিতায় সনেট প্রবর্তন করেন।

**জন্ম :** ২৪ জানুয়ারি, ১৮২৪।

**পিতা :** রাজনারায়ণ দত্ত।

**মাতা :** জাহ্নবী দেবী।

**জন্মস্থান :** সাগরদাঁড়ি, কেশবপুর, যশোর।

**ধর্মান্তরিত হন :** ৯ ফেব্রুয়ারি, ১৮৪৩।

**প্রথম প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ :** The Captive Lady, ১৮৪৯ সাল।

**ছদ্মনাম :** Timothy Penpoem.

**প্রথম নাটক :** শর্মিষ্ঠা, ১৮৫৯ সালে প্রকাশিত।

**অমিত্রাক্ষর ছন্দের সর্বপ্রথম প্রয়োগ :** 'পদ্মাবতী' নাটকে। তবে সফল প্রয়োগ ঘটান 'তিলোত্তমাসম্ভব' কাব্যে।

**মাদ্রাজ বাস :** ১৮৪৮–১৮৫৬ সালে।

**প্রথম স্ত্রী :** রেবেকা টমসন; ১৮৪৮ সালে বিয়ে করেন।

**বিবাহ বিচ্ছেদ :** ১৮৫৫ সালে।

**দ্বিতীয় স্ত্রী :** অধ্যাপক কন্যা আঁরিয়েতা (হেনরিয়েটা); ১৮৫৬ সালে বিয়ে করেন।

**কলকাতায় প্রত্যাবর্তন :** ২ ফেব্রুয়ারি, ১৮৫৬।

**বাংলা ভাষার সর্বপ্রথম সার্থক ট্রাজেডি নাটক :** কৃষ্ণকুমারী।

**ইউরোপ গমন :** ১৮৬২ সালে।

**ইউরোপ বাস :** ১৮৬২-১৮৬৬ সালে।

**স্বদেশ প্রত্যাবর্তন :** ৫ জানুয়ারি, ১৮৬৭।

**জীবনাবসান :** ২৯ জুন, ১৮৭৩ সালে।

**মধুসূদন রচনাবলী :**

**নাটক :** শর্মিষ্ঠা (১৮৫৮), পদ্মাবতী (১৮৬০), কৃষ্ণকুমারী (১৮৬১), হেক্টর বধ (১৮৭১), মায়াকানন (১৮৭৩), বিষ না ধনুগুণ (১৮৭৩)।

**প্রহসন :** ১. একেই কি বলে সভ্যতা (১৮৫৯), বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ (১৮৫৯)।

– পাইকপাড়ার প্রজাদের অনুরোধে প্রহসন দুটি রচনা করেন।
– 'বিষ না ধনুগুণ' অসম্পূর্ণ নাটক।
– নাটকে যথেষ্ট পারদর্শিতা প্রদর্শনের জন্য মধুসূদন দত্তকে 'আধুনিক বাংলা নাটকের জনক' বলা হয়।
– 'চর্তুদশপদী কবিতাবলী' ফ্রান্সের ভার্সাই নগরীতে বসে রচনা করেন।
– পত্রকাব্য হলো 'বীরাঙ্গনা'।



**কাব্যগ্রন্থ :** ১. তিলোত্তমাসম্ভব (১৮৬০), মেঘনাদবধ (১৮৬১), ব্রজাঙ্গনা (১৮৬১), বীরাঙ্গনা (১৮৬২), ৫. চতুর্দশপদী কবিতাবলী (১৮৬৬)

**ইংরেজি কাব্যগ্রন্থ :** ১. Visions of the Past (১৮৪৮), The Captive Lady (১৮৪৯)

– এছাড়াও খণ্ডকাব্য Rizia
– ১৮৬১ সালে মধুসূদন দত্ত দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' নাটকের ইংরেজি অনুবাদ করেন।

**জীবনাবসান :** ২৯ জুন ১৮৭৩।

**মডেল প্রশ্ন**

১. **বাংলা সাহিত্যে সার্থক মহাকবি কে?**
উত্তর : মাইকেল মধুসূদন দত্ত।

২. **মাইকেল মধুসূদন দত্তের জন্ম ও মৃত্যুর তারিখ লিখুন।**
উত্তর : জন্ম ২৫ জানুয়ারি ১৮২৪ ও মৃত্যু ২৯ জুন ১৮৭৩।

৩. **মধুসূদন দত্তের প্রথম প্রকাশিত কাব্য কোনটি? কত সালে প্রকাশিত?**
উত্তর : The Captive Lady; ১৮৪৯ সালে প্রকাশিত।

৪. **Visions of the Past ও The Captive Lady কাব্য দুটির রচয়িতা কে?**
উত্তর : মাইকেল মধুসূদন দত্ত।

৫. **মধুসূদন সর্বপ্রথম তার কোন কাব্যগ্রন্থে অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্তন করেন?**
উত্তর : চর্তুদশপদী কবিতাবলী।

৬. **'বীরাঙ্গনা কাব্য' কে রচনা করেন? কোন শ্রেণীর কাব্য?**
উত্তর : মাইকেল মধুসূদন দত্ত। পত্রকাব্য।

৭. **'বীরাঙ্গনা কাব্য'টি কার কাব্যগ্রন্থ অনুসরণে লেখা? কতটি পত্র আছে?**
উত্তর : ইটালির কবি ওভিদের Heroides কাব্যগ্রন্থেরর অনুসরণে লেখা। কাব্যটির পত্র সংখ্যা ১১টি।

৮. **সনেট কি? বাংলা সাহিত্যে সনেটের প্রবর্তক কে?**
উত্তর : যে কবিতায় কবি হৃদয়ের একটিমাত্র ভাব বা অনুভূতি অখণ্ড থেকে চতুর্দশ অক্ষর ও চতুর্দশ চরণ দ্বারা একটি বিশেষ পদের মধ্য দিয়ে কবিতা হিসেবে আত্মপ্রকাশ লাভ করে তাকে চতুর্দশপদী কবিতা বা সনেট বলে। বাংলা সাহিত্যাঙ্গনে বাংলায় সনেট রচনা শুরু করেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত এবং তার হাতেই এসেছে সনেট রচনার যুগান্তর সাফল্য। এ কারণেই তাকে বাংলা সাহিত্যে সনেটের প্রবর্তক বলা হয়।

৯. **একটি সনেটের ক'টি অংশ? বিশ্লেষণ করুন।**
উত্তর : সনেটে যেমন চৌদ্দটি লাইন বা পঙ্‌ক্তি থাকে তেমনি আবার প্রতিটি লাইন বা পঙ্‌ক্তিতে চৌদ্দটি বা আঠারোটি অক্ষর থাকে। সাধারণভাবে কবিতার চৌদ্দটি লাইন দুটি ভাগে বিভক্ত থাকে। প্রথম ভাগে আট লাইন এবং দ্বিতীয় ভাগে ছয় লাইন। প্রথম ভাগকে 'অষ্টক' এবং দ্বিতীয় ভাগকে 'ষটক' বা 'ষষ্টক' নামে অভিহিত করা হয়। পরবর্তীতে এ ভাগ অন্যরকম হতেও দেখা যায়। তিনটি চার লাইনের ভাগ; প্রতিটি 'চতুষ্ক' নামে পরিচিত এবং শেষ দুটি অন্ত্যমিলবিশিষ্ট চরণ।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



১০. মধুসূদনের সনেট জাতীয় রচনা কোনটি? কত সালে প্রকাশিত?
উত্তর : 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী'; ১৮৬৫ সালে প্রকাশিত।

১১. 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী' কাব্যে কয়টি কবিতার সন্নিবেশ ঘটেছে?
উত্তর : ১০২টি কবিতা।

১২. মধুসূদনের প্রথম সনেট কোনটি?
উত্তর : বঙ্গভাষা।

১৩. 'হে বঙ্গ ভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন তা সবে অবোধ আমি অবহেলা করি'—পংক্তিটি কোন কবিতার? রচয়িতা কে?
উত্তর : বঙ্গভাষা; মাইকেল মধুসূদন দত্ত।

১৪. বাংলা ভাষায় সর্বপ্রথম এবং সর্বশ্রেষ্ঠ মহাকাব্য কোনটি? এটি কোন ছন্দে রচিত?
উত্তর : মেঘনাদবধ মহাকাব্য, অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত।

১৫. অমিত্রাক্ষর ছন্দের স্রষ্টা মাইকেল মধুসূদন দত্তের অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত প্রথম কাব্য কোনটি?
উত্তর : 'তিলোত্তমা সম্ভব'। এটি ১৮৭০ সালে প্রকাশিত।

১৬. কোন কাব্য লিখে মাইকেল প্রথম বাঙালি কবি সংবর্ধনা পান এবং কার দ্বারা?
উত্তর : 'মেঘনাদবধ' কাব্যটি লেখার দুসপ্তাহের মধ্যে কালীপ্রসন্ন সিংহ 'বিদ্যোৎসাহিনী' সভার পক্ষ থেকে কবিকে সংবর্ধিত করেন।

১৭. মধুসূদনের প্রথম নাটক কোনটি? কত সালে প্রকাশিত হয়?
উত্তর : শর্মিষ্ঠা। ১৮৫৯ সালে প্রকাশিত হয়।

১৮. বাংলা সাহিত্যের প্রথম ট্রাজেডি কোনটি? কত সালে প্রকাশিত হয়?
উত্তর : কৃষ্ণকুমারী। ১৮৬১ সালে প্রকাশিত হয়।

১৯. 'একেই কি বলে সভ্যতা' ও 'বুঁড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' গ্রন্থদ্বয়ের রচয়িতা কে? কোন শ্রেণীর রচনা?
উত্তর : মাইকেল মধুসূদন দত্ত; প্রহসন।

২০. মধুসূদন দত্ত সর্বপ্রথম কোন নাটকে আমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রয়োগ করেন?
উত্তর : 'পদ্মাবতী' নাটকে।

২১. মধুসূদন দত্তের কয়েকটি নাটকের নাম উল্লেখ করুন।
উত্তর : শর্মিষ্ঠা, কৃষ্ণকুমারী, মায়াকানন, পদ্মাবতী।

২২. বাংলা কাব্যসাহিত্যে আধুনিকতার জনক কে? এ ক্ষেত্রে তাকে কেন জনক হিসেবে চিহ্নিত করা হয়?
উত্তর : মাইকেল মধুসূদন দত্ত (১৮২৪–৭৩) বাংলা কাব্যসাহিত্যে আধুনিকতার জনক। মধ্যযুগের কাব্যে দেবদেবীর মাহাত্ম্যসূচক কাহিনীর বৈশিষ্ট্য অতিক্রম করে বাংলা কাব্যধারায় মানবতাবোধ সৃষ্টিপূর্বক আধুনিকতার লক্ষণ ফোটানোতেই মাইকেল মধুসূদন দত্তের অতুলনীয় কীর্তি প্রকাশিত। তিনি তার সাহিত্যসৃষ্টিতে, বিষয়নির্বাচনে ও প্রকাশভঙ্গিতে, ভাবে ও ভাষায়, অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক বৈশিষ্ট্যে এমন একটি আশ্চর্য শিল্পকুশলতা ফুটিয়ে তুলেছেন যাকে বাংলা সাহিত্যের অঙ্গনে অভিনব বলে চিহ্নিত করা যায়।



২৩. প্রহসন বলতে কি বোঝায়? কতিপয় উদাহরণ দিন।
উত্তর : প্রহসন বলতে সংস্কৃত আলঙ্কারিকরা সমাজের কুরীতি শোধনার্থে রহস্যজনক ঘটনা সম্বলিত হাস্যরসপ্রধান একাঙ্কিকা নাটককে বোঝাতেন। এতে হাস্যরসময় জীবনালেখ্যই রূপায়িত হয়। বর্তমানকালে প্রহসনকে সংজ্ঞায়িত করা হয় অতিমাত্রায় লঘু কল্পনাময়, আতিশয্যব্যঞ্জক, হাস্যরসোজ্জ্বল সংস্কারমূলক ব্যাঙ্গাত্মক নাটক হিসেবে। অর্থাৎ এককথায় প্রহসন হলো সমাজের ত্রুটি নির্দেশক ব্যাঙ্গাত্মক নাটক। মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'একেই কি বলে সভ্যতা' (১৮৬০), 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' (১৮৬০), দীনবন্ধু মিত্রের 'সধবার একাদশী' (১৮৬৬), 'বিয়ে পাগলা বুড়ো' (১৮৬৬), 'জামাই বারিক' (১৯২৯); গিরিশচন্দ্র ঘোষের 'বড় দিনের বকশিস' (১৮৯৪); মীর মশাররফ হোসেনের 'এর উপায় কি?' (১৮৭৬), 'ভাই ভাই এইতো চাই' (১৮৯৯), 'ফাঁস কাগজ' (১৮৯৯) প্রভৃতি বাংলা সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য প্রহসন।

২৪. 'মেঘনাদবধ' মহাকাব্যের রচয়িতা কে? এ মহাকাব্য সম্পর্কে আপনি আর কি জানেন?
উত্তর : 'মেঘনাদবধ' কাব্যের রচয়িতা মাইকেল মধুসূদন দত্ত। 'মেঘনাদবধ' মহাকাব্যের কাহিনী সংস্কৃত মহাকাব্য রামায়ণ থেকে গৃহীত হয়েছে। রাবণ, মেঘনাদ, লক্ষ্মণ, রাম, প্রমীলা, বিভীষণ, সীতা এ মহাকাব্যের প্রধান চরিত্র। বাংলা সাহিত্যের একমাত্র সার্থক এ মহাকাব্য ১৮৬১ সালে প্রকাশিত হয়।

২৫. মাইকেল মধুসূদন দত্তের প্রহসনদ্বয়ের পরিচয় দিন।
উত্তর : মাইকেল মধুসূদন দত্তের রচিত প্রহসন 'একেই কি বলে সভ্যতা' (১৮৫৯), 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' (১৮৫৯)। 'একেই কি বলে সভ্যতা' প্রহসনে তৎকালীন নব্যবঙ্গীয় সম্প্রদায়ের সুরা পান এবং ইংরেজ অনুকরণের প্রতি ব্যঙ্গ করা হয়েছে।

২৬. বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক ট্র্যাজেডি নাটকের পরিচয় দিন।
উত্তর : বাংলা সাহিত্যের প্রথম এবং সার্থক ট্র্যাজেডি নাটক হলো মাইকেল মধুসূদন দত্ত রচিত 'কৃষ্ণকুমারী'। নাটকটি ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দে রচিত হয়, ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয় এবং ১৮৬৭ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে 'শোভাবাজার থিয়েটার'-এ প্রথম অভিনীত হয়। উল্লেখ্য, কৃষ্ণকুমারী তার সর্বশেষ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ নাটক।

২৭. 'তিলোত্তমাসম্ভব' কাব্যটি কার রচিত?
উত্তর : মহাভারতের সুন্দ ও উপসুন্দ কাহিনী অবলম্বন করে মাইকেল মধুসূদন দত্ত রচিত কাহিনীর নাম 'তিলোত্তমা সম্ভব' (১৮৬০) কাব্য। এটি তার প্রথম কাব্যগ্রন্থ এবং বাংলা সাহিত্যে অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত প্রথম প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ।

২৮. অমিত্রাক্ষর ছন্দ বলতে কোন ধরনের ছন্দকে বোঝায়? এর বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করুন।
উত্তর : 'অমিত্রাক্ষর ছন্দ' হলো অন্ত্যমিলনহীন এবং যতির বাধাধরা নিয়ম লঙ্ঘনকারী ছন্দবিশেষ। এর ইংরেজি পরিভাষা Blank verse। অমিত্রাক্ষর ছন্দে ভাবের প্রবহমানতা নেই এবং ১৪ মাত্রার চরণ থাকে এবং চরণ শেষে অন্ত্যমিল থাকে না। উল্লেখ্য, কবি মাইকেল মধুসূদন দত্তকে (১৮২৪-১৮৭৩ খ্রি) বাংলা সাহিত্যে অমিত্রাক্ষর ছন্দের সার্থক প্রবর্তক বলা হয়। তার 'মেঘনাদবধ' ও 'বীরাঙ্গনা' কাব্যের আদ্যোপান্ত অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



**২৯. মাইকেল মধুসূদন দত্তের দেশপ্রেমের প্রবল প্রকাশ ঘটেছে সাহিত্যের কোন ক্ষেত্রে?**

উত্তর : মাইকেল মধুসূদন দত্তের প্রবল দেশপ্রেমের প্রকাশ ঘটেছে সনেটে। এর বাংলা অর্থ 'চতুর্দশপদী কবিতা'। এর প্রতি পঙ্‌ক্তিতে চৌদ্দ বা আঠার অক্ষরযুক্ত চৌদ্দ পঙ্‌ক্তির নির্দিষ্ট কলেবরে কবি হৃদয়ের দেশপ্রেম প্রবলরূপে এক বিশিষ্ট ছন্দরীতিতে রূপায়িত হয়ে উঠেছে। তিনিই বাংলা সাহিত্যে সনেটের প্রবর্তক।

**৩০. মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'মেঘনাদবধ' কি ধরনের রচনা?**

উত্তর : ১৮৫৭ খ্রিষ্টাব্দে সংঘটিত সিপাহি বিপ্লবের স্বাধীনতামন্ত্রে উজ্জীবিত হয়ে মাইকেল মধুসূদন রাবণকে নায়ক ও রামকে খলনায়ক করে রচনা করেন মহাকাব্য 'মেঘনাদবধ'। এটি একটি স্বাধীনতাভিলাষী কাব্য। সংস্কৃত মহাকাব্য 'রামায়ণ'-এর ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ কাহিনী অবলম্বনে 'মেঘনাদবধ' মহাকাব্য রচিত।

**৩১. বাংলা সাহিত্যে মধুসূদন কোন কোন শিল্পাঙ্গিক নিয়ে কাজ করেছেন? এগুলোর একটি প্রসঙ্গে লিখুন।**

উত্তর : বাংলা সাহিত্যে মধুসূদন কাজ করেছেন– মহাকাব্য, কাব্য, নাটক, প্রহসন, পত্রকাব্য, গীতিকাব্য, চতুর্দশপদী কবিতা ইত্যাদি শিল্পাঙ্গিক নিয়ে।

চতুর্দশপদী কবিতা : 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী' নামে সনেট জাতীয় কবিতা রচনার মাধ্যমে মধুসূদন বাংলা কাব্যে একটি নতুন শাখার সৃষ্টি করেন। একটি সনেটে ১৪টি পঙ্‌ক্তি থাকে, প্রথম ৮টিকে বলা হয় অষ্টক এবং শেষ ৬টিকে বলা হয় ষটক্। একটি সনেটে একটি মাত্র ভাবের বাহন। মাইকেল মধুসূদন মোট ১০২টি সনেট রচনা করেন, যা 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী' গ্রন্থে প্রকাশিত হয়।

**৩২. মাইকেল মধুসূদনের ৫টি শিল্পাঙ্গিকের ১টি করে উদাহরণ দিন।**

উত্তর :

১. নাটক— পদ্মাবতী;
২. মহাকাব্য— মেঘনাদবধ;
৩. সনেট— চতুর্দশপদী কবিতাবলী;
৪. প্রহসন— একেই কি বলে সভ্যতা;
৫. পত্রকাব্য— বীরাঙ্গনা কাব্য।

**৩৪. বাংলা কবিতার ছন্দ কত প্রকার ও কি কি?**

উত্তর : বাংলা কবিতার ছন্দ তিন প্রকার। যথা : ১. অক্ষরবৃত্ত, ২. মাত্রাবৃত্ত, ৩. স্বরবৃত্ত।

১. **অক্ষরবৃত্ত ছন্দ :** যে ছন্দের পর্বে শব্দের আদি ও মধ্যবর্তী যুগ্মধ্বনি সংকুচিত ও একমাত্রার এবং শব্দের অন্তঃস্থিত যুগ্মধ্বনি সম্প্রসারিত ও দুইমাত্রা হয় তাকে অক্ষরবৃত্ত ছন্দ বলে। এ ছন্দের মূলপর্ব আট বা দশ মাত্রার হয়। এই ছন্দ সুর প্রধান।

২. **মাত্রাবৃত্ত ছন্দ :** যে ছন্দে যুগ্মধ্বনি সর্বদা বিশ্লিষ্ট ভঙ্গিতে উচ্চারিত হয়ে দু'মাত্রার মর্যাদা পায় এবং অযুগ্মধ্বনি একমাত্রার বলে গণনা করা হয় তাকে মাত্রাবৃত্ত ছন্দ বলে। মাত্রাবৃত্ত ছন্দ ধ্বনি-প্রধান। এ ছন্দে ছয় মাত্রার পর্বই অধিক। চার, পাঁচ, সাত, আট মাত্রার পর্বও এ ছন্দে পাওয়া যায়।

৩. **স্বরবৃত্ত ছন্দ :** স্বরধ্বনির সংখ্যার উপর পর্বের মাত্রা-সংখ্যা নির্ভরশীল যে ছন্দের, তার নাম স্বরবৃত্ত ছন্দ। এ ছন্দে সাধারণত প্রতি পর্বে চারটি অক্ষর থাকে। এর লয় হবে দ্রুত।



## মীর মশাররফ হোসেন (১৮৪৭-১৯১২)

জন্ম : ১৩ নভেম্বর ১৮৪৭।

জন্মস্থান : অবিভক্ত নদীয়া (বর্তমানে বাংলাদেশের কুষ্টিয়া) জেলার কুমারখালী থানার অন্তর্গত গড়াই নদীর তীরবর্তী লাহিনীপাড়া গ্রাম।

পিতা : মীর মোয়াজ্জেম হোসেন; মাতা : দৌলতননেসা।

প্রথম উপন্যাস : রত্নাবতী (১৮৬৯)।

জীবনাবসান : ১৯ নভেম্বর, ১৯১২।

'বিষাদ সিন্ধুর' হিন্দি সংস্করণ : কবীন্দ্র বেণীপ্রসাদ বাজপেয়ী অনূদিত ১৯৩০ সালে 'বিষাদ সিন্ধু'র হিন্দি সংস্করণ প্রকাশিত হয়।

### গ্রন্থপঞ্জি

| গ্রন্থের নাম | গ্রন্থের প্রকৃতি | প্রকাশকাল |
|---|---|---|
| ১. রত্নবতী | উপন্যাস | ২ সেপ্টেম্বর ১৮৬৯ |
| ২. গোরাই-ব্রিজ অথবা গৌরী-সেতু | কাব্য | ২০ জানুয়ারি ১৮৭৩ |
| ৩. বসন্তকুমারী | নাটক | ২ ফেব্রুয়ারি ১৮৭৩ |
| ৪. জমিদার দর্পণ | নাটক | ১ মে ১৮৭৩ |
| ৫. এর উপায় কি? | প্রহসন | ১৮৭৩ |
| ৬. বিষাদ সিন্ধু | উপন্যাস | ১৮৯১ |
| ৭. সঙ্গীত-লহরী | সঙ্গীত সঙ্কলন | ৪ আগস্ট ১৮৮৭ |
| ৮. গো-জীবন | প্রবন্ধ | ৮ মার্চ ১৮৮৯ |
| ৯. বেহুলা গীতাভিনয় | নাটক | ২৩ জুন ১৮৮৯ |
| ১০. টালা অভিনয় | | ১৮৯৭ |
| ১১. তহমিনা | | ১৮৯৭ |
| ১২. নিয়তি কি অবনতি | | ১৮৯৯ |
| ১৩. উদাসীন পথিকের মনের কথা | আত্মজৈবিক উপন্যাস | ২৯ আগস্ট ১৮৯০ |
| ১৪. মৌলুদ শরীফ | ধর্মগ্রন্থ | ১৯০৩ |
| ১৫. গাজী মিয়ার বস্তানী | নকশাধর্মী উপাখ্যান | ৩০ জুন ১৮৯৯ |
| ১৬. মুসলমানের বাঙ্গলা শিক্ষা (প্রথম, দ্বিতীয়) | শিশু শিক্ষার পাঠ্যগ্রন্থ | ১৯০৮ |
| ১৭. বিবি খোদেজার বিবাহ | কাব্য | ২৫ মে ১৯০৫ |
| ১৮. হযরত ওমরের ধর্মজীবন লাভ | কাব্য | ১১ আগস্ট ১৯০৫ |
| ১৯. হযরত বেলালের জীবনী | কাব্য | ২৫ সেপ্টেম্বর ১৯০৫ |
| ২০. হযরত আমীর হামযার ধর্মজীবন লাভ | কাব্য | ১০ নভেম্বর ১৯০৫ |
| ২১. মদিনার গৌরব | কাব্য | ১৫ ডিসেম্বর ১৯০৬ |
| ২২. মোসলেম বীরত্ব | কাব্য | ২০ জুলাই ১৯০৭ |
| ২৩. এসলামের জয় | ইতিহাস | ৪ আগস্ট ১৯০৮ |

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



| গ্রন্থের নাম | গ্রন্থের প্রকৃতি | প্রকাশকাল |
|---|---|---|
| ২১. আমার জীবনী | আত্মচরিত | ১৯০৮-১৯১০ |
| ২২. বাজীমাৎ | কাব্য | ১ ডিসেম্বর ১৯০৮ |
| ২৩. ঈদের খোতবা | পদ্যানুবাদ | ১২ জুলাই ১৯০৯ |
| ২৪. বিবি কুলসুম | জীবনী | ৯ মে ১৯১০ |
| ২৫. উপদেশ | পদ্যানুবাদ | ডিসেম্বর ১৯১৫ |

– 'বিষাদ সিন্ধু' তিন পর্বের উপন্যাস। মহরম পর্ব প্রকাশিত হয় ১ মে ১৮৮৫। এর পৃষ্ঠা সংখ্যা ২০৪। উদ্ধার পর্ব ১৪ আগস্ট ১৮৮৭ সালে প্রকাশিত হয়। এজিদ-বধ পর্বের প্রকাশকাল ১০ মার্চ ১৮৯০। তিন পর্ব একত্রে 'বিষাদ সিন্ধু' নামে ১৮৯১ সালে প্রকাশিত হয়। 'আমার জীবনী' আত্মচরিতটি ১২ খণ্ডে বিভক্ত।

### সম্পাদিত পত্র-পত্রিকা

| পত্রিকার নাম | প্রকাশকাল | পত্রিকার প্রকৃতি |
|---|---|---|
| ১. আজীজন্নেহার | ১৮৭৪ | মাসিক পত্রিকা |
| ২. হিতকরী | ১৮৯০ | সাপ্তাহিক/পাক্ষিক পত্রিকা |
| ৩. হুগলী বোধোদয় | – | – |

**মডেল প্রশ্ন**

১. **মীর মশাররফ হোসেনের জন্ম ও মৃত্যুর তারিখ উল্লেখ করুন।**
উত্তর : জন্ম ১৩ নভেম্বর ১৮৪৭ ও মৃত্যু ১৯ নভেম্বর ১৯১২।

২. **বাংলা সাহিত্যে 'গাজী মিয়া' কে?**
উত্তর : মীর মশাররফ হোসেন।

৩. **'রত্নবতী' উপন্যাসটির রচয়িতা কে? কত সালে প্রকাশিত?**
উত্তর : মীর মশাররফ হোসেন; ১৮৬৯ সালে প্রকাশিত।

৪. **'বিষাদ সিন্ধু' গ্রন্থটির রচয়িতা কে? কোন শ্রেণীর রচনা?**
উত্তর : মীর মশাররফ হোসেন; উপন্যাস।

৫. **'বিষাদসিন্ধু' কত খণ্ডে রচিত? কত সালে প্রকাশিত?**
উত্তর : তিন খণ্ডে। ১৮৮৫-১৮৯০ সালে প্রকাশিত হয়।

৬. **'বিষাদসিন্ধু' উপন্যাসের বিষয়বস্তু কি?**
উত্তর : কারবালার মর্মান্তিক ঘটনা।

৭. **'জমিদার দর্পণ' নাটকটি কার রচনা? কত সালে প্রকাশিত হয়?**
উত্তর : মীর মশাররফ হোসেন; ১৮৭৩ সালে প্রকাশিত হয়।

৮. **'রত্নবতী' ও 'বসন্তকুমারী' নাটকের রচয়িতা কে?**
উত্তর : মীর মশাররফ হোসেন।

৯. **'জমিদার দর্পণ' কোন শ্রেণীর রচনা?**
উত্তর : নাটক।



১০. **'এর উপায় কি' ও 'ভাই ভাই এইতো চাই' গ্রন্থদ্বয়ের রচয়িতা কে? কোন শ্রেণীর রচনা?**
উত্তর : মীর মশাররফ হোসেন; প্রহসন।

১১. **মীর মশাররফ হোসেনের প্রবন্ধগুলোর নাম লিখুন।**
উত্তর : গো-জীবন, আমার জীবনী, বিবি কুলসুম।

১২. **'বিবি কুলসুম' কোন শ্রেণীর রচনা?**
উত্তর : প্রবন্ধগ্রন্থ।

১৩. **মীর মশাররফ হোসেনের 'গোজীবন' কোন ধরনের রচনা।**
উত্তর : প্রবন্ধগ্রন্থ।

১৪. **'আমার জীবনী' গ্রন্থের রচয়িতা কে?**
উত্তর : মীর মশাররফ হোসেন।

১৫. **বাংলা সাহিত্যের প্রথম মুসলিম ঔপন্যাসিকের নাম ও পরিচয় উল্লেখ করুন?**
উত্তর : বাংলা সাহিত্যের প্রথম মুসলিম ঔপন্যাসিক মীর মশাররফ হোসেনের জন্ম কুষ্টিয়ার লাহিনীপাড়া গ্রামে ১৩ নভেম্বর ১৮৪৭ খ্রিষ্টাব্দে। তিনি ঔপন্যাসিক, নাট্যকার ও প্রাবন্ধিক। তিনি ১৮৬৯ সালে 'রত্নবতী' উপন্যাসটি রচনা করেন, যা বাংলা সাহিত্যে মুসলিম রচিত প্রথম উপন্যাস। তার বিখ্যাত উপন্যাস 'বিষাদ-সিন্ধু' (১৮৮৫-১৮৯০)।

১৬. **মীর মশাররফ হোসেনের অমর গ্রন্থ বিষাদসিন্ধু সম্পর্কে ধারণা দিন।**
উত্তর : ইতিহাস আশ্রিত উপন্যাস 'বিষাদ-সিন্ধু' ৩ খণ্ডে রচিত। ইমাম হাসান ও হোসেনের সঙ্গে দামেস্ক অধিপতি মাবিয়ার একমাত্র পুত্র এজিদের কারবালা প্রান্তরের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ এবং ইমাম হাসান-হোসেনের করুণ মৃত্যু এ উপন্যাসের মূল উপজীব্য।

১৭. **'বিষাদ সিন্ধু' গ্রন্থ নামের তাৎপর্য বুঝিয়ে দিন।**
উত্তর : মুসলিম ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির এক বিষাদময় কাহিনী অবলম্বনে মীর মশাররফ হোসেন রচনা করেছেন 'বিষাদসিন্ধু' নামক উপন্যাস জাতীয় গ্রন্থটি। এ গ্রন্থে হযরত মুহম্মদ (স)-এর দৌহিত্র ইমাম হাসানকে হত্যা করা হয় বিষপ্রয়োগে আর ইমাম হোসেনসহ অনেক নিকটাত্মীয়দের নির্মমভাবে হত্যা করা হয় কারবালা প্রান্তরে। এ কারণে গ্রন্থটি হয়ে উঠেছে বিষাদের সিন্ধু বা সাগর। বিষাদময় কাহিনীর ব্যাপকতার জন্যই গ্রন্থটির নামকরণ হয়েছে 'বিষাদ-সিন্ধু'।

১৮. **মীর মশাররফ হোসেনের সাহিত্যজীবনের প্রথম দিকের রচনাগুলো কোন পত্রিকায় প্রকাশিত হতো? এর সম্পাদক কে ছিলেন?**
উত্তর : মীর মশাররফ হোসেনের সাহিত্য জীবনের প্রথম দিকের রচনাগুলো প্রকাশিত হতো 'গ্রামবার্তা প্রকাশিকা' ও 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকায়। পত্রিকা দুটোর সম্পাদক ছিলেন–কাঙাল হরিনাথ ও ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত।

১৯. **মীর মশাররফ হোসেনের পরিচয় দিন। সাহিত্যে তার অবদান উল্লেখ করুন।**
উত্তর : মীর মশাররফ হোসেনের জন্ম কুষ্টিয়ার লাহিনীপাড়ায়। তিনি ছিলেন একাধারে ঔপন্যাসিক, নাট্যকার ও প্রাবন্ধিক। বঙ্কিমযুগের অন্যতম প্রধান গদ্যশিল্পী ও উনিশ শতকের বাঙালি মুসলমান সাহিত্যিকদের পৃথিকৃৎ ছিলেন তিনি। তাঁর রচিত প্রথম উপন্যাস 'রত্নবতী'। তার উল্লেখযোগ্য রচনা হচ্ছে 'গোরাই-ব্রিজ', 'বসন্তকুমারী', 'জমিদার দর্পণ', 'এর উপায় কি',

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



'বিষাদ-সিন্ধু', 'গো-জীবন', 'উদাসীন পথিকের মনের কথা', 'গাজী মিয়াঁর বস্তানী', 'আমার জীবনী', 'আমার জীবনীর জীবনী বিবি কুলসুম' ইত্যাদি। এর মধ্যে 'বিষাদ-সিন্ধু' তার অমর কীর্তি। বাংলার মুসলমান সমাজের দীর্ঘ অর্ধ-শতাব্দীর জড়তা দূর করে আধুনিক ধারায় ও রীতিতে সাহিত্য চর্চার সূত্রপাত ঘটে তাঁর শিল্পকর্মের মাধ্যমেই।

**২০. মীর মশাররফ হোসেন-এর দুটি আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থের নাম লিখুন।**

**উত্তর :** মীর মশাররফ হোসেনের দুটি আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ হচ্ছে– ১. আমার জীবনী; ২. বিবি কুলসুম।

**২১. 'উদাসীন পথিকের মনের কথা' কার লেখা এবং কি ধরনের রচনা?**

**উত্তর :** 'উদাসীন পথিকের মনের কথা' রচয়িতা মীর মশাররফ হোসেন। এটি একটি উপন্যাস, যার প্রকৃতি হচ্ছে ইতিহাস-আশ্রিত উপাখ্যানধর্মী। এটি প্রকাশ হয় ২৯ আগস্ট ১৮৯০। 'উদাসীন পথিক' এই ছদ্মনামে মশাররফ হোসেন ব্যক্তিগত জীবনের পটভূমিতে স্বীয় পারিবারিক ইতিহাস ও সমসাময়িক বাস্তব ঘটনার চিত্র তুলে ধরেছেন এ গ্রন্থে। প্রকৃতপক্ষে এটিকে উপন্যাস কিংবা আত্মজীবনীমূলক রচনা এর কোনোটাই বলা যায় না বরং বলতে হয় গ্রন্থটি লেখকের আত্মজীবনী-নির্ভর কতিপয় বাস্তব ও কাল্পনিক ঘটনার মিশেলে উপন্যাসসুলভ সাহিত্যিক উপস্থাপনা।

## রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১)

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাংলা সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি এবং বিশ্বের প্রথম শ্রেণীর কবি-সাহিত্যিকদের মধ্যে অন্যতম। তিনি একই সঙ্গে কবি, ঔপন্যাসিক, গল্পকার, প্রবন্ধকার, শিক্ষাবিদ, ভাষাবিদ, নাট্যকার, গীতিকার, সুরকার, গায়ক,

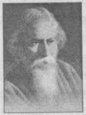

অভিনেতা, নাট্যপ্রযোজক, চিত্রশিল্পী ও দার্শনিক ছিলেন। আদর্শবাদী ও মানবতাবাদী এই মহাপুরুষ মানবকল্যাণ ও সুন্দরের অন্বেষায় আজীবন সাধনা করে গেছেন।

**জন্ম :** ৭ মে ১৮৬১ (২৫ বৈশাখ, ১২৬৮) কলকাতার জোড়াসাঁকোর সম্ভ্রান্ত ঠাকুর পরিবারে।

**পিতা ও মাতা :** মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং সারদা দেবী।

**জন্মক্রম :** বাব-মার চতুর্দশতম সন্তান এবং অষ্টম পুত্র।

**শিক্ষা :** বিভিন্ন শিক্ষকদের তত্ত্বাবধানে স্বগৃহে প্রাথমিক শিক্ষার হাতেখড়ি। এরপর কলকাতার ওরিয়েন্টাল সেমিনারি, নর্মাল স্কুল, বেঙ্গল একাডেমী ও সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুলে পড়লেও কোথাও মন বসেনি। শেষ পর্যন্ত আবার বাড়িতেই পড়াশোনার ব্যবস্থা। ১৮৭৮ সালে মেজভাই সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে প্রথমে ইংল্যান্ড গমন। সেখানে কিছুদিন ব্রাইটনে এবং পরে লন্ডনের ইউনিভার্সিটি কলেজে মাস তিনেক ইংরেজি সাহিত্য পাঠ। কিন্তু দেড় বছর পর পিতার নির্দেশে শিক্ষা অসম্পন্ন রেখে স্বদেশে ফিরে আসেন (১৮৮০)। দ্বিতীয়বার ইংল্যান্ড যাত্রা করেন ব্যারিস্টারি পড়ার উদ্দেশ্যে (১৮৮১)। কিন্তু শিক্ষা সমাপ্ত করেননি।

**লেখালেখির সূচনা :** আট বছর বয়সে কবিতা রচনার সূত্রপাত। তেরো বছর বয়সে প্রথম কবিতা প্রকাশিত হয় 'অমৃতবাজার' নামে একটি দ্বিভাষিক পত্রিকায় (১৮৭৪)। কবিতাটির নাম 'হিন্দুমেলার উপহার'।

**বিবাহ :** যশোরের ভবতারিণী দেবীর সাথে; ১৮৮৩ সালের ৯ ডিসেম্বর। পরে শ্বশুরবাড়িতে তার নাম বদলে রাখা হয় মৃণালিনী দেবী।

**শান্তিনিকেতন :** রবীন্দ্রনাথের পিতা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর বীরভূম জেলার বোলপুরে শান্ত-নির্জন স্থানে ২০ বিঘা জমি ক্রয় করে সেখানে একটি একতলা বাড়ি নির্মাণ করে এর নাম দেন শান্তিনিকেতন। রবীন্দ্রনাথ সেখানে ১৯০১ সাল থেকে পাকাপাকিভাবে বসবাস শুরু করেন। সেখানে তিনি 'ব্রহ্মচর্যাশ্রম' নামে একটি আবাসিক বিদ্যালয় স্থাপন করেন (১৯০১)। পরবর্তীকালে এটাই বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপ পায় এবং শিল্প-সংস্কৃতির পীঠস্থানে পরিণত হয় (১৯২১)।



**রাজনীতি ও সমাজকল্যাণ :** উনিশ শতকের শেষাংশ ও বিশ শতকের শুরুর দিকে বেশ ক'বছর রবীন্দ্রনাথ সক্রিয়ভাবে রাজনীতি ও সমাজকল্যাণমূলক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করেন। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ হলে রবীন্দ্রনাথ এর বিরুদ্ধে সভা-সমিতিতে বক্তৃতা, প্রবন্ধ ও দেশাত্মবোধক সঙ্গীত রচনা করেন। শিলাইদহে অবস্থানকালে তিনি দরিদ্র কৃষক ও শ্রমজীবীদের কল্যাণে বহুমুখী উদ্যোগ গ্রহণ করেন। ১৯১৭ সালে ভারতে ব্রিটিশ শাসকদের দমননীতির বিরুদ্ধে তিনি নানাভাবে প্রতিবাদ ও ক্ষোভ প্রকাশ করেন। জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে ব্রিটিশদের প্রদত্ত 'স্যার' উপাধি বর্জন করেন (১৯১৯)। এছাড়া তিনি হিন্দু-মুসলিম সংকট, ভারতীয় রাজনীতি ও সমাজনীতি, বিশ্ব পরিস্থিতি ইত্যাদি বিষয়ে বহুবিধ রচনা লিখে সমাজ সচেতনতার পরিচয় দেন।

**নোবেল পুরস্কার :** ১৯১২ সালে তার গীতাঞ্জলি কাব্যের ইংরেজি অনুবাদ (Song Offerings) প্রকাশিত হলে ইউরোপ-আমেরিকায় ব্যাপক প্রশংসিত হয়। কবিপ্রতিভা বিশ্বস্বীকৃতি অর্জন করেন ১৯১৩ সালে নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির মাধ্যমে।

**গ্রন্থসংখ্যা :** রবীন্দ্রনাথ তাঁর আশি বছরের জীবনে আমৃত্যু রচনা করেছেন বহু কবিতা, গল্প, উপন্যাস, নাটক, ভ্রমণ, কাহিনী, প্রবন্ধ, সঙ্গীত, পত্রাবলীসহ অজস্র গ্রন্থ। রবীন্দ্রনাথের বিশাল সাহিত্যভাণ্ডারের মধ্যে রয়েছে ৫৬টি কাব্যগ্রন্থ, ৪টি গীতিপুস্তক, ১১৯টি ছোটগল্প, ১২টি উপন্যাস, ৯টি ভ্রমণকাহিনী, ২৯টি নাটক, ১৯টি কাব্যনাট্য, ১৩টি চিঠিপত্রের বই। আর তাঁর রচিত গানের সংখ্যা ২২৩২টি। এছাড়া তার অঙ্কিত চিত্রাবলীর সংখ্যা প্রায় দুহাজার।

**মৃত্যু :** ১৯৪১ সালের ৭ আগস্ট (২২ শ্রাবণ, ১৩৪৮)।

## সাহিত্যকর্ম

রবীন্দ্রনাথের উল্লেখযোগ্য সাহিত্যকর্মের পরিচয় নিচে উল্লেখ করা হলো :

কাব্য

| শিরোনাম | প্রকাশকাল |
|---|---|
| ১. কবিকাহিনী | ১৮৭৮ |
| ২. বনফুল | ১৮৮০ |
| ৩. সন্ধ্যাসঙ্গীত | ১৮৮২ |
| ৪. প্রভাতসঙ্গীত | ১৮৮৩ |
| ৫. কড়ি ও কোমল | ১৮৮৬ |
| ৬. মানসী | ১৮৯০ |
| ৭. সোনার তরী | ১৮৯৪ |
| ৮. চিত্রা | ১৮৯৬ |
| ৯. কল্পনা | ১৯০০ |
| ১০. ক্ষণিকা | ১৯০০ |
| ১১. গীতাঞ্জলি | ১৯১০ |

| শিরোনাম | প্রকাশকাল |
|---|---|
| ১২. চৈতালী | ১৯১২ |
| ১৩. বলাকা | ১৯১৫ |
| ১৪. পূরবী | ১৯২৫ |
| ১৫. পুনশ্চ | ১৯৩৬ |
| ১৬. প্রান্তিক | ১৯৩৮ |
| ১৭. সেঁজুতি | ১৯৩৮ |
| ১৮. নবজাতক | ১৯৪০ |
| ১৯. সানাই | ১৯৪০ |
| ২০. রোগশয্যায় | ১৯৪১ |
| ২১. আরোগ্য | ১৯৪১ |
| ২২. জন্মদিনে | ১৯৪১ |
| ২৩. শেষ লেখা | ১৯৪১ |

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



- রবীন্দ্রনাথের প্রথম প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ 'কবিকাহিনী' (১৮৭৮)।
- রবীন্দ্রনাথের দ্বিতীয় প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ 'বনফুল'(১৮৮০)।
- প্রথম জীবনে রবীন্দ্রনাথের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য কবিতা 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ'।
- 'গীতাঞ্জলি' কাব্যগ্রন্থে মোট ১৫৭টি কবিতা ও গান আছে।
- রবীন্দ্রনাথের 'তীর্থযাত্রী' কবিতাটি T.S. Eliot-এর 'The Journey of the Magi'-এর অনুবাদ।
- রবীন্দ্রনাথের প্রথম স্বাক্ষরযুক্ত প্রকাশিত কবিতা 'হিন্দুমেলার উপহার' (১৮৭৫)।

## উপন্যাস

| শিরোনাম | প্রকাশকাল | শিরোনাম | প্রকাশকাল |
|---|---|---|---|
| ১. বৌঠাকুরাণীর হাট | ১৮৮৩ | ৭. ঘরে-বাইরে | ১৯১৬ |
| ২. রাজর্ষি | ১৮৮৭ | ৮. যোগাযোগ | ১৯২৯ |
| ৩. চোখের বালি (মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস) | ১৯০৩ | ৯. শেষের কবিতা | ১৯২৯ |
| ৪. নৌকাডুবি | ১৯০৬ | ১০. দুই বোন | ১৯৩৩ |
| ৫. গোরা | ১৯১০ | ১১. মালঞ্চ | ১৯৩৩ |
| ৬. চতুরঙ্গ | ১৯১৬ | ১২. চার-অধ্যায় | ১৯৩৪ |

- রবীন্দ্রনাথের লেখা প্রথম উপন্যাস 'করুণা' যা মাসিক ভারতী পত্রিকায় এক বছর ধরে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয় (১৮৭৭-৭৮)।
- গ্রন্থাকারে প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের প্রথম উপন্যাস 'বৌঠাকুরাণীর হাট' (১৮৮৩)।
- বাংলা সাহিত্যের প্রথম মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস 'চোখের বালি'।

## প্রবন্ধ

| শিরোনাম | প্রকাশকাল | শিরোনাম | প্রকাশকাল |
|---|---|---|---|
| ১. বিবিধ প্রসঙ্গ | ১৮৮৩ | ১১. শিক্ষা | ১৯০৮ |
| ২. আত্মশক্তি | ১৯০৫ | ১২. শব্দতত্ত্ব | ১৯০৯ |
| ৩. ভারতবর্ষ | ১৯০৬ | ১৩. সংকলন | ১৯২৫ |
| ৪. সাহিত্য | ১৯০৭ | ১৪. মানুষের ধর্ম | ১৯৩৩ |
| ৫. বিচিত্র প্রবন্ধ | ১৯০৭ | ১৫. সাহিত্যের পথে | ১৯৩৬ |
| ৬. আধুনিক সাহিত্য | ১৯০৭ | ১৬. ছন্দ | ১৯৩৬ |
| ৭. প্রাচীন সাহিত্য | ১৯০৭ | ১৭. কালান্তর | ১৯৩৭ |
| ৮. লোকসাহিত্য | ১৯০৭ | ১৮. বাংলা-ভাষা-পরিচয় | ১৯৩৮ |
| ৯. স্বদেশ | ১৯০৮ | ১৯ সভ্যতার সংকট | ১৯৪১ |
| ১০. সমাজ | ১৯০৮ | | |

- রবীন্দ্রনাথের প্রথম প্রকাশিত প্রবন্ধগ্রন্থ 'বিবিধপ্রসঙ্গ' (১৮৮৩)।



## ছোটগল্প

| শিরোনাম | প্রকৃতি | প্রকাশকাল |
|---|---|---|
| ১. ভিখারিণী | ছোটগল্প | ১৮৭৪ |
| ২. গল্পগুচ্ছ প্রথম খণ্ড | ছোটগল্প গ্রন্থ | ১৯০০ |
| ৩. গল্পগুচ্ছ দ্বিতীয় খণ্ড | ছোটগল্প গ্রন্থ | ১৯২৬ |
| ৪. গল্পগুচ্ছ তৃতীয় খণ্ড | ছোটগল্প গ্রন্থ | ১৯২৭ |
| ৫. গল্পগুচ্ছ চতুর্থ খণ্ড | ছোটগল্প গ্রন্থ | - |
| ৬. গল্পসল্প | ছোটগল্প গ্রন্থ | ১৯৪১ |
| ৭. তিন সঙ্গী | ছোটগল্প গ্রন্থ | ১৯৪১ |
| ৮. ঘাটের কথা | ছোটগল্প | ১৮৮৪ |
| ৯. রাজপথের কথা | ছোটগল্প | ১৮৮৪ |
| ১০. মুকুট | ছোটগল্প | ১৮৮৫ |
| ১১. দেনা পাওনা (প্রথম সার্থক ছোটগল্প) | ছোটগল্প | ১৮৯০ |
| ১২. একরাত্রি | ছোটগল্প | – |
| ১৩. মহামায়া | ছোটগল্প | – |
| ১৪. সমাপ্তি | ছোটগল্প | – |
| ১৫. মাল্যদান | ছোটগল্প | – |
| ১৬. মধ্যবর্তিনী | ছোটগল্প | – |
| ১৭. শাস্তি | ছোটগল্প | – |
| ১৮. প্রায়শ্চিত্ত | ছোটগল্প | – |
| ১৯. মানভঞ্জন | ছোটগল্প | – |
| ২০. দুরাশা | ছোটগল্প | – |
| ২১. অধ্যাপক | ছোটগল্প | – |
| ২২. নষ্টনীড় | ছোটগল্প | – |
| ২৩. স্ত্রীর পত্র | ছোটগল্প | – |
| ২৪. রবিবার | ছোটগল্প | – |
| ২৫. শেষকথা | ছোটগল্প | – |
| ২৬. ল্যাবরেটরী | ছোটগল্প | – |
| ২৭. ব্যবধান | ছোটগল্প | – |
| ২৮. মেঘ ও রৌদ্র | ছোটগল্প | – |
| ২৯. দিদি | ছোটগল্প | – |
| ৩০. কর্মফল | ছোটগল্প | – |
| ৩১. হৈমন্তী | ছোটগল্প | – |
| ৩২. ছুটি | ছোটগল্প | – |

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



| শিরোনাম | প্রকৃতি | প্রকাশকাল |
|---|---|---|
| ৩৩. পোস্টমাস্টার | ছোটগল্প | – |
| ৩৪. কাবুলিওয়ালা | ছোটগল্প | – |
| ৩৫. শুভা | ছোটগল্প | – |
| ৩৬. অতিথি | ছোটগল্প | – |
| ৩৭. আপদ | ছোটগল্প | – |
| ৩৮. গুপ্তধন (অতি প্রাকৃত) | ছোটগল্প | – |
| ৩৯. জীবিত ও মৃত (অতি প্রাকৃত) | ছোটগল্প | – |
| ৪০. নিশীথে (অতি প্রাকৃত) | ছোটগল্প | – |
| ৪১. মণিহারা (অতি প্রাকৃত) | ছোটগল্প | – |
| ৪২. ক্ষুধিত পাষাণ (অতি প্রাকৃত) | ছোটগল্প | – |

- ☐ *রবীন্দ্রনাথের প্রথম প্রকাশিত ছোটগল্প 'ভিখারিনী' (১৮৭৪)।*
- ☐ *রবীন্দ্রনাথের প্রথম গল্পসংগ্রহের নাম 'ছোটগল্প' (১৮৯৩)।*
- ☐ *রবীন্দ্রনাথকে বলা হয় বাংলা ছোটগল্পের জনক।*

## ভ্রমণ কাহিনী

| শিরোনাম | প্রকৃতি | প্রকাশকাল |
|---|---|---|
| ১. রাশিয়ার চিঠি | ভ্রমণকাহিনী | ১৯১৯ |
| ২. য়ুরোপপ্রবাসীর পত্র | ভ্রমণকাহিনী | ১৮৮১ |
| ৩. জাপান যাত্রী | ভ্রমণ কাহিনী | ১৯১৯ |
| ৪. পারস্যে | ভ্রমণ কাহিনী | ১৯৩১ |

## আত্মজীবনী

| শিরোনাম | প্রকৃতি | প্রকাশকাল |
|---|---|---|
| ১. জীবনস্মৃতি | আত্মজীবনী | ১৯১২ |
| ২. ছেলেবেলা | আত্মজীবনী | ১৯৪০ |
| ৩. চরিত্রপূজা | জীবনী | ১৯০৭ |

## নাটক, গীতিনাট্য ও প্রহসন

| শিরোনাম | প্রকৃতি | প্রকাশকাল |
|---|---|---|
| ১. বাল্মীকি প্রতিভা | নাটক | ১৮৮১ |
| ২. কালমৃগয়া | গীতিনাট্য | ১৮৮২ |
| ৩. মায়ার খেলা | নাটক | ১৮৮৮ |
| ৪. চিত্রাঙ্গদা | নৃত্যনাট্য | ১৮৯২ |
| ৫. গোড়ায় গলদ | প্রহসন | ১৮৯২ |



| শিরোনাম | প্রকৃতি | প্রকাশকাল |
|---|---|---|
| ৬. বিসর্জন | নাটক | ১৮৯১ |
| ৭. প্রায়শ্চিত্ত | নাটক | ১৯০৯ |
| ৮. রাজা | নাটক | ১৯১০ |
| ৯. অচলায়তন | নাটক | ১৯১২ |
| ১০. ডাকঘর | নাটক | ১৯১২ |
| ১১. ফাল্গুনী | নাটক | ১৯১৬ |
| ১২. বসন্ত | গীতিনাট্য | ১৯২৩ |
| ১৩. রক্তকরবী | নাটক | ১৯২৪ |
| ১৪. নটীর পূজা | নৃত্যনাট্য | ১৯২৬ |
| ১৫. পরিত্রাণ | নাটক | ১৯২৯ |
| ১৬. তপতী | নাটক | ১৯২৯ |
| ১৭. চণ্ডালিকা | নৃত্যনাট্য | ১৯৩৩ |
| ১৮. বাঁশরী | নাটক | ১৯৩৩ |
| ১৯. তাসের দেশ | নৃত্যনাট্য | ১৯৩৩ |
| ২০. শ্রাবণগাথা | নৃত্যনাট্য | ১৯৩৪ |

- ☐ *রবীন্দ্রনাথের প্রথম প্রকাশিত নাটক 'বাল্মীকি প্রতিভা' (১৮৮১)।*
- ☐ *রবীন্দ্রনাথ তাঁর নিজের লেখা ১৩টি নাটকে অভিনয় করেন।*
- ☐ *রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কাজী নজরুল ইসলামকে 'বসন্ত' গীতিনাট্যটি উৎসর্গ করেন।*

**মডেল প্রশ্ন**

১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্ম ও মৃত্যুর তারিখ লিখুন।
উত্তর : জন্ম ৭ মে, ১৮৬১ সাল (২৫ বৈশাখ, ১২৬৮ বঙ্গাব্দ) ও মৃত্যু ৭ আগস্ট, ১৯৪১ সাল (২২ শ্রাবণ, ১৩৪৮ বঙ্গাব্দ)।

২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কত সালে নোবেল পুরস্কার পান?
উত্তর : ১৯১৩ সালে।

৩. শান্তিনিকেতন কত সালে এবং কোথায় প্রতিষ্ঠিত হয়?
উত্তর : ১৯০১ সালে; বোলপুরে।

৪. 'গীতাঞ্জলি' কাব্যগ্রন্থ রবীন্দ্রনাথ কার সহযোগিতায় অনুবাদ করেন?
উত্তর : W. B. Yeats-এর সহযোগিতায় অনুবাদ করেন।

৫. রবীন্দ্রনাথের প্রথম কাব্যগ্রন্থ কোনটি? কত সালে কোন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়?
উত্তর : কবি কাহিনী; ১৮৭৮ সালে 'ভারতী' পত্রিকায়।

৬. কত বছর বয়সে রবীন্দ্রনাথের প্রথম কাব্য বনফুল সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়?
উত্তর : ১৫ বছর বয়সে।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



৭. রবীন্দ্রনাথের প্রথম প্রকাশিত কবিতা কোনটি এবং কত সালে প্রকাশিত হয়?
উত্তর : হিন্দু মেলার উপহার; ১২৮১ বঙ্গাব্দে (১৮৭৪ সালে)।

৮. ভানুসিংহ ঠাকুর কার ছদ্মনাম?
উত্তর : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছদ্মনাম।

৯. 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী' কোন জাতীয় রচনা? রচয়িতা কে?
উত্তর : গীতিকাব্য সংকলন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

১০. ব্রজবুলি ভাষায় রবীন্দ্রনাথ কোন কাব্যটি রচনা করেছেন?
উত্তর : ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী।

১১. ভারত সরকার কত সালে রবীন্দ্রনাথকে 'স্যার' বা 'নাইটহুড' উপাধি দান করে?
উত্তর : ১৯১৫ সালের ৩ জুন।

১২. রবীন্দ্রনাথ বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীতটি কার গানের সুরের অনুসরণে লিখেছিলেন?
উত্তর : গগন হরকরার সুরের অনুসরণে রচনা করেন।

১৩. রবীন্দ্রনাথ সম্পাদিত পত্রিকাগুলোর নাম কি? কত সালে প্রথম প্রকাশিত হয়?
উত্তর : সাধনা, (১৮৯৪), ভারতী (১৮৯৮), বঙ্গদর্শন (১৯০১), তত্ত্ববোধিনী (১৯১১)।

১৪. কোন কবিতা প্রকাশিত হওয়ার পর বঙ্কিমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথকে জয়মাল্য উপহার করেন?
উত্তর : সন্ধ্যাসঙ্গীত। এটি ১৮৮২ সালে প্রকাশিত হয়।

১৫. ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গের প্রেক্ষিতে রবীন্দ্রনাথ কোন গানটি রচনা করেন?
উত্তর : বাংলার মাটি বাংলার জল।

১৬. রবীন্দ্রনাথকে কত সালে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় ডক্টরেট ডিগ্রি প্রদান করে?
উত্তর : ১৯৪০ সালে।

১৭. রবীন্দ্রনাথের মা ও বাবার নাম কি?
উত্তর : মা সারদা দেবী ও বাবা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

১৮. রবীন্দ্রনাথ তাঁর কোন ছড়াটিকে 'শৈশবের মেঘদূত' নামে অভিহিত করেছেন?
উত্তর : বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদে এল বান।

১৯. রবীন্দ্রনাথের মতে, তাঁর জীবনে কোনটি আদি কবির প্রথম কবিতা?
উত্তর : বিদ্যাসাগরের 'জল পড়ে পাতা নড়ে'।

২০. রাশিয়ার সাহিত্যিক ও গবেষক রবীন্দ্রনাথকে কার সঙ্গে তুলনা করেছেন?
উত্তর : লিও তলস্তয়।

২১. ঠাকুর পরিবারের আসল পদবি কি ছিল?
উত্তর : কুশারী।

২২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে কে 'গুরুদেব' সম্মানে ভূষিত করেন?
উত্তর : মহাত্মা গান্ধী।

২৩. রবীন্দ্রনাথকে প্রথম কে 'বিশ্বকবি' বলে সম্মানিত করেন?
উত্তর : ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়।



২৪. 'কবিগুরু' তোমার প্রতি চাহিয়া আমাদের বিস্ময়ের সীমা নেই'।— এটি কার উক্তি?
উত্তর : শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

২৫. 'এনেছিলে সাথে করে মৃত্যুহীন প্রাণ
মরণে তাই তুমি করে গেলে দান।— উক্তিটি কার? কার উদ্দেশ্যে উক্তিটি করেছিলেন?
উত্তর : রবীন্দ্রনাথের। চিত্তরঞ্জন দাসের উদ্দেশ্যে।

২৬. 'আমি মুগ্ধ হয়েছি তোমার কবিতা শুনে। তুমি যে বিশ্ব বিখ্যাত কবি হবে তাতে কোন সন্দেহ নেই'।— কার উদ্দেশ্যে রবীন্দ্রনাথ এ উক্তি করেছিলেন?
উত্তর : কবি কাজী নজরুল ইসলামের উদ্দেশ্যে।

২৭. 'তাহার প্রাঙ্গণে তব, আমি কবি তোমারি অতিথি'। কার উদ্দেশ্যে রবীন্দ্রনাথ এ উক্তি করেছিলেন?
উত্তর : ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের।

২৮. রবীন্দ্রনাথ কাকে বলেছিলেন, আমাদের সাহিত্য জগৎ চায় আপনার অনশন ভঙ্গ হোক'।
উত্তর : কাজী নজরুল ইসলামকে।

২৯. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে কখন এবং কে 'ভারতের মহাকবি' হিসেবে আখ্যায়িত করেন?
উত্তর : বেইজিং-এ রবীন্দ্র শতবার্ষিকী উপলক্ষে চীনা কবি চি-সি-লিজন রবীন্দ্রনাথকে 'ভারতের মহাকবি' হিসেবে আখ্যায়িত করেছিলেন।

৩০. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে কত সালে এবং কিভাবে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় ডক্টরেট ডিগ্রি প্রদান করে?
উত্তর : ১৯৪০ সালে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় শান্তিনিকেতনে একটি বিশেষ সমাবর্তনের আয়োজন করে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে 'ডক্টরেট' ডিগ্রি প্রদান করে।

৩১. রবীন্দ্রনাথ তাঁর কোন কবিতায় হরিপদ কেরানির প্রসঙ্গ এনেছেন?
উত্তর : বাঁশী।

৩২. রবীন্দ্রনাথ লন্ডনের টিউব-রেলে বেড়ানোর সময় কোন কাব্যগ্রন্থের পাণ্ডুলিপি হারিয়েছিলেন?
উত্তর : ইংরেজি গীতাঞ্জলির পাণ্ডুলিপি।

৩৩. রবীন্দ্রনাথের শেষ কবিতাটি তিনি কাকে দিয়ে লিখিয়েছিলেন?
উত্তর : শ্রীমতি রাণীচন্দ।

৩৪. কোন ঘটনার প্রেক্ষিতে রবীন্দ্রনাথ 'প্রশ্ন' কবিতাটি লিখেছিলেন?
উত্তর : ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দে হিজলী জেলে বন্দীদের ওপর ব্রিটিশদের অত্যাচারের প্রেক্ষিতে।

৩৫. রবীন্দ্রনাথ কোন কবিতাটি ইংরেজিতে লিখে বাংলায় অনুবাদ করেন?
উত্তর : দ্যা চাইল্ড।

৩৬. রবীন্দ্রনাথ কোন গ্রন্থটি নামকরণ করে যেতে পারেননি?
উত্তর : শেষ লেখা।

৩৭. জালিয়ানওয়ালাবাগের যে ঘটনায় রবীন্দ্রনাথ তাঁর নাইট উপাধি ত্যাগ করেছিলেন তাঁর বর্ণনা কোন কাব্যগ্রন্থে পাওয়া যায়?
উত্তর : 'নৈবেদ্য' কাব্যগ্রন্থ।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



৩৮. কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কবে রবীন্দ্রনাথকে ডি. লিট. উপাধিতে ভূষিত করে?
উত্তর : ২৬ ডিসেম্বর, ১৯১৩ সালে।

৩৯. রবীন্দ্রনাথ কোন কবিতাটিকে তাঁর সমস্ত কাব্যের ভূমিকা হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন?
উত্তর : নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ।

৪০. 'সোনার তরী' কাব্যের 'সুপ্তোত্থিতা' কবিতার সঙ্গে কোন গ্রন্থের কোন গল্পের মিল লক্ষণীয়?
উত্তর : ঠাকুরমার ঝুলির 'ঘুমন্তপুরী' গল্পের।

৪১. রবীন্দ্রনাথের 'বলাকা' কাব্যের মূল সুর কি?
উত্তর : গতিবাদ।

৪২. রবীন্দ্রনাথের 'সঞ্চয়িতা' কাব্যগ্রন্থে তাঁর কটি কাব্যের কবিতা স্থান পেয়েছে?
উত্তর : ২৭টি।

৪৩. রবীন্দ্রনাথ তাঁর কোন কাব্য সম্পর্কে বলেছেন, 'কবির সঙ্গে যেন একজন শিল্পী এসে যোগ দিলেন?
উত্তর : মানসী।

৪৪. রবীন্দ্রনাথ তাঁর কোন কাব্যকে সাহিত্যের একটা অনধিকার প্রবেশের দৃষ্টান্ত' বলে অভিহিত করেছেন?
উত্তর : ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলীকে।

৪৫. রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুতে শোকার্ত নজরুল কোন কবিতাটি লিখেছিলেন?
উত্তর : রবি-হারা।

৪৬. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নৃত্যনাট্যগুলোর নাম করুন।
উত্তর : নটীর পূজা (১৯২৬), চিত্রাঙ্গদা (১৯৯২) চণ্ডালিকা (১৯৩৩) ও শ্যামা (১৯৩৯)।

৪৮. রবীন্দ্রনাথ কোন গ্রন্থটি কাজী নজরুল ইসলামের নামে উৎসর্গ করেন?
উত্তর : 'বসন্ত' গীতিনাট্য।

৪৯. রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক কোন নাট্যকার রবীন্দ্রনাথকে ব্যঙ্গ করে নাটক লিখেছিলেন? নাটকের নাম কি?
উত্তর : ডি এল রায়। আনন্দ বিদায়।

৫০. রবীন্দ্রনাথের 'অরূপ রতন' নাটকটি কোন নাটকের সংক্ষিপ্ত রূপ?
উত্তর : রাজা।

৫১. 'রক্তকরবী' নাটকের মূল নামকরণ কি ছিল?
উত্তর : নন্দিনী।

৫২. রবীন্দ্রনাথ কোন গদ্য নাটকটি শরৎচন্দ্রকে উৎসর্গ করেছেন?
উত্তর : কালের যাত্রা।

৫৩. 'বাল্মীকি প্রতিভা', 'বিসর্জন' ও 'চিত্রাঙ্গদা' নাট্যত্রয় কে রচনা করেছেন?
উত্তর : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

৫৪. 'ডাকঘর' ও 'তাসের দেশ' রবীন্দ্রনাথের কোন ধরনের রচনা?
উত্তর : সাঙ্কেতিক নাটক।



৫৫. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রথম সার্থক উপন্যাস কোনটি?
উত্তর : বৌঠাকুরাণীর হাট।

৫৬. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দুটি ঐতিহাসিক উপন্যাসের নাম লিখুন।
উত্তর : বৌ ঠাকুরাণীর হাট (১৮৮৩) ও রাজর্ষি (১৮৮৩)।

৫৭. রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি সামাজিক উপন্যাসের নাম লিখুন।
উত্তর : চোখের বালি (১৯০৩), নৌকাডুবি (১৯০৬) ও দুই বোন (১৯৩৩)।

৫৮. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাব্যধর্মী উপন্যাস কোনটি?
উত্তর : শেষের কবিতা (১৯২৯)।

৫৯. রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক উপন্যাস কোনটি?
উত্তর : ঘরে-বাইরে (১৯১৬)।

৬০. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কোন ঘটনার প্রেক্ষিতে ব্রিটিশ প্রদত্ত 'নাইট' উপাধি বর্জন করেন?
উত্তর : ১৯১৯ সালের জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে।

৬১. রবীন্দ্রনাথের কোন উপন্যাসটি হিন্দিতে প্রথম অনূদিত হয়?
উত্তর : রাজর্ষি।

৬২. রবীন্দ্রনাথের কোন উপন্যাস 'এপিকধর্মী উপন্যাস' হিসেবে খ্যাত?
উত্তর : গোরা।

৬৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখিত মোট উপন্যাসের সংখ্যা কত?
উত্তর : ১২টি।

৬৪. বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসের তুল্য রবীন্দ্রনাথের কোন উপন্যাস?
উত্তর : চোখের বালি।

৬৫. ব্রিটিশ সরকারের কারাগারে বন্দীদের উদ্দেশ্যে রবীন্দ্রনাথ কোন উপন্যাসটি উপহার দেন?
উত্তর : চার অধ্যায়।

৬৬. কোন গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ বিজ্ঞানের প্রতি অপরিসীম আগ্রহের কথা বলেছেন?
উত্তর : বিশ্বপরিচয় (১৯৩৭)।

৬৭. 'সভ্যতার সংকট' প্রবন্ধটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কত সালে পাঠ করেন?
উত্তর : ১৯৪১ সালে তাঁর নিজের জন্মদিনে।

৬৮. রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক প্রবন্ধগ্রন্থের নাম কি?
উত্তর : কালান্তর।

৬৯. স্বদেশ কি? এর রচয়িতা কে?
উত্তর : প্রবন্ধ গ্রন্থ। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

৭০. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অতিপ্রাকৃত গল্পসমূহের নাম লিখুন।
উত্তর : অতিপ্রাকৃত শব্দের অর্থ অলৌকিক, অনৈসর্গিক, Supernatural। তার অতিপ্রাকৃত গল্পগুলো হলো- 'গুপ্তধন', 'জীবিত ও মৃত', 'মণিহারা', 'ক্ষুধিত পাষাণ', 'নিশীথে', 'সম্পত্তি সমর্পণ' প্রভৃতি।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



৭১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গান কোন কোন দেশের জাতীয় সংগীত হিসেবে নির্বাচিত হয়েছে?
উত্তর : বাংলাদেশ ও ভারতের জাতীয় সঙ্গীত-এর রচয়িতা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তাঁর রচিত 'জনগণমন' গানটিকে ভারত সরকার জাতীয় সঙ্গীত হিসেবে গ্রহণ করে। অন্যদিকে 'আমার সোনার বাংলা' বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত। এ গান রাষ্ট্রীয় উপলক্ষসমূহে বিধি অনুসারে গাওয়া হয় বা এর সঙ্গীত বাজানো হয়।

৭২. 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি' কবিতাটি কবে, কোন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়?
উত্তর : বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত 'আমর সোনার বাংলা' ১৯০৫ সালে (১৩১২ বঙ্গাব্দ) একটি কবিতা হিসেবে 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

৭৩. 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি' কবিতাটি বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণাপত্রে জাতীয় সঙ্গীত হিসেবে গৃহীত হয় কত সালে?
উত্তর : ২৫ চরণের এ কবিতাটির প্রথম ১০ চরণ ৩ মার্চ ১৯৭১ বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণাপত্রে জাতীয় সঙ্গীত হিসেবে গৃহীত হয়।

৭৪. 'জীবনস্মৃতি' কার আত্মজীবনী?
উত্তর : 'জীবনস্মৃতি' (১৯১২) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মজীবনী। এখানে রবীন্দ্রনাথের বাল্যকাল থেকে পঁচিশ বছর বয়স পর্যন্ত সময়কার কাহিনী ও ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে। ছোট ছোট ঘটনা, চিত্র, স্বভাবের বিকাশ, অভিজ্ঞতার সঞ্চয় কিভাবে ঘটেছে তার সহজ সুন্দর আখ্যান এতে বর্ণিত। আত্মজীবনী রচনার প্রচলিত রীতি ভেঙে রবীন্দ্রনাথ এ গ্রন্থে নতুন ধারা সৃষ্টি করেছেন।

৭৫. 'শেষের কবিতা' কোন ধরনের রচনা?
উত্তর : 'শেষের কবিতা' রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাব্যধর্মী উপন্যাস। এটি ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দে 'প্রবাসী' পত্রিকায় ছাপা হয়। ভাষার অসামান্য ঔজ্জ্বল্য, দৃপ্তশক্তি ও কবিতার দীপ্তি এ উপন্যাসটিকে এমন স্বাতন্ত্র্য এনে দিয়েছে, যার জন্য এ গ্রন্থটি রবীন্দ্রনাথের বিস্ময়কর সৃষ্টির অন্যতম। অমিত, লাবণ্য, কেতকী, শোভনলাল প্রমুখ এ উপন্যাসের চরিত্র। উপন্যাসটির কতিপয় বাক্য আজ প্রবাদের মর্যাদা পেয়েছে। যেমন– 'ফ্যাশনটা হলো মুখোশ, স্টাইলটা হলো মুখশ্রী'। 'কালের যাত্রার ধ্বনি শুনিতে কি পাও' এ কবিতাটি দিয়ে উপন্যাসটি শেষ হয়েছে।

৭৬. 'রক্তকরবী' নাটকটি কোন ধরনের রচনা?
উত্তর : রক্তকরবী' নাটকটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা। এটি তার একটি সাংকেতিক নাটক। মানুষের সমস্ত লোভ কিভাবে জীবনের সমস্ত সৌন্দর্য ও স্বাভাবিকতাকে অস্বীকার করে মানুষকে নিছক যন্ত্রে ও উৎপাদনের প্রয়োজনীয় উপকরণে পরিণত করে এবং তার বিরুদ্ধে মানুষের প্রতিবাদ কিরূপ আকার ধারণ করে তারই রূপায়ণ এ নাটক। এ নাটকে ধনের ওপর ধান্যের, শক্তির ওপর প্রেমের এবং মৃত্যুর ওপর জীবনের জয়গান গাওয়া হয়েছে।

৭৭. রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পের বৈশিষ্ট্যগুলি কী কী?
উত্তর : রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পগুলো কাব্যধর্মী। রবীন্দ্র গল্পের বিষয়বৈচিত্র্য অসাধারণ। প্রেম ও প্রকৃতি তার গল্পের মূল উপাদান। তিনি গল্প সরাসরি আরম্ভ করেন এবং মুহূর্তের মধ্যে পাঠকের মনকে ঘটনাস্রোতে মগ্ন করেন। ঠিক মুখে বলা গল্পের মত সহজ স্বচ্ছন্দ স্রোতে বয়ে চলে তার কাহিনী।



৭৮. রবীন্দ্রনাথের নাটকগুলোকে কোন কোন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়? তার ২টি সাংকেতিক নাটকের নাম লিখুন।
উত্তর : রবীন্দ্রনাথের নাটকের শ্রেণীগুলো হচ্ছে– গীতিনাট্য, কাব্যনাট্য, সাংকেতিক নাটক, সামাজিক নাটক, প্রহসন, নৃত্যনাট্য ইত্যাদি।
দুটি সাংকেতিক নাটক– ডাকঘর, রাজা।

৭৯. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কখন এবং কেন নাইট উপাধি বর্জন করেছিলেন?
উত্তর : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৯১৯ সালের ১৩ এপ্রিল নাইট উপাধি বর্জন করেন। কারণ এ দিনে রাউলাট অ্যাক্ট-এর বিরুদ্ধে পাঞ্জাবের জালিয়ানওয়ালাবাগে এক জনসমাবেশে ভারতীয়দের ওপর ব্রিটিশ পুলিশ আকস্মিকভাবে গুলি চালিয়ে অসহায় ব্যক্তিদের হত্যা করে। ইংরেজদের এ অত্যাচারী মূর্তি দেখে রবীন্দ্রনাথ ভাইসরয়কে এক পত্র লিখে 'নাইট' উপাধি ফিরিয়ে দেন। উল্লেখ্য, তিনি ১৯১৫ সালে নাইট উপাধি পান।

৮০. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পর্কে যা জানেন লিখুন।
উত্তর : বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ প্রতিভা। তিনি ছিলেন একাধারে কবি, নাট্যকার, ঔপন্যাসিক, ছোট গল্পকার, প্রাবন্ধিক, দার্শনিক, গায়ক, চিত্রশিল্পী, অভিনেতা, সমাজসেবী ও শিক্ষাবিদ। তিনি জন্মগ্রহণ করেন কলকাতার জোড়াসাঁকোর সম্ভ্রান্ত ঠাকুর পরিবারে ১৮৬১ সালের ৭ মে (২৫ বৈশাখ ১২৬৮)। মূলত কবি হিসেবে তাঁর প্রতিভা বিশ্বময় স্বীকৃত। ১৯১৩ সালে নোবেল পুরস্কারে ভূষিত করা হয়। এশিয়ার বিদগ্ধ ও বরেণ্য ব্যক্তিদের মধ্যে তিনিই প্রথম এ পুরস্কার জয়ের গৌরব অর্জন করেন। তাঁর আশি বছরের দীর্ঘ জীবনে রচনার মধ্যে রয়েছে অসংখ্য কবিতা, গান, ছোটগল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ, নাটক, গীতিনাট্য, নৃত্যনাট্য, ভ্রমণকাহিনী, চিঠিপত্র এবং দেশে বিদেশে প্রদত্ত বক্তৃতামালা। তিনি তাঁর দীর্ঘজীবনে নানাভাবে আমন্ত্রিত হয়ে এশিয়া, ইউরোপ ও আমেরিকার বহু দেশ সফর করেন। সেসব দেশে তিনি কেবল কবি হিসেবেই নন, বরং বিশ্বের অন্যতম মানবতাবাদী দার্শনিক হিসেবে স্বীকৃত হন। ১৯৪১ সালের ৭ আগস্ট (২২ শ্রাবণ ১৩৪৮) এই মহামনীষী মৃত্যুবরণ করেন।

৮১. ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলীর ছয়টি লাইন লিখুন।
উত্তর : আজি এ প্রভাতে রবির কর
কেমনে পশিল প্রাণের পর
কেমনে পশিল গুহার আঁধারে প্রভাতপাখির গান!
না জানি কেন রে এত দিন পরে জাগিয়া উঠিল প্রাণ
জাগিয়া উঠেছে প্রাণ
ওরে উথলি উঠেছে বারি,
ওরে প্রাণের বেদনা প্রাণের আবেগ রুধিয়া রাখিতে নারি।

৮২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কোন কাব্যগ্রন্থের জন্য নোবেল পুরস্কার লাভ করেন?
উত্তর : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাংলা 'গীতাঞ্জলি' ও আরো কয়েকটি কাব্যগ্রন্থ থেকে বাছাই করা কবিতার অনুবাদ সংগ্রথিত করে 'Song Offerings' নামে একটি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। আর এ গ্রন্থটির জন্য তিনি নোবেল পুরস্কার লাভ করেন।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



## দীনবন্ধু মিত্র (১৮৩০-১৮৭৩)

প্রখ্যাত নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্রের জন্ম ১৮৩০ সালে নদীয়ার চৌবেড়িয়া গ্রামের এক দরিদ্র পরিবারে। গ্রাম্য পাঠশালার পাঠ শেষ করার পর পিতা কালাচাঁদ মিত্রের তদবিরে স্থানীয় জমিদারের সেরেস্তায় মাসিক আট টাকা বেতনে চাকরি লাভ (১৮৪০)। লেখাপড়ার প্রতি তার ছিল তীব্র ঝোঁক। পাঁচ বছর চাকরি করার পর পিতার অমতে তা ত্যাগ করে উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য বাড়ি থেকে কোলকাতায় পালিয়ে যান। সেখানে গৃহভৃত্যের কাজ করে জীবনধারণ ও পড়াশোনার খরচ যোগাড় করেন। প্রথমে লঙ সাহেবের অবৈতনিক স্কুলে, পরে কলুটোলা ব্রাঞ্চ স্কুলের শেষ পরীক্ষায় বৃত্তি লাভ করেন। অতঃপর হিন্দু কলেজে ভর্তি (১৮৫০) হন। কলেজের সব পরীক্ষায় বৃত্তি লাভ করেন। কলেজের শেষ পরীক্ষা না দিয়ে ১৮৫৫ সালে ১৫০ টাকা বেতনে পাটনায় পোস্টমাস্টার পদে চাকরি লাভ করেন। দেড় বছরের মধ্যে পোস্টাল ইন্সপেক্টর পদে উন্নীত হন। নদীয়া ও ঢাকা বিভাগে দীর্ঘদিন দায়িত্ব পালন। ১৮৬৯-১৮৭০ পর্যন্ত কোলকাতায় পোস্টমাস্টার জেনারেলের সহকারী ছিলেন। ১৮৭১ সালে লুসাই যুদ্ধের সংবাদাদি ডাকযোগে পাঠানোর বন্দোবস্ত করার জন্য কাছাড় গমন করেন। সে সময়ে ডাক বিভাগের ডিরেক্টর জেনারেল হগের অপ্রীতিভাজন হওয়ায় পোস্টমাস্টার জেনারেলের সহকারী পদ থেকে অপসারিত হন। ১৮৭২ সালে ইস্ট ইন্ডিয়ার রেলওয়ের ইন্সপেক্টর পদে যোগ দেন। সাহিত্য জীবনের শুরু কবিতা দিয়ে। নাট্যকার রূপেই দীনবন্ধু মিত্র সমধিক খ্যাত। নীলকর সাহেবদের বীভৎস অত্যাচারে লাঞ্ছিত নীল চাষীদের দুরবস্থা অবলম্বনে রচনা করেন 'নীল দর্পণ' (১৮৬০) নাটক। এটি প্রকাশিত হওয়ার পর পরই নীলকরদের বিরুদ্ধে তুমুল আলোড়নের সৃষ্টি হয়।

**কাব্য :** সুরধুনী কাব্য (১ম ভাগ-১৮৭১ ও ২য় ভাগ-১৮৭৬) ও দ্বাদশ কবিতা (১৮৭২)।

**প্রহসন :** সধবার একাদশী (১৮৬৬), বিয়ে পাগলা বুড়ো (১৮৬৬)।

**নাটক :** নীলদর্পণ (১৮৬০), নবীন তপস্বিনী (১৮৬৩), লীলাবতী (১৮৬৭), জামাই বারিক (১৮৭২), কমলে কামিনী (১৮৭৩)।

**মৃত্যু :** ১ নভেম্বর ১৮৭৩

**মডেল প্রশ্ন**

১. **'নীলদর্পণ' কোন শ্রেণীর রচনা? রচয়িতা কে এবং কত সালে রচিত?**
উত্তর : নাটক; দীনবন্ধু মিত্র ১৮৬০ সালে রচনা করেন।

২. **'নবীন তপস্বিনী' ও 'জামাই বারিক' কোন শ্রেণীর রচনা? রচয়িতা কে?**
উত্তর : নাটক; দীনবন্ধু মিত্র।

৩. **'সধবার একাদশী' ও 'বিয়ে পাগলা বুড়ো' কোন শ্রেণীর রচনা? রচয়িতা কে?**
উত্তর : প্রহসন; দীনবন্ধু মিত্র।

৪. **বাংলাভাষায় প্রথম আর্থ-সামাজিক রাজনৈতিক বিষয়ে নাটক লেখেন কে? নাটকটি সম্পর্কে যা জানেন লিখুন।**
উত্তর : বাংলাভাষায় প্রথম আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক বিষয়ে প্রথম নাটক লেখেন দীনবন্ধু মিত্র। তার রচিত এ নাটকের নাম 'নীলদর্পণ'। নাটকটি ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে ঢাকার বাংলাবাজারস্থ বাঙ্গালাযন্ত্রে রামচন্দ্র ভৌমিক কর্তৃক মুদ্রিত হয়েছিল। নাটকটি সর্বপ্রথম অভিনীত হয়েছিল ঢাকার পূর্ববঙ্গীয় রঙ্গভূমির উদ্যোগে ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দের মে মাসের শেষে বা জুন মাসের প্রথমদিকে। নাটকটিতে উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে নীলকরদের অত্যাচারে পীড়িত সাধারণ কৃষকজীবনের মর্মন্তুদ চিত্র ফুটে ওঠে।



৫. **'সধবার একাদশী' কোন ধরনের রচনা?**
উত্তর : দীনবন্ধু মিত্রের রচিত 'সধবার একাদশী' (১৮৬৬) মূলত একটি প্রহসনমূলক সামাজিক নাটক। নাটকে উনবিংশ শতকের মধ্যভাগে ইংরেজি শিক্ষিত নব্য যুবকদের মদ্যপান ও বেশ্যাসক্তি তাদের জীবনে যে বিপর্যয় সৃষ্টি করেছিল তার কাহিনী উল্লেখ আছে।

৬. **'নীলদর্পণ' কোন ধরনের রচনা?**
উত্তর : দীনবন্ধু মিত্রের নীলকর সাহেবদের বীভৎস অত্যাচারে লাঞ্ছিত নীল চাষীদের দুরবস্থা অবলম্বনে রচিত নাটক 'নীলদর্পণ'।

৭. **'নীলদর্পণ' নাটকের সাহিত্যমূল্যের চেয়ে সামাজিক মূল্য বেশি।' –মন্তব্যটির পক্ষে কিছু লিখুন।**
উত্তর : 'নীলদর্পণ' নাটকে বাস্তব চিত্র রূপায়ণের ফলে সে আমলে নীলকরদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে দেশব্যাপী প্রবল আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। ইংরেজ নীলকরদের অত্যাচারে এ দেশে কৃষকজীবনের দুর্বিষহ অবস্থার পরিবর্তন ঘটানোর ক্ষেত্রে এই নাটকটির গুরুত্ব অপরিসীম। তাই বলা যায়, নাটকটির সাহিত্যমূল্য যা-ই হোক না কেন, তার চেয়ে সামাজিক মূল্য অনেক বেশি ছিল।

৮. **'নীলদর্পণ' নাটকের ইংরেজি অনুবাদ করেছিলেন কে? নাটকটির প্রকাশক কে ছিলেন?**
উত্তর : ধারণা করা হয় নাটকটির ইংরেজি অনুবাদ করেছিলেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত (ছদ্মনাম A Native)। প্রকাশক রেভারেন্ড জেমস্ লঙ।

## কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬)

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম। অন্যায়-অত্যাচার-শোষণ ও দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে আজীবন সংগ্রামী আমাদের বিদ্রোহী কবি ঝড়ের মতো বাংলা সাহিত্য-অঙ্গনে আবির্ভূত হয়ে নতুন প্রাণের সঞ্চার করেছিলেন। মাত্র অল্পকালের সাহিত্য সাধনায় এত ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করার ক্ষমতা পৃথিবীর খুব কম কবিই অর্জন করেছিলেন।

**জন্ম :** ২৪ মে ১৮৯৯; ১১ জ্যৈষ্ঠ ১৩০৬।

**জন্মস্থান :** পশ্চিমবাংলার বর্ধমান জেলার আসানসোল মহকুমার চুরুলিয়া গ্রাম।

**পিতা ও মাতা :** কাজী ফকির আহমদ এবং জাহেদা খাতুন।

**দরিরামপুর হাই স্কুলে পাঠ :** ১৯১৪ সালে।

**৪৯ নং বাঙালি পল্টনে যোগদান :** ১৯১৭ সালে।

**কলকাতায় আগমন :** ১৯২০ সালে।

**প্রথম বিয়ে :** ১৯২১ সালে, কুমিল্লায় (সৈয়দা খাতুন ওরফে নার্গিস বেগমের সঙ্গে)। কবি তার সঙ্গে কখনো একত্রে বাস করেননি।

**গ্রেপ্তার পরোয়ানা জারি :** ১৯২২ সালে।

**গ্রেপ্তার ও কারাবাস :** ২৩ নভেম্বর ১৯২২ সালে গ্রেপ্তার করে কুমিল্লা থেকে কলকাতায় আনা হয়। ৮ জানুয়ারি ১৯২৩ আদালত কর্তৃক সশ্রম কারাদণ্ড প্রদান করা হয় এবং ১৯২৩ সালের ১৫ ডিসেম্বর তিনি মুক্তিলাভ করেন।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



দ্বিতীয় বিয়ে : ১৯২৪ সালে। স্ত্রী প্রমীলা সেনগুপ্তা (আশালতা সেনগুপ্তা)।

প্রথম পুত্র : বুলবুল, জন্ম ১৯২৬ সালে। মৃত্যু ১৯৩০ সালে।

অন্য দুই পুত্র : কাজী সব্যসাচী ও কাজী অনিরুদ্ধ।

কবিপত্নী পক্ষাঘাতগ্রস্ত হন : ১৯৩৯ সালে।

কবিপত্নীর মৃত্যু : ১৯৬২ সালে।

অসুস্থ হন : ১৯৪২ সালে।

ঢাকায় আসেন : ১৯৭২ সালে।

জীবনাবসান : ১৯৭৬ সালের ২৯ আগস্ট, বাংলা ১৩৮৩ সালের ১২ ভাদ্র।

চিরনিদ্রায় শায়িত : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় মসজিদ অঙ্গনে।

শিল্পী জীবন : ২৩ বছর।

প্রথম প্রকাশিত রচনা : বাউণ্ডেলের আত্মকাহিনী, 'সওগাত' পত্রিকার জ্যৈষ্ঠ (১৩২৬) সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

প্রথম প্রকাশিত কবিতা : মুক্তি, বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকায় (শ্রাবণ, ১৩২৬) প্রকাশিত হয়।

প্রথম প্রকাশিত প্রবন্ধ : 'তুর্ক মহিলার ঘোমটা খোলা' সওগাত পত্রিকায় (কার্তিক, ১৩২৬) প্রকাশিত হয়।

'বিদ্রোহী' কবিতা প্রকাশিত হয় : ১৯২২ সালের জানুয়ারি মাসে। লেখা হয় ১৯২১ সালের ডিসেম্বর মাসে।

প্রথম গ্রন্থ : গদ্য প্রবন্ধ 'যুগবাণী', ১৯২২ সালে।

নজরুল রচনাবলী : কবিতাগ্রন্থ ২২টি; কাব্যানুবাদ ৩টি; কিশোর কাব্য ২টি; উপন্যাস ৩টি; গল্পগ্রন্থ ৩টি; নাটক ৩টি; কিশোর নাটিকা ২টি; প্রবন্ধ গ্রন্থ ৫টি; সঙ্গীত গ্রন্থ ১৪টি। তাঁর রচিত গানের প্রকৃত সংখ্যা এখন পর্যন্ত নির্ধারণ করা যায়নি।

কাব্য : অগ্নিবীণা (১৯২২), দোলনচাঁপা (১৯২৩), বিষের বাঁশি (১৯২৪), পুবের হাওয়া (১৯২৫), সাম্যবাদী (১৯২৫)।

জীবনীমূলক কাব্য : চিত্তনামা (১৯২৫), সর্বহারা (১৯২৬), ভাঙার গান (১৯২৪), ফণি-মনসা (১৯২৭), সিন্ধু-হিন্দোল (১৯২৭), প্রলয়-শিখা (১৯৩০), জিঞ্জির (১৯২৮), শেষ সওগাত (১৯৫৮), সন্ধ্যা (১৯২৯), চক্রবাক (১৯২৯), নতুন চাঁদ ( ১৯৪৫), সঞ্চিতা (১৯২৮), মরু-ভাস্কর (১৯৫৭), ঝড় ( ১৯৬০)।

কিশোর কাব্য : ঝিঙেফুল (১৯২৬), সাত ভাই চম্পা।

উপন্যাস : বাঁধন হারা (১৯২৭), কুহেলিকা ( ১৯৩১), মৃত্যুক্ষুধা (১৯৩০)।

গল্পগ্রন্থ : ব্যথার দান ( ১৯২২), রিক্তের বেদন (১৯২৫), শিউলিমালা (১৯৩১)।

নটিক : ঝিলিমিলি ( ১৯৩০), আলেয়া (১৯৩১), মধুমালা (১৯৫৯)।

প্রবন্ধ : যুগবাণী (১৯২২), রুদ্রমঙ্গল (১৯২৩), রাজবন্দীর জবানবন্দী (১৯২৩), দুর্দিনের যাত্রী (১৯২৬), ধূমকেতু (১৯৫৭)।

গান ও স্বরলিপির বই : বুলবুল (১৯২৮), চোখের চাতক (১৯৩০), চন্দ্রবিন্দু (১৯৩০), নজরুল গীতিকা (১৯৩০), নজরুল স্বরলিপি (১৯৩২), সুর-মুকুর (১৯৩৪), গুলবাগিচা (১৯৩৪), সুরসাকী ( ১৯৩১), সুরলিপি (১৯৩৪)।

কাব্যানুবাদ : রুবাইয়াত-ই-হাফিজ (১৯৩০), রুবাইয়াত-ই-ওমর খৈয়াম, কাব্যে আমপারা।

চিত্র-কাহিনী : বিদ্যাপতি, সাপুড়ে।



পুরস্কার : কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক 'জগত্তারিণী স্বর্ণপদক' (১৯৪৫), ভারত সরকার কর্তৃক 'পদ্মভূষণ' (১৯৬০), রবীন্দ্র-ভারতী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক 'ডি-লিট' (১৯৬৯), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক 'ডি-লিট' (১৯৭৪) ও বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক 'একুশে পদক' ( ১৯৭৬)।

জীবনাবসান : ১২ ভাদ্র ১৩৮৩ বঙ্গাব্দ (২৯ আগস্ট ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দ)

মডেল প্রশ্ন

১. কাজী নজরুল ইসলামের জন্ম ও মৃত্যুর তারিখ কত?
উত্তর : জন্ম ১১ জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৬ বঙ্গাব্দ (২৪ মে, ১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দ) ও মৃত্যু ১২ ভাদ্র, ১৩৮৩ বঙ্গাব্দ (২৯ আগস্ট, ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দ)।

২. কবি নজরুল ইসলামের প্রথম রচনা কোনটি?
উত্তর : বাউণ্ডেলের আত্মকাহিনী।

৩. কাজী নজরুল ইসলামের প্রথম কবিতা কোনটি? কোন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়?
উত্তর : মুক্তি। ১৩২৬ বঙ্গাব্দে মুসলিম সাহিত্য পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয়।

৪. কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কত সালে কবি নজরুলকে 'জগত্তারিণী পদক' প্রদান করে?
উত্তর : ১৯৪৫ সালে।

৫. নজরুলের বিখ্যাত 'বিদ্রোহী' কবিতা কত সালে, কোন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়?
উত্তর : ১৯২১ (১৩২৮ বঙ্গাব্দ) 'সাপ্তাহিক বিজলী' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

৬. নজরুল ইসলামের প্রথম রচনা 'বাউণ্ডেলের আত্মকাহিনী' কত সালে কোন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়?
উত্তর : ১৩২৬ বঙ্গাব্দে 'সওগাত' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

৭. 'সাম্যবাদী' নজরুল ইসলামের কোন শ্রেণীর রচনা? কত সালে প্রথম প্রকাশিত হয়?
উত্তর : কবিতা। ১৬ ডিসেম্বর ১৯২৫ 'লাঙ্গল' পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয়।

৮. নজরুল ইসলাম কত সালে বাংলাদেশের নাগরিকত্ব লাভ করেন?
উত্তর : ১৯৭৬ সালে।

৯. নজরুলের প্রথম কাব্যগ্রন্থের নাম কি? কত সালে প্রকাশিত হয়?
উত্তর : অগ্নিবীণা, ১৯২২ সালে প্রকাশিত হয়।

১০. কাজী নজরুল ইসলামের মোট প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা কত?
উত্তর : ৫১টি।

১১. নজরুলের রচনার প্রধান বৈশিষ্ট্য কি?
উত্তর : সংস্কার ও পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে মুক্তি।

১২. নজরুল ১৯৪০ সালে কোন পত্রিকা সম্পাদনা করেন?
উত্তর : দৈনিক নবযুগ।

১৩. নজরুল ইসলাম কত সালে ধূমকেতু পত্রিকায় কোন কোন কবিতা প্রকাশের জন্য এক বছর কারাবরণ করেন?
উত্তর : ১৯২২ সালে 'আনন্দময়ীর আগমনে' এবং 'বিদ্রোহীর কৈফিয়ৎ' নামক কবিতা প্রকাশের জন্য।

১৪. নজরুল পুনরায় কোন কবিতা রচনার জন্য কত সালে ৬ মাস কারাবরণ করেন?
উত্তর : 'প্রলয়-শিখা' রচনার জন্য, ১৯৩০ সালে।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



**দ্বিতীয় বিয়ে :** ১৯২৪ সালে। স্ত্রী প্রমীলা সেনগুপ্তা (আশালতা সেনগুপ্তা)।

**প্রথম পুত্র :** বুলবুল, জন্ম ১৯২৬ সালে। মৃত্যু ১৯৩০ সালে।

**অন্য দুই পুত্র :** কাজী সব্যসাচী ও কাজী অনিরুদ্ধ।

**কবিপত্নী পক্ষাঘাতগ্রস্ত হন :** ১৯৩৯ সালে।

**কবিপত্নীর মৃত্যু :** ১৯৬২ সালে।

**অসুস্থ হন :** ১৯৪২ সালে।

**ঢাকায় আসেন :** ১৯৭২ সালে।

**জীবনাবসান :** ১৯৭৬ সালের ২৯ আগস্ট, বাংলা ১৩৮৩ সালের ১২ ভাদ্র।

**চিরনিদ্রায় শায়িত :** ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় মসজিদ অঙ্গনে।

**শিল্পী জীবন :** ২৩ বছর।

**প্রথম প্রকাশিত রচনা :** বাউণ্ডেলের আত্মকাহিনী, 'সওগাত' পত্রিকার জ্যৈষ্ঠ (১৩২৬) সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

**প্রথম প্রকাশিত কবিতা :** মুক্তি, বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকায় (শ্রাবণ, ১৩২৬) প্রকাশিত হয়।

**প্রথম প্রকাশিত প্রবন্ধ :** 'তুর্ক মহিলার ঘোমটা খোলা' সওগাত পত্রিকায় (কার্তিক, ১৩২৬) প্রকাশিত হয়।

**'বিদ্রোহী' কবিতা প্রকাশিত হয় :** ১৯২২ সালের জানুয়ারি মাসে। লেখা হয় ১৯২১ সালের ডিসেম্বর মাসে।

**প্রথম গ্রন্থ :** গদ্য প্রবন্ধ 'যুগবাণী', ১৯২২ সালে।

**নজরুল রচনাবলী :** কবিতাগ্রন্থ ২২টি; কাব্যানুবাদ ৩টি; কিশোর কাব্য ২টি; উপন্যাস ৩টি; গল্পগ্রন্থ ৩টি; নাটক ৩টি; কিশোর নাটিকা ২টি; প্রবন্ধ গ্রন্থ ৫টি; সঙ্গীত গ্রন্থ ১৪টি। তাঁর রচিত গানের প্রকৃত সংখ্যা এখন পর্যন্ত নির্ধারণ করা যায়নি।

**কাব্য :** অগ্নিবীণা (১৯২২), দোলনচাঁপা (১৯২৩), বিষের বাঁশি (১৯২৪), পুবের হাওয়া (১৯২৫), সাম্যবাদী (১৯২৫)।

**জীবনীমূলক কাব্য :** চিত্তনামা (১৯২৫), সর্বহারা (১৯২৬), ভাঙার গান (১৯২৪), ফণি-মনসা (১৯২৭), সিন্ধু-হিন্দোল (১৯২৭), প্রলয়-শিখা (১৯৩০), জিঞ্জির (১৯২৮), শেষ সওগাত (১৯৫৮), সন্ধ্যা (১৯২৯), চক্রবাক (১৯২৯), নতুন চাঁদ ( ১৯৪৫), সঞ্চিতা (১৯২৮), মরু-ভাস্কর (১৯৫৭), ঝড় ( ১৯৬০)।

**কিশোর কাব্য :** ঝিঙেফুল (১৯২৬), সাত ভাই চম্পা।

**উপন্যাস :** বাঁধন হারা (১৯২৭), কুহেলিকা ( ১৯৩১), মৃত্যুক্ষুধা (১৯৩০)।

**গল্পগ্রন্থ :** ব্যথার দান ( ১৯২২), রিক্তের বেদন (১৯২৫), শিউলিমালা (১৯৩১)।

**নাটক :** ঝিলিমিলি ( ১৯৩০), আলেয়া (১৯৩১), মধুমালা (১৯৫৯)।

**প্রবন্ধ :** যুগবাণী (১৯২২), রুদ্রমঙ্গল (১৯২৩), রাজবন্দীর জবানবন্দী (১৯২৩), দুর্দিনের যাত্রী (১৯২৬), ধূমকেতু (১৯৫৭)।

**গান ও স্বরলিপির বই :** বুলবুল (১৯২৮), চোখের চাতক (১৯৩০), চন্দ্রবিন্দু (১৯৩০), নজরুল গীতিকা (১৯৩০), নজরুল স্বরলিপি (১৯৩২), সুর-মুকুর (১৯৩৪), গুলবাগিচা (১৯৩৪), সুরসাকী ( ১৯৩১), সুরলিপি (১৯৩৪)।

**কাব্যানুবাদ :** রুবাইয়াত-ই-হাফিজ (১৯৩০), রুবাইয়াত-ই-ওমর খৈয়াম, কাব্যে আমপারা।

**চিত্র-কাহিনী :** বিদ্যাপতি, সাপুড়ে।



**পুরস্কার :** কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক 'জগত্তারিণী স্বর্ণপদক' (১৯৪৫), ভারত সরকার কর্তৃক 'পদ্মভূষণ' (১৯৬০), রবীন্দ্র-ভারতী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক 'ডি-লিট' (১৯৬৯), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক 'ডি-লিট' (১৯৭৪) ও বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক 'একুশে পদক' ( ১৯৭৬)।

**জীবনাবসান :** ১২ ভাদ্র ১৩৮৩ বঙ্গাব্দ (২৯ আগস্ট ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দ)

**মডেল প্রশ্ন**

১. **কাজী নজরুল ইসলামের জন্ম ও মৃত্যুর তারিখ কত?**
উত্তর : জন্ম ১১ জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৬ বঙ্গাব্দ (২৪ মে, ১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দ) ও মৃত্যু ১২ ভাদ্র, ১৩৮৩ বঙ্গাব্দ (২৯ আগষ্ট, ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দ)।

২. **কবি নজরুল ইসলামের প্রথম রচনা কোনটি?**
উত্তর : বাউণ্ডেলের আত্মকাহিনী।

৩. **কাজী নজরুল ইসলামের প্রথম কবিতা কোনটি? কোন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়?**
উত্তর : মুক্তি। ১৩২৬ বঙ্গাব্দে মুসলিম সাহিত্য পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয়।

৪. **কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কত সালে কবি নজরুলকে 'জগত্তারিণী পদক' প্রদান করে?**
উত্তর : ১৯৪৫ সালে।

৫. **নজরুলের বিখ্যাত 'বিদ্রোহী' কবিতা কত সালে, কোন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়?**
উত্তর : ১৯২১ (১৩২৮ বঙ্গাব্দ) 'সাপ্তাহিক বিজলী' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

৬. **নজরুল ইসলামের প্রথম রচনা 'বাউণ্ডেলের আত্মকাহিনী' কত সালে কোন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়?**
উত্তর : ১৩২৬ বঙ্গাব্দে 'সওগাত' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

৭. **'সাম্যবাদী' নজরুল ইসলামের কোন শ্রেণীর রচনা? কত সালে প্রথম প্রকাশিত হয়?**
উত্তর : কবিতা। ১৬ ডিসেম্বর ১৯২৫ 'লাঙ্গল' পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয়।

৮. **নজরুল ইসলাম কত সালে বাংলাদেশের নাগরিকত্ব লাভ করেন?**
উত্তর : ১৯৭৬ সালে।

৯. **নজরুলের প্রথম কাব্যগ্রন্থের নাম কি? কত সালে প্রকাশিত হয়?**
উত্তর : অগ্নিবীণা, ১৯২২ সালে প্রকাশিত হয়।

১০. **কাজী নজরুল ইসলামের মোট প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা কত?**
উত্তর : ৫১টি।

১১. **নজরুলের রচনার প্রধান বৈশিষ্ট্য কি?**
উত্তর : সংস্কার ও পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে মুক্তি।

১২. **নজরুল ১৯৪০ সালে কোন পত্রিকা সম্পাদনা করেন?**
উত্তর : দৈনিক নবযুগ।

১৩. **নজরুল ইসলাম কত সালে ধূমকেতু পত্রিকায় কোন কোন কবিতা প্রকাশের জন্য এক বছর কারাবরণ করেন?**
উত্তর : ১৯২২ সালে 'আনন্দময়ীর আগমনে' এবং 'বিদ্রোহীর কৈফিয়ৎ' নামক কবিতা প্রকাশের জন্য।

১৪. **নজরুল পুনরায় কোন কবিতা রচনার জন্য কত সালে ৬ মাস কারাবরণ করেন?**
উত্তর : 'প্রলয়-শিখা' রচনার জন্য, ১৯৩০ সালে।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



১৫. নজরুল ইসলাম কত সালে 'লাঙ্গল' পত্রিকা সম্পাদনা করেন?
উত্তর : ১৯২৫ সালে।

১৬. নজরুল ইসলামের কয়েকটি কাব্যগ্রন্থের নাম লিখুন।
উত্তর : অগ্নিবীণা, দোলন চাঁপা, ছায়ানট ইত্যাদি।

১৭. নজরুলের 'বিদ্রোহী' কবিতাটি কোন কাব্যের অন্তর্গত?
উত্তর : অগ্নিবীণা।

১৮. 'সিন্ধু-হিন্দোল' কাব্যগ্রন্থের রচয়িতা কে?
উত্তর : কাজী নজরুল ইসলাম।

১৯. কাজী নজরুল ইসলাম কত সালে দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হন?
উত্তর : ১৯৪২ সালের ১০ অক্টোবর।

২০. নজরুল কত সালে স্থায়ীভাবে ঢাকায় আসেন?
উত্তর : ১৯৭২ সালের ২৪ মে।

২১. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কত সালে নজরুল ইসলামকে ডক্টরেট ডিগ্রি প্রদান করে?
উত্তর : ৯ অক্টোবর ১৯৭৪ সালে।

২২. কত সালে নজরুলকে জাতীয় কবির মর্যাদা দেয়া হয়?
উত্তর : ২৪ মে ১৯৭২।

২৩. নজরুল ইসলামকে কত সালে একুশে পদক প্রদান করা হয়?
উত্তর : ১৯৭৬ সালে।

২৪. ঝিলিমিলি, আলেয়া ও মধুমালা গ্রন্থত্রয় কে রচনা করেছেন? কোন শ্রেণীর রচনা?
উত্তর : কাজী নজরুল ইসলাম, নাটক।

২৫. 'মধুমালা' নাটকটির রচয়িতা কে?
উত্তর : কাজী নজরুল ইসলাম।

২৬. কাজী নজরুল ইসলামের প্রথম উপন্যাস কোনটি?
উত্তর : বাঁধনহারা (১৯২৭)।

২৭. কাজী নজরুল ইসলামের 'মৃত্যুক্ষুধা' গ্রন্থটি কোন শ্রেণীর রচনা? কত সালে প্রকাশিত হয়?
উত্তর : উপন্যাস, ১৯৩০ সালে প্রকাশিত হয়।

২৮. কাজী নজরুল ইসলামের কয়েকটি উপন্যাসের নাম লিখুন।
উত্তর : বাঁধনহারা, মৃত্যুক্ষুধা, কুহেলিকা।

২৯. 'সঞ্চিতা' কাব্য সংকলনটি কত সালে প্রকাশিত হয়? এটি কে, কার উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করেন?
উত্তর : কাজী নজরুল ইসলামের 'সঞ্চিতা' কাব্য সংকলনটি ১৯২৮ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। এতে ৭৮টি কবিতা ও গান রয়েছে। কাজী নজরুল ইসলাম তার কাব্য সংকলনটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে উৎসর্গ করেছিলেন।

৩০. কোন কবিতা রচনা করার জন্য নজরুল কারারুদ্ধ হন?
উত্তর : 'আনন্দময়ীর আগমনে' কবিতাটি ধূমকেতুর পূজা সংখ্যায় ১৯২২ সালের ২৬ সেপ্টেম্বর প্রকাশিত হলে ধূমকেতু নিষিদ্ধ করা হয় এবং কাজী নজরুলের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করা হয়। তিনি ৬ মাস কারাবরণ করেন।



৩১. বাংলাদেশ থেকে কাজী নজরুল ইসলাম যেসব সম্মান ও সুযোগ-সুবিধা পেয়েছেন সেগুলো উল্লেখ করুন।
উত্তর : বাংলাদেশ সরকার বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামকে ১৯৭৬ সালে সাহিত্যে একুশে পদক প্রদান করে। এছাড়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তাকে ১৯৭৪ খ্রিষ্টাব্দে ডি.লিট ডিগ্রি প্রদান করে। ১৯৭৬ খ্রিষ্টাব্দে সরকার তাকে নাগরিকত্ব প্রদান করে। ১৯৪২ সালের ১০ অক্টোবর তিনি মস্তিষ্কের ব্যাধিতে আক্রান্ত হন।

৩২. নজরুল ইসলামের সম্পাদিত পত্রিকা কয়টি ও কি কি?
উত্তর : কাজী নজরুল ইসলাম সম্পাদিত পত্রিকা তিনটি। যথা– 'দৈনিক নবযুগ' (১৯২০), অর্ধ সাপ্তাহিক 'ধূমকেতু' (১৯২২), সাপ্তাহিক 'লাঙ্গল' (১৯২৫)।

৩৩. কাজী নজরুল ইসলাম কোন কোন কবিতা বা গ্রন্থ রচনার জন্য কারাবরণ করেন?
উত্তর : কবি কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬ খ্রি) তার 'আনন্দময়ীর আগমনে' (১৯২২) কবিতাটি রচনার জন্য কারারুদ্ধ হন এবং এক বছরের জন্য সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। 'প্রলয়শিখা' (১৯৩০) গ্রন্থের জন্য তিনি ৬ মাস কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। 'বিদ্রোহী' কবিতা রচনার জন্য কারাবরণ না করলেও এর মাধ্যমে তিনি বিদ্রোহী কবি হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন।

৩৪. কাজী নজরুল ইসলামের 'অগ্নিবীণা' কাব্য নিষিদ্ধ হয় কেন?
উত্তর : বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলামের বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ 'অগ্নিবীণা'তে 'রক্তাম্বরধারিণী মা' কবিতাটি অন্তর্ভুক্ত। কবিতাটি ১৩২৯ বঙ্গাব্দের ভাদ্র মাসে প্রথম ধূমকেতু পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। পরবর্তীতে কবিতাটিতে তৎকালীন রাজনৈতিক চেতনা প্রাধান্য পাওয়ায় ব্রিটিশ সরকার এ কবিতাটির জন্যই অগ্নিবীণা কাব্যকে নিষিদ্ধ করে।

৩৫. কাজী নজরুল ইসলামের নামের সাথে জড়িত 'ধূমকেতু' কোন ধরনের প্রকাশনা? বিশেষ দিকগুলো উল্লেখ করুন।
উত্তর : বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬ খ্রি) সাহিত্যসেবার পাশাপাশি সাংবাদিকতায়ও আত্মনিয়োগ করেছিলেন। তার সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় অর্ধ সাপ্তাহিক পত্রিকা 'ধূমকেতু' (১৯২২)। এতে দেশের মুক্তির দিশারি হিসেবে 'অনুশীলন' ও 'যুগান্তর' দলের সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনকে উৎসাহ প্রদান ও ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা দাবি করে তৎকর্তৃক বহু অগ্নিঝরা সম্পাদকীয়, কবিতা ও প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। উল্লেখ্য, 'ধূমকেতু'র পূজা সংখ্যায় (২২ সেপ্টেম্বর ১৯২২) তার 'আনন্দময়ীর আগমনে' কবিতা প্রকাশিত হওয়ায় তিনি গ্রেপ্তার হন।

৩৬. কাজী নজরুল ইসলামের প্রথম প্রকাশিত গল্প, কবিতা ও প্রবন্ধের নাম লিখুন।
উত্তর : কাজী নজরুল ইসলামের প্রথম প্রকাশিত গল্প 'বাউণ্ডেলের আত্মকাহিনী', প্রথম কবিতা 'মুক্তি' এবং প্রথম প্রবন্ধ 'তুর্ক মহিলার ঘোমটা খোলা'।

৩৭. কাজী নজরুল ইসলামের কয়টি উপন্যাস? এগুলোর নাম কি?
উত্তর : বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম রচিত উপন্যাসের সংখ্যা ৩টি। এগুলো হলো : ১. বাঁধনহারা, ২. কুহেলিকা ও ৩. মৃত্যুক্ষুধা।

৩৮. নজরুলের বিদ্রোহের নানা প্রান্ত উন্মোচন করুন।
উত্তর : মানবপ্রেমই নজরুলের বিদ্রোহের সঞ্চালিকা শক্তি। নজরুলের বিদ্রোহ অগণিত সাধারণ মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা, অভাব-অভিযোগকে কেন্দ্র করে। গতানুগতিক মূল্যবোধ ও প্রচলিত সংস্কার বিশ্বাসকে আঘাত করে সেখানে নতুন মূল্যবোধের প্রতিষ্ঠা। পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করতে সকল প্রকার শোষণের ও নিপীড়নের বিরুদ্ধেই ছিল তার বিদ্রোহ; যা তার সাহিত্যের মধ্য দিয়ে স্পষ্ট হয় উঠেছে।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



**৩৯. নজরুলের বিদ্রোহী কবিতার 'আমি' কে?**

উত্তর : নজরুলের বিদ্রোহী কবিতায় অনাদৃত, লাঞ্ছিত, উৎপীড়িত, অবমানিত গণমানুষের প্রতীক হচ্ছে 'আমি'। এই 'আমি'র উদার আঙিনায় সমস্ত সাধারণ এসে ভিড় জমিয়েছে, যাদের মুখে এতকাল কোনো ভাষা ছিল না, যাদের মনে ছিল না কোনো আত্মবিশ্বাস। সেই অগণিত নির্যাতিত, অবহেলিত মানুষের প্রতিভূ হলো নজরুলের 'আমি'।

**৪০. কাজী নজরুল ইসলামের জীবনের বৈচিত্র্যময় দিকগুলো তুলে ধরুন।**

উত্তর : বাংলাদেশের জাতীয় কবি এবং অবিভক্ত বাংলার সাহিত্য, সমাজ ও সংস্কৃতি ক্ষেত্রের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে তিনি 'বিদ্রোহী কবি' এবং আধুনিক বাংলা গানের জগতে 'বুলবুল' নামে খ্যাত। রবীন্দ্রনাথের অনুকরণমুক্ত কবিতা রচনায় তাঁর অবদান খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর ব্যতিক্রমধর্মী কবিতার জন্যই 'ত্রিশোত্তর আধুনিক কবিতা'র সৃষ্টি সহজতর হয়েছিল বলে মনে করা হয়। নজরুল সাহিত্যকর্ম এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে অবিভক্ত বাংলায় পরাধীনতা, সাম্প্রদায়িকতা, সাম্রাজ্যবাদ, উপনিবেশবাদ, মৌলবাদ এবং দেশী-বিদেশী শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেন। তাঁর সংগ্রামী জীবনে রচনার মধ্যে রয়েছে– কাব্যগ্রন্থ, উপন্যাস, গল্পগ্রন্থ, নাটক, প্রবন্ধ, সঙ্গীতগ্রন্থ, কাব্যানুবাদ। এ মহান কবি বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উত্তরপার্শ্বে চিরনিদ্রায় সমাহিত।

**৪১. কাজী নজরুল ইসলামের 'দারিদ্র্য' কবিতাটি কোন কাব্যের অন্তর্ভুক্ত?**

উত্তর : 'দারিদ্র্য' কবিতাটি 'সিন্ধু-হিন্দোল' কাব্যের অন্তর্ভুক্ত।

**৪২. 'আমি অর্ফিয়াসের বাঁশরি'– কোন কবির উক্তি?**

উত্তর : 'আমি অর্ফিয়াসের বাঁশরি' এটি বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের উক্তি। উক্তিটি তার অগ্নিবীণা কাব্যগ্রন্থের 'বিদ্রোহী' কবিতার অন্তর্গত।

## পল্লীকবি জসীমউদ্‌দীন (১৯০৩-১৯৭৬)

গ্রামীণ জীবন ও সংস্কৃতির অবহেলিত উপকরণ সংগ্রহের মাধ্যমে আধুনিক বাংলা কবিতার ভাব প্রকাশ ও আঙ্গিক নির্মাণের স্বতন্ত্র বলয় সৃষ্টি করেছেন যিনি, তিনি পল্লীকবি জসীমউদ্‌দীন। কাহিনী, কাব্য, ছন্দ ও গীতিময়তায় তিনি বাংলা কাব্যে নবদিগন্তের সূচনা করেন। পল্লী বাংলার সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, বিরহ-বেদনা তার লেখায় জীবন্তভাবে ধরা দিয়েছে।

**জন্ম :** ১৯০৩ সালের ১ জানুয়ারি, ফরিদপুর জেলার তাম্বুলখানা গ্রামের মাতুলালয়ে।

**পৈতৃক নিবাস :** একই জেলার গোবিন্দপুর গ্রামে।

**পিতা ও মাতা :** স্কুল শিক্ষক আনসার উদ্দীন মোল্লা এবং আমিনা খাতুন ওরফে রাঙাছুট।

**ছাত্রজীবন :** পাশের গ্রাম শোভারামপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার মাধ্যমে বাল্যশিক্ষার সূচনা। ১৯২১ সালে ফরিদপুর জেলা স্কুল থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাস করার পর ১৯২৪ সালে ফরিদপুর রাজেন্দ্র কলেজ থেকে আইএ এবং ১৯২৯ সালে বিএ পাস করেন। ১৯৩১ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এমএ পাস করেন।

**বিবাহ :** ১৯৩৯ সালে মাদারীপুর জেলার নলগড়া গ্রামের মহসী উদ্দীন খানের কন্যা মমতাজ বেগমের (মণিমালা) সঙ্গে।



**কর্মজীবন :** ১৯৩১-৩৭ পর্যন্ত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে দীনেশচন্দ্র সেনের অধীনে রামতনু লাহিড়ী রিসার্চ অ্যাসিস্ট্যান্ট। ১৯৩৮ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে প্রভাষক হিসেবে যোগদান। ১৯৪৪ সালে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সরকারের পাবলিসিটি বিভাগের অফিসার পদে যোগদান। ১৯৪৭ সালে পূর্ব পাকিস্তান সরকারের প্রচার বিভাগে যোগদান। ১৯৬২ সালে সরকারি চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ।

**পরলোকগমন :** ১৯৭৬ সালের ১৩ মার্চ কবি ঢাকায় ইন্তেকাল করেন। কবির ইচ্ছানুযায়ী নিজ বাড়ি ফরিদপুরের আম্বিকাপুর গ্রামে দাদীর কবরের পাশে তাকে দাফন করা হয়।

**কাব্যগ্রন্থ :** রাখালী (১৯২৭), নকশী কাঁথার মাঠ (১৯২৯), বালুচর (১৯৩০), ধানক্ষেত (১৯৩৩), সোজন বাদিয়ার ঘাট (১৯৩৪), হাসু কান্দে (১৯৬৩), রূপবতী (১৯৪৬), মাটির কান্না (১৯৫৮), সকিনা (১৯৫৯), সুচয়নী (১৯৬১), মা যে জননী কান্দে (১৯৬৩), হলুদ বরণী ( ১৯৬৬), জলে লেখন (১৯৬৯), ভয়াবহ সেই দিনগুলোতে (১৯৭২), মাগো জ্বালায়ে রাখিস আলো (১৯৭৬), কাফনের মিছিল (১৯৮৮)।

**নাটক :** পদ্মাপাড় (১৯৫০), বেদের মেয়ে (১৯৫১), মধুমালা (১৯৫১), পল্লীবধূ (১৯৫৬), গ্রামের মায়া (১৯৫৯), ওগো পুষ্পধনু (১৯৬৮), আসমান সিংহ (১৯৮৬)।

**উপন্যাস :** বোবা কাহিনী (১৯৬৪)।

**গল্পগ্রন্থ :** বাঙ্গালীর হাসির গল্প (১ম খণ্ড -১৯৬০, ২য় খণ্ড -১৯৬৪)।

**গদ্যগ্রন্থ :** যাদের দেখেছি (স্মৃতিকথা, ১৯৫২), ঠাকুর বাড়ির আঙিনায় (স্মৃতিকথা, ১৯৬১)।

**শিশুতোষ গ্রন্থ :** হাসু (১৯৩৮), এক পয়সার বাঁশী (১৯৪৯), ডালিম কুমার (১৯৫১)।

**ভ্রমণকাহিনী :** চলে মুসাফির (১৯৫২), হলদে পরীর দেশ (১৯৬৭), যে দেশে মানুষ বড় (১৯৬৮)।

**পুরস্কার :** প্রেসিডেন্টের প্রাইড অব পারফরমেন্স (১৯৫৮), রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি. লিট ডিগ্রি (১৯৬৯), বাংলা একাডেমী সাহিত্য পুরস্কার (প্রত্যাখ্যান) (১৯৬৪), একুশে পদক (১৯৭৬), স্বাধীনতা দিবস পুরস্কার (মরণোত্তর) (১৯৭৬)।

**মডেল প্রশ্ন**

**১. 'নকশী কাঁথার মাঠ' কাব্যের রচয়িতা কে? কোন জাতীয় রচনা?**

উত্তর : জসীমউদ্‌দীন। কাব্যগ্রন্থ।

**২. 'কবর' কবিতার রচয়িতা কে? কোন কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত?**

উত্তর : জসীমউদ্‌দীন। 'রাখালী' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত।

**৩. জসীমউদ্‌দীনের কয়েকটি কাব্যগ্রন্থের নাম উল্লেখ করুন।**

উত্তর : সোজন বাদিয়ার ঘাট, বালুচর, ধানক্ষেত, রাখালী ইত্যাদি।

**৪. 'নকশী কাঁথার মাঠ' কাব্যগ্রন্থের ইংরেজি অনুবাদ কোনটি? এটি কে অনুবাদ করেন?**

উত্তর : The Field of the Embroidered Quilt, অনুবাদ করেন E. M. Milford।

**৫. জসীমউদ্‌দীন কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?**

উত্তর : ফরিদপুর জেলার তাম্বুলখানা গ্রামে।

**৬. জসীমউদ্‌দীনের তিনটি কাব্যগ্রন্থের নাম লিখুন।**

উত্তর : জসীমউদ্‌দীনের তিনটি কাব্যগ্রন্থ হলো : ১. নকশী কাঁথার মাঠ, ২. সোজন বাদিয়ার ঘাট, ৩. রাখালী।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



৭. 'নকসী কাঁথার মাঠ' কি ধরনের কাব্য? সংক্ষেপে এর পরিচয় দিন।

উত্তর : 'নকসী কাঁথার মাঠ' (১৯২৯) হচ্ছে গাথাকাব্য। চাষীর ছেলে রূপাই ও পাশের গ্রামের মেয়ে সাজুর প্রেম, বিয়ে, সুখময় জীবন, বিচ্ছেদ কাহিনী নিয়ে রচিত। এ কাব্যের ইংরেজি অনুবাদ করেন E.M. Milford 'Field of the Embroidery Quilt' নামে।

৮. জসীমউদ্দীনের প্রথম প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ কোনটি? তার প্রথম নাটক, ভ্রমণ সাহিত্য, প্রবন্ধগ্রন্থ ও উপন্যাসের নাম লিখুন।

উত্তর : পল্লীকবি জসীমউদ্দীন (১৯০৩-১৯৭৬ খ্রি) এর প্রকাশিত প্রথম কাব্যগ্রন্থ হলো 'রাখালী' (১৯২৭)। জসীমউদ্দীনের প্রথম নাটক 'পদ্মাপাড়' (১৯৫০), প্রথম ভ্রমণ সাহিত্য 'চলে মুসাফির' (১৯৫৭), প্রথম প্রবন্ধগ্রন্থ 'জারীগান' (১৯৬৮) এবং প্রথম ও একমাত্র উপন্যাস 'বোবা কাহিনী' (১৯৬৪)।

৯. 'জসীমউদ্দীনের কবিতার বিষয় কেবলই গ্রাম।'–কেন?

উত্তর : জসীমউদ্দীন যুগের বিক্ষোভ ও আলোড়ন থেকে নিজেকে সরিয়ে রেখে গ্রামীণ প্রকৃতির অনাবিল সৌন্দর্যের মধ্যে নিজেকে বিলীন করেছিলেন। সেখান থেকেই তিনি সংগ্রহ করেছেন তার কাব্যের উপকরণ। পল্লী এবং পল্লীর মানুষকেই তিনি তার কবিতায় ফুটিয়ে তুলেছেন। এ কারণে তার কবিতার বিষয় কেবলই গ্রাম।

১০. জসীমউদ্দীনের 'কবর' কবিতা সম্পর্কে লিখুন।

উত্তর : জসীমউদ্দীনের ছাত্রাবস্থায় 'কবর' কবিতা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমিক পর্যায়ের পাঠ্য তালিকাভুক্ত হয়। কবিতাটি প্রথম 'কল্লোল' পত্রিকায় ছাপা হয়। এ কবিতায় এক বৃদ্ধ দাদু তার জীবনের শোকার্ত অধ্যায়গুলো উন্মোচন করেছেন তার একমাত্র অবলম্বন নাতির কাছে।

## রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন (১৮৮০-১৯৩২)

রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন এ দেশের নারী জাতির মুক্তির অগ্রদূত। এ দেশের নারীরা যুগ যুগ ধরে ছিলেন নির্যাতিত, অবহেলিত এবং নানা কুসংস্কার ও সামাজিক বাধানিষেধের বেড়াজালে বন্দী। বিশেষত, তার সময়কালে বাঙালি মুসলমান সমাজের অবস্থা ছিল খুবই পতিত। মুসলমানদের সমস্ত গৌরব তখন লুপ্ত। তারা সামাজিক ও রাজনৈতিকভাবে পড়েছিলেন পিছিয়ে। অশিক্ষা, সংস্কার ও ধর্মান্ধতার ফলে তাদের অবস্থা হয়ে পড়েছিল খুবই শোচনীয় আর নারীদের অবস্থা ছিল আরো করুণ। সে সময় মুসলিম জাতির উদ্ধারকল্পে বেশ কয়েকজন ক্ষণজন্মা পুরুষ জন্মালেও রোকেয়াই ছিলেন একমাত্র নারী, যিনি ইতিহাসে তার নাম স্বর্ণাক্ষরে লিখে রেখে গেছেন এবং নারী জাতির মুক্তি ও কল্যাণের জন্য সারাজীবন সংগ্রাম করে গেছেন। তার সাহিত্য সাধনা, সংগ্রাম, স্বপ্ন ও সংগঠন সবকিছুই ছিল নারীদের জন্য নিবেদিত। তাই তিনি কেবল একজন সুসাহিত্যিকই নন, বাঙালি নারীর মুক্তির সংগ্রামের প্রথম সাহসী সংগ্রামী এবং নারীকল্যাণের দূত। কিন্তু সবকিছু ছাপিয়েও তার সাহিত্য সাধনা বিশেষ মূল্য বহন করে এবং তিনি তার সাহিত্যসাধনা দ্বারা বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে প্রভূত অবদান রেখে গেছেন।

জন্ম : ৯ ডিসেম্বর, ১৮৮০।

জন্মস্থান : রংপুর জেলার পায়রাবন্দ গ্রাম।



পিতা : জহীরুদ্দিন মোহাম্মদ আবু আলী হায়দার সাবের (ভূস্বামী)।

মাতা : রাহাতুন্নেসা সাবেরা চৌধুরানী।

শিক্ষা : পারিবারিক বাধা-নিষেধ সত্ত্বেও বড় ভাই ও বড় বোনের উৎসাহ ও যত্নে বাংলা ভাষা ও ইংরেজি ভাষায় ব্যুৎপত্তি অর্জন।

বিবাহ : বিহারের ভাগলপুরের অধিবাসী খান বাহাদুর সৈয়দ সাখাওয়াত হোসেনের সঙ্গে (১৮৯৮)।

সাহিত্যিক হিসেবে আত্মপ্রকাশ : ১৯০২ সালে প্রথম রচনা 'পিপাসা (মহরম)' প্রকাশিত হয় কলকাতার নবপ্রভা পত্রিকায়।

প্রথম স্কুল প্রতিষ্ঠা : ১৯০৯ সালের ১ অক্টোবর মাত্র পাঁচজন ছাত্রী নিয়ে বিহারে 'সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল' চালু।

কলকাতায় স্কুল স্থানান্তর : ১৯১১ সালের ১৬ মার্চ দ্বিতীয় ও চূড়ান্ত পর্যায়ে সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল প্রতিষ্ঠা। (১৩নং ওয়ালিউল্লাহ লেন, কলকাতা)।

মহিলা সংগঠন প্রতিষ্ঠা : আঞ্জুমানে খাওয়াতীনে ইসলাম

মৃত্যু : ৯ ডিসেম্বর, ১৯৩২। ফজরের আজানের পর (এর আগের রাতে ১১টার সময় তিনি লিখেছিলেন তার শেষ রচনা 'নারীর অধিকার')।

রচনাবলী : মতিচূর প্রথম খণ্ড (১৯০৪) মতিচূর দ্বিতীয় খণ্ড (১৯২২) পদ্মরাগ (১৯২৪) Sultana's Dream (১৯২২) অবরোধ-বাসিনী (১৯৩১) রোকেয়া পত্র পরিচিতি (মোশফেকা মাহমুদ সম্পাদিত) (১৯৬৫), রোকেয়া রচনাবলী (আবদুল কাদির সম্পাদিত) (১৯৭৩)

এছাড়া তার অজস্র প্রবন্ধ-গল্প-কবিতা প্রভৃতি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এগুলোর অধিকাংশই আবদুল কাদির সম্পাদিত রোকেয়া রচনাবলীতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

**মডেল প্রশ্ন**

১. রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন কবে কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?

উত্তর : রংপুর জেলার পায়রাবন্দ গ্রামে; ১৮৮০ সালের ৯ ডিসেম্বর।

২. 'মতিচূর' ও 'অবরোধবাসিনী' রোকেয়ার কোন ধরনের রচনা?

উত্তর : গদ্যগ্রন্থ।

৩. 'পদ্মরাগ' (১৯২৪) তার কোন ধরনের রচনা?

উত্তর : উপন্যাস।

৪. তিনি কবে কোথায় মৃত্যুবরণ করেন?

উত্তর : ৯ ডিসেম্বর ১৯৩২; কোলকাতা।

৫. রোকেয়া সাখাওয়াতের উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলোর নাম লিখুন।

উত্তর : রোকেয়া সাখাওয়াত রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থসমূহ– পদ্মরাগ, মতিচূর, সুলতানার স্বপ্ন, অবরোধবাসিনী প্রভৃতি।

৬. মুসলিম নারী জাগরণের অগ্রদূত বলা হয় কাকে? কেন বলা হয়?

উত্তর : রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনকে মুসলিম নারী জাগরণের অগ্রদূত বলা হয়। মতিচূর, সুলতানার স্বপ্ন, পদ্মরাগ, অবরোধবাসিনী প্রভৃতি বেগম রোকেয়ার প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। এ গ্রন্থসমূহের মাধ্যমে তিনি মুসলিম নারী সমাজের দুর্দশার চিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



৭. **রোকেয়া সাখাওয়াতের পরিচয় দিন। তার অবদান উল্লেখ করুন।**
**উত্তর :** বাঙালি মুসলিম নারী জাগরণের অগ্রদূত রোকেয়া সাখাওয়াত ৯ ডিসেম্বর ১৮৮০ রংপুর জেলার পায়রাবন্দ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। রোকেয়া সারা জীবন কুশিক্ষা ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে লড়ে গেছেন। তিনি ১৯০৬ সালে 'আঞ্জুমান খাওয়াতীন' নামে একটি মহিলা সমিতি প্রতিষ্ঠা করেন। রোকেয়া যেসব গ্রন্থ রচনা করেন সেসবের নাম : 'মতিচূর', 'পদ্মরাগ', 'অবরোধবাসিনী' ও 'সুলতানার স্বপ্ন'। 'সুলতানার স্বপ্ন' প্রকৃতপক্ষে তার ইংরেজি গ্রন্থ, নাম 'Sultana's Dream'। ১৯৩২ সালের ৯ ডিসেম্বর মৃত্যুবরণ করেন এ মহিয়সী নারী।

৮. **রোকেয়া সাখাওয়াতের পিতা ও স্বামীর নাম কি?**
**উত্তর :** রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন ছিলেন একজন সাহিত্যিক, সমাজসেবী ও শিক্ষাব্রতী। এক রক্ষণশীল মুসলিম পরিবারে তার জন্ম। তার পিতা জহির উদ্দীন আবু আলী হায়দর সাবের, স্বামী সাখাওয়াত হোসেন।

৯. **বিবিসি জরিপে সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালির তালিকায় রোকেয়া সাখাওয়াতের অবস্থান কততম?**
**উত্তর :** বিবিসি জরিপে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালির তালিকায় তার স্থান ৬ষ্ঠ।

১০. **'রোকেয়াই বাংলা সাহিত্যে প্রথম নারীবাদী লেখক'– কথাটি বুঝিয়ে দিন।**
**উত্তর :** রোকেয়াকে বলা হয় মুসলিম নারীমুক্তি আন্দোলনের পথিকৃৎ। তিনি বাংলা গদ্যের একজন বিশিষ্ট শিল্পী, সমাজের কুসংস্কার ও জড়তা দূর করে নারীকে সামনে এগিয়ে যাওয়ার জন্য তিনি তার লেখনী ধারণ করেন। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকেই তিনি বাংলা সাহিত্যে 'নারীর অধিকার' বিষয়ক অনেক প্রবন্ধ রচনা করে নারীদের সচেতন করার চেষ্টা করেন। এ কারণেই তাকে বাংলা সাহিত্যে প্রথম নারীবাদী লেখক বলা হয়।

১১. **নারী শিক্ষাবিস্তারে রোকেয়া সাখাওয়াতের ভূমিকা কথা লিখুন।**
**উত্তর :** রোকেয়া কলকাতায় সাখাওয়াত মেমোরিয়াল উর্দু প্রাইমারি স্কুল স্থাপন করেন ১৬ মার্চ ১৯১১ সালে। ১৯১৭ সালে এই স্কুল মধ্য ইংরেজি গার্লস স্কুলে ও ১৯৩১ সালে উচ্চ ইংরেজি গার্লস স্কুলে রূপান্তরিত হয়। আমৃত্যু তিনি এই স্কুলের প্রধান শিক্ষয়িত্রী ও সুপারিনটেনডেন্ট পদে দায়িত্ব পালন করেন। মুসলিম নারী শিক্ষার অন্ধকার যুগে কলকাতার বিভিন্ন মহল্লায় ঘুরে ঘুরে তিনি ছাত্রী সংগ্রহ করতেন এবং নারীদের সচেতন করার চেষ্টা করতেন।

১২. **মুসলমান মহিলাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে রোকেয়া কোন প্রতিষ্ঠানটি গড়ে তুলেছিলেন?** ***অথবা,* সমাজে নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে তার প্রতিষ্ঠিত সংগঠনের নাম কি?**
**উত্তর :** আঞ্জুমানে খাওয়াতীনে ইসলাম।

১৩. **'অবরোধবাসিনী' কার রচনা? তার কাছে আমরা কেন ঋণী?**
**উত্তর :** 'অবরোধবাসিনী' রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন রচিত একটি 'গদ্যগ্রন্থ'। রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন এ দেশের নারীসমাজের মুক্তির অগ্রদূত। নারী জাতির মুক্তি ও কল্যাণের জন্য সারা জীবন সংগ্রাম করে গেছেন। তৎকালীন নারীসমাজ অশিক্ষা, কুসংস্কার ও ধর্মান্ধতার বেড়াজালে আবদ্ধ ছিল, বিশেষত বাঙালি মুসলমান সমাজের অবস্থা ছিল খুবই পতিত। আর সে সমাজব্যবস্থা থেকে নারী জাতিকে টেনে তুলে মুক্তি ও কল্যাণের পথের অগ্রপথিক হিসেবে ভূমিকা পালন করেন এ মহীয়সী নারী। তার সাহিত্য-সাধনা, সংগ্রাম, স্বপ্ন ও সংগঠন সবকিছুই ছিল নারীদের জন্য নিবেদিত। তাই তার কাছে আমরা তথা বাংলার নারীসমাজ চিরঋণী।



১৪. **রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন সম্পর্কে যা জানেন লিখুন।**
**উত্তর :** বাঙালি মুসলিম নারী জাগরণের অগ্রদূত রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন ১৮৮০ সালে রংপুর জেলার পায়রাবন্দ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম জহিরুদ্দীন মোহাম্মদ আবু আলী সাহেব। রোকেয়ার স্বামী খান বাহাদুর সাখাওয়াত হোসেন ছিলেন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট।
রোকেয়ার বিয়ে হয়েছিল আঠারো বছর বয়সে। স্বামী হারান আটাশ বছর বয়সে। বৈধব্য যন্ত্রণা ভোলার জন্য তিনি কাজের মধ্যে ডুবে যান। ভাগলপুরে মাত্র পাঁচজন ছাত্রী নিয়ে প্রথমে 'সাখাওয়াত মেমোরিয়াল স্কুল' স্থাপন করেন। কিন্তু পারিবারিক কারণে ভাগলপুরে টিকতে পারলেন না, চলে এলেন কলকাতায়। ১৯১১ সালে মাত্র আটজন ছাত্রী নিয়ে সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুলের কাজ শুরু করলেন। স্কুল পরিচালনায় তাঁর ইংরেজি, বাংলা ও উর্দু ভাষাজ্ঞান তাঁকে সাহায্য করেছিল। এ স্কুলটি রোকেয়ার অক্লান্ত পরিশ্রমে ও অন্যান্য গুণী ব্যক্তির সাহায্য-সহযোগিতার ফলে ইংরেজি স্কুলে রূপ নিয়েছিল।
রোকেয়া সারা জীবন কুশিক্ষা ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে লড়ে গেছেন। তার রচনায় তার স্বাক্ষর আছে। তিনি ১৯০৬ সালে 'আঞ্জুমান খাওয়াতীন' নামে একটি মহিলা সমিতি প্রতিষ্ঠা করেন। রোকেয়া যেসব গ্রন্থ রচনা করেন সেসবের নাম : 'মতিচুর', 'পদ্মরাগ', 'অবরোধবাসিনী' ও 'সুলতানার স্বপ্ন'। 'সুলতানার স্বপ্ন' প্রকৃতপক্ষে তার ইংরেজি গ্রন্থ, নাম 'Sultana's Dream'। এটি একটি ক্ষুদ্র ইংরেজি পুস্তক। ১৯৩২ সালের ৯ ডিসেম্বর মৃত্যুবরণ করেন এই মহিয়সী নারী।

## ফররুখ আহমদ (১৯১৮-১৯৭৪)

ফররুখ আহমদ যশোর জেলার মাঝআইল গ্রামে ১০ জুন, ১৯১৮ সালে জন্মগ্রহণ করেন।

**কাব্যগ্রন্থ :** সাত সাগরের মাঝি (১৯৪৪), সিরাজাম্ মুনীরা (১৯৫২), নৌফেল ও হাতেম (১৯৬১), হাতেমতায়ী (১৯৬৬)।
**সনেট সংকলন :** মুহূর্তের কবিতা (১৯৬২)।
**শিশুতোষ গ্রন্থ :** পাখির বাসা (১৯৬৫), নতুন লেখা (১৯৬৯), হরফের ছড়া (১৯৭০), ছড়ার আসর (১৯৭০), হে বন্য স্বপ্নেরা, হাবেদা মরুর কাহিনী।
**পুরস্কার :** ১৯৬০ সালে বাংলা একাডেমী সাহিত্য পুরস্কার, ১৯৬১ সালে পাকিস্তান সরকারের প্রেসিডেন্ট পুরস্কার 'প্রাইজ অব পারফরমেন্স', ১৯৬৬ সালে 'হাতেমতায়ী' গ্রন্থের জন্য আদমজী পুরস্কার এবং একই বছর 'পাখির বাসা' গ্রন্থের জন্য 'ইউনেস্কো' পুরস্কার। 'একুশে পদক' মরণোত্তরে ভূষিত।
**মৃত্যু :** ১৯ অক্টোবর ১৯৭৪।

**মডেল প্রশ্ন**

১. **ফররুখ আহমদের পরিচয় কি? সাহিত্যে তার উল্লেখযোগ্য অবদান সম্পর্কে আলোকপাত করুন।**
**উত্তর :** মুসলিম রেনেসাঁর কবি ফররুখ আহমদ। তিনি ছিলেন ইসলামী আদর্শের উজ্জ্বল প্রতীক। 'সাতসাগরের মাঝি' (১৯৪৪) তার শ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ। তাঁর রচিত শিশুতোষ গ্রন্থ 'পাখির বাসা' (১৯৬৫)-এর জন্য তিনি ১৯৬৬ সালে ইউনেস্কো পুরস্কার লাভ করেন। 'হাতেমতায়ী' তাঁর রচিত কাহিনী কাব্য। ১৯৬৬ সালে 'হাতেমতায়ী' গ্রন্থের জন্য তিনি আদমজী পুরস্কার লাভ করেন। আর 'নৌফেল ও হাতেম' (১৯৬১) তাঁর কাব্যনাট্যের নাম।

২. **ফররুখ আহমদের জন্মতারিখ কত?**
**উত্তর :** ১০ জুন, ১৯১৮।

৩. **তিনি কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?**
**উত্তর :** মাঝআইল গ্রাম, যশোর।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



৪. **তিনি মূলত কি ছিলেন?**
উত্তর : ইসলামী স্বাতন্ত্র্যবাদী কবি।

৫. **তাঁর রচিত কবিতায় কি কি উজ্জ্বলভাবে প্রস্ফুটিত হয়েছে?**
উত্তর : ইসলামী আদর্শ এবং আরব-ইরানের ঐতিহ্য।

৬. **তাঁর রচিত কবিতা কেন বিশিষ্ট?**
উত্তর : আরবি-ফারসি শব্দের প্রয়োগ নৈপুণ্যে, বিষয়বস্তু ও আঙ্গিকের অভিনবত্বে।

৭. **তিনি তার হাতেম তায়ী গ্রন্থের জন্য কি পুরস্কার লাভ করেন?**
উত্তর : আদমজী পুরস্কার (১৯৬১)।

৮. **তিনি 'পাখির বাসা' গ্রন্থের জন্য কি পুরস্কার লাভ করেন?**
উত্তর : ইউনেস্কো (১৯৬৬)।

৯. **তিনি আর কি কি পুরস্কারে ভূষিত হন?**
উত্তর : বাংলা একাডেমী পুরস্কার, একুশে পদক।

১০. **ফররুখ আহমদ রচিত শ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থের নাম কি?**
উত্তর : সাত সাগরের মাঝি (১৯৪৪)।

১১. **ফররুখ আহমদ রচিত কাব্যনাট্যের নাম কি?**
উত্তর : নৌফেল ও হাতেম (১৯৬১)।

১২. **ফররুখ আহমদ রচিত সনেট সংকলনের নাম কি?**
উত্তর : মুহূর্তের কবিতা (১৯৬৩)।

১৩. **ফররুখ আহমদ রচিত শিশুতোষ গ্রন্থের নাম কি?**
উত্তর : পাখির বাসা (১৯৬৫)।

১৪. **ফররুখ আহমদ রচিত কাহিনীকাব্যের নাম কি?**
উত্তর : হাতেম তায়ী (১৯৬৬)।

১৫. **তিনি কত তারিখে মৃত্যুবরণ করেন?**
উত্তর : ১৯ অক্টোবর ১৯৭৪।

## কায়কোবাদ (১৮৫৭-১৯৫১)

মোহাম্মদ কাজেম আল কোরেশী বাংলা সাহিত্যে কায়কোবাদ নামে পরিচিত। কায়কোবাদ গীতিকবিতা রচনার মাধ্যমে সাহিত্যক্ষেত্রে আবির্ভূত হন। কিন্তু মহাকাব্য রচনাতেই তিনি প্রতিভা বিকাশের সার্থকতা অনুভব করেছেন। মুসলমানদের গৌরবময় ইতিহাসের কাহিনী অবলম্বনে 'মহাশ্মশান' নামে মহাকাব্য রচনা করেন। ১৭৬১ খ্রিস্টাব্দে পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এ যুদ্ধে মহারাষ্ট্রীয়দের পরাজয় এবং আহমদ শাহ আবদালীর বিজয় বর্ণনা কাব্যটির বিষয়বস্তু। মহাশ্মশান ১৯০৪ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। সমগ্র কাব্যটি তিনখণ্ডে বিভক্ত। গীতিকবিতার ক্ষেত্রে তার প্রতিভা প্রথম জীবনে 'অশ্রুমালা' (১৮৯৫) কাব্য রচনাতেই প্রকাশ পেয়েছিল। বিরহবিলাপ (১৮৭০), কুসুমকানন (১৮৭৩) তার প্রথম জীবনের রচনা। কায়কোবাদ তার সাহিত্যজীবনের শেষ পর্বে আখ্যানকাব্য রচনায় মনযোগী হন। এ পর্বে তার উল্লেখযোগ্য সাহিত্যকর্ম শিবমন্দির (১৯২১), অমিয় ধারা (১৯২৩), শ্মশান ভস্ম (১৯৩৮), মহরম শরীফ (১৯৩২) ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।



### মডেল প্রশ্ন

১. **কায়কোবাদের প্রকৃত নাম কি? তার জন্ম কোথায়?**
উত্তর : কায়কোবাদের প্রকৃত নাম মুহম্মদ কাজেম আল কুরায়শী। তার জন্মস্থান আগলা-পূর্বপাড়া গ্রাম, নবাবগঞ্জ, ঢাকা।

২. **বাঙালি মুসলমান কবিদের মধ্যে প্রথম মহাকাব্য রচয়িতা কে? কাব্যটির নাম কি?**
উত্তর : বাঙালি মুসলমান কবিদের মধ্যে প্রথম মহাকাব্য রচয়িতা কায়কোবাদ। কাব্যটির নাম 'মহাশ্মশান'।

৩. **কায়কোবাদ রচিত দুটি বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থের নাম লিখুন।**
উত্তর : গীতিকাব্য– অশ্রুমালা, মহাকাব্য– মহাশ্মশান।

৪. **আধুনিক বাংলা সাহিত্যে প্রথম মুসলিম কবি কে?**
উত্তর : কায়কোবাদ।

৫. **নিখিল ভারত সাহিত্য সংঘ কর্তৃক ১৯৩২ সালে তাকে কোন উপাধিগুলো দেয়া হয়?**
উত্তর : 'কাব্যভূষণ', 'বিদ্যাভূষণ', 'সাহিত্যরত্ন'।

৬. **কোন ঘটনা অবলম্বনে 'মহাশ্মশান' কাব্য রচিত হয়?**
উত্তর : ১৭৬১ খ্রিস্টাব্দে পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এ কাহিনী অবলম্বনে 'মহাশ্মশান' কাব্য রচিত হয়।

৭. **'মহাশ্মশান' কাব্যের কাহিনী কোন যুদ্ধভিত্তিক?**
উত্তর : বাঙালি মুসলমান কবিদের মধ্যে প্রথম মহাকাব্য রচয়িতা কবি কায়কোবাদ। তার 'মহাশ্মশান' মহাকাব্য পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধ অবলম্বনে (১৯০৫) ৩ খণ্ডে রচিত। প্রধান চরিত্র ইব্রাহিম কার্দি, জোহরা বেগম, হিরণবালা, আতা খাঁ, লঙ্গ, রত্নজি, সুজাদ্দৌলা, সেলিনা, আহমদ শাহ আবদালী প্রমুখ।

# আধুনিক ও সমসাময়িক কবি, লেখক ও নাট্যকার

## আখতারুজ্জামান ইলিয়াস (১৯৪৩-১৯৯৭)

জন্ম : ১২ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৩, গোহাটি গ্রাম, গাইবান্ধা (মাতুলালয়); পৈতৃক নিবাস : বগুড়া।

- তিনি মূলত কথাসাহিত্যিক।
- তার 'চিলেকোঠার সেপাই' উপন্যাসের উপজীব্য ১৯৬৯-এর গণআন্দোলন।
- অনাহার, অভাব ও শোষণের শিকার হয়ে যারা মানবেতর জীবনযাপন করছে, সেসব অবহেলিত মানুষের জীবনাচরণ তার গল্প ও উপন্যাসে উজ্জ্বলভাবে অঙ্কিত হয়েছে।

গল্প : অন্য ঘরে অন্য স্বর (১৯৭৬), খোঁয়ারি (১৯৮২), দুধভাতে উৎপাত (১৯৮৫), দোজখের ওম (১৯৮৯)।
উপন্যাস : চিলেকোঠার সেপাই (১৯৮৭) ও খোয়াবনামা (১৯৯৬)।
পুরস্কার : বাংলা একাডেমী পুরস্কার (১৯৮২)।
মৃত্যু : ৪ জানুয়ারি ১৯৯৭, ঢাকা, ক্যান্সার রোগে।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



**মডেল প্রশ্ন**

১. আখতারুজ্জামান ইলিয়াস কবে, কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?
উত্তর : ১২ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৩; গাইবান্ধা জেলার গোটিয়া গ্রামে (মাতুলালয়ে)।

২. আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের গল্প ও উপন্যাস সম্পর্কে কি বলা হয়?
উত্তর : অনাহার, অভাব, দারিদ্র্য ও শোষণের শিকার হয়ে যারা মানবেতর জীবনযাপন করছে সেসব অবহেলিত মানুষের জীবনাচরণ তার গল্প ও উপন্যাসে উজ্জ্বলভাবে অঙ্কিত হয়েছে।

৩. তার শ্রেষ্ঠ রচনা মহাকাব্যোচিত উপন্যাস কোনটি এবং এর বিষয়বস্তু কি?
উত্তর : খোয়াবনামা (১৯৯৬)। গ্রামবাংলার নিম্নবিত্ত শ্রমজীবী মানুষের জীবনালেখ্যসহ ফকির-সন্ন্যাসী বিদ্রোহ, তেভাগা আন্দোলন, ১৯৪৩-এর মন্বন্তর, পাকিস্তান আন্দোলন, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ইত্যাদি ঐতিহাসিক উপাদান।

৪. তিনি কোন রোগে কবে মারা যান?
উত্তর : ক্যান্সারে, ১৯৯৭ সালের ৪ জানুয়ারি।

## আবু ইসহাক (১৯২৬-২০০২)

জন্ম : ১ নভেম্বর ১৯২৬; শিরঙ্গল গ্রাম, নড়িয়া, শরীয়তপুর।

☐ তিনি মূলত পরিচিত ঔপন্যাসিক হিসেবে।
☐ পেশায় ছিলেন একজন সরকারি চাকুরে।
☐ 'সূর্য-দীঘল বাড়ী' উপন্যাসটি তার প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ। এ উপন্যাসে তৎকালীন গ্রামীণ মুসলমান জীবনের বাস্তব প্রতিচ্ছবি চিত্রিত হয়েছে। পঞ্চাশ সালের মন্বন্তর, দেশ বিভাগ, স্বাধীনতা লাভের আনন্দ, আশাভঙ্গের বেদনা তার উপন্যাসে স্থান পেয়েছে।

উপন্যাস : সূর্য-দীঘল বাড়ী (১৯৫৫), পদ্মার পলিদ্বীপ (১৯৮৬), জাল (১৯৮৮)।
গল্প : হারেম (১৯৬২), মহাপতঙ্গ (১৯৬৩)।
পুরস্কার : বাংলা একাডেমী পুরস্কার (১৯৬৩), একুশে পদক (১৯৯৭)।
মৃত্যু : ২০০২ সালে।

**মডেল প্রশ্ন**

১. আবু ইসহাক কবে, কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?
উত্তর : ১৯২৬ সালের ১ নভেম্বর; শরীয়তপুর জেলার নড়িয়ার শিরঙ্গল গ্রামে।

২. তিনি মূলত কি হিসেবে পরিচিত?
উত্তর : ঔপন্যাসিক হিসেবে।

৩. তার প্রকাশিত প্রথম গ্রন্থের নাম ও ধরন কি?
উত্তর : সূর্য-দীঘল বাড়ি (১৯৫৫); উপন্যাস।

৪. বাংলা একাডেমী থেকে প্রকাশিত, তার সম্পাদিত অভিধানের নাম কি?
উত্তর : সমকালীন বাংলা ভাষার অভিধান (১৯৯৩)।



## আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ (১৯৩৪-২০০১)

জন্ম : ৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৪, গীর্জা মহল্লা, বরিশাল।

☐ পেশায় ছিলেন বাংলাদেশ সরকারের প্রাক্তন সচিব, এরশাদ সরকারের মন্ত্রী।
☐ তিনি মানবতাবাদী ও দেশপ্রেমমূলক কবিতা রচনা করেছেন।
☐ 'কোন এক মাকে', 'আমি কিংবদন্তীর কথা বলছি' তার বিখ্যাত দুটি কবিতা।

কবিতা : সাতনরী হার (১৯৫৫), কখনো রং কখনো সুর (১৯৭০), কমলের চোখ (১৯৭৪), আমি কিংবদন্তীর কথা বলছি (১৯৮১), সহিষ্ণু প্রতীক্ষা (১৯৮২), প্রেমের কবিতা (১৯৮২), বৃষ্টি ও সাহসী পুরুষের জন্য প্রার্থনা (১৯৮৩), আমার সময় (১৯৮৭), নির্বাচিত কবিতা (১৯৯১), আমার সকল কথা (১৯৯৩)।
পুরস্কার : বাংলা একাডেমী পুরস্কার (১৯৭৯), একুশে পদক (১৯৮৫)।
মৃত্যু : ২০০১ সালে।

**মডেল প্রশ্ন**

১. আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ কবে, কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?
উত্তর : ১৯৩৪ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি; বরিশালের গীর্জা মহল্লায়।

২. তার প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থের নাম ও ধরন কি?
উত্তর : সাতনরী হার (১৯৫৫); কাব্যগ্রন্থ।

৩. তিনি পেশায় কি ছিলেন?
উত্তর : বাংলাদেশ সরকারের সচিব, এরশাদ সরকারের মন্ত্রী, বিশ্বখাদ্য ও কৃষি সংস্থার অতিরিক্ত মহাপরিচালক। কিন্তু তার সবচেয়ে বড় পরিচয় তিনি একজন কবি।

৪. তার উল্লেখযোগ্য দুটি কবিতার নাম লিখুন।
উত্তর : আমি কিংবদন্তীর কথা বলছি ও কোন এক মাকে (কুমড়ো ফুলে ফুলে নুয়ে পড়েছে লতাটা)।

৫. কবি আবুজাফর ওবায়দুল্লাহ কবে মৃত্যুবরণ করেন?
উত্তর : ২০০১ সালে।

## আবুল ফজল (১৯০৩-১৯৮৩)

জন্ম : ১ জুলাই ১৯০৩; কেঁওচিয়া গ্রাম, সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম।

☐ তার প্রথম পেশা স্কুল শিক্ষকতা। তিনি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হন ১৯৭৩ সালে।
☐ তিনি রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের উপদেষ্টা ছিলেন।
☐ তিনি ১৯২৬ সালে গঠিত 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ'-এর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা।
☐ তিনি 'বুদ্ধির মুক্তি' আন্দোলনের অন্যতম কর্ণধার।

উপন্যাস : চৌচির (১৯৩৪), প্রদীপ ও পতঙ্গ (১৩৪৭), রাঙ্গা প্রভাত (১৩৬৪)।
গল্পগ্রন্থ : মাটির পৃথিবী (১৩৪৭), শ্রেষ্ঠগল্প (১৩৭১), নির্বাচিত গল্প (১৯৭৮), মৃতের আত্মহত্যা (১৯৭৮)।
নাটক : কায়েদে আজম (১৯৪৬), প্রগতি (১৯৪৮), স্বয়ম্বরা (১৯৬৬)।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



প্রবন্ধ : বিচিত্র কথা (১৩৪৭), সাহিত্য ও সংস্কৃতি সাধনা (১৯৬১), সাহিত্য সংস্কৃতি ও জীবন (১৯৬৫), সমাজ সাহিত্য ও রাষ্ট্র (১৯৬৮), সমকালীন চিন্তা (১৯৭০), মানবতন্ত্র (১৩৭৯), সাহিত্য ও অন্যান্য প্রসঙ্গ (১৯৭৪), শুভবুদ্ধি (১৯৭৪), একুশ মানে মাথা নত না করা (১৯৭৮), রবীন্দ্র প্রসঙ্গ (১৯৭৯)।

আত্মকাহিনী ও দিনলিপি : রেখাচিত্র (১৯৬৬), লেখকের রোজনামচা (১৯৬৯), দুর্দিনের দিনলিপি (১৯৭২)।

জীবনী ও স্মৃতিকথা : সাংবাদিক মজিবর রহমান (১৯৬৭), শেখ মুজিব : তাঁকে যেমন দেখেছি (১৯৭৮)।

পুরস্কার : প্রেসিডেন্টের রাষ্ট্রীয় পুরস্কার (১৯৬৩) ও 'রেখাচিত্র' গ্রন্থের জন্য আদমজি পুরস্কার (১৯৬৬) লাভ।

উপাধি : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক ডক্টরেট উপাধি প্রদান (১৯৭৪)। 'মুক্তবুদ্ধির চির সজাগ প্রহরী' বলে আখ্যায়িত।

মৃত্যু : ৪ মে ১৯৮৩; চট্টগ্রাম।

**মডেল প্রশ্ন**

১. আবুল ফজল কবে এবং কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?
উত্তর : ১ জুলাই ১৯০৩; কেঁওচিয়া গ্রাম, সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম।

২. তার প্রথম পেশা কি ছিল?
উত্তর : স্কুলে শিক্ষকতা।

৩. তিনি কবে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিযুক্ত হন?
উত্তর : ১৯ এপ্রিল, ১৯৭৩।

৪. তিনি কার শাসনামলে রাষ্ট্রপতির উপদেষ্টা ছিলেন?
উত্তর : জিয়াউর রহমানের।

৫. আবুল ফজল কোন সংগঠনের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন?
উত্তর : ১৯২৬ সালে গঠিত মুসলিম সাহিত্য সমাজের।

৬. তিনি সাহিত্য সমাজের অন্যতম কর্ণধার হিসেবে কোন আন্দোলন গড়ে তোলেন?
উত্তর : 'বুদ্ধির মুক্তি' আন্দোলন।

৭. বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলনের মূল কথা কি ছিল?
উত্তর : 'জ্ঞান যেখানে সীমাবদ্ধ, বুদ্ধি যেখানে আড়ষ্ট, মুক্তি সেখানে অসম্ভব।'

৮. বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলনের মুখপত্র বার্ষিক পত্রিকার নাম কি ছিল?
উত্তর : শিখা (১৯২৭)।

৯. শিখার কোন সংখ্যা তিনি সম্পাদনা করেন?
উত্তর : ৫ম সংখ্যা (১৯৩১)।

১০. তার সাহিত্যকর্মের প্রতিপাদ্য কি?
উত্তর : স্বদেশপ্রীতি, অসাম্প্রদায়িক জীবনচেতনা, সত্যনিষ্ঠা, মানবতা ও কল্যাণবোধ।

১১. তিনি কি নামে আখ্যায়িত হন?
উত্তর : মুক্ত বুদ্ধির চিরসজাগ প্রহরী।



১২. তিনি কবে কোথায় মৃত্যুবরণ করেন?
উত্তর : ৪ মে ১৯৮৩; চট্টগ্রামে।

১. বাংলাদেশের একজন গদ্য লেখকের পরিচয় দিন।
উত্তর : আবুল ফজল (১৯০৩-১৯৮৩) চট্টগ্রামের সাতকানিয়ায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি 'মুসলিম সাহিত্য সমাজের' অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। সমাজ ও সমকাল সচেতন প্রাবন্ধিক হিসেবে ব্যাপক খ্যাতি অর্জন করেন। কথাশিল্পী হিসেবেও তিনি প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনাবলী চৌচির, মাটির পৃথিবী, সাহিত্য ও সংস্কৃতি সাধনা, মানবতন্ত্র ইত্যাদি।

২. 'একুশে ফেব্রুয়ারী' বাংলা কবিতার অন্তহীন প্রেরণার উৎস–এ প্রসঙ্গে অল্প কথায় লিখুন।
উত্তর : একুশ মানে প্রতিজ্ঞা, একুশ মানে চেতনা। সাহিত্যে এ চেতনা জাগ্রত হয়েছে সর্বাধিক। সাহিত্যের অন্যান্য ধারার মতো বাংলা কবিতায় এ চেতনাকে তুলে ধরেছেন এ দেশের সচেতন কবি সমাজ। শামসুর রাহমান, মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, গোলাম মোস্তফার মত কবিরা ভাষা আন্দোলনের চেতনাকে প্রস্ফুটিত করেছেন তাদের কবিতার মাধ্যমে। বর্তমান কবিরাও স্বাধিকার আন্দোলনের প্রথম ধাপ একুশে ফেব্রুয়ারিকে নিয়ে কবিতা রচনা করে চলছেন। তাই বলা যায়, একুশে ফেব্রুয়ারি বাংলা কবিতার অন্তহীন প্রেরণার উৎস।

## আল মাহমুদ (১৯৩৬-)

জন্ম : ১১ জুলাই ১৯৩৬; মোড়াইল, ব্রাহ্মণবাড়িয়া।

প্রকৃত নাম : মির আব্দুল শুকুর আল মাহমুদ।

□ তার শ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ 'সোনালী কাবিন' (১৯৭৩)।

□ তার কবিতায় বাংলাদেশের লোকজ ঐতিহ্য ও লোকশব্দের সুসমন্বয় লক্ষ্য করা যায়।

কাব্যগ্রন্থ : লোক লোকান্তর (১৩৭০), কালের কলস (১৩৭৩), সোনালী কাবিন (১৯৭৩), বখতিয়ারের ঘোড়া (১৯৮৪), আরব্য রজনীর রাজহাঁস (১৯৮৬), একচক্ষু হরিণ (১৯৮৯)।

গল্প : পানকৌড়ির রক্ত (১৯৭৫), সৌরভের কাছে পরাজিত (১৯৮৩), গন্ধবণিক (১৯৮৬), ময়ূরীর মুখ (১৯৯৪)।

উপন্যাস : ডাহুকী (১৯৯২), কবি ও কোলাহল, কাবিলের বোন, নিশিন্দা নারী, আগুনের মেয়ে (১৯৯৫), পুরুষ সুন্দর।

প্রবন্ধ : কবির আত্মবিশ্বাস, দিনযাপন (১৯৯০), কবিতার বহুদূর (১৯৯৭), নারী নিগ্রহ (১৯৯৭)।

পুরস্কার : বাংলা একাডেমী পুরস্কার (১৯৬৮), বাংলাদেশ লেখক সংঘ পুরস্কার (১৯৮০), ফিলিপ্স সাহিত্য পুরস্কার (১৯৮৬), একুশে পদক (১৯৮৭), নাসিরউদ্দিন স্বর্ণপদক (১৯৯০)।

**মডেল প্রশ্ন**

১. আল মাহমুদের প্রকৃত নাম কি?
উত্তর : মীর আবদুস শুকুর আল মাহমুদ।

২. 'সোনালী কাবিন' কোন শ্রেণীর রচনা?
উত্তর : কাব্যগ্রন্থ।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



৩. 'পাখির কাছে ফুলের কাছে' গ্রন্থটির রচয়িতা কে এবং এটি কোন শ্রেণীর রচনা?
উত্তর : আল মাহমুদ, শিশু সাহিত্য।

৪. আল মাহমুদের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থের নাম লিখুন।
উত্তর : লোক লোকান্তর, কালের কলস, সোনালী কাবিন, মায়াবী পর্দা দুলে উঠো, বখতিয়ারের ঘোড়া ইত্যাদি।

৫. 'অদৃষ্টবাদীদের রান্নাবান্না' কোন শ্রেণীর রচনা এবং এর রচয়িতা কে?
উত্তর : কাব্যগ্রন্থ, আল মাহমুদ।

৬. আল মাহমুদের 'নোলক' কবিতাটি কোন কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত?
উত্তর : লোক লোকান্তর।

৭. আল মাহমুদ কবে বাংলা একাডেমী পুরস্কার লাভ করেন?
উত্তর : ১৯৬৮ সালে।

## আলাউদ্দিন আল আজাদ (১৯৩২-২০০৯)

জন্ম : ৬ মে ১৯৩২ (২২ বৈশাখ ১৩৩৯); রামনগর, নরসিংদী।

- ☐ মূল পরিচিতি কবি, পেশায় অধ্যাপক, বিভিন্ন সরকারের সান্নিধ্য লাভ করেছেন। এরশাদ সরকারের আমলে সংস্কৃতি উপদেষ্টা ছিলেন।
- ☐ তার 'কর্ণফুলী' উপন্যাসটি পাহাড়-সমুদ্রঘেরা একটি বিশেষ জনপদ অবলম্বনে রচিত।
- ☐ তার বিখ্যাত কবিতা 'স্মৃতিস্তম্ভ' মানচিত্র কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত।
- ☐ তার বিখ্যাত উপন্যাস 'তেইশ নম্বর তৈলচিত্র' অবলম্বনে তৈরি চলচ্চিত্র 'বসুন্ধরা' ১৯৭৭ সালে জাতীয় পুরস্কার লাভ করে।

ছোটগল্প : জেগে আছি (১৯৫০), ধানকন্যা (১৯৫১), মৃগনাভি (১৯৫৩), অন্ধকার সিঁড়ি (১৯৫৮), উজান তরঙ্গে (১৯৬২), জীবনজমিন (১৯৮৮)।

উপন্যাস : তেইশ নম্বর তৈলচিত্র (১৯৬০), কর্ণফুলী (১৯৬২), ক্ষুধা ও আশা (১৯৬৪), খসড়া কাগজ (১৯৮৬), পাটরাণী (১৯৮৬), স্বাগতম ভালোবাসা (১৯৯০), পুরন্দর (১৯৯৪), ক্যাম্পাস (১৯৯৪), অনূদিত অন্ধকার (১৯৯১), স্বপ্নশিলা (১৯৯২)।

কবিতা : মানচিত্র (১৯৬১), লেলিহান পাণ্ডুলিপি (১৯৭৫), অ্যাসেস অ্যান্ড স্পার্কস (১৯৮৪), সাজঘর (১৯৯০), চোখ (১৯৯৬)।

নাটক : মায়াবী প্রহর (১৯৬৩), নিঃশব্দ যাত্রা (১৯৭২), সংবাদ শেষাংশ (১৯৭৫), হিজল কাঠের নৌকা (১৯৭৬)।

প্রবন্ধ : শিল্পীর সাধনা (১৯৫৮), সাহিত্যের আগন্তুক ঋতু (১৯৭৪)।

পুরস্কার : বাংলা একাডেমী পুরস্কার (ছোটগল্প, ১৯৬৪), ইউনেস্কো পুরস্কার (উপন্যাস কর্ণফুলীর জন্য, ১৯৬৫), জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার (উপন্যাস তেইশ নম্বর তৈলচিত্র অবলম্বনে বসুন্ধরা, ১৯৭৭), শেরে বাংলা সাহিত্য পুরস্কার (১৯৮৭), কথক একাডেমী পুরস্কার (সাহিত্য, ১৯৮৯), দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ স্বর্ণপদক (সাহিত্য ও সংস্কৃতি, ১৯৯৪)।

মৃত্যু : ৪ জুলাই ২০০৯।



মডেল প্রশ্ন

১. 'তেইশ নম্বর তৈলচিত্র' গ্রন্থটির রচয়িতা কে এবং এটি কোন শ্রেণীর রচনা?
উত্তর : আলাউদ্দিন আল আজাদ; উপন্যাস।

২. উপজাতীয়দের জীবনচিত্র অবলম্বনে আলাউদ্দিন আল আজাদের রচিত গ্রন্থ কোনটি?
উত্তর : কর্ণফুলী (উপন্যাস)।

৩. 'শীতের শেষ রাত বসন্তের প্রথম দিন' গ্রন্থটির রচয়িতা কে? কোন শ্রেণীর রচনা?
উত্তর : আলাউদ্দিন আল আজাদ; উপন্যাস।

## আশরাফ সিদ্দিকী (১৯২৭-)

জন্ম : ১ মার্চ ১৯২৭; নাগবাড়ী, টাঙ্গাইল।

- ☐ তিনি মূলত লোকসাহিত্যিক ও সংস্কৃতিবিদ হিসেবে পরিচিত।
- ☐ তার প্রথম প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থের নাম 'তালেব মাষ্টার ও অন্যান্য কবিতা' (১৯৫০)।
- ☐ তার 'গলির ধারের ছেলেটি' সাহিত্যকর্মটি নিয়ে চলচ্চিত্র নির্মিত হয়েছে; নাম 'ডুমুরের ফুল'।

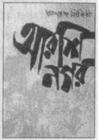



প্রবন্ধ-গবেষণা : লোকসাহিত্য (১৯৬৪) কিংবদন্তীর বাংলা (১৯৭৫); শুভ নববর্ষ (১৯৭৭), লোকায়ত বাংলা (১৯৭৮), Folkloric Bangladesh (১৯৭৭); Bengali Folklore (১৯৭৭)।

গল্প : গলির ধারের ছেলেটি (১৯৮১), কাগজের নৌকা (১৯৬২), শেষ নালিশ (১৯৯২)।

উপন্যাস : শেষ কথা কে বলবে (১৯৮০), গুণীন (১৯৮৯), আরশিনগর (১৯৮৮)।

কবিতা : সাত ভাই চম্পা (১৯৫৩), বিষকন্যা (১৯৫৫), কুচবরণের কন্যে (১৯৭৭), আরশিনগর (১৯৮৪), দাঁড়াও পথিকবর (১৯৯০)।

শিশুতোষ : সিংহের মামা ভোম্বল দাস (১৯৬৩), আমার দেশের রূপকাহিনী (১৯৬৪), বাংলাদেশের রূপকথা (১৯৯১), অসি বাজে ঝন্‌ঝন (১৯৭৯), রূপকথার রাজ্যে (১৯৯৩)।

রম্যরচনা : প্যারিস সুন্দরী (১৯৭৫)।

অনুবাদ : সাগর থেকে আনা (১৯৭৫), চলো যাই বই পড়ি (১৯৫৭)।

পুরস্কার : All Bengal Essay Competition, Gold Medal (১৯৪৮), বাংলা একাডেমী পুরস্কার (১৯৬৪), দাউদ পুরস্কার (১৯৬৫), ইউনেস্কো পুরস্কার (১৯৬৬), একুশে পদক (১৯৮৮), নাসিরউদ্দিন স্বর্ণপদক (১৯৮৯), জাতীয় সাহিত্য পদক (১৯৮৯), ড. দীনেশ সেন পদক, কলকাতা (১৯৯৬-৯৭)।

মডেল প্রশ্ন

১. আশরাফ সিদ্দিকী কবে, কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?
উত্তর : ১৯২৭ সালের ১ মার্চ, টাঙ্গাইলের নাগবাড়ী নামক স্থানে।

২. তিনি মূলত কি হিসেবে পরিচিত?
উত্তর : লোকসাহিত্য-সংস্কৃতিবিদ।

৩. তার প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থের নাম ও ধরন কি?
উত্তর : তালেব মাষ্টার ও অন্যান্য কবিতা (১৯৫০); কাব্যগ্রন্থ।

৪. তার কোন সাহিত্যকর্ম নিয়ে চলচ্চিত্র হয়েছে এবং চলচ্চিত্রটির নাম কি ছিল?
উত্তর : গলির ধারের ছেলেটি, ডুমুরের ফুল।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



## আহমদ শরীফ (১৯২১-১৯৯৯)

জন্ম : ১৩ ফেব্রুয়ারি, ১৯২১; সুচক্র-দণ্ডী, চট্টগ্রাম।

- ☐ তিনি মূলত পরিচিত ছিলেন শিক্ষাবিদ ও গবেষক হিসেবে।
- ☐ তিনি মৃত্যুর পূর্বে তার মৃত্যু-উত্তর দেহ বাংলাদেশ মেডিকেল কলেজকে দান করে যান।

প্রবন্ধ-গবেষণা : বিচিত চিন্তা (১৯৬৮), সাহিত্য সংস্কৃতি চিন্তা (১৯৬৯), স্বদেশ অন্বেষা (১৯৭০), জীবনে সমাজে সাহিত্যে (১৯৭০), যুগ যন্ত্রণা (১৯৭৪), কালিক ভাবনা (১৯৭৪), বাঙালী ও বাংলা সাহিত্য (১ম খণ্ড ১৯৭৮, ২য় খণ্ড ১৯৮৩), প্রত্যয় ও প্রত্যাশা (১৯৭৯), মানবতা ও গণমুক্তি (১৯৯০), বাঙলা, বাঙালী ও বাঙালিত্ব (১৯৯২), সংস্কৃতি (১৯৯২), সংকট : জীবনে ও মননে (১৯৯৩), জিজ্ঞাসা ও অন্বেষা (১৯৯৭)।

সম্পাদনা : লায়লী মজনু (১৯৫৭), রসুল বিজয় (১৯৬৪), সয়ফুল মূলক বদিউজ্জামাল (১৯৭৫), বাংলা একাডেমী সংক্ষিপ্ত বাংলা অভিধান (১৯৯২)।

পুরস্কার : বাংলা একাডেমী পুরস্কার (১৯৬৮), দাউদ সাহিত্য পুরস্কার (১৯৬৯), অলক্ত সাহিত্য পুরস্কার (১৯৮৪), মুক্তধারা সাহিত্য পুরস্কার (১৯৮৯), একুশে পদক (১৯৯১), The Humanist and Ethical Association of Bangladesh First National Humanist Award (১৯৯১), ডি. লিট (সম্মানসূচক), রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় (১৯৯৩)।

মৃত্যু : ১৯৯৯ সাল।

**মডেল প্রশ্ন**

১. 'বিচিত চিন্তা' এবং 'যুগ যন্ত্রণা' কোন শ্রেণীর রচনা এবং এগুলোর রচয়িতা কে?
উত্তর : প্রবন্ধ; ড. আহমদ শরীফ।

২. 'পুঁথি পরিচিতি' -এর রচয়িতা কে? কোন জাতীয় রচনা?
উত্তর : ড. আহমদ শরীফ; প্রবন্ধ গ্রন্থ।

৩. 'কালিক ভাবনা' গ্রন্থটির রচয়িতা কে? কোন শ্রেণীর রচনা?
উত্তর : ড. আহমদ শরীফ; প্রবন্ধ গ্রন্থ।

৪. 'স্বদেশ অন্বেষা' কোন জাতীয় রচনা এর রচয়িতা কে?
উত্তর : প্রবন্ধ গ্রন্থ; ড. আহমদ শরীফ।

## আহসান হাবীব (১৯১৭-১৯৮৫)

জন্ম : ২ জানুয়ারি ১৯১৭; শঙ্করপাসা গ্রাম, পিরোজপুর।

- ☐ তিনি মূলত কবি ও সাংবাদিক।
- ☐ তার কবিতার বিষয়বস্তু গ্রামীণ ঐতিহ্যমণ্ডিত সামাজিক বাস্তবতা, মধ্যবিত্ত মানুষের সংগ্রামী চেতনা ও সমকালীন যুগযন্ত্রণা।

কাব্যগ্রন্থ : রাত্রিশেষ (১৯৪৭), ছায়াহরিণ (১৯৬২), সারাদুপুর (১৯৬৪), আশায় বসতি (১৩৮১), মেঘ বলে চৈত্রে যাবো (১৯৭৬), দুই হাতে দুই আদিম পাথর (১৯৮০), প্রেমের কবিতা (১৯৮১), বিদীর্ণ দর্পণে মুখ (১৯৮৫)।



উপন্যাস : অরণ্যে নীলিমা (১৯৬২), জাফরানী রং পায়রা, রানী খালের সাঁকো (১৯৬৫)।

শিশুতোষ গ্রন্থ : ছোটদের পাকিস্তান (১৯৫৪), বৃষ্টিপড়ে টাপুর-টুপুর (১৯৭৭), ছুটির দিন দুপুরে (১৯৭৮)।

পুরস্কার : বাংলা একাডেমী পুরস্কার (১৯৬১) ও একুশে পদক (১৯৭৮)।

মৃত্যু : ১০ জুলাই ১৯৮৫, ঢাকা।

**মডেল প্রশ্ন**

১. আহসান হাবীবের জন্ম ও মৃত্যুসাল উল্লেখ করুন।
উত্তর : জন্ম : ১৯১৭ ও মৃত্যু : ১৯৮৫ সালে।

২. আহসান হাবীবের প্রথম কাব্যগ্রন্থ কোনটি? কত সালে প্রকাশিত হয়?
উত্তর : রাত্রিশেষ; ১৩৬২ বঙ্গাব্দে।

৩. আহসান হাবীবের 'ছায়া হরিণ' কোন শ্রেণীর রচনা? কত সালে প্রকাশিত হয়?
উত্তর : কাব্যগ্রন্থ; ১৩৬৯ বঙ্গাব্দে।

৪. 'মেঘ বলে চৈত্রে যাবো' কোন জাতীয় রচনা? রচয়িতা কে?
উত্তর : কাব্যগ্রন্থ; আহসান হাবীব।

৫. 'আশায় বসতি' ও 'দুই হাতে দুই আদিম পাথর' কোন শ্রেণীর রচনা এর রচয়িতার নাম কি?
উত্তর : কাব্যগ্রন্থ; আহসান হাবীব।

৬. 'সারা দুপুর' কার লেখা, কোন জাতীয় গ্রন্থ?
উত্তর : 'সারা দুপুর' আহসান হাবিবের লেখা। এটি একটি কাব্যগ্রন্থ।

## কাজী মোতাহার হোসেন (১৮৯৭-১৯৮১)

জন্ম : লক্ষ্মীপুর গ্রাম, কুমারখালী, কুষ্টিয়া; ৩০ জুলাই ১৮৯৭ (মাতুলালয়)।

পৈতৃক নিবাস : বাগমারা গ্রাম, পাংশা, ফরিদপুর।

প্রবন্ধ : সঞ্চয়ন (১৯৩৭)।

অন্যান্য গ্রন্থ : নজরুল কাব্য পরিচিতি (১৯৫৫), সেই পথ লক্ষ্য করে (১৯৫৮), সিম্পোজিয়াম (১৯৬৫), গণিত শাস্ত্রের ইতিহাস (১৯৭০), আলোক বিজ্ঞান (১৯৭৪)।

পুরস্কার : প্রবন্ধ সাহিত্যে বাংলা একাডেমী পুরস্কার লাভ (১৯৬৬), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক সম্মানসূচক 'ডক্টরেট' উপাধি প্রদান (১৯৭৪) ও 'জাতীয় অধ্যাপক' মর্যাদায় ভূষিত (১৯৭৫)।

মৃত্যু : ৯ অক্টোবর ১৯৮১; ঢাকা।

**মডেল প্রশ্ন**

১. কাজী মোতাহার হোসেনের জন্ম কত সালে?
উত্তর : ৩০ জুলাই ১৮৯৭।

২. তিনি কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?
উত্তর : লক্ষ্মীপুর গ্রাম, কুমারখালী, কুষ্টিয়া (মাতুলালয়)।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



৩. তিনি মূলত কি ছিলেন?
উত্তর : সাহিত্যিক, শিক্ষাবিদ ও বিজ্ঞানী।

৪. কাজী মোতাহার হোসেনের জীবনের অন্যতম কীর্তি কোনটি?
উত্তর : ঢাকায় 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ' প্রতিষ্ঠা।

৫. তার প্রথম ও বিখ্যাত প্রবন্ধ সংকলন কোনটি?
উত্তর : 'সঞ্চয়ন' (১৯৩৭)।

৬. তিনি কবে মৃত্যুবরণ করেন?
উত্তর : ৯ অক্টোবর ১৯৮১।

## খান মুহাম্মদ মঈনুদ্দীন (১৯০১-১৯৮১)

জন্ম : চারিগ্রাম, মানিকগঞ্জ; ৩০ অক্টোবর ১৯০১।

স্মৃতিচারণমূলক গ্রন্থ : যুগস্রষ্টা নজরুল (১৯৫৭)।

শিশুতোষ গ্রন্থ : মুসলিম বীরাঙ্গনা (১৯৩৬), আমাদের নবী (১৯৪১), খোলাফায়ে রাশেদিন (১৯৫১), সোনার পাকিস্তান (১৯৫৩), স্বপন দেখি (১৯৫৯), শাপলা শালুক (১৯৬২)।

কাব্য : পালের নাও (১৯৫৬), আর্তনাদ (১৯৫৮), হে মানুষ (১৯৫৮)।

উপন্যাস : অনাথিনী (১৯২৬), নয়া সড়ক (১৯৬৭)।

গল্পগ্রন্থ : ঝুমকোলতা (১৯৫৬)।

পুরস্কার : 'যুগস্রষ্টা নজরুল' গ্রন্থের জন্য ইউনেস্কো পুরস্কার (১৯৬০), শিশুসাহিত্যে বাংলা একাডেমী পুরস্কার (১৯৬০) ও একুশে পদক (১৯৭৮)।

মৃত্যু : ১৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৮১; ঢাকা।

মডেল প্রশ্ন

১. খান মুহাম্মদ মঈনুদ্দীনের জন্ম কত সালে?
উত্তর : ৩০ অক্টোবর ১৯০১।

২. তিনি কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?
উত্তর : চারিগ্রাম, মানিকগঞ্জ।

৩. কবি কাজী নজরুল ইসলামের জীবন ও সাহিত্যকর্মের ওপর স্মৃতিচারণমূলক গ্রন্থের নাম কি?
উত্তর : যুগস্রষ্টা নজরুল (১৯৫৭)।

৪. খান মুহাম্মদ মঈনুদ্দীনের শ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থের নাম কি?
উত্তর : হে মানুষ (১৯৫৮)।

৫. কোন গ্রন্থ রচনার জন্য তিনি ইউনেস্কো পুরস্কার (১৯৬০) লাভ করেন?
উত্তর : যুগস্রষ্টা নজরুল (১৯৫৭)।

৬. তিনি কবে, কোথায় মৃত্যুবরণ করেন?
উত্তর : ১৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৮১; ঢাকায়।



## গোলাম মোস্তফা (১৮৯৭-১৯৬৪)

জন্ম : ১৮৯৭; মনোহরপুর গ্রাম, শৈলকুপা, ঝিনাইদহ।

- তার পেশা ছিল শিক্ষকতা।
- তার কাব্যের প্রধান বিষয়বস্তু ইসলাম ও প্রেম।
- পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা প্রশ্নে উর্দুভাষার প্রতি তার সমর্থন ছিল।

কাব্যগ্রন্থ : রক্তরাগ (১৯২৪), খোশরোজ (১৯২৯), কাব্যকাহিনী (১৯৩২), সাহারা (১৯৩৬), হাস্নাহেনা (১৯৩৮), বুলবুলিস্তান (১৯৪৯), তারানা-ই-পাকিস্তান (১৯৫৬), বনি আদম (১৯৫৮), গীতিসঞ্চয়ন (১৯৬৮)।

গদ্যগ্রন্থ : বিশ্বনবী (১৯৪২), ইসলাম ও জেহাদ (১৯৪৭), ইসলাম ও কমিউনিজম (১৯৪৬), আমার চিন্তাধারা (১৯৫২)।

উপাধি : ১৯৫২ সালে যশোর সাহিত্য সঙ্ঘ কর্তৃক কাব্য সুধাকর ও ১৯৬০ সালে পাকিস্তান সরকার কর্তৃক সিতারা-ই-ইমতিয়াজ উপাধিতে ভূষিত।

মৃত্যু : ১৩ অক্টোবর ১৯৬৪; ঢাকা।

মডেল প্রশ্ন

১. গোলাম মোস্তফার উপাধি কি?
উত্তর : কাব্য সুধাকর।

২. 'বুলবুলিস্তান' কোন জাতীয় রচনা? কোন কবি, কত সালে এটি রচনা করেন?
উত্তর : অনুবাদ কাব্য; কবি গোলাম মোস্তফা, ১৯৪৯ সালে।

৩. গোলাম মোস্তফা কত সালে পাকিস্তান সরকার কর্তৃক খেতাবে ভূষিত হন?
উত্তর : ১৯৬০ সালে ('সিতারা-ই- ইমতিয়াজ' খেতাব)।

৪. কবি গোলাম মোস্তফার কয়েকটি উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থের নাম লিখুন।
উত্তর : হাস্নাহেনা, রক্তরাগ, বনি আদম প্রভৃতি।

## জহির রায়হান (১৯৩৫-১৯৭২)

জন্ম : ১৯ আগস্ট ১৯৩৫; মজুপুর গ্রাম, ফেনী।

- প্রকৃত নাম মোহাম্মদ জহিরুল্লাহ।
- তিনি ছিলেন মূলত কথাশিল্পী ও চলচ্চিত্র পরিচালক।
- রাষ্ট্রভাষার আন্দোলনে তার সক্রিয় অংশগ্রহণ ছিল।
- গণহত্যার ওপর তার তৈরি প্রামাণ্যচিত্র Stop Genocide।

উপন্যাস : হাজার বছর ধরে (১৩৭১), আরেক ফাল্গুন (১৩৭৫), বরফ গলা নদী (১৩৭৬), শেষ বিকেলের মেয়ে (১৩৬৭), আর কত দিন (১৩৭৭), কয়েকটি মৃত্যু (১৩৮২), তৃষ্ণা (১৩৬২)।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



গল্পগ্রন্থ : সূর্যগ্রহণ (১৩৬২)।

পুরস্কার : হাজার বছর ধরে উপন্যাসের জন্য ১৯৬৪ সালে আদমজী সাহিত্য পুরস্কার লাভ। ১৯৭২ সালে উপন্যাসের জন্য বাংলা একাডেমী কর্তৃক মরণোত্তর সাহিত্য পুরস্কার প্রদান।

মৃত্যু : ১৯৭২-এর ৩০ জানুয়ারি মিরপুরে নিখোঁজ ভাই শহীদুল্লাহ কায়সারকে খুঁজতে গিয়ে ফিরে আসেননি।

মডেল প্রশ্ন

১. জহির রায়হানের 'আরেক ফাল্গুন' কি ধরনের উপন্যাস?
উত্তর : ভাষা আন্দোলনভিত্তিক উপন্যাস হচ্ছে 'আরেক ফাল্গুন'। ১৯৪৮ থেকে ১৯৫২ হয়ে ১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত চলমান আন্দোলন, জনতার সম্মিলন, প্রেম-প্রণয় উপন্যাসটির মূল বিষয়।

২. জহির রায়হানের কতিপয় উপন্যাসের নাম করুন।
উত্তর : বরফ গলা নদী, আরেক ফাল্গুন, হাজার বছর ধরে ইত্যাদি।

৩. 'শেষ বিকেলের মেয়ে' গ্রন্থটির রচয়িতা কে? কোন শ্রেণীর রচনা?
উত্তর : জহির রায়হান, উপন্যাস।

## জাহানারা ইমাম (১৯২৯-১৯৯৪)

জন্ম : সুন্দরপুর গ্রাম, মুর্শিদাবাদ; ৩ মে ১৯২৯।

স্মৃতিচারণমূলক গ্রন্থ : একাত্তরের দিনগুলি (১৯৮৬)।

অন্যান্য গ্রন্থ : গজ কচ্ছপ (১৯৬৭), সাতটি তারার ঝিকিমিকি (১৯৭৩), নিঃসঙ্গ পাইন (১৯০৯), ক্যান্সারের সাথে বসবাস (১৯৯১), প্রবাসের দিনগুলি (১৯৯২)।

পুরস্কার : সাহিত্যকৃতির জন্য বাংলা একাডেমী পুরস্কার লাভ (১৯৯০)।

মৃত্যু : ২৬ জুন ১৯৯৪।

মডেল প্রশ্ন

১. জাহানারা ইমাম কবে, কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?
উত্তর : ৩ মে ১৯২৯; সুন্দরপুর গ্রাম, মুর্শিদাবাদ।

২. মুক্তিযুদ্ধের ওপর তার স্মৃতিচারণামূলক গ্রন্থের নাম লিখুন। কত সালে তা প্রকাশিত হয়?
উত্তর : একাত্তরের দিনগুলি। ১৯৮৬ সালে।

৩. 'ক্যান্সারের সাথে বসবাস' গ্রন্থটি কার লেখা?
উত্তর : জাহানারা ইমাম।

৪. 'সাতটি তারার ঝিকিমিকি' গ্রন্থটি কার লেখা?
উত্তর : জাহানারা ইমাম।

৫. তিনি কবে, কোথায় মৃত্যুবরণ করেন?
উত্তর : ২৬ জুন ১৯৯৪, যুক্তরাষ্ট্রে।



৬. তিনি কোন রোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেন?
উত্তর : ক্যান্সার।

৭. তিনি মুক্তিযুদ্ধের সময় কি কি ভূমিকা পালন করেন?
উত্তর : ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে জাহানারা ইমামের প্রথম সন্তান রুমী যুদ্ধে যোগদান করে। রুমী ও তাঁর সঙ্গী মুক্তিযোদ্ধাদের অপারেশনে সহযোদ্ধাদের মতো অংশগ্রহণ করেন জাহানারা ইমাম। বাড়িতে মুক্তিযোদ্ধাদের আশ্রয় ও খাদ্য দেয়া, গাড়িতে অস্ত্র আনা-নেয়া ও তা যুদ্ধক্ষেত্রে পৌছে দেয়া, খবর আদান-প্রদান ইত্যাদি ছিল তাঁর মুক্তিযুদ্ধকালীন ভূমিকা।

## বন্দে আলী মিয়া (১৯০৬-১৯৭৯)

জন্ম : ১৫ ডিসেম্বর ১৯০৬; রাধানগর গ্রাম, পাবনা।

- তিনি প্রথম 'ইসলাম দর্শন' পত্রিকায় সাংবাদিক হিসেবে যোগ দেন।
- তার সম্পাদিত কয়েকটি পত্রিকা– কিশোর পরাগ, শিশুবার্ষিকী, জ্ঞানের আলো।
- পল্লী প্রকৃতির সৌন্দর্য তার কবিতায় অনন্যতা লাভ করেছে।

কাব্য : ময়নামতির চর (১৯৩২), অনুরাগ (১৯৩২)।

শিশুতোষ গ্রন্থ : চোর জামাই (১৯২৭), মেঘকুমারী (১৯৩২), মৃগপরী (১৯৩৭), বোকা জামাই (১৯৩৭), কামাল আতাতুর্ক (১৯৪০), ডাইনী বউ (১৯৫৯), রূপকথা (১৯৬০), কুঁচবরণ কন্যা (১৯৬০), ছোটদের নজরুল (১৯৬০), শিয়াল পণ্ডিতের পাঠশালা (১৯৬৩)।

পুরস্কার : শিশুসাহিত্যে উল্লেখযোগ্য অবদানের জন্য ১৯৬২ সালে বাংলা একাডেমী পুরস্কার এবং ১৯৬৫ সালে প্রেসিডেন্ট পুরস্কার লাভ।

মৃত্যু : ১৭ জুন ১৯৭৯; রাজশাহী।

মডেল প্রশ্ন

১. বন্দে আলী মিয়া কবে, কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?
উত্তর : ১৫ ডিসেম্বর ১৯০৬; রাধানগর গ্রাম, পাবনা।

২. তিনি মূলত কি ছিলেন?
উত্তর : কবি, ঔপন্যাসিক ও শিশুসাহিত্যিক।

৩. তার কবিতায় কিসের পরিচয় ফুটে ওঠে?
উত্তর : পল্লী প্রকৃতির সৌন্দর্য।

৪. তার রচিত কাব্যগ্রন্থগুলোর নাম কি?
উত্তর : ময়নামতির চর (১৯৩২), অনুরাগ (১৯৩২) ইত্যাদি।

৫. তার রচিত শিশুতোষ গ্রন্থগুলোর নাম কি?
উত্তর : চোর জামাই (১৯২৭), মৃগপরী (১৯৩৭), ডাইনী বউ (১৯৫৯), রূপকথা (১৯৬০), কুঁচবরণ কন্যা (১৯৬০)।

৬. তিনি কবে কোথায় মৃত্যুবরণ করেন?
উত্তর : ১৭ জুন ১৯৭৯; রাজশাহী।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



## বুদ্ধদেব বসু (১৯০৮-১৯৭৪)

বুদ্ধদেব বসুর আমলে রবীন্দ্রনাথকে মনে পড়ে। প্রতিভার বিচিত্রমুখিতায় রবীন্দ্রনাথই তাঁর তুলনা। তিনি কবি, ঔপন্যাসিক, গল্পকার, নাট্যকার, অনুবাদক, সমালোচক ও সম্পাদক সব ক্ষেত্রেই গুরুত্বপূর্ণ। আধুনিক কবিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নন তিনি, তবে প্রধান পুরোহিত। কবিতা সম্পাদনা করে, আধুনিক কবি ও কবিতার পক্ষে প্রবন্ধ লিখে, বিশ্বের আধুনিক কবিতা অনুবাদ করে তিনি আমাদের আধুনিকতার শিক্ষক হয়ে আছেন। তিনি আধুনিক কবিদের মধ্যে সবচেয়ে গীতিময় ও আবেগপ্রবণ।

জন্ম : কুমিল্লা, নভেম্বর ১৯০৮।

কাব্যগ্রন্থ : মর্মবাণী (১৯২৫), বন্দীর বন্দনা (১৯৩০), পৃথিবীর পথে (১৯৩৩), কঙ্কাবতী (১৯৩৭), দময়ন্তী (১৯৪৩), দ্রৌপদীর শাড়ী (১৯৪৮), শ্রেষ্ঠ কবিতা (১৯৫৩), শীতের প্রার্থনা : বসন্তের উত্তর (১৯৫৫), যে-আঁধার আলোর অধিক (১৯৫৮), দময়ন্তী : দ্রৌপদীর শাড়ী ও অন্যান্য কবিতা (১৯৬৩), মরচেপড়া পেরেকের গান (১৯৬৬), একদিন : চিরদিন (১৯৭১), স্বাগত বিদায় (১৯৭১) ইত্যাদি।

উপন্যাস : সাড়া (১৯৩০), সানন্দা (১৯৩৩), লাল মেঘ (১৯৩৪), পরিক্রমা (১৯৩৮), কালো হাওয়া (১৯৪২), তিথিডোর (১৯৪৯), নির্জন স্বাক্ষর (১৯৫১), মৌলিনাথ (১৯৫২), নীলাঞ্জনের খাতা (১৯৬০), পাতাল থেকে আলাপ (১৯৬৭), রাত ভ'রে বৃষ্টি (১৯৬৭), গোলাপ কেন কালো (১৯৬৮), বিপন্ন বিস্ময় (১৯৬৯) ইত্যাদি।

গল্প : অভিনয়, অভিনয় নয় (১৯৩০), রেখাচিত্র (১৯৩১), হাওয়া বদল (১৯৪৩), শ্রেষ্ঠগল্প (১৩৫৯), একটি জীবন ও কয়েকটি মৃত্যু (১৯৬০), হৃদয়ের জাগরণ (১৩৬৮), ভালো আমার ভেলা (১৯৬৩), প্রেমপত্র (১৯৭২)।

প্রবন্ধ : হঠাৎ-আলোর ঝলকানি (১৯৩৫), কালের পুতুল (১৯৪৬), সাহিত্যচর্চা (১৩৬১), রবীন্দ্রনাথ : কথাসাহিত্য (১৯৫৫), স্বদেশ ও সংস্কৃতি (১৯৫৭), সঙ্গ নিঃসঙ্গতা ও রবীন্দ্রনাথ (১৯৬৩), প্রবন্ধ সংকলন (১৯৬৬), কবি রবীন্দ্রনাথ (১৯৬৬)।

ভ্রমণ কাহিনী : সব পেয়েছির দেশে (১৯৪১), জাপানি জার্নাল (১৯৬২), দেশান্তর (১৯৬৬)।

নাটক : মায়া-মালঞ্চ (১৯৪৪), তপস্বী ও তরঙ্গিণী (১৯৬৬), কলকাতার ইলেক্ট্রা ও সত্যসন্ধ (১৯৬৮)।

স্মৃতিকথা : আমার ছেলেবেলা (১৯৭৩), আমার যৌবন (১৯৭৬)।

অনুবাদ : কালিদাসের মেঘদূত (১৯৫৭), বোদলেয়ার : তাঁর কবিতা (১৯৬০), হেল্ডার্লিনের কবিতা (১৯৬৭), রাইনের মারিয়া রিলকের কবিতা (১৯৭০)।

পুরস্কার : ১৯৬৭ সালে 'তপস্বী ও তরঙ্গিণী' কাব্যনাট্যের জন্য সাহিত্য আকাদেমী পুরস্কার, ১৯৭০-এ পদ্মভূষণ উপাধি ও ১৯৭৪-এ 'স্বাগত বিদায়' গ্রন্থের জন্য রবীন্দ্র-পুরস্কার (মরণোত্তর) লাভ।

মৃত্যু : ১৮ মার্চ ১৯৭৪; কলকাতা।

**মডেল প্রশ্ন**

১. বুদ্ধদেব বসুর জন্মসাল কত এবং কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?
উত্তর : ৩০ নভেম্বর ১৯০৮; কুমিল্লা।

২. রবীন্দ্রনাথের পর বাংলা সাহিত্যে কাকে সব্যসাচী লেখক বলা হয়?
উত্তর : বুদ্ধদেব বসুকে।



৩. তিনি মূলত কি ছিলেন?
উত্তর : কবি, কথাসাহিত্যিক, নাট্যকার, প্রাবন্ধিক, অনুবাদক ও সম্পাদক।

৪. তার সম্পাদিত পত্রিকাগুলোর নাম কি?
উত্তর : প্রগতি (১৯২৭-২৯) ও কবিতা (১৩৪২-৪৭)।

৫. হুমায়ুন কবিরের সাথে তার সম্পাদিত ত্রৈমাসিক পত্রিকা কোনটি?
উত্তর : চতুরঙ্গ (১৯৩৮)।

৬. বাংলা সাহিত্যে বুদ্ধদেব বসুর অবদান উল্লেখ করুন।
উত্তর : কথাসাহিত্যিক বুদ্ধদেব বসু (১৯০৮-১৯৭৪) যাকে বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের পর সব্যসাচী লেখক বলা হয়, তিনি মাসিক 'কল্লোল' (১৯২৩) পত্রিকার নিয়মিত লেখক ছিলেন। তার কাব্যগ্রন্থগুলো হলো 'বন্দীর বন্দনা' (১৯৩০), কঙ্কাবতী (১৯৩৭), যে আঁধার আলোর অধিক (১৯৫৮), মরচে পড়া পেরেকের গান (১৯৬৬), একদিন চিরদিন (১৯৭১) ইত্যাদি।

## মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯০৮-১৯৫৬)

জন্ম : ১৯ মে ১৯০৮, সাঁওতাল পরগণা, দুমকা, বিহার।

পৈতৃক নিবাস : মালবদিয়া গ্রাম, বিক্রমপুর, মুন্সিগঞ্জ।

- মনোবিশ্লেষণ ও ফ্রয়েডীয় চেতনার প্রভাব, মার্ক্সীয় দর্শনের প্রয়োগ এবং নানা নিরীক্ষার প্রয়াস তার উপন্যাসের বৈশিষ্ট্য।
- তার পিতৃদত্ত নাম প্রবোধকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাক নাম মানিক।
- তার রচিত প্রথম গল্পের নাম 'অতসী মামী'। এটি 'বিচিত্রা' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল।
- তিরিশের দশকে বাংলা কথাসাহিত্যের যে পালাবদল বাংলা গল্প ও উপন্যাসের নতুন একটি বিশ্ব নির্মাণকে সম্ভবপর করে তুলেছিল, তিনি ছিলেন এর প্রধান স্থপতি।
- তার জীবনের প্রথমভাগে তিনি সাহিত্যিকভাবে ফ্রয়েডীয় ছিলেন, আর শেষভাগে মূলত মার্ক্সীয়। তিনি মার্ক্সিস্ট লেখক ছিলেন।

উপন্যাস : জননী (১৯৩৫), দিবারাত্রির কাব্য (১৯৩৫), পুতুল নাচের ইতিকথা (১৯৩৬), পদ্মানদীর মাঝি (১৯৩৬), শহরতলী (১৯৪০), অহিংসা (১৯৪১), শহরবাসের ইতিকথা (১৯৪৬), চিহ্ন (১৯৪৭), চতুষ্কোণ (১৯৪৮), জীয়ন্ত (১৯৫০), সোনার চেয়ে দামী (১৯৫১), স্বাধীনতার স্বাদ (১৯৫১), ইতিকথার পরের কথা (১৯৫২), আরোগ্য (১৯৫৩), হরফ (১৯৫৪), হলুদ নদী সবুজ বন (১৯৫৬)।

গল্পগ্রন্থ : অতসী মামী ও অন্যান্য গল্প (১৯৩৫), প্রাগৈতিহাসিক (১৯৩৭), মিহি ও মোটা কাহিনী (১৯৩৮), সরীসৃপ (১৯৩৯), বৌ (১৯৪৩), সমুদ্রের স্বাদ (১৯৪৩), ভেজাল (১৯৪৪), হলুদ পোড়া (১৯৪৫), আজকাল পরশুর গল্প (১৯৪৬), মাটির মাশুল, ছোটবড় (১৯৪৮), ছোট বকুলপুরের যাত্রী (১৯৪৯), শ্রেষ্ঠ গল্প (১৯৫০), ফেরিওয়ালা (১৯৫৩), উত্তরকালে গল্প সংগ্রহ ইত্যাদি।

প্রবন্ধ গ্রন্থ : লেখকের কথা।

- মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রথম প্রকাশিত উপন্যাসের নাম– জননী (১৯৩৫)।
- তার 'পদ্মানদীর মাঝি' (১৯৩৬) উপন্যাসটি 'পূর্বাশা' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়।
- 'পদ্মানদীর মাঝি' নিয়ে চলচ্চিত্র নির্মাণ করেন– গৌতম ঘোষ।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



☐ 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসের উল্লেখযোগ্য চরিত্র– কুবের, কপিলা, মালা, ধনঞ্জয়, গণেশ, হোসেন মিয়া, শীতলবাবু।
☐ শশী, কুসুম চরিত্র দুটি 'পুতুল নাচের ইতিকথা' উপন্যাসের।
মৃত্যু : ৩ ডিসেম্বর ১৯৫৬, কলকাতা।

মডেল প্রশ্ন

১. **মানিক বন্দোপাধ্যায় কবে কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?**
উত্তর : ১৯ মে ১৯০৮; সাঁওতাল পরগনা, দুমকা, বিহার।

২. **মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আসল নাম কি ছিল?**
উত্তর : প্রবোধ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (প্রথম গল্পের লেখক হিসেবে ডাক নাম মানিক ব্যবহৃত। এভাবেই আসল নাম ঢাকা পড়ে পরবর্তীকালে মানিক বন্দোপাধ্যায় নামে খ্যাতি লাভ।)

৩. **তার রচিত প্রথম গল্পের নাম কি এবং এটি কোন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়?**
উত্তর : অতসী মামী; প্রকাশিত হয় বিচিত্রা পত্রিকায় (পৌষ সংখ্যা ১৩৩৫)।

৪. **মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রথম প্রকাশিত উপন্যাসের নাম কি?**
উত্তর : জননী (১৯৩৫)।

৫. **মানিক সাহিত্য সম্পর্কে কি বলা হয়?**
উত্তর : শরৎচন্দ্র ও কল্লোল গোষ্ঠীর লেখকদের পর বাংলা সাহিত্যে বস্তুতান্ত্রিকতা ও মনোবিশ্লেষণ মানিক সাহিত্যে সবচেয়ে বেশি প্রতিফলিত।

৬. **ভিখু ও পাচি তার কোন গল্পের পাত্র-পাত্রী?**
উত্তর : প্রাগৈতিহাসিক।

৭. **শশী ও কুসুম কোন উপন্যাসের পাত্র-পাত্রী?**
উত্তর : পুতুলের ইতিকথা।

১৪. **'পদ্মা নদীর মাঝি' উপন্যাসের উপজীব্য ও চরিত্র সম্পর্কে ধারণা দিন।**
উত্তর : কথা সাহিত্যিক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আঞ্চলিক উপন্যাস 'পদ্মানদীর মাঝি' (১৯৩৬) উপন্যাসে জেলে জীবনের সুখ-দুঃখ বর্ণনা করা হয়েছে। উল্লেখযোগ্য চরিত্র— কুবের, কপিলা, মালা, ধনঞ্জয়, গণেশ, শীতলবাবু, হোসেন মিঞা প্রভৃতি।

## মুনীর চৌধুরী (১৯২৫-১৯৭১)

জন্ম : ২৭ নভেম্বর, ১৯২৫; মানিকগঞ্জ (মাতুলালয়)।

পৈতৃক নিবাস : নোয়াখালী।
☐ তিনি মূলত শিক্ষাবিদ, নাট্যকার, সমালোচক ও বাগ্মী।
☐ তিনি 'রক্তাক্ত প্রান্তর' নাটকটি রচনা করেছিলেন কায়কোবাদের 'মহাশ্মশান' মহাকাব্যের বিষয় অবলম্বনে।
☐ ভাষা আন্দোলনকে উপজীব্য করে তিনি রচনা করেছিলেন 'কবর' নাটক।
নাটক : রক্তাক্ত প্রান্তর (১৯৬২), চিঠি (১৯৬৬), কবর (১৯৬৬), দণ্ডকারণ্য (১৯৬৬), পলাশী ব্যারাক ও অন্যান্য (১৯৬৯)।



অনুবাদ নাটক : কেউ কিছু বলতে পারে না (১৯৬৭), রূপার কৌটা (১৯৬৯), মুখরা রমণী বশীকরণ (১৯৭০)।
প্রবন্ধ গ্রন্থ : ড্রাইডেন ও ডি. এল. রায় (১৯৬৩, পরে তুলনামূলক সমালোচনা গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত), মীর মানস (১৯৬৫), তুলনামূলক সমালোচনা (১৯৬৯), বাংলা গদ্যরীতি (১৯৭০)।
পুরস্কার : ১৯৬২ সালে নাটকে বাংলা একাডেমী পুরস্কার, ১৯৬৫ সালে মীর মানস গ্রন্থের জন্য দাউদ পুরস্কার এবং ১৯৬৬ সালে সিতারা-ই-ইমতিয়াজ খেতাব লাভ।
মৃত্যু : স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রাক্কালে অপহৃত ও নিখোঁজ (১৪ ডিসেম্বর ১৯৭১)।

মডেল প্রশ্ন

১. **মুনীর চৌধুরীর জন্মতারিখ কত এবং তিনি কত তারিখে অপহৃত ও নিখোঁজ হন?**
উত্তর : ১৯২৫ সালের ২৭ নভেম্বর জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৯৭১ সালের ১৪ ডিসেম্বর অপহৃত ও নিখোঁজ হন।

২. **'নষ্ট ছেলে' কোন জাতীয় রচনা?**
উত্তর : নাটক; মুনীর চৌধুরী।

৩. **'মুখরা রমণী বশীকরণ' গ্রন্থটির রচয়িতা কে এবং এটি কোন জাতীয় রচনা ?**
উত্তর : মুনীর চৌধুরী; অনুবাদ নাটক।

৪. **'মুখরা রমণী বশীকরণ' নাটকটি কত সালে প্রকাশিত হয় ?**
উত্তর : ১৯৭১ সালে।

৫. **'রক্তাক্ত প্রান্তর' নাটকটির রচয়িতা কে এবং এর উপজীব্য বিষয় কি?**
উত্তর : মুনীর চৌধুরী; এর উপজীব্য বিষয় পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধ।

৬. **'কবর' গ্রন্থটি কোন শ্রেণীর রচনা? এর উপজীব্য বিষয় কি?**
উত্তর : নাটক; এর উপজীব্য বিষয় ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন।

৭. **১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারির পটভূমিতে রচিত 'কবর' নাটকের রচয়িতা কে?**
উত্তর : বিখ্যাত নাট্যকার মুনীর চৌধুরী রচিত নাটক 'কবর'। '৫২-এর ভাষা আন্দোলনের পটভূমিতে নাটকটি রচিত। তিনি ১৯৫৩ সালের ১৭ জানুয়ারি ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে বসে নাটকটি রচনা করেন। নাটকটি ঐ বছরের ২১ ফেব্রুয়ারি রাজবন্দিদের দ্বারা ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে অভিনীত হয়।

৮. **মুনীর চৌধুরীর 'রক্তাক্ত প্রান্তর' কোন শ্রেণীর নাটক?**
উত্তর : 'রক্তাক্ত প্রান্তর' নাটকটি পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধের (১৭৬১) ঘটনা অবলম্বনে তিন অঙ্কবিশিষ্ট ঐতিহাসিক নাটক। এ নাটকটির কাহিনী কায়কোবাদের মহাকাব্য 'মহাশ্মশান' থেকে গ্রহণ করা হলেও সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র তথা মৌলিক নাটক।

## মুহম্মদ এনামুল হক (১৯০৬-১৯৮২)

জন্ম : বখতপুর গ্রাম, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম; ১৯০৬ সালে।
☐ তিনি মূলত শিক্ষাবিদ ও গবেষক।
☐ কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ডের পরিচালক হিসেবেও কাজ করেছেন।
সাহিত্যকর্ম : আবাহন (গীতি সংকলন, ১৯২০-১৯২১), ঝর্ণাধারা (কবিতা সংকলন, ১৯২৮), চট্টগ্রামী বাঙ্গালার রহস্য-ভেদ (১৯৩৫), আরাকান রাজসভায় বাঙ্গালা সাহিত্য [আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদের সাথে একযোগে রচনা, (১৯৩৫)], বঙ্গে সুফী প্রভাব (১৯৩৫), বাঙলা ভাষার সংস্কার (১৯৪৪), পূর্ব

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

পাকিস্তানে ইসলাম (১৯৪৮), ব্যাকরণ মঞ্জরী (১৯৫২), মুসলিম বাঙ্গালা সাহিত্য (১৯৫৭), বাংলাদেশের ব্যবহারিক অভিধান (স্বরবর্ণাংশ সম্পাদনা, ১৯৭৪), A History of Sufism in Bengal (Asiatic Society of Bangladesh, ১৯৭৫), মনীষা মঞ্জুষা (১ম খণ্ড ১৯৭৫), মনীষা মঞ্জুষা (২য় খণ্ড ১৯৭৬), বুলগেরিয়া ভ্রমণ (১৯৭৮), আদ্যপরিচয়, শেখ জাহিদ (সম্পাদনা, ১৯৮০)।

সম্পাদিত অন্যান্য গ্রন্থ : Perso-Arabic Elements in Bengali (with Dr. G. M. Hilali, ১৯৬৭), Abdul Karim Sahitya Bisharad Commemoration Volume (Asiatic Society of Bangladesh 1972), Dr. Mohammad Shahidullah Felicitation Volume (Asiatic Society of Pakistan, 1966).

পুরস্কার : ১৯৬৪ সালে সাহিত্য ও শিক্ষাক্ষেত্রে অবদান রাখার জন্য 'বাংলা একাডেমী' পুরস্কার লাভ। ১৯৬৬ সালে 'প্রেসিডেন্ট পুরস্কার', ১৯৬৮ সালে 'সিতারা-ই-ইমতিয়াজ', ১৯৭৯ সালে 'একুশে পদক', ১৯৮০ সালে শেরে বাংলা সাহিত্য পুরস্কার এবং ১৯৮১ সালে মুক্তধারা সাহিত্য পুরস্কারে ভূষিত।

মৃত্যু : ১৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৮২; ঢাকা (পিজি হাসপাতাল)।

**মডেল প্রশ্ন**

১. মুহম্মদ এনামুল হকের জন্ম কত সালে এবং তিনি কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?
উত্তর : ১৯০৬ সালে; বখতপুর গ্রাম, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম।

২. তিনি মূলত কি ছিলেন?
উত্তর : শিক্ষাবিদ ও গবেষক।

৩. তার রচিত সাহিত্যকর্মগুলো কি কি?
উত্তর : চট্টগ্রামী বাঙ্গালার রহস্য-ভেদ, আরাকান রাজসভায় বাঙ্গালা সাহিত্য, বঙ্গে সুফী প্রভাব, ব্যাকরণ মঞ্জরী, মুসলিম বাঙ্গালা সাহিত্য, মনীষা মঞ্জুষা (১ম ও ২য় খণ্ড)।

৪. তিনি কত তারিখে মৃত্যুবরণ করেন?
উত্তর : ১৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৮২; ঢাকা।

## মুহম্মদ আবদুল হাই (১৯১৯-১৯৬৯)

জন্ম : মরিচা গ্রাম, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ; ২৬ নভেম্বর, ১৯১৯।

- 'ধ্বনিবিজ্ঞান ও বাংলা ধ্বনিতত্ত্ব' (১৯৬৪) গ্রন্থের জন্য তিনি আমাদের কাছে স্মরণীয় হয়ে আছেন। লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি ধ্বনিবিজ্ঞান নিয়ে গবেষণা করেছেন।
- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'সাহিত্যপত্রিকা'র প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক ছিলেন তিনি। তখন পত্রিকাটি ছিল যাণ্মাসিক।

প্রকাশিত গ্রন্থ : সাহিত্য ও সংস্কৃতি (১৯৫৪), বিলাতে সাড়ে সাতশ' দিন (১৯৫৮), তোষামোদ ও রাজনীতির ভাষা (১৯৫৯), ভাষা ও সাহিত্য (১৯৬০), A Phonetic and Phonological Study of Nasals and Nasalization in Bengali (১৯৬০), ধ্বনিবিজ্ঞান ও বাংলা ধ্বনিতত্ত্ব (১৯৬৪), বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (সৈয়দ আলী আহসান সহযোগে, ১৯৬৮)। প্রবন্ধ ও গবেষণার জন্য ১৯৬১ সালে বাংলা একাডেমী পুরস্কার লাভ।

মৃত্যু : ঢাকা রেল লাইনে কাটা পড়ে, ৩ জুন ১৯৬৯ সালে।



**মডেল প্রশ্ন**

১. 'ধ্বনিবিজ্ঞান ও ধ্বনিতত্ত্ব' গ্রন্থের রচয়িতা কে? এটি কোন জাতীয় গ্রন্থ?
উত্তর : মুহম্মদ আবদুল হাই; প্রবন্ধ গ্রন্থ।

২. 'বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত' সৈয়দ আলী আহসান কার সহযোগে রচনা করেছেন এবং কত সালে?
উত্তর : মুহম্মদ আবদুল হাই; ১৯৬৮ সালে।

৩. 'তোষামোদ ও রাজনীতির ভাষা' গ্রন্থটির রচয়িতা কে? এটি কত সালে প্রকাশিত হয়?
উত্তর : মুহম্মদ আবদুল হাই; ১৯৫৯ সালে প্রকাশিত হয়।

## ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ (১৮৮৫-১৯৬৯)

জন্ম : পেয়ারা গ্রাম, চব্বিশ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ; ১০ জুলাই ১৮৮৫।

গবেষণামূলক রচনা : সিদ্ধা কাহ্নুপার গীত ও দোহা (১৯২৬), বাংলা সাহিত্যের কথা (১ম খণ্ড ১৯৫৩, ২য় খণ্ড ১৯৬৫), বৌদ্ধ মর্মবাদীর গান (১৯৬০)।

ভাষাতত্ত্ব : ভাষা ও সাহিত্য (১৯৩১), বাংলা ব্যাকরণ (১৯৬৫), বাংলা ভাষার ইতিবৃত্ত (১৯৬৫)।

প্রবন্ধ পুস্তক : ইকবাল (১৯৪৫), আমাদের সমস্যা (১৯৪৯), বাংলা আদব কি তারিখ (১৯৫৭), Essays on Islam (১৯৪৫), Traditional Culture in East Pakistan (১৯৬৩)।

গল্পগ্রন্থ : রকমারি (১৯৩১)।

শিশুতোষ গ্রন্থ : শেষ নবীর সন্ধানে, ছোটদের রসুলুল্লাহ (১৯৬২), সেকালের রূপকথা (১৯৬৫)।

অনুবাদ গ্রন্থ : দীওয়ানে হাফিজ (১৯৩৮), অমিয়শতক (১৯৪০), রুবাইয়াত-ই-ওমর খৈয়াম (১৯৪২), শিকওয়াহ ও জওয়াব-ই-শিকওয়াহ (১৯৪২), মহানবী (১৯৪৬), বাইঅতনামা (১৯৪৮), বিদ্যাপতি শতক (১৯৫৪), কুরআন প্রসঙ্গ (১৯৬২), মহররম শরীফ (১৯৬২), অমর কাব্য (১৯৬৩), ইসলাম প্রসঙ্গ (১৯৬৩), Hundred Sayings of the Holy Prophet (১৯৪৫), Buddhist Mystic Songs (১৯৬০)।

সংকলন ও সম্পাদনা : পদ্মাবতী (১৯৫০), প্রাচীন ধর্মগ্রন্থে শেষ নবী (১৯৫২), গল্প সংকলন (১৯৫৩), দুই খণ্ডে প্রকাশিত আঞ্চলিক ভাষার অভিধান।

সম্পাদিত পত্রপত্রিকা : আঙ্গুর (শিশু পত্রিকা, ১৯২০), দি পীস (১৯২৩), বঙ্গভূমিক (১৯৩৭), তকবীর (১৯৪৭)।

পুরস্কার : ১৯৬৭ সালে ফরাসি সরকার কর্তৃক নাইট অব দ্য অর্ডারস অব আর্টস অ্যান্ড লেটার্স পদক, পাকিস্তান সরকার কর্তৃক রাষ্ট্রীয় সম্মান প্রাইড অব পারফরম্যান্স, ১৯৬৭ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ইমেরিটাস প্রফেসর পদ লাভ।

মৃত্যু : ১৩ জুলাই ১৯৬৯; ঢাকা।

**মডেল প্রশ্ন**

১. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর জন্ম তারিখ কত?
উত্তর : ১০ জুলাই, ১৮৮৫।

২. তিনি কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?
উত্তর : পেয়ারা গ্রাম, চব্বিশ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



৩. তিনি মূলত কি ছিলেন?
উত্তর : ভাষাবিদ, ভাষাবিজ্ঞানী, গবেষক ও শিক্ষাবিদ।

৪. বাংলা একাডেমী প্রকাশিত কোন অভিধানের তিনি প্রধান সম্পাদক?
উত্তর : বাংলা একাডেমী আঞ্চলিক ভাষার অভিধান।

৫. তিনি কি কি পত্রিকা সম্পাদনা করেন?
উত্তর : আঙ্গুর (১৯২০), দি পীস (১৯২৩), বঙ্গভূমিক (১৯৩৭), তকবীর (১৯৪৭)।

৬. তিনি কত তারিখে মৃত্যুবরণ করেন?
উত্তর : ১৩ জুলাই ১৯৬৯।

## শওকত ওসমান (১৯১৭-১৯৯৮)

জন্ম : ২ জানুয়ারি, ১৯১৭; সবল সিংহপুর, হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ।

□ প্রকৃত নাম : শেখ আজিজুর রহমান।
□ তিনি মূলত কথাসাহিত্যিক।
□ গ্রন্থাকারে প্রকাশিত প্রথম পুস্তক 'জননী' (১৯৬১)।
□ উপন্যাস 'বনি আদম' সাহিত্য সাময়িকীতে প্রকাশিত হয় ১৯৪৬ সালে।

প্রবন্ধ : সংস্কৃতির চড়াই উৎরাই (১৯৮৫), মুসলিম মানসের রূপান্তর (১৯৮৬), ভাব ভা... ভাবনা (১৯৭৪), হপ্তম পঞ্চম (১৯৫৭), নষ্টতান অষ্টভান (১৯৮৬), তিন মির্জা (১৯৮৬)।

গল্প : পিঁজরাপোল (১৩৫৮), প্রস্তর ফলক (১৯৬৪), উপলক্ষ (১৯৬৫), জ... যদি তব বঙ্গে (১৯৭৫), নেত্রপথ (১৯৬৮), উভশৃঙ্গ (১৩৭৫)।

উপন্যাস : বনি আদম (১৯৪৩), জননী (১৯৬৮), ক্রীতদাসের হাসি (১৯৬২), চৌরসন্ধি (১৯৬৮), সমাগম (১৯৬৭), জাহান্নাম হইতে বিদায় (১৯৭১), দুই সৈনিক (১৯৭৩), নেকড়ে অরণ্য (১৯৭৩), পতঙ্গ পিঞ্জর (১৯৮৩), রাজসাক্ষী (১৯৮৫), জলাংগী (১৯৮৬)।

নাটক : আমলার মামলা (১৯৪৯), তস্কর ও লস্কর (১৯৫৩), পূর্ণ স্বাধীনতা চূর্ণ স্বাধীনতা (১৯৯০)।

পুরস্কার : বাংলা একাডেমী পুরস্কার (১৯৬২), আদমজী সাহিত্য পুরস্কার (১৯৬৬), প্রেসিডেন্ট পুরস্কার (১৯৬৭), একুশে পদক (১৯৮৩), মুক্তধারা সাহিত্য পুরস্কার (১৯৯১)।

মৃত্যু : ২১ মে ১৯৯৮।

**মডেল প্রশ্ন**

১. শওকত ওসমানের জন্ম ও মৃত্যুর তারিখ কত?
উত্তর : জন্ম ১৯১৯ সালে এবং মৃত্যু ২১ মে ১৯৯৮।

২. 'ক্রীতদাসের হাসি' কোন জাতীয় রচনা এবং এর রচয়িতা কে? এটি কত সালে প্রকাশিত হয়?
উত্তর : উপন্যাস; শওকত ওসমান। ১৯৬৬ সালে প্রকাশিত হয়।

৩. শওকত ওসমানের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য উপন্যাসের নাম উল্লেখ করুন।
উত্তর : জননী, রাজা উপাখ্যান, সমাগম, চৌরসন্ধি, বনি আদম ইত্যাদি।



৪. 'রাজা উপাখ্যান' কোন জাতীয় রচনা? রচয়িতা কে?
উত্তর : প্রতীকধর্মী ঐতিহাসিক উপন্যাস; শওকত ওসমান।

৫. শওকত ওসমানের আসল নাম কি? তার পরিচয় দিন।
উত্তর : কথাসাহিত্যিক শওকত ওসমানের আসল নাম শেখ আজিজুর রহমান। ১৯১৭ সালের ২ জানুয়ারি তিনি হুগলিতে জন্মগ্রহণ করেন ও ১৯৯৮ সালে মৃত্যুবরণ করেন।

৬. শওকত ওসমানের 'জননী' উপন্যাসের প্রতিপাদ্য কি?
উত্তর : কথাসাহিত্যিক শওকত ওসমানের (১৯১৭-১৯৯৮) গ্রন্থাকারে প্রকাশিত প্রথম উপন্যাস 'জননী' (১৯৬১)। এ উপন্যাসের প্রতিপাদ্য সন্তানের মঙ্গল কামনায় মা যে কোনো পথ অবলম্বন করতে পারে। এ উপন্যাসের উল্লেখযোগ্য চরিত্র হলো মা (দরিয়া বিবি), ইয়াকুব, আজহার, মোনাদি প্রমুখ।

৭. শওকত ওসমান সাহিত্যের কোন শাখায় অবদানের জন্য বিখ্যাত হয়েছেন? এ প্রসঙ্গে তার একটি গ্রন্থের নাম লিখুন।
উত্তর : বাংলা সাহিত্যের উপন্যাসে অবদান রাখার জন্য শওকত ওসমান বিখ্যাত হয়েছেন। এ প্রসঙ্গে তার উল্লেখযোগ্য একটি উপন্যাস হলো 'ক্রীতদাসের হাসি'।

## শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৭৬-১৯৩৮)

রবীন্দ্রনাথের পর সাড়া জাগিয়ে দেখা দেন শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। তিনি জনপ্রিয় ঔপন্যাসিক ছিলেন, জনপ্রিয়তায় তাঁকে আর কেউ ছাড়িয়ে যেতে পারেননি। ঔপন্যাসিক হিসেবে কয়েক দশক আগে তিনি যে মর্যাদা পেতেন, এখন আর তাঁকে তা দেয়া হয় না; তবে তিনি আবার মর্যাদা পাবেন। তিনি সস্তা জনপ্রিয় ছিলেন না। তিনি বাঙলা ভাষার প্রধান ঔপন্যাসিকদের একজন। তিনি বাঙালির আবেগস্রোতকে খুলে দিয়েছিলেন; এবং আবেগে ভেসে গিয়েছিল পাঠকেরা। তিনি সবকিছু দেখতেন হৃদয়ের যুক্তির সাহায্যে, মস্তিষ্কের সাহায্যে নয়। তিনি সামাজিকভাবে নিষিদ্ধ কিছু ব্যাপারকে নিয়ে এসেছিলেন সামনে, সেগুলোকে দিয়েছিলেন মহিমা। দাঁড়িয়েছিলেন সামাজিক অনেক রীতিনীতির বিরুদ্ধে। তাই তিনি ছিলেন একধরনের বিদ্রোহী। বাঙালির আবেগ ও ভাবাবেগের মুক্তিদাতা হিসেবে স্মরণীয় হয়ে থাকবেন শরৎচন্দ্র। বহু উপন্যাস লিখেছিলেন তিনি, যেগুলো একসময় বাঙালির প্রাত্যহিক পাঠ্যপুস্তকে পরিণত হয়েছিলো।

জন্ম : ১৮৭৬ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর।

স্থান : পশ্চিমবঙ্গের হুগলি জেলার দেবানন্দপুর গ্রামে।

□ তার প্রথম সাহিত্যকর্ম 'মন্দির' (১৯০৩) এবং দ্বিতীয় সাহিত্যকর্ম 'বড় দিদি' (১৯১৩)।
□ সাহিত্যে বিশেষ অবদানের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তাকে 'ডি লিট' (১৯৩৬ সালে) ডিগ্রি প্রদান করে। বাঙালি সমাজে নারীর বঞ্চনা, নারীর দুঃখ তার উপন্যাসের একটি বিশেষ দিক। তার রচনায় সমাজের নিম্নশ্রেণীর মানুষের জীবন, জীবিকা ও আবেগ প্রাধান্য পেয়েছে।
□ তিনি 'মন্দির' গল্পের জন্য কুন্তলীন পুরস্কার (১৯০৩) লাভ করেন।

| উপন্যাস | প্রধান চরিত্র |
| --- | --- |
| শ্রীকান্ত (১৯১৭-১৯৩৩) | রাজলক্ষ্মী, শ্রীকান্ত, ইন্দ্রনাথ, অভয়া, কমললতা, সুনন্দা। |
| চরিত্রহীন (১৯১৭) | সতীশ, সাবিত্রী, কিরণময়ী। |
| গৃহদাহ (১৯২০) | মহিম, অচলা, সুরেশ। |

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



| উপন্যাস | প্রধান চরিত্র |
|---|---|
| পল্লী সমাজ (১৯১৬) | রমা, রমেশ। |
| দেবদাস (১৯১৭) | দেবদাস, পার্বতী, চন্দ্রমুখী। |
| দত্তা (১৯১৮) | নরেন, বিজয়া, বিলাস, রাসবিহারী, বনমালী। |
| শুভদা (১৯৩৮) | শুভদা, ললনা। |
| শেষপ্রশ্ন (১৯৩১) | কমল। |
| দেনাপাওনা (১৯২৩) | ষোড়শী, নির্মল। |
| শেষের পরিচয় (১৯৩৯) | সবিতা, রমনী বাবু। |
| পণ্ডিতমশাই (১৯১৪) | বৃন্দাবন, কুসুম। |

□ 'গৃহদাহ' উপন্যাসের মূল বিষয়বস্তু আপন স্বামী মহিম এবং স্বামীর বন্ধু সুরেশের প্রতি অচলার প্রেমাকর্ষণের দ্বন্দ্ব।

□ 'শ্রীকান্ত' আত্মচরিতমূলক উপন্যাস। এটি চার পর্বে বিভক্ত। ইন্দ্রনাথ বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কিশোর চরিত্র। উপন্যাসটির প্রথম খণ্ড প্রকাশের সময় নিজের ছদ্মনাম 'শ্রীকান্ত শর্মা' ব্যবহার করেন।

□ 'পথের দাবী' রাজনৈতিক পটভূমিকায় রচিত উপন্যাস। এটি ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত হয়েছিল।

□ শরৎচন্দ্রের 'চরিত্রহীন' উপন্যাসটি সর্বপ্রথম 'যমুনা' নামক সাহিত্যপত্রে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়।

□ শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবী' উপন্যাসটি প্রথম প্রকাশিত হয় বঙ্গবাণী (১৩২৯ বঙ্গাব্দ) পত্রিকায়।

**ছোটগল্প :** মন্দির, কাশীনাথ, একাদশী বৈরাগী, মামলার ফল, পরেশ, সতী, বিলাসী, অভাগীর স্বর্গ, মহেশ।

□ শরৎচন্দ্র রচিত সবচেয়ে সার্থক ছোটগল্প হলো 'মহেশ'। এ গল্পটি সমগ্র বাংলা সাহিত্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন। 'মহেশ' একটি বলদের নাম। মহেশের প্রতি দরিদ্র কৃষক গফুরের অকৃত্রিম ভালবাসা, মহেশকে খেতে দিতে না পারার বেদনা, কসাইয়ের কাছে মহেশকে বিক্রি এবং পরে অস্বীকার, গফুর কর্তৃক মহেশের মাথায় আঘাত এবং মহেশের মৃত্যু, শেষান্তে রাতের আধারে গফুরের গ্রাম ত্যাগ এ কাহিনীই 'মহেশ' গল্পে বর্ণিত হয়েছে।

| ছোটগল্প | চরিত্র |
|---|---|
| রামের সুমতি | রাম, নারায়নী। |
| মেজদিদি | হেমাঙ্গিনী, কাদম্বিনী, কেষ্ট। |
| মহেশ | গফুর, আমেনা, তর্করত্ন। |
| বড়দিদি | মাধবী, সুরেন্দ্রনাথ, ব্রজরাজ। |

□ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে জগত্তারিণী স্বর্ণপদক লাভ করেন ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দে।

মৃত্যু : ১৬ জানুয়ারি ১৯৩৮।

**মডেল প্রশ্ন**

১. **শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কবে কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?**
উত্তর : ১৫ সেপ্টেম্বর ১৮৭৬; দেবানন্দপুর গ্রাম, হুগলী।

২. **শরৎচন্দ্রের আত্মচরিতমূলক উপন্যাস কোনটি?**
উত্তর : শ্রীকান্ত।



৩. **'শ্রীকান্ত' উপন্যাস কয় খণ্ডে প্রকাশিত?**
উত্তর : চার খণ্ডে।

৪. **শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কয়েকটি উপন্যাসের নাম উল্লেখ করুন।**
উত্তর : চরিত্রহীন, বৈকুণ্ঠের উইল, শেষ প্রশ্ন, শুভদা, চন্দ্রনাথ, পথের দাবী, শেষের পরিচয় ইত্যাদি।

৫. **শরৎচন্দ্রের আলোড়ন সৃষ্টিকারী প্রথম উপন্যাস কোনটি?**
উত্তর : অপরাজেয় কথাসাহিত্যিক হিসেবে পরিচিত ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের উপন্যাস 'বড়দিদি' ১৯০৭ সালে প্রকাশিত হয়। এই উপন্যাসটি সরলা দেবী সম্পাদিত 'ভারতী' পত্রিকায় প্রকাশিত হলে বাংলা সাহিত্যে আলোড়নের সৃষ্টি করে। উল্লেখযোগ্য চরিত্র হলো সুরেন্দ্রনাথ, ব্রজরাজ, মাধবী, প্রমীলা।

৬. **শরৎচন্দ্রের আত্মজীবনীমূলক উপন্যাসের নাম কি?**
উত্তর : অপরাজেয় কথাসাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৭৬-১৯৩৮)-এর আত্মজৈবনিক উপন্যাস 'শ্রীকান্ত' ৪ খণ্ডে রচিত। উল্লেখযোগ্য চরিত্র হচ্ছে শ্রীকান্ত, ইন্দ্রনাথ, অন্নদাদিদি, রাজলক্ষ্মী, অভয়া, রোহিণী, গুরুদেব, যদুনাথ, সুনন্দা, কুশারী, পুঁটু, গহর, কমললতা। উপন্যাসটির সমাপ্তি টানা হয় কমললতার নিরুদ্দেশ যাত্রার মধ্য দিয়ে।

৭. **'গৃহদাহ' উপন্যাসের প্রধান দু'টি চরিত্রের নাম কি?**
উত্তর : শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের উপন্যাস 'গৃহদাহ' (১৯২০)-এর প্রধান দুটি চরিত্র সুরেশ ও অচলা; অন্যান্য উল্লেখযোগ্য চরিত্র মহিম, মৃণাল। মহিম ও সুরেশ দুই পুরুষের প্রতি অচলার আকর্ষণ-বিকর্ষণ এ উপন্যাসের মূল উপকরণ। উপন্যাসে বিবাহ-বহির্ভূত অসামাজিক প্রেমের কাহিনী তুলে ধরা হয়েছে।

৮. **শরৎচন্দ্রের কোন উপন্যাসটি সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত হয়েছিল? কেন বাজেয়াপ্ত হয়েছিল?**
উত্তর : বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচিত রাজনৈতিক উপন্যাস 'পথের দাবী' বিপ্লববাদীদের প্রতি সমর্থনের অভিযোগে ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত হয়। উপন্যাসটি ১৯২৬ সালে প্রকাশিত হয়।

## শহীদুল্লাহ কায়সার (১৯২৭-১৯৭১)

জন্ম : মজুপুর গ্রাম, ফেনী; ১৬ ফেব্রুয়ারি, ১৯২৭।

উপন্যাস : সারেং বৌ (১৯৬২) ও সংশপ্তক (১৯৬৫)।

স্মৃতিকথা : রাজবন্দীর রোজনামচা (১৯৬২)।

ভ্রমণ কাহিনী : পেশোয়ার থেকে তাসখন্দ (১৯৬৬)।

পুরস্কার : 'সারেং বৌ' উপন্যাসের জন্য আদমজী পুরস্কার (১৯৬২) ও উপন্যাসে বাংলা একাডেমী পুরস্কার (১৯৬২) লাভ।

মৃত্যু : স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রাক্কালে অপহৃত ও নিখোঁজ (১৪ ডিসেম্বর ১৯৭১)

**মডেল প্রশ্ন**

১. **শহীদুল্লাহ কায়সারের জন্ম কত সালে?**
উত্তর : ১৬ ফেব্রুয়ারি ১৯২৭; ফেনীতে।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



২. তিনি মূলত কি হিসেবে পরিচিত?
উত্তর : সাংবাদিক ও সাহিত্যিক।

৩. তার পুরো নাম কি ছিল?
উত্তর : আবু নঈম মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ।

৪. তিনি কোন শিরোনামে উপসম্পাদকীয় রচনা করেন?
উত্তর : 'রাজনৈতিক পরিক্রমা', 'বিচিত্র কথা'।

৫. তার উপন্যাসে বাঙালি জীবনের কোন দিকটি উজ্জ্বলভাবে প্রকাশিত?
উত্তর : বাঙালি জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষা, দ্বন্দ্ব-সংঘাত ও সংগ্রামী চেতনা।

৬. তিনি কোন দুটি উপন্যাস লিখে খ্যাত হন?
উত্তর : সারেং বৌ (১৯৬২), সংশপ্তক (১৯৬৫)।

৭. রাজবন্দীর রোজনামচা নামক তার স্মৃতিকথা কবে প্রকাশিত হয়?
উত্তর : ১৯৬২ সালে।

৮. তার ভ্রমণবৃত্তান্তের নাম কি?
উত্তর : পেশোয়ার থেকে তাসখন্দ (১৯৬৬)।

৯. 'সংশপ্তক' কি ধরনের রচনা?
উত্তর : সাংবাদিক ও সাহিত্যিক শহীদুল্লাহ কায়সারের দুটি বিখ্যাত উপন্যাস সারেং বৌ (১৯৬২), সংশপ্তক (১৯৬৫)। মহাভারতের শব্দ সংশপ্তক অর্থ হলো যে সৈনিকেরা জীবনমরণ পণ করে যুদ্ধে লড়ে, পালিয়ে আসে না। সংশপ্তক একটি মহাকাব্যিক উপন্যাস। উপন্যাসে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী শুরু থেকে বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনের পূর্ববর্তী বাংলাদেশের সামাজিক-রাজনৈতিক পরিবর্তন ও রূপান্তর আলোচনা করা হয়েছে।

## শামসুর রাহমান (১৯২৯-২০০৬)

জন্ম : মাহুতটুলী, ঢাকা; ২৪ অক্টোবর ১৯২৯।

- ☐ তার পৈতৃক নিবাস বর্তমান নরসিংদী জেলার রায়পুরার পাড়াতলি গ্রামে।
- ☐ তার ডাক নাম বাচ্চু।
- ☐ মুক্তিযুদ্ধকালে তিনি লিখতেন মজলুম আদিব ছদ্মনামে।
- ☐ তার রচিত বিখ্যাত দুটি কবিতার নাম স্বাধীনতা তুমি, তুমি আসবে বলে হে স্বাধীনতা।

কবিতা : প্রথম গান, দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে (১৯৬০), রৌদ্র করোটিতে (১৯৬৩), বিধ্বস্ত নীলিমা (১৯৬৭), নিরালোকে দিব্যরথ (১৯৬৮), নিজ বাসভূম (১৯৭০), বন্দী শিবির থেকে (১৯৭২), দুঃসময়ের মুখোমুখি (১৯৭৩), ফিরিয়ে নাও ঘাতক কাঁটা (১৯৭৪), আদিগন্ত নগ্ন পদধ্বনি (১৯৭৪), এক ধরনের অহংকার (১৯৭৫), শূন্যতায় তুমি শোকসভা (১৯৭৭), প্রতিদিন ঘরহীন ঘরে (১৯৭৮), ইকারুসের আকাশ (১৯৮২), উদ্ভট উটের পিঠে চলেছে স্বদেশ (১৯৮২), মাতাল ঋত্বিক (১৯৮২), নায়কের ছায়া (১৯৮৩), হোমারের স্বপ্নময় হাত (১৯৮৫), শিরোনাম মনে পড়ে না (১৯৮৫), ধুলায় গড়ায় শিরস্ত্রাণ (১৯৮৫), অবিরল জলভূমি (১৯৮৬), সে এক পরবাসে (১৯৯০), গৃহযুদ্ধের আগে (১৯৯০), খণ্ডিত গৌরব (১৯৯২), ধ্বংসের কিনারে বসে (১৯৯২)।

উপন্যাস : অক্টোপাস (১৯৮৩), নিয়ত মন্তাজ (১৯৮৫), অদ্ভুত আঁধার এক (১৯৮৫), এলো সে অবেলায় (১৯৯৪)।



শিশু-কিশোরতোষ : এলাটিং বেলাটিং (১৯৭৪), ধান ভানলে কুঁড়ো দেবো (১৯৭৭), রংধনু সাঁকো (১৯৯৪), লাল ফুলকির ছড়া (১৯৯৫)।

সম্পাদনা : হাসান হাফিজুর রহমানের অপ্রকাশিত কবিতা (১৩৯২), দুই বাংলার ভালবাসার কবিতা (সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে, ১৯৮৮)।

পুরস্কার : আদমজী পুরস্কার (১৯৬৩), বাংলা একাডেমী পুরস্কার (১৯৬৯), একুশে পদক (১৯৭৭), স্বাধীনতা পুরস্কার (১৯৯১)।

মৃত্যু : ১৭ আগস্ট ২০০৬, ঢাকা।

**মডেল প্রশ্ন**

১. শামসুর রাহমান তার কবিতায় কি ধারণ করেছেন?
উত্তর : আধুনিক নগর জীবনের দাবদাহ, ক্লেদ, ক্লান্তি ও হতাশা।

২. 'বন্দী শিবির থেকে' গ্রন্থটির রচয়িতা কে এবং এটি কোন জাতীয় রচনা?
উত্তর : শামসুর রাহমান; কাব্যগ্রন্থ।

৩. 'স্বাধীনতা তুমি' কবিতাটি কোন কবির রচনা এবং কোন কাব্যগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত?
উত্তর : শামসুর রাহমান; 'শ্রেষ্ঠ কবিতা' কাব্যগ্রন্থ থেকে।

৪. শামসুর রাহমানের কয়েকটি কাব্যগ্রন্থের নাম উল্লেখ করুন।
উত্তর : প্রথম গান, দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে, রৌদ্র করোটিতে, বিধ্বস্ত নীলিমা, নিরালোকে দিব্যরথ, নিজ বাসভূম, বাংলাদেশ স্বপ্ন দ্যাখে, উদ্ভট উটের পিঠে চলেছে স্বদেশ ইত্যাদি।

৫. সাহিত্যকর্মে বিশেষ অবদানের জন্য শামসুর রাহমান যেসব পুরস্কার পেয়েছেন তার কয়েকটি উল্লেখ করুন।
উত্তর : বাংলা একাডেমী পুরস্কার ১৯৬৯, মিৎসুবিশি পুরস্কার ১৯৮২, আদমজী পুরস্কার ১৯৬৩, জীবনানন্দ দাশ পুরস্কার ১৯৭৩ ইত্যাদি।

৬. শামসুর রাহমান কবে মৃত্যুবরণ করেন?
উত্তর : ১৭ আগস্ট ২০০৬।

৭. শামসুর রাহমানের আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থের সংখ্যা কয়টি নাম উল্লেখ করুন।
উত্তর : কবি শামসুর রাহমানের আত্মজীবনী বা আত্মস্মৃতিমূলক গ্রন্থ দুটি। যথা– স্মৃতির শহর' (১৯৭৯) ও 'কালের ধূলোয় লেখা' (২০০৪)।

৮. শামসুর রাহমানের পরিচয় দিন। তার সাহিত্যজীবন সম্পর্কে টীকা লিখুন।
উত্তর : কবি শামসুর রাহমানের জন্ম ১৯২৯ সালের ২৪ অক্টোবর পুরানো ঢাকার মাহুতটুলিতে। পৈতৃক নিবাস নরসিংদী জেলার রায়পুরার পাড়াতলি গ্রামে। তিনি বাংলাদেশের আধুনিক কবি। রোমান্টিকতার সাথে সমাজমনস্কতার সংমিশ্রণ ঘটিয়ে তিনি নতুন কাব্যধারার জন্ম দিয়েছেন। তাঁর প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থের সংখ্যা ৬৫। উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ হচ্ছে 'প্রথম গান, দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে', 'রৌদ্র করোটিতে', 'বিধ্বস্ত নীলিমা', 'বন্দী শিবির থেকে', 'বাংলাদেশ স্বপ্ন দ্যাখে', 'উদ্ভট উটের পিঠে চলছে স্বদেশ', 'বুক তার বাংলাদেশের হৃদয়' ইত্যাদি। উপন্যাস লিখেছেন ৪টি। উল্লেখযোগ্য উপন্যাস হচ্ছে 'নিয়ত সন্তান', 'এলো সে অবেলায়'। এছাড়া লিখেছেন প্রবন্ধ, আত্মস্মৃতি। তার দুটি বিখ্যাত কবিতা– 'স্বাধীনতা তুমি', 'তুমি আসবে বলে হে স্বাধীনতা'। পেয়েছেন আদমজী পুরস্কার, বাংলা একাডেমী পুরস্কার, একুশে পদক, স্বাধীনতা পদক। মৃত্যুবরণ করেন ২০০৬ সালের ১৮ আগস্ট।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



৯. কবি শামসুর রাহমানের কবিতায় দেশপ্রেম কিভাবে ফুটে উঠেছে তার ব্যাখ্যা দিন।

উত্তর : কবি শামসুর রাহমান কবি হিসেবে ছিলেন অন্তর্মুখী। সেই হিসেবে তার কবিতাও ছি অন্তর্মুখী। তার কবিতার উপজীব্য ছিল রাজনৈতিক টানাপোড়েন, মানুষের প্রতিদিনের সংঘাত সংগ্রাম। উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের পরিপ্রেক্ষিতে লেখা কবিতা 'আসাদের শার্ট' উঠে আসে সাধা মানুষের মুখে। একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের সময় তিনি লেখেন তার 'বন্দী শিবির থেকে' কাব্যগ্রন্থে কবিতাগুলো। পূর্ব বাংলা এবং স্বাধীন বাংলাদেশে তার মৃত্যুকালীন সময় পর্যন্ত সংঘটিত রাজনৈতিক সামাজিক ঘটনাপ্রবাহ তার কবিতায় উপস্থাপিত হয়েছে ঈর্ষণীয় উচ্চতায়। তার কয়েকটি কাব্যগ্রন্থে শিরোনামেও মিলবে এর প্রমাণ : 'নিজ বাসভূমে', 'দুঃসময়ের মুখোমুখি', 'ফিরিয়ে নাও ঘাতক কাঁটা' 'উদ্ভট উটের পিঠে চলেছে স্বদেশ', 'দেশদ্রোহী হতে ইচ্ছে করে'। স্বৈরশাসক এরশাদের শাসনামলে সংগঠিত গণআন্দোলনে শহীদ নূর হোসেনকে নিয়ে লেখা কবিতার নাম দেন 'বুক তার বাংলাদেশের হৃদয়'। সবকিছু মিলিয়ে আমরা বলতে পারি, কবি শামসুর রাহমানের কবিতা ধারণ করেছে যুগের প্রে ছাড়াও যুগের বেদনাকে, যুগের অন্তরের রক্তক্ষরণকে, যুগের অপরাজেয় প্রাণকে। তিনি তার সময়ে শুধু একজন মহৎ কবিই নন, তিনি তার সময়ের যুগন্ধর কবি।

## সিকান্দার আবু জাফর (১৯১৯-১৯৭৫)

জন্ম : তেতুলিয়া গ্রাম, খুলনা; ১৯১৯।

☐ তিনি মূলত সঙ্গীত রচয়িতা, কবি, নাট্যকার ও সাংবাদিক।

☐ পেশা ছিল সাংবাদিকতা।
☐ তিনি 'মাসিক সমকাল' পত্রিকার সম্পাদনা করে স্মরণীয় হয়ে আছেন।
☐ তিনি বাংলা একাডেমী পুরস্কার লাভ করেন ১৯৬৬ সালে।

কবিতা : প্রসন্ন প্রহর (১৯৬৫), বৈরীবৃষ্টিতে (১৯৬৫), তিমিরান্তক (১৯৬৫), কবিতা ১৩৭২ (১৯৬৮), বৃশ্চিক লগ্ন (১৯৭১)।

নাটক : শকুন্ত উপাখ্যান (১৯৫৮), সিরাজউদ্দৌলা (১৯৬৫), মহাকবি আলাওল (১৯৬৫)।

উপন্যাস : মাটি আর অশ্রু (১৯৪২), পূরবী (১৯৪৪), নতুন সকাল (১৯৪৫)।

গল্পগ্রন্থ : মতি আর অশ্রু (১৯৪১)।

কিশোর উপন্যাস : জয়ের পথে (১৯৪২), নবী কাহিনী (১৯৫১)।

অনুবাদ : রুবাইয়াৎ ওমর খৈয়াম (১৯৬৬), সেন্ট লুইয়ের সেতু (১৯৬১), বারনাড মালামুডের যাদুর কলস (১৯৫৯), সিংয়ের নাটক (১৯৭১)।

গান : মালব কৌশিক (১৯৬৯)।

মৃত্যু : ৫ আগস্ট ১৯৭৫, ঢাকা।

মডেল প্রশ্ন

১. সিকান্দার আবু জাফর মূলত কি ছিলেন?
উত্তর : কবি, সঙ্গীত রচয়িতা, নাট্যকার ও সাংবাদিক।

২. তিনি কোন পত্রিকা সম্পাদনা করে স্মরণীয় হয়ে আছেন?
উত্তর : মাসিক সমকাল।



৩. তার রচিত সংগ্রামের বিখ্যাত গান কোনটি?
উত্তর : আমাদের সংগ্রাম চলবেই, জনতার সংগ্রাম চলবেই।

৪. সিকান্দার আবু জাফর কত সালে বাংলা একাডেমী পুরস্কার লাভ করেন?
উত্তর : ১৯৬৬ সালে।

## সুফিয়া কামাল (১৯১১-১৯৯৯)

জন্ম : ২০ জুন ১৯১১ (১০ আষাঢ় ১৩১৮ বঙ্গাব্দ); শায়েস্তাবাদ, বরিশাল।

☐ তার পৈতৃক নিবাস কুমিল্লায়।
☐ তাকে বলা হয় জননী সাহসিকা।
☐ তিনি মূলত কবি।
☐ তিনি রবীন্দ্র কাব্যধারার গীতিকবিতা রচয়িতা।

কবিতা : সাঁঝের মায়া (১৯৩৮), মায়া কাজল (১৯৫১), মন ও জীবন (১৯৫৭), উদাত্ত পৃথিবী (১৯৬৪), দীওয়ান (১৯৬৬), প্রশস্তি ও প্রার্থনা (১৯৬৮), অভিযাত্রিক (১৯৬৯), মৃত্তিকার ঘ্রাণ (১৯৭০), মোর যাদুদের সমাধি পরে (১৯৭২)।

গল্প : কেয়ার কাঁটা (১৯৩৭)।

শিশুতোষ : ইতল বিতল (১৯৬৫), নওল কিশোরের দরবারে (১৯৮২)।

ডায়েরী : একাত্তরের ডায়েরী (১৯৮৯)।

পুরস্কার : বাংলা একাডেমী পুরস্কার (১৯৬২), লেনিন পুরস্কার, রাশিয়া (১৯৭০), একুশে পদক (১৯৭৬), নাসিরউদ্দিন স্বর্ণপদক (১৯৭৭), সংগ্রামী নারী পুরস্কার, চেকোশ্লোভাকিয়া (১৯৮১), স্বাধীনতা পদক (১৯৯৭)।

মৃত্যু : ২০ নভেম্বর ১৯৯৯।

মডেল প্রশ্ন

১. সুফিয়া কামাল কবে, কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?
উত্তর : ১৯১১ সালের ২০ জুন, বরিশালে।

২. তিনি মূলত কি হিসেবে পরিচিত?
উত্তর : কবি।

৩. তিনি কোন ধরনের কবি?
উত্তর : রবীন্দ্র কাব্যধারার গীতিকবিতা রচয়িতা।

৪. তিনি কি কি পুরস্কার লাভ করেন?
উত্তর : বাংলা একাডেমী পুরস্কার (১৯৬২), লেনিন পুরস্কার, রাশিয়া (১৯৭০), একুশে পদক (১৯৭৬), বেগম রোকেয়া পদক (১৯৯৬)।

৫. বেগম সুফিয়া কামাল সম্পর্কে আপনার মূল্যায়ন কি?
উত্তর : বেগম সুফিয়া কামাল একজন কবি ও সমাজসেবক। সুফিয়া কামাল (১৯১১-৯৯)-এর বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ 'সাঁঝের মায়া', 'মন ও জীবন', 'উদাত্ত পৃথিবী', 'অভিযাত্রিক', 'মায়া কাজল' প্রভৃতি। তিনি সমাজসেবা ও নারীকল্যাণমূলক নানা কাজের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। এই কর্মের স্বীকৃতির জন্য তাকে বাংলাদেশের জনগণ 'জননী সাহসিকা' অভিধায় অভিষিক্ত করেছে।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



## সৈয়দ আলী আহসান (১৯২০-২০০২)

জন্ম : ২৬ মার্চ ১৯২২, আলোকদিয়া, মাগুরা।

☐ তিনি মূলত অধ্যাপক ও লেখক।

☐ তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের কবিদের মধ্যে তিনিই বোধ হয় একমাত্র কবি যিনি একদিকে পাশ্চাত্য প্রভাবপুষ্ট বিদগ্ধ শিল্পীমানসের দ্বারা পরিচালিত, অন্যদিকে অভিজাত ও রুচিশীল এবং শিল্পসৌকর্যের দ্বারা স্থিত।

প্রবন্ধ-গবেষণা : বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (যুগ্মভাবে, ১৯৫৪), পদ্মাবতী (১৯৬৮), মধুমালতী (১৯৭২), Essays in Bengal Literature (১৯৫৬), কবিতার কথা (১৯৫৭), সাহিত্যের কথা (১৯৬৪)।

আধুনিক বাংলা কবিতা : শব্দের অনুষঙ্গে (১৯৭০), আধুনিক জার্মান সাহিত্য (১৯৭৬), সতত স্বাগত (১৯৮৩)।

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস : প্রাচীন যুগ (১৯৯৪), আমাদের আত্মপরিচয় এবং বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ (১৯৯৬), মৃগাবতী (১৯৯৮)।

কাব্যগ্রন্থ : অনেক আকাশ (১৯৫৯), একক সন্ধ্যায় বসন্ত (১৯৬৪), সহসা সচকিত (১৯৬৫), আমার প্রতিদিনের শব্দ (১৯৭৪), চাহার দরবেশ ও অন্যান্য কবিতা (১৯৮৫), রজনীগন্ধা (১৯৮৮)।

শিশুতোষ : কখনো আকাশ (১৯৮৪)।

পুরস্কার : বাংলা একাডেমী পুরস্কার (১৯৬৭), সুফী মোতাহার হোসেন স্বর্ণপদক (১৯৬৭), একুশে পদক (১৯৮৩), নাসিরউদ্দিন স্বর্ণপদক (১৯৮৫), স্বাধীনতা পদক (১৯৮৮)।

মৃত্যু : ২৫ জুলাই, ২০০২।

**মডেল প্রশ্ন**

১. **সৈয়দ আলী আহসান রচিত কয়েকটি কাব্যগ্রন্থের নাম লিখুন।**
উত্তর : অনেক আকাশ, সহসা সচকিত, আমার প্রতিদিনের শব্দ, চাহার দরবেশ ও অন্যান্য কবিতা প্রভৃতি।

২. **১৯৭১ সালে স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্রের শব্দ সৈনিকের সক্রিয় ভূমিকা কে পালন করেছিলেন?**
উত্তর : সৈয়দ আলী আহসান।

৩. **'হুইটম্যানের কবিতা' কোন জাতীয় রচনা এবং এর রচয়িতা কে?**
উত্তর : অনূদিত কাব্যগ্রন্থ; সৈয়দ আলী আহসান।

## সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ (১৯২২-১৯৭১)

জন্ম : ষোলশহর, চট্টগ্রাম; ১৫ আগস্ট ১৯২২।

☐ তিনি মূলত কথাসাহিত্যিক।

☐ তার প্রকাশিত প্রথম গল্পের নাম 'হঠাৎ আলোর ঝলকানি', ঢাকা কলেজে ম্যাগাজিনে প্রথম প্রকাশিত হয়।

☐ মুক্তিযুদ্ধকালে তিনি প্রবাসে ইউনেস্কোতে কর্মরত ছিলেন।

উপন্যাস : লালসালু (১৯৪৮), চাঁদের অমাবস্যা (১৯৬৪), কাঁদো নদী কাঁদো (১৯৬৮)।

ছোটগল্প : নয়নচারা (১৯৫১), দুইতীর (১৯৬৫), গল্প সমগ্র (১৯৭২)।



নাটক : বহিপীর (১৯৬০), তরঙ্গভঙ্গ (১৩৭১), সুড়ঙ্গ (১৯৬৪)।

পুরস্কার : পিইএন পুরস্কার (১৯৫৫), উপন্যাসে বাংলা একাডেমী পুরস্কার (১৯৬১), আদমজী পুরস্কার (১৯৬৫), একুশে পদক (১৯৮৩, মরণোত্তর)।

মৃত্যু : ১০ অক্টোবর ১৯৭১, প্যারিস।

**মডেল প্রশ্ন**

১. **'লালসালু' কোন শ্রেণীর রচনা এবং এর রচয়িতা কে?**
উত্তর : উপন্যাস; সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ।

২. **'লালসালু' উপন্যাসের বিষয়বস্তু কি?**
উত্তর : গ্রামীণ পটভূমি।

৩. **'চাঁদের অমাবস্যা' ও 'কাঁদো নদী কাঁদো' গ্রন্থদ্বয়ের রচয়িতা কে এবং এটি কোন শ্রেণীর রচনা?**
উত্তর : সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ; উপন্যাস।

৪. **'কাঁদো নদী কাঁদো' উপন্যাসের উপজীব্য কি?**
উত্তর : সৈয়দ ওয়ালী উল্লাহর (১৯২২-১৯৭১) এ উপন্যাসটিতে ধর্মের নামে আচার-সর্বস্বতা, বিজ্ঞানের নামে অদৃষ্টবাদিতা, বাস্তবতার নামে স্বপ্ন কল্পনা প্রভৃতির বিরোধিতা করা হয়েছে।

৫. **সৈয়দ ওয়ালিউল্লাহ রচিত দুটি উপন্যাসের নাম লিখুন।**
উত্তর : সৈয়দ ওয়ালিউল্লাহ রচিত দুটি উপন্যাস হচ্ছে 'লালসালু' ও 'কাঁদো নদী কাঁদো'।

## সৈয়দ শামসুল হক (১৯৩৫-)

জন্ম : ২৭ ডিসেম্বর ১৯৩৫; কুড়িগ্রাম।

প্রবন্ধ : হৃৎ কলমের টানে (১ম খণ্ড ১৯৯১, ২য় খণ্ড ১৯৯৫)।

গল্প : তাস (১৯৫৪), শীত বিকেল (১৯৫৯), রক্তগোলাপ (১৯৬৪), আনন্দের মৃত্যু (১৯৬৭), প্রাচীন বংশের নিঃস্ব সন্তান (১৯৮২), সৈয়দ শামসুল হকের প্রেমের গল্প (১৯৯০), জলেশ্বরীর গল্পগুলো (১৯৯০), শ্রেষ্ঠ গল্প (১৯৯০)।

উপন্যাস : এক মহিলার ছবি (১৯৫৯), সীমানা ছাড়িয়ে (১৯৬৪), নীল দংশন (১৯৮১), মৃগয়ায় কালক্ষেপ (১৯৮৬), খেলা রাম খেলে যা (১৯৯১) ইত্যাদি।

কবিতা : একদা এক রাজ্যে (১৯৬১), বৈশাখে রচিত পংক্তিমালা (১৯৭০), অগ্নি ও জলের কবিতা (১৯৮৯), শ্রেষ্ঠ কবিতা (১৯৯০), নাভিমূলে ভস্মাধার।

কাব্যনাট্য : পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায় (১৯৭৬), গণনায়ক (১৯৭৬), নুরুলদীনের সারা জীবন (১৯৮২), এখানে এখন (১৯৮৮)।

অনুবাদ গ্রন্থ : ম্যাকবেথ, টেম্পেস্ট, শ্রাবণ রাজা (১৯৬৯)।

শিশুতোষ : সীমান্তের সিংহাসন (১৯৮৮), আনু বড় হয়, হডসনের বন্দুক

পুরস্কার : বাংলা একাডেমী পুরস্কার (১৯৬৬), আদমজী সাহিত্য পুরস্কার (১৯৬৯), অলক্ত স্বর্ণপদক (১৯৮২), আলাওল সাহিত্য পুরস্কার (১৯৮৩), কবিতালাপ পুরস্কার (১৯৮৩), একুশে পদক (১৯৮৪), নাসিরউদ্দিন স্বর্ণপদক (১৯৯০), জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার, চিত্রনাট্য, সংলাপ ও গীতিকার।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



মডেল প্রশ্ন

১. 'খেলারাম খেলে যা' গ্রন্থের রচয়িতা কে এবং এটি কোন শ্রেণীর রচনা?
উত্তর : উপন্যাস; সৈয়দ শামসুল হক।

২. 'এক মহিলার ছবি' শামসুল হকের কোন শ্রেণীর রচনা?
উত্তর : উপন্যাস।

৩. শামসুল হকের কয়েকটি উপন্যাসের নাম লিখুন।
উত্তর : অনুপম দিন, দেয়ালের দেশ, দূরত্ব, এক মহিলার ছবি ইত্যাদি।

৪. 'পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়' নাটকের প্রেক্ষাপট উল্লেখ করুন।
উত্তর : 'পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়' সৈয়দ শামসুল হকের মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক নাটক। এটি তার মুক্তিযুদ্ধকে অবলম্বন করে লেখা সবচেয়ে সার্থক ও মঞ্চসফল নাটক। লেখক এটি কাব্যনাট্যের আঙ্গিকে লিখেছেন। উত্তর বাংলার আঞ্চলিক শব্দের নিপুণ ব্যবহার রয়েছে এ নাটকে। গতিশীল ভাষার ব্যবহারের মধ্য দিয়ে যুদ্ধকালীন বাস্তবতার কুশলী প্রয়োগ ঘটেছে এ নাটকে। যুদ্ধশেষে মুক্তিবাহিনীর গ্রামে প্রবেশের সময়কার ঘটনা এখানে সংলাপ ব্যবহারের কুশলতায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। এ কাব্যনাট্যে বাঙালির দেশপ্রেম, দেশের শত্রুর প্রতি প্রবল ঘৃণা এবং আক্রোশের সাথে বাঙালির সাংস্কৃতিক জীবনের চিত্র রূপায়িত হয়েছে।

৫. বাংলাদেশের বর্তমান সাহিত্যাঙ্গনে সব্যসাচী লেখক কাকে বলা হয়?
উত্তর : বাংলাদেশের বর্তমান সাহিত্যাঙ্গনে সৈয়দ শামসুল হককে সব্যসাচী লেখক বলা হয়। তিনি একাধারে গল্প, কবিতা, উপন্যাস, নাটক ও চলচ্চিত্রের চিত্রনাট্য রচনা করেন।

## হাসান হাফিজুর রহমান (১৯৩২-১৯৮৩)

জন্ম : ১৪ জুন ১৯৩২; জামালপুর শহর (মাতুলালয়)

পৈতৃক নিবাস : কুলিকান্দি গ্রাম, জামালপুর।

সম্পাদনা : একুশে ফেব্রুয়ারি (১৯৫৩)।

কাব্য : বিমুখ প্রান্তর (১৯৬৩), আর্ত শব্দাবলী (১৯৬৮), অন্তিম শরের মতো (১৯৬৮), যখন উদ্যত সঙ্গীন (১৯৭২), বজ্রে চেরা আঁধার আমার (১৯৭৬), শোকার্ত তরবারী (১৯৮২), আমার ভেতরের বাঘ (১৯৮৩), ভবিতব্যের বাণিজ্য তরী (১৯৮৩)।

প্রবন্ধ : আধুনিক কবি ও কবিতা (১৯৬৫), মূল্যবোধের জন্যে (১৯৭০), সাহিত্য প্রসঙ্গ (১৯৭৩), আলোকিত গহ্বর (১৯৭৭)।

গল্প : আরো দুটি মৃত্যু (১৯৭০)।

পুরস্কার : লেখক সংঘ পুরস্কার (১৯৬৭), আদমজী পুরস্কার (১৯৬৭), বাংলা একাডেমী পুরস্কার (১৯৭১), সুফী মোতাহার হোসেন স্মৃতি পুরস্কার (১৯৭৬), অলক্ত সাহিত্য পুরস্কার (১৯৮১), নাসিরুদ্দীন স্বর্ণপদক (১৯৮২), একুশে পদক (১৯৮৪, মরণোত্তর)।

মৃত্যু : ১ এপ্রিল ১৯৮৩; মস্কো, রাশিয়া।



মডেল প্রশ্ন

১. হাসান হাফিজুর রহমানের জন্মাসন কত এবং তার জন্মস্থান কোথায়?
উত্তর : ১ জুন, ১৯৩২; জামালপুর।

২. তিনি স্মরণীয় হয়ে আছেন কেন?
উত্তর : তার সম্পাদনায় ১৯৫৩ সালে প্রকাশিত হয় ভাষা আন্দোলনভিত্তিক প্রথম সাহিত্য সংকলন 'একুশে ফেব্রুয়ারি' এবং তিনি সম্পাদনা করেন 'বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ : দলিলপত্র' (১৯৮২-৮৩)।

## হুমায়ূন আহমেদ (১৯৪৮-২০১২)

জন্ম : ১৩ নভেম্বর ১৯৪৮; দৌলতপুর গ্রাম, মোহনগঞ্জ, নেত্রকোনা।

প্রকাশিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : নীল অপরাজিতা, প্রিয়তমেষু, জয়জয়ন্তী, দূরে কোথায়, Flowers of Flame; এইসব দিনরাত্রি, অন্যভুবন, ময়ূরাক্ষী, অমানুষ, ছায়াসঙ্গী, মহাপুরুষ, নিশিকাব্য, দুই দুয়ারী, নৃপতি, ভৌতিক অমনিবাস, বহুব্রীহি, ফেরা, ১৯৭১, ভয়, মে ফ্লাওয়ার, অন্ধকারের গান, এই বসন্তে, অরণ্য, অপরাহ্ন, হিমুর হাতে কয়েকটি নীলপদ্ম, এপিটাফ, আগুনের পরশমণি, পারাপার, ছায়াবিথী, পোকা, জল জোছনা, রূপালী দ্বীপ, দারুচিনি দ্বীপ, অয়োময়, অচিনপুর, বাসর, শ্যামল ছায়া, দিনের শেষে, নক্ষত্রের রাত, প্রথম প্রহর, রজনী, জলকন্যা, এবং হিমু, শ্রাবণ মেঘের দিন, শ্রেষ্ঠ গল্প, এলেবেলে-১, এলেবেলে-২, সমুদ্র বিলাস, কোথাও কেউ নেই, জনম জনম, নন্দিত নরকে, শঙ্খনীল কারাগার, নির্বাসন, অনীশ, হিমু, মেঘের ছায়া, নিষাদ, নিশীথিনী, সাজঘর, ইরিনা, কুহক, রুমালী, অপেক্ষা, নীলপদ্ম, জোছনা ও জননীর গল্প, বলপয়েন্ট, কাঠপেন্সিল, ফাউন্টেইন পেন, রং পেন্সিল, নিউইয়র্কের নীলাকাশে ঝকঝকে রোদ ইত্যাদি।

পুরস্কার : বাংলা একাডেমী পুরস্কার (১৯৮১), মাইকেল মধুসূদন পদক (১৯৮৭), বাচসাস পুরস্কার (১৯৮৮), হুমায়ূন কাদির স্মৃতি পুরস্কার (১৯৯০), জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার (শ্রেষ্ঠ কাহিনী ১৯৯৩), জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার (শ্রেষ্ঠ ছবি ১৯৯৪), একুশে পদক (১৯৯৪), জয়নুল আবেদিন স্বর্ণপদক, অতীশ দীপঙ্কর স্বর্ণপদক।

মৃত্যু : ১৯ জুলাই ২০১২ (বেলভ্যু হাসপাতাল, ম্যানহাটন, নিউইয়র্ক, যুক্তরাষ্ট্র)

মডেল প্রশ্ন

১. হাসান হাফিজুর রহমানের জন্মাসন কত এবং তার জন্মস্থান কোথায়?
উত্তর : ১ জুন, ১৯৩২; জামালপুর।

২. হুমায়ূন আহমেদ-এর জন্ম কবে?
উত্তর : ১৩ নভেম্বর ১৯৪৮।

৩. তার জন্মস্থান কোথায়?
উত্তর : দৌলতপুর গ্রাম, মোহনগঞ্জ উপজেলা, নেত্রকোনা (পৈতৃক নিবাস কুতুবপুর, কেন্দুয়া, নেত্রকোনা)।

৪. তিনি কোন ক্যান্সারে আক্রান্ত ছিলেন?
উত্তর : কোলন ক্যান্সার।

৪. বাংলা কথাসাহিত্যে সংলাপপ্রধান নতুন শৈলীর জনক কে?
উত্তর : হুমায়ূন আহমেদ।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



৫. বাংলা কল্পবিজ্ঞান সাহিত্যের পথিকৃৎ বলা হয় কাকে?

উত্তর : হুমায়ূন আহমেদ।

৬. হুমায়ূন আহমেদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন বিভাগের অধ্যাপক ছিলেন?

উত্তর : রসায়ন।

৭. তার ডাকনাম কি?

উত্তর : কাজল (পিতৃপ্রদত্ত নাম শামসুর রহমান)।

৮. হুমায়ূন আহমেদ 'দৈনিক পাকিস্তান' পত্রিকায় কোন ছদ্মনামে কবিতা লিখতেন?

উত্তর : মমতাজ আহমেদ শিখু।

৯. তার প্রথম প্রকাশিত সাহিত্যকর্ম কি?

উত্তর : God নামের একটি ইংরেজি কবিতা।

১০. তার লেখা প্রথম টিভি নাটকের নাম কি?

উত্তর : প্রথম প্রহর (১৯৮৩)। উল্লেখ্য, প্রথম মঞ্চ নাটক 'মহাপুরুষ' (১৯৮৬)।

১১. প্রথম টিভি ধারাবাহিক নাটকের নাম কি?

উত্তর : এইসব দিন রাত্রি (১৯৮৪)।

১২. প্রথম প্রকাশিত উপন্যাসের নাম কি?

উত্তর : নন্দিত নরকে (১৯৭২)।

১৩. তার রচিত হিমু সংক্রান্ত উপন্যাস কি কি?

উত্তর : ময়ূরাক্ষী, দরজার ওপাশে, হিমু, হিমুর হাতে কয়েকটি নীলগল্প, এবং হিমু, পারাপার, হিমুর রূপালী রাত্রি, একজন হিমু কয়েকটি ঝিঁ ঝিঁ পোকা, হিমুর দ্বিতীয় প্রহর, তোমাদের এই নগরে, সে আসে ধীরে, আঙ্গুল কাটা জগলু, হিমু মামা, হলুদ হিমু কালো র‍্যাব, আজ হিমুর বিয়ে, হিমু রিমান্ডে, হিমুর মধ্যদুপুর, চলে যায় বসন্তের দিন, হিমুর একান্ত সাক্ষাৎকার ও অন্যান্য, হিমু এবং হার্ভার্ড Ph.D. বল্টু ভাই।

১৪. তার রচিত মিসির আলী সংক্রান্ত উপন্যাস কি কি?

উত্তর : দেবী, নিশিথিনী, নিষাদ, অন্যভুবন, বৃহন্নলা, ভয়, বিপদ, অনীশ, মিসির আলির অমীমাংসিত রহস্য, আমি এবং আমরা, তন্দ্রাবিলাস, আমিই মিসির আলি, বাঘবন্দী মিসির আলি, কহেন কবি কালিদাস, হরতন ইশকাপন, মিসির আলির চশমা, মিসির আলি! আপনি কোথায়?, মিসির আলি আনসলভড, যখন নামবে আঁধার।

১৫. তার রচিত অন্যান্য উল্লেখযোগ্য উপন্যাসগুলো কি কি?

উত্তর : নন্দিত নরকে, শঙ্খনীল কারাগার, এইসব দিনরাত্রি, মন্দ্রসপ্তক, দূরে কোথাও, নি, ফেরা, কৃষ্ণপক্ষ, সাজঘর, বাসর, গৌরীপুর জংশন, বহুব্রীহি, লীলাবতী, কবি, নৃপতি, অমানুষ, শুভ্র, নক্ষত্রের রাত, কোথাও কেউ নেই, শ্রাবণ মেঘের দিন, বৃষ্টি ও মেঘমালা, মেঘ বলেছে চৈত্রে যাবো, আমার আছে জল, আকাশ ভরা মেঘ, মহাপুরুষ, শূন্য, ওমেগা পয়েন্ট, ইমা, আমি এবং আমরা, কে কথা কয়, অপেক্ষা, পেন্সিলে আঁকা পরী, অয়োময়, কুটু মিয়া, দ্বিতীয় মানব, ইস্টিশন, মধ্যাহ্ন, মাতাল হাওয়া, দারুচিনি দ্বীপ, রূপালী দ্বীপ, শুভ্র গেছে বনে, ম্যাজিক মুনসি, বাদশাহ নামদার, দেয়াল ইত্যাদি।

১৬. তার আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থগুলো কি কি?

উত্তর : বলপয়েন্ট, কাঠপেন্সিল, ফাউন্টেইন পেন, রংপেনসিল, নিউইয়র্কের নীলাকাশে ঝকঝকে রোদ, হোটেল গ্রেভার ইন, আমার ছেলেবেলা।



১৭. তার রচিত মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক উপন্যাস কি কি?

উত্তর : জোছনা ও জননীর গল্প, সৌরভ, ১৯৭১, অনীল বাগচীর একদিন, আগুনের পরশমণি, শ্যামল ছায়া।

১৮. তার রচিত রাজনৈতিক উপন্যাসের নাম কি?

উত্তর : দেয়াল।

১৯. তার রচিত উল্লেখযোগ্য নাটক কি কি?

উত্তর : এইসব দিনরাত্রি, কোথাও কেউ নেই, নক্ষত্রের রাত, হিমু, খোয়াবনগর, পক্ষীরাজ, জুতা বাবা, তারা তিনজন-টি মাস্টার, তৃষ্ণা, রূপালি, মন্ত্রী মহোদয়ের আগমন শুভেচ্ছা স্বাগতম, বাদল দিনের প্রথম কদম ফুল, তিন প্রহর, আমি হিমু হতে চাই, একদিন হঠাৎ, এবং আইনেস্টাইন, বিহঙ্গ, বনকুমারী, বনবাতাসী, বৃহন্নলা, দূরত্ব, চন্দ্র কারিগর, চন্দ্রগ্রস্ত, চন্দ্রগ্রহণ, অপরাহ্ন, রূপালি নক্ষত্র, সবুজ ছায়া, উড়ে যায় বকপক্ষী ইত্যাদি।

২০. তার পরিচালিত চলচ্চিত্রগুলো কি কি?

উত্তর : আগুনের পরশমণি (মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক, ১৯৯৪), শ্রাবণ মেঘের দিন (২০০০), দুই দুয়ারী (২০০০), চন্দ্রকথা (২০০৩), শ্যামল ছায়া (মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক, ২০০৪), নয় নম্বর বিপদ সংকেত (২০০৭), আমার আছে জল (২০০৮), ঘেঁটুপুত্র কমলা (২০১২)।

২১. তার রচিত সাহিত্য নিয়ে নির্মিত অন্যান্য পরিচালকের চলচ্চিত্রগুলো কি কি?

উত্তর : শঙ্খনীল কারাগার (মুস্তাফিজুর রহমান, ১৯৯২), দূরত্ব (মোরশেদুল ইসলাম, ২০০৬), নন্দিত নরকে (বেলাল আহমেদ, ২০০৬), নিরন্তর (আবু সাইয়ীদ), সাজঘর (শাহ আলম কিরণ, ২০০৭), দারুচিনি দ্বীপ (তৌকির আহমেদ, ২০০৭), প্রিয়তমেষু (মোরশেদুল ইসলাম, ২০০৯), আবদার (সুভাষ দত্ত)।

২২. হুমায়ূন আহমেদ রচিত উল্লেখযোগ্য গান কি কি?

উত্তর : ও আমার উড়াল পঙ্খীরে, একটা ছিল সোনার কন্যা, ও কারিগর দয়ার সাগর ওগো দয়াময়, চাঁদনী পসরে কে আমার স্মরণ করে, আমার আছে জল, লিলুয়া বাতাস, আমার ভাঙা ঘরের ভাঙা চালা, মাথায় পরেছি সাদা ক্যাপ, ঠিকানা আমার নোট বুকে আছে (তার রচিত শেষ গান)।

২৩. তার প্রাপ্ত উল্লেখযোগ্য পুরস্কার কি কি?

উত্তর : লেখক শিবির পুরস্কার (১৯৭৩), বাংলা একাডেমী পুরস্কার (উপন্যাসে, ১৯৮১), মাইকেল মধুসূদন দত্ত পুরস্কার (১৯৮৭), বাচসাস পুরস্কার (১৯৮৮), হুমায়ুন কাদির স্মৃতি পুরস্কার (১৯৯০), একুশে পদক (সাহিত্যে, ১৯৯৪), জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার [কাহিনী (শঙ্খনীল কারাগার, ১৯৯২); কাহিনী, সেরা চলচ্চিত্র ও সংলাপ (আগুনের পরশমণি, ১৯৯৪) এবং চিত্রনাট্যকার (দারুচিনি দ্বীপ, ২০০৭)], জয়নুল আবেদীন স্বর্ণপদক ও অতীশ দীপঙ্কর স্বর্ণপদক।

২৪. তার সৃষ্ট উল্লেখযোগ্য চরিত্র কি কি?

উত্তর : হিমু (আসল নাম হিমালয়), রূপা, মিসির আলী, বাকের ভাই (উপন্যাস– কোথাও কেউ নেই), আবদুল মজিদ (অপরাহ্নের গল্প) প্রভৃতি।

২৫. তিনি কবে মৃত্যুবরণ করেন?

উত্তর : ১৯ জুলাই ২০১২ (বেলভ্যু হাসপাতাল, ম্যানহাটন, নিউইয়র্ক, যুক্তরাষ্ট্র)।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



## কবি-সাহিত্যিকদের প্রকৃত নাম, ছদ্দনাম ও উপাধি

| প্রকৃত নাম | উপাধি | ছদ্মনাম |
|---|---|---|
| অনন্ত বড়ু | – | বড়ু চণ্ডীদাস |
| অনুপা দেবী | – | অনুপমা দেবী |
| অহিদুর রেজা | – | হাসন রাজা |
| অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত | – | নীহারিকা দেবী |
| অন্নদাশঙ্কর রায় | – | লীলাময় রায় |
| আব্দুল কাদির | ছান্দসিক কবি | – |
| আব্দুল করিম | সাহিত্যবিশারদ | – |
| আবদুল মান্নান সৈয়দ | – | অশোক সৈয়দ |
| আবু নঈম মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ | – | শহীদুল্লাহ কায়সার |
| আবুল ফজল | – | শমসের উল আজাদ |
| আবুল হোসেন মিয়া | – | আবুল হাসান |
| আলাওল | কবিগুরু, মহাকবি | – |
| ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত | যুগসন্ধিক্ষণের কবি | – |
| ঈশ্বরচন্দ্র | বিদ্যাসাগর | কস্যচিৎ উপযুক্ত ভাইপোস্য |
| এম ওবায়দুল্লাহ | – | আশকার ইবনে শাইখ |
| কাজেম আল কোরায়শী | – | কায়কোবাদ |
| কাজী নজরুল ইসলাম | বিদ্রোহী কবি | ধূমকেতু |
| কালিকানন্দ | – | অবধূত |
| কালীপ্রসন্ন সিংহ | – | হুতোম পেঁচা |
| গোলাম মোস্তফা | কাব্য সুধাকর | – |
| গোবিন্দ দাস | স্বভাব কবি | – |
| চারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় | – | জরাসন্ধ |
| জসীমউদ্দীন | পল্লীকবি | জমীরউদ্দীন মোল্লা |
| জীবনানন্দ দাশ | রূপসী বাংলার কবি/তিমির হননের কবি | – |
| তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় | – | হাবু শর্মা |
| নজিবর রহমান | সাহিত্যরত্ন | – |
| নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় | – | সুনন্দ |
| নীহাররঞ্জন গুপ্ত | – | বানভট্ট |
| নূরন্নেসা খাতুন | সাহিত্য সরস্বতী ও বিদ্যাবিনোদিনী | – |
| প্রমথ চৌধুরী | – | বীরবল |
| প্যারীচাঁদ মিত্র | – | টেকচাঁদ ঠাকুর |
| প্রবোধকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় | – | মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় |
| প্রেমেন্দ্র মিত্র | – | কৃত্তিবাস ভদ্র |
| ফররুখ আহমদ | মুসলিম রেনেসাঁর কবি | – |
| বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় | সাহিত্যসম্রাট | কমলাকান্ত |
| বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় | – | বনফুল |
| বাহরাম খান | দৌলত উজীর | – |
| বিদ্যাপতি | মিথিলার/পদাবলীর কবি | – |
| বিষ্ণু দে | মার্কসবাদী কবি | – |



| প্রকৃত নাম | উপাধি | ছদ্মনাম |
|---|---|---|
| বিনয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় | – | যাযাবর |
| বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় | – | কূর্মিপৃষ্ঠী |
| বিমল মিত্র | – | জাবালি |
| বিমল ঘোষ | – | মৌমাছি |
| বিহারীলাল চক্রবর্তী | ভোরের পাখি | – |
| বেগম রোকেয়া | মুসলিম নারীজাগরণের অগ্রদূত | – |
| ভারতচন্দ্র | রায়গুণাকর | – |
| মঈনুদ্দিন আহমেদ | – | সেলিম আল দীন |
| মধুসূদন দত্ত | মাইকেল | টিমোথি পেনপোয়েম/এ নেটিভ |
| মুকুন্দ দাস | চারণ কবি | – |
| মুকুন্দরাম বসু | কবি কঙ্কন | – |
| মধুসূদন মজুমদার | – | দৃষ্টিহীন |
| মালাধর বসু | গুণরাজ খান | – |
| মীর মশাররফ হোসেন | – | গাজী মিয়া |
| ড. মনিরুজ্জামান | – | হায়াৎ মামুদ |
| ড. মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ | ভাষাবিজ্ঞানী | – |
| মোঃ শহীদুল হক | – | শহীদুল জহির |
| মোজাম্মেল হক | শান্তিপুরের কবি | – |
| যতীন্দ্রনাথ বাগচি | দুঃখবাদের কবি | – |
| রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর | বিশ্বকবি ও নাইট (প্রত্যাখ্যাত) | ভানুসিংহ |
| রামনারায়ণ | তর্করত্ন | – |
| রাজশেখর বসু | – | পরশুরাম |
| রোকনুজ্জামান খান | – | দাদা ভাই |
| শেখ আজিজুর রহমান | – | শওকত ওসমান |
| শেখ ফজলল করিম | সাহিত্যবিশারদ/কাব্যরত্নাকর | – |
| শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় | অপরাজেয় কথাশিল্পী | অনিলা দেবী |
| শ্রীকর নন্দী | কবিন্দ্র পরমেশ্বর | – |
| সতীনাথ ভাদুড়ী | – | চিত্র গুপ্ত |
| সমরেশ বসু | – | কালকূট |
| সমর সেন | নাগরিক কবি | – |
| সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত | ছন্দের যাদুকর | – |
| সুকান্ত ভট্টাচার্য | কিশোর কবি | – |
| সুধীন্দ্রনাথ দত্ত | ক্লাসিক কবি | – |
| সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় | – | নীললোহিত |
| সুভাষ মুখোপাধ্যায় | পদাতিকের কবি | – |
| সোমেন চন্দ | – | ইন্দ্রকুমার সোম |
| সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী | স্বপ্নাতুর কবি | – |
| সৈয়দ মুজতবা আলী | – | প্রিয়দর্শী, মুসাফির, সত্যপীর |
| হরিনাথ মজুমদার | – | কাঙাল হরিনাথ |
| হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় | বাংলার মিল্টন | – |

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



## কবি-সাহিত্যিকদের প্রকৃত নাম, ছদ্মনাম ও উপাধি

| প্রকৃত নাম | উপাধি | ছদ্মনাম |
|---|---|---|
| অনন্ত বড়ু | – | বড়ু চণ্ডীদাস |
| অনুপা দেবী | – | অনুপমা দেবী |
| অহিদুর রেজা | – | হাসন রাজা |
| অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত | – | নীহারিকা দেবী |
| অন্নদাশঙ্কর রায় | – | লীলাময় রায় |
| আব্দুল কাদির | ছান্দসিক কবি | – |
| আব্দুল করিম | সাহিত্যবিশারদ | – |
| আবদুল মান্নান সৈয়দ | – | অশোক সৈয়দ |
| আবু নঈম মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ | – | শহীদুল্লাহ কায়সার |
| আবুল ফজল | – | শমসের উল আজাদ |
| আবুল হোসেন মিয়া | – | আবুল হাসান |
| আলাওল | কবিগুরু, মহাকবি | – |
| ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত | যুগসন্ধিক্ষণের কবি | – |
| ঈশ্বরচন্দ্র | বিদ্যাসাগর | কস্যচিৎ উপযুক্ত ভাইপোস্য |
| এম ওবায়দুল্লাহ | – | আশকার ইবনে শাইখ |
| কাজেম আল কোরায়শী | – | কায়কোবাদ |
| কাজী নজরুল ইসলাম | বিদ্রোহী কবি | ধূমকেতু |
| কালিকানন্দ | – | অবধূত |
| কালীপ্রসন্ন সিংহ | – | হুতোম পেঁচা |
| গোলাম মোস্তফা | কাব্য সুধাকর | – |
| গোবিন্দ দাস | স্বভাব কবি | – |
| চারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় | – | জরাসন্ধ |
| জসীমউদ্দীন | পল্লীকবি | জমীরউদ্দীন মোল্লা |
| জীবনানন্দ দাশ | রূপসী বাংলার কবি/তিমির হননের কবি | – |
| তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় | – | হাবু শর্মা |
| নজিবর রহমান | সাহিত্যরত্ন | – |
| নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় | – | সুনন্দ |
| নীহাররঞ্জন গুপ্ত | – | বানভট্ট |
| নূরন্নেসা খাতুন | সাহিত্য সরস্বতী ও বিদ্যাবিনোদিনী | – |
| প্রমথ চৌধুরী | – | বীরবল |
| প্যারীচাঁদ মিত্র | – | টেকচাঁদ ঠাকুর |
| প্রবোধকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় | – | মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় |
| প্রেমেন্দ্র মিত্র | – | কৃত্তিবাস ভদ্র |
| ফররুখ আহমদ | মুসলিম রেনেসাঁর কবি | – |
| বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় | সাহিত্যসম্রাট | কমলাকান্ত |
| বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় | – | বনফুল |
| বাহরাম খান | দৌলত উজীর | – |
| বিদ্যাপতি | মিথিলার/পদাবলীর কবি | – |
| বিষ্ণু দে | মার্কসবাদী কবি | – |



| প্রকৃত নাম | উপাধি | ছদ্মনাম |
|---|---|---|
| বিনয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় | – | যাযাবর |
| বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় | – | কৃচিৎপ্রৌঢ় |
| বিমল মিত্র | – | জাবালি |
| বিমল ঘোষ | – | মৌমাছি |
| বিহারীলাল চক্রবর্তী | ভোরের পাখি | – |
| বেগম রোকেয়া | মুসলিম নারীজাগরণের অগ্রদূত | – |
| ভারতচন্দ্র | রায়গুণাকর | – |
| মঈনুদ্দিন আহমেদ | – | সেলিম আল দীন |
| মধুসূদন দত্ত | মাইকেল | টিমোথি পেনপোয়েম/এ নেটিভ |
| মুকুন্দ দাস | চারণ কবি | – |
| মুকুন্দরাম বসু | কবি কঙ্কন | – |
| মধুসূদন মজুমদার | – | দৃষ্টিহীন |
| মালাধর বসু | গুণরাজ খান | – |
| মীর মশাররফ হোসেন | – | গাজী মিয়া |
| ড. মনিরুজ্জামান | – | হায়াৎ মামুদ |
| ড. মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ | ভাষাবিজ্ঞানী | – |
| মোঃ শহীদুল হক | – | শহীদুল জহির |
| মোজাম্মেল হক | শান্তিপুরের কবি | – |
| যতীন্দ্রনাথ বাগচি | দুঃখবাদের কবি | – |
| রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর | বিশ্বকবি ও নাইট (প্রত্যাখ্যাত) | ভানুসিংহ |
| রামনারায়ণ | তর্করত্ন | – |
| রাজশেখর বসু | – | পরশুরাম |
| রোকনুজ্জামান খান | – | দাদা ভাই |
| শেখ আজিজুর রহমান | – | শওকত ওসমান |
| শেখ ফজলল করিম | সাহিত্যবিশারদ/কাব্যরত্নাকর | – |
| শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় | অপরাজেয় কথাশিল্পী | অনিলা দেবী |
| শ্রীকর নন্দী | কবিন্দ্র পরমেশ্বর | – |
| সতীনাথ ভাদুড়ী | – | চিত্র গুপ্ত |
| সমরেশ বসু | – | কালকূট |
| সমর সেন | নাগরিক কবি | – |
| সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত | ছন্দের যাদুকর | – |
| সুকান্ত ভট্টাচার্য | কিশোর কবি | – |
| সুধীন্দ্রনাথ দত্ত | ক্ল্যাসিক কবি | – |
| সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় | – | নীললোহিত |
| সুভাষ মুখোপাধ্যায় | পদাতিকের কবি | – |
| সোমেন চন্দ | – | ইন্দ্রকুমার সোম |
| সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী | স্বপ্নাতুর কবি | – |
| সৈয়দ মুজতবা আলী | – | প্রিয়দর্শী, মুসাফির, সত্যপীর |
| হরিনাথ মজুমদার | – | কাঙাল হরিনাথ |
| হেমচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় | বাংলার মিল্টন | – |

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



মডেল প্রশ্ন

১. গোলাম মোস্তফাকে কাব্য সুধাকর উপাধি দেন কে?
উত্তর : যশোর সাহিত্য সংঘ।

২. রামমোহন রায় কত সালে রাজা উপাধি পান?
উত্তর : ১৮৩০ সালে। নামমাত্র দিল্লিশ্বর মোগল বাদশা দ্বিতীয় আকবর তাকে 'রাজা' উপাধি দিয়ে ইংল্যান্ডের রাজার নিকট দূত হিসেবে পাঠান। ১৮৩৩ সালে তিনি ইংল্যান্ডেই মারা যান।

৩. 'বাংলার স্কট' বলা হয় কাকে?
উত্তর : বঙ্কিমচন্দ্রকে।

৪. 'শান্তিপুরের কবি' বলা হয় কাকে?
উত্তর : মোজাম্মেল হককে।

৫. আবদুল করিম সাহিত্যিবিশারদকে 'সাহিত্যবিশারদ' উপাধি প্রদান করেন কে?
উত্তর : চট্টল ধর্মমণ্ডলী। তিনি ১৯০৯ সালে এ উপাধি এবং ১৯২০ সালে নদীয়ার সাহিত্য সভা থেকে 'সাহিত্যসাগর' উপাধি লাভ করেন।

৬. 'কালকূট' ছদ্মনামে লিখতেন কোন লেখক?
উত্তর : সমরেশ বসু।

৭. পরশুরাম ছদ্মনামে হাস্যরসাত্মক গল্প লিখতেন কে?
উত্তর : রাজশেখর বসু।

৮. কোন খ্যাতিমান লেখক 'বীরবল' ছদ্মনামে লিখতেন?
উত্তর : প্রমথ চৌধুরী।

৯. বাংলা সাহিত্যে 'ভোরের পাখি' বলা হয় কাকে?
উত্তর : বিহারীলাল চক্রবর্তী।

১০. প্যারীচাঁদ মিত্রের ছদ্মনাম কি?
উত্তর : টেকচাঁদ ঠাকুর।

১১. বাংলা সাহিত্যের কোন সাহিত্যিক 'গাজী মিঞা' হিসেবে পরিচিত?
উত্তর : মীর মশাররফ হোসেন।

১২. 'রায়গুণাকর' কার উপাধি?
উত্তর : ভারতচন্দ্র।

১৩. 'যাযাবর' ছদ্মনামের অন্তরালে আত্মগোপন করে আছেন—
উত্তর : বিনয় কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়।

১৪. 'নীললোহিত' কার ছদ্মনাম?
উত্তর : সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়।

১৫. 'নীহারিকা দেবী' ছদ্মনামে লিখতেন কে?
উত্তর : অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত।

# ৩৫তম বিসিএস

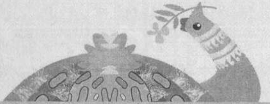

# বাংলা
## দ্বিতীয় পত্র

(শুধুমাত্র সাধারণ ক্যাডারের জন্য)

পূর্ণমান-১০০

| | |
|---|---|
| ১। অনুবাদ (ইংরেজি থেকে বাংলা) | ১৫ |
| ২। কাল্পনিক সংলাপ | ১৫ |
| ৩। পত্রলিখন | ১৫ |
| ৪। গ্রন্থ-সমালোচনা | ১৫ |
| ৫। রচনা | ৪০ |

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

# বাংলা লিপির উৎপত্তি ও বিবর্তন

## ৩৫তম বিসিএস

## ৯

# অনুবাদ

### ইংরেজি থেকে বাংলা

নম্বর ১৫

ন্যূনতম ভাষাজ্ঞান যাচাইয়ের জন্য বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় Translation বা অনুবাদ একটি বহুল ব্যবহৃত মাধ্যম। অনুবাদ প্রধানত দুই প্রকার : ১. আক্ষরিক অনুবাদ ও ২. ভাবানুবাদ। প্রাথমিকভাবে আক্ষরিক অনুবাদের ওপর জোর দেয়া হলেও যেখানে ভাবানুবাদ প্রযোজ্য সেখানে আক্ষরিক অনুবাদ করা রীতিমতো বেমানান ও হাস্যকর। যেমন– That's a long story– 'সেটা অনেক দীর্ঘ গল্প' এই আক্ষরিক অনুবাদের চেয়ে ভাবানুবাদ 'সে অনেক কথা' বেশি সাবলীল ও শ্রুতিমধুর। তেমনিভাবে একটি শব্দের একাধিক অর্থ সম্বন্ধে ধারণা রাখা উচিত। Passage Translation-এর ক্ষেত্রে পারিভাষিক শব্দগুলো জানা অত্যাবশ্যক। Translation বা অনুবাদ করার সময় নিম্নোক্ত কৌশলগুলো অবলম্বন করা যেতে পারে :

### 1. Tense-এর ব্যবহার

অনুবাদের প্রধান কৌশল হচ্ছে Tense-এর বিভিন্ন Structure ব্যবহার করা। যেমন—

A. অতীতে সংঘটিত কোনো কাজের বর্তমান প্রাসঙ্গিকতা থাকলে তা Present Perfect Tense দ্বারা প্রকাশ করা হয়। যেমন—

- তুমি কি কখনো বিদেশে গিয়েছ?— Have you ever been to abroad?

B. বর্তমানে কোনো কাজ হচ্ছে বোঝাতে Present Continuous Tense ব্যবহৃত হয়।

- মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছে— It is raining in torrents.

C. অতীতে কোনো কাজ শুরু হয়ে অদ্যাবধি চলছে এবং ভবিষ্যতেও চলতে পারে এরূপ বোঝাতে Present Perfect Continuous Tense ব্যবহার করতে হয়। সেক্ষেত্রে বাংলায় যাবৎ, ধরে, হতে, থেকে ইত্যাদি শব্দগুলো এবং ইংরেজিতে অনির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে for ও নির্দিষ্ট সময়ের আগে since বসে।

- সকাল থেকে গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি হচ্ছে— It has been drizzling since morning.

D. Present Perfect Tense বর্তমান সময়ের সাথে সম্পর্কিত, তাই এতে অতীতজ্ঞাপক শব্দ (যেমন– yesterday, ago, etc) উল্লেখ করা যাবে না বাক্যে যতই ইয়াছি, ইয়াছে, ইয়াছেন থাকুক না কেন সেক্ষেত্রে Past Indefinite Tense ব্যবহার করতে হবে। যেমন—

- আমি গতকাল তোমার চিঠি পেয়েছি— I received your letter yesterday.

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



E. পরপর সংঘটিত অতীতের দুটি ঘটনার মধ্যে যেটি আগে ঘটে সেটি Past Perfect অন্যটি হয় Past Indefinite. সেক্ষেত্রে before-এর পূর্বে ও After-এর পরে Past Perfect বসে।
▮ ডাক্তার আসার পূর্বে রোগী মারা গেল— The patient had died before the doctor came.

F. ভবিষ্যতে সংঘটিতব্য দু'টি কাজের মধ্যে একটির পূর্বে অন্যটি সম্পাদিত হয়ে থাকলে সম্পাদিত কাজটি Future Perfect Tense হয়, অন্যটি হয় Present Indefinite অথবা Future Indefinite.
▮ রহিম আসার আগেই করিম এসে থাকবে— Karim will have come before Rahim will come.

## 2. Phrasal Verb-এর ব্যবহার

একটি Verb আলাদাভাবে এক অর্থ দেয় কিন্তু তা Phrasal verb তথা Group verb হলে অন্য অর্থ প্রদান করে। যেমন—

A. Tell মানে 'বলা' কিন্তু Tell upon অর্থ ক্ষতি করা।
▮ The hard work is telling upon my health-এর সঠিক অনুবাদ— এ কঠিন পরিশ্রম আমার স্বাস্থ্যের ক্ষতি করছে।

B. Take অর্থ নেয়া, গ্রহণ করা কিন্তু Take after মানে সাদৃশ্য থাকা অনুরূপ হওয়া, দেখতে একই রকম হওয়া।
▮ The boy takes after his father— ছেলেটি তার পিতার মতো।

C. Cry অর্থ কান্নাকাটি করা, চিৎকার করা তবে Cry down অর্থ খাটো করে দেখা।
▮ Do not cry down your enemy— শত্রুকে খাটো করে দেখো না।

D. Set অর্থ স্থাপন করা, ঠিকঠাক করা কিন্তু Set in অর্থ আরম্ভ করা, শুরু হওয়া।
▮ The rains have set in— বর্ষা আরম্ভ হয়েছে।

E. Hail অর্থ শুভেচ্ছা জানানো, অভিনন্দিত করা কিন্তু hail from অর্থ- কোথাও থেকে আসা।
▮ তাঁর বাড়ি যশোর— He hails from Jessore.

## 3. Phrase & idioms-এর ব্যবহার

যে কোনো idiom-এর শব্দগুলো পরিচিত মনে হলেও আসলে তার অর্থ কল্পনার বাইরে। তাই বিভিন্ন idiom-এর প্রকৃত অর্থ মুখস্থ রাখা আবশ্যক। এখানে কতিপয় উদাহরণ দেয়া হলো।

A. To leave no stone unturned অর্থ যথাসাধ্য/ আপ্রাণ চেষ্টা করা, চেষ্টার ত্রুটি না করা।
▮ He left no stone unturned— সে চেষ্টার কোনো ত্রুটি করল না।

B. To catch somebody red handed অর্থ কাউকে হাতেনাতে ধরা।
▮ The thief was caught red handed— হাতেনাতে চোর ধরা পড়ে।

C. Go to the dogs — অর্থ গোল্লায় যাওয়া, নষ্ট/ বখাটে হওয়া।
▮ He has gone to dogs— সে গোল্লায় গেছে।

D. Tell অর্থ 'বলা' কিন্তু telling speech অর্থ 'কার্যকর বক্তৃতা'।
▮ The leader gave a telling speech-এর সঠিক বঙ্গানুবাদ— নেতা কার্যকর বক্তৃতা দিলেন।

E. Live from hand to mouth অর্থ দিন আনে দিন খায়।
▮ 'Live from hand to mouth' means in Bangla — দিন আনে দিন খায়।

F. Ring অর্থ আংটি বা বৃত্ত, চক্র কিন্তু Ring leader অর্থ পালের গোদা, দলনেতা।
▮ The ring leader was caught— দলনেতা ধরা পড়েছে।



G. Make way for অর্থ কাউকে জায়গা করে দেয়া, যেতে দেয়া।
▮ The crowd made way for the leader— জনতা নেতাকে জায়গা করে দিল।

H. At stake অর্থ সংকটাপন্ন
▮ মানবজাতি এখন সংকটাপন্ন।— Mankind is at stake now.

## 4. প্রবাদ প্রবচনের ব্যবহার

প্রবাদ প্রবচন বা বাগধারা প্রত্যেকটি ভাষার অলংকার স্বরূপ। এগুলো অনুবাদ করে তোলা যায় না বরং অভিজ্ঞতার মাধ্যমে রপ্ত করতে হয় বা মুখস্থ করতে হয়। এখানে কতিপয় প্রবাদ উল্লেখ করা হলো।

A. To carry coal to New Castle অর্থ তেলা মাথায় তেল দেয়া।

B. 'Rome was burning while Niru was playing on flute' অর্থ কারো পৌষমাস, কারো সর্বনাশ।
▮ Nero fiddles while Rome burns— What is sport to the cat is death for the rat.

C. All that glitters is not gold— চকচক করলেই সোনা হয় না

D. Black will take no other hue — কয়লা ধুইলেও ময়লা যায় না।

E. All's well that ends well– শেষ ভালো যার সব ভালো তার।

F. Too many cooks spoil the broth — অধিক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট।

## 5. Preposition-এর ব্যবহার

বিভিন্ন শব্দের সাথে বিভিন্ন Preposition বসে। অনুবাদ করার সময় বিষয়টি মাথায় রাখতে হবে

A. Die of — কোনো রোগের কারণে মারা যাওয়া।
▮ সে কলেরায় মারা গিয়েছে— He died of Cholera.

B. Live — বাস করা, বাঁচা কিন্তু কোন কিছুর উপর নির্ভর করে বাঁচা হলো – Live on.
▮ গরু ঘাস খাইয়া বাঁচে— The cow lives on grass.

C. Come অর্থ আসা। কিন্তু Come from কোনো জায়গা থেকে আসা, যা ঐ ব্যক্তির বাসস্থান/ জন্মস্থান নির্দেশ করে।
▮ তার বাড়ি রাজশাহী— He comes from Rajshahi.

D. 'Across' prepositionটি আড়াআড়িভাবে অতিক্রম করতে ব্যবহৃত হয়। সেক্ষেত্রে swim across অর্থ সাঁতরে নদী পার হওয়া।
▮ সে সাঁতার দিয়ে নদী পার হলো— She swam across the river.

E. দুয়ের মধ্যে বোঝাতে between এবং 'দুইয়ের অধিক' এর ক্ষেত্রে among ব্যবহৃত হয়।
▮ দুভাইয়ের মধ্যে আমগুলো ভাগ করে দাও— Divide mangoes between the two brothers.

## 6 Causative Verb

কোনো কাজ নিজে না করে অন্যকে দিয়ে করানো বোঝাতে causative verbs make /get/have ব্যবহৃত হয়। এর structure টি হচ্ছে get/ have + object + v-এর Past Participle অথবা make + object + v এর present form.
▮ আমি কাজটি করিয়েছি— I have got the work done.
▮ He can make you do this— সে তোমাকে দিয়ে এটি করাতে পারে।

কিছু কিছু verb আছে যেগুলো অর্থগতভাবেই causative। যেমন- eat অর্থ খাওয়া কিন্তু feed অর্থ খাওয়ানো। তেমনি He is walking the baby সে বাচ্চাটিকে হাঁটাচ্ছে।
▮ আমি তোমাকে খাওয়াই— I feed you.

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



### 7. Present Participle-এর ব্যবহার

নাচতে নাচতে, হাসতে হাসতে, কাঁদতে কাঁদতে ইত্যাদি প্রকাশ করতে present participle ব্যবহৃত হয়।

- সে হাসিতে হাসিতে ঘরে ঢুকিলো— He entered the room laughing.
- শিশুটি হাসতে হাসতে মায়ের নিকট এলো— The baby came to its mother laughing.

### 8. অবাস্তব আকাঙ্ক্ষা

কোন অসম্ভব বা বাস্তব আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করতে নিম্নোক্ত structure গুলো ব্যবহৃত হয়।

a. I wish I were ........... b. If + past + perfect c. Had + Sub + ............

- 'আমার যদি পাখির মতো ডানা থাকত' বাক্যটির সঠিক ইংরেজি অনুবাদ— Had I the wings of a bird!.

## অনুশীলনীর জন্য গুরুত্বপূর্ণ অনুবাদ

**০১** Computer is the new miracle of science. It can make thousands calculation in a moment. It can store its memory millions of facts and figures. In Bangladesh the use of computer is growing rapidly. In developed countries computers are used in banks, shops, airlines, offices, libraries, everywhere. Bangladesh is eager to advance on computer technology. It seems that computer is going to dominate the future civilization of man.

অনুবাদ : কম্পিউটার হলো বিজ্ঞানের নতুন ধরনের অলৌকিক রহস্য। এতে মুহূর্তের মধ্যে হাজার হাজার গণনা করা যায়। এ কম্পিউটার লক্ষ লক্ষ ঘটনা ও সংখ্যাকে সংরক্ষিত রাখতে পারে। বাংলাদেশে কম্পিউটারের ব্যবহার দ্রুতগতিতে বাড়ছে। উন্নত দেশগুলোতে ব্যাংক, দোকান, বিমান, গবেষণা, অফিস, লাইব্রেরি সর্বত্রই কম্পিউটার ব্যবহৃত হচ্ছে। বাংলাদেশও কম্পিউটার প্রযুক্তির অগ্রগতিতে আগ্রহী। মনে হয়, কম্পিউটার ভবিষ্যৎ মানব সভ্যতার ওপর প্রভাব বিস্তার করবে।

**০২** We cannot all be politicians or lead millions of people. We cannot all be heroes and fight for freedom of the oppressed. But each of us can make life happier for those around us. We can all look after our neighbour when he is sick, teach the ignorant, comfort the unfortunate and keep around us fresh, clean and tidy. We can all be kind, patient and loving. We can all be truthful, humble and obedient. These are the greatest things in life, because without them the world will never be happy.

অনুবাদ : আমরা সকলে রাজনৈতিক নেতা হতে পারি না অথবা লক্ষ লক্ষ মানুষকে পরিচালনা করতে পারি না। আমরা সকলে বীর নায়ক হতে পারি না এবং নির্যাতিতদের মুক্তির জন্য সংগ্রাম করতে পারি না। কিন্তু আমরা প্রত্যেকে আমাদের চারপাশের সকলের জীবনকে সুখী করতে পারি। আমরা আমাদের পীড়িত প্রতিবেশীর সেবা করতে পারি, নিরক্ষরকে শিক্ষিত করতে পারি। আমরা সবাই সদয় ও ধৈর্যশীল হতে পারি এবং আমাদের চারপাশের সবকিছুকে পরিচ্ছন্ন রাখতে পারি। আমরা সত্যবাদী, বিনয়ী এবং স্নেহশীল হতে পারি। এগুলোই জীবনের সবচেয়ে বড় ব্যাপার। কারণ এগুলো ছাড়া পৃথিবীতে কখনোই সুখী হতে পারে না।



**০৩** In our life we give up many things considering them as very difficult or impossible. Sometimes we show some courage and start some work. But even the slightest difficulty makes us nervous and we leave it there. Lives of greatmen teach us that there is nothing impossible in this world. Nepolean want to the extent of saying that the word 'impossible' didn't exist in his dictionary. It is true that even those tasks which are seeming impossible can be accomplished with a strong and sincere discrimination.

অনুবাদ : আমরা আমাদের অনেক জিনিসকেই কঠিন এবং অসম্ভব মনে করে পরিত্যাগ করি। কখনো কখনো আমরা কিছুটা সাহস প্রদর্শন করে কাজ শুরু করি। কিন্তু সামান্যতম অসুবিধা আমাদের স্নায়ু দৌর্বল্য এনে দেয় এবং আমরা সেই অবস্থাতেই পরিত্যাগ করি। মহাপুরুষদের জীবনী আমাদের এ শিক্ষা দেয় যে পৃথিবীতে অসম্ভব বলে কিছু নেই। নেপোলিয়ন এমন কথাও বলেছেন যে, অসম্ভব শব্দটি তাঁর অভিধানে নেই। এটা সত্য যে, এমনকি যে কাজকে আপাতত অসম্ভব বলে মনে হচ্ছে তা দৃঢ় ও আন্তরিক প্রত্যয় দ্বারা সম্পূর্ণ করা যায়।

**০৪** No work is superior or inferior in itself. Work is work . It is absolutely wrong to consider any work as high or low. The work itself is a dignity. Every work has some dignity attached to it. It is improper for anybody to think that a certeain work is undignified or below his status. Dignity of labour means that all and every kind of work is dignified.

অনুবাদ : কোনো কাজই কাজের দিক থেকে উঁচু বা নিচু নয়। কাজ কাজই। কোনো কাজকে উঁচু বা নীচু বিবেচনা করাটা সম্পূর্ণ ভুল। কাজ মানেই হলো মর্যাদা। প্রত্যেক কাজের সাথেই কিছুটা মর্যাদা জড়িত। যে কারও পক্ষে এটা চিন্তা করা অযথার্থ হবে যে, কোনো একটি বিশেষ কাজ অসম্মানজনক বা তার পদমর্যাদা অপেক্ষা নীচুস্তরের। সবরকম কাজই হলো সম্মানজনক– শ্রমের মর্যাদা বলতে এটাই বোঝায়।

**০৫** The value of man's life is measured not by the number of years he has lived, but by the number of good deeds he has done. A man may live a longer life without doing any noble task for the good of the world. But such life is useless and such man is forgotten as soon as he dies. But a man who does noble work for the benefit of mankind lives in the memory of the people even long after his death, though he may live a short life here. The great men like Jesus Christ, the great Prophet (sm) and Vivekananda died young, but they are still remembered with great reverence on account of their noble deeds.

অনুবাদ : মানুষের জীবনের মূল্য সে কত বছর বেঁচে থাকল তার দ্বারা নিরূপিত হয় না, নিরূপিত হয় সে কত সৎকর্ম করেছে তার দ্বারা। পৃথিবীর উপকারে লাগতে পারে এমন কিছু মহৎ কর্ম না করেও কোনো মানুষ দীর্ঘজীবী হতে পারে। এরূপ ব্যক্তির জীবন মূল্যহীন এবং তারা মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই বিস্মৃত হয়। কিন্তু যে মানুষ মানবজাতির মঙ্গলের জন্য কাজ করে, সে স্বল্পজীবী হয়েও মানুষের স্মৃতিতে বেঁচে থাকে। যীশুখ্রিষ্ট, মহানবী এবং বিবেকানন্দের মতো মহাপুরুষেরা অল্প বয়সে মারা গেলেও তাদের মহৎ কর্মের জন্য এখনো তাদের গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করা হয়।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



**০৬** Our life is short. But we have to do many things. Human life is nothing but
collection of moments. So we must not spend a single moment in vain. To kill
time is to shorten life. Time and tide wait for none.

অনুবাদ : আমাদের জীবনকাল সংক্ষিপ্ত। কিন্তু আমাদের অনেক কাজ করতে হবে। মানবজীবন কতকগুলো মুহূর্তের সমষ্টি ছাড়া আর কিছুই নয়। সেজন্য আমরা একটি মুহূর্তও বৃথা অপচয় করব না। সময় অপচয় করার অর্থ হলো জীবনকে সংক্ষিপ্ত করা। সময় এবং স্রোত কারো জন্য অপেক্ষা করে না।

**০৭** Man is the worshipper of beauty. Since the dawn of creation his eyes have never ceased
to look on the lovely things. He has found beauty in the human face, in the baby's smile, in
the lover's glance and in the philosopher's view. And all this beauty has gladdened his heart.
His spirit has thrilled at its touch. He has tried to realise this joy and mystery, but in vain.

অনুবাদ : মানুষ সৌন্দর্যের পূজারী। সৃষ্টির উষালগ্ন থেকে সে কখনো সুন্দর জিনিস দেখা থেকে তার চোখকে বিরত রাখতে পারেনি। সে মানুষের মুখে, শিশুর হাসিতে, প্রেমিকের মুগ্ধ দৃষ্টিতে, দার্শনিকের ভ্রূ-কুঞ্চনে সৌন্দর্য খুঁজে পেয়েছে। আর এসব সৌন্দর্য তার হৃদয়কে আনন্দিত করেছে। এর স্পর্শে তার আত্মা হয়েছে পুলকিত। সে এই আনন্দ ও রহস্যকে অনুধাবন করার চেষ্টা করেছে, কিন্তু ব্যর্থ হয়েছে।

**০৮** The beauty of the Taj beggars description. It has been called a dream in
marble and a tear-drop on the checks of time. The Taj is best seen in moonlitnight
when the dazzling white of the marble is mellowed into a dream of softness.

অনুবাদ : তাজমহলের সৌন্দর্য ভাষায় প্রকাশ করা অসম্ভব। একে বলা হয় মর্মর প্রস্তরে নির্মিত এক স্বপ্ন এবং কালের করতলে এক বিন্দু নয়নের জল। জ্যোৎস্নালোকে যখন শুভ্র সমুজ্জ্বল মর্মর প্রস্তর স্বপ্নিল পেলবতায় রূপান্তরিত হয়, তখন তাজকে দেখায় সবচেয়ে সুন্দর।

**০৯** The most important thing for a citizen is simple to be a good man. He must
try to be honest, just and merciful in his private life. This is his primary duty. The
reason shouldn't be difficult to understand. The well being of a state or a city
ultimately depends on the moral character of its citizens.

অনুবাদ : কোনো নাগরিকের পক্ষে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো একজন ভালো মানুষ হয়ে ওঠা। তাকে অবশ্যই তার ব্যক্তিগত জীবনে সৎ, ন্যায়পরায়ণ এবং সদয় হবার চেষ্টা করতে হবে। এটাই তার প্রাথমিক দায়িত্ব। এর কারণ বোঝা কঠিন নয়। কোনো রাজ্য বা নগর মূলত নির্ভর করে তার নাগরিকদের নৈতিক চরিত্রের ওপর।

**১০** Students have their duties. They have duties to themselves, to their parents and
relatives, to their country and to humanity at large. Student life is the seedtime of life.
So a student should build up his health, form good habits and cultivate good manners.
One of the surest ways to be good and great in life is to have genuine love and regard
for one's parents and teachers and read the lives of great men.

অনুবাদ : ছাত্রদের নিজস্ব কর্তব্য আছে। নিজেদের প্রতি, পিতামাতার প্রতি, আত্মীয়স্বজনদের প্রতি, দেশের প্রতি এবং সামগ্রিকভাবে সমাজের প্রতি কর্তব্য আছে। ছাত্রজীবন হলো জীবনের বীজ বপনের সময়। সেজন্য একজন ছাত্রের উচিত তার স্বাস্থ্য গঠন করা, ভালো অভ্যাস গড়ে তোলা এবং ভালো ব্যবহার করা। জীবনে ভালো এবং বড় হওয়ার নিশ্চিত পথগুলোর অন্যতম পথ হলো পিতামাতা ও শিক্ষকের প্রতি অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ও ভালবাসা পোষণ করা এবং মহাপুরুষদের জীবনী পাঠ করা।



**১১** Wealth is no doubt necessary for happiness in life. But it has a tendency to
concentrate in the hands of a few. The result is the rich become richer and the
poor become poorer. This is certainly a misuse of wealth. It should be fairly
distributed among all so that it may bring happiness to the greatest number of
people in the society.

অনুবাদ : জীবনে সুখের জন্য নিঃসন্দেহে সম্পদের প্রয়োজন, কিন্তু মুষ্টিমেয় কয়েকজনের হাতে সম্পদের কেন্দ্রীভূত হওয়ার প্রবণতা আছে। এর ফলে ধনী আরো ধনী, দরিদ্র আরো দরিদ্র হচ্ছে। এটা নিশ্চিতই সম্পদের অপব্যবহার। এটা সকলের মধ্যে সুষ্ঠুভাবে বণ্টিত হওয়া উচিত যাতে তা সমাজের সর্বাধিক মানুষের কাছে সুখ এনে দিতে পারে।

**১২** Student life is the stage of preparation for future. This is the most important
period of life. A student is young today, but he will be a man tomorrow. He has
different duties. He should perform them well. As a student, his first duty is to
study and learn. He should take care of his lessons.

অনুবাদ : ছাত্রজীবন হলো ভবিষ্যৎ প্রস্তুতির কাল। এটি হলো জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সময়। একজন ছাত্র আজ কিশোর, কিন্তু আগামীকাল সে হয়ে উঠবে পূর্ণবয়স্ক। তার নানা রকম কর্তব্য আছে। সেগুলো তার ভালোভাবে করা উচিত। ছাত্র হিসেবে তার প্রথম কর্তব্য লেখাপড়া শেখা। তার পড়াশোনার প্রতি সচেতন হওয়া উচিত।

**১৩** Honesty is a great virtue. If you do not deceive others, if you don't tell a lie,
if you are strictly just and fair in your dealing with others, you are an honest man.
Honesty is the best policy. An honest man is respected by all. Every man trusts
an honest man. None can prosper in life if he is not honest.

অনুবাদ : সততা একটি মহৎ গুণ। যদি তুমি কাউকে প্রতারণা না কর, মিথ্যা কথা না বল, অন্যের সঙ্গে ব্যবহারে ন্যায়নিষ্ঠ এবং পরিচ্ছন্ন থাক, তাহলেই তুমি হবে সৎ মানুষ। সততাই শ্রেষ্ঠ নীতি। একজন সৎ মানুষ সকলের কাছে সম্মানিত হন। সৎ ব্যক্তিকে সকলেই বিশ্বাস করে। সৎ না হলে কেউই জীবনে উন্নতি করতে পারে না।

**১৪** Patriotism is love for one's country. It is a powerful sentiment and wholly
unselfish and noble. A patriot can sacrifice even his own life for good of his
country. It is idealism that gives courage and strength. But false patriotism makes
a man narrow minded and selfish.

অনুবাদ : দেশাত্মবোধ হলো দেশের প্রতি ভালোবাসা। এটি একটি শক্তিশালী এবং সম্পূর্ণ স্বার্থপরহীন ও মহৎ আবেগ। একজন দেশ প্রেমিক তার দেশের মঙ্গলের জন্য নিজের জীবন পর্যন্ত উৎসর্গ করতে পারেন। এটি এমন একটি আদর্শবাদ, যা সাহস ও শক্তি দেয়। কিন্তু মেকি দেশপ্রেম মানুষকে সংকীর্ণমনা ও স্বার্থপর করে তোলে।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



**১৫** Although religion doesn't inhabit the acquistion of wealth, and it doesn't hold up large fortune an evil. The tenor of its teaching, by and large, is to induce an attitude of indifference to wordly things, things which gratify one's lover self and keep one engrossed in money making. The student should be made to realise that the real good of life are spiritual, love of things of the so spirit and service of one's fellow men. Joy is in ordered disciplined life. These are blessing which money cannot buy. What is wealth before such things of spirit? Of all religious teachers Jesus Christ has dealt more comprehensively than any other with the problem of wealth in all its aspects. With only four words, "Blessed are the poor" he changed altogether the values which man attached to human existence and human happiness and acquisition and possession of wealth. Real bliss consisted, he taught, not in riches nor in anything else which the world regarded as prosperity or felicity, but in the joy and happiness derived from being at peace with one's fellow men through perfect store, fellowship, selfless service and sacrifice.

অনুবাদ : ধর্ম যদিও ধনসম্পদ ও বিত্তবৈভবকে নিষেধ করেনি, তবুও সামগ্রিকভাবে ধর্মের মূলকথা হলো যে, মানুষ যেন অর্থোপার্জনের মোহে পার্থিব জিনিসে আচ্ছন্ন হয়ে না পড়ে। ছাত্রদের একথা বুঝতে হবে যে, জীবনের আসল মঙ্গল আছে আধ্যাত্মিকতায়, আত্মিক ভালবাসায় ও মানুষকে সাহায্য করার ভিতর। সুবিন্যস্ত জীবনের ভেতর আছে আনন্দ। এই আশীর্বাদগুলো টাকা দিয়ে কেনা যায় না। আত্মার কাছে অর্থবিত্ত কিছুই না। সকল ধর্ম প্রচারকদের মধ্যে যীশু খ্রিস্টই বোধ হয় ধনসম্পদের সমস্যা নিয়ে বেশি আলোচনা করেছেন। তাকে ধর্মবিজ্ঞানের সর্বোচ্চ ব্যাখ্যাতা বলা যায়– 'দরিদ্ররাই আশীর্বাদপুষ্ট'। এই চারটি শব্দ দ্বারা তিনি মানুষের অস্তিত্ব, সুখ, সম্পত্তির অধিকার এগুলোর গুরুত্ব বদলে দিয়েছেন। তিনি প্রচার করলেন, প্রকৃত সুখ ধনসম্পত্তিতে, পার্থিব অর্জনের মধ্যে লুকিয়ে নেই বরঞ্চ অপরের সাথে শান্তিতে বসবাস ও অপরের কল্যাণে নিজের ত্যাগের মহান সুপথে সুখ নিহিত।

**১৬** War is a curse for human beings. In ancient times, only soldiers participated in wars. But in these days all people both military people and civilians have to suffer the consequences of war. None can escape from the bombs used by the enemy. In fact, war turns men into beasts.

অনুবাদ : যুদ্ধ মানবজাতির জন্য অভিশাপ। প্রাচীনকালে যুদ্ধ সৈনিকদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু সামরিক-বেসামরিক সকল লোককেই যুদ্ধের প্রতিফল ভোগ করতে হয়। বোমা ব্যবহারকারী শত্রুর হাত থেকে কেউই মুক্তি পেতে পারে না। বস্তুত যুদ্ধ মানুষকে পশুতে পরিণত করে।

**১৭** The greatest wealth to each person is his honour. If anyone robs us of our wealth, he takes nothing away from us. The reason is that money in itself carries no value. Money always changes hand. It passes on from person to person. But the man who snatches away my honour, robs me of my greatest wealth. This does not make him rich, but it makes me totally destitute.



অনুবাদ : প্রত্যেক মানুষের কাছে তার সুনামই হলো বড় ঐশ্বর্য। যে আমাদের টাকা-কড়ি নেয়, সে আমাদের কিছুই নিতে পারে না। কারণ টাকার নিজের কোনো মূল্য নেই। আজ যে তোমার, কাল সে আমার। আবার পরশু দিন আর একজনের হবে। কিন্তু যে আমার সুনাম কেড়ে নেয়, সে আমার যথাসর্বস্বই কেড়ে নেয়। তাতে সে ধনী হয় না বটে, কিন্তু আমাকে একেবারে নিঃস্ব করে দেয়।

**১৮** One can become successful in the work, if one tries. God helps those who help themselves. We learn this lesson from the lives of those who have become great in the world. Whether it is knowledge or wealth, nobody can achieve it if he himself does not try. We should keep this in our mind.

অনুবাদ : চেষ্টা করলে সফলকাম হওয়া যায়। যে স্বয়ং চেষ্টা করে আল্লাহ তার সহায় হন। পৃথিবীতে যারা বড় হয়েছেন তাদের জীবনী থেকে আমরা এ শিক্ষাই পেয়ে থাকি। বিদ্যাই হোক আর ধনই হোক, স্বয়ং চেষ্টা না করলে কেউই তা লাভ করতে পারে না। এ কথাটি আমাদের স্মরণ রাখা উচিত।

**১৯** Flood is a natural calamity. Bangladesh falls a victim to this flood every year. During floods, the suffering of people and other animals beggars description. Crops are greatly damaged too. Various diseases like diarrhoea and cholera break out in an epidemic form after flood. Hence, flood is a serious problem for our country. The government is trying to solve this problem.

অনুবাদ : বন্যা একটি প্রাকৃতিক দুর্যোগ। বাংলাদেশ প্রতিবছর এ বন্যার কবলে পড়ে। বন্যার সময় মানুষ ও অন্যান্য প্রাণী অবর্ণনীয় দুঃখ-কষ্ট ভোগ করে। ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হয়। বন্যার পর উদরাময় ও কলেরার ন্যায় নানা প্রকার রোগ মহামারী আকারে দেখা দেয়। কাজেই বন্যা আমাদের দেশের জন্য একটি মারাত্মক সমস্যা। সরকার এ সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করছে।

**২০** Poverty is a great problem in our country. But we hardly realize that this miserable condition is our own creation. Many do not try to better their condition by means of hard labour and profitable business. They only bemoan their miserable lot and curse their fate. We must shake off this inactivity and aversion to physical labour. If we remember the wise saying that 'Man is the architect of his own life' and advance in life with firm steps, our misery will disappear and peace and happiness will be our constant companion.

অনুবাদ : আমাদের দেশে দারিদ্র্য একটি বড় সমস্যা। কিন্তু এই শোচনীয় অবস্থা যে প্রধানত আমাদের নিজেদের দ্বারাই সৃষ্ট, তা আমরা প্রায়ই বুঝতেই পারি না। অনেকেই কঠিন পরিশ্রম এবং লাভজনক ব্যবসার দ্বারা নিজেদের অবস্থার উন্নতি সাধন করতে চেষ্টা করে না। তাছাড়া নিজেদের দুরবস্থার জন্য কেবল হা-হুতাশ করে এবং ভাগ্যকে অভিসম্পাত করে। এই জড়তা ও শ্রমবিমুখতা ঝেড়ে ফেলতে হবে। 'মানুষ নিজেই নিজের ভাগ্য নির্মাতা'– এই মহান বাক্য স্মরণে রেখে দৃঢ় পদক্ষেপে জীবনপথে অগ্রসর হলে দারিদ্র্য ও দুঃখ দূর হবে এবং সুখ ও শান্তি আমাদের চিরসঙ্গী হবে।

**২১** It is education which makes our life beautiful and successful. There is no utility of education, if it does not improve our moral character. Have you turned your eyes to our society? No one wants to pay due respect to his superiors and teachers. It is really a matter of great regret.

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



অনুবাদ : জীবনকে সুন্দর ও সার্থক করার জন্যই শিক্ষা। আমাদের নৈতিক চরিত্রের উন্নতিই যদি সাধিত না হয় তবে বিদ্যার কোনো মহিমাই থাকে না। আমাদের সমাজের দিকে কি একবার চেয়ে দেখেছ? গুরুজনের প্রাপ্য সম্মান, শিক্ষাগুরুর উপযুক্ত মর্যাদা কেউ দিতে চায় না। এটা দুঃখজনক ব্যাপার।

২২ Most of the people of our country are illiterate. They can neither read nor write. But a man cannot progress if he does not know how to read and write. For this reason, our country is lagging behind at a great extent. An uneducated population is a burden to a country. A poor country like ours needs a job-orientied education system.

অনুবাদ : আমাদের দেশের অধিকাংশ লোক নিরক্ষর। তারা পড়তেও জানে না, লিখতেও জানে না। অথচ লেখাপড়া না জানলে মানুষ উন্নতি করতে পারে না। এ কারণে আমাদের দেশ এত পিছনে পড়ে আছে। অশিক্ষিত জনগণ একটি দেশের বোঝা। আমাদের মতো দরিদ্র দেশের জন্য প্রয়োজন কর্মমুখী শিক্ষাব্যবস্থা।

২৩ Liberty does not decend upon a people, a people must raise itself to it. It is a fruit that must be earned before it can be enjoyed. That freedom means freedom only from foreign rule is an outworn idea. It is not merely government that should be free but also people themselves should be free. And no freedom has any real value for common men or women unless it also means freedom from want, disease and ignorance.

অনুবাদ : স্বাধীনতা কোনো জাতির ওপর নেমে আসে না, জাতিকে স্বাধীনতার পর্যায়ে উন্নীত হতে হয়। এটি এমন একটি ফল যা ভোগ করার পূর্বে অর্জন করতে হয়। স্বাধীনতা অর্থ বিদেশি শাসন থেকে মুক্তি– এটি সেকেলে ধারণা। শুধু সরকার স্বাধীন হবে না, জনসাধারণ নিজেরাও স্বাধীন হবে। স্বাধীনতা যদি অভাব, রোগ ও অজ্ঞতা থেকে মুক্তি না বুঝায় তবে সাধারণ নর-নারীর কাছে সে স্বাধীনতার প্রকৃত কোনো মূল্য নেই।

২৪ Man has an unquenchable thirst for knowledge. He is never satisfied with what he has known and seen. This curiosity to know more, coupled with his indomitable spirit of adventure, has inspired him to undertake and carry out difficult and dangerous tasks. In the fields of science and technology, man has already achieved what was once inconcievable.

অনুবাদ : জ্ঞানের জন্য মানুষের পিপাসা দুর্নিবার। সে যা জেনেছে এবং দেখেছে তা নিয়ে সে কখনো তৃপ্ত নয়। সে আরও বেশি জানতে ও দেখতে চায়। এই অধিকতর জানার কৌতূহল অদম্য অ্যাডভেঞ্চার স্পৃহার সঙ্গে যুক্ত হয়ে দুরূহ এবং বিপজ্জনক কার্যাদি গ্রহণ ও পরিচালনা করতে তাকে অনুপ্রাণিত করেছে। এককালে যা ছিল অচিন্তনীয়, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে মানুষ তা ইতোমধ্যে অর্জন করে ফেলেছে।

২৫ The judiciary is an important part of all the government. The separation of the judiciary is inevitable for the administration of right judgement. This provision is incorporated in the constitution of Bangladesh. The constitution is supreme law of country. We hope that the present democratic government will protect the constitution for the welfare of the people.

অনুবাদ : বিচার বিভাগ সকল সরকারেরই একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। সুষ্ঠু বিচারকার্য পরিচালনার জন্য বিচার বিভাগের পৃথকীকরণ আবশ্যক। এ ধারা বাংলাদেশের সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত আছে। সংবিধানই দেশের সর্বোচ্চ আইন। আমরা আশা করি, বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকার জনগণের কল্যাণে সংবিধানকে সংরক্ষণ করবে।



২৬ It is difficult to get rid of bad habits. So, we should be very careful so that we do not get into any bad habit in our boyhood. Idleness is such a bad habit. Every boy and girl will have to be industrious. They should give up idleness as poison. Their duty should be to obey the superiors and follow their advice.

অনুবাদ : বদ অভ্যাস থেকে মুক্ত হওয়া কঠিন। তাই বাল্যকালে আমরা যাতে কোনোরূপ বদ অভ্যাসে অভ্যস্ত না হই, সেদিকে আমাদের সতর্ক থাকা উচিত। আলস্য এরূপ একটি বদঅভ্যাস। প্রতিটি বালক-বালিকাকে পরিশ্রমী হতে হবে। আলস্যকে তাদের বিষবৎ পরিত্যাগ করা উচিত। গুরুজনকে মান্য করা এবং তাদের উপদেশ পালন করা তাদের কর্তব্য হওয়া উচিত।

২৭ Smoking is a dangerous habit. People addicted to smoking might become victim of cancer. That cancer is a fatal disease needs no telling. So, a vigorous campaign against smoking is a crying need. The physicians with their superior knowledge about the dangers of smoking should be the leaders of the campaign. They should come forward.

অনুবাদ : ধূমপান বিপজ্জনক অভ্যাস। ধূমপানে আসক্ত লোকেরা ক্যান্সারে আক্রান্ত হতে পারে। ক্যান্সার যে একটি মারাত্মক ব্যাধি তা বলার অপেক্ষা রাখে না। তাই ধূমপানের বিপদগুলো সম্পর্কে সর্বাধিক জ্ঞান রাখেন যে চিকিৎসকগণ তাদেরই এ অভিযানে নেতৃত্ব দান করতে হবে। তাদের এগিয়ে আসা উচিত।

২৭ The saying that 'Health is wealth' is indeed very true. Even a millionaire will lead a miserable life, if his health breaks down beyond recovery. Health is undoubtedly a priceless possession. If a man is healthy, he is an asset to his family and also to the society. On the other hand, an unhealthy person is a burden to all.

অনুবাদ : 'স্বাস্থ্যই সম্পদ'–এ কথা প্রকৃতই সত্য। এমনকি একজন লক্ষপতির জীবনও দুস্থ হয়ে দাঁড়ায় যদি তার স্বাস্থ্য এরূপভাবে নষ্ট হয়ে যায়, যা আর ফিরে পাবার সম্ভাবনা নেই। নিঃসন্দেহে স্বাস্থ্য অমূল্য সম্পদ। একজন স্বাস্থ্যবান ব্যক্তি তার পরিবার এবং সমাজের সম্পদ। অন্যদিকে যদি রুগ্ন হয় তবে সে সকলের জন্য বোঝা হয়ে দাঁড়ায়।

২৯ Truthfulness is one of those qualities which make a man really great. A person who does not know how to speak the truth cannot be trusted. Those whom no body believes can never be established. By telling lies, one can succeed two or four times, but such success cannot provide one with permanent result. It must be exposed today or tomorrow.

অনুবাদ : যে সমস্ত গুণ থাকলে মানুষ যথার্থ বড় হতে পারে সত্যবাদিতা তার অন্যতম। সত্য কথা বলতে না পারলে কখনো অপরের বিশ্বাসভাজন হওয়া যায় না। যাকে কেউ বিশ্বাস করে না সে কখনো প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারে না। মিথ্যা কথা বলে হয়তো দু-চারবার কার্যসিদ্ধি হতে পারে, কিন্তু সেরকম কার্যসিদ্ধি থেকে কোন স্থায়ী সুফল ফলে না। একদিন না একদিন তা প্রকাশ হয়ে পড়বেই।

৩০ It was the 16th December, 1971. On this day the Pakistani army surrenderd their arms. It will go down in history as a red letter day. We achieved freedom after nine-month-long bloody struggle. The man who deserves the greatest credit for this is Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahaman.

অনুবাদ : ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর। এই দিনে পাকিস্তানি সৈন্যরা আত্মসমর্পণ করেছিল। ইতিহাসে এটি স্মরণীয় দিন হয়ে থাকবে। নয় মাস রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের পর আমরা স্বাধীনতা অর্জন করেছিলাম। এর জন্য সর্বাপেক্ষা অধিক কৃতিত্বের দাবিদার যে মানুষটি, তিনি হলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

# বিভিন্ন নিয়োগ পরীক্ষার আসা অনুবাদ

## বিসিএস পরীক্ষায় আসা অনুবাদ (ইংরেজি)

। Man is liable to some troubles from which society cannot save him—he has always suffered from death, sorrow, disappointments of various kinds and disease, etc. It is only self-confidence and a absolute reliance on God that can save him from them. If he gains self-confidence and devotion to God, even the direct misfortune will not be able to upset him in any way. Strong in his own power, he will face all his troubles with a smiling face. But our students are deprived of this education under the present system. It has to be reintroduced if our men, and for that matter the country, are to be saved. *[34th BCS 2014]*

**অনুবাদ :** মানুষ কিছু সমস্যার জন্য দায়ী যেগুলো থেকে সমাজ তাকে রক্ষা করতে পারে না– মৃত্যু, দুঃখ, বিভিন্ন প্রকার হতাশা, রোগ-ব্যাধি ইত্যাদি সর্বদা সে ভুগতে থাকে। একমাত্র আত্মবিশ্বাস এবং আল্লাহর প্রতি পূর্ণ আস্থাই তাকে এগুলো থেকে রক্ষা করতে পারে। যদি সে আত্মবিশ্বাস ও আল্লাহর প্রতি অনুরাগ অর্জন করতে পারে তবে সরাসরি দুর্ভাগ্যও তাকে যে কোনো ভাবে বিষণ্ন করতে পারবে না। আত্মশক্তিতে দৃঢ় থেকে সে সকল সমস্যা হাসিমুখে মোকাবিলা করবে। কিন্তু আমাদের শিক্ষার্থীরা বর্তমান প্রক্রিয়ায় এই শিক্ষা থেকে বঞ্চিত। এটাকে পুনঃপ্রবর্তন করতে হবে যদি আমাদের মানুষগুলোকে দেশের তাগিদে রক্ষা করতে হয়।

। The students of Bangladesh played a significant role during the freedom struggle in 1971. Their sacrifice, zeal, heroism, and gallantry constitute an important part of our national history. During the nine-month struggle, numerous students left their places of learning and underwent military training to fight against the Pakistani armed forces. The student community of this country have always been conscious about their socio-political responsibilities. They have created the tradition of sacrificing their tender lives for the cause of mother tongue, democracy and homeland. In 1952, they faced bullets or gun-shots and ultimately Bangla was made one of the state languages of Pakistan. They led a mass movement in 1969 to free Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman who was falsely implicated in the so-called "Agartala Conspiracy Case." They brought down the existing regime from the pinnacle of power. However, the students should not assume that their duties are over. They should remember that it is hard to win freedom, but it is harder to preserve it. *[33rd BCS 2013]*

**অনুবাদ :** ১৯৭১ সালের মুক্তিসংগ্রামে বাংলাদেশের ছাত্রসমাজ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। তাদের ত্যাগ, উদ্দীপনা, বীরত্ব ও সাহসিকতা আমাদের জাতীয় ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় সৃষ্টি করেছে। নয় মাস ব্যাপী এ যুদ্ধের সময় বহু ছাত্র তাদের বিদ্যালয় ত্যাগ করে এবং পাকিস্তানি সশস্ত্র বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই করতে সামরিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে। এদেশের ছাত্র সমাজ সব



সময়ই তাদের সামাজিক ও রাজনৈতিক দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন। তারা মাতৃভাষা, গণতন্ত্র এবং স্বদেশের জন্য তাদের তেজোদীপ্ত জীবন উৎসর্গ করার ঐতিহ্য সৃষ্টি করেছে। ১৯৫২ সালে তারা বুলেট বা বন্দুকের গুলির সম্মুখীন হয়েছিল এবং শেষ পর্যন্ত বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছিল। তাঁরা তথা কথিত "আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা"-র মিথ্যা অভিযোগ থেকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে মুক্ত করতে ১৯৬৯ সালের গণ-অভ্যুত্থানের নেতৃত্ব দিয়েছিল। তারা বিদ্যমান চরম ক্ষমতার কর্তৃত্বের অবসান ঘটায়।

যাই হোক, ছাত্রদের এটা মনে করা উচিত নয় যে তাদের দায়িত্ব শেষ হয়ে গেছে। তাদের মনে রাখতে হবে যে, স্বাধীনতা অর্জন করা কঠিন কিন্তু এটা রক্ষা করা আরো কঠিন।

। Twentieth century marked a turning point in our realisation for protection of mankind. It was evident more than ever before that advancement in science in the form of rapid industrialisation has given rise to severe atmospheric degradation. Emission of Green House Gases (GHGs) into the atmosphere of our planet Earth; due to unabated race for growth and development by developed economies, is the root cause of global warming. Developed as well as developing nations are now facing increased natural calamities like cyclones, floods, droughts etc. being caused due to global warming induced climate change. Climate change incidences have become global concerns for the whole of mankind. For addressing this, global leaders resolved under the auspices of United Nations to reduce emissions of GHGs to minimize global warming which, in its turn will help protect mankind from adverse impacts of climate change. Bangladesh and other coastal and island nations are most vulnerable to climate change in extreme events. As such, Bangladesh, along-with other climate vulnerable developing nations should move all UN bodies to make developed economies to cut GHGs emissions to required levels for a cooler planet, Earth.*[32nd BCS 2012]*

**অনুবাদ :** মানবজাতি রক্ষায় আমাদের উপলব্ধির ক্ষেত্রে বিংশ শতাব্দী একটি পরিবর্তন সূচনাকারী সময় হিসেবে চিহ্নিত। দ্রুত শিল্পায়নের মতো বিজ্ঞানের অগ্রগতির ফলে বায়ুমণ্ডল যে মারাত্মক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছে সে বিষয়টি আগের যে কোনো সময়ের চেয়ে স্পষ্ট ছিল। উন্নত দেশগুলোর প্রবৃদ্ধি ও উন্নয়নের অপ্রতিহত গতির ফলে আমাদের পৃথিবী নামক গ্রহের বায়ুমণ্ডলে গ্রিন হাউজ গ্যাসের নির্গমন হচ্ছে যা বৈশ্বিক উষ্ণায়নের মূল কারণ। জলবায়ু পরিবর্তনের দ্বারা সৃষ্ট বৈশ্বিক উষ্ণায়নের ফলে এখন উন্নত ও উন্নয়নশীল উভয় জাতিই ঘন ঘন ঘূর্ণিঝড়, বন্যা, খরা ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগের শিকার হচ্ছে। সমস্ত মানবজাতির জন্যই জলবায়ু পরিবর্তনের এ প্রকোপ বৈশ্বিক উদ্বেগের ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে জাতিসংঘের উদ্যোগে বিশ্বের নেতৃবর্গ গ্রিন হাউজ গ্যাস নির্গমন কমিয়ে বৈশ্বিক উষ্ণায়ন হ্রাসকরণের পক্ষে ঐকমত্য পোষণ করেছেন যা আসলে মানবজাতিকে জলবায়ু পরিবর্তনের মারাত্মক প্রভাব থেকে রক্ষা করতে সহায়তা করবে। জলবায়ু পরিবর্তনের চরম পর্যায়ে বাংলাদেশ ও অন্যান্য উপকূলীয় ও দ্বীপরাষ্ট্রসমূহেরই সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হবার সম্ভাবনা রয়েছে। তাই একটি তুলনামূলক শীতল গ্রহ তথা পৃথিবীর জন্য বাংলাদেশসহ জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতির সম্মুখীন হতে পারে এমন দেশগুলোকে জাতিসংঘের সকল সদস্যকে সাথে নিয়ে উন্নত দেশগুলোর গ্রিন হাউজ গ্যাস নির্গমন প্রয়োজনীয় মাত্রায় নামিয়ে আনতে বাধ্য করতে হবে।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



- The first step I take is bringing my key along with me. Obviously, I don't want to have to knock on the door at 1.30 in the morning and rose my parents out of bed. Second, I make it a point to stay out past midnight. If I come in before then, my father is still up, and I'll have to face his disapproving look. All I need in my life is for him to make me feel guilty. Trying to make it as a college student is as much as I'm ready to handle. Next I am careful to be very quiet upon entering the house. This involves lifting the front door up slightly as I open it, so that it does not creak. It also means treating the floor and steps to the second floor like a minefield, stepping carefully over the spots. I'm upstairs, I stop in the bathroom without turning on the lights. *[31st BCS 2011]*

**অনুবাদ :** আমি আমার চাবি সাথে রাখার পদক্ষেপটাই প্রথমে গ্রহণ করি। স্পষ্টতই রাত দেড়টার সময় আমি দরজায় করাঘাত করে আমার মা-বাবাকে বিছানা থেকে উঠাতে চাই না। দ্বিতীয়ত, আমি ইচ্ছে করেই রাতের প্রথমার্ধ পর্যন্ত বাইরে থাকি। যদি আমি এ সময়ের আগে ঘরে ফিরি তাহলে দেখব যে আমার বাবা তখনও জেগে আছেন এবং আমাকে তখন তার প্রতিকূল দৃষ্টির সম্মুখীন হতে হবে। এর ফলে সবসময়েই আমার মনে ভীষণ অপরাধবোধ জাগ্রত হয়। তাই এ ধরনের পরিস্থিতি মোকাবেলার চেষ্টায় একজন কলেজের ছাত্র হিসেবে আমি সদাপ্রস্তুত। এরপর, আমি ঘরে প্রবেশের সময় নিরবতা বজায় রাখার ক্ষেত্রে খুবই সতর্ক থাকি। এর মধ্যে রয়েছে সামনের দরজা যেভাবে খুলেছি ঠিক সেভাবেই এটিকে হালকা ধাক্কা দিয়ে ভেতরে প্রবেশ করাই, যাতে এটি শব্দ না করে। এর আরো মানে হচ্ছে মেঝে এবং তৃতীয় তলায় আরোহণের জন্য পদক্ষেপ এমনভাবে ফেলতে হবে যাতে মনে হয় কোনো গোপন বোমা পুঁতে রাখা মাইনফিল্ডের মধ্য দিয়ে হাঁটছি। উপরের তলায় গিয়ে আলো না জ্বালিয়েই আমি গোসলখানায় ঢুকে পড়ি।

- Knowledge is called by the name of science or philosophy, when it is acted upon or impregnated by Reason. Knowledge, indeed, when thus exalted into a scientific form is also power; not only it is excellent in itself, but whatever such excellence may be, it is something more. It has a result beyond itself. There are two ways of using knowledge and in matter of fact those who use it in one way are not likely to use it in the other. Then there are two methods of Education; the end of the one is to be philosophical, of the other to be mechanical; the one rises towards general ideas, the other is exhausted upon what is particular and external. And knowledge if tends more and more to be particular, ceases to be knowledge. It is not the brute creation or passive sensation, rather something intellectual that expresses itself. *[30th BCS 2011]*

**অনুবাদ :** জ্ঞান যখন যুক্তিকে অনুসরণ করে বা যুক্তিকে তার সাথে সম্পৃক্ত করে তখন তাকে বিজ্ঞান বা দর্শন নামে ডাকা হয়। প্রকৃতপক্ষে, এভাবে বৈজ্ঞানিক রূপে উন্নীত জ্ঞান ক্ষমতাও, এটা শুধু নিজেই উৎকৃষ্ট নয়। কিন্তু এরূপ উৎকর্ষ যাই হোক না কেন, তা উৎকর্ষের চেয়েও বেশি। এর নিজেকে ছাড়িয়ে যাওয়ার একটি ফলাফল আছে। জ্ঞান ব্যবহারের দুটি পথ আছে এবং বস্তুত যারা এটাকে একভাবে ব্যবহার করে তারা সাধারণত এটাকে অন্যভাবে ব্যবহার করে না। সে ক্ষেত্রে



শিক্ষার দুটি পদ্ধতি আছে; একটার লক্ষ্য দার্শনিক, অন্যটার লক্ষ্য যান্ত্রিক; একটা ধাবিত হয় সাধারণ ধারণার দিকে, অন্যটি পূর্ণাঙ্গ আলোচনা করে এমন কিছুর যা বিশেষ ও বাহ্যিক এবং জ্ঞান ক্রমাগত বিশেষ হওয়ার দিকে ঝুকলে জ্ঞান আর জ্ঞান থাকে না। এটা জড় সৃষ্টি বা নিক্রিয় অনুভূতি নয় বরং এমন বুদ্ধিবৃত্তিক কিছু যা নিজেকে প্রকাশ করে।

- Providing enough energy to meet an ever-increasing demand is one of the gravest problems the world is now facing. Energy is the key to an industrialized economy, which calls for a doubling of electrical output every ten to twelve years. Meanwhile, the days of cheap abundant and environmentally acceptable power may be coming to an end. Coal is plentiful but polluting, natural gas is scarce, oil is not found everywhere. Nuclear power now appears costly and risky. In many countries of the world, keen interest is being shown in new energy sources. Among the familiar but largely undeveloped sources, solar energy, geothermal energy and energy from the ocean deserve special consideration. *[29th BCS 2010]*

**অনুবাদ :** ক্রমবর্ধমান চাহিদার সাথে তাল মিলিয়ে পর্যাপ্ত শক্তির যোগান দেয়া বর্তমান বিশ্বের গুরুতর সমস্যাগুলোর একটি। শক্তি শিল্পায়িত অর্থনীতির মূল চালিকাশক্তি, যার জন্য প্রতি ১০-১২ বছর অন্তর দ্বিগুণ বৈদ্যুতিক উৎপাদনের প্রয়োজন পড়ে। ইতোমধ্যে পরিবেশে ব্যবহার-উপযোগী শক্তির সস্তা প্রাচুর্যের দিন শেষ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। কয়লা প্রচুর পরিমাণে পাওয়া গেলেও এটা পরিবেশ দূষিত করে, প্রাকৃতিক গ্যাস স্বল্প পরিমাণে পাওয়া যায়, তেল সবখানে পাওয়া যায় না। এখন পারমাণবিক শক্তিকে ব্যয়বহুল এবং ঝুঁকিপূর্ণ বলে মনে হয়। বর্তমানে পৃথিবীর অনেক দেশ শক্তির নতুন নতুন উৎস আবিষ্কারে তীব্র আগ্রহ প্রকাশ করছে। আমাদের পরিচিত কিন্তু এখনও ব্যাপকভাবে অনুন্নত ও অর্জনপ্রিয় উৎসসমূহের মধ্যে সৌরশক্তি, ভূতাপশক্তি, সামুদ্রিক শক্তি বিশেষ বিবেচনার দাবি রাখে।

- There is some truth in the common saying that while dogs become attached to persons, cats are generally attached to places. A dog will follow his master anywhere, but a cat keeps to the house it is used to live and even when the house changes hands, the cat will remain there so long as it is kindly treated by the new owners. A cat does not seem to be capable of personal devotion, often shown by a dog. It thinks most for its own comfort and it loves us only cupboard love. *[28th BCS 2009]*

**অনুবাদ :** কুকুর ব্যক্তির প্রতি এবং বিড়াল সাধারণত স্থানের প্রতি অনুরক্ত– এ সাধারণ প্রবাদ বাক্যটির মধ্যে কিছুটা সত্য নিহিত আছে। প্রভু যেখানে যাবে, কুকুর তার সাথে সেখানেই যাবে, কিন্তু বিড়াল যে বাড়িতে বাস করতে অভ্যস্ত সে বাড়িতেই থাকবে। এমনকি, বাড়ির মালিক বদল হলেও যদি নতুন মালিকের ভালো ব্যবহার পায়, তবে বিড়াল সেখানেই থাকবে। বিড়াল কুকুরের মতো ব্যক্তিবিশেষের প্রতি আনুগত্য দেখাতে অসমর্থ। বিড়াল নিজের আরামের কথাই সবচেয়ে বেশি চিন্তা করে এবং এর ভালোবাসা কেবল উদ্দেশ্য প্রণোদিত ভালোবাসা।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



- I don't want to get old. No one wants to age, but aging is inevitable. Time gives us wrinkles, a bent posture, and fragile bones. It makes us insecure, forgetful, and fearful. The elderly can easily become a burden to the families they once provided for and protected. The children who once vied for their parents' attention are now so consumed with their own affairs that they hardly ever visit. For many elderly people, the stench of ammonia in hospital-like atmosphere of a nursing home is worse than death. To some, it signifies loneliness, cruelty and abandonment. With all the turmoil involved in the aging process, it is no wonder that we are becoming a nation of frightened adults, forever searching for that magical youth serum from the elusive fountain of youth. *[27th BCS 2009]*

অনুবাদ : আমি বৃদ্ধ হতে চাই না। কেউই বৃদ্ধ হতে চায় না কিন্তু বয়োবৃদ্ধি অনিবার্য। সময় চামড়ায় ভাঁজ ফেলে দেয়, শরীর বাঁকিয়ে দেয় এবং হাড়গুলো ভঙ্গুর করে তোলে। এটা আমাদের নিরাপত্তাহীন, ভুলো ও শঙ্কিত করে তোলে। বৃদ্ধরা যারা একদিন পরিবারের ভরণ-পোষণ করেছে, নিরাপত্তা দিয়েছে তারা সহজেই পরিবারের বোঝা হয়ে যায়। যে সন্তান-সন্ততি একসময় পিতামাতার দৃষ্টি আকর্ষণের প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হতো, তারা আজ নিজেদের বিষয়ে এতই ব্যাপৃত যে, কদাচিত পিতামাতার সাথে সাক্ষাতের অবকাশ পায়। নার্সিং হোমের মতো হাসপাতালগুলোতে অ্যামোনিয়ার দুর্গন্ধযুক্ত পরিবেশ অনেক বৃদ্ধের কাছে মৃত্যুর চেয়েও খারাপ। কারো কারো কাছে এ অবস্থা নির্জনতা, নির্মমতা ও পরিত্যক্তের প্রতীক। বয়োবৃদ্ধি প্রক্রিয়া সংশ্লিষ্ট যে বিশৃঙ্খলা শুরু হয়েছে তাতে অবাক হওয়ার নেই যে, আমরা এক ভীত, বৃদ্ধ জাতিতে পরিণত হতে যাচ্ছি। যৌবনের মায়াময় ঝর্ণা থেকে সর্বদা আমরা যাদুময় যৌবনের সিরাম অনুসন্ধান করে যাচ্ছি।

## পিএসসির বিভিন্ন নিয়োগ পরীক্ষায় আসা অনুবাদ

- English is an international language. There is no country in the world where English is not spoken. Once one has taken delight in this language one cannot but learn it. It is with the purpose to enrich the Bangla language that one should learn English. Do you not like speaking English? *[শিক্ষা অধিদপ্তরের ইন্সট্রাক্টর (টেকনিক্যাল) ২০১৪]*

অনুবাদ : ইংরেজি একটি আন্তর্জাতিক ভাষা। পৃথিবীতে এমন কোনো দেশ নেই যেখানে ইংরেজি বলা হয় না। একবার কেউ এই ভাষায় মজা পেলে, সে এটা না শিখে পারে না। বাংলা ভাষাকে সমৃদ্ধ করার উদ্দেশ্যেই আমাদের ইংরেজি শেখা উচিত। তোমরা কি ইংরেজিতে কথা বলা পছন্দ করো না?

- The great advantage of early rising is the good start it gives in our day's work. The early riser has done a large quantity of hard work before other men have got out of bed. In early morning the mind is fresh and there are fewer disturbances. So, the work done at that time is generally well done. By beginning so early, he knows that he has plenty of time to do all the work throughly. He is not, therefore, tempted to hurry over any part of it. *[তুলা উন্নয়ন বোর্ডের তুলা উন্নয়ন কর্মকর্তা ২০১৪]*



অনুবাদ : খুব ভোরে উঠার বড় সুবিধা হচ্ছে এটা আমাদের দিনের কাজের সুন্দর একটা সূচনা দেয়। অন্যান্য মানুষজন ঘুম থেকে উঠার আগেই ভোরে উত্থানকারী কঠিন কাজের অনেকটাই করে ফেলে। খুব ভোরে মন থাকে সতেজ আর ঝামেলাও থাকে অনেক কম। তাই এ সময়ে করা কাজগুলি সাধারণত ভালো হয়। এত ভোরে শুরু করে সে জানে যে, সকল কাজ সম্পূর্ণরূপে করার জন্য তার পর্যাপ্ত সময় রয়েছে। এজন্য তাকে কোনো কিছুতে তাড়াহুড়ো করতে হয় না।

- My five years old daughter Mini cannot live without chattering. She spent only a year to learn her tongue and since then has not wasted a minute in silence. Her mother is often vexed at this and would stop her prattle, but I would not. To See Mini quiet is unnatural and I cannot bear it long. And so, my own talk with her is always lively. *[স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের সায়েন্টিফিক অফিসার ২০১৪]*

অনুবাদ : আমার পাঁচ বছরের মেয়ে মিনি বকবক করা ছাড়া একদম থাকতেই পারে না। ভাষা শিখতে ও মাত্র একবছর সময় নিয়েছে এবং তখন থেকে ও নীরব হয়ে এক মিনিটও অপচয় করে না। এতে ওর মা বিরক্ত হয় এবং ওর বকবকানি থামাতে চেষ্টা করে, কিন্তু আমি করি না। ওর চুপ থাকাটা দেখতে খুব অস্বাভাবিক লাগে, আর আমি এটা বেশিক্ষণ সহ্য করতে পারি না। আর এজন্যই ওর সাথে আমার কথোপকথন সর্বদা প্রাণোচ্ছল হয়।

- I was very tired and lay down on the grass. I must have slept sound for hours and when I awoke it was just daylight. I tried to rise but was not able to stir. *[জরিপ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক ২০১৪]*

অনুবাদ : আমি খুব ক্লান্ত ছিলাম আর ঘাসের উপর শুয়ে পড়লাম। আমি নিশ্চয়ই কয়েক ঘণ্টার জন্য গভীর ঘুমিয়েছিলাম আর যখন জাগলাম তখন সবেমাত্র সকাল হয়েছিল। আমি উঠার জন্য চেষ্টা করলাম কিন্তু নড়তে পারলাম না।

- Honesty is a noble virtue. It is the secret of success in every sphere of life. The value of honesty is very great. It wins love, respect, fearlessness. An honest man passes his days in respect of happiness. Honesty is the best policy. *[সহকারী আবহাওয়াবিদ ২০১৪]*

অনুবাদ : সততা একটি মহৎ গুণ। জীবনের সকল ক্ষেত্রে এটা হচ্ছে সফলতার রহস্য। সফলতার মূল্য বিশাল। এটা ভালোবাসা, সম্মান ও নির্ভীকতাকে জয় করে। একজন সৎ ব্যক্তি সুখের সাথে দিন অতিবাহিত করে। সততাই সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা।

- The world is like a looking glass. If you smile, it smiles, if you frown, it frowns back. If you look at it through a red glass, all becomes red and rosy. If through a blue, all blue; if through a smoked one, all dull and dirty. *[জাতীয় সংসদ সচিবালয়ের ক্যামেরাম্যান ২০১৪]*

অনুবাদ : পৃথিবী একটি আয়নার মত। তুমি হাসলে এটাও হাসে, তুমি ভ্রুকুটি করলে এটাও ভ্রুকুটি করে। তুমি যদি লাল গ্লাসের ভিতর দিয়ে এটাকে দেখ তবে সবকিছু লাল ও গোলাপী হয়ে যায়। নীল গ্লাসের ভিতর দিয়ে দেখলে নীল হয়, ধোঁয়ার ভিতর দিয়ে দেখলে সবকিছু ঘোলা ও অপরিষ্কার হয়ে যায়।

- He who loves his country is a patriot. The patriots love their country more dearly than their own lives. They are ready to lay down their lives for the welfare of their country. Everybody honours them. They live even after their death. *[যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের মোটরযান পরিদর্শক ২০১৪]*

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



অনুবাদ : যে দেশকে ভালোবাসে সে একজন দেশপ্রেমিক। দেশপ্রেমিক নিজেদের জীবনের চেয়ে দেশকে বেশি ভালোবাসেন। দেশের মঙ্গলের জন্য তারা নিজেদের জীবনকে উৎসর্গ করতে প্রস্তুত। প্রত্যেকে তাদেরকে সম্মান করে। মৃত্যুর পরেও তারা বেঁচে থাকেন।

■ No man can live alone. When we are children the family protects us. When we grow up, we need the help of all people around us. If we try to live alone, our lives are no other them of animals. *[সহকারী তথ্য অফিসার ২০১৪]*
অনুবাদ : কোনো মানুষ একা বাস করতে পারে না। আমরা যখন শিশু তখন পরিবার আমাদের রক্ষণাবেক্ষণ করে। আমরা যখন বেড়ে উঠি, তখন চারপাশের সকল মানুষ আমাদের প্রয়োজন হয়। আমরা যদি একা বাস করতে চেষ্টা করি, আমাদের জীবন পশুর জীবন থেকে ভিন্ন কিছু নয়।

■ Bangladesh is the land of our birth. The blue sky and the fresh air of this land are very dear to us. It is our duty to build up our dear motherland. It is our sacred duty. If we do our respective duties, then only our country will make progress. *[সংস্কৃতিবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীন কপিরাইট অফিসার ২০১৪]*
অনুবাদ : বাংলাদেশ আমাদের জন্মভূমি। এ দেশের নীল আকাশ আর নির্মল বাতাস আমাদের খুব প্রিয়। আমাদের প্রিয় মাতৃভূমিকে গঠন করা আমাদের কর্তব্য। এটা আমাদের পবিত্র দায়িত্ব। আমরা যদি আমাদের স্ব স্ব দায়িত্ব পালন করি, তাহলে আমাদের দেশ উন্নতি সাধন করবে।

■ Who are the true friends? Their number is very low. Many friends are found in good days. They are avaricious. They are selfish too. They leave their friends in hard days. A true friend stands by his friend in weal and woe. *[শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সহকারী প্রোগ্রামার ২০১৪]*
অনুবাদ : কারা প্রকৃত বন্ধু? তাদের সংখ্যা খুবই কম। সুসময়ে অনেক বন্ধুদের দেখা যায়। তারা লোভী। তারা স্বার্থপরও বটে। তারা দুঃসময়ে বন্ধুদের ছেড়ে চলে যায়। একজন প্রকৃত বন্ধু সুখে-দুঃখে তার বন্ধুর পাশে থাকে।

■ He who loves his country is a patriot. The patriots love their country more dearly than their own lives. They are ready to lay down their lives for the welfare of their country. Everybody honours them. They live even after their death. *[তুলা উন্নয়ন বোর্ডের সহকারী বীজ-তুলা সংগ্রহ এবং জিনিং কর্মকর্তা ২০১৪]*
অনুবাদ : যিনি তার দেশকে ভালোবাসেন, তিনি দেশপ্রেমিক। দেশপ্রেমিকেরা দেশকে তাদের জীবনের চাইতে বেশি ভালোবাসেন। তারা দেশের জন্য তাদের জীবন উৎসর্গ করতে প্রস্তুত। সবাই তাদের সম্মান করেন। এমনকি তারা মৃত্যুর পরও বেঁচে থাকেন।

■ A garden is not a source of beauty only. It is also a source of income. A house without garden look bare and poor. A garden is useful for other purpose too. Everything has its own colour. *[কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন পরিদপ্তরের সহকারী মহাপরিদর্শক (স্বাস্থ্য) ২০১৪]*
অনুবাদ : একটি বাগান কেবল সৌন্দর্যের উৎস নয়। এটি আয়েরও একটি উৎস বটে। বাগানবিহীন একটি বাড়িকে নীরস ও নিঃস্ব মনে হয়। অন্যান্য উদ্দেশ্যের ক্ষেত্রেও একটি বাগান দরকার। প্রত্যেকটি জিনিসের নিজস্ব একটি রং রয়েছে।



■ We should bear the courage to say the right thing. We need not fear men nor care for what others think of us. So long as our purpose is honest, God will be on our side. And with his help we shall be able to encourage the weak. Thus we shall be able to march in life and reach its goal. *[শিল্প মন্ত্রণালয়ের বয়লার পরিদর্শক ২০১৪]*
অনুবাদ : সত্য বলার সৎসাহস আমাদের থাকা উচিত। মানুষকে ভয় পাওয়া কিংবা অন্যরা আমাদের সম্পর্কে কি চিন্তা করে তা নিয়ে উদ্বিগ্ন হওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের উদ্দেশ্য সৎ থাকবে, ততক্ষণ সৃষ্টিকর্তা আমাদের পাশে থাকবেন। এবং তার সহায়তায় আমরা দুর্বলদের অনুপ্রেরণা দিতে সক্ষম হব। আর এভাবে আমরা জীবন পথে এগিয়ে যেতে এবং তার গন্তব্যস্থলে পৌছতে সমর্থ হব।

■ The world is like looking glass. If you smile, it smiles, if you frown, it frowns back. If you look at it through a red glass, all seems red and rosy. If through a blue, all blue; if through a smoked one, all dull and didy. *[বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের সাব-অ্যাসিস্টেন্ট মেইনটেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার ২০১৪]*
অনুবাদ : পৃথিবীটা একটি আয়নার মত। যদি তুমি হাসো, সে হাসবে, আর যদি তুমি ভ্রূকুটি কর, সেও পাল্টা তোমার প্রতি ভ্রূকুটি করবে। যদি তুমি একটি লাল চশমা পড়ে এর দিকে তাকাও, তাহলে সবকিছু তোমার নিকট লাল এবং গোলাপি মনে হবে। যদি নীল চশমা পড়, তাহলে সবকিছু নীল মনে হবে; কালো চশমা দিয়ে তাকালে, সবকিছু নীরস এবং নিষ্প্রাণ মনে হবে।

■ Dishonest men may seen to prosper and go undetected lent only for short time. Dishonesty is sure to be detected in the long run and follow punishment and disgrace. Honesty is therefore, the best policy. *[মেরিন একাডেমীর শিক্ষা কর্মকর্তা ২০১৪]*
অনুবাদ : অসৎ লোকেরা হয়ত অল্প সময়ের জন্য দৃষ্টির অগোচরে থেকে উন্নতি করতে পারে। অবশেষে অসততা নিশ্চিতভাবে প্রকাশিত হয় এবং এর ফল হয় শাস্তি এবং অসম্মান। অতএব, সততাই সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা।

■ Knowledge is vaster than Ocean. The more we gather knowledge, the more our thirst for it increases. So any kind of restrictions on the persuit of knowledge is not at all desireable. So knowledge is very important of life. *[আইন, বিচার ও সংসদবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অনুবাদ কর্মকর্তা ও সহকারী সচিব (ড্রাফটিং) ২০১৪]*
অনুবাদ : জ্ঞান মহাসমুদ্রের চেয়েও সুবিশাল। আমরা যতই জ্ঞান আহরণ করি, আমাদের জ্ঞানের তৃষ্ণা ততই বেড়ে যায়। তাই জ্ঞান অন্বেষণের পথে কোনো প্রকার সীমাবদ্ধতা মোটেই কাম্য নয়। অতএব জীবনে জ্ঞান খুব গুরুত্বপূর্ণ।

■ Self-reliance means depending on one's own-self. It is a great virtue. Self help is the best help. God helps those who help themselves. So everybody must rely on his own abilities to be self-reliant. A self-reliant man has confidence in his own abilities. He takes heart in the face of difficulties. *[প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের সহকারী ইলেকট্রনিক প্রকৌশলী ২০১৪]*
অনুবাদ : আত্মনির্ভরতা বলতে নিজের উপর নির্ভরশীলতাকে বোঝায়। এটি একটি মহৎ গুণ। আত্মনির্ভরতাই প্রকৃত নির্ভরতা। বিধাতা তাদেরকে সহায়তা করেন যারা নিজেদের সহায়তা করেন। সুতরাং প্রত্যেককেই নিজের সামর্থ্যের উপর নির্ভরশীল হয়ে আত্মনির্ভরশীল হয়ে উঠতে হবে। আত্মনির্ভর ব্যক্তি নিজের সামর্থ্যের উপর আস্থাশীল। তিনি সাহসিকতার সঙ্গে প্রতিবন্ধকতার মোকাবিলা করেন।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



- Youth is the best time when there is freshness and vigour in mind and body. This is the time when it is most necessary for one to remember the maxim— 'as you sow so you will reap.' This is as it were, the sowing season of man and if he wants to reap the harvest of prosperity and happiness he must sow the seed of industry, truthfulness, virtue and honesty in this season. *[রেলপথ মন্ত্রণালয়ের উপ-সহকারী প্রকৌশলী (ইলেকট্রিক্যাল) ২০১৪]*

  **অনুবাদ :** যৌবন হচ্ছে সর্বোৎকৃষ্ট সময় যখন মনে এবং শরীরে সতেজতা এবং প্রাণশক্তি থাকে। এ সময় যে কথাটি মনে রাখা সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন তা হলো— 'যেমন কর্ম তেমন ফল।' এটা যেন একটি মানুষের বীজ রোপনের সময় এবং সে যদি উন্নতি এবং সুখের ফসল পেতে চায় তাহলে তাকে অবশ্যই সততা, নিষ্ঠা, সত্যবাদিতা ও পরিশ্রমের বীজ বপন করতে হবে।

- Life has no simple definition. You can easily recognise most things as either living or non-living. A dog is alive, but a rock is not. People identify living things by certain activities that non-living things do not perform. For example, living things grow, require food, and reproduce themselves. *[কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের মেডিকেল অফিসার ২০১৪]*

  **অনুবাদ :** জীবনের কোনো সাধারণ সংজ্ঞা নেই। অধিকাংশ বস্তুকে তুমি সহজেই শনাক্ত করতে পারবে জড় অথবা জীব বস্তু হিসেবে। একটি কুকুর হয় জীবন্ত, কিন্তু একটি শিলা তা নয়। মানুষ জীব বস্তুকে শনাক্ত করে কিছু কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে যা জড়বস্তু সম্পাদন করে না। উদাহরণস্বরূপ জীববস্তু বড় হয়, খাবারের প্রয়োজন হয় এবং এরা নিজেরা জন্ম বিস্তার করে।

- Man is the architect of his own future. If he makes a proper division of his time and does his duties accordingly, he is sure to improve and prosper in life; but if he does otherwise, he is sure to repent when it is too late and he will have to drag a miserable existence from day to day. *[কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট জুনিয়র ইনস্ট্রাক্টর (টেক) ২০১৪]*

  **অনুবাদ :** মানুষ তার নিজ ভাগ্যের নির্মাতা। যদি সে তার সময়কে যথাযথ বিভাজন করে এবং তার কর্তব্য সঠিকভাবে পালন করে, নিশ্চিত সে জীবনে উন্নতি করবে; কিন্তু যদি সে তা না করে নিশ্চিত সে অনুশোচনা করবে যখন অনেক দেরি হয়ে যাবে এবং তাকে দিনের পর দিন শোচনীয়ভাবে জীবনযাপন করতে হবে।

- Tea is a popular drink. We take tea to remove our fatigue. But taking too much tea is injurious to health. A large quantity of tea is produced in Bangladesh. Bangladesh earns a lot of foreign exchange by exporting tea. *[শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উপ-সহকারী প্রকৌশলী ২০১৪]*

  **অনুবাদ :** চা হচ্ছে একটি জনপ্রিয় পানীয়। আমরা ক্লান্তি দূর করার জন্য চা পান করি। কিন্তু অতিরিক্ত চা পান করা স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকারক। বাংলাদেশে প্রচুর চা উৎপন্ন হয়। চা রপ্তানি করে বাংলাদেশ প্রচুর পরিমাণে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে।



- A truly active man always finds time for everything. He is never in hurry and never behind hand. Such a man never spends a single moment for nothing. He never leaves a letter unanswered. *[স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের ইপিআই অ্যান্ড সার্ভিসেস-এর কোল্ড চেইন ইঞ্জিনিয়ার ২০১৪]*

  **অনুবাদ :** একজন সত্যিকারের কর্মঠ ব্যক্তি সবকিছুর জন্য সর্বদা সময় পান। তিনি কখনই ব্যস্তসমস্ত নন আবার খুব ধীরও নন। এমন একজন ব্যক্তি অকারণে একমুহূর্তও অপচয় করেন না। তিনি কোনো চিঠির উত্তর না করে ফেলেও রাখেন না।

- Youth is the best time when there is freshness and vigour in mind and body. This is the time when it is most necessary for one to remember the maxim— 'as you sow so you will reap'. This is as it were, the sowing season of man and if he wants to reap the harvest of prosperity and happiness he must sow the seed of industry, truthfulness, virtue and honesty in this season. *[কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন পরিদপ্তরের সহকারী প্রধান পরিদর্শক ২০১৪]*

  **অনুবাদ :** যৌবন হচ্ছে সর্বোৎকৃষ্ট সময় যখন মনে এবং শরীরে সতেজতা এবং প্রাণশক্তি থাকে। এ সময় যে কথাটি মনে রাখা সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন তা হলো— 'যেমন কর্ম তেমন ফল।' এটা যেন একটি মানুষের বীজ রোপণের সময় এবং সে যদি উন্নতি এবং সুখের ফসল পেতে চায়। তাহলে তাকে অবশ্যই সততা, নিষ্ঠা, সত্যবাদিতা ও পরিশ্রমের বীজ বপন করতে হবে।

- Punctuality is to be cultivated and formed into habit. This quality is to be acquired through all over boyhood. Boyhood is the seed-time. The habit formed at this time will continue all through our life 'Everything at the right time" should be our motto. *[বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়ের কম্পিউটার প্রোগ্রামার ২০১৪]*

  **অনুবাদ :** সময়ানুবর্তিতার চর্চা করতে হবে এবং এটাকে অভ্যাসে পরিণত করতে হবে। আমাদের শৈশব থেকেই বিভিন্ন কাজের মধ্যে দিয়ে তা অর্জন করতে হবে। শৈশবকাল বীজ বপনের সময়। এ সময়ে গঠিত অভ্যাসই জীবনব্যাপী চলমান থাকবে। 'সবকিছু যথাসময়ে'– এটাই আমাদের মূলমন্ত্র হওয়া উচিত।

- A remarkable statesman and one of the world's longest-detained political prisoners, Nelson Mandela has also become a universal symbol of justice and humanity. For many in the twenty first century he is the closest thing we have to secular saint. *[তথ্য ও যোগাযোগ-প্রযুক্তি বিভাগের সহকারী মেইনটেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার ২০১৪]*

  **অনুবাদ :** একজন অসামান্য রাষ্ট্রপ্রধান এবং দীর্ঘসময় রাজনৈতিকভাবে কারাবন্দিদের মধ্যে অন্যতম নেলসন ম্যান্ডেলা ন্যায়-বিচার এবং মানবতার সর্বজনীন প্রতীকে পরিণত হয়েছেন। একবিংশ শতাব্দীর অনেকের মতে তিনি একজন জাগতিক ধর্মগুরুর কাছাকাছি ব্যক্তিত্ব।

- We live in society. So we must learn to live in peace and amity with others. We have to respect others life and property. We have a lot of duties and responsibilities to the society. *[এলজিআরডি মন্ত্রণালয়ের স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের সহকারী প্রকৌশলী ২০১৪]*

  **অনুবাদ :** আমরা সমাজে বাস করি। তাই আমাদেরকে শান্তি এবং বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের মাধ্যমে অপরের সাথে মিশতে শিখতে হয়। আমাদেরকে অবশ্যই অপরের জীবন ও সম্পত্তির প্রতি শ্রদ্ধা করতে হবে। সমাজের প্রতি আমাদের অনেক দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



- Patience is a great virtue. None can make progress without patience. You should not give up any work if you fail to do it once. Try again and again and you will be successful. So we should have patience in every sphere of life. *[শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উপসহকারী প্রকৌশলী (সিভিল) ২০১৪]*

অনুবাদ : ধৈর্য মহৎ গুণ। ধৈর্য ছাড়া কেউ উন্নতি করতে পারে না। কোনো কাজে একবার কৃতকার্য হতে না পারলে তা ছেড়ে দেওয়া উচিত নয়। বার বার চেষ্টা করলে সফল হওয়া যায়। তাই জীবনের সর্বক্ষেত্রেই আমাদের ধৈর্য ধারণ করা উচিত।

- Without efforts there can be no progress in life. Life losses its interest if there is no struggle. Games become dull if there is no competition in them and if the result can be easily foreseen. *[সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ফিল্ড অফিসার ২০১৪]*

অনুবাদ : চেষ্টা ব্যতীত জীবনে সফলতা আসে না। জীবন তার আকর্ষণ হারায় যদি সেখানে সংগ্রাম না থাকে। খেলাধুলা নিরানন্দ হয় যদি সেখানে প্রতিযোগিতা না থাকে এবং সহজেই ফলাফলের পূর্বাভাস পাওয়া যায়।

- The greatest results in life are usually attained by simple means and the exercise of ordinary qualities. The common life of everyday with its cares, necessities and duties afford ample opportunity for acquiring experience of the best kind and its most beaten paths provide the true with abundant scope for efforts and room for self-improvement. The road of human-welfare lies among the old highway of steadfast well doing. They who are most persistent and work in the truest spirit will usually be the most successful. *[আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সাব-রেজিস্ট্রার ২০১৪]*

অনুবাদ : জীবনের বড় সাফল্যগুলো অর্জিত হয় সহজ উপায়ে এবং সাধারণ গুণগুলোর অনুশীলনের মাধ্যমে। সতর্কতা, প্রয়োজনীয়তা এবং দায়িত্বসহ প্রতিদিনের সাধারণ জীবন সবচেয়ে ভালো ধরনের অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য প্রদান করে প্রচুর সুযোগ এবং প্রচেষ্টা ও আত্মোন্নয়নের জন্য সবচেয়ে কঠিন পথগুলো এনে দেয় প্রচুর সুযোগসহ সত্যকে। দৃঢ় কৃতকর্মের প্রাচীন পথেই মানবকল্যাণের পথ নিহিত রয়েছে। যারা অনেক অধ্যবসায়ী এবং সত্যের সন্ধানে কাজ করে তারাই সাধারণত অধিক সফল হবে।

- The most common causes of deforestation are cutting and burning the forestland. Though the forestlands are cut and burnt for the sake of agriculture and habitant, it has a negative effect on environment. The removal of trees causes the birds and other animals living on them to leave the place. It also causes serious damage to the soil, as trees give protection to soil as well. In the end, the soil gets sediment in the riverbed and causes frequent floods. *[স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীন মেরিন একাডেমীর প্রদর্শক ২০১৪]*

অনুবাদ : নির্বনীকরণের সবচেয়ে সাধারণ কারণগুলো হচ্ছে বনভূমি নিধন এবং পোড়ানো। কৃষি ও বসবাসকারীর প্রয়োজনে বনভূমি কেটে ফেলা এবং পোড়ানো হলেও পরিবেশের উপর এর নেতিবাচক প্রভাব রয়েছে। গাছপালা অপসারণের কারণে এদের উপর বসবাসকারী পাখি এবং অন্যান্য প্রাণীর স্থান ত্যাগ করতে হয়। এটি মাটি ক্ষয়েরও মারাত্মক কারণ, কেননা গাছপালা মাটি সংরক্ষণ করে থাকে। অবশেষে মাটি নদীস্তরে সঞ্চিত হয়ে প্রায়ই বন্যার সৃষ্টি করে।



- Bangladesh has her own national Flag. It stands for our sovereignty and it is the symbol of our national pride and prestige. It is the symbol of our national hope and ideals. All the Bangladeshis honour the National Flag. It is also honoured by the people of all other countries of the world as we do their National Flag. *[মহিলা ও শিশুবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উপজেলা মহিলাবিষয়ক কর্মকর্তা ২০১৪]*

অনুবাদ : বাংলাদেশের নিজস্ব জাতীয় পতাকা রয়েছে। এটা সার্বভৌমত্বের প্রতীক এবং আমাদের জাতীয় গৌরব ও মর্যাদার বিষয়। এটা আমাদের জাতীয় আকাঙ্ক্ষা ও আদর্শসমূহের প্রতীক। সকল বাংলাদেশীই জাতীয় পতাকাকে সম্মান করে। বিশ্বের অন্যান্য দেশের জনগণও এর প্রতি সম্মান দেখায় যেমনিভাবে আমরা তাদের জাতীয় পতাকাকে সম্মান করি।

- Our manpower is a great resource. But like land and water we must use it properly. Water is no use in the canal. It must come to everyone who is thirsty and every paddy field that looks dry. So we must have the right people in the right place. *[স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সহকারী হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা ২০১৪]*

অনুবাদ : জনশক্তি আমাদের একটি বড় সম্পদ। কিন্তু পানি ও ভূমির ন্যায় আমাদেরকে একে যথাযথভাবে ব্যবহার করতে হবে। খালের পানির কোনো ব্যবহারই হয় না। এটাকে অবশ্যই সকল তৃষ্ণার্থ মানুষ ও শুষ্ক ফসলি জমিতে আসতে হবে। সুতরাং সঠিকস্থানে আমাদের সঠিক মানুষ থাকা দরকার।

- Potato plants have blossoms and seeds, but no one know what kind of potato will grow from a potato seed. All the potatoes of one kind that have even been grown have come from one potato. A potato is not a seed; it is part of a potato plants root. *[সমাজসেবা অধিদপ্তরের সমাজসেবা অফিসার ২০১৪]*

অনুবাদ : আলু গাছে ফুল এবং বীজ আছে কিন্তু কেউ জানে না একটি আলু বীজ থেকে কোন প্রকারের আলু জন্মাবে। এমনকি একই জাতের সব আলু একটি মাত্র আলু থেকে জন্মাতে পারে। একটি আলু একটি বীজ নয়; এটি আলু গাছের মূলেরই একটি অংশ।

- Bangladesh is a land of rivers. All the rivers fall into the Bay of Bengal. Many towns, bazars and villages stand on both the banks of the rivers. In the rainy season the rivers assume terrible aspects, but in winter they are quite calm. *[জাতীয় মুদ্রণ অধিদপ্তরের প্রেস ম্যানেজার ২০১৪]*

অনুবাদ : বাংলাদেশ একটি নদীমাতৃক দেশ। সবগুলো নদী বঙ্গোপসাগরে পতিত হয়। অনেক শহর, বাজার, গ্রাম নদীর উভয় তীরে অবস্থিত। বর্ষাকালে নদীগুলো ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করে, কিন্তু শীতকালে শান্ত থাকে।

- My five years old daughter Mini cannot live without chattering. She spent only a year to learn her tongue and since then has not wasted a minute in silence. Her mother is often vexed at this and would stop her prattle, but I would not. To see Mini quiet is unnatural and I cannot bear it long. And so my own talk with her is always lively. *[জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর টেকনিক্যাল এসিস্ট্যান্ট ২০১৪]*

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



অনুবাদ : আমার পাঁচ বছর বয়সী কন্যা মিনি বক্‌বক্ করা ছাড়া থাকতে পারে না। সে কথা বলা শিখতে সময় নিয়েছে মাত্র এক বছর এবং সেই সময় থেকে এক মিনিটও সে নিরবে কাটায়নি। তার মা প্রায়ই এতে বিরক্ত হয় এবং থামায়; কিন্তু আমি তা করি না। মিনিকে নিরবে থাকতে দেখা আমার কাছে অস্বাভাবিক লাগে এবং বেশিক্ষণ আমি তা সহ্যও করতে পারি না। আর আমি ওর সাথে সর্বদা প্রাণবন্তভাবে কথা বলি।

- It was so cold! it was snowing and the evening was begining darken. It was the best evening of the year before New years Eve. Though the cold and dark, a poor little girl with bare head and naked feet was wandering along the road. *[কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের ইনস্ট্রাক্টর (ননটেক) ২০১৪]*

অনুবাদ : অনেক শীত ছিল! তুষারপাত হচ্ছিল এবং সন্ধার অন্ধকার ঘনিয়ে আসছিল। নতুন বছরের প্রাক্কালের পূর্বে এটি ছিল সবচেয়ে সেরা সন্ধ্যা। যদিও শীত এবং অন্ধকার ছিল, একটি দরিদ্র ছোট বালিকা ন্যাড়া মাথা এবং খালি পায়ে রাস্তায় একাকি ঘুরে বেড়াচ্ছিল।

- Self reliance means depending on one's own life. It is a great virtue. Self-help is the best help. God helps those who help themselves. So everybody must rely on his own abilities to be self-reliant. A self-reliant man has confidence in his own abilities. *[জরিপ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক ২০১৪]*

অনুবাদ : আত্মনির্ভরশীলতা বলতে বোঝায় কারো নিজের ওপর নির্ভর করা। এটি একটি মহৎ গুণ। নিজের সাহায্যই সর্বোত্তম সাহায্য। আল্লাহ তাদের সাহায্য করেন যারা নিজেদের সাহায্য করে। তাই আত্মনির্ভরশীল হওয়ার জন্য প্রত্যেকেই অবশ্যই তার নিজের কর্মদক্ষতার ওপর নির্ভর করবে। একজন আত্মনির্ভরশীল ব্যক্তির তার নিজের কর্মদক্ষতার ওপর আত্মবিশ্বাস থাকে।

- We should bear the courage to say the right thing. We need not bear man nor care for what others think of us. So long as our purpose is honest, God will be on our side. And with His help we shall be able to encourage the weak. Thus we shall be able to march in life and reach its goal. *[শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক কর্মকর্তা ২০১৪]*

অনুবাদ : আমাদের সত্য কথা বলার মত সৎ সাহস থাকা উচিত। মানুষকে ভয় করার প্রয়োজন নেই। এমনকি অন্যেরা আমাদের নিয়ে কি ভাববে তাও পরোয়া করার দরকার নেই। যতক্ষণ আমাদের উদ্দেশ্য সৎ থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ আমাদের সহায়ক থাকবেন। এবং তার সহায়তায়, আমরা দুর্বলকে উৎসাহিত করতে পারব। এভাবে আমরা জীবন পথে অগ্রসর হতে পারব এবং খুঁজে নিতে পারব জীবনের লক্ষ্য।

- Punctuality is to be cultivated and formed into a habit. This quality is to be acquired through all our work from our boyhood. Boyhood is the seed-time. The habit formed at this time will continue all through our life. 'Everything at the right time' should be our motto. *[তথ্য ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের সহ. প্রকৌশলী ২০১৪]*

অনুবাদ : সময়নিষ্ঠাকে অনুশীলন করতে হয় এবং অভ্যাসে পরিণত করতে হয়। আমাদের বাল্যকাল থেকে সমস্ত কাজের মাধ্যমে এ গুণটি অর্জন করতে হয়। বাল্যকাল বীজ বপনের সময়। এ সময়ে গঠিত অভ্যাস সারা জীবন চলতে থাকে। 'সঠিক সময়ে সবকিছু' আমাদের মূলমন্ত্র হওয়া উচিত।



We usually do not talk about seconds. So, there are some clocks that do not have this third hand. This third hand shows the exact time to the second. Many clocks have this. This hand is usually thin and long. *[অর্থ মন্ত্রণালয়ের রিসার্চ অফিসার ২০১৪]*

অনুবাদ : আমরা সাধারণত সেকেন্ডের কথা বলি না। তাই কিছু কিছু ঘড়ি আছে যার এই তৃতীয় কাটাটি নেই। এই তৃতীয় কাটাটি সঠিক সময় দেখায় সেকেন্ড পর্যন্ত। অনেক ঘড়িতে এটি আছে। এই কাটাটি সাধারণত পাতলা এবং লম্বা।

- The world is like a looking glass. If you smile, it smiles, if you frown it frowns back. If you look at it through a red glass, all seen red and rosy, if through a blue, all blue, through a smoked one, all dull and dirty. *[পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সহকারী সাইফার অফিসার ২০১৪]*

অনুবাদ : পৃথিবী আয়নার মতো। তুমি যদি হাসো তাহলে এটি হাসবে, তুমি যদি ভ্রুকুটি করো তাহলে এটি তোমার প্রতি ভ্রুকুটি করবে। তুমি যদি লাল আয়নার মধ্য দিয়ে একে অবলোকন করো তাহলে সব কিছুই তোমার কাছে লাল ও গোলাপি মনে হবে, যদি নীল আয়নার মধ্য দিয়ে অবলোকন করো তাহলে সবকিছুই নীল মনে হবে, যদি ধূমায়িত আয়নার মাধ্যমে অবলোকন করো তাহলে সবকিছুই নীরব এবং নোংরা মনে হবে।

- Tomorrow as yesterday, the fitest will survive in the struggle for existence. But, whereas in the past selfishness was the measure of fitness, in the future survival value will be determined by breadth and depth of love. Modern science is teaching, as it never was taught before, that no one lives for himself alone. *[পরিবেশ ও বন মন্ত্রালয় এবং শিল্প মন্ত্রণালয়ের সহকারী লাইব্রেরিয়ান ২০১৩]*

অনুবাদ : অতীতের মত ভবিষ্যতেও যোগ্যরাই অস্তিত্বের লড়াইয়ে টিকে থাকবে। অতীতে যেখানে স্বার্থপরতা ছিল যোগ্যতার মাপকাঠি, সেখানে ভবিষ্যতে ভালোবাসার গভীরতায় টিকে থাকার গুণ নির্ধারণ করা হবে। পূর্বে যা কখনই শিক্ষা দেয়া হয়নি তা আধুনিক বিজ্ঞান শিক্ষা দিচ্ছে যে, কেউ কেবল নিজের জন্য বাঁচে না।

- Some have criticised Bankim's historical novels on the ground that they are a strange amalgam of romance and history in which truth is sacrificed at the alter of art. Others have criticised him because he does not make history on integral part of the life of his heroes and heroines. *[অর্থ মন্ত্রণালয়ের প্রকাশনা অফিসার/ফটোগ্রাফার ২০১৩]*

অনুবাদ : অনেকে বঙ্কিমের ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলোকে এই ভিত্তিতে সমালোচনা করেছেন যে তার উপন্যাসগুলো এক অদ্ভুত রোমান্স এবং ইতিহাসের সমন্বয় যেখানে সত্যকে সাহিত্যের খাতিরে বিসর্জন দেয়া হয়েছে। অন্যরা তাকে এভাবে সমালোচনা করেছেন যে তিনি তার নায়ক-নায়িকাদের জীবনে ইতিহাসকে অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে তৈরি করেননি।

- A patriot is a man who loves his country, works for it, and is willing to fight and die for it. Every soldier is bound to do his duty, but the best soldiers do more than this. They risk their lives because they love the country. They are the best friend of the people. *[কৃষি মন্ত্রণালয়ের লাইব্রেরিয়ান ২০১৩]*

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



অনুবাদ : দেশপ্রেমিক হচ্ছে সে ব্যক্তি যে দেশকে ভালোবাসে, দেশের জন্য কাজ করে ও দেশের জন্য যুদ্ধ করে এবং মরতে ইচ্ছা পোষণ করে। প্রত্যেক সৈনিক তার দায়িত্ব পালনে বাধ্য কিন্তু প্রকৃত সৈনিকেরা দায়িত্বের বাইরেও অনেক কিছু করে থাকে। তারা জীবনের ঝুঁকি নেয় কারণ তারা দেশকে ভালোবাসে। তারা জনগণের প্রকৃত বন্ধু।

**I** Knowledge is vaster than an ocean. The more we gather knowledge, the more our thirst for it increases. So, any kind of restriction on the persuit of knowledge is not at all desirable. *[ডাক অধিদপ্তরের হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা ২০১৩]*

অনুবাদ : জ্ঞান মহাসাগরের চেয়েও বিশাল। আমরা যতই জ্ঞান আহরণ করি আমাদের জ্ঞানতৃষ্ণা ততই বেড়ে যায়। তাই, জ্ঞানার্জনের ক্ষেত্রে কোনো রকম প্রতিবন্ধকতা মোটেই প্রত্যাশিত নয়।

**I** A patriot is a man who loves his country, works for it, and is willing to fight and die for it. Every soldier is bound to do his duty, but the best soldiers do more than this. They risk their lives because they love the country. They are the best friend of the people. *[অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের প্রোগ্রামার ২০১৩]*

অনুবাদ : একজন দেশপ্রেমিক তিনি, যিনি নিজের দেশকে ভালোবাসেন, দেশের জন্য কাজ করেন এবং দেশের জন্য যুদ্ধ করেন ও প্রাণ দিতে ইচ্ছুক। প্রত্যেক সৈনিক তার কর্তব্য করতে বাধ্য, কিন্তু প্রকৃত সৈনিক এর চাইতেও বেশি করে থাকেন। তারা দেশকে ভালোবাসেন বলে দেশের জন্য জীবনের ঝুঁকি নিয়ে থাকেন। তারা জনগণের সর্বোত্তম বন্ধু।

**I** Smoking is very harmful. It is expensive too. It pollutes the environment. Those who smoke cannot live long. Smoking causes cancer, heart attack and diseases of the respiratory organs. So everyone should give up smoking. *[বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন সচিবালয়ের পরিসংখ্যান কর্মকর্তা ২০১৩]*

অনুবাদ : ধূমপান খুব ক্ষতিকর। এটি ব্যয়বহুলও। এটি পরিবেশকে দূষিত করে। যারা ধূমপান করে তারা বেশি দিন বাঁচতে পারে না। ধূমপান ক্যান্সার, হৃদরোগ এবং শ্বাসতন্ত্রের বিভিন্ন রোগ সৃষ্টি করে। তাই প্রত্যেকের ধূমপান ত্যাগ করা উচিত।

**I** Good books are store house of knowledge and wisdom. Any one who has the key can enter these store house and help himself. What is the key? Simply the ability to read. He who can read can store his mind with the great thoughts of the great thinkers of the world.*[জাতীয় সংসদ সচিবালয়ের সহকারী হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা ২০১৩]*

অনুবাদ : ভালো বই হচ্ছে জ্ঞান ও প্রজ্ঞার ভাণ্ডার। যার কাছে চাবি আছে সেই এসকল ভাণ্ডারে প্রবেশ করতে পারে ও নিজেকে সহায়তা করতে পারে। চাবিটি কী? কেবল পড়ার সামর্থ্য। যে পড়তে পারে সে পৃথিবীর মহান চিন্তাবিদগণের মহান ভাবনায় মন পরিপূর্ণ করতে পারে।

**I** The great advantage of early rising is the good start, it gives us in our days works. The early riser has done a large amount of hard work before other man have got out of bed. In the early morning the mind is fresh and there are few sounds or other distractions, so that work done at that time is generally well done. *[মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক ২০১৩]*



অনুবাদ : সুন্দর প্রারম্ভ হচ্ছে খুব সকালে ঘুম থেকে উঠার বিশাল সুবিধা (এবং) কাজের ক্ষেত্রে এটা আমাদেরকে সমস্ত দিনটিদেয়। অন্য সব লোক ঘুম থেকে উঠার আগেই প্রাতঃ উত্থানকারী অনেক কঠিন কাজ সমাধা করতে পারে। খুব সকালে মন সজীব থাকে এবং শব্দ বা বাধা-বিঘ্ন কম থাকে, সুতরাং সে সময় যে কাজ করা হয় সাধারণত সেগুলো সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করা যায়।

**I** Time is very valuable. To neglect it is not proper. The success of the man who makes the right use of his time is inevitable. All the famous men of the world have made the right use of time. We should follow them. *[জাতীয় সংসদ সচিবালয়ের প্রথম শ্রেণীর সহকারী পরিচালক ২০১৩]*

অনুবাদ : সময় অত্যন্ত মূল্যবান। একে অবজ্ঞা করা সঠিক নয়। যে মানুষ সময়ের সৎ ব্যবহার করে তার সফলতা অনিবার্য। পৃথিবীর সকল বিখ্যাত ব্যক্তিরাই সময়ের সঠিক ব্যবহার করেছেন। আমাদের উচিত তাদের অনুসরণ করা।

**I** Each year around the world International Women's Day (IWD) is celebrated on March 8. Hundred's of events occur not just on this day but also throughout March to mark the economic, political and social achievements of women. The sentiment of IWD has been honoured since 1908, but it wasn't formally established until after a decision made at the 1910 International Conference of working women in Copenhagen. *[জাতীয় সংসদ সচিবালয়ের প্রথম শ্রেণীর প্রডিউসার/সহকারী পরিচালক ২০১৩]*

অনুবাদ : সারা বিশ্বেই প্রতি বছর ৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালিত হয়। নারীদের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক অর্জন চিহ্নিত করতে শুধু এই দিনেই শতাধিক কার্যক্রম গৃহীত হয় না বরং সারা মার্চ মাস জুড়েই চলতে থাকে। ১৯০৮ সাল থেকে আইডব্লিউডি-র অনুভূতি সম্মানের সাথে দেখা হচ্ছে। কিন্তু এটি আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়নি যতক্ষণ না ১৯১০ সালে কোপেনহেগেনে শ্রমজীবী নারীদের সম্মেলনে এ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

**I** We live in society. So we have to maintain peace in society. We have a lot of duties and responsibilities towards the society. We rely upon one another. Our aim is to build a happy society. *[বাংলাদেশ রোড ট্রান্সপোর্ট অথরিটি (বিআরটিএ)-এর মোটরযান পরিদর্শক ২০১৩]*

অনুবাদ : আমরা সমাজে বাস করি। তাই সমাজে আমাদের শান্তি বজায় রাখতে হবে। সমাজের প্রতি আমাদের অনেক দায়িত্ব ও কর্তব্য আছে। আমরা পরস্পরের ওপর নির্ভর করি। আমাদের উদ্দেশ্য একটি সুখী সমাজ গঠন করা।

**I** Knowledge is vaster than ocean. The more we gather knowledge, the more our thirst increases. So any kind of restriction on the pursuit of knowledge is not at all desirable. Everybody has the right to walk freely in the ocean of knowledge. *[পরিকল্পনা বিভাগের ২য় শ্রেণীর গবেষণা অনুসন্ধানী ২০১৩]*

অনুবাদ : জ্ঞান মহাসমুদ্রের চেয়েও সুবিশাল। আমরা যতই জ্ঞান আহরণ করি, আমাদের জ্ঞানের তৃষ্ণা ততই বেড়ে যায়। তাই জ্ঞান অন্বেষণের পথে কোনো প্রকার সীমাবদ্ধতা মোটেই কাম্য নয়। অতএব জীবনে জ্ঞান খুব গুরুত্বপূর্ণ।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



- Beside mother tongue, we try to learn mainly one language. The aim of learning English is three: to earn livelihood, to communicate with foreign people and to acquire knowledge about different things. *[মেরিন ফিসারিজ একাডেমির জুনিয়র ইন্সট্রাক্টর ২০১৩]*

অনুবাদ : মাতৃভাষার পাশাপাশি আমরা মূলত আরেকটি ভাষা শেখার চেষ্টা করি। ইংরেজি শিক্ষার লক্ষ্য হলো তিনটি—জীবন জীবিকার জন্য, বিদেশী লোকদের সাথে যোগাযোগের জন্য এবং বিভিন্ন বিষয় সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করার জন্য।

- None can ever prosper if he does not labour. You must labour hard if you like to acquire either money or learning. Those who are idle lag behind forever. If you want to be healthy, you must be diligent. An idle man is as it were, a burden to the society. None like him. *[বাংলাদেশ টেলিভিশনের শিল্প নির্দেশক ২০১৩]*

অনুবাদ : পরিশ্রম না করলে কেউ কখনো উন্নতি করতে পারে না। যদি তুমি টাকা অথবা জ্ঞান অর্জন করতে চাও তবে অবশ্যই তোমাকে কঠিন পরিশ্রম করতে হবে। যে অলস সে সর্বদা পিছিয়ে পড়ে থাকে। যদি তুমি স্বাস্থ্যবান হতে চাও তবে অবশ্যই তোমাকে পরিশ্রমী হতে হবে। একজন অলস ব্যক্তি যেন সমাজের বোঝা। তাকে কেউ পছন্দ করে না।

- Dishonest men may be seen to prosper and go undetected lent only for short time. Dishonesty is sure to be detected in the run and follow punishment and disgrace. Honesty is therefore, the best policy. *[ক্রীড়া অধিদপ্তরের খেলা ক্রীড়া কর্মকর্তা ও প্রভাষক ২০১৩]*

অনুবাদ : অসৎ ব্যক্তিরা আপাতদৃষ্টিতে উন্নতি করে থাকে এবং সাময়িকভাবে তাদের অপরাধ ধরা পড়ে না। কিন্তু পরিণামে তাদের অসাধুতা ধরা পড়ে এবং তজ্জন্য তারা শাস্তি ভোগ করে এবং অপমানিত হয়। তাই সততাই সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা।

- Our total environment influences our life and our way of living. The main elements of our human environment are men, animals, plants, soil, air and water. There are relationships between these elements. When these relationships are disturbed life becomes difficult or impossible. *[জাতীয় সংসদ সচিবালয়ে দ্বিতীয় শ্রেণীর সহকারী গবেষক ২০১৩]*

অনুবাদ : আমাদের সার্বিক পরিবেশ আমাদের জীবন ও জীবন ধারাকে প্রভাবিত করে। আমাদের মনুষ্য পরিবেশের প্রধান উপাদানগুলো হচ্ছে মানুষ, প্রাণী, গাছপালা, মাটি, বাতাস এবং পানি। এ সমস্ত উপাদানগুলোর মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক রয়েছে। যখন এই সম্পর্ক বিঘ্নিত হয়, তখন জীবন কঠিন বা অসম্ভব হয়ে উঠে।

- Poverty is a great problem in our country. But we hardly realise that this miserable condition is our creation we can remove poverty by hard labour and profitable business. *[অর্থ মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন পদ ২০১৩]*

অনুবাদ : দারিদ্র্য হচ্ছে আমাদের দেশের সবচেয়ে বড় সমস্যা। কিন্তু আমরা কদাচ উপলব্ধি করি যে, এ শোচনীয় অবস্থা আমাদেরই সৃষ্টি। আমরা কঠোর পরিশ্রম এবং লাভজনক ব্যবসার মাধ্যমে এ দারিদ্র্য দূরীভূত করতে পারি।



- A truly active man always finds time for everything. He is never in a hurry and never behind hand. Such a man never spends a single moment for nothing. He never leaves a letter unanswered. He does not set his hand to many thing at a time but when he once undertakes to do a thing, he does not rest till it is well finished. *[বন ও পরিবেশ মন্ত্রণালয়ের সহকারী রিসার্চ অফিসার ২০১৩]*

অনুবাদ : একজন সত্যিকারের কর্মঠ মানুষ সবকিছুর জন্য সর্বদা সময় পায়। সে কখনই ব্যস্তসমস্ত এবং পশ্চাদপদ নয়। এমন একজন মানুষ একটি মাত্র মুহূর্ত কখনই অযথা ব্যয় করে না। সে কখনই একটি চিঠিকেও জবাবহীন রেখে দেয় না। একই সময়ে সে অনেক বিষয়ের প্রতি মনোনিবেশ করে না কিন্তু যখন একটি বিষয় সম্পন্ন করার দায়িত্ব গ্রহণ করে তখন তা সুন্দরভাবে শেষ না হওয়া পর্যন্ত সে বিশ্রাম নেয় না।

- In our country poverty is a great problem. But we do not understand that this plight is of our own creation. Most people do not try to improve their condition with hard labour. They only express regret for their distress and blame their lot for it. *[তথ্য মন্ত্রণালয়ের ডাটা এন্ট্রি কন্ট্রোল সুপারভাইজার ও সহকারী তথ্য অফিসার ২০১৩]*

অনুবাদ : দারিদ্র্য আমাদের দেশের বড় সমস্যা। কিন্তু আমরা বুঝতে পারি না যে, এ দুরবস্থা আমাদের নিজেদের সৃষ্টি। অধিকাংশ লোকজন কঠিন পরিশ্রম দ্বারা তাদের নিজেদের অবস্থার উন্নয়নে চেষ্টা করে না। তাদের এ দুর্দশার জন্য তারা শুধু হতাশা ব্যক্ত করে এবং ভাগ্যকে দোষারোপ করে।

- He who loves his country is a patriot. The patriots love their country more dearly than their own lives. They are ready to lay down their lives for the welfare of their country. Everybody honours them. They live even after their death. *[আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ডাটা এন্ট্রি/কন্ট্রোল সুপারভাইজার ২০১৩]*

অনুবাদ : যে নিজের দেশকে ভালোবাসে সেই দেশপ্রেমিক। দেশপ্রেমিকরা তাদের জীবনের চেয়ে বেশি তাদের দেশকে ভালোবাসে। দেশের মঙ্গলের জন্য তারা নিজেদের জীবন বিলিয়ে দিতে প্রস্তুত। প্রত্যেকে তাদেরকে সম্মান করে। এমনকি মৃত্যুর পরও তারা বেঁচে থাকে।

- Smoking is very harmful. It is expensive too. It pollutes the environment. Those who smoke cannot live long. So, everyone should give up smoking. *[জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের পরীক্ষক ২০১৩]*

অনুবাদ : ধূমপান খুব ক্ষতিকর। এটি ব্যয়বহুলও। এটি পরিবেশকে দূষিত করে। যারা ধূমপান করে তারা বেশি দিন বাঁচতে পারে না। তাই প্রত্যেকের ধূমপান ত্যাগ করা উচিত।

- Bangladesh is a land of rivers. All the rivers fall into the Bay of Bengal. Many towns, bazars and villages stand on both the banks of the rivers. In the rainy season the rivers assume terrible aspects, but in winter they are quite calm. *[জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের পরীক্ষক ২০১৩]*

অনুবাদ : বাংলাদেশ একটি নদীমাতৃক দেশ। সব নদীগুলো বঙ্গোপসাগরে পতিত হয়। অনেক শহর, বাজার এবং গ্রাম নদীর উভয় তীরেই অবস্থিত। বর্ষাকালে নদীগুলো ভয়ঙ্কর রূপধারণ করে কিন্তু শীতকালে শান্ত থাকে।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



। Poverty is a great problem in our country. But we hardly realise that this miserable condition is our creation. Many do not try to better their condition by hard labour and profitable business. They only curse their fate. We must shake of this inactivity and aversion to physical labour. Man is the maker of his own fortune. *[শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের জুনিয়র ইন্সট্রাক্টর ২০১৩]*

অনুবাদ : দারিদ্র্য হচ্ছে আমাদের দেশের এক বিরাট সমস্যা। কিন্তু আমরা কদাচিৎ উপলব্ধি করি যে, এ শোচনীয় অবস্থা আমাদেরই সৃষ্টি। কঠোর পরিশ্রম ও লাভজনক কাজের মাধ্যমে অনেকেই তাদের অবস্থার উন্নতি করতে চেষ্টা করে না। তারা কেবল তাদের ভাগ্যকে অভিশাপ দিয়ে থাকে। এ নিষ্ক্রিয়তা ও কায়িক শ্রমের প্রতি অনীহাকে আমাদের অবশ্যই পরিত্যাগ করতে হবে। মানুষ নিজেই তার সৌভাগ্যের নির্মাতা।

। Man is the architect of his own fortune. If he makes a proper division of his time and does his duties accordingly, he is sure to improve and prosper in life, but if he does otherwise he is sure to repent when it is too late and he will have to drag a miserable existence from day to day. *[আবহাওয়া অধিদপ্তরের সহকারী আবহাওয়াবিদ ২০১৩]*

অনুবাদ : মানুষ তার নিজের জীবনের স্থপতি। সে যদি তার সময়কে যথার্থভাবে ভাগ করতে পারে এবং সেই অনুযায়ী কাজ করতে পারে তবে সে জীবনে অবশ্যই উন্নতি করতে সক্ষম হবে। অন্যথায় সে অবশ্যই অনুতপ্ত হবে যদিও তা অনেক দেরি হয়ে যাবে এবং সে দিন দিন সমস্যায় পর্যবসিত হবে।

। In the ordinary use capital means the money, one invests in a business. But the economist says that capital does not mean money. Money is simply a medium of exchange. *[প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের পিটিআই ইন্সট্রাক্টর ২০১৩]*

অনুবাদ : সাধারণ ব্যবহারিক অর্থে পুঁজি বলতে মুদ্রাকে বোঝায়, যেটাকে কেউ ব্যবসায় বিনিয়োগ করে। কিন্তু অর্থনীতিবিদ বলেন যে, পুঁজি বলতে মুদ্রাকে বোঝায় না। মুদ্রা হচ্ছে শুধু বিনিময়ের মাধ্যম।

। Then a strange thing happened. All the gigantic reptiles died within a short time. We do not know the reason. Perhaps it was due to a sudden change in climate. Perhaps they had grown so large that they could neither swim nor crawl. *[প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের সহকারী থানা/উপজেলা শিক্ষা অফিসার ২০১৩]*

অনুবাদ : তারপর একটি অদ্ভুত ঘটনা ঘটল। মুহূর্তের মধ্যে সব বড় বড় সরীসৃপগুলো মরে গেল। আমরা কারণটা জানি না। হয়তো এটা হয়েছিল হঠাৎ জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য। নিশ্চয়ই তারা এতো বড় হয়ে গিয়েছিল যে তারা সাঁতরাতেও পারল না, হামাগুড়িও দিতে পারল না।

। We should have the courage to say the right thing. We need not fear men nor care for what others think of us. So long as our purpose is honest. God will be on our side. And with His help we shall be able to encourage the weak. Thus we shall be able to march in life and search its goal. *[জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তা ২০১৩]*

অনুবাদ : আমাদের সত্য কথা বলার সাহস থাকা চাই। অন্যকে ভয় পেলে চলবে না এবং আমাদেরকে নিয়ে কে কি ভাবে তা নিয়েও শঙ্কিত হবার কিছু নেই। যত দিন আমাদের উদ্দেশ্য সৎ হয় ততদিন স্রষ্টা আমাদের পাশে থাকবে। আর তার সহায়তায় আমরা দুর্বলদেরকে উৎসাহিত করতে সক্ষম হব। এভাবেই আমরা জীবনে এগিয়ে যাব এবং খুঁজে নেব অভীষ্ট লক্ষ্য।



। A patriot is a man who loves his country, works for it, and is willing to fight and die for it. Every soldier is bound to do his duty, but the best soldiers do more that this. They risk their lives because they love the country they are fighting for. *[তথ্য মন্ত্রণালয়ের সহকারী তথ্য অফিসার ২০১৩]*

অনুবাদ : যে ব্যক্তি নিজের দেশকে ভালোবাসে, দেশের জন্য কাজ করে এবং দেশের জন্য যুদ্ধ করতে ও জীবন দিতে ইচ্ছা পোষণ করে— সেই দেশপ্রেমিক। প্রত্যেক সৈন্য তার কর্তব্য সম্পাদনে বাধ্য, কিন্তু শ্রেষ্ঠ সৈনিকেরা এর চেয়েও বেশি কিছু করে থাকে। তারা তাদের জীবনে ঝুঁকি নেয় কারণ তারা যে দেশের জন্য যুদ্ধ করে সে দেশকে ভালোবাসে।

## ব্যাংক নিয়োগ পরীক্ষায় আসা অনুবাদ

। The centralized and bureaucratized governance system prevailing in Asia and Pacific region was established by the colonial rulers. This system was inherently repressive and insulated from the common people. The system was consistent with the supreme colonial objective centered on maximizing revenue and maintaining law and order in the colonies. Establishment of the self-governance system at local levels was eventually of little concern to colonial masters. In most cases, they attempted to transfer their own systems of governance in their respective colonies. The centralized governance system so devised, however, proved useful for rapid industrialization in almost all Asian countries following massive decolonization process. Gradually, those newly born countries badly felt the need for effective local governance system that would work as an integral part of the total national governance. This need became more important with the advent of the new millennium. *[Janata Bank Ltd. Assistant Executive Officer (Teller) 2015]*

অনুবাদ : এশিয়া এবং প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে বিদ্যমান কেন্দ্রীভূত এবং আমলাতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করেছিল ঔপনিবেশিক শাসকেরা। এই ব্যবস্থাটি জন্মগতভাবে ছিল উৎপীড়নকর এবং সাধারণ মানুষ থেকে বিচ্ছিন্ন। রাজস্ব সর্বোচ্চকরণ এবং আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য কেন্দ্রীভূত সর্বোচ্চ ঔপনিবেশিক উদ্দেশ্যের সাথে এই ব্যবস্থা সঙ্গতিপূর্ণ ছিল। স্থানীয় পর্যায়ে নিজেদের শাসনব্যবস্থার প্রতিষ্ঠাই ছিল ঔপনিবেশিক প্রভূদের উদ্বেগের বিষয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে, তাদের নিজ নিজ ঔপনিবেশ ও তাদের নিজস্ব শাসন ব্যবস্থা স্থানান্তরিত করতে তারা চেষ্টা করেছিল। এইভাবে কেন্দ্রীভূত শাসন ব্যবস্থা কিন্তু প্রায় সব এশিয়ান দেশগুলোতে দ্রুত শিল্পায়ন এর জন্য উপকারী প্রমাণিত হয় বা অনুসৃত হয় বৃহদায়তন ঔপনিবেশায়ন প্রক্রিয়া দ্বারা। ক্রমান্বয়ে, এই নতুন সৃষ্ট দেশগুলো কার্যকর স্থানীয় শাসন ব্যবস্থার প্রয়োজন গভীরভাবে অনুভব করতে লাগল যা গোটা জাতীয় শাসনের একটি অখণ্ড অংশ হিসেবে কাজ করবে। নতুন সহস্র বৎসর এর আবির্ভাবের সাথে এই প্রয়োজন আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠে।

। Global warming is an issue that calls for a global response. The rapid change in climate will be too great to allow many eco-systems to suitably adapt, since the change has direct impact on bio-diversity, agriculture, forestry, dry land, water resources and human health. Due to unusual weather pattern, rising greenhouse gas,

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



declining air quality etc. society demands that businesses also take responsibility in safeguarding the planet. In addition, Bangladesh is one of the most climate change vulnerable countries. In line with global development and response to the environmental degradation, financial sector in Bangladesh should play an important role as one of the key stake-holders. *[Janata Bank Ltd. Assistant Executive Officer 2013]*

অনুবাদ : বৈশ্বিক উষ্ণতা এমন একটি বিষয় যা দাবি করে বিশ্বব্যাপী প্রতিক্রিয়ার। জলবায়ুর দ্রুত পরিবর্তন এত গুরুতর যে এটি অনেক বাস্তুসংস্থানকে অভিযোজন করতে ব্যাহত করে, যেহেতু জীববৈচিত্র্য, কৃষি, বন, শুষ্কভূমি, পানির উৎস এবং মানবস্বাস্থ্যের উপর এ পরিবর্তনের সরাসরি প্রভাব রয়েছে। অস্বাভাবিক আবহাওয়া, গ্রিনহাউস গ্যাসের বৃদ্ধি, বায়ুর গুণাগুণের অবনতি ইত্যাদির জন্য সমাজ দাবি করে যে শিল্প উদ্যোক্তাদেরকেও এই গ্রহকে রক্ষা করতে দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে। অধিকন্তু বাংলাদেশ হচ্ছে পরিবেশ পরিবর্তনের জন্য অরক্ষিত দেশগুলোর মধ্যে অন্যতম। বৈশ্বিক উন্নতির সাথে তাল রেখে সুবিধাভোগীদের একজন হিসেবে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক খাতের উচিত পরিবেশ বিপর্যয় মোকাবিলায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখা।

I Transnational flows of goods and capital have driven globalization during recent years. These flows have been made possible by the gradual lowering of barriers to trade and investment across national borders, thus allowing for the expansion of the global economy. However, states have often firmly resisted applying similar deregulatory policies to the international movement of people. As noted by the World Bank in its report, "Globalization, Growth, and Poverty", while countries have sought to promote integrated markets through liberalization of trade and investment, they have largely opposed liberalizing migration policies. Many countries maintain extensive legal barriers to prevent foreigners seeking work or residency from entering their national borders. *[Bangladesh Bank Assistant Director (General Side) 2014]*

অনুবাদ : সাম্প্রতিক বছরগুলোতে পণ্য ও পুঁজির আন্তদেশীয় প্রবাহ বিশ্বায়নকে প্রসারিত করেছে। জাতীয় সীমানা জুড়ে ব্যবসা ও বিনিয়োগে প্রতিবন্ধকতার ক্রমহ্রাসের দ্বারা, (এবং) এভাবেই বিশ্ব অর্থনীতির প্রসারণের অনুমোদনের দ্বারা এই প্রবাহ সম্ভব হয়েছে। যা হোক, মানুষের আন্তর্জাতিক চলাচলের উপর সমানভাবে মুক্তনীতি প্রয়োগ করতে দেশসমূহ প্রায়ই দৃঢ়ভাবে প্রতিরোধ করেছে। বিশ্বব্যাংকের রিপোর্টে যেমন সূচতি, 'বিশ্বায়ন, প্রবৃদ্ধি এবং দরিদ্রতা,' যখন দেশগুলি ব্যবসা ও বিনিয়োগের উদারকরণের মাধ্যমে সমন্বিত বাজারের উন্নয়নের সন্ধান করেছে, তখন তারা বহির্গমন নীতির উদারকরণকে ব্যাপক বিরোধিতা করেছে। অনেক দেশ ব্যাপক প্রতিবন্ধকতা অক্ষুণ্ন রাখে ঐ সমস্ত বিদেশীদেরকে বাধা দেওয়ার জন্য যারা তাদের জাতীয় সীমানা থেকে প্রবেশ করে খোঁজ করে কাজ বা অভিবাসন।

I Bangladesh needs to further raise investment, develop infrastructure and increase overall productivity for achieving the expected level of economic growth, the Asian Development Bank said as it found the rates of progress far below the mark. The Bank believes that for faster poverty reduction, Bangladesh needs to lift its annual GDP growth rate to about 8.0 percent in the medium term. To achieve this growth,investment needs to rise to 37.6 percent of GDP. *[Sonali Bank Ltd. Officer & Officer (Cash) 2014]*



অনুবাদ : প্রবৃদ্ধির হার লক্ষ্যমাত্রার অনেক নিচে হওয়ায় এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক বলেছে, প্রত্যাশিত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের জন্য বাংলাদেশকে আরো বেশি বিনিয়োগ, কাঠামোগত উন্নয়ন ও সামগ্রিক উৎপাদন বাড়াতে হবে। ব্যাংকটি বিশ্বাস করে যে, দ্রুত দারিদ্র্য বিমোচনে বাংলাদেশকে তার বার্ষিক জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার মধ্যবর্তী মাত্রায় প্রায় ৮০%-এ উন্নীত করা প্রয়োজন। এ প্রবৃদ্ধি অর্জন করতে জিডিপি'র ৩৭.৬% পর্যন্ত বিনিয়োগ বৃদ্ধি করা আবশ্যক।

I National Budget of a country is the annual program of the Government's expenditure and income for a fiscal year. In a developing economy like Bangladesh, the annual national budget reflects the government's development philosophy, priorities and approaches towards equity and social justice. The role of the public sector to provide infrastructure and basic public goods is to create an enabling environment for the private sector to act as the engine of economic growth through the national budget. As the national budget formulated annually may undermine the economic stability and growth prospect in the medium term, it seems to be myopic. Medium Term Budgetary Framework (MTBF) is an effective measure for redressing the problems emanating from the short time limit of the annual budget. The framework of MTBF must be inclusive and bottom up to reach Bangladesh in a trajectory of highperforming quality growth with prices of commodities stabilized, income and human poverty brought to a minimum, health and education for all secured and capacity building combined with creativity enhanced, social justice established, interpersonal and regional income disparity reduced, and a capacity to tackle the adverse effects of climate change achieved as envisioned in the Government's Outline Perspective Plan (2010-2021). *[Pubali Bank Ltd. Officer/Senior Officer 2014]*

অনুবাদ : একটি আর্থিক বছরের জন্য সরকারের ব্যয় ও আয়ের বার্ষিক কার্যক্রমই হচ্ছে একটি দেশের জাতীয় বাজেট। বাংলাদেশের মতো একটি উন্নয়নশীল অর্থনীতিতে বার্ষিক জাতীয় বাজেট প্রতিফলিত করে সমতা ও সামাজিক ন্যায়বিচারের ক্ষেত্রে সরকারের উন্নয়ন দর্শন, অগ্রাধিকার এবং অগ্রসরতা। অবকাঠামো ও মৌলিক সাধারণ জিনিসপত্র সরবরাহ করার ক্ষেত্রে সরকারি খাতের ভূমিকা হচ্ছে জাতীয় বাজেটের মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়নের চালিকাযন্ত্র হিসেবে বেসরকারি খাতের জন্য সক্রিয় পরিস্থিতি সৃষ্টি করা। যেহেতু বার্ষিকভাবে প্রণীত বাজেট মধ্যবর্তী সময়ে অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা ও উন্নয়ন প্রত্যাশাকে দুর্বল করে দিতে পারে, তাই এটাকে দূরদৃষ্টিহীন বলে মনে হয়। বার্ষিক বাজেটের স্বল্প থেকে উদ্ভূত সমস্যাগুলো নিরসন করতে মধ্যবর্তী বাজেট কাঠামো (এমটিবিএফ) একটি ফলপ্রসূ উপায়। এমটিবিএফ-এর কাঠামো অবশ্যই হতে হবে সংযুক্ত এবং নিম্নস্তর থেকে বাংলাদেশকে পৌছাতে একটি অবক্র পথে গুণগতমান উন্নয়ন করে সাথে প্রয়োজনীয় জিনিসের দাম স্থিত করে, আয় এবং মানুষের অভাব একটি সর্বনিম্ন অবস্থায় আনা, সবার জন্য স্বাস্থ্য এবং শিক্ষা নিশ্চিত করে এবং সক্ষমতা সৃষ্টির সাথে যুক্ত সৃজনশীলতা উন্নতকরণ, সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিতকরণ, আন্তঃব্যক্তিগত এবং আঞ্চলিক আয় বৈষম্য দূরীভূতকরণ এবং একটি আবহাওয়া পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাবকে লড়ার সক্ষমতা অর্জন করা যেমন কল্পনা করা হয়েছে সরকারের পরিপ্রেক্ষিত রূপরেখা পরিকল্পনায় (২০১০-২০২১)।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



- Perhaps the most important role that the Central Bank, and more generally the government can play in creating a conducive environment for NGO and private sector initiatives for financial inclusion to flourish. This conducive environment starts with providing the macro-economic fundamentals for financial inclusion. A critical ingredient in this is ensuring that the monetary policy instruments we have at our disposal contribute to robust economic growth while ensuring that inflation remains under control. Economic growth is essential to generate the demand for the enterprises developed by micro-finance and stable inflation is necessary to ensure that the progress of poor people make from having access to savings, insurance and loans is not eroded away. So while the world of macro-economic policy may seem miles away from that of micro-finance, they are in fact very inter-linked. So irrespective of whether we have a policy on micro-finance this issue of macro-stability will have a profound impact on how the micro-finance industry shapes up in future. *[Pubali Bank Ltd. Junior Officer/Junior Officer (Cash) 2014]*

অনুবাদ : আর্থিক অন্তর্ভুক্তি সফল করার জন্য সম্ভবত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা যা কেন্দ্রীয় ব্যাংক এবং অধিকতরভাবে সরকার পালন করতে পারে তা হচ্ছে এনজিও এবং ব্যক্তিগত উদ্যোগসমূহের জন্য একটি সহায়ক পরিস্থিতি সৃষ্টি করা। আর্থিক অন্তর্ভুক্তির এই সহায়ক পরিস্থিতি শুরু হয় ব্যাপক অর্থনৈতিক বুনিয়াদ সরবরাহ করা দিয়ে। এটির একটি সংকটপূর্ণ উপাদান হলো নিশ্চিত করা যে, আর্থিক নীতি উপকরণ যা আমাদের আয়ত্তে আছে তা অংশগ্রহণ করে অর্থনৈতিক বেড়ে উঠা জোরালো করতে সাথে এটা নিশ্চিত করে যে মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে আছে। অর্থনীতির দ্বারা সামষ্টিক চাহিদা সৃষ্টি করতে অর্থনৈতিক বিকাশ অপরিহার্য এবং স্থিতিশীল মুদ্রাস্ফীতি নিশ্চিত করতে যে অগ্রগতি গরিব মানুষেরা তৈরি করে সঞ্চয়, বীমা এবং ঋণ এর প্রবেশাধিকার থেকে তা ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না। সামষ্টিক অর্থব্যবস্থা ক্ষুদ্র অর্থনীতি থেকে অনেক তফাত মনে হলেও এরা মূলত আন্তঃসম্পর্কিত। তাই ক্ষুদ্র অর্থনীতিতে নিরপেক্ষভাবে আমাদের কোনো নীতি-ব্যবস্থা আছে কিনা তা দীর্ঘ স্থিতিশীলতার এমন বিষয়টি ব্যাপক প্রভাব ফেলবে ক্ষুদ্র অর্থব্যবস্থা কিভাবে শিল্প আকৃতি পেতে পারে তার উপর।

- Our Consitution starts with three words : 'We, The People'. The words are simple but mighty. They are also revolutionary in nature. They are mighty because they signify the collective mind of the nation. They are revolutionary because they represent a glorified moment of the Bengali Nation's commitment for oneness. This oneness develops into an image of a document which we call the constitution. *[Rajshahi Krishi Unnayan Bank Senior Officer 2014]*

অনুবাদ : আমাদের সংবিধান শুরু হয় তিনটি শব্দ দিয়ে : 'আমরা, জনগণ।' শব্দগুলো সরল কিন্তু অপার শক্তিশালী। এরা বৈশিষ্ট্য গুণে বৈপ্লবিকও। এরা অপার শক্তিশালী কারণ এরা সূচিত করে জাতির মিলিত মনস্ক। এরা বৈপ্লবিক কারণ এরা চিত্রিত করে বাঙালি জাতির একতার প্রতিশ্রুতির একটি পবিত্র মুহূর্ত। এই একতা বিকশিত হয় একটি দলিলের ধারণায় যাকে আমরা বলি সংবিধান।



- Despite immense contribution to the country, business men do not get as much respect as they deserve. It is because of the few who are dishonest in business, evading taxes and inflicting pains to people by increasing price illogically. Trade organizations also failed to ensure transparency. Therefore, the business leaders have been urged to maintain honesty, efficiency and accountability in business. The businessmen played an important role in developing the country and made significant contribution to society through activities under corporate social responsibility. *[Rajshahi Krishi Unnayan Bank Officer 2014]*

অনুবাদ : দেশের প্রতি বিপুল অবদান রাখা সত্ত্বেও, ব্যবসায়ীরা প্রাপ্য সম্মান পান না। এটার কারণ সেই অল্প কজন যারা ব্যবসায় অসৎ, কর ফাঁকি দেয় এবং অযৌক্তিকভাবে দাম বৃদ্ধি করে মানুষকে কষ্ট দেয়। বাণিজ্য সংগঠনগুলোও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে অসমর্থ হয়েছে। তাই, ব্যবসায়িক নেতাদের ব্যবসার মধ্যে সততা, দক্ষতা এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে বলা হয়েছে। দেশকে গড়ে তুলতে ব্যবসায়ীরা প্রয়োজনীয় ভূমিকা পালন করেছেন এবং সমিতিবদ্ধ সামাজিক দায়িত্বশীলতার অধীনে কার্যকলাপ এর মাধ্যমে সমাজের প্রতি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন।

- The post-crisis global econmy on two track recovery path warrants some shift of emphasis in growth strategy for Bangladesh, from export-led to domestic demand-driven growth. To this end the government is steadily expanding social safety net expenditure outlays in annual budgets. Exployment and income generation by new private and public sector investments are continually augmenting domestic demand; rise in wage levels for rural day laborers, and revision in wage structures for apparels export sector workers have also helped underpin domiestic demand. Bangladesh Bank's financial inclusion campalgn is also contributing towards bolstering domestic demand, promoting financing of micro and small enterprises is the other major thrust area of the financial inclusion campaign besides agriculture. The urgency of supporting emergence of employment generating small and medium scale enterprises has heightened further in the context of recent influx of migrant workers returning from the trouble-hit Middle Eastern countries. *[Bangladesh Development Bank Officer 2014]*

**Translation :** রপ্তানিচালিত প্রবৃদ্ধি থেকে অভ্যন্তরীণ চাহিদাচালিত প্রবৃদ্ধি বিশ্ব অর্থনীতির সংকট থেকে উত্তরণের দুটো পথে বাংলাদেশকে প্রবৃদ্ধি কৌশলের দিকে ধাবিত হবার নিশ্চয়তা প্রদান করে। সরকার এ লক্ষে ক্রমাগতভাবে বাজেটে সামাজিক নিরাপত্তাজনিত নেটওয়ার্কিং ব্যয় বৃদ্ধি করছে। সরকারি ও বেসরকারি খাতে নতুন বিনিয়োগের ফলে কর্মসংস্থান এবং আয় অবিরামভাবে অভ্যন্তরীণ চাহিদা বাড়াচ্ছে; গ্রামীণ দিনমজুরদের পারিশ্রমিক বৃদ্ধি এবং পোশাক রপ্তানি খাতের শ্রমিকদের বেতন কাঠামো বৃদ্ধিতে পুনর্গঠনও অভ্যন্তরীণ চাহিদা বৃদ্ধিতে সহায়তা করছে। অভ্যন্তরীণ চাহিদা বৃদ্ধিতে বাংলাদেশ ব্যাংকের অর্থনৈতিক অন্তর্ভুক্তি অভিযানও অবদান রাখছে; কৃষির পাশাপাশি ক্ষুদ্র শিল্পে অর্থায়ন করাও সামগ্রিক অর্থনৈতিক অভিযানের পেছনে বড় একটা প্রভাবশালী ক্ষেত্র। সম্প্রতিক সময়ে সমস্যাক্রান্ত মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলো থেকে প্রবাসী শ্রমিকদের দেশে ফেরার পরিপ্রেক্ষিতে কর্মের যোগানদাতা ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের প্রয়োজনীয়তা ও উদ্ভবের তাগিদ বৃদ্ধি পেয়েছে।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



- It has to be admitted that monetary policies, however much sound they may be, are not enough to make economic miracle happen; nor are they an alternative to long-term infrastructure development and investment in productive ventures and enterprises. Diversion of capital and credit–and also, what many quarters have feared about flight of capital through over invoicing of imports– as well as other devious means, have remained a headache for banks. This could be possible because political leaderships have always soft-pedalled on the key issue of improving governance and curbing corruption. The banks have now been asked to strictly scrutinize the credit-worthiness of borrowers. It is indeed vital to make an authentic assessment of the credibility of the fund's use for productive purposes. Political interference has stood in the way of doing the job properly. *[Probashi Kallyan Bank Executive Officer (Cash) 2014]*

**অনুবাদ :** এটা স্বীকার করতে হবে যে, অর্থনৈতিক নীতিসমূহ যতই ভালো মনে হোক না কেন, সেগুলো অর্থনীতিতে আলোড়ন সৃষ্টি করার মতো পর্যাপ্ত নয়; ব্যবসায়ী উদ্যোগ ও উৎপাদনে বিনিয়োগ এবং দীর্ঘমেয়াদি অবকাঠামো উন্নয়নের বিকল্পও নয়। মূলধন ও ঋণের স্থানান্তর এবং আরো অনেকে আমদানির অতিরিক্ত চালানের মাধ্যমে মূলধন পাচারের ব্যাপারে আশঙ্কা করে এবং প্রতারণার মাধ্যমে অর্থ পাচার ব্যাংকগুলোর জন্য মাথা ব্যাথার কারণ হয়ে আছে। এটা সম্ভব হতে পারে কারণ রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ সুশাসন উন্নয়ন এবং দুর্নীতি দমনে সবসময়ই নেতিবাচক অবস্থান নিয়েছে। এখন ব্যাংকগুলোকে বলা হচ্ছে ঋণ বিতরণের ক্ষেত্রে ঋণগ্রহীতার ঋণ গ্রহণ ক্ষমতা সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মভাবে যাচাই করে নিতে। উৎপাদনশীল খাতে অর্থের যোগান নিশ্চিত করতে বিশ্বাসযোগ্য ও সঠিকভাবে ঋণের যাচাই বাছাই করতে হবে। ঠিকমতো এ কাজ করার পথে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ প্রধান অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

- Increasing concern with the adverse affects of centralized bureaucratic control on development planning, resource mobilization and popular participation in administration at the local level in developing countries have paved the way for resurgence of interest in decentralization. Many development planners, administrators and management specialists have advocated for the adoption of alternative national policies and implementation strategies based on the concept of decentralization to promote balanced development, to increase the quantum of popular participation at the grassroots level and to harness and optimally utilize local resources. The growing interest in the concept of decentralization is no accident. It grew as a result of disappointing experiences of the developing countries during the last two decades in the field of development. The use of highly centralized planning and control mechanisms, the increasing realization of new and humane way of approaching developmental policies and programmes and the tremendous expansion of governmental activites and the attendant complexities have pushed many developing countries to adopt decentralization as a kind of creed encompassing social, political and economic spheres. *[Investment Corporation of Bangladesh Senior Officer 2014]*



**অনুবাদ :** উন্নয়নশীল দেশগুলোর উন্নয়ন পরিকল্পনা, সম্পদের গতিশীলতা এবং স্থানীয় পর্যায়ের প্রশাসনে জনতার অংশগ্রহণের ব্যাপরে কেন্দ্রীয় আমলাতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণের বিরূপ প্রভাবসহ ক্রমবর্ধমান উদ্বেগ বিকেন্দ্রীকরণের আগ্রহ পুনরুদয়ের জন্য পথ করে দিয়েছে। ভারসাম্যপূর্ণ উন্নয়ন বর্ধিত করতে, মাঠপর্যায়ে জনতার অংশগ্রহণের পরিমাণ বৃদ্ধি করতে এবং স্থানীয় সম্পদ সন্তোষজনকভাবে কাজে লাগাতে অনেক উন্নয়ন পরিকল্পনাকারী, প্রশাসক এবং নির্বাহী বিশেষজ্ঞরা সমর্থন করেছে বিকেন্দ্রীকরণের ধারণার ভিত্তিতে বিকল্প জাতীয় নীতিমালা গ্রহণের এবং প্রয়োগের সমর্থন করেছেন। তাই বেড়ে চলা বিকেন্দ্রীকরণের ধারণার প্রতি আগ্রহ কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। এটি গত দুই দশকের উন্নয়নের ক্ষেত্রে উন্নয়নশীল দেশগুলোর হতাশাদায়ক অভিজ্ঞতার ফলাফল হিসেবে তৈরি হয়েছে। মাত্রাতিরিক্ত পরিকল্পনা এবং নিয়ন্ত্রণ কলা কৌশল এর ব্যবহার, নতুন এবং উৎকৃষ্টভাবে উন্নয়ন পরিকল্পনা এবং নীতির দিকে অগ্রসর হবার ক্রমবর্ধমান উপায়ের উপলব্ধি এবং সরকারি কর্মকাণ্ডের অসাধারণ সম্প্রসারণ এবং উপস্থিত জটিলতা বাধা দিয়েছে অনেক উন্নয়নশীল দেশকে বিকেন্দ্রীকরণকে গ্রহণ করতে একটি সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক বলয় পরিবেশিষ্টত করার একটি উপায় হিসেবে।

- Designing appropriate micro-finance regulatory regimes is still globally an ongoing work in progress. While differing in specifics according to country circumstances, the general features of the desirable regimes are by now well recognized. MFIs accepting deposits only from their member-borrowers pose no risk for systemic stability, the deposits in effect being cash collaterals for loans drawn. Non-prudential regulations requiring good governance with clear accountabilities, sound lending practices, fairness in fees/charges and in redressing customer grievances, adequacy and transparency in financial disclosures largely suffice in regulating such non-deposit taker MFIs. The larger MFIs accepting deposits from non-members can pose potential systemic risks, warranting prudential regulations (capital adequacy, reserve and provisioning requirements, etc.) in line with those for banks and other deposit taking supervised financial institutions. *[Palli Karma-Sahayak Foundation (PKSF) Assistant Manager 2014]*

**অনুবাদ :** উপযুক্ত ক্ষুদ্র অর্থায়ন ব্যবস্থার উদ্ভাবন এখনও বিশ্বব্যাপী একটি চলমান প্রক্রিয়া। দেশের বিভিন্ন অবস্থা অনুসারে বৈশিষ্ট্য ভিন্ন হলেও কাঙ্ক্ষিত নিয়ম-নীতির সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলো এখন ভালোভাবে শনাক্তকৃত। ঋণগ্রহণকারী সদস্যদের নিকট থেকে আমানত গ্রহণকারী এমএফআই পদ্ধতিগত স্থায়িত্বের জন্য কোনো ঝুঁকি গ্রহণ করে না, কার্যত আমানতগুলো হচ্ছে উত্তোলিত ঋণের নগদ জামানত। এমএফআই-এর এমন আমানতবিহীন গ্রহীতা নিয়ন্ত্রণ করতে অপরিকল্পিত ব্যবস্থাপনাগুলো খুব কাজে লাগে যেগুলোর (অবশ্য) প্রয়োজন স্পষ্ট দায়বদ্ধতা সহকারে সুশাসন, ঋণ প্রদানের সুনীতি, ফি/চার্জের সুবিচার এবং ক্রেতাদের অভিযোগের নিরসন, আর্থিক কার্যক্রমের পর্যাপ্ততা এবং স্বচ্ছতা। অসদস্যদের কাছ থেকে বিশাল আমানত গ্রহণকারী এমএফআই সম্ভাব্য পদ্ধতিগত ঝুঁকি গ্রহণ করতে পারে যা ব্যাংক এবং অন্যান্য আমানত গ্রহণকারী আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর সাথে মিল রেখে পরিকল্পিত নিয়মগুলোর ন্যায্যতা প্রতিপন্ন করে (পুঁজির পর্যাপ্ততা, সংরক্ষণ ও পদ্ধতিগত প্রয়োজন ইত্যাদি)।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



I Communalism is a peculiar South Asian phenomenon. In the Western countries they do not use the term in the sense we use it here. Communalism, in fact, does not signify any well-defined concept or doctrine. It is rather a state of mind, a somewhat perverted attitude nourished by individuals belonging to one religious community toward, those of other religious communities. It is a kind of tribal attitude born of ignorance, suspicion and fear with regard to people who do not belong to the tribe. Vested interests such as political, economic, religious and in many countries of the so-called third world, military vested interests-these elements take advantage of the situation and exploit it to serve their nefarious ends. *[Probashi Kallyan Bank Senior Officer 2014]*

অনুবাদ : সাম্প্রদায়িকতা দক্ষিণ এশিয়ার একটি অদ্ভুত বাস্তবতা। আমরা এখানে এই শব্দটি যে অর্থে ব্যবহার করি পশ্চিমা দেশগুলো সেই অর্থে ব্যবহার করে না। বাস্তবতা হলো, সাম্প্রদায়িকতা কোনো সুনির্দিষ্ট ধারণা সূচিত করে না অথবা কোনো মতবাদও প্রদান করে না। বরং এটি এক প্রকার মানসিক অবস্থা, যা ব্যক্তিগত বিকৃত মনোভাব, এক ধর্মের থেকে অন্য ধর্মের সম্প্রদায়ের প্রতি উদ্ভব হয়। এটি এক প্রকার গোষ্ঠীগত মতবাদ যার জন্ম হয় অজ্ঞতায়, সন্দেহে এবং অন্য গোষ্ঠীর প্রতি অজানা আতঙ্ক থেকে। কিছু কায়েমি স্বার্থ যেমন- রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয় এবং তথাকথিত তৃতীয় বিশ্বের অনেক দেশে সামরিক কায়েমি স্বার্থে এসব উপাদান থেকে সুযোগের সদ্ব্যবহার করে এর উৎপত্তি হয় এবং অসাধু উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তা কাজে লাগানো হয়।

I While the grand edifice of financial superpower collapsed transmitting shockwaves to the remote corners of the globe through integrated financial networks, the financial sector in Bangladesh evidenced its immunity, thanks to a closed capital account and pre-emptive actions to secure its foreign exchange reserve position at the sight of some early signs of the crisis. Fortunately, the financial sector also stood resilient since it does not have exposure to risky derivatives market home or abroad. The financial sector reform programs that kicked off in the 1990s have instilled implementation of prudential regulation and supervision in the banking sector, which laid the foundation of sound and resilient financial sector. *[Mercantile Bank Ltd. Senior Officer 2014]*

অনুবাদ : যেখানে অর্থনৈতিকভাবে প্রধান শক্তিশালীদের ধ্বংস হওয়ার বিষয়টি সুসংহত অর্থনৈতিক নেটওয়ার্কের মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে পৃথিবীর বিভিন্ন দূরবর্তী স্থানে, বাংলাদেশের অর্থনৈতিক খাত প্রমাণ করেছে এটির অনাক্রমতা, এই সংকটের পূর্ব লক্ষণ দেখা মাত্রই বন্ধ পুঁজি হিসাব এবং পূর্ব-সংক্রান্ত কাজের মাধ্যমে এর বৈদেশিক মুদ্রা সংরক্ষণ নিশ্চিত করার জন্য। ভাগ্যক্রমে, যেহেতু এটির কোন সরাসরি প্রকাশ নেই ঘর দেশ-বিদেশের বিপজ্জনক পরিবর্তনশীল বাজারের সাথে, অর্থনৈতিক খাতও স্বাভাবিক ছিল। অর্থনৈতিক খাত সংশোধন কার্যক্রম যা শুরু হয়েছিল ১৯৯০ তে স্থাপন করেছে দূরদর্শী প্রবিধান এবং রক্ষণাবেক্ষণ এর ব্যাংকিং খাতের রূপায়ণ, যা ভিত গড়ে দিয়েছে সুষ্ঠ এবং স্থিতিস্থাপক অর্থনৈতিক খাতের।



I In an attempt to improve the overall performance of clerical workers, many companies have introduced computerized performance monitoring and control system (CPMCS) that record and report a worker's computer-driven activities. However, at least one study has shown that such monitoring may not be having the desired effect. In the study, researchers asked monitored clerical workers and their supervisors how assesment of productivity affected supervisors' rating of workers' performance. In contrast to unmonitored workers doing the same work, who without exception identified the most important element in their jobs as customer service, the monitored workers and their supervisors all responded that productivity was the critical factor in assigning rating. This finding suggested that there should have been a strong correlation between a monitored worker's productivity and the overall rating the worker received. However, measures of the relationship between overall rating and individual elements of performance clearly supported the conclusion that supervisors gave considerable weight to criteria such as attendance, accuracy, and indications of customer satisfaction. *[Rupali Bank Ltd. Officer 2013]*

অনুবাদ : কেরানিদের সর্বোপরি কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির প্রয়াসে অনেক প্রতিষ্ঠান কম্পিউটার দ্বারা পর্যবেক্ষণ এবং নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা চালু করেছে যা একজন কর্মচারীর কম্পিউটার চালিত কার্যসমূহ সংরক্ষণ করে এবং রিপোর্ট করে। যা হোক, অন্তত একটি গবেষণা দেখিয়েছে যে, এমন পর্যবেক্ষণ কাঙ্খিত ফলাফল নাও পেতে পারে। গবেষণায় গবেষকরা পর্যবেক্ষিত কেরানি এবং তাদের তত্ত্বাবধায়কদের জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে, কিভাবে উৎপাদনশীলতার মূল্যায়ন কর্মচারীদের অবদানের মূল্য নির্ধারণকে প্রভাবিত করেছিল। একই কাজে কর্মরত অপর্যবেক্ষিত কর্মচারীরা যারা কোনো ব্যতিক্রম ছাড়াই তাদের কাজের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান চিহ্নিত করেছিলেন যেমন ক্রেতা সেবা, তাদের বিপরীতে, পর্যবেক্ষিত কর্মচারীরা এবং তাদের তত্ত্বাবধায়ক সবাই মতামত দেয় যে, মূল্য নির্ধারণে উৎপাদনশীলতা ছিল একটি সঙ্কটপূর্ণ বিষয়। এই ফলাফল পরামর্শ দিয়েছিল যে, পর্যবেক্ষিত কর্মচারী ও তাদের তত্ত্বাবধায়কদের উৎপাদনশীলতা এবং কর্মচারীদের প্রাপ্ত সার্বিক মূল্য নির্ধারণের মধ্যে একটি শক্তিশালী যোগসূত্র থাকা উচিত ছিল। যা হোক, সার্বিক মূল্য নির্ধারণ এবং কাজের স্বতন্ত্র উপাদানের মধ্যে সম্পর্কের পরিমাণ স্পষ্টভাবে উপসংহারকে সমর্থন করেছিল যে, তত্ত্বাবধায়করা কিছু নীতির উপর বেশি জোর দিয়েছিলেন যেমন উপস্থিতি, সঠিকতা এবং ক্রেতা সন্তুষ্টির নির্দেশনা।

I The debate on agricultural biotechnology is focused mainly on the environmental impact, bio-safety issues, and intellectual property rights. The crucial issues of harnessing the technology to make a dent in poverty, create employment, achieve nutritional security and address issues of inequality are almost neglected. It is now time to move ahead and look beyond to a broader picture for addressing larger issues of growth and equity that can emerge from the applications of biotechnology. Unless this is done and necessary correctives applied in the policy for development and commercialization of the technology, the result can be disastrous. *[Bangladesh Krishi Bank Data Entry/Control Operator 2013]*

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



**অনুবাদ :** কৃষিভিত্তিক জৈবপ্রযুক্তির বিতর্ক প্রধানত ঘনীভূত হয়েছে পরিবেশগত প্রভাব, জৈব-নিরাপত্তা বিষয়সমূহ এবং বুদ্ধিভিত্তিক সম্পদের অধিকার নিয়ে। এই প্রযুক্তি ব্যবহার করে দরিদ্রতা হ্রাস, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, পুষ্টিভিত্তিক নিশ্চয়তা অর্জন এবং বৈষম্য বিষয়ক উদ্যোগ এই বিষয়গুলো প্রায় অবহেলিত। এখন সময় হয়েছে সামনে এগিয়ে যাবার এবং একটি বড় দৃশ্যপটের দিকে তাকানোর যাতে উন্নয়ন এবং সাম্যের মত বড় বিষয়গুলো পর্যালোচনা করা হবে যা কিনা জৈবপ্রযুক্তির প্রয়োগের মধ্য দিয়ে উঠে আসতে পারে। এটা বাস্তবায়ন এবং এই প্রযুক্তির উন্নয়ন এবং বাণিজ্যিকিকরণ এর নীতিমালায় প্রয়োজনীয় সঠিকতা প্রয়োগ করা না হলে, ফলাফল হতে পারে ধ্বংসাত্মক।

■ Both borrowers and lenders in the sub-prime mortgage market are wishing they had listened to the old saying : neither a borrower nor a lender be. Last year people with poor credit ratings borrowed $ 605 billion in mortgages, a figure that is about 20% of the home-loan market. It includes people who cannot afford to meet the mortgage payments, on expensive homes they have bought, and low-income buyers. In some cases, the latter could not even meet the first payment. Both sides can be blamed. Lenders, after the 2 – 3 percentage point premium they could charge, offered loans, known as 'liar loans', with no down payments and without any income verification to people with bad credit histories. They believed that rising house prices would cover them in the event of default. Borrowers ignored the fact that interest rates would rise after an initial period. One result is that default rates on these sub-prime mortgages reached 14% last year-a record. The problems in this market also threaten to spread to the rest of the mortgage market, which would reduce the flow of credit available to the shrinking numbers of consumers still interested in buying property. *[Rupali Bank Ltd. Senior Officer 2013]*

**অনুবাদ :** উপ-সর্বোচ্চ বন্ধক বাজারের ধারকারী এবং দানকারী উভয়েই এখন ভাবছে যে তাদের প্রবাদবাক্য, ধার করো না, ধার দিয়ো না শোনা উচিত ছিল। গত বছর খারাপ ক্রেডিট নির্ধারিত মানুষ ৬০৫ বিলিয়ন ডলার বন্ধক-এ ধার করেছিল, এটি গৃহ ঋণ বাজারের প্রায় ২০%। এর মধ্যে আছে ঐ সমস্ত মানুষ, যারা দামি বাড়ি ক্রয়ের উপর বন্ধকী ঋণ পরিশোধ করতে পারে না এবং নিম্ন-আয়ের ক্রেতারা। কিছু ক্ষেত্রে শেষোক্ত ব্যক্তিরা এমনকি প্রথম কিস্তিও পরিশোধ করতে পারে না। উভয় পক্ষকেই দোষারোপ করা যায়। ঋণ দানকারীরা ২-৩ শতাংশ পয়েন্ট কিস্তির পর ঋণ দিতে চাইত, যেটা 'মিথ্যা ঋণ' হিসেবে পরিচিত। কোনো অগ্রিম কিস্তি এবং অখ্যাতি ইতিহাস সম্বলিত ব্যক্তির আয় যাচাই করা ছাড়াই। তারা বিশ্বাস করত যে, বাড়ির উদীয়মান মূল্য খেলাপী ঘটনার ক্ষেত্রে তাদেরকে রক্ষা করবে। ধারকারী উপেক্ষা করত এই সত্যটি যে সুদের হার প্রাথমিক পর্যায়ের পর বাড়বে। একটি ফল হচ্ছে যে, উপ-সর্বোচ্চ বন্ধকের উপর খেলাপী হার, যেটা ১৪% এ পৌঁছায়। গতবছরের একটি রেকর্ড। বাজারের সমস্যাগুলো ভয় দেখায় যে সেটা অবশিষ্ট বন্ধক বাজারে ছড়িয়ে বাড়তে পারে, যা অতি সামান্য পরিমাণ ভোক্তা যারা তখনও সম্পত্তি কিনতে আগ্রহী তাদের প্রতি ক্রেডিট এর তলব কমিয়ে দিবে।

## ৩৫তম বিসিএস

## ২

# কাল্পনিক সংলাপ

নম্বর ১৫

সংলাপ হচ্ছে মৌখিক কথোপকথন বা বাক্যালাপ, যার ইংরেজি 'dialogue' বা 'conversation'। দুই বা তার বেশি ব্যক্তির মধ্যে যে কথাবার্তা তাকেই বলা হয় সংলাপ বা কথোপকথন। প্রাত্যহিক জীবনে আমরা প্রতিনিয়ত একে অপরের সঙ্গে কথা বলে থাকি। দেখা যায়, তার অধিকাংশ কথাই বিচ্ছিন্ন, অসম্পূর্ণ এবং যথাযথ শব্দ প্রয়োগে ও বাক্য-বিন্যাসে সুসংহত নয়। লিখিত সংলাপে বিচ্ছিন্ন বা অসম্পূর্ণ বাক্য কাম্য নয়; তাকে শুধু ভাষাগত সম্পূর্ণতা দান করলেই চলবে না, অর্থগত পূর্ণতাও দিতে হবে।

কাল্পনিক সংলাপ রচনায় দক্ষতা অর্জনের উদ্দেশ্য হচ্ছে সহজ ও স্বাভাবিক উপায়ে চিন্তা-ভাবনাকে প্রকাশ করতে শেখা। সংলাপ রচনার মাধ্যমে কোনো বিষয়ে মতভিন্নতা সম্পর্কে ধারণা সুস্পষ্ট হয় এবং দুপক্ষের যুক্তি উপস্থাপন ও যুক্তি খণ্ডনের দক্ষতা তৈরি হয়।

সংলাপনির্ভর সাহিত্য শাখার নাম নাটক। সংলাপই নাটকের একমাত্র প্রকাশ-মাধ্যম। সংলাপের মধ্য দিয়ে নাটকের কাহিনী এগোয়, ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে নাটকের কাহিনী ও চরিত্র পরিণতির অভিমুখী হয়। তবে শিক্ষার্থীর অনুশীলিত সংলাপের সঙ্গে নাটকের সংলাপের পার্থক্য দুস্তর। শিক্ষার্থীর লেখ্য সংলাপ প্রধানত বিষয়ানুগ, তাতে কেবল প্রদত্ত বিষয়ের আলোচনা প্রাধান্য লাভ করে, নাটকের কাহিনীর অগ্রগতি ও চরিত্রের পরিণামমুখী বিকাশের অবকাশ নেই। এজন্য সাধারণ সংলাপ চরিত্রানুগ হয় না।

সমাজ ও জীবন সম্পর্কে যাদের দৃষ্টি স্বচ্ছ ও গভীর, সেই সাথে ভাষার উপর যাদের পরিপূর্ণ দখল আছে তাদের পক্ষে সংলাপ রচনা খুব বেশি কঠিন কাজ হয়।

### সংলাপ রচনার কৌশল

সংলাপ রচনা একটি সৃষ্টিধর্মী শিল্পকর্ম এবং এটি একটি অনুশীলন-সাপেক্ষ বিষয়। সেজন্য শিক্ষার্থীকে কিছু কৌশল ও নিয়ম অনুসরণ করতে হয়। এজন্য নিচের বিষয়গুলোর ওপর ধারণা ও দখল থাকতে হবে।

১. সংলাপ রচনা শুরু করার আগে প্রদত্ত বিষয়টি ভালোভাবে ভেবে-চিন্তে মনের মধ্যে বিষয়টিকে গুছিয়ে নিতে হয়। তারপর উপযুক্ত চরিত্র কল্পনা করে নিয়ে তাদের স্ব স্ব দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে ভেবে ঠিক করে নেয়া ভালো। বিষয়ের উপস্থাপনা ও পরিণতির মধ্যে একটি সুসংহত সামঞ্জস্য বিধান অপরিহার্য।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



২. সংলাপের ভাষা স্পষ্ট, প্রাঞ্জল ও হৃদয়স্পর্শী হওয়া বাঞ্ছনীয়। সংলাপনির্ভর বাক্য ছোট হলেই ভালো। বড় বড় জটিল বাক্য কিংবা অতিকথন সংলাপকে ক্লান্তিকর করে।

৩. যাদের মধ্যে সংলাপ হবে, সে চরিত্রগুলো নির্দিষ্ট থাকলে তাদের মুখে কথা বসিয়ে সংলাপ রচনা করতে হয়। চরিত্র নির্দিষ্ট করে বলা না থাকলে বিষয় অনুযায়ী চরিত্র ভেবে নিতে হয়। মনে রাখতে হবে ছেলেমানুষের মুখে বুড়োর কথা যেমন বেমানান, তেমনি বুড়োর মুখে ছেলেমানুষী কথা হাস্যকর।

৪. মনে রাখতে হবে সংলাপ যেন বক্তা-প্রতিবক্তার নিছক প্রশ্ন ও উত্তরে পর্যবসিত না হয়। আলাপ-আলোচনার মধ্য দিয়ে বক্তব্য বিষয় এগোবে, প্রয়োজনে তর্ক-বিতর্কের কিছুটা আমেজ আসতে পারে।

৫. সংলাপের ভাষা এমন হওয়া উচিত যেন তার ভেতর দিয়ে চরিত্রের নৈতিকতা, শিক্ষার মান, সামাজিক বৈশিষ্ট্য, বয়স, লিঙ্গ, ব্যক্তিত্ব ইত্যাদি সম্পর্কে মোটামুটি ধারণা করা যায়। কার সাথে বক্তা কথা বলছে তার প্রভাবও তার সংলাপের ভাষায় পড়ে। বক্তা কি বিব্রত, উৎকণ্ঠিত, রাগান্বিত—এসবও তার সংলাপে ফুটে ওঠা চাই।

৬. লক্ষ্য রাখতে হবে যেন বক্তার একটি সংলাপ লিখতে আধ পৃষ্ঠা না লাগে। বরং সংলাপ হবে ছোট। একজনের দীর্ঘ সংলাপের মধ্যে অন্যজনের সংলাপ ঢুকিয়ে দিলে বড় সংলাপে ছেদ পড়ে এবং তা ছোট হয়ে আসে।

৭. পাঠ্যসূচি অনুযায়ী যে সংলাপ লিখতে হয় তাতে নাটকীয়তার অবকাশ নেই। তবে উক্তি-প্রত্যুক্তির মধ্য দিয়ে আলোচ্য বিষয় এগোতে এগোতে স্বাভাবিকভাবে কিছুটা নাটকীয় রস ও মাধুর্যের আমেজ এসেই পড়ে। সরস সংলাপ হৃদয়গ্রাহী হয়। বিশেষ ক্ষেত্রে কৌতুক-রস কিংবা ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের শাণিত ফলা সংলাপকে সজীব ও প্রাণবন্ত করে।

৮. সংলাপের কোনো নির্দিষ্ট মাপজোখ নেই। বক্তব্য বিষয় পূর্ণতা লাভ করলেই সংলাপের সমাপ্তি। তবে দীর্ঘ সংলাপ না হওয়াই উত্তম।

## নমুনা সংলাপ

### ০১ বিজ্ঞান ও বিজ্ঞান-মনস্কতা বিষয়ে শিক্ষক ও ছাত্রের মধ্যে সংলাপ।

ছাত্র : স্যার, একটা কথা জিজ্ঞেস করতে পারি?

শিক্ষক : বলো, কী জানতে চাও।

ছাত্র : স্যার, দৈনন্দিন জীবনে আমরা বিজ্ঞানের জয়জয়কার দেখতে পাচ্ছি। ছাত্রছাত্রী বিজ্ঞান বিষয়ে পড়াশোনা করছে। অনেকে সর্বোচ্চ ডিগ্রি নিয়ে বৈজ্ঞানিক গবেষণা করছেন। অথচ তাদের অনেকেই অবৈজ্ঞানিক চিন্তা ও বিশ্বাসে আচ্ছন্ন। মানসিক গঠনে তারা বিজ্ঞান-মনস্ক নন। এ ব্যাপারটা আমার বোধগম্য নয়।

শিক্ষক : তার মানে, তুমি বিজ্ঞান শিক্ষার সঙ্গে বিজ্ঞান চেতনার সম্পর্ক দেখতে পাচ্ছ না। তাই তো?

ছাত্র : জি স্যার।



শিক্ষক : শোনো। তুমি ঠিকই ধরেছ। আসলে বিজ্ঞান শিক্ষার লক্ষ্য কেবল বিলাসিতার জন্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে ব্যবহার করা নয়। কিংবা কেবল চাকরি ও গবেষণার জন্য বিজ্ঞান শিক্ষা নয়। বিজ্ঞান শিক্ষার গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য হচ্ছে, চিন্তা-চেতনায় বিজ্ঞানকে গ্রহণ করা, জীবন ও কর্মে বিজ্ঞান-মনস্ক হওয়া।

ছাত্র : তার মানে, বিজ্ঞান শিক্ষা লাভ করে মানুষ যুক্তিবাদী হবে। জীবন ও জগৎকে যুক্তি, বৈজ্ঞানিক প্রমাণ ও বাস্তবতার আলোকে বিচার করতে শিখবে। তাই নয় কি স্যার?

শিক্ষক : অবশ্যই। বিজ্ঞান শিক্ষা এমন হওয়া উচিত যাতে মানুষ অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কার থেকে মুক্তি পায়। কেবল বিজ্ঞান শিক্ষায় শিক্ষিত নয়, আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত সবাইকেই বিজ্ঞান-মনস্ক হতে হবে।

ছাত্র : তাহলে বিজ্ঞান-মনস্কতা বলতে আমরা কী বুঝব স্যার?

শিক্ষক : শোনো, এক কথায় বিজ্ঞান-মনস্কতা হচ্ছে, জীবনে অন্ধভাবে সবকিছু মেনে না নিয়ে যুক্তির আলোকে তাকে বিচার করা। কার্য-কারণ সম্পর্ক যাচাই করে তাকে গ্রহণ করা।

ছাত্র : বিজ্ঞান শিক্ষা সত্ত্বেও বিজ্ঞান-মনস্কতার প্রসার কেন হচ্ছে না স্যার?

শিক্ষক : এ বিষয়টা আমাদের ভেবে দেখতে হবে। তবে আপাতত মনে হচ্ছে, বিজ্ঞান শিক্ষার সঙ্গে এখন দর্শন ও নৈতিক শিক্ষার কোনো যোগ নেই। ফলে জীবন সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক ও মানবিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রসার ঘটছে না। ফলে অনেক ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের অপব্যবহারও ঘটছে।

ছাত্র : জনজীবনে এই বিজ্ঞান-মনস্কতার প্রসার কীভাবে ঘটতে পারে, স্যার?

শিক্ষক : এ বিষয়টা আমাদের ভেবে দেখতে হবে। তবে আপাতত মনে হচ্ছে, বিজ্ঞান শিক্ষার সঙ্গে এখন দর্শন ও নৈতিক শিক্ষার কোনো যোগ নেই। ফলে জীবন সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক ও মানবিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রসার ঘটছে না। ফলে অনেক ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের অপব্যবহারর ঘটছে।

ছাত্র : জনজীবনে এই বিজ্ঞান-মনস্কতার প্রসার কীভাবে ঘটতে পারে, স্যার?

শিক্ষক : আমার মনে হয় প্রথমেই বিজ্ঞান শিক্ষার সঙ্গে দর্শন ও নৈতিক শিক্ষার যোগাযোগ ঘটনো দরকার। তা ছাড়া পাড়ায় পাড়ায় ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিজ্ঞান ক্লাব ও বিজ্ঞান পাঠচক্র গড়ে তোলা দরকার। তা না হলে কেবল প্রাতিষ্ঠানিক ও চাকরিমুখী শিক্ষা দিয়ে জনজীবনে বিজ্ঞানসম্মততার উদ্বোধন ঘটাতে পারবে না।

ছাত্র : তাহলে তো স্যার, আমাদের কলেজে একটা বিজ্ঞান ক্লাব গঠন করা দরকার।

শিক্ষক : সেটা করলে তো খুবই ভালো হয়। দেখো, কোনো উদ্যোগ নিতে পারো কিনা।

ছাত্র : অবশ্যই চেষ্টা করব স্যার।

শিক্ষক : আশা করি, সফল হবে। আমিও তোমাদের সহযোগিতা করব।

ছাত্র : ধন্যবাদ স্যার। আসি।

শিক্ষক : ধন্যবাদ। এসো।

### ০২ দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি নিয়ে দুই বান্ধবীর সংলাপ।

সালমা : সাদিয়া তোর সঙ্গে দেখা হয়ে ভালোই হলো। চল আমার সঙ্গে, একটু মিষ্টির দোকানে যাব। বাসায় মেহমান এসেছে।

সাদিয়া : বেশ চল। 'প্রাইম সুইটস'-এ যাবি? সেখানকার মিষ্টি কিন্তু খুব ভালো।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



সালমা : দামটাও খুব ভালো। এমন কিছু মিষ্টি আছে যেগুলোর কেজি ১২০০ টাকা। আমার বড়ভাই কী বলেন জানিস, ওদের ছেলেবেলায় নাকি এক টাকায় ষোলটা রসগোল্লা পাওয়া যেত। বেশ বড় সাইজের।

সাদিয়া : ওফ! সেসব কি সুখের দিনই না তাঁদের গেছে।

সালমা : তুই যা ভাবছিস ঠিক তা নয়। তখন লোকের হাতে টাকাও কম ছিল।

সাদিয়া : কিন্তু এখন লোকের যেমন আয় বেড়েছে জিনিসপত্রের দামও বেড়েছে তার চেয়ে অনেক বেশিগুণ।

সাদিয়া : শুধু বেড়েছে বলছিস কেন? বল ক্রমাগত বেড়েই চলছে। লাগামহীন পাগলা ঘোড়ার মতো।

সালমা : হা-হা-হা।

সাদিয়া : তুই হাসছিস কেন? বিষয়টি কি হাসির? তুই কি ভেবে দেখেছিস স্বল্প আয়ের মানুষদের জন্য এটা কত বড় ভোগান্তির বিষয়, কষ্টের বিষয়।

সালমা : ঠিকই বলেছিস। অন্যান্য দেশে শুনেছি জিনিসের দাম সরকার ঠিক করে দেয়। অন্যান্য জিনিসের দাম বাড়লেও খাবার জিনিসের দাম খুব একটা বাড়ে না।

সাদিয়া : কিছুদিন আগে সরকার নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য ঠিক করে বাজারে তালিকা টানিয়ে রাখার নিয়ম করেছিলেন। কিন্তু সঠিক তদারকির অভাবে সেটাও ভেস্তে গেছে।

সালমা : আচ্ছা সাদিয়া, জিনিসের দাম ক্রমাগত বেড়েই চলছে কেন বলত?

সাদিয়া : প্রথমত, আমাদের দেশে চাহিদার তুলনায় উৎপাদন কম। দ্বিতীয়ত, অনুন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা; আর রাস্তার স্থানে স্থানে চাঁদাও নাকি দিতে হয়। আরেকটি বিষয় আছে, সেটি হলো জিনিস মজুদ রেখে কৃত্রিমভাবে অভাব সৃষ্টি করে দাম বাড়িয়ে দেয়া।

সালমা : তুই ঠিক ঠিকই বলেছিস। কিন্তু দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধিতে সরকারের দায়-দায়িত্বই তো বেশি। প্রশাসনিকভাবে সরকার আড়তদার, মজুদদারদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ নিলে নিশ্চয়ই ভালো ফল পাওয়া যাবে।

সাদিয়া : সবচেয়ে বেশি জরুরি নির্বিঘ্নে পণ্য পরিবহনের ব্যবস্থা করা।

সালমা : চাহিদা অনুযায়ী উৎপাদনও বাড়াতে হবে। আমাদের দেশে তো জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে ১৬ কোটিতে এসে দাঁড়িয়েছে। এ বিশাল জনসংখ্যার রসদ যোগান দেয়া সহজ কাজ নয়।

সাদিয়া : হা-হা-হা। বস্তুত, দায়িত্বটা শুধু সরকারের একার নয়, জনগণেরও। বিশেষত, উৎসব-আয়োজনে পরিমিতিবোধের দিকে লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন।

সালমা : মোদ্দা কথা হলো আমাদের সবারই সচেতন হওয়া প্রয়োজন।

## ০৩ ভবিষ্যৎ জীবন নিয়ে দুই পরীক্ষার্থী বন্ধুর সংলাপ।

মিলন : সিয়াম, তুমি তো দেখছি সারাক্ষণই পড়ছ, এত পড়ে লাভ কী বলতো?

সিয়াম : বলছ কি মিলন। সামনে পরীক্ষা, না পড়লে চলবে কেন? আমি তো বলি, তোমার আরও পড়াশোনা করা উচিত।

মিলন : আমি যে তা ভাবি না, তা নয়, তবে কি জানো, বিশেষ উৎসাহ পাই না। বাবা-মায়ের ইচ্ছে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ি। আমার কিন্তু একটুও ইচ্ছে হয় না ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ার।



সিয়াম : আসলে কি জানো, আমাদের নিজেদের ইচ্ছেমতো আমরা ভবিষ্যৎ গড়ে তুলতে পারি না। আমাদের ভবিষ্যৎ গড়ে ওঠে অভিভাবকদের ইচ্ছেয়। একটু মেধাবী হলে তো কথাই নেই, হয় ডাক্তারি পড়, নয়তো ইঞ্জিনিয়ারিং পড়। যেন এছাড়া আর কিছু পড়ার নেই, করার নেই। আসলে আমাদের অভিভাবক খোঁজে নিশ্চিত টাকা রোজগারের একটা পেশা।

মিলন : তুমি ঠিক বলেছ সিয়াম। সেই সঙ্গে বেশির ভাগ ছেলেমেয়ের জীবনে কি নিদারুণ আশাভঙ্গের ইতিহাস জড়িয়ে থাকে ভেবে দেখেছ। উচ্চ মাধ্যমিক পাসের পর কতজন ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ভর্তির সুযোগ পায় বলো তো। ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ার হবার আশা নিয়ে যারা ভর্তির সুযোগ পেল না তাদের কথা ভেবে দেখেছ কি?

সিয়াম : লেখাপড়ার সঙ্গে জীবিকার প্রশ্ন চিরকালই জড়িয়ে থাকবে। কিন্তু সেই সঙ্গে কার কোনদিকে প্রবণতা সেটাও বিবেচনায় রাখা প্রয়োজন।

মিলন : আচ্ছা সিয়াম, তুমি ভবিষ্যৎ জীবনের কথা কিছু ভেবেছ?

সিয়াম : এসএসসি পাসের পরেই আমি আমার জীবনের একটা লক্ষ্য স্থির করেছি। তুমি তো জানো আমার এসএসসির ফল ভালোই হয়েছে। ইচ্ছে করলে বিজ্ঞান পড়তে পারতাম। কিন্তু আমি মানবিক বিভাগই বেছে নিয়েছি। আমার ইচ্ছে ভবিষ্যতে আমি একজন ভালো সাংবাদিক হবো। সেটা আমার পেশাও হবে, আর হবে আমার সামাজিক দায়িত্ব পালনের নেশা।

মিলন : বাড়ি থেকে কোনো বাধা পাওনি।

সিয়াম : আমার বাড়ির সবাই আমার ইচ্ছাকে মেনে নিয়েছেন। মা যেহেতু শিক্ষিকা, তাঁর ইচ্ছে ছিল শিক্ষাজীবী হই। মাকে বোঝালাম সাংবাদিকতাও তো কলম-পেশাই। মা সহাস্যে মেনে নিলেন। আচ্ছা মিলন, তুমি ভবিষ্যৎ জীবন কেমন করে গড়ে তুলতে চাও?

মিলন : আমি একজন অর্থনীতিবিদ হতে চাই। সত্যি সিয়াম, মাঝে মাঝে মনে হয়, এ দেশের অর্থনৈতিক কাঠামোর মধ্যে কোনো গোলমাল আছে। নইলে এত দারিদ্র্য, এত অপচয়, এত বৈষম্য কেন? এসব সমস্যার কি কোনো সমাধান নেই? অন্তর থেকে আমি একজন অর্থনীতির ছাত্র হতে চাই।

সিয়াম : তোমার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা খুব ভালো মিলন। আর একজন ভালো অর্থনীতিবিদ হতে হলে যে বেশ করে পড়াশোনা করা দরকার সেটা নিশ্চয় জানো। নতুন উদ্যমে এবার পড়া শুরু করে দাও।

মিলন : তোমার সঙ্গে কথা বলে আমার উৎসাহ আরও বেড়ে গেল, সিয়াম। আমিও তোমার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করিছি।

## ০৪ চিকিৎসক ও রোগীর সংলাপ।

রোগী : আসতে পারি?

ডাক্তার : আসুন। বসুন। আপনার নাম? বয়স কত? বলুন আপনার কী সমস্যা?

রোগী : নাম সাকিব শাহরিয়ার। বয়স ২৪। সমস্যা হলো, আমার ঘুম আসে না। সারাক্ষণই অস্থির লাগে।

ডাক্তার : রাতে কটায় ঘুমাতে যান? কতক্ষণ ঘুমান আপনি?

রোগী : রাত বারোটা-একটায়। তিন থেকে চার ঘণ্টার বেশি ঘুম হয় না।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



ডাক্তার : আপনি কী করেন?

রোগী : আমি জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ম্যানেজমেন্টে মাস্টার্স করছি। সামনেই আমার ফাইনাল পরীক্ষা।

ডাক্তার : তাহলে আপনার লেখাপড়া প্রায় শেষ পর্যায়ে। প্রস্তুতি কেমন?

রোগী : প্রস্তুতি বেশ ভালোই। তবে এখন পড়ালেখায় যথেষ্ট ব্যাঘাত হচ্ছে। মন বসাতে পারছি না।

ডাক্তার : কত দিন থেকে এমন হচ্ছে?

রোগী : প্রায় এক মাস। সারাক্ষণ দুর্বল লাগে, মাথা ব্যথা করে।

ডাক্তার : বিশ্ববিদ্যালয়ে আপনার বন্ধু কয় জন?

রোগী : বন্ধু আছে অনেক। তবে ঘনিষ্ঠ বন্ধু চার-পাঁচ জন।

ডাক্তার : পড়তে ভালো না লাগলে কী করেন?

রোগী : টিভি দেখি।

ডাক্তার : ঘুম না এলে কী করেন?

রোগী : তখনও টিভি দেখি?

ডাক্তার : হুমম। কিন্তু বেশিক্ষণ ধরে টিভি দেখা তো ঠিক না। এতে তো মানুষের সৃষ্টিশীলতা সীমিত হয়ে পড়ে।

রোগী : ঠিক বুঝতে পারলাম না, স্যার।

ডাক্তার : বুঝিয়ে বলছি। যেমন ধরুন, আপনি বিভিন্ন ধরনের বই পড়তে পারেন কিংবা ছবি আঁকতে বা ডায়েরি লিখতে পারেন। এতে আপনার চিন্তার প্রসার হবে। তখন দেখবেন ছোটখাটো ব্যাপার নিয়ে আপনি আর অস্থির হয়ে যাচ্ছেন না। এছাড়াও হয় খেলাধুলা, না হয় রোজ অন্তত আধ ঘন্টা ব্যায়াম করতে হবে। তাতে আপনার ক্ষুধা বাড়বে, ঘুম ভালো হবে। আর চেষ্টা করেন সহপাঠীদের সাথে মিশতে, তাদের সঙ্গে পড়ার বিষয় নিয়ে নিয়মিত আলাপ-আলোচনা করতে। দেখবেন ভালো বন্ধু পেলে আপনার আর মন খারাপ লাগবে না।

রোগী : তবে কী আমার কোনো শারীরিক সমস্যা নেই?

ডাক্তার : সম্ভবত নেই। তবে আমি একটু আপনাকে চেক করব। পাশের বেডে শুয়ে পড়ুন। [রোগী বিছানায় শোয়। ডাক্তার স্টেথিস্কোপ দিয়ে তার বুক পরীক্ষা করেন। নাড়ির স্পন্দন অনুভব করেন। তারপর বুক ও পেটের বিভিন্ন জায়গায় চাপ দিতে থাকেন।] কোথাও কি ব্যথা পাচ্ছেন?

রোগী : জি না।

ডাক্তার : ঠিক আছে। মনে হচ্ছে, আপনার কোনো শারীরিক সমস্যা নেই। তবু আপনার রক্তশূন্যতা আছে কিনা তা পরীক্ষা করতে দিচ্ছি। রিপোর্ট পাওয়ার পর আসুন। আমি রিপোর্ট দেখে প্রয়োজন হলে ওষুধ লিখে দেব।

রোগী : ধন্যবাদ স্যার। আপনার পরামর্শ অবশ্যই মেনে চলার চেষ্টা করব। আসি।

ডাক্তার : ঠিক আছে। ভালো থাকবেন।



### ০৫ গ্রীষ্মের ছুটিতে কোথায় বেড়াতে যাওয়া হবে তার পরিকল্পনা নিয়ে দু বান্ধবীর সংলাপ।

শশী : পরীক্ষা তো শেষ হলো, সামনে একমাস গ্রীষ্মের ছুটি। ছুটিতে কক্সবাজার বেড়াতে যাব ভাবছি। তোর কী পরিকল্পনা?

ইভা : আমার কোনো পরিকল্পনা করতে হয়নি, শশী। বাবা-মা আগে থেকেই সিদ্ধান্ত করে রেখেছেন, আমার পরীক্ষা শেষ হলেই গ্রামের বাড়ি বেড়াতে যাবেন।

শশী : তুই তো কখনো কক্সবাজার যাসনি, ইভা। চল, এবার আমার সঙ্গে কক্সবাজার বেড়িয়ে আসবি। যদিও আমার পরিকল্পনাটা এখনো বাসায় বাবা-মাকে জানাইনি।

ইভা : তাহলে তো বেশ ভালোই হলো। আমি বলছি কি শশী, তুই চল আমার সঙ্গে। আমাদের গ্রামের বাড়ির পাশ দিয়ে ইছামতি নদী বয়ে গেছে। বিকেলে নদীর পাড়ে ঘোরার মজাটাই আলাদা। নদীর নির্মল বাতাস তোর সর্বাঙ্গে বুলিয়ে দেবে এক স্বাস্থ্যকর আমেজ, আর সবুজ গাছগাছালি তোর মনকে আরও সতেজ করে তুলবে।

শশী : তুই যে কাব্য শুরু করলি, ইভা।

ইভা : কাব্য যে বাস্তব নয়, তোকে কে বলল? গ্রীষ্মের ভর দুপুরে আমবাগানে গিয়েছিস কখনো। নিবিড় ছায়ায় গাছপাকা আম খাওয়ার মজা কেমন টের পেয়েছিস কোনোদিন? পুকুরে সাঁতার কাটা আর মাঠ ভরা ধান দেখার আনন্দ যদি জানতি। আর বিকেলে নদীর তীরে বেড়াতে বেড়াতে সূর্যাস্ত দেখা।

শশী : কিন্তু গ্রামে যে ভীষণ গরম ইভা।

ইভা : তুইতো গরমের দেশেরই মানুষ ইভা, গরমকে তোর ভয় কেন? আমি মোটেই গরম-কাতর-নরম-মেয়ে নই। তাছাড়া আমাদের গ্রামের বাড়িতে ইলেকট্রিসিটি আছে। গরম নিয়ে ভাবনার কোনো কারণ নেই।

শশী : তোর কথা শুনে মনে হচ্ছে আমিও তোর সঙ্গী হয়ে যাই।

ইভা : সত্যি যদি, আমি নিশ্চিতভাবে বলতে পারি আমাদের গ্রামের বাড়ি তোর ভালো না লেগে পারবে না।

শশী : হয়তো তাই। অসাধারণের পেছনে ছুটোছুটি করতে গিয়ে সাধারণ জিনিস দেখার মন আমরা হারিয়ে ফেলি।

ইভা : কবির কথায়, 'দেখা হয় নাই চক্ষু মেলিয়া একটি ধানের শীষের উপর একটি শিশির বিন্দু।'

শশী : চল, তোর সঙ্গে গ্রামের বাড়ির সেই শিশির বিন্দুর খোঁজেই যাই। বাবা-মার কাছ থেকে অনুমতিটা পেলেই হলো।

ইভা : অবশ্যই অনুমতি দেবেন।

শশী : তাই যেন হয়।

### ০৬ বইমেলা নিয়ে দুই বন্ধুর মধ্যে সংলাপ।

ফারুক : এবার বইমেলা থেকে কী বই কিনলে, নয়ন?

নয়ন : বইমেলায় গিয়েছিলাম, কিন্তু বই কিনিনি। কেবল ক্যাটালগ সংগ্রহ করেছি।

ফারুক : কেন? কেনার মতো কোনো বই পাওনি? বইমেলার প্রধান উদ্দেশ্য তো পাঠকদের সঙ্গে বইয়ের সংযোগ ঘটিয়ে দেয়া।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



নয়ন : শুধু বইয়ের সঙ্গে পাঠকের যোগাযোগের কথা বলছ কেন? এছাড়া আছে পাঠকের সঙ্গে পাঠকের যোগ, পাঠকের সঙ্গে লেখকের ও প্রকাশকের যোগ। এই চতুর্বর্গ যোগাযোগেই না বইমেলার সার্থকতা। বইমেলাতে আমি নিছক ক্রেতা নই। আমি একজন গ্রন্থপ্রেমী হিসেবেই সেখানে গিয়েছিলাম।

ফারুক : আমি কিন্তু 'বাংলা একাডেমি প্রমিত বাংলা ভাষার ব্যাকরণ' বইটি কিনেছি। খুব মূল্যবান বই, বই কেনার তালিকা থেকে এটি যেন বাদ না যায়।

নয়ন : ঠিকই বলেছ। বাংলা একাডেমি বইমেলা উপলক্ষে ৪০% কমিশনে দিচ্ছে। একাডেমি প্রকাশিত অভিধানসহ বেশ কয়েকটি বইয়ের নাম আমি লিখে রেখেছি।

ফারুক : বাহ, তুমি দেখছি মেলা থেকে অনেক বই কিনছো। তোমার কাছ থেকে বই নিয়ে পড়া যাবে। চাইলে দিও কিন্তু।

নয়ন : অবশ্যই দেব।

ফারুক : জানো নয়ন, মেলার অধিকাংশ স্টলে মাত্র ২০% কমিশন দিচ্ছে।

নয়ন : না, এরকম তো হওয়ার কথা নয়। মেলায় ৩০% কমিশনে বই বিক্রির নিয়ম রয়েছে। তুমি কি এটা জান না?

ফারুক : নয়ন তাহলে আমি কি বই কিনে ঠকেছি?

নয়ন : বিষয়টা হার-জিতের প্রশ্ন নয়। মেলায় এরকম অসাধু ব্যবসায়ী থাকবেন এটা আশা করা যায় না। আবার হিসাবেও ভুল হতে পারে। আবার একটু হিসাব করে দেখো তো।

ফারুক : হিসাবের আর প্রয়োজন নেই। তুমি যে আমাকে সচেতন করে দিলে এটাই আমার জন্য অনেক বড় পাওয়া হলো। এ নিয়ে বিক্রেতার সঙ্গে কিংবা নিজের সঙ্গে গোলমালে জড়াতে চাই না, বাবা।

নয়ন : আমি কী মনে করি জানো? ছাত্রদের জন্য একটা বিশেষ কমিশনের ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। তাহলে শিক্ষার্থীদের বই কেনা ও বই পড়ায় প্রতি আগ্রহ বাড়বে।

ফারুক : কিন্তু বন্ধু, 'বই কিনে কেউ কখনো দেউলিয়া হয়নি।'

নয়ন : শুনেছি, মেলায় এবার বিদেশি বইয়ের প্রাচুর্য খুব বেশি।

ফারুক : তেমন না। তবে অনেক দামি দামি বই আছে। এনসাইক্লোপিডিয়া জাতীয় বইগুলোকে তো ছোঁয়াই যায় না। প্রাচীন চিত্রকলার ওপর একটি বই খুব পছন্দ হয়েছিল, কিন্তু দাম শুনে পিছিয়ে আসতে হলো।

নয়ন : আমি কালই মেলায় যাব। আরও একবার যাবে নাকি আমার সঙ্গে?

ফারুক : অবশ্যই যাব। তোমার সঙ্গে মেলায় ঘুরে একটা নতুন অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে চাই। পছন্দ হলে দু-একটি বইও যে কিনবো না, এমন নয়।

## ০৭ সংস্কৃতি ও অপসংস্কৃতি নিয়ে দুই বন্ধুর সংলাপ।

মুকুল : অপসংস্কৃতি বলে চেঁচানো আমাদের একটা ম্যানিয়া হয়ে দাঁড়িয়েছে।

সুমন : 'অপ' শব্দের অর্থ খারাপ। সংস্কৃতির ক্ষেত্রে খারাপ কিছু দেখলে অপসংস্কৃতি বলা তো অন্যায় নয়, দোষেরও নয়।



মুকুল : দেখ, সুমন, আমরা বড় বেশি রক্ষণশীল। প্রচলিত পুরনো পথে হাঁটতে আমরা অভ্যস্ত। তার একটু ব্যতিক্রম হলেই বা তাতে একটু নতুনত্ব এলেই আমাদের গেল গেল রব। হিন্দি সিনেমার গান, পশ্চিমা রক-পপের অনুপ্রবেশ মাত্রকেই আমরা সর্বনাশের কারণ বলে ভয়ে সিঁটিয়ে থাকি। অপসংস্কৃতি বলে চেঁচিয়ে দেশ মাথায় করি।

সুমন : ওভাবে ভাবছিস কেন?

মুকুল : কীভাবে ভাববো বল।

সুমন : আগে সংস্কৃতি-অপসংস্কৃতির বোধটা পরিষ্কার করে নিই।

মুকুল : তাই হোক।

সুমন : শিক্ষা-দীক্ষা, গান, নাচ, নাটক এসবের একটা সাধারণ নাম হলো সংস্কৃতি। একেই ইংরেজিতে বলা হয় কালচার। কেউ বা কালচারের প্রতিশব্দ কৃষ্টি বলেন।

মুকুল : বুঝলাম। তারপর?

সুমন : এখন দেখতে হবে সংস্কৃতির ধারক ও বাহক কী?

মুকুল : সংবাদপত্র, বই, সিনেমা, টেলিভিশন, বেতার, ভিডিও, বিজ্ঞাপন ইত্যাদি।

সুমন : এগুলোই হলো এক অর্থে সংস্কৃতির উপকরণ। এদের ব্যবহারের ও পরিবেশনের দায়-দায়িত্ব অপরিসীম। এরাই মানুষকে শিক্ষা দেয়, মানবিক মূল্যবোধ গড়ে তোলে, দেশাত্মবোধের উদ্বোধন ঘটায়, পারস্পরিক মমত্ব-সহানুভূতি-সহমর্মিতার বোধ জাগায়, প্রেম-প্রীতি-ভালোবাসার বিকাশ ঘটায়।

মুকুল : বুঝেছি, একেই বলে সুস্থ সংস্কৃতি।

সুমন : ঠিক ধরেছিস। বিপরীত হলেই অপসংস্কৃতি। যা মানুষকে বিকৃত রুচির পথে ঠেলে দেয়, অবক্ষয়ের পথে চালিত করে, মানুষের মহৎ ভাবনা-চিন্তার অবলোপ ঘটায়, মানুষের প্রতি মানুষের দায়-দায়িত্ব কর্তব্যবোধ ধ্বংস করে, ঘৃণায় বিদ্বেষে-জিঘাংসায় অমানুষ করে তোলে, তাকে মানুষের শুভবোধের পরিচয় বলবি? তাকে সংস্কৃতি, না অপসংস্কৃতি বলবি?

মুকুল : তা না হয় হলো। কিন্তু পশ্চিমা ঝড়ের তাণ্ডব ঘরের যাবতীয় জিনিসপত্র লণ্ডভণ্ড করে দেয় বলে কি সারা বছর ঘরের দরজা-জানালা রুদ্ধই থাকবে? বাইরের আলো হাওয়ার অবাধ চলাচলের পথ না থাকলে ঘরের মানুষটা বাঁচবে কী করে?

সুমন : না, প্রবেশের সুযোগ অবশ্যই থাকবে। তবে অবাঞ্ছিতকে বর্জন করে কেবল বাঞ্ছিতটুকু নেবার যথার্থ গ্রহণী-ক্ষমতা ও সেই নির্বাচনী-মানসিক দৃঢ়তা থাকা দরকার। দিবে আর নিবে মিলাবে মিলিবে—এই উদার সমন্বয়ী মনোভাবের মধ্য দিয়েই তো জ্ঞান-বিজ্ঞান, সাহিত্য-সংস্কৃতি সব কিছুরই উৎকর্ষ সম্ভব।

মুকুল : তাহলে বল, বাধাটা কেবল সুস্থতার অন্তরায় যেটুকু।

সুমন : অবশ্যই।

## ০৮ ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থী ও ভর্তি কর্মকর্তা : প্রসঙ্গ কলেজ ভর্তির প্রক্রিয়া।

শিক্ষার্থী : আসসালামু আলাইকুম, একটি তথ্য জানতে চাচ্ছিলাম স্যার।

ভর্তি কর্মকর্তা : বলো, তোমাকে কীভাবে সাহায্য করতে পারি?

শিক্ষার্থী : আমি এ কলেজে ভর্তির প্রক্রিয়া সম্পর্কে জানতে চাচ্ছিলাম, স্যার।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



ভর্তি কর্মকর্তা : আমাদের কলেজে ভর্তির প্রক্রিয়া অত্যন্ত সহজ। প্রথমে তুমি আমার কাছ থেকে একটি ভর্তি ফর্ম কিনে তা যথাযথভাবে পূরণ করবে। এখানে কলেজের ব্যাংক একাউন্ট নম্বর রয়েছে। ব্যাংক একাউন্টে ভর্তি ফি হিসেবে প্রয়োজনীয় পরিমাণ টাকা জমা করে এখানে রশিদটি ফর্মটির সাথে জমা দেবে।

শিক্ষার্থী : তাহলে আপনি আমাকে একটা ক্রমিক নম্বর দেবেন?

ভর্তি কর্মকর্তা : না। আমি তোমাকে একটি প্রবেশপত্র দেব। তোমাকে ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হবে। তুমি যদি ঐ দিন এ কার্ডটি সাথে আনতে ভুলে যাও, তাহলে তোমাকে পরীক্ষা দিতে দেয়া হবে না। সুতরাং সাবধান থাকবে, যেন এটা ভুলে রেখে না আসো।

শিক্ষার্থী : আর আমি যদি পর্যাপ্ত নম্বর না পাই, তাহলে কী হবে?

ভর্তি কর্মকর্তা : তুমি যাচাই পরীক্ষায় কত নম্বর পেলে তার দ্বারা আমাদের এখানে ভর্তির যোগ্যতা নির্ভর করবে না। আমরা শ্রেষ্ঠ ফলাফলকারী শিক্ষার্থীদের মধ্য থেকে প্রথম ৩০০ জন বেছে নেব।

শিক্ষার্থী : তার মানে, আমি যদি শ্রেষ্ঠ ফলাফলকারী প্রথম ৩০০ জনের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হই, তাহলে ভর্তির অনুমতি পাব, তাই না?

ভর্তি কর্মকর্তা : ঠিক বলেছ। এছাড়া তোমাকে একটি সাক্ষাৎকার পরীক্ষারও মুখোমুখি হতে হবে। লিখিত পরীক্ষায় ৮০ এবং মৌখিক পরীক্ষায় ২০ নম্বর। তুমি সর্বমোট যত নম্বর পাবে, তার ভিত্তিতে তোমার যোগ্যতাকে যাচাই করা হবে।

শিক্ষার্থী : তাইতো দেখছি। এ তো বরং একটা বড়সড় যুদ্ধ।

ভর্তি কর্মকর্তা : আর এজন্যই তো তোমাকে একজন বড় যোদ্ধা হতে হবে। তোমার অস্ত্রপাতি নিয়ে সুযোগটির প্রতি ঝাঁপিয়ে পড়ো।

শিক্ষার্থী : আপনার উপদেশের জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ, স্যার।

## ০৯ দুই বন্ধু নিশি ও নিপা। বিয়ে বাড়িতে অনুষ্ঠানের প্রসঙ্গ নিয়ে তাদের মধ্যে সংলাপ।

নিশি : তুই বললি বলেই না লাল শাড়ি পরেছিলাম, পার্লারে গিয়ে সেজে এসেছিলাম অথচ তুই গেলি না। দে, এবার পার্লারের বিলের টাকা দে। না, না, কোনো অজুহাত শুনতে চাই না....

নিপা : তোকে তো আগেই বলেছিলাম, চাচিকে রাজি করাতে পারলে যাব। কিন্তু ... । তোর মতো আমি তো আর সুখে নেই রে। তুই চাইলেই যা খুশি করতে পারিস। আমি গ্রামের মেয়ে, চাচার বাসায় থেকে পড়ালেখা করি। আমার সমস্যা তুই বুঝবি না। ... । বাদ দে, তার চেয়ে বল, বর কেমন দেখলি?

নিশি : বর? মন্দ না। বয়স অবশ্য একটু বেশি। বেটে, মোটা, কালো। তবে বোঝা যায় টাকাওয়ালা।

নিপা : খাওয়া-দাওয়া কেমন করলি?

নিশি : কমন মেন্যু : রোস্ট, রেজালা, বোরহানি, দই, মিষ্টি। বাড়তি অবশ্য রুই না কী মাছ যেন ছিল।

নিপা : খেয়ে বুঝতে পারলি না কী মাছ?

নিশি : বিয়ে বাড়িতে গিয়ে আমি কখনও খাই না। তাছাড়া এখন আমি ডায়েটিং করছি। তুই গেলে অবশ্য পেটপুরে খেতে পারতি। চাচার বাসায় কী না কী খাস।



## ১০ বাবা এবং ছেলের মধ্যে পড়াশুনো নিয়ে সংলাপ।

বাবা : রনি! তোমার পড়াশোনা কেমন চলছে?

রনি : ভালো, বাবা, কিন্তু আমি নিশ্চিত নই যে, আমি সঠিক দিকে এগোচ্ছি কি না।

বাবা : তুমি কী বোঝাতে চাচ্ছ? তুমি কি বলতে চাচ্ছ যে তোমার ভালো প্রস্তুতি হয়নি?

রনি : ঠিক তা নয়। সত্যিকার অর্থে আমার মনে হয় মোটামুটি ভালো প্রস্তুতি আছে কিন্তু কেউই একশভাগ আত্মপ্রত্যয়ী হতে পারে না, পারে কি?

বাবা : আচ্ছা, দেখি এদিকে এসো। তোমার সমস্যা খুলে বলো।

রনি : তুমি কী জানতে চাও?

বাবা : কোন বিষয়গুলোকে তুমি সবচেয়ে বেশি কঠিন বলে মনে কর?

রনি : আমার কাছে গণিত, উদ্ভিদবিদ্যা এবং ইংরেজি কঠিন মনে হয়।

বাবা : এই ব্যাপার। ঠিক আছে, তাহলে ওগুলো থেকে গুরুত্বপূর্ণ পাঠগুলো প্রতিদিন বেশি বেশি পড়বে এবং অন্যান্য বিষয়ও প্রত্যেকটি একদিন পর একদিন পড়ো।

রনি : ঠিক আছে বাবা।

বাবা : তোমার নতুন ইংরেজি শিক্ষক সম্পর্কে তোমার মতামত কী? সে কেমন শেখায়?

রনি : হ্যাঁ, উনি সত্যিকারেই ভালো শেখান এবং তিনি যে অনেক জানেন তা অস্বীকার করার উপায় নেই। কিন্তু ...

বাবা : কিন্তু কী ... ?

রনি : আমার মনে হয় কারো কাছ থেকে ইংরেজি শেখার চেয়ে তা বরং নিজ থেকে শেখা উচিত।

বাবা : শুনতে ভালোই লাগছে, কিন্তু (তোমার কথা) বোঝার জন্য আমার একটু বেশি শোনা প্রয়োজন।

রনি : আমি বোঝাতে চাচ্ছি, পাঠ শিখে বা মুখস্থ করে ইংরেজি শেখা সত্যিকার অর্থে কঠিন।

বাবা : হ্যাঁ, তা ঠিক। কিন্তু তোমাকে শুধু ঐ অর্থে শেখার ব্যাপারে নয়, তোমার পরীক্ষার ব্যাপারেও ভাবতে হবে।

রনি : তা জানি এবং সে কারণেই আমি না বলছি না।

বাবা : আচ্ছা, লক্ষ্য কর রনি, তোমার জ্ঞানেরও প্রয়োজন এবং সার্টিফিকেটেরও প্রয়োজন, তাই নয় কি?

রনি : হ্যাঁ, বাবা।

বাবা : আমি বুঝতে পারি তুমি মুখস্থ করাকে ঘৃণা কর। কিন্তু তুমি যদি শিখতে চাও তাহলে বুদ্ধিবৃত্তিক উন্নয়নের একটি নির্দিষ্ট পর্যায়ের পর তোমার জন্য আর কিছু মুখস্থ করা লাগবে না।

রনি : আমিও তাই আশা করি বাবা।

## ১১ বদমেজাজি মালিক জালাল তালুকদার ও ধুরন্ধর ড্রাইভার শাকিল। গাড়ির ক্রমবর্ধমান জ্বালানি খরচ নিয়ে তাদের মধ্যে সংলাপ।

মালিক : নাহ্, শাকিল তোমাকে রেখে আমার আর চলছে না।

ড্রাইভার : স্যার কী কিছু বললেন?

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



মালিক : তোমাকে এক কথা আর কতবার বলব? বলছি, তোমাকে রেখে আমার আর পোষাচ্ছে না। দিন দিন তো তোমার সিএনজি খরচ বেড়েই চলছে। সমস্যা কী?

ড্রাইভার : এটার আমি কী জানি স্যার।

মালিক : ওই দিন না গ্যাস বেশি খায় বলে গাড়ির কাজ করিয়ে আনলে?

ড্রাইভার : কাজ তো আপনার পরিচিত লোকেরাই করল। আমি তো বলেছিলাম রহিম ভাইয়ের ওইখানে নিয়ে যেতে। আপনিই না বললেন বারিধারা নিয়ে যাও, আমার পরিচিত লোক আছে।

মালিক : গত রবিবার তেজগাঁওয়ের পেট্রোল পাম্পের বিল দিয়েছো কিন্তু ওই দিকে তো যাওনি?

ড্রাইভার : জ্যামের জন্যই তো ওই পথ দিয়ে যেতে হলো। তাই ওই দিক থেকেই সিএনজি নিয়েছি।

মালিক : গতকাল গাবতলী বাসস্ট্যান্ডে কেন গিয়েছিলে?

ড্রাইভার : হয়েছে কী স্যার, আমার খালাতো ভাই-ভাবির সাথে রাস্তায় দেখা। তারা গাড়ি পাচ্ছিল না। এই জন্য একটু এগিয়ে দিয়ে এসেছিলাম আর কি-

মালিক : সন্ধ্যার পর এক ঘণ্টা কাজ করালেও প্রতিদিন বাড়তি একশো করে টাকা দেওয়া লাগে, আর আমার গাড়িতে তোমার আত্মীয় নিয়ে গিয়ে বিল ধরিয়ে দাও আমার হাতে। তা-ও সহ্য হতো যদি সে আত্মীয় আসলেই তোমার আত্মীয় হতো! খ্যাপ মারা তোমার পুরানো অভ্যাস-

ড্রাইভার : না স্যার, এত সন্দেহ হলে তো আর থাকা যায় না। আমাকে বাদ দিয়ে দেন।

মালিক : আমি তো বাদ দিতেই চাই, কিন্তু তোমার ম্যাডামের জন্যই তো পারি না। সামনের মাস থেকে তোমার বেতন তোমার ম্যাডামের কাছ থেকে নেবে।

ড্রাইভার : ঠিক আছে। ম্যাডাম আপনার মতো এত হিসাব করে না।

মালিক : কি বললে?

ড্রাইভার : না, বললাম কোন দিকে যাব স্যার?

## ১২ নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের উচ্চাভিলাষী কন্যা লাবণী ও নিরীহ মা : প্রসঙ্গ হিন্দি ছবির নায়িকা হওয়ার প্রবল আত্মবিশ্বাস।

মা : তুই নায়িকা হবি? বলিস কী?

লাবণী : কেন, আমার কথা তোমার বিশ্বাস হচ্ছে না বুঝি? পত্রিকায় পড়োনি, হিন্দি সিনেমার বড় বড় নায়িকারা এক সময় এক্সট্রা ছিল। তারা খুব সাধারণ পরিবার থেকে সুপারস্টার হয়েছে। আমিও হব।

মা : কিন্তু-

লাবণী : কিন্তু কী?

মা : তাদের তো সে যোগ্যতা ছিল-

লাবণী : মা হয়ে এমন কথা তুমি বলতে পারলে, ছি! মানলাম, আমার হাইট একটু কম কিন্তু ৪ ফিট ১১ ইঞ্চিকে কী শর্ট বলা যায়? বলো, কী চুপ করে আছ কেন? ও গায়ের রঙের কথা বলবে তো, জানি। শোনো মা, আজকাল ফর্সা মেয়েদের কোনো কদর নেই, বুঝলে? মুম্বাই ফিল্মের দুধে-আলতারঙা নায়িকাগুলোর হাঁড়ির খবর সব আমি জানি- সবগুলোই কালো পেত্নি, বুঝলে! কিন্তু আমি কালো নই, শ্যামলা।



মা : কিন্তু তোমার নাক, ঠোঁট-

লাবণী : মা, আমার ভালো দিক কী কিছুই তোমার চোখে পড়লো না? চ্যাপটা নাকের মেয়েদের মধ্যে একটা কন্টিনেন্টাল ছাপ থাকে, বুঝলে? আর মোটা ঠোঁটের মেয়েরা ফিল্ম ইন্ড্রাস্ট্রিতে আলাদা একটা কদর পায়।

মা : তুই তো নাচ জানিস না, মারপিট জানিস না, তার কী হবে?

লাবণী : আহা, জানি না- শিখে নেবো। দেখো মা, আমি হবো এই দেশের টপ নায়িকা। বাংলা ছবিতে অভিনয় আমি করবো না। বেছে বেছে পরিচালকের সাথে কাজ করবো আমি। এই ধরো করন জোহর, সঞ্জয় লীলা বানসালি, রামগোপাল ভার্মা, রাকেশ রোশন- এঁদের সাথে। তা-ও স্ক্রিপ্ট যদি পছন্দ না হয়, সোজাসাপ্টা না করে দেবো।

মা : তাই নাকি!

লাবণী : এভাবেই তো নতুন নায়িকা হিট হয়। শাহরুখ খান, আমীর খান বা সালমান খানের মতো বুড়ো নায়কদের ছবি যে মাঝে মাঝে হিট হয় সেটা কিন্তু তাদের জন্য নয়- ওই ছবির নতুন নায়িকার জন্য।

মা : তুই একটু এই ঘর থেকে যাবি? আমার মাথা ব্যথাটা আবার বেড়েছে। একটা এইস আর একগ্লাস পানি দিবি, মা? তোর বাবা আজ সিএনজি চালাতে যাবে না? গিয়ে বল, ঘরে বাজার নাই। আর যাবার সময় লাইটটা অফ করে দিয়ে যা।

লাবণী : আমি আমার পরিকল্পনার কথা বলতে এলেই তোমার মাথা ধরে যায়, না? তোমাকে না কত বার বলেছি আমি নায়িকা হলেই তোমাদের সবাইকে নিয়ে মুম্বাই চলে যাব। জুহু বিচে বাংলো বাড়ি কিনব।

মা : আহ্, তুই যাবি?

লাবণী : যাচ্ছি, যাচ্ছি...

## ১৩ পার্সেল প্রেরক শিপলু ও পোস্টমাস্টার : প্রসঙ্গ বিদেশে পার্সেল পাঠানো।

শিপলু : আমি ইন্দোনেশিয়াতে একটা পার্সেল পাঠাতে চাচ্ছিলাম। আমাকে কী করতে হবে?

পোস্টমাস্টার : প্রথমে আপনাকে বলি, আপনি এ পোস্ট অফিস থেকে ৫ কেজির বেশি ওজনের পার্সেল পাঠাতে পারবেন না। আর আপনি কি পাঠাতে চান?

শিপলু : কিছু বই।

পোস্টমাস্টার : ও, আচ্ছা। তাহলে প্রথমে আপনাকে বইগুলো প্যাকেট করতে হবে। আপনি কাগজ বা কাপড় দিয়ে তা মুড়িয়ে নিতে পারেন। কিন্তু এটা নিশ্চিত করতে হবে যে, মোড়কটা যথাযথভাবে মোড়ানো হয়েছে, যেন ঝাঁকুনির কারণে ভেতরের জিনিস বের না হয়ে আসে।

শিপলু : বেশ। তারপর?

পোস্টমাস্টার : তারপর আপনাকে ডানে প্রাপকের ঠিকানা এবং বামে প্রেরকের ঠিকানা লিখতে হবে। আপনি অবশ্য প্রাপক ও প্রেরক উভয়ের টেলিফোন নম্বরও লিখতে পারেন।

শিপলু : আমাকে কি কোনো ফর্ম পূরণ করতে হবে?

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



পোস্টমাস্টার : না। ঐ সব কাজ আমিই করে দেব। এখন ... দাঁড়ান দেখে নিই ... এ পার্সেলের ওজন হলো দেড় কেজি এবং আপনাকে এর জন্য ১২০০ টাকা দিতে হবে।

শিপলু : এই নিন (টাকা)। সাহায্যের জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ।

পোস্টমাস্টার : আপনাকেও ধন্যবাদ।

## ১৪ ব্যায়াম করার উপকারিতা নিয়ে দুই বন্ধুর মধ্যে সংলাপ।

প্রীতম : এই সঞ্জয়! কেমন আছ?

সঞ্জয় : ভালো, তুমি কেমন আছ, প্রীতম?

প্রীতম : এই আছি আর কি।

সঞ্জয় : কেন, কোনো সমস্যা?

প্রীতম : ঠিক তা নয়। কিন্তু আমার আসলে তেমন ভালো লাগছে না।

সঞ্জয় : তোমার সমস্যার ব্যাপারে আমাকে বলো তো?

প্রীতম : আসলে, আমি এটাকে সমস্যা বলব কি না জানি না। আমি প্রাণচাঞ্চল্য অনুভব করছি না। আমি রাতে প্রায়ই ঘুমাতে পারি না কিন্তু দিনে আমার অবশ্যই ঘুমানো লাগে। তুমি তো দেখেছ যে আমি শ্রেণিকক্ষে ঘুমে ঢলে পড়ি।

সঞ্জয় : হ্যাঁ, বুঝেছি। কিন্তু আমার ধারণা তোমার সমস্যা খারাপ থেকে আরো খারাপ হবে যদি ...

প্রীতম : যদি ...? যদি কী বলো?

সঞ্জয় : যদি তুমি ব্যায়াম না করো।

প্রীতম : তুমি কি ব্যায়াম করো?

সঞ্জয় : হ্যাঁ করি। এবং এ কারণেই আমি উদ্যমী অনুভব করি। আমার কাজ করার শক্তিও আছে। আমার রাতে গভীর ঘুম হয় আর এজন্য আমাকে ক্লাসরুমে ঘুমানোর প্রয়োজন পড়ে না।

প্রীতম : সম্ভবত ব্যায়াম স্বাস্থ্য গঠন করে।

সঞ্জয় : তুমি 'সম্ভবত' বলছ কেন? এটাই সত্য। ব্যায়াম তোমার রক্ত চলাচলের প্রক্রিয়াকে ভালোভাবে সংঘটিত হতে সাহায্য করে। এটা অতিরিক্ত চিনি এবং চর্বি, যা দেহের গভীরে বেড়ে উঠতে চায় তাকে পুড়িয়ে ফেলে। এভাবে তা তোমাকে উচ্চ রক্তচাপ, হৃদরোগ, ডায়াবেটিস এবং অনেক ধরনের সাধারণ অসুস্থতা থেকে রক্ষা করে।

প্রীতম : বিষয়টি বুঝিয়ে বলার জন্য আমি তোমার কাছে কৃতজ্ঞ। আগামীকাল থেকে নিয়মিতভাবে ব্যায়াম করার জন্য আমি আমার মনকে প্রস্তুত করে ফেলেছি।

সঞ্জয় : এটা আসলেই খুব ভালো একটা সিদ্ধান্ত।

## ১৫ একজন শিক্ষক এবং একজন ডাক্তারের কাজের সাদৃশ্য নিয়ে দুই ছাত্রের মধ্যে সংলাপ।

ছাত্র-১ : তুমি তো জান যে আমাদের শিক্ষক আমাদের প্রত্যেককে একে অপরের সাথে একজন শিক্ষক এবং একজন ডাক্তারের জীবন সম্বন্ধে কথা বলতে বলেছেন। সুতরাং এসো প্রশ্ন করি এবং উত্তর দিই।

ছাত্র-২ : নিশ্চয়ই। শিক্ষকের নির্দেশ অনুসারে কাজ করার আগ্রহের জন্য ধন্যবাদ।



ছাত্র-১ : আচ্ছা, একজন ডাক্তারের জীবন এবং একজন শিক্ষকের জীবন নিয়ে তুমি কী চিন্তা কর? তোমাকে অবশ্যই আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে কথা বলতে হবে।

ছাত্র-২ : আমার মনে হয় একজন ডাক্তার এবং একজন শিক্ষকের মধ্যে অনেক মিল রয়েছে।

ছাত্র-১ : কীভাবে?

ছাত্র-২ : কেন, উভয়ের লক্ষ্য অন্যদের জীবনকে সহজ করা। শিক্ষক সমাজের বুদ্ধিবৃত্তিক স্বাস্থ্য গঠন করেন। একইভাবে, ডাক্তার সমাজের শারীরিক স্বাস্থ্য গঠন করে।

ছাত্র-১ : এক অর্থে তা সত্য। কিন্তু আমার মনে হয় সমাজে শিক্ষকের জীবন বেশি গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু সে জীবন আমাদের সমাজে অবহেলিত রয়ে যাচ্ছে।

ছাত্র-২ : তুমি এমনটি মনে করছ কেন?

ছাত্র-১ : শুধু ডাক্তার এবং শিক্ষকের আয়ের স্তরের পার্থক্যের দিকেই তাকিয়ে দেখ না। তুমি কি কল্পনা করতে পার ব্যাপারটা কেমন দেখায়?

ছাত্র-২ : আচ্ছা, আমি বলছি। একজন কলেজ বা স্কুল শিক্ষকের আয় প্রতি মাসে পনের থেকে বিশ হাজার টাকা এবং একজন ডাক্তারের গড় আয় মাসে প্রায় সত্তর থেকে আশি হাজার টাকা। এবার তাহলে ভেবে দেখ!

ছাত্র-১ : তাই তো। একটি জাতি কীভাবে সন্তুষ্ট হতে পারে, যদি একজন জাতি-গঠনকারী সন্তুষ্ট না হয়?

ছাত্র-২ : সত্যিকার অর্থে, আমি দুটো জীবনের এ দিক সম্পর্কে আগে ভাবিনি। আজকের আলোচনা আমার জ্ঞান চক্ষু খুলে দিয়েছে।

## ১৬ মা ও মেয়ের মধ্যে সংলাপ যেখানে মেয়ে তার হোস্টেল জীবন সম্পর্কে মাকে বলছে।

মা : শিল্পী, আমি তোমার হোস্টেল জীবন সম্পর্কে জানার লোভ সামলাতে পারছি না। তুমি কি আমাকে এ বিষয়ে বলবে?

শিল্পী : অবশ্যই, মা। এটা একটা সত্যিকারের সুন্দরজীবন। আমি এতদূর পর্যন্ত বলব যে, যারা হোস্টেল জীবনের স্বাদ পায়নি তারা জীবনে বড় কিছু হারিয়েছে।

মা : তুমি এ ব্যাপারে আগ্রহে এত ফেটে পড়ছো কেন? এর মধ্যে এমন কী আছে, শিল্পী?

শিল্পী : হোস্টেল জীবন নিয়ন্ত্রিত, সত্য, কিন্তু আবার খুব মুক্তও। কেউ তোমাকে নির্দিষ্ট সময়ে পড়তেও বলবে না, ঘুমাতেও বলবে না।

মা : বুঝেছি। তার মানে সেখানে মোটেও কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই।

শিল্পী : না মা, ঠিক তেমনটা নয়। সেখানে সত্যিকার অর্থেই নিয়ন্ত্রণ আছে। উদাহরণস্বরূপ, রাতে ৮ টার পর তুমি বাইরে থাকতে পারবে না। গেস্ট রুম ছাড়া কোনো পুরুষ বন্ধু হোস্টেলের ভেতর ঢুকতে পারবে না।

মা : কিন্তু হোস্টেলে আমি আমার মেয়ের নিরাপত্তার ব্যাপারে উদ্বিগ্ন।

শিল্পী : ওহ্ মা! ওখানে সব রকমের নিরাপত্তার আয়োজন আছে। কিন্তু আকর্ষণ হলো ঐ যে তোমার কথা বলার মতো অনেক বন্ধু আছে। তুমি বিভিন্ন খেলাও খেলতে পার।

মা : শুনতে তো ভালোই লাগছে। খাবারের অবস্থা কেমন?

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



শিল্পী : ও হ্যাঁ, আমরা আমাদের হোস্টেলে যে খাবার খাই সেটা সেরা না হলেও যথেষ্ট ভালো। মাঝেমধ্যে তুমি যদি মনে কর যে নতুন কিছু খাওয়া প্রয়োজন, তাহলে তুমি পার্শ্ববর্তী হোটেলেও যেতে পার।

মা : লেখাপড়ার কী অবস্থা?

শিল্পী : শেখা এবং ভালো গ্রেড অর্জনের জন্য যত ধরনের সাহায্য প্রয়োজন তা হোস্টেলে আছে। বড় ক্লাসের সব ছাত্রীরা খুবই সহযোগিতাপূর্ণ। তারা নোটসহ আমাকে অনেক সাহায্য করে।

মা : আমি সব ব্যাপার জেনে আশ্বস্ত হলাম। কিন্তু তুমি কি মনে কর না যে এমন কিছু আছে, যা হোস্টেল তোমাকে দিতে পারে না?

শিল্পী : আমি অবশ্যই তা অনুভব করি মা। আমি জানি যে, হোস্টেল আমাকে আমার মা দিতে পারবে না। এ কারণেই আমি যখনই ছুটি পাই তখনই বাড়িতে ছুটে আসি।

## ১৭ বিনা বেতনে অধ্যয়নের সুযোগ প্রার্থনা করে একজন ছাত্রের কলেজ অধ্যক্ষের সাথে সংলাপ।

ছাত্র : আসসালামু আলাইকুম স্যার। ভেতরে আসতে পারি?

অধ্যক্ষ : হ্যাঁ, এসো। বলো আমার কাছে কিসের জন্য এসেছো?

ছাত্র : স্যার, আমাকে যদি বিনা বেতনে অধ্যয়নের অনুমতি দেয়া হতো।

অধ্যক্ষ : ঠিক আছে, কিন্তু তুমি তো জানো, ছাত্রদের বিনা বেতনে অধ্যয়নের অনুমতি দেয়ার জন্য কিছু নিয়ম আছে। তোমার পারিবারিক ইতিহাস সম্পর্কে বলো। তোমার বাবা কী করেন?

ছাত্র : স্যার, তিনি একজন খুবই দরিদ্র কৃষক।

অধ্যক্ষ : আচ্ছা। তোমরা মোট কতজন ভাইবোন এবং তারা কী করে?

ছাত্র : স্যার, আমি সবচেয়ে বড় ছেলে। আমার ছোট ভাই আপনার এ কলেজেরই একাদশ শ্রেণির ছাত্র। আমার একজন ছোট বোন আছে, যে অষ্টম শ্রেণিতে পড়ে।

অধ্যক্ষ : একজন কৃষক হয়ে তোমার বাবা কীভাবে তোমাদের তিনজনের পড়াশুনার ব্যয়ভার বহন করেন? আমি সত্যিই অবাক হচ্ছি।

ছাত্র : স্যার, এটা সত্যিই আশ্চর্যজনক। কিন্তু বর্তমানে তিনি অসহায় বোধ করছেন। তিনি আমাকে বলেছেন যে, আমি যদি বিনা বেতনে অধ্যয়নের সুযোগ না পাই তাহলে আমাকে পড়াশুনা ছাড়তে হবে এবং তার সাথে মাঠে কাজ করতে হবে।

অধ্যক্ষ : না, না, তা কীভাবে হয়? তাছাড়া তুমি একজন ভালো ছাত্র। আচ্ছা, এই ফর্মটি নাও এবং বর্ণিত উপায়ে পূরণ করো এবং জমা দাও। আমি আশা করি পরিচালনা পর্ষদ তোমাকে বিনা বেতনে অধ্যয়নের সুযোগ দেবেন।

ছাত্র : আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ, স্যার। আমি আপনার প্রতি কৃতজ্ঞ থাকব।

## ১৮ নিয়োগদাতার সাথে চাকরিপ্রার্থীর ভাইভার সংলাপ।

প্রার্থী : আসসালামু আলাইকুম। ভেতরে আসবো, স্যার।

নিয়োগদাতা : হ্যাঁ, আসুন, আপনিই কি মি. ইলিয়াস?

প্রার্থী : জ্বী স্যার। আমার পুরো নাম ইলিয়াস খন্দকার।



নিয়োগদাতা : আমরা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আপনার সিভি এবং আবেদনপত্র পড়েছি। আমরা খুশি যে, আপনি আমাদের প্রয়োজনের কিছু মেটাতে পেরেছেন। এ কথা সত্য যে, যেহেতু এটা মার্কেটিং পোস্ট সেহেতু শহরের মধ্যে এবং সারা দেশেও ব্যাপক ঘোরাঘুরির দরকার হবে। আপনি কি মনে করেন এ জন্য আপনি শারীরিকভাবে যোগ্য?

প্রার্থী : সত্য কথা বলতে কি, স্যার, ঠিক এ ব্যাপারটাই আমার সবচেয়ে বেশি পছন্দ। যেহেতু আমি এখনো অবিবাহিত, সেহেতু ব্যাপকভাবে ভ্রমণে আমার কোনো বাধা নেই।

নিয়োগদাতা : ভালো। আপনি পরিসংখ্যানে কতটা ভালো?

প্রার্থী : মার্কেট থেকে সংগৃহীত তথ্যকে বিশ্লেষণ করার জন্য আমি পরিসংখ্যানের মডেল ব্যবহার করতে পারি।

নিয়োগদাতা : আপনি কি কম্পিউটার অপারেটিং করতে জানেন?

প্রার্থী : স্যার, আমি MS Word, Data base Programming, এবং Excel জানি।

নিয়োগদাতা : বেশ, আপনি কত টাকা বেতন আশা করছেন?

প্রার্থী : স্যার, আমার বর্তমান প্রতিষ্ঠান থেকে আমি প্রতি মাসে ২০০০০ টাকা বেতন পাই। এটা নিশ্চিত যে, আমি অন্য কোথাও আরও ভালো সুযোগ খুঁজব।

নিয়োগদাতা : ঠিক আছে। আমরা আপনাকে প্রতি মাসে ২৫০০০ টাকা বেতন দেব। কোম্পানির নিয়ম অনুযায়ী আপনার আরও কিছু সুযোগ-সুবিধা থাকবে।

প্রার্থী : ঠিক আছে স্যার, আমি আপনার প্রতিষ্ঠানে চাকরি করতে চাই।

নিয়োগদাতা : তাহলে আপনি আগামী ১ তারিখে এসে জয়েন করতে পারেন।

প্রার্থী : আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ, স্যার।

## ১৯ অনেকদিন পরে দেখা হয়েছে এমন দুই বন্ধুর মধ্যে সংলাপ।

সমীর : আরে বন্ধু দুলাল। কেমন আছো? অনেক দিন আগে আমাদের শেষ দেখা হয়েছিল।

দুলাল : হ্যাঁ সমীর, আমি ভালো আছি। তুমি কেমন আছো? আমাদের এক সাথে খেলায় হারিয়ে যাওয়ার দিনগুলো তোমার মনে আছে? আমাদের গ্রামে থাকার সময়টা কতই না সুন্দর ছিল।

সমীর : তোমার এখনো মনে পড়ে? তখন আমরা মাঠে এক সাথে খেলতাম, নদীতে সাঁতার কাটতাম এবং কোনো গন্তব্য ছাড়াই পথ দিয়ে অনেক দূর হাঁটতাম। কিন্তু এখন পড়াশুনার চাপ কাঁধে বোঝার মতো চেপে বসেছে। জীবন হয়ে গেছে সংকুচিত।

দুলাল : আসলে জীবনের ভিন্ন ভিন্ন স্তরে আছে ভিন্ন ভিন্ন দায়িত্ব ও আনন্দ। এখন জীবন মানে জীবনের জন্য প্রস্তুতি। প্রকৃতপক্ষে এটা একটা চ্যালেঞ্জ, তাই না?

সমীর : হ্যাঁ, আসলে প্রত্যেকেই সবার জীবনের প্রত্যেকটি স্তরে একেকজন শিশু। কে না চায় একটা দায়-দায়িত্বহীন সময়?

দুলাল : আসলেই, এ সময় তুমি আবারও পাবে যখন বৃদ্ধ হয়ে যাবে।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



সমীর : যাই হোক, ভবিষ্যতে কী হবে বলে স্থির করেছ?

দুলাল : ডাক্তারি পড়ার জন্য দেশের বাইরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।

সমীর : এটা একটা ভালো চিন্তা। আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার হব।

দুলাল : এটাও অসাধারণ। আমাদের সমাজে সব ধরনের মানুষই প্রয়োজন আছে। তোমার মোবাইল নম্বরটা দাও। মাঝেমধ্যে ফোনে আলাপ হবে। আপাতত বিদায়। দেশের বাইরে যাওয়ার আগে আবারও দেখা হবে ইনশাল্লাহ।

## ২০ স্কুলের বার্ষিক ক্রীড়া বিষয়ে দুই বন্ধুর সংলাপ।

পলিন : গালিব, গতকাল তুমি দেখা না করেই চলে গেলে।

গালিব : হ্যাঁ পলিন। বিকেলের দিকে শরীরটা ক্লান্ত হয়ে গিয়েছিল। তোমাকে খুঁজেছি, না পেয়ে পরে চলে গিয়েছি।

পলিন : হ্যাঁ, গত তিনদিন ছিল উত্তেজনা আর কাজে ভরপুর। গত রাতে আমি খুব ক্লান্তিবোধ করেছি এবং এত ঘুমিয়েছি যে এখন খুব ভালো লাগছে।

গালিব : খেলার প্রোগ্রামটা আসলেই খুব মজার ছিল। আমাদের প্রায় ১৫-১৬টি ইভেন্ট ছিল। তুমি তিনটাতে অংশগ্রহণ করেছিলে এবং একটাতে প্রথম পুরস্কার পেয়েছ।

পলিন : তুমিও ভালো করেছিলে। যাহোক, ফাহিম পাঁচটি ইভেন্টে অংশ নিয়ে যে তিনটিতে প্রথম পুরস্কার জিতেছিল তার নৈপুণ্য দেখে আমি অবাক হয়েছিলাম।

গালিব : তার প্রচুর প্রাণশক্তি।

পলিন : আর সে পরীক্ষাতেও ভালো করে।

গালিব : মাঠের সাজগোছ এবং ঐ দিনের আয়োজন বিষয়ে তোমার কী মতামত?

পলিন : সাজগোছ ছিল খুবই সুন্দর। তারপরও আমি মনে করি আমরা আরো গাছ, রঙিন ফুল ও পাতা ব্যবহার করতে পারতাম পরিস্থিতিকে আরো প্রাকৃতিক মনে করার জন্য।

গালিব : অনেকটা গলফ মাঠের মতো?

পলিন : হ্যাঁ।

গালিব : কিন্তু সেটা হতো প্রচুর খরচের ব্যাপার। আমরা যা করেছি তা খুব খারাপ ছিল না।

পলিন : ঠিক।

গালিব : আর আমি অপেক্ষায় আছি আগামী বছরের খেলার দিনের জন্য।

৩৫তম বিসিএস

৩

# পত্রলিখন

নম্বর ১৫

পত্র আধুনিক বিশ্বে যোগাযোগের একটি প্রধান মাধ্যম। আমাদের আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধব, যারা দূর-দূরান্তে বাস করে চিঠিপত্রের মাধ্যমে আমরা তাদের সাথে সংবাদ আদান-প্রদান করে থাকি। এছাড়া সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন কাজকর্ম থেকে শুরু করে ব্যবসায়িক লেনদেন ও যোগাযোগ ক্ষেত্রে চিঠিপত্র এখনো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে।

**পত্রের প্রকারভেদ :** পত্রকে প্রধানত দুইভাগে ভাগ করা হয়। যথা : ১. অনানুষ্ঠানিক পত্র এবং ২. আনুষ্ঠানিক পত্র।

১. **অনানুষ্ঠানিক পত্র :** আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব এবং পরিচিত ও অপরিচিত ব্যক্তিবর্গের কাছে এ ধরনের পত্র লেখা হয়। ব্যক্তিগত পত্র এ পত্রের অন্তর্ভুক্ত।

২. **আনুষ্ঠানিক চিঠিপত্র :**

ক. **ব্যবসায় সংক্রান্ত পত্র :** বৈষয়িক কাজকর্ম ও ব্যবসায়িক লেনদেন সংক্রান্ত যোগাযোগ এ ধরনের পত্রের মাধ্যমে করা হয়।

খ. **অফিস সংক্রান্ত পত্র :** সরকারি ও বেসরকারি অফিসসমূহের বিভিন্ন প্রকার আদেশ ও নির্দেশ এ ধরনের পত্রের মাধ্যমে সম্পাদিত হয়। এছাড়া বিভিন্ন ধরনের দরখাস্ত, নিয়োগ ও ছুটির আবেদন, প্রশংসাপত্র, অভিযোগপত্র, স্মারকলিপি (Memorandum) ইত্যাদিও অফিস সংক্রান্ত পত্রের অন্তর্ভুক্ত।

গ. **সামাজিক অনুষ্ঠানে নিমন্ত্রণপত্র :** বিভিন্ন প্রকার সামাজিক অনুষ্ঠানের নিমন্ত্রণপত্রসমূহ সামাজিক পত্রের অন্তর্ভুক্ত। এ ধরনের পত্রকে ব্যক্তিগত পত্রের পর্যায়ভুক্তও ধরা হয়।

ঘ. **সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্য পত্র :** যেসব পত্র জনস্বার্থে, সাধারণত সংবাদপত্রে প্রকাশের উদ্দেশ্যে পত্রিকা সম্পাদকের বরাবর রচিত হয়, সেগুলোকে সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্য পত্র বলে।

বিসিএস লিখিত পরীক্ষার সিলেবাসে পত্রলিখন অংশে অফিস বা প্রতিষ্ঠান সংক্রান্ত পত্র, আধা প্রাতিষ্ঠানিক পত্র, স্মারকলিপি এবং ব্যাবসায় সংক্রান্ত পত্র অন্তর্ভুক্ত থাকায় আলোচ্য অধ্যায়ে এ বিষয়গুলো নিয়েই আলোচনা করা হয়েছে।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



**অফিস সংক্রান্ত পত্র (Official Letter) :** সরকারি বা বেসরকারি অফিসে কর্মরত কর্মচারীগণ যে চিঠিপত্র লিখেন অথবা জনসাধারণ অফিসে যেসব চিঠি লিখে থাকেন, সেগুলোকে অফিস সংক্রান্ত পত্র বলে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সংক্রান্ত পত্রও অফিস সংক্রান্ত পত্রের অন্তর্ভুক্ত।

**আধা-প্রাতিষ্ঠানিক পত্র (Demi-official Letter) :** সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সমপর্যায়ভুক্ত বিভাগ বা কর্মকর্তাদের মধ্যে পারস্পরিক অনানুষ্ঠানিক কিন্তু গোপন তথ্য আদান-প্রদানের জন্য যে চিঠি ব্যবহার করা হয়, তাকে আধা-প্রাতিষ্ঠানিক পত্র বা Demi-official Letter বলে। একে Semi-official Letter-ও বলে।

**ব্যবসায়িক পত্র (Business Letter) :** যে চিঠিপত্রে ব্যবসায় অথবা কারবার সম্পর্কিত আলাপ-আলোচনা, পণ্যের ফরমায়েশ প্রদান, অভিযোগ, তথ্য অনুসন্ধান ইত্যাদির খবরাখবর দেয়া ও নেয়া হয় তাকে ব্যাবসায়িক পত্র বলে।

**স্মারকলিপি (Memorandum) :** নির্দিষ্ট অভিযোগ বা দাবি-দাওয়ার কথা স্মরণ করিয়ে দিতে কোনো সমাজ, গোষ্ঠী বা দলের হয়ে (সাধারণত ব্যক্তিগত স্বাক্ষরহীন) যে পত্র লেখা হয় তাকে স্মারকলিপি বলে।

# অফিস সংক্রান্ত ও আধা-প্রাতিষ্ঠানিক পত্র

বৈষয়িক ও ব্যবহারিক নানা কাজে আমাদেরকে বিভিন্ন সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের কাছে যেসব চিঠিপত্র লিখতে হয় সেগুলোকে বলা যেতে পারে অফিস সংক্রান্ত পত্র বা Official letter. এ ধরনের পত্রের মধ্যে পড়ে ছুটি, বৃত্তি, চাকরি বা এ ধরনের আবেদনপত্র কিংবা কোনো কিছুর অনুমতি লাভের আবেদন (শিক্ষা সফরের অনুমতি, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের অনুমতি, মাইক ব্যবহারের অনুমতি ইত্যাদি), সরকারি বা বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কাছে কোনো অভাব-অভিযোগ বা সমস্যা নিরসনে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের আবেদন (যেমন– ডাকঘর, নলকূপ ইত্যাদি স্থাপন, রাস্তাঘাট মেরামত, ত্রাণ সাহায্য প্রার্থনা, নদীর ভাঙন রোধে পদক্ষেপ গ্রহণ ইত্যাদি)।

এ শ্রেণির পত্রে কেবল মূল প্রসঙ্গ ও প্রয়োজনীয় বক্তব্য-বিষয় প্রাধান্য পায়। বক্তব্য উপস্থাপনে ধারাবাহিকতা ও পারম্পর্য রক্ষা করতে হয়। সে সাথে বিশেষ নজর রাখতে হয় ভাষার সরলতা, স্পষ্টতা ও প্রায়োগিক শুদ্ধতার ওপর। এ ধরনের পত্রের ছক বা কাঠামো যথাযথভাবে অনুসরণ করা বিশেষ গুরুত্ব বহন করে।

**অফিস সংক্রান্ত পত্রের অংশ-বিভাজন**

এ ধরনের পত্রে মোটামুটিভাবে নিচের ছক বা কাঠামো মেনে চলা দরকার :

১. **তারিখ :** উপরে বাম দিকে (পূর্বে ডান দিকে লেখা হতো) চিঠির তারিখ দিতে হয়। তারিখ একেবারে নিচে আবেদনকারীর ঠিকানার নিচেও দেয়া চলে।

২. **পত্র-প্রাপকের ঠিকানা :** পত্রের শুরুতে বাম দিকে পত্র-প্রাপকের প্রাতিষ্ঠানিক ঠিকানা লিখতে হয়।

৩. **বিষয় :** এ ধরনের পত্রে পত্র-প্রাপকের ঠিকানার নিচে সামান্য ফাঁক রেখে 'বিষয়' কথাটি লিখে তার পাশে পত্রের মূল বিষয় খুব সংক্ষেপে উল্লেখ করতে হয়, যেন শিরোনাম দেখেই পত্র প্রাপক পত্রের বিষয়বস্তু সম্পর্কে ধারণা করতে পারেন।



৪. **সম্ভাষণ :** অফিসিয়াল পত্রে নিবেদন, জনাব, মহাত্মন, মান্যবরেষু, মহোদয় ইত্যাদি সম্ভাষণের যে কোনো একটি প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যবহার করতে হয়।

৫. **মূল পত্রাংশ :** পত্রের মূল বক্তব্য এ অংশে থাকে। সাধারণত দুটি অনুচ্ছেদে এ বক্তব্য উপস্থাপিত হয়। প্রথম অনুচ্ছেদে বক্তব্য বিষয় বা সমস্যার প্রকৃতি তুলে ধরা হয়। দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে পত্র-প্রাপকের কাছে যে জন্য পত্র লেখা হচ্ছে সে বিষয়ে আবেদন করা হয়ে থাকে।

৬. **বিদায় সম্ভাষণ :** বিদায় সম্ভাষণে সাধারণত বিনীত, বিনয়াবনত, নিবেদক ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

৭. **নাম-স্বাক্ষর :** বিদায় সম্ভাষণের নিচে পত্র-লেখকের নাম-স্বাক্ষর করতে হয়। পত্র-লেখক কোনো প্রতিষ্ঠান বা এলাকার প্রতিনিধিত্ব করলে তা নাম-স্বাক্ষরের নিচে ঠিকানাসহ উল্লেখ করা হয়ে থাকে।

**০১** **স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস মাধ্যমিক পর্যায়ের সকল শ্রেণিতে পাঠ্যপুস্তকের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার বিষয়ে যুক্তি দেখিয়ে কর্তৃপক্ষের নিকট একটি আবেদনপত্র লিখুন।**

তারিখ : ১২.০৩.২০১৫

মহাপরিচালক
মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তর
ঢাকা, বাংলাদেশ।

**বিষয় : মাধ্যমিক পর্যায়ের পাঠ্যবইয়ে স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস অন্তর্ভুক্ত করার আবেদন।**

জনাব,

সম্মানপূর্বক বিনীত নিবেদন এই যে, আমরা এখন একটি স্বাধীন দেশের নাগরিক। ৩০ লক্ষ শহীদের রক্তের বিনিময়ে অর্জিত আমাদের সোনার বাংলাদেশ। মা-বোনের ইজ্জত এবং অনেক ত্যাগ-তিতিক্ষা ও দীর্ঘ নয় মাস রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে অর্জন করা স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশে অধিকার রয়েছে আমাদের সকলের। এটি কারও ব্যক্তিগত সম্পদ বা সম্পত্তি নয়, নয় কোনো বিশেষ দলের বা গোষ্ঠীর। তবু স্বাধীনতা পরবর্তী সরকারগুলো তাদের ভিতকে মজবুত ও নিজেদের রাজনৈতিক দুর্বলতা ঢেকে রাখার অপচেষ্টা হিসেবে বিভিন্ন প্রিন্ট মিডিয়া এবং ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার সহায়তা নিয়ে স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস বিকৃত করার মতো জঘন্য ঘটনার অবতারণা করে চলেছে।

এ সকল বিকৃত ইতিহাস যেমন বিকৃত মন-মানসিকতার বহিঃপ্রকাশ, তেমনি একটি দুর্বল ও বিকৃত জাতি হিসেবে দেশকে ধ্বংস করে দেবার পাঁয়তারাও বটে। আমাদের দেশের রাজনীতিবিদরা স্বাধীনতার ঘোষক, স্বাধীনতায় নেতৃত্ব, মহান জাতির পিতা প্রভৃতি অহেতুক প্রশ্নে সব সময়ই দ্বিধাবিভক্ত থেকে নিজেদের স্বার্থে প্রচারণা চালিয়ে জাতির সাথে প্রতারণা করে চলেছে। অত্যন্ত লজ্জা ও ঘৃণার বিষয় হলো এ দেশে এখনো বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদের প্রতি শ্রদ্ধা সর্বজনীন ও প্রশ্নমুক্ত হয়নি। আমরা জানি জাতির উৎপত্তি, ইতিহাস, প্রত্নতাত্ত্বিকতা প্রভৃতি বিকৃত ও নষ্ট হয়ে গেলে জাতীয় পরিচয় দেয়ার জন্য সে জাতির আর কিছু অবশিষ্ট থাকে না। এমতাবস্থায় আমাদের নতুন প্রজন্মকে

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



তাদের জাতীয় ইতিহাস সম্পর্কে অবহিত করার বিকল্প নেই। আর সেক্ষেত্রে মাধ্যমিক পর্যায়ের সকল শ্রেণিতে মুক্তিযুদ্ধের ধারাবাহিক ইতিহাস সংযোজনের বিকল্প নেই।

অতএব, জনাবের সমীপে আবেদন মাধ্যমিক পর্যায়ের সকল শ্রেণিতে স্বাধীনতা সংগ্রামের সঠিক ইতিহাস সংযোজনের মধ্য দিয়ে নতুন প্রজন্মকে তাদের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাসের সাথে পরিচয় করিয়ে দিতে মহোদয়ের সু আজ্ঞা হয়।

বিনীত নিবেদক
মাদারীপুর মাধ্যমিক স্কুল শিক্ষক সমিতির পক্ষে

(শাফিনা নেওয়াজ)
সভাপতি, মাদারীপুর মাধ্যমিক স্কুল শিক্ষক সমিতি, মাদারীপুর

**০২ ব্যাংকে 'সিনিয়র অফিসার' পদে চাকরির জন্য উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের বরাবর একটি আবেদনপত্র লিখুন।**

তারিখ : ২০.০২.২০১৫

ব্যবস্থাপনা পরিচালক
উত্তরা ব্যাংক লিমিটেড
প্রধান কার্যালয়, উত্তরা ব্যাংক ভবন
মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।

**বিষয় : সিনিয়র অফিসার পদে নিয়োগের জন্য আবেদন।**

জনাব,
বিনীত নিবেদন এই যে, গত ৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৩ তারিখের 'দৈনিক প্রথম আলো' পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে জানতে পারলাম আপনার অধীনে সিনিয়র অফিসার পদে কিছু সংখ্যক অভিজ্ঞতাসম্পন্ন কর্মকর্তা নিয়োগ করা হবে। উক্ত পদের জন্য একজন আগ্রহী প্রার্থী হিসেবে নিচে আমার পূর্ণাঙ্গ জীবনবৃত্তান্ত, শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা সম্বলিত তথ্যাদি আপনার অবগতির জন্য পেশ করলাম।

নাম : শরিফুল ইসলাম
পিতার নাম : ফখরুল ইসলাম
মাতার নাম : ফাতেমা ইসলাম
বর্তমান ঠিকানা : ৩০/১ মনিপুর, মিরপুর, ঢাকা
স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম : শ্রীফলতলা, ডাকঘর : শ্রীফলতলা বাজার, উপজেলা : কালিয়াকৈর, জেলা গাজীপুর
জন্ম তারিখ : ১৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৯
ধর্ম : ইসলাম (সুন্নি)
জাতীয়তা : বাংলাদেশি
শিক্ষাগত যোগ্যতা :



| পরীক্ষার নাম | শাখা | পাসের বছর | প্রাপ্ত বিভাগ | বোর্ড/বিশ্ববিদ্যালয় |
|---|---|---|---|---|
| এসএসসি | বাণিজ্য | ২০০৪ | প্রথম বিভাগ | ঢাকা বোর্ড |
| এইচএসসি | বাণিজ্য | ২০০৬ | প্রথম বিভাগ | ঢাকা বোর্ড |
| বিকম (অনার্স) | বাণিজ্য | ২০১০ | দ্বিতীয় শ্রেণি | ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় |
| এমকম (একাউন্টিং) | বাণিজ্য | ২০১১ | দ্বিতীয় শ্রেণি | ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় |

অভিজ্ঞতা : সিএ ফার্ম আকিব এন্ড সন্স-এ তিন বছর অডিটর হিসেবে কর্মরত ছিলাম।
অতএব, মহোদয়ের নিকট আকুল আবেদন, উপরিউক্ত তথ্যাদি বিবেচনা করে আমাকে উক্ত পদে নিয়োগ দিলে আমি আমার কর্মদক্ষতা ও সততার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের সার্বিক উন্নতি বিধানের চেষ্টা করব।

বিনীত নিবেদক

(শরিফুল ইসলাম)

সংযুক্তি :
১. সকল পরীক্ষার সত্যায়িত সনদপত্র।
২. সকল প্রশংসাপত্রের সত্যায়িত ফটোকপি।
৩. অভিজ্ঞতার সনদপত্র।
৪. প্রথম শ্রেণির গেজেটেড অফিসার প্রদত্ত চারিত্রিক সনদপত্র।
৫. সদ্য তোলা ৩ কপি পাসপোর্ট সাইজ ছবি।

**০৩ ফসলি জমিতে ইটভাটা স্থাপনের অনুমতি প্রদান না করার অনুরোধ জানিয়ে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক বরাবর একটি আবেদনপত্র লিখুন।**

তারিখ : ১৫.০৩.২০১৫

জেলা প্রশাসক
ঢাকা

**বিষয় : ফসলি জমিতে ইটভাটা স্থাপনের অনুমতি না প্রদান প্রসঙ্গে।**

জনাব,
বিনীত নিবেদন এই যে, ঢাকা জেলার ধামরাই উপজেলার আঘারপাড়া একটি সমৃদ্ধ ইউনিয়ন। এ ইউনিয়নটি একটি শিল্প সমৃদ্ধ এলাকা। শিল্পোন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের ফলশ্রুতিতে প্রত্যেকটা গ্রামে এসেছে অর্থনৈতিক সচ্ছলতা। নির্মিত হচ্ছে নতুন নতুন কলকারখানা, কমার্শিয়াল কমপ্লেক্স, অভিজাত অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিং। এরই জের ধরে ফসলি জমিতে স্থাপিত হচ্ছে নতুন নতুন ইটভাটা। এতে করে নষ্ট হচ্ছে ফসলি জমি। ইট বহনের জন্য যে রাস্তা বানানো হচ্ছে তাও তৈরি হচ্ছে ফসলি জমিতে। আর সাথে সাথে দূষিত হচ্ছে আশপাশের পরিবেশও। নষ্ট হচ্ছে ফসলও। এতে বিঘ্ন হচ্ছে আমাদের

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



স্বাভাবিক জীবনযাত্রা। অতিরিক্ত ট্রাকের চাপে সৃষ্টি হচ্ছে যানবাহনের জ্যাম। ঘটছে বড় বড় সব সড়ক দুর্ঘটনা। আর ইট ভাটার পাশেই যারা বসবাস করছে, তারা ইটভাটার অত্যধিক গরমে কুলিয়ে উঠতে পারছে না। ইটভাটার সংখ্যা এখানে প্রয়োজনের তুলনায় অনেক বেশি।

এমতাবস্থায় মহোদয়ের নিকট বিনীত প্রার্থনা, এ এলাকার ফসলি জমিতে নতুন ইটভাটা স্থাপনে আপনি যদি অনুমতি না দেন, তাহলে আশা করছি এর সুন্দর সুরাহা সম্ভব হবে।

নিবেদক
আঘারপাড়া ইউনিয়নের পক্ষে
আমির হোসেন
ধামরাই, ঢাকা।

**০৪ আপনার এলাকার বহুল ব্যবহৃত সড়কটির আশু মেরামতের অনুরোধ জানিয়ে মেয়রের বরাবর একটি চিঠি লিখুন।**

তারিখ : ১৪.০৩.২০১৫

মেয়র
নোয়াখালী পৌরসভা।

**বিষয় : মাইজদী বাজার থেকে নোয়াখালী বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ পর্যন্ত রাস্তা সংস্কারের আবেদন।**

জনাব,
সবিনয় নিবেদন এই যে, আমরা নোয়াখালী পৌরসভার মাইজদী বাজার এলাকার বাসিন্দা। এ এলাকায় প্রায় ৫০ হাজার লোকের বাস। আমাদের এলাকাটি অত্যন্ত ঘনবসতিপূর্ণ। এখানে একটি বিশ্ববিদ্যালয় কলেজসহ একাধিক স্কুল-মাদ্রাসা-মক্তব রয়েছে। কিন্তু দীর্ঘদিন যাবৎ এলাকার সব রাস্তার করুণ অবস্থা বিরাজ করছে। ফলে এলাকার বাসিন্দাগণ চরম দুর্ভোগের সম্মুখীন। স্কুল-কলেজের ছাত্রছাত্রী যারা এ রাস্তায় যাতায়াত করে তাদের দুর্ভোগেরও শেষ নেই। তাছাড়া রাস্তাটি যথেষ্ট চওড়াও নয়। সঙ্কীর্ণ এ রাস্তায় সকালবেলা বিভিন্ন অফিসের প্রাইভেট কার, মাইক্রো বাস আসা-যাওয়া করে। তার উপর প্রতিদিন দোকানপাটের মালামাল ও মাটি বোঝাই ট্রাক্টর, বালি রড ও সিমেন্ট বোঝাই ট্রাক চলাচলের ফলে রাস্তা ব্যবহারের অনুপযোগী হয়ে পড়েছে। ট্রাকের কারণেও সববয়সী মানুষ যাতায়াত করতে সীমাহীন অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছে। সত্যিই এ পথে হেঁটে যাতায়াত করা কষ্টসাধ্য ব্যাপার। এমনকি যারা গাড়িতে যাতায়াত করেন তাদের পক্ষেও নির্বিঘ্নে চলাচল করা সম্ভব হচ্ছে না।

এমতাবস্থায় মহোদয়ের নিকট বিনীত প্রার্থনা, এ জনগুরুত্বপূর্ণ সড়কটির আশু মেরামতের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে এলাকার সর্বসাধারণের দুর্দশা লাঘবে বাধিত করবেন।

নিবেদক
এলাকাবাসীর পক্ষে
সাজ্জাদ হুসাইন
মাইজদী বাজার, নোয়াখালী।



**০৫ আপনার এলাকার জলাবদ্ধতার প্রতিকার প্রার্থনা করে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের জন্য একটি প্রতিবেদন প্রস্তুত করুন।**

তারিখ : ২৭.০২.২০১৫

জেলা প্রশাসক
খুলনা

**বিষয় : জলাবদ্ধতার প্রতিকার প্রসঙ্গে।**

মহোদয়,
শিবসা আর কপোতাক্ষের মিলন মোহনায় প্রতিষ্ঠিত পাইকগাছা পৌরসভার অন্যতম প্রধান সমস্যা জলাবদ্ধতা। প্রাকৃতিক নিষ্কাশন পথগুলো বন্ধ করে স্বার্থান্বেষী মহল চিংড়ির চাষ করায় পৌর এলাকার জলাবদ্ধতা ক্রমান্বয়ে ভয়াবহ হয়ে উঠেছে। জলাবদ্ধতার কারণে পরিবেশ দূষণ ঘটছে। পৌরবাসী চরম দুর্ভোগের শিকার হচ্ছে। পৌরবাসী জানায়, শিববাড়ি স্লুইস গেট, বাইশার আবাদ নদীর সংযোগ খালের স্লুইস গেট, মঠবাড়ি খাল, গৌরাঙ্গ খাল, গাগড়ামারি খাল প্রভৃতি দিয়ে পাইকগাছা থানা সদর এলাকার পানি নিষ্কাশিত হতো। কিন্তু বর্তমানে প্রাকৃতিক নিষ্কাশন পথগুলোর প্রায় সবই বন্ধ। প্রভাবশালী ঘের মালিকরা চিংড়ি চাষের জন্য স্লুইস গেটগুলো অকার্যকর করে রাখায় এবং নদী ও খাল ভরাট হয়ে যাওয়ায় শহরের পানি নিষ্কাশনে মারাত্মক সমস্যা বিরাজ করছে। পৌর এলাকায় সুষ্ঠু ড্রেনেজ ব্যবস্থাও নেই। বৃষ্টি হলে শহরের বিভিন্ন এলাকায় পানি জমে যায়। যা সহজে নিষ্কাশিত হতে পারে না। অনেক স্থানে স্থায়ী জলাবদ্ধতা তৈরি হয়। পানি ও আবর্জনা পচা দুর্গন্ধে পরিবেশ দূষিত হচ্ছে। ফলে জনগণ দুর্ভোগের শিকার হচ্ছে। পানি ও বায়ু দূষণের ফলে এলাকায় ডায়রিয়া, চর্মরোগসহ নানাধরনের রোগের বিস্তার ঘটছে। শিববাড়ি এলাকায় খালের স্লুইস গেটটি দীর্ঘ প্রায় আট বছর ধরে বন্ধ। প্রভাবশালী ঘের মালিকরা ঐ গেটটি নিজেদের প্রয়োজনে অকার্যকর করে রেখেছে; পৌর এলাকায় চিংড়ি চাষ করছে। সকল এলাকায় ছোট ছোট ঘেরে চিংড়ি চাষ করা হচ্ছে। এখানে চিংড়ি চাষের কারণে বয়রার স্লুইস গেটটিও বন্ধ। বাইশার আবাদ ও হাড়িয়া নদী ভরাট হয়ে গেছে। নিয়মনীতি লঙ্ঘন করে মৎস্য চাষের কারণে বিভিন্ন খালে জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয়েছে। শহরের ৬ নং ওয়ার্ড এলাকার গাগড়ামারি খালটি এখন সম্পূর্ণ বন্ধ জলাশয়। পচা পানি, কচুরিপানা আর আবর্জনায় ভরপুর এ জলাশয় থেকে প্রতিনিয়ত দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে। মশা-মাছির বংশবিস্তার ঘটছে। প্রায় সমগ্র পাইকগাছা এলাকায় লোনা পানিতে বাগদা চিংড়ির চাষ করা হয়ে থাকে। লবণাক্ততার প্রভাবে পাকা ভবনাদিসহ বিভিন্ন অবকাঠামো দ্রুত নষ্ট হয়ে যায়। পৌর এলাকাকে লবণাক্ততার প্রভাবমুক্ত রাখার জন্য পৌরসভা ও জেলা পরিষদ সিদ্ধান্ত নিয়েছিল— শহর এলাকায় লোনা পানি উঠানো ও চিংড়ি চাষ করা হবে না। কিন্তু এ সিদ্ধান্ত উপেক্ষা করে অনেকেই চিংড়ি চাষ করছে। লোনা পানিতে চিংড়ি চাষের কারণে শহরে লবণাক্ততার মারাত্মক ক্ষতিকর প্রভাব পড়ছে। দালান-কোঠা লোনায় আক্রান্ত হয়ে দেয়াল ও ছাদের পলেস্তরা খসে পড়ছে। এলাকার গাছপালা বিরান হয়ে যাচ্ছে। পৌরসভার চেয়ারম্যান পাইকগাছা শহর এলাকায় জলাবদ্ধতার কথা

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



স্বীকার করে বলেন, 'প্রাকৃতিক নিষ্কাশন পথগুলো রুদ্ধ হয়েছে। সুষ্ঠ ড্রেনেজ ব্যবস্থা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে অর্থ সঙ্কটের পাশাপাশি জায়গা সমস্যা রয়েছে। কেউ জায়গা ছাড়তে চায় না। আবার কেউ কেউ কোর্টে গিয়ে নিজ সম্পত্তি দাবি করে জায়গার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করছে।'

এমতাবস্থায়, আপনার নিকট আকুল আবেদন এই যে, অনতিবিলম্বে জলাবদ্ধতার প্রতিকারের ব্যবস্থা করে জনগণের দুঃখ-দুর্দশা লাঘবে আপনার সদয় সহানুভূতির স্বাক্ষর রাখবেন।

নিবেদক
এলাকার জনগণের পক্ষে
আবদুস সালাম
পাইকগাছা পৌর এলাকা, খুলনা।

**০৬ অফিসে যথাসময়ে অনুপস্থিত থাকার কারণ দর্শানোর অনুরোধ জানিয়ে কর্তৃপক্ষের আদেশক্রমে নিম্নপদস্থ কর্মচারীকে জরুরিপত্র লিখুন।**

তারিখ : ১৪.০৩.২০১৫

সহকারী হিসাব কর্মকর্তা
ইউনিভার্সেল ট্রেডিং কোম্পানি লি.
আঞ্চলিক কার্যালয়
১২ মতিঝিল, ঢাকা।

**বিষয় : যথাসময়ে অফিসে অনুপস্থিত থাকার কারণ দর্শানো প্রসঙ্গে।**

জনাব,
গত ৯ জানুয়ারি ২০১৫ তারিখের স্মারক নং-প্র.কা./ম-প্রশা/নং-১৬/৩ এর নির্দেশ মতে আপনাকে অবগত করা যাচ্ছে যে, আপনি আপনার ব্যক্তিগত কারণ দেখিয়ে ২ মার্চ ২০১৫ থেকে ৫ মার্চ ২০১৫ পর্যন্ত ছুটি মঞ্জুর করিয়ে ৬ মার্চ ২০১৫ তারিখের পরিবর্তে ৮ মার্চ ২০১৫ নিজ কর্মস্থলে যোগদান করেন। যার ফলশ্রুতিতে প্রতিষ্ঠানের স্বাভাবিক কাজে নানা বিঘ্ন ঘটে।

অতএব, প্রতিষ্ঠানের শৃঙ্খলার স্বার্থে এবং প্রাতিষ্ঠানিক আইন অনুসারে পত্র প্রাপ্তির ৭ (সাত) কর্মদিবসের মধ্যে অফিসে উক্ত সময়ে অনুপস্থিত থাকার কারণ প্রধান কার্যালয়ে প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হলো।

অনুরোধক্রমে

(আনোয়ার জাহিদ)
সহকারী ব্যবস্থাপক
আঞ্চলিক কার্যালয়
মতিঝিল, ঢাকা।



**০৭ রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ থেকে একটি ছাত্রদলকে শিক্ষা সফরে প্রেরণের আবেদন জানিয়ে বিভাগের চেয়ারম্যানের কাছে একটি দরখাস্ত লিখুন।**

তারিখ : ১৬.০৩.২০১৫

চেয়ারম্যান
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

**বিষয় : শিক্ষা সফরে প্রেরণের জন্য আবেদন।**

জনাব,
বিনীত নিবেদন এই যে, আমরা আপনার বিভাগের অনার্স শেষবর্ষের ছাত্রছাত্রী। রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ থেকে আমরা আমাদের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সহযোগিতা ও সাহচর্যে ১০ দিনের শিক্ষা সফর কর্মসূচির মাধ্যমে চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম, কক্সবাজার অঞ্চলে সফরে যেতে চাই। এ শিক্ষা সফরে ছাত্রছাত্রী থাকবে ৫০ জন। শিক্ষা সফরের ব্যয়ভার বহন করবে অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীরা। আপনার অনুমোদন পেলে আমাদের বিভাগের ৩ জন শিক্ষক তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে দলের সাথে যেতে সম্মতি দিয়েছেন। আপনার অনুমতি পেলে এবং সম্মানিত শিক্ষকদের তত্ত্বাবধানে শিক্ষা সফরে গেলে আমাদের অভিভাবকরাও সানন্দে অনুমতি দেবেন বলে আমাদের বিশ্বাস।

অতএব, শিক্ষা সফরের শিক্ষা ও আনন্দ থেকে আমরা যাতে বঞ্চিত না হই সেটা বিবেচনা করে শিক্ষা সফরে প্রেরণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য সবিনয়ে প্রার্থনা করছি।

বিনীত
আপনার একান্ত অনুগত ছাত্রছাত্রীবৃন্দ
অনার্স শেষবর্ষ
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

**০৮ বিশেষ প্রয়োজনে তিন দিনের ছুটি ও কর্মস্থল ত্যাগের আবেদন জানিয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে একটি আবেদনপত্র লিখুন।**

তারিখ : ২৬.০২.২০১৫

মহাব্যবস্থাপক
প্রফেসর'স প্রকাশন
৩৮/৩ বাংলাবাজার (তৃতীয় তলা), ঢাকা-১১০০।

**বিষয় : ছুটি ও কর্মস্থল ত্যাগের অনুমতির জন্য আবেদন।**

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



জনাব,

সবিনয় নিবেদন এই যে, আমি অত্র প্রতিষ্ঠানের একজন অফিস সহকারী। কিছুক্ষণ পূর্বে টেলিফোন মারফত অবগত হলাম বাড়িতে আমার পিতা ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। তার দেখাশুনা ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করার জন্য বাড়িতে কেউ নেই। কারণ আমার পিতামাতার আমিই একমাত্র সন্তান এবং উপার্জনক্ষম ব্যক্তি। তাই আজই আমার বাড়িতে যাওয়া জরুরি হয়ে পড়েছে।

অতএব, উপরিউক্ত অবস্থা বিবেচনা করে আমাকে অন্তত তিন দিনের ছুটি মঞ্জুর এবং কর্মস্থল ত্যাগের অনুমতি প্রদানের জন্য বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি।

নিবেদক

আপনার অনুগত

(সাইফুল ইসলাম)

অফিস সহকারী

প্রফেসর'স প্রকাশন।

**০৯ আপনার এলাকার পানীয় জলের অভাব দূরীকরণের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট একটি আবেদনপত্র রচনা করুন।**

তারিখ : ১১.০৩.২০১৫

জেলা প্রশাসক

কুমিল্লা।

**বিষয় : পানীয় জলের সংকট দূরীকরণে নলকূপ স্থাপনের জন্য আবেদন।**

জনাব,

বিনীত নিবেদন এই যে, আমরা কুমিল্লা জেলার দাউদকান্দি উপজেলার সুন্দলপুর ইউনিয়নের পূর্ব সুন্দলপুর গ্রামের অধিবাসী। এটি একটি জনবহুল ও বৃহৎ গ্রাম। এখানে প্রায় আট হাজার লোকের বসবাস। কিন্তু এ গ্রামে মাত্র আটটি নলকূপ রয়েছে, যার মধ্যে আবার দুটি বহুদিন ধরে অকেজো হয়ে আছে। ফলে মাত্র ছয়টি নলকূপ এত মানুষের বিশুদ্ধ খাবার পানি সরবরাহের জন্য যথেষ্ট নয়। তাই এ গ্রামের মানুষ বিশুদ্ধ পানীয় জলের অভাবে বেশ দুর্ভোগ পোহাচ্ছে। নিরুপায় হয়ে তারা পুকুর, ডোবা ও জলাশয়ের পানের অনুপযুক্ত পানি পান করে পানিবাহিত রোগ ডায়রিয়া, আমাশয় ইত্যাদির শিকার হচ্ছে। কাজেই পানীয় জলের এ সঙ্কট সমাধানে গ্রামের অকেজো নলকূপ দুটি মেরামত এবং এর সাথে আরো চারটি নতুন নলকূপ স্থাপন খুবই জরুরি হয়ে পড়েছে।

অতএব, উদ্ভূত পরিস্থিতিতে মানবিক দৃষ্টিতে বিচার বিশ্লেষণ করে উক্ত গ্রামের অকেজো নলকূপ দুটি মেরামত ও আরো চারটি নতুন নলকূপ স্থাপন করে অত্র গ্রামের জনসাধারণের পানীয় জলের সঙ্কট দূরীকরণে আপনার সাহায্যের হাত সম্প্রসারিত করে বাধিত করবেন।

নিবেদক

পূর্ব সুন্দলপুর গ্রামের জনসাধারণের পক্ষে

মো. আবুল খায়ের ভূঁইয়া

দাউদকান্দি, কুমিল্লা।



**১০ আপনার এলাকায় রাস্তা সংস্কারের প্রয়োজনীয়তার কথা জানিয়ে জেলা প্রশাসকের কাছে আবেদন করুন।**

তারিখ : ১৭.০৩.২০১৫

জেলা প্রশাসক

জয়পুরহাট।

**বিষয় : রাস্তা সংস্কারের জন্য আবেদন।**

মহোদয়,

সম্মানপূর্বক নিবেদন এই যে, জয়পুরহাট সদর উপজেলার শালপাড়া বাজার থেকে ফড়িয়া বাজারের রাস্তাটি বহুদিন ধরে সংস্কারের অভাবে জীর্ণ থেকে জীর্ণতর হয়ে বর্তমানে চলাচলের অযোগ্য হয়ে পড়েছে। অথচ এ রাস্তার পাশেই রয়েছে বেশ কয়েকটি বাজার, হাসপাতাল, কলেজ ও অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। ২০১০ সালের প্রলয়ঙ্করী বন্যায় জয়পুরহাট সদর উপজেলা সম্পূর্ণরূপে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়। সরকারি-বেসরকারি দেশি-বিদেশি সাহায্যকারী সংস্থা রাস্তাটির দুরবস্থার কারণে দ্রুত ও যথার্থভাবে সাহায্য সামগ্রী পৌছাতে পারেনি। রাস্তাটিতে বিভিন্ন স্থানে এমনি গর্তের সৃষ্টি হয়েছে যে যানবাহন তো দূরের কথা পায়ে হেঁটে চলাই দুষ্কর। জরুরি অবস্থায় অ্যাম্বুলেন্সে করে রোগী হাসপাতালে নেয়া সম্ভব হয় না বলে অনেকে অকালে মৃত্যুবরণ করে।

অতএব, আপনার নিকট আকুল আবেদন এই যে, অনতিবিলম্বে রাস্তাটি সংস্কারের ব্যবস্থা করে জনগণের দুঃখ-দুর্দশা লাঘবে আপনার সদয় সহানুভূতির স্বাক্ষর রাখবেন।

নিবেদক

এলাকার জনগণের পক্ষে

আবদুস সবুর

সদর, জয়পুরহাট।

**১১ ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত জনসাধারণের সাহায্যার্থে জেলা প্রশাসকের নিকট আবেদনপত্র লিখুন।**

তারিখ : ২৮.০২.২০১৫

জেলা প্রশাসক

নোয়াখালী।

**বিষয় : ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত জনসাধারণে জন্য জরুরি সাহায্যের আবেদন।**

জনাব,

সবিনয় নিবেদন এই যে, আমরা নোয়াখালী জেলার সদর উপজেলার অন্তর্গত অনন্তপুর ইউনিয়নের জনগণ অবর্ণনীয় দুর্দশার মধ্যে কালযাপন করছি। গত ২১ নভেম্বর আমাদের ইউনিয়নের উপর দিয়ে

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



ভয়াবহ এক ঘূর্ণিঝড় বয়ে গেছে। যার ফলশ্রুতিতে সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত আমাদের ইউনিয়ন। এ ইউনিয়নের প্রায় সব ঘরই মাটির সাথে মিশে গেছে। ঘণ্টায় ২৫০ কিলোমিটার বেগে প্রবাহিত ঘূর্ণিঝড়ের করাল গ্রাসের শ্যেন দৃষ্টি এড়িয়ে দু চারটা ঘর সোজা দাঁড়িয়ে থাকলেও তাদের চাল উড়ে গেছে। কৃষকের ঘরে খাদ্যশস্য যা ছিল তা ঝড়ের তাণ্ডবে উড়ে গেছে। ফলে ধনী দরিদ্র সবারই একই অবস্থা। কান্না-আর্তনাদ, ক্ষুধা-আহাজারিতে এলাকাটি এখন শ্মশানের রূপ পেয়েছে। দুর্গত এলাকায় খাবারের সাথে সাথে পানীয় জলের সংকট দেখা দিয়েছে। কারণ নলকূপগুলো ঝড়ে বিধ্বস্ত ও অকেজো। গ্রামের লোকজন বিশেষত শিশু ও বৃদ্ধরা ডায়রিয়ায় আক্রান্ত হতে শুরু করেছে। এসব সংবাদ জাতীয় পত্রিকায় প্রকাশ হলেও অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে, এখন পর্যন্ত এখানে কোনো সাহায্য শিবির খোলা হয়নি, সাহায্যের হাত কেউ সম্প্রসারিত করেনি। এ অবস্থায় সরকারি সাহায্য অত্যন্ত জরুরি।

অতএব, ওপরের বিষয়াদি বিবেচনা করে বিধ্বস্ত ইউনিয়নটির জনগণকে সবদিক দিয়ে রক্ষার জন্য জরুরি সাহায্য পাঠাতে আপনার হস্তক্ষেপ কামনা করছি।

বিনীত
অনন্তপুর ইউনিয়নের অসহায় জনসাধারণের পক্ষে
সাজ্জাদ হোসেন
সদর, নোয়াখালী।

**১২ আপনার ইউনিয়নে একটি পাঠাগার স্থাপনের জন্য জেলা প্রশাসকের নিকট একখানা আবেদনপত্র লিখুন।**

তারিখ : ১৪.০৩.২০১৫

জেলা প্রশাসক
জামালপুর।

**বিষয় : দোয়াইল ইউনিয়নে পাঠাগার স্থাপনের জন্য আবেদন।**

জনাব,
যথাবিহীত সম্মানপূর্বক বিনীত নিবেদন এই যে, আমরা জামালপুর জেলার সরিষাবাড়ী উপজেলার দোয়াইল ইউনিয়নের অধিবাসী। অত্র ইউনিয়নে একটি ডিগ্রি কলেজ, দুটি উচ্চ বিদ্যালয়, একটি ফাজিল মাদ্রাসা, পাঁচটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং তিনটি রেজিস্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে। ইউনিয়নের শতকরা ৬৫ ভাগ মানুষ অক্ষর জ্ঞানসম্পন্ন, ৫৬ ভাগ অধিবাসী প্রাথমিক শিক্ষায় শিক্ষিত। ৪৪ ভাগ মাধ্যমিক শিক্ষা সম্পন্ন করেছে এবং ২৫ ভাগ স্নাতক। এ ইউনিয়নে একটি পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র ও একটি সরকারি দাতব্য চিকিৎসালয় রয়েছে। উপজেলা সমবায় সমিতির সকল কার্যক্রমে ইউনিয়নের অধিবাসীবৃন্দ সার্বিক সহযোগিতায় সক্রিয়। তাছাড়া সরকারের বয়স্ক শিক্ষাদান কার্যক্রমের অধীনে বেশ কয়েকটি কেন্দ্র ফলপ্রসূতার সাথে কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। সরকারি, বেসরকারি, ব্যক্তিগত ও সামবায়িক উদ্যোগে অত্র ইউনিয়নের কৃষিজ উন্নয়ন এবং ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের উৎপাদন উন্নয়নমুখী। কিন্তু পরিতাপের বিষয় হচ্ছে, সকল ব্যবস্থাপনা সত্ত্বেও সঠিক পঠন-পাঠনের সুযোগের অভাবে ইউনিয়নবাসী স্ব স্ব ক্ষেত্রে তাদের মেধার সর্বোচ্চ প্রতিফলন ঘটানোর উপযোগী জ্ঞান লাভ করতে পারছে না। এমতাবস্থায়, এই ইউনিয়নে একটি পাঠাগার অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।



অতএব, জনাবের নিকট ইউনিয়নবাসীর প্রার্থনা এই যে, উপর্যুক্ত বিষয়াবলীর আলোকে, জনসাধারণের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন তথা গ্রামোন্নয়নের স্বার্থে আমাদের ইউনিয়নে একটি পাঠাগার স্থাপন করতে আপনার সদয় হস্তক্ষেপ কামনা করছি।

বিনীত
দোয়াইল ইউনিয়নবাসীর পক্ষে
আলাল উদ্দিন।

**১৩ আপনাদের ক্লাবের সমাজ উন্নয়নমূলক কাজের জন্য অর্থ সাহায্য চেয়ে জেলা প্রশাসকের কাছে একটি আবেদনপত্র রচনা করুন।**

তারিখ : ১৬.০৩.২০১৫

জেলা প্রশাসক
ভোলা।

**বিষয় : সমাজ উন্নয়নমূলক কাজের জন্য আর্থিক সাহায্যের আবেদন।**

জনাব,
সবিনয় নিবেদন এই যে, ভোলা মানব কল্যাণ সংঘ গত দুই দশক ধরে গ্রামের উন্নয়নমূলক বিভিন্ন কাজ করে আসছে। সংঘের তরুণ ও নিবেদিত প্রাণ উৎসাহী কর্মীরা স্বেচ্ছাশ্রমের মাধ্যমে শিক্ষা, যোগাযোগ ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে লক্ষণীয় পরিবর্তন এনেছে। সংঘের উদ্যোগে সবার জন্য স্বাস্থ্য ও সম্পূর্ণরূপে নিরক্ষরতা দূরীকরণ, বনায়ন, রাস্তাঘাট নির্মাণ, মৎস্য চাষ, হাঁস-মুরগির খামার, গবাদিপশুর খামারসহ বিভিন্ন কর্মসূচি হাতে নেয়া হয়েছে। এ কর্মসূচিগুলো বাস্তবায়িত হলে সমগ্র জেলায় এটি উদাহরণ হয়ে থাকবে এবং মডেল হিসেবে গৃহীত হবে। গৃহীত উন্নয়নমূলক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করতে আনুমানিক ৫ লাখ টাকা প্রয়োজন, যার বৃহৎ অংশ স্থানীয়ভাবে মেটানো হবে। আপনার কাছ থেকে ১ লাখ টাকা স্থায়ী মঞ্জুরি পেলে আমরা এগুলো সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে পারব বলে আশা রাখি।

অতএব, বিনীত নিবেদন এই যে, আমাদের এ মহতী উদ্যোগকে সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের লক্ষ্যে স্থায়ী মঞ্জুরি হিসেবে ১ লাখ টাকা অনুদানের আবেদন জানাচ্ছি।

নিবেদক
আশরাফুল আমিন
সভাপতি
ভোলা মানব কল্যাণ সংঘ
ভোলা।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



**১৪** আপনার এলাকায় একটি ব্রিজ নির্মাণের জন্য কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন জানিয়ে একটি পত্র লিখুন।

তারিখ : ১৮.০৩.২০১৫

মাননীয় মন্ত্রী
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

**বিষয় : লক্ষ্মীপুরের চন্দ্রগঞ্জে ব্রিজ নির্মাণের জন্য আবেদন।**

জনাব,

যথাবিহীত সম্মানপূর্বক বিনীত নিবেদন এই যে, আমরা লক্ষ্মীপুর জেলার সদর উপজেলার চন্দ্রগঞ্জ ইউনিয়নের অধিবাসী। এ ইউনিয়নের প্রায় মধ্যভাগ দিয়ে পূর্ব-পশ্চিমে প্রবাহিত হয়েছে কৃষি সেচ ব্যবস্থার প্রয়োজনে একটি খাল। খালটি পুরো এলাকাটিকে উত্তর অংশ ও দক্ষিণ অংশ– এ দু'ভাগে বিভক্ত করেছে। খালের উত্তর পাশে ঢাকা-লক্ষ্মীপুর মহাসড়ক এবং স্নাতক মহাবিদ্যালয়, একটি গণপাঠাগারসহ বেশ কয়েকটি উচ্চ বিদ্যালয় এবং দক্ষিণ পাশে পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রসহ ইউনিয়ন পরিষদের কাউন্সিল ভবন ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ অফিস অবস্থিত। তাছাড়া খালটির দক্ষিণ ও উত্তর উভয়পার্শ্বেই নবনির্মিত সড়ক রয়েছে, যা রাজধানীসহ সারাদেশে যোগাযোগের মাধ্যম। এলাকার উৎপাদিত কৃষিপণ্য বর্তমান বাজার ব্যবস্থায় দ্রুত বিপণনের জন্য বিভিন্ন বাজার, গঞ্জে বা ঢাকা-চট্টগ্রামে সরবরাহ করতে হলে এ খালটির জন্য তা বিঘ্নিত হয়। কারণ, খালের উপর কোনো ব্রিজ নির্মিত হয়নি। এলাকাবাসী এপার-ওপার যাতায়াতে, পণ্যাদি সরবরাহে মান্ধাতার আমলের খেয়া তরীর শরণাপন্ন হতে বাধ্য হয়, বর্তমানে আধুনিক বিশ্বের যোগাযোগ ব্যবস্থার সাথে, যা নিতান্তই বেমানান এবং গ্রামীণ উন্নয়নে প্রতিবন্ধকতা স্বরূপ।

এমতাবস্থায়, মহোদয় সমীপে আমাদের আকুল আবেদন এই যে, উক্ত খালের উপর একটি ব্রিজ নির্মাণ করে বিদ্যমান সমস্যাবলী দূর করে এ এলাকার উন্নয়নের গতি ত্বরান্বিত করতে জনাবের সু- আজ্ঞা হয়।

বিনীত নিবেদক
এলাকাবাসীর পক্ষে
আলমগীর হোসেন
লক্ষ্মীপুর সদর, লক্ষ্মীপুর।



**১৫** আপনার এলাকায় মহাবিদ্যালয় স্থাপনের প্রয়োজনীয়তার কথা জানিয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিবের কাছে একটি আবেদনপত্র লিখুন।

তারিখ : ১৯.০৩.২০১৫

সচিব মহোদয়
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

**বিষয় : বেগমগঞ্জের বাংলাবাজারে একটি মহাবিদ্যালয় স্থাপনের জন্য আবেদন।**

মহোদয়,

নোয়াখালী জেলার বেগমগঞ্জ উপজেলার বাংলাবাজার একটি সমৃদ্ধ এলাকা। ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলন থেকে শুরু করে স্বাধীনতা যুদ্ধে এ অঞ্চলের রয়েছে গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস। অনেক আগ থেকেই এ অঞ্চলের মানুষ শিক্ষা-দীক্ষা, ব্যবসা-বাণিজ্য ও রাজনীতি সচেতন। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে, অদ্যাবধি এ অঞ্চলে কোনো মহাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়নি। অথচ এখানে রয়েছে একটি মাধ্যমিক বালক বিদ্যালয় ও একটি বালিকা বিদ্যালয়, একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়, দুটি কিন্ডারগার্টেন এবং একটি দাখিল মাদ্রাসা। এছাড়াও এ বাজারের চতুর্দিকের গ্রামগুলোতে রয়েছে মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও মাদ্রাসাসহ প্রায় ২০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। সামাজিক ও অর্থনৈতিক দিক দিয়ে অত্র এলাকার অধিকাংশ অধিবাসীই নিম্নমধ্যবিত্ত বা নিম্নবিত্তের। কিন্তু এরা প্রায় সকলেই শিক্ষানুরাগী অথচ অত্র অঞ্চলে কোনো মহাবিদ্যালয় না থাকায় কেবল উচ্চবিত্তের সন্তানেরা শহরে গিয়ে উচ্চ শিক্ষা লাভের সুযোগ পায়। আর অধিকাংশ শিক্ষার্থীরই শিক্ষাজীবনের যবনিকাপাত ঘটছে শুধু মহাবিদ্যালয়ের অভাবে। ফলে ক্রমান্বয়ে বেড়ে চলেছে বেকারত্ব ও হতাশা। সুতরাং এখানে একটি মহাবিদ্যালয় স্থাপিত হলে ঝরেপড়া এবং শিক্ষাবঞ্চিত এসব শিক্ষার্থীর উচ্চ শিক্ষার পথ সহজ ও সুগম হবে।

অতএব, আমরা একটি মহাবিদ্যালয় স্থাপনের জরুরি প্রয়োজন অনুভব করছি এবং মহাবিদ্যালয় স্থাপনের জন্য স্থান নির্বাচন এবং প্রাথমিক পদক্ষেপ গ্রহণ করার সকল প্রকার ব্যবস্থা নিয়েছি। এমতাবস্থায় আপনার মন্ত্রণালয়ের সার্বিক সহযোগিতা কামনা করছি এবং আমাদের আবেদন মঞ্জুর করার অনুরোধ জানাচ্ছি।

বিনীত নিবেদক
এলাকার জনগণের পক্ষে
জাকির হোসেন
বাংলাবাজার, বেগমগঞ্জ, নোয়াখালী।

**১৬** আপনার এলাকায় একটি দাতব্য চিকিৎসালয়ের প্রয়োজনীয়তা বিশ্লেষণ করে জেলা প্রশাসকের নিকট একটি আবেদনপত্র রচনা করুন।

তারিখ : ২৫.০২.২০১৫

বরাবর
জেলা প্রশাসক
টাঙ্গাইল।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



বিষয় : দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপনের জন্য আবেদন।

জনাব,

সম্মানপূর্বক বিনীত নিবেদন এই যে, টাঙ্গাইল জেলার ঘাটাইল উপজেলার দিগার একটি বর্ধিষ্ণু ও জনবহুল এলাকা। এ এলাকায় প্রায় দশ হাজার লোকের বাস। এখানে ইউনিয়ন পরিষদ অফিস, ডাকঘর ও বেশ কয়েকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য যে, এখানে কোনো রেজিস্টার্ড ডাক্তার বা সরকারি কোনো চিকিৎসালয় নেই। তাই স্বাস্থ্য সেবার জন্য এ অঞ্চলের জনসাধারণকে ৮/১০ কিলোমিটার দূরে উপজেলা স্বাস্থ্য কেন্দ্রের শরণাপন্ন হতে হয়, যা গরিব ও সংকটাপন্ন রোগীর পক্ষে একেবারেই অসম্ভব। উপযুক্ত চিকিৎসার অভাবে এবং হাতুড়ে ডাক্তারের অপচিকিৎসায় অনেকেই অকালে মৃত্যুবরণ করছে। তাই এ অঞ্চলে একটি দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন অতীব জরুরি হয়ে পড়েছে।

অতএব, বিনীত প্রার্থনা এই যে, এ অঞ্চলে একটি দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করে বিনা চিকিৎসায় মৃত্যুর হাত থেকে এলাকাবাসীকে রক্ষা করার যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ জানাচ্ছি।

নিবেদক
অত্র এলাকার অধিবাসীদের পক্ষ থেকে
আব্দুছ ছামাদ
দিগর, ঘাটাইল, টাঙ্গাইল।

**১৭** **'অধিক খাদ্য ফলাও' আন্দোলনের জন্য ন্যায্যমূল্যে সার সরবরাহের অনুরোধ জানিয়ে যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট একটি আবেদনপত্র লিখুন।**

তারিখ : ২৭.০৩.২০১৫

মাননীয় মন্ত্রী
কৃষি মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

বিষয় : ন্যায্যমূল্যে সার সরবরাহের জন্য আবেদন।

জনাব,

সম্মানপূর্বক বিনীত নিবেদন এই যে, আমরা নওগাঁ জেলার মহাদেবপুর উপজেলার অধিবাসী। এ উপজেলার উর্বর সমভূমি কৃষিনির্ভর বাংলাদেশের কৃষি উৎপাদনে খুবই সহায়ক। কয়েক হাজার হেক্টর জমিতে প্রধান শস্য ধান, প্রধান অর্থকরী শস্য পাট, বিভিন্ন রবিশস্যের চাষ খুবই ভালো হয়। এলাকার সেচ ব্যবস্থার জন্য স্থানীয় জনগণের উদ্যোগে ও সরকারি সহযোগিতায় খাল খনন করা হয়েছে। কিন্তু এ উপজেলায় কৃষকরা ন্যায্যমূল্যে রাসায়নিক সার ব্যবহার করতে পারছে না। আধুনিক কৃষিব্যবস্থায় প্রাকৃতিক-জৈবিক সার উৎপাদন প্রক্রিয়া যথেষ্ট নয়। রাসায়নিক সারের পর্যাপ্ত যোগানের অভাবে মূল্য বেশি হওয়ায় স্থানীয় দরিদ্র কৃষকদের খুবই সমস্যায় পড়তে হচ্ছে। তারা পর্যাপ্ত পরিমাণে সার জমিতে প্রয়োগ করতে পারছে না। ফলে উৎপাদন হ্রাস পাচ্ছে। এতে করে এলাকায় খাদ্যশস্যের ঘাটতি দেখা দিচ্ছে। যা জনজীবনে দুর্ভোগ বয়ে আনছে।



এমতাবস্থায়, হুজুর সমীপে এলাকাবাসীর আকুল আবেদন এই যে, বাংলাদেশ সরকারের 'অধিক খাদ্য ফলাও' আন্দোলনের বাস্তবায়নার্থে অত্র এলাকায় ন্যায্যমূল্যে সার সরবরাহ করার জন্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করতে আপনার সু-দৃষ্টি কামনা করছি।

নিবেদক
এলাকাবাসীর পক্ষে
গোলাম কিবরিয়া
মহাদেবপুর, নওগাঁ।

**১৮** **আপনার এলাকায় বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে একটি আবেদনপত্র লিখুন।**

তারিখ : ২৪.০১.২০১৫

নির্বাহী প্রকৌশলী
বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড
নারায়ণগঞ্জ।

বিষয় : বিদ্যুৎ সংযোগদানের জন্য আবেদন।

জনাব,

বিনীত নিবেদন এই যে, ঢাকা শহরের সন্নিকটে নারায়ণগঞ্জ জেলার আড়াইহাজার উপজেলার রসুলপুর একটি বর্ধিষ্ণু গ্রাম। এ গ্রামের পাশ ঘেঁষেই গড়ে উঠেছে বেশ কিছু শিল্প-কারখানা। শহরের প্রভাবে এ গ্রামের শিক্ষিত যুবকেরা উন্নয়নমুখী কর্মকাণ্ডে যুক্ত হয়ে ছোটখাট শিল্পসহ বিভিন্ন কাজ হাতে নিয়েছে। এছাড়া গ্রামটি কৃষিপ্রধান হওয়ায় কৃষি ব্যবস্থার আধুনিকীকরণের জন্য কৃষকেরা অগভীর ও গভীর নলকূপ বসাতে আগ্রহী। আটার কল ও ধানের কলসহ কয়েকটি হালকা কল বসানোরও পরিকল্পনা রয়েছে কৃষকদের। কিন্তু গ্রামে বিদ্যুৎ সংযোগ না থাকায় এসব কাজ সম্ভব হচ্ছে না বা বিঘ্নিত হচ্ছে। আবাসিক প্রয়োজন ছাড়াও এ সমস্ত ছোট ছোট শিল্প-কারখানা, গভীর-অগভীর নলকূপ ও কলে বিদ্যুতের প্রয়োজনীয়তা একান্ত অপরিহার্য। তাই গ্রামটিতে বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা করা হলে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের প্রাণচাঞ্চল্যে স্ব-নির্ভরতা ধরা দেবে বলে আমরা বিশ্বাস করি।

অতএব, মহোদয়ের নিকট আমাদের আবেদন এই যে, সবদিক বিবেচনাপূর্বক গ্রামটিকে বিদ্যুৎ সংযোগদানের মাধ্যমে গ্রামটির স্বনির্ভরতার পথকে সুগম করার ব্যবস্থা করলে চির কৃতজ্ঞ থাকবো।

নিবেদক
কামরুল হাসান
রসুলপুর গ্রামবাসীর পক্ষে
আড়াইহাজার, নারায়ণগঞ্জ।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



**১৯** আপনার গ্রামে আপনি একটি আধুনিক তাঁতশিল্প স্থাপনে আগ্রহী। ঐ গ্রামে তাঁতশিল্প স্থাপনের উপযুক্ত কারণ উল্লেখ করে সরকারি অনুমোদন লাভের জন্য শিল্প সচিবের কাছে একটি আবেদনপত্র লিখুন।

তারিখ : ২০.০২.২০১৫

সচিব মহোদয়
শিল্প মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ঢাকা।

**বিষয় : একটি তাঁত শিল্প স্থাপনের সরকারি অনুমোদনের জন্য আবেদন।**

জনাব,
সবিনয় নিবেদন এই যে, আমি পাবনা জেলার আটঘরিয়া উপজেলার চাচকিয়া গ্রামের অধিবাসী এবং এ অঞ্চলের একজন সুতা ব্যবসায়ী। আমি ২০০৪ সালে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম কম (ব্যবস্থাপনা) পাস করেছি এবং এরপর থেকে ব্যবসায়ের সাথে জড়িত আছি। দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতার আলোকে আমি দেখতে পেয়েছি যে, এ অঞ্চলের সাধারণ মানুষের উন্নয়ন তথা জাতীয় উন্নয়নের স্বার্থে এখানে একটি আধুনিক তাঁতশিল্প স্থাপন করা প্রয়োজন। কিন্তু সরকারি অনুমোদনের অভাবে এখানকার কোনো শিল্পপতির পক্ষে এ মহৎ উদ্যোগ গ্রহণ করা সম্ভব হচ্ছে না। অথচ আমাদের এ এলাকায় তাঁতশিল্প প্রতিষ্ঠার জন্য যথেষ্ট স্থান, অনুকূল পরিবেশ ও যথেষ্ট কাঁচামাল রয়েছে। কারণ এখানকার অধিবাসীরা উত্তরাধিকার সূত্রে কুটির শিল্পের সুতা উৎপাদন ও রং করে। কিন্তু এখানকার ক্ষুদ্র শিল্পে লুঙ্গি, গামছা ছাড়া আর কিছুই উৎপাদন করা হয় না। অন্যদিকে এখানকার বহু যুবক ও তরুণ বেকার অবস্থায় উদ্দেশ্যহীন ও অলস জীবনযাপন করে। এসব বেকার যুবকের কর্মসংস্থানের জন্য এখানে তাঁতশিল্প গড়ে উঠলে তা খুবই ফলপ্রসূ হবে বলে মনে করি।

অতএব, মহোদয় সমীপে আবেদন এই যে, উপরিউক্ত বিষয় বিবেচনা করে আমাদের এলাকায় একটি তাঁত শিল্প স্থাপনের অনুমোদন দিয়ে বাধিত করবেন।

নিবেদক
নিয়াজ মাহমুদ
চাচকিয়া, আটঘরিয়া, পাবনা।

**২০** কোনো বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে হিসাবরক্ষক পদে নিয়োগের জন্য আবেদনপত্র লিখুন।

তারিখ : ১৫.০৩.২০১৫

জেনারেল ম্যানেজার
উত্তরা ব্যাংক লিমিটেড
প্রধান কার্যালয়, উত্তরা ব্যাংক ভবন
মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।



**বিষয় : হিসাবরক্ষক পদে নিয়োগের জন্য আবেদন।**

জনাব,
বিনীত নিবেদন এই যে, গত ৬ মার্চ ২০১৫ তারিখের 'দৈনিক প্রথম আলো' পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে জানতে পারলাম আপনার প্রতিষ্ঠানে হিসাররক্ষক পদে কিছু সংখ্যক অভিজ্ঞতাসম্পন্ন কর্মকর্তা নিয়োগ করা হবে। উক্ত পদের জন্য একজন প্রার্থী হিসেবে নিচে আমার পূর্ণাঙ্গ জীবনবৃত্তান্ত, শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা সংবলিত তথ্যাদি আপনার অবগতির জন্য পেশ করলাম।

নাম : শরিফুল ইসলাম
পিতার নাম : ফখরুল ইসলাম
মাতার নাম : হালিমা খাতুন
বর্তমান ঠিকানা : ৩০/১ মনিপুর, মিরপুর, ঢাকা।
স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম : শ্রীফলতলা, ডাকঘর : শ্রীফলতলা বাজার, উপজেলা : কালিয়াকৈর, জেলা : গাজীপুর।
জন্ম তারিখ : ০৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৯।
বর্তমান বয়স : ২৬ বছর ১ মাস ১১ দিন।
ধর্ম : ইসলাম (সুন্নি)।
জাতীয়তা : বাংলাদেশী।
শিক্ষাগত যোগ্যতা :

| পরীক্ষার নাম | শাখা | পাসের বছর | প্রাপ্ত বিভাগ | বোর্ড/বিশ্ববিদ্যালয় |
|---|---|---|---|---|
| এসএসসি | বাণিজ্য | ২০০৫ | প্রথম বিভাগ | ঢাকা বোর্ড |
| এইচএসসি | বাণিজ্য | ২০০৭ | প্রথম বিভাগ | ঢাকা বোর্ড |
| বিবিএ | বাণিজ্য | ২০১১ | সিজিপিএ ৩.৫ | ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় |
| এমবিএ | বাণিজ্য | ২০১২ | জিপিএ ৩.২৮ | ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় |

অভিজ্ঞতা : সিএ ফার্ম আকিব এন্ড সন্স-এ তিন বছর অডিটর হিসেবে কর্মরত ছিলাম।

অতএব, মহোদয়ের নিকট আকুল আবেদন উপরিউক্ত তথ্যাদি বিবেচনা করে আমাকে উক্ত পদে নিয়োগ দিলে আমি আমার কর্মদক্ষতা ও সততার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের সার্বিক উন্নতি বিধানের চেষ্টা করব।

বিনীত নিবেদক

(শরিফুল ইসলাম)

সংযুক্তি :
১. সকল পরীক্ষার সত্যায়িত সনদপত্র।
২. সকল প্রশংসাপত্রের সত্যায়িত ফটোকপি।
৩. অভিজ্ঞতার সনদপত্র।
৪. প্রথম শ্রেণির গেজেটেড অফিসার প্রদত্ত চারিত্রিক সনদপত্র।
৫. সদ্য তোলা ৩ কপি পাসপোর্ট সাইজ ছবি।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

# ব্যক্তিগতপত্র

ব্যক্তিগতপত্রের কাঠামোতে ছয়টি অংশ থাকে। যেমন– ১. মঙ্গলসূচক শব্দ, ২. স্থান ও তারিখ, ৩. সম্বোধন, ৪. মূল পত্রাংশ (মূল বক্তব্য), ৫. নাম-স্বাক্ষর (পত্রলেখকের স্বাক্ষর), ৬. শিরোনাম : শিরোনাম পত্র পাঠানোর খামের উপর লিখতে হয়। খামের উপর বাম দিকে পত্রলেখকের (প্রেরক) ঠিকানা এবং ডান দিকে পত্র প্রাপকের পূর্ণাঙ্গ ঠিকানা স্পষ্টভাবে লিখতে হয়।

**০১** বাংলাদেশে রবীন্দ্র সাহিত্য চর্চার বর্তমান অবস্থা জানিয়ে প্রবাসী বন্ধুর নিকট একটি পত্র লিখুন।

১৪.০৩.২০১৫
আজিমপুর, ঢাকা

প্রিয় বন্ধু 'ক',

আমার অসংখ্য প্রীতি ও শুভেচ্ছা নিও। আশা করি মা-বাবা, ভাই-বোন ও বন্ধুদের নিয়ে ভালো আছ। গত রবিবার তোমার চিঠি পেলাম। চিঠি পেয়ে বড়ই খুশি হয়েছি। চিঠিতে জানতে চেয়েছ বাংলাদেশে রবীন্দ্রসাহিত্য চর্চার বর্তমান অবস্থা কেমন। তার কিছু বিবরণ তোমাকে চিঠিতে জানাচ্ছি।

রবীন্দ্রসাহিত্যপ্রেমী প্রবাসী বন্ধু তুমি তো ভালো করেই জানো যে, কবিশ্রেষ্ঠ রবীন্দ্রনাথ এক বিস্ময়কর প্রতিভা। তিনি পৃথিবীর সর্বকালের সেরা কবিদের একজন। কেবল কবি শ্রেষ্ঠই নন, কিংবা শুধু ভাষা-সাধকই নন; তিনি চিন্তাবিদ, দার্শনিকও। তিনি মনুষ্যত্বের সাধক। অন্যায়-অবিচারের বলিষ্ঠ প্রতিবাদী কণ্ঠ। তিনি নৈরাশ্য পীড়িতকে শোনালেন নবজীবনের গান। জাতির কণ্ঠে দিলেন গণসঙ্গীত। মুখে দিলেন নবযুগের ভাষা। মানব জীবনের এমন কোনো ক্ষেত্র নেই, এমন কোনো চিন্তা নেই, এমন কোনো ভাব নেই যেখানে তিনি সাহিত্যের মাধ্যমে বিচরণ করেননি। খণ্ডকালের হয়েও তিনি সর্বকালের। বিশেষ দেশের হয়েও সব দেশেই তার সাদর প্রতিষ্ঠা। রবীন্দ্রনাথ তাই আমাদের গর্ব। তিনি দেশ ও জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক। তিনি পরলোক গমন করেছেন দৈহিকভাবে সত্য। কিন্তু তার সাহিত্য বেঁচে আছে বাংলাদেশ তথা বিশ্বের প্রতিটি মানসপটে। তাই তো আমরা আজও মনেপ্রাণে অহর্নিশি রবীন্দ্রসাহিত্য চর্চা করে যাচ্ছি।

বাঙালির সাহিত্য চর্চার ও সৃষ্টির মূল উৎস রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। পূর্বের অবস্থা হতে 'রবীন্দ্রসাহিত্য চর্চা' বর্তমানে সমৃদ্ধ হয়েছে বলে আমি বিশ্বাস করি। রবীন্দ্র জন্মজয়ন্তী ও মৃত্যুবার্ষিকীতে বর্তমানে মাসব্যাপী অনুষ্ঠান করে বাংলাদেশ। দেশের স্কুল-কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন সাহিত্য চর্চাকেন্দ্র এবং গণমাধ্যমগুলো বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করে থাকে। যেখানে তার অসাধারণ গান বাজে প্রত্যেক



শিল্পীর কোমল কণ্ঠে। শুধু গান নয় তার নাটক মঞ্চস্থ হয় যা সাহিত্য চর্চার নিখাত প্রেম বহন করে। আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন গবেষণামূলক গ্রন্থ ও প্রবন্ধ প্রকাশ করে ক্ষুদে সাহিত্যপ্রেমী থেকে শুরু করে দেশের প্রখ্যাত বুদ্ধিজীবী, গবেষক, কবি ও সাহিত্যিকেরা। প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে, তার জীবন-দর্শন নিয়ে, তার কবিতা আবৃত্তি, তার গানসহ নানা সাহিত্যকর্ম নিয়ে। এতে করে রবীন্দ্রসাহিত্য চর্চা অনেকাংশে বাড়ছে এবং ভবিষ্যতেও এ ধারা অব্যাহত থাকবে বলে আমি আশা রাখি।

বাংলা ভাষা সাহিত্য নিয়ে দেশের সর্ববৃহৎ গবেষণাকারী সংস্থা বাংলা একাডেমি। এ প্রতিষ্ঠানটি নিয়মিতই চর্চা করে রবীন্দ্রসাহিত্য। এখান থেকে প্রতিবছরই কমবেশি রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে রবীন্দ্রসাহিত্য ও গবেষণামূলক পুস্তক প্রকাশিত হয়। আরো আশার তথ্য হলো বাংলা একাডেমি ২০১১ সাল হতে রবীন্দ্রসাহিত্য পুরস্কার প্রবর্তন করে। যার ফলে সাহিত্য চর্চা আরো বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাড়ছে রবীন্দ্র গবেষণা কেন্দ্র, রবীন্দ্রসাহিত্য চর্চার ক্ষেত্র। দেশের বিখ্যাত সাংস্কৃতিক কেন্দ্র 'ছায়ানট' সবচেয়ে বেশি রবীন্দ্রসাহিত্য চর্চা করে। পাশাপাশি সাংস্কৃতিক সংগঠন উদীচী, রবীন্দ্রসাহিত্য চর্চা কেন্দ্র, রবীন্দ্র সরোবরে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন সংগঠনের রবীন্দ্রসাহিত্য চর্চা তথা দেশের সর্বস্তরের ছোট-বড় নানা প্রতিষ্ঠানই প্রত্যেক অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে নানামুখী আয়োজন করে আসছে। তাছাড়া প্রাতিষ্ঠানিক অঙ্গনে, স্কুল-কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে নানা অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে রবীন্দ্রসাহিত্য চর্চা করে থাকে। পাঠ্য বইয়ের তালিকায় স্থান পেয়েছে রবীন্দ্রনাথের প্রখ্যাত কবিতা-গল্প। এখানেও রবীন্দ্রসাহিত্য চর্চা হচ্ছে।

সম্প্রতি বাংলাদেশে মহাসমারহে পালিত হয় রবীন্দ্রনাথের সার্ধশততম জন্মবার্ষিকী। যেখানে আয়োজন করা হয় নানামুখী অনুষ্ঠান ও রবীন্দ্রসাহিত্য চর্চার।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, বর্তমান বাংলাদেশে রবীন্দ্রসাহিত্য চর্চা অত্যন্ত সমৃদ্ধশালী সাহিত্যে প্রবাহমান।

রবীন্দ্রনাথ ছিলেন অনন্ত জীবন, চিরজীবী মানবাত্মা ও প্রকৃতির চিরন্তন সৌন্দর্যের কবি। রবীন্দ্রনাথের দানের ঐশ্বর্যে ভরে আছে বাঙালির প্রাণ। তাই তাকে নিয়ে চর্চার শেষ নেই। সর্বোপরি তাকে নিয়ে বর্তমান বাংলাদেশে যে চর্চা প্রবাহমান তা নিঃসন্দেহে আশাব্যঞ্জক।

আমি ভালো আছি। আজ আর নয়। বাসার বড়দের প্রতি সালাম ও ছোটদের প্রতি স্নেহ জানিও। কবে বাংলাদেশে ফিরবে জানিও।

ইতি
তোমার বন্ধু
'খ'

| | STAMP |
|---|---|
| From | To |
| Name : .................... | Name : .................... |
| Address : .................... | Address : .................... |

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



**০২** বাংলাদেশে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মোৎসব পালনের বিবরণ দিয়ে প্রবাসী বন্ধুকে একটি পত্র লিখুন।

১৫.০৩.২০১৫
বনানী, ঢাকা

সুপ্রিয় বন্ধু অপরূপ,

আমার ভালোবাসা ও শুভেচ্ছা নিও। প্রায় এক মাস হলো তোমার কোন পত্রাদি পাইনি। গত চিঠিতে আমরা যে বাংলাদেশে খুব উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মোৎসব পালন করব তা তোমাকে জানিয়েছিলাম। এখন আমরা কীভাবে এবার আমাদের বাংলাদেশে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মোৎসব পালন করেছি তা তোমাকে সংক্ষেপে জানাচ্ছি।

মানব সভ্যতার অগ্রযাত্রার পেছনে সৃষ্টিশীল, প্রতিভাধর মানুষেরা বরাবরই পথনির্দেশকের ভূমিকা পালন করে থাকেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তেমনই একজন মানুষ বাঙালির আত্মপরিচয় ও সত্তা নির্মাণে যার ভূমিকা অপরিসীম ও অনবদ্য। তার সৃষ্টির মধ্যে আমরা পেয়েছি বাঁচার, দেখার, চেনার ও জানার পরিপূর্ণ রসদ। এই মহান মনীষী জন্মগ্রহণ করেছিলেন আজ হতে দেড়শত বছর পূর্বে কলকাতার জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারে। তারই স্মরণে, তারই কৃতি ও সৃষ্টি স্মরণে আমরা বাঙালিরা বিভিন্নভাবে নানা আয়োজনে নানা উৎসবে সমবেত হই তারই সৃষ্টি সাহিত্যের যথোচিত চর্চা করি। এর মধ্যে জন্মোৎসব অন্যতম। গতবার ছিল রবি ঠাকুরের ১৫৩তম জন্মোৎসব।

জন্মোৎসব কর্মসূচি বর্ণনায় বলব– দিনটিতে বাঙালি রঙিন সাজে সেজেছিল। মনে হয়েছিল যেন মরা গাঙেও পাল তোলা নৌকা ভাসতে চায় সোনার তরীরূপে, আকাশের দিকে চেয়ে হেলেদুলে, বৈশাখী সমীরণে। এ উৎসবকে ঘিরে আমাদের দেশে সরকারি কর্মসূচি ছিল অনেক। এর মধ্যে ছিল সেমিনার, বই প্রকাশ, স্মারক গ্রন্থ প্রকাশ। মঞ্চস্থ হয়েছিল বিভিন্ন নাটক যা রবি ঠাকুরের অমর কীর্তি আয়োজন করা হয়েছিল নাট্যোৎসব। আবৃতি সংগঠনগুলোও থেমে ছিল না। এর পাশাপাশি সংবাদপত্র টিভি-রেডিও ইত্যাদি গণমাধ্যমে বিশেষ সংখ্যা, বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন ছিল। বিভিন্ন স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠান করা হয়েছিল নব নব উৎসাহ-উদ্দীপনায়। এছাড়া দেশি-বিদেশি ব্যক্তিদের আমন্ত্রণ করে সেমিনারও করা হয়েছিল। তৎসঙ্গে বিভিন্ন অঙ্গসংগঠন থেকে তো কোথাও না কোথাও অনুষ্ঠান, মোড়ক উন্মোচন নানা ধরনের গান, গীতি-আলেখ্য, কবিতাসহ আরো অনেক কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছিল।

রবীন্দ্র জন্মোৎসব উদ্‌যাপনের ফলে প্রথমত আমাদের অন্তরে সবার আগে যেটি সম্পন্ন হয়েছে তা হলো দায়মুক্তি। এর ফলে কিছুটা হলেও আমাদের বিশ্ববাধির স্মৃতি ও তাঁর সৃষ্টির প্রতি শ্রদ্ধা জানানো হলো। ফলত প্রকাশ পেয়েছে বিশ্বের দরবারে বাঙালি কর্তৃক রবীকে শ্রদ্ধা নিবেদন। তরুণ প্রজন্ম শিখছে নতুন প্রেরণা যা রবীন্দ্র চেতনায় উজ্জীবিত হয়ে আমরা আবার আমাদের সমাজ ও সংস্কৃতিকে নবমাত্রায় উত্তরণে ভূমিকা রাখব বলে আমার ঋত্বিক ভাবনা।

আর বিশেষ কিছু নয়। আমি ভালো আছি। তোমার গুরুজনদের শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা জানিয়ে শেষ করছি। তবে বন্ধু তোমার চিঠির প্রতীক্ষায় রইলাম।

প্রীতিমুগ্ধ তোমার
মিহির

| From | To (STAMP) |
|---|---|
| Name : .................... | Name : .................... |
| Address : .................... | Address : .................... |



**০৩** মুক্তিযুদ্ধের উপর রচিত একটি উপন্যাস সম্প্রতি পড়ে আপনার ভালো লেগেছে। কেন ভালো লেগেছে তার কারণ জানিয়ে আপনার বন্ধুর কাছে একটি পত্র লিখুন।

১৭.০৩.২০১৫
উত্তরা, ঢাকা

প্রিয় কারিনা,

আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা নিও। আশা করি কুশলেই আছ। আমার পড়ার সীমানায় কোন মহৎ গ্রন্থের আগমন ঘটলে তোমাকে জানাতে হয়। আমার আনন্দে ভাগ বসানোর এই আগ্রহ তোমার বহুদিনের। তাই আজ একটি বইয়ের কথা না লিখে পারলাম না।

বইটির নাম 'ক্রীতদাসের হাসি'। এ উপন্যাসটির লেখক শওকত ওসমান। এটি শওকত ওসমানের কালোত্তীর্ণ উপন্যাস। এটি আসলে প্রতীকাশ্রয়ী উপন্যাস। উপন্যাসটিতে প্রতীকাশ্রয়ে তৎকালীন পাকিস্তানিদের বিরূপ শাসনের সমালোচনা করা হয়েছে। বাগদাদের বাদশা হারুন অর রশিদ অত্যাচারী, সে ক্রীতদাস তাতারি ও বাদী মেহেরজানের প্রণয়ে বাধা সৃষ্টি এবং তাতারিকে গৃহবন্দি ও অত্যাচার করে। তাতারি আমৃত্যু বাদশা হারুনের নির্যাতনের প্রতিবাদ করে যায়। এখানে তাতারি বাঙালি জনতার এবং বাদশা হারুন আইয়ুব খানের প্রতীক। তাতারির হাসি উপন্যাসে বাঙালির স্বাধীনতার প্রতীক হয়ে উঠেছে।

বাংলা সাহিত্যের প্রতি তোমার আগ্রহের অন্ত নেই। উপন্যাসটি পুরনো হলেও প্রথম পড়ার সুযোগ এই এখন পাওয়া গেল। তোমারও উপন্যাসটি ভালো লাগবে বলে আমার বিশ্বাস। উপন্যাসটি পড়ে তোমার মতামত জানাবে। আজ এ পর্যন্তই।

| প্রেরক | প্রাপক (টিকিট) |
|---|---|
| নাম : .................... | নাম : .................... |
| ঠিকানা : .................... | ঠিকানা : .................... |

ইতি
তোমার বন্ধু
টুম্পা

**০৪** 'একুশের বই মেলা' সম্পর্কে জানিয়ে প্রবাসী বন্ধুকে একটি পত্র লিখুন।

১২.০৩.২০১৫
সূত্রাপুর, ঢাকা

প্রিয় শাহেদ,

তোমার জন্য আমার অসংখ্য আন্তরিক প্রীতি ও অফুরন্ত শুভেচ্ছা। প্রায় তিন বছর হলো বাইরে গিয়েছ। ইতোমধ্যে দেশের অনেক কিছু বদলেছে। সব খবর তোমার কাছে হয়ত যায়নি। আমি একুশের বইমেলার বর্তমান অবস্থাটা তোমার কাছে তুলে ধরতে চাই। মনের চোখ দিয়ে দেখতে তোমার ভালোই লাগবে।

এ বছর একুশের বইমেলা যথারীতি জাতীয় মননের প্রতীক বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গণে আয়োজিত হয়েছিল। তবে তার অবয়ব আগের সকল বৈশিষ্ট্য ছাড়িয়ে গেছে বলে তা ছিল অনন্য।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



যে দিকটি বড় হয়ে উঠেছিল তা হলো জনতার ঢল। প্রথম থেকে শেষ দিন পর্যন্ত অগণিত মানুষের পদচারণায় মুখরিত হলো মেলার সুবিশাল অঙ্গন। সবাই যে বই কিনতে আসে এমন নয়, অনেকে আসে বই দেখতে, নতুন বইয়ের খোঁজ নিতে। কবি-সাহিত্যিকগণ আসেন। পরস্পর দেখা-সাক্ষাতের সুযোগ নিতে। কেউ আসেন ভক্তদের সাক্ষাৎ দিতে। কেউ কেউ এমনিতেই ঘুরে বেড়ায়। তবে বইয়ের ক্রেতার সংখ্যাও কম নয়, অনেকের হাতেই থাকে বইয়ের প্যাকেট।

বই মেলার আকর্ষণ শুধু বই নয়; আছে অনেক কিছুই। বাংলা একাডেমি পয়লা থেকে একুশে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত বক্তৃতামাল্য আর আলোচনা অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করেছিল। বাংলা একাডেমি পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানও হয়েছিল। সঙ্গীতানুষ্ঠান আর নাট্যানুষ্ঠান ছিল প্রত্যেক সন্ধ্যার নিয়মিত কর্মসূচি। গানের বৈচিত্র্য অগণিত দর্শক-শ্রোতার মনে দাগ কেটে আছে। বইমেলার এসব অনুষ্ঠান ও আলোচনার মাধ্যমে সাহিত্য আর সংস্কৃতির সাথে পরিচয় লাভে সমাগত জনতা আনন্দিত হয়েছে, অভিভূত হয়েছে। তবে বই কিনে বা বই দেখে নিজস্ব সাহিত্যের সাথে যে পরিচিতি ঘটেছে তা জীবনে তাৎপর্য সৃষ্টিকারী বলে বিবেচিত হতে পারে। নতুন বই প্রকাশের প্রেরণাও দেয় একুশের বই মেলা।

একুশের বইমেলায় আনন্দ আছে। কিন্তু এতে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব আছে জাতীয় জীবনে স্বদেশপ্রেমের চেতনা সৃষ্টিতে। বইমেলায় দেশের প্রতি, ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি ভালোবাসার যে প্রকাশ তা আমাদের জাতীয় জীবনের জন্য বিশেষ তাৎপর্যের ধারক-বাহক। আমাদের অভিলাষ। এ হাওয়া অক্ষুণ্ন থাকুক। আজ এ পর্যন্তই। আবারও প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

ইতি
তোমারই বন্ধু
রাকিব

| From | To |
|---|---|
| | STAMP |
| Rakibul Haq | Shahed Ahmed |
| 15 Tati Bazar | PO Box–2444 |
| Sutrapur, Dhaka | Berlin, Germany |

**০৫** বালিকা স্কুলের আশে-পাশে উত্যক্তকারীদের বিরত রাখতে কী কী পদক্ষেপ নেয়া যায় তা নিয়ে বন্ধুর সঙ্গে মত বিনিময় করে একটি চিঠি লিখুন।

১৫.০৩.২০১৫
মিরপুর, ঢাকা

প্রিয় মুহিত,
প্রীতি ও শুভেচ্ছা নিও।

লেখাপড়ার পাশাপাশি অবসর সময়ে নিরক্ষরতা দূর করার জন্য কাজ করে চলেছো জেনে খুশি হলাম। তোমার চিঠিতে অন্য আরেকটি বিষয়ে তুমি পরামর্শ চেয়েছ যে, বালিকা বিদ্যালয়ের আশে-পাশে উত্যক্তকারীদের বিরত রাখতে কী কী পদক্ষেপ নেয়া যেতে পারে। অর্থাৎ উত্যক্তকারীদেরকে আমরা কীভাবে সামাজিক অবক্ষয় থেকে ফিরিয়ে আনতে পারি, এর সমাধান কী হতে পারে।



তোমার পত্রটি আমার হৃদয়ে দারুণভাবে রেখাপাত করেছে। মুহিত, মন যেন আবার জেগে উঠতে চাইছে। চোখে লাগছে নতুন দিনের নির্মল আলো। আমার উদ্বেলিত হওয়ার আসলে একটিই কারণ, তাহলো তুমি যে বিষয়ে আমার নিকট পরামর্শ চেয়েছ সেটি। দেখ, তোমার মতো এভাবে সমাজের সব মানুষ যদি বুঝতে পারে, বিশেষ করে আমাদের মতো স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া ছাত্র-ছাত্রীরা যদি বিষয়টি অনুধাবন করে যে, উত্যক্তকরণ একটি গর্হিত কাজ, সামাজিক অবক্ষয়; তাহলে কেউ আর এটি করতে কখনোই সম্মুখ হবে না। জনসচেতনতাই সমাজের নানাবিধ অবক্ষয়, সমস্যা-সমাধানের একমাত্র শক্তিশালী হাতিয়ার। তাই আমি মনে করি, জনসচেতনতামূলক বিভিন্ন কাজ করে উত্যক্তকারীদের বিরত রাখা যেতে পারে। একটি বিষয় মনে রেখ শক্তি প্রয়োগ করে কিংবা হুংকার দিয়ে সাময়িক সমাধানের চেয়ে সচেতনতাসৃষ্টিমূলক পদক্ষেপসমূহ, যেমন : বাবা-মা বা মুরব্বিদেরকে তাদের সন্তান সম্পর্কে খোঁজ খবর বাড়াতে পরামর্শ দেয়া, উত্যক্তকারীদের স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দেয়া যে, এ সকল কাজ অন্যায় ও অপরাধমূলক, তাই এ সব করা থেকে বিরত হও, বিদ্যালয়ে পড়ুয়া ছাত্রীদের সচেতন করে গড়ে তোলা ও এ সকল সমস্যা মোকাবেলায় বাড়ির-মুরব্বি বা শ্রেণির অন্যান্য বন্ধু ও বান্ধবীদের সাথে একত্রে চলাচল করা, শিক্ষক-শিক্ষিকাদের নিয়মতান্ত্রিক ও শৃঙ্খলাপূর্ণভাবে বিদ্যালয়ের আশে-পাশে চলতি পথে এসব বিষয় নিরীক্ষায় রাখা। তাছাড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে সম্মিলিত ঐক্য জোট গড়ে ছাত্র-ছাত্রী কিংবা শিক্ষক-শিক্ষিকাদের জীবন ও সম্পদের রক্ষা করা যেতে পারে। এখানে একটি বিষয় যে, সম্মিলিতভাবে করলে অনেক কঠিন কাজও সহজ হয়ে যায়। মানুষ নিয়েই যেহেতু সমাজ, সেহেতু সমাজের অধিকাংশ সচেতন ব্যক্তিবর্গ একত্র হলে এসব সমস্যা সমাধান করা অসম্ভব নয়। সরকারও গণসচেতনতা সৃষ্টির জন্য নানামুখী কাজ করে চলেছে। প্রয়োজনে তুমি এ সকল সমস্যা মোকাবেলা করতে স্থানীয় থানা ও জনপ্রশাসনের সাহায্য নিতে পারবে।

ঠিক আছে, কাজ চালিয়ে যাও। হতাশ হয়ো না, কিংবা মন মতো হচ্ছে না দেখে ভেঙ্গে পড়ো না। ভালো থাকো। পত্র দিও।

ইতি
তোমার প্রিয় বন্ধু
মাসুম

| প্রেরক | প্রাপক |
|---|---|
| | টিকিট |
| নাম : ........................ | নাম : ........................ |
| ঠিকানা : .................... | ঠিকানা : .................... |

**০৬** ইভটিজিং প্রতিরোধে জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে বন্ধুকে একটি পত্র লিখুন।

২৯.০১.২০১৫
সেগুনবাগিচা, ঢাকা

প্রিয় হিমু,
প্রীতি ও ভালোবাসা রইল।

আজ মনটা খুবই খারাপ। সকালে ঘুম থেকে জেগে পত্রিকা হাতে নিতেই চোখে পড়ে, 'ইভটিজিং : আর কত মৃত্যু?' বল তো, কতদিন আর এমন খবর দেখতে হবে পত্রিকার পাতায়? কতদিন আমরা মেনে নেব এই অসামাজিক কর্মকাণ্ড, অবক্ষয়।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



গত চিঠিতে তুমি লিখেছিলে, তুমি ও তোমার কয়েকজন বন্ধু মিলে তোমার এলাকায় একটি ইভটিজিং প্রতিরোধ কমিটি গঠন করেছ। জেনে খুশি হলাম ইভটিজিং এর মতো সামাজিক অবক্ষয় ঠেকাতে তোমরা তোমাদের সামাজিক দায়িত্ব পালন করে চলেছ। দুঃখ হয় তাদের জন্য যারা সামাজিক দায়িত্ব পালন না করে বরং সমাজকে বিষিয়ে তুলছে। তোমার ইভটিজিং প্রতিরোধ কমিটি দেশের মানুষের নিকট এই তথ্য প্রদান করুক, ইভটিজিং একটি সামাজিক ব্যাধি। আমাদের যাপিত জীবনে এটি একটি প্রাত্যহিক দুষ্ট ক্ষত। দেশের হাজারো সমস্যার মধ্যে এটি এখন একটি প্রধান সামাজিক সমস্যা।

যদিও ইভটিজিং রোধে সুনির্দিষ্ট কোনো আইন নেই; তবে দেশে বিদ্যমান কয়েকটি আইনে এ সম্পর্কিত ধারা উল্লেখ আছে। যেমন : নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০-এর ১০ ধারা; নারী ও শিশু নির্যাতন দমন (সংশোধন) আইন, ২০০৩-এর ৯ (ক); ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ অধ্যাদেশ, ১৯৭৬-এর ৭৬ নং ধারার নারী ও শিশুর বিরুদ্ধে অমার্জিত বা অসংলগ্ন কোনো ব্যবহার করার জন্য উক্ত ধারার আওতায় অপরাধীর বিচারের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। সম্প্রতি হাইকোর্ট ইভটিজিংকে যৌন হয়রানি হিসেবে চিহ্নিত করেছে।

বন্ধু হিমু, আমার অবস্থানগত সমস্যার কারণে আমি যেটি পারছি না, তুমি ও তোমার বন্ধুরা সেটি করে চলেছ। তোমাদের আসলে ধন্যবাদ দিলে, ছোট করা হবে। তোমরা সমাজের মানুষ হিসেবেই সামাজিক দায়িত্ব পালন করে চলেছ। তোমাদের দেখে দেশের সচেতন নাগরিকের শিক্ষা নেওয়া উচিত। সভা-সেমিনার ও গণসচেতনতামূলক কাজের মাধ্যমে যে জনসচেতনতা সৃষ্টি করে চলেছ উত্তরোত্তর সেটি বৃদ্ধি পাক এবং উপকৃত হোক দেশের অগণিত মা-বোন ও নারী সমাজ। এ লক্ষ্যেই কাজ করে যাও। তোমাদের পরবর্তী কার্যক্রম জানার অধীর আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষায় থাকব। ভালো থেকো।

ইতি
তোমার প্রিয় বন্ধু
মুহিত
রাজবাড়ি

| প্রেরক | প্রাপক (টিকিট) |
|---|---|
| নাম : ........................ | নাম : ........................ |
| ঠিকানা : ........................ | ঠিকানা : ........................ |

**০৭** জাতীয় বৃক্ষরোপণ সপ্তাহ পালনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আলোকপাত করে বন্ধুকে একটি পত্র লিখুন।

১৬.০৩.২০১৫
মতিঝিল, ঢাকা

প্রিয় সোহাগ,

ভালোবাসা নিস। গতকাল তোর চিঠি পেলাম। চিঠিতে লিখেছিস তোর লেখাপড়ার চাপ এখন আর তেমন নেই। তাই ফাইনাল পরীক্ষার মধ্যবর্তী এই দীর্ঘ সময়ে পড়াশোনার পাশাপাশি তুই কি করতে পারিস জানতে চেয়েছিস। তোর জন্য সুন্দর, বলতে পারিস মহৎ একটি কাজ ঠিক করেছি। তুই জানলে খুশি হবি যে, আমি স্বয়ং এই একই কাজে বর্তমানে নিজেকে ব্যস্ত রেখেছি। সেটি হলো— জাতীয় বৃক্ষরোপণ সপ্তাহ পালন।



বৃক্ষ মানুষের অকৃত্রিম বন্ধু। আমরা আমাদের প্রয়োজনে বৃক্ষ কাটছি কিন্তু লাগানোর কোনো উদ্যোগ নেই। দুঃখজনক হলেও সত্য যে, বৃক্ষের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আমরা উদাসীন এবং ভয়ানকরূপে অজ্ঞ। কিন্তু মানুষের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য বৃক্ষই হচ্ছে পরম বন্ধু। মানবকুলের একমাত্র বন্ধু হিসেবে বৃক্ষই সরবরাহ করছে অক্সিজেন এবং শোষণ করে নিচ্ছে কার্বন-ডাই-অক্সাইড। এছাড়াও সূর্যের ক্ষতিকর অতি বেগুনী রশ্মি থেকে বৃক্ষই মানুষকে রক্ষা করছে ক্যান্সারসহ নানাবিধ ক্ষতিকর ব্যাধির হাত থেকে। প্রয়োজনীয় পরিমাণ বনভূমি না থাকার কারণে দেখা দিচ্ছে অনাবৃষ্টি ও ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তরে পানি সংকট। বৃক্ষ থেকে আমরা ফল, ফুল, অক্সিজেন ছাড়াও জ্বালানি পাই। তাছাড়া মানুষের কঠিন ও জটিল রোগব্যাধির ওষুধ হিসেবেও বৃক্ষের পাতা ও ফলমূল ব্যবহৃত হয়। তাই প্রাণি তথা মানবজীবনের সর্বস্তরে বৃক্ষের প্রয়োজন রয়েছে। সরকার এজন্য প্রতিবছর ১-৭ জুলাই বৃক্ষরোপণ সপ্তাহ আনুষ্ঠানিকভাবে পালন করার ব্যবস্থা নিয়েছে। কিন্তু আমাদের বৃহৎ জনগোষ্ঠীর সচেতনতার অভাবে সরকারি উদ্যোগ আনুষ্ঠানিকতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকছে। মানুষের সুস্থ জীবনযাপনের জন্য একটি দেশের মোট আয়তনের শতকরা ২৫ ভাগ বনভূমি থাকা জরুরি। কিন্তু আমাদের দেশে রয়েছে মাত্র ১৭ ভাগ বনভূমি। বিশেষজ্ঞরা সর্বনাশা অবস্থা বিবেচনা করে গাছ লাগানোর ওপর জোর দিয়েছেন। সর্বোপরি বৃক্ষ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য বর্ধন করে এবং আমাদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার কাজে কার্যকর অবদান রাখে। তাই জাতীয় জীবনে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির গুরুত্ব অপরিসীম।

আমার বিশ্বাস, তুই বৃক্ষরোপন কর্মসূচির প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে তোর এই সময়গুলোকে দেশ ও জাতির কল্যাণে বৃক্ষরোপণে কাজে লাগাবি। আর কি লিখব। ভালো থাক। তোর বাবা-মাকে আমার সালাম দিস। তোর ছোট ভাই সোহেলের প্রতি আদর রইল।

ইতি
শিমুল সরদার
পিরোজপুর

| প্রেরক | প্রাপক (টিকিট) |
|---|---|
| নাম : ........................ | নাম : ........................ |
| ঠিকানা : ........................ | ঠিকানা : ........................ |

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

# স্মারকলিপি

**স্মারকলিপি (Memorandum) :** নির্দিষ্ট অভিযোগ বা দাবি-দাওয়ার কথা স্মরণ করিয়ে দিতে কোনো সমাজ, গোষ্ঠী বা দলের হয়ে (সাধারণত ব্যক্তিগত স্বাক্ষরহীন) যে পত্র লেখা হয় তাকে স্মারকলিপি বলে।

**স্মরকলিপির বিভিন্ন অংশ :** স্মারকলিপি রচনার ক্ষেত্রে কিছু নিয়ম বা রীতি অনুসরণ করতে হয়। স্মারকলিপির বিভিন্ন অংশ এরকম : ১. মূল শিরোনাম, ২. উপশিরোনাম, ৩. নাম-স্বাক্ষর ও তারিখ।

**০১** **শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস নির্মূল করার উদ্দেশ্যে সন্ত্রাসমুক্ত আইন প্রণয়নের জন্য সংসদ সদস্যবৃন্দের প্রতি আহ্বান জানিয়ে একটি স্মারকলিপি রচনা করুন।**

**দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো থেকে সন্ত্রাস দূরীকরণের লক্ষ্যে**
**বাংলাদেশের মাননীয় জাতীয় সংসদ সদস্যবৃন্দের উদ্দেশ্যে**
**স্মারকলিপি**

মাননীয় সংসদ সদস্যবৃন্দ,
জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে আপনারা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশে সরকারের জাতীয় সংসদের সদস্যপদ লাভ করায় আপনাদের জানাই আন্তরিক অভিনন্দন ও প্রাণঢালা শুভেচ্ছা। আপনারা দেশ ও জাতির অতন্দ্র সেবক, সমগ্র জনসাধারণের প্রাণের ধন। অন্যান্য বিষয়ের সাথে দেশবাসী শিক্ষা উন্নয়নেও আপনাদের সহযোগিতা ও আন্তরিকতা প্রত্যাশী।

হে জনপ্রতিনিধিবৃন্দ,
শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড। শিক্ষাঙ্গন জ্ঞানচর্চার বৃন্দাবন। এই অঙ্গনেই গড়ে ওঠে জাতির কর্ণধার। এ অঙ্গন থেকেই উপযুক্ত শিক্ষা গ্রহণ করে সবাই ফিরে যায় দেশের সেবায়। এখানেই সৃষ্টি হয় জাতির বিবেক-সেবক। জাতীয় দুর্যোগে এ অঙ্গনই হয়ে ওঠে জাতির রক্ষাকবচ। বাংলার শিক্ষাঙ্গনই জাতিকে উপহার দিয়েছে ভাষা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধের মতো গৌরবদীপ্ত ঘটনা। অথচ আজ বাংলাদেশের শিক্ষাঙ্গনগুলো হয়ে উঠেছে সমর অঙ্গন। শিক্ষার্থীদের হাতে কলমের পরিবর্তে আজ বিবিধ আগ্নেয়াস্ত্র। অস্ত্রের ঝনঝনানি, বারুদের ঝাঁঝালো গন্ধে পবিত্র শিক্ষাঙ্গন আজ সমরাঙ্গনে পরিণত হয়েছে। জ্ঞান শিক্ষা ও জ্ঞান চর্চার পরিবর্তে সেখানে চলছে অস্ত্রের মহড়া।

হে দেশপ্রেমিকগণ,
জাতি আজ দেশের সকল দায়িত্ব আপনাদের হাতে অর্পণ করেছে। সকল শক্তি আজ আপনাদের হাতে গচ্ছিত। আপনাদের সদিচ্ছা ও আন্তরিকতা দিয়েই কেবল আপনারা পারেন জাতিকে এ অবক্ষয়ের চোরাবালি থেকে রক্ষা করতে। শিক্ষাঙ্গন থেকে সন্ত্রাস দূর করে, শিক্ষার্থীদের হাতের অস্ত্র কেড়ে নিয়ে



তাদের হাতে কলম তুলে দিতে। আপনারাই পারেন দেশের শিক্ষাঙ্গনগুলোতে জ্ঞান-চর্চার পরিবেশ গড়ে তুলতে, জাতির ললাট থেকে কলঙ্কের চিহ্ন মুছে ফেলতে। আপনারা ব্যর্থ হলে দেশ-জাতি ধ্বংস ও বিধ্বস্তের অতল গহ্বরে তলিয়ে যাবে।

হে শিক্ষানুরাগীগণ,
দেশ-জাতির কল্যাণে যে কোনো আইন-প্রণয়নের ক্ষমতা জাতি আপনাদের হাতে তুলে দিয়েছে। সুতরাং আর দেরী করার সময় নেই। দেশ-জাতি রক্ষার্থে শিক্ষাঙ্গনের পবিত্রতা শিক্ষার পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে যথাযথ আইন প্রণয়ন করে তার দ্রুত বাস্তবায়ন করুন, তা যতই কঠোর হোক। সমগ্র জাতি আপনাদের মুখের দিকে চেয়ে আছে। কেবল আপনারাই পারেন এ অবক্ষয় থেকে তরুণ সমাজকে রক্ষা করে দেশ-জাতিকে সমৃদ্ধ করতে। বর্তমান প্রেক্ষাপটে দেশের এ দুঃসময়ে সেটাই হবে আপনাদের একমাত্র অনন্য করণীয়।

দেশের জনগণের ঐকান্তিক প্রত্যাশা পূরণ করে, শিক্ষাঙ্গন থেকে সন্ত্রাস সমূলে উৎপাটন করে, শিক্ষাঙ্গনে জ্ঞান-চর্চার পরিবেশ ফিরিয়ে এনে দিয়ে আপনাদের পবিত্র দায়িত্ব পালন করে জাতীয় জীবনে আপনারা বিরল দৃষ্টান্তের অধিকারী হবেন—এই আমাদের প্রত্যয়।

বিনয়াবনত
এম হাবিবুর রহমান
এফ রহমান হল, ঢা.বি.

তারিখ : ১২.০৩.২০১৫
ঢাকা

**০২** **আপনাদের কলেজের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানকল্পে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীর উদ্দেশ্যে একটি স্মারকলিপি রচনা করুন।**

**চৌমুহনী সরকারি এস এ কলেজের সমস্যাবলীর সমাধানকল্পে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীর নিকট**
**স্মারকলিপি**

হে শিক্ষামোদী,
আপনার সুষ্ঠু নেতৃত্বে এ দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় সমূহ পরিবর্তন সাধন হয়ে এক নব চাঞ্চল্য এসেছে। দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো জাতি গঠনের কারখানা। এখান থেকেই জন্ম নিচ্ছে আগামী দিনের কর্ণধারেরা। চৌমুহনী সরকারি এস এ কলেজ বেগমগঞ্জ উপজেলার একমাত্র সরকারি কলেজ। এ কলেজটি জন্মলগ্ন থেকেই নানাবিধ সমস্যার মধ্য দিয়ে হাঁটি হাঁটি পা পা করে এর অস্তিত্বকে টিকিয়ে রেখেছে। বর্তমানে কলেজটি নানামুখী সমস্যার সম্মুখীন। সমস্যাগুলো সমাধানের উদ্দেশ্যে আপনার দৃষ্টিগোচর করতে প্রয়াস পাচ্ছি। কলেজটির প্রতি আপনি আপনার আন্তরিক দৃষ্টিনিবদ্ধ করে এলাকাবাসী ও শিক্ষার্থীদের কৃতজ্ঞতায় বেঁধে রাখবেন, এই আমাদের প্রত্যাশা।

১. জেলার সবচেয়ে বড় ব্যবসাকেন্দ্র চৌমুহনীর কেন্দ্রেই কলেজটি অবস্থিত। কলেজে আসার বিভিন্ন রাস্তার মধ্যে মাত্র একটি রাস্তা পাকা, বাকিগুলোর অধিকাংশ কাঁচা এবং কোথাও বা সামান্য অংশে ইট বিছানো। কলেজটি ২০০৮ সালের বন্যার পানিতে দীর্ঘদিন ডুবে থাকায় মেঝের এবং মাঠের অবস্থা বর্তমানে খুবই করুণ।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



২. খেলার মাঠটি আকৃতিতে ছোট এবং অত্যন্ত নিচু। সামান্য বৃষ্টিতেই পানি জমে এবং খেলাধুলার অনুপযোগী হয়ে পড়ে। মাঠটির আয়তন বৃদ্ধি ও মাটি ভরাটে কমপক্ষে দুই লাখ টাকা প্রয়োজন।
৩. কলেজটিতে নামমাত্র লাইব্রেরি থাকলেও তাতে হাতে গোনা কিছু বই আছে যা একটি ডিগ্রি কলেজের জন্য অত্যন্ত নগণ্য। যে বইগুলো আছে তাও অবকাঠামোগত কারণে অরক্ষিত। ছাত্রসংখ্যা ও ক্লাসরুমের তুলনায় আসবাবপত্র যথেষ্ট কম। বিজ্ঞানাগার ও মিলনায়তন নির্মাণ করা আজও সম্ভব হয়নি। খেলাধুলার সরঞ্জামাদিও ছাত্র-ছাত্রীর তুলনায় অনেক কম।
৪. সরকারের উন্নয়ন কার্যক্রমের অধীনে কলেজটির এ সমস্যাগুলো আপনার মাধ্যমে সমাধান হলে তিন হাজার ছাত্র-ছাত্রী শিক্ষার সুন্দর ও যথার্থ পরিবেশ পেত।

উপরিউক্ত সমস্যাগুলো সমাধানকল্পে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেয়ার জন্য আপনার সদয় দৃষ্টি কামনা করছি। আপনার সুস্থ শরীর, পেশাগত সুনাম ও দীর্ঘায়ু কামনা করি।

শ্রদ্ধাবনত
চৌমুহনী সরকারি এস এ কলেজের ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ
নোয়াখালী

তারিখ : ১৫.০৩.২০১৫
নোয়াখালী

**০৩** **আপনার এলাকার অভাব-অভিযোগ জানিয়ে স্থানীয় সংসদ সদস্য বরাবরে একটি স্মারকলিপি পেশ করুন।**

**মাননীয় সংসদ সদস্য জনাব ........ -এর মনসুরনগর ইউনিয়ন সফর উপলক্ষে আমাদের**

**স্মারকলিপি**

আপনার শুভাগমনে আমাদের এ প্রত্যন্ত অঞ্চলে আজ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। এ দেশের কৃতি সন্তান হিসেবে আপনার পদধ্বনি শুনে নিস্তেজ এলাকাবাসীর মনে আজ নতুন প্রাণের সঞ্চার হয়েছে। তাই অবহেলিত জনসাধারণের পক্ষ থেকে আপনাকে জানাই সাদর অভিনন্দন। শ্রদ্ধাঞ্জলি গ্রহণ করে আপনি আমাদের ধন্য করুন।

**হে দেশ গড়ার মহান সৈনিক,**

দেশের প্রতি আপনার অগাধ ভালোবাসা, সমাজ গড়ার অবিরাম চেষ্টার কথা আজ এলাকার প্রতিটি মানুষই অবগত। দেশের সর্বাঙ্গীণ উন্নয়ন সাধনের প্রতি আপনার সদা-সতর্ক দৃষ্টি প্রতিনিয়ত প্রতিফলিত হচ্ছে। আপনার সুযোগ্য পরিচালনায় আজ মৌলভীবাজার জেলার রাজনগর উপজেলার সর্বত্র উন্নয়নের ছাপ পড়েছে। আমাদের ইউনিয়নটিও সে আশীর্বাদ থেকে বঞ্চিত থাকেনি। তবু আজ আপনাকে সন্নিকটে পেয়ে আমাদের দু চারটি অভাব-অভিযোগের কথা ব্যক্ত করতে চাই।

১. আপনি কেবল একজন নির্বাচিত সংসদ সদস্যই নন, আপনি জনগণের বন্ধু। অথচ আমাদের এতদঞ্চলের বেশির ভাগ মানুষই কৃষক মজুর। এখানে উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রয়োজন, কারণ কৃষকদের ফলানো ফসল তারা যথাসময়ে শহরে-বন্দরে পাঠাতে পারে না। এছাড়া অসুখ-বিসুখে মানুষ যথাসময়ে উপজেলা সদর বা জেলা সদরের সাথে যোগাযোগ করতে পারে না। কিন্তু মাত্র চার কিলোমিটার দূরেই ঢাকা-সিলেট পাকা সড়কটি অবস্থিত। তাই আপনার কাছে আবেদন এই চার কিলোমিটার রাস্তা পাকা করে এলাকাবাসীর দুর্ভোগ দূর করতে সক্রিয় হবেন।



২. অত্যন্ত দুঃখের সাথে উল্লেখ করতে হয় যে, অত্র এলাকার চার বর্গ কিলোমিটারের মধ্যে আজ পর্যন্ত কোনো দাতব্য চিকিৎসালয় নেই। অথচ নানা দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত হয়ে প্রতি বছর এলাকার কয়েক শত নারী-পুরুষ ও শিশু মৃত্যুমুখে পতিত হয়। সরকারি অনুদানে এতদঞ্চলে একটি দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করে আমাদের বাধিত করবেন।
৩. 'সবার জন্য শিক্ষা' স্লোগানের প্রেক্ষিতে এ অঞ্চলেও ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ক্রমবর্ধমান। কিন্তু শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ এখানে পর্যাপ্ত নয়। চারটি উচ্চ বিদ্যালয় ও দুটি দাখিল মাদ্রাসা থাকলেও এখানে কোনো কলেজ নেই। স্কুল-মাদ্রাসাগুলোতে উপযুক্ত শিক্ষক এবং প্রয়োজনীয় চেয়ার টেবিলও নেই। তাই আপনার কাছে একটি কলেজ স্থাপনপূর্বক এসব সমস্যার আশু সমাধান কামনা করছি।
৪. আর একটি বিষয় আপনাকে অবহিত না করলেই নয়, দিনের আলোতে এ এলাকাটি সুশোভিত বলেই মনে হয়। কিন্তু এর রাতের রূপটি আপনি কখনো দেখেননি। বিদ্যুতের আলো নেই বলে রাতে অঞ্চলটি ভূতুরে পল্লীতে পরিণত হয়। ঐতিহ্যবাহী 'মনসুরনগর' বৃহৎ বাজারটিও বিদ্যুতের অভাবে সন্ধ্যার পূর্বেই বন্ধ হয়ে যায়। রাতে চুরি-ডাকাতি এখানকার নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। আশা করি অচিরেই আপনি অত্র এলাকায় বিদ্যুৎ সরবরাহের সুব্যবস্থা করবেন।

পরিশেষে, আপনার দীর্ঘায়ু কামনা করে বলছি, উল্লিখিত দাবিসমূহ জনগণের প্রাণের দাবি। আপনার পরম অনুগ্রহে এসব আশা-আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়িত হয়ে সুষ্ঠু সুন্দর জীবন এখানে গড়ে উঠুক— এ কামনাই করছি।

বিনীত
মনসুরনগর ইউনিয়নের অধিবাসীবৃন্দ
পলাশবাড়ি, গাইবান্ধা

তারিখ : ১৭.০২.২০১৫
গাইবান্ধা

**০৪** **আপনার এলাকার রাস্তা সংস্কারের আবশ্যকতা বর্ণনা করে স্থানীয় সংসদ সদস্যের উদ্দেশ্যে একটি স্মারকলিপি রচনা করুন।**

**মাননীয় সংসদ সদস্য ..............-এর নিকট জনগুরুত্বসম্পন্ন বিষয়ে**

**স্মারকলিপি**

জনাব,

দেশের প্রতি আপনার অগাধ ভালোবাসা, সমাজ গড়ার অবিরাম চেষ্টার কথা আজ এলাকার প্রতিটি মানুষই অবগত। দেশের সর্বাঙ্গীণ উন্নয়ন সাধনের প্রতি আপনার সদাসতর্ক দৃষ্টি প্রতিনিয়ত প্রতিফলিত হচ্ছে। আপনার সুযোগ্য পরিচালনায় আজ রংপুর জেলার পীরগঞ্জ উপজেলার সর্বত্র উন্নয়নের ছাপ পড়েছে। আমাদের ইউনিয়নটিও সে আশীর্বাদ থেকে বঞ্চিত থাকেনি।

আপনি কেবল একজন নির্বাচিত সংসদ সদস্যই নন, আপনি জনগণের বন্ধু। অথচ আমাদের এতদঞ্চলের বেশির ভাগ মানুষই কৃষক মজুর। এখানে উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থার সুবিধা নেই। তাই কৃষকদের ফলানো ফসল তারা যথাসময়ে শহর-বন্দরে পাঠাতে পারে না। এছাড়া জরুরি প্রয়োজন বা অসুখ-বিসুখে মানুষ যথাসময়ে উপজেলা সদর বা জেলা সদরের সাথে যোগাযোগ করতে ব্যর্থ হয়।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



পীরগঞ্জ উপজেলা থেকে মিঠাপুকুর পর্যন্ত দীর্ঘ ১০ কিমি. রাস্তা যানবাহন ও লোক চলাচলের অযোগ্য হয়ে পড়েছে। উপজেলার সাথে স্থল পথে যোগাযোগের এটাই একমাত্র রাস্তা। সড়কটির দুরবস্থা বর্ণনাতীত। দীর্ঘদিন সংস্কারের অভাবে ইঞ্জিনচালিত যানবাহন চলাচল প্রায় বন্ধ। এতদসত্ত্বেও এবারের ভয়াবহ বন্যা সড়কটিকে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছে। সড়কটির দু-পাশের মাটি নরম হয়ে সরে গেছে। মাঝে মাঝে বিরাট গর্তের সৃষ্টি হয়েছে। রিকশা, সাইকেল ও মোটর সাইকেল চলতে পারছে না। এলাকায় প্রচুর পরিমাণে তরিতরকারি ও অন্যান্য কাঁচামাল উৎপাদন করা হয়। পরিবহনের অব্যবস্থার কারণে এসব কাঁচামাল অন্যত্র যেতে পারছে না। এতে স্থানীয় উৎপাদক ও কৃষকগণ উৎপাদনে উৎসাহ হারিয়ে ফেলছে।

আপনি জানেন, উপজেলা সদরের সাথে স্থলপথে যোগাযোগ প্রশাসনিক কারণেও গুরুত্বপূর্ণ। সরকারি কর্মকর্তাবৃন্দের স্বচ্ছন্দে যাতায়াতে সড়কটি প্রধান অন্তরায়। শুকনো মৌসুমে কোনো রকমে গাড়ি চলাচল করলেও বর্ষাকালে এ সড়কটি যে চেহারা ধারণ করে তা এক কথায় 'ভয়ঙ্কর'। এ সময়ে পানির নিচে লুকিয়ে থাকে অদৃশ্য গর্ত। সাধারণ পথচারীরা প্রায়ই এসব গর্তে পড়ে গিয়ে আঘাত পায়। এ অবস্থা আজকের নয় বা একদিনে এ দুরবস্থা আসেনি। স্বাধীনতা-উত্তর মাত্র একবার সড়কটির প্রতি সরকারের শুভদৃষ্টি পড়েছিল। তাও আবার পাঁচ কিলোমিটার রাস্তা সংস্কারের পর অজ্ঞাত কারণে বন্ধ হয়ে যায়। এরপর থেকে অত্র এলাকাবাসী যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে বার বার বিষয়টি উত্থাপন করেছে। কিন্তু কোনো সুফল না পেয়ে তারা আজ হতাশাগ্রস্ত। হতাশা থেকে ক্ষোভ দানা বেঁধে উঠছে জনমনে, উপজেলা সদরে মিছিল করে সেই ক্ষোভের প্রকাশও তারা ঘটিয়েছে। কিন্তু কর্তৃপক্ষের নীরব উদাসীনতায় তাতে সামান্য ফাটল ধরেনি। রাস্তাটি ক্ষতবিক্ষত হয়ে আর কতদিন উপেক্ষায় পড়ে থাকবে— এ জিজ্ঞাসা আজ সবার। এলাকাবাসীর একান্ত কামনা, বিষয়টিকে গুরুত্বসহ বিচার করবেন এবং যথাশীঘ্র সম্ভব সড়কটি পুনঃনির্মাণের সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

আপনার কাছে একান্ত বিনয়ের সাথে জানাচ্ছি, উল্লিখিত দাবি জনগণের প্রাণের দাবি। আপনার অনুগ্রহে আমাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়িত হোক— এ প্রত্যাশা রেখে এবং আপনার দীর্ঘায়ু কামনা করে শেষ করছি।

তারিখ : ১৮.০৩.২০১৫
রংপুর

বিনয়াবনত
রামনাথপুর ইউনিয়নের অধিবাসীবৃন্দ
পীরগঞ্জ, রংপুর

**০৫** আপনার এলাকায় একজন দেশবরেণ্য ব্যক্তির আগমন উপলক্ষে অভিনন্দনপত্র রচনা করুন।

**দেশবরেণ্য জননেতা জনাব ফরিদুল হক সাহেবের**
**নারায়ণগঞ্জে শুভ পদার্পণ উপলক্ষে অভিনন্দন**

**হে জন্মভূমির কৃতী সন্তান!**

শীতের কুহেলি ভেদ করে এই শহরের বুকে আজ আলোর বন্যা, মুখ আজ আনন্দে মুখর। বাংলাদেশের কৃতী সন্তান তুমি। প্রাদেশিক অধিকর্তারূপে এখানকার মাটিতে তোমার শুভ পদার্পণে আমাদের হৃদয় আজ আনন্দে উদ্বেল।



**হে মহানায়ক!**

'তোমার কীর্তির চেয়ে তুমি যে মহৎ তাই তব জীবনের রথ' মহৎ হতে মহত্তর যশ আর কীর্তির পথে, বিরাট থেকে বিরাটতর কর্মক্ষেত্রে ধাবমান। স্বাধীনতা আন্দোলনে তুমি ছিলে অন্যতম সেনানায়ক। সত্য ও ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা তোমার সাধন। গণজীবনে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য সৃষ্টিই তোমার জীবনের একমাত্র ব্রত।

**হে দরদী বন্ধু!**

তুমি আমাদের একান্ত আপন, দুর্দিনের বন্ধু, সুদিনের সঙ্গী। আমাদের অভাব-অভিযোগ, আশা-আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে তুমি শুধু অতি পরিচিত নও—এগুলো তোমারও অভাব-অভিযোগ, আশা-আকাঙ্ক্ষা। কারণ তুমিই যে আমাদের। তবু নতুনরূপে আজ তোমাকে পেয়েছি। তাই নতুন করে তোমাকে জানাই আমাদের কথা।

প্রায় লক্ষাধিক লোকের বাস শহরে ভূগর্ভস্থ পয়ঃপ্রণালীর অভাববশত জনস্বাস্থ্যের বিপুল ক্ষতি সাধিত হচ্ছে। এতদুপলক্ষে কর্তৃপক্ষ একটি পরিকল্পনা প্রণয়ন করলেও প্রয়োজনীয় অর্থের অভাবে তা বাস্তবায়নের পথে প্রতিবন্ধকতা রয়েছে যথেষ্ট। পরিচ্ছন্ন জীবনযাত্রার সহায়ক এই মহৎ পরিকল্পনাটি যাতে অচিরেই বাস্তব রূপ পরিগ্রহ করে সেজন্য তোমার প্রসন্ন দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

এই জেলার যোগাযোগ ব্যবস্থার অপ্রতুলতা দেশপ্রাণ ব্যক্তিমাত্রকেই মর্মপীড়িত করে। অঞ্চল বিশেষে এ অব্যবস্থা এতই মর্মন্তুদ যে জরুরি পরিস্থিতিতেও সেখানে যথাসময়ে সাহায্য প্রেরণ করা দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে। দুর্বিপাক ও অপরাপর সংকটকালীন পরিস্থিতির মোকাবিলার জন্য জেলা সদরের সঙ্গে থানার বর্তমান যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন ও তথা সরকারি পরিবহন ব্যবস্থার আশু প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রাচুর্য সত্ত্বেও একটি চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় না-থাকায় এতদঞ্চলের শিক্ষাক্ষেত্রে পরিপূর্ণতার অভাব রয়েছে। একটি চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাকল্পে যথাশক্তি নিয়োগ করে তুমি এ জেলাকে শিক্ষাক্ষেত্রে অগ্রবর্তী করবে এ বিশ্বাস আমাদের কাছে।

**হে আমাদের আপনজন!**

যে সমস্যাবলীর উল্লেখ করলাম, তা শুধু আমাদের নয়, তোমারও। এসবের সমাধান তোমার আজীবনের স্বপ্ন। আমরা শুধু মনে করিয়ে দিলাম।

পরিশেষে, পরম করুণাময় আল্লাহর নিকট তোমার নিরাপদ দীর্ঘ জীবন কামনা করি। তোমার সেবার মহিমায় এদেশের মানুষ ধন্য হোক, পুণ্য হোক।

তারিখ : ১২.০৩.২০১৫
নারায়ণগঞ্জ

ইতি
আপনার গুণমুগ্ধ
নারায়ণগঞ্জবাসী

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



০৬ শিক্ষার্থীদের বিদায় সংবর্ধনা উপলক্ষে মানপত্র রচনা করুন।

ভবিষ্যতের যাত্রা তোমাদের শুভ হোক

বিদায়ী ভাইবোনেরা ও সুহৃদ,

'ভুবনের ঘাটে ঘাটে এক হাটে লও বোঝা শূন্য করে দাও অন্য হাটে।' যে পথ একদিন তোমাদের নিয়ে এসেছিল এই কলেজ অঙ্গনে, সে পথই আবার তোমাদের দিয়েছে ডাক। একদিকে চলার নেশা আর অন্যদিকে পিছুটান। বেহাগ রাগিনীতে বাজছে বিদায়ের সুর। সে সুর এখন মূর্ছিত হচ্ছে এই কলেজের অঙ্গনে, মূর্ছিত হচ্ছে প্রতিটি প্রাণে।

সম্মুখে চলার যাত্রীরা,

এই কলেজে তোমাদের কেটেছে স্মৃতিমধুর প্রীতিময় অনেকদিন। নিরলস শ্রম, কঠোর অধ্যবসায় ও আন্তরিক আগ্রহে নিজেদের আলোকিত মানুষ হিসেবে গড়ার সাধনায় তোমরা ছিলে সচেষ্ট। তোমাদের প্রাণোচ্ছল সাহচর্য আর শ্রদ্ধাভাজন শিক্ষকদের প্রীতিস্নিগ্ধ শিক্ষায় কলেজের দিনগুলো হয়েছে ঐতিহ্যময়। আজ ভবিষ্যতের সিঁড়িতে তোমরা যখন প্রজ্ঞার ছায়া ফেলতে যাচ্ছ তখন বলি,—এই কলেজের স্মৃতিময় দিনগুলো তোমরা যেন ভুলে না-যাও। যেন না-ভোল প্রিয় শিক্ষক-শিক্ষিকাদের ঐকান্তিক অবদানের কথা। এই বিদ্যানিকেতনের অভিজ্ঞতা ও ঐতিহ্য যেন হয় তোমাদের ভবিষ্যৎ গড়ে তোলার প্রেরণা।

সূর্যশিখা ভাইবোনেরা,

লাখো শহীদের রক্তের বিনিময়ে আমাদের দেশ আজ স্বাধীন। দারিদ্র্য, অশিক্ষা, সংকীর্ণতা, পশ্চাদপদতার আঁধার এখনো দেশ থেকে ঘোচেনি। নতুন শতাব্দীর অগ্রপথিক তোমরা। বিশ্বায়নের নবদিগন্তে এ দেশে নতুন নতুন অগ্রগতি ও সাফল্য অর্জনে তোমরা আমাদের প্রেরণা হবে এই প্রত্যাশা নিয়ে কামনা করব—মহৎ আদর্শে নতুন দেশ ও নতুন বিশ্ব গড়ার সাধনায় তোমরা সফল হও।

তোমরা দেশের হও, দশের হও, বিশ্বের হও। তোমাদের চিন্তা ও কর্ম হোক—দেশব্রতী কর্মীর, সৃষ্টিশীল কারিগরের, মানবমুক্তির সৈনিকের। তোমরা সার্থক হও। তোমাদের সাধনা হোক দেশ ও জাতির ঐতিহ্যগর্ব ইতিহাস।

তারিখ : ২৫.০২.২০১৫
ঢাকা

তোমাদের সাথী ছাত্রছাত্রীবৃন্দ
আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ
মতিঝিল, ঢাকা



০৭ একজন অধ্যাপকের অবসরগ্রহণ উপলক্ষে বিদায় সংবর্ধনাপত্র রচনা করুন।

ঢাকা কমার্স কলেজের শ্রদ্ধেয় প্রফেসর মিএগ্রা লুৎফর রহমানের বিদায়ে শ্রদ্ধাঞ্জলি

হে মহান শিক্ষাব্রতী,

ঐতিহ্যবাহী এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এক মহান দায়িত্ব নিয়ে আপনি এসেছিলেন প্রায় দেড় দশক আগে। তারপর বিগত দিনগুলোতে অকুণ্ঠ ত্যাগ, কঠোর শ্রম ও ঘনিষ্ঠ সাধনায় এই কলেজের ঐতিহ্যকে করেছেন আরো গৌরবোজ্জ্বল ও সমুন্নত। আজ অসংখ্য কর্মদিনের স্মৃতিচিহ্নিত এই উজ্জ্বল অঙ্গন ছেড়ে আপনি বিদায় নিচ্ছেন–এ আমাদের কাছে গভীর বেদনাবহ, খুবই মর্মস্পর্শী। আজ বিদায়বেলায় ব্যথাভার হৃদয়ে আপনাকে জানাই গভীর শ্রদ্ধা ও অকুণ্ঠ কৃতজ্ঞতা।

হে কর্মীপুরুষ,

সুদীর্ঘ কর্মজীবনে ব্যতিক্রমধর্মী নিষ্ঠা ও দক্ষতায় আমাদের মতো অসংখ্য ছাত্রকে আপনি ব্রতী করেছেন আত্মিক উৎকর্ষ সাধনের এক মহৎ সাধনায়। উৎসাহিত করেছেন কঠিন শ্রমে, প্রয়াসী কর্মোদ্যোগে, মহান কর্তব্য চেতনায়। দিয়েছেন সুশৃঙ্খল ও নিয়মানুগত জীবনচর্চার দীক্ষা। নিরবচ্ছিন্ন আন্তরিকতার যে অবদান আপনি এখানে রেখে গেছেন তা তুলনারহিত, অনন্য।

হে সৌম্য,

আপনার কাছ থেকে আমরা পেয়েছি সত্যিকার আলোকিত মানুষ হবার শিক্ষা। আমাদের সকল কাজে ও সমস্যা সমাধানে আপনার কাছ থেকে আমরা সর্বদা পেয়েছি বিচক্ষণ ও বাস্তব দিক-নির্দেশনা। কঠিন পরিস্থিতি মোকাবিলায় পেয়েছি অন্তরের দৃঢ় শক্তি। তাই আমাদের হৃদয়ের মণিকোঠায় আপনি থাকবেন চির সমুজ্জ্বল হয়ে।

হে বিদায়ী সুহৃদ,

আমাদের অস্থির আবেগকে আপনি প্রশ্রয় দেননি। বরং আমাদের অসংযত আবেগোচ্ছ্বাসকে সংহত করায় প্রয়াসী হয়েছেন। কর্তব্যে কঠোর হলেও–স্নেহ, মমতা ও সাহচর্যে আপনি ছিলেন আমাদের সত্যিকারের সুহৃদ। আমাদের সৌভাগ্য এমন মহান ও উদার ব্যক্তিত্বের সাহচর্য আমরা পেয়েছি আমাদের জীবন গড়ার সূচনালগ্নে। এজন্যে আমরা আপনার কাছে কৃতজ্ঞ। বিদায় মুহূর্তে আমাদের তারুণ্যপ্রসূত অনিচ্ছাকৃত ভুল-ত্রুটির জন্যে ক্ষমাপ্রার্থী। অনাগত দিনগুলোর জন্যে প্রার্থনা করি আপনার শুভাশিস।

হে বিদায়ী শিক্ষাবিদ,

আপনার প্রেরণা হয়ে থাক আমাদের চলার পথে আলো হয়ে। আজ আনুষ্ঠানিক বিদায় মুহূর্তে আমাদের সবার কামনা : আপনি দীর্ঘজীবী হোন। সে জীবন হোক কর্মসফল, আনন্দঘন ও সুখময়।

তারিখ : ১৪.০৩.২০১৫
ঢাকা

বিনয়াবনত
ঢাকা কমার্স কলেজের ছাত্রছাত্রীবৃন্দ
ঢাকা

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



**০৮** আপনার কলেজে নতুন অধ্যক্ষের যোগদান উপলক্ষে একটি অভিনন্দনপত্র রচনা করুন।

**রাজশাহী সরকারি কলেজে নতুন অধ্যক্ষ জহিরুল হক চৌধুরী**
**আপনাকে স্বাগতম**

**হে নবাগত শিক্ষাগুরু,**
আপনার যোগদানের মধ্য দিয়ে রাজশাহী সরকারি কলেজ আবার প্রাণচঞ্চল হয়ে উঠেছে। আপনার মতো একজন জ্ঞানের মশালকে আমাদের মাঝে পেয়ে আমরা সত্যিই গর্বিত। আপনি আমাদের হৃদয়ের জঞ্জাল দূর করে জ্ঞানের প্রদীপ জ্বেলে দেবেন–এ প্রত্যাশায় আপনাকে জানাচ্ছি আমাদের হৃদয়ের প্রাণঢালা অভিনন্দন ও ভালোবাসা।

**হে নব কর্ণধার,**
আপনাকে আমরা আমাদের কলেজের নব কর্ণধাররূপে পেয়েছি। এতদিন আমাদের কলেজ ছিল কর্ণধারবিহীন। তাই আমরা লেখাপড়া ও প্রশাসনিক দিক থেকে অনেক পিছিয়ে পড়েছিলাম। আপনার আগমনে আবার কলেজ শিক্ষা-দীক্ষা, সংস্কৃতি-শিল্প-সাহিত্যে মুখর হয়ে উঠবে–এটাই আমাদের কামনা।

**হে অভিভাবক,**
বিশ্ব আজ এগিয়ে চলেছে দুর্বার গতিতে। সভ্যতা স্পর্শ করেছে মঙ্গল গ্রহকেও। নানামুখী সৃষ্টির উল্লাস আজ পৃথিবীর সর্বত্র। আমরাই কেবল পিছিয়ে। আমরা আজ আপনাকে আশ্রয় ও ছায়ারূপে পেয়েছি। আপনার মূল্যবান শিক্ষা ও আদর্শ আমাদেরকে অনুপ্রাণিত করবে। আমাদের নতুন পৃথিবীর সন্ধান দেবে। আপনি এসেছেন, আপনি থাকবেন আমাদের মাঝে। আপনি আমাদের অভিভাবক। আপনার নিকট সামান্য ভুল ধরা পড়লে বা কোনো বিচ্যুতি ঘটলে আমাদের পরিশুদ্ধ করে তুলবেন। আমাদের ভুল সন্তানতুল্য দৃষ্টিতে দেখবেন, ক্ষমা করবেন। কারণ আপনিই তো আমাদের শিক্ষাদাতা। আপনি ফেলে দিলে অন্ধকারে সবাই ডুবে যাব।

**হে জ্ঞানের অগ্নিশিখা,**
আপনার সফল পরিচালনায় এই বিদ্যাপীঠের শিক্ষাসম্পর্কিত কার্যাবলী সুন্দরভাবে সামনের দিকে অগ্রসর হবে। আপনার আগমনে আমাদের একমাত্র উপঢৌকন শ্রদ্ধা ব্যতীত কিছুই দিতে পারলাম না। এটুকুই আপনি সাদরে গ্রহণ করবেন।

**হে মহান শিল্পী,**
আপনি মানুষ গড়ার মহান শিল্পী। আপনার সুপরিকল্পনা প্রয়োগ করে বিশৃঙ্খলামুখর বিদ্যাপীঠের সুষ্ঠু পরিবেশ ফিরিয়ে আনবেন। প্রতিটি ছাত্রের জীবনকে আপনার দীক্ষায় দীক্ষিত করে তুলবেন এটাই আমাদের প্রত্যাশা।
পরিশেষে বিধাতার কাছে আপনার দীর্ঘ জীবন ও সুস্বাস্থ্য কামনা করছি।

শ্রদ্ধাবনত
রাজশাহী সরকারি কলেজের ছাত্রছাত্রীবৃন্দ
রাজশাহী

তারিখ : ২৮.০২.২০১৫
রাজশাহী



**০৯** কলেজের নবীনবরণ অনুষ্ঠানে নবীন ছাত্রছাত্রীদের উদ্দেশ্যে একটা অভিনন্দনপত্র রচনা করুন।

**নটরডেম কলেজের নবীন ছাত্রদের অভিনন্দন**

**নবীন বন্ধুরা,**
নতুন স্বপ্নের সুষমা নিয়ে তোমরা যারা এসেছ এই ঐতিহ্যবাহী বিদ্যানিকেতনে আজ তোমাদের বরণের আহ্বান। সোনারোদ মাখা আজকের আশ্চর্য সকালে সমস্ত নিসর্গ যখন সৌন্দর্যের বরণডালা সাজিয়ে বসে আছে আকুল হয়ে, তখন আমরা তোমাদের বরণ করছি উতরোল আনন্দ দিয়ে, তরঙ্গিত গান দিয়ে, প্রাণের সজীব মুখরতার আলপনা এঁকে। তোমরা আমাদের অজস্র শুভেচ্ছা গ্রহণ কর।

**সাথী বন্ধুরা,**
নতুন জীবনের আলোকশিখায় তোমরা জ্ঞানের বিশাল চত্বরে পা বাড়িয়েছ, লক্ষ আলোর দিগন্তের দিকে শুরু হলো তোমাদের অভিযাত্রা। আলোকিত মানুষ হবার পথে যাত্রা তোমাদের সফল হোক। মহৎ মানুষ হবার সাধনা তোমাদের সার্থক হোক।

**হে নতুন দিনের যাত্রী,**
আজ যখন তোমাদের বরণ করে নিতে চলেছি তখন সমগ্র বিশ্ব পা ফেলেছে বিস্ময়কর সম্ভাবনাময় নতুন শতাব্দীতে। বিশ্বায়নমুখী আমাদের প্রিয় দেশটিতে তখন অশিক্ষা, দারিদ্র্য, নৈরাজ্য, সন্ত্রাস ইত্যাদি ফেলেছে ভয়াল কালো থাবা। আমাদের বিশ্বাস, প্রাণবন্ত তারুণ্য নিয়ে, ব্রতী হবে মহৎ স্বপ্নচোখে–তোমরা অবস্থান নেবে মূল্যবোধের অবক্ষয়ের বিরুদ্ধে। ব্রতী হবে মহৎ মানবিক শিক্ষা সাধনায়, নিজেদের গড়ে তুলবে অগ্রসর স্বদেশ ও মানবিক বিশ্ব রচনার স্থপতি হিসেবে।
এই প্রত্যাশার পতাকা উড়িয়ে আমরা তোমাদের আবাহন করি। তোমাদের যাত্রাপথে ছড়িয়ে দিই অজস্র শুভেচ্ছা।

অনেক অভিনন্দনসহ
দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রছাত্রীবৃন্দ
নটরডেম কলেজ, ঢাকা

তারিখ : ১৮.০৩.২০১৫
ঢাকা

**১০** আপনার কলেজের বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে তথ্য ও সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর আগমন উপলক্ষে অভিনন্দনপত্র রচনা করুন।

**বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রতিমন্ত্রীকে অভিনন্দন**

**হে মহান অতিথি,**
লাবণ্যভরা করতোয়া বহমান স্রোতধারা আমাদের হৃদয় পাতার প্রগাঢ় নিকুঞ্জে পুলকিত সচ্ছলতায় হাসে আপনার আগমনের বাস্তবতায়। বাতাসের মনোহরা সুরভী আলতো আবেশে ঘোষণা করছে আপনার পদধ্বনি। তাই তো হারানো স্মৃতির সূত্রগ্রহণে তৎপর আর আকাশস্পর্শী গৌরবে গৌরবান্বিত এই ভূমি, তাই আপনি গ্রহণ করুন আমাদের প্রাণঢালা অভিনন্দন আর বরণমালা।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



**হে সৌভাগ্যের বরপুত্র,**
আপনার ছোটবেলার দূরন্তপনা এ মাঠেই প্রকাশ পেয়েছে। লক্ষপ্রাণের শুকতারা আপনি। আপনিই এই আঁধার এলাকার একমাত্র বন্দর, আশার সোনার তরী, তাই তো আপনার কাছে বলা যায় হৃদয়ের কথা, প্রাণের কথা। এই এলাকার অন্যতম প্রাচীন প্রতিষ্ঠানে আপনিও একদিন জ্ঞানের দীপালি জ্বালাতে শিক্ষকতা করেছেন। তবে সে গৌরবের দিন আজ সোনালি অতীত। যদিও চলছে কোনোরকমে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে। শত শত ছাত্রছাত্রী এই প্রতিষ্ঠান থেকে উত্তীর্ণ হয়ে দেশ ও জাতির কল্যাণে নিজেদের নিয়োজিত করেছে, করেছে দেশকে সমৃদ্ধ। কিন্তু তারপরও এই বিদ্যাপীঠের চোখেমুখে একরাশ অভিমান গুমরে গুমরে কাঁদছে, কখনো ভেঙে পড়বে মাথার উপরে।

**হে সংগ্রামী বীর মুক্তিযোদ্ধা,**
স্বাধীনতা যুদ্ধের বীরসেনানি অহঙ্কারী বাঙালি মায়ের সন্তান। বীর মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে লেখা থাকবে গৌরবোজ্জ্বল খাতায় কালের কপোলতলে আপনার নাম। তাই তো আমরাও গর্বিত। রাজনীতিবিদ হিসেবে আপনি চার চারবার এমপি নির্বাচিত হয়েছেন। কারণ, আপনার জনগণের সাথে আত্মার সম্পৃক্ততা, নিষ্ঠা, শ্রম আর নিঃস্বার্থ দেশপ্রেম, তাই তো আমরা ধন্য। ত্যাগ আর সাধনায় আপনি পূজনীয়, বরণীয়।

**হে মহান বিদ্যানুরাগী,**
আরব্য রজনীর বন্দি রাজকন্যার মতো জীর্ণশীর্ণ দশা এই প্রতিষ্ঠানের। তবে আছে গৌরবের ফলাফল, ছাত্রছাত্রীর আচরণ সে তো আমাদের অলঙ্কার, শিক্ষক ও প্রভাষকমণ্ডলীর পরিশ্রম প্রশ্নাতীত, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের ব্যবহার সবাইকে সন্তুষ্ট করার মতো। এর সাথে যুক্ত হয়েছে দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতাসমৃদ্ধ অধ্যক্ষ জনাব সুবর্ণ কাজীর সার্বিক তত্ত্বাবধান, রয়েছে পরিচালনা পর্ষদ ও বিজ্ঞ উপদেষ্টামণ্ডলী, আরো রয়েছে এলাকার দানবীর, শিক্ষানুরাগী, নিঃস্বার্থবান সমাজকর্মী প্রাণপুরুষ–অত্র প্রতিষ্ঠানের সভাপতি জনাব এরশাদ মজুমদার সাহেবের সঠিক দিক-নির্দেশনা।

**হে মহান শিক্ষাব্রতী,**
শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড। তাই সময়ের প্রয়োজনেই কলেজ শাখা খুলতে হয়েছে। কিন্তু সম্মুখে অমাবস্যার গাঢ় অন্ধকার আর অন্ধকার, তাই তো কমনরুম সে তো অকল্পনীয় বিষয়। বিজ্ঞানাগারে যন্ত্রপাতি, পাঠাগারে বইয়ের সংখ্যা নগণ্য, শ্রেণিকক্ষের সংকট চলছে। ক্রিকেট খেলার সামগ্রী আসবে কোথা থেকে? মিলনায়তন নেই, আর আপনার স্মৃতিধন্য খেলার মাঠটি চারদিকে ভেঙে যাচ্ছে। তাইতো আপনার আগমনে আমাদের হৃদয়বাগানে ফুটল কোমল পরাগ। আপনিই করবেন সব সমস্যার সমাধান। প্রতিষ্ঠানটি পাবে নতুন প্রাণ, তিরোহিত হবে হাজার মনের গহীন আঁধার, এ আমাদের চরম প্রত্যয়।

**হে আলোর দিশারী,**
আপনি আমাদের ঘরের ছেলে, আপনার কাছে চাওয়ার নেই তবে পাওয়ার আছে। স্বপ্নীল সুফল প্রাপ্তির আশায় শুভ বরণের আয়োজন রয়েছে আপনার কাছে সমাধানের প্রত্যাশা। সমস্যাহীন বিকশিত পরিণতিতে রচিত হবে এক গৌরবময় অধ্যায়। কারণ আপনি বগুড়ার, বগুড়া আপনার। পরিশেষে আপনার সুস্বাস্থ্য, দীর্ঘজীবন ও সার্থক উত্তরণ কামনা করি। আপনি সুখী হোন। সেবায়, ত্যাগে ও কর্মে আপনার জীবন হোক উজ্জ্বল।

তারিখ : ২৫.০২.২০১৫
বগুড়া

বিনীত
ছাত্রছাত্রীবৃন্দ
বগুড়া আজিজুল হক কলেজ
বগুড়া

# ব্যবসা সংক্রান্ত পত্র

**ব্যবসায় সংক্রান্ত পত্রের কাঠামো**

১. **শিরোনামপত্র :** পত্রের সবচেয়ে ওপরে প্রতিষ্ঠানের নাম, ঠিকানা, টেলিফোন নম্বর, ই-মেইল ঠিকানা ইত্যাদি থাকে। ছাপানো প্যাড হিসেবে এটি ব্যবহৃত হয়। শিরোনাম অংশে তারিখ, সূত্র ইত্যাদিও থাকে।
২. **অন্তর্বর্তী ঠিকানা বা পত্র-প্রাপকের ঠিকানা :** ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা, প্রতিষ্ঠানের নাম, ঠিকানা এর অন্তর্গত। পত্রের বাম দিকে এ ঠিকানা লিখতে হয়। যেমন–
শিল্প সচিব
শিল্প মন্ত্রণালয়
ঢাকা-১০০০।
৩. **বিষয় :** এ অংশে বিষয় লিখে সংক্ষেপে পত্রের মূল বিষয়বস্তু সম্পর্কে ধারণা দিতে হয়।
৪. **সম্ভাষণ :** সম্ভাষণে জনাব, মহোদয় লেখা হয়।
৫. **পত্রের মূল অংশ বা বিষয়বস্তু :** এ অংশে মূল বিষয়বস্তু বা বক্তব্য সংক্ষেপে উপস্থাপন করতে হয়।
৬. **বিদায় সম্ভাষণ :** এ অংশে প্রথমে ধন্যবাদ, শুভেচ্ছা বা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হয়ে থাকে। এরপর বিদায় সম্ভাষণ হিসেবে বিনীত, নিবেদক, আপনার বিশ্বস্ত ইত্যাদি সৌজন্য বাচন ব্যবহার করা শিষ্টাচারের পরিচায়ক।
৭. **নাম-স্বাক্ষর :** বিদায় সম্ভাষণের নিচে নাম-স্বাক্ষর করতে হয়। স্বাক্ষরের নিচে বন্ধনীর মধ্যে পুরো নাম এবং তার নিচে পদমর্যাদার উল্লেখ করা হয়। প্রয়োজনে প্রতিষ্ঠানের নাম-ঠিকানাও উল্লেখ করা যেতে পারে।
৮. **সংযুক্তি :** এ অংশে ফরমায়েশকৃত দ্রব্যের তালিকা, ব্যবসা-বাণিজ্য সংক্রান্ত আনুষঙ্গিক কাগজপত্রের অনুলিপি বা ফটোকপি থাকে।
৯. **বহির্ঠিকানা :** এনভেলাপের ওপরে প্রাপক ও প্রেরকের ঠিকানা লিখতে হয়।

**০১** কোনো প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রেরিত মাল ত্রুটিপূর্ণ হওয়ার কারণে একখানি অভিযোগপত্র রচনা করুন।

প্যাসিফিক মোজাইক
চৌমুহনী, নোয়াখালী

তারিখ : ১০.০৩.২০১৫

ম্যানেজার
জেরিন টাইলস
২৫ গ্রিন রোড, ঢাকা।

বিষয় : প্রেরিত ত্রুটিপূর্ণ মার্বেল স্লেট প্রসঙ্গে।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



জনাব,
গত ১২ মার্চ ২০১৫ আমাদের প্রেরিত অর্ডার মোতাবেক এস এ ট্রান্সপোর্টযোগে বিশ কার্টুন ফুওয়াং টাইলস আপনারা পাঠিয়েছেন তা ১৯ মার্চ ২০১৫ পেয়েছি। কিন্তু দুঃখের বিষয় তিনটি কার্টুনের সবগুলো টাইলস ভাঙা পাওয়া গেছে। সুতরাং আমাদের আর্থিক ক্ষতির কথা বিবেচনা করে এবং আপনাদের প্রতিষ্ঠানের সুনাম রক্ষার্থে পুনরায় উক্ত তিন কার্টুন টাইলস পাঠিয়ে দেয়ার জন্য বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি। আপনাদের ব্যবসায়িক সাফল্য কামনা করে শেষ করছি।

শুভেচ্ছাসহ
ব্যবস্থাপক
প্যাসিফিক মোজাইক
চৌমুহনী, নোয়াখালী।

**০২ আপনার প্রয়োজনীয় কিছু বই ডাকযোগে ভিপিপি করে পাঠানোর অনুরোধ জানিয়ে কোনো পুস্তক ব্যবসায়ীর নিকট একটি পত্র লিখুন।**

বর্ণালী বইঘর
৫৩ নীলক্ষেত, ঢাকা ১২০৫

তারিখ : ১৪.০৩.২০১৫

ব্যবস্থাপক (বিপণন)
প্রফেসর'স প্রকাশন
৩৭/১ বাংলাবাজার (দ্বিতীয় তলা)
ঢাকা-১১০০।

**বিষয় : ভিপিপি যোগে বই পাঠানোর আবেদন।**

জনাব,
অনুগ্রহপূর্বক আপনাদের প্রকাশিত নিম্নলিখিত বইগুলো অতি সত্বর ভিপিপি যোগে নিচের ঠিকানায় পাঠিয়ে বাধিত করবেন। বইয়ের মূল্য বাবদ অগ্রিম হিসেবে ৩০০০০ (ত্রিশ হাজার) টাকা ডিডি করে পাঠালাম (আইএফআইসি ব্যাংক; তাং ১২.০৫.২০১৩)। বই পাওয়ার পর বাকি টাকা পরিশোধ করে দেয়া হবে।

| গ্রন্থের নাম | লেখকের নাম | কপি সংখ্যা |
|---|---|---|
| ১. প্রফেসর'স বিসিএস বাংলা (লিখিত) | মুহাম্মদ আসাদুজ্জামান | ২৫ কপি |
| ২. প্রফেসর'স বিসিএস ইংলিশ (লিখিত) | জহিরুল ইসলাম ও শিমুল কুমার সাহা | ৪০ কপি |
| ৩. প্রফেসর'স বিসিএস বাংলাদেশ বিষয়াবলি (লিখিত) | প্রফেসর'স সম্পাদনা পরিষদ | ৩০ কপি |
| ৪. প্রফেসর'স বিসিএস আন্তর্জাতিক বিষয়াবলি (লিখিত) | প্রফেসর'স সম্পাদনা পরিষদ | ২০ কপি |

নিবেদক
ব্যবস্থাপক
বর্ণালী বইঘর
৫৩ নীলক্ষেত, ঢাকা-১২০৫।



**০৩ হারানো মালের ক্ষতিপূরণ দাবি করে রেলওয়ে কর্তৃপক্ষের নিকট একটি পত্র লিখুন।**

ইউনাইটেড লাইব্রেরি
সাহেব বাজার, রাজশাহী

তারিখ : ২৭.০২.২০১৫

প্রধান বাণিজ্যিক কর্মকর্তা
বাংলাদেশ রেলওয়ে, চট্টগ্রাম।

**বিষয় : হারানো মালের ক্ষতিপূরণের দাবি জানিয়ে আবেদন।**

জনাব,
১০ মার্চ ২০১৫ তারিখে প্রেরিত নতুন চটে মোড়া ১৮০টি বইয়ের একটি প্যাকেট গতকাল ১১ মার্চ ২০১৫ তারিখে রাজশাহী রেল স্টেশনে এসে পৌঁছেছে জেনে আমরা প্যাকেটটি ছাড়াতে স্টেশনে যাই। কিন্তু প্যাকেটটির একস্থানে ছেঁড়া দেখে আমি প্যাকেটটি গ্রহণ না করে মাল করণিক ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার উপস্থিতিতে প্যাকেটটি খুলে দেখি প্যাকেটে ৬০টি বই কম রয়েছে। উক্ত বইয়ের মূল্য ৭০০০.০০ (সাত হাজার) টাকা। আমার এ প্যাকেটটি বাংলাদেশ রেলওয়ের দায়িত্বে পাঠানো হয়েছিল। সুতরাং এ প্যাকেটের সকল দায়িত্ব বাংলাদেশ রেলওয়ে কর্তৃপক্ষের।
আপনার অবগতির জন্য মালের চালান নম্বর, রেলওয়ে রশিদ, সংশ্লিষ্ট করণিকের বিবৃতি আপনার বরাবরে প্রেরণ করলাম। আশা করি, অতি সত্বর হারানো মালের ক্ষতিপূরণ বাবদ অর্থ প্রদানে বাধিত করবেন।

নিবেদক
ব্যবস্থাপক
ইউনাইটেড লাইব্রেরি
সাহেব বাজার, রাজশাহী।

**০৪ আপনার কলেজের ক্রীড়া সামগ্রী ক্রয়ের জন্য মূল্য তালিকা চেয়ে বিক্রেতাদের কাছে পত্র লিখুন।**

শহীদ সোহরাওয়ার্দী কলেজ ছাত্র সংসদ
লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা ১১০০

তারিখ : ১৫.০৩.২০১৫

ম্যানেজার
শাহ স্পোর্টস
মওলানা ভাসানী হকি স্টেডিয়াম মার্কেট, ঢাকা ১০০০।

**বিষয় : ক্রীড়া সামগ্রীর মূল্য তালিকা প্রেরণ প্রসঙ্গে।**

জনাব,
আমাদের কলেজের জন্য কিছু ক্রীড়াসামগ্রী ক্রয় করা প্রয়োজন। সে লক্ষ্যে নিচের তালিকা অনুযায়ী আপনার প্রতিষ্ঠান কর্তৃক মূল্য তালিকা প্রেরণের অনুরোধ জানাচ্ছি।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



উল্লেখ্য যে, আগামী ২০ এপ্রিল ২০১৫-এর মধ্যে আপনাদের মূল্য তালিকা পাঠালে এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠান থেকে তা অপেক্ষাকৃত সন্তোষজনক হলে আমরা স্বল্পসময়ের মধ্যেই ক্রয় আদেশ পাঠাবো বলে আশা করছি।

| ক্রীড়া সামগ্রীর নাম | সংখ্যা |
|---|---|
| ১. ক্রিকেট ব্যাট | ১২টি |
| ২. প্যাড | ২৪টি |
| ৩. কেডস্ | ১৫ জোড়া |
| ৪. জার্সি (ক্রিকেট) | ১৫ সেট |
| ৫. ব্যাডমিন্টন র‍্যাকেট | ২০টি |
| ৬. ব্যাডমিন্টন নেট | ৫টি |
| ৭. ফুটবল | ৫টি |
| ৮. জার্সি (ফুটবল) | ১৫ সেট |

নিবেদক
রাজিব আহমেদ
ক্রীড়া সম্পাদক
শহীদ সোহরাওয়ার্দী কলেজ ছাত্র সংসদ
লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা ১১০০।

**০৫** **ক্ষতিগ্রস্ত বীমাকৃত মালের ক্ষতিপূরণের জন্য বীমা কোম্পানির কাছে একটি দাবিপত্র রচনা করুন।**

রিয়া গার্মেন্টস
সেকশন ১২, মিরপুর, ঢাকা

তারিখ : ১২.০২.২০১৫

ব্যবস্থাপক
সাধারণ বীমা করপোরেশন
প্রধান কার্যালয়
মতিঝিল বা/এ, ঢাকা ১০০০।

**বিষয় : অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্ত গার্মেন্টসের ক্ষতিপূরণের দাবিতে আবেদনপত্র।**

জনাব,
অত্যন্ত দুঃখের সাথে জানাচ্ছি যে, গত ৪ মার্চ আকস্মিক অগ্নিকাণ্ডে আমাদের গার্মেন্টস সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হয়েছে। ৫ মার্চ জাতীয় দৈনিকসমূহে এ সংবাদ সবিস্তারে প্রকাশিত হয়েছে। নিশ্চয়ই এ সংবাদটি আপনার চোখে পড়েছে। তিনজন গার্মেন্টস শ্রমিক সমস্ত কাপড় ও অন্যান্য কাচামালের সাথে দগ্ধীভূত হয়েছে। অগ্নিকাণ্ডের সাথে সাথেই আমরা ফায়ার সার্ভিস ও স্থানীয় সকলকে জানাই। তাদের প্রাণপণ চেষ্টায় প্রায় আড়াই ঘণ্টা পরে আগুন আয়ত্তে আসে বটে, তবে এরই মধ্যে সবশেষ। অগ্নিকাণ্ডের কারণ এখনও জানা সম্ভব হয়নি।

সর্বধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডের ফলে আমাদের বিশ লাখ টাকা ক্ষতি হয়েছে। আপনার বীমা কোম্পানিতে আমাদের প্রতিষ্ঠানের অগ্নিবীমা করা আছে, যার নম্বর ১২৩৪/০৮।



এমতাবস্থায় আপনাদের শর্তানুসারে আমাদের ক্ষতিপূরণের আশু ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। আমাদের দাবির সপক্ষে কি কি কাগজপত্র দাখিল করতে হবে তা আমাদেরকে জানিয়ে বাধিত করবেন।

নিবেদক
হাফিজ আহমেদ
ব্যবস্থাপক, রিয়া গার্মেন্টস
সেকশন ১২, মিরপুর, ঢাকা।

**০৬** **ব্যবসায় সম্প্রসারণের লক্ষ্যে কোনো ব্যাংক থেকে ঋণ চেয়ে একখানা পত্র রচনা করুন।**

নলেজ ওয়েজ পাবলিকেশন্স
৩৭/১ বাংলাবাজার (দোতলা), ঢাকা ১১০০

তারিখ : ১৫.০৩.২০১৫

ব্যবস্থাপক
আইএফআইসি ব্যাংক লি.
নর্থব্রুক হল রোড শাখা, ঢাকা।

বিষয় : ব্যাংক ঋণের জন্য আবেদন।

জনাব,
আমাদের প্রতিষ্ঠান নলেজ ওয়েজ পাবলিকেশন্স দীর্ঘদিন যাবৎ আপনার শাখার গ্রাহক হিসেবে লেনদেন করে আসছে। চলতি এবং সঞ্চয়ী উভয় হিসাবেই আমরা আপনার ব্যাংকে লেনদেন করে থাকি। আমরা বর্তমানে ব্যবসা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ব্যাপক পরিকল্পনা হাতে নিয়েছি। এ লক্ষ্য বাস্তবায়ন করতে আনুমানিক ২০ থেকে ২৫ লাখ টাকার প্রয়োজন। অথচ বর্তমানে আমাদের ব্যবসায় থেকে সর্বোচ্চ ১০ লাখ টাকা যোগানো সম্ভব হবে। বাকি ১০ লাখ টাকার জন্য আপনার শরণাপন্ন হতে বাধ্য হলাম।

উল্লেখ থাকে যে, ২০১০ সালে ৮ লাখ টাকা ঋণ গ্রহণ করে আমরা ব্যাংকের শর্তানুযায়ী যথাসময়ে পরিশোধ করেছি। আমাদের লেনদেন সম্পর্কে আপনি নিশ্চয় অবগত আছেন। গতবারের মতো এবারও আপনার ব্যাংকের যাবতীয় নিয়ম-কানুন মেনে চলার এবং যথাসময়ে ঋণ পরিশোধের প্রতিশ্রুতি রইল।

অতএব, আমাদের ব্যবসায়িক দিক বিবেচনা করে উক্ত ১০ লাখ টাকার ঋণ মঞ্জুরের জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ জানাচ্ছি।

নিবেদক
ইবনে এ রহিম
স্বত্বাধিকারী
নলেজ ওয়েজ পাবলিকেশন্স
৩৭/১ (দোতলা), বাংলাবাজার
ঢাকা ১১০০।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



**০৭** কোনো প্রতিষ্ঠানের উৎপাদিত জিনিসের মূল্য তালিকা প্রেরণ করার অনুরোধ জানিয়ে একটি পত্র রচনা করুন।

প্রিমিয়ার কালার
সর্বপ্রকার রং বিক্রয়ের বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান
৩২ মৌলভীবাজার, ঢাকা ১১০০

তারিখ : ২৭.০২.২০১৫

ব্যবস্থাপক (বিপণন)
এশিয়ান পেইন্টস
রাজেন্দ্রপুর, গাজীপুর।

বিষয় : বিভিন্ন প্রকার রং-এর মূল্য তালিকা প্রেরণ প্রসঙ্গে।

মহোদয়,
আমাদের শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন। গত ১৪ মার্চ ২০১৫ তারিখে 'দৈনিক ইত্তেফাক' পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপন মারফত জানতে পারলাম যে, আপনাদের উৎপাদিত পেইন্টস সামগ্রী বিশ্বের বিভিন্ন দেশের পাশাপাশি বাংলাদেশের বাজারে বিপণন করা হচ্ছে। আমরা আপনাদের উৎপাদিত পেইন্টস সামগ্রী বাজারজাত করতে আগ্রহী। তাই এ উপলক্ষে বিভিন্ন প্রকারের রং ও এর সাথে সংশ্লিষ্ট আনুষঙ্গিক জিনিসপত্রের একটি মূল্য তালিকা আমাদের কাছে প্রেরণের জন্য অনুরোধ করছি। তাছাড়া রং ও এর সাথে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সামগ্রী বাজারজাত সংক্রান্ত আপনাদের প্রতিষ্ঠানের শর্তাবলীও আমাদের জানা প্রয়োজন। আমরা আপনাদের প্রতিষ্ঠানের সমৃদ্ধি কামনা করছি।

নিবেদক
খালেদ মাহমুদ
ব্যবস্থাপক
প্রিমিয়ার কালার
৩২ মৌলভীবাজার, ঢাকা।

**০৮** বাংলাদেশ থেকে কিছু অপ্রচলিত পণ্য রপ্তানির সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের জন্য বিদেশি কোনো ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের কাছে একটি পত্র লিখুন।

মল্লিক ব্রাদার্স
৪৬ নিউ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা ১১০০

তারিখ : ২০.০২.২০১৫

মহাব্যবস্থাপক
ব্রাদার্স এন্ড কোং
১৪ সুভাস বসু স্ট্রিট, কোলকাতা
পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।



জনাব,
আমাদের শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন। আপনারা নিশ্চয়ই অবগত আছেন যে, বাংলাদেশ থেকে বেশ কিছু অপ্রচলিত পণ্য বহির্বিশ্বে রপ্তানি করা হয়ে থাকে। এসব পণ্য আমদানিকারক দেশসমূহের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশি পণ্যের মাধ্যমে প্রচুর মুনাফা অর্জনে সক্ষম হচ্ছে। কিন্তু প্রতিবেশী দেশ হিসেবে ভারত এখন পর্যন্ত এ বিষয়ে তেমন কোনো উৎসাহ দেখায়নি। অথচ ভৌগোলিক কারণে ভারতে এসব পণ্য রপ্তানি করা সহজসাধ্য ও স্বল্পব্যয় সাপেক্ষ। আমরা জানতে পেরেছি ভারতে এসব পণ্যের ব্যাপক চাহিদা আছে। তাই আমরা আপনাদের মাধ্যমে নিম্নোক্ত পণ্যসমূহ রপ্তানি করার আগ্রহ প্রকাশ করছি :
১. ইলিশ মাছ, ২. চিংড়ি মাছ, ৩. শুটকি মাছ, ৪. শাক-সবজি, ৫. পান-সুপারি ও ৬. দিয়াশলাই
আশা করি, আপনারা এসব পণ্য আমদানি করার জন্য উৎসাহিত হবেন। আপনাদের দেশে উল্লিখিত পণ্যসমূহের চাহিদার সম্ভাব্যতা যাচাই করে অনতিবিলম্বে আমাদের সাথে যোগাযোগ করার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ জানাচ্ছি।

নিবেদক
শুভাশীষ মল্লিক
ব্যবস্থাপক
মল্লিক ব্রাদার্স
৪৬ নিউ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা।

**০৯** আপনি ব্যবসায় বন্ধ করে দেয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। দেনাদারের কাছে দেনা পরিশোধের জন্য একখানা চিঠির মুসাবিদা করুন।

মেসার্স প্রীতম জেনারেল স্টোর
১১৫ চকবাজার, ঢাকা।

তারিখ : ১৬.০৩.২০১৫

মেসার্স ইসলাম স্টোর
কলেজ রোড, চৌমুহনী, নোয়াখালী।

বিষয় : পাওনা পরিশোধ প্রসঙ্গে।

জনাব,
আমাদের শুভেচ্ছা নিবেন। আমরা অত্যন্ত দুঃখের সাথে জানাচ্ছি যে, অনিবার্য কারণবশত আমরা আমাদের মেসার্স প্রীতম জেনারেল স্টোরের কার্যক্রম বন্ধ করে দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। এ মাসের মধ্যেই আমরা আমাদের যাবতীয় দেনা-পাওনার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি ঘটানোর ইচ্ছা পোষণ করছি। তাই আপনাদের নিকট আমাদের পাওনা ৭৫,০০০ (পচাত্তর হাজার) টাকা এ মাসের মধ্যে পরিশোধের জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করছি।
আপনারা আমাদের দীর্ঘদিনের গ্রাহক। পাওনা পরিশোধে আপনারা সবসময়ই সহযোগিতা করেছেন। এবারও বিশেষ অবস্থায় আপনাদের সহযোগিতা কামনা করছি। আশা করি যথাসময়ে পাওনা পরিশোধ করে আমাদের চিন্তামুক্ত করবেন।

ধন্যবাদান্তে
মোঃ জাফর ইকবাল
স্বত্বাধিকারী
প্রীতম জেনারেল স্টোর
১১৫ চকবাজার, ঢাকা।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



১০ বাড়ি ভাড়া সংক্রান্ত চুক্তিপত্র রচনা করুন।

বাড়ি ভাড়া সংক্রান্ত চুক্তিপত্র

| প্রথম পক্ষ | দ্বিতীয় পক্ষ |
|---|---|
| হাশেম মিয়া | বশির উদ্দিন |
| ১৪ ইসলামপুর, ঢাকা | নয়াবাজার, ঢাকা |

আমরা উভয়পক্ষ সাক্ষীগণের উপস্থিতিতে নিম্নলিখিত শর্তসমূহ মেনে নিয়ে সম্পূর্ণ সুস্থ মস্তিষ্কে এবং স্বেচ্ছায় চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করলাম :

চুক্তির শর্তসমূহ

১. প্রথম পক্ষ তার ১৪নং ইসলামপুরস্থিত তৃতীয় তলার ডান পাশের চার রুমের ফ্ল্যাটটি মাসিক ২০,০০০.০০ (বিশ হাজার) টাকা ভাড়ায় দ্বিতীয় পক্ষকে ২০১৫ সালের ১ ফেব্রুয়ারি থেকে ভাড়া দেন।
২. এ ভাড়ার মেয়াদ ২০১৮ সালের ৩১ ডিসেম্বর শেষ হবে। দ্বিতীয় পক্ষ ইচ্ছা করলে পুনরায় নতুন শর্তে প্রথম পক্ষের কাছ থেকে বাড়ি ভাড়া নিতে পারবেন।
৩. দ্বিতীয় পক্ষ বাসায় উঠবার পূর্বে দু'মাসের ভাড়া তথা ৪০,০০০ (চল্লিশ হাজার) টাকা প্রথম পক্ষকে অগ্রিম দিতে হবে, যা বাসা ছেড়ে যাওয়ার পূর্বে ভাড়া বাবদ সমন্বয় করা হবে।
৪. দ্বিতীয় পক্ষের ব্যবহৃত বিদ্যুৎ, গ্যাস, টেলিফোন প্রভৃতি বিল দ্বিতীয় পক্ষকেই পরিশোধ করতে হবে।
৫. দ্বিতীয় পক্ষ উক্ত ফ্ল্যাটটির ভাড়া পরবর্তী মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে প্রথম পক্ষকে দিতে বাধ্য থাকবেন।
৬. দ্বিতীয় পক্ষ উক্ত ফ্ল্যাটটির কোনো ক্ষতি সাধন করতে পারবেন না। ফ্ল্যাটটির কোনো ক্ষতি হলে দ্বিতীয় পক্ষ ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য থাকবেন।
৭. দ্বিতীয় পক্ষ এ ঘরটি অন্যের ব্যবহারের জন্য ভাড়া দিতে পারবেন না এবং ফ্ল্যাটটির মেয়াদ শেষ হওয়ার পূর্বে ছেড়ে দিতে চাইলে তিন মাস পূর্বে প্রথম পক্ষকে জানাতে হবে।
৮. উপযুক্ত শর্তাবলী দ্বিতীয় পক্ষ ভঙ্গ করলে প্রথম পক্ষের দুই মাসের নোটিশে দ্বিতীয় পক্ষ ফ্ল্যাট ছেড়ে দিতে বাধ্য থাকবেন।
৯. প্রথম পক্ষ এসব চুক্তি ভঙ্গ করলে দ্বিতীয় পক্ষকে তার ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য থাকবেন।

| সাক্ষীগণের স্বাক্ষর : | স্বাক্ষর ও তারিখ : |
|---|---|
| ১. শফিকুল হক, ১২ আশেক লেন, ঢাকা। | প্রথম পক্ষ : |
| ২. রশিদ মিয়া, জিন্দাবাহার, ঢাকা। | হাশেম মিয়া |
| ৩. মোহন, ১৪ লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা | ১.২.২০১৫ |
| | দ্বিতীয় পক্ষ : |
| | বশির উদ্দিন |
| | ১.২.২০১৫ |



১১ আপনি একজন লেখক হিসেবে পুস্তক প্রকাশকের সাথে একটি চুক্তিপত্র রচনা করুন।

লেখক-প্রকাশক চুক্তিপত্র

| প্রথম পক্ষ | দ্বিতীয় পক্ষ |
|---|---|
| ড. কায়েস রহমান | মোহাম্মদ জসিম উদ্দিন |
| বাংলা বিভাগ | স্বত্বাধিকারী |
| রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় | প্রফেসর'স প্রকাশন |
| রাজশাহী | ৩৮/৩ বাংলাবাজার, ঢাকা |

আমরা উভয়পক্ষ নিম্নবর্ণিত শর্তসাপেক্ষে সজ্ঞানে এই চুক্তিপত্র সম্পাদন করছি–

১. দ্বিতীয় পক্ষ প্রথম পক্ষের লিখিত 'উচ্চতর ব্যাকরণ ও রচনা' বইখানি নিজ ব্যয়ে মুদ্রিত করে প্রকাশ ও বিক্রয় করবেন। এজন্য দ্বিতীয় পক্ষ প্রথম পক্ষকে বইয়ের নেট দামের শতকরা দশ টাকা হিসেবে রয়েলিটি প্রদান করবেন।
২. এই চুক্তির মেয়াদ পাঁচ বছর। প্রথম পক্ষ দ্বিতীয় পক্ষের আচরণে সন্তুষ্ট থাকলে এবং রয়েলিটি বাবদ অর্থ প্রদানে কোনো সমস্যার সৃষ্টি না-হলে দ্বিতীয় পক্ষকে চুক্তির মেয়াদ বাড়িয়ে দিতে পারেন। পাঁচ বছর পর এই বইয়ের উপর দ্বিতীয় পক্ষের কোনো অধিকার থাকবে না।
৩. বইটি ১/৮ ডিমাই সাইজের মোটা ও মসৃণ কাগজে ছাপাতে হবে এবং শক্ত বোর্ড বাধাই করতে হবে।
৪. বই বিক্রির সাথে প্রথম পক্ষের কোনো সম্পর্ক থাকবে না। প্রতিটি সংস্করণ প্রকাশের আগে উভয় পক্ষ আলোচনাক্রমে ঠিক করবেন যে কতো কপি বই ছাপা হবে এবং সেই অনুযায়ী প্রথম পক্ষকে তার প্রাপ্য শোধ করতে হবে।
৫. বইয়ের কোনো প্রকার সংশোধন ও পরিবর্তনের ক্ষমতা দ্বিতীয় পক্ষের থাকবে না।
৬. প্রথম সংস্করণে বইটি পাঁচ হাজার কপি ছাপা হবে। বইয়ের মূল্য নির্ধারিত হবে সত্তর টাকা। চুক্তি মোতাবেক লেখকের মোট ৩৫,০০০.০০ (পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা মাত্র) টাকা পাওনা হবে। বই ছাপার কাজ শুরু হওয়ার সাথে সাথে দ্বিতীয় পক্ষ প্রথম পক্ষকে এক চতুর্থাংশ টাকা অগ্রিম প্রদান করবেন এবং বাকি টাকা বই প্রকাশের এক বছরের মধ্যে পরিশোধ করবেন।

| সাক্ষীগণের স্বাক্ষর | স্বাক্ষর ও তারিখ |
|---|---|
| ১. ................................ | |
| | (ড. কায়েস রহমান) |
| | প্রথম পক্ষ |
| ২. ................................ | |
| ৩. ................................ | (মোহাম্মদ জসিম উদ্দিন) |
| | দ্বিতীয় পক্ষ |

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



১২ রেলওয়ে কর্তৃপক্ষের নিকট হারানো মালপত্রের ক্ষতিপূরণ দাবি করে একটি পত্র লিখুন।

তারিখ : ২৬.০২.২০১৫

বরাবর
স্টেশন মাস্টার
কমলাপুর রেলওয়ে স্টেশন
ঢাকা-১০০০।

বিষয় : হারানো মালের জন্য ক্ষতিপূরণ দাবি।

জনাব
আমি অত্যন্ত দুঃখের সাথে জানাচ্ছি যে, গত ২০.০১.২০১৫ তারিখে চট্টগ্রামের দিল্লী অ্যালুমিনিয়াম, চট্টগ্রাম রেল স্টেশন মারফত ২৪০১ নং ট্রেনে করে আমাকে আলী হাসান নামে তিন বস্তা ক্রোকারীজ সামগ্রী পাঠিয়েছে। কিন্তু ২৫.০১.২০১৫ তারিখে রসিদ নিয়ে মাল আনতে গিয়ে আমরা তা পাইনি। এ বিষয়ে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করে পর পর দুবার দুটি পত্র রেজিস্ট্রি করে পাঠিয়েছি। কিন্তু ফেব্রুয়ারি মাস অতিক্রান্ত হয়ে মার্চ মাস এলেও আপনার কাছ থেকে কোনো জবাব পেলাম না।

ঐ তিনটি বস্তায় প্রায় ত্রিশ হাজার টাকা মূল্যের বিভিন্ন ক্রোকারীজ সামগ্রী ছিল। অতএব ঐ টাকা অবিলম্বে ফেরত দিয়ে বাধিত করবেন। অন্যথায় আমি আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বাধ্য হব।

বিনীত
আলী হাসান
ব্যবস্থাপক
বিকাশ ক্রোকারীজ, ঢাকা

# সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্য পত্র

জনগণের অভাব-অভিযোগ, স্থানীয় কোনো সমস্যা কিংবা জনগুরুত্বসম্পন্ন কোনো বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন-নিবেদন করে ব্যর্থ হলে ভুক্তভোগীরা অনেক সময় পত্র-পত্রিকার শরণাপন্ন হন। জনগণ যেন তাদের অভাব অভিযোগ ইত্যাদির প্রতিকার প্রার্থনা করতে পারে কিংবা কোনো বিষয়ে পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য ঊর্ধ্বতন মহলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে সে জন্য সংবাদপত্রে চিঠিপত্রের বিশেষ কলাম থাকে। চিঠিতে যে বক্তব্য থাকে তার দায়দায়িত্ব লেখকের ওপর বর্তায়, সম্পাদক কোনো দায়দায়িত্ব নেন না।

সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্য দুটি পত্র লিখতে হয়: ক. সম্পাদককে লেখা অনুরোধপত্র, খ. পত্রিকায় প্রকাশের জন্য পত্র।

**ক. সম্পাদককে লেখা অনুরোধপত্র**

পত্রলেখক যে সংবাদপত্রে চিঠিটি প্রকাশ করতে চান সেই পত্রিকার সম্পাদককে অনুরোধ জানিয়ে একটি চিঠি লিখতে হয়। এই চিঠিটি যথাসম্ভব সংক্ষিপ্ত হওয়াই ভালো। সম্পাদককে সম্বোধন ছাড়াও যথাস্থানে তারিখ এবং নিচে প্রেরকের নাম, ঠিকানা ও স্বাক্ষর দিতে হয়।

**খ. পত্রিকায় প্রকাশের জন্য পত্র**

পত্রিকায় প্রকাশিতব্য চিঠিটিই মূল চিঠি। বিষয়বস্তু অনুযায়ী সেটি তথ্যসমৃদ্ধ, যুক্তিযুক্ত, বাস্তবভিত্তিক হওয়া উচিত। প্রাসঙ্গিক বিষয়ের উল্লেখ এমন হওয়া উচিত যেন কর্তৃপক্ষ বিষয়টির গুরুত্ব অনুভব করে পদক্ষেপ গ্রহণে অগ্রসর হন। চিঠিটি বড় হবে কি ছোট হবে– তা অবশ্য সমস্যা ও বিষয়বস্তুর ওপরই প্রধানত নির্ভর করে। তবে চিঠি যথাসম্ভব বিষয়ানুগ, বাহুল্যবর্জিত, সংক্ষিপ্ত হলেই ভালো হয়। বক্তব্য বিষয় যত প্রাঞ্জল ও হৃদয়গ্রাহী হয় ততই ভালো। এ ধরনের চিঠিতে ভাবাবেগ প্রকাশের সুযোগ থাকে না। বক্তব্যে পারম্পর্য রক্ষা ও ভাষার প্রয়োগে শুদ্ধতার দিকে বিশেষ মনোযোগী হতে হয়।

প্রকাশিতব্য চিঠিতে মূল বিষয় অনুযায়ী উপযুক্ত শিরোনাম দিতে হয়। চিঠির শেষে প্রেরকের নাম ও ঠিকানার উল্লেখ করতে হয়। পত্র-প্রেরক কোনো সংগঠন, প্রতিষ্ঠান বা এলাকাবাসীর পক্ষে চিঠি লিখলে তার নাম উল্লেখ করা উচিত। কোনো কারণে যদি পত্র-প্রেরক নাম প্রকাশ করতে না চান তাহলে চিঠিতে তা উল্লেখ করতে হয়।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



**০১** আপনার এলাকায় ছিনতাই বেড়ে যাওয়ায় উদ্বেগ প্রকাশ করে সংবাদপত্রে প্রকাশার্থে একটি পত্র লিখুন।

তারিখ : ১৫.০৩.২০১৫

সম্পাদক
দৈনিক সমকাল
১৩৬ তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা ১২০৮।

**বিষয় : সংযুক্ত পত্রটি প্রকাশের জন্য আবেদন।**

জনাব,
আপনার সম্পাদিত বহুল প্রচারিত দৈনিক 'সমকাল' পত্রিকায় চিঠিপত্র বিভাগে নিম্নলিখিত পত্রটি প্রকাশ করলে বাধিত হবো।

বিনীত
আমিন মোহাম্মদ
কল্যাণপুর, ঢাকা।

### ক্রমবর্ধমান ছিনতাইয়ে জনজীবন অতিষ্ঠ

ঢাকা মহানগরীর কল্যাণপুর একটি জনবহুল এলাকা। এখানে সমাজের সর্বস্তরের মানুষ দীর্ঘদিন যাবৎ নিরবচ্ছিন্ন সুখ-শান্তিতে বসবাস করে আসছিলেন। কিন্তু সম্প্রতি ছিনতাইকারীদের উপদ্রবে এখানকার জনজীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। কতিপয় উচ্ছৃঙ্খল তরুণ রাস্তার মোড়ে মোড়ে জটলা বেঁধে হৈ-হল্লা করে, চায়ের দোকানে আড্ডা জমায়। সুযোগ বুঝে তারা পথচারীদের উপর অস্ত্র ঠেকিয়ে ছিনতাই করে। তাদের দ্বারা সংঘটিত খুন, রাহাজানি নিত্য-নৈমিত্তিক ঘটনা। এ অপকর্মের বিরুদ্ধে কেউ মুখ খুলতে চাইলে প্রাণনাশের হুমকিও দেয়া হয়।

এমতাবস্থায় এই ত্রাসের রাজত্বের অবসান ঘটিয়ে জনজীবনে নিরাপত্তা ও শান্তি ফিরিয়ে আনার জন্যে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

নিবেদক
এলাকাবাসীর পক্ষে,
**আমিন মোহাম্মদ**
কল্যাণপুর, ঢাকা।

**০২** যে কোনো উপলক্ষে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির পেছনে ব্যবসায়ীদের অনৈতিক ও অন্যায্য মুনাফালোভী মানসিকতার সমালোচনাসহ তার প্রতিকারের উপায় নির্দেশ করে সংবাদপত্রের জন্য একটি পত্র রচনা করুন।

তারিখ : ২৮.০২.২০১৫

বরাবর
সম্পাদক
দৈনিক সমকাল
১৩৬ তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা ১২০৮।

**বিষয় : সংযুক্ত পত্রটি প্রকাশের জন্য আবেদন।**



জনাব,
আপনার সম্পাদিত বহুল প্রচারিত দৈনিক 'সমকাল' পত্রিকায় চিঠিপত্র বিভাগে নিম্নলিখিত পত্রটি প্রকাশ করলে বাধিত হব।

বিনীত
মোহাম্মদ হান্নান
সূত্রাপুর, ঢাকা।

### দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি : ব্যবসায়ীদের অনৈতিক ও অন্যায্য মুনাফালোভী মানসিকতা

নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্যবৃদ্ধিতে দেশব্যাপী হাহাকার শুরু হয়েছে। সম্প্রতি কোনো সঙ্গত কারণ না থাকলেও হু হু করে জিনিসের দাম যেভাবে বেড়ে চলেছে তাতে নাগরিক জীবনে দারুণ অস্বস্তির সৃষ্টি হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে বাজারে কোনো নিয়ন্ত্রণ না থাকায় ব্যবসায়ীদের মুনাফা বৃদ্ধির দুর্বার লোভ-লালসা জেগে উঠেছে। অবশ্য বাজারে পণ্যের কোনো সংকট নেই। কোনো পণ্যেরই সরবরাহে ঘাটতি রয়েছে এমন কথা কেউ বলে না। বাজারে পণ্যের সমারোহ। পয়সা দিলেও পাওয়া যাবে না এমন পণ্য বাজারে নেই। দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহার্য জিনিসপত্রের দামই সবচেয়ে বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে। সেজন্য সাধারণ মানুষের জীবনে দুর্দশার অন্ত নেই।

মহানগরীর বিভিন্ন ব্যবসাকেন্দ্র ঘুরে তথ্যানুসন্ধান করে দেখেছি যে, কোনো ব্যবসায়ী বাজারে পণ্যের অভাব আছে বলে জানায়নি। খুচরা বিক্রেতারা নিজেদের দায়িত্ব সম্পর্কে সাফাই গেয়ে জানায় যে তারা পাইকারী বাজার থেকে উচ্চ মূল্যে পণ্য ক্রয় করে এনেছে। বেশি দাম হাঁকা তাদের পক্ষে অসম্ভব। পাইকারী বাজারের ব্যবসায়ীরাও একই কথা বলে। তাদের পণ্য বেশি দামে কেনা বলে তারা তো দাম ঠিক রাখার জন্য দাম কমিয়ে বিক্রি করতে পারে না। তাহলে বাজারের পরিস্থিতি এরূপ দাঁড়িয়েছে যে, মজুতদারেরাই নিজেদের লাভের জন্য জিনিসপত্রের দাম চড়িয়ে দিয়েছে এবং তাদের দেখাদেখি সকল ব্যবসায়ীও বেশি মুনাফার পথ বেছে নিয়েছে। বাজারে চলছে মুনাফা অর্জনের প্রতিযোগিতা।

নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম বাড়ার ফলে জনগণের জীবনে কঠোর দুর্ভোগ নেমে এসেছে। মধ্যবিত্তের টানা-পোড়েনের জীবনে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি আশঙ্কার ছায়া ফেলছে। বিশেষত সীমিত আয়ের লোকদের বেলায় এ সংকট ভয়াবহ রূপ নিচ্ছে। অন্যদিকে দারিদ্র্যসীমার নিচে অবস্থানরত মানুষের জন্য তা এক অভিশাপ হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। কারণ দ্রব্যমূল্য যেভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে সেভাবে তাদের উপার্জন বৃদ্ধি পায়নি। অথচ জীবনযাপনের ব্যয় বহন অপরিহার্য।

সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সাথে আলাপ-আলোচনা করে এ অভিজ্ঞতা হয়েছে যে, বাজারের ওপর সরকারের কোন প্রকার নিয়ন্ত্রণ নেই। আর বাজার নিয়ন্ত্রণহীন অবস্থায় থাকলে সাধারণ ব্যবসায়ীকে তার নিরর্থক বোঝা বহন করতে হচ্ছে। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধিতে যেহেতু অনেকের বেশি বেশি লাভ হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেয়, সেজন্য মূল্য বৃদ্ধিতে স্বার্থপর ব্যবসায়ীরা উৎসাহবোধ করে। তাই পণ্যদ্রব্য বৃদ্ধিতে মুষ্টিমেয় লোকের লাভের অঙ্কের স্ফীতি ঘটে, কিন্তু দেশের আপামর জনসাধারণকে দুর্ভোগের বোঝা বহন করতে হয়। জনগণের দুর্ভোগের কথা কেউ চিন্তা করে না। জনজীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহ করে জানা গেছে যে, জনসাধারণ এহেন মূল্যবৃদ্ধিকে স্বার্থসংশ্লিষ্টদের অশুভ তৎপরতা বলে বিবেচনা করে। এ ব্যাপারে সরকারের উদ্যোগহীনতাকে তাঁরা প্রশংসনীয় মনে করে না। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধিতে সরকারের জনপ্রিয়তা হ্রাস পাচ্ছে। তাই এ ব্যাপারে সরকারের তৎপর হওয়া অত্যাবশ্যক। ব্যবসায়ীদের লাভের লোভ কমাতে হবে এবং জনগণকে সচেতন হতে হবে।

নিবেদক
**মোহাম্মদ হান্নান**
সূত্রাপুর, ঢাকা।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



**০৩** পাঠ্যপুস্তকে বানান ও তথ্যগত ত্রুটি সংশোধনের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্য সম্পাদকের কাছে একটি পত্র লিখুন।

তারিখ : ২৫.০২.২০১৫

সম্পাদক
দৈনিক ইত্তেফাক
৪০ কাওরান বাজার, ঢাকা ১২১৫।

বিষয় : সংযুক্ত পত্রটি প্রকাশের জন্য আবেদন।

জনাব,
আপনার বহুল প্রচারিত, 'দৈনিক ইত্তেফাক' পত্রিকার চিঠিপত্র কলামে নিম্নলিখিত শিক্ষামূলক গুরুত্বপূর্ণ সংবাদটি প্রকাশ করে বাধিত করবেন।

বিনীত
সাইফুল ইসলাম
করিমগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ।

### পাঠ্যপুস্তকে বানান ও তথ্যগত ত্রুটি সংশোধন প্রসঙ্গে

বাংলা ভাষায় শব্দ ও ভাষা ব্যবহারের নানা নিয়ম ও কৌশল রয়েছে। এর মধ্যে শুদ্ধ বানানরীতি একটি অপরিহার্য বিষয়। যেমন : ণ-ত্ব বিধান ও ষ-ত্ব বিধান; যুক্তবর্ণের ব্যবহার, সন্ধি ও সমাসবদ্ধ শব্দের ব্যবহার, দেশি-বিদেশি বিভিন্ন শব্দের বানান রীতি এসবগুলোই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কিন্তু পরিতাপের বিষয় হলো ইদানীংকালে প্রাথমিক থেকে শুরু করে মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যপুস্তকে বানান সংক্রান্ত ত্রুটি ব্যাপকভাবে পরিলক্ষিত হচ্ছে। তাছাড়া তথ্যগত ত্রুটি তো আরও মারাত্মক আকার ধারণ করেছে। বিভিন্ন পাঠ্যপুস্তকে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস থেকে শুরু করে গণিত ও বিজ্ঞান সংক্রান্ত ব্যাপক তথ্যগত ত্রুটি বিদ্যমান রয়েছে।

একই বিষয়ে বিভিন্ন পাঠ্যপুস্তকে বিভিন্ন তথ্য দেখা যায়। এক্ষেত্রে সঠিক তথ্য নির্ধারণ করা কঠিন হয়ে পড়ছে। এ সকল গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তথ্যবিভ্রাট এবং ভুল তথ্য থাকার দরুন কোমলমতি শিশুদের মনে যেমন বিরূপ প্রভাব পড়বে তেমনি অন্যান্য স্তরের শিক্ষার্থীরাও ভুল শিক্ষা নিয়ে দেশ ও জাতিকে করবে কলঙ্কিত। এ ব্যাপারে বেশ কয়েকবার যথাযথ কর্তৃপক্ষের সুদৃষ্টি আকর্ষণ করা হলেও কোনো ফল পাওয়া যায়নি।

বানান ও তথ্য সংক্রান্ত এসব নিয়ম সঠিকভাবে পালিত হয় না বলে ভাষায় বিশৃঙ্খলা তৈরি হয়। বাংলা ভাষার বানানরীতিতেও ব্যাপক পরিবর্তন এসেছে। বাংলা একাডেমি বেশ কিছু বানান এর পরিবর্তন সাধন করেছে। এসব বিষয়ের প্রতিফলন পাঠ্যপুস্তকে যথাযথভাবে নিয়ে আসতে হবে। মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস, বিজ্ঞান বিষয়ক সঠিক তথ্য পাঠ্য পুস্তকে তুলে ধরতে হবে। সেজন্য সঠিক উৎস থেকে এ সকল বিষয় চয়ন করতে হবে। যেমন – বাংলাপিডিয়া, বিভিন্ন ওয়েব সাইটের সহায়তা নেয়া যেতে পারে। অন্যথায় জাতি বিভ্রান্ত হবে, জাতির জীবনে নেমে আসবে অজ্ঞতার অভিশাপ।

জাতির এ ক্রান্তিকালে বিভ্রান্ত ও হতাশাগ্রস্ত মানুষকে সঠিক বানানরীতি ও সঠিক তথ্য সম্পর্কে দিক-নির্দেশনা দেয়া এবং পাঠ্যপুস্তকে বিরাজমান ভুলত্রুটি সংশোধনের কোনো বিকল্প নেই। তাই



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয়সহ বুদ্ধিজীবী ও সচেতন নাগরিক সমাজের যথাযথ সুদৃষ্টি আকর্ষণ করছি, যেন অতি সত্বর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

বিনীত
সচেতন নাগরিকদের পক্ষে,
সাইফুল ইসলাম
করিমগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ।

**০৪** যুবসমাজের নৈতিক অবক্ষয় রোধের উপায় সম্পর্কে মতামত জানিয়ে সংবাদপত্রের চিঠিপত্র কলামে একটি পত্র লিখুন।

তারিখ : ১৪.০৩.২০১৫

সম্পাদক
দৈনিক কালের কণ্ঠ
প্লট-৩৭১/এ, ব্লক-ডি, বসুন্ধরা
বারিধারা, ঢাকা ১২১৯।

বিষয় : সংযুক্ত পত্রটি প্রকাশের জন্য আবেদন।

জনাব,
আপনার বহুল প্রচারিত ও জনপ্রিয় দৈনিক পত্রিকার চিঠিপত্র কলামে প্রকাশের জন্য 'যুবসমাজের নৈতিক অবক্ষয় রোধের উপায়' শিরোনামে একটি চিঠি পাঠালাম। সমকালীন সমাজ প্রেক্ষাপটে চিঠিটির গুরুত্ব বিবেচনা করে অনুগ্রহ করে প্রকাশের ব্যবস্থা করলে চিরকৃতজ্ঞ থাকবো।

বিনীত
বাধন অধিকারী
গুলশান-১, ঢাকা।

### যুবসমাজের নৈতিক অবক্ষয় রোধে কার্যকর ব্যবস্থা নিন

যে কোনো জাতির প্রাণশক্তি তাদের যুবসমাজ। তারাই জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষার মূর্ত প্রতীক। কিন্তু আজ সমাজের দিকে তাকালে দেখা যাচ্ছে, যুবকদের একটা বড় অংশ হতাশা ও আত্মগ্লানিতে নিমজ্জিত। অনেক যুবক নৈতিক অবক্ষয়ের শিকার। তাদের অনেকেরই সামাজিক কিংবা পারিবারিক মূল্যবোধ নেই। তাদের কেউ মাদকাসক্ত, কেউ অসামাজিক, আবার কেউ চাঁদাবাজি, অস্ত্রবাজি ও ছিনতাই প্রভৃতি কাজে লিপ্ত। এজন্য অবশ্য এককভাবে কেবল যুবসমাজকে দায়ী করা যায় না। যুবসমাজের আজকের এ নৈতিক অবক্ষয়ের জন্য মূলত দায়ী সামাজিক ও রাজনৈতিক অস্থিরতা। নেতিবাচক দলীয় রাজনীতি, সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি এবং সঠিক দিক-নির্দেশনার অভাব যুবসমাজের ভবিষ্যৎ ক্রমাগত জটিল করে তুলছে। ব্যাপক বেকারত্ব, সুস্থ বিনোদনের অভাবও তাদের সঠিক পথের নির্দেশ দিচ্ছে না। এ অবস্থায় যুবসমাজ দ্রুত নৈতিক অবক্ষয়ের পথে ধাবিত হচ্ছে।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



যুবসমাজের নৈতিক অবক্ষয়ের কারণগুলো যথাযথভাবে আজ চিহ্নিত করা প্রয়োজন। সেগুলো যত শীঘ্র সম্ভব দূর করে বিপথগামী যুবসমাজকে সুস্থতার দিকে ফিরিয়ে আনতে হবে। সর্বাগ্রে শিক্ষাঙ্গনের সুষ্ঠু পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে হবে। রাজনৈতিক দলগুলোর সন্ত্রাস-লালন বন্ধ ও ব্যাপক কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে। বিশেষ করে সুস্থ সংস্কৃতিবোধের বিকাশ ঘটাতে হবে। অপসংস্কৃতি, দুর্নীতি সমাজ থেকে দূর করতে হবে। অবৈধ টাকার উৎস বন্ধ করতে হবে। শিক্ষাব্যবস্থা কেবল কর্মমুখী বা শিক্ষার জন্য শিক্ষা করলে হবে না, শিক্ষার উদ্দেশ্য নীতি-নৈতিকতা প্রদান এবং স্বদেশ ও স্বজাতির চেতনা বিকাশের উপযোগী করতে হবে। সবার জন্য সুস্থ বিনোদনের ব্যবস্থা করতে হবে। এসব বিষয়ে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় অগ্রগতি ঘটালে অপসংস্কৃতির বিস্তার বাধাগ্রস্ত হবে।
একটি পশ্চাৎপদ জাতিকে দক্ষ যুবশক্তিই কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছে দিতে পারে। তাই তাদের সঠিক পথে চালনা করার জন্য জাতীয় নেতৃবৃন্দ, বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়, শিক্ষক-অভিভাবক সকলকেই দায়িত্ব নিতে হবে। আসুন, আমরা সকলেই যুবসমাজের অবক্ষয় রোধে আন্তরিকতার সাথে এগিয়ে যাই।

বিনীত
**বাধন অধিকারী**
গুলশান-১, ঢাকা।

**০৫ আপনার এলাকার যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্যে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে সংবাদপত্রের চিঠিপত্র কলামে একটি পত্র লিখুন।**

তারিখ : ১৬.০৩.২০১৫

সম্পাদক
দৈনিক প্রথম আলো
১০০ কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ
কারওয়ান বাজার, ঢাকা।

**বিষয় : সংযুক্ত পত্রটি প্রকাশের জন্য আবেদন।**

জনাব,
আপনার বহুল প্রচারিত 'প্রথম আলো' পত্রিকায় অনুগ্রহ করে নিম্নোক্ত সংবাদটি প্রচার করে বাধিত করবেন।

বিনীত নিবেদক
সাইমন জাকারিয়া
লোহাগড়া, নড়াইল।

**যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন প্রসঙ্গে**

আমরা নড়াইল জেলার লোহাগড়া উপজেলার অধিবাসী। দীর্ঘদিন ধরে আমাদের এলাকায় যোগাযোগ ব্যবস্থা খুবই নাজুক। লোহাগড়া উপজেলায় লোহাগড়া হাট একটি প্রসিদ্ধ হাট। অত্র হাটে আলফাডাঙ্গা, বোয়ালমারী, এড়েন্দা, ভাটিয়াপাড়া, কাশিয়ানী, শিয়ারবর ও লাহুড়িয়া থেকে হাজার হাজার লোক বাজার সদাই করতে আসে। এমন কি এই বাজারের মধ্য দিয়েই অত্র এলাকার জনসাধারণ নড়াইল, যশোর, ঢাকা ও খুলনা সদরে



যায়। অথচ দীর্ঘদিন যাবৎ আড়িয়ারা-লোহাগড়া রাস্তাটি সংস্কার করা হয়নি। ফলে জনসাধারণের চলাচলের যথেষ্ট অসুবিধা হচ্ছে। এমনকি প্রতিনিয়ত সংস্কারের অভাবে লোকজন দুর্ঘটনার শিকার হচ্ছে। অত্র এলাকার মানুষের দুঃখ কষ্টের কথা যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট বার বার আবেদন করেও কোনো ফল হয়নি।
তাই সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে আমার আকুল আবেদন, অনতিবিলম্বে অত্র এলাকার যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি কল্পে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে আজ্ঞা হয়।

বিনীত নিবেদক
সাইমন জাকারিয়া
লোহাগড়া, নড়াইল।

**০৬ বন্যাকবলিত অঞ্চলের বন্যার্তদের সাহায্যের আবেদন জানিয়ে কোনো দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশের জন্য পত্রিকার সম্পাদকের নিকট পত্র লিখুন।**

তারিখ : ১৭.০৩.২০১৫

সম্পাদক
দৈনিক কালের কণ্ঠ
প্লট-৩৭১/এ, ব্লক-ডি, বসুন্ধরা
বারিধারা, ঢাকা ১২১৯।

**বিষয় : সংযুক্ত পত্রটি প্রকাশের জন্য আবেদন।**

জনাব,
নিম্নলিখিত মানবিক সংবাদটি আপনার বহুল প্রচারিত দৈনিক 'কালের কণ্ঠ' পত্রিকায় চিঠিপত্র কলামে প্রকাশ করে আর্ত-পীড়িত মানুষের সাহায্যের জন্য সহযোগিতা দানে বাধিত করবেন।

বিনীত
লুৎফর রহমান
হোমনা, কুমিল্লা।

**বন্যার্তদের জন্য সাহায্য চাই**

কুমিল্লা জেলার হোমনা উপজেলার সবকটি গ্রাম ভয়াবহ বন্যায় কবলিত। বন্যার পানি এ অঞ্চলের নদীসমূহের বিপদ সীমার উপর দিয়ে বয়ে চলেছে। হোমনার সবকটি গ্রাম আজ জলমগ্ন। উঁচু জায়গা এত কম যে, সেখানে মানুষের আশ্রয় মিলছে না। মানুষ উঁচু গাছের ডালে মাচা পেতে কোনোরকমে বেঁচে আছে। গৃহপালিত পশুপাখি ভেসে গেছে বানের জলে। খাবারের সামগ্রীও ভেসে গেছে। যৎসামান্য কিছু রক্ষা করা সম্ভব হয়েছে, শুকনা খাবার যা ছিল তাও শেষ। বন্যাকবলিত এলাকায় সবচেয়ে বেশি অভাব পানীয় জলের। বন্যার পানি পানে কলেরা, আমাশয়সহ বিভিন্ন পেটের পীড়া দেখা দিয়েছে। অচিরেই এগুলো মহামারী আকার ধারণ করবে। গাছের উপরে স্থাপিত মাচা থেকে পড়ে গিয়ে অনেক শিশুর সলিল সমাধি হয়েছে। সাপের কামড়ে মানুষ মারা যাচ্ছে। মানুষ দিশেহারা হয়ে পড়েছে। গ্রামগুলোর দিকে তাকালে মনে হয় শুধু

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



পানি আর পানি। এ যেন এক মহাসমুদ্র। জরুরি ভিত্তিতে এখানে খাদ্য ও চিকিৎসা সাহায্যের প্রয়োজন। স্থানীয় প্রশাসন থেকে যতটুকু পাওয়া যাচ্ছে, তা প্রয়োজনের তুলনায় খুবই নগণ্য।

বন্যাকবলিত এসব মানুষের জন্য শিশু খাদ্য, শুকনো খাদ্য, পানি বিশুদ্ধকরণ ট্যাবলেট, খাবার স্যালাইন ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় ওষুধ প্রেরণ খুবই জরুরি হয়ে পড়েছে। তাই গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়সহ সহৃদয় ব্যক্তি, সরকারি-বেসরকারি পর্যায়ের প্রতিষ্ঠানের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, যেন অতি সত্বর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

বিনীত
বন্যার্তদের পক্ষে
লুৎফর রহমান, হোমনা, কুমিল্লা।

**০৭** **বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি পালনের প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করে সংবাদপত্রে একটি পত্র লিখুন।**

তারিখ : ০৫.০৩.২০১৫

সম্পাদক
দৈনিক যুগান্তর
ক-২৪৪ প্রগতি সরণি, কুড়িল (বিশ্বরোড)
বারিধারা, ঢাকা-১২১৯।

**বিষয় : সংযুক্ত পত্রটি প্রকাশের জন্য আবেদন।**

জনাব,
আপনার বহুল প্রচারিত দৈনিক 'যুগান্তর' পত্রিকার চিঠিপত্র কলামে নিম্নলিখিত জনকল্যাণমূলক সংবাদটি প্রকাশ করে বাধিত করবেন।

বিনীত
মামুন আহমেদ
বেতাগী, বরগুনা।

**বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি পালনের প্রয়োজনীয়তা**

বৃক্ষ মানুষের অকৃত্রিম বন্ধু। কিন্তু আমাদের অজ্ঞতা আর নির্বুদ্ধিতার কারণে নষ্ট হচ্ছে প্রাকৃতিক ভারসাম্য। আমরা ডেকে আনছি আমাদের সর্বনাশ। আমাদের প্রয়োজনে বেহিসেবিভাবে উজাড় করছি বৃক্ষ। আমরা বৃক্ষ কাটছি কিন্তু লাগানোর উদ্যোগ নেই। দুঃখজনক হলেও সত্য যে, বৃক্ষের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আমরা উদাসীন এবং ভয়ানকরূপে অজ্ঞ। মানুষের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য বৃক্ষই হচ্ছে পরম বন্ধু।

আমাদের জীবন ধারণের জন্য প্রয়োজন অক্সিজেন গ্রহণ আর বিষাক্ত কার্বন-ডাই-অক্সাইড বর্জন করা। পৃথিবীতে বৃক্ষই একমাত্র মানবকুলের বন্ধু হিসেবে সরবরাহ করছে অক্সিজেন আর শোষণ করে নিচ্ছে কার্বন-ডাই-অক্সাইড। শুধু সমুদ্রের পানি থেকে নয়, গাছপালা থেকে বাতাসে জলীয় বাষ্প আসে যা মেঘ ও বৃষ্টিরূপে ভূ-পৃষ্ঠে পতিত হয়। আমরা ইদানিং গ্রিনহাউস ইফেক্টের কথা শুনছি, অনাবৃষ্টি দেখছি, পৃথিবী-পৃষ্ঠে তাপমাত্রা বাড়ছে, বায়ুমণ্ডলের ওজোনস্তর ভেঙ্গে যাচ্ছে, সূর্যের অতি বেগুনি রশ্মি পৃথিবী পৃষ্ঠে সরাসরি এসে ক্যান্সারসহ নানাবিধ দুরারোগ্য ব্যাধির সৃষ্টি করছে। এগুলোর একমাত্র কারণ প্রয়োজনীয় পরিমাণ বনভূমির অভাব। বৃষ্টিপাত ও ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তরের পরিবর্তন হচ্ছে। বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে চলছে ধীর গতিতে নীরব মরুকরণ যা একদিন ভয়াবহ রূপ ধারণ করবে। নলকূপের পানিতে আর্সেনিক দেখা দিচ্ছে। মানব সভ্যতা আজ হুমকির সম্মুখীন। কেউ কি ভেবে দেখছে যে তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে জলস্ফীতি ঘটে বিস্তীর্ণ অঞ্চল জলমগ্ন হবে? এ সমস্ত বিপদ থেকে রক্ষার উপায় নির্দিষ্ট পরিমাণ বনভূমি যা আমাদের নেই।



বৃক্ষ থেকে আমরা ফল, ফুল, অক্সিজেন, ছায়া ও জ্বালানি পাই। তাছাড়া মানুষের কঠিন ও জটিল রোগ-ব্যাধির ওষুধ হিসেবেও বৃক্ষের পাতা ও ফল-মূল ব্যবহৃত হয়। তাই প্রাণী তথা মানব জীবনের সর্বস্তরে বৃক্ষের প্রয়োজন রয়েছে। সরকার এজন্য প্রতিবছর ১-৭ জুলাই বৃক্ষরোপণ সপ্তাহ আনুষ্ঠানিকভাবে পালন করার ব্যবস্থা নিয়েছে। কিন্তু আমাদের বৃহৎ জনগোষ্ঠীর সচেতনতার অভাবে সরকারি উদ্যোগ আনুষ্ঠানিকতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকছে। মানুষের সুস্থ জীবনযাপনের জন্য একটি দেশের মোট আয়তনের শতকরা ২৫ ভাগ বনভূমি থাকা জরুরি। কিন্তু আমাদের দেশে রয়েছে মাত্র ১৭.০৮ ভাগ বনভূমি। বিশেষজ্ঞরা সর্বনাশা অবস্থা বিবেচনা করে গাছ লাগানোর ওপর জোর দিয়েছেন। সর্বোপরি বৃক্ষ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য বর্ধন করে এবং আমাদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার কাজে কার্যকর অবদান রাখে। তাই জাতীয় জীবনে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির গুরুত্ব অপরিসীম।

বিনীত
মামুন আহমেদ
বেতাগী, বরগুনা।

**০৮** **সড়ক দুর্ঘটনা রোধের ব্যাপারে আপনার পরামর্শ সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্য কোনো দৈনিক পত্রিকার সম্পাদকের নিকট পত্র লিখুন।**

তারিখ : ১২.০৩.২০১৫

সম্পাদক
দৈনিক ইনকিলাব
২/১ আর কে মিশন রোড
ঢাকা-১২০৩।

**বিষয় : সংযুক্ত পত্রটি প্রকাশের জন্য আবেদন।**

জনাব,
আপনার বহুল প্রচারিত 'দৈনিক ইনকিলাব' পত্রিকায় চিঠিপত্র কলামে নিম্নলিখিত জাতীয় স্বার্থসংশ্লিষ্ট পত্রটি প্রকাশ করে বাধিত করবেন।

নিবেদক
শফিকুল হক
ফুলগাজী, ফেনী।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



## নিরাপদ সড়ক চাই

সড়ক দুর্ঘটনা আজকাল একটি নিয়মিত ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। খবরের কাগজ খুললে বিচিত্র দুর্ঘটনার সচিত্র খবর আমরা দেখতে পাই। দুর্ঘটনায় চিরতরে বিদায় নিচ্ছে কতজন, পঙ্গুত্ব চির সাথী হচ্ছে কতজনের। সন্তান হচ্ছে পিতৃহারা, পিতা হচ্ছে সন্তানহারা। কত নববধূর মেহেদির রঙ মলিন হবার আগেই বৈধব্য তাকে আলিঙ্গন করছে। ঘর থেকে যে বেরিয়ে গেল কাজে, আর ফিরল না কোনোদিন ঘরে। এমনি হাজারো হৃদয়বিদারক ঘটনা ঘটছে। অসুস্থ পিতার ওষুধ আনতে গিয়ে পুত্র ফিরে আসছে লাশ হয়ে। 'জন্মিলে মরিতে হবে, অমর কে কোথা রবে।' কিন্তু এর পরেও কথা থেকে যায়। স্বাভাবিক মৃত্যু অনভিপ্রেত নয়। অস্বাভাবিক মৃত্যু অনভিপ্রেত ও অনাকাঙ্ক্ষিত। দুর্ঘটনার সাথে জড়িত মানুষের চলাচল ও যানবাহন চালনা। একটু সতর্ক হলেই দুর্ঘটনা এড়ানো সম্ভব।

সড়কে নিয়োজিত কতিপয় ট্রাফিক নিয়ন্ত্রক মাঝে মাঝে ব্যস্ত থাকেন বেআইনিভাবে চালিত যানবাহন থেকে ট্যাক্স! আদায়ে। নেশাগ্রস্ত হয়ে বেপরোয়াভাবে গাড়ি চালায় ড্রাইভার। উপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা হলে শুরু হয় আন্দোলন, মিছিল। চালক জানে জনগণের হাতে ধরা না পড়লে আইনের ফাঁক ফোকরে বা দুর্বার আন্দোলনের মাঝ দিয়ে সে মুক্তি পেয়ে যাবে।

নিরাপদ সড়কের জন্য সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে যেসব বলিষ্ঠ ও ফলপ্রসূ ভূমিকা নিতে হবে সেগুলো হলো :

১. গাড়ি চালকদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণ প্রদান ও লাইসেন্স ছাড়া গাড়ি না চালানো নিশ্চিত করতে হবে।
২. অগ্রাধিকার ভিত্তিতে রাস্তাঘাট সংস্কার, রাস্তা সোজাকরণ, অতিরিক্ত যাত্রী বহন ও যাত্রীবাহী গাড়িতে মালামাল পরিবহন, অতিরিক্ত মাল পরিবহন ইত্যাদি বন্ধ করতে হবে।
৩. ট্রাফিক নিয়ন্ত্রকের বখরা আদায় বন্ধকরণসহ দুর্ঘটনার জন্য দায়ী ব্যক্তিদের কঠোর শাস্তি দিতে হবে।
৪. জেব্রাক্রসিং ও স্থানে স্থানে ওভার ব্রিজের ব্যবস্থা করে জনগণকে এ পথ দিয়ে চলার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে।
৫. যেখানে সম্ভব বিভিন্ন ধরনের যানবাহনের জন্য ভিন্ন ভিন্ন রাস্তার ব্যবস্থা করতে হবে।
৬. প্রচার মাধ্যমসহ বিভিন্নভাবে দুর্ঘটনা এড়ানোর মানসিকতা গঠনে সচেষ্ট হতে হবে।
৭. লাইসেন্স প্রদানে কড়াকড়ি নিয়ম আরোপ করতে হবে।
৮. কেবল যান্ত্রিক ত্রুটিমুক্ত গাড়ি রাস্তায় ছাড়ার ব্যবস্থা করতে হবে।
৯. ট্রাক চলাচলের জন্য নির্দিষ্ট সময় করে দিতে হবে এবং নির্দিষ্ট রাস্তার ব্যবস্থা করতে হবে।

আশা করি উপযুক্ত সুপারিশমালা কার্যকর হলে দুর্ঘটনা রোধ করে নিরাপদ সড়কের আশা করা যেতে পারে।

নিবেদক
**শফিকুল হক**
ফুলগাজী, ফেনী

**০৯** আপনাদের গ্রামে একটি ডাকঘর স্থাপনের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করে একটি দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশের জন্য সম্পাদকের কাছে পত্র লিখুন।

তারিখ : ১০.০৩.২০১৫

সম্পাদক
দৈনিক প্রথম আলো
১০০ কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ
কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫।

**বিষয় : সংযুক্ত পত্রটি প্রকাশের জন্য আবেদন।**



জনাব,
আপনার বহুল প্রচারিত দৈনিক 'প্রথম আলো' পত্রিকায় নিম্নলিখিত জনগুরুত্বপূর্ণ প্রতিবেদনটি প্রকাশ করে জনসাধারণকে কৃতজ্ঞতায় আবদ্ধ করবেন।

বিনীত
মনির হোসেন
মহব্বতপুর, বেগমগঞ্জ, নোয়াখালী

## মহব্বতপুর গ্রামে ডাকঘর চাই

নোয়াখালী জেলার বেগমগঞ্জ উপজেলার মহব্বতপুর একটি ঘনবসতিপূর্ণ বৃহৎ গ্রাম। গ্রামটিতে ব্যবসায়ী, ডাক্তার, উকিল, চাকরিজীবীসহ বিভিন্ন পেশার মানুষসহ প্রায় ১৫ হাজার লোকের বসবাস। এ গ্রামটিতে প্রাথমিক বিদ্যালয়, মাধ্যমিক বিদ্যালয়, বালিকা বিদ্যালয় ও একটি বড় বাজার ও ব্যাংক রয়েছে। গ্রামের অনেক লোক দূর-দূরান্তে চাকরি করে। অনেক ছেলেমেয়ে হোস্টেলে থেকে লেখাপড়া করে। ফলে শহর থেকে মনিঅর্ডার আসে গ্রামের অনেক পরিবারের কাছে। যা দিয়ে তাদের সাংসারিক ব্যয় নির্বাহ হয়। শহরে পড়ুয়াদের খরচের টাকা পাঠাতে হয় মনিঅর্ডার যোগে। দূর-দূরান্তের আত্মীয়-স্বজনের কাছ থেকে চিঠি আসে, তাদেরকেও চিঠি লিখতে হয়। গ্রামের অনেকেই মধ্যপ্রাচ্য, জাপান, যুক্তরাষ্ট্রসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে কর্মরত। যে ডাকঘরের মাধ্যমে চিঠিপত্র প্রেরণ, মনিঅর্ডার করা বা গ্রহণ করতে হয় তার দূরত্ব ৪ কিলোমিটার। সেখান থেকে পিয়ন সপ্তাহে একদিন মাত্র এ গ্রামে আসে। অনেক সময় বৃষ্টিভেজা কাদার রাস্তায় বাড়ি বাড়ি চিঠি বিলি না করে সে একটি দোকানে রেখে যায়। মনিঅর্ডারের টাকা ঠিকমতো না পাওয়ায় অনেক সময়ই খাদ্যদ্রব্য ও ওষুধ কেনাও সম্ভব হয় না। দীর্ঘদিন থেকে অনুভূত ডাকঘরের অভাবের কথা জানিয়ে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট বিভিন্ন সময়ে আবেদন নিবেদন করা হয়েছে।

অতএব, আমাদের আকুল আবেদন ডাক বিভাগ কর্তৃপক্ষ সদয় হয়ে আমাদের গ্রামে একটি শাখা ডাকঘর স্থাপন করে জনসাধারণের বহুদিনের অসুবিধা ও কষ্ট দূর করবেন।

গ্রামবাসীর পক্ষে
মনির হোসেন
মহব্বতপুর, বেগমগঞ্জ, নোয়াখালী।

**১০** মাদকাসক্তির বিরুদ্ধে জনমত সৃষ্টির উদ্দেশ্যে সংবাদপত্রের চিঠিপত্র কলামে প্রকাশের জন্য একটি পত্র রচনা করুন।

তারিখ : ১২.০৩.২০১৫

সম্পাদক
দৈনিক সমকাল
১৩৬ তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা ১২০৮।

**বিষয় : সংযুক্ত পত্রটি প্রকাশের জন্য আবেদন।**

জনাব,
আপনার বহুল প্রচারিত দৈনিক 'সমকাল' পত্রিকার চিঠিপত্র কলামে জাতীয় স্বার্থ সংশ্লিষ্ট নিম্নলিখিত পত্রটি প্রকাশ করে বাধিত করবেন।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



বিনীত
আবদুস সবুর সবুজ
১৮৫ শহীদ শামসুজ্জোহা হল
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

### মাদকমুক্ত সুস্থ জীবন চাই

মাদকদ্রব্যের প্রতি আসক্ত হয়ে বর্তমান বিশ্বের তরুণ সমাজ আত্মবলী দিচ্ছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে নেশাগ্রস্তের সংখ্যাও বৃদ্ধি পাচ্ছে ঘরে ঘরে। ফলে শিক্ষা, সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিকাশ সর্বত্র হুমকির সম্মুখীন। আমাদের দেশ দারিদ্র্যের কষাঘাতে জর্জরিত। দারিদ্র্য ও অন্যান্য সামাজিক সমস্যার কারণে স্বাভাবিক জীবন যাপন পদে পদে এখানে ব্যাহত হচ্ছে এবং বাড়ছে বেকারত্ব। ফলে দেশের যুব মানস ধীরে ধীরে অকর্মণ্য ও অথর্ব হয়ে পড়ছে। নেশার ঘোরে বহু তরুণের অমূল্য জীবন প্রদীপ অকালে নিভে যাচ্ছে। আজকাল অনেক শিক্ষিত ও স্বচ্ছল পরিবারের কিশোর, তরুণ-তরুণীরাও এই নেশার জগতে আত্মহননে এগিয়ে যাচ্ছে। এ পরিস্থিতি জাতির জন্য অত্যন্ত দুঃখজনক। কারণ, তারুণ্য সকল উন্নয়নের উৎস। তাদেরকে হারিয়ে আমরা সৌভাগ্য লগ্নে দেশের দুর্ভাগ্য দেখতে চাই না। এই মাদকাসক্ত তরুণদের ধ্বংসের হাত থেকে আমাদের রক্ষা করতে হবে।

এক্ষেত্রে সর্বপ্রথম বাবা-মাকে সচেতন হতে হবে। সামাজিক দায়িত্ববোধ ও ধর্মীয় নীতিবোধ শিক্ষা দিয়ে তাদেরকে গড়ে তুলতে হবে শৈশব থেকেই। এছাড়া সর্বস্তরের জনগণকে থাকতে হবে সদাজাগ্রত। অর্থের লোভে যেন চোরাই পথে এ দেশে মাদকদ্রব্য প্রবেশ করতে না পারে সেজন্য দেশের আপামর জনসাধারণকে সতর্ক হতে হবে। সরকারি-বেসরকারি সমাজকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানসমূহকে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা নিতে হবে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর পাঠ্যসূচিতে মাদকবিরোধী গল্প-প্রবন্ধ অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। প্রচার মাধ্যমগুলোকে প্রতিবেদনের মাধ্যমে বলিষ্ঠ ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে।

একতাবদ্ধ হয়ে কল্যাণকর মনোভাব নিয়ে শহর, নগর, গ্রামে-গঞ্জে শাখায় শাখায় বিভক্ত হয়ে মাদকবিরোধী আন্দোলন চালাতে হবে। এভাবে সচেষ্ট হয়ে আমাদের দেশকে মাদকমুক্ত করতে হবে। তরুণরা আমাদের ভাই-বোন তথা আমাদেরই সন্তান। তারা সুস্থ থাকলে আমরাও সুস্থ থাকবো এবং দেশেরও হবে মঙ্গল। সেজন্য দেশের আবালবৃদ্ধবণিতা সবার মাদকবিরোধী আন্দোলনে একযোগে এগিয়ে আসা একান্ত প্রয়োজন। এ ব্যাপারে সর্বস্তরের জনগণ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অংশগ্রহণ করলে গড়ে উঠবে একটি মাদকমুক্ত সুস্থ সমাজ।

বিনীত
**আবদুস সবুর সবুজ**
১৮৫ শহীদ শাসুজ্জোহা হল
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

**১১ পরিবেশ দূষণ বিষয়ে জানিয়ে সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্য পত্রিকা সম্পাদকের নিকট একটি পত্র লিখুন।**

তারিখ : ১৫.০৩.২০১৫
সম্পাদক
দৈনিক ইত্তেফাক
৪০ কাওরান বাজার, ঢাকা ১২১৫।

**বিষয় : সংযুক্ত পত্রটি প্রকাশের জন্য আবেদন।**



জনাব,
আপনার বহুল প্রচারিত স্বনামধন্য 'দৈনিক ইত্তেফাক' পত্রিকায় আমার নিম্নলিখিত জনগুরুত্বপূর্ণ প্রতিবেদনটি চিঠিপত্র কলামে ছাপালে চিরকৃতজ্ঞ থাকব।

বিনীত
মোজাম্মেল হক
টঙ্গী, গাজীপুর।

### দূষণমুক্ত পরিবেশ চাই

বাংলাদেশ তৃতীয় বিশ্বের একটি অনুন্নত দেশ। হাজারো সমস্যায় জর্জরিত এ দেশের মানুষ। সেই সমস্যাগুলোর মধ্যে আর একটি হলো পরিবেশ দূষণ। ১৫ কোটি লোকের এ দেশে জনসংখ্যা সমস্যা, অনুন্নত জীবন ব্যবস্থা এবং অসচেতনতার জন্য প্রতিনিয়ত পরিবেশ দূষণ হচ্ছে। গ্রাম অপেক্ষা শহরেই এই দূষণ ঘটছে দ্রুত। ঢাকা শহরসহ দেশের অন্য বড় শহরগুলোতে বাড়তি লোকের চাহিদার সঙ্গে উন্নত পরিবহন ব্যবস্থার সমন্বয় সাধিত হচ্ছে না। গাড়িগুলো থেকে বিশ্রী রকমের কালো ধোঁয়া বের হচ্ছে। শহরের আবাসিক সমস্যা প্রকট হচ্ছে দিন দিন। শহরের বস্তিবাসীরা অপরিকল্পিতভাবে গড়ে তুলছে আবাস। অধিক জনসংখ্যা ও অসচেতন জনগণ অবাধে দেশের বনাঞ্চল ধ্বংস করছে। স্বাস্থ্য সচেতনতার অভাবে যেখানে-সেখানে মলমূত্র ত্যাগ করছে। শহরের ফুটপাথগুলোতে গড়ে উঠছে ওয়েল্ডিং শিল্প। ফলে পরিবেশ হয়ে যাচ্ছে দূষিত। শিল্পক্ষেত্রে কোনো নিয়ম-কানুন মেনে চলা হচ্ছে না। অপরিকল্পিতভাবে আবাসিক এলাকাতেও গড়ে উঠছে বিভিন্ন ধরনের শিল্প, যেগুলো মানুষ ও পরিবেশের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর। ফলে বাতাসে সিএফসি এবং কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ বাড়িয়ে দিচ্ছে। এ অবস্থা চলতে থাকলে পরিবেশ আরো অধিক হারে দূষিত হয়ে জীবন হবে বিপন্ন। তাই এদিকে যথাযথ কর্তৃপক্ষ ও সচেতন নাগরিকদের নজর দেয়ার সময় এসেছে। এ লক্ষ্যে কতিপয় বিষয় নিয়ে আমাদের এখনই ভাবতে হবে।

ক. পুরনো এবং অধিক ধোঁয়া ছাড়ে এমন গাড়ি চলার ক্ষেত্রে বিধিনিষেধ আরোপ করতে হবে।
খ. শহরগুলোতে নির্দিষ্ট জায়গায় ময়লা ফেলার জন্য জনগণকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। স্বাস্থ্য সচেতনতা গড়ে তুলতে হবে।
গ. মানব জীবনের জন্য হুমকি এমন শিল্পকে শনাক্ত করতে হবে। এক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞের মতামত নিয়ে নিরাপদ জায়গায় শিল্প স্থাপনের জন্য অনুমতি দেয়া যেতে পারে।
ঘ. বৃক্ষরোপণে জনগণকে উৎসাহিত করতে হবে এবং বনজঙ্গল নিধনের ক্ষেত্রে কড়াকড়ি আরোপ করতে হবে।
ঙ. জনসংখ্যা হ্রাস করার জন্য সবাইকে একযোগে কাজ করে যেতে হবে। পরিকল্পিত পরিবার গঠনের জন্য সকলকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে।

উপরিউক্ত পদক্ষেপ ছাড়াও অন্যান্য সহায়ক ব্যবস্থা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে আমাদের সকলকে এগিয়ে আসতে হবে। সকলের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় আমরা বাঁচাতে পারি এই দেশকে, এই পৃথিবীকে। বাঁচাতে পারি আমাদের সম্ভাবনাময় আগামী প্রজন্মকে।

বিনীত
**মোজাম্মেল হক**
টঙ্গী, গাজীপুর

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



১২ যানজট নিরসন সম্পর্কে সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্য পত্রিকা সম্পাদকের নিকট একটি পত্র রচনা করুন।

তারিখ : ২৪.০২.২০১৫

সম্পাদক
দৈনিক প্রথম আলো
১০০ কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ,
ঢাকা ১২১৫।

**বিষয় : সংযুক্ত পত্রটি প্রকাশের জন্য আবেদন।**

জনাব,
আপনার বহুল প্রচারিত স্বনামধন্য দৈনিক 'প্রথম আলো' পত্রিকায় আমার নিম্নলিখিত পত্রটি মতামত কলামে ছাপালে চিরকৃতজ্ঞ থাকব।

বিনীত
আবদুল মান্নান
মালিটোলা, ঢাকা ১০০০।

### যানজট নিরসনে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক

বর্তমানে বাংলাদেশের শহর ও নগরবাসীর কাছে এক অসহ্য যন্ত্রণা যানজট। রাজধানী ঢাকাসহ দেশের বেশ কয়েকটি শহরে এই সমস্যা প্রকট। তবে ঢাকা শহরে এই যানজট একটা বিরাট সমস্যা হিসেবে বিপন্ন করছে ঢাকাবাসীকে। প্রতিনিয়ত লোকসংখ্যা বাড়ার সাথে সাথে এই শহরে বাড়ছে যানজটের তীব্রতা। বাসা থেকে বেরোলেই কোথাও না কোথাও দেখা যায় এই অস্বস্তিকর পরিবেশ। অপ্রশস্ত রাস্তা, সুষ্ঠু পরিকল্পনার অভাব, ট্রাফিক নিয়ম পালনে অনীহা, বিশেষ করে উদাসীনতা এবং নাগরিকদের অসচেতনতা যানজটের অন্যতম কারণ। ইতোমধ্যেই ঢাকা শহরের রিকশা নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেছে। লাইসেন্সবিহীন রিকশার সংখ্যা বেড়েছে অকল্পনীয়ভাবে।

রাজধানী ঢাকার সবচেয়ে যানজট প্রবণ এলাকা পুরনো ঢাকা, পুরনো ঢাকার রাস্তাগুলোর সংস্কার এবং বৃদ্ধি তেমনভাবে ঘটেনি। এই যানজট জনজীবনকে করছে বিপন্ন। তাই এই শহরের জীবনযাত্রাকে সহজ ও সাবলীল করার জন্য নিম্নোক্ত পদক্ষেপ নেয়া জরুরি মনে করছি :

ক. রিকশা উঠিয়ে দিয়ে এর বিকল্প পরিবহন ব্যবস্থা গড়ে তোলা।
খ. ফুটপাতের অবৈধ দোকানপাট উচ্ছেদ।
গ. খারাপ গাড়ির লাইসেন্স বাতিল এবং প্রয়োজনে কঠিন ব্যবস্থা গ্রহণ।
ঘ. বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ রাস্তার নিচে পাতাল পথের ব্যবস্থা।
ঙ. গুরুত্বপূর্ণ সড়ক এবং মোড়ে ওভারব্রিজ নির্মাণ।
চ. ট্রাফিক ব্যবস্থাকে আরো শক্তিশালী ও কার্যক্ষম করে তোলা।
ছ. সভা-সমাবেশের ক্ষেত্রে কতকগুলো স্থান নির্দিষ্ট করা এবং সড়কের মাঝে বা সড়ক বন্ধ করে সভা-সমাবেশ নিষিদ্ধ করা।



উপরিউক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ ও নাগরিক সচেতনতাই পারে যানজটের মত অস্বস্তিকর অবস্থা থেকে আমাদেরকে মুক্তি দিতে।

বিনীত
আবদুল মান্নান
মালিটোলা, ঢাকা।

১৩ 'ধূমপানে বিষপান' শিরোনামে পত্রিকায় প্রকাশের উপযোগী একটি পত্র লিখুন।

তারিখ : ০৬.০৩.২০১৫

সম্পাদক
দৈনিক প্রথম আলো
১০০ কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ
কারওয়ান বাজার, ঢাকা ১২১৫।

**বিষয় : সংযুক্ত পত্রটি প্রকাশের জন্য আবেদন।**

জনাব,
ইতোমধ্যে লক্ষ্য করেছি যে, বিভিন্ন সামাজিক ও জাতীয় সমস্যার সমাধানকল্পে জনমত গড়ে তোলার ক্ষেত্রে আপনার বহুল প্রচারিত দৈনিক পত্রিকাটি এক নিরন্তর ও নিরলস ভূমিকা পালন করে চলেছে। বরাবরের মতো এবারও নিম্নোক্ত জাতীয় স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট পত্রটি আপনার পত্রিকায় প্রকাশ করবেন বলে আশা করি।

বিনীত
সৈয়দ মোস্তাক
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

### ধূমপানে বিষপান

সুস্থ থাকার পূর্বশর্ত হলো- সুস্থ মানসিকতা, সুস্থ চিন্তা, সুস্থ কর্ম ও সুস্থ খাদ্য গ্রহণ। 'স্বাস্থ্য মানুষের মৌলিক অধিকার'– স্লোগানটি আজ শুধুই নীতিকথায় পর্যবসিত। সুস্থ চেতনা বিসর্জন দিয়ে বিশ্বব্যাপী চলছে জীবাণুযুদ্ধ, রাসায়নিক যুদ্ধ। নেশা যুদ্ধ তার সর্বশেষ সংস্করণ। নেশার কবলে আক্রান্ত হয়ে পড়েছে মানুষ, বিশেষ করে যুব সম্প্রদায়। আমরা এতই বোকা যে, সিগারেটের গায়ে 'ধূমপানে বিষপান', 'ধূমপানে ক্যান্সার হয়, 'ধূমপান স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর'— ইত্যাদি পরীক্ষিত সত্যবাণী লেখা থাকলেও তা অগ্রাহ্য করি। 'ধূমপান যেন ফ্যাশন, স্মার্টনেস'। আমরা বুঝিই না আমাদের মৃত্যু আমরাই ডেকে আনছি। ধূমপানের আওতাভুক্ত পদার্থের মধ্যে রয়েছে তামাক দিয়ে প্রস্তুত সিগারেট, বিড়ি, গ্রামীণ হুক্কা, পাতার বিড়ি ইত্যাদি। নেশার জগতেও এসেছে নানা রূপান্তর। এসেছে কোকেন, এলএসডি, স্ম্যাক আর হেরোইন। মাদকের মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীন হলো 'আফিম'। আফিম থেকে 'মরফিন বেস' তৈরি হয়। এছাড়াও রয়েছে নানা ধরনের অত্যাধুনিক মাদক সেবন পদ্ধতি। আর এসব মাদকদ্রব্য সেবন করছে শিশু থেকে বৃদ্ধ শ্রেণি পর্যন্ত সকলে। বর্তমানে মেয়েদেরকেও এ নেশায় ঝুঁকতে দেখা

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



যায়। ধূমপানের জায়গা হিসেবে রাস্তার মোড়, পাড়া বা মহল্লার দোকান, রেস্টুরেন্টে; ট্রেনের কামরা, বাসের মধ্যে, খোলা মাঠকে ছাড়িয়ে তা ছড়িয়ে পড়েছে সর্বস্থানে। ফলে ক্ষতিগ্রস্ত শুধু ঐ ধূমপায়ী ব্যক্তিই হচ্ছে না; হচ্ছে অধূমপায়ীও। একটু সুস্থ মাথায় চিন্তা করলে দেখা যায়– অমিত প্রতিভার এই যুব সম্প্রদায়কে নিয়ে চলছে বহুমাত্রিক ষড়যন্ত্র। সুকৌশলে তাদের হাতে নেশা বস্তু তুলে দিচ্ছে স্বার্থান্বেষী মহল, জাতির মেরুদণ্ডকে ভেঙে দেয়ার জন্য। এই ষড়যন্ত্রের শিকার নর-নারী এমনকি নিষ্পাপ শিশুও। এতে করে সমস্ত জাতিই নেশাগ্রস্ততার দিকে ঝুঁকছে নিয়ন্ত্রণহীনভাবে। ধূমপান উপযোগী পদার্থ তামাক, গাজা, পপি ইত্যাদি মাদক জাতীয় পদার্থ দিয়ে তৈরি। যাতে থাকে বিষাক্ত নিকোটিন। এসব কারণে ধূমপানে দুরারোগ্য ব্যাধি দেখা দেয়। এজন্য বলা হয় 'ধূমপানে বিষপান'। ধূমপানের ফলে ফুসফুসের ক্ষতি হয় সবচেয়ে বেশি। প্রথমে ফুসফুস পরে রক্তের সঙ্গে মিশে শরীরের নানা জায়গায় ছড়িয়ে যায় বিষ। ফলত : দেখা যায় যক্ষা, ব্রংকাইটিস, দন্তক্ষত, ক্ষুধা-মন্দা, গ্যাস্ট্রিক, আলসার, হৃদরোগ, মাথাঘোরা এমনকি মৃত্যুদূত ক্যান্সারও। চোখের দৃষ্টি পর্যন্ত নষ্ট হয়। ঠোঁট, মুখ, দাঁত ইত্যাদির মারাত্মক ক্ষতি সাধন করে ধূমপান। এ কুঅভ্যাস পরিশেষে মৃত্যুর দ্বারে পৌঁছে দেয়। তাই এ বিষরূপ মহাঘাতককে বিষপান বলাই শ্রেয়।

এমন অবস্থায় যুবসমাজ তথা দেশ ও জাতিকে এই দুরারোগ্য মরণব্যাধি নেশার হাত থেকে রক্ষা করতে হলে অবশ্যই সরকারি ও বেসরকারি প্রচেষ্টায় জনমত গড়ে তুলতে হবে। ইতোমধ্যে সরকার পাবলিক প্লেসে ধূমপান নিষেধ ঘোষণা করেছেন এবং ধূমপানকারী প্রকাশ্যে ধূমপান করলে ৫০ টাকা জরিমানা ঘোষণা করেছে। এ উদ্যোগে সাধুবাদ জানাই সরকারকে। পুলিশের এনফোর্সমেন্ট বিভাগের অধীনে একটি স্বতন্ত্র সেল গঠন করে মাদকদ্রব্য সেবন রোধ, মাদক চোরাচালান কঠোর হাতে দমন করে অপরাধীকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে। এজন্য চাই সকলেরই উদার মানসিকতা, সহযোগিতা ও সমন্বিত উদ্যোগ।

নিবেদক
সৈয়দ মোস্তাক
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

**১৪ আপনার এলাকায় একটি খাল পুনঃখননের প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করে সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্য একটি পত্র লিখুন।**

তারিখ : ১৫.০৩.২০১৫

বরাবর
সম্পাদক
দৈনিক যায়যায়দিন
এইচআরসি মিডিয়া ভবন
লাভ রোড, ৪৪৬/ই+এফ+জি তেজগাঁও শিল্প এলাকা
ঢাকা ১২০৮।

বিষয় : সংযুক্ত পত্রটি প্রকাশের জন্য আবেদন।



জনাব,
আপনার বহুল প্রচারিত পত্রিকার চিঠিপত্রের পাতায় প্রকাশের জন্য 'ইছামতি খাল পুনর্খনন-এর আবেদন' জানিয়ে চিঠিটি পাঠাচ্ছি। জনস্বার্থে চিঠিটি প্রকাশের ব্যবস্থা করার জন্য সবিনয় অনুরোধ জানাই।

বিনীত
কাশেম তরফদার
ভোলা।

### ইছামতি খাল পুনর্খনন-এর আবেদন

ভোলা জেলার সদর থানা একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক থানা। এ থানার দাপুনিয়া ইউনিয়নের বৃহত্তর জনগোষ্ঠী কৃষির উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল। এলাকার দক্ষিণ-পশ্চিম দিক দিয়ে প্রবাহিত পুরাতন পদ্মানদী। এ অঞ্চলের চর এলাকা ছাড়িয়ে ফসলী জমি ও নিচু এলাকার পদ্মার সংযোগ রক্ষা করছে ইছামতি খাল। দীর্ঘকাল এ খালটির পানি প্রবাহ এলাকার কৃষিকাজে অপরিহার্য ভূমিকা রাখলেও এখন খালটি কৃষকদের জন্য অভিশাপ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ খালটি ভরাট হয়ে যাওয়ায় শুষ্ক মৌসুমে পানিসেচের কোনো কাজে আসে না। ফসলের ভরা মৌসুমে পানির অভাবে কৃষকরা দিশেহারা হয়ে পড়ে। অন্যদিকে বর্ষা মৌসুমে ঘটে উল্টো ব্যাপার। নদীর উপচে পড়া পানি এই খাল দিয়ে প্রবাহিত হয়ে দশ হাজার একর জমির ফসল ডুবিয়ে দেয়। এই অবস্থায় পানি উন্নয়ন বিভাগ যদি খালটির সামান্য সংস্কার করে তবে তা পানি সেচ ও কৃষি উন্নয়নে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে। এজন্য দরকার খালটির পুনর্খননসহ নানামুখী সংস্কার।

এর পরিপ্রেক্ষিতে এলাকাবাসীর দাবি, ইছামতি খালের পুনর্খনন করাসহ খালের নানামুখী সংস্করণ করে অভিশপ্ত খালটিকে কৃষি উন্নয়নের উপযুক্ত করা। আমরা এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সুদৃষ্টি কামনা করি।

বিনীত
এলাকাবাসীর পক্ষে
কাশেম তরফদার
ভোলা।

**১৫ শিক্ষাঙ্গন সন্ত্রাসমুক্ত রাখার সপক্ষে যুক্তি দেখিয়ে সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্য একটি পত্র রচনা করুন।**

তারিখ : ১৪.০৩.২০১৫

সম্পাদক
দৈনিক যায়যায়দিন
এইচআরসি মিডিয়া ভবন
লাভ রোড, ৪৪৬/ই+এফ+জি তেজগাঁও শিল্প এলাকা
ঢাকা ১২০৮।

বিষয় : সংযুক্ত পত্রটি প্রকাশের জন্য আবেদন।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



জনাব,
আপনার বহুল প্রচারিত পত্রিকার চিঠিপত্রের পাতায় নিম্নলিখিত চিঠিটি প্রকাশের ব্যবস্থা করার জন্য সবিনয় অনুরোধ জানাই।

নিবেদক
রেহনুমা তাহসীন
রোকেয়া হল, ঢাবি, ঢাকা ১০০০।

### সন্ত্রাসমুক্ত শিক্ষাঙ্গন চাই

শিক্ষাঙ্গন হচ্ছে একজন শিক্ষার্থীর জন্য অতিগুরুত্বপূর্ণ স্থান। এখানে সে তার মানবিক গুণাবলী বিকাশের শিক্ষা লাভ করে থাকে। কিন্তু বাংলাদেশে শিক্ষক-শিক্ষার্থীর মিলনমেলার এ স্থানকে কলুসিত করছে একদল স্বার্থান্বেষী। তারা ক্যাম্পাসে নিজেদের প্রভাব বজায় রাখতে অনেক সময় নিজেরাই অস্ত্র হাতে নিচ্ছে, আবার অনেক সময় প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করতে ভাড়া করছে এলাকার চিহ্নিত সন্ত্রাসীদের। কিছু কিছু ছাত্র সংগঠন নিজেদের মধ্যে ক্ষমতা ভাগাভাগিকে কেন্দ্র করে অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়ছে। এ সংঘর্ষে যে কেবল নিকৃষ্ট ধারার ছাত্ররাজনীতির সঙ্গে জড়িতরাই আহত কিংবা নিহত বা শিক্ষাঙ্গন থেকে বহিষ্কৃত হচ্ছে তা নয়, অনেক সময় নিরীহ ছাত্রদেরও প্রাণ যাচ্ছে। সাম্প্রতিক সময়ে ঢাকা, জাহাঙ্গীরনগর, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকটি সংঘর্ষের ঘটনার সময় কতিপয় উচ্ছৃঙ্খল ছাত্রের সশস্ত্র মহড়ার ছবিও প্রকাশিত হয়েছে বিভিন্ন জাতীয় দৈনিক পত্রিকায়। অপরাধীদের বিরুদ্ধে কার্যকর ব্যবস্থা নেয়া হয় না বলেই ওরা নির্বিঘ্নে এসব অপরাধ বার বার করতে পারছে। আর এসবের মূলে রয়েছে হীন রাজনৈতিক স্বার্থ।

এমতাবস্থায় শিক্ষাঙ্গনে এই ত্রাসের রাজত্বের অবসান ঘটানোর লক্ষ্যে সুষ্ঠু ছাত্ররাজনীতি পরিচালনার স্বার্থে সঠিক নিয়ম-কানুন প্রণয়ন এবং সেগুলোর বাস্তবায়নে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণে সংশ্লিষ্ট সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

নিবেদক
**রেহনুমা তাহসীন**
রোকেয়া হল
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা ১০০০।

**১৬** **নারী নির্যাতন রোধে পাঁচটি করণীয় উল্লেখ করে সংবাদপত্রের জন্য একটি পত্র রচনা করুন।**

তারিখ : ০৬.০৫.২০১৩

সম্পাদক
দৈনিক সমকাল
১৩৬ তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা ১২০৮।

**বিষয় : সংযুক্ত পত্রটি প্রকাশের জন্য আবেদন।**



জনাব,
আপনার সম্পাদিত বহুল প্রচারিত দৈনিক 'সমকাল' পত্রিকায় চিঠিপত্র বিভাগে নিম্নলিখিত পত্রটি প্রকাশ করলে বাধিত হবো।

বিনীত
নেহা রাইয়ান
শামসুন্নাহার হল
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

### নারী নির্যাতন প্রতিহত করুন, কোলাহলমুক্ত স্বদেশ গড়ুন

গত এপ্রিল মাসে দেশের বেশ কয়েকটি দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত হয় নরসিংদীর একটি মেয়ের প্রতি তার স্বামীর নির্যাতনের খবর। সেখানে স্বামী তার স্ত্রীর ডান হাতের আঙুল ধারালো চাপাতি দিয়ে সারপ্রাইজ দেবার কথা বলে কেটে ফেলে। এ ধরনের হাজারো ঘটনা আমাদের সমাজে প্রতিনিয়ত ঘটছে যা সংবাদপত্রে আসছে না। এসব নির্যাতন রুখতে হলে কতিপয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

১. সরকারকে 'নারী উন্নয়ন নীতি ২০১৩' পুরোপুরি বাস্তবায়নে সচেষ্ট হতে হবে।
২. নারী শিক্ষার হার বৃদ্ধির লক্ষ্যে মেয়েদের জন্য উপবৃত্তির পরিমাণ আরো বাড়াতে হবে।
৩. 'ইভটিজিং নিয়ন্ত্রণ আইন' কার্যকর করতে হবে।
৪. কর্মক্ষেত্রে নারীদের জন্য নিরাপদ পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে।
৫. পুরুষদেরকে তাদের কর্তৃত্ববাদী মনোভাব পরিবর্তন করতে হবে। এ লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমে উৎসাহমূলক অনুষ্ঠান প্রচার করতে হবে। নারী নির্যাতনকারীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে।

দেশ থেকে নারী নির্যাতন দূর করতে হলে এসব ব্যাপারে সকলের সচেতনতা আবশ্যক। তাই এ ব্যাপারে শুধু সরকারকে নয়, দেশবাসীকেও উদারতা ও নৈতিকতার পরিচয় দিতে আহ্বান জানাচ্ছি।

নিবেদক
নেহা রাইয়ান
শামসুন্নাহার হল
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

**১৭** **শিল্প কারখানার বর্জ্য আপনার এলাকার জলাশয় নষ্ট করছে জানিয়ে পত্রিকায় প্রকাশের জন্য একটি পত্র লিখুন।**

তারিখ : ১৬.০৩.২০১৫
সম্পাদক
দৈনিক যুগান্তর
ক-২৪৪ প্রগতি সরণি, কুড়িল (বিশ্বরোড)
বারিধারা, ঢাকা-১২১৯।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



বিষয় : সংযুক্ত পত্রটি প্রকাশের জন্য আবেদন।

জনাব,
আপনার বহুল প্রচারিত জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় চিঠিপত্র বিভাগে অনুগ্রহপূর্বক নিম্নলিখিত পত্রটি প্রকাশ করে বাধিত করবেন।

নিবেদক
জান্নাতী নূর
ফরিদপুর।

**শিল্প কারখানার বর্জ্য অপসারণের আবেদন**

আমরা ফরিদপুর সদর থানার অন্তর্গত পশ্চিম গোয়ালচামটস্থ এলাকার বাসিন্দা। এ এলাকায় প্রায় ৭০ হাজার লোকের বসবাস। এখানে রয়েছে সরকারি ও বেসরকারি কয়েকটি প্রাইমারি ও হাইস্কুল ছাড়াও দু'টি মাদ্রাসা, একটি কলেজ, দুটি ক্লিনিক এবং একটি নিউমার্কেট। ঘনবসতিপূর্ণ এ এলাকার অবকাশযাপনের জন্য রয়েছে মুচি বাড়ির ব্রিজ সংলগ্ন একটি সুবিশাল খেলার মাঠ। আর এ মাঠের পাশ দিয়েই উত্তর-দক্ষিণে আঁকাবাঁকা একটি জলাশয়। এলাকার অধিকাংশ লোক এই জলাশয়ে স্নান করে এবং নিজেদের পরিবারের নানা প্রয়োজন মিটিয়ে থাকে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, জলাশয়টির পূর্ব পাশে সম্প্রতি কয়েকটি ইন্ডাস্ট্রি বা শিল্প-কারখানা গড়ে উঠে জলাশয়ের পানি বিষাক্ত ও নোংরা করে চলছে। ফলে জলাশয়টিতে চাষ করা মাছের যেমন ক্ষতি হচ্ছে, তেমনি মানুষের শরীরে দেখা দিচ্ছে চর্মরোগ। গত ৬ মাস ধরে অনুরোধের পরও কর্তৃপক্ষের দৃষ্টিগোচর হচ্ছে না। তাই অনতিবিলম্বে জনদুর্ভোগ লাঘবে যথাযথ কর্তৃপক্ষকে বিষয়টি খতিয়ে দেখে এর উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে অনুরোধ করা হলো।

নিবেদক
**জান্নাতী নূর**
ফরিদপুর।

কচড়ইক্ষ
৩৫তম বিসিএস
৪

# গ্রন্থ-সমালোচনা

নম্বর
১৫

বর্তমান পৃথিবীতে সাড়ে তিন হাজারের ওপর ভাষা প্রচলিত আছে। পৃথিবীতে প্রচলিত সমৃদ্ধ ভাষাসমূহের মধ্যে বাংলা অন্যতম একটি ভাষা। বাংলা সাহিত্যের বয়স এক হাজার বছরের কিছু বেশি। এ দীর্ঘ সময় সাহিত্য চর্চার কল্যাণে বাংলা সাহিত্য শক্তিশালী সাহিত্যের মর্যাদা লাভ করেছে। সাহিত্যের মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রথম এশীয় হিসেবে ১৯১৩ খ্রিষ্টাব্দে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। এছাড়া বহু লেখক, কবি, সাহিত্যিক, সমালোচক কর্তৃক গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ রচিত হয়েছে এবং তার আলোচনা-সমালোচনা হয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থগুলো এক থেকে একাধিক ভাষায় অনূদিত হয়েছে। কালজয়ী এসব সাহিত্য প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে অবদান রাখতে সক্ষম। সে কারণে কালের বিবর্তনে গ্রন্থসমূহের আলোচনার প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'কপালকুণ্ডলা', 'কৃষ্ণকান্তের উইল'; মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'মেঘনাদবধ কাব্য'; মীর মশাররফ হোসেনের 'বিষাদ সিন্ধু'; কাজী নজরুল ইসলামের 'অগ্নিবীণা'; জসীমউদ্‌দীনের 'নকশী কাঁথার মাঠ'; জীবনানন্দ দাশের 'বনলতা সেন'; বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পথের পাঁচালী'; মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মানদীর মাঝি'; সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর 'লালসালু'; আবু ইসহাকের 'সূর্য-দীঘল বাড়ী'; মুনীর চৌধুরীর 'রক্তাক্ত প্রান্তর'; জহির রায়হানের 'হাজার বছর ধরে'– এরকম বহু কালজয়ী কাব্য, উপন্যাস, নাটক ও প্রবন্ধ নিয়ে এ বিভাগটি সাজানো হয়েছে। ৩৫তম বিসিএস থেকে সিলেবাসে 'গ্রন্থ সমালোচনা' অধ্যায়টি নতুন সংযোজিত হয়েছে। তবে নির্বাচিত বিষয়গুলো আয়ত্ত করতে পারলে আশানুরূপ নম্বর পাওয়া যাবে।

## প্রাচীন ও মধ্যযুগ

### ০১. চর্যাপদ (হাজার বছরের পুরান বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধ গান ও দোহা)

রচয়িতা : ২৪ জন বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্য
সঙ্গ্রাহক : হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

বাংলা সাহিত্যের আদি নিদর্শন চর্যাপদ প্রাচীন যুগের সৃষ্টি। ১৮৮২ সালে প্রকাশিত 'Sanskrit Buddhist Literature in Nepal' গ্রন্থে রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র সর্বপ্রথম নেপালের বৌদ্ধতান্ত্রিক সাহিত্যের কথা প্রকাশ করেন। তাতে উদ্দীপ্ত হয়ে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী নেপালের 'রয়েল লাইব্রেরি' থেকে

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



'আত্মজা ও একটি করবী গাছ' গল্পে প্রতীকী শিল্প-কৌশল প্রয়োগ করা হয়েছে। ইনাম, সুহাস আর ফেকু— এই তিন সহচরকে নিয়ে গল্পের শুরু। তাদের কথাবার্তায় জীবনধারণে বিচিত্র রূপ ফুটে ওঠে। বেকার তিন সহচর নানা অপকর্মে জীবন কাটায়। রাতে তারা এক জায়গায় যায়। সেখানে শীতল হওয়ার হাতছানি আছে। এক বুড়ো তার স্ত্রী ও আত্মজা রুকু বাড়িতে থাকে। রুকুর দেহবিক্রি করার টাকায় বুড়োর দিন কাটে। বুড়ো তাতে সহযোগিতা করে সত্য, কিন্তু করবী গাছের বিষফল খেয়ে জীবনের অবসানও কামনা করে।

'পরবাসী' বা 'মারী' গল্পতেও উঠে এসেছে দাঙ্গার উন্মত্ততা বা উদ্বাস্তু জীবনের ছবি। মুক্তিযুদ্ধের প্রাক্কালে ভিটেহারা রামশরণদের কথায় আমরা খুঁজে পাই বাস্তাহারার বেদনা—

> স্বাধীন হইচি আমরা–ঘৃণায় আর রাগে রামশরণের গলার আওয়াজ চিড় খেয়ে গেল, স্বাধীন হইছি তাতে আমার বাপের কি? আমি তো এই দেহি, গত বছর পরাণের ভয়ে পালালাম ইণ্ডেয়–নটা মাস শ্যাল কুকুরের মতো কাটিয়ে ফিরে আলাম স্বাধীন দ্যাশে। আবার সেই শ্যাল কুকুরের ব্যাপার। ছোওয়াল মিয়ের হাত ধরে আজ ইস্টিশান; কাল জাহাজ ঘাট—রামশরণের কথা থেকে ছড়াৎ ছড়াৎ শব্দে ধার ছিটকোতে থাকে, স্বাধীনতাটা কি, আঁ? আমি খাতি পালাম না—ছোওয়াল মিয়ে শুকিয়ে মরে, স্বাধীনতাটা কোঁয়ানে? ...স্বাধীন হইছি না কি হইছি–আমি বোঝবো কেমন করে? আটে এট্টা ভিটে ছিলো, এখন তাও নেই। আমি স্বাধীনতা কিসি?

উদ্বাস্তু জীবন সমস্যা মুক্তিযুদ্ধোত্তর পরিস্থিতিতেও বদলায় না—উদ্বাস্তু বা দাঙ্গাতাড়িত জীবনের যে বিষণ্নতা, সংকট রামশরণ যেন তাকেই একবার মনে করিয়ে দেয়।

দাঙ্গার নিজস্ব রাজনীতিতে 'পরবাসী' গল্পটি স্বতন্ত্র হয়ে ওঠে। এভাবে সরাসরি দাঙ্গার কথা তিনি আর কোথাও বলেননি। যে গল্পে তিনি দেখিয়েছেন কীভাবে ধ্বংস হয় মানুষের মানবিক সত্তা, মানুষ কিভাবে প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে ওঠে। সেদিন বশিরের মতো প্রতিহিংসাপরায়ণ মানুষ কোমল বাংলাদেশকে হিংস্র করে তুলেছিল। শান্তি, সহাবস্থানের নিজস্বতাকে ভুলে এক মরণ খেলায় মেতে উঠেছিল মানুষ সেদিন—আর সেদিনই 'ধর্ম' তার ধারণ করার শক্তি হারায়। দাঙ্গার নিজস্ব রাজনীতিতে তাই ওয়াজুদ্দি চাচার মতো স্থির প্রত্যয়ী মানুষদের খুন হতে হয় দাঙ্গাবাজদেরই হাতে।

'পরবাসী' গল্পটি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পটভূমিকায় রচিত। বশির আর ওয়াজদ্দি পরের জমিতে চাষাবাদ করে। নিঃস্ব জীবন তাদের। কিন্তু সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় তারা আপনজনদের হারায়। নির্মম দুর্ভোগের চিত্র হিসেবে গল্পটি বিবেচ্য।

হাসান আজিজুল হকের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বলা হয়েছে, 'হাসান আজিজুল হক বিশিষ্ট তার শিল্পসাধ্যের জন্য। আমাদের সমাজের নিচের তলার মানুষ কীভাবে মার খায়, মার খেয়ে মরতে মরতেও কীভাবে মাথা তোলে, সমাজ-সচেতন শিল্পীরূপে সেই জিনিসটি তিনি ব্যাপকভাবে তার গল্পে তুলে ধরেছেন। তার গল্পে প্রক্রিয়ায় সংঘাত ও দ্বন্দ্বগুলি খুব-ই স্পষ্ট, কখনো কখনো ভয়ঙ্কররূপে পরিস্ফুট। কিন্তু ভাষা-শিল্পের প্রচণ্ড এক কাব্য সংঘাত সৃষ্টির মাধ্যমে এ ভয়ঙ্করের রূপ তিনি নির্মাণ করেন। তাতে জীবন যেমন ফুটে ওঠে, তেমনি জীবন চাপাও পড়ে যায়। বৈশাখের পুঞ্জ-মেঘের কালো সন্ধ্যায় মেঘের গর্জন যেমন বৃষ্টি আনে, আবার বৃষ্টিকে তাড়িয়েও দেয়, অনেকটা সেই রকম। বাংলাদেশের বাংলা ছোটগল্পের ধারায় এ গল্পগ্রন্থটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ভাষা, বিষয়বিন্যাস ও শিল্পরীতির অনন্য প্রকাশ 'আত্মজা ও একটি করবী গাছ' গল্পগ্রন্থটি।

# ৩৫তম বিসিএস

## ৫

# রচনা

নম্বর
৪০

নাতিদীর্ঘ সুবিন্যস্ত গদ্য রচনাকে সাধারণত প্রবন্ধ বলা হয়। একে আমরা রচনা বলেও অভিহিত করে থাকি। পূর্বে বিসিএস লিখিত পরীক্ষায় সংকেতবিহীন ও সংকেতযুক্ত ২টি প্রবন্ধ (৪০ + ৪০) = ৮০ নম্বরের লিখতে হতো। তবে নতুন সিলেবাস অনুযায়ী ৩৫তম বিসিএস লিখিত পরীক্ষায় ৪০ নম্বরের ১টি প্রবন্ধ লিখতে হবে। প্রবন্ধের ভাষা হবে বিষয়বস্তু অনুযায়ী। গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ভাষা হবে গাম্ভীর্যপূর্ণ। তেমনি সহজ-সরল বক্তব্য প্রকাশ করার জন্য সরলতার দিকে নজর রাখতে হবে। মনে রাখা প্রয়োজন প্রতিবেদন এবং প্রবন্ধ এক নয়। রিপোর্ট হবে ভাবাবেগমুক্ত, বস্তুনিষ্ঠ। সেখানে লেখকের ব্যক্তিগত আবেগ বা মনোভাব প্রকাশের অবকাশ নেই। সেজন্য একই বস্তুর ওপর বিভিন্ন লেখকের রিপোর্ট একই ধরনের হবে। তবে ব্যক্তিত্ব ও দৃষ্টিভঙ্গির তারতম্যের ফলে প্রবন্ধে তারতম্য হবে। মোট কথা, প্রবন্ধ লেখার জন্য বিষয়বস্তু সম্পর্কে ধারণা, ভাষার ওপর আধিপত্য এবং লেখকের মৌলিকত্ব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

অতএব প্রবন্ধ লেখার ক্ষেত্রে আপনার আর ভয় থাকা উচিত নয়। যেমন ধরুন, আপনাকে 'বাংলাদেশের গ্যাস সম্পদ' শিরোনামে একটি প্রবন্ধ লিখতে বলা হলো। তখন হয়তো আপনি এসব ভেবে ঘাবড়ে যাবেন যে, বাংলাদেশে কবে প্রথম গ্যাস পাওয়া গেল, এখন কয়টা কূপ আছে, কোন কূপ কোথায় অবস্থিত, কোন কূপ থেকে কত গ্যাস দৈনিক উত্তোলন করা হচ্ছে, প্রতিদিন দেশে কি পরিমাণ গ্যাস জ্বালানো হয় ইত্যাদি তো আপনার স্পষ্ট স্মৃতিতে নেই। অতএব, এ বিষয়ে রচনা লেখা চলবে না। কিন্তু তা ঠিক নয়। এসব তথ্য উক্ত শিরোনামে একটা প্রবন্ধ লিখতে অবশ্যই সাহায্য করবে। কিন্তু যার এসব তথ্য মুখস্থ নেই তিনিও এই বিষয়ে প্রবন্ধ লিখতে পারবেন যদি তার লেখার অভ্যাস থাকে। প্রতিদিন সংবাদপত্র পড়ে আপনি বাংলাদেশের গ্যাস সম্পদ সম্পর্কে যে ধারণা পেয়েছেন তাই একটি পূর্ণাঙ্গ রচনা লিখার ক্ষেত্রে যথেষ্ট।

প্রবন্ধ রচনায় দক্ষতা অর্জনের উপায় : প্রবন্ধ রচনায় রাতারাতি দক্ষতা অর্জন করা যায় না। এ জন্য নিয়মিত অনুশীলন ছাড়াও নিম্নলিখিত দিকগুলো সহায়ক ভূমিকা পালন করে :

১. প্রবন্ধ লেখায় দক্ষতা অর্জনের জন্য প্রচুর প্রবন্ধ ও রচনা পড়তে হয় এবং কোন বিষয়ে কি বক্তব্য কিভাবে উপস্থাপিত হয়েছে তা খুঁটিয়ে দেখতে হয়। পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধ, সংবাদ, প্রতিবেদন, ফিচার ইত্যাদি নিয়মিত পাঠ করলে নানা বিষয়ে বিষয়গত ধারণা ও শব্দভাণ্ডার বাড়ে। এতে প্রবন্ধ লেখা সহজ হয়ে ওঠে।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



২. প্রবন্ধের বিষয় সম্পর্কে ধারণা স্পষ্ট হওয়া দরকার। প্রবন্ধের মর্মবস্তু যুক্তি, তথ্য, তত্ত্ব, বিচার-বিশ্লেষণ ইত্যাদি বিষয়ানুগ, প্রাসঙ্গিক ও সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে। অপ্রাসঙ্গিক বাহুল্য ও অনাবশ্যক বিস্তৃতি উৎকৃষ্ট প্রবন্ধের পরিপন্থী। একই বক্তব্যের পুনরাবৃত্তি যেন না ঘটে সেদিকেও লক্ষ্য রাখতে হয়।

৩. প্রবন্ধ রচনায় ভাষার ওপর সহজ দক্ষতা থাকা দরকার। প্রবন্ধের ভাষা হবে বিষয় ও ভাবের অনুগামী। চিন্তাশীল মননধর্মী প্রবন্ধের ভাষা হবে ভাবগম্ভীর। পক্ষান্তরে ব্যক্তিগত লঘু রচনায় ভাষা হবে হালকা লঘু চালের এবং তাতে প্রয়োজনমতো আবেগধর্মিতাকেও স্পর্শ করতে পারে।

৪. ভাষা-রীতির ক্ষেত্রে সাধু ও চলিত যেন মিশে না যায় সেটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

পরিশেষে বলা যায়, মুখস্থ করে ভালো প্রবন্ধ লেখা কঠিন। এক্ষেত্রে নিয়মিত বিষয়ভিত্তিক লিখার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে এবং পত্র-পত্রিকাসহ বিভিন্ন বই, পুস্তক থেকে বিভিন্ন বিষয়ে ব্যাপক ও বিস্তৃত জ্ঞান অর্জন করতে হবে।

# সরকার-প্রশাসন ও রাজনীতি

## রচনা ০১ হরতাল : প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ

**ভূমিকা :** হরতাল বর্তমান বাংলাদেশের একটি প্রধান আলোচ্য ও বিবেচ্য বিষয়। বাংলাদেশের ভূখণ্ডে হরতাল শুরু হয়েছে অনেক আগে থেকে এবং এর পরিমাণও অনেক। দেশব্যাপী হরতালের পাশাপাশি হয়েছে আঞ্চলিক ও স্থানীয় পর্যায়ে হরতাল। তবে আশির দশক থেকে বাংলাদেশে হরতালের তীব্রতা বেড়েছে। অতীতে কালেভদ্রে হরতালের পরিবর্তে এখন আমরা দেখছি ঘন ঘন হরতাল। হরতাল জনগণের দৈনন্দিন জীবনকে মারাত্মকভাবে প্রভাবিত করছে। হরতাল রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের একটি কৌশল হিসেবে বহু আগে থেকেই স্বীকৃত। প্রধানত রাজনৈতিক কর্মসূচি হিসেবেই ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে উপমহাদেশের জনগণের বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামের ধারায় এর সূচনা। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরও বাঙালিরা মাতৃভাষার মর্যাদা রক্ষা, গণতান্ত্রিক অধিকার আদায় সর্বোপরি স্বাধিকারের লক্ষ্য অর্জনের জন্য সভা, সমাবেশ, মিছিল, ধর্মঘট, ঘেরাও এবং অবরোধের পাশাপাশি হরতাল কর্মসূচি গ্রহণ করে। তবে বর্তমানে রাজনৈতিক কর্মসূচি হিসেবে হরতালের যথার্থতা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। হরতাল দেশের জন্য অকল্যাণকর বিষয়ে পরিণত হয়েছে। অর্থনীতির জন্য মারাত্মক ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

**হরতালের উৎপত্তি :** হরতাল শব্দটি বাংলাভাষায় গৃহীত হয়েছে গুজরাটি ভাষা থেকে। বাংলা একাডেমি প্রকাশিত ব্যবহারিক বাংলা অভিধানে বলা হয়েছে 'হরতাল [গুজরাটি শব্দ : হর (প্রত্যেক) + তাল (তালা) অর্থাৎ প্রতি দরজায় তালা] শব্দের অর্থ— বিক্ষোভ প্রকাশের জন্য যানবাহন, হাটবাজার, দোকানপাট, অফিস আদালত প্রভৃতি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য বন্ধ করা।' হরতাল বলতে কি বোঝায় তা শব্দের অর্থ থেকে খুবই স্পষ্ট। ইংরেজি 'জেনারেল স্ট্রাইক' বা 'সাধারণ ধর্মঘট' এবং হিন্দি 'বন্‌ধ' শব্দকে হরতালের সমার্থক বলে ধরে নেয়া যায়। আদিতে হরতাল ছিল ব্যবসায়ীদের কারবার সংক্রান্ত দাবি দাওয়া আদায়ের লক্ষ্যে চাপ সৃষ্টি ও প্রতিবাদ প্রকাশের কৌশল হিসেবে দোকানপাট, গুদাম ঘর প্রভৃতি বন্ধ রাখা। ১৯২০-৩০-এর দশকে ভারতের রাজনীতিতে হরতাল নতুন মাত্রা যোগ করে। এ সময় মহাত্মা গান্ধী তার নিজ এলাকা গুজরাটে পরপর অনেকগুলো ব্রিটিশ বিরোধী বন্‌ধ বা ধর্মঘটের ডাক দিয়ে হরতালকে একটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের রূপ দেন।



**হরতালের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট :** যে কোনো ন্যায়ভিত্তিক সমাজেই সংঘবদ্ধভাবে প্রতিবাদ ও ক্ষোভ প্রকাশের কতিপয় পথ ও পদ্ধতি থাকে। এ ধরনের প্রতিবাদ ও ক্ষোভ প্রকাশের একটি মাধ্যম হলো হরতাল। তবে দেশভেদে এর রকমফের পরিলক্ষিত হয়। নিচে হরতালের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট আলোচনা করা হলো :

১. **মুর্শিদকুলী খানের চাকলা ব্যবস্থা :** নবাব মুর্শিদকুলী খানের সময় চাকলা ব্যবস্থা চালু ছিল। এ ব্যবস্থায় সব ক্ষুদ্র জমিদারকে চাকলাদারদের মাধ্যমে সরকারি রাজস্ব পরিশোধ করতে বলা হলে ক্ষুদ্র জমিদারেরা তা মেনে নিতে পারেনি। তারা পূর্বের মতো সরাসরি সরকারকে রাজস্ব দেয়ার পক্ষে আরজি জানিয়ে মৃদু প্রতিবাদ গড়ে তোলে। নবাবী সরকার পদ্ধতিতে দাবিদাওয়া জানানোর জন্য আরজির উপরে অন্য কোনো পদ্ধতিতে দাবিদাওয়া সরকার সহ্য করতো না। আরজির মধ্য দিয়ে পরিচালিত আন্দোলনকে ক্ষুদ্র জমিদাররা নাম দিয়েছিল হুকুমত-ই-বায়াৎ, যার অর্থ খোদ সরকার ও তাদের মাঝামাঝি অন্য কোনো কর্তৃপক্ষ তাদের নিকট গ্রহণযোগ্য নয়।

২. **ডিং বিদ্রোহ :** রংপুরের প্রজা সমাজ ১৭৮৩ সালে ইজারাদার দেবী সিংহের অত্যাচারের বিরুদ্ধে ডিং বিদ্রোহ ঘোষণা করে। ডিং ছিল দাবি পূরণ না হওয়া পর্যন্ত খাজনা দেয়া বন্ধ রাখার আন্দোলন। এ আন্দোলনে প্রজারা সরকারের বিরুদ্ধে নয়, বিদ্রোহ প্রকাশ করেছিল সরকার কর্তৃক নিয়োগকৃত স্থানীয় কর্তাদের বিরুদ্ধে।

৩. **ডংকা আন্দোলন :** রংপুরের প্রজাদের ডিং আন্দোলনের আদলে পরবর্তীতে যশোর নদীয়া পাবনার নীল চাষীদের ডংকা আন্দোলন গড়ে উঠে। ডংকা এক রকমের ঢোল। ১৮৫৯-৬০ সালের এ আন্দোলনে বাংলার নীল চাষীরা ডংকা বাজিয়ে ঘোষণা করে দেয় যে, তারা আর নীল চাষ করবে না। একটি ডংকার আওয়াজ শোনামাত্র দূরে আর একটি ডংকা বাজানো মানে ছিল সেখানেও ঐ আন্দোলনের শরিকরা সংহতি ঘোষণা করছে।

৪. **জোট :** ১৮৫০-৬০ এর দশকে ফরায়েজি আন্দোলনের কৌশল ছিল জোট। জমিদার কর্তৃক বেআইনি ও অন্যায়ভাবে আরোপিত আবওয়াব (খাজনাতিরিক্ত চাঁদা) আদায়ের বিরুদ্ধে প্রজারা জোট গঠন করে প্রতিরোধ রচনা করে। প্রতি পরগনায় কৃষকদের নিয়ে জোট গঠন করা হয়। স্থানীয় জোটগুলো সংশ্লিষ্ট হয় আঞ্চলিক জোটের সঙ্গে। আঞ্চলিক জোট সমন্বয়ে গঠিত হয় কেন্দ্রীয় জোট।

৫. **ধর্মঘট :** ১৮৭৩ সালের পাবনা কৃষক বিদ্রোহ সংগঠকরা যে আন্দোলন পরিচালনা করে তা ছিল আজকের ধর্মঘটের অনুরূপ। ধর্মঘট হচ্ছে হিন্দু কৃষক পরিবারের একটি দেবতার প্রতীকস্বরূপ পাত্র। এ পাত্র স্পর্শ করে প্রজারা প্রতিজ্ঞা করে যে, প্রচলিত ও প্রতিষ্ঠিত খাজনা হারের উপরে তারা কোনো বাড়তি খাজনা দিবে না।

৬. **১৯২০-৬০ এর দশক :** ১৯২০-এর দশক থেকে ৫০-এর দশক পর্যন্ত হরতাল ও ধর্মঘটকে সমার্থক হিসেবেই গণ্য করা হতো। ষাটের দশক থেকে রাজনৈতিক আন্দোলনে হরতালকেই ধর্মঘটের চেয়ে অধিকতর জোরদার অস্ত্র হিসেবে গণ্য করা হতে থাকে।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



৭. **স্বাধীন বাংলাদেশে হরতাল :** মুক্তিযুদ্ধের প্রাক্কালে গণমানুষকে আন্দোলনে উদ্বুদ্ধ করতে হরতাল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ১৯৮০-এর দশকে হরতাল বাংলাদেশের রাজনৈতিক আন্দোলনে একটি বহুল ব্যবহৃত কৌশল হিসেবে আবির্ভূত হয়। বিরোধী দলসমূহ জেনারেল এরশাদের শাসনকে (১৯৮২-৯১) অবৈধ ঘোষণা করে ঘনঘন হরতাল ডেকে প্রশাসনকে অকেজো করে দেয় এবং তার সরকারের পতন ঘটে। পরবর্তীতে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে বিরোধী দলসমূহ বেগম খালেদা জিয়ার সরকারকে (১৯৯১-৯৬) উপর্যুপরি হরতালের মাধ্যমে তীব্রচাপে রাখে। শেখ হাসিনার প্রশাসনও (১৯৯৬-২০০১) হরতালের চাপ থেকে মুক্ত ছিল না। এরই ধারাবাহিকতায় চার দলীয় জোট সরকার (২০০১-২০০৬) এবং ১৪ দলীয় মহাজোট সরকারও (২০০৯-বর্তমান) হরতালের অস্ত্র থেকে রক্ষা পায়নি।

**বাংলাদেশে হরতালের সাম্প্রতিক প্রবণতা :** যতই দিন গড়াচ্ছে, মানুষের চিন্তাচেতনার পরিধি যতই প্রসারিত হচ্ছে ততই বাংলাদেশের হরতালের চিত্র নতুন মাত্রায় মোড় নিচ্ছে। নিচে বাংলাদেশের হরতালের সাম্প্রতিক প্রবণতা তুলে ধরা হলো :

১. **মাত্রাবৃদ্ধি :** দিন দিন শিক্ষার হার বাড়ছে, বৃদ্ধি পাচ্ছে রাজনৈতিক চেতনা, বোধোদয় হচ্ছে গণতান্ত্রিক চেতনার। শুধু কমছে না হরতালের মাত্রা। বাংলাদেশের বিগত পাঁচ দশকের রাজনৈতিক ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, যত গণতান্ত্রিক অধিকার প্রসারিত হচ্ছে হরতালও যেন তত বেশি হচ্ছে।

২. **প্রতিবাদের ভাষা উপেক্ষিত :** নব্বইয়ের দশকের শুরুতে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা ফিরে আসার পরও হরতাল চলছে। নিপীড়ক শাসকের বিরুদ্ধে আন্দোলনের এ চূড়ান্ত হাতিয়ারটি অনেক ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হচ্ছে প্রাথমিক হাতিয়ার হিসেবে। মোটকথা বর্তমানে সভা, মিছিল, ধর্মঘট প্রভৃতি গণতান্ত্রিক প্রতিবাদের ভাষা ছেড়ে বেশি বেশি আশ্রয় নেওয়া হচ্ছে হরতালের।

৩. **একক কিংবা জোটবদ্ধভাবে আহ্বান :** বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলগুলো হরতাল ডাকছে কখনো এককভাবে, কখনো জোটবদ্ধভাবে। যেমন– বর্তমান বিরোধী দল বিএনপি কখনো এককভাবে সরকারি কর্মকাণ্ডের প্রতিবাদে হরতাল আহ্বান করে, আবার কখনো বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী ও এর অঙ্গ সংগঠন বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবিরের সাথে জোটবদ্ধ হয়ে হরতাল আহ্বান করে।

৪. **আঞ্চলিক ও স্থানীয়ভাবে আহ্বান :** বাংলাদেশে জাতীয়ভিত্তিক হরতালের পাশাপাশি বর্তমানে পালিত হচ্ছে আঞ্চলিক ও স্থানীয় পর্যায়ে অসংখ্য হরতাল। কখনো নিজ এলাকার এমপির সমর্থনে বন্দী থেকে মুক্তি, অযথা হয়রানি বন্ধ, স্থানীয় সমস্যার সমাধান ইত্যাদি কারণে এ সকল অঞ্চলে হরতালের আহ্বান করা হয়।

**বাংলাদেশে হরতালের ইস্যুসমূহ :** নানাবিধ ইস্যুকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশে হরতালের কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। নিচে এ সকল ইস্যু উল্লেখ করা হলো :

১. **মিছিল, সমাবেশে বাধা :** মিছিল, সমাবেশে বাধা বাংলাদেশে হরতালের অন্যতম প্রধান ইস্যু। বাস্তব অবস্থা পর্যবেক্ষণে দেখা যায় যে, বিরোধী দলের মিছিল কিংবা আহ্বানকৃত সমাবেশে সরকারি দল বিশৃঙ্খলার আশঙ্কায় প্রায়শই বাধা দান করে। এতে বিরোধী দল তাদের গণতান্ত্রিক অধিকারহরণের প্রতিবাদে হরতাল আহ্বান করে।



২. **হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদ :** বিরোধী দলের নেতাকর্মী বা সাধারণ ও নিরীহ জনগণের নৃশংস হত্যাকাণ্ডের ঘটনা বাংলাদেশে প্রায়শই ঘটে। আর প্রতিবাদে বাংলাদেশে হরতাল আহ্বানের ঘটনা বিরল নয়।

৩. **দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি :** বাংলাদেশে যে সরকারই ক্ষমতায় থাকুক না কেন দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতির লাগাম টেনে ধরতে সহসাই ব্যর্থ হয়। নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতার বাইরে চলে যায়, নিদারুণ কষ্টের মাঝে দিনাপাত করতে থাকে তারা। এ সুযোগকে কাজে লাগিয়েও বিরোধী দল সরকারি দলের ব্যর্থতার অভিযোগ ও দ্রব্যমূল্যের নিয়ন্ত্রণ সাধারণ মানুষের নাগালে আনার আহ্বান জানিয়ে হরতালের ডাক দেয়।

৪. **বাজেটের প্রতিবাদ :** সরকার প্রতিবছর যে বাজেট পেশ করে তা সরকারি পক্ষ থেকে 'গণমুখী' বাজেট বলা হলেও বিরোধী দল নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে। এই বাজেট 'গরিব মারার বাজেট', এই বাজেট 'গণমানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে পারেনি' ইত্যাদি অভিযোগ এনে বাজেটকে প্রত্যাখ্যান করে এবং হরতালের ডাক দেয়।

৫. **ধর্মীয় ইস্যু :** ধর্মীয় ইস্যুকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশে হরতাল আহ্বানের ঘটনা অহরহ লক্ষ করা যায়। মসজিদ, মন্দির, প্যাগোডায় হামলা, ভাংচুর কিংবা ইসলাম ধর্মের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (স)-কে কটূক্তিকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশে ধর্মভিত্তিক ইসলামী দল ও অন্যান্য সমমনা দলগুলো প্রায়শই হরতালের মত কর্মসূচি ঘোষণা করে।

৬. **দমনপীড়ন রোধ :** বাংলাদেশে ক্ষমতাসীন দল বিরোধী দলগুলোর উপর ব্যাপকমাত্রায় দমনপীড়ন কার্যক্রম চালায়। এ দমনপীড়ন কখনো যৌক্তিক, আবার কখনো অযৌক্তিক হলেও বিরোধী দল ঢালাওভাবে সরকারি দলকে দোষীসাব্যস্ত করে দমনপীড়ন রোধে হরতালের ডাক দেয়।

৭. **যুদ্ধাপরাধী ইস্যু :** সাম্প্রতিককালে যুদ্ধাপরাধী ইস্যুকে কেন্দ্র করে হরতাল আহ্বানের ঘটনা বাংলাদেশে ব্যাপকভাবে আলোচিত। স্বাধীনতার দীর্ঘ ৪২ বছর পর যুদ্ধাপরাধীদের বিচার কার্যক্রম চলছে। আর এ যুদ্ধাপরাধীদের বিচার কার্যক্রম ও রায়কে কেন্দ্র করে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী ও তার সমমনা দলগুলো হরতালের ডাক দিচ্ছে।

৮. **বন্দি ব্যক্তিদের মুক্তি :** বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতি নিম্নমানের হওয়ায় এখানে গণতন্ত্র চর্চা খুব একটা লক্ষ করা যায় না। ফলে বিরোধী রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গের উপর দমন, নির্যাতন ও বন্দি করে রাখার মতো ঘটনা অহরহ চোখে পড়ে। বিরোধী দল তার বন্দি নেতাকর্মীদের মুক্তির দাবিতে পুনঃপুনঃ হরতাল আহ্বান করে।

৯. **দলীয়করণ :** ক্ষমতাসীন সরকারের দলীয়করণ প্রবণতা বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতির একটি চিরচেনা প্রত্যয়। প্রশাসন, ব্যাংক, শিক্ষাক্ষেত্র সর্বত্র সরকার দলীয় লোকদের দাপট ও প্রাধান্য লক্ষ করা যায়। এ দলীয়করণ রোধকল্পেও হরতাল আহ্বান করা হয়।

১০. **দুর্নীতি :** ক্ষমতাসীন সরকার দলীয় লোকজন পেশিবলে দেশকে দুর্নীতির আখড়ায় পরিণত করে অরাজকতার দেশ কায়েম করতে চায়। এহেন অজুহাতে আমাদের দেশে হরতালের ঘটনা ঘটে।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



১১. **গৃহীত সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার বা সংশোধন :** বাংলাদেশের ক্ষমতাসীন সরকার কখনো কখনো সত্যিকার অর্থে জনগণের কল্যাণে, আবার কখনো কখনো নিজ ক্ষমতার ভিত্তি মজবুত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণ বা সংশোধন করে থাকে। গৃহীত সিদ্ধান্ত ভালোমন্দ যাই থাকুক না কেন বিরোধিতার খাতিরে বিরোধিতা করে সরকারের গৃহীত সিদ্ধান্ত বা সংশোধনী ইস্যুকে কেন্দ্র করে বিরোধী দল হরতাল ডাকবেই এটা আমাদের রাজনৈতিক সংস্কৃতির অনুষঙ্গ বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

১২. **সরকার পতন :** সরকার পতন বাংলাদেশের হরতালের একটি বড় ইস্যু। এই সরকার ব্যর্থ, গণমানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে পারেনি, নিরাপত্তা দিতে পারেনি, বেকার সমস্যার সমাধান করতে পারেনি, নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি পূরণে ব্যর্থ, অগণতান্ত্রিক সরকার ইত্যাদি অভিযোগ এনে সরকার পতনের ডাক দিয়ে বিরোধী দল লাগাতার বা খণ্ড খণ্ড হরতাল আহ্বান করে।

**বাংলাদেশের হরতালের বৈশিষ্ট্য/প্রকৃতি :** হরতাল প্রতিবাদের ভাষা হলেও বাংলাদেশের হরতাল শান্তিপূর্ণের চেয়ে ধ্বংসাত্মক এবং অগণতান্ত্রিক ও অবিবেচনা প্রসূত। নিচে বাংলাদেশের হরতালের বৈশিষ্ট্য/প্রকৃতি আলোচনা করা হলো :

১. **বোমাবাজি :** বাংলাদেশে হরতাল চলাকালে বা হরতালের আগের দিন বোমাবাজির ঘটনা নব্বইয়ের দশকে শুরু হয় এবং এখনো অব্যাহত আছে। হরতাল অমান্য করে কোনো যানবাহন বের হলে তা রুখতে পিকেটারদের অনুরোধের স্থান নেয় বোমা। চলন্তবাসে ইট-পাটকেল নিক্ষেপের পরিবর্তে ছুড়ে মারা হয় বোমা। এতে সাধারণত মানুষের মৃত্যু ও আহত হওয়ার ঘটনা ঘটে।

২. **ভাংচুর :** বাংলাদেশে বর্তমানে হরতাল আর ভাংচুর সমার্থক শব্দে পরিণত হয়েছে। হরতাল হবে অথচ হরতালের আগের রাতে কিংবা হরতালের দিন গাড়ি, দোকানপাট ভাংচুর হবে না এটা যেন আমাদের দেশে হরতালকারী ও পিকেটাররা ভাবতেই পারে না। তাই তারা হরতালের আগের রাত থেকে ভাংচুর শুরু করে এবং তা অব্যাহত রাখে হরতালের শেষ পর্যন্ত।

৩. **অগ্নিসংযোগ :** অগ্নিসংযোগ বাংলাদেশের হরতালের একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়েছে। বাস, ট্রাক, ট্রেন, সিএনজি, অটোরিকশা, মোটরসাইকেল, রিকশা ইত্যাদিতে হরতালে অগ্নিসংযোগ করে হরতালকারীরা নিজেদের ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ করে সরকারকে তাদের অস্তিত্বের জানান দেয়।

৪. **ধাওয়া-পাল্টাধাওয়া :** বাংলাদেশে হরতাল মানেই পুলিশের সাথে হরতালকারীদের ধাওয়া-পাল্টাধাওয়ার চিরচেনা ও জীবন্ত দৃশ্য চোখের সামনে দগদগ করে জ্বলতে থাকে। এ ধাওয়া-পাল্টাধাওয়ায় পুলিশ যেমন টিয়ার গ্যাস, রাবার বুলেট, গরম পানি ছোড়ে, তেমনি পিকেটাররাও ইট-পাটকেল নিক্ষেপ, বোমা নিক্ষেপ বা ককটেল বিস্ফোরণ ঘটায়। এতে করে উভয়পক্ষের মাঝে আহত বা নিহত হওয়ার ঘটনা ঘটে।

৫. **বিরোধী দলের মিছিলে বাধা :** বিরোধী দল হরতাল আহ্বান করে হরতালের দিনে হরতালের সমর্থনে মিছিল বের করে থাকে। বিরোধী দলের এ মিছিলে পুলিশের বাধা একটি অবশ্যম্ভাবী ঘটনা। এ সময় হরতালকারীদের সাথে পুলিশের ধস্তাধস্তির ঘটনা ঘটে। এতে বিরোধী দলের নেতাকর্মী থেকে শুরু করে প্রথম সারির নেতারাও রেহাই পান না।



৬. **সরকারি দলের হরতাল বিরোধী মিছিল :** হরতালের দিন রাজধানী ঢাকাসহ দেশের সর্বত্র খণ্ড খণ্ড আকারে সরকারি দলের হরতাল বিরোধী মিছিল করতে দেখা যায়। বিরোধী দলের মিছিলে পুলিশ বাধাদান করলেও হরতাল বিরোধী মিছিলে পুলিশ কোনো বাধা দান করে না। হরতাল মানি না, গণবিরোধী হরতাল প্রত্যাহার কর ইত্যাদি স্লোগান দিয়ে হরতাল বিরোধীরা রাজপথ কাঁপিয়ে তোলে।

৭. **বিরোধী দলের কার্যালয় অবরোধ :** বাংলাদেশের হরতালে নতুন মাত্রা যোগ হয়েছে বিরোধী দলের কার্যালয় অবরোধ। পর্যবেক্ষণে দেখা যায় যে, হরতালের দিন পুলিশ বিরোধী দলের কার্যালয় ঘেরাও করে রাখে, প্রয়োজনে গেট তালাবদ্ধ করে রাখে। ফলে কোনো নেতাকর্মী কার্যালয় থেকে বের হয়ে মিছিল বা পিকেটিংয়ে অংশগ্রহণ করতে পারে না।

৮. **পিকেটারদের জেলখানায় বন্দি :** হরতাল চলাকালে পিকেটাররা যেমন ওঁতপেতে থাকে পিকেটিং কিংবা ভাংচুর অগ্নিসংযোগের লক্ষ্যে, তেমনি পুলিশও সতর্ক থাকে এদের ধাওয়া করতে। মিছিল, ভাংচুর কিংবা অগ্নিসংযোগকালে প্রায়শই পুলিশ পিকেটারদের ধরে টেনেহিঁচড়ে নিয়ে জেলখানায় বন্দি করে রাখে।

৯. **সাংবাদিক নিপীড়ন :** বাংলাদেশের হরতালে সাংবাদিক নিপীড়নের ঘটনা নেহায়েত কম নয়। ফটোসাংবাদিক, ভিডিওম্যান বা সংবাদকর্মীরা পুলিশ কিংবা বিরোধী দল উভয়েরই নির্যাতন ও নিপীড়নের শিকার হন। এতে অনেক সাংবাদিকের আহত বা নিহত হবার ঘটনা ঘটে। অনেক হরতালে সাংবাদিকদের বহনকারী যানবাহন ভাংচুর কিংবা পুড়িয়ে দেয়ার ঘটনাও ঘটেছে।

**বাংলাদেশে হরতালের নেতিবাচক দিকসমূহ :** বাংলাদেশে হরতালের নেতিবাচক দিকসমূহ ব্যাপক। নিচে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো :

১. **অর্থনৈতিক ক্ষতি :** বাংলাদেশের বেশির ভাগ হরতালের ইস্যু রাজনৈতিক হলেও, অর্থনীতিরই ক্ষতি বেশি হয়। ৩ এপ্রিল ২০১৩ ঢাকা চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) এক সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করে। উক্ত সম্মেলনে ডিসিসিআই-এর সভাপতি আব্দুস সবুর খান হরতালে দেশের অর্থনীতির ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণ তুলে ধরেন। আব্দুস সবুর খানের দেয়া তথ্য মতে, একদিনের হরতালে দেশের অর্থনীতির ক্ষতি হয় ১৬০০ কোটি টাকা বা ২০৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং এক বছরে ৪০ দিনের হরতালে গড়ে দেশের ক্ষতি হয় ৬৪,০০০ কোটি টাকা। উক্ত রিপোর্টে আরো উল্লেখ করা হয়, একদিনের হরতালে গার্মেন্টস শিল্পে ৩৬০ কোটি টাকা, সরকারের রাজস্ব খাতে ২৫০ কোটি টাকা, ম্যানুফ্যাকচারিং খাতে ১০০ কোটি টাকা, পরিবহন ও যোগাযোগ খাতে ৬০ কোটি টাকা, শিক্ষা, আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং পর্যটন খাতে ৫০ কোটি টাকা, বীমা খাতে ১৫ কোটি টাকা এবং অন্যান্য খাতে ৬৫ কোটি টাকা ক্ষতি হয়।

২. **প্রাণহানি :** বাংলাদেশের হরতালে ব্যাপক প্রাণহানির ঘটনা ঘটে। কখনো পুলিশ, কখনো পিকেটার, আবার কখনো উভয়পক্ষের প্রাণহানি ঘটে। এতে নিহত ব্যক্তির পরিবার উপার্জনক্ষম ব্যক্তিকে হারিয়ে অমানিশার ঘোর অন্ধকারে পতিত হয়।

৩. **বিনিয়োগে বাধা :** হরতালের কারণে দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিশৃঙ্খল অবস্থায় পতিত হয়। এতে করে বিদেশী বিনিয়োগকারী ঝুঁকির মুখে বিনিয়োগ করতে উৎসাহবোধ করে না। ফলে দেশের শিল্পকারখানা ক্ষতির সম্মুখীন হয়।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



৪. **হয়রানি :** বাংলাদেশের হরতালের একটি উল্লেখযোগ্য নেতিবাচক দিক হলো হয়রানি। পিকেটারদের পাশাপাশি অনেক সাধারণ মানুষও এ হয়রানির শিকার হন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো– নিরপরাধ ও অরাজনৈতিক ব্যক্তিদের গ্রেপ্তার, খেটে খাওয়া মানুষদের বেঁচে থাকার অবলম্বন হরণ, ছিনতাই, ভাংচুর ইত্যাদি।

৫. **দেশের ভাবমূর্তি বিনষ্ট :** হরতালে সবচেয়ে বড় যে ক্ষতিটি হয় তা হলো ভিতরে ও বাইরে দেশের ভাবমূর্তি বিনষ্ট। অব্যাহত ও ঘন ঘন হরতাল দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে অস্থিতিশীল করে তোলে। দেশের এ অস্থিতিশীল রাজনৈতিক পরিস্থিতির চিত্র বিশ্ব মিডিয়ায় প্রকাশ পাওয়ায় দেশি-বিদেশী বিনিয়োগকারী, দাতা সংস্থা ও দেশের শুভাকাঙ্ক্ষীরা দেশ সম্পর্কে বিরূপ ধারণা পোষণ করে।

৬. **শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত :** বলা হয়, 'শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড'। কিন্তু অবস্থাদৃষ্টে মনে হয় আমাদের দেশের রাজনীতিবিদরা শিক্ষা নামক জাতির এই মেরুদণ্ডকে ভেঙ্গে দিতে বদ্ধ পরিকার। কারণ দেশের বড় বড় পাবলিক পরীক্ষা, স্কুল-কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা ও অন্যান্য শিক্ষা কার্যক্রমের তোয়াক্কা না করেই হরতাল আহ্বান করে রাজনীতিবিদরা। এতে করে কোমলমতি শিক্ষার্থীদের পড়াশুনার ছেদ পড়ে, শিক্ষাঙ্গনে সেশনজট বৃদ্ধি ও সার্বিক শিক্ষা কার্যক্রম ভূলুণ্ঠিত হয়।

৭. **জরুরি চিকিৎসা ব্যাহত :** হরতালের একটি মারাত্মক ও আত্মঘাতি দিক হলো জরুরি চিকিৎসা কার্যক্রমে বাধা দান। অ্যাম্বুলেন্স হরতালের আওতামুক্ত হলেও বাস্তবে এ চিত্র খুব কমই পরিলক্ষিত হয়। এতে করে চিকিৎসক ও চিকিৎসার অভাবে অনেকেই বাড়িতে কিংবা রাস্তায় মারা যান, যা জাতির জন্য খুবই দুর্ভাগ্যজনক।

৮. **রাজনীতির প্রতি অনীহা :** হরতালের ধ্বংসযজ্ঞের কারণে নিরীহ মেধাবী ও দেশপ্রেমিক নাগরিকগণ রাজনীতিতে অংশগ্রহণে অনীহা দেখায়। ফলে দেশের রাজনৈতিক উন্নয়ন ও গণতন্ত্র চর্চা ব্যাহত হয়।

৯. **খেটে খাওয়া মানুষের দুর্ভোগ :** বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার এখনও এক বিরাট অংশ দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করে। এ দরিদ্র জনগণ বোঝে না হরতালের মারপ্যাচ, বোঝে না রাজনীতির খেলা, তারা তিনবেলা পেটপুরে খেতে পারলেই সন্তুষ্ট। এ দরিদ্র জনগণ হরতালের দিনেও কাজের অন্বেষণে বের হয়। কিন্তু কখনও তারা লাঞ্ছিত হন, আবার কখনো তারা ধ্বংসযজ্ঞের বলি হয়ে বাড়ি ফিরেন।

**হরতালের ইতিবাচক দিক :** হরতালের নেতিবাচক দিক বেশি থাকলেও কিছু কিছু ক্ষেত্রে হরতালের ইতিবাচক দিকও পরিলক্ষিত হয়। ইতিবাচক দিকগুলো হলো :

১. **১৯৭১ সালের হরতাল :** ১৯৭১ সালের ২-৬ মার্চ পর্যন্ত হরতালগুলো ডাকা হয়েছিল আধাবেলা করে এবং ৮ মার্চ থেকে মহান স্বাধীনতা সংগ্রামের সশস্ত্র যুদ্ধের আগে সর্বাত্মক হরতালের রূপ নেয়া অসহযোগ আন্দোলনের স্থায়িত্ব ছিল মাত্র ১৮ দিন। এ সময়ে রিকশা ছাড়াও যান্ত্রিক যানবাহন চলাচলে কোনো বিধিনিষেধ ছিল না। বন্ধ রাখা হয় অফিস, আদালত কল-কারখানা।

২ **১৯৯৬ সালের হরতাল :** ১৯৯৬ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি বিএনপি সরকার একটি প্রহসনমূলক সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠান করে। দেশ-বিদেশে এর বিন্দুমাত্র গ্রহণযোগ্যতা ছিল না। এই নির্বাচনের ফলাফল বাতিলের দাবিতে ১৯৯৬ সালের ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাসের হরতালকে অযৌক্তিক বলা যাবে না।

৩. **সময় অপচয় রোধ :** হরতালের সময় সীমিত আকারে যানবাহন চলাচল করে। এতে সহজেই যাত্রী তার গন্তব্যে পৌঁছতে পারে।



**উপসংহার :** নব্বইয়ের দশকের শুরু থেকে দেশে প্রায় আড়াই দশক সংসদীয় শাসন বিরাজ করছে এই ভূখণ্ডে। সংবাদপত্রের স্বাধীন মত প্রকাশের অবাধ স্বাধীনতা আছে। সামরিক শাসন, জরুরি আইন কিংবা এ ধরনের কোনো কোনো আইনে রাজনীতি করার অধিকার কেড়ে নেয়া হয় না। সভা, সমাবেশ, মিছিল করা যায় অবাধে। প্রতিবাদের ভাষা আছে অনেক। রাজনৈতিক দলগুলোকে সেটাই অনুসরণ করতে হবে। একই সাথে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা, জবাবদিহিতা, মত প্রকাশের স্বাধীনতা, সাংবিধানিক পদ্ধতিতে ক্ষমতার পরিবর্তন—এসবও নিশ্চিত করা চাই। গণতন্ত্রের ভিত সুদৃঢ় হতে থাকলে প্রতিবাদের জন্য হরতাল পরিহার করে অন্যান্য পন্থা অনুসরণের প্রবণতাও বাড়তে থাকবে বলে প্রত্যাশা করা যায়।

## রচনা ০২ যুদ্ধাপরাধীদের বিচার ও বাংলাদেশ

**ভূমিকা :** যুদ্ধাপরাধ মানবতাবিরোধী এক ঘৃণ্য অপরাধ। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এ বিষয়টি আরো স্পর্শকাতর। কারণ চির সবুজের দেশ বাংলার নিরীহ, নিরস্ত্র, শান্তিপ্রিয় মানুষ মুক্তিযুদ্ধকালীন সুপরিকল্পিতভাবে গণহত্যাযজ্ঞের অসহায় শিকার হয়েছিল। সর্বাধুনিক মারণাস্ত্রে সজ্জিত হয়ে সাড়ে সাত কোটি মানুষের উপর হিংস্র হায়েনার মত ঝাঁপিয়ে পড়েছিল পশ্চিম পাকিস্তানি ষড়যন্ত্রকারীরা, সৈন্যরা, পশুরা। তাদেরকে সহায়তা করেছিল এ দেশীয় কতিপয় অমানুষ। তাই স্বাধীনতা-পরবর্তী যুদ্ধাপরাধের বিচারের বিষয়টি প্রশাসনিকভাবেই অনিবার্য হয়ে পড়ে। কিন্তু স্বাধীনতা-পরবর্তী ৪৩ বছরেও সকল যুদ্ধাপরাধীদের বিচারকার্য সম্পাদন করা সম্ভব হয়নি। এহেন প্রেক্ষিতে যুদ্ধাপরাধীদের জঘন্য অপরাধের শাস্তি নিশ্চিত করতে বর্তমান সরকার এক মহান উদ্যোগ গ্রহণ করে। এ উদ্যোগের প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসেবে সাম্প্রতিক সময়ে কতিপয় চিহ্নিত ও স্বঘোষিত যুদ্ধাপরাধীকে আইনের হাতে সোপর্দ করে এবং বিচার প্রক্রিয়ার আওতায় নিয়ে আসে।

**যুদ্ধাপরাধের সংজ্ঞা :** যুদ্ধাপরাধ বলতে কোনো দেশ, জাতি, সামরিক বা বেসামরিক ব্যক্তি কর্তৃক যুদ্ধের প্রথা বা আন্তর্জাতিক নীতিমালা লঙ্ঘন করাকে বোঝায়।

হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস থেকে প্রকাশিত 'দ্য ব্ল্যাক বুক অফ কমিউনিজম : ক্রাইম, টেরর, রিপ্রেশান' গ্রন্থে যুদ্ধাপরাধের সাংজ্ঞিক অর্থ 'যুদ্ধের আইন বা প্রথাকে লঙ্ঘন করা' বলতে হত্যা, নির্যাতন বা সাধারণ নাগরিকদের নির্বাসিত করে অধিকৃত জনপদে ক্রীতদাস শ্রম ক্যাম্পে পরিণত করা, আটককৃতদের হত্যা ও নির্যাতন, অপহৃতদের হত্যা, সামরিক বা বেসামরিক প্রয়োজনীয়তা ছাড়াই দায়িত্বজ্ঞানহীন নগর, শহর ও গ্রামাঞ্চলকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করাকে উল্লেখ করা হয়।

চতুর্থ জেনেভা কনভেনশনের ১৪৭ ধারায় যুদ্ধাপরাধ প্রসঙ্গে বলা হয় : ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা, নির্যাতন বা অমানবিক ব্যবহার এবং কারো শরীর বা স্বাস্থ্যে গুরুতর আঘাত করা বা তার দুর্দশার কারণ তৈরি, অন্যায়ভাবে কাউকে বিতাড়ন বা স্থানান্তর করা বা আটক করা, শত্রুবাহিনীর সেবাদানে বাধ্য করা, যথাযথ ও নিয়মতান্ত্রিক বিচার পাওয়ার অধিকার থেকে কাউকে ইচ্ছাকৃতভাবে বঞ্চিত করা, কাউকে জিম্মি করা, বিপুল পরিমাণে ধ্বংসযজ্ঞ চালানো ও সম্পত্তি আত্মসাৎ করা, সামরিক প্রয়োজন না থাকা সত্ত্বেও বেআইনি ও নীতিবিরুদ্ধ ওপরের যে কোনো এক বা একাধিক কর্মকাণ্ড যুদ্ধাপরাধ হিসেবে বিবেচিত হবে। যুদ্ধাপরাধের ধারণার মর্মমূলে ছিল যে, একটি দেশের বা দেশের সৈন্যদের কাজের জন্য একজন ব্যক্তিও দায়ী হতে পারেন। গণহত্যা, মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ, সাধারণ নাগরিকদের হয়রানি— এসবই যুদ্ধাপরাধের মধ্যে পড়ে। এসবের মধ্যে সবচেয়ে গুরুতর হলো গণহত্যা।

সুতরাং যুদ্ধাপরাধ হচ্ছে কোনো যুদ্ধ বা সামরিক সংঘাত চলাকালীন সময়ে কোনো ব্যক্তি কর্তৃক বেসামরিক জনগণের বিরুদ্ধে সংগঠিত, সমর্থিত নির্দিষ্ট সংজ্ঞায়িত অপরাধ কর্মকাণ্ডসমূহ।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



**বাংলাদেশে যুদ্ধাপরাধের সাথে জড়িত সংগঠন**

১. **শান্তি কমিটি :** ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে পাকিস্তান প্রশাসনকে সহযোগিতা করার লক্ষ্যে ১০ এপ্রিল তারিখে ঢাকায় শান্তি কমিটি গঠিত হয়। শান্তি কমিটি গঠনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল পাকিস্তানের সশস্ত্র বাহিনীকে সহায়তা করা এবং দেশকে বিচ্ছিন্নতা থেকে রক্ষা করে পাকিস্তানি হুকুমত বজায় রাখা। ক্রমান্বয়ে সারাদেশে শান্তি কমিটি গঠিত হয়। স্বাধীনতা বিরোধী রাজনৈতিক নেতা ও কর্মীরা এসব কমিটি গঠন করে মুক্তিযুদ্ধের সময় হানাদার পাকিস্তানি বাহিনীকে সহযোগিতা করে।

২. **রাজাকার বাহিনী :** ১৯৭১ সালের মে মাসে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানি সামরিক সরকার তাদের সহায়ক শক্তি হিসেবে 'রাজাকার' নামে একটি আধা-সামরিক বাহিনী গড়ে তোলে। এই বাহিনীর মোট সদস্য সংখ্যা ছিল পঞ্চাশ হাজার। পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর প্রধান সহযোগী হিসেবে এই বাহিনী দায়িত্ব পালন করে। বিশেষ করে গ্রাম অঞ্চলে এই বাহিনীর অত্যাচারের চিহ্ন আজো বিদ্যমান।

৩. **আল-বদর বাহিনী :** ১৯৭১ সালের আগস্ট মাসে ময়মনসিংহে এই বাহিনী গঠিত হয়। সম্পূর্ণ ধর্মীয় আদর্শের উপর ভিত্তি করে এই বাহিনীর গঠন ও কার্যক্রম পরিচালিত হয়। বাঙালি জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী বিশেষ ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে এই বাহিনীকে ব্যবহার করা হয়। আল-বদর বাহিনীর কার্যকলাপের মধ্যে বুদ্ধিজীবী হত্যাকাণ্ড অন্যতম। মিরপুর বধ্যভূমি এই বাহিনীর হত্যাযজ্ঞের সাক্ষ্য বহন করে।

৪. **আল-শামস বাহিনী :** ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর সহযোগী স্বাধীনতা-বিরোধী এক শ্রেণীর ধর্মান্ধ ও শিক্ষিত তরুণ পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সহযোগিতায় ও ধর্মান্ধ রাজনৈতিক দলের উদ্যোগে আল-শামস বাহিনী গঠন করে। আল বদর বাহিনীর সঙ্গে মিশে এরা দেশের স্বাধীনতাকামী ব্যক্তিদের এবং স্বাধীনতা লাভের পূর্বক্ষণে বুদ্ধিজীবীদের নির্মমভাবে হত্যা করে।

**যুদ্ধাপরাধের প্রকৃতি ও বাংলাদেশ :** বাংলাদেশে যুদ্ধাপরাধের প্রকৃতি খুবই ভয়াবহ ও লোমহর্ষক। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধকালে পাকিস্তানি সশস্ত্র হায়েনা বাহিনী তাদের এদেশীয় কুচক্রী মহল নিয়ে দেশের অভ্যন্তরে হত্যা, লুট, ধর্ষণ, অগ্নিকাণ্ড ও বিভিন্ন ধ্বংসাত্মক তাণ্ডবলীলা চালায়। এরা নির্বিচারে গণহত্যা, গণধর্ষণ, লুণ্ঠন ও অগ্নিসংযোগে অংশ নেয়। ভয়াল দীর্ঘ নয় মাসের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে ৩০ লাখ মুক্তিকামী বাঙালি শাহাদতবরণ করে, সম্ভ্রম হারায় ২ লাখ মা-বোন। উপরিউক্ত দিকগুলো ছাড়াও বাংলাদেশের যুদ্ধাপরাধের উল্লেখযোগ্য কিছু প্রকৃতি তুলে ধরা হলো :

১. **আইনভঙ্গ, সনদ ও চুক্তিপত্র অমান্য :** মুক্তিযুদ্ধকালে বর্বর পাকিস্তানিরা আইনভঙ্গ, সনদ ও চুক্তিপত্র অমান্যের সর্বকালের রেকর্ড ভঙ্গ করে। এ সময় ইয়াহিয়া খান ও তার সাঙ্গোপাঙ্গরা বিমান ও নৌবাহিনী ব্যবহারের সংশ্লিষ্ট সকল আইন ভঙ্গ, জাতিসংঘের সনদ পদদলিত, ১৯৪৮ সালের গণহত্যা চুক্তিসভাপত্র অমান্য, ১৯৪৯ সালের চারটি চুক্তিসভাপত্রও অগ্রাহ্য, বিশেষ করে আন্তর্জাতিক নয় এমন এক সশস্ত্র সংঘর্ষকালে যে সকল নিয়ম মানতে প্রতিটি রাষ্ট্র বাধ্য তা অমান্য, নিরাপরাধ লোকের অধিকার হরণ, সংঘর্ষকালে ত্রাণকার্য সম্পর্কিত আইনকানুন অগ্রাহ্য এবং সংস্কৃতি সংরক্ষণ সম্পর্কিত আইনও তারা ভঙ্গ করেছে।

২. **হত্যা ও সম্পত্তি বিনষ্ট :** পাকিস্তানিরা জাতিগত, জাতীয়তাগত, ভাষাগত, ধর্মগত, সংস্কৃতিগত, গোত্রগত, ভেদনীতি গ্রহণ করে অসামরিক নর-নারীকে হত্যা, অসামরিক জনসাধারণের সম্পত্তি বিনষ্ট এবং একটি জাতির সকল অস্তিত্ব ধ্বংসের হীন প্রচেষ্টা চালিয়েছে। আর তাদের এ প্রচেষ্টায় সহায়তা করেছে এদেশীয় ঘৃণ্য দোসররা।



৩. **বিদেশী পত্রিকার প্রতিবেদন ও প্রতিবেদকের মন্তব্যে ধ্বংসযজ্ঞ :** ১৯৭১ সালে সংঘটিত মুক্তিযুদ্ধের ভয়াবহ প্রকৃতি শুধুমাত্র দেশীয় পত্রিকার মাঝে সীমাবদ্ধ ছিল না বরং দেশের সীমানা ছাড়িয়ে বিশ্বের নাম করা পত্রিকাগুলোর সচিত্র প্রতিবেদন ও প্রতিবেদকের মন্তব্যে চিত্র ফুটে উঠেছে। নিচে এমন কয়েকটি পত্রিকার প্রতিবেদন ও প্রতিবেদকের মন্তব্য উল্লেখ করা হলো—

ক. **টাইমস্ অফ ইন্ডিয়া :** আমেরিকান এইড (AID) কার্যসূচির অধীনে ৩ বছর ঢাকায় ছিলেন জন রোড নামক জনৈক আমেরিকান কর্মকর্তা। তিনি যুক্তরাষ্ট্রের সিনেটে বৈদেশিক সম্পর্ক কমিটির সামনে যে জবানবন্দী দেন (টাইমস অফ ইন্ডিয়া, ২ মে ১৯৭১) তাতে তিনি বলেন যে, পূর্ব বাংলায় জঙ্গলের আইন চালু রয়েছে। সুপরিকল্পিত উপায়ে নিরস্ত্র বেসামরিক জনসাধারণ, বুদ্ধিজীবী হিন্দুদের হত্যা করা হচ্ছে। তিনি ২৯ মার্চ ১৯৭১ রমনা কালীবাড়ি পরিদর্শন করে দেখেন যে, সেখানে ২০০ থেকে ৩০০ লোক হত্যা করা হয়েছে। মেশিনগানের গুলি খেয়ে, আগুনে পুড়ে নর-নারী ও শিশুদের মৃতদেহ পড়ে আছে। সকল জায়গা ধূলিসাৎ করে দেয়া হয়।

খ. **নিউইয়র্ক টাইমস্ :** নিউইয়র্ক টাইমস্ ৩০ মার্চ ১৯৭১ সালে প্রদত্ত রিপোর্টে উল্লেখ করে, সর্বত্র বেসামরিক ব্যক্তিদের সেনাবাহিনী হত্যা করেছে।

গ. **টাইম :** ৩ মে ১৯৭১ নিউইয়র্কের সাপ্তাহিক টাইম পত্রিকায় উল্লেখ করা হয়, একজন যুবক সৈন্যদের কাছে আকুল প্রার্থনা জানায় তাকে যা কিছু করা হোক না কেন, তার ১৭ বছরের বোনটিকে যেন রেহাই দেয়া হয়। তার সামনেই বেয়নেট দিয়ে বোনটিকে হত্যা করে পশুরা।

ঘ. **ল্য এক্সপ্রেস পত্রিকার প্রতিবেদকের মন্তব্য :** ফ্রান্সের 'ল্য এক্সপ্রেস' পত্রিকার সাংবাদিক তার অভিজ্ঞতা বর্ণনা দেন এভাবে, 'প্রতি রাতেই আমি মেশিনগান ও মর্টারের গুলির শব্দ শুনতাম। বাঙালিদের তাড়িয়ে তাড়িয়ে ধরতো সৈন্যরা, তারপর যানবাহনের পেছনে এমনভাবে বেঁধে দিত যাতে তাদের মাথা মাটিতে বারবার এসে আঘাত হানে।'

ঙ. **সানডে টাইমস :** সানডে টাইমস পত্রিকায় পাকিস্তানস্থ প্রতিনিধি (১৩ জুন ১৯৭১ সংখ্যা) জানিয়েছেন যে, 'পুরান ঢাকায় কয়েকটি এলাকা নিশ্চিহ্ন করে দেয়ার সময় সান্ধ্য আইনের সময় যে শত শত মুসলমানদের পাকড়াও করা হয়েছিল তাদেরও কোনো চিহ্ন পরবর্তীতে আর মেলেনি।' ১৫ এপ্রিল ১৯৭১ তিনি ঢাকায় ঘোরার সময় দেখেছেন যে, 'ইকবাল হলের (বর্তমান জহুরুল হক হল) দুটি সিঁড়িতে প্রচুর রক্ত তখনও ছড়িয়ে আছে এবং হলের ছাদে চারজন ছাত্রের মাথা তখনও পচছে। দেয়ালে গুলির দাগ এবং রীতিমত ডিডিটি পাউডার ছড়িয়ে দেয়া সত্ত্বেও চারদিকে দুর্গন্ধ। মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগে ২৩ জন মহিলা ও শিশুর পচা লাশ সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়।'

চ. **সানডে টেলিগ্রাফ :** লন্ডনের সানডে টেলিগ্রাফ পত্রিকা ৪ এপ্রিল ১৯৭১ পাকিস্তানি কুচক্রীদের মানসিকতা ও ষড়যন্ত্র সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা ও মন্তব্যে লেখে, 'গত সপ্তাহে পশ্চিম পাকিস্তানি সেনাবাহিনী নৃশংসভাবে গণপ্রজাতান্ত্রী বাংলাদেশ হিসেবে আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারকামী পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধীনতা আন্দোলনের জীবনীশক্তি নিঃশেষ করা ছাড়া আর সবই করেছে। পাকিস্তানের জেনারেল ও কর্নেলরা খুব সাবধানে দু'বছর ধরে যে পরিকল্পনা করেছে তারই ফল এই নৃশংসতা। তাদের অনেকেই ব্রিটিশদের হাতে ট্রেনিংপ্রাপ্ত, অনেকেই চারিত্রিক নম্রতায় না হলেও বাহ্যিক ব্যবহারে 'ব্রিটিশদের চাইতেও ব্রিটিশ'।'

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



৪. **শীর্ষ পাঁচ যুদ্ধাপরাধ :** ১৯৭১ সালে পাক হানাদার বাহিনী ও তাদের দোসররা বাংলাদেশে ১৭ ধরনের যুদ্ধাপরাধ, ১৩ ধরনের মানবতাবিরোধী অপরাধ এবং ৪ ধরনের গণহত্যাজনিত অপরাধসহ মোট ৫৩ ধরনের অপরাধে লিপ্ত ছিল। এ প্রসঙ্গে শীর্ষ পাঁচ যুদ্ধাপরাধ হলো–

(i) ১৯৭১ সালের ২৫ ও ২৬ মার্চ ঢাকায় 'অপারেশন সার্চলাইট' নামে সেনা অভিযানে নির্বিচারে ৫০ হাজার বাঙালি নিধন। যুদ্ধকালীন সর্বমোট ৩০ লাখ বাঙালিকে নৃশংসভাবে হত্যা।

(ii) লুণ্ঠন, ধর্ষণ, অগ্নিসংযোগ ও দেশজুড়ে হত্যাকাণ্ড।

(iii) মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে পূর্বপরিকল্পিতভাবে বুদ্ধিজীবী এবং বিভিন্ন পেশাজীবী যেমন চিকিৎসক, প্রকৌশলী, আমলা, ছাত্র ও সমাজকর্মীদের হত্যা এবং তাদের গণকবর দেয়া।

(iv) হাজার হাজার বাঙালি নারীকে ধর্ষণ ও নিগ্রহ।

(v) এদেশ থেকে হিন্দু জাতিসত্তাকে নির্মূলের জন্য হত্যা, ধর্ষণ ও নির্যাতন।

**দেশে দেশে যুদ্ধাপরাধ ও বিচার :** যুদ্ধাপরাধ একটি আন্তর্জাতিক অপরাধ। এটি এখন আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইনের আওতায় চলে এসেছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর শান্তি ও মানবতার বিরুদ্ধে যে কোনো অপরাধকে যুদ্ধাপরাধ হিসেবে আখ্যা দেয়া হয়েছে। বিশ্বব্যাপী বিভিন্ন সময় বিভিন্ন দেশে নানা আঙ্গিকে যুদ্ধাপরাধ সংঘটিত হয়েছে। আবার যুদ্ধাপরাধের বিচারে গঠিত হয়েছে বিভিন্ন ট্রাইব্যুনাল ও কোর্ট। নিচে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো :

১. **যুদ্ধাপরাধ ও আন্তর্জাতিক ট্রাইব্যুনালের ধারণা :** ১৮৯৯ সালে ফিলিপাইন-আমেরিকান যুদ্ধকালীন সময়ে শান্তিপূর্ণ সমাধানের উদ্দেশ্যে হল্যান্ডে আয়োজিত Hague Peace Conference-1-এ প্রথমবারের মতো Laws of war এবং War crime-গুলোকে চিহ্নিত করে তা আন্তর্জাতিক আইন হিসেবে গ্রহণ করার জন্য প্রয়োজনীয় আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করা হয়। এখানে প্রথমবারের মতো যুদ্ধাপরাধ ও আন্তর্জাতিক ট্রাইব্যুনালের কনসেপ্টের সূচনা হয়েছিল।

২. **উল্লেখযোগ্য ট্রাইব্যুনাল :** দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর যুদ্ধাপরাধ নিয়ে বিশ্বের ছোট বড় দেশগুলো সোচ্চার হওয়ায় বিভিন্ন ট্রাইব্যুনাল গঠিত হয়। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো– ন্যুরেমবার্গ ট্রাইব্যুনাল, টোকিও ট্রাইব্যুনাল, যুগোস্লাভিয়া ট্রাইব্যুনাল ও রুয়ান্ডা ট্রাইব্যুনাল। নিচে ছকের মাধ্যমে দেখানো হলো :

দেশে দেশে যুদ্ধাপরাধ ও বিচার

| ট্রাইব্যুনাল | প্রতিষ্ঠা | কার্যক্রম শুরু-শেষ | রায় প্রকাশ | অভিযুক্ত | শাস্তি |
|---|---|---|---|---|---|
| ন্যুরেমবার্গ ট্রাইব্যুনাল | – | ১৮ অক্টোবর ১৯৪৫- ৩১ আগস্ট ১৯৪৬ | ১ অক্টোবর ১৯৪৬ – | দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জার্মানির অভিযুক্ত ২৪ সেনা | মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত-১২ জন যাবজ্জীবন কারাদণ্ড–৩ জন এবং কারাদণ্ড-৪ জন |
| টোকিও ট্রাইব্যুনাল | ২০ জুলাই ১৯৪৫ | ১৯৪৬ সালের মে/জুন মাসে | নভেম্বর ১৯৪৮ | জাপানের ২৮ জন যুদ্ধাপরাধী | মৃত্যুদণ্ড ও বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ড দেয়া হয়। |
| যুগোস্লাভিয়া ট্রাইব্যুনাল | ২৫ মে ১৯৯৩-এ গঠিত এবং ১৭ নভেম্বর ১৯৯৩ প্রতিষ্ঠিত | ৮ নভেম্বর ১৯৯৪-চলমান | – | বসনিয়ার সার্ব নেতা ও সামরিক কমান্ডারগণ | – |
| রুয়ান্ডা ট্রাইব্যুনাল | ৮ নভেম্বর ১৯৯৪ | ১৯৯৭ | ১৯৯৮ | রুয়ান্ডা গণহত্যায় জড়িত তুতসিরা | রুয়ান্ডার সাবেক প্রধানমন্ত্রীকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড প্রদান। |



৩. **আইসিসি গঠন :** বিভিন্ন দেশের যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের জন্য ২০০২ সালে নেদারল্যান্ডের দি হেগ শহরে গঠন করা হয় ইন্টারন্যাশনাল ক্রিমিনাল কোর্ট (আইসিসি)। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র, চীন, ইসরাইলসহ বেশ কয়েকটি দেশ এ আন্তর্জাতিক আদালতের বিরোধিতা করে এবং এর সাথে যে কোনো ধরনের সম্পৃক্ততা রাখতে অস্বীকার করে।

৪. **বিশেষ আদালত, ট্রাইব্যুনাল বা কোর্ট :** যুদ্ধাপরাধের বিচারের জন্য বিভিন্ন দেশে আন্তর্জাতিক ও জাতীয় আইনের সমন্বয়ে বিশেষ আদালত, ট্রাইব্যুনাল বা কোর্ট স্থাপিত হয়। যেমন– সিয়েরা লিওনের বিশেষ আদালত, লেবাননের বিশেষ ট্রাইব্যুনাল, পূর্ব তিমুরে দিলি ডিস্ট্রিক্ট কোর্ট, কম্বোডিয়া ট্রাইব্যুনাল ইত্যাদি।

**যুদ্ধাপরাধীদের বিচার ও বাংলাদেশ :** ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর পাকিস্তান সশস্ত্র বাহিনীর প্রায় ৯৩,০০০ সৈন্য ঢাকার রমনা রেসকোর্স (বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) ময়দানে ভারত ও বাংলাদেশ বাহিনীর যৌথ কমান্ডের নিকট আত্মসমর্পণ করে। আত্মসমর্পণে অন্তর্ভুক্ত ছিল পাকিস্তানের সকল আধা-সামরিক বাহিনী ও বেসামরিক সশস্ত্র বাহিনীসহ স্থল, বিমান ও নৌ বাহিনীর সকল সদস্য। আত্মসমর্পণের দলিলে আনুষ্ঠানিক নিশ্চয়তা প্রদান করা হয় যে, আত্মসমর্পণকারী সকল ব্যক্তির সঙ্গে জেনেভা কনভেনশনের বিধান অনুযায়ী মর্যাদাপূর্ণ ও সম্মানজনক আচরণ করা হবে এবং তাদের নিরাপত্তা ও কল্যাণ নিশ্চিত করা হবে। নিচে বাংলাদেশের যুদ্ধাপরাধীদের বিচার প্রক্রিয়া আলোচনা করা হলো :

১. **বিচারের ঘোষণা ও আইন পাস :** ১০ জানুয়ারি ১৯৭২ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তান থেকে দেশে আসার পর রেসকোর্স ময়দানে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের ঘোষণা দেন। Bangladesh Collaborators (Special Tribunals) Order, 1972 নামে বাংলাদেশে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের জন্য প্রথম আইন পাস হয়।

২. **দালাল আইন প্রয়োগ :** ১৯৭২ সালের ২৪ জানুয়ারি রাষ্ট্রপতির ঘোষণা দ্বারা প্রবর্তিত দালাল আইনটির প্রয়োগ শুরু হয় ফেব্রুয়ারি মাস থেকে তদন্ত প্রক্রিয়া শুরু করার মাধ্যমে।

৩. **সংশোধনী ও বিচার আরম্ভ :** ১৯৭২ সালে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের জন্য গঠিত আইনটির তিন দফা সংশোধনী হয়। এ আইনের অধীনে ৩৭ হাজারেরও বেশি ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং বিভিন্ন আদালতে তাদের বিচার আরম্ভ হয়।

৪. **সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা :** ১৯৭৩ সালের ৩০ নভেম্বর রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৮ ধরনের অপরাধে জড়িতদের বাইরে রেখে সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করেন। এই ১৮ ধরনের অপরাধ হলো– ১. বাংলাদেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালানোর চেষ্টা; ২. বাংলাদেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালানোর ষড়যন্ত্র; ৩. রাষ্ট্রদ্রোহিতা; ৪. হত্যা; ৫. হত্যার চেষ্টা; ৬. অপহরণ; ৭. হত্যার উদ্দেশ্যে অপহরণ; ৮. আটক রাখার উদ্দেশ্যে অপহরণ; ৯. অপহৃত ব্যক্তিকে গুম ও আটক রাখা; ১০. ধর্ষণ; ১১. দস্যুবৃত্তি; ১২. দস্যুবৃত্তিকালে আঘাত; ১৩. ডাকাতি; ১৪. খুনসহ ডাকাতি; ১৫. হত্যা বা মারাত্মক আঘাতসহ দস্যুবৃত্তি অথবা ডাকাতি; ১৬. আগুন অথবা বিস্ফোরক দ্রব্যের সাহায্যে ক্ষতিসাধন; ১৭. বাড়িঘর ধ্বংসের উদ্দেশ্যে আগুন অথবা বিস্ফোরক দ্রব্য ব্যবহার; ১৮. ফৌজদারি দণ্ডবিধির ৪৩৬ ধারা (আগুন অথবা বিস্ফোরক দ্রব্যের সাহায্যে কোনো জলযানের ক্ষতিসাধন) অথবা এসব কাজে উৎসাহ দান।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



৫. **সাধারণ ক্ষমা ঘোষণার প্রভাব :** বঙ্গবন্ধু কর্তৃক সাধারণ ক্ষমা ঘোষণাকালীন কারাগারে ৩৭ হাজার ৪১ জন বন্দি ছিল। ৭৩টি দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনাল করে তাদের বিচার কাজ চালানো হচ্ছিল। এ সাধারণ ক্ষমার আওতায় ২৫ হাজার ৭১৯ জন অভিযুক্ত ব্যক্তি ছাড়া পেয়ে যায়। সুনির্দিষ্ট অভিযোগে আটক বাকি প্রায় ১১ হাজারের যুদ্ধাপরাধী হিসেবে বিচার চলছিল। ১৯৭৩ সালের অক্টোবর পর্যন্ত ২ হাজার ৮৮৪টি মামলার নিষ্পত্তি হয়। এতে মৃত্যুদণ্ড হয়েছিল ১৯ জনের, বাকিদের যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। মূলত দালাল আইনেই এ বিচারকার্য পরিচালনা করা হয়।

৬. **যুদ্ধবন্দিদের বিচারের দাবি :** ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর ৯৩,০০০ আত্মসমর্পণকারী যুদ্ধবন্দিকে ভারতীয় হেফাজতে নিয়ে যাওয়া হয়। আত্মসমর্পণের পরপরই বাংলাদেশ এ পর্যায়ে ১৯৫ জন পাকিস্তানি যুদ্ধবন্দিকে যুদ্ধাপরাধ ও গণহত্যার অভিযোগে বিচারের জন্য শনাক্ত করে। তবে ১৯৭২ সালের জুলাই মাসে পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যে সম্পাদিত সিমলা চুক্তি অনুযায়ী যুদ্ধবন্দিদের নিরাপদে পাকিস্তানে ফেরত পাঠানোর সম্ভাবনা দেখা দেয়, এ প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ ১৯৫ জন যুদ্ধবন্দির বিচারের জোর দাবি জানাতে থাকে। প্রস্তাবিত বিচারের বিরুদ্ধে পাকিস্তান আন্তর্জাতিক আদালতে একটি আনুষ্ঠানিক আবেদনও পেশ করে।

৭. **চুক্তি স্বাক্ষর :** যুদ্ধবন্দিদের বিচারের দাবির প্রেক্ষিতে ভারত ও পাকিস্তানের প্রতিনিধিরা ১৯৭৩ সালের জুলাই-আগস্ট মাসে ইসলামাবাদ ও দিল্লিতে আরেকটি চুক্তি স্বাক্ষরের জন্য পুনরায় বৈঠকে মিলিত হয়। দুই দেশের মধ্যে সম্পাদিত শেষ চুক্তি অনুযায়ী সুনির্দিষ্ট গুরুতর যুদ্ধাপরাধের দায়ে অভিযুক্ত ১৯৫ জন ব্যতীত বাকি সকল যুদ্ধবন্দিকে পাকিস্তানে ফেরত পাঠানোর ব্যবস্থা চূড়ান্ত হয়।

৮. **যুদ্ধবন্দিদের বিচারের দাবি প্রত্যাহার :** ১৯৭৪ সালে লাহোরে ইসলামী ঐক্য সংস্থার শীর্ষ সম্মেলন এবং পাকিস্তান কর্তৃক বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দানের পর তিনটি দেশ অর্থাৎ পাকিস্তান, ভারত ও বাংলাদেশের প্রতিনিধিরা নয়াদিল্লিতে পুনরায় বৈঠকে মিলিত হয় এবং দক্ষিণ এশিয়ার শান্তি ও সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠার স্বার্থে বাংলাদেশকে ১৯৫ জন যুদ্ধবন্দির বিচারের দাবি প্রত্যাহারে রাজি করানো হয়।

৯. **নির্বাচনী ইশতেহারে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার :** ২০০৮ সালের নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার সংক্রান্ত বিষয়টি বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ নির্বাচনী ইশতেহারে অন্তর্ভুক্ত করে এবং জনগণকে এ মর্মে নির্বাচনে প্রতিশ্রুতি দেয় যে, তারা সরকার গঠন করতে পারলে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার বাংলার এ মাটিতে নিশ্চিত করবে। নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ বিপুল ভোটে জয়ী হয়। এরপর সরকার গঠন করে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের লক্ষ্যে আনুষ্ঠানিক কার্যক্রম শুরু করে, যা শেষ করার অভিপ্রায়ে এখনো কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে।

১০. **প্রজ্ঞাপন জারি ও সংশোধনী পাস :** মার্চ ২০১০ যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের জন্য ট্রাইব্যুনাল, তদন্ত সংস্থা ও আইনজীবী প্যানেল গঠন করে প্রজ্ঞাপন জারি করে। ২০০৯ সালের ৯ জুলাই জাতীয় সংসদে ১৯৭৩ সালের আন্তর্জাতিক অপরাধ (ট্রাইব্যুনাল) অ্যাক্টের সংশোধনী পাস করা হয়।



১১. **ট্রাইব্যুনাল গঠন :** যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের লক্ষ্যে আওয়ামী লীগ সরকার দুটি ট্রাইব্যুনাল গঠন করে। নিচে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো :

(i) **ট্রাইব্যুনাল-১ :** আন্তর্জাতিক অপরাধ (ট্রাইব্যুনাল) অ্যাক্ট ১৯৭৩-এর ১৯-এর ৬ নং সেকশনের প্রদত্ত ক্ষমতাবলে ২০১০ সালের ২৫ মার্চ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকালীন সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধের বিচারের লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-১ গঠন করা হয়। তখন এর চেয়ারম্যান হিসেবে ছিলেন বিচারপতি নিজামুল হক। কিন্তু স্কাইপ সংলাপের জের ধরে বিচারপতি নিজামুল হক ১১ ডিসেম্বর ২০১২ পদত্যাগ করলে ১৩ ডিসেম্বর ২০১২ ট্রাইব্যুনালের পুনর্গঠন করা হয়। পুনর্গঠিত ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যান হন– বিচারপতি এটিএম ফজলে কবির এবং সদস্য হন-বিচারপতি আনোয়ারুল হক ও বিচারপতি জাহাঙ্গীর হোসেন।

(ii) **ট্রাইব্যুনাল-২ :** বিচারপ্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করতে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-২ গঠন করা হয় ২২ মার্চ ২০১২। পুনর্গঠিত ট্রাইব্যুনাল অনুযায়ী ট্রাইব্যুনাল-২ এর বর্তমান চেয়ারম্যান হলেন– বিচারপতি ওবায়দুল হাসান এবং সদস্য বিচারপতি মোঃ শাহিনুর ইসলাম ও বিচারপতি মজিবুর রহমান মিয়া।

১২. **ট্রাইব্যুনালের রায় :** এ পর্যন্ত (২৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৫) ট্রাইব্যুনাল ১৭টি রায় প্রদান করেন। যুদ্ধাপরাধী ট্রাইব্যুনাল প্রথম রায় প্রকাশ করেন ২১ জানুয়ারি ২০১৩। এ ১৭টি রায়ের মাধ্যমে মোট ১৮ জনের বিরুদ্ধে রায় প্রদান করে ট্রাইব্যুনাল, যাদের মধ্যে ১৪ জনকে মৃত্যুদণ্ড, একজনকে যাবজ্জীবন, একজনকে ৯০ বছর এবং দুইজনকে আমৃত্যু কারাদণ্ড দেয় ট্রাইব্যুনাল। এর মধ্যে ৯ মামলার রায়ে ১০ জনের বিরুদ্ধে ট্রাইব্যুনাল-২ এবং ৮ মামলায় আট অভিযুক্তের বিরুদ্ধে রায় ঘোষণা করে ট্রাইব্যুনাল-১।

**উপসংহার :** ইতিহাসের শিক্ষা হচ্ছে– ক্ষমতাগর্বী, অন্যায়কারী সব সময়ই আত্মধ্বংসী নীতি গ্রহণ করে পৃথিবীর নিরপরাধ মানুষের দুর্দশার কারণ হয়, পরিণামে সে নিজেও ধ্বংস হয়ে যায়। হিটলারের মতো বহু অমানুষেরই শেষ পরিণতি একই। ইয়াহিয়া খানরাও ইতিহাসের হাত থেকে রক্ষা পাবে না। যেমন পায়নি তাদের এ দেশীয় দোসররা। যাদেরকে আজ স্বাধীনতার প্রায় ৪৩ বছর পর যুদ্ধাপরাধের দায়ে কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হয়েছে। কেবল বাংলাদেশীই নয়, পাকিস্তানিসহ সকল মানবতাবিরোধী যুদ্ধাপরাধীদের যথার্থ বিচার বাংলাদেশের মানুষ প্রত্যাশা করে।

## রচনা ০৩ রাজনৈতিক সংস্কৃতি : প্রেক্ষিত বাংলাদেশ

**ভূমিকা :** রাজনৈতিক সংস্কৃতির ধারণাটি খুব বেশি প্রাচীন নয়। 'রাজনৈতিক সংস্কৃতি' (Political culture) প্রত্যয়টি প্রথম ব্যবহার করেন সিডনি ভারবা। তারপর থেকে রাজনীতি বিশ্লেষণে রাজনৈতিক সংস্কৃতির সম্পৃক্ততা ও প্রভাবের বিষয়টি আলোচনায় আসে। আধুনিক কালে প্রতিটি রাজনৈতিক ব্যবস্থাই তার নিজস্ব রাজনৈতিক সংস্কৃতির আবহে গড়ে উঠতে দেখা যায়। কোনো সমাজের বিদ্যমান রাজনৈতিক সংস্কৃতির উপাদানগুলো যদি সেখানকার রাজনৈতিক ব্যবস্থার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ না হয় তাহলে সে ব্যবস্থা স্বতঃস্ফূর্তভাবে বিকশিত হতে পারে না। আরোপিত বিধি-

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



বিধান, নীতিপদ্ধতি ও প্রতিষ্ঠানগুলো তখন বিদ্যমান বিশ্বাস ও বোধের সাথে খাপ খাওয়াতে না পেরে রাজনীতিতে হযবরল অবস্থার সৃষ্টি করে। মোটকথা, উন্নত রাজনৈতিক সংস্কৃতির বদৌলতে দেশের রাজনৈতিক উন্নয়ন হয় ও রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় থাকে।

**রাজনৈতিক সংস্কৃতি :** রাজনৈতিক সংস্কৃতি হচ্ছে সাধারণ সংস্কৃতির সেই অবিচ্ছেদ্য অংশ যা একজন নাগরিকের মূল্যবোধ, বিশ্বাস, ধারণা, অনুভূতি ও ঐতিহ্যের সমষ্টি; কোনো রাজনৈতিক ব্যবস্থায় রাজনীতির প্রতি ব্যক্তি ও সদস্যগণের মনোবৃত্তি ও দৃষ্টিভঙ্গির নমুনা। রাজনৈতিক সংস্কৃতি হলো কতকগুলো অন্তর্গত প্রবণতা ও মাত্রাবোধ।

সিডনি ভারবা বলেন, 'রাজনৈতিক সংস্কৃতি হচ্ছে বাস্তবভিত্তিক বিশ্বাস, প্রকাশযোগ্য প্রতীক ও মূল্যবোধের সমষ্টি; এগুলো সেই পরিস্থিতি বা পরিবেশকে নির্দেশ করে যেখানে রাজনৈতিক ক্রিয়াকর্ম অনুষ্ঠিত হয়।'

লুসিয়ান পাই বলেন, 'রাজনৈতিক সংস্কৃতি হচ্ছে কতকগুলো মনোবৃত্তি, বিশ্বাস ও অনুভূতির সমষ্টি। এগুলো কোনো রাজনৈতিক ব্যবস্থায় আচরণ নিয়ন্ত্রণকারী ধারণা ও বিধি বিধানকে নির্দেশ করে।'

উপরিউক্ত সংজ্ঞার আলোকে বলা যায়, যে প্রক্রিয়ায় একটি রাজনৈতিক ব্যবস্থায় রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ সংঘটিত হয়, সে সম্পর্কে একটি জাতির রাজনৈতিক ও অরাজনৈতিক বিশ্বাস ও দৃষ্টিভঙ্গির সমষ্টিকে রাজনৈতিক সংস্কৃতি বলা হয়।

**রাজনৈতিক সংস্কৃতি ও বাংলাদেশ :** বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতি বিশ্লেষণ করলে এর দুটি দিক পরিলক্ষিত হয়। এগুলো হলো : ক. ইতিবাচক দিক, খ. নেতিবাচক দিক।

**ইতিবাচক দিক :** ইতিবাচক দিকগুলোর মধ্যে রয়েছে—

১. **গণতন্ত্রকামী মানুষ :** এদেশের মানুষের চরিত্র বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, এরা গণতন্ত্রের জন্য অজস্র লড়াই করেছে। যেমন– ১৯৫২, '৬২, '৬৬, '৬৮, '৬৯, '৭০, '৭১, '৯০ সালে এরা গণতন্ত্র উদ্ধারে আত্মাহুতি দিয়েছে। ইতিহাসের পাতায় ঠাঁই নিয়েছে সালাম, বরকত, আসাদ, মতিউর, নূর হোসেনরা।

২. **নিয়মিত নির্বাচন :** ১৯৯১ থেকে একটি ধারাবাহিক ও নিয়মিত নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে, যা রাজনীতির একটি শুভ দিক। রাজনীতিতে নির্বাচন হচ্ছে প্রাণ।

৩. **জবাবদিহিতা বৃদ্ধি :** ১৯৯১-পরবর্তী সময়ে জবাবদিহিতা বৃদ্ধি পেয়েছে। রাজনৈতিক দলগুলোকে তাদের অন্যায় আচরণের জন্য ক্ষমা চাইতে হচ্ছে অথবা ভুল স্বীকার করতে হচ্ছে।

৪. **বিচার বিভাগের স্বাধীনতা :** বহু প্রতীক্ষিত বিচার বিভাগ এখন স্বাধীন। কাজেই কেউ অন্যায় করলে এখন পার পাওয়া সহজ নয়। উজির-নাজির সবাইকে কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হবে অন্যায়কারী হলে। আইনের চোখে সকলেই সমান বলে বিবেচিত হবে।

৫. **স্বাধীন দুর্নীতি দমন কমিশন :** বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতির একটি উল্লেখযোগ্য দিক স্বাধীন দুর্নীতি দমন কমিশন গঠন। দুর্নীতির দায়ে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে শাস্তি পেতে হচ্ছে। রাজনীতি থেকে দুর্নীতি এভাবে ধীরে ধীরে মুক্ত হবে আশা করা যায়।

৬. **জনসচেতনতা বৃদ্ধি :** বাংলাদেশের মানুষ এখন অত্যন্ত রাজনীতিসচেতন। যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের ফলে তারা দৈনন্দিন রাজনৈতিক ক্রিয়া-কর্ম সম্পর্কে অবগত হচ্ছে। নিজেদের ভালমন্দ বুঝতে শিখেছে।



৭. **বৈদেশিক বিনিয়োগ বৃদ্ধি :** একটি দেশের অর্থনীতি ও রাজনীতি পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। অর্থনীতি সফল হলে রাজনীতিও স্বচ্ছ হয়। আর রাজনীতি স্বচ্ছ হলে অর্থনীতি চাঙ্গা হয়। সাম্প্রতিককালে পৃথিবীর বহু দেশ ও বিখ্যাত প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশে বিনিয়োগের জন্য এগিয়ে এসেছে, যা বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতিকে বেগবান করবে এবং রাজনীতি আরো স্বচ্ছ, জবাবদিহিপূর্ণ হবে।

৮. **গণমাধ্যমের স্বাধীনতা :** পূর্বের তুলনায় বাংলাদেশের গণমাধ্যমগুলো এখন অনেক বেশি স্বাধীনতা ভোগ করছে। সরাসরি সরকারের ভালো কাজের প্রশংসা করছে। মন্দ কাজের নিন্দা করছে। এরূপ গণমাধ্যমের স্বাধীনতা রাজনৈতিক দলগুলোকে আরো বেশি স্বচ্ছ ও স্পষ্ট হতে বাধ্য করছে।

৯. **শিক্ষার হার বৃদ্ধি :** শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড। স্বাধীনতা-পরবর্তী উত্তরোত্তর বাংলাদেশে শিক্ষার হার বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। শিক্ষিত মানুষ বুঝতে বা উপলব্ধি করতে সক্ষম হচ্ছে রাজনৈতিক দল ও নেতাদের চরিত্র। ভালোমন্দ বিচার করতে সক্ষম হচ্ছে। যা বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ রাজনীতিকে আলোর সন্ধান দেবে।

১০. **অর্থনৈতিক উন্নয়ন :** বাংলাদেশের মানুষের মাথাপিছু আয় বেড়েই চলেছে। মাতৃস্বাস্থ্যের উন্নয়ন ঘটছে। শিশু মৃত্যুহার হ্রাস পাচ্ছে, গর্ভকালীন মৃত্যুহার হ্রাস পাচ্ছে, নারী স্বাধীনতা বৃদ্ধি পাচ্ছে প্রভৃতি অর্থনৈতিক উন্নয়নকে ইঙ্গিত করছে। এরূপ ধারাবাহিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন দেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতির ইতিবাচক স্বাক্ষর বহন করে।

১১. **তৃণমূল পর্যায়ে রাজনৈতিক সংগঠন :** বাংলাদেশের বড় বড় রাজনৈতিক দলগুলোর তৃণমূল পর্যায়ে রাজনৈতিক দল রয়েছে। যারা নিত্য জনগণকে সচেতন করে চলেছে।

১২. **অন্যান্য :** এছাড়াও স্বাধীন নির্বাচন কমিশন গঠন, ভূ-রাজনৈতিক গুরুত্ব, মানব সম্পদ বৃদ্ধি প্রভৃতি বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতির ইতিবাচক দিক হিসেবে বিবেচিত।

**নেতিবাচক দিক :** প্রফেসর রেহমান সোবহান স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতির যে সমস্যাগুলোকে চিহ্নিত করেছেন সেগুলো নিম্নরূপ : ১. মতদ্বৈতিক চিরাচরিত শাসন, ২. প্রাতিষ্ঠানিক ত্রুটি, ৩. নিম্ন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান, ৪. অসুস্থ রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান, ৫. অগণতান্ত্রিক নীতি।

নিচে ধারাবাহিকভাবে বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতির নেতিবাচক দিকগুলো উপস্থাপন করা হলো :

১. **নির্বাচন সমস্যা :** নির্বাচন গণতন্ত্রের প্রাণ। আমাদের দেশে নির্বাচন ব্যবস্থার গ্রহণযোগ্যতা ও বিশ্বস্ততা নিয়ে মতভেদ রয়েছে। নির্বাচনে কারচুপি, জাল ভোট, অর্থ ব্যবহার, আইন ও পেশীশক্তির ব্যবহার রয়েছে। শিক্ষিত-বিশ্বস্ত জনপ্রিয়রা দল থেকে মনোনয়ন পাচ্ছেন না। মনোনয়নে গুরুত্ব দেয়া হয় পুঁজিপতি ও পেশীশক্তির অধিকারীদের। নির্বাচন কমিশন গঠন করা হয় রাজনৈতিক স্বার্থে।

২. **রাজনৈতিক দলের ব্যর্থতা :** রাজনৈতিক দলসমূহ নির্বাচনের পূর্বে বড় বড় প্রতিশ্রুতি দিয়ে নির্বাচনী বৈতরণী পার হলে তা ভুলে যায়। যারা নেতৃত্বে আছেন তারা সর্বদা নেতৃত্বে থাকতে চান। সিদ্ধান্তগ্রহণে দলের প্রধানের প্রাধান্য দেখা যায়। জনগণের পৃষ্ঠপোষক ও ভাগ্য নিয়ন্ত্রক না হয়ে রাজনৈতিক দলগুলো নিজেদের ভাগ্যোন্নয়নে গুরুত্ব দেয়। দলীয় কোন্দল, রাজনৈতিক হত্যা, ক্ষমতাসীন কর্তৃক বিরোধীদের কোণঠাসা করে রাখা, বিরোধী দলগুলোর অরাজকতা সৃষ্টি করে সরকারকে বিপর্যস্ত করা বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে পরিণত হয়েছে।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



৩. **অস্থিরতা ও অসহিষ্ণুতা :** জনচরিত্রের দিক দিয়ে আমরা একটা অস্থির জাতি। তার প্রমাণ রাজনৈতিক দলগুলোর স্লোগানে– 'অ্যাকশন, অ্যাকশন, ডাইরেক্ট অ্যাকশন' অথবা 'জ্বালো জ্বালো আগুন জ্বালো...', '... গদিতে আগুন জ্বালো একসাথে'। এরূপ স্লোগান রাজনৈতিক অপসংস্কৃতিরই নামান্তর।

৪. **অরাজকতা ও অনৈতিকতা :** বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে মারামারি, লাঠালাঠি, ভাংচুর, জ্বালাও পোড়াও, বোমাবাজি, গুলি, হত্যা, লুটতরাজ, চাঁদাবাজ, টেন্ডারবাজি নিত্যনৈমিত্তিক এবং স্বাভাবিক ঘটনায় পরিণত হয়েছে। স্লোগান ওঠে— 'বুবুজান অথবা ভাবীজান... বাংলা ছেড়ে চলে যান।' কিংবা '... ধইরা ধইরা জবাই কর।'

৫. **সমঝোতার অভাব :** বাংলাদেশের রাজনৈতিক ব্যবস্থা মারাত্মকভাবে ঐকমত্যের প্রশ্নে বাধার সম্মুখীন হচ্ছে। যার ফলে আজও সমাধান হয়নি বাঙালি-বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ দ্বন্দ্ব, স্থানীয় সরকার কাঠামো, পররাষ্ট্র নীতি। জাতীয় ঐকমত্যের অভাবেই সৃষ্টি হয়েছে গণতন্ত্র ও রাষ্ট্রের ভাঙন। পারেনি স্বাধীনতার শক্তি ও স্বাধীনতার বিরোধী শক্তিকে চিহ্নিত করতে। ব্যর্থ হয়েছে রাজাকার, আল বদর, আল শামসদের শাস্তি দিতে।

৬. **ক্ষমতার অপব্যবহার :** বাংলাদেশের রাজনীতিবিদরা ক্ষমতার মোহে মত্ত হয়ে ধরাকে সরা জ্ঞান করে। আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি রাজনৈতিক নেতাদের ক্ষমতার অপব্যবহারের ফলে দিন দিন আয়ত্তের বাইরে চলে যাচ্ছে। পুলিশকে সরকারি দলের সম্পত্তি হিসেবে ব্যবহার করছে। ক্ষমতাবানরা ভুলেই যান ভবিষ্যতে তাদের ক্ষমতার বাইরে যেতে হবে বা হতে পারে।

৭. **রাবার স্ট্যাম্প পার্লামেন্ট :** বাংলাদেশের পার্লামেন্ট কমবেশি রাবার স্ট্যাম্পে পরিণত হয়েছে। কারণ পার্লামেন্টের কাজ আইন প্রণয়ন, ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করা হলেও প্রধানমন্ত্রীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোনো আইন সংসদে গৃহীত হয় না। পার্লামেন্টকে পাশ কাটিয়ে অনেক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত ও নীতি প্রণীত হয়। তাছাড়া পার্লামেন্ট কমিটিগুলোতে রয়েছে সরকারি দলের প্রাধান্য, বিরোধী দলের বয়কট সংস্কৃতি, নিয়মিত মিটিংয়ের অভাব।

৮. **দ্বন্দ্ব-বিদ্বেষ ও ভাবাদর্শের সংঘাত :** বাংলাদেশের রাজনীতিতে রয়েছে দ্বন্দ্ব-বিদ্বেষ ও ভাবাদর্শগত সংঘাত। ভাবাদর্শগত সংঘাত হিসেবে দেখা যায় ১৯৭২ সালের সংবিধানের মূলনীতি পরিবর্তন, ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রকে ধর্মীয় রাষ্ট্রে পরিণত করা, সমাজতন্ত্র-পুঁজিবাদ দ্বন্দ্ব। একে অপরকে গালি দিচ্ছে ভারতের-চীনের দালাল বলে, যা কখনো সুস্থ রাজনৈতিক সংস্কৃতি হতে পারে না।

৯. **ধর্মীয় ও উত্তরাধিকার রাজনীতি :** বাংলাদেশের রাজনীতিতে ধর্মের ব্যবহার ব্যাপক। এ দেশের মানুষ ধার্মিক, কিন্তু ধর্মান্ধ নয়। ধর্মকে ব্যবহার করছে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল বিভিন্নভাবে। যেমন– ডানপন্থিরা স্লোগান দিচ্ছে– 'নারায়ে তাকবীর আল্লাহু আকবার', বামপন্থিরা 'আল্লাহু আকবার' বলে। নির্বাচনকালীন রাজনৈতিক নেতারা হজে যান। মাথায় কাপড় দেন, সমাবেশে আসসালামু আলাইকুম, খোদা হাফেজ, ইনশাল্লাহ, মাশাল্লাহ শব্দ ব্যবহার করে জনগণকে ধোকা দেয়ার চেষ্টা করেন। উত্তরাধিকারসূত্রে রাজনৈতিক গুরুত্বপূর্ণ পদগুলো বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতারা গ্রহণ করে চলেছে। নেতৃত্বে দেখা দিয়েছে শূন্যতা।



১০. **যুদ্ধংদেহী দৃষ্টিভঙ্গী :** এ দেশের রাজনৈতিক দলগুলোর মনোভাব যুদ্ধংদেহী। এখানে সবাই রাজা। কেউ প্রজা হতে চায় না। কেউ কাউকে মানতে চায় না। সবাই যেন সর্বদা এক অসুস্থ প্রতিযোগিতায় লিপ্ত।

১১. **স্ববিরোধিতা ও বিরোধিতার খাতিরে বিরোধিতা করা :** বাংলাদেশ হচ্ছে স্ববিরোধিতার চ্যালেঞ্জে ভরা একটি দেশ। রাজনৈতিক দলের সন্ত্রাসীরা শ্লোগান দেয় হাতে অস্ত্র নিয়ে— 'সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে লড়তে হবে একসাথে' অথবা 'অস্ত্র ছাড় কলম ধর, শিক্ষাজীবন রক্ষা কর' প্রভৃতি। অথচ চোখের সামনেই কোমরে গোঁজা পিস্তল বা চাদরের আড়ালে বেরিয়ে পড়া রাইফেলের বাট দেখা যাচ্ছে। অন্যদিকে, রাজনৈতিক দলগুলো বিরোধিতার খাতিরে বিরোধিতা করে চলেছে। তারা বিরোধীদের ভালোকে ভালো বলতে ভুলে গেছে।

১২. **শাসকগোষ্ঠীর দুর্বলতা :** বাংলাদেশের নির্ভরশীল শাসকশ্রেণী অথর্ব ও মেরুদণ্ডহীন। জনগণের স্বার্থে তাদের কোনোকিছুই করার ক্ষমতা নেই। কারণ তাদের রয়েছে অভ্যন্তরীণ ও বহিঃশক্তির চাপ। কোনো নীতি নির্ধারণে দাতাগোষ্ঠীর মতামতকে প্রাধান্য দিতে হয়। এজন্য ক্ষমতাসীন ও ক্ষমতাহীনরা একের পর এক ভুয়া বা ফাঁকা ইস্যু নিয়ে পরস্পরের প্রতি কাদা ছোঁড়াছুঁড়ি করে। তাদের প্রচারমাধ্যমগুলো এ নিয়েই ব্যাপকভাবে ঢেঁড়ি পেটায়। এ দিয়ে কেবল রাজনৈতিক আবহাওয়াই উত্তপ্ত হয়, জনগণের উপকারে কিছুই আসে না।

**উপসংহার :** বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতিকে অভিজ্ঞমহল অভিহিত করেছেন খণ্ডিতরূপে। সুস্থ রাজনীতি চর্চার মাধ্যমে গড়ে উঠবে সুস্থ রাজনৈতিক সংস্কৃতি। দেশ ও জনতা আশাবাদী— গণতন্ত্রের বন্ধুর পথ যাত্রার মধ্য দিয়ে আমাদের সম্মিলিত লক্ষ্য নির্ধারিত হবে। কোটি কোটি মুক্তি উদ্বেল মানুষ 'যত মত তত পথের' মাঝেও খুঁজে পাবে অভীষ্ট গন্তব্য।

## রচনা ০৪ বাংলাদেশে গণতন্ত্র চর্চা : সমস্যা ও সম্ভাবনা

**ভূমিকা :** গণতন্ত্র তথা সংসদীয় রীতি-পদ্ধতির জন্য বাংলাদেশের মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও আন্দোলন দীর্ঘদিনের। ১৯৭১ সালে স্বাধীন ও সার্বভৌম জাতি হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভের পর বাংলাদেশের জনগণ প্রত্যাশিত সংসদীয় গণতন্ত্রের পথেই প্রথম যাত্রা শুরু করে। কিন্তু ১৯৭৫ সালের ১০ জানুয়ারি চতুর্থ সংশোধনীর মাধ্যমে সংসদীয় গণতন্ত্রের সমাপ্তি ঘটে। পরবর্তীকালে ১৯৭৭ সালে পঞ্চম সংশোধনীর মাধ্যমে পুনরায় বহুদলীয় গণতন্ত্রের পথে যাত্রা শুরু হলেও ১৯৮২ সালে সামরিক অভ্যুত্থানের ফলে দেশে আবার গণতন্ত্রের যাত্রা রুদ্ধ হয়ে যায়। দীর্ঘ আন্দোলনের পর ১৯৯১ সালে অবাধ, নিরপেক্ষ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের মাধ্যমে পঞ্চম জাতীয় সংসদে সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়।

**সংসদীয় সরকারব্যবস্থা :** সংসদীয় সরকার পদ্ধতি মূলত একটি সুদীর্ঘ প্রক্রিয়ার ফসল। বিভিন্ন দেশে, বিভিন্ন পরিবেশ ও পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে সংসদীয় গণতন্ত্রের রয়েছে বিভিন্ন মাত্রা। রাষ্ট্রবিজ্ঞানীগণ মনে করেন ১. আইনসভার কাছে নির্বাহী কর্তৃত্বের জবাবদিহিতা, ২. স্বাধীন বিচার বিভাগ, ৩. নিয়মিত নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠান, ৪. মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা, ৫. জনস্বার্থে পরিচালিত প্রশাসন, ৬. আইনের শাসন প্রভৃতি সংসদীয় পদ্ধতির অনিবার্য শর্তাবলী।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



Encyclopedia Britanica সংসদীয় সরকারের সার্থকতার জন্য ব্যক্তি স্বাধীনতা, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, রাজনৈতিক দলগুলোর সুস্থ শুভবুদ্ধি, সর্বসাধারণের রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের সুবিধা, সংখ্যালঘুদের অধিকার সংরক্ষণ এবং সমস্ত পদ্ধতিতে রাজনৈতিক ব্যবস্থার পরিবর্তন সংসদীয় সরকারের প্রয়োজনীয় শর্তাবলী বলে উল্লেখ করেছেন। আর এসব শর্ত প্রধানত দুটি ভাগে বিভক্ত। যথা :

১. সংবিধানের সর্বোচ্চ মর্যাদা ও সাংবিধানিকতা এবং ২. প্রতিযোগিতামূলক রাজনৈতিক দল ব্যবস্থা। তবে বাংলাদেশের সংসদীয় সরকার ব্যবস্থায় গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের ক্ষেত্রে বহুবিধ সমস্যা রয়েছে।

**বাংলাদেশে গণতন্ত্র চর্চার সমস্যা :** গণতন্ত্র বলতে যদি আইনের শাসন, প্রতিনিধিত্বশীল সরকার, নিয়মিত নির্বাচন, মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা, শক্তিশালী দল ব্যবস্থা, সহিষ্ণু মানসিকতা, গণমাধ্যমের স্বাধীনতা ইত্যাদি বোঝায় তাহলে বাংলাদেশে গণতন্ত্র চর্চার সমস্যাগুলোকে প্রধানত দু ভাবে ভাগ করে আলোচনা করা যেতে পারে। যথা :

**প্রথমত,** আচরণগত বা সাংস্কৃতিক সমস্যা এবং **দ্বিতীয়ত,** আদর্শিক বা সাংবিধানিক সমস্যা।

**আচরণগত বা সাংস্কৃতিক সমস্যা :** বাংলাদেশের গণতন্ত্র চর্চার আচরণগত বা সাংস্কৃতিক দিক বিশ্লেষণ করলে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় পাওয়া যায় : ১. রাজনৈতিক আচরণ, ২. রাজনৈতিক অনুশীলন ও ৩. রাজনৈতিক প্রথা বা পদ্ধতি, যা যে কোনো গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের জন্য একান্ত অপরিহার্য। আর তৃতীয় বিশ্বের একটি উন্নয়নশীল গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের জন্য বিষয়গুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ গণতন্ত্র মানে শুধু রাজনৈতিক নেতার জোরালো ভাষণ নয়। সত্যিকার গণতন্ত্র হচ্ছে অর্জন ও অনুশীলনের বিষয়। অথচ বাংলাদেশের কোনো কোনো রাজনৈতিক নেতা-নেত্রীর বক্তৃতা-বিবৃতি শুনে মনে হয়ে গণতন্ত্র ইতোমধ্যে ষোল আনাই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে কিংবা গণতন্ত্র আতুর ঘরে মৃত্যুবরণ করেছে, অর্থাৎ গণতন্ত্র সম্পর্কে তাদের উভয়ের ধারণা পরস্পরবিরোধী এবং রাজনৈতিকভাবে তারা সম্মুখীন হচ্ছেন পরস্পরবিরোধিতায়। কারণ আমাদের নেতা-নেত্রীরা যখন কথা বলেন তখন চরমের প্রান্তসীমায় অবস্থান করেন। অবশ্য তাদের ধারণা অনুযায়ী এটাও এক ধরনের 'Political Policy', কিন্তু এ ধরনের রাজনৈতিক কলাকৌশলের মারপ্যাঁচে আমাদের কাঙ্ক্ষিত গণতন্ত্র সত্যিই বিপদাপন্ন, যার ফলে রাজনীতির মান নেমে গিয়ে পৌছেছে নিম্ন রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে। যে সংসদীয় গণতন্ত্রের জন্য সুদীর্ঘকালের স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলন, সেই গণতন্ত্রের স্বাদ পাওয়ার আগেই পঞ্চম সংসদে দীর্ঘকালীন অচলাবস্থা, ভোটারবিহীন ১৫ ফেব্রুয়ারির ('৯৬) প্রহসনমূলক নির্বাচন, সপ্তম সংসদে বিরোধী দলের জাতীয় স্বার্থসংশ্লিষ্টহীন ইস্যুতে একটানা সংসদ বর্জন, অষ্টম সংসদে জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক প্রশ্নে অনৈক্য, নবম সংসদে সরকার ও বিরোধী দলের টালবাহানা গণতন্ত্র চর্চার ক্ষেত্রে আচরণগত সমস্যার সৃষ্টি করছে। এক্ষেত্রে অন্যান্য সমস্যাগুলো হলো :

১. **অসহিষ্ণুতা :** গণতন্ত্রের অন্যতম শর্ত হচ্ছে সহিষ্ণুতা, আপোশ এবং সমঝোতা। গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান কেবল তখনই কাজ করতে পারে, যখন রাজনৈতিক নেতারা আলাপ-আলোচনা এবং সমঝোতায় রাজি থাকেন। কিন্তু বাংলাদেশের রাজনৈতিক ব্যবস্থায় রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে যুক্তিসঙ্গত সমঝোতার যথেষ্ট অভাব রয়েছে, যা গণতন্ত্র চর্চার ক্ষেত্রে অন্যতম প্রধান সমস্যা।



২. **নেতৃত্ব নির্বাচন :** বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলগুলোর নেতা ও নেতৃত্ব নির্বাচিত হয় কে কতটা মারমুখী তা দিয়ে। বাংলাদেশের প্রধান রাজনৈতিক দলগুলো বিশেষ করে যারা ক্ষমতায় আছে এবং ক্ষমতায় ছিল কোনো দলেই স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক নেতৃত্ব নির্বাচন পদ্ধতি নেই। এই দলগুলোর নেতা-নেত্রী এমনকি কমিটি নির্বাচনের দায়িত্ব পর্যন্ত দলের প্রধান ব্যক্তির হাতে এবং সবকিছু তার ইচ্ছার ওপর নির্ভর করে। ফলে গণতন্ত্র চর্চা সম্ভব হয় না।

৩. **উপদলীয় কোন্দল :** বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলগুলোর ভেতরে গণতন্ত্র চর্চার অনুপস্থিতির কারণে গোষ্ঠী ও উপদলীয় কোন্দল সৃষ্টি হয়, যে কারণে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে অসংখ্য উপদলের সমাহার লক্ষ্যণীয়। এই উপদলগুলো সময় ও অবস্থা বুঝে তাদের আনুগত্যের পরিবর্তন ঘটায়, যা গণতন্ত্র চর্চার ক্ষেত্রে বিরাট অন্তরায়।

৪. **রাজনৈতিক সহিংসতা :** বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে উপদলীয় কোন্দলের কারণে রাজনৈতিক সহিংসতা স্বাভাবিক ঘটনায় পরিণত হয়েছে। সে কারণে রাজনৈতিক মতপার্থক্য মীমাংসার উপায় হিসেবে সহিংসতাকে ব্যবহার করা হয়। ফলে নির্বাচনকে কেন্দ্র করে সন্ত্রাস বাংলাদেশের স্বাভাবিক ঘটনা।

৫. **বিরোধিতার জন্য বিরোধিতা :** সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিরোধী দল একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। কিন্তু বাংলাদেশে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ এখন পর্যন্ত রাজনৈতিক বিরোধিতা সহ্য করার মতো ধৈর্য ও পরিপক্বতা অর্জন করতে পারেনি। জাতীয় স্বার্থসংশ্লিষ্ট ইস্যুতে বিরোধী দলসমূহের বিরোধিতার জন্য বিরোধিতা গণতন্ত্র চর্চার অন্যতম অন্তরায়।

**আদর্শিক বা সাংবিধানিক সমস্যা :** প্রকৃত অর্থে বাংলাদেশে কোনো রাজনৈতিক দলই এখন পর্যন্ত প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে উঠেনি। কারণ বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলগুলোর সুনির্দিষ্ট কোনো আর্থ-সামাজিক কর্মসূচি নেই, লিখিত কর্মসূচি যতটুকু আছে তারও প্রয়োগ নেই। রাজনৈতিক দলের কাছে কোনো তথ্য-ডাটা নেই, স্বয়ংসম্পূর্ণ বিভাগীয় কর্মকাণ্ড নেই, ফাইলপত্র বা গবেষণা নেই। এক্ষেত্রে অন্যান্য সমস্যাগুলো হলো :

১. **সাংবিধানিক বাধা :** বাংলাদেশ সংবিধানের ১১ নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে 'প্রজাতন্ত্র হবে একটি গণতন্ত্র'। এ সত্ত্বেও সংবিধানের মধ্যেই রয়েছে গণতন্ত্র বিকাশের পথে বিরাট বাধা। রাষ্ট্রের তিনটি বিভাগ তথা নির্বাহী বিভাগ, বিচার বিভাগ এবং আইন বিভাগ, যাদের মধ্যে ক্ষমতার ভারসাম্য থাকতে হয়।

২. **সাংবিধানিক অসামঞ্জস্য :** বাংলাদেশের সকল ক্ষমতা প্রকৃত অর্থে এক ব্যক্তির হাতে কেন্দ্রীভূত। ১৯৭৫-৯০ পর্যন্ত এই অপরিসীম ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন রাষ্ট্রপতি এবং ১৯৯০ সালের পর তা এসে জমা হয়েছে প্রধানমন্ত্রীর ওপর। সংবিধান মোতাবেক রাষ্ট্রপতি কাজ করবেন প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শে এবং এ নিয়ে আদালতে প্রশ্ন তোলা যাবে না। অন্যদিকে প্রধানমন্ত্রী একাধারে সংসদ নেতা এবং দলের প্রধান। সংবিধান মোতাবেক কোনো সংসদ সদস্য তার ইচ্ছা অনুযায়ী দলের বিরুদ্ধে ভোট দিতে পারবে না, দিলে তার সদস্যপদ খারিজ হয়ে যাবে। এ সবই প্রমাণ করে যে, বাংলাদেশের সংবিধানের মর্মবস্তুই ক্ষেত্রবিশেষে গণতন্ত্রের সাথে সামঞ্জস্যহীন।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



**গণতন্ত্র বিকাশে করণীয় :** এ অবস্থায় বাংলাদেশে গণতন্ত্রের বিকাশের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহকে গুরুত্ব দিতে হবে :

১. **নিয়মিত অবাধ, নিরপেক্ষ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন :** গণতান্ত্রিক সমাজের প্রধান এবং প্রথম শর্ত হলো নিরপেক্ষ নির্বাচন। বাংলাদেশে নির্বাচন কমিশন সাংবিধানিকভাবে ক্ষমতাসীন হলেও নির্বাচন কমিশন সচিবালয় প্রধানমন্ত্রীর অফিসের অধীন। অতীতে রাজনৈতিক সরকার বিভিন্ন সময় নির্বাচনের ফলাফল নিজেদের অনুকূলে আনার জন্য কমিশনকে প্রভাবিত করেছে। নির্বাচনকে নিয়মিত, অবাধ, নিরপেক্ষ ও শান্তিপূর্ণ করার জন্য নির্বাচন কমিশনকে সম্পূর্ণ স্বাধীন ও প্রভাবমুক্ত করতে হবে।

২. **বিচার বিভাগের স্বাধীনতা :** ১/১১-এর পরে সামরিক বাহিনীর ছত্রছায়ায় আশ্রিত ২০০৭ সালের তত্ত্বাবধায়ক সরকার এসে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা প্রদান করলেও এখনও বিচার বিভাগ সম্পূর্ণ স্বাধীন নয়। কেননা প্রধান বিচারপতি নিয়োগ দেন রাষ্ট্রপতি।

৩. **গণমাধ্যমগুলোর মুক্তপ্রবাহ অধিকার :** গণতন্ত্রের অন্যতম প্রধান অনুষঙ্গ 'অবাধ ও মুক্তচিন্তা প্রবাহ', যা বাংলাদেশে এখনো প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পায়নি। অবাধ তথ্যপ্রবাহের ব্যাপারে বাংলাদেশে দুই সরকারের ভূমিকা প্রায় একই রকম। প্রতিশ্রুতি দিয়েও আওয়ামী লীগ সরকার যেমন বেতার-টেলিভিশনের স্বায়ত্তশাসন দেয়নি, তেমনি জোট সরকার কমিশনের রিপোর্ট পাওয়া সত্ত্বেও কোনো কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করেনি। সাবেক সরকারের মতো বর্তমান সরকারও সংবাদপত্রের সমালোচনার ব্যাপারে যথেষ্ট অসহিষ্ণু। সংবাদপত্রের ক্ষেত্রে অবশ্য কিছুটা স্বাধীনতা থাকলেও টেলিভিশনকে একতরফাভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে, যা সম্পূর্ণ অযাচিত ও অনৈতিক।

৪. **সংসদ সদস্যদের স্বাধীনভাবে মত প্রকাশের সুযোগ :** বাংলাদেশ সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদ মোতাবেক কোনো সাংসদ তার সংসদীয় দলের সিদ্ধান্তের বাইরে ভোট প্রদান করলে তার সদস্যপদ বাতিল হয়ে যায়। এ বিধানের পেছনে যে যুক্তি দেওয়া হয় তা হলো, টাকার লোভ দেখিয়ে সদস্যদের কিনে নিয়ে সরকারের পতন ঘটাতে পারে। অথচ আমাদের সংবিধানে আবার সরকারের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব উত্থাপনের সুযোগও রয়েছে। অর্থাৎ একদিকে অনাস্থা প্রস্তাব উত্থাপনের সুযোগ এবং অন্যদিকে এ সম্পর্কে সংসদ সদস্যদের স্বাধীনভাবে মত প্রকাশের সুযোগ না দেয়া এক ধরনের পরস্পরবিরোধিতা। তাই সরকারের পতন হবে এ ভয়ে ৭০ নং অনুচ্ছেদ অব্যাহত রাখলে সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। প্রকৃত অর্থে ৭০ নং অনুচ্ছেদের মাধ্যমে বাংলাদেশের সংসদদের শৃঙ্খলিত করা হয়েছে।

৫. **মহিলা সংসদ সদস্য নির্বাচনে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা :** বাংলাদেশ জাতীয় সংসদে নারীদের জন্য ৫০টি আসন সংরক্ষিত আছে। সংবিধানের ৬৫ অনুচ্ছেদের তিন দফার পরিবর্তে নতুন একটি দফা সংযোজন করা হয়েছে। এতে বলা হয়েছে, এই আইন প্রবর্তনকালে বিদ্যমান সংসদের অব্যবহিত পরবর্তী সংসদের প্রথম বৈঠকের তারিখ থেকে শুরু করে ১০ বছর অতিবাহিত হওয়ার অব্যবহিত পরবর্তীকালে সংসদ ভেঙ্গে না যাওয়া পর্যন্ত মহিলাদের জন্য ৫০টি আসন সংরক্ষিত থাকবে। সংসদে রাজনৈতিক দলের নির্বাচিত সদস্যদের দ্বারা আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব পদ্ধতিতে এসব আসনে নির্বাচন হবে। এ সংশোধনের পরও সরাসরি নির্বাচনে যে কোনো আসনে নারীরা অংশ নিতে পারবেন।



সংবিধানে নতুন অনুচ্ছেদ (২৩) সংযোজন করে বলা হয়েছে, বর্তমান সংসদ থেকেই এ আইন কার্যকর হবে এবং অবশিষ্ট মেয়াদের জন্য পূর্বে উল্লিখিত পদ্ধতিতে ৫০টি নারী আসনে নির্বাচিত হবে।

সে মোতাবেক দশম জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত নারী আসনের ৫০টির মধ্যে ৪২টি আসনে আওয়ামী লীগ, জাতীয় পার্টি ৬টি, ওয়ার্কার্স পার্টি ১টি ও জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ) ১টি আসনে নির্বাচিত হন।

৬. **দুর্নীতি ও সন্ত্রাসের মূলোৎপাটন :** সর্বোপরি প্রশাসনের দুর্নীতি দূর করা, শিক্ষাঙ্গনকে সন্ত্রাস মুক্ত করা এবং সাম্প্রদায়িকতা পরিহার করতে হবে। মনে রাখতে হবে যে, গণতন্ত্র চাওয়া-পাওয়ার বিষয় নয়। এটা কেউ কাউকে দিতে পারে না। গণতন্ত্র হলো অনুশীলনের বিষয় এবং অনুশীলনের মাধ্যমে তা বিকশিত হয়। আমাদের যা সমস্যা তা হলো অনুশীলনের মানসিকতার অভাব। যে সরকার ক্ষমতায় থাকে তারা নিজেদের জোরেশোরে 'বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকার' বলে প্রমাণ করতে চায়, অতীতের কোনো সরকারই গণতান্ত্রিক ছিল না। এই মানসিকতারও পরিবর্তন করতে হবে। অর্থাৎ রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক মানসিকতা এবং সাংবিধানিক কিছু পরিবর্তন সাধন করে তাকে লালন করতে পারলে বিকশিত হবে বলে আশা করা যায়।

**উপসংহার :** সার্বিক বিবেচনায় বলা যায় যে, বাংলাদেশে গণতন্ত্র চর্চার ক্ষেত্রে যেমন অসংখ্য সমস্যা রয়েছে, তেমনি রয়েছে বিপুল সম্ভাবনা। তাই বাংলাদেশে গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিক রূপদানের জন্য ক্ষমতাসীন দল ও ক্ষমতার বাইরের দলগুলোকে রাজনৈতিক সহিষ্ণুতা, আলোচনা, সমঝোতা, দলের ভেতরে ও বাইরে গণতন্ত্র চর্চা অব্যাহতভাবে অনুশীলন করতে হবে। তাহলেই কেবল কায়েম হবে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা, পূর্ণতা লাভ করবে সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা। দেশে বিরাজ করবে কাঙ্ক্ষিত স্থিতিশীলতা ও শান্তি। জনগণ ভোগ করবে স্বাধীনতা ও মুক্ত গণতন্ত্রের সুফল।

## রচনা ০৫ আইনের শাসন ও বাংলাদেশ

*[২৫তম; ২২তম বিসিএস]*

**ভূমিকা :** আধুনিক বিশ্ব মানে গণতান্ত্রিক বিশ্ব। বাস্তবে যাই হোক, পৃথিবীর প্রায় প্রতিটি দেশে সরকার কোনো না কোনো যুক্তিতে নিজেদের গণতান্ত্রিক বলে দাবি করে। তাই পৃথিবীতে সম্ভবত এমন কোনো রাষ্ট্র পাওয়া যাবে না যেখানে কোনো আইন বা সংবিধান নেই। তবে দেশ ও সরকার পদ্ধতি ভেদে আইন কিংবা সংবিধানের চরিত্র ভিন্ন হতে পারে। এমনকি কোনো দেশে রাষ্ট্র পরিচালনা এবং নাগরিকদের ব্যক্তিগত জীবনে আইনের প্রয়োগ কতটা হলো সেটিও একটি ভিন্ন প্রশ্ন। অতএব একটি গণতান্ত্রিক দেশ হিসেবে বাংলাদেশেও আইন, সংবিধান, আইন প্রয়োগকারী সংস্থা ও প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি সবই আছে। কিন্তু প্রশ্ন হলো, আমাদের দেশে আইনের প্রয়োগ ও বাস্তবায়নের মাত্রা ও ধরন কী?

**আইনের শাসনের নীতি ও অভিব্যক্তি :** সাধারণ অর্থে আইনের শাসন হলো আইনের সর্বোচ্চ প্রাধান্য বা কর্তৃত্ব। রাষ্ট্র পরিচালনার প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রতিটি বিষয় নির্ধারণের মাপকাঠি হবে আইন এবং রাষ্ট্রের প্রতিটি নাগরিক আইনের চোখে সমান বলে বিবেচিত হবে। সুতরাং আইনের সর্বোচ্চ কর্তৃত্ব (Supremacy of law) এবং আইনের চোখে সমতা (Equality before law) এ দুটি বিষয়কে মূল ধরলেও আইনের শাসনের আরো কিছু প্রাসঙ্গিক দিক বা বিষয় চলে আসে। যেমন—

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



১. **শাসনকার্যে স্বেচ্ছাচারিতার স্থান নেই :** আইনের শাসনের মৌলিক প্রণোদনা হলো শাসনকার্যে স্বেচ্ছাচারিতার কোনো স্থান থাকবে না। রাষ্ট্র কেবল সংবিধিবদ্ধ আইন বা প্রচলিত রীতিনীতি ও বিশ্বাসের ফলে গড়ে উঠা আইনের মাধ্যমে পরিচালিত হবে। ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা দল নয়, আইনই হবে রাষ্ট্র পরিচালনার মূল মাপকাঠি।

২. **আইনের চোখে সকলেই সমান :** আইনের শাসনের আরেকটি মূলনীতি হলো, জাতি-ধর্ম-বর্ণ-গোত্র-দল বা উপদল নয়, বরং রাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবে রাষ্ট্রের প্রতিটি ব্যক্তিই আইনের চোখে সমান বলে বিবেচিত হবে। রাষ্ট্রের কোনো নাগরিক যেমন আপন প্রভাবে আইনের উর্ধ্বে উঠতে পারে না, তেমনি কোনো নাগরিকই আইনের চোখে নিম্নতর বলে বিবেচিত হতে পারে না।

৩. **আইনের অশ্রয় গ্রহণের অধিকার ও সুযোগ :** আইনের শাসনের আরেকটি দিক হলো, রাষ্ট্রের প্রতিটি নাগরিকের যেমন তার কৃতকর্মের জন্য আইনের মুখোমুখি হতে হবে, তেমনি তার অধিকার ও দাবির ব্যাপারে আইনের আশ্রয় গ্রহণের অধিকার ও সুযোগ থাকতে হবে।

৪. **আইন যৌক্তিক হবে :** আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার একটি পূর্বশর্ত হলো আইনকে অবশ্যই যৌক্তিক হতে হবে। কোনো আইন যদি নীতিগত বা পদ্ধতিগতভাবে অযৌক্তিক হয়, তাহলে সে আইনে পরিচালিত শাসন আইনের শাসনের মূলনীতির অনুকূল হতে পারে না।

৫. **ক্ষমতার ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা :** আইন প্রণয়ন, বাস্তবায়ন এবং আইনের যথার্থ প্রয়োগ ও মূল্যায়নসহ বিভিন্ন পর্যায়ে নিয়োজিত সরকারের আইন, শাসন ও বিচার বিভাগের মধ্যে ক্ষমতার ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা আবশ্যক। বিশেষত বিচার বিভাগকে আইন ও শাসন বিভাগের নিয়ন্ত্রণমুক্ত রাখতে হবে।

৬. **জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার অনুকূল আইন প্রণয়ন :** আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য আইনপ্রণেতাদের জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার অনুকূল হতে হবে।

সুতরাং আইনের শাসন একটি সার্বিক প্রক্রিয়া এবং এটি একটি প্রায়োগিক বিষয়।

**আইনের শাসন ও বাংলাদেশের সংবিধান :** আইনের শাসন বাংলাদেশের সংবিধানের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য। সংবিধানের ২৭ ধারা অনুযায়ী বাংলাদেশের সকল নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান বলে বিবেচিত হবে এবং আইনের সমান অশ্রয় লাভের অধিকারী হবে। সংবিধানের ৩১ ধারা অনুযায়ী আইনের অশ্রয় লাভ এবং আইনানুযায়ী আচরণ লাভের অধিকার দেশের প্রতিটি নাগরিকের অবিচ্ছেদ্য অধিকার। প্রচলিত আইনের বাইরে কোনো ব্যক্তির বিরুদ্ধে এমন কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে না যাতে তার জীবন, স্বাধীনতা, দেহ, সুনাম বা সম্পত্তির হানি হতে পারে। সুতরাং বাংলাদেশের সংবিধান অনুযায়ী—

- সরকার প্রচলিত আইনের বাইরে এমন কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারেন না, যা ব্যক্তির জান, মাল, সম্মান ও সুনামের জন্য হানিকর।
- কোনো ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হলে তা অবশ্যই প্রচলিত আইনের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হতে হবে এবং এক্ষেত্রে অবশ্যই যথাযথ নিয়মনীতি ও পদ্ধতির অনুসরণ করে তাকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দিতে হবে। কেননা সংবিধান অনুযায়ী ব্যক্তির বিচার হওয়ার যেমন বিধান আছে, তেমনি তার আইনের অশ্রয় লাভেরও অধিকার আছে।
- পার্লামেন্টে কোনো আইন পাসের ক্ষেত্রে অবশ্যই সংবিধানের ২৭ ও ৩১ ধারার মূলনীতি ও চেতনার প্রতি দৃষ্টি রাখতে হবে।
- আইন অনুযায়ী কারো বিচার চাওয়া বা পাওয়ার ক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয় হবে একটাই যে, সে বাংলাদেশের নাগরিক।



**বাংলাদেশে আইনের শাসনের বিভিন্ন দিক :** বাংলাদেশ উন্নয়নশীল বিশ্বের একটি অন্যতম গণতান্ত্রিক দেশ। সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা, আদর্শ সংবিধান, নির্বাচিত সরকার ও আইন পরিষদ এবং দীর্ঘদিনের প্রতিষ্ঠিত বিচারব্যবস্থা ইত্যাদির বিচারে এ দেশে আইনের শাসনের একটি অনুকূল পরিবেশ থাকাটাই স্বাভাবিক। কিন্তু প্রাতিষ্ঠানিক এতোসব আয়োজন সত্ত্বেও বাস্তবে আমাদের সমাজ ও রাষ্ট্রে আইনের শাসনের প্রতিফলন একেবারেই সীমিত। কেননা আমাদের আইনি কাঠামো, প্রয়োগকারী সংস্থা ও প্রতিষ্ঠান এবং রাজনৈতিক সদিচ্ছা—প্রতিটি ক্ষেত্রেই আইনের শাসনের প্রতিকূল উপসর্গ বিদ্যমান। নিচে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো :

১. **ব্যক্তির প্রাধান্য :** আমাদের দেশে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে, আইনের ওপর ব্যক্তির প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত। রাজনৈতিক নেতা, প্রভাবশালী আমলা বা রাষ্ট্রের নেতৃস্থানীয়দের জন্য আইনের পরিধি অনেক সময় সীমিত হয়ে পড়ে। ব্যক্তির অবস্থানভেদে আইন প্রয়োগে ভিন্নতা এখানে নিত্যদিনের ঘটনা। একই অপরাধে ক্ষমতায় থাকা অবস্থায় কোনো ব্যক্তির ক্ষেত্রে আইনের যে বিধান, ক্ষমতা হারালে তা অন্যরকম। অনুরূপ বিরোধী দলে থাকা অবস্থায় কেউ দুর্নীতির দায়ে অভিযুক্ত হলেও ক্ষমতায় গেলে সে অভিযোগ আইনের চোখে ধরা পড়ে না। অর্থাৎ আইনের সমপ্রয়োগ নীতি আমাদের সমাজে অনুপস্থিত।

২. **আইন প্রণেতা কর্তৃক আইন ভঙ্গ :** এশিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকার দেশগুলোকে Gunnar Myrdal এক কথায় Soft Society বলে চিহ্নিত করেছেন। তার মতে, এসব দেশে ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব যাদের হাতে থাকে তারা এ কথা বেমালুম ভুলে যান যে, তাদের এ ক্ষমতা ও কর্তৃত্বও আইন এবং আইনি প্রতিষ্ঠানের অধীন। তাই এ সকল দেশে আইনের শাসন টিকে থাকা খুবই কঠিন। বাংলাদেশও এর ব্যতিক্রম নয়। এখানে আইনপ্রণেতারাই প্রধান আইন ভঙ্গকারী। এখানে আইন থাকে প্রভাবশালীদের পকেটে। প্রয়োজনমতো নোট লিখে আইন প্রয়োগকারী সংস্থা বা বিচারকদের নিকট পাঠিয়ে দিলে এ নির্দেশই আইন হিসেবে গণ্য হয়।

৩. **প্রশাসনিক দুর্বলতা :** তৃতীয় বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও আইনের শাসনের পথে একটা গুরুত্বপূর্ণ অন্তরায় হলো প্রশাসনিক দুর্বলতা। প্রশাসন এখানে রাজনীতিবিদদের হাতে জিম্মি। আইন প্রয়োগকারী সংস্থা নির্ভয়ে ও নির্দ্বিধায় তাদের দায়িত্ব পালন করতে পারে না। কোনো আইন কোথায়, কখন, কীভাবে এবং কতটুকু প্রয়োগ করা হবে তা আইনের নিজস্ব বিধিতে নয় বরং উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ নামক মন্ত্রী, নেতা বা তাদের অনুগত আমলার ইচ্ছানুযায়ী নির্ধারিত হয়। এটা আইনের শাসন ও ন্যায়বিচারের মৌলিক চেতনার বিরোধী।

৪. **পোষক-পোষিতের প্রভাব :** আইন ও বিচার ক্ষেত্রে পোষক-পোষিতের (Patron-Client relationship) সম্পর্কের উপস্থিতির ফলে আইনের সুবচন আর সুশাসন প্রায়ই নির্বাসিত হতে দেখা যায়। রাজনৈতিক নেতা-নেত্রী, আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্য ও আমলাদের আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব বা দলীয় নেতা-কর্মী-সমর্থককে আনুকূল্য প্রদানের জন্য এখানে আইনকে প্রায়ই পাশ কাটিয়ে যাওয়া যায়। আমাদের নেতা-নেত্রীরা দলীয় রাজনীতির নোংরা মানসিকতার বশে দলীয় নেতা-কর্মীদের যাবতীয় অপকর্মকেও বৈধ বলে চালিয়ে দিতে কুণ্ঠাবোধ করেন না। আইনের মাপকাঠিতে ব্যক্তি কতটা অপরাধী তা কোনো বিষয় নয়, বরং ক্ষমতাসীন দল বা প্রভাবশালী মহলের সাথে তার সম্পর্কের মাত্রাটাই বিচারের মানদণ্ডে পরিণত হয়।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



৫. **অপ-আইন প্রণয়ন ও প্রয়োগ :** বাংলাদেশে রাজনৈতিক স্বার্থে সরকারগুলো একের পর এক অপ আইন প্রণয়ন ও প্রয়োগ করে যাচ্ছে। যখন কোনো দল বিরোধী দলে থাকে তখন তার দৃষ্টিতে যেটি গণবিরোধী কালো আইন, ক্ষমতায় আরোহণ করার পর তো আর কালো আইন থাকে না। ক্ষমতায় টিকে থাকার স্বার্থে সেটি রাতারাতি সাদা হয়ে যায়। বিশেষ ক্ষমতা আইন, ৫৪ বিধি, জননিরাপত্তা আইন, সন্ত্রাস দমন আইন, দ্রুত বিচার আইন প্রভৃতি সম্পর্কে রাজনৈতিক দলগুলো একে অপরের বিরুদ্ধে সমালোচনার তীর ছুড়লেও বাস্তবে সকলেই এ সকল অপ-আইনের পক্ষে।

৬. **আইনের সমতানীতি উপেক্ষিত :** বাংলাদেশে আইনের চোখে সমতার নীতি কেবল ওপর মহলের বেলায়ই প্রযোজ্য। সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে আইনের শাসন বা আইনের চোখে সমতার নীতি শুধু শাসনের সংবিধিবদ্ধ নীতি হিসেবেই সত্য। কেননা এখানে ন্যায়বিচার বেচাকেনা হয়। নিম্ন আদালতে ঘুষ, দুর্নীতি আর শাসনবিভাগীয় হস্তক্ষেপের যে দুষ্টচক্র বিদ্যমান তাতে গরিব, অশিক্ষিত, খেটে খাওয়া মানুষ কেবল ভোগান্তিরই শিকার হয়। আর উচ্চতর আদালতে বড় বড় আইনজীবী দিয়ে মামলা পরিচালনা করতে না পারলে মামলায় জেতা যায় না। অথচ এদের দর আকাশচুম্বী, যা এ দেশের সাধারণ জনগণ চিন্তাও করতে পারে না।

৭. **আইনের শাসন বাস্তবায়নে ত্রুটি :** বাংলাদেশে কিছু সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও যে সংবিধান ও আইনি ব্যবস্থা রয়েছে তার বাস্তবায়ন হলেও অবস্থা বর্তমানের তুলনায় অনেক ভালো হতো। কিন্তু এ দেশে পুলিশ নামক আইনপ্রয়োগকারী সংস্থাটি যে দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত তাতে ভালো আইনও তাদের সংস্পর্শে কলুষিত হতে বাধ্য। এখানে কাউকে শাস্তি প্রদান বা কারো বিরুদ্ধে প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য সন্ত্রাসী বা গুণ্ডাবাহিনী ভাড়া করার চেয়ে পুলিশ বা নিম্ন আদালতের ম্যাজিস্ট্রেটদের ভাড়া করা অনেক সহজ। তাছাড়া নিম্ন আদালতের বিচারকরা এখানে শাসনবিভাগীয় মন্ত্রী, রাজনৈতিক নেতা বা দলীয় প্রভাবশালী ব্যক্তির ক্রীড়নক। তাই আদালতে গিয়ে ন্যায়বিচার পাওয়ার আশা এ দেশের মানুষ প্রায় ছেড়েই দিচ্ছে।

৮. **আইন প্রণেতাদের সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি :** বাংলাদেশে আইন প্রণেতাদের সর্বজনীনতা না থাকায় আইন প্রণয়নেও তারা সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গির ঊর্ধ্বে উঠতে ব্যর্থ হন। এখানে দেশের জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার বিরুদ্ধে কেবল দলীয় সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে নিজ নিজ দলীয় স্বার্থে আইন প্রণয়ন করতে দেখা যায়। এ প্রবণতার মারাত্মক বহিঃপ্রকাশ ঘটে গত আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে। এ সময় একের পর এক সংসদে গণঅভীপ্সার বিরুদ্ধে আইন প্রণয়ন করতে দেখা গেছে। ইতোপূর্বেও বিভিন্ন সামরিক সরকারের আমলে ইনডেমনিটিসহ নানাবিধ অপ-আইন এভাবে পাস করতে দেখা গেছে।

৯. **বিচারকদের স্বচ্ছতার অভাব :** অধ্যাপক লাস্কি বলেছেন, "কিভাবে রাষ্ট্র তার বিচারকার্য নিষ্পন্ন করছে তা জানতে পারলেই রাষ্ট্রের নৈতিক চরিত্রের স্বরূপ অনেকটা সঠিকভাবে নির্ধারণ করা যায়।" আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার থেকে বিচারবিভাগের স্বাধীনতার পাশাপাশি এর কার্যের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা অপরিহার্য। বিচারকদের বিচারকার্য নিষ্পত্তি করার সময় শ্রেণী স্বার্থের ঊর্ধ্বে অবস্থান করতে হবে সকল প্রকার ভয়-ভীতি, লোভ, মোহ মুক্ত থাকতে হবে। মনে রাখতে হবে বিচারের ক্ষেত্রে এ পৃথিবীতে তারাই চূড়ান্ত বিচারক। কাজেই তাদের সামান্য ভুলে একজন নিরপরাধীও শাস্তি ভোগ করতে পারে এবং একজন অপরাধী আইনের চোখকে ফাঁকি দিয়ে মুক্ত হতে পারে।



**বাংলাদেশে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় করণীয় :** আইনের শাসন আমাদের দেশে একেবারে নেই এমনটা নয়। সাম্প্রতিক সময় সুশীল সমাজ ও গণমানুষের দাবির মুখে অপরাধীদের বিরুদ্ধে অনেক ক্ষেত্রে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে দেখা গেছে। তথাপি আইনের শাসনকে যথার্থ রূপ দিতে হলে আমাদেরকে কতিপয় বিষয়ের প্রতি জরুরি ভিত্তিতে দৃষ্টি দিতে হবে :

- কার্যকর অর্থে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে হবে। সেজন্য শীঘ্রই বিচার বিভাগকে শাসন বিভাগ থেকে আলাদা করতে হবে।
- বিচার বিভাগীয় স্বচ্ছতা ও প্রশাসনিক জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য অচিরেই ন্যায়পাল নিয়োগ করতে হবে।
- প্রচলিত পুলিশ ব্যবস্থার সংস্কার সাধন করতে হবে। অর্থাৎ পুলিশ বাহিনীর সদস্যদের দুর্নীতির বিষয়ে যেমন কঠোর হওয়া দরকার, তেমনি তাদের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির বিষয়েও নজর দিতে হবে।
- বাংলাদেশে প্রচলিত বিশেষ ক্ষমতা আইন, ৫৪ ধারাসহ সকল গণবিরোধী আইন বাতিলের পদক্ষেপ নিতে হবে।
- আইনকে তার নিজস্ব গতিতে চলতে দেয়ার রাজনৈতিক সদিচ্ছা থাকতে হবে। এ বিষয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর ঐকমত্য দরকার। অপরদিকে অপরাধীকে দলীয় সমর্থন দেয়ার নোংরা মানসিকতা পরিহার করতে না পারলে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। তাই বাংলাদেশে আইনের শাসন নিশ্চিত করতে হলে সরকারের পাশাপাশি বিরোধীদলকে সৎ মনোভাব নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে।

**উপসংহার :** উপরিউক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলতে পারি যে, দেশের জনগণকে আইনি শিক্ষা, নৈতিক শিক্ষা এবং অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন করতে না পারলে কোনো আইনের যথার্থ প্রয়োগ সম্ভব নয়। তাই বাংলাদেশে আইনের শাসন নিশ্চিত করতে হলে সরকারের পাশাপাশি বিরোধী দলকে সৎ মনোভাব নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে।

## রচনা ০৬ বাংলাদেশের জাতীয় সংহতির সমস্যা ও সম্ভাবনা

*[১৮তম বিসিএস]*

**ভূমিকা :** বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার একটি উন্নয়নশীল দেশ। এখানে জাতীয় সংহতি নানা সমস্যার আবর্তে প্রতিনিয়ত বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। বিশেষত বাংলাদেশে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংহতিই বেশি সমস্যাগ্রস্ত। রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা, কর্তৃত্ববাদী রাজনৈতিক সংস্কৃতি, আমলাতন্ত্রের প্রাধান্য ও নেতৃত্বের অযোগ্যতা এ দেশের রাজনৈতিক ঐক্যকে করেছে সুদূর পরাহত। তাছাড়া এলিট শ্রেণীর প্রাধান্য ও ব্যাপক অর্থনৈতিক বৈষম্য এ দেশের জনগণের ঐক্যের অনুভূতিকে নানাভাবে বিপর্যস্ত করছে। তবে শতকরা ৯৮ জনেরও বেশি বাঙালি জনগোষ্ঠী এবং দীর্ঘদিনের ধর্মীয় সহাবস্থানের ঐতিহ্য এ দেশের জাতীয় সংহতির অন্যতম অবলম্বন হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।

**জাতীয় সংহতির ধারণা :** জাতীয় সংহতির ধারণাটি অত্যন্ত জটিল ও ব্যাপক। এর কোনো সামগ্রিক একক প্রতিচিত্র (Blueprint) নেই। তবু সাধারণভাবে এটি সমাজের বিচ্ছিন্ন উপাদান বা শক্তিগুলোকে একটি সামগ্রিক এককে রূপায়ণকে বুঝায়। অন্য কথায়, জাতীয় সংহতি বলতে ছোট ছোট বিভিন্ন সমাজের একটি সংগঠিত জাতি হিসেবে পরিণত হওয়াকে বুঝায়। Ernest B Hass জাতীয় সংহতি

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



বলতে বুঝিয়েছেন, 'Process whereby political actors in several distinct national settings are persuaded to shift their loyalties, expectations and political activities toward a new centre, whose institutions poses or demand jurisdictions over the preexisting national states.'

জোহান গালতুং-এর মতে, 'সংহতি হচ্ছে সে সকল পদ্ধতি যেখানে দুই বা ততোধিক বিষয়ের সমন্বয়ে একটি নতুন বিষয় গঠিত হয়। যখনই বিষয়গুলো একীভূত হবে তখন তাদের মধ্যে সংহতি স্থাপিত হবে।' অধ্যাপক মাইরন ওয়েনার বলেন, 'বিখণ্ড চিন্তাধারাকে উচ্ছেদ করে একটি জাতীয়ভিত্তিক চিন্তাধারা প্রতিষ্ঠা করাই হলো জাতীয় সংহতি।' তার মতে, জাতীয় সংহতির জন্য পাঁচটি বিষয় অত্যন্ত জরুরি : ক. ভৌগোলিক জাতীয়তাবোধ সৃষ্টি; খ. একটি জাতীয় কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠা; গ. ন্যূনতম জাতীয় মূল্যবোধ সৃষ্টি; ঘ. এলিট ও জনগণের মধ্যকার দূরত্ব ঘোচানো এবং ঙ. সংহতি প্রতিষ্ঠার প্রতিষ্ঠান ও আচরণ গঠন।

সুতরাং জাতীয় সংহতি বলতে আমরা নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর সমন্বয়কে বুঝাতে পারি :

– বিভিন্ন ও বিচ্ছিন্ন সাংস্কৃতিক বিশ্বাসকে একীভূতকরণ;
– একটি জাতীয় চেতনার সৃষ্টি;
– বিভিন্ন রাজনৈতিক একক ও বিশ্বাসগুলোকে একটি ভৌগোলিক কাঠামোর আওতায় এনে জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠা;
– নাগরিকদের একটি সাধারণ রাজনৈতিক পদ্ধতির আওতায় সংঘবদ্ধ করা এবং
– শাসক ও শাসিতের মধ্যে সংহতি বিধান।

অতএব, জাতীয় সংহতির বর্ণিত ধারণার প্রেক্ষিতে বলা যায়, জাতীয় সংহতি একটি বহুমুখী প্রক্রিয়া এবং এর কতগুলো বিশিষ্ট দিক রয়েছে। যেমন—১. জাতীয় একাত্মতা প্রতিষ্ঠা; ২. রাজনৈতিক সংহতি, গ. অর্থনৈতিক সংহতি; ঘ. সাংস্কৃতিক সংহতি এবং ঙ. ধর্মীয় সংহতি।

**বাংলাদেশের জাতীয় সংহতির সমস্যাবলী :** দক্ষিণ এশিয়ার অনেক দেশের তুলনায় বাংলাদেশে জাতীয় সংহতির সমস্যা তত প্রকট না হলেও এ দেশে জাতীয় সংহতি নানাভাবে বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। যেমন–

ক. **একাত্মতার সংকট :** জাতীয় একাত্মতার সংকট বাংলাদেশের জাতীয় সংহতির ক্ষেত্রে একটি অন্যতম অন্তরায়। এ পরিচয় বা একাত্মতার আবার কতগুলো দিক রয়েছে :

১. **জাতীয় পরিচয়ের সমস্যা :** বাংলাদেশের প্রায় ৯৮ শতাংশ লোক বাঙালি হলেও পার্বত্য চট্টগ্রামসহ দেশের বিভিন্ন এলাকায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা পাহাড়ি ও উপজাতীয় জনগোষ্ঠী কখনোই বাঙালি জাতির সাথে মিশে যেতে চায় না। তারা তাদের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার ও স্বাধীন পরিচয় নিয়ে বেঁচে থাকার অধিকার আদায়কল্পে যে সংগ্রামের সূচনা করে তা বিশেষত পাহাড়ি অঞ্চলে বিচ্ছিন্নতাবাদের জন্ম দিয়েছে। এমন কি গত প্রায় তিন দশক যাবৎ তারা সশস্ত্র সংগ্রামে লিপ্ত। ১৯৯৭ সালে সম্পাদিত শান্তি চুক্তি এক্ষেত্রে একটি অন্যতম মাইলফলক হলেও তার সফলতার মাত্রা বা হার খুবই নগণ্য। পাহাড়িরা এ দেশে বাস করলেও তারা কখনোই মূল ভূখণ্ডের সাথে একীভূত হওয়াকে মনেপ্রাণে মেনে নিতে চায় না। ফলে দেখা যায়, পাহাড়ি-বাঙালির এ বিভক্তিবোধ জাতির জীবনে বিভিন্ন ক্ষেত্রে নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। এমনকি এটি বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলগুলোর নীতিগত বিভেদেরও একটি বিশেষ উপলক্ষ।



২. **ধর্মীয় পরিচয়ের সমস্যা :** স্বাভাবিকভাবে আমরা এ দেশের সকল মানুষকে বাঙালি কিংবা বাংলাদেশী বলে আখ্যা দিলেও এ দেশের জনগণের ধর্মীয় বিশ্বাস ও স্বতন্ত্র ধর্মীয় পরিচয় তাদের জীবনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করে আছে। বিশেষ করে ৯০.৪ শতাংশ মুসলমানের এ দেশে ৮.৫ শতাংশ হিন্দু এবং ১.১ শতাংশ অন্যান্য ধর্মের অনুসারী রয়েছে। তবে এ দেশে বিভিন্ন ধর্মীয় জনগোষ্ঠীর মধ্যকার সম্পর্ক জাতীয় ঐক্যকে বিনষ্ট করে বিচ্ছিন্নতাবাদের দিকে মোড় নেয়ার মতো কোনো অবস্থা কখনো সৃষ্টি করেনি। কিন্তু সাম্প্রতিক কালে দেশে আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ায় হিন্দু-মুসলিম সম্পর্কের কিছুটা অবনতি হয়েছে সত্যি। হিন্দুদের সাধারণভাবে কোনো একটি বিশেষ দল বা গোষ্ঠীর সাথে মিলিয়ে ফেলার প্রবণতা বিরোধী অন্য দলের সাথে তাদের সম্পর্কের অবনতি ঘটায় স্বাভাবিকভাবেই। তাই দেখা যায়, জাতীয় ঐক্য ও সংহতির ক্ষেত্রে বিশেষত হিন্দু সম্প্রদায় একটা গুরুত্বপূর্ণ ফ্যাক্টর হয়ে দাঁড়ায়। অনেকে এ বিষয়টি আন্তর্জাতিক পর্যায়ে উঠিয়ে নিয়ে অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে চাপ প্রয়োগের কৌশলও অবলম্বন করে। ফলে সংখ্যালঘুর বিষয়টি জাতীয় রাজনীতিতে সাম্প্রতিককালে বেশ গুরুত্বপূর্ণ প্রভাবক হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে।

খ. **এলিট-জনতা ব্যবধান :** বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিকসহ জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই দেখা যায়, এ দেশের এলিট শ্রেণী ও সাধারণ জনতার মাঝে ব্যাপক ব্যবধান বিদ্যমান। ফলে সমাজে দুটি শ্রেণীর জন্ম হয়েছে। কেন্দ্রীয় শ্রেণী ও প্রান্তীয় শ্রেণী। সুতরাং এখানে জাতিগঠনের ক্ষেত্রে একটা সাধারণ ধরন হলো, এখানে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নে অংশগ্রহণের সমান সুযোগ নেই। ফলে সমাজে সহযোগিতার পরিবর্তে কর্তৃত্ব কিংবা বিদ্রোহের মাত্রা প্রবল হচ্ছে।

গ. **রাজনৈতিক সংহতির সমস্যা :** নব্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত একটি উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে বাংলাদেশের রাজনৈতিক ব্যবস্থা এখনো একটি শক্ত ভিতের ওপর দাঁড়াতে পারেনি। ফলে রাজনৈতিক সংস্কৃতি, প্রতিষ্ঠান, সংগঠন ও জনগণের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি সর্বক্ষেত্রেই রয়েছে ব্যাপক দুর্বলতা। যেমন—

১. **কর্তৃত্ববাদী :** বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতি মূলত কর্তৃত্ববাদী। এখানে শাসকশ্রেণীর মানসিকতায় রয়েছে পরনির্ভরশীলতার প্রভাব। দীর্ঘদিনের পরাধীনতা আমাদেরকে এ বিষয়ে নানা নেতিবাচক উপসর্গে অভ্যস্ত করে তুলেছে। পূর্বতন শাসকদের মতো স্বাধীন বাংলাদেশের শাসকদেরও খোলামেলা সমালোচনা অপছন্দনীয় এবং সবসময় জাতীয় ঐক্য বিনষ্ট হওয়ার ভয়ে তারা বিব্রত। এমতাবস্থায় শাসকশ্রেণী যেমন জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার আদায়ের দাবি ও সংগ্রামকে সহজভাবে নিতে পারে না, তেমনি জনগণও সরকারকে সম্পূর্ণরূপে সহযোগিতা ও গণতান্ত্রিক রীতিনীতির সাথে পরিচিত নয়। ফলে উভয় শ্রেণীর সমন্বয় ও সহযোগিতার ক্ষেত্র তেমন প্রসারিত হচ্ছে না।

২. **সামরিক-বেসামরিক সম্মিলিত পদচারণা :** দেশের রাজনীতিতে সামরিক ও বেসামরিক আমলাদের সম্মিলিত পদচারণা ও আধিপত্য রাজনীতিতে শক্তিশালী দল, উপদল ও গোষ্ঠীর বিকাশকে নানাভাবে বাধাগ্রস্ত করছে। ফলে রাজনীতির যে সুশীল চরিত্র (Civilian character) সেটা প্রস্ফুটিত হতে পারছে না। জনগণের রাজনীতিতে সক্রিয় অংশগ্রহণের সুযোগ হয়ে পড়েছে সীমিত। তাছাড়া সরকারের গণমুখী রাজনীতির বিকাশ বাধাগ্রস্ত হয়ে ক্রমশ আমলানির্ভর ও গণবিমুখ হয়ে পড়ছে। ফলে সরকার ও জনগণের মধ্যকার পারস্পরিক সহযোগিতা ও ঘনিষ্ঠতা দুর্বল হওয়ার পাশাপাশি জাতীয় ঐক্যের বিষয়টিও দুর্বল হয়ে পড়েছে।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



৩. **রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা :** রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা বাংলাদেশের রাজনীতির আরেকটি অন্যতম নেতিবাচক উপসর্গ। ক্ষমতার দ্বন্দ্ব, শাসকশ্রেণীর স্বেচ্ছাচারিতা, সন্ত্রাস, আদর্শগত মতবিরোধ প্রভৃতি এ দেশের রাজনীতিকে সবসময়ই অস্থিতিশীল করে রাখে। ফলে রাজনৈতিক ঐকমত্য প্রতিষ্ঠার কোনো প্রচেষ্টাই সফল হয় না। এজন্য অবশ্য নিম্ন রাজনৈতিক সংস্কৃতিই অধিকাংশ ক্ষেত্রে দায়ী।

৪. **গণতান্ত্রিক আদর্শ ও মূল্যবোধের অভাব :** গণতন্ত্রের মতো একটি সর্বজনীন মতবাদে বিশ্বাস ও এর ঐকান্তিক অনুসরণ জাতীয় ঐক্য ও সংহতিকে অনেক মজবুত করতে পারে। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, আমাদের দেশে গণতান্ত্রিক আদর্শ ও মূল্যবোধের প্রতি বিশ্বাসের যথেষ্ট অভাব রয়েছে। বিশেষ করে এ দেশের মানুষ দীর্ঘদিনের ঔপনিবেশিক এবং পাকিস্তানি শাসন ও শোষণের ফলে গণতান্ত্রিক চর্চার সুযোগ তেমন পায়নি।

এমনকি স্বাধীনতার পর প্রায় তিন যুগ অতিক্রান্ত হতে চললেও গণতন্ত্রের যাত্রা শুরু হয়েছে মাত্র এক যুগ আগে। তাই গণতন্ত্রের শক্ত ভিত এ দেশে এখনো সেভাবে স্থাপিত হয়নি। ফলে এ দেশের রাজনীতিতে সবসময়ই সংকটাপন্ন অবস্থায় দেখা যায়।

৫. **রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের দুর্বলতা :** বাংলাদেশের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলোর কোনোটিই মজবুত নয় এবং এগুলো জনগণের ব্যাপক আস্থা অর্জন করতেও সমর্থ হয়নি। জনগণ এ দেশের সংসদ, নির্বাচন ব্যবস্থা, দল ব্যবস্থা, বিচার ব্যবস্থাসহ সকল রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান ও ব্যবস্থার কার্যকারিতা ও বিশ্বাসযোগ্যতার ব্যাপারে সন্ধিহান। ফলে দেখা যায়, এদের কোনোটিই জাতীয় ঐক্য ও সংহতির প্রতীক হিসেবে জনগণকে ব্যাপকভাবে ঐক্যবদ্ধ করতে সমর্থ হয় না।

৬. **সম্মোহনী নেতৃত্বের অভাব :** স্বাধীনতা-পূর্ববর্তীকালে স্বাধীনতাযুদ্ধের নেতারা যেভাবে জনগণকে তাদের সম্মোহনী নেতৃত্বের দ্বারা ঐক্যবদ্ধ করতে পেরেছিলেন, স্বাধীনতা পরবর্তীকালে আর তেমন দেখা যায়নি। বিশেষ করে, স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় এ দেশের জনগণ যেভাবে একটি সমন্বিত নেতৃত্বের অধীনে ঐক্যবদ্ধ হয়ে যুদ্ধ করেছিল পরবর্তীকালে সে নেতৃত্ব যেমন পূর্বতন অবস্থান বজায় রাখতে পারেনি, তেমনি জনগণও তাদের ডাকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার যুক্তি খুঁজে পায়নি। ফলে এ দেশের রাজনীতিতে নেতৃত্বের সংকট লেগেই আছে। আর এ সংকট জাতীয় সংহতিকে করেছে আরো বেশি সংকটাপন্ন।

**ঘ. অর্থনৈতিক সংহতির সমস্যা :** বাংলাদেশে অর্থনৈতিক সংহতিতেও চরম সংকট বিদ্যমান। যেমন—

১. **অর্থনৈতিক অসাম্য ও আয়ের বৈষম্য :** বাংলাদেশে অর্থনৈতিক অসাম্য ও আয়ের বৈষম্য অত্যন্ত ব্যাপক। বিশেষ করে শহুরে অর্থনীতি এবং গ্রামীণ অর্থনীতির মধ্যকার পার্থক্য চরম। আবার শহুরে জনগণের আয়ের মধ্যেও ব্যাপক বৈষম্য। গুটিকয়েক লোক দেশের গোটা অর্থনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং শহরগুলোর বিশেষ কিছু এলাকায় অর্থনৈতিক উন্নয়নের চাকচিক্য চোখে পড়লেও মূলত, শতকরা ৬০-৭০ জন লোক দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করছে। ফলে দেখা যায়, জনগণের এ বহুরূপী আয় বৈষম্যের ফলে তাদের চিন্তা-চেতনা ও কর্মকাণ্ডকে কোনো ঐক্যবদ্ধ জায়গায় আনা মুশকিল হয়ে পড়ে।

২. **দারিদ্র্যের ব্যাপকতা :** দারিদ্র্যের ব্যাপকতা এ দেশের জনগণকে অধিকাংশ সময়ই তাদের জীবনধারণের ন্যূনতম প্রয়োজনের ব্যাপারে ব্যতিব্যস্ত রাখে। ফলে তারা জাতীয় কোনো বিষয় নিয়ে মাথা ঘামানোর সুযোগ তেমন পায় না। তাদের এ উদাসীনতার ফলে জাতীয় সংহতি নানাভাবে বাধাগ্রস্ত হয়ে থাকে।



**ঙ. সাংস্কৃতিক সংহতির সমস্যা :** বাংলাদেশের জাতীয় সংস্কৃতি কতগুলো উপাদানে সমৃদ্ধ, যা এ দেশের আপামর জনসাধারণের কাছে ব্যাপকভাবে সমাদৃত। আবহমান কাল থেকে এ দেশের মানুষ যে বাঙালি সংস্কৃতিকে লালন করেছে তা কেবল সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেই নয়, রাজনীতি, অর্থনীতিসহ জাতীয় জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই তা থেকেছে এ দেশের মানুষের অনুপ্রেরণার প্রধান উৎস।

অনেক ঘাত-প্রতিঘাত এবং বিভ্রান্তির পরও বাঙালির সে চিরায়ত সাংস্কৃতিক পরিচয় মিলিয়ে যায়নি। তবে পশ্চিমা সংস্কৃতির আঘাতে এ দেশীয় সংস্কৃতি আজ ক্ষতবিক্ষত। ফলে সংস্কৃতিতে যে সংকটের সৃষ্টি হয়েছে তা জাতির প্রতিটি ক্ষেত্রেই প্রতিফলিত হচ্ছে। তাই সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের যে ঐক্যবদ্ধ ডাক সে ডাক ইদানীং তেমন প্রাণবন্ত মনে হয় না।

**বাংলাদেশে জাতীয় সংহতির সম্ভাবনা :** জাতীয় সংহতির যে সকল সমস্যার কথা আলোচিত হলো এগুলো একদিনের সৃষ্ট কোনো সমস্যা নয়। বরং জাতীয় ইতিহাসের বিবর্তন, জনগণের জীবনযাত্রার পরিবর্তন ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভাঙ্গাগড়ার যে ইতিহাস তারই ফল। তথাপি বাঙালি জাতির হাজার বছরের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, মুক্তিযুদ্ধের ঐক্যবদ্ধ চেতনা আর সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম জনগোষ্ঠীর ভ্রাতৃত্বের শিক্ষা ইত্যাদিকে পুঁজি করে আজও একটি ঐক্যবদ্ধ জাতি গঠনের প্রয়াসকে অর্থবহ করে তোলা যায়। বাঙালির সাহিত্য ও সংস্কৃতির ধারা অনেকটা ম্রিয়মাণ হলেও এ দেশের জাতীয় ঐক্য আর সংহতির যে কোনো প্রয়াসকে কার্যকর করতে সাংস্কৃতিক আন্দোলনের ঐক্যবদ্ধ ধারার সাথে মিলিয়ে দেয়া যেতে পারে। এতে সে আন্দোলন নিশ্চিতভাবে বেগবান হবে।

তাছাড়া এ দেশের ৯০.৪ শতাংশ লোক মুসলমান। সংখ্যাগরিষ্ঠ এ মুসলিম জনগোষ্ঠী দীর্ঘদিন যাবৎ সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এ দেশের হিন্দুসহ অন্যান্য ধর্মাবলম্বী জনগোষ্ঠীর সাথে মিলেমিশে বাস করার যে ঐতিহ্য সৃষ্টি করেছে তাকে পুঁজি করেই এ দেশে ধর্মীয় বন্ধন সৃষ্টি সম্ভব। সেজন্য যে শ্রেণীটি বিচ্ছিন্নভাবে এ দেশের হিন্দুদের নির্যাতনের অপপ্রয়াস চালাচ্ছে তাদের দমনের ব্যাপারে সরকারকে আরো কঠোর হওয়া আবশ্যক।

অন্যদিকে আমাদের রাজনীতিতে নব্বই-পরবর্তী সময়ে গণতান্ত্রিক যে ধারা সৃষ্টি হয়েছে সেটিও ক্রম অগ্রসরমান। পরপর তিনটি গণতান্ত্রিক নির্বাচনের পর স্থানীয় নির্বাচনগুলোও জাতীয় নির্বাচনের মতো একটি সুষ্ঠু ধারায় সংযুক্ত হচ্ছে। তাছাড়া আমাদের রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যেও মৌলিক কোনো বিষয়ে তেমন মতানৈক্য দেখা যায় না। যতটুকু বিভেদ সেটা নিছকই রাজনৈতিক কৌশল। আর যদিও আদর্শগত কিছু থাকে তা-ও মিটিয়ে ফেলা সম্ভব। এর প্রমাণ নব্বই সালে এরশাদবিরোধী আন্দোলন ও এর পরবর্তী পর্যায়ে লক্ষ্য করা গেছে।

**উপসংহার :** উপরিউক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, বাংলাদেশের রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজ ও সংস্কৃতিতে বর্তমানের যে সংকটগুলোর কথা বলা হয় এদের মাত্রা পার্শ্ববর্তী ভারত, পাকিস্তান, মিয়ানমার, শ্রীলংকা ও নেপালসহ যে কোনো দেশের তুলনায় নগণ্য। পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা আমাদের অনেক যাতনা দিলেও তাকে অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে আনা হয়েছে। জাতীয় পরিচয়ের যে সমস্যা সেগুলোর মাত্রা এবং মৌলিকত্ব তেমন নেই। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যে বৈষম্য এটা পুঁজিবাদী বিশ্বের স্বাভাবিক প্রবণতারই অংশ। সেজন্য প্রচেষ্টাও চলছে যেন দারিদ্র্যমুক্ত বাংলাদেশ গড়ে একটি সুষম সমাজ প্রতিষ্ঠা করা যায়। সুতরাং জাতীয় জীবনে সমৃদ্ধির জন্য যেটা দরকার তা হলো একটি সুন্দর সমাজ ও দেশ গড়ার প্রত্যাশাকে জাগিয়ে রাখা।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



## রচনা ০৭ পার্বত্য শান্তিচুক্তি : প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া

*[২৮তম বিসিএস]*

**ভূমিকা :** প্রায় দুই যুগ ধরে আত্মঘাতী তৎপরতায় লিপ্ত শান্তিবাহিনীর সাথে তৎকালীন আওয়ামী লীগ সরকার ১৯৯৭ সালের ২ ডিসেম্বর চূড়ান্ত শান্তিচুক্তি সম্পাদন করেছে। শান্তির অন্বেষায় শান্তিবাহিনীর রাজনৈতিক সংগঠন জনসংহতি সমিতির সাথে দীর্ঘ আলোচনা ও অবশেষে শান্তিচুক্তি দেশের অভ্যন্তরীণ আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক এবং আন্তর্জাতিক অঙ্গনে যথেষ্ট প্রভাব ফেলতে সক্ষম হয়েছে। এ ব্যাপারে 'ওয়াশিংটন পোস্ট' পত্রিকা মন্তব্য করে, 'এই শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ দীর্ঘদিনের একটি বিদ্রোহের অবসান ঘটিয়েছে।' ইউনেস্কো বাংলাদেশের তৎকালীন ও বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ঐতিহাসিক পার্বত্য শান্তিচুক্তি সম্পাদন করে এ অঞ্চলের বিরাজিত দীর্ঘদিনের রক্তপাত ও জাতিগত সহিংসতা অবসানের স্বীকৃতিস্বরূপ শান্তি পুরস্কারে ভূষিত করেছে।

**ইতিহাসের ধারাবাহিকতা :** পার্বত্য চট্টগ্রামের অশান্তির ইতিহাস দীর্ঘ, মর্মান্তিক এবং রক্তাক্ত। এ এলাকায় উপজাতীয় বসতি স্থাপিত হয় কয়েক শতাব্দী পূর্বে । ১৪১৮ সালে চাকমা রাজা মুআন সিনী বার্মা থেকে বিতাড়িত হয়ে কক্সবাজারের রামু ও টেকনাফ এলাকায় আশ্রয় গ্রহণ করেন। পরে চাকমা ও মগরা (মার্মা) পার্বত্য চট্টগ্রামের অন্যান্য অঞ্চলে বসতি স্থাপন করে। ১৬৬৬ সালে মুঘল সম্রাট আওরঙ্গজেবের সময় পার্বত্য চট্টগ্রাম মুঘল শাসনাধীনে আসে। এরপর বাঙালিরা চাকমা রাজার আমন্ত্রণে সমতল ভূমি থেকে পার্বত্য এলাকায় বসবাস করতে শুরু করে। ১৯২০ সালে পার্বত্য চট্টগ্রামকে ব্রিটিশ গভর্নর জেনারেলের নিয়ন্ত্রণাধীন এলাকা ঘোষণা করে বিশেষ মর্যাদা দেয়া হয়। অতঃপর ১৯৫৭ সালে র‍্যাডক্লিফ মিশন পার্বত্য চট্টগ্রামকে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত করে। ১৯৬০ সালে পানিবিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের পর কাপ্তাই কৃত্রিম হ্রদ সৃষ্টি হলে বিপুলসংখ্যক উপজাতীয় পরিবার তাদের ফসলি জমি ও বাস্তুভিটা হারায়। তৎকালীন পাকিস্তান সরকার উপজাতীয়দের ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করলেও উপজাতীয়দের কাছে এটি একটি গভীর ক্ষত হিসেবে কাজ করে।

১৯৭১ সালের স্বাধীনতার পর পার্বত্য চট্টগ্রামে এক নতুন সংকট সৃষ্টি হয়। ১৯৭২ সালে উপজাতীয় নেতা মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা বাংলাদেশের খসড়া সংবিধান প্রণয়ন কমিটির কাছে ও তৎকালীন গণপরিষদে পার্বত্য চট্টগ্রামের জন্য বিশেষ মর্যাদা ও স্বায়ত্তশাসনের দাবি জানিয়ে ব্যর্থ হন। পাহাড়ি জনগণের দাবি মেনে নিতে নতুন সরকারের ব্যর্থতার ফলে ১৯৭২ সালের মার্চ মাসে লারমার নেতৃত্বে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি নামে পাহাড়ি জনগণের একটি রাজনৈতিক সংগঠন গড়ে ওঠে। পরবর্তী সময়ে এর সঙ্গে যোগ হয় শান্তিবাহিনী নামে একটি সামরিক শাখা। ১৯৭৫ সালের আগস্ট মাসে শেখ মুজিবুর রহমানের হত্যাকাণ্ড জনসংহতি সমিতির ইতিহাসে এক সঙ্কটময় অবস্থার সূচনা করে। লারমা সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতে চলে যান। ১৯৭৫ থেকে ১৯৭৭ সালের মধ্যে শান্তিবাহিনী সামরিক দিক থেকে অধিকতর সংগঠিত হয়। এর সদস্য সংখ্যা দিন দিন বাড়তে থাকে। শান্তি বাহিনীর জন্ম ও বিকাশের মধ্য দিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়িদের আত্মরক্ষার সংগ্রামের রাজনৈতিক কৌশল সশস্ত্র রূপ লাভ করে। '৬০, '৭০ ও '৮০-এর দশকে মানবেন্দ্র লারমা ছাড়াও পার্বত্য চট্টগ্রামে জুম্ম জাতীয়তাবাদের বিকাশে যারা বিশেষ ভূমিকা পালন করেন তাদের অন্যতম হলেন বিহারী খীসা, জ্ঞানেন্দু বিকাশ চাকমা, বীরেন্দ্র কিশোর রোয়াজা প্রমুখ।



**অতীত শান্তি আলোচনা :** পার্বত্য সশস্ত্র সংঘাত অবসানের লক্ষ্যে জনসংহতি সমিতির সঙ্গে প্রথম আলোচনা শুরু হয় ১৯৮৫ সালে, জেনারেল এরশাদের শাসনামলে। ১৯৮৮ সাল পর্যন্ত মূলত সেনা কর্মকর্তাদের সঙ্গে জনসংহতি সমিতির এই শান্তি আলোচনা চলে। এ সময় ১৯৮৯ সালের ২ জুলাই পার্বত্য চট্টগ্রাম স্থানীয় সরকার পরিষদ আইনের অধীনে তিন পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ গঠন করা হয়। এই পরিষদের চেয়ারম্যান নির্বাচনের ব্যবস্থা রাখা হয় উপজাতীয়দের মধ্য থেকে। প্রতি জেলায় ৩০ জন সদস্য রাখা হয় যার, এক-তৃতীয়াংশ বাঙালি এবং দুই-তৃতীয়াংশ বিভিন্ন উপজাতীয় জনগোষ্ঠী থেকে। কিন্তু সন্তু লারমার নেতৃত্বাধীন শান্তিবাহিনী এই সরকারের তীব্র বিরোধিতা শুরু করলে পরিষদের হাতে যে ২২ ধরনের ক্ষমতা হস্তান্তর হওয়ার কথা ছিল তা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

১৯৯১ সালে বিএনপি সরকার ক্ষমতাসীন হবার পর ১৯৯৫ সাল পর্যন্ত শান্তিবাহিনীর সঙ্গে ১৩ দফা বৈঠক হয়েছে। তৎকালীন যোগাযোগমন্ত্রী কর্নেল অলি আহমেদের নেতৃত্বাধীন একটি জাতীয় কমিটি এই শান্তি আলোচনা পরিচালনা করে। এ পর্যায়ের শান্তি আলোচনায় বামপন্থী নেতা রাশেদ খান মেননও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। তবে উপরিউক্ত দু পর্যায়ে কোনো বৈঠকেই সমস্যার কোনো ইতিবাচক সমাধান বেরিয়ে আসেনি।

আওয়ামী লীগ সরকার ১৯৯৬ সালের ২২ জুন ক্ষমতায় বসার পর আবার নতুন করে শান্তিবাহিনীর সঙ্গে আলোচনা শুরুর উদ্যোগ নেয়। পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি স্থাপন এবং সমস্যার রাজনৈতিক সমাধানের লক্ষ্যে '৯৬ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১১ সদস্যের একটি জাতীয় কমিটি গঠন করেন। কমিটির প্রধান হিসেবে মনোনীত হন তৎকালীন চিফ হুইপ আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ। শান্তি আলোচনার পাশাপাশি ১৯৯৭ সালের ১ আগস্ট থেকে পার্বত্য চট্টগ্রামে অস্ত্র বিরতি শুরু হয়। সরকারের সাথে আলোচনাকালে জনসংহতি সমিতি ৫ দফা দাবি পেশ করে। দাবিগুলো নিম্নরূপ :

১. বাংলাদেশের সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রামকে একটি নির্বাচিত আঞ্চলিক পরিষদের কর্তৃত্বাধীন পৃথক স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চলের মর্যাদা প্রদান, যার নাম হবে জুম্মল্যান্ড।
২. পার্বত্য চট্টগ্রামের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতিসত্তাসমূহের জাতিগত সাংবিধানিক স্বীকৃতি প্রদান।
৩. ১৯৪৭-এর ১৪ আগস্টের পর থেকে পার্বত্য চট্টগ্রামে অনুপ্রবেশকারী বহিরাগতদের প্রত্যাহার। পার্বত্য ভূমির ওপর পাহাড়ি স্বত্বের স্বীকৃতি।
৪. বিডিআর ক্যাম্প ব্যতীত পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে সামরিক ও আধাসামরিক বাহিনীর সকল ক্যাম্প ও সেনানিবাস তুলে নেয়া।
৫. ১৯৬০ সালের পর থেকে যেসব পাহাড়ি চট্টগ্রাম ছেড়ে পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে চলে যেতে বাধ্য হয়েছে, তাদের দেশে ফিরিয়ে আনা। জনসংহতি সমিতির সদস্যদের বিরুদ্ধে উত্থাপিত সকল আইনি অভিযোগ প্রত্যাহার এবং তাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা।

**পার্বত্য শান্তিচুক্তির প্রধান বৈশিষ্ট্য :** মোট ২৬টি বৈঠক শেষে সরকার ও জনসংহতি সমিতির মধ্যে ঐতিহাসিক পার্বত্য শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, মন্ত্রীবর্গ,

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



সশস্ত্র বাহিনীর প্রধান এবং জনসংহতি সমিতির নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন পার্বত্য চট্টগ্রামবিষয়ক জাতীয় কমিটির চেয়ারম্যান আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ ও জনসংহতি সমিতির পক্ষে জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা (সন্তু লারমা)। শান্তিচুক্তির প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো হলো :

১. **চুক্তি বাস্তবায়ন কমিটি :** চুক্তিতে উভয় পক্ষ পার্বত্য চট্টগ্রামকে উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চল হিসেবে বিবেচনা করে এই অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণ এবং এ অঞ্চলের সার্বিক উন্নয়ন অর্জন করার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেছেন। চুক্তি বাস্তবায়নের জন্য তিন সদস্যবিশিষ্ট একটি কমিটি গঠিত হবে। প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক মনোনীত একজন সদস্য হবেন এর আহ্বায়ক। অন্য দুজন সদস্য হবেন টাস্কফোর্সের চেয়ারম্যান কল্পরঞ্জন চাকমা এমপি ও পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সভাপতি সন্তু লারমা। স্বাক্ষরের পর থেকেই চুক্তি বলবৎ হয়েছে।

এ চুক্তিতে পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পবিষদের নাম পরিবর্তন করে পার্বত্য জেলা পরিষদ করা হয়। অ-উপজাতীয় বলে তাকে চিহ্নিত করা হয়েছে, যিনি উপজাতীয় নন এবং পার্বত্য জেলায় যার বৈধ জমি আছে এবং যিনি পার্বত্য জেলার সুনির্দিষ্ট ঠিকানায় সাধারণত বসবাস করেন। চুক্তিতে ১৯৮৯ সালের রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন তিনটির বিভিন্ন ধারা পরিবর্তন, সংশোধন ও সংযোজন করার ব্যাপারে উভয় পক্ষ একমত হয়েছেন বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

২. **ভূমি প্রসঙ্গ :** পার্বত্য জেলা এলাকাধীন বন্দোবস্তযোগ্য খাসজমিসহ কোনো জায়গাজমি পরিষদের পূর্ব-অনুমোদন ছাড়া ইজারা প্রদানসহ বন্দোবস্ত, ক্রয়-বিক্রয় ও হস্তান্তর করা যাবে না। তবে রক্ষিত বনাঞ্চল, কাপ্তাই জলবিদ্যুৎ প্রকল্প এলাকা, বেতবুনিয়া ভূ-উপগ্রহ এলাকা, রাষ্ট্রীয় শিল্প-কারখানা ও সরকারের নামে রেকর্ডকৃত ভূমির ক্ষেত্রে এ বিধান প্রযোজ্য হবে না। পার্বত্য জেলা পরিষদের নিয়ন্ত্রণ ও আওতাধীন কোনো প্রকার জমি, পাহাড় ও বনাঞ্চল পরিষদের সাথে আলোচনা ও এর সম্মতি ব্যতিরেকে সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ ও হস্তান্তর করা যাবে না। কাপ্তাই হ্রদের জলে ভাসা জমি অগ্রাধিকার ভিত্তিতে জমির মূল মালিকদের বন্দোবস্ত দেয়া হবে।

পরিষদ ভূমি উন্নয়ন কর আদায় করবে এবং আদায়কৃত কর পরিষদের তহবিলে থাকবে। সরকার প্রণীত কোনো আইন পরিষদের বিবেচনায় 'কষ্টকর' বা 'আপত্তিকর' হলে লিখিত আবেদন পেলে সরকার তা বিবেচনা করতে পারবে। পরিষদের বিষয়সমূহের মধ্যে বৃত্তিমূলক শিক্ষা, মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা ও মাধ্যমিক শিক্ষা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

৩. **পার্বত্য আঞ্চলিক পরিষদ :** তিন জেলার স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন সংশোধন ও সংযোজন করে তিন জেলা পরিষদের সমন্বয়ে একটি আঞ্চলিক পরিষদ গঠন করা হবে। পার্বত্য জেলা পরিষদগুলোর সদস্যদের দ্বারা পরোক্ষভাবে এই পরিষদেও চেয়ারম্যান নির্বাচিত হবেন। তিনি একজন উপজাতীয় হবেন এবং তার পদমর্যাদা হবে প্রতিমন্ত্রীর সমতুল্য। পরিষদের চেয়ারম্যানসহ সদস্য থাকবেন ২২ জন। এদের মধ্যে দুই-তৃতীয়াংশ হবেন উপজাতীয়। পরিষদের গঠন হবে নিম্নরূপ : চেয়ারম্যান ১ জন, উপজাতীয় সদস্য (পুরুষ) ১২ জন, উপজাতীয় সদস্য (মহিলা) ২ জন, অ-উপজাতীয় সদস্য (পুরুষ) ৬ জন ও অ-উপজাতীয় সদস্য (মহিলা) ১ জন। উপজাতীয় পুরুষ সদস্যদের মধ্য থেকে ৫ জন নির্বাচিত হবেন চাকমা উপজাতি থেকে, ৩ জন মার্মা উপজাতি থেকে, ২ জন ত্রিপুরা উপজাতি থেকে, ১ জন মুরং ও তংচঙ্গা উপজাতি থেকে এবং ১ জন লুসাই, বোম, পাংখো, খুমী, চাক ও লিয়াং উপজাতি থেকে। অ-উপজাতীয় পুরুষ সদস্যদের মধ্য থেকে প্রত্যেক জেলা থেকে দুজন করে নির্বাচিত হবেন। উপজাতীয় মহিলা সদস্য নিয়োগের ক্ষেত্রে চাকমা উপজাতি থেকে একজন ও অন্যান্য উপজাতি থেকে একজন নির্বাচিত হবেন। পরিষদের মহিলাদের জন্য তিনটি আসন সংরক্ষিত রাখা হবে এক-তৃতীয়াংশ অ-উপজাতীয় থেকে।



তিন পার্বত্য জেলার চেয়ারম্যানগণ পদাধিকারবলে পরিষদের সদস্য হবেন। পরিষদের মেয়াদ হবে ৫ বছর। পরিষদে সরকারের যুগ্মসচিব সমতুল্য একজন মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা থাকবেন এবং এতে উপজাতীয় প্রার্থীকে অগ্রাধিকার দেয়া হবে।

পরিষদ তিনটি পার্বত্য জেলা পরিষদের অধীনে পরিচালিত সকল উন্নয়ন কর্মকাণ্ড সমন্বয় সাধন করাসহ তিনটি পার্বত্য জেলা পরিষদের আওতাধীন ও এদের ওপর অর্পিত বিষয়াদি সঠিক তত্ত্বাবধান ও সমন্বয় করবে। আঞ্চলিক পরিষদের সিদ্ধান্তই হবে চূড়ান্ত। পৌরসভাসহ স্থানীয় পরিষদসমূহও এই পরিষদের তত্ত্বাবধানে থাকবে। এছাড়া প্রশাসন, পরিষদ আইনশৃঙ্খলা উন্নয়ন, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, এনজিওদের কার্যাবলীর সমন্বয় সাধন, উপজাতীয় আইন ও সামাজিক বিচার পরিচালনা এবং ভারী শিল্পের লাইসেন্স প্রদান করবে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম বোর্ড পরিষদের তত্ত্বাবধানে থাকবে। সরকার একজন উপজাতীয়কে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে এর চেয়ারম্যান হিসেবে নিয়োগ করবেন। ১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধি ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট আইনে কোনো অসঙ্গতি থাকলে তা দূর করা হবে। আঞ্চলিক পরিষদ গঠিত না হওয়া পর্যন্ত সরকার অন্তর্বর্তীকালীন আঞ্চলিক পরিষদ গঠন করবেন।

নিম্নোক্ত উৎস থেকে পরিষদের তহবিল গঠিত হবে : জেলা পরিষদ, পরিষদের ওপর ন্যস্ত সম্পত্তি, সরকার বা অন্যান্য কর্তৃপক্ষের ঋণ ও অনুদান, কোনো প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তি কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান, পরিষদের অর্থ বিনিয়োগ থেকে মুনাফা, পরিষদ থেকে প্রাপ্ত যে কোনো অর্থ, সরকারের নির্দেশে পরিষদের ওপর ন্যস্ত অন্যান্য আয়ের উৎস থেকে প্রাপ্ত অর্থ।

৪. **পুনর্বাসন ও সাধারণ ক্ষমা :** চুক্তি মোতাবেক শরণার্থী প্রত্যাবাসন অব্যাহত থাকবে এবং একটি টাস্কফোর্সের মাধ্যমে তাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হবে। ভূমি জরিপ কাজ শুরু করার ব্যাপারে চুক্তিতে উভয় পক্ষ একমত হন। এছাড়া জায়গাজমি বিষয়ে বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য একজন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতির নেতৃত্বে একটি কমিশন গঠন করা হবে। উপজাতীয় শরণার্থীদের ঋণ-সুদ মওকুফ করা হবে। চাকরি ও উচ্চশিক্ষার জন্য কোটা ব্যবস্থা বহাল থাকবে। উপজাতীয় কৃষ্টি ও সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখা হবে।

৫. **যে সকল বিষয় জেলা পরিষদের অধীনে থাকবে :** পার্বত্য জেলা পরিষদের কার্য ও দায়িত্বের মধ্যে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত থাকবে : ভূমি ও ভূমি ব্যবস্থাপনা, পুলিশ, উপজাতীয় আইন ও সামাজিক বিচার, যুবকল্যাণ, পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন, স্থানীয় পর্যটন, পৌরসভা ও ইউনিয়ন পরিষদ ব্যতীত ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্ট ও অন্যান্য স্থানীয় শাসন সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠান, স্থানীয় শিল্প-বাণিজ্যের লাইসেন্স প্রদান, কাপ্তাই হ্রদের জলসম্পদ ব্যতীত অন্যান্য নদী-নালা, খাল-বিলের সুষ্ঠু ব্যবহার ও সেচ ব্যবস্থা, জন্ম-মৃত্যু অন্যান্য পরিসংখ্যান সংরক্ষণ, মহাজনি কারবার ও জুম চাষ।

জেলা পরিষদ যে সকল সূত্র ও ক্ষেত্র থেকে কর, টোল ও ফিস ইত্যাদি আদায় করতে পারবে সেগুলো হলো : অযান্ত্রিক যানবাহনের রেজিস্ট্রেশন ফি, পণ্য ক্রয়-বিক্রয়ের ওপর কর। ভূমি ও

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



দালান-কোঠার ওপর হোল্ডিং কর, গৃহপালিত পশু বিক্রয়ের কর, সামাজিক বিচারের ফিস, সরকারি ও বেসরকারি শিল্প প্রতিষ্ঠানের ওপর হোল্ডিং কর, বনজ সম্পদের ওপর রয়্যালটির অংশবিশেষ, সিনেমা, যাত্রা, সার্কাস ইত্যাদির ওপর সম্পূরক কর, খনিজসম্পদ অন্বেষণ বা নিষ্কর্ষণের উদ্দেশ্যে সরকার কর্তৃক প্রদত্ত অনুজ্ঞাপত্র বা পাট্টাসমূহ সূত্রে প্রাপ্ত রয়্যালটির অংশবিশেষ, ব্যবসা, লটারি ও মৎস্য ধরার ওপর কর। নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হলে অ-উপজাতীয়কে সংশ্লিষ্ট সার্কেল প্রধানের সার্টিফিকেট সংগ্রহ করতে হবে। জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও সদস্যদের শপথ করাবেন একজন বিচারপতি। জেলা পরিষদের মেয়াদ বর্ধিত হবে তিন বছরের স্থলে পাঁচ বছর। পরিষদের সভায় চেয়ারম্যানের অনুপস্থিতিতে শুধু উপজাতীয় সদস্য সভাপতিত্ব করতে পারবেন। পরিষদের মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা সচিব হবেন একজন উপসচিবের সমকক্ষ। এ পদে উপজাতীয় কর্মকর্তাদের অগ্রাধিকার দেয়া হবে। পরিষদ বিভিন্ন কর্মকর্তা ও কর্মচারীর পদ সৃষ্টি করবে। তবে তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর পদে নিয়োগ করতে পারবে এবং তাদের বদলি ও অপসারণ ইত্যাদি এর ওপর ন্যস্ত হবে। কিন্তু কর্মকর্তাদের নিয়োগ করবে সরকার। তাদের বদলি, বরখাস্ত ইত্যাদিও সরকারই স্থির করবে।

চুক্তিতে জেলা পরিষদগুলোকে বাজেট প্রণয়নের ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। পরিষদের কার্যকলাপের সামঞ্জস্য সাধনের নিশ্চয়তা বিধানের জন্য সরকার পরিষদকে পরামর্শ প্রদান ও অনুশাসন এবং প্রয়োজনে তথ্য ও ব্যাখ্যা চাওয়া এবং পরামর্শ বা নির্দেশ দিতে পারবে। পরিষদ বাতিলের ৯০ দিনের মধ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠানের বিধান চুক্তিতে রাখা হয়েছে। পরিষদ পুলিশের সাব-ইন্সপেক্টর ও অধস্তন স্তরের সকল সদস্যকে নিয়োগ করবে এবং এক্ষেত্রে উপজাতীয়গণ অগ্রাধিকার পাবে।

উপরোক্ত বিশ্লেষণ থেকে যেসব উল্লেখযোগ্য দিক পরিলক্ষিত হয় সেগুলো হলো :

– পার্বত্য চট্টগ্রামকে উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চল হিসেবে বিবেচনা করা হবে।
– স্বাক্ষরের পর থেকেই চুক্তি বলবৎ হবে।
– বিডিআর ও স্থায়ী সেনানিবাস (তিন জেলা সদরে তিনটি এবং আলী কদম, রুমা ও দীঘিনালা) ব্যতীত সামরিক বাহিনী, আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর সকল অস্থায়ী ক্যাম্প প্রত্যাহার করা হবে।
– পার্বত্য চট্টগ্রামে সকল সরকারি, আধা-সরকারি, পরিষদীয় ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে সকল স্তরে নিয়োগে উপজাতীয়দের অগ্রাধিকার দেয়া হবে।
– পার্বত্য চট্টগ্রামবিষয়ক মন্ত্রণালয় গঠন করা হবে। একজন উপজাতীয় এই মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী হবেন।
– রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইনসমূহ পরিবর্তন, সংশোধন, সংযোজন ও অবলোকন করা হবে।
– পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদের নতুন নাম হবে পার্বত্য জেলা পরিষদ।
– প্রতি জেলা পরিষদের তিনটি মহিলা আসনের মধ্যে এক-তৃতীয়াংশ অ-উপজাতীয়দের জন্য সংরক্ষিত থাকবে।
– পরিষদের সাথে আলোচনা ছাড়া সরকার কোনো জমি, পাহাড় ও বনাঞ্চল অধিগ্রহণ ও হস্তান্তর করবে না।
– কাপ্তাই হ্রদের জলে ভাসা জমি অগ্রাধিকার ভিত্তিতে জমির মূল মালিকদের বন্দোবস্ত দেয়া হবে।
– মাতৃভাষার মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষা চালু হবে।
– তিন জেলা সমন্বয়ে ২২ সদস্যবিশিষ্ট পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ গঠন করা হবে। এর মেয়াদ হবে ৫ বছর।



– পার্বত্য জেলা পরিষদের নির্বাচিত সদস্যদের দ্বারা চেয়ারম্যান নির্বাচিত হবেন। তার পদমর্যাদা হবে একজন প্রতিমন্ত্রীর সমকক্ষ এবং তিনি হবেন উপজাতীয়।
– পরিষদের মুখ্য কর্মকর্তা হবেন একজন যুগ্ম সচিব পর্যায়ের ব্যক্তি। উপজাতীয় প্রার্থীকে অগ্রাধিকার দেয়া হবে।
– আঞ্চলিক পরিষদ তিন জেলা পরিষদের উন্নয়ন কর্মকাণ্ড সমন্বয় সাধন এবং তত্ত্বাবধান করবে।
– উপজাতীয় আইন ও সামাজিক বিচার আঞ্চলিক পরিষদের আওতাভুক্ত থাকবে এবং পরিষদ ভারী শিল্পের লাইসেন্স প্রদান করবে।
– ১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধি এবং অন্যান্য আইনে অসঙ্গতি থাকলে তা দূর করা হবে।

**পার্বত্য শান্তিচুক্তির আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রভাব :** পার্বত্য শান্তিচুক্তির আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রভাব সুদূরপ্রসারী। পার্বত্য চট্টগ্রামের আয়তন প্রায় সমগ্র দেশের এক-দশমাংশ। এখানে রয়েছে প্রচুর পরিমাণ প্রাকৃতিক সম্পদ। শান্তি বাহিনীর উপস্থিতির কারণে এতদিন এখানে উন্নয়ন কর্মকাণ্ড সম্ভব হয়নি। এখন সে অনিশ্চয়তার অবসান হয়েছে। শান্তি বাহিনীই এখন মূল কর্মকাণ্ডের নেতৃত্বে এসেছে। ঐ অঞ্চলের সকল কর্তৃত্ব ও উন্নয়নের ভার এখন তাদের নেতাদের হাতে অর্পিত। সুতরাং রাজনৈতিক ও সামাজিক দিক দিয়ে যেমন ঐ অঞ্চলে অস্থিরতা দূর হয়েছে, তেমনি সামাজিক ক্ষেত্রে সহাবস্থানের ফলে শান্তির বার্তা নিয়ে এসেছে। ইতিমধ্যেই সরকার ঐ অঞ্চলকে বিশেষ মর্যাদা দিয়ে উন্নয়নের পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে। তাছাড়া পার্বত্য অঞ্চলের প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণ ও তার যথাযথ ব্যবহারের জন্য দাতাগোষ্ঠীর সাথে সংলাপ শুরু হয়েছে। পার্বত্য অঞ্চলের ভূমি উন্নয়ন, শিল্প-কারখানা স্থাপন, আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো, প্রশাসন প্রভৃতি উপজাতীয়দের হাতে অর্পণ করায় তারা নিজেরাই নিজেদের ভাগ্য উন্নয়নে সচেষ্ট হয়েছে। সরকার ভূমি বণ্টন, পুনর্বিন্যাস, প্রশাসনিক সংস্কার, স্থানীয় সরকার গঠন ও বিশেষ মন্ত্রণালয় গঠনের মতো যেসব পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে তা ঐ অঞ্চলের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে উৎসাহ-উদ্দীপনা সৃষ্টি করেছে। এসব উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে পাহাড়ি ও বাঙালিদের যৌথ অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা গেলে পার্বত্য চট্টগ্রাম জাতীয় উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারবে।

এছাড়া দেশের চাকরি, শিক্ষা প্রভৃতি ক্ষেত্রে তাদের জন্য কোটা নির্ধারণ ও পার্বত্য অঞ্চলে এক্ষেত্রে তাদের বিশেষ সুবিধা দানের ফলে তারা অগ্রসর জাতিতে পরিণত হওয়ার সুযোগ পেয়েছে, যা দেশের সার্বিক উন্নয়নে সকল জনশক্তির সুষ্ঠু অংশগ্রহণ নিশ্চিত করেছে। দেশের সকল নাগরিক সমান মর্যাদার অধিকারী এবং জাতীয় উন্নয়নে সকলের অংশগ্রহণের ফলে দেশের আরেক ধাপ অগ্রগতির সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছে। মোট কথা, পার্বত্য শান্তিচুক্তি একটি অনিবার্য রাজনৈতিক বাস্তবতা এবং এর সফল বাস্তবায়নই দেশ তথা পার্বত্য অঞ্চলে শান্তির সুবাতাস ও স্থিতিশীলতা আনয়নে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে পারে।

**উপসংহার :** পার্বত্য চট্টগ্রামের মানুষ এখন অরাজকতা ও অস্থিতিশীলতা থেকে পরিত্রাণ পেতে চায়। সংঘাতের পরিবর্তে চায় সহাবস্থান, যাতে থাকবে পারস্পরিক উপলব্ধি আর সংবেদনশীলতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এই প্রত্যাশার ফলে যদি পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি ও স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহলে সৌন্দর্যের রাণী পার্বত্য চট্টগ্রাম দেশী-বিদেশী সকলের কাছে এক আকর্ষণীয় ক্ষেত্র হিসেবে পরিগণিত হবে। পর্যটন ক্ষেত্র হিসেবে যেমন দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে, তেমনি পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূখণ্ডে থাকা প্রাকৃতিক গ্যাস ও তেল উত্তোলনের মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিবাসীদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নও নিশ্চিত হবে।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

# শিল্প-বাণিজ্য-অর্থনীতি

## রচনা ০৮ বাংলাদেশের পাটশিল্পের ভবিষ্যৎ

*[৩৩তম বিসিএস]*

**ভূমিকা :** পাট বাংলাদেশের একটি অন্যতম অর্থকরী ফসল। এক সময় পাটকে বলা হতো সোনালী আঁশ। আর তাই পৃথিবীর বৃহত্তম পাটকলটিও ছিল বাংলাদেশে। অথচ সে পাট আজ আর আগের অবস্থানে নেই। সার্বিক কৃষিখাতের যে নেতিবাচক অবস্থা পাটশিল্পের ক্ষেত্রে এ অবস্থা আরো নাজুক। ইতিমধ্যে আদমজী জুট মিলসহ অনেকগুলো জুট মিল বন্ধ হয়ে গেছে। সরকারি-বেসরকারি নির্বিশেষে প্রতিটি পাটকলই এখন লোকসানি প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। ফলে বাধ্য হয়েই উদ্যোক্তাদেরকে এ সকল শিল্প প্রতিষ্ঠান বন্ধ করতে হচ্ছে। কিন্তু এ বন্ধের প্রক্রিয়া নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। পার্শ্ববর্তী দেশ ভারত যেখানে নতুন নতুন পাটশিল্প স্থাপন করে বাংলাদেশ থেকে পাট আমদানি করছে সেখানে বাংলাদেশ কেন তার চালু মিলগুলোকে লাভজনক করতে পারবে না। পাটের গতানুগতিক ব্যবহার হ্রাস পেলেও এর বিকল্প ব্যবহারও আবিষ্কৃত হয়েছে।

**বাংলাদেশে পাটশিল্পের বিবর্তন :** বাংলাদেশে পাটশিল্প বিবর্তনের সুদীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে। নিচে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো :

১. **পাটশিল্পের সূচনা :** বাংলাদেশে পাটশিল্পের সূচনা ১৯৫২ সালে এবং এই সূচনা বেসরকারি শিল্পোদ্যোক্তাদের দ্বারা সৃষ্টি হয়। ১৯৫২ থেকে ১৯৭১ সালের মধ্যে বেসরকারি শিল্পোদ্যোক্তাদের দ্বারা এ দেশে বিশ্বের অন্যতম বৃহত্তম পাটশিল্প স্থাপিত হয় এবং বিশ্ব বাজারে পাটজাত পণ্য রপ্তানিতে বাংলাদেশ সেরা প্রমাণিত হয়, দেশে পাটপণ্য শ্রেষ্ঠ রপ্তানির আয়ের খাত হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে, দেশের পাটশিল্পে প্রায় ২ লাখ শ্রমিক-কর্মচারীর কর্মসংস্থান হয়।

২. **পাটশিল্পের পরিত্যক্ত অবস্থা :** ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু হয় এবং সেই বছর ডিসেম্বরে রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের ফলে বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভ করে। এক শ্রেণীর পাটশিল্প স্থাপনকারী অস্থানীয় শিল্পপতিরা স্বাধীনতা যুদ্ধের পর এবং দেশ স্বাধীন হওয়ার প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ ত্যাগ করে। ফলে এই সকল পাটশিল্প ১৯৭১-৭২ সালে পরিত্যক্ত হয়ে পড়ে। অস্থানীয়দের দ্বারা স্থাপিত পাটকল মালিকরা দেশ ত্যাগ করার কারণে সকল পাটকল 'পরিত্যক্ত' হয়ে পড়ে।

৩. **পাটকলের রাষ্ট্রীয়করণ :** বাংলাদেশ সরকার সমাজতন্ত্রের রাজনৈতিক দর্শনে পরিচালনার অংশ হিসেবে 'পরিত্যক্ত' পাটকলের সাথে স্থানীয় বাংলাদেশী উদ্যোক্তাদের দ্বারা স্থাপিত পাটকলসহ দেশের সকল পাটকলকে ১৯৭২ সালে 'রাষ্ট্রায়ত্ত' করে নেয় এবং রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশ জুট মিলস কর্পোরেশন (বিজেএমসি) স্থাপন করে দেশের সকল পাটকল পরিচালনার ব্যবস্থা অবলম্বন করে। উক্ত কর্পোরেশনের মাধ্যমে পরিচালিত দেশের পাটকলসমূহ ক্রমাগত লোকসান দিতে থাকে।



৪. **পাটকলের বিরাষ্ট্রীয়করণ :** ১৯৭৯ সালে 'জিয়া সরকার' পাট শিল্পখাতকে বিরাষ্ট্রীয়করণ কার্যক্রম শুরু করেন। ১৯৭৯-৮০ এর মধ্যে ৭টি পাট-সুতাকল বেসরকারি খাতে হস্তান্তর করেন—যার মধ্যে বাংলাদেশীদের দ্বারা স্থাপিত ৩টি পাট-সুতাকল পূর্বতন দেশীয় মালিকদের নিকট হস্তান্তর করেন, বাকি চারটি বিক্রয়ের মাধ্যমে বাংলাদেশীদের নিকট হস্তান্তর করেন এবং পাটশিল্প স্থাপন বেসরকারি উদ্যোক্তাদের নিকট উন্মুক্ত করে দেন।

৫. **বিরাষ্ট্রীয়করণ স্থিমিত :** ১৯৮১ সালে জিয়াউর রহমান শাহাদাতবরণ করলে জিয়া সরকারের শিল্প উপদেষ্টা শফিউল আজম পরবর্তী সরকারের আমলেও উপদেষ্টা হিসেবে নিয়োজিত হন এবং পাটশিল্প বিরাষ্ট্রীয়করণ নীতি অব্যাহত রাখেন। ১৯৮২-৮৪ সালে বাংলাদেশীদের দ্বারা স্থাপিত পাটকলসমূহের মধ্যে ৩৫টি পাটকল পূর্বতন বাংলাদেশী মালিকদের নিকট হস্তান্তর করা হয়। কিছুদিন পর সফিউল আজম উপদেষ্টার পদ থেকে বিদায় হন এবং পাটকল বিরাষ্ট্রীয়করণ কার্যক্রম আর অগ্রসর হয়নি।

৬. **আর্থিক সহায়তা :** ১৯৮২ সাল থেকে পাটশিল্প সরকারি-বেসরকারি দুটি খাতে পরিচালিত হতে থাকে। বিরাষ্ট্রীয়করণের পর ১৯৮৩-৮৫ সময়ে বিরাষ্ট্রীয়কৃত বেসরকারি মিলসমূহ মুনাফা অর্জন করে, যদিও ঐ সময়ে সরকারি খাতের পাটকল (বিজেএমসির মাধ্যমে পরিচালিত) ক্রমাগত লোকসান দিতেই থাকে। তৎকালীন সরকার তখন পাটশিল্প সম্পর্কে যে সকল নীতি অবলম্বন করে তাতে সরকারি খাতে পাটকলগুলো আরো বেশি লোকসানে পতিত হয় এবং বেসরকারি খাতের পাটকলসমূহ লাভজনক থেকে লোকসানে পতিত হয়। এমতাবস্থায় সরকার সামগ্রিকভাবে বাংলাদেশের পাটশিল্পকে টিকিয়ে রাখতে নগদ আর্থিক সহায়তা প্রদান পন্থা অবলম্বন করে। এতে সরকারের রাজস্ব খাত থেকে বিপুল পরিমাণ অর্থ খরচ হতে থাকে।

৭. **সংস্কার কর্মসূচি গ্রহণ :** সরকারের রাজস্ব খাত থেকে বিপুল অর্থ ব্যয় রোধকল্পে ১৯৯০ সালে বিশ্বব্যাংক একটি সমীক্ষা পরিচালনাপূর্বক পাটশিল্পকে লাভজনক করার একটি সংস্কার কর্মসূচি গ্রহণ করে। ঐ সংস্কার কর্মসূচি ১৯৯২ সালে শুরু হয়ে ১৯৯৫-৯৬ সালে শেষ হয়। এতে বিশ্বব্যাংকের প্রতিশ্রুত ২৫০ মিলিয়ন ডলার প্রদানের অঙ্গীকার থাকলেও মাত্র ৪৫ মিলিয়ন ডলার প্রদান করা হয়। মেয়াদান্তে দেখা যায়, বিশ্বব্যাংকের ফর্মুলায় গৃহীত সংস্কার কর্মসূচি বাংলাদেশের সরকারি খাত বা বেসরকারি খাতের পাটশিল্পকে স্বয়ম্ভর করতে ব্যর্থ হয়েছে। বিশ্বব্যাংকও এই ব্যর্থতার কথা স্বীকার করেছে।

৮. **বিশ্বব্যাংকের সহায়তা কামনা :** বিশ্বব্যাংক, পাট খাতের সরকারি (বিজেএমসি) ও বেসরকারি (বিজেএমএ ও বিজেএসএ) উভয় খাত মিলিতভাবে পাট মন্ত্রণালয়ের ও অর্থ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে নতুনভাবে আরেকটি পাটশিল্প সংস্কার কর্মসূচি প্রণয়নপূর্বক বিশ্বব্যাংকের আর্থিক সহায়তা কামনা করার পরামর্শ দেয়। সে উদ্দেশ্যে পাট মন্ত্রণালয়ের নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠন করা হয়। ১৯৯৭ সালের অক্টোবরে ঐ রিপোর্ট পাট মন্ত্রণালয়ের নিকট পেশ করা হয়। কিন্তু পাট মন্ত্রণালয় তথা সরকার উক্ত রিপোর্টের ওপর কোনোরূপ কার্যক্রম এ যাবত গ্রহণ করেনি।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



৯. **পাটকলের লোকসান :** বিশ্বব্যাংক সংস্কার কর্মসূচি সমাপনের পর ১৯৯৭ সালে বিশ্ব বাজারে পাটজাত পণ্য রপ্তানির দাম অসম্ভবভাবে হ্রাস পায়, ফলে সকল পাটকলই লোকসানে পতিত হয়। সরকার আবার ১৯৮৮ সালে রাজস্ব খাত থেকে এই পণ্য রপ্তানিতে নগদ আর্থিক সহায়তা আরম্ভ করে, এই নগদ আর্থিক সহায়তা লোকসানের জন্য পর্যাপ্ত ছিল না। ফলশ্রুতিতে সকল পাটকল কমবেশি লোকসান দিতে থাকে।। বেসরকারি মিলসমূহের মধ্যে অনেক মিল রুগ্ন হয়ে পড়ে ও কোনো কোনো মিল বন্ধ হয়ে যায়।

১০. **বাজেটের মাধ্যমে সহায়তা :** লোকসান অবস্থা সরকারি মিলেও থাকার কারণে সরকারি মিলসমূহ চালু রাখার স্বার্থে ১৯৯৬ সাল থেকে ২০০১ সাল পর্যন্ত সরকারি মিলকে (বিজেএমসি) বাংলাদেশ সরকার বাজেট বরাদ্দের মাধ্যমে ৫০৫ কোটি টাকা সহায়তা প্রদান করে, কিন্তু বেসরকারি মিলের লোকসান অবস্থার অনুরূপ পরিস্থিতিতে সরকার কোনোরূপ আর্থিক সহায়তা প্রদান করেনি।

**বাংলাদেশের পাটশিল্পের সমস্যা :** বাংলাদেশের পাটশিল্প আজ নানাবিধ সমস্যায় জর্জরিত। যেমন–

১. **লোকসানি মিলে পরিণত :** দেশের সরকারি বেসরকারি প্রায় সবগুলো জুট মিলই বর্তমানে লোকসানি মিলে পরিণত হয়েছে। এসব মিল বর্তমানে সরকারি-বেসরকারি উদ্যোক্তাদের জন্য বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এমতাবস্থায় এগুলো নিয়ে উভয় সংকটের সৃষ্টি হয়েছে।

২. **পাটের বিকল্প আবিষ্কার :** দেশে অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে প্লাস্টিকসহ অন্যান্য বিকল্প আবিষ্কৃত হওয়ায় পাটের চাহিদা বেশ হ্রাস পেয়েছে। অবশ্য সরকার পলিথিন বন্ধ করায় এক্ষেত্রে কিঞ্চিত সম্ভাবনা জেগে উঠে। কিন্তু সে সম্ভাবনাকেও আমরা এখন পর্যন্ত কাজে লাগাতে পারিনি।

৩. **সিবিএ সংগঠনের প্রভাব :** বাংলাদেশের পাটকলগুলোতে সিবিএ নামের দৈত্যের প্রভাবে প্রয়োজনীয় সংস্কার সাধন করা যাচ্ছে না। ফলে প্রয়োজনের অতিরিক্ত শ্রমিক, ক্রয় দুর্নীতিসহ নানা সমস্যায় জর্জরিত মিলগুলো একের পর এক বন্ধ হচ্ছে। অথচ বাংলাদেশের পাট আমদানি করে ভারত একের পর এক নতুন নতুন জুট মিল স্থাপন করছে।

৪. **পাটের উৎপাদন হ্রাস :** বাংলাদেশে পাট উৎপাদনের পরিমাণও উল্লেখযোগ্য পরিমাণে হ্রাস পেয়েছে। বিশেষ করে ভারতের অনুন্নত বীজ উৎপাদনে ব্যাপক নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। তাছাড়া ন্যায্য দাম না পেয়ে কৃষকরাও পাট উৎপাদনের আগ্রহ হারিয়ে ফেলছে।

**পাটশিল্পের বর্তমান অবস্থা :** বাংলাদেশের সোনালী আঁশ বলে খ্যাত পাটশিল্পের অবস্থা বর্তমানে খুবই করুণ। নিচের এ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো-

১. **জুট মিল ও স্পিনিং মিল বন্ধ :** বাংলাদেশে পাটের শোচনীয় অবস্থার প্রেক্ষিতে একে একে অনেক নামকরা জুট মিল ও স্পিনিং মিল বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। যেমন–নারায়ণগঞ্জে অবস্থিত (আদমজী জুট মিল (বিশ্বের বৃহত্তম জুট মিল) লোকসানের কারণে বন্ধ হয়ে যায় ৩০ জুন ২০০২। এতে দেশের পাটশিল্প মুখ থুবড়ে পড়ে।

২. **পাট চাষ হ্রাস :** বর্তমানে বাংলাদেশে পাট চাষের জৌলুস আর নেই। বাজারে পাটের নিম্নমূল্য, সরকারের অনীহা, পাটকল বন্ধ ইত্যাদি কারণে বাংলাদেশে দিন দিন পাট চাষ উল্লেখযোগ্য পরিমাণে হ্রাস পাচ্ছে।



৩. **উৎপাদন ও বিতরণ লক্ষ্যমাত্রার তারতম্য :** ২০১১-১২ অর্থবছরে বিএডিসির পাটবীজের উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা ১৬৫০ মেট্রিক টন এবং বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা ১৫৮৯ মেট্রিক টন। পাটের এ উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা যেমন অর্জিত হওয়া বর্তমান পরিস্থিতিতে অসম্ভব, তেমনি বিতরণ লক্ষ্যমাত্রাও টার্গেট পূরণে অক্ষম।

৪. **আন্তর্জাতিক সুযোগ কাজে লাগানো নিয়ে সংশয় :** আন্তর্জাতিক বাজারে কাঁচা পাটের দাম বেশ চাঙ্গা। একইভাবে পাটজাত পণ্যের বাজার সম্প্রসারণমুখী। এই সুযোগটি আমরা কতটা কাজে লাগাতে পারবো তা নিয়ে যথেষ্ট সংশয় রয়েছে।

৫. **অভ্যন্তরীণ বাজার সংকুচিত :** আদমজী জুট মিলসহ ৫টি জুট মিল বন্ধ হয়ে যাওয়ায় পাটের অভ্যন্তরীণ বাজার সংকুচিত হয়ে পড়ছে। পাটজাত পণ্য রপ্তানিতে এর বিরূপ প্রভাব পড়ছে। অন্যদিকে, পাটের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী ভারতে পাটের আবাদ-উৎপাদন বাড়ছে। পাট উৎপাদন বাড়ানোর জন্য চাষীদের নানাভাবে উৎসাহিত ও সহযোগিত করা হচ্ছে।

৬. **পাট চোরাই পথে পাচার :** ভারত প্রতি বছর যে পরিমাণ পাট বাংলাদেশ থেকে আমদানি করে তার চেয়ে কয়েকগুণ বেশি পাট চোরাপথে টেনে নেয়। ভারতের ৭৫-৮০টি জুট মিল কোনো না কোনোভাবে বাংলাদেশের পাটের ওপর নির্ভর করে সারা বছর চালু থাকে। পাটের এই উৎসটি বন্ধ হলে এগুলোর অধিকাংশই রাতারাতি বন্ধ হয়ে যাবে।

৭. **বেসরকারি খাতের শোচনীয় অবস্থা :** সরকারি খাতের পাশাপাশি আমাদের বেসরকারি খাতের অবস্থাও সঙ্গীন ও শোচনীয়। বেসরকারি জুট মিল অ্যাসোসিয়েশনের অনেক মিলই এখন বন্ধ। এই খাতে হস্তান্তরিত ৩৫টি জুট মিলের ৩০টি এবং ১০টি স্পিনিং মিল বন্ধ বলে জানা গেছে। কাঁচা পাটের পর্যাপ্ত প্রাপ্তি সত্ত্বেও জুট মিলগুলো এই করুণ ও মর্মান্তিক দশায় পতিত।

**বাংলাদেশের পাটশিল্পের ভবিষ্যৎ/সম্ভাবনা :** পাটের হৃতগৌরব ফিরিয়ে আনার প্রচেষ্টা বাংলাদেশে অব্যাহত রয়েছে। সংশ্লিষ্ট কোনো কোনো মহলের দাবি, এখনও বৈদেশিক মুদ্রার ৩০ শতাংশের বেশি পাট থেকে আসে। পাট ও পাটজাত পণ্যের চাহিদাও বহির্বিশ্বে ক্রমাগত বাড়ছে। সুতরাং এই খাতে আয় বাড়ানোর আরো সুযোগ রয়েছে। অন্যদিকে অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রেও পাটের বিপুল সম্ভাবনার কথা বিশেষজ্ঞরা বলে থাকেন। যেমন–

১. **কাঁচা পাট থেকে কাগজের মণ্ড আবিষ্কার :** কাঁচা পাট থেকে কাগজের মণ্ড তৈরির প্রযুক্তি আবিষ্কার করে বিজ্ঞানী আবদুল খালেক আমাদের মাঝে আশার আলো জাগিয়েছিলেন। কাগজের উৎকর্ষ কাঁচামাল হিসেবে পাটের সম্ভাবনা বিপুল। বলা হয়ে থাকে, মণ্ড তৈরিতে পাটের ব্যবহার নিশ্চিত করা গেলে এই খাত থেকে প্রতি বছর আমাদের বাজেটের সম পরিমাণ অর্থ যোগান দেয়া সম্ভব। এতে কাগজ আমদানি করতে আমাদের যে বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় হয় তা লাঘব হবে এবং কৃষকও তার পাটের ন্যায্যমূল্য পাবে।

২. **পাটের মিহি তন্তু আবিষ্কারের প্রচেষ্টা :** পাটের মিহি তন্তুসহ বিভিন্ন তন্তু আবিষ্কারের ব্যাপারে দীর্ঘদিন যাবৎই নানা সম্ভাবনার কথা শোনা যাচ্ছে। বলা হয় যে, পাটের এই মিহি তন্তু ব্যবহার করে উন্নতমানের কাপড় উৎপাদন সম্ভব।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



৩. **পলিথিন ব্যাগের বিকল্প ব্যবহার :** পলিথিন ব্যাগের বিকল্প হিসেবে পাটের ব্যাগের ব্যবহারের কথা সবারই জানা। সস্তায় সহজলভ্য করে পলিথিনসহ প্লাস্টিক ও নাইলনের বিকল্প হিসেবে পাটের ব্যাগকে বাজারে ছাড়তে পারলে এ শিল্প অবশ্যই তার হৃতগৌরব ফিরে পেতে পারে।

৪. **রপ্তানি চাহিদা :** রপ্তানি ক্ষেত্রেও পাটের চাহিদা একেবারে কম নয়। ভারত, চীন, মিশরসহ অন্যান্য আমদানিকারক দেশসমূহে বাংলাদেশী পাটের বেশ চাহিদা রয়েছে।

৫. **পাটের জীবন রহস্য উন্মোচন :** সোনালী আঁশ পাটের বাংলাদেশে নতুন করে স্বপ্নযাত্রা শুরু হয়েছে। মাকসুদুল আলমের নেতৃত্বে বাংলাদেশের একদল বিজ্ঞানী ২০১০ সালে পাটের জীবন রহস্য বা জিন নকশা উন্মোচন করেছেন। এর ফলে বাংলাদেশের আবহাওয়া ও প্রয়োজন অনুযায়ী পাটের নতুন জাত উদ্ভাবন করা যাবে। সর্বোপরি পাটের গুণগত মান ও বিপুল মাত্রায় উৎপাদন করানো সম্ভব হবে।

**সুপারিশমালা :** দেশের বেসরকারি খাতের (বিজেএমএ) অনেক মিল আর্থিক সংকটের কারণে বন্ধ হয়ে গেছে। বর্তমানে সরকারি (বিজেএমসি) এবং বেসরকারি খাতের (বিজেএমএ) অনেক জুটমিল বন্ধ আছে। বিজেএমসি পরিচালিত মিলসমূহের মধ্যে দেশের বৃহত্তম জুট মিল আদমজী পাটকল ইতিমধ্যে বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। আরো ৭টি মিল বেসরকারি খাতে বিক্রয়-হস্তান্তর প্রক্রিয়ার জন্য অনেক দিব যাবৎ বন্ধ রয়েছে। বেসরকারি খাতে প্রায় ২০টি মিলই বর্তমানে বন্ধ রয়েছে। এহেন পরিস্থিতি থেকে পরিত্রাণ পেতে যে সকল নীতি-নির্ধারণী বিবেচনা করা প্রয়োজন তা নিম্নরূপ :

১. **পাটকল বেসরকারি খাতে হস্তান্তর :** সরকারি মালিকানায় বিজেএমসির মাধ্যমে পরিচালিত যে সকল পাটকল বেসরকারি খাতে হস্তান্তর প্রক্রিয়াধীন আছে, তা বেসরকারি ক্রেতা উদ্যোক্তাদের নিকট সত্বর হস্তান্তর প্রক্রিয়া সমাধান করা।

২. **প্রাইভেটাইজেশন ত্বরান্বিত :** বিজেএমসির মাধ্যমে পরিচালিত বাকি মিলসমূহের প্রাইভেটাইজেশন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করা। সরকারি মিলসমূহ বেসরকারি খাতে যতদিন হস্তান্তরিত না হয়, সে সময় সরকারি এবং বেসরকারি খাতের মিলসমূহের মধ্যে দুই রকম বা বৈষম্য নীতি পরিহার করা, দু খাতের মিলের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা বন্ধ করা।

৩. **প্রস্তাবিত সংস্কার কর্মসূচি বাস্তবায়ন :** পাটশিল্প সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য বিশ্বব্যাংকের সুপারিশক্রমে পাট মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে যে পুনর্বিন্যাসকৃত পাটশিল্প সংস্কার কর্মসূচি প্রণয়ন করা হয়েছে এবং যা পাট মন্ত্রণালয়ে জমা আছে, তা বর্তমানে অর্থ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে বিশ্বব্যাংকের সহায়তায় বাস্তবায়নের পদক্ষেপ জরুরিভাবে গ্রহণ করা দরকার। প্রস্তাবিত সংস্কার কর্মসূচি বাস্তবায়ন পাটশিল্পকে পুনর্জীবিত করবে।

**উপসংহার :** বাংলাদেশের পাট শিল্পের উন্নয়ন ও বিকাশের নানা পদক্ষেপ গ্রহণের কথা বলাই হচ্ছে, আসলে কাজের কাজ কিছুই হচ্ছে না। অথচ উল্লিখিত সম্ভাব্য ক্ষেত্রগুলোতে পাটের ব্যবহার নিশ্চিত করা গেলে পাট রাজস্ব ও বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের ক্ষেত্রে শীর্ষে উঠে আসতে পারে। এই সম্ভাবনা কার্যকর করার যথোচিত উদ্যোগ নেয়া জরুরি। একদিন বাংলাদেশই পাটের রাজা ছিল। আবারও রাজার আসনে তাকে অধিষ্ঠিত করতে হবে।



## রচনা ০৯ বাংলাদেশের দারিদ্র্য ও দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি

*[১৫তম বিসিএস]*

**ভূমিকা :** বাংলাদেশ বিশ্বের একটি অন্যতম দারিদ্র্যপীড়িত দেশ। বাংলাদেশে যেসব সামাজিক সমস্যা রয়েছে তার মধ্যে দারিদ্র্য প্রধান সমস্যা। দারিদ্র্যের নির্মম কষাঘাতে এ দেশের সমাজজীবন চরমভাবে বিপর্যস্ত। দারিদ্র্য আমাদের জাতীয় জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে উন্নতি ও অগ্রগতির ধারাকে ব্যাহত করছে। ন্যূনতম জীবনযাত্রার মান বজায় রাখতে পারছে না এ দেশের প্রায় অর্ধেক মানুষ। দারিদ্র্যের প্রভাবে আমাদের দেশের মানুষ মৌলিক মানবিক চাহিদা পূরণে প্রতিনিয়ত ব্যর্থ হয়ে বিভিন্ন ধরনের অপরাধ ও অপকর্ম করছে। কাজেই দারিদ্র্য বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের প্রধান প্রতিবন্ধক। বর্তমান প্রেক্ষাপটে তাই বাংলাদেশের দারিদ্র্য ও দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে সরকারি-বেসরকারি পর্যায়ে গৃহীত কর্মসূচিসমূহের পর্যালোচনা অত্যন্ত গুরুত্বের দাবিদার।

**দারিদ্র্য :** দারিদ্র্য একটি আপেক্ষিক বিষয়। একে সুনির্দিষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত করা যায় না। আভিধানিক অর্থে 'দারিদ্র্য' বলতে অভাব বা অনটনকেই বোঝায়। দারিদ্র্য মানে মৌলিক সামর্থ্যের অভাব। ন্যূনতম খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসার অভাবসমূহ মৌলিক সামর্থ্যের অভাবের আওতায় পড়ে। বস্তুত বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে দরিদ্র হলো সেই ব্যক্তি, যে তার আর্থিক সামর্থ্যের অভাবে নিতান্ত প্রয়োজনীয় খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান এবং চিকিৎসার ন্যূনতম মানও বজায় রাখতে পারে না।

**বাংলাদেশের দারিদ্র্য পরিস্থিতি :** যদিও বিভিন্ন পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাসহ সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রণীত সকল নীতি-পরিকল্পনায় দারিদ্র্য বিমোচনকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে বিগত প্রায় সব সরকারই বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করেছে এবং দারিদ্র্য বিমোচনের প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে, তবুও বাংলাদেশে দারিদ্র্য পরিস্থিতি এখনো উদ্বেগজনক। বিভিন্ন তথ্য মতে, দেশে দারিদ্র্য ক্রমহ্রাসমান হলেও এখনো দারিদ্র্যের উপস্থিতি সুবিস্তৃত ও গভীর। বর্তমানে দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাসকারী জনগণের সংখ্যা প্রায় ২৪ শতাংশ। 'রূপকল্প ২০২১' পূরণে ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশে দারিদ্র্যসীমা ১৫ শতাংশ কমিয়ে আনার পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে।

**সমাজে দারিদ্র্যের প্রভাব :** বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার একটি বিশাল অংশ বর্তমানে দারিদ্র্যের নির্মম কষাঘাতে জর্জরিত হবার কারণে এ দেশের আর্থ-সামাজিক জীবনে দারিদ্র্য অত্যন্ত ব্যাপক ও সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করেছে। আমাদের জীবনের এমন কোনো দিক নেই যা দারিদ্র্যের প্রভাবমুক্ত। এ দেশের প্রতিটি সমস্যার সাথেই দারিদ্র্য প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িত। বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক জীবনে দারিদ্র্যের বিরূপ প্রভাবের বিশেষ বিশেষ দিকগুলো নিচে অতি সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো :

১. দারিদ্র্যের ব্যাপকতার ফলে দেশের একটি বিশাল জনগোষ্ঠী অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা ও চিত্তবিনোদনসহ তাদের জীবনের কোনো মৌলিক চাহিদাই সঠিকভাবে পূরণ করতে পারছে না।

২. 'যত মানুষ তত রোজগার'—এই ধারণার বশবর্তী হয়ে দরিদ্র জনগণ অধিক সন্তান জন্ম দেয় বলে দেশের জনসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে।

৩. দাম্পত্য কলহ; পারিবারিক ভাঙন, আত্মহত্যা, যৌতুকপ্রথা, পতিতাবৃত্তি, অপরাধপ্রবণতা প্রভৃতি দারিদ্র্যের কারণে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



৪. দারিদ্র্যের ব্যাপকতার কারণেই বাংলাদেশে কৃষি খাত, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প, ভারী শিল্পসহ ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে প্রত্যাশিত উন্নতি ঘটছে না।
৫. দারিদ্র্যের প্রভাবে দেশে স্বাস্থ্য ও পুষ্টিহীনতা ব্যাপকহারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে বার্ধক্য, অকালমৃত্যু, অন্ধত্ব, দুর্বলতা, অসুস্থতা প্রভৃতি ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে।
৬. দারিদ্র্যের প্রভাবে দেশে সামাজিক অনিশ্চয়তা বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে শ্রমিক অসন্তোষ, যুব অসন্তোষ, রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা, হরতাল, ধর্মঘট প্রভৃতি বৃদ্ধি পাচ্ছে।
৭. দারিদ্র্যের কারণে পর্যাপ্ত কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে না পারায় দেশে বেকারত্বের হার বেড়েই চলছে।
৮. দারিদ্র্যের প্রভাবে দেশের শিক্ষাক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় অগ্রগতি অর্জন করা যাচ্ছে না।

এক কথায় বলা চলে, দারিদ্র্য হলো সকল সামাজিক সমস্যার মূল উৎস এবং আমাদের দেশে জাতীয় উন্নয়নের প্রধান অন্তরায়। দারিদ্র্য শুধু একটি সামাজিক সমস্যাই নয়, বরং বহু সামাজিক সমস্যার জন্মদাতাও। তাই দারিদ্র্য বাংলাদেশের জন্য একটি মারাত্মক অভিশাপ।

**বাংলাদেশে দারিদ্র্যের কারণ :** বাংলাদেশে দারিদ্র্যের ব্যাপকতার জন্য কোনো একক কারণ দায়ী নয় বরং বহুবিধ কারণেই এ দেশে দারিদ্র্য ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছে। বাংলাদেশে দারিদ্র্য বিস্তারের প্রধান কারণগুলো হলো দীর্ঘ সময় ধরে সাম্রাজ্যবাদী ও ঔপনিবেশিক শাসকদের দ্বারা শোষিত হওয়া, অনুন্নত কৃষিব্যবস্থা, অনগ্রসর শিল্পব্যবস্থা, ত্রুটিপূর্ণ শিক্ষাব্যবস্থা, মাত্রাতিরিক্ত জনসংখ্যা, কুসংস্কার ও ভাগ্যের ওপর নির্ভরশীলতা, প্রাকৃতিক দুর্যোগের ব্যাপকতা, দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র, সম্পদের অসম বণ্টন, মুদ্রাস্ফীতি ও দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, নিরক্ষরতা ও অজ্ঞতা, ভয়াবহ বেকারত্ব, ব্যাপক বাণিজ্য ঘাটতি, সামাজিক নিরাপত্তার অভাব, প্রাকৃতিক সম্পদের অপূর্ণ ব্যবহার, বাস্তবমুখী নীতি ও পরিকল্পনার অভাব, মহিলাদের কর্মসংস্থানের অভাব, প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা, ব্যাপক আকারে দুর্নীতি ইত্যাদি।

**দারিদ্র্য বিমোচনে সরকারি কর্মসূচি :** বাংলাদেশ সরকার দেশের দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য যে সকল কর্মসূচি গ্রহণ করেছে সেগুলো নিচে আলোচনা করা হলো :

**সামাজিক নিরাপত্তা :** বর্তমান ২০১৪-১৫ অর্থবছরের বাজেটে সামাজিক নিরাপত্তা ও কল্যাণ খাতে ১৫,১৯৭ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। তাছাড়া, মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম (২০১০-১১)-এর আওতায় পলিসি সাপোর্ট হিসেবে গৃহীত পদক্ষেপসমূহ বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে নিম্নলিখিত কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে :

- চলতি অর্থবছরে বয়স্ক, দুস্থ মহিলা, অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধা, প্রতিবন্ধী, এতিম প্রভৃতি জনগোষ্ঠীর জন্য বিভিন্ন ভাতা হিসেবে নগদ প্রদান ও খাদ্য নিরাপত্তা কার্যক্রমের পরিধি ও বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হয়েছে।
- সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য (এমডিজি) বিবেচনায় রেখে দারিদ্র্য বিমোচন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনকল্পে ২০১৪-১৫ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় সামাজিক নিরাপত্তা ও সামাজিক ক্ষমতায়ন খাতে ১৫,১৯৭ কোটি টাকা বরাদ্দ রয়েছে। সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় নগদ প্রদান হিসেবে বয়স্ক ভাতা বাবদ ৯৮০.১০ কোটি টাকা, স্বামী পরিত্যক্তা দুঃস্থ মহিলাদের জন্য ৩৬৪.৩২ কোটি টাকা, অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধা সম্মানী ৩৬০ কোটি টাকা। এছাড়া ২০১৩-১৪ অর্থবছরে জলবায়ু পরিবর্তন তহবিল বাবদ ২,৭০০.০০ কোটি টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে।



- দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন, পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (PKSF), মিউনিসিপ্যাল ডেভেলপমেন্ট ফান্ড (MDF), সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (SDF), বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন (BNF), ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট কোম্পানি লিমিটেড (IDCOL) প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের কাছে ন্যস্ত ক্ষুদ্র ঋণ ও বিনিয়োগ তহবিলসমূহের সঞ্চালন গতি বৃদ্ধির চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। ২০১২-১৩ অর্থবছরে PKSF, SDF ও BNF-এর ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচি বাবদ যথাক্রমে ৩৪৯.৫০ কোটি টাকা, ৩৪২.৭০ কোটি (সংশোধিত বরাদ্দ) টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে।
- সরকারি শিশু পরিবার ও অন্যান্য নিবাসীদের খোরাকী ভাতা ২২.৯০ কোটি টাকা হতে ২৭.৫৪ কোটি টাকায় উন্নীত করা হয়েছে। শহীদ পরিবার ও মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য রেশন বাবদ ২১.০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। এছাড়া দুর্যোগ অনুদান হিসেবে থোক বরাদ্দ ৮৫ কোটি টাকা হতে বৃদ্ধি করে ১০০ কোটি টাকা করা হয়েছে।
- সরকারের fiscal কার্যক্রম অব্যাহত এবং জোরদার করার প্রয়োজনে বিশ্বব্যাংক এবং এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকসহ উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাসমূহের বিশেষ বাজেট সহায়তা (Budget Supoort) গ্রহণের প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।
- পল্লী উন্নয়ন বোর্ড, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, সমাজকল্যাণ অধিদপ্তর, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, মৎস্য অধিদপ্তর, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, বিসিক প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের কাছে বিদ্যমান ঘূর্ণায়মান ক্ষুদ্রঋণ তহবিলসমূহের সঞ্চালন ও প্রচলন গতি বৃদ্ধির জন্য উদ্যোগ অব্যাহত রয়েছে।

প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য উপরোক্ত পদক্ষেপসমূহকে কতিপয় কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সামাজিক নিরাপত্তা ও সামাজিক ক্ষমতায়ন খাতে নিম্নলিখিত কার্যক্রমের অনুকূলে বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হয়েছে।

**সামাজিক নিরাপত্তা ও সামাজিক ক্ষমতায়ন খাত**

*(কোটি টাকায়)*

| কার্যক্রম | বাজেট (২০১৩-১৪) | বাজেট (২০১২-১৩) (সংশোধিত) |
|---|---|---|
| নগদ প্রদানসহ (বিভিন্ন ভাতা) ও অন্যান্য কার্যক্রম | ৯০৮০.৬৮ | ৭৭০৫.১৪ |
| নগদ প্রদান (বিশেষ) কার্যক্রম : সামাজিক ক্ষমতায়ন | ৭৬.১৫ | ৫৯.১২ |
| খাদ্য নিরাপত্তা কার্যক্রমসমূহ : সামাজিক নিরাপত্তা | ৬৯৯৮.০৮ | ৭০৭২.৫৫ |
| ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচি | ৩৪৯.৫০ | ৩৪২.৭০ |
| বিভিন্ন তহবিল | ৪৩২৬.৩৫ | ৩১৯২.৯৬ |

**সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচির আওতায় নগদ অর্থ সহায়তা প্রদান কার্যক্রম :** জানুয়ারি, ২০১৪ পর্যন্ত বিভিন্ন ভাতা বাবদ ৬৯৯৮.০৮ কোটি টাকা বিতরণ করা হয়েছে। খাদ্য নিরাপত্তাসহ বিভিন্ন কর্মসংস্থানমূলক কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের কাজ এগিয়ে চলেছে। সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচির আওতায় নগদ অর্থ সহায়তা প্রদান বিষয়ক উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহ নিম্নরূপ :

১. **বয়স্ক ভাতা কর্মসূচি :** বাংলাদেশের দুর্দশাগ্রস্ত, অবহেলিত, আর্থিক দৈন্যতায় জর্জরিত বয়স্ক জনগোষ্ঠীর আর্থসামাজিক অবস্থা বিবেচনা করে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় বয়স্ক ভাতা

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাস্তবায়িত এ কার্যক্রমে ২০১৩-১৪ অর্থবছরে বয়স্কভাতা কর্মসূচির জন্য ৯৮০.১০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়। এর ফলে মাসিক ৩০০ টাকা হারে প্রায় ০.২৭ কোটি ভাতাভোগী উপকৃত হচ্ছে।

২. **অসচ্ছল প্রতিবন্ধীদের জন্য ভাতা :** সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন এ কর্মসূচির জন্য ২০১৩-১৪ অর্থবছরে বরাদ্দ রয়েছে ১৩২.১৩ কোটি টাকা এবং ফেব্রুয়ারি ২০১৪ পর্যন্ত ৯৯.১০ কোটি টাকা বিতরণ করা হয়েছে।

৩. **বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা দুঃস্থ মহিলা ভাতা কার্যক্রম :** গ্রামের দরিদ্র, অসহায় ও অবহেলিত মহিলা জনগোষ্ঠী বিশেষ করে বিধবাভাতা খাতে চলতি অর্থবছরে বরাদ্দের অঙ্ক ৩৬৪ কোটি ৩২ লক্ষ টাকা। এর মাধ্যমে ৯ লক্ষ ২০ হাজার সুবিধাভোগীকে নগদ সহায়তা প্রদান করা হবে।

৪. **দরিদ্র মায়ের জন্য মাতৃত্বকালীন ভাতা :** এ কর্মসূচির ২০১৩-১৪ অর্থবছরের লক্ষ্য অনুযায়ী নির্বাচিত ১.১৬ লক্ষ জন ভাতাভোগী মাকে মাসিক ৩৫০ টাকা হারে ভাতা প্রদানের পাশাপাশি স্বাস্থ্য ও পুষ্টি এবং অন্যান্য বিষয়ে সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করে মা'দের দারিদ্র্য হ্রাস এবং মা ও শিশুর পুষ্টি উপাদান গ্রহণ বৃদ্ধি করা হবে। এ লক্ষ্যে ২০১৩-১৪ অর্থবছরের জন্য ৪৮.৮৮ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে।

৫. **অসচ্ছল প্রতিবন্ধীদের জন্য ভাতা :** এ কর্মসূচির আওতায় ২০১৩-১৪ অর্থবছরে ৩ লক্ষ ১৪ হাজার জন প্রতিবন্ধীদের জন্য মাসিক ৩৫০ টাকা হারে মোট ১৩২ কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছে।

৫. **মুক্তিযোদ্ধার সম্মানী ভাতা :** এ কর্মসূচির আওতায় ২০১৩-১৪ অর্থবছরে গত অর্থবছরের মতোই ২ লক্ষ জন মুক্তিযোদ্ধার জন্য মাসিক ২,০০০ টাকা হারে ৩৬০ কোটি টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে, যা মুক্তিযোদ্ধাদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে ভূমিকা রাখছে।

৭. **অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধা ও তাদের পোষ্যদের জন্য প্রশিক্ষণ এবং আত্মকর্মসংস্থানের জন্য ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচি :** এ কর্মসূচির লক্ষ্য মুক্তিযোদ্ধা ও তাদের পোষ্যদের আত্মকর্মসংস্থানমূলক কর্মকাণ্ডের উপযোগী দক্ষ মানব সম্পদ হিসেবে গড়ে তোলার জন্য একক বা যৌথভাবে বিভিন্ন ট্রেডে দক্ষতা উন্নয়নে প্রশিক্ষণ প্রদান করা এবং সে দক্ষতা কাজে লাগিয়ে আত্মকর্মসংস্থান সৃজনের লক্ষ্যে ঋণ প্রদান করা। ডিসেম্বর ২০১৩ পর্যন্ত এ কর্মসূচির অনুকূলে ৫০.৮৮ কোটি টাকা বিতরণ করা হয়, যার বিপরীতে ৩০.৭১ কোটি টাকা আদায় করা হয় এবং আদায়ের হার শতকরা ৬০.৩৬।

৮. **গৃহায়ন তহবিল :** বাসস্থান মানুষের মৌলিক চাহিদাগুলোর অন্যতম বিবেচনায় দেশের গৃহহীন, দরিদ্র ও নিম্নবিত্ত জনগোষ্ঠী বিশেষ করে গ্রামীণ গৃহহীন পরিবারের বাসস্থান সমস্যা নিরসন তথা দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে সরকার ১৯৯৭-৯৮ অর্থবছরে ৫০.০০ কোটি টাকা বাজেট বরাদ্দের মাধ্যমে গৃহায়ন তহবিল গঠন করে। বাজেট বরাদ্দের মাধ্যমে এ পর্যন্ত তহবিল কর্তৃক প্রাপ্ত অর্থের পরিমাণ ১৬৭.০১ কোটি টাকা।

৯. **কাজের বিনিময়ে খাদ্য (কাবিখা) কর্মসূচি :** গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কারের জন্য খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়াধীন কাজের বিনিময়ে খাদ্য (কাবিখা) কর্মসূচির আওতায় ২০১৩-১৪ অর্থবছরে ৫০ লক্ষ মানুষের জন্য ১,৪৫৬.৯৮ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।



১০. **ভিজিডি :** এই কর্মসূচির জন্য ২০১৩-১৪ অর্থবছরে বরাদ্দ করা হয়েছে ৮৮৯.২০ কোটি টাকা। ২০১২-১৩ অর্থবছরে ৭,৫০,০০০ জন উপকারভোগীকে প্রতিমাসে ৩০ কেজি খাদ্য সহায়তাসহ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে এবং ২ লক্ষ ৭০ হাজার মেট্রিক টন খাদ্য সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

১১. **ভিজিএফ এবং গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ (টেস্ট রিলিফ-টিআর) :** খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়াধীন ভিজিএফ কর্মসূচির আওতায় ২০১৩-১৪ অর্থবছরে ১,৩২৬.৯১ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। টিআর কর্মসূচির আওতায় ২০১৩-১৪ অর্থবছরে ৩৯ লক্ষ মানুষের জন্য ১,২৯১.৯৪ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

**উন্নয়ন বাজেটের আওতায় দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি :** সরকারি উদ্যোগে দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য ওপরের কর্মসূচিসমূহ ছাড়াও উন্নয়ন বাজেটের আওতায় সরাসরি দারিদ্র্য বিমোচনে অবদান রাখার লক্ষ্যে আদর্শ গ্রাম, সমন্বিত মৎস্য কার্যক্রমের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন, পশুসম্পদ উন্নয়ন কার্যক্রমে আত্মকর্মসংস্থান, গ্রামীণ মহিলাদের জন্য কর্মসংস্থান সৃষ্টি, কৃষি বহুমুখীকরণ ও নিবিড়করণ, তাঁতিদের জন্য ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থান, দারিদ্র্য বিমোচনে স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণ বৃদ্ধিকরণ, সামাজিক ক্ষমতায়ন, পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন, পল্লী বিদ্যুতায়ন, গ্রামীণ স্যানিটেশন প্রকল্প, উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম, মাধ্যমিক স্তরের ছাত্রীদের উপবৃত্তি প্রদান, মসজিদভিত্তিক দারিদ্র্য বিমোচন, পল্লী মাতৃকেন্দ্রের মাধ্যমে জনসংখ্যা কার্যক্রম জোরদারকরণ, সম্প্রসারিত পল্লী সমাজকর্ম, দরিদ্র মহিলাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, যুব প্রশিক্ষণ ও আত্মকর্মসংস্থান ইত্যাদি কর্মসূচি বাস্তবায়িত হচ্ছে।

**অন্যান্য সংস্থার দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি :** বাংলাদেশের দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে স্থানীয় সরকার ও প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি), বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি), পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন এবং বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী বিভিন্ন ধরনের কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে।

**দারিদ্র্য বিমোচনে এনজিওসমূহের কর্মসূচি :** বাংলাদেশে সরকারি সংস্থার পাশাপাশি বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থাও (এনজিও) দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। এর মধ্যে ব্র্যাক, প্রশিকা, আশা, কারিতাস, স্বনির্ভর বাংলাদেশ প্রভৃতি এনজিওর কার্যক্রম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এ সকল এনজিওর উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম হলো ঋণ প্রদান, শিশু ও বয়স্কদের জন্য উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কর্মসূচি, প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা, মহিলাদের অধিকার সম্বন্ধীয় আইনগত পরামর্শ প্রদান, মৎস্য ও পশুসম্পদ উন্নয়ন, রেশম সম্পদ উন্নয়ন, সেচ কর্মসূচি, নলকূপ স্থাপন ও বিতরণ, পরিবেশসম্মত কৃষি, সামাজিক বনায়ন ও গৃহায়ন কর্মসূচি ইত্যাদি।

**দারিদ্র্য বিমোচনে সফলতার জন্য করণীয় :** দারিদ্র্য বিমোচনের ক্ষেত্রে বেশ কিছু ইতিবাচক অগ্রগতি ও সফলতা অর্জিত হলেও বাংলাদেশে দারিদ্র্যের প্রভাব ও বিস্তার এখনো অত্যন্ত ভয়াবহ ও ব্যাপক। দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে গৃহীত কর্মসূচিসমূহ সংগঠিত, পরিকল্পিত, পর্যাপ্ত এবং বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ও দক্ষতা নির্ভর না হওয়ায় এ ক্ষেত্রে প্রত্যাশিত সফলতা অর্জিত হচ্ছে না। নিচে বাংলাদেশে দারিদ্র্য বিমোচনে সফলতা লাভের জন্য কয়েকটি উপায়ের কথা উল্লেখ করা হলো :

- ধনী-গরিবের মাঝে বিদ্যমান ব্যাপক বৈষম্য দূর করার কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।
- শক্তিশালী স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে জাতীয় আয় বণ্টনের ব্যবস্থা করতে হবে।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



- যে কোনো মূল্যে বেকার জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে।
- জাতীয় পর্যায়ে দারিদ্র্য বিমোচনের বাস্তবমুখী নীতি, পরিকল্পনা ও কর্মসূচি প্রণয়ন করে তা স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করতে হবে।
- কৃষি, শিল্প প্রভৃতি খাতে উৎপাদন বৃদ্ধির বাস্তবভিত্তিক কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।
- যে কোনো মূল্যে দেশের সকল খাতে বিদ্যমান দুর্নীতি বন্ধের ব্যবস্থা করতে হবে।
- প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলার জন্য প্রতিরোধ, প্রতিকার, উন্নয়ন ও সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
- কর্মমুখী ও বাস্তবভিত্তিক শিক্ষাব্যবস্থা চালু করতে হবে।
- রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করতে হবে।
- মুদ্রাস্ফীতি রোধ করে দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি রোধ করতে হবে।
- আইনের শাসন, সুবিচার, সুশাসন ও ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠা করতে হবে।
- যোগাযোগ ও যাতায়াত ব্যবস্থার উন্নতি করতে হবে।
- প্রাতিষ্ঠানিক ঋণের পর্যাপ্ততা ও সহজলভ্যতা বৃদ্ধি করতে হবে।
- হরতাল, ধর্মঘট, সন্ত্রাস, সামাজিক বিশৃঙ্খলা ইত্যাদি বন্ধ করে স্থিতিশীল ও শান্তিপূর্ণ সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে হবে।
- সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগ (FDI) বৃদ্ধির ব্যবস্থা করতে হবে।

উপরোক্ত পদক্ষেপসমূহ বাস্তবায়ন করতে পারলে বাংলাদেশের জনগণকে দারিদ্র্যের চরম অভিশাপ থেকে মুক্ত করা সম্ভব হবে।

**উপসংহার :** দারিদ্র্য বাংলাদেশের একটি জটিল ও মারাত্মক সামাজিক সমস্যা। দারিদ্র্যই বাংলাদেশের জাতীয় উন্নতি ও অগ্রগতির পথে প্রধান প্রতিবন্ধক এবং দেশের হাজারো সমস্যার জন্মদাতা। তাই যে কোনো মূল্যে দারিদ্র্য বিমোচন করতে হবে। কিন্তু দারিদ্র্য বিমোচন তথা অর্থনৈতিক উন্নয়ন একটি বহুমাত্রিক ও জটিল বিষয়। দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন অর্থনীতিতে উচ্চ প্রবৃদ্ধি অর্জন ও জাতীয় আয়ের সুষম বন্টন। বাংলাদেশে সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে বার্ষিক প্রবৃদ্ধি ৬ থেকে ১০ শতাংশে উন্নীত করা ছাড়া অন্য কোনো বিকল্প নেই। এজন্য দেশের সরকার ও সর্বস্তরের জনগণকে অব্যাহত প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে।

## রচনা ১০ সাম্প্রতিক পণ্যমূল্য বৃদ্ধি ও গণ-জীবন/দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি

*[১১তম বিসিএস]*

**ভূমিকা :** বর্তমানে দেশের অন্যতম আলোচ্য বিষয় নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য লাগামহীন বৃদ্ধি। মূল্য বৃদ্ধির এ হার আশঙ্কাজনক পর্যায়ে উপনীত হওয়ায় তা 'টক অব দি কান্ট্রি'তে পরিণত হয়েছে। বলগাহীন আকাশচুম্বী দ্রব্যমূল্যে বিপর্যস্ত হয়ে জনজীবনে নাভিঃশ্বাস উঠেছে। দৈনন্দিন জীবনে আমাদের বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজন অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসা। আর এ মৌলিক মানবিক চাহিদাগুলোর মধ্যে অন্নের প্রয়োজন সর্বাগ্রে। কিন্তু খাদ্যদ্রব্য, চাল, ডাল, তেল, লবণ, মরিচ, পিঁয়াজ, রসুন, মাছ, তরকারি, চিনি, দুধ ইত্যাদি নিত্যদিনের প্রয়োজনীয় জিনিসের মূল্যের অস্বাভাবিক ঊর্ধ্বগতি জনজীবনের গতিকে অচল ও আড়ষ্ট করে তুলেছে ক্ষুধার্ত মানুষ দ্রব্যমূল্যের এই ঊর্ধ্বগতিতে অর্ধাহারে, অনাহারে দিনাতিপাত করছে। দ্রব্যমূল্য তাদের নাগালের মধ্যে থাকার অভিপ্রায় ব্যক্ত করেছে তারা। কিন্তু বাস্তব পরিস্থিতি তাদের প্রতিকূলে। তবুও আশার রাজ্যে জনগণের বিশ্বাস দ্রব্যমূল্যের এই অবস্থার পরিবর্তন হবে, তাদের আশা বাস্তবে রূপ নেবে।



**দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট :** বর্তমানে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি আমাদের দেশের প্রধান সমস্যা হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। ন্যায়সঙ্গত মূল্য বলতে বর্তমানে কোনো নির্ভরযোগ্য সূত্র পাওয়া যায় না। অথচ মাত্র কয়েক দশক আগেও আমাদের দেশের অবস্থা এমন ছিল না। অতীতের সেই কথাগুলো আজ আমাদের কাছে রূপকথার মতো মনে হয়। যেমন—শায়েস্তা খাঁর আমলে টাকায় আট মন চাল পাওয়া যেত। এখন আর সে মূল্য আশা করা যায় না। এক সের লবণ এক পয়সা, এক পয়সায় এক সের দুধ, দু আনায় এক সের তেল, একটি লুঙ্গি এক টাকা এবং একটি সুতি শাড়ি দু টাকা—তা খুব বেশি দিনের কথা না হলেও এটা কেউ এখন আর আশা করে না। ব্রিটিশ শাসনামলেও আমাদের দেশে দ্রব্যমূল্য একটা নিয়ন্ত্রিত অবস্থায় ছিল। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান ও ভারত বিভক্ত হওয়ার পর এ অবস্থার কিছুটা পরিবর্তন হলেও পণ্যদ্রব্যের মূল্য মানুষের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যেই থাকে। ১৯৭১ সালে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ রাষ্ট্রের উদ্ভব হলে দেশে অর্থনৈতিক বিপর্যয়, দুর্ভিক্ষ ও মহামারী আমাদের জীবনে অতর্কিত হানা দেয়। জনজীবন হয় অতিষ্ঠ। এরই ধারাবাহিকতায় আজ আমাদের এই অবস্থান। বর্তমানে দ্রব্যমূল্যের লাগামহীন ঘোড়া জনগণকে হতাশার রাজ্যে নিয়ে গেছে।

**দ্রব্যমূল্যের ক্রমবৃদ্ধি :** দিনের পর দিন দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি জনমনে হতাশা ও উদ্বেগের সৃষ্টি করেছে। অতি মুনাফালোভী এক শ্রেণীর ব্যবসায়ী মহলের চক্রান্তে দ্রব্যমূল্যের হাল একেবারে বেসামাল হয়ে পড়েছে। চোরাচালান ও কালোবাজারীর ফলে অধিকাংশ পণ্যের দাম অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে যাচ্ছে। নিত্যব্যবহার্য দ্রব্যের দাম বিশেষ করে চাল, ডাল, তেল, পিঁয়াজ, মরিচ, মাছ, মাংস, তরি-তরকারি ইত্যাদির দাম দফায় দফায় বৃদ্ধি পাচ্ছে। দ্রব্যমূল্যের ক্রয়বৃদ্ধির কিছু চিত্র নিচে তুলে ধরা হলো :

১. **নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য :** ২০০২ সালের জুলাই মাসে প্রতি লিটার সয়াবিন তেল ছিল ৩৮ থেকে ৪০ টাকা। ২০১৩ সালে প্রতি লিটার সয়াবিনের মূল্য এসে দাঁড়িয়েছে ১৩৬ টাকায়। তাছাড়া মাংস, মসলা, চাল ইত্যাদি পণ্যের দামও জনগণের ক্রয়ক্ষমতার বাইরে চলে গেছে। বর্তমানে এক কেজি চালের দাম ৩০-৫০ টাকা, এক কেজি মাছ ২০০-৮০০ টাকা, এক কেজি গরুর মাংস ২৮০ টাকা, খাসির মাংস ৪৮০ টাকা বিক্রি হচ্ছে। অপরদিকে এক কেজি রসুন ৬০ টাকা, আদা ১০০ টাকা, শুকনা মরিচ ১৫০ টাকা, হলুদ ১৫০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। আর এক কেজি মসুর ডাল ১১০-১২০ টাকা, খেসারি ডাল ৬০-৭০ টাকা, মুগ ডাল ১২০-১৫০ টাকা দরে বিক্রি হচ্ছে। নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের এরূপ মূল্যবৃদ্ধি জনমতে বিরূপ প্রভাব ফেলেছে।

২. **পানির বিল :** পূর্বে পানির বিলের দাম ছিল প্রতি এক হাজার লিটার ৪ টাকা ৩০ পয়সা। ২০০২ সালের আগস্ট মাস থেকে করা হয়েছে ৪ টাকা ৫০ পয়সা। ২০০৩ সালের সেপ্টেম্বর থেকে করা হয়েছে ৪ টাকা ৭৫ পয়সা। বর্তমান পানির বিলের দাম আরো বৃদ্ধি পেয়েছে প্রায় দেড় থেকে দুই গুণ। পানির এরূপ বিল শহরবাসীদের আতঙ্কিত করে তুলেছে।

৩. **গ্যাস বিল :** গ্যাসের বিল পূর্বে ছিল প্রতি মাসে সিঙ্গেল চুলা ২১০ টাকা এবং ডাবল চুলা ৩৩০ টাকা। জানুয়ারি ২০০২ থেকে করা হয়েছে সিঙ্গেল ২৭৫ টাকা (৬৫ টাকা বৃদ্ধি) এবং ডাবল ৩৫০ টাকা (২০ টাকা বৃদ্ধি) এবং মাত্র ৮ মাস চলার পরেই সেপ্টেম্বর ২০০২ থেকে রেট বাড়িয়ে আবার করা হয়েছে সিঙ্গেল ৩৫০ টাকা এবং ডাবল ৩৭৫ টাকা। বর্তমানে সিঙ্গেল চুলা ৪০০ এবং ডাবল চুলা ৪৫০ টাকা করা হয়েছে।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



৪. **বিদ্যুৎ বিল :** গত কয়েক বছর ধরে বিদ্যুতের দাম অস্বাভাবিক হারে বৃদ্ধি করা হয়েছে। পূর্বে ১ থেকে ১০০ ইউনিট পর্যন্ত ২.২৬ টাকা ছিল। কিন্তু সেপ্টেম্বর ২০০৩ থেকে ২.৫০ টাকা করা হয়েছে। জুন ২০১২ পর্যন্ত ১০০ ইউনিট পর্যন্ত ব্যবহারের ক্ষেত্রে প্রতি ইউনিট বিদ্যুতের দাম ছিল ৩.০৫ টাকা। ১০১ থেকে ৪০০ ইউনিট পর্যন্ত পূর্বে ছিল ২.৪২ টাকা, বর্তমানে ১০১ থেকে ৪০০ ইউনিট ৪.০৫ টাকা। ৪০১ থেকে তদূর্ধ্ব ৮ টাকা। সাধারণত বাসা বাড়ির বিদ্যুৎ খরচ থাকে ১০১ থেকে ৪০০ ইউনিটের মধ্যে, আর এই জায়গাতেই রেট বাড়িয়ে করা হয়েছে ৪.০৫ টাকা।

এরূপ হারে পানির বিল, গ্যাস বিল, টেলিফোন বিল ও দ্রব্যমূল্যের অতিরিক্ত খরচ জনগণের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেছে। আর মধ্যবিত্ত শ্রেণীই মূল্যের এরূপ বৃদ্ধিতে অসহায় ও নিরুপায় হয়ে পড়েছে।

**দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির কারণ :** দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির মূলে রয়েছে স্বার্থপরতা, অসাধু সমাজবিরোধী তৎপরতা, অর্থলোভী মানুষের মানবতাবিরোধী আচরণ। নিচে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির কারণসমূহ আলোচনা করা হলো :

১. **চাঁদাবাজি :** দেশে চাঁদাবাজি আজ নিত্যদিনের ঘটনায় পরিণত হয়েছে। গবেষণায় দেখা গেছে, কৃষকের কাছ থেকে কোনো দ্রব্য কেনার পর ঢাকা পর্যন্ত পৌছাতে ট্রাকের ভাড়ার প্রায় কাছাকাছি খরচ পড়ে চাঁদাবাজ, ট্রাক লোড-আনলোড করা এবং খাজনা খরচে। রাস্তার চাঁদাবাজি ছাড়াও কারওয়ান বাজারে নিয়ে আসার পরও পুলিশকে চাঁদা দিতে হয়। এক হিসেবে দেখা গেছে, যশোর থেকে ঢাকা পর্যন্ত সবজি আনতে ট্রাক ভাড়া দিতে হয় সাড়ে পাঁচ থেকে ছয় হাজার টাকা। রাস্তায় চাঁদাবাজির কারণে খরচ পড়ে কম-বেশি দু হাজার টাকা আর ট্রাকে মাল ওঠাতে-নামাতে ১৩০০ থেকে ১৫০০ টাকা। এ ধরনের চাঁদাবাজির দরুণ দ্রব্যমূল্য লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে।

২. **আমদানি পণ্য :** ভোজ্য তেলের পর্যাপ্ত মজুদ থাকা সত্ত্বেও খুচরা ব্যবসায়ীদের ওপর কোনো নিয়ন্ত্রণ না থাকায় ভোজ্য তেলের দাম ও নিত্য ব্যবহার্য জিনিসের দাম বৃদ্ধির আরেকটি কারণ। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, বর্তমানে পাইকারি বাজারে প্রতি কেজি সয়াবিন ১০০ টাকা হলেও খুচরা বাজারে বিক্রি হচ্ছে ১৩৬ টাকা। কয়েক বছরের হিসেবে দেখা গেছে, রমজান মাসে দেশে মোট ৯০-৯৫ হাজার টন ভোজ্য তেলের চাহিদা থাকে। এ সুযোগে এক শ্রেণীর অসাধু ব্যবসায়ী পূর্ব থেকেই তেল মজুদ করে রমজান মাসে দাম বাড়িয়ে দেয়।

৩. **জনসংখ্যা বৃদ্ধি :** সুজলা-সুফলা, শস্য-শ্যামলা আমাদের এই বাংলাদেশ। কিন্তু সেই রূপকথার বাংলা আর নেই। নেই গোলাভরা ধান, গাল ভরা পান, গোয়াল ভরা গরু, পুকুর ভরা মাছ। পেটে খাবার নেই, পরনে নেই কাপড়। এসবের মূল কারণ হলো জনসংখ্যার দ্রুত বৃদ্ধি। অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১৪ মতে, বাংলাদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ১.৩৭%। মানুষ বাড়ছে অথচ জমি বাড়ছে না, বাড়ছে না খাদ্যোৎপাদন। ফলে নিত্যনিদের জিনিসের অপ্রতুল সরবরাহের কারণে দাম অস্বাভাবিক হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

৪. **জমির উর্বরতা হ্রাস :** যুগের পর যুগ ধরে আমাদের জমিগুলোতে সনাতন পদ্ধতিতে চাষাবাদ করা হচ্ছে। জমিতে একই ধরনের ফসল উৎপাদন, সার ও কীটনাশক ব্যবহারের ফলে জমির উর্বরতা শক্তি হ্রাস পাচ্ছে। কৃষকের প্রত্যাশা অনুযায়ী জমিতে ফসল ফলছে না। অথচ চাহিদা বাড়ছে দিনের পর দিন। বাজারে চাহিদার তুলনায় অনেক কম খাদ্যশস্য আমদানি হচ্ছে। বাধ্য হয়েই চড়া দামে ভোক্তারা তা কিনছেন। জমিতে আশানুরূপ ফসল উৎপাদিত হলে সরবরাহ বৃদ্ধি পাবে এবং দ্রব্যমূল্যের দামও জনগণের ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে থাকবে।



৫. **অনুন্নত পরিবহন ব্যবস্থা :** যানবাহনের অব্যবস্থা, রাস্তাঘাটের অভাবে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে মালামাল পৌছাতে নির্দিষ্ট খরচের তুলনায় অনেক বেশি খরচ হয়ে থাকে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, রংপুর, দিনাজপুর থেকে ঢাকায় পণ্য আমদানি করতে স্থানীয় দামের তুলনায় পরিবহন ব্যবস্থার সমস্যার কারণে কয়েকগুণ খরচ বেশি হয়ে থাকে। রংপুর, দিনাজপুরে যে জিনিসের দাম কেজি প্রতি ৪-৫ টাকা, ঢাকায় সেই একই জিনিস কেজি প্রতি ২০-২৫ টাকায় বিক্রি হয়ে থাকে। পরিবহন ব্যবস্থার ত্রুটি এবং অনেক জিনিস নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অন্য স্থানে সরবরাহ করতে না পারার কারণে তা পচে যায়। এতে দ্রব্যের অপ্রতুলতা ঘটে। চাহিদার তুলনায় দ্রব্যের সরবরাহ বা পরিমাণ কম থাকে। ফলে দ্রব্যমূল্যে ঊর্ধ্বগতি পরিলক্ষিত হয়।

৬. **চোরাচালান :** প্রচুর খাদ্যশস্য চোরাচালানের ফলে দেশের খাদ্য সংকট প্রকট আকার ধারন করছে। এক শ্রেণীর অসাধু ব্যবসায়ী অতিরিক্ত মুনাফা লাভের আশায় চোরাই পথে মালামাল পাচার করে থাকে। ফলে দেশে খাদ্যাভাব দেখা দেয়। নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের কৃত্রিম সংকটের সৃষ্টি হয়। এতে দ্রব্যমূল্যের দাম বৃদ্ধি পায়।

**দ্রব্যমূল্য ঊর্ধ্বগতির নির্দিষ্ট সময় :** আমাদের মতো গরিব ও জনসংখ্যা অধ্যুষিত দেশে নিত্যদিনই দ্রব্যমূল্যের বৃদ্ধি ঘটে থাকে। তবে এ মূল্য বৃদ্ধি সারা বছর কিছুটা স্থিতিশীল থাকলেও প্রতি বছর রমজান মাসে এর অস্বাভাবিক ঊর্ধ্বগতি পরিলক্ষিত হয়। রমজানের আগমনবার্তায় রাজধানীর বিভিন্ন বাজারে উপচেপড়া ভিড়, অসাধু ব্যবসায়ীদের ফায়দা লোটা, চোরাকারবারি, নিয়ন্ত্রণহীন বাজার ব্যবস্থা ইত্যাদি কারণই এর জন্য দায়ী। প্রতি বছরই পবিত্র রমজানের সিয়াম সাধনা শুরু হয় লাগামহীন দ্রব্যমূল্য, পানি-বিদ্যুৎ সংকট, ছিনতাই, সন্ত্রাস ও তীব্র যানজটের বিড়ম্বনা আর উৎকণ্ঠা নিয়ে। রমজানের আগমনী বার্তায় পণ্যমূল্য এক ধাপ বৃদ্ধি পায়। গবেষণায় দেখা গেছে, পণ্যের যোগান নয় বরং অসাধু ব্যবসায়ী, মজুদদারি ও নিয়ন্ত্রণহীন বাজার ব্যবস্থাই এই মূল্য বৃদ্ধির মূল কারণ।

**দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির প্রতিকার :** বর্তমানে দেশের সবচেয়ে বড় সমস্যা হলো দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি। বাজারে পণ্যের দামের অস্বাভাবিক বৃদ্ধিতে ক্রেতারা দীর্ঘশ্বাস ফেলছেন। নির্দিষ্ট আয়ের মানুষের ক্রয়ক্ষমতার বাইরে চলে গেছে পণ্যের মূল্য। দিনমজুর, খেটে খাওয়া মানুষ সারাদিনের ঘর্মক্লান্ত রোজগার দিয়ে দু বেলা পেটপুরে খেতে পারছে না। অর্ধাহারে, অনাহারে তারা আজ চরম সংকটে দিনাতিপাত করছে। এ পরিস্থিতির প্রতিকার করার জন্য সরকারি, বেসরকারি পর্যায়ে বিভিন্ন পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে। দ্রব্যমূল্যের এরূপ ঊর্ধ্বগতিতে নিম্নোক্ত কার্যকর পদক্ষেপ নেয়া জরুরি বলে বিশেষজ্ঞ মহল ধারণা করছেন :

১. **সরকারি উদ্যোগ :** দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি নিয়ন্ত্রণে সরকার একটি দ্রব্যমূল্য নির্ধারণ নীতিমালা প্রণয়ন করতে পারেন। এ আইনের আওতায় দ্রব্যমূল্যের মূল্য নির্ধারণ, চোরাকারবারি প্রতিরোধ, ফড়িয়া ও অসাধু ব্যবসায়ীদের দৌরাত্ম্য হ্রাস, দ্রব্যমূল্যের নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি ব্যবস্থা গ্রহণ করে সরকার এ পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে পারেন। ব্যবসায়ীরা যাতে ইচ্ছেমতো জিনিসের দাম বৃদ্ধি করতে না পারে সেজন্য একটি নিয়ন্ত্রণ কমিটি গঠন করে তাদের হাতে এ বিষয়ক দায়িত্ব ন্যস্ত করতে পারেন। ব্যবসায়ী বিশেষজ্ঞ কমিটি নামে একটি কমিটি গঠন করে এ অবস্থার উন্নতি করা যেতে পারে।

২. **পণ্যমূল্য নির্ধারণ, আইন প্রণয়ন ও প্রয়োগ :** পণ্যমূল্য নির্ধারণে আইন প্রণয়ন ও তা প্রয়োগের ব্যবস্থা নিতে হবে। সরকারের খাদ্য মন্ত্রণালয় অথবা পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় এ পদক্ষেপ নিতে পারে। পণ্যমূল্য নির্ধারণ ও তদারকি করার জন্য পণ্যমূল্য মনিটরিং সেল নামে একটি সেল গঠন করে তার কার্যকারিতা জোরদার করা যেতে পারে। নিয়ম বহির্ভূতভাবে কেউ কেনাবেচা করলে তার বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এভাবে আইন প্রণয়ন ও তা প্রয়োগের মাধ্যমে দ্রব্যমূল্যের লাগামহীন গতি রোধ করা যেতে পারে।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



৩. **কৃষি ভর্তুকি বাড়ানো :** কৃষিপ্রধান বাংলাদেশের কৃষকই হচ্ছে অর্থনীতির মেরুদণ্ড। অথচ আমরা তাদের বিশাল অবদানের কথা ভুলে যাই। কিন্তু এ দেশের কৃষকরা আজ যুগের পরিবর্তনের সাথে সাথে প্রায় সর্বস্বান্ত হয়ে দাঁড়িয়েছে। অথচ দেশের জনসংখ্যার শতকরা প্রায় ৯০ ভাগ এই কৃষির ওপর নির্ভরশীল। বিভিন্ন ব্যাংক ও এনজিও এসব কৃষকদের সহজ শর্তে ঋণ দিয়ে থাকে। এর ফলে চাষী তার সর্বশক্তি দিয়ে ফসল ফলানোর চেষ্টা করে। কিন্তু ক্ষেতের ফসল গোলায় তোলার আগে তাকে ঋণ শোধ করতে হয়। এমতাবস্থায় সরকারিভাবে কৃষিতে ভর্তুকি দিলে কৃষকদের অবস্থার উন্নতি হবে। অর্থাৎ কৃষিখাতে ভর্তুকির কোনো বিকল্প নেই। উৎপাদন বাড়াতে হলে কৃষকদের উজ্জীবিত করে তুলতে হবে। আর উৎপাদন বাড়লে বাজারে পণ্যের সরবরাহ বৃদ্ধি পাবে। পণ্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি রোধ হবে।

৪. **সরকারের গৃহীত পদক্ষেপ :** দ্রব্যমূল্যের লাগামহীম ঊর্ধ্বগতিতে সরকার নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে দোকানে দোকানে পণ্যের মূল্য তালিকা টানানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। এ বিষয়টি মনিটরিং করার জন্য টিসিবিকে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। পাশাপাশি এখন থেকে প্রতি সপ্তাহে স্পর্শকাতর পণ্যের খুচরা ও পাইকারি মূল্যের তালিকা বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে পাঠানোর নির্দেশ দেয়া হয়। বর্তমান আইনানুযায়ী দোকানে দোকানে পণ্যের মূল্য তালিকা টানানো বাধ্যতামূলক। বাণিজ্য মন্ত্রণালয় এই আইন প্রয়োগের ব্যাপারে আইন মন্ত্রণালয়ের সহায়তা নেবে। সরকারের গৃহীত পদক্ষেপের ফলে বাজারে পণ্যমূল্যের দাম অনেকটা নিয়ন্ত্রণে আসবে বলে জনগণের বিশ্বাস।

**উপসংহার :** সরকার ও জনগণ সমাজবিরোধী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে সজাগ হয়েছে এবং চোরাকারবারি ও কালোবাজারি ইতোমধ্যেই সরকার ও জনগণের হাতে লাঞ্ছনা ও শাস্তি ভোগ করছে। ব্যবসায়ী, সরকার ও জনগণের সার্বিক সহযোগিতায় দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব হলে দেশের মানুষ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলবে। আমাদের এই সুজলা, সুফলা, শস্য-শ্যামলা বাংলাদেশ কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যে অদূর ভবিষ্যতে উন্নত ও সমৃদ্ধ হয়ে উঠবে—এ বিশ্বাস আমাদের সকলের।

## রচনা ১১ বাংলাদেশের মৎস্যসম্পদ

৩১তম *বিসিএস*

**ভূমিকা :** বাংলাদেশ নদীমাতৃক দেশ। অসংখ্য খাল-বিল, নদী-নালা, হাওর-বাওড়, উন্মুক্ত জলাশয় এবং প্লাবন ভূমি এ দেশকে মৎস্যচাষ ও আহরণের পাদভূমিতে পরিণত করেছে। এক সময় এদেশের মানুষকে বলা হতো 'মাছে ভাতে বাঙালি'। গোলা ভরা ধান, গোয়াল ভরা গরু আর পুকুর ভরা মাছ বাঙালি ঐতিহ্যের অন্যতম দিক। পূর্বে এ দেশে অল্প শ্রম ও পুঁজিতে অতি সহজেই মৎস্য আহরণ করা যেত। তাছাড়া তখন মুক্ত জলাশয় এবং বদ্ধ জলাশয় উভয় ক্ষেত্রেই স্বাভাবিকভাবে প্রচুর পরিমাণ মৎস্য উৎপাদিত হতো। কিন্তু প্রাকৃতিক বিপর্যয়, অবকাঠামোগত পরিবর্তন ইত্যাদির ফলে বাংলাদেশে অনেক জাতের মাছই বিলুপ্ত হয়ে গেছে। ফলে চাহিদার তুলনায় মৎস্য উৎপাদনের পরিমাণ কমে গেছে।

**বাংলাদেশের মৎস্যসম্পদ :** বাংলাদেশে সাধারণত চার ধরনের ক্ষেত্র থেকে মৎস্য আহরণ ও চাষ করা হয়। যেমন—

ক. **বদ্ধ জলাশয় :** বাংলাদেশে চাষ উপযোগী প্রায় ২০ লক্ষ পুকুর ও দীঘি রয়েছে, যার আয়তন প্রায় ৩.৫১ লক্ষ হেক্টর। তাছাড়া প্রায় ৬০০০ হেক্টর বাওড় রয়েছে। এছাড়া অসংখ্য মৌসুমী জলাশয়, রাস্তা পার্শ্বস্থ ডোবা, জলাধার, পাহাড়ি ক্রিক ইত্যাদি জলাভূমির আয়তন প্রায় ৬.২৮ লক্ষ হেক্টর। পুকুরের বর্তমান হেক্টরপ্রতি উৎপাদন ১৩.১৫ মেট্রিক টন, যা যথাযথ কৌশল ও আধুনিক পদ্ধতি



প্রয়োগের মাধ্যমে অধিক উৎপাদন উন্নীত করা সম্ভব। তাছাড়া দেশে চাষযোগ্য পোল্ডার/একক্রোজার, বিল, ধানী জমি, উপকূলীয় ঘের এবং মিঠাপানির বদ্ধ জলাভূমির পরিমাণ ১৪.৫১ লক্ষ হেক্টর। এসব জলাভূমির বর্তমান হেক্টর প্রতি উৎপাদন ৫০৫ কেজি।

খ. **মুক্ত জলাশয় :** নদ-নদী, খাল-বিল, হাওর-বাওড়, সুন্দরবন ও মোহনা অঞ্চল, কাপ্তাই হ্রদ ও প্লাবনভূমি মিলে দেশে প্রায় ৪০.২৪ লাখ হেক্টর মুক্ত জলাশয় রয়েছে, যেখান থেকে বাৎসরিক প্রায় ১০.৮৩ লাখ মেট্রিক টন মৎস্য উৎপাদিত হয়।

গ. **উপকূলীয় জলাভূমি :** বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলের জলাভূমি চিংড়ি চাষ ব্যবস্থাপনার জন্য খুবই উপযোগী। প্রাথমিক পর্যায়ে সনাতনী পদ্ধতিতে চাষ হলেও পরবর্তী পর্যায়ে উন্নত পদ্ধতিতে চিংড়ি চাষ ব্যবস্থাপনা সম্প্রসারিত হয়। উপকূলীয় অঞ্চলে চিংড়ি চাষভুক্ত জমির পরিমাণ প্রায় ১.৪১ লাখ হেক্টর। এ সকল জলাভূমিতে চিংড়ি উৎপাদনের বর্তমান গড় হার প্রায় ৩,০০,৪০০ কেজি। এখানে গলদা এবং বাগদা উভয় জাতের চিংড়িই চাষ হয়। বিশেষ করে দেশের দক্ষিণাঞ্চলীয় জেলা খুলনা, সাতক্ষীরা, বাগেরহাট, কক্সবাজার, ভোলা প্রভৃতি জেলায় চিংড়ির চাষ হয়।

ঘ. **সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ :** বাংলাদেশের একান্ত অর্থনৈতিক জলাশয়ের পরিমাণ প্রায় ১,৪০,৯১৫ বর্গ কিলোমিটার। এছাড়া মোহনা অঞ্চল, সুন্দরবনের রক্ষিত জলাভূমি, বেইজ লাইন জলাভূমি ও আন্তঃদেশীয় অঞ্চলের জলাভূমি মিলে রয়েছে সর্বমোট প্রায় ২.৬৩ লাখ বর্গ কিলোমিটার জলাশয়। দেশে সামুদ্রিক জলাশয়ের আয়তন সাধু পানির এলাকার চেয়ে বেশি হওয়া সত্ত্বেও সামুদ্রিক উৎস থেকে দেশে মোট মৎস্য উৎপাদনের প্রায় ২১.৩১ ভাগ আহরিত হয়।

সর্বোপরি ২০১২-২০১৩ অর্থবছরে দেশে মোট মৎস্য সম্পদ উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ৩৪.১০ লক্ষ মেট্রিক টন এবং ২০১৩-২০১৪ অর্থবছরে উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ৩৫.৫৫ লক্ষ মেট্রিক টন।

**বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে মৎস্য :** বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে মৎস্যসম্পদ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। নিচে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো :

ক. **দারিদ্র্য বিমোচন :** মৎস্য আমাদের একটি অতীব মূল্যবান ও সম্ভাবনাময় দেশীয় সম্পদ। দেশে যে পরিমাণ মৎস্য চাষোপযোগী জলাশয় রয়েছে এগুলোর যথাযথ সংরক্ষণ ও উন্নয়নের মাধ্যমে মৎস্যচাষের ব্যবস্থা করতে পারলে তা দারিদ্র্য বিমোচনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। কেননা অল্প পুঁজি, ন্যূনতম প্রশিক্ষণ ও সহজতর প্রযুক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে একটি দরিদ্র পরিবারও সরকারি-বেসরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় স্বাবলম্বী হতে পারে। এজন্য আমাদেরকে বিদেশী ঋণের বোঝা কিংবা এনজিওর খপ্পর—কোনোটিই বরণ করতে হবে না। প্রয়োজন কেবল দক্ষ ব্যবস্থাপনা, জনসচেতনতা এবং যথাযথ প্রশিক্ষণ।

খ. **কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি :** বাংলাদেশে বর্তমানে একটি বিরাট জনগোষ্ঠী বেকার রয়েছে। বিশেষ করে যুব বেকারদের কর্মস্পৃহা ও সামর্থ্য সত্ত্বেও তারা জাতির জন্য বোঝা হয়ে আছে। অথচ মৎস্যখাতের উন্নয়নের মাধ্যমে তাদের কর্মসংস্থানের বিপুল সুযোগ সৃষ্টি করা যেতে পারে। ইতিমধ্যেই দেশের বিভিন্ন এলাকায় অনেক যুবক তাদের সাফল্যের নজির স্থাপন করেছে। দেশে যে প্রায় ৪৫ লাখ হেক্টর জলাশয় রয়েছে, এর অধিকাংশতেই বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় চাষাবাদ করা হচ্ছে না। তাই স্বল্প প্রশিক্ষণ ও প্রয়োজনীয় পুঁজি সরবরাহের মাধ্যমে দেশের যুবসমাজকে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে মৎস্যচাষে উৎসাহিত করতে পারলে তারা প্রচলিত দাপ্তরিক চাকরির মোহ থেকে অবশ্যই মুক্তি পাবে। এভাবে দেশের একটা বিরাট সম্ভাবনাময় অংশ আত্মকর্মসংস্থানের পথ খুঁজে পাবে।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



গ. **জেলে সম্প্রদায়ের আয়-রোজগার বৃদ্ধি :** দেশের মোট জনসংখ্যার শতকরা ১০ ভাগ লোক প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে মৎস্যখাতের ওপর নির্ভরশীল। ১৩ লাখ লোক সরাসরি মৎস্যচাষ ও আহরণের কাজে নিয়োজিত। কিন্তু মৎস্যখাতের দুরবস্থা তথা বিভিন্ন জাতের মাছের বিলুপ্তি ও খাল-বিল, নদী-নালা, হাওর-বাওড়ে মাছের আকাল দেশের এ বিরাট জনগোষ্ঠীর জীবনে বিপর্যয় নিয়ে এসেছে। তাই পরিকল্পিত উপায়ে দেশের মৎস্যসম্পদের সংরক্ষণ ও উন্নয়ন করতে না পারলে অদূর ভবিষ্যতে মৎস্য চাষ ও আহরণের সাথে সম্পৃক্ত একটি বিরাট জনগোষ্ঠীর জীবনে ভয়াবহ বিপর্যয় নেমে আসতে পারে। অথচ অব্যাহত সরকারি প্রচেষ্টা এবং যথাযথ কলাকৌশল প্রয়োগ করে করে উন্মুক্ত জলাশয়ের মাছ সংরক্ষণ, বদ্ধ জলাশয়ের পরিকল্পিত মৎস্য উৎপাদন এবং সামুদ্রিক ও উপকূলীয় এলাকায় অবাধে মৎস্যনিধন রোধ করা যায়। এতে দেশে সার্বিকভাবে সম্পৃক্ত জনগোষ্ঠীর আয়-রোজগার বাড়ার পাশাপাশি জাতীয় অর্থনীতিতেও ইতিবাচক প্রভাব পড়বে।

ঘ. **রপ্তানি আয় ও বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন :** রপ্তানি আয় বৃদ্ধি এবং বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনেও মৎস্যসম্পদের ভূমিকা অনস্বীকার্য। বাংলাদেশের রপ্তানি আয়ের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ (প্রায় ৬ ভাগ) আসে মৎস্যখাত থেকে। ২০১৩-১৪ অর্থবছরে (জানুয়ারি ২০১৪) ০.৪৮ লক্ষ মেট্রিক টন মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য রপ্তানি করে ৩০৮০.১৫ কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা আর্জিত হয়েছে। এমনকি আমাদের ৭১১ কিলোমিটার উপকূলীয় তটরেখা বরাবর ২০০ নটিক্যাল মাইল পর্যন্ত প্রায় পৌনে ২ লাখ বর্গ কিলোমিটার জুড়ে যে সামুদ্রিক জলসম্পদ রয়েছে তার যথাযথ ব্যবহার ও ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে আমাদের মৎস্য রপ্তানির পরিমাণ আরো বৃদ্ধি করা যায়। কেননা কক্সবাজার, খুলনা, সাতক্ষীরা, ভোলা, নোয়াখালী প্রভৃতি জেলায় উপকূলীয় এলাকায় চিংড়ি চাষকে আরো সম্প্রসারিত করা সম্ভব। এতে একদিকে যেমন আমাদের বাণিজ্যিক ভারসাম্য অবস্থার ক্ষেত্রে ইতিবাচক প্রভাব পড়বে এবং পাশাপাশি অত্যন্ত মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হবে।

ঙ. **প্রোটিনের চাহিদা পূরণ :** দেশের প্রায় ১৬ কোটি লোকের প্রোটিনের যে বিশাল চাহিদা তা পূরণেও মৎস্য অতীব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এক হিসাব মতে, এ দেশের মানুষের প্রাণিজ আমিষের প্রায় ৬০ ভাগ আসে মৎস্য থেকে। এ প্রেক্ষিতে দেখা যায়, দেশে মোট মৎস্যের চাহিদা রয়েছে প্রায় ৩২ লাখ মেট্রিক টন। অথচ উৎপাদিত হয় মাত্র ৩০.৬২ লাখ মেট্রিক টন। তাই দেশে এখনো প্রায় ১.৩৮ লাখ মেট্রিক টন মৎস্য ঘাটতি রয়েছে। অন্যদিকে দেশের জনগোষ্ঠীর প্রেটিনেরও প্রচুর অভাব রয়েছে। এমনকি মৎস্য উৎপাদন ব্যাহত ও হ্রাস পাওয়ায় জনস্বাস্থ্য হুমকির মুখে পড়তে পারে। 'মাছে ভাতে বাঙালি'—এ প্রবাদটি আজ কেবলই কল্পনা। তাই প্রয়োজনীয় পুষ্টি সরবরাহের মাধ্যমে জনগণের স্বাস্থ্য রক্ষা ও সুস্থ সবল জাতি গঠনে মৎস্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

চ. **জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন :** জনগণের জীবনযাত্রার মানবৃদ্ধি ও সমৃদ্ধি আনয়নে মৎস্যচাষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। কেননা বাংলাদেশে যে সীমিত পরিমাণ কৃষিজমি তাতে, গতানুগতিক প্রক্রিয়ায় চাষাবাদ করে জীবনের পরিবর্তন আনয়ন সম্ভব নয়। তাই কৃষি বহুমুখীকরণের নীতির ভিত্তিতে চাষাবাদযোগ্য জমিতে পরিকল্পিত উপায়ে ধান চাষের পাশাপাশি মাছ চাষ দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিবর্তনে ব্যাপক ভূমিকা রাখতে পারে।



**বাংলাদেশের মৎস্যখাতের বিদ্যমান সমস্যাবলী ও এর কারণ :** অসংখ্য নদ-নদী, খাল-বিল, হাওর-বাওড়, সামুদ্রিক জলসম্পদ আর বিরাট কর্মক্ষম জনগোষ্ঠী থাকা সত্ত্বেও এ দেশের মৎস্যখাত আজ গভীর সংকটে নিপতিত। মৎস্য উৎপাদন, সংরক্ষণ, ব্যবস্থাপনা এবং প্রক্রিয়াজাতকরণ পর্যন্ত প্রতিটি ক্ষেত্রেই রয়েছে অজস্র সমস্যা। এ সকল সমস্যার ফলে কেবল মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির প্রয়াসই ব্যাহত হচ্ছে না বরং বিদ্যমান বিপুল পরিমাণ মৎস্যসম্পদ আজ ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে। এ অবস্থা অবশ্য একদিনে সৃষ্টি হয়নি। বরং দীর্ঘদিনের পুঞ্জিভূত সমস্যা ও অব্যবস্থাপনার ধারাবাহিক পরিণতিতে আজকের এ নাজুক অবস্থা। তবে এ অবস্থার জন্য দায়ী কারণগুলোর অন্যতম হলো :

১. **জলমহাল থেকে নির্বিচারে মৎস্য আহরণ :** রাজস্বভিত্তিক ইজারা ব্যবস্থাপনায় ইজারাগ্রহীতারা অধিক লাভের আশায় জলমহাল থেকে নির্বিচারে মৎস্য আহরণ করছে। তাছাড়া ব্যক্তিগত মালিকানাধীন জলাগুলোকেও সেচে সম্পূর্ণরূপে মৎস্য আহরণ করা হচ্ছে। ফলে পরবর্তী বছর মৎস্য প্রজননের প্রয়োজনীয় মাছ জলাশয়গুলোতে থাকছে না। এ অবস্থায় জলমহালগুলোতে মৎস্য প্রজনন ক্ষেত্রও সংরক্ষণ করা হচ্ছে না।

২. **ডিমওয়ালা ও পোনা মাছ নিধন :** দেশে যৎসামান্য ডিমওয়ালা ও পোনামাছ যা আছে তাও নির্বিচারে নিধন করা হচ্ছে। এ ব্যাপারে সরকারি বিধিনিষেধের কোনো তোয়াক্কা করা হচ্ছে না।

৩. **অপরিকল্পিত ও সমন্বয়হীন কার্যক্রম :** বিভিন্ন সরকারি, আধাসরকারি, বেসরকারি সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানের অপরিকল্পিত ও সমন্বয়হীন উন্নয়নমূলক কার্যক্রম যেমন—কৃষি কাজে অতিরিক্ত পানি নিষ্কাশন, রাসায়নিক সার ও কীটনাশক প্রয়োগের ফলে মাছের স্বাভাবিক জীবন প্রণালী ব্যাহত হচ্ছে। তাছাড়া বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ এবং সড়ক ও রাস্তাঘাট নির্মাণের প্রাক্কালে যথাযথভাবে ফিস পাস (Fish Pass) নির্মাণ না করায় মাছের বিচরণ, প্রজনন ও শুষ্ক মৌসুমে প্লাবন ভূমি থেকে মুক্ত জলাশয়ে যাতায়াত ব্যাহত হচ্ছে।

৪. **জলাশয় দূষণ :** কলকারখানা, শিল্প প্রতিষ্ঠান, নগর ও বন্দরের বর্জ্যপদার্থ দ্বারা জলাশয় দূষণের ফলে মাছের প্রজননক্ষেত্র বিনষ্টসহ মাছের স্বাভাবিক জীবনযাত্রার পরিবেশগত বিপর্যয়ে মুক্ত জলাশয়ের মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি ব্যাহত হচ্ছে।

৫. **মাছের আবাসস্থলের ক্ষতিসাধন :** বন্যা নিয়ন্ত্রণ এবং সেচ প্রকল্পের প্রয়োজনে বিভিন্ন অবকাঠামো নির্মাণ, প্রাকৃতিক পরিবেশ ও মনুষ্যসৃষ্ট বিবিধ প্রতিকূল পরিবেশ, প্রতিবেশী দেশের উজানে বাঁধ নির্মাণ ইত্যাদি কারণে জলমহালে অতিরিক্ত পলি পড়ে মাছের আবাসস্থলের ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হচ্ছে। তাছাড়া মাছের উৎপাদন ও প্রজনন চালু রাখতে প্রয়োজনীয় অভয়াশ্রমও রাখা হচ্ছে না।

৬. **কারেন্ট জালের মাধ্যমে মৎস্য নিধন :** মৎস্য বিভাগের এক পরিসংখ্যানে দেখা যায়, দেশে প্রতি বছর যে পরিমাণ মাছ ধরা হয় তার শতকরা ২৫ ভাগই হচ্ছে কারেন্ট জালের মাধ্যমে। কারেন্ট জালের মাধ্যমে প্রতি বছর কেবল জাটকা অর্থাৎ ইলিশের বাচ্চাই নিধন করা হয় ২০ হাজার মেট্রিক টন। ডিমওয়ালা ইলিশ এবং এ ২০ হাজার মেট্রিক টন জাটকার অন্তত শতকরা ১০ থেকে ১৫ ভাগও যদি নিধন বন্ধ করা সম্ভব হয় তাহলে বছরে অতিরিক্ত আড়াই লাখ টন ইলিশের উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে। জাটকা সংরক্ষণ, অভয়াশ্রম ব্যবস্থাপনা এবং ইলিশ প্রজনন সুরক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়নের ফলে ২০১০-১১ অর্থবছরে ইলিশের উৎপাদন ৩.৪০ লক্ষ মেট্রিক টন। যা ২০০৮-০৯ অর্থবছরে ছিল ২.৯৯ লক্ষ মেট্রিক টন।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



৭. **কারিগরি জ্ঞানের অভাব :** বাংলাদেশে 'হোয়াইট গোল্ড' বলে পরিচিত চিংড়ির চাষও নানাভাবে ব্যাহত হচ্ছে। উপকূলীয় এলাকায় গড়ে ওঠা ঘেরগুলোর যেমন কোনো সামঞ্জস্য নেই, তেমনি এগুলো গড়ে উঠেছে বিভিন্ন অনুপযুক্ত স্থানে অপরিকল্পিত উপায়ে। এর কারণ লাগসই প্রযুক্তিনির্ভর কারিগরি জ্ঞানের অভাব। এ খাতের অন্যান্য সমস্যাগুলোর অন্যতম হলো উপযুক্ত/মৌসুমী সময়ে চিংড়ি পোনার অপর্যাপ্ত সরবরাহ, চিংড়ির রোগ নির্ণয় ও নিরাময়ে প্রয়োজনীয় গবেষণাগার/স্বাস্থ্য পরীক্ষাগার না থাকা ও অধিক ঘনত্বে পোনা মজুদ প্রভৃতি। এ সকল সমস্যার যথাযথ সমাধান করতে পারলে দেশের রূপালী বিপ্লবকে আরো অনেক দূর এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব।

**মৎস্য সংরক্ষণ ও উৎপাদন বৃদ্ধির কলাকৌশল এবং করণীয় :** দেশে বর্তমানে ১১ লাখ মেট্রিক টন মাছের যে বিপুল ঘাটতি তা পূরণ করার জন্য সরকারি-বেসরকারি পর্যায়ে যত দ্রুত সম্ভব কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। সেজন্য মৎস্য উৎপাদন ও সংরক্ষণের ক্ষেত্রে আধুনিক প্রযুক্তি ও কৌশল প্রয়োগের কোনো বিকল্প নেই। সুতরাং আমাদের মৎস্যখাতের বিদ্যমান সমস্যাগুলো কাটিয়ে এ খাতের বিপুল সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে হলে নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর প্রতি আশু দৃষ্টি দেয়া দরকার :

১. **জলাধার সৃষ্টি ও ফিস পাস নির্মাণ :** বন্যা নিয়ন্ত্রণ এবং কৃষিকাজের প্রয়োজনে সেচ প্রকল্পভুক্ত এলাকায় বাঁধ ও রাস্তাঘাট নির্মাণের প্রাক্কালে মৎস্যসম্পদের বিকল্প জলাধার সৃষ্টি ও ফিস পাস নির্মাণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

২. **ধানক্ষেতে মাছ চাষ কার্যক্রম চালু :** বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধের ভেতরের এলাকাসহ সুবিধাজনক যে কোনো ধান চাষ এলাকায় বাড়তি ফসল হিসেবে মাছ উৎপাদনের জন্য ধানক্ষেতে মাছ চাষের কার্যক্রম চালু করতে হবে।

৩. **মৎস্য অভয়াশ্রম স্থাপন :** প্রজননক্ষম মাছের মজুদ বৃদ্ধি এবং বিলুপ্তপ্রায় প্রজাতির রক্ষার্থে রুই, পাঙ্গাস, ইলিশজাতীয় মাছসহ অন্যান্য মাছ জলমহালের যে অংশে প্রাকৃতিকভাবে প্রজনন করে সে অংশ/স্থানকে চিহ্নিত করে সুফলভোগী জনগোষ্ঠীর সম্পৃক্ততায় সরকারি ও বেসরকারিভাবে মৎস্য অভয়াশ্রম স্থাপনে উদ্যোগী হতে হবে।

৪. **পোনামাছ অবমুক্তকরণের পদক্ষেপ :** সুফলভোগীদের অংশীদারিত্বমূলক অংশগ্রহণের ভিত্তিতে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে পোনামাছ অবমুক্তকরণের পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

৫. **কারেন্ট জাল নিষিদ্ধ :** আহরণ চাপ নিয়ন্ত্রণের জন্য মৎস্য আহরণের ব্যবহৃত জাল ও সুফলভোগীদের সংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। এক্ষেত্রে কারেন্ট জালের উৎপাদন, বিপণন ও ব্যবহার নিষিদ্ধকরণে কার্যকরী ব্যবস্থাগ্রহণ অত্যন্ত জরুরি। ইতিমধ্যেই এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়নের উদ্যোগ নেয়া হলেও তার বাস্তবায়ন দেখার জন্য জাতি অপেক্ষমান।

৬. **জলমহাল সংস্কার :** অতিরিক্ত পলি পড়ে যে সকল মুক্ত জলমহালে মাছের আবাসস্থল সংকুচিত হয়ে মাছের স্বাভাবিক জীবন প্রণালীর ওপর প্রতিকূল প্রভাব ফেলছে, সে সকল জলমহাল সংস্কারের কার্যক্রম হাতে নেয়া আবশ্যক।

৭. **জলমহালের যথোপযুক্ত ইজারা নির্ধারণ :** জৈবিক মৎস্য ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের আওতায় উৎপাদন পরিকল্পনার ভিত্তিতে দীর্ঘমেয়াদি জলমহাল ইজারা প্রদান ও উৎপাদন বৃদ্ধির স্বার্থে জলমহালের ভৌতিক ও পরিবেশগত বৈশিষ্ট্যের আলোকে ইজারা মূল্য নির্ধারণ করা উচিত।



৮. **ইলিশের উন্নয়ন ও সংরক্ষণে জৈবিক কার্যক্রম :** ইলিশ মৎস্যসম্পদ সংরক্ষণ ও উন্নয়নের জন্য জৈবিক কার্যক্রম গ্রহণ করা আবশ্যক।

৯. **উপকূলীয় ভূমি ব্যবহার নীতিমালা প্রণয়ন :** উপকূলীয় ভূমি ব্যবহার নীতিমালা প্রণয়ন করে ভূমির শ্রেণীবিন্যাস করে উক্ত ভূমিতে স্থানীয় সুযোগ-সুবিধা ও পরিবেশ সহনীয় লাগসই চিংড়ি চাষ ব্যবস্থাপনার সম্প্রসারণ আবশ্যক।

১০. **উপযোগী পরিবহন ব্যবস্থা :** উপযুক্ত সময়ে সুস্থ, সবল চিংড়ি পোনা সরবরাহ, চিংড়ি পোনার মৃত্যুহার হ্রাসের জন্য বিমান এবং অন্যান্য উপযোগী পরিবহন ব্যবস্থার সুযোগ সৃষ্টি আবশ্যক।

১১. **আধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর কার্যক্রম গ্রহণ :** সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদের পরিমাণ, বিভিন্ন প্রজাতির মাছ ও চিংড়ি আহরণোত্তর মজুদ পুনঃনিরূপণ এবং সহনশীল মাত্রায় আহরণযোগ্য ফলন ধরার পরিমাণ নির্ণয়ে আধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর কার্যক্রম গ্রহণ আবশ্যক।

**উপসংহার :** পরিশেষে বলা যায় যে, বাংলাদেশে মৎস্যসম্পদের যে বিপুল সম্ভাবনা একে কাজে লাগাতে হলে অবশ্যই প্রয়োজনীয় লাগসই প্রযুক্তির ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। তাছাড়া মৎস্যসম্পদের গুরুত্বকে সরকারি-বেসরকারি পর্যায়ে তুলে ধরতে না পারলে কোনো কার্যক্রমই সফল হবে না।

## রচনা ১২ বাংলাদেশের তৈরি পোশাক শিল্প : সমস্যা ও সমাধান

**ভূমিকা :** তৈরি পোশাক শিল্প বাংলাদেশের রপ্তানি আয়ের প্রধান খাত। সম্ভাবনাময় এ খাতকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে কর্মসংস্থানের বিশাল একটি বাজার। এ পোশাক শিল্পই হয়ে উঠেছে দেশের অর্থনীতির প্রধান চালিকা শক্তি। অথচ এ পোশাক শিল্পে দীর্ঘদিন ধরেই অস্থিরতা ও বিশৃঙ্খলা চলছে। কখনো শ্রমিকরা তাদের বেতন-ভাতার দাবিতে বিক্ষোভ করছে, আবার কখনো কারখানায় হামলা করছে, আগুন লাগিয়ে দিচ্ছে এবং মূল্যবান জিনিসপত্র ভাঙচুর করছে। এভাবে তৈরি পোশাক শিল্পে একটা বিশৃঙ্খলা লেগেই আছে। এ অস্থিরতা এবং বিশৃঙ্খলা এদেশের রপ্তানি আয়ের প্রধান এ খাতকে ধ্বংস করে দিচ্ছে। এ অবস্থা থেকে পরিত্রাণ পেতে হলে এসব বিশৃঙ্খলা এবং অস্থিরতা চিরতরে বন্ধ করতে হবে। এর পাশাপাশি মালিক-শ্রমিক সুসম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

**বাংলাদেশের তৈরি পোশাক শিল্পের সমস্যাসমূহ :** বাংলাদেশে তৈরি পোশাক শিল্পে নানাধিক সমস্যা বিদ্যমান। নিম্নে বাংলাদেশের পোশাকশিল্পের সমস্যাসমূহ আলোচনা করা হলো :

১. **ভবন ধস :** ভবন ধসে ব্যাপক সংখ্যক শ্রমিকের প্রাণহানি বাংলাদেশের তৈরি পোশাক বা গার্মেন্টস শিল্পের আলোচিত ও ভয়াবহ সমস্যাগুলোর অন্যতম। ২৪ এপ্রিল ২০১৩ ঢাকার সাভারে 'রানা প্লাজা' নামে নয়তলা একটি ভবন ধসে পড়ে। এ ভবনটিতে পাঁচটি গার্মেন্টস ছিল। এ ভবন ধসের ঘটনায় ১,১২৭ জনের প্রাণহানি ঘটে, জীবিত উদ্ধার করা হয় ২,৪৩৮ জন। এছাড়া ২০০৫ সালে স্পেকট্রাম গার্মেন্টস ভবন ধসে ৬৪ জনের প্রাণহানি ঘটে। ভবন ধসের এ ভয়াবহ ঘটনায় শ্রমিকরা ভয় ও শঙ্কায় আজ অনেকেই গার্মেন্টসের বিকল্প পথের সন্ধান করছেন। এতে করে গার্মেন্টস শিল্প দিন দিন হুমকির সম্মুখীন হচ্ছে।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



২. **অগ্নিকাণ্ড :** বাংলাদেশের তৈরি পোশাক শিল্প কারখানাগুলোতে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা প্রায়শই ঘটে। এতে করে মুহূর্তেই অঙ্গারে পরিণত স্ব স্ব ক্ষেত্রে লালন করা শ্রমিক-মালিকের স্বপ্ন। ১৯৯০ সালে সারকা গার্মেন্টসে ৩০ জন, ২০০৬ সালে কেটিএস গার্মেন্টসে ৫৫ জন, ২০১২ সালে তাজরীন ফ্যাশনস-এ ১১২ জন এবং ২০১৩ সালে তুং হাই সোয়েটার কারখানায় মালিকসহ ৮ জন আগুনে পুড়ে মারা যায়। অগ্নিকাণ্ডের এ ঘটনায় বাংলাদেশের গার্মেন্টস মালিকরা একদিকে পুঁজিহীন হচ্ছেন, অন্যদিকে বিদেশী ক্রেতারাও মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছেন।

৩. **দক্ষ শ্রমিকের অভাব :** বাংলাদেশের পোশাক শিল্পের সাথে জড়িত শ্রমিকরা অধিকাংশই অশিক্ষিত, স্বল্পশিক্ষিত ও অদক্ষ। আমদানিকারকরা দেশের মানুষের রুচি ও নির্দেশ মোতাবেক পোশাক তৈরি করতে বলে। কিন্তু বাংলাদেশের অশিক্ষিত, স্বল্পশিক্ষিত, অদক্ষ শ্রমিকরা অনেক সময় নির্দেশ অনুযায়ী চাহিদামতো পোশাক তৈরিতে ব্যর্থ হয়। তাই অনেক সময় বিদেশীরা তা গ্রহণ না করে ফেরৎ পাঠায় বা ভবিষ্যতে এদেশীয় শিল্প প্রতিষ্ঠানের প্রতি বিমুখ মনোভাব পোষণ করে। ফলে বাংলাদেশের পোশাক শিল্প ক্ষতির সম্মুখীন হয়।

৪. **শ্রমিকদের নিম্ন মজুরি :** বাংলাদেশের পোশাক শিল্পের দ্রুত বিকাশের মূলে রয়েছে শ্রমিক সহজলভ্যতা। শ্রমিক সহজলভ্যতার সুযোগকে কাজে লাগিয়ে পোশাক শিল্প মালিকরা শ্রমিকদেরকে তাদের ইচ্ছেমতো ব্যবহার করছে। আট ঘণ্টার কাজ বার বা ষোল ঘণ্টা করিয়েও ন্যায্য মজুরি থেকে বঞ্চিত করছে। সরকার শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরির দিক নির্দেশনা দিলেও শিল্প মালিকরা তা মানছে না বা মানতে টালবাহানার আশ্রয় নিচ্ছেন। ফলে পোশাক শিল্পে প্রায়ই অসন্তোষ দেখা দিচ্ছে। শ্রমিকরা আন্দোলন করছে; জ্বালাও, পোড়াও নীতির আশ্রয় নিচ্ছে। যা বাংলাদেশের পোশাক শিল্পের জন্য সবচেয়ে বড় সমস্যা বলে সাম্প্রতিক কালে বিবেচিত হচ্ছে।

৫. **বিশ্ববাজারে মূল্যহ্রাস :** গত কয়েক বছরে বিশ্ববাজারে তৈরি পোশাকের মূল্য উল্লেখযোগ্য হারে কমে গেছে। বিশেষ করে ওভেন পোশাকের কাটিং অ্যান্ড মেকিং (সিএম) চার্জ কমেছে ১৫ ভাগের বেশি। উদ্যোক্তারা জানিয়েছেন, আগে প্রতি ডজন পোশাকে সিএম পাওয়া যেত ১০ ডলার। বর্তমানে তা ৬ থেকে ৭ ডলারে নেমে এসেছে। নীট পোশাকের মূল্যও কমেছে উল্লেখযোগ্য হারে। চীন, ভিয়েতনাম এবং অন্যান্য প্রতিযোগী দেশ কম মূল্যে পোশাক সরবরাহ করার কারণে এক্ষেত্রে বাংলাদেশের উদ্যোক্তারা বেশ চাপে রয়েছেন।

৬. **গ্যাস ও বিদ্যুৎ সংকট :** বিদ্যুৎ ও গ্যাসের তীব্র সংকটের কারণে পোশাক রপ্তানিকারকরা সমস্যায় পড়ছেন। পোশাক উৎপাদনকালীন এসব শিল্প প্রতিষ্ঠানে অধিকাংশ সময়ই বিদ্যুৎ থাকে না। গ্যাসের চাপ কম থাকায় উদ্যোক্তারা গ্যাস জেনারেটরও ব্যবহার করতে পারেন না। ডিজেলচালিত জেনারেটর দিয়ে উৎপাদন করার কারণে উৎপাদন খরচ বৃদ্ধি পেয়েছে। টেক্সটাইল উপখাতেও চলছে গ্যাসের নিম্নচাপ সমস্যা। গ্যাসের চাপ কম থাকায় অনেক মিলের উৎপাদন অর্ধেকে নেমে এসেছে। উদ্যোক্তাদের মতে, গ্যাস এবং বিদ্যুৎ সমস্যার কারণে এ খাতে নতুন উদ্যোক্তা আসছেন না। এক হিসাব মতে, পোশাক ও টেক্সটাইল খাতে বিনিয়োগ ২৬ শতাংশ কমেছে। কাজেই গ্যাস ও বিদ্যুৎ সংকট বাংলাদেশের তৈরি পোশাক শিল্পকে দিন দিন হুমকির সম্মুখীন করে তুলেছে।



৭. **রফতানির সীমাবদ্ধতা :** বিশ্বের বিভিন্ন দেশে প্রায় ১১৫ প্রকারের পোশাকের চাহিদা রয়েছে। এর মধ্যে ইউরোপীয় ইউনিয়নের দেশসমূহের চাহিদা রয়েছে ৮৫ রকমের পোশাকের। অথচ বাংলাদেশ মাত্র ৩৬ রকমের পোশাক উৎপাদন করতে সক্ষম। উৎপাদনের এ সীমাবদ্ধতা বাংলাদেশের পোশাক শিল্পের অপর একটি বড় সমস্যা। অথচ হংকং ৬৫টি রকমের, চীন ৯০ রকমের, ভারত ৬০ রকমের পোশাক রপ্তানি করে থাকে। বাংলাদেশের পোশাক শিল্প সবচেয়ে বেশি প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হচ্ছে ভারত ও চীনের সাথে। উৎপাদনের এ সীমাবদ্ধতা বাংলাদেশের পোশাক শিল্পকে নানাবিধ সমস্যার সম্মুখীন করে তুলেছে।

৮. **মূলধনের স্বল্পতা :** বিশ্বের উন্নয়নশীল প্রতিটি দেশেরই শিল্পায়নের প্রধান অন্তরায় মূলধন। উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে বাংলাদেশও এ সমস্যার সম্মুখীন। বাংলাদেশের প্রভূত সম্ভাবনাময় পোশাক শিল্পে যে পরিমাণ মূলধন বিনিয়োগ করা উচিত যথাসময়ে যথাযথভাবে সে পরিমাণে ব্যাংকসমূহ বা ব্যক্তিগত উদ্যোক্তারা বিনিয়োগ করতে পারছে না। ফলে বাংলাদেশের পোশাক শিল্প ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে। বাংলাদেশের পোশাক শিল্প অতিমাত্রায় বিদেশী পুঁজির ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে। নির্ভরশীলতার কারণে বিদেশীদের খেয়াল-খুশিমতো এ শিল্প অনেকটা পরিচালিত হয়। এর ফলে শিল্পের উন্নয়নে অনিশ্চয়তা দিন দিন বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে।

৯. **অনুন্নত অবকাঠামো ও অব্যবস্থাপনা :** বাংলাদেশের পোশাক শিল্পের অপর একটি সমস্যা হলো অনুন্নত অবকাঠামো। বাংলাদেশের রাস্তাঘাট, কালভার্ট, হাসপাতাল প্রভৃতির অবস্থা যথেষ্ট নাজুক। তাছাড়া রয়েছে আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যের জন্য প্রয়োজনীয় বন্দরজনিত অব্যবস্থাপনা ও বন্দরের অভাব। পণ্য খালাস করতে বিদেশী জাহাজগুলোকে দিনের পর দিন অপেক্ষা করতে হয়। কাঁচামাল বিদেশ থেকে আমদানি করার পর বন্দর থেকে তা খালাস করতে এক শ্রেণীর কাস্টমস্ কর্মকর্তা-কর্মচারীদের হয়রানির শিকার হতে হয়। এক হিসেবে দেখা যায়, বাংলাদেশের কাস্টমস্ কর্মকর্তা-কর্মচারীর ৮০ ভাগই অনৈতিক কাজে জড়িত। এরূপ অব্যবস্থাপনা ও অবকাঠামোগত দুর্বলতা বাংলাদেশের পোশাক শিল্পের অগ্রযাত্রাকে ব্যাহত করছে।

১০. **আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি :** বাংলাদেশের তৈরি পোশাক শিল্পের বিকাশে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি সবচেয়ে বড় বাধা হিসেবে কাজ করছে। চাঁদাবাজি, মাস্তানি, ছিনতাই, হরতাল, অবরোধ, বিক্ষোভ, ধর্মঘট, অপহরণ প্রভৃতি অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড দিনের পর দিন একের পর এক ঘটেই চলেছে। এরূপ আইন শৃঙ্খলার অবনতি বাংলাদেশের তৈরি পোশাক শিল্পের উন্নয়নে প্রধান অন্তরায় হিসেবে বিবেচনা করা যায়। ফলে বাংলাদেশের অর্থনীতির উন্নয়ন হুমকির সম্মুখীন হয়ে পড়েছে।

**বাংলাদেশে তৈরি পোশাক শিল্পে বিদ্যমান সমস্যা থেকে উত্তরণে আশু সুপারিশসমূহ :** বাংলাদেশের জাতীয় অর্থনীতিতে সবচেয়ে সম্ভাবনাময় শিল্প হচ্ছে তৈরি পোশাক শিল্প। তাই এ শিল্পকে উত্তরোত্তর উন্নতি ও বিকশিত করতে হলে এর সমস্যার সমাধান অতি জরুরি। এ সম্পর্কে কতিপয় সুপারিশ নিম্নে উপস্থাপন করা হলো :

১. **অবকাঠামোগত উন্নয়ন সাধন করা :** বাংলাদেশের অবকাঠামোগত দুর্বলতা দূর করতে হলে প্রথমে অবকাঠামোগত উন্নয়ন তথা শিল্পাঞ্চলগুলোর সাথে বিশেষ করে ঢাকা-চট্টগ্রাম রেল, সড়ক, আকাশ পথে পরিবহন ব্যবস্থার আরো উন্নয়ন প্রয়োজন। অপরদিকে দ্রুততার সাথে গ্যাস, বিদ্যুৎ সংকট দূরীকরণে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



২. **পশ্চাৎ সংযোগ শিল্পের প্রসার ঘটানো :** বাংলাদেশে তৈরি পোশাক শিল্পের সুতা, বোতাম, কাপড় বিদেশ থেকে ৮৫ ভাগ আমদানি করতে হয়। কেননা দেশে প্রস্তুতকৃত কাপড়ের পরিমাণ খুবই অপ্রতুল। কাজেই পোশাক শিল্পের সমস্যা সমাধানে পশ্চাৎ সংযোগ শিল্পের প্রসার ঘটাতে হবে।

৩. **পোশাক শিল্পকে আয়কর মুক্ত করা :** পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশের তৈরি পোশাক শিল্পকে আয়কর মুক্ত করতে হবে। আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতামূলক বাজারে টিকে থাকার জন্য রপ্তানিমুখী তৈরি পোশাক শিল্পের আয় সম্পূর্ণভাবে করমুক্ত করে রপ্তানি বাণিজ্যকে উৎসাহিত করা প্রয়োজন।

৪. **পোশাকের শ্রেণী বৃদ্ধি করা :** বিশ্ববাজারে ১১৫ রকমের পোশাকের চাহিদা থাকলেও বাংলাদেশ মাত্র ৩৬ রকমের পোশাক তৈরি করতে পারঙ্গম। কাজেই বিশ্বের চাহিদা অনুযায়ী বাংলাদেশের পোশাকের শ্রেণী বৃদ্ধি করা একান্ত প্রয়োজন।

৫. **শ্রমিকদের দক্ষতা বৃদ্ধি করা :** বাংলাদেশের তৈরি পোশাক শিল্পখাতে নিয়োজিত শ্রমিক, কর্মকর্তা, কর্মচারীদের দক্ষতার যথেষ্ট অভাব রয়েছে। যথাযথ প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে শ্রমিকদের দক্ষতা বৃদ্ধি করা যেতে পারে। প্রয়োজনে বিদেশে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রেরণের মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধির ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

৬. **অ্যাপারেল বোর্ড গঠন করা :** রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর বর্তমান বস্ত্র সেল পোশাক শিল্পখাতের বর্ধিত কর্মকাণ্ড তত্ত্বাবধান করার জন্য যথেষ্ট নয়। পোশাক সম্প্রসারণের সাথে সাথে তৈরি পোশাক প্রস্তুতকারক ও রপ্তানিকারক একটি অ্যাপারেল বোর্ড প্রতিষ্ঠার জন্য দাবি জানিয়ে আসছে। প্রস্তাবিত অ্যাপারেল বোর্ডের নিজস্ব আয় থেকেই এর সকল ব্যয়ভার বহন করা সম্ভব। উল্লেখ্য যে, প্রতিবেশী দেশ ভারতেও তৈরি পোশাক শিল্প খাতের সামগ্রিক কর্মকাণ্ড তত্ত্বাবধান করার জন্য অ্যাপারেল বোর্ড রয়েছে।

৭. **বিদেশে লবিস্ট নিয়োগ :** বাংলাদেশে তৈরি পোশাক শিল্পের সমূহ সম্ভাবনাকে অবহিত করতে বিদেশে প্রয়োজনে লবিস্ট নিয়োগ করা যেতে পারে। লবিস্ট নিয়োগ করলে তারা বিশ্বের বাজারে বাংলাদেশের পোশাক শিল্পের ইতিবাচক দিকগুলো তুলে ধরতে পারবে ফলে এদেশে বিদেশী বিনিয়োগ বৃদ্ধির পাশাপাশি পোশাক রপ্তানি বৃদ্ধি পাবে।

৮. **আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতি ঘটাতে হবে :** দেশের সুস্থ ও স্বাভাবিক আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি শিল্পোন্নয়নের পূর্বশর্ত। বিভিন্ন সময়ে রাজনৈতিক দলসমূহ কর্তৃক ঘোষিত হরতাল, অবরোধ, ধর্মঘট প্রভৃতির কারণে রপ্তানিমুখী শিল্পখাত, বিশেষ করে রপ্তানিমুখী তৈরি পোশাক শিল্পখাত বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়। বিশ্ববাজারে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ হয়। এ সমস্যার সমাধানকল্পে পোশাক শিল্পখাতকে সকল প্রকার রাজনৈতিক কর্মসূচির আওতামুক্ত রাখার জন্য ঐক্যবদ্ধ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে।

৯. **আধুনিক যন্ত্রপাতি স্থাপন তথা প্রযুক্তিগত উন্নয়ন সাধন করা :** পোশাক শিল্পকে বিশ্ববাজারে তুলে ধরতে হলে সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন আধুনিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে মানসম্মত পোশাক তৈরি করা। আর এজন্য উন্নত প্রযুক্তির যন্ত্রপাতি আমদানি করতে হবে। আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে উৎপাদন বহুগুণে বৃদ্ধি পাবে। কম খরচে অধিক উৎপাদন করতে পারলে তা পোশাক শিল্পকে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে সহায়তা করবে।



১০. **টেক্সটাইল পল্লী প্রতিষ্ঠা করা :** সুতা, বস্ত্র, পোশাক ইত্যাদি উৎপাদনের ক্ষেত্রে কাঁচামাল যত কম নাড়াচাড়া করা যাবে, উৎপাদন ব্যয় তথা অপচয় তত কমবে। তাই টেক্সটাইল পল্লী প্রতিষ্ঠা করা একান্ত দরকার।

**উপসংহার :** পরিশেষে বলা যায় যে, দেশের রপ্তানি বাণিজ্যে তৈরি পোশাক শিল্পের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। এ শিল্প খাত থেকে রপ্তানি আয়ের সিংহভাগই অর্জিত হয়। জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধন, অধিক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে বেকারত্বের চাপ রোধ এবং অধিক বৈষয়িক সমৃদ্ধি লাভের মাধ্যমে জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন ঘটাতে তৈরি পোশাক শিল্পের অবদান অনস্বীকার্য। এদেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক কর্মতৎপরতার মেরুদণ্ড এ পোশাক শিল্প আজ নানামুখী সমস্যায় জর্জরিত। বর্তমান প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ বিশ্ববাজারে টিকে থাকতে হলে বাংলাদেশের তৈরি পোশাক শিল্পকে অনেক পথ পাড়ি দিতে হবে। আর এর জন্য অবশ্যই সুষ্ঠু পরিকল্পনা, নীতিমালা এবং সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা অতি জরুরি।

## রচনা ১৩ বাংলাদেশের পর্যটনশিল্প : সমস্যা ও সম্ভাবনা

*[২৯তম; ১৫তম বিসিএস]*

**ভূমিকা :** সুপ্রাচীন কাল থেকে মানুষ দেশে দেশে ভ্রমণ করে আসছে। পৃথিবী দেখার দুর্নিবার নেশায় মানুষ সাত সমুদ্র তের নদী পাড়ি দিয়েছে—বিক্ষুব্ধ মহাসমুদ্র পাড়ি দিয়ে পৌঁছেছে অজানা অচিন দেশে। মানুষের এই দুর্নিবার ভ্রমণাকাঙ্ক্ষা থেকেই পর্যটনশিল্পের উৎপত্তি। সভ্যতা বিকাশের সাথে সাথে পর্যটনের রূপ ও প্রকৃতিতে এসেছে অভাবিত পরিবর্তন। পর্যটন এখন শুধু কোনো ব্যক্তি বা ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর দেশভ্রমণ নয়, বরং সমগ্র মানবগোষ্ঠীর জন্য একটি বিশ্বজনীন শখ ও নেশা। আর তাই পর্যটন এখন একটি শিল্প, যা অনেক দেশের অর্থনীতির একটি মুখ্য উপাদান। ইতিমধ্যেই এ শিল্প বিশ্বব্যাপী একটি দ্রুত বিকাশমান খাত হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি ছাড়াও বহুমাত্রিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে পর্যটন বর্তমানে অনেক দেশেই শীর্ষ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী শিল্পে পরিণত হয়েছে। বর্তমান প্রেক্ষাপটে তাই প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের লীলাভূমি বাংলাদেশে পর্যটনশিল্পের বর্তমান অবস্থা এবং এর সমস্যা ও সম্ভাবনা সম্পর্কে আলোচনা করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

**পর্যটন কি :** পর্যটনের সংজ্ঞার ক্ষেত্রে সমস্যা রয়েছে। একেক জনকে একেক দিক নিয়ে সংজ্ঞায়ন করতে দেখা যায়। এ দিকগুলোর মধ্যে রয়েছে সৌন্দর্যপ্রিয়তা, কৌতূহলপ্রিয়তা, প্রকৃতি প্রেম ইত্যাদি। এছাড়াও এর অর্থনৈতিক, ব্যবস্থাপকীয়, বাজারজাত সম্পর্কীয়, সামাজিক, পরিবেশগত ও আরো অনেক দিক সংজ্ঞায়নের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়।

পর্যটন একাধারে একটি দৃষ্টিভঙ্গি এবং কর্মকাণ্ড। পর্যটনের দৃষ্টিভঙ্গি অনোপার্জনমূলক এবং এর কর্মকাণ্ড নিয়ত স্থানান্তরী ও অস্থায়ী অবস্থানমূলক। AIEST (অ্যাসোসিয়েশন অফ ইন্টারন্যাশনাল এক্সপার্টস ইন সায়েন্টিফিক ট্যুরিজম)-এর মতে, 'কোনো উপার্জনমূলক কাজে যুক্ত নয় এবং স্থায়ীভাবে বসতি গড়ে না এমন ব্যক্তির ভ্রমণ এবং কোথাও থাকা থেকে উৎসারিত প্রপঞ্চ ও সম্পর্কের সমষ্টি হচ্ছে পর্যটন।' পর্যটনকে এভাবেও সংজ্ঞায়িত করা হয় : '... activities of human being travelling to and staying in places outside their usual environment for the purpose of education, experience, enrichment and enjoyment.' সংক্ষেপে, জাগতিক সৃষ্টি দর্শনার্থে ব্যক্তির অনোপার্জনমূলক স্থানান্তর, অস্থায়ী অবস্থান এবং এর সাথে সম্পৃক্ত ক্রিয়াদিকে পর্যটন বলা যায়।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



**বাংলাদেশের পর্যটনশিল্পের আকর্ষণ :** প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের লীলাভূমি বাংলাদেশ। অপরিমেয় সৌন্দর্য ছড়িয়ে রয়েছে এই দেশে। ঐতিহাসিক, সাংস্কৃতিক, ঐতিহ্যিক ও আত্মিক সকল সম্পদেই বাংলাদেশ সমৃদ্ধ। তাই যুগ যুগ ধরে বিদেশী পর্যটকদের কাছে বাংলাদেশ চিরসবুজে ঘেরা এক স্বপ্নের দেশ হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আসছে। নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ু এবং প্রাচীন সভ্যতার একটি কেন্দ্র হিসেবে পর্যটকদের আকর্ষণ করার মতো অনেক সম্পদ রয়েছে এ দেশে। বাংলাদেশের সুন্দরবন, সোনারগাঁও, কক্সবাজার, কাপ্তাই, কুয়াকাটা, রাঙামাটি, ময়নামতি, পাহাড়পুরসহ বিভিন্ন প্রাকৃতিক, ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক স্থানসমূহ দেশী-বিদেশী পর্যটকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য যথেষ্ট সমৃদ্ধ। তাই প্রাচীনকাল থেকে বহু জ্ঞানী-গুণী বিদেশী পর্যটক বাংলার বুকে পা রেখে মুগ্ধ হয়েছেন। বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে রয়েছে বিভিন্ন উপজাতি। যেমন— চাকমা, মারমা, মগ, সাঁওতাল, গারো, কুকি, টিপরা, মনিপুরী, খাসিয়া ইত্যাদি। তাদের বিচিত্র পোশাক, জীবনযাত্রার পদ্ধতি এবং বর্ণাঢ্য সংস্কৃতির সম্ভার হৃদয়ে দোলা দেয়। এত সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য দেশের মতো পর্যটন বাংলাদেশে এখনো শিল্প হিসেবে পূর্ণ বিকশিত হতে পারেনি। অথচ দারিদ্র্য বিমোচনে এবং দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে পর্যটনশিল্প গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

**বিশ্ব অর্থনীতিতে পর্যটনশিল্পের অবদান :** বর্তমানে বিশ্বের একক বৃহত্তম শিল্প এবং বিশ্বের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিশেষ অবদান সৃষ্টিকারী অন্যতম খাত পর্যটনশিল্প। বিশ্বের গড় উৎপাদনের ক্ষেত্রে এ খাত বর্তমানে ২ লাখ ৫০ হাজার কোটি মার্কিন ডলার মূল্যের যোগান দিচ্ছে, যা বিশ্বের মোট জাতীয় উৎপাদনের ৫.৫%।

**বাংলাদেশে পর্যটনশিল্প বিকাশের প্রেক্ষাপট :** প্রাচীনকাল থেকেই অতিথিপরায়ণতা ও সম্প্রীতির এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করে এসেছে বাংলাদেশ। কিন্তু পর্যটকদের আকৃষ্ট করার মতো এখানে অনেক উপকরণ থাকলেও স্বাধীনতা-পূর্বকালে এ ব্যাপারে কার্যত কোনো ব্যবস্থাই গ্রহণ করা হয়নি। স্বাধীনতার পর পর্যটনের ওপর সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয় এবং এর সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের লক্ষ্যে ১৯৭৩ সালের ১ জানুয়ারি 'বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন' নামে একটি জাতীয় পর্যটন সংস্থা গঠিত হয়। দেশের পর্যটনের উন্নয়নের স্বার্থে প্রয়োজনীয় সকল প্রকার কার্য পরিচালনার একক দায়িত্ব এই সংস্থার ওপর ন্যস্ত হয় এবং সংস্থাটি নতুন নতুন প্রকল্প গ্রহণ ও সেগুলো বাস্তবায়নের কাজ শুরু করে। বিদেশী পর্যটকদের আকর্ষণের জন্য বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, ইতিহাস ও সংস্কৃতি তুলে ধরে বিদেশে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি বৃদ্ধির কাজও পর্যটন কর্পোরেশন গ্রহণ করে।

**জাতীয় পর্যটন নীতিমালা :** ১৯৯২ সালে প্রথম পর্যটন সম্পর্কিত জাতীয় নীতিমালা ঘোষিত হয়। এ জাতীয় নীতিতে বর্ণিত দেশের পর্যটনের উদ্দেশ্য নিম্নরূপ :

১. বিদেশী পর্যটকদের আকৃষ্ট করে দেশের বৈদেশিক মুদ্রার আয় বাড়ানো।
২. জনসাধারণের মধ্যে পর্যটনের প্রতি উৎসাহ বৃদ্ধি করা ও তাদের জন্য অল্প খরচে পর্যটন সুবিধা সৃষ্টি।
৩. দেশের পর্যটন সম্পদের উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং এর মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন।
৪. বিদেশে বাংলাদেশ সম্পর্কে ইতিবাচক ভাবমূর্তি গড়ে তোলা।
৫. বেসরকারি পুঁজির জন্য একটি স্বীকৃত বিনিয়োগের ক্ষেত্র উন্মোচন করা।
৬. বেশি সংখ্যক নাগরিকের কর্মসংস্থানের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করা।
৭. বিদেশী পর্যটক ও দেশীয় জনসাধারণের চিত্তবিনোদনের ব্যবস্থা করা।
৮. হস্ত ও কুটিরশিল্পের উন্নয়ন, দেশের ঐতিহ্যের লালন ও বিকাশের মাধ্যমে জাতীয় সংহতি ও ঐকমত্য সুদৃঢ় করা।



**বাংলাদেশের অর্থনীতিতে পর্যটনশিল্পের গুরুত্ব :** জাতিসংঘের এক রিপোর্টে বলা হয়েছে, বিশেষত তৃতীয় বিশ্বের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের ক্ষেত্রে পর্যটনের ভূমিকা অনন্য। কারণ এটি অপ্রচলিত পণ্যের রপ্তানি বাড়ায়, বাণিজ্যিক লেনদেন অনুকূলে রাখতে সাহায্য করে। ফলে জাতীয় উন্নয়ন ত্বরান্বিত হয়। কয়েক দশক আগে উন্নত দেশগুলো পর্যটনশিল্পকে এককভাবে নিয়ন্ত্রণ করতো। কিন্তু বর্তমানে উন্নয়নশীল দেশগুলো এ ক্ষেত্রে এগিয়ে আসছে এবং তাৎপর্যপূর্ণ অগ্রগতি অর্জন করেছে। উদাহরণস্বরূপ, মেক্সিকো ও ইন্দোনেশিয়ার কথা বলা যেতে পারে। এ দুটো দেশের মোট রপ্তানি আয়ের ৭০% পর্যটন খাত থেকে আসে। এছাড়া মরক্কো, সিঙ্গাপুর, থাইল্যান্ড, কোরিয়া প্রভৃতি দেশ পর্যটনশিল্প উন্নয়নের মাধ্যমে তাদের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও অবকাঠমো উন্নয়নে সমর্থ হয়েছে।

বাংলাদেশ ইতিমধ্যে পর্যটনশিল্পের মাধ্যমে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করেছে। কিন্তু প্রতিবেশী অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশের আয় এর চেয়ে বহুগুণ বেশি। সার্কভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে পর্যটনশিল্প থেকে সবচেয়ে বেশি উপার্জন করে ভারত। তাই আমাদের দেশে পর্যটনশিল্পকে অর্থনৈতিক উন্নয়নে কাজে লাগাতে হলে আরো অনেক বিদেশী পর্যটক আকর্ষণ করতে হবে।

**বাংলাদেশের পর্যটনশিল্পের সমস্যাসমূহ :** বহুমুখী সমস্যার আবর্তে বাংলাদেশে পর্যটনশিল্প সংকটাপন্ন। অপার প্রাকৃতিক শোভামণ্ডিত এ দেশে পর্যটনশিল্পের মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রার আয় বাড়াবার এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টির কোনো সুনির্দিষ্ট ও সমন্বিত পদক্ষেপ এখন পর্যন্ত না হওয়ায় পর্যটনশিল্পের আশানুরূপ বিকাশ ঘটছে না। ১৯৯২ সালে ঘোষিত পর্যটন সম্পর্কিত জাতীয় নীতিমালারও সুচারু বাস্তবায়ন হচ্ছে না। বাংলাদেশের পর্যটনশিল্পের প্রধান সমস্যাগুলো নিম্নরূপ :

১. **যোগাযোগ ও অবকাঠামোগত সমস্যা :** বাংলাদেশের আকর্ষণীয় ও দর্শনীয় স্থানগুলো বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে অবস্থান করছে। এ সকল স্থানে যাতায়াতের জন্য নৌ ও সড়ক যোগাযোগের ব্যবস্থা পর্যাপ্ত নয়। এ ছাড়া ভ্রমণের জন্য দ্রুত ও নিরাপদ যানবাহনের ব্যবস্থা, আরামদায়ক ও নিরাপদ হোটেল, মোটেল ও বাসস্থানের ব্যবস্থা এবং কাঙ্ক্ষিত বিনোদনের অভাব রয়েছে।

২. **বেসরকারি উদ্যোগের অভাব :** পর্যটন বেসরকারি উদ্যোগেই সব দেশে সমৃদ্ধ হয়। কিন্তু আমাদের দেশে এখনো পর্যন্ত এমন কোনো পরিবেশ সৃষ্টি হয়নি যাতে পর্যটন খাতে বেসরকারি উদ্যোক্তারা ব্যাপক পুঁজি বিনিয়োগ করতে পারেন। তাছাড়া বেসরকারি খাতে পর্যটন এখনো শিল্প হিসেবে স্বীকৃতি পায়নি। পর্যটন খাতে বেসরকারি উদ্যোগকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য প্রয়োজনীয় কর্মতৎপরতারও অভাব রয়েছে।

৩. **সরকারি উদ্যোগের অভাব :** যে কোনো দেশের সরকারি পর্যটন দপ্তরেই স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রমোশন বিভাগ থাকে। তারা দেশে ও বিদেশে যথাক্রমে অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক পর্যটকদের উৎসাহিত করার জন্য নিরলসভাবে কাজ করে। দেশের বাইরে দূতাবাসগুলোর মাধ্যমে এ কাজ পরিচালিত হয়। অথচ আমাদের অনেক বিদেশী দূতাবাসে পর্যটন বিষয়ক কোনো ডেস্ক পর্যন্ত নেই বলে অভিযোগ রয়েছে।

৪. **অনুন্নত অভ্যন্তরীণ পর্যটন ব্যবস্থা :** অভ্যন্তরীণ পর্যটন উন্নত না হলে কোনো দেশে আন্তর্জাতিক পর্যটন বিকাশ লাভ করতে পারে না। আর অভ্যন্তরীণ পর্যটন উন্নত হয় কেবল দেশের ব্যাপক জনগোষ্ঠীকে পর্যটনে উৎসাহিত করার মাধ্যমে। কিন্তু আমাদের দেশে এ ক্ষেত্রে গৃহীত উদ্যোগ পর্যাপ্ত নয়।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



৫. **নিরুপদ্রব পরিবেশ এবং নিরাপত্তার অভাব :** বাংলাদেশে পর্যটনের ক্ষেত্রে নিরুপদ্রব পরিবেশ এবং নিরাপত্তার অভাব পরিলক্ষিত হয়। পত্রিকায় প্রায়ই দেখা যায়, বিমানবন্দরে বিদেশীরা নানাভাবে প্রতারিত কিংবা ভোগান্তির শিকার হচ্ছে। বিমানবন্দর পেরিয়ে ট্যাক্সি বা মোটর ভাড়া করতে গিয়েও তারা প্রতারকের খপ্পরে পড়ে। এ সকল কারণে পর্যটকদের মনে বাংলাদেশের প্রতি নেতিবাচক মনোভাব গড়ে ওঠে।

৬. **আকর্ষণীয় প্রচার ও সাবলীল উপস্থাপনার অভাব :** বাংলাদেশের নয়নাভিরাম অফুরন্ত প্রাকৃতিক শোভা এবং ঐতিহাসিক স্থাপত্যকীর্তি থাকলেও দেশী-বিদেশী পর্যটকদের কাছে সেগুলো আকর্ষণীয় করে প্রচার এবং উপস্থাপন করার পর্যাপ্ত উদ্যোগ নেই। এর ফলে পর্যটনশিল্প দ্রুতগতিতে বিকশিত হচ্ছে না।

৭. **দক্ষ গাইডের অভাব :** ভ্রমণের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশে আসা বিদেশীদের অনেক সমস্যার মধ্যে একটি হলো ভালো গাইডের দুষ্প্রাপ্যতা। ভিন দেশে এসে একজন পর্যটক প্রথমেই পেতে চায় একজন ভালো গাইড, যিনি তার ভ্রমণকে সহজ ও আকর্ষণীয় করে তুলবেন। কিন্তু আমাদের দেশের পর্যটন কেন্দ্রগুলোতে ভালো ও উপযুক্ত গাইডের অপ্রতুলতা রয়েছে। আজকাল পৃথিবীর অনেক দেশেই বেসরকারিভাবে গাইড পাওয়া যায়। ঐসব দেশে পর্যটনশিল্প পর্যাপ্ত বিকশিত হওয়ায় অনেকেই গাইডের কাজকে পেশা হিসেবে বেছে নিয়েছে। এদিক থেকে আমরা পিছিয়ে আছি এবং পর্যটকরা তাদের কৌতূহল নিবৃত্ত করার সুযোগ পাচ্ছে না, অথচ এটা তাদের ন্যায্য পাওনা।

৮. **পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণের অভাব :** দেশে পর্যটনশিল্পের উন্নয়ন ও বিকাশের জন্য দক্ষ ও মানসম্মত জনশক্তি অপরিহার্য। আর আধুনিক পদ্ধতিতে প্রশিক্ষণের মাধ্যমেই কেবল এ ধরনের জনশক্তি গড়ে তোলা যায়। কিন্তু বাংলাদেশে পর্যটন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণের আধুনিক ব্যবস্থা একেবারেই অপর্যাপ্ত।

৯. **রাজনৈতিক অস্থিরতা :** হরতাল, ধর্মঘট তথা রাজনৈতিক অস্থিরতা এ দেশের অন্যান্য খাতের মতো পর্যটনশিল্পের বিকাশের ক্ষেত্রেও প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে। বাংলাদেশে যখন-তখন হরতাল-ধর্মঘট শুরু হওয়ায় বাড়তি ঝক্কির সম্মুখীন হয় পর্যটকরা। ফলে ভাটা পড়ে পর্যটকদের উৎসাহে, অবদমিত হয় বিদেশীদের বাংলাদেশ ভ্রমণের ইচ্ছা। আর এভাবেই রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে বাংলাদেশ পর্যটনশিল্প থেকে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়।

১০. **পর্যটন নীতির দৈন্যদশা :** বাংলাদেশে পর্যটনশিল্পের ক্ষেত্রে সরকারি নীতির দৈন্যদশা পরিলক্ষিত হয়। পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাসমূহে এ খাতে বরাদ্দ অপ্রতুল। পর্যটন সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কাজে নিয়োজিত বিভিন্ন সরকারি বিভাগ যেমন— রাস্তাঘাট, যানবাহন, প্রত্নতত্ত্ব, সংস্কৃতি, ক্রীড়া প্রভৃতির মধ্যে সমন্বিত কর্মকাণ্ডের নীতি অনুসৃত হয় না। পর্যটনশিল্পের বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই নীতিগত দুর্বলতা রয়েছে। পর্যটন বিশেষজ্ঞ সৈয়দ রাশিদুল হাসান এ ধরনের যেসব ক্ষেত্র চিহ্নিত করেছেন তন্মধ্যে রয়েছে : নাজুক যোগাযোগ ব্যবস্থা, অভ্যন্তরীণ পর্যটকদের প্রণোদনার অনুপস্থিতি, পর্যটকদের নিরাপত্তায় কর্তৃপক্ষীয় অনীহা ও পরিকল্পনা বিভ্রাট, পর্যটন সংক্রান্ত তথ্যের অভাব এবং কর্মতৎপরতার অযথার্থতা।

**বাংলাদেশে পর্যটনশিল্পের সম্ভাবনা :** বাংলাদেশে রয়েছে অফুরন্ত প্রাকৃতিক শোভা। বিস্তীর্ণ পাহাড়-পর্বত, বর্ণাঢ্য উপজাতি, বিশ্বের বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ সুন্দরবন, দীর্ঘতম সমুদ্র সৈকত কক্সবাজার, হ্রদ, নদ-নদী, চা-বাগান, প্রাচীন ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন প্রভৃতি এ দেশের পর্যটনের অন্যতম আকর্ষণ। তাই প্রাচীন কাল থেকে বহু জ্ঞানী-গুণী বিদেশী পর্যটক বাংলার বুকে পা রেখে রূপসী এ দেশ দেখে মুগ্ধ হয়েছেন। কিন্তু এ দেশে পর্যটনশিল্প এখনো তেমনভাবে বিকশিত হয়নি। অথচ এ দেশের প্রাকৃতিক ও ঐতিহাসিক পর্যটন আকর্ষণকে সঠিকভাবে কাজে লাগাতে পারলে বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের একটি সম্ভাবনার দ্বার খুলে যেতে পারে। পর্যটনশিল্প হতে পারে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী অন্যতম প্রধান খাত।



বিশ্বব্যাপী পর্যটনকে বলা হয় 'Invisible Export Goods' বা অদৃশ্য রপ্তানি পণ্য। অন্যান্য রপ্তানি পণ্যের চেয়ে পর্যটনের সুবিধা হলো, অন্যান্য পণ্য রপ্তানির একটা সীমা আছে, সুতরাং রপ্তানি আয়ও সীমিত। কিন্তু পর্যটন এমন একটি শিল্প যেখানে বিনিয়োগ, চাকরি ও আয়ের কোনো সীমা নেই। বিশেষত বাংলাদেশে যেখানে অসংখ্য সমস্যা, বেকারত্ব, প্রতিকূল বৈদেশিক বাণিজ্য, প্রধান প্রধান অর্থনৈতিক খাতগুলোর শ্লথগতি এবং পুঁজি, প্রযুক্তি ও সম্পদের অপ্রতুলতা রয়েছে, সেখানে নৈসর্গিক প্রকৃতি ও ঐতিহ্যকে কাজে লাগিয়ে স্বল্প পুঁজিতে পর্যটনশিল্পের উন্নয়ন করতে পারলে তা ব্যাপক কর্মসংস্থান ও বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের বিরাট উৎস হতে পারে। কারণ এ খাতে উচ্চ প্রযুক্তি ও বিরাট মূলধন বিনিয়োগের কোনো প্রয়োজন নেই, প্রয়োজন শুধু জাতির মানসিক গঠন এবং সেবাদানের উপযুক্ত দক্ষ জনগোষ্ঠী।

পর্যটন একটি সেবাশিল্প। এ সেবা উপস্থাপন ও পরিবেশনার জন্য চাই দক্ষতা, উন্নত আচরণ, কৌশল ও আন্তরিকতা। এজন্য বলা হয়, পর্যটনের অন্যতম উপাদান হলো মানবসম্পদ। বাংলাদেশের শিক্ষিত বেকারদের সঠিক প্রশিক্ষণ প্রদান করে সহজেই পর্যটনের উপযোগী দক্ষ জনশক্তিতে রূপান্তর করা যেতে পারে। আর একমাত্র পর্যটন শিল্পেই কর্মসংস্থানের সীমাহীন সুযোগ সৃষ্টি হতে পারে। আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশগুলোর আয়ের এক উল্লেখযোগ্য অংশ আসে পর্যটন খাত থেকে। কারণ এ দেশগুলো তাদের অবারিত প্রাকৃতিক সৌন্দর্য বিদেশী পর্যটকদের সামনে তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছে। তাদের রুচি ও পছন্দ অনুযায়ী গড়ে তুলেছে হোটেল, মোটেল, রেস্টুরেন্ট, রেস্ট হাউস ইত্যাদি। বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের লক্ষ্যে এসব দেশ তাদের যাতায়াত ব্যবস্থার উন্নয়নসহ বিদেশী পর্যটকদের সর্বাধিক সুযোগ-সুবিধা প্রদানের যথাসাধ্য চেষ্টা করে চলেছে। বাংলাদেশও যদি পর্যটনশিল্পের উন্নয়নের জন্য যথার্থ পদক্ষেপ গ্রহণ করে তাহলে এ শিল্প থেকে বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা আয় করে উন্নয়নের পথে তাৎপর্যপূর্ণ অগ্রগতি অর্জন করতে পারবে।

**পর্যটনশিল্পের উন্নয়নের জন্য করণীয় :** বাংলাদেশের পর্যটনশিল্পের সংকটের উত্তরণ এবং বিদ্যমান সমস্যার সমাধান হঠাৎ করে সম্ভব না হলেও এজন্য এখনই পদক্ষেপ গ্রহণ করা দরকার। নিম্নে বাংলাদেশের পর্যটনশিল্পের উন্নয়ন ও বিকাশের জন্য কতিপয় সুপারিশ পেশ করা হলো :

- অবিলম্বে পর্যটন সম্পর্কিত জাতীয় নীতিমালা সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে।
- দেশের আকর্ষণীয় পর্যটন স্থানগুলোকে সুপরিকল্পিতভাবে আধুনিকায়ন করে দেশী-বিদেশী পর্যটকদের কাছে তা তুলে ধরার ব্যবস্থা করতে হবে।
- ঐতিহাসিক নিদর্শন ও দর্শনীয় স্থানসমূহে যাতায়াতের জন্য উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা, আরামদায়ক বাসস্থান ও অন্যান্য অবকাঠামো নির্মাণের ব্যবস্থা করতে হবে।
- অভ্যন্তরীণ পর্যটন ব্যবস্থাকে উন্নত করার জন্য দেশের ব্যাপক জনগোষ্ঠীকে পর্যটন সম্পর্কে সচেতন ও আগ্রহী করে তোলা অত্যন্ত প্রয়োজন। এজন্য পর্যটন বিষয়ে ব্যাপক গণশিক্ষা এবং স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের পর্যটন বিষয়ে শিক্ষা দিতে হবে।
- দেশের শিক্ষিত বেকার জনগোষ্ঠীকে পর্যটন বিষয়ে আধুনিক ও মানসম্মত প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে। এজন্য দেশের বিভিন্ন স্থানে পর্যটন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট স্থাপন করতে হবে।
- পর্যটকদের নিরাপত্তার জন্য দেশে সুষ্ঠু আইনশৃঙ্খলার প্রয়োজন। বিমানবন্দরে নানা উটকো ঝামেলা, ভিক্ষুকদের উৎপাত, ছিনতাই ইত্যাদি যাতে বিদেশী পর্যটকদের বিব্রত না করে সেদিকে দৃষ্টি দেয়া প্রয়োজন।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



- প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দক্ষ পর্যটক গাইড গড়ে তুলতে হবে এবং দক্ষ গাইডের দুষ্প্রাপ্যতা দূর করতে হবে।
- বিমানবন্দরে পর্যটকদের জন্য আলাদা ডেস্কের ব্যবস্থা করতে হবে।
- পর্যটনশিল্পের উন্নয়নের জন্য বেসরকারি উদ্যোগকে ব্যাপকভাবে উৎসাহিত করা প্রয়োজন। এজন্য প্রয়োজনীয় নীতি ও কর্মসূচি প্রণয়ন করে প্রয়োজনবোধে রেয়াতি ঋণ ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা যেতে পারে।
- পর্যটনশিল্পের বিকাশের জন্য উদার দৃষ্টিভঙ্গি ও মুক্ত মনের প্রয়োজন।
- বাংলাদেশের পর্যটন কেন্দ্র ও আকর্ষণীয় স্থানগুলোর ওপর ফিল্ম ও ডকুমেন্টারি তৈরি করে বিদেশে বাংলাদেশের মিশনসমূহের মাধ্যমে তা বহির্বিশ্বে ব্যাপকভাবে প্রচারের ব্যবস্থা করতে হবে।
- পর্যটন স্পটগুলোতে নিয়মিতভাবে আকর্ষণীয় খেলাধুলা, হস্তশিল্প প্রদর্শনী, মাছধরা, নৌকা ভ্রমণ, লোকসঙ্গীত ইত্যাদির ব্যবস্থা করতে হবে।
- ব্যয়বহুল ও প্রযুক্তি নির্ভর নগরভিত্তিক পর্যটনশিল্পের পরিবর্তে প্রাকৃতিক অতুলনীয় দৃশ্য এবং পুরাকীর্তিসমূহ পর্যটন আকর্ষণ হিসেবে গড়ে তুলতে হবে।
- পর্যটকদের সহায়তা দানের জন্য স্থানীয়ভাবে পর্যটন ক্লাব, প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে হবে।
- সর্বোপরি দেশের আইনশৃঙ্খলার উন্নয়ন করে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা আনয়ন করতে হবে।

**উপসংহার :** উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, বাংলাদেশে পর্যটনের আকর্ষণের অভাব নেই। একজন পর্যটক যা চায় তার সবই আছে এ দেশে। কিন্তু অভাব আছে কার্যকর উদ্যোগের, সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার এবং আন্তরিক প্রচেষ্টার। বর্তমানে আমাদের দেশে দেশী-বিদেশী পর্যটকদের জন্য সীমিত পর্যটন সুবিধা আছে। কেননা সরকারি ও বেসরকারি উভয় ক্ষেত্রে এ শিল্পে বিনিয়োগ চাহিদার তুলনায় সামান্য। ফলে আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে পর্যটনশিল্পে বাংলাদেশের সাফল্য খুবই কম। কিন্তু পর্যটনশিল্পে বাংলাদেশের সম্ভাবনা খুবই উজ্জ্বল। পর্যটনশিল্পে বিদ্যমান সমস্যাসমূহ সমাধান করতে পারলে এবং উপযুক্ত পর্যটন পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারলে বাংলাদেশের পর্যটনশিল্প কর্মসংস্থান, বিনিয়োগ ও বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের অন্যতম প্রধান উৎস হতে পারে।

## রচনা ১৪ জ্বালানি সংকট নিরসনে বিকল্প শক্তি

**ভূমিকা :** জ্বালানি সংকট— বিশ্বজুড়ে এক মূর্তিমান আতংকের নাম। জীবনযাত্রার গতিকে নিশ্চল করে দেয়া, উন্নয়নের গতিকে থমকে দেয়া কিংবা অর্থনৈতিক মেরুদণ্ডকে শিরদাঁড়াহীন করে দেয়ার সীমাহীন শক্তিশালী দানব ক্রমচলমান জ্বালানি সংকট। সভ্যতাকে আলোকিত করা বিদ্যুতের প্রাণহানীও তো এর মুঠোয় আবদ্ধ। তাই জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিতের বিষয়টি এখন সব অঞ্চলের সব দেশের জন্যই প্রধান ইস্যু। যার উপায় হিসেবে আবিষ্কৃত হয়েছে নবায়নযোগ্য জ্বালানির এক অভাবনীয় বিকল্প শক্তি। জ্বালানি সংকটে জর্জরিত আমাদের প্রিয় বাংলাদেশের জন্য এক অসাধারণ উপায় হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে এ বিকল্প শক্তি। বিকল্প শক্তিকে যথাযথভাবে কাজে লাগাতে পারলে দেশের জ্বালানি চাহিদা যেমন মেটানো সম্ভব, তেমনি দেশের অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড সমুন্নত রাখা সম্ভবপর হবে। বিকল্প জ্বালানি শক্তি তাই সময়ের চাহিদা হিসেবে আমাদের সুবিবেচনায় নিতে হবে।



**জ্বালানি : চাহিদা চিত্র ও সংকট**

১. **প্রাকৃতিক গ্যাস :** দেশের জ্বালানির প্রধান খাত প্রাকৃতিক গ্যাস। প্রাকৃতিক গ্যাস হচ্ছে প্রকৃতিতে তৈরি হাইড্রোকার্বন যা সাধারণ তাপমাত্রায় ও চাপে বায়বীয় অবস্থায় থাকে। আধুনিক বিশ্বে তেলের পর গ্যাসকে প্রধান জ্বালানি শক্তির উৎস হিসেবে বিবেচনা করা হয়। প্রাকৃতিক গ্যাস বাংলাদেশের প্রধান জ্বালানি সম্পদ, যা দেশের মোট বাণিজ্যিক জ্বালানি ব্যবহারের শতকরা প্রায় ৭৫ ভাগ পূরণ করে। বিদ্যুৎ উৎপাদন, সার কারখানা, বাণিজ্যিক শিল্প ও গৃহস্থালী খাতে জ্বালানির প্রধান উৎস প্রাকৃতিক গ্যাস। এর মধ্যে ৮৮.৯০% শতাংশেরও বেশি গ্যাস ব্যবহৃত হয় বিদ্যুৎ উৎপাদনে।

দেশে এ যাবত আবিষ্কৃত গ্যাসক্ষেত্রের সংখ্যা ২৬টি। এগুলোর উত্তোলনযোগ্য, সম্ভাব্য ও প্রমাণিত মজুদের পরিমাণ ২৬.৭৩ ট্রিলিয়ন ঘনফুট। বর্তমানে দেশের ১৯টি গ্যাসক্ষেত্রের ৮০টি কূপ থেকে গ্যাস উৎপাদিত হচ্ছে। দেশে উৎপাদিত এ পরিমাণ গ্যাস চাহিদার তুলনায় কম। অথচ খাতওয়ারি গ্যাসের চাহিদা বৃদ্ধি পাচ্ছে প্রতিনিয়ত। দেশের ক্রমবর্ধমান গ্যাস চাহিদার কথা বিবেচনা করে মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার আওতায় ডিসেম্বর ২০১৫ শেষে দৈনিক ২,৮০০ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস উৎপাদনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। তাছাড়াও গৃহীত পরিকল্পনার সফল সমাপ্তিতে দৈনিক গ্যাস উৎপাদন ক্ষমতা ৪,৮০০ মিলিয়ন ঘনফুটে দাঁড়াবে।

২. **কয়লা :** কার্বন মৌলের অবিশুদ্ধ রূপ কয়লা। বিভিন্ন ধরনের কয়লার মধ্যে খনিজ কয়লার প্রধান ব্যবহার জ্বালানি হিসেবে। এর মধ্যে বিটুমিনাস ও অ্যানথ্রাসাইট হচ্ছে সবচেয়ে উন্নতমানের কয়লা। এক পরিসংখ্যান অনুযায়ী, প্রতি বছর বিশ্বে ৫,৮০০ মিলিয়ন টন কয়লা জ্বালানি হিসেবে ব্যবহৃত হয়। বাংলাদেশেও জ্বালানি হিসেবে কয়লার গুরুত্ব কোনো অংশেই কম নয়। দেশে এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত কয়লা খনির সংখ্যা ৬টি। এর মোট মজুদ প্রায় ২,৭০০ মিলিয়ন টন, যা প্রায় ৩৭ ট্রিলিয়ন ঘনফুট গ্যাসের সমতুল্য। ৬টির মধ্যে বড়পুকুরিয়া কয়লা খনিটি বাংলাদেশের প্রথম এবং বর্তমানে চালু থাকা একমাত্র কয়লা খনি। এ খনি থেকে দৈনিক ৩,০০০ মেট্রিক টন কয়লা উত্তোলিত হয়। বাকি খনিগুলো থেকে কয়লা উত্তোলন না হওয়ায় বিশাল পরিমাণ কয়লা জ্বালানি থেকে বঞ্চিত হচ্ছে বাংলাদেশ।

৩. **জ্বালানি তেল :** জ্বালানি তেল বা খনিজ তেল হলো ভারি হাইড্রোকার্বন যৌগসমূহের সমষ্টি। এ তেল প্রথমে ক্রুড অয়েল হিসেবে খনি থেকে পাওয়া যায়। পরিশোধনের পর এর থেকে কেরোসিন, পেট্রোল, ডিজেল, অকটেন প্রভৃতি পাওয়া যায়। বিশ্বে শক্তি সম্পদ হিসেবে খনিজ তেলের গুরুত্ব অপরিসীম। বাংলাদেশ ইতোমধ্যেই একটি প্রাকৃতিক গ্যাসসমৃদ্ধ অঞ্চল হিসেবে প্রমাণিত হলেও তেলের আবিষ্কার ঘটেছে খুব কমই। পেট্রোবাংলার হিসাব মতে, বর্তমানে দেশের জ্বালানি তেলের মজুদ প্রায় ৫৩ লক্ষ মেট্রিক টন। এ যাবৎ ৩টি তেলক্ষেত্র আবিষ্কৃত হলেও উত্তোলন নেই বললেই চলে। বর্তমানে দেশে তেলের চাহিদা প্রতিদিন প্রায় ৪৫,০০০ ব্যারেল। অবশ্যম্ভাবীভাবে বাংলাদেশকে তাই চাহিদার প্রায় পুরোটাই বিদেশ থেকে অপরিশোধিত ও পরিশোধিত আকারে আমদানি করতে হয়। এতে ব্যয় হচ্ছে প্রচুর অর্থ। সাথে সাথে আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের মূল্য বৃদ্ধি পেলেও দেশের অভ্যন্তরীণ বাজারে তেলের মূল্যসহ শুল্কহার পুনঃনির্ধারিত না হওয়ায় বিপুল লোকসানের সম্মুখীন হতে হয় সরকারকে। পাশাপাশি জনজীবন পরিচালনায় অতি প্রয়োজনীয় এ তেলের মূল্যবৃদ্ধিতে ভুক্তভোগী হতে হয় প্রতিটি মানুষকে। কারণ এতে অযাচিতভাবে বেড়ে যায় জীবনযাত্রার ব্যয়। তথাপিও দেশে ডিজেল ও কেরোসিনের ঘাটতি রয়েছে। সব মিলিয়ে চাহিদার তুলনায় অত্যধিক ঘাটতিসহ ভর্তুকি সংকটে অনেকটাই বিপর্যস্ত জ্বালানির এ খাত।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



৪. **বিদ্যুৎ সংকট :** আধুনিক সভ্যতার প্রাণ হচ্ছে বিদ্যুৎ। কৃষি, শিল্প, সেবাখাতসহ দৈনন্দিন জীবনে বিদ্যুতের চাহিদা ব্যাপক। তবে দেশে মোট চাহিদার বিপরীতে বিদ্যুৎ সুবিধা প্রাপ্তি এখনও পর্যাপ্ত নয়। বর্তমানে দেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় ৬২ শতাংশ বিদ্যুৎ সুবিধার আওতাধীন। বিদ্যুৎ সরবরাহ কম থাকায় লোডশেডিংয়ে বিপর্যস্ত জনজীবন। শিল্প-কলকারখানাসহ উৎপাদনের প্রতিটি খাতে বিদ্যুৎ সংকট সৃষ্টি করেছে ভয়াবহ নেতিবাচক অবস্থার। বিগত তিন বছরে তুলনামূলকভাবে বিদ্যুতের উৎপাদন ক্ষমতা বাড়লেও তা ক্রমবর্ধমান চাহিদার তুলনায় যথেষ্ট নয়। ফলে পাল্লা দিয়ে বেড়েছে বিদ্যুৎ সংকট। পিডিবি'র সূত্র মতে, বর্তমানে দেশে প্রতিদিন বিদ্যুতের চাহিদা ৬,২০০ মেগাওয়াট, আর উৎপাদন হচ্ছে ৫,২০০ মেগাওয়াট। অন্যদিকে বিদ্যুৎ বিতরণকারী সংস্থাসমূহের হিসেবে, দেশে বিদ্যুতের চাহিদা মোট ৭,৩০০ মেগাওয়াট। এ হিসেবে বর্তমানে চাহিদা ও উৎপাদনের মাঝে ব্যবধান ২,০০০ মেগাওয়াটেরও বেশি। প্রাকৃতিক গ্যাসের মারাত্মক উৎপাদন ঘাটতি, কয়লা উত্তোলন ও তা থেকে গ্যাস উৎপাদনের সীমাবদ্ধতা এবং জ্বালানি বা খনিজ তেলের প্রবল আমদানি নির্ভরতাসহ বিশাল বাজেটের ভর্তুকির কারণে সৃষ্ট জ্বালানি সংকট এর জন্য প্রধানভাবে দায়ী।

**বিকল্প শক্তি ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি :** বৈশ্বিক জ্বালানি উৎপাদনের তুলনায় ক্রমাগত ব্যবহার বৃদ্ধির প্রেক্ষাপটে বিশ্বে জ্বালানি সংকট এক আশংকার নাম। কেননা বিপুল হলেও জীবাশ্ম জ্বালানি একটা সময়ে অবশ্যই ফুরিয়ে যাবে। তখন প্রয়োজনের তাগিদে কিংবা পরিস্থিতির বিচারে জ্বালানি হিসেবে বিকল্প জ্বালানি তথা নবায়নযোগ্য জ্বালানিকেই বেছে নিতে হবে। পরিবেশগত বিপর্যয়, টেকসই উন্নয়ন ও আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার এ সূচকটিকেই বলা হয় বিকল্প বা নবায়নযোগ্য জ্বালানি। নবায়নযোগ্য জ্বালানি বলতে বোঝায় যেসব জ্বালানির উৎসকে নবায়ন করা যাবে অর্থাৎ মজুদ ফুরিয়ে গেলে আবার নতুনভাবে তৈরি করে নেয়া সম্ভব হবে। এ বিকল্প বা নবায়নযোগ্য জ্বালানি শক্তির উৎস কয়েক ধরনের। যথা—

১. **সৌর শক্তি/বিদ্যুৎ :** সৌরশক্তি হচ্ছে সূর্যরশ্মিকে রূপান্তর করে বিদ্যুৎশক্তিতে পরিণত করা। আংশিক পরিবাহী উপকরণ সাধারণত সিলিকন নির্মিত সৌর কোষসমূহের প্যানেল ব্যবহার করে সৌরশক্তি ধরে রাখা যায়। এটিকে সূর্যালোক দ্বারা আলোকিত করা হলে সৌর বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয়। সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদন একটি সাশ্রয়ী, সহজ ও পরিবেশবান্ধব প্রক্রিয়া। বাংলাদেশে সৌরবিদ্যুৎ ক্রমেই প্রচলিত হচ্ছে। সূর্যরশ্মির অফুরান সম্পদে সমৃদ্ধ এ দেশে বিকল্প বিদ্যুৎ উৎস হিসেবে সৌরবিদ্যুতের উজ্জ্বল সম্ভাবনা বিদ্যমান। দেশে এ পর্যন্ত স্থাপিত সোলার সিস্টেমের উৎপাদন ক্ষমতা প্রায় ৬৫ মেগাওয়াট। এর মাধ্যমে বিদ্যুৎ সুবিধা ভোগ করছে প্রায় ৬০ লাখ মানুষ। দেশে সৌর বিদ্যুৎ সিস্টেম প্রায় পুরোটাই আমদানি নির্ভর।

২. **পরমাণু বিদ্যুৎ :** ক্রমবর্ধমান বিদ্যুৎ চাহিদা বা ঘাটতি পূরণের অন্যতম বিকল্প শক্তি পরমাণু বিদ্যুৎ। পরমাণু প্লান্ট স্থাপনের মাধ্যমে পরমাণু বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয়। একটি ছোট আকারের পরমাণু প্লান্ট থেকে প্রচুর পরিমাণ শক্তি তথা বিদ্যুৎ উৎপাদন করা সম্ভব। পরমাণু শক্তি থেকে বিশ্বে উৎপাদিত বিদ্যুৎ ২০ শতাংশেরও বেশি। বাংলাদেশের বিদ্যুৎ পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে বিদ্যুৎ সংকট নিরসনে পরমাণু বিদ্যুৎ হতে পারে চূড়ান্ত আশীর্বাদ। কিন্তু অত্যন্ত ব্যয়বহুল ও প্রবল ঝুঁকিপূর্ণ বিধায় দেশে পরমাণু বিদ্যুৎ প্রকল্প এখনও আলোর মুখ দেখতে পারেনি। তবে সম্প্রতি পাবনার রূপপুরে পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের জন্য রাশিয়ার সাথে বাংলাদেশের একটি চুক্তি হয়। সে ক্ষেত্রে আশা করা যায় বাংলাদেশ অদূর আগামীর কোনো একদিন পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্রের সুবিধা পাবে।



৩. **বায়ু বিদ্যুৎ :** বায়ুবিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয় বায়ুশক্তিচালিত কেন্দ্র থেকে। বায়ুশক্তিচালিত টারবাইন দ্বারা যথেষ্ট পরিমাণ বিদ্যুৎ উৎপাদন করা যায়। এ প্রক্রিয়ায় বিশ্বে প্রতিবছর বিদ্যুৎ উৎপাদন ৩০ শতাংশ হারে বাড়ছে। বায়ুশক্তি দূষণমুক্ত, নির্ভরযোগ্য এবং সহজে স্থাপনযোগ্য। এটি আবহাওয়ার গতি-প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল। বায়ু বিদ্যুৎ উৎপাদনে এ শক্তির সবচেয়ে উপযুক্ত স্থান সমুদ্র এলাকা।

৪. **বায়োগ্যাস প্রকল্প :** মূলত পচনশীল পদার্থ যেমন গোবর, বিভিন্ন বর্জ্য পদার্থ ও অন্যান্য জৈব পদার্থ বাতাসের অনুপস্থিতিতে পচানোর ফলে যে জ্বালানি গ্যাস তৈরি হয় তা বায়োগ্যাস প্লান্ট হিসেবে পরিচিত। এতে ৬০-৭০ ভাগ জ্বালানি গ্যাস তৈরি হয়ে অবশিষ্ট অংশ উন্নতমানের জৈবসার হিসাবে ব্যবহৃত হতে পারে। গৃহস্থালি রান্নাবান্না এবং বাতি জ্বালানো ছাড়াও বায়োগ্যাস দিয়ে জেনারেটরের সাহায্যে বিদ্যুৎ উৎপাদন করে বাতি, ফ্যান, ফ্রিজ, টিভিসহ অন্যান্য বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি চালানো সম্ভব। বায়োগ্যাস প্লান্ট এক ধরনের সাশ্রয়ী প্রযুক্তি।

নবায়নযোগ্য বিকল্প জ্বালানির উপরোল্লিখিত উৎস ছাড়াও আরো কিছু বিকল্প শক্তি রয়েছে। যেগুলো বিশেষ পরিবেশগত বৈশিষ্ট্যের মুখাপেক্ষী বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে যথোপযুক্ত না হলেও বিশ্ব প্রেক্ষাপটে যথেষ্ট গ্রহণযোগ্য হিসেবে বিবেচিত। যেমন— হাইব্রিড পাওয়ার প্লান্ট, জিওথার্মাল বা ভূ-উত্তাপ শক্তি, সাগরের তাপশক্তি, বায়োডিজেল এবং টাইডাল এনার্জি ইত্যাদি।

**সংকট নিরসন : জ্বালানি নিরাপত্তা ও করণীয় :** জ্বালানি যে কোনো দেশের অর্থনীতির গতিধারার মূল চালিকা শক্তি। বর্তমান বিশ্বে জনপ্রতি জ্বালানি ব্যবহারের হার ঐ দেশের উন্নয়নের সূচক হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। তাই দেশের উন্নয়নে জ্বালানি সংকট নিরসন তথা জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ বিষয়টি এখন সর্বাধিক বিবেচ্য বিষয়। অথচ জ্বালানি নিরাপত্তাহীনতাকে সাথে নিয়েই নিত্য চলা বাংলাদেশের। জ্বালানির প্রতিটি ক্ষেত্রেই দেশে সংকট বিদ্যমান। জ্বালানি খাতের চলমান সংকটাবস্থার এহেন পরিস্থিতিতে জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে আন্তরিক ও যথোপযুক্ত পরিকল্পনার বাস্তবায়ন প্রয়োজন। খাতভিত্তিক কর্মসূচির অগ্রযাত্রায় এর সুফল পাওয়া যেতে পারে তাড়াতাড়ি। যেমন– প্রাকৃতিক গ্যাসের ক্ষেত্রে প্রয়োজন অধিক সংখ্যক গ্যাসক্ষেত্র আবিষ্কারের পথে অগ্রসর হওয়া এবং তা উত্তোলনে প্রয়োজনীয় কাঁচামালের পর্যাপ্ত সরবরাহ নিশ্চিত করা। কয়লা সম্পদেও দেশের সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। এক্ষেত্রে তাই পাঁচটি কয়লা খনির প্রতিটি থেকেই যথা পরিমাণ কয়লা উত্তোলনের ব্যবস্থা নিতে হবে। সরে আসতে হবে উন্মুক্ত কিংবা ভূ-গর্ভস্থ পদ্ধতিতে কয়লা উত্তোলনের অযাচিত বিতর্ক থেকে। যাতে করে কারোরই ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা না থাকে। জ্বালানি তেলে বাংলাদেশ পুরোপুরি আমদানি নির্ভর হলেও দেশে সন্তোষজনক পরিমাণ তেলের মজুদের সম্ভাবনা প্রায় নিশ্চিত হওয়া গেছে। বাণিজ্যিক জ্বালানির প্রধান এ তিন খাতের সংকট নিরসনের মধ্যেই বিদ্যুৎ সংকট নিরসনের মূল সূত্র নিহিত। তাই এর সাথে সাথে বিদ্যুৎ সংকটের অন্যান্য অনভিপ্রেত কারণগুলো চিহ্নিত করে তা সমাধানে সচেষ্ট পদক্ষেপ নেয়া জরুরি। পাশাপাশি বিদ্যুৎ সংকট নিরসনে বিকল্প শক্তি তথা উপযুক্ত নবায়নযোগ্য জ্বালানির ব্যবস্থা গ্রহণ করে দ্রুত সম্প্রসারণের ব্যবস্থা করতে হবে। আশা করা যায় এরূপ বহুমুখী পদক্ষেপের সফল বাস্তবায়নে দেশের জ্বালানি সংকট এবং বিদ্যুৎ সংকটের অধিকাংশই নিরসন হবে। স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ বিনির্মাণে যার কোনো বিকল্প নেই।

**উপসংহার :** উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, বাংলাদেশ জ্বালানি সম্পদে সমৃদ্ধ না হলেও একেবারে অপ্রতুলও নয়। বাংলাদেশ এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত জ্বালানি দিয়ে চাহিদা পূরণের পাশাপাশি বিকল্প জ্বালানি আবিষ্কারের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। সৌর বিদ্যুৎ, বায়ুগ্যাস, পরমাণু বিদ্যুৎ, বায়ু বিদ্যুৎ এ প্রচেষ্টারই ফসল। উপযুক্ত কারিগরি প্রযুক্তি ও যথোপযুক্ত অর্থায়নের মাধ্যমে এ বিকল্প জ্বালানি ব্যবহার নিশ্চিত করা যেতে পারে।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



## রচনা ১৫ বাংলাদেশের শ্রমবাজার : সংকট ও সম্ভাবনা

**ভূমিকা :** প্রবাসী শ্রমিক, রেমিট্যান্স ও বাংলাদেশের অর্থনীতি একই যোগসূত্রে গাঁথা। কারণ বৈদেশিক কর্মসংস্থান এবং প্রবাসীদের প্রেরিত অর্থ বেকার সমস্যা, বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বৃদ্ধিসহ দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ব্যাপক অবদান রাখছে। বিশ্বের বহু দেশে ছড়িয়ে আছে বাংলাদেশী শ্রমিক। বিশেষ করে আরব রাষ্ট্রসমূহে ও মধ্যপ্রাচ্যে। সাম্প্রতিক সময়ে আরব বিশ্বের অস্থিতিশীল রাজনীতি আর ভয়াবহ ভূমিকম্প ও সুনামির পর জাপানে পারমাণবিক সংকট বাংলাদেশের অর্থনীতিতে নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। সংকুচিত হয়ে আসছে দেশের অর্থনীতির প্রাণ ভোমরা রেমিট্যান্স প্রবাহ। আরব দেশগুলোর বর্তমান পরিস্থিতির কারণে প্রায় লক্ষাধিক জনশক্তি দেশে ফিরে আসার পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে। ফলে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে তাদের রেমিট্যান্স। ২০০৮ সালে শুরু হওয়া অর্থনৈতিক মন্দার রেশ কাটতে না কাটতে বিশ্ব অর্থনীতির নতুন এ সংকটে বাংলাদেশ ও বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশগুলোর রেমিট্যান্স-নির্ভর অর্থনীতি এখন হুমকির মুখে পড়েছে।

**বাংলাদেশের শ্রমবাজার :** বিশ্বের প্রায় দেশেই বাংলাদেশের শ্রমশক্তি রয়েছে। প্রতিবছর উল্লেখযোগ্য সংখ্যক বাংলাদেশী কাজের জন্য মধ্যপ্রাচ্যসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে গমন করে থাকে। তবে বাংলাদেশের প্রবাসী জনশক্তির অধিকাংশই সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরাত, মালয়েশিয়া, কুয়েত, ওমান ও সিঙ্গাপুরে কর্মরত। এছাড়া বাহরাইন, লিবিয়া, কাতার, জর্ডান, লেবানন, ব্রুনাই, দক্ষিণ কোরিয়া, মরিসাস, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, আয়ারল্যান্ড ও ইতালিসহ অন্যান্য দেশেও বাংলাদেশী শ্রমশক্তি কর্মরত রয়েছে। এর মধ্যে মধ্যপ্রাচ্যেই রয়েছে বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় শ্রমবাজার। সারাবিশ্বে অন্তত ৭০ লাখ বাংলাদেশী বৈধভাবে চাকরি নিয়ে বসবাস করছেন, যার প্রায় ৭০ শতাংশই আছেন মধ্যপ্রাচ্যে। এর মধ্যে সৌদি আরবে ১৯৭৬ সাল থেকে ২০১১ সালের জানুয়ারি পর্যন্ত গমনকারী বাংলাদেশী শ্রমিকের সংখ্যা ২৫ লাখ ৮০ হাজার ১৯৮ জন, যা মোট জনশক্তির ৩৬ শতাংশ। তন্মধ্যে শুধু ২০১০-১১ সালে প্রায় ৪.৩৯ লক্ষ বাংলাদেশী নাগরিক কাজের সন্ধানে বিদেশে গমন করছে। সংখ্যার বিচারে সৌদি আরবের পরে সংযুক্ত আরব আমিরাত বাংলাদেশের অন্যতম শ্রমবাজার। অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১২ মতে, ২০১১-২০১২ (জুলাই-মার্চ) অর্থবছরে দেশটিতে গমনকারী শ্রমিকের সংখ্যা ৮৬৯৯৬ জন। এছাড়া মধ্যপ্রাচ্যের অন্যান্য দেশ, যেমন কুয়েতে ৭ শতাংশ, কাতারে ২ শতাংশ ও লিবিয়ায় ১ শতাংশ বাংলাদেশী শ্রমশক্তি নিয়োজিত রয়েছে। মধ্যপ্রাচ্য জুড়ে বিস্তৃত এ ৮০ শতাংশ শ্রমবাজারের অবশিষ্ট ২০ শতাংশ মালয়েশিয়া (১০ শতাংশ), সিঙ্গাপুর (৪ শতাংশ) ও পৃথিবীর অন্যান্য দেশে বিস্তৃত।

**বাংলাদেশের রেমিট্যান্স চিত্র :** ১৯৭৬ সালে সর্বপ্রথম জনশক্তি রফতানির মাধ্যমে দেশে রেমিট্যান্স প্রবাহ শুরু হয়। ঐ বছর মোট রেমিট্যান্স প্রাপ্তির পরিমাণ ছিল ৩৫.৮৫ কোটি টাকা। এরপর প্রতিবছরই উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে দেশের রেমিট্যান্স প্রবাহ ক্রমান্বয়ে এগিয়েছে। বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১৪ অনুযায়ী ২০১৩-২০১৪ অর্থবছরের জুলাই-ফেব্রুয়ারি সময়ে দেশের রেমিট্যান্স প্রাপ্তির পরিমাণ ৯২০৬.১২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। রেমিট্যান্সের সিংহভাগ আসে মধ্যপ্রাচ্যের দেশসমূহ থেকে। এক্ষেত্রে কয়েক বছর যাবত একচ্ছভাবে সৌদি আরবের পরই আরব আমিরাতের অবস্থান। তৃতীয় অবস্থানে যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বব্যাংকের মাইগ্রেশন অ্যান্ড রেমিট্যান্সেস ফ্যাক্ট বুক-২০১১ অনুযায়ী, ২০১০ সালে রেমিট্যান্স অর্জনে নিম্ন আয়ের দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান শীর্ষে, যার পরিমাণ প্রায় ১১০০ কোটি ডলার এবং দক্ষিণ এশিয়ায় রেমিট্যান্স অর্জনে ভারতের পরই বাংলাদেশের অবস্থান।

**আরব, মধ্যপ্রাচ্য সংকট ও বাংলাদেশের রেমিট্যান্স প্রবাহ :** আরব বিশ্বজুড়ে এখন রাজনৈতিক সুনামি চলছে। সেই সুনামি আঘাত হানছে উত্তর আফ্রিকার মুসলিম দেশগুলোতে। মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে এরই মধ্যে দেখা দিয়েছে ভয়াবহ রাজনৈতিক সংকট। আন্দোলনের ভয়ে তটস্থ আলজেরিয়া, জর্ডান,



ইয়েমেন, মরক্কো, বাহরাইন, এমনকি সৌদি আরবও। প্রবাসী আয়ের শতকরা ৮০ ভাগই আসে মধ্যপ্রাচ্যের দেশসমূহ থেকে। যেমন : ২০১৩-২০১৪ (ফেব্রুয়ারি ২০১৪) অর্থবছরে প্রেরিত অর্থের পরিমাণ (মিলিয়ন মার্কিন ডলারে) ছিল সৌদি আরবের ২০৩৯.১, আরব আমিরাত ১৭৩৯.১, কাতার ১৬৬.৩, ওমান ৪৩২.৫, বাহরাইন ২৮২.৮, কুয়েত ৭২৭.৪, মালয়েশিয়া ৬৭০.৪, যুক্তরাষ্ট্র ১৫০০.৬, সিঙ্গাপুর ২৭৭.৭, যুক্তরাজ্য ৬০০.২ এবং অন্যান্য ৭৭০.১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় শ্রমবাজার সৌদি আরব এবং মালয়েশিয়া। দুটি দেশেই জনশক্তি রফতানি বন্ধ ছিল। বর্তমানে এই বৃহৎ শ্রমবাজার চালু হয়েছে। যা বাংলাদেশের রেমিট্যান্স প্রবাহকে আরও গতিশীল করবে। এছাড়া ওমান ও কাতারেও বাংলাদেশী জনশক্তি নেয়া হচ্ছে না। ফলে এসব দেশের বাংলাদেশী জনশক্তি আমদানির প্রতি বিমুখতা এবং সাম্প্রতিক মধ্যপ্রাচ্য সংকট দুইয়ে মিলে দেশের জনশক্তি রফতানি এবং রেমিট্যান্স প্রবাহে নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে। চলতি অর্থবছরের প্রথম ১০ মাস প্রবাসী বাংলাদেশিরা ব্যাংকিং চ্যানেলের মাধ্যমে ১ হাজার ২০০ কোটি ডলারের বেশি মূল্যায়নের বৈদেশিক মুদ্রা দেশে পাঠিয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংক ঘোষিত দ্বিতীয়ার্ধের (জানু-জুন ১৩) মুদ্রানীতিতে চলতি অর্থবছরে মোট ১ হাজার ৪৪৭ কোটি ডলার রেমিট্যান্স আসবে বলে প্রাক্কলন করা হয়েছে।

**শ্রমবাজার সংকট, সম্ভাবনা ও করণীয় :** দেশের সবচেয়ে বেশি বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের সেরা মাধ্যম জনশক্তি রফতানি বা প্রবাসী আয়। কিন্তু ক্রমবর্ধমান শ্রমবাজার সংকটহেতু জনশক্তি রফতানিতে ধ্বস দেশের রেমিট্যান্স প্রবাহকে প্রতিনিয়তই স্থবির করে তুলছে। প্রায় তিন বছর ধরে জনশক্তি রফতানির নিম্নমুখী প্রবণতা রয়েছে। বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দা, বিদেশে মানুষরূপী অমানুষদের পদচারণ ও অপতৎপরতায় বাংলাদেশীদের ভাবমূর্তি সংকট, দক্ষ শ্রমিকের অভাব এবং বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশের জনশক্তি রফতানি বন্ধ হয়ে যাওয়া এবং কূটনৈতিক তৎপরতার অভাবসহ নানাবিধ কারণ এর পেছনে জড়িত। সাম্প্রতিক সময়ে লিবিয়া এবং মধ্যপ্রাচ্য ও আরব বিশ্বে রাজনৈতিক সংকটে রিক্ত নিঃস্ব হয়ে প্রবাসী শ্রমিকদের দেশে ফিরে আসার প্রবণতায় দেশের রেমিট্যান্স প্রবাহে যোগ করেছে সংকটের নতুন মাত্রা। ফলে দক্ষিণ এশিয়ার দ্বিতীয় বৃহত্তম প্রবাসী আয় বা রেমিট্যান্স অর্জনকারী দেশ হয়েও হুমকির মুখে দাঁড়িয়ে বাংলাদেশ। অথচ জাতীয় অর্থনীতিতে অসামান্য অবদান রাখা এ বৃহৎ খাতটির স্থবিরতা দূর করা প্রয়োজন সবার আগে। এক্ষেত্রে যথেষ্ট সুযোগও রয়েছে বাংলাদেশের। মধ্যপ্রাচ্যের শ্রমবাজারে চাহিদার ভাটা পড়লেও পূর্ব এশিয়াসহ বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলের অর্থনৈতিকভাবে অনেক এগিয়ে যাওয়া দেশগুলোতে দক্ষ ও অদক্ষ জনবলের ব্যাপক ঘাটতি রয়েছে। এসব অঞ্চলে বাংলাদেশের জনশক্তি রফতানিকে সহায়তা দিয়ে মধ্যপ্রাচ্যে শ্রমবাজারের যে ধাক্কা লেগেছে তা পূরণ করা সম্ভব। এছাড়া আফ্রিকা মহাদেশ ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের দেশগুলোতে জনশক্তি রফতানির সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছে। এক্ষেত্রে নতুন করে শ্রমবাজার পাওয়ার উজ্জ্বল সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছে বাংলাদেশের সামনে। এখন প্রয়োজন দ্রুত কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ। ২০২২ সালে বিশ্বকাপ ফুটবলের আয়োজক দেশ কাতারে নির্মাণ শিল্পে বাংলাদেশীদের কাজ পাওয়ার সুযোগ রয়েছে। সামগ্রিকভাবে সংকটময় পরিস্থিতিতেও দেশের জনশক্তি রফতানি বৃদ্ধির মাধ্যমে প্রবাসী আয়ের উর্ধ্বমুখী গ্রাফ ধরে রাখার যথেষ্ট সম্ভাবনা বিদ্যমান বাংলাদেশের সামনে। এক্ষেত্রে এ সম্ভাবনাকে কাজে লাগানোর পাশাপাশি বিদেশে বাংলাদেশের বন্ধ হয়ে যাওয়া শ্রমবাজার উন্মুক্ত করার জন্য জোর কূটনৈতিক প্রচেষ্টা ও কার্যকরী উদ্যোগ গ্রহণ জরুরি।

**উপসংহার :** উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, বাংলাদেশের শ্রম বাজার এক বিশাল সম্ভাবনাময় খাত। এ খাত থেকে বাংলাদেশ প্রতিবছর প্রচুর রেমিট্যান্স পেয়ে থাকে, যা বাংলাদেশের অর্থনীতিতে ব্যাপক অবদান রাখে। তাই বাংলাদেশের শ্রমবাজারের সমস্যাসমূহ চিহ্নিত করে তা সমাধানের আশু ব্যবস্থা গ্রহণ করা জরুরি।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

# সামাজিক সমস্যা ও বিষয়াবলি

## রচনা ১৬ দুর্নীতি : প্রেক্ষিত বাংলাদেশ

### বাংলাদেশে দুর্নীতি ও সন্ত্রাস : সমাধানের উপায়

*[২৭তম বিসিএস]*

**ভূমিকা :** সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে বিষবাষ্পের মতো ছড়িয়ে পড়া সর্বগ্রাসী দুর্নীতির ভয়াল কালো থাবায় বিপন্ন আজ মানবসভ্যতা। এ সর্বনাশা সামাজিক ব্যাধির মরণ ছোবলে বর্তমান সমাজ জর্জরিত। রাষ্ট্রীয় প্রশাসন থেকে শুরু করে দেশের রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি, শিক্ষানীতি, সংস্কৃতি, শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্যসহ সর্বত্রই চলছে দুর্নীতি। দুর্নীতির করালগ্রাসে সম্ভাবনাময় বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ ক্রমশ হয়ে উঠছে অনিশ্চিত ও অনুজ্জ্বল। তাই বিশেষজ্ঞরা দুর্নীতিকে জাতীয় উন্নয়নের অন্যতম প্রধান অন্তরায় হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।

**দুর্নীতি :** দুর্নীতি সমাজের প্রচলিত নীতি, আদর্শ ও মূল্যবোধের পরিপন্থী বিশেষ ধরনের অপরাধমূলক আচরণ। দুর্নীতির সাথে পেশা, ক্ষমতা, সুযোগ-সুবিধা, পদবি প্রভৃতি অপব্যবহার সংশ্লিষ্ট। আভিধানিক অর্থে দুর্নীতি হলো ঘুষ বা অনুগ্রহ দ্বারা জনকর্তব্য সম্পাদনে একাগ্রতার বিকৃতি বা ধ্বংস।

নৈতিক প্রেক্ষাপটে বলা যায়, নীতিবিচ্যুত হওয়া বা কোনো গুণ ও পবিত্রতার অবমাননাই হলো দুর্নীতি। প্রশাসনিক দৃষ্টিকোণ থেকে বলা যায়, ব্যক্তিগত স্বার্থ চরিতার্থ কিংবা আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব বা অন্য কাউকে অবৈধ সুযোগ-সুবিধা প্রদানের উদ্দেশ্যে যদি কোনো সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী নিজের খেয়ালখুশিমতো সরকারি ক্ষমতা বা পদমর্যাদার অপব্যবহার করে বা টাকা-পয়সা এবং বস্তুগত ও অন্যবিধ উৎকোচাদির মাধ্যমে অন্যায় কোনো কাজ করে অথবা ন্যায়সঙ্গত কাজ করা থেকে বিরত থাকে তাহলে তার এরূপ কার্যকলাপ দুর্নীতি।

Social Work Dictionary-র সংজ্ঞানুসারে, 'Corruption is in political and public service administration, the abuse of office for personal gain, usually through bribery, extortion, influence pedding and special treatment given to some citizens and not to others'—অর্থাৎ রাজনৈতিক ও সরকারি প্রশাসনে দুর্নীতি বলতে অফিস-আদালতকে ব্যক্তিগত লাভের জন্য অপব্যবহার করাকে বোঝায়। সাধারণত ঘুষ, বলপ্রয়োগ বা ভয়প্রদর্শন, প্রভাব এবং ব্যক্তিবিশেষকে বিশেষ সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে গণপ্রশাসনের ক্ষমতা অপব্যবহারের দ্বারা ব্যক্তিগত সুবিধা অর্জনকে দুর্নীতি বলা হয়।

মোটকথা, অন্যায় ও অবৈধ পথে কোনো কিছু করা বা করার চেষ্টাই দুর্নীতি। যেমন— কেউ যদি ঘুষ গ্রহণ করে সেটাও দুর্নীতি, আবার কেউ যদি ঘুষগ্রহণে কাউকে সহায়তা করে সেটাও দুর্নীতি।



**বাংলাদেশে দুর্নীতির ক্ষেত্রসমূহ :** বাংলাদেশের প্রায় প্রতিটি সেক্টরই কোনো না কোনোভাবে দুর্নীতির সাথে জড়িত। নিচে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো :

১. **রাজনৈতিক ক্ষেত্রে :** রাজনৈতিক দলগুলো দেশের মূল চালিকাশক্তি। অথচ রাজনৈতিক ক্ষেত্রেই বর্তমানে ব্যাপকহারে দুর্নীতি চলছে। জনগণের সাথে রাজনৈতিক অঙ্গীকারের বরখেলাপ, ক্ষমতায় থাকাকালে নিজ পদ ও ক্ষমতা ব্যবহার করে রাষ্ট্রীয় সুযোগ-সুবিধাকে অন্যায়ভাবে নিজের আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব ও নিজ দলীয় কর্মী-সমর্থকদের স্বার্থে কাজে লাগানো, তাদেরকে নির্মাণকাজের ঠিকাদারি বা হাট-বাজারের ইজারা প্রদান এবং বিভিন্ন ধরনের লাইসেন্স দেয়া, ব্যবসায়ীমহলসহ বিভিন্ন ব্যক্তি ও সংস্থার কাছ থেকে কমিশন গ্রহণ ও চাঁদা আদায় এবং বিনিময়ে তাদের বিভিন্ন অন্যায় সুবিধা প্রদান, সরকারি অর্থের অপচয় ও আত্মসাৎসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দুর্নীতি বর্তমানে এ দেশে স্বাভাবিক রীতিতে পরিণত হয়েছে।

২. **প্রশাসনিক ক্ষেত্রে :** বর্তমানে বাংলাদেশের কোনো সরকারি দপ্তর বিভাগই দুর্নীতিমুক্ত নয়। ঘুষ বা উৎকোচ গ্রহণ, সরকারি অর্থ আত্মসাৎ, অপচয় ও চুরি ছাড়াও ক্ষমতার অপব্যবহার, কাজে ফাঁকি দেয়া, স্বজনপ্রীতি, সরকারি সুযোগ-সুবিধার অপব্যবহার ইত্যাদির মাধ্যমে প্রশাসনে ব্যাপকহারে দুর্নীতি হয়ে থাকে।

৩. **অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে :** ব্যবসায়ী মহল কর্তৃক মজুদদারির মাধ্যমে দ্রব্যবাজারে কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করে অতিরিক্ত মুনাফা আদায়, বিভিন্ন অজুহাতে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি করা, চোরাকারবার, খাদ্যে ভেজাল দেয়া, নকল পণ্য উৎপাদন ও বিক্রয়, ওজনে কম দেয়া, সরকারি রেশনে কারচুপি করা, কর, শুল্ক, খাজনা ইত্যাদি ফাঁকি দেয়াসহ এ ধরনের অর্থনৈতিক দুর্নীতি বর্তমানে বাংলাদেশকে গ্রাস করে ফেলছে।

৪. **শিক্ষা ক্ষেত্রে :** পরীক্ষায় ব্যাপক নকলপ্রবণতা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অর্থ আত্মসাৎ, শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে বিভিন্ন অজুহাতে অতিরিক্ত অর্থ আদায়, ক্লাসে ভালোভাবে না পড়িয়ে প্রাইভেট টিউশনি ও কোচিং সেন্টারে পাঠদান, নিয়মিত ক্লাসে না আসা, দলীয় ভিত্তিতে অযোগ্য লোকদের বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিয়োগ দেয়াসহ এ ধরনের অসংখ্য দুর্নীতির কারণে বর্তমানে বাংলাদেশে শিক্ষার গুণগত মানের চরম অবনতি ঘটেছে। ফলে প্রয়োজনীয় যোগ্যতাসম্পন্ন এবং দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে উঠছে না।

৫. **ধর্মীয় ক্ষেত্রে :** এ দেশে ধর্মকে কেন্দ্র করেও নানা রকমের দুর্নীতি চলছে। জনসাধারণের ধর্মীয় বিশ্বাস ও অনুভূতির সুযোগ নিয়ে বিভিন্ন ধরনের প্রতারণা, স্বার্থসিদ্ধি, অর্থ উপার্জন ও জনস্বার্থবিরোধী কাজ ধর্মীয় দুর্নীতির পর্যায়ভুক্ত। বিভিন্ন ধরনের ধর্মব্যবসা, রোগমুক্তি ও মনোবাসনা পূরণে ধর্মের দোহাই দিয়ে ধর্মপ্রাণ মানুষের সাথে ধোঁকাবাজি, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানকে ব্যক্তি বা দলীয় স্বার্থে কাজে লাগানোও ধর্মীয় দুর্নীতির পর্যায়ে পড়ে।

৬. **বেসরকারি খাতে :** শুধু সরকারি খাতে নয়, বেসরকারি খাতেও দুর্নীতি ছড়িয়ে পড়েছে। শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ার নামে সরকারি সুবিধা ও ব্যাংক ঋণ নিয়ে সে টাকা বিলাস-ব্যসন বা অন্য কাজে ব্যবহার এবং বিদেশী ব্যাংকে জমা করা, ব্যাংক ঋণ ইচ্ছাকৃতভাবে পরিশোধ না করা, কর ও শুল্ক ফাঁকি দেয়া, শেয়ার মার্কেট কেলেংকারি ইত্যাদি এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে। দুঃখজনক হলেও সত্য যে, ঋণখেলাফী বর্তমানে বাংলাদেশে রাতারাতি ধনী হওয়ার প্রধান হাতিয়ারে পরিণত হয়েছে।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



**বাংলাদেশের সর্বগ্রাসী দুর্নীতির প্রভাব :** বাংলাদেশে দুর্নীতির ভয়াবহ বিস্তার এবং এর ফলে সৃষ্ট অর্থনৈতিক ক্ষতিসহ অন্যান্য ক্ষতির বিশালতার কারণে উন্নয়ন বিশেষজ্ঞগণ দুর্নীতিকে বাংলাদেশের জাতীয় উন্নয়নের সবচেয়ে বড় অন্তরায় হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। নিচে বাংলাদেশের সর্বগ্রাসী দুর্নীতির প্রভাব আলোচনা করা হলো :

১. **জাতীয় উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত :** দুর্নীতির ফলে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয় সরকারি খাতে জাতীয় উন্নয়ন প্রক্রিয়া। যে অর্থ ঋণ করে আনা হয় দেশের উন্নয়নের জন্য বা যে অর্থ সাহায্য হিসেবে আসে দরিদ্র জনগণের উপকারের জন্য তার সিকিভাগও সফলভাবে ব্যবহৃত হয় না। যে অর্থ উন্নয়নমূলক কর্মসূচি ও উৎপাদনশীল কাজে ব্যয় করার কথা তা চলে যায় দুর্নীতিবাজ আমলা ও শাসকগোষ্ঠীর পকেটে। দুর্নীতির ফলে অদক্ষ ঠিকাদারের হাতে গড়ে ওঠে নিম্নমানের বিভিন্ন স্থাপনা। সরবরাহকারীরা কমদামের ও নিম্নমানের জিনিস বেশি দামে সরবরাহ করে বিপুল অঙ্কের টাকা আয় করে। সরকারি কর্মকর্তাদের একটি নির্দিষ্ট অঙ্কের টাকা ঘুষ হিসেবে না দেয়া পর্যন্ত উন্নয়নমূলক কর্মসূচির ফাইল চাপা পড়ে থাকে।

২. **অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ব্যাহত :** দুর্নীতি বাংলাদেশের উচ্চতর অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির পথে অন্যতম অন্তরায়। দেশীয় অর্থনীতির বিভিন্ন খাত যেমন— কৃষি, শিল্প, ব্যাংকসহ অন্যান্য আর্থিক খাতের দুর্নীতি দেশজ উৎপাদনকে নানাভাবে বাধাগ্রস্ত করে থাকে। বিশ্বব্যাংক বাংলাদেশে দুর্নীতি বিষয়ে এক গবেষণা প্রতিবেদনে বলেছে, বাংলাদেশের দুর্নীতির ব্যাপকতা রোধ করা গেলে জিডিপির প্রবৃদ্ধি ২-৩ শতাংশ বেড়ে যেত এবং মাথাপিছু আয় দ্বিগুণ হয়ে ৭০০ ডলারে উন্নীত হতো। এমনকি বিশেষজ্ঞরা দাবি করেন, দুর্নীতির ফলে যে অর্থ অপচয় হয় তা উন্নয়নমূলক কাজে ব্যয় করা গেলে জিডিপির প্রবৃদ্ধি হতো ৪ শতাংশ বেশি।

৩. **বিনিয়োগ বাধাগ্রস্ত :** ব্যাপক দুর্নীতি ও প্রশাসনিক হয়রানি বাংলাদেশে দেশী-বিদেশী বিনিয়োগের একটি বড় অন্তরায়। ইউএনডিপির মতে, দুর্নীতি কমাতে পারলে বাংলাদেশে প্রকৃত বিনিয়োগের পরিমাণ অন্তত ৫ শতাংশ এবং বার্ষিক জিডিপির হার ০.৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেত। ইতিপূর্বে এডিবি এবং ইইউ বাংলাদেশকে এই বলে সতর্ক করে দিয়েছে যে, দুর্নীতি, অস্বচ্ছতা আর আমলাতান্ত্রিক জটিলতার কারণে বাংলাদেশ পর্যাপ্ত পরিমাণ বিদেশী বিনিয়োগ আকর্ষণ করতে পারছে না।

৪. **মানব উন্নয়ন ভূলুণ্ঠিত :** বাংলাদেশের মানব উন্নয়ন প্রক্রিয়া সর্বত্র আজ ভূলুণ্ঠিত। মানব উন্নয়নে বাংলাদেশের অবস্থান এখনো দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে সর্বনিম্নে। এজন্য মূলত দুর্নীতিই দায়ী। কেননা স্বাস্থ্য, শিক্ষা, পুষ্টি, পরিবার পরিকল্পনা, বয়স্ক সাক্ষরতাসহ মানব উন্নয়নের বিভিন্ন খাতে এ পর্যন্ত সরকারি ও বেসরকারিভাবে যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় করা হয়েছে তা যদি দুর্নীতিমুক্ত হয়ে সঠিকভাবে ব্যবহৃত হতো তাহলে মানব উন্নয়নে বাংলাদেশের অবস্থান নিঃসন্দেহে আরো ওপরে থাকতো।

৫. **দারিদ্র্য বিমোচনে বাধা :** দুর্নীতি ও দারিদ্র্য আমাদের জাতীয় জীবনে দুটি প্রধান সমস্যা। দারিদ্র্য অনেক ক্ষেত্রে দুর্নীতিকে সহায়তা করছে, আবার দুর্নীতির ফলে আমরা দারিদ্র্যের বেড়াজাল থেকে বেরিয়ে আসতে পারছি না। দুর্নীতি পদে পদে দারিদ্র্য বিমোচনের সরকারি-বেসরকারি নানাবিধ প্রয়াসকে বাধাগ্রস্ত করছে। এমনকি আমাদের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও প্রবৃদ্ধি যেটুকু হচ্ছে তাও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কাছে ঠিকমতো পৌছুচ্ছে না। দুর্নীতিবাজ আমলা, রাজনীতিবিদ, এনজিও কর্মকর্তা ও ধনকুবেরদের যোগসাজশে তা দরিদ্র জনগোষ্ঠীর নাগালের বাইরেই থেকে যায়। অথচ দুর্নীতির ফলে যে অর্থ অপচয় হয় তা যদি দারিদ্র্য বিমোচনে সঠিকভাবে কাজে লাগানো যেত তাহলে কয়েক বছরেই বাংলাদেশের দারিদ্র্য বিমোচন সম্ভব হতো।



৬. **শীর্ষ দুর্নীতিগ্রস্ত দেশ হিসেবে চিহ্নিত :** বাংলাদেশের সর্বগ্রাসী দুর্নীতির ভয়াবহ ও নেতিবাচক দিক হলো দুর্নীতিতে বিশ্বে শীর্ষস্থান লাভ। দুর্নীতি বিরোধী আন্তর্জাতিক সংস্থা ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল (টিআই) কর্তৃক প্রকাশিত রিপোর্টে ২০০১, ২০০২, ২০০৩, ২০০৪, ২০০৫ এ পাঁচ বছর বাংলাদেশকে বিশ্বের সবচেয়ে দুর্নীতিগ্রস্ত দেশ হিসেবে চিহ্নিত করেছে। পরপর পাঁচবার দুর্নীতিবাজ জাতি হিসেবে এই পরিচিতি সারা বিশ্বে বাংলাদেশের ভাবমূর্তিকে প্রশ্নবিদ্ধ করেছে।

**বাংলাদেশে দুর্নীতির ব্যাপকতার কারণসমূহ :** পৃথিবীর সব দেশেই কম-বেশি দুর্নীতি থাকলেও বাংলাদেশে এর প্রসার অত্যন্ত ব্যাপক ও ভয়াবহ। এর পেছনে নানা কারণ রয়েছে। যেমন—

১. **ঐতিহাসিক কারণ :** বাংলাদেশে ঐতিহাসিকভাবেই দুর্নীতি চলে আসছে। ঔপনিবেশিক শাসনামলে বিদেশী শাসক-শোষকদের স্বার্থরক্ষার জন্য এ দেশে এক শ্রেণীর দুর্নীতিবাজ আমলা ও মধ্যস্বত্বভোগী সৃষ্টি করা হয়েছিল, যারা দুর্নীতি, প্রতারণা ও বঞ্চনার মাধ্যমে জনগণকে শোষণ করত। ঔপনিবেশিক বেনিয়াদের সৃষ্ট দুর্নীতির প্রক্রিয়া আজও সমাজে ক্রিয়াশীল রয়েছে।

২. **আর্থিক অসচ্ছলতা :** আর্থিক অসচ্ছলতা ও নিম্ন জীবনযাত্রার মান দুর্নীতি বিস্তারের অন্যতম প্রধান কারণ। দারিদ্র্যের প্রভাবে বাংলাদেশের বিভিন্ন পেশাজীবী ও শ্রমজীবী মানুষ সমাজে স্বাভাবিক উপায়ে মৌল চাহিদা পূরণে ব্যর্থ হয়ে অস্বাভাবিক উপায় অবলম্বন করছে, যার প্রভাবে সমাজে দুর্নীতির প্রসার ঘটছে।

৩. **উচ্চাভিলাষী জীবনের মোহ :** রাতারাতি আর্থ-সামাজিকভাবে প্রতিষ্ঠা লাভের তীব্র আকাঙ্ক্ষা এ দেশে দুর্নীতি বিকাশের অন্যতম প্রধান কারণ। স্বল্পসময়ে অধিক সম্পদের মালিক হওয়ার প্রচেষ্টায় সমাজের উচ্চ শ্রেণী স্ব স্ব ক্ষমতাও পেশাগত পদবির অপব্যবহারের মাধ্যমে দুর্নীতি করে থাকে।

৪. **বেকারত্ব :** বাংলাদেশে ভয়াবহ বেকারত্বের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হিসেবে সমাজে দুর্নীতি প্রসারিত হচ্ছে। বেকারত্ব দূরীকরণের জন্য অনেকে অবৈধ উপায়ে এবং ঘুষ প্রদানের মাধ্যমে চাকরি পাওয়ার চেষ্টা করে। আবার চাকরি পাওয়ার পর তারাও পেশাগত দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে ঘুষ লেনদেনের সাথে জড়িয়ে পড়ে। আর এর ফলে দুর্নীতি ক্রমশ বাড়তেই থাকে।

৫. **অসম অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতা :** বাংলাদেশে অর্থ হলো সামাজিক মর্যাদা পরিমাপের প্রধান মানদণ্ড। আমাদের সমাজে যার যত বেশি অর্থ সে-ই তত প্রভাব-প্রতিপত্তি ও মর্যাদার অধিকারী। সামাজিক মর্যাদা লাভের অসম এই অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতা সমাজে দুর্নীতি বিস্তারে সহায়তা করছে। সৎপথে অর্জিত অর্থের মাধ্যমে দ্রুত সম্পদশালী হওয়া সম্ভব নয় বিধায় অনেকে বাধ্য হয়ে দুর্নীতির মাধ্যমে রাতারাতি ধনী হওয়ার চেষ্টা করে।

৬. **রাজনৈতিক অস্থিরতা :** বাংলাদেশে দুর্নীতি বিস্তারে বিরাজমান রাজনৈতিক ও সামাজিক অস্থিরতা বিশেষভাবে দায়ী। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ চর্চার অভাব, অগণতান্ত্রিক উপায়ে রাজনৈতিক ক্ষমতার বদল এবং রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা লাভের তীব্র আকাঙ্ক্ষা দুর্নীতি বিস্তারের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করছে। আবার রাজনৈতিক পরিচিতির সুযোগ নিয়ে অনেক ক্ষেত্রে প্রভাব খাটিয়ে দুর্নীতিবাজরা ব্যাপকভাবে দুর্নীতি করার চেষ্টা করে।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



৭. **অপর্যাপ্ত বেতন ও পারিশ্রমিক :** আমাদের দেশে কর্মজীবী মানুষদের বেতন ও পারিশ্রমিক চাহিদার তুলনায় একেবারেই অপর্যাপ্ত। ফলে তারা তাদের বিভিন্ন প্রয়োজন পূরণের জন্য অর্থ আত্মসাৎ, ঘুষ বা বিকল্প কোনো উপায়ে অর্থ উপার্জনের চেষ্টা করে। বাংলাদেশে স্বল্প বেতনভুক্ত কর্মচারীদের মাঝে দুর্নীতিপরায়ণতা আসার পেছনে অপর্যাপ্ত বেতন কাঠামো মুখ্যত দায়ী।

৮. **দেশপ্রেম ও মানবিক মূল্যবোধের অভাব :** সদাজাগ্রত দেশপ্রেম ও মানবিক মূল্যবোধসম্পন্ন সমাজে দুর্নীতি গড়ে উঠতে পারে না। যারা দেশ এবং জাতির উন্নয়ন ও স্বার্থ সম্পর্কে সদা সচেতন তারা দুর্নীতি থেকে নিজেরা বিরত থাকে, অন্যকেও দুর্নীতি থেকে বিরত রাখে। কিন্তু আমাদের দেশে অনেক ক্ষেত্রেই ব্যক্তিগত ও দলীয় স্বার্থকে দেশ ও জাতির স্বার্থের ঊর্ধ্বে স্থান দেয়া হয় বিধায় সর্বক্ষেত্রেই দুর্নীতির বিস্তার ঘটছে।

৯. **আইনের অস্পষ্টতা :** অনেক সময় প্রচলিত আইনের অস্পষ্টতা বা আইনের ফাঁকের সুযোগ নিয়ে দুর্নীতি করা হয়। জালিয়াতির মাধ্যমে অর্থ আত্মসাতের ক্ষেত্রে এরূপ দুর্নীতি বেশি পরিলক্ষিত হয়। আবার অনেক সময় জনগণের অজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে আইনের মনগড়া ব্যাখ্যা দিয়েও দুর্নীতি করা হয়।

১০. **দুর্নীতি দমনে সদিচ্ছার অভাব :** দুর্নীতি, অবৈধভাবে অর্থ উপার্জন, সরকারি অর্থ আত্মসাৎ বা ক্ষমতার অপব্যবহারের জন্য চাকরিচ্যুত বা বিচারের সম্মুখীন করার জোরালো ব্যবস্থা আমাদের দেশে নেই। দুর্নীতিবাজদের সাথে শাসকগোষ্ঠীর গোপন আঁতাত থাকায় শক্ত হাতে দুর্নীতি দমন করার ব্যাপারে সরকারের সদিচ্ছার অভাব লক্ষ্য করা যায়। দুর্নীতি দমনের প্রতি সরকারের এই শিথিলতার ফলে বাংলাদেশে দুর্নীতি দিন দিন প্রসারিত হচ্ছে।

১১. **নৈতিক অবক্ষয় :** বাংলাদেশে দুর্নীতি প্রসারের অন্যতম প্রধান কারণ হলো এ দেশের জনগণের মাঝে নীতি, নৈতিকতা ও সামাজিক মূল্যবোধের চরম অবক্ষয় ঘটা। বর্তমানে এ দেশের জনগণের মাঝে নৈতিকতার এমনই অবক্ষয় ঘটেছে যে তারা দুর্নীতিবাজদের প্রতি সহনশীল মনোভাবাপন্ন হয়ে পড়েছে। দুর্নীতিবাজদের প্রতি সামাজিক ঘৃণা এখন আর জোরালোভাবে লক্ষ্য করা যায় না।

**দুর্নীতি দমনের উপায়সমূহ :** বর্তমানে দুর্নীতি সমস্যা আমাদের জাতীয় জীবনে ক্যান্সারস্বরূপ বিস্তার লাভ করেছে। তাই বাংলাদেশের জাতীয় উন্নয়নের স্বার্থে সমাজের সর্বস্তর থেকে দুর্নীতির মূলোচ্ছেদ করার বিষয়টি এক নম্বর অগ্রাধিকার পাওয়া উচিত। বাংলাদেশে ব্যাপক বিস্তৃত দুর্নীতি প্রতিরোধ ও মোকাবিলা করার জন্য নিম্নলিখিত উপায়ে পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে :

১. **দুর্নীতিবিরোধী টাস্কফোর্স গঠন :** বাংলাদেশে সর্বস্তরের দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত সকল প্রাসঙ্গিক ইস্যু মূল্যায়ন এবং দুর্নীতির মূলোৎপাটনের জন্য দক্ষ, যোগ্য ও অভিজ্ঞ নাগরিকদের সমন্বয়ে অনতিবিলম্বে একটি টাস্কফোর্স গঠন করতে হবে। এই টাস্কফোর্স দুর্নীতি দমনের একটি বিশদ কর্মসূচি সুপারিশ করবে। সুপারিশ অনুসারে দুর্নীতি দমনের জন্য ব্যাপকভাবে 'Operation Clean Corruption' শুরু করতে হবে।

২. **ন্যায়পালের পদ বাস্তবায়ন :** বাংলাদেশে দুর্নীতি দমনের জন্য ন্যায়পালের পদ বাস্তবায়ন করা প্রয়োজন। সরকারি ও রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাধর কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে সাধারণ নাগরিকের দুর্নীতি ও অনিয়মের অভিযোগের তদন্ত নিরপেক্ষভাবে সম্পাদনের জন্য ন্যায়পালের অফিস প্রতিষ্ঠা করা দরকার। ন্যায়পালকে রাষ্ট্রের যে কোনো বিভাগের সিদ্ধান্ত ও কার্যক্রমের তদন্ত করার এবং



জবাবদিহিতা আদায় করার ক্ষমতা দিতে হবে। ন্যায়পালের পদ সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করলে সরকারি প্রশাসনযন্ত্রে নিরপেক্ষ দায়িত্ব পালন ও জবাবদিহিতার সুযোগ সৃষ্টি হবে। ফলে দুর্নীতি প্রতিরোধ সহজতর হবে।

৩. **স্বাধীন ও নিরপেক্ষ বিচার বিভাগ প্রতিষ্ঠা :** দুর্নীতি প্রতিরোধের অপরিহার্য পূর্বশর্ত হলো বিচার বিভাগের স্বাধীনতা। এজন্য শাসন বিভাগ, আইন বিভাগ ও রাজনৈতিক দলের প্রভাব ও হস্তক্ষেপ থেকে মুক্ত আইনের অধীন পূর্ণ স্বাধীন ও নিরপেক্ষ বিচার বিভাগ প্রতিষ্ঠা করতে হবে, যাতে তারা দুর্নীতির সাথে সংশ্লিষ্ট মামলা-মোকদ্দমা বিচার নিষ্পত্তি করতে পারেন। একই সাথে দুর্নীতিবাজদেরকে আদালতে হাজির করার অধিকার এবং আদালতের রায় কার্যকর করার পূর্ণক্ষমতাও বিচার বিভাগকে দিতে হবে।

৪. **স্বাধীন দুর্নীতি দমন কমিশন গঠন :** দুর্নীতি দমনে নিয়োজিত সরকারের বিশেষ বিভাগ দুর্নীতি দমন ব্যুরোকে পুনর্গঠন করে একটি স্বাধীন ও শক্তিশালী দুর্নীতি দমন কমিশন গঠন করা হয়েছে। কিন্তু নানা প্রতিকূলতার কারণে তা কার্যক্রম চালাতে পারছে না। এ কমিশনকে সব ধরনের প্রভাবমুক্ত থেকে স্বাধীন ও নিরপেক্ষভাবে ভূমিকা পালন করতে হবে।

৫. **সরকারি নিরীক্ষা কমিটি গঠন :** রাষ্ট্রের কার্যনির্বাহী বিভাগের আয়-ব্যয়ের ধারাবাহিক ও নিয়মিত পরীক্ষার জন্য পর্যাপ্ত জনবলসহ উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন সরকারি নিরীক্ষণ কমিটি গঠন করা প্রয়োজন। কারণ রাষ্ট্রের কার্যনির্বাহী বিভাগের বাজেটের ওপর আইনগত নিয়ন্ত্রণ ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে না পারলে দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হবে না। এজন্য সরকারি পর্যায়ে নিরীক্ষণ কমিটি গঠন করেও দুর্নীতি প্রতিরোধ করা যেতে পারে।

৬. **রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সৎ ও আইনগত নির্দেশনা :** বাংলাদেশে রাজনৈতিক আবরণে এবং রাজনৈতিক ক্ষমতার অপব্যবহারের মাধ্যমে বেশি দুর্নীতি হয়ে থাকে। তাই বিভিন্ন পর্যায়ের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ সরকারি আমলাদের সততার সঙ্গে আইনগত দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের নির্দেশনা দান করলে তা দুর্নীতি হ্রাসে সহায়ক হবে। কারণ রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সততা, আইনের প্রতি শ্রদ্ধা, দেশপ্রেম ও কর্তব্যনিষ্ঠা জনগণের মধ্যে দুর্নীতি বিরোধী মূল্যবোধ ও নৈতিকতা গড়ে তুলতে উৎসাহিত করে। সিঙ্গাপুর ও মালয়েশিয়ার রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের কার্যক্রম এ ক্ষেত্রে উদাহরণ হতে পারে।

৭. **আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা :** দুর্নীতি দমনের পূর্বশর্ত হলো আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা। দুর্নীতির দায়ে অভিযুক্ত ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ কোনোভাবেই যাতে শাস্তি এড়িয়ে যেতে না পারে, সেজন্য দুর্নীতির সাথে সংশ্লিষ্ট আইনের কঠোর প্রয়োগ দুর্নীতির প্রবণতা হ্রাসে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে। আইনের ফাঁক বা অস্পষ্টতার সুযোগে কেউ যাতে দুর্নীতি করতে বা দুর্নীতি করে শাস্তি এড়িয়ে যেতে না পারে সেজন্য সংশ্লিষ্ট আইনের সংশোধন, সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা প্রদান এবং প্রয়োজনে নতুন আইন প্রণয়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

৮. **আয়-ব্যয়ের সামঞ্জস্যহীনতার জবাবদিহিতার ব্যবস্থাকরণ :** দুর্নীতি দমনের উত্তম ও কার্যকর ব্যবস্থা হলো সরকারি প্রশাসনের বিভিন্ন পর্যায়ে কার্যরত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের আয় ও ব্যয়ের মধ্যকার সামঞ্জস্যহীনতা সম্পর্কে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে কঠোর জবাবদিহিতার ব্যবস্থা গ্রহণ করা। এসব ক্ষেত্রে আয়ের উৎস সম্পর্কে সুষ্ঠ ও নিরপেক্ষ অনুসন্ধান করা হলে দুর্নীতি বেরিয়ে আসে। সরকারি প্রশাসনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের আয়ের সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ ব্যয়ের হিসাব যথাযথভাবে নেয়া হলে দুর্নীতি স্বাভাবিকভাবেই হ্রাস পাবে।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



৯. **দুর্নীতিবাজদের সামাজিকভাবে বয়কটকরণ :** অনেক সময় পেশাগত বা ব্যবসায়িক দিক থেকে সমাজের মানুষ অতি সহজে দুর্নীতিবাজদের চিহ্নিত করতে পারে। ঘুষখোর, সুদখোর, চোরাচালানি প্রভৃতি শ্রেণীকে সামাজিকভাবে বয়কট ও তাদের প্রতি ঘৃণা প্রদর্শন করা হলে দুর্নীতির প্রবণতা হ্রাস পাবে। এসব শ্রেণীর সাথে সামাজিক সম্পর্কচ্ছেদ করার পদক্ষেপ সামাজিকভাবে গ্রহণ করতে হবে। দুর্নীতির বিরুদ্ধে ব্যাপক সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে।

১০. **পর্যাপ্ত বেতন ও পারিশ্রমিক প্রদান :** আমাদের দেশে সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন তাদের প্রয়োজন ও চাহিদার তুলনায় অপর্যাপ্ত বলে অনেক সময় তারা তাদের বিভিন্ন প্রয়োজন পূরণের জন্য বাধ্য হয়ে অসৎ উপায়ে অর্থ উপার্জন করে। তাই তাদের দুর্নীতি বন্ধ করার জন্য বাজারদরের সাথে সমাঞ্জস্যপূর্ণ এবং প্রয়োজনের তুলনায় পর্যাপ্ত বেতন ও সুযোগ-সুবিধা তাদের জন্য নির্ধারণ করতে হবে। অন্যথায় তাদের দুর্নীতি বন্ধ করা যাবে না।

১১. **দুর্নীতির বিরুদ্ধে নৈতিক ও সামাজিক চেতনা সৃষ্টি :** দুর্নীতি দমনের আদর্শ এবং সর্বোৎকৃষ্ট উপায় হলো মানুষের মাঝে সামাজিক, নৈতিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধকে জাগ্রত করা। কারণ নৈতিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধসম্পন্ন ব্যক্তি কখনো দুর্নীতির আশ্রয় নিতে পারে না। তাই ছেলে-মেয়েদেরকে সামাজিক ঐতিহ্য, মূল্যবোধ, নীতি ও আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হবার মানসিকতাসম্পন্ন করে গড়ে তোলার শিক্ষা প্রদান করতে হবে, যাতে করে ছোটবেলা থেকেই তাদের মাঝে দুর্নীতি ও অনিয়মকে ঘৃণা করার মানসিকতা গড়ে ওঠে। এজন্য পারিবারিক পর্যায় থেকে উচ্চ শিক্ষার স্তর পর্যন্ত নৈতিক শিক্ষার প্রতি সর্বাধিক গুরুত্ব দিতে হবে।

**উপসংহার :** বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক জীবনের সর্বাংশ আজ দুর্নীতির কবলে নিমজ্জিত। দুর্নীতির কালো হাত সমাজ জীবনের সকল দিককে গ্রাস করেছে। দুর্নীতিই বাংলাদেশের জাতীয় উন্নয়নের সবচেয়ে বড় অন্তরায়। দুর্নীতিই আমাদের সকল অর্জন এবং জাতীয় উন্নয়নের সকল প্রচেষ্টাকে নস্যাৎ করে দিচ্ছে। তাই জাতীয় উন্নয়নের মাধ্যমে বিশ্বের বুকে একটি সমৃদ্ধশালী ও মর্যাদাবান জাতি হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভের জন্য আমাদেরকে দুর্নীতি নামক এই সর্বনাশা ও সর্বগ্রাসী সামাজিক ব্যাধির মূলোৎপাটনে সর্বশক্তি নিয়োগ করতে হবে।

## রচনা ১৭ সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয় ও এর প্রতিকার

*[২৪তম; ১৭তম বিসিএস]*

**ভূমিকা :** বাংলাদেশে সামাজিক মূল্যবোধের যে চরম অবক্ষয় ও অবনতি ঘটেছে, সে কথা আর নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে না। বাংলাদেশের সামাজিক মূল্যবোধের এই অবক্ষয়ে জনজীবন আজ অতিষ্ঠ। অফিস-আদালত, রাস্তা-ঘাট, হাট-বাজার, যানবাহন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সর্বত্রই এর উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। বাংলাদেশে যতগুলো সমস্যা রয়েছে তার মধ্যে সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয়কে শীর্ষ পর্যায়ে রাখা যায়। শুধু বাংলাদেশের জনগণই নয়, বিদেশী দাতা গোষ্ঠীসহ বিভিন্ন সামাজিক ও মানবিক সংগঠনগুলোও এই সমস্যার ব্যাপারে উদ্বিগ্ন এবং এর হ্রাসকল্পে তারা সরকারকে উপদেশ ও চাপ দুটোই প্রয়োগ করেছে। কিন্তু এর উন্নতি তো দূরের কথা, দিন দিন এ সমস্যা আরো প্রকট আকার ধারণ করছে।



**সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয় ও এর কারণসমূহ :** দীর্ঘকাল ঔপনিবেশিক শাসনের ফলে স্বাধীনতা-উত্তরকালে একাধিক কারণে বাংলাদেশে সামাজিক মূল্যবোধের পূর্ণ অবক্ষয় ঘটেছে—এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায়। সাম্প্রতিককালে এর ক্রমবর্ধমান ব্যাপকতা জাতীয় উন্নয়নের মূল স্রোতধারাকে ব্যাহত করছে। বিভিন্ন সমাজবিজ্ঞানী ও বুদ্ধিজীবী মহল সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয়ের প্রকৃত কারণ উদ্‌ঘাটনের জন্য বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন মতবাদ ব্যক্ত করেছেন। এখানে তাদের মতবাদের আলোকে মূল্যবোধের অবক্ষয়ের কারণসমূহ আলোচনা করা হলো :

১. **দারিদ্র্য :** দারিদ্র্যের দিক থেকে শীর্ষস্থানে অবস্থানকারী দেশের মধ্যে বাংলাদেশ একটি। জাতিসংঘের মানব উন্নয়ন রিপোর্ট ২০১৪-এ ১৮৭টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ছিল ১৪৫তম। বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষই দারিদ্র্যের কষাঘাতে জর্জরিত। ফলে জীবনের মৌলিক চাহিদা পূরণ করতে গিয়ে এবং পরিবারের ভরণ-পোষণ যোগাতে গিয়ে বাংলাদেশের মানুষ সমাজবিরোধী কাজকর্ম করতেও দ্বিধাবোধ করে না।

২. **জনসংখ্যার আধিক্য :** ১,৪৭,৫৭০ বর্গ কিলোমিটার বিস্তৃত বাংলাদেশের ভূখণ্ডের মধ্যে পঞ্চম আদমশুমারি রিপোর্ট ২০১১ অনুযায়ী জনসংখ্যা ১৪ কোটি ৯৭ লাখ ৭২ হাজার ৩৬৪ জন এবং প্রতি বর্গ কিলোমিটারে ১,০১৫ জন লোক বাস করে। জনসংখ্যার দিক দিয়ে বাংলাদেশ বর্তমানে বিশ্বের অষ্টম এবং এশিয়ার পঞ্চম জনাধিক্য দেশ। মাথাপিছু জমির পরিমাণ মাত্র ০.২৩ একর। প্রাকৃতিক সম্পদের দিক দিয়েও এ দেশ ততটা সমৃদ্ধ নয়। তাই সীমিত আয়তন ও সম্পদের ওপর মাত্রাতিরিক্ত জনসংখ্যার চাপ মানুষের মৌল চাহিদা পূরণের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। ফলে কর্মসংস্থান ও সুযোগের অভাবে মানুষ বিকল্প রাস্তা হিসেবে অন্ধকার জগতে পা বাড়ায় তথা অপরাধমূলক কার্যকলাপে জড়িয়ে পড়ে।

৩. **বেকারত্ব :** দেশে প্রায় তিন কোটি লোক বেকারত্বের বোঝা বহন করে চলেছে। বেকারত্ব গোটা জাতিকে এক মহাসংকটে ফেলেছে। কর্মক্ষম মানুষ কর্মের অভাবে নিশ্চুপ বসে থাকতে থাকতে জীবিকার তাগিদে যে কোনো কাজের জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত থাকে। বিশেষ করে পরিবারের প্রতি অর্থনৈতিক দায়িত্ব পালনের লক্ষ্যে চোরাচালান, রাহাজানি, ছিনতাই, মাদকদ্রব্যের ব্যবসা ইত্যাদি গর্হিত কাজ করে থাকে। এভাবেই বাড়তে থাকে মূল্যবোধের অবক্ষয়।

৪. **মাদকাসক্তি :** বাংলাদেশে মাদকাসক্তি সমস্যা প্রকট হয়ে দেখা দিয়েছে। বর্তমানে মাদকাসক্তি ও সন্ত্রাস শব্দ দুটো সমার্থকরূপে বিবেচিত হয়। দেখা যায়, যে মাদকদ্রব্য গ্রহণ করে সে কমবেশি সন্ত্রাস ও চাঁদাবাজি করে। মাদক সেবনের টাকা জোগাড় করতে গিয়ে তাকে ছিনতাই, রাহাজানি, ডাকাতি, চাঁদাবাজি ইত্যাদির আশ্রয় নিতে হয় আর এভাবেই কলুষিত হচ্ছে আজকের সমাজ।

৫. **অশিক্ষা :** বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষই অশিক্ষিত তথা মূর্খ। মূর্খরা উন্নত জীবন ও জগতের প্রতি সাধারণত উদাসীন, এদের মধ্যে পশুবৃত্তির প্রবণতাটাই বেশি পরিমাণে প্রকট। তাই সমাজবিরোধী কার্যকলাপ করতে এদের বিবেকে বাধে না। এ কারণে সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয়ের জন্য অশিক্ষাকেই প্রধানত দায়ী বলে মনে করা হয়।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



৬. **রাজনৈতিক কারণ :** স্বাধীনতার পর থেকে বিশেষত '৭৫-এর পর থেকেই বাংলাদেশের রাজনীতিতে চরম অস্থিরতা বিরাজ করছে। রাজনীতি ক্রমান্বয়ে পেশীশক্তি-নির্ভর হয়ে পড়েছে। প্রতিপক্ষকে রাজনৈতিকভাবে মোকাবিলার পরিবর্তে পেশীশক্তি দ্বারা ঘায়েল করার এক আত্মঘাতী প্রতিযোগিতায় নেমেছে আজকের রাজনৈতিক সংগঠনগুলো। আর এ কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে কিছু বিপথগামী তরুণ-যুবক। তাই সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয়ের জন্যে দুর্বল রাজনৈতিক অঙ্গীকার দায়ী বলে সমাজবিজ্ঞানীরা অভিমত ব্যক্ত করেন।

৭. **অসম বণ্টন ব্যবস্থা :** বাংলাদেশে সম্পদ বণ্টন ব্যবস্থা যথেষ্ট ত্রুটিপূর্ণ। এ দেশের মুষ্টিমেয় লোকের কাছে বিশাল সম্পত্তি ও টাকা-পয়সার অধিকারী। এর ফলে সমাজের অধিকাংশ লোক সহায়-সম্পদহীন। এক হিসাবে দেখা গেছে, এ দেশের শতকরা ৯০ ভাগ সম্পদ ১০ ভাগ লোক ভোগ করছে এবং মাত্র ১০ ভাগ সম্পদ ভোগ করছে ৯০ ভাগ লোক। প্রাচুর্যের আধিক্যে লালিত সন্তান সম্পদের অহংকার ও টাকার গরমে যেমন অসামাজিক কার্যকলাপ তথা মদ, গাঁজা, হেরোইন ও কোকেন সেবন করে, তেমনি অভাব আর তাচ্ছিল্যের মধ্যে বেড়ে ওঠা সন্তান সন্ত্রাস, মাস্তানি, চাঁদাবাজি আর রাহাজানিতে সুদক্ষ হয়ে ওঠে।

৮. **সামাজিক কারণ :** কিছু কিছু সামাজিক কারণেও সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয় বাড়তে থাকে, সেগুলো হচ্ছে :

ক. **পারিবারিক কারণ :** যেসব পিতা-মাতা অর্থনৈতিক বা অন্যান্য কাজকর্মে ব্যস্ত থাকে এবং সন্তানের পেছনে সময় দিতে পারে না বেশির ভাগ ক্ষেত্রে তাদের সন্তান পিতা-মাতার অবাধ্য হয়ে গড়ে ওঠে। পিতা-মাতার অনুপস্থিতিতে সন্তান অনেক সময় অবাঞ্ছিত অভ্যাস ও আচরণ রপ্ত করে। তাছাড়া বহুদিন যাবৎ যদি পিতা-মাতার মধ্যে মনোমালিন্য বা ব্যক্তিত্বের সংঘাত চলে আসে তাহলে সন্তান-সন্ততির মধ্যে হতাশা ও উদ্দেশ্যহীনতার সৃষ্টি হয়। এর ফলে সন্তান মাদকাসক্তিসহ সমাজবিরোধী কার্যকলাপে লিপ্ত হতে থাকে।

খ. **প্রেমে ব্যর্থতা :** প্রেমে ব্যর্থতার কারণে কিংবা প্রেমিক-প্রেমিকা প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করলে অনেকে মানসিকভাবে ভেঙ্গে পড়ে এবং অভিমানে মাদকদ্রব্য সেবন ও অন্যান্য অনৈতিক কাজে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। কেউ কেউ প্রতিশোধ হিসেবে খুন, এসিড নিক্ষেপ ও ধর্ষণ করতেও দ্বিধা করে না।

গ. **সঙ্গদোষ :** মানুষ সামাজিক জীব। সবাই মিলেমিশে পৃথিবীতে বেঁচে থাকতে চায়। ফলে পরিবারের বাইরে মিশতে গিয়ে সঙ্গদোষে অনেকেই খারাপ হয়ে যায়। আর এদের দ্বারাই সংঘটিত হয় সামাজিক অবক্ষয়মূলক কার্যাদি।

ঘ. **অনুকরণ :** মানুষ অনুকরণপ্রিয়। কেউ কোনো কিছু করলে অন্যদের সেটা করার ইচ্ছা বা প্রবণতা জাগে। বিশেষ করে বাংলাদেশের ছেলেমেয়েদের অনেকেই অশ্লীল পত্রিকা, সিনেমা দেখে বা গল্প শুনে অধঃপতনের দিকে যাচ্ছে। অনেকে মাদকদ্রব্য সেবন একটি বাহাদুরিমূলক ফ্যাশন হিসেবে গ্রহণ করে অবাধে তার ব্যবহার করছে।

৯. **চলচ্চিত্র ও স্যাটেলাইট চ্যানেল :** চলচ্চিত্রের অশ্লীল নাচ, গান, সংলাপ আর অতি নিম্নমানের কাহিনীতে এ দেশের যুবসমাজ ক্রমান্বয়ে বিপথগামী হয়ে যাচ্ছে। তাছাড়া ডিশ এন্টেনার প্রভাবে বিদেশী সংস্কৃতির নামে যে অপসংস্কৃতি আমাদের সমাজে ভূতের মতো চেপে বসেছে তার কুফল ইতোমধ্যেই অনুমান করা যাচ্ছে।



১০. **সেশনজট :** সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয়ের পেছনে পরোক্ষভাবে যে কারণটি চিহ্নিত করা যায় তা হলো সেশনজট। বিশ্ববিদ্যালয়ের সেশনজটের শিকার আজ হাজার হাজার ছাত্র। নির্দিষ্ট সময়ের কোর্স শেষ করতে দ্বিগুণ সময় লাগায় অনেকেই দুশ্চিন্তা আর বিষণ্ণতায় ভোগে এবং অনেক দরিদ্র বা মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান এই দীর্ঘ সময়ের শিক্ষার ব্যয়ভার বহন করতে অপারগ হয়ে পড়ে। একদিকে অনাগত ভবিষ্যৎ অন্যদিকে আর্থিক দুশ্চিন্তা দুয়ে মিলে তারা বিষণ্ণতার চরম সীমায় পৌঁছে যায় এবং এর ফলে একপর্যায়ে তারা বিভিন্ন সমাজবিরোধী কার্যকলাপে অনিচ্ছা থাকা সত্ত্বেও জড়িয়ে পড়ে।

১১. **ভৌগোলিক কারণ :** ভৌগোলিক কারণ তথা নানাবিধ প্রাকৃতিক দুর্যোগ, এলাকার প্রভাব, ঋতুর প্রভাব, খাদ্যাভ্যাস ইত্যাদি কারণও মানুষের মধ্যে বিরাট প্রভাব ফেলে এবং এর ফলে মানুষ সামাজিক মূল্যবোধ-গর্হিত কাজ করে থাকে।

**মূল্যবোধের অবক্ষয়ের প্রতিকার :** আমাদের জাতীয় জীবনে সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয় জাতীয় সামাজিক সমস্যা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। দেশ ও জাতির স্বার্থে এ সমস্যার প্রতিকার খুবই জরুরি। নিচে মূল্যবোধের অবক্ষয়ের কিছু প্রতিকার সম্পর্কে আলোচিত হলো :

১. **দারিদ্র্য বিমোচন :** সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয় রোধকল্পে দারিদ্র্য বিমোচনের ওপর যথেষ্ট নজর দিতে হবে। সহায়-সম্বলহীন লোকদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে হবে। বেকারদের বিভিন্ন ধরনের কারিগরি প্রশিক্ষণ ও ঋণ দিয়ে উৎপাদনমুখী কাজে নিয়োগ করতে হবে।

২. **গ্রাম উন্নয়ন :** গ্রামপ্রধান বাংলাদেশে গ্রামই প্রাণ। গ্রামই বাংলাদেশের অর্থনীতিতে বড় ভূমিকা পালন করছে। তাই সরকারকে গ্রাম উন্নয়ন তথা কৃষি সেক্টরের দিকে অধিক নজর দিতে হবে। কৃষিকাজে জড়িত ব্যক্তিদের মধ্যে যারা ইতোমধ্যে সর্বস্বান্ত হয়ে পড়ে বিভিন্ন বিবেকবর্জিত কাজে জড়িত হয়ে পড়েছে তাদেরকে স্বাবলম্বী করতে সরকারকে দৃষ্টি দিতে হবে।

৩. **জনসংখ্যা হ্রাস :** বাংলাদেশের ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা বৃদ্ধি রোধকল্পে সরকারকে আরো সজাগ ও কঠোর নীতি গ্রহণ করতে হবে। জনসংখ্যা যদি বর্তমান হারে বাড়তেই থাকে, তবে সামাজিক অবক্ষয়ও বাড়তে থাকবে। জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করতে ব্যর্থ হলে দেশের জন্য প্রণীত পরিকল্পনাও ব্যর্থ হবে। তাই মূল্যবোধের অবক্ষয় রোধকল্পে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে ব্যবস্থা গ্রহণ অতি জরুরি।

৪. **বেকারত্ব হ্রাস :** যেহেতু অধিকাংশ অপরাধ বেকাররাই ঘটিয়ে থাকে, তাই এদের কর্মের সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি করলে সামাজিক অবক্ষয়ও বহুলাংশে হ্রাস পাবে। বেকারদের আত্মকর্মসংস্থানে প্রেরণা যোগাতে হবে। তাদের যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা অনুযায়ী ব্যাংক ঋণের পরিমাণ বাড়াতে হবে এবং কর্মসংস্থান ব্যাংকের শাখা ও মূলধন বৃদ্ধি করতে হবে। পাশাপাশি ঋণ গ্রহণের শর্ত আরো শিথিল করতে হবে।

৫. **রাজনৈতিক অঙ্গীকার :** যে কোনো রাজনৈতিক সংগঠন বা স্থানীয় নেতৃবৃন্দ রাজনৈতিক কর্মসূচিতে যুবশক্তিকে পেশীশক্তির কাজে ব্যবহার করবে না এই মর্মে আন্তরিক সিদ্ধান্তে আসতে হবে। প্রয়োজনে নেতৃবৃন্দের সাথে আলোচনায় বসে বিষয়টি সুরাহা করতে হবে।

৬. **শিক্ষার প্রসার :** শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড। শিক্ষিত জাতি একটা দেশের শক্তি। আধুনিক জীবনযাপনের অন্যতম শর্ত হলো শিক্ষা। অশিক্ষা অন্ধকারের শামিল। তাই মূল্যবোধের অবক্ষয় রোধকল্পে ব্যাপক জনগোষ্ঠীকে উপযুক্ত শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলতে হবে। কেননা সামাজিক, রাজনৈতিক, নাগরিক ও ধর্মীয় কর্তব্যবোধ সম্পর্কে যতই উপদেশ বা বাণী শোনানো হোক না কেন তাতে কাজের কাজ কিছুই হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠীকে শিক্ষিত করে তোলা হবে।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



৭. **সম্পদের সুষম বণ্টন :** বাংলাদেশের সমাজব্যবস্থায় সম্পদ বণ্টনে যে বিশাল বৈষম্য রয়েছে তা দূর করতে হবে। প্রয়োজনে সরকারকে নতুন নীতি প্রণয়ন করতে হবে। সবার সম্পদের হিসাব নিতে হবে এবং আয়ের উৎসের সাথে সম্পদ বৃদ্ধির সামঞ্জস্য কতটুকু তার একটা জরিপ চালিয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে।

৮. **সংস্কৃতির অবাধ প্রসার রোধ :** বাংলাদেশের সামাজিক অবক্ষয়ে সবচেয়ে বেশি ভূমিকা পালন করে বিজাতীয় সংস্কৃতির অনুপ্রবেশ। সংস্কৃতি তথা বিনোদনের নামে স্যাটেলাইটের কিছু চ্যানেল আমাদের যুবসমাজ থেকে প্রৌঢ় পর্যন্ত সবার মধ্যে যৌন উদ্দীপনা তথা বিকৃতির সৃষ্টি করছে, যার ফলে বেড়ে যাচ্ছে ধর্ষণসহ মারাত্মক সামাজিক অপরাধসমূহ। তাই নির্দিষ্ট কিছু শিক্ষামূলক এবং সপরিবারে দেখার মতো চ্যানেল রেখে বাকি চ্যানেল বন্ধের ব্যাপারে সরকারকে আশু পদক্ষেপ নিতে হবে।

৯. **পারিবারিক কর্তব্যবোধ :** পিতা-মাতাকে সন্তান-সন্ততির ব্যাপারে আরো বেশি খেয়াল রাখতে হবে। সন্তান-সন্ততি যেন পাড়া বা মহল্লার বখাটে ছেলেমেয়েদের সাথে না মেশে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। অর্থাৎ সন্তানদের গতিবিধির ওপর পিতা-মাতার কড়া নজর রাখতে হবে।

১০. **সেশনজট নিরসন :** শিক্ষা ক্ষেত্রে সেশনজট নিরসন করতে হবে। একাডেমিক ক্যালেন্ডার অনুযায়ী সকল পরীক্ষা এবং নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে রেজাল্ট দেয়ার জন্য শিক্ষকদের বাধ্য করতে হবে।

১১. **ধর্মীয় বোধ জাগ্রত :** মানুষের মধ্যে ধর্মীয় বোধ জাগ্রত করতে বিভিন্ন প্রচারমাধ্যমকে বিশেষ ভূমিকা রাখতে হবে। কেননা ধর্মীয় অনুভূতি মানুষের বিবেকের রক্ষাকবচ।

**উপসংহার :** পরিশেষে বলা যায়, সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয় এমন একটি অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতি, যা সমাজে প্রতিষ্ঠিত মূল্যবোধকে অস্বীকার করে। এর ফলে সমাজের সর্বত্রই হতাশা ও বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়। বাংলাদেশে সাম্প্রতিককালে এর প্রভাব লক্ষ্যণীয়। সামাজিক অবক্ষয়ের মাধ্যমে একটা দেশ ক্রমান্বয়ে হারিয়ে যেতে পারে, ধ্বংসের অতল গহ্বরে বিলীন হয়ে যেতে পারে পৃথিবীর মানচিত্র থেকে। আবার এই অবস্থার উন্নতির মাধ্যমে হয়ে উঠতে পারে একটা আধুনিক সভ্য ও উন্নত জাতি এবং রাষ্ট্রে। তাই বাংলাদেশের সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয় রোধকল্পে উপরিউক্ত প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণে আমাদের সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে।

## রচনা ১৮ ভেজালবিরোধী অভিযান

*[২৯তম বিসিএস]*

**ভূমিকা :** মানুষের প্রধান মৌলিক চাহিদা হচ্ছে খাদ্য। বেঁচে থাকার জন্য যেমন খাদ্য দরকার তেমনি সুস্থ, সুন্দর, স্বাভাবিকভাবে বেঁচে থাকার জন্য ভেজালবিহীন খাদ্য অপরিহার্য। কারণ, ভেজাল খাদ্য বিভিন্ন কঠিন রোগের জন্ম দেয়। দিনের পর দিন ভেজাল খাদ্য খেয়ে আমরা জটিল ও মারাত্মক সব রোগে আক্রান্ত হচ্ছি। আমাদের আয়ু, কর্মশক্তি, দৈহিক ও মানসিক স্পৃহা দিন দিন হ্রাস পাচ্ছে। আর ক্রেতা অধিকার সম্পর্কে আমাদের অজ্ঞতা, ভেজালবিরোধী আইন ও এর সুষ্ঠু প্রয়োগের অভাব এবং নৈতিকতার অবক্ষয়ের কারণে খাদ্যে ভেজালের পরিমাণ দিন দিন বেড়েই চলছে। আমরা প্রতিদিন যা খাচ্ছি তার সিংহভাগই ভেজালে পরিপূর্ণ।



**ভেজাল খাদ্য এবং ভেজালের কারণ :** মানবদেহের জন্য ক্ষতিকর এবং আইনত নিষিদ্ধ দ্রব্য খাদ্যদ্রব্যে ব্যবহার এবং মেয়াদোত্তীর্ণ দ্রব্য খাদ্যদ্রব্যে ব্যবহার করলে সে খাদ্যকে ভেজাল খাদ্য বলে থাকি। তাছাড়া কোনো খাদ্যদ্রব্যে যেসব উপাদান যে পরিমাণে থাকার কথা তা না থাকলে সে খাদ্যকেও আমরা ভেজাল বলি।

ভেজাল খাদ্য বিরোধী আন্দোলনের অপর্যাপ্ততা, আইনের সঠিক প্রয়োগ, নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয় এবং ক্রেতার অধিকার সম্পর্কে আমাদের অজ্ঞতা-ই মূলত ভেজাল খাদ্যের কারণ। আমাদের দেশে এখন টাকাই মুখ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। কে, কিভাবে টাকা রোজগার করছে তা এখন কোনো বিষয় নয়। ফলে নৈতিকতা বিবর্জিত হয়ে আমরা কাজ করছি। তাছাড়া ভেজাল খাদ্য বিরোধী আইনের অপর্যাপ্ততা এবং এ আইনের প্রয়োগ না থাকায় খাদ্যে ভেজাল দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছে। দেরিতে হলেও নতুন আইন প্রণয়ন এবং তার প্রয়োগে বিষয়টি আলোচিত বিষয়ে পরিণত হয়েছে।

**ভেজালের পদ্ধতি :** আমাদের দৈনন্দিন খাবারে কোন জিনিসটিতে ভেজাল নেই তা বের করা কঠিন। অপরিহার্য ওয়াসার পানিতে আবর্জনা থাকে, মিনারেল ওয়াটার নামে সুন্দর সুন্দর বোতলজাত পানি কোনো রকম প্রক্রিয়া ছাড়াই বাজারে অবাধে বিক্রি হয়। তাছাড়া খাদ্যদ্রব্যকে আকর্ষণীয় করতে এবং বেশি লাভ করতে বিচিত্র সব পদ্ধতির আশ্রয় নেয়া হয়। নিচে কিছু খাদ্যদ্রব্য নিয়ে আলোচনা করা হলো :

১. **শাকসবজি ও ফলমূল :** আমরা প্রতিদিন যেসব শাকসবজি ও ফলমূল কিনে খাচ্ছি সেগুলো সতেজ রাখতে ও পাকাতে বিক্রেতারা ক্যালসিয়াম কার্বাইডসহ বিভিন্ন বিষাক্ত কেমিক্যাল ব্যবহার করছে। এসব কেমিক্যাল মিশ্রিত খাদ্যগ্রহণ করলে কিডনি ও লিভার নষ্ট হতে পারে, চোখের দৃষ্টিশক্তি হ্রাস ছাড়াও ক্যান্সারে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে বলে জানিয়েছেন খাদ্য বিশেষজ্ঞরা।

২. **ভোজ্য তেল :** মহাখালী জনস্বাস্থ্য ইনস্টিটিউটের খাদ্য পরীক্ষাগার ও সিটি করপোরেশনের পরীক্ষাগারে পরীক্ষা করে দেখা গেছে, বাজারজাতকারীর গাওয়া ঘি ৯৩ ভাগ ভেজাল ও খাবারের অনুপযোগী; বাটার অয়েল ৯২ ভাগ ভেজাল, ডালডা ১০০ ভাগ ভেজাল, সয়াবিন ও সরিষার তেল ৯২ ভাগ ভেজাল এবং খাবারের অনুপযোগী। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এসব ভোজ্য তেল খেলে কিডনি, লিভারের ক্যান্সার হওয়া ও গর্ভস্থ শিশু প্রতিবন্ধী হওয়ার আশঙ্কা খুবই বেশি। নানা ধরনের পেটের রোগে আক্রান্ত হওয়ার পর যদি সেসব রোগ শরীরে থাকে, তবে কিডনি ও লিভার অকেজো হয়ে যাবে এবং আরো নানা জটিল ব্যাধিতে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা প্রবল।

৩. **মাছ ও শুঁটকি :** মাছের বাজারেও ভেজালের করাল গ্রাস অব্যাহত আছে। ছোট-বড় বিভিন্ন মাছকে সতেজ রাখতে ও সেগুলো সতেজ দেখানোর জন্য বিক্রেতারা ফরমালিন ব্যবহার করে, যা মানবদেহের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর। এছাড়া শুঁটকি মাছের সাথে অসাধু ব্যবসায়ীরা বিষাক্ত কীটনাশক ও ডিডিটি ব্যবহার করে, যা মানবদেহে ক্যান্সার, হৃদরোগসহ বিভিন্ন জটিল রোগ সৃষ্টি করে।

৪. **আটা-ময়দা ও ডিম :** পাউরুটি, বিস্কুট, নুডলসের আটা-ময়দা ৯৫ ভাগ ভেজাল, নিম্নমানের ও খাবার অনুপযোগী। ইদানীং ফার্মের সাদা ডিম লাল করার জন্য বিষাক্ত লাল রং ব্যবহৃত হচ্ছে। উপরোক্ত খাদ্য ও সাদা ডিমে কলকারখানার বিষাক্ত ডাই ও রং ব্যবহার করা হয় যা মানুষের জন্য খুবই ঝুঁকিপূর্ণ। বিশেষজ্ঞদের মতে এসব বিষাক্ত রং মিশ্রিত খাদ্যের জন্য দেশে ডায়াবেটিস ছাড়াও কিডনি ও লিভারসহ অন্যান্য অঙ্গে ক্যান্সার ও মারাত্মক রোগ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



৫. **ডাল :** বাজারের ডালের ৯৬ ভাগই ভেজাল, নিম্নমানের ও খাওয়ার অযোগ্য। এসবে বিষাক্ত রং ও ফাঙ্গাস থাকে। আমদানিকৃত নিম্নমানের মসুর ডালকে দেশি করার জন্য 'নিউরোটক্সিন' নামে যে কেমিক্যাল ব্যবহৃত হয় তা দেহে প্রবেশের পর স্নায়ুতন্ত্র ধ্বংস করে ফেলে। আর 'মাইকোটক্সিন' নামে যে কেমিক্যাল ব্যবহৃত হয় তা ক্যান্সারসহ জটিল রোগ সৃষ্টির জন্য দায়ী। এছাড়া রং মেশানো ছোলা, মাষকলাইসহ অন্য ডালও বিভিন্ন মরণব্যাধি তৈরি করতে পারে।

৬. **গুঁড়া মশলা :** বাজারের ৯৬ ভাগ গুঁড়া মশলা ভেজাল ও খাবারের অনুপযোগী। মরিচ, হলুদ, ধনে গুঁড়ার সাথে ব্যাপক হারে ব্যবহৃত হচ্ছে ইটের গুঁড়া, বিষাক্ত সব রং। বিশেষজ্ঞরা বলেছেন, এ ধরনের ভেজাল মশলা দিয়ে তৈরি খাবার খেলে কিডনি ও লিভার নষ্ট, ক্যান্সার ও হৃদরোগসহ যে কোনো ধরনের জটিল রোগ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। শিশু ও গর্ভবতী মায়ের জন্য এগুলো সবচেয়ে বিপজ্জনক বলে জানা গেছে।

৭. **আয়োডিন লবণ :** বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সংস্থার (বিসিক) হিসাব অনুযায়ী দেশে অনেক কোম্পানি আয়োডিনযুক্ত লবণ উৎপাদন করছে। তবে এর মধ্যে গুটি কতক প্রতিষ্ঠান মূলত নিজস্ব কারখানায় আয়োডিনযুক্ত লবণ তৈরি করছে। পরীক্ষায় জানা গেছে, বাজারের লবণ কোম্পানিগুলোর ৯৫ ভাগ লবণেই আয়োডিন নেই। এর ফলে আয়োডিনের অভাবে গলগণ্ড, মানসিক প্রতিবন্ধিত্ব ও নানা জটিল রোগ সৃষ্টি হচ্ছে।

৮. **মিনারেল ওয়াটার, জুস ও জেলি :** বিশেষজ্ঞদের পরীক্ষায় প্রমাণিত হয়েছে বাজারের মিনারেল ওয়াটার নামে প্রচলিত পানির ৯৬ ভাগই পানের অযোগ্য। এছাড়া বাজারজাতকৃত ৯৭ ভাগ জুসের মধ্যে ফলের রস বলতে কিছু নেই। বাজারের বেশির ভাগ জুস, সস ও জেলিতে যে বিষাক্ত রং মেশানো হয়, সেসব রং মিশ্রিত জুস, সস, জেলি খেলে কিডনি, লিভারের ক্যান্সার, পেটের পীড়াসহ যে কোনো জটিল রোগ হওয়ার সম্ভাবনা খুবই বেশি।

৯. **আইসক্রিম :** বাজারজাতকারী আইসক্রিম কোম্পানির মধ্যে ৯৫ ভাগ কোম্পানির আইসক্রিম খাওয়ার অযোগ্য। যা খেলে কিডনি, লিভার ও পেটের পীড়া, ডায়রিয়া ও ক্যান্সারসহ জটিল সব রোগ হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

১০. **মিষ্টির দোকান ও রেস্তোরাঁ :** রাস্তার পাশের জিলাপি দোকানের জিলাপিতে মবিল ও এক ধরনের রং মেশানো হয় এবং মিষ্টির দোকানগুলোতে মিষ্টি তৈরিতে বিষাক্ত দুধ, রং ও টিস্যু পেপার মেশানো হয়। এছাড়া রাস্তার পাশের ছোট ছোট দোকানগুলোর প্রায় সবগুলোতেই পিয়াজু, সিঙ্গাড়া, পরোটা, পুরিসহ তেলে ভাজা খাদ্যগুলো বহুবার ব্যবহৃত তেলে ভাজা হয়। এসব খাবার বিষে পরিণত হয়। এগুলো খেলে লিভার অকেজোসহ যে কোনো জটিল রোগ হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

১১. **চাইনিজ রেস্টুরেন্ট ও ফাস্টফুড শপ :** বিশেষজ্ঞদের মতে ৭০ ভাগ চাইনিজ রেস্টুরেন্ট ও ফাস্টফুডের দোকানের খাবারের মান খুব খারাপ। এসব রেস্টুরেন্ট ও শপে পঁচা মাংস, বিষাক্ত রং ও কেমিক্যাল ব্যবহৃত হয়। এগুলো খেলে সরাসরি কিডনি ও লিভার নষ্ট হতে পারে। এছাড়া ক্যান্সার, পেটের পীড়া, টাইফয়েড, ভাইরাল হেপাটাইটিস ও অন্যান্য জটিল রোগ হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল।

**ক্রেতা অধিকার ও বাংলাদেশ :** পণ্য ক্রয়ের ক্ষেত্রে ক্রেতার বিশেষ কিছু অধিকার আছে। ক্রেতাদের সকল অধিকার আজ আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত। জাতিসংঘের নির্দেশ মোতাবেক সকল উন্নত দেশে ক্রেতাদের স্বার্থ সংরক্ষণের লক্ষ্যে 'কনজুমারস ল' নামেই বিবিধ আইন প্রণীত হয়েছে। তবে অনেক



অনুন্নত দেশেই ক্রেতাদের অধিকার সংরক্ষণের আইনগত ব্যবস্থা এখনও প্রতিষ্ঠিত হয়নি। এসব দেশে ক্রেতা অধিকার সংরক্ষণের জন্য কঠোর আইন প্রণয়নের দাবিতে ক্রমান্বয়ে আন্দোলন গড়ে উঠছে। ক্রেতাদের অধিকার শুধু ন্যায্য মূল্যে সঠিক ও ভালো মানের পণ্য ক্রয়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং বাস, ট্রেন অথবা বিমানে নিরাপদ ও স্বাচ্ছন্দ্যে ভ্রমণ করাও যে কোনো যাত্রীর মৌলিক অধিকার। অর্থের বিনিময়ে যে কোনো সময় ডাক্তারের নির্ভুল ও সঠিক প্রয়োজনীয় সেবা লাভও প্রতিটি রোগীর অধিকার। প্রকৃতপক্ষে প্রত্যেক ব্যক্তিই একজন ক্রেতা।

১৯৬০ সালের এপ্রিল মাসে হল্যান্ডের হেগ নগরে অনুষ্ঠিত হয়েছিল যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, অস্ট্রেলিয়া, বেলজিয়াম প্রভৃতি দেশের ক্রেতা সংগঠনের উদ্যোক্তাদের এক সম্মেলন। এ সম্মেলনেই গঠিত হয় আন্তর্জাতিক ক্রেতা সংগঠন 'ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশন অব কনজুমারস ইউনিয়ন' (আইওসিইউ)।

ক্রেতাদের অধিকার সর্বপ্রথম আমেরিকায় প্রতিষ্ঠিত হয়। পরবর্তীতে জাতিসংঘ ধারায় ৭টি অধিকার স্বীকৃতি লাভ করে। জাতিসংঘ স্বীকৃত ৭টি অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আজ বিশ্বব্যাপী গড়ে উঠেছে ক্রেতা অধিকার আন্দোলন। জাতিসংঘের সদস্যভুক্ত অধিকাংশ দেশেই আইনের মাধ্যমে এ অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এ সাতটি অধিকার হলো—

১. নিরাপত্তার অধিকার;
২. জানার অধিকার;
৩. অভিযোগ ও প্রতিনিধিত্বের অধিকার;
৪. ন্যায্যমূল্যে পছন্দসই পণ্য কেনার অধিকার;
৫. ক্ষতিপূরণ পাওয়ার অধিকার;
৬. ক্রেতার শিক্ষালাভের অধিকার;
৭. স্বাস্থ্যকর পরিবেশের অধিকার।

বাংলাদেশে ক্রেতাদের যে অধিকার রয়েছে এ সম্পর্কেই তাদের কোনো ধারণা নেই। তাছাড়া কোনো পণ্য সম্পর্কে অভিযোগ করেও অধিকাংশ সময় কোনো সুফল পাওয়া যায় না। কোনো পণ্য ব্যবহারের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত ক্রেতা যদি আইনের আশ্রয় নিতে যায় তবে সে তো ক্ষতিপূরণ পায়ই না বরং সে আরো ক্ষতির সম্মুখীন হয়। তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে ক্রেতার অধিকারের ব্যাপারে সুফল আসছে। এর জন্য কাজ করছে 'কনজ্যুমারস এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ক্যাব)।

**ভেজাল রোধে আইন :** 'পূর্ব পাকিস্তান বিশুদ্ধ খাদ্য সামগ্রী অধ্যাদেশ' নামে ১৯৫৯ সালের ৪ অক্টোবর তৎকালীন প্রাদেশিক গভর্নর একটি অধ্যাদেশ জারি করেন। খাদ্যদ্রব্যের বিপণনে ভেজাল নিরোধ এবং মনুষ্যভোগ্য খাদ্যসামগ্রীর উৎপাদন ও বিক্রয়ের উন্নতকরণ এবং নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে প্রণীত এ আইন বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর 'বাংলাদেশ বিশুদ্ধ খাদ্যসামগ্রী অধ্যাদেশ' নামে বলবৎ থাকে। এ আইনে কতিপয় খাদ্যসামগ্রীর উৎপাদন, বিক্রয়, বিশ্লেষণ, পরিদর্শন ও বাজেয়াপ্তকরণ সম্পর্কিত বিধান রয়েছে। এ আইনে আইন লঙ্ঘনকারীকে প্রথমবার অপরাধের জন্য ১০০ টাকা থেকে সর্বোচ্চ ১০০০ টাকা পর্যন্ত জরিমানা এবং ৬ সপ্তাহ থেকে ১ বছর পর্যন্ত সশ্রম কারাদণ্ড; দ্বিতীয়বার অপরাধের জন্য ন্যূনপক্ষে ১০০ টাকা থেকে সর্বোচ্চ ৪০০০ টাকা পর্যন্ত জরিমানা এবং ৩ মাস থেকে ১ বছর পর্যন্ত সশ্রম কারাদণ্ডের বিধান রয়েছে।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



**বিএসটিআই :** বিভিন্ন ধরনের পণ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের লাইসেন্স প্রদান, মান নিয়ন্ত্রণ এবং ভেজাল খাদ্যের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিয়ে থাকে বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস অ্যান্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশন (বিএসটিআই)। শিল্প, খাদ্য ও রাসায়নিক পণ্যের মান নির্ধারণ ও নিয়ন্ত্রণ বিএসটিআই-এর প্রধান কাজ। তাছাড়া দেশব্যাপী সরকার নির্ধারিত ওজন পরিমাপের বিষয়টিও তারা প্রয়োগ করে। ৬টি বিভাগীয় শহরে ৬টি আঞ্চলিক কার্যালয় এবং ঢাকাস্থ সদর দপ্তর দ্বারা সকল বিভাগে বিএসটিআই কার্য পরিচালনা করে। বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস ইনস্টিটিউশন (বিডিএসআই) ও সেন্ট্রাল টেস্টিং ল্যাবরেটরিজ (সিটিএল) একত্রিত হয়ে ১৯৮৫ সালে বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস অ্যান্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশন (বিএসটিআই) প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠার পর থেকে বিএসটিআই পণ্যের মান নিয়ন্ত্রণ, অনুমোদন এবং ভেজালরোধে কাজ করে যাচ্ছে।

**খাদ্যে ভেজাল রোধে বর্তমান অভিযান :** সরকার ভেজাল খাদ্য নিয়ন্ত্রণে যে ভ্রাম্যমাণ আদালতের ব্যবস্থা করেছে তা সব মহলে দারুণ প্রশংসিত হয়েছে। এ ধরনের সরকারি তৎপরতা আরো আগে থেকেই প্রয়োজন ছিল। মোবাইল কোর্ট বর্তমানে সে প্রয়োজনীয়তা পূরণ করার চেষ্টা করছে। ১১ জুলাই ২০০৫ বাংলাদেশে প্রথমবারের মতো ভেজাল ও অস্বাস্থ্যকর খাবার তৈরির জন্য হোটেল মালিককে সাজা প্রদান ও জরিমানা করা হয়। এদিন রাজধানীর এক থ্রিস্টার হোটেলের রান্না কক্ষে অভিযান চালিয়ে মালিককে ৯৭ হাজার ৪০০ টাকা জরিমানা এবং অনাদায়ে দু'বছর এক মাস কারাদণ্ড প্রদান করা হয়। এভাবে নামী-দামী মিষ্টি দোকান, আইসক্রিম ফ্যাক্টরি, ফাস্টফুড শপ, চাইনিজ রেস্টুরেন্টসহ, অনেক নামী-দামি কোম্পানির পণ্যে ভেজাল ধরে জরিমানা এবং কারাদণ্ড প্রদান করে।

বাংলাদেশে সাধারণত ঈদের সময় এসব তৎপরতা লক্ষ্য করা যায়। ঈদের পর আবার যে যার মতো করে অবাধে ব্যবসা চালিয়ে যায়। ভেজাল বিরোধী অভিযানে এ সম্পর্কিত আইনের দুর্বলতা ধরা পড়ার পর নতুন আইন করতে হয়েছে। আশা করা যায়, সরকারের সদিচ্ছা এবং আইন প্রয়োগকারীদের সততা অটুট থাকলে ভেজালের পরিমাণ কমবে।

**উপসংহার :** পরিশেষে বলা যায় যে, একটি সুখী, সৃমদ্ধশালী জাতি হিসেবে দাঁড়াতে হলে দেশের মানুষকে কর্মঠ এবং সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হতে হবে। আর খাবার অপরিহার্য বিধায় তা খাঁটি হওয়া জরুরি। তাছাড়া ভেজাল, ওজনে কম দেয়ার প্রবণতা যদি আমাদের অটুট থাকে এবং ক্রেতা অধিকার যদি পূরণ না করা হয় তাহলে রপ্তানির ক্ষেত্রে আমাদের সমস্যায় পড়তে হবে। আমাদের নিজেদের স্বার্থেই নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। ক্রেতাদের যদি তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন করা যায় এবং সংঘবদ্ধ করা যায় তাহলে উৎপাদনকারীরা বাধ্য হবে মান নিয়ন্ত্রণে।

## রচনা ১৯ মাদকাসক্তি ও বিপন্ন ভবিষ্যৎ প্রজন্ম

**ভূমিকা :** আধুনিক বিশ্বে নিত্যনতুন আবিষ্কার মানব জীবনকে একদিকে যেমন দিয়েছে স্বাচ্ছন্দ্য ও গতিময়তা, অন্যদিকে তেমনি সঞ্চারিত করেছে হতাশা ও উদ্বেগের। পুরাতন সামাজিক ও নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয় ঘটছে দিনে দিনে, নতুন মূল্যবোধও সবসময় গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠেনি। সামগ্রিকভাবে হতাশা, আদর্শহীনতা, বিভ্রান্তি, বেকারত্ব, রাজনৈতিক অস্থিরতা, সামাজিক-ধর্মীয় ও নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয় ইত্যাদি নানাবিধ কারণ যুবসমাজকে মাদকাসক্ত করে তুলছে। তাই বর্তমান বিশ্বসভ্যতা যে কয়টি মারাত্মক সমস্যার সম্মুখীন, মাদকাসক্তি তার অন্যতম।



**মাদকদ্রব্য ও মাদকাসক্তি :** মাদকদ্রব্য হচ্ছে সেসব বস্তু যা গ্রহণের ফলে স্নায়ুবিক বৈকল্যসহ নেশার সৃষ্টি হয়। সুনির্দিষ্ট সময় পর পর তা সেবনের দুর্বিনীত আসক্তি অনুভূত হয় এবং কেবল সেবন দ্বারাই সে তীব্র আসক্তি (সাময়িক) দূরীভূত হয়। বাংলাদেশে যেসব মাদকদ্রব্যের সেবন সর্বাধিক সেগুলো হলো গাঁজা, ফেনসিডিল, হেরোইন, রেকটিফাইড স্পিরিট, মদ, বিয়ার, তাড়ি, পঁচুই, ঘুমের ওষুধ, প্যাথেড্রিন ইনজেকশন ইত্যাদি। এসব মাদকদ্রব্য গ্রহণ করে নেশা সৃষ্টিকে মাদকাসক্তি বলা হয়। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার (WHO) মতে, মাদকাসক্তি হচ্ছে চিকিৎসা গ্রহণযোগ্য নয় এমন দ্রব্য অতিরিক্ত পরিমাণে ক্রমাগত বিক্ষিপ্তভাবে গ্রহণ করা এবং এসব দ্রব্যের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়া।

**মাদকাসক্তির কারণ :** মাদকাসক্তির কারণ বহুবিধ। এ পর্যন্ত বিজ্ঞানী, গবেষক ও চিকিৎসকরা মাদকাসক্তির অন্তরালে যে কারণগুলো সক্রিয় বলে চিহ্নিত করেছেন সেগুলো নিচে আলোচিত হলো :

১. **সঙ্গদোষ :** মাদকাসক্তির জন্য সঙ্গদোষ একটি মারাত্মক কারণ। কারণ কোনো বন্ধুবান্ধব বা পরিচিত ব্যক্তি নেশাগ্রস্ত হলে সে তার সঙ্গীদেরও নেশার জগতে আনার আপ্রাণ চেষ্টা চালায়। এক পর্যায়ে সুস্থ সঙ্গীটিও নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। সেজন্য বলা হয়ে থাকে, 'সৎ সঙ্গে স্বর্গবাস, অসৎ সঙ্গে সর্বনাশ।'

২. **কৌতূহল :** কৌতূহলও মাদকাসক্তির একটি মারাত্মক কারণ। মাদকাসক্তির ভয়াবহতা জেনেও অনেকে কৌতূহলবশত মাদকদ্রব্য গ্রহণ করে। এভাবে একবার দুবার গ্রহণের ফলে এক পর্যায়ে সে মাদকাসক্ত হয়ে পড়ে।

৩. **সহজ আনন্দ লাভের বাসনা :** মানুষ অনেক সময় আনন্দ লাভের সহজ উপায় হিসেবে মাদকের প্রতি ঝুঁকে পড়ে এবং ধীরে ধীরে মাদকাসক্ত হয়ে পড়ে।

৪. **প্রথম যৌবনের বিদ্রোহী মনোভাব :** কৈশোর ও যৌবনের সন্ধিক্ষণে ছেলেমেয়েদের বিদ্রোহী মনোভাবের মধ্য দিয়েই তাদের ব্যক্তিত্ব অনেকাংশে গড়ে ওঠে। এই বিদ্রোহী মনোভাবের কারণে তারা ভালো-মন্দ বিচার না করে সামাজিক অনেক নিয়ম-কানুনের সঙ্গে মিশে যেতে চায় অথবা ভাঙতে চায়। এই বিদ্রোহী মনোভাব তাদেরকে অনেক সময় মাদকাসক্ত করে তোলে।

৫. **মনস্তাত্ত্বিক বিশৃঙ্খলা :** তরুণদের মধ্যে মাদকাসক্তি বিস্তৃতির একটা প্রধান কারণ হলো হতাশা। পরীক্ষায় ফেল, পারিবারিক কলহ, প্রেমে ব্যর্থতা, সেশন জট, বেকারত্ব প্রভৃতি কারণে তারা শোক, বিষাদ ও বঞ্চনার চেতনাকে নেশায় আচ্ছন্ন করতে চায়।

৬. **পারিবারিক কলহ :** প্রতিটি সন্তানই চায় তার পরিবারের অভ্যন্তরে মা ও বাবার মধ্যে সুসম্পর্ক বজায় থাকুক। কিন্তু অনেক পরিবারে মা ও বাবার মধ্যে সুসম্পর্কের পরিবর্তে প্রায়শ দ্বন্দ্ব ও কলহ লেগে থাকে, যা অনেক সন্তানই স্বাভাবিকভাবে মেনে নিতে পারে না। ফলে এক পর্যায়ে এসব সন্তান মাদকাসক্ত হয়ে অন্যভাবে মানসিক প্রশান্তি খোঁজার চেষ্টা করে।

৭. **পরিবারের অভ্যন্তরে মাদকের প্রভাব :** এক পরিসংখ্যানে দেখা যায়, মাদকাসক্ত ব্যক্তিদের অনেকের পিতা-মাতার মধ্যে নেশার অভ্যাস ছিল। পরিবারের অভ্যন্তরে মাদকের প্রভাবে এসব পিতা-মাতার সন্তান সহজেই মাদকাসক্ত হয়ে পড়ে।

৮. **ধর্মীয় মূল্যবোধের বিচ্যুতি :** ধর্মীয় মূল্যবোধ ও জ্ঞান মানুষের মধ্যে মানবতাবোধ ও ভ্রাতৃত্বের বিকাশ ঘটায় এবং মানুষকে চরিত্রবান করে তুলে সঠিক পথে পরিচালিত করে। কিন্তু সাম্প্রতিককালে ধর্মীয় মূল্যবোধ থেকে বিচ্যুতি মাদকাসক্তি বিস্তারে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



৯. **চিকিৎসাসৃষ্ট মাদকাসক্তি :** বহু নেশাগ্রস্ত ব্যক্তি মাদকদ্রব্য প্রথম গ্রহণ করে ডাক্তারের নির্দেশে। তারপর সতর্ক তত্ত্বাবধানের অভাবে ও ব্যবস্থাপত্র ঘন ঘন ব্যবহারের কারণে সেই জীবন রক্ষাকারী ওষুধ-ই একদিন তাকে মাদকাসক্ত করে তোলে।

১০. **মাদকদ্রব্যের সহজলভ্যতা :** নেশাজাতীয় বস্তুটি যদি মানুষের হাতের কাছে না থাকে তবে মানুষ নেশা বা মাদকাসক্ত হবার সুযোগ কম পাবে। কিন্তু বাংলাদেশে প্রশাসনিক দুর্বলতার কারণে অনেকটা প্রকাশ্যেই মাদকদ্রব্য ক্রয়-বিক্রয় হয়। মাদকদ্রব্যের সহজলভ্যতার কারণে মাদকাসক্তদের সংখ্যাও দিন দিন বাড়ছে।

**মাদকাসক্তিতে কারা বেশি আক্রান্ত :** যেসব পরিবারে পারিবারিক বন্ধন শিথিল, মা-বাবা, ভাই-বোনের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা কম, সেসব পরিবারের সদস্যরাই বেশি মাদকাসক্ত হয়ে থাকে। বাংলাদেশে অধিকাংশ মাদকাসক্তের গড় বয়স ১৮-৩২ বছর। এটা আমাদের জন্য দুর্ভাগ্যজনক। কারণ, এই সময়টিই জীবনের সোনালী সময়। এই সময়ই মানুষ পরিবার, দেশ, জাতি তথা বিশ্বের জন্য বেশি শ্রম দেয়। জরিপ করে দেখা গেছে, বাংলাদেশের মতো একটি উন্নয়নশীল দেশে মাদকাসক্তরা বছরে প্রায় ৪ হাজার কোটি টাকা ব্যয় করে।

**মাদকাসক্তি ও বিপন্ন ভবিষ্যৎ প্রজন্ম :** বিশ্বব্যাপী মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার এবং চোরাচালানের মাধ্যমে এর ব্যাপক প্রসার ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য এক মারাত্মক হুমকি সৃষ্টি করেছে। মাদকের নিষ্ঠুর ছোবলে অকালে ঝরে যাচ্ছে বহু তাজা প্রাণ এবং অঙ্কুরেই বিনষ্ট হচ্ছে বহু তরুণের সম্ভাবনাময় উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ। বাংলাদেশের বিভিন্ন ক্ষেত্রে মাদকাসক্তির ধ্বংসাত্মক প্রভাব নিয়ে নিচে আলোচনা করা হলো :

১. **যুবসমাজের ওপর প্রভাব :** মাদকদ্রব্যের অবৈধ পাচার আমাদের দেশের যুবসমাজের ওপর মারাত্মক ক্ষতিকর প্রভাব বিস্তার করছে। প্রেমে ব্যর্থতা, হতাশা, বেকারত্ব, দারিদ্র্য, কৌতূহল প্রভৃতির কারণে আমাদের দেশের যুবসমাজের এক বিরাট অংশ মাদকদ্রব্যের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ছে। মাদকদ্রব্যের ওপর এ নির্ভরশীলতা যুবসমাজের এক বিরাট অংশকে অবচেতন ও অকর্মণ্য করে তুলেছে।

২. **সামাজিক বিশৃঙ্খলা :** যারা মাদকে আসক্ত হয়ে পড়ে তারা যে কোনো উপায়ে মাদকজাতীয় দ্রব্য সংগ্রহের চেষ্টা করে। বাংলাদেশের বিভিন্ন শ্রেণীর মাদকাসক্তরা মাদকদ্রব্য সংগ্রহের জন্য চুরি, ডাকাতি, ছিনতাইসহ বিভিন্ন ধরনের অপরাধমূলক কাজে জড়িত হয়। এভাবে সমাজের বিভিন্ন জায়গায় সামাজিক বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করে।

৩. **অন্যান্য সামাজিক সমস্যার জন্ম দেয় :** মাদকাসক্তি সমস্যাকে কেন্দ্র করে সমাজে আরো বহু ধরনের সামাজিক সমস্যার জন্ম হচ্ছে। কারণ মাদকাসক্ত ব্যক্তিরা তাদের মনের চাহিদা মেটানোর জন্য যে কোনো ধরনের কাজ করতে প্রস্তুত থাকে। এ চাহিদা পূরণের জন্য তারা চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই, লুট, ধর্ষণ, পতিতালয়ে গমন, পারিবারিক ভাঙ্গন প্রভৃতি সামাজিক সমস্যার সৃষ্টি করছে।

৪. **অবৈধ ব্যবসা :** মাদকদ্রব্যের ব্যবসা অত্যন্ত লাভজনক এবং সম্পূর্ণ আইনবিরোধী। কারণ এর পুরো ব্যবসাই চোরাইপথে অবৈধভাবে করতে হয়। সরকারকে ফাঁকি দিয়ে এক শ্রেণীর ব্যবসায়ী অধিক মুনাফা লাভের আশায় রাতারাতি বড়লোক হওয়ার স্বপ্নে এই অবৈধ ব্যবসা করছে।



৫. **শারীরিক ও মানসিক ক্ষতি :** মাদকদ্রব্যের সেবন বা ব্যবহার মানসিক ও শারীরিকভাবে আসক্তদের মারাত্মকভাবে ক্ষতি করে। মাদকদ্রব্যের অপব্যবহারের মাধ্যমে আমাদের দেশে ক্রমাগতহারে অকর্মণ্য যুবক-যুবতীর সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে, যারা কর্মক্ষমতা হারিয়ে পরিবার ও সমাজে অস্বাভাবিক আচরণ করছে।

৬. **নৈতিক অধঃপতন :** মাদকদ্রব্যের সাথে অবৈধ যৌন সম্পর্ক, পাপ এবং পতিতাবৃত্তির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান। মাদকদ্রব্য সেবনের ফলে ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের বাহ্যিক আচরণ বা মুখোশ খুলে যায়। আসক্তদের বিবেক লোপ পায়। ফলে অতিরিক্ত মাদক সেবনের পর স্বভাবতই যৌনসংক্রান্ত যে কোনো ব্যাপারে ব্যক্তির মাঝে চরম নৈতিক অধঃপতন দেখা দেয়।

৭. **পারিবারিক ভাঙ্গন ও হতাশা বৃদ্ধি :** মাদকদ্রব্যের অবৈধ পাচারের ফলে আমাদের দেশের বহু লোক কোনো না কোনোভাবে এর প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ছে। এর প্রভাবে আসক্ত ব্যক্তির দ্বারা পরে সৃষ্টি হচ্ছে পারিবারিক ভাঙ্গন এবং পুরো সমাজ ব্যবস্থায় সর্বস্তরের লোকের মাঝে দেখা দিয়েছে হতাশা।

৮. **সামাজিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধের অবক্ষয় :** মাদকাসক্ত ব্যক্তিরা যেহেতু আসক্ত হবার পর তাদের চেতনা হারিয়ে ফেলে, তাই পরবর্তীকালে তারা পূর্বের আদর্শ ও মূল্যবোধ ধরে রাখতে পারে না। আমাদের দেশের মাদকাসক্ত ব্যক্তিরা তাদের সামাজিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধ থেকে ক্রমেই সরে পড়ছে।

৯. **অপরাধপ্রবণতার হার বৃদ্ধি :** আমাদের দেশে মাদকাসক্তি সমস্যা ক্রমাগতভাবে মানুষের মধ্যে অপরাধপ্রবণতা বৃদ্ধি করছে। নেশা গ্রহণের ফলে ব্যক্তির মাঝে অস্বাভাবিকতা, অপ্রকৃতিস্থতা, বিচারবুদ্ধিহীনতা ও পাশবিকতা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। আসক্ত ব্যক্তির মধ্যে অপরাধপ্রবণতা বৃদ্ধির ফলে সমাজে অপরাধ ও অনাচার বেড়ে যাচ্ছে।

১০. **শিক্ষার ওপর প্রভাব :** মাদকাসক্তি সমস্যা আমাদের দেশের শিক্ষার ওপরও ব্যাপক প্রভাব ফেলছে। কারণ মাদকাসক্তির প্রভাবে অনেক মেধাবী ও ভালো ছাত্রছাত্রী মাদকদ্রব্য গ্রহণ করে তাদের সুন্দর ও সুস্থ ছাত্রজীবনের অবসান ঘটিয়ে ক্রমে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। যারা ফিরে আসছে তারাও সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে ফিরে আসতে পারছে না। সুতরাং দেখা যায়, মাদকাসক্তি সমস্যা আমাদের দেশের শিক্ষার ওপরও মারাত্মক ক্ষতিকর প্রভাব ফেলছে।

**মাদকাসক্তি সমস্যা সমাধানের উপায় :** বিশ্বজুড়ে মাদকাসক্তি একটি জটিল সামাজিক সমস্যা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করায় এ সমস্যা সমাধানের জন্য স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে কর্মসূচি গ্রহণ করা হচ্ছে। চলছে বিভিন্ন গবেষণা ও প্রতিরোধমূলক কর্মসূচি।

প্রতিটি শাস্ত্র, বিষয় ও ধর্মে মাদককে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে এবং এর প্রতিকারে বিভিন্ন দিকনির্দেশনা দেয়া হয়েছে। ইসলাম ধর্মের ঊষালগ্নে ও নবী করিম (স)-এর মদিনা হিজরতের পর চিন্তাশীল সাহাবাগণ মাদকের ক্ষতিকারক বিভিন্ন দিক নিয়ে ভাবতে থাকেন। তারা বিভিন্ন ঘটনাপ্রবাহ থেকে লক্ষ করেন যে, এসব নেশা উদ্রেককারী মাদকবস্তু আসক্তদের বিবেকবুদ্ধি লুপ্ত করে দেয়। ফলে

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



ব্যবহারকারী বেসামাল হয়ে পড়ে এবং নানা ধরনের সামাজিক অনাচার সৃষ্টি করে, যা সুস্থ সামাজিকতার পথে খুবই ক্ষতিকর। বিষয়টি তারা নবীজীর নজরে আনেন। এ সময়ে মাদকের প্রতিরোধ, প্রতিকার ও ক্ষতিকারক বিভিন্ন দিক সম্পর্কে একাধিক আয়াত নাজিল হয়। যেমন—

১. হে ঈমানদারগণ, নেশাগ্রস্ত অবস্থায় নামাজের ধারে কাছেও যেও না। *(সূরা নিসা, আয়াত ৪৩)*

২. হে মুমিনগণ, এই যে মদ, জুয়া, প্রতিমা ও ভাগ্য নির্ধারক শরসমূহ এসব শয়তানের কার্য। অতএব এগুলো থেকে বেঁচে থাক, যাতে তোমরা কল্যাণপ্রাপ্ত হও। *(সূরা মায়েদা, আয়াত ৯০)*

৩. তারা তোমাকে মদ ও জুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। বলে দাও, এই উভয়ের মধ্যে রয়েছে মহাপাপ, আর মানুষের জন্য উপকারিতাও রয়েছে, তবে মানুষের জন্য যে উপকারিতা রয়েছে এগুলোর পাপ উপকারিতা অপেক্ষা অনেক বড়। *(সূরা বাকারা, আয়াত ২১৯)*

পবিত্র কুরআনে যে কাজগুলো করা থেকে বিরত থাকতে বলা হয়েছে তা পালন করা এবং এ ব্যাপারে অন্যকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য প্রতিটি মুসলমানের প্রতি জোর তাগিদ রয়েছে।

কোনো সমাজেই মাদকাসক্তি কাম্য নয়। তাই ধর্ম, দর্শন, সমাজতত্ত্ব, সাহিত্য প্রতিটি বিষয়ে তাদের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গিতে এসব বদ নেশার প্রতি নিষেধমূলক প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করা হয়েছে। মাদকাসক্তি সমস্যার পেছনে বহুবিধ কারণ বিদ্যমান। তাই এই সমস্যা মোকাবিলা ও প্রতিরোধ করার জন্য বহুমুখী কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। এ সমস্যা মোকাবিলার জন্য সবচেয়ে বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া হচ্ছে প্রতিকারমূলক ও প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা। নিচে এসব ব্যবস্থা নিয়ে আলোচনা করা হলো :

ক. **প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা বা পদক্ষেপ :** মাদকাসক্তদের শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক অবস্থা বিচার-বিশ্লেষণ করে তাদের সুস্থ করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করাকে প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা বলা হয়। আসক্ত ব্যক্তিদের প্রথমে তার পরিবেশ থেকে সরিয়ে আনা হয়, যাতে সে আর পুনরায় মাদক গ্রহণ করার সুযোগ না পায়। পরে তাকে সুস্থ ও স্বাভাবিক করার জন্য কোনো চিকিৎসাকেন্দ্রে ভর্তি করে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়, যাতে ব্যক্তি পরিপূর্ণরূপে সুস্থ হয়ে তার হারানো ক্ষমতা ফিরে পায় এবং স্বাভাবিকভাবে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে পারে। মাদকাসক্তি প্রতিরোধে প্রতিকারমূলক ব্যবস্থার বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে।

খ. **প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা :** মাদকাসক্তির করাল ছোবল থেকে সমাজ ও সমাজের মানুষকে রক্ষা করার জন্য যেসব প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া হয় তাকেই প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা বলে। মাদকাসক্তি নিয়ন্ত্রণে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা হিসেবে যেসব পদক্ষেপ নেয়া হয় সেগুলো নিম্নরূপ :

   ১. মাদকদ্রব্যের উৎপাদন ও আমদানি নিষিদ্ধকরণের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট দেশগুলোর সাথে সমন্বিত কার্যক্রম গ্রহণ করে প্রতিরোধ ব্যবস্থা জোরদার করা।

   ২. স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন পাঠ্যসূচিতে মাদকের ক্ষতিকর দিকগুলো অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে ব্যাপক সচেতনতা কার্যক্রম চালু করা।

   ৩. বিভিন্ন সভা, সমিতি, সেমিনার, আলোচনা ও অন্যান্য প্রচার মাধ্যমগুলোতে প্রচারের মাধ্যমে মাদক প্রতিরোধের ব্যবস্থা করা।

   ৪. মাদক প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত আইনের বাস্তবায়ন করা।

   ৫. পরিবারের কর্তা ব্যক্তিদের তাদের অধীনস্তদের ব্যাপারে সজাগ দৃষ্টি রাখা এবং পারস্পরিক বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তোলা।



**উপসংহার :** পরিশেষে বলা যায়, মাদকদ্রব্যের অপব্যবহারজনিত সমস্যা আজ বিশ্বব্যাপী। লাভজনক এ ব্যবসাকে কেন্দ্র করে আন্তর্জাতিক চোরা-চালানী চক্র গড়ে উঠেছে। এ সমস্যার ভয়াবহতার কথা বিবেচনা করে জাতিসংঘের মহাসচিব বলেছেন, 'এ বিশ্বকে মাদকমুক্ত করা এক বিশাল সমস্যা।' বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে এ ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষার জন্য মাদকাসক্তি নিরাময় ও প্রতিরোধ আন্দোলনে আপামর জনসাধারণকে এগিয়ে আসতে হবে। এর পূর্বশর্ত হিসেবে ধূমপান ও মাদকবিরোধী আন্দোলনকে বেগবান করতে হবে। সরকারি মহল থেকে শুরু করে গণমাধ্যম, রাজনীতিবিদ, কূটনীতিবিদ, বুদ্ধিজীবী, আইনজীবী, সমাজকর্মী, সমাজবিজ্ঞানী, অর্থনীতিবিদসহ সকল শ্রেণীর মানুষের সক্রিয় অংশগ্রহণপূর্বক মাদকমুক্ত বিশ্ব গড়ে তুলে এ বিশ্বকে সবার বাস-উপযোগী করে তুলতে হবে।

## রচনা ২০ সড়ক দুর্ঘটনা : নিরাপদ সড়ক চাই

**ভূমিকা :** সড়ক দুর্ঘটনা বর্তমান সময়ের আলোচিত ও মর্মস্পর্শী ঘটনা। এ দুর্ঘটনায় প্রতিদিন হারিয়ে যাচ্ছে হাজারো মানুষ, ধূলিসাৎ হয়ে যাচ্ছে হাজারো স্বপ্ন। পত্রিকার পাতা খুললেই এর সত্যতার প্রমাণ মিলে। সড়ক দুর্ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে আজ আমাদের নিরাপত্তার প্রধান হুমকি। প্রতিদিনই দেশের কোথাও না কোথাও ঘটছে সড়ক দুর্ঘটনা। ফলে অনেকেই পঙ্গুত্ব বরণ করে পরিবার ও সমাজের বোঝা হয়ে দুর্বিষহ জীবন-যাপন করছে। দেশে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি ঘটছে। কিন্তু কমছে না সড়ক দুর্ঘটনা। সড়ক পথ হয়ে উঠছে বিপজ্জনক। তাই স্বাভাবিকভাবেই সড়ক দুর্ঘটনা সম্পর্কে আলোচনা ও কার্যকর পদক্ষেপ নেয়া আজ সময়ের দাবি।

**সড়ক দুর্ঘটনার ধরন :** সংবাদপত্রে যে খবরটি প্রতিদিনের অনিবার্য বিষয়, তা হলো সড়ক দুর্ঘটনা। সড়ক দুর্ঘটনাগুলো ঘটে বিভিন্নভাবে। যেমন-বাস ও মিনিবাসের মুখোমুখি সংঘর্ষে অথবা বাস ও ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষে, ট্রাক অথবা বাস-মিনিবাসের সাথে বেবি-টেম্পুর ধাক্কায়, বাস-মিনিবাস ও ট্রাক পিছন দিক থেকে রিকশাকে ধাক্কা দিয়ে, গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে খাদে পড়ে; এমনকি পায়ে হেঁটে রাস্তা পার হবার সময়ও অনেক পথচারী দুর্ঘটনার হাত থেকে রক্ষা পায় না। এসব দুর্ঘটনা দেখে মনে হয় মৃত্যু যেন ওঁত পেতে বসে আছে রাস্তার অলিতে-গলিতে।

**সড়ক দুর্ঘটনার কারণ :** সড়ক দুর্ঘটনার অনেক কারণ বিদ্যমান। নিচে সড়ক দুর্ঘটনার প্রধান কয়েকটি কারণ আলোচনা করা হলো :

১. **অতিরিক্ত গতি এবং ওভারটেকিং :** সড়ক দুর্ঘটনার প্রধান কারণ হচ্ছে গাড়িগুলোর অতিরিক্ত গতিসীমা। অসাবধানতার সঙ্গে অতিরিক্ত গতিতে অন্য একটি চলমান গাড়িকে ওভারটেকের চেষ্টাই সড়ক দুর্ঘটনার একটি অন্যতম কারণ। পুলিশ রিপোর্টেও বেশির ভাগ দুর্ঘটনার কারণ হিসেবে বলা হয়েছে অতিরিক্ত গতি এবং চালকদের বেপরোয়া গাড়ি চালানো। ট্রাকে-কোচে পাল্লা দিয়ে সংঘর্ষ এবং দ্রুত বেগে পুলে উঠার সময়েই দুর্ঘটনা ঘটার নিদর্শন রয়েছে ভূরিভূরি।

২. **অপ্রশস্ত পথ :** অপ্রশস্ত পথ ব্যবস্থাও বাংলাদেশের অধিকাংশ সড়ক দুর্ঘটনার জন্য দায়ী। ঢাকা থেকে যাতায়াতের সবচেয়ে ব্যস্ত পথ ঢাকা-আরিচা এবং ঢাকা-চট্টগ্রাম হাইওয়ে। কিন্তু পর্যাপ্ত পরিমাণ প্রশস্ত না হওয়াতে এ দুটি পথেই দুর্ঘটনা এবং হতাহতের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি ঘটে। ট্রাক, বাস, মিনিবাস, টেম্পো সবরকম দ্রুতগতির যানবাহনের সঙ্গে পদচালিত ভ্যান, রিকশা ঠেলাগাড়ি সবই চলাচল করে এই পথে। ফলে দেখা যায় স্বল্প পরিসর পথে দ্রুত গতিসম্পন্ন গাড়ির সঙ্গে মন্থর গতির গাড়ির একত্রে চলাচলের কারণে প্রায়ই দুর্ঘটনা ঘটে।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



৩. **প্রযুক্তির অপব্যবহার :** বর্তমান সময় সম্পূর্ণরূপে প্রযুক্তি নির্ভর। যার ফলে মোবাইল, গান শোনার বিভিন্ন বৈদ্যুতিক যন্ত্র (এমপি থ্রি প্লেয়ার) ইত্যাদি সব পেশার মানুষের কাছে সহজলভ্য হয়ে পড়েছে এতে করে গাড়ি চালনার সময় চালক মোবাইল ফোনে কথা বলেন বা গান শোনেন। ফলে তিনি গাড়ি চালানোয় অসতর্ক হয়ে পড়েন। এতে করে যেকোনো সময়ই দুর্ঘটনার কবলে পড়ছে গাড়ি চালক নিজেসহ গাড়িযাত্রী এবং পথচারীরা।

৪. **ওভারলোডিং :** 'ওভারলোড' মানে পরিমিতির বেশি মাল বহন করা। বেশি ওজনের মালামাল বহন করে গতি সীমা ছাড়িয়ে প্রতিটি ট্রাকই এক একটি যন্ত্রদানব হয়ে উঠে। এর ফলে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে চালকরা প্রায়ই দুর্ঘটনা ঘটায়।

৫. **আইন অমান্য :** সড়ক দুর্ঘটনার অন্যতম কারণ আইন অমান্য করে গাড়ি চালানো। জরিপে দেখা গেছে, ৯১ শতাংশ চালক জেব্রা ক্রসিংয়ে অবস্থানরত পথচারীদের অধিকার আমলই দেয় না। পাশাপাশি ৮৪ ভাগ পথচারী নিয়ম ভেঙ্গে রাস্তা পার হয়। এক সমীক্ষায় দেখা গেছে, ঢাকা শহরে শতকরা ৯৪ জন রিকশাচালক ট্রাফিক আইন ও নিয়মের প্রাথমিক বিষয়গুলোও জানে না। তারা জানে না ডানে বা বাঁয়ে যেতে হলে কি সংকেত দিতে হবে। কোথায় কিভাবে মোড় নিতে হবে। ফলে দুর্ঘটনা ঘটছে অহরহ।

৬. **জনসংখ্যার চাপ ও অপ্রতুল পরিবহন ব্যবস্থা :** দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে যানবাহন। এক হিসাবে দেখা গেছে, রাজধানী ঢাকায় বর্তমানে প্রতি কিলোমিটারে ২৪৭টির মতো গাড়ি চলে। ঢাকা মেট্রোপলিটন এলাকার আওতাধীন মোট ২২৩১.৩০ কিলোমিটার সড়কে আনুমানিক গাড়ি চলাচল করে ৫ লাখ ৫০ হাজার। শুধু ঢাকা শহরেই নয়, সমগ্র বাংলাদেশেই গাড়ি ও জনসংখ্যা বাড়ছে দ্রুত হারে। ফলে বেড়ে যাচ্ছে দুর্ঘটনার হারও।

৭. **ট্রাফিক অব্যবস্থাপনা :** বাংলাদেশে সড়ক পথের দৈর্ঘ্য প্রায় ২৫ হাজার কিলোমিটার। এসব সড়ক ও মহাসড়কে প্রতিদিন কয়েক লক্ষ যন্ত্রচালিত যানবাহন চলাচল করছে। কেবল রাজধানী ঢাকায় বাস মিনিবাস, প্রাইভেটকার, জিপ, পিকআপ, ট্রাক, অটোরিকশা ও মটর সাইকেল মিলিয়ে কয়েক লক্ষ যানবাহন চলাচল করে। এছাড়াও বৈধ-অবৈধ রিকশার সংখ্যা কয় লক্ষ তা সঠিকভাবে বলা সম্ভব নয়। কিন্তু এই বিশাল যানবাহন বাহিনীকে সুশৃঙ্খল অবস্থার মধ্যে আনার মতো ট্রাফিক ব্যবস্থা এদেশে আজও গড়ে উঠেনি।

**সড়ক দুর্ঘটনার ক্ষয়ক্ষতি :** সড়ক দুর্ঘটনার ফলাফল কেবল মানুষের মৃত্যুর ক্ষতি নয়, অপূরণীয় আরো অনেক ক্ষতির বোঝা চাপিয়ে দেয় সাধারণের জীবনে। সড়ক দুর্ঘটনায় আহত হয়ে অনেক মানুষ প্রাণে বেঁচে থাকে বটে, কিন্তু জীবনের স্বাভাবিক গতি তারা হারিয়ে ফেলে চিরকালের মতো। পঙ্গুত্ব, শারীরিক বৈকল্য আর যন্ত্রণা ও বেদনার ভার বহন করে বেঁচে থাকা সেই সব মানুষের সংখ্যা আমাদের দেশে কম নয়। নিম্নে সড়ক দুর্ঘটনার ক্ষয়ক্ষতির কিছু পরিসংখ্যান তুলে ধরা হলো :

১. **বিশ্বব্যাপী সড়ক দুর্ঘটনার ক্ষয়ক্ষতি :** বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার হিসাব মতে, প্রতি বছর পৃথিবীতে সড়ক দুর্ঘটনায় প্রায় ১২ লাখ মানুষ নিহত হয়। ২ কোটিরও অধিক মানুষ আহত হয় এবং প্রায় ৫০ লক্ষ মানুষ পঙ্গুত্ব বরণ করে, যা খুবই মর্মান্তিক ও অপ্রত্যাশিত। সড়ক দুর্ঘটনার বর্তমান হার অব্যাহত থাকলে ২০২০ সালে সড়ক দুর্ঘটনায় হতাহতের হার বর্তমানের তুলনায় ৬০ ভাগ বৃদ্ধি পাবে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।



২. **বাংলাদেশের ক্ষয়ক্ষতির পরিসংখ্যান :** পুলিশের এফআইআর অনুযায়ী ২০১৪ সালে শুধু মহাসড়কগুলোতেই ২ হাজার ২৭টি দুর্ঘটনা ঘটে এবং এতে ২ হাজার ৬৭ জন নিহত হয় এবং অন্তত ২ হাজার জন আহত হয়। এটা কেবল পুলিশের নিকট নথিভুক্ত মহাসড়কগুলোর দুর্ঘটনার হিসাব। মহাসড়ক ছাড়া অন্যান্য সড়কে, পুলিশের কাছে নথিভুক্তহীন অসংখ্য সড়ক দুর্ঘটনার মাধ্যমে বাংলাদেশে মহাসড়কসহ নিহতের সংখ্যা প্রতি বছর গড়ে ১২-২০ হাজার জন। সম্প্রতি এক জরিপ থেকে জানা যায়, দেশের বিভিন্ন হাসপাতালে ১৫% থেকে ৩০% শয্যায় দুর্ঘটনা কবলিত রোগীদের ভর্তি করতে হচ্ছে, যা স্বাস্থ্যসেবার ক্ষেত্রে সৃষ্টি করছে অপ্রত্যাশিত চাপ। এর ফলে স্বাস্থ্যখাতের সীমিত সম্পদের অনেকখানিই চলে যায় সড়ক দুর্ঘটনায় আহতদের সেবায়।

৩. **সড়ক দুর্ঘটনায় শিশুদের ক্ষয়ক্ষতি :** সড়ক দুর্ঘটনায় বয়স্কদের পাশাপাশি শিশুদের ক্ষয়ক্ষতির হারও অত্যন্ত ব্যাপক ও ভয়াবহ। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তথ্য অনুযায়ী সারা পৃথিবীতে প্রতি বছর সড়ক দুর্ঘটনায় ২ লাখেরও বেশি শিশু মারা যায়। আহত হয় হাজার হাজার শিশু যাদের বয়স ১৫ বছরের নিচে। সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত ৯৬ শতাংশ শিশুই অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের সাধারণত বস্তিতে বসবাসকারী ও এখানে সেখানে ঘুরে বেড়ানো শিশুরাই দুর্ঘটনার শিকার হয় বেশি। দুর্ঘটনায় আহত অভিভাবকহীন অনেক শিশুই সময় মতো চিকিৎসা সুবিধা পায় না। এদের অনেকেই ভুগে ভুগে মৃত্যুবরণ করে। আবার অনেকেই পঙ্গু হয়ে ভিক্ষাবৃত্তিকে জীবিকার একমাত্র উপায় হিসেবে বেছে নেয়।

৪. **সড়ক দুর্ঘটনার অর্থনৈতিক ক্ষতি :** বাংলাদেশে প্রতি বছর সড়ক দুর্ঘটনায় ব্যক্তি, যানবাহন ও সমাজের যে সুদূরপ্রসারী ক্ষতি হয় তার অর্থনৈতিক হিসাব দাঁড়ায় বছরে প্রায় ৫ হাজার কোটি টাকা, যা জিডিপি'র দুই ভাগ। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার হিসাব মতে আন্তর্জাতিকভাবে সড়ক দুর্ঘটনায় অর্থনৈতিক ক্ষতির পরিমাণ বছরে প্রায় ৫২০ বিলিয়ন ডলার। উন্নয়নশীল এবং অনুন্নত দেশে এর পরিমাণ ৬৫ বিলিয়ন ডলার। এই পুরো টাকাটাই দেশের উন্নয়ন বাজেট থেকে মেটানো হয়। ফলে চাপ পড়ে জাতীয় অর্থনীতিতে। মৃত্যু, পঙ্গুত্ব, আর্থিক ক্ষতি বাধাগ্রস্ত করে জাতীয় উন্নয়নের ধারাকে।

৫. **সড়ক দুর্ঘটনার পারিবারিক ও সামাজিক ক্ষতি :** সড়ক দুর্ঘটনার মৃত্যু অস্বাভাবিক মৃত্যু। এ দুর্ঘটনার কবলে পড়ে অকালে অনেকের জীবন ঝরে যায়। সেই শোক গোটা পরিবার ও আত্মীয়-স্বজনদের বুকে শেলের মত বিধে থাকে। দুর্ঘটনায় নিহত, আহত বা পঙ্গু ব্যক্তিদের প্রত্যেকের পরিবার, বন্ধুবান্ধব, প্রতিবেশী, সহকর্মী সকলেই আর্থ-সামাজিক ও মানসিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। হঠাৎ করেই এসব পরিবারের আয় কমে যায়। ফলে বিপর্যস্ত হয় পুরো পরিবার। অনেক সময় সড়ক দুর্ঘটনায় সমাজ ও দেশ হারায় তার কৃতি সন্তানকে। এই দুর্ঘটনা অনেককে চিরদিনের মত পঙ্গু করে দেয়।

**সড়ক দুর্ঘটনা প্রতিরোধের উপায় :** নিঃশব্দ আঁততায়ীর মতো প্রতিবছর সড়ক দুর্ঘটনা আমাদের চার হাজার স্বজনকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিচ্ছে। কিন্তু এ মৃত্যুকে তো আমরা ঠেকাতে পারি। এজন্য প্রয়োজন একটু সচেতনতা, ধৈর্য, সতর্কতা আর ট্রফিক আইনের যথাযথ প্রয়োগ। যেসব কারণে সড়ক দুর্ঘটনা ঘটে তার প্রত্যেকটি কারণই প্রতিরোধযোগ্য। তাই সড়ক দুর্ঘটনা প্রতিরোধের জন্য করণীয় হলো-

১. **বেপরোয়া গতি নিয়ন্ত্রণ :** সড়ক দুর্ঘটনার প্রধান কারণ হলো গাড়িগুলোর বেপরোয়া গতি এবং ওভারটেকিং করার প্রবণতা। বেপরোয়া গতিতে গাড়ি চালানোর প্রবণতা বেশি দেখা যায় ট্রাক,

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



মিনিবাস আর দূরপাল্লার বাস চালকদের মধ্যে। এসব গাড়ির চালকগণ ভুলে যায় বেশ কিছু মানুষের জীবন কিছু সময়ের জন্য তাদের জিম্মাদারীতে রয়েছে। চালকগণ একটু সহনশীল হলে, বেপরোয়া গতিতে গাড়ি চালানোজনিত সড়ক দুর্ঘটনা সহজেই প্রতিরাধ করা যায়। তাই সড়ক দুর্ঘটনা হ্রাসের জন্য দেশের ব্যস্ততম সড়কগুলোতে ওভারটেকিং নিষিদ্ধকরণ এবং গাড়ির সর্বোচ্চ গতিসীমা বেঁধে দেয়া উচিত এবং এটা কার্যকর করার জন্য ভ্রাম্যমান ট্রাফিক পুলিশ দেয়া উচিত।

২. **ট্রাফিক আইনের যথাযথ প্রয়োগ :** ট্রাফিক আইনের যদি যথাযথভাবে প্রয়োগ করা হয় এবং আইন লঙ্ঘনকারীদের বিরুদ্ধে যদি কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় তাহলে সড়ক দুর্ঘটনার পরিমাণ অনেক কমে যাবে বলে বিশেষজ্ঞগণ মনে করেন। কেননা, ট্রাফিক আইন যথাযথভাবে প্রয়োগ করলে চালকদের মধ্যে ভীতির সৃষ্টি হবে এবং চালকরা গাড়ি চালানোর সময় সাবধানতা অবলম্বন করবে।

৩. **লাইসেন্স প্রদানে জালিয়াতি প্রতিরোধ :** সড়ক দুর্ঘটনা হ্রাস করার জন্য গাড়ির লাইসেন্স ও চালকদের লাইসেন্স প্রদানের জালিয়াতি প্রতিরোধ করতে হবে। বর্তমানে দেখা যায় লাইসেন্স প্রদানে জালিয়াতির আশ্রয় গ্রহণ করে কর্তৃপক্ষ অনভিজ্ঞ ড্রাইভারদের হাতে ছেড়ে দেন নিরীহ যাত্রীদের ভাগ্য। তাই গাড়িচালক ও গাড়ির লাইসেন্স প্রদানে সুষ্ঠু নীতিমালা প্রণয়ন করে তা কার্যকর করতে হবে।

৪. **ফিটনেস সার্টিফিকেটবিহীন গাড়ি প্রতিরোধ করা :** এক সমীক্ষায় দেখা গেছে যে, দেশের বিভিন্ন সড়কে চলাচলকারী গাড়ির মধ্যে অর্ধেকের বেশি গাড়ির লাইসেন্স বিহীন। আবার লাইসেন্সবিহীন গাড়ির মধ্যে অধিকাংশেরই রাস্তায় চলাচলের উপযোগী ফিটনেস নেই। যার ফলে ঘটে দুর্ঘটনা। আবার যেসব গাড়ির ফিটনেস সার্টিফিকেট আছে তার মধ্যেও রয়েছে অনেক গাড়ি যেগুলো চলাচলের উপযোগী নয়। এগুলোর ফিটনেস সার্টিফিকেট সংগ্রহ করা হয়েছে জালিয়াতির মাধ্যমে। এসব গাড়িগুলো দূরপথে যাতায়াত করার সময় নানাবিধ দুর্ঘটনার শিকার হয়। সুতরাং সড়ক দুর্ঘটনা প্রতিরোধের জন্য অবৈধ উপায়ে ফিটনেস সার্টিফিকেট প্রদান করা বন্ধ করে ফিটনেসবিহীন গাড়ির চলাচল কঠোরভাবে প্রতিরোধ করতে হবে।

৫. **পথচারীকে সতর্ক হতে হবে :** সড়ক দুর্ঘটনা থেকে বেঁচে থাকার জন্য পথচারীদের পথ চলার নিয়ম সম্পর্কে অবহিত হতে হবে। পথচারীরা অনেক সময় প্রচলিত আইন অমান্য করে রাস্তা দিয়ে হাঁটেন। শুধু তাই নয়, বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে ওভার ব্রিজ থাকা সত্ত্বেও তারা তা খুব কমই ব্যবহার করেন। তাছাড়া অনেক সময় পথচারীরা অসতর্কতার সাথে রাস্তা পার হন যার দরুন অনেক দুর্ঘটনা ঘটে। সুতরাং রাস্তায় চলাচলের সময় পথচারীদের আরও সতর্ক ও সচেতন হওয়া প্রয়োজন। রাস্তা পারাপারের সময় প্রথমে ডানে, পরে বামে এবং আবার ডানে তাকিয়ে রাস্তা পার হতে হবে। বিদ্যুৎ সংকেত ও যানবাহন নিয়ন্ত্রণকারী পুলিশের সংকেত অনুসরণ করে জেব্রা ক্রসিং দিয়ে রাস্তা পার হতে হবে।

৬. অন্যান্য পদক্ষেপ : সড়ক দুর্ঘটনা প্রতিরোধের জন্য আরো যেসব পদক্ষেপ গ্রহণ করা দরকার তা হলো—
- মহাসড়কের বিভিন্ন স্থানে স্থাপিত অনুমোদনবিহীন গতিরোধক ভেঙ্গে ফেলা।
- মহাসড়কের উভয় পাশের হাট-বাজার ও অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ করা।
- নির্ধারিত গন্তব্যে পৌছানোর আগে রাস্তায় গাড়ি বিকল হলে জরিমানার ব্যবস্থা করা।



- অতিরিক্ত যাত্রী ও মালামাল বহন বন্ধ করা।
- দুর্ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের বিরুদ্ধে দ্রুত আইনগত ব্যবস্থা নেয়ার জন্য পৃথক আইন প্রণয়নসহ পৃথক আদালত স্থাপন করা।
- প্রতিটি সড়ক-মহাসড়কে যান্ত্রিক ও অযান্ত্রিক পরিবহনের চলাচলের জন্য পৃথক লেনের ব্যবস্থা করা।
- প্রতিমাসে মহাসড়কে মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে যানবাহনের ত্রুটি-বিচ্যুতি পরীক্ষা করা।
- প্রশস্ত রাস্তাঘাট তৈরি এবং পুরনো রাস্তাঘাট মেরামত করা। ঝুঁকিপূর্ণ স্থানসমূহ চিহ্নিত করে তা সংস্কারের ব্যবস্থা নেয়া।
- পথচারীদের চলাচলের জন্য প্রতিটি সড়কের পাশ দিয়ে ফুটপাত নির্মাণ করা।
- ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে ট্রাফিক আইন সম্পর্কে জ্ঞান প্রদানের জন্য স্কুল, কলেজের পাঠ্যসূচিতে ট্রাফিক আইন সংক্রান্ত বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা।
- সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার সহযোগিতায় যানবাহন চালনা ও পথচারীদের যথানিয়মে সড়ক পারাপারে উদ্বুদ্ধকরণের জন্য প্রচার কার্যক্রম অব্যাহত রাখা।

সর্বোপরি সরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি পরিবহন মালিক সমিতি, পরিবহন শ্রমিক ইউনিয়ন, গাড়ি চালক সমিতি এবং জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে সড়ক দুর্ঘটনা অনেকাংশে হ্রাস করা সম্ভব। তাই এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট সকলকে সচেষ্ট ও সচেতন হতে হবে।

**সড়ক দুর্ঘটনা রোধের জন্য বাংলাদেশ সরকারের গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপ :** সড়ক দুর্ঘটনার আর্থ-সামাজিক ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণ অপরিসীম। তাই সরকার সড়ক দুর্ঘটনা রোধের জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। যেমন—

**সড়ক নিরাপত্তা ও সরকার :** সড়ক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বিভিন্ন সময় সরকার দেশে সড়কসংশ্লিষ্ট কয়েকটি সংস্থা বা কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠা করে। সড়ক পরিবহন সেক্টরের সার্বিক তত্ত্বাবধান, ব্যবস্থাপনা ও সুষ্ঠু নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে সরকার ১৯৮৮ সালে বাংলাদেশ রোড ট্রান্সপোর্ট অথরিটি (বিআরটিএ) গঠন করে। এ সংস্থা দেশের যান্ত্রিক যানবাহনের রেজিস্ট্রেশন, উপযুক্ততা সনদসহ মোটরযান অধ্যাদেশে বর্ণিত অন্যান্য রেগুলেটরি দায়িত্ব পালন করে আসছে। এর আগে দেশের সড়ক পরিবহন ব্যবস্থার উন্নয়নে ৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৬১ সালে জারিকৃত এক অধ্যাদেশের মাধ্যমে গঠিত হয় বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন করপোরেশন (বিআরটিসি)। পরিবহন অবকাঠামো ও ট্রাফিক ব্যবস্থাপনার পরিকল্পনা ও সমন্বয় সাধন এবং পরিবহন সংক্রান্ত বিভিন্ন সংস্থার প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন ও দীর্ঘমেয়াদি পরিবহন পরিকল্পনা প্রণয়নের লক্ষ্যে গঠিত হয়েছে ঢাকা যানবাহন সমন্বয় বোর্ড (ডিটিসিবি)। এ ছাড়াও সরকার সড়ক নিরাপত্তার জন্য সড়ক নিরাপত্তা সেল গঠনের পাশাপাশি বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে (বুয়েট) দুর্ঘটনা রিসার্চ সেন্টার স্থাপন করেছে। সড়ক ও মহাসড়কে অপরাধ এবং দুর্ঘটনা রোধকল্পে দেশের ৭২টি হাইওয়ে ফাঁড়িকে একক কমান্ডে এনে ১১ জুন ২০০৫ যাত্রা শুরু করে হাইওয়ে পুলিশ।

**সড়ক নিরাপত্তা সংশ্লিষ্ট আইন :** দেশের প্রচলিত আইনে বেপরোয়া গতিতে গাড়ি চালানোর কারণে এবং চালকের উদাসীনতা ও অদক্ষতার জন্য দুর্ঘটনার সর্বোচ্চ শাস্তি ৩ বছরের কারাদণ্ড। ১৯৮২ সালের ১৫ জুন জারিকৃত ৯ নম্বর অধ্যাদেশে সড়ক দুর্ঘটনায় চালকের শাস্তির বিধান ছিল ১৪ বছর। একই সাথে জামিন

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



অযোগ্য করা হয়েছিলো। পরবর্তীতে ১৯৮৪ সালের ২০ আগস্ট ২২ নম্বর অধ্যাদেশে শাস্তির মেয়াদ ১৪ বছর থেকে কমিয়ে ৭ বছর করা হয় এবং জামিনযোগ্য করা হয়। কিন্তু ১৯৮৫ সালের ৮ অক্টোবর জারিকৃত আরেকটি অধ্যাদেশের মাধ্যমে এ শাস্তি বা কারাদণ্ড আরো চার বছর কমিয়ে ৩ বছর করা হয়।

অন্যান্য পদক্ষেপ

- সড়ক দুর্ঘটনার কারণ ও তার প্রতিরোধের উপায় সম্পর্কে গবেষণা করার লক্ষ্যে সরকার বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে দুর্ঘটনা প্রতিরোধ সংক্রান্ত একটি গবেষণা কেন্দ্র স্থাপন করেছে।
- সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে দেশব্যাপী সড়ক, মহাসড়ক, ব্রিজ, কালভার্ট, ফ্লাইওভার ও বাইপাস সড়ক নির্মাণের কাজ হাতে নেয়া হয়েছে। সড়ক প্রশস্তকরণ এবং রোড ডিভাইডার নির্মাণের কাজও এগিয়ে চলছে।
- সড়ক ও মহাসড়ক থেকে দুর্ঘটনার কারণ হিসেবে চিহ্নিত হাটবাজার অপসারণের কাজ চলছে।
- অতিরিক্ত মালামাল ও যাত্রী পরিবহন প্রতিরোধে সড়ক পথে ওয়েটিং ব্রিজ স্থাপন করার ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।
- যানবাহনের ফিটনেস যাচাইয়ের জন্য স্থাপিত কম্পিউটারাইজ ভেহিকেল ইন্সপেকশন সেন্টারকে কার্যকর করা হয়েছে।
- অদক্ষ ও লাইসেন্সবিহীন চালকের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের কার্যক্রম জোরদার করা হয়েছে।
- সড়ক নিরাপত্তা সেল গঠনসহ হাইওয়ে পুলিশ ইউনিটকে অধিকতর শক্তিশালী করার ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।
- সকল জেলা ও উপজেলা হাসপাতালগুলোতে সড়ক দুর্ঘটনায় আহতদের চিকিৎসা দেয়ার ব্যবস্থা নিয়েছে সরকারের স্বাস্থ্য বিভাগ। দুর্ঘটনা কবলিত রোগীদের পরিচর্যা ও উন্নত সেবাদানের জন্য ইতোমধ্যেই ৬০০ শয্যা বিশিষ্ট অর্থোপেডিক হাসপাতালকে নিটোর (NITOR) হিসেবে জাতীয় ইনস্টিটিউটে উন্নীত করা হয়েছে। এর ফলে এ প্রতিষ্ঠান থেকে চিকিৎসক, প্যারামেডিক ও নার্সরা দুর্ঘটনাজনিত রোগীদের সেবা প্রদানের জন্য বিশেষজ্ঞ প্রশিক্ষণ নিতে পারবেন।
- সড়ক দুর্ঘটনায় আঘাত প্রাপ্তদের দ্রুত চিকিৎসা সেবাদানের লক্ষ্যে ফেনী, দাউদকান্দি, ভালুকা, সিরাজগঞ্জ, ফরিদপুর ও চট্টগ্রামে মহাসড়কের পাশে ৬টি ট্রমা সেন্টার স্থাপন করেছে সরকার। ইতোমধ্যে ৫টি ট্রমা সেন্টার কাজ শুরু করেছে। পর্যায়ক্রমে প্রতিটি মহাসড়কের পাশেই ট্রমা সেন্টার স্থাপন করার পরিকল্পনা রয়েছে সরকারের।

উপসংহার : উপরিউক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, প্রতিদিন সড়ক দুর্ঘটনায় অকালে ঝরে যায় কত প্রাণ। কত ঘরে জমে বুক চাপা কান্না। কত পরিবারের বেঁচে থাকার আলো যায় নিভে। স্বপ্ন ভেঙে টুকরো টুকরো হয়, কিন্তু তবুও মানুষকে পথ চলতে হয়। মানুষের পথ চলা যতদিন থাকবে দুর্ঘটনাও ততোদিন থাকবে। সড়ক দুর্ঘটনা প্রতিরোধের কার্যক্রম জোরদার না করলে এ নিঃশব্দ ঘাতকদের রোধ করা যাবে না। তাই বাড়াতে হবে জনসচেতনতা। সচেতন হতে হবে যানবাহন চালক, হেলপার, যানবাহন মালিক, যাত্রী, পথচারী, ট্রাফিক পুলিশ সবাইকে।

# বিজ্ঞান-প্রযুক্তি, তথ্য ও যোগাযোগ

## রচনা ২১ তথ্যপ্রযুক্তি ও বাংলাদেশ

*[৩১তম; ২৫তম বিসিএস]*

ভূমিকা : বর্তমান বিশ্বের সবচেয়ে আলোচিত ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি। শিল্প বিপ্লবের পর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির উন্নয়ন পৃথিবীতে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ক্ষেত্রে নজিরবিহীন উন্নতির ফলে গোটা বিশ্ব আজ গ্লোবাল ভিলেজে পরিণত হয়েছে। তথ্যপ্রযুক্তি দূরকে এনেছে চোখের সামনে, পরকে করেছে আপন, আর অসাধ্যকে সাধন করেছে। তথ্যপ্রযুক্তি বর্তমান বিশ্বের সকল প্রকার উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের মূল হাতিয়ার। যে জাতি তথ্যপ্রযুক্তিতে যত বেশি দক্ষ, তাদের সার্বিক অবস্থাও তত বেশি উন্নত। একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় প্রস্তুত হতে এবং জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে বিশ্ব পরিমণ্ডলে নিজ অবস্থান সুদৃঢ় ও উজ্জ্বল করতে হলে তথ্যপ্রযুক্তির কোনো বিকল্প নেই। কারণ একবিংশ শতাব্দীর সম্ভাবনা ও চ্যালেঞ্জ দুইই আবর্তিত হচ্ছে তথ্যপ্রযুক্তিকে ঘিরে।

তথ্যপ্রযুক্তি কি : তথ্য সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াকরণ, ব্যবস্থাপনা এবং বিতরণের জন্য ব্যবহৃত প্রক্রিয়া ও পদ্ধতির সমন্বয়কে তথ্যপ্রযুক্তি বলা হয়। কম্পিউটিং, মাইক্রো ইলেকট্রনিক্স, টেলিকমিউনিকেশন ইত্যাদি বিষয় তথ্যপ্রযুক্তির সাথে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত।

তথ্যপ্রযুক্তির কয়েকটি বিশেষ দিক : ডেটাবেস উন্নয়ন প্রযুক্তি, সফটওয়্যার উন্নয়ন প্রযুক্তি, নেটওয়ার্ক, মুদ্রণ ও রিপ্রোগ্রাফিক প্রযুক্তি, তথ্যভাণ্ডার প্রযুক্তি, বিনোদন প্রযুক্তি, শিক্ষণ-প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা ইত্যাদি সবই তথ্যপ্রযুক্তির এক-একটি উল্লেখযোগ্য দিক।

তথ্যপ্রযুক্তির বৈশিষ্ট্য : তথ্যপ্রযুক্তির নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যসমূহ লক্ষ্য করা যায় :

- তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে সময় বাড়ার সাথে সাথে কাজের খরচ কমতে থাকে।
- তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহারের ক্ষেত্র ও কাজের পরিমাণ ক্রমান্বয়ে বাড়তে থাকে।
- উন্নত প্রযুক্তি লেনদেন ও তথ্য যোগাযোগে দ্রুত পরিবর্তন সাধন করে।
- তথ্যপ্রযুক্তি চিকিৎসা, শিক্ষণ ও সংশ্লিষ্ট কর্মকাণ্ডের গতিকে ত্বরান্বিত ও সহজ করে।
- তথ্যপ্রযুক্তি উৎপাদনের সকল ক্ষেত্রে অপচয় হ্রাস করে।
- তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবসা-বাণিজ্যে লাভজনক প্রক্রিয়া সৃষ্টি করে।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



**তথ্যপ্রযুক্তি ও বর্তমান বাংলাদেশ/তথ্যপ্রযুক্তিতে আমাদের বর্তমান অবস্থা :** গত দুই দশকে বিশ্বজুড়ে ঘটেছে অভাবনীয় সব পরিবর্তন। তথ্যপ্রযুক্তির মাধ্যমে মানুষ সময় ও দূরত্বকে জয় করেছে। বিশ্বকে এনেছে হাতের মুঠোয়। বাংলাদেশও তথ্যপ্রযুক্তির এ জীয়নকাঠির স্পর্শে ধীরে ধীরে জেগে উঠছে। গত দশ বছরে এ দেশে তথ্যপ্রযুক্তির উল্লেখযোগ্য বিকাশ ঘটেছে। তথ্যপ্রযুক্তি যে বাংলাদেশের জন্যও সম্ভাবনাময় প্রযুক্তি, এ কথা আজ সবাই উপলব্ধি করছে। তরুণ প্রজন্ম, বিশেষ করে স্কুল-কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা তথ্যপ্রযুক্তির ব্যাপারে খুবই আগ্রহ প্রকাশ করছে। বাংলাদেশ ব্যাংক, ইপিবি, বিসিসি, বিসিএস, নন-রেসিডেন্ট বাংলাদেশীদের সংগঠন টেকবাংলা প্রভৃতি সংগঠন থেকে প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায়, তথ্যপ্রযুক্তির প্রতিটি ক্ষেত্রেই বাংলাদেশ গত দশ বছরে এগিয়েছে।

**তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার :** তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার যে জীবনযাত্রার মান বদলে দিতে পারে তা বিশ্বাস করতে এখন আর কেউ ভুল করছে না। তাই তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার বাংলাদেশে এখন অনেক বেড়েছে। স্কুল থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত কম্পিউটার শিক্ষা কার্যক্রম প্রবর্তন করা হয়েছে। প্রতিনিয়ত কম্পিউটারের ব্যবহার বাড়ছে। দেশে এখন কম্পিউটার হার্ডওয়্যার, সফটওয়্যার, ইন্টারনেট ও তথ্যপ্রযুক্তি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ৭ থেকে ৮ হাজারের মতো। সারা দেশে কম্পিউটার হার্ডওয়্যারের শো-রুম রয়েছে সহস্রাধিক। ঢাকাতেই গড়ে উঠেছে ৫ শতাধিক হার্ডওয়্যার প্রতিষ্ঠান। সফটওয়্যার প্রতিষ্ঠানের সংখ্যাও শতাধিক। তাছাড়া বর্তমানে কম্পিউটার মেলা, প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতা, ওয়েব ডিজাইন প্রতিযোগিতা এবং কম্পিউটার ও তথ্যপ্রযুক্তিবিষয়ক সেমিনার, সিম্পোজিয়াম ও প্রদর্শনী অহরহ হচ্ছে। ঢাকাসহ সারা দেশের শহরগুলোতে ইন্টারনেট ব্যবহারের জন্য 'সাইবার ক্যাফে' একের পর এক স্থাপিত হচ্ছে।

**তথ্যপ্রযুক্তির প্রসারে সরকারের পদক্ষেপ :** কোনো দেশকে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে বিশ্ব পরিমণ্ডলে নিজের অবস্থান সুদৃঢ় ও উজ্জ্বল করতে হলে তথ্যপ্রযুক্তি বিকাশের কোনো বিকল্প নেই। বর্তমান সরকারের (শেখ হাসিনা সরকার) অন্যতম নির্বাচনী অঙ্গীকার ছিল তথ্যপ্রযুক্তির সম্ভাব্য সর্বোচ্চ বিকাশের মাধ্যমে মানবসম্পদ উন্নয়ন। এ লক্ষ্যে বর্তমান সরকারের শাসনামলে তথ্যপ্রযুক্তির বিকাশে সহায়ক কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। যেমন—

- তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার বাড়ানোর জন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন আধুনিক যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়ানো। আর তাই দেশের অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে যোগাযোগ প্রযুক্তির উন্নয়ন করা হচ্ছে। প্রায় সারা দেশ ডিজিটাল টেলিফোনের আওতায় চলে আসছে। ইতোমধ্যেই দেশের প্রতিটি জেলায় ইন্টারনেট পৌছে গেছে। শিগগিরই উপজেলা পর্যায়ে পৌছে যাবে।
- তথ্যপ্রযুক্তির দ্রুত প্রসারের লক্ষ্যে সরকার 'জাতীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নীতিমালা' অনুমোদন করেছে। এই নীতিমালার সুষ্ঠু বাস্তবায়নের প্রয়াসে সরকার ঢাকার প্রাণকেন্দ্র কারওয়ান বাজারে ৭০ হাজার বর্গফুট আয়তনের ফ্লোরে অত্যাধুনিক সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত একটি 'আইসিটি ইনকিউবেটর' স্থাপন করেছে।
- বিদেশে বাংলাদেশের সফটওয়্যার ও তথ্যপ্রযুক্তি পণ্য বাজারজাতকরণের লক্ষ্যে 'আইসিটি বিজনেস প্রমোশন সেন্টার' স্থাপন করা হয়েছে।
- তথ্যপ্রযুক্তি প্রসারের লক্ষ্যে ঢাকার অদূরে কালিয়াকৈরে ২৬৫ একর জমিতে হাইটেক পার্ক স্থাপন করা হচ্ছে। সম্প্রতি রেলওয়ের ফাইবার অপটিক লাইন সবার ব্যবহারের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়েছে।



- দেশের সকল অঞ্চলে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির প্রসার এবং এ বিষয়ে দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলার লক্ষ্যে মাধ্যমিক স্কুল পর্যায়ে কম্পিউটার শিক্ষা কোর্স প্রবর্তন এবং কম্পিউটার প্রদান কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। কম্পিউটার সায়েন্সে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীদের জন্য চালু করা হয়েছে আইসিটি ইন্টার্নশীপ কর্মসূচি। এছাড়াও তথ্যপ্রযুক্তি ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে বেশ কয়েকটি উন্নয়নমূলক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

**অর্থনৈতিক উন্নয়নে তথ্যপ্রযুক্তির ভূমিকা :** তথ্যপ্রযুক্তিতে উন্নয়নের যে জোয়ার বইছে উন্নত দেশগুলোতে, দক্ষিণ এশীয় দেশগুলোর মধ্যে ভারতে তার প্রভাব অনেক আগে পড়লেও আমরা তা থেকে অনেক পেছনে পড়ে আছি। তথ্যপ্রযুক্তিকে মূলধন হিসেবে ব্যবহার করে এবং মেধা ও শ্রমকে কাজে লাগিয়ে সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া, তাইওয়ান, ভারত, থাইল্যান্ড প্রভৃতি দেশ অনেক এগিয়ে গেছে। অথচ আমাদের নির্বুদ্ধিতার কারণে আজ আমরা তথ্যের সুপার হাইওয়ের সাথে যুক্ত হতে পারছি না। আবার সরকারের অনীহার কারণে ফাইবার অপটিকস ব্যবহারের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়েছি আমরা। তাই আমাদের প্রচুর টাকা খরচ করে ব্যবহার করতে হচ্ছে ভি স্যাটের লাইন। তবে নানা প্রতিকূলতা সত্ত্বেও তথ্যপ্রযুক্তি খাত বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিভিন্নভাবে অবদান রাখছে। দেশে কম্পিউটার সফটওয়্যার তৈরি বেশ বেড়েছে। প্রতি বছর প্রায় ২০০ কোটি টাকার সফটওয়্যার বিদেশে রপ্তানি হচ্ছে।

**সম্ভাবনাময় সফটওয়্যার শিল্প :** বাংলাদেশে বর্তমানে সফটওয়্যার শিল্প সবচেয়ে সম্ভাবনাময় শিল্প হিসেবে দেখা দিয়েছে। হার্ডওয়্যার নির্মাণের সঙ্গে এখনো বাংলাদেশ তেমনভাবে জড়িত হয়নি। এ দেশে সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট তিনটি ক্যাটাগরিতে হচ্ছে। এগুলো হলো—কাস্টমাইজড সফটওয়্যার, মাল্টিমিডিয়া সফটওয়্যার ও ওয়েব সফটওয়্যার। এর মধ্যে দেশে শিক্ষা ও বিনোদনে কম্পিউটারভিত্তিক মাল্টিমিডিয়ার বাজার অতি দ্রুত প্রসারিত হচ্ছে। দেশের ১৬ শতাংশ সফটওয়্যার ফার্ম তাদের ডেভেলপ করা সফটওয়্যার বিদেশে রপ্তানি করছে। বাংলাদেশ থেকে সফটওয়্যার রপ্তানি হচ্ছে অস্ট্রেলিয়া, বেলজিয়াম, ভুটান, কানাডা, সাইপ্রাস, দুবাই, জার্মানি, ভারত, মালয়েশিয়া, কোরিয়া, যুক্তরাজ্য ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। এর মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সবচেয়ে বেশি সফটওয়্যার রপ্তানি হচ্ছে।

**কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে তথ্যপ্রযুক্তি শিল্প :** বাংলাদেশে বর্তমানে কম্পিউটার হার্ডওয়্যার, সফটওয়্যার, ইন্টারনেট ও তথ্যপ্রযুক্তিবিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য ৭-৮ হাজার প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। এ সকল প্রতিষ্ঠানে বিপুল সংখ্যক বেকার যুবক-যুবতীর কর্মসংস্থান হচ্ছে। বর্তমানে দেশে তথ্যপ্রযুক্তি শিল্প বেকার যুবদের কর্মসংস্থানের নতুন দ্বার উন্মোচন করেছে। তথ্যপ্রযুক্তি জ্ঞানসম্পন্ন কোনো যুবক-যুবতী আর বেকার থাকছে না। দেশ-বিদেশে এখন কম্পিউটার প্রোগ্রামার, সফটওয়্যার ডেভেলপার ও আইটি কর্মীদের বিপুল চাহিদা দেখা দিয়েছে। তারা সহজেই ভালো উপার্জন করতে পারছে।

**তথ্যপ্রযুক্তির উন্নয়নের জন্য করণীয় :** বর্তমান একবিংশ শতাব্দীর প্রতিযোগিতামূলক বিশ্বে বাংলাদেশকে টিকে থাকতে হলে তথ্যপ্রযুক্তির উন্নয়নের বিকল্প নেই। আমাদের দেশের শিক্ষিত তরুণ সম্প্রদায় তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় তাদের যোগ্যতা বারবারই প্রমাণ করেছে। তাই আমাদের তরুণদের মেধা, সৃজনশীলতা ও উদ্ভাবনী শক্তিকে একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার জন্য কার্যকরী করে তুলতে হবে। এজন্য নিম্নলিখিত পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা দরকার :

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



**জাতীয় তথ্য অবকাঠামো গঠন :** জাতীয় তথ্য অবকাঠামো গড়ে তোলা ব্যতীত বিশ্বব্যাপী তথ্যপ্রযুক্তি বিপ্লবের অংশীদার হওয়া সম্ভব নয়, যে রকম সংযোগ সড়ক ছাড়া মহাসড়কে পৌছানো সম্ভব নয়। তথ্য অবকাঠামো ব্যতীত গ্রামীণ বাংলাদেশ তথ্য বৈষম্যের শিকার হবে, যা বাজার অর্থনীতি, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে সুবিধালাভের সম্ভাবনাকে সংকুচিত করে ফেলবে। ফলে বাংলাদেশ তথ্যপ্রযুক্তিভিত্তিক নতুন অর্থনীতির অংশীদার হওয়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবে।

**টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন :** টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা তথ্য অবকাঠামোর মেরুদণ্ড। শক্তিশালী ও সুবিস্তৃত টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা ব্যতীত তথ্যপ্রযুক্তির উন্নয়ন একেবারেই অসম্ভব। অথচ এ দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থায় প্রবেশের কোনো সুযোগ নেই। তাই দেশের তথ্যপ্রযুক্তি শিল্পের উন্নয়নে নিম্নোক্ত কর্মসূচিগুলো গ্রহণ করা যেতে পারে :

- টেলিনেটওয়ার্ক সম্প্রসারণে বার্ষিক লক্ষ্য নির্ধারণ ও তার বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা।
- টেলি নিয়ন্ত্রণ কমিশনকে (TRC) সর্বজনীন সেবার লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নের দায়িত্ব দেয়া।
- টেলিঘনত্ব ও টেলিনাগালের হার বৃদ্ধি করা।
- টেলিযোগাযোগ খরচ সাধারণ মানুষের আয়ত্তের মধ্যে আনা।
- দ্রুতগতির তথ্য সংযোগ (High speed data network) প্রকল্প দ্রুত বাস্তবায়ন করা।
- জরুরিভিত্তিতে ডাকঘর, স্বাস্থ্যকেন্দ্র, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, গণগ্রন্থাগার, রেলস্টেশন, স্থানীয় কমিউনিটি সেন্টার, হাট-বাজার, এনজিও শাখায় ইন্টারনেট স্থাপন করা।
- সর্বজনীন টেলিসেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে টিএন্ডটিকে (T&T) সম্পূর্ণভাবে বেসরকারি খাতে ছেড়ে দেয়া।
- অপটিক্যাল ফাইবার ব্যাকবোনের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করা।

**মানবসম্পদ উন্নয়ন :** দক্ষ মানবসম্পদ উন্নয়ন ছাড়া কোনো অবস্থাতেই দারিদ্র্য দূরীকরণ এবং তথ্যপ্রযুক্তির বিকাশ সাধন সম্ভব নয়। তাই মানবসম্পদ উন্নয়নের জন্য নিচের পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করা যেতে পারে :

- বাজারের চাহিদার প্রেক্ষিতে তথ্যপ্রযুক্তি শিক্ষার কারিকুলাম দ্রুত নবায়নের ব্যবস্থা করা।
- সরকারি-বেসরকারি সব ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তথ্যপ্রযুক্তি শিক্ষার সুযোগ নিশ্চিত করা।
- ডিগ্রি পর্যন্ত বাধ্যতামূলক কম্পিউটার শিক্ষা চালু করা।
- বেকার জনগোষ্ঠীর জন্য তথ্যপ্রযুক্তি শিক্ষার ব্যবস্থা করা।
- ইংরেজি শিক্ষাকে প্রযুক্তি শিক্ষা হিসেবে গুরুত্ব দেয়া।
- বাস্তবভিত্তিক যোগ্যতা অর্জনের জন্য তথ্যপ্রযুক্তি শিল্প ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে সম্পর্কোন্নয়নের ব্যবস্থা করা।

**তথ্যপ্রযুক্তিভিত্তিক শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্য ও অর্থনীতি চালু করা :** বিশ্বব্যাপী তথ্যপ্রযুক্তির ব্যাপক প্রসারের যুগে জীবনযাত্রার সকল ক্ষেত্রে তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহারের প্রতি আমরা কত দ্রুত সাড়া দেব তার ওপর নির্ভর করছে আগামী দিনের বাংলাদেশের ভাগ্য। তাই আমাদের উচিত অতি দ্রুত তথ্যপ্রযুক্তিভিত্তিক শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্য, ব্যাংকিং ও অর্থনীতি চালু করা, আর এজন্য আমাদের করণীয় হবে :



- সরকারি-বেসরকারি উদ্যোগে দেশের প্রধান প্রধান শহরগুলোতে সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক স্থাপন করা।
- দেশে নিয়মিত সফটওয়্যার ডিজাইন ও প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতার আয়োজন করা।
- সফটওয়্যার কোয়ালিটি ইনস্টিটিউট ও সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করা।
- সকল অফিস-আদালতে বাধ্যতামূলক ই-মেইল ব্যবহার নিশ্চিত করা।
- ই-কমার্সভিত্তিক ব্যবসা-বাণিজ্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টাকে জোরদার করা।
- বাংলাদেশ ভিত্তিক ই-কমার্স কনটেন্ট তৈরিকে উৎসাহিত করা।
- জনগণের জন্য টেলিমেডিসিন সেবা চালু করা।
- বাংলা ভাষায় ইন্টারনেটভিত্তিক তথ্য সেবা চালু করা।

**তথ্যপ্রযুক্তিভিত্তিক ব্যাংকিং ব্যবস্থা চালুকরণ :** সুদক্ষ ব্যাংকিং ব্যবস্থা দেশের অর্থনীতির প্রাণশক্তি। আর এই ব্যাংকিং খাতকে দক্ষ, যুগোপযোগী ও আধুনিক করার জন্য তথ্যপ্রযুক্তিভিত্তিক ব্যাংকিং ব্যবস্থা চালুকরণের কোনো বিকল্প নেই। আর এজন্য করণীয় হলো :

- ব্যাপক কৌশলগত পরিকল্পনাভিত্তিক Banking Automation নিশ্চিত করা।
- রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে সম্পূর্ণ তথ্যপ্রযুক্তিভিত্তিক করার লক্ষ্যে ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা।
- কেন্দ্রীয় ব্যাংকে Automated Clearing House অবিলম্বে চালু করা।
- ব্যাংকসমূহের সকল উপজেলাভিত্তিক শাখাগুলো নেটওয়ার্কের আওতায় আনা।

**তথ্যপ্রযুক্তিভিত্তিক দক্ষ সরকারব্যবস্থা গঠন :** তথ্যপ্রযুক্তির উন্নয়নের মাধ্যমে জাতীয় উন্নয়ন সাধন করার জন্য প্রয়োজন তথ্যপ্রযুক্তিভিত্তিক দক্ষ সরকারব্যবস্থা গড়ে তোলা। আর এ জন্য করণীয় হলো :

- সরকারি তথ্যে অবাধ প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ইন্টারনেটভিত্তিক তথ্য ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলা।
- সমস্ত সরকারি প্রতিষ্ঠানে ই-মেইল ব্যবহার বাধ্যতামূলক করা।
- আঞ্চলিক Video Conferencing System গড়ে তোলা।
- সরকারি বিভিন্ন সেবা তথা আমদানি-রপ্তানি লাইসেন্স, ট্রেডমার্ক, নাগরিকত্ব নিবন্ধন, স্বত্বাধিকার ও জমি নিবন্ধন সেবা ইন্টারনেটের আওতায় আনা।
- সরকারি সুবিধা বিশেষ করে বেতন, অবসর ভাতা ইত্যাদি ইলেকট্রনিক মাধ্যমে প্রদানের ব্যবস্থা করা।

**উপসংহার :** পরিশেষে বলা যায় যে, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিই বর্তমান বিশ্বে সকল প্রকার উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের মূল হাতিয়ার। যে জাতি তথ্যপ্রযুক্তিতে যত বেশি দক্ষ, তাদের সার্বিক অবস্থাও তত বেশি উন্নত। তাই তথ্যপ্রযুক্তির মাধ্যমে দারিদ্র্য দূরীকরণ, অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও যুবদের বেকারত্ব দূর করার জন্য আমাদেরকে স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করতে হবে। দেশে তথ্যপ্রযুক্তির বিপ্লব ঘটানোর জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাতে হবে। সরকার, বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও সর্বস্তরের জনগণের ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টার মাধ্যমে অচিরেই বাংলাদেশ তথ্যপ্রযুক্তির ক্ষেত্রে বিপ্লব ঘটিয়ে ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত হয়ে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে বিশ্ব পরিমণ্ডলে নিজ অবস্থান সুদৃঢ় ও উজ্জ্বল করতে সক্ষম হবে—এটাই আমাদের একমাত্র প্রত্যাশা।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



## রচনা ২২ তথ্যবিপ্লবে ইন্টারনেট

*[২৯তম বিসিএস]*

**ভূমিকা :** মানবসভ্যতার বিস্ময়কর বিকাশে বিজ্ঞান যে অনন্য ভূমিকা পালন করছে তার গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শন ইন্টারনেট। বিশ্বজুড়ে যোগাযোগ ব্যবস্থায় যুগান্তকারী একটি ব্যবস্থার নাম ইন্টারনেট। ইন্টারনেট কম্পিউটার বাহিত এমন একটি যোগাযোগ ব্যবস্থা যার মাধ্যমে বিশ্বের দেশগুলো আজ পরস্পর ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। 'বিশ্বায়ন' ধারণায় তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রাখছে এই ইন্টারনেট। মানবজীবনের বিচিত্র কর্মকাণ্ডে ইন্টারনেটের ব্যবহার জীবনকে করে তুলছে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ, সমৃদ্ধ হচ্ছে অগ্রসর মানুষের ধ্যানধারণা। কম্পিউটার ছিল বিজ্ঞানের বিস্ময়। এখন কম্পিউটার প্রযুক্তির সাথে ইন্টারনেট প্রযুক্তি যুক্ত হয়ে এক বিস্ময়কর অবদান রূপে প্রকাশ পাচ্ছে। জীবনের ব্যাপক ও বহুমুখী কাজে এখন ইন্টারনেট ব্যবহৃত হয়ে আধুনিক ইলেক্ট্রনিক্স প্রযুক্তিকে মানবকল্যাণে বিপুলভাবে সম্ভাবনাময় করে তুলেছে। এরই ধারাবাহিকতায় তথ্যবিপ্লবেও রয়েছে ইন্টারনেটের গুরুত্বপূর্ণ ও সফল অবদান।

**তথ্যবিপ্লব ও তথ্যপ্রযুক্তি :** তথ্যপ্রযুক্তির চরম উৎকর্ষতার এ যুগে খুব জোর দিয়েই বলা যায়, 'Information is power.' জ্ঞান আহরণের পাশাপাশি তথ্যসমৃদ্ধ হওয়া শক্তি অর্জনের ক্ষেত্রে একটি অপরিহার্য বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। শিল্প বিপ্লবের পর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির উন্নয়ন পৃথিবীতে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা। তথ্যপ্রযুক্তি দূরকে এনেছে চোখের সামনে, পরকে করেছে আপন, আর অসাধ্যকে সাধন করেছে। তথ্যপ্রযুক্তি বর্তমান বিশ্বে সর্বপ্রকার উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের মূল হাতিয়ার। বর্তমান বিশ্বে পরিবর্তিত ব্যবসায়-বাণিজ্য, রাজনীতি, শিক্ষাদীক্ষা, উন্নয়ন, যোগাযোগ, সমরক্ষেত্র, খেলাধুলা প্রভৃতি সর্বক্ষেত্রে তথ্য ও প্রযুক্তির অবাধ বিচরণ। যে কৌশল তথ্যকে এ গুরুত্বপূর্ণ আসনে অধিষ্ঠিত করেছে তাই হলো তথ্যপ্রযুক্তি। তথ্যপ্রযুক্তির ব্যাপক ব্যবহার ও চর্চা এখন শুধু হাতে গোনা দু-একটি উন্নত দেশের আভিজাত্যের বিষয় নয়, তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশগুলোতেও এর ব্যাপক প্রসার ঘটেছে।

**ইন্টারনেট কি :** ইন্টারনেট কথাটি ইন্টারন্যাশনাল নেটওয়ার্ক এর সংক্ষিপ্ত রূপ। আন্তর্জাতিক যোগাযোগের জনপ্রিয় মাধ্যম হিসেবে ইন্টারনেটের উদ্ভব। কম্পিউটার নেটওয়ার্কের একটি আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা হিসেবে গড়ে উঠেছে এ প্রক্রিয়া। সারা বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ব্যবহৃত কম্পিউটারকে একটি বিশেষ পদ্ধতিতে যুক্ত করে যে যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে তাই হলো ইন্টারনেট। ইন্টারনেটের সাথে অন্যান্য কম্পিউটার সংযুক্ত রয়েছে এ পদ্ধতিতে। এ প্রযুক্তির মাধ্যমে বিশ্বের বিভিন্ন কম্পিউটার থেকে যে কোনো কম্পিউটারে ছবিসহ যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ ও প্রেরণ করা যায়। ইন্টারনেট একটি সুবিশাল তথ্য সংযোগ পদ্ধতি, যা সারা পৃথিবী জুড়ে সম্প্রসারিত। সারা বিশ্বের অগণিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, বৈচিত্র্যপূর্ণ গবেষণাগার, সংবাদ সংস্থা, ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানসহ কোটি কোটি ব্যক্তিগত কম্পিউটারের সঙ্গে ইন্টারনেট যুক্ত হয়ে এ মহাযোগাযোগ গড়ে তুলেছে। এখন ইন্টারনেটের সাথে যুক্ত যে কোনো ব্যক্তিগত কম্পিউটার বিশ্বের যে কোনো স্থান থেকে তথ্য সংগ্রহে সক্ষম। ইন্টারনেট চালানোর জন্য সাধারণত তিনটি জিনিস প্রয়োজন, এগুলো হলো : কম্পিউটার, মডেম এবং ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডার।



**ইন্টারনেটের উৎপত্তি :** ইন্টারনেট বিষয়টি অত্যাধুনিক হলেও এর ধারণা কিছুকাল আগের। ১৯৬৯ সালে আমেরিকার প্রতিরক্ষা কর্তৃপক্ষ হাইড্রোজেন বোমার ভয়ে পেন্টাগনে কম্পিউটার থেকে কম্পিউটারে তথ্য আদান-প্রদানের জন্য টেলিফোনের একটি বিকল্প সংযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলেন। পরে বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণাগারে কম্পিউটার থেকে কম্পিউটারে তারের যোগাযোগ ঘটিয়ে বড় করে তোলা হয় নেটওয়ার্ক। পরে ডেস্কটপ কম্পিউটার তৈরির পর টেলিনেটওয়ার্কের সঙ্গে টেলিফোন সেটের বদলে কম্পিউটার জুড়ে দেয়া হয়। কৃত্রিম উপগ্রহের মাধ্যমে যোগাযোগ ব্যবস্থায় ব্যাপক পরিবর্তন আসে। ১৯৮৪ সালে ডাইরেক্ট ব্রড কাস্টিং স্যাটেলাইট সিস্টেম চালু হয়। এখন ইন্টারনেটের সঙ্গে ডিজিটাল টিভি, মাইক্রোচিপস কম্পিউটার লিংকস মিলিয়ে তৈরি হয়েছে কনফ্রেন্সিং। এর মাধ্যমে বিভিন্ন দেশের মানুষ সরাসরি আলোচনায় অংশ নিতে পারে। সত্তর দশকে কম্পিউটার থেকে কম্পিউটারে চিঠিপত্র আদান-প্রদান নিয়ে ই-মেইল পদ্ধতি শুরু হয়। পরবর্তীতে অপটিক্যাল ফাইবার কেবলের বিস্তৃতি ও স্যাটেলাইট টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থার বদৌলতে ইন্টারনেটের সাহায্যে দুই প্রান্তে কম্পিউটারের মাধ্যমে যোগাযোগ প্রক্রিয়া শুরু হয়। বাড়তি কিছু সফটওয়্যার যেমন-ম্যাভেন, সেটফোর্ট, ইন্টারনেট গ্লোবাল ফোন, ইন্টারনেট ফোন, ইসপারসন বা নিভোট মিলিয়ে ইন্টারনেট প্রযুক্তি বিশ্বজুড়ে আজ সম্প্রসারমান।

**ইন্টারনেটের সম্প্রসারণ :** আমেরিকার প্রতিরক্ষা কর্তৃপক্ষ চারটি কম্পিউটারের মাধ্যমে যে যোগাযোগ ব্যবস্থা তৈরি করেছিল তার নাম ছিল 'ডার্পানেট'। পরবর্তী তিন বছরে কম্পিউটারের সংখ্যা বেড়ে ছত্রিশে দাঁড়ায়। চাহিদা বাড়ার ফলে ১৯৮৪ সালে আমেরিকার ন্যাশনাল সাইন্স-ফাউন্ডেশন সর্বসাধারণের জন্য 'নেস্কেনেট' নামে একটি যোগাযোগ ব্যবস্থা চালু করে। তিন বছরের মধ্যে এ ব্যবস্থা সারাবিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। এটি তখন গবেষণা কাজে তথ্য বিনিময়ে সীমাবদ্ধ ছিল। এর সঙ্গে অনেক ছোট বড় নেটওয়ার্ক যুক্ত হয়ে সমস্যার সৃষ্টি করে। সমগ্র ব্যবস্থাটি নিয়ন্ত্রণের জন্য '৯০-এর দশকের শুরুতে কেন্দ্রীয় নেটওয়ার্ক হিসেবে ইন্টারনেট গড়ে তোলা হয়। ১৯৯৩ সালে বাণিজ্যিক কাজে ব্যবহারের জন্য ইন্টারনেটকে উন্মুক্ত করে দেয়া হয়। অল্পদিনের মধ্যে ইন্টারনেটের সাথে যুক্ত হয় লাখ লাখ সদস্য। এর ব্যবহারকারীর সংখ্যা দ্রুত সারাবিশ্বে ছড়িয়ে যাচ্ছে।

**ইন্টারনেটের প্রকারভেদ :** ইন্টারনেট প্রক্রিয়ায় ব্যবহৃত কতকগুলো পদ্ধতি রয়েছে সেগুলো নিম্নে দেয়া হলো :

১. **ই-মেইল :** ই-মেইলের মাধ্যমে যে কোনো সংবাদ পাঠানো যায়। এ প্রক্রিয়ায় খুব দ্রুত অর্থাৎ ফ্যাক্স-এর দশভাগের একভাগেরও কম সময় এবং কম খরচে তথ্যাদি পাঠানো যায়।
২. **ওয়েব :** ইন্টারনেটের মাধ্যমে সংযুক্ত কম্পিউটারগুলোতে যে তথ্য রাখা হয়েছে সেগুলো ব্যবহার করার ব্যবস্থা বা পদ্ধতিকে ওয়েব বলে।
৩. **নেট নিউজ :** ইন্টারনেটের তথ্যভাণ্ডারে সংরক্ষিত সংবাদ যে কোনো সময় এ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে উন্মুক্ত করা যায়।
৪. **চ্যাট :** এ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে একাধিক ব্যক্তির সাথে একই সময়ে কথা বলা যায় বা আড্ডা দেয়া যায়।
৫. **আর্কি :** আর্কির কাজ হলো তথ্যসমূহকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে সূচি আকারে উপস্থাপন করা।
৬. **ইউজনেট :** অনেকগুলো সার্ভারের নিজস্ব সংবাদ নিয়ে গঠিত তথ্যভাণ্ডার, যা সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত।
৭. **গোফার :** তথ্য খুঁজে দেয়ার একটি পদ্ধতি, যার সাহায্যে গুরুত্বানুযায়ী তথ্যের সমন্বয় সাধিত হয়।
৮. **ই-ক্যাশ :** ইন্টারনেটের মাধ্যমে ইলেকট্রনিক ব্যাংকিং ব্যবস্থাকে ই-ক্যাশ পদ্ধতি বলে। আসলে ই-ক্যাশ অনেকগুলো আধুনিক অর্থনৈতিক লেনদেনের সমষ্টি।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



**বাংলাদেশের ইন্টারনেট :** বাংলাদেশে ইন্টারনেট চালু হয় ১৯৯৩ সালের ডিসেম্বর মাসে। তখন এর ব্যবহার ছিল সীমিত এবং কেবল ই-মেইলে তার প্রয়োগ ছিল। ১৯৯৬ সালের ১৫ জুন থেকে অনলাইন সংযোগ দেয়া শুরু হলে বাংলাদেশ তথ্যপ্রযুক্তির বিশাল জগতে প্রবেশ করে। ২০০০ সালের শুরুতে এর ৬০ হাজার সংযোগ দেয়া হয়েছিল। বর্তমানে তা ক্রমাগত বাড়ছে। ১৯৯৬ সাল থেকে বাংলাদেশে ফাইবার অপটিক কেবল নেটওয়ার্কের মাধ্যমে দেশের অভ্যন্তরীণ বড় শহরগুলোকে সংযুক্ত করার পদক্ষেপ নেয়া হয়। ঢাকার মগবাজার ও গুলশানের টেলিফোন এক্সচেঞ্জের মধ্যে প্রথম ফাইবার অপটিক সংযোগ স্থাপন করা হয়। বর্তমানে শহরগুলোতে আন্তঃএক্সচেঞ্জগুলোর মধ্যে ফাইবার অপটিক সংযোগ আছে।

**সাবমেরিন কেবলে বাংলাদেশ :** বাংলাদেশ মূলত মাইক্রোওয়েভ স্যাটেলাইটের মাধ্যমে বহির্বিশ্বের সাথে যুক্ত, যা অত্যন্ত ব্যয়বহুল। ২২ নভেম্বর ২০০৫ বাংলাদেশ এই প্রথমবারের মতো আন্তর্জাতিক কোনো সাবমেরিন ফাইবার অপটিক ক্যাবলের সাথে সংযুক্ত হয়। এদিন বাংলাদেশ মধ্যপ্রাচ্যের ২২০টি চ্যানেলের মধ্য থেকে ১২০টি চ্যানেলের সাথে যুক্ত হয়। আশা করা যাচ্ছে, খুব শীঘ্রই এ প্রকল্প সমাপ্ত হবে। এখন আমাদের আগের মতো VSAT দিয়ে ইন্টারনেট ব্যবহার করতে হবে না। এ সাবমেরিন ক্যাবলে যুক্ত হওয়ায় দ্রুতগতির ইন্টারনেট সেবা নিশ্চিত করা যাবে। পাশাপাশি আমাদের টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থায়ও নবদিগন্তের সূচনা হবে। এ প্রকল্প আমাদের ইন্টারনেট ব্যবস্থায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন সূচনা করবে।

**তথ্যবিপ্লবে ইন্টারনেট :** তথ্যবিপ্লবে ইন্টারনেট যুগান্তকারী বিপ্লব এনেছে। ইন্টারনেট চোখের পলকে বিশ্বের যে কোনো জায়গায় তথ্য পাঠাতে বা তথ্য এনে দিতে সক্ষম। লেখা, পড়া, শিক্ষা, গবেষণার ক্ষেত্রে বই অত্যন্ত জরুরি, যা সবসময় হাতের কাছে পাওয়া যায় না। এখন ঘরে বসেই বিশ্বের যে কোনো লাইব্রেরিতে প্রবেশ করা যায় এবং প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সংগ্রহ করা যায়। ইন্টারনেট ভ্রমণবিলাসীদের জন্য বন্ধু স্বরূপ। এটি ভ্রমণ স্থানের আবহাওয়া, থাকার হোটেল রিজার্ভেশন, রেন্ট এ কার, প্লেনের টিকিট বুকিংয়ের ব্যবস্থা করে থাকে। ইন্টারনেট ডাক্তার বা চিকিৎসা ব্যবস্থাকে করেছে সহজলভ্য ও স্বল্প ব্যয়বহুল। ইন্টারনেটের মাধ্যমে সরাসরি যোগাযোগ করা যায় পৃথিবীর ভালো ভালো চিকিৎসকদের সাথে। ফলে ঘরে বসেই পেতে পারি উন্নত চিকিৎসা। আইনগত পরামর্শ লাভের জন্য বা কোনো রেফারেন্সের প্রয়োজন হলে সেই আইনজীবী বা আইন ফার্মে ইন্টারনেট কমান্ড করলে তার তথ্যাদি ঘরে বসে পাওয়া সম্ভব। এতে সময়, অর্থ ও শ্রম বহুগুণে সাশ্রয় হয়। ইন্টারনেটের মাধ্যমে পৃথিবীর যে কোনো দেশের রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া, অর্থনৈতিক পরিস্থিতি মুহূর্তের মধ্যে জানা যায়। বিনোদন হিসেবে গান শোনা, সিনেমা দেখা, খেলা দেখা প্রভৃতি ঘরে বসেই সম্ভব ইন্টারনেটের কারণে। দৈনিক পত্রিকার খবর, শেয়ার বাজারের খবর, বাজারের হালচাল সবই জানা যায় এ প্রক্রিয়ায়।

**ইন্টারনেটের ক্ষতিকর দিক :** ইন্টারনেটের বহুমাত্রিক উপকারিতার পাশাপাশি এর বেশ কিছু ক্ষতিকর দিকও রয়েছে। অবশ্য তা নির্ভর করে ইন্টারনেট ব্যবহার ও এর গ্রহণযোগ্যতার ওপর। এর মাধ্যমে মিথ্যা খবর প্রদান, অশ্লীল ও কুরুচিপূর্ণ ছবি প্রদর্শন, জুয়াখেলা ইত্যাদি ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। এটি ছাত্র ও যুবসমাজকে এবং তাদের রুচিকে নষ্ট করে দিচ্ছে। এতে নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয় বৃদ্ধি পাচ্ছে। কেউ কেউ অসাধু উদ্দেশ্যে ভাইরাসের সংক্রমণ ঘটিয়ে অসংখ্য কম্পিউটারের ক্ষতি করছে। প্রতিষ্ঠানের গোপন ও মূল্যবান তথ্য চুরি ও পাচার করা সম্ভব হচ্ছে। ১৯৮৮ সালে যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের কম্পিউটার নেটওয়ার্কে কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে ইন্টারনেট ওয়ার্ম নামক ভাইরাসের সংক্রমণ ঘটায়। এর ফলে কয়েক হাজার কম্পিউটারের কার্যকারিতা নষ্ট হয়ে যায়। কিছুদিন পূর্বে বাংলাদেশ দূতাবাসে ইন্টারনেটের মাধ্যমে প্রেরিত গোপন তথ্য ফাঁস হয়ে যায়। তবে এসব অসুবিধা ইন্টারনেট সিস্টেমের দোষ নয়। এক ধরনের অপরাধীরা এর অপব্যবহার ও নানারূপ বিঘ্ন ঘটিয়ে থাকে।



**বাংলাদেশের অবস্থান :** তথ্যপ্রযুক্তি হতে পারে বাংলাদেশের সমৃদ্ধির মহাসড়ক। গত দুই দশকে ঘটেছে বিশ্বজুড়ে অভাবনীয় সব পরিবর্তন। তথ্যপ্রযুক্তির মাধ্যম মানুষ সময় ও দূরত্বকে জয় করেছে; বিশ্বকে এনেছে হাতের মুঠোয়। বাংলাদেশও তথ্যপ্রযুক্তির এ জীয়নকাঠির স্পর্শে ধীরে ধীরে জেগে উঠেছে। গত দশ বছরে এদেশে তথ্যপ্রযুক্তির উল্লেখযোগ্য বিকাশ ঘটেছে। তথ্যপ্রযুক্তি যে বাংলাদেশের জন্যও সম্ভাবনাময় প্রযুক্তি, এ কথা আজ সবাই উপলব্ধি করছে। তরুণ প্রজন্ম বিশেষ করে স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা তথ্যপ্রযুক্তির ব্যাপারে খুবই আগ্রহ প্রকাশ করছে। বাংলাদেশ ব্যাংক, ইপিবি, বিসিসি, বিসিএস, নন রেসিডেন্ট বাংলাদেশীদের সংগঠন 'টেকবাংলা' প্রভৃতি সংগঠন থেকে প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায়, তথ্যপ্রযুক্তির প্রতিটি ক্ষেত্রেই বাংলাদেশ গত দশ বছরে এগিয়েছে। তবে এ কথা সত্য যে, উন্নত বিশ্ব যেখানে তথ্যপ্রযুক্তি থেকে ষোল আনা ফসল ঘরে তুলছে, বাংলাদেশ যেখানে অর্জন করছে খুবই সামান্য। তথ্যপ্রযুক্তিতে বাংলাদেশ পিছিয়ে থাকার কিছু সুনির্দিষ্ট কারণও আছে। তথ্যপ্রযুক্তির বিকাশ লাভের জন্য যে অবকাঠামো দরকার তা বাংলাদেশে অপ্রতুল। এ প্রযুক্তির অত্যাবশ্যকীয় উপাদান কম্পিউটারের দামও বেশি। অদক্ষতার কারণে কম্পিউটার দুর্বোধ্য যন্ত্র হিসেবে বিবেচিত। অনেক শিক্ষিত ব্যক্তির নিকটও এ সর্বাধুনিক প্রযুক্তিটি মূল্যহীন। সম্প্রতি সকল বন্ধ্যাত্ব কাটিয়ে বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক তথ্য প্রবাহের সাম্রাজ্য ইন্টারনেটের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়েছে।

**তথ্যপ্রযুক্তির উন্নয়নে করণীয় :** কোনো দেশকে জ্ঞানবিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে বিশ্ব পরিমণ্ডলে নিজ অবস্থান সুদৃঢ় ও উজ্জ্বল করতে হলে তথ্যপ্রযুক্তির বিকাশের কোনো বিকল্প নেই। বর্তমানে তথ্যপ্রযুক্তিতে পিছিয়ে পড়া দেশগুলোর সাথে উন্নত দেশগুলোর এক ধরনের বৈষম্য আলোচিত হচ্ছে। ইংরেজিতে একে বলা হচ্ছে Digital Divide, বাংলায় ডিজিটাল বৈষম্য। তাই একবিংশ শতাব্দীর এ প্রতিযোগিতামূলক বিশ্বে টিকে থাকতে হবে যোগ্যতা দিয়ে এবং তথ্যপ্রযুক্তির নবতর কৌশল আয়ত্তে এনে। এজন্য নিম্নলিখিত কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা প্রয়োজন।

১. বিশ্বায়নের এ যুগে টিকে থাকতে হলে আমাদের দেশের তরুণ সমাজকে তথ্যপ্রযুক্তিভিত্তিক শিক্ষায় শিক্ষিত করতে হবে।
২. যেহেতু বাংলাদেশের শতকরা প্রায় ৮০ ভাগ লোক গ্রামে বাস করে, সেহেতু বিশাল সংখ্যক গ্রামবাসীকে শিক্ষিত, সচেতন ও তথ্যপ্রযুক্তির জ্ঞানে দক্ষ করে তোলার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে এবং ইন্টারনেটের প্রসার ঘটাতে হবে।
৩. বিশ্বব্যাপী চলমান তথ্যপ্রযুক্তি বিপ্লবের অংশীদার হওয়ার জন্য জাতীয় তথ্য অবকাঠামো গড়ে তোলার কোনো বিকল্প নেই।
৪. তথ্যঅবকাঠামোর মেরুদণ্ড টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন ঘটাতে হবে।
৫. তথ্যপ্রযুক্তির বিকাশ সাধনের জন্য বাংলার বিশাল জনসংখ্যাকে দক্ষ জনসম্পদে পরিণত করতে হবে।
৬. তথ্যপ্রযুক্তিভিত্তিক শিল্প, ব্যবসায়-বাণিজ্য, ব্যাংকিং ও অর্থনীতি চালু করতে হবে।
৭. তথ্যপ্রযুক্তিভিত্তিক দক্ষ সরকার ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে।

**উপসংহার :** তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিই বর্তমান বিশ্বের সকল প্রকার উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের মূল হাতিয়ার। তথ্যপ্রযুক্তির দিক থেকে যারা যত বেশি অগ্রগামী, তারা তত বেশি উন্নত। বিজ্ঞানের বিপুল অগ্রগতির ফসল ইন্টারনেট এখন পৃথিবীর সীমানা ছাড়িয়ে গ্রহান্তের কর্মকাণ্ডে নিজের স্থান করে নিয়েছে। কিন্তু এক্ষেত্রে তৃতীয় বিশ্বের দেশের মতো আমরাও পিছিয়ে আছি। তাই আমাদের উচিত ইন্টারনেটের ব্যাপক ও বহুমাত্রিক প্রসার ঘটিয়ে দেশকে আধুনিক বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলার উপযোগী করে গড়ে তোলা।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



## রচনা ২৩ সংবাদপত্রের স্বাধীনতা

*[২৮তম বিসিএস]*

**ভূমিকা :** সংবাদপত্র আধুনিক জীবনের অনিবার্য সঙ্গী। অজানাকে জানানো বা অজানা বিশ্বকে হাতের মুঠোয় এনে দেয় সংবাদপত্র। সংবাদপত্র বর্তমান সভ্যতার একটি প্রধান অঙ্গ, দেশ-বিদেশের সংবা ব্যতীত আমাদের জ্ঞানের পরিধি বিস্তৃত হয় না। নানা দেশের বিচিত্র সংবাদ, নানারকম রাজনৈতিক অর্থনৈতিক, সামাজিক আলোড়ন এবং উন্নয়ন প্রভৃতির সংবাদ যেমন আমরা সংবাদপত্রের মাধ্যমে পাই তেমনি পাই নিজের দেশের রাজনীতি, অর্থনীতি বিষয়ক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের খবর। তাই সংবাদপ আমাদের বর্তমান জীবনের এক অপরিহার্য সঙ্গী; এক পরমাত্মীয়।

**ঐতিহাসিক পটভূমি :** সংবাদপত্র ঠিক কবে কোন দেশে প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল তা সুস্পষ্টভাবে ব মুশকিল। তবে এ কথা সত্য যে, এ সংবাদপত্র একদিনে উদ্ভব হয়নি। সর্বপ্রথম ভেনিসে সংবাদপ প্রকাশিত হয়েছিল বলে জানা যায়। একাদশ শতাব্দীতে চীন দেশে এক প্রকার সংবাদপত্র মুদ্রিত হয় ইংল্যান্ডের রানী প্রথম এলিজাবেথের রাজত্বকালে সর্বপ্রথম মুদ্রিত সংবাদপত্র প্রকাশিত হয় এ ক সর্বজন স্বীকৃত। উপমহাদেশে আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালে সর্বপ্রথম বাংলা সংবাদপত্র চালু হয়। ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দে ইংরেজ মিশনারিরা শ্রীরামপুরে সর্বপ্রথম বাংলা সংবাদপত্র চালু করেন। 'সমাচার দর্পণ' নাে সাপ্তাহিক পত্রিকা হিসেবে এ পত্রিকাটি সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয়। ১৯৪০ থেকে ১৯৪৪ সালের কোন এক সময় ভারতবর্ষের সর্বপ্রথম মুদ্রিত ইংরেজি সংবাদপত্র 'ইন্ডিয়ান গেজেট' প্রকাশিত হয় বাংলাদেশের প্রথম দৈনিক সংবাদপত্র 'আজাদ'। পূর্বে সংবাদপত্র হাতে হাতে লিখে কিংবা লিথো ক প্রচার করা হতো। এখন উন্নত ধরনের মুদ্রণ যন্ত্রে, বিশেষত রোটারি অফসেটে হাজার হাজা সংবাদপত্র অতি অল্প সময়ে ছাপানো সম্ভব হচ্ছে।

**বিভিন্ন প্রকার সংবাদপত্র :** সংবাদপত্র বিভিন্ন রকমের হতে পারে। বর্তমান পৃথিবীর সভ্য দেশগুলো দৈনিক, সাপ্তাহিক, পাক্ষিক, মাসিক, ত্রৈমাসিক, বার্ষিক প্রভৃতি বিভিন্ন ধরনের পত্রিকা পৃথিবীর না জায়গা থেকে প্রকাশিত হয়ে থাকে।

**সংবাদপত্রের প্রয়োজনীয়তা :** পৃথিবীতে শিক্ষা ও জ্ঞান-বিস্তারের যতগুলো পন্থা আবিষ্কৃত হয়েছে ত মধ্যে সংবাদপত্রের আসন সর্বশ্রেষ্ঠ। সংবাদপত্র পাঠ না করলে কারো জ্ঞান পরিপূর্ণরূপে বিকশিত হ না। সংবাদপত্রকে বলা হয় জীবনযাত্রার চলমান অভিধান। এটি বর্তমান সভ্যতার অন্যতম জ্ঞ সংবাদপত্রের মাধ্যমে দূর-দূরান্তের সংবাদ আমাদের কাছে পৌছাতে পারে। বর্তমান যুগে মানুষে জীবনে যতই জটিলতা বৃদ্ধি পেয়েছে, সংবাদপত্রের প্রয়োজন ও গুরুত্ব তত তীব্রভাবে অনুভূত হয়েছে কারণ সমস্যাসঙ্কুল জীবনের সমস্যা সমাধানেও সংবাদপত্র পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষভাবে সহায়তা করতে পারে। সংবাদপত্রের বড় বৈশিষ্ট্য এই যে, সকল শ্রেণীর মানুষের জীবনেই এর প্রয়োজনীয়তা অনুভূ হয়। সকল রুচিসম্পন্ন মানুষ যেমন এর মধ্যে মনের প্রশ্নের উত্তর পান, তেমনি সাধারণ মানুষ অনে জ্ঞাতব্য তথ্য আহরণ করে সেগুলোর দ্বারা নিজেকে নিয়ন্ত্রিত করতে পারেন। আমরা সংবাদপত্রে মাধ্যমে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সচেতনতা গড়ে তুলতে পারি। এছাড়া দেশের অর্থনীতি, শি ক্ষেত্রের উৎপাদন, আমদানি, রপ্তানি প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কে জনসাধারণের পক্ষে সচেতন হয়ে ওঠা স হয়। সংবাদপত্র আমাদের নানা রকমের কৌতূহল নিবৃত্ত করে। সংবাদপত্রের মাধ্যমেই আমরা নিয়ো বিজ্ঞপ্তি পেয়ে বেকারত্বের অভিশাপ থেকে মুক্ত হই।



**সংবাদপত্রের স্বাধীনতার প্রেক্ষিত বাংলাদেশ :** সংবাদপত্র জনমত গঠন ও রাষ্ট্রশাসন ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। কেননা একটা দেশের বিভিন্ন ধরনের সমস্যা, রাষ্ট্রশাসন সংক্রান্ত নানা তথ্য সংবাদপত্রে পরিবেশন করা হয়। কখনো কখনো বিভিন্ন ধরনের সমস্যার ইঙ্গিত ও তা সমাধানের উপায় নির্দেশ করা হয় সংবাদপত্রে। এতে করে জনগণ দেশ সম্পর্কে সচেতন হতে পারে। এজন্য সংবাদপত্রের স্বাধীনতা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সংবাদপত্র সঠিক সংবাদকে যাতে প্রকাশ করতে পারে তার ব্যবস্থা থাকা দরকার। অবশ্য সংবাদপত্রের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সবাইকে বিশেষত সাংবাদিককে স্মরণ রাখতে হবে যে তার স্বাধীনতা আছে বলেই তিনি সর্বদা সব সত্য তুলে ধরতে পারেন না। কিংবা নিজের খেয়াল খুশিমত কোনো সংবাদ পরিবেশন করতে পারেন না। সংবাদ বা প্রতিবেদন রচনার ক্ষেত্রেও কিছু নিয়মবিধি আছে। এ নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটলে সংবাদপত্রের চরিত্র ভ্রষ্ট হয়। এ ধরনের সাংবাদিকতাকে সাম্প্রতিককালে হলুদ সাংবাদিকতা (yellow journalism) নামে অভিহিত করা হচ্ছে। সংবাদপত্র হচ্ছে লোক শিক্ষক। জনকল্যাণের জন্য তা যেন সঠিকভাবে কাজ করে সেদিকে সংবাদপত্র মালিক, সাংবাদিক সবাইকে আন্তরিক হতে হবে। তাহলে সাংবাদপত্র তার সঠিক ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হবে।

সংবাদপত্রে যেমন আছে সৎ, নির্ভীক সাংবাদিক, তেমনি আছেন অসৎ সাংবাদিক। অথচ নিরপেক্ষ সংবাদ পরিবেশনই সংবাদপত্র এবং সাংবাদিকের কর্তব্য। সংবাদপত্র দেশের রাজনীতি তথা সামগ্রিক ক্ষেত্রে একটা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। সংবাদপত্রের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার জন্যই একে অভিহিত করা হয়েছে 'The fourth estate'। সংবাদপত্রের শক্তির প্রাচুর্য ও জনমানসে তার প্রত্যক্ষ প্রতিক্রিয়ার কথা ভেবেই দেশের রাজনৈতিক শক্তিগুলো এর সুযোগ গ্রহণ করতে চায় এবং দলের কাজে ব্যবহার করতে চায়। এরই পরিপ্রেক্ষিতে সাম্প্রতিককালের সংবাদপত্রগুলো প্রায়ই কোনো না কোনো দলের মুখপত্র হয়ে উঠেছে। অথবা পরোক্ষ কোনো বিশেষ দল বা নীতির প্রতি সমর্থন জুগিয়ে চলেছে। তাই বর্তমানে সংবাদপত্রের মাধ্যমে খাঁটি ও পক্ষপাতহীন সংবাদ পরিবেশন খুব কম ক্ষেত্রেই পাওয়া যায়। আবার নির্ভীক, সৎ সংবাদ পরিবেশনের জন্য নির্ভীক সাংবাদিকের অপমৃত্যু ঘটে মুষ্টিমেয় ক্ষমতালোভী স্বার্থান্বেষী মানুষের হাতে। এ বিষয়টি নিরপেক্ষ সংবাদ পরিবেশনের ক্ষেত্রে বিশাল বাধা। সংবাদপত্র ও সাংবাদিকের নিরাপত্তা বিধান করার দায়িত্ব সরকারসহ আমাদের সবার। একজন সাংবাদিক আমাদেরই লোক এ ধ্রুব সত্যটি সবাইকে উপলব্ধি করতে হবে। সাংবাদিকের প্রধান দায়িত্ব ও কর্তব্য জনসাধারণকে সংবাদপত্রের মাধ্যমে সত্যের পথে পরিচালিত করা, ব্যক্তিবোধের উন্মেষ ঘটানো এবং ব্যক্তির শুভবুদ্ধিকে উদ্দীপ্ত করা। নিজেদের ব্যক্তিগত কিংবা দলগত স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রেখে সংবাদ পরিবেশন করতে গেলে জনসাধারণের প্রতি অবিচার করা হয়। সাংবাদিককে সত্যনিষ্ঠ, নিরাসক্ত, নির্ভীক ও কঠোর সমালোচক হতে হবে। এক বিচারে, সাংবাদিক প্রকৃতপক্ষে জাতির শিক্ষক, জাতিকে যথার্থপথে পরিচালনার দায়িত্ব তারই। সংবাদপত্রকে কেন্দ্র করে নানাভাবে মত বিনিময়ের সুযোগ থাকতে পারে– মত পার্থক্য সত্ত্বেও সত্যের অবিচল প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়; এই সত্য প্রতিষ্ঠাই প্রকৃত সাংবাদিকতার লক্ষ্য। সংবাদপত্রের মাধ্যমে বিনিময়ের বা দৃষ্টিভঙ্গির সত্যতা প্রকাশের সুযোগ থাকে বলে অনেকে সংবাদপত্রকে 'Second Parliament of the nation' বলে অভিহিত করে থাকেন।

**সাংবাদিকতার নীতিমালা :** গণতান্ত্রিক সমাজে সংবাদপত্রে যেসব নীতি মেনে চলা হয়, সাংবাদিকতার নীতিমালা বলতে আমরা তাই বুঝি। দীর্ঘকালের অভিজ্ঞতার আলোকে ক্রমান্বয়ে বিবর্তনের মাধ্যমে এই

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



নীতিমালা সৃষ্টি হয়েছে। নীতিমালা মূলত উপলব্ধির ব্যাপার। বিভিন্ন দেশে সাংবাদিকগণ উপলব্ধি করেছেন যে, জনস্বার্থে, সংবাদপত্রের স্বার্থে এবং সাংবাদিকদের নিজেদের স্বার্থেও কিছু নীতি মেনে চলতে হবে। নৈতিক কারণেই তা মেনে চলা জরুরি। জনসাধারণের যা জানার অধিকার আছে তাদেরকে তা জানাতে হবে। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবন সংশ্লিষ্ট যেসব বিষয় তাদেরকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রভাবিত করতে পারে, সে বিষয়গুলো তাদেরকে অবহিত করতে হবে। তাছাড়া জনগণকে নির্ভুল ও বস্তুনিষ্ঠ বিষয়গুলো জানাতে হবে। কাজেই যেসব সংবাদ পরিবেশন করা হবে তা শুধু নির্ভুল, সত্য ও বস্তুনিষ্ঠ হলেই চলবে না। তা সম্পূর্ণ সত্য হতে হবে, তাতে ভারসাম্য থাকতে হবে, তা এমনভাবে পরিবেশন করতে হবে যেন জনগণ তা সঠিক অর্থে গ্রহণ করেন এবং তা সঠিক প্রেক্ষাপটে তুলে ধরতে হবে। একটু চিন্তা করলেই দেখা যাবে যে, কোনো ঘটনা, কোনো বক্তব্য অথবা কোনো পরিস্থিতিকে পক্ষপাতিত্বের উর্ধ্বে উঠে দেখতে না পারলে পরিবেশিত সংবাদে এই গুণগুলো রক্ষা করা যাবে না। পরিবেশিত সংবাদটিতে—

১. যদি কোনো সাংবাদিকের নিজস্ব কল্পনাপ্রসূত কিছু যুক্ত না হয়ে থাকে।

২. তথ্য যদি উপযুক্ত সূত্র থেকে পাওয়া গিয়ে থাকে।

৩. সেসব যদি যথাযথভাবে যাচাই করা হয়ে থাকে।

৪. পূর্ববর্তী ঘটনাবলী এবং বিরাজমান পরিস্থিতি থেকে তা যদি বিচ্ছিন্ন করে না দেখানো হয়ে থাকে এবং

৫. বিষয়টি বিতর্কিত হলে যদি সব দিক তুলে ধরা হয়ে থাকে তাহলে পরিবেশিত সংবাদটিতে উপরে উল্লেখিত গুণাবলী থাকবে বলে আশা করা যায়। নৈতিক কারণে সংবাদপত্রের যেসব কাজ থেকে বিরত থাকতে হবে তা নিম্নরূপ :

ক. রাষ্ট্রবিরোধী কিছু লেখা যাবে না ও এ রকম কাজে উৎসাহ দেয়া যাবে না।

খ. আদালত অবমাননা করা যাবে না।

গ. আদালতে অপরাধ প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত কাউকে অপরাধী বলা যাবে না।

ঘ. কারো মানহানি করা চলবে না।

ঙ. কোনো সম্প্রদায় অথবা গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে ঘৃণা ছড়ানো চলবে না।

চ. কোনো সম্প্রদায়ের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করা চলবে না।

ছ. কোনো গুজব ছড়ানো চলবে না।

জ. সংবাদপত্রে কোনো কুসংস্কারকে প্রশ্রয় দেয়া চলবে না।

ঝ. জীবনের কোনো দিকই উপেক্ষা করার প্রয়োজন নেই। কিন্তু অশ্লীলতাকে বর্জন করতে হবে।

ঞ. কারো ব্যক্তিগত জীবনের কোনো গোপন দিক যা জনগণের জানার অধিকার নেই তা ফাঁস করে তাকে বিব্রত করা চলবে না। অর্থাৎ কারো প্রাইভেসিতে হানা দেয়া চলবে না।

ট. কারো দেশপ্রেমের প্রতি কটাক্ষ করা চলবে না। কোনো প্রমাণ ছাড়া কাউকে বিদেশী এজেন্ট বা এ জাতীয় বিশেষণে ভূষিত করা যাবে না।

ঠ. কোনো বিজ্ঞাপনকে সংবাদের ছদ্মবেশ দেয়া যাবে না ইত্যাদি।



**সাংবাদিকতা ও সংবাদপত্রের দায়বদ্ধতা :** সাংবাদিকতার অর্থ হচ্ছে একজন প্রত্যক্ষদর্শী, প্রত্যক্ষসাক্ষী। সাংবাদিকতা একটি মহান পেশা এবং সাংবাদিকেরা দেশের সম্পদ। এই কারণেই যে কোনো পরিস্থিতিতে তাদের সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ থাকা প্রয়োজন। সাংবাদিকদের প্রধান ও একমাত্র দায়িত্ব হচ্ছে সত্যের সংরক্ষণ ও বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ পরিবেশন করা। জ্ঞানী-গুণী, কবি-সাহিত্যিকরা বলেন, সাংবাদিকদের কলমের ক্ষমতা তরবারির চেয়ে ধারালো ও শক্তিশালী। সহজেই অনুমেয় যে, কলম এমন একটি অস্ত্র যা সর্বাধুনিক মারণাস্ত্রের চেয়েও মারাত্মক। এই কলমের সামান্যতম দু ফোটা কালি পৃথিবীর সমস্ত ধন-সম্পদের চেয়েও বেশি মূল্যবান। সেই কলম যখন কোনো সাংবাদিকের হাতের অস্ত্র হয় তখন তার ক্ষমতাও বেড়ে যায় অন্তহীনভাবে। সাংবাদিকগণ সমাজের ও দেশের ভীষণ প্রয়োজনীয় ও অত্যাবশ্যকীয় শ্রেণী। সব পেশার একটি নির্দিষ্ট গণ্ডি আছে, আছে সংরক্ষিত সীমানা। কিন্তু একজন সাংবাদিকের পেশার নির্দিষ্ট কোনো গণ্ডি নেই। অন্তহীন তার বিচরণের ক্ষেত্র। তারা ত্রিভুবনের যেকোনো বিষয় লেখার অধিকার রাখে। যারা এ পেশায় এসে কলম হাতে নেন সে মুহূর্তে নিজের অজান্তেই সমাজ ও দেশের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব কাঁধে নিয়েই কাজ করছেন বলে বিবেচিত হবে।

সাংবাদিকরা পরিচয়পত্র অর্থাৎ অ্যাক্রিডিটেশন কার্ড বহন করেন। এ কারণে তারা যে কোনো স্থানে প্রবেশাধিকার রাখেন। এমন কি বিশেষ সংরক্ষিত এবং নিরাপত্তাবেষ্টিত জায়গায় প্রবেশাধিকার থাকতে পারে, যা সমাজের অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তির থাকে না। তারা দেশের বাইরেও যে কোনো স্থানে বিশেষ ব্যক্তিত্বের পরিচয়ে পরিচিত হন এবং সম্মানিত হয়ে থাকেন। দেশের এবং দেশের বাইরে কোথায় কি ঘটছে জনগণ তা জানার জন্য তৃষ্ণার্ত থাকে এবং তাদের তৃষ্ণা মেটায় সাংবাদিকদের কলমের কালি। কখনো কখনো তাদের অজান্তে একেবারে নিষিদ্ধ ও বিপজ্জনক কোনো তথ্য তাদের হাতে এসে যায়। সেটি ইচ্ছে করলে দেশের মঙ্গলের জন্য ব্যবহার করা যায়, আবার সেটাই দেশের সার্বভৌমত্বকে হুমকির মুখে ঠেলে দেয়ার জন্য সহজেই ব্যবহার করা যথেষ্ট হতে পারে।

স্বাভাবিকভাবেই তাই সাংবাদিকরা খুব স্পর্শকাতর পরিস্থিতির সম্মুখীন হন। আবার দুঃখজনক হলেও সত্যি, কেউ কেউ নিজ স্বার্থ হাসিলের উদ্দেশ্যে দেশের স্বার্থ বিরোধী কাজ করার সাংবাদিকতার সুযোগ নিয়ে থাকেন। এরা মহান পেশায় থেকে দেশকে কলঙ্কিত করতে পারে। সংখ্যাগরিষ্ঠ নিবেদিত সাংবাদিকরা, যারা দেশের জন্য যে কোনো ঝুঁকি নিতে প্রস্তুত তাদেরই উচিত, এসব মুখোশধারী ব্যক্তি, যারা সংবাদিকতার কলঙ্ক, তাদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়া।

বলাবাহুল্য, মানব সভ্যতার এক অনন্য দীপ্তি এবং গণমানুষের মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় হচ্ছে সংবাদপত্র। এটি পাঠককে দেশ-বিদেশ ও পারিপার্শ্বের নাগরিক জীবনকে প্রভাবিত কিংবা আপন করে তুলতে পারে। পাঠক শ্রোতাকে নির্ভরযোগ্য বস্তুনিষ্ঠ তথ্য দূর নিকটে কোথায় কি হচ্ছে তা ছাপার অক্ষরে তুলে ধরে থাকে। বার বার পড়ার সুযোগ থাকে। ফলে পাঠক হৃদয়ঙ্গম করতে সক্ষম হন। কিন্তু সংবাদপত্রের প্রতিদ্বন্দ্বী রূপে রেডিও, টেলিভিশন, ইলেকট্রনিক মিডিয়া, ই-মেইল ও ইন্টারনেটের আবির্ভাব ঘটেছে। এসব চ্যানেল বা মাধ্যম পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তের মানুষকে জানিয়ে দেয় কোথায় কি হচ্ছে বিজ্ঞানের এ সাফল্য উভয়ের গৌরব আরো বৃদ্ধি করেছে।

অনেক সময় বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ পরিবেশন করতে গিয়ে সংবাদপত্রের সম্পাদক ও সাংবাদিকরা প্রাণ হারাচ্ছেন, বিকলাঙ্গ হচ্ছেন। সংবাদপত্র জগতের এমন বিপন্নতা প্রতিরোধ অবশ্যই জরুরি। প্রত্যেক

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



মানুষের মতো একজন সাংবাদিকেরও নিজস্ব মত ও চিন্তা আছে। আর থাকাটাই স্বাভাবিক। সংবাদপত্রের কাছে পাঠকের বস্তুনিষ্ঠ দাবি অত্যন্ত প্রবল। এ সাংবাদিকদের স্বাধীনতার প্রতি হুমকি ও অপশক্তির বিরুদ্ধে প্রতিবাদে তাদের কলমযুদ্ধ অবিরত চালিয়ে যাবেন— এ প্রত্যাশা সকলের।

**স্বাধীনতার বিরূপ প্রভাব :** সংবাদপত্র জনসংযোগে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। সংবাদপত্র জনগণের শিক্ষকও বটে। দেখা গেছে পৃথিবীর অধিকাংশ শিক্ষিত লোক সংবাদপত্র ছাড়া এর বেশি কিছু পড়েন না। সংবাদপত্রের মাধ্যমে তারা শিল্প, সাহিত্য, বিজ্ঞান, রাজনীতি ইত্যাদির সমকালীন ধারা সম্বন্ধে নিজেদের অবহিত রাখেন। সুতরাং সংবাদপত্রকে যথার্থই জনগণের বিশ্ববিদ্যালয় বলা যেতে পারে। অথচ জনগণের সংবাদপত্র আজ অন্যতম এক শিল্প আঙ্গিক। সাংবাদিকরা অনেক সময় স্বাধীনতার আতিশয্যে তাদের দায়-দায়িত্বের কথা ভুলে যান। তখন তারা সংবাদ পরিবেশনে পক্ষপাতিত্বের পক্ষ নেন। দেশ, সমাজের তখন মারাত্মক ক্ষতি হয়। অথচ বাংলাদেশের সংবিধানেও সংবাদপত্রের স্বাধীনতার বিষয়টি স্পষ্ট করে দেয়া হয়েছে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সংবিধানের ৩৯ নম্বর অনুচ্ছেদে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা এবং জনগণের ভাব প্রকাশের স্বাধীনতা নিশ্চিত করার কথা বলা হয়েছে। এ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে :

৩৯ (১) চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতার নিশ্চয়তা দান করা হইল। (২) রাষ্ট্রের নিরাপত্তা, বিদেশী রাষ্ট্রসমূহের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক, জ্ঞান শৃঙ্খলা, শালীনতা বা নৈতিকতার স্বার্থে কিংবা আদালত অবমাননা, মানহানি বা অপরাধ সংঘটনে প্ররোচনা সম্পর্কে আইনের দ্বারা আরোপিত যুক্তিসঙ্গত বাধানিষেধ সাপেক্ষে।

ক. প্রত্যেক নাগরিকের বাক ও ভাব প্রকাশের স্বাধীনতার অধিকারের;

খ. সংবাদপত্রের স্বাধীনতার নিশ্চয়তা দান করা হইল।

উপর্যুক্ত অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সহজেই অনুমেয় যে, স্বাধীনতার সঙ্গে পরাধীনতার বিষয়টিও জড়িত। অর্থাৎ একজন সৎ, নিষ্ঠাবান সাংবাদিক কখনো তার দায়িত্ববোধ ও কর্তব্যবোধকে আইন ও নৈতিকতার বিরোধী হিসেবে প্রয়োগ করতে পারে না। আর যখন তিনি এই অনাকাঙ্ক্ষিত বিষয়ের আশ্রয় নেন তখন সাংবাদিকতার স্বাধীনতা নামক বিষয়টি পরাভূত হয়। এ অবস্থায় সংবাদপত্রকে বলা হয় বিপজ্জনক প্রতিষ্ঠান। অবশ্য এর মূল কারণ বোঝা দুঃসাধ্য নয়। ব্যবসায়িক স্বার্থ ও মুনাফার মৃগয়া যেখানে অবাধ উদ্যম; যেসব দেশে জ্ঞান বিজ্ঞান প্রভৃতি পর্যন্ত সে বিকৃত উদ্দেশ্য সিদ্ধিতে প্রযুক্ত হয়– ধর্ম এবং দেবতাও নিস্তার পায় না। 'মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা' কথাটা কার্যত হয়েছে স্বত্বাধিকারী মহামালিকদের যদৃচ্ছ আত্মপ্রচারের উদ্দেশ্য সিদ্ধির স্বাধীনতা। তখন সংবাদপত্রের স্বাধীনতা খর্ব হয়। সংবাদপত্রে ইয়েলো জার্নালিজম বলে একটা কথা প্রচলিত আছে– যা সংবাদপত্রের স্বাধীনতার অতিরঞ্জিতের ফসল। মি. জোসে পুলিৎজার জার্মানিতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি আর্থিক অবস্থার কারণে জার্মানি ছেড়ে চলে যান। তিনি খুব লেখাপড়া জানতেন না। কিন্তু তাকে আমেরিকার প্রথম সাংবাদিকতায় অংশগ্রহণ করতে হয়। তিনি মেধা ও প্রজ্ঞা দিয়ে পরে তিনটি সংবাদপত্রের মালিক হন। বিশেষ করে সংবাদপত্রে আগে মহিলা কলাম লেখা, দুর্নীতি ও সাংস্কৃতিক ইত্যাদি বিষয়ে পত্রিকায় সংবাদ হিসেবে তিনিই প্রথম স্থান করে দেন। তিনি বাহ্যিকভাবে লাভবান হওয়ার জন্য ইচ্ছাকৃতভাবে বাজে শিরোনাম, সংবাদে যৌন আবেদন, তথ্য বিভ্রাট, রসবোধ, লেখনীর মাধ্যমে সংবাদ ছাপাতে শুরু করেন। এর ফলে ব্যবসা দ্রুত বৃদ্ধিসহ অর্থনৈতিকভাবে ধনকুবের হয়ে উঠেন।



১৮৯০ সাল থেকে মি. জোসে সংবাদের ভাষা ছবির কার্টুনের মাধ্যমে শুরু করেন। এই কার্টুনে হলুদ রং ব্যবহার শুরু করেন। এর নাম দেয়া হয় 'ইয়েলো কিড'। তিনি ১৮৯০ সাল থেকে ১৯০০ সাল পর্যন্ত বিবেকবর্জিত ও বেপরোয়াভাবে সংবাদপত্রের পাতায় নানা ধরনের বৈচিত্র্যময় অর্থনৈতিক সংবাদ, ছবি, কার্টুন, স্ক্যান্ডালিং সবকিছু ছাপানো শুরু করেন। কথায়, মানুষ বলে হলুদ সাংবাদিকতা শুরু হয়েছে। অর্থাৎ সংবাদ বা খবরে উপযুক্ত অর্থনৈতিক হলুদ লাগালে খবরটি অসুস্থ হয়ে পড়ে। তখন সংবাদ আর সংবাদ থাকে না। সাংবাদিকদের স্বাধীনতার অপব্যবহার ও অতিরঞ্জিত ব্যবহারের ফসল এই ইয়েলো জার্নালিজম এর ফলে জনগণ বিভ্রান্ত হয়, তথ্য সন্ত্রাস ও বিভ্রান্তি ঘটে, পক্ষপাতিত্বের দাবানলে প্রতিপক্ষ ঘায়েল হয় এবং অযাচিত ঘটনার সূত্রপাত ঘটে।

**উপসংহার :** সংবাদপত্রের স্বাধীনতার কুফল ও সুফল উভয় দিক পরিলক্ষিত হলেও এ কথা সত্য যে, সংবাদ ও সাংবাদিকের স্বাধীন মত প্রকাশে এর বিকল্প নেই। একজন সাংবাদিক সমাজেরই মানুষ, কাজেই সামাজিক মানুষ হিসেবে তার দায়িত্ব ও কর্তব্য তার লেখায় প্রতিফলিত হবে এটা অবান্তর কিছু নয়। কিন্তু সেই সামাজিক অধিকার প্রয়োগ করতে গিয়ে তিনি স্বেচ্ছাচারিতার আশ্রয় গ্রহণ করলে তা দেশ ও সমাজে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করবে। অন্যদিকে, সংবাদ পরিবেশনে হুমকি বা বিধি-নিষেধ আরোপ করা হলে তাও দেশের জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়াবে। তাই সংবাদপত্রের স্বাধীনতা নিশ্চিত করার জন্য সরকার ও বিরোধী দলগুলোর একত্রে অবস্থান জরুরি। এ স্বাধীনতা নিশ্চিত হলে সংবাদ ও সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে আমাদের সাবলীল পথচলা সুগম হবে।

## রচনা ২৪ বেসরকারি টিভি চ্যানেল ও বাংলাদেশের গণমাধ্যম

**ভূমিকা :** আধুনিক যুগ মানে তথ্যের অবাধ প্রবাহের যুগ। আধুনিক যুগ মানে সরকারি খাতকে পিছনে ফেলে বেসরকারি খাতের বিকাশ ও প্রতিযোগিতার যুগ। তাই সর্বক্ষেত্রে সরকারি নিয়ন্ত্রণের বেড়াজাল ছিন্ন করে আজ বেসরকারি খাত তথা শিল্প ও ব্যবসায়ী সমাজ তাদের আধিপত্য কায়েম করেছে। এমনকি আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তি তথা মিডিয়ার ক্ষেত্রে এর প্রভাব সবচেয়ে বেশি লক্ষ্য করা যাচ্ছে। বিশ্বব্যাপী CNN, BBC, National Geographic, Adventure Oneসহ নানাবিধ পশ্চিমা সংবাদ ও বিনোদন চ্যানেলের দেখাদেখি ভারত, বাংলাদেশ, চীন, হংকং, সিঙ্গাপুরসহ এশিয়ার বিভিন্ন দেশেও এখন প্রচুর বেসরকারি টিভি চ্যানেল চালু হয়েছে। বাংলাদেশে অবশ্য এ জাতীয় প্রয়াস খুব বেশি দিনের না হলেও বেসরকারি টিভি চ্যানেলের যাত্রা এক যুগ অতিক্রম করেছে।

**বাংলাদেশের বেসরকারি টিভি চ্যানেল :** বাংলাদেশে দীর্ঘকাল যাবৎ শুধু একটি সরকারি টিভি চ্যানেল ছিল। সরকারি ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণাধীন থাকায় এ চ্যানেলটির তেমন অগ্রগতি ও উন্নয়ন সম্ভব হয়নি। পরবর্তীতে বেসরকারি খাতে টেলিভিশন চ্যানেলের অনুমতি প্রদান ইলেকট্রনিক মিডিয়ার অগ্রগতির ক্ষেত্রে এক নববিপ্লবের সূচনা হয়েছে। জানুয়ারি ২০১৫ পর্যন্ত দেশে লাইসেন্সপ্রাপ্ত বেসরকারি টিভি চ্যানেলের সংখ্যা ৪১টি হলেও এর অনেকগুলোই এখনো সম্প্রচারে আসতে পারেনি। নিচে সম্প্রচারে এসেছে এমন বেসরকারি চ্যানেলগুলি সম্পর্কে আলোচনা করা হলো :

১. **এটিএন বাংলা :** বাংলা ভাষায় বাণিজ্যিক ভিত্তিতে বিশ্বব্যাপী অনুষ্ঠান প্রচারের পটভূমিকায় যাত্রা শুরু হয় এটিএন বাংলার। ১৯৯৪ সালের ১ জুন এ চ্যানেলটি সরকারি অনুমোদন লাভ করলেও অনুষ্ঠান

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



সম্প্রচার শুরু হয় ১৯৯৭ সালের ১৫ জুলাই। এটি সিন স্যাটেলাইট আইকম ৩-এর মাধ্যমে তার সম্প্রচার চালিয়ে থাকে। বাংলাদেশের মাল্টিমিডিয়া প্রোডাকশন কোম্পানি লি.-এর পরিচালনা কর্তৃপক্ষ এবং এর চেয়ারম্যান মাহফুজুর রহমান। এ চ্যানেলটি প্রতিদিন ২৪ ঘণ্টা অনুষ্ঠান সম্প্রচার করে থাকে। ইসলামী অনুষ্ঠানমালা, বাংলা ছায়াছবি, নাটক, নাটিকা, ম্যাগাজিন, টক শো, সঙ্গীতানুষ্ঠান, নাচ ও সংবাদ প্রচারসহ নানাবিধ আয়োজনের সম্ভার নিয়ে এটিএন হাজির হয় দর্শকদের মাঝে।

২. **চ্যানেল আই :** ১৯৯৯ সালের ১ অক্টোবর সিঙ্গাপুর থেকে সম্প্রচারিত স্যাটেলাইট অ্যাপেস্টার/২-এর মাধ্যমে এটি তার অনুষ্ঠান সম্প্রচার করে। বাংলাদেশে এ টিভি চ্যানেলটির পরিচালনা কর্তৃপক্ষ ইমপ্রেস টেলিফিল্ম লিমিটেড। বাংলা ছায়াছবি, সঙ্গীতানুষ্ঠান, ম্যাগাজিন, টক শো, প্রামাণ্য অনুষ্ঠান, বিদেশী সিরিজ, নাটক, সাক্ষাৎকার, আলোচনা অনুষ্ঠান, সংবাদসহ হরেক রকমের আয়োজন এর অনুষ্ঠানমালায় স্থান পায়।

৩. **ইটিভি বা একুশে টিভি :** বাংলাদেশের দূরদর্শন সম্প্রচারের ক্ষেত্রে এক নতুন দিগন্তের সূচনা হয় ২০০০ সালে। সে বছর ১০ মে বেসরকারি নিয়ন্ত্রণে একুশে টিভি (ইটিভি) নামে একটি টিভি চ্যানেল সম্প্রচার শুরু করে। এ চ্যানেলটি চালু হওয়ার পর ইলেকট্রনিক মিডিয়ার অনুষ্ঠান ও সংবাদ প্রচারে নতুন নতুন মাত্রা যুক্ত হতে থাকে। কিন্তু দেশের সর্বোচ্চ আদালতে ইটিভির লাইসেন্স গ্রহণ প্রক্রিয়ার প্রতিটি ক্ষেত্রে ব্যাপক দুর্নীতি ও জালিয়াতি প্রমাণিত হওয়ায় ২০ আগস্ট, ২০০২ চ্যানেলটি সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করে দেয়া হয়। উল্লেখ্য, ইটিভিই ছিল একমাত্র বেসরকারি চ্যানেল, যা বাংলাদেশ টেলিভিশনের টাওয়ারের মাধ্যমে টেরিস্ট্রিয়াল সম্প্রচার সুবিধা ভোগ করত। ফলে ইটিভির ছিল বিটিভির মতো দেশব্যাপী সম্প্রচারের সুবিধা। ৩০ মার্চ ২০০৭ ইটিভি পুনরায় স্যাটেলাইট সম্প্রচার শুরু করে।

৪. **এনটিভি বা ইন্টারন্যাশনাল টেলিভিশন চ্যানেল লি. :** 'সময়ের সাথে আগামীর পথে' এই স্লোগানে নিরপেক্ষ ও মানসম্পন্ন সংবাদ প্রচারের লক্ষ্য নিয়ে বেসরকারি খাতে তৃতীয় স্যাটেলাইট চ্যানেল হিসেবে যাত্রা শুরু করে এনটিভি। ৩ জুলাই ২০০৩ এ চ্যানেলটি সম্প্রচার শুরু করে। ১৯৯৯ সালে বন্ধ হয়ে যাওয়া টোটাল এন্টারটেইনমন্টে নেটওয়ার্ক বা টিইএন এর লাইসেন্সটি কিনে নেয় বর্তমান এনটিভি কর্তৃপক্ষ। সিঙ্গাপুর থেকে সম্প্রচারিত স্যাটেলাইট এপেস্টার/২ এর মাধ্যমে ২৪ ঘণ্টা অনুষ্ঠান সম্প্রচার করা হচ্ছে।

৫. **আরটিভি :** 'আজ এবং আগামীর' এ স্লোগান নিয়ে ১ ডিসেম্বর ২০০৫ থেকে পরীক্ষামূলক সম্প্রচার শুরু করেছে নতুন স্যাটেলাইট চ্যানেল আরটিভি। ২৫ ডিসেম্বর ২০০৫ পর্যন্ত পরীক্ষামূলকভাবে সম্প্রচার চলার পর ২৬ ডিসেম্বর থেকে এটি আনুষ্ঠানিকভাবে মূল সম্প্রচার শুরু করে।

৬. **বৈশাখী টেলিভিশন :** ২৯ ডিসেম্বর ২০০৫ সালে এ বেসরকারি টিভি চ্যানেলটি তার কার্যক্রম শুরু করে।

৭. **চ্যানেল ওয়ান :** 'সম্ভাবনার কথা বলে'– এ স্লোগান নিয়ে ১৭ জানুয়ারি ২০০৬ পরীক্ষামূলক সম্প্রচারের মাধ্যমে যাত্রা শুরু করে চ্যানেল ওয়ান। ২৪ জানুয়ারি ২০০৬ রাষ্ট্রপতি অধ্যাপক ড. ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদের উদ্বোধনের মধ্য দিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে যাত্রা শুরু করে স্যাটেলাইটটি। টেলিযোগাযোগ আইন লঙ্ঘন করায় ২৭ এপ্রিল ২০১০ সরকার চ্যানেলটি বন্ধ করে দেয়।



৮. **বাংলাভিশন :** শ্যামল বাংলা মিডিয়া লিমিটেডের পরিচালনায় ৩১ মার্চ ২০০৬ কার্যক্রম শুরু করে বাংলাভিশন। এ চ্যানেলের স্লোগান 'দৃষ্টিজুড়ে দেশ'।

৯. **ইসলামিক টিভি :** 'একটি সুন্দর পৃথিবীর জন্য' স্লোগানকে ধারণ করে ১৪ এপ্রিল ২০০৭ ইসলামিক টিভির অভিযাত্রা শুরু হয়। এ চ্যানেলটি সংবাদসহ ইসলামিক অনুষ্ঠানসূচির ওপর অধিক গুরুত্বারোপ করে। ৫ মে ২০১৩ মধ্যরাত থেকে সরকার সাময়িকভাবে চ্যানেলটি বন্ধ করে দেয়।

১০. **দিগন্ত টিভি :** 'সত্য ও সুন্দরের পক্ষে অঙ্গীকারবদ্ধ' স্লোগান নিয়ে ২০০৮ সালের ২৮ আগস্ট চ্যানেলটির পরীক্ষামূলক সম্প্রচার শুরু হয়। ৫ মে ২০১৩ মধ্যরাত থেকে সরকার সাময়িকভাবে চ্যানেলটি বন্ধ করে দেয়।

১১. **দেশ টিভি :** ২৬ মার্চ ২০০৯ আনুষ্ঠানিক সম্প্রচার শুরু করে দেশের ১১তম বেসরকারি স্যাটেলাইট টিভি চ্যানেল 'দেশ টিভি'। এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক নাট্যব্যক্তিত্ব আসাদুজ্জামান নূর।

১২. **মাই টিভি :** ১২তম বেসরকারি স্যাটেলাইট টিভি চ্যানেল হিসেবে ১৫ এপ্রিল ২০১০ আনুষ্ঠানিকভাবে সম্প্রচার শুরু করে। স্লোগান 'সৃষ্টিতে বিস্ময়'।

১৩. **এটিএন নিউজ :** 'বাংলার ২৪ ঘণ্টা, স্লোগান নিয়ে ৭ জুন ২০১০ পূর্ণ সম্প্রচার শুরু করে ২৪ ঘণ্টার সংবাদভিত্তিক স্যাটেলাইট টিভি চ্যানেল এটিএন নিউজ।

১৪. **মোহনা টিভি :** নভেম্বর ২০১০ সালে মোহনা টিভি তার আনুষ্ঠানিক কার্যক্রম শুরু করে।

১৫. **সময় টেলিভিশন :** ২৪ ঘণ্টা সংবাদ প্রচারের অঙ্গীকার নিয়ে সময় টেলিভিশনের যাত্রা শুরু হয় ১৭ এপ্রিল ২০১১ সালে।

১৬. **ইন্ডিপেন্ডেন্ট টেলিভিশন :** ২৮ জুলাই ২০১১ বাংলাদেশে ইন্ডিপেন্ডেন্ট টেলিভিশনের যাত্রা শুরু হয়।

১৭. **মাছরাঙ্গা টেলিভিশন :** ৩০ জুলাই ২০১১ বেসরকারি টিভি চ্যানেল মাছরাঙ্গা টেলিভিশনের যাত্রা শুরু হয়।

১৮. **বিজয় টিভি :** বিজয় টিভির আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হয় ১৬ ডিসেম্বর ২০১১।

১৯. **চ্যানেল 9 :** চ্যানেল 9-এর আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হয় ৩০ জানুয়ারি ২০১২।

২০. **জিটিভি :** ১২ জুন ২০১২ সালে জিটিভি'র আনুষ্ঠানিক কার্যক্রম শুরু হয়।

২১. **চ্যানেল 24 :** এ চ্যানেলের কার্যক্রম শুরু হয় ২৩ মে ২০১২ সালে।

২২. **একাত্তর টিভি :** একাত্তর টিভির আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হয় ২১ জুন ২০১২।

২৩. **এশিয়ান টিভি :** ১৮ জানুয়ারি ২০১৩ এশিয়ান টিভির আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হয়।

২৪. **এসএ টিভি :** এসএ টিভির আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হয় ১৯ জানুয়ারি ২০১৩।

**গণমাধ্যমের অগ্রযাত্রায় বেসরকারি টিভি চ্যানেলের প্রভাব :** বাংলাদেশে তথ্যপ্রযুক্তির বিকাশ ও গণমাধ্যমের যাত্রাপথে এ পর্যন্ত যে কয়টি পদক্ষেপ গৃহীত হয়েছে তার মধ্যে বেসরকারি টিভি চ্যানেলসমূহের বিকাশ ও সাফল্য অন্যতম। কতিপয় নেতিবাচক সম্ভাবনা ও উপসর্গ বাদ দিলে বলা যায়, এটি এ দেশের গণমাধ্যমের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ রচনার অন্যতম মাইলফলক হিসেবে বিবেচিত হবে। যেমন—

১. **স্যাটেলাইটের বৃহত্তর জগতে প্রবেশ :** বিশ্বব্যাপী যখন স্যাটেলাইট নিয়ে ব্যাপক প্রতিযোগিতা চলছিল, মহাকাশের শূন্যপথে যখন অবাধে সাংস্কৃতিক বাণিজ্য আর আমদানি-রপ্তানি চলছিল, এক যুগ আগেও বাংলাদেশ ছিল কেবলই আমদানিকারক। দেশে স্যাটেলাইট প্রযুক্তি এলেও ১৯৯৭

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



সালের আগ পর্যন্ত বাংলাদেশের কোনো দেশীয় স্যাটেলাইট চ্যানেল ছিল না। স্যাটেলাইটে এ দেশের মানুষ কেবল বিদেশী চ্যানেলে অনুষ্ঠান উপভোগ করত। ১৯৯৭ সালে দেশের প্রথম স্যাটেলাইট চ্যানেল 'এটিএন বাংলা'-এর যাত্রা শুরু হলে স্যাটেলাইটের বৃহত্তর জগতে বাঙালি সংস্কৃতি ও বাংলা ভাষার অনুপ্রবেশ ঘটে এবং সম্ভাবনার নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়।

২. **বাঙালি সংস্কৃতির আন্তর্জাতিকতা :** স্যাটেলাইটে নতুন নতুন টিভি চ্যানেলের আত্মপ্রকাশ বাঙালি সংস্কৃতির আন্তর্জাতিকীকরণের ক্ষেত্রে অতীব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। কেননা এ সকল টেলিভিশন বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতিকে আশ্রয় করে যে সকল অনুষ্ঠান সম্প্রচার করছে তা বিশ্বব্যাপী কোটি কোটি দর্শকের কাছে চলে যাবে এবং বাঙালি সংস্কৃতি আন্তর্জাতিক সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে নিজেকে তুলে ধরার সুযোগ পাবে।

৩. **বিদেশী চ্যানেলের ওপর নির্ভরশীলতা হ্রাস :** বেসরকারি টিভি চ্যানেলগুলো চালু হওয়ায় এ দেশের দর্শকরা অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, যেমন কোনো গুরুত্বপূর্ণ খেলা, কোনো বিখ্যাত আন্তর্জাতিক পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠান এবং বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ সংবাদের জন্য বিদেশী চ্যানেলগুলোর ওপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভরশীল ছিল। এক্ষেত্রে বিটিভি দর্শকদের চাহিদার খুব কমই পূরণ করতে পারত। নব্বই দশকের শেষ দিকে বেসরকারি টিভি চ্যানেলগুলোর প্রতিষ্ঠা এক্ষেত্রে দর্শকদের সামনে এক বিকল্প আশ্রয় হিসেবে দেখা দেয়। আগে যেখানে স্টার স্পোর্টস বা ইএসপিএন ছাড়া খেলা দেখা যেত না, সেখানে এ দেশীয় দর্শকদের জন্য বেসরকারি টিভি চ্যানেলগুলো বিভিন্ন কোম্পানির সৌজন্যে বিভিন্ন খেলাধুলা সম্প্রচার করে থাকে।

৪. **দেশীয় গণমাধ্যমের প্রতিযোগিতা :** একসময় এ দেশে গণমাধ্যম বিশেষত ইলেকট্রনিক মিডিয়া বলতে বোঝাত বিটিভি এবং বাংলাদেশ বেতারকে। কিন্তু তথ্যপ্রযুক্তি আর পুঁজির অবাধ প্রবাহে এ দুটি সরকারি গণমাধ্যম তাদের একক কর্তৃত্ব টিকিয়ে রাখতে পারেনি এবং এভাবে টিকিয়ে রাখাটা কাম্যও নয়। তাই নব্বই-পরবর্তীকালে রাজনৈতিকভাবে গণতান্ত্রিক প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হওয়ার বোধ প্রবল হওয়ার সুবাদেই এ দেশের গণমাধ্যমেও প্রতিযোগিতার সূচনা হয়। পুরাতনের অচলায়তন ভেঙ্গে নতুনের আহ্বান নিয়ে একের পর এক আবির্ভূত হয় চ্যানেল আই, ইটিভি, এটিএন আর এনটিভির মতো টিভি চ্যানেল। অনুষ্ঠান নির্মাণের ধরন ও মান এবং সংবাদ প্রচারসহ প্রতিটি ক্ষেত্রেই তারা পারস্পরিক প্রতিযোগিতায় লিপ্ত।

৫. **গণমাধ্যমের ওপর সরকারি প্রভাব হ্রাস :** ইতিপূর্বে দেশে যখন বেসরকারি উদ্যোগে কোনো বেতার কিংবা টিভি কেন্দ্র স্থাপনের অনুমোদনের নিয়ম ছিল না, তখন বিশেষ করে ইলেকট্রনিক মিডিয়ার ওপর সরকারের ছিল একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণ। সরকারি টিভি বাংলাদেশ টেলিভিশন এবং বাংলাদেশ বেতারে সরকার ইচ্ছেমতো অনুষ্ঠান ও সংবাদ প্রচার করত। কিন্তু বেসরকারি টিভি ও চ্যানেলের আবির্ভাব এ ক্ষেত্রে সরকারি মাধ্যমগুলোর কর্তৃত্বকে কিছুটা হলে রাশ টেনে ধরতে সক্ষম হয়েছে।

৬. **অনুষ্ঠান নির্মাণে বৈচিত্র্য :** বেসরকারি টিভি চ্যানেলগুলো বাংলাদেশ টেলিভিশনের গতানুগতিক ও একঘেয়ে অনুষ্ঠান সম্প্রচারের অচলায়তন থেকে বেরিয়ে এসে দর্শকদের চাহিদা ও রুচির সাথে তাল মিলিয়ে অনুষ্ঠান নির্মাণের ব্যাপারে খুব যত্নশীল। তাই তাদের অনুষ্ঠানে রয়েছে বৈচিত্র্য ও নতুনত্ব। উদাহরণ হিসেবে ইটিভির সংবাদ প্রচারের বিষয়টি উল্লেখ করা যায়। ইটিভির পথ ধরেই বর্তমানে প্রতিটি চ্যানেলই প্রতিবেদনমূলক সংবাদ প্রচার করছে।



৭. **নাট্যশিল্পের বিকাশ :** গণমাধ্যমকে আশ্রয় করে নাট্যশিল্পের যে বিকাশধারা তা নব্বইয়ের দশকের মাঝামাঝি এসে বেশ গতি পায়। বিশেষ করে প্যাকেজ নাটক নির্মাণে নির্মাতাদের আগ্রহ অনেক গুণ বেড়ে যায়। পূর্বে বিটিভির একচ্ছত্র আধিপত্যের কারণে একটি নাটক সম্প্রচারের জন্য বহু কাঠখড় পোড়াতে হতো। কিন্তু বেসরকারি চ্যানেলগুলো নির্মাতাদের জন্য এক্ষেত্রে ব্যাপক সুযোগ এনে দিয়েছে। ফলে নির্মাতা প্রতিষ্ঠান, নাট্যাভিনেতা-অভিনেত্রীসহ সকল ক্ষেত্রে চাঞ্চল্য আসে এবং একের পর এক নতুন নতুন নাটক নির্মিত হতে থাকে।

৮. **সংবাদের বস্তুনিষ্ঠতা :** আধুনিকতার এ চরম উৎকর্ষের যুগেও সাধারণ জনগণ বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ থেকে নানা কারণে নানাভাবে বঞ্চিত হয়ে থাকে। বিভিন্ন সময়ে সরকারগুলো প্রচার মাধ্যমগুলোর ওপর নানাভাবে আক্রমণ অব্যাহত রেখেছে। এক্ষেত্রে বেসরকারি টিভি চ্যানেলগুলোর অনুসন্ধানমূলক ও প্রতিবেদনমূলক সংবাদ প্রচারের প্রয়াস কিছুটা হলেও বস্তুনিষ্ঠতার সন্ধান দিয়েছে। এরা সরকারের সম্পূর্ণ প্রভাবমুক্ত এ কথা বলা না গেলেও নিঃসন্দেহে বিটিভি কিংবা বাংলাদেশ বেতারের তুলনায় ভালো।

**সমস্যাবলী :** বাংলাদেশে বেসরকারি টিভি চ্যানেলগুলোকে তাদের অনুষ্ঠান প্রচারের ক্ষেত্রে নানা সমস্যায় পড়তে হচ্ছে। যেমন—

প্রথমত, আমাদের দেশে দক্ষ ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কলাকুশলীর যথেষ্ট অভাব রয়েছে। বিশেষ করে অনুষ্ঠান নির্মাণের উপযোগী লোকবলই অনেক সময় পাওয়া যায় না।

দ্বিতীয়ত, আমাদের টিভি চ্যানেলগুলোর প্রযুক্তিগত অনেক সীমাবদ্ধতা রয়েছে। বিশেষ করে ইটিভি যেভাবে বিটিভি থেকে টেরিস্ট্রিরিয়াল সুবিধা পেয়েছিল সেরূপ সুবিধা এখন অন্য চ্যানেলগুলো না পাওয়ায় তাদের সম্প্রচার দেশের একটা ক্ষুদ্রাংশের মাঝেই সীমিত হয়ে আছে।

তৃতীয়ত, টিভি চ্যানেলগুলো বেসরকারি হলেও এগুলো এখনো সরকারি নিয়ন্ত্রণ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত নয়। সরকারি একটা প্রচ্ছন্ন প্রভাব এদের ওপর থেকেই গেছে।

চতুর্থত, আমাদের দেশের খুব বেশি লোক স্যাটেলাইট সুবিধা পায় না। সাধারণত শহরের উচ্চবিত্ত ও উচ্চ মধ্যবিত্ত শ্রেণীই স্যাটেলাইট সংযোগ নিয়ে থাকে এবং এদের সংখ্যা খুবই কম। এমতাবস্থায় কোম্পানিগুলোও টিভি চ্যানেলগুলোর অনুষ্ঠান স্পন্সর ও বিজ্ঞাপনদানের ব্যাপারে তেমন আগ্রহ দেখায় না।

পঞ্চমত, বেসরকারি টিভি চ্যানেলগুলো লাভের বিচারে অনেক সময় অবাঞ্ছিত বিজ্ঞাপন প্রচার করে থাকে। যেমন ধূমপানের বিজ্ঞাপন প্রচার জাতীয় স্বার্থে অনুচিত হলেও এরা নির্দ্বিধায় তা করে যাচ্ছে।

ষষ্ঠত, স্যাটেলাইট চ্যানেলগুলোর সার্বক্ষণিক অনুষ্ঠান প্রচার অনেক ক্ষেত্রে শিশু-কিশোরদের লেখাপড়ায় দারুণ ব্যাঘাত ঘটিয়ে থাকে।

**উপসংহার :** পরিশেষে বলা যায়, বিশ্বায়ন আর তথ্যপ্রযুক্তির এ প্রতিযোগিতামূলক বিশ্বব্যবস্থায় টিকে থাকার জন্য জাতিকে প্রস্তুত করতে গণমাধ্যম অতীব জরুরি। এক্ষেত্রে বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশে বেসরকারি গণমাধ্যমের সাহসী অভিযাত্রাকে অবশ্যই স্বাগত জানাতে হয়। বিশেষ করে অতি অল্প সময়ে বাংলাদেশে এক্ষেত্রে যে বিপ্লব ঘটেছে তা নিঃসন্দেহে গণমাধ্যমের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের ইঙ্গিতবহ।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



## রচনা ২৫ ডিশ এন্টেনার সুফল ও কুফল

## ডিশ সংস্কৃতির ভালোমন্দ

*[১৭তম বিসিএস]*

**ভূমিকা :** বর্তমান একবিংশ শতাব্দীতে বিজ্ঞান ও তথ্য-প্রযুক্তিতে অভাবনীয় অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। এ অগ্রগতির পেছনে রয়েছে যুগে যুগে আবির্ভূত বিভিন্ন মনীষীর কঠোর অধ্যবসায় ও নিরলস পরিশ্রম। ডিশ এন্টেনা মনীষীদের এহেন পরিশ্রমেরই ফসল। এর মাধ্যমে ঘরে বসে খুব সহজেই পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের টিভি চ্যানেলের অনুষ্ঠান উপভোগ করা যায়। তবে ডিশ এন্টেনার সহজলভ্যতার যেমন সুফল রয়েছে, তেমনি রয়েছে এর দীর্ঘমেয়াদি কুফল। তাই আজ বিশ্বব্যাপি ভাবনার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে যে, ডিশ এন্টেনার মাধ্যমে প্রচারিত অনুষ্ঠান মানবিক বিকাশ ও সভ্যতার উৎকর্ষে কতটুকু কার্যকর।

**স্যাটেলাইট ও ডিশ এন্টেনা :** ডিশ এন্টেনা মূলত স্যাটেলাইটের অনুষ্ঠান প্রচারের জন্য ব্যবহৃত বিশেষ এন্টেনা। এটি সাধারণ দেশীয় টিভিতে ব্যবহৃত এন্টেনার তুলনায় ভিন্নতর ও বড়। বর্তমানে মহাশূন্যে অসংখ্য স্যাটেলাইট স্থাপিত হয়েছে। এশিয়া অঞ্চলে স্থাপিত স্যাটেলাইটগুলোর অন্যতম হলো এশিয়া স্যাট। হংকংভিত্তিক এ স্যাটেলাইটটি বিষুব রেখা থেকে প্রায় ২২ হাজার মাইল ওপরে অবস্থিত এরকম অসংখ্য স্যাটেলাইটের মধ্যে একটি। এটি অক্ষরেখার সাথে ১০৫ ডিগ্রি কৌণিক অবস্থানে রয়েছে। এর পাশাপাশি অন্যান্য স্যাটেলাইটের মধ্যে রয়েছে ইন্দোনেশিয়ার তিনটি পালাপা, তিনটি চীনা স্যাট, রাশিয়ার দুটি, ইউরোপীয় ইন্টারন্যাশনাল ইনটেলস্যাট। এগুলো ঠিক ইকুয়েডরের ওপরে অবস্থিত। আর এশিয়া স্যাটের অবস্থান সিঙ্গাপুরের ওপর। হংকংয়ের ওয়াম্পাও গ্রুপ হাচিসানের সঙ্গে যৌথভাবে এ স্যাটেলাইটের মাধ্যমে অনুষ্ঠান প্রচার করে। একটি প্রাইভেট কোম্পানি স্টার টিভি এটির মালিক।

বাংলাদেশে ডিশ এন্টেনার ব্যবহার শুরু হয় ১৯৯২ সালে। বর্তমানে আমাদের প্রায় সব শহরেই ডিশ এন্টেনার ব্যবহার রয়েছে। এমনকি তা গ্রামাঞ্চলেও ক্রমান্বয়ে ছড়িয়ে পড়ছে। এই সম্প্রচার প্রচলন ক্যাবল (Cable) সংযুক্তির মাধ্যমে সম্ভব হচ্ছে। একটি ডিশ থেকে ক্যাবল সংযোগের মাধ্যমে পঞ্চাশ বা একশটি টিভি গ্রাহক স্যাটেলাইট টিভি চ্যানেলগুলো দেখতে পারে। তারা এককালীন ২০০০ টাকা এবং মাসে কমবেশি ২০০ টাকা ভাড়া দিয়ে ঘরে বসে স্যাটেলাইট নেটওয়ার্কের অনুষ্ঠানগুলো উপভোগ করে থাকে।

**ডিশ এন্টেনার সুফল :** ডিশ এন্টেনার প্রভাব ও পরিণতি নিয়ে ব্যাপক বিতর্ক থাকলেও ডিশ এন্টেনার যে ইতিবাচক প্রভাব রয়েছে তা অস্বীকার করার উপায় নেই। যেমন—

১. **দৃষ্টিভঙ্গির বিকাশ ও প্রসার :** বর্তমান তথ্যপ্রযুক্তির বিপ্লবের যুগে তা থেকে পালিয়ে বাঁচার উপায় খোঁজার অর্থ হলো নিজেকে বঞ্চিত করা। এ প্রেক্ষিতে ডিশ এন্টেনার প্রচলন থেকে দূরে থাকার অর্থ নিজের দৃষ্টিভঙ্গির প্রসারকে বাধাগ্রস্ত করা। বরং এর প্রচলন আমাদেরকে বিভিন্ন সমাজ, সভ্যতা আর সংস্কৃতির সাথে যেভাবে পরিচিত হওয়ার অপার সুযোগ সৃষ্টি করে, তা যে কোনো দেশের জনগণের দৃষ্টিভঙ্গির বিকাশ ও প্রসারের সুযোগ এনে দেয়। মানুষ তার নিজের সাথে অপরের যোগসূত্র ঘটিয়ে ভাবতে শিখে এবং বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে মানিয়ে নেয়ার উপযোগী করে নিজেকে গড়ে তুলতে পারে।



২. **বিশ্বায়নের বৃহত্তর প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ :** বিশ্বায়নের প্রভাবে মানুষ বিশ্বের আনাচে-কানাচে যেখানেই থাকুক না কেন তাকে অন্যান্য সমাজ, সভ্যতা ও সংস্কৃতির সংস্পর্শে আসতেই হচ্ছে। আর এটা তার নিজ স্বার্থেই প্রয়োজন। কেননা বিশ্বায়ন মানুষকে তার জ্ঞান-বিজ্ঞান, অভিজ্ঞতা, সম্পদ সবকিছুই অপরের সাথে সংশ্লিষ্ট হয়ে ভোগ বা বিতরণ করতে বাধ্য করছে। এমতাবস্থায় ডিশ এন্টেনার মাধ্যমে স্যাটেলাইটের সম্প্রসারিত প্রক্রিয়ায় অনুপ্রবেশ করলে মানুষ বিশ্বায়নের বৃহত্তর প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের সুযোগ পাবে। নতুবা জগতের স্বাভাবিক নিয়মে অন্যরা তাকে শোষণ করবে কিন্তু নিজের অজ্ঞতার কারণে সে কেবল শোষিতই হবে।

৩. **প্রতিযোগিতার মাধ্যমে সামর্থ্য অর্জন :** প্রতিযোগিতামূলক এ বিশ্বব্যবস্থায় মুখ লুকিয়ে রেখে বাঁচার উপায় নেই। বরং প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয়ে ঘাত-প্রতিঘাতের মাধ্যমেই সামর্থ্য অর্জন করতে হবে। এমতাবস্থায় নানা অজুহাত দেখিয়ে ডিশ এন্টেনার বিরুদ্ধে না দাঁড়িয়ে বরং স্যাটেলাইটের বৃহত্তর জগতে অনুপ্রবেশ করে অন্যান্য জাতি, গোষ্ঠী ও সংস্কৃতিসমূহের পাশে নিজের অবস্থান গড়ে নিতে চেষ্টা করাটাই বেশি বাস্তবসম্মত।

৪. **আন্তর্জাতিক বাজার ব্যবস্থায় অনুপ্রবেশ :** আজকাল স্যাটেলাইট প্রযুক্তি বিনোদনের চেয়ে অর্থনৈতিক উদ্দেশ্যেই বেশি ব্যবহৃত হচ্ছে। তাই ডিশ এন্টেনার মাধ্যমে স্যাটেলাইটের বৃহত্তর জগতে ব্যাপক অনুপ্রবেশের সুযোগ নিয়ে আন্তর্জাতিক বাজারে নিজেদের পণ্যের পসরা উপস্থিত করা যায়। এতে দেশীয় শিল্পগুলো রপ্তানিমুখী করারও সুযোগ সৃষ্টি হয়।

৫. **ইতিহাস-ঐতিহ্যের প্রচার ও প্রসার :** প্রতিটি জাতিরই নিজস্ব ইতিহাস ও ঐতিহ্য রয়েছে, যা অন্যান্য জাতির জন্য শিক্ষণীয়, অনুসরণীয় এবং প্রেরণাদায়ক হতে পারে। এগুলো ডিশ এন্টেনার মাধ্যমে নিজের জাতি ও দেশের বাইরে পৌঁছে দিতে পারলে বিশ্ব দরবারে নিজের যেমন মাথা উঁচু হয়, তেমনি অন্যান্য জাতি এবং জনগোষ্ঠীও উপকৃত হয়।

৬. **শিক্ষা বিস্তার :** শিক্ষা বিস্তারেও ডিশ এন্টেনার বিরাট ভূমিকা থাকতে পারে। এর মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীরা দেশ-বিদেশের বিভিন্ন বিষয়, শিক্ষাব্যবস্থা, পদ্ধতি ও আচার-আচরণ সম্পর্কে ধারণা লাভ করে নিজের একটা ভুবন তৈরি করতে শেখে। এতে শিক্ষার্থীর জ্ঞানের প্রসারতা ও অভিজ্ঞতার ক্ষেত্র বৃদ্ধি পায়।

৭. **বিনোদনের ক্ষেত্র প্রসার :** ডিশ এন্টেনার প্রচলনের মাধ্যমে বিনোদনের ক্ষেত্র অনেক দূর প্রসারিত হয়। দেশীয় সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের বাইরে অনুপ্রবেশের ফলে বিনোদনের সুযোগ বৃদ্ধি পায় এবং দেশীয় সংস্কৃতির সাথে বিনোদনের নতুন নতুন মাধ্যম ও উপকরণ যুক্ত হতে থাকে।

**ডিশ এন্টেনার কুফল :** আধুনিক সভ্যতা আর সংস্কৃতির অন্যতম বাহন হিসেবে ডিশ এন্টেনা ব্যাপকতর হলেও বিশ্বে, বিশেষত উন্নয়নশীল বিশ্বে এর নেতিবাচক প্রভাব নিয়ে নানা কথা হচ্ছে। নিম্নে ডিশ এন্টেনার কুফলসমূহ আলোচনা করা হলো :

১. **দেশীয় সংস্কৃতির ক্ষয়সাধন :** ডিশ এন্টেনা বিভিন্ন জাতি ও সম্প্রদায়ের সংস্কৃতিকে বিদেশী সংস্কৃতির সংস্পর্শে নিয়ে আসার ফলে অনেক ক্ষেত্রে দেশীয় সংস্কৃতি, ভাষা ও সাহিত্যের বিলুপ্তির মতো করুণ পরিণতি ভোগ করতে হচ্ছে। বিশেষ করে পশ্চিমা চাকচিক্যপূর্ণ প্রাণহীন সংস্কৃতি দেশীয় সংস্কৃতি ধ্বংসের জন্য মূলত দায়ী। প্রযুক্তির দখলদারিত্বের মাধ্যমে পশ্চিমারা সাংস্কৃতিক আধিপত্যের যে নীতি গ্রহণ করেছে তাতে উন্নয়নশীল দেশসমূহ তাদের দেশীয় সংস্কৃতিকে আর টিকিয়ে রাখতে পারছে না।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



২. **নৈতিক অধোগতি :** প্রতিটি সংস্কৃতিই একটা বোধ, বিচার আর নৈতিক মানদণ্ডের ওপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু ডিশ এন্টেনার ব্যাপকতায় বিদেশী সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের কবলে পড়ে দেশীয় সংস্কৃতির এ মৌলিক বৈশিষ্ট্য টিকে থাকছে না। বিশেষত পশ্চিমা খোলামেলা সংস্কৃতি অনেকটা সমাজ ও সামাজিক মানুষের জীবনবোধের সাথে বেমানান। তাই দেখা যায়, এসব সমাজের জনগণ তথা যুবশ্রেণীর মাঝে নৈতিক অবনতি চরম রূপ ধারণ করে এবং তা সামাজিক স্থিতিশীলতার জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়ায়।

৩. **পশ্চিমের ওপর নির্ভরশীলতা :** সত্তর ও আশির দশকে উন্নয়নশীল দেশগুলোর উন্নত দেশের ওপর নির্ভরশীলতার বিষয়ে যে তোলপাড় শুরু হয়েছিল তার একটি অন্যতম বিবেচ্য বিষয় ছিল সাংস্কৃতিক ও প্রযুক্তিগত নির্ভরশীলতা। ডিশ এন্টেনার ব্যাপক প্রচলনই এ নির্ভরশীলতাকে তীব্রতর করার অন্যতম মাধ্যম। কেননা এর মাধ্যমে একদিকে যেমন সাংস্কৃতিক স্বকীয়তা হারিয়ে উন্নয়নশীল দেশগুলো পশ্চিমের ওপর নির্ভরশীল হচ্ছে, তেমনি স্যাটেলাইট প্রযুক্তি আমদানির জন্যও পশ্চিমের ওপরই নির্ভর করতে হচ্ছে।

৪. **নব্য ঔপনিবেশিকতার ধারক :** স্যাটেলাইট প্রযুক্তিকে নব্য ঔপনিবেশিকতার অন্যতম মাধ্যম হিসেবে বিবেচনা করা যায়। কেননা ঔপনিবেশিক শাসনের অবসানের পর সাম্রাজ্যবাদীরা তাদের যে সকল নতুন কৌশল উদ্ভাবন করে তার মধ্যে সাংস্কৃতিক সাম্রাজ্যবাদ অন্যতম। এ সময় তারা অর্থনৈতিক প্রক্রিয়ার পাশাপাশি সাংস্কৃতিক বন্ধ্যাত্ব সৃষ্টির মাধ্যমে পুরনো কলোনিগুলোতে শাসন করার যে নীতি গ্রহণ করে তা দূর থেকে সম্ভব করছে এ স্যাটেলাইট প্রযুক্তি। তাই পশ্চিমারা এখন ভূমি দখলের চেয়ে আকাশ দখলের ব্যাপারেই বেশি আগ্রহী।

৫. **সংস্কৃতির পণ্যায়ন :** সংস্কৃতি মানুষের একান্তই নিজস্ব এবং প্রতিটি মানুষই তার নিজের সাহিত্য ও সংস্কৃতির মাঝে নিজের পরিচয় ও অস্তিত্বের সন্ধান পায়। কিন্তু ডিশ এন্টেনার ব্যাপক ব্যবহারের মাধ্যমে সাংস্কৃতিক আমদানি-রপ্তানির বাণিজ্য এতই প্রসারিত হয়েছে যে, সংস্কৃতি এখন আর মানসিক শান্তি ও আত্মিক প্রশান্তির খোরাক নয় বরং সংস্কৃতি এখন এক ধরনের পণ্যে পরিণত হয়েছে। সংস্কৃতির এ পণ্যায়ন বিশ্ব সভ্যতার আগামী দিনগুলোর জন্য একটি অশনি সংকেত।

৬. **নগ্নতার বিশ্বায়ন :** মানুষ ইতিহাসের অনেকগুলো ধাপ পেরিয়ে আজকের এ সভ্যতার পর্যায়ে উপনীত হয়েছে। আদিম যুগে মানুষ যখন পোশাক আবিষ্কার করেনি তখন তারা উলঙ্গ ছিল। কিন্তু সভ্যতার চূড়ান্ত পর্যায়ে এসেও উলঙ্গতাকে সভ্যতা বলে চালিয়ে দেয়ার যে অপপ্রয়াস তার অন্যতম আশ্রয় হচ্ছে ডিশ এন্টেনা। পশ্চিমাদের এ পশ্চাদপদতা এ মাধ্যমটির আশ্রয়ে আজ সভ্যতা বলে বিশ্বব্যাপী প্রচারিত হচ্ছে। নগ্নতার বিশ্বায়নের জন্য পশ্চিমারা আজ ডিশ এন্টেনাকে ব্যাপকভাবে ব্যবহার করছে।

৭. **পুঁজিবাদের মুখপাত্র :** ডিশ এন্টেনার মাধ্যমে বিবিসি, সিএনএন, এবিসি, স্টার টিভিসহ দেশী-বিদেশী চ্যানেলগুলো মূলত পুঁজিবাদের মুখপাত্র হিসেবেই ভূমিকা পালন করছে। এরা প্রতিনিয়ত পণ্যের বিজ্ঞাপন, পুঁজিবাদী শক্তিগুলোর প্রশংসা আর বাণী প্রচার করে পুঁজিবাদকে আরো স্ফীত এবং শোষণকে স্থায়ী করতে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে।

**উপসংহার :** উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, ডিশ এন্টেনার নেতিবাচক দিক থাকলেও আধুনিক সভ্যতার অন্যতম আবিষ্কার এ মাধ্যমটিকে উপেক্ষা করার কোনো উপায় নেই। কেননা বিশ্বায়ন আর প্রযুক্তি বিপ্লবের এ বিশ্বব্যবস্থা থেকে বেরিয়ে যাওয়ার অর্থ হলো নিজেকে সভ্যতা থেকে আলাদা করে রাখা। এটা কোনো জাতির জন্যই সুখকর নয়। কেননা তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর অর্থনৈতিক দারিদ্র্য আর রাজনৈতিক দেউলিয়াপনার সুযোগ পশ্চিমা দেশগুলো অনেক আগেই গ্রহণ করেছে। এবার তাদের সাংস্কৃতিক সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার পালা। সুতরাং তাদের উপেক্ষা করা অসম্ভব হলেও নিজের অস্তিত্বের খাতিরে সাংস্কৃতিক স্বকীয়তা বজায় রাখার ব্যাপারে প্রতিটি জাতি-গোষ্ঠীকেই সতর্ক থাকতে হবে। সেজন্য ডিশ এন্টেনা ওপর দেশীয় নিয়ন্ত্রণ আবশ্যক।

# বাংলাদেশ ও বহির্বিশ্ব

## রচনা ২৬ ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ক : একটি মূল্যায়ন

*[১৮-তম বিসিএস]*

**ভূমিকা :** বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্ক বাংলাদেশের বৈদেশিক নীতিতে একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। প্রতিবেশী রাষ্ট্র হিসেবে দেশ দুটোর সম্পর্কের ভিত্তি ঐতিহাসিক। বাংলাদেশ ও ভারত দুটি পৃথক রাষ্ট্র হলেও উভয় দেশের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে অপূর্ব মিল রয়েছে। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে ভারতের অবস্থান দেশ দুটোকে আরো কাছাকাছি নিয়ে এসেছে। এ সময় ভারতের সাধারণ মানুষ বাংলাদেশের মানুষের জন্য যে অপরিসীম ভালোবাসা ও সহমর্মিতা প্রকাশ করেছিল তা স্মরণযোগ্য। কিন্তু বিগত প্রায় সাড়ে তিন দশকে সীমান্ত এলাকায় বিএসএফের অসহিষ্ণু কার্যকলাপ এবং বেশ কিছু দ্বিপাক্ষিক সমস্যা বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্কে অনেকটা ফাটল ধরিয়েছে। এর ফলে বন্ধুপ্রতিম দুই দেশের সামগ্রিক সম্পর্কের অবণতি ঘটছে।

**বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্কের নানাদিক :** বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্কের নানাদিক নিম্নে উল্লেখ করা হলো :

১. **সীমান্ত সমস্যা :** বাংলাদেশ-ভারত সীমান্ত সমস্যার গোড়াপত্তন ১৯৪৭ সালে হলেও বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর এ সমস্যা প্রকট আকার ধারণ করে। শুধু ২০০০ সালের পর সীমান্তবর্তী বিভিন্ন এলাকায় বিএসএফের হাতে নিহত হয়েছেন প্রায় ১৫০০ সাধারণ মানুষ এবং বিডিআর সদস্য। বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তবর্তী এলাকায় যেসব বাংলাদেশী বসবাস করছেন তাদের নাগরিক অধিকারের সুযোগ-সুবিধাসহ মানবাধিকার লঙ্ঘিত হচ্ছে প্রতিনিয়ত। সীমান্ত এখন প্রায় সারা বছরই উত্তপ্ত থাকে। সেখানে 'উত্তেজনা, 'বাংকার খনন', 'রেড এলার্ট', 'ফ্ল্যাগমিটিং', 'ফাঁকা গুলি' এখন নিত্যদিনের ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। সীমান্তকেন্দ্রিক এসকল সমস্যা দু'রাষ্ট্রের মধ্যে দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কের ওঠা-নামাকে দারুণভাবে প্রভাবিত করে।

২. **বাংলাদেশ-ভারত আন্তর্জাতিক সীমানা রেখা ও সীমান্ত অঞ্চল :** বাংলাদেশের প্রায় চারপাশেই ভারত। বাংলাদেশের উত্তরপূর্বে আসাম, পশ্চিমে পশ্চিমবঙ্গ, পূর্বে আসাম ও ত্রিপুরা এবং দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর। ভৌগোলিকভাবে ভারতের সাথে বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক সীমানার পরিমাপ সবচেয়ে বেশি। ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক সীমানার দৈর্ঘ্য হলো ৪ হাজার ১৫৬ কিলোমিটার। এর মধ্যে স্থল সীমানা ৩ হাজার ৯৭৬ কিলোমিটার এবং জল সীমানা ১৮০ কিলোমিটার। ৬.৫ কিলোমিটার সীমানা এখনও চিহ্নিত হয়নি। মোট সীমানার মধ্যে ৪২ কিলোমিটার সীমানা নিয়ে ভারতের সঙ্গে এখন পর্যন্ত সমস্যা বিদ্যমান। এই ৪২ কিলোমিটারের মধ্যে ৩৫.৫ কিলোমিটার এলাকায় উভয়পক্ষ যৌথভাবে সীমানা চিহ্নিত করে বাঁশের খুঁটি বসিয়েছে। আর বাকি ৬.৫ কিলোমিটার সীমানা এখনও অচিহ্নিত রয়ে গেছে। সেজন্য মুহুরীর চর, লাঠিটিলা ও দুইখাতা এলাকার ওই অচিহ্নিত সীমানায় বাংলাদেশ-ভারত সীমান্ত রক্ষী ও স্থানীয় জনগণের মধ্যে বিরোধ লেগেই

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



আছে। এছাড়া পঞ্চগড়, রাজশাহী কুষ্টিয়া ও ফেনীসহ কয়েকটি এলাকায় ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের ৩৫.৫ কিলোমিটার এলাকা চিহ্নিত হওয়ার পর স্থায়ীভাবে কংক্রিটের সীমানা পিলার বসানো হয়নি। এর মূল কারণ ভারতীয় কর্তৃপক্ষের অসহযোগিতা। এর বাইরেও বাংলাদেশ এবং ভারতের মধ্যে রয়েছে বেশকিছু অদখলীয় জমি ও ছিটমহল, যা দুদেশের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টির অন্যতম কারণ।

৩. **বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তে উত্তেজনাপূর্ণ এলাকা :** বাংলাদেশ-ভারত আন্তর্জাতিক সীমানার প্রায় পুরোটা জুড়েই সারা বছর উত্তেজনা বিরাজ করে। তবে এর মধ্যে কিছু কিছু সীমান্ত এলাকা বেশি স্পর্শকাতর। এসব স্পর্শকাতর এলাকা দেশের উত্তরাঞ্চল, পূর্বাঞ্চল ও পশ্চিমাঞ্চলেই বেশি। এগুলো হলো :

– পঞ্চগড় জেলা সীমান্ত।
– ঠাকুরগাঁওয়ের বালিয়াডাঙ্গি ও হরিপুর সীমান্ত।
– দিনাজপুরের বিরল, ফুলবাড়ি, হিলি বন্দর ও বিরামপুর সীমান্ত।
– জয়পুরহাটের উচনা সীমান্ত।
– সাতক্ষীরার কলারোয়া, দেবহাটা ও কালীগঞ্জ সীমান্ত।
– চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা ও জীবননগর সীমান্ত।
– মেহেরপুরের গাংনী ও মুজিবনগর সীমান্ত।
– লালমনিরহাটের পাটগ্রাম সীমান্ত।
– চাঁপাইনবাবগঞ্জের শিবগঞ্জ, গোমস্তাপুর ও ভোলাহাট সীমান্ত।
– রাজশাহী জেলার পবা, গোদাগাড়ি ও চারঘাট সীমান্ত।
– কুড়িগ্রাম জেলার রৌমারী, ভুরুঙ্গামারী, রাজিবপুর ও নাগেশ্বরী সীমান্ত।
– ফেনী জেলার ফুলগাজি সীমান্ত।
– সিলেটের পাদুয়া, জকিগঞ্জ, বিয়ানীবাজার ও জৈন্তাপুর সীমান্ত।
– যশোরের বেনাপোল, শার্শা, ঝিকরগাছা সীমান্ত।
– ময়মনসিংহের হালুয়াঘাট সীমান্ত।
– নেত্রকোণার বাদামবাড়ি সীমান্ত।
– কুমিল্লার চৌদ্দগ্রাম ও বুড়িচং সীমান্ত।

৪. **সীমান্ত সমস্যার কারণ এবং দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে এর প্রতিক্রিয়া :** যে কোনো দেশের (স্থলভাগ, জলাভূমি, নদী, অরণ্য ও পাহাড়বেষ্টিত) সীমান্তরেখা সূচারুরূপে চিহ্নিত করা খুব জটিল এবং দুরূহ কাজ। এই জটিল কাজটি সম্পূর্ণরূপে সম্পন্ন না হওয়ায় সীমান্ত সংক্রান্ত নানা সমস্যার সৃষ্টি হয়। বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তের বেশ কয়েকটি সুনির্দিষ্ট সমস্যা দু দেশের সম্পর্কে অনেকটাই ফাটল ধরিয়েছে। এগুলো হচ্ছে–

ক. সীমান্তে জিরো লাইনের কাছাকাছি দেখামাত্র বিএসএফ-এর গুলিবর্ষণ।
খ. বিএসএফ সদস্যদের বাংলাদেশ ভূখণ্ডে অনুপ্রবেশ ও অসহনশীলতা।
গ. সীমান্তবর্তী বাংলাদেশী গ্রামে ভারতীয় দুর্বৃত্তদের হানা, ডাকাতি, লুটপাট, হামলা ও অপহরণ এবং কৃষকদের ক্ষেতের ফসল কেটে নিয়ে যাওয়া।
ঘ. ৬.৫ কিলোমিটার সীমানা (দুই খাতা, মুহুরির চর, লাঠিটিলা এলাকা) চিহ্নিত না হওয়া।
ঙ. তথাকথিত বাংলাভাষীদের বাংলাদেশ ভূখণ্ডে ঠেলে পাঠানোর চেষ্টা।



চ. বাংলাদেশ এবং ভারতের অভ্যন্তরে থাকা ১৬২টি ছিটমহলের সমাধান না হওয়া
ছ. স্থানীয় লোকজনের মধ্যে বিরোধ এবং ছিটমহলের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা।
জ. ভারত এবং বাংলাদেশের অভ্যন্তরে থাকা ৬ হাজার একরেরও বেশি অপদখলীয় জমি হস্তান্তর না হওয়া।
ঝ. চোরাচালানি নিয়ে দু দেশের সীমান্তরক্ষী বাহিনীর মধ্যে বিরোধ।
ঞ. ভারতীয় বিচ্ছিন্নতাবাদীদের বাংলাদেশে ঘাঁটি থাকার অভিযোগ।

এ সকল সমস্যা সমাধানের জন্য ১৯৭৪ সালে মুজিব-ইন্দিরা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল। বাংলাদেশ এ চুক্তি স্বাক্ষরের পর সংসদে তা অনুমোদন করে ভারতকে বেরুবাড়ি ছিটমহল হস্তান্তর করলেও ভারত এতদিনেও সে চুক্তি বাস্তবায়ন করেনি। চুক্তির ১৪ নম্বর অনুচ্ছেদ অনুযায়ী বাংলাদেশ তাৎক্ষণিকভাবে ভারতকে কয়েকটি ছিটমহল ছেড়ে দিলেও ভারত বাংলাদেশের দহগ্রাম-আঙ্গরপোতা ছিটমহল ব্যবহারের জন্য পাটগ্রাম থানার ১৭৮ × ৮৫ মিটার এলাকা (যা তিন বিঘা করিডোর নামে পরিচিত) সে সময় উন্মুক্ত করে দেয়নি। এ করিডোর নিয়ে ১৯৮২ সালে এরশাদ-ইন্দিরা চুক্তি হয়। চুক্তির শর্ত অনুযায়ী ভারত অনতিবিলম্বে বাংলাদেশী মুদ্রার ১ টাকা কর গ্রহণের মাধ্যমে তিন বিঘা করিডোর বাংলাদেশকে লিজ দিতে রাজি হয়। ১৯৯২ সালে বাংলাদেশের সাথে ভারতের আরেকটি চুক্তি হয় তিন বিঘা করিডোরের ব্যবহার বিধি নিয়ে। চুক্তি অনুসারে ১৯৯২ সালের ৬ জুন ভারত সরকার তিনবিঘা করিডোর দিয়ে ১ ঘন্টা পরপর চলাচলের জন্য সুযোগ দেয়।

৫. **সীমানা নির্ধারণ প্রক্রিয়া ও ছিটমহল সংক্রান্ত সমস্যা :** ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত সমস্যার আরেকটি অন্যতম কারণ হলো অপদখলীয় ছিটমহল। বাংলাদেশের সঙ্গে মিয়ানমারসহ ভারতের ৪৫১০ কিলোমিটার এলাকায় সীমানা জরিপ ও তা চিহ্নিত করার কাজ শুরু হয় ১৯৫২ সালে। মৌজা ম্যাপ অনুযায়ী সীমানা চিহ্নিত করতে বসানো শুরু হয় তিন ধরনের পিলার। দাগ নম্বর চিহ্নিত জমির সুবিধামতো স্থানে ৫ ফুট উঁচু কংক্রিটের তৈরি মেইন পিলার এবং দুই মেইন পিলারের মাঝে স্থাপন করা হয় আড়াইফুট উঁচু অনেক সাব পিলার। মৌজার প্রতিটি জমির দাগ নম্বরের পাশে বসানো হয় 'টি' পিলার। প্রাপ্ত হিসাব অনুযায়ী বাংলাদেশ সীমান্তে মেইন পিলার ও সাবপিলারের সংখ্যা ৫৫ হাজারের বেশি। 'টি' পিলারের সংখ্যা ১ লাখের অধিক।

স্বাধীনতার পর ভারত-বাংলাদেশের জরিপ কর্মকর্তারা সীমান্ত এলাকার প্রতি ১ মাইল জায়গার স্ট্রিপম্যাপ তৈরির মাধ্যমে সীমান্ত জরিপ করেছেন, যা এখনো শেষ হয়নি। সাতক্ষীরা এবং দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার মধ্যে সীমান্ত হিসেবে চিহ্নিত হাড়িয়াভাঙা নদীর মোহনায় প্রায় ৩০ বর্গ কিলোমিটার এলাকা নিয়ে জেগে ওঠা দক্ষিণ তালপট্টি দ্বীপটির মালিকানা দাবি করে ভারত। এতেও অনাকাঙ্ক্ষিত সমস্যার সৃষ্টি হয়।

৬. **ছিটমহলের খতিয়ান :** ভূমি জরিপ অধিদপ্তরের হিসাব অনুযায়ী ভারতের ভেতর বাংলাদেশের ছিটমহলের সংখ্যা মোট ৫১টি (লালমনিরহাট জেলার ৩৩টি ও কুড়িগ্রাম জেলার ১৮টি), যার মোট আয়তন ১১.৪৬৮০ বর্গমাইল (৭০৮৩.৫২ একর) এবং বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ভারতের ছিটমহলের সংখ্যা ১১১টি (লালমনিরহাট ৫৯টি, পঞ্চগড়ে ৩৬টি, নীলফামারীতে ৪টি এবং কুড়িগ্রামে ১২টি), যার আয়তন ২৬.৯৬৬ বর্গমাইল (১৭২৫৮.২৪ একর)।

ভারতের হিসাব মতে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ভারতের মোট ছিটমহল ১৩০টি। এর মধ্যে ১১৯টি হস্তান্তরযোগ্য এবং ১১টি অহস্তান্তরযোগ্য। অপরদিকে ভারতের ভেতর বাংলাদেশের মোট ছিটমহলে ৯১টি। এর মধ্যে ৬৮টি হস্তান্তরযোগ্য, ২৩টি অহস্তান্তরযোগ্য।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



**সীমান্ত সমস্যার সম্ভাব্য সমাধান :** সীমান্ত সমস্যা সমাধান বাংলাদেশ-ভারত উভয় দেশের জন্যই অত্যন্ত জরুরি। কেননা এর ফলে উভয় দেশই বিভিন্নভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। তাই এই অনাকাঙ্ক্ষিত সমস্যা সমাধানে নিচের পদক্ষেপগুলো নেয়া যেতে পারে :

১. ১৯৭৪ সালে স্বাক্ষরিত ইন্দিরা-মুজিব চুক্তি দ্রুত বাস্তবায়ন করতে হবে।
২. অদ্যাবধি অমীমাংসিত ৬.৫ কিমি. সীমান্ত দ্রুত চিহ্নিত করে এ ব্যাপারে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
৩. ভারতের আধিপত্যবাদী মনোভাব পরিত্যাগ করে বন্ধুসুলভ মনোবৃত্তি নিয়ে এ সমস্যা সমাধানে এগিয়ে আসতে হবে।
৪. ছিটমহল অধিবাসীদের সকল নাগরিক সুবিধা প্রদান করে মূল ভূ-খণ্ডে তাদের নির্বিঘ্নে যাতায়াত নিশ্চিত করতে হবে।
৫. দেশের মূল রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক স্রোতে ছিটমহলের অধিবাসীদের সম্পৃক্ত করতে হবে।
৬. দু দেশের সীমান্তরক্ষীদের এ ব্যাপারে পরম সহিষ্ণুতার পরিচয় দিতে হবে।
৭. চুক্তি বাস্তবায়নে দু দেশের কূটনৈতিক পর্যায়ে সর্বোচ্চ ভূমিকা পালন করতে হবে।

উল্লেখ্য, ছিটমহল সমস্যা সমাধানে বাংলাদেশ ও ভারতের আলোচনার অনেক দূর অগ্রগতি হয়েছে।

১. **পানিবণ্টন সমস্যা :** স্বাধীনতা লাভের পরই বাংলাদেশ প্রথম যে সমস্যার সম্মুখীন হয় তা হলো পানি বণ্টন সমস্যা। বাংলাদেশের সব নদীর প্রবাহই ভারতের ভেতর দিয়ে এসেছে বলে পানি প্রবাহের ক্ষেত্রে ভারতের ওপর এ দেশ নির্ভরশীল। ভারত ইচ্ছা করলেই বিভিন্ন নদীর প্রবাহের ওপর প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম। বাংলাদেশের জন্য নদীর পানি কৃষিকাজ, শিল্প-কারখানা, নদীপথে যাতায়াত ও প্রাকৃতিক ভারসাম্যের জন্য একান্ত প্রয়োজনীয়। কিন্তু ভারত বাংলাদেশের এই প্রয়োজনীয়তাকে মোটেই পাত্তা দেয় নি।

ভারত ফারাক্কা বাঁধ নির্মাণ করার ফলে পদ্মার প্রবাহ স্থবির হয়ে পড়ে। অথচ আন্তর্জাতিক নিয়ম অনুযায়ী কোনো দেশের মধ্য দিয়ে নদী অন্য দেশে প্রবাহিত হলে তার নিয়ন্ত্রণ সিদ্ধ নয়। ভারত এই নিয়ম মান্য করে প্রতিবেশী বাংলাদেশের মতো ছোট একটি দেশকে রক্ষা করার ক্ষেত্রে অগ্রসর হয়নি। যে ফারাক্কা বাঁধ নিয়ে এত বিতর্ক, বর্তমানে তা স্তিমিত হয়ে পড়লেও সম্প্রতি ভারত তার অভ্যন্তরস্থ নদীগুলোর প্রবাহ খাল কেটে অন্যদিকে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টায় অগ্রসর হওয়ার পর বাংলাদেশ আরো বিপন্ন হয়ে পড়েছে। বাংলাদেশের এ সম্পর্কিত প্রতিবাদ ভারতের মনঃপুত হয়নি।

২. **আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্প :** আগামী ৫০ বছরের ক্রমবর্ধমান পানির চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র এবং এর অববাহিকার সকল নদ-নদীর পানি বাঁধ, জলাধার ও সংযোগ খালের মাধ্যমে প্রত্যাহার করে ভারতের উত্তর ও উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে, এমনকি দক্ষিণের কাবেরি নদী পর্যন্ত টেনে নিয়ে খরাপীড়িত অঞ্চলে পানি সরবরাহের জন্য ভারত যে মহাপরিকল্পনা হাতে নিয়েছে তা-ই River Inter-linking Project বা আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্প নামে পরিচিত।

এই প্রকল্পের আওতায় ৩৭টি ছোট-বড় নদীকে ৩০টি খালের মাধ্যমে সংযোগ ঘটিয়ে ৭৪টি জলাধারে পানি সংরক্ষণ করে পানির প্রবাহ ঘুরিয়ে ভারতের উত্তর, উত্তর-পশ্চিম ও দক্ষিণাঞ্চলের খরাপ্রবণ রাজ্যগুলোতে বণ্টন করে কৃষিকাজে ব্যবহার করা হবে। ব্রহ্মপুত্র অববাহিকার পানি পশ্চিমবঙ্গ, উড়িষ্যা হয়ে দক্ষিণ ভারতের অন্ধ্রপ্রদেশ ও কর্ণাটক দিয়ে তালিমনাড়ুতে নিয়ে যাওয়া হবে। আর গঙ্গার পানি পৌঁছবে উত্তর প্রদেশ, হরিয়ানা, রাজস্থান এবং গুজরাটে। ১২০০ কিমি দীর্ঘ কৃত্রিম নদী সম্বলিত এই প্রকল্পের মাধ্যমে ভারত গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের এক-তৃতীয়াংশ পানি তথা ১৭৩ বিলিয়ন ঘনমিটার পানি সরিয়ে নিতে সক্ষম হবে।



ছোট-বড় মিলে বাংলাদেশে রয়েছে ২৩০টির মতো নদ-নদী। এগুলোর মধ্যে ৫৭টি হলো আন্তর্জাতিক—এর মধ্যে ৫৪টি এসেছে ভারত থেকে এবং বাকি তিনটি মিয়ানমার থেকে। বাংলাদেশের অবস্থান ভাটিতে হওয়ায় উজানে যে কোনো ধরনের পানি নিয়ন্ত্রণের প্রত্যক্ষ প্রভাব বাংলাদেশের ওপর পড়ে। কিন্তু ভারত বাংলাদেশের স্বার্থের দিকে ভ্রূক্ষেপ না করে দু দেশের অভিন্ন সম্পদ পানি নিয়ে ষড়যন্ত্র শুরু করে ১৯৫৬ সাল থেকে। কোলকাতা বন্দরের নাব্যতা বৃদ্ধির অজুহাতে ভারত পশ্চিমবাংলার মুর্শিদাবাদ জেলার রাজমহল ও ভগবান গোলার মাঝে ফারাক্কায় এক মরণবাঁধ নির্মাণ শুরু করে ১৯৫৬ সালে। রাজশাহী সীমান্ত থেকে ১৬ কিমি উজানে গঙ্গা নদীর ওপর নির্মিত এই বাঁধের কাজ শেষ হয় ১৯৬৯ সালে। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় এই বাঁধ চালু হওয়ার পর থেকে বাংলাদেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে মরুকরণ প্রক্রিয়া শুরু হয়। পানি সম্পর্কিত দ্বিপাক্ষিক স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য ১৯৭২ সালে গঠিত বাংলাদেশ-ভারত যৌথ নদী কমিশনের (Joint Rivers Commission) মাধ্যমে ভারতীয় নীতির প্রতিবাদ করেও বাংলাদেশের কোনো লাভ হয়নি। অতঃপর বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে ১৯৯৬ সালের ১২ ডিসেম্বর ৩০ বছর মেয়াদি গঙ্গার পানিবণ্টন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। কিন্তু এই চুক্তিতে কোনো গ্যারান্টি ক্লোজ না থাকায় বাংলাদেশ পানির ন্যায্য হিস্যা পাচ্ছে না। অধিকন্তু ভারত তার সাম্প্রতিক আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্পের মাধ্যমে বাংলাদেশের অস্তিত্ব ধ্বংসের ষড়যন্ত্রে মেতে উঠেছে। শুধু তাই নয়, ভারত সিলেট সীমান্তবর্তী বরাক নদীর ওপর পানি-বিদ্যুৎ উৎপাদন বাঁধ নির্মাণের মাধ্যমে সুরমা ও কুশিয়ারা নদীর পানি নিয়ন্ত্রণ করে দেশের পূর্বাঞ্চলকেও শুকিয়ে মারার পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে।

৩. **গ্যাস রপ্তানি বিতর্ক :** বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্কের অন্যতম সমস্যা হলো গ্যাস রপ্তানি সংক্রান্ত সমস্যা। বাংলাদেশে যে পরিমাণ গ্যাস রক্ষিত আছে তা বহির্বাণিজ্যের জন্য কোনো অংশেই অনুকূল নয়। অথচ গ্যাস রপ্তানির জন্য বাংলাদেশের ওপর অবিরাম চাপ সৃষ্টি করে বাংলাদেশকে অস্থিতিশীল এক পর্যায়ে ঠেলে দেয়া হয়েছে। সাম্রাজ্যবাদী শক্তি সব সময় চায় ছোট দেশগুলো দরিদ্র থেকে তাদের দয়ার ওপর নির্ভরশীল থাকুক। তাহলে ছোট দেশগুলোকে নিয়ে পুতুলের মতো খেলা করা সম্ভব হবে। বাংলাদেশ ভারতে তেল রপ্তানির ক্ষেত্রে সম্মত না হলে বিশ্বব্যাংক ও আন্তর্জাতিক অর্থ ফান্ড যে কোনো সময়ে তাদের ঋণ বন্ধ করে দিতে পারে। আমেরিকা তার দেশে বাংলাদেশের পোশাক রপ্তানি বন্ধ করে দিয়ে হাজার হাজার নর-নারীর জীবনে বেকারত্ব সৃষ্টি করতে সক্ষম।

৪. **মুক্তবাণিজ্য চুক্তি :** বাংলাদেশ ভারতের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে চলছে ভারসাম্যহীনতা। তার উপর সম্প্রতি বাংলাদেশকে পড়তে হচ্ছে আরেকটি নতুন সমস্যায় এই সমস্যাটি হলো ভারতের সঙ্গে মুক্ত বাণিজ্য সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করা। এক্ষেত্রে দেশের অর্থনৈতিক অবকাঠামো ও শিল্পোন্নয়নের দিকটি গভীরভাবে বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত নেয়া প্রয়োজন। তার কারণ, মুক্তবাণিজ্য সমশ্রেণীর দুটি দেশের মধ্যে প্রচলন যত সুবিধাজনক, অসম দুটি দেশের ক্ষেত্রে সেই সুবিধা আশা করা কঠিন। তাই বর্তমানে দেশের বিভিন্ন শিল্প-প্রতিষ্ঠান যে পণ্য উৎপাদন করে তা দেশের চাহিদা মেটাতে প্রায় সক্ষম। ভারতকে বাংলাদেশে মুক্তভাবে পণ্যের প্রবেশাধিকার দিলে বাংলাদেশের উৎপাদিত পণ্য অবিক্রীত থাকবে এবং তার ফলে শিল্প কারখানার যে ক্ষতি হবে তার প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়বে কারখানায় কর্মরত কর্মচারীদের ওপর।

৫. **ট্রানজিট ও ট্রান্সশিপমেন্ট :** বাংলাদেশ ভারতের তুলনায় ছোট দেশ হলেও ভৌগোলিক বিবেচনায় ভারত বাংলাদেশের নিকট একটি ক্ষেত্রে আটক রয়েছে। ভারতের যে পূর্বাঞ্চলীয় ৭টি রাজ্য রয়েছে এগুলো বাংলাদেশের ভূমি দ্বারা মূল ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন। এ সাতটি রাজ্য হলো ত্রিপুরা, আসাম, মেঘালয়, মণিপুর, মিজোরাম, নাগাল্যান্ড ও অরুণাচল। এ রাজ্যগুলোতে একদিকে প্রচুর

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



প্রাকৃতিক সম্পদ রয়েছে এবং সুষ্ঠু যোগাযোগ ব্যবস্থার অভাবে এ সকল সম্পদের যথাযথ ব্যবহার যেমন করা যাচ্ছে না তেমনি এ সকল অঞ্চলের যথাযথ উন্নয়নও সাধিত হচ্ছে না। তাছাড়া বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনের অস্তিত্ব প্রায় প্রতিটি রাজ্যেই সমানভাবে বিদ্যমান রয়েছে। এমতাবস্থায় বিচ্ছিন্নতাবাদ দমন, অভ্যন্তরীণ সহজতর এবং দ্রুত যোগাযোগ প্রতিষ্ঠার জন্য ভারত বাংলাদেশের ওপর দিয়ে এ সাতটি রাজ্য বা সেভেন সিস্টারসে যাওয়ার একটি ট্রানজিট দাবি করে আসছে দীর্ঘদিন ধরে। অন্যদিকে বাংলাদেশও তার ভৌগোলিক অখণ্ডতা ও সার্বভৌমত্ব এবং অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা বিঘ্নিত হওয়াসহ নানাবিধ আশঙ্কায় এ জাতীয় ভারতীয় দাবির প্রতি ইতিবাচক সাড়া দিতে পারছে না। ফলে যখনই ভারতের সাথে বাংলাদেশের কোনো দ্বিপাক্ষিক আলোচনার প্রশ্ন এসেছে ভারত তখনই এ বিষয়টিকে আলোচনার মূল এজেন্ডায় এনে দরকষাকষির চেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। ফলে এ বিষয়টিতে বাংলাদেশ ছাড় না দেয়ায় ভারত বাংলাদেশকে বেকায়দায় ফেলার নানা ফন্দি আঁটতে কখনোই ভুল করেনি।

৬. **পুশইন ও পুশব্যাক :** ভারতের আধিপত্য নীতি, সীমান্তে (বিজিবি) ও বাঙালি হত্যা এবং পুশইনের ঘটনা নতুন নয়। চলতি পুশইনের ঘটনাটি শুরু হয় ৭ জানুয়ারি ২০০৩ ভারতের উপ-প্রধানমন্ত্রী লালকৃষ্ণ আদভানির একটি বিতর্কিত বিবৃতির পর থেকেই। আদভানি ঐ বিবৃতিতে বলেন, ভারতে ২ কোটির মতো অবৈধ বাংলাদেশী রয়েছে। বলা হয়, ঐ সব বাংলাদেশী ভারতের জাতীয় নিরাপত্তার জন্য হুমকিস্বরূপ। তাই ভারত বাংলাভাষী মুসলিম নাগরিকদের বিভিন্ন সীমান্ত পয়েন্ট দিয়ে বাংলাদেশে ঠেলে পাঠাচ্ছে। উল্লেখ্য, পুশইনকে কেন্দ্র করে কয়েক বছর আগে ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ক খুব নাজুক অবস্থার মধ্যে নিপতিত হয়েছিল। ১৯৯২ সালে এই পুশইনের উৎপত্তি হয়েছিল।

**উপসংহার :** পরিশেষে বলা যায় যে, ভারতের সাথে বাংলাদেশের যে কয়টি বিবাদমান ইস্যু রয়েছে সেগুলো খুবই জটিল। এ বিষয়গুলোর সাথে জাতীয় নিরাপত্তা এমনকি স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের প্রশ্ন জড়িত। বিশেষ করে নদীর পানি বণ্টন, গ্যাস রপ্তানিসহ মুক্তবাণিজ্য এলাকা গঠনের মতো বিষয়গুলোতে সিদ্ধান্ত নিতে বাংলাদেশকে অত্যন্ত সতর্কতার সাথে পা ফেলতে হবে। বহিরাগত কোনো পরামর্শ বা চাপের কাছে অবনত হওয়ার অর্থ হবে জাতীয় স্বার্থকে বিকিয়ে দেয়ার নামান্তর। মোটকথা নিজ দেশের স্বার্থের কথা বিবেচনায় রেখেই ভারতের সাথে সম্পর্কের অগ্রগতির কথা ভাবতে হবে।

## রচনা ২৭ মানব সম্পর্ক উন্নয়নে বিশ্বায়ন

*[৩১তম বিসিএস]*

## বিশ্বায়ন বা গ্লোবালাইজেশন

*[২৯তম বিসিএস]*

**ভূমিকা :** জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অঙ্গনে বর্তমানে এক বহুল আলোচিত বিষয় 'বিশ্বায়ন'। ধারণাগত অর্থে বিশ্বায়ন বলতে বোঝায় 'বিশ্বের জ্ঞান-বিজ্ঞান, প্রযুক্তি-সংস্কৃতি, অর্থনীতি ও পরিবেশের তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক দৃষ্টিকোণ থেকে একই দিকে উত্তরণ।' উত্তর-দক্ষিণ ও পূর্ব-পশ্চিমের মধ্যে ঐক্য সৃষ্টি করাই এর মূল উদ্দেশ্য। তৃতীয় বিশ্বের একটি দেশ হিসেবে বাংলাদেশ বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ার একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। তাই বর্তমান প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশসহ অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশে বিশ্বায়নের প্রভাব সম্পর্কে পর্যালোচনা অত্যন্ত সময়োপযোগী একটি বিষয়।



**বিশ্বায়ন :** বিশ্বায়ন হলো পারস্পারিক ক্রিয়া ও আন্তঃসংযোগ সৃষ্টিকারী এমন একটি পদ্ধতি যা বিভিন্ন জাতির সরকার, প্রতিষ্ঠান এবং জনগণের মধ্যে সমন্বয় ও মিথস্ক্রিয়ার সূচনা করে। অন্যভাবে বলা যায়, বিশ্বায়ন হলো এমন একটি প্রক্রিয়া যার সাহায্যে রাষ্ট্রকেন্দ্রিক সংস্থাসমূহ বিশ্বজুড়ে আন্তঃরাষ্ট্রীয় সম্পর্ক গড়ে তোলে। বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশে বিশ্বায়ন বলতে বিশ্ব অর্থনীতির সাথে একাত্মতা বোঝায়। 'উৎপাদনের ক্ষেত্রে কোনো বাধা নয়, প্রতিবন্ধকতা থাকবে না শুল্ক ও বাণিজ্যে, একমাত্র মুক্ত বাণিজ্যেই জাতির অর্থনৈতিক উন্নয়নের সর্বোত্তম পন্থা'—এরূপ অর্থনৈতিক উদারীকরণের পথ ধরেই জন্মলাভ করেছে মুক্তবাজার অর্থনীতির ধারণা। দানা বেঁধেছে বিশ্বায়ন।

সুতরাং বিশ্বায়ন হলো দ্রব্য উৎপাদন, বিনিয়োগ ও প্রযুক্তির আন্তঃদেশীয় অবাধ প্রবাহ। এ সংজ্ঞায় বিশ্বায়নকে এমন একটি প্রক্রিয়া হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে, যা অর্থনৈতিক, তথ্যবিপ্লব, যোগাযোগ, প্রযুক্তি ইত্যাদি ক্ষেত্রে বিশ্বকে প্রভাবিত করে। সাধারণ অর্থনৈতিক দিক থেকে বিশ্বায়ন হচ্ছে সমগ্র বিশ্বকে একটি মাত্র বিশাল বাজারে একত্রীকরণ। এ ধরনের একত্রীকরণের মাধ্যমে বিভিন্ন দেশের মধ্যকার সকল প্রকার বাণিজ্যিক প্রতিবন্ধকতা দূরীভূত হয়।

**বিশ্বায়নের কারণ :** বিশ্বায়নের কারণ বহুবিধ। তবে সবচেয়ে বড় কারণ হচ্ছে মুনাফা অর্জন ও আর্থিক আধিপত্য বিস্তার। এক সমীক্ষায় দেখা যায়, গ্লোবাল কোম্পানিসমূহের সম্পদের এক বিশাল অংশই নিজ দেশের (Home country) বাইরে অবস্থিত এবং কোনো কোনো গ্লোবাল কোম্পানির বিক্রির সিংহভাগই অনুষ্ঠিত হয় বহির্বিশ্বে। বিশ্বায়নের অন্যান্য কারণসমূহ নিম্নরূপ :

১. **ছোট হয়ে আসছে পৃথিবী :** গতিশীল যোগাযোগ, উন্নত যাতায়াত ব্যবস্থা, ক্রমবর্ধমান আর্থিক সঞ্চালন এবং দ্রুত প্রযুক্তিগত উন্নয়নের ফলে সময় ও দূরত্বের ব্যবধান এতই হ্রাস পেয়েছে যে, একটি বৃহৎ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের পক্ষে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে বিচরণ বর্তমানে কোনো কষ্টসাধ্য ব্যাপারই নয়।

২. **দেশীয় বাজারের অপর্যাপ্ততা :** বৃহৎ কোম্পানিগুলোর কাছে নিজ দেশীয় বাজার ছোট ও অপর্যাপ্ত বলে প্রতীয়মান হতে পারে। যে সকল দেশের নিজস্ব বাজার খুবই ছোট সে সকল দেশে সৃষ্ট বৃহৎ কোম্পানি অচিরেই বহির্বিশ্বে বাণিজ্য প্রসার ঘটাতে বাধ্য হয়।

৩. **আকর্ষণীয় পণ্যের বাজার বিস্তৃতি :** যে কোনো আকর্ষণীয় পণ্যের বাজার সহজেই এক দেশ থেকে অন্য দেশে পরিব্যাপ্ত হয়। উদাহরণস্বরূপ কোকাকোলা বা টয়োটা গাড়ির কথা উল্লেখ করা যেতে পারে।

৪. **সস্তা শ্রম ও কাঁচামাল ব্যবহার :** উন্নত বিশ্বে শ্রম ও কাঁচামাল ব্যয়বহুল বিধায় অনেক বড় কোম্পানি গ্লোবাল কার্যক্রম গ্রহণের মাধ্যমে সস্তা শ্রম ও কাঁচামাল ব্যবহারের সুযোগ গ্রহণে আগ্রহী হয়।

৫. **বিক্রয় ও মুনাফা বৃদ্ধি :** অনেক ক্ষেত্রে হাইটেক শিল্প-কারখানা তাদের গবেষণা ও উন্নয়ন কাজে এত অর্থ ব্যয় করে যে, তাদের উৎপাদন ব্যয় সাশ্রয়ের জন্য বিক্রয় বৃদ্ধি অপরিহার্য হয়ে পড়ে। সেক্ষেত্রে দুনিয়াব্যাপী বাজার সম্প্রসারণে তৎপর হওয়া ছাড়া তাদের উপায় থাকে না।

৬. **বিনিয়োগের ঝুঁকি হ্রাস :** কোনো একক দেশে বিনিয়োগ অনেক সময় ঝুঁকিপূর্ণ বলে বিবেচিত হতে পারে। এরূপ ঝুঁকি এড়ানোর লক্ষ্যে বিভিন্ন দেশে বিনিয়োগ ও উৎপাদনের সিদ্ধান্ত সুফল বয়ে আনতে পারে।

৭. **পরিবহন ব্যয় হ্রাস :** অনেক কোম্পানি পরিবহন ব্যয় হ্রাসকল্পে বহির্বিশ্বে উৎপাদন সম্প্রসারণের সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকে। পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে পণ্য পরিবহন নিঃসন্দেহে ব্যয়সাধ্য। সুতরাং পরিবহন ব্যয় যাতে কোনো দেশে পণ্যের অযথা মূল্যবৃদ্ধির কারণ না ঘটায় সে লক্ষ্যে ঐ দেশেই বহুজাতিক কোম্পানিসমূহ পণ্যের উৎপাদন কার্যক্রম শুরু করে।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



৮. **বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার উদ্ভব :** World Bank, WTO, IMF, EEC, NAFTA, SAPTA, ASEAN ইত্যাদি আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সংস্থা গঠনের মাধ্যমে বিশ্বায়ন প্রক্রিয়া যে বহু গুণে ত্বরান্বিত হয়েছে তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

**বিশ্বায়নের ব্যাপ্তি :** বর্তমানে আমাদের জীবনযাত্রার প্রায় সকল ক্ষেত্রে বিশ্বায়নের বিস্তার ঘটেছে। বিশ্বায়নের বিস্তারকে নিম্নোক্তভাবে আলোচনা করা যেতে পারে :

১. **প্রযুক্তিগত বিশ্বায়ন :** শিল্প বিপ্লবের সময় থেকেই এই ধরনের বিশ্বায়ন শুরু হয়েছে। ঐ সময়ে যে সকল যুগান্তকারী যান্ত্রিক আবিষ্কার সাধিত হয় তার ফলে পৃথিবীর মানুষ পরস্পরের কাছাকাছি আসতে শুরু করে। যান্ত্রিক উৎপাদন থেকে যান্ত্রিক যাতায়াত ও যোগাযোগের সুফল ভোগ করতে মানুষ তৎপর হয়ে ওঠে। পৃথিবীর এক প্রান্তে তৈরি পণ্য অপর প্রান্তে সহজলভ্য হয়। আর এভাবেই ঘটে প্রযুক্তিগত বিশ্বায়নের বিস্তার।

২. **তথ্যগত বিশ্বায়ন :** এরূপ বিশ্বায়নের ইতিহাস বেশি দিনের নয়। বিগত দুই দশকে এর অভূতপূর্ব উন্নয়ন সাধিত হয়। যদিও প্রযুক্তির সাথেই এর সম্পর্ক তবু যোগাযোগের ক্ষেত্রে বহুমাত্রিক উন্নয়নের ফলে বর্তমান যুগকে বলা হয় তথ্যপ্রযুক্তির যুগ। তথ্য আদান-প্রদানে প্রযুক্তির ব্যবহার বিশ্বায়নের গতিকে বহু গুণে ত্বরান্বিত করেছে। ঘরে বসেই মুহূর্তের মাঝে সারা বিশ্ব পরিক্রমণ এখন আর কোনো দুঃসাধ্য ব্যাপার নয়। ইন্টারনেট, ই-মেইল, ই-কমার্সের বদৌলতে এখন ঘরে বসেই ব্যবসা-বাণিজ্য করা যাচ্ছে। তাই তথ্যপ্রযুক্তির বিস্ময়কর অগ্রগতিতে বিশ্বায়ন প্রক্রিয়া হয়েছে গতিময়।

৩. **অর্থনৈতিক বিশ্বায়ন :** প্রযুক্তিগত ও তথ্যগত বিশ্বায়নের ফলে অর্থনৈতিক বিশ্বায়ন আবির্ভূত হয়েছে মহীরুহ হয়ে। মূলধন লগ্নি, শ্রম নিয়োগ, উপকরণ স্থানান্তর, বাজার উন্নয়ন ইত্যাদি কর্মকাণ্ড এখন আর দেশের গণ্ডি মেনে চলছে না। বিশ্বব্যাংক, বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা, আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলসহ বহু আন্তর্জাতিক সংস্থা সমগ্র বিশ্বের অর্থনীতিকে যেভাবে প্রভাবিত করছে তাতে কোনো একটি দেশের পক্ষে আর বিচ্ছিন্ন থাকা সম্ভব নয়। উদাহরণস্বরূপ, শুধু ইন্টারনেটের বদৌলতে জ্ঞানভিত্তিক যে অর্থনীতি তৈরি হয়েছে তাতে ২০০০ সালে শুধু যুক্তরাষ্ট্রেরই আয় হয়েছে ৮৩০ বিলিয়ন ডলার। ভারত ২০০৮ সাল নাগাদ শুধু সফটওয়্যার রপ্তানি করে বছরে আয় করবে ৫০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার।

৪. **সামরিক বিশ্বায়ন :** আন্তঃমহাদেশীয় মিসাইল সিস্টেমসহ বিভিন্ন অত্যাধুনিক যুদ্ধাস্ত্র আবিষ্কারের ফলে পৃথিবীর যে কোনো দেশকে আগ্রাসনের শিকারে পরিণত করা বর্তমানে খুবই সহজ। আর এর ফলে দরিদ্র ও অনুন্নত দেশসমূহ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। বিশ্ব নিরাপত্তার নামে আমেরিকা-ব্রিটেন মহাশক্তি বর্তমানে যে কোনো সময় পৃথিবীর যে কোনো অঞ্চলে আগ্রাসন চালাতে সক্ষম।

৫. **পরিবেশগত বিশ্বায়ন :** মানুষের কর্মকাণ্ড, বিশেষত শিল্প ও সমরাস্ত্র সংক্রান্ত আচার-আচরণে পরিবেশগত ভারসাম্য বিনষ্ট হচ্ছে। বায়ুদূষণ, পানিদূষণসহ বিভিন্ন দূষণের কারণে গাছপালা, মাটি ইত্যাদি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। এক দেশের পরিবেশ দূষণের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে পার্শ্ববর্তী দেশসমূহ।

৬. **সামাজিক-রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিশ্বায়ন :** বিশ্বায়নের ফলে বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে সামাজিক-রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তন সাধিত হচ্ছে। তৃতীয় বিশ্বের দেশসমূহ অনেক ক্ষেত্রে অপসংস্কৃতির শিকারে পরিণত হচ্ছে। নিজেদের সামাজিক মূল্যবোধ অনেক ক্ষেত্রেই ভূলুণ্ঠিত হচ্ছে। বৃহৎ শক্তি যে রাজনৈতিক চাপ সৃষ্টি করছে তার ফলে সামাজিক-সাংস্কৃতিক আবহাওয়া পাল্টে যাচ্ছে।



**বিশ্বায়নের প্রভাব :** বিশ্বায়নের ধারণা ক্রমে পরিব্যাপ্তি লাভ করছে। বিশেষত অর্থনীতি ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে এর প্রভাব ব্যাপকাকারে ছড়িয়ে পড়ছে। বিশ্বায়নের প্রভাবকে ইতিবাচক ও নেতিবাচক এ দুভাবে আলোচনা করা যেতে পারে।

**বিশ্বায়নের ইতিবাচক প্রভাব :** জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নয়ন ও তথ্যপ্রযুক্তির দ্রুত প্রসারে আজ পৃথিবী যে সত্যি সত্যিই ছোট হয়ে আসছে তার প্রমাণ পেতে বেশি দূর যেতে হয় না। ঘরে বসেই কম্পিউটার ও ইন্টারনেটের বদৌলতে সমগ্র পৃথিবীর খোঁজখবর পাওয়া যায়। এ সবই বিশ্বায়নের ইঙ্গিত বহন করে। বিশ্বায়নকে তাই উপেক্ষা করা দুরূহ। বিশ্বায়নের ইতিবাচক প্রভাবসমূহ নিম্নরূপ :

১. **আন্তর্জাতিক সম্পর্ক উন্নয়ন :** বিশ্বায়নের প্রভাবে বিশ্বের দেশগুলোর মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক জোরদার হচ্ছে। অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রগুলো একে অপরের ওপর নির্ভরশীল হচ্ছে। বিভিন্ন মাত্রাভেদে এ পারস্পরিক নির্ভরতাই বিশ্বায়নের পক্ষে একটি বড় সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করছে। বিশ্বায়নের ফলে ইউরোপের দেশসমূহ ইতিমধ্যে এক হয়ে গেছে। ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত দেশসমূহের মধ্যে পাসপোর্ট ও ভিসা ব্যবস্থা উঠে গেছে। পাশাপাশি চালু হয়েছে একক মুদ্রা ইউরো। বাংলাদেশও বিশ্বায়নের প্রতি সাড়া দিয়েছে। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সহযোগিতামূলক জোট ও ব্যবস্থার সাথে একীভূত হচ্ছে। যেমন—সার্ক, সাফটা, বিসমটেকসহ বিভিন্ন গ্লোবাল ফ্রন্টের সক্রিয় সদস্য হচ্ছে বাংলাদেশ। এভাবেই বিশ্বায়নের প্রভাবে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের উন্নয়ন হচ্ছে।

২. **বৃহদায়তন কর্মকাণ্ডের সুবিধা :** বিশ্বায়নের ফলে যে বৃহৎ বাজার ব্যবস্থার ব্যাপ্তি হয়েছে, তাতে বৃহদায়তন উৎপাদন ও বিপণন সহজসাধ্য হয়েছে। এতে একদিকে হ্রাস পাচ্ছে উৎপাদন ব্যয়, অন্যদিকে বৃদ্ধি পাচ্ছে মুনাফার পরিমাণ।

৩. **ভৌগোলিক শ্রমবিভাগ ও বিশেষায়ন :** বিশ্বায়নের ফলে ভৌগোলিক শ্রমবিভাগ ও বিশেষায়নের ক্ষেত্র প্রসারিত হচ্ছে। ফলে প্রতিটি দেশ তার আপেক্ষিক সুবিধা অনুযায়ী উৎপাদনশীল কাজে নিয়োজিত থাকতে পারছে।

৪. **গ্লোবাল ভাবমূর্তি উন্নয়ন :** গ্লোবাল পণ্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরণের ফলে সর্বত্র পণ্যের একই রূপ ভাবমূর্তি সৃষ্টি হয়। এতে পণ্যের গ্রহণযোগ্যতা বাড়ে। উদাহরণস্বরূপ, বলা যেতে পারে, কোকাকোলা বা পেপসির এ জাতীয় গ্লোবাল ভাবমূর্তি তৈরি হয়েছে যার ফলে বিশ্বব্যাপী এদের গ্রহণযোগ্যতা রয়েছে।

৫. **জ্ঞান, দক্ষতা ও অভিজ্ঞতার স্থানান্তর :** কথায় বলে, 'Think globally, act locally' অর্থাৎ 'চিন্তা করুন বিশ্বব্যাপী, কাজ করুন কাছাকাছি'। বর্তমান বিশ্বে এর ব্যতিক্রম হচ্ছে না। বিশ্বের উন্নত দেশসমূহে যে জ্ঞান, দক্ষতা ও অভিজ্ঞতার উন্নয়ন সাধিত হচ্ছে তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে অন্যান্য দেশ সহজেই নিজেদের সমৃদ্ধ করতে পারছে। কারণ বিশ্বায়নের প্রভাবে বর্তমানে বিশ্ব জ্ঞানভাণ্ডার সকলের জন্যই উন্মুক্ত।

৬. **অবাধ বাণিজ্যের সুযোগ সৃষ্টি :** বিশ্বায়নের ফলে বিভিন্ন দেশের মধ্যে অবাধ বাণিজ্য সহজসাধ্য হয়েছে। ই-কমার্সের বদৌলতে আলাদা মাত্রা ও গতি সঞ্চারিত হয়েছে এ অবাধ বাণিজ্যে। পৃথিবীর এক প্রান্তে বসে অন্য প্রান্তের সাথে ব্যবসায়ের কাজ অতি দ্রুত সমাধা করা এখন কোনো কঠিন ব্যাপার নয়।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



৭. **আন্তর্জাতিক সংঘাত হ্রাস :** বিশ্বায়নের ফলে বিশ্বের দেশগুলো একে অপরের ওপর বিভিন্নভাবে নির্ভরশীল হয়ে পড়ছে। বর্তমানে কোনো দেশই নিজেকে আলাদাভাবে চিন্তা করতে পারে না। এতে যে বিশ্বায়নের বন্ধন রচিত হয় তা আন্তর্জাতিক সংঘাত হ্রাসে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

৮. **বিশ্বব্যাপী সুস্থ প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র তৈরি :** বিশ্বায়নের অর্থ নিজের সম্পদ বিশ্বের কাছে তুলে দেয়া নয়, বরং বিশ্বের সম্পদ নিজের কাজে লাগানো। এ কারণে পৃথিবীর যে দেশ যত উন্নত সে দেশ বিশ্বায়ন থেকে তত বেশি উপকৃত। বস্তুত বিশ্বায়নই পারে বিশ্বব্যাপী একটি সুস্থ প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র তৈরি করে সমগ্র বিশ্বকে একটি উন্নত 'বিশ্বগ্রামে' রূপান্তরিত করতে।

**বিশ্বায়নের নেতিবাচক প্রভাব :** বিশ্বায়নের নেতিবাচক প্রভাব লক্ষ্য করা যায় উন্নয়নশীল দেশসমূহে। এ কারণেই এসব দেশের কৃষক সম্প্রদায়, শ্রমিক শ্রেণী, সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী ইত্যাদি শ্রেণীর লোকেরা বিশ্বায়নবিরোধী আন্দোলনে রসদ যোগায়। নিচে বিশ্বায়নের নেতিবাচক প্রভাবসমূহ আলোচনা করা হলো :

১. **অর্থনৈতিক শোষণ ও মেধাপাচার :** মুক্তবাজার অর্থনীতির আওতায় বিশ্বায়ন উন্নত দেশের জন্য বিশ্বসম্পদের দ্বার খুলে দিলেও দরিদ্র বা পশ্চাৎপদ দেশের জন্য তা একটি বড় অভিশাপস্বরূপ। বিশ্বায়নের ফলে দরিদ্র দেশের মেধা ও সম্পদ অবাধে পাচার হচ্ছে ধনী দেশে। এতে গরিব দেশ হচ্ছে আরো গরিব, আর ধনী দেশ হচ্ছে আরো ধনী।

২. **অসম প্রতিযোগিতা বৃদ্ধি :** বিশ্বায়নের ফলে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মাঝে অসম প্রতিযোগিতা বৃদ্ধি পেয়েছে। যে সকল দেশের শিল্প ও শিল্পের অবকাঠামো দুর্বল সে সকল দেশ শিল্পোন্নত দেশের আগ্রাসনের শিকারে পরিণত হচ্ছে। শিল্পে পশ্চাৎপদ দেশসমূহের বহু শিল্প প্রতিযোগিতায় টিকতে না পেরে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। ফলে বেকার হচ্ছে লক্ষ লক্ষ শ্রমিক।

৩. **রাষ্ট্রীয় গোপনীয়তা রক্ষা কঠিন :** বিশ্বায়নের ফলে গরিবে দেশগুলোর পক্ষে তাদের রাষ্ট্রীয় গোপনীয়তা রক্ষা করাও একটি দুঃসাধ্য ব্যাপারে পরিণত হচ্ছে। ইন্টারনেট, ই-মেইল, ফ্যাক্স ইত্যাদির মাধ্যমে যে কোনো গোপনীয় দলিল, সংবাদ, তথ্য অতি দ্রুত বিদেশী প্রতিপক্ষের হাতে চলে যেতে পারে। এক্ষেত্রেও পশ্চাৎপদ দেশগুলোই মার খাচ্ছে ধনী দেশগুলোর কাছে।

৪. **শিক্ষাব্যবস্থায় বিপর্যয় :** বিশ্বায়ন শিক্ষা ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে গরিব দেশগুলোর বিরুদ্ধে আগ্রাসী ভূমিকা পালন করছে। উন্নত বিশ্বের শিক্ষা ও প্রযুক্তি উন্নত বিধায় অনুন্নত দেশসমূহকে তা থেকে উপকৃত হওয়ার ক্ষেত্রে একদিকে যেমন ব্যয় করতে হচ্ছে প্রচুর অর্থ, অন্যদিকে ভেঙে পড়ছে তাদের নিজস্ব শিক্ষাব্যবস্থা ও প্রযুক্তির ভিত্তি।

৫. **সাংস্কৃতিক বিপর্যয় :** বিশ্বায়নের ফলে সাংস্কৃতিক অঙ্গনেও তৈরি হচ্ছে এক নৈরাজ্যকর পরিস্থিতি। ধনী দেশসমূহের অপসংস্কৃতির শিকারে পরিণত হচ্ছে গরিব দেশের যুবশ্রেণী। ফলে উন্নয়নশীল দেশসমূহের নিজস্ব সংস্কৃতি ক্রমে বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে।

৬. **বেকার সমস্যা বৃদ্ধি :** বিশ্বায়নের ফলে উৎপাদন ব্যবস্থায় উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে তৃতীয় বিশ্বের অনেক দেশে শিল্প কারখানা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। ফলে এসব দেশে ভয়াবহ বেকারত্ব দেখা দিচ্ছে।



**বিশ্বায়ন ও বাংলাদেশ :** উন্নয়নশীল দেশগুলোতে সাধারণত বিশ্বায়নের নেতিবাচক প্রভাবই বেশি লক্ষ্য করা যায়। উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে বাংলাদেশও এর ব্যতিক্রম নয়। নিচে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো :

১. **বিদেশী পণ্যের প্রসার :** বাংলাদেশ বর্তমানে বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ার চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে। মুক্তবাজার অর্থনীতি আমাদের স্পর্শ করছে কিন্তু এর প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি লাভ করার মতো পরিবেশ বা উপাদানসমূহ বর্তমানে আমাদের দেশে পর্যাপ্ত পরিমাণে নেই। ফলে অবাধ বাজারের নামে বাংলাদেশ ক্রমান্বয়ে বিদেশী পণ্যের বাজারে পরিণত হচ্ছে।

২. **অসুসংহত বাজার কাঠামো :** বিশ্বব্যাংক, আইএমএফসহ দাতা গোষ্ঠীর বিভিন্ন কঠোর শর্ত আরোপের কারণে বাংলাদেশ দেশীয় মুদ্রা ও পুঁজির বাজারে কোনো সুসংহত কাঠামো অর্জন করতে পারেনি। ফলে দেশে রপ্তানির পরিমাণ প্রত্যাশিত মাত্রায় বাড়েনি। অন্যদিকে এ দেশে বৈদেশিক বিনিয়োগের পরিমাণ আশঙ্কাজনক হারে হ্রাস পেয়েছে।

৩. **নিম্ন মানব উন্নয়ন সূচক :** নোবেল বিজয়ী অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেনের মতে, 'মানব উন্নয়নকে বাদ দিয়ে কখনো বিশ্বায়ন সম্ভব নয়। যেসব দেশের মানব উন্নয়ন সূচক অত্যন্ত কম তারা বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ায় হুমকির সম্মুখীন হয়ে পড়বে।' বাংলাদেশে মানব উন্নয়ন সূচক নিম্ন অবস্থানে বিদ্যমান। তাই বর্তমান অবস্থায় বিশ্বের উন্নত দেশগুলোর সাথে তাল মিলিয়ে চলা বাংলাদেশের জন্য সত্যিই দুরূহ ব্যাপার।

৪. **ভারতের সাথে পণ্য প্রতিযোগিতায় ব্যর্থ :** বিশ্বায়নের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো কম দামে ভালো পণ্য উৎপাদন করে বাজার দখল করা। এক্ষেত্রে আমাদের পণ্য ভারতের কাছে মার খাচ্ছে। যেখানে একটি নির্দিষ্ট অংশের সাথে বাণিজ্যে বাংলাদেশ টিকতে পারে না, সেখানে বিশ্বায়নের ফলে অন্যান্য শক্তিশালী দেশের সাথে টিকে থাকা প্রায় অসম্ভব।

৫. **বিশ্ব অর্থনৈতিক বাজারে প্রবেশের তাগিদ :** উন্নত বিশ্ব বাংলাদেশকে বিশ্ব অর্থনৈতিক বাজারে প্রবেশের তাগিদ দিচ্ছে। অথচ অর্থনৈতিক বিশ্বায়নের ফলে এশিয়ার মুদ্রাবাজার ক্রমাবনতিশীল। উন্নয়নশীল দেশগুলোর মুদ্রাবাজারের পতনের পাশাপাশি এসব দেশের প্রধান প্রধান স্টক মার্কেটেও ধস অব্যাহত রয়েছে। এ ধরনের পরিস্থিতিতে অস্থিতিশীল অর্থনৈতিক কাঠামোবেষ্টিত বাংলাদেশ প্রতিযোগিতামূলক অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটে কতটুকু স্থায়িত্ব অর্জন করার ক্ষমতা রাখে তা চিন্তার বিষয়।

৬. **বিশ্বজনীন প্রতিযোগিতায় ব্যর্থ :** অর্থনৈতিক এবং প্রতিরক্ষার ক্ষেত্রেও বাংলাদেশ বিশ্বজনীন প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হবার সামর্থ্য অর্জন করতে পারেনি। চোরাচালানের মাধ্যমে ভারতীয় পণ্যের প্রবেশ বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বাজার ব্যবস্থা ও জাতীয় অর্থনীতিতে মারাত্মক বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করছে। তাই বাংলাদেশের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার মতো অর্থনৈতিক কাঠামো দাঁড় না করিয়ে বিশ্বায়নে অনুপ্রবেশ দেশের জন্য বুমেরাং হয়ে দেখা দেবে।

**বিশ্বায়নের ভবিষ্যৎ :** ভবিষ্যৎ সব সময় অনিশ্চয়তার। তারপরও কিছু কিছু ক্ষেত্রে যুগোপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণ করলে অনিশ্চিত ভবিষ্যৎকে সাফল্যমণ্ডিত করে তোলা অনেকাংশে সম্ভবপর হয়। বর্তমানে বিশ্বায়নের যে ধারা তাতে ধনী দেশগুলো ধনী হচ্ছে এবং গরিব দেশগুলো আরো বেশি গরিব হচ্ছে। এ অবস্থা থেকে উত্তরণ পেতে হলে ধনী দেশগুলোকে গরিব দেশগুলোর প্রতি আরো বেশি নমনীয় ও

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



সহনশীল হতে হবে, পাশাপাশি বাজার অর্থনীতিকে আরো বেশি সমাজনৈতিক ও কল্যাণমুখী হতে হবে। ধনী দেশগুলো উদার ও সহনশীল হলে বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ভবিষ্যতে নিম্নোক্ত সুবিধা পাওয়া যাবে :

১. অবাধ তথ্য-প্রযুক্তি বিনিময় করা যাবে;
২. কমদামে পণ্যভোগ করা যাবে;
৩. গরিব দেশের শিক্ষার্থীরা সহজেই উন্নত দেশের শিক্ষা গ্রহণ করতে পারবে;
৪. যোগাযোগ ব্যবস্থার অভূতপূর্ব উন্নতি ঘটবে;
৫. বিশ্বব্যাপী দারিদ্র্য হ্রাস পাবে;
৬. চিকিৎসা ব্যবস্থার উন্নতি হবে অর্থাৎ গরিব দেশগুলো সুচিকিৎসার আওতায় আসবে;
৭. আন্তর্জাতিক সম্পর্কোন্নয়ন ঘটবে;
৮. যুদ্ধের ধামামা হ্রাস পাবে;
৯. কূটনৈতিক উন্নয়ন ঘটবে;
১০. জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন ঘটবে ইত্যাদি।

**বিশ্বায়নের ক্ষেত্রে উন্নয়নশীল দেশগুলোর করণীয় :** বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশগুলোকে বিশ্বায়নের তীব্র প্রতিযোগিতা মোকাবিলা করে উন্নয়নের পথে এগিয়ে যেতে হলে কতগুলো নীতি-নির্ধারণী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। যেমন—

১. রাষ্ট্রকে ভৌত কাঠামো উন্নয়ন, বিশেষ করে তথ্যপ্রযুক্তির কাজে লাগে তেমন অবকাঠামো (যেমন—টেলিযোগাযোগ বা তথ্য-হাইওয়ে) উন্নয়নে সবিশেষ যত্নবান হতে হবে।
২. সামাজিক খাতে দক্ষ বিনিয়োগ করে যেতে হবে। অবহেলিত মানুষের কর্মক্ষমতা বাড়ানোর প্রয়োজনে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা খাতে বিনিয়োগ বাড়িয়ে যেতে হবে। এই বিনিয়োগ যাতে দক্ষভাবে খরচ হয় তার প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে। দারিদ্র্য নিরসনে বিশেষ যত্নবান হতে হবে।
৩. তথ্যপ্রযুক্তির উন্নয়নে উৎসাহ ও বিনিয়োগ বাড়িয়ে যেতে হবে। শিল্পায়নের স্থবিরতা দূর করে কৃষি ও প্রযুক্তিনির্ভর শিল্পায়নে মনোযোগ দিতে হবে। ক্ষুদে উদ্যোক্তা, বিশেষ করে শিক্ষিত বেকারদের কি করে প্রযুক্তিনির্ভর করা যায় সেদিকে নজর দিতে হবে।
৪. সুশাসন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে স্থানীয় শাসনের গুণগত মান বাড়াতে হবে।
৫. দুর্নীতিমুক্ত আইনের শাসন ও জবাবদিহিতাসম্পন্ন সরকারব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করতে হবে।
৬. পরিবেশ সচেতন কর্মপরিধি বাড়িয়ে রাষ্ট্রকে মানবিক উন্নয়নে নেতৃত্ব দিতে হবে।

**উপসংহার :** আধুনিক সভ্যতার গতিশীল চক্রের এক অবশ্যম্ভাবী ফল বিশ্বায়ন। তাই বিশ্বায়নকে নব্য উপনিবেশবাদ বলে ঠেকিয়ে রাখা যাবে না। বিশ্বায়নকে যত নেতিবাচক বিশেষণেই ভূষিত করা হোক না কেন, বিশ্বায়ন এগিয়ে যাবে তার আপন গতিতে। তাই এরূপ বৈশ্বিক প্রেক্ষাপট থেকে কোনো রাষ্ট্রই দূরে থাকতে পারে না। তবে পূর্বপ্রস্তুতি ছাড়া বিশ্বায়নের পথে অগ্রসর হলে তা বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য বিপর্যয় ডেকে আনবে। আর অর্থনৈতিক বিশ্বায়ন তখনই ফলপ্রসূ ও কার্যকর হবে যখন এর সুফল সর্বত্র সমানভাবে বণ্টন করা যাবে। এজন্য প্রয়োজন সুষম মানের সম্পদ উন্নয়ন, রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা অর্জন, সম্পদের সুষম বণ্টন ও স্বচ্ছ প্রশাসনিক কাঠামো। তবেই বিশ্বায়নের পথে বাংলাদেশের যাত্রা হবে ফলদায়ক।

# ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি

## রচনা ২৮ বিশ্বায়ন ও আমাদের সংস্কৃতি

*[৩০তম; ২৭তম; ২১তম; ১৩তম বিসিএস]*

**ভূমিকা :** বিশ্বায়ন মূলত একটি সর্বব্যাপী ও সার্বক্ষণিক চলমান প্রক্রিয়া। তথ্যপ্রযুক্তি ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের ব্যাপক প্রসারের ফলে পৃথিবীর প্রায় প্রতিটি মানুষই একটি একীভূত বিশ্বব্যবস্থায় মিলিত হচ্ছে। ক্রমেই লীন হচ্ছে ভৌগোলিক সীমারেখা ও চিন্তার ভিন্নতাসূচক স্বাতন্ত্র্যবোধ। মানুষ পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে বসবাস করলেও প্রত্যেকে প্রত্যেকের সাথে পরিচিত হওয়ার সুযোগ পাচ্ছে উন্নত যোগাযোগ নেটওয়ার্কের ফলে। তথ্যপ্রযুক্তির অবাধ প্রবাহের এ যুগে উন্নত সংস্কৃতি দুর্বল সংস্কৃতিকে গ্রাস করবে কি-না এ নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে বিশ্বব্যাপী। আমাদের সংস্কৃতি নিঃসন্দেহে অনেক গৌরবময় ঐতিহ্যের অধিকারী কিন্তু তা সত্ত্বেও বিশ্বায়ন আমাদের সংস্কৃতিতে কি প্রভাব বিস্তার করবে, সুদূরপ্রসারী কি পরিবর্তন ঘটবে তা এখনই ভেবে দেখার বিষয়।

**বিশ্বায়ন :** নব্বই-এর দশকের শুরুতেই সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর পরিবর্তিত বিশ্বব্যবস্থায় সারা বিশ্বে সবচেয়ে বেশি আলোচিত একটি বিষয় হলো বিশ্বায়ন। মার্শাল ম্যাকলোহান-এর মতে 'গ্লোবাল ভিলেজ'-এর অন্য একটি রূপই হচ্ছে বিশ্বায়ন। একে অভিহিত করা হয় এমন একটি প্রক্রিয়া হিসেবে, যা রাষ্ট্র ও সম্প্রদায়ের পুরোনো কাঠামো ও সীমানাকে অবলুপ্ত করেছে। বিশ্বায়নকে বলা হচ্ছে একটি সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক জীবনের ক্রমবর্ধমান পরাজাতীয়করণ (Transnationalization), যার ফলে সৃষ্টি হয়েছে এক বিশ্ব সীমানা, এক বিশ্ব সম্প্রদায়। এটি এমন একটি সর্বব্যাপী অভিজ্ঞতা যে আমাদের জীবনের অধিকাংশ দিকই এর আওতাভুক্ত হয়ে পড়েছে।

গিডেন্স (Giddens) বিশ্বায়ন প্রসঙ্গে বলেন, 'স্থানিক অভিজ্ঞতার মূলসূত্রই বদলে গেছে, নৈকট্য ও দূরত্ব পরস্পরের সাথে এমনভাবে একত্র হয়েছে যার তুলনা অতীত থেকে মেলা ভার।'

**বিশ্বায়নের সাম্প্রতিক ধারা :** বর্তমানে যে বিশ্বায়নের কথা বলা হচ্ছে তা মূলত পুঁজিবাদের সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বায়নের উপনিবেশবাদী চেহারা ছাড়া আর কিছু নয়। এর মাধ্যমে সম্পদশালী দেশগুলো তৃতীয় বিশ্বের ওপর অর্থনৈতিক নয়া উপনিবেশবাদ প্রতিষ্ঠা করে পুঁজিবাদের হাতকে শক্তিশালী করতে চায়। সুতরাং পুঁজিবাদের তথাকথিত বিশ্বায়ন থেকে স্বল্পোন্নত দেশগুলোর চাওয়া-পাওয়ার কিছুই নেই। এ কথাটি অর্থনীতির বেলায় যেমন প্রযোজ্য, সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও ঠিক একই রকম।

**সংস্কৃতি :** সংস্কৃতি শব্দটির অর্থ অত্যন্ত জটিল। সংস্কৃতির সাথে জীবনের নিগূঢ় সম্পর্ক আছে। সংস্কৃতিকে সুনির্দিষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত করা যায় না। সংস্কৃতি হলো মানুষের আচরণের সমষ্টি। মানুষের জাগতিক নৈপুণ্য ও কর্মকুশলতা, তার বিশ্বাস, আশা-আকাঙ্ক্ষা, কলা ও নৈতিকতা, রাজনীতি, ভাষা, মূল্যবোধ সবকিছুই সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত। সংস্কৃতি হচ্ছে সমাজের মানুষের অর্জিত জ্ঞান, বিশ্বাস, কলা,

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



নীতি, নিয়ম, সংস্কার ও অন্যান্য যে কোনো বিষয়ে দক্ষতার জটিল সমাবেশ। মোতাহের হোসেন চৌধুরী বলেন, 'সংস্কৃতি মানে সুন্দরভাবে বিচিত্রভাবে বাঁচা।'

সংস্কৃতি সম্পর্কে ম্যাথু আর্নল্ড বলেন, 'সংস্কৃতি আমাদের পরিচয় করিয়ে দেয় বিশ্বের সর্বোত্তম জিনিসগুলোর সঙ্গে এবং সে সঙ্গে মানুষের গৌরবময় ইতিহাসের সঙ্গেও।'

কালটাজার গ্রাসিয়ান বলেন, 'মানুষ জন্মায় বর্বর হয়ে, সংস্কৃতিই তাকে করে সুসভ্য।'

আবার শওকত ওসমান বলেন, 'সংস্কৃতি জীবনকে মোকাবিলার চেতনা।'

সুতরাং এক কথায় বলা যায়, সংস্কৃতি হলো চলমান জীবনের দর্পণ অর্থাৎ মানুষের দৈনন্দিন জীবন প্রণালীর গ্রহণযোগ্য চর্চা বা প্রথা যা কোনো সমাজের মানুষের পরিচয় বহন করে।

**আমাদের সংস্কৃতির ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকার :** সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য হলো মানুষের দীর্ঘদিনের আচার-আচরণ, কাজকর্ম, কথাবার্তা প্রভৃতির মাধ্যমে গ্রহণযোগ্য কোনো প্রথা বা উপাদান। আমাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের মধ্যে ধর্মীয় রীতিনীতি, উৎসব, লোকসাহিত্য, সংগীত, ঋতুভিত্তিক উৎসব, বিভিন্ন প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন, সামাজিক প্রথা, খেলাধুলা প্রভৃতি অন্তর্ভুক্ত। আমাদের সংস্কৃতি হাজার বছর ধরে তামাটে বাঙালিদের জীবন বোধের উপর গড়ে উঠেছে। জীবন ধারণের জন্য কৃষিকাজ, ঈশ্বর বিশ্বাসে ধর্ম-কর্ম, স্নেহ মাখা পারিবারিক বন্ধন, গ্রামীণ কবি সাহিত্যিকদের সৃষ্ট লোকসাহিত্য, গ্রামীণ সংগীত, জীবনঘনিষ্ঠ হরেক রকম উপাদান আমাদের সংস্কৃতিকে করেছে বৈচিত্র্যময়। সুলতানী শাসকগণ বিভিন্ন সাংস্কৃতিক চর্চা, ধর্মীয় চর্চাকে উৎসাহিত করতেন; মুঘল শাসকগণ গল্প, কবিতা, উপন্যাস রচনায় সাহিত্যিকদের উৎসাহ দিতেন। রাজদরবারে কবিতা, গল্প শোনার জন্য লেখকদের আহ্বান করতেন। ব্রিটিশ শাসনামলে ইংরেজি সংস্কৃতির সংস্পর্শে আসে বাংলা সংস্কৃতি। এরপরে পাকিস্তান আমলে আমাদের সংস্কৃতিতে রাজনৈতিক কারণে অস্তিত্বের ইস্যুছাড়া আর তেমন কোনো প্রভাব পড়েনি।

**বিশ্বায়ন ও সংস্কৃতি :** এক সংস্কৃতির মানুষের সাথে যখন অন্য সংস্কৃতির মানুষের সুসম্পর্ক গড়ে ওঠে, গড়ে ওঠে বন্ধুত্ব, ভ্রাতৃত্ববোধ, মমত্ববোধ ঠিক তখনই বিশ্বায়নের প্রশ্ন দেখা দেয়। সংস্কৃতি পারস্পরিক বিনিময়যোগ্য। এটি চিরদিন স্থির থাকে না। বিভিন্ন সংস্কৃতির সাথে মিশে এর রূপ পরিবর্তন হবে, নতুনত্বের আবির্ভাব ঘটবে এটাই স্বাভাবিক। বিশ্বায়নের মূল বিষয় হলো এক সংস্কৃতির আচার-অনুষ্ঠান, শিক্ষা, অর্থনীতি, রাজনীতি, ব্যবসা, বাণিজ্য, তথ্য-প্রযুক্তি, যোগাযোগ ব্যবস্থা, বিজ্ঞান-দর্শন, শান্তি ইত্যাদির সাথে অন্য সংস্কৃতির মিলন। তাহলে দেখা যাচ্ছে সংস্কৃতি বিশ্বায়নের তুলনায় একটি ক্ষুদ্র বিষয়। আর বিশ্বায়ন হলো কতগুলো সংস্কৃতির সমষ্টি। এ সামান্য পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও উভয়ের সাথে গভীর সম্পর্ক বিদ্যমান।

**সংস্কৃতিতে বিশ্বায়নের প্রভাব :** জ্যান নেডারভিন (Jan Nederveen) মনে করেন, বিশ্বায়ন স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্কৃতির সংমিশ্রণ ঘটিয়ে একটি সংকর সংস্কৃতি (Hybrid Culture) সৃষ্টি করবে। তিনি এর নাম দিয়েছেন 'তৃতীয় সংস্কৃতি'। এ নয়া সংস্কৃতি এখন স্থানীয় সংস্কৃতির সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত। Jayaweera-এর মতে, বিশ্বায়ন থেকে যে সামাজিক সম্পর্ক উদ্ভূত হয় তা গোটা বিশ্বকে ক্রমান্বয়ে একটা একক প্রধান অর্থনীতি, একক সরকার ব্যবস্থা এবং একক সংস্কৃতিতে সংহত করে।' বরং বিশ্বায়ন থেকে জাত এ নয়া সংস্কৃতি বিনোদন ও যৌনতার পৃষ্ঠপোষকতাই কেবল করে থাকে। দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য, সংস্কৃতির এ ধারা প্রায় সর্বাংশেই উন্নত থেকে স্বল্পোন্নত দেশের দিকে ধাবিত।



**বিশ্বায়ন ও আমাদের সংস্কৃতি :** বিশ্বায়নের তোড়ে আন্তঃব্যক্তিক ও আন্তঃরাষ্ট্রীয় যোগাযোগ বৃদ্ধির কারণে সাংস্কৃতিক যোগাযোগ বৃদ্ধি পেয়েছে। সাংস্কৃতিক যোগাযোগের ব্যাপকতায় পৃথিবীর বিভিন্ন সংস্কৃতির আদান-প্রদানও অনেক বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু ডিজিটাল ডিভাইড ও সুযোগের অভাবে পৃথিবীর অনেক সংস্কৃতিই প্রতিযোগিতায় উন্নত বিশ্বের সংস্কৃতির কাছে মার খাচ্ছে এবং সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য হারিয়ে বিদেশী সংস্কৃতির মাঝে বিলিন হয়ে যাচ্ছে। এ দুর্ভাগ্যজনক পরিস্থিতির শিকার হচ্ছে বিশেষত তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলো কারণ, নিজস্ব সংস্কৃতিকে তুলে ধরার যথেষ্ট সুযোগ না পাওয়ায় এসব দেশে অবাধেই বিদেশী সংস্কৃতির চর্চা হচ্ছে। বাংলাদেশও এই পরিস্থিতির শিকার। আমাদের শিশু ও যুবকদের মাঝে দেশীয় সংস্কৃতির প্রতি অবজ্ঞা আর বিদেশী সংস্কৃতির অন্ধ অনুকরণের যে সর্বনাশা প্রবণতা দেখা যাচ্ছে তা তাদেরকে উদ্দেশ্যহীন এক দুর্গম পথের যাত্রীতে পরিণত করেছে। ফলে ভেঙে যাচ্ছে হাজার বছরের ঐতিহ্যবাহী সামাজিক প্রতিষ্ঠান, মূল্যবোধ। আর নীতি-নৈতিকতার অবক্ষয়ে সমাজ কাঠামো আজ ধ্বংস প্রায়। বস্তুবাদী আর ভোগবাদী দৃষ্টিভঙ্গির প্রসার মানবিকতাবোধ ও বিচারকে ক্ষতবিক্ষত করেছে প্রতিনিয়ত। বিদেশী সংস্কৃতির প্রভাবে আমাদের সংস্কৃতি আজ বিপদাপন্ন।

**বিশ্বায়নের ক্ষতিকর প্রভাব :** বিশ্বায়ন আমাদের সংস্কৃতিকে এমনভাবে আঘাত করছে যে, এর প্রতিরোধহীন অবিরাম স্রোতে আমাদের দেশীয় সংস্কৃতির নাভিশ্বাস উঠেছে। পশ্চিমা চটকদার সংস্কৃতি আমাদের হাজার বছরের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের মূলে কুঠারাঘাত করেছে। ফলে আমরা আমাদের স্বকীয়তা হারিয়ে ক্রমেই সাংস্কৃতিক দৈন্যের দিকে ধাবিত হচ্ছি। ফলে এর প্রভাব পড়েছে সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে। নিচে বিশ্বায়নের ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা করা হলো :

১. **সমাজ কাঠামো ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানের উপর প্রভাব :** বিশ্বায়ন আমাদের সমাজ কাঠামো ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলোর গঠন ও প্রকৃতিতে ব্যাপক পরিবর্তন নিয়ে এসেছে। আবহমান বাংলায় যে সামাজিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ছিল তা এখন প্রায় অচল। বয়ঃজ্যেষ্ঠদের প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মানবোধ এখন নেই বললেই চলে। বিদেশী সংস্কৃতির স্রোতে ভাসমান আমাদের তরুণেরা অনেক বেশি স্বাধীনতা চায়। কিন্তু তারা জানে না যতটুকু স্বাধীনতা দরকার তার মাত্রা অতিক্রম করলে পথভ্রষ্ট হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে এবং আমাদের সমাজে তাই হচ্ছে। ফলে আমাদের তরুণ সমাজ আজ পথভ্রষ্ট।

২. **পরিবার ব্যবস্থায় প্রভাব :** সংস্কৃতির বিশ্বায়নে আমাদের পরিবার ব্যবস্থায় এসেছে বিকৃতি। এখন মানুষ যৌথ সংসারে তৃপ্তি পায় না, চায় স্বামী-স্ত্রীর একক সংসার। সন্তানদের কাজের লোকের দায়িত্বে রেখে পিতামাতা উপার্জন কিংবা সামাজিকতার স্বাদ আস্বাদন করছে। সন্তানের প্রতি পিতা-মাতার আন্তরিকতা ও স্নেহবোধ, দায়িত্ববোধ, আন্তরিকতার বন্ধন ধীরে ধীরে ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যাচ্ছে। একই সাথে বয়ঃবৃদ্ধ বাবা-মাকে দূরে বা নিভৃত পল্লীতে রেখে সন্তান বাইরে সুখ-খুঁজে বেড়াচ্ছে। এছাড়াও আমাদের পরিবার কাঠামো পারিবারিক জীবনের সুমধুর বন্ধনকে ছিন্ন ভিন্ন করে দিচ্ছে প্রতিনিয়ত। পশ্চিমা সমাজের বিবাহহীন অবাধ যৌনাচারের সংস্কৃতি ও পারিবারিক বন্ধনহীন বাউণ্ডুলের জীবনের বিকৃত ধারণা আমাদের হাজার বছরের পুরোনো পারিবারিক জীবনের ধারণাকে প্রায় পরাস্ত করে ফেলেছে।

৩. **সংগীত ও লোককাহিনীর উপর প্রভাব :** দেশীয় সংস্কৃতিতে অন্য একটি বিপর্যয় নেমে এসেছে আমাদের সংগীতের ক্ষেত্রে। আমাদের ঐতিহ্যবাহী সুরসম্ভার হারিয়ে যাচ্ছে বিজাতীয় সংগীতের প্রভাবে। আবদুল আলীম, আব্বাস উদ্দিনের কণ্ঠে পল্লী জীবনের যে হৃদয়গ্রাহী চিত্র ফুটে উঠত তা

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



এখন আর শোনা যায় না। ব্যান্ড সংগীতের নামে আমাদের নতুন প্রজন্মের শিল্পীরা সে চেচামেচির মহড়া দেয় তা মানুষের হৃদয়কে স্পর্শ করে না মোটেও। তথাপি একদল উঠতি যুবকের অবচেতন মনের দুর্বলতাকে পুঁজি করে এসবের বাজার দিন দিন গরম হচ্ছে। আগে যেখানে একতারা, দোতরা, সারিন্দা, তবলা, ঢোল এবং বাঁশির সুরে বাঙালির হৃদয় আকুল হতো, এখন গীটার আর কী বোর্ডের কর্কশ সুরের মাঝে তা খুঁজে পাওয়া যায় না। আগেকার দিনে বেহুলা-লক্ষীন্দর, কমলার বনবাস কিংবা আলোমতি প্রেমকুমারের যে যাত্রাগান পালাগান হতো এবং গ্রাম বাংলার মানুষ রাতভর প্রাণ ভরে উপভোগ করতো, তাও এখন আর দেখা যায় না।

৪. **পোশাক-পরিচ্ছদের উপর প্রভাব :** পোশাক-পরিচ্ছদে আমাদের নিজস্ব ঐতিহ্য ছিল। বিদেশী সংস্কৃতির ব্যাপক প্রসার ও চর্চা আমাদের ঐতিহ্যবাহী পোশাক-পরিচ্ছদে ব্যাপক পরিবর্তন এনেছে। জিন্স, টি-শার্ট, স্কার্ট এখন আমাদের ছেলেমেয়েদের খুবই প্রিয়। শাড়ি-লুঙ্গি কিংবা পাজামা-পাঞ্জাবি এখন আর তাদের তেমন প্রিয় নয়। আমাদের মেয়েদের অনেকেই স্বল্পবসনকে আধুনিক জীবনের নমুনা বলে ভুল করে। এমনকি পশ্চিমা সংস্কৃতির অন্ধ অনুকরণের ফলে তারা একদিকে যেমন আধুনিক জীবনের অচিন পাখিকে ধরতে পারে না, তেমনি দেশীয় সংস্কৃতির সাথেও নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারে না। ফলে তারা একটি দোদুল্যমান অবস্থায় পতিত হয় এবং অবশেষে জীবন হয়ে পড়ে লক্ষ্যহীন ও হতাশাপূর্ণ।

৫. **ভাষা ও সংলাপের উপর প্রভাব :** বিশ্বায়নের আর একটি প্রত্যক্ষ ও বাহ্যিক ধরন হলো আমাদের নতুন প্রজন্মের কথাবার্তার পরিবর্তন। অনুকরণপ্রিয় শিশুরা বাবা-মাকে বাংলা ভাষায় সম্বোধন না করে বিদেশী বিশেষত ইংরেজিতে পাপা-মাম্মী/মম ডাকতে আগ্রহী। কথায় কথায় অন্য ভাষার শব্দের ব্যবহার, বাংলা শব্দের বিকৃতি এখন প্রায়শ লক্ষ্য করা যায়।

৬. **চলচ্চিত্রের উপর প্রভাব :** বিদেশী চলচ্চিত্রের অশুভ প্রভাব পড়েছে আমাদের চলচ্চিত্রে। চলচ্চিত্রে এখন স্বল্প বসনা নারীদের পদচারণা খুব বেশি। শিল্পের ছোঁয়া নেই এসব অভিনয়ে। উত্তেজক দৃশ্যসমূহে শিহরিত হয় দর্শকবৃন্দ। বিদেশী চলচ্চিত্রে তরুণদের বিয়ার খাওয়ার দৃশ্য দেখে আমাদের তরুণেরা মাদকের নেশায় মত্ত। বিদেশী সংস্কৃতির মরণ ছোবল আমাদের যুব সমাজকে অপরাধপ্রবণও করে তুলেছে।

৭. **ব্যবসার উপর প্রভাব :** বিদেশী সংস্কৃতির অনুকরণে ব্যবসা ক্ষেত্রে যেসব নতুন বিষয়ের চর্চা শুরু হয়েছে তার মধ্যে একটি হলো শহর এলাকায় ক্যাট ওয়াক সংস্কৃতি। এর সাথে আমাদের সংস্কৃতির কোনোরূপ সম্পর্ক নেই। পাশ্চাত্য স্টাইলে নানা ফ্যাশন শো, পণ্যের বিজ্ঞাপনে মডেলদের ব্যবহার প্রভৃতি আমাদের সংস্কৃতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। প্রকৃতপক্ষে আমাদের সমাজের বিত্তবান ও অনুকরণপ্রিয় ব্যক্তিরা এসব সংস্কৃতিকে দেশীয় সংস্কৃতির উপর চাপিয়ে দিচ্ছে।

৮. **খাদ্যাভ্যাসের উপর প্রভাব :** বিজাতীয় সংস্কৃতির প্রভাবে আমাদের খাদ্যাভ্যাসের ক্ষেত্রেও পরিবর্তন সূচিত হয়েছে। কোনো খাবারের পুষ্টিমান বিবেচনা না করে টেলিভিশন চ্যানেলে খাবারের বিজ্ঞাপন প্রচারে আমাদের নতুন প্রজন্ম আগ্রহী হচ্ছে। এমন কি বড়দের ক্ষেত্রেও আত্মীয়স্বজন বেড়াতে এলে রকমারী পিঠা-পায়েস, গুড়-মুড়ির পরিবর্তে নুডুলস, চিপস বা বিজাতীয় সংস্কৃতির কোনো খাদ্য উপাদান দিয়ে আপ্যায়ন করা হচ্ছে।



৯. **ফার্স্ট ফুড :** আমাদের সংস্কৃতির নুতন সংযোজন হলো ফার্স্ট ফুড সংস্কৃতি। বর্তমানে তরুণ-তরুণীসহ শিশু কিশোর এমনকি বয়স্কদের মাঝেও এ সংস্কৃতির চর্চা হচ্ছে। এ চর্চাটি সাধারণত শহর এলাকায় দেখা যায়।

১০. **ধর্মীয় জীবন বোধ ও নৈতিক শিক্ষার উপর প্রভাব :** বিদেশী সংস্কৃতি আমাদের জীবনের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ দিককে চরমভাবে আঘাত করেছে, সেটি হলো আমাদের ধর্মীয় জীবনবোধ ও নৈতিক শিক্ষা। পশ্চিমা ভোগবাদী সংস্কৃতির ব্যাপক প্রচারের ফলে আমাদের ধর্মনিষ্ঠা এবং নৈতিকতাবোধ আহত হচ্ছে নিঃসন্দেহে। নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা, অবাধ যৌনাচার আর অ্যালকোহলিক সংস্কৃতি বিশেষ করে ইসলামী সংস্কৃতির বিরোধী। অথচ সুখী-সুন্দর ও শান্তিময় জীবনের জন্য এসব কিছুর চেয়ে ধর্মীয় জীবনের প্রয়োজনীয় অনুসরণ খুবই জরুরি। বিদেশী সংস্কৃতির প্রাবল্য আমাদের সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয়ে প্রধান অনুঘটক হিসেবে কাজ করছে।

১১. **উৎসবের উপর প্রভাব :** আমাদের সংস্কৃতির ওপর আর এক ভয়ংকর থাবা পড়েছে যা গ্রাস করেছে সম্ভাবনাময় তারুণ্যকে। থার্টি ফার্স্ট নাইট, ভ্যালেন্টাইন্স ডে. প্রভৃতি বিজাতীয় সংস্কৃতি তরুণ-তরুণীদের গ্রাস করেছে, তাদের সুকুমার বৃত্তিকে করেছে কলুষিত। বাঙালির পয়লা বৈশাখ, পয়লা ফাল্গুন তরুণ-তরুণীদের এতটা আলোড়িত করতে পারছে না।

**বিশ্বায়নের ইতিবাচক প্রভাব :** বিশ্বায়নের এ যুগে বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে গেলে দরজা বন্ধ করে ঘরে বসে থাকার কোনো উপায় নেই। অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক দিকের মতো সাংস্কৃতিক দিক থেকেও আন্তর্জাতিক সমাজের সাথে তাল মিলিয়ে চলার মতো উপযোগী করে নিজেদের গড়ে তুলতে হবে। এ ক্ষেত্রে আমাদের দ্বার বন্ধ করে ভ্রমরটাকে রোখার আগে দেখতে হবে খোলা জানালার বাইরে আমাদের জন্য কল্যাণের অনেক কিছুই আছে। সংস্কৃতি এমন কোনো জিনিস নয় যার কোনো পরিবর্তন করা যাবে না, বরং সমাজ ও জীবনের পরিবর্তন এবং সময়ের ধারায় এ সংস্কৃতি পরিবর্তিত হতে পারে। এমন কি অন্য কোনো সংস্কৃতির সংস্পর্শে এসে পারস্পরিক বিনিময়ের মাধ্যমে নিজেকে সমৃদ্ধ করতে পারে।

বিশ্বায়নের এ যুগে বিজাতীয় সংস্কৃতির সান্নিধ্য আমাদের চিন্তা-চেতনা ও দৃষ্টিভঙ্গির প্রসার ঘটিয়েছে নিঃসন্দেহে। এটি আমাদেরকে বিভিন্ন সংকীর্ণ ধ্যান-ধারণার পরিবর্তে বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে চিন্তা করার সুযোগ করে দিচ্ছে। বিভিন্ন বিদেশী সংস্কৃতির সাথে অবাধ মেলামেশার মাধ্যমে আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞানের বৃহত্তর রাজ্যে আমাদের অনুপ্রবেশ সহজতর হয়েছে। ফলে ধীরে হলেও আমরা ক্রমে আধুনিক জীবনের দিকে ধাবিত হচ্ছি। অনুপ্রাণিত হচ্ছি বিশ্বের বিভিন্ন জাতির ঈর্ষণীয় সংস্কৃতি দেখে।

বিশ্বায়ন আমাদের সংস্কৃতিকে বিদেশী সংস্কৃতির সংস্পর্শে যেমন নিয়ে গেছে, তেমনি এর ফলে আমাদের সংস্কৃতিও বিশ্ববাসীর কাছে তুলে ধরার সুযোগ হয়েছে। এর মধ্যেই আমাদের বেশ কয়েকটি স্যাটেলাইট চ্যানেল প্রতিষ্ঠিত হওয়ার কারণে আমাদের দেশীয় সংস্কৃতি চর্চার ক্ষেত্র অনেক সম্প্রসারিত হয়েছে।

**আমাদের করণীয় :** বর্তমানে এক পৃথিবীর বাসিন্দা হিসেবে বিশ্ব সাম্রাজ্যের বাইরে যাওয়ার কোনো উপায় আমাদের নেই। তাই এর মধ্যে থেকেই নিজেদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আর স্বার্থকে বাঁচিয়ে রেখে চলতে হবে। আর জটিল এ বিশ্বব্যবস্থায় চলতে হলে আমাদের আরো বেশি কুশলী হতে হবে। সেজন্য—

১. বিদেশী সংস্কৃতির দরজা বন্ধ করে নিজেদেরকে আরো বেশি প্রতিযোগিতার উপযোগী করে তুলতে হবে।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



২. দেশীয় সংস্কৃতিকে লালন আর বিদেশী সংস্কৃতির মোকাবেলায় টিকে থাকার জন্য দেশীয় সংস্কৃতিকে যুগোপযোগী করে তুলতে হবে।
৩. বিদেশী সংস্কৃতির অনুসরণ ও অনুকরণের ক্ষেত্রে আরো বেশি সজাগ হতে হবে।
৪. আমাদের সংস্কৃতিকে বিশ্বের সমগ্রপ্রান্তে ছড়িয়ে দেয়ার জন্য স্যাটেলাইট চ্যানেলের সংখ্যা বৃদ্ধিসহ অনুষ্ঠান সম্প্রচারে আরো বৈচিত্র্য আনয়ন করতে হবে।
৫. বিদেশী সংস্কৃতির নেতিবাচক প্রভাব সম্পর্কে আমাদের সচেতন হতে হবে। সেজন্য বিভিন্ন সংস্কৃতির উপযোগিতা সম্পর্কে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিচার বিবেচনার পর তা দেশে সম্প্রচারের অনুমোদন দিতে হবে।
৬. বিজাতীয় কুরুচিপূর্ণ সংস্কৃতি বন্ধের জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা চালাতে হবে।
৭. বিজাতীয় সংস্কৃতির প্রকাশই আভিজাত্যের পরিচায়ক তরুণদের এ ভ্রান্ত ধারণা ঘোচাতে হবে।
৮. সংস্কৃতি রক্ষার জন্য সরকারি পৃষ্ঠপোষকতার পাশাপাশি বেসরকারি পৃষ্ঠপোষকতা বৃদ্ধি করতে হবে।

**উপসংহার :** বিশ্বায়নের এ বিশ্বব্যবস্থা থেকে বেরিয়ে যাওয়ার অর্থ হলো নিজেকে সভ্যতা থেকে আলাদা করে রাখা। এটা কোনো জাতির জনই সুখকর নয়। এখন প্রশ্ন জাগে, তাহলে কি নিজস্ব সমাজ, সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে উপেক্ষা করেই বিশ্বব্যবস্থার সাথে তাল মিলাতে হবে? যদি তাই হয়, তাহলে এটাও অস্তিত্বের জন্য একটি মারাত্মক হুমকি। কেননা, তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলো অর্থনৈতিক সংকট ও রাজনৈতিক দেউলিয়াপনার সুযোগ উন্নত দেশগুলো অনেক আগেই গ্রহণ করেছে। এবার তাদের সাংস্কৃতিক সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার পালা। সুতরাং তাদের উপেক্ষা করা অসম্ভব হলেও নিজের অস্তিত্বের খাতিরে, নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার প্রয়োজনে সাংস্কৃতিক স্বকীয়তা বজায় রাখার ব্যাপারে আমাদের সতর্ক থাকতে হবে।

## রচনা ২৯ বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য

### বাংলাদেশের সংস্কৃতি ও তার রূপান্তর

*[১১তম বিসিএস]*

**ভূমিকা :** সংস্কৃতি সমাজ ও রাষ্ট্রের দর্পণস্বরূপ। প্রতিটি রাষ্ট্রেরই নিজস্ব সংস্কৃতি থাকে। এ সংস্কৃতিই বিশ্বের দরবারে একটি জাতির গৌরব-অগৌরবের জানান দেয়। কোনো দেশের সংস্কৃতির দিকে তাকালেই সে দেশের চেহারা উপলব্ধি করা সম্ভব। সুজলা-সুফলা-শস্য শ্যামলা সোনার বাংলায় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের কোনো কমতি নেই। বাংলার এ সংস্কৃতির ইতিহাস হাজার বছরের পুরনো। কালের পরিক্রমায় ফুলে-ফলে সুশোভিত হয়ে বর্তমান রূপ পেয়েছে আমাদের সংস্কৃতি। সময়ের পরিক্রমায় অনেক গ্রহণ, বর্জন, পরিবর্তন পরিমার্জনের মধ্য দিয়ে আমাদের সংস্কৃতিতে অনেক নতুন উপাদান যুক্ত হয়েছে, আবার হারিয়ে গেছে অনেক উপাদান।

**সংস্কৃতি কি :** সংস্কৃতি হলো মানুষের আচার-আচরণের সমষ্টি। মানুষের জাগতিক নৈপুণ্য ও কর্মকুশলতা, তার বিশ্বাস, আশা-আকাঙ্ক্ষা, নৈতিকতা, রাজনীতি, ভাষা, কলা, মূল্যবোধ সবকিছুই সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত। সংস্কৃতি হচ্ছে সমাজের মানুষের অর্জিত জ্ঞান, বিশ্বাস, কলা, নীতি, নিয়ম, সংস্কার ও অন্যান্য যে কোনো বিষয়ে দক্ষতার সর্বাধিক সমাবেশ। মোতাহের হোসেন চৌধুরী বলেন, 'সংস্কৃতি মানে সুন্দরভাবে, বিচিত্রভাবে বাঁচা।' সংস্কৃতি সম্পর্কে এমারসন বলেন, 'সংস্কৃতিই খুলে দেয় সুন্দরের চেতনার দরজা।'



**সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য :** সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য হলো মানুষের দীর্ঘদিনের আচার-আচরণ, কাজকর্ম, রীতিনীতির মাধ্যমে গ্রহণযোগ্য কোনো প্রথা বা উপাদান। বাংলাদেশের সংস্কৃতির রয়েছে গৌরবময় ঐতিহ্য। এখানে বাস করে মুসলমান-হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিষ্টানসহ আরো অনেক জাতি। এখানে প্রাণ খুলে তারা তাদের প্রাণের ভাষায় ধর্মীয় ও সামাজিক আচার অনুষ্ঠান পালন করে। একের অনুষ্ঠানে অন্যেরা হয় আমন্ত্রিত; একে অপরের সাথে ভাগ করে নেয় এ আনন্দ। আমাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের মধ্যে ধর্মীয় রীতিনীতি, উৎসব, লোকসাহিত্য, সংগীত, ঋতুভিত্তিক উৎসব, বিভিন্ন প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন, খেলাধুলা, সামাজিক প্রথা প্রভৃতি অন্তর্ভুক্ত। আমাদের সংস্কৃতির চর্চা হয় সুপ্রাচীন কাল থেকেই। বিভিন্ন সময়ে আমাদের সংস্কৃতিতে পরিবর্তন, পরিবর্ধন এবং সমৃদ্ধি এসেছে। মধ্যযুগে সুলতানী শাসনামলে আমাদের সংস্কৃতির বিকাশে প্রভূত অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। সুলতানী শাসনামলে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক চর্চা, ধর্মীয় চর্চাকে উৎসাহিত করা হয়। হোসেন শাহের আমলে শ্রী চৈতন্যদেব বৈষ্ণবধর্ম প্রচার করেন। মোগল শাসকগণ কবিতা, গল্প, উপন্যাস রচনার জন্য সাহিত্যিকদের উৎসাহ দিতেন, কবিতা, গল্প শোনার জন্য লেখকদের দরবারে আহ্বান করতেন। ব্রিটিশ শাসনামলে ইংরেজি সংস্কৃতির সংস্পর্শে আসে বাংলা সাহিত্য। পাকিস্তান আমলে রাজনৈতিক কারণে আমাদের সংস্কৃতিতে অস্তিত্বের ইস্যু ছাড়া আর তেমন কোনো প্রভাব পড়েনি।

**লোকসাহিত্য :** আমাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের অন্যতম উপাদান হলো লোকসাহিত্য। লোকসাহিত্যের ইতিহাস ও ঐতিহ্য হাজার বছরের পুরনো। বাংলা ভাষা সৃষ্টির প্রাথমিক যুগেই লোকসাহিত্যের জন্ম। সাধারণ মানুষের মনের কথা, মুখের কথা ভাষা ও ছন্দে বাণীবদ্ধ হয়ে এবং তা লোকমুখে প্রচারিত ও প্রচলিত হয়ে যে সাহিত্য সৃষ্টি হয় তাকে লোকসাহিত্য বলে। যে সাহিত্য লেখা হয়নি তালপাতার মূল্যবান গাত্রে, যে সাহিত্য পায়নি সমাজের উঁচু স্তরের সমাদর, যে সাহিত্য পল্লীর সাধারণ মানুষের কথা বলেছে গানে গানে, যে সাহিত্যের রচয়িতার নামও অনেক সময় হারিয়ে গেছে তাকে বলা হয় লোকসাহিত্য। এ সাহিত্য সাধারণ মানুষ ও পল্লীর আলোছায়া, ভালোবাসা ও স্মৃতিকে সম্বল করে বেঁচে আছে। লোকসাহিত্য পল্লীবাংলার সাধারণ মানুষের হৃদস্পন্দন। এ সাহিত্য পল্লীর মানুষের আনন্দকে ফুটিয়ে তুলেছে ফুলের মতো, বেদনাকে বাজিয়েছে একতারার সুরের মতো। এখানে আছে সরল অনুভবের কথা। এ সরলতাই সকলকে মোহিত করে। লোকসাহিত্য তাই পল্লীর মানুষের বুকের বাঁশরী। বাস্তব জীবনের ঘাত-প্রতিঘাত, আনন্দ-বেদনায় পল্লীর নিরক্ষর অথচ সহজ-সরল মানুষ গানের আসর জমিয়েছে, বাজিয়েছে প্রাণের বীণা। তাদের কর্মক্লান্ত অবসর মুহূর্তগুলো গ্রাম্য সুর মূর্ছনায় মুখরিত হয়ে উঠেছে। বুনো ফুলের স্নিগ্ধ সৌন্দর্যে মন মাতাল না হলেও তার বিহ্বল সৌন্দর্যে মন পুলকিত না হয়ে পারে না। তেমনি বাংলার লোকসাহিত্যের আছে স্নিগ্ধ মায়াময় সৌন্দর্য ও প্রাণের স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ। তাই পল্লীসাহিত্য এত চিরন্তন আবেদন মুখর ও বৈচিত্র্যময়। লোকসাহিত্য বড়ই বৈচিত্র্যময় ও চিত্তাকর্ষক। এর ভাণ্ডারও অনেক বড় ও বিশাল। অনেক রকম সৃষ্টি এখানে দেখা যায়। যেমন—

১. ছড়া : আগডুম বাগডুম ঘোড়াডুম সাজে
ঢাক-ঢোল ঝাঁঝর বাজে
অথবা, ছেলে ঘুমালো পাড়া জুড়ালো বর্গী এল দেশে
বুলবুলিতে ধান খেয়েছে খাজনা দেব কিসে।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



২. লোকসংগীত : মনমাঝি তোর বৈঠা নেরে
আমি আর বাইতে পারলাম না।

৩. গীতিকা : ভিনদেশী পুরুষ দেখি চাঁদের মতন
লাজরক্ত হইল কন্যার পরথম যৌবন।

৪. ধাঁধা : সবুজ বুড়ি হাটে যায়
হাটে গিয়ে চিমটি খায়।

উত্তর : লাউ।

৫. রূপকথা, উপকথা, ব্রতকথা : রাজরানীর গল্প, রাজকন্যা রাজকুমারের গল্প, রাক্ষস-খোক্কসের গল্প, দৈত্য-দানবের গল্প প্রভৃতি।

৬. প্রবাদ-প্রবচন : সবুরে মেওয়া ফলে
অথবা, অল্প বিদ্যা ভয়ঙ্করী।

৭. খনার বচন : কলা রুয়ে না কেটো পাত
তাতেই কাপড় তাতেই ভাত।

অথবা, যদি বরষে মাঘের শেষ,
ধন্য রাজার পুণ্য দেশ।

**ধর্মীয় রীতিনীতি :** বাংলাদেশসহ সমগ্র উপমহাদেশের সাংস্কৃতিক বিকাশের মূলে রয়েছে ধর্মের প্রভাব। বাংলাদেশের মানুষ বিভিন্ন ধর্মের অনুসারী। বিভিন্ন ধর্মের লোকজন একই সমাজে ধর্মীয় সম্প্রীতি বজায় রেখে বসবাস করছে। কোনো ধর্মের ধর্মীয় উৎসবে সকল ধর্মের লোক আনন্দ প্রকাশ করে। একের আনন্দে অপর ধর্মের লোক একাত্মতা প্রকাশ করে। এ দেশের মানুষ স্বাভাবিক ধর্মভীরু ও আনন্দ প্রকাশে স্বতঃস্ফূর্ত। তথাপি কিছু উগ্রপন্থী, সামাজিক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী ব্যক্তি, গোষ্ঠী ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান সংঘাত সৃষ্টিতে মাঝে মাঝে ইন্ধন যোগায় যা সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতির ধারাকে বাধাগ্রস্ত করে।

**সংগীত :** আমাদের সমৃদ্ধ সংগীতভাণ্ডার আমাদের সংস্কৃতির একটি গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহ্য। জারি, সারি, ভাটিয়ালি, ভাওয়াইয়া, মুর্শিদী, মারফতী, পালাগান প্রভৃতি গানের চর্চা হয় নিয়মিত। এছাড়া বিয়ের গান, ফসল তোলার গানের প্রচলন ছিল। গান এবং কথা ও অভিনয়ের সমন্বয়ে কবিগান, যাত্রাপালা দর্শক-শ্রোতাদের অফুরন্ত আনন্দ দান করতো। দেওয়ানা মদীনা, রহিম-রূপবান, চম্পাবতী, আলোমতি, বেদের মেয়ে, লাইলী-মজনু, শিরি-ফরহাদ, চণ্ডীদাস-রজকিনী প্রভৃতি যাত্রাপালার কাহিনী প্রাণভরে দেখতো। ঘুম পাড়ানী গান গেয়ে মায়েরা সন্তানদের ঘুম পাড়াতেন। তবে বর্তমান যুগের পরিবর্তনে এসব ঐতিহ্য হারিয়ে যেতে বসেছে। দেশের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মানুষ ভিন্ন স্বাদের গানের দিকে ঝুঁকে পড়েছে, যেগুলোর সাথে আমাদের সংস্কৃতির নৈকট্য নেই। বর্তমানে দেশীয় সংগীত চর্চা যেটুকু হচ্ছে তা প্রতিষ্ঠানকেন্দ্রিক। এক শ্রেণীর মানুষ আবার অশ্লীলতা মেশানো সংগীতের দিকে ঝুঁকে পড়েছে যা আমাদের জন্য মর্মপীড়ার কারণ।

**প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন :** সমগ্র বাংলার বিস্তীর্ণ জনপদে ছড়িয়ে থাকা প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনসমূহ আমাদের সংস্কৃতির প্রাচীন ঐতিহ্যের স্বাক্ষর বহন করে। আমাদের প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনসমূহের মধ্যে ঢাকার লালবাগ কেল্লা, বগুড়ার মহাস্থানগড়, কুমিল্লার আনন্দ বিহার, শালবন বিহার, ময়নামতির নিদর্শনসমূহ,



সোনারগাঁওয়ের নিদর্শনসমূহ, পাহাড়পুরের সোমপুর বিহার প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। ঢাকার লালবাগ কেল্লা, আহসান মঞ্জিল, ছোট কাটরা, বড় কাটরা, হোসনী দালান মুসলিম শাসনামলের নিদর্শন। নওগাঁ জেলার সোমপুর বিহার, জগদ্দল বিহার বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী পাল রাজাদের স্থাপত্য। এ স্থানদ্বয়ে হিন্দু ও বৌদ্ধ সভ্যতার নিদর্শন রয়েছে।

**উৎসব ও বাঙালি আমেজ :** হরেক রকমের উৎসব ও ঋতুভিত্তিক সাংস্কৃতিক জীবনধারা আমাদের জীবনকে আলোড়িত করে, রক্তে তোলে আশ্চর্য-উন্মাদনা। বাংলা নববর্ষ, ফাল্গুন তথা বসন্তের আগমন প্রভৃতি উৎসবে বাঙালি মেতে ওঠে নিজস্ব সাংস্কৃতিক অনুভূতির শিহরণে। বাংলা সাহিত্যের দুই প্রাণপুরুষ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও কাজী নজরুল ইসলামের জন্ম ও মৃত্যুবার্ষিকী ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে প্রতিপালিত হয়। ঋতুভেদে আমাদের সমাজে উৎসব বৈচিত্র্য পরিলক্ষিত হয়। হেমন্তকালে ঘরে ঘরে নতুন পিঠার আয়োজন, শীতকালে খেজুর রস ও পিঠা-পায়েসের আয়োজন বাংলার গ্রাম্য সংস্কৃতির একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। ফসল তোলার প্রাক্কালে নেচে গেয়ে আনন্দ করা, অনাবৃষ্টির সময় মেঘের গান গাওয়া, ভরা বাংলার নৌকা বাইচ প্রভৃতি ছিল গ্রাম বাংলার নিত্যদিনের চিত্র।

**কুটির শিল্প :** বাংলাদেশের ঘরে ঘরে কুটির শিল্প ছিল মানুষের কর্মের উৎস। কিন্তু বৃহৎ শিল্পের সাথে প্রতিযোগিতায় টিকতে না পেরে কুটির শিল্প আজ বিলুপ্ত প্রায়। তবে বেত, বাঁশ, পোড়ামাটির কাজ আজও টিকে আছে। শিক্ষিত সমাজের সচেতনতাই এই ঐতিহ্যকে বিপুল পৃষ্ঠপোষকতা দান করেছে। ঢাকার শাঁখার কাজ, রূপার তারের কাজ, টাঙ্গাইলের শাড়ি, জামালপুরের বাসন, সিলেটের শীতল পাটি প্রভৃতি ঐতিহ্যবাহী কারুকার্য এখনও দেশে-বিদেশে যথেষ্ট সমাদৃত হচ্ছে। এগুলো বাংলাদেশের গৌরবোজ্জ্বল সংস্কৃতির অনন্য দিক।

**খেলাধুলা :** গ্রামীণ খেলা আমাদের সংস্কৃতির ঐতিহ্য। তবে অনেক খেলা এখন হারিয়ে গেছে বা যাচ্ছে। শুকনো মৌসুমে দাঁড়িয়াবান্ধা, গোল্লাছুট, বর্ষা মৌসুমে হাডুডু খেলার বহুল প্রচলন ছিল এ দেশে। ভরা বর্ষায় নৌকাবাইচ ছিল এক চমৎকার বিনোদন। কিন্তু এসব সংস্কৃতির বেশির ভাগই আজ কালের গর্ভে নিমজ্জিত।

**পারিবারিক ও সামাজিক দিক :** আগের দিনে এ দেশের মানুষ পারিবারিক বন্ধনে সুখে শান্তিতে বাস করতো। কবি দ্বিজেন্দ্র লালের ভাষায়,

*'ভাইয়ের-মায়ের এমন স্নেহ*
*কোথায় গেলে পাবে কেহ।'*

কিন্তু যৌথ পরিবার প্রথা, সামাজিক বন্ধন ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হচ্ছে। মানুষ সুখে-দুঃখে অন্যের পাশে দাঁড়ানো ভুলে যাচ্ছে। যৌথ পরিবার প্রথা মানুষের মনে এখন আর সাড়া জাগায় না। তাই গ্রামাঞ্চলের অনেক ঘরে এখনো শোভা পায় কাপড়ে সেলাই করা নিম্নোক্ত ছন্দটি-

"ভাই বড় ধন, রক্তের বাঁধন
যদিও পৃথক হয় নারীর কারণ।"

তবে এটি সামাজিক বিবর্তনের একটি দিক। কিন্তু সামাজিক সহযোগিতা দিন দিন কমছে। নগরভিত্তিক পেশিশক্তির দৌরাত্ম্যের বিস্তৃতি, নষ্ট রাজনীতির প্রভাবে গ্রাম্য সমাজে অশান্তির ছায়া নেমে এসেছে। তবুও শান্তি প্রিয় মানুষ নিজেদের সামাজিক ঐক্য টিকিয়ে রাখার চেষ্টা করছে, পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে শান্তি প্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট রয়েছে।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



**উপসংহার :** সংস্কৃতি আমাদের সমাজ জীবনের প্রতিচ্ছবি। কোনো সমাজের কোনো সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য যখন দীর্ঘদিন ধরে সে সমাজের মানুষের জীবনযাত্রায় গ্রহণযোগ্যতা ধারণ করে টিকে থাকে তখন তা সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য হিসেবে প্রতিষ্ঠা পায়। কিন্তু বাংলার সংস্কৃতি আজ আর সে পূর্বতন অবিচ্ছিন্ন ধারায় নেই। আধুনিক ও বিদেশী সভ্যতায় মোহান্ধ হয়ে আমরা আমাদের স্বাভাবিক স্বতঃস্ফূর্ত জীবনধারাকে হারিয়ে ফেলতে বসেছি। তাই এখনই সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে রক্ষা করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ জরুরি।

## রচনা ৩০ বাংলাদেশের লোকশিল্প

*[১০ম বিসিএস]*

**ভূমিকা :** প্রাচীন কাল থেকেই বাঙালিরা মৌসুমী কাজের অবসরের ফাঁকে ফাঁকে হরেক রকমের কারুশিল্প সৃষ্টি করতো। এগুলোর মধ্যে সুচি শিল্প, তাঁত শিল্প, নকশিকাঁথা ও মসলিন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। গৃহিণীরা কাজের বিশ্রামে নকশিকাঁথা কিংবা নানারূপ কারুময় শিল্পকলা অনায়াসে সৃষ্টি করে ফেলতো। এসবের সুনাম বহুকাল আগেই বিদেশেও ছড়িয়েছে। আমাদের লোকশিল্প আমাদের সমৃদ্ধ ঐতিহ্যের পরিচায়ক।

**লোকশিল্পের পরিচয় :** লোকশিল্প সাধারণ লোকের জন্য সাধারণ লোকের সৃষ্টি। এর পরিধি এত ব্যাপক ও প্রকৃতি এত বিচিত্র যে, এককথায় এর সংজ্ঞা নিরূপণ করা যায় না। অগাস্ট প্যানিয়েলা (August panyella) বলেন, লোকশিল্পের কেবল 'শিল্প' শব্দ বোঝা কঠিন নয়, 'লোক' শব্দও সমান সমস্যাপূর্ণ। তাঁর ভাষায়, 'In the expression 'Folk art' it is not only the word 'art' that is difficult to understand, the word 'Folk' is equally problematic.'

Webster's New Collegiate Dictionary 'লোক'-এর ব্যাখ্যা এভাবে দিয়েছে : 'লোক' হলো সাধারণ মানুষের একটি বড় অংশ যারা গোষ্ঠীচরিত্র নির্ধারণ করে এবং সভ্যতা, আচার, বিশ্বাস, ঐতিহ্য, পুরাণ, চারু ও কারুশিল্পের বিশিষ্ট রূপকে বংশপরম্পরায় ধরে রাখে।

নৃতাত্ত্বিক অভিধানে 'লোক'-এর সংজ্ঞা দিয়েছে এভাবে : পুরাতন ঐতিহ্যের অংশীদার যেসব সাধারণ মানুষ, নৃতত্ত্বের পরিভাষায় তারাই Folk বা লোক নামে অভিহিত। আর 'শিল্প' হলো মানব মনের আনন্দিত উপলব্ধির বহিঃপ্রকাশ। শিল্প মানুষের সত্তার গভীরতম প্রকাশ।

বিশেষজ্ঞরা লোকশিল্পের সংজ্ঞা এড়িয়ে যান এ বলে যে, দেখলেই তাকে চেনা যাবে। 'Know it when you see it. Material will define itself if one would allow it to so.'

সবচেয়ে সহজলভ্য উপাদান মাটি থেকে আরম্ভ করে কাঠ, বাঁশ, বেত, পাতা, সুতা, লোহা, তামা-সোনা-রূপা, ধাতব দ্রব্য, সোলা, পাট, পুঁতি, ঝিনুক, চামড়া পর্যন্ত নানা উপাদান লোকশিল্প নির্মাণে ব্যবহৃত হয়। কামার, কুমার, ছুতার, তাঁতি, কাঁসারু, সোনারু, শাঁখারি, পটুয়া প্রভৃতি পেশাদার এবং অন্য অনেক অপেশাদার নর-নারী লোকশিল্পের নির্মাতা। এরূপ বিভিন্ন ও শ্রেণী প্রকৃতির লোকশিল্পের সংজ্ঞায়ন সত্যিই দুঃসাধ্য ব্যাপার। এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকায় এরই প্রতিফলন ঘটেছে। বিশেষজ্ঞরা বলেন, যদিও লোকশিল্পের সংজ্ঞা এখনো নির্ণয় করা হয়নি, তবু গোষ্ঠীবদ্ধ মানুষ যারা উন্নত সমাজের কাঠামোর মধ্যেই বিরাজ করে কিন্তু ভৌগোলিক অথবা সাংস্কৃতিক কারণে শিল্পের উন্নত ধারা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে, তাদের নির্মিত এই শিল্পকে লোকশিল্পরূপে বিবেচনা করা যায়, অবশ্য স্থানীয় চাহিদা ও রুচির কারণে এই শিল্প স্থানীয় বৈশিষ্ট্যসূচক রীতি ও বস্তুগুণ ধারণ করে।



লোকশিল্পের অপর একটি সংজ্ঞা দিয়েছেন হ্যারল্ড ওসবোর্ন (Harold Osborne)। তিনি লিখেছেন, আনুষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ পায়নি এমন কারুশিল্পী প্রথাগত যেসব বস্তু ও সরঞ্জাম প্রাত্যহিক জীবনের ব্যবহার, অলংকরণ, বিবাহ বা মৃতের সৎকারের কাজে তৈরি করে, সেসব শিল্পবস্তুকে লোকশিল্প বলে।

সুতরাং লোকশিল্পী পূর্বপুরুষের কাছ থেকে জ্ঞান আহরণ করে সমাজের মানুষের চাহিদা ও উপযোগিতার কথা বিবেচনায় রেখে মনের মাধুরী মিশিয়ে প্রথাগতভাবে যে শিল্প গড়ে, তাকেই লোকশিল্প হিসেবে আখ্যা দেয়া যায়।

**লোকশিল্পের শ্রেণীবিভাগ :** ফোকলোরের তিনটি প্রধান ধারা রয়েছে। যথা : মৌখিক (oral), বস্তুগত (material) ও অঙ্গক্রিয়াগত (performing)। লোকজ চারু ও কারুশিল্প একত্রে 'লোকশিল্প' নামে অভিহিত। লোকশিল্পের তিনটি প্রধান শাখা রয়েছে। যথা : চিত্র, ভাস্কর্য ও স্থাপত্য। প্রতি শাখার আবার নানা উপবিভাগ রয়েছে। উপকরণ, ক্যানভাস ও রীতি অনুযায়ী উন্নত শিল্পের মতো লোকশিল্পেরও নিম্নরূপ শ্রেণীকরণ করা যায় : ক. অঙ্কন ও নকশা, খ. সূচিকর্ম, গ. বয়নশিল্প, ঘ. আদর্শায়ন, ঙ. ভাস্করণ, চ. স্থাপত্যশিল্প।

নিচে উল্লিখিত শ্রেণীবিভাগ অনুযায়ী কয়েকটি লোকশিল্পজাত বস্তুর নাম, আধার, উপকরণ ও শিল্পীর নাম আলোচনা করা হলো :

**ক. অঙ্কন**

১. **আল্পনা :** বর্তমানে ধর্মীয়, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে আল্পনা আঁকা সাধারণ রীতিতে পরিণত হয়েছে। লোকশিল্পের এ ধারাটি শিক্ষিত সমাজেও উঠে এসেছে। লোকশিল্পের এটি একটি জনপ্রিয় শাখা, এতে রঙ-তুলির ব্যবহার আছে। চালের পিটালি দিয়ে সাদা, গোবর জল দিয়ে মেটে, কাঠ-কয়লা দিয়ে কালো, পোড়া ইটের গুঁড়া দিয়ে লাল বা খয়েরি ইত্যাদি দেশজ রঙ ও বাজারের কেমিক্যালজাত বিভিন্ন রঙ এ উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়। সাধারণত মেঝে, দেওয়াল, কুলা, পিঁড়ি, ঘরের খুঁটি, দুয়ার, পূজার বেদী, সরা, কলস, ঝাঁপি ইত্যাদি আধার বা পাত্রে আল্পনা আঁকা হয়।

২. **পটচিত্র :** পটচিত্র আর একটি মাধ্যম, যা এ দেশের লোকঐতিহ্যের সাথে জড়িত। আল্পনার রূপকার নারীসমাজ, পটচিত্রের রূপকার মূলত পুরুষ, তবে এর জটিল প্রক্রিয়ায় নারীরাও অংশগ্রহণ করে থাকে। এদিক থেকে পটচিত্র একটি যৌথশিল্প। পটুয়া নামের এক শ্রেণীর পেশাজীবী মানুষ পটচিত্রের নির্মাতা পটুয়াদের আদি পুরুষ 'মস্করী' বৌদ্ধ ছিল। তারা বুদ্ধকাহিনী পট বা কাপড়ে এঁকে তার সাহায্যে বৌদ্ধধর্ম প্রচার করত। মধ্যযুগে পটুয়ারা কৃষ্ণলীলা, রামলীলা, চৈতন্যলীলা কাপড়ে অথবা কাগজে চিত্রিত করে প্রচার করত। এটি তাদের জীবিকারও উপায় ছিল। এ যুগে গাজীর পট, মহরমের পট-এর সন্ধান পাওয়া যায়, যার পৃষ্ঠপোষক ছিল মুসলিম সমাজ। এভাবে পট হিন্দু-বৌদ্ধ-মুসলমান সব সম্প্রদায়ের কাছে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে।

৩. **উল্কি :** উল্কি লোকশিল্পের একটি স্থায়ী ধারা। বিশ্বের নানা জাতির মধ্যে শরীরের নানা অংশে উল্কি আঁকার ও ধারণ করার রীতি প্রচলিত আছে। আফ্রিকার কোনো কোনো উপজাতি প্রায় সারা অঙ্গেই বিচিত্র রূপের ও রঙের উল্কি পরে। উল্কি অঙ্কনে ধর্ম, চিকিৎসা, সংবাদ আদান-প্রদান, সৌন্দর্যচর্চা ইত্যাদি মনোভাব কাজ করে। আমাদের দেশে বৈরাগী-বোষ্টামীরা বাহুতে রাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্তির

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



উল্কি ধারণ করে। উপজাতিদের মধ্যে সাঁওতাল, ওঁরাও, মুরিয়ারা উল্কি পরে। তারা গোত্রধর্ম, পবিত্রতা ও সৌন্দর্যজ্ঞানে উল্কি ধারণ করে থাকে। উল্কি আঁকার জন্য পেশাদার নারী-পুরুষ আছে। উল্কি দেহে আজীবন থেকে যায়। বর্তমানে শহরের অনেক শৌখিন ছেলেমেয়ে ফ্যাশন হিসেবে অঙ্গে উল্কি ধারণ করে।

৪. **মুখোশচিত্র :** গ্রামবাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে মুখোশ তৈরি হয়। হাল্কা কাঠ, শোলা, মাটি, রঙ ইত্যাদি মুখোশ তৈরির উপকরণ। গাজন-নৃত্যে শিবের, কালী-নৃত্যে কালীদেবীর মুখোশ পরার রীতি হিন্দু সমাজে প্রচলিত আছে। দেবতার মুখোশে দেবভাব, মানুষের মুখোশে মানবভাব, জীবজন্তুর মুখোশে পশুভাব, ভূত-প্রেতের মুখোশে বীভৎসভাব ফুটিয়ে তোলা হয়। এ ধরনের মুখোশে নৃত্যাভিনয়ের চেতনামিশ্রিত থাকায় লোকশিল্পী কিছুটা সৌন্দর্যসৃষ্টির প্রয়াস পান।

৫. **শখের হাঁড়ি :** লোকশিল্পীদের কাজ বিশদ এবং বহুল। তারা হাঁড়ি গড়েন, সরা তৈরি করেন, সেই হাঁড়ি ক্ষেত্র বিশেষে শখের হাঁড়ি, সেই সরা ক্ষেত্র বিশেষে লক্ষ্মীর সরা। কোনো কোনো গ্রামাঞ্চলে মাটির সরাতে লক্ষ্মী-রাধাকৃষ্ণ-গাজীর মূর্তি ও মহরমের ঘটনা চিত্রিত করা হয়। এতে পটের অনুরূপ রঙ-তুলির ব্যবহার আছে। শখের হাঁড়িতে ফল, ফুল, ফসল, বসতি, জনপদ ইত্যাদির চিত্র ফুটিয়ে তোলা হয়।

৬. **পুতুলচিত্র :** ছুতার, কুমার, মালাকার এবং গৃহস্থ বালিকারা রঙ এবং রঙিন সুতার সাহায্যে পুতুলচিত্র তৈরি করে। পুতুলচিত্র তৈরির উপকরণ হলো কাঠ, কাপড়, মাটি, শোলা ইত্যাদি।

৭. **খেলনাচিত্র :** গ্রামবাংলার গৃহস্থ নরনারীরা কাঠ বা মাটিনির্মিত খেলনার ওপর রঙের সাহায্যে বিভিন্ন চিত্র এঁকে খেলনাচিত্র তৈরি করেন।

**খ. বয়নশিল্প**

১. **নকশি পাটি :** নকশি পাটি বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী লোকশিল্প। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের লোকশিল্পীরা রঙিন বেত দিয়ে অত্যন্ত সুন্দর ও চমৎকার নকশি পাটি তৈরি করে থাকেন।

২. **নকশি শিকা :** বাংলাদেশের গ্রামীণ অঞ্চলের নারীদের কাছে অত্যন্ত জনপ্রিয় আরেকটি বয়নশিল্প হলো নকশি শিকা। গৃহস্থ রমণীরা পাট বা সুতার জো-এর ওপর পাট, সুতা, পুতি, কড়ি ইত্যাদির সাহায্যে নকশি শিকা তৈরি করেন। এই নকশি শিকায় গ্রামবাংলার নারীরা বিভিন্ন জিনিসপত্র সাজিয়ে রাখেন।

৩. **নকশি পাখা :** গ্রামবাংলার আরেকটি ঐতিহ্যবাহী বয়নশিল্প নকশি পাখা। গৃহস্থ নারীরা অত্যন্ত শখ করে পাতা বা সুতার টানার ওপর রঙে রঙিন সুতা এবং পাটের মাধ্যমে নকশি পাখা তৈরি করেন।

৪. **ঝুড়ি, কুলা-ডালা, ফুলচাঙ্গা :** এ দেশের ঐতিহ্যবাহী বয়নশিল্পের অন্যতম হলো বেত ও বাঁশের জো-এর তৈরি ঝুড়ি, কুলা-ডালা ও ফুলচাঙ্গা। ঝুড়ি এবং কুলা-ডালা তৈরি করে যে সকল লোকশিল্পী তাদেরকে ডোম জাতি বলা হয়। আর সাধারণত গৃহস্থ রমণীরা ফুলচাঙ্গা তৈরি করে।

**গ. সূচিকর্ম**

১. **নকশি কাঁথা :** নকশি কাঁথা নিঃসন্দেহে বাংলাদেশের লোকশিল্পের সবচেয়ে মনোরম নিদর্শন। নকশি কাঁথা সূচিকর্মের অন্তর্ভুক্ত। কয়েক ফালি কাপড় স্তর পরম্পরায় সাজিয়ে কাঁথার জমিন তৈরি করা হয়। সাধারণ ব্যবহার্য সূচে রঙ-বেরঙের সুতা পরিয়ে 'ফোঁড়' দ্বারা এই জমিনে ছবি আঁকা হয়।



২. **নকশি কাঁথার ছবি ও নকশা :** নকশি কাঁথাতে সাধারণত মাছ, পাতা, ছড়া বা ধানের শীষ, চাঁদ, তারা, বৃক্ষ, ঘোড়া, হাতি, দেব-দেবীর ছবি অথবা কোনো গ্রামীণ ঘটনার ছবি বুনন করা হয়। পাহাড়-পর্বত, পশু-পাখি, প্রসাধনী দ্রব্য, রান্নাঘরের জিনিসপত্র, পালকী, মটর, ঘোড়-সওয়ার, মসজিদ-মন্দির, গ্রাম্যমেলা, রাধা-কৃষ্ণ, লক্ষ্মী, জ্যামিতিক নকশা, ফুল ও নানা ধরনের আল্পনা এবং শ্লোক, নানা ফিগার মোটিফ এতে দেখতে পাওয়া যায়।

৩. **নকশি কাঁথার প্রকার :** লোকশিল্প হিসেবে নকশি কাঁথা ব্যক্তিগত, সামাজিক ও ধর্মীয় কাজে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। প্রয়োজনের দিক থেকে নকশি কাঁথাকে চার ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন— লেপ, ঢাকনা, ওশার ও থলে। এসবের মধ্যে লেপ এবং ঢাকনাই উল্লেখযোগ্য। লেপকাঁথা আবার দুই প্রকার। যেমন— দোরখা এবং আঁচল বুননী।

**ঘ. আদর্শায়ন**

লোকশিল্পের অন্যতম প্রধান শাখা এই আদর্শায়ন। পুতুল, খেলনা, হাঁড়ি-পাতিল, দেবমূর্তি, মুখোশ, মুকুট, সন্দেশ-পিঠা-আমসত্ত্বের ছাঁচ, নকশি পিঠা, মিষ্টি, অলঙ্কার, নৌকা, তাজিয়া, রথ, শৌখিন দ্রব্য, খাট-পালঙ্ক-সিন্দুক-বাক্স, পাল্কি, গাড়ি ইত্যাদি সবই আদর্শায়নের অন্তর্ভুক্ত লোকশিল্পজাত বস্তু।

১. **পুতুল :** কুমার, ছুতার, গৃহস্থ রমণী ও বালিকারা মাটি, কাঠ, কাপড়, সুতা, পাট, ধাতু ইত্যাদির সাহায্যে মাটির পুতুল কাঠের পুতুল, কাপড়ের পুতুল, ধাতুর পুতুল ইত্যাদি তৈরি করেন।

২. **খেলনা :** মাটি, কাঠ, শোলা ও ধাতুর সাহায্যে কুমার, ছুতার, গৃহস্থ ব্যক্তি ও মহিলারা শিশু-কিশোরদের জন্য নানা রকমের খেলনা তৈরি করেন। এই ধরনের খেলনার মাঝে রয়েছে বিভিন্ন ধরনের পশু-পাখি, মানুষ, হাঁড়ি-পাতিল ইত্যাদির প্রতিকৃতি।

৩. **দেবমূর্তি :** হিন্দুদের দেবমূর্তি একটি উল্লেখযোগ্য লোকশিল্প। পেশাদার কুমার মাটি, বাঁশ, কাঠ, সুতা, শোলা, ধাতু, কাপড়, রঙ ইত্যাদি উপকরণের সাহায্যে হিন্দুদের নানা দেবদেবীর মূর্তি তৈরি করেন।

৪. **নকশি পিঠা :** বাংলার নারীমনের শিল্প সৌন্দর্যের প্রকাশ নকশি পিঠা। এতে আছে যুগ-যুগান্তরের বাংলার অন্তঃপুরিকাদের চিন্তা, চেতনা ও রসবোধ। পিঠা সুন্দর, স্বাদে ভরপুর ও বেশিদিন রাখার জন্য বিভিন্ন ডিজাইনে, মোটিফে, সাইজে বা নকশা দিয়ে যে পিঠা তৈরি করা হয় তাকে নকশি পিঠা বলে। অতিথি আপ্যায়ন, বিয়ে-শাদী, ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান, বিশেষ অনুষ্ঠান, ঈদ, খতনা, নবান্ন, শবে-বরাত, শবে-কদর ও জামাই আদরে নকশি পিঠা দিয়ে অতিথিদের আপ্যায়ন করা হয়।

**ঙ. ভাস্করণ :** কাঠখোদাই শিল্প (প্রধানত মূর্তি ও নকশা খোদাই), ধাতুর নকশা, পোড়ামাটির ফলকচিত্র ইত্যাদি হলো লোকশিল্পের অন্তর্ভুক্ত ভাস্করণের নিদর্শন। বাড়ি, দরজা, জানালা, বেড়া, খাট, পালঙ্ক, বাক্স, সিন্দুক, বাদ্যযন্ত্র ইত্যাদি তৈরির ক্ষেত্রে ছুতার কাঠ খোদাই করে বিভিন্ন রকমের দৃষ্টিনন্দন নকশা ও ডিজাইন তৈরি করেন। বাসন-কোসন এবং শৌখিন দ্রব্যের যাবতীয় কাজে কাঁসারু ও স্বর্ণকার তামা, পিতল, লোহা, সোনা, রূপা ইত্যাদির সাহায্যে ধাতুর নকশা তৈরি করেন। এ ছাড়া ঘরবাড়ি, মসজিদ, মন্দির ইত্যাদি অলঙ্করণের সময় কুমার পোড়ামাটির ফলকচিত্র তৈরি করেন।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



**চ. স্থাপত্যশিল্প :** বাংলাদেশের স্থাপত্যশিল্পে লোকশিল্পের ব্যাপক প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। ঘর-বাড়ি, দালান-কোঠা, মসজিদ, মন্দিরসহ বিভিন্ন ধরনের অবকাঠামো নির্মাণের ক্ষেত্রে ঘরামি, ছুতার ও রাজমিস্ত্রিরা বিশেষ ধরনের নকশা ও ডিজাইনে এগুলো গড়ে তোলেন। এ সকল অবকাঠামো নির্মাণে মাটি, মাঠ, বাঁশ, খড়, দড়ি ইত্যাদি উপকরণ ব্যবহার করা হয়।

**লোকশিল্প সংগ্রহের গুরুত্ব :** লোকশিল্প যে কোনো জাতির ইতিহাস ও ঐতিহ্যের সাথে সম্পর্কিত একটি গুরুত্বপূর্ণ শিল্প। তাই একটি জাতির আত্মপরিচয় সম্পূর্ণভাবে জানার জন্য লোকশিল্প সংগ্রহের গুরুত্ব অপরিসীম। এ সম্পর্কে বিখ্যাত লোকবিজ্ঞানী আশুতোষ ভট্টাচার্য বলেন, 'লোক-সংস্কৃতির রূপ-রসগত বহুমুখী আলোচনাই এর সব নয়, এর জন্য তাত্ত্বিক আলোচনা প্রয়োজন। কিন্তু এ কথা সত্য, তাত্ত্বিক আলোচনার পূর্বে এর উপকরণের যথাসম্ভব সামগ্রিক সংগ্রহ আবশ্যক। কেবল মাত্র আংশিক সংগ্রহের ওপর তাত্ত্বিক আলোচনা সম্ভব নয়। কেবলমাত্র সংগ্রহের আয়তন নয় তার গুণগত দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। বৈজ্ঞানিক উপায়ে কিংবা সংগ্রহ বিষয়ে কোনো স্বীকৃত প্রতিষ্ঠানে আধুনিক পদ্ধতিতে শিক্ষাপ্রাপ্ত গবেষক বা সংগ্রহকারী দ্বারা সংগ্রহ করা দরকার।'

**লোকশিল্প সংগ্রহের সমস্যা :** লোকশিল্পজাত বস্তু সংগ্রহের সমস্যা ও অসুবিধা অনেক। অনেক সময় লোকশিল্পী তার নিজস্ব সৃষ্টি হস্তান্তর করতে অনীহা প্রকাশ করেন। কারণ, শিল্পী সৃষ্টির আনন্দে তাঁর শিল্পকর্মে ব্রতী হন তাই নিজের সৃষ্টির প্রতি মমত্ববোধের জন্য তিনি হাতের তৈরি জিনিস সহজে হাতছাড়া করতে চান না। পূর্বপুরুষের স্মৃতিবিজড়িত অতি পুরাতন লোকশিল্পজাত বস্তু পরিবারের ঐতিহ্য হিসেবে ধরে রাখতে চান শিল্পীর উত্তরাধিকারী।

সরল গ্রামবাসী অনেক সময় তাদের শিল্পকর্মের গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারে না। যে সামান্য জিনিস তারা তৈরি করে ক্ষেত্রবিশেষে তা যে অমূল্য সম্পদরূপে বিবেচিত হতে পারে তা তারা বোঝে না। ফলে তার সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তাও তারা হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না। সেজন্য অনেক সময় লোকশিল্পজাত সামগ্রী সংগ্রহের ক্ষেত্রে তাদের কাছ থেকে আশানুরূপ সাড়া ও সহযোগিতা পাওয়া যায় না।

শিল্পকর্মের গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতনতা আর একটি সমস্যার সৃষ্টি করে। সেটা হলো নকল সামগ্রী চালিয়ে দেয়ার প্রবণতা। শিল্প সামগ্রীর পেশাদারী বিক্রেতা বা মিডলম্যানদের মধ্যে সাধারণত এ ধরনের প্রবণতা দেখা যায়। যেমন— পিতল বা ব্রোঞ্জের প্রাচীন ভাস্কর্যের চাহিদা বৃদ্ধির দরুন আজকাল পুরাতন আদলে পিতল ব্রোঞ্জের মডেল তৈরি করে তার ওপর এক প্রকার রাসায়নিক পদার্থ প্রয়োগ করা হয়। ফলে পুরাতন মূর্তি এবং এসব নকল ভাস্কর্যের মধ্যে তারতম্য করা মুস্কিল হয়ে পড়ে।

**লোকশিল্প সংরক্ষণের সমস্যা :** সংগৃহীত সামগ্রীর সংরক্ষণেও সমস্যা আছে। সাধারণত ভঙ্গুর ও ক্ষণস্থায়ী উপাদানে লোকশিল্প সৃষ্টি করা হয়। ফলে এগুলোর স্থায়িত্ব কম। বাঁশ, বেত, সুতা, পাতা প্রভৃতির ক্ষেত্রে এ সমস্যা দেখা দেয়। লোকশিল্পীরা যে রঙ ব্যবহার করেন তারও স্থায়িত্ব নেই। তাছাড়া প্রতিকূল আবহাওয়ায় সংগৃহীত, সামগ্রী ধীরে ধীরে নষ্ট হয়ে যায়।

**লোকশিল্প সংরক্ষণের উদ্যোগ :** লোকশিল্পের সংগ্রহ দু রকমের হতে পারে। যথা- বাস্তব সংগ্রহ এবং দলিলায়ন। বাস্তব সংগ্রহের জন্য প্রয়োজন সংগ্রহশালা বা জাদুঘর।

১৯৩৭ সালে স্থাপিত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্গ সংস্থা 'আশুতোষ মিউজিয়াম অফ ইন্ডিয়ান আর্ট' নামক জাদুঘর সম্ভবত বিভাগ-পূর্ব বাংলায় লোকশিল্প সংগ্রহের প্রথম প্রাতিষ্ঠানিক প্রয়াস। ১৯৬৯ সালে এ জাদুঘরের সংগ্রহ সংখ্যা ছিল ২৫,০০০। এর বিরাট অংশ হলো লোকশিল্প। এ জাদুঘরে বাংলাদেশের লোকশিল্পের বেশ কিছু নিদর্শন আছে। এর মধ্যে নকশি কাঁথা ও মাটির খেলনা পুতুল উল্লেখযোগ্য।



১৯১৩ সালে প্রতিষ্ঠিত ঢাকা জাদুঘর ১৯৮৩ সালে জাতীয় জাদুঘরে উন্নীত হয়। ২,১৫,০০০ বর্গফুটের এ বিশাল জাদুঘরে লোকশিল্পের নিদর্শনের মধ্যে আছে অনেকগুলো নকশিকাঁথা, কাঠ খোদাই, টেরাকোটা বা পোড়া মাটির ফলক, পুতুল, পুঁথি, পটচিত্র, মৃৎপাত্র প্রভৃতি।

বাংলা একাডেমির লোক-ঐতিহ্য বিভাগের লোকশিল্প সংগ্রহশালার জন্য সংগ্রহ শুরু হয় ১৯৬৪ সাল থেকে। ১৯৬৯ সালে গৃহসংস্থানের পর সংগ্রহশালা বাস্তব রূপ গ্রহণ করে। সংগ্রহের মধ্যে আছে নকশিকাঁথা, মুখোশ, লোকবাদ্যযন্ত্র, শীতল পাটি, নকশি পাখা, লোক-অলঙ্কার, নকশি পিঠা, শিকা, মৃৎফলক, পুতুল প্রভৃতি।

লোকশিল্পের পঠন-পাঠন ও সংগ্রহের জন্য ১৯৭৪ সালে বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন গঠন করা হয়। বাংলার এককালের রাজধানী সোনারগাঁয়ে লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশনের সদর দপ্তর এবং লোকশিল্প জাদুঘরের স্থান নির্বাচন করা হয়। ১৯৭৬ সালের অক্টোবর মাসে সর্দার বাড়ি নামক এক পুরনো জমিদার বাড়ি মেরামত করে তাতে লোকশিল্প যাদুঘর স্থাপিত হয়। লোকশিল্পের নানা নিদর্শন এ সংগ্রহশালায় স্থান পেয়েছে।

এ ছাড়া চট্টগ্রামের জাতিতত্ত্ব জাদুঘর, রাঙামাটির ট্রাইবাল কালচারাল একাডেমি ও নেত্রকোনার বিরিশিরি ট্রাইবাল একাডেমিতে উপজাতীয় শিল্পের সংগ্রহ আছে। মহাস্থানগড়, পাহাড়পুর ও ময়নামতির প্রত্নতাত্ত্বিক জাদুঘরের লোকশিল্পের নিদর্শনের মধ্যে মাটির ফলকচিত্র উল্লেখযোগ্য। তাছাড়া দিনাজপুর, কিশোরগঞ্জ, ত্রিশাল প্রভৃতি আঞ্চলিক জাদুঘরে কিছু কিছু লোকশিল্পের নিদর্শন রক্ষিত আছে।

**উপসংহার :** বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থায় লোকশিল্পের প্রয়োজন বা উপযোগিতা জাতিতাত্ত্বিক দিক দিয়ে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। কিন্তু লোকশিল্পের অনেক উপাদানই আজ বিলুপ্তির পথে। এমতাবস্থায় লোকশিল্পের নমুনা সংগ্রহ ও সংরক্ষণ, সেগুলোর উৎস-ইতিহাস ও শিল্প-বিচার এখন জরুরি হয়ে পড়েছে। আবহমান বাংলার ঐতিহ্য ও গৌরবকে ধরে রাখার স্বার্থে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে লোকশিল্পের জন্য আর্থিক বিনিয়োগ ও বাজারজাত ব্যবস্থা উন্নত করতে হবে। দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য লোকশিল্পীদের উৎসাহ বাড়াতে হবে। এতে লোকশিল্পসহ আমাদের হারানো দিনের অনেক ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি কিছুটা হলেও রক্ষা পাবে।

## রচনা ৩১ বাংলাদেশের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি

**ভূমিকা :** ঐতিহাসিক পথপরিক্রমায় বাংলাদেশে মুসলিম, হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান প্রভৃতি ধর্মাবলম্বী মানুষ পাশাপাশি অবস্থান করে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির এক গীতিময় ঐতিহ্য ধারণ করে আছে। সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানের বাস হলেও স্বীয় অস্তিত্ব আর মান-সম্মান নিয়ে হিন্দু, খ্রিস্টান, বৌদ্ধসহ অন্য ধর্মাবলম্বী মানুষও এখানে স্ব স্ব ধর্ম পালন করছে। সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক অঙ্গনে ধর্মীয় বাতাবরণকে পাশ কাটিয়ে জাতীয় চেতনায় এবং শান্তির প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে প্রত্যেকেই সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রেখে জীবনযাপন করছে। এ সৌহার্দ্যে কখনো ফাটল দেখা দিলেই ঐতিহ্যগত সহমর্মিতা আর শান্তির স্বর্গীয় শিক্ষা সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম জনগোষ্ঠীকে সব সময়ই বাড়াবাড়ির পথে থেকে ফিরিয়ে রেখেছে। ধর্মীয় আচার-আনুষ্ঠানিকতা এবং নিয়মতান্ত্রিক উপাসনার ধর্মীয় রীতি এ

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



দেশের প্রতিটি ধর্মপ্রাণ মানুষের মাঝে থাকলেও ধর্মান্ধতার বিষাক্ত ছোবল কখনও কখনও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির মাঝে বাধার সৃষ্টি করে। এ ধর্মান্ধতার বিষাক্ত ছোবল বন্ধের যথাযথ পদক্ষেপ না নিলে সম্প্রদায়িক সম্প্রীতির ঐতিহ্য ম্লান হয়ে যেতে পারে।

**বাংলাদেশে পালিত ধর্ম :** বাংলাদেশের ইতিহাস অনেক প্রাচীন। দীর্ঘদিনের ইতিহাসের ধারায় এখানে বিভিন্ন শাসকগোষ্ঠী যেমন শাসন করেছে, তেমনি বিকাশ লাভ করেছে বিভিন্ন ধর্ম, সংস্কৃতি আর বিশ্বাস। তাই বাংলাদেশের আনাচে-কানাচে আজও হিন্দু, বৌদ্ধ, ইংরেজ আর মুসলিম শাসকদের নানা কীর্তি চোখে পড়ে। বর্তমানে এ দেশের ৯০.৪% লোক মুসলমান। দ্বিতীয় বৃহত্তম জনগোষ্ঠী হিসেবে রয়েছে হিন্দুরা (৮.৫%)। স্বাধীনতা পূর্বকালে, বিশেষ করে ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের প্রাক্কালে এ দেশে বিপুল পরিমাণ হিন্দুর বসবাস থাকলেও মূলত রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক কারণেই হিন্দুরা কালক্রমে পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতে পাড়ি জমায়। ফলে তাদের সংখ্যা ক্রমে হ্রাস পেতে থাকে। অন্যদিকে ব্রিটিশ শাসনামল এবং পরবর্তীতে এনজিও কার্যক্রমের নামে খ্রিষ্টান মিশনারীদের ব্যাপক তৎপরতায় এ দেশে খ্রিষ্টানদের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। তাছাড়া পার্বত্য চট্টগ্রাম, পটুয়াখালীসহ বিভিন্ন স্থানে যে সকল উপজাতি রয়েছে তাদের অধিকাংশই বৌদ্ধ ও খ্রিষ্টান। তবে তাদের অনেকেরই আবার নিজস্ব ধর্ম রয়েছে।

**সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও বাংলাদেশ :** বাংলাদেশ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির এক অন্যতম উদাহরণ। সাম্প্রতিককালে সংখ্যালঘু নির্যাতনের অভিযোগ উঠলেও প্রকৃতার্থে এটি দুদিক থেকেই রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। কেউ যদি সংখ্যালঘুদের নির্যাতন করে থাকে তা যেমন সুযোগসন্ধানী রাজনীতিকদের নোংরামির ফল, তেমনি যারা এ নিয়ে ব্যাপক তোলপাড় করছে সেটাও রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির কৌশল। কারণ এ দেশের সাধারণ মানুষের স্বাভাবিক প্রবণতায় এমন আচরণ অনুপস্থিত।

ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করলেও দেখা যায়, এ দেশের বিভিন্ন ধর্ম, বর্ণের মানুষ কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে চলেছে। ইংরেজবিরোধী আন্দোলন থেকে ভাষা আন্দোলন এবং সর্বশেষ স্বাধীনতা আন্দোলনেও এ দেশের মানুষ ধর্মীয় বাদ-বিচারের ঊর্ধ্বে ওঠে জাতীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে লড়েছে। পাকিস্তানি শাসকরা যখন ধর্মের দোহাই দিয়ে বাঙালি জাতিকে শোষণ করছিল, তখন এ দেশের মানুষ সে শুভংকরের ফাঁকি ঠিকই বুঝতে পেরেছে। ফলে ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে শোষকের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরে স্বদেশ ভূমিকে মুক্ত করেছে। এ দেশের মানুষ জেনেছে ধর্মের দোহাই দিয়ে শোষণ করা কোনো শাসকের কাজ নয়, জালিমের কাজ।

বর্তমানে এ দেশে মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ হলেও ঐতিহাসিক কাল থেকেই এখানে হিন্দু-মুসলমান পাশাপাশি বসবাস করে আসছে। হিন্দু-মুসলিম সৌহার্দ্যের অনেক নিদর্শন এখনো দেখা যায়। বাংলার আনাচে-কানাচে পাশাপাশি বাড়ি, পাশাপাশি ঘরে হিন্দু-মুসলিম-খ্রিষ্টান বসবাস করছে, প্রতিনিয়ত পারস্পরিক লেনদেন হচ্ছে। সমমর্যাদা আর অধিকার নিয়ে এখানে সকল ধর্মের মানুষ তাদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবন পরিচালনা করছে। ব্রাহ্মণ্যবাদের মিথ্যা আভিজাত্য একসময় বাঙালি সমাজে জাতিভেদ আর বর্ণভেদের দুষ্ট ক্ষত সৃষ্টি করলেও কালক্রমে তা বিলুপ্ত হয়। বিশেষ মুসলিম ভ্রাতৃত্ব ও মানসিক শিক্ষার প্রচ্ছন্ন ছায়া এবং বাঙালির ঐতিহ্যগত সৌহার্দ্য এ ক্ষতকে বিস্তৃত হতে দেয়নি।

বাংলাদেশের মানুষের আরেকটি গুণ হলো এখানে হিন্দু-মুসলমানের বাইরেও প্রতিবেশী ও সমাজের সদস্য হিসেবে তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক তাকে তারা বেশ গুরুত্ব দেয়। এখানে প্রতিটি ধর্মের মানুষ তাদের স্ব স্ব ধর্ম স্বাধীনভাবে পালন করে এবং একে অপরের ধর্মীয় অনুষ্ঠান ও রীতিনীতির প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধাশীল। এমনকি একে অপরকে নিজস্ব ধর্মীয় ও সামাজিক অনুষ্ঠানে নিমন্ত্রণ জানানোর যে ঐতিহ্যিক



রীতি তা সত্যিই প্রশংসনীয়। পরধর্মের অনুষ্ঠানে উপস্থিত হওয়া এবং উপভোগ করার অনুপম রীতি এখানে বিদ্যমান। তা ছাড়া পহেলা বৈশাখ, পৌষসংক্রান্তি ও পিঠা পুলির উৎসবসহ এমন কিছু উৎসব আছে যেখানে জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে প্রতিটি বাঙালি এক অভিন্ন অস্তিত্বের সন্ধান খোঁজে।

পরধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ এবং প্রত্যেককে তাদের ধর্ম-কর্ম পালনের সুযোগদানের ব্যাপারে এ দেশের প্রতিটি মানুষ সজাগ। প্রতিটি মসজিদে আজানের পবিত্র ধ্বনির আবহ যেমন মানব মনকে আলোড়িত করে, তেমনি মন্দির, চার্চ কিংবা প্যাগোডায় বিনীত প্রার্থনার আকুলতাও তেমনি পবিত্র আবহ ছড়ায়।

**মুসলমানদের আচার-অনুষ্ঠান ও দৃষ্টিভঙ্গি :** বাংলাদেশ নানা ধর্মের মানুষের দেশ হলেও মূলত মুসলিম জনগোষ্ঠীর আচার-অনুষ্ঠান ও দৃষ্টিভঙ্গিই জাতীয় জীবনে প্রধান। কেননা বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম এ মুসলিম দেশটিতে প্রায় ১৩ কোটি মুসলমানের বাস। বাংলাদেশের মুসলমানরাও বিশ্বের অন্য দশটি মুসলিম দেশের মতো যাবতীয় ধর্মীয় অনুষ্ঠান-আনুষ্ঠানিকতার ব্যাপারে যথেষ্ট যত্নবান। ধর্মীয় কর্তব্য পালন, ধর্মের প্রতি অনুরাগ ও ধর্মীয় বিধিবিধানের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ এ দেশের প্রতিটি মুসলমানেরই রয়েছে। তবে ধর্মের নামে বাড়াবাড়ি কিংবা উগ্রতা এ দেশের ধর্মপ্রাণ মানুষের স্বাভাবিক চেতনায় অনুপস্থিত। ব্যক্তিগত জীবনে ধর্মের অনুশাসনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকলেও এ দেশের মুসলমানরা তাদের এ বিশ্বাসকে অপরের ওপর চাপিয়ে দেয়ার নীতিতে বিশ্বাসী নয়।

তাছাড়া বাংলাদেশের মুসলমানদের মাঝে ধর্মীয় কার্যকলাপ ও আনুষ্ঠানিকতায় কোনো কোনো ক্ষেত্রে ভিন্নতা থাকলেও তা তাদের পারস্পরিক সম্পর্ককে তেমন ক্ষতিগ্রস্ত করে না। বরং প্রত্যেকেই যার যার মত ও পথ অনুযায়ী ধর্মীয় অনুশাসনের অনুসরণ করে থাকে। পীর-মাশায়েখ আর আলেম-ওলামাদের দিক-নির্দেশনায় আবহমান কাল থেকেই এ দেশের প্রতিটি ঘরে ধর্মীয় শিক্ষার যে অমিয় ধারা প্রবাহিত তা শান্তির শিক্ষা, বিধাতা ভালোবাসার শিক্ষা। ধর্ম এ দেশের সহজ, সরল মানুষের মাঝে উগ্রতা কিংবা বিচ্ছিন্নতা নয়, ভ্রাতৃত্ব আর সৌহার্দ্যের শিক্ষাই দিয়েছে। তাই ঈদ বা ধর্মীয় সভায় মুসলমানদের যে মিলনমেলা তা প্রতিটি মানুষকেই ভ্রাতৃত্ব ও সহমর্মিতার আদর্শে উদ্বুদ্ধ করে।

বাংলাদেশের মুসলমানদের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হলো, তারা বিশ্বব্যাপী মুসলমানদের ওপর যে নির্যাতন ও নিপীড়ন হচ্ছে তার বিরোধী হলেও তাদের প্রতিক্রিয়া অবশ্যই শান্তিপূর্ণ। পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতের গুজরাটে মুসলমানদের ওপর যে অবর্ণনীয় নির্যাতন চালানো হয় তার প্রতিক্রিয়ায় এ দেশের হিন্দুদের কোনো ক্ষতি এ দেশের মুসলমানরা করেনি। বরং এদেশের হিন্দুরাও এ বর্বরতার নিন্দা জানায়। তাছাড়া বিশ্বব্যাপী মুসলমানদের দুর্দশা লাঘবের জন্য বিধাতার কাছে প্রার্থনা করাকে এ দেশের মুসলমানরা তাদের ধর্মীয় দায়িত্ব মনে করে। পাশাপাশি সন্ত্রাস, নৈরাজ্যসহ মানববিধ্বংসী সব কর্মকাণ্ডকে এ দেশের মানুষ বরাবরই ঘৃণা করে। তাই ধর্মীয় উগ্রতা কিংবা ধর্মান্ধতা, নয় বরং ধর্মীয় অনুশাসনের প্রতি ঐকান্তিকতা আর অনুসরণকেই দুনিয়া ও আখিরাতের মুক্তির একমাত্র পথ হিসেবে ধরে নেয়াই এ দেশের মানুষের বৈশিষ্ট্য।

**বাংলাদেশের রাজনীতিতে ধর্ম :** বাংলাদেশের রাজনীতিতে ধর্মের উপস্থিতি নিয়ে অনেক কথা চালু থাকলেও এ দেশের মানুষ ধর্মকে রাজনীতি থেকে পুরোপুরি পৃথক করার তত্ত্বে এখনো পুরোপুরি অভ্যস্ত হয়ে ওঠেনি। তাই বলে ধর্মের নামে রাজনৈতিক সহিংসতাকেও তারা সমানভাবে ঘৃণা করে। বিশেষ করে রাজনৈতিকভাবে ধর্মকে হেয় প্রতিপন্ন করা বা ধর্মবিরোধী কার্যক্রমকে তারা কখনোই সমর্থন করেনি। বিপরীত পক্ষে পুরোপুরি ধর্মীয় শাসন প্রতিষ্ঠার যে আদর্শিক আন্দোলন তার প্রতিও জনসাধারণের সমর্থন

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



তেমন লক্ষ্য করা যায় না। বরং এ দেশের মানুষ মধ্যপন্থা অবলম্বন বিশ্বাসী। তাই দেখা যায়, জামায়াতে ইসলামীর মতো ধর্মভিত্তিক দল এককভাবে যেমন সুবিধা করতে পারেনি, তেমনি বামপন্থী দলগুলোর অবস্থাও করুণ। বরং বিএনপি, জাতীয় পার্টির মতো দলগুলো যখন ধর্মের প্রতি তাদের সহানুভূতি ধরে তুলতে পেরেছে তখন ভোটারদের সহানুভূতিও পেয়েছে। তাছাড়া বাংলাদেশের আলেম-ওলামা ও পীর-মাশায়েখদের একটা বিরাট অংশ সরাসরি কোনো দলের সমর্থন করে না। তারা মূলত মানুষকে ধর্ম-কর্মের শিক্ষাদান ও এসব ব্যাপারে সজাগ করে তোলাকেই মূল দায়িত্ব মনে করেন। ফলে বাংলাদেশে কোনো উগ্রবাদী রাজনৈতিক গোষ্ঠীর উপস্থিতি— এ দেশের ধর্মপ্রাণ জনগণ মেনে নেবে না।

**উপসংহার :** নানা অপপ্রচার এবং অপতৎপরতা সত্ত্বেও এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়, বাংলাদেশ কোনো অর্থেই সম্প্রদায়িক রাষ্ট্র নয়। এখানকার মানুষের দীর্ঘদিনের যে সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় ঐতিহ্য তা কোনো সময়ই ধর্মীয় বাড়াবাড়ি প্রশ্রয় দেয়নি। বরং প্রাচীনকাল থেকে এখানে বিভিন্ন ধর্ম-বর্ণের মানুষ পাশাপাশি বাস করে আসছে। বিশেষ করে বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক চর্চার সর্বজনীনতা দেখলে অনায়াসেই বলা যায়, এখানকার মানুষ প্রথমেই তাদের জাতীয় ও সাংস্কৃতিক পরিচয়কে প্রাধান্য দেয়। কিন্তু বাংলাদেশে মসজিদ, মন্দির ও মানুষের ধর্ম-কর্ম পালন কোনো মতেই এতে ক্ষতিগ্রস্ত হয় না। বরং তারা ক্ষেত্রবিশেষে ধর্মের বিরুদ্ধে আপোষ করতেও নারাজ। তাই একবার এক কমিউনিস্ট নেতা বলেছিলেন, 'বিকালবেলা আমি যখন সমাজতন্ত্রের ওপর বক্তৃতা দেই তখন প্রচুর লোক জড়ো হয়, কিন্তু যখন মাগরিবের আযান হয় তখন মুসলমানরা মসজিদে আর হিন্দুরা মন্দিরে চলে যায়।'

## রচনা ৩২ বাংলার লোকসাহিত্য/সমাজ ও লোকসংস্কৃতি/পল্লীসাহিত্য

**ভূমিকা :** আমরা প্রকৃতির সন্তান। বিশাল আকাশ আমাদের ঘরের ছাদ। আর বায়ুসাগরের মধ্যে আমরা ডুবে আছি। তবুও আমাদের অনেক সময়ই মনে থাকে না, যে আমাদের ঘিরে আছে বাতাস। পণ্ডিত বহুভাষাবিদ ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ সঙ্গত কারণেই একবার লোকসাহিত্যকে বাতাসের সাথে তুলনা করেছিলেন। কেননা বাতাস যেমন আমাদের ঘিরে আছে, তেমনি আমাদের চারপাশে ছড়িয়ে আছে লোকসাহিত্য। লোকসাহিত্য বাতাসের মতোই উদার ও সীমাহীন। আমরা লোকসাহিত্যকে মনে না রাখলেও লোকসাহিত্য কিন্তু আমাদের সাথে মিশে আছে। তার সুশীতল ও ছায়ানিবিড় স্নেহাঞ্চলে আমাদের বেঁধে রেখেছে।

**লোকসাহিত্য কি :** এক কথায় সাধারণ মানুষের মনের কথা, মুখের কথা ভাষা ও ছন্দে বাণীবদ্ধ হয়ে এবং লোকমুখে তা প্রচারিত ও প্রচলিত হয়ে যে সাহিত্য সৃষ্টি হয় তাকে লোকসাহিত্য বলে। জনৈক সমালোচক বলেন, যে সাহিত্য লেখা হয়নি তালপাতার মূল্যবান গাত্রে, যে সাহিত্য পায়নি সমাজের উচুঁতলার লোকদের সমাদর, যে সাহিত্য পল্লীর সাধারণ মানুষের কথা বলেছে গানে গানে, যে সাহিত্যের রচয়িতার নামও অনেক সময় হারিয়ে গেছে, তাকে বলা হয় লোকসাহিত্য। এ সাহিত্য সাধারণ মানুষ ও পল্লীর আলোছায়া, ভালোবাসা ও স্মৃতিকে সম্বল করে বেঁচে আছে। আমরা অনেক ছড়া, গান, গীতিকা, গাথা পড়ি ও শুনি। কিন্তু জানি না সেগুলোর রচয়িতা কারা? এগুলো অনেক দিন ধরে বেঁচে আছে পল্লীর মানুষের কণ্ঠে। কোন কবি-সাহিত্যিক লিখেছিলেন এ বেদনাময় কাহিনী তার আমরা জানি না। কিন্তু এগুলো বেঁচে আছে চিরকাল। সুতরাং বলা যায়, যে সাহিত্য কোনো বিশেষ ব্যক্তিচিন্তা বা সাধনা থেকে উদ্ভূত না হয়ে মানুষের মনে আপনা থেকেই জন্মায়, যার মধ্যে কোনো



নিগূঢ় তত্ত্বকথা বা কোনো রকমের নীতি উপদেশ নিহিত থাকে না, কিন্তু নিতান্ত সরল প্রাণের সুখ-দুঃখ, কান্না-হাসি প্রভৃতির অনাড়ম্বর প্রকাশ ঘটে এবং যা নিত্য পরিবর্তনশীল নদীস্রোতের মতো মানুষের মনে বিরাজ করে, তাকেই লোকসাহিত্য বলে। সাধারণ মানুষের মনের সহজ ও স্বচ্ছন্দ রূপায়ণ হলো লোকসাহিত্য। বাংলার লোকসাহিত্য বাঙালির স্বতঃস্ফূর্ত হৃদয়ধারার প্রতিচ্ছবি।

**বাংলা লোকসাহিত্যের ইতিকথা :** বাংলা লোকসাহিত্যের ইতিহাস ও এর ঐতিহ্য হাজার বছরের। বাংলা ভাষা সৃষ্টির প্রাথমিক যুগেই লোকসাহিত্যের জন্ম হয়। লিখিত সাহিত্যের নির্দিষ্ট লেখক থাকে। কিন্তু লোকসাহিত্যের কোনো সুনির্দিষ্ট লেখকের পরিচয় পাওয়া যায় না। মনে হয় যেন সারা সমাজ একসাথে বসে নিজেদের মনের কথা গানের সুরে বলেছে। তা লেখা হয়নি কাগজে বা তালপাতায়। তবে তা লেখা হয়েছে মানুষের হৃদয়পটে। গ্রামের মানুষ সে গান, গাথা মনে রেখেছে এবং আনন্দ-বেদনায় তা গেয়েছে। এভাবে বেঁচে আছে লোকসাহিত্য। লোকসাহিত্যের সৃষ্টি ও বিকাশের রীতি বেশ চমৎকার। যেমন ছড়ার কথাই ধরা যাক। কখন যে কার মনে কোন ঘটনা দাগ কেটেছে এবং সে ঘটনা ছন্দলাভ করেছে তা আজ কারো মনে নেই। কিন্তু সে ছড়া একজনের কাছ থেকে ক্রমশ ছড়িয়ে পড়েছে সারা সমাজে। সমাজে যখন ছড়াটিকে ভালো লেগেছে, তখন সেটিকে মুখে মুখে ছড়িয়ে দিয়েছে চারদিকে। এভাবে ছড়াটি হয়ে উঠেছে সমগ্র সমাজের সৃষ্টি। ফলে গীতিকার, লেখকের নাম পাওয়া যায় না। কেননা হয়তো তার কোনো নির্দিষ্ট কবি নেই। অনেকের মনের কথা হয়তো জমাট বেঁধে একটি গীতিকায় রূপ পেয়েছে। আবার হয়তো কোনো এক কবি সত্যিই রচনা করেছিলেন গীতিকাটি। রচনার পর সকলের সামনে গান করেন সেটি। সকলের ভালো লাগে তা। সমাজের সকল লোক সে গানটি মুখস্থ করে এবং মুখে মুখে গায় সেটি। এভাবে বহু বছর কেটে যায়। কালের প্রবাহে গানটির রচয়িতার নামটি হারিয়ে যায়। তখন গীতিকাটি হয়ে উঠে সারা সমাজের সৃষ্টি। কবির রচনাও কালের দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় বদলে যায়। হয়তো নতুন রূপে তা মানুষের কণ্ঠে কণ্ঠে শোভা পায়। এভাবে বাংলা লোকসাহিত্যের বিভিন্ন পসরা—ছড়া, গীতি, গাথা, রূপকথা, উপকথা, ছড়াগান, গল্পকাহিনী, প্রবাদ, ধাঁধা লোকগাঁথা আরো অনেক কিছুই বাংলা লোকসাহিত্যকে বিকশিত করেছে।

**লোকসাহিত্য যেভাবে সংগৃহীত হয় :** বাংলা সাহিত্য লোকসাহিত্যে বেশ ধনী। অফুরন্ত লোকসাহিত্য আছে আমাদের। পল্লীতে পল্লীতে, গ্রামে গ্রামে তা ছড়িয়ে ছিলো এবং আজও আছে। ভদ্র তথা সুধী সমাজ এর সংবাদ অনেক দিন জানতো না। কেননা লোকসাহিত্য লিখিত হয়নি। তা বেঁচে ছিল গ্রামের মানুষের মনে। তারাই ছিলো লোকসাহিত্যের লালন-পালনকারী। তারপর এক সময় আসে, যখন ভদ্রলোকদের দৃষ্টি পড়ে সেদিকে। শুরু হয় লোকসাহিত্য সংগ্রহ। বাংলাদেশের পল্লী ও গ্রামাঞ্চল থেকে সংগৃহীত হয় অনেক ছড়া, অনেক গীতিকা। আমরা সেগুলোর স্বাভাবিক সৌন্দর্যে মুগ্ধ হই। বাংলা লোকসাহিত্য সংগ্রহের জন্য যাঁদের নাম বিখ্যাত তাঁদের মধ্যে চন্দ্রকুমার দে (১৮৮৯—১৯৪৬)। তিনি ছিলেন ময়মনসিংহের অধিবাসী। লোকসাহিত্যের প্রতি তাঁর ছিল প্রবল অনুরাগ। তাই তিনি সংগ্রহ করেছিলেন অনেকগুলো গীতিকা। তাঁর সংগৃহীত গীতিকাগুলো সম্পাদনা করে ময়মনসিংহ গীতিকা (১৯২০) নামে প্রকাশ করেন ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন। দীনেশচন্দ্র সেন নিজে সংগ্রাহক ছিলেন না। কিন্তু তাঁর ছিলো লোকসাহিত্যের প্রতি গভীর অনুরাগ। তিনি লোকসাহিত্যকে দেশে-বিদেশে জনপ্রিয় করে তুলেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও লোকসাহিত্যের অনুরাগী ছিলেন। তিনি সংগ্রহ করেছিলেন অনেকগুলো ছড়া। কেবল ছড়া সংগ্রহ করে তিনি থেমে যাননি। লোকসাহিত্যের উপর একটি অসাধারণ বইও তিনি লিখেছিলেন। বইটির নাম ছিল 'লোকসাহিত্য'। এ বই লোকসাহিত্যকে জনপ্রিয় করতে অনেক সহায়তা করেছে।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



রূপকথা সংগ্রহ করেছিলেন দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার (১৮৭৭—১৯৫৭), উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী (১৮৬৩—১৯১৫)। দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদারের রূপকথা সংগ্রহের নাম 'ঠাকুরমার ঝুলি', 'ঠাকুরদার ঝুলি'। উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরীর রূপকথা সংগ্রহের নাম 'টুনটুনির বই'। এছাড়া আছেন আরো অনেক সংগ্রাহক, যাঁদের সকলের চেষ্টায় আমরা পেয়েছি এক অপূর্ব লোকসাহিত্যের ভাণ্ডার।

**লোকসাহিত্যের পৃথিবী :** পল্লী তথা গ্রামবাংলাই লোকসাহিত্যের পৃথিবী। বাংলার লোকসাহিত্য পল্লীবাংলার সাধারণ মানুষের হৃদস্পন্দন। এ সাহিত্য পল্লীর মানুষের আনন্দকে ফুটিয়ে তুলেছে ফুলের মতো। বেদনাকে বাজিয়েছে একতারার সুরের মতো। এখানে আছে সরল অনুভবের কথা, এ সরলতাই সকলকে মোহিত করে। লোকসাহিত্য তাই পল্লীর মানুষের বুকের বাঁশরী। বাস্তব জীবনের ঘাত-প্রতিঘাত, আনন্দ-বেদনায় পল্লীর নিরক্ষর অথচ সহজ-সরল মানুষ গানের আসর জমিয়েছে—সাজিয়েছে প্রাণের বীণা। তাদের কর্মক্লান্ত অবসর মুহূর্তগুলো গ্রাম্য সুর মূর্ছনায় মুখরিত হয়ে উঠেছে। বুনো ফুলের স্নিগ্ধ সৌন্দর্যে মন মাতাল না হলেও তার বিহ্বল সৌন্দর্যে মন পুলকিত না হয়ে পারে না। তেমনি বাংলাদেশের লোকসাহিত্যের আছে স্নিগ্ধ-মায়াময় সৌন্দর্য ও প্রাণের স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ। তাই পল্লীসাহিত্য এত চিরন্তন আবেদনমুখর ও বৈচিত্র্যময়।

লোকসাহিত্যের কবিদের কোনো চিন্তা করার দরকার ছিল না, তাঁরা অবলীলায় বলে যেতেন তাদের মনের কথা, হৃদয়ের কথা। সুর ও ছড়া-ছন্দের মধ্যেই তারা তাঁদেরকে ডুবিয়ে রাখতেন। তাই লোকসাহিত্যে পাওয়া যায় চমৎকার সহজ উপমা, সরল বর্ণনা, যাতে রয়েছে প্রাণের স্পর্শ ও আবেগের ছোঁয়া।

**লোকসাহিত্যের বিষয় :** লোকসাহিত্য বড়ই বৈচিত্র্যময় ও চিত্তাকর্ষক। এর ভাণ্ডারও কিন্তু অনেক বড়, অনেক বিশাল। অনেক রকমের সৃষ্টি এখানে দেখা যায়। লোকসাহিত্যের বিষয় বা উপাদানকে নিম্নরূপ শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। যথা :

১. ছড়া বা ছড়াগান, ২. গান বা গীতি, ৩. গীতিকা (Ballad), ৪. ধাঁধা, ৫. রূপকথা, উপকথা, ব্রতকথা, ৬. প্রবাদ, ৭. খনার বচন ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

১. **ছড়া বা ছড়াগান :** ছড়া বা ছড়াগান লোকসাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। ছড়া বড় মজার। বলতে গেলে সব বাঙালির সারাটা বাল্যকাল কাটে ছড়ার যাদুমন্ত্র উচ্চারণ করে। খুব কম লোকই আছে যাদের বাল্যকাল মাথা দুলিয়ে, নেচে, খেলে ছড়া কেটে বা ছড়াগান না গেয়ে কাটেনি। এসব ছড়া বা ছড়াগানে যাদু আছে। ছড়ার মধ্যে যেসব কথা থাকে, অনেক সময় সেসব কথার কোনো অর্থ হয় না বা অর্থ খুঁজে পাওয়া যায় না। এক পংক্তির অর্থ বুঝা যায় কিন্তু পরের পংক্তির অর্থ বুঝা যায় না। ছড়া আসলে অর্থের জন্য নয় তা ছন্দের জন্য, সুরের জন্য। অনেক আবোল-তাবোল কথা থাকে এর মধ্যে এবং এ আবোল তাবোল কথাই মধুর হয়ে ওঠে ছন্দের তালে। এরূপ একটি ছড়া হচ্ছে—

*আগডুম বাগডুম ঘোড়াডুম সাজে*
*ঝাঁঝর কাসর মদঙ্গ বাজে।*

এ পংক্তি দুটোর মধ্যে কথার তেমন অর্থ না থাকলেও এর ছন্দ ও তালে আমরা মাতাল হই। ছড়ার কথায় কোনো অর্থ থাকে না এ কথাও পুরোপুরি সত্য নয়। ছড়ার অর্থ থাকে গভীর গোপনে। সে



ধরা দিতে চায় না, কেননা তার অর্থটা বড় নয়। এরূপ একটি ছড়া যার ভেতর অনেক দুঃখ লুকিয়ে আছে; তুলে ধরা হলো :

*ছেলে ঘুমালো পাড়া জুড়ালো বর্গী এলো দেশে*
*বুলবুলিতে ধান খেয়েছে খাজনা দেব কিসে।*
*ধান ফুরোলো পান ফুরোলো খাজনার উপায় কি*
*আর কিছুকাল সবুর করো রসুন বুনেছি।*

এটি একটি ঘুমপাড়ানি ছড়া এবং পংক্তিতে পংক্তিতে আছে স্বপ্নময় ঘুমের আবেশ। কিন্তু এর ভেতর ছেঁড়া সুতোর মতো রয়েছে বর্গীদের অত্যাচারের কথা। বর্গী তথা মারাঠা দস্যুরা একসময় বাংলায় যে ত্রাসের রাজ্য কায়েম করেছিল, তারই স্মৃতি ধরে রাখা হয়েছে এ ছড়ার মধ্যে। আবার সহজ-সরল আবেগময় ও আবেদনময়তায় ভরা শিশুদের ঘুমপাড়ানি ছড়া, যেমন—

*ঘুম পাড়ানি মাসি পিসি মোদের বাড়ি যেও*
*বাটা ভরা পান দিবো বসে বসে খেয়ো।*

কিংবা,

*আয় আয় চাঁদ মামা*
*টিপ দিয়ে যা .*
*চাঁদের কপালে চাঁদ টিপ দিয়ে যা।*

এখানে গ্রামবাংলার সহজ–সরল মানুষের অতিথি আপ্যায়নের চিত্র ফুটে উঠেছে।

আবার রোদের সময় বৃষ্টি হলে গ্রামের বালক কিশোর দল ছড়া কাটে—

*রোদ হচ্ছে বৃষ্টি হচ্ছে*
*খেঁকশিয়ালের বিয়ে হচ্ছে।*

কিংবা দল বেঁধে গেয়ে উঠে:

*শিয়ালে বিয়া করে রে*
*ছাতি মাথায় দিয়া।*

এরূপ হাজারো ছড়া রয়েছে। যা আমাদের লোকসাহিত্য সমৃদ্ধ করেছে।

২. **গান বা গীতি/ লোকসংগীত :** লোকসংগীত বা লোকগীতি বাংলা লোকসাহিত্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ। এসব লোকসংগীতের মধ্যে গ্রামবাংলার আবেগ-অনুভূতি, তাদের দুঃখ-বেদনা-আনন্দ লুকিয়ে আছে। এসব গানের সুরের মূর্ছনা এখনও আমাদের পাগল করে।

*মন মাঝি তোর বৈঠা নেরে*
*আমি আর বাইতে পারলাম না।*

আবার বিরহের গান, যেমন—

*বিদেশ গিয়া বন্ধু তুমি আমায় ভুইলো না*

কিংবা হালকা রসের গান–

*বন্ধু তিনদিন তোর বাড়িত গেলাম*
*দেখা পাইলাম না। বন্ধু তিন দিন–*

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



এসব গান আমাদের মনকে নাড়া দেয়। এরপর রয়েছে বাংলার জারি, সারি, মুর্শিদি, ভাওয়াইয়া, ভাটিয়ালি, বাউল, গাজীর গান। এগুলো লোকসাহিত্যের ভাণ্ডারকে করেছে সমৃদ্ধ। দীর্ঘদিন ধরে এসব রচনা লোকচিত্তে আনন্দের সামগ্রী হয়ে রস যুগিয়ে আসছে।

৩. **গীতিকা (Ballad) :** গীতিকা লোকসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। গীতিকা ছড়ার মতো ছোটো নয়। গীতিকা আকারে অনেক বড়। এতে বলা হয় নরনারীর জীবন ও হৃদয়ের কথা। গীতিকাসমূহে একজন পুরুষ ও একজন নারীর হৃদয় দেয়া-নেয়ার বিষাদময় কাহিনী বর্ণনা করা হয়। গীতিকার নায়ক-নায়িকারা পল্লীর গাছপালার মতো সরল সবুজ, তারা পরস্পরকে ছাড়া আর কিছু জানে না। এর ফলে গীতিকায় পাওয়া যায় চিরকালের কামনা-বাসনার কাহিনী। এসব গীতিকার মধ্যে 'মহুয়া', 'দেওয়ানা মদিনা', 'মলুয়া' উল্লেখযোগ্য। এগুলো প্রথম প্রকাশিত হয়েছিলো ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন সম্পাদিত ময়মনসিংহ গীতিকায়। বাংলা গীতিকা সাহিত্যের মধ্যে পড়ে—

ক. নাথ গীতিকা, গোরক্ষ বিজয়, ময়নামতির গান।

খ. ময়মনসিংহ গীতিকা ও

গ. পূর্ববঙ্গ গীতিকা।

নাথ গীতিকাগুলো ঐতিহাসিক ঘটনা কিংবা কিংবদন্তির উপর প্রতিষ্ঠিত বলে এগুলোর আখ্যানভাগে গতানুগতিকার পরিবর্তে নাটকীয় গতি ও দীপ্তি লক্ষ্য করা যায়। ময়মনসিংহ গীতিকায় গ্রামবাংলার সাধারণ মানুষের চিত্র নিখুঁতভাবে ফুটে উঠেছে। যেমন—

*বাইদ্যার ছেড়ি উইঠ্যা যখন বাঁশে মারলো নাড়া*
*বইস্যা আছিল নইদার ঠাকুর উইঠ্যা অইল খাড়া।*

এখানে প্রেমরসের অপূর্ব সৌন্দর্য ফুটে উঠেছে। আবার নবযৌবন সমাগতা কন্যার চিত্রটি অশিক্ষিত পল্লীকবির কণ্ঠে এখানে জীবন্ত ও একান্ত বাস্তব হয়ে উঠেছে—

*ভিনদেশী পুরুষ দেখি চাঁদের মতন*
*লাজরক্ত হইল কন্যার পরথম যৌবন।*

৪. **ধাঁধা :** ধাঁধাও লোকসাহিত্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ। গ্রামবাংলার যুবক, কিশোর, আবালবৃদ্ধ-বণিতা অবসর সময়ে ধাঁধার আসর বসায়। বর্তমান আধুনিক শিক্ষিত সমাজে ধাঁধা যথেষ্ট সমাদৃত। এ সমস্ত ধাঁধার মাধ্যমে মানুষের বুদ্ধি ও বিচক্ষণতা যাচাই করা হতো। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়—

তিন অক্ষরে নাম যার জলে বাস করে, মাঝের অক্ষর কেটে দিলে আকাশেতে উড়ে—(চিতল, চিল। মাছ ও পাখি।)

সবুজ বুড়ি হাঁটে যায়। হাঁটে গিয়ে চিমটি খায়– (লাউ)।

এসব হাজারো ধাঁধা গ্রামবাংলার মানুষের মুখে মুখে বেঁচে আছে, যা আজও মানুষকে আনন্দ দান করে।

৫. **রূপকথা, উপকথা, ব্রতকথা :** বাংলা লোকসাহিত্যে রূপকথা, উপকথা, ব্রতকথা প্রভৃতির পরিচয় পাওয়া যায়। রূপকথাগুলো অসম্ভব ও অবিশ্বাস্য ঘটনার বিবরণীতে পূর্ণ। এসব রূপকথার গল্পগুলোর মধ্যে রাজা-রানীর গল্প, রাজকন্যা-রাজকুমারের গল্প, রাক্ষস-খোক্ষসের গল্প, দৈত্য-দানবের গল্প উল্লেখযোগ্য। ডালিমকুমার, নীলকুমার-লালকুমার ও রাক্ষসের গল্প শুনতে ভালো লাগে। কিশোর-কিশোরীদের নিকট এসব গল্প বড়ই প্রিয়।



বাংলার উপকথাগুলোতে পশুপাখির চরিত্র অবলম্বনে রস ও রসিকতার সাহায্যে উপদেশ ও নীতি শিক্ষাদান এবং ব্রতকথাগুলোতে অন্তঃপুরবাসী মহিলাদের দ্বারা লৌকিক দেবদেবীর উদ্দেশ্যে মহাত্ম্যগান রচিত হয়েছে। ব্রতকথাগুলো এক সময় বাংলার লোকসমাজে খুব জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। অনেকে মনে করেন, এ ব্রতকথাগুলো বাংলার আদিম কাব্য। এগুলোতে বাংলার লোকসাধারণের ধর্ম ও কর্মের পুরাতন ইতিহাস তার ক্ষীণরেখায় বিধৃত হয়েছে।

৬. **প্রবাদ বা প্রবচন :** প্রবাদ বাংলা লোকসাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত—'অল্প বিদ্যা ভয়ঙ্করী', 'সবুরে মেওয়া ফলে', 'সময়ের এক ফোঁড়, অসময়ে দশ ফোঁড়'—এসব হাজারো প্রবাদ বাংলা লোকসাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে। প্রবাদের কথাগুলো যথেষ্ট তাৎপর্যময়, অর্থবহ; এতে অভিজ্ঞতা ও বুদ্ধিদীপ্তির পরিচয় মিলে।

৭. **খনার বচন :** বাংলার লোকসাহিত্যে খনার বচন এক অমূল্য সম্পদ। প্রাচীন বাংলার মানুষ এসব বচনগুলো মেনে চলতো। যেমন—

*কলা রুয়ে না কেটো পাত—তাতেই কাপড় তাতেই ভাত।*
*যদি বরষে আগনে, রাজা যায় মাগনে।*
*যদি বরষে মাঘের শেষ, ধন্য রাজার পুণ্য দেশ,*
*কার্তিকের উনো জলে*
*দুনো ধান, খনা বলে।*

এসব খনার বচনগুলোতে প্রাচীন বাংলার জ্ঞানী-গুণীদের অভিজ্ঞতার পরিচয় বিধৃত হয়েছে।

এসব ছাড়াও বাংলা লোকসাহিত্যে রয়েছে অজস্র সম্পদ। যেমন—হেয়ালী, আর্য-তার্জা, ডাক ইত্যাদি। বাংলা লোকসাহিত্যের একটি উল্লেখযোগ্য শাখা তার মঙ্গলকাব্য, পাঁচালী, বাউলগান, টপ্পা, শ্যামাসংগীত প্রভৃতিকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। এগুলো কাব্যসাহিত্যের পর্যায়ভুক্ত হলেও মৌখিকভাবে এগুলোর পরিবেশন বাঙালির হৃদয়মনকে আকর্ষণ করেছিল। এছাড়া প্রাচীনকাল থেকে বাংলার লোকসংস্কৃতিতে যাত্রা, পালাগান, কবিগান প্রভৃতির ধারা অব্যাহত ছিল। পল্লীর অশিক্ষিত নিরক্ষর সম্প্রদায় এগুলো পরিবেশন করে আনন্দ উপভোগ করত। এগুলোর স্বাদ যেমন অভিনব, রস পরিবেশনও তেমনি বিচিত্র প্রকৃতির।

**লোকসাহিত্য সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা :** আধুনিক শিক্ষা ও সংস্কৃতির সর্বনাশা স্রোতে বাংলার লোকসাহিত্য বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে যাচ্ছে। আমাদের দেশ এখনও পল্লীপ্রধান ও গ্রামনির্ভর। সুতরাং এ সাহিত্যকে ও এর অমূল্য সম্পদকে রক্ষা করতে হবে। বিদেশে এসব সাহিত্যকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য Folklore Society গঠিত হয়েছে। আমাদের দেশেও সাহিত্য প্রেমিকদের এ ব্যাপারে কর্মতৎপর হতে হবে। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য হলেও আমাদেরকে বাংলার লোকসাহিত্যকে ধ্বংসের মুখ থেকে উদ্ধার করতে হবে এবং এগুলোকে বাঁচিয়ে রাখার সময় এসেছে।

**উপসংহার :** বাংলার লোকসাহিত্য আজ আর সে পূর্বতন অবিচ্ছিন্ন ধারায় নেই। আধুনিক ও বিদেশী সভ্যতায় মোহান্ধ হয়ে আমরা আমাদের স্বাভাবিক স্বতঃস্ফূর্ত জীবনধারাকে হারিয়ে ফেলতে বসেছি। এখন আর কর্মক্লান্ত দিনের শেষে পল্লী মায়ের কোলে পল্লীজননীর আঁচল পেতে গানের আসর বসে না। সন্ধ্যার পর বৈদ্যুতিক আলোয় সিনেমার আসর বসে আর স্যাটেলাইটের প্রভাবে তারা মাতাল হয়। আমরা আমাদের ঐতিহ্য ও জীবনধারা থেকে হারিয়ে যাচ্ছি। কে এদের রক্ষা করবে? পূর্বাকাশে কালো মেঘ জমেছে। তবুও আমরা আশায় বুক বেঁধেছি—হয়তো একদিন মেঘ কেটে যাবে। কালো মেঘে ঢাকা আমাদের লোকসাহিত্যকে বাঁচাতে হবে। প্রয়োজন শুধু এর সংরক্ষণ ও অনুশীলন।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



## রচনা ৩৩ সর্বস্তরে বাংলা ভাষার ব্যবহার

*[২০তম বিসিএস]*

**ভূমিকা :** মাতৃভাষা মানুষের মায়ের ভাষা, প্রাণের ভাষা। তাই মানব জীবনের সর্বস্তরে মাতৃভাষার গুরুত্ব অপরিসীম। বিভিন্ন দার্শনিক, চিন্তাবিদ, মনীষী, কবি-লেখক-শিল্পী মাতৃভাষার গুরুত্বকে মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেছেন। মাতৃভাষা হলো মন, মনন ও চিন্তনের ভাষা। মানুষের আনন্দ-বেদনা, সুখ-দুঃখ মাতৃভাষার মাধ্যমেই যথার্থভাবে প্রকাশিত হয়। ব্যক্তি জীবনের ইচ্ছা, আকাঙ্ক্ষা, সমাজ জীবনের শিক্ষা-সংগ্রাম-আন্দোলন-সংস্কার, জাতীয় জীবনের ঐক্য-শৃঙ্খলা, পরিকল্পনা ও কর্মতৎপরতা তথা নাগরিক জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে মাতৃভাষা পালন করে অনন্যসাধারণ ভূমিকা।

**বাংলা ভাষা :** বাংলা আমাদের মাতৃভাষা। পৃথিবীর প্রাচীন ভাষাগুলোর মধ্যে বাংলা অন্যতম। বিভিন্ন চরাই-উৎরাই পেরিয়ে এ ভাষা ক্রমশ বিকশিত হয়েছে। এ ভাষায় রচিত হয়েছে মূল্যবান সাহিত্যকর্ম। কিন্তু নানা সময়ে বাংলা ভাষার ওপর বহুবিধ আক্রমণ ও আঘাত এসেছে, বাংলা ভাষার বিকাশকে রুদ্ধ করার অপ্রচেষ্টা ও ষড়যন্ত্র চলেছে। ব্রিটিশ আমলে এ ভাষা পেয়েছে চরম অবহেলা। ১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষ ব্রিটিশের কাছ থেকে স্বাধীনতা লাভের পরও ১৯৫২ সালে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর হাতে এ ভাষার জন্য প্রাণ দিতে হয়েছে বাংলার দামাল তরুণদের। জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে এ ভাষার অবাধ ব্যবহার ছিল তরুণদের প্রধান দাবি। তৎকালীন দুই পাকিস্তানের বৃহত্তম জনগোষ্ঠীর ভাষা বাংলা হওয়া সত্ত্বেও পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী বাংলা ভাষার বিকাশ রুদ্ধ করতে বিভিন্ন ষড়যন্ত্র করেছে। এর ফলেই সৃষ্টি হয় ভাষা আন্দোলন এবং মহান একুশে ফেব্রুয়ারিতে ভাষার জন্য ছাত্র-জনতার আত্মদানের বিরল দৃষ্টান্ত। অবশেষে ১৯৫৬ সালের সংবিধানে বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দেয়া হয়। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীন হলে বাংলা ভাষাকে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার দেশের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে মর্যাদা দেয়। কিন্তু রাষ্ট্রভাষা হিসেবে মর্যাদা লাভ করলেও বাংলা ভাষা আজও জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে ব্যবহার হচ্ছে না।

পৃথিবীতে বাঙালিরাই সেই গৌরবময় জাতি, যারা মাতৃভাষার মর্যাদা রক্ষার জন্য প্রাণ দিয়েছে। বাংলা ভাষার মর্যাদা আজ বিশ্বব্যাপী প্রতিষ্ঠিত। কারণ ১৯৯৯ সালের ১৭ নভেম্বর জাতিসংঘের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক সংস্থা ইউনেস্কো আমাদের ভাষা শহীদ দিবসকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে ঘোষণা করেছে এবং বাংলা ভাষার সম্মানে ১৯৯৯ সাল থেকে বিশ্বব্যাপী মহান একুশে ফেব্রুয়ারিতে পালিত হচ্ছে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস।

**বাংলা ভাষা ব্যবহারের সমস্যা :** বাংলাদেশ একটি একক ভাষাভিত্তিক রাষ্ট্র। বাংলা ভাষা দেশের সমগ্র জনগোষ্ঠীকে একই বন্ধনে বেঁধে রেখেছে। বিশ্ববিখ্যাত সাহিত্যিকদের সৃষ্টিসম্ভারে বাংলা ভাষা আর বাংলা সাহিত্য আজ ঐশ্বর্যমণ্ডিত। এ ভাষা জীবনের সর্বক্ষেত্রের প্রয়োজন মেটাতে সক্ষম। ধ্বনিতাত্ত্বিক দিক থেকেও এ ভাষার কোনো দৈন্য নেই। এজন্যেই বাংলা ভাষা জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে ব্যবহারযোগ্য এবং প্রয়োগে তেমন কোনো সমস্যা নেই। নিম্নলিখিত যেসব সমস্যা আপাত দৃশ্যমান, সেগুলো ভাষাপ্রেমিকদের ঐকান্তিক প্রয়াসে দূর করা সম্ভব। যেমন :

ক. বাংলা পরিভাষার জটিলতা এবং মানসম্পন্ন অনুবাদ শব্দ ব্যবহারে অদক্ষতা।
খ. সরকারি চিঠিপত্রে সাধু ভাষার ব্যবহার।
গ. আইন-কানুন, নিয়ম-বিধি এবং বৈজ্ঞানিক ও চিকিৎসাবিষয়ক শব্দাবলীর অনুবাদে অসুবিধা।
ঘ. ইংরেজি থেকে বাংলায় উত্তরণের মনস্তাত্ত্বিক জড়তা।



**প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ :** এসব সমস্যা উত্তরণে বিভিন্ন প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। বাংলা একাডেমি থেকে ইতোমধ্যে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক বাংলা পরিভাষা পুস্তক প্রকাশিত হয়েছে। তবে প্রয়োজনের তুলনায় এগুলো অপ্রতুল। তাছাড়া কিছুসংখ্যক ইংরেজি শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ ব্যবহারোপযোগী নয়। আবার অনেক পরিভাষার গ্রহণযোগ্যতা সম্পর্কেও প্রচুর সন্দেহ রয়েছে। বাংলায় যথাযথ অনুবাদের জন্য মানসম্পন্ন শব্দাবলী প্রয়োজন। আর প্রয়োজন দেশের প্রধান প্রধান পণ্ডিতদের সমন্বয়ে ভাষার একটি ঐক্যবদ্ধ ও সমন্বিত বিধান এবং এর প্রয়োগ ও ব্যবহারে দেশের সর্বশ্রেণীর ও পেশার মানুষের আন্তরিকতা। তাছাড়া শিক্ষা ক্ষেত্রে পাণ্ডিত্যপূর্ণ পরিভাষা ব্যবহার করলেও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে প্রশাসনিক পরিভাষার প্রয়োজন সমধিক।

বাংলা টাইপ রাইটারের স্বল্প গতি বাংলা ভাষা ব্যবহারে বিশেষ প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে। সরকারের পৃষ্ঠপোষকতা ও সহযোগিতায় বাংলা টাইপ রাইটারের গতি বৃদ্ধি এবং মান উন্নয়নে ব্যবস্থা গ্রহণ প্রয়োজন। অন্যদিকে মুদ্রাক্ষরিক হিসেবে এ যাবৎ অফিস-আদালতে ইংরেজি জানা টাইপিস্টদের অগ্রাধিকার দিয়ে বাংলার প্রতি অবহেলা প্রদর্শন করা হয়েছে। এ মনোভাব পরিহার করা উচিত। যথাযথ প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করলে বাংলা টাইপিস্টরা যথেষ্ট দক্ষতা প্রদর্শন করতে সক্ষম হবে। অবশ্য বর্তমানে কম্পিউটারের ব্যবহারের ফলে এ সমস্যা অনেকাংশেই দূরীভূত হয়েছে।

বর্তমানে অফিস-আদালতে সাধু ভাষা ব্যবহৃত হচ্ছে। কিন্তু সাধু ভাষা ব্যবহারিক কাজে বর্তমানে প্রায় পরিত্যক্ত। কথোপকথন, সংবাদপত্র, সৃষ্টিশীল গ্রন্থরাজি ও পাঠ্য-পুস্তকাদির প্রায় সর্বস্তরে ইতিমধ্যে চলিত ভাষা স্থানগ্রহণ করেছে। তাই অফিস-আদালতে চলিত ভাষা চালু হলে বাংলার প্রচলন ও ব্যবহার আরো দ্রুত হবে।

উচ্চ শিক্ষা, চিকিৎসাবিজ্ঞান ও প্রকৌশল বিজ্ঞান, মানববিজ্ঞান এবং আইন সংক্রান্ত উচ্চতর শিক্ষাগ্রন্থসমূহ ব্যাপকভাবে ইংরেজি থেকে বাংলায় অনুবাদ না করায় উচ্চ শিক্ষা ক্ষেত্রে এখনো ইংরেজির প্রাধান্য অক্ষুণ্ন রয়েছে। ফলে শিক্ষা ক্ষেত্রে এবং আইন ও প্রশাসনিক বিধিবিধানের ক্ষেত্রে বাংলা প্রচলনে বিরাট অন্তরায় সৃষ্টি করছে।

অফিস-আদালতে, উচ্চতর শিক্ষা ও বিশেষ বিশেষ পরীক্ষা ক্ষেত্রে বাংলা প্রচলনের সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধকতা হচ্ছে ইংরেজি থেকে বাংলায় উত্তরণের মনস্তাত্ত্বিক জটিলতা। আমাদের ঔপনিবেশিক আমলের চিন্তা-পরিপুষ্ট মানসিকতা চিরকালই স্বদেশের শিক্ষা-সংস্কৃতি-ভাষা থেকে বিদেশের ভাষা-সংস্কৃতিকে বড় করে দেখেছে। তাছাড়া শ্রেণীবৈষম্য টিকিয়ে রাখার জন্য সুবিধাবাদী শিক্ষিত শ্রেণী আজও ইংরেজি ভাষার পক্ষে দুর্বলতা পোষণ করছেন।

**সর্বস্তরে বাংলা ভাষা ব্যবহারে সুপারিশ :** উল্লিখিত আলোচনার প্রেক্ষিতে জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে বাংলা ভাষা প্রচলনের জন্য নিম্নোক্ত পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করা অত্যাবশ্যক :

১. শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে বাংলা ভাষাকে সর্বজনীনভাবে ব্যবহার করার লক্ষ্যে সকল শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের উপযোগী বাংলা পুস্তক রচনা ও প্রকাশ প্রয়োজন। কলেজ ও উচ্চশিক্ষার পাঠ্যপুস্তক অনুবাদ, রচনা ও প্রকাশনার জন্য সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় প্রকাশনা সংস্থা প্রতিষ্ঠা করা আবশ্যক। কিন্ডারগার্টেন সিস্টেমের স্কুলসমূহে ইংরেজি বইয়ের আধিপত্য কমিয়ে এবং বাংলা বইয়ের যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে বাংলা ভাষা চর্চায় সকলকে উৎসাহিত করা প্রয়োজন।
২. যথার্থ পরিভাষা না পেলে বিদেশী শব্দগুলো অস্থায়ীভাবে বাংলায় রাখা কিংবা আত্তীকরণ করা যেতে পারে। বিভিন্ন মন্ত্রণালয় বিভাগ ও অফিস-আদালতে ব্যবহৃত ও চালু প্রতিশব্দগুলো একত্র করে একটি কার্যকর পরিভাষা কোষ তৈরি করা যেতে পারে।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



৩. নিম্ন-আদালতে জমিজমা বা রাজস্বের ক্ষেত্রে আরজি, সমন, সওয়াল-জবাব বাংলায় যেমন হচ্ছে, উচ্চ আদালতেও তেমনটি হওয়া সম্ভব। এজন্য যাবতীয় আইনের বাংলা অনুবাদের জন্য একটি সংস্থা বা কমিশনের ওপর দায়িত্ব অর্পণ করা যেতে পারে।
৪. সকল ব্যাংক ও বীমা প্রতিষ্ঠানে লেনদেন, হিসাবরক্ষণ পদ্ধতি ও বাণিজ্যিক কাগজপত্র বাংলায় চালু করা যেতে পারে। এতে দেশের অর্থনৈতিক বিষয়াদির সঙ্গে সর্বস্তরের জনগণের সম্পর্ক দৃঢ় ও গভীর হবে।
৫. শুধু ইংরেজি ভাষা নয়, বাংলা ভাষা উত্তমরূপে জানলে চাকরির নিশ্চয়তা বিধান করা হবে—এরকম ধারণা ও সিদ্ধান্ত নিয়ে সব অফিস-আদালতে চাকরির পরীক্ষায় বাংলার প্রতি বেশি গুরুত্ব প্রদান করলে জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে দ্রুত বাংলা ব্যবহার সম্ভব।
৬. প্রশাসনের সর্বোচ্চ পর্যায় থেকে চাপ সৃষ্টি অব্যাহত থাকলে সর্বস্তরে বাংলা চালু দ্রুত সম্পন্ন হবে। অফিস-আদালতের সর্বপর্যায়ে বাংলা প্রচলনের জন্য ইতোমধ্যে জাতীয় সংসদে আইন প্রণীত হয়েছে। সে আইন সকলে মেনে চললে সুফল ফলবে।
৭. সর্বোপরি মাতৃভাষার প্রতি শ্রদ্ধাবোধ এবং এর প্রসারে বিভিন্ন ব্যবহারিক কার্যক্রম গ্রহণ করা যেতে পারে এবং বাংলা ভাষার বিস্তারে বাংলা একাডেমিকে আরো সম্প্রসারিত করা যেতে পারে।

**উপসংহার :** জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে বাংলা ভাষার ব্যবহারে আইন আর আন্তরিকতা একসঙ্গে মিলিত হলে সর্বস্তরে এটি দ্রুত প্রতিষ্ঠা লাভ করবে। বহু ত্যাগ-তিতিক্ষা, সংগ্রাম, আন্দোলন এবং আত্মাহুতির পর বাংলা ভাষা আজ স্বমহিমায় দীপ্তিমান এবং বিশ্বব্যাপী শ্রদ্ধার আসনে আসীন। এই দীপ্তি আরো উজ্জ্বল হবে সেদিন, যেদিন সর্বস্তরের মানুষ আন্তরিকভাবে বাংলা ভাষা জীবনের সর্বত্র প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করে যাবে, বাংলা ভাষাবিরোধী সকল মনোভাবকে বিসর্জন দেবে।

## রচনা ৩৪ বাংলা সাহিত্যের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ

*[২০তম বিসিএস]*

**ভূমিকা :** প্রতিটি জাতির নিকট তাদের ভাষা মধুর ও প্রাণপ্রিয়। পৃথিবীর প্রতিটি ভাষারই একটি নিজস্ব সাহিত্য জগৎ রয়েছে, যা তাদের নিজস্ব সংস্কৃতি থেকে ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছে। প্রতিটি ভাষা ও সাহিত্য তাদের বৈশিষ্ট্য ও মহিমা দান করে বিশ্বসাহিত্যকে করেছে মহিমান্বিত ও পরিপুষ্ট।

**সাহিত্য কি :** অল্প কথায় সাহিত্যের সংজ্ঞা প্রদান করা অত্যন্ত কঠিন। মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার অন্ত নেই। সে নিজেকে বাইরে দেখতে চায়। অপরের মধ্যে মানুষ আপনাকে পেতে চায় এবং পেতে চায় বলেই সে নতুন নতুন সৃষ্টিতে নিজেকে প্রকাশ করতে চায়। স্রষ্টা সৃষ্টির আনন্দে বিচিত্ররূপে জগৎ সৃষ্টি করেছেন। মানুষ তেমনি নিজের ভাব-কল্পনাকে বহু রূপ পরিগ্রহ করিয়ে তার মাধুর্য উপভোগ করতে চায়। এভাবে আত্মপ্রকাশের জন্য মানুষের মনে তীব্র আকাঙ্ক্ষার জন্ম নেয়। মানুষের এ আত্মপ্রকাশের বাণীবদ্ধ রূপই হয়ে উঠে সাহিত্য।

"Literature is the reflection of human mind"—এ কারণেই বলা হয় 'সাহিত্য হচ্ছে মানব মনের প্রতিচ্ছবি'। সাহিত্য হচ্ছে আলোর পৃথিবী, সেখানে যা আসে আলোকিত হয়ে আসে। কালো এসে এখানে নীল হয়ে যায়, অসুন্দর হয়ে যায় সুন্দর শিল্পকলা।



আত্মপ্রকাশের বাসনা, পারিপার্শ্বিকের সাথে সংযোগ কামনা, কল্পজগতের প্রয়োজনীয়তা এবং রূপপ্রিয়তা—এসব সাহিত্য সৃষ্টির উৎস। সুতরাং সাহিত্য বলতে সাহিত্যিকের মন, বস্তুজগৎ ও প্রকাশভঙ্গি এ তিনের সমন্বয়কে বুঝায়। সর্বকালের সহৃদয়জনের হৃদয়ভেদ্য ভাবকে আত্মগত করে আবার তাকে পরের করে প্রকাশই সাহিত্য। মোটকথা বিশ্বপ্রকৃতি, স্রষ্টা, মানব ও জীবজগৎ সকলই সাহিত্যের সামগ্রী। আর এ সামগ্রী যখন সাহিত্যিকের কল্পনারঞ্জিত হয়ে ভাবময়রূপে আত্মপ্রকাশ করে তখনই তা সাহিত্য।

**সাহিত্যের উদ্দেশ্য :** বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাষায়—'অন্তরের জিনিসকে বাহিরের, ভাবের জিনিসকে ভাষার, নিজের জিনিসকে বিশ্বমানবের ও ক্ষণকালের জিনিসকে চিরকালের করে তোলা সাহিত্যের কাজ।' এর সাধারণ উদ্দেশ্য আনন্দদান। সাহিত্য জগৎ ও জীবনকে সুন্দর করে এবং কোনো কোনো সময় সত্যকে আমাদের কাছে গোচর বা প্রত্যক্ষ করে আনন্দদান করে। মানুষের জীবনের দুঃখ-বেদনা, হাসি-কান্না ও বিচিত্র সমস্যা যে সাহিত্যের উপকরণ, সে সম্বন্ধে সন্দেহ নেই। কিন্তু সাহিত্যিক যখন সৃষ্টি করেন, তখন জীবনের নিগূঢ় রহস্য তাকে উদ্বুদ্ধ করে। তিনি সকলের সাথে নিজেকে যুক্ত রেখে প্রেমের দ্বারা, প্রীতির দ্বারা মানুষকে গ্রহণ করে, তার সৃষ্টিকে রূপময় করে তোলেন। সাহিত্য এভাবে মানুষ, প্রকৃতি বা কোনো ভাবনা-চিন্তাকে আমাদের কাছে নিঃসংশয়িতরূপে সত্য করে তোলে। সাহিত্য থেকে বিভিন্ন মনোবৃত্তি, শিক্ষা, পারিপার্শ্বিক ও সংস্কৃতিসম্পন্ন জনগণ বিভিন্ন অর্থ গ্রহণ করে। কিন্তু প্রত্যক্ষভাবে কোনো সামাজিক, নৈতিক বা রাষ্ট্রিক শিক্ষাদান বা মতবাদ প্রচার করা সাহিত্যের উদ্দেশ্য নয়।

**বাংলা ভাষার জন্ম :** অন্য সব কিছুর মতো ভাষাও জন্ম নেয়, বিকশিত হয়, কালে কালে রূপ বদলায়, আবার কালের গর্ভে হারিয়েও যায়। আজ যে বাংলা ভাষায় আমরা কথা বলি, কবিতা লিখি, গান গাই অনেক আগে এ ভাষা এরকম ছিল না। হাজার বছর ধরে ক্রমপরিবর্তনের ফলে বাংলা ভাষা বর্তমান রূপ ধারণ করেছে। যে প্রাচীন ভাষা থেকে বাংলা ভাষা জন্ম হয়েছে তার নাম 'প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা'।

অনেকে মনে করেন, বাংলা ভাষার উদ্ভব ঘটেছে সপ্তম শতাব্দীতে। আবার কেউ কেউ মনে করেন ৯৫০ খ্রিস্টাব্দের কাছাকাছি কোনো সময়ে বাংলা ভাষার জন্ম হয়েছিল। জন্মের পর থেকে বাংলা ভাষা পাথরের মতো এক স্থানে বসে থাকেনি। এর পরিবর্তন হয়েছে মানুষের কণ্ঠে, কবিদের রচনায়। এ বদলের প্রকৃতি অনুসারে বাংলা ভাষাকে তিনটি স্তরে বিভক্ত করা হয়। যথা :

ক. প্রথম স্তরটি প্রাচীন বাংলা ভাষা। এর প্রচলন ছিল ৬৫০ থেকে ১২০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত।
খ. দ্বিতীয় স্তরটি মধ্যযুগের বাংলা ভাষা। এটি ১২০১ থেকে ১৮০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত।
গ. তৃতীয়ত, ১৮০১ খ্রিস্টাব্দ থেকে শুরু হয় আধুনিক বাংলা ভাষা—এ সময় থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত কিছু কিছু পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে বর্তমান আধুনিক ভাষার সৃষ্টি হয়েছে।

**বাংলা সাহিত্যের জন্ম ও এর তিন যুগ :** আনুমানিক দশম শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে রচিত হচ্ছে বাংলা সাহিত্য। তাই বাংলা সাহিত্যের বয়স এক হাজার বছরেরও বেশি। আর এ সময়েই সৃষ্টি হয়েছে সুবিশাল এক সাহিত্য। হাজার বছরে বাংলা সাহিত্য কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বাঁক নিয়েছে, এ বাঁকগুলো অত্যন্ত স্পষ্ট। নিচে বাংলা সাহিত্যের বিকাশ ধারার বিশেষ দিক আলোচিত হলো :

**প্রাচীন যুগের প্রথম প্রদীপ চর্যাপদ :** বাংলা ভাষার প্রথম বইটির নাম চর্যাপদ। ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দে পণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী নেপালের রাজ দরবারের গ্রন্থাগার থেকে আবিষ্কার করেন এ দুর্লভ বইটি। কিন্তু এর ভাষা ছিল দুর্বোধ্য, বিষয়বস্তু দুরূহ। এ চর্যাপদকে নিয়ে বিভিন্ন ভাষার পণ্ডিতদের মধ্যে

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



কাড়াকাড়ি পড়ে যায়। কিন্তু বাংলা ভাষার এক সেরা পণ্ডিত ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ১৯২৬ সালে ইংরেজিতে 'বাংলা ভাষার উৎপত্তি ও বিকাশ' নামে বই লিখে প্রমাণ করেন চর্যাপদ আর কারো নয়, বাঙালির। চর্যাপদের ভাষা বাংলা। এরপর ডক্টর প্রবোধচন্দ্র বাগচী, ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, ডক্টর সুকুমার সেন প্রমুখ পণ্ডিতগণ এর ভাষা ও বিষয়বস্তু পর্যালোচনা করে প্রমাণ করেন চর্যাপদ বাংলা ভাষায় রচিত। চর্যাপদ কতকগুলো পদ বা কবিতা বা গানের সংকলন। এতে আছে ৪৬টি পূর্ণ কবিতা ও একটি ছেঁড়া খণ্ডিত কবিতা। এ কবিতাগুলো লিখেছিলেন ২৪ জন বৌদ্ধ বাউল কবি। এ কবিরা সকলের জন্যে সাহিত্য রচনা করেননি, করেছেন নিজেদের জন্যে। তারা এ কবিতাগুলোতে নিজেদের সাধনার গোপন কথা বলেছেন। তবু মনের ছোঁয়ায় তাতে লেগেছে সাহিত্যের নানা রঙ ও সৌরভ।

চর্যাপদের কবিতাগুলোতে শুধু ধর্মের কথা নেই, আছে ভালো কবিতার স্বাদ। আছে সেকালের বাংলার সমাজের ছবি, আর সে ছবিগুলো এতো জীবন্ত যে, মনে হয় এইমাত্র প্রাচীন বাংলার গাছপালা, আর সাধারণ মানুষের মধ্যে একটু হেঁটে এলাম। এখানে আছে গরিব সাধারণ মানুষের দুঃখ-বেদনার কথা, সুখ ও আনন্দের কথা, আছে নদী ফুল ও আকাশের কথা। একটি কবিতায় এক দুঃখী কবি তার সংসারের অভাবের ছবি অত্যন্ত মর্মস্পর্শী করে তুলে ধরেছেন। কবির ভাষায়—

*টালত মোর ঘর নাহি পড়বেষী*
*হাড়ীত ভাত নাহি নিতি আবেশী॥*
*বেঙ্গ সংসার বড়হিল জাঅ।*
*দুহিল দুধ কি বেন্টে ষামায়॥*

কবি বলেছেন, টিলার ওপরে আমার ঘর, আমার কোনো প্রতিবেশী নেই। হাঁড়িতে আমার ভাত নেই, আমি প্রতিদিন উপোস থাকি। ব্যাঙের মতো প্রতিদিন সংসার আমার বেড়ে চলেছে, যে দুধ দোহানো হচ্ছে তা আবার ফিরে যাচ্ছে গাভীর বাটে। এরূপ চর্যাপদে আছে সমাজের উঁচু শ্রেণীর লোকের অত্যাচারের ছবি। আজকাল শ্রেণীসংগ্রামের জন্যে রচিত হয় সাহিত্য। সুতরাং বলা যায়—বাংলা সাহিত্যে শ্রেণী সংগ্রামের সূচনা হয়েছিল প্রথম কবিতাগুচ্ছেই। এ কবিতাগুলোতে আছে অনেক সুন্দর সুন্দর উপমা; আছে মনোহর কথা, যা সত্যিকার কবি না হলে উপলব্ধি করা যায় না। কবি কম্বলাম্বরপদ, তার ধনসম্পদের কথা বলেছেন—

*সোনে ভরিতী করুণা নাবী।*
*রূপা থুই নাহিক ঠাবী॥*

কবি বলেছেন, আমার করুণা নামের নৌকা সোনায় সোনায় ভরে গেছে। সেখানে আর রুপো রাখার মতো তিল পরিমাণ জায়গা নেই। এ কথা পড়ার সাথে সাথে মনে পড়ে রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত কবিতা 'সোনার তরী'র সেই পঙক্তিগুলো, যেখানে কবি বলেছেন—

*ঠাঁই নাই ঠাঁই নাই ছোট সে তরী*
*আমার সোনার ধানে গিয়েছে ভরি।*

প্রাচীন যুগের বাংলা সাহিত্য ছিল কবিতা ও গাননির্ভর। আগে কবিরা কবিতা গাইতেন, পাঠকেরা শুনতো কবির চারদিকে বসে। তাই এগুলো একই সাথে গান ও কবিতা। বাঙালির প্রথম গৌরব এগুলো।

**বাংলা সাহিত্যের অন্ধকার যুগ :** ১২০০ থেকে ১৩৫০ পর্যন্ত ১৫০ বছর বাংলা ভাষায় উল্লেখযোগ্যভাবে সাহিত্য রচিত হওয়ার ইতিহাস পাওয়া যায় না। তাই ফসলশূন্য এ সময়টিকে বলা



হয় অন্ধকার যুগ। এ সময়টাকে নিয়ে অনেকে ভেবেছেন, অনেক পণ্ডিত অনেক আলোচনা করেছেন। কিন্তু কেউ কোনো সাহিত্য নিদর্শন খুঁজে পাননি। তবে অন্ধকার সময়ের রচনা সম্বন্ধে আমরা অনুমান করতে পারি যে, এ সময় যা রচিত হয়েছিল, তা কেউ লিখে রাখেনি। তাই এতোদিনে তা মানুষের স্মৃতি থেকে মুছে গেছে। এরপর থেকে বাংলা সাহিত্যের ধারাবাহিক ইতিহাস পাওয়া যায়। ১৩৫০ সালের পরেই আসেন মহৎ কবিরা, আসেন বড়ু চণ্ডীদাস তার শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য নিয়ে এবং আসর মাতিয়ে তুলেছেন অনেক কবি।

**বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগ :** অন্ধকার যুগের পরে পুনরায় প্রদীপ জ্বলে, আসে মধ্যযুগ। এ যুগটি সুদীর্ঘ। এ সময়ে রচিত হয় অসংখ্য কাহিনীকাব্য, গীতিকবিতা; মানুষ আর দেবতার কথা গীত হয় একসাথে। আগের মতো সাহিত্য আর সীমাবদ্ধ হয়ে থাকেনি, এর মধ্যে দেখা দেয় বিস্তার। এর ফলে সাহিত্যে স্থান পায় দেবতা ও দৈত্য, মানুষ ও অতিমানুষ; আসে গৃহের কথা, সিংহাসনের কাহিনী। এ সময়ে যারা মহৎ কবি, তাদের মধ্যে বড়ু চণ্ডীদাস, মুকুন্দরাম চক্রবর্তী, বিজয়গুপ্ত, চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস, ভারতচন্দ্র, আলাওল, দৌলত কাজী প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। মধ্যযুগের অন্যতম প্রধান ফসল হচ্ছে মঙ্গলকাব্য। এ যুগে অসংখ্য কবি রচনা করেন মঙ্গলকাব্য। মঙ্গলকাব্যকে মধ্যযুগের উপন্যাস বলা হয়। এগুলো সব দীর্ঘকাব্য। দেবতাদের কাহিনীই এগুলোর মুখ্য উপজীব্য। এ যুগের সকল সাহিত্যই দেবতাকেন্দ্রিক। মানুষ সে সময়ে প্রাধান্য লাভ করেনি। মানুষের সুখ-দুঃখের কথা এসেছে দেবতার কথা প্রসঙ্গে। তবে দেবতার ছদ্মবেশে এসব কাব্য জুড়ে আছে মানুষ। মধ্যযুগের তথা বাংলা ভাষার প্রথম মহাকবি হলেন বড়ু চণ্ডীদাস। তিনি রচনা করেন 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' নামক এক অসাধারণ দীর্ঘ কাব্য। এ কাব্যটির নায়ক-নায়িকা কৃষ্ণ ও রাধা।

মঙ্গলকাব্যের মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত হচ্ছে চণ্ডীমঙ্গল আর মনসামঙ্গল। চণ্ডীমঙ্গলের শ্রেষ্ঠ কবি হলেন কবিকঙ্কন মুকুন্দরাম চক্রবর্তী এবং ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর। মনসামঙ্গলের দুজন সেরা কবি হলেন বিজয়গুপ্ত এবং বংশীদাস। চণ্ডী পুজো প্রচারের জন্যে যে মঙ্গলকাব্য, তার নাম চণ্ডীমঙ্গল কাব্য, আর মনসা দেবীর পুজো প্রচারের জন্য যে কাব্য রচিত তার নাম মনসামঙ্গল কাব্য। চাঁদ সওদাগর, বেহুলা, লখিন্দরের কাহিনী আজও বাংলা সাহিত্যে প্রেমিকদের মনকে নাড়া দেয়।

মধ্যযুগের শ্রেষ্ঠ ফসল বৈষ্ণব পদাবলী। এ কবিতাগুলো ক্ষুদ্র হলেও এগুলোতে যে আবেগ প্রকাশিত হয়েছে, তা তুলনাহীন। এ কবিতার নায়ক-নায়িকা কৃষ্ণ ও রাধা। বৈষ্ণব কবিরা কখনও রাধার বেশে, কখনো কৃষ্ণের বেশে নিজেদের হৃদয়ের আকুল আবেগ প্রকাশ করেছেন তাদের কবিতাগুলোতে। ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন ১৬৫ জন বৈষ্ণব কবির নাম জানিয়েছেন। তবে বৈষ্ণব কবিতার চার মহাকবি হলেন বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস ও গোবিন্দদাস। বৈষ্ণব কবিরা সৌন্দর্য সচেতন। সেকালে তারা সৌন্দর্যের যে সূক্ষ্ম বর্ণনা দিয়েছেন তা সত্যিই বিস্ময়কর। আকুল করা আবেগে ভরপুর বৈষ্ণব কবিতাগুলো। চণ্ডীদাসের একটি পদ উল্লেখযোগ্য :

*সই কেবা শুনাইল শ্যাম নাম।*
*কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো*
*আকুল করিল মোর প্রাণ।*

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



কবি জ্ঞানদাস সহজ-সরল আবেগ প্রকাশ করেন সহজ-সরল ভাষায়। কিন্তু ভাষার মধ্যে সঞ্চার করে দিয়েছেন প্রাকৃত হৃদয়ের তীব্র চাপ। জ্ঞানদাসের একটি কবিতার কয়েক পঙ্‌ক্তি—

*রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর।*
*প্রতি অঙ্গ লাগি কান্দে প্রতি অঙ্গ মোর।*
*হিয়ার পরশ লাগি হিয়া মোর কান্দে*
*পরান পিরিতি লাগি থির নাহি বান্ধে।*

যেখানে রাধা রাখছে তার আলতা রাঙানো পা, সেখানেই যেনো রাধার পা থেকে ঝরে পড়ছে স্থলপদ্মের লাল পাপড়ি। এমন অনেক সুন্দর বর্ণনায় সমৃদ্ধ বৈষ্ণব কবিতা।

মধ্যযুগে মুসলমান কবিরা একটি নতুন পথের সন্ধান দিয়েছেন। তারাই প্রথমে শোনালেন শুধু মানুষের গল্প-কাহিনী। তারা দেবতার পরিবর্তে মানুষের হৃদয়ের কথা, দুঃখ-বেদনা, হাসি-কান্নার কথা তাদের কাব্যে বর্ণনা করেছেন। এ সময়কার মুসলমান কবিদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন শাহ মুহম্মদ সগীর, বাহরাম খান, আফজল আলী প্রমুখ। এরা ষোড়শ শতকের কবি। সপ্তদশ শতাব্দীর বিখ্যাত কবি হলেন সৈয়দ সুলতান, আবদুল হাকিম, কাজী দৌলত, আলাওল। তারা সবাই মিলে বাংলা কবিতাকে অপূর্ব সৌন্দর্যদান করেছিলেন। এর ফলে বাংলা সাহিত্য মধ্যযুগ থেকে হয়ে উঠে হিন্দু-মুসলমান উভয়ের সম্পত্তি। তারা উভয়ে মিলে বুনে যেতে থাকেন কাব্যলক্ষ্মীর শাড়ির পাড়। এ সময়কার উল্লেখযোগ্য অবদান হলো ইউসুফ-জুলেখা, লাইলি-মজনু, নসিহৎনামা, নূরনামা, কারবালা, শহরনামা, সতীময়না প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থ। মধ্যযুগের মুসলমান কবিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কবি ছিলেন আলাওল। তার শ্রেষ্ঠ কাব্যের নাম পদ্মাবতী। উপমা, সৌন্দর্যে ও অলঙ্কারে 'পদ্মাবতী' বাংলা সাহিত্যের এক অনুপম সৃষ্টি।

**মধ্যযুগের লোকসাহিত্য :** বাংলা সাহিত্য লোকসাহিত্যে যথেষ্ট সমৃদ্ধ। ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ একবার একে বাতাসের সাথে তুলনা করেছিলেন। বাতাস যেমন আমাদের ঘিরে আছে তেমনি আমাদের চারপাশে ছড়িয়ে আছে অজস্র লোকসাহিত্য। যে সাহিত্য লেখা হয়নি তালপাতার মূল্যবান গাত্রে, যে সাহিত্য পায়নি সমাজের উঁচুতলার লোকদের আদর, যে সাহিত্য পল্লীর সাধারণ মানুষের কথা বলেছে গানে গানে, যে সাহিত্যের রচয়িতার নামও অনেক সময় হারিয়ে গেছে তাকে বলা হয় লোকসাহিত্য। এ সাহিত্য বেঁচে আছে শুধু পল্লীর মানুষের ভালোবাসা ও স্মৃতিকে সম্বল করে। লোকসাহিত্য পল্লীর মানুষের বুকের বাঁশরী। লোকসাহিত্যের ভাণ্ডার অনেক বড়, অনেক বিশাল। ছড়া, গীতি, গীতিকা, ধাঁধা, রূপকথা, উপকথা প্রভৃতিতে ভরপুর আমাদের লোকসাহিত্য। লোকসাহিত্য সংগ্রহের জন্যে যাঁদের নাম বিখ্যাত তাদের মধ্যে বিখ্যাত চন্দ্রকুমার দে। ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন প্রকাশ করেন ময়মনসিংহ গীতিকা। দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার সংগ্রহ করেন রূপকথা—ঠাকুরমার ঝুলি, ঠাকুরদাদার ঝুলি। উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরীর রূপকথা সংগ্রহের নাম টুনটুনির বই। লোকসাহিত্যের অন্যতম শাখা ছড়ার মধ্যে লুকিয়ে আছে গভীর ভাব ও ইতিহাস। যেমন—'আগডুম বাগডুম ঘোড়াডুম সাজে' কিংবা 'ছেলে ঘুমালো পাড়া জুড়ালো বর্গী এলো দেশে'। এ ছড়াগুলো যথেষ্ট অর্থবহ। গীতিকা লোকসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। মহুয়া, দেওয়ানা মদিনা, মলুয়া উল্লেখযোগ্য গীতিকা। গীতিকায় পাওয়া যায় পল্লীর গাছপালার মতো সবুজ চিরকালের নর-নারীর কামনা-বাসনার কাহিনী। বাংলার গীতিকাগুলোর সৌন্দর্য অশেষ। মধ্যযুগের কাহিনীগুলোর মধ্যে এগুলোই শ্রেষ্ঠ।



**বাংলা সাহিত্যের আধুনিক যুগ :** মধ্যযুগের অবসানে আসে আধুনিক যুগ, ১৮০০ অব্দে। মধ্যযুগে বাংলা সাহিত্য ছিল সংকীর্ণ; সবগুলো শাখা বিকশিত হয়নি তাতে। উনিশ শতকে বিকশিত হয় সব শাখা। বাংলা সাহিত্য হয়ে ওঠে সম্পূর্ণ সাহিত্য। মানুষ এ সময়ে যুক্তিতে আস্থা আনে, আবেগকে নিয়ন্ত্রণ করে, মানুষকে মানুষ বলে মূল্য দেয়। এর প্রভাব পড়ে বাংলা সাহিত্যে, তাই বাংলা সাহিত্য হয়ে উঠে আধুনিক। আধুনিক যুগের সবচেয়ে বড় অবদান গদ্য। প্রাচীন বা মধ্যযুগে বাংলা সাহিত্যে গদ্য বলতে বিশেষ কিছু ছিলো না। তখন ছিলো কেবল কবিতা বা পদ্য। ১৮০০ খ্রিষ্টাব্দে স্থাপিত ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের লেখকরা সুপরিকল্পিতভাবে বিকাশ ঘটান বাংলা গদ্যের। তাঁদের প্রধান ছিলেন উইলিয়াম কেরি। তার সহায়ক ছিলেন রামরাম বসু। এ সময়ে গল্প, উপন্যাস, নাটক লেখা হয় গদ্যে। প্রবন্ধ গদ্য ছাড়া লেখাই যায় না। উনিশ শতকের প্রথম অর্ধেক কেটেছে সদ্যোজাত গদ্যের লালন-পালনে। এ সময়ে বিভিন্ন লেখক নিজ নিজ ভঙ্গিতে গদ্য রচনা করেন এবং গদ্যসাহিত্যকে বিকশিত করেন। সে সময়ের যারা প্রধান গদ্যলেখক তারা হচ্ছেন মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, রাজা রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, তারাশঙ্কর তর্করত্ন, ভূদেব মুখোপাধ্যায় প্রমুখ। গদ্যসাহিত্যে আসে বৈচিত্র্য; রচিত হয় গল্প, নাটক, প্রহসন, প্রবন্ধ প্রভৃতি।

বাংলা সাহিত্যে প্রথম উপন্যাস লেখেন প্যারীচাঁদ মিত্র, উপন্যাসের নাম 'আলালের ঘরের দুলাল'। ব্যঙ্গবিদ্রূপে ভরা মজার কাহিনী লেখেন কালীপ্রসন্ন সিংহ। মহাকাব্য রচনা করেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত। নাম মেঘনাদবধ কাব্য। তিনি একাই বাংলা সাহিত্যকে অনেক পূর্ণাঙ্গতা দিয়ে গেছেন। তার হাতেই প্রথম রচিত হয় সনেট, ট্র্যাজেডি, প্রহসন। উপন্যাস সৃষ্টি করেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। উপন্যাস ছাড়াও সমালোচনা, বিদ্রূপাত্মক প্রবন্ধ এবং আরো অনেক রকম রচনার দ্বারা তিনি বাংলা সাহিত্যকে এগিয়ে নিয়ে যান।

এরপরে আসেন দীনবন্ধু মিত্র, বিহারীলাল চক্রবর্তী, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, মীর মশাররফ হোসেন, কায়কোবাদ। তারপর আসেন মোহিতলাল মজুমদার, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, কাজী নজরুল ইসলাম, জীবনানন্দ দাশ, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বুদ্ধদেব বসু, বিষ্ণু দে, অমিয় চক্রবর্তী, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং আরো অনেক প্রতিভা।

উনিশ শতকে রচিত হয় প্রবন্ধ, বাংলা ভাষার ব্যাকরণ, আত্মজীবনী, নাটক, গল্প, সাহিত্য সমালোচনা, বিজ্ঞান ও দর্শন। প্রতিষ্ঠিত হয় দৈনিক সংবাদপত্র, সাহিত্য সাময়িকী। এ শতকে বাংলা সাহিত্য হয়ে ওঠে অভিনব সাহিত্য, মধ্যযুগে একশো বছরে যা রচিত হয়েছে তার চেয়ে অনেক বেশি রচিত হয়েছে উনিশ শতকের একেকটি দশকে।

বিশ শতকে বাংলা সাহিত্য হয়ে ওঠে নতুন আলোয় উজ্জ্বল। কবিতা, উপন্যাস, গল্প, নাটক সব ক্ষেত্রেই এ শতকে দেখা দেয় নতুন চেতনা, নতুন সৌন্দর্য। এ শতকে বাংলা সাহিত্যে অবদান রাখেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। সাহিত্যের প্রতিটি শাখাতেই তিনি বিচরণ করেছেন। রবীন্দ্রনাথ আমাদের শ্রেষ্ঠতম কবি, তিনি শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিকও। ছোটগল্পেও তিনি শ্রেষ্ঠতম। এ শতকের দুজন অতুলনীয় গদ্যশিল্পী হলেন অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও প্রমথ চৌধুরী। চলিত রীতির প্রবক্তা হিসেবে প্রমথ চৌধুরী বিখ্যাত হয়ে আছেন। এ শতকে নাটকের ক্ষেত্রে খুব বড় প্রতিভা চোখে পড়ে না। রবীন্দ্রনাথ এ শতকের শ্রেষ্ঠ নাট্যকার।

১৯৪৭-এর দেশবিভাগের পর বাংলা সাহিত্যের বিষয় ও ভাবগত দিক থেকে পরিবর্তন ও পরিবর্ধন সাধিত হয়। উপন্যাস, নাটক, গল্প ও কাব্যের ক্ষেত্রে নতুন মাত্রা যোগ হয়। এ সময়কার উল্লেখযোগ্য ঔপন্যাসিক হলেন সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ, শওকত ওসমান, আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, আব্দুল মান্নান

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



সৈয়দ, শওকত আলী, হাসান হাফিজুর রহমান, রাজিয়া খান, সেলিনা হোসেন, হুমায়ুন আজাদ, হুমায়ূন আহমেদ, ইমদাদুল হক মিলন প্রমুখ। এদের মধ্যে হুমায়ূন আহমেদ সর্বাধিক জনপ্রিয়। বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য নাট্যকার হলেন আসকার ইবনে শাইখ, নুরুল মোমেন, মুনীর চৌধুরী, সিকান্দার আবু জাফর, আ.ন.ম. বজলুর রশীদ, কল্যাণ মিত্র, মমতাজ উদ্দিন আহমদ, মামুনুর রশীদ, সেলিম আল দীন, আনিস চৌধুরী, আবদুল্লাহ আল-মামুন। এরা বাংলাদেশের নাট্যসাহিত্যকে বিভিন্ন দিক থেকে সমৃদ্ধ করেছেন। বাংলাদেশের কাব্যসাহিত্যে যারা অবদান রেখেছেন তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন ফররুখ আহমদ, আহসান হাবীব, সুফিয়া কামাল, সৈয়দ আলী আহসান, শামসুর রাহমান, আল মাহমুদ, হাসান হাফিজুর রহমান, রফিক আজাদ, নির্মলেন্দু গুণ, মহাদেব সাহা, বেলাল চৌধুরী, আসাদ চৌধুরী প্রমুখ কবিগণ। কাব্য সাহিত্য বাংলা সাহিত্যকে দিয়েছে অনন্য গতিপ্রবাহ।

**উপসংহার :** বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস সুদীর্ঘ কালের বর্ণিল ইতিহাস। হাজার বছর ধরে তিল তিল করে গড়ে উঠেছে এর সাহিত্যভাণ্ডার। আমরা একবিংশ শতকের দ্বারপ্রান্তে পৌছে গেছি। এ শতকে সাহিত্য ক্ষেত্রে দেখা দেবে নতুন চেতনা। তা হয়তো বহুবর্ণের দীপাবলী আর আকাশের রংধনুর সাতরং হয়ে দেখা দেবে একুশ শতকের প্রথম, দ্বিতীয় বা তৃতীয় দশকে। চিরকাল জ্বলবে বাংলা সাহিত্যের লাল নীল দীপাবলী। আমরা সবাই আগামী দিনের সাহিত্য সাধকদের আগমন প্রত্যাশা করে বসে আছি। সেসব অনাগত সাহিত্য সাধকদের কোমল হাতের ছোঁয়ায় বাংলা সাহিত্য অমরত্ব লাভ করবে এটাই আমাদের কাম্য।

## রচনা ৩৫ বাংলা সাহিত্যে দেশপ্রেম

### বাংলা সাহিত্যে স্বদেশপ্রীতি

**ভূমিকা :** স্বদেশপ্রেম সাহিত্যের একটি বিশিষ্ট উপাদান। পৃথিবীর সব ভাষার সব সাহিত্যেই স্বদেশপ্রীতি বিশাল অংশ দখল করে আছে। কিন্তু মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে স্বদেশপ্রেম লক্ষ্য করা যায় না। দেশপ্রেমের অনুভূতি বাংলা রেনেসাঁর দান। ইউরোপেও মধ্যযুগে দেশপ্রেমের বাস্তব উপলব্ধি ছিল না। তখন ধর্মের বা রাজার জন্য সংগ্রাম করা বা প্রাণ দেওয়া বীরত্বের কাজ বলে গণ্য হতো। দেশপ্রেম নামক অনুভূতির জন্ম রেনেসাঁর পরে। তাই সাহিত্যে স্বদেশপ্রীতি বা দেশপ্রেমের প্রকাশ অনেকটা নতুন বা আধুনিক ধারণা।

**উনিশ শতকের দেশপ্রেম :** উনবিংশ শতাব্দীতে ইংরেজি শিক্ষা ও সভ্যতার সংস্পর্শে এসে বাংলাদেশে স্বদেশপ্রেমের ধ্যান-ধারণা বিকাশ লাভ করতে শুরু করে। তবে এর নেপথ্যে প্রেরণা জোগায় ইংরেজদের দীর্ঘদিনের শাসন-শোষণ এবং এ দেশবাসীর সচেতনতা ও স্বাজাত্যবোধ। কিন্তু সেকালের দেশপ্রেম চিন্তায় হিন্দুদের ধর্মবোধ ও সাম্প্রদায়িক চেতনা প্রতিফলিত হয়েছে। কারণ বাংলাদেশে নানা রাজনৈতিক কারণে হিন্দুরাই ইউরোপীয় শিক্ষা-সংস্কৃতির দিকে প্রথম আকৃষ্ট হয়েছিল এবং তখন একটি শিক্ষিত হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অভ্যুদয় ঘটেছিল। দীর্ঘকাল মুসলমান শাসনে বাস করার ফলে একটা রাজনৈতিক বিরুদ্ধবাদিতা তাদের মনে দানা বেঁধেছিল। তাই সেকালের দেশপ্রেমমূলক কবিতায় এসবের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

**বাংলা সাহিত্যে দেশপ্রেমের প্রকাশ :** বাংলা সাহিত্যে দেশপ্রেমের প্রকাশ বিচিত্রমুখী। কারো দেশপ্রেম সাম্প্রদায়িক ও ধর্মীয় অনুভূতিসম্পন্ন, কারো দেশপ্রেম অসাম্প্রদায়িক ও জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকলের কল্যাণকামী। আবার কেউ কেউ দেশের মাটি, মানুষ ও প্রকৃতির সৌন্দর্যে মুগ্ধ, কেউ কেউ দেশের পরাধীনতা ও দুর্দশায় ব্যথিত ও ক্ষুব্ধ। বাংলা কবিতা, গান, নাটক, উপন্যাস, গল্প, লোকসাহিত্য সব শাখায় দেশপ্রেমের বহুমুখী প্রকাশ রয়েছে। তবে বাংলা কাব্যে দেশপ্রেমের প্রকাশ ঘটেছে সর্বাধিক। বিভিন্ন কবি বিভিন্নভাবে তাদের দেশপ্রেমের বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছেন।



- **ঈশ্বর গুপ্ত :** ঈশ্বর গুপ্তের কবিতার ভঙ্গি ব্যঙ্গাত্মক, রাজনৈতিক চেতনার বড় পরিচয় নেই। ফলে ইউরোপীয় শিক্ষা-সংস্কৃতি ও আচার-আচরণের গড্ডালিকা প্রবাহের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে তিনি তার স্বদেশপ্রীতির পরিচয় দিয়েছেন :

  *'কতরূপ স্নেহ করি*
  *দেশের কুকুর ধরি*
  *বিদেশের ঠাকুর ফেলিয়া।'*

  কিন্তু তার এ উগ্র স্বাজাত্যবোধ সমসাময়িক ইংরেজি ভাবতরঙ্গে আত্মবিসর্জনকারী যুবশ্রেণীর কাছে কিছু উপদেশের বাণী বহন করলেও এগুলোর সাহিত্য মূল্য খুব কম।

- **রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় :** স্বাধীনতা ও দেশপ্রেমের কবি বলে রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের খ্যাতি ছিল। তার 'স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে' কবিতাটি স্বাধীনতাপ্রিয় অনেকের চেতনাকেই আলোড়িত করলেও সিপাহী বিদ্রোহকে লক্ষ্য করে তার কটূক্তি এবং ইংরেজ অধিকারের প্রতি সমর্থন প্রমাণ করে, তার রাজনৈতিক চিন্তাধারা অত্যন্ত অস্পষ্ট ছিল।

- **মধুসূদন :** মধুসূদনের কবিচিত্ত রাজনৈতিক চিন্তা দ্বারা আচ্ছন্ন হয়নি কিন্তু তার অন্তরের গভীরে স্বাধীনতার বোধ ছিল। দলত্যাগী বিভীষণের প্রতি মেঘনাদের দীপ্ত বচন তার প্রমাণ। তাছাড়া দেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের বন্দনায় তিনি শান্ত, কোমল, অরাজনৈতিক এবং অসাম্প্রদায়িক এক দেশপ্রীতির পরিচয় দিয়েছেন। যেমন, চতুর্দশপদীর অন্তর্গত 'পরিচয়' কবিতায় তিনি লিখেছেন :

  *'যে দেশে কুহরে পিক বসন্ত কাননে;*
  *দিনেশে যে দেশে সেবে নলিনী যুবতী;*
  *চাঁদের আমোদ যথা কুমুদ-সদনে,*
  *সে দেশে জনম মম।'*

  শান্ত-কোমল দেশপ্রেমের কল্পনা মধুকবির কাব্যে চমৎকারভাবে প্রকাশিত হয়েছে।

- **হেমচন্দ্র-নবীনচন্দ্র :** হেমচন্দ্র বা নবীনচন্দ্রের স্বাধীনতা কল্পনা ভাবের দিক থেকে সাম্প্রদায়িক, রচনাভঙ্গির দিক থেকেও সাহিত্যিক গুণবর্জিত। তবে হেমচন্দ্রের ব্যঙ্গ কবিতাগুলোয় ইংরেজদের সাম্রাজ্যবাদী লুণ্ঠতরাজের প্রতি আক্রমণ আছে। নবীন সেনের দেশপ্রেমও হেমচন্দ্রের সমজাতীয়। 'রৈবতক-কুরুক্ষেত্র-প্রভাস' কাব্যে তিনি প্রাচীনকালে ভারতে এক ঐক্যবদ্ধ সভ্যতা গড়ে উঠেছিল বলে কল্পনা করেছেন।

- **বঙ্কিমচন্দ্র :** বঙ্কিমচন্দ্র উঁচুদরের শিল্পী হলেও দেশপ্রেমমূলক দৃষ্টিভঙ্গিতে তিনি সাম্প্রদায়িকতা দোষে দুষ্ট। তিনি তার বিভিন্ন উপন্যাসে হিন্দু-ভারতের কল্পনা করেছেন, মুসলমানদের প্রতি বিদ্বেষ দেখিয়েছেন এবং ইংরেজদের অধিকারকে মেনে নিয়েছেন। বঙ্কিমের মুসলিম-বিদ্বেষের তীব্রতা উনিশ শতকের বাঙালির স্বদেশ-চেতনার সবচাইতে দুর্বলতম স্থান। তবে 'কমলাকান্তের দপ্তরে' মাঝে মাঝে তার স্বদেশপ্রেম উদার মূর্তিতে প্রকাশিত হয়েছে।

- **দীনবন্ধু :** দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' নাটকে দেশপ্রেমের এক অভিনব মূর্তি প্রকাশিত হয়েছে। দীনবন্ধু গ্রামের কৃষক শ্রেণীর নির্যাতনের এক জীবন্ত চিত্র এঁকেছেন এবং এঁকেছেন ইংরেজ শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে মুসলমান তোরাপ আর হিন্দু নবীনমাধবের যুক্ত প্রতিরোধের চিত্র।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



- রবীন্দ্রনাথ : বিশ্বদৃষ্টিসম্পন্ন ও উদারচিত্ত রবীন্দ্রনাথ দেশকে জননীরূপে কল্পনা করেছেন, আকুণ্ঠ ভালোবাসায় বাংলাদেশের প্রকৃতির গান গেয়েছেন। উগ্র জাতীয়তাবাদ ও সাম্প্রদায়িকতা তার রচনায় স্থান পায়নি। তিনি বিশ্বমানবের মিলনের বাণী প্রচার করেছেন। রবীন্দ্রনাথের দেশপ্রেম সম্পর্কে সৈয়দ আলী আহসান বলেন, 'রবীন্দ্রনাথের জাতীয়তার মধ্যে উচ্চ আদর্শবাদ নিহিত আছে। এ জাতীয়তা রঙ্গলাল-হেমচন্দ্র-নবীনচন্দ্রের নিছক গোত্রপ্রীতি নয়, কিংবা মাইকেল মধুসূদন দত্তের সুস্নিগ্ধ মাতৃভূমিপ্রীতি নয়। এর মধ্যে তিনি একটি সুমহান সত্য এবং পরম ঐক্যের পরিচয় দিতে চেয়েছেন। 'ভারততীর্থ' কবিতায় এ ইঙ্গিত আছে। রবীন্দ্রনাথের কল্পনায় ভারতবর্ষের একই পরম সত্যে মিলিত হয়েছে বিভিন্ন জাতি এবং বিভিন্ন সংস্কৃতি।'
- দ্বিজেন্দ্রলাল : উনিশ শতকের শেষে ও বিশ শতকের প্রথম দিকে দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকে সাম্প্রদায়িক দেশপ্রেম থেকে মুক্ত হবার চেষ্টা চোখে পড়ে। 'রাণাপ্রতাপ' নাটকে হিন্দু-মুসলমান বিরোধকে কেন্দ্র করে সাম্প্রদায়িক দেশপ্রেম প্রচারের চেষ্টা হলেও 'মেবারপতন' এবং তার অনেক কবিতায় মানব মৈত্রীর বাণীও প্রচার করতে চেয়েছেন দ্বিজেন্দ্রলাল।
- সত্যেন্দ্রনাথ : সত্যেন্দ্রনাথও অসাম্প্রদায়িক দেশপ্রেমমূলক অনেক কবিতা লিখেছেন। প্রকৃতি বন্দনার পাশাপাশি তার কবিতায় জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে উদার দেশপ্রেমের সুর বিদ্যমান।
- নজরুল : বিশ শতকে দেশপ্রেমমূলক কবিতায় নতুন বাণী ও ভঙ্গি নিয়ে আবির্ভূত হন কাজী নজরুল ইসলাম। তার দেশপ্রেম সাম্প্রদায়িকতামুক্ত এবং জাতি-ধর্ম নির্বিশেষ সকল মানুষের কল্যাণকামী। নজরুলের দেশপ্রেমমূলক কবিতায় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরোধিতা যেমন আছে, তেমন দেশী-বিদেশী শোষকদের বিরুদ্ধেও সুতীব্র ধিক্কার বর্ষিত হয়েছে। তিনি সাধারণ দরিদ্র মানুষের প্রতি তার স্নেহ কবিতার মধ্য দিয়ে প্রকাশ করেছেন, দেশের জল-মাটি হাওয়ার প্রতি ব্যক্ত করেছেন ভালোবাসা, আর ঘৃণা জানিয়েছেন দেশী-বিদেশী অত্যাচারীদের প্রতি। তার দেশপ্রেম আসলে সর্বহারা, বঞ্চিত মানুষের প্রতি প্রেম।

**বাংলা নাটকে দেশপ্রেম :** বাংলা নাটকের মধ্যে স্বদেশপ্রীতির পরিচয় গভীরভাবে ফুটে উঠেছে। দেশপ্রেমমূলক নাটক রচনার মধ্যে গিরিশ চন্দ্রের সিরাজ-উদ-দৌলা উল্লেখযোগ্য। দীনবন্ধু মিত্রের 'নীল দর্পণ'-এ দেশপ্রেমের এক অভিনব মূর্তি প্রকাশিত হয়েছে। স্বাধীনতোত্তর বাংলা নাটকে দেশপ্রেম আরো বেশি মূর্ত হয়ে আমাদের সামনে ধরা দিয়েছে। বাংলাদেশে মুনীর চৌধুরী, মামুনুর রশীদ, আবদুল্লাহ আল মামুন, সৈয়দ শামসুল হক প্রমুখ নাট্যকার তাদের নাটকে দেশপ্রেমের বহুমুখী প্রকাশ ঘটেয়েছেন।

**বাংলা কথাসাহিত্যে স্বদেশপ্রেম :** বাংলা কথাসাহিত্যে স্বদেশপ্রেমের প্রভূত নিদর্শন রয়েছে। শরৎচন্দ্র তার সাহিত্যে দেশপ্রেমের অপরূপ চিত্র তুলে ধরেছেন। তার 'পথের দাবী', 'শ্রীকান্ত' প্রভৃতি উপন্যাসে স্বদেশ এবং স্বজাতির প্রতি গভীর ভালোবাসা ও মমত্ববোধ জাগিয়ে তুলেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, মীর মশাররফ হোসেন, সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী, শওকত ওসমান, শহীদুল্লাহ কায়সার, আবুল ফজল, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ প্রমুখ কথাশিল্পীর গল্প-উপন্যাসে স্বদেশপ্রেম মূর্তমান হয়ে উঠেছে।

এছাড়া আমাদের ভাষা আন্দোলন, মুক্তিযুদ্ধ ও বিভিন্ন গণআন্দোলনে আমাদের কবি ও সাহিত্যিকরা তাদের রচনায় স্বদেশপ্রেমকে উচ্চকিত করে তুলেছেন।

**উপসংহার :** সাহিত্য মানুষের অনুভূতি প্রকাশের সর্বোৎকৃষ্ট মাধ্যম। আর দেশপ্রেম মানুষের সহজাত অনুভূতি। সাহিত্যে মানুষ তার দেশ-মাটি-মানুষের কথা হৃদয় দিয়ে ব্যক্ত করতে চায় এবং সাহিত্য হয়ে ওঠে জাতির পরিচিতির বাহন। আর এভাবেই সাহিত্যে স্বদেশপ্রীতির অনভূতি বিকশিত হয়ে চলে। বাংলা সাহিত্যেও বিভিন্নভাবে স্বদেশপ্রীতির স্বরূপ প্রকাশিত হয়েছে এবং আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও স্বাজাত্যবোধের প্রেরণা হিসেবে কাজ করে চলেছে।



## রচনা ৩৬ বাংলা নাটক ও নাট্যচর্চা/বাংলা নাট্যসাহিত্য

## বাংলাদেশের নাটক বা নাট্য আন্দোলন

*[১০ম বিসিএস]*

**ভূমিকা :** জাগতিক মানুষ যখন বাহ্যিক জগতের রূপ-রস-শব্দ-গন্ধ-স্পর্শের সাথে নিজের আত্মার মিল খুঁজে পায় আর সে মিলনের প্রভাবে যখন তার মনে সুর ও ভাবের সৃষ্টি হয়, তার শৈল্পিক প্রকাশই সাহিত্য। সাহিত্য মানুষের মনের খোরাক এবং এক হৃদয়ের সাথে অন্য হৃদয়ের মিলন ঘটানো বা একাত্মতার শ্রেষ্ঠতম মাধ্যম। নাট্যসাহিত্য বা নাটক হলো সাহিত্যের ভাব প্রকাশের অন্যতম একটি মাধ্যম বা উপায়।

**নাটক কি :** সংস্কৃত আলঙ্কারিকগণ নাটক বা নাট্যসাহিত্যকে কাব্যসাহিত্যের মধ্যে স্থান দিয়েছেন। তারা নাটককে দৃশ্যকাব্য বলে আখ্যায়িত করার প্রয়াস পেয়েছেন। দৃশ্যকাব্য সকল প্রকার কাব্যসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ। 'কাব্যেষু নাটকং রম্যম্।' নাটক দৃশ্য ও শ্রাব্যকাব্যের সমন্বয়ে রঙ্গমঞ্চের সাহায্যে গতিমান মানবজীবনের প্রতিচ্ছবি আমাদের সম্মুখে মূর্ত করে তোলে।

'নাটক' শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ অভিনয়যোগ্য সাহিত্যগ্রন্থ বা দৃশ্যকাব্য। সংস্কৃত 'নট' ধাতুর সাথে 'অক' (তৃ) প্রত্যয়যোগে 'নাটক' শব্দটি গঠিত। নট শব্দের অর্থ নর্তক বা অভিনেতা বা কুশীলব। তাই অভিনয়যোগ্য দৃশ্যকাব্যকে নাটক বলা হয়। Elizabeth Drew যথার্থই বলেছেন, "Drama is the creation of life in terms of the theatre." জনৈক বিশেষজ্ঞ বলেন, "নট অন্যের রূপ ধারণ করে অভিনয় করে বলিয়া নাটকের নাম 'রূপক'।"

সুতরাং দেখা যায় যে, রঙ্গমঞ্চের সাহায্য ব্যতীত নাটকীয় বিষয় পরিস্ফুট হয় না। নাট্যোল্লিখিত কুশীলবগণ তাদের অভিনয় নৈপুণ্যে নাটকের কঙ্কালসার দেহে প্রাণসঞ্চার করেন; তাকে বাস্তব রূপৈশ্বর্য দান করেন। দর্শকরা মঞ্চস্থ নাটকের অভিনয় একই সাথে দর্শন ও শ্রবণ করে সাহিত্যরস পান করার সুযোগ পান। তাই সাহিত্যের বিশেষ জনপ্রিয় শাখা নাটক।

**নাটকের আঙ্গিক ও বৈশিষ্ট্য :** নাটক কথোপকথন বা সংলাপনির্ভর। নাটকে সাহিত্যিক বা নাট্যকার নিজে অনুপস্থিত থাকেন। নাটকের বিভিন্ন চরিত্রের সংলাপের মধ্য দিয়ে কাহিনী অগ্রসর হয়। কাহিনীর সমুদয় ঘটনাই দর্শকের চোখের সামনে সংঘটিত হয়। গল্প বা উপন্যাসে লেখক সমস্ত ঘটনার ধারাবাহিক বা নাটকীয় বর্ণনা লিপিবদ্ধ করেন। চরিত্র চিত্রণও লেখকের দক্ষতার উপর নির্ভর করে। কিন্তু নাটকে যে কোনো চরিত্র তার আচার-আচরণ ও কথোপকথনের মধ্য দিয়ে নিজেই নিজেকে চিত্রিত করে।

সনাতনপন্থী নাট্যকার ও সমালোচকগণ নাটকের তিনটি ঐক্যনীতির (Unities) কথা উল্লেখ করেছেন। যথা :

ক. **সময়ের ঐক্য (Unity of Time) :** নাটকীয় আখ্যানভাগ রঙ্গমঞ্চে দেখাতে যতক্ষণ সময় লাগে, বাস্তব জীবনে সংঘটিত হতে যেন ততক্ষণই সময় লাগে এদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। Aristotle এ কাল নির্দেশ করতে গিয়ে একে 'single revolution of the sun' অর্থাৎ ২৪ ঘণ্টার মধ্যে সীমাবদ্ধ করেছেন।

খ. **ঘটনার ঐক্য (Unity of Action) :** নাটকে এমন কোনো দৃশ্য বা চরিত্র সমাবেশ থাকবে না, যাতে নাটকের মান ও সুর ব্যাহত হয়। সমস্ত চরিত্র ও দৃশ্যই নাটকের মূল বিষয় ও সুরের পরিপোষকরূপে প্রদর্শিত হওয়া চাই এবং নাটকটি যাতে আদি, মধ্য ও অন্ত সমন্বিত একটি অখণ্ড সৃষ্টিরূপে পরিস্ফুট হয়।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



গ. স্থানের ঐক্য (Unity of Place) : নাটকে এমন কোনো স্থানের উল্লেখ থাকবে না, যেখানে নাট্য নির্দেশিত সময়ের মধ্যে নাটকের কুশীলবগণ যাতায়াত করতে পারে না। অর্থাৎ নাটকে উল্লিখিত ঘটনাস্থল অবাস্তব হতে পারবে না।

এ তিন ধরনের ঐক্যের সমন্বয় সাধন করে যে নাটক রচিত হয়, তাকেই আদর্শ নাটক বলা যায়। তবে অনেক পণ্ডিত ও সমালোচক মনে করেন, এ তিনটি ঐক্যনীতি পালন করলে নাটকের স্বাভাবিকতা অনেক পরিমাণে ক্ষুণ্ন হয়। কারণ এতগুলো বিধি-নিষেধের মধ্যে মানব জীবনের স্বাধীন লীলা প্রদর্শন সম্ভবপর হয় না। ইংরেজি সাহিত্যে Ben Jonson এ ঐক্যনীতি মেনে চলেছেন এবং Shakespeare মাত্র The Tempest ও The Comedy of Errors-এ এ নিয়ম মেনে চলেছেন। কিন্তু তিনি সর্বত্রই ঘটনার ঐক্য মেনে নাটকের মূল বিষয় পরিস্ফুট করেছেন। এতে তার নাটকের বৈচিত্র্য ও সজীবতা আরও উজ্জ্বল হয়েছে।

নাটকে বাস্তব জীবনের প্রতিচ্ছবি রূপায়িত হয়। এখানে অবান্তর প্রসঙ্গ বা অবাঞ্ছিত ঘটনার প্রবেশ আকাঙ্ক্ষিত নয়। জীবনের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, ব্যথা-বেদনা, প্রেম-ভালোবাসা, আশা-আকাঙ্ক্ষা, ইচ্ছা-অনিচ্ছা, মিলন-বিচ্ছেদ, জন্ম-মৃত্যু, উত্থান-পতন, ভালো-মন্দ প্রভৃতির প্রতিফলন ঘটে নাটকে। দর্শক বা পাঠক তার মনের আবেগ-অনুভূতিকে নাটকের বিষয়বস্তুর সাথে একীভূত করার সুযোগ লাভ করেন। তাই দর্শক বা পাঠকের গ্রহণ বা বর্জনের মাপকাঠিতে নাটকের উৎকর্ষ যাচাই হয়ে থাকে।

**বাংলা নাট্যসাহিত্য :** বিশ্বের অন্যান্য দেশের নাট্যশিল্প সুদীর্ঘকালের ভাঙ্গাগড়া ও উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে বিকশিত হয়েছে। কিন্তু বাংলা নাটকের ইতিহাসে তেমন কোনো উল্লেখযোগ্য উত্থান-পতনের অধ্যায় নেই। শতাধিক বছরের স্বল্পবিস্তৃত সময়ে এর উদ্ভব, বিবর্তন ও বিকাশ সীমাবদ্ধ। ইংরেজি সাহিত্যের সাথে আমাদের প্রত্যক্ষ সংযোগের ফলেই এ দেশে বাংলা নাটকের আবির্ভাব ঘটে।

আধুনিককালে যাকে আমরা বাংলা নাটক বলি, প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে তা ছিল না। যাত্রা, কথকতা, টপ্পা, খেউড়, হাঁফ, আখড়াই, মঙ্গলকাব্য, কবিগান প্রভৃতি প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের প্রধান সম্বল। তবে এ কথা সত্য যে, বাংলাদেশের চিরকালের নাটক 'যাত্রা'। যাত্রা পুরনো কালের, নাটক নতুন কালের। বাংলা নাটকের কথা বলতে গেলে প্রথমেই মনে পড়ে এক বিদেশীকে। তার দেশ রাশিয়া এবং নাম গেরাসিম। অষ্টাদশ শতকের শেষ দিকে তিনি কলকাতায় আসেন। তিনি 'ডিসগাইস' নামে একটি প্রহসনের অনুবাদ মঞ্চস্থ করেন ১৭৯৫ খ্রিষ্টাব্দে। তাকে অনুসরণ করে এ দেশে গড়ে উঠে মঞ্চ এবং নাটক লিখিত ও অভিনিত হতে থাকে।

বাংলা ভাষায় প্রথম মৌলিক নাটকটির নাম ভদ্রার্জুন। এটা একটি কমেডি। রচনা করেন তারাচাঁদ শিকদার ১৮৫২ সালে। এ বছরই প্রকাশিত হয় যোগেন্দ্রচন্দ্র গুপ্তের প্রথম ট্রাজেডি কীর্তিবিলাস। ১৮৫৩ সালে হরচন্দ্র ঘোষের ভানুমতি, চিত্তবিলাস প্রকাশিত হয়। এরপর ১৮৫৪ সালে রামনারায়ণ তর্করত্ন লেখেন 'কুলীনকুলসর্বস্ব'। একে বাংলা ভাষার প্রথম সামাজিক নাটক বলা যায়।

সংস্কৃত ও ইংরেজি প্রভাবিত রামনারায়ণ তর্করত্নের পর মধুসূদন দত্ত ও দীনবন্ধু মিত্র বাংলা নাটকে যুগান্তর আনয়ন করেন। মধুসূদনের রচিত উল্লেখযোগ্য নাটক হলো 'শর্মিষ্ঠা', 'পদ্মাবতী', কৃষ্ণকুমারী ইত্যাদি। 'শর্মিষ্ঠা' বাংলা ভাষায় প্রথম আধুনিক নাটক। তার শ্রেষ্ঠ নাটক কৃষ্ণকুমারী। তিনি বা... বিদ্রূপাত্মক সামাজিক প্রহসনও লিখেন দুটি—'একেই কি বলে সভ্যতা' ও 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ'।



মধুসূদনের পদাঙ্ক অনুসরণ করে বাংলা নাটক উন্নতির দিকে এগিয়ে চলে। মধুসূদনের সমসাময়িক নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্র। তার প্রথম নাটক 'নীলদর্পণ; তিনি 'লীলাবতী' 'সধবার একাদশী' প্রভৃতি নাটক ও প্রহসন রচনা করেন। দীনবন্ধু মিত্রের পরে মনোমোহন বসু, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজকৃষ্ণ রায় প্রমুখ নাট্যকারেরা নাটক রচনা করে খ্যাতি লাভ করেন। এ সময়ে মীর মশাররফ হোসেন 'বসন্তকুমারী' এবং 'জমিদার দর্পণ' নাটক রচনা করে খ্যাতিলাভ করেন।

বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে একটি চিরস্মরণীয় নাম গিরিশচন্দ্র ঘোষ। তিনি একাধারে নাট্যকার ও অভিনেতা। তার রচিত পৌরাণিক নাটক 'অভিমন্যুবধ', 'জনা'; ঐতিহাসিক নাটক 'কালাপাহাড়', 'সিরাজ-উ-দ্দৌলা'; সামাজিক নাটক 'বলিদান' বাংলা সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। গিরিশচন্দ্র ঘোষের পর নাট্যকার অমৃতলাল বসুর অবদান উল্লেখযোগ্য। তার রচিত 'হরিশচন্দ্র', 'তরুবালা', 'বিবাহ বিভ্রাট', 'অবতার' প্রভৃতি নাটক বাংলা নাট্যসাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে। এ সময়কার উল্লেখযোগ্য নাট্যকার হলেন দ্বিজেন্দ্রলাল রায়। তার রচিত ঐতিহাসিক নাটক 'চন্দ্রগুপ্ত', 'নূরজাহান' ও 'শাজাহান' প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ নাটক বাংলা নাট্যসাহিত্যে নবযুগের সূচনা করে। এ সময়ে ক্ষীরোদ প্রসাদ বিদ্যাবিনোদ 'কিন্নরী', 'রঘুবীর', 'প্রতাপাদিত্য' প্রভৃতি নাটক লিখে যথেষ্ট খ্যাতিলাভ করেন।

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নাট্যসাহিত্যে বেশ কয়েকটি নতুন ধারার প্রবর্তন করেন। তিনি বাংলা নাটকের গতি পরিবর্তনে সবচেয়ে বেশি সাফল্যের অধিকারী। গীতিনাট্য, কাব্যনাট্য, নৃত্যনাট্য, সাংকেতিক নাটক প্রভৃতি নাট্যশাখা তিনিই সংযোজন করেন। রবীন্দ্রনাথের 'বিসর্জন', 'রাজা', 'ডাকঘর', রক্তকরবী', 'কালের যাত্রা', 'চিত্রাঙ্গদা', 'চণ্ডালিকা', 'শ্যামা', 'শেষ রক্ষা', 'বৈকুণ্ঠের খাতা' প্রভৃতি নাট্যসাহিত্যের বিভিন্ন শাখা সমৃদ্ধ করেছে। রবীন্দ্রনাথের পর থেকে বাংলা নাটক বিভিন্ন নাট্যকারের প্রতিভাকে আশ্রয় করে উত্তরোত্তর সমৃদ্ধির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

**বাংলাদেশের নাটক :** দেশবিভাগের পূর্বে (১৯৪৭-এর পূর্বে) পূর্ব বাংলায় মীর মোশাররফ হোসেন, কাদের আলী, আব্দুল করিম প্রমুখ নাট্যকার নাটক রচনা করে খ্যাতি অর্জন করেন। ইব্রাহীম খাঁ, শাহাদাৎ হোসেন, আবুল ফজল, আকবর উদ্দিন, নূরুল মোমেন, কাজী নজরুল ইসলাম প্রমুখ নাট্যকারও এ সময় নাটক রচনা শুরু করেন। শাহাদাৎ হোসেনের 'নবাব আলীবর্দী ও 'আনারকলি', আকবর উদ্দীনের 'সিন্ধু বিজয়', ইব্রাহিম খাঁর 'আনোয়ার পাশা' ও 'কামাল পাশা', নূরুল মোমেনের 'নেমেসিস', আবুল ফজলের 'আলোকলতা', কাজী নজরুল ইসলামের 'ঝিলিমিলি' ও 'আলেয়া' বাংলা নাট্যসাহিত্যে বিশেষ স্থান দখল করে আছে।

দেশবিভাগের পর (১৯৪৭-এর পর) আনন্দ মোহন বাগচীর 'মসনদ', আ. ন. ম. বজলুর রশীদের 'মেহের নিগার', আবুল ফজলের 'কায়েদে আযম', আসকার ইবনে শাইখের 'অগ্নিগিরি', ইব্রাহিম খলিলের 'স্পেন বিজয়', ইব্রাহীম খাঁর 'ঋণ পরিশোধ' ও 'কাফেলা', মুনীর চৌধুরীর 'রক্তাক্ত প্রান্তর' ও 'কবর', সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর 'বহিপীর', আলী মনসুরের 'পোড়াবাড়ী', আনিস চৌধুরীর 'মানচিত্র' প্রভৃতি নাটক বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশে আব্দুল্লাহ আল-মামুন, সৈয়দ শামসুল হক, মমতাজউদদীন আহমদ, মামুনুর রশীদ, সেলিম আল-দীন, রশীদ হায়দার, মমতাজ হোসেন, হুমায়ূন আহমেদ প্রমুখ নাট্যকার নাটক রচনা করে বাংলা নাটককে সমৃদ্ধ করেছেন। আব্দুল্লাহ্ আল মামুনের সুবচন নির্বাসনে, এখনও দুঃসময়, ওরা কদম আলী এবং সৈয়দ শামসুল হকের পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায় প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য মঞ্চনাটক।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



**বাংলা সাহিত্যে নাটকের অভাব :** উনবিংশ শতাব্দী থেকে আরম্ভ করে আজ পর্যন্ত বাংলা উপন্যাস, ছোটগল্প, গীতিকবিতা ও প্রবন্ধ প্রভৃতিতে যে চরম উৎকর্ষ লাভ ঘটেছে, দুঃখের বিষয় বাংলা সাহিত্যে নাটকের বা নাট্যসাহিত্যের সে অনুযায়ী উৎকর্ষ ঘটেনি। নাট্যসাহিত্যের বিকাশের অভাবের কতিপয় যে কারণ চিহ্নিত করা যায়, তা নিম্নরূপ :

১. পরিমিত সংখ্যক নাট্যশালার অভাব।
২. উচ্চশ্রেণীর নাটকীয় প্রতিভার অভাব।
৩. নাটক একটি অত্যন্ত কঠিন শিল্পকর্ম।
৪. অভিনেতা-অভিনেত্রী, সহৃদয় সামাজিকবর্গ ও নিজের মধ্যে ঐক্য স্থাপনের অভাব।
৫. জাতি হিসেবে বাঙালি অতিমাত্রায় ভাবপ্রবণ ও গান প্রিয়। ভাবপ্রবণতা নাটকের পরিপন্থি।
৬. জীবনযুদ্ধে আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য যে শক্তি, সাহস, নিষ্ঠা ও সংযমের প্রয়োজন তা বাঙালির চরিত্রে বহুদিন ধরেই অনুপস্থিত।
৭. প্রতিভার অভাব নয় বরং সুস্থ সক্রিয় জীবনদর্শনের অভাবই আমাদের নাট্যসাহিত্যের দারিদ্র্যের কারণ।
৮. নাটক বোঝার মতো শিক্ষিত রুচি ও মনোবৃত্তি আমাদের এখনও সৃষ্টি হয়নি।

**বর্তমান নাট্যসাহিত্যের প্রসার :** সম্প্রতি বাংলাদেশের নাট্যসাহিত্যে উন্নতির হাওয়া বইছে। নাট্যচর্চার ক্ষেত্র যথেষ্ট প্রসার লাভ করছে। ঢাকাসহ সারা দেশে অসংখ্য নাট্যগোষ্ঠী গড়ে উঠেছে এবং নিয়মিত নাটক মঞ্চস্থ হচ্ছে। রেডিও ও টিভিতে নাটক প্রচারিত হচ্ছে। বাংলা একাডেমি প্রতিবছর একজন নাট্যকারকে পুরস্কৃত করছে। এছাড়াও শিল্পকলা একাডেমী নাট্য উৎসবের আয়োজন করছে। মাঝে মাঝে বিটিভিতে মঞ্চনাটক প্রচারিত হচ্ছে। দিন দিন নাটকের দর্শক সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। নাট্যসাহিত্য উন্নয়নের জন্য সরকারকে এগিয়ে আসতে হবে; যেমন—মঞ্চ স্থাপন, নাট্য গোষ্ঠীকে নাট্যচর্চায় আর্থিক সাহায্য দান, নাট্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা। তবে বর্তমান সময়ে নাট্যচর্চায় আশাব্যঞ্জক অনুকূল পরিবেশের সৃষ্টি হচ্ছে।

**উপসংহার :** বাংলা নাট্যসাহিত্য সমৃদ্ধশালী না হলেও আমরা আশাবাদী। আমাদের সাহিত্যে শেক্সপীয়র নেই বলে দুঃখ করে লাভ নেই। অদূর ভবিষ্যতে আমাদের সাহিত্যেও যে এমন প্রতিভার আবির্ভাব ঘটবে না তা কেউ বলতে পারে না। তবে এ কথা সত্য যে, আমাদের জীবনে নতুন শিক্ষিত সুস্থ সমাজ চৈতন্য না আসা পর্যন্ত নাট্যসাহিত্য সম্বন্ধে আশান্বিত হবার কোনো কারণ নেই। তবুও আমরা নাট্যসাহিত্যের ভবিষ্যৎ উন্নয়নের প্রতি যথেষ্ট আশাবাদী।

## রচনা ৩৭ বাংলাদেশের শিশুসাহিত্য

**ভূমিকা :** জন্মের পর থেকেই একটি শিশু বিস্ময়ভরে পৃথিবীর দিকে দৃষ্টিপাত করে। চারদিকের আলো-ছায়া, পাখির কলকাকলী, মানুষজন, পশুপাখি প্রতিটি বস্তুর দিকে শিশু কৌতূহলভরা দৃষ্টিতে চায়। সবকিছুর অর্থ ও রহস্য সে উদঘাটন করতে চায়। এরকম একটি সংবেদনশীল পর্যায়ে শিশুর সুষম বিকাশে শিশুসাহিত্যের গুরুত্ব অপরিসীম। এ কারণে শিশুদের নিয়ে সাহিত্য রচনার ব্রতী হয়েছেন সাহিত্যিক, প্রাবন্ধিক, লেখক, মনোবিজ্ঞানী এবং আরো অনেকে। দেশের বুদ্ধিজীবী, কুশীলব, প্রখ্যাত ব্যক্তিদের সাহিত্য রচনার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে শিশুসাহিত্যের অগ্রগতি ও উন্নয়ন অব্যাহত রয়েছে।



**সংজ্ঞার্থ নিরূপণ :** সাহিত্য মানব জীবনের উৎকর্ষ ঘটায়। সুন্দর, সাবলীল সাহিত্য তাই মানব জীবনে কল্যাণ বয়ে আনে। শিশুসাহিত্যও শিশুদের ভাবনা-ধারণা নিয়ে জিজ্ঞাসু ব্যক্তির তথা বহু জনের বহু মতের জালে আবদ্ধ হয়েছে। শিশুসাহিত্য রচিত হয় পঠন-শ্রবণের মাধ্যমে শিশুদের আনন্দ বিধান আর শিক্ষাদানের জন্য। শিশুসাহিত্যের সংজ্ঞায় তাই বলা হয়, 'In its usually accepted sense, children's literature includes only that literature intended for the entertainment or instruction of children.'

শিশুর মন জটিলতামুক্ত তাই তারা সরল পথের অনুরাগী। রবীন্দ্রনাথের মতে, 'শিশুরা আর যাই হোক, অর্থলোভী জাত নয়। অতএব শিশুপাঠ্য রচনায় যত খুশি ভাটপাড়া সুলভ শব্দ প্রয়োগ করুন। আশঙ্কার কিছু মাত্র কারণ নেই—শিশুরা সে রচনা দেখে গলা শুকিয়ে জলের গ্লাসের দিকে হাত বাড়াবে না।'

শিশুমন কল্পনাপ্রবণতার অধিকারী। তাদের চোখে মুখে রয়েছে স্বপ্নের ঝিলিক। তারা চারপাশের পৃথিবীকে সহজেই সজীব করে তুলতে পারে। তাদের মাঝে সুপ্ত রয়েছে অসীম সম্ভাবনা। শিশুসাহিত্য বিশেষজ্ঞ এমেলিয়া এইচ মানসন এ প্রসঙ্গে বলেছেন, 'Children must have their secret lives and so do we, and each must be respected.'।

শিশুদের সাহিত্যে সহজ-সরল শব্দ ব্যবহার হয়ে থাকে। কেননা তারা কঠিন ও ভাবগাম্ভীর্যপূর্ণ শব্দ সহজে বুঝতে ও আয়ত্ত করতে সক্ষম নয়। তাদের সাহিত্য শুধু আনন্দের বাহন নয়, অনুভূতিরও বাহন। এ কারণে একজন সাহিত্যিক যখন শিশুদের জন্য কিছু রচনায় প্রবৃত্ত হন, তখন তিনি সহজ-সরল শব্দ ব্যবহার করেন, যা একজন শিশু পড়ামাত্রই বুঝতে পারে। তাছাড়া তিনি শিশুদের শিক্ষামূলক বিষয়ের চেয়ে আনন্দরস ও অনুভূতি ব্যক্তকরণের দিকেই গুরুত্ব দেন বেশি।

**শিশুসাহিত্যের বৈশিষ্ট্য :** সহজ-সরল ভাষায় হাস্যরস ও অনুভূতি প্রকাশের জন্য শিশুদের নিয়ে যে সাহিত্য রচিত হয় সাধারণত তাকে বলা হয় শিশুসাহিত্য। ওপরের আলোচনার প্রেক্ষিতে শিশুসাহিত্যের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য উপস্থাপন করা যেতে পারে :

ক. সহজ-সরল শব্দের সমাহার।
খ. গুরুগম্ভীর ও কঠিন শব্দ পরিহার।
গ. প্রাত্যহিক জীবনে ব্যবহৃত শব্দাবলি প্রয়োগ।
ঘ. অভিধানের অনুগামী না হয়ে শিশুমনে দোলা লাগানো শব্দ প্রয়োগ।
ঙ. হাস্যরস ও কৌতূহল উদ্দীপক শব্দ ও বাক্য।
চ. তৎসম শব্দের পরিবর্তে দেশীয় শব্দের প্রয়োগ।
ছ. সমাসবদ্ধ শব্দের প্রয়োগ কম।
জ. শব্দের অর্থ স্পষ্ট ও বোধগম্যতা ইত্যাদি।

**শিশুসাহিত্যের উদ্দেশ্য :** শিশুসাহিত্যের উদ্দেশ্য শিশুর মনোবিকাশের পথ সুগম করা। ভয়-ভীতি, অন্ধ কুসংস্কার ইত্যাদি পরিহার করে যাতে সুষম জীবন গড়ে তুলতে পারে সেদিকটি গুরুত্ব দিয়েই শিশুসাহিত্য রচিত হয়ে থাকে। জোসেফ ফ্রাঙ্ক এ প্রসঙ্গে বলেন, '... আসলে শিশুসাহিত্য হচ্ছে তা-ই যা তার পাঠককে একটা প্রত্যক্ষবাদী আর কল্যাণজনক অভিজ্ঞতা দেয়। সে অভিজ্ঞতা যেমন অনুভূতির হতে পারে, তেমনি জ্ঞানেরও। ... শিশুসাহিত্যের এই-ই চরিত্র লক্ষণ এবং এই-ই উদ্দেশ্য।'

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



**প্রকারভেদ :** শিশুসাহিত্যের প্রকারভেদ ও সংজ্ঞার্থ নিরূপণে শিশুসাহিত্যিক, জ্ঞানপিপাসু, মনোবিজ্ঞানী, দার্শনিকগণের মধ্যে মতানৈক্য বিদ্যমান। তবে সমালোচনা-আলোচনা যা-ই থাকুক, শিশুসাহিত্যের বিষয়াবলী প্রধানত দুটি বৈশিষ্ট্যশ্রেয়ী : ভাবগত এবং শিক্ষণীয়। বিখ্যাত শিশুসাহিত্যিক মার্গারেট এল নরগার্ড শিশুভোগ্য রচনাবলীকে নিম্নোক্ত বারো ভাগে বিভক্ত করেছেন :

১. ছেলেভুলানো উপাখ্যান আর ছবির বই, ২. লৌকিক উপাখ্যান, ৩. পরীর উপাখ্যান বা রূপকথা, ৪. আবোল-তাবোল উপাখ্যান আর সবাক পশুকাহিনী, ৫. কিংবদন্তি, ৬. আন্তর্জাতিক ভাব ছড়ানো গল্প-উপন্যাস, ৭. আঞ্চলিক কাহিনী, ৮. কল্পিত পশুকাহিনী, ৯. ইতিহাস এবং জীবনী, ১০. সমকালীন রোমাঞ্চ এবং কীর্তিকাহিনী, ১১. প্রকৃতিবিজ্ঞান, জড়বিজ্ঞান ও বিশ্বকোষ, ১২. ছড়া ও কবিতা।

**শিশুসাহিত্যের বিষয় :** শিশুরা অনুকরণপ্রিয়, ভালোমন্দ যাচাই করার বুদ্ধি তাদের অনুপস্থিত। কাজেই শিশুসাহিত্যের বিষয় হবে জীবনধর্মী, কল্যাণধর্মী, যা তাকে সত্যে ব্রতী হতে অনুপ্রেরণা জোগাবে। তাই জীবন ও বাস্তবতা এ দুয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য রেখে শিশুসাহিত্যের বিষয়াবলি নির্বাচিত হওয়া উচিত। আর্নেস্ট ফিলারের ভাষায়, It clearly refers to an attitude not a style'।

কাজেই একজন সাহিত্যিক যখন বিষয় নির্বাচন করবেন তখন তাকে এসব বিষয় প্রাধান্য দিয়েই তা নির্বাচন করতে হবে। একজন শিশুসাহিত্যিক যখন তার বিষয় নির্ধারণ করবেন তখন তিনি শিশুর মনোপযোগী সাহিত্যই নির্ধারণ করবেন।

**শিশুসাহিত্যের ক্রমবিকাশ :** বিশ্বে শিশুসাহিত্যের যাত্রা শুরু প্রাচীনকাল থেকেই। প্রথম শিশুপাঠ গ্রন্থ হিসেবে স্বীকৃত 'কেজেমনির হিতোপদেশ'। গ্রন্থটি রচিত হয়েছিল আজ থেকে প্রায় ছয় হাজার বছর আগে। অন্যান্য সাহিত্যের তুলনায় শিশুসাহিত্যের যুগবিভাগ সরল। মার্গারেট এল নরগার্ডের মতে, এ সাহিত্যের দীর্ঘতম পর্ব আদিযুগ—যার সূচনা প্রাচীন যুগে এবং অবদান মধ্যযুগে। মধ্যযুগের সঠিক তারিখ নির্ণয়ে তিনি অবশ্য ব্যর্থ হয়েছেন। তবে প্রাচীনকালে শিশুসাহিত্যের সন্ধান পাওয়া যায় মিশর, ভারতীয় উপমহাদেশ, আসিরিয়া-ব্যাবিলনিয়া, গ্রিস প্রভৃতি দেশে। পাথর, মাটির ফলক, প্যাপিরাসের বুকে প্রাচীনকালে শিশুসাহিত্য লেখা হতো। আঙ্গিকের ক্ষেত্রে গদ্য আর কবিতা এবং বিষয়ের ক্ষেত্রে রূপকথা, রূপককথা, ইতিহাস, জীবনী ইত্যাদি বিষয় এ সময় লেখার মধ্যে স্থান পেত। আদিযুগে শিশুদের নিয়ে রচিত আরেকটি বিখ্যাত গ্রন্থের নাম 'সুত্তপাঠক'। এ গ্রন্থটি প্রায় চার হাজার বছর পূর্বে রচিত হয়। গ্রন্থটি ভারতীয় উপমহাদেশের বলে স্বীকৃতি লাভ করেছে। 'সুত্তপাঠক'-এর পর ভারতীয় উপমহাদেশে রচিত হয় আরো অনেক গ্রন্থ। শিশুদের কাছে সেগুলো খুব জনপ্রিয়তা অর্জন করে। এগুলোর মধ্যে কালিদাসের 'দ্বাত্রিংশৎ পুত্তলিকা', সোমদেবের 'কথাসরিৎসাগর', 'হিতোপদেশ' ইত্যাদি গ্রন্থের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

ইংল্যান্ডে ১৪৭৬ সালে উইলিয়াম ক্যাকসটন প্রথম মুদ্রণযন্ত্র স্থাপন করেন। তিনি ইউরোপের সাহিত্যের বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। পরবর্তীকালে শিশুদের নিয়ে অনেক সাহিত্য রচিত হয়। এর মধ্যে জন বুনিয়ানের (১৬২৮-৮৮) নীতিবাগীশ রচনা পিলগ্রিমস প্রগ্রেস (১৬৭৮-৮৪), আর দ্য লাইফ অ্যান্ড ডেথ অব মি. ব্যাডম্যান (১৬৮০), ড্যানিয়েল ডিফোর (১৬৫৯-১৭৩১) রবিনসন ক্রুসো (১৭১৯), জোনাথন সুইফটের (১৬৬৭-১৭৪৫) কাল্পনিক ভ্রমণ কাহিনী গালিভারস ট্রাভেলস (১৭১৬) ইত্যাদি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইউরোপের লৌকিক কাহিনী সংকলন শিশুসাহিত্যের ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। এগুলোর সংগ্রাহক এবং প্রকাশক ফ্রান্সের শার্ল পেরো। গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় ১৬৯৮ সালে।



আধুনিক যুগে শিশুসাহিত্যের বিকাশে যারা অভাবনীয় সাফল্য রেখেছেন তাদের মধ্যে ইংল্যান্ডের লুই ক্যারলের নাম সর্বপ্রথম স্মরণীয়। তার 'এলিস ইন ওয়ান্ডারল্যান্ড' ও 'এলিস থ্রু দ্য লুকিং গ্লাস' পৃথিবীর প্রতিটি শিশুর কাছে লোভনীয়। কল্পনার মনোহারিতা এবং এডভেঞ্চারের নাটকীয়তায় এই গ্রন্থ দুটি সমগ্র শিশুসাহিত্যে মাইলফলক। এছাড়া ব্যাপক সমাদর লাভ করেছেন আর এম ব্যালান্টাইন ও রবার্ট লুই স্টিভেনসন। ব্যালান্টাইনের 'গোরিলা হানটার্স' এবং 'কোরাল আইল্যান্ড' শিশুদের কাছে খুব জনপ্রিয়। তাছাড়া জে কে রলিংসের শিশুতোষ সিরিজ 'হ্যারিপটার' ও সাম্প্রতিক সময়ে খুবই জনপ্রিয়তা লাভ করে।

**বাংলাদেশে শিশুসাহিত্যের গতিপ্রকৃতি :** বাংলাদেশে শিশুসাহিত্যের চর্চা দীর্ঘদিনের নয়। প্রাচীনকালে শিশুদের নিয়ে রচিত তেমন উল্লেখযোগ্য বাংলা গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া দুষ্কর। তবে মধ্যযুগের শেষের দিকে দেব-দেবীর কাহিনীনির্ভর শিশুসাহিত্য শিশুমহলে সমাদর লাভ করে। মঙ্গলকাব্যের বিভিন্ন উপাখ্যান শিশুদের মাঝে সহজেই স্থান পায়। রামায়ণ, মহাভারতের নানা কাহিনী এবং কিছু আধাসাহিত্যিক উপাখ্যান নিয়ে রচিত হয় শিশুসাহিত্য। এসব সাহিত্য শিশুদের কাছে ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করে। এভাবে শিশুসাহিত্য প্রাচীন ও মধ্যযুগ অতিক্রম করে আধুনিক যুগে পদার্পণ করে। উনিশ শতককে বাংলা শিশুসাহিত্যের সূচনা পর্ব বলা যায়। অনেকে রাধামাধব মিত্রের কবিতাবলিকে বাংলার প্রথম শিশুতোষ গ্রন্থ বলে মনে করেন। এ গ্রন্থটি ১৮৫৬ সালে প্রকাশিত হয়। রাধামাধবের দ্বিতীয় গ্রন্থ 'বোধেন্দুদয়' ১৮৬৩ সালে প্রকাশিত হয়। এতে বিভিন্ন জাতির মাতৃভাষাপ্রীতি সম্পর্কিত কিছু উক্তি ছিল। বাংলা শিশুতোষ কবিতায় ভাষাপ্রীতির প্রকাশ এর আগে আর দেখা যায়নি। পুরোপুরি শিশুভোগ্য উপন্যাসগুলোর মধ্যে হরিনাথ মজুমদারের 'বিজয়-বসন্ত', সর্বানন্দ রায়ের 'শরৎকুমারী', মুনশী নামদারের 'বনগাঁয়ে শিয়াল রাজা' ইত্যাদির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

ক. **শিশুসাহিত্যে বাংলা নাটক :** সূচনাপর্বে শিশুতোষ নাটকের অস্তিত্ব ছিল প্রায় অজ্ঞাত। পত্রপত্রিকায় মাঝে মাঝে দু-একটি রচনা দেখা যেত। এগুলোর মধ্যে ১৮৭৯ সালে প্রকাশিত 'বালক বন্ধু' পত্রিকার 'জাতে জাতে লড়াই' বিশেষভাবে স্মরণীয়। তাছাড়া 'সাত ভাই চম্পা', 'ভক্তির ডোর', 'চিতোর গৌরব' ইত্যাদিও ব্যাপকভাবে জনপ্রিয় নাটক।

খ. **শিশুদের নিয়ে কবিতা :** বাংলা ভাষায় শিশুদের জন্য বহু কবিতা গ্রন্থ রচিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সুকুমার রায় থেকে শুরু করে বাংলা সাহিত্যের প্রায় সব উল্লেখযোগ্য কবিরা শিশুদের জন্য বহু কবিতা লিখেছেন। এছাড়া আমাদের শিশুতোষ ছড়াসাহিত্যও বেশ সমৃদ্ধ।

গ. **শিশুসাহিত্যে রূপকথা :** শিশুদের রচনায় রূপকথা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন আঙ্গিকে এসেছে। এর মধ্যে যোগীন্দ্রনাথের সবচেয়ে জনপ্রিয় গ্রন্থ 'ছোটদের রামায়ণ'। দক্ষিণারঞ্জনের 'ঠাকুরমার ঝুলি' ও 'ঠাকুরদাদার ঝুলি' আজও শিশুমহলে জনপ্রিয়। রূপকথার বড় সংগ্রাহক বলে তাকে গণ্য করা হয়ে থাকে। বাংলা শিশুসাহিত্যের অন্যতম রূপকার হলেন অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তার রচিত 'রাজকাহিনী', 'ক্ষীরের পুতুল', 'ভূতপত্রীর দেশ' ইত্যাদি ব্যাপকভাবে সমাদৃত।

ঘ. **স্বাধীনতাত্তোর শিশুরচনা :** বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর শিশুসাহিত্যের গতিপ্রকৃতি পরিবর্তিত হয়। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর প্রায় ছয় বছর আমাদের শিশুসাহিত্যের তেমন কোনো উল্লেখযোগ্য রচনা পাওয়া যায় না। তবে ১৯৭৮ সালের পর বাংলা সাহিত্যের চর্চা নবরূপে সূচিত হয়। এর মধ্যে রচনাভঙ্গীতে তথা বিষয়গত বৈচিত্র্যে মনোরম কিছু বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থ যেমন— সত্যেন

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



সেনের 'আমাদের এই পৃথিবী' ও 'এটমের কথা' এ দুটি গ্রন্থই শিশুদের জনপ্রিয়। সুব্রত বড়ুয়া 'চাঁদে প্রথম মানুষ' আকাশচারণ বিষয়ক সর্বশ্রেষ্ঠ রচনা। সবচেয়ে উপভোগ্য সংকলন হাবিবুর রহমানের 'পুতুলের মিউজিয়াম' এবং আবদুল্লাহ আল-মুতীর 'রহস্যের শেষ নেই' ও 'আবিষ্কারের নেশায়'। ভাষা ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক অনেক শিশুতোষ গ্রন্থ রচিত হয়েছে। এগুলোর মধ্যে রয়েছে আসাদ চৌধুরীর 'বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ', সাহিদা বেগমের 'মুক্তিযুদ্ধের গল্প শোন', রফিকুল ইসলামের 'আমাদের মুক্তিযুদ্ধ' ইত্যাদি। মুক্তিযুদ্ধের শহীদদের নিয়ে লিখিত হয়েছে দুটি ব্যতিক্রমধর্মী গ্রন্থ মুহাম্মদ জাহাঙ্গীরের 'সব কটা জানালা' এবং আমীরুল ইসলামের 'কিশোর মুক্তিযোদ্ধাদের গল্প'।

**বাংলাদেশের শিশুপত্রিকা :** বেশ কটি শিশুপাঠ্য পত্রপত্রিকা আমাদের দেশ থেকে প্রকাশিত হয়েছে। এগুলোর মধ্যে সরকারের চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের 'নবারুণ', শিশু একাডেমী থেকে প্রকাশিত 'শিশুবার্ষিকী', এখলাস উদ্দীন সম্পাদিত 'রঙিন ফানুস' ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। উল্লেখযোগ্য পত্রিকার পরিচয় নিচে দেয়া হলো :

১. **নবারুণ :** তথ্য মন্ত্রণালয়ের চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা দপ্তর থেকে প্রকাশিত একটি সচিত্র কিশোর মাসিক পত্রিকা। পত্রিকাটিতে কবিতা, ছড়া, গল্প, প্রবন্ধ ও নানাবিধ ফিচার থাকে। পত্রিকাটিতে শিশু-কিশোরদের জন্য একটি বিভাগ নির্ধারিত রয়েছে। এতে শিশুদের রচনা প্রকাশিত হয়।

২. **সবুজ পাতা :** ইসলামিক ফাউন্ডেশন থেকে প্রকাশিত একটি মাসিক পত্রিকা। 'শিশু-কিশোরদের কাছে ইসলামের মৌলিক আদল ও শিক্ষা পৌঁছানো, নিজেদের ইতিহাস-ঐতিহ্য, সংস্কৃতির সত্যিকার চেহারা তাদের কাছে তুলে ধরা, জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্পকলা ও সাহিত্যের সঙ্গে তাদের পরিচয় করানো, দেশ ও দশের প্রতি তাদের কর্তব্যবোধ জাগিয়ে তোলা, তাদের মনে মানুষ হওয়ার আগ্রহ বাড়ানো এবং জ্ঞান-স্পৃহার প্রতি আগ্রহী করে তোলা সবুজ পাতার উদ্দেশ্য।'

৩. **শিশু :** বাংলাদেশ শিশু একাডেমী থেকে প্রকাশিত সচিত্র মাসিক পত্রিকা। শিশু-কিশোর লেখকদের রচনা সমৃদ্ধ 'কচি হাতের কলম থেকে' এই পত্রিকার একটি আকর্ষণীয় বিভাগ। পত্রিকাটিতে অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সের শিশুদের উপযোগী লেখা প্রকাশিত হয়ে থাকে।

৪. **ধান শালিকের দেশ :** ধান শালিকের দেশ বাংলা একাডেমি থেকে প্রকাশিত একটি সচিত্র শিশু-কিশোর ত্রৈমাসিক পত্রিকা।

৫. **ফুলকুঁড়ি :** মাহবুবুল হক সম্পাদিত 'ফুলকুঁড়ি' বেসরকারি উদ্যোগে প্রকাশিত একটি সচিত্র শিশু-কিশোর মাসিক। ফুলকুঁড়ি একটি শিশু সংগঠনের মুখপাত্র হিসেবে প্রকাশিত হয়।

৬. **কিশোর জগৎ :** বেসরকারি উদ্যোগে প্রকাশিত মোখতার আহমেদ সম্পাদিত একটি সচিত্র কিশোর পত্রিকা।

৭. **সায়েন্স ওয়ার্ল্ড :** বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিষয়ক আমাদের শিশু-কিশোরদের আগ্রহ ও চর্চা যে দিন দিন বাড়ছে তার প্রধান প্রমাণ মাসিক সায়েন্স ওয়ার্ল্ড। পত্রিকাটি শিশু-কিশোর মাসিক পত্রিকা হিসেবে না হলেও স্কুল-কলেজের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যেই এর জনপ্রিয়তা বেশি।

শিশুসাহিত্যের অগ্রগতিতে বাংলাদেশের দৈনিক পত্রিকাগুলোর অবদান কম নয়। প্রায় প্রতিটি দৈনিক পত্রিকায় শিশুদের জন্য সপ্তাহে একটি বিভাগ নির্ধারিত থাকে। এ বিভাগে শিশুতোষ বিষয়ক রচনা, গল্প, কবিতা, ছড়া প্রকাশিত হয়। ইত্তেফাকে 'কচিকাঁচার মেলা', প্রথম আলোতে 'গোল্লাছুট', যুগান্তরে 'আলোর নাচন' সংবাদে 'খেলাঘর', দৈনিক খবরে 'শাপলা দোয়েল', দৈনিক ইনকিলাবে 'সোনালী



আসর', দৈনিক জনতায় 'কচি কণ্ঠের আসর' ইত্যাদি নামে দৈনিক পত্রিকাগুলোতে শিশুদের জন্য আলাদা বিভাগ রয়েছে। আমাদের দেশের বিশিষ্ট সাহিত্যিকদের রচনা এবং শিশু-কিশোর রচিত লেখাও এতে ছাপা হয়। এই বিভাগগুলো আমাদের শিশু পত্রিকার অভাব অনেকখানি ঘুচিয়েছে।

**শিশুসাহিত্যে বর্তমান উদ্যোগ :** শিশুসাহিত্য শিশুর সুষম বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। এ বিষয় প্রাধান্য দিয়েই শিশুসাহিত্যের প্রসারে দেশের লেখক, বুদ্ধিজীবী সবাই একই কাতারে শামিল হয়েছেন। বর্তমান বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় আলী ইমাম, আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ, সাহিদা বেগম, সুকুমার বড়ুয়া, খালেক বিন জয়েন উদ্দীন প্রমুখ সাহিত্যিক শিশুদের নিয়ে সাহিত্য রচনা করছেন। শিশু একাডেমী, বাংলা একাডেমি, পাবলিক লাইব্রেরি, নজরুল একাডেমী প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান থেকে শিশুদের জন্য বিভিন্ন লেখা প্রকাশিত হয়ে থাকে। শিশুদের সাহিত্যচর্চায় উৎসাহদানেও এসব প্রতিষ্ঠান গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। বাংলাদেশে কর্মরত বিভিন্ন দেশী-বিদেশী সংগঠনও শিশুদের অধিকার ও শিশুসাহিত্য নিয়ে কাজ করে আসছে। বর্তমান সরকারও শিশুদের সমস্যা সমাধান ও তাদের মানসিক বিকাশে নানা উদ্যোগ নিয়েছে। বাংলাদেশ টেলিভিশন, বাংলাদেশ বেতার শিশুদের নিয়ে গল্প, নাটক ও বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠান প্রচার করে থাকে।

**উপসংহার :** শিশুসাহিত্যের ধারা অব্যাহত রাখা ও তা আরো সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য সরকারি, বেসরকারি, ব্যক্তিগত, প্রাতিষ্ঠানিক সব ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ প্রয়োজন। হ্রাসকৃত মূল্যে কাগজ ও অন্যান্য প্রকাশনা সামগ্রীর সরবরাহের ব্যবস্থা থাকলে এ দেশে আরো উন্নতমানের শিশু পত্রিকা ও শিশুসাহিত্য প্রকাশের সম্ভাবনা রয়েছে। আজকের শিশুরাই আগামী দিনে নেতৃত্ব দেবে। এ কারণে শিশুদের সুস্থ বিকাশ ও সুষম মনের অধিকারী হওয়া প্রয়োজন। তা না হলে দেশ ও জাতির কল্যাণে আত্মনিয়োগে তারা ব্যর্থ হবে।

## রচনা ৩৮ সাহিত্য ও জাতীয় চেতনা

**ভূমিকা :** 'সহিত' কথাটি সম্পৃক্ত হয়েই 'সাহিত্য' কথাটির উৎপত্তি। জীবনের সঙ্গেই সাহিত্যের যোগ, জীবনকে নিয়েই সাহিত্যের বিচিত্র প্রকাশ। জীবনের নিভৃত গুঞ্জন, তার সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনার অনুভূতি, মানুষের সমাজ ও রাষ্ট্র, তার ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি, তার ইতিহাস সাহিত্যের উপজীব্য। সাহিত্য মানুষের জন্য আবার মানুষের সৃষ্টিতে তা মুখরিত। মানুষ তৈরি করে সাহিত্য, তাই সাহিত্যে প্রতিফলন ঘটে মানুষের জীবনের। সাহিত্যের এই জীবন ঘনিষ্ঠতার প্রেক্ষিতে সাহিত্য সমাজ ও রাষ্ট্রের সঙ্গে সুনিবিড় বন্ধনে আবদ্ধ। লেখকের মনে যত কথা জমে থাকে তার অনেকখানি আসে জাতীয় জীবন থেকে। তাই জাতীয় চরিত্রের খবর জানতে হলে জাতীয় সাহিত্যের অনুশীলনই সর্বোত্তম পন্থা।

**সাহিত্য কি :** মানব হৃদয়ের বিচিত্র অনুভূতি যখন রসমধুর হয়ে ভাষায় রূপায়িত হয়ে ওঠে তখন তাকে সাহিত্য হিসেবে অভিহিত করা হয়। জগৎ ও জীবনের বিচিত্র বিষয় সাহিত্যের উপজীব্য। সাহিত্যে মানুষের সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনার প্রতিফলন ঘটে। সেজন্য সাহিত্য মানব জীবনের প্রতিচ্ছবি। সাহিত্যে শুধু ভাবের বিকাশ ঘটে তা নয় বরং তা রসমধুর হয়ে বাস্তব রূপ লাভ করে। সাহিত্য যেমন মানুষের জীবন ও পরিবেশ থেকে উপকরণ সংগ্রহ করে, তেমনি তা মানুষের বিচিত্র রস পিপাসা মিটাবার জন্য বিচিত্র আঙ্গিকে রূপ লাভ করে। আর তাই বলা হয় সাহিত্য অমৃত আর সাহিত্যিকরা অমর।

**সাহিত্য সৃষ্টির ইতিকথা :** মানুষ নিজেকে যত স্বাধীন বলে মনে করুক সে কখনও একান্তভাবে স্বাধীন নয়। একদিকে সে যেমন ব্যক্তি বিশেষ, অপরদিকে আবার তার জাতির ভাবকল্পনা ও ঐতিহ্যের প্রতিনিধি এবং সমাজের অঙ্গবিশেষ। এই হিসেবে তার মধ্যে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের চিহ্ন রয়েছে। তাই মানুষ নিজেকে বিস্তৃত করে দেখতে চায়। সে বাস্তব জগৎ ব্যতীত আর একটি কল্প জগতের স্বপ্ন

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



দেখে। কারণ, বাস্তব জগতে তার সকল প্রকার আশা আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত হয় না। তাই কল্পনার জগতে সে জীবনের অপূর্ণতার বৃত্তাংশকে পরিপূর্ণ করে পায়। যা জীবনে পাওয়া গেল না তা-ই কল্পনায় পেয়ে লেখক আশ্বস্ত হন, কল্পনাকে লেখক সত্য বলে গ্রহণ করেন। বন্ধন জর্জরিত কবিচিত্ত তাই বিশ্বের স্বর্ণযুগ কল্পনা করেন, বেদনাহত লাঞ্ছিত কীটস তাই সৌন্দর্য ও সত্যের অভিন্নতাকে প্রত্যক্ষ করেন, বাঙালি সাহিত্যিক মরণের মধ্যে অমৃতের আস্বাদন করেন। আর এভাবেই সৃষ্টি হয় সাহিত্য।

**সাহিত্যের বিষয়বস্তু :** সাহিত্যের উপকরণ সংগৃহীত হয় মানুষের জীবন থেকে। মানুষের হৃদয়ের বিচিত্র অনুভূতি অবলম্বনেই সাহিত্য পল্লবিত হয় তার সৃষ্টি সম্ভারে। তাই সাহিত্যের মধ্যে মানুষকে প্রত্যক্ষ করা চলে। সাহিত্যের নানা শাখা প্রশাখায় তার গল্পে উপন্যাসে, নাটকে কবিতায়, প্রবন্ধে মানুষের কথা বলা হয়, স্পষ্ট করে তোলা হয় মানুষের পরিচয়। তবে আলেখ্য অঙ্কনে কবি-সাহিত্যিকের মনে কল্পনা কঠোর বাস্তবকে রঙিন আর রসমধুর করে তোলে। আর সে কারণেই সাহিত্যে প্রতিফলিত জীবন সৌন্দর্যমণ্ডিত মনে হয়। কারো মতে শিল্পের জন্যই শিল্প। বাস্তব জীবনের স্বরূপ সন্ধান সেখানে অপ্রাসঙ্গিক। অপরদিকে সাহিত্য বাস্তবতার অনুসারী। সাহিত্য যদি জীবনের কথা না বলে নিছক আনন্দলোকে শিল্পের জন্য শিল্প নিয়ে বিচরণ করে লাভ নেই।

**বিষয়বস্তুর বিবর্তন :** জীবনের ক্ষেত্র বিশাল ও ব্যাপক। সভ্যতার, বিশেষ করে বস্তুবাদী সভ্যতার বিস্তৃতির সাথে সাথে মানব জীবনের জটিলতা ও রহস্য অনেক বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে। আগের সাহিত্যের বিষয়বস্তু ছিল নর-নারীর প্রণয়, তার সংঘাত ও প্রতিক্রিয়া। বস্তুর অবসরভোগী সমাজে এটাই ছিল বড় ঘটনা এবং সেদিন সাহিত্যও ছিল এ অবসরভোগী সমাজের অবসর বিনোদনের বস্তু। বিত্তবান এই অবসরভোগীদের কেন্দ্র করেই সেদিন রাষ্ট্রীয় জীবন আবর্তিত ও আলোড়িত হতো। তাই সাহিত্যে তার প্রতিফলন হয়েছিল। আজ অবসরভোগী সমাজ নিশ্চিহ্ন ও শক্তিহীন। বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও গণতন্ত্রের আবির্ভাবের ফলে এখন শ্রমিক অর্থাৎ মেহনতি জনতাই সব দেশের রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক জীবনের প্রাণকেন্দ্র হয়ে দাঁড়িয়েছে। ফলে এদের জীবনের বিচিত্র ঘটনা ও সমস্যা আজ বড় হয়ে উঠেছে। আধুনিক জীবন সভ্যতার প্রাণকেন্দ্র এ শ্রমিক শ্রেণীর জীবনও তাই আমাদের সাহিত্যের বিষয়বস্তু। অন্ন-বস্ত্রের সমস্যাই এদের জীবনের সমস্যা, তাই আধুনিক সাহিত্যে এই সমস্যারই ছায়াপাত হচ্ছে। জীবনের সাথে সাহিত্যের সম্পর্ক যে কত নিবিড় ও গভীর এটা তার এক উজ্জ্বল নিদর্শন। তবুও একথা সত্য যে অন্ন-বস্ত্রের সমস্যা সমাধান সাহিত্যের ধর্ম নয়, সাহিত্যের কাজ নয়। জীবনের মহত্ত্ব ও সৌন্দর্যের দিকে ইঙ্গিত করা ও তার রসমূর্তি গড়ে তোলাই সাহিত্যের প্রধান ধর্ম। কিন্তু দৈনন্দিন জীবনের অভাব অভিযোগ ও প্রাণ ধারণের নিত্যবস্তু থেকে বঞ্চিত হলে মহত্ত্ব ও সৌন্দর্য চর্চা নিছক বিলাস হয়ে দাঁড়ায়। এজন্যই সাহিত্যিক জীবনের প্রাথমিক চাহিদা ও প্রয়োজন হতে বিস্মৃত হতে পারেন না। তাই সাহিত্যে প্রতিফলিত হয় ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখ, সমাজচিত্র ও জাতীয় চেতনার প্রতিচ্ছবি।

**জাতীয় চেতনা :** আমাদের জীবনের রঙ্গমঞ্চে অবিরাম-অবিশ্রান্তভাবে চলছে সুখ-দুঃখের বিচিত্র অভিনয়। প্রতিটি মানুষ এর মধ্য থেকেই আহরণ করে নিজ জীবনের সঞ্জীবনী সুধা। সুখ-দুঃখ, আশা-নিরাশার দ্বন্দ্বে দোলায়িত এই জীবন-সংসার থেকে এমন করে মনের নিভৃত কোণে গড়ে ওঠে ব্যক্তি চরিত্রের পাকা বুনিয়াদ। ব্যক্তির আপন বৈশিষ্ট্য যদি বহির্জগতের এ প্রভাবকে বিকৃত না করত, তাহলে জাতির প্রতিটি লোকের চেতনা আমরা একই রকম দেখতে পেতাম। তথাপি-ব্যক্তি জীবনের খুঁটিনাটি সহস্র ভেদ সত্ত্বেও গভীরভাবে লক্ষ করলে দেখা যায় গোটা জাতির বিশেষ বিশেষ দিকে একটা প্রবল ঝোঁক আছে। ঐ ঝোঁকের মূলে যা থাকে তাকেই বলে জাতীয় চেতনা। এই বিশেষ ঝোঁকের জন্য



একটি জাতি আর একটি জাতি থেকে স্বতন্ত্র। লেখকের মনের মণিকোঠায় সাহিত্য ফুটে ওঠে ফুলের মতো। সে ফুল ফোটানোর জন্য লেখক রস গ্রহণ করেন জাতীয় চেতনার মৃত্তিকা হতে। এ জন্যই সাহিত্যে পাওয়া যায় জাতীয় চেতনার নিদর্শন।

**জাতীয় চেতনার বিবর্তন :** আমরা স্বাধীন জাতি, স্বাধীনতা প্রিয় জাতি। কিন্তু আমাদের ইতিহাস পরাধীনতার ইতিহাস। সেই সুবাদে আমরা এসেছি অনেক জাতির সংস্পর্শে, আমাদের মনের কপাটে আঘাত করেছে নানা রকমের বিজাতীয় ভাবধারা। একদিন যাকে লালন করেছিলাম অতি সন্তর্পণে মনের নিভৃতে নেপথ্যে, একেই কুৎসিত ভেবে পরম উপেক্ষায় ফেলে এসেছি জীবনপথের মাঝখানে। তাই আমরা আনকোরা, নতুন, আগাগোড়া পরিবর্তিত জাতি। আমাদের সত্যিকার পরিচয় পাওয়া যায় আধুনিক বাংলা সাহিত্যের পাতায়। অবিরাম পরিশ্রমের পরে বিশ্রাম যেমন চিরন্তন সত্য, ঠিক তেমনই সাহিত্যিকরা যতই বাকবিস্তার করুন না কেন, যতই অপরিচয়ের রাজ্যে আমাদের নিয়ে যান না কেন, শেষ পর্যন্ত তাদেরকেও ফিরতে হয় এবং পাঠকদেরকেও ফিরাতে হয় জাতীয় চেতনার পরম নির্ভরস্থলে। সাহিত্য কল্প লতিকা হলেও তার মূল থাকে জাতির মনোভূমিতে। গোড়া ছাড়া আগা যেমন নিতান্ত আজগুবি, সাহিত্যিকের মনটাকেও তেমনিই স্বয়ম্ভূ মনে করা কল্পনা-বিরুদ্ধ। সাধারণ মানুষ জানে না আপন মনের রহস্য। যদিও ঘটনার সংঘাতে মাঝে মাঝে স্ফুলিঙ্গের মত নিগূঢ় চরিত্রের একটা অস্ফুট ইঙ্গিত ধরা পড়ে, তবুও সুলেখক না হলে কারও পক্ষে আপন মনকে তার সমস্ত ঐশ্বর্যসহ প্রকাশ করা সম্ভব নয়। চরিত্রের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম দিকগুলো অতি নিপুণ দর্শকের দৃষ্টিও এড়িয়ে যায়। সুসাহিত্যিকের লেখায় ফাঁকে ফাঁকে সেই অবরুদ্ধ আবেগগুলো ফুটে উঠে; নিপুণ পাঠকের হৃদয়ে দোলা দেয় বলেই তার লেখার ভিতর সারা দেশের অন্তঃপ্রকৃতির কথা মূর্ত হয়ে ওঠে।

সাহিত্য চলে সাহিত্যিকের মনের সঙ্গে, আর সাহিত্যিকের মনটাও একান্তভাবে আকাশচারী নয়। সাহিত্যের মধ্যে সমাজ ও জাতির বাহ্য ও অন্তর্জীবনের ছবি পূর্ণমাত্রার প্রতিবিম্বিত। ইউরোপ জড়বাদী, তাই তার সাহিত্যে পাওয়া যায় ঐশ্বর্য ও আড়ম্বরপূর্ণ বর্ণনা। বেশির ভাগ ইউরোপীয় সাহিত্য লোভের কাল্পনিক খোরাক যুগিয়ে আমাদের মনকে টানে। ইউরোপীয় সাহিত্যের সাথে যাদের ঘনিষ্ঠ পরিচয় তারা সবাই একবাক্যে স্বীকার করেন ইউরোপীয় চরিত্রে মর্মকথা বিলাস, পঙ্কিল দুর্বার ধনস্পৃহা ও তজ্জনিত নিদারুণ অর্থনৈতিক অসন্তোষ। সাহিত্যে শুধু জাতীয় চেতনার নিদর্শনই মেলে, এ কথা বললে সত্যের অপলাপ হবে। প্রকৃতপক্ষে জাতীয় চেতনা গঠনে সাহিত্যের দান সর্বাধিক। আমাদের প্রাচীন সভ্যতা ও সংস্কৃতি আজ অবলুপ্ত। পাশ্চাত্য সাহিত্য ও সভ্যতা উন্নত গিরি শিখর থেকে নেমে এসে আমাদের আশ্রয় কুটির ভাসিয়ে নিচ্ছে। তাই পরাশ্রয়ী, পরান্নপুষ্ট আমাদের ভাবনা ও চেতনা হয়েছে পরানুসারী। তাই আমাদের সাহিত্যের সুরেও বেজে ওঠে সে মূর্ছনা।

**সাহিত্য ও জাতীয় চেতনা :** সাহিত্য মানুষের জীবনচিত্র। আর এ মানুষ বাস করে সমাজ ও রাষ্ট্রের বিশাল প্রতিবেশে। সে জন্য সাহিত্যিক পারিপার্শ্বিক প্রতিবেশ ও জাতীয় চেতনাকে অস্বীকার করতে পারে না। সেজন্য সাহিত্যে সমাজ ও রাষ্ট্রের পরিচয় স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সাহিত্য পাঠের মাধ্যমে জানা যায় সমাজ ও রাষ্ট্রকে, উপলব্ধি করা যায় জাতীয় চেতনাকে। যে জাতির চরিত্র যত উন্নত, সে জাতির সাহিত্যে ধ্বনিত হয় উন্নত সুর। আবার সাহিত্যের উন্নতির সাথে শুরু হয় জাতির চরিত্রোৎকর্ষ। বেণু ও বীণার আওয়াজ স্বতন্ত্র; যদিও উভয়েই বাজানো চলে একই গান। তেমনই প্রত্যেক জাতির আছে বিভিন্ন চারিত্রিক সত্তা, যাদের মিলনে গড়ে উঠবে একদিন মহামানবের সভ্যতা। পরানুচিকীর্ষার ফলে আমরা যদি সেই স্বাতন্ত্র্য হারাই তাতে না আসবে আমাদের জাতীয় কল্যাণ, না হবে বিশ্বের সমৃদ্ধি। সাহিত্য যেন জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষা, সুখ-দুঃখ নিয়ে তৈরি বহুতন্ত্রী বীণা; যার ঝংকারে ধ্বনিত হয় জাতির চেতনার ব্যঞ্জনা। অনুভূতি ও

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



প্রকাশভঙ্গির নৈপুণ্যে সাহিত্য জাতির মর্মে জাগায় সুর। বিশ্বের দরবারে পথে প্রান্তরে দেশ-বিদেশের শ্রোতা সেই সুরের অমৃত দিয়ে ভরে নেয় তাদের হৃদয়ের পাত্র। সুতরাং নিঃসন্দেহে বলা যায়– পুষ্প উদ্যানের পরিচয় যেমন তার সৌন্দর্যে ও গন্ধে, একটি জাতির পরিচয় তেমনই তার সাহিত্যে।

**সাহিত্যে জাতীয় চেতনার প্রভাব :** সাহিত্যে মানবজীবনের যে উপকরণ প্রবেশ করে তা সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনেরই বিষয়বস্তু। কারণ মানুষ নিজেই সমাজ, নিজেই রাষ্ট্র। কারণ, সমাজ বলতে সংঘবদ্ধ জনগোষ্ঠীকেই বোঝায়। আর রাষ্ট্র তার সম্প্রসারিত রূপ। জাতীয় জীবনে আছে বিপুল বৈচিত্র্য। মানুষ তার সংকীর্ণ দৃষ্টি দিয়ে তার খণ্ডাংশ হয়ত প্রত্যক্ষ করে। কিন্তু সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবন যখন সাহিত্যে রূপ লাভ করে তখন কবি সাহিত্যিকরা নিজেদের বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গিতে নির্বাচিত ও গ্রহণযোগ্য উপায়ের রূপটুকু সাহিত্যে স্থান দেন। এতে পাঠকের চোখে সমাজের বিচিত্র রূপ প্রতিফলিত হয়। সাহিত্য এভাবে অজ্ঞাত জগতের সন্ধান দেয়। অতীত আর বর্তমান মানব সভ্যতার যে চিত্রটি পাঠক প্রত্যক্ষ করে, সেটি তার কাছে উপভোগ্য হয়। সমাজ ও জাতীয় জীবনের উপর রচিত সাহিত্য পাঠকদের সচেতন করে। সাহিত্যের মাধ্যমে প্রকাশিত জাতীয় জীবনের সুখকর চিত্রটি যেমন পাঠককে আনন্দিত করে, তেমনই জাতীয় জীবনের বেদনা-কাতর ছবিটিও পাঠক হৃদয়ে নাড়া দেয়। সাহিত্যের মাধ্যমে উচ্চকিত হয় বঞ্চিত মানুষের কণ্ঠস্বর। স্বাধীনতা সংগ্রাম, স্বাধিকার অর্জনের দাবি আর উৎপীড়িতের ক্রন্দনরোল যেমন সাহিত্যে অনুরণিত হয়, তেমনই শোষণের প্রতিকারের উচ্চারণও সাহিত্যে কান পেতে শোনা যায়। এভাবেই জাতীয় জীবন ও চেতনা সাহিত্যে প্রতিনিয়ত প্রতিফলিত হয়ে সাহিত্যের সঙ্গে জাতীয় জীবন ও চেতনার সম্পর্ক সুদৃঢ় হয়ে উঠেছে।

**জাতীয় চেতনায় সাহিত্যের প্রভাব :** এ কথা সত্য যে, সাহিত্য কখনো মানুষকে শিক্ষা দানের দায়িত্ব গ্রহণ করে না। হৃদয়ের নিভৃত কুঞ্জে বিনোদনের আবহ সৃষ্টিই তার কাজ। কিন্তু সাহিত্যের প্রভাবে মানুষ প্রভাবিত হয়। বিশ্বের ইতিহাসে এমন অনেক বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে যার পেছনে সাহিত্যের প্রভাব বিশেষভাবে কার্যকরী, যেমন-ফরাসি বিপ্লব। সাহিত্য মানুষকে সত্যিকার মানুষ করে তোলে। মানুষের দেশ, কাল, ইতিহাসকে জানার জন্য সাহিত্য সাহায্য করে। অতীত আর বর্তমান জীবন সাহিত্যের রসময় উপজীব্য। জাতির ভবিষ্যৎ রচনায়, জাতীয় সংস্কৃতির সম্ভাব্য রূপাঙ্কনে সাহিত্য অপরিহার্য উপাদান। সাহিত্য হিংসায় কোলাহলমুখর উন্মত্ত পৃথিবীতে দুদণ্ডের শান্তি আনে, জরাগ্রস্ত মনে আনে উৎসাহের জোয়ার। একই চেতনায় উজ্জীবিত মানুষকে পরস্পরের কাছাকাছি এনে মানসিক প্রেরণা যোগায় এক একটি শ্রেণীর মানুষকে বাঁধে সৌভ্রাতৃত্বের বন্ধনে। মানুষের ব্যক্তি জীবনে সাহিত্যের এ প্রভাব জাতীয় জীবনকেও নিয়ন্ত্রণ করে। সুখকর জীবনের জন্য দরকার একটি উন্নত রাষ্ট্রব্যবস্থা। সাহিত্য এর পেছনে প্রতিনিয়ত কাজ করে। সাহিত্যের প্রেরণায় উদ্দীপ্ত জাতি নতুন রূপ লাভ করে। সাহিত্যের আদর্শে প্রভাবিত মানুষ রাষ্ট্রে ভাঙ্গাগড়ার কাজ করে। এর ফলে রাষ্ট্র পায় নতুন রূপ, এগিয়ে চলে সমৃদ্ধির পথে।

**উপসংহার :** জাতীয় চেতনা ও সাহিত্যের পারস্পরিক সম্পর্ক সাহিত্যকে যেমন সমৃদ্ধ করে, তেমনি জাতীয় জীবনকে সুন্দর করতে সহায়তা করে। জাতীয় চেতনা থেকে বিচ্ছিন্ন হলে কোনো সাহিত্যের মধ্যেই জীবনের আনন্দ ও প্রেরণার উৎস খুঁজে পাওয়া যাবে না। সে জন্য বৃহত্তর জাতীয় জীবন থেকে উপকরণ সংগ্রহ করে সাহিত্যে রূপ দিতে হবে। সার্থক সাহিত্য সৃষ্টির জন্য এ বৈশিষ্ট্য অবশ্যই অনুসরণযোগ্য। আবার সুন্দর জাতি গঠনের জন্য সাহিত্য থেকে প্রেরণা লাভ করতে হবে। উন্নত লক্ষ্যে পৌছবার রাস্তা বিভিন্ন জাতির বিভিন্ন রকম। জাতির পক্ষে সেই সুগম পথের সন্ধান রাখেন সাহিত্যিকরা। তিনি জাতীয় চেতনার অনুকূল পথেরই যাত্রী। তাই সাহিত্যকে অনুসরণ করে আমরা পাই জাতির অন্তরঙ্গ পরিচয়। তবে সাহিত্যের আবেদন জাতির সংকীর্ণ সীমায় সীমাবদ্ধ নয়, এর আবেদন সর্বজনীন ও বিশ্বজনীন।

# ভাষা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধ

## রচনা ৩৯ ভাষা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধ

**ভূমিকা :** দ্বি-জাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে ধর্মীয় কারণে প্রতিষ্ঠিত পাকিস্তান একটি ইসলামী রাষ্ট্র হলেও এর সমাজ ব্যবস্থার একক আদর্শগত কোনো যোগসূত্র ছিল না। এর কারণ পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যকার ভাষাগত বিরোধ। এ কারণে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ পাকিস্তানের মৌলিক আদর্শের সাথে কোনো দিন একাত্মতা অনুভব করতে পারেনি। আর এ কারণেই পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার অব্যবহিত পরে ১৯৪৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে পূর্ব বাংলার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তরুণ অধ্যাপক আবুল কাশেমের নেতৃত্বে 'তমদ্দুন মজলিস' নামক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের মাধ্যমে ভাষা আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটে। এর প্রভাব বাংলার সুদীর্ঘ রাজনৈতিক ইতিহাসের পরতে পরতে দেখতে পাওয়া যায় এবং এর সার্থক পরিণতি স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ।

**ভাষা আন্দোলনের ঐতিহাসিক পটভূমি :** বাংলার জাতীয় ইতিহাসে এক অবিস্মরণীয় ঘটনার বীজ রোপিত হয় পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার অব্যবহিত পরেই যখন নিখিল পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের মাতৃভাষা বাংলা হওয়া সত্ত্বেও সম্পূর্ণ অগণতান্ত্রিক উপায়ে উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে চাপিয়ে দেয়ার প্রচেষ্টা চালানো হয়। এরই প্রেক্ষিতে ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট পাকিস্তান স্বাধীন হওয়ার মাত্র ১৭ দিনের মাথায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তরুণ অধ্যাপক আবুল কাসেমের নেতৃত্বে ১৯৪৭ সালের ১ সেপ্টেম্বর ৩ সদস্যবিশিষ্ট তমদ্দুন মজলিস গঠিত হয়। এ সংগঠনের অপর সদস্যদ্বয় ছিলেন সৈয়দ নজরুল ইসলাম এবং শামসুল আলম। জন্মলগ্ন থেকেই সংগঠনটি বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবি উত্থাপন করে আসছিল। কিন্তু এ দাবি পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ব্যক্তিবর্গ কিছুতেই মেনে নিতে রাজি ছিলেন না। প্রকৃতপক্ষে পূর্ব পাকিস্তানে ভাষা আন্দোলনের সূত্রপাত হয় ভাষা সম্পর্কে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর একতরফা সিদ্ধান্ত এবং উক্ত সিদ্ধান্তকে জোরপূর্বক বাঙালিদের উপর চাপিয়ে দেয়ার ইচ্ছা এবং তৎপরতার মধ্য দিয়ে। পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হিসেবে উর্দুকে গ্রহণ করতে সচেষ্ট হন; যদিও বাস্তবে উর্দু ভাষাভাষী লোকের অনুপাত ছিল অনেক কম। নিচের ছকের মাধ্যমেই তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

| | | | |
|---|---|---|---|
| বাংলা | ৫৪.৬% | উর্দু | ৬% |
| পাঞ্জাবি | ২৭.১% | সিন্ধি | ৪.৮% |
| পশতু | ৬.১% | ইংরেজি | ১.৪% |

এমতাবস্থায় কেন্দ্রীয় সরকারের অন্যায় সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে পূর্ব বাংলায় তিন পর্যায়ে আন্দোলন পরিচালিত হয় :

**ভাষা আন্দোলনের প্রথম পর্যায় :** নভেম্বর ১৯৪৭-এ করাচিতে কেন্দ্রীয় পর্যায়ে একটি শিক্ষা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে উর্দুকে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার সিদ্ধান্ত হয়। ফলে পূর্ববাংলায় এ

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড প্রতিবাদ শুরু হয়। ১৯৪৮ সালের জানুয়ারি মাসে এ সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে ঢাকায় সর্বপ্রথম 'রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ' গঠন করা হয় এবং কতিপয় দাবিতে শান্তিপূর্ণ আন্দোলনের নীতি গৃহীত হয়। এ পরিষদের দাবি ছিল নিম্নরূপ :

ক. বাংলা ভাষা হবে পূর্ব বাংলার একমাত্র শিক্ষার বাহন এবং অফিস-আদালতের প্রধান মাধ্যম।

খ. পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে দুটি—বাংলা ও উর্দু।

**ভাষা আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্যায় :** ১৯৪৮ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি পাকিস্তান গণপরিষদের প্রথম অধিবেশনে কংগ্রেস দলীয় সদস্য, বিশেষত কুমিল্লার ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত ইংরেজি ও উর্দুর পাশাপাশি বাংলা ভাষা ব্যবহারের দাবি জানান। কিন্তু পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান এই দাবির বিরোধিতা করেন। ফলে ঢাকায় ছাত্র ও বুদ্ধিজীবী মহলে চরম অসন্তোষ দেখা দেয় এবং ২৬ ফেব্রুয়ারি সর্বত্র ধর্মঘট পালিত হয়। এভাবে সংগ্রাম পরিষদ ১৫ মার্চ পর্যন্ত ধর্মঘট ও হরতাল পালনের মধ্য দিয়ে দেশব্যাপী আন্দোলন অব্যাহত রাখে। অবশেষে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিন বাংলা ভাষার দাবি সমর্থনের আশ্বাস দিলে আন্দোলন প্রশমিত হয়। কিন্তু ১৯৪৮ সালের ২১ মার্চ মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ রেসকোর্স ময়দানের জনসভায় এবং কার্জন হলের এক সমাবর্তন অনুষ্ঠানে 'উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা' হিসেবে ঘোষণা দিলে আন্দোলন পুনরায় চাঙ্গা হয়ে ওঠে এবং দেশব্যাপী তীব্র প্রতিবাদ শুরু হয়।

**ভাষা আন্দোলনের শেষ পর্যায়**

ক. **নাজিমুদ্দীনের ঘোষণা :** ১৯৫০ সালে প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান এবং ১৯৫২ সালের ২৬ জানুয়ারি খাজা নাজিমুদ্দীন পুনরায় একই ঘোষণা দেন যে, 'উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা।' ফলে ছাত্র-বুদ্ধিজীবী মহলে দারুণ ক্ষোভ ও হতাশার সৃষ্টি হয় এবং আন্দোলন তীব্র আকার ধারণ করে। এ আন্দোলনের অংশ হিসেবেই ৩০ জানুয়ারি ঢাকায় ছাত্র ধর্মঘট পালিত হয়।

খ. **রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটি :** উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা ঘোষণার প্রতিবাদে রাষ্ট্রভাষা বাংলা আন্দোলনকে আরো তীব্রতর করার লক্ষ্যে ৩০ জানুয়ারি এক জনসভায় 'সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটি' গঠন করা হয়। এতে ২১ ফেব্রুয়ারিকে ভাষা দিবস হিসেবে পালন করা হয় এবং দেশব্যাপী হরতাল পালনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

গ. **ঐতিহাসিক মিছিল ও ১৪৪ ধারা ভঙ্গ :** ২১ ফেব্রুয়ারির উক্ত কর্মসূচিকে বানচাল করার জন্য তৎকালীন গভর্নর নূরুল আমিন সরকার ঢাকায় ১৪৪ ধারা জারি করে। কিন্তু সংগ্রাম পরিষদ এ নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে মিছিল বের করলে পুলিশের সাথে ছাত্র-জনতার এক মারাত্মক সংঘর্ষ বাঁধে। এক পর্যায়ে পুলিশ মিছিলের ওপর গুলি চালালে সালাম, বরকত, রফিক, জব্বারসহ অনেকে প্রাণ হারান এবং আহত হন বহুসংখ্যক ব্যক্তি। এর ফলে সারা বাংলায় আন্দোলন ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে। ঢাকায় এ ঘটনার প্রতিবাদে তিন দিন লাগাতার হরতাল পালিত হয় এবং দেশব্যাপী প্রতিবাদ ও বিক্ষোভ অব্যাহত থাকে।

ঘ. **রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা লাভ :** অবশেষে তীব্র বিক্ষোভের মুখে সরকার নতি স্বীকার করতে বাধ্য হয় এবং সাময়িকভাবে প্রাদেশিক মুখ্যমন্ত্রী নুরুল আমিন বাংলাকে অন্যতম জাতীয় ভাষা করার সুপারিশ সম্বলিত একটি প্রস্তাব প্রাদেশিক পরিষদে উত্থাপন করেন। প্রস্তাবটি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। অতঃপর ১৯৫৬ সালের সংবিধানের ২১৪ নং অনুচ্ছেদে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে মর্যাদা দিলে বাঙালি জাতির বিজয় অর্জিত হয়।



**বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে ভাষা আন্দোলনের গুরুত্ব :** রেহমান সোবহান তার 'বুর্জোয়া রাষ্ট্রব্যবস্থার সংকট' নামক প্রবন্ধে বলেন, 'বস্তুত যে অন্তর্নিহিত দুর্বলতা পাকিস্তানের ভাঙন এবং স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার মূল কারণ, তার বহিঃপ্রকাশ ঘটে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরপরই রাষ্ট্রভাষার প্রশ্নে।' উল্লিখিত বক্তব্য থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পেছনে মূল হাতিয়ার ছিল ভাষা আন্দোলন। এ আন্দোলন পূর্ব বাংলার গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে এক ধাপ এগিয়ে দেয়। জনগণের মধ্যে এ আন্দোলনে এক নতুন জাতীয় চেতনার উন্মেষ ঘটে এবং এ চেতনার মাধ্যমেই ক্রমে ক্রমে বাঙালি জাতীয়তাবাদ বিকাশ লাভ করে। জনগণের রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক মুক্তির আকাঙ্ক্ষাকে বহুগুণে বাড়িয়ে দেয় এ আন্দোলন। তাই ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন ছিল বাংলাদেশের গণচেতনার প্রথম বহিঃপ্রকাশ এবং স্বাধিকার আন্দোলনের এক বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে এ আন্দোলন নিম্নোক্তভাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল :

১. **'৫৪-এর নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের জয়লাভ :** '৫৪-এর নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনী মেনিফেস্টো ২১-দফার প্রথম দফাই ছিল বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবি। এ নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট মুসলমানদের জন্য সংরক্ষিত ২৩৭টি আসনের ২২৩টি আসন লাভ করে। শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হকের নেতৃত্বে যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠন করে। এপ্রিল ১৯৫৪ সালে আইন পরিষদের অধিবেশনে মুসলিম লীগ পর্যন্ত বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার পক্ষে মত পোষণ করে। এটি ছিল বাঙালি জাতির ৫২-র ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠা জাতীয় ঐক্যের প্রতিফলন।

২. **'৫৬ সালের সংবিধানে স্বীকৃতি :** মার্চ ১৯৫৬ সালে পাকিস্তানের প্রথম সংবিধান গৃহীত হয়। ১৯৫৪ সালের প্রথম আইন পরিষদে গৃহীত ভাষা ফর্মুলা এ সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এটা ছিল বাংলা ভাষা আন্দোলনের চূড়ান্ত বিজয়। সংবিধানের ২১৪ নং অনুচ্ছেদে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা এবং ইংরেজিকে পরবর্তী ২০ বছরের জন্য সরকারি ভাষা হিসেবে চালু রাখার কথা উল্লেখ করা হয়।

৩. **রাজনৈতিক স্বাধিকার আন্দোলনে ভাষা আন্দোলনের তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা :**

ক. ভাষা আন্দোলনকে কেন্দ্র করে বাঙালি জাতি সর্বপ্রথম অধিকার সচেতন হয়ে ওঠে।

খ. ভাষা আন্দোলনই সর্বপ্রথম রক্তের বিনিময়ে জাতীয়তাবাদী গণদাবি আদায়ের শিক্ষা ও প্রেরণা দান করে।

গ. ভাষা আন্দোলন বাঙালিদের ঐক্যের দুর্ভেদ্য প্রাচীর গঠন এবং অধিকার আদায়ে ইস্পাত কঠিন শপথে বলীয়ান করে তোলে।

ঘ. এ আন্দোলন বাঙালি 'এলিট' এবং জনসাধারণের মধ্যে সেতুবন্ধনে সহায়তা করে।

ঙ. ১৯৫২ সাল থেকে শুরু করে ১৯৭১ সালের মুক্তি আন্দোলনের প্রতিটি স্তরে প্রেরণা যুগিয়েছে এই ভাষা আন্দোলনের রক্তরাঙা ইতিহাস।

৪. **পরবর্তীকালের ঘটনাপ্রবাহে ভূমিকা :** '৫২-এর একুশের চেতনায় ভাস্বর বাঙালি জাতি রাজনৈতিক অধিকার বা স্বাধিকার আন্দোলনের মাধ্যমে ধীরে ধীরে স্বাধিকার অর্জনের দিকে এগুতে থাকে। '৬২-এর 'হামিদুর রহমান শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট'-এর বিরুদ্ধে ব্যাপক আন্দোলনে ছাত্র সমাজ ১৭ সেপ্টেম্বর ১৯৬২ 'শিক্ষা দিবস' ঘোষণা করে। ১৯৬৫-এর পাক-ভারত যুদ্ধ বাঙালি জাতিকে এমন একটি ধারণা গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করে যে, পাকিস্তানিরা আমাদের শুধু নিজেদের স্বার্থ হাসিলের জন্য ব্যবহার করবে। তাই অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে ফেব্রুয়ারি ১৯৬৬ সালে লাহোরে শেখ মুজিব ঐতিহাসিক ৬ দফা দাবি উত্থাপন করেন। ভাষা সংগ্রামের মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠা ঐক্যবদ্ধ বাঙালি জাতি ছয় দফাকে জাতীয় মুক্তির প্রতীক হিসেবে গ্রহণ করে।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



'৬৯-এর ঐতিহাসিক গণঅভ্যুত্থান এবং '৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের জয়লাভের পেছনে প্রেরণা ও শক্তি যুগিয়েছিল '৫২-র ভাষা আন্দোলন। '৭০-এর নির্বাচনে আওয়ামী লীগ পূর্ব বাংলার ১৬৯টি আসনের মধ্যে ১৬৭টি এবং প্রদেশিক পরিষদের ৩০০টি আসনের মধ্যে ২৮২টি আসন লাভ করে এবং একক সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। নির্বাচনের ফলাফল অনুযায়ী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর ছিল আইনসঙ্গত। কিন্তু তা না করে শুরু হয় ষড়যন্ত্র। প্রহসনমূলক আলোচনায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় শেখ মুজিবের হাতে ক্ষমতা দেওয়া হবে না, প্রয়োজনে বাঙালি জাতিকে ধ্বংস করে দেয়া হবে। সাংবাদিক এ্যান্থনি ম্যাসকারেনহাস এটাকে 'বিশ শতকের সর্বাধিক জঘন্যতম প্রবঞ্চনা' বলে আখ্যায়িত করেন। আলোচনার নামে কালক্ষেপণ করে ২৫ মার্চ ১৯৭১ মধ্যরাত থেকে 'অপারেশন সার্চলাইট' নামে বাঙালি নিধন অভিযান শুরু হয়ে যায়। ফলে সকল ধরনের অহিংস তৎপরতার সুযোগ নস্যাৎ হয়ে যায়। এমতাবস্থায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা প্রদান করেন। এটি ছিল মহান ভাষা সংগ্রামের মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠা ঐক্যবদ্ধ বাঙালি জাতির কাছে প্রত্যাশার চূড়ান্ত প্রাপ্তি। সে কারণে জাতি পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর কবল থেকে বাংলাদেশকে মুক্ত করতে মুক্তিযুদ্ধ শুরু করে। আর এতে প্রেরণা যুগিয়েছে একুশের চেতনা। সাহসিকতার সাথে যুদ্ধ করে ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ হানাদার বর্বর পাকিস্তান বাহিনীকে আত্মসমর্পণে বাধ্য করে বাংলার বীর জনতা।

**উপসংহার :** বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন পূর্ব বাংলার জনগণের মধ্যে এক নতুন জাতীয় চেতনার উন্মেষ ঘটায় এবং এ চেতনাই ক্রমে ক্রমে বাঙালি জাতীয়তাবাদের বিকাশ ঘটায়। ১৯৮০ সালের 'জিজ্ঞাসা'র একুশে সংকলনে ভাষা আন্দোলনের তাৎপর্য সম্পর্কে বলা হয় 'পূর্ব পাকিস্তানের ইতিহাসে ভাষা আন্দোলন এক নতুন দিকদর্শন। এই আন্দোলন বাঙালিদের মনে যে বৈপ্লবিক চেতনা ও ঐক্যের উন্মেষ ঘটায় তা আমাদের পরবর্তী সকল আন্দোলনে প্রাণশক্তি ও অনুপ্রেরণা যোগায়।' এই আন্দোলনের মধ্য দিয়ে ছাত্র-জনতা যে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সূচনা করে তা ক্রমশ শক্তিশালী হতে থাকে। ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্টের ঐতিহাসিক বিজয়, ১৯৬২ সালের শিক্ষা আন্দোলন, ১৯৬৬ সালের স্বাধিকার আন্দোলন, ১৯৬৮-৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান, ১৯৭০ সালের নির্বাচন এবং সর্বোপরি ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে বিশেষভাবে প্রেরণা যুগিয়েছে এ ভাষা আন্দোলন।

## রচনা ৪০ ভাষা আন্দোলন এবং বাংলা ভাষার বিশ্বায়ন

**ভূমিকা :** পাকিস্তান সৃষ্টির শুরু থেকেই পাকিস্তানের জাতীয় নেতৃত্ব সাংস্কৃতিক মিশ্রণের এক কেন্দ্রীভূত নীতি গ্রহণ করে। এ নীতির চাপ অধিকমাত্রায় অনুভূত হয় পশ্চিম পাকিস্তানের চেয়ে পূর্ব বাংলায় তথা পূর্ব পাকিস্তানে। শুধু সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেই নয়, জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রেও কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব বিমাতাসুলভ আচরণ শুরু করে। এতে পূর্ব পাকিস্তানের যুব সম্প্রদায়, বুদ্ধিজীবী এবং সর্বোপরি আপামর জনসাধারণের মধ্যে চরম হতাশার সৃষ্টি হয়, সৃষ্টি হয় এক চাপা অসন্তোষের। আর এ হতাশা ও অসন্তোষের তীব্র ও ব্যাপক প্রসার ঘটে ভাষা আন্দোলনকে কেন্দ্র করে। মূলত দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে ধর্মীয় কারণে প্রতিষ্ঠিত পাকিস্তান ইসলামী রাষ্ট্র হলেও এর সমাজ ব্যবস্থায় একক আদর্শগত কোনো যোগসূত্র ছিল না। এর কারণ পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যকার ভাষাগত বিরোধ। এ কারণে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ পাকিস্তানের মৌলিক আদর্শের সাথে কোনোদিন একাত্মতা অনুভব করতে পারেনি। আর এ কারণেই পাকিস্তান সৃষ্টির অব্যবহিত পরেই ১৯৪৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে পূর্ব বাংলায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তরুণ অধ্যাপক আবুল কাসেমের নেতৃত্বে 'তমদ্দুন মজলিস' নামক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের মাধ্যমে ভাষা আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটে। এ আন্দোলনের প্রভাব বাংলার সুদীর্ঘ রাজনৈতিক ইতিহাসের পরতে পরতে দেখতে পাওয়া যায় এবং যার সার্থক পরিণতি স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ।



**ভাষা আন্দোলনের ঐতিহাসিক পটভূমি :** বাংলার জাতীয় ইতিহাসে এক অবিস্মরণীয় ঘটনার বীজ রোপিত হয় পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার অব্যবহিত পরেই যখন নিখিল পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের মাতৃভাষা বাংলা হওয়া সত্ত্বেও সম্পূর্ণ অগণতান্ত্রিক উপায়ে উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে চাপিয়ে দেয়ার প্রচেষ্টা চালানো হয়। এরই প্রেক্ষিতে ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট পাকিস্তান স্বাধীন হওয়ার মাত্র ১৭ দিনের মাথায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তরুণ অধ্যাপক আবুল কাসেমের নেতৃত্বে ১ সেপ্টেম্বর ৩ সদস্যবিশিষ্ট তমদ্দুন মজলিস গঠিত হয়। এ সংগঠনের অপর সদস্যদ্বয় ছিলেন সৈয়দ নজরুল ইসলাম এবং শামসুল আলম। জন্মলগ্ন থেকেই সংগঠনটি বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবি উত্থাপন করে আসছিল। কিন্তু এ দাবি পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ব্যক্তিবর্গ কিছুতেই মেনে নিতে রাজি ছিলেন না। প্রকৃতপক্ষে পূর্ব পাকিস্তানে ভাষা আন্দোলনের সূত্রপাত হয় ভাষা সম্পর্কে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর একতরফা সিদ্ধান্ত এবং উক্ত সিদ্ধান্তকে জোরপূর্বক বাঙালিদের উপর চাপিয়ে দেয়ার ইচ্ছা এবং তৎপরতার মধ্য দিয়ে। পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠী পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হিসেবে উর্দুকে গ্রহণ করতে সচেষ্ট হন; যদিও বাস্তবে উর্দু ভাষাভাষী লোকের অনুপাত ছিল অনেক কম। ছকের মাধ্যমেই তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

| *ভাষার নাম* | *ভাষাভাষীর শতকরা হার* |
|---|---|
| *বাংলা* | *৫৪.৬%* |
| *পাঞ্জাবি* | *২৭.১%* |
| *পশতু* | *৬.১%* |
| *উর্দু* | *৬%* |
| *সিন্ধি* | *৪.৮%* |
| *ইংরেজি* | *১.৪%* |

*সূত্র : বাংলাদেশের রাজনৈতিক উন্নয়ন, লেখক : ড. আব্দুল ওঁদুদ ভুইয়া, পৃষ্ঠা-১৭০*

**ভাষা আন্দোলনের প্রথম পর্যায় :** ১৯৪৭ সালের নভেম্বর মাসে করাচিতে এক কেন্দ্রীয় পর্যায়ের শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে উর্দুকে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার সিদ্ধান্ত হয়। ফলে পূর্ব বাংলায় এ সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড প্রতিবাদ শুরু হয়। ১৯৪৮ সালের জানুয়ারি মাসে এ সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে ঢাকায় সর্বপ্রথম রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠন করা হয় এবং কতিপয় দাবিতে শান্তিপূর্ণ আন্দোলনের নীতি গৃহীত হয়। এ পরিষদের দাবি ছিল নিম্নরূপ :

১. বাংলা ভাষা হবে পূর্ব বাংলার একমাত্র শিক্ষার বাহন এবং অফিস-আদালতের প্রধান মাধ্যম।
২. পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে দুটি– বাংলা ও উর্দু।

**ভাষা আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্যায় :** ১৯৪৮ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি পাকিস্তান গণপরিষদের প্রথম অধিবেশনে কংগ্রেস দলীয় সদস্যগণ বিশেষত কুমিল্লার ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত দাবি জানান ইংরেজি ও উর্দুর পাশাপাশি বাংলা ভাষা ব্যবহার করার জন্য। কিন্তু পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান এ নীতির বিরোধিতা করে বলেন–

'(the mover) should realise that Pakistan has been created because of the demand of one hundred million Muslims in the subcontinent, and the language of a hundred million Muslims is Urdu.'

*উৎস : Constituent Assembly of Pakistan Debates; Vol-2, February 25, 1948, Page-17]*

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



'৬৯-এর ঐতিহাসিক গণঅভ্যুত্থান এবং '৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের জয়লাভের পেছনে প্রেরণা ও শক্তি যুগিয়েছিল '৫২-র ভাষা আন্দোলন। '৭০-এর নির্বাচনে আওয়ামী লীগ পূর্ব বাংলার ১৬৯টি আসনের মধ্যে ১৬৭টি এবং প্রদেশিক পরিষদের ৩০০টি আসনের মধ্যে ২৮২টি আসন লাভ করে এবং একক সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। নির্বাচনের ফলাফল অনুযায়ী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর ছিল আইনসঙ্গত। কিন্তু তা না করে শুরু হয় ষড়যন্ত্র। প্রহসনমূলক আলোচনায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় শেখ মুজিবের হাতে ক্ষমতা দেওয়া হবে না, প্রয়োজনে বাঙালি জাতিকে ধ্বংস করে দেয়া হবে। সাংবাদিক এ্যান্থনি ম্যাসকারেনহাস এটাকে 'বিশ শতকের সর্বাধিক জঘন্যতম প্রবঞ্চনা' বলে আখ্যায়িত করেন। আলোচনার নামে কালক্ষেপণ করে ২৫ মার্চ ১৯৭১ মধ্যরাত থেকে 'অপারেশন সার্চলাইট' নামে বাঙালি নিধন অভিযান শুরু হয়ে যায়। ফলে সকল ধরনের অহিংস তৎপরতার সুযোগ নস্যাৎ হয়ে যায়। এমতাবস্থায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা প্রদান করেন। এটি ছিল মহান ভাষা সংগ্রামের মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠা ঐক্যবদ্ধ বাঙালি জাতির কাছে প্রত্যাশার চূড়ান্ত প্রাপ্তি। সে কারণে জাতি পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর কবল থেকে বাংলাদেশকে মুক্ত করতে মুক্তিযুদ্ধ শুরু করে। আর এতে প্রেরণা যুগিয়েছে একুশের চেতনা। সাহসিকতার সাথে যুদ্ধ করে ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ হানাদার বর্বর পাকিস্তান বাহিনীকে আত্মসমর্পণে বাধ্য করে বাংলার বীর জনতা।

**উপসংহার :** বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন পূর্ব বাংলার জনগণের মধ্যে এক নতুন জাতীয় চেতনার উন্মেষ ঘটায় এবং এ চেতনাই ক্রমে ক্রমে বাঙালি জাতীয়তাবাদের বিকাশ ঘটায়। ১৯৮০ সালের 'জিজ্ঞাসা'র একুশে সংকলনে ভাষা আন্দোলনের তাৎপর্য সম্পর্কে বলা হয় 'পূর্ব পাকিস্তানের ইতিহাসে ভাষা আন্দোলন এক নতুন দিকদর্শন। এই আন্দোলন বাঙালিদের মনে যে বৈপ্লবিক চেতনা ও ঐক্যের উন্মেষ ঘটায় তা আমাদের পরবর্তী সকল আন্দোলনে প্রাণশক্তি ও অনুপ্রেরণা যোগায়।' এই আন্দোলনের মধ্য দিয়ে ছাত্র-জনতা যে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সূচনা করে তা ক্রমশ শক্তিশালী হতে থাকে। ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্টের ঐতিহাসিক বিজয়, ১৯৬২ সালের শিক্ষা আন্দোলন, ১৯৬৬ সালের স্বাধিকার আন্দোলন, ১৯৬৮-৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান, ১৯৭০ সালের নির্বাচন এবং সর্বোপরি ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে বিশেষভাবে প্রেরণা যুগিয়েছে এ ভাষা আন্দোলন।

## রচনা ৪০ ভাষা আন্দোলন এবং বাংলা ভাষার বিশ্বায়ন

**ভূমিকা :** পাকিস্তান সৃষ্টির শুরু থেকেই পাকিস্তানের জাতীয় নেতৃত্ব সাংস্কৃতিক মিশ্রণের এক কেন্দ্রীভূত নীতি গ্রহণ করে। এ নীতির চাপ অধিকমাত্রায় অনুভূত হয় পশ্চিম পাকিস্তানের চেয়ে পূর্ব বাংলায় তথা পূর্ব পাকিস্তানে। শুধু সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেই নয়, জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রেও কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব বিমাতাসুলভ আচরণ শুরু করে। এতে পূর্ব পাকিস্তানের যুব সম্প্রদায়, বুদ্ধিজীবী এবং সর্বোপরি আপামর জনসাধারণের মধ্যে চরম হতাশার সৃষ্টি হয়, সৃষ্টি হয় এক চাপা অসন্তোষের। আর এ হতাশা ও অসন্তোষের তীব্র ও ব্যাপক প্রসার ঘটে ভাষা আন্দোলনকে কেন্দ্র করে। মূলত দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে ধর্মীয় কারণে প্রতিষ্ঠিত পাকিস্তান ইসলামী রাষ্ট্র হলেও এর সমাজ ব্যবস্থায় একক আদর্শগত কোনো যোগসূত্র ছিল না। এর কারণ পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যকার ভাষাগত বিরোধ। এ কারণে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ পাকিস্তানের মৌলিক আদর্শের সাথে কোনোদিন একাত্মতা অনুভব করতে পারেনি। আর এ কারণেই পাকিস্তান সৃষ্টির অব্যবহিত পরেই ১৯৪৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে পূর্ব বাংলায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তরুণ অধ্যাপক আবুল কাসেমের নেতৃত্বে 'তমদ্দুন মজলিস' নামক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের মাধ্যমে ভাষা আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটে। এ আন্দোলনের প্রভাব বাংলার সুদীর্ঘ রাজনৈতিক ইতিহাসের পরতে পরতে দেখতে পাওয়া যায় এবং যার সার্থক পরিণতি স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ।



**ভাষা আন্দোলনের ঐতিহাসিক পটভূমি :** বাংলার জাতীয় ইতিহাসে এক অবিস্মরণীয় ঘটনার বীজ রোপিত হয় পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার অব্যবহিত পরেই যখন নিখিল পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের মাতৃভাষা বাংলা হওয়া সত্ত্বেও সম্পূর্ণ অগণতান্ত্রিক উপায়ে উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে চাপিয়ে দেয়ার প্রচেষ্টা চালানো হয়। এরই প্রেক্ষিতে ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট পাকিস্তান স্বাধীন হওয়ার মাত্র ১৭ দিনের মাথায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তরুণ অধ্যাপক আবুল কাসেমের নেতৃত্বে ১ সেপ্টেম্বর ৩ সদস্যবিশিষ্ট তমদ্দুন মজলিস গঠিত হয়। এ সংগঠনের অপর সদস্যদ্বয় ছিলেন সৈয়দ নজরুল ইসলাম এবং শামসুল আলম। জন্মলগ্ন থেকেই সংগঠনটি বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবি উত্থাপন করে আসছিল। কিন্তু এ দাবি পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ব্যক্তিবর্গ কিছুতেই মেনে নিতে রাজি ছিলেন না। প্রকৃতপক্ষে পূর্ব পাকিস্তানে ভাষা আন্দোলনের সূত্রপাত হয় ভাষা সম্পর্কে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর একতরফা সিদ্ধান্ত এবং উক্ত সিদ্ধান্তকে জোরপূর্বক বাঙালিদের উপর চাপিয়ে দেয়ার ইচ্ছা এবং তৎপরতার মধ্য দিয়ে। পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠী পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হিসেবে উর্দুকে গ্রহণ করতে সচেষ্ট হন; যদিও বাস্তবে উর্দু ভাষাভাষী লোকের অনুপাত ছিল অনেক কম। ছকের মাধ্যমেই তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

| *ভাষার নাম* | *ভাষাভাষীর শতকরা হার* |
|---|---|
| *বাংলা* | *৫৪.৬%* |
| *পাঞ্জাবি* | *২৭.১%* |
| *পশতু* | *৬.১%* |
| *উর্দু* | *৬%* |
| *সিন্ধি* | *৪.৮%* |
| *ইংরেজি* | *১.৪%* |

*সূত্র : বাংলাদেশের রাজনৈতিক উন্নয়ন, লেখক : ড. আব্দুল ওঁদুদ ভুইয়া, পৃষ্ঠা-১৭০*

**ভাষা আন্দোলনের প্রথম পর্যায় :** ১৯৪৭ সালের নভেম্বর মাসে করাচিতে এক কেন্দ্রীয় পর্যায়ের শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে উর্দুকে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার সিদ্ধান্ত হয়। ফলে পূর্ব বাংলায় এ সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড প্রতিবাদ শুরু হয়। ১৯৪৮ সালের জানুয়ারি মাসে এ সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে ঢাকায় সর্বপ্রথম রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠন করা হয় এবং কতিপয় দাবিতে শান্তিপূর্ণ আন্দোলনের নীতি গৃহীত হয়। এ পরিষদের দাবি ছিল নিম্নরূপ :

১. বাংলা ভাষা হবে পূর্ব বাংলার একমাত্র শিক্ষার বাহন এবং অফিস-আদালতের প্রধান মাধ্যম।
২. পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে দুটি– বাংলা ও উর্দু।

**ভাষা আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্যায় :** ১৯৪৮ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি পাকিস্তান গণপরিষদের প্রথম অধিবেশনে কংগ্রেস দলীয় সদস্যগণ বিশেষত কুমিল্লার ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত দাবি জানান ইংরেজি ও উর্দুর পাশাপাশি বাংলা ভাষা ব্যবহার করার জন্য। কিন্তু পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান এ নীতির বিরোধিতা করে বলেন–

'(the mover) should realise that Pakistan has been created because of the demand of one hundred million Muslims in the subcontinent, and the language of a hundred million Muslims is Urdu.'

[উৎস : *Constituent Assembly of Pakistan Debates; Vol-2, February 25, 1948, Page-17*]

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



লিয়াকত আলী খানের এ উক্তির ফলে ঢাকায় ছাত্র ও বুদ্ধিজীবী মহলে চরম অসন্তোষ দেখা দেয় এবং
২৬ ফেব্রুয়ারি সর্বত্র ধর্মঘট পালিত হয়। এভাবে সংগ্রাম পরিষদ ১৫ মার্চ পর্যন্ত ধর্মঘট ও হরতাল
পালনের মধ্য দিয়ে আন্দোলনকে চাঙ্গা রাখে। অবশেষে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী খাজা নাজিমদ্দিন বাংলা
ভাষার দাবি সমর্থনের আশ্বাস দিলে আন্দোলন প্রশমিত হয়, কিন্তু ১৯৪৮ সালের ১৯ মার্চ মোহাম্মদ
আলী জিন্নাহ তার প্রথম পূর্ব পাকিস্তান সফরে এসে ঢাকার রমনা রেসকোর্সে এক জনসভায় ঘোষণা
করেন : 'উর্দু এবং একমাত্র উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা' (Urdu and only Urdu shall be
the state language of Pakistan)। তিন দিন পরে কার্জন হলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন
উৎসবে তিনি যখন একই ঘোষণার পুনরাবৃত্তি করেন, তখন ছাত্রগণ খোলাখুলিভাবে না, না, না.....
বলে এর প্রতিবাদ জানায়। পরবর্তীতে তারা বাংলা ভাষার দাবিতে ধর্মঘট পালন করেন। গণপরিষদের
কংগ্রেস সদস্যগণও বাংলা ও উর্দুর সমান মর্যাদা দাবি করেন। পরবর্তীতে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ এবং
পূর্ব পাকিস্তানের মুসলিম ছাত্রলীগের মধ্যে এক আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু এ আলোচনা মোটেই
ফলপ্রসূ হয়নি। পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব বাংলা ভাষার দাবিকে বিনষ্ট করার জন্য দমনমূলক নীতির
আশ্রয় গ্রহণ করে এবং ভাষা আন্দোলনের সমর্থকদের জেলে আটক করা হয়। ফলে চারদিকে
প্রতিবাদের ঝড় উত্থিত হয় এবং আন্দোলনের পথ প্রশস্ত হয়। ছাত্র নেতৃবৃন্দ এবং জনগণ
সম্মিলিতভাবে আটককৃত ছাত্রদের মুক্তির দাবিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ দেশের অন্যান্য শিক্ষা
প্রতিষ্ঠানে ধর্মঘট আহ্বান করে। এর ফলে দেশের সর্বত্রই বাংলা ভাষার দাবি জোরালো আকার ধারণ
করে। এতে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী আরও দমনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে উদ্যত হন।

**ভাষা আন্দোলনের শেষ পর্যায় :**

ক. **নাজিমুদ্দিনের ঘোষণা :** ১৯৫০ সালে মূলনীতি কমিটির (Basic Principles Committee)
অন্তর্বর্তীকালীন রিপোর্ট প্রকাশিত হলে তা পূর্ব বাংলায় ছাত্রসমাজ ও জনগণ কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত
হয়। কারণ এ রিপোর্টে পূর্ব বাংলার জনগণের প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের দাবি, ক্ষমতা
বিকেন্দ্রীকরণের দাবিসহ বাংলা ভাষার দাবিকে মানা হয়নি। বরং তাতে নগ্নভাবে বলা হয়েছিল যে
উর্দু পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হওয়া উচিত। ১৯৫০ সালে প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান
এবং ১৯৫২ সালের ৩০ জানুয়ারি খাজা নাজিমউদ্দীন পুনরায় একই ঘোষণা দেন যে উর্দুই হবে
পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা। ফলে ছাত্র-বুদ্ধিজীবী মহলে দারুণ ক্ষোভ ও হতাশার সৃষ্টি হয়
এবং আন্দোলন তীব্র আকার ধারণ করে। এ আন্দোলনের অংশ হিসেবেই ৩০ জানুয়ারি ঢাকায়
সর্বাত্মক ছাত্র ধর্মঘট পালিত হয়।

খ. **রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটি :** উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার ঘোষণার প্রতিবাদে রাষ্ট্রভাষা বাংলার
আন্দোলনকে আরও তীব্রতর করার লক্ষ্যে ১৯৫২ সালের ৩০ জানুয়ারি এক জনসভায় সর্বদলীয়
রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটি গঠিত হয়। এ কমিটিতে আওয়ামী লীগ থেকে ২ জন, পূর্ব পাকিস্তান
যুবলীগ থেকে ২ জন, খিলাফতই রব্বানী থেকে ২ জন, ছাত্রলীগ থেকে ২ জন এবং বিশ্ববিদ্যালয়
কমিটি থেকে ২ জন সদস্য গৃহীত হয়। আহ্বায়ক ছিলেন গোলাম মাহবুব। এ কমিটি ২১
ফেব্রুয়ারিকে ভাষা দিবস হিসেবে পালন করার এবং দেশব্যাপী হরতাল পালনের সিদ্ধান্ত নেয়।



গ. **ঐতিহাসিক মিছিল এবং ১৪৪ ধারা ভঙ্গ :** ২১ ফেব্রুয়ারির উক্ত কর্মসূচিকে বানচাল করার জন্য
তৎকালীন গভর্নর নুরুল আমীন সরকার ঢাকায় ১৪৪ ধারা জারি করেন। কিন্তু পূর্ব বাংলার ছাত্র-
জনতা এতে ভয় পায়নি। তারা এতে কোনোরূপ ভ্রুক্ষেপ না করে সংগ্রাম চালিয়ে যায়। সরকার
কর্তৃক জারিকৃত ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে শান্তিপূর্ণ মিছিল বের করে তৎকালীন প্রাদেশিক ভবনে গিয়ে
তাদের দাবি মায়ের ভাষা, বাংলা ভাষার দাবি উত্থাপন করবে বলে স্থির করে। নির্ধারিত সময়সূচি
অনুসারে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরাতন কলা ভবনের সামনে থেকে মিছিল অগ্রসর হয় এবং কিছুদূর
অগ্রসর হয়ে মিছিল যখন ঢাকা মেডিকেল কলেজের সামনে আসে ঠিক তখনই সে মিছিলের উপর
পুলিশ গুলিবর্ষণ করে। ফলে মিছিল কিছুটা ছত্রভঙ্গ হয় এবং কয়েকজন তরুণ ঘটনাস্থলেই মৃত্যুর
কোলে ঢলে পড়ে। রফিক, বরকত, সালাম, জব্বারসহ আরও নাম না জানা অনেক ছাত্র মৃত্যুবরণ
করেন। সরকারের এ বর্বরোচিত হামলার প্রতিবাদে সারাদেশে বিদ্রোহের আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে
ওঠে। ছাত্রদের পাশাপাশি সমাজের সর্বস্তরের মানুষ প্রতিবাদমুখর হয়ে শহীদানের রক্তে রঞ্জিত
রাজপথে নেমে আসেন এবং এক প্রবল অপ্রতিরোধ্য আন্দোলন গড়ে ওঠে।

ঘ. **রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলা ভাষার স্বীকৃতি লাভ :** অবশেষে এদেশের আপামর জনসাধারণের প্রবল
বিক্ষোভের মুখে সরকার নতি স্বীকার করতে বাধ্য হয় এবং সাময়িকভাবে বাংলাকে অন্যতম
রাষ্ট্রভাষা করার একটি প্রস্তাব প্রাদেশিক পরিষদে উত্থাপন করা হয়। প্রস্তাবটি সর্বসম্মতিক্রমে
গৃহীত হয়। অতঃপর ১৯৫৬ সালের সংবিধানের ২১৪ নং অনুচ্ছেদে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে
মর্যাদা দিলে বাঙালি জাতির বিজয় অর্জিত হয়।

**ভাষা আন্দোলন এবং বাংলা ভাষার বিশ্বায়ন :** ১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারি এদেশের আপামর ছাত্র
সমাজের বুকের তাজা রক্তের বিনিময়ে যে মাতৃভাষা বাংলা অর্জিত হয়েছে তার গণ্ডি এখন শুধু দেশের
মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। বরং একুশে ফেব্রুয়ারি এবং ভাষা আন্দোলনের চেতনা আজ ছড়িয়ে পড়েছে সর্বত্র।
ভাষার জন্য বাঙালি জাতির এ আত্মত্যাগ আজ নতুন করে বিশ্বকে ভাবতে শিখিয়েছে মাতৃভাষার গুরুত্ব
সম্পর্কে। ১৭ নভেম্বর ১৯৯৯ জাতিসংঘের শিক্ষা, বিজ্ঞান এবং সাংস্কৃতিক সংস্থা (UNESCO) সাধারণ
পরিষদে আমাদের জাতীয় চেতনার ধারক একুশে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃতি
দিয়েছে। বিশ্বের প্রতিটি প্রান্তের মানুষ আজ বাঙালিদের মাতৃভাষার জন্য আত্মত্যাগের সাথে একাত্মতা
ঘোষণা করেছে। সালাম, বরকত, রফিক, জব্বারের রক্তের বিনিময়ে অর্জিত বাংলা ভাষা আজ যে বৈশ্বিক
মর্যাদা লাভ করেছে তা মূলত আমাদের জাতীয় চেতনাবোধের বিজয়। ইউনেস্কোর গৃহীত প্রস্তাবে
আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালনের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করে বলা হয় যে, 'সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণে
ভাষা সবচেয়ে শক্তিশালী হাতিয়ার। মাতৃভাষার প্রচলন কেবল ভাষাগত বৈচিত্র্য এবং বহু ভাষাভিত্তিক
শিক্ষাকেই উৎসাহিত করবে না, তা ভাষাগত এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের উন্নয়ন অনুধাবনের ক্ষেত্রে সহায়তা
করবে।' বাংলাদেশসহ জাতিসংঘভুক্ত ১৯৩টি দেশ বর্তমানে একুশে ফেব্রুয়ারিকে পালন করছে আন্তর্জাতিক
মাতৃভাষা দিবস হিসেবে। বাংলা ভাষা ও বাঙালির জন্য এ প্রাপ্তি সহস্র মর্যাদার প্রতীক।

আন্তর্জাতিক ভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে ২১ ফেব্রুয়ারি এবং এর মাধ্যমে আমাদের ভাষা
আন্দোলনের চেতনার সাথে সংযোগ ঘটেছে বিশ্বায়ন এবং আন্তর্জাতিকতাবাদের। আমাদের ভাষা
আন্দোলন আজ শুধু বাংলাদেশ বা বাঙালি জাতির ভাষা আন্দোলন নয়, বিশ্বের যে জাতিই মায়ের

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



লিয়াকত আলী খানের এ উক্তির ফলে ঢাকায় ছাত্র ও বুদ্ধিজীবী মহলে চরম অসন্তোষ দেখা দেয় এবং ২৬ ফেব্রুয়ারি সর্বত্র ধর্মঘট পালিত হয়। এভাবে সংগ্রাম পরিষদ ১৫ মার্চ পর্যন্ত ধর্মঘট ও হরতাল পালনের মধ্য দিয়ে আন্দোলনকে চাঙ্গা রাখে। অবশেষে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী খাজা নাজিমদ্দিন বাংলা ভাষার দাবি সমর্থনের আশ্বাস দিলে আন্দোলন প্রশমিত হয়, কিন্তু ১৯৪৮ সালের ১৯ মার্চ মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ তার প্রথম পূর্ব পাকিস্তান সফরে এসে ঢাকার রমনা রেসকোর্সে এক জনসভায় ঘোষণা করেন : 'উর্দু এবং একমাত্র উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা' (Urdu and only Urdu shall be the state language of Pakistan)। তিন দিন পরে কার্জন হলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবে তিনি যখন একই ঘোষণার পুনরাবৃত্তি করেন, তখন ছাত্রগণ খোলাখুলিভাবে না, না, না..... বলে এর প্রতিবাদ জানায়। পরবর্তীতে তারা বাংলা ভাষার দাবিতে ধর্মঘট পালন করেন। গণপরিষদের কংগ্রেস সদস্যগণও বাংলা ও উর্দুর সমান মর্যাদা দাবি করেন। পরবর্তীতে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ এবং পূর্ব পাকিস্তানের মুসলিম ছাত্রলীগের মধ্যে এক আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু এ আলোচনা মোটেই ফলপ্রসূ হয়নি। পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব বাংলা ভাষার দাবিকে বিনষ্ট করার জন্য দমনমূলক নীতির আশ্রয় গ্রহণ করে এবং ভাষা আন্দোলনের সমর্থকদের জেলে আটক করা হয়। ফলে চারদিকে প্রতিবাদের ঝড় উত্থিত হয় এবং আন্দোলনের পথ প্রশস্ত হয়। ছাত্র নেতৃবৃন্দ এবং জনগণ সম্মিলিতভাবে আটককৃত ছাত্রদের মুক্তির দাবিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ দেশের অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্মঘট আহ্বান করে। এর ফলে দেশের সর্বত্রই বাংলা ভাষার দাবি জোরালো আকার ধারণ করে। এতে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী আরও দমনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে উদ্যত হন।

**ভাষা আন্দোলনের শেষ পর্যায় :**

ক. **নাজিমুদ্দিনের ঘোষণা :** ১৯৫০ সালে মূলনীতি কমিটির (Basic Principles Committee) অন্তর্বর্তীকালীন রিপোর্ট প্রকাশিত হলে তা পূর্ব বাংলায় ছাত্রসমাজ ও জনগণ কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হয়। কারণ এ রিপোর্টে পূর্ব বাংলার জনগণের প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের দাবি, ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণের দাবিসহ বাংলা ভাষার দাবিকে মানা হয়নি। বরং তাতে নগ্নভাবে বলা হয়েছিল যে উর্দু পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হওয়া উচিত। ১৯৫০ সালে প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান এবং ১৯৫২ সালের ৩০ জানুয়ারি খাজা নাজিমউদ্দীন পুনরায় একই ঘোষণা দেন যে উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা। ফলে ছাত্র-বুদ্ধিজীবী মহলে দারুণ ক্ষোভ ও হতাশার সৃষ্টি হয় এবং আন্দোলন তীব্র আকার ধারণ করে। এ আন্দোলনের অংশ হিসেবেই ৩০ জানুয়ারি ঢাকায় সর্বাত্মক ছাত্র ধর্মঘট পালিত হয়।

খ. **রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটি :** উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার ঘোষণার প্রতিবাদে রাষ্ট্রভাষা বাংলার আন্দোলনকে আরও তীব্রতর করার লক্ষ্যে ১৯৫২ সালের ৩০ জানুয়ারি এক জনসভায় সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটি গঠিত হয়। এ কমিটিতে আওয়ামী লীগ থেকে ২ জন, পূর্ব পাকিস্তান যুবলীগ থেকে ২ জন, খিলাফতই রব্বানী থেকে ২ জন, ছাত্রলীগ থেকে ২ জন এবং বিশ্ববিদ্যালয় কমিটি থেকে ২ জন সদস্য গৃহীত হয়। আহ্বায়ক ছিলেন গোলাম মাহবুব। এ কমিটি ২১ ফেব্রুয়ারিকে ভাষা দিবস হিসেবে পালন করার এবং দেশব্যাপী হরতাল পালনের সিদ্ধান্ত নেয়।



গ. **ঐতিহাসিক মিছিল এবং ১৪৪ ধারা ভঙ্গ :** ২১ ফেব্রুয়ারির উক্ত কর্মসূচিকে বানচাল করার জন্য তৎকালীন গভর্নর নুরুল আমীন সরকার ঢাকায় ১৪৪ ধারা জারি করেন। কিন্তু পূর্ব বাংলার ছাত্র-জনতা এতে ভয় পায়নি। তারা এতে কোনোরূপ ভ্রুক্ষেপ না করে সংগ্রাম চালিয়ে যায়। সরকার কর্তৃক জারিকৃত ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে শান্তিপূর্ণ মিছিল বের করে তৎকালীন প্রাদেশিক ভবনে গিয়ে তাদের দাবি মায়ের ভাষা, বাংলা ভাষার দাবি উত্থাপন করবে বলে স্থির করে। নির্ধারিত সময়সূচি অনুসারে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরাতন কলা ভবনের সামনে থেকে মিছিল অগ্রসর হয় এবং কিছুদূর অগ্রসর হয়ে মিছিল যখন ঢাকা মেডিকেল কলেজের সামনে আসে ঠিক তখনই সে মিছিলের উপর পুলিশ গুলিবর্ষণ করে। ফলে মিছিল কিছুটা ছত্রভঙ্গ হয় এবং কয়েকজন তরুণ ঘটনাস্থলেই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। রফিক, বরকত, সালাম, জব্বারসহ আরও নাম না জানা অনেক ছাত্র মৃত্যুবরণ করেন। সরকারের এ বর্বরোচিত হামলার প্রতিবাদে সারাদেশে বিদ্রোহের আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠে। ছাত্রদের পাশাপাশি সমাজের সর্বস্তরের মানুষ প্রতিবাদমুখর হয়ে শহীদানের রক্তে রঞ্জিত রাজপথে নেমে আসেন এবং এক প্রবল অপ্রতিরোধ্য আন্দোলন গড়ে ওঠে।

ঘ. **রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলা ভাষার স্বীকৃতি লাভ :** অবশেষে এদেশের আপামর জনসাধারণের প্রবল বিক্ষোভের মুখে সরকার নতি স্বীকার করতে বাধ্য হয় এবং সাময়িকভাবে বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার একটি প্রস্তাব প্রাদেশিক পরিষদে উত্থাপন করা হয়। প্রস্তাবটি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। অতঃপর ১৯৫৬ সালের সংবিধানের ২১৪ নং অনুচ্ছেদে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে মর্যাদা দিলে বাঙালি জাতির বিজয় অর্জিত হয়।

**ভাষা আন্দোলন এবং বাংলা ভাষার বিশ্বায়ন :** ১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারি এদেশের আপামর ছাত্র সমাজের বুকের তাজা রক্তের বিনিময়ে যে মাতৃভাষা বাংলা অর্জিত হয়েছে তার গণ্ডি এখন শুধু দেশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। বরং একুশে ফেব্রুয়ারি এবং ভাষা আন্দোলনের চেতনা আজ ছড়িয়ে পড়েছে সর্বত্র। ভাষার জন্য বাঙালি জাতির এ আত্মত্যাগ আজ নতুন করে বিশ্বকে ভাবতে শিখিয়েছে মাতৃভাষার গুরুত্ব সম্পর্কে। ১৭ নভেম্বর ১৯৯৯ জাতিসংঘের শিক্ষা, বিজ্ঞান এবং সাংস্কৃতিক সংস্থা (UNESCO) সাধারণ পরিষদে আমাদের জাতীয় চেতনার ধারক একুশে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। বিশ্বের প্রতিটি প্রান্তের মানুষ আজ বাঙালিদের মাতৃভাষার জন্য আত্মত্যাগের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করেছে। সালাম, বরকত, রফিক, জব্বারের রক্তের বিনিময়ে অর্জিত বাংলা ভাষা আজ যে বৈশ্বিক মর্যাদা লাভ করেছে তা মূলত আমাদের জাতীয় চেতনাবোধের বিজয়। ইউনেস্কোর গৃহীত প্রস্তাবে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালনের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করে বলা হয় যে, 'সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণে ভাষা সবচেয়ে শক্তিশালী হাতিয়ার। মাতৃভাষার প্রচলন কেবল ভাষাগত বৈচিত্র্য এবং বহু ভাষাভিত্তিক শিক্ষাকেই উৎসাহিত করবে না, তা ভাষাগত এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের উন্নয়ন অনুধাবনের ক্ষেত্রে সহায়তা করবে।' বাংলাদেশসহ জাতিসংঘভুক্ত ১৯৩টি দেশ বর্তমানে একুশে ফেব্রুয়ারিকে পালন করছে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে। বাংলা ভাষা ও বাঙালির জন্য এ প্রাপ্তি সহস্র মর্যাদার প্রতীক।

আন্তর্জাতিক ভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে ২১ ফেব্রুয়ারি এবং এর মাধ্যমে আমাদের ভাষা আন্দোলনের চেতনার সাথে সংযোগ ঘটেছে বিশ্বায়ন এবং আন্তর্জাতিকতাবাদের। আমাদের ভাষা আন্দোলন আজ শুধু বাংলাদেশ বা বাঙালি জাতির ভাষা আন্দোলন নয়, বিশ্বের যে জাতিই মায়ের

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



ভাষায় কথা বলার জন্য আন্দোলন করুক না কেন, সেখানে উৎসাহ যোগাবে বাংলা ভাষা প্রতিষ্ঠার আন্দোলন। অমর একুশের আন্তর্জাতিক ভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃতি বয়ে এনেছে অসাধারণ গৌরব। '৫২ থেকে '৭১ -এর মহান মুক্তিযুদ্ধ পর্যন্ত বাঙালি জাতি স্বায়ত্তশাসন, স্বাধিকার ও আত্মনিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার জন্য যে আন্দোলন করেছিল তা আজ আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত। বিশ্বায়নের এ নতুন শতাব্দীতে আমাদের মহান একুশে ফেব্রুয়ারি যোগ করেছে এক নতুন মাত্রা। ২১ ফেব্রুয়ারি আজ উদযাপিত হচ্ছে নতুন আঙ্গিকে, নতুন মাত্রায়, আন্তর্জাতিকতাবাদের সাথে সংশ্লিষ্ট হয়ে। বিশ্বের সকল দেশের কাছে বাংলাদেশ আজ ভাষাভিত্তিক জাতীয় আন্দোলনের মূর্ত প্রতীক।

**উপসংহার :** উপর্যুক্ত আলোচনার মাধ্যমে এ কথা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, পাকিস্তান সৃষ্টির অব্যবহিত পর থেকেই পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী পূর্ব পাকিস্তানকে তাদের উপনিবেশ হিসেবে গড়ে তুলতে সচেষ্ট হন। সে উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যে তারা প্রথমে বাংলা ভাষার ওপরে আঘাত হানে। আর ১৯৫২ সালে রাষ্ট্রভাষার প্রশ্ন নিয়ে বাঙালি জাতি সর্বপ্রথম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে লিপ্ত হয়। ভাষা আন্দোলনের সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ হয়েই বাঙালি জাতি পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর প্রতিটি ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করে দিতে সক্ষম হয়। ১৯৫২ সাল থেকে শুরু করে ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রতিটি স্তরে প্রেরণা যুগিয়েছে ভাষা আন্দোলনের রক্তরাঙা ইতিহাস। ভাষার জন্য বাংলামায়ের সন্তানদের আত্মত্যাগ দেশের গণ্ডি পেরিয়ে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলেও আজ স্বীকৃতি লাভ করেছে। UNESCO কর্তৃক আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা হিসেবে ঘোষিত হওয়ার পর বিশ্বের প্রতিটি প্রান্তে ছড়িয়ে পড়েছে বাঙালি ও বাংলা ভাষার গৌরব। বর্তমানে বিশ্বের প্রায় ৩০ কোটি লোক বাংলা ভাষায় কথা বলে। এ শুধু বাংলা ভাষার বিশ্বায়নই নয়, বরং বাঙালি জাতির বিজয়। আমাদের শহীদদের আত্মত্যাগের ফলেই আজ আমরা গর্ব করতে পারি। ভাষা আন্দোলনের আদর্শকে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে বাস্তবায়িত করতে পারলেই বায়ান্নর শহীদদের আত্মদান সার্থক হবে।

## রচনা ৪১ ভাষা আন্দোলনভিত্তিক বাংলা সাহিত্য

*[২৯তম বিসিএস]*

**ভূমিকা :** জাতির জীবনে এমন কিছু দিন রয়েছে যেগুলো নিজ মহিমায় প্রোজ্জ্বল। এমনি স্মৃতি বিজড়িত মহিমা উজ্জ্বল ও স্মরণীয় একটি দিন একুশে ফেব্রুয়ারি। ভাষার জন্য রক্ত দিতে হয়েছে এমন ঘটনা পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল। বিশ্বে আমরাই একমাত্র জাতি, যারা মাতৃভাষার জন্য জীবন দিয়েছি। বিশ্বে বাংলাই একমাত্র ভাষা, যার প্রতি ভালোবাসা ও মর্যাদাবোধ থেকে একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্ম। মহান একুশে ফেব্রুয়ারির বেদনা, স্মৃতি, আনন্দ ও মহিমা আমাদের বাঙালি চেতনার সঙ্গে মিশে আছে। ১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারি বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসেও একটি স্মরণীয় দিন। মাতৃভাষার গৌরব রক্ষায় কী মহিমাময় আত্মত্যাগই না করেছিল বাংলার দামাল ছেলেরা। বুকের তাজা রক্ত ঢেলে পিচঢালা কালো রাজপথ রক্তে রঞ্জিত করেছিল। সত্যিই এটি ছিল একটি নজিরবিহীন ঘটনা। তাই একুশের চেতনা আমাদের সামগ্রিক জাতীয় চেতনা। সাহিত্য ক্ষেত্রে এ চেতনা ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেছে। আমাদের সাহিত্য ও সংস্কৃতি একুশের চেতনায় সঞ্জীবিত ও সন্দীপ্ত। আমাদের জীবনের গভীরে, অনুভূতির তীক্ষ্ণতায় একুশ এক অপরিমেয় শক্তি, প্রাণের দীপ্ত জাগরণ।



**ভাষা আন্দোলনের প্রেক্ষাপট :** ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন বাঙালির ইতিহাসকে অমর করার পাশাপশি বাংলা সাহিত্যকেও করেছে সমৃদ্ধ। এ ইতিহাস একদিকে আনন্দের, অন্যদিকে অশ্রুসজল। এ দিনের প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের মানুষ নিজের জীবনের বিনিময়ে পাকিস্তানিদের ষড়যন্ত্রের জাল থেকে মায়ের ভাষাকে উদ্ধার করে। কেননা ১৯৪৭ সালে এ উপমহাদেশ থেকে ইংরেজরা বিদায় নিলেও শুরু হয়েছিল পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর শোষণ। প্রথমেই তারা চক্রান্ত করে বাঙালির প্রাণপ্রিয় মাতৃভাষা বাংলাকে নিয়ে। গোটা পাকিস্তানবাসীর মধ্যে শতকরা ৫৮ জন অধিবাসীর মাতৃভাষা ছিল বাংলা। সুতরাং রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবি ছিল তৎকালীন সাত কোটি বাঙালির প্রাণের দাবি। কিন্তু পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠী বাঙালির এ প্রাণের দাবিকে উপেক্ষা করে, এমনকি উর্দুকে রাষ্ট্রভাষারূপে স্বীকৃতি দিয়ে বাঙালির প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ শুরু করে।

১৯৪৮ সালের ২১ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক জনসভায় পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাতা মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ উর্দুকেই পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা বলে ঘোষণা করেন। এর তিন দিন পর ২৪ মার্চ কার্জন হলে অনুষ্ঠিত সমাবর্তন অনুষ্ঠানেও তিনি সে ঘোষণার পুনরাবৃত্তি করেন। পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠীর বাংলা ভাষা নিয়ে এরূপ ষড়যন্ত্রের কারণে তাদের বিরুদ্ধে বাঙালি জাতি প্রথমেই সোচ্চার হয়ে ওঠে। ক্রমে ক্রমে এ আন্দোলন দানা বেঁধে ওঠে এবং ১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারি এক প্রবল বিস্ফোরণে উপনীত হয়। পরিণামে সালাম, বরকত, রফিক, জব্বার ও আরো অনেকেই জীবন দিয়ে মাতৃভাষার মর্যাদা সমুন্নত রাখার প্রয়াস চালায়। এভাবে ক্রমাগত আন্দোলনের ফলশ্রুতিতে বাংলা রাষ্ট্র ভাষার মর্যাদা পায়। কিন্তু একুশ রূপ নেয় এক স্বতন্ত্র মর্যাদায়। একুশ তখন এক সংগ্রামের নাম, একুশ তখন এক চেতনার নাম। কী করে জাতীয় স্বার্থে আত্মাহুতি দিতে হয় তা শিখিয়েছে এ মহান একুশ। একুশের দেখানো সংগ্রামের পথ ধরেই এ দেশে শুরু হয় স্বাধিকার আন্দোলন। শুরু হয় সবরকম অত্যাচার আর শোষণের বিরুদ্ধে বাঙালির সংগ্রামী আন্দোলন। সকল আন্দোলনের পেছনে প্রেরণা দিয়েছে একুশের ভাষা আন্দোলন। একুশের চেতনায় বাঙালি ঐক্যবদ্ধ হয়ে শোষণের বিরুদ্ধে, অত্যাচারের বিরুদ্ধে লড়তে শিখেছে।

**সাহিত্যের উপকরণ হিসেবে ভাষা আন্দোলন :** ১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারি বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এক স্মরণীয় দিন। বাংলার দামাল ছেলেদের আত্মত্যাগেরই ফসল আমাদের রাষ্ট্রভাষা বাংলা। দেশ, দেশের মানুষ কিংবা মাতৃভাষার প্রতি এতবড় আত্মত্যাগের নজির পৃথিবীতে বিরল। তাই একুশের চেতনা আমাদের সামগ্রিক চেতনা, জাতীয় চেতনা। সাহিত্যক্ষেত্রে এ চেতনা ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেছে। আর এ চেতনার মধ্যেই নিহিত আছে আমাদের মুক্তির চেতনা; যার জাগরণে সাহিত্য হয়েছে বিকশিত।

**সাহিত্য সংস্কৃতির প্রেরণাস্বরূপ ভাষা আন্দোলন :** জাতীয় জীবনে একুশে ফেব্রুয়ারির চেতনা দেশের সাহিত্যিক ও সংস্কৃতিবিদদের প্রেরণা দিয়েছে। সৃষ্টিকর্মে আর সাধারণ মানুষকে দিয়েছে সংস্কৃতি সাধনার প্রেরণা। এ দিনটির পর থেকেই বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনা নিয়ে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীর উদ্ভব ঘটে, জন্ম হয় নানা পত্র-পত্রিকার। কবিতা-গল্প, প্রবন্ধ-উপন্যাস-নাটকে স্বাধিকার অর্জন এবং বাংলা ভাষার পঠন-পাঠন ও চর্চার প্রতি আগ্রহ এগিয়ে চলে দ্রুতগতিতে। সাংস্কৃতিক কর্মীরা জনসাধারণের সমর্থন ও অস্তিত্ব সম্পর্কে সচেতন হওয়ায় সংস্কৃতির স্রোতধারা সমাজজীবনে হয়ে ওঠে কল্যাণমুখী। পরাধীনতার

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



বন্ধন ও কুসংস্কারের জালে আবদ্ধ অভিজাত মুসলিম সমাজ প্রচার করল যে, বাংলাভাষা বাঙালি মুসলমানদের মাতৃভাষা নয়। কিন্তু এ হীনম্মন্যতার বিরুদ্ধে ক্ষোভ বাঙালিকে উদ্বুদ্ধ করেছিল নবতর চেতনায়। তাই তারা পরবর্তীকালে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল স্বাধীনতা সংগ্রামে। একুশ আমাদের সাহিত্য ও সংস্কৃতিকে করেছে উজ্জীবিত এবং আলোকবর্তিকা হয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সংস্কৃতির অঙ্গনে।

**বাংলা সাহিত্যে একুশ :** একুশের চেতনার বাস্তব প্রতিফলন ঘটেছে আমাদের বাংলা সাহিত্যের প্রতিটি ক্ষেত্রে। বাঙালি সাহিত্য, সংস্কৃতি ও কৃষ্টির সাথে একুশের চেতনা মিশে আছে একাকার হয়ে। কথাসাহিত্য, নাটক, ছোটগল্প, কবিতা, সংগীতসহ সাহিত্যের প্রতিটি শাখায় এ চেতনাকে তুলে ধরেছেন এ দেশের সচেতন লেখক ও সাহিত্যিকগণ। বায়ান্ন'র একুশে ফেব্রুয়ারি মাতৃভাষার জন্য যেসব তরুণ রক্তের অঞ্জলি দিয়েছিলেন, স্বাধীনতা-উত্তরকালে তা বাংলাদেশের শিল্প-সাহিত্যের ধমনীতে নিত্য সক্রিয় রয়েছে। শামসুর রাহমান, মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ, সিকান্দার আবু জাফর, মুনীর চৌধুরী, আবুল ফজল প্রমুখ কবি-সাহিত্যিকগণ ভাষা আন্দোলনকে কেন্দ্র করে দেশ-কাল-সমাজের সমকালীন প্রজন্মের উপযোগী সাহিত্য নির্মাণে ব্রতী হয়েছেন। বস্তুত ভাষা আন্দোলনের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে এ দেশের সাহিত্যিকগণ রচনা করেছেন অজস্র সাহিত্য। ভাষা আন্দোলনের চেতনা তাদের উজ্জীবিত করেছে সাহিত্য সৃষ্টিতে।

**একুশের নাটক :** একুশের প্রতিফলন বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায় মুনীর চৌধুরীর 'কবর' নাটকে। বায়ান্নর একুশে ফেব্রুয়ারিতে ছাত্ররা ভাষার দাবিতে মিছিল করে মেডিকেল কলেজ হোস্টেলের কাছে এলেই পুলিশের গুলিতে নিরীহ ছাত্রদের মৃত্যু ঘটে। এরপর তাদের লাশ গুম করা, কারফিউর মধ্যে পুলিশ প্রহরায় রাতের অন্ধকারে কবর দেয়া– এসব অমানবিক কর্মকাণ্ডের প্রতিবাদে মুনীর চৌধুরী লেখেন 'কবর' নাটক। 'কবর' নাটকটি শুধু একুশের সাহিত্য নয়, বাংলা সাহিত্যে এটি এক অনন্য সাধারণ সৃষ্টি। একুশে ফেব্রুয়ারির প্রথম বার্ষিকীতে অর্থাৎ ১৯৫৩ সালের একুশে ফেব্রুয়ারিতে রাজবন্দি মুনীর চৌধুরীর লেখা বিখ্যাত 'কবর' নাটকটি ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে প্রথম অভিনীত হয়েছিল রাজবন্দিদের উদ্যোগে। এভাবে একুশের চেতনা বাংলাদেশের নাট্য-আন্দোলনে বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনার ধারাকে পরিব্যাপ্ত করেছিল।

**একুশের গল্প :** একুশের পটভূমিতে যেমন নাটক রচিত হয়েছে, তেমনি রচিত হয়েছে সার্থক ছোটগল্প। শওকত ওসমানের 'মৌন নম্র' গল্পে চলমান বাসের ভেতরে জগদ্দল নীরবতা চুরমার হয়ে যায় ঢাকা থেকে প্রত্যাগত বৃদ্ধের বুকভেদী আর্তনাদে :

*"কি দোষ করেছিল আমার ছেলে? ওরা কেন তাকে গুলী করে মারল ...?"*

বৃদ্ধের জন্য বাসের সকল যাত্রীর সহানুভূতি জাগে। এমনকি বাসের ড্রাইভার এক হাতে স্টিয়ারিং ধরে, অন্য হাত বৃদ্ধের দিকে এগিয়ে দেয়। ভাষা আন্দোলনে পুত্রহারা পিতার জন্য বাসের সকল যাত্রীর যেমন সহানুভূতি তেমনি আন্দোলনে নিহত সকল সন্তানের জন্যে সারা দেশের মানুষের মনে জেগেছে সহানুভূতি। তাই ভাষা আন্দোলন পূর্ব বাংলার মানুষকে ব্যথিত বিচলিত বিক্ষুব্ধ করে তুলেছে। এরই পরিণামে এই আন্দোলন একটি জাতীয় আন্দোলনে রূপ পরিগ্রহ করেছে।

**একুশের ছড়া :** একুশে ফেব্রুয়ারির পটভূমিতে যেমন রচিত হয়েছে গল্প, নাটক তেমনি ছড়া, কবিতা ও গান। সাহিত্যের নানা অঙ্গন সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে।



আবু জাফর ওবায়দুল্লাহর ছড়ায় : খোকা মায়ের কোলে শুয়ে গল্প শুনতে পারবে না। কেননা–

*"মাগো, ওরা বলে,*
*সবার কথা কেড়ে নেবে।"*

খোকা কথার ঝুড়ি নিয়ে বাড়ি ফিরে আসবে। কিন্তু খোকার জীবিত অবস্থার বাড়ি ফিরে আসা হয় না। মা অবলা চোখে তাকিয়ে দেখেন–

*"উঠানে, উঠানে*
*যেখানে খোকার শব*
*শকুনিরা ব্যবচ্ছেদ করে।"*

**একুশের কবিতা :** একুশের প্রথম কবিতা মাহবুব-উল-আলম চৌধুরীর 'কাঁদতে আসিনি, ফাঁসির দাবি নিয়ে এসেছি।' ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারির রক্তাক্ত ঘটনার পরপরই তিনি এ কবিতা রচনা করেন। শামসুর রাহমানের 'স্বাধীনতা তুমি', মোহাম্মদ মনিরুজ্জামানের 'শহীদ স্মরণে', গোলাম মোস্তফার 'একুশে ফেব্রুয়ারি' প্রভৃতি কবিতায় ভাষা আন্দোলনের চেতনার প্রতিফলন ঘটেছে। 'সংগ্রাম চলবেই' কবিতায় সিকান্দার আবু জাফর লিখেছেন–

*"জনতার সংগ্রাম চলবেই*
*আমাদের সংগ্রাম চলবেই।"*

কবির এ সংগ্রাম পাকিস্তানি শোষকদের বিরুদ্ধে অত্যাচারের দৃঢ় প্রতিবাদ। 'স্বাধীনতা তুমি' কবিতায় শামসুর রাহমান একুশের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে লিখেছেন–

*"স্বাধীনতা তুমি*
*শহীদ মিনারে অমর একুশে ফেব্রুয়ারির উজ্জ্বল সভা।"*

শামসুর রাহমান একুশের শহীদদের মধ্যে দেখেছেন মোহাম্মদ, যিশু ও বুদ্ধের বিদীর্ণ হৃদয়। তাদের রক্ত ঝরে ঝরে পড়েছে–

*"সাদা সাদা অসংখ্য দাঁতের কুটিল হিংস্রতায়"*

এক প্রতিক্রিয়াশীল শাসকগোষ্ঠীর আঘাতে বিদীর্ণ হয়েছে ছাত্ররা একুশে ফেব্রুয়ারিতে। সেই প্রতিক্রিয়াশীল শাসক গোষ্ঠীকে কবি তুলনা করেন চেঙ্গিশ, ফারাও, তৈমুরের সাথে।

কিন্তু চেঙ্গিসের তরবারির হিংস্রতা, ফারাওয়ের বীভৎসতা আর তৈমুরের রক্তনেশার মধ্যে বাংলা ভাষার অস্তিত্ব বিলীন হতে পারে না। যুগে-যুগে বাংলা ভাষা রাষ্ট্রভাষার মর্যাদায় আসীন হয়েছে।

সিকান্দার আবু জাফর উপলব্ধি করেছেন : একুশে ফেব্রুয়ারিতে ভাষার প্রশ্নে পূর্ব বাংলার সকল মানুষ এক সত্তা ও এক অস্তিত্ব লাভ করেছে। একুশের মধ্যে কবি লক্ষ্য করেছেন :

*"একটি মহৎ জন জাগৃতি*
*একটি সবল জীবন-চেতনা"*

**একুশের উপন্যাস :** একুশের উপন্যাস সীমিত। তবে একুশের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য উপন্যাস জহির রায়হানের 'আরেক ফাল্গুন', শওকত ওসমানের 'আর্তনাদ', সেলিনা হোসেনের 'নিরন্তর ঘণ্টাধ্বনি'। ১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারির সংগ্রামী প্রেরণা কতটা জীবনায় রূপ ধারণ করতে পারে, তার সার্থক দৃষ্টান্ত জহির রায়হানের 'আরেক ফাল্গুন'।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



**একুশের সংগীত :** একুশ নিয়ে যেমন কবিতা তেমনি সংগীত রচিত হয়েছে। একুশের সংগীত রচনা করেছেন জসীমউদ্দীন, আবদুল লতিফ, তোফাজ্জল হোসেন, আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী।

একুশের সংগীত রচনা করতে গিয়ে জসীমউদ্দীন নির্ভয়ের ও আশার বাণী শুনিয়েছেন :

*"জাগিছে প্রভাত উজ্জ্বলতম*
*চরণে দলিত মহা নির্মম আঁধার লভিছে ক্ষয়*
*ভয় নাই নাহি ভয়।"*

পূর্ব বাংলার মানুষ আঁধার রাত্রি অতিক্রম করে উজ্জ্বল প্রভাতে এসে পৌঁছেছে।

একুশে ফেব্রুয়ারির পটভূমিতে আবদুল লতিফ জাগরণী সংগীত শুনিয়েছেন : 'বাংলা বিনে গতি নাই'। আবদুল লতিফের কথায় 'বাংলা বিনে গতি নাই' এ উপলব্ধি থেকে একুশের আন্দোলন এবং এ আন্দোলনের পরিণামে ঘটে বাংলার মানুষের আত্মপ্রতিষ্ঠা এবং একটি ভাষাভিত্তিক সার্বভৌম রাষ্ট্রলাভ।

একুশ নিয়ে অমর সংগীত রচনা করেছে আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী :

*"আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি*
*আমি কি ভুলিতে পারি।"*

**চলচ্চিত্রে একুশ :** উর্দু ও হিন্দি চলচ্চিত্রের যুগে একুশ বাংলা চলচ্চিত্র নির্মাণে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছিল। সরাসরি একুশের চেতনা নিয়ে জহির রায়হান ১৯৭০ সালে নির্মাণ করেছিলেন 'জীবন থেকে নেয়া' চলচ্চিত্রটি।

**চিত্রকলায় একুশ :** আমাদের সাহিত্যের শিল্পরূপ চিত্রকলা ও ভাস্কর্য। এ শিল্পেও একুশের অবদান অপরিসীম। শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন, কামরুল হাসান, আবদুর রাজ্জাক, হামিদুজ্জামান প্রমুখের আঁকা ছবি ও ভাস্কর্য একুশের চেতনাকে করেছে মূর্তমান।

**একুশের চেতনা ও জাতিসত্তার স্বরূপ :** আমাদের জাতিসত্তার স্বরূপ আবিষ্কারেও একুশের অবদান অসামান্য। আমরা জেনেছি আমরা বাঙালি। জেনেছি বাংলা ভাষা আমাদের অস্তিত্বের অঙ্গীকার। বাংলাদেশ আমাদের দেশ। একুশের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়েই আমরা বাষট্টি, ছেষট্টি, উনসত্তর ও একাত্তরে আমাদের আত্মপরিচয়, আমাদের ঠিকানা ও দেশমাতৃকার মুক্তির জন্যে লড়াই করেছি। একুশের পথ ধরেই এসেছে স্বাধীনতা।

**বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র মোকাবিলায় একুশের চেতনা :** একুশের ভাষা আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলা ভাষা স্বীকৃতি পেলেও পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী বাংলা ভাষার বিরুদ্ধে তাদের চক্রান্ত অব্যাহত রাখে। পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে বাংলা ভাষার বিকৃতি ঘটানোর জন্য তারা নানা অপপ্রয়াস চালায়। তাদের চেষ্টা ছিল বাংলা ও উর্দু মিলে একটা ভাষা তৈরি করা, বাংলা বর্ণমালা তুলে দিয়ে রোমান হরফে বাংলা প্রবর্তন করা ইত্যাদি। পাকিস্তানি আমলে বাংলা সাহিত্যকে জোর করে পাকিস্তানিকরণের চেষ্টাও কম হয়নি। রবীন্দ্রনাথকে বর্জনের ষড়যন্ত্র, রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপনে বাধা প্রদান, রবীন্দ্র সংগীত নিষিদ্ধকরণের অপচেষ্টা ও নজরুলের রচনাকে আংশিক বা খণ্ডিতভাবে গ্রহণ ছিল তাদের হীন তৎপরতার অঙ্গ। এসব হীন তৎপরতার বিরুদ্ধে আন্দোলনের প্রেরণা জুগিয়েছে একুশ। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের হাজার বছরের ঐতিহ্য রক্ষার আন্দোলনে একুশ এক অনির্বাণ চেতনা।



**উপসংহার :** বাংলাদেশের মানুষ একুশে ফেব্রুয়ারির আত্মত্যাগ থেকে যে অনুপ্রেরণা লাভ করেছে সাহিত্যক্ষেত্রে তার ব্যাপক প্রতিফলন হলেও তা দেশের সর্বত্র অনুসৃত হচ্ছে না। শঠতার রাজনীতি, দালালচক্রের সংস্কৃতিপরায়ণ মনোভাব একুশের পবিত্রতাকে অনেকাংশে ম্লান করে দিচ্ছে। বর্তমান প্রজন্মের কাছে একুশের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করার দায়িত্ব যাদের তারাও সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছেন। এমতাবস্থায় নতুন প্রজন্মকে একুশের সঠিক ইতিহাস শোনাতে হবে, একুশের চেতনায় তাদের উদ্বুদ্ধ করতে হবে। একুশের চেতনাকে জাতির সর্বময় কল্যাণে বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যে আমাদের চিরদিন স্মরণ রাখতে হবে।

*"আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি*
*আমি কি ভুলতে পারি?"*

## রচনা ৪২ মুক্তিযুদ্ধ ও বাংলা সাহিত্য

**ভূমিকা :** আধুনিক বাংলা সাহিত্য ভাষা আন্দোলনে যতটা আলোড়িত হয়েছিল, মুক্তিযুদ্ধে তার চেয়ে বেশি আন্দোলিত হয়েছে। কেননা মুক্তিযুদ্ধের সময় মানুষের মধ্যে যে জাতীয়তাবাদী চেতনা, স্বদেশপ্রেম ও মানবতাবাদী আবেগের স্ফুরণ ঘটেছিল তা প্রকাশ পায় বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন অঙ্গনে। মোটকথা, মুক্তিযুদ্ধ অনুষঙ্গটি বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে বিভিন্নভাবে। এর মাধ্যমে সাহিত্যের ভাব, ভাষা, প্রকাশভঙ্গি আমূল পরিবর্তিত হয়েছে; বাংলা সাহিত্যে যোগ হয়েছে নতুন মাত্রা।

**মুক্তিযুদ্ধের চেতনাসমৃদ্ধ কবি/সাহিত্যিক :** মুক্তিযুদ্ধের চেতনাসমৃদ্ধ বাংলাদেশের কবি ও সাহিত্যিকদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন হাসান হাফিজুর রহমান। তার সম্পাদিত 'বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস ও দলিলপত্র' গ্রন্থটি ১৬ খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে। তার এ গ্রন্থটি আমাদের মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলোর অনুপুঙ্খ বিবরণ উপস্থাপন করে। বিশিষ্ট কবি-সাহিত্যিকদের মধ্যে যাদের বিভিন্ন লেখায় মুক্তিযুদ্ধের চেতনা প্রতিফলিত হয়েছে তাদের মধ্যে শামসুর রাহমান, এম আর আখতার মুকুল, আব্দুল গাফফার চৌধুরী, আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, জাহানারা ইমাম, সেলিনা হোসেন, শওকত ওসমান, সৈয়দ শামসুল হক, বদরুদ্দিন উমর প্রমুখ উল্লেখযোগ্য।

**মুক্তিযুদ্ধ ও বাংলা সাহিত্য :** ১৯৭১ সালে বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে এদেশের বিভিন্ন কবি, সাহিত্যিক, ঔপন্যাসিক, নাট্যকার, কবিতা, উপন্যাস ও নাটক লিখে মুক্তিযুদ্ধে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছেন। শুধু মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ই নয়, মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী সময়েও মুক্তিযুদ্ধকে কেন্দ্র করে রচিত হয়েছে নানা কবিতা, উপন্যাস, নাটক, গল্প, প্রবন্ধ ইত্যাদি। মুক্তিযুদ্ধকে কেন্দ্র করে বাংলা সাহিত্যের যেসকল দিক মুখরিত হয়েছে তা নিম্নে আলোচনা করা হলো :

১. **কবিতা :** মুক্তিযুদ্ধের অব্যবহিত পরে 'হে স্বদেশ' (১৩৭৮) এবং 'উত্তরণে অমরত্ব' (১৯৮২) নামক দুটি কবিতা সংকলন প্রকাশিত হয়। দুটি সংকলনেই মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক কবিতা প্রাধান্য পেয়েছে। এরপর প্রকাশিত হয় 'মুক্তিযুদ্ধের কবিতা' (১৯৮৪) এবং 'মুক্তিযুদ্ধের নির্বাচিত কবিতা' (১৯৮৭)। এসব সংকলনের কবিতাগুলো বিশ্লেষণ করলে যে বিষয়গুলো চোখে পড়ে তা হলো :

ক. অবরুদ্ধ বাংলাদেশের ভীতি, শঙ্কা ও মৃত্যুর মধ্য দিয়ে জীবন ও যুদ্ধকে অবলোকন।

খ. যুদ্ধক্ষেত্রে শঙ্কা ও ভীতির মধ্য দিয়ে সহযোদ্ধার মৃত্যু ও শত্রুহননের উল্লাস এবং বিজয়ের স্বপ্ন নিয়ে লেখা কবিতা।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



গ. সাধারণভাবে মুক্তিযুদ্ধ জনতার সংগ্রামের উদ্দীপনা, শোষণ ও নীপিড়নের বিরুদ্ধে সহিংস প্রতিবাদের উচ্চারণ।

ঘ. যুদ্ধ-পরবর্তীকালে রচিত যুদ্ধের স্মৃতিচারণ, ধ্বংসস্তূপের মধ্যে ঘরে ফেরার আনন্দ ও স্বজন হারানোর বেদনা ইত্যাদি।

**মুক্তিযুদ্ধের চেতনাসমৃদ্ধ কবি ও কবিতা :** মুক্তিযুদ্ধের চেতনায়সমৃদ্ধ হয়ে অনেক কবি জ্বালাময়ী কবিতা রচনা করেছেন। নিচে এরূপ কিছু কবি ও তাদের কবিতা উল্লেখ করা হলো :

ক. **জসীমউদ্দীন :** মুক্তিযুদ্ধের কবিতা আলোচনার ক্ষেত্রে প্রথমেই আসেন পল্লীকবি জসীমউদ্দীন। ১৯৭১ সালের ২ মে ধ্বংসযজ্ঞ শুরুর পরপরই তিনি লিখেছেন 'দগ্ধগ্রাম' ও 'মুক্তিযোদ্ধা' কবিতা। তিনি সহজ সরল ভাষায় লিখেছেন পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর অত্যাচারের নগ্ন ইতিহাস—

"মার কোল হতে শিশুরে কাড়িয়া কাটিল যে খান খান
পিতার সামনে মেয়েরে কাটিয়া করিল রক্তস্নান।"

যুদ্ধের মাঝামাঝি সময়ে বাংলাদেশে অবরুদ্ধ বয়ঃবৃদ্ধ কবি যেন মানসিকভাবে মুক্তিযোদ্ধায় পরিণত হয়েছেন—

"আমি একজন মুক্তিযোদ্ধা, মৃত্যু পিছনে আগে
ভয়াল বিশাল নখর মেলিয়া দিবস রজনী জাগি।"

খ. **সুফিয়া কামাল :** ১৯৭১ সালের ২ মার্চ সোনার বাংলা খচিত পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে মানুষের যে চেতনার প্রতিফলন ঘটেছিল, বাঙালি জাতীয় চেতনার যে ঐক্য সংগঠিত হয়েছিল তার প্রকাশ যেসব কবির কবিতায় ফুটে উঠেছে তার মধ্যে সুফিয়া কামাল অন্যতম। বেগম সুফিয়া কামাল তার 'প্রথম শহীদ বাংলাদেশের মেয়ে' কবিতায় এ চেতনার প্রকাশ ঘটিয়েছেন। বাংলাদেশকে পাক হানাদার মুক্ত করার দীপ্ত শপথ নিয়ে যে নারী, পুরুষ, শিশু, বৃদ্ধ নির্বিশেষে ত্যাগ স্বীকার করেছিল, সবাই প্রাণ বিসর্জনে প্রস্তুত হয়েছিল, তার প্রকাশ ঘটেছে কবি বেগম সুফিয়া কামালের কবিতায়।

গ. **আবুল হোসেন :** বাংলাদেশের আধুনিক কবিদের মধ্যে অগ্রজ আবুল হোসেন 'পুত্রদের প্রতি' কবিতায় এক বাঁশিওয়ালার কথা বলেছেন, হ্যামিলনের বাঁশিওয়ালার মতো যিনি সব ছেলেদের ঘরছাড়া করবেন, যারা আর ফিরবে না, যাদের মুখ আর দেখা যাবে না। স্বাধীনতা আর মুক্তির জন্য একটি পুরো প্রজন্ম ঘড়ছাড়া হলো। কেউ তাদের সেদিন ধরে রাখতে পারেনি ঘরে।

ঘ. **শামসুর রাহমান :** একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের শ্বাসরুদ্ধকর, ভয়াবহ বন্দীদশা তথা মুক্তিযুদ্ধে মানুষের একাত্মতা সবচেয়ে প্রবলভাবে প্রকাশ পেয়েছে শামসুর রাহমানের কবিতায়। মুক্তিযুদ্ধের সময় রচিত 'বন্দী শিবির থেকে' কাব্যের কবিতায় অবরুদ্ধ ঢাকার চিত্রকল্প চমৎকারভাবে ফুটে উঠেছে—

"এ বন্দী শিবিরে
মাথা খুঁড়ে মরলেও পারি না করতে উচ্চারণ
মনের মতন শব্দ কোনো।
মনের মতন সব কবিতা লেখার
অধিকার ওরা
করেছে হরণ।"



২. **মুক্তিযুদ্ধের চেতনাসমৃদ্ধ ঔপন্যাসিক ও উপন্যাস :** মুক্তিযুদ্ধের চেতনার উপর নির্ভর করে বাংলা সাহিত্যে অনেক উপন্যাস রচিত হয়েছে। নিম্নে উল্লেখযোগ্য ঔপন্যাসিকের কিছু মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক উপন্যাস সম্পর্কে আলোচনা করা হলো :

ক. **রাইফেল রোটি আওরাত :** শহীদ অধ্যাপক আনোয়ার পাশার 'রাইফেল রোটি আওরাত' মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক উপন্যাসসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সংযোজন। এ দেশের ইতিহাসের এক দুঃসহ ও নৃশংসতম অধ্যায়ের বিশ্বস্ত দলিল এই উপন্যাসটি। এ শুধু একাত্তরের বাংলাদেশের হাহাকারের চিত্র নয়, তার দীপ্ত যৌবনেরও এক প্রতিচ্ছবি। এ গ্রন্থের নায়ক সুদীপ্ত শাহীন বাংলাদেশ আর বাঙালির আশা আকাঙ্ক্ষা, সংকল্প প্রত্যয় আর স্বপ্ন কল্পনারই যেন প্রতীক। একাত্তরের মার্চের সে ভয়াবহ কটা দিন আর এপ্রিলের প্রথমার্ধের কালো দিনগুলোর মর্মান্তিক অভিজ্ঞতার সংকীর্ণ পরিধি টুকুতেই এ বইয়ের ঘটনাপ্রবাহ সীমিত, কিন্তু এর আবেদন আর দিগন্ত দুঃখ এ সময়সীমার আগেও বহুদূর বিস্তৃত। বাঙালির বেদনা আর আশা-নিরাশার এ এমন এক শিল্পরূপ যা সব সময় সীমাকে ডিঙ্গিয়ে এক দীর্ঘস্থায়ী অপরূপ সাহিত্য কর্ম হয়ে উঠেছে। এটি তার শেষ বই। জীবনের শেষ বই প্রত্যক্ষ আর সাক্ষাৎ ঘটনাবলীকে তিনি উপন্যাসে রূপ দিয়েছেন এ গ্রন্থে। ঢাকায় বিশেষ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অঞ্চলে, যে বিশ্ববিদ্যালয় এ দেশের সব প্রগতি আন্দোলনের উৎস তার উপর পাক হানাদারের বর্বর আক্রমণ আর তাদের অমানুষিক তাণ্ডবলীলার এমন নিখুত ছবি, এমন শিল্পোত্তীর্ণ রচনা আর কোথাও দেখেছি বলে মনে পড়ে না। ইতিহাসের দিক দিয়েও এ বইয়ের মূল্য অপরসীম।

"ফ্ল্যাশব্যাক রীতিনির্ভর রাইফেল রোটি আওরাত-এর ভাষা শ্লেষাত্মক, প্রশ্ননির্ভর বিশ্লেষণধর্মী। নির্লিপ্ত, নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টিচেতনা দিয়ে লেখক প্রতিটি চরিত্র, পরিবেশ চিত্রিত করেছেন। সর্বত্র অনুসন্ধিৎসা আছে। ভাবাবেগের প্রাবল্য নেই, চরিত্র-পরিবেশ-ভাষা সর্বত্র এক সংহত, সংযত নির্লিপ্ত শিল্পীমনেরই যেন উৎসারণ।" চোখের সামনে ঘটা টাটকা ঘটনাবলির উত্তাপ তার শিল্প সত্তাকে কেন্দ্রচ্যুত করেনি কোথাও। লেখকের জন্য এর চেয়ে প্রশংসার কথা আর হতে পারে না।

খ. **দুই সৈনিক :** আমাদের জাতীয় চরিত্রের কলঙ্কময় দিক শওকত ওসমান তার দুই সৈনিক উপন্যাসে অঙ্কিত করেছেন। সেই স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় কিভাবে আমাদেরই আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে কেউ কেউ কত অযাচিতভাবে পাক মিলিটারির সহায়তা করতে এগিয়ে গিয়েছিল এবং অবশেষে নিজেদের এবং প্রিয়জনদের জীবনে দুর্ভোগ ও করুণ পরিণতি নেমে এসেছিল তার একটি চিত্র তিনি অঙ্কন করেছেন দুই সৈনিক উপন্যাসে।

গ. **নেকড়ে অরণ্য :** শওকত ওসমানের মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক আরেকটি উপন্যাস 'নেকড়ে অরণ্য' নির্বাসিত রমণীদের বোবা কান্নায় মুখর। একটা গুদাম ঘর শৃঙ্খলিত বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করছে। গুদাম ঘরের মধ্যে যেসব নারী আছে তারা অপমানিতা, নির্যাতিতা, ধর্ষিতা এবং সেই সূত্রে হিন্দু-মুসলমান শিক্ষিত-অশিক্ষিত গ্রামীণ ও নাগরিক রমণীদের মধ্যে একটা ঐক্য ও সাম্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। রুচি, সংস্কৃতি ও ভাষার ব্যবধান দূর হয়ে একটি গভীর মমত্ববোধ পরা সবাই পরস্পরের কাছাকাছি এসেছিল। সকলের কাছে একটা দুঃখই পাহাড়। তারই ভার সকলে বহনরতা। তাই একে অপরের কাছাকাছি হওয়ার ব্যগ্রতা অপরিসীম।

ঘ. **অবেলায় অসময় :** আমজাদ হোসেনের 'অবেলায় অসময়' উপন্যাসের স্থান আকর্ষণীয়, একটি চলমান নৌকা বাংলাদেশের মিলন তীর্থ। মিলিটারির আক্রমণের ভয় নৌকাটির ভেতরে বড়ুয়া, ব্যানার্জী, জনসন, জসিমুদ্দি, কিশিত, টুপী, নামাবলী সবই আছে। কিন্তু এরা সব জাত ধর্ম এ নদীর জলে ধুয়ে ফেলেছে। সব এখন মানুষ।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



আলী মাঝির দার্শনিক উপলব্ধি– 'সুখের সময় যত জাত ধর্মের বাহাদুরী, মারামারি, খুনোখুনি। আজকে আমার এ নৌকার ভিতরে যেমন এক জাতের মানুষ, সারাজীবন এইভাবে বসবাস করলেই তো আর গাল গালাজ হয় না।'

স্মৃতিচারণের মধ্য দিয়ে খণ্ড খণ্ড কাহিনী ফ্ল্যাশব্যাক রীতিতে এগিয়ে চলছে। আলী মাঝি ও ফাতেমা, আদম ও হাওয়া, কাসেম ও সকিনা সমান মর্যাদা অর্জন করেছে। জুটির নাম নির্বাচনে আমজাদ হোসেনের ইতিহাস চেতনা কাজ করছে। বর্ণনার ভাষায় ঋজুতা, স্বাচ্ছন্দ্য ফুটে উঠেছে।

ঙ. **হাঙ্গর নদী গ্রেনেড :** সেলিনা হোসেনের 'হাঙ্গর নদী গ্রেনেড' উপন্যাসের নামকরণ এবং বিষয় বস্তুতে প্রতীকী ব্যঞ্জনার প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। হাঙ্গর আক্রমণকারী মিলিটারি, নদী-বুড়ী-তথা বাংলাদেশের নিস্তরাদ জীবন এবং গ্রেনেড মুক্তিযোদ্ধা।

সর্বমোট বিরানব্বই পৃষ্ঠার উপন্যাসটির চুয়াল্লিশ পৃষ্ঠা পর্যন্ত প্রধান চরিত্র বুড়ীর জীবন, তার কৈশোর, যৌবন, বিবাহ, সন্তানহীনতা, সন্তানপ্রাপ্তি, স্বামীর মৃত্যু, সতীনের বড় ছেলের বিয়ে, দাদী হওয়া ইত্যাদি যেন হাজার বছরের বাংলাদেশের নিস্তরাদ এক ঘেয়ে বৈচিত্রহীন শান্তনদীর মত প্রবাহিত জীবনের বর্ণনা রয়েছে। হাজার বছরের বাংলাদেশের নয় মাস সংক্ষিপ্ত অথচ ব্যতিক্রমী। নয় মাসের প্রথম পর্যায় পাকবাহিনী আক্রমণকারী হাঙ্গর এবং দ্বিতীয় পর্যায় প্রতি আক্রমণকারী মুক্তিযোদ্ধা গ্রেনেড। তাই হাঙ্গর ও গ্রেনেড উপন্যাসটির অর্ধেক জায়গা মাত্র জুড়েছে। হাজার বছরের নদীমাতৃক বাংলাদেশের হাঙ্গর ও গ্রেনেডের অবস্থান সংক্ষিপ্ত এবং ব্যতিক্রমী। তাই ইচ্ছে করেই হয়ত সেলিনা হোসেন তিন শব্দের নামকরণের যে সমন্বয় সাধন করেছেন তাকে সমান গুরুত্ব দিয়ে সমান জায়গা করে দেননি। সেলিনা হোসেনের বর্ণনা আন্তরিক, জীবন্ত এবং তীক্ষ্ম। ভাষা সরল বাক্য তীর্যক। সর্বত্র ঔচিত্যবোধের ছাপ বর্তমান।

চ. **যাত্রা :** শওকত আলীর 'যাত্রা' ২৭ মার্চ থেকে ৩ এপ্রিলের জিঞ্জিরা সৈয়দপুরের ঘটনা ধারণ করেছে। 'যাত্রা'র প্রথমেই বুড়িগঙ্গায় 'হুড়োহুড়ি পাড়াপাড়ি করে নৌকায় ওঠা' পলায়নপর জনস্রোতের ঢাকা থেকে জিঞ্জিরা হয়ে উদ্দেশ্যবিহীন ছুটে চলার মর্মান্তিক দৃশ্য বিবৃত হয়েছে। হাজার হাজার ভয়তাড়িত রাতজাগা, ক্লান্ত মানুষগুলোর একই চিন্তা এখন দূরে চলে যাওয়া। শহর থেকে শুধু চলে যাওয়া যেখানে হোক, ঠিকানাবিহীন হোক শুধু হেটে চলা। এক নদী পার হয়ে আরেক নদী। যেন বা বাংলাদেশের বুকের ভিতরে চলে যাচ্ছে মানুষ শত্রুর হাত যেন পৌছতে না পারে, মৃত্যুর হিংস্র থাবার বাইরে যেন চলে যাওয়া যায়।

সেদিন পলায়নপর মানুষের কোনো স্বতন্ত্র পরিচিতি ছিল না, সেদিন 'সবাই একসঙ্গে হাটে, তারপর লীলা-মঞ্জু-সাকিনা, হাসান, বাচ্চারা বিনু, রায়হান যেন একটি পরিবার।' এখানে পঙ্গু, অসুস্থ হাসানের জন্য সেবা করতো বিনু প্রফেসর পত্নী, এখানে লীলা অপেক্ষা করে হাসানের জন্য যোশেফ ফার্নান্দেজ ধরে রাখে হাসানকে, রায়হানের টাকার জন্য ঢাকার দিকে রওয়ানা দেয় রাতের আধারে। পলায়নটা সেদিন সত্য ছিল, অপরিহার্য ছিল। তবু তারও মধ্যে আনিসের মতো লোকেরা দেখেছে প্রতিরোধের লক্ষণ। 'এই অবস্থাতেই প্রতিরোধ গড়ে উঠবে কেউ চাক বা না চাক তবু প্রতিরোধ হবে।'

ছ. **সৌরভ ও আগুনের পরশমণি :** উপন্যাস দুটোতে কাহিনীগত ঐক্য আছে। সৌরভ, কাদের, রফিক মুক্তিযুদ্ধে ট্রেনিংয়ে যায় আগরতলায় আর আগুনের পরশমণিতে আলম, সাদেক, গৌরাঙ্গ ট্রেনিং শেষে ঢাকায় যুদ্ধ করতে আসে। যুদ্ধের সময়ে বাঙালিদের স্বাধীনতাকামী মনোভাব প্রেম ও দ্রোহের নিরিখে এখানে দেখানো হয়েছে।



জ. **নির্বাসন :** হুমায়ূন আহমেদের নির্বাসন পঙ্গু মুক্তিযোদ্ধাকে নিয়ে লিখিত। কথা ছিল জরীর সাথে আনিসের বিয়ে হবে। কিন্তু স্বাধীনতা যুদ্ধে পাক বাহিনীর হাতে আনিস গুলিবিদ্ধ হলে তার নিম্নাঙ্গ অবশ হয়ে যায়। চিকিৎসা চলে দীর্ঘদিন। কিন্তু রোগ মুক্তির কোনো লক্ষণ নেই। একটি ধূসর বিবর্ণ রিক্ত অন্ধকার সময় আনিসকে ঘিরে ফেলে। জরীর বিয়ে হয়ে যায় অন্য ছেলের সাথে। বরযাত্রীরা তৈরি হয়েছে বিদায় নিতে। সবাই জরীকে ধরাধরী করে উঠানে নিয়ে এলো। আনিস জানালা দিয়ে নিচে তাকিয়ে আছে। গভীর বিষাদে আনিসের চোখে জল এল। যে জীবন কোয়েলের, দোয়েলের, ফড়িংয়ের মানুষের সাথে তার কোনো কালেই দেখা হয় না। একটি বেদনাময় অনুসরণের মধ্যে কাহিনী শেষ হয়েছে।

৩. **মুক্তিযুদ্ধের চেতনাসমৃদ্ধ নাটক ও নাট্যকার :** মুক্তিযুদ্ধের চেতনাসমৃদ্ধ নাটকসমূহের মধ্যে সৈয়দ শামসুল হকের 'পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়' নাটকটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এটি মুক্তিযুদ্ধকে অবলম্বন করে লেখা তার সবচেয়ে সার্থক ও মঞ্চসফল নাটক। লেখক এটি কাব্যনাট্যের আঙ্গিকে লিখেছেন। উত্তর বাংলার আঞ্চলিক শব্দের নিপুণ ব্যবহার রয়েছে এ নাটকে। গতিশীল ভাষার ব্যবহারের মধ্য দিয়ে যুদ্ধকালীন বাস্তবতার কুশলী প্রয়োগ ঘটেছে এ নাটকে। যুদ্ধ শেষে মুক্তিবাহিনীর গ্রামে প্রবেশের সময়কার ঘটনা, বাঙালির দেশপ্রেম, দেশের শত্রুর প্রতি প্রবল ঘৃণা এবং আক্রোশের সাথে বাঙালির সাংস্কৃতিক জীবনের চিত্র রূপায়িত হয়েছে এ নাটকে।

**পরিশেষ :** পরিশেষে বলা যায়, সমসাময়িক বিশাল ঘটনা মুক্তিযুদ্ধ বাংলা সাহিত্যকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করেছে। এর মাধ্যমে বাংলা সাহিত্যে এসেছে নানান নতুন শব্দ, নির্মাণ শৈলী এবং প্রকাশভঙ্গি। যদিও এসব সাহিত্যকর্ম সম্পূর্ণতা অর্জন করেনি তথাপি মুক্তিযুদ্ধের ব্যাপকতা প্রকাশে যেসব খণ্ডচিত্র প্রকাশ পেয়েছে তা আগামী প্রজন্মকে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস জানতে সাহায্য করবে। সুতরাং বাংলা সাহিত্যে মুক্তিযুদ্ধের প্রভাব অপরিসীম।

## রচনা ৪৩ মুক্তিযুদ্ধ ও বাংলাদেশের উপন্যাস

**ভূমিকা :** মুক্তিযুদ্ধ অনুষঙ্গটি বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে বিভিন্নভাবে। এর মাধ্যমে সাহিত্যের ভাব, ভাষা, প্রকাশভঙ্গি আমূল পরিবর্তিত হয়েছে; বাংলা সাহিত্যে যোগ হয়েছে নতুন মাত্রা। স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলা উপন্যাসের ভূখণ্ডে মুক্তিযুদ্ধ বিশাল এলাকা জুড়ে পরিব্যাপ্ত। মুক্তিযুদ্ধের পটভূমি, যুদ্ধ প্রস্তুতি, যোদ্ধার ভূমিকা, বর্বর বাহিনীর নৃশংসতা, অবরুদ্ধ বাংলাদেশের নারী-পুরুষের মানসিকতা পাক বাহিনীর প্রতিরোধ সংগ্রাম এবং বিজয় এই ঐতিহাসিক দলিল চিত্র অঙ্কন করতে শক্তিমত্ত হাত নিয়ে এগিয়ে এসেছিলেন কয়েকজন প্রবীণ ও তরুণ ঔপন্যাসিক। দেশ, জাতি ও মানুষের বিপর্যয় মুহূর্তের চিত্র অঙ্কন করতে গিয়ে ঐতিহাসিক, সামাজিক দায়িত্ব যেমন তারা পালন করেছেন, তেমনি ভবিষ্যৎ সম্ভাবনারোজ্জ্বল ভূ-খণ্ডের বর্ণাঢ্য চিত্র রচনা করেছেন এবং সর্বত্র বাস্তব জীবনবোধের স্বাক্ষর রেখেছেন।

**চেতনায় স্বাধীনতা :** বাংলাদেশের ইতিহাসে ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন এবং ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা সংগ্রাম দুটি গৌরবজনক অধ্যায়ই শুধু নয়, যে কোনো অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ হওয়ারও অনুপ্রেরক তীর্থতিথি। তাই একুশে ফেব্রুয়ারি অথবা ২৬ মার্চ কিংবা ১৬ ডিসেম্বরে আমরা প্রতি বছর অভিষিক্ত হই।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



**বাংলা উপন্যাসের সূচনাকালে স্বাধীনতা :** বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে বাংলা উপন্যাসের জনক বলা হয়। এর একটি কারণ তিনি বিষয় হিসেবে বিভিন্ন কিছুকে উপন্যাসে আনয়ন করেছেন। স্বাধীনতাস্পৃহা পরাধীন ভারতবর্ষের উপন্যাসে তিনিই প্রথম প্রকাশ করেছিলেন। তার 'আনন্দমঠ' উপন্যাসে প্রথম ব্যক্ত হয় ভারতীয়দের স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা। এর পর বাংলা ভাষার প্রধান ঔপন্যাসিকগণ এই বিষয়কে উপন্যাস কেন্দ্রে স্থাপন করেছেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'গোরা' ও 'ঘরে-বাইরে' উপন্যাসে ভিন্ন মাত্রায় হলেও রাজনীতি ও স্বাধীনতা স্থাপন স্পৃহার কথা আছে। শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবী'তে তিনি তো স্বাধীনতার দাবিই তুললেন মূলত। আর নজরুলের 'মৃত্যুক্ষুধা'য় আছে শোষিত ভারতবাসীর স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা। অর্থাৎ উপন্যাসে স্বাধীনতার ব্যাপারটি এসেছে প্রথম থেকেই এবং নানা মাত্রায়।

**স্বাধীনতা স্পৃহা ও ১৯৭১-এর পূর্বকাল :** ১৯৭১ সালে সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে দেশ স্বাধীন হবার অব্যবহিত পূর্বে নানা সংগ্রাম ও আন্দোলনের মাধ্যমে বাংলাদেশের স্বাধীনতার পক্ষে দেশের মানুষের সহানুভূতি জাগ্রত হয়। উপন্যাস শিল্পীগণ সেই উত্তাল দিনগুলোতে অগ্রবর্তী চিন্তার পথিকৃতের মতো উপন্যাসে স্বাধীনতার কথা ব্যক্ত করেন। যদিও ১৯৫৮ সালে আইয়ুব খান সামরিক আইন জারি করেন এবং এতে নানা প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয় তবু সাহিত্য শিল্পীগণ বিভিন্ন কৌশলে স্বাধীনতার কথা সাহিত্যের অন্যান্য মাধ্যমের মতো উপন্যাসেও প্রকাশ করেন। এ প্রসঙ্গে আবুল ফজলের 'রাঙ্গা প্রভাত' (১৯৫৭), শওকত ওসমানের 'ক্রীতদাসের হাসি' (১৯৬২), সত্যেন সেনের 'বিদ্রোহী কৈবর্ত' (১৯৬৯), আনোয়ার পাশার 'নীড় সন্ধানী' (১৯৬৮), ইন্দু সাহার 'কিষাণ' (১৯৬৯) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এসব উপন্যাসে কখনো পরোক্ষভাবে কখনো প্রতীক বা রূপকের আড়ালে স্বাধীনতার কথা ব্যক্ত হয়েছে।

**মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক বিভিন্ন উপন্যাস :** বিভিন্ন বাংলা উপন্যাসে স্বাধীনতার আকৃতি বা আকাঙ্ক্ষা প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু ১৯৭১ সালে যুদ্ধের ফলে অর্জিত প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা বিশেষ করে যুদ্ধের ভয়াবহতা, লোক হত্যা, নারী ধর্ষণ ও নির্যাতন, যুদ্ধের পক্ষে জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ, কারো কারো যুদ্ধের বিরোধীতা ইত্যাদি নানা বিষয় উঠে এল উপন্যাসে। এসব উপন্যাসে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা প্রত্যক্ষভাবে কার্যকর এবং যুদ্ধের অভিজ্ঞতা ক্রিয়াশীল। এ প্রসঙ্গে মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক উপন্যাসের একটি তালিকা নিচে প্রদান করা হলো :

১. শওকত ওসমান : জাহান্নাম হইতে বিদায়, নেকড়ে অরণ্য, দুই সৈনিক, জলাঙ্গী।
২. আনোয়ার পাশা : রাইফেল রোটি আওরাত।
৩. রশীদ করীম : আমার যত গ্লানি।
৪. সৈয়দ শামসুল হক : নিষিদ্ধ লোবান, নীল দংশন, দ্বিতীয় দিনের কাহিনী, ত্রাহী।
৫. শওকত আলী : যাত্রা।
৬. মাহমুদুল হক : জীবন আমার বোন।
৭. রশীদ হায়দার : খাঁচায়, নষ্ট জোছনায় এ কোন অরণ্য, অন্ধ, কথামালা।
৮. আহমদ ছফা : ওংকার।
৯. সেলিনা হোসেন : হাঙ্গর নদী গ্রেনেড, কাঁটাতারে প্রজাপতি, নিরন্তর ঘন্টাধ্বনি।
১০. হুমায়ূন আহমেদ : সৌরভ, আগুনের পরশমণি, অনিল বাগচীর একদিন, জোছনা ও জননীর গল্প, শ্যামল ছায়া, নির্বাসন।
১১. ইমদাদুল হক মিলন : কালো ঘোড়া, ফেরাও, মহাযুদ্ধ, অভিমান।
১২. মঞ্জু সরকার : তমস, প্রতিমা উপাখ্যান।
১৩. আবু জাফর শামসুদ্দিন : দেয়াল।



১৪. সরদার জয়েন উদ্দিন : বিধ্বস্ত রোদের ঢেউ।
১৫. আমজাদ হোসেন : অবেলায় অসময়।
১৬. নুর মোহাম্মদ মোল্লা : এক প্রজন্মে সংলাপ।
১৭. আল মাহমুদ : উপমহাদেশ।
১৮. জহির রায়হান : আরেক ফাল্গুন।
১৯. শাহরিয়ার কবির : পূর্বের সূর্য।
২০. দিলারা হাশেম : একদা, অনন্ত।

**বিভিন্ন উপন্যাসের বিষয় সংক্ষেপ**

- **রাইফেল রোটি আওরাত :** শহীদ অধ্যাপক আনোয়ার পাশার 'রাইফেল রোটি আওরাত' মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক উপন্যাসসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সংযোজন। এ দেশের ইতিহাসের এক দুঃসহ ও নৃশংশতম অধ্যায়ের বিশ্বস্ত দলিল এই উপন্যাসটি। এ শুধু একাত্তরের বাংলাদেশের হাহাকারের চিত্র নয়, তার দীপ্ত যৌবনেরও এক প্রতিচ্ছবি। এ গ্রন্থের নায়ক সুদীপ্ত শাহীন বাংলাদেশ আর বাঙালির আশা আকাঙ্ক্ষা, সংকল্প প্রত্যয় আর স্বপ্ন কল্পনারই যেন প্রতীক। একাত্তরের মার্চের সে ভয়াবহ কটা দিন আর এপ্রিলের প্রথমার্ধের কালো দিনগুলোর মর্মান্তিক অভিজ্ঞতার সংকীর্ণ পরিধি টুকুতেই এ বইয়ের ঘটনাপ্রবাহ সীমিত, কিন্তু এর আবেদন আর দিগন্ত দুঃখ এ সময়সীমার আগেও বহুদূর বিস্তৃত। বাঙালির বেদনা আর আশা-নিরাশার এ এমন এক শিল্পরূপ যা সব সময় সীমাকে ডিঙ্গিয়ে এক দীর্ঘস্থায়ী অপরূপ সাহিত্য কর্ম হয়ে উঠেছে।

- **দুই সৈনিক :** আমাদের জাতীয় চরিত্রের কলঙ্কময় দিক শওকত ওসমান তার দুই সৈনিক উপন্যাসে অঙ্কিত করেছেন। সেই স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় কিভাবে আমাদেরই আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে কেউ কেউ কত অযাচিতভাবে পাক মিলিটারির সহায়তা করতে এগিয়ে গিয়েছিল এবং অবশেষে নিজেদের এবং প্রিয়জনদের জীবনে দুর্ভোগ ও করুণ পরিণতি নেমে এসেছিল তার একটি চিত্র তিনি অঙ্কন করেছেন দুই সৈনিক উপন্যাসে।

- **নেকড়ে অরণ্য :** শওকত ওসমানের মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক আরেকটি উপন্যাস 'নেকড়ে অরণ্য' নির্বাসিত রমণীদের বোবা কান্নায় মুখর। একটা গুদাম ঘর শৃঙ্খলিত বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করছে। গুদাম ঘরের মধ্যে যেসব নারী আছে তারা অপমানিতা, নির্যাতিতা, ধর্ষিতা এবং সেই সূত্রে হিন্দু-মুসলমান শিক্ষিত-অশিক্ষিত গ্রামীণ ও নাগরিক রমণীদের মধ্যে একটা ঐক্য ও সাম্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। রুচি, সংস্কৃতি ও ভাষার ব্যবধান দূর হয়ে একটি গভীর মমত্ববোধ পরা সবাই পরস্পরের কাছাকাছি এসেছিল। সকলের কাছে একটা দুঃখই পাহাড়। তারই ভার সকলে বহনরতা। তাই একে অপরের কাছাকাছি হওয়ার ব্যগ্রতা অপরিসীম।

- **অবেলায় অসময় :** আমজাদ হোসেনের 'অবেলায় অসময়' উপন্যাসের স্থান আকর্ষণীয়, একটি চলমান নৌকা বাংলাদেশের মিলন তীর্থ। মিলিটারির আক্রমণের ভয় নৌকাটির ভেতরে। বড়ুয়া, ব্যানার্জী, জনসন, জসিম্মদ্দি, কিশিত, টুপী, নামাবলী সবই আছে। কিন্তু এরা সব জাত ধর্ম এ নদীর জলে ধুয়ে ফেলেছে। সব এখন মানুষ।

  আলী মাঝির দার্শনিক উপলব্ধি– 'সুখের সময় যত জাত ধর্মের বাহাদুরী, মারামারি, খুনোখুনি! আজকে আমার এ নৌকার ভিতরে যেমন এক জাতের মানুষ, সারাজীবন এইভাবে বসবাস করলেই তো আর গাল গালাজ হয় না।'

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



স্মৃতিচারণের মধ্য দিয়ে খণ্ড খণ্ড কাহিনী ফ্ল্যাশব্যাক রীতিতে এগিয়ে চলছে। আলী মাঝি ও ফাতেমা, আদম ও হাওয়া, কাসেম ও সকিনা সমান মর্যাদা অর্জন করেছে। জুটির নাম নির্বাচনে আমজাদ হোসেনের ইতিহাস চেতনা কাজ করছে। বর্ণনার ভাষায় ঋজুতা, স্বাচ্ছন্দ্য ফুটে উঠেছে।

□ **হাঙ্গর নদী গ্রেনেড :** সেলিনা হোসেনের 'হাঙ্গর নদী গ্রেনেড' উপন্যাসের নামকরণ এবং বিষয়বস্তুতে প্রতীকী ব্যঞ্জনার প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। হাঙ্গর আক্রমণকারী মিলিটারি, নদী-বুড়ী-তথা বাংলাদেশের নিস্তরাদ জীবন এবং গ্রেনেড মুক্তিযোদ্ধা।

সর্বমোট বিরানব্বই পৃষ্ঠার উপন্যাসটির চুয়াল্লিশ পৃষ্ঠা পর্যন্ত প্রধান চরিত্র বুড়ীর জীবন, তার কৈশোর, যৌবন, বিবাহ, সন্তানহীনতা, সন্তানপ্রাপ্তি, স্বামীর মৃত্যু, সতীনের বড় ছেলের বিয়ে, দাদী হওয়া ইত্যাদি যেন হাজার বছরের বাংলাদেশের নিস্তরাদ এক ঘেয়ে বৈচিত্রহীন শান্তনদীর মত প্রবাহিত জীবনের বর্ণনা রয়েছে। হাজার বছরের বাংলাদেশের নয় মাস সংক্ষিপ্ত অথচ ব্যতিক্রমী। নয় মাসের প্রথম পর্যায় পাকবাহিনী আক্রমণকারী হাঙ্গর এবং দ্বিতীয় পর্যায় প্রতি আক্রমণকারী মুক্তিযোদ্ধা গ্রেনেড। তাই হাঙ্গর ও গ্রেনেড উপন্যাসটির অর্ধেক জায়গা মাত্র জুড়েছে। হাজার বছরের নদীমাতৃক বাংলাদেশের হাঙ্গর ও গ্রেনেডের অবস্থান সংক্ষিপ্ত এবং ব্যতিক্রমী। তাই ইচ্ছে করেই হয়ত সেলিনা হোসেন তিন শব্দের নামকরণের যে সমন্বয় সাধন করেছেন তাকে সমান গুরুত্ব দিয়ে সমান জায়গা করে দেননি। সেলিনা হোসেনের বর্ণনা আন্তরিক, জীবন্ত এবং তীক্ষ্ম। ভাষা সরল বাক্য তীর্যক। সর্বত্র ঔচিত্যবোধের ছাপ বর্তমান।

□ **পুবের সূর্য :** শাহরিয়ার কবির কিশোরদের জন্য লিখিত 'পুবের সূর্য' উপন্যাসে ২৫ মার্চের ভয়ঙ্কর রাতের ভয়াবহ পরিবেশ, মিলিটারির নির্বিচার হত্যাকাণ্ড আর ভীত সন্ত্রস্ত মানুষের রাত্রিযাপন ও সংগ্রামী মানুষের প্রতিরোধের কাহিনী বেশ দক্ষতার সাথে ফুটিয়ে তুলেছেন।

স্মৃতিচারণ ভঙ্গিতে লেখা এই কাহিনীতে অনেক ক্ষেত্রেই ফ্ল্যাশব্যাক রীতি অনুসৃত। শাহরিয়ার একটি ব্যতিক্রমী চরিত্র অঙ্কন করে অগ্রসর চিন্তা এবং মহৎ শিল্পী চেতনার পরিচয় দিয়েছেন। অত্যাচারী পাঞ্জাবি সেনাদের জঘন্যতম অত্যাচারের পাশাপাশি চিত্রিত হয়েছে পশ্চিমা মেজর বেগের মত চরিত্র, যে বন্দুককে ভীষণভাবে ঘৃণা করে এবং অস্থির হয়ে বলে আমাদের জেনারেল যা করেছেন যা ভাবছেন সভ্যতার ইতিহাসে এর নজির নেই। আমি জানি এসব বলা ঘোরতর অন্যায়, তবু তোমার কি মনে হয় শাস্তি থেকে বাঁচতে পারবেন? এ চরিত্র যেন শওকত ওসমানের 'নেকড়ে অরণ্য'-এর শের খানের পূর্ণ ও বলিষ্ঠ সংস্করণ।

উপন্যাসের প্রধান চরিত্র বাবু ক্যাম্পে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখলো, নতুন মুখের স্বপ্ন। 'সব শেষে সূর্য উঠল, জ্বলন্ত ইস্পাতের গোলকের মতো টকটকে লাল সূর্য, অসম্ভব লাল সূর্য।' বাংলাদেশের স্বাধীনতা সূর্যের উদয় সম্ভাবনার এই প্রতীকী ব্যঞ্জনা দিয়েই আলোচ্য উপন্যাসের কাহিনী শেষ। 'স্বল্প ভাষণে, সুমিত বিন্যাসে ঘটনাগুলো স্বাভাবিকতায় সংস্থাপিত এবং চরিত্রগুলোও আপনরূপে সুবিকশিত।'

□ **জীবন আমার বোন :** মাহমুদল হকের 'জীবন আমার বোন' উপন্যাসে হানাদার বাহিনীর আক্রমণের চাইতে এখানকার তরুণদের রাজনীতি সম্পর্কে তাদের বিবেচনাহীন আবেগ এবং কয়েকটি তরুণ-তরুণীর অবদমিত যৌন ইচ্ছার কথা চিত্রিত হয়েছে। মাহমুদুল হকের ভাষা এ গ্রন্থে চরিত্রানুগ, পরিবেশানুগ, প্রাণবন্ত। খোকা ও তার বন্ধুদের চরিত্রের মতো মাহমুদুল হকের ভাষাও অস্থির, চঞ্চল ও দ্রুতলয়ের। ভাষা সর্বত্র টগবগে, ঘোড়ার মত লাফিয়ে এক প্রকার দৌড়িয়ে চলেছে এ ভাষা।



'সারা শহর ফেটে পড়েছে বারুদের মত। স্টেডিয়ামে চেয়ার ভাঙাভাঙি, দোকানপাট সব বন্ধ, রাস্তায়-রাস্তায় কেবল মানুষ আর মানুষ। লাঠি সোটা, লোহার রড পাইপ যে যা হাতের কাছে পেয়েছে তাই নিয়ে ছেলে বুড়ো জোয়ানে সব ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছে উন্মত্তের মতো। স্লোগান আর স্লোগান, চতুর্দিকে ফেটে পড়েছে স্লোগান।'

হানাদার বাহিনীর নির্যাতনের ভয়ে ২৭ মার্চের পরে বোন রঞ্জুকে নিয়ে বুড়িগঙ্গা পার হয়ে ওপারে গিয়ে উঠেছিল সে। বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে থৈ থৈ মানুষ যে যার নিজেকে সামলাতে ব্যস্ত। শিলাবৃষ্টির পর জ্বরে রঞ্জুর গা পুরে যাচ্ছিল। তারপর সেখানেই মেশিনগান আর মর্টার নিয়ে পলায়নরত ভীত সন্ত্রস্ত নরনারীর ওপর পাশবিক উল্লাসে ঝাপিয়ে পড়েছিল হিংস্র সেনাদল অতর্কিতে। সেদিন বাকশক্তিহীন, অসুস্থ শায়িত রঞ্জু তিন লক্ষ চল্লিশ হাজার পায়ের তলায় পড়ে চ্যাপটা হয়েছিল। একা বেঁচে থাকার অধিকার তার দেশ কিছুতেই দিতে পারে না রঞ্জুকে, পরে বুঝেছিল খোকা। খোকাদের এই চৈতন্যোদয়ই পরবর্তীকালে মুক্তিযুদ্ধকে তীব্র গতিদান করেছিল।

□ **যাত্রা :** শওকত আলীর 'যাত্রা' ২৭ মার্চ থেকে ৩ এপ্রিলের জিঞ্জিরা সৈয়দপুরের ঘটনা ধারণ করেছে। 'যাত্রা'র প্রথমেই বুড়িগঙ্গায় 'হুড়োহুড়ি পাড়াপাড়ি করে নৌকায় ওঠা' পলায়নপর জনস্রোতের ঢাকা থেকে জিঞ্জিরা হয়ে উদ্দেশ্যবিহীন ছুটে চলার মর্মান্তিক দৃশ্য বিবৃত হয়েছে। হাজার হাজার ভয়তাড়িত রাতজাগা, ক্লান্ত মানুষগুলোর একই চিন্তা এখন দূরে চলে যাওয়া। শহর থেকে শুধু চলে যাওয়া যেখানে হোক, ঠিকানাবিহীন হোক শুধু হেটে চলা। এক নদী পার হয়ে আরেক নদী। যেন বা বাংলাদেশের বুকের ভিতরে চলে যাচ্ছে মানুষ শত্রুর হাত যেন পৌছতে না পারে, মৃত্যুর হিংস্র থাবার বাইরে যেন চলে যাওয়া যায়।

সেদিন পলায়নপর মানুষের কোনো সতন্দ্র পরিচিতি ছিল না, সেদিন 'সবাই একসঙ্গে হাটে, তারপর লীলা-মঞ্জু-সাকিনা, হাসান, বাচ্চারা বিনু, রায়হান যেন একটি পরিবার।' এখানে পঙ্গু, অসুস্থ হাসানের জন্য সেবা করতো বিনু প্রফেসর পত্নী, এখানে লীলা অপেক্ষা করে হাসানের জন্য যোশেফ ফার্নান্দেজ ধরে রাখে হাসানকে, রায়হানের টাকার জন্য ঢাকার দিকে রওয়ানা দেয় রাতের আধারে। পলায়নটা সেদিন সত্য ছিল, অপরিহার্য ছিল। তবু তারও মধ্যে আনিসের মতো লোকেরা দেখেছে প্রতিরোধের লক্ষণ। 'এই অবস্থাতেই প্রতিরোধ গড়ে উঠবে কেউ চাক বা না চাক তবু প্রতিরোধ হবে।'

□ **খাঁচায় :** রশীদ হায়দারের 'খাঁচায়' উপন্যাসে একাত্তরের অবরুদ্ধ বাংলাদেশের মানুষের যন্ত্রণার কথা উচ্চারিত হয়েছে। ডিসেম্বরেই এ খাঁচায় আটকে পড়া মানুষের যন্ত্রণা-উৎকণ্ঠা তীব্র হয়েছিল।

আমেরিকার সেভেনথ ফ্লীট বঙ্গোপসাগরের দিকে এগিয়ে আসছে শুনে জাফরের সমস্ত অনুভূতিগুলো নিক্রিয় হয়ে রাস্তার মতো হয়ে গেছে। যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছে আমেরিকা, খাঁচাটা আরো সংকুচিত হয়ে আসছে, খাঁচার চারপাশে উদ্যত মরণাস্ত্র।

যুদ্ধ লোভকে তীব্র করেছে, ধ্বংসকে অনিবার্য করেছে, মানুষকে বিচ্ছিন্ন করেছে প্রিয়জন থেকে, মানবিক সমস্ত বোধকে উৎপাটিত করতে চেষ্টা করেছে যুদ্ধ। তবু কোনো যুদ্ধই মানবতাকে ধ্বংস করতে পারে না, পারেনি। পাকিস্তানি ক্যাপ্টেন ইশতিয়াকের কাছেও সে মানবতা দুর্নিরীক্ষ্য নয়।

রবীন্দ্রনাথের 'কাবুলীওয়ালা' তার পিতৃহৃদয়ের বৈভব নিয়ে আরেকবার রশীদ হায়দারের সামনে এসেছিল। এই দৃষ্টির সচেতনতা, এই মানবিকতা অনুসন্ধানেই শিল্পীর মহৎ গুণ।

অন্যদিকে রশীদ হায়দার স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশের একটি সম্ভব্য চিত্র রচনা করেছেন কয়েকটি আচড়ে। সেই সঙ্গে খাঁচার প্রতীকী ব্যঞ্জনা যথার্থ শিল্পরূপ লাভ করে। খাঁচা বাংলাদেশ, খাঁচায় বন্ধ টিয়ে বাংলাদেশের মানুষ।

□ **অন্ধ কথামালা :** রশীদ হায়দারের 'অন্ধ কথামালা' উপন্যাসে মৃত্যু মুহূর্তে প্রতীক্ষারত একজন মুক্তিযোদ্ধার দুর্বিষহ স্মৃতি বর্ণনায় ভয়াকুল ও কল্পনাজলে বয়নের রুদ্ধশাস আবেগতপ্ত চিত্র অঙ্কিত।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



- **সৌরভ ও আগুনের পরশমণি :** উপন্যাস দুটোতে কাহিনীগত ঐক্য আছে। সৌরভ, কাদের রফিক মুক্তিযুদ্ধে ট্রেনিংয়ে যায় আগরতলায় আর আগুনের পরশমণিতে আলম, সাদেক ও গৌরাঙ্গ ট্রেনিং শেষে ঢাকায় যুদ্ধ করতে আসে। যুদ্ধের সময়ে বাঙালিদের স্বাধীনতাকামী মনোভাব প্রেম ও দ্রোহের নিরিখে এখানে দেখানো হয়েছে।
- **নির্বাসন :** হুমায়ূন আহমেদের নির্বাসন পঙ্গু মুক্তিযোদ্ধাকে নিয়ে লিখিত। কথা ছিল জরীর সাথে আনিসের বিয়ে হবে। কিন্তু স্বাধীনতা যুদ্ধে পাক বাহিনীর হাতে আনিস গুলিবিদ্ধ হলে তার নিম্নাঙ্গ অবশ হয়ে যায়। চিকিৎসা চলে দীর্ঘদিন। কিন্তু রোগ মুক্তির কোনো লক্ষণ নেই। একটি ধূসর বিবর্ণ রিক্ত অন্ধকার সময় আনিসকে ঘিরে ফেলে। জরীর বিয়ে হয়ে যায় অন্য ছেলের সাথে। বরযাত্রীরা তৈরি হয়েছে বিদায় নিতে। সবাই জরীকে ধরাধরী করে উঠানে নিয়ে এলো। আনিস জানালা দিয়ে নিচে তাকিয়ে আছে। গভীর বিষাদে আনিসের চোখে জল এল। একটি বেদনাময় অনুসরণের মধ্যে কাহিনী শেষ হয়েছে।
- **জোছনা ও জননীর গল্প :** 'জোছনা ও জননীর গল্প' উপন্যাসে হুমায়ূন আহমেদ তিনটি কাজ করেছেন। প্রথমত, তার নিজের ভাষায় দেশমাতার ঋণ শোধ করার চেষ্টা করেছেন। দ্বিতীয়ত, একটি মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক উপন্যাস লিখেছেন এবং তৃতীয়ত, মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে কিছু বিভ্রান্তি দূর করার চেষ্টা করেছেন।

এ উপন্যাসের কাঠামোটি খুবই আকর্ষণীয়। গল্পটি শুরুতে নীলগঞ্জ হাইস্কুলের আরবি শিক্ষক মওলানা ইরতাজউদ্দিন কাশেমপুরির। এটি নানাভাবে এগোবে। পরাধীন দেশে জুম্মার নামাজ হয় না, জুম্মার নামাজ পড়াতে অস্বীকৃতি জানান তিনি। এই কারণে ক্যাপ্টেন বাসেত তাকে নীলগঞ্জ স্কুল এবং বাজারে সম্পূর্ণ নগ্ন অবস্থায় প্রদক্ষিণ করায়। বাজারে ছোট্ট একটা ঘটনা ঘটল। দরজির দোকানের এক দর্জি একটা চাদর নিয়ে ছুটে এসে ইরতাজউদ্দিনকে ঢেকে দিয়ে জড়িয়ে ধরে থাকল। ঘটনা এতই দ্রুত ঘটল যে সঙ্গের মিলিটারিরা বাধা দেবার সময় পেল না।

ইরতাজউদ্দিন ও দরজিকে মাগরেবের নামাজের পরে সোহাগী নদীর পারে নিয়ে গুলি করা হলো। মৃত্যুর আগে ইরতাজউদ্দিন পরম নির্ভরতার সঙ্গে আল্লাহপাকের কাছে উঁচু গলায় শেষ প্রার্থনা করল। পরদিন নীলগঞ্জ স্কুলের হেড মাস্টার মনসুর সাহেব ও তার পাগল স্ত্রী আসিয়া ইরতাজউদ্দিনের লাশ টেনে আনার সময় বেলুচ রেজিমেন্টের সেপাই আসলাম খা তাদের সঙ্গে হাত মেলায়। আসলাম চরিত্রটির মাধ্যমে লেখক বুঝিয়েছেন পাকিস্তান আর্মিতেও দুএকজন হৃদয়বান লোক ছিল।

এ উপন্যাসে চরিত্র হয়ে এসেছেন মওলানা ভাসানী, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান, বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকী, ইন্দিরা গান্ধী, ইয়াহিয়া খান, ভুট্টো, টিক্কা খান অর্থাৎ সেই সময়কার সব শ্রদ্ধেয় ও নিন্দিত মানুষজন। ভারতীয় বাহিনীর চরিত্ররা এসেছে যে যার ভূমিকায়। মুক্তিযোদ্ধারা এসেছে, রাজাকাররা এসেছে। শর্ষীনার পীর সাহেব এসেছেন আর এসেছে সমগ্র দেশের নানাস্তরের নানারকম মানুষ।

বিভিন্ন স্মরণীয় উদ্ধৃতি তুলে ধরা হয়েছে এ উপন্যাসে। বিভিন্ন চরিত্র, বিভিন্ন ঘটনার কথা বলা হয়েছে। শাহেদ, আসমানী, জোহর, মোবারক, গৌরাঙ্গ, নাইমুল, মরিয়ম, শাহ কলিম, রুনি, হি হ্যাগি স্যার, ধীরেন্দ্র রায় চৌধুরী, কংকন। আর অতি ছোট্ট হারুন মাঝি। সে ছিল একজন ডাকাত। একটি উত্তাল সময় কিভাবে দেশের প্রায় প্রতিটি মানুষকে ঠেলে দিয়েছিল স্বাধীনতার দিকে, কিভাবে দেশপ্রেমের মন্ত্রে উজ্জীবিত হয়ে মৃত্যুকে তুচ্ছজ্ঞান করেছিল মানুষ এই উপন্যাসের পাতায় পাতায় ছড়নো আছে সেই কথা।

- **তমস ও প্রতিমা উপাখ্যান :** মার্কসবাদী লেখক বামপন্থী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে মুক্তিযুদ্ধে শ্রমজীবী মানুষের অংশগ্রহণকে বিস্তারিতভাবে তুলে ধরেছেন।



**উপসংহার :** মুক্তিযুদ্ধ আমাদের জাতীয় জীবনের এক অমলিন অধ্যায়। মুক্তিযুদ্ধ ১৯৭১ সালে সংঘটিত হলেও স্বাধীনতার আকুতি বাঙালির মনে দীর্ঘদিন ধরে লালিত। বাংলাদেশের অনেক ঔপন্যাসিক তাদের উপন্যাসে মুক্তিযুদ্ধের প্রসঙ্গ টেনে দেন। প্রায় প্রত্যেক লেখকের দৃষ্টিতে অসাম্প্রদায়িক মনোভাবের প্রকাশ ঘটেছে। হিন্দু-মুসলিম-খ্রিষ্টান-বৌদ্ধ জাত সত্তার উপরে এক বাংলাদেশী জাতিসত্তার প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করা হয়েছে।

## রচনা ৪৪ মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও আমাদের সংস্কৃতি

**ভূমিকা :** স্বাধীনতা মানুষের অনন্ত পিপাসা। এ পিপাসা থেকেই মানুষের মনে জন্ম হয় সংগ্রামী চেতনার। আর এ সংগ্রামী চেতনাবোধই মানুষের রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক মুক্তির পথকে সুগম করে স্বাধীনতা অর্জনে উদ্বুদ্ধ করে। আমরা বাঙালি। স্বাধীন বাংলাদেশের অধিবাসী। কিন্তু এ দেশ এক সময় পরাধীন ছিল। সুদীর্ঘ নয় মাসব্যাপী এক রক্তাক্ত মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে আমরা অর্জন করেছি স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব, অর্জন করেছি কথা বলার অধিকার, অর্জন করেছি এই স্বাধীন বাংলাদেশ। তাই মুক্তিযুদ্ধ আমাদের জাতীয় জীবনে এক অহঙ্কার, এক স্মরণীয় অধ্যায়। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ শুধু একখণ্ড ভূমি অধিকার করার যুদ্ধ নয়, এ যুদ্ধের চেতনা ছিল অনেক গভীরে; আত্মমুক্তি ও আত্মবিকাশের আকাঙ্ক্ষার লালিত স্বপ্ন।

**মুক্তিযুদ্ধের পটভূমি :** বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলন তথা মুক্তিযুদ্ধের রয়েছে একটি ঐতিহাসিক পটভূমি। ১৭৫৭ সালের ২৩ জুন ষড়যন্ত্রমূলক যুদ্ধে পলাশীর প্রান্তরে বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজ-উদ-দৌলা ইংরেজদের হাতে পরাজিত হন। সেদিন থেকে বাংলার আকাশে স্বাধীনতার সূর্য অস্তমিত হয়। শুরু হয় ইংরেজদের ঔপনিবেশিক শাসন। দু'শ বছর ধরে চলতে থাকে ইংরেজদের শোষণ আর নির্যাতন। শাসন-শোষণ, লাঞ্ছনা আর নিপীড়নের যাঁতাকলে পিষ্ট হয়ে বাঙালি জাতির মনের কোণে জন্ম নিয়েছিল বিক্ষোভ, আন্দোলন আর সংগ্রামের চেতনা। ফলশ্রুতিতে ১৯৪৭ সালে স্বাধীন পাকিস্তান রাষ্ট্রের একাংশরূপে জন্ম নেয় পূর্ব পাকিস্তান। পাকিস্তান সৃষ্টির পর হতে শাসকবর্গের বাঙালি নিধনের ইতিহাস নতুন কোনো ঘটনা নয়। ১৯৫২ সাল থেকে ১৯৭১ সালের ইতিহাস বাঙালিদের হত্যা ও বঞ্চনারই ইতিহাস। জাতীয় জীবন থেকে এ হতাশা মুছে ফেলার জন্য বাঙালিদের করতে হয়েছে ৯ মাসের সশস্ত্র সংগ্রাম মুক্তিযুদ্ধ।

**২৫ মার্চ কালরাত :** ইয়াহিয়া-ভুট্টো চক্রের ষড়যন্ত্রকে নস্যাৎ করার জন্য বঙ্গবন্ধুর আহুত অসহযোগ আন্দোলন যখন সারা বাংলায় অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মতো প্রজ্বলিত হয়ে ওঠে তখন ইয়াহিয়া-ভুট্টো চক্র শেখ মুজিবের সাথে আলোচনার জন্য ১৫ মার্চ ঢাকায় আসেন। শুরু হয় ষড়যন্ত্রের বেড়াজালে ঘেরা তাদের প্রহসনমূলক আলোচনা। অতঃপর ২৫ মার্চ রাতে আলোচনার সমাপ্তি ঘোষণা না করেই ইয়াহিয়া-ভুট্টো রাতের আঁধারে পশ্চিম পাকিস্তানে পলায়ন করেন। ২৫ মার্চ কালরাতেই শুরু হয় নিরস্ত্র বাঙালির উপর জল্লাদ বাহিনীর বর্বরোচিত নগ্ন হামলা। এ সময় বন্দি হওয়ার পূর্ব মুহূর্তে শেখ মুজিব বাংলার স্বাধীনতা ঘোষণা করে সকলকে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর মোকাবিলা করার আহ্বান জানান।

**প্রতিরোধ যুদ্ধ :** বাঙালি জনসাধারণ অসীম সাহসিকতার সাথে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে দুর্বার প্রতিরোধ গড়ে তোলে। লক্ষ নিরস্ত্র বাঙালিগণ পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর হিংস্রতা থেকে দেশকে রক্ষা করার জন্য মৃত্যুর দুর্জয় শপথ নিয়ে সংগ্রাম চালিয়ে যেতে থাকে। তারা বিভিন্ন স্থানে ব্যারিকেড সৃষ্টি করে রেললাইন, ব্রিজ ধ্বংস করে প্রতি পদক্ষেপে পাকিস্তানি বাহিনীকে প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন করতে থাকে।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



**মুজিবনগর সরকার :** স্বৈরাচার ইয়াহিয়া খানের জল্লাদ বাহিনী যখন বাংলাদেশে নারকীয় হত্যাযজ্ঞ
চালিয়ে যেতে থাকে ঠিক তখনই কুষ্টিয়ার মেহেরপুরে (বর্তমান মুজিব নগর) বাংলার রাজনৈতিক নেতৃবর্গ
সাংবাদিক সম্মেলন ডেকে স্বাধীন বাংলার নতুন সরকার গঠন করেন। অতঃপর জাতীয় পরিষদ সদস্য
অবসরপ্রাপ্ত কর্নেল এম এ জি ওসমানীকে স্বাধীন বাংলার সর্বাধিনায়ক নিযুক্ত করা হয়। মুজিব নগর
সরকার নবগঠিত বাংলাদেশ সেনাবাহিনীকে ১১টি সেক্টরে ভাগ করে যুদ্ধ পরিচালনার নির্দেশ দেন।

**মুক্তিযুদ্ধে গেরিলা আক্রমণ :** মুক্তিযুদ্ধে গেরিলা বাহিনীর ভূমিকা ছিল অন্যতম। ছাত্র ও যুবকরা শত্রুকে
আঘাত হানার জন্য প্রয়োজনীয় রণকৌশল শিখে দ্রুত বাংলার বনে-জঙ্গলে, গ্রামে-গঞ্জে, শহরে-বন্দরে
ঢুকে আক্রমণ শুরু করে। মুক্তি বাহিনীর গেরিলা আক্রমণে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী তাদের মনোবল
হারিয়ে ফেলে। মুক্তিবাহিনীর সংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে ক্রমে তারা ঢাকা, রাজশাহী, খুলনা প্রভৃতি বড়
শহরে পাক বাহিনীর ওপর প্রচণ্ড আঘাত হানতে শুরু করে। নভেম্বর মাসের শেষের দিকে তারা
দিনাজপুর, কুষ্টিয়া, খুলনা, যশোরসহ বিস্তৃত এলাকা মুক্ত করে হানাদার বাহিনীর মনোবল ধ্বসিয়ে দেয়।

**ভারতের যুদ্ধ ঘোষণা :** পাকিস্তান সরকার উপায় না দেখে আকস্মিকভাবে ভারতের অমৃতসর,
যোধপুর, পাঠানকোট এবং আগ্রায় বিমান হামলা চালায়। ফলে বাধ্য হয়ে ভারত ১৯৭১ সালের ৪
ডিসেম্বর পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। এরপর ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী
৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশকে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করেন এবং পরে অন্যান্য দেশ
বাংলাদেশকে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করে।

**যৌথ বাহিনীর আক্রমণ ও চূড়ান্ত বিজয় :** অতঃপর মুক্তিবাহিনী এবং ভারতীয় বাহিনীর সমন্বয়ে
গঠিত হয় যৌথ কমান্ড। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর ওপর আক্রমণ পরিচালিত হয় আকাশ পথ,
স্থলপথ এবং জলপথে। সম্মিলিত বাহিনীর চতুর্মুখী আক্রমণে পাকিস্তানি বাহিনী শীঘ্রই নাজেহাল
হয়ে পড়ে। মুক্তি বাহিনী ও ভারতীয় বাহিনীর যৌথ কমান্ডের প্রচণ্ড আঘাতে পাক-হানাদার বাহিনী
দিশেহারা হয়ে পড়ে। হানাদার বাহিনী তাদের তাবেদার রাজাকার, আলবদর, আল সামস দ্বারা
বাংলাদেশের কৃতি সন্তানদের হত্যা করে। তাদের সীমাহীন অত্যাচারে বহু মানুষ প্রাণ হারায়। মা-
বোনদের ইজ্জত ভূলুণ্ঠিত হয়। শিক্ষক, বুদ্ধিজীবী, সাহিত্যিক, ডাক্তারকে তারা নৃশংসভাবে হত্যা
করে। পাক বাহিনীর এ নৃশংস হত্যাকাণ্ডে মুক্তিবাহিনী আরো ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। তারা পাক হানাদার
বাহিনীর দালাল নিধনে তৎপর হয়ে ওঠে এবং ঢাকার গেরিলা যোদ্ধারা আইয়ুব খানের কুখ্যাত
দালাল প্রাক্তন গভর্নর মোনায়েম খানকে তার বাসভবনে হত্যা করে। ফলে পাক হানাদার বাহিনী
গেরিলা বাহিনীর প্রচণ্ড আঘাতে জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে দুর্বল হয়ে পড়ে। অতঃপর ১৯৭১ সালের
১৬ ডিসেম্বর ইয়াহিয়ার জল্লাদ বাহিনীর সর্বাধিনায়ক এ কে নিয়াজী ৯৩ হাজার সৈন্যসহ যৌথ
বাহিনীর সর্বাধিনায়ক জগজিৎ সিং অরোরার নিকট আত্মসমর্পণ করেন। অবশেষে এক সাগর রক্তের
বিনিময়ে বাংলাদেশ বিশ্বের মানচিত্রে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে স্থায়ী আসন লাভ করে।

**মুক্তিযুদ্ধের চেতনার স্বরূপ :** অনেক রক্ত আর অসংখ্য জীবনের বিনিময়ে অর্জিত আমাদের স্বাধীনতা।
বাঙালি জাতির জীবনে তাই স্বাধীনতার চেতনা যেমন গভীর, তেমনি ব্যাপক। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর
তৎকালীন অস্থায়ী রাষ্ট্রপ্রধান সৈয়দ নজরুল ইসলাম মুক্তিযুদ্ধের শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করতে গিয়ে
বলেছিলেন, 'আমরা অত্যন্ত শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি সেসব শহীদদের কথা, সেসব অসম সাহসী বীর
যোদ্ধাদের কথা, যারা তাদের আত্মবলিদানের জন্য অমর হয়েছেন, তারাই আমাদের প্রেরণার উৎস হয়ে
থাকবেন চিরকাল।' যে চেতনা ও সাহস নিয়ে মুক্তিযুদ্ধ হয়েছে বাংলাদেশের সাহিত্য, সংস্কৃতিতে মুক্তিযুদ্ধের



সেই যথার্থ প্রতিফলন এখনো ঘটেনি। বরং জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে আজ মিথ্যার মলিনতা বিদ্যমান। ফলে
আমাদের সব গৌরবই যেন ঢেকে যেতে বসেছে। মানবিক মূল্যবোধ আজ প্রায় নিষ্পেষিত ও বিপন্ন।
এমতাবস্থায় প্রশ্ন দেখা দিয়েছে, এত কষ্টে অর্জিত এ স্বাধীনতা তথা মুক্তিযুদ্ধের চেতনা কতটুকু অটুট ও
অক্ষত থাকবে, যার মাধ্যমে আমরা আমাদের আগামী প্রজন্মকে মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস জানাতে পারব?

**সংস্কৃতি :** সংস্কৃতি হলো মানুষের আচার-আচরণের সমষ্টি। মানুষের জাগতিক নৈপুণ্য ও কর্মকুশলতা,
তার বিশ্বাস, আশা-আকাঙ্ক্ষা, নৈতিকতা, রাজনীতি, ভাষা, কলা, মূল্যবোধ সবকিছুই সংস্কৃতির
অন্তর্ভুক্ত। সংস্কৃতি হচ্ছে সমাজের মানুষের অর্জিত জ্ঞান, বিশ্বাস, কলা, নীতি, নিয়ম, সংস্কার ও অন্যান্য
যে কোনো বিষয়ে দক্ষতার সর্বাধিক সমাবেশ। মোতাহের হোসেন চৌধুরী বলেন, 'সংস্কৃতি মানে
সুন্দরভাবে, বিচিত্রভাবে বাঁচা।' সংস্কৃতি সম্পর্কে এমারসন বলেন, 'সংস্কৃতিই খুলে দেয় সুন্দরের চেতনার
দরজা।' সংস্কৃতি সম্পর্কে ম্যাথু আর্নল্ড-এর অভিমত হলো, 'সংস্কৃতি আমাদের পরিচয় করিয়ে দেয়
বিশ্বের সর্বোত্তম জিনিসগুলোর সঙ্গে এবং সেই সঙ্গে মানুষের গৌরবময় ইতিহাসের সঙ্গে।' আবার
কালটাজার গ্রাসিয়ান বলেন, 'মানুষ জন্মায় বর্বর হয়ে, সংস্কৃতিই তাকে করে সুসভ্য'। তবে সংস্কৃতি
শনাক্তকরণের কোনো নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য নেই, গণ্ডি নেই। এটি চলমান জীবনের প্রতিচ্ছবি। এলাকাভিত্তিক
এর ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। একটা নির্দিষ্ট এলাকার মানুষের জীবন প্রণালী অর্থাৎ মানুষের দৈনন্দিন
আচার-আচরণ, কাজকর্ম, পোশাক-পরিচ্ছদ, প্রচলিত লোককাহিনী, ধর্মীয় উৎসব-অনুষ্ঠান, প্রতিষ্ঠান,
চিন্তা-চেতনা সবকিছুই সংস্কৃতির মধ্যে পড়ে।

**সাংস্কৃতিক জীবনে মুক্তিযুদ্ধের প্রভাব :** 'সংস্কৃতি' বলতে শুধু সুকুমার কলার চর্চা নয়, সংস্কৃতি হলো
একটি জাতির আত্মবিকাশ ও আত্মোপলব্ধির এক প্রভাবশালী প্রত্যয়। বিভেদ যেখানে, সংস্কৃতি সেখানে
নেই। হিংসা যেখানে আছে, সেখানে সংস্কৃতি নেই। মুক্তিযুদ্ধে বাঙালি জাতির স্লোগান ছিল সুন্দরভাবে
বাঁচার অধিকার, প্রাণের অধিকার, বাঁচার আন্দোলন। এ আন্দোলনের মূল ভিত্তি ছিল ভালোবাসা,
দেশকে ভালোবাসা, দেশের মানুষকে ভালোবাসা, দেশের ভাষা-কৃষ্টি ও লালিত আচার-আচরণকে
ভালোবাসা। আমাদের সংস্কৃতি চেতনায় মুক্তিযুদ্ধ এক বলিষ্ঠ প্রত্যয়ী অনুপ্রেরণা। মুক্তিযুদ্ধ আমাদেরকে
ত্যাগ করতে শিখিয়েছে, বিভেদ ভুলে একতার জয়গান গাইতে অনুপ্রাণিত করেছে। আজ আমরা
একটি স্বাধীন ভূমি পেয়েছি। আমাদের সাংস্কৃতিক অঙ্গনে আজ যে জাগরণ এসেছে, তার মূলে রয়েছে
'৫২-এর অমর একুশ, আছে '৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ। মুক্তিযুদ্ধের শিক্ষা আমাদের যে চেতনা, যে ত্যাগ, যে
শিক্ষা দিয়ে গেছে, তার ওপরই গড়ে উঠেছে আমাদের বর্তমান সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল। সুতরাং আমাদের
সাংস্কৃতিক জীবনে মুক্তিযুদ্ধের এক বিশেষ প্রভাব রয়েছে।

**উপসংহার :** বাংলাদেশের মানুষের জাতীয় জীবনে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। মুক্তিযুদ্ধের
চেতনা একটি বলিষ্ঠ চেতনা, আত্মপ্রত্যয়ের দৃঢ় উচ্চারণ। প্রখ্যাত চিন্তাবিদ মনীষী সৈয়দ ইসমাইল
হোসেন সিরাজী লিখেছেন, 'আলোক ব্যতীত যেমন পৃথিবী জাগে না, স্রোত ব্যতীত যেমন নদী টেকে
না, স্বাধীনতা ব্যতীত তেমনি জাতি কখনো বাঁচিতে পারে না।' আমরাও সেই চিরন্তন সত্যের পথ
ধরেই ১৯৭১ সালে এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মধ্য দিয়ে অর্জন করেছি আমাদের প্রাণপ্রিয় স্বাধীনতা।
১৯৭১ সালের ঐতিহাসিক সেই মুক্তিযুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল যে বোধ বা চেতনাকে কেন্দ্র করে তারই
নাম মুক্তিযুদ্ধের চেতনা। ত্রিশ লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে আমরা যে স্বাধীনতা অর্জন করেছি তাকে চির
সমুন্নত রাখার ক্ষেত্রে আবহমান কাল ধরে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা প্রেরণা যোগাবে এ জাতিকে, যা সংস্কৃতি
চেতনার ও বলিষ্ঠ প্রত্যয়ী অনুপ্রেরণা।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



## রচনা ৪৫ বাংলাদেশের সমাজ কাঠামো পরিবর্তনে মুক্তিযুদ্ধ
## মুক্তিযুদ্ধের চেতনার পটভূমিতে গণতান্ত্রিক সমাজ

*[৩৩তম বিসিএস]*

**ভূমিকা :** বাংলাদেশ একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে বিশ্বের মানচিত্রে একটি সগৌরব আসনে অধিষ্ঠিত। ত্রিশ লক্ষ শহীদের রক্তের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীনতা বিশ্বে মাতৃভূমির জন্য আত্মত্যাগের এক অনন্য দৃষ্টান্ত। আধুনিক মারণাস্ত্রে সজ্জিত একটি দুর্ধর্ষ সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে প্রায় নিরস্ত্র জনগণের যে দুর্বার সংগ্রাম সংঘটিত হয়েছিল তার কোনো তুলনা নেই। এ দেশের বীর মুক্তিযোদ্ধারা নিজেদের জীবনকে মরণের হাতে সমর্পণ করে যে দুর্জয় প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল আর দেশের অগণিত মানুষ জীবনের ভয় তুচ্ছ করে যেভাবে সহযোগিতা প্রদর্শন করেছিলেন তা বিশ্বের সংগ্রামের ইতিহাসে এক অনন্য দৃষ্টান্ত হয়ে আছে। মুক্তিসেনাদের মধ্যে ছিল এ দেশের ছাত্র-জনতা, কৃষক, শ্রমিক সর্বস্তরের মানুষ। তারা যে প্রতিরোধ করে তুলেছিল তাতে পরাজিত হয়ে এ দেশ থেকে বিদায় নিতে হয়েছিল এক শক্তিশালী শোষক বাহিনীকে। এর পরিণামে এসেছে বাংলাদেশের স্বাধীনতা—হয়েছে স্বাধীন বাংলাদেশ—গড়ে উঠেছে স্বাধীন বাংলাদেশে নতুন সমাজ কাঠামো।

**বাংলাদেশের সমাজ কাঠামো পরিবর্তনে মুক্তিযুদ্ধের প্রভাব :** বাংলাদেশের সমাজ কাঠামো পরিবর্তনে মুক্তিযুদ্ধের ইতিবাচক ও নেতিবাচক প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। নিচে বাংলাদেশের সমাজ কাঠামো পরিবর্তনে মুক্তিযুদ্ধের প্রভাব বিশ্লেষণ করা হলো :

**ক. ইতিবাচক প্রভাব :**

১. **রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধি :** মুক্তিযুদ্ধের ফলে পাকিস্তান আমলের মৌলিক গণতন্ত্রের পরিবর্তে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা চালু হয়। জনগণ এ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করার ফলে পূর্বের তুলনায় অধিক রাজনৈতিক সচেতন হয়ে ওঠে। তাই স্থানীয় নির্বাচনে তরুণ নেতৃত্বের আবির্ভাব ঘটে। নেতৃত্বের পরিবর্তনের ফলে সমাজের শ্রেণী বিন্যাসেও পরিবর্তন সাধিত হয়। মৌলিক গণতন্ত্র চালু হওয়ায় গ্রামে-গঞ্জে নতুন নতুন নেতার আবির্ভাব হয়, যারা সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এছাড়া রাজনীতির ক্ষেত্রে নারীরা এগিয়ে আসে। তারা মেম্বার, চেয়ারম্যান নির্বাচিত হওয়ার জন্য নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে।

২. **শিক্ষা সচেতনতা বৃদ্ধি :** মুক্তিযুদ্ধের পর গ্রামীণ শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয়। এতে জনগণ শিক্ষার প্রতি সচেতন হয়ে ওঠে। উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে ইংরেজির পরিবর্তে বাংলাকে প্রাধান্য দেয়া হয়। অধিকাংশ গ্রামীণ এলাকায় প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হয়। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কাছে পাওয়ায় গ্রামের জনগণ তাদের ছেলেমেয়েদের স্কুলে পাঠায় এবং গ্রামের লোক শিক্ষিত হয়ে ওঠে। ফলে তারা দেশের উন্নয়নে ব্যাপক ভূমিকা রাখতে শুরু করে।

৩. **কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি :** স্বাধীনতার পর যান্ত্রিক সভ্যতা গ্রামবাংলাকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছে। ফলে কৃষি উৎপাদন বাড়ানোর জন্য সেচ ব্যবস্থায় বিদ্যুৎ ব্যবহার, উন্নত যন্ত্রপাতি,



যান্ত্রিক চাষাবাদ পদ্ধতির ব্যবহার শুরু হয়। সার, কীটনাশক ও সেচ ব্যবস্থার প্রসার হওয়ায় কৃষি উৎপাদন বহু গুণ বৃদ্ধি পায়। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা কৃষি ব্যবস্থায় আধুনিকতার ছাপ ফেলে। পূর্ব বাংলার অর্থনীতি ছিল কৃষিনির্ভর। কিন্তু পাকিস্তান সরকার পূর্ব পাকিস্তানের কৃষি ব্যবস্থার উন্নতির ক্ষেত্রে কোনো ভ্রূক্ষেপ করত না। অথচ তারা পূর্ব পাকিস্তানের কৃষক, অর্থনীতি শোষণ করে যাবতীয় ফসল ও অর্থ নিয়ে যেত। তাই স্বাধীনতার পর সরকার কৃষি ব্যবস্থার দিকে দৃষ্টি দেন। এর ফলে কৃষিতে দ্রুত উন্নয়ন ঘটে। উৎপাদন ব্যবস্থায় স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়ার পথে এগিয়ে যায়।

৪. **নেতৃত্বের পরিবর্তন :** মুক্তিযুদ্ধোত্তর বাংলাদেশের গ্রামীণ সমাজে নেতৃত্বের পরিবর্তনের ফলে মানুষ শহরমুখী হতে থাকে। তারা গ্রামে উৎপাদিত কৃষিপণ্য শহরে রপ্তানি করতে থাকে এবং শহরের শিল্পপণ্য গ্রামে আমদানি করতে থাকে। ফলে গ্রাম ও শহরের মধ্যে ব্যবসায়-বাণিজ্যের বিশেষ সুযোগ সৃষ্টি হয়। মুক্তিযুদ্ধের আগে বাংলাদেশের গ্রামীণ অবকাঠামো খুব একটা ভালো ছিল না। রাস্তাঘাট, ব্রিজ, কালভার্ট ছিল না বললেই চলে। ফলে গ্রামীণ যোগাযোগ ব্যবস্থা খুবই খারাপ ছিল। কিন্তু স্বাধীনতার পর সরকার গ্রামীণ সমাজ কাঠামো উন্নয়নের জন্য খুবই তৎপর হয়। ফলে গ্রাম ও শহরের মধ্যে পার্থক্য অনেকটা কমে আসে।

৫. **শিল্পায়ন :** পশ্চিমা শাসনামলে এদেশে কাঁচামালের প্রাচুর্য থাকা সত্ত্বেও সরকারের বৈরী নীতির ফলে এদেশে শিল্প প্রতিষ্ঠিত হয়নি। মুক্তিযুদ্ধের পর এদেশের সরকারের ব্যাপক শিল্পনীতির ফলে শিল্পায়ন হচ্ছে। স্বাধীনতার পর দেখা গেছে সরকার গ্রামে-গঞ্জে কুটিরশিল্প স্থাপনে আগ্রহী হয়ে ওঠে। এতে ব্যাপক কর্মসংস্থান হয়। শিল্পায়নের পর গ্রামীণ অবকাঠামোতে আরও ব্যাপক পরিবর্তন হয়।

৬. **গ্রাম ও শহরে যোগাযোগ স্থাপন :** মুক্তিযুদ্ধের ফলে জনগণের সচেতনতা বৃদ্ধি পায়। উচ্চ শিক্ষা, চাকরি, ব্যবসায়-বাণিজ্য, বিভিন্ন কাজ ইত্যাদি প্রয়োজনে মানুষ শহরমুখী হয়। ফলে গ্রাম ও শহরের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপিত হয়। এছাড়া বাংলাদেশে স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় রাস্তাঘাটসহ বহু কিছু ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। কিন্তু স্বাধীনতার পর যোগাযোগ ব্যবস্থার ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন হয়। রাস্তাঘাটের উন্নয়ন, মিডিয়া প্রভৃতি ক্ষেত্রে শহর ও গ্রামের মধ্যে ব্যাপক পরিবর্তন হয়।

৭. **গ্রামীণ এলাকায় আধুনিকতার ছাপ :** গ্রাম ও শহরের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপনের ফলে গ্রামের চেহারা দিন দিন পাল্টাচ্ছে। গ্রামীণ জনগণ আধুনিক শিক্ষা ও সংস্কৃতির দ্বারা প্রভাবিত হচ্ছে। স্বাধীনতার পূর্বে দেখা গেছে বাংলাদেশের গ্রামীণ পরিবেশে আধুনিকতার কোনো ছাপই ছিল না। কারণ সেখানে ছিল না শিক্ষিত মানুষ, রেডিও, টেলিভিশন অথবা টেলিফোন ব্যবস্থা। কিন্তু স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশের গ্রামীণ পরিবেশেও শহরের মতো আধুনিকতার ছাপ পড়েছে। সেখানে রেডিও, টেলিভিশন, টেলিফোন ব্যবস্থা এবং শিক্ষিতের হার অত্যন্ত বেড়ে গেছে। ফলে আধুনিকতার ক্ষেত্রে গ্রাম্য পরিবেশও কম নয়।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



৮. **অবকাঠামোগত উন্নয়ন :** মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাংলাদেশের অবকাঠামোগত উন্নয়নে ব্যাপক ভূমিকা রাখে। স্বাধীনতাত্তোর বাংলাদেশে বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা সমাধানের জন্য প্রশাসনিক কেন্দ্র স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। এতে করে শহর ও গ্রাম উভয় জায়গায় প্রশাসনিক কেন্দ্র স্থাপনের জন্য অবকাঠামোর পরিবর্তন হচ্ছে।

৯. **নতুন নতুন প্রশাসনিক কেন্দ্র স্থাপন :** মুক্তিযুদ্ধের চেতনা জনগণের চাহিদা ও প্রয়োজনীয়তা বহুগুণে বাড়িয়ে দেয়। ফলে স্থাপিত হয় নতুন নতুন বিভিন্ন প্রশাসনিক কেন্দ্র। এ প্রশাসনিক ব্যবস্থা স্থাপিত হওয়ায় জনগণ রাষ্ট্রের বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা সহজেই ভোগ করতে পারে। জনগণ রাষ্ট্রের কাঠামো সম্পর্কে ভালোভাবে বুঝতে পারে।

১০. **শহরায়ন :** মুক্তিযুদ্ধের চেতনার একটি উল্লেখযোগ্য প্রভাব হলো শহরায়ন। শিল্পায়নের ফলে প্রয়োজনীয় লোকের যোগান দিতে গ্রামীণ জনগণ শহরে ভিড় জমাচ্ছে। এতে করে শহরের আয়তন বাড়ানোর প্রয়োজন হয় এবং শহর সংলগ্ন গ্রামও শহরে পরিণত হয়।

১১. **পরিবার ব্যবস্থায় ভাঙ্গন :** মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাংলাদেশের গ্রামীণ সমাজে যে বিষয়ের ব্যাপক পরিবর্তন হয় তা হলো পরিবার ব্যবস্থা। এক সময় সমাজে যৌথ পরিবার ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু সমাজের লোকজন শিক্ষা-দীক্ষা, চাকরি ও কাজের সন্ধানে শহরমুখী হওয়ায় আগেকার পরিবার ব্যবস্থা আর নেই। এখন পরিবার ব্যবস্থা ভেঙে গিয়ে একক পরিবার গঠিত হচ্ছে। যৌথ পরিবার ব্যবস্থায় মা-বাবা, ভাই-বোন সকলকে নিয়ে বসবাস করতো। কিন্তু সামাজিক গতিশীলতার কারণে মানুষ সে যৌথ পরিবার ব্যবস্থা ধরে রাখতে পারছে না। কারণ চাকরি বা অন্য কোনো কারণে মানুষ এক জায়গা হতে অন্য জায়গায় স্থানান্তর হচ্ছে। ফলে একক পরিবার গঠিত হচ্ছে।

১২. **নারীদের অবস্থান :** গ্রামীণ নারীদের ব্যাপক পরিবর্তন আনে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা। এক সময় গ্রামের নারীরা ঘরের বাইরে কাজ করতে পারত না। তারা ঘরের কাজে আবদ্ধ থাকত এবং শিক্ষা দীক্ষার ক্ষেত্রেও তারা পিছিয়ে ছিল। কিন্তু স্বাধীনতার পর বাংলাদেশের গ্রামীণ নারীদের ব্যাপক পরিবর্তন হয়। তারা শিক্ষা-দীক্ষায় এগিয়ে যায় এবং চাকরি-বাকরির ক্ষেত্রে জায়গা করে নেয়।

১৩. **মিশ্র সংস্কৃতির উদ্ভব :** পূর্ব পাকিস্তান সরকার এ দেশের সংস্কৃতিকে ধ্বংস করার চক্রান্ত করেছিল। কিন্তু তারা সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হয়। মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বলীয়মান হয়ে বাংলাদেশের জনগণ সংস্কৃতির ব্যাপক পরিবর্তন ঘটায়। এদেশের গ্রামীণ সংস্কৃতির পাশাপাশি বিদেশী সংস্কৃতির আগমন ঘটে। ফলে একটা মিশ্র সংস্কৃতির উদ্ভব ঘটে। শহরের সংস্কৃতির প্রভাব, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি এবং বিদ্যুতের প্রসারের ফলে গ্রামেও বিস্তৃতি লাভ করেছে।

১৪. **তারুণ্যের দেশপ্রেম চেতনা :** মুক্তিযুদ্ধের চেতনা স্বাধীন বাংলাদেশের তরুণদেরকে দেশপ্রেমে নব উদ্যমে নব জাগ্রত চেতনায় ব্যাপকভাবে উজ্জীবিত করেছে। তাই আজ স্বাধীনতাবিরোধীদের সর্বোচ্চ শাস্তির দাবিতে বিভিন্ন আন্দোলন, সমাবেশ ও অনশন করতে দেখা যায়। যার বাস্তব উদাহরণ চিহ্নিত যুদ্ধাপরাধী কাদের মোল্লার ফাঁসির দাবিতে ৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৩ সালে গড়ে উঠা শাহবাগের গণজাগরণ মঞ্চের অব্যাহত আন্দোলন।



খ. **নেতিবাচক প্রভাব :**

১. **রাজনীতির উপর অনাস্থা :** বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরপরই যুদ্ধাপরাধীদের ক্ষমা করে দেয় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। ফলশ্রুতিতে জুলিও কুরি শান্তি পদক পায়। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্ভাসিত মানুষের ওপর এর মারাত্মক প্রভাব পড়ে। অন্যদিকে বাম মুক্তিযোদ্ধাদের ওপর চলে নির্মম নিপীড়ন। ফলে মানুষ আস্থা হারাতে থাকে রাজনীতির ওপর। স্বপ্নপূরণের ব্যর্থতা অচিরেই প্রকটতা পায়।

২. **ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ ও বিশৃঙ্খল অবস্থা :** স্বাধীনতার মাত্র ৩ বছরের মাথায় নানা অনিয়ম, দুর্নীতি ও ভঙ্গুর অর্থনীতিকে কেন্দ্র করে দেখা দেয় ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ। দুর্ভিক্ষের চরম অবস্থা মোকাবেলার লক্ষ্যে দেশ-বিদেশ থেকে উপযুক্ত ত্রাণ আসার পরও তা সবার কাছে না পৌছানো মানুষকে অস্থিরতায় ফেলে দেয়। ফলে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ভূলুণ্ঠিত হয়।

৩. **রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড :** স্বাধীনতার পর ক্ষমতার মোহ ও লোভের বশবর্তী হয়ে মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে অবজ্ঞা করে কিছু উচ্ছৃঙ্খল সামরিক অফিসার ও উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা বাংলাদেশে রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডের রাজনীতি শুরু করে। ফলে সংঘটিত হয় ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট এর মত ভয়াবহ রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড। এতে শেখ মুজিবুর রহমান সপরিবারে নিহত হন। এ রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড আরো একটি বড় রকমের ধাক্কা দেয় সাধারণ মানুষের জীবনে। এরপর বার বার সামরিক শাসনের কবলে পড়ে বাংলাদেশের সাধারণ জীবন পর্যুদস্ত হয়ে ওঠে।

৪. **মুক্তিযোদ্ধা-অমুক্তিযোদ্ধা দ্বন্দ্ব :** মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে ঘিরে স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলাদেশে শুরু হয় মুক্তিযোদ্ধা-অমুক্তিযোদ্ধা দ্বন্দ্ব। মুক্তিযোদ্ধারা চাকরি, শিক্ষা সর্বক্ষেত্রে অমুক্তিযোদ্ধাদের তুলনায় সুযোগ-সুবিধা বেশি পাওয়ায় এ দ্বন্দ্ব প্রকট আকার ধারণ করে। এতে করে উভয়পক্ষের মাঝে এক প্রকার চাপা ক্ষোভ বা স্নায়ুযুদ্ধ বিরাজমান।

৫. **স্বাধীনতার পক্ষ-বিপক্ষ দ্বন্দ্ব :** স্বাধীনতার পক্ষ-বিপক্ষ দ্বন্দ্ব স্বাধীনতার পর থেকে বর্তমান পর্যন্ত চরম আকার ধারণ করেছে। মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাসী ব্যক্তিবর্গ স্বাধীনতার পক্ষ আর বাকিরা স্বাধীনতার বিপক্ষ শক্তি। এ দ্বন্দ্বকে কেন্দ্র করে আজকাল প্রায়শই হরতাল, ভাঙচুর, জ্বালাও-পোড়াও এর মত সহিংস কার্যকলাপ লক্ষ্য করা যায়।

**উপসংহার :** স্বাধীনতা-পূর্ব বাংলাদেশের গ্রামীণ পরিবেশ ছিল এক অন্ধকার অমানিশায় ডুবে, ছিল না শিক্ষার হার, ছিল না আধুনিকতার কোনো ছাপ। কিন্তু স্বাধীনতার পর মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাংলাদেশের গ্রামীণ সমাজ কাঠামোতে ব্যাপক পরিবর্তন আনে। স্বাধীনতার পর সরকার গ্রামীণ অবকাঠামো পরিবর্তনের জন্য নানা ধরনের কর্মসূচি হাতে নেন। রাস্তাঘাটসহ স্কুল, কলেজ বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলে। লোকজন শিক্ষিত হয়ে চাকরি-বাকরি প্রভৃতি ক্ষেত্রে নিয়োজিত হয় এবং গ্রামীণ কুসংস্কার, গোঁড়ামি ইত্যাদি রহিত হয়। গ্রামীণ নারীরা শিক্ষা সচেতন হয়েছে। গ্রামীণ মেয়েদের উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত করার লক্ষ্যে গ্রামাঞ্চলে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত মেয়েদের অবৈতনিক শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। অর্থাৎ মুক্তিযুদ্ধের চেতনাই আমাদেরকে পথে এগিয়ে নিয়ে এসেছে এবং সে চেতনাই এ দেশবাসীর উত্তরোত্তর উন্নত জীবন গড়ার অনুপ্রেরণা।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

# শিক্ষা ও স্বাস্থ্য

## রচনা ৪৬ বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থা : সমস্যা ও সমাধান

**ভূমিকা :** শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড। পৃথিবীর যে জাতি যতো বেশি শিক্ষিত সে জাতি ততো বেশি উন্নত। শিক্ষাই পারে ব্যক্তির অন্তর্নিহিত গুণাবলির বিকাশ ঘটিয়ে প্রকৃত মানুষ তথা সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে। আর এ জন্য চাই মানসম্মত ও যুগোপযোগী শিক্ষা ব্যবস্থা। কারণ মানসম্মত শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমেই আমরা কেবল শিক্ষার ভালো মান আশা করতে পারি।

**বাংলাদেশের বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থা :** বর্তমান যুগ বিশ্বায়নের যুগ। এ যুগে পৃথিবী তথ্য ও প্রযুক্তি নির্ভর। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্যি যে, আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা প্রযুক্তি নির্ভর বা কারিগরি মাধ্যমে নয়। আমাদের দেশের শিক্ষাব্যবস্থা বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত। যেমন—

ক. বাংলা মাধ্যমে শিক্ষা ব্যবস্থা

খ. ইংরেজি মাধ্যমে শিক্ষা ব্যবস্থা

গ. মাদ্রাসা মাধ্যমে শিক্ষা ব্যবস্থা— ১. আলীয়া মাদ্রাসা ও ২. কওমী মাদ্রাসা।

পক্ষান্তরে, আমরা যদি উন্নত বিশ্বের দেশগুলোর দিকে তাকাই তাহলে আমরা দেখব সেখানে একমুখী শিক্ষা ব্যবস্থা প্রচলিত। আর আমাদের দেশে হরেক রকম শিক্ষা ব্যবস্থা। যার কারণে, আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা নানা সমস্যায় জর্জরিত।

**বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থার সমস্যা ও অসঙ্গতি :** বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ে এ পর্যন্ত অনেক আলোচনা হয়েছে এবং শিক্ষাব্যবস্থার বিভিন্ন বিষয় নিয়ে প্রায়ই বিতর্ক দেখা দেয়। তবে সার্বিকভাবে দেশের প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থাকে পর্যালোচনা করলে এতে অসংখ্য সমস্যা ও অসঙ্গতি চোখে পড়ে। আর এ কারণেই অব্যাহত প্রচেষ্টা আর কর্মসূচির পরও আমরা শিক্ষায় কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌছতে পারছি না। দেশের এক-তৃতীয়াংশ লোক এখনো নিরক্ষর। প্রাথমিক শিক্ষা থেকে উচ্চতর শিক্ষা পর্যন্ত প্রতিটি স্তরেই শিক্ষার নীতি, পদ্ধতি, ব্যবস্থাপনা, পরিচালনাসহ সকল ক্ষেত্রে রয়েছে অসংখ্য সমস্যা আর অসঙ্গতি। তাছাড়া সরকার একমুখী মাধ্যমিক শিক্ষা চালুর সিদ্ধান্ত নেয়ায় এ নিয়েও বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। নিচে বর্তমান বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থার কতিপয় সমস্যা ও এর সমাধান সম্পর্কে একটি নাতিদীর্ঘ আলোচনা করা হলো :

১. **প্রাথমিক স্তরে সমস্যা ও অসঙ্গতি :** যে কোনো জাতির শিক্ষাব্যবস্থার মূলভিত্তি হলো শিশুশিক্ষা। শিশুদের যদি যথাযথ নীতি ও পদ্ধতির আলোকে শিক্ষাদানের মাধ্যমে একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে নিয়ে যাওয়া যায় তাহলে জাতি অবশ্যই লক্ষ্য অর্জনে সমর্থ হবে। এক্ষেত্রে জার্মানি, জাপান প্রভৃতি দেশের কথা প্রণিধানযোগ্য। কিন্তু পরিতাপের বিষয়, আমাদের দেশের শিশুশিক্ষার নীতি, পদ্ধতি, কৌশল ও ব্যবস্থাপনাসহ সকল ক্ষেত্রেই অত্যন্ত বিশৃঙ্খল অবস্থা বিরাজ করছে।



দেশের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষকের অভাব, জরাজীর্ণ বিদ্যালয় ভবন, শিক্ষকদের উদাসীনতা, পাঠ্যবইয়ের সংকটসহ অজস্র সমস্যা লেগেই আছে। আবার কিন্ডারগার্টেনের নামে দেশে যে বিপুল সংখ্যক স্কুল গজিয়েছে এগুলোর সিলেবাস, শিক্ষকদের যোগ্যতা প্রভৃতি আদৌ মানসম্মত ও শিশুশিক্ষার উপযোগী কি-না তা খতিয়ে দেখার যেন কেউ নেই। তাছাড়া শহর এলাকায় যে সকল ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল গজিয়ে উঠেছে এগুলো অল্প বয়সে শিশুদের অতিমাত্রায় জ্ঞানদানের যে অপচেষ্টা চালাচ্ছে তা অনেক ক্ষেত্রেই হিতে বিপরীত হয়ে দেখা দিচ্ছে। কেননা শিশুরা প্রথম অবস্থায় যাই শেখানো হয় তাই শেখে। তাই বলে পর্যায়ক্রমে না এগিয়ে প্রথমে যদি তাদেরকে অতিমাত্রায় চাপ দেয়া হয় তাহলে এ চাপ এক পর্যায় তাদের জন্য অসহনীয় হয়ে পড়ে। তখন শিশুটি শিক্ষার মূল দৌড় থেকেই ছিটকে পড়ে। তখন বাংলা কিংবা ইংরেজি কোনো মাধ্যমেই সে নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারে না। সুতরাং সমন্বিত শিশু শিক্ষানীতি না থাকায় শিশুরা ভিন্ন ভিন্ন শিক্ষা, বিশ্বাস ও যোগ্যতায় বড় হচ্ছে, যা দীর্ঘমেয়াদে জাতীয় ঐক্য ও দৃষ্টিভঙ্গির বিকাশকেও বাধাগ্রস্ত করছে।

২. **পাঠ্যসূচির সমন্বয়হীনতা :** শিক্ষা একটি সামগ্রিক প্রক্রিয়া। কিন্তু প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট সিলেবাস অনুযায়ী শিক্ষার্থীদের শিক্ষাদান করা হয়। এতে শিশু থেকে উচ্চতর পর্যায় পর্যন্ত প্রতিটি পর্যায়ে শিক্ষার্থীর মননশীলতা, জাতীয় অগ্রাধিকার ও সময়ের প্রেক্ষিত বিবেচনায় সিলেবাস

### বাংলাদেশের সংবিধানে শিক্ষা সংশ্লিষ্ট বিধান

**অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষা।**

১৭। রাষ্ট্র

(ক) একই পদ্ধতির গণমুখী ও সার্বজনীন শিক্ষাব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য এবং আইনের দ্বারা নির্ধারিত স্তর পর্যন্ত সকল বালক-বালিকাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষাদানের জন্য,

(খ) সমাজের প্রয়োজনের সহিত শিক্ষাকে সঙ্গতিপূর্ণ করিবার জন্য এবং সেই প্রয়োজন সিদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যে যথাযথ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও সদিচ্ছা-প্রণোদিত নাগরিক সৃষ্টির জন্য,

(গ) আইনের দ্বারা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিরক্ষরতা দূর করিবার জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

**ধর্ম প্রভৃতি কারণে বৈষম্য।**

২৮। (১) কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী-পুরুষভেদ বা জন্মস্থানের কারণে কোন নাগরিকের প্রতি রাষ্ট্র বৈষম্য প্রদর্শন করিবেন না।

(২) রাষ্ট্র ও গণজীবনের সর্বস্তরে নারী পুরুষের সমান অধিকার লাভ করিবেন।

(৩) কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী, পুরুষভেদ বা জন্মস্থানের কারণে জনসাধারণের কোন বিনোদন বা বিশ্রামের স্থানে প্রবেশের কিংবা কোন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে ভর্তির বিষয়ে কোন নাগরিককে কোনরূপ অক্ষমতা, বাধ্যবাধকতা, বাধা বা শর্তের অধীন করা যাইবে না।

**ধর্মীয় স্বাধীনতা।**

৪১। (২) কোন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে যোগদানকারী কোন ব্যক্তির নিজস্ব ধর্ম-সংক্রান্ত না হইলে তাঁহাকে কোন ধর্মীয় শিক্ষাগ্রহণ কিংবা কোন ধর্মীয় অনুষ্ঠান বা উপাসনায় অংশগ্রহণ বা যোগদান করিতে হইবে না।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



প্রণয়ন করতে হয়। কিন্তু আমাদের দেশে সিলেবাস প্রণয়নে আমরা এখনো ঔপনিবেশিকতার বৃত্ত থেকে বেরিয়ে আসতে পারছি না। আমাদের শিশুদের, বিশেষ করে ইংরেজি মাধ্যম এবং কিন্ডারগার্টেন স্কুলে এখনো পশ্চিমা গল্প কাহিনী পড়ানো হয়। আমাদের জাতীয় ইতিহাস, ঐতিহ্য আর বিশ্বাসের বিষয়সমূহ সেখানে খুব কম গুরুত্ব পায়। রাজনৈতিক বিশ্বাস ও দলীয় দৃষ্টিভঙ্গির দুষ্টচক্র আমাদের শিশুর মস্তিষ্ককেও নানাভাবে বিকারগ্রস্ত করছে। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়েও ঘন ঘন সিলেবাস পরিবর্তন করা হচ্ছে। শিক্ষার্থীদের কাছে জাতির ইতিহাস-ঐতিহ্য আর বিশ্বাসের কোনো সমন্বিত রূপ তুলে ধরা যাচ্ছে না। ফলে এরা এক ধরনের দ্বিধা-দ্বন্দ্ব আর অস্পষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েই বড় হচ্ছে, যা জাতীয় সংহতি ও উন্নতির সমন্বিত প্রচেষ্টাকে ভণ্ডুল করার ক্ষেত্রে সূক্ষ্ম ভূমিকা পালন করছে।

সাম্প্রতিক সময়ে অবশ্য ইংরেজির প্রতি বেশ গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে। কিন্তু অত্যন্ত অবৈজ্ঞানিকভাবে হুট করেই নবম-দশম এবং উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে Communicative English চালু করা হয়েছে। Communicative English চালু করার আবশ্যকতা রয়েছে কিন্তু যে শিক্ষার্থী ভালোভাবে ইংরেজি পড়তেই পারে না তার জন্য সম্পূর্ণ নতুন এ পদ্ধতির সাথে খাপ খাওয়ানো খুবই কঠিন। প্রাথমিক স্তর থেকে ক্রমে এ ব্যবস্থার সম্প্রসারণ করা হলে শিক্ষার্থীরা নিজেদের প্রস্তুত করার সুযোগ পেত।

তাছাড়া Communicative system-এ ইংরেজি পড়ানোর আরেকটি সমস্যা হলো, ইতিপূর্বে যারা ইংরেজি বিষয়ে শিক্ষালাভ করেছেন তারা সকলেই ইংরেজি সাহিত্যে জোর দিতেন। Communicative English পড়ানোর উপযোগী কোর্স আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ছিল না। যদিও সম্প্রতি কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে এ বিষয়ে নতুন কোর্স চালু হয়েছে। তাই স্কুল, কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়েও শিক্ষকরা এ বিষয়ে যথাযথভাবে পাঠদান করতে পারছেন না।

সাম্প্রতিক সময়ের আরেকটি সমস্যা হলো, ঘন ঘন সিলেবাস পরিবর্তন করে শিক্ষাব্যবস্থার মৌলিক পরিবর্তনের চেষ্টা করা হলেও যোগ্য ও বিষয়ভিত্তিক শিক্ষকের অভাবে তা ফলপ্রসূ হয় না। এরূপ জটিলতার অন্যতম উদাহরণ হলো Communicative English চালু।

৩. **শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে ভাষা নির্বাচনে সমস্যা :** শিক্ষার মাধ্যম শিক্ষাব্যবস্থায় একটি গুরুত্বপূর্ণ বিবেচ্য বিষয়। একদিকে নিজস্ব ভাষা ও সংস্কৃতির সাথে সম্পর্ক রেখে শিক্ষাদান অন্যদিকে আন্তর্জাতিক ভাষা ও সংস্কৃতির সাথে জাতিকে পরিচিত করে প্রতিযোগিতামূলক বিশ্বে টিকে থাকার উপযোগী করে গড়ে তোলা—এ দ্বিবিধ প্রয়োজনীয়তার বিষয়টি বিবেচনা করতে হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে আমরা এখনো এ দুয়ের মধ্যে সমন্বয় সাধন করতে পারিনি। মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের নামে বাস্তবতা থেকে আমরা অনেক পিছিয়ে পড়েছি। কারণ আন্তর্জাতিক ভাষা হিসেবে ইংরেজির গুরুত্বকে অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই। আন্তর্জাতিক শ্রমবাজার, জ্ঞান-বিজ্ঞান-প্রযুক্তি, অর্থনৈতিক আদান-প্রদান সর্বত্র ইংরেজির যে রাজত্ব সেখানে আমাদের কোনো অনুপ্রবেশ নেই। তাই বাংলা ভাষার প্রতি অবজ্ঞা না করে বাস্তবতার নিরিখে আমাদেরকে দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে ইংরেজি গ্রহণ করতে হবে।



৪. **যোগ্য ও অভিজ্ঞ শিক্ষকের স্বল্পতা :** শিক্ষার্থীর শিক্ষা গ্রহণের বিষয়টি বহুলাংশে শিক্ষকের যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা আর আন্তরিকতার ওপর নির্ভর করে। অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়, আমাদের দেশের শিক্ষক সমাজ এক্ষেত্রে তাদের প্রয়োজনীয় ভূমিকা পালনে ব্যর্থ। এ ব্যর্থতার পেছনে অনেক কারণ থাকলেও অন্যতম কারণ শিক্ষকদের যোগ্যতার অভাব। বিশেষ করে বেসরকারি কলেজ ও স্কুলগুলোতে যে নিয়োগ পদ্ধতি রয়েছে তাতে অনেক অযোগ্য লোকও ডোনেশন, স্বজনপ্রীতি, আঞ্চলিক প্রভাব-প্রতিপত্তির বলে শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ পাচ্ছে। অন্যদিকে একসময় শিক্ষকতা সম্মানজনক বলে বিবেচিত হলেও বর্তমানে এর প্রতি মেধাবী ছাত্রদের আগ্রহ হ্রাস পাচ্ছে। শিক্ষকদের যে বেতন ভাতা ও সুযোগ-সুবিধা তাতে মেধাবী লোকদের এর প্রতি আগ্রহ না থাকারই কথা। তাই অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যেমন ইংরেজি, গণিত ইত্যাদির শিক্ষক পাওয়া যায় না।

৫. **নকল প্রবণতা :** পরীক্ষায় নকল আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার আরেকটি দুরারোগ্য ব্যাধি। এ ব্যাধির ফলে ছাত্র-শিক্ষক, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ জাতি অধঃপতনের দিকে যাচ্ছে। বর্তমানের এ নাজুক অবস্থা একদিনে সৃষ্টি হয়নি। শিক্ষা ক্ষেত্রের নানা অব্যবস্থাপনা আর রাজনীতির দুষ্টচক্র এ ব্যাধিকে দুরারোগ্য ব্যাধিতে রূপ দিয়েছে। সার্টিফিকেটসর্বস্ব শিক্ষার প্রতি অভিভাবক ও ছাত্রছাত্রীদের দুর্বলতা মূলত নকলের ব্যাপকতার জন্য দায়ী। পাশাপাশি রাজনৈতিক প্রভাবও এক্ষেত্রে বিরাটভাবে দায়ী। এক্ষেত্রে সরকারকে প্রশাসনের বিরুদ্ধে বা রাজনৈতিক নেতাদের বিরুদ্ধে কোনো কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে দেখা যায়নি। তবে সম্প্রতি সরকার এ ব্যাপারে বেশ কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে এবং গত কয়েকটি পরীক্ষায় নকল প্রতিরোধে সরকার সফলও হয়েছে।

৬. **বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষায় অসঙ্গতি :** উচ্চ শিক্ষার প্রসারে পৃথিবী জুড়েই ইদানীং বেসরকারি উদ্যোগে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার তোড়জোড় লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এ ধারায় বাংলাদেশেও নব্বই দশকের শুরুতে কতিপয় বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় এবং বর্তমানে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় দ্বিগুণ। কিন্তু ইদানীং এ সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মান, টিউশন ফিসহ অন্যান্য খরচের ব্যাপকতা, অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধা ও উদ্যোক্তাদের অব্যবস্থাপনা, যোগ্যতা ও বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। কেননা আমাদের মতো গরিব দেশে এ ধরনের শিক্ষার অর্থ হলো মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত শ্রেণীকে মেধা থাকা সত্ত্বেও শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা। তাছাড়া বিপুল অঙ্কের টাকার লোভে দিন দিন বেসরকারি কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা বেড়ে চলেছে কিন্তু এদের অধিকাংশেরই বিশ্ববিদ্যালয়ের মান অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নেই। তাছাড়া শিক্ষা বেচাকেনার হাট থেকে উদ্যোক্তারা যে বিপুল অঙ্কের টাকা হাতিয়ে নিচ্ছে তা নিয়ন্ত্রণের কোনো প্রয়াসও চোখে পড়ে না।

৭. **পাঠ্যপুস্তকের স্বল্পতা :** প্রয়োজনীয় বই তথা পাঠ্যপুস্তকের সংকট আমাদের শিক্ষাক্ষেত্রে অন্যতম অন্তরায়। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শ্রেণীর যে সকল বই বোর্ড নিয়ন্ত্রণ করে সেগুলোর নিম্নমান, যথাসময়ে বিতরণ না হওয়া ইত্যাদি সমস্যা প্রতি বছরই দেখা যায়। তবে বর্তমান সরকার প্রাথমিক শ্রেণীর মতো মাধ্যমিক শ্রেণীর বইও বিনামূল্যে বিতরণ করছে এবং বছরের শুরুতেই শিক্ষার্থীদের হাতে বই পৌছে দেয়ার সাফল্য দেখিয়েছে। অন্যদিকে মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের কথা বলা হলেও উচ্চ শিক্ষাক্ষেত্রে বাংলায় মানসম্মত বই বেশ দুর্লভ। একদিকে বাংলা বইয়ের সংকট অন্যদিকে ইংরেজির দুর্বলতা—এ দ্বিবিধ কারণে শিক্ষার্থীদের লেখাপড়া অনেকক্ষেত্রেই ব্যাহত হয়।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



**শিক্ষা ব্যবস্থার সার্বিক মান উন্নয়নে করণীয় :** শিক্ষার উন্নতি ও উন্নয়নে স্বাধীনতা পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সময়ে বহু শিক্ষা কমিশন গঠন হলেও প্রকৃতার্থে শিক্ষার উন্নয়ন হয়নি। তথাপি প্রচেষ্টা থেমে নেই। প্রতিটি সরকারই আপন আপন দৃষ্টিভঙ্গি ও চিন্তা-চেতনার আলোকে পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। তবে বর্তমান অবস্থা থেকে উত্তরণ এবং উন্নয়নের জন্য নিম্নোক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ জরুরি :

১. প্রাথমিক থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায় পর্যন্ত সিলেবাসের ক্ষেত্রে সমন্বয় সাধন জরুরি। বিশেষ করে ইংরেজি শিক্ষার ক্ষেত্রে তা অত্যাবশ্যক। হঠাৎ করে এসএসসি কিংবা এইচএসসি পর্যায়ে উন্নত সিলেবাস প্রণয়ন করলেও তা ছাত্রছাত্রীরা কার্যকরভাবে গ্রহণ করতে পারছে কিনা সে বিষয়টি বিবেচনায় আনতে হবে।

২. দেশে প্রচলিত বিভিন্ন প্রকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যকার সমন্বয় সাধন অত্যাবশ্যক। বিশেষ করে সরকারি প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রমের সাথে কিন্ডারগার্টেন ও মাদ্রাসা শিক্ষার সমন্বয় সাধন জরুরি।

৩. প্রাথমিক পর্যায় থেকেই ইংরেজি শিক্ষার ওপর জোর দেয়া আবশ্যক। বিশেষ করে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে ইংরেজি মাধ্যমে পড়াশোনাকে বাধ্যতামূলক করা উচিত।

৪. পরীক্ষায় নকল বন্ধের জন্য প্রথমেই স্কুল-কলেজগুলোতে বিনা-নকলে পাস করার উপযোগী পড়াশোনা হচ্ছে কিনা তা নিশ্চিত করা আবশ্যক। নতুবা নকল বন্ধ করে পাসের হার কমানো যাবে, শিক্ষার মান বাড়ানো যাবে না। আর শিক্ষার মান বাড়াতে না পারলে নকল প্রতিরোধের কোনো প্রচেষ্টাই কাজে আসবে না।

৫. শিক্ষকদের যোগ্যতা ও দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য শিক্ষক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম জোরদার করা আবশ্যক। শিক্ষকদের যথাযথ প্রশিক্ষণ দিতে না পারলে যত ভালো সিলেবাসই হোক না কেন তা ফলপ্রসূ হবে না।

৬. বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চ শিক্ষার মান নিরূপণ ও বজায় রাখার জন্য সরকারের আরো দৃঢ় কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। শিক্ষাকে বাণিজ্যিক পণ্য হিসেবে যথেচ্ছা বেচাকেনা করার সুযোগ দেয়া অনৈতিক। এক্ষেত্রে মেধার ভিত্তিতে নির্দিষ্ট সংখ্যক কোটা পূরণের বিধান করে দেয়া যেতে পারে, যেখানে মেধাবীরা বিশেষ সুযোগ-সুবিধায় পড়ার সুযোগ পাবে।

**উপসংহার :** আমাদের জাতিকে শিক্ষিত করে একটি উন্নত জাতি হিসেবে গড়ে তুলতে হলে অবশ্যই শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে গণসচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে। সচেতনতা ছাড়া কেবল পৃষ্ঠপোষকতা দিয়ে জাতির উন্নতি সম্ভব নয়।

## রচনা ৪৭ সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা : পরিকল্পনা ও সাফল্য

*[২৭তম; ২৪তম; ২৩তম বিসিএস]*

**ভূমিকা :** প্রত্যেক দেশেই জাতীয় আশা-আকাঙ্ক্ষা এবং আদর্শের প্রতিফলন ঘটে প্রাথমিক শিক্ষায়। প্রাথমিক শিক্ষা যে দেশে যত সুষ্ঠুভাবে দেয়া হয় সে দেশ তত বেশি উন্নত। প্রাথমিক শিক্ষার ভিত্তিভূমি দুর্বল হলে ব্যক্তির জীবনে তো বটেই, জাতীয়, সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের ওপরও তার ক্ষতিকর প্রভাব অপরিসীম। তাই দেশের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে সবার জন্য মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করা দরকার। বাংলাদেশ সরকার আশির দশকে এর গুরুত্ব অনুধাবন করে প্রাথমিক শিক্ষাকে সর্বজনীন, অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করেছে। এজন্য সরকার বিভিন্ন কর্মসূচি ও পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। কিন্তু এখন পর্যন্ত এ ক্ষেত্রে কাঙ্ক্ষিত সাফল্য অর্জন করা সম্ভব হয়নি। তাই দেশের সার্বিক উন্নয়নের স্বার্থে প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থায় বিদ্যমান সমস্যাসমূহ দূর করে এর মানোন্নয়ন করা জরুরি।



**সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা :** আমাদের দেশে সর্বজনীন শিক্ষা বলতে মৌলিক শিক্ষাকে বোঝায়, যা প্রধানত প্রাথমিক শিক্ষার মাধ্যমে দেয়া হয়। প্রাথমিক শিক্ষা আনুষ্ঠানিক শিক্ষার প্রথম স্তর। প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য দুটি : ১. মানসম্মত মৌলিক বা বুনিয়াদি শিক্ষা নিশ্চিতকরণ, ২. শিক্ষাব্যবস্থার পরবর্তী স্তরে প্রবেশের জন্য যোগ্যতা অর্জন। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের জন্য ১৯৭২ সালে গৃহীত সংবিধানে দেশে সর্বজনীন শিক্ষা প্রবর্তনের অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হয়। এতে বলা হয় :

"ক. একই পদ্ধতির গণমুখী ও সর্বজনীন শিক্ষাব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য এবং আইনের দ্বারা নির্ধারিত স্তর পর্যন্ত সকল বালক-বালিকাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষা দানের জন্য; খ. সমাজের প্রয়োজনের সহিত শিক্ষাকে সঙ্গতিপূর্ণ করিবার জন্য এবং সেই প্রয়োজন সিদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যে যথাযথ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও সদিচ্ছাপ্রণোদিত নাগরিক সৃষ্টির জন্য; গ. আইনের দ্বারা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিরক্ষরতা দূর করিবার জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।"

নিরক্ষরতা দূর করতে হলে প্রথমেই প্রয়োজন নিরক্ষরতার উৎসমূল বন্ধ করা অর্থাৎ মানসম্মত সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচির সফল বাস্তবায়ন। অবশ্য একই সাথে প্রয়োজন নিরক্ষর থেকে যাওয়া শিশু, কিশোর-কিশোরী ও বয়স্কদের জন্য ব্যবহারিক সাক্ষরতা কর্মসূচি ও অব্যাহত শিক্ষা কর্মসূচির সফল বাস্তবায়ন। বাংলাদেশে ৬-১০ বছর বয়সী ছেলেমেয়েদের জন্য সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচি শুরু হয় ১৯৮০ সনে অর্থাৎ দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার (১৯৮০-১৯৮৫) সূচনালগ্নে। এই কর্মসূচির বাস্তবায়ন তিন দশকের অধিক সময় ধরে চলে আসছে। কিন্তু গণদারিদ্র্য ও গণনিরক্ষরতার মতো সমস্যায় নিমজ্জিত বাংলাদেশে সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়ন একটি দুরূহ ও সময়সাপেক্ষ কাজ।

**প্রাথমিক শিক্ষার গুরুত্ব :** এ কথা সর্বজনবিদিত যে, আমাদের জাতীয় জীবনের সকল সমস্যা, সংকট ও দুর্দশার মূল উৎস নিরক্ষরতা। এই অভিশাপ থেকে যদি আপামর জনসাধারণকে মুক্ত করা যেত তাহলে বর্তমানে জাতীয় জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে অর্থাৎ কৃষি, স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা, সমাজসেবা, সমবায় ইত্যাদি জাতিগঠনমূলক সকল উন্নয়ন প্রচেষ্টাই সাফল্যমণ্ডিত হয়ে উঠত। আমাদের ব্যক্তিগত, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রের অধিকাংশ সমস্যা বা সংকট শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর দ্বারাই সমাধান করা সম্ভব হতো।

**প্রাথমিক শিক্ষার উপযোগিতা :** সাম্প্রতিককালে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, প্রাথমিক শিক্ষা শুধু প্রতিটি শিশুর মানবিক গুণাবলী অর্জনের জন্যই প্রয়োজন নয়, প্রাথমিক শিক্ষা একটি দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অগ্রগতির জন্যও আবশ্যকীয় পূর্বশর্ত। প্রাথমিক শিক্ষা শুধু মানুষকে সাক্ষরতা এবং ভাষা ও গণিতের দক্ষতা দেয় না, সেই সঙ্গে তার বিচারবুদ্ধির বিকাশ ঘটায়, মাঠে-ময়দানে, কল-কারখানায় কর্মীদের কর্মদক্ষতা ও উৎপাদনশীলতা বাড়ায়, মানুষকে উদ্যমশীল করে এবং জীবনের নানা মৌলিক চাহিদা যথা—পুষ্টি, আশ্রয়, পোশাক, স্বাস্থ্য এসব মেটাবার ক্ষমতা বাড়িয়ে তোলে।

বিশ্বব্যাংকের এক সমীক্ষায় পাওয়া যায়, প্রাথমিক শিক্ষায় শিক্ষিত একজন ব্যক্তির আয়, প্রাথমিক শিক্ষায় শিক্ষিত নন এমন একজন ব্যক্তির তুলনায় ৫২.৬ শতাংশ বেশি। তেমনিভাবে মাধ্যমিক শিক্ষায় শিক্ষিত একজন ব্যক্তির আয় একই স্তরের শিক্ষায় শিক্ষিত নন এমন ব্যক্তির চেয়ে ৭.২ শতাংশ বেশি। আর একজন স্নাতক ডিগ্রিধারীর আয় বেড়ে যায় ১৬.২ শতাংশ। এ ছাড়া প্রাথমিক শিক্ষায় শিক্ষিত একজন নারীর আয় বৃদ্ধির পরিমাণ ৯২.২৫ শতাংশ। কাজেই দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্যও প্রাথমিক শিক্ষার উপযোগিতা সবচেয়ে বেশি।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



**প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য :** গতিশীল সামাজিক জীবনের চাহিদা এবং সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা ও বাস্তবায়নের প্রেক্ষিতে প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য ও সাধারণ উদ্দেশ্যসমূহ নির্ধারণ করা হয়। বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক পটভূমির প্রেক্ষিতে নিচে বর্ণিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ প্রাথমিক শিক্ষার জন্য চিহ্নিত করা হয় :

১. শিক্ষার্থীর মনে সর্বশক্তিমান আল্লাহতায়ালার প্রতি অটল আস্থা ও বিশ্বাস গড়ে তোলা যেন এই বিশ্বাস তার সমগ্র চিন্তা ও কর্মে অনুপ্রেরণার উৎস হিসেবে কাজ করে।
২. সর্বশক্তিমান আল্লাহতায়ালার প্রতি পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাসের ভিত্তিতে শিক্ষার্থীর আধ্যাত্মিক, সামাজিক ও নৈতিক মূল্যবোধ জাগিয়ে তোলা।
৩. পারস্পরিক সমঝোতা এবং সকলের প্রতি শ্রদ্ধার মনোভাব সৃষ্টি করা।
৪. কায়িক শ্রমের প্রতি ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি এবং শ্রমজীবী মানুষের প্রতি শ্রদ্ধার মনোভাব গড়ে তুলতে সাহায্য করা।
৫. পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণের জন্য শিক্ষার্থীকে তার অধিকার, কর্তব্য ও দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন করে তোলা।
৬. সুনাগরিক হিসেবে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায়/প্রতিষ্ঠানে কার্যকর অংশগ্রহণের জন্য শিক্ষার্থীকে অধিকার অর্জনে এবং কর্তব্য ও দায়িত্ব সম্পাদনে প্রশিক্ষণ দেয়া।
৭. দেশপ্রেমের চেতনায় উদ্বুদ্ধ করে তোলা।
৮. জাতীয় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি সম্পর্কে জ্ঞান দান করা এবং এগুলোর প্রতি শ্রদ্ধাবোধ জাগিয়ে তোলা।
৯. শিক্ষার্থীর শারীরিক বিকাশে সহায়তা করা এবং স্বাস্থ্যকর জীবনযাপনের অভ্যাস ও মনোভাব গড়ে তুলতে সাহায্য করা।
১০. ভাষা, সংখ্যাজ্ঞান ও হিসাব সম্পর্কিত মৌলিক দক্ষতা অর্জনে সহায়তা করা।
১১. শিক্ষার্থীদের মনে বিশ্বভ্রাতৃত্ব এবং আন্তর্জাতিকতাবোধ জাগিয়ে তোলা।
১২. বিদেশী ভাষা হিসেবে ইংরেজির প্রাথমিক দক্ষতা অর্জন এবং ব্যবহারে সহায়তা করা।

**প্রাথমিক স্তরের পাঠ্যবিষয় :** প্রাথমিক শিক্ষার উপরোক্ত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহকে বাস্তবে রূপায়িত করার জন্য যেসব বিষয়াবলি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বিভিন্ন শ্রেণীর জন্য নির্বাচন করা হয়েছে সেগুলো হলো : মাতৃভাষা (বাংলা), ইংরেজি, গণিত, বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয়, পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ ও বিজ্ঞান), ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা (ইসলাম, হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রিস্টান) শরীরচর্চা, চারু ও কারুকলা এবং সঙ্গীত। শিক্ষার্থীরা যারা যে ধর্মাবলম্বী তারা সেই ধর্ম বিষয়ে অধ্যয়ন করবে।

**প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়নে সরকার গৃহীত কার্যক্রম :** প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়নে এবং সম্প্রসারণে সরকারের উদ্দেশ্য ছিল নতুন স্কুল প্রতিষ্ঠা করা, সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শ্রেণীকক্ষ বাড়ানো, স্কুল পুনর্নির্মাণ, মেরামত, রেজিস্টার্ড বেসরকারি স্কুলের উন্নয়ন, স্যাটেলাইট স্কুল নির্মাণ, শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচি চালু রাখা এবং উপজেলা রিসোর্স সেন্টার নামে নতুন প্রতিষ্ঠান চালু করা। এ সময় প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নে বাংলাদেশ সরকার ও উন্নয়ন সহযোগী বিভিন্ন সংস্থা যেমন— ADB, World Bank, DFID, UNICEF, IDA, SIDA, USAID ও IDB সম্মিলিতভাবে কাজ করে। প্রাথমিক শিক্ষার সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে তৎকালীন সরকার ২০০২ সালে ADB-এর আর্থিক সহায়তায় পরবর্তী ছয় বছরের জন্য এক নতুন পরিকল্পনা প্রণয়ন করে। এই



পরিকল্পনা 'প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন প্রোগ্রাম দুই' (PEDP-II) নামে পরিচিত। PEDP II-এর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল সরকারের শিক্ষানীতি, সবার জন্য শিক্ষা ও অন্যান্য প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী প্রাথমিক শিক্ষায় শিক্ষার্থী ভর্তি, পাঁচ বছর শিক্ষা কার্যক্রমের সঙ্গে থাকা, প্রাথমিক শিক্ষাচক্র সম্পন্ন করা এবং শিক্ষার হার ও শিক্ষার মানোন্নয়নে সহায়তা করা।

এছাড়াও প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়নে বাংলাদেশে সরকারের গৃহীত/গৃহীতব্য কার্যক্রমগুলো নিম্নরূপ :

১. প্রাথমিক শিক্ষার গুণগতমান উন্নয়নের লক্ষ্যে তৃতীয় প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি (পিইডিপি-৩) বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ কর্মসূচির আওতায় বিভিন্ন কার্যক্রমের মাধ্যমে বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী ছাত্রছাত্রীদের ভর্তি ও উপস্থিতির হার বৃদ্ধি, ভর্তিকৃত ছাত্রছাত্রীদের ঝরে পড়া রোধ এবং সংযোগ ঘন্টা (contact hour) বৃদ্ধির বিষয়ে অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়েছে।
২. বিদ্যমান নীতিমালা অনুযায়ী প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে মহিলা ও পুরুষ শিক্ষকের অনুপাত ৬০ ঃ ৪০ অনুসরণ করা হয়। বর্তমানে মহিলা ও পুরুষ শিক্ষকের অনুপাত হলো ৫৮.৪ ঃ ৪১.৬।
৩. বর্তমানে ২০১১ শিক্ষাবর্ষ থেকে পাঁচ বছরের বয়সের শিশুদের জন্য সব সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে 'শিশু শ্রেণী' নামে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হয়। প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণীতে অতিরিক্ত শিক্ষক নিয়োগের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
৪. ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যের সাথে সঙ্গতি রেখে প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থাপনায় মাঠ পর্যায়ে ১১০৯টি অফিসে ইন্টারনেট সংযোগসহ কম্পিউটার সরবরাহ করা হয়েছে এবং মাঠ পর্যায়ে সকল অফিস VPN/WAN এর মাধ্যমে কেন্দ্রীয় অফিসের সাথে সংযুক্ত করা হয়েছে।
৫. প্রতিবছর সারাদেশে পঞ্চম শ্রেণীর মূল্যায়ন পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। ২০০৯ সাল থেকে সারা দেশে অভিন্ন প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে পঞ্চম শ্রেণীতে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা এবং ২০১০ সাল থেকে এবতেদায়ী মাদ্রাসায় সমাপনী পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হচ্ছে।
৬. তৃতীয় প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি (পিইডিপি-৩) ২০১১-১২ অর্থবছর হতে বাস্তবায়ন শুরু হয়েছে। এ ছাড়াও বিদ্যালয় পর্যায়ে ইংরেজি শিক্ষার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে ইংলিশ ইন একশন প্রকল্প বাস্তবায়নের পরিকল্পনা রয়েছে।
৭. ৯ জানুয়ারি ২০১৩ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশের ২৬,১৯৩টি বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়কে জাতীয়করণের ঘোষণা দেন।

**অবকাঠামোগত উন্নয়ন :** সরকার ২০১১-১২ অর্থবছরে প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার অবকাঠামোগত উন্নয়নের লক্ষ্যে ৬৬৮টি সরকারি এবং ৯৭টি রেজিস্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয় পুনঃনির্মাণ সম্পন্ন করে, পিটিআইবিহীন ১২টি জেলা শহরে পিটিআই স্থাপন কার্যক্রম চালু করে এবং বিদ্যালয়বিহীন এলাকায় ১৫০০টি বিদ্যালয় স্থাপনের কার্যক্রম হাতে নেয়।

**প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়নের প্রতিবন্ধকতাসমূহ :** প্রাথমিক শিক্ষায় সর্বাধিক বাজেট বরাদ্দ, ছাত্র উপবৃত্তি প্রকল্প চালু, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠা, বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা আইনের প্রবর্তন, বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ইউনিট প্রতিষ্ঠা, প্রাথমিক শিক্ষার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ন এবং নানাবিধ পরিকল্পনা গ্রহণ করে দেশব্যাপী সর্বজনীন

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থাপনাকে শক্তিশালী করা হয়েছে। এসবের ফলে শিক্ষার হার ও সুযোগ-সুবিধার যথেষ্ট অগ্রগতি পরিলক্ষিত হলেও এখনো অনেক প্রতিবন্ধকতা দূর হয়নি। নিচে প্রতিবন্ধকতাগুলোর একটি চিত্র তুলে ধরা হলো :

- শ্রেণীকক্ষ ও শিক্ষক অপ্রতুলতা কাটেনি, ফলে অধিকাংশ স্কুলে তথাকথিত স্ট্যাগারিং পদ্ধতি চলছে।
- শহর ও গ্রামে শিক্ষার মান ও সুযোগ-সুবিধা সমান নয়। এ ব্যবধান ক্রমশ বাড়ছেই।
- ছাত্র হাজিরা অসন্তোষজনক। গড় উপস্থিতি মাত্র ৪০ থেকে ৬০ শতাংশ।
- ঝরে পড়ার হার এখনো অবাঞ্ছিত রকমের। বর্তমানে সরকারি হিসেবেই ৩৩ শতাংশ শিক্ষার্থী প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করার আগেই ঝরে পড়ে।
- শিক্ষক-শিক্ষার্থী অনুপাত অত্যন্ত বেশি। ফলে শিখন-শিক্ষণ কার্যক্রম মারাত্মকভাবে ব্যাহত হয়।
- পাঠদানের নির্ধারিত সময় অত্যন্ত কম, বছরে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে ৪৪৪ ঘণ্টা এবং তৃতীয় থেকে পঞ্চম শ্রেণীতে ৭৩৪ ঘণ্টা।
- মূল্যায়ন পদ্ধতি যুগোপযোগী নয়। অনেক ক্ষেত্রেই শিক্ষাক্রমের উদ্দেশ্যের সঙ্গে সঙ্গতিহীন।
- শৈশবকালীন শিশুদের পরিচর্যা ও উন্নয়ন এবং প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা বলতে কোনো কিছুর অস্তিত্ব নেই।
- শিক্ষকদের ইন সার্ভিস ট্রেনিং বলতে কিছু নেই। একদিনের সাব ক্লাস্টার ট্রেনিং থাকলেও তা যথেষ্ট নয়।
- স্কুল ম্যানেজিং কমিটি এবং শিক্ষক অভিভাবক সমিতির অধিকাংশেরই শিক্ষার প্রতি কোনো অঙ্গীকার নেই। ফলে প্রাথমিক শিক্ষায় সমাজ সম্পৃক্তকরণ ফলপ্রসূ নয়।
- শিক্ষকরা পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধিতে নিস্পৃহ।
- জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার বিভিন্ন সাব সেক্টর, শিক্ষা স্তর সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সমন্বয় ও সহযোগিতার অভাব শিক্ষা ক্ষেত্রে দেশের সার্বিক সিস্টেম লসের অন্যতম কারণ।

এছাড়া শিক্ষকদের আর্থিক দুরবস্থা, পদোন্নতি সমস্যা, ভৌত সুবিধার অপ্রতুলতা, দপ্তরি সমস্যা, শিশু জীবনের সঙ্গে শিক্ষাক্রমের অন্তর্ভুক্ত বিষয়বস্তুর প্রাসঙ্গিকতার অভাব, পর্যাপ্ত শিক্ষা উপকরণের অভাব, অভিভাবকদের দারিদ্র্য ও অসচেতনতা এবং রক্ষণশীল দৃষ্টিভঙ্গি, ব্যাপক ঘুষ ও দুর্নীতি, উচ্চপদে বিভাগবহির্ভূত লোকের পদয়ন ইত্যাদি  নানাবিধ কারণে সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার সুষম বিস্তার ও গুণগত মানোন্নয়ন ব্যাহত হচ্ছে।

**বর্তমান পরিস্থিতিতে করণীয় :** প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে বিরাজমান এসব সমস্যা সমাধানের জন্য ইতিপূর্বে যেসব পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে তার অনেকগুলোই যথেষ্ট অর্থ-সম্পদ বিনিয়োগের অভাবে ব্যর্থ হয়েছে। কাজেই সর্বাগ্রে শিক্ষা খাতে এবং প্রাথমিক শিক্ষা খাতে বরাদ্দের পরিমাণ অন্তত দ্বিগুণ করতে হবে। এছাড়া সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার সর্বিক মানোন্নয়নের জন্য যেসব পদক্ষেপ গ্রহণ করা দরকার সেগুলো হলো :

১. জরিপের মাধ্যমে দু কিলোমিটার দূরত্বের মধ্যে সব শিশুর জন্য পাঁচ বা ছয় কক্ষবিশিষ্ট বিদ্যালয় স্থাপন নিশ্চিত করা।
২. বিদ্যালয়গুলোর ভৌত পরিবেশ উন্নত করে তাতে প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষার্থীর বসার ব্যবস্থা ও যথেষ্ট পরিমাণ পাঠ্যপুস্তক, বোর্ড, চক প্রভৃতি শিক্ষা উপকরণের সরবরাহ নিশ্চিত করা।
৩. শিক্ষার্থী সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে উপযুক্ত মানের শিক্ষক সরবরাহ করা এবং তাদের পেশাগত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।



৪. আকর্ষণীয় শিক্ষাক্রম প্রবর্তন এবং তাতে শিশুদের দৈনন্দিন জীবনের প্রতিফলন, পরিবেশের ওপর গুরুত্ব দান ও আনন্দের উপকরণ সংযোজন করা।
৫. প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের পদোন্নতি এবং উচ্চতর বেতন স্কেল প্রদান করা।
৬. শিক্ষকদের কাজের ব্যাপকতা হ্রাস করা।
৭. প্রতিটি বিদ্যালয়ে দপ্তরি, অফিস সহকারী (করণিক) নিয়োগ করা।
৮. পিটিআই ও উপজেলা রিসোর্স সেন্টারকে আধুনিকীকরণের মাধ্যমে শিক্ষকদের যথাযথ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।
৯. ঘুষ, দুর্নীতি ও অপচয় বন্ধ করা।

**উপসংহার :** সর্বজনীন মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষার জন্য অপরিহার্য শর্ত হচ্ছে জাতীয় অঙ্গীকার, স্থানীয় জনগণের প্রচেষ্টা এবং সার্বিক গুণগত ব্যবস্থাপনা থাকা। সার্বিক গুণগত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে যোগ্য নেতৃত্ব, অনুপ্রাণিত জনশক্তি, অনুকূল পরিবেশ ও সহমর্মিতা, সংশোধনমূলক তদারকি এবং অধিকতর সামাজিক সম্পৃক্ততা অর্জন করা সম্ভব। আমরা যদি শিক্ষার জন্য একটা শক্তিশালী ভিত্তি রচনা করতে চাই তাহলে সৃজনশীল ও উদ্ভাবনীমূলক শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার অনুকূলে অবকাঠামো ও পরিবেশ ছাড়াও উন্নত যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষক-প্রশিক্ষক এবং মানসম্মত শিখন-শিক্ষাসামগ্রী যোগানের নিশ্চয়তা বিধান করতে হবে।

## রচনা ৪৮ গণশিক্ষা

*[১৩তম বিসিএস]*

**ভূমিকা :** যে কোনো জাতির উন্নতির মূলে রয়েছে শিক্ষা। পৃথিবীর সমস্ত সমৃদ্ধিশালী জাতির উন্নতির নেপথ্য কারণ যদি আমরা খুঁজি, তাহলে তাদের শিক্ষার ভূমিকাই সর্বাগ্রে আমাদের চোখে পড়ে। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য, বাংলাদেশের শতকরা প্রায় সত্তর জন লোকই অশিক্ষিত বা অক্ষরজ্ঞানহীন। এ বিপুল জনগোষ্ঠী যেখানে অশিক্ষা ও অজ্ঞতার অন্ধকারে ডুবে আছে, সেখানে দেশের সামগ্রিক কল্যাণ অসম্ভব। কাজেই এ দেশের নিরক্ষরতার বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করা খুবই জরুরি। আশার কথা যে, সাম্প্রতিককালে দেশের অনেক সচেতন নাগরিক এবং শিক্ষিত ও সমাজহিতৈষী ব্যক্তি এ কথা অনুধাবন করছেন যে, গণশিক্ষা অর্থাৎ সর্বজনীন শিক্ষাদান ব্যতীত দেশ তথা রাষ্ট্রের কল্যাণ হতে পারে না। তাছাড়া দেশের সরকারও শিক্ষার সম্প্রসারণে ব্যাপক ভূমিকা গ্রহণ করেছে।

**গণশিক্ষা কি :** একটি দেশের নর-নারী সকলকে উপযুক্ত শিক্ষাদান করলে তাকে 'গণশিক্ষা' বা 'সর্বজনীন' শিক্ষা বলে। দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ নর-নারী গ্রামে-গঞ্জেই বাস করে। এ দেশে সেকালের সভ্যতার কেন্দ্রস্থল ছিল গ্রাম। সুতরাং প্রাচীনকালে গ্রামবাসীদেরকে পুঁথিপাঠ, জারী গান, যাত্রা প্রভৃতির মাধ্যমে গণশিক্ষা দেয়া হলেও সে শিক্ষার যথেষ্ট ভূমিকা পালন করতে ব্যর্থ হয়েছে। ফলে যুগের পরিবর্তনের সাথে সাথে গ্রামের অজ্ঞ ও অশিক্ষিত লোকজন শক্তিমান শিক্ষিতদের ক্রীড়নকে পরিণত হয়েছে। অবিলম্বে এর প্রতিকার হওয়া দরকার। গণশিক্ষার প্রচলন ছাড়া এর সত্যিকারের প্রতিকার সম্ভবপর নয়। এর জন্য সর্বাগ্রে জনগণের মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে শিক্ষা বিস্তৃত হওয়া প্রয়োজন। নতুবা তারা দেশের উন্নতি কিংবা নিজেদের ভালোমন্দ বিচার করতে ব্যর্থ হবে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমাদের দেশে গণশিক্ষার অবস্থা অতীব শোচনীয়। মূলত গণশিক্ষা বলতে বোঝায় এমন একটি শিক্ষা, যা দ্বারা জনসাধারণ নিজেদের ভালো-মন্দ বিচার করার ক্ষমতা লাভ করে। মানুষ তখন কেবল নিজের

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



ব্যক্তিগত চিন্তায় মগ্ন থাকে না, বরং দেশের সামগ্রিক মঙ্গল চিন্তায় লিপ্ত থাকে। দেশ যদি বিপদের মধ্যে পড়ে তা হলে প্রত্যেকটি মানুষ ব্যক্তিগতভাবে বিপদের মধ্যে পড়বে, এ উপলব্ধি যখন প্রত্যেকটি মানুষের মধ্যে জাগ্রত হবে তখনি বুঝতে হবে যে, গণশিক্ষার ফল ফলতে শুরু করেছে।

**বাংলাদেশ ও গণশিক্ষা :** একটা স্বাধীন দেশে বর্তমান যুগে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠী মূর্খ ও নিরক্ষর হয়ে থাকবে, এটা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের ও লজ্জাজনক। আমাদের স্বাধীনতার তিন দশক পেরিয়ে গেছে। এর আগে পাকিস্তানিদের প্রবঞ্চনা ও ব্রিটিশদের অবহেলার কুচক্রে এ দেশের মানুষ শিক্ষার প্রতি আগ্রহী হয়নি। এজন্য শিক্ষার হার এত নিচে। আর শিক্ষার অভাবেই এ দেশ এত অনুন্নত। ফলে আমাদের দেশে গণশিক্ষার সমস্যা নিয়ে গভীর ভাবনা-চিন্তার বিশেষ প্রয়োজন রয়েছে। বর্তমান আর্থ-সামাজিক অবস্থায় এ সমস্যার সমাধান করা কঠিন। কারণ এখনো পর্যন্ত জীবনে শিক্ষার যে কত প্রয়োজন সে সম্পর্কে অনেকেরই সম্যক ধারণা নেই। আমাদের অসচেতনতা ও অবহেলার ফলেই এ অবস্থা। তাই এখন প্রয়োজন সুষ্ঠু পরিকল্পনা গ্রহণ এবং তার সঠিক বাস্তবায়ন।

**গণশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা**

শিক্ষা মৌলিক অধিকার। তাই শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা প্রশ্নাতীত। আমাদের দেশের শিক্ষার হার অতি নিচু। সঙ্গত কারণেই আমাদের দেশে গণশিক্ষার বিকল্প নেই। উন্নত দেশগুলো শিক্ষাকে জাতীয় সমস্যা হিসেবে ধরে নিয়ে বাধ্যতামূলক শিক্ষাব্যবস্থা সর্বস্তরে চালু করেছে বলে সর্বত্র উন্নতির জোয়ার বয়ে চলেছে। গণশিক্ষার মাধ্যম দেশপ্রেম, জাতীয়তাবোধ, চেতনা জাগ্রত হয় এবং শিল্প-সংস্কৃতির গুরুত্ব অনুভূত হয়। আর এর মাধ্যমে উপার্জন ও আর্থিক উন্নতিরও সুযোগ সৃষ্টি হয়। তাই গণশিক্ষার বিকল্প নেই।

**বাংলাদেশে গণশিক্ষার উদ্দেশ্য :** সরকার কর্তৃক গৃহীত গণশিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ হচ্ছে :

১. নিরক্ষর লোকদের সাক্ষরতা জ্ঞান অর্জন, কর্মদক্ষতা অর্জন ও উৎপাদনমুখী কর্মে উদ্বুদ্ধ করা।
২. মেধাবী নিরক্ষরদের সাক্ষরতা জ্ঞান ও মেধা বিকাশের মাধ্যমে সমাজের সম্পদে পরিণত করা, যাতে তারা আত্মনির্ভরশীল হতে পারে।
৩. ন্যূনতম লেখাপড়া শেখানো এবং সাধারণ হিসাব-নিকাশ করার মতো অঙ্ক শেখানো।
৪. উন্নয়নশীল পৃথিবীর আধুনিক গতিশীলতার সাথে পরিচয় করিয়ে তাদের বিবেক ও বুদ্ধির বিকাশ সাধন।
৫. বিভিন্ন পেশা, বৃত্তিমূলক কাজ, কৃষি উন্নয়ন, সমাজকল্যাণ ও আর্থিক সচ্ছলতা মোতাবেক সুখী জীবনযাপনে সক্ষম করে তোলা।
৬. শিক্ষার মাধ্যমে জ্ঞান, শক্তি, সহনশীলতা ও মানবীয় জ্ঞানের বিকাশ সাধন।
৭. নিজেদের অধিকার, দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সজাগ করে তোলা।
৮. সমাজের সমস্যা সমাধানে নির্দিষ্ট ভূমিকা পালনের শিক্ষাদান এবং জাতীয় উন্নয়ন ত্বরান্বিত করা।

**বাংলাদেশে গণশিক্ষা কার্যক্রমের সূচনা :** ব্যাপক ভিত্তিতে বাংলাদেশের দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী (১৯৮০-৮৫) পরিকল্পনায় শিক্ষা মন্ত্রণালয় একটা গণশিক্ষা কর্মসূচি গ্রহণ করে। গণশিক্ষা সাক্ষরতা কর্মসূচির অন্যতম লক্ষ্য ছিল গ্রামীণ অশিক্ষিত লোকদের সাক্ষরতা দান করা। এ সাক্ষরতা প্রদান শুধু লিখতে ও পড়তে জানাতেই সীমাবদ্ধ থাকবে না। বরং এ শিক্ষা প্রদানের উদ্দেশ্য ছিল তাদের এ শিক্ষা গ্রহণ করে সাধারণ চিঠিপত্র লেখা, পারিবারিক হিসাবপত্র রাখা, খবরের কাগজ পড়া ও গ্রামীণ উন্নয়ন সংক্রান্ত সহজ ভাষায় লেখা সরকারি প্রচার পুস্তিকা পড়ে ও বুঝে নিজ নিজ এলাকায় উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণের যোগ্যতা অর্জন করা। এ কাজ সফলভাবে সম্পন্ন করার জন্য কিছু কিছু ব্যবস্থাও গ্রহণ করা হয়েছিল।



**এনজিওসমূহের গণশিক্ষা কার্যক্রম :** বাংলাদেশে দেশী-বিদেশী বিভিন্ন এনজিও তাদের শিক্ষা কার্যক্রমের আওতায় গণশিক্ষা কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। ইউনিসেফ, ব্র্যাক, প্রশিকা, গণ সাক্ষরতা সমিতি প্রভৃতি এনজিও গ্রামে-গঞ্জে স্কুল প্রতিষ্ঠা করে অত্যন্ত আধুনিক প্রক্রিয়ায় গণশিক্ষা কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। তাদের এ কার্যক্রম অনেক ক্ষেত্রেই ব্যাপক সাফল্য অর্জন করেছে এবং কার্যকর বলে প্রমাণিত হয়েছে।

**বর্তমান সরকারের গণশিক্ষা কার্যক্রম :** গণশিক্ষা কার্যক্রমকে বাস্তব রূপদানের উদ্দেশ্যে সরকার ইতোমধ্যেই প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এর মধ্যে বিদ্যালয়, ক্লাব, মসজিদ, বাড়ির আঙ্গিনা প্রভৃতি স্থানে বয়স্কদের জ্ঞানদান কার্যক্রম পরিচালনার ব্যবস্থা করা হয়েছে। আন্তর্জাতিক সাহায্যে বই-পুস্তক, খাতা ইত্যাদি বিনামূল্যে সরবরাহ করা এ সকল কার্যক্রমের অন্যতম। এছাড়া সরকারি স্কুলগুলো শিফটে পরিচালনার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে এবং ইতোমধ্যেই দেশের বিভিন্ন জেলা ও উপজেলার বিভিন্ন স্কুলে দুই শিফটে ক্লাস হচ্ছে। সবকারি এ কার্যক্রমের ফলে দেশের অনেক জেলা নিরক্ষরমুক্ত হয়েছে বলে ঘোষণা করা হয়েছে। এছাড়া শিক্ষার বিষয়ে জনগণের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

**উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় :** দেশে ১৯৯২ সালে উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রম শুরু হওয়ার পর থেকে উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় বিজ্ঞানভিত্তিক পরিকল্পনার মাধ্যমে স্বল্পশিক্ষিত জনগণকে উচ্চশিক্ষিত করার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। বিশেষ পরিকল্পনায় এসএসসি কার্যক্রমের মাধ্যমে ঝরে পড়া মেধাশক্তিকে পুনরুজ্জীবনের সুযোগ দেয়া হচ্ছে। এক্ষেত্রে ঘরে বসেই বেতার ও টেলিভিশনের মাধ্যমে ২ থেকে ৫ বছর মেয়াদে এসএসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া সম্ভব। এ কার্যক্রমও অত্যন্ত ফলপ্রসূ বলে বিবেচিত ও প্রংশসিত হচ্ছে।

**উপসংহার :** দেশের লক্ষ লক্ষ জনগোষ্ঠীকে নিরক্ষরমুক্ত করা এবং জাতীয়ভাবে মানব সম্পদ উন্নয়নের জন্য শিক্ষার বিস্তার অত্যন্ত জরুরি। আর এক্ষেত্রে সুষ্ঠু ও বাস্তবভিত্তিক গণশিক্ষা কার্যক্রম ফলপ্রসূ ও কার্যকর বলে প্রমাণিত। বাংলাদেশ সরকার তথা দেশী-বিদেশী বিভিন্ন  ফোরাম, এনজিওর সার্বিক সহযোগিতায় সুপরিকল্পিত ব্যবস্থা গ্রহণ করে গণশিক্ষা কার্যক্রমকে সফল করে তুলতে হবে। এ ক্ষেত্রে শ্রীলঙ্কা ও ইন্দোনেশিয়ার অভিজ্ঞতা কাজে লাগানো যেতে পারে এবং বর্তমান কার্যক্রমকে আরো সুবিন্যস্ত ও সম্প্রসারিত করা যেতে পারে।

## রচনা ৪৯ মানবসম্পদ উন্নয়নে শিক্ষা

### দক্ষ জনশক্তি উন্নয়নে বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থা

**ভূমিকা :** একটি দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় সম্পদগুলোর মধ্যে মানবসম্পদ অন্যতম। মানবসম্পদ আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য অত্যাবশ্যকীয় মৌলিক উপাদান। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত, টেকসই ও দীর্ঘমেয়াদি করার ক্ষেত্রে দক্ষ মানবসম্পদের ভূমিকা বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। কারণ মানুষের জন্যই উন্নয়ন এবং মানুষই উন্নয়নের অপরিহার্য নিয়ামক। তাই অর্থসম্পদ ও ভৌতসম্পদের প্রাচুর্যতা থাকা সত্ত্বেও যদি মানবসম্পদের দুষ্প্রাপ্যতা থাকে তাহলে সে ক্ষেত্রে উন্নয়নের প্রক্রিয়া ও গতি মন্থর হয়ে পড়ে। বাংলাদেশ বিভিন্ন প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যেও মানবসম্পদ উন্নয়নের মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক উন্নতি সাধনের জন্য অব্যাহত প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। আর এ লক্ষ্য অর্জনের অন্যতম হাতিয়ার হিসেবে শিক্ষাকে চিহ্নিত করা হয়েছে।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



**মানবসম্পদ কী :** মানবসম্পদ বলতে কী বুঝায় সে সম্পর্কে বিশেষজ্ঞগণ তাদের নিজ নিজ দৃষ্টিকোণ থেকে ভিন্ন ভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন। বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ পল জে মায়ার বলেছেন, 'The greatest natural resource of our country is its people'. আধুনিক অর্থনীতিবিদগণ মনে করেন, অন্যান্য সম্পদের মতো মানুষও জাতির সম্পদ। বিভিন্ন অর্থনৈতিক সমীক্ষা ও বিশ্লেষণ থেকে দেখা গেছে, কোনো দেশের জাতীয় আয় (GNP) যেমন তার প্রাকৃতিক সম্পদের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ঠিক তেমনি দেশের মানুষের গুণগত মানের সঙ্গেও সম্পর্কযুক্ত। অর্থাৎ সমাজে বসবাসকারী ব্যক্তিদের ছাড়া সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নতি কোনো ক্রমেই সম্ভব নয়। সমাজের উন্নয়নে প্রকৃতপক্ষে অর্থ ও বস্তুসম্পদের মতো ব্যবহৃত হচ্ছে মানবসম্পদ। বিশিষ্ট চিন্তাবিদ কার্ল মার্কস মানুষকে তাই মানবীয় মূলধন (Human capital) হিসেবে বিবেচনা করেছেন। এই মানবীয় মূলধনকে আধুনিক পরিভাষায় মানবসম্পদ (Human resource) হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। মানবশক্তি তখনই মানবসম্পদে রূপান্তরিত হয়, যখন তাকে সুপরিকল্পিতভাবে পরিচালনা করা যায়।

**মানব কখন মানবসম্পদ হিসেবে বিবেচিত হবে :** মানবসম্পদ (Human resource) সম্পূর্ণভাবে স্বাভাবিক বা জন্মগত নয়। সাধারণ মানুষ বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জন করে মানবসম্পদে পরিণত হয়। স্বাভাবিক মানুষ এবং মানবসম্পদের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। যেমন—

১. কোনো ব্যক্তিকে তখনই সম্পদ হিসেবে বিবেচনা করা হবে যখন সে সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হবে। মানবসম্পদের একটি প্রয়োজনীয় উপাদান হলো স্বাস্থ্য বা দৈহিক সামর্থ্য।

২. কোনো ব্যক্তিকে তখনই সামাজিক দিক থেকে উপযোগী বা সম্পদ হিসেবে বিবেচনা করা হবে যখন সে সামাজিক কোনো না কোনো উৎপাদন প্রক্রিয়ায় দক্ষতার সঙ্গে অংশগ্রহণ করতে পারবে।

৩. প্রত্যেক মানুষের সাধারণ মানসিক ক্ষমতার সঙ্গে কিছু না কিছু বিশেষ মানসিক ক্ষমতা থাকে। এই বিশেষ মানসিক ক্ষমতা তাকে কোনো বিশেষ কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে সহায়তা করে। এই বিশেষ মানসিক ক্ষমতার অধিকারী ব্যক্তিকে মানবসম্পদ বলা হয়।

৪. মানবকে সম্পদ হিসেবে বিবেচনা করার একটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিবেচ্য উপাদান হচ্ছে সাক্ষরতা (Literacy)। কোনো ব্যক্তিকে সম্পদ হিসেবে বিবেচনা করা হবে তখনই যখন সে সামাজিক নির্দিষ্ট মান অনুযায়ী সাক্ষরতা অর্জন করবে।

**মানবসম্পদ উন্নয়ন কী :** মানবসম্পদ উন্নয়ন হলো জনসম্পদের এমন এক গুণগত পরিবর্তন প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে তারা উৎপাদনক্ষম ও দক্ষ জনশক্তি হিসেবে উৎপাদন প্রক্রিয়ায় ক্রমবর্ধিষ্ণুভাবে বলিষ্ঠ অবদান রাখতে পারে এবং মানবীয় শক্তি-সামর্থ্যের সর্বোত্তম বিকাশে সক্ষম হয়ে উঠতে পারে। আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (ILO) মানবসম্পদ উন্নয়ন বলতে ব্যক্তিকে কর্মে নিযুক্ত করার সম্ভাবনা বৃদ্ধির প্রক্রিয়াকে বিবেচনা করেছে। বিশ্বব্যাংকের মতে মানবসম্পদ উন্নয়ন হলো কোনো রাষ্ট্রের মানুষের সামগ্রিক বিকাশ প্রক্রিয়ার একটি অংশ, যার মাধ্যমে রাষ্ট্রের সমগ্র জনসংখ্যার কর্মে নিযুক্তির সম্ভাবনা বাড়ানো যায় এবং তার মাধ্যমে সামাজিক অসাম্য দূর করা যায়। (Human Resource development is a complementary approach to other development strategies, particularly employment and reduction of inequalities)। ফ্রেডারিক হার্বিসন ও চার্লস এ মায়ার্স-এর মতে, 'মানবসম্পদ উন্নয়ন বলতে এমন এক প্রক্রিয়াকে বুঝায় যার মাধ্যমে কোনো সমাজের সকল মানুষের জ্ঞান, দক্ষতা ও ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।' (Human Resource development is the process of increasing the knowledge, the skill and the capacities of all the people in a society.)



**মানবসম্পদ উন্নয়নের গুরুত্ব :** উন্নয়নের মূলে রয়েছে মানুষ। তাই পল্লী উন্নয়ন, প্রাকৃতিক সম্পদ উন্নয়ন, কৃষি উন্নয়ন, শিল্প উন্নয়ন ইত্যাদি ক্ষেত্রে অবদান রাখতে হবে মানুষকেই এবং উন্নয়ন ঘটাবে মানুষ। অতএব দেশে যত রকমের বস্তুসম্পদ এবং সম্ভাবনা থাকুক না কেন যতক্ষণ মানুষ এ সম্পদ আহরণ এবং ব্যবহার উপযোগী করতে না পারবে ততক্ষণ আমরা এ সেবা থেকে বঞ্চিত থাকবো। তাই দেশের জনসংখ্যাকে মানবসম্পদে পরিণত করতে হবে।

'৬০-এর দশকে সাহায্যদাতা সংস্থাগুলো মানবসম্পদ উন্নয়নকে একটি সার্বিক উন্নতি এবং আধুনিকায়নের 'ইঞ্জিন' হিসেবে গণ্য করতো। বর্তমানে যে কোনো দেশের জনগোষ্ঠী সেই দেশে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ হিসেবে বিবেচিত হয়। সীমিত ভূমি ও প্রাকৃতিক সম্পদের দেশ জাপান, হংকং, সিঙ্গাপুর ও নেদারল্যান্ড প্রমাণ করেছে যে, একটি দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও সামগ্রিক উন্নয়ন নির্ভর করে জনগণের দক্ষতা, পরিশ্রম ও উদ্যোগের ওপর। সুতরাং বলা যায় যে, উন্নয়ন প্রকৃতপক্ষে মানুষের দ্বারাই সংঘটিত হয়।

**মানবসম্পদ উন্নয়নের উপায় :** হার্বিসন এবং মায়ার্স তাদের গবেষণায় মানবসম্পদ উন্নয়নের ৫টি উপায় উল্লেখ করেছেন। যথা :

১. **আনুষ্ঠানিক শিক্ষা :** প্রাথমিক শিক্ষা স্তর থেকে শুরু করে বিভিন্ন কাঠামোর মাধ্যমিক শিক্ষা এবং কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ও উচ্চ পর্যায়ের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত শিক্ষাকে বোঝানো হয়েছে।

২. **কর্মকালীন প্রশিক্ষণ :** ধারাবাহিক বা উপানুষ্ঠানিক পদ্ধতিতে প্রতিষ্ঠানভিত্তিক বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করা।

৩. **আত্মউন্নয়ন :** যেমন জ্ঞান, দক্ষতা ও সামর্থ্যের উন্নয়ন যা ব্যক্তি তার নিজের চেষ্টায় আনুষ্ঠানিক উপায়ে অথবা দূরশিক্ষণ পদ্ধতিতে অনানুষ্ঠানিক উপায়ে পড়ে বা অন্যের কাছ থেকে শিখে নিজের আগ্রহ ও কৌতূহল অনুযায়ী ব্যাপক গুণমান, দক্ষতা ও যোগ্যতা অর্জনের মাধ্যমে নিজেকে তৈরি করে।

৪. **স্বাস্থ্য উন্নয়ন :** উন্নততর চিকিৎসা ব্যবস্থা এবং গণস্বাস্থ্য কার্যক্রমের মাধ্যমে কর্মরত জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্য উন্নয়ন।

৫. **পুষ্টি উন্নয়ন :** পুষ্টি মানুষের কর্মদক্ষতা বাড়িয়ে দেয়। ফলে মানুষ অধিক সময় ধরে কাজ করতে পারে এবং তার কর্মজীবন দীর্ঘ হয়।

**মানবসম্পদ উন্নয়নে শিক্ষার গুরুত্ব :** মানবসম্পদ উন্নয়ন নিঃসন্দেহে সকল প্রকার উন্নয়নের মূল চাবিকাঠি। আর এ ক্ষেত্রে শিক্ষার গুরুত্ব সর্বাধিক। কারণ শিক্ষাই হলো মানবসম্পদ উন্নয়নের প্রধান উপায়। সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা, উচ্চ হারের মাধ্যমিক শিক্ষা এবং সুনির্বাচিত উচ্চশিক্ষা যে দ্রুত প্রবৃদ্ধি অর্জনের হাতিয়ার হিসেবে কাজ করে থাকে সে শিক্ষা আমরা পাই পূর্ব এশিয়ার দেশগুলো থেকে। মানবসম্পদ সঞ্চয়নে শিক্ষা সেখানে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। আর মানবসম্পদ গঠনের এ প্রক্রিয়া ঐ অঞ্চলে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার বাড়াতে সক্রিয় ভূমিকা পালন করছে বলে প্রায় সকল বিশেষজ্ঞই এক মত। তবে এর পাশাপাশি রাষ্ট্র বস্তুগত অবকাঠামো উন্নয়ন, উপযুক্ত নীতি সমর্থন দিয়ে মানবসম্পদ উন্নয়নের গতিকে আরো সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যে নিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছে।

শিক্ষার প্রতি প্রাধান্য, বিশেষ করে প্রাথমিক শিক্ষার জন্য অর্থ প্রবাহিত করে পূর্ব এশিয়ার দেশসমূহ শুধু যে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিই অর্জন করতে সাফল্য দেখিয়েছে তাই নয় এর ফলে সামাজিক সাম্য অর্জন ও

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



মানুষের জীবনের মান উন্নয়ন ত্বরান্বিত হয়েছে। এসব দেশে আয়ের বৈষম্য কমেছে, শিশু মৃত্যুর হার কমেছে, স্বাস্থ্য সুবিধা বেড়েছে এবং জীবনের গড় আয়ু বেড়েছে। প্রাথমিক শিক্ষা খাতে রাষ্ট্র যেমন উদার হস্তে বিনিয়োগ করেছে, উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে তেমনি ব্যক্তিগত খাত তাদের চাহিদা মতো মানবসম্পদ তৈরির প্রয়োজনে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। প্রযুক্তির উন্নয়নে রাষ্ট্র গভীর মনোযোগ দিয়েছে।

পূর্ব এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলো তাদের শিক্ষাখাতে দীর্ঘমেয়াদে বেশ কিছু কার্যকরী পরিকল্পনা গ্রহণের মাধ্যমে এগিয়ে গেছে। এই দেশগুলোর অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জনের প্রাথমিক স্তরেই তাদের জনসংখ্যার প্রায় ১০০ ভাগকেই প্রাথমিক ও মৌলিক শিক্ষায় শিক্ষিত করেছে। কেবল তাই নয় এই শিক্ষা যেন সন্তোষজনক গুণগত মান অর্জন করতে পারে সেজন্য সরকারগুলো সর্বদা সতর্ক দৃষ্টি রেখেছে। তাছাড়া এই অঞ্চলের দেশগুলো শিক্ষার প্রতি জনগণের দৃষ্টিভঙ্গিতে আমূল পরিবর্তন আনতে সক্ষম হয়েছে। কেবল জ্ঞান অর্জন নয় বরং শিক্ষাকে জীবন এবং জীবিকার সাথে সম্পৃক্ত করার কথা তারা ভেবেছে সর্বাগ্রে।

প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের পরবর্তী শিক্ষাকে এসব দেশে শ্রম বাজারের চাহিদা অনুযায়ী গড়ে তোলা হয়েছে। যা এই পর্যায়ের স্নাতকদেরকে আন্তর্জাতিক মান অর্জনে সহায়তা করেছে। উদাহরণস্বরূপ সিঙ্গাপুর দ্রুত সাইবার অর্থনীতি গড়ে তুলেছে। এর জন্য তাদের প্রয়োজন একদল সৃজনশীল উচ্চ শিক্ষিত কর্মীবাহিনী। এ উদ্দেশ্যে সিঙ্গাপুর তাদের নিজস্ব বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সাথে বিশ্বের বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সংযোগ কার্যক্রম শুরু করে। উন্নয়ন এবং গবেষণা কার্যক্রমে ব্যয় করে চলছে ব্যাপকভাবে।

**মানবসম্পদ উন্নয়নে শিক্ষার অবদান :** মানুষকে উন্নয়নের হাতিয়ার হিসেবে বিবেচনায় আনলে উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নে মানবসম্পদের বিষয়টি মুখ্য হয়ে ওঠে। উন্নয়ন কর্মসূচির বাস্তবায়ন, সঠিক সংগঠন গড়ে তোলা এবং যথাযথ প্রযুক্তি নির্দিষ্টকরণ ও প্রয়োগের জন্য দক্ষ, যোগ্য, দেশপ্রেমিক, নিষ্ঠাবান, সৎ ও উৎপাদনশীল মানবসম্পদের প্রয়োজন। আর দেশের জনসম্পদকে মানবসম্পদে রূপান্তর করতে হলে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের কোনো বিকল্প নেই। কারণ শিক্ষা মানবসম্পদ উন্নয়নে বিভিন্নভাবে অবদান রাখে। যেমন—

১. **শিক্ষা পরিবর্তনের আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টি করে :** শিক্ষা আত্মসচেতনতা বাড়িয়ে দেয় এবং মানুষের মধ্যে পরিবর্তনের আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টি করে। শিক্ষা মানুষকে তাদের অভ্যাস, রীতিনীতি এবং সামাজিক অবস্থা ও ব্যবস্থাপনা জানতে সাহায্য করে এবং পরিবর্তনের আকাঙ্ক্ষা তাদের মধ্যে জাগ্রত করে।

২. **নিজের উদ্যোগে জ্ঞানার্জনের পথ সুগম করে :** নিরক্ষর ব্যক্তির জ্ঞান আহরণের সুযোগ অত্যন্ত সীমিত। কিন্তু নিরক্ষর ব্যক্তির সাক্ষর হলে নিজের আগ্রহ ও প্রয়োজন মতো বইপত্র, পুস্তিকা ও সংবাদপত্র পড়ে জ্ঞানার্জন করতে পারে এবং নিজের বিবেক ও বুদ্ধি খাটিয়ে নিজের ও পরিবারের উন্নয়ন এবং দেশের উন্নয়নমূলক কাজে অংশগ্রহণ করতে পারে।

৩. **শিক্ষা মানুষের চিন্তা ও বিচার শক্তির বিকাশ ঘটায় :** মানব সভ্যতার ইতিহাসে সাক্ষরতা অর্জনের আগে ও পরে সমাজের মধ্যে গুণগত পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। সংক্ষেপে বলা যায় একজন সাক্ষর ব্যক্তি যোগাযোগ স্থাপনে অধিকতর ক্ষমতার অধিকারী, সচেতনতায় তীক্ষ্ণধী এবং পরিবেশের ওপর অধিক নিয়ন্ত্রণের অধিকারী।



৪. **সমাজ সচেতনতা ও ঐক্যবোধ জাগ্রত করে :** শিক্ষা মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি উদার ও গণতান্ত্রিক করতে সাহায্য করে। শিক্ষা মানুষের চেতনার উন্মেষ ঘটায়। পত্রপত্রিকা পাঠ, আলাপ-আলোচনা এবং জ্ঞানী ব্যক্তিদের সঙ্গে মত বিনিময়ের ফলে ব্যক্তি জীবনের ওপর সমাজের প্রভাব এবং সমাজের প্রতি ব্যক্তির দায়িত্ব সম্পর্কে অধিক সচেতন হয়। তারা বুঝতে শিখে ব্যক্তির স্বার্থ সমষ্টির স্বার্থের মধ্যে নিহিত, তখন তারা সমাজের বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে ভাবতে শেখে এবং সমাজ উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের জন্য এগিয়ে আসে।

৫. **নাগরিক অধিকার ও দায়িত্ববোধের উন্মেষ ঘটায় :** শিক্ষার মাধ্যমে জনগণ নাগরিক দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে জানে এবং দায়িত্ব পালনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে। অন্যদিকে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে তারা নিজেদের অধিকার প্রয়োগ ও প্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট হয়। সুশিক্ষিত ব্যক্তিরা গড্ডালিকা প্রবাহে ভেসে না গিয়ে গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে নিজেদের মতামত প্রকাশ করতে পারে।

৬. **কর্মদক্ষতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করে :** একজন সাক্ষরকর্মী নিরক্ষরকর্মীর চেয়ে অধিকতর 'কর্মদক্ষ'। কারণ সাক্ষর ব্যক্তির চিন্তা ও বিচার বিশ্লেষণ, আত্মমূল্যায়ন ও সংশোধন এবং কর্মজীবনের কর্মসম্পাদন ও কর্মসূচি গ্রহণের ক্ষমতা নিরক্ষর ব্যক্তির চেয়ে অনেক বেশি। তাছাড়া নিজ পেশা সংক্রান্ত পুস্তক-পুস্তিকা পাঠ এবং উচ্চতর প্রশিক্ষণের মাধ্যমেও সাক্ষর ব্যক্তি তার কর্মদক্ষতা বাড়াতে সক্ষম হয়।

৭. **শিক্ষা সুষম সমাজ গঠনে সহায়তা করে :** সর্বজনীন শিক্ষা সুষম সমাজ গঠনের ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। অপেক্ষাকৃত কম আয়ের মানুষরা সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা পেলে শুধু যে তাদের আয় বাড়ানোর সুযোগ পায় তাই নয়, শিশু মৃত্যুর হার কমানো, স্বাস্থ্য সুবিধা গ্রহণ ও সামাজিক উন্নয়নের অন্যান্য সুযোগ গ্রহণের সুবিধা পেয়ে থাকে। এর ফলে তাদের জীবনের মান তারা কিছুটা বাড়াতে সক্ষম হয়।

৮. **স্বাস্থ্যবিধি ও পরিবার পরিকল্পনার গুরুত্ব সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করে :** সাক্ষর ব্যক্তি স্বাস্থ্যহানির কুফল সম্পর্কে অধিকতর সচেতন বলে রোগ প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা মেনে চলার চেষ্টা করে। অন্যদিকে নিরক্ষর ব্যক্তিরা স্বাস্থ্য রক্ষার উপায় সম্পর্কে উদাসীন থেকে প্রতিরোধযোগ্য রোগের কবলে পড়ে স্বাস্থ্য ও কর্মদক্ষতা দুই-ই হারায়। শিক্ষিত ব্যক্তিরা পরিকল্পিত পরিবারের সুফল সম্পর্কে সচেতন ও পরিবার পরিকল্পনা নিয়মকানুন সতর্কতার সঙ্গে মেনে চলে বলেই তাদের পরিবারের সদস্য সংখ্যা সীমিত থাকে। এ ব্যাপারে অধিকাংশ নিরক্ষর উদাসীন থাকে বলে তাদের পরিবারের সদস্য সংখ্যা পরিকল্পিতভাবে বাড়তে থাকে। ফলে তাদের পারিবারিক জীবন সংকটে পতিত হয়।

৯. **শিক্ষা জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে স্পৃহা জাগায় :** শিক্ষা মানুষকে আত্মসচেতন করে তোলে এবং স্বাস্থ্যকর ও সুন্দর জীবনযাপনের প্রেরণা যোগায়। জ্ঞানার্জনের মাধ্যমে মানুষ অন্যের পরিবেশকে জানতে পারে। ফলে তারা নিজেকে অন্যের সঙ্গে তুলনা করতে পারে এবং নিজের জীবনযাত্রার মান মূল্যায়ন করে তার সার্বিক মানোন্নয়নের জন্য উদ্যোগী হয়। অন্যদিকে নিরক্ষর মানুষ রোগ, শোক, দারিদ্র্য ইত্যাদিকে ভাগ্যের ফল হিসেবে গ্রহণ করে এবং সমাজে মানবেতর জীবনযাপনে অভ্যস্ত হয়।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



**মানবসম্পদ উন্নয়নের জন্য যে ধরনের শিক্ষা দরকার :** ১৯৬০-এর দশকে যেখানে দুই এশিয়ার (দক্ষিণ এশিয়া এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া) মাথাপিছু আয় ছিল প্রায় কাছাকাছি, পরবর্তীতে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলো তাদের নাগরিকদের মানবসম্পদ উন্নয়নের মাধ্যমে প্রজন্মান্তর সমৃদ্ধি ঘটাতে ব্যর্থ হয়েছে। অন্যদিকে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলো এক্ষেত্রে অনেক এগিয়ে গেছে। বাংলাদেশের বাজেটে শিক্ষাখাতের জন্য বরাদ্দ যাও বা থাকে তা মূলত শিক্ষকদের বেতন ও অবকাঠামো খাতেই ব্যয় করা হয়। শিক্ষাক্রম ও শিক্ষার মানোন্নয়ন, লাইব্রেরির উন্নয়ন ইত্যাদি বাবদ খুব সামান্যই অর্থ বরাদ্দ থাকে।

বাংলাদেশের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা যে মানবসম্পদ উন্নয়নের জন্য মোটেই উপযোগী নয় তা বিভিন্ন গবেষণায় ধরা পড়েছে। এসব গবেষণায় ধরা পড়েছে যে প্রাথমিক শিক্ষা পেশা পরিবর্তনের সামান্য সাহায্য করলেও মানবসম্পদ উন্নয়নে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষার তেমন কোনো ভূমিকাই নেই।

বাংলাদেশ উন্নয়ন পরিষদের (BIDS) সাম্প্রতিক এক সমীক্ষায় দেখা, যায় বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাত্ত্বিক জ্ঞানের ব্যবহারিক প্রয়োগে অপারদর্শী। কাজেই তারা অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন ও সামাজিক চাহিদা পূরণে তেমন সক্ষম নন। এ অবস্থায় যুগোপযোগী মানবসম্পদ তৈরির লক্ষ্যে আমাদের দেশীয় শিক্ষা ব্যবস্থার উৎকর্ষ অর্জনের জন্য নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর দিকে জরুরি দৃষ্টি দেয়া আবশ্যক।

১. জনসংখ্যার বিশালত্ব ও ব্যাপক দারিদ্র্য পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখে বাংলাদেশে মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিতকরণে সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করা উচিত। এক্ষেত্রে শুধু পর্যাপ্ত অর্থ বরাদ্দই যথেষ্ট নয়, মানসম্পন্ন শিক্ষক, শিক্ষকের যথেষ্ট বেতনাদি, উন্নতমানের শিক্ষাক্রম এবং সর্বোপরি রাজনৈতিক নেতৃত্ব, অভিভাবক এবং শিক্ষক শ্রেণীর আন্তরিকতা ততোধিক গুরুত্বপূর্ণ।

২. প্রাথমিক শিক্ষার পরপরই মাধ্যমিক শিক্ষার মান উন্নত করার জন্য বাড়তি গুরুত্ব দিতে হবে। এক্ষেত্রে মাধ্যমিক শিক্ষাক্রমের আমূল পরিবর্তন কাম্য যা জ্ঞান, দক্ষতা, মূল্যবোধ, নৈতিকতা ও মৌলিক উৎকর্ষতাকে উৎসারিত করবে। এই পর্যায়ে প্রযুক্তির ব্যবহার কি করে বাড়ানো যায় সে দিকটাও মাথায় রাখতে হবে।

৩. বাংলাদেশে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কিছু অনাকাঙ্ক্ষিত সমস্যায় জর্জরিত। ছাত্ররাজনীতি, সন্ত্রাস, শিক্ষকদের দলীয় রাজনীতিতে সম্পৃক্ততা ইত্যাদি এ ধরনের সমস্যাগুলোর মধ্যে প্রধান। ফলে উচ্চ শিক্ষা তার স্বকীয়তা হারাচ্ছে। তাই ছাত্রছাত্রীদের তথ্যপ্রযুক্তির সাথে অধিকতর অন্তর্ভুক্তি, বিশ্বের উন্নত বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ থেকে বিশেষজ্ঞ শিক্ষক এনে বিষয়ভিত্তিক লেকচার প্রদানের ব্যবস্থা, বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরতদের পৃথিবীব্যাপী বিভিন্ন মাল্টিন্যাশনাল প্রতিষ্ঠানসমূহে কাজের সুবিধা সৃষ্টি ইত্যাদি বিভিন্ন সময়োপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে আমাদের দেশের উচ্চ শিক্ষার সুনাম পুনঃপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা করতে হবে।

**উপসংহার :** বর্তমান যুগে যে কোনো দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য প্রাকৃতিক সম্পদের পাশাপাশি মানবসম্পদের গুরুত্ব অপরিসীম। মানবসম্পদ উন্নয়নই হলো দেশের সার্বিক উন্নয়নের প্রধান হাতিয়ার। আর মানবসম্পদ উন্নয়নের ক্ষেত্রে আধুনিক, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিভিত্তিক এবং যুগোপযোগী শিক্ষাই মুখ্যভূমিকা পালন করে। কিন্তু আমাদের দেশের বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থা নানাবিধ কারণে দেশের বিপুল জনগোষ্ঠীকে দক্ষ মানবসম্পদে পরিণত করার ক্ষেত্রে কার্যকরী ভূমিকা পালনে ব্যর্থ হচ্ছে। তাই মানবসম্পদ উন্নয়নের জন্য প্রথমেই এ দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার সার্বিক মানোন্নয়নে সকলকে সচেষ্ট হতে হবে।



## রচনা ৫০ এইডস : তৃতীয় বিশ্বের জনস্বাস্থ্যের এক মারাত্মক হুমকি

*[১৫তম বিসিএস]*

**ভূমিকা :** একুশ শতকে জ্ঞান-বিজ্ঞানের চরম উৎকর্ষতার মাঝেও বিশ্বব্যাপী এইডস জনস্বাস্থ্যের জন্য একটি মারাত্মক হুমকি। পৃথিবীর কোনো কোনো অঞ্চলে এটি এক নম্বর ঘাতক ব্যাধি। সামগ্রিকভাবে বিশ্বে ঘাতকব্যাধী হিসেবে এর অবস্থান চতুর্থ। তবে সামগ্রিক বিচারে এটি সবচেয়ে মারাত্মক মানবিক বিপর্যয় সৃষ্টিকারী ব্যাধি। এ রোগ পৃথিবীর প্রায় প্রতিটি প্রান্তে তার সর্বনাশের মহাডংকা বাজিয়ে চলেছে। বিশেষ করে আফ্রিকা, এশিয়া, পূর্ব ইউরোপ ও ক্যারিবীয় অঞ্চলে এ রোগের প্রকোপ দেখে বিশ্ব সম্প্রদায় আজ মহাশংকায়। যেসব দেশে এইচআইভি/এইডস মহামারী আকারে দেখা দিয়েছে সেখানকার অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে প্রতিকূল ও সুদূরপ্রসারী বিরূপ প্রভাব লক্ষণীয়। শেষ পর্যন্ত এ ঘাতকব্যাধি মানব সম্প্রদায়কে কোন তিমিরে নিয়ে যাবে তাও কেউই বলতে পারবে না। অবশ্য বিশ্ববাসী ইতোমধ্যেই এ মহাঘাতকের বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে শুরু করেছে।

**এইডস কি :** AIDS-এর পূর্ণরূপ হলো Acquired Immuno Deficiency Syndrome বা স্ব-উপার্জিত অনাক্রম্যতার অভাবের লক্ষণাবলী। এটি একটি ধ্বংসাত্মক ব্যাধি যা ভাইরাস সংক্রমণের মাধ্যমে রোগীর দেহে বাসা বাঁধে। এর ভাইরাসের নাম HIV (Human Immuno Deficiency Virus)। এটি মানবদেহে প্রবেশ করে তার রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থাকে এমনভাবে বিনষ্ট করে দেয় যে সাধারণ রোগের জীবাণু তখন অপ্রতিরোধ্য গতিতে শরীরকে কুরে কুরে অকাল মৃত্যু নিশ্চিত করে। এইচআইভি ভাইরাস অন্যসব ভাইরাসের মতোই। তবে এর কার্যপদ্ধতি ভিন্ন ধরনের। এ ভাইরাসের কেন্দ্রসমূহের RNA-এর চতুর্দিকে প্রোটিনের দুটি স্তর ও চর্বিযুক্ত পর্দা দ্বারা শক্তভাবে আটকানো থাকে। উপকরণাদির সাথে নানা প্রকার জারকরস বা এনজাইম থাকে যার মধ্যে reverse transcriptase প্রধান। নিজের সংখ্যা বাড়ানোর জন্য ভাইরাস এ এনজাইম ব্যবহার করে। কিছু RNA, কিছু প্রোটিন, গ্লাইকোপ্রোটিন এবং চর্বিঝিল্লি মিলে এ ভাইরাস গঠিত হয়। নির্দিষ্ট প্রকার দেহকোষের ওপর সঠিক গ্রাহক বা receptor থাকলে সে ধরনের কোষের সঙ্গে ভাইরাস সংযুক্ত হতে পারে। HIV-র আক্রমণের জন্য এ ধরনের আমাদের শরীরের কোষ হচ্ছে লিম্ফোসাইট ($T_4$ Lymphocyte)। HIV-র আক্রমণের ফলে $T_4$ Lymphocyte দ্বারা শরীরের যে অনাক্রম্য ব্যবস্থা (Immuno system) তৈরি হওয়ার কথা, সে ব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে দুর্বল হয়ে পড়ে এবং সুযোগ সন্ধানী ভাইরাস ও রোগজীবাণু দ্বারা শরীর সহজেই আক্রান্ত হয়। এমতাবস্থায় রোগীকে যক্ষ্মা, নিউমোনিয়া, বিকলাঙ্গতা, স্নায়ুবিক বৈকল্য, ক্যান্সার ইত্যাদিতে ভুগতে দেখা যায়।

**এইডসের ইতিহাস :** ১৯৫৯ সালে প্রথম ব্রিটেনের এক ব্যক্তির রক্তে এইডসের ভাইরাসের সন্ধান পাওয়া যায়। ১৯৭০-এর দশকে আফ্রিকায় এইডস ছড়িয়ে পড়ে। ১৯৮১ সাল থেকে এইডসকে একটি মারাত্মক ব্যাধি হিসেবে চিহ্নিত করা হয় এবং এ বছরই এইডস রোগের কারণ চিহ্নিত করা হয়। মূলত ১৯৭৭-৭৮ সালে আমেরিকা, হাইতি ও আফ্রিকায় এইডস রোগ পরিলক্ষিত হয়। ১৯৮৫ সালে হলিউডের বিখ্যাত অভিনেতা হাডসন এই রোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করলে বিশ্বব্যাপী আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। ১৯৮৫ সালে মানুষের রক্তে এইডসের ভাইরাস আছে কিনা তার পরীক্ষা পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়। এভাবে বর্তমানে পৃথিবীর প্রায় প্রতিটি প্রান্তেই এইডস তার মরণবার্তা নিয়ে একের পর এক হাজির হচ্ছে।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



**বিশ্বজুড়ে এইডসের বিস্তৃতি :** আজকের পৃথিবী এইচআইভি/এইডস-এর কারণে এক চরম বিপর্যয়ের সম্মুখীন। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ আক্রান্ত হয়েছে এইডস মহামারীতে। বিশ্বে এ পর্যন্ত ৬ কোটিরও বেশি লোক এইচআইভি সংক্রমিত হয়েছে। ২০০৭ সালে শুমারি অনুযায়ী বিশ্বব্যাপী আনুমানিক ৩৩.২ মিলিয়ন মানুষ এইডস এ আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেছে, যার মধ্যে ৩,৩০,০০০ জন ছিল শিশু। আর বাকি ৩ কোটি ৩২ লক্ষ লোক আক্রান্ত হয়ে বেঁচে আছে।

**বিশ্ব AIDS/ HIV চিত্র :** WHO-এর ২০১৩ সালের প্রতিবেদন অনুযায়ী, বিশ্বে প্রায় ৩ কোটি ৫ লাখ মানুষ এইচআইভি ভাইরাসে আক্রান্ত, যার ৩ কোটি ২ লাখ শিশু, যাদের বয়স ১৫ বছরের কম। ২০১৩ সালে নতুন ২.১ মিলিয়ন নতুন করে এতে আক্রান্ত হয়। ৩৫ মিলিয়ন আক্রান্ত মানুষের মধ্যে ১৯ মিলিয়ন মানুষ জানেই না তারা এইচআইভি ভাইরাসে আক্রান্ত। এইচআইভি আক্রান্ত মানুষগুলোর অধিকাংশই নিম্ন ও মধ্য আয়ের দেশগুলোতে বাস করে। আফ্রিকার সাব-সাহারা অঞ্চল সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত এলাকা। মোট আক্রান্ত ৩৫ মিলিয়নের ২৪.৭ মিলিয়ন এ অঞ্চলে বাস করে। ১৯৮১ সালে এইচআইভি আবিষ্কারের পর ২০১৩ পর্যন্ত ৩৯ মিলিয়ন মানুষ এ রোগে মারা যায়। শুধু ২০১৩ সালেই এইডস আক্রান্ত হয়ে মারা যায় ১.৫ মিলিয়ন।

**এইডসের কারণ ও বিস্তার :** এইডস মূলত এর ভাইরাসের মাধ্যমে সংক্রমিত হয়। তাই এটি একটি সংক্রামক রোগ হিসেবেই চিহ্নিত। এটি রোগীর শরীরে অবস্থান করে এবং এ ভাইরাস নানা প্রক্রিয়ায় অন্যের শরীরে সংক্রমিত হতে পারে। অনুসন্ধানে জানা গেছে, এইডস আক্রান্ত ব্যক্তির রক্ত, বীর্য, যৌনরস, মূত্র, চোখের পানি, থুথু এবং মায়ের দুধে এইচআইভি অবস্থান করে। তবে চোখের পানি, থুথু ও মূত্রের মধ্যে ভাইরাসের ঘনত্ব কম থাকায় এগুলোতে এইডস সংক্রমিত হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম। এটি কোনো ছোঁয়াচে না হলেও এইচআইভি ভাইরাস নানা প্রক্রিয়ায় বিস্তার লাভ করতে পারে। যেমন— ক. এইডস আক্রান্ত ব্যক্তির সাথে যৌনমিলনের মাধ্যমে, খ. এইডস আক্রান্ত ব্যক্তির রক্ত গ্রহণের মাধ্যমে, গ. এইডস জীবাণু দ্বারা সংক্রমিত সুচ, সার্জিকেল যন্ত্রপাতি ব্যবহারের মাধ্যমে, ঘ. এইডস আক্রান্ত মায়ের গর্ভধারণের মাধ্যমে সন্তান জন্মলাভ করলে। সুতরাং বিশ্বব্যাপী এইডসের ব্যাপক বিস্তারের পেছনে যে সকল কারণ দায়ী সেগুলো নিম্নরূপ :

১. **অবাধ যৌনাচার :** বিশ্বব্যাপী অবাধ যৌনাচার এইডসের ব্যাপক বিস্তারের জন্য মূলত দায়ী। কেননা এইডস আক্রান্ত রোগীর সঙ্গে যৌনমিলনের মাধ্যমে এইডসের ভাইরাস সংক্রমিত হয়ে এইডসের বিস্তার ঘটায়। বিশেষত, অনুন্নত দেশগুলোতে কোনো প্রকার সাবধানতা অবলম্বন না করে এইডস আক্রান্ত নারী-পুরুষের অবাধ যৌনাচার চলছে। এ ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত সাবধানতা এবং রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক দায়িত্বহীনতার অভাবও এ প্রবণতাকে আরো উসকে দিচ্ছে। ফ্রি সেক্সের নামে বিশ্বব্যাপী যে সর্বনাশা খেলা চলছে তা-ই মানবজাতিকে আজকের এ সংকটময় অবস্থার মুখোমুখি এনে দাঁড় করিয়েছে।

২. **সমকামিতা :** সমকামিতা পশ্চিমা দেশগুলোতে এইডস বিস্তারে বিশেষ সহায়ক ভূমিকা পালন করছে। এর মাধ্যমে এইডস আক্রান্ত ব্যক্তির সাথে মেলামেশার ফলে আক্রান্ত হচ্ছে সুস্থ মানুষ।

৩. **মাদকাসক্তি :** মাদকাসক্তির ব্যাপক বিস্তারও এইডসের বিস্তারের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। কেননা মাদকাসক্তির ফলে দেখা যায় এরা অনেক সময় এইডস আক্রান্ত ব্যক্তির ব্যবহৃত সুচ ও সিরিঞ্জ ব্যবহার করে এইডসে আক্রান্ত হয়। তাছাড়া এরা এক-একটি সিরিঞ্জ ও সুচ দিয়ে কয়েকজনে মাদক সেবন করে। ফলে এদের মধ্যে কেউ এইডস আক্রান্ত থাকলে বাকিরা সবাই আক্রান্ত হয়। অনেক সময় দেখা যায়, আসক্তির ফলে হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে এরা নিজের অজান্তেই এ মহামারীর কবলে পড়ে যায়।



৪. **রক্ত সঞ্চালন :** এইডস ভাইরাস সংক্রমণের অন্যতম মাধ্যম রক্ত সঞ্চালন। যে কোনো প্রকারেই হোক এইডস আক্রান্ত ব্যক্তির রক্ত যদি সুস্থ ব্যক্তির দেহের রক্তের সঙ্গে মিশ্রিত হয় তাহলে সে নিশ্চিতভাবে এইডসে আক্রান্ত হবে। বিশেষত, ইনজেকশন, উভয়ের কাটা, ফোড়া, ঘা ইত্যাদির মাধ্যমে এবং আক্রান্ত ব্যক্তির শেভিং, রেজার, ব্লেড, দন্ত চিকিৎসায় ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি ও নাক-কান ফোঁড়ায় সুচ ইত্যাদি জীবাণু অবস্থায় ব্যবহারের ফলে এইচআইভি ছড়াতে পারে। সুতরাং রক্তদান, রক্তগ্রহণ ও রক্ত সঞ্চালন এইচআইভি/এইডস সংক্রমণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

**এইডস ও বিশ্বস্বাস্থ্য :** যুগে যুগে যক্ষ্মা, কুষ্ঠ, কলেরা, বসন্ত, ডেঙ্গুসহ অনেক ধরনের রোগই পৃথিবীজুড়ে ব্যাপকহারে জনগণের মৃত্যুর কারণ হয়েছে। কিন্তু বর্তমানে বিশ্বজুড়ে এইডসের যে বিস্তার তা সর্বকালের সকল মহামারীকে ছাড়িয়ে গেছে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির এ চরম উৎকর্ষের যুগেও এইডস বিশ্ব মানব সমাজের ভিত্তিমূলে আঘাত হেনে মানব প্রজন্মের জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিশেষ করে আফ্রিকা মহাদেশে এ রোগের যে প্রকোপ দেখা যাচ্ছে তাতে অদূর ভবিষ্যতে এ মহাদেশে মানব অস্তিত্বের কি দশা হবে তা ভাবলে রীতিমতো আঁতকে উঠতে হয়।

এইডসের একটি বিশেষ দিক হলো এইডসে আক্রান্ত রোগীর সুস্থ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে খুবই কম। তাই একবার এইডস আক্রান্ত হলে মৃত্যু অনেকটা নিশ্চিত বলা যায়। কারণ এ রোগে আক্রান্ত ব্যক্তির শরীর সকল প্রকার রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে এবং এর ফলে একের পর এক নতুন নতুন উপসর্গ তার শরীরে দৃষ্ট হতে থাকে।

তাছাড়া এইডস রোগে আক্রান্ত ব্যক্তি তার পরিবার ও সমাজের জন্য এক ধরনের বোঝা। কেননা আক্রান্ত ব্যক্তির মাধ্যমে পরিবারের অন্য সদস্যদের আক্রান্ত হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা থাকায় তাকে ঘরে রাখা যেমন বিপজ্জনক, তেমনি আলাদা করে সরিয়ে রাখাও বেদনাদায়ক।

তাই পরিবারের লোকজন অজান্তে কিংবা জেনে শুনে আক্রান্ত ব্যক্তির সাথে মেলামেশার কারণে অন্যরাও আক্রান্ত হয়। ফলে পুরো পরিবারে নেমে আসে ভয়াবহ বিপর্যয়। অন্যান্য রোগের ক্ষেত্রে আত্মীয়স্বজনের সহযোগিতা পাওয়া গেলেও এইডস আক্রান্ত পরিবারগুলো প্রায়ই সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে।

এইডস আক্রমণের আরেকটি লক্ষণীয় বিষয় হলো এ রোগের নির্মম শিকার হচ্ছে শিশুরা। কেননা এইডস আক্রান্ত মায়ের গর্ভে জন্মলাভের ফলে তারা অবধারিতভাবে এ রোগের শিকার হয়ে জীবন দিচ্ছে। ফলে এইডস আক্রান্ত দেশে শিশু মৃত্যুর হার বেশি। বাহামায় ৫ বছরের কম বয়সী শিশুর ৬০%-এর মৃত্যুর কারণ এইডস। জাম্বিয়ায় এ হার ৭০%। তাছাড়া শিশুরা মায়ের সংশ্রবে থাকার ফলে মা এইডস আক্রান্ত হলে সেও নিশ্চিতভাবে আক্রান্ত হয়ে পড়ে। ফলে নিষ্পাপ শিশুটিকে কেবল তার জন্মধাত্রী মায়ের কারণেই অকাল মৃত্যুবরণ করতে হচ্ছে।

এইডস সংক্রমণের চিকিৎসার দিকটাও বেশ গুরুত্বপূর্ণ। কেননা এ পর্যন্ত এইডস রোগের তেমন নির্ভরযোগ্য কোনো চিকিৎসা ব্যবস্থা নেই। আর যা আছে তাও বেশ ব্যয়সাধ্য। ফলে দারিদ্র্যপীড়িত আফ্রিকার মতো অঞ্চলগুলোতে এ রোগটির বিস্তারের অর্থই হলো বিনা চিকিৎসায় মৃত্যুবরণ। ফলে দেখা যায় পরিবারের কেউ এইডসে আক্রান্ত হলে সে পরিবারটি অর্থনৈতিকভাবে দুদিক থেকে সমস্যায় পড়ে। একদিকে উপার্জনক্ষম ব্যক্তির অসুস্থতার ফলে উপার্জন বন্ধ হয়ে পড়ে, অন্যদিকে তার ব্যয়বহুল চিকিৎসার ভার বহন করতে গিয়ে পরিবারের অন্যরাও চরম দারিদ্র্যের কবলে নিপতিত হয়। ফলে দেখা যায়, এইডস আক্রান্ত দেশগুলোর জাতীয় ও মাথাপিছু আয় হ্রাস পায়। কেননা বয়স্ক ব্যক্তিরা এইডসে আক্রান্ত হলে তাদের উৎপাদন থেকে জাতি বঞ্চিত হয়। এ পরিসংখ্যান অনুযায়ী আফ্রিকার সাব সাহারান অঞ্চলে এইডসের কারণে দৈনিক আয় দুই ডলারের কম। ২০১৫ সালের মধ্যে সর্বাধিক এইডস আক্রান্ত দেশে মাথাপিছু জিডিপি ১০% হ্রাস পাবে। এইডস দেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার পাশাপাশি শিক্ষাব্যবস্থাকেও

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



নানাভাবে প্রভাবিত করে। একদিকে এইডসের ব্যাপক আক্রমণের ফলে অর্থনৈতিক দুরবস্থা শিক্ষা ব্যয়ের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত সামর্থ্য ও সরাসরি বরাদ্দ উভয় ক্ষেত্রেই সমস্যা দেখা দেয়। তা ছাড়া আতঙ্কিত জনগণের মধ্যে স্কুল গমানাগমনের হারও কমে যায়। সোয়জিল্যান্ডে এইডসের কারণে মেয়েদের স্কুল গমনের হার ৩৬% হ্রাস পেয়েছে। আফ্রিকার সাব সাহারান অঞ্চলে এইডসের কারণে ৮ লাখ ৬০ হাজার ছেলেমেয়ে তাদের শিক্ষক হারিয়েছে। ২০০০ সালে সেন্ট্রাল আফ্রিকান রিপাবলিকে ৩০০ শিক্ষকের মধ্যে ৮৫% এইডসের কারণে মারা যায়। আবার আক্রান্ত দেশগুলোর গড় আয়ু এইডসের কারণে মারাত্মকভাবে হ্রাস পাচ্ছে। সাব সাহারান এলাকার চারটি দেশ যেমন বতসোয়ানা, মালাবি, মোজাম্বিক ও সোয়াজিল্যান্ডে গড় আয়ু ৪০ বছরের নিচে নেমে এসেছে। ২০০০ সালের শেষে ১ কোটি ২১ লাখ ছেলেমেয়ে কোথাও তাদের মা বা বাবা আবার কোথাও তাদের মা-বাবা উভয়কে হারিয়ে এতিম হয়েছে। এ সকল এতিম শিশুর অনেকেই এইডস আক্রান্ত। মা-বাবা হারা শিশুর সংখ্যার এ ব্যাপকতা আক্রান্ত দেশগুলোতে ব্যাপক সামাজিক বিপর্যয়ের কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। সুতরাং সকল দিক বিচেনায় দেখা যাচ্ছে, যুদ্ধ কিংবা দারিদ্র্য নয়, এইডসই নতুন শতাব্দীতে বিশ্ব সম্প্রদায়ের সামনে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ।

**এইডস প্রতিরোধে করণীয় :** মারণব্যাধি এইডস প্রতিরোধ করতে হলে এখনই জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে।

**প্রথমত,** বিশ্বব্যাপী অবাধ যৌনাচার ও ব্যাভিচারের বিরুদ্ধে আইনগত ও সচেতনতামূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। নর-নারীর যৌন সম্পর্ক মানব বংশবিস্তারের একমাত্র কৌশল হিসেবে এটির প্রতি যথেষ্ট দায়িত্বশীল ও সতর্ক থাকার ব্যাপারে রাজনৈতিক, সামাজিক, ধর্মীয় সকল ধরনের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে। এ ক্ষেত্রে প্রথম দায়িত্ব পরিবার ও সমাজের। তারপর ধর্মীয় শিক্ষার মাধ্যমে নৈতিকতার ব্যাপক বিস্তার হলে অযাচিত যৌনাচার অনেকটাই রোধ করা সম্ভব।

**দ্বিতীয়ত,** মাদকাসক্তির বিরুদ্ধেও সামাজিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয় ও নৈতিক আন্দোলন জোরদার করতে হবে। এ ব্যাপারে প্রশাসনকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে।

**তৃতীয়ত,** এইডস বিষয়ে জনগণের মাঝে সচেতনতা সৃষ্টির জন্য এ বিষয়ে ব্যাপক তৎপরতা চালাতে হবে। সেজন্য যৌনশিক্ষা ও প্রয়োজনীয় সাবধানতা বিষয়ে জনগণকে অবহিত করতে হবে। তাছাড়া এইডস বিস্তারের নানা মাধ্যম ও এগুলো থেকে দূরে থাকার বিষয়ে জনগণকে সতর্ক করা খুবই জরুরি। সেজন্য জাতীয়, আন্তর্জাতিক, সরকারি ও বেসরকারি সকল প্রচার মাধ্যমে ব্যাপক সতর্কতামূলক প্রচার অব্যাহত রাখতে হবে।

**চতুর্থত,** এইডস প্রতিরোধ কার্যক্রমে জাতিসংঘ ও অঙ্গ সংগঠনসহ অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোকে সক্রিয় ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে হবে। কেননা এইডস এখন আর কোনো একক দেশের সমস্যা নয়, বরং এটি মানবজাতির জন্য একটি চ্যালেঞ্জ। তাই আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে ব্যাপকভাবে আক্রান্ত দেশগুলোকে সাহায্য-সহযোগিতা ও প্রতিরোধ কার্যক্রমে অংশগ্রহণে এগিয়ে আসতে হবে।

**পঞ্চমত,** ব্যক্তিগত পর্যায়ে প্রতিটি ব্যক্তিকেই এ বিষয়ে সতর্ক হতে হবে। বিশেষত রক্তদান, রক্তগ্রহণ, রক্তসঞ্চালন, সুচ, সিরিঞ্জ, ব্যান্ডেজের ব্যবহার এবং যৌন মেলামেশার ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

**ষষ্ঠত,** এইডস আক্রান্ত ব্যক্তির ক্ষেত্রে সমাজের কর্তব্য বিষয়েও সচেতন হতে হবে। কেননা এইডস আক্রান্ত ব্যক্তির ব্যাপারে সামাজিক উদাসীনতা সামাজিক বিপর্যয় ডেকে আনতে পারে।

**উপসংহার :** সর্বোপরি এইডসের চিকিৎসা এখনো পর্যাপ্ত নয়। সুতরাং আক্রান্ত দেশগুলোতে পর্যাপ্ত চিকিৎসা সহায়তা প্রদান খুবই জরুরি। তাছাড়া এ সকল দেশের অর্থনৈতিক পুনর্গঠন ও দারিদ্র্য বিমোচনের ব্যাপারেও বিশেষ গুরুত্ব প্রদান আবশ্যক

# নারী ও শিশু

## রচনা ৫১ নারী উন্নয়ন ও ক্ষমতায়ন

**ভূমিকা :** পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক নারী। নারীরা এখন আর শুধু অন্তঃপুরবাসী নয়, বরং তারা উন্নয়নে পুরুষের সম অংশীদারিত্বের দাবি রাখে। অথচ বাংলাদেশের নারীসমাজ যুগ যুগ ধরে শোষিত ও অবহেলিত হয়ে আসছে। পুরুষশাসিত সমাজব্যবস্থায় ধর্মীয় গোঁড়ামি, সামাজিক কুসংস্কার, নিপীড়ন ও বৈষম্যের বেড়াজালে নারীদের সর্বদা রাখা হয়েছে অবদমিত। তাদের মেধা ও শ্রমশক্তিকে সমাজ ও দেশ গঠনে সম্পৃক্ত করা হয়নি। নারীর উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নে গ্রহণ করা হয়নি কোনো বাস্তব পদক্ষেপ। অথচ মানুষের মৌলিক প্রয়োজনগুলো পূরণ করতেও পুরুষের পাশাপাশি সহায়তা করে নারী। এটি কোনো একমুখী প্রক্রিয়া নয় বরং দ্বিপাক্ষিক প্রক্রিয়া।

**নারী উন্নয়ন ও ক্ষমতায়ন :** নারী উন্নয়ন ও ক্ষমতায়ন বলতে বোঝায় ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক ইত্যাদি ক্ষেত্রে ব্যক্তির অধিকার এবং রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক সর্বজনীনতা সংরক্ষণ করে আত্মশক্তিতে বলীয়ান হয়ে নারীর স্বাধীন ও সার্বভৌম সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা নিশ্চিত করা। দেশের সামগ্রিক উন্নয়নের লক্ষ্যে নারীর সার্বিক উন্নয়ন ও ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করা প্রয়োজন।

**বাংলাদেশের সংবিধানে নারী :** ব্রিটিশ ভারতীয় উপমহাদেশে নারী জাগরণের বিষয়টি যেমন বাস্তবসম্মত ছিল তদ্রুপ বাংলাদেশের স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে নারী অধিকারের বিষয়টি সময়ের দাবি হয়ে দাঁড়ায়। তাই এ দেশের জাতীয় উৎপাদনে নারীর অংশগ্রহণ আবশ্যক হয়ে ওঠে। এ প্রেক্ষাপটে ১৯৭২ সালে নবগঠিত রাষ্ট্র বাংলাদেশের সংবিধানে নারীর অধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতা নিশ্চিত করার বিধান সন্নিবেশিত হয়। সংবিধানের ২৮(১) ধারায় উল্লেখ করা হয়েছে, 'কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী-পুরুষ ভেদে বা জন্মস্থানের কারণে কোনো নাগরিকের প্রতি রাষ্ট্র বৈষম্য প্রদর্শন করবে না।' ২৮(২) ধারায় বলা হয়েছে, 'রাষ্ট্র ও গণজীবনের সর্বস্তরে নারী পুরুষের সমান অধিকার লাভ করবেন।' ২৮(৩)-এ উল্লেখ আছে, 'কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী-পুরুষ ভেদে বা বিশ্রামের কারণে জনসাধারণের কোনো বিনোদন বা বিশ্রামের স্থানে প্রবেশের কিংবা কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির বিষয়ে কোনো নাগরিককে কোনোরূপ অক্ষমতা, বাধ্যবাধকতা, বাধা বা শর্তের অধীন করা যাবে না।' ২৮(৪)-এ উল্লেখ আছে, 'নারী বা শিশুদের অনুকূলে কিংবা নাগরিকদের কোনো অনগ্রসর অংশের অগ্রগতির জন্য বিশেষ বিধান প্রণয়ন হতে এই অনুচ্ছেদের কোনো কিছুই রাষ্ট্রকে নিবৃত্ত করবে না।' ২৯(১)-এ রয়েছে, 'প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগ বা পদ লাভের ক্ষেত্রে সকল নাগরিকের জন্য সুযোগের সমতা থাকবে।' ৬৫(৩) ধারায় নারীর জন্য জাতীয় সংসদে আসন সংরক্ষিত রাখা হয়েছে এবং এ ধারার অধীনে স্থানীয় শাসনসংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানসমূহে নারীর প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা হয়েছে।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



বাংলাদেশে নারী উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নে গৃহীত পদক্ষেপসমূহ

১. উন্নয়ন পরিকল্পনা : ১৯৭২ সালে রচিত সংবিধানে নারী-পুরুষের সমান অধিকার নিশ্চিত করা হয়। শুধু সংবিধানে নয়, বাস্তব জীবনের সর্বক্ষেত্রে নারী-পুরুষের অংশগ্রহণ ও নারীর ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে বাস্তব পদক্ষেপ নিয়ে বর্তমান সরকারের লক্ষ্য হলো নারীসমাজের অধিকার প্রতিষ্ঠাসহ সমাজের সকল স্তরে নারীর উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নে যাবতীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা। স্বাধীনতা সংগ্রামে যে সকল নারী অবদান রেখেছেন ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিলেন, সেসব নারীর পুনর্বাসন ও ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে ১৯৭২ সালে বাংলাদেশ নারী পুনর্বাসন বোর্ড গঠন করেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সরকার। সে সময় ১৯টি জেলা ও ২৭টি মহকুমাসহ মোট ৬৪টি কেন্দ্রের মাধ্যমে নারী উন্নয়ন কর্মসূচি শুরু হয়।

নারী পুনর্বাসন বোর্ডের দায়িত্ব ও কর্মপরিধি বৃদ্ধি পাওয়ায় ১৯৭৪ সালে এ বোর্ড বৃহত্তর কলেবরে পুনর্গঠিত করে সংসদের একটি অ্যাক্ট-এর মাধ্যমে নারী পুনর্বাসন ও কল্যাণ ফাউন্ডেশনে রূপান্তরিত করা হয়। ফাউন্ডেশনের বহুবিধ কার্যক্রমের মধ্যে অন্যতম ছিল : ১. দেশের সকল জেলা ও মহকুমায় নারী উন্নয়নের লক্ষ্যে ভৌত অবকাঠামো গড়ে তোলা; ২. নারীর ব্যাপক কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান; ৩. নারীকে উৎপাদনমুখী কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত করে প্রদর্শনী ও বিক্রয় কেন্দ্র স্থাপন করা; ৪. উৎপাদন ও প্রশিক্ষণ কাজে নিয়োজিত নারীর জন্য দিবাযত্ন সুবিধা প্রদান করা; ৫. যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত নারীদের চিকিৎসা প্রদান করা এবং ৬. মুক্তিযুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত নারীর ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ার জন্য বৃত্তিপ্রথা চালু করা।

অনুরূপভাবে দ্বিবার্ষিক পরিকল্পনায়ও (১৯৭৮-৮০) নারীর কর্মসংস্থান ও দক্ষতা বৃদ্ধি কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায়ও (১৯৮৫-৯০) একই কর্মসূচি গৃহীত হয়। চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় (১৯৯০-৯৫) নারী উন্নয়নকে সামাজিক ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের অংশ হিসেবে চিহ্নিত করে উন্নয়নের মূল স্রোতধারায় সম্পৃক্তকরণের লক্ষ্যে আন্তঃখাত উদ্যোগ গৃহীত হয়।

২. সাংগঠনিক ও প্রাতিষ্ঠানিক উত্তরণ : নারী উন্নয়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার ১৯৭৪ সালে 'বাংলাদেশ নারী পুনর্বাসন বোর্ডকে' নারী পুনর্বাসন ও কল্যাণ ফাউন্ডেশনে রূপান্তরিত করার পর নারী উন্নয়নে নীতি নির্ধারণের লক্ষ্যে ১৯৭৮ সালে মহিলাবিষয়ক স্বতন্ত্র মন্ত্রণালয় গঠন করে। এছাড়া ১৯৭৬ সালে সরকারি রেজুলেশনবলে জাতীয় মহিলা সংস্থা গঠিত হয় এবং ১৯৯১ সালে জাতীয় মহিলা সংস্থাকে বিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা হয়। সরকারের গৃহীত নারী উন্নয়ন কার্যক্রম মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ১৯৮৪ সালে মহিলাবিষয়ক পরিদপ্তর গঠিত হয় এবং ১৯৯০ সালে এ পরিদপ্তরকে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরে উন্নীত করা হয়। এছাড়া ১৯৭৬ সালে শিশুদের সার্বিক উন্নয়নে বাংলাদেশ শিশু একাডেমী প্রতিষ্ঠা করা হয়। ১৯৯৪ সালে শিশু বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করে মহিলাবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের নামকরণ করা হয় 'মহিলা ও শিশুবিষয়ক মন্ত্রণালয়'।

১৯৯০ সালের পর থেকে মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং ১৯৯৪ সালের ৫ মার্চ থেকে শিশুবিষয়ক, ১৯৯৫ সালে বেইজিং কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন এবং ১৯৯৬ সালে বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি মন্ত্রণালয়ের ওপর ন্যস্ত হয়। এছাড়াও মহিলা ও শিশুবিষয়ক মন্ত্রণালয় যেসব অতিরিক্ত দায়িত্ব পালন করে তা হলো : ক. নারীসমাজকে উন্নয়নের মূল স্রোতধারায় সম্পৃক্তকরণ, খ. নারীর প্রতি বৈষম্য দূরীকরণ সনদ (সিডো) বাস্তবায়ন এবং নিয়মিতভাবে জাতিসংঘে প্রতিবেদন প্রেরণ, গ. মহিলাবিষয়ক অধিদপ্তর ও বাংলাদেশ জাতীয় মহিলা সংস্থার বিষয়াদি, ঘ. শিশু অধিকার সনদ (সিআরসি) বাস্তবায়ন ও জাতিসংঘে প্রতিবেদন প্রেরণ, ঙ. জাতীয় শিশুনীতি প্রণয়ন ও



বাস্তবায়ন, চ. বিশ্বখাদ্য কর্মসূচি বাস্তবায়ন। নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠা ও নারী নির্যাতন প্রতিরোধকল্পে আন্তঃমন্ত্রণালয় নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ কমিটি গঠিত হয়েছে। নারী ও মেয়ে শিশু নির্যাতন প্রতিরোধের লক্ষ্যে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের কেন্দ্রীয় নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ সেল, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, জাতীয় মহিলা সংস্থায় নারী ও শিশু নির্যাতন সেল এবং জেলা, থানা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে নারী নির্যাতন প্রতিরোধ কমিটি গঠন করা হয়েছে।

৩. আইনি পদক্ষেপ : বাংলাদেশে নারী ও মেয়ে শিশুর প্রতি নির্যাতন রোধকল্পে কতিপয় প্রচলিত আইনের সংশোধন ও নতুন আইন প্রণীত হয়েছে। এসব আইনের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো মুসলিম পারিবারিক আইন, যৌতুক নিরোধ আইন, বাল্যবিবাহ রোধ আইন, নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ (বিশেষ বিধান) আইন প্রভৃতি। নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধে আইনগত সহায়তা ও পরামর্শ প্রদানের জন্য নারী নির্যাতন প্রতিরোধ সেল, নির্যাতিত নারীদের জন্য পুনর্বাসন কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। তাছাড়া আইনজীবীর ফি ও অন্যান্য খরচ বহনে সহায়তা দানের উদ্দেশ্যে জেলা ও সেশন জজের অধীনে নির্যাতিত নারীদের জন্য একটি তহবিল রয়েছে।

৪. প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন : ১৯৭২ সালে শেখ মুজিবুর রহমান সরকার নারীর প্রশাসনিক ক্ষমতায়ন, সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর্যায়ে নারীর অন্তর্ভুক্তি তথা উন্নয়নের মূল স্রোতধারায় নারীকে সম্পৃক্ত করার প্রথম উদ্যোগ গ্রহণ করে। সরকারি চাকরিতে দশ ভাগ কোটা নারীর জন্য সংরক্ষণ করা হয়। ১৯৭৩ সালে দুজন নারীকে মন্ত্রিসভায় অন্তর্ভুক্ত করা হয় এবং ১৯৭৪ সালে একজন নারীকে বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক নিয়োগ করা হয়। বর্তমান সরকারের মন্ত্রিসভায় ৪ জন নারী (মার্চ ২০১৫ পর্যন্ত) রয়েছেন। বর্তমানে প্রধানমন্ত্রী, জাতীয় সংসদের স্পিকার ও বিরোধীদলীয় নেতা তিনজনই নারী। ৫ জানুয়ারি ২০১৪ দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সরকারি ও বিরোধী দলের প্রধানসহ ৩৫০টি আসনের মধ্যে ৬৯টি আসনে নারীরা জয়লাভ করে, যেখানে ১৯ জন নির্বাচিত আর ৫০ জন সংরক্ষিত আসনে মনোনীত। পরবর্তীতে উপনির্বাচনের মাধ্যমে আরেকজন নারী সদস্য নির্বাচিত হওয়ায় দশম জাতীয় সংসদে মোট নারী সদস্য ৭০ জন। ইউনিয়ন পরিষদের ১২টি সদস্যপদের মধ্যে ৯টিতে সরাসরি নির্বাচনে অংশগ্রহণের সুযোগ রাখাসহ সংরক্ষিত ৩টি আসনে নারীর প্রতিযোগিতার সুযোগ রাখা হয়েছে। তৎকালীন আওয়ামী সরকারের আমলে (বর্তমানে ক্ষমতাসীন) যেসব গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেয়া হয় তার মধ্যে রয়েছে ইউনিয়ন পরিষদের মহিলাদের সংরক্ষিত আসনে সরাসরি ভোটে নির্বাচন। ২০১১ সালের অষ্টম ইউপি নির্বাচনে বহু নারী সরাসরি ভোটে চেয়ারম্যান ও মেম্বার নির্বাচিত হয়েছেন। গ্রাম পরিষদেও ৩০% নারীর অংশগ্রহণ সংরক্ষণ করা হয়েছে। একইভাবে উপজেলা ও জেলা পরিষদে ৩০% মহিলা নির্বাচিত হয়। ফলে সারা বাংলাদেশে রাজনৈতিকভাবে নারীদের অংশগ্রহণ শক্তিশালী হয়েছে বলে আশা করা যায়। তাছাড়া পার্লামেন্টেও নারীর অংশগ্রহণ অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্তমানে সাধারণ আসন থেকে ২০ জন নারী সদস্য এবং সংরক্ষিত আসনে ৫০ জন নারী সংসদ সদস্য রয়েছেন।

**বিশ্ব প্রেক্ষিতে নারী উন্নয়নের ক্রমবিকাশ**

১৯৪৫ : জাতিসংঘ নারী-পুরুষের সমান অধিকার নকশা তৈরি করে।

১৯৪৬ : জাতিসংঘ নারীর মর্যাদা শীর্ষক কমিশন গঠন করে।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



১৯৫২ : জাতিসংঘে নারীর রাজনৈতিক অধিকার সনদ প্রণয়ন ও অনুমোদন।
১৯৭৫ : আন্তর্জাতিক নারীবর্ষ পালিত হয়। মেক্সিকোতে প্রথম নারী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।
১৯৭৬ : ১৯৭৬ থেকে ১৯৮৫ সময়কালকে জাতিসংঘের বিশ্ব নারী দশকরূপে ঘোষণা।
১৯৭৯ : জাতিসংঘ নারীর সার্বিক অধিকার সুরক্ষামূলক 'সিডো' সনদ প্রণয়ন ও অনুমোদন করে।
১৯৮০ : মধ্য দশকী বিশ্ব নারী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।
১৯৮৫ : দশক সমাপনী বিশ্ব নারী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।
১৯৯৫ : সামাজিক উন্নয়ন শীর্ষক বিশ্বসভা অনুষ্ঠিত হয়। নারী বিষয়ক চতুর্থ বিশ্ব সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।
১৯৯৮ : চতুর্থ বিশ্ব নারী সম্মেলন গৃহীত প্লাটফরম ফর অ্যাকশন বাস্তবায়ন।
২০১১ : ১ জানুয়ারি ২০১১ যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে কার্যক্রম শুরু করে জাতিসংঘের নারী বিষয়ক সংস্থা ইউএন উইমেন।

## বাংলাদেশে নারী উন্নয়নে গৃহীত পদক্ষেপসমূহ

১৯৭৩ : জাতীয় সংসদে সদস্য পদে মহিলাদের জন্য কোটা ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়।
১৯৭৫ : প্রথম বিশ্ব নারী সম্মেলনে বাংলাদেশ অংশগ্রহণ করে এবং বর্ষধারার পক্ষে ভোটদান করে।
১৯৭৬ : ক. বাংলাদেশ জাতীয় মহিলা সংস্থা গঠন করা হয়,
খ. মহিলা সেল গঠন করা হয়,
গ. মহিলাবিষয়ক বিভাগ গঠন করা হয়,
ঘ. সরকারি খাতের সাংগঠনিক কাঠামোতে কোটাভিত্তিক মহিলাদের পদ সৃষ্টি করা হয়।
১৯৭৮ : মহিলাবিষয়ক মন্ত্রণালয় চালু করা হয়।
১৯৮০ : দ্বিতীয় বিশ্ব নারী সম্মেলনে বাংলাদেশ অংশগ্রহণ করে এবং সম্মেলনে সিদ্ধান্তপত্রে স্বাক্ষরদান করে।
১৯৮৪ : ক. 'সিডো' (CEDAW) সনদ গ্রহণ ও অনুমোদন করে।
খ. মহিলাবিষয়ক অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠিত হয়।
১৯৮৫ : দশক সমাপনী সম্মেলনে অংশগ্রহণ করে এবং সম্মেলনে (Nairobi Forward Locking strategy) অবদান রাখে।
১৯৮৫-১৯৯০ : নারী ও পুরুষের উন্নয়নে অসাম্য দূর করতে লক্ষ্য নির্ধারণ এবং বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়।
১৯৯১ : WID Focal point তৈরি করা হয়।
১৯৯৫ : ক. NCWD (National Council For Womens Develoment) সৃষ্টি করে।
খ. চতুর্থ বিশ্ব নারী সম্মেলনে বাংলাদেশ অংশগ্রহণ করে এবং সুপারিশ করে।
১৯৯৬ : ক. PFA বাস্তবায়নের জন্য টাস্কফোর্স গঠন করা হয়।
খ. PFA বাস্তবায়নে কোর গ্রুপ গঠন করা হয়।
১৯৯৭ : ক. নারী উন্নয়নে জাতীয় নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়।
খ. স্থানীয় সরকারসমূহে নির্বাচনে মহিলাদের জন্য এক-তৃতীয়াংশে সংরক্ষিত আসনে সরাসরি ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়।
১৯৯৮ : নারী উন্নয়নে জাতীয় কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা হয়।
২০০২ : এসিড অপরাধ দমন আইন ২০০২ এবং এসিড নিয়ন্ত্রণ আইন ২০০২ জারি করা হয়।
২০০৩ : নারী ও শিশু নির্যাতন দমন (সংশোধন) বিল পাস।



২০০৪ : সংবিধানের চতুর্দশ সংশোধনীর মাধ্যমে সংসদে নারীদের জন্য ৪৫টি আসন সংরক্ষণ।
২০১১ : ৯ জানুয়ারি ২০১১ সরকারি চাকরিজীবী নারীদের মাতৃত্বকালীন ছুটি ৬ মাস করা হয়।
২০১১ : সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে সংসদে নারীদের ৫০টি আসন সংরক্ষণ।
২০১৩ : দেশের প্রথম নারী স্পিকার হিসেবে ৩০ এপ্রিল ২০১৩ শপথ ও দায়িত্ব গ্রহণ করেন সংরক্ষিত নারী আসনের সংসদ সদস্য ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী।

**জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ও সরকারের কর্মপরিকল্পনা :** ইতিপূর্বে বিভিন্ন উন্নয়ন পরিকল্পনায় নারী উন্নয়নে কর্মসূচি ও কার্যক্রম গ্রহণ করা হলেও তা ছিল বিচ্ছিন্ন ও সমন্বয়হীন। কিন্তু বেইজিং নারী উন্নয়ন কর্মপরিকল্পনায় নারী উন্নয়নের লক্ষ্যে যে ক্ষেত্রগুলো চিহ্নিত হয়েছে তার একটি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যভিত্তিক বাস্তবায়ন কৌশল প্রণয়নের লক্ষ্যে ও বেইজিং ঘোষণা বাস্তবায়নের অঙ্গীকারের ফলে মহিলা ও শিশুবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে প্রথমবারের মতো বাংলাদেশ জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ও কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে যার প্রধান লক্ষ্য হলো নির্যাতিত ও অবহেলিত এ দেশের বৃহত্তম নারী সমাজের ভাগ্যোন্নয়ন করা।

নারী উন্নয়ন নীতির প্রধান লক্ষ্যসমূহ হলো নিম্নরূপ :

- রাষ্ট্রীয়, সামাজিক ও পারিবারিক জীবনের সকল ক্ষেত্রে নারীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করা;
- নারীর রাজনৈতিক, সামাজিক, প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করা;
- নারীর মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা করা;
- নারীকে শিক্ষিত ও দক্ষ মানবসম্পদ হিসেবে গড়ে তোলা;
- নারী সমাজকে দারিদ্র্যের অভিশাপ থেকে মুক্ত করা;
- নারী-পুরুষের বিদ্যমান বৈষম্য নিরসন করা;
- সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিমণ্ডলে নারীর অবদানের যথাযথ স্বীকৃতি প্রদান করা;
- জাতীয় জীবনে সর্বত্র নারী-পুরুষের সমতা প্রতিষ্ঠা করা;
- নারী ও মেয়ে শিশুর প্রতি সকল প্রকার নির্যাতন বন্ধ করা;
- রাজনীতি, প্রশাসন ও অন্যান্য কর্মক্ষেত্র, আর্থ-সামাজিক কর্মকাণ্ড, শিক্ষা, সংস্কৃতি ও ক্রীড়া এবং পারিবারিক জীবনের সর্বত্র নারী-পুরুষের সমানাধিকার প্রতিষ্ঠা;
- বিধবা, অভিভাবকহীন, স্বামী পরিত্যক্তা, অবিবাহিতা ও সন্তানহীনা নারীর নিরাপত্তা ব্যবস্থা করা;
- গণমাধ্যমে নারী ও মেয়ে শিশুর ইতিবাচক ভাবমূর্তি তুলে ধরাসহ জেন্ডার প্রেক্ষিত প্রতিফলিত করা;
- মেধাবী ও প্রতিভাময়ী নারীর সৃজনশীল ক্ষমতা বিকাশে সহায়তা দেয়া;
- নারী উন্নয়নে প্রয়োজনীয় সহায়ক সেবা প্রদান করা ইত্যাদি।

উপরোক্ত লক্ষ্যসমূহ বাস্তবায়নে সরকার যেসব পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে তা হলো :

১. **নারীর মানবাধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতা বাস্তবায়ন**

- মানবাধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতা যেমন– রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ইত্যাদি ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের যে সমঅধিকার, তার স্বীকৃতিস্বরূপ নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ করা;
- নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সনদ (সিডো) বাস্তবায়ন করা;
- সম্পদ, কর্মসংস্থান, বাজার ও ব্যবসায়ে নারীকে সমান সুযোগ ও অংশীদারিত্ব দেয়া;

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



- শিক্ষা পাঠ্যক্রম, বিভিন্ন পুস্তকাদিতে নারীর অবমূল্যায়ন দূরীভূত করা এবং নারীর ইতিবাচক ভাবমূর্তি তুলে ধরা;
- নারী-পুরুষ শ্রমিকদের সমান মজুরি ও কর্মস্থলে নিরাপত্তা প্রদান এবং চাকরি ক্ষেত্রে বৈষম্য দূর করা;
- নারীর অংশগ্রহণ প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের মাধ্যমে প্রাতিষ্ঠানিক এবং অ-প্রাতিষ্ঠানিক খাতে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে নারীর অবদানের স্বীকৃতি দেয়া;
- সরকারের জাতীয় হিসাবসমূহে গার্হস্থ্য শ্রমসহ সকল নারী শ্রমের সঠিক প্রতিফলন নিশ্চিত করা;
- নারী যেখানে অধিক সংখ্যক কর্মরত আছেন সেখানে যাতায়াত ব্যবস্থা, বাসস্থান, বিশ্রামাগার, পৃথক প্রক্ষালন কক্ষ এবং দিবাযত্ন কেন্দ্র স্থাপনসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

২. নারীর প্রতি সকল প্রকার নির্যাতন দূরীকরণ
- পারিবারিক ও সামাজিক পর্যায়ে এবং কর্মক্ষেত্রে নারীর প্রতি শারীরিক, মানসিক ও যৌন নিপীড়ন, নারী ধর্ষণ, পতিতাবৃত্তিতে নিয়োগ, যৌতুক ও নারীর প্রতি সহিংসতা দূর করা;
- নারী নির্যাতন প্রতিরোধ সম্পর্কিত প্রচলিত আইন যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে সংশোধন এবং নতুন আইন প্রণয়ন করা;
- নির্যাতিত নারীকে আইনগত সহায়তা দেয়া;
- নারী পাচার বন্ধ ও ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসন করা;
- নারীর প্রতি নির্যাতন দূরীকরণ এবং এক্ষেত্রে আইনের যথাযথ প্রয়োগের জন্য বিচার ব্যবস্থায় পুলিশ বাহিনীর সর্বস্তরে বর্ধিত হারে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা,

৩. শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ
- নারীশিক্ষা বৃদ্ধি, নারী-পুরুষের মধ্যে শিক্ষার হার ও সুযোগের বৈষম্য দূর করা এবং উন্নয়নের মূল স্রোতধারায় নারীকে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে সক্রিয় ও স্পষ্ট নীতি অনুসরণ করা;
- আগামী দশ বছরে নিরক্ষরতা দূর করার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা গ্রহণ করা, বিশেষত মেয়ে শিশু ও নারীসমাজের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ওপর সর্বাধিক গুরুত্ব দেয়া;
- মেয়েদের জন্য দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষা অবৈতনিক করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা;
- টেকসই উন্নয়ন ও অব্যাহত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যে নারীর জন্য আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কর্মসূচি গ্রহণ ও শক্তিশালী করা;
- শিক্ষার ক্ষেত্রে নারী ও মেয়েশিশুর সমান অধিকার নিশ্চিত করা, শিক্ষার সকল পর্যায়ে অসমতা দূর করা, শিক্ষাকে সর্বজনীন করা, ভর্তির হার বৃদ্ধিসহ নিরক্ষরতা দূর করা এবং মেয়েশিশুকে বিদ্যালয়ে ধরে রাখার লক্ষ্যে পদক্ষেপ গ্রহণ করা;
- নারীর দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সকল প্রশিক্ষণে নারীকে সমান সুযোগ দেয়া;
- কারিগরি প্রযুক্তিগত ও উচ্চ শিক্ষাসহ শিক্ষার সকল পর্যায়ে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিশেষ কার্যক্রম গ্রহণ করা।

৪. জাতীয় অর্থনীতিতে নারীর সক্রিয় ও সমঅধিকার নিশ্চিতকরণ
- অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহে সিদ্ধান্ত গ্রহণ পর্যায়ে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি এবং নারী-পুরুষের মধ্যে বিরাজমান পার্থক্য দূর করা;



- অর্থনৈতিক নীতি (বাণিজ্যনীতি, মুদ্রানীতি, করনীতি প্রভৃতি) প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে নারীর সমান অধিকার নিশ্চিত করা;
- নারীর ক্ষমতায়নের প্রতি লক্ষ্য রেখে সামষ্টিক অর্থনীতিতে নীতি প্রণয়নে ও কর্মসূচিতে নারীর চাহিদা ও স্বার্থ বিবেচনায় রাখা;
- সামষ্টিক অর্থনৈতিক নীতির প্রয়োগে বিরূপ প্রতিক্রিয়া প্রতিহত করার লক্ষ্যে নারীর অনুকূলে Safety nets গড়ে তোলা।
- জাতিসংঘের সংশ্লিষ্ট সংস্থা, উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা ও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলোকে নারীর দারিদ্র্য দূরীকরণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণে সহায়তা দান ও অনুপ্রাণিত করা।

৫. নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন
- নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে জরুরি বিষয়াদি যথা—স্বাস্থ্য, শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, জীবনব্যাপী শিক্ষা, কারিগরি শিক্ষা, তথ্য, উপার্জনের সুযোগ, উত্তরাধিকার, সম্পদ, ঋণ প্রযুক্তি এবং বাজার ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে অর্জিত সম্পদসহ ভূমির ওপর অধিকার ইত্যাদির ক্ষেত্রে নারীর পূর্ণ ও সমান সুযোগ এবং নিয়ন্ত্রণের অধিকার দেয়া এবং এ লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় নতুন আইন প্রণয়ন করা।

৬. নারীর কর্মসংস্থান
- নারীর শ্রমশক্তির শিক্ষিত ও নিরক্ষর উভয় অংশের কর্মসংস্থানের জন্য সর্বাত্মক উদ্যোগ গ্রহণ করা;
- চাকরির ক্ষেত্রে নারীর বর্ধিত নিয়োগ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রবেশ পর্যায়সহ সকল ক্ষেত্রে কোটা বৃদ্ধি এবং কার্যকর করা;
- সকল নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানকে সরকার অনুসৃত কোটা ও কর্মসংস্থানের নীতির আওতায় চাকরির ক্ষেত্রে নারীকে সকল প্রকার সমসুযোগ প্রদানের জন্য উদ্বুদ্ধ করা;
- নারী উদ্যোক্তা শ্রেণী গড়ে তোলার লক্ষ্যে বিশেষ প্রশিক্ষণ ও ঋণদান কর্মসূচি গ্রহণ করা;
- নারীর বর্ধিত হারে কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ, অবস্থান ও অগ্রসরমানতা বজায় রাখার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পরিবেশ গড়ে তোলা;
- নারীর ব্যাপক কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট সকল আইন, বিধি ও নীতির প্রয়োজনীয় সংস্কার করা।

৭. নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন
- রাজনীতিতে অধিক হারে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য প্রচার মাধ্যমসহ রাজনৈতিক দলসমূহকে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করা;
- নারীর রাজনৈতিক অধিকার অর্জন ও প্রয়োগ এবং এর সুফল সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টির কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা;
- নির্বাচনে অধিক হারে নারীপ্রার্থী মনোনয়ন দেয়ার জন্য রাজনৈতিক দলগুলোকে অনুপ্রাণিত করা;
- নারীর রাজনৈতিক অধিকার আদায়ের ও প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ভোটাধিকার প্রয়োগে সচেতন করা এবং তৃণমূল পর্যায় থেকে জাতীয় পর্যায় পর্যন্ত ভোটার প্রশিক্ষণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা;
- সিদ্ধান্ত গ্রহণের সর্বোচ্চ স্তর মন্ত্রিপরিষদে, প্রয়োজনে সংবিধানের সংশ্লিষ্ট ধারার অধীনে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক নারী নিয়োগ করা।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



৮. নারীর প্রশাসনিক ক্ষমতায়ন

- প্রশাসনিক কাঠামোর উচ্চ পর্যায়ে নারীর জন্য সরকারি চাকরিতে প্রবেশ সহজ করার লক্ষ্যে চুক্তিভিত্তিক এবং সরাসরি প্রবেশের (লেটারেল এনট্রি) ব্যবস্থা করা;
- বাংলাদেশের দূতাবাসগুলোতে রাষ্ট্রদূতসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের মঞ্জুরি কমিশন, পরিকল্পনা কমিশন, বিচার বিভাগের উচ্চ পদে নারীদের নিয়োগ প্রদান করা;
- জাতিসংঘের বিভিন্ন শাখা ও অঙ্গ সংগঠনে এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংগঠনে রাষ্ট্রীয় প্রতিনিধি বা প্রার্থী হিসেবে নারীকে নিয়োগ/মনোনয়ন দেয়া;
- নারীর ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে প্রবেশ পর্যায়সহ সকল পর্যায়ে, গেজেটেড ও নন-গেজেটেড পদে কোটা বৃদ্ধি করা।

৯. বিশেষ দুর্দশাগ্রস্ত নারী

- নারীর অবস্থানের বিভিন্নতা এবং বিশেষভাবে দুর্দশাগ্রস্ত নারীর প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে তাদেরকে বিশেষ সুবিধা প্রদানের জন্য পদক্ষেপ ও কর্মসূচি গ্রহণ করা।

**উপসংহার :** নারী ক্ষমতায়নের ধারণা বর্তমান বিশ্বব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পরিণত হয়েছে। সে কারণে বাংলাদেশ বেইজিং-এ নারী উন্নয়ন ও কর্মপরিকল্পনায় যে ক্ষেত্রগুলো চিহ্নিত হয়েছে তা বাস্তবায়নের অঙ্গীকার করেছে। সুশীল সমাজ গঠনে নারীর উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নে মানবিক মূল্যবোধের অনুশীলন করার লক্ষ্যে শুধু সরকারি প্রচেষ্টা নয়, বেসরকারি সংস্থাসমূহের দায়দায়িত্বও অনেক। সরকারি-বেসরকারি যৌথ প্রচেষ্টায় নারী উন্নয়ন নীতিমালা ও কার্যক্রম বাস্তবায়নের পথ প্রশস্ত হতে পারে এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

## রচনা ৫২ নারী শিক্ষা উন্নয়ন

*[২৯তম বিসিএস]*

**ভূমিকা :** পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক নারী। নারীরা এখন আর শুধু অন্তঃপুরবাসী নয়, বরং পুরুষের পাশাপাশি নারীরাও সমাজের উন্নতি সাধনে কাজ করছে। অথচ বাংলাদেশের নারীসমাজ যুগ যুগ ধরে শোষিত ও অবহেলিত হয়ে আসছে। পুরুষশাসিত সমাজব্যবস্থায় ধর্মীয় গোঁড়ামি, সামাজিক কুসংস্কার, নিপীড়ন ও বৈষম্যের বেড়াজালে নারীদের সর্বদা রাখা হয়েছে অবদমিত। তাদের মেধা ও শ্রমশক্তিকে সমাজ ও দেশ গঠনে সম্পৃক্ত করা হয়নি। নারীর উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নে গ্রহণ করা হয়নি কোনো বাস্তব পদক্ষেপ। অথচ মানুষের মৌলিক প্রয়োজনগুলো পূরণ করতেও পুরুষের পাশাপাশি সহায়তা করে নারী। এটি কোনো একমুখী প্রক্রিয়া নয় বরং দ্বিপাক্ষিক প্রক্রিয়া। নারী উন্নয়ন ও ক্ষমতায়ন বলতে বোঝায় ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক ইত্যাদি ক্ষেত্রে নারীর অধিকার এবং রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক সর্বজনীনতা সংরক্ষণ করে আত্মশক্তিতে বলীয়ান হয়ে নারীর স্বাধীন ও সার্বভৌম সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা নিশ্চিত করা। দেশের সামগ্রিক উন্নয়নের লক্ষ্যে নারীর সার্বিক উন্নয়ন ও ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করা প্রয়োজন।

**বাংলাদেশের সংবিধানে নারী :** উনবিংশ শতাব্দীর গোড়া থেকেই এ উপমহাদেশে নারী জাগরণের উন্মেষ ঘটে। ব্রিটিশবিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলন, পাকিস্তান আমলে ভাষা আন্দোলন, '৬৯-এর



গণঅভ্যুত্থান এবং স্বাধিকার আন্দোলনেও নারীর সক্রিয় অংশগ্রহণ ছিল অসাধারণ। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে পুরুষের পাশাপাশি নারীরাও অসামান্য অবদান রাখে। মুক্তিযুদ্ধের এই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকেই বাংলাদেশের নারীরা আত্মনির্ভরশীল ও সচেতন হয়ে ওঠে। শিক্ষা গ্রহণ ও কর্মসংস্থানের প্রত্যাশা এবং নিজেদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক অধিকার প্রতিষ্ঠায় নারীসমাজের মধ্যে বিপুল সাড়া জাগে। এতে দেশে নারী উন্নয়নের এক বিরাট সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়। ফলে দেশের জাতীয় উৎপাদনে নারীর অংশগ্রহণ আবশ্যক হয়ে ওঠে। এ প্রেক্ষাপটে ১৯৭২ সালে নবগঠিত রাষ্ট্র বাংলাদেশের সংবিধানে নারীর অধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতা নিশ্চিত করার বিধান সন্নিবেশিত হয়। সংবিধানের ২৭ ধারায় উল্লেখ করা হয়, 'সকল নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান ও আইনের সমান আশ্রয় লাভের অধিকারী।' ২৮(৩)-এ উল্লেখ আছে, 'কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী-পুরুষ ভেদে বা বিশ্রামের কারণে জনসাধারণের কোনো বিনোদন বা বিশ্রামের স্থানে প্রবেশের কিংবা কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির বিষয়ে কোনো নাগরিককে কোনোরূপ অক্ষমতা, বাধ্যবাধকতা, বাধা বা শর্তের অধীন করা যাবে না।' ২৮(৪)-এ উল্লেখ আছে, 'নারী বা শিশুদের অনুকূলে কিংবা নাগরিকদের কোনো অনগ্রসর অংশের অগ্রগতির জন্য বিশেষ বিধান প্রণয়ন হতে এই অনুচ্ছেদের কোনো কিছুই রাষ্ট্রকে নিবৃত্ত করবে না।' ২৯(১)-এ রয়েছে, 'প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগ বা পদ লাভের ক্ষেত্রে সকল নাগরিকের জন্য সুযোগের সমতা থাকবে।' ২৯(২)-এ বলা হয়েছে, 'কেবল ধর্ম, বর্ণ, গোষ্ঠী, নারী-পুরুষভেদ বা জন্মস্থানের কারণে কোনো নাগরিক প্রজাতন্ত্রের কর্মের নিয়োগ বা পদলাভের অযোগ্য হবেন না কিংবা সেক্ষেত্রে তার প্রতি বৈষম্য প্রদর্শন করা যাবে না।' ৬৫(৩) ধারায় নারীর জন্য জাতীয় সংসদে আসন সংরক্ষিত রাখা হয়েছে এবং এ ধারার অধীনে স্থানীয় শাসনসংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানসমূহে নারীর প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা হয়েছে।

**নারীর আর্থ-সামাজিক অবস্থান :** বাংলাদেশে আর্থ-সামাজিকভাবে নারীর অবস্থান বহুলাংশে অবহেলিত। দেশের জনসংখ্যার অর্ধেক নারী হলেও পুরুষের সমকক্ষ দাবি করা তাদের পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। নারীরা শিক্ষা-দীক্ষায় পুরুষের চেয়ে অনগ্রসর। ফলে তারা অবহেলিত ও পশ্চাৎপদ। লেখাপড়া কম জানা বা না জানার কারণে দেশের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে নারীর অবদান গুরুত্বপূর্ণ নয়। সামাজিক দিক থেকে নারীরা বিপর্যস্ত। পুরুষের সাথে সম-অধিকার তারা ভোগ করতে পারে না। নানা কুসংস্কারে নারীদের মন আচ্ছন্ন। চার দেয়ালের মধ্যেই যেন তারা সীমাবদ্ধ। নারী সমাজের অনগ্রসরতার জন্য তাদের সামাজিক মর্যাদা নেই। সমাজকে এগিয়ে নেয়া তাদের পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না; বরং তারা সমাজকে পেছনে ঠেলে দিচ্ছে।

**নারী নির্যাতন :** বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থায় নারীরা নানা ধরনের নির্যাতনের শিকার হচ্ছে। স্বামীগৃহে অত্যাচার, যৌতুক প্রথা, অর্থনৈতিক সঙ্কট, স্বাস্থ্যগত সমস্যা, সামাজিক কুসংস্কার ইত্যাদি নানা কারণে বাংলাদেশের নারী সমাজকে প্রতিনিয়ত নির্যাতনের শিকার হতে হয়। এসিড নিক্ষেপে নারীর জীবন বিপর্যস্ত করা এখন নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনায় পরিণত হয়েছে। নারীরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পরনির্ভরশীল। ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত এবং উপেক্ষিত জীবনের অধিকারী এদেশের নারী সমাজ।

**নারীশিক্ষা :** আমাদের দেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক নারী। সমাজ গঠনে তারা পুরুষের পাশাপাশি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর গণতান্ত্রিক চেতনার বিকাশ ঘটেছে। নারী-পুরুষের সমান অধিকার স্বীকৃত হয়েছে। বিশ্ব পরিসরে বিভিন্ন আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে এবং দেশের নারী সংগঠনগুলোর ইতিবাচক ভূমিকার ফলে জীবন ও জীবিকার নানাস্তরে নারীরা এগিয়ে

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



এসেছে। শিক্ষাঙ্গনেও তারা পারদর্শিতা দেখাতে সক্ষম হয়েছে। তবে নারীশিক্ষার ক্ষেত্রে যে অগ্রগতি, তা মূলত উচ্চবিত্ত ও নিম্নবিত্তের মধ্যে সীমিত। দেশের মোট নারীর ৪৯.৪ শতাংশ মাত্র সাক্ষর। বাকি ৫০.৬ শতাংশ নারী এখনো কুসংস্কার ও অজ্ঞতার আবর্ত থেকে বেরিয়ে আসতে পারেনি।

**নারীমুক্তি আন্দোলন :** বাংলাদেশে নারীর অধিকারহীনতা ও নির্যাতন যথেষ্ট উৎকণ্ঠার কারণ হয়ে উঠেছে। সেজন্য দেশে নারীমুক্তি আন্দোলনের সূত্রপাত হয়েছে এবং এর কিছুটা ইতিবাচক ফলও প্রত্যক্ষ করা যাচ্ছে। এদেশে বহুদিন আগেই মহীয়সী বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন নারীর ন্যায্য অধিকার আদায়ের আন্দোলন শুরু করেছিলেন। তার দেখানো পথ অনুসরণ করেই এদেশে নারীমুক্তি আন্দোলন সম্প্রসারিত হয়েছে। দেশের নারী সমাজের সচেতনতার ফলে নারী নির্যাতন বিরোধী আইন প্রণীত হয়েছে এবং তা প্রয়োগের মাধ্যমে নারীর অধিকার সংরক্ষণ করা হচ্ছে। সে সাথে নারী নির্যাতন বন্ধের প্রয়াস চালানো হচ্ছে। দেশে পারিবারিক আদালত প্রতিষ্ঠাও নারী আন্দোলনের ফসল।

**নারীর অবমূল্যায়ন :** বিশ্বব্যাপী আজ যেখানে নারী প্রগতির জয়ধ্বনি ঘোষিত হচ্ছে, সেখানে আমাদের নারীসমাজকে নানাভাবে অবমূল্যায়ন করা হচ্ছে। এখানকার সমাজে নারীকে সবসময় পুরুষের অধঃস্তন হিসেবে উপস্থাপন করা হয়। প্রচার-বিজ্ঞাপনে অহেতুক নারীর উপস্থিতি টেনে আনা হয়। নির্যাতিত নারীর পুরো নাম-ঠিকানা, এমনকি ছবি সংবলিত রিপোর্ট পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। অথচ নির্যাতনকারী পুরুষের ছবি ছাপানো হয় না। বস্তুত এখানে খাওয়া-দাওয়া, পোশাক-পরিচ্ছদ, শিক্ষা-দীক্ষা ইত্যাদি ক্ষেত্রে নারীরা পুরুষের বৈষম্যের শিকার হয়। তবে ইদানীং এ ভাবধারার অনেক পরিবর্তন হয়েছে।

**নারীর ক্ষমতায়ন :** নারীর প্রশাসনিক ক্ষমতায়ন, সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর্যায়ে নারীর অন্তর্ভুক্তি তথা উন্নয়নের মূল স্রোতধারায় নারীকে সম্পৃক্ত করার প্রথম উদ্যোগ নেয়া হয় ১৯৭২ সালে। ১৯৭৩ সালে দুজন নারীকে মন্ত্রিসভায় অন্তর্ভুক্ত করা হয় এবং ১৯৭৪ সালে একজন নারীকে বাংলা একাডেমীর মহাপরিচালক নিয়োগ করা হয়। বর্তমান সরকারের মন্ত্রিসভায় ৫ জন নারী (১৫ মে ২০১৩ পর্যন্ত) রয়েছেন। বর্তমানে প্রধানমন্ত্রী, জাতীয় সংসদের স্পিকার ও বিরোধীদলীয় নেতা তিনজনই নারী। এছাড়া পররাষ্ট্র, কৃষি ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের মতো গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রীগণও নারী। ইউনিয়ন পরিষদের ১২টি সদস্যপদের মধ্যে ৯টিতে সরাসরি নির্বাচনে অংশগ্রহণের সুযোগ রাখাসহ সংরক্ষিত ৩টি আসনে নারীর প্রতিযোগিতার সুযোগ রাখা হয়েছে। ২০১১ সালের অষ্টম ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে বহু নারী সরাসরি ভোটে চেয়ারম্যান ও মেম্বার নির্বাচিত হয়েছেন। এছাড়া ২০০৯ সালে অনুষ্ঠিত তৃতীয় উপজেলা নির্বাচনে প্রত্যেক উপজেলায় একজন নারী ভাইস চেয়ারম্যানের পদ সৃষ্টি করা হয়।

বাংলাদেশের প্রশাসনে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ে সচিব, অতিরিক্ত সচিব, যুগ্মসচিব এবং উপসচিবগণ নীতি নির্ধারণে ভূমিকা পালন করে থাকেন। বর্তমানে সচিব, অতিরিক্ত সচিব, যুগ্ম সচিব এবং উপসচিব পদে বহু নারী রয়েছেন। রাষ্ট্রদূত, বিচারপতি, বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নর, কাস্টমস কমিশনার, ডিসি পুলিশ সুপারসহ কয়েকজন নারী রয়েছেন। সম্প্রতি ডিসি পর্যায়ে মহিলা নিয়োগের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। সরকার নারীর ক্ষমতায়ন ও অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য গেজেটেড পদে শতকরা ১০ ভাগ এবং ননগেজেটেড পদে শতকরা ১৫ ভাগ কোটা নির্দিষ্ট করেছে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নতুন শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে শতকরা ৬০ ভাগ কোটা নারীদের জন্য সংরক্ষণ করা হয়েছে। সম্প্রতি সেনা, নৌ ও বিমানবাহিনীতে অফিসার পদে মহিলাদের নিয়োগ বাংলাদেশে নারী ক্ষমতায়নের ইতিহাসে জন্ম দিয়েছে নতুন অধ্যায়ের।



**নারী উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নে কতিপয় সুপারিশ :** নারী উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নে বাস্তব কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নের মূল দায়িত্ব সরকারের। একটি সুসংগঠিত ও সুবিন্যস্ত প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা গড়ে তোলার মাধ্যমেই এ দায়িত্ব সুচারুরূপে সম্পন্ন করা সম্ভব। তবে সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি সকল পর্যায়ের কর্মকাণ্ডে নারী উন্নয়ন ও ক্ষমতায়ন প্রেক্ষিত বিষয়ে উদ্যোগী হতে হবে। এ প্রসঙ্গে সম্ভাব্য কতিপয় সুপারিশ তুলে ধরা হলো :

১. **নারী উন্নয়নে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো :** নারীর ক্ষমতা উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে জাতীয় অবকাঠামো যেমন—মহিলা ও শিশুবিষয়ক মন্ত্রণালয়, মহিলাবিষয়ক অধিদপ্তর, জাতীয় মহিলা সংস্থা ও বাংলাদেশ শিশু একাডেমীর প্রশাসনিক কাঠামো শক্তিশালী করতে হবে। পর্যায়ক্রমে দেশের সকল বিভাগ, জেলা, থানা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে এসব প্রতিষ্ঠানের প্রশাসনিক কাঠামো বিস্তৃত করতে হবে এবং নারী উন্নয়নের যাবতীয় কর্মসূচি প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণের জন্য এ প্রতিষ্ঠানসমূহের ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে।

২. **জাতীয় মহিলা উন্নয়ন পরিষদ :** নারী উন্নয়ন নীতি নির্ধারণ, উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন ও পর্যালোচনার জন্য প্রধানমন্ত্রীকে সভাপতি করে ৪৪ সদস্যবিশিষ্ট যে মহিলা উন্নয়ন পরিষদ গঠন করা হয়েছে তার কার্যপরিধি নিম্নরূপ হতে পারে :

   ক. আর্থ-সামাজিক উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে মহিলাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও সংস্থার উন্নয়নমূলক কার্যক্রম সংক্রান্ত নীতি প্রণয়ন ও কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন।

   খ. মহিলাদের আইনগত অধিকার, মহিলা উন্নয়ন এবং মহিলাদের নির্যাতন প্রতিরোধ সংক্রান্ত বিষয়াবলী সম্বন্ধে নীতি প্রণয়ন।

   গ. সকল কর্মক্ষেত্রে মহিলাদের স্বার্থ সংরক্ষণ, অংশগ্রহণ ও তাদের ভাগ্যোন্নয়ন সম্পর্কে গৃহীত পদক্ষেপ বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

৩. **সংসদীয় কমিটি :** বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ কর্তৃক গঠিত নারী উন্নয়নবিষয়ক সংসদীয় স্থায়ী কমিটি গঠন করতে হবে, যা নারী উন্নয়ন কর্মসূচির পর্যালোচনা করে নারী অগ্রগতির লক্ষ্যে সরকারকে সুনির্দিষ্ট উদ্যোগ গ্রহণ করার পরামর্শ প্রদান করবে।

৪ **নারী উন্নয়ন ফোকাল পয়েন্ট :** বিভিন্ন ফোকাল পয়েন্ট যথা—মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতির আলোকে কর্মসূচি গ্রহণ, প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করবে এবং এ সকল সংস্থার কার্যক্রমে যাতে জেন্ডার প্রেক্ষিত প্রতিফলিত হয় এবং তাদের বিভিন্ন প্রতিবেদন ও দলিলসমূহে জেন্ডার বিষয়ে সুস্পষ্ট ও পর্যাপ্ত তথ্য সন্নিবেশিত হয় সে লক্ষ্যে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। এছাড়া মহিলা ও শিশুবিষয়ক মন্ত্রীকে সভাপতি এবং নারী উন্নয়নে চিহ্নিত ফোকাল পয়েন্ট মন্ত্রণালয় ও সরকারি বেসরকারি নারী উন্নয়নমূলক সংস্থার প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি 'নারী উন্নয়ন বাস্তবায়ন ও মূল্যায়ন কমিটি' গঠন করা যেতে পারে। এ কমিটি নারী উন্নয়ন সম্পর্কিত কর্মসূচি পর্যালোচনা, সমন্বয় ও মূল্যায়ন করবে। কমিটি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও সংস্থার সমস্যা চিহ্নিত করে ভবিষ্যতে কর্মসূচি দ্রুত বাস্তবায়নের জন্য পরামর্শ প্রদান করবে।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



৫. **থানা ও জেলা পর্যায় :** নারীর অগ্রগতি এবং ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে জেলা পর্যায়ের প্রশাসন, জেলা পরিষদ, পৌরসভা, স্থানীয় সরকার, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের দপ্তর ও এনজিওদের কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন ও নারী উন্নয়ন কার্যক্রমের অগ্রগতি পর্যালোচনা করা যেতে পারে।

৬. **তৃণমূল পর্যায়ে :** তৃণমূল পর্যায়ে গ্রাম ও ইউনিয়নে নারীকে স্বাবলম্বী দল হিসেবে সংগঠিত করতে হবে। এ দলসমূহকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে বিভিন্ন সরকারি সংস্থার আওতায় নিবন্ধীকৃত সংগঠন হিসেবে রূপ দেয়া যেতে পারে। সরকারি, বেসরকারি উৎস, ব্যাংক, অন্যান্য আর্থিক সংস্থা থেকে প্রাপ্ত সম্পদ আহরণ করে এ সংগঠনগুলোর সাথে ইউনিয়ন পরিষদ, থানা পরিষদ, জেলা পরিষদ, পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশনসমূহের নিবিড় সম্পর্ক স্থাপন ও সমন্বয় সাধন করবে এবং তৃণমূল পর্যায়ের সকল সংগঠনের কার্যক্রমের স্থানীয় উন্নয়নের প্রেক্ষিতে অন্তর্ভুক্তির জন্য উৎসাহিত এবং সহায়তা দান করবে।

৭. **নারী ও জেন্ডার সমতাবিষয়ক গবেষণা :** নারী উন্নয়ন ও সমতা বিষয়ে ব্যাপক গবেষণা পরিচালনার জন্য দক্ষতা বৃদ্ধির ব্যবস্থা নিতে হবে। সকল গবেষণা প্রতিষ্ঠানকে নারী উন্নয়ন, ক্ষমতায়ন এবং নারী ও শিশুদের অধিকার সম্পর্কিত বিষয়ে গবেষণার জন্য উৎসাহিত করতে হবে এবং পৃথক জেন্ডার গবেষণা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার উদ্যোগ নিতে হবে।

৮. **নারী উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান :** ঢাকায় বিদ্যমান নারী উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান শক্তিশালীকরণসহ বিভাগ, জেলা ও থানায় প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গড়ে তোলা যেতে পারে। এসব কেন্দ্রে বিভিন্ন কারিগরি, বৃত্তিমূলক, নারী অধিকার এবং শিক্ষা ও সচেতনতা বৃদ্ধি সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ দেয়ার ব্যবস্থা করতে হবে।

৯. **সামাজিক সচেতনতা :** নারী উন্নয়নের লক্ষ্যে সামাজিক সচেতনতা কর্মসূচির ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে। এ কর্মসূচিতে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে ১. আইনবিধি ও দলিলাদি থেকে নারীর মর্যাদাহানিকর বক্তব্য ও মন্তব্য অপসারণ, ২. মন্ত্রণালয় ও সংস্থার কার্যনির্বাহী, আইন ও বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তা, নীতিনির্ধারক, আইন প্রয়োগকারী সংস্থার কর্মকর্তা, বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাবৃন্দের সচেতনতা এবং ৩. নারী-পুরুষের সম্পর্ক, অধিকার ও নারী উন্নয়ন সংক্রান্ত বিষয়াবলী শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্তকরণ ইত্যাদি বিষয়ের ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করতে হবে।

১০. **নারী নির্যাতন প্রতিরোধ :** নারী উন্নয়নের লক্ষ্যে নারী নির্যাতন প্রতিরোধ কর্মসূচির ওপরও বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করতে হবে। বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে এ উদ্দেশ্যে সুপরিকল্পিত কর্মসূচি গ্রহণ করতে উদ্বুদ্ধ করতে হবে এবং এসব কর্মসূচিতে সচেতনতা, আইনগত পরামর্শ ও শিক্ষা, শাস্তিমূলক ব্যবস্থা তথা মামলা পরিচালনা করা, মামলা পরিচালনার জন্যে নিরাপদ আশ্রয় ও পুনর্বাসন, আর্থিক সহায়তা ইত্যাদি কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

১১. **সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সহযোগিতা :** নারী উন্নয়ন নীতি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে তৃণমূল পর্যায় থেকে জাতীয় পর্যায় পর্যন্ত সর্বস্তরে সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সম্ভাব্য



সহযোগিতার যোগসূত্র গড়ে তুলতে হবে। সরকারের পক্ষ থেকে বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানসমূহকে যথোপযুক্ত এবং সময়োপযোগী সহায়তা প্রদান করতে হবে এবং সরকারি-বেসরকারি সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে চিন্তাধারা, দক্ষতা ও তথ্যের আদান-প্রদান করতে হবে। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে নিয়মিত যোগাযোগ, বৈঠক, কর্মশালা ইত্যাদির মাধ্যমে এই আদান-প্রদান চলবে। ক্ষেত্র বিশেষে সরকারি-বেসরকারি যৌথ উদ্যোগে নারী উন্নয়ন কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে।

১২. **বহুপাক্ষিক সহযোগিতা :** নারীর ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে দ্বিপাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক আর্থিক ও কারিগরি সহযোগিতা ও অভিজ্ঞতা এবং প্রযুক্তি বিনিময়ের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক, আঞ্চলিক ও উপ-আঞ্চলিক সহযোগিতাকে উৎসাহিত করতে হবে।

**উপসংহার :** দেশের মোট জনসংখ্যার অর্ধেক নারী। নারী সমাজকে উপেক্ষা করে, অবহেলিত রেখে জাতি এগিয়ে যেতে পারে না। তাই নারীশিক্ষার ব্যাপক সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে এবং সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নারীদের কর্মসংস্থানের সুব্যবস্থা করতে হবে। নারী-পুরুষের ব্যবধান সম্পর্কে পুরানো ধ্যান-ধারণার পরিবর্তন ঘটিয়ে তাদের মর্যাদা স্বীকার করতে হবে। বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ। এ দেশের যথাযথ অগ্রগতি সাধনের লক্ষ্যে প্রতিটি স্তরে নারী-পুরুষকে সমানভাবে মর্যাদা দান করা উচিত।

## রচনা ৫৩ শিশুশ্রম ও বাংলাদেশের শিশু শ্রমিক

*[১৭তম বিসিএস]*

**ভূমিকা :** বর্তমানে বিশ্বব্যাপী শিশুশ্রম একটি গুরুতর ও জটিল সামাজিক সমস্যারূপে বিরাজ করছে। উন্নত ও উন্নয়নশীল উভয় সমাজে শিশুশ্রমের আধিক্য রাজনীতিবিদ, সমাজচিন্তাবিদ, আইনবিদ ও নীতি নির্ধারকদের ভাবিয়ে তুলেছে। জাতিসংঘ শিশু তহবিল মতে, বাংলাদেশে ১৪ বছরের কম বয়সী ৬.৩ মিলিয়ন শিশু গার্মেন্টস, বাসাবাড়িসহ বিভিন্ন সেক্টরে কাজ করে। UNICEF প্রদত্ত Asian Child Labour Report-এ বলা হয়েছে বাংলাদেশের শিল্প কারখানায় ৪০% শিশু কাজ করে। অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশের মতো বাংলাদেশেও শিশুশ্রম একটি জটিল ও ব্যাপকতর সমস্যা হিসেবে দেখা দিয়েছে। বাংলাদেশ সরকারের পরিসংখ্যান ব্যুরোর তথ্যানুযায়ী দেশের মোট শ্রমিকের শতকরা ১২ ভাগ শিশু শ্রমিক। শিশুর জীবন, তার পরিবার, সমাজ, দেশ এমনকি মানবজাতির জন্য শিশুশ্রমের প্রভাব শুভ ও কল্যাণকর নয়। তাই এ সমস্যা মোকাবিলায় কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণে এখনই সচেষ্ট হতে হবে। অন্যথায় বিপর্যস্ত মানবতার মধ্য দিয়ে আগামী প্রজন্মের সমাজজীবন নিঃসন্দেহে অস্বস্তিকর ও বিব্রতকর হয়ে উঠবে।

**শিশু ও শিশুশ্রমের ধারণা :** শিশুশ্রম ধারণাটির ব্যাখ্যার প্রেক্ষাপট হিসেবে শিশু কাকে বলা হবে, তা নির্ধারণ করা প্রয়োজন। জাতিসংঘ শিশু সনদে বর্ণিত সংজ্ঞানুযায়ী ১৮ বছরের কম বয়সী সকলেই শিশু। এ সংজ্ঞানুযায়ী বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার শতকরা ৪৫ ভাগই শিশুর দলে রয়েছে। এই হিসেবে শিশু সম্পর্কিত সকল আইন ও নীতি ১৭ বছর বয়স পর্যন্ত সকলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।

বাংলাদেশে সকল ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবার মতো শিশুর একক কোনো সংজ্ঞা নেই। জাতীয় শিশুনীতিতে শুধু ১৪ বছরের কম বয়সীদের শিশু ধরা হয়েছে। সংবিধিবদ্ধ আইনসমূহের ধারা অনুযায়ী ১৭ বছরের

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



চেয়ে অনেক কম বয়সীদের শিশু হিসেবে ধরা হয়েছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে শিশুদের বয়সসীমা নির্ধারণ করা হয়েছে ১১ বছর পর্যন্ত। পেনাল কোডের ধারা অনুযায়ী ১৬ বছরের কম বয়সীদের শিশু হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছে। আবার বাংলাদেশের কয়েকটি আইনে সাধারণভাবে ১৫ বছরের কম বয়স্কদের শিশু হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

**শিশুশ্রম :** বেঁচে থাকার অধিকার, নিরাপত্তালাভের অধিকার এবং উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের অধিকার থেকে বঞ্চিত যে কোনো শিশুই শিশুশ্রমিক। আয় করার জন্য কাজ করতে গিয়ে শিশুরা তাদের বয়স ও লিঙ্গ অনুযায়ী বিপদ, ঝুঁকি, শোষণ, বঞ্চনা ও আইনের জটিলতার সম্মুখীন হলে সেই কাজকে শিশুশ্রম বলা হয়। শিশুশ্রমের কতিপয় বৈশিষ্ট্য থেকে এর সংজ্ঞা নিরূপণ করা যেতে পারে।

Social Work Dictionary (1995-NASW)-র সংজ্ঞানুযায়ী, 'Child labour is paid or forced employment of children who are younger than a legally defined age.'

আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (ILO) এবং জাতিসংঘের শিশু অধিকার সনদে শিশু শ্রমের ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে। উক্ত ব্যাখ্যানুযায়ী, 'যখন কোনো শ্রম বা কর্মপরিবেশ শিশুর স্বাস্থ্য বা দৈহিক, মানসিক, আধ্যাত্মিক, নৈতিক এবং সামাজিক বিকাশের ক্ষেত্রে বিপজ্জনক ও ক্ষতিকারক হয়ে দাঁড়ায় তখন তা শিশুশ্রম হিসেবে বিবেচিত হবে।' (ILO and UN Convention on the Rights of the child consider child labour to be exploitative when the work or conditions are harmful to the child's health or physical, mental, spiritual, moral and social development.)

উপরোক্ত বিশ্লেষণের পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, শিশুশ্রম হলো শিশুদের এমন লাভজনক কাজে নিয়োগ করা যা তাদের স্বাস্থ্য ও শারীরিক বিকাশের জন্য বিপজ্জনক।

**বাংলাদেশে শিশুশ্রমের ধরন :** ১৯৯৪ সালে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (ILO) এবং ইউনিসেফ (UNICEF) পরিচালিত এক জরিপ (র‍্যাপিড অ্যাসেসমেন্ট অব চাইল্ড লেবার সিচুয়েশন ইন বাংলাদেশ) অনুযায়ী বাংলাদেশের শহরাঞ্চলে প্রায় ৩০১ ধরনের অর্থনৈতিক কাজে শিশুরা শ্রম দিচ্ছে। এর মধ্যে রয়েছে কুলি, হকার, রিকশা শ্রমিক, পতিতা, সমকামিতায় বাধ্য হওয়া, ফুল বিক্রেতা, আবর্জনা সংগ্রাহক, ইট-পাথর ভাঙ্গা, হোটেল শ্রমিক, বুননকর্মী, মাদক বাহক, বিড়ি শ্রমিক, ঝালাই কারখানার শ্রমিক, বেডিং স্টোরের শ্রমিক ইত্যাদি।

**বাংলাদেশে শিশুশ্রমের কারণ :** শিশুশ্রম অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দারিদ্র্যের ফসল আবার একই সাথে তা দারিদ্র্যের কারণও বটে। বাংলাদেশে ইউনিসেফের এক তথ্যে দেখা যায়, ৪৩ শতাংশ শ্রমজীবী শিশু পারিবারিক চরম অর্থনৈতিক দুরবস্থার কারণে শহরে স্থানান্তরিত হয়ে শিশু শ্রমিক হয়েছে। এটিই বাংলাদেশের মতো দারিদ্র্যপীড়িত দেশে শিশু শ্রমবৃদ্ধি পাওয়ার মুখ্য কারণ।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে শিশুশ্রমের সুনির্দিষ্ট কারণগুলোর মধ্যে রয়েছে—

১. দারিদ্র্যক্লিষ্ট পরিবারের শিশুরাই নিজের এবং পরিবারের অস্তিত্ব রক্ষার তাগিদে কর্মে নিযুক্ত হয়;
২. চরম দারিদ্র্যের ছোবলে অভিভাবকরা শিশুদের স্কুলের পরিবর্তে কর্মক্ষেত্রে পাঠাতে বাধ্য হয়;
৩. শিক্ষার জন্য প্রাসঙ্গিক ব্যয়ভার বহন করার অক্ষমতা;
৪. শিক্ষাব্যবস্থার দুর্বলতা;



৫. শিশুশ্রমের ক্ষতিকর পরিণাম সম্পর্কে অজ্ঞতা;
৬. যেখানে শিশুর জন্য শিক্ষার উদ্যোগ ব্যর্থ হয় সেখানে বিকল্প উদ্যোগের অভাব;
৭. শিশুর অধিকার সংরক্ষণে আইনগত পদক্ষেপের দুর্বলতা;
৮. প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে সহায়-সম্বলহীন হওয়া;
৯. বালিকা শিশুদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ;
১০. অতিরিক্ত জনসংখ্যা ইত্যাদি।

**বাংলাদেশে শিশুশ্রম পরিস্থিতি :** বাংলাদেশে সুবিধাবঞ্চিত, অসহায়, দুর্দশাগ্রস্ত গ্রামীণ এবং বস্তিবাসী শহুরে শিশুদের মধ্যে আর্থ-সামাজিক অবস্থানগত তেমন কোনো পার্থক্য নেই। সকলেই কঠোর শ্রমের শিকার। এ দেশের দরিদ্র পরিবারের এক বৃহত্তর অংশের অর্থনীতি শিশুশ্রমের ওপর টিকে আছে। বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ঐতিহ্যগতভাবেই শিশুরা বিভিন্ন কাজে নিয়োজিত হয়ে আসছে। গ্রামবাংলায় শিশুরা কৃষিকাজে পিতামাতাকে সাহায্য করছে এটি একটি সাধারণ চিত্র। শহরের শিশুরা তাদের শ্রম মেধা মনন ঢেলে দেয় বিভিন্ন কলকারখানায়, গার্মেন্টস শিল্পে, বিড়ি কারখানায়, ওয়ার্কশপে। তারা এ কাজ করে বন্দরে, গঞ্জে, হাটবাজারে, পথেঘাটে।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর তথ্য মতে, বাংলাদেশে ৫ থেকে ১৪ বছর বয়সী শিশুর সংখ্যা ৩৫.০৬ মিলিয়ন। এর মধ্যে শিশুশ্রমিক ৪.৯ মিলিয়ন; যা দেশের মোট শিশুর ১৪.২% শিশুশ্রমিক। ৫ থেকে ১৭ বছর বয়সী ৭.৯ মিলিয়ন শিশুশ্রমিক রয়েছে। এর মধ্যে ৭৩.৫ ভাগ মেয়ে শিশু এবং ২৬.৫ ভাগ ছেলে শিশুশ্রমিক। বাংলাদেশে শিশুশ্রমের প্রধান প্রধান তথ্যাবলি পরবর্তী পৃষ্ঠায় উল্লেখ করা হলো :

**শিশু শ্রমিক বৃদ্ধির প্রবণতা (১৯৯০-২০০৮) :** শিশু শ্রমিকের (৫-১৪ বছর) মোট সংখ্যা ১৯৯০-৯১ সালের শ্রমশক্তি জরিপের তথ্যানুযায়ী ছিল ৫.৮ মিলিয়ন। ২০০৭-২০০৮ সালে তা বৃদ্ধি পেয়ে ৭.৯ মিলিয়নে উপনীত হয়েছে। এ সময় শিশুশ্রমের হার মোট শ্রমশক্তির শতকরা ১২.৯ ভাগ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১৪.২ ভাগে পৌঁছেছে।

শিশুশ্রম বৃদ্ধির প্রবণতা

| *জরিপের সাল* | *১৯৯০-৯১* | *১৯৯৫-৯৬* | *১৯৯৯-২০০০* | *২০০৭-০৮* |
|---|---|---|---|---|
| *মোট শিশু শ্রমিকের সংখ্যা (মিলিয়ন)* | *৫.৮* | *৬.৫* | *৬.৯* | *৭.৯* |
| *শতকরা হার (মোট বেসামরিক শ্রমশক্তি)* | *১১.৩* | *১১.৬* | *১২.৯* | *১৪.২* |

*[উৎস : Labour Force Survey]*

**শিশু শ্রমিকদের জীবনমান :** বাংলাদেশের শহুরে শিশু শ্রমিকদের জীবনমান পরিমাপক এক জরিপে দেখা যায়, শতকরা ৫৬ ভাগ শিশু শ্রমিক ভাসমান, ৫৩ ভাগ দিনে দুবেলা আহার পায়, ৪৭ ভাগ তিনবেলা খেতে পায়, ৫৬ ভাগ ভাত, ৪৪ ভাগ রুটি বা অন্যান্য খাবার, ৬১ ভাগ ভগ্ন বা রুগ্ন স্বাস্থ্যের অধিকারী, ৩৯ ভাগ মাঝারি স্বাস্থ্যের অধিকারী, ৬২ ভাগ শিশু শ্রমিকের দিনে আয় ২০ টাকা, ২১ ভাগের আয় দিনে ২০-৩০ টাকা এবং ১৩ ভাগের আয় দিনে ৩০ টাকার ওপরে।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



**শিশু শ্রমের পরিবেশ :** বাংলাদেশের শিশু শ্রমিকেরা কেমন প্রতিকূল কর্মপরিবেশে কাজ করে তার একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা হতে পারে নিম্নরূপ :

ক. দীর্ঘ সময়ব্যাপী কাজ করা।

খ. মজুরিবিহীন বা ন্যূনতম মজুরির চেয়েও কম মজুরিতে নিয়োগ।

গ. সাপ্তাহিক বন্ধ বা বাৎসরিক ছুটির অনুপস্থিতি।

ঘ. কর্মের স্থানে পর্যাপ্ত আলো, বাতাস, পানি, বিশ্রাম কক্ষ, মলমূত্র ত্যাগের সুব্যবস্থার অনুপস্থিতি।

ঙ. চিকিৎসার সুবিধার অভাব। চ. কর্মের মাঝে বিরতির অভাব।

চ. কর্মের মাঝে বিরতির অভাব।

ছ. পেশাগত গতিশীলতার সুযোগের অনুপস্থিতি। অনেক ক্ষেত্রে নিয়োগকর্তার নিকট থেকে শিশু শ্রমিকের পিতামাতা ঋণ বা অগ্রিম পারিশ্রমিক গ্রহণ করে থাকে। এরূপ পরিস্থিতিতে কাজের চাপ বা কর্মপরিবেশ অসহনীয় হলেও শিশু তা থেকে মুক্তি পেতে পারে না।

জ. পেশাগত নিরাপত্তার অনুপস্থিতি।

**শিশুশ্রমের নেতিবাচক প্রভাব :** শিশুশ্রম শিশুর জীবনে এক অমানবিক অধ্যায়। শিশুরা কর্মে নিয়োজিত হওয়ার পরিণাম হয়তো তাৎক্ষণিক লাভ, কিন্তু এর সুদূরপ্রসারী প্রভাব দীর্ঘমেয়াদি। কেননা শিশুশ্রম শিশুর শারীরিক, বুদ্ধিবৃত্তিক, আবেগগত, সামাজিক ও নৈতিক জীবনকেও বিষিয়ে তোলে। যেসব ক্ষেত্রে শিশুশ্রমের নেতিবাচক প্রভাব লক্ষ্য করা যায় সেগুলো নিচে আলোচনা করা হলো :

১. **শিশুস্বাস্থ্যের ওপর প্রভাব :** শিশুশ্রম শিশুর সুস্বাস্থ্য রক্ষা ও শারীরিক বিকাশে অন্তরায় সৃষ্টি করে। শিশুশ্রম শিশুর স্বাস্থ্যের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ ও বিপজ্জনক। এতে তাদের স্বাস্থ্যহানি, অপুষ্টি, বিভিন্ন রোগ-ব্যাধিতে আক্রান্ত হওয়া এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যাওয়ার প্রবণতা দেখা দেয়। আবার শিশু শ্রমিকের কর্ম পরিবেশ তার দৈহিক ও মানসিক বিকাশের স্থায়ী ক্ষতি করতে পারে।

২. **দুর্ঘটনাজনিত ভবিষ্যৎ অনিশ্চয়তা :** বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানে বা কর্মক্ষেত্রে শিশুদের ঝুঁকিপূর্ণ ও বিপজ্জনক কর্মপরিবেশে কাজ করতে হয়। ফলে শিল্প দুর্ঘটনার শিকার হয়ে কর্মক্ষমতা সম্পূর্ণরূপে হারিয়ে অনেক শিশুই ভবিষ্যতে অনিশ্চয়তায় পতিত হয়। সম্প্রতি পরিচালিত এক সমীক্ষায় দেখা যায় যে, কাজ করার সময় আগুনে পোড়া, চোখে আঘাত লাগা ও বৈদ্যুতিক দুর্ঘটনায় ৪৫ শতাংশ শিশু হাতে এবং ২৭ শতাংশ শিশু পায়ে আঘাত পাচ্ছে। শিশুকালে এসব আঘাত ভবিষ্যৎ কর্মক্ষমতা হ্রাস করে কর্মলাভে অনিশ্চয়তা সৃষ্টি করে।

৩. **নিরক্ষরতা অজ্ঞতা ও অশিক্ষা সমস্যার উদ্ভব ও বিস্তার :** শিশুশ্রম বিদ্যালয়ে শিশু ভর্তির হার কমিয়ে দেয়। এতে নিরক্ষরতা ও অজ্ঞতার হার বাড়ে। আর নিরক্ষরতা ও অজ্ঞতার মধ্যে অশিক্ষাও বাড়ে। সম্প্রতি পরিচালিত এক সমীক্ষায় দেখা যায় যে, ঢাকা শহরের ৭০ শতাংশ শিশু শ্রমিক বিদ্যালয়ে যায় না এবং ৫০ শতাংশ কখনো যায়নি। যে ৫০ শতাংশ শিশু বিদ্যালয়ে গমন করেছিল তারা আবার বড়জোর তিন বছর পড়াশোনা করে বিদ্যালয় ত্যাগ করে। শহর এলাকায় ৮০ শতাংশ শিশু বিদ্যালয়ে ভর্তি হলেও এতে শিশু শ্রমিকের সংখ্যা খুবই নগণ্য। সুতরাং শিশুশ্রমের সাথে শিশুশিক্ষার একটা বিপরীত সম্পর্ক তৈরি হয়।



৪. **জাতীয় অর্থনীতিতে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে :** শিশুশ্রম জাতীয় অর্থনীতি নানাভাবে সংকটাপন্ন করে। এতে বেকারত্ব সৃষ্টি হয় এবং অসম বণ্টন ব্যবস্থার প্রসার হয়। স্বল্প মজুরিতে শিশুশ্রমের সহজপ্রাপ্যতা প্রাপ্তবয়স্কদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সীমিত করে। অন্যদিকে মজুরির হার কমে যায় বলে দরিদ্র শ্রেণী তাদের ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত হয়। ফলে আয়ের অসম বণ্টন বেড়ে যায়।

৫. **অপরাধপ্রবণতা বৃদ্ধি :** শিশুশ্রম শুধু শিশুদের স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও বিকাশের প্রতিবন্ধক নয়, বরং সমাজে এমন অনেক সমস্যা রয়েছে যেগুলো শিশুশ্রমের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হিসেবে সৃষ্টি হয়। যেমন—কিশোর অপরাধ প্রবণতার অন্যতম কারণ হলো শিশুশ্রম। বিশেষ করে যেসব শিশু রাস্তায় কুলি ও দিনমজুরের কাজ করে এবং কাজে নিয়োজিত, তাদের মধ্যে অপরাধ প্রবণতা বেশি দেখা যায়। অন্যদিকে, গৃহের শিশু শ্রমিকরা বিভিন্ন ধরনের চুরির কাজে নিয়োজিত থাকে। শিশু নির্যাতনের শিকার শিশু শ্রমিকরা সমাজের প্রতি প্রতিশোধপরায়ণ হয়ে ওঠে।

সুতরাং এসব অবস্থার প্রেক্ষিতে দেখা যায়, সমাজজীবন ও জাতীয় জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে শিশুশ্রমের অনেক নেতিবাচক প্রভাব রয়েছে।

**শিশুশ্রমের বিরুদ্ধে গৃহীত কার্যক্রম :** শিশুশ্রম প্রতিরোধ এবং শিশু অধিকার সংরক্ষণে বাংলাদেশের সংবিধানে যথেষ্ট গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। এছাড়া আইএলও'র সদস্যরাষ্ট্র হিসেবে শিশুশ্রম নিয়ন্ত্রণের জন্য বাংলাদেশ আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। একই সাথে জাতিসংঘের শিশু অধিকার সনদে ১৯৯০ সালের ৩ আগস্ট সমর্থনকারী দেশ হিসেবে বাংলাদেশ শিশুশ্রম বন্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণে বদ্ধপরিকর। শিশুদের সার্বিক সুরক্ষা নিশ্চিত করা ও অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে প্রণীত হয় শিশু আইন ১৯৭৪, যা যুগোপযোগীকরণের মাধ্যমে শিশু আইন ২০১১ রূপে প্রণয়ন করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। ১৯৯৪ সালে প্রথম জাতীয় শিশু নীতি প্রণয়ন করা হয়। বাংলাদেশ সরকার ১৯৯৪ সালে প্রণীত জাতীয় শিশু নীতি যুগোপযোগীকরণের মধ্য দিয়ে সময়োপযোগী ও আধুনিক একটি শিশু নীতি প্রণয়নের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। জাতীয় শিশু নীতি ২০১১ বাংলাদেশের শিশুদের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ বিনির্মাণে একটি সদূরপ্রসারী রূপকল্প। শিশুদের সর্বোত্তম স্বার্থ রক্ষার্থে জাতীয় সকল উন্নয়ন সংক্রান্ত নীতিমালা প্রণয়ন, পরিকল্পনা গ্রহণ, কর্মসূচি বাস্তবায়ন ও বাজেট প্রণয়নের ক্ষেত্রে জাতীয় শিশু নীতি ২০১১ প্রাসঙ্গিক ও গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা হয়।

**বাংলাদেশে শিশুশ্রম প্রতিরোধের উপায় :** শিশুদের শ্রমে নিয়োগ ও উপার্জনে বাধ্য করা শুধু অমানবিক নয়, অবিচারও বটে। তারপরও শিশুশ্রম বেড়েই চলেছে। তাই শিশুশ্রম প্রতিরোধে নিম্নোক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা দরকার :

১. শিশুকল্যাণমূলক কর্মসূচির ব্যবস্থা গ্রহণ; ২. আইনগত উদ্যোগ গ্রহণ; ৩. শ্রম ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন; ৪. পর্যাপ্ত সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার প্রবর্তন এবং ৫. শিশু অধিকার সনদের পূর্ণ বাস্তবায়ন।

উপরিউক্ত পদক্ষেপসমূহ গ্রহণের জন্য নিম্নোক্ত কর্মসূচি গ্রহণের মাধ্যমে শিশুশ্রম প্রতিরোধ করা যেতে পারে :

১. ব্যাপক গণসচেতনতা সৃষ্টি ও উদ্বুদ্ধকরণ কর্মসূচি গ্রহণ; ২. সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে সমন্বিত কর্মসূচি গ্রহণ; ৩. বাধ্যতামূলক প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষায় শিশু-কিশোরদের অন্তর্ভুক্তকরণ; ৪. দারিদ্র্য দূরীকরণে শিশু অভিভাবকদের জন্য আয় বৃদ্ধিমূলক প্রকল্প গ্রহণ; ৫. নিয়োগকর্তাদের শিশু আইন বিষয়ক জ্ঞানে উদ্বুদ্ধকরণ কর্মসূচি গ্রহণ।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



**বাংলাদেশের শিশু শ্রমিকদের সমস্যাসমূহ :** বাংলাদেশে শ্রমজীবী শিশুরা বিভিন্ন ক্ষতিকর কাজের সাথে জড়িত এবং মনিবপক্ষ কর্তৃক অর্থনৈতিক শোষণের যাঁতাকলে নিষ্পেষিত। নিচে বাংলাদেশের শিশুশ্রমিকদের সমস্যাসমূহ আলোকপাত করা হলো :

১. বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষ মনে করে যে, ১৪ বছর বয়সে, এমনকি তারও আগেই ছেলেমেয়েরা বয়ঃপ্রাপ্ত হয় এবং কাজ করার জন্য উপযুক্ত হয়ে যায়।
২. শিশু শ্রমিকদের একটি বিরাট অংশ গৃহকর্মে নিয়োজিত। এদের অধিকাংশই মেয়ে। মেয়েশিশুদের অনেকেই শারীরিক নির্যাতন এবং সেই সঙ্গে মানসিক ও যৌন নির্যাতনের শিকার হয়। অন্য শিশুরা যে অধিকারগুলো ভোগ করে, তারা সে অধিকার ভোগ করতে পারে না।
৩. অনেক শিশুই বিপজ্জনক শ্রমে নিয়োজিত। যেমন—তাদের বিপজ্জনক উপকরণ নিয়ে কাজ করতে হয়, কাঁচশিল্পে আগুনের সংস্পর্শে কাজ করতে হয় অথবা যেখানে পর্যাপ্ত আলো-বাতাস চলাচলের ব্যবস্থা নেই সেখানেও কাজ করতে হয়।
৪. শোষণমূলক যেসব অবস্থায় শিশু শ্রমিকদের কাজ করতে হয়, তার মধ্যে রয়েছে কর্মক্ষেত্রে অতি দীর্ঘ সময় থাকা, নিম্ন মজুরি এবং দৈহিক, মানসিক ও যৌন নির্যাতনের ঝুঁকি।
৫. যেহেতু দীর্ঘ সময় কাজ করতে হয় তাই কর্মজীবী শিশুরা বেশ কিছু মৌলিক অধিকার যেমন—শিক্ষা, বিশ্রাম এবং খেলাধুলার অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়।

**শিশু শ্রমিকদের সমস্যার সম্ভাব্য সমাধান**

১. প্রতিটি জেলার ১৪ বছরের কম বয়সী শিশুরা যত ধরনের কাজের সাথে সংশ্লিষ্ট তা চিহ্নিত করার চেষ্টা করতে হবে।
২. শ্রমজীবী প্রতিটি শিশুর পড়াশোনার সুযোগ নিশ্চিত করতে হবে। এজন্য আনুষ্ঠানিক এবং উপানুষ্ঠানিক উভয় ধরনের শিক্ষার সুযোগ কাজে লাগাতে হবে।
৩. যেসব পরিবার শিশুদেরকে গৃহকর্মে নিয়োজিত করে সেসব পরিবারের সদস্যদের উৎসাহিত করতে হবে যাতে তারা কাজে নিয়োজিত শিশুদেরকে কিছু কিছু সুযোগ দেয়।
৪. শিশু নির্যাতনের যে কোনো ঘটনাকে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার মাধ্যমে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করে দৃঢ়তার সঙ্গে মোকাবিলা করা।
৫. শিশুশ্রম ও শিশু অধিকার সম্পর্কে গণসচেতনতা সৃষ্টি করা।

**উপসংহার :** শিশুশ্রম একটি অপ্রিয় বাস্তবতা। ক্রমবর্ধমান দারিদ্র্য-পরিবেশগত অবনতি এবং অন্যদের দায়িত্বহীনতা থেকেই শিশুশ্রমের পরিমাণ বাড়ছে। শিশুশ্রম শারীরিক, মানসিক এবং সামাজিক প্রেক্ষাপটে অবশ্যই বর্জনীয়। শিশুরাই দেশের ভবিষ্যৎ। তাই দেশ ও জাতির সার্বিক উন্নয়নের স্বার্থে সকল শিশুকে যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। এজন্য যে কোনো মূল্যে শিশুশ্রম বন্ধ করতে হবে এবং শিশুদের সার্বিক উন্নয়ন ও সর্বাঙ্গীন বিকাশের লক্ষ্যে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সুষ্ঠু ও সুপরিকল্পিত কার্যক্রম গ্রহণ করে তার যথাযথ বাস্তবায়নের প্রতি সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করতে হবে।

# পরিবেশ ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ

## রচনা ৫৪ বাংলাদেশের পরিবেশ সমস্যা এবং এর সমাধান

*[২৪তম; ২১তম; ১১তম বিসিএস]*

**ভূমিকা :** বর্তমান বিশ্বে পরিবেশগত সমস্যা একটি মারাত্মক সমস্যা। একটু লক্ষ্য করলেই আমরা দেখতে পাই, নিজেদের অবহেলার কারণেই প্রতিদিন আমরা চারপাশে তৈরি করছি বিষাক্ত পরিমণ্ডল এবং নিজেদের ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে ঠেলে দিচ্ছি এক নিঃশব্দ বিষক্রিয়ার মধ্যে। ফলে পরিবেশের মারাত্মক অবনতি ঘটছে, যা আমাদের জীবনের জন্য হুমকিস্বরূপ।

**বাংলাদেশের পরিবেশ ধ্বংসকারী বিভিন্ন মাধ্যম বা উপাদান :** এক সময় বাংলাদেশ ছিল প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের লীলাভূমি, এর মাঠ-ঘাট, পাহাড়, নদী-নালা, বায়ু সবকিছুই ছিল বিশুদ্ধ আর নির্মল। কিন্তু বড়ই পরিতাপের বিষয় মানুষের তথা প্রাণীকূলের বেঁচে থাকার পরিবেশের প্রধান তিনটি উপাদান, যথা-মাটি, পানি ও বায়ু নানা উপায়ে দূষিত হচ্ছে; এ দূষণ আমরা ঘটাচ্ছি কখনো জেনে আবার কখনো না জেনে। যে সকল বিভিন্ন উপায় বা মাধ্যমে বাংলাদেশের পরিবেশ ক্ষতির সম্মুখীন হয় সেগুলো নিম্নে আলোচিত হলো :

১. **বিষাক্ত বাতাস :** দেশের জনসংখ্যা যেভাবে দিন দিন বেড়ে চলেছে, ঠিক তেমনিভাবে বাড়তি লোকের চাহিদা মেটানোর জন্য বৃদ্ধি পাচ্ছে যানবাহন এবং তৈরি হচ্ছে নতুন নতুন কলকারখানা। এসব গাড়ি ও কলকারখানা থেকে উদ্গত ধোঁয়া বাতাসকে করে তুলছে বিষাক্ত। বিশেষ করে বাস ট্রাকের কালো ধোঁয়া, ইটের ভাটার ধোঁয়া এবং রাস্তার ধুলোবালি পরিবেশকে দ্রুত বিপর্যয়ের দিকে নিয়ে যাচ্ছে।
২. **পলিথিন :** বাংলাদেশে পলিথিন নিষিদ্ধ করা হলেও তা রূপ পরিবর্তন করে বিভিন্নভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। পলিথিন নামক এ বিপদজনক দ্রব্যটির যাত্রা শুরু হয় আশির দশকের গোড়ার দিকে। বর্জ্য হিসেবে পলিথিন এই সভ্যতার এক ভয়াবহ শত্রু। বিশ্বজুড়ে পরিবেশ বিজ্ঞানীদের সাবধান বাণী থাকা সত্ত্বেও পলিথিন সামগ্রীর ব্যবহার এ দেশে বেড়েছে আশঙ্কাজনকভাবে। পলিথিন এক অবিনাশী বর্জ্য, যেখানেই ফেলা হোক না কেন এর শেষ নেই। পোড়ালে এই পলিথিন থেকে যে ধোঁয়া বের হয় তা-ও পরিবেশের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর। তবে ২০০২ সালের ১ মার্চ সরকার সারা দেশে পলিথিনের শপিং ব্যাগ নিষিদ্ধ করেছে।
৩. **প্লাস্টিক সামগ্রী :** পলিথিনের সঙ্গে সঙ্গে বেড়েছে প্লাস্টিক সামগ্রীরও ব্যবহার। প্লাস্টিকের বিভিন্ন পণ্যে বাজার এখন সয়লাব। মাটির জন্য এই প্লাস্টিক মারাত্মক ক্ষতিকর। এটি মাটির জন্য উপকারী ব্যাকটেরিয়াকে মেরে ফেলে। প্লাস্টিক পোড়ানোর সময় উৎপন্ন হাইড্রোজেনসায়ানাইট গ্যাস চামড়ার জন্য ভীষণ ক্ষতিকর।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



৪. **বন উজাড় :** যে কোনো দেশের পরিবেশে বনভূমি বিশেষ ভূমিকা পালন করে। বনভূমির ওপর দেশের পরিবেশগত ভারসাম্য বহুলাংশে নির্ভরশীল। কোনো দেশে পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য দেশের আয়তনের ২৫ শতাংশ বনভূমি থাকা দরকার। অথচ আমাদের দেশের বনভূমির পরিমাণ ১০ শতাংশেরও কম। সরকারি হিসেবে বনভূমির পরিমাণ ১৭.৫ শতাংশ। বনভূমি উজাড় আমাদের দেশের পরিবেশগত সমস্যার অন্যতম কারণ।

৫. **পানিতে আর্সেনিক :** দেশের অনেক অঞ্চলে খাবার পানিতে আর্সেনিকের মতো মারাত্মক রাসায়নিক পদার্থের উপস্থিতি পাওয়া গেছে। তথ্যটি যে কোনো নাগরিকের জন্য উদ্বেগজনক বিষয়। কারণ আর্সেনিক সরাসরি পাকস্থলীতে গেলে সাথে সাথে মৃত্যু ঘটতে পারে।

দেশের উত্তরাঞ্চলের জেলাগুলোতে প্রাপ্ত আর্সেনিকের নমুনা পরীক্ষা করে দেখা গেছে, প্রতি লিটার পানিতে আর্সেনিকের পরিমাণ ১.০১ এমজি যা বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার বেঁধে দেয়া মাত্রা ০.০৫ এমজির চেয়ে ২০ গুণ বেশি। কারখানার বিষাক্ত বর্জ্য মাটিতে ব্যাপকভাবে মিশে এবং আবাদি জমিতে প্রচুর পরিমাণে বিষাক্ত সার ব্যবহারের ফলে ভূ-গর্ভস্থ পানি এভাবে বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে। ফলে পরিবেশগত বিপর্যয় দিন দিন মারাত্মক আকার ধারণ করছে।

৬. **শব্দদূষণ :** শব্দদূষণ বর্তমান সময়ে এক মারাত্মক সমস্যা হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। আমরা এখন বাস করছি হাইড্রোলিক হর্ন নামে এক ভয়ঙ্কর শত্রুর সঙ্গে, যার উৎকট আওয়াজ প্রতিদিন একটু একটু করে চাপ বাড়াচ্ছে আমাদের কানের পর্দার ওপর এবং ক্ষয় করে দিচ্ছে আমাদের শ্রবণ ক্ষমতাকে। এছাড়া আমাদের শ্রবণযন্ত্রের ওপর চাপ বাড়ানোর জন্য রয়েছে মাইকের আওয়াজ ও কলকারখানার শব্দ। এর ফলে আরো ভয়াবহ শারীরিক ও মানসিক ব্যাধিরও সৃষ্টি হচ্ছে। এই শব্দদূষণ আমাদের পরিবেশগত বিপর্যয়কে আরো ঘনীভূত করছে।

৭. **রাসায়নিক ও কীটনাশকের ব্যাপক ব্যবহার :** ভালো ও উন্নত জাতের ফসল ফলানোর জন্য এবং কীটপতঙ্গের হাত থেকে ফসলকে রক্ষার জন্য কৃষকরা অপরিকল্পিতভাবে এবং ব্যাপকহারে রাসায়নিক সার ও কীটনাশক ব্যবহার করছে। এগুলো অতিমাত্রায় ব্যবহারের দরুন জীবজগৎ, প্রাণিজগৎ এবং পরিবেশ মারাত্মক হুমকির সম্মুখীন হচ্ছে।

৮. **জনসংখ্যা বৃদ্ধি :** জনসংখ্যা বৃদ্ধি পরিবেশের ওপর মারাত্মক প্রভাব ফেলে। কেননা অপরিকল্পিতভাবে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেলে অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা এবং চিকিৎসাক্ষেত্রে সঙ্কট দেখা দেয়। ফলে স্বাভাবিকভাবেই পরিবেশ দূষিত হয়। ক্রমবর্ধমান মানুষের চাপ একটি লোকালয়ের প্রকৃতি ও পরিবেশকে কতখানি বিনষ্ট করতে পারে তার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রাজধানী ঢাকা।

**পরিবেশ দূষণের ক্ষতিকর প্রভাব :** একসময় সুজলা-সুফলা, শস্য-শ্যামলা প্রাকৃতিক সম্পদে ভরপুর ছিল আমাদের এই দেশ। কিন্তু ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা বৃদ্ধি, শিল্পায়ন ও নগরায়ণ ও অবাধে বৃক্ষ নিধন এবং পরিবেশ সুরক্ষায় সচেতনতার অভাবে আমাদের বর্তমান পরিবেশ আজ বসবাসের অযোগ্য হয়ে ওঠেছে। কল-কারখানা এবং যানবাহনের নানা রকম ক্ষতিকারক গ্যাস, ইটের ভাটার কালো ধোঁয়া, শিল্পের বিষাক্ত বর্জ্য প্রভৃতির কারণে বাংলাদেশের পরিবেশ আজ মারাত্মক হুমকীর সম্মুখীন। অবাধে বৃক্ষ নিধনের ফলে বাতাসে অক্সিজেনের মাত্রা নেমে যাচ্ছে দ্রুত, বাড়ছে সিসার পরিমাণ, বিলুপ্ত হচ্ছে



নানা প্রজাতির পক্ষীকুল ও বনজ প্রাণী। নদীতে পানি দূষণের ফলে ধীরে ধীরে মাছের সংখ্যা কমে আসছে। ফলশ্রুতিতে পরিবেশ হচ্ছে দূষিত, হারিয়ে ফেলছে এর ভারসাম্য। পরিবেশের এই দীর্ঘমেয়াদী ক্ষতিকর প্রভাব অবশেষে বদলে দিবে আমাদের আবহাওয়া ও জলবায়ু। আর এর ফলে ঘটতে পারে ভয়াবহ দুর্যোগ, বসবাসের অযোগ্য হয়ে পড়তে পারে আমাদের এই সোনার দেশ। তাই এখনই সময় পরিবেশকে ভয়াবহ ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করার।

**পরিবেশ সমস্যার সমাধান :** পরিবেশ সমস্যা বাংলাদেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা। তাই এই সমস্যার সমাধান আশু প্রয়োজন। নিচে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে পরিবেশ সমস্যার সমাধান আলোচনা করা হলো :

১. **বনায়ন :** পরিবেশ সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে বনায়ন বিশেষ ভূমিকা পালন করে। তাই পরিবেশ দূষণের মরণ ছোবল থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য বনায়ন করা দেশের সচেতন প্রত্যেকটি নাগরিকের কর্তব্য। বিশ্ব পরিবেশ দিবস ও জাতিসংঘ পরিবেশ কর্মসূচির ২৫তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পরিবেশ সংরক্ষণে সরকারের গৃহীত পদক্ষেপ বর্ণনা করে বলেন, 'সরকার দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর সীমানা বেষ্টনীতে ইটের দেয়ালের পরিবর্তে সবুজ গুল্ম বেষ্টনী গড়ে তোলার নির্দেশ দিয়েছে।'

২. **শব্দদূষণ রোধ :** হাইড্রোলিক হর্ন এবং যত্রতত্র মাইক বাজানোর বিরুদ্ধে সরকার যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করলে শব্দদূষণের কবল থেকে অনেকাংশে রক্ষা পাওয়া যাবে বলে মনে হয়। হাইড্রোলিক হর্নের ব্যবহারের ক্ষেত্রে এরশাদ সরকারের আমলে আইন প্রণয়ন করা হলেও বর্তমানে তা কাগুজে বাঘ হয়ে আছে। সুতরাং বর্তমান সরকারের উচিত জাতীয় স্বার্থে শব্দদূষণ রোধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

৩. **পলিথিন বর্জন :** পলিথিন পরিহার করা পরিবেশ রক্ষার স্বার্থে দেশের প্রতিটি মানুষের কর্তব্য। নব্বই সালের গোড়ার দিকে দেশে পলিথিন উৎপাদন বন্ধের ব্যাপারে তৎকালীন সরকার একটি উদ্যোগ গ্রহণ করে। কিন্তু পরে রাজনৈতিক জটিলতা এবং ভোট নষ্ট হবার আশঙ্কায় সিদ্ধান্তটির মৃত্যু ঘটে। সম্প্রতি পলিথিন ব্যাগ নিষিদ্ধ করা হলেও এর ব্যবহার কমবেশি এখনো চলছে। এ ব্যাপারে প্রশাসনকে আরো কঠোর ভূমিকা পালন করতে হবে।

৪. **পানিদূষণ রোধ :** পরিবেশ সমস্যার সমাধান তথা জীবের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য পানিদূষণ সমস্যার সমাধান অতীব জরুরি। পানিদূষণ রোধ করে পরিবেশ রক্ষার জন্য প্রয়োজনে নদীর আশেপাশে গড়ে ওঠা শিল্প-কারখানাগুলো অন্যত্র স্থানান্তর করতে হবে।

৫. **প্রাকৃতিক সার ব্যবহার :** রাসায়নিক সারের ব্যাপক ব্যবহারের ফলে আমাদের পরিবেশের ওপর যে প্রভাব পড়ছে তা থেকে রক্ষা পাওয়ার একমাত্র উপায় রাসায়নিক সারের ব্যবহার কমিয়ে প্রাকৃতিক সারের ব্যবহারের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেয়া।

৬. **পরিবেশ আইনের প্রয়োগ :** প্রত্যেক দেশের মতো আমাদের দেশেও পরিবেশ রক্ষার জন্য বেশ কিছু আইন রয়েছে। পরিবেশ অধিদপ্তর যদি পরিবেশ আইন যথাযথ বাস্তবায়ন করে এবং পরিবেশ বিপর্যয়ের সমস্যা সম্পর্কে অধিক প্রচারণা চালায় ও জনমত গড়ে তোলার চেষ্টা করে তাহলে পরিবেশ বিপর্যয়ের হাত থেকে আমরা অনেকটা নিরাপদ থাকতে পারব বলে বিশ্বাস।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



৭. **সচেতনতা বৃদ্ধি :** পরিবেশ বিপর্যয়ের সমস্যা সামগ্রিকভাবে একটি দেশের জাতীয় সমস্যা। কাজেই এই সমস্যা থেকে জাতিকে মুক্ত করার জন্য কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা বিশেষ আইনই যথেষ্ট নয়, এজন্য দরকার দেশের সমগ্র জনগণের চেতনাবোধ। দেশের জনগণ যদি পরিবেশ বিপর্যয়ের সমস্যা সম্পর্কে সচেতন হন, তাহলে পরিবেশ বিপর্যয়ের কবল থেকে আমরা অতি সহজেই নিজেদের অস্তিত্বকে রক্ষা করতে পারব।

**উপসংহার :** পরিশেষে বলা যায়, পরিবেশ বিপর্যয়ের মতো নিঃশব্দ শত্রুর হাত থেকে দেশকে রক্ষা করতে হলে আমাদের এখনই উদ্যোগী হওয়া প্রয়োজন। তাই বর্তমান সরকারের উচিত রাজনৈতিক দক্ষতা, সকলের ম্যান্ডেট আর সমন্বিত প্রশাসনিক পদক্ষেপকে কাজে লাগিয়ে বিপন্ন পরিবেশের মরণ ছোবল থেকে দেশবাসীকে রক্ষা করা এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একটি নিরাপদ ও সুন্দর স্বদেশভূমি নিশ্চিত করা।

## রচনা ৫৫ বাংলাদেশের প্রাকৃতিক দুর্যোগ

**ভূমিকা :** বাংলাদেশ প্রাকৃতিক দুর্যোগের দেশ। ভৌগোলিক অবস্থান ও জলবায়ুর কারণে প্রাকৃতিক দুর্যোগ এ দেশের একটি পরিচিত দৃশ্যপট। তীব্রতা ও ক্ষয়ক্ষতির ব্যাপকতায় বাংলাদেশের প্রাকৃতিক দুর্যোগ বর্তমানে বিশ্বব্যাপী পরিচিতি লাভ করেছে। প্রায় প্রতি বছরই এ দেশে কোনো না কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগ দেখা দেয়। এর ফলে জনগণ চরম দুর্ভোগ পোহায়, ব্যক্তি ও পরিবারের সম্পদ বিনষ্ট হয়, বিপুল পরিমাণ রাষ্ট্রীয় সম্পদ ধ্বংস হয়, দেশ ও জাতির উন্নয়নের ধারা বিঘ্নিত হয় এবং পরিবেশের দ্রুত অবনতি ঘটে। এই প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রতিরোধ করা সম্ভব না হলেও সময়মতো পূর্বপ্রস্তুতি নিয়ে এবং বিজ্ঞান, তথ্যপ্রযুক্তি, কলা-কৌশল ও জনগণের সচেতনতা সঠিকভাবে কাজে লাগিয়ে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ অনেকাংশে লাঘব করা সম্ভব। এজন্য সরকারসহ দেশের প্রতিটি নাগরিককে দুর্যোগ মোকাবিলায় সচেতন ও সচেষ্ট হতে হবে।

### দুর্যোগ ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ কি

প্রাকৃতিক বা মানবসৃষ্ট যে সকল ঘটনা মানুষের স্বাভাবিক জীবনধারাকে ব্যাহত করে, মানুষের সম্পদ ও পরিবেশের এমনভাবে ক্ষতিসাধন করে যার ফলে আক্রান্ত জনগোষ্ঠীকে জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে ব্যতিক্রমধর্মী প্রচেষ্টার মাধ্যমে মোকাবিলা করতে হয়, তা-ই হলো দুর্যোগ। আর প্রাকৃতিক কারণে যে সকল দুর্যোগ সংঘটিত হয় সেগুলো প্রাকৃতিক দুর্যোগ।

**বাংলাদেশে প্রাকৃতিক দুর্যোগের ভয়াবহতা :** বাংলাদেশ পৃথিবীর সবচেয়ে দুর্যোগপ্রবণ দেশগুলোর অন্যতম। প্রায় প্রতি বছরই বিভিন্ন ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগের শিকার হয় বাংলাদেশ। এ দেশের প্রধান প্রধান প্রাকৃতিক দুর্যোগের মধ্যে রয়েছে ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, টর্নেডো, বন্যা, খরা, নদীভাঙন, ভূমিকম্প, আর্সেনিক দূষণ ইত্যাদি। বাংলাদেশে প্রাকৃতিক দুর্যোগের রূপ অত্যন্ত ভয়াবহ। প্রাকৃতিক দুর্যোগের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হয় বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস ও নদীভাঙনে। এক হিসাবে দেখা যায়, বিগত ১৩১ বছরে এ অঞ্চলে সংঘটিত বড় বড় ১০টি ঘূর্ণিঝড়ের মধ্যে 'সিডর'-এর মাত্রা ছিল ভয়ঙ্কর। ২০০৭ সালের ১৫ নভেম্বর ঘটে যাওয়া এ ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ২.৩ মিলিয়ন ডলার, নিহতের সংখ্যা দশ সহস্রাধিক এবং উপকূলীয় প্রায় ২২টি জেলায় এর প্রভাব পড়েছিল। ১৯৬০ সালের মাঝামাঝি থেকে ১৯৯৭ সালের জুন পর্যন্ত এ দেশে ছোট ও বড় ধরনের ঘূর্ণিঝড়, টর্নেডো,



জলোচ্ছ্বাস ও কালবৈশাখীর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১৬৭টি এবং এর মধ্যে ১৫টি ছিল ভয়াবহ। এ সকল প্রাকৃতিক দুর্যোগে প্রাণহানির সংখ্যা ছিল ৬ থেকে ৮ লক্ষ এবং প্রায় ৩০ হাজার কোটি টাকার সম্পদের ক্ষতি হয়েছে। এছাড়া পদ্মা, মেঘনা, যমুনা, তিস্তা ইত্যাদি নদীতে ভাঙনের ফলে দেশের হাজার হাজার লোক গৃহহীন হয়ে পড়েছে। এ সকল প্রাকৃতিক দুর্যোগ বাংলাদেশের উন্নয়নের অগ্রযাত্রাকে অনেকাংশে পিছিয়ে দিয়েছে। নিচে বাংলাদেশের প্রধান কয়েকটি প্রাকৃতিক দুর্যোগ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো :

### বন্যা

নদীমাতৃক বাংলাদেশের প্রধান প্রাকৃতিক দুর্যোগ বন্যা। ভৌগোলিক অবস্থান, ভূতাত্ত্বিক কাঠামো, অতি বৃষ্টিপাত, একই সময়ে প্রধান নদীসমূহের পানি বৃদ্ধি, নদীতে পলল সঞ্চয়ন, পানি নিষ্কাশনে বাধা, ভূমিকম্প, নির্বিচারে বৃক্ষনিধন ইত্যাদি কারণে প্রায় প্রতি বছরই এ দেশে বন্যা হয়ে থাকে। বিগত দশকসমূহের মধ্যে ১৯৫২, ১৯৫৪, ১৯৬৮, ১৯৭৪, ১৯৮৭, ১৯৮৮, ১৯৯৮ ও ২০০৪ সালে এ দেশে ভয়াবহ বন্যা হয়েছে। বর্তমানে এ দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও উন্নয়নের প্রধান অন্তরায় হিসেবে বন্যা আবির্ভূত হয়েছে।

**বন্যার ক্ষতি :** বন্যাজনিত ক্ষয়ক্ষতি এত ব্যাপক যে, স্বল্প পরিসরে তা আলোচনা করা কঠিন। বন্যায় সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হয় জমির ফসলের। বন্যায় হাজার হাজার কোটি টাকার ফসলহানি ঘটে। গাছপালা ও ঘরবাড়ি বিনষ্ট হয়। রাস্তাঘাট ও সেতু ধ্বংস হয়। শহর-বন্দর ডুবে যাওয়ায় ব্যবসা-বাণিজ্যের বিপুল ক্ষতি হয়। বন্যার সময় মহামারীসহ বিভিন্ন ধরনের স্বাস্থ্য সমস্যা দেখা দেয়। বন্যার পানিতে পরিবেশ দূষণ মারাত্মক আকার ধারণ করে। এক কথায়, বন্যা মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ও উন্নয়নের ধারাকে মারাত্মকভাবে ব্যাহত করে।

### খরা

সাধারণত বৃষ্টিপাত কম হওয়ার কারণে খরা পরিস্থিতি ঘটে থাকে। খরার প্রভাবে খরাপীড়িত এলাকার শস্যাদি পানির অভাবে শুষ্ক হয়ে লাল বর্ণ ধারণ করে এবং গাছপালা শুকিয়ে যেতে থাকে। মাঠের ফসলের জমিতে ফাটল দেখা দেয়। মাটির রস শুকিয়ে যায় এবং ভূগর্ভস্থ পানির লেভেল নিচে নামতে থাকে। নদী-নালা, খাল-বিল, পুকুর-হাওর ইত্যাদিতে অন্যান্য বছরের তুলনায় খরার সময় পানি অস্বাভাবিকভাবে কমে যায় অথবা সম্পূর্ণ শুকিয়ে যায়।

**বাংলাদেশে খরার কারণ :** বাংলাদেশের খরা পরিস্থিতি পর্যালোচনা এবং অনুসন্ধান করলে নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহ খরার প্রধান কারণ হিসেবে বিবেচিত হয়। যথা :

ক. বাংলাদেশের পরিবেশগত ভারসাম্যের অবনতি।
খ. মাত্রাতিরিক্ত জনসংখ্যা বৃদ্ধি।
গ. নির্বিচারে বন উজাড়।
ঘ. ভৌগোলিক আবহাওয়ার পরিবর্তন।
ঙ. ভূগর্ভস্থ পানির স্তর নিচে নেমে যাওয়া।
চ. ভারত কর্তৃক যৌথ নদী (৫৪) থেকে একতরফাভাবে পানি প্রত্যাহার। এতে ভূ-উপরিস্থ পানির প্রবাহ হ্রাস পাচ্ছে, ফলে বাষ্পীকরণের পরিমাণ কমছে।
ছ. অপরিকল্পিত ও মাত্রাতিরিক্ত জমি চাষাবাদ। এতে মাটিতে পানি প্রাপ্যতা দিন দিন কমছে এবং প্রাকৃতিক নিয়মে বাষ্পীকরণের পরিমাণ হ্রাস পাচ্ছে।
জ. সময়োপযোগী সুষম বৃষ্টির অভাব ইত্যাদি।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



**বাংলাদেশের খরা পরিস্থিতি :** বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান এবং প্রাকৃতিক কারণে পানির চাহিদা অত্যন্ত প্রকট হওয়া সত্ত্বেও শুষ্ক মৌসুমে বৃষ্টিপাত কম হয়। আবার গ্রীষ্ম-বর্ষাকালে আশানুরূপ বৃষ্টিপাত না হলে সেচ, কৃষি, ফসল উৎপাদনসহ বিভিন্ন পানি ব্যবহারের ক্ষেত্রে নিদারুণ সংকটসহ দেশে খাদ্যঘাটতি দেখা দেয়। সার্বিক অবস্থা পর্যালোচনা করে দেখা যায়, বাংলাদেশে যখনই খরা হয় তখন কম বৃষ্টিপাতের কারণে পর্যাপ্ত পরিমাণ ফসল উৎপাদনে বিঘ্ন ঘটে; ভূগর্ভস্থ পানি পুনর্ভরণ হ্রাস পায়; খাল-বিল-পুকুর ইত্যাদিতে পূর্বের চেয়ে কম পানি থাকে। এমনকি ভূ-উপরিস্থ অধিকাংশ জলাশয় শুকিয়ে যায় এবং গৃহস্থালী কাজে পানির সংকট দেখা দেয়, উষ্ণ আবহাওয়া বিরাজ করে এবং তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায়। এক কথায়, খরা বাংলাদেশের জনজীবনে ব্যাপক দুর্ভোগ ডেকে আনে।

## ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস

বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান প্রাকৃতিক দুর্যোগ ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস। এ দেশে ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসে জীবন, সম্পদ ও পরিবেশের ব্যাপক ক্ষতি হয়। নিচে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

**ঘূর্ণিঝড় :** সাইক্লোন বা ঘূর্ণিঝড় কথাটি এসেছে গ্রীক 'কাইক্লোস' শব্দ থেকে। এর অর্থ সাপের কুণ্ডলী। বিজ্ঞানের বিশ্লেষণ মতে, সাইক্লোন হচ্ছে নিম্নচাপ উদ্ভূত একটি এলাকা। কোনো অল্প পরিসর স্থানে হঠাৎ বায়ুর উষ্ণতা বৃদ্ধি পেলে বায়ু হালকা হয়ে ওপরে উঠে এবং সেখানে নিম্নচাপ কেন্দ্রের সৃষ্টি হয়। তখন চারদিকের শীতল ও ভারী বায়ু প্রবল বেগে ঐ নিম্নচাপ কেন্দ্রের দিকে ছুটে আসে এবং ঘুরতে ঘুরতে কেন্দ্রে প্রবেশ করে। এই কেন্দ্রমুখী প্রবল বায়ুপ্রবাহকেই ঘূর্ণিঝড় বা সাইক্লোন বলে।

**জলোচ্ছ্বাস :** ঘূর্ণিঝড়ের কেন্দ্রে বা চক্ষুতে বাতাসের চাপ খুব কম থাকায় কেন্দ্রের কাছাকাছি অঞ্চলে সমুদ্রের পানি ফুলে ওঠে। একেই জলোচ্ছ্বাস বলে। কোনো দ্বীপাঞ্চল বা উপকূল দিয়ে ঘূর্ণিঝড় বয়ে যাওয়ার সময় ঝড়ের ঢেউ ও ঝড়ের জোয়ার এসে প্লাবন ঘটায়। তারপর ঝড়ের চক্ষু যদি সে স্থান দিয়ে অতিক্রম করে তবে ঝড়ের ঢেউ, ঝড়ের জোয়ার ও জলোচ্ছ্বাস—এই তিনটির সমন্বয়ে ঐ স্থানের বিরাট অংশ ডুবে যায়। অমাবস্যা বা পূর্ণিমার ভরা কাটালের সময় যদি জলোচ্ছ্বাস হয়, তবে তার ফল আরো মারাত্মক হয়।

**বাংলাদেশে ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের সময় :** বাংলাদেশ মৌসুমী বায়ুর দেশ। এখানে মৌসুমী ঘূর্ণিঝড় বেশি হয়। সাধারণত বর্ষা মৌসুম শুরুর আগে ইংরেজি এপ্রিল-মে মাসে, বর্ষা মৌসুমের শেষে অক্টোবর-নভেম্বর মাসে ঘূর্ণিঝড় সংঘটিত হয়। বাংলাদেশে প্রতি বছর বঙ্গোপসাগরে গড়ে ১৩-১৪টি গ্রীষ্মমণ্ডলীয় ঘূর্ণিঝড় সৃষ্টি হয়। এর মধ্যে ৪-৫টি ঘূর্ণিঝড়ের যে কোনোটির বাংলাদেশ উপকূলে আঘাত হানার সম্ভাবনা থাকে।

**বাংলাদেশের যে সকল এলাকায় ঘূর্ণিঝড় আঘাত হানে :** বাংলাদেশের উপকূলবর্তী এলাকায় ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস বেশি আঘাত হানে। এই উপকূলবর্তী অঞ্চলগুলো হচ্ছে বরিশাল, পিরোজপুর, ঝালকাঠি, পটুয়াখালী, ভোলা, বরগুনা, লক্ষ্মীপুর, চাঁদপুর, নোয়াখালী, ফেনী, চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার।

**ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের ক্ষতি :** ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস বাংলাদেশে নিয়মিত আঘাত হানে এবং এর কোনো কোনোটি খুবই মারাত্মক হয়। ১৯৬০ থেকে ২০১৩ সাল পর্যন্ত প্রায় ৫০টি ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস বাংলাদেশে আঘাত হেনেছে। এতে লক্ষ লক্ষ মানুষ ও পশুপাখি নিহত হয়েছে। কোটি কোটি টাকার সম্পদ বিনষ্ট হয়েছে। প্রাকৃতিক বন সুন্দরবন ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। প্রবল



ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসে প্রচুর বৃক্ষসম্পদ ধ্বংস হয়, বন্যপ্রাণী ও গবাদিপশু মারা যায়, ব্যাপক আবাদি জমিতে লোনাপানি ঢুকে পড়ে, ফলে বিপুল পরিমাণ ফসল ধ্বংস হয়। মানুষের ঘরবাড়ি ও অন্যান্য অবকাঠামো মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এক কথায় ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস বাংলাদেশের মানুষের স্বাভাবিক জীবনধারায় অপরিসীম ক্ষতিসাধন করে।

## কালবৈশাখী

কালবৈশাখী বাংলাদেশের আরেকটি নিয়মিত প্রাকৃতিক দুর্যোগ। কালবৈশাখী প্রতি বছরই এ দেশে আঘাত হানে। সাধারণত চৈত্র-বৈশাখ মাসে কালবৈশাখীর প্রচণ্ড থাবা শুরু হয়। এ সময় হঠাৎ দেখা যায় দুপুরের পর আকাশ ঘন কালো মেঘে ঢেকে যায় এবং উত্তর-পশ্চিম দিকে প্রচণ্ড বেগে ঝড় বইতে থাকে। এর সঙ্গে শুরু হয়ে যায় বজ্র বিদ্যুৎসহ বৃষ্টিপাত, কখনো বা শিলাবৃষ্টি। কালবৈশাখীতে বনজসম্পদ, ঘরবাড়ি, গবাদিপশু, ফসল, জীবন ও অন্যান্য সম্পদের ব্যাপক ক্ষতি হয়।

## নদীভাঙন

সীমিত ভৌগোলিক আয়তনের এই বাংলাদেশে নদীভাঙন একটি মারাত্মক প্রাকৃতিক দুর্যোগ। দেশের প্রায় সব অঞ্চলে কম-বেশি নদীভাঙন চলছে। নদীর পানির প্রবাহপথ সঙ্কুচিত হবার ফলে স্রোতের তীব্রতা বেড়ে যাওয়া এবং নির্বিচারে বৃক্ষনিধন ও নদীর গতিপথ পরিবর্তনসহ অন্যান্য কারণে দেশের প্রায় সকল প্রধান নদীতে ভাঙন চলছে। প্রতি বছর বিশেষ করে বন্যা মৌসুম ও সন্নিহিত সময়ে নদীভাঙন বাংলাদেশের প্রায় ৪০টি প্রধান ও অপ্রধান নদীতে অবধারিত ঘটনা হিসেবে দেখা দেয়।

**নদীভাঙনের ক্ষয়ক্ষতি :** নদীভাঙনের ক্ষয়ক্ষতি অপরিসীম। এর আর্থ-সামাজিক প্রতিক্রিয়াও অত্যন্ত মারাত্মক ও ভয়াবহ। নদীভাঙনের ফলে প্রতি বছর প্রায় ২০০ কোটি টাকার আর্থিক ক্ষতি হয়। প্রতি বছর প্রায় ১০ লক্ষ মানুষ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নদীভাঙনজনিত প্রতিক্রিয়ার শিকার হচ্ছে। ফলে কেবল জীবননাশই নয়, বসতবাড়ি, গোসম্পদ, গাছপালা, মূল্যবান চাষযোগ্য জমি এবং অন্যান্য পারিবারিক সম্পদ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। এছাড়াও নদীভাঙনের সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক প্রতিক্রিয়া আরো দীর্ঘমেয়াদি। নদীভাঙনের ফলে অনেক পরিবার তাদের সামাজিক মান-মর্যাদা ও অর্থনৈতিক মান রক্ষায় বিপর্যস্ত হচ্ছে, মধ্যবিত্ত ও উচ্চ মধ্যবিত্তদের মাঝে অনেকের লেখাপড়া, ব্যবসা-বাণিজ্য হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেছে এবং অনেকের পেশাগত পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেছে। এক কথায় বলা যায়, নদীভাঙন বাংলাদেশের মানুষের স্বাভাবিক জীবনধারায় অপরিসীম ক্ষয়ক্ষতি সৃষ্টি করছে।

## ভূমিকম্প

প্রাকৃতিক দুর্যোগের মধ্যে ভূমিকম্পও বহু শতাব্দী ধরে বাংলাদেশে আঘাত হানছে। ভূতাত্ত্বিকরা বাংলাদেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলকে ভূমিকম্পপ্রবণ এলাকা হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। পার্বত্য চট্টগ্রাম, সিলেট, ময়মনসিংহ ও রংপুর এই এলাকার আওতাভুক্ত।

**ভূমিকম্পের কারণ :** সাধারণত কঠিন ভূ-ত্বকের কখনো কখনো হঠাৎ কেঁপে উঠাকে বলা হয় ভূমিকম্প। কয়েকটি প্রধান কারণে ভূমিকম্প হয়ে থাকে। যেমন—

ক. কোনো কারণে পৃথিবীর অভ্যন্তরে শিলাচ্যুতি ঘটলে তাপ বিকিরণের ফলে ভূগর্ভ সঙ্কুচিত হয়ে ভূত্বকে ভাঁজের সৃষ্টি হলে ভূমিকম্প হয়।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



**দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা :** দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা হচ্ছে দুর্যোগ সংক্রান্ত নীতিমালা প্রণয়ন ও প্রশাসনিক সিদ্ধান্তসমূহের সমষ্টি এবং এগুলোর প্রায়োগিক কাজ, যা প্রশাসনিক সকল স্তরের দুর্যোগপূর্ব, দুর্যোগকালীন ও দুর্যোগপরবর্তী পর্যায়সমূহের কার্যক্রমকে বোঝায়। অন্যভাবে বলা যায়, Disaster management is an applied science which seeks by the systematic observation and analysis of disasters, to improve measurers relating to prevention, mitigation, preparedness, emergency response and recovery. অর্থাৎ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা হচ্ছে এরূপ একটি ব্যবহারিক বিজ্ঞান, যার আওতায় পড়ে যথাযথ পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে দুর্যোগ প্রতিরোধ, দুর্যোগ প্রস্তুতি এবং দুর্যোগে জরুরি সাড়া দান ও পুনরুদ্ধার ইত্যাদি কার্যক্রম।

দুর্যোগের ঝুঁকি হ্রাস ও দুর্যোগজনিত সকল প্রকার ক্ষয়ক্ষতি কমানোর উদ্দেশ্যে কাজ করাই দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার মূল লক্ষ্য। সম্ভাব্য দুর্যোগ সংঘটন কমানো ও এর ক্ষয়ক্ষতি হ্রাসের উদ্দেশ্যে উপযুক্ত পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, আসন্ন দুর্যোগের বিষয়ে সতর্ক সংকেত প্রচারের ব্যবস্থাদি প্রস্তুত রাখা, দুর্যোগপ্রবণ এলাকার অবস্থাদি সর্বদা পরিবীক্ষণ, ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রম পর্যালোচনা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার আওতাভুক্ত।

**দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্য :** দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার প্রধান উদ্দেশ্য তিনটি। সেগুলো হলো :

১. দুর্যোগের সময় জীবন, সম্পদ ও পরিবেশের যে ক্ষতি হয়ে থাকে তা এড়ানোর বা ক্ষতির পরিমাণ হ্রাস করা।
২. প্রয়োজন অনুযায়ী ক্ষতিগ্রস্ত জনগণের মধ্যে অল্প সময়ে সকল প্রকার ত্রাণ ও পুনর্বাসন নিশ্চিত করা। এবং
৩. দুর্যোগ পরবর্তী পুনরুদ্ধার কাজ ভালোভাবে সম্পন্ন করা।

**দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার পর্যায় :** দুর্যোগে সম্পদ, পরিবেশ, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবকাঠামো ইত্যাদির যে ক্ষতি হয়ে থাকে তা পুনর্নির্মাণের মাধ্যমে দুর্যোগপূর্ব অবস্থায় ফিরিয়ে আনাকেই পুনরুদ্ধার বা ব্যবস্থাপনা বোঝায়। সার্বিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে তিনটি পর্যায় লক্ষ্য করা যায়। যথা— ক. দুর্যোগপূর্ব পর্যায়, খ. দুর্যোগকালীন পর্যায় ও গ. দুর্যোগপরবর্তী পর্যায়।

**ক. দুর্যোগপূর্ব পর্যায় :** যে কোনো প্রাকৃতিক বিপর্যয় শুরুর আগে সম্ভাব্য সতর্ক ব্যবস্থা অবলম্বন করাই হলো দুর্যোগ পূর্বকালীন ব্যবস্থা। দুর্যোগের প্রকারভেদ অনুসারে প্রস্তুতি কর্মসূচি গ্রহণ করতে হয়। যেমন—

১. দুর্যোগপ্রবণ এলাকার জনগণ ও প্রশাসনকে সজাগকরণ এবং বিভিন্ন বিভাগের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা/কর্মচারী ও জনগণের করণীয় সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করা।
২. দুর্যোগ মোকাবিলার জন্য স্থানীয়, বিভাগীয় ও জাতীয়ভাবে পরিকল্পনা প্রণয়ন।
৩. সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা, জনপ্রতিনিধি ও স্বেচ্ছাসেবকদের প্রশিক্ষণদান।
৪. দুর্যোগকালে উদ্ধার, অপসারণ ও ত্রাণ কার্য পরিচালনার জন্য ত্রাণসামগ্রী মজুদকরণ এবং তা তড়িৎ গতিতে ক্ষতিগ্রস্ত জনগণের মাঝে পৌঁছে দেয়ার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ।
৫. আশ্রয়কেন্দ্র সংরক্ষণ।
৬. বেতার ও টেলিভিশনের মাধ্যমে দুর্যোগ সম্পর্কিত করণীয় বিষয়ে অবহিত করা এবং পূর্বাভাস প্রদান করা।

**খ. দুর্যোগকালীন পর্যায় :** দুর্যোগের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকার জনগণের জীবন ও সম্পদ রক্ষা করার জন্য অপসারণ, তল্লাশি ও উদ্ধার, ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ নিরূপণ এবং ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। প্রাথমিক চিকিৎসাসহ স্বাস্থ্য কর্মসূচি পরিচালনার প্রস্তুতি গ্রহণ ও আশ্রয়স্থল চিহ্নিত করা হয়।



**গ. দুর্যোগ-পরবর্তী ব্যবস্থা :** দুর্যোগে পরিবেশ, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবকাঠামো ইত্যাদির যে ক্ষতি হয়ে থাকে তা পুনর্নির্মাণের মাধ্যমে দুর্যোগপূর্ব অবস্থায় ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা করা হয় এ পর্যায়ে। এ লক্ষ্যে বেশ কিছু কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়ে থাকে। যেমন—কৃষি পুনর্বাসন কর্মসূচি প্রণয়ন, কৃষি ঋণের চাহিদা নিরূপণ ও প্রদান, বাসস্থান, শিল্পায়ন, রাস্তাঘাট, বাঁধ নির্মাণ, শিল্প কারখানা পুনর্নির্মাণ প্রভৃতি।

এ সকল কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন পর্যায়ে তথা জাতীয়, বিভাগ, জেলা ও স্থানীয় পর্যায়ে বিভিন্ন কমিটি রয়েছে। এছাড়া ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মসূচিতে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সেনাবাহিনী, বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও আন্তর্জাতিক সংস্থা অংশগ্রহণ করে থাকে। জাতীয় পর্যায়ে দুর্যোগ সংশ্লিষ্ট ৮টি কমিটি এবং ইউনিয়ন, উপজেলা ও জেলা পর্যায়ে একটি করে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠনের ব্যবস্থা আছে। এসব কমিটি হলো :

১. জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাউন্সিল (NDMC)।
২. আন্তঃমন্ত্রণালয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটি।
৩. জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা উপদেষ্টা কমিটি।
৪. ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি বাস্তবায়ন বোর্ড।
৫. দুর্যোগ সংশ্লিষ্ট 'ফোকাল পয়েন্ট'দের কার্যক্রম সমন্বয়কারী দল।
৬. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ ও গণসচেতনতা বৃদ্ধি সংক্রান্ত টাস্কফোর্স।
৭. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার সাথে সংশ্লিষ্ট বেসরকারি সংস্থাসমূহের সমন্বয় কমিটি।
৮. দুর্যোগ সংক্রান্ত সংকেতসমূহ দ্রুত প্রচার সম্পর্কিত কমিটি।

জাতীয় পর্যায়ে ৮টি কমিটি ছাড়াও দেশের সার্বিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে মাঠ পর্যায়ে অর্থাৎ জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটিসমূহ রয়েছে। যথা :

১. জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি,
২. উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি,
৩. ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি।

দুর্যোগপূর্বে, দুর্যোগকালে এবং দুর্যোগপরবর্তী সময়ে সারা দেশে জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে বিভিন্ন কমিটির এবং সংশ্লিষ্ট সরকারি, আধা সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার বহুমুখী বিশাল কর্মকাণ্ডের মধ্যে সমন্বয় সাধনের জন্য একটি স্বয়ংসম্পন্ন সরকারি দপ্তরের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হতে থাকে দীর্ঘদিন ধরে। এ ১৯৯৩ সালে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ব্যুরো (Disaster Management Bureau) প্রতিষ্ঠিত হয়। এরপর থেকে ব্যুরো দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে অর্পিত দায়িত্বসমূহ যথাযথভাবে পালন করে আসছে।

**দুর্যোগ মোকাবিলার জন্য দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা :** বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে দুর্যোগের ক্ষেত্রে লক্ষণীয় পার্থক্য রয়েছে। দেশের দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল বা অন্যান্য দ্বীপসমূহ ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসপ্রবণ ও উত্তরাঞ্চল বন্যা কবলিত ও খরাপ্রবণ অঞ্চল। দুর্যোগের প্রকার ভেদে ভিন্ন ভিন্ন মেয়াদে পরিকল্পনা গ্রহণ করা যেতে পারে। যেমন—

১. **বন্যা প্রতিরোধ :** ১৯৮৭ ও ১৯৮৮ সালে সর্বনাশা বন্যা সংঘটিত হয়েছিল। ১৯৮৮ সালের বন্যা ছিল সর্বনাশা ও ভয়াবহ। ৬০টি জেলা জুড়ে ১২৯৭৩ বর্গ কিমি এলাকার ৪ কোটি ৬৭ লক্ষ মানুষ বন্যার কবলে পড়েছিল। বন্যার ক্ষয়ক্ষতি ও ভয়াবহতা মানুষ আবার উপলব্ধি করে ১৯৯৮ সালের

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



ভয়াবহ বন্যায়। বাংলাদেশ সরকার বিভিন্ন দাতা সংস্থার সাহায্যে বিভিন্ন দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। যেমন—নদী-খাল পুনঃখনন, নদীর (বিপজ্জনক) দুধারে বাঁধ নির্মাণ, নগর রক্ষা বাঁধ, সংকেত প্রদান ব্যবস্থার উন্নয়ন। এ প্রসঙ্গে সরকার FAP (Flood Action Plan) দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিল।

২. **নদীভাঙন প্রতিরোধ ও খরা মোকাবিলা :** নদীভাঙন রোধে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা হলো নদীর তীর জুড়ে বেড়ী বাঁধ নির্মাণ করা, নদীর তীরে ব্যাপক বৃক্ষরোপণ করা ও নদীশাসন বিষয়ে পদক্ষেপ নেওয়া। খরা মোকাবিলায় দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা হলো ব্যাপক বনায়ন, বন উজার বন্ধকরণ এবং পুকুর খনন ও পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ।

**ঘূর্ণিঝড় মোকাবিলা :** ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস এ দুটি ভয়াবহ প্রাকৃতিক দুর্যোগ মানুষের জীবন ও সম্পদের প্রচুর ক্ষতি করে থাকে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ১৯৭০, ১৯৮৫, ১৯৯১ সালের ২৯ এপ্রিল, ১৫ নভেম্বর ২০০৭-এর সিডর, ২ মে ২০০৮-এর নার্গিস, ২৫ মে ২০০৯-এর আইলা ও ২০১৩ সালের ১৬ মের ঘূর্ণিঝড় মহাসেন উল্লেখযোগ্য। এসব ঘূর্ণিঝড়ে সরকার যেসব কর্মসূচি প্রণয়ন করেছে তা হচ্ছে উপকূলীয় এলাকায় কয়েক হাজার আশ্রয় কেন্দ্র স্থাপন, হেলিপ্যাড নির্মাণ, রাস্তা নির্মাণ, বনায়ন কর্মসূচি ইত্যাদি।

প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেমন—ঘূর্ণিঝড়, টর্নেডো, খরা, অতিবৃষ্টি ইত্যাদিকে মোকাবিলার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণের প্রয়োজনীয়তার ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো সময় মতো আবহাওয়ার তথ্যভিত্তিক পূর্বাভাস প্রদান ও সতর্কীকরণ। এ গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বের জন্য সরকারি পেশাভিত্তিক দপ্তর হিসেবে বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর কাজ করে থাকে।

মহাকাশ গবেষণাকারী সরকারি সংস্থা 'SPARRSO' ভূ-উপগ্রহের মাধ্যমে নিয়মিতভাবে মেঘচিত্র সরবরাহ করে আবহাওয়া অধিদপ্তরকে পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণে সহায়তা করছে। পানি উন্নয়ন বোর্ডের আওতাধীন বন্যা পূর্বাভাস কেন্দ্র বন্যা সংক্রান্ত পূর্বাভাস দান ও প্রচারের ব্যবস্থা করে থাকে।

বাংলাদেশ বেতার, বাংলাদেশ টেলিভিশন দুর্যোগ সংক্রান্ত সংকেতসমূহ প্রচারের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে আমাদের দেশে কর্মরত বেসরকারি সংস্থাসমূহ যেমন—অক্সফাম, ডিজাস্টার ফোরাম, কেয়ার বাংলাদেশ, কারিতাস, প্রশিকা, সিসিডিবি, বিডিপিসি (Bangladesh Disaster Preparation Centre) ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

**সমস্যাসমূহ :** দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও দুর্যোগ মোকাবিলার কৌশলগুলো সর্বদা সঠিকভাবে বা দ্রুত কার্যকর করা অসম্ভব হয়ে পড়ে বহুবিধ সমস্যার কারণে। যথা :

১. ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি, ২. অপ্রতুল চিকিৎসা সাহায্য, ৩. পুনরুদ্ধার ও পুনর্নির্মাণ ব্যয়সাপেক্ষ, ৪. অবকাঠামোর ক্ষয়-ক্ষতি ও নিত্যপ্রয়োজনীয় সেবার দুষ্প্রাপ্যতা, ৫. জনসচেতনার অভাব, ৬. সময়মতো সতর্কীকরণ সংকেত না দেয়া, ৭. প্রযুক্তির দুর্বলতা ও আধুনিক প্রযুক্তির অপ্রতুলতা, ৮. ত্রাণসামগ্রীর অভাব, ৯. আন্তর্জাতিক সাহায্য নির্ভরতা প্রভৃতি।

**উপসংহার :** ভৌগোলিক অবস্থানগত কারণেই বাংলাদেশ প্রাকৃতিক দুর্যোগের হাত থেকে পুরোপুরি মুক্তি পাবে না। তাই এই আকস্মিক দুর্যোগের মোকাবিলা যাতে ভালোভাবে করা যায় তার ব্যবস্থা করাই দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার প্রধান উদ্দেশ্য। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার সকল স্তরের সকল পর্যায়ের কার্যক্রম সফলভাবে পরিচালিত করতে পারলে দুর্যোগের হাত থেকে জীবন, সম্পদ ও পরিবেশকে বহুলাংশে রক্ষা করা সম্ভব হবে। দুর্যোগের মানবসৃষ্ট কারণগুলো যথাসম্ভব নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে। বাংলাদেশ তৃতীয় বিশ্বের স্বল্পোন্নত দেশ হওয়া সত্ত্বেও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও দুর্যোগ মোকাবিলার ক্ষেত্রে বেশ সফলতা লাভ করেছে। এসব সম্ভব হয়েছে সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভাগ বা দপ্তর, সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, আন্তর্জাতিক সহায়তা এবং ক্রমবর্ধমান সচেতন জনগোষ্ঠীর সম্মিলিত প্রচেষ্টার ফলে।



## রচনা ৫৭ বাংলাদেশের বন্যা সমস্যা ও প্রতিকার

**ভূমিকা :** ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে প্রতি বছর বাংলাদেশকে নানা ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলা করতে হয়। বন্যা বাংলাদেশে নতুন কিছু নয়। দু-এক বছর পরপরই আমরা বন্যার তাণ্ডবলীলা প্রত্যক্ষ করি। অবস্থানগত কারণেই আমাদের পক্ষে কখনোই সম্পূর্ণরূপে বন্যামুক্ত হওয়া সম্ভব নয়। তবে আমরা যদি পূর্বসতর্কতা অবলম্বন করি তাহলে ভবিষ্যতে বন্যার ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ কিছুটা হলেও সীমিত রাখা যাবে। তাই বন্যার কারণ এবং অর্থনীতিতে এর প্রভাব সম্পর্কে আলোচনার অবকাশ রয়েছে।

**প্রেক্ষাপট :** বিগত ৬০ বছরে বাংলাদেশে প্রায় ৩০টির মতো বড় ধরনের বন্যা সংঘটিত হয়েছে। এর মধ্যে ১৯৫৪, ১৯৫৫, ১৯৭৪, ১৯৮৫, ১৯৮৮, ১৯৯১, ১৯৯৮, ২০০০ সালের বন্যা এবং সর্বশেষ ২০০৪ সালের ভয়াবহ রেকর্ড সৃষ্টিকারী বন্যার কথা উল্লেখ করা যায়। বাংলাদেশের মানুষ বন্যার করাল গ্রাস থেকে মুক্তি পেতে চাইলেও মুক্তি পাচ্ছে না। বাংলাদেশে বন্যার অন্যতম কারণ হিসেবে দায়ী করা হয় অতিবৃষ্টিকে। বাংলাদেশে স্বাভাবিক বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ২৩২০ মিলিমিটার। এ বৃষ্টির শতকরা ৮০ ভাগেরও বেশি হয় জুন থেকে সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে। ফলে এ সময় অতিবৃষ্টি হলে নদীসমূহের দুকূল ছাপিয়ে বন্যার সৃষ্টি হয়। তবে এ দেশে বন্যার অন্যতম কারণ উজান থেকে আসা পাহাড়ি ঢল। হিমালয় থেকে নেমে আসা বিপুল জলরাশি ভারত ও নেপালের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের পদ্মা, মেঘনা ও ব্রহ্মপুত্র নদীর মাধ্যমে দক্ষিণের বঙ্গোপসাগরে পতিত হয়। প্রতি বছর প্রায় ৫০ লক্ষ কিউসেক পানি এ প্রধান তিনটি নদীর মাধ্যমে প্রবল বেগে প্রবাহিত হওয়ার সময় প্রবল চাপের মাধ্যমে বন্যার সৃষ্টি করে।

**বন্যার কারণ ও স্বরূপ অনুসন্ধান :** বিশেষজ্ঞরা বন্যার জন্য বেশ কয়েকটি কারণ চিহ্নিত করেছেন :

**ক. প্রাকৃতিক কারণ**

১. পদ্মা-মেঘনা-ব্রহ্মপুত্র অববাহিকার সকল পানি সমুদ্রে যাওয়ার যে একমাত্র পথ, তারই ভাটি এলাকায় বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান।

২. একদিকে পৃথিবীর উত্তাপ বৃদ্ধি এবং অন্যদিকে বনাঞ্চলসমূহ দ্রুত ধ্বংসপ্রাপ্ত হতে থাকায় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ যেমন ক্রমশ বাড়ছে, তেমনি হিমালয়ে আগে যে বিপুল পরিমাণ পানি বরফ হয়ে জমা থাকতো, তাও ক্রমে গলে নিচে নেমে আসছে।

৩. বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে গ্রীন হাউস প্রতিক্রিয়াজনিত কারণে সমুদ্রের পানির স্তর বৃদ্ধিও বন্যার বিশেষ কারণ।

৪. ভূ-গর্ভের অগভীর স্তরে পানির প্রবাহ (Sub-surface water circulation) বৃদ্ধিও বন্যার কারণ।

৫. বর্ষাকালে বঙ্গোপসাগরের ওপর দিয়ে প্রবাহিত দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু সমুদ্রের পানি দক্ষিণ-পশ্চিম দিক থেকে উত্তর-পূর্বদিকে ঠেলে বঙ্গোপসাগরের পূর্বাঞ্চলে অনেক সময় বন্যার সৃষ্টি করে। বর্ষাকালে মৌসুমী বায়ুর কারণে পানির উজান চাপ একটি সার্বক্ষণিক ব্যাপার।

৬. বর্ষাকালে বাংলাদেশের সমুদ্রে প্রচুর নিম্নচাপের সৃষ্টি হয়। এ সকল নিম্নচাপ সাময়িকভাবে বন্যা পরিস্থিতিকে আরো গুরুতর করে তোলে। তাছাড়া নিম্নচাপ থেকে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়, যা বন্যার পানি বৃদ্ধিতে সহায়ক হয়।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



খ. কৃত্রিম কারণ

১. অবকাঠামো নির্মাণ : মানুষ জীবনযাত্রার সুবিধার জন্য নদী অববাহিকায় ব্রিজ, জলবিদ্যুৎ উৎপাদন করার নিমিত্তে বাঁধ এবং বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য ভেড়িবাঁধ নির্মাণ করেছে। বাঁধ নির্মাণের ফলে নদীর স্বাভাবিক প্রবাহ বাধাগ্রস্ত হয়। তাছাড়া নদীর তীর বরাবর ভেড়িবাঁধ নির্মাণের ফলে নদীর পানি অববাহিকায় প্লাবিত হতে পারে না। ফলে দীর্ঘদিন ধরে নদীর তলদেশ পলি-বালি সঞ্চিত হতে হতে নদীর তলদেশ ভরাট হয়ে বন্যার প্রকোপ বৃদ্ধি পায়।

২. অরণ্য নিধন : গঙ্গা, যমুনা নদীর উৎসস্থলে ব্যাপকভাবে বন উজারকরণ বাংলাদেশে বন্যার আরেকটি কারণ। স্বাভাবিক অবস্থায় বৃষ্টির পানি নদী-নালায় আসার আগে বনাঞ্চলের গাছপালা, ঝোপ-ঝাড়, ঝরা পাতা ও শিকড়ে বাধা পেয়ে মোট বৃষ্টিপাতের ৫০-৫৫ ভাগ পানি ভূগর্ভে প্রবেশ করার সুযোগ পায়। কিন্তু বাংলাদেশে ব্যাপক হারে বনাঞ্চল কাটার ফলে বর্ষাকালে বৃষ্টিপাতের সিংহভাগ পানি বাধা না পেয়ে নদীতে চলে আসায় পানিপ্রবাহ বেড়ে যায় এবং বন্যার সৃষ্টি হয়। এছাড়া নদীর উৎসে বনাঞ্চল কেটে ফেলার কারণে বিরাণ এলাকায় প্রভূত পরিমাণ পলিমাটি বয়ে এনে প্রবাহ পথ বন্ধ করে দেয়।

৩. গঙ্গা নদীর ফারাক্কা বাঁধ : বাংলাদেশে বন্যার আরেকটি প্রধান কারণ হলো পশ্চিমবঙ্গের ফারাক্কা বাঁধ। এ বাঁধ নির্মাণের আগে ভাগীরথী নদীতে বর্ষাকালে যেখানে প্রতি সেকেন্ডে প্রায় ১,৩০,০০০ ঘনফুট পানি প্রবাহিত হতো, তা বাঁধ নির্মাণের পরে দাঁড়ায় ৮০,০০০ ঘনফুটে। এই হ্রাসপ্রাপ্ত ৫০,০০০ ঘনফুট পানিপ্রবাহ অতিরিক্ত হিসেবে বন্যার প্রকোপ বাড়িয়ে তুলেছে। তাছাড়া ভারত প্রতি বছর শুকনো মৌসুমে ফারাক্কায় পানি আটকে রেখে বর্ষা মৌসুমে সকল গেট একসঙ্গে খুলে দিয়ে বাংলাদেশকে পানিতে ডুবিয়ে দেয়ার প্রয়াস চালায়, যার ফলে বাংলাদেশে বন্যার সম্ভাবনা আরো বৃদ্ধি পায়।

৪. সামুদ্রিক জোয়ার ও জলোচ্ছ্বাস : বাংলাদেশের প্রধান তিনটি নদী বর্ষাকালে কোটি কোটি কিউসেক পানি দেশের ওপর দিয়ে নিয়ে যায়। কিন্তু এ বিপুল পরিমাণ পানি খুব সহজেই বঙ্গোপসাগরে মিশতে পারে না। কারণ নদীর মোহনায় বঙ্গোপসাগরে সৃষ্ট জোয়ারের পানির চাপ নদীর পানির চাপের চেয়ে ৫ গুণ বেশি। অর্থাৎ জোয়ার ও জলোচ্ছ্বাসের জন্য নদীর পানিপ্রবাহ বাধা পেয়ে সাগরে পতিত না হয়ে ওভার-ফ্লো হয়ে বন্যার সৃষ্টি করে। এছাড়া বিজ্ঞানীরা বন্যা ও জলোচ্ছ্বাসের আরেকটি কারণ দাঁড় করিয়েছেন, তা হলো 'গ্রীন হাউস প্রতিক্রিয়া'। গ্রীন হাউস প্রতিক্রিয়া তথা তাপমাত্রা বৃদ্ধির জন্য পর্বত শিখরে ও মেরু অঞ্চলের বরফ গলে নদীর পানির উচ্চতা ও প্রবাহ বৃদ্ধি করে, এই বরফ গলা পানি বৃষ্টির পানির সঙ্গে একত্রে প্রবাহিত হওয়ায় বন্যার তীব্রতা বৃদ্ধি পায়।

৫. ভূমিক্ষয় : অপরিকল্পিতভাবে রাস্তাঘাট, ব্রিজ ও কালভার্ট নির্মাণ, দালান-কোঠা তৈরি প্রভৃতি কাজে নিম্নভূমির অতিরিক্ত ব্যবহারের ফলে ভূমিক্ষয় হয়ে যায়। তাছাড়া সাম্প্রতিককালের ভূমিকম্পনের ফলেও অতিরিক্ত মাটিক্ষয় হয়ে নদীমুখ বন্ধ ও দিক পরিবর্তন করে ফেলেছে। এতে নদীতে পানি ধারণক্ষমতা কমে যাওয়ায় বন্যার প্রকোপ বৃদ্ধি পাচ্ছে।



বন্যা সমস্যার প্রতিকার : বন্যার ক্ষয়ক্ষতি ও দুর্ভোগ থেকে রক্ষার জন্য বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত কার্যত তেমন কিছু করা হয়নি। বাঁধের মাধ্যমে এ যাবৎ বন্যা নিয়ন্ত্রণের কিছুটা চেষ্টা করা হলেও তেমন কোনো সাফল্য অর্জিত হয়নি। সাম্প্রতিক কালের বন্যার তীব্রতা ও ব্যাপকতা সে কথাই প্রমাণ করে। ভৌগোলিক অবস্থানগত কারণে বন্যাকে স্থায়ীভাবে প্রতিরোধ করা না গেলেও বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ব্যবহার করে অবকাঠামোগত ও অ-অবকাঠামোগত নানা ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে বন্যার ভয়াবহতা ও ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ কমানো যেতে পারে। বন্যা প্রতিরোধের ক্ষেত্রে তিন ধরনের পন্থা অবলম্বন করা যেতে পারে : ক. তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা, খ. দীর্ঘমেয়াদি ব্যবস্থা ও গ. সমন্বিত ব্যবস্থা।

ক. তাৎক্ষণিক ব্যবস্থাসমূহ

১. প্রাক-সতর্কীকরণ ব্যবস্থা : বন্যা সম্পর্কে তাৎক্ষণিকভাবে প্রাক-সতর্কীকরণ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। প্রযুক্তিগতভাবে এই ব্যবস্থা গ্রহণে বাংলাদেশ সক্ষম। এক্ষেত্রে ভূ-তাত্ত্বিক ও আঞ্চলিক পরিবাহের মাধ্যমে সর্তকীকরণ ব্যবস্থার উন্নয়ন ঘটানো যেতে পারে। ফলে জান-মাল যথেষ্ট পরিমাণে রক্ষা পাবে।

২. ত্রাণব্যবস্থা সক্রিয়করণ : বন্যা-উত্তর ত্রাণব্যবস্থা সক্রিয় রাখার উদ্দেশ্যে ও ত্বরিত সাহায্য সরবরাহের জন্য আঞ্চলিক পর্যায়ে যথেষ্ট ত্রাণসামগ্রী মজুদ রাখার ব্যবস্থা করতে হবে।

৩. আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ : পানিবন্দি এলাকায় প্রতিটি ইউনিয়ন পর্যায়ে একটি জরুরি আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ করতে হবে। এ লক্ষ্যে একটি স্কুলগৃহকে বহুতলে রূপান্তরিত করা যেতে পারে, যা অন্তত ৩,০০০ লোক ধারণ করতে পারে।

৪. স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান স্থাপন : সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়সমূহকে বন্যা প্রতিরোধের জন্য আরো কার্যকর ও সক্রিয় হতে হবে। এক্ষেত্রে একটি দুর্যোগ সংক্রান্ত স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা যেতে পারে। প্রতিষ্ঠানটি বন্যাসহ সকল দুর্যোগ সম্পর্কে তথ্য আহরণ, সংরক্ষণ, প্রচার এবং দুর্যোগ প্রতিরোধক কর্মসূচি ও গবেষণা পরিচালনা করবে।

৫. অন্যান্য ব্যবস্থা : এছাড়া সরকার ও জনগণের বন্যার আগাম প্রস্তুতি গ্রহণ করা, ঘরবাড়ির ভিটে উঁচু করা ও গুচ্ছগ্রাম গড়ে তোলা, বন্যার উপযোগী ধানের উদ্ভাবন ও চাষ করা ইত্যাদি পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে বন্যার ক্ষয়ক্ষতি থেকে রক্ষা পাওয়া যেতে পারে।

খ. দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা : বন্যা প্রতিরোধ দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনাসমূহ হলো মুখ্য। দীর্ঘমেয়াদি ব্যবস্থাসমূহ নিম্নরূপ :

১. রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত : প্রকৃতপক্ষে নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার স্বার্থেই আমাদেরকে জরুরি ভিত্তিতে বন্যা নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি নিতে হবে। এক্ষেত্রে আঞ্চলিক সহযোগিতার ভিত্তিতে নেপাল, ভারত, ভুটান ও বাংলাদেশকে বন্যা নিয়ন্ত্রণের দীর্ঘমেয়াদি ও কার্যকর ব্যবস্থার জন্য সর্বোচ্চ পর্যায়ে রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



২. **বাঁধ নির্মাণ :** বন্যার পানি প্রবেশের উৎসমুখ বন্ধ করে দেয়ার উদ্দেশ্যে ব্রহ্মপুত্র, গঙ্গা ও তিস্তা— এ তিনটি নদীতেই শুধু বাঁধ নির্মাণ নয়, উক্ত তিনটি ছাড়াও দেশের বিভিন্ন খাড়ির মুখে বাঁধ দিতে হবে। এতে বাংলাদেশের পক্ষে নদীরপ্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হবে।

৩. **পোল্ডার নির্মাণ :** দেশের উপকূল ভাগে স্থাপিত ৭০০ স্বয়ংক্রিয় জোয়ারবিরোধী গেটের মতো কাঠামো দ্বারা সাগরের জোয়ার অনুপ্রবেশ রোধ এবং জলাবদ্ধ এলাকায় পোল্ডার নির্মাণ করে পানি পাম্প করে বের করার ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে।

গ. **সমন্বিত ব্যবস্থা :** ভারত, নেপাল, ভুটান ও চীনকে নিয়ে বন্যা নিয়ন্ত্রণের আন্তর্জাতিক পরিকল্পনা নিতে হবে। দেশে জাতীয় ভিত্তিতে দীর্ঘমেয়াদি ও স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। জরুরি ভিত্তিতে বন্যা নিয়ন্ত্রণের কিছু পদক্ষেপ নিতে হবে, যাতে বড় পরিকল্পনা বাস্তবায়নকালে পুনরায় বন্যা না দেখা দেয়। এ লক্ষ্যে ব্যাপকভাবে বনায়ন কর্মসূচি গ্রহণ করা যেতে পারে।

এছাড়া বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য আরো কতিপয় সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা নেয়া যেতে পারে :

১. প্রধান নদী ও শাখানদীগুলোর মুখ খনন করা, যাতে বর্ষাকালে অতিবৃষ্টির পানি দ্রুত নিষ্কাশিত হতে পারে।
২. নদীর তীর বরাবর উঁচু করে বাঁধ নির্মাণ করা, যাতে পানি নদী খাতের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হতে পারে।
৩. নদীর তলদেশ খনন করা; যাতে পানি বেশি পরিমাণে দ্রুত সাগরে চলে যেতে পারে।
৪. নদী ছোট বা বড় যা-ই হোক না কেন, নদীর মুখ বন্ধ না করে রাস্তাঘাট ও সেতু নির্মাণ।
৫. নদীর উৎসস্থলে ও অববাহিকায় ব্যাপক ঘন অরণ্য সৃষ্টি করে বৃষ্টির বা বরফ গলা পানি ধীরে ধীরে প্রবাহিত হওয়ার ব্যবস্থা করা।
৬. নদীর উৎসস্থলে ও অববাহিকায় জলাধার নির্মাণ করে পানি ধরে রাখার ব্যবস্থা করতে হবে। এই পানি পরে সেচের কাজে ব্যবহৃত হতে পারে।
৭. Flood Action plan-এর প্রস্তাবিত সমীক্ষাসমূহ পুনরায় যাচাই করা, যাতে তা জাতীয় স্বার্থে এবং চাহিদার উপযোগী করে তোলা যায়।

বন্যার সাথে যেহেতু আমাদের সহাবস্থান করতে হবে, সেহেতু বন্যাকে মেনে নিয়ে মানুষ তাদের ক্ষুদ্র সম্পদ নিয়ে যাতে বন্যায় সময় নিরাপদ থাকতে পারে সে বিষয়টি সরকারকে নিশ্চিত করতে হবে। যে বিষয়টি শুকনা মৌসুমে করা যায় তা হলো, বন্যাপ্রবণ এলাকায় সর্বোচ্চ বন্যা লেভেলের চেয়ে উঁচু মাঠ তৈরি করে (দক্ষিণাঞ্চলের কিল্লার মতো) বন্যা আশ্রয় কেন্দ্র ও স্কুল প্রতিষ্ঠা করতে হবে। এখানে বিশুদ্ধ পানি ও সুষ্ঠু পয়ঃব্যবস্থা থাকবে। খাদ্য ও ওষুধের মজুদ থাকবে। প্রথমে প্রতি ইউনিয়নে পরে প্রতি গ্রামে একটি করে বন্যা আশ্রয় কেন্দ্র নির্মাণ করতে হবে। আমাদের সস্তা জনশক্তি নির্মাণ কাজে ব্যবহার করতে হবে। এছাড়া—

– সুন্দরবন ও পাহাড়ি এলাকার মতো উঁচু খুঁটির ওপর ঘরবাড়ি নির্মাণ করার পদ্ধতি চালু করতে হবে।
– প্রথমে শহর ও পরে গ্রামকে উঁচু বাঁধ দ্বারা ঘেরাও করতে হবে।



– সস্তা শ্রমশক্তি ব্যবহার করে পুকুর, নালা, খাল, বিল খনন করে সেচের পানি সংরক্ষণ করতে হবে।
– নদী খনন অত্যন্ত ব্যয়বহুল হলেও পদ্মা, মেঘনা, যমুনা তিনটি প্রধান নদীকে নিয়মিত ড্রেজিং করে পানি সংরক্ষণের ক্ষমতা বাড়াতে হবে। খননকৃত মাটি দ্বারা উঁচু বন্যা আশ্রয় কেন্দ্র বানাতে হবে।
– নদীতীরকে স্থায়ী মজবুত কাঠামো দ্বারা সংরক্ষিত করলে নদী স্রোত বৃদ্ধি হয়ে পলি জমা বন্ধ হবে। যেরূপ স্থায়ী কাঠামো যমুনা বঙ্গবন্ধু সেতু এলাকায় করা হয়েছে।
– বেড়িবাঁধ, পানি নিয়ন্ত্রণ কাঠামো নির্মাণ করতে হবে।
– প্রতি বছর অল্প করে হলেও নদীর তীর রক্ষায় স্পার, গ্রোয়েন, পারকোপাইন, গ্যারিয়ন ইত্যাদি নিক্ষেপের পাশাপাশি শহর এলাকায় ব্রিজ এবাটমেন্ট বা পিয়ারের মতো স্কাউর ডেপথের নিচ পর্যন্ত কংক্রিটের দেয়াল নির্মাণ করা উচিত।
– পূর্বাভাস ব্যবস্থা উন্নত করতে হবে, যাতে মানুষ নিরাপদ স্থানে সরে যেতে পারে। ব্রহ্মপুত্র ও গঙ্গা অববাহিকায় অতি বৃষ্টি হলে তা আমাদের জাতীয় প্রচার মাধ্যমে জানানো উচিত। আগারগাঁওয়ে স্থাপিত রাডারটির কর্মক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য ২৪ তলা আইডিবি ভবনে স্থানান্তর করা উচিত। এছাড়া দিনাজপুর অঞ্চলে একটি রাডার কেন্দ্র স্থাপন করা প্রয়োজন।
– কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থাকে বন্যা উপযোগী করা প্রয়োজন। কাঠ বা প্লাস্টিকের ভাসমান বীজতলা তৈরি করা প্রয়োজন।
– ব্যাপক বনায়ন প্রয়োজন।

**উপসংহার :** বন্যা নামক সর্বগ্রাসী দৈত্যের ভয়ে দেশবাসী সর্বদা শঙ্কিত। বন্যার ভয়াবহ তাণ্ডবলীলায় প্রতি বছর মৃত্যুবরণ করে হাজার হাজার মানুষ। পানিতে ভেসে যায় অসংখ্য ঘরবাড়ি ও গবাদিপশু। পানিবন্দি হয়ে এক অবর্ণনীয় দুর্ভোগের শিকার হয় লাখ লাখ মানুষ। বিনষ্ট হয় হাজার হাজার একর জমির ফসল। সর্বোপরি ভেঙে যায় কৃষকের অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড এবং নেতিবাচক প্রভাব পড়ে লেনদেনের ভারসাম্যে। সুতরাং এমন অস্বস্তিকর পরিস্থিতি থেকে দেশবাসীর মুক্তির জন্য সরকারের বাস্তব ও বিজ্ঞানসম্মত পরিকল্পনা গ্রহণ করা উচিত।

## রচনা ৫৮ বাংলাদেশের ভূমিকম্প : বিপর্যয় ও ব্যবস্থাপনা

**ভূমিকা :** এমন অনেক প্রাকৃতিক পরিবর্তন আমরা লক্ষ্য করি যা মানবজীবনে কল্যাণ বয়ে আনে। আবার এই পরিবর্তন কখনো আনে ধ্বংস, আনে মৃত্যু। বর্তমানে পরিবেশের বিপর্যয়ের কারণে বাংলাদেশ নানা প্রাকৃতিক দুর্যোগের মুখোমুখি। নানা প্রকার ভূপ্রক্রিয়া এর জন্য দায়ী। মাধ্যাকর্ষণ, চৌম্বকীয় শক্তি, সৌরশক্তি প্রভৃতি ভূপৃষ্ঠের কোথাও ধীরে ধীরে পরিবর্তন আনে, আবার কখনো খুব দ্রুত পরিবর্তন সাধন করে। সাধারণভাবে বহিঃশক্তির সঙ্গে জড়িত ভূপ্রক্রিয়া ভূপৃষ্ঠে ধীর পরিবর্তন আনে। অপরদিকে অন্তঃশক্তির সঙ্গে জড়িত ভূপ্রক্রিয়া ভূপৃষ্ঠে দ্রুত পরিবর্তন সাধন করে। ভূপৃষ্ঠে দ্রুত ও আকস্মিক পরিবর্তন সাধনকারী প্রক্রিয়ার মধ্যে ভূমিকম্প অন্যতম।

**ভূমিকম্প পরিচিতি :** ভূমিকম্প হলো মাটির কম্পন। ভূমিকম্পকে ইংরেজিতে বলা হয় Earthquake. কোনো প্রাকৃতিক কারণবশত ভূপৃষ্ঠ কখনো কখনো আকস্মিকভাবে কেঁপে ওঠে। ভূত্বকের এ কেঁপে

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



ওঠাকে ভূমিকম্প বলা হয়। বিজ্ঞানীদের মতে, পৃথিবীর অভ্যন্তরে কোনো এক স্থানে ভূমিকম্পের উৎপত্তি হয়। ভূঅভ্যন্তরে যে স্থানে ভূমিকম্পের উৎপত্তি হয় তাকে ভূমিকম্পের কেন্দ্র এবং কেন্দ্রের ঠিক ওপরে ভূপৃষ্ঠের বিন্দুকে উপকেন্দ্র বলে। ভূমিকম্পের কেন্দ্র সাধারণত ভূপৃষ্ঠ থেকে অভ্যন্তরে ৩০ কিলোমিটারের মধ্যে অবস্থিত। উল্লেখ্য, কম্পন বা আন্দোলন কেন্দ্র থেকে তরলের মতো চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে এবং কম্পন বেগ কেন্দ্র থেকে উপকেন্দ্রে বেশি অনুভূত হয়। Panguine Dictionary of Philosophy-তে ভূমিকম্পের সংজ্ঞায় বলা হয়েছে : Earthquake is a movement or tremor of the earth's crust which originates naturally and below the surface.

সাধারণত ভূপৃষ্ঠ থেকে ৫ থেকে ৭০০ কিমি গভীরে এরকম কম্পনের সৃষ্টি হয়। এগুলোর মধ্যে প্রায় প্রতি ৫০০টিতে একটি মারাত্মক আকার ধারণ করে।

**ভূমিকম্পের কারণ :** সাধারণত অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক কারণে ভূমিকম্প হয়ে থাকে। প্রাকৃতিক ভূমিকম্প হয় অভ্যন্তরীণ কারণে এবং কৃত্রিম ভূমিকম্পের সৃষ্টি হয় কৃত্রিম কারণে। তা ছাড়া ভূমিকম্পের জন্য নিম্নলিখিত কারণগুলো দায়ী :

আগ্নেয়গিরি থেকে অগ্ন্যুৎপাতের কারণে ভূমিকম্প হয়। অগ্ন্যুৎপাতের কারণে সৃষ্ট ভূমিকম্প অগ্ন্যুপাতের প্রকৃতির সাথে গভীরভাবে সম্পৃক্ত। জীবন্ত বিস্ফোরক আগ্নেয়গিরি থেকে বিস্ফোরণ ঘটলে পার্শ্ববর্তী এলাকা থেকে বিরামহীন ভূমিকম্প অনুভূত হয়। এছাড়া ভূ-আন্দোলন, তাপ বিকিরণ, ভূপৃষ্ঠের চাপ বৃদ্ধি, ভূগর্ভে পানির প্রবেশ, শিলাচ্যুতি, বিস্ফোরণ ইত্যাদি কারণে ভূমিকম্পের সৃষ্টি হয়ে থাকে।

**ভূমিকম্পের মাত্রা নিরূপণ :** ভূকম্পন এবং এর মাত্রার তীব্রতা নিরূপণের জন্য সাধারণত 'সিসমোগ্রাফ' এবং রিখটার স্কেল ব্যবহৃত হয়। সিসমোগ্রাফের সাহায্যে ভূকম্পনের অনুলিপি প্রস্তুত করা সম্ভব। অপরদিকে ভূকম্পের মাত্রা নিরূপণ করা যায় রিখটার স্কেলের সাহায্যে। এই স্কেলের মান শূন্য (০) থেকে ১০ পর্যন্ত। শূন্য (০) থেকে ২ মাত্রার ভূমিকম্পকে মৃদু (মাইল্ড), ২ থেকে ৪ পয়েন্টের নিচের মাত্রায় ভূমিকম্পকে মাঝারি (মডারেট) ৫ থেকে ৭ মাত্রার ভূমিকম্পকে প্রবল (সিভিয়ার) এবং ৭-এর বেশি মাত্রার ভূমিকম্পকে বিধ্বংসী (ভায়োলেট) ভূমিকম্প বলা হয়। ৮ মাত্রার কোনো ভূমিকম্প একটি শহরকে ধুলোয় মিশিয়ে দেয়ার জন্য যথেষ্ট।

**বিশ্ব পরিমণ্ডলে ভূমিকম্প :** বাংলাদেশসহ হিমালয়ের পাদদেশে অবস্থিত অঞ্চলে যে কোনো সময় খুব বড় ধরনের ভূমিকম্প সংঘটিত হতে পারে। সম্প্রতি সম্পাদিত একটি সমীক্ষায় খুবই নিকট অতীতে এমন বড় ধরনের ভূমিকম্পের আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছে। সমীক্ষায় গবেষকরা বলেছেন, এ ভূমিকম্পের ফলে মুহূর্তের মধ্যে বিপন্ন হতে পারে পাঁচ কোটি মানুষ। ধ্বংস হয়ে যেতে পারে বাংলাদেশ, ভারত, নেপাল, পাকিস্তান ও ভুটানের বড় শহরগুলো।

পরিসংখ্যান থেকে দেখা যায়, বিশ্বে ভূমিকম্পের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের জিওলজিক্যাল সার্ভের ন্যাশনাল আর্থকোয়েক ইনফরমেশন সেন্টারের (এনইআইসি) তথ্য থেকে জানা যায়, ১৯৮৭ সালে মোট ভূমিকম্পের সংখ্যা ছিল ১১,২৯০। এ সংখ্যা ১৯৯৬ সালে বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ১৮,৮৬৪। এর মধ্যে ৩ থেকে ৫ মাত্রার ভূমিকম্পের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে সর্বাধিক।



বাংলাদেশ, মিয়ানমার, আসাম টেকটোনিক প্লেট বরাবর অবস্থিত এবং এই প্লেট হিমালয় থেকে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত। ফলে দেশগুলো মাঝারি থেকে ভয়াবহ ভূমিকম্প ঝুঁকির মধ্যে আছে। চট্টগ্রামসহ দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাংশ, সিলেট, ত্রিপুরা এবং আসাম অত্যন্ত ভয়াবহ ঝুঁকির মধ্যে আছে; কেননা হিমালয়ান প্লেট ও মিয়ানমার প্লেট পরস্পরের দিকে প্রতি বছর ১৬ মি.মি. ও ১ মি.মি. অগ্রসর হচ্ছে। এই অগ্রসরমান প্লেটের ধাক্কায় যে কোনো সময় ভয়াবহ ভূমিকম্প সংঘটিত হতে পারে।

**বাংলাদেশে ভূমিকম্পের অশনি সংকেত :** বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ এবং আমেরিকান ভূতাত্ত্বিক জরিপ ও ভারতীয় ভূতাত্ত্বিক জরিপের বিভিন্ন তথ্য থেকে জানা যায়, বাংলাদেশ বর্তমানে ভয়াবহ ভূমিকম্পের মুখোমুখি। বাংলাদেশের বৃহত্তর চট্টগ্রাম, সিলেট, রংপুরসহ উত্তরাঞ্চলে কিছুদিন যাবৎ ঘন ঘন ছোট মাপের যে কম্পনগুলো হচ্ছে সেগুলোকে বড় ধরনের ভূমিকম্পের ইঙ্গিতবহ বলে মনে করেন পরিবেশ বিজ্ঞানীরা। চট্টগ্রামে যে ভূমিকম্পনগুলো রেকর্ড হচ্ছে সেগুলো বার্মিজ ও আন্দামান নিকোবর প্লেটের সঞ্চরণের কারণ বলে মনে করা হচ্ছে। চট্টগ্রামে অনুভূত কম্পনগুলোর চেয়ে বড় দুশ্চিন্তার কারণ হচ্ছে কিছুদিন আগে রংপুর অঞ্চলে সংঘটিত ৫.২ মাত্রার ভূমিকম্পটি। কারণ এটির উৎপত্তিস্থল তিস্তাচ্যুতি। এই চ্যুতিটি এ অঞ্চলে বেশ কটি বিপর্যয়কর ভূমিকম্পের উৎপত্তিস্থল।

বিশেষজ্ঞদের মতে, বাংলাদেশ বর্তমানে ভূমিকম্পপ্রবণ এলাকা। গত এক দশকে আমাদের দেশে ২০১টি ভূমিকম্প সংঘটিত হয়েছে। বাংলাদেশে সংঘটিত বিভিন্ন সময় ভূমিকম্পের যে মাত্রা নির্ণয় করা হয়, তা নিম্নরূপ :

| ভূমিকম্প অঞ্চল | সাল | মাত্রা (রিখটার স্কেলে) |
|---|---|---|
| চট্টগ্রাম | ১৯৯৭ | ৬.৬ |
| মহেশখালী | ১৯৯৯ | ৫.২ |
| ঢাকা | ২০০১ | ৪.৮ |
| ঢাকা | ২০০২ | ৫.৫ |

এর মধ্যে ১৯৯৭ সালে ভূমিকম্পের কবলে পড়ে মৃত্যুবরণ করে ২২ জন, ১৯৯৯ সালে ৬ জন। ২০০১ সালে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে ভূমিকম্পের সময় ছুটোছুটি করে আহত হন ২২ জন। বাংলাদেশে যে ভূমিকম্পের অশনি সংকেত বেজে উঠছে তা এই সমীক্ষা থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়।

**বাংলাদেশে ভূমিকম্প এলাকা :** ১৯৯৩ সালে প্রণীত ন্যাশনাল বিল্ডিং কোডের সাইজমিক জোনিং ম্যাপে ভূমিকম্পের মাত্রানুযায়ী বাংলাদেশকে তিনটি এলাকা বা জোনে ভাগ করা হয়েছে :

ক. **মারাত্মক ঝুঁকিপূর্ণ জোন :** রিখটার স্কেলে মাত্রা ৭। এই এলাকা দেশের উত্তর ও উত্তর-পূর্বাঞ্চল নিয়ে গঠিত। বৃহত্তর সিলেট, ময়মনসিংহ, নেত্রকোনা, শেরপুর, জামালপুর, কিশোরগঞ্জ, লালমনিরহাট, কুড়িগ্রাম, রংপুরের পূর্বাঞ্চল, গাইবান্ধা, বগুড়া, সিরাজগঞ্জ ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া এই জোনের আওতাভুক্ত।

খ. **মাঝারি ঝুঁকিপূর্ণ জোন :** রিখটার স্কেলে মাত্রা ৬। দেশের মধ্যভাগ বিশেষ করে পঞ্চগড়, ঠাকুরগাঁও, দিনাজপুর, নীলফামারী, রংপুরের উত্তর-পশ্চিম ও দক্ষিণাংশ, জয়পুরহাট, নওগাঁ, টাঙ্গাইল, নরসিংদী, খাগড়াছড়ি, বান্দরবান ও কক্সবাজার জেলা এই জোনের আওতাভুক্ত।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



গ. কম ঝুঁকিপূর্ণ জোন : রিখটার স্কেলে মাত্রা ৫। এই এলাকা দেশের দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চল নিয়ে গঠিত। মেহেরপুর, ঝিনাইদহ, যশোর, বরিশাল, ঝালকাঠি, ভোলা, পটুয়াখালী, নোয়াখালী, রাজশাহী প্রভৃতি অঞ্চল এই জোনের আওতাভুক্ত।

**ভূমিকম্প ও ঢাকা অঞ্চল :** ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে পৃথিবীর এমন ২০টি বড় নগরীর অন্যতম ঢাকা। বাংলাদেশের ভূকম্পন বলয় মানচিত্র অনুসারে ঢাকার অবস্থান ২ নম্বর বলয়ে। এ বলয়ে ভূমিকম্পের সম্ভাব্য মাত্রা ৬। বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকৌশল বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. মেহেদী আহমেদ আনসারী সম্প্রতি ঢাকায় এক সেমিনারে উপস্থাপিত প্রবন্ধে জানিয়েছেন, ঢাকা নগরীর ঘরবাড়ির মাত্র ৫ শতাংশ তৈরি হয়েছে সুদৃঢ় কংক্রিটে। ৩০ শতাংশ কাঠামো প্রকৌশলগত নিয়মনীতি অনুসরণ করে নির্মিত হয়েছে। আর ২১ শতাংশ ঘরবাড়ি নির্মাণে প্রকৌশলগত কোনো নিয়মনীতি মানা হয়নি।

পুরান ঢাকার ঘরবাড়ির ওপর সম্প্রতি পরিচালিত জরিপে দেখা গেছে, প্রকৌশলীদের কোনো প্রকার পরামর্শ ও সাহায্য ছাড়াই প্রায় ৬০ শতাংশ দালান নির্মিত হয়েছে। ৪০ শতাংশ দালানের ক্ষেত্রে প্রকৌশলীর সাহায্য নেয়া হয়েছে। প্রকৌশলীর সাহায্যে নির্মিত দালানগুলোর অর্ধেকেই রয়েছে দাহ্য পদার্থ। পাশাপাশি নগরীর পুরাতন অংশে বেশির ভাগ রাস্তাই এত সরু যে, সেখান দিয়ে অগ্নিনির্বাপক গাড়ি যেতে পারে না। ভূমিকম্পের সময় আগুন ধরলে সেসব বাড়ির অধিকাংশই পুড়ে ছাই হয়ে যায়। তাছাড়া ঢাকার পূর্ব-পশ্চিম এলাকার মাটি বেলে মাটি। ওয়াটার টেবিল বা ভূগর্ভস্থ পানির অবস্থান উঁচুতে থাকায় ভবনগুলোর ভিত্তি দুর্বল। তবে ভূমিকম্পের সময় দালানকোঠা ভেঙে না পড়লেও এগুলোর ভিত দেবে যেতে পারে।

ঢাকার বস্তিগুলোতে মোট জনসংখ্যার ১৭ ভাগ মানুষ বাস করে। ঝুঁকিপূর্ণ নয়, ঢাকায় এরূপ বাসা মাত্র পাঁচ ভাগ। ঢাকার ৩০ শতাংশ বাড়ি সাধারণভাবে তৈরি। অর্থাৎ ইটের তৈরি। স্লাব ছাড়া বাড়ি ২৫ ভাগ। অবশিষ্ট বাড়ি মাটি কংক্রিটের তৈরি। ঢাকায় যেসব পুরনো বাড়ি এবং ঐতিহাসিক দালানকোঠা আছে সেগুলোর বেশির ভাগই ইট-সুরকি দিয়ে তৈরি। এগুলোও খুব দুর্বল।

স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশে নগরায়নের গতি দ্রুততর হলেও বেশির ভাগ নগরই গড়ে উঠেছে দুর্বল কাঠামোর দালানকোঠা নিয়ে অপরিকল্পিতভাবে। নগরকেন্দ্রে জমির স্বল্পতা আর ঊর্ধ্বমূল্যের কারণে রাজধানীতে হাইরাইজ এপার্টমেন্ট কালচার ব্যাপক প্রসার লাভ করেছে। ভূমিকম্পের মতো দুর্যোগকালে আশ্রয় নেয়ার মতো খোলা জায়গাও এখন ঢাকা শহরে নেই। এছাড়াও ঢাকা শহরে রয়েছে বহু পুরাতন জরাজীর্ণ দালানকোঠা যেগুলোতে মানুষ বসবাস করে। ফলে মাঝারি মাত্রার একটি ভূমিকম্পও আমাদের দেশে বিশেস করে ঢাকা শহরের জন্য ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি ও প্রাণহানির কারণ হতে পারে।

**ভূমিকম্পের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার উপায়**

**ক. প্রাক-দুর্যোগ প্রস্তুতি :** ভূমিকম্পের পূর্বাভাস প্রদান ও পরিমাপের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি স্থাপন ও পরিচালনার বিষয় পর্যালোচনা করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের প্রজ্ঞাপনে একটি কমিটি গঠিত হয়। কমিটির সুপারিশ বাস্তবায়ন করতে হলে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, বিভাগ বা অধিদপ্তরের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা প্রয়োজন। কমিটির সুপারিশসমূহের মধ্যে রয়েছে :

১. ভূমিকম্প সম্পর্কে গণসচেতনতা সৃষ্টির জন্য ব্যাপক প্রচার।

২. পূর্বপ্রস্তুতি হিসেবে সারা দেশে ভবন নির্মাণে জাতীয় 'বিল্ডিং কোড' এবং কোডের কাঠামোগত অনুসরণ বাধ্যতামূলক।



৩. রাজউকের বর্তমান ভবন নির্মাণ প্ল্যান অনুমোদনের নীতিমালার সংশোধন দরকার। কারণ এ বিষয়ে রাজউকের বর্তমান নীতিমালায় ছয়তলা পর্যন্ত ভবন নির্মাণে কোনো স্ট্রাকচারাল প্ল্যান অনুমোদনের প্রয়োজন হয় না, যা অত্যন্ত বিপজ্জনক। ঢাকা মহানগরীর প্রায় ৯৫ শতাংশ ভবন একতলা থেকে ছয়তলার মধ্যে সীমাবদ্ধ। সুতরাং ছয়তলা পর্যন্ত ভবনের ক্ষেত্রে অবশ্যই জাতীয় বিল্ডিং কোড অনুসৃত 'স্ট্রাকচারাল প্ল্যান' প্রযোজ্য হওয়া উচিত, যেহেতু জাতীয় বিল্ডিং কোডে ভূমিকম্পের জোনিক ম্যাপ অনুযায়ী সম্ভাব্য ভূমিকম্পের ম্যাগনিচুড সহ্য করার ক্ষমতাসম্পন্ন স্ট্রাকচারাল প্ল্যান অনুসরণের নীতিমালা প্রণীত হয়েছে।

৪. সারা দেশের শহরসমূহের নতুন এলাকায় রাস্তাঘাট নির্মাণের সময় দমকল বাহিনীর গাড়ি, অ্যাম্বুলেন্স, ক্রেন ইত্যাদি চলাচলের কথা বিবেচনায় রেখে প্রয়োজনমতো রাস্তা প্রশস্ত করতে হবে।

৫. ভূমিকম্প-পরবর্তী সময়ে উদ্ধার কাজে ব্যবহারের জন্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর যে যন্ত্রপাতির তালিকা তৈরি করেছে, সেগুলো এবং সেসব যন্ত্রপাতির প্রাপ্তিস্থানের তালিকা প্রত্যেক জেলা প্রশাসকের দপ্তরে সংরক্ষণ করতে হবে। এর ফলে যন্ত্রপাতি ও জনবল দ্রুত দুর্যোগকবলিত স্থানে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে।

৬. ভূমিকম্পের ফলে উদ্ভূত পরিস্থিতিতে তাৎক্ষণিকভাবে স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবক দলকে উদ্ধার কাজে নিয়োজিত করার পদক্ষেপ হিসেবে ভূমিকম্প ঝুঁকিপূর্ণ এলাকাসমূহে স্বেচ্ছাসেবক দল গঠন ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।

৭. ভূমিকম্পের পর দুর্যোগকবলিত এলাকায় ডগ স্কোয়াডের সাহায্যে ধ্বংসস্তূপে আটকে পড়া জীবিত লোকজন উদ্ধার করার ব্যবস্থা থাকা বাঞ্ছনীয়। বাংলাদেশ নৌবাহিনী ও পুলিশ বাহিনীতে এমন ডগ স্কোয়াড রাখা যেতে পারে।

৮. ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় ফিল্ড হাসপাতাল স্থাপনের প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদি বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি এবং স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের কাছে থাকা একান্ত প্রয়োজন। এছাড়া ফিল্ড হাসপাতাল স্থাপনের মহড়া অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা দরকার, যাতে প্রয়োজনের সময় অতি দ্রুত ফিল্ড হাসপাতাল স্থাপন করা যায়।

৯. বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন কর্তৃক সিলেটে নির্মীয়মান কেন্দ্রের সাথে আবহাওয়া অধিদপ্তরের ঢাকা, সিলেট, রংপুর এবং চট্টগ্রাম কেন্দ্রের সরাসরি যোগাযোগ স্থাপন করা প্রয়োজন।

১০. বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর এবং অন্যান্য সম্পৃক্ত সংস্থাসমূহের সমন্বয়ে ভূমিকম্প, ভূমিকম্প সম্বন্ধীয় গবেষণা, পরিমাণ, পূর্বাভাস এবং দুর্যোগ মোকাবিলার জন্য প্রাতিষ্ঠানিক গঠন ও উন্নয়ন প্রয়োজন, যা ভবিষ্যতে জাতীয় ভূমিকম্প গবেষণা কেন্দ্র হিসেবে কার্যক্রম গ্রহণ করতে পারবে। পাশাপাশি প্রয়োজনীয় কার্যাবলী সম্পাদনের জন্য দক্ষ পেশাগত জনবল গঠন অত্যাবশ্যক।

**খ. ভূমিকম্পের সময় করণীয় :** বাংলাদেশ ও ভারতের বেশির ভাগ মানুষ এমন সব দালান বা ঘরবাড়িতে বাস করেন, যেগুলো ভূমিকম্পের সময় প্রবলভাবে ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে ওঠে। তাই এ সকল অঞ্চলের মানুষের করণীয় হলো :

**বাড়িতে থাকলে :** ভূমিকম্পের সময় বাড়িতে থাকলে নিজেকে ও পরিবারের অন্যদের জীবন বাঁচানোর জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। কম মাত্রার ভূমিকম্প হলেও দ্রুত বৈদ্যুতিক সংযোগ বন্ধ বা বিচ্ছিন্ন করাই শ্রেয়। এমনকি গ্যাসের চুলা, হিটার ইত্যাদি বন্ধ রাখাই ভালো। বাইরে বের হওয়ার জন্য দরজা দ্রুত খুলে দেয়া উচিত। কেননা ঘরের ওপরের অংশ ভেঙে পড়তে পারে এবং তাতে বের হওয়ার পথ বন্ধ হয়ে যেতে পারে।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



**বাড়ির বাইরে থাকলে :** ভূমিকম্প অবস্থায় বাড়ির বাইরে থাকলে বড় বড় দালানকোঠার নিচে দাঁড়ানো উচিত নয়। বরং খোলা আকাশের নিচে দাঁড়িয়ে থাকলে ভূমিকম্পের ধ্বংসলীলা থেকে কিছুটা হলেও রক্ষা পাওয়া যেতে পারে।

**লিফটের ভেতরে থাকলে :** ভূমিকম্পের সময় লিফটের ভেতরে থাকলে দ্রুত নিচে নামার চেষ্টা করতে হবে।

**ট্রেন বা গাড়ির ভেতরে থাকলে :** ট্রেনে বা গাড়িতে ওঠার পর হঠাৎ ভূমিকম্প শুরু হলে কোনো জিনিস ধরে স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে থাকা উচিত যাতে ট্রেন বা গাড়ি হঠাৎ থেমে গেলে বা পড়ে গেলে ছিটকে পড়ার সম্ভাবনা কম থাকে।

**পাহাড় বা সৈকতে থাকলে :** ভূমিকম্পের সময় পাহাড় ধসে যেতে পারে। কাজেই বিপদাপন্ন স্থান থেকে নিরাপদ স্থানে গমন করাই উচিত। উপকূলীয় এলাকাতেও জীবননাশের ভয় থাকে। কাজেই এ বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য দ্রুত উপকূলীয় এলাকা ত্যাগ করা শ্রেয়।

**মার্কেট, সিনেমা হল বা আন্ডারগ্রাউন্ড শপিং মলে থাকলে :** ভূমিকম্পের সময় সিনেমা হল, সুপার মার্কেট কিংবা আন্ডারগ্রাউন্ড শপিং মলে অনেক জনসমাগম থাকায় আকস্মিক ভীতিকর পরিবেশ তৈরি হতে পারে। কাজেই ভূমিকম্পের সময় এ ধরনের কোনো স্থানে বা ভবনে থাকলে সেসব ভবন কর্তৃপক্ষ, কর্মচারী কিংবা নিরাপত্তা রক্ষীদের সাহায্য নেয়া উচিত।

**ভূমিকম্পের পরে করণীয় :** ব্যাপকাকারে ভূমিকম্প হলে তা ভয়ঙ্কর ধ্বংসলীলা সাধন করতে পারে। কাজেই সতর্কতা অবলম্বন না করলে ভূমিকম্পের পরেও নানা অসুবিধা দেখা দিতে পারে। এসব সমস্যা সমাধানে নিম্নলিখিত বিষয়ের প্রতি গুরুত্ব দেয়াই শ্রেয় :

ক. গুরুতর আহতদের না নাড়ানোই ভালো, যদি না আরো আহত হওয়ার ঝুঁকি থাকে।
খ. আগুন নেভানোর চেষ্টা করা উচিত।
গ. পানি, গ্যাস ও বৈদ্যুতিক লাইন পরীক্ষা করা।
ঘ. রেডিও অন রাখা যাতে দুর্যোগ পরবর্তী করণীয় নির্দেশাবলী শুনতে পাওয়া যায়।
ঙ. খালি পায়ে চলাফেরা না করে পায়ে জুতো পরা ভালো।
চ. সাধারণত ভূমিকম্পের পর আগুন লেগে অনেক ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এ কারণে আগুন থেকে সাবধান থাকা শ্রেয়।
ছ. গ্যাস ও বৈদ্যুতিক মেইন সুইচ বন্ধ রাখা, যাতে অতিরিক্ত কোনো প্রকার দুর্যোগ না ঘটে।
জ. ব্যাপক দুর্যোগপূর্ণ এলাকায় অসতর্কভাবে ঘোরাফেরা না করা।

**উপসংহার :** বর্তমান অবস্থায় যে কোনো সময় ভূমিকম্পের মতো মারাত্মক দুর্যোগ আমাদের জনজীবনকে বিপর্যস্ত করে হাজার হাজার প্রাণের বিলোপসাধন করতে পারে। অথচ ভূমিকম্পের হাত থেকে রক্ষার জন্য তেমন কোনো কার্যকরী উদ্যোগ বিগত দিনগুলোতে নেয়া হয়নি। তবে ভূমিকম্পের মাত্রা নিরূপণ, পরীক্ষা ও এ বিষয়ক গবেষণার জন্য চট্টগ্রামের আমবাগানে একটি গবেষণা প্রতিষ্ঠান রয়েছে। বর্তমান সরকার এ বিষয়ে নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করছে। ঢাকা, সিলেট, বরিশাল, রাজশাহী, খুলনা প্রভৃতি অফিসে চট্টগ্রামের মতো উন্নত প্রযুক্তি নির্মাণে বর্তমান সরকার কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করছে। এই উদ্যোগ বাস্তবায়িত হলে কিছুটা হলেও ভূমিকম্পের ধ্বংসযজ্ঞ থেকে রক্ষা পাওয়া সম্ভব।



## রচনা ৫৯ বিশ্ব জলবায়ু পরিবর্তন ও বাংলাদেশ

### বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি এবং বাংলাদেশের জলবায়ুতে এর প্রভাব

*[৩০তম বিসিএস]*

**ভূমিকা :** জলবায়ু পরিবর্তন বর্তমান বিশ্বের জন্য সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে উপনীত হয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তনের সবচেয়ে বড় কারণ বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি— যার ফলে আবহাওয়া পরিবর্তিত হয়েছে, সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বেড়েছে এবং বিশ্ব নিয়মিত প্রাকৃতিক দুর্যোগের সম্মুখীন হচ্ছে। বৈশ্বিক উষ্ণতা বেড়ে যাওয়ার কারণ বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা বৃদ্ধি এবং এ তাপমাত্রা বেড়ে যাওয়ার প্রধান কারণ গ্রিন হাউস ইফেক্ট। সূর্য থেকে আগত তাপশক্তি পৃথিবীপৃষ্ঠকে উত্তপ্ত করে এবং এ বিকিরিত তাপশক্তির অধিকাংশই পুনরায় বায়ুমণ্ডলে ফিরে যায়। কিন্তু মানবসৃষ্ট দূষণ এবং বনভূমি উজাড় করার ফলে বায়ুমণ্ডলে গ্রিন হাউস গ্যাসের পরিমাণ আশঙ্কাজনকভাবে বেড়ে গেছে, যা কার্বন ডাই-অক্সাইড, মিথেন ও নাইট্রাস অক্সাইডের সমন্বয়ে গঠিত। এর ফলে বিকিরিত তাপশক্তি পুনরায় বায়ুমণ্ডলে ফিরে যাওয়ার পথে বাধাপ্রাপ্ত হয় এবং এভাবেই বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায়। আধুনিক কালে ব্যাপক হারে জীবাশ্ম জ্বালানি দহন, বনাঞ্চল ধ্বংস, শিল্পায়নের ফলে গ্রিন হাউস ইফেক্টের মাত্রা অনেক বেশি বেড়ে গেছে। এর ফলে ১৮৫০-১৯৬০ সালের মধ্যে পৃথিবীর তাপমাত্রা প্রায় পাঁচগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। এই অতিরিক্ত তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে বর্তমান বিশ্ব প্রতিনিয়ত বিভিন্ন পরিবেশগত বিপর্যয়ের সম্মুখীন হচ্ছে। পরিবেশ বিপর্যয়ের ফলে সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ দেশের মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম।

**বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধির কারণ :** পৃথিবী বেষ্টনকারী আবহাওয়ামণ্ডলের কারণে পৃথিবী প্রাণধারণ ও বসবাস উপযোগী হয়েছে। মহাশূন্যের আবহাওয়ামণ্ডলে 'ওজোন স্তর' নামে অদৃশ্য এক বেষ্টনী বিদ্যমান, যা পৃথিবীতে সূর্যের ক্ষতিকর অতিবেগুনি রশ্মি প্রবেশ রোধ করে এবং বিকিরণ প্রক্রিয়ায় সূর্য থেকে আসা তাপ মহাশূন্যে পুনরায় ফিরে যেতে সহায়তা করে। কিন্তু মানব সৃষ্ট দূষণ ও বনাঞ্চল ধ্বংসের ফলে প্রকৃতি প্রদত্ত নিরাপত্তা বেষ্টনী, ওজোন স্তর ক্ষয়প্রাপ্ত হচ্ছে। গৃহস্থালি পণ্য যেমন— ফ্রিজ, এয়ারকন্ডিশনার, বিভিন্ন ধরনের স্প্রে ইত্যাদিতে ব্যবহৃত হয় ক্লোরোফ্লোরো কার্বন (সিএফসি) গ্যাস, যা শিল্পকারখানাতেও ব্যবহৃত হয়। এ অবমুক্ত সিএফসি মহাশূন্যের ওজোন স্তর ক্ষয়ের অন্যতম কারণ। এছাড়া গৃহস্থালি ও শিল্পবর্জ্য, কলকারখানা ও যানবাহনের ধোঁয়া প্রভৃতি থেকে ক্রমবর্ধমান হারে নির্গত হচ্ছে কার্বন ডাই-অক্সাইড, নাইট্রাস অক্সাইড ও মিথেন গ্যাস। একদিকে পরিবেশ দূষণ ও অপর দিকে বনভূমি উজাড় করার ফলে অতিরিক্ত কার্বন ডাই-অক্সাইড শোষিত হচ্ছে না। এর ফলে বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাই-অক্সাইডের মাত্রাতিরিক্ত বৃদ্ধি দেখা দিচ্ছে, যা সূর্য থেকে আগত তাপ বায়ুমণ্ডলে ধরে রাখে। এভাবে একদিকে ওজোন স্তরের ক্ষয়জনিত কারণে মাত্রাতিরিক্ত সূর্যের অতিবেগুনি রশ্মি পৃথিবীতে পৌঁছাচ্ছে, অন্যদিকে বায়ুমণ্ডলে প্রতিনিয়ত তাপ সঞ্চিত হচ্ছে। এভাবে পৃথিবী হয়ে উঠছে উত্তপ্ত। সামগ্রিকভাবে পরিবেশ বিপন্ন হওয়ার ফলে পৃথিবী প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হচ্ছে।

**বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি ও বাংলাদেশে এর প্রভাব :** পরিবেশ বিজ্ঞানীদের মতে বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধির ফলে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত দেশের মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম। সাম্প্রতিককালে বাংলাদেশে যেসব বড়

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগ দেখা দিচ্ছে তা মূলত জলবায়ু পরিবর্তনের কারণেই দেখা দিচ্ছে। বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধিই মূলত এ পরিবর্তিত জলবায়ুর জন্য দায়ী। বৈশ্বিক উষ্ণায়নের ফলে বাংলাদেশের সম্ভাব্য ভয়াবহ পরিণতিসমূহ আলোচনা করা হলো :

১. **সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি :** বিশ্ব উষ্ণায়নের একটি সম্ভাব্য পরিণতি হলো সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি। বায়ুমণ্ডলে তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেলে ভূপৃষ্ঠের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাবে। এর ফলে সমুদ্রের পানির উত্তাপ বৃদ্ধি পাবে এবং পানি সম্প্রসারিত হয়ে সমুদ্রের আয়তন ও পরিধিকে বাড়িয়ে তুলবে। উষ্ণায়নের ফলে হিমালয়সহ অন্যান্য পর্বতচূড়ায় জমে থাকা বরফ গলে যাবে এবং সমুদ্রের পানির উচ্চতা বেড়ে যাবে। এর ফলে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির সাথে সাথে প্লাবিত এলাকার পরিমাণও বেড়ে যাবে। উত্তর ও দক্ষিণমেরুর গ্রিনল্যান্ড, অ্যান্টার্কটিকাসহ অন্যান্য ভূভাগের বরফ গলে যাবে, যা সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা আশঙ্কাজনকভাবে বাড়িয়ে তুলবে। এভাবে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি পাবে।

বাংলাদেশ বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ ব-দ্বীপ, যেখানে অসংখ্য নদ-নদী বয়ে চলেছে। পৃথিবীর তাপমাত্রা ১° সেলসিয়াস বৃদ্ধি পেলে বাংলাদেশের ১১ শতাংশ ভূমি সমুদ্রগর্ভে বিলীন হয়ে যাবে। এর ফলে ৫৫ মিলিয়ন লোক ক্ষতিগ্রস্ত হবে। বাংলাদেশে সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা প্রতিবছর ৭ মিমি হারে বাড়ছে, যেখানে ভূ-পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির হার ৫-৬ মিমি/বছর। এর ফলে বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির হার ১-২ মিমি/বছর। Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)-এর এক সমীক্ষায় বলা হয় বর্তমান অবস্থার প্রেক্ষিতে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা প্রতি দশকে ৩.৫ থেকে ১৫ মিমি বৃদ্ধি পেতে পারে। এমনকি ২১০০ সাল নাগাদ তা ৩০ সেমি থেকে ১০০ সেমি এ পৌঁছাতে পারে। তাই সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি বাংলাদেশের জন্য ভয়াবহ বিপর্যয় সৃষ্টি করবে।

২. **মরুভূমির বৈশিষ্ট্য :** বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধির ফলে একদিকে যেমন পৃথিবীর নিচু এলাকাসমূহ সমুদ্রগর্ভে বিলীন হয়ে যাবে, তেমনি পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে মরুভূমির বৈশিষ্ট্য দেখা দেবে। বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি পাওয়ার সাথে সাথে ভূ-পৃষ্ঠে পানির পরিমাণ ক্রমাগত হ্রাস পাবে। ফলে সমগ্র ভূমি মরুভূমিতে পরিণত হবে। এর ফলে কৃষিকাজ মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে এবং জীববৈচিত্র্য হুমকির সম্মুখীন হবে। বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলে ইতোমধ্যে মরুভূমির বৈশিষ্ট্য দেখা দিয়েছে। এর ফলে খাদ্য উৎপাদন ব্যাহতসহ তা দেশের অর্থনীতিতে নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে।

৩. **নিম্নভূমিতে প্লাবন :** বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে বাংলাদেশসহ পৃথিবীর অন্যান্য নিম্নভূমি সমুদ্রগর্ভে বিলীন হয়ে যাবে। বায়ুমণ্ডলে তাপমাত্রা বেড়ে যাওয়ার ফলে অ্যান্টার্কটিকার বরফ গলে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বেড়ে যাবে এবং উপকূলীয় এলাকাসমূহ ক্রমেই নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির ফলে বাংলাদেশের প্রায় ১ লাখ ২০ হাজার বর্গ কিমি এলাকা প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ক্ষতির সম্মুখীন হবে। পরিবেশবিজ্ঞানীদের মতে, বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধির এ ধারা অব্যাহত থাকলে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা এ শতাব্দীর শেষ দিকে ২০-৬০ সেমি পর্যন্ত বাড়তে পারে। জলবায়ু পরিবর্তিত হলে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ বেড়ে যাবে এবং নদ-নদীর পানির পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে। আমাদের দেশের অধিকাংশ নদীর উৎস দেশের বাইরে ভারত ও নেপালে। তাই একদিকে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি ও অপরদিকে ব্যাক ওয়াটার ইফেক্ট যুক্ত হয়ে ভয়াবহ বন্যার সৃষ্টি করবে।



৪. **জীববৈচিত্র্য ধ্বংস :** বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধির ফলে জীববৈচিত্র্য মারাত্মক হুমকির মুখে পড়েছে। বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে ভূপৃষ্ঠের তাপমাত্রাও বৃদ্ধি পাচ্ছে। যার প্রভাবে বনাঞ্চলসমূহ ধ্বংস হওয়ার আশংকা দেখা দিচ্ছে। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বিভিন্ন প্রজাতি বিলুপ্তির পথে, কারণ এ পরিবর্তিত জলবায়ুর সাথে তারা খাপ খাওয়াতে পারছে না। এছাড়া বিভিন্ন প্রজাতির মাছ ও জলজ প্রাণী বিলুপ্তির পথে। বিভিন্ন প্রাকৃতিক সম্পদের উৎস সুন্দরবন পৃথিবীর বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ বনভূমি। বিভিন্ন দুর্লভ প্রজাতির আবাসস্থল এ সুন্দরবন। পরিবেশ ও ভূবিজ্ঞানীদের মতে, সমুদ্রের উচ্চতা মাত্র ১ মিটার বৃদ্ধি পেলে সুন্দরবনের ৭০ ভাগ তলিয়ে যাবে। জীববৈচিত্র্য ধ্বংস হয়ে গেলে তা বিশ্বের জন্য অত্যন্ত ভয়াবহ ফলাফল বয়ে আনবে। পরিবেশ তার ভারসাম্য হারিয়ে ফেলবে। এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, বাস্তুসংস্থানের বিপর্যয় ঘটলে তা মানব সভ্যতার জন্য মারাত্মক হুমকি হিসেবে আবির্ভূত হবে।

৫. **নদ-নদীর প্রবাহ হ্রাস :** বাংলাদেশ নদীমাতৃক ও কৃষিপ্রধান দেশ। জমিতে সেচ ও নৌ-চলাচলের জন্য নদ-নদীর স্বাভাবিক প্রবাহ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে নদ-নদীর স্বাভাবিক প্রবাহ বিঘ্নিত হয়। এর ফলে প্রধান প্রধান নদীর প্রবাহ হ্রাস পাবে এবং নদীর ক্ষীণ প্রবাহের কারণে সামুদ্রিক লোনা পানি সহজে দেশের অভ্যন্তরীণ নদীপ্রবাহে প্রবেশ করে নদ-নদীর পানিতে লবণাক্ততা বাড়িয়ে দেবে। ফলে সামুদ্রিক লোনা পানি উজান অঞ্চলে প্রবেশ করায় কৃষিতে প্রয়োজনীয় মৃদু পানির অভাব দেখা দেবে এবং দেশের সম্পদের বিপুল পরিমাণ ক্ষতি সাধিত হবে।

৬. **পানির লবণাক্ততা বৃদ্ধি :** পানিতে লবণাক্ততা বৃদ্ধি দেশের কৃষি ও অর্থনীতির জন্য মারাত্মক হুমকিস্বরূপ। বর্তমানে বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে ও দূরবর্তী দ্বীপসমূহের প্রায় ১.৪ মিলিয়ন হেক্টর এলাকায় লোনা পানি প্রবেশ করায় উন্মুক্ত জলাশয় ও ভূগর্ভস্থ পানি লবণাক্ত হয়ে পড়েছে। জলবায়ু পরিবর্তিত হওয়ার সাথে সাথে এ লবণাক্ততার মাত্রা আরও বৃদ্ধি পাবে। বিশেষত নদ-নদীর মোহনায় অবস্থিত দ্বীপ ও তৎসংলগ্ন এলাকার অধিক পরিমাণ লোনা পানি প্রবেশ করবে। ভূগর্ভস্থ পানি ও মাটির লবণাক্ততা বৃদ্ধি উপকূলীয় পরিবেশকে সামগ্রিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করবে।

৭. **আকস্মিক বন্যা :** পাহাড়ি ঢলের কারণে বাংলাদেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে বিশেষত মেঘনা অববাহিকায় প্রতিবছর আকস্মিক বন্যা দেখা যায়। দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে প্রায় ৪ হাজার বর্গ কিলোমিটার এবং দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের প্রায় ১ হাজার ৪০০ বর্গ কিলোমিটার এলাকা এ ধরনের আকস্মিক বন্যার শিকার। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বৃষ্টিপাত ও পাহাড়ি ঢলের পরিমাণ আরো বেড়ে যাচ্ছে। ফলে আকস্মিক বন্যার পৌনঃপুনিকতা, ক্ষতির পরিমাণ ও তীব্রতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে।

৮. **নদী ভাঙন :** বাংলাদেশে মোট সমুদ্র তটরেখার পরিমাণ ৬৫০ কিলোমিটার। এর মধ্যে সুন্দরবন উপকূল ঘিরে রয়েছে ১২৫ কিলোমিটার এবং কক্সবাজার সমুদ্র সৈকত ১২০ কিলোমিটার দীর্ঘ। এছাড়া সমুদ্র উপকূল বরাবর রয়েছে গঙ্গা ও মেঘনা অববাহিকায় অবস্থিত অসংখ্য প্রশস্ত জোয়ার ভাটা সমভূমি এবং নদী মোহনায় রয়েছে বদ্বীপ। নদীসঙ্গমে অবস্থিত এসব বদ্বীপ ও সমুদ্র তটরেখা বরাবর ভূখণ্ড প্রতিনিয়ত পরিবর্তনশীল। কিন্তু এ পরিবর্তনশীল বৈশিষ্ট্যের মাঝে এক বিশেষ ভারসাম্য বজায় থাকে। কিন্তু বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি পেলে এ ভারসাম্য বিঘ্নিত হবে। বর্তমানে

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



দেশের উপকূলীয় অঞ্চলে নদী ভাঙনের তীব্রতা বৃদ্ধি পেয়েছে। অতিরিক্ত বৃষ্টিপাতের ফলে মেঘনা ও পদ্মার তীরবর্তী এলাকাসমূহে নদী-ভাঙনের ফলে বাংলাদেশের বিপুল পরিমাণ জনগোষ্ঠী সর্বস্বান্ত হয়ে পড়েছে। IPCC-এর এক সমীক্ষায় অনুমান করা হয়েছে, প্রতি দুই সেন্টিমিটার সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধিতে উপকূলীয় তটরেখা গড়ে ২-৩ মিটার স্থলভাগের দিকে অগ্রসর হবে, ফলে ২০৩০ সাল নাগাদ মূল ভূখণ্ডের ৮০-১২০ মিটার পর্যন্ত অতিক্রম করবে এবং কালক্রমে পৃথিবীর সর্ববৃহৎ সমুদ্রসৈকত কক্সবাজার সমুদ্রগর্ভে বিলীন হয়ে যাবে।

৯. **খরা :** মাটিতে আর্দ্রতার অভাব অর্থাৎ বৃষ্টিপাতের তুলনায় বাষ্পীভবনের মাত্রা বেশি হলে খরা দেখা দেয়। বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধির ফলে জলবায়ু পরিবর্তিত হচ্ছে যার প্রভাব বাংলাদেশেও দেখা দিচ্ছে। বাংলাদেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে বর্ষাকালে প্রয়োজনীয় বৃষ্টিপাত ও পানির অভাবে কৃষিকাজ মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে এবং ফসল উৎপাদনও ক্রমাগতভাবে হ্রাস পাচ্ছে। শীতকালেও এ অঞ্চলে বৃষ্টিপাতের তুলনায় বাষ্পীভবনের হার বেশি। এর ফলে মাটির আর্দ্রতা হ্রাস পায় এবং কৃষিকাজের ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হচ্ছে। বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধির সাথে সাথে খরার প্রকোপ আরো বৃদ্ধি পাবে এবং বর্তমানের মাঝারি ধরনের খরা উপদ্রুত এলাকা মারাত্মক খরা উপদ্রুত এলাকায় পরিণত হবে।

১০. **সামুদ্রিক ঝড় ও জলোচ্ছ্বাস :** সাধারণত সামুদ্রিক ঝড় সৃষ্টি হয় উত্তপ্ত বায়ু ও ঘূর্ণিবায়ু থেকে। ঘূর্ণিঝড় সৃষ্টির পেছনে অন্যান্য প্রক্রিয়া সক্রিয় থাকলেও পানির উত্তাপ বৃদ্ধিই মূল কারণ। বাংলাদেশে প্রতিবছর মে-জুন মাসে যে সামুদ্রিক ঝড় হয় তাতে উপকূলীয় জেলাসমূহে ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হয়। বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি পাওয়ার সাথে সাথে সমুদ্রের পানির তাপমাত্রাও ক্রমবর্ধমান হারে বেড়ে যাবে। স্বাভাবিকভাবেই সামুদ্রিক ঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের তীব্রতাও বেড়ে যাবে। ২০০৭ সালে আঘাত হানা 'সিডর' বাংলাদেশে যে ধ্বংসযজ্ঞের চিহ্ন রেখে গেছে তা বর্ণনাতীত। সিডরে হাজার হাজার মানুষের সলিল সমাধির সাথে সাথে সম্পদেরও ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হয়েছে। সুন্দরবনের ওপর দিয়ে বয়ে যাওয়া সিডরের আঘাতে বিপুল পরিমাণ প্রাকৃতিক সম্পদ ধ্বংস হয়েছে এবং অসংখ্য বন্যপ্রাণীর জীবন কেড়ে নিয়েছে এ বিধ্বংসী সিডর। পরিবেশবিজ্ঞানীদের মতে এটা বাংলাদেশের জন্য বড় ধরনের আঘাত। সিডর, সুনামি, সাইক্লোনসহ অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগ মূলত জলবায়ুর দ্রুত পরিবর্তনেরই ফলাফল। আর পরিবেশ দূষণের ফলে বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধিই জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য দায়ী। মানব সৃষ্ট দূষণের ফলে জলবায়ু পরিবর্তনের যে ধারা সৃষ্টি হয়েছে, বাংলাদেশের জন্য তা সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ। দূষণের জন্য বিশ্বের শিল্পায়িত দেশগুলোর দায়ভার সবচেয়ে বেশি। কিন্তু এখন পর্যন্ত অনেক ধনী রাষ্ট্রই 'কিয়োটো প্রটোকল, ১৯৯৭' কার্যকর করেনি।

**বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি ও বাংলাদেশে সম্ভাব্য ক্ষয়ক্ষতি :** বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধির ফলে জলবায়ু পরিবর্তন ও এর প্রভাবে সম্ভাব্য ক্ষয়-ক্ষতি নিয়ে ইতোমধ্যে বিশ্বজুড়ে আতঙ্ক সৃষ্টি হয়েছে। বাংলাদেশ ও তার প্রতিবেশী দেশসমূহে ক্ষয়-ক্ষতির মাত্রা অত্যন্ত ব্যাপক হবে বলে পরিবেশ ও ভূ-বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে বাংলাদেশের উচ্চতা কম থাকার কারণে বাংলাদেশে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ



আরও ভয়াবহ হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। এছাড়া সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশ নিয়মিত প্রাকৃতিক দুর্যোগের সম্মুখীন হচ্ছে যা জলবায়ু পরিবর্তনেরই ফলাফল।

১. **বিপন্ন জনগোষ্ঠী :** বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থার প্রেক্ষিতে কোনো মাঝারি ধরনের প্লাবনে দেশের ৬৫ শতাংশ জনগোষ্ঠী প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধির ফলে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বাড়বে এবং প্লাবন এলাকার পরিধি ক্রমেই বাড়তে থাকবে। ফলে বিপুল জনগোষ্ঠীর জীবন ও জীবিকা বিপন্ন হয়ে পড়বে।

২. **অবকাঠামোগত ক্ষয়ক্ষতি :** ১৯৯০ সালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী বাংলাদেশে মোট বস্তুগত সম্পদের পরিমাণ ১৮০০০ বিলিয়ন টাকা। এর মধ্যে ভৌত অবকাঠামো রয়েছে ২৮০ বিলিয়ন টাকা মূল্যের। বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি ও সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির ফলে প্লাবনের তীব্রতা বাড়বে এবং অবকাঠামোগত ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হবে। IPCC-এর সমীক্ষা অনুযায়ী ২০১০ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশে প্লাবনজনিত কারণে বস্তুগত সম্পদের ক্ষতির পরিমাণ ২৪২ মিলিয়ন টাকা।

৩. **বিপন্ন কৃষি :** বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি পেলে বাংলাদেশের কৃষি খাত মারাত্মক ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হবে। কৃষিখাতের ওপর এ বিপর্যয় দেশের আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার ওপর ব্যাপক নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে। IPCC-এর সমীক্ষা অনুযায়ী প্লাবনের কারণে দেশে আমন ধানের উৎপাদন ১৩.৬ মিলিয়ন মেট্রিক টন হ্রাস পাবে। এমনকি জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য দেশের কৃষি উৎপাদন বর্তমানের তুলনায় প্রায় ৭০ শতাংশ কমে যেতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। শীত মৌসুমে বাংলাদেশে প্রায় ৩৬০০ বর্গ কিমি এলাকা খরার কবলে পড়ে। বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধির সাথে সাথে খরার ব্যাপ্তি আরো বেড়ে তা ২২০০ কিমি পর্যন্ত সম্প্রসারিত হবে। গত কয়েক দশক ধরে বাংলাদেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে বর্ষা মৌসুমের ফসলের ওপর খরার প্রতিকূল প্রভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে। জলবায়ু পরিবর্তন হলে দেশের মধ্য-দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে গমের আবাদ অসম্ভব হয়ে পড়বে এবং আলুর চাষও ব্যাপক ক্ষতির মুখে পড়বে। এছাড়া প্রয়োজনীয় সেচের অভাবে দেশের উত্তর-পশ্চিম ও মধ্য-পশ্চিমাঞ্চলে চাষাবাদ ব্যাপকভাবে ক্ষতির সম্মুখীন হবে।

৪. **লোনা পানির অনুপ্রবেশ :** দেশের মোট জনসংখ্যার ১৫ শতাংশ সমুদ্র তীরবর্তী অঞ্চলে বসবাস করে। IPCC-এর সমীক্ষা অনুযায়ী সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা ১০০ সেমি বৃদ্ধি পেলে ২৫,০০০ বর্গ কিমি এলাকায় লোনা পানির অনুপ্রবেশ ঘটবে। ফলে দেশের প্রায় ৩ কোটি ৫০ লাখ লোকের জীবন ও জীবিকা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এছাড়া লোনা পানি প্রবেশের ফলে দেশের চিংড়ি শিল্প ব্যাপক ক্ষতির সম্মুখীন হবে। দেশের নদ-নদীতে লোনা পানির অনুপ্রবেশ ঘটলে স্বাদু পানির মৎস্য সম্পদ ধ্বংস হবে এবং জলজ প্রাণী ও উদ্ভিদের জীবন বিপন্ন হবে।

৫. **পরিবেশ বিপর্যয় :** বাংলাদেশের জনসংখ্যার তুলনায় প্রাকৃতিক সম্পদ অত্যন্ত অপ্রতুল। বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি পেলে জলবায়ুতে যে ক্ষতিকর প্রভাব ফেলবে তা বাংলাদেশের জন্য ভয়াবহ পরিণাম ডেকে আনবে। জলবায়ু পরিবর্তিত হলে সম্পদের অপ্রাপ্যতা আরো বেড়ে যাবে এবং প্রাকৃতিক সম্পদ দ্রুত বিনষ্ট হবে। ইতোমধ্যে দেশের বৃহৎ বনভূমি সুন্দরবন ও হাওর অঞ্চলের পরিবেশ ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছে।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



**বৈশ্বিক উষ্ণতা রোধে আমাদের করণীয় :** বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি শুধু বাংলাদেশের জন্য নয় বরং সমগ্র বিশ্ব ও মানবজাতির জন্য হুমকিস্বরূপ। ভৌগোলিক অবস্থান ও ভূ-প্রাকৃতিক অবকাঠামো বাংলাদেশকে যতটা কুফলভোগী করেছে, এ সংকট সৃষ্টিতে আমাদের দেশের ভূমিকা শিল্পোন্নত দেশের তুলনায় খুবই নগণ্য। এখনই সময় এ সংকট মোকাবিলায় এগিয়ে আসার। বৈশ্বিক উষ্ণতা রোধে আমাদের সবচেয়ে যে বিষয়গুলোর ওপর জোর দিতে হবে তা হলো :

১. ব্যাপকভাবে বনায়ন কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে। দেশের সমুদ্র উপকূলবর্তী এলাকায় ও নদী তীরবর্তী এলাকাসমূহে বনায়ন কর্মসূচি শুরু করতে হবে। ফলে নদী ভাঙন ও সামুদ্রিক ঝড়ের তীব্রতা কমে যাবে।
২. বৃক্ষনিধন রোধ করতে হবে। কারণ বৃক্ষই প্রকৃতি থেকে ক্ষতিকর কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস শোষণ করে এবং অক্সিজেন নির্গমন করে। ফলে পরিবেশের ভারসাম্য বজায় থাকে।
৩. বায়ুমণ্ডলের উত্তাপ বাড়ায়— এমন ক্ষতিকর গ্যাসের নির্গমন কমাতে হবে।
৪. পরিবেশ সহায়ক জ্বালানির ব্যবহার বাড়াতে হবে।
৫. শিল্পকারখানার জ্বালানি সাশ্রয় করতে হবে এবং উৎপন্ন বর্জ্য বিশুদ্ধকরণের ব্যবস্থা নিতে হবে।
৬. সর্বোপরি, দেশের সবাইকে এ ভয়াবহ দুর্যোগ মোকাবিলায় এগিয়ে আসতে হবে।

**উপসংহার :** একবিংশ শতাব্দীর সন্ধিক্ষণে মানবজাতি যখন সভ্যতার চরম শিখরে, ঠিক তখনই এ মানবজাতি তার পরিবেশকে ঠেলে দিচ্ছে চরম বিপর্যয়ের দিকে। মানুষ তার প্রয়োজনে একদিকে যেমন পরিবেশ ও প্রাকৃতিক সম্পদকে ব্যবহার করছে অপরদিকে পরিবেশকে করে তুলছে বিষাক্ত। পরিবেশ দূষিত হচ্ছে প্রতিনিয়ত এবং পরিবেশের ভারসাম্য দ্রুত বিনষ্ট হচ্ছে। এ বিশ্ব আমাদেরই। আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে এ ভয়াবহ বিপর্যয়ের হাত থেকে বাঁচাতে আমাদেরই এগিয়ে আসতে হবে। এখন থেকেই সবাই সচেতন হলে সম্ভাব্য বিপর্যয় মোকাবিলা অনেক সহজ হয়ে যাবে এবং ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ অনেক কমে আসবে। আমাদের সীমাবদ্ধতার কথা মাথায় রেখেই কৌশলগতভাবে অগ্রসর হতে হবে। যাতে দীর্ঘকালীন প্রতিক্রিয়ার হাত থেকে জাতিকে রক্ষা করা যায়।

## রচনা ৬০ আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্প ও বাংলাদেশ

*[২৯তম বিসিএস]*

**ভূমিকা :** নদী সভ্যতার জননী। উচ্ছল ছুটে চলায় দেশীয় গণ্ডি পেরিয়ে কখনো কখনো বিভিন্ন দেশের মধ্য দিয়ে অভিন্ন নদী প্রবাহ নামে বয়ে যায় এসব নদী। নদীবিধৌত বাংলাদেশ, সীমান্ত ঘেঁষা প্রতিবেশী মিয়ানমার ও ভারতের সাথে ৫৭টি আন্তঃসীমান্ত বা অভিন্ন নদী প্রবাহে সংযুক্ত। কিন্তু অভিন্ন নদীর পানি প্রবাহে প্রতিবেশী ভারতের সাম্রাজ্যবাদী নীতি প্রয়োগে 'অভিন্ন নদী'র মর্যাদা এখন ভূলুণ্ঠিতপ্রায়। হীন স্বার্থ চরিতার্থে নদী ও নদী সভ্যতা বিরোধী সব ড্যাম, বাঁধ কিংবা প্রকল্পের মাধ্যমে অভিন্ন নদী প্রবাহে সংযুক্ত দেশের জাতীয় স্বার্থকে ক্রমশই হুমকি এবং পারস্পরিক সম্পর্ককে প্রশ্নের সম্মুখীন করছে তারা। সাম্প্রতিক সময়ে ভারতের আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্প বাস্তবায়নের গৃহীত সিদ্ধান্ত এমনই এক অপরিণামদর্শী সিদ্ধান্ত, যা সুজলা-সুফলা, শস্য-শ্যামল বাংলাদেশকে ভয়াল মরুভূমিতে পরিণত করার এক হীন ষড়যন্ত্রস্বরূপ।



**আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্প কি :** আগামী ৫০ বছরের ক্রমবর্ধমান পানির চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র এবং এর অববাহিকার সকল নদ-নদীর পানি বাঁধ, জলাধার ও সংযোগ খালের মাধ্যমে প্রত্যাহার করে ভারতের উত্তর ও উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে, এমনকি দক্ষিণের কাবেরি নদী পর্যন্ত টেনে নিয়ে খরাপীড়িত অঞ্চলে পানি সরবরাহের জন্য ভারত যে মহাপরিকল্পনা হাতে নিয়েছে তা-ই River Interlinking Project বা আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্প নামে পরিচিত। ক্যানেল সিস্টেমে মোট ৩০টি সংযোগ খালের সমন্বয়ে আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্প গড়ে উঠবে। এর মধ্যে ১৪টি হিমালয়ান অঞ্চলের এবং ১৬টি পেনিনসুলা অঞ্চলের। প্রকল্পের আওতায় ভারতের ৩৮টি নদ-নদীর মধ্যে আন্তঃসংযোগ ঘটানো হবে। পাশাপাশি ছোট-বড় ৩৪টি বাঁধ এবং ৭৪টি বড় জলাধার নির্মাণ করা হবে।

**যেভাবে হবে আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্প :** আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্পের শুরু ব্রহ্মপুত্র নদ থেকে। ব্রহ্মপুত্র নদ থেকে পানি খাল কেটে রাজস্থান, গুজরাট ও দক্ষিণ ভারতে নিয়ে যাওয়া হবে। সংযোগ খালের মাধ্যমে গঙ্গা থেকে পানি নিয়ে যাওয়া হবে গুজরাট, হরিয়ানা, রাজস্থান ও তামিলনাড়ু এলাকায়। এতে গঙ্গায় যে পানি সঙ্কট হবে তা পূরণ করা হবে ব্রহ্মপুত্র নদের পানি দিয়ে। এভাবে মোট ১৭৪ বিলিয়ন কিউসেক পানি পশ্চিম ভারতে নিয়ে যাওয়া হবে।

**আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্পের ইতিহাস :** ভারতের আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্পের ধারণাটি নতুন নয়। ব্রিটিশ আমলে স্যার আর্থার ১৯৩৯ সালে ব্যাঙ্গালোর কালিকট নাব্যখালের প্রকল্প থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে ভারতবর্ষের প্রত্যন্ত অঞ্চলের সাথে যোগাযোগের জন্য নদীসংযোগের প্রস্তাব দিয়েছিলেন। পরে ১৯৮০ সালে ভারতের পানিসম্পদ মন্ত্রণালয় একটি জাতীয় পানি পরিকল্পনার কাজে হাত দেয়। ২০০২ সালের ১৪ আগস্ট ভারতের তৎকালীন রাষ্ট্রপতি এপিজে আবদুল কালাম আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্পের মাধ্যমে দেশের নদীগুলোকে জুড়ে দেয়ার ঘোষণা দেন। রাষ্ট্রপতির ঘোষণার পর ভারতের আইনবিদ রণজিত কুমার ভারতের সুপ্রিমকোর্টে জনস্বার্থে একটি মামলা দায়ের করেন। সুপ্রিম কোর্ট ২০০২ সালের ৩১ অক্টোবর প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হওয়া উচিত বলে রায় দেন এবং এজন্য ১০ বছর সময়কাল যথেষ্ট বলে ঘোষণা দেন। পরে বাদী পক্ষ আপিল করেন। প্রকল্প বিষয়ে একই বছর একটি শক্তিশালী টাস্কফোর্স গঠিত হয়। কিন্তু ২০০৪ সালে ভারতের অভ্যন্তরে পরিবেশবাদীদের ব্যাপক প্রতিবাদ ও আন্তর্জাতিক সমালোচনার মুখে প্রকল্পটি এক রকম স্থগিত হয়ে পড়ে এবং 'ধীরে চলো' নীতি গ্রহণ করা হয়। সর্বশেষ ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০১২ ভারতীয় সুপ্রিম কোর্ট একটি বিশেষ কমিটি গঠনের মাধ্যমে ভারতের আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে নির্দেশ দেন। ২০০২ সালের এ সংক্রান্ত একটি মামলার রায় দিয়ে সুপ্রিম কোর্ট এ নির্দেশ জারি করেন।

**আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্প ও বাংলাদেশ :** উত্তরে বিস্তীর্ণ হিমালয় পর্বতমালা এবং দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর—এ পরিসীমার মধ্যেই আমাদের ছোট্ট বাংলাদেশ। নদীমাতৃক বাংলাদেশে বিস্তৃত রয়েছে অসংখ্য নদ-নদী। তিনদিক থেকে ভারতের সাথে সীমান্তবেষ্টিত বাংলাদেশের রয়েছে বিশাল আয়তনের অভিন্ন নদী প্রবাহ। এ অভিন্ন নদী প্রবাহেই ভারত আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্প বাস্তবায়নে এগিয়ে যাচ্ছে। ভারতের আন্তঃনদী সংযোগের প্রভাবজনিত কারণে বাংলাদেশ বেশি সম্পৃক্ত। ভারতের উচ্চাভিলাষী আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্পের দুটি অংশের মধ্যে একটি হচ্ছে উত্তর-পূর্ব ভারত ও বাংলাদেশের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত ব্রহ্মপুত্র ও গঙ্গাসহ হিমালয় থেকে প্রবাহিত বিভিন্ন নদ-নদীর পানি কৃত্রিম খাল ও বাঁধের মাধ্যমে গঙ্গায় টেনে নেয়া। পরে তা দেশটির দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের মরু অঞ্চলে টেনে নিয়ে সেচের ব্যবস্থা করা। এ আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্পের শুরু আসামের ব্রহ্মপুত্র নদ থেকে। বিশেষজ্ঞরা বলেছেন,

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



বাংলাদেশের তিন প্রধান নদী গঙ্গা, মেঘনা ও ব্রহ্মপুত্রের মধ্যে এখনো পর্যন্ত ব্রহ্মপুত্রের পানি কোনো বাধার মুখে পড়েনি। অভিন্ন নদীগুলোর মধ্যে ব্রহ্মপুত্রের মাধ্যমে দুই-তৃতীয়াংশের বেশি পানি বাংলাদেশে আসে। আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে এ নদীটি ভয়াবহ ক্ষতির মুখে পড়বে। বাংলাদেশের জন্য ডেকে আনবে বড় ধরনের অর্থনৈতিক ও পরিবেশগত বিপর্যয়। কেননা বাংলাদেশের কৃষি ও পরিবেশ এসব অভিন্ন নদীর ওপর বিশেষ করে গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের ওপর নির্ভরশীল।

**অভিন্ন নদী আইন ও বাংলাদেশের স্বার্থ :** একাধিক রাষ্ট্রের মালিকানা বা অংশীদারি সমৃদ্ধ নদীকে অভিন্ন নদী হিসেবে অভিহিত করা হয়। এ দিক থেকে আন্তঃসীমান্ত নদী, সীমান্ত নদী ও আন্তর্জাতিক নদীসমূহকেও অভিন্ন নদী হিসেবে অভিহিত করা হয়। ভারত ও মিয়ানমারের সাথে এরকম ৫৭টি আন্তঃসীমান্ত নদী বাংলাদেশের মোট পানি প্রবাহকে সর্বাধিক প্রভাবিত করে থাকে। আন্তঃসীমান্ত নদীর পানির উপর যেমন উজান দেশের অধিকার রয়েছে, তেমনি অধিকার রয়েছে ভাটির দেশেরও। এজন্য আন্তঃসীমান্ত বা অভিন্ন নদীর পানির উপর অংশীদার দেশগুলোর অধিকার নিরূপিত হয় আন্তর্জাতিক নদী আইনের সহায়তায়। কিন্তু বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে দীর্ঘদিনের পানি বিরোধ সমস্যাটি আন্তর্জাতিক নদী আইনের দ্বারস্থ হতে পারেনি আজও। বরং ভারত একপক্ষীয়ভাবে আন্তর্জাতিক নদী আইনকে অবজ্ঞা করে নিজেদের হীনস্বার্থ চরিতার্থের লক্ষ্যে অভিন্ন নদীর পানির উপর যথেচ্ছ কর্তৃত্বারোপ করছে। ফলে লঙ্ঘিত হচ্ছে বাংলাদেশের স্বার্থ। অভিন্ন নদী সংযোগ প্রকল্প ভারতের একটি যথেচ্ছ বিনাশী সিদ্ধান্ত। অথচ আন্তর্জাতিক নদী আইন অনুযায়ী বিষয়টি সম্পূর্ণভাবে বাংলাদেশের স্বার্থবিরোধী ও সর্বনাশী। আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী, কোনো দেশ অভিন্ন নদীর উজানে কোনো কাঠামো নির্মাণ করতে চাইলে অবশ্যই ভাটির জনপদের ওপর এর বিরূপ প্রতিক্রিয়ার বিষয়টি গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করতে হবে। বাংলাদেশকে অন্ধকারে রেখে এ নদী সংযোগ প্রকল্পের কাজ চালিয়ে যাচ্ছে তারা। আন্তর্জাতিক নদী আইন কিংবা বাংলাদেশের আপত্তি কোনোটিকেই তোয়াক্কা করছে না দেশটি। অভিন্ন নদীর পানি ব্যবহার বিষয়ক আন্তর্জাতিক আইন ও নীতির এমন কয়েকটি হলো— হেলসিংকি নীতিমালা ১৯৬৬ (অনুচ্ছেদ ৪ ও ৫), স্টকহোম কনফারেন্স ১৯৭২, জাতিসংঘ কনভেনশন ১৯৭৭ (অনুচ্ছেদ ৫), নো হার্ম রুল-জাতিসংঘ কনভেনশন ১৯৭৭ (অনুচ্ছেদ ৭), UNEP Convention on Biological Diversities, 1992, রামসার কনভেনশন অন ওয়েটল্যান্ডস ১৯৭১, World Commission on Dams (WCD) 1998 প্রভৃতি।

**বাংলাদেশে আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্পের প্রভাব :** আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে তা ভারতের জন্য সুফল বয়ে আনলেও বাংলাদেশে এর প্রভাব পড়বে ঠিক তার বিপরীতমুখী। নিম্নে বাংলাদেশে আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্পের প্রভাব উল্লেখ করা হলো :

১. **নদী সভ্যতার বিলুপ্তি ও মরুকরণ :** আন্তঃনদী-সংযোগ প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে স্বাভাবিকভাবেই বাংলাদেশে অভিন্ন গঙ্গা, মেঘনা, ব্রহ্মপুত্র নদীগুলোতে প্রভাব পড়বে। বাংলাদেশে শুকনো মৌসুমে ব্রহ্মপুত্র নদের পানি ৮০ শতাংশ চাহিদা পূরণ করে, যার ওপর নির্ভর করে বাংলাদেশের কৃষি ও জীব পরিবেশ গড়ে উঠেছে। তাই এর একটা বড় অংশ ভারতের পশ্চিমে চালান করলে বাংলাদেশে পরিবেশের ভয়াবহ বিপর্যয় হয়ে দেখা দিবে বিস্তৃত মরুকরণ। এ প্রকল্পের ফলে গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের পানি প্রবাহ কমে যাবে। ফলে সমুদ্রের লবণাক্ততা পদ্মার গোয়ালন্দ, মধুমতীর কামারখালী, ধলেশ্বরীর মানিকগঞ্জ এবং মেঘনার ভৈরব ছাড়িয়ে যাবে। ভাটির দেশ বাংলাদেশে নদীগুলো নাব্যতা হারাবে। তাই আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্প নদী ব্যবস্থা ও নদী সভ্যতার বিলুপ্তি সাধনের এক অপরিণামদর্শী ও মহা দানবীয় রূপ নিয়ে আবির্ভূত হবে।



২. **সুন্দরবন ধ্বংস :** সুন্দরবন শুধু পৃথিবীর সবচেয়ে বড় ম্যানগ্রোভ বনভূমিই নয়, এটি বিশ্ব ঐতিহ্য হিসেবেও চিহ্নিত। এ বনের মধ্য দিয়ে প্রায় ৪৫০টি ছোট-বড় খাল-নদী, দোন-ভারানি প্রবাহিত। ইতোমধ্যে ফারাক্কা বাঁধসহ অন্যান্য নদীতে বাঁধ দেয়ার ফলে সুন্দরবন অঞ্চলের নদীগুলোর পানি প্রবাহ কমে গিয়ে সৃষ্টি হয়েছে লবণাক্ততার। ফলশ্রুতিতে উজাড় হচ্ছে সুন্দরবনের সৌন্দর্য, হারিয়ে যাচ্ছে পশু-পাখি। এমতাবস্থায় আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে মারাত্মক ক্ষতির সম্মুখীন সুন্দরবন নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। এ ধারণা সম্পূর্ণই বাস্তবসম্মত।

৩. **জীববৈচিত্র্য (Bio-diversity) ধ্বংস :** বাংলার নদ-নদীর স্বার্থের সাথে শুধু মানুষই নয়, এর সাথে জড়িয়ে আছে হাজার হাজার পশুপাখি, কীটপতঙ্গ, পোকামাকড়ের জীবনও। নদ-নদী মরে গেলে এসব এলাকার অনেক দুর্লভ প্রাণী ও কীটপতঙ্গ চিরতরে বিলুপ্ত হয়ে যাবে। ধ্বংস হবে এ দেশের জীববৈচিত্র্য।

৪. **প্রতিবেশগত ভারসাম্যহীনতা :** নদীনালা কোনো দেশের বিচ্ছিন্ন কোনো অংশ নয়, বরং সে দেশের পরিবেশের সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। নদীনালার সাথে দেশের আবহাওয়া ও জলবায়ুর সম্পর্কও গভীর। সুতরাং নদ-নদী হুমকির সম্মুখীন হলে দেশের আবহাওয়া ও জলবায়ুর পরিবর্তন হতে বাধ্য। ফলে ভারতের নদী প্রকল্পের প্রতিক্রিয়া হিসেবে বাংলাদেশ চরমভাবাপন্ন হয়ে উঠবে। বাড়বে গড় তাপমাত্রা, মানুষের জীবনযাপন হবে কষ্টসাধ্য, বিপন্ন হবে Ecological balance বা প্রতিবেশগত ভারসাম্য।

৫. **অন্যান্য প্রভাব :** ভারতের আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্পের ফলে বাংলাদেশে এ সমস্ত প্রধান প্রধান নেতিবাচক প্রভাব ছাড়াও সৃষ্টি হবে আরও নানাবিধ সমস্যা। যেমন— নদীর ভূগাঠনিক ও জলজ পরিবেশের পরিবর্তন, মৎস্য সম্পদের ধ্বংস, নৌযাতায়াতে সংকোচন সমস্যা, বন্যার প্রাদুর্ভাব, বন্দরের অচলাবস্থা এবং বেকারত্ব ও উদ্বাস্তু সমস্যাসহ নানাবিধ সামাজিক ও পরিবেশগত সমস্যা।

**আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্প রোধে বাংলাদেশের করণীয় :** ভারতের আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্প রোধে নিম্নোক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।

১. **ঐক্যবদ্ধভাবে মোকাবিলা :** নদী কিংবা নদী সভ্যতা, দেশ মাতৃকা ও জীবন এবং জাতীয় স্বার্থ— এ সবকিছুরই হুমকি ভারতের আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্প। ঐ প্রকল্পের প্রভাব তাৎক্ষণিকভাবে অনুভূত না হলেও এর প্রতিক্রিয়া শুধুমাত্র ২০-২৫ বছর নয়, চলতে থাকবে যুগ যুগ ধরে। সুতরাং ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে রক্ষার জন্য এখনি ভারতকে এ প্রকল্প থেকে বিরত রাখার জন্য জাতীয় স্বার্থ রক্ষায় ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে সবাইকে। এক্ষেত্রে প্রথমেই পারস্পরিক দ্বন্দ্ব, বিভেদ, রাজনৈতিক প্রতিহিংসা, ক্ষুদ্র দলীয় স্বার্থ ভুলে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে।

২. **সচেতনতা বৃদ্ধি :** ভারতের আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্পের ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে সর্বস্তরের জনগণের মাঝে সচেতনতা বাড়াতে হবে। এক্ষেত্রে সভা, সমাবেশ, মিছিল, সেমিনার ইত্যাদি পন্থা অবলম্বন করা যেতে পারে।

৩. **জাতীয় আন্দোলন গড়ে তোলা :** গণমাধ্যমকে প্রধান হাতিয়ার বানিয়ে প্রকল্পের সকল প্রকৃত নেতিবাচক দিকগুলো ফুটিয়ে তুলে জাতীয় আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। এক্ষেত্রে সাথে নিতে হবে পরিবেশবাদী আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ত গুরুত্বপূর্ণ সব সংস্থা ও জোটকে।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



৪. **জাতীয় ও বিশ্ব জনমত গঠন :** ভারতের আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্প রোধ করার জন্য এখনই দরকার জাতীয় জনমত গঠন। জাতীয় জনমত গঠনের পাশাপাশি বাংলাদেশের জীবন-মরণ এ সমস্যাটি আন্তর্জাতিক ফোরামে উত্থাপন করে বিশ্ব জনমতও গড়ে তুলতে হবে।

৫. **জাতিসংঘে উত্থাপন :** আন্তর্জাতিক নদ-নদীর পানি বণ্টন ও প্রত্যাহার সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক বিধি-বিধান সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরে জাতিসংঘের বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ সংস্থাকে জানাতে হবে। পাশাপাশি জাতিসংঘ যেন বিষয়টি আমলে নেয় সেদিকেও নজর রাখতে হবে।

৬. **কূটনৈতিক তৎপরতা জোরদার :** আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্পসহ ভারতের নদী বিরোধী সব পরিকল্পনার বিরুদ্ধে কূটনৈতিক তৎপরতা জোরদার করতে হবে। বিশ্বের বড় বড় শক্তিশালী রাষ্ট্র, যেমন– যুক্তরাষ্ট্র, চীন, রাশিয়া, ফ্রান্স, ব্রিটেনসহ সমগ্র পশ্চিমা বিশ্বকে সংশ্লিষ্ট সমস্যার কথা জানিয়ে ভারতের ওপর চাপ সৃষ্টি করতে হবে।

৭. **সরকারের জোরালো পদক্ষেপ :** ভারতের আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্পের বিরুদ্ধে সবচেয়ে জোরালো ও কার্যকর ভূমিকা পালন করতে হবে সরকারকে। কারণ কেবলমাত্র সরকারের জোরালো উপস্থাপনাই বিশ্ব সংস্থার কাছে গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত। সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টাতেই বাংলাদেশ বিরোধী এ প্রকল্প দ্রুত প্রতিহত করা সম্ভব হতে পারে।

**উপসংহার :** উপরিউক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে ভারত যে সহযোগিতামূলক মনোভাব নিয়ে এগিয়ে এসেছিল স্বাধীনতার পর থেকে নানা কারণে সে সহযোগিতায় ফাটল ধরেছে। এক্ষেত্রে ভারতের মনোভাব 'দাদাগিরি' সুলভ। আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্পের ক্ষেত্রেও এ মনোভাব স্পষ্ট। আন্তর্জাতিক নিয়ম-নীতি ও বাংলাদেশের অনুরোধ ও আলোচনার প্রস্তাবের তোয়াক্কা না করে ভারত একতরফাভাবে এ প্রকল্প বাস্তবায়নে মরিয়া। তাই আমাদেরকে এ ব্যাপারে সতর্ক ও জাতীয় স্বার্থ রক্ষামূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করা দরকার এখনই।

ᏅᏎᏇ

# ৩৫তম বিসিএস

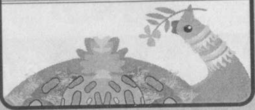

# মডেল প্রশ্ন

| বাংলা প্রথম পত্র | বাংলা দ্বিতীয় পত্র |
|---|---|
| মডেল প্রশ্ন-০১ | মডেল প্রশ্ন-০১ |
| মডেল প্রশ্ন-০২ | মডেল প্রশ্ন-০২ |
| মডেল প্রশ্ন-০৩ | মডেল প্রশ্ন-০৩ |
| মডেল প্রশ্ন-০৪ | মডেল প্রশ্ন-০৪ |
| মডেল প্রশ্ন-০৫ | মডেল প্রশ্ন-০৫ |

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

# মডেল প্রশ্ন

## বাংলা প্রথম পত্র

### মডেল প্রশ্ন ০১

[দ্রষ্টব্য : প্রত্যেক প্রশ্নের মান প্রশ্নের শেষ প্রান্তে দেখানো হয়েছে।] নম্বর

১. ক. সংজ্ঞাসহ উপসর্গ ও সন্ধির নিয়মে তিনটি করে শব্দ গঠন করুন। ৬

খ. শব্দ প্রয়োগ, বিন্যাস, চলিতরীতি ইত্যাদি শুদ্ধ করে নিচের বাক্যগুলো পুনরায় লিখুন : ০.৫ × ১২ = ৬

১. অবস্থা দৃষ্টিতে মনে হয় তারা যেন সকলেই ভূল করিবার প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয়েছে।
২. প্রাতঃকালে পরদিন ব্যাপারটি সমস্ত হাস্যজনক পরম বলে বোধ হলো।
৩. তুমি উত্তম সংবাদ বহন করিয়া এনেছো, তোমার মাথায় ফুলচন্দন পড়ুক।
৪. মধ্যাহ্নবেলায় একজন সৈনিক অশ্বারোহণে রাজপথ দিয়ে যাচ্ছেন।
৫. অস্তমান গোলাপী সূর্যের আকাশে আভা ছড়িয়ে পড়েছে।
৬. টায়টায় পুর্ন কলসি কাখে বধু ঘরে ফিরছে।
৭. দুঃখের কথা শ্রবণে তার কপাল বেয়ে অশ্রুজল ঝরছে।
৮. পুনির্মার চাদ স্নিদ্ধ জোতি ছড়ায়।
৯. এদেশের রাজনীতিকমন্ডলী নামে রাজনীতি জনতাকে ধোকা দিচ্ছে।
১০. ডা. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ্ যেমন বিদ্ধান তেমনি ব্যাবহারে বিনয়ি।
১১. অল্পকাল মধ্যে মহারবে নৈদাঘ ঝটিকা প্রধাবিত হল; এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রবল বৃষ্টিধারা পড়তে লাগল।
১২. গ্রামঞ্চলে খুদ্রঋনগৃহীতার সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে।

গ. বাংলা একাডেমি প্রবর্তিত 'প্রমিত বাংলা বানানের পাঁচটি নিয়ম লিখুন : ৬

ঘ. নিচের প্রবাদটির নিহিতার্থ প্রকাশ করুন : ৬

মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন।

ঙ. সূত্রানুসারে বাক্য গঠন করুন : ৬

ক. তুমি আমার কিছুই করতে পারবে না। (প্রশ্নবোধক বাক্য)
খ. যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে, তবে একলা চলো রে। (যৌগিক বাক্য)
গ. জল ফুটছে, ওতে হাত দিও না। (সরল বাক্য)

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



ঘ. সকাল হলো এবং সঙ্গে সঙ্গে বের হলাম। (জটিল বাক্য)
ঙ. সামাজিক রীতিনীতি এদের তেমন ভালো জানা নেই। (অস্তিবাচক বাক্য)
চ. অচিরেই তাদের ভুল ভাঙ্গে। (নেতিবাচক বাক্য)

২. যে কোনো একটি ভাব-সম্প্রসারণ লিখুন : ২০

ক. লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু; খ. সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই

৩. সারমর্ম লিখুন : ২০

ক. জাতিতে জাতিতে ধর্মে নিশিদিন হিংসা ও বিদ্বেষ
মানুষে করিছে ক্ষুদ্র, বিষাইছে বিশ্বের আকাশ,
মানবতা মহাধর্ম রোধ করি করিছে উল্লাস
বর্বরের হিংস্র নীতি, ঘৃণা দেয় বিকৃত নির্দেশ।
জাতি-ধর্ম-দেশ উর্ধ্বে ঘৃণা উর্ধ্বে পাচ্ছ যেই দেশ,
সেথায় সকলে এক, সেথায় মুক্ত সত্যের প্রকাশ,
মানব সভ্যতা সেই মুক্ত সত্য লভুক বিকাশ,
মহৎ সে মুক্তি-সংজ্ঞা মঙ্গল সে নির্বার অশেষ।
জাতি-ধর্ম-রাষ্ট্র ন্যায় সকলি যে মানুষের তরে
মানুষ সবার উর্ধ্বে—নহে কিছু তাহার অধিক।

খ. জগতের যত বড় বড় জয় বড় বড় অভিযান,
মাতা-ভগ্নী ও বধূদের ত্যাগে হইয়াছে মহীয়ান।
কোন্ রণে কত খুন দিল নর, লেখা আছে ইতিহাসে,
কত নারী দিল সিঁথির সিঁদুর লেখা নাই তার পাশে।
কত মাতা দিল হৃদয় উপড়ি, কত বোন দিল সেবা,
বীরের স্মৃতিস্তম্ভের গায়ে লিখিয়া রেখেছে কেবা?

৪. অতি সংক্ষেপে নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলোর উত্তর লিখুন : ২×১৫ =৩০

ক. চর্যাপদের আবিষ্কার বৃত্তান্ত লিখুন এবং চর্যাপদের ভাষা প্রসঙ্গে আবিষ্কারকের অভিমত তুলে ধরুন।
খ. 'মনসামঙ্গল' কাব্যের উদ্ভবের সামাজিক প্রেক্ষাপট বর্ণনা করুন।
গ. 'লাইলী-মজনু' কাব্যের কাহিনি সংক্ষেপে লিখুন।
ঘ. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে বাংলা গদ্যের জনক বলা হয় কেন?
ঙ. ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের ৫ জন লেখক ও তাদের রচিত একটি করে গ্রন্থের নাম লিখুন।
চ. 'বঙ্কিমচন্দ্রের সব উপন্যাসই রোমাঞ্চমূলক' –বিষয়টি অল্প কথায় বুঝিয়ে লিখুন।
ছ. বাংলা সাহিত্যে মধুসূদন কোন কোন শিল্পাঙ্গিক নিয়ে কাজ করেছেন? এগুলোর একটি প্রসঙ্গে লিখুন।
জ. 'বিষাদ সিন্ধু' গ্রন্থ নামের তাৎপর্য বুঝিয়ে লিখুন।
ঝ. রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পের বৈশিষ্ট্যগুলো কী কী?
ঞ. 'নীলদর্পণ' নাটকের সাহিত্যমূল্যের চেয়ে সামাজিক মূল্য বেশি।' –মন্তব্যটির পক্ষে কিছু লিখুন।
ট. নজরুলের বিদ্রোহের নানা দিক উন্মোচন করুন।
ঠ. 'জসীমউদ্দীনের কবিতার বিষয় কেবলই গ্রাম।'–কেন?
ড. নারী শিক্ষাবিস্তারে বেগম রোকেয়ার ভূমিকা উল্লেখ করুন।
ঢ. 'একুশে ফেব্রুয়ারি' বাংলা কবিতার অন্তহীন প্রেরণার উৎস–এ প্রসঙ্গে অল্প কথায় লিখুন।
ণ. 'রক্তাক্ত প্রান্তর' ও 'কবর' নাটকের রচয়িতা কে? নাটকদ্বয়ের উপজীব্য বিষয় কি?



## উত্তর ♦ মডেল প্রশ্ন : ০১

১. ক. **উপসর্গযোগে শব্দ গঠন :** যেসব অব্যয় শব্দ ধাতুর পূর্বে বসে নতুন শব্দ গঠন করে বাক্যের অর্থের সম্প্রসারণ, সংকোচন বা অন্য কোনো পরিবর্তন ঘটায় সেগুলোকে উপসর্গ বলে। যেমন : আ + হার = আহার; উপ + হার = উপহার; বি + হার = বিহার।

**সন্ধির সাহায্যে শব্দ গঠন :** দুটি শব্দের দ্রুত উচ্চারণের ফলে সম্পূর্ণ বা আংশিক দুটি ধ্বনির মিলন বা পরিবর্তনকে সন্ধি বলে। যেমন : বিদ্যা + আলয় = বিদ্যালয়; পরিঃ + কার = পরিষ্কার; তৎ + কর = তস্কর।

খ. ১. অবস্থা দেখে মনে হয়, তারা যেন সবাই ভুল করার প্রতিযোগিতায় নেমেছে।
২. পরদিন ভোরে পুরো ব্যাপারটা পরম হাসির বলে মনে হলো।
৩. তুমি ভালো সংবাদ দিয়েছ, তোমার মুখে ফুলচন্দন পড়ুক।
৪. দুপুরবেলায় একজন সৈনিক ঘোড়ায় চড়ে রাজপথ দিয়ে যাচ্ছেন।
৫. অস্তায়মান সূর্যের রক্তিম আভা আকাশে ছড়িয়ে পড়েছে।
৬. কানায় কানায় পূর্ণ কলসি কাঁখে বধূ ঘরে ফিরছে।
৭. দুঃখের কথা শুনে তার কপোল বেয়ে অশ্রু ঝরছে।
৮. পূর্ণিমার চাঁদ স্নিগ্ধ জ্যোতি ছড়ায়।
৯. এদেশের রাজনীতিবিদরা রাজনীতির নামে জনতাকে ধোঁকা দিচ্ছে।
১০. ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ যেমন বিদ্বান তেমনি বিনয়ী।
১১. কিছুক্ষণের মধ্যে শোঁ শোঁ শব্দ করে গ্রীষ্মের ঝড় এল এবং সাথে সাথে জোরে বৃষ্টির ফোঁটা পড়তে লাগল।
১২. গ্রামাঞ্চলে ক্ষুদ্রঋণ গ্রহীতার সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে।

গ. বাংলা একাডেমি প্রবর্তিত প্রমিত বাংলা বানানের পাঁচটি নিয়ম নিম্নরূপ :

i. তৎসম অর্থাৎ বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত অবিকৃত সংস্কৃত শব্দের বানান যথাযথ ও অপরিবর্তিত থাকবে। কারণ এসব শব্দের বানান ও ব্যাকরণগত প্রকরণ ও পদ্ধতি নির্দিষ্ট রয়েছে। তবে এ বানান রীতিতে যেসব ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম প্রস্তাবিত হয়েছে তা অনুসৃত হবে।

ii. যেসব বানানে মূল সংস্কৃত ই-কার, ঈ-কার এবং উ-কার ও ঊ-কার উভয়ই শুদ্ধ হিসেবে গ্রহণ করেছে, সে বানানগুলোতে শুধু ই-কার এবং উ-কার হবে। যেমন– কিংবদন্তি, খঞ্জনি, চিৎকার, ধ্বনি, ধুলি, পঞ্জি, পদবি, ভঙ্গি, মঞ্জুরি, মসি, লহরি, সরণি, সূচিপত্র, ঊর্ণা, উষা।

iii. রেফ-এর পরে ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বিত্ব হবে না। যেমন– অর্চনা, অর্জন, অর্থ, অর্ধ, কর্তন, কার্য, বর্জন, মূর্ছা, কার্তিক, বার্ধক্য, বার্তা, সূর্য।

iv. ক, খ, গ, ঘ পরে থাকলে পদের অন্তঃস্থ ম স্থানে অনুস্বার (ং) লেখা যাবে। যেমন– অহংকার, ভয়ংকর, সংগীত, শুভংকর, সংঘটন ইত্যাদি। বিকল্পে ঙ লেখা যাবে। ক্ষ-এর পূর্বে সর্বত্র ঙ হবে। যেমন– আকাঙ্ক্ষা।

v. ইংরেজি শব্দের প্রতিবর্ণীকরণে s-এর জন্য 'স' এবং sh, – sion, – ssion, – tion ইত্যাদির জন্য সাধারণত 'শ' হবে। যেমন– স্টেশন, কমিশন, শার্ট, ফটোস্ট্যাট ইত্যাদি।

ঘ. সত্যিকার কোনো আদর্শ বিনা আয়াসে বাস্তবায়ন করা যায় না। আদর্শকে প্রয়োগ করতে গিয়ে, দর্শনকে মানুষের মাঝে বাস্তবায়িত করতে গিয়ে আদর্শবান ব্যক্তিকে বিভিন্ন ত্যাগ স্বীকার করতে হয়েছে। দুঃখ-কষ্ট এবং ত্যাগ-তিতিক্ষা ছাড়া সহজে কেউ তার আদর্শকে বাস্তবায়ন করতে

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



পারেনি। এ পৃথিবীকে যারা অন্ধকারাচ্ছন্ন করে রাখতে চাইত তারাই সবসময় মহাপুরুষদের আদর্শকে বাস্তবায়নের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতো। তাই দেখা যায়, তাদের আদর্শকে বাস্তবায়ন করতে গিয়ে অনেক নির্যাতন সহ্য করতে হয়েছে। অনেককে মৃত্যুবরণ করতে হয়েছে। মন্ত্র অর্থাৎ আদর্শকে বাস্তবায়ন করতে হলে শরীর পাতন অর্থাৎ মৃত্যুকে সহজভাবে মেনে নিতে হয়।

ঙ. ক. তুমি কী করবে আমার?
খ. তোর ডাক শুনে কেউ না আসুক, একলা চলরে।
গ. ফুটন্ত জলে হাত দিও না।
ঘ. যেই সকাল হলো, অমনি বের হলাম।
ঙ. সামাজিক রীতিনীতি এদের অনেকটাই অজানা।
চ. তাদের ভুলটা ভাঙতে দেরি হয় না।

২. ক. লোভ মানব চরিত্রের এক দুর্দমনীয় প্রবৃত্তি। মানুষ যখন লোভের পথে পা বাড়ায়, তখন তার হিতাহিত জ্ঞান থাকে না। সমাজের অধিকাংশ মানুষ লোভের দ্বারা কমবেশি তাড়িত হয়। লোভ মানুষকে পাপ কাজে নিয়োজিত করে। কুপথে ধাবিত করে আর এজন্যই মানব জীবনের পরিণাম অনেক সময় দুঃখময় হয়ে ওঠে, কখনো কখনো ঘটে মৃত্যু।

নিজের ভোগ-বিলাসের জন্য দুর্দমনীয় বাসনাই লোভ। আমাদের চারপাশে সর্বত্র লোভের হাতছানি। অর্থ, বিত্ত, খ্যাতি, প্রতিষ্ঠা প্রভৃতির প্রতি মানুষের প্রচণ্ড লোভ। লোভে মানুষ পরিণামের কথা চিন্তা না করে এমন সব কাজ করে যা আইনের চোখে দণ্ডনীয়। ফলস্বরূপ বরণ করে নেয় জীবনের করুণ পরিণতি। লোভের মায়াজালে আচ্ছন্ন হয়ে মানুষ তার মা, বাবা, ভাইবোন সবাইকে অবজ্ঞা করে। স্বীয় বাসনা পূর্ণ করার জন্য সবাইকে ভুলে যেতে দ্বিধাবোধ করে না। টাকার মোহ তাকে পাগল করে তোলে। লোভ মানবজীবনের বড় শত্রু। লোভকে এ জন্য পাপের আধার বলা যেতে পারে। তিনটি জিনিস মানুষকে ধ্বংস করে : লোভ, অহংকার ও হিংসা। মানুষ আল্লাহর প্রিয় বান্দা এবং সৃষ্টির সেরা জীব। কিন্তু স্বয়ং আল্লাহও লোভীদের পছন্দ করেন না। লোভ আর স্বার্থবুদ্ধির দ্বারা তাড়িত হয়ে মানুষ ভাইকে, বন্ধুকে হত্যা করেছে। পরিণামে নিজের আত্মহননের পথ নিজেই তৈরি করছে। এ কথা সত্য যে লোভের পথে পা দিলে একদিন তার মৃত্যু হবেই। লোভ মানুষকে জঘন্য পথে ক্রমশ তাড়িত করে। কথায় আছে, 'অতি লোভে তাঁতী নষ্ট'। আর এভাবেই লোভী ব্যক্তি পথভ্রষ্ট হয়। সে অন্যায় অসত্য আর পাপের পথে ধাবিত হয়ে অকালমৃত্যুর মুখোমুখি হয়। পরিণামে নেমে আসে ভয়ংকর মৃত্যু। লোভকে বর্জন করতে হবে। তবেই জীবন সুন্দর ও সার্থক হবে। নির্লোভ জীবনের মাঝেই নিহিত আছে প্রকৃত সুখ। নির্লোভ জীবন সকলের শ্রদ্ধা ও ভক্তি অর্জন করে। তাই আমাদের প্রত্যেকের উচিত লোভ লালসা পরিহার করা।

খ. চিন্তা ও কর্মে, বিবেক ও শক্তিতে, হৃদয়ধর্ম ও নান্দনিক বোধে পৃথিবীতে মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব অবিসংবাদিত। সমরূপ মানব বৈশিষ্ট্যে বিশ্বের মানবসমাজ এক অভিন্ন পরিবারভুক্ত। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে স্বার্থান্বেষী ও ক্ষমতাদর্পী কিছু মানুষ হীন উদ্দেশ্যে মানুষে মানুষে সংকীর্ণ ভেদাভেদ সৃষ্টি করতে প্রয়াসী। তারা ধর্ম, বর্ণ ও সম্প্রদায়গত পার্থক্য উসকে দিয়ে জাতিগত বিভেদ ও শ্রেণীগত বৈষম্য সৃষ্টি করে সংঘাত, সংঘর্ষ ও হানাহানির মধ্যে মানুষকে ঠেলে দিতে চায়, মানবিক সম্প্রীতির বন্ধনকে ছিন্নভিন্ন করতে চায়। কিন্তু মানুষের আসল পরিচয় তার মনুষ্যত্বে, তার সবচেয়ে বড়ো ধর্ম মানব ধর্ম।



বিশ্ব প্রকৃতিতে মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা ঐতিহাসিক বাস্তবতা। সভ্যতার আদিলগ্নে মানুষ অসহায় হলেও প্রতিকূল পরিবেশের সঙ্গে দুর্বার সংগ্রামে মানুষ কেবল আপন অস্তিত্ব রক্ষা করেনি, প্রকৃতির ওপর ক্রমেই আধিপত্য বিস্তার করেছে। সভ্যতা নির্মাণ করতে গিয়ে মানুষ লোকালয়, গ্রাম ও নগর গড়েছে। মানুষের জ্ঞান, বুদ্ধি, শ্রম ও কৌশলের কাছে নদী, সাগর, মরু, গিরি-অরণ্য-পর্বত হয়েছে পদানত। আগুন ও বিদ্যুতের মতো শক্তিকে মানুষ নিয়ে এসেছে হাতের মুঠোয়। মহাকাশে তুলেছে বিজয় কেতন। পা বাড়িয়েছে ভিন্ন গ্রহে। রোবট ও কম্পিউটারের মতো ক্ষমতাধর বিস্ময়কে উদ্ভাবন করেছে মানুষ। শিল্প, সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন ও প্রযুক্তির নিত্যনতুন শাখায় একের পর এক সাফল্য অর্জন করে মানুষ প্রমাণ করেছে তার অবিসংবাদিত শ্রেষ্ঠত্ব। এই শ্রেষ্ঠত্বের দাবিদার কোনো একক মানুষ নয়, সমগ্র মানব সত্তা। দেশে দেশে কালে কালে মহামানবরা সেই মানবতার জয়গানেই মুখর হয়েছেন। মানব সভ্যতার দুর্দিনে জাতি-ধর্ম-বর্ণ-সম্প্রদায়ের উর্ধ্বে এ মানবতারই জয় হয়েছে। প্রমাণিত হয়েছে সবার ওপরে মানুষ সত্য।

৩. ক. মানুষে মানুষে হিংসা-বিদ্বেষ ও বিভেদের মূল কারণ জাতিগত ও ধর্মীয় পার্থক্য। অথচ জাতি-ধর্ম ও দেশকালের উর্ধ্বে মানবতার স্থান। বিশ্বে ক্রমবর্ধমান হিংসা-বিদ্বেষের ফলে মানুষের সবচেয়ে বড় ধর্ম মানবতা আজ পর্যুদস্ত। এ অবস্থায় পৃথিবীতে মানুষের মঙ্গল নিশ্চিত করতে হলে মানবতাকেই সবার উর্ধ্বে স্থান দিতে হবে।

খ. যুগ যুগ ধরে পৃথিবীর সকল বড় বড় কাজের মূলে রয়েছে নারী ও পুরুষের যৌথ ভূমিকা ও অবদান। পুরুষের পাশে থেকে সব সময় প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নারী তাদের কাজে শক্তি, সাহস ও প্রেরণা যুগিয়েছে। কিন্তু তবুও নারীর ভূমিকার যথাযথ মূল্যায়ন হয়নি; ইতিহাসের পাতায় তাদের ভূমিকা যথাযোগ্যভাবে লিপিবদ্ধ হয়নি।

৪. ক. ১৮৮২ সালে প্রকাশিত 'Sanskrit Buddhist Literature in Nepal' গ্রন্থে রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র সর্বপ্রথম নেপালের বৌদ্ধতান্ত্রিক সাহিত্যের কথা প্রকাশ করেন। তাতে উদ্দীপ্ত হয়ে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী নেপালের রয়েল লাইব্রেরি থেকে ১৯০৭ সালে ঐ সাহিত্যের কতকগুলো পদ আবিষ্কার করেন। উদ্ধারকারীর সম্পাদনায় 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ' থেকে পুঁথিগুলো ১৯১৬ সালে 'হাজার বছরের পুরান বাংলা ভাষায় বৌদ্ধগান ও দোহা' নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। এ গ্রন্থটিই পরে চর্যাপদ নামে পরিচিতি পায়। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী চর্যাপদের ভাষা সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন, 'আলো আঁধারি ভাষা, কতক আলো, কতক অন্ধকার, খানিক বুঝা যায়, খানিক বুঝা যায় না।' এ কারণেই চর্যাপদের ভাষা সান্ধ্যভাষা নামে পরিচিত।

খ. এ কাব্যের কাহিনি বাংলার আদিম লোকসমাজে প্রচলিত সর্পপূজার ঐতিহ্যের সাথে সম্পর্কিত। মধ্যযুগের পূর্বে বাংলা ছিল নদনদী ও বনজঙ্গলে পরিপূর্ণ। বিভিন্ন ধরনের সাপের বসবাস ছিল এ অঞ্চলে। সাধারণ মানুষের এ সর্পভীতি থেকেই 'মনসামঙ্গল' কাব্যের উদ্ভব হয়েছিল। সাপের অধিষ্ঠাত্রী দেবী মনসা। এ দেবীর কাহিনি নিয়ে রচিত কাব্যই মনসামঙ্গল নামে পরিচিত।

গ. আমির-পুত্র কয়েস বাল্যকালে বণিক-কন্যা লায়লীর প্রেমে পড়ে মজনু বা পাগল নামে খ্যাত হয়। লায়লীও মজনুর প্রতি গভীর আকর্ষণ অনুভব করে। কিন্তু উভয়ের বিবাহে আসে প্রবল বাধা; ফলে মজনু পাগলরূপে বনে-জঙ্গলে ঘুরে বেড়াতে থাকে। অন্যদিকে লায়লীর অন্যত্র বিয়ে হলেও তার মন থেকে মজনু সরে যায়নি। তাদের দীর্ঘ বিরহজীবনের অবসান ঘটে করুণ মৃত্যুর মাধ্যমে। এ মর্মস্পর্শী বেদনাময় কাহিনি অবলম্বনেই লায়লী-মজনু কাব্য রচিত।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



ঘ. বাংলা গদ্যের অনুশীলন পর্যায়ে বিদ্যাসাগর সুশৃঙ্খলতা, পরিমিতিবোধ ও ধ্বনিপ্রবাহে অবিচ্ছিন্নতা সঞ্চার করে বাংলা গদ্য রীতিকে উৎকর্ষের এক উচ্চতর পরিসীমায় উন্নীত করেন। বাংলা গদ্যে যতি চিহ্নের সন্নিবেশ ঘটিয়ে, পদবন্ধে ভাগ করে এবং সুললিত শব্দবিন্যাস করে বিদ্যাসাগর তথ্যের ভাষাকে রসের ভাষায় পরিণত করেন। বাংলা গদ্যের মধ্যেও যে এক প্রকার ধ্বনিঝংকার ও সুরবিন্যাস আছে তা তিনিই আবিষ্কার করেন। এ কারণেই তাকে বাংলা গদ্যের জনক বলা হয়।

ঙ. ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের ৫ জন লেখক ও তাঁদের রচিত একটি করে গ্রন্থ নিম্নরূপ : ১ রামরাম বসু— রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র; ২. উইলিয়াম কেরী— কথোপকথন; ৩. মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার— হিতোপদেশ; ৪. চণ্ডীচরণ মুন্শী— তোতা ইতিহাস এবং ৫. হরপ্রসাদ রায়— পুরুষ পরীক্ষা।

চ. উপন্যাস রচনায় বঙ্কিমচন্দ্র প্রখ্যাত ইংরেজ ঔপন্যাসিক স্যার ওয়াল্টার স্কটের রোমান্স-আশ্রয়ী ঐতিহাসিক উপন্যাসের আদর্শের অনুসারী ছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে বাস্তব জীবনকে ভিত্তিভূমি হিসেবে গ্রহণ করে বিস্ময়কর ও অলৌকিকের প্রতি প্রবণতা প্রকাশমান। ঐতিহাসিক উপন্যাসে তিনি যেমন ইতিহাস ও দৈবশক্তির সংমিশ্রণ ঘটিয়েছেন অন্যান্য সামাজিক ও দেশাত্মবোধক উপন্যাসগুলোতেও অলৌকিকতা ও কাল্পনিকতার আশ্রয় নিয়েছেন। এ কারণেই বলা হয় বঙ্কিমচন্দ্রের সব উপন্যাসই রোমাঞ্চমূলক।

ছ. বাংলা সাহিত্যে মধুসূদন কাজ করেছেন– মহাকাব্য, কাব্য, নাটক, প্রহসন, পত্রকাব্য, গীতিকাব্য, চতুর্দশপদী কবিতা ইত্যাদি শিল্পাঙ্গিক নিয়ে।

**চতুর্দশপদী কবিতা :** 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী' নামে সনেট জাতীয় কবিতা রচনার মাধ্যমে মধুসূদন বাংলা কাব্যে একটি নতুন শাখার সৃষ্টি করেন। একটি সনেটে ১৪টি পঙ্‌ক্তি থাকে, প্রথম ৮টিকে বলা হয় অষ্টক এবং শেষ ৬টিকে বলা হয় ষটক্। একটি সনেট একটি মাত্র ভাবের বাহন। মাইকেল মধুসূদন মোট ১০২টি সনেট রচনা করেন, যা 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী' গ্রন্থে প্রকাশিত হয়।

জ. মুসলিম ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির এক বিষাদময় কাহিনি অবলম্বনে মীর মশাররফ হোসেন রচনা করেছেন 'বিষাদসিন্ধু' নামক উপন্যাস জাতীয় গ্রন্থটি। এ গ্রন্থে হযরত মুহম্মদ (স)-এর দৌহিত্র ইমাম হাসানকে হত্যা করা হয় বিষপ্রয়োগে আর ইমাম হোসেনসহ অনেক নিকটাত্মীয়দের নির্মমভাবে হত্যা করা হয় কারবালা প্রান্তরে। এ কারণে গ্রন্থটি হয়ে উঠেছে বিষাদের সিন্ধু বা সাগর। বিষাদময় কাহিনির ব্যাপকতার জন্যই গ্রন্থটির নামকরণ হয়েছে বিষাদ-সিন্ধু।

ঝ. রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পগুলো কাব্যধর্মী। রবীন্দ্র গল্পের বিষয়বৈচিত্র্য অসাধারণ। প্রেম ও প্রকৃতি তার গল্পের মূল উপাদান। তিনি গল্প সরাসরি আরম্ভ করেন এবং মুহূর্তের মধ্যে পাঠকের মনকে ঘটনাস্রোতে মগ্ন করেন। ঠিক মুখে বলা গল্পের মতো সহজ, স্বচ্ছন্দ স্রোতে বয়ে চলে তার কাহিনি।

ঞ. 'নীলদর্পণ' নাটকে বাস্তব চিত্র রূপায়ণের ফলে সে আমলে নীলকরদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে দেশব্যাপী প্রবল আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। ইংরেজ নীলকরদের অত্যাচারে এ দেশে কৃষকজীবনের দুর্বিষহ অবস্থার পরিবর্তন ঘটানোর ক্ষেত্রে এ নাটকটির গুরুত্ব অপরিসীম। তাই বলা যায়, নাটকটির সাহিত্যমূল্য যা-ই হোক না কেন, তার চেয়ে সামাজিক মূল্য অনেক বেশি ছিল।



ট. মানবপ্রেমই নজরুলের বিদ্রোহের সঞ্চালিকা শক্তি। নজরুলের বিদ্রোহ অগণিত সংখ্যক সাধারণ মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা, অভাব-অভিযোগকে কেন্দ্র করে। গতানুগতিক মূল্যবোধ ও প্রচলিত সংস্কার বিশ্বাসকে আঘাত করে সেখানে নতুন মূল্যবোধের প্রতিষ্ঠা। পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করতে সকল প্রকার শোষণ ও নিপীড়নের বিরুদ্ধেই ছিল তার বিদ্রোহ; যা তার সাহিত্যের মধ্য দিয়ে স্পষ্ট হয় উঠেছে।

ঠ. জসীমউদ্দীন যুগের বিক্ষোভ ও আলোড়ন থেকে নিজেকে সরিয়ে রেখে গ্রামীণ প্রকৃতির অনাবিল সৌন্দর্যের মধ্যে নিজেকে বিলীন করেছিলেন। সেখান থেকেই তিনি সংগ্রহ করেছেন তার কাব্যের উপকরণ। পল্লী এবং পল্লীর মানুষকেই তিনি তার কবিতায় ফুটিয়ে তুলেছেন। এ কারণে তার কবিতার বিষয় কেবলই গ্রাম।

ড. বেগম রোকেয়া কলকাতায় সাখাওয়াত মেমোরিয়াল উর্দু প্রাইমারি স্কুল স্থাপন করেন ১৬ মার্চ ১৯১১ সালে। ১৯১৭ সালে এই স্কুল মধ্য ইংরেজি গার্লস স্কুলে ও ১৯৩১ সালে উচ্চ ইংরেজি গার্লস স্কুলে রূপান্তরিত হয়। আমৃত্যু তিনি এই স্কুলের প্রধান শিক্ষয়িত্রী ও সুপারিনটেনডেন্ট পদে দায়িত্ব পালন করেন। মুসলিম নারী শিক্ষার অন্ধকার যুগে কলকাতার বিভিন্ন মহল্লায় ঘুরে ঘুরে তিনি ছাত্রী সংগ্রহ করতেন এবং নারীদের সচেতন করার চেষ্টা করতেন।

ঢ. একুশ মানে প্রতিজ্ঞা, একুশ মানে চেতনা। সাহিত্যে এ চেতনা জাগ্রত হয়েছে সর্বাধিক। সাহিত্যের অন্যান্য ধারার মতো বাংলা কবিতায় এ চেতনাকে তুলে ধরেছেন এ দেশের সচেতন কবি সমাজ। শামসুর রাহমান, মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, গোলাম মোস্তফার মতো কবিরা ভাষা আন্দোলনের চেতনাকে প্রস্ফুটিত করেছেন তাদের কবিতার মাধ্যমে। বর্তমান কবিরাও স্বাধিকার আন্দোলনের প্রথম ধাপ একুশে ফেব্রুয়ারিকে নিয়ে কবিতা রচনা করে চলেছেন। তাই বলা যায়, একুশে ফেব্রুয়ারি বাংলা কবিতার অন্তহীন প্রেরণার উৎস।

ণ. 'রক্তাক্ত প্রান্তর' ও 'কবর' নাটক দুটির রচয়িতা মুনীর চৌধুরী। 'রক্তাক্ত প্রান্তর' নাটকের উপজীব্য বিষয় পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধ এবং 'কবর' নাটকের উপজীব্য বিষয় ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন।

## মডেল প্রশ্ন ০২

*[দ্রষ্টব্য : প্রত্যেক প্রশ্নের মান প্রশ্নের শেষ প্রান্তে দেখানো হয়েছে।]* নম্বর

১. ক. **শব্দ গঠনের নিয়ম বর্ণনা করুন :** ৬

উদ্ধার, মনঃকষ্ট; উপহার; মেঠো; নীলনয়না।

খ. **শব্দ প্রয়োগ, বিন্যাস, চলিতরীতি ইত্যাদি শুদ্ধ করে নিচের বাক্যগুলো পুনরায় লিখুন :** ০.৫ × ১২ = ৬

১. সোক সভায় বিশিষ্ট বুদ্ধিজিবি, বিজ্ঞানি, দার্শণিক প্রমুখগন শ্রদ্ধাঞ্জলী প্রদান করেন।
২. তার বাড়িতে আমি ঘুঘু চড়াইয়া ছাড়ব।
৩. চমকের সহিত নিদ্রাভঙ্গ হইল; অতি ব্যস্তে কুমার কক্ষ মধ্যে পদচারণ করতে লাগলেন।
৪. নীরিহ শুধুমাত্র আশির্বাদ অতিথী চেয়েছিলেন।
৫. বাজিকরের অদ্ভূদ ক্রিয়া দেখে ছাত্রগণেরা প্রফুল্লিত হইল।
৬. সে ক্রোধে আত্মহারা হয়ে উঠিয়াছে।
৭. সে কাল আমাদের রবিন্দ্র সংগিত সুন্দর শুনিয়েছিল।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



৮. ছোটগল্প হিসেবে ক্ষুদিত পাশানের স্বার্থকতা বিচার করো।
৯. প্রায়ই অর্থ কথাগুলোর বড় বড় হয়ে থাকে অস্পষ্ট।
১০. মাথা খুরি মরলেও তুমি কাহারও করুনার উদ্দোগ করিতে পারবে না।
১১. অতিশয় শুষ্ক, শীর্ন, অতিশয় কৃষ্ণ বর্ণ, বিকটাকার মনুষ্যের মতো কি আসিয়া দ্বারে দাঁড়াল।
১২. অনন্যপায় হয়ে আমি তার স্মরণাপন্ন হয়েছিলাম।

গ. **শুদ্ধ বানান লিখুন :** ৬
স্বাক্ষরতা, সখ্যতা, বিভিষন, সন্ন্যাসি, মুহূর্মুহ।

ঘ. **নিচের প্রবাদটির নিহিতার্থ প্রকাশ করুন :** ৬
গেঁয়ো যোগী ভিখ পায় না।

ঙ. **সূত্রানুসারে বাক্য গঠন করুন :** ৬
১. কেহ কহিয়া না দিলেও তপোবন বলিয়া বোধ হইতেছে। (যৌগিক বাক্য)
২. এটাই বাইরের সৌন্দর্য এবং তা এসে পৌছাল মনজগতে। (সরল বাক্য)
৩. তুমি আসবে বলে অপেক্ষা করছিলাম। (যৌগিক বাক্য)
৪. যখন বর্ষা শেষ হবে তখন আমরা গ্রামের বাড়ি যাব। (সরল বাক্য)
৫. এত টাকা পাওয়া সত্ত্বেও আমার অভাব মিটল না (জটিল বাক্য)
৬. যেহেতু কোথাও পথ পেলাম না সেহেতু আপনার কাছে এসেছি। (যৌগিক বাক্য)

২. **ভাব-সম্প্রসারণ করুন :** ২০
ক. আপনি আচরি ধর্ম পরের বোঝাও; খ. গতিই জীবন, স্থিতিতে মৃত্যু

৩. **সারমর্ম লিখুন :** ২০

ক. দরিদ্র সন্তান আমি দীন ধরণীর।
জন্মাবধি যা পেয়েছি সুখ-দুঃখভার।
বহু ভাগ্য বলে তাই করিয়াছি স্থির।
অসীম ঐশ্বর্যরাশি নাই তোর হাতে
হে শ্যামলা সর্বসহা জননী মৃন্ময়ী।
সকলের মুখে অন্ন চাহিস জোগাতে,
পারিস নে কত বার,—কই অন্ন কই
কাঁদে তোর সন্তানেরা ম্লান শুষ্ক মুখ,—
জানি মাগো, তোর হাতে অসম্পূর্ণ সুখ,
যা-কিছু গড়িয়া দিস ভেঙে ভেঙে যায়,
সব তাতে হাত দেয় মৃত্যু সর্বভুক,
সব আশা মিটাইতে পারিস নে হায়
তা বলে কি ছেড়ে যাব তোর তপ্ত বুক?

খ. দূর অতীতের পানে পশ্চাতে ফিরিয়া চাহিলাম
হেরিতেছি যাত্রী দলে দলে, জানি সবাকার নাম,
চিনি সকলেরে, আজ বুঝিয়াছি পশ্চিমি আলোতে
ছায়া ওরা। নটরূপে এসেছে নেপথ্যলোক হতে
দেহ ছদ্মসাজে; সংসারের ছায়ানাট্য অন্তহীন
সেথায় আপন পাঠ আবৃত্তি করিয়া সারাদিন কাটাইল;
সূত্রধরার অদৃষ্টের আভাসে আদেশে
চালাইল নিজ নিজ পালা, কভু কেঁদে কভু হেসে
নানাভঙ্গি নানাভাবে, শেষে অভিনয় হলে সারা
দেহবেশ ফেলে দিয়ে নেপথ্যে অদৃশ্য হলো তারা।



৪. **অতি সংক্ষেপে নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলোর উত্তর লিখুন :** ২ × ১৫ = ৩০
ক. বাংলা সাহিত্যের আদি নিদর্শন বাংলার বাইরে পাওয়া যায় কেন?
খ. কার নির্দেশে মুকুন্দরাম 'শ্রীশ্রীচণ্ডীমঙ্গল কাব্য' রচনা করেন? নির্দেশদাতা মুকুন্দরামকে কী উপাধি দেন?
গ. রচয়িতাসহ পাঁচটি রোমাঞ্চমূলক প্রণয়োপাখ্যানের নাম লিখুন এবং এ শ্রেণীর কাব্যের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করুন।
ঘ. কোন্ উদ্দেশ্যে কোন্ বছরে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়? কলেজটির নাম ফোর্ট উইলিয়াম কেন?
ঙ. সাহিত্যকর্ম ও সমাজকর্ম এ দুয়ের মধ্যে কোনটির জন্য বিদ্যাসাগর অধিক সুপরিচিত? আপনার অভিমত ব্যক্ত করুন।
চ. বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম সামাজিক উপন্যাসের নাম লিখুন। তাঁর যে কোনো উপন্যাসের দুটি বিখ্যাত লাইন লিখুন।
ছ. মাইকেল মধুসূদনের ৫টি শিল্পাঙ্গিকের ১টি করে উদাহরণ দিন।
জ. মীর মশাররফ হোসেনের সাহিত্যজীবনের প্রথম দিকের রচনাগুলো কোন পত্রিকায় প্রকাশিত হতো? এর সম্পাদক কে ছিলেন?
ঝ. রবীন্দ্রনাথের নাটকগুলোকে কোন কোন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়? তাঁর ২টি সাংকেতিক নাটকের নাম লিখুন।
ঞ. 'নীলদর্পণ' নাটকের ইংরেজি অনুবাদ করেছিলেন কে? নাটকটির প্রকাশক কে ছিলেন?
ট. নজরুলের বিদ্রোহী কবিতার 'আমি' কে?
ঠ. জসীমউদ্দীনের 'কবর' কবিতা সম্পর্কে লিখুন।
ড. 'বেগম রোকেয়াই বাংলা সাহিত্যে প্রথম নারীবাদী লেখক'— কথাটি বুঝিয়ে দিন।
ঢ. বাংলাদেশের একজন গদ্য লেখকের পরিচয় দিন।
ণ. কায়কোবাদের আসল নাম কী? তার বিখ্যাত মহাকাব্যের নাম কী?

## উত্তর ♦ মডেল প্রশ্ন : ০২

১. ক. **উদ্ধার :** এটি সন্ধিসাধিত শব্দ। ব্যঞ্জনবর্ণের সঙ্গে ব্যঞ্জনবর্ণের সংযোগে এ শব্দটি গঠিত হয়েছে। যেমন : উৎ + হার = উদ্ধার।

**মনঃকষ্ট :** এটি সন্ধিসাধিত শব্দ। কোনো কোনো ক্ষেত্রে সন্ধির বিসর্গ লোপ না পেয়ে শব্দ গঠিত হয়। যেমন : মন ঃ + কষ্ট = মনঃকষ্ট।

**উপহার :** এটি উপসর্গযোগে গঠিত শব্দ। তৎসম বা সংস্কৃত 'উপ' উপসর্গ দ্বারা গঠিত হয়েছে। যেমন : উপ + হার = উপহার।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



মেঠো : এটি প্রত্যয় সাধিত শব্দ। তদ্ধিত উয়া > ও -প্রত্যয়যোগে গঠিত হয় মেঠো শব্দটি। যেমন : মাঠ + উয়া = মাঠুয়া > মেঠো।

নীলনয়না : এটি সমাসসাধিত শব্দ। বহুব্রীহি সমাসের নিয়মানুযায়ী 'নীল নয়ন যার = নীলনয়না' শব্দটি গঠিত হয়েছে।

খ. ১. শোকসভায় বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী, বিজ্ঞানী, দার্শনিক প্রমুখ শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করেন।
২. তার ভিটায় আমি ঘুঘু চরিয়ে ছাড়ব।
৩. চমকের সাথে ঘুম ভাঙল; ব্যস্তভাবে কুমার ঘরের মধ্যে পায়চারী করতে লাগলেন।
৪. নিরীহ অতিথি শুধু আশীর্বাদ চেয়েছিলেন।
৫. বাজীকরের অদ্ভুত ক্রীড়া দেখে ছাত্রগণ প্রফুল্ল হলো।
৬. সে ক্রোধান্ধ হয়েছে।
৭. কাল সে আমাদের রবীন্দ্র সংগীত শুনিয়েছিল।
৮. ছোটগল্প হিসেবে 'ক্ষুধিত পাষাণ'-এর সার্থকতা বিচার করো।
৯. বড় বড় কথাগুলোর অর্থ প্রায়ই অস্পষ্ট থাকে।
১০. মাথা খুঁড়ে মরলেও তুমি কারও করুণার উদ্রেক করতে পারবে না।
১১. অতিশয় শুকনো, শীর্ণ, অতিশয় কালো বর্ণ, বিকটাকার মানুষের মতো কি এসে দরজায় দাঁড়াল।
১২. অনন্যোপায় হয়ে আমি তার শরণাপন্ন হয়েছিলাম।

গ.

| প্রদত্ত শব্দ | শুদ্ধ রূপ |
|---|---|
| স্বাক্ষরতা | সাক্ষরতা |
| সখ্যতা | সখ্য |
| বিভিষন | বিভীষণ |
| সন্ন্যাসি | সন্ন্যাসী |
| মুহুর্মূহু | মুহুর্মুহু |

ঘ. দূরবর্তী সস্তা জিনিসকে মূল্যবান মনে করে কাছের মূল্যবান জিনিসকে অবহেলা করা মানুষের সহজাত স্বভাব। বাংলাদেশের তৈরি শার্ট আমেরিকা থেকে কিনলে আমরা তার গুরুত্ব দেই। কিন্তু দেশে এর চেয়ে ভালো শার্টকে আমাদের অবহেলা করতে বাধে না। আসলে আমাদের মানসিক গঠনটাই হয়ে গেছে এমন যে, 'দেশের ঠাকুর ফেলিয়া বিদেশের কুকুর ধরি'। রাষ্ট্রীয় জীবনে দেশী জিনিসের অবহেলা প্রকারান্তরে দেশপ্রেমহীনতার নামান্তর। অনেক সময় দেখা যায় নিজের বাবা-মা, ভাই-বোনকে দূরে ঠেলে দিয়ে আমরা পরকে আপন ভাবি, যা সঠিক নয়। মূলত দেশপ্রেম, স্বজাত্যবোধ ও মানবিকতাবোধসম্পন্ন হতে পারলেই আমাদের এ ভ্রান্ত ধারণা কেটে যাবে।

ঙ. ১. কেহ কহিয়া দিতেছে না, তথাপি তপোবন বলে বোধ হইতেছে।
২. বাইরের সৌন্দর্য এসে পৌছাল মনোজগতে।
৩. তুমি আসবে, অতএব অপেক্ষা করছিলাম।
৪. বর্ষা গেলে আমরা গ্রামের বাড়ি যাব।
৫. যদিও এত টাকা পেলাম, তবুও আমার অভাব মিটল না।
৬. কোথাও পথ পেলাম না, তাই আপনার কাছে এসেছি।



২. ক. মহৎ কর্ম নিজের জীবনে আয়ত্ত করে, অপরকে তা করার জন্য নির্দেশ দিতে হবে। এর ব্যতিক্রম হলে হিতে বিপরীত হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে।

ধর্ম মানুষকে সৎ ও কল্যাণের পথ দেখায়, মানুষকে মহৎ ও ভালো হতে শেখায়। কিন্তু অধার্মিক ব্যক্তি যদি ধর্মের বুলি আওড়ায় তবে তা বেসুরো বাজে। সবার কাছেই তা চরম বিরক্তিকর। তাই প্রথমে নিজে ধর্মের দীক্ষা নিয়ে বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করে পরে তা অন্যকে পালন করতে বলা উচিত। নিজের মধ্যে যে গুণের অভিব্যক্তি নেই তা অন্যকে শিক্ষা দিতে বা বোঝাতে গেলে বিড়ম্বনার শিকার হতে হয়। যেমন– একজন চোর যদি এসে মানুষকে চুরি করতে নিষেধ করে, তবে সবার কাছেই তা হাস্যকর মনে হবে। কেউ তার কথা শুনবে না। তদ্রূপ কোনো ভণ্ড, প্রতারক, অসাধু ব্যক্তি মুখে যত ভালো কথাই বলুক না কেন কেউ তা থেকে শিক্ষাগ্রহণ করবে না। যে কোনো বিষয় সম্পর্কে মানুষকে শিক্ষা দিতে গেলে, উপদেশ দিতে গেলে বা বোঝাতে গেলে আগে দেখতে হবে তা নিজের মধ্যে কতটুকু আছে। আগে নিজের আচরণে প্রতিফলন ঘটাতে হবে এবং পরে তা অন্যদের বোঝাতে হবে। অন্যথায় তা মোটেও কার্যকর হবে না।

নিজের মধ্যে যা নেই অন্যকে তা বোঝাতে বা শিক্ষা দিতে যাওয়া চরম বোকামি।

খ. সৃষ্টিশীল যা কিছু দৃশ্যমান, তার সবকিছুই প্রবহমান। চলমানতাই জীবনের বৈশিষ্ট্য, নিশ্চলতা মৃত্যু। স্থবিরতা ব্যক্তি ও সমাজজীবনকে যেমন স্তিমিত করে দেয়, জাতীয় জীবনকেও করে বিপর্যস্ত। ঐশ্বর্যমণ্ডিত ও সমৃদ্ধ জাতীয় জীবনে তাই গতিশীলতার কোনো বিকল্প নেই।

নদী সতত প্রবহমান থাকলে তার বুকে কোনোরূপ শৈবাল বা আবর্জনা জমতে পারে না। কিন্তু তার গতি যদি স্থির হয়ে যায়, তবে তার বুক শৈবাল বা আবর্জনায় ভরে ওঠে। তদ্রূপ, ব্যক্তিগত তথা সামাজিক জীবনে কোনো ব্যক্তি যদি স্থবির হয় তবে তার জীবনে উন্নতির আশা অবাস্তব কল্পনা ছাড়া আর কিছুই নয়। জীবনে উন্নতির চাবিকাঠি হলো সংস্কারমুক্ত হয়ে গতিময় জীবনের দিকে অগ্রসর হওয়া। যে জাতি যতদিন উন্নয়নকামী ও কর্মঠ থাকে, ততদিন কোনোরূপ কুসংস্কার তার গতিরোধ করতে পারে না। কিন্তু সে জাতি যদি তার পুরাতন ঐতিহ্যকে বুকে ধরে অগ্রগতির পথে না এগোয় তবে স্রোতহীন নদীর মতোই শত জীর্ণতা এসে তাকে ঘিরে ফেলে। ফলে ধীরে ধীরে সে এ ধরা থেকে লয়প্রাপ্ত হয়। যে জাতির জীবনধারা অচল, অসার সে জাতির অপমৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। গতিশীল জীবন প্রবাহই জাতীয় জীবনকে করে জীবন্ত ও উজ্জ্বল।

৩. ক. পৃথিবীর প্রতি মানুষের ভালোবাসা অসীম। কারণ, মানুষ পৃথিবীর সন্তান। কিন্তু পৃথিবী সবসময় সবার মুখে অন্ন জোগাতে পারে না, অপমৃত্যুর হাত থেকে সবাইকে রক্ষা করতেও ব্যর্থ হয়। মানুষের সব আশা মেটানোও সম্ভব হয় না তার পক্ষে। কিন্তু তাই বলে মানুষ জননীতুল্য পৃথিবীকে কখনো ছেড়ে যাওয়ার কথা ভাবে না।

খ. এ বিশ্বজগৎ যেন এক বিরাট নাট্যমঞ্চ। অনাদিকাল থেকে মানুষ সেই নাট্যমঞ্চে জীবনের সুখ-দুঃখের নানা পালা অভিনয় করে। যে যার ভূমিকা শেষ করে তারপর জীবন থেকে চিরবিদায় নেয়।

৪. ক. বাংলার পাল বংশের রাজারা বৌদ্ধ ছিলেন। তাদের আমলে চর্যাগীতিকাগুলোর বিকাশ ঘটেছিল। পাল বংশের পরপরই বাংলাদেশে পৌরাণিক হিন্দুধর্ম ও ব্রাহ্মণ্য সংস্কার রাজধর্ম হিসেবে গৃহীত হয়, ফলে বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যেরা এ দেশ থেকে বিতাড়িত হয়। সেন রাজাদের প্রতাপের কারণেই বাংলাদেশের বাইরে গিয়ে তাদের অস্তিত্ব রক্ষা করতে হয়েছিল। তাই বাংলা সাহিত্যের আদি নিদর্শন বাংলার বাইরে নেপালে পাওয়া যায়।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



খ. জমিদার রঘুনাথের সভাসদরূপে থাকাকালীন তার নির্দেশে মুকুন্দরাম 'শ্রীশ্রীচণ্ডীমঙ্গল' কাব্য রচনা করেন। রঘুনাথ কবিপ্রতিভার স্বীকৃতিস্বরূপ তাকে 'কবিকঙ্কণ' উপাধি দেন।

গ. রচয়িতাসহ পাঁচটি রোমাঞ্চকর প্রণয়োপাখ্যান :
১. ইউসুফ-জোলেখা — শাহ্ মুহম্মদ সগীর; ২. লায়লী-মজনু — দৌলত উজীর বাহরাম খান; ৩. মধুমালতী — মুহম্মদ কবীর; ৪. পদ্মাবতী — আলাওল এবং ৫. সতীময়না-লোরচন্দ্রানী — দৌলত কাজী।

**এ শ্রেণীর কাব্যের বৈশিষ্ট্য :** মূল কাব্যের লক্ষ্য অনেক ক্ষেত্রেই অধ্যাত্মপ্রেম হলেও বাংলা ভাষায় পরিবেশনকালে তা আধ্যাত্মিকতা থেকে মুক্তি পেয়েছে এবং তাতে মানবপ্রেমের বৈশিষ্ট্য প্রকাশিত হয়েছে। রোমান্টিক কথা ও কাহিনির অসাধারণ ভাণ্ডার আরবি-ফারসি সাহিত্যের প্রত্যক্ষ অনুপ্রেরণায় বাংলা সাহিত্যে এ ধারার সৃষ্টি।

ঘ. ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কার্য পরিচালনা করতে আসা নবীন ইংরেজ সিভিলিয়ানদের এ দেশীয় ভাষা-সাহিত্য-শিল্প-ইতিহাস-আচার-আচরণাদি শিক্ষা দেয়ার জন্য ১৮০০ সালের ৪ মে কলকাতায় ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়।
ফোর্ট উইলিয়াম কলকাতা শহরে অবস্থিত। প্রাচ্যে ব্রিটিশরাজের সামরিক শক্তির বড় নিদর্শন এটি। ইংল্যান্ডের রাজার সম্মানে দুর্গটির নামকরণ করা হয় ফোর্ট উইলিয়াম। কলেজটি এর অভ্যন্তরভাগে অবস্থিত বলেই কলেজটির নামকরণ হয়েছে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ।

ঙ. বিদ্যাসাগর বাংলা গদ্যকে সৌন্দর্য ও পরিপূর্ণতা দান করলেও তাঁর সমাজকর্মের জন্যই তিনি অধিক সুপরিচিত। পাশ্চাত্যের মানবতাবাদী আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি সমাজসেবায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন। সমাজ সংস্কারের মনোবৃত্তি বিদ্যাসাগরের রচনায় সহজেই লক্ষণীয়, অর্থাৎ তিনি যেসব সাহিত্য রচনা করেছেন তার মূলেও সমাজ সংস্কারের উদ্দেশ্য নিহিত ছিল। তাই আমরা বলতে পারি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সমাজকর্মের জন্য অধিক সুপরিচিত ছিলেন।

চ. বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম সামাজিক উপন্যাস– বিষবৃক্ষ (১৮৭৩)।
তাঁর 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসের দুটি বিখ্যাত লাইন–
১. পথিক তুমি পথ হারাইয়াছ;
২. তুমি অধম তাই বলিয়া আমি উত্তম হইব না কেন?

ছ. ১. নাটক— পদ্মাবতী;
২. মহাকাব্য— মেঘনাদবধ;
৩. সনেট— চতুর্দশপদী কবিতাবলী;
৪. প্রহসন— একেই কি বলে সভ্যতা;
৫. পত্রকাব্য— বীরাঙ্গনা।

জ. মীর মশাররফ হোসেনের সাহিত্য জীবনের প্রথম দিকের রচনাগুলো প্রকাশিত হতো 'গ্রামবার্তা' ও 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকায়। পত্রিকা দুটোর সম্পাদক ছিলেন— কাঙাল হরিনাথ ও ঈশ্বরগুপ্ত।

ঝ. রবীন্দ্রনাথের নাটকের শ্রেণীগুলো হচ্ছে– গীতিনাট্য, কাব্যনাট্য, সাংকেতিক নাটক, সামাজিক নাটক, প্রহসন, নৃত্যনাট্য ইত্যাদি।
দুটি সাংকেতিক নাটক— ডাকঘর, রাজা।



ঞ. ধারণা করা হয় নাটকটির ইংরেজি অনুবাদ করেছিলেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত (ছদ্মনাম A Native)। প্রকাশক রেভারেন্ড জেমস্ লঙ্।

ট. নজরুলের বিদ্রোহী কবিতায় অনাদৃত, লাঞ্ছিত, উৎপীড়িত, অবমানিত গণমানুষের প্রতীক হচ্ছে 'আমি'। এই আমির উদার আঙিনায় সমস্ত সাধারণ এসে ভীড় জমিয়েছে, যাদের মুখে এতকাল কোনো ভাষা ছিল না, যাদের মনে ছিল না কোনো আত্মবিশ্বাস। সেই অগণিত নির্যাতিত, অবহেলিত মানুষের প্রতিভূ হলো নজরুলের 'আমি'।

ঠ. জসীমউদ্‌দীনের ছাত্রাবস্থায় 'কবর' কবিতা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমিক পর্যায়ের পাঠ্য তালিকাভুক্ত হয়। কবিতাটি প্রথম 'কল্লোল' পত্রিকায় ছাপা হয়। এ কবিতায় এক বৃদ্ধ দাদু তার জীবনের শোকার্ত অধ্যায়গুলো উন্মোচন করেছেন তার একমাত্র অবলম্বন নাতির কাছে।

ড. বেগম রোকেয়াকে বলা হয় মুসলিম নারীমুক্তি আন্দোলনের পথিকৃৎ। তিনি বাংলা গদ্যের একজন বিশিষ্ট শিল্পী, সমাজের কুসংস্কার ও জড়তা দূর করে নারীকে সামনে এগিয়ে যাওয়ার জন্য তিনি তার লেখনী ধারণ করেন। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকেই তিনি বাংলা সাহিত্যে 'নারীর অধিকার' বিষয়ক অনেক প্রবন্ধ রচনা করে নারীদের সচেতন করার চেষ্টা করেন। এ কারণেই তাকে বাংলা সাহিত্যে প্রথম নারীবাদী লেখক বলা হয়।

ঢ. বাংলাদেশের অন্যতম গদ্য লেখক আবুল ফজল (১৯০৩-১৯৮৩) চট্টগ্রামের সাতকানিয়ায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি 'মুসলিম সাহিত্য সমাজের' অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। সমাজ ও সমকাল সচেতন প্রাবন্ধিক হিসেবে ব্যাপক খ্যাতি অর্জন করেন। কথাশিল্পী হিসেবেও তিনি প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনাবলী চৌচির, মাটির পৃথিবী, সাহিত্য ও সংস্কৃতি সাধনা, মানবতন্ত্র ইত্যাদি।

ণ. কায়কোবাদের প্রকৃত নাম মুহম্মদ কাজেম আল কুরায়শী। তাঁর বিখ্যাত মহাকাব্যের নাম 'মহাশ্মশান' (১৯০৪)।

## মডেল প্রশ্ন ০৩

*[দ্রষ্টব্য : প্রত্যেক প্রশ্নের মান প্রশ্নের শেষ প্রান্তে দেখানো হয়েছে।]* নম্বর

১. ক. শব্দ গঠনের প্রয়োজনীয়তা আলোচনা করুন। ৬

খ. শব্দ প্রয়োগ, বিন্যাস, চলিতরীতি ইত্যাদি শুদ্ধ করে নিচের বাক্যগুলো পুনরায় লিখুন : ০.৫ × ১২ = ৬
১. যখন, তুমি এত সত্ত্বর চলে যাইবে বলে স্থির করিয়া রাখিয়াছিলে, তখন তোমার সংসারে না আসাই সর্বাংশে উচিৎ ছিল।
২. পরীক্ষা ব্যতীত কোনো বস্তুরই সম্যক পরিচয় পাওয়া যায় না। কিন্তু কোনো বস্তুকেই পরীক্ষা করবার প্রকৃতি আমাদের নেই।
৩. যেইটি তার নিজের সর্বশ্রেষ্ঠ বাহ্যবিকাশ তা আশ্রয় করিতে করিতেই তার ক্রমাগত পুষ্টিসাধন হয়।
৪. এবার জখন মেলায় যাচ্ছিলাম আমি, তখন হটাৎ কালো হয়ে উঠলো মেঘ এবং হয়ে গেলো বৃষ্টি এক পসলা।
৫. সকল বালিকাগণ পানি সিঞ্চন করবার জন্য মৃন্ময় পাত্র লইয়া বাগানে গেল।
৬. দারিদ্র মধুসুদনের শেষ জীবন ঘিরে ফেলেছিল।
৭. কীর্তিবাস বাংলা রামায়ন লিখেছেন।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



৮. মুমূর্ষ ব্যক্তির প্রতি সকলের সহানুভূতি ছিল।
৯. বাজীকরের অদ্ভুত ক্রিয়া দেখিয়া ছাত্রগণেরা প্রফুল্লিত হল।
১০. অর্ধাঙ্গিনীর অশ্রুজল দেখে স্বামী শোকে মুহ্যমান হলেন।
১১. মানুষ বাঘের মাংস খায়।
১২. সে হাবুডুবু সাগরে দুঃখ খাচ্ছে।

গ. ণ-ত্ব বিধানের পাঁচটি নিয়ম লিখুন।

ঘ. প্রবাদটির নিহিতার্থ প্রকাশ করুন : ৬
তেলা মাথায় তেল দেয়া মনুষ্য জাতির রোগ

ঙ. সূত্রানুসারে বাক্য গঠন করুন : ৬
ক. তার কথার একবর্ণও সত্য নয়। (জটিল বাক্য)
খ. তিনি অসুস্থ, তাই অফিসে আসতে পারেননি। (সরল বাক্য)
গ. লেখাপড়া করে যে, গাড়িঘোড়া চড়ে সে। (যৌগিক বাক্য)
ঘ. সে সুখবরটা শুনেছে এবং আনন্দিত হয়েছে। (জটিল বাক্য)
ঙ. আমি সেখানে গিয়ে তোমাকে দেখিনি। (জটিল বাক্য)
চ. বাংলা ভাষায় অক্ষরের ভূমিকা মুখ্য নয়। (অস্তিবাচক)

২. যে কোনো একটি ভাব-সম্প্রসারণ লিখুন : ২০

ক. যে জাতি জীবন হারা অচল অসাড়
পদে পদে বাঁধে তার জীর্ণ লোকাচার।

খ. দুর্জন বিদ্বান হইলেও পরিত্যাজ্য।

৩. সারমর্ম লিখুন : ২০

ক. একদা পরমমূল্য জন্মক্ষণ দিয়েছে তোমায়
আগন্তুক। রূপের দুর্লভসত্তা লভিয়া বসেছ
সূর্য-নক্ষত্রের সাথে। দূর আকাশের ছায়াপথে
যে আলোক আসে নামি ধরণীর শ্যামল ললাটে
সে তোমার চক্ষু চুমি তোমারে বেঁধেছে অনুক্ষণ
সখ্যডোরে দ্যুলোকের সাথে; দূর যুগান্তর হতে
মহাকাল যাত্রী মহাবাণী পুণ্য মুহূর্তেরে তব
শুভক্ষণে দিয়েছে সম্মান; তোমার সম্মুখ দিকে
আত্মার যাত্রার পন্থ গেছে চলি অনন্তের পানে—
সেথা তুমি একা যাত্রী অফুরন্ত এ মহাবিস্ময়।

খ. যেখানে এসেছি আমি, আমি সেথাকার
দরিদ্র সন্তান আমি দীন ধরণীর।
জন্মাবধি যা পেয়েছি সুখ-দুঃখভার।
বহু ভাগ্য বলে তাই করিয়াছি স্থির।
অসীম ঐশ্বর্যরাশি নাই তোর হাতে
হে শ্যামলা সর্বসহা জননী মৃন্ময়ী।



সকলের মুখে অন্ন চাহিস জোগাতে,
পারিস নে কত বার,—কই অন্ন কই
কাঁদে তোর সন্তানেরা ম্লান শুষ্ক মুখ,—
জানি মাগো, তোর হাতে অসম্পূর্ণ সুখ,
যা-কিছু গড়িয়া দিস ভেঙে ভেঙে যায়,
সব তাতে হাত দেয় মৃত্যু সর্বভুক,
সব আশা মিটাইতে পারিস নে হায়
তা বলে কি ছেড়ে যাব তোর তপ্ত বুক?

৪. অতি সংক্ষেপে নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলোর উত্তর লিখুন : ২ × ১৫ = ৩০

ক. চর্যাপদে কয়টি পদ বা গান ছিল?
খ. বাংলা সাহিত্যের অন্ধকার যুগ কোন সময়কাল?
গ. 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যের ভাব ও ভাষা কিরূপ?
ঘ. ব্রজবুলি কী? এ ভাষার দুজন শ্রেষ্ঠ কবি কে?
ঙ. 'চণ্ডীদাস সমস্যা' কী?
চ. শ্রীরামপুর মিশনের প্রতিষ্ঠাতা কে?
ছ. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর কেন বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসে স্মরণীয়?
জ. মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে লেখা একটি উপন্যাস, একটি নাটক ও একটি স্মৃতিকথার নাম লিখুন।
ঝ. 'বিষবৃক্ষ' শ্রেষ্ঠ উপন্যাস কেন?
ঞ. 'শর্মিষ্ঠা' মধুসূদনের উল্লেখযোগ্য নাটক কেন?
ট. 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী' সম্পর্কে কি জানেন?
ঠ. 'গীতাঞ্জলি' কাব্যগ্রন্থ সম্পর্কে কি জানেন?
ড. আবু ইসহাক প্রকাশিত প্রথম গ্রন্থের নাম কি? এটি কত সালে প্রকাশিত হয়?
ঢ. খোয়াবনামা, শিখা, সঞ্চয়ন—কোন ধরনের সাহিত্যকর্ম?
ণ. শশী ও কুসুম কোন উপন্যাসের পাত্র-পাত্রী? এদের স্রষ্টা কে?

## উত্তর ♦ মডেল প্রশ্ন : ৩

১. ক. শব্দ গঠনের মাধ্যমে ভাষার সমৃদ্ধি ঘটে। মানুষের মনের বৈচিত্র্যপূর্ণ ভাব প্রকাশের ক্ষেত্রে প্রয়োজন হয় নতুন নতুন শব্দ গঠনের। বাংলা ভাষায় শব্দ গঠনের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। নতুন নতুন শব্দ গঠনের মাধ্যমে ভাষার শব্দসম্ভার শুধু বৃদ্ধিই পায় না, বক্তব্য প্রকাশেও সহায়ক হয়ে থাকে। শব্দ গঠনের নিয়ম-নীতি জানা থাকলে প্রয়োজন অনুযায়ী নতুন নতুন শব্দ গঠন সম্ভব হয়। যুগোপযোগী ভাবধারা রূপায়ণে এবং ভাষার গতিশীলতার জন্য নতুন শব্দ সংযোজন করতে হয়। শব্দ গঠনের মাধ্যমে ভাষাবৈচিত্র্য আনয়নের ক্ষেত্রে শব্দ গঠন সম্পর্কে পঠন-পাঠন প্রয়োজন। বাংলায় নানা প্রক্রিয়ায় শব্দ গঠন হয়ে থাকে। যেমন : সন্ধির সাহায্যে (অন্য + অন্য = অন্যান্য), উপসর্গযোগে (অধি + নায়ক = অধিনায়ক), প্রত্যয়যোগে (বাবু + আনা = বাবুয়ানা), সমাসের সাহায্যে (বনে চরে যে = বনচর) ইত্যাদি। শব্দের সংখ্যা যে ভাষায় যত বেশি থাকে সে ভাষা তত সমৃদ্ধ হয়ে থাকে। এজন্য প্রত্যেক ভাষায়ই শব্দ গঠনের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



খ. ১. যখন, তুমি এত তাড়াতাড়ি চলে যাবে বলে ঠিক করে রেখেছিলে, তখন তোমার সংসারে না আসাই সর্বাংশে উচিত ছিল।
২. পরীক্ষা ছাড়া কোনো বস্তুরই পুরোপুরি পরিচয় পাওয়া যায় না। কিন্তু কোনো বস্তুকেই পরীক্ষা করার ইচ্ছে আমাদের নেই।
৩. যেটা তার নিজের সবচেয়ে বাইরের বিকাশ তাই আশ্রয় করতে করতেই তার ক্রমাগত পুষ্টিসাধন হয়।
৪. এবার যখন আমি মেলায় যাচ্ছিলাম, তখন হঠাৎ মেঘ কালো হ'য়ে উঠে এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেল।
৫. সকল বালিকা/বালিকাগণ পানি সেচ দেয়ার জন্য মাটির পাত্র নিয়ে বাগানে গেল।
৬. দারিদ্র্য মধুসূদনের শেষ জীবন ঘিরে ফেলেছিল।
৭. কৃত্তিবাস বাংলা রামায়ণ লিখেছেন।
৮. মুমূর্ষু ব্যক্তির প্রতি সকলের সহানুভূতি ছিল।
৯. বাজীকরের অদ্ভুত খেলা দেখে ছাত্ররা প্রফুল্ল হলো।
১০. অর্ধাঙ্গীর অশ্রু দেখে স্বামী শোকে মুহ্যমান হলেন।
১১. বাঘ মানুষের মাংস খায়।
১২. সে দুঃখের সাগরে হাবুডুবু খাচ্ছে।

গ. ণত্ব-বিধানের পাঁচটি নিয়ম নিচে উল্লেখ করা হলো :
১. ট-বর্গীয় ধ্বনির আগে দন্ত্য 'ন' এলে তা 'ণ' হয়ে যায়। যেমন– ঘণ্টা, খণ্ড, কাণ্ড ইত্যাদি।
২. ঋ, র, ষ এর পরে মূর্ধন্য 'ণ' হয়। যেমন– ঋণ, ভীষণ, মরণ ইত্যাদি।
৩. ঋ, র, ষ এর পরে স্বরধ্বনি, য য় ব হ ং এবং ক বর্গীয় ও প বর্গীয় ধ্বনি থাকলে পরবর্তী 'ন' মূর্ধন্য 'ণ' হয়। যেমন– কৃপণ, রামায়ণ, লক্ষণ ইত্যাদি।
৪. সমাসবদ্ধ শব্দে সাধারণত ণ-ত্ব বিধান খাটে না। এরূপ ক্ষেত্রে দন্ত্য 'ন' হয়। যেমন– দুর্নীতি, পরনিন্দা, ত্রিনয়ন ইত্যাদি।
৫. 'ত' বর্গীয় বর্ণের সঙ্গে সব সময় দন্ত্য 'ন' যুক্ত হয়, মূর্ধন্য 'ণ' হয় না। যেমন– দন্ত, রন্ধন, রত্ন ইত্যাদি।

ঘ. প্রকৃতির রাজ্যে মানুষে মানুষে কোনো ভেদাভেদ না থাকলেও মানব সমাজে বিরাজ করছে অর্থনৈতিক ভেদাভেদ ও বৈষম্য। একদিকে ভোগ-সুখ ও বিলাস-বৈভবের প্রাচুর্য, অন্যদিকে রিক্ত নিঃস্ব মানুষের চরম দারিদ্র্য। এ দুঃস্থ, পীড়িত, দরিদ্র, ভাগ্যাহত মানুষ মানবসমাজে সহানভূতির পাত্র হলেও তাদের দিকে তাকানোর লোকের খুব অভাব। বরং এক শ্রেণীর লোক বিত্তবান ও ক্ষমতাধরদের আরো শক্তিশালী করে তোলার কাজে ব্যস্ত। বিত্তবান ক্ষমতাশালীদের দৈনন্দিন প্রয়োজন সম্পূর্ণ মিটে যাওয়া সত্ত্বেও তোষামোদির খাতিরে ঐ শ্রেণী তাদের হাতে উপহারের উপাচার পৌঁছে দিতে সদা ব্যগ্র। সমাজে এ মানসিকতার লোকের আধিক্যের কারণে গরিব নিরন্নের দল বরাবরই থাকে বঞ্চিত ও উপেক্ষিত।

ঙ. ক. সে যা বলল, তার এক বর্ণও সত্য নয়।
খ. অসুস্থতার কারণে তিনি অফিসে আসতে পারেননি।
গ. লেখাপড়া কর, তাহলে গাড়ি ঘোড়ায় চড়তে পারবে।
ঘ. যখন সে খবরটা শুনেছে তখন সে আনন্দিত হয়েছে।
ঙ. আমি যখন সেখানে গিয়েছি তখন তোমাকে দেখিনি।
চ. বাংলা ভাষায় অক্ষরের ভূমিকা গৌণ।



ক. ভাবসম্প্রসারণ : গতিশীলতাই জীবনের ধর্ম। যে জাতির প্রাণপ্রবাহ গতিহীন, যারা জড়ের মতো তারা কখনো উন্নতি লাভ করতে পারে না। স্রোতহীন নদীতে যেমন শৈবাল দাম বাঁধে, চিন্তা ও কর্মে প্রগতিহীন জাতির জীবনে তেমনি জীর্ণ লোকাচার এসে বাধা সৃষ্টি করে। তারা দিন দিন সবদিক থেকে পিছিয়ে পড়তে থাকে।

মানুষ চিন্তা-চেতনা, বিবেক-বুদ্ধি, বিচার-বিবেচনা, কাজকর্ম প্রভৃতির মাধ্যমে নিজেকে প্রাণবন্ত ও প্রগতিশীল রাখে। আত্মোন্নয়ন জাতীয় উন্নয়নের জোয়ার বয়ে আনে। কিন্তু যে মানুষ প্রগতির ধার ধারে না, তার ভাগ্য কোনোদিন পরিবর্তিত হয় না। তদ্রূপ, যে জাতি নিজেদের উন্নয়নের জন্য চেষ্টা করে না, তারা কখনো মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারে না।

তারা দিন দিন পিছিয়ে পড়তে থাকে। স্রোতহীন নদীতে যেমন শেওলা জমে, শৈবাল দাম বাঁধে, তেমনি চিন্তা ও কর্মে গতিহীন জাতির জীবনেও নানারকম জীর্ণ লোকাচার এসে বাসা বাঁধে। তারা নানারকম কুসংস্কার, অন্ধ বিশ্বাসের বেড়াজালে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। আত্মোন্নয়ন, ভাগ্যোন্নয়ন ও জাতীয় উন্নয়ন তাদের কাছে অলৌকিক বলে মনে হয়। তারা অদৃষ্টের দিকে তাকিয়ে থাকে স্থূল বা জড় পদার্থের মতো। আস্তে আস্তে প্রাণচাঞ্চল্য হারিয়ে ফেলে তারা। অন্ধকারাচ্ছন্নতায়, কুসংস্কারে, অলসতায় গা ভাসিয়ে তারা জাতীয় চেতনার কথাও ভুলে যায়। স্বাধীনভাবে চলার ক্ষমতাও তারা হারিয়ে ফেলে। এক সময় পরাধীনতার কালো ছায়া নেমে আসে তাদের ওপর।

যে জাতি গতিশীল, প্রাণচঞ্চল, তাদের মধ্যে জরাজীর্ণতা বাসা বাঁধতে পারে না। ফলে তারা উন্নতির স্বর্ণশিখরে আরোহণ করতে পারে।

খ. ভাবসম্প্রসারণ : দুর্জনের স্বভাব-ধর্ম অন্যের ক্ষতি করা। তাই কোনো শিক্ষিত লোক যদি চরিত্রহীন হন, তবে অবশ্যই তার সঙ্গ পরিহার করা উচিত। কারণ, তার কাছ থেকে উপকার পাওয়ার চেয়ে ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। বিদ্বান লোক সুজন না হলে তার সান্নিধ্য কাম্য বলে গণ্য হয় না। মনুষ্যত্ব-বিরোধী কুপ্রবৃত্তিগুলো দুর্জন লোকের নিত্যসঙ্গী। এই ধরনের ব্যক্তির নৈতিক চরিত্র দুর্বল, ব্যবহারে এরা রূঢ়, চিন্তায় তরল। সমাজ, দেশ বা জাতি কেউ এদের দ্বারা উপকৃত হয় না। এরা সমাজের কলঙ্ক। এরা আত্মকেন্দ্রিক, লোভী এবং স্বার্থপর। কোনো কোনো দুর্জন লোক প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় শিক্ষিত হয় বটে, কিন্তু বাস্তবে জ্ঞানী হয় না। তাদের শিক্ষার সার্টিফিকেট একটি কাগজ ছাড়া অন্য কিছু নয়। সার্টিফিকেট-সর্বস্ব শিক্ষা এদের চরিত্র ও মানসিকতায় কোনো পরিবর্তন ঘটাতে পারে না। এরা শিক্ষিত হয়ে আরো ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে। চাতুরি ও ছলনায় আরও কূটকৌশলী হয়ে এরা সহজ-সরল মানুষকে প্রতারিত করে। এদের সাহচর্যে সততার অপমৃত্যু ঘটে। মানুষের সবচেয়ে বড় গুণ তার চরিত্র। মানুষের এই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ঠিক রেখে অপরাপর বৈশিষ্ট্যের বিকাশ ঘটানো আবশ্যক। তেমনি, বিদ্বান হওয়াও একটি গুণ। বিদ্যা অর্জনের মাধ্যমে মানুষ যথার্থ মানুষ হয়ে ওঠে। বিদ্যা মানুষের মনের চোখ খুলে দেয়। বিদ্যা মানবজীবনের সফলতার সহায়ক। বিদ্বানের সংস্পর্শে এলে জ্ঞানের আলোয় মন আলোকিত হয়। কিন্তু বিদ্বান ব্যক্তি যদি চরিত্রহীন হয়, তবে তার বিদ্যার কোনো মূল্য থাকে না, সে তার বিদ্যাকে অন্যায় কাজে লাগায়। এরা নিজের স্বার্থ বা অসৎ উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য যে কোনো কৌশলের আশ্রয় নিতে পারে। চরিত্রহীন বিদ্বান ব্যক্তির কাছ থেকে বিদ্যা লাভ করে জীবনে কোনো কল্যাণ সাধন করা যায় না। তাই দুর্জন যদি বিদ্বানও হয়, তবু তার সান্নিধ্য ও সংশ্রব ত্যাগ করাই মঙ্গলজনক।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



৩. ক. জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত মানুষ অন্তহীন বিশ্বলোকের সঙ্গে অনুভব করে অবিচ্ছেদ্য ও নিরন্তর সম্পর্ক। প্রকৃতির সঙ্গে সুগভীর সম্পর্কের মধ্য দিয়েই বিকশিত হয় তার জীবন। তার অস্তিত্বও সেই সম্পর্কের ওপর নির্ভরশীল। কিন্তু জীবন শেষে অনিবার্য মৃত্যুর পথযাত্রায় মানুষ নিঃসন্দেহে নিঃসঙ্গ পথিক।

খ. পৃথিবীর প্রতি মানুষের ভালোবাসা অসীম। কারণ, মানুষ পৃথিবীর সন্তান। কিন্তু পৃথিবী সবসময় সবার মুখে অন্ন জোগাতে পারে না, অপমৃত্যুর হাত থেকে সবাইকে রক্ষা করতেও ব্যর্থ হয়। মানুষের সব আশা মেটানোও সম্ভব হয় না তার পক্ষে। কিন্তু তাই বলে মানুষ জননীতুল্য পৃথিবীকে কখনো ছেড়ে যাওয়ার কথা ভাবে না।

৪. ক. চর্যাপদের পদ বা গানের সংখ্যা নিয়ে মতভেদ বিদ্যমান। সুকুমার সেনের হিসাবে ৫১টি, ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ বলেছেন ৫০টি। চর্যাপদ ছিন্নাবস্থায় পাওয়া যাওয়ায় এ মতান্তরের সৃষ্টি। সুকুমার সেন তাঁর 'চর্যাগীতি পদাবলী (প্রথম প্রকাশ : ১৯৫৬) গ্রন্থেও ৫০ জন কবির পদ উল্লেখ করেছেন। তবে আলোচনা অংশে তাঁর বক্তব্য : "... মুনি দত্ত পঞ্চাশটি চর্যার ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। টীকাকারের কাছে মূল চর্যার পুঁথিতে আরো অন্তত একটি বেশি চর্যা ছিল (একাদশ ও দ্বাদশ চর্যার মাঝখানে)। এই চর্যাটির ব্যাখ্যা না থাকায় লিপিকর উদ্ধৃত করেন নাই, শুধু 'টীকা নাই' এই মন্তব্যটুকু করিয়াছেন।" এটা ধরলে পদের সংখ্যা দাঁড়ায় ৫১।

খ. ১২০১ থেকে ১৮০০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত সময় বাংলা সাহিত্যে মধ্যযুগ বলে বিবেচিত। কিন্তু ১২০১ থেকে ১৩৫০ খ্রিষ্টাব্দ– এই ১৫০ বছরকে কেউ কেউ অন্ধকার যুগ বলে অভিহিত করেন। এ যুগের স্বপক্ষে বলা হয় যে, তুর্কি বিজয়ের ফলে মুসলিম শাসনামলের সূচনার পটভূমিতে নানা অস্থিরতার কারণে এ সময়কালে তেমন কোনো উল্লেখযোগ্য সাহিত্য সৃষ্টি হয়নি।

গ. দীর্ঘকাল ধরে লোক মুখে প্রচলিত গল্প-কাহিনি, পুরাণ এবং জয়দেবের— গীতগোবিন্দের সমন্বিত প্রভাবে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্য রচিত হয়। এর মূল কাহিনি ভাগবত থেকে সংকলিত। রাধা-কৃষ্ণের প্রেম-বিরহই এ কাব্যের মূল উপজীব্য। এ কাব্যের কাহিনি বাহ্যিক দিক থেকে পৌরাণিক রাধা-কৃষ্ণের অনুসারী হলেও এটি মূলত লোকজীবনের প্রতিচ্ছবি। অনেকে যুক্তি দেখান, রাধা-কৃষ্ণের মাধ্যমে জীবাত্মা-পরমাত্মার প্রেম এখানে ফুটে উঠেছে। তবে কোনো প্রকার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা ব্যতিরেকে পার্থিব জীবনের আলোকেও এ কাব্যের অর্থ ও রস উপভোগ করা যায়।

ঘ. বৈষ্ণব পদাবলীসমূহ যে ভাষায় রচিত হয়েছে তাকেই বলা হয় ব্রজবুলি। শাব্দিক অর্থে ব্রজবুলি হলো ব্রজের বুলি তথা ব্রজের ভাষা। এটি মিথিলার উপভাষা। মৈথিলী এবং বাংলা ভাষার সংমিশ্রণে এ ভাষার উদ্ভব। বিদ্যাপতি এবং জয়দেব এ ভাষার দু'জন শ্রেষ্ঠ কবি।

ঙ. মধ্যযুগে বাংলা সাহিত্যাঙ্গনে তিনজন চণ্ডীদাসের আবির্ভাব ঘটেছিল বলে বিভিন্ন গ্রন্থে উল্লেখ পাওয়া যায়। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যের রচয়িতা বড়ু চণ্ডীদাস, বৈষ্ণব পদাবলীর রচয়িতা দ্বিজ চণ্ডীদাস এবং আরও একজন হলেন দীন চণ্ডীদাস। এ তিনজন কবির জন্মস্থান-কাল ও সাহিত্যকর্ম নিয়ে সৃষ্ট মতবিরোধ ও অস্পষ্টতা বাংলা সাহিত্যে চণ্ডীদাস সমস্যারূপে বিবেচিত।

চ. উইলিয়াম ওয়ার্ড ও জশুয়া মার্শম্যানের সহায়তায় এবং উইলিয়াম কেরির প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ১৮০০ সালে স্থাপিত হয় শ্রীরামপুর ব্যাপটিস্ট মিশন। প্রতিষ্ঠাকালে এটি ছিল ডেনিসদের নিয়ন্ত্রণাধীন। তবে ১৮০৮ সালে এ মিশনটি যখন ইংরেজদের নিয়ন্ত্রণে চলে যায় তখন এর নামকরণ করা হয় শ্রীরামপুর মিশন।



ছ. বাংলা গদ্যের বিকাশে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ভূমিকা অবিস্মরণীয়। তিনি যতিচিহ্নের প্রবর্তন করে গদ্যরীতিতে ভাষাগত শৃঙ্খলা আনেন। এজন্য তাঁকে বাংলা গদ্যের জনক বলা হয়। পাঠ্যপুস্তক রচনায়ও তাঁর অসাধারণ সাফল্য রয়েছে। তাঁর পরিচালিত সমাজ সংস্কার আন্দোলন বাঙালি সমাজকে সাংস্কৃতিক অগ্রগতি দান করে, যা বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে পরোক্ষভাবে সমৃদ্ধ করে।

জ. সেলিনা হোসেনের উপন্যাস 'হাঙর নদী গ্রেনেড', মামুনুর রশীদের নাটক 'জয়জয়ন্তী' এবং জাহানারা ইমামের স্মৃতিকথা 'একাত্তরের দিনগুলি'।

ঝ. 'বিষবৃক্ষ' (১৮৭২) বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচিত সামাজিক উপন্যাস। উপন্যাসের কেন্দ্রীয় সমস্যার সাথে বিধবা বিবাহ, পুরুষের একাধিক বিবাহ, তার রূপতৃষ্ণা ও নৈতিকতার দ্বন্দ্ব, নারীর আত্মসম্মান ও অধিকারবোধ প্রভৃতি ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। বাংলা উপন্যাসে বিষবৃক্ষের প্রভাব অত্যন্ত গভীর। চরিত্রায়নে, ঘটনা সংস্থানে এবং জীবনের কঠিন সমস্যার রূপায়ণে 'বিষবৃক্ষ' বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপন্যাস। কারণ বঙ্কিমচন্দ্রের আগে আর কোনো লেখক এ জাতীয় বিষয় নিয়ে উপন্যাস রচনার চেষ্টা পর্যন্ত করেননি।

ঞ. মধুসূদন দত্তের প্রথম প্রকাশিত বাংলা নাটক 'শর্মিষ্ঠা'। এ নাটকটি পুরাণের কাহিনি অবলম্বনে রচিত। এ নাটকের উল্লেখযোগ্য চরিত্র : যযাতি, দেবযানী, শর্মিষ্ঠা, মাধব্য, পূর্ণিমা, রাজমন্ত্রী প্রমুখ। কলকাতার পাইকপাড়ার রাজাদের অনুপ্রেরণায় বেলগাছিয়া থিয়েটারের জন্য মধুসূদন দত্ত ১৮৫৮ সালে নাটকটি রচনা করেন। ১৮৫৯ সালের জানুয়ারি মাসে রাজাদের অর্থানুকূল্যে 'শর্মিষ্ঠা' প্রকাশিত ও ১৮৫৯ সালের ৩ সেপ্টেম্বর সেটা বেলগাছিয়া থিয়েটারে মঞ্চস্থ হয়। পাশ্চাত্যরীতিতে বাংলা নাটক রচনার চেষ্টা এ নাটকের মধ্যদিয়ে বিশেষভাবে সফলতা পায়। মধুসূদন পরে 'শর্মিষ্ঠা'র ইংরেজি অনুবাদও করেন।

ট. 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী' মাইকেল মধুসূদন দত্ত রচিত ১০২টি সনেটের সংকলন। বাংলা সনেটের আদি গ্রন্থ এটি। গ্রন্থটি ১৮৬৬ সালের ১ আগস্ট গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। মিত্রাক্ষর ও অমিত্রাক্ষর উভয়বিধ ছন্দের চতুর্দশ পঙ্ক্তিতে রচিত কবিতাসংকলন এটি। এর কয়েকটি পেত্রার্কের আদর্শে এবং বেশির ভাগ শেক্সপিয়রীয় আদর্শে রচিত। সনেটগুলোর বিষয়বস্তু বিচিত্র— ভারতীয় ও পাশ্চাত্য কবিদের উদ্দেশ্যে বন্দনা, বাংলাদেশের নদী, বৃক্ষ, পশুপাখি, পালাপার্বন এবং আত্মজীবনের সুখ-দুঃখ। বঙ্গভাষা, কপোতাক্ষ নদ, আশা ইত্যাদি বিখ্যাত সনেট এ গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত।

ঠ. 'গীতাঞ্জলি' রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৫৭টি গানের সংকলন। গানগুলো ১৯০৮ ও ১৯০৯ সালে রচিত এবং ১৯১০ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। 'গীতাঞ্জলি'র গানগুলো মূলত কবিতা। ভাবধারার দিক থেকে কবিতাগুলোকে ৫ ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন : ঈশ্বরকে না-পাওয়ার বেদনা, নিজের অহংকার ত্যাগ ও হৃদয় নির্মল করে সহনশীলতা প্রদর্শন, ঈশ্বরের ক্ষণদর্শনানুভূতি, দরিদ্র দীন-হীন-পতিতের মধ্যে ঈশ্বরকল্পনা, অসীম-সসীমের লীলাতত্ত্ব। 'গীতাঞ্জলি'র সম্পূর্ণ অনুবাদ যদিও Song Offerings (১৯১২) নয়, তবু এ গ্রন্থের অধ্যাত্মবাদ, প্রকৃতি, প্রেম যৌথধারায় ইংরেজি গ্রন্থে প্রবহমান। Song Offerings গ্রন্থের জন্য রবীন্দ্রনাথ ১৯১৩ সালে নোবেল পুরস্কার অর্জন করেন।

ড. সূর্য-দীঘল বাড়ি, ১৯৫৫ সালে।

ঢ. খোয়াবনামা— উপন্যাস, শিখা— পত্রিকা, সঞ্চয়ন— প্রবন্ধ সংকলন।

ণ. পুতুল নাচের ইতিকথা, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



## মডেল প্রশ্ন ০৪

[দ্রষ্টব্য : প্রত্যেক প্রশ্নের মান প্রশ্নের শেষ প্রান্তে দেখানো হয়েছে।] নম্বর

১. ক. সংজ্ঞাসহ সমাস ও প্রত্যয়ের নিয়মে তিনটি করে শব্দ গঠন করুন। ৬

খ. বানান, শব্দ প্রয়োগ, বিন্যাস, চলিতরীতি ইত্যাদি শুদ্ধ করে নিম্নের বাক্যগুলো পুনরায় লিখুন : ০.৫ × ১২ = ৬

১. ইহার পরে হৈমর মুখে তার চিরদিনের সেই স্নিগ্ধ হাসিটুকু আর এক দিনের জন্যও দেখি নাই।
২. কিঞ্চিৎ হতাশ হয়ে তাহারা তুলসী বৃক্ষটির দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে।
৩. পরিষ্কার পোষাক পরিহিত ছেলেটি উড়োজাহাজের আবিষ্কারের নাম পারায় বলতে পাইল পুরস্কার ও চলে গেল নমস্কার করে।
৪. যদি পরিচিত সকল বশন-ভূসণ বাদ দিয়া বর্ষারণগ্নমূর্তির বর্ণনা করতে উদ্ধ্যত হই, তা হইলেও বড় সুবিধা করতে পারা যায়নি।
৫. অভাবগ্রস্থ ছেলেটি তার দুরাবস্থার কথা বর্ণনা করল।
৬. তোমার তিরষ্কার বা পুরস্কার কিছুই চাই না।
৭. মানুষের বড় বড় সভ্যতা এ শক্তির প্রভাবেই পূর্ন মাহাত্য লাভ করেছে।
৮. তার বৈমাত্রেয় সহোদর অসুস্থ হয়ে চলদশক্তি হারিয়েছেন।
৯. এই দুর্ঘটনা দৃষ্টে আমার হৃৎকম্প উপস্থিত হইল।
১০. মনোনীত কবিতা হতে একখানা বেছে নাও এবং আবৃত্তি করিয়া পড়।
১১. আমি করব না কাজ এমন আর।
১২. শাড়ি পরা লাল মেয়েটিকে আমি ভালভাবে চিনি না।

গ. ষত্ব বিধানের পাঁচটি নিয়ম লিখুন : ৬

ঘ. নিচের প্রবাদটির নিহিতার্থ প্রকাশ করুন : ৬
আপনি আচরি ধর্ম পরের বোঝাও

ঙ. বাক্য কাকে বলে? একটি সার্থক বাক্যের কী কী গুণ থাকা আবশ্যক? ৬

২. যে কোনো একটি ভাব-সম্প্রসারণ লিখুন : ২০

ক. বিদ্যার সাথে সম্পর্কহীন জীবন অন্ধ এবং জীবনের সাথে সম্পর্কহীন বিদ্যা পঙ্গু।
খ. দুঃখের মতো এত বড় পরশপাথর আর নেই।

৩. সারমর্ম লিখুন : ২০

ক. বহুদিন ধরে বহু ক্রোশ দূরে
বহু ব্যয় করি বহু দেশ ঘুরে,
দেখিতে গিয়াছি পর্বতমালা
দেখিতে গিয়াছি সিন্ধু।
দেখা হয় নাই চক্ষু মেলিয়া
ঘর হতে শুধু দুই পা ফেলিয়া,
একটি ধানের শিষের উপর
একটি শিশির বিন্দু।



খ. ভদ্র মোরা, শান্ত বড়ো, পোষ-মানা এই প্রাণ
বোতাম-আঁটা জামার নিচে শান্তিতে শয়ান।
দেখা হলেই মিষ্ট অতি, মুখের ভাব শিষ্ট অতি,
অলস দেহ ক্লিষ্টগতি— গৃহের প্রতি টান।
তৈল-ঢালা স্নিগ্ধ তনু নিদ্রারসে ভরা,
মাথায় ছোটো বহরে বড়ো বাঙালি সন্তান।
ইহার চেয়ে হতেম যদি আরব বেদুইন!
চরণতলে বিশাল মরু দিগন্তে বিলীন।
ছুটেছে ঘোড়া, উড়েছে বালি, জীবনস্রোত আকাশে ঢালি,
হৃদয়তলে বহ্নি জ্বালি চলেছি নিশিদিন।
বরশা হাতে, ভরসা প্রাণে, সদাই নিরুদ্দেশ,
মরুর ঝড় যেমন বহে সকল-বাধাহীন।

৪. অতি সংক্ষেপে নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলোর উত্তর লিখুন : ২ × ১৫ = ৩০

ক. চর্যাপদে কত জন কবির পদ পাওয়া গেছে?
খ. মধ্যযুগের সাহিত্যের আদি নিদর্শন কোনটি?
গ. মঙ্গলকাব্য সম্পর্কে কি জানেন?
ঘ. আরাকানে কেন বাংলা সাহিত্য রচিত হয়েছিল?
ঙ. রোমান্টিক কাব্য বা রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান কী?
চ. মর্সিয়া সাহিত্য কী?
ছ. 'মৈমনসিংহ গীতিকা' কি? এগুলো কে সংগ্রহ করেন?
জ. আধুনিক যুগে ধারাবাহিক চর্চার পূর্বে বাংলা গদ্য কোথায় লেখা হতো?
ঝ. বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক যুগের বৈশিষ্ট্য কি?
ঞ. 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্য কে, কীভাবে আবিষ্কার করেন?
ট. মনসামঙ্গল কাব্যের উল্লেখযোগ্য চরিত্র ও প্রধান কাহিনি কি?
ঠ. বাংলা সাহিত্যে মধুসূদন দত্তের অবদান সম্পর্কে কি বলা যায়?
ড. কাব্য সুধাকর কার উপাধি? তার একটি কাব্যের নাম লিখুন।
ঢ. 'শেষ বিকেলের মেয়ে' গ্রন্থটির রচয়িতা কে? কোন শ্রেণীর রচনা?
ণ. 'কবর' গ্রন্থটি কোন ধরনের রচনা? এর উপজীব্য বিষয় কী?

### উত্তর ♦ মডেল প্রশ্ন : ০৪

১. ক. সমাসযোগে শব্দগঠন : সমাস শব্দের অর্থ সংক্ষেপ, মিলন, একাধিক পদের একপদীকরণ। অর্থাৎ পরস্পর অর্থ সম্পর্কযুক্ত একাধিক পদের একপদে পরিণত হওয়াকে সমাস বলে। যেমন : হাতে হাতে যে যুদ্ধ = হাতাহাতি; নীল যে পদ্ম = নীলপদ্ম; মন রূপ মাঝি = মনমাঝি।

প্রত্যয়যোগে শব্দগঠন : ধাতু বা শব্দের পরে ভিন্ন ভিন্ন অর্থে যে বর্ণ বা বর্ণসমষ্টি যুক্ত হয়ে নতুন শব্দ গঠন করে সেগুলোকে প্রত্যয় বলে। যেমন : লাজুক = লাজ + উক; বড়াই = বড় + আই; ঘরামি = ঘর + আমি। 'লাজ' 'বড়' ও 'ঘর' শব্দগুলোর পরে যথাক্রমে 'উক', 'আই' ও 'আমি' প্রত্যয় যুক্ত হয়ে শব্দ গঠিত হয়েছে।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



খ. ১. এর পরে হৈমর মুখে তার চিরদিনের সেই স্নিগ্ধ হাসিটুকু আর একদিনের জন্যও দেখিনি।
২. একটু হতাশ হয়ে তারা তুলসী গাছটির দিকে তাকায়।
৩. পরিষ্কার পোশাক পরিহিত ছেলেটি উড়োজাহাজ আবিষ্কারকের নাম বলতে পারায় পুরস্কার পেল ও নমস্কার করে চলে গেল।
৪. যদি পরিচিত সকল বসন-ভূষণ বাদ দিয়ে বর্ষার নগ্নমূর্তির বর্ণনা করতে উদ্যত হই তাহলেও বড় সুবিধে করতে পারা যায় না।
৫. অভাবগ্রস্ত ছেলেটি তার দুরবস্থার কথা বর্ণনা করল।
৬. তোমার তিরস্কার বা পুরস্কার কিছুই চাই না।
৭. মানুষের বড় বড় সভ্যতা এ শক্তির প্রভাবেই পূর্ণ মাহাত্ম্য লাভ করেছে।
৮. তার বৈমাত্রেয় ভাই অসুস্থ হয়ে চলৎশক্তি হারিয়েছেন।
৯. এ দুর্ঘটনা দেখে আমার হৃদকম্প শুরু হলো।
১০. নির্বাচিত কবিতা হতে একটি বেছে নাও এবং আবৃত্তি করো।
১১. আমি এমন কাজ আর করব না।
১২. লাল শাড়ি পরা মেয়েটিকে আমি ভালোভাবে চিনি না।

গ. ষ-ত্ব বিধানের পাঁচটি নিয়ম :
১. অ, আ ভিন্ন অন্য কোনো স্বরধ্বনি এবং ক ও র-এর পরে 'ষ' প্রত্যয়ের 'স' থাকলে তা মূর্ধন্য 'ষ' হয়। উদাহরণ : ভবিষ্যৎ, জিগীষা, মুমূর্ষু, চক্ষুষ্মান, বিষয়, বিষ, সুষমা ইত্যাদি।
২. ই-কারান্ত এবং উ-কারান্ত উপসর্গের পর কতগুলো ধাতুতে মূর্ধন্য 'ষ' হয়। উদাহরণ : অনুষ্ঠান, অভিষেক ইত্যাদি।
৩. ঋ-কার ও র-এর পর মূর্ধন্য 'ষ' হয়। উদাহরণ : বৃষ, ঋষি, কৃষ্ণ, কৃষক, বর্ষা, উৎকর্ষ, বৃষ্টি, দৃষ্টি।
৪. ট ও ঠ-এর সঙ্গে যুক্ত হলে দন্ত্য-'স' না হয়ে মূর্ধন্য 'ষ' হয়। উদাহরণ : কষ্ট, কাষ্ঠ, ওষ্ঠ্য, স্পষ্ট ইত্যাদি।
৫. সমাসবদ্ধ হয়ে দুটি পদ একপদে পরিণত হলে এবং প্রথম পদের শেষে ই, উ, ঋ থাকলে মূর্ধন্য 'ষ'-এ পরিণত হয়। উদাহরণ : যুধিষ্ঠির, গোষ্ঠী, ভ্রাতুষ্পুত্র ইত্যাদি।

ঘ. মহৎ কর্ম নিজের জীবনে আয়ত্ত করে অপরকে তা করার জন্য নির্দেশ দিতে হবে। ধর্ম মানুষকে সৎ ও কল্যাণের পথে পরিচালিত করে একথা যদি একজন অধার্মিক লোক পুনঃপুন বলতে থাকে তখন তা সবার কাছেই বিরক্তিকর মনে হয়। এক্ষেত্রে প্রথমে নিজে ধর্মের দীক্ষা নিয়ে বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করে পরে তা অন্যকে পালন করতে বলা উচিত। নিজের মধ্যে যে গুণের অভিব্যক্তি নেই তা অন্যকে শিক্ষা দিতে গেলে বিড়ম্বনার শিকার হতে হয়। যে কোনো বিষয় সম্পর্কে মানুষকে শিক্ষা দিতে গেলে, উপদেশ দিতে গেলে বা বোঝাতে গেলে আগে দেখতে হবে তা নিজের মধ্যে কতটুকু আছে। নিজের মধ্যে যা নেই অন্যকে তা বোঝাতে বা শিক্ষা দিতে যাওয়া চরম বোকামি।

ঙ. যে সুবিন্যস্ত পদসমষ্টি দ্বারা কোনো বিষয়ে বক্তার মনোভাব সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হয়, তাকে বাক্য বলে। একটি সার্থক বাক্যের তিনটি গুণ (আকাঙ্ক্ষা, আসত্তি ও যোগ্যতা) থাকা আবশ্যক।

**আকাঙ্ক্ষা** : বাক্যের অর্থ পরিষ্কারভাবে বোঝার জন্য একপদের পর অন্যপদ শোনার ইচ্ছাকেই আকাঙ্ক্ষা বলে। যেমন : 'চন্দ্র পৃথিবীর চারদিকে' এটুকু শোনবার পর আরও কিছু শোনবার ইচ্ছা হয়। 'চন্দ্র পৃথিবীর চারদিকে ঘোরে'–এখানে আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি হয়েছে বলে এটি পূর্ণাঙ্গ বাক্য।



**আসত্তি** : মনোভাব প্রকাশের ক্ষেত্রে বাক্যের অর্থসঙ্গতি রক্ষার জন্য সুশৃঙ্খল পদবিন্যাসই আসত্তি। যেমন : 'কাল বিতরণী হবে উৎসব স্কুলে আমাদের পুরস্কার অনুষ্ঠিত'। এটি বাক্য হয়নি। মনোভাব প্রকাশ করার জন্য পদগুলোকে এভাবে সাজাতে হবে 'কাল আমাদের স্কুলে পুরস্কার বিতরণী উৎসব অনুষ্ঠিত হবে'।

**যোগ্যতা** : বাক্যস্থিত পদসমূহের অন্তর্গত এবং ভাবগত মিল বন্ধনের নাম যোগ্যতা। যেমন : 'বর্ষার রৌদ্র প্লাবনের সৃষ্টি করে'– এ বাক্যটির ভাব প্রকাশের যোগ্যতা নেই। কিন্তু যদি বলা হয় 'বর্ষার বৃষ্টিতে প্লাবনের সৃষ্টি হয়।' এ বাক্যে পদসমূহের অর্থগত ও ভাবগত সমন্বয় রয়েছে।

২ ক. ভাবসম্প্রসারণ : মানুষের জীবন গঠনের জন্য বিদ্যার্জন অপরিহার্য। জ্ঞানের আলো অজ্ঞতা ও মূর্খতার হাত থেকে মানুষকে মুক্তি দেয়। বিদ্যার আলোয় আলোকিত না হলে মানুষের জীবন হয়ে যায় অন্ধের জীবনের মতো। প্রতি পদক্ষেপে সে অন্ধকারে পা বাড়ায়। অন্যদিকে অর্জিত বিদ্যা বা জ্ঞান হতে হয় জীবনমুখী। জীবনে বিদ্যা কোনো কাজে না এলে তা হয়ে যায় কেতাবি বিদ্যা। বস্তুত, বিদ্যার সাথে জীবনের নিবিড় যোগাযোগের মাধ্যমেই বিদ্যা ও মানবজীবনের সার্থকতা নির্ভরশীল। বিদ্যা মানবজীবনের অমূল্য সম্পদ। বিদ্যার আলোয় মানুষের জীবনের অজ্ঞানতার অন্ধকার দূর হয়। তা মানুষকে মানুষ হতে সাহায্য করে। বিদ্বানের ভূমিকায় সমাজ ও দেশ হয় সমৃদ্ধির আলোয় আলোকিত। শিক্ষার আলো ব্যক্তির জীবন থেকে যেমন দূর করে সংকীর্ণতার অন্ধকার, তেমনি তা সমাজকেও করে প্রগতির আলোয় আলোকিত। তাই জ্ঞানের আলো যদি জীবনকে আলোকিত না করে তবে সে জীবন ব্যর্থ। বিদ্যার সাথে সম্পর্কহীন জীবন হয়ে পড়ে বিচার-বুদ্ধিহীন। তার চোখ থাকলেও অন্তর-চক্ষু বলে কিছু থাকে না। মানব সন্তান কেবল জন্ম নিয়েই মানুষ হয় না, বিদ্যার্জনের সাধনা করেই প্রকৃত মানুষ হয়ে উঠতে হয়। অন্যদিকে, বিদ্যার সাথে থাকা চাই জীবনের নিবিড় সম্পর্ক। যে বিদ্যা কেবল সার্টিফিকেট-সর্বস্ব তার কোনো মূল্য নেই। মানুষ অনেক বড় বড় ডিগ্রি লাভ করে খ্যাতি অর্জন করে কিন্তু সে বিদ্যাকে মানবজীবনের কল্যাণে কাজে লাগানো না হলে সে ধরনের বিদ্যার কোনো সার্থকতা থাকে না। বস্তুত, জীবনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক যে শিক্ষায় সে শিক্ষাই প্রকৃত শিক্ষা। যথার্থ বিদ্বান ব্যক্তি জীবনকে সুন্দর ও গতিশীল করার পাশাপাশি সমাজকে উন্নত করার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। এভাবে বিদ্যাকে কাজে লাগাতে পারলে জ্ঞানের আলোয় সমাজ আলোকিত হয়, দেশ ও জাতি প্রগতির পথে এগিয়ে যেতে পারে। এভাবে জীবন আর বিদ্যার মিল ঘটাতে পারলেই জীবন সুন্দর হয়ে ওঠে। তাতে বিদ্যা অর্জনও সার্থক হয়। তাই ব্যক্তিজীবন ও সমাজজীবনের আলোময় বিকাশের জন্য চাই জীবনঘনিষ্ঠ শিক্ষা।

খ. ভাবসম্প্রসারণ : এই পৃথিবীতে প্রতিটি মানুষের জীবনে রয়েছে সুখ-দুঃখের সহাবস্থান। একটিকে ছাড়া অন্যটিকে মানুষ সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে পারে না। দুঃখের সংস্পর্শে না এলে মানুষের স্বীয় সত্তা ও অন্তর শক্তি সঠিকভাবে জাগ্রত হয় না। দুঃখের পরশেই মানুষের বিবেক জাগ্রত হয়, মানুষের জীবন হয় মানবিক বোধে আলোকিত, মানুষ হয়ে ওঠে মহানুভব, মহীয়ান। দুঃখই মানুষের সকল দৈন্য দূর করে তাকে খাঁটি মানুষে পরিণত করে। সুখবিলাসী মানুষ জীবনের সারবত্তা পুরোপুরি উপলব্ধি করতে পারে না। দুঃখে পড়লে মানুষ সুখের যথার্থ মর্ম বুঝতে পারে, জীবনের প্রকৃত সত্যকে উপলব্ধি করতে পারে। দুঃখের দারুণ দহন শেষে মানুষের জীবনে যে সুখ আসে তা অনাবিল ও অতুলনীয়। দুঃখই পারে মানুষের অন্তর্নিহিত মনুষ্যত্ব ও বিবেককে জাগ্রত করতে, মানুষকে খাঁটি মানুষে পরিণত করতে। দুঃখ মোকাবিলা

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



করার শক্তি দিয়েই মানুষ আপন শক্তির পরিচয় দিতে পারে। পৃথিবীতে মহৎ কিছু অর্জন করতে হলে দুঃখ সইতে হয়। প্রবাদ আছে, 'কষ্ট ছাড়া কেষ্ট মেলে না।' তাই পৃথিবীতে মহামনীষীরা দুঃখকে তুলনা করেছেন পরশপাথরের সাথে। পরশপাথরের ছোঁয়ায় লোহা যেমন স্বর্ণপিণ্ডে রূপান্তরিত হয়, দুঃখও তেমনি মানুষের জীবনকে নতুন রূপ দেয়, সকল ক্লেদ ও গ্লানি থেকে মুক্ত ও নির্মল করে। দুঃখ-কষ্ট ও ত্যাগ-তিতিক্ষা ছাড়া জীবনের স্বর্ণশিখরে আরোহণ অসম্ভব। পৃথিবীর বহু মনীষী দুঃখকে অন্তর দিয়ে অনুভব করেছিলেন, দুঃখকে বরণ করে নিয়েছিলেন বলেই আজও তারা স্মরণীয়-বরণীয় হয়ে আছেন। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স), যীশুখ্রিস্ট, গৌতম বুদ্ধ প্রমুখ মহান ধর্মবেত্তা দুঃখকে জয় করে খাঁটি মানুষে পরিণত হয়েছিলেন, কাজ করেছিলেন সমগ্র মানব জাতির কল্যাণের জন্য। বস্তুত, মানুষের মনুষ্যত্ব ও অন্তর্নিহিত গুণাবলীর বিকাশের জন্য দুঃখ মানুষের জীবনে পরশপাথরের মতোই কাজ করে।

৩. ক. সারাংশ : প্রচুর অর্থ ও সময় ব্যয় করে এবং যথেষ্ট কষ্ট স্বীকার করে মানুষ দূর-দূরান্তের সৌন্দর্য দেখতে ছুটে যায়। কিন্তু ঘরের কাছে অনির্বচনীয় সৌন্দর্যটুকু দেখা হয় না বলে সে দেখা পূর্ণতা পায় না।

খ. সারমর্ম : বাঙালি বরাবরই শান্ত ও নিস্তরঙ্গ জীবনে অভ্যস্ত। তাই গৃহ বন্ধনের মধ্যে আলস্যভরা জীবনের গণ্ডিতে সে বাঁধা পড়ে আছে। এই ঘরকুনো জীবনের গণ্ডি ভেঙে বাঙালিকে বৃহত্তর জীবনের সঙ্গে যোগসূত্র রচনা করতে হবে। কর্মচঞ্চল বৃহত্তর জীবনের সঙ্গে যুক্ত হলেই বাঙালি ঘাত-প্রতিঘাতের সঙ্গে লড়াই করার উপযুক্ত হয়ে উঠবে।

৪. ক. চর্যাপদের কবিদের সংখ্যা নিয়ে ভাষাবিদদের লেখায় মতান্তর পরিলক্ষিত হয়। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ সম্পাদিত 'Buddhist Mystic Songs' গ্রন্থে ২৩ জন কবির নাম আছে। সুকুমার সেন 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' (১ম খণ্ড) গ্রন্থে ২৪ জন কবির কথা বলেছেন। সে বিচারে এক কথায় বলা চলে, চর্যাপদের কবির সংখ্যা ২৩, মতান্তরে ২৪।

খ. মধ্যযুগের সাহিত্যের আদি নিদর্শন 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'। এটি বড়ু চণ্ডীদাস রচিত একটি কাব্যনাট্য। চর্যাপদের পর 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' বাংলা সাহিত্যের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য সাহিত্যকর্ম। এজন্য 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'কে মধ্যযুগের প্রথম কাব্য এবং বড়ু চণ্ডীদাসকে মধ্যযুগের আদি কবি বলা হয়।

গ. মঙ্গলকাব্য হলো মধ্যযুগের একটি বিশিষ্ট আখ্যাননির্ভর কাব্যধারা। এতে দেবদেবীর মাহাত্ম্য কাহিনির মধ্য দিয়ে বর্ণিত হয়। মানুষের প্রচলিত বিশ্বাস, এ কাব্য শ্রবণ করলে মঙ্গল লাভ হয়। তাই এগুলো মঙ্গলকাব্য হিসেবে পরিচিত।

ঘ. আরাকানে রচিত বাংলা সাহিত্য নিয়ে সাম্প্রতিক সাহিত্য গবেষকদের অশেষ কৌতূহল রয়েছে। তবে আরাকানে বাংলা সাহিত্য রচনার পিছনে দুটি বিশেষ কারণ অনুমেয়। প্রথমত, আরাকান রাজ্যের মগ রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় গবেষকগণ সেখানে বাংলা সাহিত্য রচনায় উৎসাহিত হয়েছিল। দ্বিতীয়ত, মধ্যযুগে বাংলায় মুঘল-পাঠানদের সংঘর্ষের ফলে অনেক আভিজাত ও সুফী মতাবলম্বী মুসলমান আরাকানে আশ্রয় নিয়েছিল। এসব মুসলমান আরাকানে বাংলা সাহিত্য রচনায় বিশেষ ভূমিকা রেখেছিল।

ঙ. রোমান্টিক কাব্য বা রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান হলো মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এমন একটি বিশিষ্ট ধারা, যা মূলত আরাকান বা রোসাঙ্গ রাজসভার বাঙালি মুসলমান অমাত্যদের পৃষ্ঠপোষকতায় গড়ে উঠেছিল। এর কবিগণও ছিলেন বাঙালি মুসলমান। এ কাব্যধারায় মধ্যযুগের ধর্মনির্ভরতার বিপরীতে মানবীয় সম্পর্ক প্রধান হয়ে উঠেছে।



চ. 'মর্সিয়া' আরবি শব্দ, যার অর্থ শোক প্রকাশ করা। মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের এক ধরনের বিয়োগান্ত ভাবধারার শোককাব্যকে মর্সিয়া সাহিত্য বলা হয়। আরবি সাহিত্যের প্রভাবে ফারসি ভাষায় মর্সিয়া সাহিত্য রচিত হয়। ভারতে মুসলিম শাসনামলে উর্দু ভাষায় মর্সিয়া সাহিত্য রচনার প্রয়াস দেখা যায়। এসব মর্সিয়া সাহিত্যের অনুসরণে বাংলা ভাষায়ও মর্সিয়া সাহিত্য রচিত হয়।

ছ. ব্রহ্মপুত্র নদ দ্বারা বিভক্ত বৃহত্তর ময়মনসিংহ জেলার পূর্বাংশ, নেত্রকোনা, কিশোরগঞ্জের বিল-হাওর ও নদ-নদী প্লাবিত বিস্তৃত ভাটি অঞ্চলের লোক কবি কর্তৃক রচিত আখ্যানমূলক কাহিনি কাব্যই 'মৈমনসিংহ গীতিকা' নামে পরিচিত। ড. দীনেশচন্দ্র সেন এগুলো সংগ্রহ করেছিলেন।

জ. ১৮০০ খ্রিস্টাব্দের পূর্বে মূলত দলিল, দস্তাবেজ, চিঠিপত্র ও আইনশাস্ত্রে গদ্য সীমাবদ্ধ ছিল। ১৫৫৫ সালে আসামের রাজাকে লেখা কুচবিহারের রাজার পত্রটিই বাংলা গদ্যের প্রথম নিদর্শন হিসেবে স্বীকৃত। পরবর্তীতে সতেরশ' সালের শেষভাগে দোম আন্তনিও লিখিত 'ব্রাহ্মণ-রোমান-ক্যাথলিক সংবাদ' এবং ১৭৩৪ সালে মনোএল-দ্য-আসসুম্পসাঁও রচিত 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ' বাংলা গদ্যের প্রাথমিক প্রচেষ্টার নিদর্শন হিসেবে স্বীকৃত।

ঝ. প্রাচীন যুগে ব্যক্তিজীবন প্রধান ছিল, ধর্ম নয়। মধ্যযুগে ধর্মটাই মুখ্য হলো, মানুষ হয়ে পড়ল গৌণ। আর আধুনিক যুগে মানুষ মুখ্য হলো এবং মানবতাই হলো একমাত্র কাম্য। সেই সাথে যোগ হলো অন্ধবিশ্বাসের বদলে যুক্তিনির্ভরতা, স্বজাত্যবোধ, স্বদেশপ্রেম, ব্যক্তিস্বাধীনতা। বিশেষ করে নারী-স্বাধীনতা আধুনিক যুগের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। পাশ্চাত্যের শিল্পবিপ্লব আধুনিক জীবনচেতনাকে ভীষণভাবে প্রভাবিত করে, পাশাপাশি সাহিত্যেও এর প্রভাব পড়ে ব্যাপক।

ঞ. ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দে (১৩১৬ বঙ্গাব্দ) কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক এবং পুঁথিশালার অধ্যক্ষ বসন্তরঞ্জন রায় সংবাদ পান যে, পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়া জেলার বনবিষ্ণুপুরের কাছে কাকিল্যা গ্রামে দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় নামক এক ব্রাহ্মণের বাড়িতে কিছু পুরাতন হাতে লেখা পুঁথি আছে। সে বছরই তিনি সেখানে যান এবং ওই ব্রাহ্মণের গোয়াল ঘরে অযত্নে রক্ষিত একরাশ পুঁথির সাথে তিনি এ গ্রন্থটি পান। অযত্নে থাকায় এ পুঁথি অর্থাৎ হাতে লেখা গ্রন্থটির সম্মুখ ও শেষভাগ অসম্পূর্ণ ছিল।

ট. মনসামঙ্গল কাব্যের উল্লেখযোগ্য চরিত্র হলো চাঁদ সওদাগর, বেহুলা, লখিন্দর। পূজা দিতে অস্বীকার করায় চাঁদ সওদাগরকে মনসা দেবী ধনহারা ও তার পুত্র লখিন্দরকে সর্পদংশনে হত্যা করে পুত্রহারা করে। বেহুলা লখিন্দরের নব পরিণীতা। পরে মনসা দেবীর নিকট চাঁদ সওদাগরের নতিস্বীকার ও বেহুলার অদম্য অধ্যবসায়ের বদৌলতে লখিন্দরের পুনর্জীবন ও পুনরায় ধনলাভ ঘটে।

ঠ. বাংলা সাহিত্যের প্রথম বিদ্রোহী লেখক; প্রথম আধুনিক কবি; প্রথম আধুনিক নাট্যকার; অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্তক; বাংলা সনেট বা চতুর্দশপদী কবিতার প্রথম রচয়িতা; প্রথম প্রহসন রচয়িতা; পুরাণকাহিনির ব্যত্যয় ঘটিয়ে আধুনিক সাহিত্যরস সৃষ্টির প্রথম শিল্পী; পাশ্চাত্য ও প্রাচ্যধারার সংমিশ্রণে নতুন ধরনের মহাকাব্য রচয়িতা।

ড. গোলাম মোস্তফা, রক্তরাগ।

ঢ. জহির রায়হান, উপন্যাস।

ণ. নাটক, এর উপজীব্য বিষয় ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



## মডেল প্রশ্ন ০৫

*[দ্রষ্টব্য : প্রত্যেক প্রশ্নের মান প্রশ্নের শেষ প্রান্তে দেখানো হয়েছে।]* নম্বর

১. ক. প্রত্যয়যোগে কিভাবে শব্দ গঠিত হয়, উদাহরণসহ পাঁচটি নিয়ম আলোচনা করুন। ৬

খ. শুদ্ধ করে লিখুন : ১০

১. যশ লাভ করিবার জন্য তাহার আকাঙ্ক্ষা খুব বেশি।
২. সে পূর্বাহ্নে আসিয়া মধ্যাহ্ণ কাটাইয়া সায়াহ্নে চলে গেল।
৩. পরপোকার মনুষত্বের পরিচায়ক।
৪. আবাল্য হইতে তিনি কাব্য প্রিয়।
৫. সে এমন রূপসী যেন অপ্সরী।
৬. বিদ্বাণ মুর্খ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর।
৭. মাতাহীন শিশুর কী দুঃখ?
৮. আমার আর বাঁচার স্বাদ নেই।
৯. দারিদ্রতার মধ্যেই মহত্ব আছে।
১০. সমৃদ্ধশালী বাংলাদেশ আমাদের একান্তভাবে কাম্য।

গ. কোন শব্দটি বানানের কোন নিয়মানুযায়ী গঠিত হয়েছে লিখুন। ৬
অভিষিক্ত, কর্নেল, সৌন্দর্য, জাপানি, প্রতিযোগিতা, ত্রিণয়ন।

ঘ. নিচের প্রবাদটির নিহিতার্থ প্রকাশ করুন : ৬
ধর্মের ঢাক আপনি বাজে।

ঙ. অর্থানুসারে বাক্য কত প্রকার ও কি কি? উদাহরণসহ লিখুন। ৬

২. যে কোনো একটি ভাবসম্প্রসারণ লিখুন : ২০

ক. মুকুট পরা শক্ত, কিন্তু মুকুট ত্যাগ আরো কঠিন।
*অথবা,*
খ. সাহিত্য জাতির দর্পণস্বরূপ।

৩. সারমর্ম লিখুন : ২০

ক. এই সব মূঢ় ম্লান মূক মুখে
দিতে হবে ভাষা; এই-সব শ্রান্ত শুষ্ক ভগ্ন বুকে
ধ্বনিয়া তুলিতে হবে আশা; ডাকিয়া বলিতে হবে—
'মুহূর্ত তুলিয়া শির একত্র দাঁড়াও দেখি সবে;
যার ভয়ে তুমি ভীত সে অন্যায় ভীরু তোমা-চেয়ে,
যখনি জাগিবে তুমি তখনি সে পলাইবে ধেয়ে।
যখনি দাঁড়াবে তুমি সম্মুখে তাহা তখনি সে
পথকুক্কুরের মতো সংকোচে সত্রাসে যাবে মিশে।
দেবতা বিমুখ তারে, কেহ নাহি সহায় তাহার;
মুখে করে আস্ফালন, জানে যে হীনতার আপনার
মনে মনে॥



*অথবা,*

খ. অন্ধকার গর্তে থাকে অন্ধ সরীসৃপ
আপনার ললাটের রতন প্রদীপ
নাহি জানে, নাহি জানে সূর্যালোকলেশ।
তেমনি আঁধারে আছে এই অন্ধ দেশ।
হে দণ্ডবিধাতা রাজা—যে দীপ্ত রতন
পরায়ে দিয়েছ ভালে তাহার যতন
নাহি জানে, নাহি জানে তোমার আলোক।
নিত্য বহে আপনার অস্তিত্বের শোক,
জনমের গ্লানি। তব আদর্শ মহান
আপনার পরিমাপে করি খান-খান
রেখেছে ধূলিতে। প্রভু, হেরিতে তোমায়
তুলিতে হয় না মাথা ঊর্ধ্ব-পানে হায়।
যে এক তরণী লক্ষ লোকের নির্ভর
খণ্ড খণ্ড করি তারে তরিবে সাগর?

৪. অতি সংক্ষেপে নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলোর উত্তর লিখুন : $১^১/_২ \times ২০ = ৩০$

ক. কার সম্পাদনায় কোন সংস্থা থেকে কত সালে চর্যাপদ গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়?
খ. মঙ্গলকাব্যের প্রধান শাখা কয়টি ও কি কি?
গ. মানসিংহ, ভবানন্দ– কোন মঙ্গল কাব্যের চরিত্র?
ঘ. গুল-ই-বকাওলী কাব্যের কবি কে? তিনি কোন শতকের কবি?
ঙ. ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের বাংলা বিভাগের প্রথম অধ্যাপক নিযুক্ত হন কে এবং কবে?
চ. 'প্রভাবতী সম্ভাষণ'-এর রচয়িতা কে? তিনি কি হিসেবে খ্যাত?
ছ. বঙ্কিমচন্দ্রের তিনটি উপন্যাসের নাম লিখুন যে তিনটিকে ত্রয়ী উপন্যাস বলা হয়।
জ. মাইকেল মধুসূদন দত্তের পিতা-মাতার নাম লিখুন।
ঝ. 'বীরাঙ্গনা কাব্য' কে রচনা করেন? এটি কোন শ্রেণীর কাব্য?
ঞ. মীর মশাররফ হোসেনের জন্ম কোথায়, কবে?
ট. Song offerings-এর মূল রচয়িতা কে?
ঠ. নজরুলের জীবনাবসান ঘটে কত সালে, কত তারিখে?
ড. রবীন্দ্রনাথের এপিকধর্মী উপন্যাস কোনটি? তাঁর মোট উপন্যাস সংখ্যা কত?
ঢ. জসীমউদ্‌দীন রচিত উপন্যাসের নাম কি? কত সালে এটি প্রকাশিত হয়?
ণ. আমি কিংবদন্তীর কথা বলছি– কবিতাটির রচয়িতা কে? তাঁর জন্ম কোন জেলায়?
ত. আল মাহমুদের প্রকৃত নাম কি? তাঁর একটি কাব্যের নাম লিখুন।
থ. বাঙালী ও বাংলা সাহিত্য গ্রন্থের রচয়িতা কে? তাঁর জন্ম কোথায়?
দ. 'হাজার বছর ধরে' উপন্যাসের রচয়িতা কে? এ রচনার দুটি চরিত্রের নাম লিখুন।
ধ. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পিতৃদত্ত নাম কি? তিনি ছিলেন মূলত একজন–
ন. একাত্তরের ডায়রী, একাত্তরের দিনগুলি এই দুটি গ্রন্থের রচয়িতা কারা?

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



## উত্তর ♦ মডেল প্রশ্ন : ০৫

১. ক. উদাহরণসহ প্রত্যয়যোগে শব্দ গঠনের পাঁচটি নিয়ম নিচে আলোচনা করা হলো :

i. **'ইনী' প্রত্যয়যোগে শব্দগঠন :** 'ইনী' প্রত্যয়যোগে সাধারণত স্ত্রীবাচক শব্দ গঠিত হয়। এর ফলে শব্দের বানানে পরিবর্তন হয়ে থাকে। যেমন : গৃহ + ইনী = গৃহিণী, প্রণয়ী + ইনী = প্রণয়িনী ইত্যাদি।

ii. **'ইক' (ষ্ণিক) প্রত্যয়যোগে শব্দগঠন :** 'ইক' প্রত্যয় বিশেষ্যকে বিশেষণ করার জন্য ব্যবহৃত হয়। এর ফলে প্রায়ই মূল শব্দের আদি স্বর বৃদ্ধি পায়। যেমন : বিপ্লব + ইক = বৈপ্লবিক, অনুষ্ঠান + ইক = আনুষ্ঠানিক ইত্যাদি।

iii. **'ইত' প্রত্যয়যোগে শব্দগঠন :** 'ইত' প্রত্যয়যোগে গঠিত শব্দের বানান পরিবর্তিত হয় এবং মূল শব্দ সংকুচিত হয়। যেমন : কুসুম + ইত = কুসুমিত, তরঙ্গ + ইত = তরঙ্গিত ইত্যাদি।

iv. **'তা' প্রত্যয়যোগে শব্দগঠন :** 'তা' প্রত্যয় অন্যপদকে বিশেষ্য বা বিশেষণ পদে পরিণত করার জন্যে ব্যবহৃত হয়। যেমন : উর্বর + তা = উর্বরতা, সভ্য + তা = সভ্যতা ইত্যাদি।

v. **'য' প্রত্যয়যোগে শব্দগঠন :** 'য' প্রত্যয় অন্য পদকে বিশেষ্য বা বিশেষণ পদে পরিণত করার জন্যে ব্যবহৃত হয়। যেমন : √ত্যজ্ + য = ত্যাজ্য, √কৃ + য = কার্য ইত্যাদি।

খ. ১. যশোলাভ করার জন্য তার আকাঙ্ক্ষা খুব বেশি।
২. সে পূর্বাহ্নে আসিয়া মধ্যাহ্ন কাটাইয়া সায়াহ্নে চলিয়া গেল।
৩. পরোপকার মনুষ্যত্বের পরিচায়ক।
৪. বাল্য হতেই তিনি কাব্যপ্রিয়।
৫. সে এমন রূপবতী যেন অপ্সরা।
৬. বিদ্বান মূর্খ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।
৭. মাতৃহীন শিশুর কী দুঃখ!
৮. আমার আর বাঁচিবার সাধ নেই।
৯. দরিদ্রতার মধ্যেই মহত্ত্ব আছে।
১০. সমৃদ্ধ বাংলাদেশ আমাদের একান্ত কাম্য।

গ. অভিষিক্ত : (অভি + সিক্ত = অভিষিক্ত) – ষত্ব বিধানের নিয়ম অনুযায়ী ই-কারান্ত উপসর্গের পরবর্তী ধাতুর 'স' 'ষ'-তে পরিবর্তিত হয়েছে।

কর্নেল : বিদেশি শব্দ হওয়ায় 'র'-এর পরে 'ণ' না হয়ে 'ন' হয়েছে।

সৌন্দর্য : (সুন্দর + য = সৌন্দর্য) প্রত্যয় যুক্ত হওয়ায় আদি স্বরের বৃদ্ধি (উ > ঔ) ঘটেছে।

জাপানি : বাংলা একাডেমির প্রমিত বাংলা বানানের নিয়ম অনুসারে 'জাপানি' জাতিবাচক হওয়ায় 'ই' কার হয়েছে।

প্রতিযোগিতা : সংস্কৃত 'প্রতিযোগিন্' (ইন ভাগান্ত) শব্দের সঙ্গে 'তা' প্রত্যয় যোগ হওয়ায় ই-কার হয়েছে।

ত্রিনয়ন : সমাসে পূর্বপদে ঋ, র,ষ থাকলেও পরপদের দন্ত্য 'ন' মূর্ধন্য 'ণ' হয় না।



ঘ. পৃথিবীতে ধর্ম ও অধর্ম বলে দুটি কথা আছে। ধর্ম মানুষকে সঠিক পথে এবং অধর্ম মানুষকে বিপথে পরিচালিত করে। সৎকাজ বা পুণ্যকর্ম যত গোপনেই করা হোক না কেন, অতি অল্প সময়ের মধ্যেই তা জনসাধারণের গোচরীভূত হয়। তদ্রূপ পাপকর্ম অতি গোপনীয়ভাবে করা হলেও তা আপনা আপনি লোকসমাজে জানাজানি হয়ে যায়। কথায় বলে, সত্য কোনোদিন গোপন থাকে না। ধর্ম মেনে চললে স্বার্থত্যাগ করে পরার্থে নিজেকে ব্যাপৃত রাখতে হয়। কিন্তু স্বার্থপরেরা ধর্মকে চাপা দিয়ে স্বার্থান্বেষী হয়ে বিপথে পরিচালিত হয়। কিন্তু সত্যকে চাপা দিয়ে কোনো অসত্যই প্রতিষ্ঠিত হয় না, কপটাচারীর মুখোশ একদিন খসে পড়বেই। কারণ, যা সত্য–তা কোনো আবরণ দিয়ে ঢেকে রাখা যায় না। যা ন্যায় এবং সত্য তা অন্যায় বা অসত্যকে দূরে ঠেলে দিয়ে দিবালোকের মতই উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে। একটা সত্যকে চাপা দিতে হলে বহু মিথ্যার আশ্রয় নিতে হয়। তাই সত্যের জয় অবশ্যম্ভাবী, তা মিথ্যার জাল ছিন্ন করে প্রকাশ পাবেই।

ঙ. অর্থ অনুসারে বাক্য পাঁচ প্রকার। যথা :

১. বিবৃতিমূলক বাক্য, ২. প্রশ্নবোধক বাক্য, ৩. অনুজ্ঞাসূচক বাক্য, ৪. ইচ্ছা বা ইচ্ছাসূচক বাক্য, ৫. আবেগ বা বিস্ময়সূচক বাক্য।

১. বিবৃতিমূলক বাক্য : যে বাক্যে কোনো ঘটনার ভাব বা অবস্থার বিবৃতি থাকে, তাকে বিবৃতিমূলক, বর্ণনাত্মক বা নির্দেশক বাক্য বলে। যেমন : সূর্য পূর্বদিকে উঠে।

২. প্রশ্নবোধক বাক্য : কোনো ঘটনা, ভাব বা অবস্থা সম্বন্ধে কিছু জানবার ইচ্ছা প্রকাশ পেলে, তাকে প্রশ্নবোধক বাক্য বলে। যেমন : কেন দেশের এই দুরবস্থা?

৩. অনুজ্ঞাসূচক বাক্য : যে বাক্যের সাহায্যে কোনো আদেশ, অনুরোধ বা নিষেধ বোঝায়, তাকে ইচ্ছাসূচক বাক্য বলে। যেমন : দয়া করে আমাকে বসতে দিন।

৪. ইচ্ছাসূচক বাক্য : যে বাক্যের সাহায্যে আশীর্বাদ, প্রার্থনা ও ইচ্ছা প্রকাশ করা হয়, তাকে ইচ্ছাসূচক বাক্য বলে। যেমন : আল্লাহ তোমার মঙ্গল করুন।

৫. বিস্ময়সূচক বাক্য : যে বাক্যে আনন্দ, বিরক্তি, ভয়, দুঃখ, ধিক্কার ইত্যাদি মনের আবেগ বোঝায়, তাকে বিস্ময়সূচক বাক্য বলে। যেমন : আহা, কী চমৎকার দৃশ্য!

২. ক. ভাবসম্প্রসারণ : ক্ষমতা অর্জন করা কঠিন। কিন্তু ক্ষমতা থেকে সরে দাঁড়ানো আরো কঠিন। রাজমুকুট ক্ষমতা ও দায়িত্বের প্রতীক। কিন্তু লোভী, ক্ষমতালিপ্সু, উচ্চাকাঙ্ক্ষী মানুষ রাজকীয় ক্ষমতা দখলের জন্য উন্মাদ হয়ে ওঠে। ফলে তার পক্ষে রাজমুকুট ত্যাগ করা কঠিন হয়ে পড়ে। মুকুট পরা অর্থাৎ কোনো জাতি বা সমাজের কর্ণধার হওয়া সহজ ব্যাপার নয়। বিশেষ গুণের অধিকারী না হলে সে দায়িত্ব কেউ পালন করতে পারে না। কঠোর সাধনা ও পরিশ্রমের মাধ্যমে সর্বসাধারণের আস্থাভাজন হতে পারলেই জাতি ও সমাজের নেতৃত্ব দেয়া সম্ভব হতে পারে। পৃথিবীর ইতিহাসে দেখা যায় যারা ক্ষমতায় এসেছিলেন, তাদের বহু সাধনা, শক্তি ও সামর্থ্যের প্রয়োজন হয়েছে। আর ক্ষমতায় আসার পর তার দায়িত্ব ও কর্তব্য আরো কয়েকগুণ বেড়ে যায়। সেসব কর্তব্য শেষ না করা পর্যন্ত ক্ষমতা থেকে সরে যাওয়া মোটেই বাঞ্ছনীয় নয়। প্রকৃত রাজার কাছে রাজমুকুট এক বিশাল দায়িত্ব। কেননা অজস্র ঐশ্বর্যের মধ্যেও তাঁকে বিলাসবিমুখ জীবনযাপন করতে হয়। প্রজাদের সুখ-দুঃখ নিয়েই তার সার্বক্ষণিক চিন্তা। এই

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



দৃষ্টিকোণ থেকে রাজমুকুট পরা এক কঠিন দায়িত্ব। অপরপক্ষে লোভী মানুষ একবার ক্ষমতায় আসতে পারলে তার নেশায় সে মত্ত হয়ে ওঠে। এ ক্ষমতার গৌরব থেকে সে কিছুতেই সরে যেতে চায় না। তখন সে অন্যায়ভাবেও ক্ষমতায় টিকে থাকতে চেষ্টা করে। ক্ষমতা ও ভোগের মায়া ত্যাগ করতে পারে না। কাজেই মুকুট পরা যেমন শক্ত তেমনি মুকুট পরিত্যাগ আরো কঠিন। ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়া নিঃসন্দেহে কঠিন ব্যাপার, কিন্তু তার চেয়েও কঠিন ক্ষমতা ত্যাগ করা। কারণ ক্ষমতায় গেলে মানুষের দায়িত্ব-কর্তব্য বেড়ে যায়, তাছাড়া ক্ষমতার মোহও ক্ষমতা ছাড়তে বাধা দেয়।

*অথবা,*

খ. ভাবসম্প্রসারণ : সাহিত্যের মাধ্যমে একটি জাতির ধ্যান ধারণা ও চিন্তার প্রকাশ ঘটে। আয়নার সামনে দাঁড়ালে আমরা যেমন নিজেদের প্রতিবিম্ব দেখতে পাই, তেমনি সাহিত্যের মধ্যে একটি জাতির সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয়, রাজনৈতিক, রাষ্ট্রীয় তথা সামগ্রিক পরিবেশ ফুটে ওঠে অর্থাৎ জাতি সাহিত্য-দর্পণে নিজেদেরকে যাচাই করার সুযোগ পায়। যে কথাগুলো মানুষের কল্যাণ বর্ধন করে, যা অর্থপূর্ণ, যা শুনলে শ্রোতার মনে জ্ঞানের উদয় হয়, তাই সাহিত্য। সাহিত্য জীবনের সঙ্গে সম্পর্কিত, জীবনের জন্য, জীবনকে নিয়ে, জীবন নির্ভর। Literature is the criticism of life—সাহিত্য জীবন সমালোচনা। সাহিত্য দুর্বল মানুষকে দেয় প্রেরণা, তার সুপ্ত শক্তিকে করে জাগ্রত, দরিদ্রকে করে নির্লোভ, প্রবৃত্তিকে দেয় আনন্দ। সাহিত্যে বিধৃত হয় যুগ পরিবেশ। এক সময় ভারতবর্ষে দ্রৌপদী পাঁচ-স্বামী নিয়ে সংসার বেঁধেছিল, তা সত্ত্বেও সে ছিল সতী, পতিব্রতা। কিন্তু আজকের উপমহাদেশে পাঁচ-স্বামী নিয়ে সংসার যেমন রুচি বিগর্হিত তেমনি কলঙ্কিত। অন্যদিকে রবীন্দ্র-ছোটগল্পের নায়িকারা, উনবিংশ শতাব্দীর নারীদের অধিকাংশ পাঁচ থেকে বারো বছরের মধ্যে সংসার করেছে, ছেলেপুলে নিয়ে সুখী হয়েছে, কুড়িতেই হয়েছে বুড়ি। কিন্তু বর্তমান বাংলা সাহিত্যের নায়িকাদের বয়স বিশ ছাড়িয়ে যাচ্ছে, কুড়িতেও তারা বুড়ি নয়, পঁচিশ-ত্রিশে বিয়ের কথা ভাবছে বড় জোর। আধুনিক সাহিত্যের নায়িকারা রবীন্দ্র নায়িকাদের মতন কলতলা, পুকুর ঘাট, নদীর ঘাট, ফল বাগানে দেখা করে না। তারা পার্কে-রেস্তোরাঁয়, নিউমার্কেটের বিপণী বিতান, ভার্সিটির করিডোরে মিলিত হয়। এভাবে যুগের পরিবর্তনের সাথে সাথে মানুষের জীবনের পরিবর্তনকে সাহিত্য ফুটিয়ে তুলছে। জাতির সামগ্রিক জীবনযাত্রা প্রতিফলিত হচ্ছে সে দর্পণে।

সাহিত্যের পরিধি বিশাল ও ব্যাপক। মানুষের জীবনের বিচিত্র ভাবকে চিত্রিত করে সাহিত্য। সিরাজউদ্দৌলা নাটক থেকে বিশ্বাঘাতক হতে চায় না মানুষ, দেশপ্রেমিক নবাব হতে চায়। রামায়ণ পড়ে সীতার মতো সতীত্বের ঔজ্জ্বল্যে দীপ্তিময় হতে চায় রমনীরা। বিষাদসিন্ধুর ইমাম হাসান, হোসেন ও পৌত্তলিক আজরের প্রাণ বিসর্জন মানুষকে করে উদ্দীপ্ত। লিও টলস্টয়ের 'ওয়ার অ্যান্ড পীসে' যুদ্ধ নয় শান্তিই বড় হয়ে ওঠে। সাহিত্য নিষ্ঠুর অত্যাচারী মানুষের বিরুদ্ধে সংগ্রামের বাণী উচ্চারণ করে। ভলটেয়ার, রুশোর সাহিত্য স্বেচ্ছাচারী ফরাসি রাজশক্তির বিরুদ্ধে গণমনকে চেতনাদীপ্ত, অনুপ্রাণিত করেছে। ম্যাক্সিম গোর্কির সাহিত্য জারের শাসনের মৃত্যু ঘণ্টা বাজিয়েছিল। বিদ্রোহী কবি নজরুল ব্রিটিশ শাসকের শোষণ থেকে দেশকে মুক্ত করার জন্য বলে উঠেছিলেন–



'শিকল পরা ছল
মোদের এই শিকল পরা ছল'

এমনিভাবে সাহিত্যে জাতির সমসাময়িক গৌরব ও উন্নতি অবনতির কাহিনি বিধৃত হয়। প্রেম-ভালবাসা, ত্যাগ, যুদ্ধ, হিংসা, জয়-পরাজয়, ব্যক্তিত্ব, নীতিহীনতা, উদারতা, ক্ষমা সবই সাহিত্যের বিষয়। সাহিত্য জীবন সম্পর্কে দেয় সত্যতম, গভীরতম ধারণা।

৩. ক. সারমর্ম : অত্যাচারে পর্যুদস্ত ও হতাশাগ্রস্ত দুঃখী মানুষের দুঃখ ও অগৌরব দূর করার জন্য চাই নব শক্তির দীক্ষা ও অনুপ্রেরণা। তাহলেই অন্যায় ও অত্যাচারের অপশক্তির বিরুদ্ধে তাদের ঐক্যবদ্ধ, সংগঠিত ও অনুপ্রাণিত করা সম্ভব হবে। ঐক্যবদ্ধ জনতার সম্মিলিত প্রতিরোধ ও তীব্র ঘৃণার সামনে অত্যাচারীর পরাজয় অনিবার্য।

*অথবা,*

খ. সারমর্ম : রত্নভাণ্ডার এই দেশ তার ঐশ্বর্য ভুলে অজ্ঞানতার অন্ধকার ও দুঃখ-গ্লানিতে আচ্ছন্ন। বিশাল ঐতিহ্য ভুলে তা বিভেদের আবর্তে নিমগ্ন। ঐতিহ্যবোধ ও ঐক্যচেতনার শক্তিতেই এই দেশ যথার্থ গৌরব পুনরুদ্ধারে সক্ষম হবে।

৪. ক. হরপ্রসাদ শাস্ত্রী; বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে ১৯১৬ সালে।
খ. ২টি; পৌরানিক মঙ্গল কাব্য ও লৌকিক মঙ্গল কাব্য।
গ. অন্নদামঙ্গল কাব্যের।
ঘ. নওয়াজিস খান, সতের শতক।
ঙ. উইলিয়াম কেরি, ১৮০১ সালের মে মাসে।
চ. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, বাংলা গদ্যের জনক হিসেবে খ্যাত।
ছ. আনন্দমঠ, দেবী চৌধুরাণী, সীতারাম।
জ. রাজনারায়ণ দত্ত, জাহ্নবী দেবী।
ঝ. মাইকেল মধুসূদন দত্ত, পত্রকাব্য।
ঞ. কুষ্টিয়া জেলার কুমারখালী থানার লাহিনীপাড়া গ্রামে ১৮৪৭ সালে।
ট. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
ঠ. ১৯৭৬ সালের ২৯ আগস্ট।
ড. গোরা, ১৩টি।
ঢ. বোবা কাহিনী, ১৯৬৪ সালে।
ণ. আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ, বরিশালে।
ত. মীর আবদুস শুকুর আল মাহমুদ। সোনালী কাবিন।
থ. আহমদ শরীফ, চট্টগ্রামে।
দ. জহির রায়হান; টুনি, মন্তু।
ধ. প্রবোধ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, তিনি ছিলেন মূলত একজন কথাসাহিত্যিক।
ন. একাত্তরের ডায়রী– সুফিয়া কামাল।
একাত্তরের দিনগুলি– জাহানারা ইমাম।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

# মডেল প্রশ্ন

# বাংলা দ্বিতীয় পত্র

## মডেল প্রশ্ন ০১

দ্রষ্টব্য : প্রত্যেক প্রশ্নের মান প্রশ্নের শেষ প্রান্তে দেখানো হয়েছে।

১. অনুবাদ (ইংরেজি থেকে বাংলা) লিখুন : ১৫

The value of man's life is measured not by the number of years he has lived, but by the number of good deeds he has done. A man may live a longer life without doing any noble task for the good of the world. But such life is useless and such man is forgotten as soon as he dies. But a man who does noble work for the benefit of mankind lives in the memory of the people even long after his death, though he may live a short life here. The great men like Jesus Christ, the great Prophet (sm) and Vivekananda died young, but they are still remembered with great reverence on account of their noble deeds.

উত্তর : পৃষ্ঠা ৪০১।

২. কাল্পনিক সংলাপ লিখুন : ১৫

ক. দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি নিয়ে দুই বান্ধবীর সংলাপ।

উত্তর : পৃষ্ঠা ৪৩৯।

*অথবা*

খ. বইমেলা নিয়ে দুই বন্ধুর মধ্যে সংলাপ।

উত্তর : পৃষ্ঠা ৪৪৩।

৩. যে কোনো একটি বিষয়ে পত্র লিখুন : ১৫

ক. ফসলি জমিতে ইটভাটা স্থাপনের অনুমতি প্রদান না করার অনুরোধ জানিয়ে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক বরাবর একটি আবেদনপত্র লিখুন।

উত্তর : পৃষ্ঠা ৪৫৯।



খ. বিশেষ প্রয়োজনে তিন দিনের ছুটি ও কর্মস্থল ত্যাগের আবেদন জানিয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে একটি আবেদনপত্র লিখুন।

উত্তর : পৃষ্ঠা ৪৬৩।

গ. আপনার ইউনিয়নে একটি পাঠাগার স্থাপনের জন্য জেলা প্রশাসকের নিকট একখানা আবেদনপত্র লিখুন।

উত্তর : পৃষ্ঠা ৪৬৬।

৪. গ্রন্থ-সমালোচনা করুন যে কোনো তিনটি : ৩ × ৫ = ১৫

ক. শ্রীকৃষ্ণকীর্তন; খ. আলালের ঘরের দুলাল; গ. নীল-দর্পণ; ঘ. গীতাঞ্জলি; ঙ. কমলাকান্তের দপ্তর।

উত্তর : পৃষ্ঠা ৫২৫, ৫৩১, ৫৭২, ৫৮৬, ৬০০।

৫. যে কোনো একটি বিষয়ে রচনা লিখুন : ৪০

ক. তথ্যপ্রযুক্তি ও বাংলাদেশ

উত্তর : পৃষ্ঠা ৫৬৩।

খ. বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থা : সমস্যা ও সমাধান

উত্তর : পৃষ্ঠা ৬৯১।

গ. যুদ্ধাপরাধীদের বিচার ও বাংলাদেশ

উত্তর : পৃষ্ঠা ৪২০।

ঘ. বাংলাদেশের প্রাকৃতিক দুর্যোগ

উত্তর : পৃষ্ঠা ৭৩৮।

ঙ. বিশ্বায়ন ও আমাদের সংস্কৃতি

উত্তর : পৃষ্ঠা ৬০৩।

## মডেল প্রশ্ন ০২

দ্রষ্টব্য : প্রত্যেক প্রশ্নের মান প্রশ্নের শেষ প্রান্তে দেখানো হয়েছে।

১. অনুবাদ (ইংরেজি থেকে বাংলা) লিখুন : ১৫

Although religion doesn't inhabit the acquistion of wealth, and it doesn't hold up large fortune an evil. The tenor of its teaching, by and large, is to induce an attitude of indifference to wordly things, things which gratify one's lover self and keep one engrossed in money making. The student should be made to realise that the real good of life are spiritual, love of things of the so spirit and service of one's fellow men. Joy is in ordered disciplined life. These are blessing which money cannot buy. What is wealth before such things of spirit? Of all religious teachers Jesus Christ has dealt more comprehensively than any other with the problem of wealth in all its aspects. With only four words, "Blessed are the poor" he changed altogether the values which man attached to human existence and human happiness and acquisition and possession of

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



wealth. Real bliss consisted, he taught, not in riches nor in anything else which the world regarded as prosperity or felicity, but in the joy and happiness derived from being at peace with one's fellow men through perfect store, fellowship, selfless service and sacrifice.

উত্তর : পৃষ্ঠা ৪০৪।

২. কাল্পনিক সংলাপ লিখুন। ১৫

ক. সংস্কৃতি ও অপসংস্কৃতি নিয়ে দুই বন্ধুর সংলাপ।

উত্তর : পৃষ্ঠা ৪৪৪।

*অথবা*

খ. বাবা এবং ছেলের মধ্যে পড়াশোনা নিয়ে সংলাপ।

উত্তর : পৃষ্ঠা ৪৪৭।

৩. যে কোনো একটি বিষয়ে পত্র লিখুন : ১৫

ক. ব্যাংকে 'সিনিয়র অফিসার' পদে চাকরির জন্য উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের বরাবর একটি আবেদনপত্র লিখুন।

উত্তর : পৃষ্ঠা ৪৫৮।

খ. বাংলাদেশে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মোৎসব পালনের বিবরণ দিয়ে প্রবাসী বন্ধুকে একটি পত্র লিখুন।

উত্তর : পৃষ্ঠা ৪৭৬।

গ. আপনার এলাকার রাস্তা সংস্কারের আবশ্যকতা বর্ণনা করে স্থানীয় সংসদ সদস্যের উদ্দেশ্যে একটি স্মারকলিপি রচনা করুন।

উত্তর : পৃষ্ঠা ৪৮৫।

৪. গ্রন্থ-সমালোচনা করুন যে কোনো তিনটি : ৩ × ৫ = ১৫

ক. পদ্মাবতী; খ. বৌঠাকুরাণীর হাট; গ. বিষাদ-সিন্ধু; ঘ. নেমেসিস; ঙ. নকশী কাঁথার মাঠ।

উত্তর : পৃষ্ঠা ৫২৮, ৫৩৪, ৫৩৬, ৫৭৮, ৫৯৪।

৫. যে কোনো একটি বিষয়ে রচনা লিখুন : ৪০

ক. মাদকাসক্তি ও বিপন্ন ভবিষ্যৎ প্রজন্ম

উত্তর : পৃষ্ঠা ৫৫৩।

খ. বাংলা সাহিত্যে দেশপ্রেম

উত্তর : পৃষ্ঠা ৬৪৬।

গ. বাংলাদেশের সমাজকাঠামো পরিবর্তনে মুক্তিযুদ্ধ

উত্তর : পৃষ্ঠ ৬৮৭।

ঘ. শিশুশ্রম ও বাংলাদেশের শিশু শ্রমিক

উত্তর : পৃষ্ঠা ৭২৫।

ঙ. মানবসম্পদ উন্নয়নে শিক্ষা

উত্তর : পৃষ্ঠা ৭০৩।



## মডেল প্রশ্ন ০৩

১. অনুবাদ (ইংরেজি থেকে বাংলা) লিখুন : ১৫

Twentieth century marked a turning point in our realisation for protection of mankind. It was evident more than ever before that advancement in science in the form of rapid industrialisation has given rise to severe atmospheric degradation. Emission of Green House Gases (GHGs) into the atmosphere of our planet Earth; due to unabated race for growth and development by developed economies, is the root cause of global warming. Developed as well as developing nations are now facing increased natural calamities like cyclones, floods, droughts etc. being caused due to global warming induced climate change. Climate change incidences have become global concerns for the whole of mankind. For addressing this, global leaders resolved under the auspices of United Nations to reduce emissions of GHGs to minimize global warming which, in its turn will help protect mankind from adverse impacts of climate change. Bangladesh and other coastal and island nations are most vulnerable to climate change in extreme events. As such, Bangladesh, along-with other climate vulnerable developing nations should move all UN bodies to make developed economies to cut GHGs emissions to required levels for a cooler planet, Earth.

উত্তর : পৃষ্ঠা ৪০৯।

২. কাল্পনিক সংলাপ লিখুন : ১৫

ক. ব্যায়াম করার উপকারিতা নিয়ে দুই বন্ধুর মধ্যে সংলাপ।

উত্তর : পৃষ্ঠা ৪৫০।

*অথবা*

খ. বিনা বেতনে অধ্যয়নে সুযোগ-প্রার্থনা করে একজন ছাত্রের কলেজ অধ্যক্ষের সাথে সংলাপ।

উত্তর : পৃষ্ঠা ৪৫২।

৩. যে কোনো একটি বিষয়ে পত্র লিখুন : ১৫

ক. আপনার এলাকায় পানীয় জলের অভাব দূরীকরণের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট একটি আবেদনপত্র রচনা করুন।

উত্তর : পৃষ্ঠা ৪৬৪।

খ. আপনার প্রয়োজনীয় কিছু বই ডাকযোগে ভিপিপি করে পাঠানোর অনুরোধ জানিয়ে কোনো পুস্তক ব্যবসায়ীর নিকট একটি পত্র লিখুন।

উত্তর : পৃষ্ঠা ৪৯৪।

গ. যুবসমাজের নৈতিক অবক্ষয় রোধের উপায় সম্পর্কে মতামত জানিয়ে সংবাদপত্রের চিঠিপত্র কলামে একটি পত্র লিখুন।

উত্তর : পৃষ্ঠা ৫০৭।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



৪. গ্রন্থ-সমালোচনা করুন যে কোনো তিনটি : ৩ × ৫ = ১৫

ক. লাইলী-মজনু; খ. ক্রীতদাসের হাসি; গ. পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়; ঘ. বনলতা সেন; ঙ. দেশে-বিদেশে।

উত্তর : পৃষ্ঠা ৫২৯, ৫৪৯, ৫৮৩, ৫৯৩, ৬০২।

৫. যে কোনো একটি বিষয়ে রচনা লিখুন : ৪০

ক. বিশ্ব জলবায়ু পরিবর্তন ও বাংলাদেশ

উত্তর : পৃষ্ঠা ৭৫৭।

খ. ভাষা আন্দোলনভিত্তিক বাংলা সাহিত্য

উত্তর : পৃষ্ঠা ৬৬৮।

গ. বাংলাদেশের লোকশিল্প

উত্তর : পৃষ্ঠা ৬১২।

ঘ. সড়ক দুর্ঘটনা : নিরাপদ সড়ক চাই

উত্তর : পৃষ্ঠা ৫৫৭।

ঙ. তথ্যবিপ্লবে ইন্টারনেট

উত্তর : পৃষ্ঠা ৫৬৮।

## মডেল প্রশ্ন ০৪

দ্রষ্টব্য : প্রত্যেক প্রশ্নের মান প্রশ্নের শেষ প্রান্তে দেখানো হয়েছে।

১. অনুবাদ (ইংরেজি থেকে বাংলা) লিখুন : ১৫

Providing enough energy to meet an ever-increasing demand is one of the gravest problems the world is now facing. Energy is the key to an industrialized economy, which calls for a doubling of electrical output every ten to twelve years. Meanwhile, the days of cheap abundant and environmentally acceptable power may be coming to an end. Coal is plentiful but polluting, natural gas is scarce, oil is not found everywhere. Nuclear power now appears costly and risky. In many countries of the world, keen interest is being shown in new energy sources. Among the familiar but largely undeveloped sources, solar energy, geothermal energy and energy from the ocean deserve special consideration.

উত্তর : পৃষ্ঠা ৪১১।

২. কাল্পনিক সংলাপ লিখুন :

ক. বিজ্ঞান ও বিজ্ঞান-মনস্কতা বিষয়ে শিক্ষক ও ছাত্রের মধ্যে সংলাপ।

উত্তর : পৃষ্ঠা ৪৩৮।

*অথবা*

খ. গ্রীষ্মের ছুটিতে কোথায় বেড়াতে যাওয়া হবে তার পরিকল্পনা নিয়ে দুই বান্ধবীর সংলাপ।

উত্তর : পৃষ্ঠা ৪৪৩।



৩. যে কোনো একটি বিষয়ে পত্র লিখুন : ১৫

ক. আপনার এলাকায় একটি ব্রিজ নির্মাণের জন্য কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন জানিয়ে একটি পত্র লিখুন।

উত্তর : পৃষ্ঠা ৪৬৮

খ. 'একুশের বই মেলা' সম্পর্কে জানিয়ে প্রবাসী বন্ধুকে একটি পত্র লিখুন।

উত্তর : পৃষ্ঠা ৪৭৭

গ. বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি পালনের প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করে সংবাদপত্রে একটি পত্র লিখুন।

উত্তর : পৃষ্ঠা ৫১০

৪. গ্রন্থ-সমালোচনা করুন যে কোনো তিনটি : ৩ × ৫ = ১৫

ক. কপালকুণ্ডলা; খ. সূর্য-দীঘল বাড়ী; গ. রক্তাক্ত প্রান্তর; ঘ. মেঘনাদবধ কাব্য; ঙ. আত্মজা ও একটি করবী গাছ।

উত্তর : পৃষ্ঠা ৫৩২, ৫৫৩, ৫৮০, ৫৮৫, ৬০৩।

৫. যে কোনো একটি বিষয়ে রচনা লিখুন : ৪০

ক. বাংলাদেশের পরিবেশ সমস্যা এবং এর সমাধান

উত্তর : পৃষ্ঠা ৭৩১।

খ. সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয়

উত্তর : পৃষ্ঠা ৫২৭।

গ. সাহিত্য ও জাতীয় চেতনা

উত্তর : পৃষ্ঠা ৬৫৭।

ঘ. আইনের শাসন ও বাংলাদেশ

উত্তর : পৃষ্ঠা ৪৪৬।

ঙ. বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য

উত্তর : পৃষ্ঠা ৬০৯।

## মডেল প্রশ্ন ০৫

দ্রষ্টব্য : প্রত্যেক প্রশ্নের মান প্রশ্নের শেষ প্রান্তে দেখানো হয়েছে।

১. অনুবাদ (ইংরেজি থেকে বাংলা) লিখুন : ১৫

National Budget of a country is the annual program of the Government's expenditure and income for a fiscal year. In a developing economy like Bangladesh, the annual national budget reflects the government's development philosophy, priorities and approaches towards equity and social justice. The role of the public sector to provide infrastructure and basic public goods is to create an enabling environment for the private sector to act as the engine of economic growth through the national budget. As the national budget formulated annually may undermine the economic stability and growth prospect in the medium term, it seems to be myopic. Medium Term Budgetary Framework (MTBF) is an effective measure for redressing the problems emanating from the short time limit of the annual budget. The framework of

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)



MTBF must be inclusive and bottom up to reach Bangladesh in a trajectory of highperforming quality growth with prices of commodities stabilized, income and human poverty brought to a minimum, health and education for all secured and capacity building combined with creativity enhanced, social justice established, interpersonal and regional income disparity reduced, and a capacity to tackle the adverse effects of climate change achieved as envisioned in the Government's Outline Perspective Plan (2010-2021).

উত্তর : পৃষ্ঠা ৪২৯

২. কাল্পনিক সংলাপ লিখুন : ১৫

ক. ভবিষ্যৎ জীবন নিয়ে দুই পরীক্ষার্থী বন্ধুর সংলাপ।

উত্তর : পৃষ্ঠা ৪৪০

অথবা,

খ. চিকিৎসক ও রোগীর সংলাপ।

উত্তর : পৃষ্ঠা ৪৪১

৩. যে কোন একটি বিষয়ে পত্র লিখুন : ১৫

ক. আপনার এলাকায় জলাবদ্ধতার প্রতিকার প্রার্থনা করে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের জন্য একটি প্রতিবেদন প্রস্তুত করুন।

উত্তর : পৃষ্ঠা ৪৬১

খ. জাতীয় বৃক্ষরোপণ সপ্তাহ পালনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আলোকপাত করে বন্ধুকে একটি পত্র লিখুন।

উত্তর : পৃষ্ঠা ৪৮০

গ. যানজট নিরসন সম্পর্কে সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্য পত্রিকা সম্পাদকের নিকট একটি পত্র রচনা করুন।

উত্তর : পৃষ্ঠা ৫১৬।

৪. গ্রন্থ-সমালোচনা করুন যে কোনো তিনটি : ৩ × ৫ = ১৫

ক. গৃহদাহ; খ. হাঙ্গর নদী গ্রেনেড; গ. কিত্তনখোলা; ঘ. একেই কি বলে সভ্যতা; ঙ. বন্দী শিবির থেকে।

উত্তর : পৃষ্ঠা ৫৩৮, ৫৬৫, ৫৮৪, ৫৭১, ৫৯৭।

৫. যে কোনো একটি বিষয়ে রচনা লিখুন : ৪০

ক. বাংলাদেশের পাটশিল্পের ভবিষ্যৎ

উত্তর : পৃষ্ঠা ৪৬১

খ. পার্বত্য শান্তিচুক্তি : প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া

উত্তর : পৃষ্ঠা ৪৫৫

গ. নারী উন্নয়ন ও ক্ষমতায়ন

উত্তর : পৃষ্ঠা ৭১৩

ঘ. বাংলাদেশের ভূমিকম্প : বিপর্যয় ব্যবস্থাপনা

উত্তর : পৃষ্ঠা ৭৫২

ঙ. বাংলাদেশের সমাজ কাঠামো পরিবর্তনে মুক্তিযুদ্ধ।

উত্তর : পৃষ্ঠা ৬৮৭